মাসিক বসুমতী

৮ম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

(১৩৩৬ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত)

সম্পাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
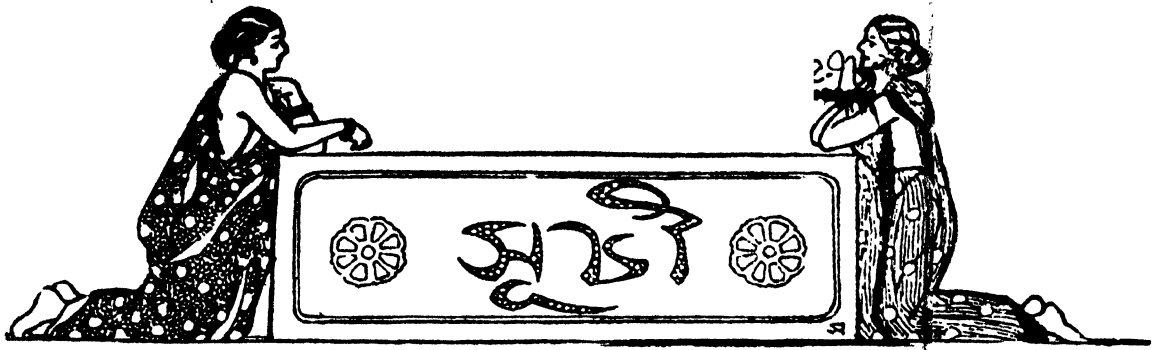
৮ম বর্ষ] ১৩৩৬ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত [২য় খণ্ড

বিষয়ের নামানুক্রমিক সূচী

লেখকগণের নামের বর্ণানুক্রমিক সূচী

চিত্রসূচী

চন্দনচর্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী,
কেলি-চলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিত-গণ্ডযুগল-স্মিতশালী।—জয়দেব।

বসুমতী-চিত্রবিভাগ]　　　　[শিল্পী—শ্রীঠাকুর সিং

ভর দিয়া দাঁড়ান প্রভৃতি, এই সকল ক্রিয়াকেই কায়িক অভিনয় বলিয়া আলঙ্কারিকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অনুকরণীয় পাত্র বা পাত্রীর—বক্তব্য বাক্যের সদৃশ বাক্যের উচ্চারণকে বাচিক অভিনয় বলা যায়।

অনুকরণীয় শ্রীরাম জানকী প্রভৃতির তাৎকালিক বেশ ও পরিচ্ছদাদির সদৃশ বেশ পরিচ্ছদাদির যে ধারণ, তাহাকে আহার্য্য অভিনয় বলা যায়।

অনুকরণীয় পাত্র বা পাত্রীর যে সাত্ত্বিক অবস্থা অর্থাৎ স্তব্ধতা, রোমাঞ্চ, ঘর্ম্ম, স্বরভঙ্গ, গাত্রকম্পন, মুখাদির বিবর্ণতা, অশ্রুবর্ষণ ও মোহ—এই অবস্থা শিক্ষা-কৌশল দ্বারা যদি অভিনেতারও হয়—তাহা হইলে তাহাকে সাত্ত্বিক অভিনয় বলা যায়।

এই চারি প্রকার অভিনয় যদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তাহা হইলে সহৃদয় শ্রোতৃবর্গের অন্তঃকরণ সেই অভিনয় দেখিতে দেখিতে যে সাত্ত্বিক অবস্থাকে প্রাপ্ত হয়, তাহাই হইল রসাস্বাদের পূর্ব্ব অবস্থা। এই অবস্থার স্বরূপ বর্ণন করিতে যাইয়া আলঙ্কারিকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে।"

অর্থাৎ মনোনিবেশ করিয়া অভিনয় দেখিতে আরম্ভ করিবার পরে দর্শকগণের—অনুকার্য্য অর্থাৎ রামাদি, অনুকারক অর্থাৎ নট নটী প্রভৃতির এবং অভিনয়-দর্শক-সহৃদয়-গণের মধ্যে যে পরস্পর ভেদ আছে, সেই ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন যে অভিনয় করিতেছে, সে আমা হইতে ভিন্ন—এইরূপ বোধও লুপ্ত হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, সে যে প্রকৃত রামচন্দ্রাদি হইতে ভিন্ন এবং সেই রাম-চন্দ্রাদিও যে তাহা হইতে ভিন্ন, এরূপ জ্ঞান সহৃদয় দর্শকগণের তৎকালে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

রঙ্গমঞ্চের উপর যে সকল অভিনয়-ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, এরূপ জ্ঞানও থাকে না, এবং তাহা যে আমারই বা আমা হইতে ভিন্ন, রামচন্দ্র প্রভৃতিরই এরূপ জ্ঞানও তখন উৎপন্ন হয় না। শুধু তাহাই নহে, সেই অভিনয়-ক্ষেত্রে দর্শকগণের মধ্যে যত নরনারী বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগেরও পরস্পরের মধ্যে যে কোন প্রকার ভেদ আছে, তাহারও জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়। তুমি, আমি, রাম, শ্যাম, গোপাল এ সকলেরই ব্যক্তিগত রামত্ব শ্যামত্ব তুমিত্ব আমিত্ব বা গোপালত্ব বুদ্ধিও সে সময় বিলোপ প্রাপ্ত হয়। সহৃদয়তা এবং রসাস্বাদনসামর্থ্য এবং অভিনেয় কাব্যের উৎকৃষ্টতা আর তার সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতৃ পুরুষ বা স্ত্রীর শিক্ষাভ্যাস-জনিত অপূর্ব্ব অভিনয়-কৌশল যখন পরস্পরে মিলিত হইয়া এক অননুভূতপূর্ব্ব—বিচিত্র—বর্ণনাতীত—সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে একটা বিরাট্ অখণ্ড একীভাবকে সৃষ্টি করে, সেই একীভাবময় অবস্থার যে অনু-ভূতি এবং সেই অনুভূতিনিবন্ধন যে চিত্তের দ্রবীময় ভাব, ইহারই নাম সত্ত্বোদ্রেক বা 'সাধারণীকরণ'। এই 'সত্ত্বো-দ্রেক' যখন উপস্থিত হয়—তখনই বুঝিতে হইবে যে, অভি-নয় জমিয়া গিয়াছে—এইবার রসাস্বাদ হইবে।

রসের আস্বাদ বা রসরূপ আস্বাদ যাহার হয়, তাহার পক্ষে সে সময় রসাস্বাদের অনুকূল বস্তু ব্যতিরিক্ত অন্য কোন বস্তুর জ্ঞান থাকে না। সে আপনার ব্যক্তিত্বকে ভুলিয়া যায়, 'আমি অমুকের পুত্র' বা 'অমুক আমার পুত্র,' 'আমি ব্রাহ্মণ' বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য অথবা শূদ্র—এ জ্ঞানও তাহার সে সময় থাকে না, ঐশ্বর্য্যের—পাণ্ডিত্যের—আভি-জাত্যের অভিনয় তাহার হৃদয় হইতে সে সময়ে অন্তর্হিত হয়। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তাহার তাৎকালিক মনোবৃত্তির বিষয় হয় না। তাহার সকল ইন্দ্রিয় যেন একীভূত হইয়া সেই সত্ত্বোদ্রেকযুক্ত মনোমধ্যে মিশিয়া যায়, তাহার মনই দেখে, মনই শুনে, মনই আঘ্রাণ করে, মনই স্পর্শ করে। সে যাহা দেখে, সে যাহা শুনে, সে যাহা স্পর্শ করে, সে যাহা ঘ্রাণ করে ও সে যাহা আস্বাদন করে—তাহার কিছুই বর্ত্ত-মানের নহে, তাহার কোনটাই ভবিষ্যতের নহে, সে তখন সুদূর অতীতের স্বপ্নময় রাজ্যে প্রবেশ করে। রঙ্গমঞ্চ তাহার নিকটে অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। সে দেখে—সেই পঞ্চবটী-কানন, সেখানে গভীর কাননের নিভৃত বেতস-কুঞ্জের ছায়া বক্ষে করিয়া কল-কলধ্বনিতে খরতর বেগে স্বচ্ছশীতসলিলা গোদাবরী অবিশ্রান্ত গতিতে লহরীমালা পূরিয়া সমুদ্রের দিকে ছুটিতেছে। সে দেখে—লতাকুঞ্জের উপরিভাগে ময়ূর-ময়ূরী বসিয়া আছে। তাহাদিগের মুখে কেকাধ্বনি নাই, সমুন্নত শালবৃক্ষের উপর কপোত-কপোতী স্থির হইয়া বসিয়া আছে; সেই গোদাবরীতীরে শিলাফলকে উপবিষ্ট নবজলধরশ্যামল কোমলাঙ্গ অশ্রুভারসিক্ত বিশাল

নয়ন শূন্যদৃষ্টি সেই রামচন্দ্রের দিকে তাহাদের নেত্র আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে, শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয়মধ্যে বিক্ষুব্ধ শোক-সমুদ্রের তরঙ্গাবলীর ন্যায় বিরহ-কাতর উক্তিনিচয় তাহার কর্ণে অথবা কর্ণভাবাবিষ্ট মানসে মধ্যে মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, পার্শ্বে অবনতবদনে দণ্ডায়মান সৌমিত্রির বিষণ্ণ উদার মুখ-মণ্ডলের চিত্র তাহার অন্তঃকরণে মুহুর্মুহুঃ প্রতিফলিত হই-তেছে; তাহার হৃদয়ে যে সকল কোমল মনোবৃত্তি তৎকালে উৎপন্ন হইতেছে, তাহারই মালা গাঁথিয়া সে যেন তখন সেই কল্পনাময় রামচন্দ্রের গলায় পরাইয়া দিতেছে। তাহার অভিলাষ, তাহার আবেগ, তাহার উৎকণ্ঠা, তাহার দীনতা, তাহার উন্মাদনা—সকলই যেন তাহার মনঃকল্পিত রামহৃদয়ে তৎকালে সমুৎপন্ন সদৃশবৃত্তিনিচয়ের প্রতিচ্ছবি হইয়া পড়ি-তেছে, রামের দেখা, রামের শোনা, রামের ভাবনা, রামের বাসনা, রামের আবেগ, রামের বিবেক তাহারই হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল বাহিরের বস্তু বা উদ্দীপন আর ভিতরের বস্তু যে সঞ্চারিতভাব, সেগুলি যেন তখন সজীব হইয়া উঠিয়াছে। মৈথিলীর প্রতি—রামচন্দ্রের যে প্রগাঢ় প্রেম, তাহার সহিত মিলিয়া তাহার জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত প্রীতিময় বাসনা তখন এক হইয়া আনন্দময়, বিস্ময়ময় নবজীবন লাভ করিয়া যেন তাহার হৃদয়ের সকল অংশ অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

এই ভাবে আলম্বন, উদ্দীপন, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারি-ভাব প্রভৃতি সব মিলিয়া যেন এক হইয়া এক অখণ্ড আনন্দ-ময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার সম্মুখীন হইয়াছে। এই অপূর্ব্বভাব-নিচয়ের আনন্দময় আস্বাদনের প্রবলবন্যায় তাহার পরিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব ভাসিয়া গিয়াছে, এই আস্বাদন বা এই চমৎকারময়—প্রসাদময়—আনন্দময়—অলৌকিক অনুভূতি হইল রসাস্বাদ বা রস। এই রসানুভূতির সৌভাগ্য যাহার ভাগ্যে ঘটে—তাহাকেই আলঙ্কারিকগণ সহৃদয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সহৃদয়গণের এই অলৌকিক আনন্দময় রসা-স্বাদের পরিচয়প্রসঙ্গে 'সাহিত্য-দর্পণ'কার লিখিয়াছেন—

"সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডশ্চ প্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ।
লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ।
স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥"

সহৃদয়গণের (পূর্ব্ববর্ণিত) সত্ত্বোদ্রেক হইবার পর রসাস্বাদ হয়, এ আস্বাদের বিষয় অনেক হইলেও ইহা অখণ্ড বা ভাগহীন, রসের অনুকূল সব বিষয়গুলি একই সময়ে একই জ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়া, ঐ সকল বিষয়ের এক অখণ্ড জ্ঞানময়তা হইয়া যায়, সুতরাং সে আস্বাদনকে অখণ্ড বলা যায়। শুধু তাহাই নহে—সে আস্বাদ দুঃখের আস্বাদ নহে, শোকের বা বিষাদের আস্বাদ নহে, এ আস্বাদ এক কথায় বলিতে গেলে চিদানন্দস্বরূপই হইয়া থাকে; এ আস্বাদনে বেদ্য হইতে বেদনের অর্থাৎ জ্ঞেয় হইতে জ্ঞানের কোন পার্থক্য থাকে না, ইহা সবই যেন চৈতন্যময়। রসের অনুকূল বস্তু ছাড়া অন্য কোন বস্তুই এ আস্বাদের বিষয় হয় না, এক কথায় বলিতে গেলে যোগিগণের নির্ব্বিকল্প সমাধিতে প্রকাশমান সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অনুভূতির সহিত ইহা সম্পূর্ণ-রূপে সদৃশ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, ইহার অন্য দৃষ্টান্ত বা উপমা সম্ভবপর নহে; বাহ্য বস্তুনিচয়ের সর্ব্বথা অপলাপকারী ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মতে যেমন 'নীল' জ্ঞানের 'নীল' হইতে কোন পার্থক্য নাই, 'নীল' জ্ঞানেরই আকার—বাহ্যবস্তুর আকার নহে, কিন্তু তাহা জ্ঞানেরই আকার, জ্ঞান হইতে অভিন্ন, সেইরূপ এ রসা-স্বাদের বিষয়নিবহ হইতে ইহার কোন পার্থক্যই অনুভূত হয় না, এই বিষয় ও বিষয়ী, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, মাতা ও মেয়, সব যেন এক হইয়া এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দঘন রসাস্বাদে পরিণত হয়। এই রসাস্বাদকে লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন এক জন আলঙ্কারিক যথার্থই বলিয়াছেন—

"পুণ্যবন্তঃ প্রমিণ্বন্তি যোগিবদ্ রসসন্ততিম্।"

সহৃদয়গণের হৃদয়ে এইরূপ রসাস্বাদ যাহার কাব্য হইতে হয়, তিনিই হইলেন যথার্থ কবি; তাঁহারই লেখনীধারণ সার্থক, তিনিই অমর, তাই আগ্নেয়পুরাণেও কথিত হইয়াছে—

"নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা॥"

এ সংসারে মানবজন্ম বড়ই দুর্লভ, আবার সেই মানুষের মধ্যে বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানলাভও একান্ত দুর্লভ, আবার সেই সকল বিদ্বান্‌গণের মধ্যে কবি হওয়াও একান্ত দুর্লভ, শুধু কবিতা লিখিয়াই কবি হওয়া যায় না, এইরূপ রসবিতরণ করিবার শক্তিশালী কবি হওয়াই এ সংসারে একান্ত দুলভ। [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

গর্ব্ব ও জ্ঞান
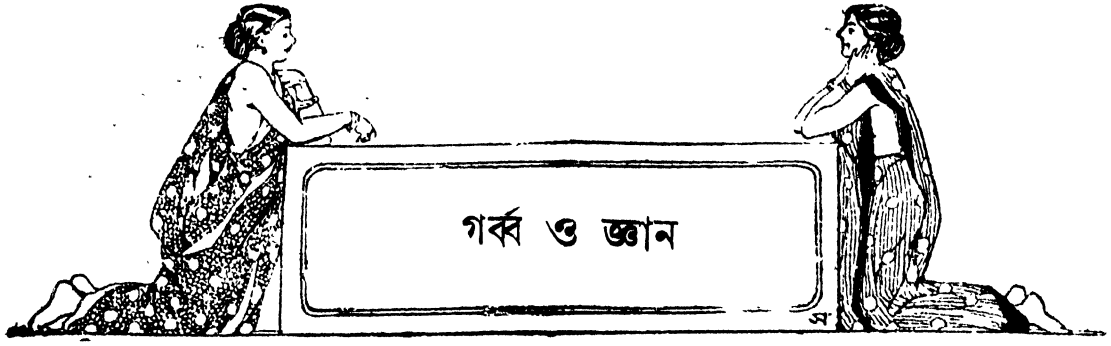
"বৌমা, কোথায় গেলে গা ?"

বৃদ্ধ শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য বহির হইতে হাঁক দিয়া একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ, পরণে একখানি মোটা খদ্দরের কাপড়, গায়ে খদ্দরের উত্তরীয়, মুখে শুভ্র বিপুল গোঁফ দাড়ি, ওষ্ঠে স্নেহপূর্ণ হাস্য, পদদ্বয় নগ্ন।

গলার সাড়া পাইবা মাত্র সুরলতা রান্নাঘরেই তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া ফেলিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিল। বৃদ্ধ গুরুদেবের মুখের পানে চাহিবা মাত্র তাহার বুকে আনন্দ ও মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। গলায় অঞ্চল দিয়া সুরলতা গুরুর চরণে প্রণাম করিল। সম্মুখের বারান্দায় তাঁহাকে বসাইয়া এক ঘটী জল আনিয়া গুরুর ধূলিধূসরিত চরণ ধুইয়া দিতে উদ্যত হইল। বৃদ্ধ মধুর হাসিয়া সুরলতার হাত হইতে ঘটী লইয়া বলিলেন—"সাত রাজ্যের ধূলা পায়ে জড় হয়েছে; মা লক্ষ্মীর কোমল হাতে কি এ সব আবর্জ্জনা যায়, মা!"

বলিয়া আপনার পদপ্রক্ষালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

পরে সুরলতার ক্ষুব্ধ মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"এক বাল্‌তি জল এনে দাও, মা—এক ঘটী জলে যে এ পায়ের আধখানাও ভাল ক'রে পরিষ্কার হবে না, মা!"

বলিয়া সরল স্নিগ্ধ হাস্যে সে স্থানটি পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সে হাসিতে ও সেই মা সম্বোধনে সুরলতার মনের ক্ষোভ অনেকখানি কমিয়া গেল।

সুরলতা অঞ্চল দিয়া মেঝে মুছিয়া সেখানে একখানি আসন বিছাইয়া দিল। গুরুদেব ক্যাম্বিসের ব্যাগ হইতে গামছাখানি বাহির করিয়া পা দুইখানি বেশ করিয়া মুছিয়া আসনের উপর সমাসীন হইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি বাড়ীর সকলের ও সে অঞ্চলের অনেকের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন। তাহার স্বামী নরেন্দ্রের চাকুরীর অবস্থা কেমন, দেবর মহেন্দ্র কেমন পড়াশুনা করিতেছে, তাহার ননদ কুমুদিনী কেমন আছে,—চিঠি পত্র লেখে কি না, পাশের বাড়ীর সেই ছেলেটি, যে গতবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারায় খুব কাঁদিয়াছিল, সে এবার উত্তীর্ণ হইয়াছে কি না, সেই কালো গাইয়ের বাছুরটি কেমন হইয়াছে, দরজার পাশে সেই যে বুড়া কুকুরটি চুপটি করিয়া শুইয়া থাকিত, তাহাকে তো এবার দেখিতে পাইতেছেন না—ইত্যাদি।

পরে বলিলেন, "এবার তুমি যাও মা—যা করছিলে কর গে। তুমি একটু সরষের তেল পাঠিয়ে দাও, মা; আমি চট্ ক'রে গঙ্গাস্নানটা সেরে নিই। তার পর মায়ে-পোয়ে সারা দুপুর গল্প করব্‌খ'ন।"

এমন সময় অষ্টাদশ বর্ষীয় এক সুন্দর স্বাস্থ্যবান্ যুবক আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

গুরুদেব স্মিতহাস্যে কহিলেন, "এই যে মহেন্দ্র এয়েছ, বাবা! তোমার কথা এই বলছিলাম। কেমন পড়াশুনো করছ, বাবা? শরীর ভাল তো? ব্যায়াম করছ তো? সেটি রোজ করা চাই, বাবা!"

মহেন্দ্র সবিনয়ে বলিল যে, সবই সে যথাসাধ্য বজায় রাখিয়াছে। আর আজ কাল কুস্তি ও লাঠি খেলাও শিখিয়াছে।

প্রসন্ন হাস্যে গুরুর মুখমণ্ডল ভরিয়া গেল। তিনি বলিলেন—"বেশ করেছ, এই তো চাই, বাবা।"

ইহারই মধ্যে সুরলতা ছোট একটি কাচের বাটিতে তেল আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া দিল ও গুরুর আদেশে আবার রান্নাঘরে ফিরিয়া গেল।

মহেন্দ্র বলিল, "গঙ্গাস্নানে যাবেন? আমি সঙ্গে যাব?"

"বেশ ত, চল না। তেলটা মেখে নিই; তুমিও মাখ।"

তেলমাখা সুরু হইল। গুরুদেব খুব ডলিয়া তেল মাখিতে মাখিতে বলিলেন—"সরষের তেল শরীরের পক্ষে অমৃত। খুব ডলে তেল মাখ্‌বে,—তাতে লজ্জা নেই। আজকাল তোমাদের সাবান মাখা যে পরিমাণে বেড়েছে, তেল মাখাও সেই পরিমাণে কমে গেছে। সাবান আমাদের দেশে মাঝে মাঝে মাখ্‌লেই যথেষ্ট—না মাখ্‌লেও ক্ষতি নেই।"

মহেন্দ্র কলেজে পড়ে; কুস্তি লড়িলেও কত সৌখীন ছেলের সঙ্গে মেশে। তাই একবার সবিনয়ে বলিল—"সাবানে কিন্তু গায়ের ময়লা দূর হয়।"

গুরুদেব বলিলেন, "তা হয় বটে। কিন্তু যারা কুস্তি লড়ে, ব্যায়াম করে—তাদের ময়লা দূর করবার জন্য সাবানের অপেক্ষায় ব'সে থাক্‌তে হয় না। ব্যায়ামের সময় যে ঘাম হয়, তাতেই লোমকূপ সাফ হয়ে ময়লা কোথায় চ'লে যায়। আমাদের দেশে যখন সাবানের চলন হয় নি, তখন বেসম আর সর মিশিয়ে শরীর পরিষ্কার করবার ব্যবস্থা ছিল। মাঝে মাঝে হলুদও মাখা হ'ত। সে সব ব্যবস্থা আজকাল প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে।"

কথায় কথায় তেল মাখা শেষ হইল। দু'জনে গামছা কাঁধে ফেলিয়া দুইখানি শুষ্ক বস্ত্র সঙ্গে লইয়া স্নানে বাহির হইলেন। মহেন্দ্র দুই জনেরই বস্ত্র লইয়া চলিল; গুরুদেবকে কিছুতেই বস্ত্র বহিতে দিল না।

গঙ্গায় পৌঁছিয়া দুজনে বেশ করিয়া স্নান করিয়া লইলেন ও মাঝ-গঙ্গা পর্য্যন্ত সাঁতার কাটিলেন। তার পর জলে আবক্ষঃ নিমজ্জিত হইয়া নিমীলিতনেত্রে যুক্তকরে পড়িতে লাগিলেন:—

"দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে,
ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে,
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে॥
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাত-
স্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং,
ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্‌॥"

ধীরে মধুর স্বরে গুরুদেব সমস্ত স্তোত্রটি গাহিয়া গেলেন। পুরাতন পরিচিত স্তোত্র, কিন্তু ঐকান্তিকী ভক্তির মধুরতার সহিত তাহা উচ্চারিত হইতেছিল।

"তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ,
পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।
নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে,
কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে॥"

শুনিয়া সত্যই মনে হইল যে, গঙ্গাস্মরণে তাঁহার সারা জীবনের সমস্ত কলুষ ধুইয়া মুছিয়া গেল।

"রোগং শোকং পাপং তাপং,
হর মে ভগবতি কুমতিকলাপম্‌।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে,
ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে॥"

এমনই পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও দৃঢ় ভক্তির সহিত তিনি ঐ স্তোত্র পড়িয়া গেলেন যে, মনে হইল, তিনি কলুষবিনাশিনী জাহ্নবীকে একমাত্র গতি জানিয়া তাঁহার শরণ লইলেন।

স্তব শেষ হইলে দুই জনে জল হইতে উঠিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিলেন ও ধৌত বস্ত্র লইয়া গৃহের দিকে যাত্রা করিলেন।

নরেন্দ্র সবেমাত্র মুখ ধুইয়া চায়ের বাটি লইয়া বসিয়াছে, এমন সময় গুরুদেব স্নান করিয়া ফিরিলেন।

চায়ের বাটি কোনমতে নামাইয়া নরেন্দ্র তাড়াতাড়ি প্রণামটা সারিয়া লইল।

গুরুদেব আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"তুমি এই বুঝি উঠ্‌লে, নরেন!"

নরেন আম্‌তা আমতা করিয়া বলিল—"আজ রবিবার, তাই—"

"সকালে ওঠাই ভাল বাবা, শরীর ভাল থাকে।" —বলিয়া গুরুদেব জপে বসিলেন।

২

সিদ্ধেশ্বর দ্বিপ্রহরে আসিয়া নরেনকে ডাকিল—"তিনি আজ এসেছেন; যদি দেখ্‌তে চাও, শীগ্‌গির চল।"

আহারাদির পর নরেন্দ্র সবেমাত্র শয্যায় একটু গা গড়াইবার যোগাড় করিতেছিল, এমন সময় সিদ্ধেশ্বর আসিয়া দেখা দিল।

নরেন্দ্র উঠিয়া বসিয়া কহিল, "এস হে সিধু, ব'স।"

সিদ্ধেশ্বরের বাড়ী বালিতেই, নরেনের সঙ্গে এক আফিসে কায করে।

নরেন্দ্র পুরাতন পদ্ধতিতে সাধারণ গুরুর কাছে মন্ত্র লইয়াছিল। মন্ত্র লইবার তাহার কোনই আগ্রহ ছিল না। কারণ, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য গায়ত্রীজপ করিবারই অবসর তাহার ঘটিয়া উঠিত না। কেবল স্ত্রীর অত্যধিক আগ্রহ ও অনুরোধে সে একসঙ্গে মন্ত্র লইয়াছিল। সিদ্ধেশ্বর সে কথা যখন শুনিল, তখন নরেন্দ্রের আত্মার অবমাননায় অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বলিল, "বড় ভুল করেছ, নরেন, আজকালকার দিন কি চোখ বুজিয়া একটা ক্রিং কি ছ্রিং কাণে ভরিয়া লওয়া আমাদের পোষায়?"

নরেন্দ্র একটু লজ্জিত হইলেও মুখে বলিয়াছিল, "চুপ ষ্টুপিড, গুরুনিন্দা করিস্ না।"

সিধু বলিয়াছিল, "এ নিন্দা নয়—স্বরূপ বর্ণনা। তবে তিনি এলে তোকে এক দিন দেখাব, তা হ'লে ত তোর কোন পাতক হবে না।"

নরেন্দ্র হাসিয়া বলিয়াছিল—"বোধ হয় হবে না।"

আজ সেই গুরুর আগমন শুনিবার পর তাহার গৃহে যে তাহার আপনার গুরুর আগমন হইয়াছে, সে কথা নরেন্দ্র আর মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। কামিজের উপর একটা চাদর জড়াইয়া নরেন্দ্র সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল।

নরেন্দ্র সিদ্ধেশ্বরের গুরুকে এই প্রথম দেখিল। বেশ সুপুরুষ। বয়স দেখিলে চৌত্রিশ পঁইত্রিশ বলিয়া মনে হয়, সুখী ও সৌখীন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। পরিচ্ছদের বিশেষত্ব আছে—সব শুভ্র ও রেশমের তৈয়ারি। জুতা যোড়াটি পর্য্যন্ত সাদা রেশম দিয়া মোড়া। অতি শুভ্র শয্যার উপর সম্মুখে শ্বেতপাথরের পাত্রে কতকগুলি যূঁই, বেল ফুল লইয়া বসিয়া আছেন। ফুলের মিষ্ট গন্ধে সমস্ত কক্ষটি আমোদিত।

সিদ্ধেশ্বরের অনেকগুলি বন্ধু সেখানে বসিয়া আছে; দুই এক জন প্রৌঢ়ও আসিয়াছেন। সম্মুখের অপর একটি কক্ষে চিকের আড়ালে মহিলারা বসিয়াছেন;—মাঝে মাঝে ফিস্ ফিস্ শব্দে তাহা বুঝা যাইতেছে।

সিদ্ধেশ্বর আসিতেই নবীন গুরু বলিলেন, "এসেছ সিধু! তোমার অপেক্ষায় আমরা কায আরম্ভ করতে পারিনি।"

সিদ্ধেশ্বর একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "আমার এই বন্ধুটিকে ডাক্‌তে গিয়ে একটু দেরী হয়ে গেল। আপনার কথা শুনে আপনাকে একবার দেখবার জন্য এর বড় আগ্রহ ছিল, তাই খবরটা দিতে গিয়েছিলাম।"

গুরু একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বন্ধুটির নাম কি হে?"

"নরেন্দ্র।"

"বল কি,—একেবারে গৃহদাহের নায়ক। হাঁ৷ হে নরেন্দ্র, আমার ভেতর দেখবার কি এমন আছে, যার জন্য তুমি দেখতে উৎসুক হয়েছিলে? সিধু যা বলেছে, তা বিশ্বাস কোরো না। যেমন বেশী রৌদ্র চোখে লাগলে মানুষের দৃষ্টি ঠিক থাকে না, তেমনি বেশী প্রেম বা বেশী ভক্তি থাকলে মানুষের বোঝবার শক্তি কমে যায়; সিধুর শেষোক্ত অবস্থা হয়েছে।"

সিধু লজ্জিতভাবে মাথা নীচু করিয়া বলিল—"আজ্ঞে, আমি ত একা নই—বাঙ্গালা দেশের কে আপনাকে না জানে? আমি না হয় আপনার শিষ্য, আপনার শিষ্য নয় অথচ আপনার গুণানুরক্ত এমন লোকেরও ত অভাব নেই। আপনার প্রেমাশ্রমে ত শিষ্য অশিষ্য কত লোকই আসে, কে আপনার ভক্ত না হয়ে ফেরে!"

নবীন গুরু কৃত্রিম কোপের সহিত বলিলেন,"Naughty boy! তুমি ক্রমশঃ আমার একটা চলন্ত ও জীবন্ত বিজ্ঞাপন হয়ে পড়্‌ছ দেখছি। ওহে নরেন, আমি তোমারই মত একটা মানুষ মাত্র—তার বেশী নই। Shakespeareএর ভাষায় বল্‌তে গেলে Fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer. অর্থাৎ আমিও তোমার মত মানুষ—আঘাতে কাঁদি, সুখে হাসি। একই রোগে ভুগি, একই ঔষধে আরোগ্য হই—ইত্যাদি।"

তার পর কার্য্য আরম্ভ হইল। কার্য্য আর বিশেষ কিছু নহে—সক্রেটিস্ কি জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, এপিক্‌টেটাসের উক্তির মধ্যে কতখানি সত্য নিহিত আছে, সত্যই ধর্ম্ম—সে হিসাবে মেটারলিঙ্কের লেখার মধ্যে কি পরিমাণে ধর্ম্ম পাওয়া যায়, রামায়ণে যুক্তি না থাকিলেও কতখানি ভক্তি আছে, এই সব আলোচনা চলিল।

পরে গুরু বলিলেন—"একটা কথা এ সময়ে আমাদের

ভুল্‌লে চল্‌বে না। বহু বহু বৎসর পূর্ব্বেকার রচিত রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি কাব্য হিসাবে বেশ সুন্দর—কিন্তু শুধু তাই নিয়ে এখন আর জীবনযাত্রা চল্‌বে না। এখানে যেখানে যা সত্য পাব, তাই আমাদের কুড়ুতে হবে। এখন শুধু গৌতম বা জৈমিনিই যে আমাদের ঋষি, তা নন, ইমার্শনের চরণতলেও এখন আমাদের বস্‌তে হবে। যেখানে যা ভাল জিনিষ পাব, তাই আমাদের আহরণ করতে হবে। নিজের যেটা খারাপ, সেটা তোমাকে খারাপই বল্‌তে হবে—যেটা ভাল, শুধু তাকেই ভাল বল্‌তে হবে। গীতা নিয়ে আজ সবাই উন্মত্ত। গীতা কি না—যুদ্ধবিমুখ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের চতুর চেষ্টা। তাই হ'ল উচ্চ ধর্ম্মগ্রন্থ। সে গ্রন্থের মূল্য আছে স্বীকার করি, কিন্তু সে ধর্ম্ম হিসাবে নয়।"

এক জন সবিনয়ে বলিল—"তা হ'লে ধর্ম্মের জন্য আমরা কোথায় যাব ?"

নবীন গুরু বলিলেন—"বলেছি ত, সত্যের সন্ধানে। দেশ-বিদেশের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস থেকে খণ্ড খণ্ড সত্য আহরণ কর্‌তে হবে; সেই খণ্ড সত্যের সমষ্টিই হবে আমাদের ধর্ম্ম। আর এক ধর্ম্ম হবে ঐকান্তিক প্রেম। তার সন্ধান পাবে বৈষ্ণব-কবিতায়। কৃষ্ণভক্ত কেউ তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ক'রে বল্‌বেন—এ দেহের কবিতা নয়, এ আত্মার। নীতিবাগীশ বল্‌বেন, এ লালসা, বিষবৎ পরিত্যজ্য। এ কাব্য অর্থাৎ রসাত্মক বাক্য হ'তে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম নয়। কারও কথা এখানে সত্য নয়। দু'দল দু'ধারে চ'লে গেলেন, সত্য রইল প'ড়ে মাঝখানে। এ লালসা বটে, প্রেমও বটে। লালসাই হচ্ছে আসক্তি, লালসাতেই প্রেমের জন্ম,—যেমন পঙ্কে পদ্ম। ঐকান্তিক প্রেম কি ? না আমি আর কিছু চাই নে, —সংসার নয়, স্বামী নয়, পুত্র নয়;—আমি চাই শুধু তোমাকে। এমন নইলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় ?" বলিয়া গুরু গাহিলেন—

"বঁধু সে তুমি আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি　　তোমারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান॥
পীরিতি-রসেতে　　ঢালি তনু মন
দিয়েছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি,　　তুমি মোর গতি,
মন নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া　　ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া　　কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥"

নবীন গুরুর পাণ্ডিত্যের আতসবাজিতে পুরুষ ভক্তগণ মোহিত হইয়া পড়িল। সঙ্গীতের মাধুর্য্যে চিকের আড়ালের সবাই মুগ্ধ হইল !

ইহার পর গুরু কিয়ৎক্ষণ তন্ময় হইয়া রহিলেন। এ দিকে সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইল। গুরুকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া নরেন্দ্র এবার উঠিল। নবদৃষ্ট এই গুরুর পাণ্ডিত্য, তাঁহার কণ্ঠের মধুর স্বর ভাবিতে ভাবিতে সে গৃহে ফিরিল। কি গভীর জ্ঞান! বৈষ্ণব কবি হইতে শরৎচন্দ্র, সক্রেটিস্ হইতে মেটারলিঙ্ক, কিছুই তাঁহার অজানা নাই। নরেন্দ্র একবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

ঘরে ফিরিয়া নরেন্দ্র দেখিল, প্রদীপের আলোকে তাহাদের বৃদ্ধ গুরুদেব কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেছেন। আর মহেন্দ্র ও সুরলতা মুগ্ধ হইয়া তাহাই শুনিতেছে।

দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া সে শুনিল—গুরু পড়িতেছেন—

"এত যদি শ্রীরাম বলিলেন সীতারে।
যোড়হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে॥
কি কার্য্য আমার রঘুনাথ এ জীবনে।
প্রবেশ করিব অগ্নি তোমার বচনে॥
পরীক্ষা দিলাম পূর্ব্বে দেব-বিদ্যমানে।
দেবেরা বলিল যাহা শুনিলে আপনে॥
দেশেতে আনিলা তুমি দিয়া যে আশ্বাস।
অকস্মাৎ মোরে কেন দিলা বনবাস॥
মহাদেবী হইয়া মুনির ঘরে বসি।
ফল-মূল খাই আমি, নিত্য উপবাসী॥
পতিকুলে পিতৃকুলে নাহি পাই স্থান।
অগ্নিতে পরীক্ষা দিয়া কর অপমান॥
ব্রহ্মা বলিলেন যত শুনিলে আপনি।
মহারাজ আসি কত বুঝালে কাহিনী॥
সাক্ষাতে শুনিলে তুমি পিতার বচন।
তবে সে আমারে লইয়া দেশে আগমন॥

কুলবধূ যত নারী সেই থাকে ঘরে।
সভাতে পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে॥
সর্ব্বগুণ ধর তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া পরীক্ষা নিতে হয় ত উচিত॥
অদেখা হইব প্রভু ঘুচাব জঞ্জাল।
সংসারের সাধ নাহি যাইব পাতাল॥
আজি হৈতে ঘুচুক তোমার লাজ-দুঃখ।
আর যেন নাহি দেখ জানকীর মুখ॥
নিরবধি অপবাদ দিতেছ আমারে।
সভায় পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে॥
জন্মে জন্মে প্রভু মোর তুমি হও পতি।
আর কোন জন্মে মোর ক'রো না দুর্গতি॥
ইহা কহিলেন সীতা সভা-বিদ্যমানে।
মেলানি মাগিনু প্রভু তোমার চরণে॥"

বৃদ্ধ গুরু কৃত্তিবাসের এই অমর গাথা গাহিতেছেন, আর তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। শ্রোতা দুই জনও ঘন ঘন চক্ষু মুছিতেছে।

কিন্তু এই সরল ভক্তির দৃশ্য নরেন্দ্রের মনে একটুও রেখাপাত করিল না। সে ভাবিল, সিধুর গুরু ও তাহার গুরুতে কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ! কোথায় সক্রেটিস্, ইমার্সন, শরৎচন্দ্র, চণ্ডিদাস, আর কোথায় পয়ার ছন্দে রচিত বাঙ্গালায় লেখা অত্যন্ত সাদাসিদা রামায়ণ! হায় ভাগ্য!

৩

নবীন গুরুর নাম শুভ্রানন্দ।

ধীরে ধীরে নরেন্দ্র শুভ্রানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে তাঁহার আশ্রমে একবার গেল। সেখানে গিয়া দেখিল, কত শিক্ষিত লোক তাঁহার শিষ্য, তাহার মধ্যে কত গৃহী শিষ্য—যেমন হাঁসপাতালের outdoor patient, তাহারা সংসারে স্ত্রী-পুত্র লইয়া থাকে, কেবল দুঃখে পড়িলে, সন্দেহ উপস্থিত হইলে, উপদেশ লইতে হইলে গুরুর কাছে উপস্থিত হয়। আর কতকগুলি বিরাগী শিষ্য—যেমন indoor patient—তাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া আশ্রমের কাযে লাগিয়া আছে। নরেন্দ্র অপূর্ব্ব বিস্ময়ে দেখিল, পতিতের প্রতি শুভ্রানন্দের ঘৃণা নাই, পতিতার প্রতিও তাঁহার অগাধ প্রেম। এমন কত যুবতী সেখানে আছে, যাহারা প্রলোভনে পড়িয়া গৃহ ছাড়িয়া আসিয়া আর গৃহে ফিরিবার পথ খুঁজিয়া পায় নাই। তাহাদের গুরু সদয়-হৃদয়ে আশ্রয় দিয়াছেন। আবার ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ কোন কোন গৃহবঞ্চিতাকে বিবাহ করিবার অনুমতি পাইয়াছে, তাহাদের নাম হইতেছে বিরাগি-গৃহী।

এক দিন সে আপনাকে আর সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিল—"আমাকে দীক্ষা দিন।"

শুভ্রানন্দ বলিলেন—"তোমার দীক্ষা ত হয়েছে। আর তোমাকে ত আমি উপদেশ দিতে ত্রুটি করি না।"

নরেন্দ্র তবু জিদ করিয়া বসিল, সে মন্ত্র লইবে; কারণ, উপদেশ পাইলেও অনেক সময়ে সে যেন আপনাকে অনেকটা পর মনে করে। সে প্রেমাশ্রমের একবারে আপনার জন হইতে চাহে।

শুভ্রানন্দ বলিলেন—"তা হ'লে সস্ত্রীক দীক্ষা লও।" দিনস্থিরও তিনি করিয়া দিলেন। শরতের শুভারম্ভে শুভ্রাকাশে যখন শ্বেত বলাকাশ্রেণী উড়িবে, নদীর দুই ধারে যখন শুভ্র কাশকুসুমের তরঙ্গ বহিয়া যাইবে, কঠিন ভূমিতল যখন কোমল শুভ্র শেফালীর বন্যায় ছাইয়া যাইবে, সেই সময়ে শারদীয়া পূর্ণিমার দিন তাহাদের দীক্ষা হইবে।

সুরলতাকেও স্বামীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে রাজী হইতে হইল।

ক্রমে সেই দিন আসিল। প্রভাতেই শুভ্রানন্দের শুভাগমন হইল। দ্বিপ্রহর হইতে দীক্ষাদানের আয়োজন চলিল। পাঁচ প্রকার শুভ্র প্রাণীর মাংস, যথা—শুভ্র ছাগ, শুভ্র মেষ, শ্বেতবর্ণ পারাবত, হংস ও ইলিশ মাছ। ইহার সহিত পাঁচ প্রকার অমল-ধবল অন্ন। দুইটি বন্ধু, স্বামী, স্ত্রী ও গুরু এই পাঁচ জনে ইহা ভোজন করাই ব্যবস্থা।

সন্ধ্যায় যখন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল, শুভ্রানন্দ স্বহস্তে তিনটি পাত্রে এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত করিলেন। নির্জ্জন অঙ্গনে তিনি নরেন্দ্র ও সুরলতাকে ডাকিয়া আনিলেন। ভাবী শিষ্যযুগলের হাতে শুভ্র কাচপাত্রে পরিপূর্ণ পানীয় দিয়া বলিলেন—"তোমরা শুভ্র পূর্ণচন্দ্রের পানে একবার এক দৃষ্টে তাকাও—একবার মনে কর, ঐ চন্দ্রের সমস্ত জ্যোৎস্না তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, তার পর ঐ পানীয় ধীরে ধীরে পান কর।"

বলিয়া শুভ্রানন্দ পূর্ণচন্দ্রের পানে চাহিয়া আপনার

পাত্র-পূর্ণ পানীয় এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলেন। প্রথমে নরেন্দ্র, পরে সুরলতা ধীরে ধীরে তাঁহার আদেশ পালন করিল।

শুভ্রানন্দ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে দুই জনের মুখের পানে চাহিলেন। নরেন্দ্র বিহ্বল হইয়া পড়িল। কয়েকবার দুলিয়া শুভ্রানন্দের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। শুভ্রানন্দ দক্ষিণ হস্তে তাহাকে বুকের কাছে উঠাইয়া লইলেন ও সেই রকম দৃষ্টিতে সুরলতার পানে চাহিলেন। সুরলতার সমস্ত শরীর দুলিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, শুভ্রানন্দের বক্ষ, বাহু, চরণ তাহাকে যেন প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছে। তাহার ভয় হইল, বুঝি সে-ও তাহার স্বামীর মত শুভ্রানন্দের পায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। মনে মনে সুরলতা গুরুদেবকে স্মরণ করিল। মনে মনে বলিল, 'ঠাকুর, আমায় রক্ষা কর।' গুরুদেব যে মন্ত্র তাহার কাণে কাণে বলিয়া দিয়াছিলেন, মনে মনে সে তাহা জপ করিতে লাগিল। কোথা হইতে সুরলতার দেহে মনে বল আসিল। তাহার দেহ আর দুলিল না; শুভ্রানন্দের দেহ তাহাকে আর আকর্ষণ করিতে পারিল না।

শুভ্রানন্দ বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিলেন। পরাজয়ে তিনি বিরক্ত হইলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তে সে ভাব দমন করিয়া নরেন্দ্রকে লইয়া তিনি আপনিই সুরলতার দিকে অগ্রসর হইলেন। বলিলেন—"শরতের পূর্ণিমা-রজনী সৌন্দর্য্যের উৎস। এই সৌন্দর্য্য ধরণীর বুকে আনন্দের ঢেউ তোলে। এই আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের মাঝে তোমাদের দুজনকে আমি মন্ত্র দিলাম;—সে মন্ত্র সৌন্দর্য্য ও আনন্দ। তোমরা সুন্দর ও সৌন্দর্য্য বিতরণ কর; নিজে আনন্দ পাও ও অপরকে আনন্দ বিলাও।"

তার পর একটু থামিয়া বলিলেন—"এবার চল, তোমরা কিছুক্ষণ আমার কাছে বস্‌বে।"

অন্তঃপুরের একটি কক্ষ এই উপলক্ষে সুসজ্জিত রাখা হইয়াছিল। শুভ্রানন্দ আসিয়া আপনার পৃথক্ শুভ্র কোমল আসনে বসিলেন। নরেন্দ্র ও সুরলতা শুভ্রানন্দের দক্ষিণ দিকে একখানি আসনে দুই জনে পাশাপাশি বসিল। শুভ্রানন্দের আশীর্ব্বাদেই হউক আর পানীয়ের মাহাত্ম্যেই হউক, সুরলতার সঙ্কোচ কিছু কমিয়া গিয়াছিল।

শুভ্রানন্দ বুঝাইতেছিলেন—"আত্মা নিত্য, আত্মা সত্য, আত্মা মুক্ত। আত্মার পাপ নাই, পুণ্য নাই—কোন বন্ধন নাই। ক্রমশঃ এই চিন্তা কর্‌বে—এই আত্মাই তুমি, আত্মা একটা ধার করা জিনিষ নহে, তুমিই আত্মার বিকাশ; তোমার এই পুষ্পপুট তুল্য অধর, সুন্দর বাহু, চারু নেত্র ইহা আত্মারই অভিব্যক্তি। অপরূপ সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি এই দেহকে ক্লেশ দিলে আত্মাকেই ক্লেশ দেওয়া হবে। দেহকে আদর করিলে আত্মারই সমাদর; দেহের কল্যাণেই আত্মার কল্যাণ।"

শুভ্রানন্দ আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় "কৈ গো বৌমা, কোথায় গেলে" বলিয়া বৃদ্ধ কুলগুরু শ্যামাচরণ সেই কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ ঝটিকার আঘাতে যেন উৎসবের দীপমালা চঞ্চল হইয়া নির্ব্বাণোন্মুখ হইল। শুভ্রানন্দের মুখে ভ্রুকুটি ফুটিল, ভক্তদ্বয় বিচলিত হইল, নরেন্দ্র একটা অস্বোয়াস্তি ভোগ করিতে লাগিল, সুরলতা লজ্জায় অধোবদন হইল।

ভক্তদ্বয়ের মধ্যে সিধু এক জন, সে চুপি চুপি শুভ্রানন্দকে বলিল, "এই নরেনের পুরাতন গুরু।"

গায়ে একখানা মোটা চাদর জড়ানো, খালি পা, হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ—গুরুর এই মূর্ত্তি দেখিয়া সৌখীন গুরু শুভ্রানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়, নমস্কার! উপবেশন করুন—না কি আসন পরিগ্রহ করুন বল্‌ব? আপনি ভীত হবেন না, আপনাদের উপজীবিকার উপর আমি হস্তক্ষেপ করছি না। আপনারা শুধু—আপনাদের অর্থভাণ্ডের কল্যাণের জন্য শিষ্যালয়ে আগমন করেন, আমি এদের আত্মার কল্যাণের জন্য যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা ক'রে থাকি। তার জন্য ক্ষুব্ধ হবেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় আপনারা যদি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত না হয়ে ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত দুই-ই হতেন, তা হ'লে কোন ভাবনা থাকৃত না।"

বৃদ্ধ গুরু প্রথমে ব্যাপারটা প্রণিধান করিতে না পারিয়া অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়াছিলেন; পরে ব্যাপার বুঝিয়া শান্তমুখে বলিলেন, "ঠিক বলেছ, বাবা, ব্রাহ্মণ যদি আমরা হ'তাম, তা হ'লে আবার ভাবনা? তা হ'লে কোথায় থাক্‌ত আমাদের গর্ব্ব, কোথায় থাক্‌ত বিলাসিতা!"

কথাটা শুনিয়া শুভ্রানন্দ চট্ করিয়া উত্তর দিতে পারিলেন না; কারণ, কথাটা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া যে বলা হইয়াছিল, তাহা ঠিক বুঝা গেল না—সাধারণ প্রসঙ্গ উপলক্ষ করিয়া—না তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া?

শুভ্রানন্দ চটিয়া গেলেন। বলিলেন, "আপনাদের মত গুরুদের জন্যই দেশ উৎসন্ন যেতে বসেছে। শুধু কাণে ছুটো মন্ত্র দিয়ে আর প্রণামীটা আদায় করেই কারও কর্ত্তব্য শেষ হয় না।"

গুরু প্রশান্ত মুখে বলিলেন, "ঠিক বলেছ বাবা! গুরুর কর্ত্তব্য শুধু তাতে শেষ হয় না নয়, তাতে আরম্ভও হয় না। তুমি বাবা, শিক্ষিত দেখ্‌ছি। ওঁদেরও ত শিক্ষিত মনে হচ্ছে—কিন্তু আমার মাকে এমন কষ্ট দিয়ে বসিয়ে রেখেছ কেন? আর যে দৃষ্টিতে সবাই মায়ের পানে চেয়ে রয়েছ, সে ত সন্তানের চক্ষের দৃষ্টি নয়। তুমি যত কলুষের নাম করেছ, তার মধ্যে এর চেয়ে বড় কলুষ ত একটাও নেই, বাবা।"

সিধু ও অপর ভক্ত সত্যই সুরলতার পানে বারে বারে চাহিতেছিল। তাহারা ভয়ানক চটিয়া গেল। সিধু নরেনের পানে চাহিয়া বলিল, "কি হে নরেন, মন্ত্রের দিনেই গুরুকে অপমান কর্‌তে সুরু কর্‌লে! ওঁর কাছে মন্ত্র নেওয়া তোমাদের মত পৌত্তলিকের উচিত হয় নি।"

নরেন্দ্র বড়ই লজ্জিত হইল। গুরুর পানে চাহিয়া বলিয়া ফেলিল, "আপনি এখন অন্য ঘরে গিয়ে বসুন—আমরা বড় ব্যস্ত আছি।"

গুরুর প্রশান্ত চিত্ত তাহাতেও বিচলিত হইল না। তেমনই প্রফুল্ল মুখে তিনি বলিলেন, "বেশ বাপ, আমি তাই যাচ্ছি।"

বলিয়া গমনোদ্যত হইলেন।

সুরলতা আর সহিতে পারিল না। অতর্কিতে উঠিয়া পড়িয়া সে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল ও গুরুর পদতলে পড়িয়া কহিল—"আপনি রাগ ক'রে যাবেন, বাবা! আমার মহাপাতক হয়েছে। আমায় ক্ষমা করুন।"

শুভ্রানন্দ বিরক্ত হইয়া নরেন্দ্রের পানে চাহিলেন। নরেন্দ্র হাঁকিল—"এ দিকে এস, যেও না।"

একটা মহামূল্যবান্ জিনিষ কেহ ছিনাইয়া লইলে যেমন লোকের অবস্থা হয়, ভক্তদ্বয় তেমনই ভাবে হাঁ হাঁ করিয়া ছুয়ারের বাহিরে ছুটিয়া আসিল।

মহেন্দ্র গুরুদেবের ডাক শুনিয়া চুপি চুপি ছুয়ারের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল ও রাগে ফুলিতেছিল। ভিতরে রান্না হইতেছে পাঁচ প্রকারের মাংস, বাহিরে বক্তৃতা হইতেছে দেহই আত্মা। কোথায় ইহার ধর্ম্ম, কি ইহার মর্ম্ম, কোথায় ইহাদের মন্ত্র, কি ইহাদের উদ্দেশ্য—সে সব মহেন্দ্র ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল ইহা একটা ভয়ানক ষড়্‌যন্ত্র—একটা দারুণ অন্যায়।

তাহার সম্মুখে তাহাদের কুলগুরুকে শুভ্রানন্দ পরিহাস করিল, নরেন্দ্র তাহাকে অপমান করিল, তথাপি সে চুপ করিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহার ভ্রাতৃজায়ার পিছু পিছু ছুই জন অভদ্র যুবা ছুটিয়া আসিল—সে আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিল না।—মুহূর্ত্তে সে ছুয়ারের আড়াল হইতে বাহির হইয়া কক্ষের দিকে অঙ্গুল নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "এ ভাবে পাগলের মত ছুটে আস্‌তে আপনাদের লজ্জা হ'ল না? যান, ভাল চান ত যেখানে ছিলেন, সেখানে গিয়ে বসুন।"

তার পর মহেন্দ্র সে দিকে আর দৃষ্টিপাতমাত্র না করিয়া গুরুর পানে চাহিয়া বলিল, "আপনি আমার ঘরে বস্‌বেন আসুন, বৌদিদি, তুমিও এস।"

ইহার পর প্রোগ্রামে ছিল শুভ্র পঞ্চপ্রাণীর পবিত্র মাংসের সদ্ব্যবহার। মাংস বিশেষ ফেলা গেল না—কিন্তু শুভ্রানন্দের শুভ্র আনন্দ তেমন আর জমিল না।

৮

বিনোদপুর ষ্টেশনের বাহিরে একখানি গরুর গাড়ী আসিয়া থামিতে তাহার ভিতর হইতে নরেন্দ্র, মহেন্দ্র ও সুরলতা নামিয়া আসিল। নরেন্দ্রকে ধরিয়া নামাইতে হইল—এতই সে রুগ্ন ও ছুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। নরেন্দ্রকে আর প্রায় চেনা যায় না। ছুঃখ ও আশঙ্কায় ুরলতার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে।

ষ্টেশনের ভিতরে আসিতেই মহেন্দ্র সবিস্ময়ে দেখিল, তাহাদের কুলগুরু শ্যামাচরণ সেখানে বসিয়া। মহেন্দ্রের দিকে তাঁহারও দৃষ্টি পড়িতেই তিনি ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—"এ কি, মহেন্দ্র, বৌমা, নরেন! এ কি, নরেনের কি চেহারা হয়ে গিয়েছে! আহা, কি হয়েছিল? কোথায় গিয়েছিলে বাবা? দাঁড়াও বাবা, আগে তোমার বস্‌বার ব্যবস্থা ক'রে দিই।"

বলিয়া তাড়াতাড়ি নিজের ব্যাগ হইতে একটা চাদর লইয়া বিছাইতে গেলেন।

মহেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "আমাদের সঙ্গে কম্বল আছে, বিছিয়ে দিচ্ছি।"

বলিয়া মহেন্দ্র, দাদাকে ধরিয়া প্লাটফরমের একপ্রান্তে লইয়া গেল ও কম্বলখানি সেখানে বিছাইয়া দিল। সকলেই কম্বলের উপর বসিলে গুরুদেব বলিলেন,"এখনও ট্রেণের দেড় ঘণ্টা দেরী আছে, বাবা। এবার বল মহেন্দ্র, ব্যাপার কি?"

মহেন্দ্র সংক্ষেপে বলিল, ছয়মাস হইতে নরেন্দ্রের জ্বর ও কাসি, কিছুতে সারিতে চাহে না। ভাল ডাক্তারকে দিয়া চিকিৎসা করিয়াও জ্বর বন্ধ হইল না। ২।১ বার মুখ দিয়া রক্তও উঠিল। ভয় পাইয়া সকলে মিলিয়া মাস দেড়েক পুরীতে গিয়াছিল, বিশেষ কিছু ফল হয় নাই। সেখান হইতে ফিরিয়া নরেন্দ্রের অত্যন্ত আগ্রহ হইল, গঙ্গার ধারে শুভ্রানন্দের প্রেমাশ্রমে কিছু দিন থাকিবে। তাহারা কত নিষেধ করিল, কিন্তু কিছুতেই নরেন্দ্রকে বুঝান গেল না। সে এক ধুয়া ধরিয়া রহিল, প্রভুর কাছে না গেলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। তখন অগত্যা সকলে মিলিয়া প্রেমাশ্রমে গেলাম। সেখানে তিনি আমাদের দেখিয়াই আগুন। বলিলেন, এমন রোগীকে কি বলিয়া এখানে আনা হইল? অত যে তাঁহার প্রেম—কর্পূরের মত কোথায় যে সব উবিয়া গেল! নিজে ত একবার উঁকিও মারিতেন না। শেষটা এক দিন বলিলেন, এ রোগ থাইসিস্ —জীবনের আশা নেই। প্রেমাশ্রমের সকলেরই মঙ্গলের ভার তাঁহার উপর, কাযেই এখানে এ রকম রোগীকে রাখা যাইতে পারে না, এক জন শিষ্যের জন্য তিনি ত আর তাঁহার শতাধিক শিষ্যের ক্ষতি করিতে পারেন না। আর ইদানীং দাদা আশ্রমের হিতের জন্য আশ্রমে মাসিক সাহায্য করিতে পারিতেন না, উনি ত আর প্রণামী নেন না। কাযেই আকর্ষণও তাঁহার কমিয়া গিয়াছিল। মহেন্দ্র আর সহ্য করিতে পারে নাই, তাই শুভ্রানন্দকে বেশ দুই কথা শুনাইয়া দিয়া আজই চলিয়া আসিয়াছে।

মহেন্দ্র এই সব বলিতেছিল আর স্বরলতার চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতেছিল। গুরুর চক্ষুও জলে ভরিয়া আসিল। তিনি অন্য দিকে চাহিয়া চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—"নরেনের এই অসুখকে তারা থাইসিস্ বলে। আর মা, তুমিও সেই কথা বিশ্বাস ক'রে কষ্ট পাও? আমাকে কি এ বিষয়ে একবারও জানাতে নেই, মা!"

স্বরলতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কি কর্‌ব বাবা! যে ব্যবহার করা হয়েছিল আপনার উপর, তার পর কোন্ মুখে আমি আপনাকে আস্‌তে লিখ্‌ব?"

গুরু ব্যথাভরা কণ্ঠে বলিলেন, "ঐখানেই তোমার ভুল হয়েছিল, মা! তোমাদের যে আমি সত্য সত্যই সন্তান মনে করি। সে সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত আমার মনে কোন অভিমান আমি পোষণ করিনি। তোমাদের দেখ্‌বার জন্য এক একবার মন বড় চঞ্চল হ'ত; কিন্তু এই মনে ক'রে যাই নি যে, হয় ত গেলে তোমরা আমায় নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়্‌বে। নূতনত্বের আকর্ষণ যে বড়ই বেশী, মা! সে সব কথা এখন থাকুক্, মা! আমাদের গ্রামে কিছু দিন থেকে দেখ্‌বে চল। সেখানে খুব ভাল এক কবিরাজ আছেন; তাঁকে দিয়ে আমি নরেনের চিকিৎসা করাব। নরেনকে সুস্থ ক'রে তবে তোমাদের ছেড়ে দেব।"

বলিয়া গুরুদেব উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আপনি গিয়া মাতৃগ্রামের ৪ খানি টিকিট কিনিয়া আনিলেন।

গুরুদেবের বাড়ী আসিয়া তাহারা একবারে বিস্মিত হইয়া গেল। তাঁহার ঘর সংস্কৃত পুথি ও ইংরাজী পুস্তকে বোঝাই। এই আড়ম্বরহীন সরল ব্রাহ্মণকে দেখিয়া কে বলিবে, ইঁহার ভিতর অগাধ বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য আছে। গ্রামের ছোট বড় সবাই তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করে। সংসারে তাঁহার আপনার বলিতে কেহ নাই—অথচ সমগ্র গ্রামের সবাই তাঁহার আপনার চেয়েও প্রিয়।

কবিরাজ সংবাদ পাইবামাত্র তখনই আসিলেন। পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, তাঁহাদের আয়ুর্ব্বেদমতে ইহাকে ক্ষয়রোগ বলা চলে না। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। তবে আরোগ্য হওয়া না হওয়া ভগবানের হাত।

এক মাস অসাধারণ যত্নের সহিত চিকিৎসা হইল। নরেন্দ্র প্রায় সুস্থ হইয়া উঠিল। একটা উপসর্গ—কাসি মাঝে মাঝে দেখা দিতে লাগিল।

এক দিন স্বরলতা বলিল, "বাবা, কাসিটা ত একবারে গেল না। আবার যদি বাড়ে?"

সে দিন গুরুদেব নরেন্দ্রের শিয়রে চক্ষু মুদিয়া বহুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল, তাঁহার যেন সংজ্ঞা নাই। তার পর চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন ও বারকয়েক ভক্তিগদ্গদ-কণ্ঠে মা-মা বলিয়া ডাকিলেন। উঠিয়া বার

কয়েক নরেনের দেহে হাত বুলাইয়া দিলেন। সে দিন হইতে নরেনের কাসির আর চিহ্ন রহিল না।

বাড়ী ফিরিবার দিন নরেন দুই হাতে গুরুদেবের পা জড়াইয়া বলিল—"আমার অপরাধের সীমা নাই—আমায় ক্ষমা করুন। আমায় পরিত্যাগ কর্‌বেন না।"

গুরুদেব সস্নেহে বলিলেন—"তোমরা যে অপরিত্যজ্য, বাবা।"

সুরলতা কাঁদিয়া বলিল—"বাবা, আপনার দয়ায় এঁকে ফিরে পেলাম। কিন্তু বাবা—"

"কি মা?"

"আপনার শরীরটা যে খারাপ দেখ্‌ছি, একটু কাসি হয়েছে।"

"পাগ্‌লি মা—ও কিছু নয়—দুদিনে সেরে যাবে।"

সঙ্গে সঙ্গে এক বার কাসি আসিল। গুরুদেব ক্ষিপ্রহস্তে তাহা আপনার উত্তরীয়ে মুছিয়া লইলেন। উত্তরীয়ের খানিকটা অংশ যে রক্তে লাল হইয়া গেল।

তিনি সে রক্তচিহ্ন গোপনের জন্য যতই সতর্কতা অবলম্বন করুন—সুরবালার উৎসুক চক্ষুর ব্যাকুল দৃষ্টিকে প্রতারিত করিতে পারিলেন না।

আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া সুরবালা বসিয়া পড়িল—ক্রমে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

রক্ত-করবী

বহে হেমন্তের হাস্যে হিরণ্য-হিল্লোল,
কাঁপে রক্ত-করবীর গুচ্ছ সুতরুণ
কোথা অলক্তক-শোভা কোথায় অরুণ
লাজরক্ত নবোঢ়ার কমল-কপোল?

বর্ণরাগে পরাজিত লজ্জিত প্রবাল
পশিল কি সাগরের আঁধার অতলে
পুষ্পরত্ন তুমি বনলক্ষ্মীর অঞ্চলে—
কার অধরের তুমি হাসি ইন্দ্রজাল।

তুমি কোন্ কিশোরীর নব পূর্ব্বরাগ
আধ লজ্জা, আধ প্রেম, বেদনা মধুর
রূপের ভাষায় কোন্ রাগিণীর সুর
ভৈরবী, ললিত, টোড়ী বাহার বেহাগ!

ভ্রমর কটাক্ষে তব কোন্ স্বপ্নাবেশ—
আছে কি তোমার কাছে প্রিয়ার সন্দেশ?

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ
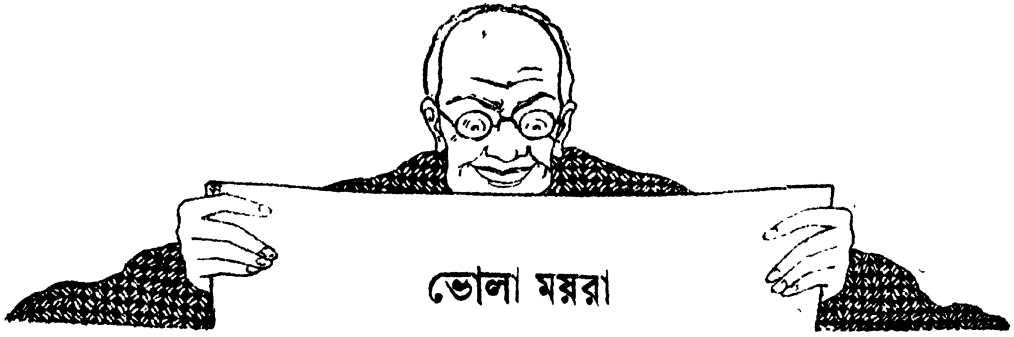
(১) ভোলানাথের জন্মস্থান

ইনি "ভোলা ময়রা" নামেই বিখ্যাত ছিলেন। ইহার প্রকৃত নাম,—ভোলানাথ দে। ভোলানাথের জন্মস্থান লইয়া অনেকে অযথা গোলযোগ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন শ্রীরামপুর, কেহ কেহ গুপ্তিপাড়া, কেহ কেহ বা বাগবাজার। হুগলী-কলেজের অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রেরিত পত্র পাইয়া গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় ১৩০৪ বঙ্গাব্দে "ভারতী"-পত্রিকায় লিখিয়াছেন, "ভোলা ময়রার জন্মস্থান গুপ্তিপাড়া; ত্রিবেণীতে তাহার বিবাহ হয়। ভোলার পিতার নাম কৃপারাম; এই ব্যক্তি "কিপু ময়রা" নামে বিখ্যাত ছিল। তাহার মায়ের নাম গঙ্গামণি। ভোলার বাস্তবিক বাগবাজারে দোকান ছিল। তাহাকে স্বয়ং দেখিয়াছে, এমন লোক এখনও জীবিত। ভোলানাথের কনিষ্ঠ সহোদর হৃদয়নাথ মোদক তালতলায় দোকান করিত। তাহার বংশ এখনও আছে। ভোলানাথ মোদক বাল্যকালে পাঠশালায় পড়িয়াছিল। সামান্য হিসাব, তালপাতায় খরিদ্দারের নাম-লেখা এবং বড় বড় বানান্ শিখিয়াই সে পাঠশালা পরিত্যাগ করে। ভোলানাথ সতত রামায়ণ ও মহাভারত পড়িত ও শুনিত। সঙ্কীর্ত্তনে প্রায়ই যোগ দিত; বড় কৃষ্ণভক্ত পুরুষ ছিল। নিত্য গঙ্গাস্নান করিত; এবং চরিত্র ভাল ছিল বলিয়াই বিশ্বাস। ভোলা বড় রসিক পুরুষ। তাহার কণ্ঠস্বরও মন্দ ছিল না।"

ঈশান বাবু লিখিয়াছেন, "ভোলানাথের জন্মস্থান গুপ্তিপাড়া; ত্রিবেণীতে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তাহার কনিষ্ঠ সহোদর হৃদয়নাথ তালতলায় দোকান করিত, এবং তাহার বংশধরগণ এখনও জীবিত আছে।" ঈশান বাবুর এই সকল কথা তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত। ভোলানাথের বহু-সংখ্যক বংশধর এখনও বর্ত্তমান, এবং তাঁহাদের অনেকেই বিলক্ষণ কৃতবিদ্য। ঈশান বাবুর এই সকল কথা তাঁহারা কিছুমাত্র বিশ্বাস করেন না। ভোলানাথের নাৎ-জামাই স্বর্গত নবীনচন্দ্র দাস মহাশয় * ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী (ভোলানাথের পৌত্রী), এই সকল কথা বিশ্বাস করা দূরে থাকুক, তাঁহারা ইহা শুনিয়া অবাক্ হইয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, ভোলানাথ পূর্ব্বে সিমলায় থাকিতেন। কলিকাতাই তাঁহার জন্মস্থান। গভীর অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে, বাগবাজারে ভোলানাথের দোকান ছিল। এই দোকানে তিনি সন্দেশ, মিঠাই, পুরী, খই, মুড়কী ও বাতাসা প্রভৃতি সামগ্রী প্রস্তুত করিতেন। বারুদখানার ঠিক দক্ষিণ-দিকেই তাঁহার দোকান ছিল। উত্তরে মার্হাট্টা-ডিচ্ ও চীৎপুর-ক্রীক্, দক্ষিণে পাউডার-মিল রোড (বর্ত্তমান সময়ে বাগবাজার ষ্ট্রীট), পূর্ব্বে হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট এবং পশ্চিমে গঙ্গা ও চিৎপুর রোড,—এই চতুঃসীমার অন্তর্গত স্থানকে লোকে পূর্ব্বে "বারুদ-খানা" * বলিত। আমিও ৪৮ বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন লোকদিগকে

---

* স্বর্গত নবীনচন্দ্র দাস মহাশয় কে, তাহাও বলা কর্ত্তব্য। ইনি বঙ্গ-বিখ্যাত লোক। বাগবাজার রসগোল্লার জন্য চির-প্রসিদ্ধ। নবীন বাবুই এই রসগোল্লার জন্মদাতা। "আবার খাবো" নামক সন্দেশেরও তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি অতি মহাশয় লোক ছিলেন। বয়সে প্রবীণ হইলেও তিনি নবীনের ন্যায় সুরসিক ছিলেন। কবি-গাহনায় এক দিন তাঁহার বিলক্ষণ সখ ছিল। তিনি ভোলানাথের কনিষ্ঠ পুত্র মাধবচন্দ্রের জামাতা। নবীন বাবুর সহধর্ম্মিণী এখনও জীবিতা। নবীন বাবুর সহিত আমার বিশেষ আলাপ-পরিচয় ছিল। এক দিন তিনি ভোলানাথের সম্বন্ধে সংবাদ দিবার নিমিত্ত আমাকে তাঁহার বাগবাজারের বাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে আমি অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। নবীন বাবু, ভোলানাথের রচিত কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য গান ও ছড়া আমাকে দিয়াছেন। নবীন বাবুর রসগোল্লা যেরূপ রসময়ী, তাঁহার কথা তদপেক্ষা রসময়ী। কয়েক বৎসর হইল, নবীন বাবুর মৃত্যু হইয়াছে।—লেখক

* ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুন, বুধবার, বেলা ১২টার সময় বাগবাজারে যুদ্ধ হয়। মার্হাট্টা-ডিচের উত্তর দিকে সিরাজের সেনাপতি মীরজাফর ও ইহার দক্ষিণ দিকে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর সেনাপতি এন্সাইন পিকার্ড ও ব্ল্যাগ সাহেব স্ব স্ব সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার তিন বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ-হেষ্টিংসের পূর্ব্ব পক্ষের শ্বশুর এন্জিনিয়ার-জেনারেল কর্ণেল সি-এফ স্কট বাগবাজারে পেরিন 'সাহেবের' বাগানে একটি "বারুদ-খানা" স্থাপন করেন। ইহার পূর্ণ নাম Bagbazar Powder Mills. ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ম্যানেজার কর্ণেল বুচানন্ পেরিনের বাগান ও বারুদ-খানা ক্রয় করিয়াছিলেন। তৎপরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী ৪ হাজার টাকা মূল্য দিয়া ইহা তাঁহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লন।

"বারুদ-খানা" বলিতে শুনিয়াছি। এখনও কেহ কেহ "বারুদ-খানা" বলিয়া থাকে। বাগবাজার-ষ্ট্রীটের দক্ষিণ পার্শ্বে ভগবতী গাঙ্গুলীর বাড়ী ছিল। সম্মুখে ঢেউ-খেলান প্রাচীর ছিল, ইহাও আমি দেখিয়াছি। এই বাড়ীখানির পশ্চিম দিকে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, সিভিলিয়ান্-ম্যাজিষ্ট্রেট আনন্দরাম বড়ুয়া মহাশয় একটি প্রেস করিয়াছিলেন। এই দুইখানি বাড়ীর মধ্যস্থলে একখানি গোলপাতার ঘর ছিল। এই ঘরেই ভোলানাথের দোকান ছিল। বাগবাজার-নিবাসী প্রসিদ্ধ প্রত্ন-তত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিত কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী, বিখ্যাত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নবীনকৃষ্ণ সরকার, নন্দলাল মুখোপাধ্যায় ও যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় আমাকে বলিয়াছিলেন যে, উক্ত গোলপাতার ঘরেই ভোলানাথের দোকান ছিল। ভোলানাথের মৃত্যুর পরে আর একটি লোক উক্ত ঘরে দোকান করিয়াছিল। সেই ব্যক্তিও বলিয়াছিল যে, উক্ত ঘরেই পূর্ব্বে ভোলানাথের দোকান ছিল। বসু-পাড়া-লেনে ভোলানাথের বাসাবাড়ী ছিল, ইহাও কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী মহাশয় বলিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে ভোলানাথের আর্থিক অবস্থা উন্নত হইলে তিনি গ্রে-ষ্ট্রীটে একখানি দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে স্থায়ি-ভাবে বাস করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি স্বর্গত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের বাটীর ঠিক সম্মুখ দিয়া পশ্চিম দিকে যে ফুটপাথ চলিয়া গিয়াছে, সেই ফুট-পাথের কোণে ও মহারাজ নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের মোড়ে একখানি দ্বিতল-গৃহ অদ্যাপি বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানিই ভোলানাথের নিজ বসতি-বাটী। ১২৩১ বঙ্গাব্দে (১৮২৪ খৃষ্টাব্দে) তিনি রামলোচন কলুর নিকট হইতে ৷৩৸০ (তিন কাঠা বার ছটাক) জমী ১ শত ৪৫৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া উক্ত বাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ভোলানাথের পৌত্র বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের নিকটে শুনিয়াছি যে, ভোলানাথ যখন বাটী-নির্ম্মাণ করেন, তখন মাটীর নিম্নভাগ হইতে তিন জালা কড়ি বাহির হইয়াছিল। বোধ হয়, উক্ত কলু এই কড়ির জালা মৃত্তিকার নিম্নে পুতিয়া রাখিয়াছিল। কয়েক বৎসর হইল, ভোলানাথের বংশধরগণ শ্রীশরচ্চন্দ্র সেনকে এই বাড়ীখানি বিক্রয় করিয়াছেন। জনৈক কবিরাজ তাঁহার নিকট হইতে ইহা ক্রয় করিয়া ইহাতে এখন বাস করিতেছেন।

(২) ভোলানাথের সময়-নিরূপণ

স্বর্গত নবীনচন্দ্র দাস মহাশয় আমাকে এক দিন তাঁহার বাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় সহধর্ম্মিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া বলিলেন, "আশ্বিনে ঝড়ের" বৎসরে আমার বিবাহ হইয়াছিল। ইহার ১৩ বৎসর পূর্ব্বে আমার দাদা-শ্বশুরের অর্থাৎ ভোলানাথের (৭৬ বৎসর বয়সে) মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে (১২৭১ বঙ্গাব্দে) "আশ্বিনে ঝড়" হইয়াছিল। নবীন বাবুর কথানুসারে এখন বুঝিতে পারা যায়, ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে (১১৮২ বঙ্গাব্দে) ভোলানাথের জন্ম ও ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে (১২৫৮ বঙ্গাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

(৩) ভোলানাথের বংশধরগণ

তিন চারিখানি কাগজে "ভোলা-ময়রা"-শীর্ষক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখকগণ স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, "ভোলানাথের বংশধর নাই"। এই কথা শুনিলে না হাসিয়া থাকিতে পারা যায় না। ভোলানাথের সংসার জাজ্বল্যমান। তাঁহার পিতার নাম রামগোপাল মোদক (দে)। ভোলানাথের চারি পুত্র,—চিন্তামণি, চন্দ্রনাথ, রসিকলাল ও মাধবচন্দ্র। প্রথম তিন জন নিঃসন্তান হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মাধবচন্দ্রের চারিটি পুত্র ও পাঁচটি কন্যা। পুত্রগুলির নাম,—যোগেন্দ্রনাথ, কালীনাথ, নগেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ। * যোগেন্দ্রনাথের পাঁচটি পুত্র,—অতুলকৃষ্ণ (এম-বি), দিবাকর (রায় সাহেব), শোভাকর, ফণীন্দ্র ও ধীরেন্দ্র। কালীনাথ মৃত ও নিঃসন্তান। নগেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান। সুরেন্দ্রনাথের দুইটি পুত্র,—নরেন্দ্র ও হরেন্দ্র। মাধবচন্দ্রের পাঁচটি কন্যার মধ্যে এখন একমাত্র কন্যা জীবিতা আছেন। ইনিই বিখ্যাত নবীনচন্দ্র দাস মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী। মাধবচন্দ্রের পুত্র ও কন্যাগুলির অনেক সন্তান আছে। এখন পাঠকগণ বুঝিয়া দেখুন, ভোলানাথের বংশধরগণ অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন কিনা!

(৪) ভোলানাথের কবির দল

মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের জীবনের শেষভাগে ভোলানাথের প্রসার ও প্রতিপত্তি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তৎকালে হরু ঠাকুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগুরু ছিলেন। তিনি রাম বসু অপেক্ষা ভোলানাথকেই অধিক ভালবাসিতেন। এই হেতু, তিনি উৎকৃষ্ট সুরে উৎকৃষ্ট গান বাঁধিয়া ভোলানাথকেই দিতেন। ভোলানাথ যেখানে গাহনা করিতে যাইতেন, হরু ঠাকুরও প্রায় তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। এজন্য হরু ঠাকুর ও ভোলানাথের উপরি রাম বসুর জাতক্রোধ জন্মিয়াছিল। রাম বসুর রচিত গানে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। হরু ঠাকুর, মহারাজ নবকৃষ্ণের এবং ভোলানাথ হরু ঠাকুরের বিশেষ প্রেমপাত্র ছিলেন বলিয়া মহারাজ নবকৃষ্ণ, ভোলানাথেরও প্রতি বিশেষ স্নেহ ও দয়া প্রকাশ করিতেন। ভোলানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র চিন্তামণি, ভোলানাথের জীবনের শেষভাগে পৃথক্ কবির দল বাঁধিয়া গাহনা করিতেন। বিশেষতঃ ভোলানাথ অতি অল্পবয়সেই স্বীয় প্রতিভা-বলে মহারাজকে পরম প্রীত করিয়াছিলেন। মহারাজ, ভোলানাথের প্রতি যেরূপ প্রসন্ন ছিলেন, মহারাজের পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণও চিন্তামণির প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার দলের জন্য তাঁহাকে অনেক টাকা দিয়াছিলেন। চিন্তামণির মৃত্যুর পরে তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা রসিকলাল ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধবচন্দ্র, পিতা ভোলানাথের খাতা লইয়া এক একটি পৃথক্ দল করিয়াছিলেন। মাধবচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীনগেন্দ্রনাথ পিতার দল চালাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখে

---

* বন্ধুবর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দে মহাশয় শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ লোক। তিনি যেরূপ সুরসিক, সেইরূপ কাব্যামোদী। ভোলানাথের বাটী খরিদ করিবার সময় যে কাগজ-পত্র লিখিত হইয়াছিল, তাহা সমস্তই তাঁহার নিকটে ছিল। কার্য্য-বশতঃ আজ তাহা হস্তান্তরিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আমাকে অনেক নূতন তথ্য বলিয়া দিয়াছেন।—লেখক।

শুনিয়াছি যে, নানা কারণে তিনি দল তুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। খল্‌সিনী-নপাড়া-নিবাসী থাকমোহন সেন তাঁহার বাঁধনদার এবং কালিদাস তন্তুবায় নামক আর একটি লোক তাঁহার দোহার ছিলেন। উভয়ে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের খাতাগুলি লইয়া অন্তর্দ্ধান করেন।

(৫) ভোলানাথের ঢুলি ও বাঁধনদারগণ

ভোলানাথ অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। তাঁহার যে অন্তর্নিহিতা বলবতী শক্তি ছিল, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, তিনি স্বয়ং গান ধরিলে, তাঁহার পরম-প্রিয় ও সুদক্ষ ঢুলি তিনু (তিনকড়ি) ও নুটো (নটবর) ঢোল বাজাইলে এবং তাঁহার পরমারাধ্য গুরু হরু ঠাকুর আসরে উপস্থিত থাকিলে, স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরকেও আসরে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইবে, এবং সমস্ত আসরও নিস্তব্ধ হইয়া পড়িবে। দিগ্‌বিজয়ী ভোলানাথের মুখের কথা এই :—

ভোলা যদি ধরে বোল তিনু নুটো ধরে ঢোল,
আসরে বসিয়া যদি হরু দেন কোল।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সবে হন্ অগ্রসর
নিস্তব্ধ হইয়া যায় মানুষের গোল।

ভোলানাথ যখন বড় বড় আসরে ও মজলিসে কবি-গান করিতে যাইতেন, তখন তিনি স্বীয় গুরু হরু ঠাকুরকে বহু-সমাদরে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। বলিতে হইলে, হরু ঠাকুরই কবি-ওয়ালাদিগের গুরু। বিশেষতঃ তিনি ভোলানাথকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন বলিয়া তাঁহাকেই উৎকৃষ্ট সুরে উৎকৃষ্ট গান বাঁধিয়া দিতেন। ভোলানাথ স্বয়ং সুকবি হইলেও হরু ঠাকুর তাঁহার সর্ব্ব-প্রধান বাঁধনদার ছিলেন। ধরতার তৎক্ষণাৎ উত্তর দেওয়া দলপতির পক্ষে সকল সময় সুবিধা-জনক হইত না। এজন্য বাঁধনদারের প্রয়োজন হইত। ভোলানাথের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব বলবৎ ছিল। বিশেষতঃ, তিনি গালাগালির গান বাঁধিতে নিরতিশয় দক্ষ ছিলেন। ভোলানাথের দলে হরু ঠাকুর ভিন্ন আরও এই কয়েক জন বাঁধনদারের নাম দেখিতে পাওয়া যায়,—সাতু রায় (অবৈতনিক), গদাধর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী ও কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য।

(৬) ভোলানাথের সময়ে বাবু বা সৌখীন-সম্প্রদায়

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "তৎকালে কলিকাতা-সহরের মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে 'বাবু' বা 'সৌখীন' নামে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী-শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্ম্মে আস্থা-বিহীন হইয়া ভোগ-সুখেই দিন কাটাইত। মুখে, ভ্রূপার্শ্বে ও নেত্রকোণে নৈশ অত্যাচারের চিহ্ন-স্বরূপ কালিমার রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাউরী কাটা চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিন্‌-ফিনে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মস্‌লিন্ বা কেম্‌ব্রিকের বেনিয়ান্, গলদেশে উত্তম-রূপ চুনট করা উড়ুনি এবং পায়ে পুরু-বগলস্-সমন্বিত চীনের বাড়ীর জুতা। এই 'বাবু' ('সৌখীন'
শয়েরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ী উড়াইয়া, দেখিয়া, সেতার, এস্‌রাজ, বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, ফুল-আকড়াই হাফ-আকড়াই, পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রিকালে বারাঙ্গনাদিগের গৃহে গৃহে গীত-বাদ্য ও আমোদ-প্রমোদ করিয়া কাল কাটাইত, এবং খড়দহের ও ঘোষ-পাড়ার মেলা, এবং মাহেশের স্নান-যাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে সঙ্গে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত।"

(৭) ভোলানাথের সময়ে বিদ্যাশিক্ষার অবস্থা

ভোলানাথের সময়ে "গুরু-মহাশয়ই" বাঙ্গালা-ভাষায় শিক্ষাদান করিতেন। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে মহাশয়ের মুখে আমি স্বয়ং শুনিয়াছি, "আমাদের সময়ে গুরু-মহাশয়ের পাঠশালায় যিনি 'মৃত্যুঞ্জয়,' 'জগদীশ্বর', 'রুক্মিণী', 'শশধর' 'শম্ভু' প্রভৃতি শব্দের বানান্ বলিতে পারিতেন, তিনি এক জন কৃতবিদ্য বলিয়া গণ্য হইতেন।" রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, "গুরু-মহাশয়দিগের শিক্ষা-প্রণালী উন্নত ছিল না, কিন্তু তাঁহাদের অবলম্বিত ছাত্রগণের প্রতি দণ্ড-বিধানটি বড়ই কঠোর ছিল। 'নাড়ু-গোপাল' অর্থাৎ হাঁটু গাড়িয়া শোয়াইয়া এক হাতে একখানি প্রকাণ্ড ইষ্টক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রাখাইয়া দেওয়া, জলে ভিজাইয়া বিছুটী-লতা দ্বারা দেহে প্রহার ও বেত্রাঘাত করা ইত্যাদি অনেক কঠোর দণ্ড-বিধান প্রচলিত ছিল। ৫ বৎসর হইতে ১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাল-পাতে, তার পর ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কলাপাতে, তার পর ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কাগজে লেখা হইত। সামান্য অঙ্ক কষিতে সামান্য পত্র লিখিতে ও পড়িতে এবং 'শিশুবোধ', 'দাতাকর্ণ' 'গুরু-দক্ষিণা,' 'গঙ্গার বন্দনা' প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিতে সমর্থ করা গুরু-মহাশয়দিগের শিক্ষা-দানের শেষ সীমা ছিল। গুরু-মহাশয় অতি ভীষণ পদার্থ ছিলেন।" আমি স্বয়ং বাল্যকালে অত্যন্ত শান্ত-শিষ্ট ছিলাম বলিয়া আমাকেও মধ্যে মধ্যে বেত্রাঘাত, বিছুটী-প্রহার ও নাড়ু-গোপালের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হয় নাই।

ভোলানাথের সময়ে ইংরাজী-শিক্ষার কিরূপ অবস্থা ছিল তাহাও বলা আবশ্যক। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, "যখন বঙ্গ-সমাজ উক্তরূপে চলিতেছিল, তখন ইহা পরিবর্ত্তন করিতে এক ব্যক্তি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। ইনি কে? স্কুল-মাষ্টার। প্রথমে তাঁহার বেশ-ভূষা অদ্ভুত, উচ্চারণ কদাকার ও শিক্ষা-প্রণালী অপকৃষ্ট ছিল। রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকে এক জন ইংরাজী পড়াইতেন। তিনি যখন পড়াইতে আসিতেন, তখন জরির জুতা ও মুক্তার মালা পরিয়া আসিতেন। এখন একবার মনে করিয়া দেখুন দেখি, প্রেসিডেন্সী কলেজের এক জন বাঙ্গালী অধ্যাপক জরির জুতা ও মুক্তার মালা পরিয়া পড়াইতেছেন, ইহা কি চমৎকার বোধ হয়! তৎকালে প্রথমে ইংরাজী পড়িতে যাইলেই 'স্পেলিং বুক,' 'স্কুল-মাষ্টার', 'কামরূপা' ও 'তুতিনামা' এই সকল পুস্তক পাঠ করিতে হইত। কেহ যদি অধিক পড়িতেন, তাঁহাকে [illegible] ইট' পড়িতে হইত। যিনি "রয়্যাল গ্রামার [illegible] ক মনে করিত, তাঁহার মত বিদ্বান আর কেহ

নাই। বিবাহের সভায় এই সকল ইংরাজী বানান্ লইয়া জিজ্ঞাসা-বাদ হইত,—Nibuchadnezzar, Kerxes, Xenophon, Kamschatka ইত্যাদি!” তৎকালে যেরূপ বাঙ্গালা-পদ্যে ইংরাজী-শব্দের অর্থ শিখান হইত, তাহার নমুনা দিলাম :—

“গাড্ ঈশ্বর, লাড্ ঈশ্বর, কম্ মানে এস,
ফাদর বাপ্, মাদর মা, সিট মানে ব'স।
ব্রাদর ভাই, সিষ্টর বোন্, ফাদর-সিষ্টর পিসী,
ফাদর-ইন্-ল মানে শ্বশুর, মাদর-সিষ্টর মাসী।
আই মানে আমি, আর ইউ মানে তুমি,
আস্ মানে আমাদিগে, গ্রাউণ্ড মানে জমি।
ডে মানে দিন, আর নাইট মানে রাত,
উইক্‌কে সপ্তাহ বলে, রাইস্ মানে ভাত।
পম্‌কিম্ লাউ কুম্‌ড়ো, কোকম্বর শসা।
ব্রিঞ্জেল বার্ত্তাকু, আর প্লোমেন্ চাসা॥

(৮) ভোলানাথের সময়ে ধনিগণের বদান্যতা ও আমোদের সামগ্রী

বিজ্ঞবর স্বর্গত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন, “সেকালের ধনী লোকগণ অত্যন্ত বদান্য ছিলেন। পুষ্করিণী-খননাদি পূর্ত্তকর্ম্মে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁহারা সন্ন্যাসী ও দরিদ্রদিগকে বিলক্ষণ দান করিতেন। তাঁহারা অতিথি-সেবায়ও তৎপর ছিলেন। তাঁহারা গুণী লোকদিগকে বিলক্ষণ-রূপে পালন করিতেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ গায়কগণকে বিশিষ্ট অর্থানুকূল্য করিতেন। কোন কোন স্থলে উপযুক্ত পাত্রে তাঁহাদিগের দানশীলতা প্রয়োজিত হইত না বটে, কিন্তু তাঁহারা যে অত্যন্ত বদান্য ছিলেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ধনী লোকমাত্রেই কোন পর্ব্বাহ-উপলক্ষে কবিতা শুনিবার ইচ্ছা হইলে অগ্রেই নিতাই দাসকে (নিত্যানন্দ বৈরাগীকে) বায়না দিতেন। ইঁহার সহিত ভবানী বেণের (ভবানীচরণ বণিকের) সঙ্গীত-যুদ্ধ ভাল হইত। কথায় বলে ‘নিতে-ভবানের লড়াই।’ এক বা দুই দিনের পথ হইতেও লোক সকল এই লড়াই দেখিতে আসিত। যাঁহার বাড়ীতে গাহনা হইত, তাঁহার বাড়ীতে লোকারণ্য হইত। নিতাই দাসের যে কত গোঁড়া ছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কুমার-হট্ট, ভাটপাড়া, ত্রিবেণী, বালী, ফরাসডাঙ্গা, চুঁচুড়া প্রভৃতি নিকটস্থ ও দূরস্থ গ্রামের ভদ্র ও অভদ্র লোক নিতাইএর নামে ও ভাবে গদ্গদ হইতেন। নিতাই দাস জয়লাভ করিলে ইঁহারা যেন ইন্দ্রত্ব পাইতেন। তাঁহার পরাজয় হইলে তাঁহাদের পরিতাপের সীমা থাকিত না। অনেকের আহার-নিদ্রা রহিত হইয়া যাইত। কত স্থানে কতবার গোঁড়ায় গোঁড়ায় লাঠালাঠি কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে। ভাটপাড়ার ঠাকুর মহাশয়েরা নিতাই দাসকে স্বয়ং ‘নিত্যানন্দ প্রভু’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইঁহার গাহনার প্রাক্কালে ‘প্রভু উঠেছেন’ বলিয়াই গোঁড়ারা ভাবে ঢল-ঢল হইত। নিতাই দাস ভদ্রাভদ্র সকলকেই সমভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন।”

স্বর্গত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন, “কবি, পাঁচালী ও বুল্‌বুলীর লড়াই তৎকালে ধনিগণের মধ্যে প্রধান আমোদের সামগ্রী ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে কলিকাতা-সহরে হরু ঠাকুর ও তাঁহার প্রধান চেলা ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর, নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতি কবিওয়ালাগণ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এই সকল দলে প্রায় এক এক জন দ্রুত কবি থাকিত। ইহাদের নাম ‘সরকার’ বা ‘বাঁধনদার।’ বাঁধনদারেরা উপস্থিতমত তখনি তখনি গান বাঁধিয়া দিত। বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোন কোন কবির দলে বাঁধনদারের কার্য্য করিয়াছিলেন।”

“পাঁচালীর ব্যাপার অন্যপ্রকার। কবির দলের পর পাঁচালীর বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাহাতে এক ব্যক্তি মূল গায়ক-স্বরূপ হইয়া সুর ও তান সহকারে পদ্যে কোন পৌরাণিক বিষয় বর্ণন করিত ও মধ্যে মধ্যে সদলে সেই ভাব-মূলক এক একটি গান করিত। দাশরথি রায়, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, গঙ্গানারায়ণ নস্কর প্রভৃতি কয়েক জন পাঁচালী-ওয়ালা তৎকালে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন।”

“বুল-বুলীর লড়াই ও ঘুড়ী-উড়ান সে সময়ে ভদ্রলোকগণের একটা মহা আনন্দের বিষয় ছিল। এক একটা স্থানে লোহার জাল দিয়া ঘিরিয়া বহু-সংখ্যক বুল-বুলী পক্ষী রাখা হইত। মধ্যে মধ্যে ইহাদের মধ্যে লড়াই বাধাইয়া দিয়া কৌতুক দেখা হইত। সেই কৌতুক দেখিবার জন্য সহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত। ধাউস-ঘুড়ী, মানুষ-ঘুড়ী প্রভৃতি ঘুড়ীর প্রকার ও প্রণালী বহুবিধ ছিল। সহরের ভদ্রগৃহের নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিগণ গড়ের মাঠে গিয়া ঘুড়ীর খেলা দেখিতেন।”

“এই সময়ে ও ইহার পরে গাঁজা খাওয়াটা সহরে এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, সহরের স্থানে স্থানে এক একটা বড় গাঁজার আড্ডা হইয়াছিল। বাগবাজার, বৌবাজার ও বটতলা প্রভৃতি স্থানে এরূপ এক একটা আড্ডা ছিল। বৌবাজারের দলকে ‘পক্ষীর দল’ বলা হইত। সহরের ভদ্রগৃহের নিষ্কর্ম্মা সন্তান-গণের অনেকে ‘পক্ষীর দলের’ সভ্য হইয়াছিল। দলে ভর্ত্তি হইবার সময়ে এক এক জন এক একটি “পক্ষীর” (পক্ষীর) নাম পাইত, এবং গাঁজায় উন্নতি-লাভ সহকারে উচ্চতর পক্ষীর শ্রেণীতে উন্নীত হইত। একবার এক ভদ্র সন্তান পক্ষীর দলে প্রবেশ করিয়া ‘কাঠ-ঠোক্‌রার’ পদ পাইল। কয়েক দিন পরে তাহার পিতা তাহার অনুসন্ধানে আড্ডায় উপস্থিত হইয়া যাহাকে নিজ সন্তানের বিষয়ে প্রশ্ন করেন, সেই পক্ষীর বুলি বলে, মানুষের ভাষা কেহই বলে না! অবশেষে নিজ সন্তানকে এক কোণে দেখিতে পাইয়া যখন গিয়া তাহাকে ধরিলেন, অমনি সে ‘কড়্‌ড়্ ঠক্’ করিয়া তাঁহার হস্তে ঠুক্‌রাইয়া দিল”!

কোন্নগর-নিবাসী এক জন ভদ্রবংশীয় গুলী-খোরের মুখে বাল্যকালে নিম্ন-লিখিত রহস্য-জনক কবিতাটি শুনিয়া-ছিলাম :—

“বাগবাজারে গাঁজার আড্ডা, গুলীর কোন্নগরে,
বটতলায় মদের আড্ডা, চণ্ডুর বৌবাজারে,
এই সব মহাতীর্থ যে না চোখে হেরে,
তার মত মহাপাপী নাই ত্রিসংসারে।”

(৯) ভোলানাথের সময়ে সাধারণ লোকের ধর্ম্মে আস্থা

সূক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞবর প্রবীণ লেখক রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, "ধর্ম্মের প্রতি সে কালের লোকদিগের বিশেষ আস্থা ছিল। তাঁহারা যেরূপ বিশ্বাস করিতেন, তদনুরূপ কার্য্যও করিতেন। তাঁহারা হিন্দু-ধর্ম্মের নিয়ম সকল যত্ন-পূর্ব্বক পালন করিতেন। হিন্দু-ধর্ম্মের নিয়ম-ভঙ্গ না হয়, এ বিষয়ে তাঁহারা বড় সাবধান ছিলেন। রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর দুর্গোৎসবের সময় সাহেবদিগকে আহারের নিমন্ত্রণ করিতেন বলিয়া অন্যান্য হিন্দুগণ তাঁহার উপর বড় বিরক্ত হইয়াছিলেন। সে কালে ধর্ম্ম-বিষয়ে ভিতরে একখান, বাহিরে একখান,—এরূপ ছিল না। এক্ষণে যেমন দালানে পূজা হইতেছে, অন্তরে দেব-দেবীতে বিশ্বাস নাই, কিন্তু আশ্রম-রক্ষার জন্য বাহ্য ঠাট বজায় রাখিতে হইবে, সেকালে এরূপ ব্যাপার দৃষ্ট হইত না।"

(১০) ভোলানাথের তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা

মেদিনীপুর-জেলার অন্তঃপাতী ঘাঁটাল-সাবডিভিসানের অধীনতায় "জাড়া"-নামক একখানি প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রাম আছে। এই গ্রামে বহু দিন হইতেই "রায়"-উপাধিধারী এক ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত জমীদার-বংশ অদ্যাবধি বাস করিতেছেন। এই গ্রামের প্রায় অর্দ্ধ-ক্রোশ দক্ষিণ-দিকে "মাণিক-কুণ্ড"-নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান "মূলার" জন্য বিশেষ বিখ্যাত। শুনিতে পাওয়া যায়, এই স্থানে লম্বে ২।৩ হাত এবং ওজনে ৮।১০ সের পর্য্যন্ত "মূলা" জন্মিয়া থাকে। বড় বড় "এক্‌জিবিশনে" এই "মূলা" লইয়া যাওয়া হয়। একবার জাড়া-গ্রামে ভোলানাথ কবিগান করিতে গিয়াছিলেন। স্বর্গত গোলোক-নারায়ণ রায় মহাশয় তৎকালে "রায়"-বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ ও কর্ত্তা ছিলেন। ঘাঁটালের নিকটবর্ত্তী নিমতলা-নিবাসী যজ্ঞেশ্বর দাস নামক এক জন ধোপা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। যজ্ঞেশ্বর, "রায়" বাবু মহাশয়দিগকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। তাই তিনি "জাড়া" গ্রামকে সাক্ষাৎ গোলোক-বৃন্দাবন এবং গোলোক-নারায়ণ বাবুকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-রূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। তেজস্বী ভোলানাথ ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া রায়-বাবুদের সম্মুখেই এই গানটি ধরিয়া বসিলেন :—

"কেমন ক'রে বল্লি যগা ! জাড়া গোলোক-বৃন্দাবন !
এখানে বামুন রাজা, চাষা প্রজা, চৌদিকে দেখ বাঁশের বন।
(কেমন ক'রে বল্লি যগা ! জাড়া গোলোক-বৃন্দাবন !)
(যগা !) কোথা রে তোর শ্যামকুণ্ড, কোথা রে তোর রাধাকুণ্ড,
কোথা রে তোর গিরি-গোবর্দ্ধন,
ও তার কোন চিহ্ন, নাইকো অন্য, চারদিকে দেখ ব্যানার বন।
সামনে আছে মাণিক-কুণ্ড, কর্ গে মূলো দরশন।
(কেমন ক'রে বল্লি যগা ! জাড়া গোলোক-বৃন্দাবন !)
এখানে বামুন রাজা, চাষা প্রজা, চৌদিকে দেখ বাঁশের বন।)
কবি গাইবি, পয়সা নিবি, খোসামুদি কি কারণ ?
"কৃষ্ণ" হওয়া কি সহজ কথা, কৃষ্ণ বলিস্ কারে ?
সংসার-সাগরে যিনি যগা ! তরাইতে পারে।
বাবু বটে ঈশ্বর বাবু, বাবু শম্ভু রায়,
উমেশ বাবু শুঁটকো বাবু, ব'সে আছেন কেদারায়।
বাবু তো বাবু লালা বাবু, কোল্‌কাতায় বাড়ী,
বেগুণ-পোড়ায় নুণ দেয় না যে ব্যাটা, সে হাড়ি।
পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, মুফ্‌তের মধু অলি,
রাগ ক'রো না, রায় বাবু গো, দুটো সত্যি কথা বলি,—
যগা ধোপা খোসামুদে, অধিক বল্‌বো কি,
গরম ভাতে বেগুণ-পোড়া, পান্তা ভাতে ঘি ! *

* পরম-পূজনীয় স্বর্গত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই গানটি এবং তৎ-সম্বন্ধে গল্পটিও আমাকে বলিয়াছিলেন। এই গানটিতে ভোলানাথ, "রায়"-মহাশয়দিগের নিন্দা করিয়াছেন। গানটির ভাব এই,—"বামুন রাজা···বন"—রায় মহাশয়েরা জাতিতে ব্রাহ্মণ, এবং তাঁহাদের প্রজাগণ চাষা অর্থাৎ অশিক্ষিত। "জাড়া"-গ্রামের চতুর্দ্দিকে বাঁশের বন রহিয়াছে। "কৃষ্ণচন্দ্র···পারে—যজ্ঞেশ্বর গৃহস্বামী গোলোক-নারায়ণ রায় মহাশয়কে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সংসার-সাগরের অপর-পারে লইয়া গিয়া জীবকে মুক্তি-প্রদান করিতে পারেন। গোলোক-নারায়ণ মহাশয়ের সে শক্তি নাই। "পিঁপড়ে টিপে···খায়"—ইহা দ্বারা বলা হইল যে, বাবুরা অত্যন্ত কৃপণ। "মুফ্‌তের···অলি"—ভ্রমরগণ যেমন বিনা মূল্যে ফুলের মধু খাইয়া থাকে, রায়-বাবুরাও সেইরূপ বিনা ব্যয়ে কার্য্য উদ্ধার করেন। "বেগুণ-পোড়ায় নুণ দেয়···হাড়ি"—ভোলানাথ দূরবর্ত্তী স্থান হইতে, কবি গাইতে গিয়াছেন, বাবুরাও তাঁহার দলকে ভদ্রতা করিয়া "সিধা" দিয়াছেন। বাবুরা স্বহস্তে "সিধা" সাজাইয়া দেন নাই। বাটীর চাকররাই "সিধা" সাজাইয়া দিয়াছে। সুতরাং তাহারা ভ্রমবশতঃ নুণ দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, ইহাই সম্ভবপর। বাবুরা যখন "সিধার" সমস্ত সামগ্রীই দিয়াছেন, তখন যে তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া নুণ দেন নাই, ইহা মনে করিলেও পাপ হয়। কারণ, নুণ অতি তুচ্ছ বস্তু, এবং রায় মহাশয়রাও ধনাঢ্য, দানশীল ও সম্ভ্রান্ত লোক। ভোলানাথ একজন কবি ; এজন্য আসরে জয়লাভ করিবার ইচ্ছায় বাবুদিগকে গালাগালি দিয়া বাহাদুরী দেখাইয়াছেন।

মদীয় পরম-প্রিয়তম ও বুদ্ধিমান্ ছাত্র শ্রীমান্ মুরারিমোহন রায় বাবাজীউ উক্ত গোলোক-নারায়ণ রায় মহাশয়ের প্রপৌত্র এবং স্বর্গত হেরম্বচন্দ্র রায় মহাশয়ের পৌত্র। শ্রীমান্ মুরারিমোহন, তাহার পিতৃ-পিতামহের একখানি "বংশ-লতিকা" আমাকে দেখিতে দিয়াছিল। ইহা হইতেই আমি বাবুদের বাটীর লোকগণের নাম পাইয়াছি। পরস্পরের সহিত সম্পর্ক লিখিয়া না দিলে অর্থ-বোধ হইবে না। স্বর্গত রাজীব-লোচন রায় মহাশয়ের ৪টি পুত্র,—শিবনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ এবং গোলোকনারায়ণ। শিবনারায়ণের পুত্র শম্ভুচন্দ্র, গঙ্গানারায়ণের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র। লক্ষ্মীনারায়ণ অপুত্রক। গোলোক-নারায়ণের ২টি পুত্র,—জ্যেষ্ঠ উমেশচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ হেরম্বচন্দ্র। ভোলানাথ স্বরচিত গানটিতে ইঁহাদেরই নামোল্লেখ করিয়াছেন।

উক্ত গানটি কাহার রচিত, তৎসম্বন্ধে একটু গোলযোগ

টাকীর সুপ্রসিদ্ধ বদান্যবর জমীদার স্বর্গত কালীনাথ মুন্সী (রায় চৌধুরী) মহাশয়ের দ্বিতীয় ভ্রাতা বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সী মহোদয়, কবি-গানের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সম্বন্ধে এক জন সুদক্ষ সমালোচক ছিলেন। কলিকাতা বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে কবিগান হইলে তিনি আসরে মধ্যস্থ নিযুক্ত হইয়া দুই পক্ষের দোষগুণ নিরূপণ করিয়া দিতেন। যাঁহার বাটীতে কবি-গান হইত, তিনি স্বয়ং এবং দুই পক্ষের প্রধান প্রধান লোক গিয়া তাঁহাকে মহা-সমাদরে আসরে উপস্থিত রাখিতেন; তিনিই স্বয়ং জয় বা পরাজয় ঘোষণা করিয়া জেতার হস্তে "নিশান" তুলিয়া দিতেন। কথা এই যে, তৎকালে তাঁহার মত কবি-গানের সমেজদার আর কেহই ছিলেন না। এ সম্বন্ধে ভোলানাথ কাশিমবাজারের রাজবাটীতে কবিগান করিতে গিয়া স্বরচিত একটি ছড়ার মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথ বাবুর বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। বরাহনগরে একবার কবি-গাহনা হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, সেবার ভবানী-চরণ বণিক্ (ভবানী বেণে) ভোলানাথের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। পাড়ার ভদ্রলোকগণ এবং দুই বিপক্ষ দলের প্রধান প্রধান লোক সকল বৈকুণ্ঠনাথ বাবুকে মধ্যস্থ মানিয়া আসরে উচ্চস্থানে বসাইয়া দিলেন। সঙ্গে তাঁহার দুই চারি জন পারিষদ ছিলেন। তন্মধ্যে এক জন গোপনে ভোলানাথের কাণে কাণে বলিয়া আসিলেন, এই আসরে আপনি প্রিয়নাথ বাবুকে একটু মিঠে-কড়া রকমে গালাগালি দিবেন; আপনাকে এই অনুরোধ করা গেল। শুনিবামাত্র ভোলানাথের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, আমি বৈকুণ্ঠনাথ বাবুর মাসিক বৃত্তিভোগী। বিশেষতঃ তিনি এই আসরে মধ্যস্থ আছেন। এস্থলে তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতা প্রিয়নাথ বাবুকে কিছু অপ্রিয় বলিলে বরাহ-নগরেই আমাকে মাথাটি রাখিয়া যাইতে হইবে। তখন পারি-ষদ বাবু বলিলেন, আপনি প্রিয়নাথ বাবুকে একটু মিঠে-কড়া রকমে শুনাইয়া দিলে সুরসিক বৈকুণ্ঠনাথ বাবু আপনার প্রতি রুষ্ট না হইয়া বরং তুষ্টই হইবেন। ভোলানাথ প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, প্রিয়নাথ বাবু ও আমি উভয়েই অত্যন্ত পাণ খাইয়া থাকি। অতএব পাণ অবলম্বন করিয়াই একটি ছড়া বাঁধিয়া এককালেই তাঁহার নিন্দা ও প্রশংসা করিব। ইহা ভাবিয়াই ভোলানাথ আসরে গিয়া এই ছড়া বাঁধিয়া গাহিলেন :—

পানকে 'তাম্বূল,' 'পর্ণ' বলে সাধু ভাষা,
বুরুজে বিরাজ করে, চাষার বড় আশা।
বুড়ো বুড়ী, ছোঁড়া, ছুঁড়ী, যুবক, যুবতী,
পান পেলে সকলেরি পরম পীরিতি।
কৃষ্ণপান্তী কলা-পাতে খেত পান্তাভাত,
পানের গুণে সোণার থাল, ঘরে সোণার ছাত।
মোষের মত মুন্সী বাবু, মসীর মত কালো, *
পান খে'য়ে ঠোঁট রাঙ্গায় চেহারাখানি ভালো।
পূর্ব্ব-জন্মের পুণ্য-ফলে পান খেতে পাই,
লক্ষ্মীছাড়া বাসি-মড়া, যার পানের কড়ি নাই!

শুনিতে পাওয়া যায়, যজ্ঞেশ্বরী-নামা এক রমণী রাম বসুর বিশেষ অনুগৃহীতা ও রক্ষিতা ছিলেন। তিনি রাম বসুর ন্যায় স্বয়ং সুকবি ছিলেন। যজ্ঞেশ্বরী যেখানে কবি গাওনা করিতে যাইতেন, রাম বসুও সেইখানে প্রায় তাঁহার সঙ্গে যাইতেন। একবার কাশিমবাজার রাজবাটীতে ভোলানাথ ও যজ্ঞেশ্বরীর দলের বায়না হইয়াছিল। যজ্ঞেশ্বরী দেখিলেন, অদ্যকার আসরে ভোলানাথের হস্তে নিষ্কৃতি লাভ করা অসম্ভব। এজন্য তিনি প্রকাশ্যভাবে কহিলেন, "ভোলানাথ আমার পুত্র, এবং আমি ভোলানাথের মাতা।" ইহার অর্থ এই যে, ভোলানাথ পুত্র এবং যজ্ঞেশ্বরী মাতা হইলে ভোলানাথ আর যজ্ঞেশ্বরীকে গালাগালি দিতে পারিবেন না। ভোলানাথ পুত্র সাজিয়াও কিরূপ কৌশলে শাস্ত্ররক্ষা করিয়া যজ্ঞেশ্বরীকে তীব্রভাবে গালাগালি দিয়াছিলেন, পাঠক মহাশয়গণ তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। ভোলানাথ আসরে গিয়াই গাহিলেন :—

তুমি মাতা যজ্ঞেশ্বরী সর্ব্বকার্য্যে শুভকরী
তোমার ঐ পুরাণো এঁড়ে রাম বোস্ আমার বাপ।
যেমন পিতা তেম্নি মাতা ভোলানাথের অভয়-দাতা
মা-বাপ ঠিক লাগিয়ে দিলে থাপ॥

আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন, উক্ত গানটি ভোলানাথের রচিত। কলিকাতার সাধারণ লোক ইহা ভোলানাথের রচিত বলিয়াই জানেন। কিন্তু স্বর্গত হেরম্বচন্দ্র রায় মহাশয় আমাকে এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন, "ঘাঁটাল-নিবাসী বৈষ্ণব-জাতীয় স্বর্গত হরিবোল দাস এই গানটির রচয়িতা।" ঘাঁটাল-নিবাসী শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় লিখিয়া জানাইয়াছেন, "চন্দ্রকোণা-নিবাসী হারা কৈবর্ত্ত এই গানটি রচনা করিয়াছেন।" প্রকৃতপক্ষে এই গানটি কাহার রচিত, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। স্বর্গত হেরম্ব বাবু মহাশয় আমাকে পূর্ণ গানটি দিতে পারেন নাই। আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতেই সম্পূর্ণ গানটি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

উক্ত "যগা" কে এবং সে কোন্ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাও এ স্থলে বলা উচিত। হেরম্ব বাবু লিখিয়াছেন, "ইহার নাম যজ্ঞেশ্বর দাস; এই ব্যক্তি জাত্যংশে ধোপা এবং নিবাস নিমতলা ছিল।" কেহ কেহ কহেন, "ইহার নাম জগন্নাথ দাস; এবং এই ব্যক্তি জাত্যংশে 'বেণে' ছিল।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, এই ব্যক্তির নাম যজ্ঞেশ্বর দাস; এবং এই ব্যক্তি জাতিতে ধোপা ছিল।—লেখক।

* বৈকুণ্ঠনাথ বাবু ও তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতা প্রিয়নাথ বাবু, উভয়েই ভোলানাথের কবিতায় নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নিজ নিজ গায়ের মূল্যবান্ শাল তাঁহার গায়ে জড়াইয়া দিলেন। ভোলা-নাথের হৃৎকম্প বন্ধ হইল। খড়দা নিবাসী স্বর্গত ভোলানাথ সেন মহাশয় ১০।১২ বৎসর হইল, ৮২ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনিই এই ছড়াটি আমাকে দিয়াছিলেন। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছিলাম যে, ভোলানাথ-কর্ত্তৃক প্রিয়নাথ বাবুর আকৃতি-বর্ণন সত্য। মদীয় বাল্যবন্ধু, বৈকুণ্ঠনাথ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র, বরাহনগর-নিবাসী স্বর্গত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্, এ, বি, এল্ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, "জ্যেঠা মহাশয় (বৈকুণ্ঠনাথ বাবু) গৌরবর্ণ ও সুপুরুষ এবং প্রিয়নাথ বাবু কৃষ্ণবর্ণ ও স্থূলকায় ছিলেন।"

এখন মা ! সুধাই তোরে কেন এ'সে এই আসরে
ঘন ঘন দিচ্ছ জোরে ডাক্।
বুঝি তোমার হ'য়েছে কাল বেহায়ার নাই কালাকাল,
তাই বাবুদের সভায় এত হাঁক্॥
তোমার পুত্র ভোলা গুণধর সকল কাজেই অগ্রসর
তোমার মতন মাতার দুঃখ দেখিতে না চাই।
পঞ্চ পিতা, সপ্ত মাতা * শাস্ত্রে শুনতে পাই,
তুমি আমার গাভী-মাতা চল তোমায় * ধরাতে যাই॥

(১১) রাজা হরিনাথের নিকটে ভোলানাথের আত্ম-পরিচয়-প্রদান

প্রসিদ্ধ কাশিমবাজার-রাজবংশের প্রথিতনামা রাজা হরিনাথ বাহাদুর অতীব উদার-স্বভাব, মুক্তহস্ত ও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তিনি প্রাচীন ওস্তাদী কবিগণের গান শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। একবার তিনি ভোলা ময়রা ও রাম বসুর দলের বায়না করিয়া তাঁহাদিগকে কাশিমবাজার রাজবাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। সেই সঙ্গীত-সমরে ভোলানাথেরই জয় হইয়াছিল। আসর ভাঙ্গিবার পরে রাজা বাহাদুর ভোলানাথকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় করেন। ভোলানাথের সহিত আলাপ করিয়া রাজা বাহাদুর নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা বাহাদুর বলিলেন, "ভোলানাথ! তোমার আত্ম-পরিচয় দাও; অর্থাৎ তোমার নাম, ধাম, জাতি বাসস্থান এবং সংবৎসর ধরিয়া যাহা কর, তাহা বল।" তদুত্তরে ভোলানাথ, রাজা বাহাদুরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সম্মুখে বসিয়াই পদ্যচ্ছন্দে এইরূপে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন :—

আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা
(ওগো) সর্দ্দি-গর্ম্মি নাহি মানি।
ফুরাইলে বার মাস ষড়্ ঋতুর হয় নাশ
(ওগো) কেবল এই কথাটা জানি॥
শীতে ভাজি মুড়ি খই গর্ম্মি-কালে ঘোল মই
বার মাস ভিঁয়াই সন্দেশে।
খাইতে ভোলার গোল্লা ফিরিঙ্গী এণ্টনি মোল্লা
হল্লা ক'রে তাল্লা দিয়া বসে॥
কাল মেঘে বর্ষাকালে বক উড়ে দলে দলে
ময়ূরের প্যাখমে বাহার।
ষড়্‌ঋতু বারমাসে মাঘের মেঘের শেষে
পেটের দায়ে জাতীয় ব্যাপার।

নহি কবি কালিদাস বাগবাজারে করি বাস
পূজো হ'লে পূরী মিঠাই ভাজি।
বসন্তের কুহু শুনে ভক্তির চন্দন সনে
কৃষ্ণ-পদে মন-ফুল সাজি॥
যা কিছু পয়সা জোটে নাহি তাহা দিই পেটে
কবির নেশায় দিই ঢালি'।
কি শরতে কি হেমন্তে কি শিশিরে কি বসন্তে
ভোলার খোলা ওগো নাহি খালি॥
তবে যদি কবি পাই হ'টে কভু নাহি নাই
হোক্ ব্যাটা যত বড় মদ্দ।
জাহাজ ডোঙ্গা সোলা নাও যাহাতে লাগায়ে দাও
ভোলা নয় কিছুতেই জব্দ॥
হরু-ঠাকুরের চেলা তাঁর পদে নত ভোলা
নমি' তাঁরে আসরে নামিল।
"ভোলা এল" এই বোল বাজিল তিন্দুব ঢোল
গণ্ডগোল চৌদিকে পড়িল॥
আসরে নামিলে ভোলা শিউরে উঠে কবি-ওয়ালা
কত * দেয় গালাগালি।
বাবু ভায়া সমেজদার কবি' সূক্ষ্ম সুবিচার
ভোলারে দেন জয়-ডঙ্কা তুলি॥
নবকৃষ্ণ লালা বাবু সব বাবুকে করেন কাবু
ঠাসা রস তাঁদের ভিতরে।
বাবু ত বৈকুণ্ঠ মুন্সী যেন চাবি আর ঘুন্‌সী
মুন্সী আনা কবির আসরে॥
অন্য বাবু যত সব যেন এক এক শব
সঙ্গীতের না বুঝেন মর্ম্ম।
ওস্তাদী কবির দল সুমধুর নিরমল
রসবোধ প্রাক্তনের কর্ম্ম॥ *

(১২) আসরে ভোলানাথের নিয়ম

ভোলানাথ যখন আসরে অবতীর্ণ হইতেন, তখন তিনি এক অদ্ভুত নিয়ম রক্ষা করিতেন। আসরের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত একগাছা দড়ি বাঁধিয়া রাখিতেন। তাহার এক প্রান্তে এক ছড়া কলা ও আর এক প্রান্তে গামছায় একটি টাকা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিতেন। গান আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভোলানাথ মাথায় শাদা-ধুতির পাগড়ী বাঁধিয়া আসরের কর্ত্তাদিগকে নম্রভাবে বলিতেন, যে হারিবে, তাহার ভাগ্যে ঐ কলার ছড়া, এবং যে জিতিবে, তাহার অদৃষ্টে ঐ গামছায় বাঁধা টাকা। কর্ত্তা বাবুরা ইহাতে সম্মত হইলে ভোলানাথ আকাশের দিকে দুই হাত তুলিয়া ও দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় অভীষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিতেন। সেই সঙ্গে মনে মনে একটি স্তুতিগানও করিতেন। তৎপরে আসরের কার্য্যারম্ভ হইত।

---

* পঞ্চ-পিতা—অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, শ্বশুর, উপনয়ন-কর্ত্তা ও জন্মদাতা।

"অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা।
উপনেতা জনয়িতা পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ॥"

সপ্ত-মাতা—গর্ভধারিণী, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণ-পত্নী, রাজপত্নী, গবী, ধাত্রী ও পৃথিবী।

"আত্মমাতা গুরোঃ পত্নী ব্রাহ্মণী রাজপত্নিকা।
গবী ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈতা মাতরঃ স্মৃতাঃ॥"

* "রিজ্ এণ্ড রাইয়ৎ" নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজী সংবাদ-পত্রের সম্পাদক, সুপণ্ডিত ও সুবিজ্ঞ ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে উক্ত কবিতাটি দিয়াছিলেন। এই কবিতায় ভোলানাথের আত্ম-পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।—লেখক।

তাহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থিত করিয়া লইল। বর-কনেকে আসরের মাঝে বসাইয়া বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রিগণ ইচ্ছামত পান-ভোজন করিতে আরম্ভ করিল। পানীয়-মধ্যে প্রচুর পরিমাণে 'মাড়ুয়া' নামক শস্য হইতে প্রস্তুত 'রুক্সী' মদ্য ও উষ্ণ চা; খাদ্যের মধ্যে গোধূমচূর্ণের সহিত ঘৃত, লবণ ও মিষ্টসংযোগে প্রস্তুত নানাপ্রকার পিষ্টক এবং ছাগ অথবা মেষমাংসের কাবাব ও চাকাচাকা করিয়া কাটা পাঁউরুটীই সমধিক আদরণীয় দেখা গেল। তাহারা সকলেই জানিত যে, খাদ্য ও পানীয় উভয় সম্বন্ধেই আমি নেহাৎ 'নিরিমিষ্', সেই জন্য মধ্যে মধ্যে উষ্ণ চা ও মাখম মাখানো ভাজা পাঁউরুটী ছাড়া অন্য কোনরূপ খাদ্য বা পানীয় দিয়া তাহারা আমাকে অভ্যর্থিত করিল না। তাহাদিগের সহিত মদ্য পান অথবা ভূরিভোজন না ক'রিলেও, আমি মুক্তভাবেই তাহাদের উদ্দাম আমোদে যোগ দিতেছিলাম ও নিজেও যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম। বিচিত্র বসন-ভূষণে সাজিয়া, খোঁপায় ফুলের মালা জড়াইয়া, গলায় ফুলের মালা দোলাইয়া মূর্ত্তিমতী উৎসবের রাণীর মত রমণীদল সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে উৎসব-সঙ্গীত গাহিতেছিল। প্রাঙ্গণের এক ধারে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া দুই জন সারেঙ্গ-ওয়ালা ও এক জন বংশীবাদক রমণীগণের কণ্ঠ-সুরে সুর মিলাইয়া বাজাইতেছিল। তিন জন যন্ত্রীই এমন ক্ষিপ্রতার সহিত ও এরূপ সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে তাহাদের নিজ নিজ যন্ত্রের উপর অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতেছিল যে, আমি তাহাদের নিপুণতা দেখিয়া বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়া রহিলাম। আমি একদৃষ্টে তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। কি আশ্চর্য্য! এই তিন জন যন্ত্রীই অন্ধ। তিন জনের মধ্যে যে দুই জন সারেঙ্গ বাজাইতেছিল, তাহাদের মুখ সাধারণ অন্ধ লোকের মুখের ভাব যেরূপ হয়, সেইরূপ তীক্ষ্ণ, সতর্ক ও গম্ভীর; কিন্তু যে লোকটি বাঁশী বাজাইতেছিল. তাহার মুখখানি এমন সুন্দর ও বিশেষত্বপূর্ণ যে, তাহা মনস্তাত্ত্বিক অথবা শিল্পীর দৃষ্টি আকৃষ্ট না করিয়াই যায় না। তাহার সুন্দর জাঁকাল মুখের মর্ম্মপীড়াজনিত তিক্তভাব যেন তাহার অন্ধত্বকে আরও তিক্ততর করিয়া তুলিতেছিল। চিন্তা তাহার মৃত চক্ষুর মধ্যে যেন একটি নবীন জীবন সংক্রামিত করিয়া দিয়াছিল। তাহার মস্তিষ্কমধ্যে কি যেন একটি অরুন্তুদ চিন্তা, এক অতি উৎকট আকাঙ্ক্ষার বহ্নি নিরন্তর জ্বলিতেছিল, যাহার তীব্র জ্বালা যেন তাহার জড় নয়ন-পথের মধ্য দিয়া মাঝে মাঝে বেশ দেখা যাইতেছিল। সেই বৃদ্ধ অন্ধ অনায়াসে তাহার বাঁশীতে ফুঁ দিতেছিল, যন্ত্রচালিতের মত তাহার অঙ্গুলিগুলি বাদ্যযন্ত্রের ক্লিন্ন ও ক্ষয়িত চাবিগুলি স্পর্শ করিতেছিল। তাহার সহজ স্বচ্ছন্দ অঙ্গুলি-তাড়নে রাগ-রাগিণীগুলি মূর্ত্ত ও জীবন্ত হইয়া উঠিতেছিল। এই অলৌকিক প্রতিভাশালী বৃদ্ধ অন্ধ বংশীবাদকের মুখে একটি প্রবল নিরঙ্কুশ শক্তি যেন স্থিরা সৌদামিনীর ন্যায় নিরন্তর প্রতিভাত হইতেছিল। এই শক্তিটি এত প্রবল—এত উচ্চ অঙ্গের যে, তাহা বৃদ্ধের বাহ্য দৈন্যের আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছিল। যে সকল প্রবল মনোবৃত্তির প্ররোচনে মানুষ স্বর্গের পথে অথবা নরকের পথে ঝাঁপাইয়া পড়ে, কর্ম্ম-জগতে বীর হয় অথবা দস্যু হয়, সেই মনোবৃত্তি-নিচয়ের সকলগুলিই এই বৃদ্ধের মস্তিষ্কমধ্যে খেলিতেছিল। এই বৃদ্ধের বক্ষঃপঞ্জরের অন্তরালে যেন একটি সিংহের হৃদয় আবদ্ধ ছিল। দারুণ নৈরাশ্যের নিশ্বাসে বৃদ্ধের সমস্ত আশা—সমস্ত আকাঙ্ক্ষা যেন পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল। এই ভাবগুলি বৃদ্ধের হৃদয়মধ্যে উদ্দীপিত হইয়া যেমন তাহার অন্তরাত্মাটিকে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া দিয়াছিল, সেইরূপ তাহার মুখের উপরও যেন জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়া কালো ছাপ লাগাইয়া দিয়াছিল।

বাজনার অবকাশকালে সারেঙ্গওয়ালা দুই জন তাহাদের সমীপস্থিত একটি মেজের নিকট বারবার উঠিয়া গিয়া নিজের হাতে ঢালিয়া 'রুক্সী' পান করিতেছিল ও প্রত্যেকবার এক এক পূর্ণ-পাত্র মদিরা আনিয়া বৃদ্ধ বাঁশীওয়ালার হাতে দিতেছিল। বৃদ্ধ প্রত্যেকবারই শিষ্টাচারের সহিত মাথা নোয়াইয়া তাহাদের হাত হইতে মদিরাপূর্ণ পাত্র লইয়া 'রুক্সী' পান করিতেছিল। আমি তাহাকে একবারও সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া নিজ হস্তে মদিরা ঢালিয়া লইতে দেখিলাম না। সমব্যবসায়ী সমান পর্য্যায়ের ও সহকর্ম্মী হইলেও যেন তাহার সহচরদ্বয় বংশীবাদককে একটু বেশী ভক্তি করিতেছে ও সম্মান প্রদর্শন করিতেছে, তাহা আমি তাহাদের হাবভাব ও কথাবার্ত্তা হইতে বেশ বুঝিয়া লইলাম। জানি না কেন, আমি এই বৃদ্ধ অন্ধ বংশীবাদকের

সহিত আলাপ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলাম।

একটু অধিক রাত্রিতে যখন আমন্ত্রিতগণের আহারের জন্য ডাক পড়িল, সেই অবসরে আমি এই অন্ধ যন্ত্রি ত্রয়ের খুব কাছে গিয়া বসিলাম। তাহারাও যেন, আমি বিদেশীয় জ্ঞানে আমার সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

আমিই প্রথমে অন্ধ বংশীবাদককে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "দাজু! আপনি বাঁশী বাজানো কোথায় শিখিয়াছেন? আপনার দেশ কোথায়?"

সে উত্তর করিল, "বাবুজী! আমার দেশ নেপাল—কাঠমাণ্ডুতে। নেপালের এক জন বড় ওস্তাদের নিকট আমি বাঁশী বাজাইতে শিক্ষা করিয়াছিলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি জন্মান্ধ? না কোন— ?"

সে উত্তর করিল, "না, বাবুজী! আমি জন্মান্ধ নহি। একটি দুর্ঘটনা হইতেই আমার এই অবস্থা হইয়াছে।"

আমি কহিলাম, "কাঠমাণ্ডু শুনিয়াছি বেশ যায়গা। আমার অনেক দিন হইতে ইচ্ছা, একবার ঐ অঞ্চলে বেড়াইতে যাইব।"

আমার কথা শুনিয়া বৃদ্ধের মুখ সহসা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; তাহার ললাটের কুঞ্চনগুলি এক একবার সম্প্রসারিত ও আবার কুঞ্চিত হইতে লাগিল। তাহার মন যে অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছে, ইহা তাহার হাবভাবে বেশ বুঝা যাইতে লাগিল।

সে কহিল, "বাবুজী! নেপালে বেড়াইতে গেলে যদি আপনি আমাকে সঙ্গে লইয়া যান, তাহা হইলে আপনার খরচ বৃথা যাইবে না।"

তাহার সঙ্গী সারেঙ্গওয়ালাদের এক জন কহিল,"বাবুজী! আমাদের মহারাজা বাহাদুরের কাছে নেপালের কথা পাড়িবেন না। একবার আসরফির খেয়াল উহার মাথায় চড়িয়া গেলে, আর উহাকে বাঁশী হাতে ধরাইতেই পারা যাইবে না।" পরে বংশীবাদকের দিকে ফিরিয়া সে কহিল, "এস ওস্তাদ! এর পরে যে গং কয়খানা বাজাইতে হইবে, এই ফাঁকে একবার সেইগুলির মহলা দিয়া লওয়া যাক।"

আমি বুঝিলাম যে, বংশীবাদকের ক্ষুব্ধ মনোবৃত্তিগুলিকে প্রশমিত করিবার জন্যই তাহার সহচরদ্বয়ের এই কৌশল।

তাহারা পর পর তিনখানি গৎ বাজাইল। আমি নিবিষ্ট-চিত্তে তাহাদের বাজনা শুনিতে লাগিলাম। আমি যে উৎসুকভাবে বংশীবাদককে নিরীক্ষণ করিতেছি, সে-ও যেন তাহা বুঝিতে পারিল। আমার সহিত আলাপ করিবার জন্য যেন সে ছোঁক্ ছোঁক্ করিতে লাগিল। তাহার মুখে যে দারুণ দুঃখ ও নৈরাশ্যের ভাব ছিল, তাহা যেন নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। কি যেন একটা আশার আলোকরেখাপাতে তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। খেয়ালী লোকের খেয়াল-পরিতৃপ্তির একটা সুযোগ ঘটিলে সে যেমন আমোদ পায়, এই বৃদ্ধ খেয়ালী নেপালী বংশীবাদকও যেন তাহার মনে মনে প্রচুর আমোদ উপভোগ করিতে লাগিল।

বাজনা শেষ করিয়া যখন তাহারা বিশ্রাম করিতে লাগিল, আমি তখন আবার তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দাজু! আপনার বয়স কত?"

সে উত্তর দিল, "বিরাশী বৎসর।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি অন্ধ হইয়াছেন কত দিন?"

সে উত্তর দিল, "প্রায় পঞ্চাশ বৎসর।" তাহার কথার প্রত্যেকটি অক্ষর তীব্র বিষাদপূর্ণ—যে বিষাদের মূল কারণ তাহার অন্ধত্ব নহে, আর কিছু। কেহ যে তাহার হাত হইতে একটি ভয়ঙ্কর শক্তি লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে, ইহাই এখন তাহাকে সাতিশয় মর্ম্মপীড়া দিতেছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার সঙ্গীরা আপনাকে 'মহারাজা বাহাদুর' 'মহারাজা বাহাদুর' বলিয়া ডাকিতেছে কেন?"

সে কহিল, "আমার পিতা ও পিতামহগণ কোনও কালে নেপালের রাজা ছিলেন, সেই জন্য এখনও লোকরা ঠাট্টা করিয়া আমাকে ঐরূপ বলিয়া ডাকে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার নাম কি?"

সে কহিল, "আমার এখানকার নাম 'কাণা রণবাহাদুর', আমার নেপালের নাম 'রাজকুমার রাজেন্দ্রবিক্রম রণবাহাদুর' অথবা 'কাঞ্চা রাজকুমার'।"

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলাম, "আপনি তাহা হইলে নেপালের এক জন প্রথিতনামা নৃপতির বংশধর। আপনার এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের কারণ?"

বৃদ্ধ একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া তাহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীনির্দ্দেশে নিজের ললাট দেখাইয়া কহিল, "অদৃষ্ট!"

সেই সময় হইতে বৃদ্ধ যেন সব ভুলিয়া গেল, উৎসব ভুলিয়া গেল, আমোদ-প্রমোদ ভুলিয়া গেল, পান-ভোজন ভুলিয়া গেল। তাহার সঙ্গী সারেঙ্গওয়ালা এক পাত্র মদিরা আনিয়া তাহার হাতে দিতে গেল সে হাত সরাইয়া লইল। মদের লালসা আর তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিল না। অন্ধ বাদকত্রয় একটি গৎ বাজাইতে আরম্ভ করিল। আমি তন্ময় হইয়া সেই দুঃস্থ রাজবংশধরের মুখের পানে অবাক্ হইয়া তাকাইয়া রহিলাম আর আমি কল্পনানেত্রে ভবানীর খড়্গাকারে গঠিত পার্ব্বত্য নগরী কাঠমাণ্ডুর অপূর্ব্ব শ্রী দেখিতে লাগিলাম।

এই বৃদ্ধ অন্ধ রাজবংশধর বংশীবাদক ও আমার মধ্যে অন্যের অলক্ষিতে চিন্তার আদান-প্রদান চলিতেছিল ও আমাদের মধ্যে এমন একটি সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যাইতেছিল —যাহার কারণ রহস্যময় ও দুর্জ্জেয়। কেবল তীক্ষ্ণধীঃ অন্ধ লোকরাই তাহাদের অন্তরিন্দ্রিয়ের অলৌকিকী প্রখরতার বলে এরূপ মোহকরী শক্তি সংক্রামিত করিতে সমর্থ হয়। আমি শীঘ্রই তাহার শক্তির প্রভাব বুঝিতে পারিলাম। গীত-বাদ্য শেষ হইয়া গেলে পর সে ধীরে ধীরে তাহার আসন ছাড়িয়া আমার কাছে আসিয়া বসিল ও অতিশয় অনুচ্চ স্বরে আমার কাণে কাণে কহিল, "আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহির হইয়া আসুন। চলুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহির হইয়া পড়িলাম।

রাস্তায় গিয়া সে আমাকে বলিল, "আপনি আমাকে কাঠমাণ্ডুতে লইয়া চলুন। আমি আপনার পথ-প্রদর্শক হইয়া যাইব। আপনি আমাকে বিশ্বাস করিবেন কি? আমার কথামত কায করিলে আপনি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনীর চেয়ে বহু গুণে বেশী ধনী হইয়া যাইবেন।"

আমি তখনই মনে করিলাম যে, লোকটি হয় ত পাগল। কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরের এমনই প্রভাব আমি অনুভব করিতে লাগিলাম যে, যন্ত্রচালিতের ন্যায় আমি তাহার অনুগমন করিতে বাধ্য হইলাম।

সে একটি বন্ধুর পার্ব্বত্য পথ দিয়া আমার হাত ধরিয়া একটি খদের মধ্যে নামিতে লাগিল। অনেকটা দূর নামিয়া গিয়া একটি নির্জ্জন স্থানে দুইখানি শিলা-ফলকের উপর আমরা দুই জনে মুখোমুখি হইয়া বসিলাম। মেঘহীন নির্ম্মল নীল গগনতলে পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতেছিল আর পার্ব্বত্য প্রকৃতির বুকে, মুখে, গায় অজস্র শুভ্র কৌমুদী ঢালিতেছিল। রৌপ্যের তারের উপর আলো পড়িলে যেমন চিক্-চিক্ করে, বৃদ্ধের মস্তকের শুভ্র কেশগুলির উপর চন্দ্রালোক পড়িয়া সেইরূপ চিক্-চিক্ করিতে লাগিল। চারিদিকে নৈশ নিস্তব্ধতা, বায়ুচালিত শুষ্ক বৃক্ষপত্রের মর্-মর্ শব্দ ও নির্ঝরিণীর কলকল ধ্বনি ভিন্ন অন্য কোন শব্দই তখন শুনা যাইতেছিল না। দ্বিপ্রহর রজনীর সেই রহস্যসঙ্কুল মুহূর্ত্তে বৃদ্ধ বংশীবাদক তাহার প্রহেলিকাময় জীবনের একটি অতিগুহ্য রহস্য আমার নিকট প্রকাশ করিল।

সে কহিল, "বাবুজী! আমি আমার উপাস্য দেবতা মাতা ভবানীর নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি আপনার নিকট যাহা বলিব, তাহার একটি বর্ণও মিথ্যা নহে। আমার বয়স তখন মাত্র বিংশ বৎসর। আমি ধনবান্, রূপবান্ ও একটি স্বাধীন রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর। জগতে যত রকম পাগ্‌লামী আছে, তার মধ্যে সকলের সেরা পাগ্‌লামী ভালবাসা। এই পাগ্‌লামী লইয়া আমার জীবনের আরম্ভ; এই পাগ্‌লামী লইয়াই বোধ হয় আমার জীবনের অবসান হইবে। আমি এমন ভালবাসিতাম যে, মানুষ সেরূপ ভালবাসিতে পারে না। আমি আমার প্রণয়িনীর সরস ওষ্ঠের একটিমাত্র চুম্বন লাভের আশায় সমস্ত রাত্রি প্রাণ হাতে করিয়া সিন্দুকের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছি। তাহাতেও আমি কষ্টবোধ করি নাই। তাহার তৃপ্তির জন্য মরণই আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা কাম্য বলিয়া মনে হইত। আমার প্রণয়িনী ছিল নেপাল-দরবারের এক জন শ্রেষ্ঠ ও অর্থশালী সর্দ্দারের পত্নী। আমার প্রণয়িনীর বয়স তখন মাত্র অষ্টাদশ বৎসর। তাহার স্বামীর বয়স ত্রিশ। আমি ও আমার প্রণয়িনী অনেক দিন ধরিয়া গোপনে আমাদের প্রণয়-ব্যাপার চালাইলাম। এক দিন

তাহার স্বামী আমাদিগকে হাতে হাতে ধরিয়া ফেলিল। তাহার স্বামীর হাতে কুকৃরি ছিল, আমার খালি হাত। তবে, আমি জাপানী ওস্তাদ রাখিয়া 'জিজিৎষু' শিক্ষা করিয়াছিলাম। 'জিজিৎষুর' একটি পেঁচ মারিয়া আমি মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাকে নিরস্ত্র ও ভূতলে পাতিত করিলাম ও তাহার বুকের উপর বসিয়া দুই হাতে তাহার গলা টিপিয়া, তাহাকে হত্যা করিলাম। তাহাকে হত্যা করিয়া সেই রাত্রিতেই আমি নেপাল হইতে পলাইয়া যাইব স্থির করিলাম। আমি আমার প্রণয়িনীকে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলাম; সে কিছুতেই আমার সহিত পলাইতে স্বীকৃত হইল না। স্ত্রীলোকের স্বভাবই এইরূপ! অগত্যা আমি একাই সেই রাত্রিতে নেপাল হইতে পলাইয়া গেলাম। যাইবার সময় আমার নিজের হীরা-জহরৎ, সোনা-দানা ও আসরফি যাহা ছিল, তাহা একটি পুঁটুলী বাঁধিয়া আমার সঙ্গে লইয়া গেলাম।"

এই কথা বলিয়া অন্ধ বংশীবাদক কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে আবার বলিতে লাগিল, "বাবুজী! একটি কথা আমি আগে হইতেই বলিয়া রাখি। কথাটি এই যে, গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের মনে যদি কোন অদ্ভুত খেয়াল জাগে, তাহা হইলে গর্ভস্থ সন্তানের উপরও সেই খেয়ালের প্রভাব সংক্রামিত হয়। এই সিদ্ধান্তটি সকল ক্ষেত্রে সত্য কি না, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে শুনিয়াছি যে, আমি যখন আমার মাতার গর্ভে ছিলাম, সেই সময় আমার মাতার বিছানার উপর রাশি রাশি আস্রফি ছড়ানো না থাকিলে তাঁহার ঘুম আসিত না, সুবর্ণ-থালায় আহার্য্য পরিবেষিত না হইলে তিনি খাইতে পারিতেন না, সুবর্ণ-নির্ম্মিত পাত্র ভিন্ন অন্য কোন পাত্রে তিনি পানীয় পান করিতে পারিতেন না। আস্রফি লইয়া তোলাপাড়া ও খেলাধুলা করাই ছিল তাঁহার একমাত্র বিলাস —একমাত্র ব্যসন। আমিও ঠিক আমার মায়ের সেই আস্রফির খেয়ালটি পাইয়াছি। যে কোন অবস্থায়ই আমি পড়ি না কেন, অন্ততঃ দুইটি আস্রফি আমার জেবে সর্ব্বদার জন্য থাকা চাহ ই চাই। আস্রফি ছাড়া এক মুহূর্ত্তও আমি থাকিতে পারি না। জাগ্রতে আস্রফি নাড়িয়া চাড়িয়া আমি স্বর্গসুখ পাই; নিদ্রায় আস্রফির স্বপ্ন দেখিয়া আমার রাত্রি সুখে কাটিয়া যায়। আমার যৌবনকালে আমি রাতদিন দশ আঙ্গুলে আংটী, গলায় মতির মালা, কাণে হীরার বীরবৌলী, পাগ্ড়ীতে মতির শিরপেঁচ পরিয়া থাকিতাম। আমার কুক্রির খাপখানি পর্য্যন্ত ছিল বহুমূল্য হীরাচুণি-পান্না-খচিত। আমি যেখানে যাইতাম, দুই তিন শত আস্রফি আমার কোমরের গেঁজেতে ও আমার কোর্ত্তার জেবেই থাকিত।"

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ সত্য সত্যই তাহার কোর্ত্তার জেব হইতে দুইটি বহু প্রাচীন নেপাল-দেশীয় সুবর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া আমাকে দেখাইল।

সে কহিল, "কোথায় সোনা আছে, আমি ঘ্রাণে তাহা বুঝিতে পারি। যদিও আমি অন্ধ, তথাপি পথ চলিতে চলিতে মণিকারের দোকানের নিকট গিয়া আমার পা আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া আসে। আমি সেইখানেই দাঁড়াইয়া পড়ি। এই সুবর্ণানুরাগই আমার সর্ব্বনাশের মূল। রাতদিন সোনা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে পারিব, এই উদ্দেশ্যেই আমি জুয়াড়ী হইলাম। জুয়াড়ী হইয়াও আমি কিন্তু কখনও কাহাকে ঠকাই নাই; আমি নিজেই ঠকিতাম; ঠকিতে ঠকিতে আমি সর্ব্বস্বান্ত হইলাম। যখন আমি একবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলাম, তখন আবার দেশে ফিরিবার জন্য, একবার আবার আমার প্রণয়িনীর মুখখানি দেখিবার জন্য আমার বলবতী ইচ্ছা হইল। আমি গোপনে নেপালে ফিরিয়া গেলাম। ছয় মাস আমি চোরের মত তাহাদের বাড়ীতে লুকাইয়া রহিলাম। তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার দেবর হইয়াছিল তাহার অভিভাবক। এই যুবক সর্দ্দারও আমার প্রণয়িনীর প্রতি অনুরক্ত ছিল। কেমন করিয়া জানি না, এই যুবকের মনে সন্দেহ জন্মিল যে, তাহার প্রণয়ে এক জন প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়াছে। আমাদের নেপালীদিগের মধ্যে প্রণয়িনীর উপর সন্দিগ্ধতা একটি সহজাত সংস্কার। সন্দেহ হওয়ার পর হইতেই সেই নীচ-প্রকৃতির জীব আমার প্রণয়িনীর গতিবিধি ও কার্য্যকলাপের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করিয়া দিল। এক দিন রাত্রিতে সে আমাকে আমার প্রণয়িনীর কক্ষে তাহার সহিত এক শয্যায় শায়িত অবস্থায় ধরিয়া ফেলিল। আমার সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার খুব হাতাহাতি হইল। আমি তাহাকে হত্যা করিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু সে সাংঘাতিকভাবে আহত হইল। এই ঘটনায় আমার জীবনের সুখ একবারে অন্তর্হিত হইল। তাহার মত ভালবাসা

আর আমার ভাগ্যে জুটিল না। আমি বহু বহু দেশ পর্য্যটন করিয়াছি, বহু রাজা-রাজড়ার দরবারে ঘুরিয়াছি, বহু রমণীর সংস্রবে আসিয়াছি, কিন্তু সৌন্দর্য্যে বল, ভালবাসায় বল, তাহার মত সর্ব্বগুণসম্পন্না স্ত্রীলোক আর এক জনও আমার চোখে পড়ে নাই। আমার আততায়ী, আমার প্রণয়িনীর দেবর পূর্ব্ব হইতেই ঘরের বাহিরে লোকজন প্রহরায় রাখিয়া দিয়াছিল। তাহারা সকলে মিলিয়া আমাকে ধৃত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি অনেকক্ষণ তাহাদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিলাম। আমার প্রণয়িনীও যাহাতে তাহার দেবর নিহত হয়, সেই জন্য আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করিল। সে বুক দিয়া আমাকে আগুলিয়া রহিল। কি আশ্চর্য্য! ইতিপূর্ব্বে এই রমণীই আমার সহিত পলাইয়া যাইতে স্বীকৃত হয় নাই। আমার সহিত ছয় মাসের সঙ্গসুখই আজ তাহাকে এমন পাগল করিয়া তুলিয়াছিল যে, সে আমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিল। আমি একাকী। আমার শত্রুর পক্ষে লোকজন অনেক। তাহারা একখানি বড় সতরঞ্চি আনিয়া আমাকে চাপা দিল ও সেই সতরঞ্চির মধ্যে আমাকে জড়াইয়া লইয়া মড়ার মত বহন করিয়া লইয়া চলিল। অনেক দূরে গিয়া সেই অবস্থাতেই তাহারা আমাকে ভূগর্ভস্থ একটি অন্ধকারময় কারাকক্ষে নিক্ষেপ করিল। যখন আমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলাম, তখন আমি লুপ্তসংজ্ঞ হইলেও আমার ভগ্নফলক তরবারির বাঁট-খানি তখনও দৃঢ়ভাবে আমার মুষ্টিবদ্ধ ছিল। সেখানি কোন সময়ে আমার উপকারে আসিতে পারে মনে করিয়া আমি ইহা আমার কারাকক্ষের এক কোণে একটি গর্ত্ত করিয়া লুকাইয়া রাখিয়া দিলাম। ক্রমশঃ আমার শরীরের আঘাত ও ক্ষতগুলি আরাম হইয়া আসিতে লাগিল। বাইশ বৎসর বয়সে মানুষের যে কোন রোগ আরাম হইতে বেশী সময় লাগে না। আমার বিচারের সময় নিকট হইয়া আসিতে লাগিল। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের অন্যত্র যেরূপ, নেপালেও সেইরূপ ইচ্ছাকৃত নরহত্যা অপরাধের শাস্তি—ফাঁসি। আমার সম্পর্কেও সেই দণ্ডাজ্ঞা হইল। নেপাল-দরবারের আইনে অপরাধীকে অসুস্থ অবস্থায় ফাঁসি দেওয়া হয় না। আমি অসুস্থতার ভাণ করিয়া সময় লইতে লাগিলাম। আমার কারাকক্ষে বসিয়া আমি রাতদিন জলের কল্লোল শুনিতে পাইতাম। ইহা হইতে আমি অনুমান করিয়া লইলাম যে, আমার এই কারাকক্ষটি নিশ্চয় বাঘমতী অথবা বিষ্ণুমতী নদীর অতিশয় সন্নিকটে। আমি রাতদিন বসিয়া কি উপায়ে এই কারাগৃহ হইতে পলাইতে পারা যায়, সেই উপায় উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিতাম। ঘরের দেওয়ালে কোনরূপ ফাটল বা রন্ধ্র পাওয়া যায় কি না, তাহাই অন্বেষণ করিতে করিতে এক দিন দেওয়ালের এক স্থানে দুইখানি পাথরের জোড়ের মুখে একটু ফাঁক দেখিতে পাইয়া আমি সেই স্থানের চারি পাশে হাতড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। হঠাৎ দেওয়ালের গায়ে ক্ষোদিত কতকগুলি অক্ষর আমার হাতে ঠেকিল। অক্ষরগুলি নেপালী নহে, বিশুদ্ধ দেবনাগরী। ইতিপূর্ব্বে নেপাল হইতে পলাইয়া গিয়া আমি দীর্ঘকাল কাশীতে ছিলাম। সেই সময়ে আমি ভালরূপে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলাম। আমি সুন্দরভাবে দেবনাগরী লিপি লিখিতে ও পড়িতে পারিতাম। অন্ধকারে অঙ্গুলিস্পর্শে অক্ষরের পর অক্ষর যোজনা করিয়া আমি জানিলাম যে, এই কারাগৃহের এক জন পুরাতন অধিবাসী আমারই মত কোন হতভাগ্য জীব, এখান হইতে পলায়নের চেষ্টায় বহু বৎসর একান্ত অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে একটি সুড়ঙ্গ খনন করিয়া গিয়াছে। তাহার চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সফল হওয়ার পূর্ব্বেই তাহার জীবন ও উদ্যম সমস্তই একসঙ্গে কালের কবলে কবলিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে তাহারই মত কোন হতভাগ্য যদি মুক্তিকামী হইয়া তাহার আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে দেওয়ালের সেই ফাটা স্থানে একখানি লৌহকীলক প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া চাপ দিলেই একখানি পাথর খোলা আছে দেখিতে পাইবে। এই পাথরখানি দিয়াই সুড়ঙ্গটির মুখ চাপা আছে। আমি তখনই শিলাফলকে ক্ষোদিত বিধি অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলাম। সত্য সত্যই একটি সুড়ঙ্গের মুখ বাহির হইয়া পড়িল। আমি আমার জীবনরক্ষা সম্বন্ধে একপ্রকার হতাশ হইয়া গিয়াছিলাম। এখন আবার আমার হৃদয়ে আশা জাগিল। আমার হস্তে বল ফিরিয়া আসিল। আমি গুপ্ত স্থান হইতে আমার সেই লুক্কায়িত ভগ্ন তরবারি-ফলকখানি বাহির করিয়া আনিলাম। যে স্থানে সুড়ঙ্গটি শেষ হইয়াছিল, আমি সেই স্থান হইতে খুঁড়িতে আরম্ভ করিলাম। আমার কারারক্ষী প্রত্যহ মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে দুইবারমাত্র আসিয়া আমাকে খাদ্য ও পানীয় দিয়া যাইত। সে

অধিকক্ষণ আমার কারাগৃহে অপেক্ষাও করিত না। ইহাতে আমার বেশ সুবিধা হইয়া গিয়াছিল। আমি দিবা ও রাত্রির সমস্ত সময়টুকু ধরিয়া আমার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য অবাধে কার্য্য করিবার অবসর পাইয়াছিলাম। মূষিক যেমন আস্তে আস্তে মাটীর মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া যায়, আমিও তেমনই আমার সেই বিচিত্র খনিত্রের সাহায্যে গর্ত্ত খুঁড়িতে লাগিলাম।

এক দিন প্রাতে রক্ষী আসিয়া বলিল যে, কাল বাদে পরশু দিন প্রভাতেই আমার ফাঁসি হইবে।

আর মাত্র দুইটি দিন সময় আছে। এই সময়ের অন্তে হয় আমার মুক্তি, না হয় মৃত্যু। রক্ষী চলিয়া গেলে পরেই আমি আমার সেই ভগ্ন তরবারির বাঁটখানি হাতে লইয়া সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সিংহের ন্যায় বলে, মূষিকের ন্যায় অধ্যবসায়ে, মৃগের ন্যায় ক্ষিপ্রতার সহিত আমি আমার আরব্ধ কার্য্য শেষ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। মাত্র একটি দিন! আজিকার প্রতি ঘণ্টা আমার নিকট মিনিটের মত ছোট বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সহসা আমার খনিত্রখানি একটি দারুময় প্রাচীর-গাত্রে প্রহত হইল। আমি সেখানি বেশ করিয়া ধার দিয়া লইলাম ও তাহার দ্বারা কাঠের দেওয়ালে একটি ছিদ্র করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইলাম। সেই রন্ধ্রপথে আমি একটি প্রশস্ত ঘর দেখতে পাইলাম। সেই ঘরের ভিতর দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এই পাতালপুরীর কক্ষে যদিও সূর্য্যালোক প্রবেশের কোনই পথ ছিল না, তথাপি আমি দেখিলাম যে, ঘরের মধ্যে যেন অসংখ্য খদ্যোৎ অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপ জ্বলিতেছে। সেই আলোকে আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম যে, ঘরের মাঝখান দিয়া একটি লম্বালম্বি পথ; সেই পথের দুই ধারে উচ্চ উচ্চ আস্‌রফির স্তূপ। এত সুবর্ণ আমি জন্মে আর কখনও চক্ষুতে দেখি নাই। অন্য কেহ দেখিয়াছে কি না, তাহাও জানি না। পরদিন প্রভাতে রক্ষী যখন আমাকে খাদ্য দিতে আসিল, তখন আমি তাহাকে সেই গুপ্ত ধনাগার দেখাইলাম। সেই দিন রাত্রিতেই আমরা একযোগে সেই ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া লইয়া পলাইব, এইরূপ সঙ্কল্প করিলাম। সন্ধ্যা হইতে আমরা দুই জনে মিলিয়া দেওয়ালের গায়ের সেই ছিদ্রটিকে কাটিয়া কাটিয়া এমন বড় করিয়া ফেলিলাম যে, এক জন মানুষ তাহার ভিতর দিয়া অনায়াসে গলিয়া যাইতে পারে। সেই সিঁদের ভিতর দিয়া আমরা দুই জনে সেই ধনাগারমধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমাদের দুই ধারে দুইটি বিশাল আস্‌রফির স্তূপ ও পরবর্ত্তী কক্ষে রাশী-কৃত জড়োয়ার গহনা দেখিয়া আমার কারারক্ষক আনন্দে আত্মহারা হইয়া করতালি দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। আমি দেখিলাম যে, সে পাগল হইয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিতে লাগিলাম। সে আনন্দে এত বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল যে, সেই ঘরের কোণে যে প্রকাণ্ড একটি হীরকের স্তূপ ছিল, সেই স্তূপটি সে একবারেই দেখিতে পায় নাই। আমি আমার জামার ও পায়জামার সবগুলি জেব হীরকে পূর্ণ করিয়া লইলাম। আমার কারারক্ষী আট দশটি চটের থলিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়া-ছিল। আমরা থলিয়াগুলি গাঁজে গাঁজে বোঝাই করিয়া কেবল আস্‌রফি লইলাম। জড়োয়া গহনা কিম্বা অন্য কোন বহুমূল্য প্রস্তরাদি আমরা লইলাম না, কারণ, তাহাতে ধরা পড়ার বেশী সম্ভাবনা।

চারিটি ভারবাহী অশ্বতর ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। আমরা রাতারাতি আস্‌রফির থলিয়াগুলি অশ্বতরপৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া, অধিক লোক-চলাচলের পথে না গিয়া, অপেক্ষাকৃত দুর্গম, সঙ্কীর্ণ ও পরিত্যক্ত পার্ব্বত্যপথ ধরিয়া রওনা হইলাম। কারা হইতে পলায়নের পূর্ব্বেই ভিত্তি-গাত্রের যে শিলাখণ্ডখানি সরাইয়া আমি সুড়ঙ্গ খনন করিয়াছিলাম, সেইখানিকে আবার যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিলাম। কারারক্ষক ও আমি উভয়ে একই সময়ে কারা হইতে অন্তর্হিত হওয়ায় রাজকর্ম্মচারিগণ ও রাজ-পুরুষরা সকলেই ভাবিল যে, রক্ষীকে উৎকোচদানে বশীভূত করিয়া আমি পলায়ন করিয়াছি। রক্ষীও ধরা পড়িলে পাছে দণ্ড পায়, সেই ভয়ে নেপাল পরিত্যাগ করিয়াছে।

পরদিন প্রভাতে আমরা নেপালের সীমা অতিক্রম করিয়া ইংরাজ-রাজত্বে আসিয়া পড়িলাম। নেপাল হাতা ছাড়াইয়াই কারারক্ষী আমার সঙ্গত্যাগ করিয়া তাহার নিজের দেশে যাইতে ইচ্ছা করিল। সে ছিল সিকিম্-দেশীয় এক জন লেপচা। আমাকে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। সুতরাং, আমাদের সংগৃহীত অর্থ সমান দুই ভাগে বণ্টন করিয়া এক ভাগ তাহাকে দিলাম, অন্য ভাগ আমার রহিল। আমি যাহা ভাগে পাইলাম, তাহা ও আমার সঙ্গীর

অলক্ষিতে সংগৃহীত হীরকের মূল্য ধরিয়া আমার নিকট এক্ষণে দশ লক্ষ টাকারও অধিক ছিল।

ইতিপূর্ব্বে আমি অনেক দিন কাশীতে ছিলাম। এবারও কাশীতেই গেলাম। কাশী গিয়া আমি একবারে আমার ভোল্ বদলাইয়া ফেলিলাম। আমি সখ করিয়া আমার ভোল্ বদলাই নাই। নেপাল-দরবারের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া আমাকে আমার নাম-ধাম ও পোষাক-পরিচ্ছদ সমস্তই পরিবর্ত্তন করিতে হইল।

আমার প্রণয়িনীও আমার ধরা পড়ার অল্পদিন পরেই আত্মহত্যা করিয়া মরিল।

এবার কাশীতে আসিয়া আমি রাজা-রাজড়ার চালে বাস করিতে লাগিলাম। আমি এক জন সুন্দরী যুবতী ছত্রী-কন্যার পাণিগ্রহণও করিলাম। আমার নির্ব্বুদ্ধিতায়, আমার নিতান্ত আত্মীয় জ্ঞানে আমি এই রমণীর নিকট আমার গত জীবনের গুপ্তরহস্য সমস্ত ব্যক্ত করিলাম। কে জানিত যে, স্ত্রীলোক এত অবিশ্বাসিনী!

এই সময়ে আমি সহসা অন্ধ হইয়া গেলাম। বোধ হয়, বহুকাল ধরিয়া অন্ধকারময় কারাকক্ষে বাস ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই আমার চক্ষু দুইটি নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ।

এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় আমার স্ত্রী আমাকে এক গ্লাস ভাঙের সরবত প্রস্তুত করিয়া আনিয়া আমাকে পান করিতে দিল। আমি গ্রীষ্মকালে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ভাঙের সরবত পান করিতাম। আমার স্ত্রীর প্রস্তুত ভাঙের সরবত অত্যন্ত সুপেয় হইত। সে দিনের সরবতটার আস্বাদ আমার নিকট যেন অত্যন্ত কটু ও বিস্বাদ বলিয়া বোধ হইল। সেই রাত্রিতেই আমি ভয়ঙ্কর পীড়িত হইয়া পড়িলাম। আমার মাথার মধ্যে দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম। তখন হইতেই আমার চোখের উপর যেন একটা পরদা পড়িয়া গেল! আমি জগৎ অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলাম। আমি বাহিরে চক্ষুহীন হইলাম বটে, কিন্তু আমার অন্তর্দৃষ্টি চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। আপনি আমাকে বাহিরে চক্ষুহীন দেখিতেছেন বটে, কিন্তু এই মুহূর্ত্তে এমন একটি দীপ্তি আমার চক্ষুর মধ্যে খেলিতেছে, যাহা সমস্ত জগৎটাকে আমার নিকট ভাস্বর করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু কি কষ্ট! কি পরিতাপ! কেহই আমার কথা বিশ্বাস করে না! সকলেই আমার কথা পাগলের প্রলাপ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। আপনি বিশ্বাস করুন। আপনি একবার আমাকে নেপালে লইয়া চলুন। আমি আপনাকে সেই গুপ্ত ধনাগার দেখাইয়া দিব। আমরা দুই জনেই বড়মানুষ হইয়া ফিরিয়া আসিব।

এই অন্ধের মস্তকের পক্ক কেশ দেখিয়া ও তাহার কথার ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা অনুভব করিয়া আমি বিস্মিত হইয়া রহিলাম। আমি তাহার কথায় কোন উত্তর দিলাম না। এই বিপথগত রাজপুত্র বোধ হয় মনে করিতে লাগিল যে, অন্য লোক যেমন, আমিও তাহাকে সেইরূপ পাগলই মনে করিতেছি।

সুবর্ণের স্বপ্নে বিভোর হইয়া বৃদ্ধ আবার কহিল, "সেই আস্‌রফির স্তূপ! জাগ্রতে নিদ্রায় সকল সময়েই সেই আস্‌রফির স্তূপ আমি দেখিতে পাই। আমার দিবা-রাত্রি সেই সোনালি স্বপ্নে কাটিয়া যায়। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! আমি নিঃস্ব! একটি স্বাধীন রাজ্যের শেষ বংশধর আমি, আমি কপর্দ্দকহীন! পশুপতিনাথ! নরহত্যা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি এত কঠোর?"

বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কম্পিত কণ্ঠে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুজী, শুনিলেন ত? এখন আপনার আদেশ কি?"

আমি আবেগভরে দৃঢ়স্বরে কহিলাম, "দাজু! আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া নেপাল লইয়া যাইব।"

বৃদ্ধের মুখ আশায় ও উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে কহিল, "তা হ'লে কাল সকালেই চলুন।"

আমি কহিলাম, "পাথেয় কিছু সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে ত?"

সে কহিল, "কিছু দরকার নাই, বাবুজী! আমরা হাঁটিয়াই যাইব। পথ-ঘাট সমস্ত আমার চেনা। আমরা সমস্ত দিন পথ চলিব। যেখানে সন্ধ্যা হইবে, সেইখানে গিয়া কাহারও বাড়ীতে অতিথি হইব। আমাদের নেপালে অতিথিকে একমুষ্টি অন্ন দিতে কোন গৃহস্থই কার্পণ্য করে না। আমার শরীরে এখনও বেশ সামর্থ্য আছে। আস্‌রফি দেখিলে আবার আমার দেহে যৌবন ফিরিয়া আসিবে। চলুন, আমরা কালই প্রাতে রওনা হইয়া যাই।"

বৃদ্ধের সেই মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমি এমনই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম যে, তাহার গল্পটির অসম্ভাব্যতা আমি ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃত হইয়া গেলাম। আমি কহিলাম, "বেশ, কল্য প্রাতেই আমরা রওনা হইব।"

সে কহিল, "তাহা হইলে আমার সঙ্গে আসুন, আমি যে ঘরে বাস করি, সেই ঘরখানি আপনাকে দেখাইয়া দিই। বেশী দূর নয়, আর খানিকটা নীচে। আপনি সকালেই আমার ওখানে আসিবেন। আমি শেষ রাত্রিতেই উঠিয়া প্রস্তুত হইয়া আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিব।"

আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। সে দূর হইতে আমাকে তাহার জীর্ণ কুটীরখানি দেখাইয়া কহিল, "বাবুজী! আমি ঐ ঘরে থাকি। মনে রাখিবেন কিন্তু—কাল ভোর-বেলা।"

বৃদ্ধের নিকট বিদায় লইয়া আমি নানা চিন্তা করিতে করিতে স্বপ্ন-চালিতের ন্যায় বাসায় ফিরিয়া গেলাম।

* * *

পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া আমি প্রাতঃকৃত্য সারিয়া লইলাম ও যোধপুরী ব্রিচেস আঁটিয়া, মোটা পট্টুর মিলিটারি কোট গায়ে চড়াইয়া, হবনেল্‌ওয়ালা বুটের উপর ক্যাম্বিসের পট্টি লেগিং জড়াইয়া আমি প্রবাসের পথে বাহির হইলাম। আমার পথের সম্বল একখানি ভুটিয়া কম্বল আমার পিঠে বাঁধা ও একখানি শাণিত দুই-ফলা বড় গার্ডেন্‌-নাইফ আমার পকেটে।

* * *

বৃদ্ধের কুটীরের সম্মুখীন হইবামাত্র কি জানি কি এক অজানিত আতঙ্কে আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল। সেই পার্ব্বত্য পল্লী তখনও সুপ্ত—তখনও নীরব। বৃদ্ধের কুটীর-দ্বার তখনও রুদ্ধ। আমি দ্বারে করাঘাত করিয়া জিজ্ঞাসিলাম, "দাজু! ঘুমাইতেছেন কি?" কোনও উত্তর আসিল না। আমি আরও জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিলাম, তবু কোন সাড়া পাইলাম না। তখন দরজা ঠেলিলাম। ভিতরে দ্বারের গায়ে ঠেসানো একখানি পাথর সরিয়া গেল। দ্বার অর্গলাবদ্ধ নহে, খোলা। দরজার এক পাট খুলিয়া আমি কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। একটি মর্ম্মভেদী দৃশ্য আমার নয়নগোচর হইল!

বৃদ্ধ যে বেশে গত রজনীতে বিবাহ-উৎসবে গিয়াছিল, সেই বেশেই সে তাহার জীর্ণ ও মলিন শয্যার উপর উত্তান-ভাবে শুইয়া আছে। তাহার বার্দ্ধক্যের নিত্য সহচর বাঁশীটি রেশম দিয়া ভাঙ্গানো একটি পুরাতন রজ্জু দিয়া তাহার গলায় ঝুলানো আছে। তাহার চেতনা লুপ্ত, দেহ হিম ও মরণ-জড়। তাহার দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ। মুষ্টিমধ্যে, তাহার জীবনের অতিমাত্র প্রিয় সেই দুইটি পুরাতন নেপালী আসরফি।

শ্রীমনোমোহন রায়।

আশা-পথ

আমি আছি আশা-পথ চাহিয়া
যুগ-যুগান্তর ধরিয়া!
কতবার আমি এসেছি হেথায়
গিয়াছি আবার ফিরিয়া—
যুগ-যুগান্তর ধরিয়া।
আমি, কত আশা লয়ে আসি পথ বয়ে
তব দরশন মাগিয়া—
যুগ-যুগান্তর ধরিয়া।
তুমি দেখা নাহি দাও দূরে স'রে যাও
আমি থাকি পথে পড়িয়া—
যুগ-যুগান্তর ধরিয়া।
তুমি, দেহ-কারাগারে বাঁধিয়া আমারে
রেখেছ যতন করিয়া—
যুগ-যুগান্তর ধরিয়া।
আমি, ছাড়া নাহি পাই কেঁদে কেঁদে যাই
তুমি দেখ শুধু চাহিয়া—
যুগ-যুগান্তর ধরিয়া।
আমি, আঁধার হৃদয়ে প্রদীপ জ্বালিয়া
করিব আরতি হাসিয়া কাঁদিয়া
তুমি আসিও করুণা করিয়া—
আমি, আছি আশা-পথ চাহিয়া!

শ্রীমতী সরোজবাসিনী বসু।
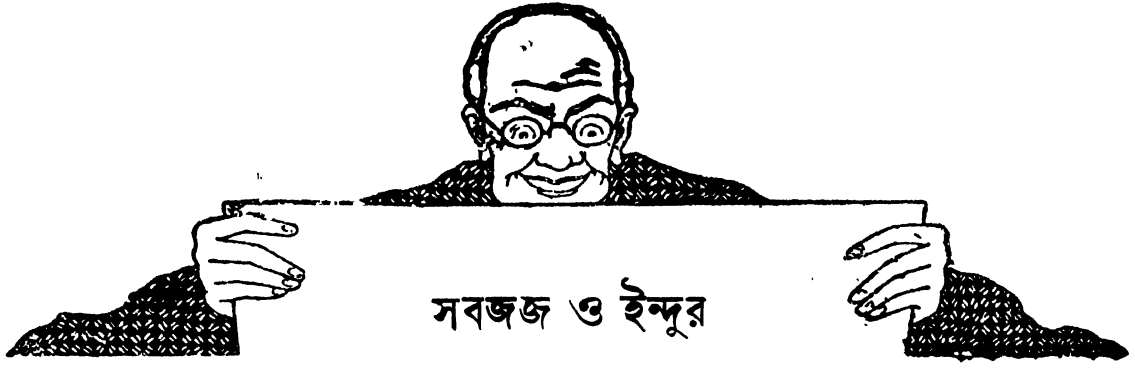
সবজজ ও ইন্দুর

১

বহুদিন পূর্ব্বে রঘুপতি বাবু বেহারের উত্তরপ্রান্তবর্ত্তী এক জেলার সবজজ ছিলেন। সে জেলায় তখন জজ ছিলেন না, পার্শ্ববর্ত্তী অন্য জেলার জজ আসিয়া দায়রার কার্য্য করিতেন। এই জেলার বাৎসরিক রিপোর্টাদি সবজজের হাত দিয়াই যাইত। বেহারের সকল জেলায়ই তখন নীলকর জমীদারদিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল, এখনও তাহার কিছু কিছু আছে। বাৎসরিক রিপোর্টে জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে অনেক বিষয়ের কৈফিয়ৎ (explanation) দিতে হয়, তাহা সময় সময় বড় মজার হয়। জেলায় চুরি-ডাকাতি বাড়িয়াছে কেন, ইহার কারণ ম্যাজিষ্ট্রেট একবার লিখিলেন, দেশে অজন্মা হওয়াতে খাদ্য শস্যাদির মূল্য বাড়িয়াছে, লোকে কিনিয়া খাইতে পারে না, সেই জন্য। আবার অন্য বৎসর, চুরি-ডাকাতি কেন কমিয়াছে, তাহার কারণও লেখা হইল—শস্যাদির মূল্য বাড়িয়াছে বলিয়া কৃষকদের হাতে পয়সা হইয়াছে, সে জন্য লোক বেশী চুরি-ডাকাতি করে নাই। খাজনার নালিশের সংখ্যা কেন বাড়িয়াছে, ইহার কারণ জজসাহেব লিখিলেন—শস্যাদি বেশী না হওয়ায় অনেক প্রজা খাজনা দিতে পারে নাই, সেই জন্য। আবার খাজনার নালিশ যেবার অপেক্ষাকৃত কম দায়ের হইল, সেবারও কৈফিয়ৎ দেওয়া হইল—ফসল কম হওয়াতে প্রজাদের অবস্থা খারাপ হইয়াছে, নালিশ করিয়াও কিছু আদায় হইবে না দেখিয়া জমীদারগণ বেশী মোকর্দ্দমা দায়ের করে নাই। মোট কথা, কি জজ, কি ম্যাজিষ্ট্রেট, হাতের কাছে অন্য কৈফিয়ৎ খুঁজিয়া না পাইলে ফসল হওয়া না হওয়াই সকল বিপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু রঘুপতি বাবু এইরূপ মামুলি কৈফিয়ৎ না দিয়া, তাঁহার জেলায় খাজনার মোকর্দ্দমা কমিয়া যাওয়ার কারণ লিখিলেন—নীলকর জমীদারদের অত্যাচারে অনেক প্রজা ভিটামাটী ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে, সেই জন্য খাজনার নালিশের সংখ্যা কমিয়াছে। এই রিপোর্ট যখন উপরওয়ালাদের হাতে পৌঁছিল, তখন এক তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইল, কমিশনার সাহেবের আসন নড়িল, তিনি ইহার তদন্ত করিতে আসিলেন।

রঘুপতি বাবু এক দিন প্রাতভ্রমণ শেষ করিয়া আসিয়া রায় লিখিতে বসিয়াছেন। তাঁহার ঘরে টেবলের উপর স্তূপাকার নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ সাজান রহিয়াছে। তিনি সেই সকল কাগজপত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছেন। তাঁহার সম্মুখস্থ ঘড়ীতে যখন আটটা বাজিল, তখন কালেক্‌টার সাহেবের এক চাপরাশী একখানা চিঠি লইয়া আসিল। কালেক্টার মিঃ গ্রিন (Mr. Green) তাঁহাকে লিখিয়াছেন, কমিশনার সাহেব তাঁহার সঙ্গে ৯টার সময় দেখা করিতে চান, তিনি যেন ঐ সময়ে কালেক্টারের কুঠীতে আসেন। রঘুপতি বাবু ধড়া-চূড়া পরিয়া যথাসময়ে যাত্রা করিলেন। তাঁহার গৃহিণী বলিলেন,—"একেবারে খেয়ে গেলে হ'ত না? ফিরে আস্‌তে অনেক দেরী হ'তে পারে।"

তিনি বলিলেন—"খাওয়া আমার মাথায় থাক, ব্যাপার কি, একবার দেখে আসি।"

২

রঘুপতি বাবু কালেক্‌টার সাহেবের কুঠীতে যাইয়া কমিশনারের নিকট কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার তলব হইল। কমিশনার মিঃ বাটলার (Butler) খুব বুড়া হইয়াছেন, মাথায় টাক, দাড়ি-গোঁফ কামান, গোলগাল চেহারা। সবজজ বাবু আসিলে তিনি হাসি-মুখে হাত বাড়াইয়া দিয়া "Good morning,

How do you do ?" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার করমর্দ্দন করিলেন এবং তাঁহাকে সম্মুখস্থ একখানা চৌকীতে বসিতে বলিলেন। রঘুপতি বাবু সেখানে উপবেশন করিলেন। পরে তাঁহাদের মধ্যে যে কথোপকথন হইল, নিম্নে তাহার অনুবাদ দিলাম।

কমি।—আপনি এ জেলায় কত দিন আছেন, রঘুপতি বাবু ?

রঘু।—এই দুই বছর।

কমি।—এ যায়গায় স্বাস্থ্য কেমন ? আপনাকে কেমন মানাইয়াছে ?

রঘু।—হাঁ, ভালই —আমার কোন অসুবিধা হয় নাই।

কমি।—আপনি কত দিন সবজজের কার্য্য করিতেছেন ?

রঘু।—আট বৎসর। আমার আর বেশী বিলম্ব নাই, আর এক বৎসর পরেই আমার retire করিবার সময় আসিবে।

কমি।—কেন, আপনার স্বাস্থ্য ত বেশ ভাল দেখা যাইতেছে, আপনি ইচ্ছা করিলে আরও তিন বৎসর কায করিতে পারেন।

রঘু।—সে উপরওয়ালাদের অনুগ্রহ।

কমি। আপনাকে বোধ হয় এখানে খুব বেশী খাটিতে হয় ?

রঘু। আজ্ঞে হাঁ। আমার এখানে কেহ সাহায্যকারী নাই। তবে এ ছোট জেলা, আমি এর চেয়ে বড় জেলায়ও কায করিয়া আসিয়াছি।

কমি।—এখানে মোকর্দ্দমার সংখ্যা বাড়িতেছে না কমিতেছে ?

রঘু।—আজ্ঞে,Title suit (স্বত্বের মোকদ্দমা) এখানে বেশী হয় না, Rent suit (খাজনার মোকর্দ্দমা) আর money suit (দেনা-পাওনার মোকর্দ্দমা)ই বেশী। money suit বড় বাড়ে কমে না, Rent suit পূর্ব্বাপেক্ষা কমিতেছে।

কমি।—কি জন্য কমিতেছে, বলিতে পারেন ?

রঘু।—তাহার কারণ আমি যতদূর বুঝিতে পারি, নীলকর জমীদারগণ আগে অনেক বেশী খাজনার মোকর্দ্দমা দায়ের করিত, কতক দিন হইল, তাহারা বেশী মোকর্দ্দমা দায়ের করে নাই। তাহাদের এলাকার অনেক রায়ত নাকি এ জেলা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

কমি।—কেন চলিয়া গিয়াছে, বলিতে পারেন ?

রঘু।—নীলকরদিগের অত্যাচারে।

এই কথা শুনিয়া কমিশনারের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"অত্যাচারে আপনি কিরূপে বুঝিলেন ?"

রঘু।—আপনি কালেক্টার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন, এ জেলার নীলকরদিগের সহিত প্রজাদের অনেক দিন হইতে strained relations (মনোমালিন্য) চলিতেছে, আমার কাছে যে সকল মোকর্দ্দমা হইয়াছে, তাহাতেও আমি বুঝিয়াছি।

কমি।—কিন্তু প্রজারা ত এত দিন গ্রাম ছাড়িয়া পলায় নাই, এখন পলাইল কেন ?

রঘু।—তাহাদের জমী, বাড়ী সব নীলকররা নীলাম করিয়া লইতেছে, সেই জন্য।

কমি।—আচ্ছা, আমি কালেক্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, চপরাশী !

এক জন চাপরাশী আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। কমিশনার বলিলেন—"কালেক্টার সাহেবকো সেলাম দেও।" "বহুৎ খুব হুজুর" বলিয়া চাপরাশী কালেক্টার সাহেবের নিকটে গেল। কালেক্টার মিঃ গ্রিন (Green) অন্য কক্ষ হইতে আসিলেন। তিনি তালগাছের মত লম্বা, মুখে দাড়ি নাই, গোঁফ দুই দিক্ দিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। রঘুপতি বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিলেন, সাহেব তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া "How do you do ?" বলিলেন, এবং নিজে একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া কমিশনারের পাশে বসিলেন। কমিশনার বলিলেন,

"I say, Green, is it a fact that many raiyats of that Indigo planters are leaving this district ?" (এ জেলার নীলকরদের অনেক রায়ত নাকি এ জেলা ছাড়িয়া যাইতেছে ?)

"Yes, many people migrate to other districts in search of employment" (এ জেলার অনেক লোক কাযের অনুসন্ধানে অন্য জেলায় যায়।)

"But are they leaving this district with their families for good ? "(কিন্তু তারা সপরিবারে চিরদিনের জন্য যাইতেছে কি না ?)

"Yes. I Know in some village, the raiyats have left for g od, because they do not find agriculture very profitable now a days" (হাঁ, আমি জানি, কোন কোন গ্রামের প্রজারা একবারে চলিয়া গিয়াছে, কারণ, কৃষিকার্য্য এখন বড় লাভজনক নয়।)

"Why not ?" (কেন নয় ?)

"As mice destroy the crops." (কারণ, ইন্দুররা শস্য নষ্ট করে।)

এবার কমিশনার সাহেব রঘুপতি বাবুর প্রতি একটি বিজয়দৃপ্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—

"So you see, Roghupati Babu, your surmise is not correct. Will you now modify your remark in the annual report in the light of the further experience you have gained ?" (রঘুপতি বাবু, আপনি এবার বুঝিলেন, আপনার অনুমান সত্য নহে। এখন আপনি এই অভিজ্ঞতার ফলে আপনার বাৎসরিক রিপোর্টে লিখিত মন্তব্য সংশোধন করিবেন ত ?)

"But, Sir, my own experience is otherwise as I have already told you. I shall however think over the matter," (কিন্তু মহাশয়, আমার নিজের অভিজ্ঞতা অন্যরূপ, তাহা আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে আমি এ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিব।)

কমিশনার একটু উগ্রভাবে বলিলেন—

"Good morning."

অর্থাৎ আপনি উঠুন। এবার কমিশনার উঠিয়া দাঁড়াইলেন না, করমর্দ্দনও করিলেন না। রঘুপতি বাবু উভয় সাহেবকে সেলাম করিয়া বিদায় হইলেন।

তিনি বাড়ীতে আসিলে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল ? কেন কমিশনার সাহেব তোমাকে ডাকিয়াছিলেন ?"

তিনি বিমর্ষ হইয়া বলিলেন,—"আর কি হইবে, আমার মাথা আর মুণ্ডু। শালা ইন্দুর আমার সর্ব্বনাশ করিবে দেখিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি গৃহিণীকে সকল কথা বলিলেন।

৩

উক্ত ঘটনার দুই মাসের পরের কথা। রঘুপতি বাবু পূজার ছুটীতে দেশে গিয়াছিলেন, কাছারী খুলিবার পূর্ব্বদিন সপরিবারে ফিরিয়া আসিতেছেন। মোকামা ঘাটে রেলগাড়ী হইতে নামিয়া, ফেরি ষ্টীমারে গঙ্গা পার হইয়া, আবার অন্য ট্রেণে উঠিতে হইবে। পূজার ছুটীর পরে কাছারী খুলিবে, গাড়ীতে ও ষ্টীমারে অনেক লোকের ভিড় হইয়াছে। তাহার মধ্যে রঘুপতি বাবুর পরিচিত অনেক *লোক আছে, এবং কয়েক জন উকীলও আছেন।* রঘুপতি বাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে মেয়েদের ষ্টীমারের ক্যাবিনে আগে পাঠাইয়া দিয়া নিজে মালপত্রের ব্যবস্থা করিলেন এবং কুলী বিদায় করিলেন। তাঁহার নিজের ষ্টীমারে প্রথম শ্রেণীর টিকিট ছিল, তিনি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া ফার্ষ্ট ক্লাস ক্যাবিনের দিকে যাইবেন, এরূপ সময়ে এক জন ইয়ুরেসিয়ান সাহেব তাঁহাকে বাধা দিল। রঘুপতি বাবুর চেহারা কালো, তাঁহার পরিধানে ধুতি এবং কোট। সে সাহেব তাঁহাকে এক জন সাধারণ লোক মনে করিয়া বলিল, "এধার মাৎ আও।" রঘুপতি বাবু ইংরাজীতে বলিলেন, "আমার ফার্ষ্ট ক্লাস টিকিট আছে।"

সাহেব বলিল, "But you do not appear to be a gentleman" (তোমাকে ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয় না) এই বলিয়া সাহেব তাঁহার পথ বন্ধ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। রঘুপতি বাবু পাশ কাটাইয়া যাইতে চেষ্টা করিলে সাহেব তাঁহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল। তাঁহার অনতিদূরে অনেকগুলি বাঙ্গালী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, কয়েক জন নব্য উকীল "বন্দে মাতরং" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহারা সকলে মিলিয়া সেই সাহেবকে মারিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রঘুপতি বাবু তাঁহাদিগকে থামাইলেন।

নগেন বাবু উকীল বলিলেন—"কেন মশায়, আপনি সরুন, আমরা ফিরিঙ্গীটাকে একবার দেখিয়া লই। এত বড় আস্পর্দ্ধা যে, আপনার গায়ে হাত দেয় ?"

রঘুপতি বাবু বলিলেন—"নগেন বাবু, উত্তেজিত হবেন না, থামুন। রাগের মাথায় বে-আইনী কায করিবেন না।"

"কেন মশায়, থামবো কেন ? এ ত আপনার কোর্ট নয় যে, আমরা আপনার হুকুমে চলিব ? ঐ ফিরিঙ্গীটা কেবল আপনার নহে, আমাদের বাঙ্গালী জাতির অপমান করিয়াছে। উহাকে কিছু উত্তম-মধ্যম দেওয়া দরকার।"

এ দিকে "বন্দে মাতরং" ধ্বনি শুনিয়াই সে সাহেব চম্পট

দিয়া এক ক্যাবিনে ঢুকিয়াছিল। সেই স্বদেশীর প্রথম আমলে "বন্দে মাতরং" অনেক সময়ে সাপের মাথায় ধুলা পড়ার কায করিত। উকীলবাবুগণ সেখানে যাইয়া তাহাকে মারাটা সুবুদ্ধির কায মনে করিলেন না, সুতরাং রঘুপতি বাবুর কথায় নিরস্ত হইলেন। তখন তাঁহারা কয়েক জন মিলিয়া এক প্রসেসন (Procession) করিয়া রঘুপতি বাবুকে একটা প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিনে instal (অধিষ্ঠিত) করিয়া আসিলেন। সেই ফিরিঙ্গী সাহেব সভয়ে তাহার ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। ঘটনাক্রমে গ্রীন (Green) সাহেব কালেক্টারও সেই ষ্টীমারে ছিলেন, তিনি ডেকের উপর দাঁড়াইয়া এই ঘটনা দেখিলেন।

৪

নদী পার হইয়া ষ্টীমার ওপারে পৌছিল। রঘুপতি বাবু পরিবারাদি সহ ষ্টীমার হইতে গাড়ীতে উঠিতে যাইলেন। তাঁহার পুত্র মেয়েদের লইয়া ইণ্টার ক্লাসে উঠিল, তিনি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ী হইতে কালেক্টার গ্রীন সাহেব তাঁহাকে ডাকিলেন। তিনি সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য সেই গাড়ীতে আসিলেন, সাহেব তাঁহাকে খাতির করিয়া কাছে বসাইয়া বলিলেন,—

"What was the row about, Raghupati Babu?" (রঘুপতি বাবু, ও কিসের গোলমাল হইল ?)

রঘুপতি বাবু কালেক্টার সাহেবকে সকল ঘটনা বলিলেন, আরও বলিলেন, তিনি না থামাইলে উকীল বাবুরা ঐ সাহেবকে মারিতেন। গ্রীন সাহেব বলিলেন, "What are you going to do now? Do you know that the gentleman in question is Mr. White—the Executive Engineer? He did not know you." (আপনি এখন কি করিতে চান ? ঐ সাহেব হইতেছেন মিঃ হোয়াইট, একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার। তিনি আপনাকে চিনিতে পারেন নাই।)

"White or black I dont care, sir. I wish to take legal steps against him." (সে সাহেব হোয়াইট (সাদা) হউক বা কালো হউক, আমি গ্রাহ্য করি না, আমি তাহার নামে মোকর্দ্দমা করিব।)

গ্রীন।—আপনি কি তবে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা করিবেন ?

রঘু।—আমাকে তাহাই করিতে হইবে, আমার অনেক সাক্ষী আছে।

গ্রীন।—আপনি যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ করেন, তবে ফৌজদারীতে যাইবেন না। আপনি আপনার superior officer (উচ্চতন কর্ম্মচারী, জজ সাহেবের) নিকট রিপোর্ট করুন। তিনি অবশ্য ইহার প্রতীকার করিবেন।

রঘু।—জজ সাহেব আমার যেমন মুরব্বী, আপনিও সেইরূপ মুরব্বী, আমি আপনাদের পরামর্শ অবশ্য শুনিব। আমি শান্তিপ্রিয় লোক। আমি নিবারণ না করিলে ঐ ষ্টীমারের মধ্যেই একটা ফৌজদারী হইত।

গ্রীন।—আমি আপনার ধৈর্য্য ও সুবুদ্ধির প্রশংসা করি। আচ্ছা, আপনি এখন যাইতে পারেন।

রঘুপতি বাবু তাঁহার নিজের কামরায় আসিলেন। গাড়ী ছাড়িবার তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। নগেন বাবু প্রমুখ উকীলগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন —

"ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনাকে কি বলিলেন ?"

রঘুপতি বাবু বলিলেন,- "সাহেব কি ব্যাপার হইয়াছে জানিতে চাহিলেন, এবং আমি ইহার কি প্রতীকার করিব, তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন।"

নগেন বাবু বলিলেন, "আপনি অবশ্য ঐ ফিরিঙ্গীটার নামে ফৌজদারী কোর্টে দরখাস্ত দিবেন। দেখুন, আপনি আমাদের সকলের মাননীয় ব্যক্তি। আপনাকে এইরূপে অপমান করিল, ইহা আমাদের কিছুতেই সহ্য হয় না। আপনি নিবারণ না করিলে তখনই আমরা তাহাকে কিঞ্চিৎ নগদ বিদায় দিয়া দিতে পারিতাম। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যাহাই বলুন, আপনি তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতে পারিবেন না। ইহা আমাদের বিশেষ অনুরোধ।"

রঘুপতি বাবু বলিলেন—"নগেন বাবু, আমারও সেই অভিপ্রায়, আমি তাহাকে কিছুতেই ছাড়িব না। তবে কি জানেন, ফৌজদারী মোকর্দ্দমাটাকে বড় ভয় করি। যদি অন্য ভাবে—"

নগেন বাবু বলিলেন—"ঐ যা—আপনি সব মাটী করিয়া ফেলিবেন দেখিতেছি। অন্য ভাবে আর কি করিবেন ?"

রঘুপতি বাবু বলিলেন—"আমি আগে জজ সাহেবের কাছে রিপোর্ট করিতে চাই, তিনি হইলেন superior officer (উপরিস্থ কর্ম্মচারী), আগে তাঁহার উপদেশ নেওয়াটা উচিত মনে করি। আসামী ত পলাইতেছে না, সে হইতেছে একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার হোয়াইট সাহেব।"

নগেন বাবু।—তা' হো'ক। অত শত করিতে গেলে অনেক বিলম্ব হইবে। ফৌজদারী মোকর্দ্দমা গরম গরম দায়ের না করিলে সুবিধা হয় না। আপনার কোন চিন্তা নাই। আমিই মোকর্দ্দমা চালাইব, আবশ্যক হইলে বারের অন্য উকীলরাও আপনাকে সাহায্য করিবেন। আপনাকে আমরা সকলে যেরূপ শ্রদ্ধা করি, আপনি সকলেরই sympathy (সহানুভূতি) পাইবেন।

আর এক জন উকীল সুবোধ বাবু বলিলেন, "এটা কেবল আপনার নহে—আমাদের বাঙ্গালী জাতির অপমান—ইহার মধ্যে আমাদের national honour (জাতির সম্মান) জড়িত রহিয়াছে।"

রঘুপতি বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, আমি বিবেচনা করিয়া দেখি।"

এই সময়ে গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা দিল। উকীল বাবুরা অন্য গাড়ীতে গেলেন।

৫

পরদিন সন্ধ্যার পর রঘুপতি বাবু তাঁহার বাসার বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন। সেখানে হরেন্দ্র বাবু মুনসেফ ও মতি বাবু ডেপুটীও আছেন। নরেন্দ্র বাবু ও সুবোধ বাবু উকীল সেখানে আসিলেন। রঘুপতি বাবু তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। নগেন্দ্র বাবু বলিলেন—"আপনি তবে কি ঠিক করিলেন ?"

রঘুপতি বাবু বলিলেন—"হঠাৎ ফৌজদারীতে নালিশ করাটা সুবিধাজনক হইবে না, আমি জজসাহেবের কাছে রিপোর্ট করিয়া দিয়াছি, দেখি তিনি কি বলেন।"

নগেন্দ্র বাবু একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আজ্ঞে, আমার বেয়াদপি মাপ করিবেন। আপনারা red tapism-টাকে বড্ড ভালবাসেন। এটা ত আফিস-সংক্রান্ত কোন বিষয় নয়, এটা আপনার personal মান-অপমানের ব্যাপার, জজসাহেবের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক কি ?"

সুবোধ বাবু বলিলেন,—"কেবল personal নহে, ইহার সহিত আমাদের national question জড়িত রহিয়াছে। আপনি এক জন বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর পোষাক পরিয়াছিলেন বলিয়া 1st classএ travel করিতে পারিবেন না, এটা কি কথা ? ইহার একটা প্রতীকার হওয়া একান্ত আবশ্যক।"

মতি বাবু বলিলেন,— "তা ত বুঝিলাম, মশাই। ফৌজদারী মোকর্দ্দমা করিলে কি সুবিধা হবে ?—সাহেবের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা—"

নগেন বাবু বলিলেন,—"মাপ করবেন মশাই—মোকর্দ্দমা যদি আপনার কাছে যায়, আপনি বুঝি তা হ'লে ম্যাজিষ্ট্রেটের ভয়ে মোকর্দ্দমা ডিসমিস্ করিবেন ?"

রঘুপতি বাবু বলিলেন,—"ভয়ে ডিস্‌মিস্ করিবেন কেন, উনি যেরূপ প্রমাণ পাইবেন, সেইরূপই বিচার করিবেন। তবে কথা হইতেছে এই, নগেন বাবু, ফৌজদারী মোকর্দ্দমা সাহেবের নামে—ঐ ম্যাজিষ্ট্রেটই দেখবেন শেষকালে তার সাফাই হবে।"

হরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"সব শিয়ালের এক ডাক।"

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"তা হো'ক। প্রত্যক্ষ ঘটনা, in broad day light—আমরা সকলেই সাক্ষ্য দিব—সত্যকে মিথ্যা করাটা কি সোজা কথা ? আপনি গাবড়াবেন না মশাই !"

রঘুপতি বাবু বলিলেন,—"জজসাহেব কি উত্তর দেন, দেখা যা'ক তখন আমার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া আপনাকে জানাব। আপনারা আমার প্রতি যে সহানুভূতি দেখাচ্ছেন, সে জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।"

সুবোধ বাবু বলিলেন,—"বলেন কি মশাই—এ যে আমাদের national question—"এই বলিয়া উকীলদ্বয় প্রস্থান করিলেন। রঘুপতি বাবুও সভাভঙ্গ দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার গৃহিণী কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া এই সব কথা শুনিতেছিলেন। তিনি বলিলেন,—"ঐ উকীল বাবুরা বুঝি তোমাকে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা করিতে বলিলেন ?"

"হাঁ গো হাঁ। কিন্তু শেষটায় মেও ধরিবে কে ?"

"কিন্তু তুমি যাই বল, তুমি কিছু না করিলে আমাদের

কিন্তু লোকের কাছে মুখ দেখান কষ্ট হবে। তুমি কি কিল খেয়ে কিল চুরি করিবে?"

"না, তা' করবো কেন? জজসাহেবের কাছে সব কথা লিখিয়া দিয়াছি, তিনি উপরওয়ালা—তাঁহাকে না জানাইয়া হঠাৎ কিছু করা উচিত নয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও সেইরূপ বলিয়াছেন।"

৬

ইহার সাত দিন পরে জজসাহেবের চিঠি আসিল। তিনি লিখিয়াছেন,—

"I learn from Mr. Green who was an eye-witness to the occurrence that you suffered through your own obstinacy. You had no business to force your way into the 1st class compartment when you were prevented by Mr. White. Your friends created a tempest over a teapot. You will be ill-advised to go to court over this trifling matter,"

(আমি মিঃ গ্রীনের নিকট জানিতে পারিলাম যে, তিনি নিজেই ঐ ঘটনা দেখিয়াছিলেন এবং আপনি আপনার নিজের একগুঁয়ামির দরুণ কষ্ট পাইয়াছেন। যখন মিঃ হোয়াইট আপনাকে নিবারণ করিলেন, তখন আপনার জোর করিয়া প্রথম শ্রেণীর কামরার মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করা উচিত হয় নাই। আপনার বন্ধুগণ একটা তিলকে তাল করিয়া তুলিয়াছিল। এই সামান্য বিষয় লইয়া যে আপনাকে নালিশ করিতে পরামর্শ দিবে, আমি তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না।)

এই উত্তর পাইয়া রঘুপতি বাবুর চক্ষুঃ স্থির হইল। তিনি আশা করিয়াছিলেন, জজ সাহেব তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া অন্ততঃ হোয়াইট সাহেবকে (appology) (ক্ষমা-প্রার্থনা) করিতে বাধ্য করিবেন। কিন্তু এ যে উল্টা তাঁহার ঘাড়েই সম্পূর্ণ দোষ চাপাইতেছে। তাঁহার মন নিতান্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। নগেন্দ্র বাবু ফৌজদারী মোকর্দ্দমা রুজু করিবার জন্য তাঁহাকে কাছারীতে তাগাদা করিতে লাগিলেন, আবার এ দিকে বাড়ীতে গৃহিণীও গঞ্জনা দিতে লাগিলেন। বেচারার জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। অবশেষে মোরিয়া হইয়া তিনি এক দিন সিনিয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে উপস্থিত হইয়া হোয়াইট সাহেবের নামে এক নালিশ দায়ের করিলেন। ডেপুটি তাঁহার এজাহার লিখিয়া লইয়া, কি হুকুম দিবেন, হঠাৎ স্থির করিতে না পারিয়া, অন্য দরখাস্ত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রীন সাহেব জানিতে পারিয়া, সেই দরখাস্ত চাহিয়া পাঠাইলেন, এবং তাঁহার নিজের ফাইলে উহা তুলিয়া লইয়া এইরূপ হুকুম লিখিলেন—"This is a trifling matter. When there is a great rush of passengers in the steamer, such pushing and hustling is inevitable. No sane man would complain of it. The complaint is dismissed under S. 203 Cr. P. C."

(এ অতি তুচ্ছ ব্যাপার। ষ্টীমারে লোকের ভিড় হইলে এরূপ ধাক্কাধাক্কি না হইয়াই পারে না। কোন্ স্থিরবুদ্ধি লোক এ জন্য আবার কোর্টে নালিশ করে? মোকর্দ্দমা ডিসমিস্ করা হইল।) সিনিয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহীত নালিশের উপর ম্যাজিষ্ট্রেট অবশ্য আইন অনুসারে এরূপ হুকুম দিতে পারেন না। কিন্তু সেই চারি হাত লম্বা তালগাছ আইনের ধার ধারিবেন কেন? আইন প্রস্তুত করিয়াছে তাঁহার বাপ-দাদারা, না তোমাদের বাপ-দাদারা?

ইহার ১৫ দিন পরে রঘুপতি বাবুর নোয়াখালী জেলায় বদলীর হুকুম আসিল। তিনি এই সময়ে বদলী না হওয়ার জন্য একখানা দরখাস্ত লিখিয়া পাঠাইলেন; কারণ, তাঁহার ছেলেরা ইস্কুলে পড়ে, এ সময়ে বদলী হইলে তাহাদের পড়ার ব্যাঘাত হইবে। জজসাহেব সেই দরখাস্তের উপর এই মন্তব্য লিখিলেন,—

"The sub-judge is fond of playing to the gallery. He has acquired a strong bias against the planters of this district, so he is not expected to decide their cases with anything like fairness. In my opinion he should not be allowed to remain here any longer." (এই সবজজ ইতর লোকের মনস্তুষ্টি করিতে ভালবাসেন। তিনি এ জেলার নীলকরদিগের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্বেষ পোষণ করেন। সুতরাং তাঁহাদের মোকর্দ্দমা তিনি নিরপেক্ষভাবে

বিচার করিতে অক্ষম। আমার মতে তাঁহাকে এ জেলায় আর রাখা উচিত নহে।)

বলা বাহুল্য, জজসাহেবের এই মন্তব্যের পর তাঁহার বদলীর হুকুম বহাল রহিল। তিনি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে নোয়াখালী চলিলেন।

নোয়াখালী গিয়া তিনি যাঁহাকে জজ পাইলেন, তিনি সেই নামজাদা জবরদস্ত পারনেল সাহেব (Mr. Parnel)। রঘুপতি বাবু যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, তখন তিনি তাঁহার মুখে সমস্ত কাহিনী শুনিয়া ক্রোধে টেবল চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"What! Is this British justice? Have we come out to administer this sort of justice in India? It is, these black sheep who are making British rule unpopular" (কি ? ইহাই কি ইংরেজের ন্যায়বিচার ? আমরা কি এ রকম ন্যায়বিচার করিতে ভারতবর্ষে আসিয়াছি ? এই সকল দুষ্ট এড়েঁই এ দেশে ইংরেজের শাসনকে কলঙ্কিত করিতেছে।) পরে তিনি বলিলেন, "আপনি এখনই আমার কাছে এই বদলীর বিরুদ্ধে একটা representation দিন, আমি তাহাতে সমস্ত ঘটনা লিখিয়া হাইকোর্টে পাঠাইব।"

রঘুপতি বাবু বলিলেন,—"আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু সে দরখাস্তের কোন ফল হইবে না। আমি এখন এখানেই থাকিতে চাই, বিশেষতঃ যখন আপনার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ মনিব পাইয়াছি। আর আমার পেনসনের সময় ত হইয়া আসিল।"

"আপনি কবে retire করিবেন ?"

"আর ৬ মাস বাদে আমার বয়স ৫৫ বৎসর পূর্ণ হইবে।"

"আপনি extensionএর দরখাস্ত দিবেন। আমি আপনার extension recommend করিব। আপনার প্রতি বড়ই অবিচার হইয়াছে।"

রঘুপতি বাবু যথাসময়ে ১ বৎসর extensionএর জন্য দরখাস্ত দিলেন। পারনেল সাহেব খুব বিশেষ করিয়া recommend করিলেন। সে কালে সব সবজজই অবলীলাক্রমে ৩ বৎসর extension পাইতেন। তিন বৎসর extensionএর মানে পনর হাজার টাকা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, রঘুপতি বাবুর extension না-মঞ্জুর হইল। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, হাইকোর্টে তাঁহার extension মঞ্জুর হইয়াছিল. কিন্তু গবর্ণমেণ্টে সেই দরখাস্ত পৌঁছিতেই তাহা পত্রপাঠ না-মঞ্জুর হইয়াছে। তিনি গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো, শুনেছ ! আমি যাহা চাই, তাহাই হইয়াছে। আমার এক মুহূর্ত্তও আর এ চাকুরী করিতে ইচ্ছা করে না। কেবল তোমার জেদে পড়িয়া extension চাহিয়াছিলাম। তুমি বলিলে—১৫ হাজার টাকা ত সোজা নয়, তিনটা মেয়ে পার করা যাবে। কিন্তু সেই শালার ইন্দুরই এই টাকাগুলির দফা রফা করিয়াছে।"

"সে কেমন ?"

"সেই বাটলার সাহেব—যিনি কমিশনার ছিলেন, তিনিই এখন চিফ্ সেক্রেটারী হইয়াছেন। তিনি নিজ মুখে বলিয়াছিলেন, আমার স্বাস্থ্য যেরূপ, তাহাতে আমি ৩ বৎসর extension পাইতে পারিব। এ সময় তিনিই এখন আমাকে এক বৎসরের extensionও দিলেন না। এ সেই ইন্দুরের জন্য, বুঝিলে ত। এই ত আমাদের চাকুরী !"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

সতীত্ব

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শিক্ষা, সতীত্ব, দুঃখ।

সতীত্ব যে মহাবৃক্ষের ফল, তাহার শাখা, প্রশাখা, কাণ্ড, লতা, পাতা প্রভৃতি প্রায় সমস্তই বুঝিবার চেষ্টা আমরা এ যাবৎ করিয়া আসিয়াছি এবং যে কর্ষণগুণে এই মহান্ তরু আজ ফলে, ফুলে, শস্যে শোভিত, বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার কতক বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এই কর্ষণ বা শিক্ষা বিষয়ে আরও দুই চারিটি কথা আবশ্যক। আজও পর্য্যন্ত সঠিক কোন্ পদার্থকে নীতি-জ্ঞান, ধর্ম্ম, কল্যাণ, উচিত, অনুচিত ইত্যাদি বলে, তাহার মীমাংসা কেহ করিতে পারেন নাই, অথবা এ সব বিষয়ে যাহা বলা হয়, তাহা সব ক্ষেত্রে খাটে না; সুতরাং মানুষের যে সমস্ত পদার্থ সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক, সেইগুলিই অনির্দ্দিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। নানা মুনির নানা মত। বুদ্ধি, দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। জীবন ক্ষণস্থায়ী। ইহার উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংযোগ, সংস্কারের প্রেরণা প্রভৃতি নানা কারণে এবং বিশেষভাবে সসীমের অক্রান্ত অসীমের সহিত মিলিবার চেষ্টার জন্য এই সব জিনিষ অনির্দ্দিষ্ট থাকিতে বাধ্য—যত দিন না সসীম অসীমের যথার্থ অনুসন্ধান পায় এবং পাইয়া যথার্থ সার্থকতায় ভরিয়া যায়। কারণ, আমরা বুঝি না বুঝি, জানি, না জানি—যতক্ষণ সসীমকে অসীম বরণ করিয়া না লইবে, অথবা অসীমকে সসীম একমাত্র কাম্য পদার্থ বলিয়া না চিনিবে, তত দিন এ কোলাহল, এ বাগ্‌বিতণ্ডা, এ মতভেদ অন্তর্হিত হইতে পারে না। এই পরিচয় করিতে হইলে সাধনা, শিক্ষা, এক-নিষ্ঠা, বৈরাগ্য, অভ্যাস সবই চাই। ইহাই জীবনের সুখশান্তি আনিবার পথ। ইহাকেই প্রকৃত উৎকর্ষ বা শিক্ষা বলে।

শিক্ষা ব্যতীত কিছু হইবার উপায় নাই। জমী কর্ষণ না করিলে কোন ফসল দেয় না, যেমন "মানস জমিন রৈল পতিত, আবাদ করলে ফ'লতো সোনা। মন রে কৃষিকায জান না।" এই শিক্ষা কিন্তু কম-বেশী অভ্যাস এবং ত্যাগ বা বৈরাগ্যের উপর স্থাপিত। শিক্ষার জন্য শারীরিক সুখত্যাগ, শিক্ষার বিষয়ে একাগ্রতা বা অন্য বিষয়ত্যাগ চাই। আবার আয়ত্ত করিবার সময় মেধা-সাহায্যে অভ্যাসও চাই। এই বৈরাগ্য বা ত্যাগ সংযমের মূল। অধ্যাত্মবিদ্যা, উৎকর্ষ, নীতিজ্ঞান ছাড়িয়া দিলেও সামান্য অর্থকরী বিদ্যা আয়ত্ত করিতেও এই সমস্ত আবশ্যক। সর্ব্বত্রই এই প্রথা। জীবন-সংগ্রামে সংযমের প্রয়োজন প্রতি পদে, নচেৎ সংসার জ্বলিয়া যাইবে, সমাজ উৎসন্ন যাইবে, দেশ এবং জগৎ লুপ্ত হইবে, ইহাই সনাতন প্রথা। এই শিক্ষা কার্য্যকরী হইবে বলিয়াই নিতান্ত শিশুকাল হইতে আরম্ভ করা হয়। শিশুকাল হইতেই চরিত্রগঠন আরম্ভ না করিলে বয়সে হওয়া কঠিন। সংসারে ঘাত-প্রতিঘাত, রোগশোক, দুঃখ-দারিদ্র্য, অসংযম, হীনতা প্রভৃতি আছেই। প্রত্যেককেই ইহার মধ্য দিয়া যাইতে হইবে, এই কারণে যাহাতে ধৈর্য্যচ্যুতি না হয়, ঈশ্বর-বিশ্বাস বা নির্ভরতারূপ খুঁটি অবলম্বন করিয়া সংসারের ঝড়-বৃষ্টি হইতে জীবনতরী রক্ষা করা হয়, তাহারই ব্যবস্থা। প্রধানতঃ সেই শিক্ষাই কার্য্যকরী, নচেৎ পাণ থেকে চূণ খসিলেই বিষম ব্যাপার।

বার-ব্রত, উপবাস, (উপ=সমীপে, বাস=বসা), তুলসী-মূলে দীপদান, পূজা জপ, স্তোত্রপাঠ, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদি পাঠ বা শ্রবণ এই সবই শিক্ষালাভ করিবার বিশেষ সহায়। ইহাদের মধ্যে সংযম শিক্ষা, শ্রীভগবানে একান্ত বিশ্বাস এবং নির্ভরতা, ধৈর্য্য, মাধুর্য্য, সেবা, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতির এবং সতীত্বের দৃষ্টান্ত অনেক আছে। ব্রত উপবাসাদি পুরাণের কথিত দৃষ্টান্তগুলিকে নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিবার প্রেরণা এবং শিক্ষা দেয়। ফলে যাহাতে নারী স্ত্রীর কর্ত্তব্য, মাতৃত্ব, গৃহিণীর কর্ত্তব্য, সতীত্ব ইত্যাদি সমস্ত শিক্ষা পান, তাহা এই ব্যাপারের মধ্যে সবই আছে। আজও অবিবাহিতা বালিকা মনোমত পতিকামনায় কাত্যায়নী পূজা, শিবপূজা প্রভৃতি করিয়া থাকে। আবার কুমারীকে সাক্ষাৎ জগজ্জননী জ্ঞানে পূজা করিয়া, সাবিত্রী-ব্রত, অনন্ত-চতুর্দ্দশী প্রভৃতি ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া সাধ্বীভাব বা মাতৃভাবের উৎকর্ষসাধন করেন। মোটামুটি হিন্দু বালিকার শিক্ষা জ্ঞানের উন্মেষেই আরম্ভ এবং জীবনব্যাপী। আবার পতি-নারায়ণ ব্রত তাঁহার সঙ্গের সাথী। এক ধর্ম্মের মধ্যে শতধা সৃষ্টি, বারমাসে তের পার্ব্বণ, ষষ্ঠী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী, অশোকাষ্টমী প্রভৃতি নিত্যই ব্রত, বার, পার্ব্বণ আছে,—যাহাতে তাঁহাকে নিত্য স্মরণ করাইয়া দিতেছে, তাঁহার কর্ত্তব্য কি? স্বামী, গৃহ, সন্তানাদি, অতিথি, অভ্যাগত ইহারাই তাঁহার শিক্ষা এবং পরীক্ষা-ক্ষেত্র। তাহাদের শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণই সতীর ধ্যান-ধারণা। প্রতিবেশী, বন্ধু, স্বজন, পুরজন, দাস, দাসী, দশ, দেশ, সকলেরই মধ্যে তিনি সদাই শিক্ষা পাইয়া, তাহাদেরই আদর, আপ্যায়ন, তুষ্টি, পুষ্টি সাধন করিয়া, গৃহি-ণীর, মাতার এবং সতীর গৌরব অর্জ্জন করেন। তিনি মেডেল, সম্মান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রি সংগ্রহে ব্যস্ত নন। কিন্তু যে যে গুণে সংসারচক্র নিয়মিত হইতেছে, অবাধ গতিতে চলিতেছে, তাহার মূলাধারও তিনি, চালক এবং রক্ষকও তিনি। সুতরাং জগতের অভ্যুদয়, শ্রেয়ঃ, প্রেয়ঃ কোন বিষয়েই তিনি কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন। দশ বিশটা সেকস্‌পীয়র, মিল্-টন্, কিটস্, সাইকোলজি বা বিজ্ঞানের মতামত না জানা থাকিলেও, কাহারও নিকট তিনি মাথা নত করিতে বাধ্য নহেন। জগতে কোন পদার্থই সম্পূর্ণ নহে। দোষ গুণ সব বিষয়ে এবং সব লোকেরই আছে, সংসারে এই নিয়ম। সুতরাং দুই দশ

বিষয়ে যদিও তাঁহারা উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলাদের নিকট ছোট, কিন্তু সংসারের অভিজ্ঞতা বা সংসারে নারীর কর্ত্তব্যজ্ঞানে বা কর্ত্তব্যপালনে, সরলতায় অথবা জগতের মোটামুটি আয় ব্যয় রক্ষণ ত্যাগ বিষয়ে গড়পড়তায় কাহারও কাছে তাঁহারা ছোট নহেন। ইহার উপর সন্তানাদি হইবার কালে যদি মোটামুটি ধাত্রীবিদ্যা এবং স্বাস্থ্যশিক্ষাজ্ঞান দেওয়া হয়, তবে অন্য বিদ্যা না জানা থাকিলেও মোটামুটি আসিয়া যায় না। প্রাচীনাদের মধ্যে ধাত্রীজ্ঞান এবং সহজ স্বাস্থ্যজ্ঞান যথেষ্ট ছিল। এখন তাঁহারা সকলেই প্রায় গত হইয়াছেন। কাযেই এ দুইটি শিক্ষার অন্য উপায়ে প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, সাধারণ গৃহস্থের কথাই বলা হইতেছে। ইহার উপর ক্ষেত্র-বিশেষে অন্য শিক্ষাও চলিতে পারে, বিশেষতঃ যখন নবীনরা এখন এরূপ শিক্ষা চান না। যদি মোটামুটি মাতার, গৃহিণীর, স্ত্রীর কর্ত্তব্যপালনই নারীর আবশ্যক হয়, তবে উপরি-উক্ত ব্যবস্থা কার্য্যকর বলিয়া বোধ হয়। নবীনের মতে এটা কুসংস্কার এবং নরের নারীর প্রতি অবৈধ অত্যাচার।

অন্য দিকে নবীনবাদীরা নারীকে আর পর্দ্দার আড়ালে, কুসংস্কারমধ্যে অশিক্ষিত অবস্থায় অত্যাচার-পীড়নের মধ্যে রাখিতে বিদ্রোহী হইয়াছেন। তাঁহারা স্বামি-স্ত্রীকে সব বিষয়ে সমান অধিকার দিতেছেন। নারী নিজেই বা নরের সহিত একযোগে, নিজেদের যুগান্তরব্যাপী পরাধীনতার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এত আলোচনা, উন্নতি সত্ত্বেও কিন্তু নারী-সমস্যা সম্পূর্ণ পূরণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এই নারী-জাগরণের দিনে, প্রাচীন মুমূর্ষু অবস্থায় "ন যযৌ ন তস্থৌ" হইয়া আছেন। নারী স্বাধীনতা চান সব বিষয়ে, কোন বিষয়েই আর নরের দৌরাত্ম্য সহ্য করিবেন না। নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিলে এ বিষয়ে অনেকটা স্বাধীন হওয়া যায়, এজন্য তিনি যথাসাধ্য জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন এবং সেইমত শিক্ষাও লইতেছেন। ইহাতে শুধু যে স্বাধীন-ভাবে জীবন কাটান হয়, তাহা নহে, পুরুষদেরও দাম্ভিকতা নষ্ট করা হয়। বিবাহ করিলে নরের কাছে বশ্যতা স্বীকার কতকটা করিতে হয়, এজন্য বিবাহ করিতে তিনি নারাজ, আবশ্যক যদি নিতান্তই বোধ হয়, তবে বিবাহ ব্যতীত নরের সহিত মিল'-মিশা করিবার তিনি পক্ষপাতী এবং অনেকে তাহা করিতেছেন। যদিই ঘটনাক্রমে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বিবাহ করিয়াই ফেলেন, তবে স্বামীর সহিত যে ত্রিবিধ মিলনের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তা ছাড়া, অন্য সব বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় তিনি রাখেন, যেমন খাওয়া-পরা, মেলা-মেশা, গতিবিধি, কার্য্য-কলাপ ইত্যাদি।

আমরা শ্রীভগবানের ইচ্ছা বুঝিতে পারি না। যদি বৈষম্যেই জগৎসৃষ্টি হইয়া থাকে, যেমন শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তবে সাম্য কেমন করিয়া হইবে, যতক্ষণ না ঠিক পথ ধরা যায়? এই যে নর-নারীর সমান অধিকারলাভ-চেষ্টা, এই যে democracy, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার সম অধিকারভাব, socialism শ্রমজীবী এবং ধনীর সংঘর্ষ, সকলেরই মূলে সেই সমতারই চেষ্টা, যাহাকে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রী নামে অভিহিত করা হইত। ইহার কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ই আছেন। মায়া, অবিদ্যা বা ভ্রম-বশে আমরা বহু মত দেখাইতেছি। সেই পূর্ব্বানুভূত স্বরূপ স্মৃতি, মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া, আমাদের অনন্তকাল ধরিয়া এই বৈষম্যের মধ্যে সাম্যদিকে প্রেরণা অবিশ্রাম দিতেছে। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক আজ, তাই জগতের সর্ব্ববিষয়ে বিভিন্নতার মধ্যে সমতা দেখিবার প্রয়াস পাইতেছেন। * ইহাই অশান্তির কারণ, ইহাই কামনারূপে মানব-হৃদয়ে ক্রমাগত গতিনির্দ্দেশ করিতেছে। এই প্রেরণা জগৎব্যাপী, সুতরাং ইহা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ঠিক ঠিক জানিয়া, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ধরিয়া, ইহার প্রকৃত ব্যবস্থা করিতে হইবে। রোগ নিরাকরণ করিতে পারিলে হাতুড়ে ব্যবস্থা চলিবে না। এই জগৎব্যাপী রোগের একমাত্র পথ, একমাত্রই প্রতীকার আছে। অন্য প্রতীকারে এ রোগ সারিবে না। হয় ত এক স্থানে রুদ্ধ হইয়া অন্য স্থানে প্রকাশ পাইবে। ইহার প্রতীকার শ্রীভগবান্ লাভ করা। 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।' যাঁহাকে লাভ করিয়া অন্য লাভ বেশী বলিয়া মনে হয় না।

ভবরোগের চিকিৎসক স্বয়ং নারায়ণ। কথাটা অপ্রিয় বটে, কিন্তু সত্য। "সূর্য্যের আলোক যেমন সত্য", তাহার তুলনায় লক্ষগুণে বড় সত্য। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইহার অন্য পথ নাই। বহুবার একই কথা বলা হইতেছে, ইহাতে পুনরুক্তি দোষ আসিতে পারে। কিন্তু যেমন বহুবার অর্দ্ধ সত্য বা আংশিক সত্যকে 'সত্য' বলিয়া প্রচার করায় তাহা পূর্ণ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অথবা মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রচার করার জন্য জগতে যত অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, সেইরূপ বারংবার অপরার্দ্ধ সত্য বা পূর্ণ সত্যটাকেই বলার সময় আসিয়াছে। তাহারই জন্য একই কথা বারংবার বলা হইতেছে।

এখন এই নবীন পাশ্চাত্য শিক্ষা এ দেশে প্রচার করিয়াছেন। এই পাশ্চাত্য শিক্ষারও দোষ আছে, গুণ ত আছেই। এই শিক্ষার ফলেই কিন্তু আজ আমরা বিজাতীয় ভাব পাইয়াছি। তথাকথিত সাহিত্যমধ্যে উপন্যাস অন্যতম। ইহাতে বাস্তব জীবনের ছায়ামাত্র লইয়া বা তাহার উপর ভিত্তি করিয়া, অবাস্তব ঘটনা সংযোগ করা হয় এমন ভাবে যে, তাহা একটি জীবনে বাস্তব রাজ্যে না ঘটিলেও সেগুলি ঘটা অসম্ভব নহে। এই বাস্তব এবং অবাস্তবের সংমিশ্রণ আছে বলিয়াই উপন্যাস এত চিত্তাকর্ষক। ইহাও সেই সসীমের এবং অসীমের মিলন-চেষ্টা। এত চিত্তাকর্ষক বলিয়াই ইহা জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, মনকে অতিমাত্রায় রঞ্জিত করে। ফলে প্রতীকার না জানায় বা প্রতীকার করিবার অনিচ্ছায়, মন অবাস্তব লইয়া ঘর-সংসার গড়িয়া ফেলে এবং বাস্তবের সহিত অবশ্যম্ভাবী অমিল হইলেই খেদ দুঃখ সৃষ্টি করে। ইহা ঘরে ঘরে হইতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার এই একটি ফল। কিন্তু তাই বলিয়া যে উপন্যাস সবই মন্দ বা অনিষ্টকর, তাহা নহে। আদর্শ জীবনেরও দৃষ্টান্ত ইহাতে অনেক পাওয়া যায়।

আজ দেশে জনক রাজার মত জীবন্মুক্ত রাজা নাই। বশিষ্ঠ

---

* Science arises from the discovery of Identity amidst Diversity.—Principles of Science.

ব্যাস প্রভৃতি ঋষিও আদর্শস্বরূপে নাই। যে শিক্ষা আমরা পাইয়াছি, তাহা যে শুভকর নহে, তাহা অনেকে বুঝিয়াছে এবং পাশ্চাত্য দেশেও এ সব শিক্ষার হিতকারিত্ব সম্বন্ধে বাদানুবাদ চলিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে মেয়েদেরও কি সর্ব্বথা সেই শিক্ষা দেওয়া যুক্তিযুক্ত? যাহা শুভকর, তাহাই কি করা উচিত নহে?

সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত, ভূগোল, বিজ্ঞান, দর্শন, নৃত্য-গীত, কলা, ইত্যাদি পাশ্চাত্য দেশেরও আছে, আমাদেরও আছে। মেয়েদের জন্য সাধারণতঃ অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা বোধ হয় এখনও হয় নাই। ডাক্তার, উকীল, এঞ্জিনিয়ার সাধারণতঃ আমাদের মেয়েদের হইতে বিলম্ব আছে। দুই দশ জন ত হইবেনই, তাঁহাদের কথা আলাদা। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা কি আমাদের জাতীয়তার প্রতিকূল নহে? আমাদের আদর্শ ঘৃণ্য, হেয়, অপদার্থ দেখাইয়া পাশ্চাত্য আদর্শকে বড় করিয়া দেখানই তাহাদের কায। ইহারই ফলে আজ আমাদের এই দশা। ইহা পূর্ব্বে দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। এই শিক্ষার ফলে আমরা অনেক অমূল্য জিনিষ হারাইয়াছি, তাহার পরিবর্ত্তে যাহা পাইয়াছি, তাহাতে আমরা "Huxley, শশধর এবং (বিশেষতঃ) Goose" হইয়া গিয়াছি। যদি ইহাই ঠিক হয়, তবে মেয়েদেরও এই শিক্ষা দিয়া কিরূপে তাহাদের সৃষ্টি করিব, তাহা কি অগ্র-পশ্চাৎ দেখা আবশ্যক নহে? পুরুষদের অপেক্ষা মেয়েদের পক্ষে এ শিক্ষা কি বেশী ক্ষতিকর হইবার সম্ভাবনা নাই? ফলে সকল শিক্ষারই দোষ-গুণ আছে। যদি পাশ্চাত্য আদর্শই ভাল মনে হয়, তবে তাহাই হউক। আর যদি এ দেশের শিক্ষাই ভাল মনে হয়, তবে তাহাও হইতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রাচীন মতে বালিকাদের শিক্ষা দিবার মত বিদ্যালয় আর একটিও দেখা যায় না, অথবা হয় ত একটি আধটি আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহাকালী পাঠশালায় এইরূপ শিক্ষা চলিত, কিন্তু অর্থাভাবে এবং লোকের অশ্রদ্ধায় তাহা টিকিতে পারিল না। আর আমাদের সাহেব হইতে বাকি কি! বিদ্যা সীমাহীন। অজ্ঞানই মানুষের প্রধান শত্রু। সুতরাং বিদ্যার প্রসার সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু শুধু বাহ্য বিদ্যাই আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। যাহাতে যথার্থ কায হয়, এমন বিদ্যা বড় একটা দেখি না। পরন্তু এটাও ঠিক যে, একটি বিষয়ও রীতিমত শিক্ষা করিতে হইলে সারা জীবনেও তাহা হয় না। এই জন্যই আবশ্যক এবং অনাবশ্যক ভেদে বিচার করিয়া শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। আজ ইহা সকলেই বুঝেন, তাই Technical educationএর এত ডাক। যদি তাই হয়, তবে মেয়েদের শিক্ষারই বা ভালরূপ ব্যবস্থা করা হয় না কেন? যদি মোটামুটি ভাবে জীবনের পথে যাত্রা করিবার বিষয়েই শিক্ষাদান উপযুক্ত মনে হয়, তবে যে আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষা ঘৃণ্য, তাহা বলা যায় না। ইহার বেশী শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা বা সুযোগ হইলে দেশী, বিলাতী সব রকমই শিক্ষা চলিতে পারে, কিন্তু যাহাতে যথার্থ কল্যাণ হয়, এইরূপ বিদ্যা। যদি সাধারণতঃ নারীকে স্ত্রী, মাতা, গৃহিণীরূপে বিরাজ করিতে হয়, তবে প্রাচীন শিক্ষার কার্য্যকারিতা অনেক বলিয়া বোধ হইবে। বিশেষতঃ যদি আমাদের মত দরিদ্র দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন আরও অধিক হয়, তবে বিলাসিতা এবং অন্যান্য ব্যাপার আপনিই আসিয়া পড়িয়া সতীত্বকে খর্ব্ব করিতে বাধ্য। ইহা পূর্ব্বে আমরা পাশ্চাত্যদেরই কথায় দেখাইয়াছি। আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি বা দেখিয়াছি যে, বিবাহের পূর্ব্বে বা বিবাহিতা নারী অবৈধ আচরণে সন্তানবতী হইয়াও বেশ সমাজে চলিয়া যাইতেছে। সন্তানকে স্তন্য দেওয়া হয় না, (কারণ অনুমান করা সহজ)। সাহেব-গোরাদের সহিতও অবাধ মেলামেশা চলিতেছে। প্রকাশ্য ব্যভিচারে কোন বাধা নাই। সন্তান জন্মিলে জারজ বলিয়া তাহাকে অনাথ আশ্রমে দেওয়া হয়, ভ্রূণহত্যার তত আজ-কাল আবশ্যক নাই; কারণ, অন্য উপায়ে সেই ফল লাভ হইতেছে। ভ্রষ্টারা প্রথমে বৈষ্ণব, পরে মুসলমান হইতেছে। আর অধিক কি বলা যাইবে? বিলাসিতা আশ্চর্য্য রকমে বাড়িয়া চলিয়াছে, অথচ এই আমাদের দেশেই বারো আনা লোক অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে দিন কাটায়, লজ্জানিবারণ করিবার বস্ত্র যুটে না। থিয়েটার, সিনেমা, খেলাধূলায় যে কত অর্থ ব্যয় হয়, তাহার সংখ্যা কে রাখে? এই না নবীন জগৎ!

অথচ শিক্ষারও যে প্রসার পাইতেছে, তাহার চিহ্ন সর্ব্বত্র। পুস্তক, বিদ্যালয় প্রভৃতি ছাড়িয়া দিলেও বক্তৃতা, ক্লাব, সোসাইটী, অভিভাবক, শিক্ষক, পিতামাতা অবস্থা ইত্যাদি সকলেই ত শিক্ষা দিতেছেন, তবু গতি এরূপ কেন? ইহার কারণ অনেক, তবে গোটাকতক এই;—জগতের সর্ব্বত্র অশান্তি, আবহাওয়া, অর্থ, প্রভুত্ব, সম্পদকে জীবনের কাম্য মনে করা, ধর্ম্মে অনাস্থা, ঈশ্বরে অবিশ্বাস, নীতির উপর অনাস্থা, প্রকৃত বিদ্যা শিক্ষা না দেওয়া ইত্যাদি; পিতা-মাতা গুরুজনদের উপর শ্রদ্ধাহীনতা, তাহাদের কর্ত্তব্যহীনতা প্রভৃতি। পিতা-মাতা শিক্ষকের কর্ত্তব্যহীনতাটাই একটা মস্ত ব্যাপার। শুধু নবীনকে দোষ দিলে চলিবে কেন? উপদেশ বা শিক্ষা দিতে হইলে যে নিজে সেইমত চলিতে হয়, এ কথা ভুলিয়া গিয়াছি বা অগ্রাহ্য করি। সুতরাং

আপনি আচরি ধর্ম্ম অন্যেরে শিখায়

আজ ইহা হয় না। আজ সন্তানকে বিদ্যা শিখান হয়, সে উপার্জ্জন করিতে পারিবে বলিয়াই। কিন্তু তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য যে, ঈশ্বরবিশ্বাস, নীতিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া, এটা কয় জন মানেন বা কাযে করেন? নিজেরই ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, নীতি-জ্ঞান তরল, কাযেই তাঁহার কথায় এবং কার্য্যে পার্থক্য থাকায় কোন কায হয় না। আজ আমাদের কথা ও কাযে এত পার্থক্য বলিয়াই জগতে এত অশান্তি।

"ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ"

সজ্জন যিনি, তিনি বাক্যে এবং কার্য্যে এক। এটা আজ কথার কথা। এ প্রত্যবায় প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, এই বচন বা শিক্ষা এবং কার্য্য এক করা কঠিন বলিয়াই না আমাদের প্রত্যহ এই দোষ করার কথা স্মরণ করিয়া শ্রীভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়।

"বাচা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণা ন কৃতং ময়া।
সোঽহং কর্ম্মদুরাচারস্ত্রাহি মাং মধুসূদন।"

হে মধুসূদন! আমি প্রতিদিন যে কার্য্য করিব প্রতিজ্ঞা করি, কার্য্যে তাহা করিতে না পারিয়া কর্ম্মদুরাচার হইয়া গিয়াছি। তুমি আমায় রক্ষা কর। আমরা কিরূপ ভীষণ কর্ম্মদুরাচার হইয়া গিয়াছি, তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। শুধু কেতাবী শিক্ষায় কি হইবে? "প্রথম ভাগ" যখন পড়ি, তখন শিখিয়াছি, "মিথ্যা কথা কহিও না", কিন্তু এমন দিন যায় না, যে দিন মিথ্যা কথা বলি না—কারণে, বিনা কারণে বলি না। চুরী জুয়াচুরী —মনে মনে অন্ততঃ সদাই করিতেছি। লুকাইয়া মনের মধ্যে পরশ্রীকাতরতা আছে। মুখে তাহাকে সাফাই দিতেছি। চিত্তবিকার মনের মধ্যে সদাই জাগে। কৈ "পরস্ত্রী মাতেব" মনে ত হয় না? যে আমার অনিষ্ট করিল, তাহার সর্ব্বনাশ মনে মনে করিয়া প্রকাশ্যে লোকের কাছে বাহাদুরী লইবার জন্ত ক্ষমা দেখান হয়। ধ্বজা উড়াইয়া সরগরম করিয়া ভগবানে ভক্তি দেখান আছে, আবার কুঁথাইয়া চোখের জল বাহির করিয়া লোকের কাছে বিশ্বপ্রেম জাহির করাও আছে। সকলেরই বিশ্বাস, আমি সোজা কথা বলি, সোজা পথে চলি। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে এত বাঁকা কথা, কায কোথায় জন্মায়? ভণ্ডামী, নষ্টামী, জুয়াচুরী করিয়া হাড় পাকিয়া গিয়াছে। পশুত্ব বিষয়ে পশুর চেয়ে জঘন্য আচরণ করিয়াছি করিতেছি, এখন আর কি হইবে? স্বয়ং ভগবান্‌ও যে হাল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য।

তাই বলি, সতীত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, কথায় কি হইবে, এই অন্ধকারে, এই তমসাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে সতী কে আছে? কে সতী থাকিতে চায়? কে স্বামীকে যথার্থ ভালবাসে? যে ভালবাসার ছড়াছড়ি কাড়াকাড়ি দেখা যায় বা শোনা যায়, সে যে নিজেকেই ভালবাসা। স্বামীর তুষ্টি-প্রীতিকে সব বিষয়ে বড় করিয়া, নিজেকে তাহার মধ্যে বিলাইয়া দিয়া পতিকে নারায়ণ, আজিকার দিনে কে ভাবিতে চায়? কে আপন পর সব এক করিয়া লইয়া তাহার মধ্যে আপনাকে মিশাইয়া দিতে চায় বা পারে? তাই বলি, আজ সতীত্ব একটা কথার কথা হইয়া দাঁড়াইতেছে। এখনও দুই চারিটি দেখা যায় বটে; কিন্তু বুঝি বা কালস্রোতে তাঁহারাও ভাসিয়া যান। বুঝি বা ভবিষ্যতে তাঁহাদের আবির্ভাব বন্ধ হয়। আজ এই ঘোর ঘনঘটার মধ্যে, অশনিপাত-বিদ্যুৎমধ্যে, সতীত্ব অর্জ্জন করিতে বা তাহা অটুটভাবে রক্ষা করিতে এবং পালন করিবার তপস্যা কয় জন করিতে চান? কয় জনের সে প্রবৃত্তি আছে, ধৈর্য্য আছে, বিশ্বাস আছে, একনিষ্ঠা আছে, প্রেম আছে? কয় জন আজ মানিতে চাহেন যে, সতীত্বের মধ্যেই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সজীবভাবে পাওয়া যায়? আবার পতিই বা কয় জন আছেন, যাঁহারা পতি-নারায়ণ মানেন, মর্য্যাদা রক্ষা করেন, নিজের পবিত্রতা অটুট রাখেন?

আজ অসতীর সম্বর্দ্ধনায় দেশ ভরিয়া গেল। সাহিত্যে, কাব্যে যথায় তথায় আজ পতিতাকেই সতী-শিরোমণি বলিয়া দেখান হইতেছে। সতীর উপরে তাহাদের স্থান দেওয়া হইতেছে। আজ প্রেমিক কবি, সাহিত্যিক কলাবিৎ, নারীর নগ্ন বা অর্দ্ধনগ্ন মাধুরী দেখাইবার জন্য প্রাণপাত করিতেছেন। আজ নবীন রসজ্ঞ সাহিত্যসেবক, স্ফুটনোন্মুখ কবি, অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত শিল্পী, কামিনীর কামকলা, হাবভাব জগতের একমাত্র সত্য বলিয়া, কাম্য বরণীয় করিয়া, মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রে, পুস্তকে, ছবিতে দেখাইতেছেন। সমাজের উদ্ধারকল্পে আজ শত শত তরুণ পতিতাদের উদ্ধারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে ব্যস্ত! এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে আজ যথার্থ সতীকে দেখে কে? কে তাঁহার মর্য্যাদা দিতে চায়? কাযেই তাঁহাকে হয় জড় পদার্থ-মধ্যে, না হয় অর্দ্ধ-সতীর মধ্যেই ফেলা হইয়াছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রী—

তুলনা

তুমি সুন্দর চারু বিশ্ববিমোহন
কি দিব তোমার তুলনা;
যূথিকার হাসি তোমার অধরে
তুমি বিকসিত জোছনা!

কুসুমের বাসে তোমার গন্ধ,
কবিতাকলাপে তোমারি ছন্দ,
পাপিয়ার তানে তোমার কণ্ঠ
শুনেছি আমি গো শুনেছি;

তুমি জ্যোতির্ম্ময় আমার নয়নে,
রবি, শশী ক্ষরে তোমার চরণে
আমি ক্ষুদ্র বিন্দু, তুমি মহাসিন্ধু
বুঝি বা এবার চিনেছি!

তুমি নিত্য শুদ্ধ চির-শান্তিময়
গুণাতীত তুমি অব্যয় অক্ষয়,
পাপ, পুণ্য যাহা, কিছু নহে তাহা—
সকলি তোমার ছলনা!

কি জানিব বল তোমার মহিমা,
বুঝিব কি বল তোমার গরিমা,
তুমি ধাতা ধ্যান, তুমি জ্ঞেয় জ্ঞান,
তুমিই তোমার তুলনা!

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

পথের স্মৃতি

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"তার পর ?"

স্ত্রীলোকটিকে সঙ্গে করিয়া সে রাত্রিতে আমাদেরই বাটীতে আনিয়াছিলাম। দুই দিন তাহাকে আমাদের বাটীতে রাখিবার পর, বর্দ্ধমান জেলায় ধুলাখালিতে তাহার বাপের কাছে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যাইবার পূর্ব্ব-দিন বৌদি'রা তাহার নিকট হইতে তাহার দুঃখের কাহিনী বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিল। আমি এবং বিনুদাও সেখানে ছিলাম। শুনিতে শুনিতে বড়বৌদি জিজ্ঞাসা করিল—"তার পর ?"

স্ত্রীলোকটি কহিল,—"তার পর বিধবা হয়ে বাপের কাছে ধূলোখালিতে চ'লে গেলুম। তখন খোকা আমার পেটে, সেইখানে গিয়েই খালাস হই। তার পর এই ৪ বছর সেই বুড়ো বাপের গলগ্রহ হয়েই ত ছিলুম। বাপের বাড়ীতে ত আর কেউই নেই মা, অথর্ব্ব বাপ, খাটা-খাটুনি খাটবার ত আর শক্তি নেই, কোন-রকমে দু'পয়সা রোজগার ক'রে এক বেলা রেঁধে তিন বেলা খেয়ে কষ্টে-সৃষ্টে এক রকম ক'রে কাটাচ্ছিল। সেই অবস্থায় আমি গিয়ে পড়তে তাকে নাকালের একশেষ হ'তে হ'ল। আবার শুধু আমার পেট্‌টিই নয়, ছেলেটাও ত ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে উঠেছিল—দু'টি দু'টি ভাত সে-ও ত খেতে আরম্ভ করেছিল।" বলিয়া আঁচল দিয়া খোকার মা তাহার চক্ষু মুছিতে লাগিল।

বড়বৌদি জিজ্ঞাসা করিল,—"পলাশতলায় তোমার স্বামীর দু'এক বিঘে জমী-টমি ছিল না ?"

"ছিল মা, ঐ দু'এক বিঘেই ছিল। তারই আশায় ত ৫ বছর পরে আবার এখানে ফিরে এলুম; ভাবলুম, ঐ দু'এক বিঘে জমী-জমা যা আছে, তা বিক্রী-সিক্রী ক'রে বিশ-পঞ্চাশটা টাকা যা পাই, তা'ও যদি বুড়ো বাপের হাতে এনে দিতে পারি! এসে দেখলুম, ঘরখানা কোন-রকমে দাঁড়িয়ে আছে। তা'তেই মাথা গুঁজে এসে পড়লুম। জমীটুকুর সন্ধান করতে গিয়ে শুনলুম, গদাই দলুই সেটুকু দখল ক'রে নিয়ে ফাঁকি দিয়ে খাচ্ছে। বলতে গেলুম, ঝাঁকি দিয়ে তেড়ে মারতে এল। ভয়ে পালিয়ে এসে নিজের ভাঙ্গা ঘরের দাওয়ায় ব'সে কাঁদতে লাগলুম, আর দেবতার কাছে নালিশ জানালুম। তা, দেবতার কি আর কাণ আছে মা, না তাঁর বিচার আছে, নইলে আমারই বুকের ওপর তাঁর হাতের শেল এমন ক'রে পড়ে কখন ?"

বড়বৌদি কহিল,—"কাঁদিস্ না মা, কাঁদিস্ না। তার পর কি হ'ল ?"

"তার পর, পাড়ার সকলের দোর দোর ঘুরলুম, কেউ যদি গদাই দলুইয়ের হাত থেকে জমীটুকু উদ্ধার ক'রে দেয়। কিন্তু কে দেবে মা ? গদাই হ'ল পাড়ার মোড়ল, তারই বশ সকলে। কেউ কি আর আমার কথায় কাণ দিলে, সকলেই মুখ বাঁকিয়ে চ'লে গেল। তখন মরিয়া হ'য়ে এক দিন গদাই দলুইয়ের উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়ে খুব গালাগাল আর শাপ দিয়ে এলুম। গদাই তখন ঘরেতেই ছিল, চুপ ক'রে সব শুনলে, একটা কথাও কইলে না। সন্ধ্যার পর, দাওয়ার ওপর চ্যাটাই বিছিয়ে খোকাকে নিয়ে শুয়ে আছি, গদাই আস্তে আস্তে উঠোনে এসে দাঁড়াল। ভয়ে চমকে উঠলুম। তার পর মুখ দিয়ে যে সব কথা সে উচ্চারণ করলে,—তা ছেলেরা এখানে রয়েছে, সে কথা আর কি ক'রে বলি মা—শুনলে পরে কাণে আঙ্গুল দিতে হয়। উঠে যাবার সময় ব'লে গেল—'জমী ত দিয়ে দেবোই, তা ছাড়া তোকে গয়না-গাঁটি গড়িয়ে দেবো, ভাল ভাল কাপড় কিনে দেবো, তোর ভাঙ্গা ঘর সারিয়ে দেবো, দেখবি কত সুখে থাকবি তুই। দুদিন পরে আসব, ভেবে চিন্তে একটা জবাব দিস্।' ভয়ে, লজ্জায়, অপমানে তখন যেন আর আমার চৈতন্যই ছিল না। চোখ মেলে যখন চাইলুম, দেখলুম, গদাই চ'লে গিয়েছে। বেহুঁসের মত তেমনি শুয়ে

শুয়েই ভগবান্‌কে ডাকলুম—'ঠাকুর, কেউ নেই আমার, তুমি আমার সব, তুমি আমায় রক্ষে কোরো, পাষণ্ডের হাত থেকে তুমি আমায় বাঁচাও, ঠাকুর' !"

"তার পরই বুঝি খোকার তোমার অসুখ করে ?"

"না মা, তা হ'লে ত সোজাসুজিই হ'ত। দুঃখের কি আর আমার অন্ত আছে মা ? এখনও বরাতে যে কত দুর্দ্দশা আছে, তা ভগবান্‌ই জানেন", বলিয়া খোকার মা মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া নিজের মনে কহিল—"আর ভগবান্ আমার কি-ই বা করবেন ?"

ছোটবৌদি জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার বাপকে খবর দিয়ে সে সময় একবার আনালে না কেন ?"

"না মা, বুড়ো বাপকে যদি এই জন্যে আনাতুম, তা হ'লে ওরা গলা টিপেই তাকে মেরে রেখে দিয়ে যেত ! পাড়া শুদ্ধু সব যে এককাট্টা, মা। তাই, সেই রাতেই শুয়ে শুয়ে ভাবলুম, আর পলাশতলায় একটি দিনও থাকা নয়। খোকার গায়ে হাত দিয়ে দেখি, জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে। সকালে উঠে, ছেলেকে সেই জ্বর গায়ে কোলে ক'রে সহরের মধ্যে চাকরী খুঁজতে এলুম। সে দিন আর কোন সুবিধে করতে পারলুম না, গোঁসাই বাবুদের মন্দিরে দুটি পেসাদ খেয়ে সন্ধ্যার সময় আবার ঘরে ফিরে এলুম। ভয়ে ভয়ে সমস্ত রাত আর চোখে পাতায় করতে পারলুম না। তার পরদিনও কাযের চেষ্টায় বেরুলুম। সে দিন এক কায পেলুম। আমাদেরই গাঁয়ে পূজো করতে আসতেন, আমাদেরই ব্রাহ্মণ—চক্রবর্ত্তী মশাই, তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন,—'আমারই ত এক জন ঝিয়ের দরকার, তা তুই আমারই এখানে থাক'।"

বড়বৌদি কহিল,—"কে,—ওপাড়ার ওই—নাম ধরতে নেই, ফারাণ চক্কোত্তি বুঝি ?"

"হ্যাঁ মা, উনি হলেন আমাদেরই পুরুত ঠাকুর। ভাবলুম, ভালই হলো, ভাল যায়গাতেই আশ্রয় পেলুম। রোগা ছেলেকে নিয়ে সেই দিন থেকেই সেখানে থাকলুম। গোয়ালের পাশে কাঠ রাখবার ছোট একটু চালা ছিল, তাই ঘিরে ঘুরে পরিষ্কার ক'রে, সেইখানে রাত্রিতে আমাদের শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিলে। দিন পাঁচ সাত কেটে গেল। ছেলের আমার অসুখ কিন্তু দিন দিন বাড়তেই লাগলো। কি জানি, চোরা সান্নিপাতিক না কি হো'ল। বাছা আমার চোখ মেলে আর চাইলেই না, বেহুঁসের মত হয়ে ক'দিন ধ'রে পড়েই রইল। তার পর এক রাত্রিতে—রাত তখন অনেক—হঠাৎ কিছু একটার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল, মনে করলুম, গোয়ালে গরুর পায়ের শব্দ। খানিক পরেই বুকের ওপর কার হাত এসে পড়ল,—আঁৎকে উঠে ব'সে পড়লুম। জাফ্‌রীর ফাঁকের জ্যোছনার আলোয় দেখি, চক্কোত্তি মশাই একেবারে আমার বিছানার ওপর ! মাথা আমার ঘুরে উঠলো, শরীরটা যেন কি রকম হয়ে গেল ! তখন চক্কোত্তি মশাই দু'হাতে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরেছে। চেঁচাতে গেলুম—গলায় রব ফুটল না, মাথার ভেতরটা শির্‌-শির্‌ ক'রে উঠলো। তখন একটু সামনের দিকে স'রে গিয়ে, ঘুরে ব'সে চক্কোত্তি মশা'য়ের বুকের ওপর খুব জোরে মারলুম জোড়াপায়ের এক লাথি। কোথা থেকে যে তখন অত বল পেলুম, তা জানি না। দেখলুম, চক্কোত্তি মশাই ছিটকে চালার বাইরে একেবারে ছাঁচতলায় গিয়ে পড়েছে। তার পর কি হ'ল, জানি না। জানলুম যখন, তখন দেখলুম, খোকাকে কোলে ক'রে আমি রথ-তলায় পথের ওপরে ব'সে আছি। ব'সে ব'সে কতখানাই যে ভাবতে লাগলুম ! ভাবনাও যত হ'তে লাগলো, ভয়ও তত করতে লাগলো। সব চেয়ে ভয় হলো, বামুনের বুকে লাথি মেরে আমি কি করলুম, কি শাস্তিই না আমাকে এর জন্যে পেতে হয় ! তা এখন দেখছি, ঠিকই হয়েছে মা, হাতে-হাতেই শাস্তি আমাকে ভগবান্ ত দিয়ে দিলেন !"

ছোটবৌদি' কহিল,—"দুটো ঘটনা সঙ্গে সঙ্গেই ঘটেছে ব'লে আজ তোমার মনে ও কথা উদয় হচ্ছে। খোকা তোমার দু'এক বছর পরে মারা গেলে আর এ কথা তুমি ভাবতে না।"

"না মা, হতভাগী পাপিষ্ঠি আমি, এ ঠিকই বামুনের শাপেই—"

"ও কথা মনেই কোরো না। তোমার খোকার আর আয়ু ছিল না, তাই সে আর তোমার রইল না। আর বামুন তুমি কা'কে বলছ ? গলায় একগাছা পৈতে থাকলেই আর চক্কোবত্তি হলেই কি বামুন হয় ? তা হয় না মা, তা হয় না। অমন যে পাষণ্ড, সে কখনও বামুনও হয় না আর তেমন বামুনের ঐ রকম কাযে তার বুকে একটা কেন, একশ' বছর ধ'রে অনবরত জোড়াপায়ের লাথি মারলেও

তা'তে পাপ হয় না। চিরকালই ত ওর স্বভাব ওই রকম। তার পর কি হ'ল ?"

"তার পর অনেকক্ষণ ধ'রে খোকাকে তেমনি ক'রে কোলে ক'রে রথ-তলাতেই ব'সে রইলুম আর আকাশ-পাতাল কত-খানাই ভাবতে লাগলুম। সেই সময় ছেলের আমার অনবরত হিক্কে উঠতে লাগলো। খানিক পরেই একবার খুব ছট্‌ফট্‌ ক'রে বাছা আমার ঘুমিয়ে পড়লো। শেষ রাত্তির পর্য্যন্ত সেই অবস্থায় সেইখানে ব'সে থাকবার পর হঠাৎ ভয় হ'ল যে, চকোত্তি মশাই এসে এখান থেকে যদি আমায় ধ'রে নিয়ে যায়! তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালুম। তখনও কাক ডাকে নি, লোক জাগে নি। বাছাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে গঙ্গার পথ ধ'রে চললুম। সমস্ত রাত্তির ঠাণ্ডা লেগে বাছার গা একেবারে হিম হয়ে গিছলো! কিন্তু তখন কি আর জানতে পেরেছি যে, ঠাণ্ডা-হিম মরা ছেলেকেই এতক্ষণ বুকে জড়িয়ে ছিলুম!" বলিয়া খোকার মা আবার আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

বিনুদা জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে যে তুমি সে দিন বল্‌লে যে, মার অনুগ্রহ হয়েছিল ?"

"কি আর বলব বাবা আমার! সমস্ত দিন মরা ছেলেকে নিয়ে গঙ্গার ধারে ব'সে রইলুম, কত লোক এলো, কত লোক দেখে গেল, কিন্তু কেউ-ই ত আর কিছু করলে না, তাই সন্ধ্যা অবধি ব'সে থেকে, নিজের বুকের ধনকে নিজের বুকে ক'রেই শ্মশানে নিয়ে গিয়ে ফেল্‌লুম। ভগবান্ যেন সে দিনের মত এ দিনেও আমায় কোথা থেকে বল দিলেন, নইলে আমি যে—"

সমস্ত শুনিয়া বিনুদা দাঁড়াইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কোথায় যাবে, বিনুদা ?"

বড়বৌদি কহিল,—"জলখাবার দেবো, একেবারে খেয়ে বেরুবি বিনু!" বিনুদা কাহারও কথার জবাব না দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পরই শুনিলাম যে, হারাণ চক্রবর্ত্তীকে কে মারিয়া আধমরা করিয়াছে। রাতে বিনুদা বাড়ী আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কিছু শুনলে, বিনুদা ?" বিনুদা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে শুনে নাই এবং তাহার পরই এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার করিতে বসিল অর্থাৎ স্কুলের বইগুলি খুঁজিয়া লইয়া গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়িতে বসিল। সকালে কোন কোন দিন বিনুদাকে পড়িতে দেখিতাম বটে, কিন্তু রাত্রিতে এত চাড় করিয়া পড়িতে বসা,—শ্রীরামপুর আসিবার পর কোন দিনই আমি বিনুদার দেখি নাই। ধরিতে গেলে, বাড়ীতে বিনুদা একরকম পড়িতই না। পড়ার কথা তাহার মনে পড়িয়া যাইত স্কুলে আসিয়া এবং তাই, ঘণ্টা বাজিবার আগে ও টিফিনের ছুটীতেই বিনুদার যত পড়ার তাড়া লাগিয়া যাইত।

পরদিন প্রভাতে হারাণ চক্রবর্ত্তীর সকল সংবাদই জানিতে পারা গেল। তাহার বাড়ী চড়াও হইয়া তাহাকে কীল, চড়, ঘুসি মারিয়াছে, মাথার টিকি কাটিয়া দিয়াছে, ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়া কাপড়-চোপড় পৈতা ছিঁড়িয়া দিয়াছে এবং একখানা পা তাহার একবারে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। যে এই সকল কাণ্ড করিয়াছে, সে আর কেহই নহে—সে বিনুদা।

বড় জ্যেঠামহাশয় ও বড়দা বাড়ী ছিলেন না, কি একটা বৈষয়িক কাযের জন্য দিন দুই হইল তাঁহারা বর্দ্ধমান গিয়াছিলেন, ফিরিতে তাঁহাদের আরও দিন পাঁচ সাত বিলম্ব ছিল।

বড়বৌদি কহিল,—"বিনু, তুই শেষকালে হলি কি? মানুষ খুন আরম্ভ করলি ?"

বিনুদা কহিল,—"করবে না ত কি ? ও ব্যাটাকে খুন করতে পারলে তবেই ঠিক হ'ত!"

"আচ্ছা, তা তোর এত মাথাব্যথা কেন ?"

"আমার মাথা আছে, তাই মাথাব্যথা করে, আর কারও মাথা থাকলে ঠিকই তারও মাথাব্যথা করতো।"

বড়বৌদি রাগ করিয়া কহিল,—"তুই যা, এখান থেকে চ'লে যা, সেই কালীঘাট গিয়ে গুণ্ডোমী কর গে যা। দাঁড়াও, আজই আমি ঠাকুরপোকে দিয়ে সেখানে চিঠি লিখিয়ে দেওয়াচ্ছি! আচ্ছা, তুই না ভদ্দর লোকের ছেলে ?"

"ভদ্রলোকের ছেলে হ'তে পারি, বড়বৌদি, কিন্তু নিজে আমি মোটেই ভদ্রলোক নই, ভয়ানক অভদ্র।"

"কি বলছিস্ রে গাধা ?"

হঠাৎ ছোটদা সেইখানে পদার্পণ করিয়াই কহিল,—"গাধা কিন্তু কথাটা যা বলেছে তা মোটেই গাধার মত নয়, একেবারেই মানুষের মত। তোমাদের ভদ্র হওয়া মানে ত শান্ত, শিষ্ট, ভীরু এবং অক্ষম? অর্থাৎ বাইরে

লোকের অত্যাচার সহ্য ক'রে এসে বাড়ীতে মেয়েদের কাছে খুব বীরত্ব প্রকাশ এবং পথে-ঘাটে অন্য জাতের কাছে লাঞ্ছনা খেয়ে, মুখ বুজিয়ে পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে পালিয়ে এসে বাঁচা ?"

ছোটদার মুখের দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বড়বৌদি কহিল,—"তুমি আবার কে গো—'বন থেকে বেরুলে টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে ?'—তুমি আবার কি কও ?"

"কই যে, বাঙ্গালীর অভিধান খুলে মিলিয়ে নাও, ভদ্রলোক মানে যা বললুম, তাই কি না ! পথে-ঘাটে রেলে-ষ্টীমারে তোমরা যে যাও, কা'র ভরসায় ? জানবে যে, তোমাদের নিজেদের ভরসাতেই যাও। কেউ যদি হাত ধ'রে তোমাদের টেনে নিয়ে যায়, বাঁচাবার তোমাদের কেউ থাকবে না, বাঁচাও ত তোমরাই তোমাদের বাঁচাবে। লাঞ্ছনা, গালাগাল, অপমান, অত্যাচার, এমন ক'রে সহ্য করতে বুঝি জগতে আর কোন ভদ্রলোকরাই পারে না, বৌদি। একটা পাঞ্জাবী মেয়ের গায়ে একটা সাহেব হাত দিতে যা'ক দেখি, অমনি তা'দের পুরুষ তা'র কোমরের ছোরা খুলে কেমন না তাকে তেড়ে যায় ! এক জন মারহাট্টার ওপর বিনা দোষে একটা গুর্খা এসে তার ভোজালে দেখিয়ে অত্যাচার ক'রে যাক দেখি, কেমন না সেই মারহাট্টা তার ভোঁতা নাকমুখকে একবারে থেঁতো ক'রে দিয়ে ছাড়ে !"

"তুমি যে যাত্রার দলের গায়েন হয়ে উঠলে, ঠাকুরপো ?"

"তবু ভাল বৌদি, ভদ্রলোক হয়ে উঠিনি। বাপ! ভদ্রলোক হ'তে হলেই গিয়েছিলুম আর কি। বিনে, খবরদার, কখন যেন ভদ্রলোক হয়ে যাস নি। আমাদের দেশের ভদ্রলোকদের, বৌদি, গুণ অগুণতি, ক'টা আর বলবো ? এরা আবার ধার্ম্মিক এমনি যে, ভারতের আর কোন জাতের মধ্যে এমন নেই। আর সকলে ধর্ম্ম করে ধর্ম্মের জন্যে, আর এরা ধর্ম্ম করে পরকে ফাঁকি দেবার জন্যে। সেই জন্যে এদের পয়সা উপায়ের সমস্ত আয়োজনের পেছনে থাকে মস্ত এক ধর্ম্মের লেজুড়। পরনে গেরুয়া যদি দেখেছে আর মুখে হরি হরি শুনেছে, তা হ'লে কি আর রক্ষে আছে, দেশের যত ভদ্র-ভদ্রী অমনি ছুটে এসে পায়ের তলায় প'ড়ে লুটোপুটি ! অন্য জাতের লোকরা ভগবান্‌কে পাবার জন্যে নিজেরা ডাকাডাকি করে, পরিশ্রম করে, এদের অতটা করবার শক্তি নেই, তাই এরা সাধুবাবার একটু পায়ের ধুলো বা একটুখানি ছাই-ভস্ম বা একরতি পুষ্প লাভ ক'রে রাতারাতি উদ্ধার হবার জন্যে লালায়িত। এরা চায় ঠিক একেবারে যাকে বলে—ফাঁকি দিয়ে স্বর্গলাভ। সমস্ত জাতটার ভিতর ভীরুতারও যেমন অন্ত নেই, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মেরও তেমনই শেষ নেই। আমাদের মধ্যে, হরিকে যে যত কম জানে, মুখে হরি হরি তার ততই বেশী। এদের ফোঁটা, চন্দন, তুলসীর মালা আর টিকির বহরের সঙ্গে সঙ্গে এদের জুচ্চুরী, ঠকামী আর পিশাচবৃত্তি মাপ-কাঠীতে একেবারে ঠিক মাপা ! এগুলো যেন এদের ফাঁকি-প্রবঞ্চনার জালের এক একটা গাট্ !"

বড়বৌদি চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; তেমনই চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"আচ্ছা, ঠাকুরপো, সকলেই এই রকম ?"

"তাই কি আমি বলছি, বৌদিদি ? আমাদের ভেতর সত্যিকারের যারা ভাল, তেমন ভাল বুঝি কোথাও নেই, কিন্তু তা যে খুবই কম, বেশীর ভাগই ঐ তোমার হারাণ চক্রবর্ত্তীর মত জানবে। পাঞ্জাব যাও, বোম্বাই যাও, মাদ্রাজ যাও, সব যায়গাতেই দেখবে, জাত-ভায়ের ওপর পরস্পরের কত ব্যথা, কত সহানুভূতি। আর আমাদের ? আমরা অবশ্য সহানুভূতি পাই—সেটা আমাদের সুদিনে, কিন্তু দুর্দ্দিনে কোন অনুভূতিই আর আমরা হাত্‌ড়ে পাই না। ওই যে আগেই বলেছি যে, বেলকুল ফাঁকির ভিত্তির ওপরেই আমাদের যা কিছু সব। দুঃখের কথা বলবো কি, বৌদি, ভদ্রঘরের ঝি-বৌদের পথে বেরোবার পর্য্যন্ত উপায় নেই। বেরিয়েছে কি হাজারটা কু-চোখের দৃষ্টি অমনই তা'দের ওপর এসে পড়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেহ নিয়ে কি কুৎসিত আলোচনা ! কি লাভ হয় এতে তাদের, জানি না, কিন্তু এই তারা করে। কিন্তু উন্নতিশীল, কাযের দেশের লোক যারা, তারা তাদের দেশের মেয়েদের ওপর এমন করে না। চীনেদের দেশে, সমুদ্রের ওপর হাজার হাজার পান্‌সীতে সুন্দরী মেয়েরাই দাঁড় বেয়ে যাত্রী নিয়ে যায়, তাদের মাথা খোলা, বুক খোলা, বুকে কচি ছেলে কাপড় জড়িয়ে বাঁধা, চুক্ চুক্ ক'রে দুধ খাচ্ছে, কিন্তু সে দিকে কোন যাত্রীই হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে না। সে দাঁড় হাতে তার নিজের কাযে ব্যস্ত থাকে, যাত্রীরা তাদের কাযে

থাকে, তার সঙ্গে একটা কথাও বলে না, নৌকা থেকে নামবার সময় খালি ভাড়াটা গুণে হাতে দিয়ে দিলে; সে সময় দু'জনের মুখে হয় ত একটু হাসি দেখা দেয়; কিন্তু সে হাসির ভেতর থাকে পবিত্রতা আর পরস্পরকে পরস্পরের একটু ধন্যবাদ জানান।"

ছোট-বৌদি সামনের ঘরেই দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, বড়বৌদি, তাহার দিকে চাহিয়া কহিল,—"ওলো ছোটবৌ, এই আমার যায়গায় এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠাকুরপোর লেকচারগুলো শোন্, আমার এ সব বোঝবারও শক্তি নেই, শোনবারও সময় নেই।"

ছোটদা কহিল,—"আমারও বেণাবনে মুক্তো ছড়াবার সময়ের অভাব বৌদি" বলিয়া ছোটদা চলিয়া গেল। ছোট-বৌদি বাহিরে আসিয়া কহিল,—"সত্যি, যা বল্লে, কথাগুলো সব ঠিক। চক্রবর্ত্তীর মত অমন বদ্ চরিত্তিরের লোক আর আছে না কি! বেশ করেছ ঠাকুরপো, মেরেছ।"

"তা হ'লে দেব-দেবী দুজনের একই কথা! তবে আজ থেকে, ছোটবৌ, বিনুর কাছ থেকেই পাঠ নিতে আরম্ভ কর" বলিয়া বড়বৌদি চলিয়া চাইতেছিল, বিনুদা তাহার পথ আগলাইয়া কহিল,—"সত্যি, বাবাকে এ সব লিখবে, বৌদি?"

"লিখবই ত।"

"তোমার পায়ে পড়ি বৌদি, লক্ষ্মীটি।"

"তা হ'লে আর এ রকম করবিনি বল্?"

"আচ্ছা, আর করব না।"

"আমার পা ছুঁয়ে বল্।"

বিনুদা বড়বৌদির পা ছুঁইয়া বলিল, আর করিবে না। বড়বৌদি কহিল,—"এইবার থেকে আখড়া-টাক্‌ড়া বন্ধ ক'রে মন দিয়ে লেখাপড়া করবি বল্?"

"করব বৌদি।"

"করব বৌদি নয়, ঠিক করবি?"

"তোমার পা ছুঁয়ে বল্লুম বৌদি, এর ওপরও আবার ঠিক?"

"লক্ষ্মী ভাইটি আমার, আর কুসঙ্গে বেড়িও না। এখন ত আর ছেলেমানুষটি নও, এখন বড় হয়েছ, ওরকম মতিগতি ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে মন দিয়ে লেখাপড়া কর, সুবোধ সুশীল হও।"

"সত্যি বলছি বড়বৌদি, এইবার থেকে ঠিক সুবোধ সুশীল হব, ঠিক একেবারে দ্বিতীয় ভাগের সেই সুশীল বালকের মত, অর্থাৎ মন দিয়ে লেখাপড়া কোরব, কখন কাহাকে কটু কথা বলব না, কাহারও সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করবো না, কখন পরের দ্রব্যে হাত দেবো না, আর যখন বিদ্যালয়ে থাকবো, গুরুমশাই যাহা করিতে বলিবে, কদাচ তাহার অন্যথা করব না।"

ইহার পর হইতে সত্যই বিনুদা অতিমাত্রায় সুশীল বালক হইয়া পড়িল এবং সত্যই অনুকূল মিত্তিরের আখড়া পরিত্যাগ করিয়া অসীম উৎসাহ ও যত্নের সহিত পড়াশুনায় মন দিল। ফলে বৎসরখানেক পরে, 'টেষ্ট' পরীক্ষার ফল যখন বাহির হইল, তখন দেখা গেল যে, বিনুদা স্কুলের মধ্যে প্রথম হইয়া পাশ করিয়াছে এবং তাহার পর নূতন আর এক দম লইয়া যে পড়িতে বসিল, সে দম ত্যাগ করিল একেবারে 'এনট্রান্স' পরীক্ষা দিয়া আসিবার পর।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

তখন চৈত্রমাসের শেষ। পাড়ার কৃষ্ণচূড়া গাছগুলি সব রাঙ্গা হইয়া উঠিয়া তাহাদের তলার চারিদিক্ পর্য্যন্ত রাঙ্গাইয়া রাখিয়াছে। অশোকের গাছে গাছে কাহারা যেন রংয়ের পিচকারী মারিয়া হোলি খেলিয়া গিয়াছে। কাল কোকিল লালের এত ছড়াছড়ি সহ্য করিতে না পারিয়া গায়ের জ্বালায় গাছে গাছে ডাকিয়া সারা হইতেছে। তাহাদের সে ডাককে ছাপাইয়া, পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে তখন চড়কের ঢাক বাজিয়া উঠিয়াছিল, আর সেই শব্দে মনের ঢাকেও যেন কি এক বৈচিত্র্যের কাঠি পড়িয়া মনকে নাচাইয়া দোলাইয়া দিয়া যাইতেছিল।

আমাদের পরীক্ষা দেওয়া হইয়া গিয়াছিল। চৈত্রমাস বলিয়া জ্যেঠামহাশয় আমাদের কালীঘাট লইয়া যাইতে পারিতেছিলেন না। বৈশাখের প্রথমেই আমরা কালীঘাট চলিয়া যাইব।

এমনই সময়ে এক দিন ছোটদা কহিল,—"কাল তারকেশ্বরে গাজনের মেলা দেখতে যাব, তোরা যেতে চাস্ না কি?"

কহিলাম,—"তোমার বড় অন্যায়, ছোটদা, যেতে চাই কি না, এ আবার তুমি জিজ্ঞাসা করছ ?"

পরদিন নয়টার মধ্যে আহারাদি সারিয়া লইয়া আমরা তিন জনে তারকেশ্বর যাত্রা করিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া, লোকের ভীড় দেখিয়া মনে হইল যে, বাঙ্গালাদেশের সমস্ত লোকই বুঝি সে দিন তারকেশ্বরে আসিয়া জড় হইয়াছে। সমস্ত দিন উৎসব ও মেলা দেখার আনন্দে কাটাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেই জন-সমুদ্রের মধ্য দিয়া ষ্টেশনের পথে আসিতে আসিতে ছোটদার সহিত তাহার অনেক দিনের এক বন্ধুর দেখা হইল। পথের এক ধারে দাঁড়াইয়া ছোটদা তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিল দেখিয়া আমরা পথের ওপাশে এক পাঁচপাওয়ালা গরু দেখিবার জন্য সেইখানে গিয়া দাঁড়াইলাম। মিনিট দুই চারি পরে ফিরিয়া দেখি, যেখানে দাঁড়াইয়া ছোটদা কথা কহিতেছিল, সেখানে আর ছোটদা নাই। সেই জন-স্রোতের ইতস্ততঃ চারিদিকে চাহিয়া খুঁজিলাম, ছোটদাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। কিছু দূর পর্য্যন্ত আগাইয়া গেলাম, তাহার সন্ধান করিতে পারিলাম না। আবার অনেকটা পিছাইয়া আসিয়া খুঁজিলাম, তবুও তাহাকে পাইলাম না। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন আশে পাশে চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিতেছিল। রাত প্রায় এক প্রহর পর্য্যন্ত এই ভাবে ষ্টেশন হইতে মন্দির এবং মন্দির হইতে ষ্টেশন ছোটদাকে খুঁজিয়া ফিরিলাম, কিন্তু কোন স্থানেই তাহাকে আবিষ্কার করিতে না পারিয়া শেষে উভয়ে ক্লান্ত হইয়া মাঠের উপর একটা বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলাম।

যেখানে গিয়া আমরা বসিলাম, তাহার অদূরেই কতকগুলি গেরুয়াধারী ভীড় জমাইয়া গান গাহিতেছিল। বিনুদা কহিল,—"চ', ঐখানে ব'সে ব'সে গান শুনি গিয়ে, ছোটদার সঙ্গে আর কখনও কোথাও আসা নয়।"

তখন লোকের ভীড় ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল। যাহারা গান করিতেছিল, তাহারা সংখ্যায় ছিল ছয় জন। হাত পাঁচ সাত লম্বা এক খণ্ড মোটা বাঁশের বাখারির শীর্ষদেশে ছোট একখানা সাইনবোর্ড বাঁধা, আসরের মাঝখানে মাটীতে পোতা ছিল। সাইনবোর্ডখানিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল,—"শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ সমাজ।" তাহার নীচে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা ছিল,—"শ্রীগৌরাঙ্গের সেবায় যথাসাধ্য দিয়া পুণ্য সঞ্চয় করুন।" 'গৌরাঙ্গ'দের সকলকারই গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। জন দুই তিন ছাড়া আর সকলেরই বুকের উপর লম্বা দাড়ি ঝুলিতেছিল এবং সে দাড়ি তাহাদের দেহের মতই শীর্ণ, শুষ্ক এবং বিবর্ণ। প্রত্যেকেরই পরনে গেরুয়া এবং মাথায়ও তাহাদের গেরুয়ার একখানি করিয়া চাদর জড়ান, তবে তাহা এতই ময়লা যে, তাহা আর বলিবার নহে।

সকলেই দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া গান করিতেছিল। এক জনের কোমরে গলার সহিত টানা দিয়া একটা হার্ম্মোনিয়ম্ ঝুলিতেছিল। শ্রোতৃগণের ভিতর হইতে যাহারা ধর্ম্মার্থে 'যথাসাধ্য দিয়া পুণ্যসঞ্চয়' করিতেছিল, তাহাদের দেওয়া পয়সাগুলি আসিয়া সম্মুখের একখানি বিছান গেরুয়া চাদরের উপর জমা হইতেছিল। গান শেষ হইলে একে একে শ্রোতারা যখন চলিয়া গেল, তখন শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গরা বসিয়া সারাদিন উপার্জ্জনের সেই পয়সাগুলি গণিতে লাগিল। সেই সময় এক জন আমাদের দিকে চাহিয়া বলিল,—"তোমাদের বাড়ী কোথায় গা, বাবুরা ?" বিনুদা কহিল,—"আমাদের বাড়ী এখান থেকে দু' ক্রোশ দক্ষিণে হরিহরপুর। যাত্রার দলে চাকরী করবো ব'লে বেরিয়েছি।" যে হার্ম্মোনিয়ম্ বাজাইতেছিল, সে তাহার গেরুয়া চাদরে মুখের ঘাম মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমরা কি গাইতে পার ?"

বিনুদা কহিল,—"গাইতে শুধু আমিই পারি, আর ও বক্তৃতায় পাকা। শিবুহাটীর দলে ও বরাবর কেষ্ট সাজতো। তবে সঙ্গে গেয়ে যেতে পারবে।" যে কষ্টে হাসি চাপিয়াছিলাম, তাহা ভগবান্‌ই জানেন। সে লোকটি বলিল,—"ভাল ভাল। আচ্ছা, কি জান গাও দেখি একখানা" বলিয়া সে হার্ম্মোনিয়মে খুব মৃদু সুর দিতে লাগিল। বিনুদা একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই গান ধরিল,—

"কানাই, কি ভেবে তুই গৌর হলি তাই আমারে বল্।
ওরে, ব্রজের লোকে পাগল যে সব—নদে ছেড়ে চল্॥"

সকলেরই মনোযোগ তখন আমাদের দিকে আকৃষ্ট হইল। বিনুদা গাহিতে লাগিল—

"বুঝি, মা-যশোদা অনাহারে,
আছেন ব'সে পথের ধারে,
ধবলী-শ্যামলী আজও ফেলছে চোখের জল॥"

গান শেষ হইলে, এক জন কহিল,—"যাত্রাদলের চেয়ে তোমরা আমাদের কাছেই কায কর না কেন?"

বিনুদা কহিল,—"তা করলেও পারি; এখানে মাইনে কত পাব?"

"এখানে মাইনে হিসেবে কায নয়। রোজ যা উপায় হবে, তার সিকি যাবে হেড্ আফিসে, বাকী বারো আনার মধ্যে খেয়ে দেয়ে যা থাক্‌বে, সেইটে আমাদের ভেতর ভাগ হবে।"

আমি কহিলাম—"সমান ভাগ?"

"তা কি হয় কখনো! যারা নূতন, তারা ভাগে কিছু কম পাবে। তা' তোমরা যদি মন লাগিয়ে থাক এইখানে, ত খাওয়া-দাওয়া বাদে পাঁচ ছ'টাকা ক'রে তোমাদের যে এখন পোষাবে, তার আর ভুল নেই। একটু পুরোনো হ'লে আরও বেশী হবে। আর বেশী হওয়া না হওয়া সেটা ত আমাদেরই ওপর নির্ভর করছে কি না। যত ঘুরতে পারবো, ততই উপায় বেশী হবে। ফি দলে আমাদের আট জন ক'রে থাকা নিয়ম। আট জনই আমরা ছিলুম।"

বিনুদা জিজ্ঞাসা করিল—"আর দু'জন বুঝি ছেড়ে গেছে?"

একটা ছোট্ট থেলো হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে এক জন কহিল,—"হাঁ, একেবারে জন্মশোধ" বলিয়া হ-হ করিয়া হাসিতে লাগিল। যে বিনুদার সহিত কথা কহিতেছিল, সে কহিল,—"নবাবগঞ্জের মেলা থেকে আসতে আসতে পথে তাদের দু'জনেরই হ'ল কলেরা, তাইতে দু'জন সেই পথেতেই—"

ওদিকে এক জন তখন মাটীর কলসীতে সিদ্ধির সরবৎ প্রস্তুত করিতেছিল। সিদ্ধিটা বোধ হয় পূর্ব্বাহ্ণেই বাটা ছিল, এখন শুধু তাহাতে জল ও মিষ্টি মিশাইয়া ঢালাঢালি করা হইতেছিল। সরবৎ প্রস্তুত হইলে সকলেই এক এক গ্লাস পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। আমাদের দিকেও এক গ্লাস আসিল। জার্ম্মাণীর তৈরী পাতলা পিতলের চাদরের সেই গ্লাসটি আমাদের সামনে রাখিয়া এক জন কহিল,—"দু'জনে ভাগাভাগি ক'রে একটু খেয়ে ফেল, পরিশ্রমের পর শরীর সুস্থ হবে'খন,—ঘুম হবে, ক্ষিধে হবে—।"

বিনুদা কহিল,—"সমস্ত দিন পেটে কিছু পড়েনি, ক্ষিধে ত এখনই ভয়ানক—।"

"ক্ষিধে পেয়েছে? আচ্ছা, আনা দুয়েকের কিছু মিষ্টি এনে খাও তোমরা। দাও ত হে মাইতির পো, দু'আনা পয়সা দিয়ে দাও।—তা হ'লে, দলে থাকাই তোমাদের ঠিক ত? মন দিয়ে থাক—দেখবে উন্নতি হয়ে যাবে।"

বিনুদা কহিল—"উন্নতির আশা যখন আছে, তখন এইখেনেই আমরা থাকবো। তা হ'লে এইখান থেকেই ত আমরা বহাল হব, না হেড্ আফিসে লিখতে-টিক্‌তে হবে?"

"কিচ্ছু না; এখানকার চার্জ্জ ত আমার ওপরেই কি না। আমাদের একুশটা দল আছে, একুশ যায়গায় ঘুরছে। সব দলেতেই এক এক জনের ওপর চার্জ্জ থাকে।"

যাহা হউক, বিনুদা উঠিয়া যাইয়া রাস্তার ওদিক্‌কার একখানি দোকান হইতে কচুরীতে ও মিষ্টিতে মিলাইয়া দু'আনার খাবার কিনিয়া আনিল। কিন্তু সমস্ত দিনের পর যে রকম ক্ষুধা পাইয়াছিল, তাহাতে দু'আনার খাবারেই বা কি হইবে—চার আনার খাবারেই বা কি হইবে। তবে, রাত্রির আহারের জন্য ফলাহারের যে আয়োজন দেখিলাম, তাহাতে তখনকার সেই দু'আনাতেই মনকে বুঝাইয়া ভবিষ্যতের আশার অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

বিনুদার পীড়াপীড়িতে সিদ্ধি অবশ্য এক চুমুক খাইতে হইল। বাকী প্রায় একটি গ্লাস সিদ্ধি বিনুদা' চোঁ চোঁ করিয়া শেষ করিয়া শূন্য গ্লাসটি উপুড় করিয়া রাখিল। মোট কথা, আমরা দলভুক্ত হইয়া গেলাম।

ঘণ্টাখানেক পরেই ফলাহারের ব্যবস্থা যাহা হইল, তাহা প্রথম শ্রেণীর না হইলেও তাহার নিন্দা করা চলে না। দই, চিঁড়া, কলা, চিনি এবং তৎসঙ্গে আর একটি দ্রব্য মিশিয়া ফলাহারের যে উপাদেয়ত্ব এবং নূতনত্ব উৎপাদন করিয়াছিল, তাহা নারিকেল-কোরা। সুতরাং মন্দ কি করিয়া বলা যায়?

ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শীর্ণকায় যে লোকটি, তাহার একটি পায়ে প্রকাণ্ড গোদ ছিল। খাইতে বসিয়া সে ছোট্ট একটি শালপাতার ঠোঙ্গা হইতে এক রত্তি ঘি আঙুলে চাঁচিয়া লইয়া ফলাহারের সহিত মাখিয়া লইল। তাহার পাশে যে বসিয়া ছিল, সে বলিয়া উঠিল,—"পাড়ুইয়ের আমাদের ঘিটুকু খাওয়ার কামাই নেই! কিন্তু ফলারের সঙ্গে ঘি, এ বাবা এই নতুন দেখলুম!"

ফলাহার মাখিতে মাখিতে পাড়ুই কহিল—"মূরক্ষ তোমরা, জান্‌বা ক্যাম্‌নে? ঋণং কিরিত্বায়া গ্রেতং পিভেৎ। ত,' কাঁচা খাও, বাতে খাও, ফলারে খাও,—খালেই অইল। গ্রেত না খাবা ত শরীলে কি ছাই তাওৎ পাবা?"

ঘৃত খাইয়া খাইয়া পাড়ুইয়ের শরীরে তাকত্ যাহা হইয়াছিল, তাহা দেখিলে কিন্তু চম্‌কাইয়াই উঠিতে হয়। ঘৃতের লোভে তাহার শরীরের সর্ব্বস্থানের মাংস, হাড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উদরে আসিবার পথে, বোধ হয়, পথ ভুলিয়া সব ওই একটি পায়ে আসিয়া তাহার জমা হইয়াছিল এবং উদরটিও অধিকারীর বিনানুমতিতে সম্মুখের দিকে খুব বেশী রকম অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিল।

আহারান্তে শুইবার আয়োজন হইল। পার্শ্বেই কাহাদের একখানি দরমা দিয়া ঘেরা চালা ছিল, সেইখানেই সারি সারি আট জনের শয্যার ব্যবস্থা হইল। ব্যবস্থা আর কি,—এক এক জন এক একখানি ময়ূর-মার্কা ময়দার থলিয়া পাতিয়া তাহারই উপর নিজেদের সেই গেরুয়ার উত্তরীয়, যাহা গানের সময় সকলের মাথায় উঠিয়াছিল, তাহাই বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। ছোট ছোট বালিস অবশ্য সকলেরই একটা করিয়া ছিল। আমরা একখানিমাত্র থলিয়া পাইলাম। ইন্‌চার্জ্জ কহিল,—"কাল তোমাদের আর একখানা ক'রে থলিয়া দেওয়া হবে, আর চাদর কাপড়ও রং ক'রে দেবার ব্যবস্থা হবে। আজকের রাত্তিরটা ঐতে কোন রকমে দু'জনে কাটিয়ে দাও।"

বিনুদা কহিল,—"আপনারা শোন্—আমরা একটু বাইরে থেকে আসছি।"

"এখন আবার বাইরে কেন? রাত হয়েছে, শুয়ে পড়; আবার ভোরে উঠ্‌তে হবে।"

সেই মাইতির পো কহিল,—"চুরুট্-টুরুট একটু খাবে আর কি। তা, এইখানেই খাও না তোমরা, তাতে কোন দোষ নেই।"

ইনচার্জ্জ কহিল,—"আচ্ছা যাও—যাও, শীগ্‌গির এস।"

কথা কহিতে না পারিয়া আমার পেট ফুলিয়া উঠিতেছিল। বাহিরে আসিয়া বিনুদা'কে কহিলাম,—"তুমি কি বল দেখি? এই বিদেশে এমন এক বিপদে প'ড়লুম, সে সব দুশ্চিন্তা তোমার কিচ্ছু নেই, তুমি কি না—"

"দুশ্চিন্তা ক'রে আর করবি কি? কাছে ত আর পয়সা কড়ি কিছু নেই যে, শ্রীরামপুরের টিকেট ক'রে চ'লে যাব। ছোটটুদার আক্কেলটা একবার দেখ্‌লি ত?"

"তোমার আক্কেলের বা কসুর কি? যা'ক, এখন তা হ'লে কি করবে? একটা কিছু উপায় করতে হবে ত! না, সিদ্ধি খেয়ে, ফলার খেয়ে আর গেরুয়া প'রে গান গেয়ে এই কেষ্ট-গৌরাঙ্গের দলে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে?"

"আরে, আজ এই রাত্রে যেখানে হোক এক যায়গায় শুতে হবে ত? কিছু খেতেও ত হবে। তা,' এ কি মন্দটা আর হোল?"

চালার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে, মাইতির পোর সঙ্গে আর ইন্‌চার্জ্জের সঙ্গে ভয়ানক বকাবকি হইতেছে। ইন্‌চার্জ্জ কহিতেছে,—"কলিতে কি কারোর ভাল কত্তে আছে? খেতে পেতিস্ না, এখানে এনে ঢুকিয়ে দিলুম, এখন আমায় চোখ রাঙ্গাবি বৈ কি! আমি হলুম এ দলের হেড্।—আমি যদি দু'এক টাকা এদিক্ সেদিক্ ক'রে নিই, তাতে তোর চোখ টাটাবে কেন? তাও যে নি, তোদের ভাগ তোদের ষোল আনা দিয়ে, তবে নি। একুশটা ত দল আছে, খবর নিগে যা', কোন্ দলের হেড্ এ কায না করে। এই, তুই যে কৈবর্ত্ত হয়ে বামুনের মেয়েদের সব পায়ের ধুলো দিচ্ছিস্,—তাদের কাছ থেকে পয়সা নিচ্ছিস, তা তার ওপর আমি কোন দিন লোভ করেছি?"

"আমি একলাই এ কায করি, আর কেউ করে না?"

"করুক না। যে যা পারে, উপায় ক'রে নিক্ না, তাতে আর কারো হিংসে করলে চলবে কেন?"

মাইতির পো ইহার পর আর কোন উত্তর করিল না। খানিক পরে সকলেরই নাসিকাধ্বনি হইতে লাগিল।

পরদিন প্রত্যূষে ইন্‌চার্জ্জ বিনুদাকে কহিল,—"আমরা এখনি গান আরম্ভ কোরবো। সকাল সকাল আজ রান্না-বান্না সেরে খেয়ে দেয়ে নিয়ে, ওবেলা সব আজ চ'লে যেতে হবে।"

বিনুদা জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় যাবেন?"

"ত্রিবেণীর মেলায় যেতে হবে। সেখানে ৫।৭ দিন চলবে। তোমাদের কাপড় চাদর সেইখানে গিয়ে সব ছুবিয়ে দোব। এখন তোমরা দু'জনে একটা কায ক'রে রাখ্‌তে পারবে?"

"কি কায?—পারব না কেন?"

"আর কিছু নয়, বাজারটা ক'রে রাখবে" বলিয়া দুইটা টাকা বিনুদার হাতে দিয়া বলিল,—"আট আনার চাল

নেবে, ভাল শোল মাছ কি অন্ত মাছ যা পাও সেরখানেক, আর আলু, পটল, ঝিঙে,—যা পাও। কাঠ দু'আনার, বাতাসা আধ্ সের, পারবে ত ?"

বিমুদা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে পারিবে।

"বাজার-টাজার করা অভ্যেস আছে ত ? দর ক'রে কিনতে পারবে ?"

"খুব পারবো, বাড়ীতে বাজার-হাট ত আমিই করি।"

"বেশ, বেশ" বলিয়া ইন্‌চাজ´ কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে বসিল।

খানিক পরেই শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ সমাজের গান আরম্ভ হইলে, বিমুদা আমাকে টানিয়া বাজার করিতে বাহির হইল এবং বাজারের বদলে বরাবর ষ্টেশনে আসিয়া শ্রীরামপুরের দুইখানি টিকিট কিনিয়া প্লাটফর্ম্মে দণ্ডায়মান ট্রেণের একখানি কামরার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া কহিল,—"খবরদার, গাড়ী থেকে এখন আর নাবিসনি যেন, বেটারা যদি দেখতে পায়, তা হ'লেই আবার—। গাড়ীটা ছাড়বে কখন্, একবার জেনে এলে হ'ত।"

আমি গাড়ীর জানালা দিয়া সেই সময় দেখিতে পাইলাম, ছোটদা প্লাটফর্ম্মের এক ধারে দাঁড়াইয়া চারিদিকে কি যেন খুঁজিতেছে। "ঐ যে ছোটদা" বলিয়া তাড়াতাড়ি নামিতে যাইতেছিলাম, বিমুদা এক হ্যাঁচ্‌কায় বসাইয়া দিয়া কহিল,—"গাড়ী থেকে নামিস নি, এইখান থেকে চেঁচিয়ে ডাক্।"

তাহাই ডাকিলাম। ছোটদা গাড়ীর ভিতর উঠিয়া আসিয়া কহিল,—"আচ্ছা ছেলে ত তোরা! সমস্ত রাত খুঁজে বেড়িয়েছি, কোথায় ছিলি বল ত ?"

আমি কহিলাম,—"আচ্ছা ছেলে আমরা না তুমি, ছোটদা ? রাত দশটা পর্য্যন্ত তোমায় খুঁজে খুঁজে—"

"আচ্ছা, সে সব হবে'খন। দাঁড়া, টিকেট তিনখানা আগে কিনে নিয়ে আসি, গাড়ী ছাড়বার আর দেরী নেই।"

বিমুদা কহিল,—"আমাদের টিকেট কিনেছি ছোটদা, খালি তোমারটা কিনে নিয়ে এস।"

"তোদের টিকেট কিনেছিস্ কি রকম! টাকা দিলে কে ?"

"শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ।"

"শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ ?"

"হ্যাঁ। তুমি টিকিট কিনে নিয়ে এস, সে সব বলব এখন।"

অতঃপর ছোটদা গাড়ী হইতে নামিয়া টিকিট কিনিতে চলিয়া গেল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

প্রসাধন

নীল সাড়ীখানি করিয়া যতন
পরিয়ো ললিত ধাঁজে—
নীল সাগরের ঢেউয়ের মতন
শত লীলায়িত ভাঁজে।
কালো চুলে বেণী বিনায়ে গাঁথিয়া
আধ' খোলা পিঠে দুলাইয়ো প্রিয়া,—
আসব-ভুখারী ভিখারী ভ্রমর
ভোরের গন্ধরাজে!

আয়ত তোমার আঁখির কোণায়
টানিয়ো কাজল-রেখা,—
কাজল-দীঘির তটতলে শ্যাম
লঘু শৈবাল-লেখা।
সিন্দূরে আঁকিয়ো—সীমন্তে সীঁতি,
দূর্ব্বার দলে সাঁঝ-মালতীটি;
ললাটে বিন্দু, শ্বেত ছায়াপথে
লাল তারা দিবে দেখা!

দু'পায়ে বুলায়ো আল্‌তার তুলি
সরু বাকা মৃদু আঁকে,—
স্থল-শতদল দু'টি যেন কেউ
হিজল-তলায় রাখে।
বুকের শ্যাঙলী আঙিয়ার 'পর
হেমহার প'রো দীপ্ত দু'-নর,
পদ্মপাতায় সাজানো কনক-
চাঁপার ফুল দু'-থাকে!

নূপুর তোমার খুলিয়া রাখিয়ো,
আর এক নূপুর আছে,—
প্রেয়সি, তোমার নূপুর বাজে যে
আমার হিয়ার মাঝে।
চুমা-চন্দনে অমল কমল
অবলেপি' দিব—তব করতল;
তুমি শুধু হাসি-কুঙ্কুমরাগ
মুখে মেখো—নত লাজে!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

অষ্টাদশ মহাপুরাণের শ্লোকসংখ্যা

মৎস্য ও নারদপুরাণে শিবপুরাণ স্থলে বায়ুপুরাণকে মহাপুরাণ-মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। কূর্ম্মপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ স্থলে বায়ুপুরাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে বামন ও নারদীয় পুরাণ স্থলে নৃসিংহ ও বায়ুপুরাণ কথিত হইয়াছে। মোটের উপর বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, শিব, বামন, নৃসিংহপুরাণ ভিন্ন ভিন্ন মতে মহাপুরাণ বা উপপুরাণমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। নারদ-পুরাণে সংক্ষেপে অষ্টাদশ মহাপুরাণের প্রতিপাদ্য শ্লোকসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং মৎস্যপুরাণেও শ্লোকসংখ্যা আছে, উহাতে সামান্য ব্যতিক্রম যাহা আছে, তাহা পাঠকবর্গ নিম্নলিখিত মান-চিত্রের (১) দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইহার মধ্যে ১৩খানি মহাপুরাণ নির্ব্বিবাদসিদ্ধ, ৫খানি সবিবাদ এবং ভবিষ্যপুরাণ যাহা বোম্বের মুদ্রিত পাওয়া যায়, উহাতে উক্ত পুরাণের শ্লোকসংখ্যা ১৪ হাজার ৫ শত বা ১৪ হাজারের পরিবর্ত্তে ৫০ হাজারে পরিণত হইয়া বহুতর অবান্তর কথা যুক্ত হইয়াছে, এই বিষয় ঐ পুরাণালোচনা-প্রসঙ্গে বিবৃত করিব এবং অন্যান্য পুরাণগুলিরও নির্দ্দিষ্টসংখ্যক শ্লোক পাওয়া যায় না। যেমন কূর্ম্মপুরাণে ১৭ হাজার শ্লোক আছে, বর্ত্তমানে মুদ্রিত ঐ পুরাণের একমাত্র ব্রাহ্মী-সংহিতাংশ যাহা ৬ হাজার শ্লোকনিবদ্ধ, উহা মুদ্রিত করিয়া সম্পূর্ণ কূর্ম্মপুরাণ নামে প্রচারিত হইয়াছে, উহার ভাগবতী, সৌরী ও বৈষ্ণবী-সংহিতা নামক অংশত্রয় ১১ হাজার শ্লোকাত্মক পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মীসংহিতোক্ত ৬ হাজার শ্লোকও বঙ্গবাসীর মুদ্রিত পুস্তকে নাই, উহার সংখ্যা ৫ হাজার ৪ শত ৮৬ হয়, এইরূপ বহুল উদাহরণ সেই সেই পুরাণপ্রসঙ্গে দেখান হইবে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ পৃথক্ পুরাণ নহে, অষ্টাদশ পুরাণই ব্রহ্মাণ্ড নামে কথিত হয়, ইহা কূর্ম্মপুরাণে বলা হইয়াছে, যথা—'ব্রাহ্মং পুরাণং প্রথমং পাদ্মং বৈষ্ণবমেব চ। শৈবং ভাগবতঞ্চৈব ভবিষ্যং নারদীয়কম্। মার্কণ্ডেয়মথাগ্নেয়ং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ। লিঙ্গং তথা চ বারাহং স্কান্দং বামনমেব চ। কৌর্ম্মং মাৎস্যং গারুড়ঞ্চ বায়বীয়মনুত্তমম্। অষ্টাদশং সমুদ্দিষ্টং ব্রহ্মাণ্ডমিতি সংজ্ঞিতম্ ॥'

অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও তাহার শ্লোকসংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণের মত

মানচিত্র (১)

বরাহ কূর্ম্ম বিষ্ণুপুরাণ মতে	নারদীয় পুরাণ মতে	শ্লোকসংখ্যা	মৎস্য পুরাণ মতে	শ্লোক	লিঙ্গ, অগ্নি, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মতে	শ্লোক	মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে
১ ব্রহ্ম	ব্রহ্ম	১০০০০	ব্রহ্ম	৩০০০০	ব্রহ্ম	২৫০০০	ব্রহ্ম
২। পদ্ম	পদ্ম	৫৫০০০	পদ্ম	৫৫০০০	পদ্ম	১২০০০	পদ্ম
৩। বিষ্ণু	বিষ্ণু	২৩০০০	বিষ্ণু	২৩০০০	বিষ্ণু	২৩০০০	বিষ্ণু
৪। শিব	বায়ু	২৪০০০	বায়ু	২৪০০০	শিব (বায়ু)	২৪০০০	শিব
৫। ভাগবত	ভাগবত	১৮০০০	ভাগবত	১৮০০০	ভাগবত	১৮০০০	ভাগবত
৬। ভবিষ্য	নারদীয়	২৫০০০	নারদ	২৫০০০	নারদীয়	২৫০০০	নারদীয়
৭। নারদীয়	মার্কণ্ডেয়	৯০০০	মার্কণ্ডেয়	৯০০০	মার্কণ্ডেয়	৯০০০	মার্কণ্ডেয়
৮। মার্কণ্ডেয়	অগ্নি	১৫০০০	অগ্নি	১৬০০০	অগ্নি	১২০০০	অগ্নি
৯। অগ্নি	ভবিষ্য	১৪০০০	ভবিষ্য	১৪৫০০	ভবিষ্য	১৪০০০	ভবিষ্য
১০। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত	১৮০০০	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত	১৮০০০	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত	১৮০০০	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত
১১। লিঙ্গ	লিঙ্গ	১১০০০	লিঙ্গ	১১০০০	লিঙ্গ	১১০০০	নৃসিংহ
১২। বরাহ	বরাহ	২৪০০০	বরাহ	২৪০০০	বরাহ	১৪০০০	বরাহ
১৩। স্কন্দ	স্কন্দ	৮১০০০	স্কন্দ	৮১০০০	স্কন্দ	৮৪০০০	স্কন্দ
১৪। বামন	বামন	১০০০০	বামন	১০০০০	বামন	১০০০০	বামন
১৫। কূর্ম্ম	কূর্ম্ম	১৭০০০	কূর্ম্ম	১৮০০০	কূর্ম্ম	৮০০০	কূর্ম্ম
১৬। মৎস্য	মৎস্য	১৪০০০	মৎস্য	১৪০০০	মৎস্য	১৩০০০	মৎস্য
১৭। গরুড়	গরুড়	১৯০০০	গরুড়	১৮০০০	গরুড়	৮০০০	গরুড়
১৮। বায়ু	ব্রহ্মাণ্ড	১২০০০	ব্রহ্মাণ্ড	১২২০০	ব্রহ্মাণ্ড	১২০০০	ব্রহ্মাণ্ড

নারদীয় পুরাণে ১৮খানি মহাপুরাণের একটি বৃহৎ সূচীপত্র আছে, উহা তত্তৎপুরাণ সমালোচনা-প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে এবং উহা হইতে পুরাণের বর্ত্তমান কলেবরেরও বিচার করা অনেকটা সহজসাধ্য হইবে।

(১) সৃষ্টি

উপলভ্যমান পুরাণ সকলের মধ্যে প্রত্যেকটির পঞ্চলক্ষণ বিচার

পুরাণ বলিলেই যে পাঁচটি লক্ষণ পাওয়া যায়, উহার সর্গ বা সৃষ্টি সম্বন্ধে সকল পুরাণে একরূপ নহে। বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ৩য়াধ্যায়ে একরূপ, এমন কি, অবিকৃত, একই শ্লোকে সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে, এই স্থলে সেশ্বর সাংখ্যমত প্রদর্শিত হইয়াছে, "প্রাধানিকী চেশ্বরকারিতা চ" ইহার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা এই কালকেও নিত্য মানা হইয়াছে। ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রকৃতির রজোগুণের আধিক্য সংঘটিত হইলে মহদাদি ক্রমে সৃষ্টি হয়, এই সকল তত্ত্বের নাম কখন কখন নূতন বলা হইয়াছে। ফল কথা, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের সঙ্কল্পমাত্রে প্রকৃতি অষ্টাবস্থা প্রসব করিলেন, অর্থাৎ প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই আট প্রকৃতি হইতে ভূতসৃষ্টি, তাহা হইতে ক্রমশঃ নদ, নদী, গিরি, বর্ষ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে।

লিঙ্গপুরাণের ৩য়াধ্যায়ে বিস্পষ্ট সাংখ্যকারিকোক্ত প্রকৃতির বর্ণন করা হইয়াছে এবং এই স্থানেও সেশ্বর সাংখ্যমতই অভিব্যক্ত, পরন্তু ঈশ্বর শিব, প্রকৃতি শৈবী—তিনিই বিশ্বধাত্রী, শিব কর্ত্তৃক দৃষ্টা হইয়া শৈবী হইয়াছেন, অজ পুরুষাধিষ্ঠিতা শৈবী মহদাদি ক্রমে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

লিঙ্গপুরাণের ৩য়াধ্যায়ে ৩৯শাধ্যায়ে ও সপ্ততিতমাধ্যায়ে বিস্তৃত সৃষ্টির কথা কথিত হইয়াছে, ইহাও সেশ্বর সাংখ্যমত অলিঙ্গ শিব, ইনি গুণহীন গন্ধাদিহীন নিত্য অক্ষয়। লিঙ্গ, শৈব গন্ধাদিযুক্ত ত্রিগুণ ইহার উৎপত্তি অলিঙ্গ হইতে পরে এই লিঙ্গ বা প্রকৃতি সাত আট ও একাদশ ভাবে বিস্তৃত, ইহা দ্বারা ষড় বিংশতিতত্ত্ব বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ৩য়াধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, স্বেচ্ছাময় প্রভু শূন্যময় বিশ্ব দেখিয়া নিজের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ত্রিগুণ আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহার পর ত্রিগুণ হইতে মহান্ অহঙ্কারাদি ক্রমে বিশাল বিশ্বের সৃষ্টি হইল, এই পুরাণের মতে গোলোকধাম নিত্য, তন্মধ্যে নবীননীরদশ্যাম দ্বিভুজ মুরলীধর নিত্য-বিগ্রহ বিষ্ণু বাস করেন, তিনিই প্রাকৃত লয়ের পর প্রাকৃত সৃষ্টি পূর্ব্বোক্তরূপে করেন।

শিবপুরাণের ৫মাধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে মনুক্ত পুরুষ-সৃষ্টির কথাই বলা হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণের ৪৭শাধ্যায়ে জলশায়ী নারায়ণের নাভি-পদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি, নারায়ণ প্রবুদ্ধ হইয়া রসাতলগতা মহীকে উদ্ধার করেন ও পরে পূর্ব্ববৎ সকল সৃষ্ট হইয়াছিল, এইরূপে প্রাকৃত ৩, সৃষ্টির বৈকৃত ৫, কৌমার ১, মিলিত ৯টি সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে।

দেবীভাগবতের ২।৩য়াধ্যায়ে নিত্য পরব্রহ্ম-পরমাত্মার শক্তি বা প্রকৃতি, বহ্নির দাহিকা, চন্দ্রের শোভা, সূর্য্যের প্রভার ন্যায় অভিন্ন, এই মতে আত্মা আকাশ কাল দিক্ বিশ্বগোলক ও গোলক নিত্য পদার্থ; ঐ শক্তিযুক্ত ঈশ্বরকেই ভগবান্ কহে, সেই ভগবান্ স্বেচ্ছাময় সাকার ও নিরাকার, তাঁহাকে যোগিগণ নিরাকার অদৃশ্য ব্রহ্ম বলেন। সেই ভগবতী হইতেই সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে।

মৎস্যপুরাণে ২য়াধ্যায়ে ২৫—৩২ শ্লোকে, মনুসংহিতার ১মাধ্যায়ের ৫—১৩ শ্লোকের প্রতিপাদ্য সৃষ্টিই কথিত হইয়াছে এবং এই শ্লোকগুলি একার্থপ্রতিপাদক এবং একরূপ শব্দেই লেখা, এইরূপ পুরাণের একার্থকতা বা অভিন্ন আনুপূর্ব্বী বহু স্থানেই পরিলক্ষিত হয়। মৎস্যপুরাণেও বেদোক্ত পুরুষসৃষ্টি ক্রমে বিশ্বোৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।

কূর্ম্মের ৪র্থাধ্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণে ১মাংশে দ্বিতীয়াধ্যায়ে যে সৃষ্টিপ্রকরণ কথিত হইয়াছে, উহা প্রায় একরূপ। কূর্ম্ম, গরুড় ও বিষ্ণুপুরাণের বহু শ্লোকে এইরূপ ঐক্য যে, উহা এক শ্লোক বলিলেই হয়, বহু শ্লোক অভিন্নই আছে। এই সৃষ্টিপ্রকরণে বলা হইয়াছে, যিনি রূপাদি নির্দ্দেশবর্জ্জিত পরমাত্মা জন্মাদি ষড় ভাববিকারহীন, যাঁহাকে সৎ মাত্র বলা যায়, যিনি সর্ব্বব্যাপক, সেই এক ব্রহ্ম, তিনিই ব্যক্ত অব্যক্ত পুরুষ ও কালরূপে স্থিত, তাঁহার প্রথম রূপ পুরুষ, দ্বিতীয় তৃতীয় রূপ ব্যক্ত ও অব্যক্ত চতুর্থ রূপ কালব্যক্ত বিষ্ণু, অব্যক্ত প্রধান। পুরুষ ও কালের মধ্যে যাহা পরম, জ্ঞানিগণ উহাই পরমপদরূপে অবলোকন করেন। ঐ অব্যক্ত বা প্রধান নিত্য, শব্দস্পর্শাদিহীন, ত্রিগুণ ও জগদ্যোনি। প্রলয়ের পর তাহা দ্বারাই সমস্ত ব্যাপ্ত ছিল, বেদবিদ্গণ উহাকেই প্রধান পদে অভিহিত করেন, সেই সময়ে দিন, রাত্রি, আকাশ, ভূমি, জ্যোতিঃ ছিল না। কেবল প্রধান ব্রহ্ম এবং পুরুষমাত্র ছিলেন, প্রধান ও পুরুষ এই দুই রূপ বিষ্ণু হইতে ভিন্ন এবং সৃষ্টিসময়ে যাহা দ্বারা সংযোজিত ও প্রলয়ে বিযোজিত হয়, উহার নাম কাল; মহাপ্রলয়কালে ব্যক্ত বিশ্ব প্রকৃতিতে লীন থাকে। কাল অনাদি অনন্ত, সেই জন্য সৃষ্টি, স্থিতি, লয় উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ প্রবাহরূপে যথাক্রমে হয়। প্রলয়ে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা ঘটে এবং পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত হয়েন, পরে সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে পরব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর পরিণামী ও অপরিণামী প্রকৃতি ও পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে ক্ষোভিত অর্থাৎ সৃষ্টির জন্য উন্মুখ করেন, কিন্তু ইহাতে তাহার কোন ক্রিয়াবত্তা নাই। যেমন গন্ধ নিকটবর্ত্তী হইলে মনের চঞ্চলতা জন্মে, পরমেশ্বরের এই ক্ষোভজনকতাও তদ্রূপ।

সেই পুরুষোত্তমই সঙ্কোচ-বিকাশ দ্বারা ক্ষোভ্য ও ক্ষোভক, তিনিই প্রধানরূপে স্থিত। পরে পুরুষাধিষ্ঠিত সেই সাম্যাবস্থা-প্রাপ্ত গুণত্রয় হইতে মহদাদি ক্রমে সৃষ্টি হয়। বীজ যেমন ত্বক্ দ্বারা আবৃত, মহত্তত্ত্বও সেইরূপ প্রকৃতি দ্বারা আবৃত থাকে। পরে মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারাদি ক্রমে বৈকারিক সৃষ্টি আরম্ভ হয়, এই সৃষ্টি নয় প্রকার। গরুড়পুরাণে ও ভাগবতে এইরূপ সৃষ্টির কথা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, শ্লোকও প্রায় একরূপ। কূর্ম্ম ও বিষ্ণুপুরাণে বহু শ্লোক অভিন্ন।

সৃষ্টি সম্বন্ধে পুরাণের নূতন দার্শনিকতা

ব্রহ্ম, পদ্ম ও অগ্নিপুরাণেও সেশ্বর সাংখ্যমতই বলা হইয়াছে। সকল পুরাণেই যে সৃষ্টির কথা আছে, উহাতে পুরাণের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইয়াছে। ঠিক আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ বা মায়াবাদ—কোন মতই পুরাণে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, অথচ আরম্ভবাদের কাল আত্মা, দিক্ ও আকাশকে নিত্য বলা হইয়াছে এবং সেইরূপ ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতিও বলা হইয়াছে, আবার পরিণামবাদের মতই প্রকৃতি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সৃষ্টির কথাও আছে এবং মায়াবাদের মতও জগতের অসত্যতা বলা হইয়াছে। এই প্রধানতঃ দার্শনিক ত্রিবিধ মতের সামঞ্জস্যরূপে পুরাণ সকলে একটি নূতন দার্শনিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই মতকে ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব বলা হয়, ইহা বিষ্ণুপুরাণে সূত্রিত ও ভাগবতে বিস্তৃত হইয়াছে। কূর্ম্ম ও বিষ্ণুপুরাণের মত সৃষ্টিপ্রকার অন্য পুরাণে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয় নাই। দেবীভাগবতের মতও উহারই বিশ্লেষণ মাত্র। ফল কথা, ঐতিহ্য বা পৌরাণিক দর্শন নামে পুরাণের দার্শনিকাংশ স্থান পাইবার যোগ্য। অধিকাংশ পুরাণেই প্রথম ভাগে এই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

অনেকে পুরাণের পঞ্চলক্ষণাতিরিক্ত বিষয়গুলিকে অতিরিক্ত মনে করিয়া উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলেন এবং একজাতীয় প্রশ্নের উত্তরে অপর কথা বলিতে দেখিয়াও তাদৃশ সন্দেহই দৃঢ়ীভূত হয়, কিন্তু ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে এ সন্দেহ থাকে না। যেমন মনুসংহিতায় প্রথমে ঋষিগণ ধর্ম্ম কি, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তরে "আসীদিদম্ তমোভূতম্" ইত্যাদি শ্লোকে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে, আপাত-দৃষ্টিতে সত্য সত্যই ইহা অসঙ্গতাভিধান মনে হয়, মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজ বলেন, এই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অপ্রকৃতাভিধান হইলেও জগতের নশ্বরত্ব-প্রদর্শন দ্বারা মহাপ্রয়োজন সাধিত হইয়াছে। কুল্লুকভট্ট বলেন যে, এই উত্তর সমীচীন নহে; কারণ, ধর্ম্মের স্বরূপ প্রশ্নে ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলকীর্ত্তন সঙ্গত নহে। পরন্তু মনূক্ত দশবিধ ধর্ম্মমধ্যে বিদ্যাশব্দবাচ্য আত্মজ্ঞানও ধর্ম্মপদবাচ্য, সুতরাং মুনিদিগের ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নে জগৎকারণরূপে ব্রহ্মপ্রতিপাদন অপ্রস্তুতাভিধান নহে। মহাভারতেও আত্মজ্ঞানকে ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। পুরাণ-সকলেও সেইরূপ মীমাংসা হয়। ঐরূপ সন্দেহের স্থল বহু বলিয়া এ স্থানে মীমাংসার প্রকার পরিদর্শিত হইল না। দেবীভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের ৩২শাধ্যায়ে বিস্পষ্ট বৈদান্তিক সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণিত আছে।

(২) প্রতিসর্গ

প্রতিসর্গ বা প্রলয়—এই প্রলয় ও সৃষ্টির মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প। প্রলয়ের পর সৃষ্টি, সৃষ্টির পর প্রলয়। যাহার আকৃতি—রূপ আছে, উহারই ধ্বংস আছে, সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মে যখন এই ধ্বংস আরম্ভ হইয়া চরমে পৌঁছায়, উহাকে প্রতিসর্গ বা প্রলয় বলে। প্রলয়ের অবস্থা অন্ধকার, এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে তমোময় ছিল, কিছু জানা যাইত না। ইহা প্রলয়ের স্বরূপ, কিরূপে এমন বিচিত্র জগৎ তাদৃশ অন্ধতমসাচ্ছন্নরূপে পর্য্যবসিত হয়, তাহা পুরাণে দেখান হইয়াছে, ঐ প্রদর্শিত প্রণালীর নাম প্রতিসর্গ, উহা পুরাণের একটি স্বরূপনির্ব্বাহক অঙ্গ।

প্রতিসর্গ, প্রতিসন্ধি, প্রতিসঞ্চর, প্রলয়, মহাপ্রলয় ইত্যাদি পর্য্যায়শব্দ। প্রতিসর্গ চারি প্রকার;—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক। পুরাণশাস্ত্রে এই চারি প্রকার প্রতিসর্গ কথিত হইয়াছে।

প্রতিদিন যে ভূতক্ষয় পরিদৃষ্ট হয়, ইহার নাম নিত্য প্রতিসঞ্চর অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায় লয়ের নাম নিত্যপ্রলয়।

বিষ্ণুপুরাণে—এই প্রলয়টির কথার উল্লেখ নাই, তথায় নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক প্রলয়ের কথা আছে।

নৈমিত্তিক প্রলয়—চতুর্যুগসহস্রাবসানে শতবর্ষকাল ভীষণ অনাবৃষ্টি হইবে। ঐ সময়ে সূর্য্যের সপ্তরশ্মি দ্বারা নিখিল জলরাশি শোষিত হইলে সূর্য্যরশ্মি দ্বারা ভূর্ভুবঃ স্বঃ জন মহঃ লোক দগ্ধ হইবে, তাহার পর ঈশ্বর-প্রেরণায় মেঘ সকল আকাশ আচ্ছন্ন করিবে ও শতবর্ষ পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়া সমস্ত একার্ণব হইবে, এমন কি, সপ্তর্ষিস্থান পর্য্যন্ত ঐ জলরাশি প্লাবিত করিলে, অনন্ত-শয্যায় ভগবান্ নারায়ণ যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হন, পুনরায় ব্রহ্মলোকবাসী মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক ধ্যাত হইয়া প্রবুদ্ধ হয়েন, তখনই পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ হয়, এই সময়ের নাম নৈমিত্তিক প্রলয়।

প্রাকৃতিক প্রলয়—অনাবৃষ্টি ও অগ্নিসম্পর্কে নিখিল লোক (ভূর্ভুবাদি সপ্তলোক) সপ্তপাতাল ভগবদিচ্ছায় দগ্ধ হইলে, পৃথিবীর গন্ধ জল গ্রাস করে, তখন পৃথিবী জলে লীন হয়, অর্থাৎ পৃথিবীর প্রলয় জলে হয়, পৃথিবী জলস্বরূপা হয়েন। এইরূপে জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ শব্দ সহ অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে, মহান্ প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপে নিখিল ব্যক্তপদার্থ অব্যক্তে লীন হইয়া যায়, ঐ অব্যক্ত প্রকৃতি পুরুষে এবং পুরুষ নারায়ণে লীন হয়, ইহার নাম প্রাকৃতিক লয়।

আত্যন্তিক প্রলয়—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ তাপ জানিয়া যে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেই আত্যন্তিক লয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ সংসারের দুঃখময়ত্ব নশ্বরত্ব জ্ঞানের দ্বারা বৈরাগ্যাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া ভক্তিমার্গে, যোগমার্গে বা জ্ঞানমার্গে মোক্ষলাভের নাম আত্যন্তিক প্রলয়; সুতরাং এই প্রলয়ের উপযোগী অংশ কিরূপ বৃহৎ, তাহা পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারেন। এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য তীর্থমাহাত্ম্য, ব্রত, নিয়ম প্রভৃতি সকলই ইহার অংশভূত হইলেও অপ্রস্তুতাভিধান হয় না। যাহারা পুরাণের বহিরঙ্গ-সমালোচক, তাহারা একটুক্ ধীর পর্য্যালোচনার অধিকারী বলিয়াও মনে হয় না, তাহা হইলে এই সকল অংশকে তাহারা পুরাণের অঙ্গ নহে, এই কথা বলিতে সাহসী হইত না।

ষট্‌সন্দর্ভে জীব গোস্বামী বলেন, প্রতিসর্গ পুরাষানুগৃহীত তত্ত্ব হইতে বাসনাময় সৃষ্টির নামই বিসর্গ বা প্রতিসর্গ; যেমন বীজ হইতে বীজের উৎপত্তি।

বীরমিত্রোদয়ে কথিত হইয়াছে, প্রতিসর্গঃ সংহারঃ। আমাদের মনে হয়, তত্ত্বসৃষ্টির পর ভৌতিক সৃষ্টিপরম্পরায় সৃষ্টির পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তির পর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। ঐ বিশেষ সৃষ্টি হইতে ধ্বংস পর্য্যন্তই প্রতিসর্গ।

(৩) বংশ

প্রাচীন বংশাবলী। এই প্রাচীন বংশ রাজাদেরই দেখা যায় এবং ঐ রাজগণের সংস্রবে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদেরও বংশ পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় (রাজা) ও ক্ষত্রিয়-(রাজ) সম্বন্ধ ব্রাহ্মণগণের বংশপরম্পরার নামই বংশ। এই বংশ ভারত-যুদ্ধের পর ১ শত বৎসর পর্য্যন্তও বেশ পাওয়া যায়, তৎপরে যাহা পাওয়া যায়, উহা অতি সংক্ষিপ্ত এবং সম্পূর্ণ বুঝাও যায় না। পূর্ব্বকার এই বংশধারামধ্যেও প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দুই ভাগ আছে। চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, সংজ্ঞা, শিব, পার্ব্বতী, ইলা, গঙ্গা, ভীষ্ম প্রভৃতি অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত, ইহাদের কথাও তত্তৎস্থলে আলোচিত হইবে।

পূর্ব্বতন রাজন্যগণের বংশাবলী বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্ম, মৎস্য, বিষ্ণু, পদ্ম, অগ্নি, লিঙ্গ, কূর্ম্ম, শিব, মার্কণ্ডেয়, ভাগবত, গরুড়-পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশে পাওয়া যায়। বামন, বরাহ, নারদীয়, স্কন্দ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও ভবিষ্যপুরাণে ঐ বংশাবলী পাওয়া যায় না।

বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—সুসঙ্গত ও উত্তমরূপ বংশাবলী আছে। বোধ হয়, ঐ দুই পুরাণ পূর্ব্বে একই ছিল; কারণ, বর্ত্তমানে যে উহাদের ভিন্ন কলেবর দেখা যায়, তাহাতে উহাদের অধিকাংশ অধ্যায় ও শ্লোক অবিকৃত ও একই আছে। কূর্ম্মপুরাণে বায়বীয় ব্রহ্মাণ্ড বলা হইয়াছে। গরুড়পুরাণ ব্যতীত কোন পুরাণে বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পৃথক্ পুরাণদ্বয়ের উল্লেখ নাই। অষ্টাদশ পুরাণ-গণনায় কেহ বায়ু কেহ বা ব্রহ্মাণ্ড বলিয়াছেন। বায়ুপুরাণ এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে উত্তমরূপে মুদ্রিত হইয়াছে, ব্রহ্মাণ্ডের মুদ্রণ নিকৃষ্ট, উভয়ের বর্ণিত বিষয়ও প্রায় একরূপ, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের কিয়দংশ লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কারণ, উহাতে আনববংশের শেষাংশ ও পৌরববংশ সমগ্র নাই, কিন্তু বায়ুপুরাণে আছে।

ব্রহ্মপুরাণ ও হরিবংশ—একরূপ, উভয়ের প্রদত্ত বংশাবলীরও মিল আছে। তন্মধ্যে হরিবংশই উৎকৃষ্ট; কারণ, ব্রহ্মপুরাণেরও বোধ হয়, ব্রহ্মাণ্ডবৎ কিয়দংশ লুপ্ত হইয়াছে; উহাতে উত্তর-পাঞ্চালের রাজবংশ ও চেদি-মগধবংশের কথা পাওয়া যায় না। এই পুরাণদ্বয়েরও পূর্ব্বোক্ত পুরাণদ্বয়ের ন্যায় কচিৎ কোথায় সামান্যমাত্র প্রভেদ আছে।

মৎস্য—ইহার প্রদত্ত তালিকা তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন (১) মনু ঐক্ষ্বাক শার্য্যাত ইত্যাদি বংশ। (২) ঐলবংশ যযাতি পর্য্যন্ত। (৩) যাদব পৌরব প্রভৃতি ৫টি ঐলবংশ। ইহার মধ্যে ৩য় বংশতালিকা বায়ুপুরাণের অনুরূপ, পরন্তু ঐ অংশের বর্ণনা মৎস্যপুরাণে ভিন্নরূপ হইলেও বায়ুর সহিত বহু মিল আছে। প্রথম দুই ভাগ বায়ুপুরাণ হইতে বিভিন্ন হইলেও প্রথমাংশে মিল আছে এবং মৎস্যপুরাণ-প্রদত্ত বংশতালিকার বিষয় মূল্যবান্।

পদ্ম—এইপুরাণের ৫ম খণ্ডোক্ত বংশতালিকা মৎস্যপুরাণের ন্যায়, এমন কি, প্রায় মিলিয়া যায়।

বিষ্ণু—ইহার ৪র্থাংশে গদ্যে বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে, উহার কিয়দংশ বায়ুর ও কিয়দংশ হরিবংশের সহিত মিলিয়া যায়। তন্মধ্যে ঐক্ষ্বাকবংশ বায়ুবৎ, যাদববংশ হরিবংশবৎ। পার্জ্জিটার বলেন, বিষ্ণুপুরাণে বৌদ্ধধর্ম্মের কথা থাকায় মনে হয়, ঐ পুরাণ খৃষ্টীয় ৫ শতাব্দীতে যখন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হয়, তখন লেখা হইয়াছে। (তৎকৃত গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠা) আমাদের মনে হয়, পার্জ্জিটারের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমপরিপূর্ণ, কারণ, গৌতম-বুদ্ধের পূর্ব্বেও বৌদ্ধ মত ছিল, ইহা তাঁহাদের গ্রন্থদ্বারাই সুপ্রমাণিত হইয়াছে এবং রামায়ণে ও মহাভারতে বৌদ্ধমতের কথা পাওয়া যায়, সুতরাং ৫ম শতাব্দীর মনে না করিয়া খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫ম শতাব্দীরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করিবার বহু কারণ বিদ্যমান আছে।

গরুড়, অগ্নি ও ভাগবতে—প্রায় একরূপ বংশাবলী। গরুড় ও ভাগবতে ঐক্ষ্বাকবংশ বায়ুপুরাণবৎ, অগ্নি মৎস্যবৎ। গরুড়ে ও ভাগবতে ঠিক যেন বিষ্ণুপুরাণকে সম্মুখে রাখিয়া বংশাবলী লিখিত হইয়াছে, এইরূপ বোধ হয়। অগ্নিপুরাণে কাশী ও কান্যকুব্জের বংশ অন্যরূপ আছে। ভাগবতে সম্পূর্ণ উত্তম-প্রণালীতে বংশ লেখা থাকায় উহার মূল্য আছে। পূর্ব্বতন ঘটনাবলীর পুনরুল্লেখ আছে।

লিঙ্গপুরাণে—বায়ুর ন্যায় বংশাবলী, মৎস্যের মতও আছে।

কূর্ম্মপুরাণে—প্রায় মৎস্যবৎ, কিঞ্চিৎ বায়ুবৎ। যৌবনাশ্বের সমসাময়িক যে গৌতমকে বলা হইয়াছে, উহা ভুল, এইরূপ কথা পার্জ্জিটার মনে করেন। আমরা দেখাইয়াছি, ঋষিগণ যোগ-বলে দীর্ঘজীবন লাভ করেন, সুতরাং তাঁহাদের ঐরূপ দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকা অনার্য্যজাতির অবিশ্বাস্য হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

শিবপুরাণে—মনু, ঐক্ষ্বাক ও শার্য্যাত বংশ মাত্র আছে। উহা হরিবংশের ন্যায়।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে—মনুর বংশ ও কিছু বৈশাল-বংশের পূর্ব্বাংশ মাত্র আছে। উহারও অন্য পুরাণের সহিত মিল নাই। পরন্তু মিলিত বংশাবলীই গ্রাহ্য।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—যুবনাশ্বের স্ত্রী ও মান্ধাতার মাতা গৌরী এই কথা বলা হইয়াছে। শিব, ব্রহ্ম ও হরিবংশে গৌরী মান্ধাতার পিতামহী বলা হইয়াছে। পরন্তু হরিবংশে পরিশেষে পৌরববংশীয় মতিনারের কন্যা গৌরীকে মান্ধাতার মাতা বলা হইয়াছে—

'যুবনাশ্বঃ সুতস্তস্য ত্রিষু লোকেষ্বতিদ্যুতিঃ।
অত্যন্তধার্ম্মিকা গৌরী তস্য (যুবনাশ্বস্য) পত্নী পতিব্রতা ॥'

বায়ু ৮৮ অধ্যায় ৬৫ শ্লোক।

ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ুপুরাণেই এই কথা পাওয়া যায়।

বায়ুপুরাণের কোন কোন পুস্তকে অত্যন্তধার্ম্মিকা স্থলে 'অতিমানাত্মজা' আছে, উহাও লিপিকরপ্রমাদে 'মতিনারাত্মজা'র স্থলে বিকৃত হইয়া অতিমানাত্মজা হইয়াছে।

প্রধানতঃ সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ, তন্মধ্যেও সূর্য্যবংশীয় রাজা সুদ্যুম্ন হইতেই চন্দ্রবংশও প্রবর্ত্তিত।

সূর্য্যবংশ সম্বন্ধে রামায়ণে রাম-বিবাহসময়ে বশিষ্ঠোক্ত একটি তালিকা আছে, উহা অসম্পূর্ণ; কারণ, ১৩খানি পুরাণে রাম পর্য্যন্ত ৬৩ জন রাজা কথিত হইয়াছেন। কিন্তু রামায়ণে মাত্র ৩৫ জনের নাম দেওয়া হইয়াছে, কালিদাসও রঘুবংশে অন্য পুরাণের মতই গ্রহণ করিয়াছেন। পুরুকুৎস, ত্রসদস্যু, হরিশ্চন্দ্র, রোহিতাশ্ব, ঋতুপর্ণ, অশ্মক প্রভৃতির নাম রামায়ণে নাই।

অম্বরীষ নাভাগের পুত্র, রামায়ণে নাভাগের পিতামহ অম্বরীষ, রামায়ণে দীলিপ ১ জন, পুরাণমতে ২ জন। পুরাণ মহাভারত রঘুবংশ সকলেই রামায়ণের বিরুদ্ধার্থ বলিয়াছেন। এই সকল দৃষ্টে মনে হয়, রামায়ণে রামচরিত্র-বর্ণনই লক্ষীভূত, সূর্য্যবংশ-বর্ণন অভিপ্রেত নহে, এবং বশিষ্ঠোক্ত বংশেও বিবাহ-সভায় পূর্ব্বের কয়েক জন বলিয়া পরের কিছু বলা হইয়াছে মাত্র, এ স্থানে সম্পূর্ণ তালিকা দিবার স্থানও নয়, ঋষি প্রদানও করেন নাই। সেই বংশতালিকা দেখিলেই বুঝা যায় যে, সংক্ষেপে কতিপয় নাম মাত্র বলা হইয়াছে। পূর্ণ তালিকা বলা হয় নাই।

কান্যকুব্জের রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ অমাবসু। মহাভারতে ও অগ্নিপুরাণে প্রদত্ত তালিকায় অজমীঢ়ের পুত্র জহ্নু। জহ্নুর অধস্তন ৮ম পুরুষ বিশ্বামিত্র এবং বিশ্বামিত্রের ১৫শ উর্দ্ধতত ভরত বিশ্বামিত্রের দৌহিত্র, এই ঘটনা অসম্ভব। ইহা দৃষ্টে মনে হয় জহ্নু নামক রাজা একাধিক ছিলেন।

কাশীর রাজবংশ সম্বন্ধেও দুই মত। ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু, ব্রহ্ম, হরিবংশ, বিষ্ণু, গরুড়, ভাগবতে একরূপ। অগ্নিপুরাণে অন্যরূপ। পাণ্ডবদের সময়ে কাশীরাজ সুবাহু—অভিভূ।

বংশাবলী বিশ্বাসযোগ্য কেন?

১। এই সকল বংশতালিকা পরস্পরবিসংবাদিনী হইলেও বিশ্বাস্য। কারণ, ঋগ্বেদের ঋকে উত্তর-পাঞ্চালের রাজগণের নাম পাওয়া যায়।

২। অন্যান্য গ্রন্থ দ্বারাও উহা প্রমাণিত হয়। যেমন রঘুবংশাদিতে রামায়ণ-মত উপেক্ষা করিয়া পৌরাণিক মতের অনুসরণ করা হইয়াছে। সুতরাং পুরাণের প্রদত্ত তালিকা প্রামাণিক বুঝিতে হইবে।

৩। ভুল বংশাবলীর দ্বারাও ঐ তালিকা সত্য প্রমাণিত হয়। তংসু ও দুষ্মন্তের মধ্যের নাম পাওয়া যায় না।

ক্ষত্রিয় রাজাদের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগের বংশাবলী না থাকিলেও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ক্ষত্রিয়সংসৃষ্ট ব্রাহ্মণদের বংশাবলী আছে।

ষট্ সন্দর্ভে—ব্রহ্মপ্রসূত রাজগণের ত্রৈকালিক পুরুষপরম্পরার নাম বংশ।

"রাজ্ঞাং ব্রহ্মপ্রসূতানাং বংশস্ত্রৈকালিকোঽন্বয়ঃ।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন (কাশীরাজ—সভাপণ্ডিত)।

মরুর প্রেম

আমি অস্থির-তম উন্মাদ সম
বিশ্বের দ্বারে দ্বারে—
প্রেমের লাগিয়া প্রেমের ভিখারী
ফিরিয়াছি বারে বারে।

আলোকোৎসবে রূপ-সভাতলে
সুর-তটিনীর পুলিন-উপলে,
যেথা বাজে গীতি প্রেম কল্লোলে,
নির্ঝর ঝর ধারে ;—

সেথা হ'তে ফিরে ধরণীর তীরে
প্রেম-মরীচির মায়াতট ঘিরে
বহি নিরাশার শত ব্যথা শিরে
বিফলে ঘুরেছি হা—রে—
অস্থিরতম উন্মাদ সম
বিশ্বের দ্বারে দ্বারে!

এত উপেক্ষা—এত অনাদর
কে বল সহিতে পারে?
ক্ষুব্ধ প্রেমের দেবতা আমার
গুমরিছে হাহাকারে!

তাই জ্বালিয়াছি উন্মদ দুখে
বহ্নির জ্বালা দীর্ণ এ বুকে,
দগ্ধ নিশ্বাস ছুটে শিখামুখে
মরণ—অন্ধকারে—

সে কি সুন্দর জ্বালা-মরীচিকা
সে কি মনোরম রূপ-বিভীষিকা,
নিভে যায় আলো, ম্লান নীহারিকা
সে রূপের পারাবারে!

সে জ্বালার কূলে তাই দেবতার
রচেছি প্রেমের অর্ঘ্যোপহার
ব্যথা-ভরা সুখ দিই উপহার
চরণেতে ভারে ভারে,—
ক্ষুব্ধ প্রেমের দেবতা যে মোর
গুমরিছে হাহাকারে!

আজি আমি ভীমা খড়্গহস্তা
রুধির-লোলুপা ছিন্নমস্তা—
আত্ম-বলিতে নহিক ত্রস্তা
আরাধিতে দেবতারে—
প্রেমের লাগিয়া প্রেমের ভিখারী
ফিরেছি যে দ্বারে দ্বারে।

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল (বি, এ)।

মরু-সমুদ্রে

আফ্রিকার বিরাট্ সাহারা মরুভূমি এবং ভীষণ-প্রকৃতি হিংস্রশ্বাপদ-সঙ্কুল দুর্ভেদ্য অরণ্যানীর মধ্য দিয়া প্রতীচ্য জাতি নানাবিধ আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষায় যাত্রা করিতে ভীত হয় না। কিছু দিন পূর্ব্বে সিট্রোন মধ্য-আফ্রিকা অভিযান সম্প্রদায় মোটরযোগে দুস্তর সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করিয়াছিলেন—আলজিরিয়া হইতে মাদাগাস্কার পর্য্যন্ত ১৫ হাজার মাইল পথ পরিভ্রমণ করিয়া ছিলেন। "মাসিক বসুমতীর" পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এই বিচিত্র পর্য্যটন-কাহিনীর সারাংশ সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

জর্জ্জেস্ মারী হার্ড এই অভিযানে নেতৃত্ব করিয়া ছিলেন।

বেনি আবেসের মরু-উদ্যান

সাহারার মরুভূমি-মধ্যে যাত্রিদল

এম্, লুই আহূঁই ডুব্রেল, মেজর এ, বেটেম্বার্গ, এম্, লিয়েঁা পোরের, এম্ জর্জ্জেস্ স্পেট্, আলেকজান্দার জ্যাকো ভ্লেপ, ডাক্তার ইউজিন্ ব্যারোমিয়ার, চার্লস্ ক্রল প্রভৃতি নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার সহযাত্রী হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে মোটর-গাড়ীর কল-কব্জা অচল হইলে, উহা মেরামত করিবার জন্য ৯ জন অভিজ্ঞ মিস্ত্রীও তাঁহারা সঙ্গে লইয়াছিলেন। সিট্রোন্ মোটর-গাড়ীগুলি ৮ হইতে ১০ ঘোড়ার শক্তি-বিশিষ্ট ছিল। পথিমধ্যে ভ্রমণের উপযোগী দ্রব্যসম্ভার বহনের জন্য

তুয়ারেগ সর্দ্দার

প্রত্যেক মোটর-গাড়ীর সঙ্গে একখানি করিয়া 'ট্রেলার' ছিল। প্রত্যেক গাড়ীতেই অতিরিক্ত জল, গ্যাস ও তৈলপূর্ণ আধার সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৫ হাজার মাইল অতিক্রম করিতে তাঁহাদের ৯ মাস সময় লাগিয়াছিল।

যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ফ্রান্স হইতে অভিযান-কারীরা তাঁহাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য পূর্ব্বাহ্নে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যাত্রার পূর্ব্বে প্রায় ২২ শত মণ খাদ্যদ্রব্য তাঁহারা স্থানে স্থানে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মরুভূমির নারী

বেনি আবেসের বংশীবাদক

অতিক্রম করার পর অভিযান-কারীরা কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। নভেম্বর মাসে তাঁহারা মরুভূমির যে স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার নাম ট্যানেজ রুফট। এই স্থান সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। ইহার পর মরুভূমির যে অংশে তাঁহারা উপনীত হন, তাহার মত দুস্তর মরুভূমি তাঁহারা পূর্ব্বে দেখেন নাই, এখানে কোন কিছুই পাইবার উপায় নাই। বিন্দুমাত্র জল নাই, সামান্য তৃণ অথবা জীবিত কোনও পদার্থের আভাস পর্য্যন্ত নাই—শুধু সীমাহীন মরু-সমুদ্র। ওয়ালেন হইতে টেসালিট্ পর্য্যন্ত ৩ শত ৩০ মাইলের মধ্যে এক বিন্দু জলের দেখা তাঁহারা পান নাই

অবগুণ্ঠনাবৃত তুয়ারেগ

অভিযান-কারীরা কোলম্ বেচার (আল জিরিয়ার অন্তর্গত একটি নগর) হইতে যাত্রা করেন। তাঁহারা যে পথে মরু-সমুদ্র ও অরণ্যানী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, পূর্ব্বে কোনও পর্য্যটক তাহার অনেক স্থানে গমন করিতে পারেন নাই।

চাদহ্রদের নর্ত্তকী

সাহারা মরুভূমির মধ্য দিয়া বুরেম পর্য্যন্ত (নীলনদের তীরবর্ত্তী স্থান) যাত্রাপথে তাঁহারা প্রথম যাত্রী নহেন। ১৯২২।২৩ খৃষ্টাব্দে—"সিট্রোন ক্যাটারপিলার ট্রাক্টর" অভিযানকারী দল টুগার্ট হইতে টিম্বাক্টো পর্য্যন্ত মোটরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ২ হাজার মাইল পথ ২০ দিনে অতিক্রম করেন।

পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করা সাধারণ ব্যাপার নহে। বেনি আবেস্ মরু-উদ্যান

সুলতান বাম্মোর বেগমবৃন্দ

ফরাসী সুদানের নারী

নিয়ামের অশ্বারোহী যোদ্ধা

এই ভীষণ মরু-সমুদ্রের অর্থাৎ ওয়ালেন হইতে ৫০ মাইল দূরে তাঁহারা কয়েক জন মরুযাত্রীর কঙ্কাল দেখিতে পাইয়াছিলেন। বালুকারাশির উপর অস্থিগুলি বিক্ষিপ্ত ছিল। জলাভাবে হতভাগ্যগণ এইখানে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহারা সুদান হইতে মরুপথে যাত্রা করিয়াছিল এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে জল পাইবে মনে করিয়া পথিভ্রান্ত হইয়া এইখানে দেহ রক্ষা করিয়াছিল।

আরবগণ বলিয়া থাকে, মরুভূমিমধ্যে তৃষ্ণায়

পোষা অষ্ট্রীচ পক্ষী

মরু-সমুদ্রের রণতরী

প্রাণবিয়োগের মত যন্ত্রণাপ্রদ মৃত্যু আর কিছুই নাই। যন্ত্রণার আতিশয্যে সমস্ত দেহের রক্ত শুষ্ক হইয়া যায়। তখন শরীরের আচ্ছাদন-বস্ত্র অসহনীয় হইয়া উঠে। তৃষ্ণার্ত্ত

নিয়ামের সর্দ্দার

মরুযাত্রী তখন গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া অনলবর্ষী সূর্য্য-তাপে অধিকতর যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।

মরুভূমির অধিবাসীরা তৃষ্ণাপীড়িত ব্যক্তির শুশ্রূষায় প্রথমে পানীয় জল প্রদান করে না। কারণ, তাহা হইলে তখনই সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইবে। প্রথমতঃ রোগীর অধরোষ্ঠ তাহারা সিক্ত করিয়া দেয়। তার পর আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা তাহার শরীর মার্জ্জিত করে, ধীরে ধীরে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া তাহাকে স্নান করাইয়া দেয়। তার পর সামান্য পরিমাণ দুগ্ধ

নাইগারের বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী

তাহাকে পান করায়, অবশেষে এক ঢোক জল পান করিতে দেয়। মরুভূমিতে যাহারা তৃষ্ণা-পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে, তাহারা কখনও কখনও কিছু দিন ধরিয়া জড়ভরতের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহাদের মানসিক শক্তিও আচ্ছন্ন হইয়া থাকে।

অভিযানকারীরা লিখিয়াছেন, পাঁচ দিন মরুভূমির মধ্যে যাত্রা করিবার পর মরু-সমুদ্রের বিরাট্ নীরবতায় সকলেই অল্পাধিক-পরিমাণে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নানা বিষয়ে অসুবিধাও তাঁহাদিগকে সহ্য করিতে হইতেছিল।

মোটর-গাড়ীর চাকা বালুকারাশির মধ্যে ডুবিয়া যাওয়ার ফলে গ্যাসোলিনের ব্যয়ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সূর্য্যালোকের প্রচণ্ড তীব্রতায় নয়ন ধাঁধিয়া যাইতেছিল, অসহ্য উত্তাপের ভীষণতা এবং গ্যাসোলিনের উগ্রগন্ধ যাত্রীদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল, তাঁহাদের মনে আশঙ্কা জন্মিল, টৈসালিটে পৌঁছিবার পূর্ব্বে পাছে জল ও গ্যাস ফুরাইয়া যায়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা দূরে তখন মরু-উদ্যানের তরঙ্গায়িত শোভা দেখিতে পাইলেন। জল ও গ্যাস ফুরাইবার বহু পূর্ব্বেই তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলেন।

টাসাও প্রাসাদে সুলতান বাম্বো
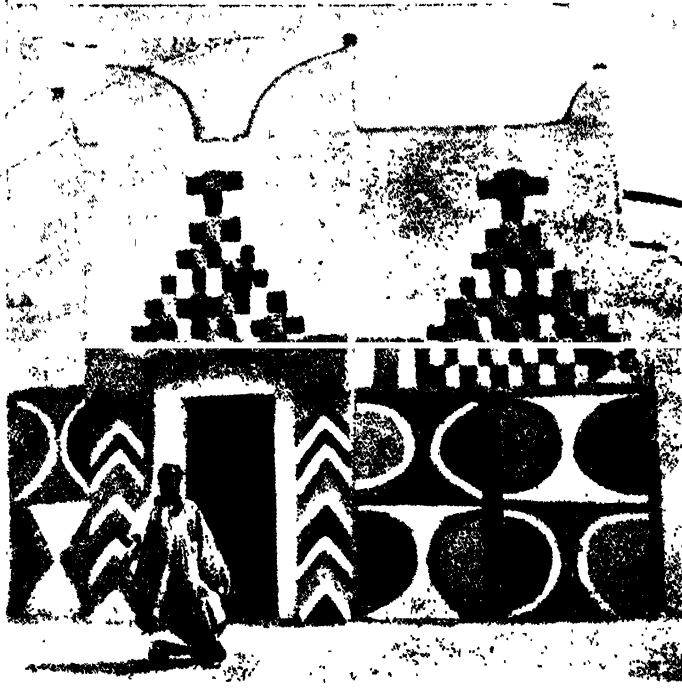
মরু-উদ্যানে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা সতর্ক হইয়াছিলেন। অনেক সময় মরু-দস্যুদল ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে। যাত্রী-দিগকে অসতর্ক পাইলে, তাহারা তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। রাত্রি-কালে পালাক্রমে পাহারার বন্দোবস্ত হইল। গাড়ীগুলিকে ব্যূহাকারে রক্ষা করিয়া যন্ত্রচালিত কামানগুলি এমন ভাবে স্থাপন করিলেন যে, যদি দস্যুদল আসে, কোন দিক্ দিয়াই তাহারা

দিবারাত্রব্যাপী যুবকের কঠোর পরীক্ষা

যুবরাজসহ বার্ম্মো সুলতান

কানুরী নারী

তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। কিন্তু সেখানে মরু-দস্যুর কোন সন্ধানই তাঁহারা পান নাই।

মরুভূমিতে য়ুরোপীয়গণের নিকট কোনও জিনিষের পার্থক্য অনুভূত হয় না। কিন্তু আরব বা তুয়ারেগগণ সকল

[illegible] দেশীয় নর্তক ও নর্তকী

চাদহ্রদের নারীর কেশপ্রসাধনের দৃশ্য

নারীর কেশপ্রসাধনের অপর দৃশ্য

বিষয়ের সন্ধান রাখে। এজন্য অভিযানকারীরা পথিপ্রদর্শক হিসাবে এক জন তুয়ারেগকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এই

ব্যক্তি মরু অঞ্চলে তুই বৎসর বয়সের পর আর আসে নাই। কিন্তু তথাপি তাহার শৈশব-স্মৃতির বলে

জিগুারের মল্লযুদ্ধ

তাঁহারা অতঃপর কি করিবেন ভাবিতেছেন, সহসা পাহাড়ের অন্তরাল হইতে এক জন তুয়ারেগের মূর্ত্তি তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইল। প্রশ্ন সত্ত্বেও লোকটা ট্যাবানকোর্টে যাইবার পথ বলিতে পারিল না। মেজর বেটেম্‌বার্গ তাহাকে একটি রৌপ্য-মুদ্রা দিতেই তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তখন অদূরবর্ত্তী কূপের কথা তাহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইতে দেখা গেল। দ্বিতীয় মুদ্রা দেখাইতেই তাহার আরও অনেক কথা মনে পড়িল। ক্রমে গুটিকয়েক মুদ্রা প্রদান করিতেই শুধু ট্যাবান্‌কোর্ট নহে, টিম্‌বকটু পর্য্যন্ত যাইবার পথ তাহার মনে পড়িয়া গেল।

সে অভিযানকারীদিগকে মরু-উদ্যানের মধ্যবর্ত্তী কূপের নিকট অনায়াসে পৌছাইয়া দিয়াছিল।

আধারগুলি জলপূর্ণ করিয়া লইয়া যাত্রীরা যাত্রারম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পথিপ্রদর্শক এ অঞ্চলে পূর্ব্বে কখনও যে আসে নাই, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। কারণ, দুই ঘণ্টা যাত্রার পর তাঁহারা যেখানে আসিয়া পৌছিলেন, তাহার সম্মুখে দুরতিক্রমণীয় পাহাড় দেখিতে পাইলেন। পথিপ্রদর্শক তখন টেসালিটে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য পরামর্শ দিল, নচেৎ সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

আর্চ্চালমবোণ্টের সুন্দরী নির্ব্বাচন

এই লোকটির সাহায্যে তাঁহারা অনতিবিলম্বে ট্যাবান্‌কোর্টে পৌছিলেন। এখানে এক দল তুয়ারেগকে তাঁহারা শিবির স্থাপন করিয়া থাকিতে দেখিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া তাঁহাদের মনে হইয়াছিল যে, ইহারা অতীতযুগের কোনও বিশিষ্ট শক্তিশালী আমীরবংশের সন্তান। তাহাদের গর্ব্বিত ব্যবহার, রাজোচিত ভাবভঙ্গী এবং দর্শনীয় সাজ-সজ্জায় তাঁহারা তাহাই মনে করিলেন। পুরুষদিগের মুখে
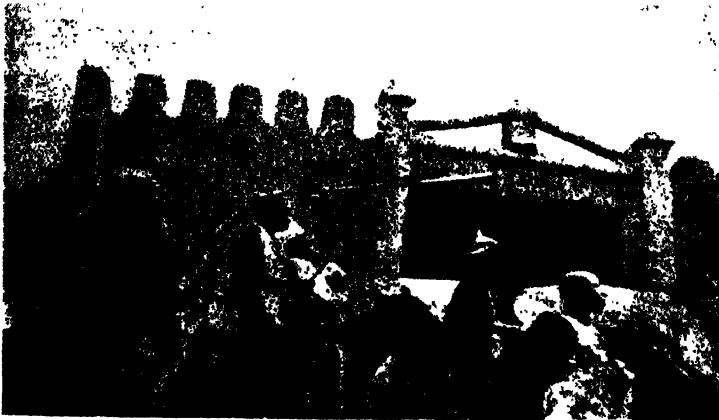
জিগুারের ভেরী-বাদক

অবগুণ্ঠন দেখিলে মনে হয়, সে যুগের ধর্ম্ম-যুদ্ধে সমাগত বীরগণ যেন শিরস্ত্রাণ পরিয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক দলপতির হস্তে বল্লম, কটিবন্ধে তরবারি এবং হরিণ-চর্ম্ম-নির্ম্মিত ঢাল।

আফ্রিকার ভানুমতীর দল

এই তুয়ারেগগণ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। 'ইমোচার' অর্থাৎ আমীর। ইহাদিগের মধ্য হইতেই দলপতি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। ইহার সাহস ও বীরত্বের সীমা নাই। 'ইম্‌রাদ্‌' বা দাস, ইহারা তাহাদের মনিবদিগের ন্যায় ককেশীয় রক্ত-সম্ভূত। 'বেল্লা' বা দাসগণ নিগ্রোবংশ সম্ভূত। প্রত্যেক দাস সম্প্রদায়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার কোনও উচ্চবংশ-সম্ভূত সম্প্রদায়ের হস্তে নিহিত। ইহারা প্রভুকে কর প্রদান করে এবং প্রয়োজনকালে সৈনিক সরবরাহ করিয়া থাকে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

মোগোরম পুরুষের নৃত্য

নারীরা ভাল অবস্থাতেই থাকে—ইহারা অত্যন্ত স্বাধীন। আরবদিগের রীতি নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত রীতি-নীতি ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। এই তুয়ারেগ নারীরা কখনও অবগুণ্ঠন ধারণ করে না। কিন্তু পুরুষরাই অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া থাকে।

কোলমবেচার হইতে অভিযানকারীরা তিন সপ্তাহে বুরেম দুর্গে পৌছিয়াছিলেন। নাইগার নদের তীরবর্ত্তী একটি খণ্ড-শৈলের উপর এই দুর্গ অবস্থিত। নাইগার নদ আড়াই হাজার মাইল দীর্ঘ এবং প্রস্থে এক মাইলের কিঞ্চিৎ অধিক। অভিযানকারীরা এখানে সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। দুর্গাধিপতি নিগোনা তুয়ারেগ জাতির অন্তর্গত। শত শত সশস্ত্র সৈনিক শ্বেতাঙ্গ অভিযানকারীদিগকে সসম্মানে অভিনন্দিত করিয়া তত্রত্য দর্শনীয় পদার্থ-সমূহ দেখাইয়াছিল। ধর্ম্ম-যুদ্ধের যোদ্ধাদিগের ন্যায় বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহীদিগকে তাঁহারা এখানে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। মধ্য-যুগের খৃষ্টান-ধর্ম্মাবলম্বীরা মধ্য-আফ্রিকাতে কি করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস অনাবিষ্কৃত।

আফ্রিকার পুরুষের আননরাগ

নায়ামি হইতে যাত্রা করিয়া তাঁহারা ডোশোতে, পৌছিলেন। ডোশো হইতে টেসাওয়া গমনকালে পথিমধ্যে

মোগোরম নারীর ওষ্ঠভূষণ

আফ্রিকান সুন্দরীর অধরোষ্ঠভূষণ

তাঁহাদিগকে থামিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের দলস্থ একখানি গাড়ী কয়েক শত গজ পশ্চাতে পড়িয়া ছিল। গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় একটা চিতা বাঘ সম্মুখে আসিয়া পড়িল। চালক এঞ্জিন বন্ধ করিয়া বৈদ্যুতিক সার্চ্চলাইট তাহার দিকে নিক্ষিপ্ত করিবামাত্র বাঘটা হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইল। শিকারীর বন্দুকের গুলী অব্যর্থ লক্ষ্যে শার্দ্দূলকে ভূপাতিত করিল।

টেসাওয়াতে পৌঁছিবামাত্র সুলতান বার্ম্মু হাউসার ৩ হাজার অশ্বারোহী সেনা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনার জন্য সমবেত হইল। তাহারা বাদ্যধ্বনি সহকারে তাঁহাদিগকে সুলতান-সমীপে লইয়া গেল। এই সুলতানের এক শত পত্নী। এককালে তাঁহার প্রতাপ অখণ্ড ছিল, এখনও তাঁহার সেনাদল অল্প নহে। সুলতানের পত্নীগণ সকল কার্য্যই সম্পাদন করিয়া থাকেন। নৃত্যগীত—সমস্তই এই সকল পত্নী করিয়া থাকেন।

অভিযানকারীদিগকে সুলতান বার্ম্মু অনেক অধিকার দিয়াছিলেন। এমন কি, অন্তঃপুরচারিণী পত্নীদিগের আলোক-চিত্র গ্রহণের অনুমতিদানেও কৃপণতা করেন নাই।

জিণ্ডারে অবস্থানকালে তাঁহারা একটা কৌতুকাবহ ব্যাপার অবলোকন করিয়াছিলেন। সেই সময় তথায় একটা উৎসব ছিল। যাহারা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, এই উৎসব তাহাদেরই। এই সময় তাহারা পত্নী মনোনীত করিয়া লয়।

এক স্থানে বহুসংখ্যক নারী সমবেত হয়। 'টম্‌টমের' বাদ্যধ্বনির সঙ্গে তাহারা হাততালি দিয়া গান করিতে থাকে। বিবাহার্থী যুবক কটি পর্য্যন্ত বস্ত্রাবৃত হইয়া নারীদলের সম্মুখীন হয়। এক জন বৃদ্ধ একটি বেত্রবৎ বৃক্ষশাখা লইয়া প্রত্যেক যুবকের পৃষ্ঠে অথবা বক্ষোদেশে প্রবলবেগে আঘাত করে। দলের আর এক জন প্রৌঢ় প্রার্থীদিগের পদতলে বসিয়া তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করে।

যোঙ্গো জাতির নৃত্য

প্রত্যেক যুবকের পৃষ্ঠ বা বক্ষোদেশে দশ বারো বার আঘাত করা হয়, কিন্তু যন্ত্রণা হইলেও সেই যুবক তাহা ভাব-ভঙ্গীতে প্রকাশ করিতে পারিবে না। এই পরীক্ষায় যদি যুবক উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে বিবাহের অধিকার প্রদত্ত হয় এবং তাহাকে সাহসী বলিয়া গণ্য করা হয়।

কোমাডুলো নদীতে নানা প্রকার জলক্রীড়া দেখিবার অবকাশ তাঁহারা পাইয়াছিলেন। নর ও নারী মিলিয়া এই জলক্রীড়া হয়। দুইটি প্রকাণ্ড ফাঁপা লাউ কাঠের দ্বারা সংযুক্ত করিয়া উহার উপর নর ও নারী বিপরীত-মুখী হইয়া উপবিষ্ট হয়। তাহাদের চরণ জলমগ্ন থাকে। সঙ্কেত পাইবামাত্র হস্ত ও পদের সাহায্যে তাহারা নদীর পরপারে অতিক্রান্ত উত্তীর্ণ হয়।

মোগোরম হইতে মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বীর দেশ নাই। অভিযানকারীরা এই অংশে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পান যে, দেশীয়গণ বস্ত্রধারণকে

ষ্ট্যান্‌লেভিলির যাদুকরী

অবশ্য-প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলিয়া মনে করে না। পুরুষ ও নারী উভয়ই প্রায় নগ্ন-বেশে থাকে।

মোগোরমের সন্নিহিত মাজাস্ অঞ্চলের নারীরা ওষ্ঠাধরকে ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রপথে দারু-নির্ম্মিত চক্র ধারণ করিয়া থাকে। ইহাতে তাহাদিগকে অত্যন্ত কুৎসিত ও বীভৎস দেখায়। এই দারুচক্রগুলিকে ক্রমশঃ বৃহদায়তন ওষ্ঠালঙ্কারে পরিণত করা হয়। যে নারীর ওষ্ঠাধর এমন ভাবে অলঙ্কার-শোভিত না হয়, কেহ তাহাকে পত্নীত্বে বরণ করিবে না। আহার-গ্রহণকালে ইহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া

আফ্রিকার প্রধান বিচারপতি

ম্যাঙ্গবেট্টু সর্দ্দারের প্রিয়তমা পত্নী

ভিন্নদেশের লোকের দুঃখই হয়।

আর্চ্চামবোল্ট দুর্গের সন্নিহিত হইয়া অভিযানকারীরা এক দল লোকের দেখা পান। তাহারা নগ্নদেহ, শুধু কটিবন্ধে সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডমাত্র আছে। ইহাদের দেহ এক প্রকার কর্দ্দমের দ্বারা অনুলিপ্ত। স্ফটিকমালা ইহাদের গলদেশে বিলম্বিত, লৌহ এবং তাম্র-কঙ্কণ করপ্রকোষ্ঠের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। ইহাদের শিরোদেশে অষ্ট্রীচ পক্ষীর পালক।

সারার সঙ্গতকারী দল

আর্চ্চাম্বোল্ট দুর্গ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে অভিযানকারীদিগকে তত্রত্য অধিবাসীরা নানারূপে আপ্যায়িত করিয়াছিল। আফ্রিকার মধ্যে এই স্থানের অধিবাসীদিগের সৌন্দর্য্যের খ্যাতি আছে। ইহাদের মত সুন্দর পুরুষ ও সুন্দরী নারী আফ্রিকার কুত্রাপি নাই। পুরুষগণ দীর্ঘাকার এবং সুগঠিত-দেহ। নারীরা তন্বী, ক্ষীণাঙ্গী।

এই নারী-প্রদশনীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন, প্রায় ৫ শত

বাঙ্গুই জেলায় ধর্ম্মসংক্রান্ত নৃত্য

ইহারা অনেক সময় টুলের উপর নিঃশব্দে বসিয়া থাকে। টুল ইহাদের সঙ্গেই থাকে। ইহাদের কথার আদান-প্রদান একপ্রকার কাসির দ্বারা সম্পাদিত হয়। সেই কাসির শব্দ শুধু তাহাদেরই বোধগম্য। এই সম্প্রদায় যণ্ডোনামে অভিহিত। তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অধিবাসীরা ইহাদিগকে ভয় করিয়া চলে। অথচ যণ্ডোরা কাহারও কোন অনিষ্ট করে বলিয়া শুনা যায় না।

শ্মশানযাত্রার নৃত্য

কুমারী তরুণী সৌন্দর্য্য-প্রতিযোগিতায় সমবেত হইয়াছে। সহরের দুই জন প্রধান ব্যক্তি কালো চশমা ধারণ করিয়া বিচারকের আসনে উপবিষ্ট। তাঁহারা প্রত্যেক তরুণীর প্রবেশভঙ্গী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। পরীক্ষাশেষে চরণ-সৌন্দর্য্যের জন্য একটি তরুণী শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিল।

এই স্থানের মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বিচিত্র। মৃত ব্যক্তিকে তাহার ব্যবহৃত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া দেওয়া হয়। কটিবন্ধ, কণ্ঠহার এবং পাখীর পালকবিশিষ্ট শিরোভূষণ পরাইয়া তাহাকে একটি চৌকীর উপর স্থাপিত করা হয়। গ্রামের যাবতীয় নর-নারী তাহার চারিদিকে বৃত্তাকারে দাঁড়াইয়া থাকে। বাদ্যকরগণ তাহাদের দেশের প্রচলিত পদ্ধতিতে সঙ্গীত বা কোলাহল করিতে থাকে।

৫ শত নারীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা যুবতী

গ্রামের প্রাচীনগণ তার পর মৃতব্যক্তির গুণগান করিতে থাকে এবং পেশাদার নারীরা নানা প্রকার বিলাপ দ্বারা গভীর শোক প্রকাশের চেষ্টা করে। এই সকল প্রক্রিয়া শেষ হইলে বৃহৎ মনুষ্যবৃত্ত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া একটি বৃত্তকে অপর বৃত্ত দ্বারা বেষ্টিত করা হয়। তার পর দুই বৃত্তস্থ নর-নারীরা বিশৃঙ্খলভাবে নৃত্য করিতে থাকে। সেইরূপ ভাবে মৃতদেহকে যমরাজের রাজ্যে প্রেরণ করা হয়।

জালিঙ্গা নামক স্থানে অভিযানকারীরা দেখিলেন, তাঁহাদের ভ্রমণ-পথের অর্দ্ধেক অতিক্রম করিয়াছেন। সেখানে প্রচুর শিকার পাওয়া যায় দেখিয়া তথায় তাঁহারা কয়েক দিন অবস্থান করিলেন। এই অঞ্চলের অরণ্যে হরিণ, সিংহ এবং হস্তী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সেই দেশীয় ২০ জন সুদক্ষ শিকারীর সহায়তা লইয়া তাঁহারা মৃগয়ায় গমন করিলেন। এই সকল শিকারীর হাতে ১২ হাত দীর্ঘ সুশাণিত বর্শা। উহারা বল্লম চালনায় সিদ্ধহস্ত। হস্তি-যূথ অশ্বকে অত্যন্ত ভয় করে বলিয়া ইহারা নির্ভীকভাবে হস্তীর দলের মধ্যে সবেগে অশ্বচালনা করে। হস্তীরা তখন পলায়ন করিতে থাকে। সেই সময় এই শিকারীরা তাহাদের শিকারকে লক্ষ্য করিয়া উন্মত্তের ন্যায় অশ্ব চালিত করে। সঙ্গে সঙ্গে অবসর বুঝিয়া দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া হৃদয়দেশের উদ্দেশে বল্লম নিক্ষেপ করে। সাধারণতঃ পশুরা পলায়ন করে বটে; কিন্তু রক্তস্রাব

আবাবুয়ার গায়কদল

বল্লমধারী শিকারী

আফ্রিকার যোদ্ধা

পত্নীপরিবৃত্ত ম্যাজেবেটু সর্দার

হেতু দুই চারি দিনের মধ্যেই আহত পশু প্রাণ-ত্যাগ করে এবং তাহাদের পলায়ন-পথ লক্ষ্য করিয়া ইহারা নিহত পশু-দিগকে খুঁজিয়া বাহির করে।

জলহস্তী এতদ-ঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অভিযানকারীরা কয়েকটা জল-হস্তীকে শিকার করিয়াছিলেন।

জালিঙ্গায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর সেই অঞ্চলের শাসক অগ্নি জ্বালিয়া হস্তি শিকারের ব্যবস্থা করিলেন। এই প্রথায় শিকার অত্যন্ত বর্ব্বরোচিত। হস্তি-যূথ যেখানে অবস্থান করে, তাহার চারি পার্শ্বে দেশীয়গণ বৃত্তাকারে পথ নির্ম্মাণ করে। এই পথের সকন্নিটে সহজদাহ্য কোন বস্তুই থাকে না। অরণ্যমধ্যে হস্তিদল যখন প্রবেশ করিয়াছে দেখা যায়, সেই সময় ৮ গজ অন্তর গ্রামবাসিগণকে পথের উপর দাঁড় করাইয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেকের হাতে একটি মশাল। নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত শুনিবামাত্র তাহারা বৃত্তমধ্যস্থ ঝোপ-জঙ্গলে আগুন ধরাইয়া দেয়। কিয়ৎকাল পরে ভীষণ গর্জ্জন করিয়া দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠে।

হস্তি-যূথ অকস্মাৎ চতুর্দ্দিক্ হইতে অগ্নিবেষ্টিত হইয়া অরণ্যের মধ্যস্থলে সমবেত হয়। শুণ্ড দ্বারা বৃক্ষশাখা ভঙ্গ করিয়া তাহারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু এই দাবাগ্নি হইতে রক্ষার কোন উপায় নাই। ধূমজালে

বেঙ্গামিসার যাদুকরী

ম্যাঙ্গেবেটু নারীর কেশপ্রসাধন

দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া তাহারা পরস্পর পরস্পরকে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সেই অবস্থায় দেশীয়গণ বর্শা-ঘাতে তাহাদিগকে বধ করে অথবা অগ্নিতে তাহারা দগ্ধ হয়।

ষ্ট্যান্লে ভিলি নামক স্থানে অভিযানকারীরা উপনীত হইলে তত্রত্য শাসনকর্ত্তা এবং য়ুরোপীয় উপনিবেশের অধিকাংশ অধিবাসী তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিলেন। এখানে তাঁহারা দেশীয় বিচারকদিগের বিচার-পদ্ধতি দেখিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। এক জন লোক নদীর একাংশে জাল নিক্ষেপ করিয়া মৎস্য ধরিয়াছিল। এই অংশ অন্যের অধিকারভুক্ত। বাদী আদালতে এই বলিয়া আরজী পেশ করিয়াছিল যে, প্রতিবাদী তাহার অনভিমতে তাহার অধিকারভুক্ত নদীতে মৎস্য ধৃত করায় তাহার বহু অর্থের ক্ষতি হইয়াছে। প্রধান বিচারপতি ওয়াগেনিয়া উভয় পক্ষের বক্তব্য ধীরভাবে শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদীর পক্ষে রায় দিয়া বলিলেন যে, নদীতে যথেষ্ট মৎস্য আছে। প্রত্যেকেরই তাহাতে অধিকার আছে, সুতরাং প্রতিবাদী মৎস্য ধরায় অপরাধ হয় নাই।

বাদী এত সহজে হাল ছাড়িয়া না দিয়া জানাইল যে, হুজুরের যে অংশ নির্দ্দিষ্ট আছে, নদীর সেইখানেও প্রতিবাদী

মাছ ধরিয়া লইয়াছে। বিচারক এ কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বটে! লোকটা আমার অংশেরও মাছ ধরিয়াছে? লোকটাকে ১৫ দিন হাজতে দাও!"

মায়ানগারা অঞ্চলের ম্যাঙ্গেবেটু সম্প্রদায় অতি বিচিত্র-ভাবে কেশপ্রসাধন করিয়া থাকে। এই প্রথায় কেশ-প্রসাধনের ফলে নর ও নারীর মাথার খুলি পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া পড়ে। বাল্যকাল হইতেই কেশবন্ধনের ফলে এই-রূপ ঘটিয়া থাকে।

নায়াসা হ্রদ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা মোজাম্বিকের দিকে ধাবিত হইলেন। ৮ মাসব্যাপী ভ্রমণে তাঁহারা অসংখ্য জলাভূমি, অরণ্য ও নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন। মাডাগাস্কারে যাইবার জন্য তাঁহাদিগকে জাহাজে আরোহণ করিতে হইয়াছিল।

মাডাগাস্কার দ্বীপ নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও হল্যাণ্ড এই তিনটি দেশকে একত্র করিলে যত স্থান হয়, মাডাগাস্কার তত বড় দ্বীপ। ইহার লোকসংখ্যা ৩৪ লক্ষ। নানাবিধ খনিজ দ্রব্য, কাষ্ঠ ও কৃষিজাত পদার্থের জন্য এই দ্বীপ বিখ্যাত। তাঁহারা ৮ হাজার আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। এই প্রবন্ধে তাহার কতিপয় চিত্রমাত্র প্রদত্ত হইল।

এইরূপে দুস্তর মরু-সমুদ্র, ভীষণ অরণ্যানী উত্তীর্ণ হইয়া অভিযানকারীরা মাডাগাস্কার হইতে জলপথে ফ্রান্সে প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

স্মৃতির স্বপন

কি সঙ্গীত গা'ব আমি, কিছু নাহি জানি!
মনোবীণে বাজে তার স্মৃতির রাগিণী
নিশিদিন! 'ফল্গু' সম বহিছে অন্তরে
ব্যথার সলিল! কেহ বোঝে না বাহিরে!

হাসি খেলি ঘুরি ফিরি—কহি কত কথা!
নাহি সে ব্যথার ব্যথী বুঝিবে সে ব্যথা!
অন্তরের ভাব চাপি রেখেছি গোপনে!
প্রাণ কাঁদে! কাঁদি একা রহিলে নির্জ্জনে!

কান্না যদি গান হয় গাহিতে গো পারি
যত বল মোরে; আমি নিশিদিন ধরি
গাইব প্রাণের গান, অতি সঙ্গোপনে—
ধরেছি তাহারে বুকে, ভুলিব কেমনে?

'রক্ত-রাঙা গোলাপের' স্নিগ্ধ ওষ্ঠাধরে
চুম্বনে চুম্বনে আমি দিয়েছিনু ভ'রে।
কোথা সে 'মানসী' মোর? দূরে! কত দূরে?—
সবারে ত্যজিয়া সখি, কোন্ সুরপুরে?

একা একা ঘুরি কিছু নাহি লাগে ভালো।
জ্ব'লে পুনঃ নিভে গেল তব প্রেম-আলো!
আঁধার হৃদয় মোর জীবনে কি কাজ?
বিরহী 'যক্ষে'র সম ঘুরিতেছি আজ!

এসেছিল প্রিয়া মোর আঁধার ভবনে—
কবেকার কোন্ এক গোধূলি লগনে!
চ'লে গেল! রেখে শুধু স্মৃতির স্বপন!—
তাই লয়ে হৃদে—প্রেম করেছি বপন।

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়।

পথের কাঁটা

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

১

পিতা-মাতার অপরিসীম আদরে উমানাথের নিরুদ্বেগ, নিশ্চিন্ত দিনগুলি বেশ অখণ্ড শান্তিতেই বহিয়া যাইতেছিল, কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে এক বিষম ব্যাধি আক্রমণ করিল—যৌবন। এই দুরন্ত রিপু নিঃশব্দে দেহ-দুর্গ অধিকার করিয়া কখন্ যে আপনার জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া দেয়, সকল সময় সকলের কাছে সে সমাচারও পৌঁছায় না। অন্ততঃ সরলহৃদয় উমানাথ সে বারতা পায় নাই। এখন পর্য্যন্ত সে কৈশোরস্বপ্নেই বিভোর হইয়া আছে। কিন্তু আজ একটা বদ্‌মায়েস কোকিল অজস্রপুষ্পিত বকুলবৃক্ষের শাখা হইতে হঠাৎ তাহাকে সে সংবাদটা দিয়া গেল। অদূরে চম্পক-বৃক্ষ হইতে তৎক্ষণাৎ একটা শ্যামা বসন্তের অভিসার-গীতি গাহিয়া উঠিল। দহিয়াল শিষ দিতে আরম্ভ করিল—জাগো, জাগো, জাগো। কোথায় কোন্‌খানে একটা পাপিয়া গা-ঢাকা দিয়া বসিয়াছিল। সে আর থাকিতে পারিল না। পর্দ্দায় পর্দ্দায় সুর চড়াইয়া নির্লজ্জ ব্যগ্রতায় চেঁচাইতে সুরু করিল—পিউ পিউ পিউ পিউ কাঁহা—পিউ কাঁহা—পিউ কাঁহা। ইহাকে সান্ত্বনা দিতে আর একটি পাখী যেন বিহঙ্গবধূকে ক্রমান্বয়ে উপদেশ দিতে লাগিল—বউ কথা কও, বউ কথা কও। পরিহাস-রসিক এক পাখী অমনি বলিয়া উঠিল, খোকা হ'ক খোকা হ'ক।

উমানাথ চকিত হইয়া উঠিল।

স্থান—খিড়কির বাগান। সময় সূর্য্যাস্ত।

পাত্র সে নিজে এবং অদূরে একটি বালিকা বকুল-মূল হইতে ঝরা ফুল কুড়াইতেছে।

উমানাথ কুমারীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম কি?

উমা।

উমা! আমার নাম যে উমানাথ। এত ফুল নিয়ে কি করবে?

মালা গাঁথব।

কার জন্যে?

উমার অঞ্চলগলিত হইয়া ফুলগুলি ছড়াইয়া পড়িল আর সে ছুটিয়া পলাইল। তাহার একটু কারণও আছে।

সরলহৃদয় উমানাথ সরলভাবেই প্রশ্ন করিয়াছিল বটে, কিন্তু কিছু দিন হইতে উমার মা নবদুর্গা অতিশয় উতলা হইয়া উঠিয়াছেন। কন্যার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কন্যার পিতা দুর্গাশঙ্করের সে পরিমাণে উৎকণ্ঠাবৃদ্ধি হইতেছে না। অনুনয়-বিনয়, মান-অভিমান সকলই ব্যর্থ হইয়াছে। বাকি কেবল চোখের জল। সেই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগে দুর্গাশঙ্কর ব্যস্ত ও ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, আহা, কর কি, কাঁদ কেন? শুভ কর্ম্মে চোখের জল মহা অমঙ্গল, জান না? সব ত ঠিক হয়েই রয়েছে।

ঠিক হয়ে রয়েছে কি?

আরে মেয়েমানুষ, নাকের ডগা থেকে এক আঙুল দূরে ত দেখবার শক্তি নেই। কাযেই কেঁদে মর। আমি কি অমনি নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে আছি! এ যে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ! যে যার স্বামী—আগে থাকতেই ঠিক হয়ে থাকে।

তা ত থাকে। কিন্তু সেটিকে ত খুঁজে বার করতে হবে? সন্ধান করা চাই ত?

এ কি গরু যে খুঁজে বার করব? সে সব ঠিক হয়ে আছে। এই সামনের অঘ্রাণে চার হাত এক ক'রে দেব।

বলি, মনের কথাটা ভেঙ্গেই বল না।

বলি, ও-পাড়ার কালীশ্বর মিত্রকে জান ত?

তা ত জানি

তারির ছেলে উমানাথ।

উমানাথ! তারা বড়লোক। ছেলের বে দেবে, সাধ-আহ্লাদ করবে। তারা গেরস্ত-ঘর থেকে মেয়ে নেবে কেন?

নিতেই হবে। নইলে ওর নাম উমানাথ হ'ল কেন? সেটা বোঝাও।

বোঝাব আমার মাথা! তুমি ঐ ভেবে নিশ্চিন্দি হয়ে ব'সে আছ? হা আমার পোড়া কপাল!

কি পাগল! এ যে বিধাতার যোগাযোগ! নিশ্চিন্ত না হব কেন? বেশ ত, ওর নাম উমানাথ হ'ল কেন, সেটা ত বুঝ্‌তে হবে! নিজের কথাটা একবার ভেবে দেখ দিকি। বলি, তোমার নাম ত নবদুর্গা?

হুঁ! তা কি হয়েছে?

তোমার বিবাহ হয়েছে ত?

তুমি পাগল হ'লে নাকি?

বলি, হয়েছে ত?

কোথায় যাব মা! বিশ বছর একসঙ্গে ঘর ক'রে জিজ্ঞাসা করছেন, তোমার বে হয়েছে ত! মাথায় একটু ক'রে মধ্যমনারায়ণ মাখ।

বলি, স্বীকার পাও না যে, বে হয়েছে।

হয় নি ত কি আমি পরপুরুষ নিয়ে ঘর করছি! কি ঘেন্না মা!

বেশ! কার সঙ্গে বে হয়েছে, ঠাকরুণ? হরিশঙ্কর নয়, হরশঙ্কর নয়, কালীশঙ্কর নয়, গৌরীশঙ্করও নয়। একেবারে দুর্গাশঙ্কর। নবদুর্গা—দুর্গাশঙ্কর! কেমন? প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ দেখ্‌তে পাচ্ছ কি?

তবে বিরাজীর বে কালাচাঁদের সঙ্গে হ'ল কেন?

আঃ, ভারি বে। ছ্যাঃ, ও কি একটা বিয়ে! দিন-রাত কিচ্‌কিচিতে কাণ ঝালাপালা, বাড়ীতে কাক-চিল বস্‌তে পায় না! সে রকম বে আমি দেবো না। আমার একটি মেয়ে। উমানাথও বাপের এক ছেলে। কত দিক্ দিয়ে তোমায় বোঝাব।

গৃহিণী কহিলেন, আমি বুঝেছি, আর বেশী বিষ্ণে খরচ করতে হবে না। ভাঁড় খালি হয়ে যাবে। হুঁঃ, ছেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে চায়! যে বড় ভাগ্যিমানি, সেই ওর গলায় মালা দেবে। বেশী আশার ফল—চোখের জল।

বেশী আশা কি, গিন্নি! এ যে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ!

সরল-স্বভাব, শিশু-প্রকৃতি দুর্গাশঙ্করের সহজ সিদ্ধান্ত গৃহিণী গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু অন্তরাল হইতে শুনিয়া উমা অক্ষরে অক্ষরে তাহা বিশ্বাস করিল। সে জানিল, উমানাথই তাহার ভাবী পতি এবং সেই জন্য মালা গাঁথা সম্বন্ধে কথা উঠিতেই লজ্জিতা বালিকার কম্পিত হস্ত হইতে ফুলগুলি ছড়াইয়া পড়ে।

উমা ছুটিয়া পলাইতে উমানাথ আশ্চর্য্য হইয়া কিছুক্ষণ তাহার পশ্চাৎ চাহিয়া রহিল। গতিবেগে বালিকার হস্তবদ্ধ কেশপাশ তখন এলাইয়া পড়িয়াছে। উমানাথ ভাবিল, কি সুন্দর! কিন্তু পলাইল কেন? বল্‌লেই হ'ত, গৃহদেবতা নারায়ণের জন্য মালা গাঁথ্‌ব—আমার ঠাকু'মা যেমন নিত্য গাঁথেন। পূজার ফুল যোগাবার জন্যই ত বাগান করা হয়েছে! কিন্তু কি সুন্দর!

উমানাথ উর্দ্ধে অধে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। মেঘে মেঘে রং ধরিয়াছে। পুষ্করিণীর বীচিবিক্ষোভিত জলে সেই সোনালী ছায়া। পাতায় পাতায় সেই সোনালী আভা। কি সুন্দর!

উমানাথ দেখিল, পাতার আড়াল থেকে একটি কচি কুঁড়ি অর্দ্ধোন্মীলিত নয়নে মুগ্ধ বিস্ময়ে আকাশপানে চাহিয়া আছে। ও দেখিতেছে কি? ওঃ, আজ যেন ফুলের উৎসব, গন্ধের সদাব্রত! অদূরে ঐ সোনালী গোলাপ—ও ডাকে কা'কে? বসন্ত-পবন এই উদ্যানমধ্যে কিসের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে? কিসের? কিসের? ও সর্ব্বদা চঞ্চল কেন?

উমানাথ চারিদিকে চাহিল। রূপে, শব্দে, গন্ধে উদ্যান পরিপূর্ণ। কেবল রাশি রাশি বিক্ষিপ্ত ফুল সত্ত্বেও ঐ বকুল-তলাটা যেন শূন্য হইয়া গেছে! আর এই পরিপূর্ণ শোভা-সম্পদের মাঝে তাহার অন্তরে আজ কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, বুকে কি অব্যক্ত বেদনা; উমানাথ বারবার সেই বকুলমূল দেখিতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য, সবই যেন যোড়া-গাঁথা! ঐ মাধবীলতাটা ফুলের মালা নিয়ে মহা আনন্দে ঐ কদমগাছটার পানে ধেয়ে চলেছে। গাছটাও আনন্দে শিউরে উঠ্‌ছে। ঐ পাখী দু'ট পাশাপাশি ব'সে কত সোহাগ করছে আর ওদের কণ্ঠস্বরে যেন আনন্দ ঝ'রে পড়ছে!

চারিদিক্ চাহিতে চাহিতে উমানাথ দেখিল, অদূরে

তাহার পিতার পোষা পাগল তাহার পানে চাহিয়া ফিক্‌ফিক্ করিয়া হাসিতেছে।

উমানাথ প্রশ্ন করিল, পাগল, তোমার বে হয়েছে ?

হুঁ, কত !

কত কি ?

শোন না। প্রথম বে হ'ল একটা সাপুড়ের সঙ্গে।

সাপুড়ের সঙ্গে ? তুমি যে পুরুষমানুষ।

কে বল্‌লে ? দু'চার গাছ দাড়ী থাকলেই যদি পুরুষমানুষ হয়, তা হ'লে তোমাদের ঐ রামছাগলটা—যে গণ্ডা গণ্ডা বাচ্ছা বিয়োয়—সেও পুরুষমানুষ ? হুঁ-হুঁ বাছাধন, একেবারে বাকি্য হ'রে গেল যে !

তা তুমি শ্বশুর-বাড়ী যাও না কেন ?

ও মা ! যে সাপের ফোঁস্-ফোঁসানি ! আমি কি তার কাছে ঘেঁসতে পারি ?

তোমার বরকে বল্‌লে না কেন ?

বল্‌লুম না ! সে একটা সাপের মন্তর শিখিয়ে দিলে। তা'তে সাপগুলো বশ হ'ল, কিন্তু দু'দিন ঘর ক'রে বুঝ্‌লুম, সেও একটা আস্ত পাগল।

পাগল !

সুধু কি পাগল ? নেশা-ভাং করে। কতকগুলো ভূত-প্রেত-দানা-দত্যি সারাদিন সিদ্ধি বাটছে আর যে চাইছে, তা'কে বিলুচ্ছে। আমাকে বল্‌লে, খাবি ? আমি বল্‌লুম, না, আমি সিদ্ধি খাব না।

উমানাথ জিজ্ঞাসা করলে, তার পর ?

আমার বরকে বল্‌তে গেলুম। ও মা, গিয়ে দেখি, এক পেল্লায় ষণ্ডা মাগী দশহাতে কাদার পুতুল গড়ছে, আর ও ভেঙ্গে ভেঙ্গে দিয়ে বল্‌ছে, ভাল ক'রে গড়্ !

সোনার পুতুল গ'ড়ে মাগী বাজালে ঢাক-ঢোল, মিন্‌ষে ভেঙ্গে দিয়ে বল্‌লে, বল হরি হরিবোল ! আবার দু'জনেই হাসে ! আমি খানিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। আমার পানে ফিরেও চাইলে না। সময় কখন্ বল, ঐ খেলা নিয়েই মত্ত। আমি পেন্নাম ক'রে গুটি গুটি স'রে পড়্‌লুম।

তার পর ?

তার পর স্বয়ম্বরা হলুম।

এক স্বামী থাকতে ?

পাগল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, কি জানো বাবাজি ! আমি যে গুরুমশায়ের কাছে পড়্‌তুম, তিনি ছিলেন ভারি উদার। এক দিন পাঁচ ঘা'র যায়গায় দশ ঘা বেত মেরে বললেন, 'অধিকন্তু ন দোষায়।' কথাটি আমি শিখে রাখ্‌লুম। ভাবলুম, কাযে লাগ্‌বে। সেই থেকে বাবাজি, লুচি-সন্দেশ, রসগোল্লা থেকে স্বামী পর্য্যন্ত ঐ এক উপদেশ খাটিয়ে আস্‌ছি।

উমানাথ হাসিয়া বলিল,বেশ ত! কার গলায় মালা দিলে ?

সে একটা গয়লার ছেলেকে। মনে করেছিলুম, খুব ক্ষীর, সর, ননী খাব।

খেলে ?

রামঃ ! উল্‌টে ফুলশয্যার রাত্তিরে আমারই প্রাণটি চুরি ক'রে নিয়ে পালাল।

তার পর ?

তার পর আর কি ! মনের দুঃখে আর এক জনের গলায় মালা দিলুম।

ওরে বাপ রে ! এ যে বিয়ের ব্রত করেছ দেখ্‌ছি।

হাঁ, বাপধন। আমি পতিব্রতা কি না ! পতিই আমার ব্রত।

এবার মালা দিলে কা'কে ?

তোমার বাবাকে।

আমার বাবাকে ?

হাঁ, বাবাজি ! ভেবে দেখলুম, পায়ের ওপর পা দিয়ে আমিরী করতে হ'লে এক জন ভর্ত্তা চাই—যে ভার নিয়ে ভরণ-পোষণ করবে। তাই তোমার বাবাকে মালা দিলুম। তা দেখছি, ঠকিনি।

তবে যে বাবাকে দাদা বল ?

তুমি না সংস্কৃত পড় ? 'বিদ্বান্-বিদ্বাংসৌ-বিদ্বাংসঃ' কর ? এই বিদ্যে হচ্ছে ? দা ধাতু দানে ? যে ভাত-কাপড় দু-ই দেয়, সে ডবল দা—দাদা।

ভাত-কাপড় দু-ই যদি পাও, তবে আবার মাঝে মাঝে চক্ষু বুজে ধ্যান কর কি ?

পাগল ভাবস্থ হইয়া বলিল—

অথগুমণ্ডলাকারং চন্দ্রকান্তং কলেবরম্।
মোদকস্য গৃহে জাতং মণ্ডাখ্যাতি ভূমণ্ডলে॥
অপক্বং গোলকঞ্চৈব কাঁচাগোল্লেতি নাটরে।
চক্রাকারং চতুষ্কোণং নমস্তে বহুরূপিণে॥

উমানাথ হাসিতে হাসিতে কহিল, আচ্ছা, পাগল, সেই যে গয়লার ছেলেটা তোমার মন চুরি ক'রে পলাল, সে বুঝি আর তোমার খোঁজ-খবর করে না ?

কে, সেই কেষ্টা ? কখন কখন করে। কিন্তু খুব লুকিয়ে। এক দিন দেখি, একটা রাক্ষসীর বুকের ভিতর ব'সে মুচকে হেসে কটাক্ষ হান্‌ছে। মনে মনে হেসে বল্‌লুম, আমার সর্ব্বস্ব ত নিয়েছিস্, আর কি নিবি ? ওতে আর আমি ভুল্‌ছি নি।

কিন্তু পাগল, আমি যে তাকে চাই।

পাগল চকিত হইয়া বলিল, খবরদার চেয়ো না। তুমি মজ্‌বে মজ্‌বে, মজ্‌বে !

আর যদি ম'জে থাকি ?

এই দেখ, ভালমানুষের ছেলেটাকে মজিয়েছে ! বাবাজি, তার চেয়ে তুমি আমার মত গোল্লায় যাও।

তার মানে ?

দিব্যি গোল্লা খাও। বাপের বিষয় আছে, রাজার মত ব'সে ব'সে দেদার গোল্লা, রসগোল্লা খাও। তোমায় পথে পথে ফেরাবে।

তা হ'ক, তবু তাকে চাই।

কা'কে ?

সেই শ্যামকে।

শ্যাম-শ্যাম করছ, শ্যাম কি আর আছে, বাপধন !

কি হ'ল ?

সে সেই রাধী গয়লানী চেটে মেরে দিয়েছে।

সে কি ! শ্যাম কি সন্দেশ-রসগোল্লা ?

তার চেয়েও মিষ্টি, বাবাজি !

তা হ'ক ! চেটে মেরে দিলে কি ?

ঐ হ'ল ! না হয় আস্ত গিলেছে। বলিয়া পাগল গাহিল—

সে কালোরূপ লুকাল কোথায়।
তোমায় চিনি চিনি, চিন্তামণি,
সেই তুমি কি নদীয়ায় ॥
পড়ে কি হে পড়ে মনে, ছিল কি ভাব বৃন্দাবনে,
হয়ে বংশীধারী, রাসবিহারী,
ধরেছিলে নারীর পায় ॥
কে ভাবিনী ভাব ধরালে, ডোর-কৌপীন তোমায় পরালে,
কে দিলে বরণ, গৌরবরণ,
চাঁদের কিরণ মেঘের গায় ॥
শিখেছ কার মুখের বুলি, সার করেছ কাঁথা-ঝুলি,
কার ভাবে ভোলা, হরিবোলা,
ধূলায় লুটায় সোনার কায় ॥
বহে কি স্রোত অন্তঃশিলে, বুক ভেসে যায় প্রেম-সলিলে,
ওহে গোলোকবাসী, হয়ে উদাসী
ঠেকেছ কার প্রেমের দায় ॥

সুর ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিতেছে। উমানাথের মনে হইল, যেন কত কিন্নর-কণ্ঠ খোল-করতাল সহ তাহাতে যোগ দিয়াছে। আকাশ, বাতাস, তরুলতা, ফুল, পাতা সব তরতর করিয়া কাঁপিতেছে। গান কখন থামিয়াছে। কিন্তু এখনও মনে হইতেছে, পুষ্করিণীর লহরে লহরে তাহা খেলিয়া বেড়াইতেছে।

উমানাথ জিজ্ঞাসা করিল, শ্যাম গৌর হয়েছে ?

পাগল বলিল, আর হ'ল বৈ কি !

কেন গৌর হ'ল ?

মাল্‌পো খাবে ব'লে।

না, তুমি ঠাট্টা করছ। আমার শ্যাম শ্যামই আছে।

কেন ? তোমার গায়ের জোরে ?

গায়ের জোরে নয়, বেতের জোরে। এক দিন গুরুমশায় অন্যায় ক'রে আমাকে বেত মারলে। বড় দুঃখ হ'ল। বাগানে এসে চুপ ক'রে ব'সে আছি। পাখীগুলো গান করতে করতে এ-ডাল ও-ডাল ছুটাছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে। দেখতে দেখতে মনে হ'ল, গাছগুলো যেন হাজার হাজার আঙ্গুল নেড়ে আমায় ডাক্‌ছে, আর কে যেন বল্‌ছে, আয়, আয়, আমার সঙ্গে খেলা করবি আয়। আমাদের বাড়ীতে কথা হয়েছিল। কথক বলেছিলেন, বৃন্দাবনে শ্যাম রাখাল-বালকদের ডেকে এনে তাদের সঙ্গে খেলা করতেন। আমার মনে হ'ল, শ্যাম খেলা করতে ডাক্‌ছে। ছুটে গিয়ে তার কাঁধে চেপে বস্‌লুম। তার পর উঠি-পড়ি, ঘাসের ওপর গড়াগড়ি, কত খেলা ! শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘাটের সিঁড়িতে বস্‌লুম। তখনও পিঠটা একটু জ্বলছিল। ঝির-ঝির ক'রে বাতাস বইছে। আমার মনে হ'ল, কে যেন গায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল। কিন্তু শ্যাম কৈ ? কোথায় লুকিয়ে আছে ? শ্যাম, শ্যাম ব'লে কাঁদতে লাগলুম। কেউ এল না। তবু ব'সে ব'সে শ্যাম শ্যাম করতে লাগলুম। বুকের ভিতরটা দুলতে লাগল।

তবে আর কি! শ্যাম-শ্যাম কর।

তাই ত করি। ভারি আনন্দ হয়।

এখন নতুন ভাব, তাই আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু জেনে রেখ, বাবাজি, ভারি ছ্যাঁচড়া।

কে?

ঐ শ্যামো। যখন কাঁদাবে, নদী বইয়ে দেবে। বুকের ভিতর ব'সে বুক আঁচ্ড়াবে। তখন মনে হবে, বুকের ভিতর থেকে বার করতে পারলে বাঁচি!

শ্যামের দেখা কি পাব না?

সে তার খুসী।

খুসী! তবে লোকে শ্যাম-শ্যাম করে কেন?

সখ। কি জান, বাবাজি, ওটা এক রকম জুয়াখেলা। যারা খেলে, তারা কি হার-জিত হিসেব ক'রে খেলে? খেলারই একটা মাতামাতি আছে।

জীবন নিয়ে জুয়াখেলা!

সখ। কেউ ত মাথার দিব্যি দেয় নি।

২

কালীবর বলিলেন, দুর্গাশঙ্করের কন্যা উমার সঙ্গে তোমার বিবাহ স্থির করেছি। ওদের কাছ থেকে এক পয়সা আমি নেব না। তোমার কি রকম ঘড়ি-চেন্ পোষাক-আসাক চাই বল, আমি সব ক'রে দেব। তোমার শোবার ঘর যদি নতুন রকম ক'রে সাজাতে চাও, তাও বল। আমি সব ক'রে দেব।

উমানাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, কিন্তু আমি ত বিবাহ করব না।

অতীব বিস্ময়ে কিছুক্ষণ পুত্রের মুখ চাহিয়া কালীবর বলিলেন, বে' করবে না! তবে কি করবে?

পাগল কহিল, ঠিক্ ঠিক্। বল, বাবাজি, বে' করবে না ত করবে কি? করবার আছে কি? যা হ'ক, একটা কিছু ত করতে হবে। তা পতিতা উদ্ধারই কর না।

উমানাথ বলিল, কিন্তু—

কালীবর কহিলেন, ওর আবার কিন্তু কি? পুরুষানুক্রমে আমরা বে' ক'রে আস্ছি, আর তুমি বেটা কি এমন কেলেবর হয়েছ যে, কুলপ্রথা ভঙ্গ করবে? কি বল, পাগল?

পাগল বলিল, তা বটে! কিন্তু কালীবরের বেটা তাকে বর হবে না ত কি বর্ব্বর হবে? তা বল, দাদা! কিন্তু, বাবাজী বে' করবেন না কেন, সেটা ত শোনা চাই।

বাবাজী বলিল, ও সব বড় ঝঞ্ঝাট—

পাগল কহিল, ঝাঁট-পাট সব বৌমা এসে দেবেন, তার জন্যে তোমার মাথাব্যথা কেন, বাপধন?

কিন্তু যতি-ধর্ম্ম—

কর্ত্তা বিষম চটিয়া বলিলেন, সে বেটা আবার কে? হাঁ হে পাগল?

ইতিমধ্যে পুরোহিত আসিয়াছেন, কেহ লক্ষ্য করে নাই। তিনি দেখিলেন, বিবাহের পাওনাটা হাতছাড়া হইয়া যায়। বলিলেন, হ'ক্ না যতি-ধর্ম্ম! শাস্ত্রে বল্ছে, 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।'

পাগল বলিল, ঠিক্ই ত! আগুনের মাঝখানে ব'সে যার গায় আঁচ লাগে না, সে বীর।

উমানাথ মনে মনে ভাবিল—বীর। আগুন নিয়ে খেল্ব, অথচ হাত পুড়বে না। বলিল, আচ্ছা, কাল বল্ব।

পুরোহিত বলিলেন, সামনে অকাল, কাল বল্বে কি?

কর্ত্তা বলিলেন, তা বটে ত! এক দিনে এমন কি বিদ্যে বাড়বে যে, একেবারে কেলেবর (clever) হবে?

সে দিনকার সেই সন্ধ্যা, সেই বকুলতলা আর সেই মালাগাঁথার কথা উমানাথের অন্তশ্চক্ষুর উপর ভাসিয়া উঠিল। কি সুন্দর! পাগল ঠিক বলেছে, আগুন নিয়ে যে খেল্তে পারে, সে-ই ত বীর। উমানাথ ভাবিতে লাগিল। পাগল তখন গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছে—'ছড়িয়ে দিলে ভালবাসা কুড়িয়ে পাবে না—'

উমানাথ ভাবিল, পাগল ইঙ্গিত করিতেছে, দেওয়া-নেওয়াই প্রেমের সুখ, দুই জনের মধ্যেই তাহা সম্ভব। জগতের কল্যাণে বহু জনে তাহা বিকীর্ণ হইলে প্রতিদান বা আস্বাদ কিছুই পাওয়া যায় না। পিতাকে বলিল, আপনি যা বল্বেন, তা-ই হবে।

উমানাথ দ্রুত চলিয়া গেল। পুরোহিত বলিলেন, কর্ত্তা, পূজা ত এল। এবার কার নামে সঙ্কল্প হবে?

পাগল খাড়া হইয়া বসিয়া বলিল, মায়ের ত এবার আসা হবে না, তার আবার সঙ্কল্প কি?

পুরোহিত হাসিয়া কহিলেন, ঐ নাও! পাগ্লার কাছে

টেলিগ্রাফ এসেছে, মায়ের এবার আসা হবে না। কেন বল দেখি? মায়ের বেরি-বেরি হয়েছে? ওরে মহামূর্খ! পঞ্জিকাটা পর্য্যবেক্ষণ ক'রে দেখ। দোলায় আগমন—ফলং মড়কম্।

অরে মহাব্রাহ্মণ—

দেখুন, কর্ত্তা, আমায় বলে চণ্ডাল! মায়ের আসা হবে না কেন শুনি?

কৈলাসে গুপ্ত ষড়্যন্ত্র হয়েছে। হাঁস, পেঁচা, ময়ূর, ইন্দুর সবাইকে ডেকে সিঙ্গি গর্জ্জন ক'রে বললেন, দাস্যভাব বর্জ্জন। এই সব বেঁকে বস্‌ল। মহাদেবের বাহন—'ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ'—বুড়ো রাসকেল সেই বৃষটা কাঁধ থেকে সাপুড়ে শিবকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে, তিনি এখন হাঁসপাতালে।

পুরোহিত হাসিতে হাসিতে কহিলেন, তা হ'লে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণপতি, দুর্গা, কেউই এবার আসছেন না?

পাগল গম্ভীর হইয়া বলিল, না। আসবেন কেবল চোরা। তা যা করবার তা ক'রে যাবেন।

তা হ'লে এবার বলিও বন্ধ বল?

না, ঐটি হবার যো নেই। বলি দিতে হবে। নইলে চোরাও আসতেন না। তিনি রক্ত-মাংস খাবেন—আমরা চুষব হাড়।

তা হ'লে এবার চোরারই পূজ'?

হাঁ—ষোড়শোপচারে।

রঙ্গ-রহস্যে সে দিনের সভা ভঙ্গ হইল।

দুর্গাশঙ্করের একাগ্র কামনার ফলেই হউক বা তাঁহার কন্যার সৌন্দর্য্যবলেই হউক, উমানাথের সহিত উমার বিবাহ মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ!

ফুলশয্যার রাত্রিতে গৃহ নিস্তব্ধ হইলে উমানাথ ডাকিল, উমা!

উমা তন্দ্রা-জড়িত চক্ষু উন্মীলন করিল। কি সুন্দর!

উমানাথ জিজ্ঞাসা করিল, সে দিন কার জন্যে মালা গাঁথবে ব'লে ফুল কুড়চ্ছিলে বল ত?

উমার অধর ঈষৎ স্ফুরিত হইল। মুখে কিছু বলিল না। একখানি সুকোমল বাহু উমানাথের বক্ষের উপর স্থাপন করিয়া অকাতরে ঘুমাইয়া পড়িল। কি নিশ্চিন্ত নির্ভর!

উমানাথের বুকের ভিতর তোল্‌পাড় করিতে লাগিল। মনের ভিতর তরঙ্গ তুলিয়া কত প্রলাপই উঠিতেছে, আবার নিঃশব্দে তলাইয়া যাইতেছে। কিন্তু বালিকা বধূকে জাগাইতে উমানাথের মমতা হইল। বহুক্ষণ জাগিয়া জাগিয়া দুই চক্ষু দিয়া সে বধূর অপরূপ মাধুরী পান করিতে লাগিল। সারাদিন ধরিয়া বাছিয়া বাছিয়া সে কত কথাই ভাবিয়া রাখিয়াছিল, তাহার একটাও বলা হইল না। তথাপি মন বলিতেছে, এ আমার—আমার —আমার! তার পর কখন্ যে পাখী প্রথম কূজনে প্রকৃতিকে জাগাইয়াছে, তপনের প্রথম কিরণ কখন্ যে ধরা চুম্বন করিয়াছে, সে জানিতেই পারিল না। জাগিয়া দেখিল, তাহার নিত্য-নিয়মিত ধ্যানের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে এবং যে সাকার প্রতিমা তাহাকে অভিনব ধ্যানে নিমগ্ন করিয়াছিল, তাহাও তাহার পার্শ্বে নাই। সূর্য্যের আলোক সহসা যেন ম্লান হইয়া গেল।

বিবাহের পর বধূ এক বৎসরকাল পিতৃগৃহে বাস করে। যাইবার সময় উমানাথ বলিল, দেখ, উমা, তোমার আমার একই নাম। বদলাতে হবে। আমি তোমাকে বল্‌ব—বৌ। তুমি আমাকে কি বল্‌বে, বল দিকি?

আপনি যা' ব'লে দেবেন।

উমানাথের বড় আমোদ বোধ হইল। বলিল, আপনি! আমাকে 'আপনি' কেন?

গুরুলোককে যে 'আপনি মশাই' বল্‌তে হয়।

আমি বুঝি তোমার গুরুলোক?

তবে কি লোক?

উমানাথ বড় বিপদে পড়িল।

এ প্রশ্নের সদুত্তর কোন পাঠ্য পুস্তকে নাই, কোন শিক্ষকও ব'লে দেন নি। বলিল, আমি যে তোমার ভাল-বাসার লোক।

উমা বলিল, তবে তাই বল্‌ব?

কি?

ভালবাসার লোক।

উমানাথের বড় হাসি পাইল। কিন্তু সে হাসি চাপিয়া ভাবিতে লাগিল, ইংরাজী ভাষাটি বেশ! 'মাই লাভ' (my love)—কত ভাব! কিন্তু বাংলায় তা' ত বলা চলে না। তাই ত!

এ দিকে এই কঠিন সমস্যার মীমাংসা হইতেছে না, ও

দিকে 'মহাপায়া' বহিবার বেহায়া হইতে মায় পুরোহিত পর্য্যন্ত তাড়া দিতেছেন—বারবেলা পড়িবে। ওঃ, বারবেলা, দিক্‌শূল, অশ্লেষা, মঘা, তেরস্পর্শ—প্রেমচর্চ্চায় এমনি কত অনাসৃষ্টি যে পঞ্জিকা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার ত অন্ত নাই!

ও-দিক্ হইতে আবার তাড়া। উমা—নূতন বধূ একটু অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। এমন সময় এই গুরু সমস্যার আপনিই সমাধান হইয়া গেল। পাড়ার এক ঠাক্‌রুণদিদি বন্ধ দ্বারের বাহির হইতে বলিলেন, কি লো, বরের সঙ্গে কথা যে ফুরয় না। গড় করি, মা, বিয়ের কনে, কি বেহায়াপনা!

কিন্তু উমানাথ গ্রাহ্যই করিল না। বরং খুসী হইয়া ভাবিল, ঐ কথাটাই ভাল—বর। কথাটা কিন্তু এর মুখ দিয়া বাহির করিতে হইবে। বলিল, আচ্ছা, বৌ— গুরু-লোক নয়—আমি তোমার আর কে?

আপনি আমার—

আবার 'আপনি!'

মৃদু ধমকে উমা একটু থতমত খাইয়া গেল। বলিল, আমার বর।

বেশ, বেশ! আচ্ছা, ঐ ব'লে ডেকে যাও।

উমা বলিল—ঐ।

উমানাথ হাসিয়া বলিল, তুমি ভারি রসিক, বৌ! ঐ নয়, বল বর।

'বর' বলিয়াই দ্রুত নিষ্ক্রমণ।

৩

দিন যায় বটে, থাকে না। কিন্তু আমার পাঠক-পাঠিকাদের ভিতর কেহ যদি নবপরিণীত থাকেন, একবার ভাবিয়া দেখুন, নবানুরাগের বিচ্ছেদ-কণ্টকিত দিনগুলি কেমন করিয়া কাটিতেছে। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় মিলনের পথ চাহিয়া অভিশপ্ত সময় যে কেমন করিয়া বহিয়া যায়, বেদনাভারাক্রান্ত বিরহ-বিকল পলগুলি কেমন করিয়া যে অচপল, অপলক নেত্রে মুখের পানে চাহিয়া থাকে, বাঞ্ছিত-মিলনে যে মধুর বিনিদ্র রাত্রি মুহূর্ত্তে পোহাইয়া যায়, বঞ্চিত দশায় সেই বিধুর বিনিদ্র রজনী অজগর সর্পের ন্যায় কেমন করিয়া যে মন্থরগতি প্রাপ্ত হয়, তাহা একমাত্র ভুক্তভোগীই ধারণা করিতে পারেন। একটিমাত্র নীরব চুম্বন যার আলম্বন, পত্রে তাহা ব্যক্ত করিবার আকিঞ্চন, কেবল ছত্রে ছত্রে অশ্রু-সিঞ্চন। উমানাথ উমাকে শতবার পত্র লিখিল, শতবার ছিঁড়িল। অবশেষে পাগলের উদ্দেশে চলিল।

কিছুক্ষণ অন্বেষণের পর উমানাথ দেখিল, পাগল এক ঘন কিশলয়সমাচ্ছন্ন লতা-বিতানে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বলি-তেছে, লাগ্ ভেল্‌কি লাগ্—লাগ্ ভেল্‌কি লাগ্!

উমানাথ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কি ব্যাপার!

পাগল বলিল, চুপ্ চুপ! ওর ফুল ফুটবে।

লতায় ফুল ফুটবে, তার আবার ভেল্‌কি কি?

বাজীকর আমের আঁটি পুত্‌লে, চারা হ'ল, ফল ধর্‌ল, তার পর চেয়ে দেখ, সে গাছও নেই, আমও নেই। সুধু বাজীকর দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু সে যে ভেল্‌কি দেখাচ্ছে।

এও ভেল্‌কি দেখাচ্ছে। মেয়ে হ'ল, ট্যাঁ ট্যাঁ ক'রে মাই খেলে। তার পর দাঁত উঠ্‌ল—বোল ছুট্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে গা'ময় ফুল ফুট্‌ল, অমনি মৌমাছি যুটল মধু খেতে, জানে না যে, সে মধু নয়, মাটীরই রস। তখন সেই খাদি চুল হয়েছেন খোঁপা, সমজ্‌দার তারিফ্ করছেন তোফা! জানেন না যে, ও খোঁপা নয়—কুণ্ডলী পাকানো সাপ, একেবারে মাথার ওপর উঠে বসেছে।

উমানাথ কহিল, তা হ'ক, পাগল, সেও সুন্দর।

পাগল বলিল, হাঁ, বাবাজি—সুন্দর। নইলে আর বাজীকরের বাজী কি? তবে দুঃখ এই যে, সত্য নয়।

সত্য নয়?

সত্য বল কাকে? যা চিরদিন থাকে। সাপ খোলস ছাড়লে, একেবারে ধবধবে সাদা। চুল হ'ল শোণের নুড়ি। তখন কাল কেউটে আর চক্কর ধরে না। বিষদাঁত ভেঙ্গে গিয়েছে। গা'ভরা ফোটা ফুল সব ঝরে পড়েছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে চিতেয় চড়েছে। তার পর যে মাটী, সেই মাটী! মাঝখান থেকে একটা ভোজবাজী হয়ে গেল। তখন যদি চোখ চেয়ে দেখ, দেখ্‌বে, সেই বাজীকরই দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর সব মিছে, সেই বাজীকরই সত্য।

উমানাথ বলিল, পাগল, তোমাকে আমি খুঁজছিলুম।

পাগল সবিস্ময়ে চাহিয়া কহিল, তুমি ত আর এক পাগল হে!

কেন?

পাগল নইলে পাগল খোঁজে ?

তুমি কি কাউকে খোঁজ না ?

হাঁ, খুঁজি। আমি খুঁজি মহাজন।

মহাজন ?

হাঁ। আমি রসের পাগল। রসকরা, রসগোল্লা খাব ব'লে মহাজন খুঁজছি।

তেমন মহাজন ত অনেক রয়েছে।

আ—রামঃ। কোথা ? সব ছিটে বেড়ার আড়ত ক'রে চিটে গুড়ের কারবার করছে।

কেন, রসগোল্লা ত বাজারে ঢের পাওয়া যায়।

সব চিটে রস। ও কি রসকরা, না, ময়রার মস্করা। আমি চাই এমন রসগোল্লা যে, ফুরবে না। পেট ভ'রে খেলেও ক্ষিধে বাড়্‌বে।

এমন মহাজন পাবে কোথা ?

প্রাণ দিয়ে খুঁজলেই পাবে। কিন্তু, বাবাজি, তোমার অত খোঁজে কায কি ? বে' থা করেছ। এইবার কুমোরের ব্যবসা ধর। দেদার পুতুল গড় আর গাড়ী-ঘোড়া চড়।

পুতুল গড়্‌ব কেন ?

নইলে গুষ্টীর পিণ্ডি চট্‌কাবে কে, বাপধন ?

তা হ'ক। সে মহাজন কোথা বলুন।

কি জান, বাবাজি, তার সখের মহাজনী। ঘরে ঘরে ফেরি করে। তোমার যখন বড় তেষ্টা পাবে, তখনি শুন্‌বে, দোরে এসে হাঁক্‌ছে—

চাই রসের কুল্‌পি চাই।
পাবে আনা-আনা আনারসে
সিকেয় দু'ট ক্ষীর-মালাই॥
ঠকাব না মাল দেব খাটি—
পরিপাটী ভাবের জমাটি,
এ সখের ব্যাসাত সখে বিলুই
মনের মানুষ যদি পাই॥

পাগল গাহিতে গাহিতে অন্যমনে চলিয়া গেল। উমানাথ তাহার পশ্চাৎ চাহিয়া রহিল। পরে ঘরে ফিরিল।

৪

বৎসর অতীত না হইতে উমা শ্বশুরালয়ে ফিরিল। নানা কারণে বর-বধূর এই কয়মাস সাক্ষাৎ হয় নাই। মাঝে মাঝে পত্র-বিনিময় হইয়াছে মাত্র। বধূর প্রথম সন্দর্শনে উমানাথ বিহ্বল হইয়া পড়িল। এই সেই, তবু সে নয়, কোথা হইতে যেন নব জন্ম লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে! সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টি, কিন্তু চকিতে চকিতে যেন বিদ্যুৎ চমকিতেছে! উমানাথ বুঝিল, ইহার স্পর্শে মৃত্যু। সেই স্মিত হাসি, কিন্তু কি মধুর মাদকতাময়! সেই সব, তবে এ বৈভব এ কোথা হইতে পাইল ? কে যেন রেখাচিত্রের উপর রং বুলাইয়া দিয়াছে।

উমা জিজ্ঞাসা করিল, অমন একদৃষ্টে কি দেখছ ? চিন্‌তে পারছ না ?

উমানাথের মনে হইল, এমন কোন বাদ্যযন্ত্র সে শুনে নাই—যাহার সহিত এ স্বরের তুলনা হইতে পারে। শ্যাম, শ্যাম, তোমার হাসি তোমার বাঁশী কি এমনি মধুর!

উমা আবার হাসিয়া কহিল, চিন্‌তে পারলে না বুঝি ?

বধূর দ্বিতীয় প্রশ্নে উমানাথের সে স্বর-সুধার পিপাসা বাড়িয়া উঠিল। বলিল, বৌ, কথা কও।

সঙ্গে সঙ্গে সেই দুষ্ট পাখীটা বার বার করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল, বৌ কথা কও, বৌ কথা কও!

উমানাথ হাসিয়া বলিল, ঐ শোন! আমি একবার, ও হাজারবার মিনতি করছে, বৌ, কথা কও।

না, ও বল্‌ছে—বর, কথা কও। বলিয়া উমা বরের পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। উমানাথ চকিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, এ কি, এই সব চাঁপার কলি—অঙ্গুলি, না, অগ্নিশিখা!

প্রণাম করিয়া বধূ বরের মুখের পানে মুখ তুলিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল। তাহার সেই রাগরঞ্জিত স্ফুরিত ওষ্ঠপুট, নয়নের নীরব মিনতি উমানাথকে উন্মাদ করিয়া তুলিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই পাগলের কথা মনে হইল—আগুনের মাঝখানে ব'সে যার গায় আঁচ লাগে না, সেই ত বীর!

ঝঞ্ঝাবাতের মত একটা প্রবল দীর্ঘশ্বাস দমন করিতে করিতে উমা উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তুমি 'অসিধার' না কি ব্রত নিয়েছ, স্বপাক হবিষ্য কর, কম্বল পেতে শোও, রেঁধে দুদিন হাত পুড়িয়েছ—

পুরুতমশায় বলেছেন, সহধর্ম্মিণী রেঁধে দিলে কোন দোষ হবে না।

এ তনু-আবরণ শ্রীহীন ম্লান
ঝরে ত ঝ'রে যাক শুকায়ে,
হৃদয়-মাঝে মম দেবতা মনোরম

ত্রিসীমানায় আসব না। এমন ক'রে আমার জীবন ব্যর্থ ক'রে দিয়ো না। একটুখানি সেবা করতে দাও।

অশ্রু আর বাগ মানিল না।

উমানাথ বিচলিত হইয়া বলিল, তাই হবে, উমা। তা'তে যদি তুমি সুখী হও, তাই হবে।

উমা কহিল, সুখী! আমি খুব সুখী, খুব সুখী! আর বেশি সুখী হ'লে সইবে না।

আহার ও শয়ন সম্বন্ধে উমানাথ ব্রহ্মচর্য্যের বহিরাচার ভঙ্গ করিল। কিন্তু মানুষের মন অনেক কঠিন বন্ধন দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

৮

উমানাথ যে ঘরে শয়ন করিত, তাহা খিড়কির বাগানের ঠিক উপরে। গভীর রাত্রে ধীরে ধীরে সে জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল, যেন স্বপ্নে আঁকা চিত্র। জল নিস্তরঙ্গ, পত্র নিস্পন্দ। কোথাও সাড়া নাই, শব্দ নাই। কেবল চন্দ্রকর যেন ঝিল্লীর গানে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। মায়া, মায়া, এ সবই মায়া। কিন্তু কি সুন্দর! শ্যামসুন্দর, তুমি কেমন দেখিনি, কিন্তু তুমি নিশ্চয় আরও সুন্দর। আহা, উমাকে দেখাই।

উমা পাশের ঘরেই শয়ন করিত। দ্বার অর্গলবদ্ধ নহে, ভেজান থাকিত মাত্র। যদি ঘুমাইয়া থাকে, ঘুম ভাঙ্গাইবে না ভাবিয়া উমানাথ নিঃশব্দপদসঞ্চারে প্রবেশ করিল।

বধূ নিদ্রিতা। ঈষৎ হসিতাধরা। হয় ত কি স্বপ্ন দেখিতেছে। স্বপ্ন—স্বপ্ন দেখিতেছে। উমানাথ অনিমেষ-নেত্রে দেখিতে লাগিল। ঘুমঘোরে বধূর বক্ষোবস্ত্র ঈষৎ স্রস্ত। মৃদু নিশ্বাসে উঠিতেছে পড়িতেছে, যেন বীচি-আন্দোলিত ঈষৎ ফুল্ল কমল-কোরক।

দেখিতে দেখিতে উমানাথের শিরায় শিরায় খরস্রোত প্রবাহিত হইল। আত্মহারা হইয়া উমাকে স্পর্শ করিবামাত্র সে ত্রস্ত হইয়া বসন সংযত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার প্রফুল্ল কপোলযুগল রক্তিম আভায় অধিকতর রমণীয় হইয়াছে। উত্তেজনায় বক্ষঃস্থল ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে। বাতুল উমানাথ বধূকে বক্ষে ধারণ করিবার নিমিত্ত কর প্রসারণ করিতেই উমা বলিল, এ কি! তোমার জীবনের ব্রত সামান্য একটা স্ত্রীলোকের জন্য ভঙ্গ করবে? তোমার পবিত্র শরীর কলুষিত করবে?

উমানাথ শ্বাস-কম্পিত স্বরে কহিল, তা হ'ক, উমা! ব্রত যাক, ধর্ম্ম যাক—

ছি! বলিয়া উমা দ্রুতপদে অন্য কক্ষে গিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিল। ক্ষণিকের মোহে চেতনা পাইয়া লাঞ্ছিত অবসন্ন উমানাথ শয্যার উপর বসিয়া শুনিল, কে নিষুপ্ত নিঃশব্দ ভবন গুঞ্জরিত করিয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে।

উমানাথ বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এখনই ত সর্ব্বনাশ হয়েছিল। আপনাকে আর বিশ্বাস করা যায় না। পলায়ন—পলায়ন—পলায়ন ব্যতীত আত্মরক্ষার আর উপায় নাই। আজ উমা আমায় রক্ষা করিল,কিন্তু কাল? মনে হ'ত, নারী আমার শত্রু; কি বিষম ভ্রম! শত্রু আমার ভিতরে। উমানাথ সঙ্কল্প স্থির করিয়া উমার কাছে ব্যক্ত করিল।

উমা বলিল, পথের কাঁটা ব'লে আমাকে মাড়িয়ে চ'লে যাবে? কি করেছি আমি তোমার?

কি করেছ? শাস্ত্র বলে, নারী নরকের দ্বার। কিন্তু তুমি আমায় নরক থেকে রক্ষা করেছ।

সেই অভিমান? কিন্তু বুঝে দেখ—

অভিমান নয়, উমা! আমি সত্য বল্‌ছি। কেঁদ না, কেঁদ না! তুমি সত্যই আমাকে রক্ষা করেছ। আমার এ জীবনটাই নইলে বৃথা হ'ত।

কেন তুমি যাবে, পথে পথে ফিরবে? তার চেয়ে আমায় সরিয়ে দাও।

উমা, উত্তরমুখো দক্ষিণমুখো একসঙ্গে চলা যায় না। তা' যদি হ'ত, বুদ্ধদেব গোপাকে ত্যাগ ক'রে যেতেন না।

গোপার অবলম্বন ছিল পুত্র রাহুল। আমার কি আছে?

তোমায় অবলম্বন? এস।

উমানাথ শ্যামসুন্দরকে দেখাইয়া বলিল, ঐ তোমার অবলম্বন।

ঐ পাথর?

পাথর নয়, পাথর নয়। প্রাণ দিয়ে দেখ—প্রাণময়। প্রাণ দিলে শ্যাম কথা কয়, হাসে, সোহাগ করে। প্রাণ দিয়ে দেখ, আমার শ্যামসুন্দর কত সুন্দর!

তোমার শ্যামসুন্দর যত সুন্দর হ'ক, আমার শ্যামসুন্দর তুমি।

আমি! এই শরীর—যা এত সুন্দর মনে করছ, জরায়

আক্রমণ করবে, মৃত্যুর পর ঘৃণায় কেউ ফিরে চাইবে না। উমা, আমাকে ভুলে যাও, নইলে যন্ত্রণা পাবে। শ্যামকে চাও, সুখী হবে।

আমি খুব সুখী। তোমার সেবা ক'রে, তোমায় দেখে, তোমার কথা শুনে, আমার দিন সুখে কাটছে; আমার এ সুখটুকু কেন কেড়ে নেবে?

উমা, মানুষের ভালবাসায় ভাঁটা পড়ে। মৃত্যু মায়ের কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিয়ে যায়, স্ত্রীর দৃঢ় বাহুপাশ থেকে স্বামীকে ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু শ্যামের প্রেমের জোয়ার একটানা বয়।

তুমি কি আমায় ব্যভিচারিণী হ'তে বল? পায়ে না স্থান দাও, যেখানে তোমার মন টানে, যাও। আমি তোমার পথের কাঁটা হব না। কিন্তু জেনো, প্রাণ থাকতে আমার প্রাণে ভাঁটা পড়বে না। আমার জীবনেও জোয়ার বইবে —চোখের জলে। কিন্তু তুমি পথে পথে বেড়াবে, বৃক্ষমূলে শোবে, আমি কেমন ক'রে রাজ-শয্যায় শোব? তুমি ভিক্ষা করবে, আমি কেমন ক'রে—

উমা আর বলিতে পারিল না। চক্ষু দিয়া দরদর ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল।

উমানাথ কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল, বৌ—

সেই আদরের ডাক! কিন্তু আর কেন—আর কেন—

উমা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। উমানাথ বলিল, উমা, আমার জন্য কেঁদ না, শ্যামের জন্য কাঁদ। তোমার কাঁদা সার্থক হবে। না বুঝে একটা খেয়ালের বশে তোমায় মজিয়ে গেলুম। কি করব! আমি আর আমি নেই। তুমি প্রসন্ন হয়ে আমায় ছেড়ে দাও।

আজকের দিনটা থাক।

উমা, আর আমায় মায়ায় বেঁধ না। আমার বুকের ভিতর আগুন জ্বলেছে। আর আমি এক দণ্ড তিষ্ঠতে পারছি নি।

বাবাকে মাকে ব'লে যাও।

কে কার বাপ, কে কার মা, কে কার স্ত্রী? সব মায়া—ব ভোজবাজী।

উমা স্বামীর পদধূলি লইয়া বলিল, আর কি দেখা বে না?

শ্যামসুন্দর জানেন।

উমা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, হবে, হবে, হবে। তোমাকে শেষ দেখা না দেখে আমি চোখ বুজব না।

একবস্ত্রে উমানাথ গৃহত্যাগ করিল।

উমা কাঁদিল না, অশ্রু পাছে দৃষ্টি রোধ করে। যতক্ষণ দেখা যায়, দেখিল। তার পর তীব্র যন্ত্রণায় লুটাইয়া পড়িল।

অশ্রুধারে দুইটি দুর্ব্বহ বৎসর বহিয়া গেলে উমানাথের পিতা-মাতা সন্তপ্তের সান্ত্বনাস্থল কাশীতে যাত্রা করিলেন। বারাণসীধামে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হয়, যদি সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু উমা সঙ্গে গেল না। বলিল, তিনি আমায় শ্যামসুন্দরকে দিয়া গিয়াছেন, আমি তাঁহাকে লইয়াই থাকিব।

ক্রমে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। পুরোহিত একটা যদৃচ্ছালাভের উদ্দেশ্যে কুশ-পুত্তলি দাহন করিয়া শ্রাদ্ধ-শান্তি করিবার বিধান দিলেন। উমা স্বীকৃত হইল না। বলিল, তিনি জীবিত আছেন।

পুরোহিত একটু বেজার হইয়া বলিলেন, কেমন ক'রে জান্‌লে, বৌমা, কে বলেছে?

উমা দৃঢ়স্বরে বলিল, বলেছে আমার সীঁথার সিন্দুর, হাতের লোয়া, আমার মন। নইলে আমি বেঁচে আছি কেন? শ্যামসুন্দর বলেছেন, দেখা হবে।

শ্যামসুন্দর? ও ত পাথর।

তবে আপনি কার পুজ' করেন?

সদুত্তর দিতে হইলে পুরোহিতকে বলিতে হইত—উদরের। কিন্তু তিনি বহির্ব্বাটীতে কেবল মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, হিঁদুয়ানী গেল।

এ দিকে উমার শরীর দ্রুত, অতিদ্রুত ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। আকার সেই আছে, তবু মনে হয়, সে নয়। এ যেন মূর্ত্তিমতী তপস্যা! পুরোহিত নিত্য নৈবেদ্য নিবেদন করা সত্ত্বেও উমা স্বহস্তে বহুবিধ আহার্য্য যত্নে প্রস্তুত করিয়া শ্যামসুন্দরকে ভোগ দেয়। পরে আপনার নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ রাখিয়া পাগলকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করায়।

পুরোহিত বলিলেন, বৌমা, এ সব অযথা বাজে খরচ কেন?

কি?

আমি একদফা ভোগ দিয়ে যাব, আবার তুমি রেঁধে

ভোগ দাও। শ্যামসুন্দর কি রাক্ষস যে, যা পাবে, তাই খাবে ?

বেশ! আপনি তা হ'লে সকালে মাখন মিছরি মিষ্টি দিয়ে বাল্যভোগ দেবেন। তার পর দুপুর-বেলা খাওয়াব আম।

তুমি খাওয়াবে? তুমি তন্ত্র জানো, না মন্ত্র জানো যে ভোগ দেবে? তোমার হাতে তিনি খাবেন কেন?

কেন খাবেন না?

তুমি ত বামুন নও।

শুনেছি ত শ্যামসুন্দর নিজে গয়লার ছেলে, কায়েতের হাতে খাবেন না কেন?

গয়লার ছেলে? তোমরা শাস্ত্র বোঝ না।

না-ই বুঝলুম। কিন্তু ভক্তি ক'রে দিলে—

ভক্তি! তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীর কি ভক্তি ছিল না?

কে বল্‌লে?

তবে?

তবে কি?

তবে তাঁরা রেঁধে খাওয়াতেন না কেন?

তাঁদের দরকার হয় নি।

যত দরকার তোমারই?

সে আপনি বুঝবেন না।

বুঝব আমার মাথা! ঠাকুর শুদ্ধ এঁটো হয়েছে, তা জানো?

উমা কহিল, ইচ্ছা না হয়, আপনি এঁটো ঠাকুরের পূজ করবেন না। যিনি রাজি হবেন, তিনিই করবেন।

পুরোহিত বেগতিক বুঝিয়া বলিলেন, রাজি হব না কেন বৌমা! রাজি যে হতেই হবে, সাত পুরুষের যজমান। কিন্তু সেরূপ দক্ষিণা দেয় কে?

সে আমি দেব।

তা হ'লে ত কথাই নেই, বলিয়া পুরোহিত চলিয়া গেলেন।

আশার মোহিনী-ভাবে এমনি নিষ্ফল প্রতীক্ষায় আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। কৈ, তিনি ত আসিলেন না। দ্বাদশ বৎসর পরে সন্ন্যাসীও ত আপনার জন্মভূমি দর্শন করিতে আসে। বুঝি এখানে আসিবার পক্ষেও আমি তাঁর পথের কাঁটা। শ্যামসুন্দর, কি পাপে আমার এ শাস্তি! কি অপরাধে আমার জীবন এমন করিয়া ব্যর্থ করিয়া দিলে? আমি স্ত্রী নই, মা নই, আমি কেবল অভাগিনী।

বধুর বিধুর হৃদয়ের ন্যায় উমানাথের শয়ন-কক্ষটাও যেন তেমনই তাহার প্রত্যাশায় রহিয়াছে। দুগ্ধফেননিভ শয্যা তেমনই পাতা। উমা তাহার ব্যবহারের প্রত্যেক জিনিষটি সাজাইয়া গুছাইয়া রাখে। এই ঘরই তাহার সুখ-স্মৃতির বাসর। দিনশেষে উমার অন্ধকার হৃদয়ের প্রতিচ্ছবিরূপে সন্ধ্যা যখন ঘনাইয়া উঠে, ধীরে ধীরে সে নিত্য খিড়কির বাগানে আসিয়া বসে—সেই বকুল-মূলে যেখানে তিনি তাহাকে প্রথম সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। এই ত সে দিনের কথা, কিন্তু তাহার পর যুগ বহিয়া গিয়াছে।

এমনই এক বৈশাখী সন্ধ্যায় উমা দেখিল, পাগল এক আম্রবৃক্ষের গুঁড়ি ধরিয়া ঘুরিতেছে আর বলিতেছে—খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি।

উমা কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, বাবা, অনেক দিন ত হ'ল, তুমি যদি বল ত আমি খুঁজ্‌তে যাই।

পাগল উৎসাহভরে কহিল, যাবি মা, বেশ বেশ! নইলে আর খুঁজে পাবিনি। ভাই যা।

উমা যাইতে যাইতে শুনিল, পাগল অশ্রু-বিকসিত-কণ্ঠে গাহিতেছে—

সত্যি কি মা যাবি উমা, পাষাণপুরী শ্মশান করে।
আবার কবে দেখা হবে, বারেক দেখি নয়ন ভ'রে॥
ভস্মমাখা বলদ-চাপা,
ধ'রে একটা ন্যাংটা ক্ষ্যাপা,
রাজাকে ধিক্ সোনার চাঁপা সঁপে দেছে তারি করে।
ভাঙ্গড় তোলা নাই মমতা,
তুই ত বুঝিস মায়ের ব্যথা,
ভাসিয়ে দিয়ে কনকলতা মার প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে॥

কয়েক জন সঙ্গিনী সঙ্গে উমা তীর্থযাত্রা করিল। এ-দেশ সে-দেশ, এ-তীর্থ ও-তীর্থ ঘুরিয়া উমা যখন শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইল, তখন আর শরীর বহিতেছে না। জ্যৈষ্ঠ-মাসের সূর্য্য মাথার উপর অগ্নিকর বর্ষণ করিতেছেন। প্রান্তর যেন অগ্নিক্ষেত্র। মাঝে প্রত্যাখ্যাতা নারীর অন্তর-তাপ। উমা মনে মনে বলিল, শ্যামসুন্দর, আমি যে বড়মুখ ক'রে বলেছিলুম, দেখা হবে। তার পর সেই প্রান্তরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

এক জন সঙ্গিনী জলের অন্বেষণে ছুটিল। এক জন কোলের উপর তাহার মাথা তুলিয়া লইয়া অঞ্চলে বীজন করিতে লাগিল। সেই সময় কমণ্ডলু-করে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত।

সন্ন্যাসী উমার শুষ্ক অধরে ও চক্ষুতে জল-সিঞ্চন করিলেন। উমা চক্ষু মেলিয়া দেখিল। সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, মায়া—মায়া, সব ঝুট!

সন্ন্যাসী তাড়াতাড়ি উঠিলেন। কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আর একবার ফিরিয়া দেখিলেন। উমা তখন চক্ষু বুজিয়াছে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

৬

পরন্তু জীবমাত্রেরই যেমন প্রাক্তন সংস্কার ব্যতীত জন্মের পরে ভক্ষ্য-পেয়াদি বিষয়ে বিচিত্র রাগ জন্মিতে পারে না, তদ্রূপ, মানবগণের যে বিদ্যাবিশেষে বিশিষ্ট অনুরাগ ও অধিকার, তাহাও প্রাক্তন সংস্কার ব্যতীত জন্মিতে পারে না। কারণ, মানবগণের মধ্যে সকলেই সকল বিদ্যায় সমান অনুরাগী ও অধিকারী হয় না। কেহ গণিতে বিরক্ত, কিন্তু ইতিহাসে অতীব অনুরক্ত। কেহ আবার ইতিহাসকে উপহাস করিয়া গণিতের গণনায় মত্ত। কেহ কর্কশ তর্কশাস্ত্রের চর্চ্চায় সতত সে বিষয়ে একাগ্রচিত্ত। কেহ আবার অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া সতত সংগীত শিক্ষায় উন্মত্ত। যে বিদ্যায় যাহার অধিক অনুরাগ জন্মে, সেই বিদ্যাতেই তাহার অধিক অধিকার জন্মে, ইহাও সর্ব্বসম্মত সত্য। কিন্তু কেন ঐরূপ হয়? মানবগণের বিদ্যাবিশেষে অধিক অনুরাগ ও অধিকারের মূল কি? ইহা বিচার করিয়া বুঝিতে গেলে পূর্ব্বজন্মে তাহার সেই বিদ্যার বিশেষ অভ্যাস বা অনুশীলন জন্য সংস্কারবিশেষই উহার মূল বলিয়া স্বীকার্য্য। শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্র ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, মনুষ্যত্ব-রূপে সকল মনুষ্য তুল্য হইলেও তাঁহাদিগের মধ্যে প্রজ্ঞা ও মেধার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ আছে। মনোযোগপূর্ব্বক কোন বিদ্যার অভ্যাস করিলে সেই বিষয়ে প্রজ্ঞা ও মেধার বৃদ্ধি হয়, ইহাও পরীক্ষিত সত্য। সুতরাং কোন বিদ্যার অভ্যাস বা অনুশীলন যে, সেই বিদ্যাবিষয়ে প্রজ্ঞা ও মেধার বৃদ্ধির কারণ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা হইলে যে সমস্ত মানবের ইহজন্মে কোন বিদ্যার অনুশীলনের পূর্ব্বে অথবা প্রারম্ভেই সেই বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ এবং প্রজ্ঞা ও মেধার উৎকর্ষ বুঝা যায়, তাহাদিগের সেই বিষয়ে পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসই উহার কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, সে বিষয়ের অভ্যাস বা অনুশীলন ব্যতীত কখনই তাহাতে কাহারই বিশেষ অনুরাগ ও বিশেষ অধিকার জন্মিতে পারে না, কারণ ব্যতীত কার্য্য জন্মে না।

ফল কথা, মানববিশেষের যে, বিদ্যাবিশেষে অত্যন্ত অনুরাগ এবং অল্প উপদেশেই অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাতে বিশেষ অধিকার, তাহা তাহার পূর্ব্বজন্মের সংস্কার ব্যতীত কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সেই বিষয়ে কিছু উপদেশ পাইলেই তখন তদ্দ্বারা তাহার সেই প্রাক্তন সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইয়া থাকে। আবার কাহারও ইহজন্মে কোন উপদেশ ব্যতীতও অদৃষ্টবিশেষ বা অন্য কোন কারণে প্রাক্তন সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হয়, ইহাও সত্য। সেই স্থলে বিনা উপ-দেশেও তাহার বিদ্যাবিশেষে অধিকার জন্মে, ইহারও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আমি যখনই একটি দশমবর্ষীয় বালকের সুকণ্ঠে শিক্ষিত গায়কের ন্যায় 'ধ্রুপদ' গান শ্রবণ করি, তখনই আমার মনে হয়—

> "তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং
> মহৌষধিং নক্তমিবাত্ম-ভাসঃ।
> স্থিরোপদেশামুপদেশকালে
> প্রপেদিরে প্রাক্তন-জন্ম-বিদ্যাঃ" ॥ ৩০

অমরকবি কালিদাস কুমার-সম্ভবের প্রথম সর্গে পূর্ব্বোক্ত মহাসত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে হিমালয়-দুহিতা জগন্মাতা পার্ব্বতীরও বিদ্যার বর্ণন করিতে উক্ত শ্লোকের দ্বারা বলিয়া-ছেন যে, যেমন শরৎকাল উপস্থিত হইলেই হংসমালা গঙ্গাকে প্রাপ্ত হয় এবং রাত্রিকাল উপস্থিত হইলেই বনস্থ মহৌষধিকে তাহার নিজ নিজ প্রভাসমূহ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, পার্ব্বতীর শিক্ষাকাল উপস্থিত হইলেই তাঁহার প্রাক্তনজন্মের সমস্ত বিদ্যা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। পার্ব্বতীর প্রাক্তনজন্মের সমস্ত উপদেশ অর্থাৎ তজ্জনিত সমস্ত সংস্কারই স্থির অর্থাৎ বিদ্যমান ছিল, তাঁহার কোন সংস্কারেরই ধ্বংস হয় নাই —ইহা প্রকাশ করিতে কলিদাস উক্ত শ্লোকে তাঁহাকে বলিয়াছেন—"স্থিরোপদেশা"। ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায় জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিলেও তাঁহাদিগের মতে সমস্তই ক্ষণিক। কোন সংস্কারই একক্ষণের অধিককাল বিদ্যমান থাকে না; দ্বিতীয়ক্ষণেই আবার অন্য সংস্কার জন্মে। কিন্তু "স্থিরবাদী" কালিদাস ঐ কথার দ্বারা কৌশলে উক্ত বৌদ্ধমতেরও প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন, ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক। আর প্রকৃত বিষয়ে ইহা অবশ্য লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, উক্ত শ্লোকে কালিদাস পূর্ব্বোক্ত দুইটি উপমার দ্বারা পার্ব্বতীর সেই জন্মে কাহারও উপদেশ ব্যতীতও

প্রাক্তনজন্মের সেই সমস্ত সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হওয়ায় সেই সমস্ত বিদ্যার প্রাপ্তি হইয়াছিল, ইহা ব্যক্ত করিয়া কাহারও যে, ইহজন্মে উপদেশ ব্যতীতও যে কোন কারণে প্রাক্তন সংস্কারবিশেষের উদ্বোধ হওয়ায় সহজেই বিদ্যাবিশেষের প্রাপ্তি হয়, এই মহাসত্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কালিদাসের প্রদর্শিত ঐ দুইটি উপমা ও উহার প্রয়োজন বুঝিলেই তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে এবং বুঝিতে পারিবে, প্রাচীন সমালোচক সত্যই বলিয়াছেন—"উপমা কালিদাসস্য"।

মূল কথা, ইহজন্মে উপদেশ ব্যতীতও যে, ব্যক্তিবিশেষের বিদ্যাবিশেষ-লাভ হইয়া থাকে এবং তাহাতে তাহার পূর্ব্বজন্মের সুদৃঢ় সংস্কারই মূল, ইহা পরম সত্য। তাই ইহজন্মে উপদেশ ব্যতীতও অনেক বালকের সংগীত ও বাদ্য শুনা যায়। অনেক বালকের চিত্র-অঙ্কন দেখা যায়। অনেক বালকের প্রতিমাগঠন দেখা যায়। অনেক বালকের বিস্ময়কর ক্রীড়াবিশেষ দেখা যায়। অনেক বালকের অত্যদ্ভুত স্মরণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক বালকের রচিত পদ্যও শুনা যায়। অনেক বালকের মুখে সহসা ধর্ম্মকথা—তত্ত্বকথা শুনা যায় এবং বহু নিরক্ষর কবির উৎকৃষ্ট সংগীত ও পদ্য শুনা যায়। তাহাদিগের মধ্যে অনেকে ইহজন্মে যে সমস্ত দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের উপদেশ লাভ করেন নাই, তাহার বর্ণনও তাহাদিগের সংগীতাদিতে শুনা যায়।

যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ "টপ্" সংগীতের স্রষ্টা নিরক্ষর কবি মধু্ কানের মধুময় সংগীতে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত "ষট্‌চক্রের" বর্ণনার সহিত জগদম্বার স্বরূপবর্ণন শুনিয়া পণ্ডিতগণ কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন—"মধু, তুমি 'ষট্‌চক্র'-তত্ত্ব বুঝিলে কিরূপে? তুমি কাহার নিকটে এই সমস্ত দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের উপদেশ পাইয়াছ? মধু, তুমি ধন্য।" যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ "জারি" গানের স্রষ্টা নিরক্ষর মুসলমান কবি পাগলা কানাইর— "বাহা—কি রথ গড়েছেন সৃষ্টিধর। কিন্তু তার সোয়ার চেনা বড় ভার"—ইত্যাদি গান শুনিয়া বোদ্ধা পণ্ডিতগণ সবিস্ময়ে তাহাকে বলিয়াছিলেন—"কানাই! তুমি কি গীতা পড়িয়াছ? গীতার—'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি—শরীরং রথমেব তু'— ইত্যাদি শ্লোকের সব কথাই যে, তুমি তোমার এই গানে বলিয়াছ। সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর জীবের দেহরূপ যে রথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার সোয়ার অর্থাৎ রথী আত্মা, কিন্তু তাঁহাকে চেনা বড় কঠিন অর্থাৎ সেই আত্মা অতি দুর্জ্ঞেয়, এই সমস্ত তত্ত্ব তুমি কাহার উপদেশে জানিয়াছ?" পাগলা কানাই কিন্তু সেই জন্মে কোন পণ্ডিতের নিকটেই ঐ সমস্ত কথা শুনেন নাই, ইহা সত্য। এখনকার পকেট গীতাও তিনি দেখেন নাই; তাঁহার অক্ষরপরিচয়ও ছিল না। নিরক্ষর মধু কান ও পাগলা কানাই পণ্ডিতগণের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। তখন অমর কবি কালিদাস পণ্ডিতগণকে স্মরণ করাইয়া দিলেন—"প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ।"

আর যে কালিদাস "কুমার-সম্ভবে" ঐ কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কবিত্বশক্তিও ত তাঁহার পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবিশেষ। শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারাও ত সকলে তাঁহার ন্যায় কাব্য রচনা করিতে পারেন না। বস্তুতঃ প্রাক্তন সংস্কার ব্যতীত কেহই কোনরূপ কাব্য রচনা করিতে পারেন না এবং অপরের কাব্য বুঝিতেও পারেন না। মহামনীষী মম্মট ভট্টও "কাব্য-প্রকাশের" প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

"শক্তিঃ কবিত্ববীজরূপঃ সংস্কারবিশেষঃ। যাং বিনা কবিত্বং ন প্রসরেৎ, প্রসৃতং বা উপহসনীয়ং স্যাৎ॥"

কবিত্বের বীজরূপ সংস্কারবিশেষই কবিত্বশক্তি। উহা কেবল ঐহিক সংস্কার নহে। উহার মধ্যে প্রাক্তন সংস্কারই মূল ও প্রধান। ঐ শক্তি বা সংস্কার না থাকিলে কবিত্বের প্রকাশ বা কাব্যরচনা সম্ভবই হয় না। কবির কাব্যরচনায় যে শক্তি অত্যাবশ্যক, তাহাকে বলে কবির কর্ত্তৃত্বশক্তি। কিন্তু তাঁহার ঐ কাব্য বুঝিতে যে শক্তি অত্যাবশ্যক, তাহাকে বলে বোদ্ধৃত্ব শক্তি। উহাও সংস্কারবিশেষ। উহা না থাকিলেও কাব্য বুঝা যায় না। তাই যাঁহার ঐ বোদ্ধৃত্ব শক্তি নাই, তাঁহার নিকটে উৎকৃষ্ট কাব্যও উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। সকলেই কাব্যরসের আস্বাদ বা অনুভব করিতে পারেন না। যাঁহাদিগের সে বিষয়ে প্রাক্তন সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হয়, সেই সমস্ত পুণ্যবান্ ব্যক্তিই কাব্যের রসাস্বাদ করিতে পারেন। ভারতের আলঙ্কারিক প্রমাণ দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

ফল কথা, কাব্যের রসাস্বাদে যেমন প্রাক্তন সংস্কারও আবশ্যক, তদ্রূপ কাব্যরচনাতেও প্রাক্তন সংস্কার আবশ্যক। অনেক ব্যক্তির যে বিজাতীয় অদ্ভুত কবিত্বের প্রকাশ হয়,

তাহাতে তাঁহাদিগের বিজাতীয় প্রাক্তন সংস্কারই প্রধান কারণ বলিয়া জানিবে। এই যে সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতে কত কত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকবি এবং কত স্ত্রী-কবি কত স্থানে কত প্রকারে সংস্কৃত ভাষায় অতিশীঘ্র বহু বহু সুকঠিন সমস্যা পূরণ করিয়া অত্যদ্ভুত কবিত্বের প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং এই বঙ্গভূমিতে বহু বহু অপণ্ডিত কবিও বঙ্গভাষায় অতিশীঘ্র গুরুভাবপূর্ণ কত কত সঙ্গীতাদি রচনা ও সমস্যাপূরণ করিয়া অতি বিস্ময়কর কবিত্বের প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, উহা তাঁহাদিগের সে বিষয়ে পূর্ব্বজন্মের বিজাতীয় সংস্কার ব্যতীত কখনই সম্ভব হইতে পারে না। কেবল ইহজন্মে শিক্ষা বা অভ্যাস দ্বারা কাহারই ঐরূপ শক্তিলাভ সম্ভব হয় না। কিছু দিন পূর্ব্বেও বাঙ্গালার কবির গানের অভ্যুদয়কালে প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা হরুঠাকুর, ভোলা ময়রা, ভবানী বণিক ও নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতি নানাস্থানে অত্যদ্ভুত কবিত্ব প্রকাশ করিয়া পণ্ডিত-সমাজে তাঁহাদিগের বিজাতীয় প্রাক্তন সংস্কারের প্রকট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তখন তাঁহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা 'এণ্টনি' সাহেবের হর-পার্ব্বতীর বন্দনা ও ভক্তিময় সংগীত শুনিয়া পণ্ডিতগণও বিস্মিত হইয়াছেন। এণ্টনি সাহেবের—"নিজ গুণে দয়া কর মা, ও মা শৈলসুতে! ও মা আমি জাত্‌ ফিরিঙ্গি জবড় জঙ্গি, বাস করি শ্রীরামপুরের গীর্জ্জাতে"—ইত্যাদি ভক্তিময় গান শুনিয়া এক দিন বৃদ্ধগণ কান্দিয়া বলিয়াছিলেন—"হায় হায়, কোন্‌ কর্ম্মফলে কোন্‌ মাতৃভক্ত সাধক ফিরিঙ্গি হইয়া জন্মিয়াছেন"।

পূর্ব্বজন্মের সাধনাও তন্মূলক সংস্কারের মহনীয় মহিমায় প্রাচীনকাল হইতে এই ভারতে কত কত বিখ্যাত ভক্ত সাধক যে, কতপ্রকারে কত কত ভাবময় সংগীতাদির দ্বারা ভারতের প্রাচীন ভাবধারা সতত অব্যাহত রাখিয়াছিলেন, এবং কত ভাবে যে সর্ব্বত্র জন্মান্তরবাদের শান্তিময় সংস্কারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা আর কি বলিব। কিন্তু এখন আর সে সব সংগীত বড় শুনিতে পাই না। এখন আর সেই সোনার বাঙ্গালার মৃত পল্লীর ঘরে ঘরে মাতৃভক্ত রামপ্রসাদের অমৃত সংগীতও শুনা যায় না। এখন আর বাঙ্গালার গুরুভারবাহী বৃদ্ধ কৃষকও পথে ঘাটে মাঠে পরিশ্রান্ত হইয়া পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল চিন্তা করিতে করিতে "বোঝা নামাও, ও মা ব্রহ্মময়ি, একবার তিলেক জিড়াই" ইত্যাদি রামপ্রসাদের গান ধরিয়া হৃদয়ে শান্তি ও বলের প্রতিষ্ঠা করে না। আর সে দিন নাই—"তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

শিষ্য। অনেক প্রাচীন কথা শুনিলাম। এ সব কথা শুনিতেও বড় ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু কবিত্বশক্তি ও গানশক্তি প্রভৃতিকে লোকে বলে ঈশ্বরদত্ত শক্তি। ঈশ্বরই ব্যক্তিবিশেষকে ঐ সমস্ত শক্তি প্রদান করেন। তাহা হইলে উহাকে প্রাক্তন সংস্কার কেন বলিতেছেন, ইহা ত বুঝিতেছি না। আর নবজাত শিশুর যে, আহারেচ্ছা, তাহাও ত ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃই জন্মে। ঈশ্বরই তাহার জীবনরক্ষার্থ তখন তাহাকে ঐরূপ বুদ্ধি প্রদান করিয়া স্তন্যপানাদিতে প্রবৃত্ত করেন। তাহার জীবনরক্ষার্থ তাহার মাতার স্তন ও তাহাতে দুগ্ধের সৃষ্টিও ত তিনিই করিয়াছেন। সুতরাং নবজাত শিশুর স্তন্যপানাদি বিষয়ে যে ইচ্ছা, তাহাতেই বা প্রাক্তন সংস্কারের প্রয়োজন কি?

গুরু। নবজাত শিশুর জীবনরক্ষার্থ ঈশ্বরই তাহাকে স্তন্যপানাদিতে প্রবৃত্ত করেন, ইহা সত্যই বলিয়াছ। কারণ, তিনিই সর্ব্বজীবের সর্ব্বকর্ম্মের কারয়িতা। তিনি কর্ম্ম না করাইলে কোন জীবই কোন কর্ম্ম করিতে পারে না। আর কবিত্বশক্তি ও গানশক্তি প্রভৃতিও তিনিই প্রদান করেন, ইহাও সত্য। কিন্তু বল দেখি, সর্ব্বশক্তিমান্‌ করুণাময় পরমেশ্বর সকল মানবকেই কবিত্ব-শক্তি ও গানশক্তি প্রভৃতি প্রদান করেন না কেন? এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবকেই যথাসময়ে তাহাদিগের ইচ্ছানুসারে সমুচিত আহার প্রদান করেন না কেন? আর তিনি কোন সময়ে অনভিজ্ঞ সরল শিশুকেও বিষলিপ্ত স্তনচোষণে অথবা দূষিত দুগ্ধাদি পানে প্রবৃত্ত করাইয়া তাহার জীবনান্ত করেন কেন? তিনি যে জীবের সাধু কর্ম্মের ন্যায় অসাধু কর্ম্মেরও কারয়িতা, ইহাও ত তোমার স্বীকার্য্য। শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন। সুতরাং তুমি কিরূপে শাস্ত্রসিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য-বিধান করিবে। তুমি শাস্ত্রানুসারে যে সিদ্ধান্ত বলিয়াছ, শাস্ত্রানুসারেই ত তাহার সামঞ্জস্যবিধান করিতে হইবে। সুতরাং তোমার বলিতেই হইবে যে, পরমেশ্বর সর্ব্বজীবের কর্ম্মফলানুসারেই অনাদি কাল হইতে এই বিচিত্র সৃষ্টি করিতেছেন এবং তিনিই সর্ব্বজীবের নিজকৃত কর্ম্মফল পাপ-পুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারেই সর্ব্বজীবের বিচিত্র সুখ-দুঃখ-বিধান করিতেছেন। তাহা

হইলে তুমি সেই পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া প্রকারান্তরে যে, জীবের পূর্ব্বজন্মের সমর্থনই করিতেছ, ইহা কি বুঝিতেছ না? মহর্ষি গৌতমও পরে বলিয়াছেন—

"পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ"—৩।২।৬০।

অর্থাৎ জীবের যে, বিচিত্র শরীর-সৃষ্টি, তাহা জীবের পূর্ব্বজন্মকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ধর্ম্মাধর্ম্মজন্য। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফল ব্যতীত জীবের বিচিত্র শরীর-সৃষ্টি হইতেই পারে না। নিজের ইচ্ছানুসারে কেহ শরীরলাভ বা জন্মলাভ করিতে পারে না। ইচ্ছা করিলেও সকলে রাজপুত্র হইয়া জন্মলাভ করে না। ফল কথা, অনন্ত জীবের যে বিচিত্র জন্ম ও তন্মূলক বিচিত্র অবস্থা, তাহা সেই সেই জীবের প্রাক্তন কর্ম্মফল ব্যতীত অন্য কোন কারণে সম্ভব হইতে পারে না। মহর্ষি গৌতম পরে বিচারপূর্ব্বক উক্ত বৈদিক সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়া তদ্দ্বারাও আত্মার নিত্যত্ব সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। কারণ, অনন্ত জীবের অসংখ্য বিচিত্র শরীর-সৃষ্টির কারণরূপে প্রাক্তন কর্ম্মফল অবশ্য স্বীকার্য্য হইলে সমস্ত জীবই যে, অনাদিকাল হইতে নিজ কর্ম্মানুসারে মানবজন্ম লাভ করিয়াও শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াছে ও করিতেছে, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং সমস্ত জীবাত্মাই যে অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান আছে, ইহাও স্বীকার্য্য। তাহা হইলে সমস্ত জীবাত্মার নিত্যত্বই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, অনাদি ভাবপদার্থ জীবাত্মার যেমন উৎপত্তি নাই, তদ্রূপ বিনাশের কোন কারণ না থাকায় কখনও বিনাশও সম্ভবই নহে। জীবের জন্মপ্রবাহ বা জগতের সৃষ্টিপ্রবাহ যে অনাদি, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

পরন্তু ইহাও প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝা আবশ্যক যে, কর্ম্মের অভ্যাস ব্যতীত কোন জীবই কোন কর্ম্ম করিতে পারে না। আমরা ইহজন্মেও কর্ম্মের অভ্যাসবশতঃই অনেক কর্ম্ম করিতেছি। যে কর্ম্মের অভ্যাস নাই, তাহা করিতে পারি না। আবার যে সমস্ত কর্ম্ম অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা ইচ্ছা করিলেও পরিত্যাগ করিতে পারি না। এইরূপ সমস্ত জীবই নিজের অভ্যাসানুসারেই নানা কর্ম্ম করিতেছে। সুতরাং সমস্ত জীবই যে পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসবশতঃই নানা বিচিত্র কর্ম্ম করিতেছে, ইহাও স্বীকার্য্য। নচেৎ জীবের কর্ম্মবিশেষে অধিক অনুরাগ এবং বাল্যকাল হইতেই সেই কর্ম্মে অধিক প্রবৃত্তিও কখনই সম্ভব হইতে পারে না। পিতার হরিনামে রুচি নাই, কিন্তু তাহার তিন বৎসর বয়সের পুত্র হরিনাম শুনিলেই হাতে তালি দিয়া নৃত্য করে, ইহা আমরাও দেখিয়াছি। কিন্তু কেন এমন হয়? কেন সেই বালক ঐরূপ করে? ইহার উত্তরে যাঁহারা যতই তর্ক করিবেন, তাঁহাদিগের সেই সমস্ত কুতর্কের কুত্রাপি প্রতিষ্ঠা হইবে না। পরন্তু বিচারের অসহ্য কশাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া সেই সমস্ত তর্কই উড়িয়া যাইবে। কুতর্কের দ্বারা প্রকৃত সত্যের অপলাপ করা যায় না। প্রকৃত সত্য এই যে, ঐ বালক তাহার পূর্ব্বজন্মের অভ্যাস ও তন্মূলক সুদৃঢ় সংস্কার বশতঃই ঐরূপ করে। তখন তাহার সেই প্রাক্তন সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হয়। নচেৎ আর কোন কারণেই তাহার ঐরূপ কার্য্য সম্ভব হইতে পারে না। আর এই যে অনাদিকাল হইতে কত মানব নিয়ত অধ্যয়ন, দান ও তপস্যাদি কর্ম্ম করিতেছে, তাহাও তাহাদিগের পূর্ব্বজন্মের অভ্যাস বশতঃই করিতেছে। পিতার অধ্যয়নে অনুরাগ নাই, কোন বিদ্যাও নাই; কিন্তু পুত্র স্বেচ্ছায় সতত অধ্যয়নে নিরত। আবার বদ্ধমুষ্টি পিতার বালক পুত্রও সতত দানে মুক্তহস্ত, ইহাও দেখা যায়। পিতা-মাতার সহস্র তিরস্কার ও বাধা সহ্য করিয়াও ভাগ্যবান্ পুত্র সতত তপস্যা ও ভগবদ্‌ভজনে নিরত, ইহারও বহু দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু বল দেখি, কেন এমন হয়? কেন তাহারা ঐরূপ অধ্যয়ন, দান ও তপস্যা করে? সমস্ত মানবই বা তুল্যভাবে কেন ঐ সমস্ত সাধু কর্ম্ম করে না? ভারতের শাস্ত্রবিশ্বাসী পূর্ব্বাচার্য্যগণ সমস্বরে ইহার উত্তর বলিয়া গিয়াছেন—

"জন্ম জন্ম যদভ্যস্তং দানমধ্যয়নং তপঃ।
তেনৈবাভ্যাসযোগেন তচ্চৈবাভ্যসতে নরঃ॥"

("ভামতী" টীকায় (২।১।৩৪) বাচস্পতি মিশ্রের উদ্ধৃত বচন)

বস্তুতঃ মানবের জন্মে জন্মে যেরূপ দান, অধ্যয়ন ও তপস্যাদি সাধু কর্ম্ম এবং হিংসা প্রভৃতি অসাধু কর্ম্ম অভ্যস্ত, মানব সেই পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃই তদনুরূপ সাধু বা অসাধু কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়, ইহাই সত্য। শ্রীভগবান্‌ও—এই মহাসত্য প্রকাশ করিতে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—"পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।" (গীতা-৬।৪৪)। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে সাধু বা অসাধু কর্ম্ম করিতে করিতে তদ্‌বিষয়ে যেরূপ দৃঢ় সংস্কার জন্মে, পরজন্মে সেই সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইয়াই মানবকে তজ্জাতীয় সাধু বা অসাধু

কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। শিশুপাল ইহজন্মেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ন্যায় জগতের পীড়ন করিয়াছিলেন, ইহার কারণ ব্যক্ত করিতে 'শিশুপালবধ' কাব্যে মহাকবি মাঘ বলিয়াছেন—

"সতী চ যোষিৎ প্রকৃতিশ্চ নিশ্চলা
পুমাংসমভ্যেতি ভবান্তরেষ্বপি।" ১।৭২।*

অর্থাৎ সাধ্বী স্ত্রী ও নিশ্চলা প্রকৃতি জন্মান্তরেও সেই পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। শিশুপালের ঐরূপ প্রকৃতি বা স্বভাব তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাসজনিত সংস্কার-মূলক, ইহাই কবির বিবক্ষিত। ফল কথা, প্রাক্তন সংস্কার ব্যতীত জীবের বিচিত্র প্রকৃতি বা কর্ম্মপ্রবৃত্তি কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং জীবের নানাবিধ প্রকৃতি বা প্রবৃত্তি এবং তন্মূলক নানাবিধ কর্ম্ম দ্বারাও জীবের প্রাক্তন সংস্কার অনুমান-সিদ্ধ হয়। প্রাক্তন সংস্কার ব্যতীত যাহা সম্ভব হইতে পারে না, তদ্দ্বারা প্রাক্তন সংস্কারের যথার্থ অনুমানই হয়। চিন্তাশীল ভারতবাসী সুচিরকাল হইতেই ঐ যথার্থ অনুমান করিতেছে এবং প্রাক্তন সংস্কার যে উহার ফল দ্বারা অনুমেয়, এই সিদ্ধান্ত সুচিরকাল হইতেই ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাই মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের প্রথম সর্গে মহামনা দিলীপের রাজোচিত মন্ত্রগুপ্তির বর্ণন করিতে ঐ সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন—

"ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব।"

শিষ্য। নিজ জীবনের এই কয়েক বৎসরেই যখন পদে পদে প্রাক্তন কর্ম্মের প্রভাব নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিয়াছি, তখন জন্মান্তরবাদ মাথায় করিয়া লইয়াছি। প্রাক্তন কর্ম্ম যখন স্বীকার করিতেই হইবে, তখন আর জন্মান্তরবাদের অন্য যুক্তি অনাবশ্যক। আর উহা ত আমাদিগের সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত। কোনরূপেই উহার খণ্ডন করা যায় না। জীবের প্রাক্তন কর্ম্ম ও জন্মান্তরগত হয়। মহাসত্যের বজ্রভিত্তির উপরে আমাদিগের সনাতন ধ্যান মহিমময় মহামণ্ডপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে,—পূর্ব্বজন্মানুভূত কোন কোন বিষয়ের স্মরণ হইলে সমস্ত বিষয়েরই স্মরণ কেন হয় না, আমরা পূর্ব্বজন্মে—কে ছিলাম, কোথায় কিরূপ ছিলাম ইত্যাদি কোন বিষয়ই আমরা কেন স্মরণ করিতে পারি না।

গুরু। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জীবের যে জন্মে যে প্রাক্তন সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হয়, তাহাই তাহার সেই বিষয়ে স্মৃতি উৎপন্ন করে। উদ্‌বুদ্ধ সংস্কারই স্মৃতির কারণ। যে সমস্ত সংস্কার অভিভূত থাকে—তাহা কোন স্মৃতি জন্মাইতে পারে না। সংস্কার থাকিলেই যে সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে স্মৃতি জন্মিবে, এইরূপ নিয়ম বলা যায় না। আমরা ইহজন্মে অনুভূত সমস্ত বিষয়েরও কি সর্ব্বদা স্মরণ করিতেছি? ইহজন্মে অনুভূত কত কত বিষয়ও যে আমাদিগের বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া রহিয়াছে। গুরুতর পীড়া বশতঃ অনেকে অনেক সুপরিচিত ব্যক্তিকেও এবং অনেক পরিজ্ঞাত বিষয়ও ভুলিয়া যায়। ক্রমে আবার সেই সমস্ত বিষয় স্মরণ করে। এইরূপ জীবের মৃত্যু হইলে তখন সেই মৃত্যুই তাহার অনেক সুদৃঢ় সংস্কারও অভিভূত করে। কিন্তু পুনর্জ্জন্ম বা দেহান্তরপ্রাপ্তি হইলে তখন আবার অনেক প্রাক্তন সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হয়। যাহা সংস্কারকে উদ্‌বুদ্ধ করে, তাহাকে সংস্কারের উদ্বোধক বলে। সেই উদ্বোধক বহু প্রকার। মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনে (৩।২।৪১ সূত্রে) স্মৃতির কারণ সংস্কারের সেই সমস্ত উদ্বোধকের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে সর্ব্বশেষে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ অদৃষ্টেরও উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, বহুস্থলে জীবের অদৃষ্টবিশেষও তাহার সংস্কারবিশেষের উদ্বোধক হইয়া থাকে। যেমন নবজাত শিশুর জীবনরক্ষক অদৃষ্টবিশেষই তাহার স্তন্যপানাদি বিষয়ে প্রাক্তন সংস্কারের উদ্বোধক হয়। এইরূপ যে স্থলে অন্য কোন উদ্বোধক নাই, কিন্তু সংস্কারের উদ্বোধ হইয়াছে, সেখানে অদৃষ্টবিশেষকেই সেই সংস্কারের উদ্বোধক বলিয়া বুঝিতে হইবে। ফল কথা, জীবের ইহজন্মে অনুভূত বহু বহু বিষয়েও যেমন সংস্কার থাকিলেও উদ্বোধকের অভাবে সেই সমস্ত সংস্কার সকল সময়ে সেই সমস্ত বিষয়ের স্মৃতি জন্মায় না, তদ্রূপ, অসংখ্য প্রাক্তন সংস্কার

* উক্ত শ্লোকে "সতীব যোষিৎ প্রকৃতিঃ সুনিশ্চলা"—এইরূপ পাঠ মল্লিনাথের সম্মত বুঝা যায়। কিন্তু "সাহিত্যদর্পণের" দশম পরিচ্ছেদে বিশ্বনাথ কবিরাজ "সতী চ যোষিৎ প্রকৃতিশ্চ নিশ্চলা"—এইরূপ পাঠের উল্লেখ করিয়া উক্ত শ্লোকে "দীপক" অলঙ্কারের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। উক্ত পাঠে দুইটি "চ" শব্দের দ্বারা সতী স্ত্রী ও নিশ্চলা প্রকৃতি এই উভয়েরই সমান প্রাধান্য বুঝা যায়। পরন্তু প্রকৃত স্থলে সতী স্ত্রীর সহিত শিশুপালের অসতী প্রকৃতির উপমাও কবির অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না।

হইলে তুমি কিলেও উদ্বোধকের অভাবে সেই সমস্ত সংস্কার যে, জীবে। হওয়ায় তাহা সেই সমস্ত বিষয়ে স্মৃতি জন্মায় না। বুঝিও অনেক প্রাক্তন সংস্কার যে, সময়বিশেষে কোন উদ্বোধক বশতঃ উদ্‌বুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বজন্মানুভূত অনেক বিষয়েরও স্মৃতি জন্মায়, ইহা সত্য। এ বিষয়ে পূর্ব্বে অনেক উদাহরণ বলিয়াছি। অন্যরূপ স্থলেও ইহার উদাহরণ বলিতেছি।

জানি না, তোমার জীবনে এইরূপ ঘটিয়াছে কি না, কিন্তু আমার জীবনে ঘটিয়াছে। ২৯ বৎসর পূর্ব্বে কোন স্থানে আমার অপরিচিত কোন এক ব্রাহ্মণ কোন পথে দূর হইতে আমাকে দেখিয়াই আমাকে ডাকিয়া তাঁহার বাসায় লইয়া তিন মাস পর্য্যন্ত আমাকে তাঁহার নিকট রাখিয়াছিলেন এবং বহু সমাদর ও অচিন্তিত উপকার করিয়াছিলেন। আবার কোন মহারাজাধিরাজও আমার সুপরিচিত কোন যুবককে কোন সময়ে পথে দেখিয়াই তাহাকে ডাকিয়া লইয়া বহু সমাদর করিয়া তাহার অধ্যয়নের সমস্ত ব্যবস্থা ও তাহার পল্লীগ্রামের বাড়ীতে দুর্গোৎসবের ব্যবস্থা পর্য্যন্তও করিয়াছিলেন, ইহাও আমি জানি। সেই যুবকের নিজমুখেও আমি ঐ সমস্ত বিস্ময়কর ব্যাপার শুনিয়াছি। আর ইহা ত অনেকেই জানেন যে, সময়বিশেষে কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিলেও তখনই কাহারও তাহার প্রতি অত্যন্ত প্রীতি জন্মে। কতকালের সুপরিচিত পরমাত্মীয়ের ন্যায় তাহার সহিত ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হয়; তাহাকে ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। তাহার উপকার করিতে উৎকট প্রবৃত্তি জন্মে। কেবল মনুষ্যের মধ্যে নহে, পশ্বাদির মধ্যেও ঐরূপ হইয়া থাকে, ইহা সত্য। কিন্তু কেন এমন হয়, ইহা বুঝিতে পার কি? ভারতের মনস্তত্ত্ববিৎ চিন্তাশীল শাস্ত্রবিশ্বাসী মনীষিগণ বুঝিয়াছেন যে, উক্তরূপ স্থলে সেই ব্যক্তি তাহার সেই দৃষ্ট ব্যক্তির সহিত তাহার পূর্ব্বজন্মের আত্মীয়তা স্মরণ করে। তখন তাহার সে বিষয়ে প্রাক্তন সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হয়। তাহার তখন সে বিষয়ে সম্পূর্ণ স্মৃতি না হইলেও সামান্যতঃ এই ব্যক্তি আমার আত্মীয় বা প্রিয়, এইরূপ অস্ফুট স্মৃতি অবশ্যই জন্মে। অনেক সময়ে অস্ফুটভাবে কাহারও তাহাকে পুত্র বা ভ্রাতা প্রভৃতি বলিয়াও মনে হয়। এইরূপ কখনও কেহ কোন ব্যক্তিবিশেষকে দেখিলেই সেই ব্যক্তির প্রতি তাহার সহসা অত্যন্ত অপ্রীতি জন্মে। তাহাকে ঘোর শত্রু বলিয়া মনে হয় এবং তাহার সহিত সহসা কলহ উপস্থিত হয় এবং তাহার সংসর্গ পরিহারে এবং কখনও তাহার অপকারেও উৎকট প্রবৃত্তি হয়, ইহাও অনেকে জানেন। সুতরাং উক্তরূপ স্থলেও তখন তাহার সেই ব্যক্তির সহিত পূর্ব্বজন্মের শত্রুতা বিষয়ে অস্ফুট স্মৃতি জন্মে, ইহাই স্বীকার্য্য। নচেৎ তখন তাহার ঐরূপ অবস্থা বা ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে না।

এইরূপ কোন সময়ে কোন স্থানে কোন সুদৃশ্য দর্শন বা সুমধুর সংগীতাদি শ্রবণ করিলে সুখী ব্যক্তিও সহসা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হন, ইহাও অনেকেই জানেন। কিন্তু কেন ঐরূপ হয়, ইহা সকলে চিন্তা করেন না। ভারতের মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ চিন্তা করিয়া উহার কারণ বলিয়া গিয়াছেন যে, ঐরূপ স্থলে তখন সেই উৎকণ্ঠিত ব্যক্তি নিশ্চয়ই কাহারও সহিত তাহার পূর্ব্বজন্মের সৌহৃদ্য স্মরণ করে। হংসবতীর সুমধুর সংগীত শ্রবণ করিয়াই রাজা দুষ্মন্ত সহসা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি সুখী হইলেও তখন তাঁহার কোন প্রিয়জন-বিরহ না থাকিলেও—কেন উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন? এ বিষয়ে ভারতের রাজার দ্বারা ঐ প্রকৃত সিদ্ধান্তের ঘোষণা করিতে অমর কবি কালিদাস "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" নাটকের পঞ্চম অঙ্কে রাজা দুষ্মন্তের উক্তি বলিয়াছেন—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি" ॥

আবার ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর-সভায় সমাগত সহস্র সহস্র সুযোগ্য নৃপতির মধ্যে ইন্দুমতী অজ রাজাকেই কেন বরণ করিয়াছিলেন? ইহা সমর্থন করিতেও কালিদাস শেষে নিজে প্রকৃত কথা বলিয়া গিয়াছেন—"

"মনো হি জন্মান্তর-সংগতিজ্ঞম্"। রঘুবংশ—৭।১৫। অজ রাজার সহিত পূর্ব্বজন্মে ইন্দুমতীর যে প.তপত্নী সম্বন্ধ ছিল, তাহা তখন ইন্দুমতীর মনই বুঝিয়াছিল,—অর্থাৎ তখন অজ রাজাকে দেখিয়াই তাঁহার ঐ প্রাক্তন সম্বন্ধের স্মরণ হইয়াছিল, ইহাই কালিদাসের ঐ কথার দ্বারা বুঝা যায়। ফল কথা, ভারতের শাস্ত্রবিশ্বাসী কবিগণও নানাভাবে নানা প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র-সিদ্ধান্তেরই প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

পুণ্ডরীক পরজন্মে মহাশ্বেতার স্থানে যাইয়াই মহাশ্বেতার সহিত তাঁহার পূর্ব্বজন্মের সৌহৃদ্য স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং পরজন্মেও তিনি মহাশ্বেতাকে ভুলিতে পারেন নাই, এই সমস্ত কথাও ভারতের কবিই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। "কাদম্বরী"র উত্তরভাগ পাঠ করিলে তুমি তাহা জানিতে পারিবে এবং কবির অপূর্ব্ব কৌশল বুঝিতে পারিবে।

শিষ্য। তবে কি কাহারও পূর্ব্বজন্মের সমস্ত বার্ত্তার স্মরণ হইতেই পারে না? উহা কি অসম্ভব? আর উহা সম্ভব হইলে উহার উপায়ই বা কি? ঋষিগণ কি উহার কোন উপায় বলিয়াছেন?

গুরু। অবশ্যই বলিয়াছেন। প্রথমে ভগবান্ মনুই বলিয়াছেন—

"বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ।
অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্ব্বিকীম্॥"

মনুসংহিতা—৪।১৪৮

অর্থাৎ সতত বেদাভ্যাস, শৌচ, তপস্যা ও সর্ব্বভূতের অহিংসার দ্বারা মানব পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করে। যাঁহাদিগের পূর্ব্বজন্মের স্মরণ হয়, তাঁহারা শাস্ত্রে "জাতিস্মর" নামে কথিত হইয়াছেন। পূর্ব্বকালে অনেক তপস্বী ও যোগী "জাতিস্মর" হইয়াছিলেন। পুরাণ এবং ইতিহাসে অনেক জাতিস্মরের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। মহা তপস্বী জড়-ভরতের মৃগ-জন্ম-লাভ হইলেও তখনই পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই মৃগজন্মের পরে ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ হইলেও তখন তাঁহার সেই প্রাক্তন মৃগজন্মের সম্পূর্ণ স্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের অষ্টম ও নবম অধ্যায় পাঠ করিলে তুমি সেই সমস্ত অদ্ভুত কথা জানিতে পারিবে।

আর যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও স্পষ্ট বলিয়াছেন,—

'সংস্কার-সাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিবিজ্ঞানম্।"—৩।১৮

অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের সেই সমস্ত অনুভব জন্য সংস্কার এবং শুভাশুভ কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ সংস্কার—এই দ্বিবিধ সংস্কারের প্রত্যক্ষ হইলে পূর্ব্বজন্মের বিশেষ জ্ঞান জন্মে। যোগী তাঁহার যোগশক্তি দ্বারা ঐ সমস্ত সংস্কারেই চিত্ত ধারণা করিতে পারেন। পরে তাঁহার ঐ ধারণাই ধ্যানরূপে পরিণত হয় এবং পরে ঐ ধ্যান সমাধিরূপে পরিণত হয়। সেই সমস্ত সংস্কারে সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যোগীর ধারণা, ধ্যান ও সমাধির ফলে তাঁহার ঐ সমস্ত অতীন্দ্রিয় সংস্কারেরও অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং তখন যে দেশে ও যে কালে যে কারণে তাঁহার ঐ সমস্ত সংস্কার জন্মিয়াছিল, সেই সমস্ত দেশ এবং কালাদিরও অবশ্য অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং যোগী তখন পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মে কোথায় কিরূপ ছিলেন ইত্যাদি সমস্তই জানিতে পারেন। এইরূপ তিনি তাঁহার ভাবী জন্মও জানিতে পারেন। যোগীর পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে। যোগদর্শনের ভাষ্যকার ব্যাসদেব ইহা সমর্থন করিতে —ভগবান্ আবট্য ও মহর্ষি জৈগীষব্যের সংবাদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি জৈগীষব্য ভগবান্ আবট্যের নিকটে তাঁহার দশমহাকল্পের জন্মপরম্পরার জ্ঞান বর্ণন করিয়াছিলেন। সংসারে সুখের অপেক্ষায় দুঃখই অধিক, সর্ব্বত্রই জন্ম ও সাংসারিক সুখাদি সমস্তই দুঃখময়, ইহাও তিনি বলিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ উহা অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য নহে। পূর্ব্বকালে যে সাধনাবিশেষের ফলে অনেকে জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ইহা ঋষিগণের পরীক্ষিত সত্য। তাই মন্বাদি ঋষিগণ ঐ সত্য প্রকাশ করিয়া উহার উপায়ও বলিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালেও গৌতমবুদ্ধদেব বোধি-বৃক্ষতলে সম্বোধি লাভ করিয়া তাঁহার অনেক জন্মের বার্ত্তা বলিয়াছিলেন, ইহা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের "জাতক" গ্রন্থে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। এখনও অনেক জাতিস্মর যোগী জীবিত আছেন—সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে জানি না। কোন কোন সময়ে কোন দেশে কোন জাতিস্মরের সংবাদ এখনও শুনা যায়। অবশ্য জাতিস্মরমাত্রেই যে, তাঁহার সমস্ত পূর্ব্বজন্মের সম্পূর্ণ স্মরণ করিয়াছেন, তাহা নহে। যাঁহার যেরূপ সাধনার ফলে পূর্ব্বজন্মের যে সমস্ত সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, সেই সমস্ত সংস্কার জন্য তাঁহার সেই সমস্ত বিষয়েই স্মরণ হইয়াছে। অনেক সাধারণ মানবেরও যে, পূর্ব্বজন্মের অধিক সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, ইহা ত তাহার ফলের দ্বারাই বুঝা যায় এবং ধ্যান দ্বারা যে ক্রমে অনেক বিস্মৃত বিষয়েরও স্মরণ হয়, ইহাও সকলেরই স্বীকার্য্য। আমাদিগেরও অনেক সময়ে এমন ঘটে যে, কোন ব্যক্তিকে দেখিলেই তখন মনে হয়, ইহাকে কোথায় দেখিয়াছি। কিন্তু

তাহাকে কোথায় দেখিয়াছি এবং তাহার পরিচয় কি, ইত্যাদি কিছুই মনে হয় না। পরে সেই বিষয়ে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিলে ক্রমে কিছু কিছু মনে হয় এবং অনেক সময়ে দীর্ঘকাল ধ্যানের পরে সেই চিন্তিত বিষয়ের সম্পূর্ণ স্মৃতিও হয়। এইরূপ যে যোগী তাঁহার সমস্ত প্রাক্তন সংস্কারেরই দীর্ঘকাল ধ্যান করিতে সমর্থ এবং সেই ধ্যান তাঁহার সেই সমস্ত বিষয়ে সমাধিরূপে পরিণত হয়, তিনি যে কালে সেই সমস্ত সংস্কারের প্রত্যক্ষই করিবেন, ইহা অসম্ভব হইতে পারে না। যোগশক্তির অসামান্য অদ্ভুত প্রভাবে সমস্তই হইতে পারে। সুতরাং যোগবলে সমস্ত পূর্ব্বজন্মের অলৌকিক প্রত্যক্ষও হইতে পারে, ইহা স্বীকার্য্য। ফল কথা, যেরূপ সাধনার দ্বারা পূর্ব্বজন্মবার্ত্তা জানিতে পারা যায়, তাহার অভাবেই সকলে উহা জানিতে পারে না। কিন্তু সাধনাবিশেষের দ্বারা অনেকেই উহা জানিয়াছেন। অনেক যোগী যোগপ্রভাবে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া নিজের সমস্ত পূর্ব্বজন্মের ন্যায় অপরের সমস্ত পূর্ব্বজন্মও জানিয়াছেন। আর যিনি নিত্য সর্ব্বজ্ঞ, তিনি নিত্যই তাহা জানিতেছেন। তাই তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥" গীতা—৪।৫

[ক্রমশঃ।

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ (মহামহোপাধ্যায়)।

যৌবন-প্রশস্তি

আমার অন্তর-প্রান্তে এস এস সুন্দর যৌবন!
সাথে লয়ে মাধুরী-সম্ভার;
সৌরভ-সুষমা দিয়া ভরি' দাও এ চিত্ত-যৌবন;—
মত্ত অলি তুলুক ঝঙ্কার!
কল্পনার স্বপ্নে শুধু এত দিন হেরেছি তোমারে!
জানি নাই বাণী তব কত সুধা ঢেলে দিতে পারে!
কৈশোরের কচি প্রাণে কভু আলো কভু অন্ধকারে
মিলাইয়া গেছে তব রূপ;
আজি তব সব সুধা সব রূপ দিয়া বারে বারে
ভরি' লব হৃদয়ের কূপ!

তুমি আস হে যৌবন নিত্যকালে মানবের প্রাণে;—
বুকে লয়ে অসংখ্য কামনা!
নিজেরে নিঃশেষ কর আপনার সব কিছু দানে,
স্বার্থ-ডোরে নিজেরে বাঁধ না!
আদিম মানব-মুখে যবে কোন ফোটেনিক' ভাষা,
তখনো ছিলে গো তুমি ছিল তব হৃদয়ের আশা;
তখনো তোমার ব্যথা, অন্তরের গূঢ় ভালবাসা
প্রকাশিতে বুকে, মুখে, চোখে;—
আজিও তেমনি আছ মানবের বুকে বাঁধি' বাসা
থাকিবে এমনি সর্ব্বলোকে!

হে কান্ত! তুমি কি শুধু মানবেরি আকাঙ্ক্ষিত ধন,
এ ধরায় আর কারো নহ?
মানবেরি লাগি' শুধু ঢেলে দাও আপন জীবন—
তারি লাগি' ভালবাসা বহ?
তবে কেন কুঁড়ি হ'তে ফুলদল ওঠে বিকশিয়া?
নব কিশলয়ে সাজি' তরু কেন হরষিত হিয়া?
তবে কেন নদী-তীরে চখাচখী দোঁহারে চুমিয়া
প্রণয়ের মিনতি জানায়?
সেও ত' তোমারি খেলা! তুমিই তা' এ বিশ্ব ভরিয়া
প্রকাশিছ নির্ব্বাক্ ভাষায়!

ষোড়শ বরষ মোর গত হোল তোমা পানে চেয়ে!—
গত কত ব্যর্থ দিন-রাত।
হে ঐন্দ্রজালিক! তুমি আজি হেথা এলে সাথে নিয়ে
স্বরগের ফুল্ল পারিজাত!
দাও দাও চিত্তে মোর স্নিগ্ধ তব অঙ্গ-পরশন!
বুলাইয়া দাও বুকে ধীরে ধীরে ও রাঙা চরণ!
গ্লানি মোর মুছে যাক্, স্নিগ্ধ হোক্ ক্ষুব্ধ মোর মন!
ঘুচে যাক ব্যর্থতার রাতি!
সুন্দরের হে পূজারি! দাও মোরে দাও আলিঙ্গন;
আজি হ'তে তুমি হবে সাথী!

শ্রীবিমল মিত্র

শ্রীরাধার প্রেম

শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা প্রেমের মূর্ত্তি। মাধুর্য্যরসে রসময়ী শ্রীরাধার প্রেমই প্রকৃত প্রেম। শ্রীভগবান্‌ই একমাত্র পুরুষ। ভক্ত সেবিকারা সকলেই নারী। সেই নারীদের সমস্ত প্রেম এক হইয়া শ্রীরাধায় আশ্রয় করিয়াছে। অথবা শ্রীরাধার প্রেমই সমস্ত নর-নারীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গোলোকেও বৃন্দাবন আছে, শ্রীরাধা আছে। মর্ত্ত্যে ভৌম বৃন্দাবনে প্রেমের স্বরূপ দেখাইবার জন্য শ্রীরাধার আবির্ভাব হইয়াছে, ইহাই পৌরাণিক বার্ত্তা।

শ্রীরাধা যমুনাকূলে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর রব শুনিলেন। বাঁশীর ঝঙ্কার একবারে তাঁহার হৃদয়ের তন্ত্রীতে যাইয়া আঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে মর্ম্মের বাণীও বাজিয়া উঠিল। বহির্জগতের ধ্বনি অন্তরে আসিয়া লুপ্ত হইয়া গেল। শ্রীরাধা সেই ধ্বনি শুনিয়াই ছুটিলেন। স্রস্ত বেশে—আলুথালু কেশে ছুটিলেন, সে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! অভিসারিকা ছুটে না, কামুকী ছুটে না; পতিপ্রাণা সাধ্বীর লজ্জা হয়, সেও ছুটিতে পারে না!

শব্দলক্ষ্যে যমুনার কূলে আসিয়া শ্রীরাধা দেখিলেন, সম্মুখে নব নটবর বংশীধারী কৃষ্ণমূর্ত্তি। শ্রীরাধা নয়ন ভরিয়া সেই অপরূপ রূপ দেখিলেন। মনে হইল, সমস্ত ইন্দ্রিয় কেন নয়ন হইয়াই দেখিল না! শ্রীকৃষ্ণ-মিলনে শ্রীরাধা আত্মহারা হইলেন। সব ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণেই মন প্রাণ নিবেদন করিয়া বসিলেন। শ্রীরাধা তরুণী, তরুণী ব্যতীত প্রেমের স্বাদ বুঝিবে না, তাই শ্রীরাধা তরুণী। শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদ্য হইবেন, তিনি আট বৎসরের বালক। আট বৎসরের শিশুর উপর তরুণীর প্রেম কামগন্ধবর্জ্জিত ও পবিত্রই হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-মিলনে বিবশা শ্রীরাধা অন্য জীব হইয়া গৃহে ফিরিলেন। রাতে চমকিয়া উঠেন, "ঐ বুঝি বাঁশী বাজে, বন-মাঝে কি মন-মাঝে, ঐ বুঝি বাঁশী বাজে!"

"সখি, বাঁশরী বাজিতে বাজিতে বাঁশরী বাজিল কই" বলিয়া শ্রীরাধা সখীদের ক্রোড়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলে—সখীরা জানিতে পারিল, শ্রীরাধা কৃষ্ণ-প্রেমে পাগলিনী হইয়াছেন। দূর হইতে যেন বাঁশরীর সুর বাজিল, "আমি যাই" বলিয়া শ্রীরাধা উঠিতে চাহিলেন; সখীরা উন্মাদাবস্থা ভাবিয়া উঠিতে দিল না। শ্রীরাধা যে দিকেই চাহেন, সবই কৃষ্ণময়। শ্বেত, রক্ত প্রভৃতি সমস্ত বর্ণই তখন কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আপনার গৌরবর্ণ তনুখানিও যেন কালার কালোয় কালো হইয়া উঠিয়াছে। এ এক অপরূপ প্রেম, এ এক অপ্রাকৃত আকর্ষণ। গভীর রাত্রি, আঁধারে প্রকৃতির সারা অঙ্গ ছাইয়া আছে, বৃষ্টি মুষলধারে হইতেছে; হয় ত বা মাথার উপর বজ্র গর্জ্জিতেছে। শ্রীরাধার সে সব দিকে হুঁস নাই। গুরুজনের তিরস্কার, সমাজের নিন্দা, লোকের ঘৃণা, সে সকল কোন চিন্তাই নাই।

মিলনের পর বিরহ, বিরহের পর মিলন, মিলনের পর চির-বিরহ অথবা চিরমিলন। মিলনে শ্রীরাধা আত্মহারা, আপনাকে ভুলে, জগৎসংসার ভুলে; আবার বিরহেও আপনহারা। তন্ময়তা-সাগরে ডুবিয়া যান, তখন কোথায় থাকে আপনি নারী, কুলবধূ, এ সব ভাবনা। "বিরহে তন্ময়ং জগৎ" হইয়া যায়।

বিরহ আইসে মিলনের জন্য। বিরহই মিলনের পরিপুষ্টি করে। বিরহ না থাকিলে মিলন বেশী দিন মধুর লাগে না। মিলনের মাদকতাও তেমন থাকে না, বহুদিনব্যাপী মিলন বৈচিত্র্যশূন্য হয়, শেষে একঘেয়ে হইয়া দাঁড়ায়। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিবা, আবার রাত্রি, আবার দিবা। মিলনে খণ্ডপ্রেমের মধুর আস্বাদ মর্ত্ত্যের সকল নরনারী পাইয়া থাকেন। বিরহেও ঐ আস্বাদ থাকে। উন্মাদক সে আস্বাদ প্রকৃত প্রেমিক ব্যতীত সকলে পাইতে পারেন না। মিলনের পর যে বিরহ, সে বিরহের প্রথমাবস্থায় ঐ আস্বাদ নাই; কেন না, তখন মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল রহিয়াছে; ভোগস্পৃহা বলবতী আছে। সে সময়ে উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা, রোমাঞ্চ, হা-হুতাশ, ক্রন্দন, শেষে মূর্চ্ছা।

"বিরহে তন্ময়ং জগৎ" প্রেমের পরিপক্কাবস্থাতেই হইয়া থাকে। তখন দেহ পড়িয়া থাকে, মন প্রেমময়ে মিশিয়া যায়। সে এক নূতন সমাধির অবস্থা।

রসঘন নির্বৃতি দশা। সে তন্ময়তায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের রূপ, রস, শব্দ ও স্পর্শ এক হইয়া যায়। এ বিরহ প্রেমেরই অপর মূর্ত্তি। মিলনের মধ্যে যেমন প্রেমের মূর্ত্তি, বিরহের মধ্যেও তেমনই প্রেমের মূর্ত্তি। মিলন ও বিরহে সে প্রেমের স্বরূপ একই থাকে। সেই প্রেমই প্রকৃত প্রেম। উহা চন্দ্রকরের মত মধুর, অমৃতের মত সুস্বাদু, জলের মত স্বচ্ছ, ইন্দ্রনীলের মত শীতল ও গঙ্গোদকের মত পবিত্র। এ সময়েই ভেদের মধ্যে অভেদ, দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈত। ইহা আস্বাদন এবং আস্বাদ্য, উপায় এবং উপেয়, ভাব এবং ভাবময়; এই প্রেমই কৃষ্ণ-লাভের কারণ। এই প্রেমই কৃষ্ণময়, প্রেম যে প্রেমময়েরই স্বরূপ, তাহা সংসারে মাতৃস্নেহের মধ্যে, সতী রমণীর পতিভক্তির মধ্যে এবং বন্ধুর নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের মধ্যেও কখন কখন

হইয়াছেন। ইহাকেও ত মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। এই বাঙ্গালা দেশে, এই ভেতো বাঙ্গালীর দেশে, গণেশ, ঈশা খাঁ, কেদার, প্রতাপাদিত্য, দনুজমর্দ্দন, সীতারাম, লক্ষ্মণ-মাণিক্য, মুকুন্দ, সুদূর অতীতে যে সমর-কুশলতা ও রাজ্যগঠন-পটুতার পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহার আভাস পর্য্যন্ত অধুনা স্কুল-পাঠ্য ইতিহাসের ভিতর খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না বলিতে পারি না। এই জন্য আমাদের স্কুলের বালকগণের নিকট বাঙ্গালার এই গৌরব-যুগ একবারে অজ্ঞাত থাকে। তাই অতীত হইতে বিচ্ছিন্ন এবং বৈদেশিক সভ্যতার কুহকে আত্মবিক্রীত আমরা,—নিজের দেশ কি এবং তাহা কোথায়, তাহা খুঁজিবার অবসর পাই না।

এই ভাবে আত্মবিদ্রোহ জিনিষটি তাহার প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়া দেশের যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাহা আমাদিগের অন্তর হইতে বাহির করিয়া বিভিন্ন ও বিজাতীয় সভ্যতা ও আদর্শের পক্ষপাতী করিতেছে।

অনেকে এখন ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তারকে ভাববিনিময় ব্যাপারের একটি শ্রেষ্ঠ বাহন মনে করিতেছেন, কিন্তু যে সূত্রে ও উদ্দেশ্যে লর্ড মেকলে এই ভাষাকে রাজভাষায় প্রচলিত করিবার জন্য এত যুক্তি ও উপকারিতার ভাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার মূলে একটা গুপ্ত উদ্দেশ্য নিহিত ছিল,—তাহা মেকলের কোনও চরিত-লেখকের লেখনীর ভিতর দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবাসিগণকে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য মেকলের পিতা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন, সেই জন্য দেখিতে পাই যে, পিতা, পুত্র মেকলেকে এই দেশে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে ইংরাজী ভাষার ভিতর দিয়া ভারতবাসীদিগকে খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। পিতৃভক্ত মেকলে তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া যে ভাষা ভারতে চালাইয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার পিতার আশার অনুরূপ ফলপ্রসূ হয় নাই সত্য,—কিন্তু ইহা আমাদিগের ভিতর ভাববিনিময়ের একটি প্রধান সেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একটি দেশ ও জাতিকে স্বকীয় আদর্শ ও শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া শৃঙ্খলিত করিবার আয়োজন ব্যর্থ হইয়াছে।

এক দিন আমরা বৈদেশিক সভ্যতার কুহকে মুগ্ধ হইয়া বিলাস-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া মনে করিয়াছিলাম, যেন ভারতে শিক্ষা করিবার মত কোনও বিষয় নাই; সেই জন্য দেখিতে পাই, ইংরাজী শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের প্রথম যুগে বাঙ্গালা দেশে মদ্যপান উচ্চশিক্ষার যেন অন্যতম অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল,—নিজেকে সভ্য ও উন্নত মনে করিতে হইলে বিদেশী অশন-ভূষণের দরকার হইত। কিন্তু এখন দেশের সেই আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হইয়াছে; আবার ভারতমাতার জীর্ণ, অবজ্ঞাত মন্দিরের দিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে।

ভারতের সেই চিরপ্রসিদ্ধ ত্যাগ, সেই আদর্শ বীরত্বের কীর্ত্তিগাথা, সেই নম্রতা ও শুচিতার পূত মূর্ত্তি, যাহা এত দিন আবর্জ্জনার ভিতর পড়িয়া আত্মগোপন করিতেছিল, তাহা নীরব সাধকমণ্ডলীর সাধনার ভিতর দিয়া দেখা দিয়াছে। আবার ভারতে পূত হোমাগ্নির গন্ধে সুরভিত তপোবনরাজির ভিতর যে শিক্ষা সম্যক্ বিকাশলাভ করিয়া আমাদের দেশকে একটি বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিল, তাহার পুনরুদ্ধারের দিকে অনেকেরই নজর পড়িয়াছে, ইহা একটি সুলক্ষণ বলিতেই হইবে।

আমরা এত দিন মায়ের কোল-ছাড়া হইয়া নিজের দেশ হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলাম। এত দিন বিলাসের পঙ্কিল পঙ্কে আপনাদিগকে নিমজ্জিত করিয়া ভুলিয়া গিয়াছি যে, মানুষের মনুষ্যত্ব ভোগে নহে—ত্যাগে। এক দিন ত আমাদের প্রাচীন বৈদিক পিতামহগণ সংযম অভ্যাস করিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত শিক্ষা দিয়া আমাদিগকে জীবনের পথে উন্নত ও প্রকৃত সত্য ও আলোকের সন্ধানে তৎপর করিয়াছিলেন। আমাদের সেই শুচিতা, সেই সন্তুষ্টির সরল আদর্শ, সেই অনাড়ম্বর-ময় সহজ জীবনযাত্রার উপায়,—সমস্তই যেন একবারে জলাঞ্জলি দিয়া 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হইয়া কলঙ্কময় জীবন বহন করিতেছি।

ভারতের সত্য স্বরূপ দেখিতে হইলে তপোবনের সেই শান্তিময় সুন্দর চিত্র কল্পনায় উদ্ভাসিত করিতে হইবে, সহরের আবর্জ্জনার ভিতর প্রকৃত ভারতকে পাওয়া যাইবে না,—সেই শান্তরসাস্পদ ঋষির তপোবনে—হিংসা-দ্বেষ একবারে যাহার ত্রিসীমায় পৌঁছিতে পারে না, যেখানে মানুষ প্রকৃতির নীরব কক্ষে বসিয়া ভগবানের সান্নিধ্যলাভ করিবার পরম সৌভাগ্য লাভ করে,—যেখানে কৃত্রিমতার আভাস একবারে অসম্ভব, যেখানে সমস্তই সহজ, সুন্দর ও পূর্ণতার গৌরব বহন করিতেছে,—ভারতের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে সেইখানে যাইতে হইবে—ঘরের বেশ পরিয়া। নচেৎ আমরা প্রকৃত সত্যকে—ধর্ম্মকে লাভ করিবার সাহস সঞ্চয় করিতে পারিব না এবং প্রাণের সহিত উপলব্ধি করিতেও পারিব না যে, ভারত আমাদের,—আমরা ভারতের, আমাদের প্রাণ—আমাদের দেহ, ব্যক্তিগত ভোগের জন্য নহে, ত্যাগের ভিতর মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিবার জন্য।

শ্রীউমেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী (বি, এ)
এম, আর, এ, এস (লণ্ডন)।

নব-আবিষ্কৃত প্রাচীন পদ-সংগ্রহ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

অ ১১।প২১। রুদ্রসিংহ-প্রতিষ্ঠিত মাধব-মন্দিরবর্ণনা।

অহি-শশি-শূল-ডম্বর-নরমুণ্ডক-মণ্ডিত সুবৃষ জটেশম্।
সাঙ্গুলি মঞ্জুল কঠিন রাজিত বিলসিত মণিফণ-শেষম্।
রাজতি মাধব-ভবনমনরম্।
সুন্দরমিদমিহ সুরজাতকল্পম্।
কাঞ্চন * বিকাসিত হাটক ঘটপরিমণ্ডিত শৃঙ্গম্।
রুচিকর তরুবর সুসম কুসুমচয়-নিপতিত সুন্দর ভৃঙ্গম্।
সনিজ যুবতিগণ কিন্নর চারণ সুর নর বিহিত বিহারম্।
বিরচিত বিহগ তুরগ গজ কেশরি হরিণ প্রমুখে পশুবারম্।
পেশল কল্পলতাবলি বিলসিত মঞ্জুল পঙ্কজজালম্।
শ্রী রুদ্রসিংহ নরপতি নির্ম্মিতমনুপম মুনিবর মালম্।

কেশব সেবক কবিরাজবিরচিতমিদমতি শৃণুত বিশেষম্ ।
সুন্দর-মাধবমন্দির-বর্ণনমতিশয় * নিবেশম্ ॥

অ ১১।২২। রাজা রুদ্রসিংহের সচিব-তনয়দের ফল্গু-উৎসব ।

সিঞ্চতি চঞ্চল লোচনমভিনব জবাকুসুম সুবিকাশম্ ।
* * ফল্গুগণমতিশয় কৃত পরিহাসম্ ॥
খেলিত সচিব-তনয়কুল মুণ্ডনমিদমতিপেশলবেশম্ ।
শিরসি সুদধদিহ নরপতি পুঙ্গব রুদ্রসিংহ সুনিদেশম্ ॥ (ধ্রু)
বস্তুতম ফল্গু গুণ্ডক মণ্ডন মণ্ডিত সুন্দর দেহম্ ।
নিন্দতি কুসুমিত কিংশুক সঞ্চয়মনুপম মোদন গেহম্ ॥
চঞ্চল মঞ্জুল কুণ্ডল মণ্ডিত মেদুর গণ্ডমনল্পম্ ।
নৃত্যতি গায়তি সুললিত গীতং ত্রিদশতনয় কুলতল্পম্ ॥
খেলন বিচলিত ফল্গুগণে তু ধরণি গগনমতিরক্তম্ ।
তনোতি পলায়িতু * বিধাবতি * খেলিতুমশক্তম্ ॥
প্রণমতি দোল গোবিন্দপদ লসদরুণ-নলিন মনুবারম্ ।
বস্তুফল্গুকুল লোহিত লোচন মুখমতি বিহিত বিহারম্ ॥
শ্রীকবিরাজ ভণিতমিদং মুদয়তু মাধবপদ সুললিতম্ ।
সচিবতনয়চয় মনোহর ফল্গু-খেলন-বর্ণন-গীতম্ ॥

অ ১১।৩৪ আসামে প্রচলিত বিহুউৎসব বর্ণনা ।

রতিপতিসদনং জলরুহবদনং
তনু জিত কনকবিকারম্ ।
ঘনকুচ-কলসং পরিলসদলসং
চলদনুপম * ॥
নৃত্যতি ললিতং হরিগুণ-বলিতং
গায়তি বিহু বিলাসম্ ।
কলিত সুবসনং মুখরিত-রশনং
নটিপটল মৃদু হাসম্ ॥
তরল দৃগমলং চলকরকমলং
কোকিলকলরবরাবম্ ।
রুচিরাপঘনং মৃদুঘন-জঘনং
যুবজনমোহনভাবম্ ॥
ভূষণ লসিতং রসভর-রসিতং
চরণ-বলিত-মঞ্জীরম্ ।
স্মৃত-হরিচরিতং ব্যপগত-দুরিতং
সকলকলারসধীরম্ ॥
গায়ন-ভণনং শ্রুতিসুখজননং
মনসি কলয়দতিবেলম্ ।
সুরজসুরনীতং তানধ্বনি *
বিরচিত বহুবিধ-খেলম্ ॥
শ্রীরুদ্রসিংহ ধরণি পতিসিংহ
নিরুপম বচন সমাজে ।
ইদমপি গানং হরিগুণ ভানং
শৃণুত ভণিত কবিরাজে ॥

রামকান্ত দ্বিজ অ ১।প৭। ভবানী-স্তোত্র ।

পার কর মোরে শুন গো ভবানি
কলিভবসিন্ধু ঘোর ।
বিধি আদি দেবে তুয়া পদ সেবে
ন জানে মহিমা তোর ॥
ও রাঙ্গা চরণ করিতে সেবন
কি আছে শকতি মোর ।
আগম পুরাণে শুন্যাছি শ্রবণে
তুমি সে মুকুতি-ধাম ।
আর নাহি জানি কেবল ভবানি
ভরসা তোমার নাম ॥
শুন্যাছিল যার করিলা উদ্ধার
সে কেনে গণনা গণি ।
আর নাহি জ্ঞান যদি কর ত্রাণ
তেবে সে মহিমা জানি ॥
শমন-সদন তাহাতে গমন
বারণ করিবা অন্তে ।
অতি শিশুমতি কর শুভগতি
ভণে দ্বিজ রামকান্তে ॥

রমাকান্ত অ১।প৫২ গৌরীস্তুতি

না জায়ো না জায়ো গৌরী
থানিক রহ পদ দেখি ।
তোমার গমন শুনিয়া আমার
নিরবধি ঝুরে আঁখি ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক গণপতি
সকলে সঙ্গেতে যাবে ।
ও রাঙ্গাচরণ আর দরশন
কত দিনে মোর হবে ॥
শরত সময়ে সকলে অভয়ে
থাকয় পরম সুখে ।
ভকতি ভাবেতে যে পারে ভজিতে
তারে কি করিবে দুখে ॥
সপ্তমী অষ্টমী আর তো নবমী
তিন দিন আছিল ভালে ।
চলিল লইয়া দশমী আসিয়া
আমার হৈল কালে ॥
ও পদযুগল ভরসা কেবল
তুয়া পরে কেহো নাই ।
চরণকমলে রমাকান্ত বোলে
অন্তকালে দিয়ো ঠাঁই ॥

মুকুন্দ অ১।প১৮ ।

দেহি দেবি তেপি চরণ, কমলযুগলশরণম্ ।
অশেষ-বিশেষ-পাপ-তাপত্রিবিধসপদি শমনম্ ॥
ভজনবিহীনে হীনে দীনে বিষয়-বিষমজলধিলীনে ।
ভূধরনন্দিনি ভুবনবন্দিনি * * সকরুণম্ ॥
ত্বং হি জননি তাতনন্দিনি কলুষজাত-বেদস্বরূপিণি ।
শমনসদনগমনবারিণি তব পদযুগলকারণম্ ॥
নবীন-অরুণ চরণকিরণ লসতি মঞ্জুমঞ্জীরনিকণম্ ।
মুকুন্দমানস সতত প্রবিশ * * *

গঙ্গাধর—অ২।প১।

তোমা বিনে মঁক্রি দীনে কেহ নাহি আর।
কালিপদ-কোকনদ চারিবেদে সার ॥
না ভজিয়া তুয়াপদ এ জনম জাই।
কৃপুতে করুণামক্রি রাখ * * ॥
জনম অবধি তুয়া না কৈলো ভাবনা।
কেমনে এড়াবে ভয় যমের যাতনা ॥
অধম দেখিয়া দয়া না কর তারিণী।
তবে কেনে নিল নাম পতিত-পাবনী ॥
করিলো বিবিধ পাপ তারো নাহি সীমা।
পতিত তারিলে জানি ও নামমহিমা ॥
দীন দয়ামক্রি দয়া কর গঙ্গাধরে।
কলিভব কালী বিনা কে তরাইতে পারে ॥

নামহীন। অ৩।প১

আজু বনে ভূপতি ভেল কানাই।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করয়ে উপাসন
কোই কোই চামর ঢুলাই ॥
সব প্রজাগণ করে পদসেবন
ভোজন তাম্বুল যোগাই।
ব্রজবালক সব করে *
শয্যা কুসুম সজাই ॥

ভণিতাহীন অ৩।প২

আরে বাঁশী রে বাজিও না।
রাধা রাধা রাধা বলি আর বাজ্য না ॥
জখনে বাজিব তুমি অনুসুরে জাব আমি
অবলারে তুমি ছেদ না ॥
তিলাঞ্জলি দিয়া লাজে দাঁড়াই আছি রাজপথে
ঘরের বাহির কৈলে ভাল বাস হে ॥

ভণিতাহীন অ৩।প৩।

অ বাপু রাম প্রাণ কান্দে রে বাপু রাম।
লৈয়া জাইছ গোপাল বনে
গৃহকর্ম্ম না লয় মনে
আমি রৈলাম চান্দমুখ চায়া।
নিকটে রাখিব ধেনু
ঘরে হৈতে শুনি বেণু
গৃহকর্ম্মে তবে মন বয়।
ভাণ্ড ভরি লব ননি
গোপালকে খুবাব তুমি
কিছু দিয় ধড়াএ বান্ধিয়া।

ভণিতাহীন অ১৪।প১

তুমি জগতের মার্গ কেবল আনন্দময়ী তুমি গঁ।
না ভজিলাম তুয়া পদ গুণ না শুনিলাম কাণে।
ক বোল বুলিব যখন সুধাব শমনে ॥
দীন হীন জনে যদি দয়া না করিবে।
পতিতপাবনী নাম কেমনে ধরিবে।
শ্যামার ভজন সুধা রস যেবা পিয়ে।
জনা জড়ামৃত তস্যা যুগে যুগে জিয়ে।
কান্দিয়া কান্দিয়া বোলে শিশু শুন গঁ জননি।
পড়িয়া রৈলাম ভবকূপে পার করিবে তুমি।
অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবে।
পতিতপাবনী নাম কেমনে ধরিবে।

রঘুরাম অ ১৪। প ২। এ দুখ তারিণি গঁ

তোমার করুণা কেনে গঁ হয় না।
আমার করম-ফলে বন্দী হৈলাম মায়াজালে মা
তোমার চরণে মন গঁ বয় না।
ভজন-যজন-হীন মিছা কাজে জাই দিন মা
বদনে তোমার নাম গঁ লয় না।

ভণিতাহীন অ ১৪। প ৯

মায়ের বরণ চিকণ কালা।
তোমারি চরণে আমারি পরাণে
গাঁথিয়া পরিব মালা।
রতনে নূপুর পায়ী।
কটিতট-মাঝে নরকর সাজে
ঘুঙ্ঘুরু বাজিবে পায়ী।
গগনে মুকুট ঠেকে।
যুঝিতে যুঝিতে - অসুর হানিতে
রুধির লাগ্যাছে বুকে।

আনন্দিরাম অ ১৪। প ১০

শুন রে পামর মন দঢ় করি নিজ মন
ভবানী-চরণ কর সার।
অসার সংসার ভার মিছা দুখ-পারাবার
তরাইতে কেউ নাই আর গঁ।
মা গঁ বিপদ নাশিনী বেদে বোলে গঁ।
তারিণী ভবানী নাম কেবল সুধার ধাম
কেবা জানে মহিমা তোমার।
দ্বিজ-বধ মহাপাপে ভবানী নামের রূপে
সুরপতি পাইল উদ্ধার। গঁ।
শুন রে অবোধ জীব অখিলের গতি শিব
যাহার অবধি নাই পাই।
আনন্দে মগন চিত ভাবে তনু পুলকিত
সতত ভবানীগুণ গাই। গঁ।
বিধি বিষ্ণু পুরন্দর তপ করি নিরন্তর
ও পদপঙ্কজ করে আশ।
বলয়ে আনন্দিরাম পূরহ আমার কাম
জনমে জনমে কর দাস। গঁ।

রাজা রামজীবন অ ১৪। প ১৭ *

অ গঁ মা কবে যাব কলি ভব তরিয়া।
শিবরস মান ঘট (?) নিরবধি করে হাট গঁ মা
লৈয়া যাব মিছা পাকে ধরিয়া।

---

* ইনি কোন্ রাজা রামজীবন? আসামে রামজীবন নামক কোন রাজা পাই নাই। গানে প্রকাশ পায়, রঘু নামে ইহার এক ভ্রাতা ছিল, রঘু ও রামজীবন উভয়েই বন্দী হন, এবং রামজীবনের পূর্ব্বে রঘু

রাখিবো কঠিন ঠাঁই　গুরু শিষ্যে দেখা নাই
আমি রৈলো তোমা পদ হেরিয়া।
ইয় ধন যৌবন　　কেহ নহে বন্ধুজন
মিছা মরি আপোন আপোন করিয়া।
আপন করম-দোষে বন্দী হৈলো মায়াপাশে
আমি রৈলো পাপে ভার ভরিয়া।
দেশে গেল রঘুরাম　তারে না হইল বাম
আমি রৈলো বন্দিশালে পড়িয়া।
রাজা রামজীবনে বাণী　শুন মা গঁ ঠাকুরাণী
স্থান দিয়া রাখ রাঙ্গা পায়।

পুথিমধ্যে রামজীবনের ৬টি পদ আছে।

বাচস্পতি অ ৫। প ৮৬

(রাজা রুদ্রসিংহ ও তাঁহার রাণী এবং রাজা শিবসিংহ ও তাঁহার রাণী প্রমথেশ্বরী তাঁহাদের সভাসদ্‌গণ কর্তৃক হরগৌরী-রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বাচস্পতির পদও ঐরূপ)

কিয়ে মনোহর　　দেখিলো সুন্দর
শঙ্কর সঙ্গে ভবানী।
অনুগত জন　　করিতে পালন
ভ্রমণ তুঁহু অবনী।
আধ তনুবর　　বলদ বাহন
বিভূতি-ভূষণ সাজে।
আধ তনুবর　　অগুরুচন্দন
আধ তনু মৃগরাজে।
আধ তনুবর　　পরে বাঘাম্বর
আধ গলে দোলে ফণী।
আধ তনুবর　　পাট পাটাম্বর
আধ গলে দোলে মণি।
কহে বাচস্পতি　　শুন ভগবতি
তুঁহু তুঁহু এক কায়া।
এখন তখন　.　মন উচাটন
কবে দিবা পদছায়া।

জয় কৃষ্ণদাস অ ৫।প১০। রাগ বরাড়ি। তাল দশকুচি।

নন্দনন্দন বনমাঝে, দেখ সখি।
পিতাম্বর ধর—　　শ্যাম মনোহর—
বংশী অধরে—মৃদু বাজে।
চূড়া চারু বলিত　　শিখি চন্দ্রক
বেড়িয়া মালতি মালে।
তথি নব পল্লব　　কুসুম বিরাজিত
টালনি বাম কপোলে।
কুণ্ডল মকর　　গণ্ডযুগ মণ্ডিত
কত মণি-খেচনি তায়।
লীলামদন　　মনোহর ভঙ্গিম
রঙ্গিমন আনন ছায়।

মুক্তি পান। নাটোরের সুপ্রসিদ্ধ প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর শ্বশুর রাজা রামজীবন সম্বন্ধে শুনিয়াছি, উক্ত কথাগুলির প্রত্যেকটিই খাটে। রামজীবন ও তাঁহার ভ্রাতা রঘু মুর্শিদাবাদ নবাব সরকার কর্তৃক বন্দী হন। রামজীবনের পূর্ব্বে রঘু মুক্তিলাভ করেন।

তথি পরমাদ　　চান্দ অতি মাধুরী—
চন্দন তিলক বনান।
কহে জয়কৃষ্ণ　　দাস রসবিগ্রহ
হেরইতে আকুল পরাণ।

মল্ল নরপতি অ ৫। প ৯৪।

ইন্দু গঞ্জন　　বদন সুন্দর
নয়ন গঞ্জানি রঙ্গে।
অধর গঞ্জন　　মঞ্জুপল্লব
চরণ-গঞ্জন পঙ্কজে।
দশন ডারিম　　বীজ গঞ্জন
মুনি সুরাসুরসেবিতে।
তপত কাঞ্চন　　বিজয় রূপিণি—
দিতিজ দারুণ * ণ্ডিতে।
চিত্তমালিনি　　চিত্তরূপিণি
নিখিল মানসমোহিনে।
হংসমালিনি　　হংসরূপিণি
ভুবন জীবন জীবনে।
মহিষঘাতিনি　　সুভমাতিনি
লোকতারণ-কারণে।
চণ্ডমারিণি　　মুণ্ডহারিণি
সকল বিঘিনি বিনাশনে।
রকতবীজ　　খেতজ পালিনি
সুরতু ভুপতি পালিতে।
নছ নায়ক　　বিভব-দায়ক
মল্ল নরপতি বদিতে। *

বিদ্যাগিরিবর অ৮।প৮

জয় আনন্দরূপ ভবানী।
তুঁহো তারা　　তুঁহো ত্রিপুরা
শ্যামা নিগমমার্গ ভবানি।
ত্বং হি দেবি *　সন্ধিনি জ্ঞানপ্রকাশিনি
দুর্ম্মতিদহন কৃপাণি।
ইষ্টজ্ঞান ক্রিয়াময়ি নিতানিতি নিতি পরমানি।
শিব সনকাদিক　　গাওত মহিমা
কো জানে অভিমানি।
ধনু অঙ্কুশ *　　পাশ বিধারিনি
ভকত অভয়দায়িনি।
রিপুকুলনাশিনি　　অনাদিনি তুমি
সুমরন্ত নির্গুণ-জ্ঞানি।
বিদ্যা গিরিবর　　করণা কিজে
জয়নগর * কোরকে রাণী। †

* কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণ মল্লদেব নামে পরিচিত। ১৫৬৩ খৃঃঅব্দে কালাপাহাড় কর্তৃক কামাখ্যা-মন্দির ধ্বংস হওয়ার পর ১৫৬৫ খৃঃঅব্দে ঐ মন্দির পুনরায় নির্ম্মাণ করেন। এই পদ যে তাঁহারই রচিত, এ সম্বন্ধে আমরা স্থিরনিশ্চয় নাই।

† বর্ত্তমান বিজনী, শুনিয়াছি, কোচরাজা বিজিত-নারায়ণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তখন বিজনীর নাম বিজয়নগর ছিল। ঐ নগরই সম্ভবতঃ :—এই পদে জয়নগর নামে উক্ত হইয়াছে; কারণ, ঐ নামে আর কোন রাজ্য আসামে ছিল না।

নিম্নে আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত কয়েকজন কবির পদ আমাদের আলোচ্য পুঁথি হইতে উদ্ধৃত হইল।

সৈয়দ মুর্ত্তজা অ ৫।প৪২

বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে সৈয়দ মুর্ত্তজার নাম পরিচিত। এ পদটি অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব কি না জানি না। অন্ততঃ পাঠান্তরের সাহায্য হইতে পারে মনে করিয়া উহা উদ্ধৃত করা হইল।

অহে নাথ কি দিব তোমারে।
কি দিব কি দিব করি মনে। ভাবি মনে।
জে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি।
তুমি আমার প্রাণনাথ আমি যে তোমার।
তোমারে তোমারে দিতে কি জাবে আমার॥
তলে জানে মনের কথা কাহারে কহিব।
তোমারে তোমারে দিয়া তোমার হৈয়া রৈব।
কি দিব আসন জার গরুড় আসন।
কি দিব ভূষণ জার কৌস্তভ ভূষণ॥
সৈয়দ মুর্ত্তজা ভাবে জিবা জারে ভাবে।
জতনে ভাবিলে সে পরিণামে পাবে॥

মিয়া অ৫।প৫২ ইহাও অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব কি না জানি না।

মঁইতো জানো নারি পিয়ারি চরণ কেইসে হোই।
জোদিন তেঁ হরি গেয়ো মধুপুর তবতেঁ গোঁঞাবই রোই॥
হাম রাজকুঁঞরি সবদিন দোলরি কে জানে ঐসন হোই।
অব প্রেম আনলে জিয়ু জরতহেঁ আখিয়াঁ ঝিয়ারন হোই॥
কাহে কগোসি কওন সুনেগা আপন দুখকে বাণি।
মিয়াকে প্রভু লাল গিরিধর কওন মিলাব আনি॥

নিম্নে বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, নরসিংহ, বলরাম দাস ও রামানন্দ রায়ের কয়েকটি পদ দেওয়া হইল। পদাবলী সাহিত্যের সহিত আমার পরিচয় বিশেষ নাই; কাযেই ইহাদের মধ্যে কোন নূতন পদ আছে কি না বলিতে পারিব না। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি পদ প্রচলিত পদকল্পতরুতে পাইয়াছি, কিন্তু তাহাতে পাঠপার্থক্য রহিয়াছে। এই জন্য স্থানে স্থানে পদকল্পতরুর পদও তুলনার জন্য পাদটীকায় দিলাম।

বিদ্যাপতি অ ৯।প১৬

জগজতি হেমময় দেখ লো অনুপাম।
অর্দ্ধ পুরুখ অর্দ্ধ * * ॥
অর্দ্ধ জটা অর্দ্ধ কুটিল চিকুরহি।
অর্দ্ধ তিলক শশী অর্দ্ধ সিন্দুরহঁ॥
অর্দ্ধ গলে নরমুণ্ড হি মালাহঁ।
অর্দ্ধ বিরাজত মোহি মোহাবহঁ।
অর্দ্ধ বিভূত অর্দ্ধ কুমকুম গোরাহঁ।
অর্দ্ধ বাঘাম্বর অর্দ্ধ পটাম্বরহঁ।
ভণ বিদ্যাপতি মনে অনুমানি হঁ।
দেহ অভয়চরণ নত্ত ভবানি হঁ।

গোবিন্দ দাস অ১৩।১৩—ইহার ৩০টি পদ এই পুথিতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

জয়তি কালি মুণ্ডমালি অখিল ভুবনপালিকে।
চরণপদ্ম শরণসদ্ম দেই * কালিকে॥
চণ্ড মুণ্ড খণ্ড খণ্ড বাহুদণ্ড হেলয়া।
দ্বীপিচর্ম্ম অঙ্গরাগ মানুষপানি কিঙ্কিণি।
দনুজ মুণ্ড শোভিতগণ্ড মনুজ মুণ্ডমালিনি।
শুষ্ক মাংস ভৈরবাংশ মন্দরক্ত-লোচনা।
হেমমুকুট জটাজুট জিহ্ব ললনভীষণা॥
গোবিন্দ দাস ভকতি আশ পরমানন্দে গাওনি।
তুয়া চরণে মাঙ্গহু শরণ দেহ সতি ভবপাবনি।

অ ৪। প ৬২ (১) গোঠ বিজয় ব্রজরাজ কিঠোর বা।
জননি বিরাজিত বেশ উজোর বা॥
থাকোক মেনে গৃহের কাজ রূপ দেখ গিয়া।
যদি না শুন আমার বোল পাছু মরিব ঝুরিয়া॥
সম বয় বেশ বহু পর চান্দ।
রাম বামে চল শ্যামর সাদ।
আগে আগনিত গোধন চলায়া।
পিছে ব্রজবালক হৈ হৈ বলিয়া।
চূড়ার উপরে কেশ সুবেশ করিয়া।
লবঙ্গের মালা তার উপরে বরিয়া।
ময়ুর শিখণ্ড চূড়ায়ে ঝলমলিয়া।
মণিকুণ্ডল গণ্ডে টল টলিয়া॥
শির পর সঙ্গ অধর পর মুরলী।
চলইতে পদ্ম করত কত খুরুলি॥
ধূলায়ে চরণচিহ্ন পদ্ম পড়ি যায়।
লাখে লাখে অলিরাজ মধুলোভে ধায়॥
মন্থর গমন কুঞ্জর বর জিনিয়া।
গোবিন্দ দাসে কহ ধনি ধনি ধনিয়া॥

[ক্রমশঃ।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

---

(১) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম, এ, সম্পাদিত পদকল্পতরু ২য় খণ্ড পৃ ৩৩ পাঠান্তর—

গোঠে বিজই ব্রজরাজ-কিশোর।
জননী বিরচিত বেশ উজোর। ধ্রু॥
আগে অগণিত গোধন চলিয়া।
পাছে ব্রজবালক হৈ হৈ বলিয়া।
সমবয় বেশ সবহু করে ছান্দ।
রাম বামে চলু শ্যামর চাঁদ।
মউর শিখণ্ড চূড়ে ঝলমলিয়া।
মণিময় কুণ্ডল গণ্ডে টলমলিয়া।
শিরপর ছান্দ অধর পর মুরলী।
চলইতে পদে করয়ে কত খুরলি।
কটিতটে পীত পটাম্বর বনিয়া।
মন্থর গতি চলু গজবর জিনিয়া।
মণিমঞ্জীর বাজত রুণিঝুণিয়া।
গোবিন্দ দাস কহই ধনি ধনিয়া॥

রঙের টেক্কা

(গল্প)

কমলের বাড়ী পাড়াগাঁয়ে; বর্দ্ধমানের ও-দিকে। ছেলেটি ভালো, বরাবর স্কলারশিপ পাইয়াছে। কাজেই হোষ্টেলে থাকিয়া প্রেসিডেন্সিতে সে বি, এ পড়ে। বাপ নাই, দেশের বাড়ীতে বিধবা মা, দুই কাকা, কাকী, ভাই-বোন; মস্ত সংসার। এক-অন্নেই সকলে আছে। তার কারণ, বাপ উকিল ছিলেন, দুই কাকার সামান্য চাকুরি; বাপ মক্কেল লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, এবং কাকারা একযোগে বাসুকির মত সংসারটাকে মাথায় করিয়া বেড়াইতেন। গৃহে অর্থাগম প্রচুর ছিল না। কাজেই পৃথক্ হওয়ার সুবুদ্ধি, যা অর্থের গরমে গজাইয়া ওঠে, সে-সুবুদ্ধি কাহারো মাথায় অঙ্কুরিত হয় নাই।

কমল কলিকাতায় থাকে। সারা সংসার তার পানে চাহিয়া আছে—বুকে মস্ত আশা, এক দিন কমল এ সংসারে লক্ষ্মীকে বাঁধিয়া আনিবে!

লেখাপড়ায় কমলের কোনো অবহেলা নাই। ভবিষ্যতের স্বপ্নও সে দেখে। সে-স্বপ্নে রামধনুর সাতটা রঙ্ জ্বল্-জ্বল্ করিতে থাকে। কলিকাতার পথে মোটরের ভিড়, সহরে বেশে-ভূষায় এই উজ্জ্বল বৈচিত্র্য,—দেখিয়া কমল ভাবে, এক দিন অভাব ঘুচাইয়া ও-ঐশ্বর্য্য তারও আয়ত্ত করা চাই!

লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা সখ তার প্রাণে জাগিয়াছিল। সে সাহিত্য-চর্চ্চা করিত; কবিতা লিখিত; এম্পায়ারে ভদ্রমহিলাদের অভিনয় হইলে দেখিতে যাইত। জোড়াসাঁকোয় ক'টা অভিনয়ও সে দেখিয়া আসিয়াছে; তা ছাড়া আর্ট একজিবিসনে ক'বারই হাজিরা দিয়াছে। তার ফলে, মনে আর্টিষ্টিক্ ছোপ্ একটু লাগিয়াছে, এবং বন্ধু-মহলে সৌন্দর্য্যের তারিফ্ সে যা' করে, তা বেশ জোর গলায়।

বন্ধু-সভায় স্ত্রী-স্বাধীনতায় কথা ওঠে, পর্দ্দার আলোচনা হয়। কমল সবেগে বলে, যে সব নারী কালো, কুৎসিত, তাদের ফেলিয়া রাখো পর্দ্দার আড়ালে, ঐ অন্ধকারের অন্ধ-কূপে—তাদের পর্দ্দার বাহিরে আনিয়ো না, সারা দুনিয়ার রঙ্ কালো হইয়া যাইবে! অপর জাতের লোক তাদের দেখিয়া ঘৃণায় নাক সিঁটকাইয়া বলিবে, বাঙালীর মেয়েরা এমন কালো, কুৎসিত! তবে যাঁরা রূপসী—তাঁরা পর্দ্দা ফাঁশাইয়া বাহিরে আসুন—গঙ্গার ধার, ইডন গার্ডেন, কার্জ্জন পার্ক, লেক—এ সব জায়গা তাঁদের রূপের প্রভায় উদ্ভাসিত হোক! বাঙলার আকাশ-বাতাস সে আলোয় উজ্জ্বল হোক্, বাঙালীর মুখও সেই সঙ্গে···ইত্যাদি।

স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে এমনি মতামত প্রকাশ করিলেও কোনো পথ-চারিণী কামিনী বা বাতায়ন-বর্ত্তিনী তরুণীর পানে অভদ্র ইতর ভঙ্গীতে সে কখনো চাহিয়াছে, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। তাঁদের দেখিয়া কোনো কবিতাও সে লেখে নাই। রূপসী নারীর প্রতি তার সম্ভ্রম ছিল একটু অসাধারণ।

২

পূজার ছুটীতে কমল বাড়ী ফিরিতেছিল। ইণ্টার-ক্লাশের টিকিট। কামরায় প্রচণ্ড ভিড়! কুলির মাথায় বিছানার মোট, ট্রাঙ্ক, আর হাতে জলের কুঁজা ও গ্লাশ; তাকে সঙ্গে লইয়া কমল সারা ট্রেণখানা পরথ করিয়া বেড়াইল—কোনো কামরায় জানলার ধারে একটু আরামের জায়গা মেলে কি না! ট্রেণখানা এক্সপ্রেশ—তাড়াতাড়ি পৌছানো যাইবে। তার পর বর্দ্ধমানে নামিয়া কমল ঐ ছোট লাইনের গাড়ী ধরিবে, ইহাই তার অভিপ্রায়। বর্দ্ধমান-লোকালে ভালো জায়গা মিলিত, কিন্তু বহুক্ষণ আড়ষ্ট ভাবে কাটাইতে হইবে, তাই এই এক্সপ্রেশের দিকে তার ঝোঁক!

একখানা সেকেণ্ড ক্লাশের কামরায় তার নজর পড়িল।

বাঙালীর ভিড়,…ক'জন নারী, বালক-বালিকা…বিচিত্র কলরব।

কামরার জানালায় এক তরুণী প্লাটফর্ম্ম-চারী এক বইওয়ালার কাছ হইতে এক গাদা রঙচঙে নভেল লইয়া বই বাছিতেছেন। তরুণী রূপসী…কপালের উপর একগোছা কোঁকড়া কালো চুল হাওয়ায় উড়িতেছে, হাতে সোনার ক'গাছি চুড়ি ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে, চোখ দুটি হাস্যে উজ্জল! অপরূপ শ্রী!

কমলের বুকখানা দুলিয়া উঠিল। এত কাছে কোনো তরুণীকে এমন করিয়া সে কোনো দিন দেখে নাই! বহু সুযোগ মিলিয়াছে—কলিকাতার পথে, এম্পায়ারে, জোড়াসাঁকোয় অভিনয়-ক্ষেত্রে। কিন্তু সে ভিড়ের মধ্যে মুখ তুলিয়া কাহারো পানে চাহিতে পারে নাই। আজ উৎসুক দৃষ্টিতে ট্রেণের কামরায় একটু কোণ খুঁজিতে খুঁজিতে…

থমকিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল।…চকিতের জন্য! তার-পর কে যেন তাকে টানিয়া বহিওয়ালার দিকে আগাইয়া দিল। কামরার এত কাছে…কমল যেন এতক্ষণ চেতনা-হীন ছিল। সহসা চেতনা ফিরিতে সে অপ্রতিভ হইল… কিন্তু…

তাড়াতাড়ি সে কহিল—পুজোয় পরীক্ষিৎ চক্রবর্ত্তীর কোনো নতুন বই বেরিয়েচে?

পরীক্ষিৎ চক্রবর্ত্তী হালের ঔপন্যাসিক। তার মস্ত নাম… দু'মাসেই তার উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ হু-হু কাটিয়া যায়।

বহিওয়ালা কহিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। এই যে, 'কাঁকরের বুকে রাঙা পা' নতুন বেরিয়েচে—চারখানা ছবি আছে।

কমল কহিল,—দাও তো একখানা। এক টাকাই দাম?

বহিওয়ালা কহিল—হাঁ।

কমল বহিখানা লইয়া তার পাতা উল্টাইতে লাগিল। কাণে একটা স্বর বাজিল,—ঐ বই আমাকেও একটা দাও…

বহিওয়ালা জবাব দিল,—আজ্ঞে,সব বিক্রী হয়ে গেছে—ঐ একখানিই ছিল। মলাটে একটু দাগ আছে!…বলেন তো, আপনার নাম-ঠিকানা দিন, ডাকে পাঠিয়ে দেবো।…

তরুণী কহিলেন—এখন পেতুম তো ট্রেণে পড়া চলতো। যাচ্ছি মধুপুর…এতখানি সময়…তরুণী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, কহিলেন—এগুলোর মধ্যে নামজাদা কারুর লেখা দেখচি না তো। পরীক্ষিৎ বাবুর নতুন বই হলে বরং…

কমল সহসা তরুণীর পানে চাহিল; তরুণীর চোখে হতাশার ম্লান ছবি! বহিওয়ালার পানে চাহিয়া কমল কহিল,—বেশ তো, এখানা ওঁকেই দাও…আমি নয় পরে নেবো।

কথাটা বলিয়া সে বহিওয়ালার হাতে 'কাঁকরের বুকে রাঙা পা' বইখানি ফিরাইয়া দিল। বহিওয়ালা সেখানা তরুণীর হাতে…

তরুণী কহিল—না, না। উনি নিয়েচেন…

কমল কহিল—না, আপনি নিন্…আমার তেমন দরকার নেই…

কমলের স্বর কাঁপিয়া উঠিল। দ্রুত সেখান হইতে সরিয়া গিয়া পাশেই ইণ্টার ক্লাশ কামরা পাইয়া সে তাহাতে চড়িয়া বসিল। সে কামরা লোকে ঠাশা; তবু…

লোকগুলা রুখিয়া উঠিল…যেন তাদের পৈতৃক কেল্লা কোন্ শত্রু আসিয়া জোর্‌সে দখল করিতেছে!

এক বৃদ্ধ কহিলেন—আহা, এতগুলি রয়েচি, তার উপর নয় আর একজন উঠচেন…বোঝার উপর শাকের আঁটি!

একটা হাস্যধ্বনি উঠিল। কমলের সে দিকে খেয়ালও ছিল না। তার মাথা ঝন্-ঝন্ করিতেছিল, কাণের ডগা দুটা বেশ গরম!…চোখের সাম্‌নে একটা রূপের আভা…আশপাশের জগৎ সে আভায় বিলুপ্ত হইয়াছিল।

মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিতে আরাম বোধ হইল, মনও তখন কল্পলোক হইতে ভূলোকে নামিল। কমলের হুঁশ্ হইল, তাই তো, ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু সে? এই ভিড়ের মধ্যে শেষ আসিয়া বসিল!

সেই তরুণী!…ঠিক!…সোনার বাঙ্‌লার মেয়ে! আহা, ঘরে ঘরে এমনি মেয়ের আবির্ভাব হোক…সোনার বাঙলা সত্যই আবার সে দিন সোনার রঙে রাঙিয়া উঠিবে!

মনের মধ্যে অনেক কথাই সার বাঁধিয়া যাতায়াত সুরু করিয়া দিল। সে কথার পাশে কামরার বিচিত্র কলরব-কোলাহলে রাজ্যের তর্ক-আলোচনা ভিড়িতেও পারিল না।

বর্দ্ধমান! কমল নামিয়া কুলি ডাকিল। কুলির হাতে মোট দিয়া কহিল,—উও প্লাটফর্ম্ম চলো। এক টাকার সীতা ভোগ-মিহিদানাও কিনিল।—হঠাৎ কে ডাকিল,—কমল বাবু যে!

কমল ফিরিল, ফিরিয়া দেখে, সেই সেকেণ্ড-ক্লাশ কামরার দ্বারে দাঁড়াইয়া তারি সতীর্থ তারকদাস…

তারকদাস তাকেই ডাকিতেছিল। ও কামরায় আর না দৃষ্টি পড়ে,—কমল সতর্ক হইয়াছিল।…এখন তারকদাসের আহ্বানে আগাইয়া আসিতে হইল। কহিল,—কোথায় চলেছেন?…

তারকদাস কহিল—মধুপুর।…আপনি?

—দেশে। আমরা আর কোথায় যাবো, বলুন?

—নমস্কার!

—নমস্কার!

কমল ওভারব্রিজ দিয়া লাইন পার হইয়া ওধারকার প্লাটফর্ম্মে আসিল। কুলি কহিল,—আট আনা লিবে, বাবু…

কমল কোনো কথা কহিল না। একটা নিশ্বাস ফেলিল …ওদিকে এক্সপ্রেসখানা এখনো দাঁড়াইয়া আছে। সে চাহিল—ঐ সে কামরা…এদিককার জানলার ধারে বসিয়া সেই তরুণী…নিবিষ্ট মনে বই পড়িতেছেন। বোধ হয়, সেই পরীক্ষিৎ চক্রবর্ত্তীর নূতন নভেল, 'কাঁকরের বুকে রাঙা পা।' কমল আর একটা নিশ্বাস ফেলিল।

৩

দু'বৎসর পরের কথা বলিতেছি।

ডবল অনারে বি-এ পাশ করিয়া কমল পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাশে বেশ প্রতিপত্তি জমাইয়াছে। প্রোফেশররা তাকে খুব ভালোবাসেন। তাঁরা এমন আশাও রাখেন, কমল এবারে ইউনিভার্সিটিতে একটা কীর্ত্তি রাখিবে।

আবার পূজার ছুটী হইয়াছে। কমল দেশে আসিয়াছে। হাওড়া ষ্টেশনে সেই দিল্লী এক্সপ্রেশের সেকেণ্ড-ক্লাসের কামরার পানে এবারেও চাহিতে ভুলে নাই। বোঝে, বৃথা চাওয়া! আবার সে-মুখ ও-কামরার জানলায় দেখিবে, সে আশা বাতুলতা, তাও জানে। তবু…

এই দু'বছরের মধ্যে কতবার দেশে গিয়াছে, প্রতিবারেই সেকেণ্ড ক্লাসের কামরার জানলায় চাহিয়াছে…আশা কখনো মিটে নাই। তবু চাওয়াটা কেমন অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে।

দেশের বাড়ীতে কাকারা তাকে পাড়িয়া ফেলিলেন, মা'রও অনুরোধের অন্ত নাই—এবার বিয়ে করতে হবে।

কথা শুনিয়া কমল চক্ষু মুদিল।…সারা বাঙলা দেশ তার মুদিত চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল,—বাঙলার ঘর, বাঙলার বাট, বাঙলার পথ, বাঙলার ঘাট…কালো কুৎসিত রাশি রাশি মুখের মাঝখানে দু'বছর আগে সেই ট্রেণের কামরায় দেখা সুশ্রী সুন্দর মুখখানি…সবুজ পাতার বুকে যেন চাঁপার কলি! অপরূপ!

মা বলিলেন,—কি বলিস্ রে?

কমল চোখ খুলিল, মাথা নাড়িয়া কহিল—না…

সে-কথার মধ্যে কতখানি হতাশা, মা বা কাকারা তা বুঝিলেন না। মা কহিলেন,—আমি কবে আছি, কবে নেই,—মা'র কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল। কমল বুঝিল, মা'র মন বেদনাতুর হইয়াছে।

একটু বিরক্তি ধরিল, এই বাঙালী মা…একটুতেই মনে এঁরা এমন ব্যথা পান্ কি বলিয়া!

মেজকাকা বলিলেন,—বড় বড় ঘর থেকে সম্বন্ধ আসচে …একটা chance…

ছোটকাকা বলিলেন,—এই ত্মাখো, দেবীপ্রসন্ন মিত্তির নিজে চিঠি লিখেচেন, কত কাকুতি ক'রে…

দেবীপ্রসন্ন মিত্র কলিকাতার মস্ত ডাক্তার। বিলাত-ফেরত, টাকার আণ্ডিল…দু'খানা মোটর। বালিগঞ্জে নিজের মস্ত বাড়ী। অসংখ্য কারবারও ফাঁদিয়াছেন; লক্ষ্মী তাঁর হাতে পড়িয়া নাকাল…দানে-দানে লক্ষ্মীর ফতুর হইবার জো! কলিকাতার ধনি-সমাজের মধ্যমণি… টাকার কথা উঠিলে লোক কুবেরের নাম ভুলিয়া এখন দেবীপ্রসন্ন মিত্রের নাম করে, তাঁর এত টাকা!

ছোটকাকা কহিলেন—কাল তাঁর চিঠি পেয়েচি। তিনি নিজে লিখেচেন। পড়ি শোনো…

আবেগে উদ্বেলিত ছোটকাকা চিঠি পড়িলেন,—

আপনার সহিত আমার পরিচয় নাই—তবে কুটুম্বিতা-স্থাপনের বাসনা আমার প্রবল। আমার একটি পৌত্রী আছে—অবিবাহিতা। বয়স পনেরো বৎসর; সুশিক্ষিতা। সুশ্রী কি না, সে বিচার আমি করিতে পারি না। তবে আমার চোখে সুশ্রী নিশ্চয়ই। এই কন্সার আমি বিবাহ দিতে চাই।

আমার পুত্র অর্থাৎ এই কন্সার পিতা স্বর্গগত। মেয়েটি আমার বিশেষ স্নেহের পাত্রী। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ কমলকুমার বসু বি-এ পাশ করিয়া পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাশে পড়িতেছেন; তাঁর সম্বন্ধে সবিশেষ সংবাদ অপরের কাছে পাইয়াছি। [illegible]

যদি তাঁর বিবাহ দিবার বাসনা থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া এক দিন মেয়ে দেখার ব্যবস্থা করিলে আপ্যায়িত হইব। আপনাদের আসার সম্বন্ধে মত জানিলে জানাইবার ব্যবস্থা করিতে পারি। মেয়ে আপনাদের পছন্দ হইলে পাত্র দেখার ব্যবস্থা করা যাইবে। এ সম্বন্ধে আপনাদের মতামত জানাইয়া বাধিত করিবেন।

যৌতুক দি সম্বন্ধে এইটুকু বলিতে পারি, আমার স্নেহের পৌত্রী…বরাভরণ ও গহনা প্রভৃতি আমার যথাসাধ্য দিব, তা ছাড়া নগদ টাকাতেও অসুবিধা না ঘটিতে পারে। আপনাদের যেরূপ অভিরুচি হয়, জানাইবেন।

আমি বিলাত-ফেরত—তবে হিন্দু। সুতরাং আশা আছে, একালে ওদিক্ দিয়া আপনাদের কোনো আপত্তি হয় তো উঠিবে না!…

কমল কহিল,—থাক! বালিগঞ্জের দেবী মিত্তির তো… তাকে দেখেচি। ওঃ, কি মিশ্ কালো রঙ! তেমনি মোটা ধ্যাবড়া চেহারা—বিলেতে ঐ মূর্ত্তি দেখিয়ে বাঙালীর নাম ডুবিয়ে এসেচে!

মা কহিলেন,—শোনো ছেলের কথা! সে কালো হলো তো তোর কি! তাকে তো তুই বিয়ে করচিস না!

কমল কহিল,—তারি নাতনী তো! ও-বংশে ফর্শা রঙ ঘেঁষতে পারে না! ঐ রঙে বিলেত ঘুরে এলো কি ব'লে?

মেজকাকা কহিলেন,—বেশ তো, মেয়ে তুই নিজে স্থাখ্ না, বাবা…

কমল কহিল—মেয়ে দেখতে গেলে ঐ কালো দেবী মিত্তিরের সামনে দেখতে হবে তো! সে চেহারা আমাদের দলে একটা ঠাট্টার বস্তু। আমরা বলি, টাকার কুমীর হলে কি হয়, এদিকে চেহারায় মহিষাসুর! ঐ চেহারা নিয়ে রোগীর ঘরে দাঁড়ায় কি ক'রে, আর রোগী ও-চেহারা দেখে আঁৎকে মরে না! বেঁচে ওঠে কি ব'লে? আমাদের দলে তা নিয়ে বহু গবেষণা হয় মাঝে মাঝে!

ছোটকাকা কহিলেন,—তা হ'লে তো ইংরেজ শ্বশুর দেখতে হয় রে!

মা কহিলেন,—মেমের মেয়ে বিয়ে করবি না কি, ভেবেচিস?

কমল কহিল,—পয়সা তেমন থাকলে সে আশা হয় তো মনে জাগতো! তা ছাড়া রঙটাই সব নয় তো…সিড়িঙ্গে মেম ভারী কদর্য্য!

মা রাগিয়া বলিলেন,—এ কি বাতিক তোর!…

কমল কহিল,—ও কথা ছেড়ে দাও না…বিয়ে আমি করবোই না। I have no right to scatter filth in the shape of dark progenies…

তর্কে কাহাকেও তার মনের ভাব বুঝানো সম্ভব নয় বুঝিয়া কমল সে স্থান ত্যাগ করিল।

মা কহিলেন,—ও বলে কি!

ছোটকাকা ইংরাজী মন্তব্যটুকুর অর্থ করিয়া দিলেন—ও' বলচে, জগতে কতকগুলো কালো-ভূত ছেলেমেয়ে এনে ময়লা ছড়াবার ওর কোনো এক্তার নেই!…

মা রাগিয়া ঝাঁজালো স্বরে কহিলেন—তোমাদের আদরে আর আস্কারায় ও এত নাই পেয়েচে…না হ'লে এমন বেয়াড়া…

মেজকাকা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—এত বড় ঘর…নিজের জীবনে একটা মস্ত বড় সহায় পেতো, পাগলা সেটা বুঝচে না…

মা কহিলেন,—থাক্ গে…ওর বিয়ের কথায় কেউ আর আমরা থাকবো না।…ওঁদের লিখে দাও, ছেলে এখন বিয়ে করতে চায় না!…অদেষ্ট! না হ'লে এমন মতি হবে কেন? ভেবেচে, পাশ করলেই চতুর্ভুজ হবে!…পাশ করচে তো সকলেই…ঠেলে উপরে তুলে ধরার মুরুব্বি ক'জনের মেলে!…বরাত, ভাই, মেজঠাকুরপো! তুমি ছোট-ঠাকুরপো, আজই জবাব লিখে দাও…ভদ্দরলোক কেন মিছে আশা ক'রে ব'সে থাকবেন!

ছোটকাকা ম্লান মুখে কহিলেন—দেখি,—আর একবার বোঝাই ওকে!

মা কহিলেন,—না, না, ক্ষেপেচো! কাকে বোঝাবে? ঠাকুদ্দা কালো দেখতে বলে ও ধারণা ক'রে ব'সে আছে, নাতনীও তার মত কালো! স্থাখো দেখি…লেখাপড়া শিখচে, না, ঢেঁকি!…এটুকু সামান্য বুদ্ধি ঘটে নেই এ ভাই, কালের দোষ, আর ওর বরাত…

মা নিশ্বাস ফেলিলেন। মেজকাকা ও ছোটকাকা বিস্ময়ে স্তম্ভিত…তাঁদের চোখের সামনে হইতে ভবিষ্যতের একটা উজ্জ্বল ছবি সরিয়া উবিয়া যাইতেছিল…!

৪

ছুটার অব্যবহিত পরে গোলদীঘিতে ঘটনা। কলিকাতায় হিমের বদলে আকাশে ধোঁয়ার মাত্রা অত্যধিক। পর্ব্বতো

বহ্নিমান্ ধূমাৎ—এই বচনের জোরে এই ধোঁয়া দেখিয়া কলিকাতার সাবধানীর দল সন্ধ্যার পর গলায় কম্ফর্টার ও গায়ে গরম কাপড় চাপাইয়া পথে বাহির হন—নতুবা হেমন্তের মর্য্যাদা থাকে না !

কমলরা দল বাঁধিয়া নানা তর্ক জুড়িয়াছিল। আলোচনার বিষয় ছিল বিবিধ। পাটের চাষ ও স্বদেশী খদ্দর হইতে সুরু করিয়া বাঙলা সাহিত্য অবধি—আলোচনায় কাহারো নিস্তার ছিল না।

কমল কহিল—হালের সাহিত্যে শাইকলোজি এক কদাকার মূর্ত্তি ধ'রে উদয় হয়েচে। তার চেহারা ঠিক এই ধোঁয়ার মত ঝাপ্‌সা…তা ভেদ ক'রে কিছু দেখা যায় না, অথচ চোখে জ্বালা ধরায় এমন যে চোখ খুলে রাখাও দায় !…

অনন্ত কহিল,—অব্যবসায়ীর দল সাহিত্যের ক্ষেতে নেমেচে। যারা যথার্থ কবি, তারা মন দেছে পাট, গম, আর ধানের চাষে !

হরেন কহিল—ও সব কথা যাক্। সাহিত্যে শক্তির কোনো লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না। বিরহী হিয়া নিয়ে খালি নাকি কান্না…তা কি পদ্য, কি গদ্য…যে দিকে চাই, ঐ এক সুর !

কমল কহিল—এর চেয়ে সেই লোমহর্ষণকারী ডিটেক্টিভ উপন্যাসের যুগ ছিল ভালো। বই প'ড়ে গা ছম্‌ছম্ করতো, প্রাণে চমক জাগতো…একটা এ্যাড্‌ভেঞ্চারের আবহাওয়া !

হরেন কহিল—সমাজেও তার আঘাত এসে বেজেচে ! বিয়ে, শ্রাদ্ধ,—এ সব ব্যাপারে আগে একটা হৈ-হৈ লাঠালাঠি ঘটতো, এখন নিঃশব্দে সমাধা হয়ে যাচ্ছে। বরযাত্রীরা অবধি এমন নিরীহ হয়ে উঠেচে যে, মেয়ের বাড়ী পাত পেড়ে নিঃসাড়ে খেয়ে চলে আসে !…তাদের বিছানার চাদরে আগুন ধরায় না, লুচি-সন্দেশ নিয়ে ঢিলও ছোড়ে না।

অনন্ত কহিল,—সেকালে পুরাণের যুগে বিবাহ-ব্যাপারে বরের রথ ঘিরে তিনশো রথীর অস্ত্র-ঝঞ্ঝনা জাগতো —তাতে একটা জীবন ছিল…কিছুকাল পূর্ব্বেও বরপণ নিয়ে বর-কর্ত্তার আকস্মিক গোলযোগ আর বর নিয়ে আসার হুঙ্কার, তাতেও জীবন ছিল। সে সব প্রতাপশালী বর-কর্ত্তারা আজ গেলেন কোথায় !…

কমল কহিল—জাতিটা lifeless হয়ে যাচ্ছে, এ তার লক্ষণ। We are a dying race. তা ছাড়া বিয়ের ব্যাপারে রণোন্মাদনা আসবে কোথা থেকে ? None but the brave deserves the fair. তা সুন্দরী বধূর অভাব ! বাঙালীর মেয়েদের মধ্যে শতকরা এক জনকে যদি সুশ্রী দেখতে পাই তো বহুৎ আচ্ছা ! স্ত্রী-স্বাধীনতার পূর্ব্বযুগে বরং বাতায়নে দু'একখানি সুশ্রী মুখ দেখা যেতো। কিন্তু এখন বাসে, ট্রামে, খোলা মোটরে নাগ্‌রা পায়ে বঙ্গবালা হামেশা দেখা যাচ্ছে সংখ্যাতীত ! কিন্তু তাঁদের মুখশ্রী… দুঃখ হয়, তারিফ করার মত মোটেই নয় ! জাতির পর্দ্দা ঘুচলো, হায় রে, পর্দ্দার আড়ালে যে আলো ছিল, তা নিবিয়ে ! তার পর bravery…ও এখন কথার কথা !

হরেন কহিল,—সুতরাং হালের বাঙলা সাহিত্য বৈচিত্র্যহীন, পঙ্গু হয়ে উঠবেই। বঙ্কিম বাবুর আনন্দমঠে শান্তি ! I adore her. বাঙালীর মেয়ে ঘোড়ায় চড়ছে… that's life. তা না, কাব্য পড়ে নিশ্বাস ফেলচে, নয় ঘোমটা মুখে আঁটা আছে, যত কাঠের পুতুল ! তাদের love আছে, না, ছাই ! শুধু ঘরের কোণে ব'সে নিশ্বাসের ঘূর্ণী ছাড়চে, নয়, চোখের জলে ঝর্ণা রচনা করচে—I hate that.

অনন্ত কহিল,—আমার পণ, জীবনে যদি কোনো তরুণীকে দেখি, মস্ত বিপদে পড়ে তার বিরুদ্ধে লড়চেন, কিম্বা তাঁকে সে-ব্যাপারে একটু সাহায্য করতে পারি, তবেই সে তরুণীকে আমি বধূত্বে বরণ করবো। না হ'লে বধূ ? ভোরে রান্নাঘরে ঢুকে কেরাণী স্বামীর ভাত রেঁধে ন'টায় তাকে সেই ভাত ধ'রে দেবে, এর জন্য বধূর প্রয়োজন নেই, একটা উড়ে বামুন is equally fit for the task. স্ত্রী যিনি হবেন, তিনি আমার সম্ভ্রম command করবেন। ঐ মেয়ে-স্কুলের গাড়ীভরা মেয়েগুলোর পানে চেয়ে দেখলে আমার চোখ ফেটে জল ঝরে—কি poor specimen of womanhood ! কলের পুতুল ..what recommendation ? না, পিয়ানো বাজিয়ে দুটো গান গাইতে পারেন ! pooh ! যেন মানুষের জীবনটা গানের সুরে ভেসে যাবার বস্তু ! একদিকে রান্নার ঘনঘটা, অপরদিকে রকমারী শাড়ী পরা আর গান গাওয়ার ছটা…জীবনে এই দুটোই সব চেয়ে বড় ব্যাপার নয়।

হরেন কহিল—যা বলেচো ! ঐ মৈমনসিং অঞ্চলের

করিম মিয়ার কবলগ্রস্তা সুহাসিনী···যিনি দুটো ঘুষি ছুড়েও নিজের মর্য্যাদা রক্ষার চেষ্টা করেন, তাঁকে আমি বধূত্বে বরণ করতে প্রস্তুত,—কলিকাতা-নিবাসী রায় বাহাদুর কিম্বা মহারাজ হবুচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী মায়া বা মমতাকে বিশ-পঁচিশ হাজার যৌতুক-সহ উপেক্ষা ক'রেও !···

কমল কহিল,—That's like a man. কিন্তু দুঃখ এই যে, যাঁদের দেখি, তাঁরা সব শ্রীহীনা···there's the rub.

আলোচনার একটা সুশৃঙ্খল ধারা ছিল, এ কথা বলা চলে না। তরুণ মন, আশার আনন্দে উদ্বেলিত, সম্পূর্ণ বেপরোয়া···আরব বেদুইনের প্রকৃতির সঙ্গে কেতাব-পড়া এ-সব প্রকৃতি সমানে তাল রাখিয়া চলিতে চায়···!

দলের মধ্যে তারকদাস শুধু চুপচাপ বসিয়া এই অপরূপ আলোচনা শুনিতেছিল, ইহাতে যোগ দেয় নাই! অনন্ত কহিল—তারক যে একেবারে চুপ !···

হরেন কহিল,—ও যে মাথা মুড়িয়েচে···ওর কথা কবার উপায় নেই !

কমল কহিল—জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে···এই তিনটি হলো মানুষের জীবনে সব চেয়ে বড় ঘটনা। জন্ম আর মৃত্যুর উপর যখন কোনো control রাখার উপায় নেই, তখন বিবাহটা ছাড়বো কেন? ওটা eventful না হ'লে জীবনের রসেই যে বঞ্চিত থাকবো !···

তারক হাসিয়া কহিল,—যা বলেচো! আমি ভিন্ন-গোঠের জীব···বন্দী। কাজেই এ স্বাধীন হাওয়ার স্বাদ বুঝবো কি ক'রে, বলো ?···

কমল কহিল—আমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল ঐ millionaire দেবী মিত্তিরের বাড়ী থেকে। আমি রাজী হলুম না। ঐ দেবী মিত্তিরটা বাঙালী কুলের কলঙ্ক··· মানে, তার চেহারার জন্য ! বাঙালীর কীর্ত্তি নানা দিক্ দিয়ে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়চে, তার মধ্যে ঐ চেহারা··· বাঙালীর উন্নতি, খাতির পাঁচশো বছর পেছিয়ে দেবে! ওঁর ঐ চেহারা Caucasian stock থেকে বাঙালীর নির্ব্বাসন ঘটাবে !···

তারক কহিল,—তা হ'লে কালা বাঙালীর ঘরের মেয়ে-গুলোর গতি হবে···?

কমল কহিল,—দেশের নেতাদের কাছে সে-সম্বন্ধে চিঠি লেখো। কর্ত্তারা আগে এ সমস্যার সমাধান করুন, তার পর বাঙালীর উন্নতি তাঁদের দেখতে হবে না। এই কালো রঙের দরুণ বিশ্ব-সভায় কত লাঞ্ছনা তাকে সহ্য করতে হচ্ছে! ফর্শা জাতকে দোষ দেওয়া শক্ত। চোখের সামনে কদর্য্য বস্তু কে দেখতে চায় ?···

তারক কহিল,—রাগ করো না ভাই, তোমার-আমার রঙও···

কমল কহিল,—আরে, অত নীচু স্তরের নয় তো! যে জাতের sense of æsthetics জাগেনি, সে-জাত নেহাৎ হতভাগা···ঐ সাঁওতাল, কুকি, টোডা, কাফ্রী—এদের সামিল !

তারক কহিল,—যাক, তোমাদের সঙ্গে তর্কে পারবো না। তবে একটা কথা বলবো—ঐ দেবী মিত্তিরের কথা যে বললে···ভদ্রলোককে ঐ অকথ্য গালাগাল···

কমল হাসিয়া কহিল,—গালাগাল অবশ্য তাঁকে নয়, তাঁর চেহারাকে। ঐ চেহারা নিয়ে ইংরেজ-সমাজে উনি বেড়ান, তাতে তারা অন্তরে কতখানি ঘৃণা···

তারক কহিল,—এতখানি ইংরাজ-প্রীতি আমার নেই, ভাই। ইংরাজের ভালো লাগা মন্দ লাগা নিয়ে জীবন বহন করলেই চতুর্ভুজ হবো না। তা ছাড়া ইংরাজ খালি রঙ্টাই কি দেখে? মানুষের অন্তরের দাম? তার শক্তি, প্রতিভা···

কমল কহিল,—তা বলচি না। ইংরাজের নামটা নিয়েচি দৃষ্টান্তের ছলে। ফর্শা যে-কোনো জাতের সম্বন্ধে ওকথা খাটে। বেশ, ইংরাজের বদলে খাস পাঞ্জাবী, ধরো, কাশ্মীরী—ধরো, আফগান কাবলীওয়ালা···কি চেহারা !···বাঙালী তাদের সভায় তামাকু-বরদারী করবে !

তারক কহিল,—গায়ের রং নিয়েই তো মানুষ মানুষ হয় না। মনের শিক্ষা···

কমল কহিল,—আহাহা,···সে হলো পরের কথা ! রঙটা হলো আমাদের এ আলোচনা-কাব্যে প্রথম সর্গ। মনের কথা উঠবে আরো দু'চার সর্গ পরে !···মনের প্রথম সর্গ শেষ করো আগে, তবে তো মনের সর্গে পৌঁছুবে !···

তারক কহিল,—ও! তা থাক। এ তর্কের কোনো দিন শেষ হয় নি, হবেও না। মোদ্দা, দেবী মিত্তিরকে উপেক্ষা করা আর তার নাৎনীকে উপেক্ষা করা—fallacy. দেবী মিত্তির কালো হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁর নাৎনী···

কমল বাধা দিয়া কহিল,— আরে, a tree is known by its fruit…

তারক হাসিয়া কহিল,—এখানে tree হলো কে? দেবী মিত্তির তো…আর fruit তাঁর নাৎনী…

কমল কহিল,—তুমি mathematical calculation সুরু করলে! ও উপমা আমি প্রত্যাহার করচি।

হাসিয়া তারক কহিল—আমি আরো উপমা দিচ্চি… সাপের মাথায় মণি, পাঁকের বুকে পদ্ম, কোকিলের কণ্ঠে সুর, কালো মেঘে শ্রাবণ-ধারা…

কমল কহিল,—থাক, ভিন্নরুচির্হি লোকঃ—মানো তো? আমার এই মত—দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং তু পৌরুষম্। যা হয়ে আছে, তাতে আমার হাত ছিল না; যাতে আমার হাত আছে, সেটা আমি মনের মত ক'রে…

গম্ভীরভাবে তারক কহিল—হুঁ! তা বলতে পারো।…

৮

অগ্রহায়ণের শেষ। কমলরা দল বাঁধিয়া বালিগঞ্জে ক্রিকেট ম্যাচ দেখিতে গিয়াছিল। কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ সহসা কালো মেঘে ভরিয়া উঠিল। খেলা বেশ জমিয়া গিয়াছে। মেঘ দেখিয়া বন্ধুরা সরিয়া পড়িল; কমল বসিয়া রহিল, কহিল,—ভিজি তো একা ভিজবো না। এত ভয় বৃষ্টিকে? তোমরা যাও, আমি যাবো না।

তারক বলিল—আমিও বসি…

ব্যাটম্যান খাসা হিট্ করিয়াছিল…হুর্‌রে পড়িয়া গেল! তারক কহিল—মার দিস্…ওই…যা, কট্-আউট্।

আর কাহাকেও নামিতে হইল না; কারণ, মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। এক ছত্রভঙ্গ ব্যাপার। পদ্ম-বনে যেন খ্যাপা হাতী ঢুকিয়াছে! কানাতের ক্ষুদ্র ছাউনি…ক'জনের আশ্রয় হয়? চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি পড়িয়া গেল।

তারক কহিল—একটা বাড়ীর ফটকে ঢুকে পড়া যাক…

কমল কহিল—তাই। তবে ছাড়াছাড়ি না হয়। কতক্ষণ এখন নির্ব্বান্ধব পরদ্বারে প্রতীক্ষা করতে হবে, তা যখন বোঝা যাচ্ছে না…

তারক কহিল—ছোটা যাক। তুমি আমার পানে নজর রেখো, আমি তোমার পানে…ব্যস্! ওয়ান-টু-থ্রী—

ছুটাছুটির সোরগোল…পথে শুধু মানুষই ছুটিতেছিল না, মোটরও। দারুণ বিশৃঙ্খলা! তাই হয়। শ্রাবণে যে-ধারা আরাম দিয়া অভিনন্দন পায়, অগ্রহায়ণে সে-ধারা ট্রেশ-পাশার! সে আসিলে লোক বিরক্ত হয়।

কাছাকাছি ফটকগুলায় বড় ভিড়। কমল কহিল,—এই বৃষ্টি মাথায় ক'রে যাত্রা করি, এসো…চুপচাপ প'ড়ে থাকা কাপুরুষতা। বিশেষ যখন জলে বেশ ভেজা গেছে, এবং ভেজাবার আর কিছু নেই…

তারক কহিল—না, না, ডানদিকে বেঁকে পড়ো…

—বেশ।

ঝাউতলা হইতে ডাহিনে নূতন রাস্তা। এদিকে সৌখীন সমাজের নূতন কলোনি গড়িয়া উঠিয়াছে। আন্তর্জাতিক পল্লী। ইংরাজ আছে, ফরাসী আছে, মার্কিণ আছে, বাঙালী, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, জাপানী অবধি!…কেহ সারা বাড়ী লইয়াছে; কেহ ফ্ল্যাট; কেহ-বা একখানা কি দু'খানা ঘর। সকলেই আরামে আছে।

ছুটিয়া বহুদূরে আসিতে বাঁ-দিকে একটা খালি বাড়ী। তারক কহিল,—ঠিক হয়েচে। এইটেয় ঢুকে পড়ো। সামনে পথ নেই। খালি বাড়ী…আমার জানা লোকের বাড়ী। বৃষ্টি এখন থামবে না…

কমল কহিল—এ্যাডভেঞ্চার হচ্ছিল মন্দ নয়। আমি রাজী, বনে জঙ্গলে বাঘের মুখে অবধি যেতে…

তারক কহিল—থাক্, পরে তার ঢের সময় পাওয়া যাবে'খন। আমার রবার-শোল জুতো, পা পিছলে যাচ্ছে। তার উপর তিন মাস হলো নিউমোনিয়া থেকে উঠেচি।…

কমল কহিল—তবে চলো…

দু'জনে খালি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। গাড়ী-বারান্দার পর হল। ওদিকে দোতলার সিঁড়ি। হলে এক উড়িয়া মালী দু'জন অনুচরসহ বর্ষার লীলা দেখিতেছে।

তারকদাস কহিল,—ওরে, উপরের ঘর খোলা আছে?

মালী কহিল,—অছ…

কমলকে লইয়া তারক দোতলায় উঠিল। সোফা, কৌচ প্রভৃতি আসবাবের অভাব নাই। তারক বাথ-রুমে ঢুকিয়া একখানা তোয়ালেও আনিল, কহিল—নাও হে, মাথার জল মুছে ফ্যালো।

কমল কহিল,—তোমার সব জানা দেখচি।

তারক কহিল,—হ্যাঁ। এ আমার এক আত্মীয়ের বাড়ী।

ভাড়া দেওয়া হবে…এমনি ফার্নিচার-সমেত। এখন খালি আছে।

কমল কহিল,—আমাদের জন্তই…?

হাসিয়া তারক কহিল—তাই বোধ হয়।

মাথার জল মুছিয়া জামা নিংড়াইয়া দু'জনে বারান্দায় চেয়ার টানিয়া বসিল। বৃষ্টির বেগ সমান প্রবল, কমিবার কোনো লক্ষণ নাই! বারান্দার নীচে লন্। তার পরেই বট, অশথ, শিশু নানা গাছে ওধারটা বেমালুম্ ঢাকিয়া গিয়াছে।

তারক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কমল কহিল,—কি, বাক্যহারা হয়ে রইলে যে…

তারক কহিল,—শীত করচে।

কমল কহিল,—কথা কও, শীত যাবে।

তারক কহিল—না, বর্ষায় চুপচাপ থাকতে হয়। হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে…

কমল কহিল,—আরামের ঘরখানি পড়িছে মনে!…

তারক কহিল,—এই নিরালায় সহসা মেঘের কাজল-কালো বুক ফুঁড়ে যদি কোনো পরীর আবির্ভাব হয়?…

কমল কহিল,—তা হ'লে adventureএর রমণীয় পরিসমাপ্তি ঘটে!…

তারক কহিল,—এক কাজ করা যাক। মালীকে আমার সেই আত্মীয়ের বাড়ী পাঠাই, এই কাছেই। শুকনো কাপড়-চোপড় কিছু আনুক।

কমল কহিল,—আনাও। আজ এইখানেই রাত্রিবাস, দেখচি। একটু বৈচিত্র্য…

হাসিয়া তারক কহিল,—তা হ'লে খাওয়া-দাওয়া…

কমল কহিল—খাওয়া একদিন নাই হলো!…

তারক চলিয়া গেল—এবং খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—আনতে পাঠিয়েচি।

কমল কহিল,—কাপড়-চোপড় ভিজে যাবে যে…

তারক কহিল,—একটা গাড়ীতে ক'রে আনবে'খন।

কমল কহিল,—ওরা যে পালালো…ভিজচে নিশ্চয়। কত দূর যাবে? ট্যাক্সি যদি না পায়…

তারক কহিল,—ম্যাচ দেখতে এসে যদি ট্যাক্সি ভাড়া দেয় তো বেকুবির চূড়ান্ত হবে।

কমল কহিল,—ওদের কি ভেজবার স্পিরিট আছে!

তারক কোনো জবাব দিল না, চুপ করিয়া বসিয়া বৃষ্টি পড়া দেখিতে লাগিল।…কমলও চুপ।

বহুক্ষণ নীরবে কাটিল। মালী কাপড়-চোপড় আনিল। কমল কহিল,—ভিজে কাপড়গুলো ছাড়া যাক।

তারক কহিল—একটু চায়ের যোগাড় দেখি।…মালীকে প্রশ্ন করিল,—গাড়ীটা আছে?…

—অছে।

তারক কহিল,—আমি নিজে যাই। তুমি এক কাজ করো…ভিতরের ঘরে ক'খানা পুরোনো ম্যাগাজিন আছে, দেখেচি। পড়ো ততক্ষণ…আলোর সুইচ ঠিক আছে।

তারক চলিয়া গেল। কমল শুকনো কাপড় পরিয়া গায়ে একটা র‍্যাপার মুড়ি দিয়া ভিজা কাপড় বারান্দার হুকে খাটাইয়া দিল।…তার পর ঘরে গিয়া ঢুকিল।…সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া সোফায় বসিল; এবং একখানা ম্যাগাজিনও খুলিল।

একখানা ম্যাগাজিন পড়া শেষ হইয়া গেল, বিজ্ঞাপন-গুলাও…আইরিস লিনেন্, আমামি, মিলেক্টা অণ্ডার-উয়্যার, ওভালটিন, নাক্‌টোন্ কলপ…পড়িয়া সে বিস্মিত হইয়া উঠিতেছিল। কি জাত্—ব্যবসায় কিছু বাকী রাখে নাই! আর দুনিয়ার উপর কি অগাধ বিশ্বাস! এই যে বিজ্ঞাপন—একখানা পোষ্টকার্ড লিখিলেই বড় বড় ছবি পাঠাইবে বিনামূল্যে…পছন্দ হয় দাম পাঠাও, পছন্দ না হইলে নি-খরচায় বেয়ারিং পোষ্টে ফেরত দাও!…এতটুকু জানাশুনা নাই,…কোথায় সাঁওতাল পরগণা, কি নিকারাগুয়া…সেথান হইতে যে একখানা পোষ্টকার্ড ছাড়িবে, তাকেই দামী ছবি পাঠাইবে! যদি জুয়াচুরি করিয়া ছবি ফেরত না দেয়, দাম না দেয়? আশ্চর্য্য! নাঃ, এ জাতের মঙ্গল হইবে না তো কি আমাদের হইবে! একটা পয়সা ফাঁকি দিতে পারিলে বর্ত্তাইয়া যাই। এই যে আজই…ট্রামে চড়িয়া অমন বাবু-সজ্জায় সজ্জিত এক ছোকরা স্রেফ ভাড়া না দিয়া নামিয়া পড়িল! ক'টাই বা—ছ' পয়সা মাত্র! তাতেও লোভ! ছি!

কমল বাহিরের দিকে চাহিল। বৃষ্টির তখনো বিরাম নাই। সন্ধ্যা নামিয়াছে।…উঠিয়া বারান্দায় আসিল। তারক? এখনো দেখা নাই!…কোথায় গেল চা আনিতে? আসামে নয়, নিশ্চয়! তবে…?

বারান্দায় সে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাস করিতে হইলে এমনি বড় বড় ঘর, বারান্দা, বাগান, লন্ চাই। নহিলে খাঁচায় পাখী থাকিতে পারে, কুকুর-বিড়াল থাকিতে পারে। মানুষের আলো চাই, হাওয়া চাই, ঘরে শোওয়া-বসার সঙ্গে নড়া-চড়ার জায়গাও একটু!···

তারক আসিল। সঙ্গে এক বেয়ারা, তার হাতে চায়ের ট্রে···বিস্কুট প্রভৃতি। কমল কহিল—কি হে যাদুকর হলে যে! মরুর বুকে ফুল ফুটোনো, আর জনহীন শূন্য বাড়ীতে চা-বিস্কুট আনা—দু'য়ে কোনো প্রভেদ নেই।

তারক হাসিল, কহিল,—বৃষ্টি থামবার লক্ষণ তো দেখ'চ না। অঘ্রাণে বৃষ্টি···

কমল কহিল—খবরের কাগজে সাধে কি weather forecast ছাপে? আমরা দেখি না···বোকা! দেখলে এখন নিশ্চয়ই এখানে থাকতুম না!···

চা-পান শেষ হইল। তারক কহিল—আজ বাড়ী ফিরবে?···

কমল কহিল—না, এ মন্দ কি! তোমার আপত্তি আছে?

তারক কহিল—কিছুমাত্র না।

কমল কহিল—একটু নিদ্রা দিলে ক্ষতি আছে?

তারক কহিল—না।···তার পর?

কমল কহিল—কাল সকালে কাপড় শুকিয়ে যাবে না? তখন বাড়ী যাবো···Arabian Nightsএর একটা রজনী যদি বা আয়ত্তে এলো···

তারক কহিল—বেশ!···

কমল আর-একখানা ম্যাগাজিন খুলিয়া সোফায় শুইয়া পড়িল···একটা চমৎকার গল্প। কিউবার ও-দিকে জঙ্গলে পথ-হারা এমিলি···বাঃ, খাসা জমিয়াছে!

হঠাৎ একটা শব্দ। চাহিয়া কমল দেখে, দুজন গুণ্ডার মত লোক তার সামনে! তার মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাত-পা বাঁধিল; কমল উঠিতে গেল, তারা জোর করিয়া শোয়াইয়া দিল। কমল ডাকিল—তারক···

লোক দুটা হাসিল। কমল চাহিয়া দেখে, যে-সোফায় তারক বসিয়াছিল, সেটা খালি। সরিয়া পড়িয়াছে? না, তারক···?

তারা জবাব দিল,—তোমার সঙ্গীকে সরিয়ে দিয়েচি··· কথার ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্‌লা। কমল কহিল,—কারণ?

—আছে।

হাত-পা বাঁধিয়া কমলকে তুলিয়া তারা নীচের একটা ঘরে আনিল। সে-ঘরে একটিমাত্র দরজা, জানালা-খড়খড়ি নাই।···

তাকে ঘরের মেঝেয় ফেলিয়া লোক দুটা বিদায় লইল; বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া তাহাতে তালা লাগাইল।

কমল স্তম্ভিত! এ ব্যাপারের অর্থ?

৬

বহুক্ষণ কাটিয়া গেল—চুপচাপ! বাহিরে বৃষ্টির শব্দ··· কমল ভাবিল, চিন্তা মিছা। কি চিন্তা করিব? কিসের চিন্তা!···

বাহিরে তালা খোলার শব্দ। চাহিয়া কমল দেখে, এ কি, দেবীপ্রসন্ন মিত্র! সেই কালো মোটা চেহারা···মাথায় টাক···মস্ত ভারী গোঁফ···বীভৎস! কমল চক্ষু মুদিল।

দেবী মিত্র কহিলেন,—চোখ বুজচো কি হে ছোকরা? যে খর্পরে পড়েচো···?

রাগে আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। ঝাঁজালো স্বরে কমল কহিল,—আমায় এ ভাবে বেঁধে রাখার মানে?

দেবী মিত্র কহিলেন,—তুমি ট্রেশপাশ করেচো···

কমল কহিল,—তার জন্য পুলিশে দিতে পারো···

দেবী মিত্র কহিলেন,—তা দেবো না। অন্য উদ্দেশ্য আছে।

—কি সে উদ্দেশ্য?

—আমার এক নাৎনী আছে। তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো। তোমার কাকাকে চিঠি লিখেছিলুম তুমি আপত্তি তুলেছিলে···

—নিশ্চয়। আমার নিজের একটা মত আছে তো··· আর সে মত সম্পূর্ণ স্বাধীন, কারো চোখ-রাঙানির তোয়াক্কা রাখে না।

—বটে! তোমার যেমন, আমারো তেমনি একটা মত আছে, নাৎনীর পাত্র সম্বন্ধে!

—তার মানে?

—আমার নাৎনীর বিয়ে তোমার সঙ্গে দেবোই আমি।

—জোর ক'রে ?

—তাই।

কমল ভাবিল, এ বলে কি! বিংশ শতাব্দীতে, এই সভ্যতার যুগে···! এ কি মোগলের আমোল পাইয়াছে!

সে কহিল,—জোর ক'রে বিয়ে যেন দিলেন, কিন্তু আমি যদি পরে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করি··· ?

—বয়ে গেল! বিয়ে তো হয়ে যাবে। কন্যাদায় মস্ত দায়। বাঙালীর এত বড় দায় আর দুটি নেই। তার পর মেয়ের ভাগ্যে যা হয় হোক্!

কমল কহিল,—তোমার তো পয়সা ঢের···পয়সা দিলে ঢের ভালো পাত্র মিলবে। আমার উপর অহেতুক এ ঝোঁক কেন? আমার মত নেই, তবু···

—তবু। আমার খুশী!

—বাঃ!

দেবী মিত্র কহিলেন,—হাঁ! পুরুত হাজির। খালি বাড়ীতে ভারী কায়দায় পাওয়া গেছে তোমায়। পালাবে কি ক'রে? শুধু মেয়েরা এলেই হয়! স্ত্রী-আচারটা···বৃষ্টির জন্য অসুবিধা হচ্ছে, তা ছাড়া হঠাৎ বিয়ে···কেউ তৈরী নেই কি না। ঘুম ভাঙিয়ে তাদের আনতে হচ্ছে···

কমল কহিল—কি এ পাগলামি!

দেবী মিত্র কহিলেন,—আমার রঙ কালো—সেজন্য তুমি খড়্গহস্ত। বাপু হে, বাঙালী কালোই···তার জন্য এত ঘৃণা সাজে না। তা ছাড়া আমি কালো ব'লে আমার নাৎনীকে দেখতেও রাজী হওনি, এমন তেজ! নারীর সম্মান জানো না, তুমি লেখাপড়া শিখচো, স্কলারসিপ পাচ্ছ! এই ঘৃণা নিয়ে জীবন সুরু করবে! তবু হাঁড়ির খবর——

—চোপ্! আমার হাঁড়ির জন্য তোমার কাছে চাল চাইতে যাই নি তো···

—হুঁ। এত তেজ! আচ্ছা, দেখি, কতক্ষণ ও তেজ থাকে!

দেবী মিত্র অট্টহাস্য করিয়া বিদায় লইলেন।

আসন্ন বিপদের কথা ভাবিয়া কমল বিস্মিত চিত্তে আবার চক্ষু মুদিল।

সহসা কার করস্পর্শ! অতি মৃদু, কোমল!—চমকিয়া কমল চোখ মেলিয়া চাহিল। যা দেখিল, অপরূপ! এক রূপসী কিশোরী···মুখে-চোখে হাসির জ্যোৎস্না!···আশ্চর্য্য! এ যে ট্রেণে দেখা সেই···রূপসী তরুণী!···অন্ধকার ঘর চকিতে আলোয় আলো হইয়া উঠিল।···

সত্যই সে তরুণী? না, তার মনের কোন্ গোপন গহনের সুপ্ত কামনা অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিল?···

তরুণী কথা কহিল,—একটু জল খান···

সত্যই তবে! কমল চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে, তরুণীর হাতে একটি ডিশ্। ডিশে ছাড়ানো ফল, মিষ্টান্ন প্রভৃতি···

তার মনে পড়িল সেই দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস। জগৎসিংহের কারা-কক্ষে আয়েষা···! সে গল্প। আর এ? সত্য! গল্পের চেয়ে সত্য ঢের বেশী সুন্দর!

কমল কহিল,—আপনি···?

তরুণী কহিল,—এ গৃহে বন্দিনী···

বন্দিনী! তবে যে তারক বলিল, এটা খালি বাড়ী! রাস্কেলের কোনো অভিসন্ধি আছে না কি?

কমল কহিল,—কিন্তু আমি···

তরুণী কহিল,—বন্দী। খেয়ে নিন্। তার পর নিশুতি রাত, বাহিরে এখনো বৃষ্টি পড়চে···চাবি আমি খুলে দিচ্ছি, পথে চ'লে যান। পথে বেরিয়ে মোড়েই মোটর-কার পাবেন। নির্ভয়ে তাতে উঠে বসবেন···ড্রাইভারকে যেখানে নিয়ে যেতে বলবেন, সে নিয়ে যাবে। ভয় নেই। মুক্তি মিলবে।

কমল কহিল,—আর আপনি···?

তরুণী একটা নিশ্বাস ফেলিল। তার পর কহিল,—বলচি, আগে আপনি জল খান···তাঁর স্বরে কি মমতা···কতখানি দরদ!

আপত্তি তুলিতে প্রাণ কাতর হইল। কমল ডিশ হাতে লইল এবং একটি রসগোল্লা তুলিয়া···

তরুণী কহিল,—শীগ্‌গির। ঐ গ্লাশে জল···

কমল কহিল—আপনাকে এখানে বন্দিনী রেখে আমি যাবো না। এ মুক্তির জন্য আপনাকে বিপদে পড়তে হবে। না···

তরুণী কহিল,—যাবেন না?

—না!

তরুণী কহিল—আশ্চর্য্য! মুক্তি আপনি চান না?

—না।

সে বাঁধনই চায়। কমলের সেই কবিতা মনে পড়িল। রবীন্দ্রনাথের সেই ছত্র!—

মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা!

সহসা মনে হইল, এ বন্দিত্বে লাভ তো নাই! তার চেয়ে বাহির হইয়া পুলিশ ডাকিয়া আনিয়া এই বন্দিনী তরুণীকে…

ডিশ্ রাখিয়া কমল কহিল,—আমি যাবো…

তরুণীর মুখে-চোখে আনন্দের দীপ্তি ফুটিল। তরুণী কহিল,—আসুন—বলিয়া হাত বাড়াইল; কমল তরুণীর হাত ধরিল। তার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল।…ঘরের আলো নিবিল।

তরুণীর হাত ধরিয়া কমল বাহিরে আসিল।…জমাট অন্ধকার। বৃষ্টি পড়িতেছে। কয়েক পা…ঐ সেই গাড়ী-বারান্দার দ্বার।

সহসা চোখে আলোর পরশ…তরুণী থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বজ্র-হুঙ্কারের মত কণ্ঠস্বর—খবর্দ্দার!

টর্চ্চের আলো! কমল ফিরিয়া দেখে, সেই দেবী মিত্র!…তার হাতে টর্চ্চের আলো, চোখে অগ্নির দাহ!

দেবী মিত্র কহিলেন—এ উত্তম! বি-এ পাশ, স্কলার… তার পক্ষে খুব উত্তম…গভীর রাত্রে গৃহবাসিনী তরুণীকে নিয়ে এই গৃহত্যাগ… elopement! পেনাল কোডখানা পড়া আছে?…দরোয়ান…

সেই গুণ্ডাকৃতি চেহারার আবির্ভাব!…দেবী মিত্র কহিলেন,—একে বেঁধে সেই ঘরে ফেলে রাখো গে। কাল পুলিশের হাতে…

দরোয়ান তাকে ধাক্কা দিয়া লইয়া চলিল। আবার সেই ঘর…দেবী মিত্তিরের স্বর কাণে গেল,—তুমি! তার পর তরুণীর কান্না! কমলের বুক ভাঙ্গিয়া গেল! মায়া-মমতার উপর এ কি দৈত্যের পেষণ! পাজী! শয়তান!…

একটা ধাক্কা…ধড়মড়িয়া চোখ খুলিয়া কমল দেখে, সামনে তারক…তার পিছনে একটা বামুন। টেবিলে দু'খানা বড় বগী থালায় গরম লুচি, নানা তরকারী। সুগন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে!…

সে একটা নিশ্বাস ফেলিল।…হা ভগবান্! এর চেয়ে সে কঠিন অত্যাচারও যে ঢের কাম্য ছিল!…

তারক কহিল—খাও…

কমল কহিল,—কোথা থেকে সব জোগাড় করলে হে?

তারক কহিল,—বললুম না, এ আমার এক আত্মীয়ের বাড়ী! মানে, আমার মাসিমার শ্বশুরের বাড়ী। মাসিমা বেঁচে নেই। তাঁর শ্বশুর এই বাড়ীতে থাকতেন—সম্প্রতি কুইন্স্ পার্কে মস্ত বাড়ী করেচেন…পূজার পর এই রাস-পূর্ণিমার দিন সে-বাড়ীতে গেছেন। দৌড়ুতে দৌড়ুতে আমার মনে পড়েছিল, তাই এখানে ওঠা। তার পর দেখলুম, রাত্রে যখন ফেরা হবে না, তখন উপোসী থাকাও তো সঙ্গত নয়…

কোনোমতে ভোজন শেষ করিয়া কমল বিছানায় শুইয়া পড়িল—শুইয়া চোখ বুজিল। যদি সেই স্বপ্নটুকুকে আবার ফিরানো যায়…

কিন্তু…

পণ্ডিতরা কি সাধে বলিয়াছেন, যা যায়, তা' আর আসে না!… সে-স্বপ্ন আর ফিরিল না!

৭

সকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই তারকের স্বর—মাসিমার শ্বশুর এসেচেন হে!…বেলা হয়েচে…ভারী আরাম্সে ঘুমোনো গেছে, মোদ্দা।

কমল চাহিয়া দেখে, ঘরে রৌদ্র। আকাশে মেঘ নাই। শীত কন্কনে।…

বাহিরে কণ্ঠস্বর—কোথায় হে?…

সঙ্গে সঙ্গে তারকের মাসিমার শ্বশুরের প্রবেশ। কমল চমকিয়া উঠিল। এ যে সেই রাত্রের স্বপ্নে দেখা দেবী মিত্র …এ মূর্ত্তি ভুলিবার নয়! মিটিংয়ে গেলে দেবী মিত্র… হেদুয়ার সুইমিং-ব্যাপারে দেবী মিত্র, ইন্‌ষ্টিটিউটে দেবী মিত্র, বেলুড়-মঠে দেবী মিত্র! যেখানে যে কোনো ব্যাপার ঘটুক, সেইখানেই…তা ছাড়া কন্‌ভোকেশনেও… দেবী মিত্র ইউনিভার্সিটির মস্ত ফেলো—সর্ব্বঘটে বিরাজিত!

স্বপ্নের কথা মনে পড়িল। বন্দিত্ব ঘটিবে না কি?… Coming events cast their shadows before— তাই? হয় যদি, দুঃখ নাই…সে তরুণীও তাহা হইলে…

দেবী মিত্র কহিলেন,—ঘুম হয়েছিল তো! সব শুনে তারককে বলেছিলুম, আমার ওখানে যেতে…তা ও রাজী হলো না।… চা এসেচে, খাও। সরযূ

—দাদু…

পরক্ষণেই এক তরুণীর প্রবেশ। এ কি,…এ যে ট্রেণের কামরার সেই সুশ্রী…

কমলের সন্দেহ জাগিল…মাথা ঠিক আছে তো? ছবির পর এই যে ছবি…এর কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা স্বপ্ন…?

তারক ডাকিল,—এসো হে—ঐ ধারে…

বিস্ময়ে স্তম্ভিত…বলিলে কমলের মনের সঠিক পরিচয় বোধ হয় দেওয়া হয় না! পুরাকালে একটা কথা চলিত ছিল—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়…এ তাই!…

মন্ত্রচালিতবৎ কমল তারকের অনুসরণ করিল!…

বারান্দায় টেবিলে চা, টোষ্ট রুটী, মাখন…

দেবী মিত্র কহিলেন,—আঃ ফলগুলো তো আনেনি… দেখি…

তিনি বিদায় লইলেন। কমল যেন কাঠ! তারক কহিল—বসো…

সরযূ কহিল,—দেখেচো, চিনির পাত্রটা…এখনি খেয়ো না, তারকদা…আমি চিনি এনে দি…

সরযূও বিদায় লইল।…

কমল কহিল,—ব্যাপার কি হে তারক? ষড়্‌যন্ত্র বলতে পারি না; কারণ, প্রকৃতির উপর মানুষের হাত থাকতে পারে না। বৃষ্টির সম্ভাবনা তুমি জানতে না, নিশ্চয়!

তারক কহিল.—না। বললুম তো ছোটার মুখে এই বাড়ীর কথা মনে হয়েছিল। তখনো আর কোনো কথা নয়…তার পর বৃষ্টি থামার লক্ষণ যখন অসম্ভব দাঁড়ালো, তখন চা আনতে গিয়ে ইতিবৃত্ত বলতে হলো—সঙ্গে সঙ্গে খাবার ব্যবস্থাও হয়ে গেল। মিত্তির সাহেব—আমরা দাদু বলি—শুনে বললেন,—তা হ'লে ছেলেটিকে একবার স্বচক্ষে দেখেও আসবো রে…আর সরযূকেও দেখাবো। ওরা না কিছু টের পায়। ব্যস্…

কমল কহিল—এঁরই নাম সরযূ?

—হাঁ।

—রাস্কেল! দু'বছর আগের কথা মনে আছে, তুমি মধুপুর যাচ্ছিলে পূজার বন্ধে?…

তারক কহিল—সেই বর্দ্ধমান ষ্টেশনে তোমার সঙ্গে দেখা হলো—খুব মনে আছে। সে তো ঐ সরযূর জন্যই যাওয়া… ও ধরলে, মধুপুর যাবো। একা কার সঙ্গে যাবে? কাজেই আমরাও সপরিবারে চললুম। আমার মা, দিদিমা, স্ত্রী, ভাইবোন সব একসঙ্গে। দিদিমাকে আর মাকে তোমার কথা বলি সেই সময়। আরো বলি, চমৎকার ছেলে…পাত্র চাও যদি সরযূর জন্য…

বটে!

ডেভেলপ্ হইলে প্লেটে যেমন ফটো ফোটে, ব্যাপারখানা তেমনি ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল।…তাই ছুটীর পর হইতে তারক অমন অন্তরঙ্গতা করিত…এবং কাকারা কি করেন, কোথায় থাকেন, কাকাদের কি নাম, এত সংবাদ সংগ্রহ করিতেছিল…ওঃ!

তারক কহিল,—দাদুর কালো রঙটার উপর তোমার যে রকম বিদ্বেষ,…তাঁর সম্পর্কীয় কোন মেয়েকে তুমি দেখবে না ব'লে পণ ক'রে বসলে…তবু আমি হাল ছাড়িনি!… মনে মনে ফন্দী আঁটছিলুম…

—কি ফন্দী?

—বায়োস্কোপ দেখতে যাওয়ার…তোমাকে নিয়ে আমি যেতুম, আর এদিক্ থেকে এঁরা…তা অকস্মাৎ এ যা ঘটনা ঘটলো…

রাতের স্বপ্নের কথা কমলের মনে পড়িল! মাঘের শেষে বৃষ্টি রাজার সৌভাগ্য সূচনা করে, আর অগ্রহায়ণের বৃষ্টি…তার যে তুলনা নাই! তুচ্ছ প্রজার প্রাণের সকল কামনা তাহাতে…

তারক কহিল—পছন্দ হয় আমার ভগ্নীকে?…

কমল কহিল—থামো, জ্যাঠামি করতে হবে না! এ পরিচয়টুকু যদি খুলে বলতে আগে…

—বাঙালীর ইজ্জৎ-রক্ষায় তুমি তৎপর কি না,…

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কমল কহিল,—বুড়োরা যে বলে, তরুণের দল একটু বেশী emotional তাদের মতামত কোনো বিষয়ে গ্রহণ করা চলে না। তা, কথাটা ঠিক!…

তারক কহিল,—দাদুকে কি বলবো? এ্যাঁ? তোমার উপর এখনো ওঁর ঝোঁক আছে প্রবল। আরো সম্বন্ধ ঢের আসচে… তা আমায় কেবলি বলেন, তোর সে বন্ধুর বিয়ে হয়ে গেছে রে?…ওঁর রঙ কালো বটে। কিন্তু এমন দরাজ মন, এমন স্নেহ…এর তুলনা নেই। আমি সঙ্গতিহীন, তবু রাজার হালে আছি, ওঁরই প্রসাদে।…সাধে বলেছিলুম সেদিন,

কাজল-কালো মেঘে সে ধারা ঝরে, ছুনিয়া তাতে স্নিগ্ধ হয়, শীতল হয়···কি বলো?

কমল কহিল,—মেজকাকাকে লিখো, ওঁরা এসে দেখুন একবার···এই জন্যই বুঝি, গোপন করবো না হে, বন্ধুর দলে তোমার উপর আমার কেমন একটা টান আছে সবার চেয়ে বেশী···coming events না কি?

কথাটা শেষ হইল না। সরযূ আসিল,—কাপে চা ও চিনি দিতেছিল, আর কমল মাথা নীচু করিয়া সরযুর চাঁপার বরণ হাতখানি দেখিতেছিল···প্রাণে কি পিপাসাই···

হঠাৎ তারক বলিল,—দাছ···

বলিয়াই সে উঠিয়া বাহিরে বারান্দায় গেল। কমলের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল, বুঝি এই কথাই সে···

লজ্জায় সে অভিভূত হইয়া পড়িল। একটু সবুর সহিল না! এমন বেকুব···!

সরযূ কহিল,—চিনি কি আপনি বেশী খান···? তার স্বর বেশ স্পষ্ট, সহজ; তাহাতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই, দ্বিধা নাই!

একটা সবেগ নিশ্বাসের সহিত জবাব ফুটিল,—আজ্ঞে না, সামান্যই।···

সরযূ ডাকিল,—তারকদা···এসো, চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

বাহির হইতে তারকদা কহিল—যাচ্ছি ভাই··

একটু আলাপের আগ্রহে কমলের বুকখানা ফাটিয়া যাইতেছিল! কোনো মতে চোখ তুলিয়া সরযূর পানে চাহিয়া কমল বলিয়া ফেলিল—পরীক্ষিৎ চক্রবর্ত্তীর সেই বই···কাঁকরের বুকে সেই যে কি···আপনি কিনেছিলেন, মনে আছে?···

সরযূ তার দিকে চাহিল। তার চোখে ও বিস্ময়, না, আনন্দ···কি ও?···যাই থাক্, একটু হাসিও আছে!

সরযূ কহিল—আপনি কিনছিলেন সে বই সেই হাওড়া ষ্টেশনে না? তার পর···

—হাঁ!

সরযূ সহসা মুখ নামাইল, তার পর কতকটা আত্মগত-ভাবেই কহিল,—নাঃ! তারকদা গেল কোথায়—বলিয়া চকিতা বিদ্যুল্লতার মত ত্বরিত গতিতে বারান্দার দিকে চলিয়া গেল।

মুখে কাপ্ তুলিয়া কমল তার সপ্রতিভ দৃষ্টি অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গীতে বারান্দার দিকে দিকে মৃদু প্রসারিত করিতেছিল···সহসা···ও-পাশে···ঐ যে সরযূ! ···সরযূ তাকেই লক্ষ্য করিতেছিল!

অসহ্য পুলকে তার দেহ-মন ছুলিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে কাপটা কাৎ হইয়া গেল, এবং গরম চা···

কমল লাফাইয়া চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।··· বাহির হইতে সেই মুহূর্ত্তে দেবী মিত্র ও তাঁর পিছনে তারক এবং শ্রীমতী সরযূ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।

দেবী মিত্র কহিলেন,—বসো, বসো···চা খাও। মাথরুলের গুণময় বাবু তোমার কে হন?···

কমল কহিল,—মেজকাকা।···

দেবী মিত্র কহিলেন,—বটে!

তারক কহিল,—সরযূ বসো···আমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করো!···

দেবী মিত্র হা-হা করিয়া হাসিলেন; কহিলেন,—ত্যাখো, ছ'জনেই ছ'জনকে ভালো করে ত্যাখো···তার পর আলাপ! এত বড় সুযোগ,এ আমি ছাড়তে দেবো না, তা মোদ্দা ব'লে রাখচি! বাপ্, সরযূ! না, বুকের কাঁটা। জানো ভাই··· কি নাম তোমার? কমল, না? তা, এ কাঁটা দেবী মিত্রের বুকে কেন ভায়া? কমলেই তো কাঁটা গাঁথা থাকে চিরদিন! তা কমলে গেঁথেই জন্ম জন্ম থাক্, দিদি!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বিচিত্র বাংলো

কালিফোর্ণিয়ার এক উদ্যানে একটি কর্ত্তিত বৃক্ষের অংশ আছে। এই বৃক্ষাংশটি ৩ হাজার বৎসরের পুরাতন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা

কর্ত্তিত বৃক্ষকাণ্ডে বিচিত্র বাংলো

হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে খনির অনুসন্ধানকার্য্যে ব্যাপৃত এক ব্যক্তি এই কর্ত্তিত বৃক্ষের অংশের উপর একটি দ্বিতল বাংলো নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই বাংলোটি এখনও ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় বিদ্যমান। উক্ত ভদ্রলোক একতলে অশ্ব রাখিতেন এবং দ্বিতলে স্বয়ং বাস করিতেন।

চোরধরা বাক্স
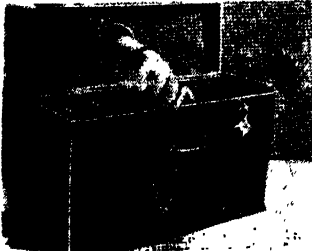
চোরধরা বাক্স

রাজপথে মূল্যবান্ দ্রব্যাদি লইয়া চলাফেরা করা সকল সময় নিরাপদ নহে। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে কৌশলী, বুদ্ধিমান্ ও দুঃসাহসী চোরের উৎপাত অত্যন্ত অধিক। পথিমধ্যেই এই সকল চোর কৌশলে পথিকের মূল্যবান্ দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিয়া থাকে। এই সকল চোরের চেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে এক জন নারী গোয়েন্দা একপ্রকার সুদৃঢ় বাক্স উদ্ভাবন করিয়াছেন। বাহকের হস্ত এই বাক্সের সঙ্গে শৃঙ্খলিত অবস্থায় থাকে। উহা ছিনাইয়া লইতে গেলেই চোরের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য বাক্সের অভ্যন্তর হইতে বিপদ-জ্ঞাপক শব্দ শ্রুত হইবে। বাক্সের ডালার মধ্যে বাহকের মণিবন্ধ প্রবিষ্ট থাকে এবং একটি হাতলের সহিত উহা শৃঙ্খলিত থাকে। বাহকের অঙ্গুলির চাপে বিপদজ্ঞাপক শব্দ নির্গত হইয়া থাকে। কাযেই বাহককে পর্য্যন্ত বলপূর্ব্বক অপহরণ করাও সহজ হয় না।

বিরাট্‌কায় সামুদ্রিক মৎস্য

বিরাট্ শীলমৎস্য বা জলহস্তী

কোন একটা সার্কাসে একটা বৃহদাকার শীল মৎস্য বা সামুদ্রিক হস্তী আছে। ইহার শরীরের বর্ত্তমান ওজন প্রায় ৮৬ মণ। এই বিরাট্ জীবটির শরীররক্ষার জন্য প্রত্যহ সাড়ে ৫ মণ মৎস্য জীবলীলা সংবরণ করে। দক্ষিণ-মেরুর সন্নিহিত সমুদ্রে এই জীবটি ধৃত হয়। তখন তাহার ওজন সাড়ে ২১ মণ মাত্র ছিল। কয় বৎসরে তাহার ওজন বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। এই শীল মৎস্যটি জলহস্তী বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। সার্কাসের কর্ত্তা ইহাকে একটি চৌবাচ্চায় জীয়াইয়া রাখিয়াছেন। উহাতে ৬ হাজার ৫ শত গ্যালন জল ধরে। এই জীবটিকে যখন স্থানান্তরিত করা হয়, তখন ১ শত ফুট প্রশস্ত গাড়ীর উপর একটি চৌবাচ্চায় রাখা হইয়া থাকে। এই চৌবাচ্চায় ১০ হাজার গ্যালন জল ধরে। মৎস্য ব্যতীত অন্য

কোনও খাদ্য এই রাক্ষসের ভক্ষ্য নহে। শিক্ষকের আদেশ মৎস্যটি পালন করিয়া থাকে।

রাজপথে কৃত্রিম পুলিস

ওয়েষ্ট লাফায়েট অঞ্চলের রাজপথের মোড়ে মোড়ে পুলিসের পরিচ্ছদ-ভূষিত কৃত্রিম মূর্ত্তি-সমূহ রক্ষিত হইয়া থাকে। যে সকল

পুলিসের পরিচ্ছদে মনুষ্য-মূর্ত্তি

স্থানে যান-বাহনের থামিবার কথা, পথের সেইরূপ সংযোগস্থলেই এই সকল মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহাতে যানবাহনাদির নিয়ন্ত্রণ-কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

জীবনরক্ষক বন্দুক ও হাউই

জীবনরক্ষক বন্দুক ও হাউই

সাধারণ বন্দুকের সহিত হাউই নিক্ষেপের ব্যবস্থার সন্নিবেশ করিয়া অধুনা দক্ষিণ-আফ্রিকায় জলমগ্ন ব্যক্তির প্রাণরক্ষার নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই বন্দুকের মধ্য হইতে আড়াইশত গজ রজ্জু নিক্ষিপ্ত করা যায়। জীবনরক্ষক তরণী হইতে বন্দুক ছুড়িলে উক্ত রজ্জু দেড়শত গজ দূরে পতিত হয়। রজ্জু নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে একটা হাউই ফাটিয়া যায় এবং রজ্জুটিকে আরও ১শত গজ দূরে লইয়া যায়। প্রদর্শনী-কালে ৬ জন সন্তরণকারীকে এই উপায়ে তরণীতে তলা

পক্ষি-পালনের কৌশল

কালিফোর্ণিয়ার কোন ব্যক্তি একটি শিশু "হমিং বার্ডকে" (সঙ্গীত-কারী ক্ষুদ্রপক্ষী) পাইয়া গৃহে লইয়া যান। কিন্তু কিরূপে এই পাখীটিকে বাঁচাইয়া রাখিবেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন জ্ঞান ছিল না। পক্ষি-সংক্রান্ত নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, মধু এবং চিনি এই দুইটি পদার্থ উক্ত পক্ষিজাতির বিশেষ প্রিয়।
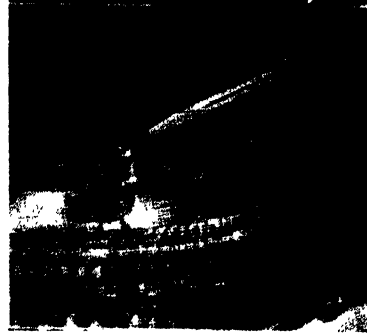
পক্ষী পালনের কৌশল

তখন তিনি 'ড্রপার' বা ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঔষধ ফেলিবার যন্ত্র সাহায্যে পক্ষিশাবককে আহার্য্য প্রদান করিতে থাকেন। পটিক্ষীও ক্রমে এই আধার হইতে আহার্য্য গ্রহণে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। পাখীটি অনেক দিন বাঁচিয়া ছিল।

জলবীক্ষণ-যন্ত্রসাহায্যে মৎস্য-শিকার

পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ ফুট জলের নিম্নস্থ পদার্থ পরিষ্কাররূপে দেখিবার উপযোগী একপ্রকার যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাকে জলবীক্ষণ-যন্ত্র বলা যাইতে পারে। মৎস্য-শিকারী বা ব্যবসায়ীরা এখন এই যন্ত্রসহযোগে মৎস্য-শিকার করিতেছে। এই জল-বীক্ষণ-যন্ত্রটি দুই ফুট দীর্ঘ। ইহার 'লেন্স' বা কাচ ৯ ইঞ্চি পরিধিবিশিষ্ট। জলের মধ্যে এই যন্ত্র প্রবিষ্ট হইলে কাচের পার্শ্ব দিয়া জল প্রবেশ করিতে পারে না। জলমধ্যে বীক্ষণ-যন্ত্রটি ডুবাইয়া দিয়া শিকারী ২৫ ফুট নিম্নের ১৩ ফুট বিস্তৃত স্থানের দৃশ্য দেখিতে পায়। শুধু মৎস্য-শিকার নহে, ইহার সাহায্যে জলনিমগ্ন বস্তুর সন্ধান করাও সহজসাধ্য। মানুষের জীবনরক্ষার

জলবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে মৎস্য-শিকার
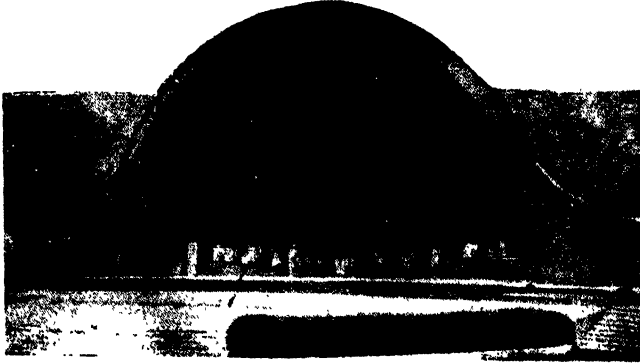
চলমান রঙ্গমঞ্চ

চলমান রঙ্গমঞ্চ

হলিউড 'বউলে' ব্যবহারের জন্য চলমান একটি রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হইয়াছে। এই রঙ্গমঞ্চের নিম্নভাগে চাকা আছে। ইস্পাতের রেল-লাইনের উপর দিয়া এই চাকার সাহায্যে রঙ্গমঞ্চটিকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অনায়াসে লওয়া যায়। রঙ্গমঞ্চের উপর চন্দ্রাতপ আছে। দশটি খিলানের উপর চন্দ্রাতপ আচ্ছাদিত থাকে। খিলানগুলি সমান নহে; ক্রমে ক্রমে আয়তনে ছোট হইয়া গিয়াছে। সমগ্র রঙ্গমঞ্চের প্রশস্ততা প্রায় ১ শত ১০ ফুট হইবে, গভীরতা ৬০ ফুট। সমগ্র রঙ্গমঞ্চটি ইস্পাতের দ্বারা নির্ম্মিত। উভয় পার্শ্বে প্রসাধন বা বেশ-কক্ষ আছে। এই চলমান রঙ্গমঞ্চটি নারীর শিরোভূষণ বা টুপীর আকারবিশিষ্ট। এঞ্জিনের দ্বারা রঙ্গমঞ্চটিকে টানিয়া লওয়া হয়।

মোটরগাড়ী-সংলগ্ন শয্যা

মোটরগাড়ী-সংলগ্ন শয্যা
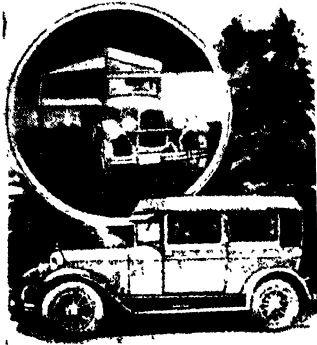
প্রতীচ্যের বাজারে একপ্রকার নূতন মোটর দেখা গিয়াছে; ইহাতে শয্যার ব্যবস্থা আছে। গাড়ীর ছাদের উপর এই শয্যা অবস্থিত। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে নিশাযাপনের জন্য শয্যার ব্যবস্থা করা যায়। অথচ সমগ্র গাড়ীখানির বসিবার স্থানগুলি ব্যবহারোপযোগী থাকে। ছাদের উপর স্প্রীংয়ের গদি তোষক থাকে, উহার এক পার্শ্বে কাঠের পায়া এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট হয় যে, শয্যা হেলিতে দুলিতে পারে না। শয্যার উপরিভাগ জলনিবারক বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। বাতাস যাতায়াতের বাতায়নও ইহাতে বিদ্যমান। চিত্রটি দেখিলেই সকল বিষয় পরিস্ফুট হইবে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্মৃতি-সৌধ

প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্মৃতি-সৌধ

সিরিয়া দেশের বালবেক্ নামক একটি নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটি স্মৃতি-সৌধ আছে। কাহার উদ্দেশ্যে কি নিমিত্ত এই স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা ইদানীং বিস্মৃতির গর্ভে সমাহিত। এই স্মৃতি-সৌধটি ৬০ ফুট উচ্চ। ইহার চারিপার্শ্বে শিকারের নানাবিধ চিত্র ক্ষোদিত রহিয়াছে। কিন্তু কোন্ যুগে, কাহারা ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহার বিন্দুমাত্র আভাস বর্ত্তমান সভ্যজগতের অগোচর।

শীতাতপ-নিবারণের বিচিত্র ব্যবস্থা

অট্টালিকা-প্রাচীরমধ্যে পশমবৎ দ্রব্য সঞ্চারিত হইতেছে

প্রস্তর হইতে পশমের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ অধুনা প্রস্তুত হইতেছে। গৃহের ছাদ ও প্রাচীরের মধ্যে ফাঁক রাখিয়া তন্মধ্যে বিশিষ্ট প্রকারের প্রস্তুত রবারের নলের সাহায্যে উক্ত পশমের ন্যায় পদার্থ বায়ুতাড়িত করিয়া সঞ্চারিত করিলে গৃহগুলিকে শীতাতপ হইতে সুরক্ষিত করা হয়। এই ভাবে গৃহ নির্ম্মিত হইলে অতিরিক্ত শীত বা সূর্য্যোত্তাপ হইতে ঘরের অধিবাসীরা অসুবিধা বোধ করিতে পারে না। গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্য্যের

উত্তাপে কষ্ট পাইতে হয় না। প্রচণ্ড শীতের সময় গৃহের অভ্যন্তর-ভাগ উষ্ণ থাকে। এই প্রকারে insulation বা বিচ্ছিন্নতা দ্বারা গৃহ-প্রাচীর বা ছাদ নির্ম্মিত হইলে বাহিরের প্রচণ্ড শব্দও গৃহাভ্যন্তরবাসীদিগকে বিরক্ত করিতে পারে না। ইহা শব্দ-নিরয়ণের ন্যায় অগ্নিভয় হইতেও গৃহকে রক্ষা করিয়া থাকে। সংগৃহীত চিত্র হইতে দেখা যাইবে, কি প্রকারে নলের সাহায্যে নির্ম্মিত অট্টালিকার মধ্যে প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত পশমবৎ দ্রব্য সঞ্চারিত করা হইতেছে।

বিচিত্র উড্ডায়মান পোত

জার্ম্মাণীর এক প্রকার উড্ডীয়মান পোত স্থলের উপর দিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া চলিত। কিন্তু ইহাতে একটা বিপদ ছিল। প্রবল বায়ুবেগে অনেক সময় এই পোত সমুদ্র-জলের উপর পড়িবার আশঙ্কা হইত। সেই সময় ভূমিতলে নামিয়া না আসিলে জলমগ্নের সম্ভাবনা। অধুনা সে আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছে। দারু-নির্ম্মিত সেতুবৎ উপকরণ পোতের সহিত সন্নিবিষ্ট করায় জলে পড়িলেও পোতের জল-নিমজ্জিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।
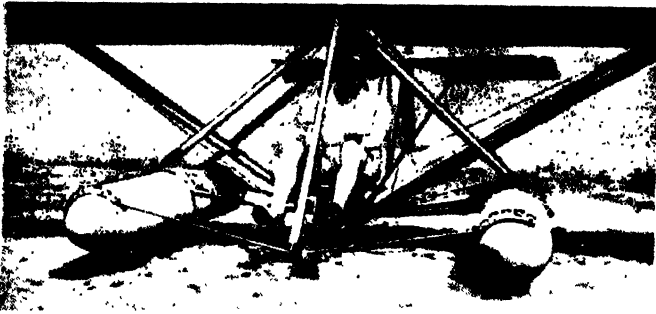
বিচিত্র জার্ম্মাণ পোত

কেদারা-শয্যা

বাহু-সমন্বিত কেদারাকে শয্যায় পরিণত করিবার বৈজ্ঞানিক কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শ্রেণীর আসন ও শয়ন সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। কেদারার একটা কল টিপিবামাত্র উহার দুইটি বাহু অবনমিত হয় এবং হেলান দিবার স্থানটি উপধানে পরিণত হয়। শয্যার অংশ কেদারার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। যখন বসিবার জন্য কেদারার প্রয়োজন, তখন উহা দেখা যায় না। কল টিপিলেই শয্যাটিও বাহির হয়। দুই তিন সেকেণ্ডের মধ্যেই আসনটিকে শয্যায় এবং শয্যাকে আসনে রূপান্তরিত করা যায়।

কেদারা-শয্যা

রেডিও শক্তি সাহায্যে বিমান-পোত পরিচালন

একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে, বৈদ্যুতিক শক্তি বায়ুস্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করিলে, তদ্দারা কি বিমানপোতাদিকে পরিচালিত করা সম্ভবপর? আমেরিকার জনৈক বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস করেন যে, ইহা সম্ভবপর। তিনি সম্প্রতি এ বিষয়ে পরীক্ষা করিতেছেন। উদ্দেশ্যসাধনের জন্য উক্ত বৈজ্ঞানিক একখানি আদর্শ বিমানপোত রচনা করিয়াছেন। তাহার সহিত হাউই জাতীয় এক প্রকার মোটর সংলগ্ন করিয়া তাহার সাহায্যে বায়ুপথে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভূতলস্থ ষ্টেশন হইতে তাড়িত-তরঙ্গ ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রক্ষিপ্ত করিলে বিমানপোত আপনা হইতে যথেচ্ছ পরিচালিত হইবে। বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব শক্তিবলে কল্পনার অতীত ব্যাপারও সম্পন্ন করা যায়।

রেডিও শক্তিসাহায্যে বিমানপোত পরিচালন

মিলন

১

স্পেশাল ডেপুটেশনের কাযের প্রচণ্ড দাপটে পুজোর এবং বড়দিনের চিরপ্রিয় ছুটী দুটো প্রবল বাত্যার মুখে খড়কুটোর মত কোথায় যে বৃথাই মিলিয়ে গেল. তা বোঝবার অবসর ঘটল তখন, যখন কায শেষ ক'রে হাঁপ ছাড়বার অবকাশ মিললো মার্চমাসের শেষাশেষি।

কিন্তু কে জানত যে. আমার এই কাযের ঝঞ্ঝা বাঙ্গালা দেশের একটি ঘরের কোণে এত বড় অনর্থ জাগিয়ে তুলেছে। কে জানত, সেখানকার ঈশান কোণে এই অবসরে এক প্রকাণ্ড কালো মেঘ সঞ্চিত হয়ে উঠেছে, যার অভিমানের তীব্র-বিদ্যুৎ চিঠির মধ্য দিয়েও আমার কাছে পৌঁছে জানিয়ে দিলে যে, যদি আর বিলম্ব করি, ত' সেই ব্যথার মেঘ যে ধারা-বর্ষণ সুরু ক'রে দেবে, তার ক্ষতি আমার কোনও ডেপুটেশন-ই পূরণ করতে পারবে না।

চিঠি এলো একবারে এই আল্টিমেটম নিয়ে যে, যদি আমি ইষ্টারের ছুটীর সঙ্গে আরও অন্ততঃ দিন পনরর ছুটী নিয়ে বাড়ী না যাই, ত'—।

কালিদাসের সেই ভ্রূবিলাস-চতুরা জনপদবধূদের সময় থেকে পরিবর্ত্তনমাত্র এইটুকু হয়েছে যে, আষাঢ়ের প্রথম দিবসের বদলে বৈশাখের সুরু এবং মেঘ-দূতের পরিবর্ত্তে পত্র-দূত!

সুতরাং যেতে হ'লো।

কিন্তু যাওয়া ত' সহজ নয়। কে জানত যে, ইষ্টারের এই ক্ষুদ্র ছুটীতেও গৃহ-গামীদের এত প্রাচুর্য্য! গাড়ীর আর ক্লাসের বিচার নেই, কোনও রকম ক'রে গৃহ-প্রত্যাশী প্রাণটা নিয়ে বাড়ী পৌঁছানর জন্য সে যে কাণ্ড, তার উৎসাহ যে অর্দ্ধপথেই তাকে মুক্তি কেন না দেয়, এই আশ্চর্য্য!

বহু কষ্টে থার্ড ক্লাসের একটি কামরায় যায়গা পাওয়া গেল। হিন্দুস্থানী আছে, পাঞ্জাবী আছে, মাড়োয়ারী আছে, মুসলমান আছে, বাঙ্গালী আছে এই গাড়ীতে—নেই কে? মেজেতে, বাঙ্কে পর্ব্বত-প্রমাণ জিনিষ-পত্র ছড়ানো, স্থানাভাবে কারও কারও আসবাব আবার হুকের ওপর দুলছে!

এত ভিড়েও দেখলাম, আমার মাথার ওপর বাঙ্কে কোনও রকম ক'রে হাত-দেড়েক যায়গা ক'রে নিয়ে একটি বাঙ্গালী ছোকরা, ঠেস্ দিয়ে প্রায় আরাম ক'রে শোবার মতই ক'রে রয়েছে। মনে মনে তাকে তারিফ ক'রে বল্লাম, হাঁ, উদ্যোগী পুরুষ-সিংহ বটে!

গাড়ী ছাড়ল, আর সেই ছাড়ার সঙ্গে, মানুষে মানুষে জিনিষ-পত্রে ঠোকাঠুকি লেগে, হুকে দোলান বিছানা-গুলো দুলে উঠে শান্ত হ'তে প্রায় মিনিট তিনেক লাগল। তার পর একটু স্থির হয়ে বসবার অবসর এলো।

বাঙ্ক থেকে সেই ছোকরাটি নেমে এসে আমার সামনে দাঁড়াল।

বয়স বোধ করি তেইশ চব্বিশ, দেহ শীর্ণ, দুর্ব্বল, চোখ দুটো লাল, কপালে মস্ত একটা কাটার দাগ। তার দেহ যেন ঈষৎ কাঁপছিল।

ছেলেটি বল্লে, মশাই-এর কাছে দেশলাই আছে? আমারটা ফুরিয়ে গেছে।

বল্লাম, আছে, ব'লে তাকে দেশলাই-টা দিলাম। সে তার বিড়ি ধরিয়ে দেশলাই-টা ফিরিয়ে দিলে।

আমি তার মুখের দিকে চেয়ে বল্লাম, ভারী কাহিল দেখাচ্ছে।

সে একটু হাসলে। বল্লে, ২।৩ দিন খাওয়া হয়নি। তার ওপর বোধ হয় একটু জ্বরও হয়েছে।

খাওয়া হয়নি কেন?

জোটেনি।

জোটেনি? তার মানে?

উত্তরে সে হাসলে, কিছুই বল্লে না।

বাড়ী থেকে আসা হচ্ছে ত?

সে ঘাড় নাড়লে, না, তার পর বাঙ্কের ওপর উঠল।

অল্প-ভাষী ছোকরা, নিজের অবস্থা বলতে চায় না, কিন্তু তাকে দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তার অবস্থা ঠিক সাধারণ মানুষের নয়—কি যেন একটা নূতনত্ব আছে। চেহারা দেখে দয়াও হয়।

খাওয়া হয়নি শুনে মনটা কেমন করতেও লাগল। পরের ষ্টেশনে তার জন্যে কিছু লুচি-মিষ্টি কিনে ডাকলাম। হাজার হ'ক বাঙ্গালী ত।

সে চোখ বুজে ছিল। আমার ডাকে চেয়ে দেখে বল্লে, আজ্ঞে?

আমি তাকে খাবারটা দিয়ে বল্লাম, খান।

সে হাত যোড় ক'রে বল্লে, না।

আমি বল্লাম, বল্ছেন খাওয়া হয়নি—এতে লজ্জা কি? আর এটা যখন কেনা হয়ে গেছে, তখন ত' আর ফিরবে না, না খেলে নষ্টই হবে। নিন—খেয়ে নিন।

সে আর কোনও উত্তর না ক'রে, খাবারটা নিলে। গভীর কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে খেতে সুরু ক'রে দিলে।

আমি নিজের যায়গায় বসলাম। খানিক পরে চেয়ে দেখলাম, খাওয়া শেষ ক'রে, সে একটা গায়ের কাপড় মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কেমন যেন মায়া হ'চ্ছিল তার ওপর।

২

ন স্থানং তিল ধারণে—তবুও ত' ওঠার বিরাম নেই।

পরের ষ্টেসনে উঠলেন এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক আর তাঁর সঙ্গে দু'জন স্ত্রীলোক। ভদ্রলোকটি যায়গা নিলেন কোনও রকম ক'রে আমারই পাশে, আর স্ত্রীলোক দুজনের মধ্যে এক জন বসলেন বেঞ্চিতে আর এক জন বিছানার ওপর।

মাথায় এক মস্ত মুরেঠা, দুই কাণে ছোট ছোট দুটো মাক্ড়ী ঝুলছে—এক পাঞ্জাবী ফরচুন-টেলার জনৈক হিন্দুস্থানীকে নিয়ে আসর সরগরম করেছিল। তার হাতটা টেনে নিয়ে বল্লে, এ, তোমার যে দেখ্ছি ভারি তকলিফ্ (দুঃখ) চলছে।

হিন্দুস্থানী কাছে ঘেঁসে গিয়ে বল্লে, ঠিক বাৎ বাবা—তকলিফ চলছেই ত'!

ফরচুন-টেলার সগর্ব্বে বল্লে, বাবা ওঁকারনাথের মন্দিরে সৌভাগ্যক্রমে এক ত্রিকালদর্শী ঋষির সঙ্গে দেখা, তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা, মাত্র ২৪ ঘণ্টার দেখা! কিন্তু তাঁর কাছে কি না ভূত—ভবিষ্যৎ আয়নার মত স্বচ্ছ, সেই জন্য ২৪ ঘণ্টায় তিনি আমাকে যে 'ইলিম' দিয়ে গেছেন, আমি গর্ব্ব ক'রে বল্তে পারি যে, ভারতবর্ষে কারুর তা নেই। ব'লে সে ভক্তিভরে কপালে দুই হাত ঠেকিয়ে ওঁকারনাথের সেই ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষকেই বোধ হয় প্রণাম করলে।

হিন্দুস্থানীটি তার হাতখানা আরও মেলে দিয়ে বল্লে, সাচ্ বাৎ। কিসের দুঃখ চলছে, বাবা?

ফরচুন-টেলার সাধু, খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বল্লে, খানদানি, সংসারের দুঃখ।

আমার পাশের নবাগত ভদ্রলোকটি দাঁতে দাঁতে চেপে বল্লেন, এই দেখুন, আর একটা নির্ব্বোধ পড়ল এক সয়তানের কবলে! শুনেছেন ওর জবাব? সংসারের দুঃখ। আর দুঃখ ত' মানষের একটা না আধটা আছেই, আর সে দুঃখ সংসারের না হয়ে কি স্বর্গের হবে, হারামজাদা? আর দেখেছেন মজা। এই সব মার্কামারা সনাতন জবাবে ঐ লোকটা কি রকম অভিভূত হয়ে পড়েছে। বিপদে পড়লে মানুষের যে দুর্ব্বলতা জন্মায়, তারই ওপর ওদের ব্যবসা চলছে, এবং বিপদ যত ঘোরতর হয়, ব্যবসায়ও চলে তেমনি হৈ হৈ ক'রে। আর মজা এই, যে যত বড় বুদ্ধিমান্ই হ'ক না, দুঃখের দিনে তার এই দুর্ব্বলতার দিক্টা ঠিক অতি বড় নির্ব্বোধের মতই প্রবল হয়ে ওঠে।

আমি বল্লাম, আপনি বুঝি এ সব বিশ্বাস করেন না?

তালু আর জিহ্বায় একটা শব্দ ক'রে আগন্তুক বল্লেন, বিশ্বাস করিনে? বেঁচে যেতাম যদি বিশ্বাস মোটেই না করতে পারতাম। কিন্তু মানুষের ভেতর কোথায় যে অণুপরিমাণ একটা দুর্ব্বলতার বীজ আছে, সেই ত' তাকে ঘুরিয়ে মারে। হায়রাণ হয়ে গিয়েছি এদের পাল্লায় পড়ে। জানি, ওরা কত সয়তান, বার তিনেক ঠকেওছি, গাঁটের কড়ি গেছে অনেক, মোটের ওপর জ্বলে পুড়ে মরেছি ওদের জন্যে, তবুও শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে, উপস্থিত সপরিবারে চলছি শ্যামবাজারে, নাগেদের বাড়ীতে আগতা আর একটি ভৈরবীর উদ্দেশ্যে। নিশ্চয়ই জানি, চতুর্থবার ঠক্তে।

আমি বল্লাম—আপনিও বুঝি খুব বিপদে পড়েছেন?

যদি জানেনই যে, ওরা সয়তান, ত' আবার ঠক্‌তে যাচ্ছেন কেন?

ভদ্রলোকটি কপালে একটা ছোট গোছ চড় মেরে বল্লেন, অদৃষ্ট! এই দেখুন না মজা! মানুষ কি একা নিজের জোরে আর বুদ্ধিতে সব করতে পারে? সে যে অসংখ্য সম্বন্ধ গ'ড়ে তুলেছে, তারাই যে তাকে বিপথে ঘুরিয়ে মারে! চলেছি কি নিজের ইচ্ছায়, এই এঁদের জন্যে। ব'লে লজ্জাবনতমুখী সেই দুটি স্ত্রীলোককে দেখিয়ে দিলেন।

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

ভদ্রলোকটি বল্লেন, বিপদ সহজ নয়, এও ঠিক। আমার একটিমাত্র ভাই, এম্, এ, পাশ করা, আর যেমন-তেমন এম, এ, নয়। আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, এমন ভাই কটা লোকে পায়? চাকরীর বাজার জানেন ত মশায়, চাকরীর চেষ্টা ক'রে ঘুরে ঘুরে তার মনটা হয়েছিল খারাপ, তার-পর এক দিন কি গোলযোগ হ'ল—অমন গোলযোগ কার না সংসারে হয় মশায়, তাতেই সে এক দিন রাত্রে না বলা না কওয়া বাড়ী থেকে বেরিয়ে সেই যে চ'লে গেল,—আজ আট মাস নিরুদ্দেশ! মন যদি এতই ঠুন্‌কো, ত এম্, এ পাশ করলি কি করতে? পুরুষ হয়ে জন্মেছিস যখন, পুরু-ষের মতন লড়তে হবে না? তার ওপর যাকে বিয়ে করে-ছিস্, তার অবস্থাটা ভাবতে হয় না? অথচ এমন ভাই-ও হয় না, নম্র, ঠাণ্ডা, এমনি ব্যবহার যে, লোকে ভাল না বেসে থাকতে পারে না। দেখুন না, ওর ঐ বৌ-দিদি, সে-ও কেঁদে আকুল আর বৌমা, ওঁর ত কথাই নেই। দিবারাত্র চোখে বর্ষার ধারা বইছে মা'র আমার। ওদের চোখের জলই ত আমাকে অতিষ্ঠ করেছে, মশাই। জানি যে ঠকতে হবে, তবুও ওদের চোখের জল দেখে সেই ঠক্‌তেই ত' যেতে হয়। বলুন, এতে আমার একার বুদ্ধি-বিবেচনা থাকে কোথায়! তাই ত' আবার চলেছি ঠক্‌তে; এবার আবার ভৈরবী কি না, তাই সঙ্গে ওঁদেরও নিতে হ'ল।

আমি সমবেদনার স্বরে বললাম, আহা!

সেই শব্দে চমকে উঠে যে মেয়েটি আমার মুখের দিকে তাকালে, তার দুই চোখ দেখে বুঝতে দেরী হ'ল না যে, সেই সে পলায়িতের দুর্ভাগা স্ত্রী। ওই দুটি চোখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কত নিদ্রাহীন রাত্রি তারা জেগে কাটিয়েছে, কত অবিরত জলধারায় অভিষিক্ত হয়েছে তারা।

এমন সময় টাকার শব্দ পেয়ে সামনে চেয়ে দেখলাম যে, সেই হিন্দুস্থানীটি গুটিকতক টাকা দিচ্ছে সেই ফর্‌চুন-টেলারকে, আর ফর্‌চুন-টেলার তার কপালে খানিকটা ছাই মাখিয়ে একটা রুদ্রাক্ষ দিয়ে, সেই রুদ্রাক্ষের অশেষ মাহাত্ম্য শত-মুখে কীর্ত্তন করছে।

আমার সঙ্গী মুখ বিকৃত ক'রে বল্লেন, হাতিয়েছে, ঠিক হাতিয়েছে। এ একটা আর্ট মশায়—চমৎকার আর্ট! ঠিক ঐ রকম ক'রে আমারও কাছ থেকে হাতিয়েছে কয়েকবার—শুনবেন সে কথা?

কায ত নেই, বল্লাম, বলুন।

৩

তারই ভেতরে এটু ভাল ক'রে ব'সে নিয়ে ভদ্রলোক বল্লেন, সকালে উঠে দেখলাম, ভাই নেই। ভাবলাম, কোথাও বেড়াতে গিয়ে থাকবে; হয় ত বা কাযের চেষ্টায় গিয়েছে। অত পাশ-করা ছেলে, হঠাৎ যে পালিয়ে যাবে, সে কথা কে ভাবতে পারে বলুন না!

সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে শুনলাম, সে সমস্ত দিন আসেনি, শুনে ভাবনা হ'ল, কিন্তু মনে করলাম যে, হয় ত কোনও বন্ধু-টন্ধুর বাড়ী গিয়ে আটকে পড়েছে। পুলিসে ডায়েরী করিয়ে রাখলাম কিন্তু, বলা 'ত' যায় না।

সে দিন রাত্রে এলো না। তার পরদিনও এলো না। বাড়ীতে তখন মেয়েদের মহলে রীতিমত কান্না-কাটি সুরু হয়েছে, আমার এক একবার রাগও হচ্ছে এই কাওয়ার্ডটার ওপর, আবার দুঃখও হচ্ছে, হাজার হ'ক ভাই-ই ত!

থানায় ছুটোছুটি করছি, তারা কোনও খবরই দিতে পারে না। সে ত' আর আশ্চর্য্য নয়—ওরা শুধু জুলুমই করতে পারে, সাহায্য করে ছাই।

এর-ওর পাল্লায় প'ড়ে তুক্-তাক করলাম কত রকমের; মন্ত্র পড়া হ'ল, আগুন জ্বালা হ'ল, হোম করা হ'ল, কিন্তু সবই ত' বৃথা।

তখন সবাই বল্লে, কলকাতায় ভবানীপুরে মোহনলাল ব'লে এক জন মস্ত বড় তান্ত্রিক আছেন, কিছু খরচ হয় বটে, কিন্তু তিনি মরা মানুষকে মাটীর ভেতর থেকে তুলে আনতে পারেন, জ্যান্ত মানুষের ত' কথাই নেই। তাঁর কাছে যাও, কামনা সফল হবে, এমন কি, একটি কথাও

তাঁকে বলতে হবে না, মুখ দেখে মনের প্রশ্ন জেনে, ভাইকে আনিয়ে দেবেন চট্‌পট্‌। ভাবলাম, তাই না কি হয়। কিন্তু এতগুলো লোক বলছে। হয় ত' হ'তেও পারে।

টাকা-কড়ি নিয়ে পৌঁছলাম মোহনলাল তান্ত্রিকের বাড়ী।

মস্ত তেতলা বাড়ী, পাশে গ্যারেজ, মোটরও আছে নিশ্চয়। শুনলাম, অবিরত কল।

সৌভাগ্যক্রমে দেখা হয়ে গেল,—বাইরের ঘরেই ছিলেন তিনি, কতকগুলি সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে।

আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, ভারি বিপদ যাচ্ছে ত' আপনার।

মনে মনে বল্লাম, যাচ্ছেই ত, তা নইলে তোমার কাছে আসতে হবে কেন। মুখে বল্লাম, হাঁ।

সংসার-সংক্রান্ত বিপদ।

সব শেয়ালের এক ডাক্‌। বাছা বাছা বুলি জানা আছে কতকগুলো, যা সব সময়েই মানুষের যে কোন অবস্থার সঙ্গে থাপ খেয়ে যায়। ওই ক'রে ওরা আস্তে আস্তে মনের কথা বার ক'রে নেয়।

আমি বল্লাম, দেখুন, আর আমি কোনও কথাই বলব না। আপনি মানুষের মনের প্রশ্নও যখন বলতে পারেন, তখন আপনি নিজেই বলুন।

খানিকটা আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, ছেলের খুব অসুখ যাচ্ছে ত'?

আমি বল্লাম, কোন কথাই আমি বলব না। আপনার যা বলবার, ব'লে শেষ করুন, তার পর আমার যা বলবার, বলব।

তিনি একটা কাগজ নিয়ে কি সব অঙ্কপাত করলেন। তার পর বল্লেন, স্ত্রীর অসুখও হ'তে পারে।

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

অসুখ যারই হোক, খুব সাংঘাতিক। শান্তি-স্বস্ত্যয়নের দরকার।

আমি বল্লাম, আপনার বলা শেষ হয়েছে কি?

তিনি বল্লেন, রহুন, চাকরীর কোন গোলমাল চলছে না ত'; অনেকগুলো টাকার ওপরও ঘা পড়বে দেখ্‌ছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আরও কিছু বলবেন?

তিনি বল্লেন, না, এরই মধ্যে একটা কিছু হবেই।

আমি বল্লাম, একটাও না, আমার ভাই পালিয়েছে, তার সম্বন্ধে তিনটি প্রশ্ন ছিল, বেঁচে আছে কি না, কোথায় আছে, কবে আসবে। সুতরাং মোটেই মিল্লো না।

আপনি আমি হ'লে অপ্রস্তুত হতাম, কিন্তু তাঁর সে রকম কোন লক্ষণই দেখা গেল না। হেসে বল্লেন, মনের ঠিক কনসেনট্রেশন হয় নি কি না, একেবারে ঠিকটি হ'ল না, কিন্তু আপনার যে একটা অশান্তি যাচ্ছে, তা ধরেছিলাম।

অশান্তি না হ'লে যে শুদ্ধমাত্র আপনার সঙ্গে হঠাৎ সদালাপ করতে এত দূর আসি নি, এ ত রাস্তার লোকও বুঝতে পারে। সেটুকু বোঝবার জন্যে ত' আপনার মত জ্যোতিষীর দরকার ছিল না।

লোকটা একটুও তাতলে না, এইখানেই ওরা আমাদের চেয়ে বড়। বল্লে, আপনি আমার ফি দেবেন না, ঠিক যখন হুবহু মিললো না, তখন কেন দেবেন ফি? কিন্তু বড় কষ্ট যাচ্ছে ত' আপনার, এই সময় আপনার ভ্রাতৃস্থানও খারাপ কি না। সত্যই আমার দুঃখ হচ্ছে আপনার জন্যে। শাস্ত্রে এর সব এমন অমোঘ প্রক্রিয়া আছে যে, তা করলে বারো ঘণ্টার মধ্যে আপনার ভাই ছুটতে ছুটতে ফিরে আসবে। সস্তায় ক'রে দোবো আপনার জন্যে। টাকা কড়ি খরচ করতে পারেন?

আমি বল্লাম, না, দশ টাকা আছে, তার ভেতর পাঁচ টাকা লাগবে আমায় ফিরে যেতে।

তিনি দুঃখিত হয়ে বল্লেন, দশটা টাকাও যদি খরচ করতে পারতেন ত' দেখতেন, কি রকম আশ্চর্য্য ফল হ'ত।

আমি বল্লাম, পাঁচ টাকার এক পয়সা বেশী নেই।

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বল্লেন, আচ্ছা, পাঁচ টাকাই। আমার খরচে পোষাবে না, কিন্তু আপনার জন্যে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে, কিছু ক্ষতি-স্বীকারই করব। আনুন টাকাটা।

দিতে হ'ল টাকাটা। ফি-এর দু-টাকা মাফ ক'রে পাঁচ টাকা আদায় করার ভেতর যে আশ্চয্য বাহাদুরী, তা যে আমার একেবারে লক্ষ্য হ'ল না, তা নয়, কিন্তু মাছি যেমন মাকড়সার জালে পড়লে নিরুপায় হয়, তেমনি নিরুপায় ছিলাম আমি।

তিনি বল্লেন, আমি ক্রিয়া করতে যাচ্ছি। বসুন আপনি। আপনাকেও দরকার হবে।

খানিক পরে ডাক পড়ল আমার। এক ঘরে ভেতরেটা

নিয়ে গিয়ে বল্লেন, এই দেখুন মড়ার মাথা সব। এই সব সংগ্রহের জন্য কি রকম অর্থব্যয় করতে হয়েছে, তা বুঝতেই পারেন।

আমি বল্লাম, আমাদের গাঁয়ের শ্মশানে মড়ার মাথার অভাব নেই। যদি এক জন লোক সঙ্গে দেন, ত' আপনাকে বিনামূল্যে এক গাড়ী মাথা পাঠিয়ে দিতে পারি।

তিনি হাসলেন। বল্লেন, হ'তে পারে। কিন্তু কলকাতায় ব'সে এ সব সংগ্রহ করতে গেলে খরচ পড়ে অনেক।

তার পর চেঁচিয়ে বল্লেন, মা, চারটি চন্দনকাঠ দিয়ে যা ত'।

একটি মেয়ে এসে কাঠ দিয়ে গেল—চন্দন-কাঠ-ই হবে বা।

একটি বাটিতে অজ্ঞাত এক পাতার রস খানিকটা নিংড়ে, পেয়ারার ডালের কলম তৈরী ক'রে, মড়ার মাথায় সেই রস দিয়ে কি লিখলেন। তার পর চন্দনকাঠ জালিয়ে আমাকে বল্লেন, এই লেখাটা ধরুন ঐ আগুনের ওপর, মাথাটা যেমন যেমন গরম হ'তে থাকবে, আপনার ভাই তেমনি ছুটে আসতে থাকবে, আপনার বাড়ীতে।

আমি বল্লাম, বেশী যেন না ছোটে, যদি হোঁচট খেয়ে পড়ে।

তান্ত্রিক আবার হাসলেন, বল্লেন, না, হোঁচট খাবে না।

তার পর বল্লেন, বারো ঘণ্টার ভেতর আসারই সম্ভাবনা, না আসে ত' উর্দ্ধপক্ষে তিন দিন।

৪

ভায়া বোধ করি ছুটতে ছুটতে হোঁচট খেয়েই প'ড়ে থাকবেন; কেন না, বহু তিন দিন কেটে গেল, অথচ তার দর্শন পাওয়া গেল না।

নিরুপায় হয়ে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম। এই যে একটা বিজ্ঞাপনের কাপিও রয়েছে পকেটে, ব'লে পকেট থেকে একখানা বিজ্ঞাপন বার ক'রে দিলেন। বিজ্ঞাপনটা এইরূপ :—

আজ প্রায় পনর দিন হইল, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ নিশীথকুমার বসু গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে। বয়স বাইশ বৎসর আট মাস। শ্যামবর্ণ, কপালে কাটার দাগ, বামগণ্ডে কৃষ্ণতিল। দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি; রোগাও নহে—মোটাও নহে, মাঝারি দেহ। গৃহে বিবাদ করিয়া গিয়াছে। যে কেহ দয়া করিয়া সন্ধান দিবেন, তিনি আমাদের মহদুপকারসাধন করিবেন, তাহা ভিন্ন উপযুক্ত পুরস্কারও পাইবেন। ভাই নিশীথ, সবাই তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল, বৌমা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু প্রায় অন্ধ করিয়াছেন, আর কেন, দয়া করিয়া এস।—তোমার দাদা বসন্ত।

কেউই দয়া ক'রে আমার ভাইয়ের সন্ধান দিতে পারলেন না, কিন্তু পাঁচ দিনের দিন একটা ২ টাকা ১২ আনার ভিঃ পিঃ পার্শেল এলো, আর এলো একখানি চিঠি। লেখক বর্দ্ধমান জেলার বনপুর গ্রামের শশিনাথ জ্যোতির্বিনোদ। তিনি আমার অবস্থায় বহু সমবেদনা জানিয়ে লিখেছেন যে, শুদ্ধ মাত্র পরোপকারপ্রবৃত্তির বশে, তিনি পার্শেল ক'রে পাঁচটি বটিকা পাঠিয়েছেন আমার ভাইকে ফিরিয়ে পাবার জন্যে। যে সকল খরচ তাঁকে করতে হয়েছে, তারই জন্য সামান্য ভি পি। পাঁচটি বটিকার মধ্যে একটি যে ঘরে আমার ভাই শুত, তার ঈশান কোণে পুততে হবে, একটি তাঁর স্ত্রীর বালিসের তলায় রাখতে হবে, একটি আমার বালিসের তলায়, একটি উত্তরাস্য হয়ে অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে হবে, একটি পূর্ব্বাস্য হয়ে গ্রামের জলাশয়ে। শান্তচিত্ত, সংযমী হয়ে এই সব করতে হবে, এবং সেই দিন হবিষ্যান্ন-ভোজন। ফলে এক দিনের মধ্যে ভ্রাতার পুনরাগমন।

চিঠি প'ড়ে গা জ্বলে গেল, স্থির করলাম, ভি পি আসিবামাত্র ফিরিয়ে দোবো। কিন্তু উপায় কি? অনুরোধ উপরোধ চল্লো বাড়ীর মধ্য থেকে। যুক্তি এই—২ টাকা ১২ আনা দিয়ে যদি নিশীথকে ফিরিয়ে পাওয়া যায়, তার চেয়ে বাঞ্ছনীয় আর কি হ'তে পারে, আর যদি না-ই পাওয়া যায়, ত' না হয় গেল ২ টাকা ১২ আনা।

নিলাম ভি পি, উত্তরাস্য পূর্ব্বাস্য নানা রকম প্রক্রিয়া হ'ল, কিন্তু তার পর এই সাড়ে সাত মাস কেটে গেল। বোধ করি, বনপুরের জ্যোতির্ব্বিনোদ মশায়ের ব্যবসা এত দিনে আরও অনেকটা ফালাও হয়েছে, কিন্তু কোথায় আমার ভাই!

ভাবি, মানুষ কত রকমই ঠকাবার ব্যবসা না করতে পারে; কারণ, জেনে শুনে ঠকবার লোকেরও যে অভাব নেই।

তার পর মাস ২।৩ কাটল। ভাই না আসার দুঃখ ত'

ছিলই, কিন্তু এই ২।১ মাস আর তার ওপর অতিরিক্ত দুঃখ পেতে হয়নি, এই যা মঙ্গল।

কিন্তু বেশী দিন সে সুখ রইল না। প্রভাতে পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যের মত হঠাৎ এক শুভদিনে আমাদের গ্রামে এসে উদয় হলেন—স্বামী শ্যামানন্দ। দেহটি কিছু অতিরিক্ত শ্যাম, কিন্তু ঘি-দুধে বেশ নাদুস-নুদুস। মাথায় সৌখীন জটা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে ত্রিশূল। তিনি গ্রামে রইলেন না, গ্রামের শেষে ছোট একটা জঙ্গল-মত ছিল, তাইতে নিলেন আড্ডা।

তিন দিনের মধ্যেই বনই হয়ে দাঁড়াল জনপদ। সাধুর দেহকে নিরাপদ করবার জন্যে একটা কুটীরও খাড়া হ'ল, এবং যদিও শুনলাম, তিনি অল্পভোজী, তবুও তাঁর জন্যে সারা-দিন ভারে ভারে যে পরিমাণ ভোজ্য সরবরাহ হ'তে লাগল, তাতে ক'রে আমার মত বহু-ভোজীরও বান-প্রস্থের প্রবল বাসনা জেগে উঠল।

পল্লীর গৃহ-লক্ষ্মীরা ভেঙ্গে পড়লেন এই সাধুর দ্বারে, কারুর রোগ-সারান, কারুর পুত্র-কামনা, কারুর স্বামি-বশীকরণ, কারুর ধনাগম। বাঞ্ছা-কল্পতরু দুহাতে বিলোতে লাগলেন ছাই, ভস্ম, শিকড়-মাকড়, এবং দু-হাতেই সংগ্রহ করতে লাগলেন, তাম্র, নিকেল এবং রৌপ্য-মুদ্রার আকারে ভক্তের ভক্তি-নিবেদন।

সাত দিনেই তাঁর অমল কীর্ত্তিকাহিনী আমাদের গ্রামকে পরিব্যাপ্ত ক'রে ছড়িয়ে পড়ল আশে পাশের আরও ৮।১০টা গ্রামে।

তখন আমার ওপর জোর তাগিদ হ'তে লাগল, এই সাধুর কাছে যাবার জন্যে—নিশীথকে ফিরিয়ে আনার একটা উপায় করতে।

শুনলাম, এর আগেই গৃহ-লক্ষ্মীরা গিয়ে এ সম্বন্ধে দরবার ক'রে এসেছেন।

আমি কিছুতেই স্বীকার করব না, কিন্তু গৃহ-লক্ষ্মীদের চোখের জলের কাছে হার মানতে হ'ল অবশেষে।

বাঘের দুধ, চাঁদের শিকড়—এমনি সব অসম্ভব দুষ্প্রাপ্য জিনিষ যোগাড় করতে খরচ হয়ে গেল টাকা পঁচিশ। সেই-গুলো সন্ধ্যার সময় পৌঁছে দিয়ে হুকুম পেলাম রাত-বারোটার সময় তাঁর সাধন-কুঞ্জে যেতে।

বাঘেই খায় কি সাপেই খায়, অথবা ক্ষ্যাপা শিয়ালে কামড়ায়—কিছুই ঠিক নেই। নিশীথ যদি জানত, তার জন্যে কি দুঃখই পেতে হয়েছে আমাকে, ত' সে কিছুতেই স্থির থাকতে পারত না, নিশ্চয়ই ছুটে আসত।

রাত বারোটার সময় গিয়ে হাজির। বল্লেন, হবন হয়ে গিয়েছে। কি ছাই হয়েছে জানি না, কিন্তু দেখলাম, কতক-গুলো পোড়া কাঠ। বল্লেন, মনে মনে তারা-মূর্ত্তি স্মরণ ক'রে প্রণাম কর এই হোমাগ্নিকে।

প্রণাম কল্লাম।

বল্লেন, দক্ষিণ-দিকে মুখ ক'রে বসো। বসলাম। তার পর মন্ত্র প'ড়ে খানিকটা ছাই আমার কপালে ঘষে জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু দেখতে পাচ্ছ?

পাচ্ছি।

কি?

আপনাকে।

স্পষ্ট দেখতে পেলাম, কষ্টে হাসি চাপলেন। বল্লেন, না, না, আমাকে নয়, আর কিছু?

এই ঘর-দোর ছাড়া আর কিছুই নয়।

বল্লেন, আচ্ছা, ফিরে যাও। এই রাত্রেই দেখতে পাবে, তোমায় ভাই-এর ছায়ামূর্ত্তি। জানবে যে, তার ৪৮ ঘণ্টার ভেতর সে ফিরে আসবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ছায়া দেখে কেমন ক'রে মানুষ চিনবো?

বল্লেন, চিনবে।

তথাস্তু।

তিনবার ৪৮ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। সাধুর যশঃসূর্য্য এই সময়ের মধ্যে যতই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে লাগল, ততই আমার ছায়া-দর্শনের আশা ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে গেল। কায়া-দর্শন ত' হ'লই না।

মোটা লাঠিটা নিয়ে বেরোলাম। আজ ছায়া-কায়ার বোঝা-পড়া করতে হবে এর সঙ্গে।

কিন্তু বেশী দূর যেতে হ'ল না। রাস্তায়ই খবর পেলাম, পুলিসে তাকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছে ইষ্টিশনে।

ব্যাপার কি?

এর আগে যেখানে ছিলেন, সেখানে এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে বড় মাখামাখি হয়। তার গহনাগুলি হাতিয়ে চম্পট দিয়ে এইখানে আড্ডা নেন জঙ্গলে।

মনে ভক্তি হ'ল, পুলিসের হেফাজতে এই সত্যস্বরূপধারী সাধুটিকে দেখবার প্রবল বাসনা দমন করতে পারলাম না।

ইষ্টিশনে গিয়ে দেখলাম, পুলিসের হাতকড়ি-পরা স্বামী শ্যামানন্দ জীউ!

প্ল্যাট-ফরমের সুরকির উপরেই ঢিপ ক'রে প্রণাম করলাম।

বল্লাম, ছায়ার ত দর্শন ঘটল না, এখন প্রভুর সত্য-স্বরূপ কায়াকেই প্রণাম করছি!

প্রভুর মুখ কালি হয়ে গেল।

৫

বসন্ত বাবু বল্লেন, এই ত ব্যাপার। বলুন, এরও পরে কারুর বিশ্বাস থাকে?

আমি বল্লাম, ফের ত' চলেছেন ভৈরবীর কাছে। বিশ্বাস নেই বা বলি কি ক'রে?

তিনি তাঁর মোটা লাঠিটা দেখিয়ে বল্লেন, আমার বিশ্বাস এখন এর ওপরে! মনে করেছেন যে, আমি যাব সেই ভৈরবীর কাছে? আমার সম্বন্ধীর চার্জ্জে এদের দিয়ে আমার নিষ্কৃতি,—থিয়েটার দেখব, বায়স্কোপ দেখব, আর ভৈরব-ভৈরবী নয় মশায়! ভায়াকে ভৈরবীর সাহায্যে আনাতে হয় ত আনান এঁরা।

আমি বল্লাম, এ কথা আপনার মোটেই বিশ্বাস হয় না যে, কেউ-ই আপনার ভাইকে আনিয়ে দিতে পারে?

তিনি বল্লেন, না। হিমালয়ে যদি কোন ঋষি মহাঋষি থাকেন ত কি ক'রে বলব মশাই, কিন্তু এই সমতল দেশে কেউ নেই, সব জোচ্চোর।

আমি বল্লাম, আর যদি এই গাড়ীতেই এমন কেউ থাকে যে, আপনার ভাইকে এনে দিতে পারে?

বসন্ত বাবু হো হো ক'রে হেসে বল্লেন, ঐ ফর্চুন-টেলারের কথা বলছেন বুঝি?

আমি বল্লাম, না।

বসন্ত বাবু বল্লেন, তবে?

ধরুন আমি।

বসন্ত বাবু নিরতিশয় বিস্মিত হয়ে বল্লেন, আপনি? আপনি—মশাই?

ব্রাহ্মণ।

জ্যোতিষী?

আমি হাসলাম, বল্লাম, সব কথা কি ফাঁস করতে আছে? আমি যদি আপনার ভাইকে ফিরিয়ে দিতে পারি, কি দেবেন বলুন?

বসন্ত বাবুর মুখ আশঙ্কায় কালো হয়ে উঠল, বল্লেন, কত দিনে?

আমি বল্লাম, ভয় নেই। সাধু-জ্যোতিষীর মেয়াদ নয়, এখনই, পাঁচ মিনিটের মধ্যে।

বসন্ত বাবু ফস্ ক'রে আমার পা ধ'রে বল্লেন, আমার সাধ্যে যা কিছু আছে, সব দেবো।

আমি পা ছাড়িয়ে নিয়ে বল্লাম, অসম্ভব কিছু চাব না, আমি শুধু এইটুকু চাই যে, আপনি তাকে কোনও তিরস্কার করতে পারবেন না। বেচারা ক্লান্ত, বোধ করি পীড়িত হয়ে আসছে।

আবার আমার পা ছুঁয়ে বল্লেন, স্বীকার করছি, একশো-বার; লাখোবার।

এমন সময় আমার চোখ প'ড়ে গেল বসন্ত বাবুর ভ্রাতৃ-বধূর মুখে; কারণ, ঘোমটা আর ছিল না, তাঁর দুই চোখে কৌতূহল, মিনতি, কৃতজ্ঞতা, উৎকণ্ঠা এবং বেদনার যে আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ হয়েছিল, তা অপরূপ। তাঁকে বল্লাম, মা, হ্যাঁ, বোধ হয়, তোমার স্বামীকে আমি ফিরিয়ে দিতে পারব।

বসন্ত বাবুকে বল্লাম, আসুন।

ছেলেটি তখনও মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছিল। আস্তে আস্তে কাপড়টা উঠিয়ে বল্লাম, দেখুন দিকিনি!

বসন্ত বাবু দুই হাত তুলে পাগলের মত চীৎকার ক'রে উঠলেন, নিশীথ—নিশীথ—নিশীথ!

ছেলেটি ঘুম থেকে চমকে উঠে সামনে আমাকে আর বসন্ত বাবুকে দেখে বিস্মিত হয়ে চেয়ে রৈল। তার পর বাঙ্ক থেকে নেমে প'ড়ে বসন্ত বাবুর পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে ডেকে উঠল—দাদা, দাদা!

বসন্ত বাবু তাকে টেনে তুলে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে বল্লেন, ভাইটি আমার, লক্ষ্মীটি আমার।

দুই ভাইএর অপূর্ব্ব মিলন-দৃশ্যে আমার চোখ যখন জলে ভ'রে এসেছিল, তখন দেখলাম, সেই মেয়েটি আমার পায়ের কাছে প'ড়ে অবিরল অশ্রু বর্ষণ করছে।

আমি তাকে বল্লাম, মা, আমার প্রার্থনার যদি কোনও মূল্য থাকে ত' কায়মনোবাক্যে আমি এই কামনা করি যে, তুমি রাজলক্ষ্মী হও, চিরসুখী হও!

বসন্ত বাবুর স্ত্রী তাকে আপনার বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে তার মুখে বুকে হাত বুলিয়ে তেমনি ক'রে আদর করতে লাগলেন, যেমন বড় বোন্ করেন তাঁর স্নেহের ছোট বোনটিকে।

ষ্টেশনে আসবার আগে গাড়ীর গতি মন্দ হয়ে এলো। লাইনের পাশে একটা বড় বাড়ীতে তখন বিবাহের সানাইয়ের সুর তার করুণ-মিলনের তানে আকাশ-বাতাস ঝঙ্কৃত ক'রে তুলছিল,—তারই মিষ্ট রাগিণী হাওয়ায় ভেসে এসে আমাদের কাণে ঠিক যেন অমৃত-বর্ষণ করতে লাগল।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বিবাহ—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

সমাজ-সংস্কারক, স্বরাজী দল এবং সরকার—এই তিন দল লোকের সম্মেলনে ভারতবর্ষ হইতে বাল্য-বিবাহ নিষ্কাসিত ও যৌবন বিবাহ প্রবর্ত্তিত হইল। ইহাতে ভারতের সর্ব্বনাশের পথ যে প্রশস্ত করা হইল, সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। যেখানে যুক্তি-তর্ক নাই,—বিবেচনা-বুদ্ধির প্রয়োগ নাই, কেবল খোস খেয়াল আর মনের টানে কোন প্রথার সমর্থন করিতে হয়, সেখানে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ভিন্ন আর প্রতিপক্ষের সহিত বিচার করিবার অন্য কোন উপায় নাই। কাযেই কি ব্যবস্থাপক সভায়, কি বক্তৃতায়, কি রঙ্গ-মঞ্চে সর্ব্বত্রই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বাল্য-বিবাহের বিরোধী দল কোনরূপ তথ্য দ্বারা সমর্থিত যুক্তি এবং প্রমাণ দ্বারা তাঁহাদের কথা সমর্থন করেন নাই বা করিবার চেষ্টা করেন নাই। বাল্য-বিবাহ যে কুসংস্কার, এ কথা তাঁহারা যেন স্বতঃসিদ্ধ সত্যের ন্যায় ধরিয়া লইয়া তর্ক করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যে স্বতঃসিদ্ধ নহে, তাহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায়। যদি বাল্য-বিবাহ কুসংস্কার, এই ধারণা স্বতঃসিদ্ধ হইত, তাহা হইলে ধরাতলে বাল্য-বিবাহের সমর্থক লোক পাওয়া যাইত না। একটা বস্তুর সমস্তটা তাহার একাংশ অপেক্ষা বৃহত্তর, এ কথা লইয়া দুই জন তথ্যানুসন্ধানকারী ব্যক্তির মধ্যে কোনমতেই তর্ক উপস্থিত হইতে পারে না। দুইটি সরল রেখা একটি স্থানকে পরিবেষ্টন করিতে পারে না, এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এমন কথা আমরা কখনও শুনি নাই। কারণ, উহা স্বতঃসিদ্ধ। বাল্য-বিবাহ তাহা নহে, সেই জন্য ঐ বিষয় লইয়া এত তর্ক এবং বাদানুবাদ চলিতেছে। সুতরাং যাহারা য়ুরোপীয় প্রথার অনুচিকীর্ষ হইয়া বাল্য-বিবাহ কুসংস্কার বলিয়া ধরিয়া লইতেছেন,—তাঁহারা যে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার জৌলুসে মুগ্ধ হইয়া ঘোর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়।

এক কালে আমাদের এই অধঃপতিত ভারতবর্ষ যে সভ্যতার উচ্চশিখরে আরূঢ় হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশ যখন ঘোর কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন ছিল, তখন এই ভারতবর্ষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা বহু পাশ্চাত্য তথ্যানুসন্ধিৎসু মহাত্মগণ কর্ত্তৃকও স্বীকৃত হইয়াছে; অনেকে ভারতের অতীত গৌরবের বিষয় চিন্তা করিয়া বিস্মিতও হইয়াছেন। এই ভারতভূমি যে মানব-জাতির আদি স্থান, ধর্ম্মবিশ্বাস, প্রেম, কবিতা এবং বিজ্ঞানের জন্মভূমি, তাহা অনেক মনীষী ব্যক্তি কর্ত্তৃকই স্বীকৃত। এক জন য়ুরোপীয়ের উক্তি আমরা এ স্থলে পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। * সেই ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যেও ইহার অনেক প্রমাণ বিদ্যমান। ছান্দোগ্য উপনিষদ বেদের জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার ভাষা দেখিলেই ইহা যে অতি প্রাচীন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। উহার প্রথম প্রপাঠকের ১০ম খণ্ডে ১ম সূত্রে একটি উপাখ্যান এইরূপ ভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে:—

"মটচীহতেষু কুরুষ্বাটিক্যা সহ জায়য়োষস্তির্হ চাক্রায়ণ ইভ্যগ্রামে প্রদ্রাণক উবাস।"

ইহার অর্থ:—কুরুদেশে শিলাবর্ষণে শস্যনাশ হইলে চক্রায়ণ-নন্দন উষস্তি নামক এক ব্রাহ্মণ নিজের অপ্রাপ্তযৌবনা পত্নীর সহিত ইভ্যগ্রামে যাইয়া বসবাস করিয়াছিলেন এবং তথায় তিনি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। এ ক্ষেত্রে জায়া শব্দের বিশেষণ রহিয়াছে আটিকি। ঐ শব্দের অর্থ, যে নারী যৌবনদশাপ্রাপ্তির সন্নিহিত হইতেছে। অর্থাৎ রজোদর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাই বুঝিতে হইবে। শ্রীশ্রীশঙ্করের, শ্রীমাধ্বের ভাষ্যেও টীকায় এবং শব্দনির্ণয়ে এইরূপ অর্থই পাওয়া যায়। ইহা হইতেই সপ্রমাণ হইতেছে যে, অতি প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষে অন্ততঃ ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল। আবার বৌধায়ন বলিয়াছেন—

"দদ্যাদ্ গুণবতে কন্যাং নগ্নিকাং ব্রহ্মচারিণীম্।"

অর্থাৎ ব্রহ্মচারিণী এবং নগ্নিকা কন্যাকে গুণবান্ পাত্রে

---

* Soil of Ancient India cradle of humanity hail hail! Venerable and efficient nurse whom centuries of brutal invasions have not yet buried under the dust of oblivion! Hail fatherland of faith, of love of poetry and of science. May we hail a revival of thy past in our western future. —M. Louis Jacolliot's Bible in India.

দান করিবে। বৌধায়ন প্রাচীন স্মৃতিকার। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে প্রাচীন ব্যবস্থা, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এখন জিজ্ঞাস্য, নগ্নিকা শব্দের অর্থ কি? সংবর্ত্ত বলিয়াছেন—

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নবমে নগ্নিকা ভবেৎ।"

অর্থাৎ আট বৎসরের কন্যার নাম গৌরী, আর নবমবর্ষীয়া কন্যার নাম নগ্নিকা। ইহার অর্থ এই যে, নবমবর্ষীয়া কন্যা-দানই বৌধায়নের মত। গোভিল গৃহ্যসূত্রে লিখিত হইয়াছে যে, "নগ্নিকা তু শ্রেষ্ঠা"। স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার নগ্নিকা অর্থে অনাগতার্ত্তবা কন্যা লিখিয়াছেন। * যে অর্থই গ্রহণ করা হউক না কেন, অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে ভারতে বাল্য-বিবাহ চলিয়া আসিতেছে, তাহা এই সকল বচন ও প্রমাণ হইতেই বুঝা যায়। ইহা ভিন্ন গৌতম, বশিষ্ঠ, পরাশর প্রভৃতি পরবর্ত্তী স্মৃতিকার যে অনাগতার্ত্তবা কন্যাকে বিবাহ দিবারই ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। সুতরাং বাল্য-বিবাহ যে সুপ্রাচীন বৈদিককাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায়ই নাই।

অবশ্য প্রাচীন ভারতে যে যৌবন-বিবাহ ছিল না, এমন কথা আমি বলি না। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সমাজে যেমন উদ্ভিন্নযৌবনা কন্যার বিবাহ প্রচলিত আছে, প্রাচীন হিন্দু-সমাজেও অনেকটা সেইরূপ ছিল। নতুবা তখন কানীন এবং সহোঢ় পুত্রের সম্ভাবনা থাকিত না। শ্রীকৃষ্ণের সহোদরা সুভদ্রার এবং উত্তরার বিবাহ যে নগ্নিকা অবস্থাতেই সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। তবে ব্রাহ্মণ-সমাজে অতি অল্পসংখ্যক কন্যার যৌবনপ্রাপ্তির পর বিবাহ হইত বলিয়াই মনে হয়।

য়ুরোপেও শ্বেতাঙ্গ জাতির মধ্যে পূর্ব্বে বাল্যবিবাহ এবং যৌবনবিবাহ উভয়ই প্রচলিত ছিল। শ্বেতাঙ্গ জাতি আর্থিক অবস্থার পেষণে বাল্যবিবাহ রহিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু তাহার ফল যাহা হইয়াছে, তাহা কোন-মতেই সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ইহার ফলে য়ুরোপ ব্যভিচারে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। ব্যভিচার এখন আর তথায় পাপ বলিয়া বিবেচিত হওয়া দূরে থাকুক, দোষ বলিয়াও বিবেচিত হইতেছে না। তথায় অধিকাংশ নারীই অবিবাহিত অবস্থায় গর্ভবতী হইয়া পড়িতেছে। কোন কোন নারী তথায় সন্তানের জননী হইবার পরও বিবাহিতা হইয়া থাকে। য়ুরোপে ব্যভিচারের প্রাবল্য এখন যত অধিক হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি কোন যুগে সেরূপ হয় নাই। ডাক্তার আলফ্রেড ব্লাস্কো এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাদটীকায় উদ্ধৃত করা হইল। * ব্যভিচার সম্পর্কিত ব্যাপারটি তথায় যেন একটা লাভজনক ব্যবসায় বা বৃত্তি (Industry) হিসাবে চালান হইতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে য়ুরোপের বহু দেশে যৌবন এবং যৌবনান্ত বিবাহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, আর উনবিংশ শতাব্দীতে এই মহাপাপ য়ুরোপীয় সমাজদেহে নিদারুণ কুষ্ঠ-রোগের ন্যায় সর্ব্বত্র বিস্তারলাভ করিয়াছে। উহা এত দূর বিস্তার লাভ করিয়াছে যে, ডাক্তার আলফ্রেড ব্লাস্কো বলিয়াছেন যে, উহা উনবিংশ শতাব্দীতে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। শ্বেতাঙ্গ-সমাজে উহা এতদূর বিস্তারলাভ করিয়াছে যে, উহা যে এত দূর বিস্তারলাভ করিতে পারে, তাহা মনুষ্যজাতির ইতি-হাসে কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। ডাক্তার ব্লাস্কো বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা এই তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। এখন য়ুরোপে এই ব্যভিচার-নিবারণ এক ঘোর সমস্যায় পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। তথায় চা-পানের আড্ডায়, জলযোগের আগারে, থিয়েটারে, সঙ্গীতালয়ে, প্রমোদভবনে ও বিপণিতে—এক কথায় যেখানেই নারী পরিচারিকারূপে বিরাজিতা, তাহার অধিকাংশ স্থানেই প্রচ্ছন্ন বেশ্যালয় বিরাজ করিতেছে, এ কথা ডাক্তার ব্লক স্বয়ং বলিয়াছেন।

---

* নগ্নিকা শব্দের আর একটি অর্থ পাওয়া যায়। যথা—
"যাবন্ন লজ্জাং জানাতি কন্যা পুরুষসন্নিধৌ।
যোন্যাদীন্যবগূহেত তাবদ্ভবতি নগ্নিকা॥"

* Although prostitution has existed in all ages, it was left to the nineteenth century to develop it into a gigantic social institution. The development of industry with vast masses of people in the competitive market, the growth and competitive market, the growth and congestion of large cities, the insecurity and uncertainty of employment have given prostitution an impetus never dreamt of at any period in human history.—The Master Problem.

মার্কিণের ব্যাপার অত্যন্ত ভীষণ। তথায় শতকরা ১৭ জন নারী ১৫ কিম্বা তদপেক্ষা অল্পবয়সে যৌনপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে; ১৬ বৎসর বয়সেও শতকরা ১৭ জন এবং ১৭ ও ১৮ বৎসর বয়সের মধ্যে শতকরা ৩৩ জন নারী কুপথাবলম্বিনী হয়। এক কথায় শতকরা ৬৭ জন নারী ১৮ বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইবার মধ্যেই সতীত্ব-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করে। এই তথ্য বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। * সুতরাং তথায় কি ভীষণ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে,তাহা সকলেই চিন্তা করিয়া দেখুন। অধিকন্তু ইন্দ্রিয়-পরায়ণ পুরুষদিগের লালসার যূপকাষ্ঠে কত অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাই যে বলি প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহার আর ইয়ত্তা করা সম্ভবে না। ১২ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা সহস্র সহস্র বালিকাকে এইভাবে বিপথগামিনী করা হইয়া থাকে। ডাক্তার এডিথ হুকার বলেন যে,একমাত্র বাল্টিমোর সহরে (মার্কিণে) এক বৎসরে দ্বাদশ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা সহস্রাধিক নারী নীতি-জ্ঞানবিরহিত পুরুষের লালসার যূপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত হইয়া থাকে। † এ কথাও শুনা যায়, তথায় বিপথগামিনী নারীরা ১২ বৎসরের অধিকবয়স্কা হইলেই পুরুষদিগকে পাপের পথে প্রলুব্ধ করিতে আরম্ভ করে। এ ক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে যে, অতি সাবধানে এবং সন্তর্পণে সংযম শিক্ষা না দিয়া মানুষকে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিতে বলিলে তাহার ফল এইরূপই হইয়া থাকে। আমাদের দেশে কলিযুগে যে দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহারও সম্ভবতঃ উহাই কারণ। আমি এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কৌলিক ধারা নির্ম্মল রাখিবার জন্য হিন্দু জাতির ব্যস্ততা অত্যন্ত অধিক ছিল। সেই জন্যই তাঁহারা সম্ভবতঃ লোক সংযমের বাঁধ রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে না দেখিয়া বর্ত্তমান যুগে স্বল্প ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়া বাল্য-বিবাহই প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। যৌবন-বিবাহ প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতেই তথায় ব্যভিচার নানা আকারে সমাজমধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে। বিবাহের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ঘোর পাপাচার যে তথায় খরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা তথাকার সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা স্বীকার করিয়া থাকেন। হ্যাভলক এলিস এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। * তথায় পুরুষ অপেক্ষা নারীরাই অধিক প্রগল্‌ভা হইয়া পড়িয়াছে। ভদ্র ঘরের মেয়ে হইয়াও তাহারা অনেক সময় অবিবাহিতা অবস্থায় যুবকদিগকে পাপপথে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। † সমাজের এইরূপ অবস্থা যে অতীব শোচনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য। য়ুরোপীয় সমাজে এই যৌবন বা যৌবনান্ত বিবাহের ফলে যে কেবল ব্যভিচার অতিমাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু এই বিষয়ে অনেক অনৈসর্গিক পাপও তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমি এ সকল কথা আর বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চাহি না; কিন্তু আমি বাধ্য হইয়া এই কথা বলিতেছি যে, নিতান্ত লঘুতায় এবং হঠকারিতার সহিত প্রাচীন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনসাধন করিতে যাইলেই সমাজের সর্ব্বনাশ হইবে। বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যবস্থা না করিয়া প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিতে যাইলেই বিপদ ঘটিবে। নরনারী-তত্ত্ব সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন তত্ত্ব। তাহাদের পরিণয়-সম্পর্কিত সমস্যা তাহার মধ্যে কঠিনতম। কারণ, দৈহিক এবং আত্মিক উভয় দিক্ দিয়াই উহাদের মিলনের কামনা অতি প্রবল এবং দুর্নিবার প্রবৃত্তির ও প্রেরণার উপর

* Prostitution in the United States Page 69.

† The general public does not realise what an enormous number of cases of seduction of young children actually occur, for most of these cases never come to court.................One Baltimore Physician reports that in the course of one year in Baltimore City more than one thousand little girls under the age of twelve years found to be victims of unscrupulous men."—Laws of Sex P. 177.

* The gradual but steady rise in the age for entering on legal marriage also points in the same direction, though it indicates not merely an increase of free unions but an increase of all forms of normal and abnormal sexuality outside marriage.—Havelock Ellis.

† The high-school boy is a much less dramatic figure than the high-school girl. Generally she sets the face, whatever it is to be, and he dances to her piping.—Revolt of Modern Youth Page 55.

One who has not been in close contact with the girls, of this age cannot realise the extent of immorality among them. Formerly it was considered that only boys showed their wild oats. Now we find that many girls do so also.—Herself. P. 150.

প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতি উভয়কে এমন ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, উহারা এক পক্ষ যেমন অপর পক্ষের প্রবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধক, অপর পক্ষে এক পক্ষ অন্য পক্ষের আত্মিক ও মানসিক তৃপ্তিদায়ক। অতি শৈশব অবস্থাতেই দেখা যায়, অর্থাৎ যখন মানুষের মনে কাম-কামনার কোনরূপ উন্মেষ হয় নাই, তখনই বালকরা বালিকাদিগের সহিত খেলা করিতে ভালবাসে। তাহাদের প্রণয় এবং কলহ উভয়ই যেন প্রবল হয়। কিন্তু প্রণয় গাঢ় এবং কলহ ক্ষণভঙ্গুর হয়। তাহার কারণ, প্রকৃতি দেবী তাঁহার সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষার জন্য নর-নারীকে পরস্পরের অনুপূরক বা অভাব এবং ত্রুটির পূরণকারী (Complementary) করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং সহজেই একে অপরের দিকে আকৃষ্ট হয়। প্রকৃতিস্থ পুরুষ বিপন্না নারীকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। আর প্রকৃতিস্থা নারী অর্থাৎ কুশিক্ষার প্রভাবে যে নারীর স্বভাব বিকৃত হয় নাই, সেই নারী,—পীড়িত, আর্ত্ত, এবং চিন্তাক্লিষ্ট পুরুষকে যেরূপ শুশ্রূষা করিতে এবং সান্ত্বনা দিতে পারে, তাহার কোন পুরুষ-বন্ধুর সহিত তাহার প্রণয় যতই প্রগাঢ় হউক না কেন, সেই বন্ধু তাহাকে সেরূপ শুশ্রূষা করিতে এবং সান্ত্বনা দিতে পারিবে না। মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতরাও স্বীকার করিয়া থাকেন যে, পুরুষজাতি বিচার-বুদ্ধি-প্রধান (intelligent) এবং নারীজাতি ভাবপ্রধান (Sentimental)। অবশ্য পুরুষ-ভাবের নারী এবং নারী-ভাবের পুরুষ যে নাই, তাহা নহে। প্রকৃতি সকল নারীকে সমান এবং সকল পুরুষকে তুল্যরূপে সৃষ্টি করেন নাই। কতকগুলি নারীকে তিনি পুরুষভাবাপন্ন (Mannish) করিয়াছেন আর কতকগুলি পুরুষকে তিনি নারীভাবাপন্ন (Effeminate) করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু পুরুষ এবং নারী উভয় জাতি যে প্রকৃতির স্বতন্ত্র ছাঁচে প্রস্তুত, সে পার্থক্য উভয় জাতির দৈহিক এবং মানসিক উভয় দিকেই লক্ষিত এবং পরিস্ফুট। জনষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার Subjection of women নামক সন্দর্ভে এই উক্তিতে সন্দেহসূচক যে কয়েকটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার তার্কিক বুদ্ধির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সেই তর্কজালে তিনি যেমন কতক সত্যকে পরিস্ফুট করিয়াছেন, তেমনই কতক সত্যকে আবৃত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা সম্ভবে না।

য়ুরোপ নর-নারীকে সমানভাবে শিক্ষিত এবং তুল্য অধিকারদানে সচেষ্ট হইয়া যে ভুল করিয়াছেন,—এখন তাঁহাদিগকে তাহার ফলভোগ করিতে হইতেছে। প্রকৃতি দুই জাতির কর্ম্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষ দুষ্টবুদ্ধির বা কুতর্কের প্রভাবে ঐ দুই জাতিকে তুল্যমূল্য করিয়াছে বলাতে প্রকৃতি তাহাদিগকে ক্ষমা করেন নাই। তথায় বিবাহব্যাপার অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রধান গির্জ্জায় ম্যাঞ্চেষ্টারের বিশপ যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে য়ুরোপে যে নর-নারীর স্থায়ী বিবাহ এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে, তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। তথায় লোক বুঝিতেছে, অন্ততঃ পুরুষদিগের মনে ধারণা জন্মিতেছে যে, বিবাহ দ্বারা কেবল কলহের সৃষ্টি হয়,—স্থায়ী বিবাহ এক পক্ষ যত দিন একবারে বিধ্বস্ত হইয়া না যায়, তত দিনের জন্য যুদ্ধ, এরূপ কথা কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন। মার্কিণে বিবাহ অল্প হইতেছে, বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা বাড়িতেছে, ব্যভিচার সমস্ত সমাজকে প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে, মনুষ্য-প্রকৃতি পশুত্বের দিকে প্রধাবিত হইতেছে, এ কথা মার্কিণের একখানি সাময়িক পত্র অত্যন্ত বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন। মার্কিণের অনেক নারী ছলা-কলা করিয়া পুরুষের সহিত প্রণয় করে এবং বিবাহান্তে সেই পুরুষের নিকট হইতে খোর-পোষের ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং স্বতন্ত্র-ভাবে স্বচ্ছন্দচারিণী হইয়া বাস করে। এই শ্রেণীর মামলায় তথাকার আদালত পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের "ডিলিনিয়েটার" পত্রে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। ফলে মার্কিণ এবং ফ্রান্সের গার্হস্থ্য জীবন ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে—য়ুরোপের অন্যত্র ঐরূপ কাণ্ড সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা জন্মিতেছে। ইহা সমস্তই বিলম্বিত বিবাহের ফল। আজ স্বরাজী দল অন্যান্য সমাজ-সংস্কারক দলের সহিত সম্মিলিত হইয়া এই বিলম্বিত বিবাহ-(Late marriage) ব্যবস্থা এ দেশে প্রবর্ত্তিত করিলেন। য়ুরোপের ন্যায় এ দেশে যে ইহার কুফল ফলিবে না, এরূপ মনে করা নিতান্তই নির্ব্বুদ্ধিতা।

আমি য়ুরোপীয় সমাজের যে সকল দোষের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহা আমার নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত। আমার সমাজে নানা দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে, এরূপ অবস্থায় অন্য

সমাজের দোষ দেওয়া আমাদের কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। তবে বাল্যবিবাহ ভাল কি যৌবনবিবাহ ভাল, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইলে কোন্ বিবাহের কতটা দোষ এবং কতটা গুণ, তাহার বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। আমি সেই জন্য দেখাইতে বাধ্য হইয়াছি যে, য়ুরোপে শ্বেতাঙ্গ জাতির মধ্যে যৌবন বিবাহ বা যৌবনান্ত বিবাহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া তথাকার সমাজে ব্যভিচার অত্যন্ত প্রবল-ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং দাম্পত্য-বন্ধন অতিমাত্র শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। য়ুরোপীয় সমাজে অধুনা এই বিষয়ে কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা আমি ঐ সমাজে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ, সুপণ্ডিত, চিন্তাশীল, এবং সমাজহিতৈষী বৈজ্ঞানিক-দিগের উক্তি এই প্রবন্ধের পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। এ বিষয়ে আরও অনেক যুক্তি-প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিত, কিন্তু বাহুল্যভয়ে আমি তাহা দিলাম না। যাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার জৌলুসে অতিমাত্র মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, এই প্রবন্ধপাঠে তাঁহাদের সে মোহ যে ভাঙ্গিয়া যাইবে, এমন দুরাশা আমি করি না। যাঁহারা জাগিয়া থাকিয়া নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই কপট নিদ্রা ভাঙ্গান সহজ নহে এবং যাহাদের বিচারবুদ্ধি একবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যাহারা তাঁহাদের স্বদেশের ঠাকুর ফেলিয়া বিদেশী কুকুরের আদর করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের চৈতন্যসম্পাদন করা মানুষের সাধ্যাতীত।

আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, য়ুরোপে বিলম্বিত বিবাহ প্রবর্ত্তনের ফলে যে, তথায় কেবলমাত্র ব্যভিচার অতি-শয় প্রবল হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নহে,—তথায় অনৈসর্গিক উপায়ে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার অনেক প্রকার উপায় উদ্ভাবিত এবং অবলম্বিত হইতেছে। তাহার কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিলে আমাদের ঘোর অপকার হইবে আশঙ্কা করিয়া আমি সে কথার আলোচনা করিলাম না। এখন আমাদের দেশে এই প্রকার বিলম্বিত বিবাহ প্রবর্ত্তিত করি-বার ফল কিরূপ হইবে, তাহা সকলে নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন। ভারতে এক সময়ে নারীদিগের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিবাহ হইত, তর্কের অনুরোধে ইহা যদি স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, উহার বিশেষ কোন কুফল দেখিয়াই মনীষীরা উহা নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সে কুফল কি হইতে পারে, তাহা পাশ্চাত্য সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়।

আমাদের দেশে কুলীন-কুমারীদিগের পূর্ব্বে অধিক বয়সে বিবাহ হইত, এখনও তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে। তখন কতকগুলি ইংরাজ ঐ পদ্ধতির নিন্দা করিতেন দেখিয়া সমাজ-সংস্কারকরা সেই ধুয়া ধরিয়া কুলীন-সমাজ ব্যভিচারে প্লাবিত বলিয়া কীর্ত্তন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। উঁহাদের দেখা-দেখি যাত্রায়, থিয়েটারে, কবির দলে কুলীন-সমাজের দোষ অত্যন্ত অতিরঞ্জিত করিয়া দেখান হইত। কবির দলের একটা গান এইরূপ ছিল,—"তোকে গা'ল (গালি) দিব কি ব'লে,—তুই যে জা'ত কুলীনের ছেলে।" কুলীন-সমাজে বিলম্বিত বিবাহ ছিল বলিয়া তাহাদের মধ্যে ব্যভিচারও যে কিছু ছিল, ইহা স্বীকার করি; কিন্তু তখনকার সমাজে কৌলীন্যের এবং বহুবিবাহের দোষকীর্ত্তনে সমাজ-সংস্কারকগণ যে সহস্রমুখ হইতেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তখন নারীদের ধর্ম্মভয় ছিল, সতীত্বের আদর ছিল, সামাজিক শাসন ছিল, কৌলিক মর্য্যাদাজ্ঞান ছিল; তখন কুরুচিপূর্ণ নাটক-নভেল ছিল না,—সামাজিক শাসন শিথিল হয় নাই,—নারী এরূপ ভোগ-বিলাসে রত হয় নাই, তখনকার ব্রাহ্মণ-কুমারীরা ব্রতনিয়মপরায়ণা ছিলেন,—সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই চরিত্র-রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন। দুই চারি জন অবশ্য যে প্রবৃত্তির তাড়নায় বা কুলোকের কুহকে পড়িয়া কুপথগামিনী হইতেন, সমাজ-সংস্কারকরা সেই দুই চারি জন দুর্ব্বলচরিত্রার দোষ সকলের উপর আরোপ করিয়া বাহাদুরী লইতেন। কিন্তু তখন যদি সেই সংযম-শিক্ষার ও ব্রত-নিয়ম-পালনের দিনে শতকরা দুই তিনটি নারী কুপথগামিনী হইত, তাহা হইলে এখন এই কামোদ্দীপক নাটক-নভেলের প্লাবনসময়ে, ধর্ম্মবিশ্বাসের শিথিলতার কালে, ভোগ-বিলাসের আধিক্যের দিনে, ব্রত-নিয়ম-লোপের যুগে নারীদিগের বিবাহের বয়স অধিক হইলে সমাজের কি সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা সকলে চিন্তা করিয়া দেখুন। সমাজসংস্কারকরা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, যদি কন্যা-দিগের ঋতুকাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে পাত্রস্থা করিতে হইবে, এইরূপ সংস্কারের বাধা নষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বিবাহের বয়স ক্রমশঃ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে,

তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে লোকের যে অধর্ম্মের ভয় ছিল, এখন তাহা লুপ্ত হওয়াতে এবং বিলম্বিত বিবাহ সার্ব্বজনীন হওয়াতে তাহার ফল কি বিষম হইবে, তাহাও চিন্তনীয়। কেবল নিজ দিক্ দিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে চলিবে না, সর্ব্বসাধারণের দিক্ দিয়া উহার চিন্তা করা আবশ্যক।

সমাজ-সংস্কারকরা বাল্যবিবাহের দোষ কিরূপ অন্যায়-ভাবে কীর্ত্তন করেন, তাহা সকলে দেখুন। আমাদের দেশে শিশুমড়ক এবং প্রসূতিমড়ক অত্যন্ত অধিক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সে জন্য বাল্য-বিবাহকে দায়ী করা অত্যন্ত অসঙ্গত। দেশে পীড়ার আধিক্য, উপযুক্ত ধাত্রীর, চিকিৎসকের, সূতিকাগারের এবং পথ্যের অভাবই ইহার কারণ। ইহা এই সকল গণ্ডমূর্খ সমাজ-সংস্কারকের মস্তকে স্থান পায় না। কিন্তু যে দেশে বাল্য-বিবাহ নাই, যে দেশের বিবাহব্যবস্থা আমাদিগের এই সকল দাসমনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির চিত্তকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, সেই বিলাতের কেবলমাত্র ইংলণ্ড এবং ওয়েলসে প্রতি বৎসর তিন চারি হাজার করিয়া প্রসূতি শমনসদনে নীত হইয়া থাকে। ইহা অধিক দিনের কথা নহে,—প্রাচীন কাহিনী নহে,—গত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের লণ্ডনের টিউডর ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত স্বনামধন্য "দি নিউ লীডার" পত্রে বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে। আমি নিম্নে পাদটীকায় সে কথা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।* এই সকল নারী বাল্যকালে বিবাহিত নহে, ১৪।১৫ বৎসরে তাহাদের বিবাহ হয় নাই। তাহাদের অধিকাংশের বয়স ৩৫ বৎসরের কম, কতকগুলির বয়স ৩৫ বৎসরেরও অধিক। কিন্তু তাই বলিয়া তথাকার বুধমণ্ডলী নারীর বিবাহের বয়স ৪০ অথবা ৪৫ বৎসরে উন্নীত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন না। তাঁহারা সুচিকিৎসার এবং প্রসূতির যত্নের ও সেবা-শুশ্রূষা অভাবই প্রসূতিনাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর আমাদের দেশের দাম্ভিক ও দাসভাবে বিভোর সমাজ-সংস্কারকগণ অন্য কিছুই নয়ন মেলিয়া দেখিবেন না, কেবল বাল্য-বিবাহের স্কন্ধে সকল দোষের পশরা চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। যাহাদের স্বাধীন বিচারবুদ্ধির একান্ত অভাব, যাহারা বাল্যকাল হইতে পরের ধুয়ায় ধুয়া মিলাইয়া কথা বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি আশা করা যাইতে পারে? যে দেশে লোক সম্বৎসরে অর্দ্ধেক দিন অনাহারে থাকে—যে দেশে এখন ১০।১৫ খানি গ্রাম খুঁজিয়া এক জন ধাত্রী পাওয়া যায় না,—যে দেশের লোক আচ্ছাদনে শতচ্ছিদ্রবিশিষ্ট গৃহে বর্ষাকালে ও শীতকালে সন্তান প্রসব করিতে বাধ্য হয়, যাহারা প্রসবকালে সুপথ্য পায় না, যাহারা গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে বার বার আক্রান্ত হইয়া রক্তহীন হইয়া পড়ে, সে দেশের লোক যে সন্তান প্রসব করিয়া বাঁচে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়; তাহাদের মৃত্যু বিস্ময়ের বিষয় নহে। সহবাস-সম্মতি কমিটী তাঁহাদের রিপোর্টে এক স্থানে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, বাল্য-বিবাহের সহিত শিশুমড়ক এবং মাতৃমড়কের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ তথ্য দ্বারা সপ্রমাণ করা সম্ভবে না।* কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা অনুকরণ করিবার প্রবল আগ্রহের ফলে বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করিয়া দিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

অল্পবয়স্কা জননীর সন্তান দুর্ব্বল হয়, এ উক্তিও তথ্য দ্বারা সপ্রমাণ হয় নাই। প্রাচীন গ্রীক, রোমক, হিব্রু প্রভৃতি জাতি অতি শৈশবেই বিবাহ করিত। তাহারা যে দুর্ব্বল ছিল, তাহার কোন প্রমাণই নাই। বর্ত্তমান সময়ে আফগান প্রভৃতি জাতিও বাল্য-বিবাহ দিয়া থাকে। জাপানীরা, রুসজাতি প্রভৃতিরাও বাল্য-বিবাহ দিত। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা দুর্ব্বল বলিয়া পরিজ্ঞাত নহে। রুসিয়ার চাষী সমাজ ৮।৯ বৎসরের বালক-বালিকাদিগের বিবাহ দেয়। ভারতের জাঠজাতি অতি শৈশবেই বিবাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা দুর্ব্বল নহে। টার্কোম্যানরা বলিষ্ঠ বলিয়াই বিখ্যাত। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও বাল্য বিবাহ বিশেষভাবে প্রচলিত। সুতরাং ইহার দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে যে, বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে সংস্কারকগণ কর্ত্তৃক উপস্থাপিত অভিযোগ সম্পূর্ণ মূর্খতা-বিজৃম্ভিত।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

* Between three and four thousand women die in childbirth every year in England and Wales. Most of them are under the age thirty five. There has been no change in the death rate for fifteen years. These facts brought out by the recent Commission on the number of death among mothers are forcing us to realise a national disaster. In the care of our mothers we are far behind such small countries as Sweden and Holland.

* From these figures by themselves no conclusion can be drawn as to whether there is any necessary connection between child marriages and infant and maternal mortality as cause and effect.—Report of the Age of Consent Committee 1928-29, Page 165.

রহস্যের খাস-মহল

ষষ্ঠ প্রবাহ

কুপের কৌশল

আমি সেই ক্ষুধার্ত্ত বেকার যুবককে উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "দুর্ভেদ্য রহস্য! তুমি আর কি জান, বল।"

যুবক বলিল,"সকল কথাই আপনাকে বলিতেছি, শুনুন। পাহারাওয়ালা সাহেব আপনাকে বো-ষ্ট্রীটের থানায় লইয়া যাইবার অল্পকাল পরে খোঁড়া বুড়ো 'ওপ্পি' বাঁধের উপর আসিল। তাহার এক পা অন্য পা অপেক্ষা একটু খাট বলিয়া সে খোঁড়াইয়া হাঁটে। আমি তাহাকে মধ্যে মধ্যে বাঁধের উপর বেড়াইতে দেখি। কিন্তু রাত্রি ভিন্ন কোন দিন দিবসে তাহাকে বাঁধের উপর বেড়াইতে দেখি নাই। ওপ্পি বুড়ো আমাকে বলিল,—সে সেই গাড়ী পূর্ব্বেও সেখানে থামিতে দেখিয়াছিল। সেই গাড়ী চলিয়া যাইবার পর সে এবং অন্যান্য লোক সেখানে একটি যুবতীকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিল; তাহারা প্রথমে মনে করিয়াছিল—যুবতী নেশায় বেহুঁস হইয়াছিল, কিন্তু পরে তাহারা বুঝিতে পারে, তাহার দেহে প্রাণ ছিল না; হাঁ, যুবতী অক্কা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু পুলিস যথাসাধ্য তদন্ত করিয়াও সেই যুবতী সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারে নাই।"

আমি বলিলাম, "এ ঘটনা কত দিন পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল?"

যুবক বলিল, "সেই বুড়ো বলিয়াছিল—তাহা প্রায় দুই মাস পূর্ব্বের ঘটনা।"

আমি কনষ্টেবলকে বলিলাম, "বাঁধের উপর কোন যুবতীর মৃতদেহ কোন দিন পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলে, কনষ্টেবল?"

কনষ্টেবল বলিল, "হাঁ মহাশয়, দেখিয়াছিলাম বটে; সেই ঘটনা আমার বেশ স্মরণ আছে। উহা গত সেপ্টেম্বর মাসের কথা। সেই রাত্রিতে ট্রাফালগার স্কোয়ারে আমার পাহারার ভার ছিল। এক দল নিষ্কর্ম্মা লোক রাত্রিকালে প্রায়ই বাঁধের উপর ঘুরিয়া বেড়ায়; সেই খোঁড়া বুড়োটাও সেই দলের লোক; এই জন্য আমার বিশ্বাস, চেষ্টা করিলে তাহার দেখা পাওয়া যাইতে পারে।"

আমি দৃঢ় স্বরে বলিলাম, "হাঁ, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। তাহার জবানবন্দী বোধ হয় মূল্যবান্ হইবে। আমি সুস্থ হইলেই স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইব। সেই বুড়ো ও তাহার সঙ্গীদের জেরা করিলে অনেক কাযের কথা জানিতে পারিব।"

অতঃপর আমি সেই যুবককে বলিলাম, "দেখ ওয়ারেণ, সেই বুড়ো খোঁড়া কি বাঁধের উপর আসিয়া সেই সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে দেখা করিয়াছিল?"

ওয়ারেণ বলিল, "কোন্ যুবতী?"

আমি বলিলাম, "যে আমাকে বেহুঁস অবস্থায় গাড়ী হইতে নামাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল?"

ওয়ারেণ বলিল, "না। সেই যুবতী চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে আর কাহারও সহিত তাহার দেখা হয় নাই।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু বুড়ো খোঁড়াটা ত প্রায় মাস দুই পূর্ব্বে বাঁধের উপর একটি যুবতার মৃতদেহ দেখিয়াছিল, সে পুলিসকে কোন কথা বলিয়াছিল?"

ওয়ারেণ হাসিয়া বলিল, "না, পুলিসের নিকট সে কোন কথা প্রকাশ করে নাই। পুলিসের সঙ্গে তাহার তেমন

সম্ভাব নাই ; তাহার সম্বন্ধে পুলিসের ভাল ধারণা আছে বলিয়াও মনে হয় না।”

আমি বলিলাম, “তাহা হইলে সেই যুবতীর মৃত্যু-রহস্য ভেদ হয় নাই ?”

ওয়ারেণ বলিল, “আমার ত সেইরূপই মনে হয়। ওপ্পি বুড়ো বলিয়াছিল—কেহ যুবতীকে হত্যা করিয়াছিল ; কিন্তু তাহার মৃতদেহে আঘাতের চিহ্ন ছিল না।”

কনষ্টেবল বলিল, “অদ্ভুত বটে, এ বিষয়ের তদন্ত হওয়া উচিত।”

আমি ওয়ারেণকে বলিলাম, “যে লোকটা আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া আনিয়া বাঁধের উপর রাখিয়া গিয়াছিল, সে লোকটার চেহারা কি রকম ?”

ওয়ারেণ বলিল, “লোকটা লম্বা, তাহার বয়স আপনার বয়স অপেক্ষা বেশী বলিয়া মনে হয় নাই। তাহার মাথায় টুপী ও গায়ে একটা লম্বা ওভারকোট ছিল। গলায় একটা কালো ‘টাই’ ছিল। সে তাড়াতাড়ি গাড়ী লইয়া ব্লাকিনিয়ারের দিকে চলিয়া গিয়াছিল।”

আমি বলিলাম, “তুমি বোধ হয় তাহার গাড়ীর নম্বর দেখ নাই ?”

ওয়ারেণ বলিল, “হাঁ, নম্বর দেখিয়াছিলাম, কিন্তু আমার মনে কোন রকম সন্দেহ না হওয়ায় আমি তাহার গাড়ীর নম্বর লিখিয়া রাখি নাই। গাড়ীর নম্বরের আগে আই, সি, কি ঐ রকম দুইটি হরফ ছিল।”

আমি বলিলাম, “ঐ দুইটি হরফ হইতে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। আমি সেই খোঁড়ার সঙ্গে দেখা করিতে চাই।”

কনষ্টেবল বলিল, “আমি ওয়ারেণের সঙ্গে গিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিব।”

অতঃপর তাহারা উভয়েই প্রস্থান করিল।

উত্তেজনায় ও অবসাদে আমার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। আমি অবিলম্বে নিদ্রাভিভূত হইলাম ; নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, আমি একটি ক্ষুদ্র কক্ষে শায়িত আছি, আমার খাটিয়ার পাশে আর একখানি খাটিয়া ছিল ; কিন্তু সেই খাটিয়ায় কোন রোগীকে দেখিতে পাইলাম না।

তখন প্রভাতকাল, নভেম্বর মাসের প্রভাত। সেই কক্ষের মুক্ত বাতায়নপথে আলোক প্রবেশ করিতেছিল। বাহিরে তখন অল্প কুয়াশা হইয়াছিল, তাহাও বুঝিতে পারিলাম। কনষ্টেবলটি আমার শয্যাপ্রান্তে আসিয়া বলিল, সে বাঁধের উপর খোঁড়ার সন্ধান পায় নাই ; সম্ভবতঃ সে সকালে কাযের সন্ধানে স্থানান্তরে গিয়াছে। রাত্রিকালে পুনর্ব্বার তাহার সন্ধান করিবে।

ওয়ারেণকে আমার জার্ম্মিণ ষ্ট্রীটের বাড়ীর ঠিকানা দিয়াছিলাম। আমার শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ হওয়ায় আমি ডাক্তার হেন্‌সাকে ধন্যবাদ জানাইয়া ডেভিসের সঙ্গে একখানি ট্যাক্সিতে বাড়ী ফিরিলাম।

বাড়ী আসিয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সবল হইয়া উঠিলাম ; এ জন্য বেলা ১২টার পর আর একখানি ট্যাক্সি লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। ট্যাক্সিওয়ালাকে ‘রহস্যের খাসমহল’ ৪৫নং ওয়েল্‌ডন ষ্ট্রীটে যাইতে আদেশ করিলাম। রহস্যভেদের জন্য আমার আগ্রহ এতই প্রবল হইয়াছিল যে, আমি আর একটা বেলাও বিলম্ব করিতে পারিলাম না।

আমি কোন দূরবর্ত্তী স্থানে ভ্রমণে বাহির হইলে আমার ব্রাউনিং পিস্তলটা পকেটে লইতে ভুলিতাম না; এরূপ নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত সঙ্গী আমি আর কোথায় পাইব ? সে দিনও আমি পিস্তলটা পকেটে লইলাম। যে সকল চতুর লোক আমার জীবন বিপন্ন করিবার জন্য আমাকে ফাঁদে ফেলিয়াছিল, তাহাদের সন্ধানে যাইবার সময় হাতিয়ার ছাড়িয়া যাওয়া সঙ্গত মনে হইল না। কিন্তু কৌতূহলাতিশয্যে আমি যে আর একটা ভুল করিয়া বসিলাম, তাহা তখন বুঝিতে পারিলাম না। সশস্ত্র অবস্থাতেও ব্যাঘ্রের গুহায় একাকী প্রবেশ করিতে যাওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত হইল না। সর্ব্বাগ্রে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সহায়তা গ্রহণ করাই আমার উচিত ছিল। কিন্তু তখন প্রতিহিংসার অনলে আমার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, অন্য কাহারও সহায়তা গ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না।

যোয়ানের সুন্দর মুখ আমার মনে পড়িল, সে তাহার পিতৃগৃহে কিরূপ অসহায়—তাহা স্মরণ হওয়ায় তাহার প্রতি করুণায় ও সহানুভূতিতে আমার হৃদয় পূর্ণ হইলেও সে যে তাহার পিতার অপকর্ম্মের সহায়—এ কথা ভাবিয়া আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলাম। কিন্তু সে যে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তাহার পিতার ঘৃণিত আদেশপালনে বাধ্য হইয়াছিল, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম। তাহার নিষ্ঠুর

পিতার অবাধ্য হওয়া তাহার অসাধ্য, ইহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

সেই রাত্রিতে আমি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলাম, আমার জীবনে তাহা সম্পূর্ণ নূতন এবং অতীব ভয়াবহ। আমার মনে হইল, ক্ষুদ্র বালিকা জেসি আরও কত দিন ঐ ভাবে পথ ভুলিবার ছল করিয়া কত নিরীহ পথিককে ভুলাইয়া, তাহার পিতৃব্যের কবলে নিক্ষেপ করিয়াছিল; আমি সৌভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম; কিন্তু অনেকে হয় ত কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কুপ ও তাহার আরব ভৃত্য ইব্রাহিম আরও কত নিরীহ ব্যক্তির জীবন লইয়া খেলা করিয়াছিল, তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য হইল।

আমি যখন পার্ক লেন ও মার্বেল পার্ক পার হইয়া এজ্‌অয়ার রোডে প্রবেশ করিলাম, তখন কুয়াসা কাটিয়া গেল। অবশেষে আমার ট্যাক্সি বিভিন্ন পথ অতিক্রম করিয়া একটি অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই বাড়ীখানি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, জেসিকে লইয়া আমি ভ্রমক্রমে সেই অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলাম; সেই স্থানে ট্যাক্সি ত্যাগ করিয়া আমি জেসির সহিত পদব্রজে অদূরবর্ত্তী ওয়েল্‌ডন ষ্ট্রীটে তাহার পিতৃব্যের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম।

আমি কুপের বাসগৃহের অদূরে উপস্থিত হইয়াছি বুঝিতে পারিয়া ট্যাক্সি হইতে নামিয়া পড়িলাম, এবং অতঃপর কি করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। জেসি আমাকে প্রথমে যে বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ভ্রমক্রমে সেখানে আসিয়াছে ভাবিয়া যে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিল, আমি সেই বাড়ীর দ্বারের সম্মুখে আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিলাম, তাহাই ৪৫ নং বাড়ী, এবং তাহা ওয়েল্‌ডন ষ্ট্রীটেই অবস্থিত। কিন্তু জেসি আমাকে সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না দিয়া আমাকে লইয়া বাঁ ধারের একটি পথ দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল; সেই পথে দুইটি ময়দান ও একটি গীর্জ্জা আমাদিগকে পার হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তখন চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকায়, বিশেষতঃ নিবিড় কুজ্ঝটিকারাশি ভেদ করিয়া আমি কোন্ দিকে চলিতেছিলাম, তাহা বুঝিতে না পারায় দিক্‌নির্ণয়ের সুযোগ পাই নাই। যে অট্টালিকায় আমি আবদ্ধ হইয়াছিলাম, তাহা যে বেজ্‌ওয়াটার পল্লীতে অবস্থিত, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইলেও সেই বাড়ীখানি কোথায়, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

আমি পূর্ব্বোক্ত ৪৫ নং বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইয়া ঘণ্টাধ্বনি করিলাম। একটি কৃষ্ণনয়না পরিচারিকা মুহূর্ত্তমধ্যে দ্বার খুলিয়া দিল। আমি প্রচুর শিষ্টাচার সহকারে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মিঃ কুপার কি এই বাড়ীতে বাস করেন?"

পরিচারিকা বিস্মিতভাবে বলিল, "ঐ নামের কোন লোককে আমি চিনি না, মহাশয়!"

আমি বলিলাম, "কিন্তু এই বাড়ী কি ৪৫ নং ওয়েল্‌ডন ষ্ট্রীট নহে?"

পরিচারিকা বলিল, "হা মহাশয়, ইহা ঐ নম্বরেরই বাড়ী।"

আমি বলিলাম, "জেসি মোনারিক্ নাম্নী একটি মেয়ে এই বাড়ীতে থাকে কি?"

পরিচারিকা অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, "জেসি মোনারিক্? কে সে? তাহাকে ত চিনি না! সে এ বাড়ীতে থাকে না।"

আমি বলিলাম, "এই বাড়ীর কর্ত্তা—তোমার মনিবের নাম কি?"

পরিচারিকা।—মিঃ ফ্রিম্‌লে।

আমি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলাম, "এ দিকে অন্য কোন ওয়েল্‌ডন ষ্ট্রীট আছে কি বলিতে পার? ওয়েল্‌ডন ষ্ট্রীট না হইলেও ওয়েল্‌ডন টেরেস্, ওয়েল্‌ডন কেসেণ্ট, কি ঐ রকম আর কিছু?"

পরিচারিকা বলিল, "কৈ. তাহা ত আমি জানি না, তবে এ ভারি অদ্ভুত ব্যাপার বটে! কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে আর এক জন ভদ্রলোক আমাদের এই বাড়ীর দরজায় আসিয়া আপনারই মত ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, একটি ছোট মেয়ে তাঁহার একটি বান্ধবীকে সঙ্গে লইয়া ৪৫নং ওয়েল্‌ডন ষ্ট্রীটে অর্থাৎ এই বাড়ীতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর হইতেই তাঁহার সেই বান্ধবী নিরুদ্দেশ!' তাহার না কি সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পরদিন সন্ধ্যাকালে এক জন ডিটেক্‌টিভ আসিয়া আমার মনিবের সঙ্গে দেখা করিয়াছিল।"

আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিলাম, "তাহা হইলে সেই মেয়েটি সেই ভদ্রলোকটির বান্ধবীকে ভুল ঠিকানা দিয়া তাহাকে অন্য কোথাও লইয়া গিয়াছিল।"

পরিচারিকা বলিল, "আপনার অনুমান সত্য হইতেও পারে, সেই মহিলাটির সম্বন্ধে আর কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই।"

যে রমণীর মৃতদেহ বাঁধের উপর পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল, সে কি এই রমণী? তাহাও ত কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বের ঘটনা।

আমি বলিলাম, "সেই ছোট মেয়েটি সেই রমণীকে যে ভাবে প্রতারিত করিয়াছিল, আমাকেও ঠিক সেই ভাবেই প্রতারিত করিয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে।—লণ্ডনে আর কোন ওয়েল্‌ডন ষ্ট্রীট আছে কি না, তাহা তুমি জান?"

পরিচারিকা বলিল, "শুনিয়াছি, হোয়াইট চ্যাপেল অঞ্চলে এই নামের আর একটা রাস্তা আছে। কিন্তু আমাদের এই বেজওয়াটার পল্লীতে আর কোন ওয়েল্‌ডন ষ্ট্রীট নাই। যে ডিটেক্‌টিভ আমার মনিবের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল. সে কর্ত্তাকে ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছিল।"

বুঝিলাম, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড সেই যুবতীর অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিল। হয় ত স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভরা কুপ ও তাহার আরব ভৃত্যের সাহায্যকারিণী জেসিকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বেজওয়াটার পল্লীর বিভিন্ন পথে নজর রাখিয়াছিল।

আমার নামের একখানি কার্ড গৃহস্বামী মিঃ ফ্রিম্‌লেকে দেওয়ার জন্য পরিচারিকার হাতে দিলাম। মিঃ ফ্রিম্‌লে কয়েক মিনিট পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। লোকটি বৃদ্ধ, মাথার চুলগুলি সমস্তই পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছিল; তাঁহার মাথায় কাল মক্‌মলের টুপি, পরিচ্ছদের পারিপাট্য দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, বৃদ্ধ হইলেও লোকটি সৌখীন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া মনে হইল, তিনি গল্প করিতে ভালবাসেন। বহুদিন পূর্ব্বে এক জন ডিটেক্‌টিভ আসিয়া তাঁহাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহা তিনি সরল ভাবেই আমার নিকট প্রকাশ করিলেন।

তাঁহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে যে মহিলাটি অদৃশ্য হইয়াছিল, তাহার আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের সংবাদ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোচর করা হইয়াছিল। একটি ক্ষুদ্র বালিকা তাহার বাড়ীর পথ ভুলিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, সে সেই মহিলাটিকে সঙ্গে লইয়া এই বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিল।

মিঃ ফ্রিম্‌লে আরও বলিলেন, "পুলিসের সন্দেহ, সেই মহিলাটি কোন বদমায়েসের কবলে পড়িয়াছিল। মহিলাটি আমার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কোথায় গিয়াছিল—তাহা আমি জানিতে পারি নাই; সম্ভবতঃ তাহাকে অন্য কোন বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। আপনিও আজ এখানে আসিয়া ঠিক সেইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। আপনি কি উদ্দেশ্যে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা জানিতে পারি কি?"

আমি সঙ্ক্ষেপে তাঁহাকে সকল কথা বলিলাম,তবে দুর্বৃত্ত কুপের ও তাহার অনুচর ইব্রাহিমের কবলে পড়িয়া আমাকে কিরূপ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, কি ভাবে আমার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল, এবং তাহার গৃহে আবদ্ধ হইয়া আমি কি দেখিয়াছিলাম—তাহা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলাম না। কি উদ্দেশ্যে আমি কুপের বাসগৃহের সন্ধান করিতেছিলাম, তাহাও তাঁহাকে বলিলাম না।

আমার কথা শুনিয়া মিঃ ফ্রিম্‌লে বলিলেন, "আমার উপদেশ, আপনি পুলিসের সাহায্য গ্রহণ করুন, আপনার এজাহারে তাহাদের সন্দেহ প্রবল হইবে এবং তাহারা উৎসাহের সহিত তদন্ত আরম্ভ করিবে। আপনি মিস্ জেসি মোনারিক্ নাম্নী যে মেয়েটির কথা বলিলেন, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।"

আমি আগ্রহভরে বলিলাম, "আমিও সেইরূপই আশা করিতেছি। এই রহস্যভেদ না হইলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না; তাহারা আমার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা উপেক্ষার অযোগ্য। তাহাদের অপরাধের উপযুক্ত দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করিতেই হইবে।"

আরও দুই একটি কথার পর আমি মিঃ ফ্রিম্‌লের নিকট বিদায় লইলাম, এবং ট্যাক্সিওয়ালার ভাড়া মিটাইয়া দিয়া কুপের বাড়ীর সন্ধানে পদব্রজে চলিতে আরম্ভ করিলাম।

পূর্ব্বরাত্রিতে কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন পথে চলিবার সময় পথের দুই ধারের দৃশ্য সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই নাই; এই জন্য

কুপের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করা আমার অসাধ্য বলিয়াই মনে হইল। চলিতে চলিতে কিছু দূরে একটি গীর্জ্জা দেখিতে পাইলাম, তাহা এভানজেলিষ্ট সেণ্ট জনের গীর্জ্জা। গীর্জ্জাটি সাউথ উইক ক্রেসেণ্টে অবস্থিত; কিন্তু পূর্ব্ব-রাত্রিতে কুয়াসাচ্ছন্ন পথে চলিবার সময় পথিপ্রান্তে যে গীর্জ্জাটি দেখিতে পাইয়াছিলাম, ইহা সেই গীর্জ্জা কি না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সেই পথের ধারে আরও কয়েকটি গীর্জ্জা থাকায় আমার মনের ধাঁধা দূর হইল না। কুপের বাসগৃহের অদূরবর্ত্তী গীর্জ্জা কোন্‌টি, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

আমি তিন ঘণ্টা ধরিয়া বেজওয়াটার পল্লীর বিভিন্ন পথে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে একই পথে দুই তিনবার আসিলাম, প্রত্যেক অট্টালিকার সম্মুখভাগ পরীক্ষা করিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার চেষ্টা সফল হইল না।

অবশেষে আমি গ্লসেষ্টার স্কোয়ার ও ব্যাডনর প্লেসের সংযোগস্থলে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। চারি দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা। বুঝিতে পারিলাম, ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সেই সকল অট্টালিকায় বাস করেন। আমার বিশ্বাস হইল, সেই স্থানের সিকি মাইলের মধ্যেই সেই 'রহস্যের খাস-মহল' অবস্থিত; কিন্তু তাহা আমার চক্ষুর অন্তরালে এভাবে সংগুপ্ত রহিয়াছে যে, আমি যথাসাধ্য চেষ্টাতেও তাহার সন্ধান পাইলাম না। হয় ত সেই অট্টালিকা আমার অতি নিকটে অবস্থিত, সেই স্থান হইতে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিলেও সেই অট্টালিকার দ্বার স্পর্শ করিতে পারে, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব আমার অগোচর রহিল। আমি যেন অন্ধকারে অন্ধের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

কিন্তু আমি হতাশ হইলাম না। আমার স্মরণ হইল, সেই অট্টালিকার সম্মুখে প্রস্তরনির্ম্মিত তিনটি ধাপ আছে, এবং দ্বারের সম্মুখে যে প্রশস্ত 'রোয়াক' আছে, তাহা সাদা ও কাল মার্ব্বেলের টালি দ্বারা আচ্ছাদিত। অট্টালিকাটি বৃহৎ এবং তাহা ধূসরবর্ণে রঞ্জিত। দ্বারের সম্মুখে যে বৈদ্যুতিক দীপ আছে—তাহার ফানুষটি গোলাকার এবং শুভ্র। দ্বারের দক্ষিণাংশে সেই বৈদ্যুতিক দীপের 'সুইচে'র বোতাম আছে —তাহাও আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

এই জন্য আমি প্রত্যেক অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই বিশেষত্বগুলি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। প্রত্যেক অট্টালিকার সম্মুখভাগ এই ভাবে পরীক্ষা করিবার জন্য আমি প্রায় কুড়িবার ওয়েলডন ষ্ট্রীটের এক মুড়া হইতে অন্য মুড়া পর্য্যন্ত যাতায়াত করিলাম। আমার এই ভাবে ঘুরাঘুরি করিতে করিতে ৫টা বাজিয়া গেল, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, আমি পথশ্রমে কাতর হইয়া পড়িলাম। আমার ধারণা হইল, কার্ল কুপ অদ্ভুত কৌশলে তাহার রহস্যের খাস-মহল আমার দৃষ্টির অন্তরালে রাখিয়াছে, তাহার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা আমার অসাধ্য!

যাহা হউক, অপরাহ্ণ ৫টার সময় আমি অবসন্ন-দেহে এল্‌ বিয়রা ষ্ট্রীটের কোণে আসিয়া হাইডপার্ক প্লেসে প্রবেশ করিলাম। আমার সম্মুখে সুদীর্ঘ পার্কের রেলিংগুলি প্রসারিত দেখিলাম; দূরে দূরে কৃষ্ণবর্ণ পত্রহীন বৃক্ষশ্রেণী সমুন্নত দেহে দণ্ডায়মান। দূরে দূরে আলোকস্তম্ভশিরে প্রজ্বালিত দীপালোকগুলি নক্ষত্রালোকের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। নানা আকারের বাস ও ট্যাক্সিগুলি এঞ্জিনের শব্দে রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া নানা দিকে ধাবিত হইতেছিল।

আমার মনে হইল, আমি শ্রান্তদেহে এবং হতাশহৃদয়ে বিভিন্ন পথে ঘুরিতে ঘুরিতে হয় ত একাধিকবার কুপের বাসভবন অতিক্রম করিয়াছি। কিন্তু আমি তাহা চিনিতে পারি নাই। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি—বেজওয়াটার পল্লীতে এরূপ অনেক অট্টালিকা আছে, যাহাদের দ্বারের সম্মুখে তিনটি ধাপ আছে এবং তাহাদের বহির্দ্বারের সম্মুখস্থ রোয়াক সাদা ও কালরঙ্গের মার্ব্বেলের টালি দ্বারা আচ্ছাদিত।

হায়, আমার অভিজ্ঞতা এইরূপ শোচনীয়! পূর্ব্বরাত্রিতে যে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম, আজ দীর্ঘকালের চেষ্টায় তাহা চিনিয়া উঠিতে পারিলাম না! বেজওয়াটার বৃহৎ পল্লী, এবং তাহার অধিকাংশ অট্টালিকার সম্মুখভাগের সাদৃশ্য এতই অধিক যে, কোন্ অট্টালিকায় প্রবেশ করিলে আমার আশা পূর্ণ হইবে, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

আমি স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম। আমি তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়াছিলাম; আমার সর্ব্বশরীর ঘুরিতে লাগিল। মধ্যাহ্নকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমি মোহাকৃষ্টচিত্তে যেন মরীচিকার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। আমার সকল চেষ্টা বিফল হইল বটে, কিন্তু আমার সঙ্কল্প শিথিল হইল না।

যোয়ানের সহিত আর একবার দেখা করিবার জন্যও আমার প্রবল আগ্রহ হইল। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় তাহার সুন্দর কিন্তু বিষাদমাখা মুখখানি পুনঃ পুনঃ আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। আমার আশঙ্কা হইল, তাহার সঙ্কট ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার নিষ্ঠুর পিতা তাহাকে তাহার গুপ্তকথা প্রকাশের ভয় দেখাইয়া যে দুশ্চেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে, তাহা হইতে তাহার নিষ্কৃতি নাই।

সে কোথায়? সে কি সেই দিনের কোন সান্ধ্য দৈনিকে বাঁধের উপর আমার মৃতপ্রায় দেহ পুলিস কর্তৃক আবিষ্কারের কথা পাঠ করিয়া আমার পরিণাম-চিন্তায় ব্যাকুল হইয়াছে? —কে জানে?

সপ্তম প্রবাহ

অভিনব অদ্ভুত কাহিনী

গভীর দুশ্চিন্তায় অতি কষ্টে তিন দিন অতিবাহিত করিলাম। কিন্তু এই তিন দিনও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া ক্লুপের বাস-গৃহের সন্ধান করিতে পারিলাম না। রহস্য ভেদ করা আমার পক্ষে অসাধ্য মনে হইল।

যেরূপে পারি, আমি স্বয়ং সেই রহস্য ভেদ করিব—ক্লুপের বাসভবন নিজের চেষ্টায় খুঁজিয়া বাহির করিব—এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে না পারায় আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সাহায্যপ্রার্থী হইলাম না। ওয়ারেণ আমার বাড়ী আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিল, সে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল—সেই খোঁড়াকে সে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই। পুলিস যে রাত্রিতে আমাকে অজ্ঞান দেখিয়া বাঁধের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই রাত্রি হইতেই সে ফেরার, সে আর এক দিনও বাঁধে বেড়াইতে আসে নাই। ওয়ারেণকে উৎসাহিত করিবার জন্য আমি তাহাকে একটি গিনি বক্‌শিস্ করিলে সে আমাকে বলিয়া গেল—খোঁড়ার সন্ধানে সে প্রতি রাত্রে বাঁধের উপর বসিয়া থাকিবে, এবং এক দিন না এক দিন নিশ্চয়ই তাহার দেখা পাইবে, তাহার পর তাহাকে আমার নিকট ধরিয়া আনিয়া পুনর্ব্বার বকশিস্ লইবে।

এই কয়েক দিনের মধ্যে আমার ম্যাজমেজে ভাব দূর হইল না, কেমন যেন অবসাদ বোধ করিতে লাগিলাম। আমার দেহে যে উগ্র ভেষজ অণুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, ইহা তাহারই ফল বলিয়া আমার ধারণা হইল। অল্প পরিশ্রমেই আমি হাঁপাইয়া উঠি, শরীরে বল পাই না। হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া উঠে, এবং কিছু কালের জন্য চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হয়। এক এক সময় আমার সমস্ত চিন্তা বিপর্য্যস্ত ও উলট্‌পালট হইয়া যায়।

তৃতীয় দিনও আমার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইলে, সেই দিন সায়ংকালে আমি ক্ষুণ্নমনে জুনিয়র এশিনিয়ম্ ক্লাবে উপস্থিত হইলাম এবং সেই স্থানেই নৈশ ভোজন শেষ করিলাম। তাহার পর আমার জার্ম্মিন ষ্ট্রীটের বাসায় আসিয়া অগ্নি-কুণ্ডের নিকট বসিয়া সেই দিনের একখানি সান্ধ্য পত্রিকা পাঠ করিতে লাগিলাম।

আমার বাসার কক্ষগুলি বেশ আরামদায়ক, বস্তুতঃ আমার ন্যায় অবিবাহিত যুবকরা যে সকল বাসায় বাস করিত, তাহাদের অনেকের বাসকক্ষ অপেক্ষা আমার কক্ষ-গুলি সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। আমার উপবেশন-কক্ষটি সুপ্রশস্ত এবং আমি অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারি, আমার অপেক্ষা অনেক ধনাঢ্য যুবকের উপবেশন-কক্ষ অপেক্ষা তাহা অধিকতর মূল্যবান্ ও সুরুচিসঙ্গত আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। এ জন্য আমার বন্ধুগণ আমার রুচির প্রশংসা করিত। আমিও তাহাতে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতাম। আমার সুবৃহৎ সুদৃশ্য টেবলখানি প্রস্ফুটিত স্থল-কমলে (লিলিজ্ অফ্ দি ভ্যালি) সুশোভিত থাকিত।

আমি ফুলের অত্যন্ত পক্ষপাতী বলিয়া আমার অনুচর ডেভিস্ প্রত্যহ প্রস্ফুটিত সুগন্ধি কুসুমরাশি কিনিয়া আনিয়া তাহা বিভিন্ন কক্ষের ফুলদানীতে সাজাইয়া রাখিত। কার্য্যো-পলক্ষে আমাকে নানা দূরদেশে ভ্রমণ করিতে হয়, এ জন্য যখন আমি লণ্ডনে থাকি, তখন আমি আরাম-বিরাম ও সুখ-স্বচ্ছন্দতা উপভোগের জন্য অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হই না। আমার উপবেশন-কক্ষের পাশে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ আছে, সেইটিই আমার আফিস-ঘর। সেই কক্ষে একটি প্রকাণ্ড টেবল আছে। সেই টেবলে আমার টেলিফোন সংস্থাপিত আছে। একটি যুবতী আমার 'টাইপিষ্ট'। সে সেই টেবলে বসিয়া আফিসের কায করে। নানাপ্রকার পুস্তক-পূর্ণ আলমারী-গুলিও সেই কক্ষে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আছে। হলঘরের বিপরীত দিকে আমার শয়নকক্ষ ও স্নানাগার।

'জীবে দয়া'

বসুমতী-চিত্রবিভাগ]　　[শিল্পী—শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই দিন অপরাহ্ণ হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত আমি কুপের বাসগৃহের সন্ধানে বেজওয়াটার পল্লীর পথে পথে ঘুরিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সে দিন আমার সকল শ্রম বিফল হইল, অবশেষে আমার মনে হইল, যদি আমি প্রতিদিন রাত্রিকালে সেই পল্লীর বিভিন্ন পথে ও পথিপ্রান্তস্থ স্কোয়ারগুলিতে ভ্রমণ করি, তাহা হইলে কোন না কোন স্থানে কুপ, ইব্রাহিম, যোয়ান বা তাহাদের পরিচারিকা স্মিথের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইতেও পারে।

মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া আমি উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি সেই সকল স্থানে ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু আমার আশা পূর্ণ হইল না; এক দিনও তাহাদের কাহারও সাক্ষাৎ পাইলাম না।

এই ভাবে পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হওয়ায় আমি অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইলাম; আমি আমার উপবেশন-কক্ষে বসিয়া চিন্তাকুল-চিত্তে ধূমপান করিতেছিলাম, সেই সময় ডেভিস্ আমার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "ওয়ারেণ একটা ভবঘুরে চাষা গোছের লোককে সঙ্গে লইয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে।"

তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমার আগ্রহ হইল; কিন্তু আমি তাহাদিগকে ডাকাইবার পূর্ব্বেই তাহারা আমার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিল। আমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওয়ারেণের সঙ্গীর মুখের দিকে চাহিলাম। লোকটি বৃদ্ধ, বয়স ৬০ বৎসরের কিছু অধিক বলিয়াই মনে হইল। দেহ ক্ষীণ, বাজপক্ষীর মুখের মত মুখের গঠনভঙ্গী; সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র বুঝিতে পারিলাম—লোকটি গোঁড়া। কৃষ্ণবর্ণ সুদীর্ঘ মলিন কোটে তাহার দেহ আবৃত। গলায় কলারের পরিবর্ত্তে একখানি লাল রুমাল দ্বারা কণ্ঠ পরিবেষ্টিত, রুমালখানি পুরাতন ও বিবর্ণ। লোকটাকে দেখিয়া আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম—সে পাকা মাতাল।

কিন্তু তাহার প্রথম সম্ভাষণেই বুঝিতে পারিলাম, লোকটি শিক্ষিত; মনে হইল, এক সময় লোকটির অবস্থা ভালই ছিল। ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় বঞ্চিত হওয়ায় এখন সে বেকার অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়।

ওয়ারেণ বলিল, "এই দেখুন 'ওপ্পি'কে লইয়া আসিয়াছি; উহাকে আমরা 'ওপ্পি' বলিয়া ডাকি। আজ উহাকে ব্লাক ফ্রায়ার্স ব্রীজের দিকে যাইতে দেখিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করাইবার জন্য ডাকিয়া আনিলাম।"

বৃদ্ধ মার্জ্জিত ভাষায় বলিল, "আপনি কি কারণে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন—তাহা ওয়ারেণের কাছে জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু আপনি তাহার নিকট যে সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন, তাহার অধিক কোন কথা আপনাকে বলিতে পারি, এরূপ আশা করিবেন না।"

আমি বলিলাম, "বাঁধের যে স্থানে আমি পড়িয়া ছিলাম, তাহার অদূরে একটি যুবতীকে একখানি মোটরকার হইতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, ইহা কি তুমি নিজে দেখিয়াছিলে?"

বৃদ্ধ বলিল, "হাঁ মহাশয়, স্বয়ং দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সেই স্থানটি আর একটু দূরে নগরের দিকে। সে সেপ্টেম্বর মাসের কথা। আমি সেই গাড়ীখানি চিনিতে পারিয়াছিলাম। যে গাড়ীতে সেই যুবতীকে লইয়া আসা হইয়াছিল, আপনি সেই গাড়ীতেই বাঁধের উপর আনীত হইয়াছিলেন।"

আমি।—সেই গাড়ী কাহারা আনিয়াছিল?

বৃদ্ধ বলিল, "দুই জন লোক, এক জন পাতলা, অন্য লোকটি খুব লম্বা জোয়ান। তাহারা মাথার টুপি ভ্রূ পর্য্যন্ত নামাইয়া দিয়াছিল; মোটা কোটে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত ছিল, এ জন্য তাহাদের চেহারা সুস্পষ্টরূপে দেখিবার সুযোগ পাই নাই। কিন্তু সেই লম্বা জোয়ানটার মুখ যতটুকু নজরে পড়িয়াছিল—তাহা দেখিয়াই মনে হইয়াছিল—লোকটা শ্বেতাঙ্গ নহে, কালা আদমী!'

তবে কি সে কুপের পরিচারক ইব্রাহিম?—আমি ঈষৎ আগ্রহভরে বলিলাম, "লোকটাকে দেখিয়া আরব বলিয়া মনে হইয়াছিল কি?"

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া বলিল, "আরব?—তা হইতেও পারে; কিন্তু একে তাহার মুখ সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাই নাই, তাহার উপর বাঁধের আলো কিছু দূরে ছিল, এই জন্য সে আরব কি অন্য দেশের লোক, তাহা ঠাহর করিতে পারি নাই।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু তাহারা যে রমণীকে গাড়ী হইতে নামাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল—তাহাকে দেখিয়াছিলে ত?"

বৃদ্ধ বলিল "হাঁ, দেখিয়াছিলাম। কন্‌ষ্টেবলটা আসিয়া তাহার লণ্ঠনের আলো সেই যুবতীর মুখের উপর নিক্ষেপ করিলে তাহার মুখ দেখিতে পাইয়াছিলাম। মুখ সাদা কাগজের মত ফ্যাকাসে! সে প্রাচীরের নীচে কাত হইয়া পড়িয়া ছিল।"

আমি বলিলাম, "তুমি যাহা দেখিয়াছিলে—তাহা পুলিসের নিকট প্রকাশ কর নাই; ইহার কারণ কি?"

বৃদ্ধ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "হাঁ, কারণ ছিল বৈ কি! পুলিস কি চীজ, তাহা আমার জানা আছে কি না। পুলিসকে কোন কথা বলিতে গেলে তাহারা আমাকে নানা রকম জেরা করিত, হয় ত আমাকে লইয়াই টানাটানি করিত। কে ইচ্ছা করিয়া ফ্যাসাদে পড়ে?—আপনি বিজ্ঞ লোক। সকলই বুঝিতে পারিতেছেন।"

হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল—বৃদ্ধ হয় ত কুপের অনুগত বা আশ্রিত; তাহার অপরাধ গোপন করায় বৃদ্ধের স্বার্থ ছিল। কিন্তু আমার মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলাম, "বড়ই দুঃখের বিষয় যে, পুলিসের নিকট কোন কথা প্রকাশ করিতে তোমার সাহস হয় নাই।"

ওয়ারেণের 'ওপ্পি'কে জেরা করিয়া জানিতে পারিলাম, তাহার নাম হপ্‌কিন্‌সন্‌। হপ্‌কিন্‌সন্‌ হইতে 'হপ্পি' অবশেষে 'হপ্পি ওপ্পিতে' পরিণত হইয়াছিল। এক সময় সে আইনব্যবসায়ী ছিল; পদস্খলন হওয়ায় সে নামিতে নামিতে পাতালের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে!

যাহা হউক, সে সেই সেপ্টেম্বরের রাত্রিতে যাহা দেখিয়াছিল—তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট প্রকাশ করিল। আমার ইচ্ছা হইল, অবিলম্বে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইয়া ফৌজদারী তদন্ত বিভাগের সহায়তা গ্রহণ করি। কিন্তু আমি জানিতাম, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে সেই নিরুদ্দিষ্টা মহিলাটির অনুসন্ধান হইয়াছিল, কিন্তু পুলিস কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই, এ অবস্থায় তাহাদের সাহায্যপ্রার্থনা না করিয়া স্বয়ং রহস্যভেদের চেষ্টা করাই সঙ্গত মনে করিলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে ভূতপূর্ব্ব আইনব্যবসায়ী হপ্‌কিন্‌সন্‌ ও তাহার বন্ধু ওয়ারেণ আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। হপ্‌কিন্‌সন্‌ আমাকে তাহার ঠিকানা দিয়া বলিয়া গেল, প্রয়োজন হইলে সেই ঠিকানায় সন্ধান লইলেই আমি তাহার সন্ধান পাইব।

বিধাতার বিধান এইরূপ বিচিত্র! আজ যে মহা সম্ভ্রান্ত বন্ধু ও বান্ধবীবর্গে পরিবৃত হইয়া বহু অর্থব্যয়ে 'স্যাভয়' হোটেলে পানাহার করিতেছে,—যাহার কৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়া শত শত লোক আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছে—কিছু দিন পরে তাহাকে হয় ত ভিক্ষা করিয়া জীবিকা সংস্থান করিতে হইতেছে। আবার ঐ নগণ্য টেলিগ্রাফ-পিয়ন এক দিন কোটিপতি।

সেই রাত্রিতে আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল না; কি করিব, কি করিলে সঙ্কল্প-সিদ্ধি হইবে, সারারাত্রি শয্যায় পড়িয়া তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। অবশেষে প্রত্যূষে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

যেরূপে এবং যত দিনে পারি, কুপের বাসগৃহ খুঁজিয়া বাহির করিব—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরদিন অপরাহ্ণ ২টার সময় পথে বাহির হইয়া পড়িলাম, এবং হাইড পার্ক ষ্ট্রীট অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন পথের ধারে যে সকল অট্টালিকা দেখিলাম, তাহাদের প্রত্যেকটি সতর্কভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। সে দিন আকাশ পরিষ্কার ছিল, শীতের প্রাখর্য্যও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। দুই সপ্তাহের কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন আকাশের ঘোলাটে ভাবের এই পরিবর্ত্তনে আমি আনন্দ লাভ করিলাম। আমি যে সকল পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম—তাহা বেজ্‌ওয়াটার পল্লীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও পল্লীবাসীরা তাহাদের বাসস্থানের সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে পল্লীর সেই অংশটিকে 'হাইড পার্ক' নামে অভিহিত করে। কারণ, হাইড পার্কের সান্নিধ্যে বাস করা গৌরবের নিদর্শন।

নভেম্বরের অপরাহ্ণে বিভিন্ন পথে চলিতে চলিতে আমি কেবল পথিপ্রান্তবর্ত্তী অট্টালিকাগুলি পরীক্ষা করিয়াই নিরস্ত হইলাম না, যে সকল নর-নারীকে পথে চলিতে দেখিলাম, তাহাদেরও মুখ দেখিতে লাগিলাম; ভাবিলাম, বিভিন্ন পথে চলিতে চলিতে কুপ বা তাহার পরিবারস্থ কাহারও সহিত আমার সাক্ষাৎ হইতেও পারে। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি দোকানে এবং ঝি-চাকরের নাম রেজিষ্ট্রী করিবার আফিসে অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু কাহারও নিকট অনুকূল উত্তর পাইলাম না। অনুমান হইল, কুপের পরিচারিকা লণ্ডনের অন্য কোন পল্লী হইতে আসিয়া সেখানে চাকরী করিতেছিল।

অবশেষে একটি লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া "লণ্ডন ডাইরেক্টরী" খুলিয়া বসিলাম। কুপারের নাম খুঁজিতে গিয়া এক কুপারের পরিবর্ত্তে ছয় জন কুপারের নাম দেখিতে পাইলাম। আমি তাহাদের ঠিকানা লিখিয়া লইয়া প্রত্যেক কুপারের গৃহে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু কোন কুপারই আমার আশা পূর্ণ করিতে পারিল না, কুপের বাড়ীর সহিত তাহাদের কাহারও বাড়ীর সাদৃশ্যও লক্ষিত হইল না। তখন বুঝিতে পারিলাম, ডাইরেক্টরীতে কুপের যে নাম আছে—তাহা তাহার ছদ্মনাম। তাহার ন্যায় নরপিশাচ ডাইরেক্টরীতে তাহার প্রকৃত নাম ব্যবহার করিবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত।

অপরাহ্ণ ৪টার পর দিবালোকের অভাব হইল, ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইলে আমার মন পুনর্ব্বার নিরাশায় পূর্ণ হইল, দীর্ঘকাল পথিভ্রমণে আমি ক্লান্ত হইয়াছিলাম, এ জন্য একখানি ট্যাক্সি লইয়া বাসায় প্রত্যাগমনের ইচ্ছা হইল। আমি পদব্রজে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া ক্রেডেন হিলের রাস্তায় উপস্থিত হইলাম। সেই পথের দুই ধারে অনেকগুলি বৃহদাকার পুরাতন বাগানবাড়ী দেখিতে পাইলাম। প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখেই এক একটি ক্ষুদ্র উদ্যান। আমি চলিতে চলিতে একখানি অট্টালিকার সম্মুখে আসিলে ধূসরবর্ণ একখানি বৃহৎ মোটর-কার আমার দৃষ্টিগোচর হইল। সেই গাড়ীখানি সেই অট্টালিকার সম্মুখস্থ পথের ধারে দাঁড়াইয়া ছিল।

আমি তখন চিন্তামগ্ন থাকায় প্রথমে সেই মোটরকারে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই; এক জন লোক বাগানের দেউড়ী খুলিয়া হঠাৎ পথে আসিল, এবং তাড়াতাড়ি সেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। সেই সময় লোকটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সে আমার দিকে মুখ ফিরাইবা-মাত্র আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম।

মোটর-কারের আরোহী স্বয়ং কুপ!

শকটখানি মুহূর্ত্তমধ্যে চলিতে আরম্ভ করিল, আমিও তীরবেগে সেই দিকে দৌড়াইলাম। কুপ আমাকে চিনিতে পারিয়াছিল বলিয়াই মনে হইল। সে আমাকে চিনিতে পারিয়া থাকিলে গাড়ীর পশ্চাৎস্থিত গবাক্ষ দিয়া আমার প্রতি লক্ষ্য করিতেছিল সন্দেহ নাই।

গাড়ীখানি দ্রুতবেগে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া পোর চেষ্টার টেরেসের সম্মুখ হইতে অন্য দিকে প্রস্থান করিল। আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহা অদৃশ্য হইয়াছিল।

হঠাৎ আমার মনে হইল—আমি কি নির্ব্বোধ! উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া আমি গাড়ীখানার নম্বরটা লিখিয়া লই নাই।

সেই সময় পোর চেষ্টার টেরেসের সম্মুখ দিয়া একখানি খালি ট্যাক্সি চলিয়া যাইতে দেখিলাম; আমি তৎক্ষণাৎ তাহাতে লাফাইয়া উঠিয়া ট্যাক্সিওয়ালাকে অগ্রগামী ধূসর কারের অনুসরণ করিতে আদেশ করিলাম।

ট্যাক্সিওয়ালা সবেগে কুপের অনুসরণ করিল। কিন্তু কুপ বোধ হয় আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াই তাহার বেগবান্ শকট এরূপ বেগে চালাইতে লাগিল যে, ভাড়াটে ট্যাক্সি দীর্ঘকাল তাহার অনুসরণ করিতে পারিল না; কুপের গাড়ী কয়েক মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হইল। আমি বেজ্-ওয়াটার রোডে উপস্থিত হইয়া কুপের গাড়ী দেখিতে পাইলাম না, তাহা কোন্ দিকে গিয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না।

আমার মনে হইল, কুপের গাড়ী পূর্ব্বদিকে গিয়াছে। আমার ট্যাক্সি অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের দিকে চলিল; কিন্তু আমি রিজেণ্ট ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াও কুপের গাড়ীর সন্ধান পাইলাম না। তখন আমার মনে হইল—কুপ পূর্ব্বে না আসিয়া পশ্চিমদিকের পথে সরিয়া পড়িয়াছিল। আমার দুর্ভাগ্য! আমার মন ক্রোধে ক্ষোভে পূর্ণ হইল। কুপের দেখা পাইয়াও তাহাকে ধরিতে পারিলাম না! এত দিনের চেষ্টা পুনর্ব্বার বিফল হইল।

কিন্তু এই ভাবে পুনঃ পুনঃ নিরাশা সঞ্চয় করিয়াও আমি নিরুৎসাহ হইলাম না। আমি সেই ট্যাক্সিতেই ক্রেডেন হিলের পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, এবং দেউড়ীর ভিতর দিয়া সেই বাড়ীর বহির্দ্বারে আসিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিলাম। কিন্তু সেই অট্টালিকার সহিত কোন গুপ্ত রহস্যের সম্বন্ধ আছে বলিয়া বিশ্বাস হইল না। একটি পরিচারিকা দ্বার খুলিয়া দিলে আমি তাহাকে বলিলাম—"মিঃ কুপারের নিকট আমি একটি সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। মিঃ কুপার তাঁহার মোটর-গাড়ীতে কিছুকাল পূর্ব্বে সেখানে আসিয়াছিলেন—তাহাও আমি জানি।"

পরিচারিকা সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বোধ হয়, আপনি ভুল করিয়াছেন মহাশয়! আজ কোন ভদ্রলোক মোটর-গাড়ীতে চড়িয়া এ বাড়ীতে আসেন নাই।"

আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "কিন্তু তুমি জান, আমার নিকট সত্য কথা গোপন করিতেছ? প্রায় পনের মিনিট পূর্ব্বে আমি তাঁহার 'কার' ঐ দেউড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, হাঁ, আমি স্বয়ং দেখিয়াছিলাম।"

পরিচারিকা অচঞ্চল স্বরে বলিল, "না মহাশয়! আপনারই দেখিবার ভুল। আমি দুপুরের পর হইতে এখানে আছি, একবারও বাহিরে যাই নাই, কোন 'কার' আমাদের দরজায় আসে নাই। আমার মনিব মফস্বলে গিয়াছেন, এজন্য কেহই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসে নাই।"

আমি অগত্যা দেউড়ীর নিকট ফিরিয়া আসিয়া সেই বাড়ীখানি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিয়া লইলাম; তাহার পর দরজায় ফিরিয়া গিয়া পরিচারিকাকে বলিলাম, "হা, এই বাড়ীতেই তিনি আসিয়াছিলেন, আমার সন্দেহের কোন কারণ নাই, বাড়ীও ভুল করি নাই, তুমিই সত্য কথা গোপন করিতেছ। ইহার কারণ কি, বল। আমি তাঁহাকে এই বাড়ীর দেউড়ী দিয়া বাহিরে যাইতে দেখিয়াছি। তিনি এখানে আসিয়াছিলেন, এ কথা অস্বীকার করিতেছ কেন?"—সঙ্গে সঙ্গে গিনির একটি আধুলী তাহার হাতে গুঁজিয়া দিলাম।

পরিচারিকা সেই আধুলীটির দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মহাশয়, আমি আপনাকে সত্য কথাই বলিয়াছি, টাকা খাইয়া আপনাকে ত মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না। সত্যই কোন ভদ্রলোক আজ বিকালে এ বাড়ীতে বেড়াইতে আসেন নাই।"

আমি বিরক্তিভরে বলিলাম, "কিন্তু আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিলাম না। যদি সরলভাবে সত্য কথা বল, তাহা হইলে তুমি আশাতীত পুরস্কার পাইবে।"

পরিচারিকা বলিল, "কিন্তু আশাতীত পুরস্কারের লোভেও আমি মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না। আপনিই বোধ হয়, বাড়ী ভুল করিয়াছেন। সেই ভদ্র লোকটিকে হয় ত পাশের কোন বাড়ী হইতে বাহিরে যাইতে দেখিয়াছেন। আপনি ভুল করিয়া এখানে আসিয়াছেন।"

তাহার মিথ্যা কথায় আমার বড় রাগ হইল, তাহাকে দুই একটি কড়া কথা শুনাইয়া দিলাম। সে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। অগত্যা আমি পথে ফিরিয়া আসিয়া সেই বাড়ীর নম্বরটি নোট-বহিতে লিখিয়া রাখিলাম।

কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আমি যখন দেউড়ীর নিকট হইতে দ্রুতবেগে কুপারের বাড়ীর অনুসরণ করিয়াছিলাম, তখন আমি সেই অট্টালিকার ভোজন-কক্ষের বাতায়নে টবের উপর তাল-জাতীয় একটি গুল্ম সংস্থাপিত দেখিয়াছিলাম, কিন্তু এবার দেখিলাম, সেই গুল্মটি সেই স্থান হইতে অপসারিত হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে সেই স্থানে একটি নর্ত্তকীর শুভ্র মার্ব্বেল-মূর্ত্তি সংস্থাপিত দেখিলাম। কালো মার্ব্বেলের বেদীর উপর সংরক্ষিত সেই মর্ম্মর-মূর্ত্তির গঠন-কৌশল অতীব প্রশংসনীয়। আমার মনে হইল—কুপের প্রস্থানের নিদর্শনস্বরূপ কি সেই মর্ম্মরমূর্ত্তির আকস্মিক আবির্ভাব? আমি ইহার প্রকৃত কারণ স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তাকুল-চিত্তে বাড়ী ফিরিলাম।

সন্ধ্যার পর পূর্ব্ব-অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া আমি চেয়ারিং-ক্রশ হাসপাতালে উপস্থিত হইলাম; তখন রাত্রি প্রায় ৮টা। ডাক্তার হেন্‌সা সাদরে আমাকে তাঁহার খাস-কামরায় লইয়া চলিলেন। কামরাটি ক্ষুদ্র, তাহাতে মূল্যবান্ আসবাবপত্র ছিল না। সেই কক্ষে ডাক্তারী কেতাবপূর্ণ কয়েকটি আলমারী দেখিতে পাইলাম। তদ্ভিন্ন একটি টেবল এবং অগ্নিকুণ্ডের নিকট খান দুই আরাম-কেদারা সংস্থাপিত ছিল। কক্ষটি সিগারেটের ধূমে আচ্ছন্ন। সে দিন আমার শরীর বেশ সুস্থ ছিল।

হঠাৎ টেলিফোনের সাড়া পাইয়া, ডাক্তার হেন্‌সা আমাকে সেই কক্ষে বসাইয়া রাখিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। কয়েক মিনিট পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "কোল্‌ফাক্স, তুমি অনেকক্ষণ এখানে একাকী বসিয়া আছ, এ জন্য আমি দুঃখিত। আমাকে একটি বালকের পায়ে অস্ত্রোপচার করিতে যাইতে হইয়াছিল; কাযটা শেষ করিয়া আসিলাম। সেণ্ট মার্টিন লেনে একখানি দ্রুতগামী মোটর-ব'স সেই বালকটির পায়ের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, তুমি এখন কেমন আছ? তোমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখি।"

ডাক্তার তাঁহার পকেট হইতে 'ষ্টেথোস্কোপ' বাহির করিয়া আমার বুক পরীক্ষা করিলেন, আমার নাড়ী টিপিলেন, তাহার পর আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

অবশেষে ডাক্তার বলিলেন, "তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছ দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি যে সেই উৎকট ভেষজের প্রভাব হইতে এত শীঘ্র মুক্তিলাভ করিতে পারিবে, ইহা আমি আশা করি নাই। তুমি সেই লোকটার কোন সন্ধান পাইয়াছ? পুনর্ব্বার তাহার বাড়ীতে গিয়াছিলে না কি?"

আমার অনুসন্ধানের যে ফল হইয়াছিল, তাহা তাঁহাকে জানাইলাম। অপরাহ্নে যে ভাবে হঠাৎ কুপের দেখা পাইয়াছিলাম, তাহাও তাঁহাকে বলিলাম।

সকল কথা শুনিয়া ডাক্তার বলিলেন, "এ যে বড়ই অদ্ভুত রহস্য, কেবল দুর্ভেদ্য নহে, অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। আমার অবসর থাকিলে এই রহস্য-ভেদে আমি তোমাকে সাহায্য করিতাম। কুপ লোকটা পাগল হইলেও অপরাধী। হাঁ, মতলববাজ পাগল। সে বোধ হয়, অনেক লোককে উৎপীড়িত ও তাহাদের জীবন বিপন্ন করিয়াছে; তথাপি কেহ তাহার বিরুদ্ধে পুলিসে অভিযোগ করে না কেন? বোধ হয়, সকলেই তাহাকে ভয় করে।"

আমি বলিলাম, "আপনার সহায়তা পাইলে আমি কৃতকার্য্য হইতেও পারি। আপনার অবসরকালে আপনি আমাকে সাহায্য করিতে পারিবেন না?"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "আমার অবসর? এই হাঁসপাতালের চাকরী থাকিতে আমার অবসর নাই। তবে সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন অপরাহ্নে কয়েক ঘণ্টা ও রবিবারে কিছু কাল আমার হাতে তেমন কোন কায থাকে না। এখানে আমার কাযের অন্ত নাই।"

মুহূর্ত্ত পরে পুনর্ব্বার টেলিফোনের ঝন্‌ঝনি শুনিয়া ডাক্তার টেলিফোনে সাড়া দিলেন, তাহার পর রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া আমাকে বলিলেন, "আমাকে এই মুহূর্ত্তেই পার্জেটে যাইতে হইবে। কিছু কাল তোমার সঙ্গে নিশ্চিন্তমনে গল্প করিব, তাহারও অবসর নাই। দিবারাত্রি কায!"

আমি বলিলাম, "অবসর পাইলে আপনি দয়া করিয়া আমার বাড়ী যাইবেন; আপনি ত আমার বাড়ীর ঠিকানা জানেন।"

ডাক্তার বলিলেন, "তাহাই হইবে, কাল তোমার সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করিব। যাইবার পূর্ব্বে টেলিফোনে তোমাকে সংবাদ দিব। উভয়ে চেষ্টা করিয়া দেখিব, রহস্য ভেদ করা অসাধ্য না হইতেও পারে। এখন তবে বিদায়, বন্ধু।"

আমি ডাক্তারের নিকট যখন বিদায় লইলাম, রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে আটটা। আমি একখানি ট্যাক্সি লইয়া 'রয়েল অটোমোবাইল ক্লাবে' চলিলাম; সেখানে পানভোজন শেষ করিয়া কয়েক জন পরিচিত ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তায় ঘণ্টাখানেক কাটাইয়া দিলাম। রাত্রি ১০টার সময় আমার বাসায় চলিলাম।

আমি বাসায় প্রবেশ করিলে ডেভিস্ বলিল, "আপনি বাহিরে যাইবার অল্পকাল পরে একটি মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি আমাকে তাঁহার নাম বলিলেন না।"

আমি বলিলাম, "যে নাম বলিতে রাজী হইল না, তাহাকে কেন তুমি আমার ঘরে প্রবেশ করিতে দিলে?"

ডেভিস্ বলিল, "কারণ, তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিপন্ন মনে হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, আজ রাত্রি ৮টার পূর্ব্বে আপনার সঙ্গে তাঁহার দেখা হওয়াই চাই। কারণ, ইহার উপর কাহারও জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে!—কিন্তু সেই মহিলাটি কে? তুমি পূর্ব্বে কোন দিন তাহাকে দেখিয়াছিলে কি?"

ডেভিস্ গম্ভীরস্বরে বলিল, "না, কোন দিনও তাঁহাকে দেখি নাই। মহিলাটি দীর্ঘাকৃতি, কৃশাঙ্গী; পরিচ্ছদের পারিপাট্য দেখিয়া বড় ঘরের মেয়ে বলিয়াই মনে হইয়াছিল। পরমা সুন্দরী, চোখের তারা নীল, বয়স ২০ বৎসরের অধিক নহে। তাঁহার চোখ দেখিয়া মনে হইতেছিল, তিনি খুব কাঁদিয়াছেন, চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল! তিনি যতক্ষণ এখানে ছিলেন, যেন ভয় পাইয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিলেন। তিনি কিছু কাল আপনার চেয়ারে বসিয়াছিলেন, তাহার পর উঠিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আপনার সৌখীন জিনিষপত্রগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। মিস্

ইভার ফটোখানি তিনি কয়েক মিনিট আগ্রহভরে দেখিয়া আমাকে বলিলেন, 'ও কাহার ফটো?'—উহা আপনার ভগিনীর ফটো, ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার চক্ষুতে কৌতূহল ফুটিয়া উঠিল। তিনি আমাকে আপনার ও আপনার আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।"

আমার কৌতূহল বৰ্দ্ধিত হইল। বলিলাম,"তোমার সঙ্গে তাহার এত কথা হইল, আর তুমি তাহার পরিচয়টা কোন কৌশলে জানিয়া লইতে পারিলে না?"

ডেভিস্ লজ্জিত হইয়া বলিল, "কিন্তু আপনাকে তিনি খুব ভাল করিয়াই জানেন। আমার অপরাধ কি বলুন? আমি তাঁহাকে তাঁহার নামের কার্ড রাখিয়া যাইবার জন্য পাঁচ ছয়বার অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি সে কথা কাণে তুলিলেন না। তিনি আপনার সুপরিচিতা, তাহাও বুঝিতে পারিলাম; তাঁহার আকার-প্রকার কিরূপ—তাহা ত আপনাকে বলিলাম, ইহা শুনিয়াও আপনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না!—হাঁ, একটা কথা আমার স্মরণ হইয়াছে; তাঁহার বাঁ কাণের পাশে একটি আঁচুলি আছে। আমি—"

আমি ডেভিসের কথায় বাধা দিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলাম, "কি! বাঁ কাণের পাশে আঁচুলি? তবে ত সে যোয়ান কুপার! যোয়ান স্বয়ং আমার ঘরে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল, অথচ দেখা হইল না?—কি দুর্ভাগ্য!"

ডেভিস্ সভয়ে বলিল, "যে যুবতী আপনাকে অজ্ঞান অবস্থায় বাঁধের উপর ফেলিয়া দিয়া গিয়াছিল—সেই নির্লজ্জা নিষ্ঠুরা নারী আজ আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল? অদ্ভুত বটে!"

আমি বলিলাম, "বিস্ময়ের কারণ নাই, ডেভিস্! সে কি কোন চিঠিপত্র রাখিয়া গিয়াছে?"

ডেভিস্ বলিল, "হাঁ, একখানি চিঠি লিখিয়া আপনার টেবলের উপর রাখিয়া গিয়াছে।"

আমি তৎক্ষণাৎ আমার আফিস-কামরায় প্রবেশ করিয়া ব্লটিংপ্যাডের উপর একখানি পত্র দেখিতে পাইলাম। আমি কম্পিত হস্তে পত্রখানি তুলিয়া লইয়া পাঠ করিলাম। তাহার পর স্তম্ভিতভাবে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম, আমার মুখে কথা সরিল না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

পথের বাঁশী

রাজ-পথ নগরীর,—
পাথর কাঁকর বন্ধনে পড়ি' লুণ্ঠিছে যেন শির।
চল-চঞ্চল চলে জন-স্রোত তাহারি বক্ষপরে,
অবিশ্রান্ত কল-কোলাহল উঠিছে মিলিত স্বরে।
শকট ছুটিছে বিকট নিনাদে ঘর্ঘর ঘর্ঘর,
ধূলির ফোয়ারা ঝর্ঝর ঝরি' দেহ করে জর্জ্জর।

বাজে তার মাঝে বাঁশী,—
তপ্ত নিদাঘে মলয় যেন রে লাগিল পরাণে আসি।
মরু-বুকে যেন ফুল,—
ফুটাল নিমেষে কোন যাদুকর কুহকেতে বিলকুল!
অথবা রে বারবার,—
চরণ-পীড়নে চক্র-পেষণে পথ করে হাহাকার।

তখন গোধূলি-বেলা,—
পশ্চিম নভে সুরু হয়ে গেছে পরীদের হোরি-খেলা।
সহসা ঢাকিল সে মহাদৃশ্য ধূম যবনিকাখানি।
সন্ধ্যা নামিল মন্দ-চরণে তমো গুণ্ঠন টানি।
নাগরীর মত সাজিল নগরী আলোকের মালা পরি,
সুদূরে মিশিল বাঁশরীর সুর মরম আকুল করি।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

নাদির খাঁর সিংহাসনাধিকার

গত ৭ই অক্টোবর তারিখে জেনারল নাদির খাঁর সেনাপতি শা-ওয়ালি খাঁ এবং শা-মামুদ খাঁ কাবুল আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছেন। আমীর হবিবুল্লা বা বাচ্চা-সাকাও সপরিবারে কাবুলের আর্ক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু ঐ দুর্গও নাদির খাঁর সেনাপতিরা অবরোধ ও আক্রমণ করিলে মুষ্টিমেয় অনুচর-বর্গকে লইয়া বাচ্চা কোহিদামানে পলায়ন করেন।

হঠাৎ ঘোর অন্ধকার ও ঝঞ্ঝাবৃষ্টির পর সূর্য্যোদয়ের মত যেন এই সংবাদটি! জেনারল নাদির খাঁ বার বার পরাজিত ও বিফলমনোরথ হইয়া পারাচীনরে—প্রায়

জেনারল নাদির খাঁ

বৃটিশ সীমানার নিকটে হটিয়া আসিয়াছেন, প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে হয় ত অর্থ ও লোকাভাবে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া বৃটিশ ভারতে পলায়ন করিতে হইবে,—এই ভাবের সংবাদ আসিতেছিল। মুহূর্ত্ত পরেই এই আশ্চর্য্য ভাগ্য-পরিবর্ত্তন! সবই তাঁহার অদ্ভুত প্রচারকার্য্যের খেলা!

নাদির খাঁ কাবুল অধিকারের পর সংবাদ আসিল, জিরগা (Assembly) বসিয়াছিল, প্রতিনিধিরা তাঁহাকেই সিংহাসনে বসিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে নাদির খাঁ রাজা হইয়াছেন, নতুবা তাঁহার উহা মনোগত ইচ্ছা ছিল না। রাজা আমানুল্লা য়ুরোপ হইতে তাঁহার এই পদলাভে আনন্দ ও সহানুভূতি জ্ঞাপনান্তে তারে জানাইয়াছেন যে, তিনি সিংহাসনের প্রার্থী নহেন, কেবল তাঁহার প্রবর্ত্তিত শিক্ষাবিস্তার ও দেশের উন্নতিবিধানের দিকে নাদিরের দৃষ্টি থাকিলেই হইল। ইহাতে আমানুল্লার মহত্ত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতের হিন্দু মুসলমান নাদিরের সিংহাসনাধিকারে যে বিশেষ সন্তুষ্ট, এমন ত মনে হয় না, তাহাদের রাজা আমানুল্লার

আমীর আমান উল্লা ও রাজ্ঞী সৌরিয়া

পুনঃ সিংহাসনপ্রাপ্তিই যেন মনোগত অভিপ্রায়। কোন মুসলমান বলিয়াছেন, সিংহাসন আফগান আইন অনুসারে রাজা আমানুল্লার নাবালক পুত্রের প্রাপ্য, রাণী সৌরিয়া তাঁহার হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে পারেন। আর এক জন মুসলমান বলিয়াছেন, অশান্ত আফগান জাতি শান্ত না হইতেই কাবুলে

জিরগা বসিলই বা কবে আর জিরগা রাজা নির্ব্বাচন করিলই বা কবে? নাদির খাঁ তাঁহার প্রভু আমানুল্লার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন।

এ সমস্ত অভিযোগের আমরা কোন কারণ দেখি না। আমানুল্লা আফগান সিংহাসন পুনরধিকার করিলে হিন্দু মুসলমান আনন্দ লাভ করিত সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি দেশত্যাগ করিয়াছেন, নাদির বাহুবলে সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, তাহাতে আমানুল্লা সন্তুষ্ট। তবে আর কি? এ অরাজকতার সময়ে নাদিরের মত জনপ্রিয় রণকুশল রাজনীতিকেরই সিংহাসন অধিকার করিয়া থাকা দেশের পক্ষে মঙ্গল। হয় ত পরে তিনি আমানুল্লাকেই সিংহাসন ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু পূর্ব্বে শান্তি-প্রতিষ্ঠা করা চাই ত?

নাদির একটা কায ভাল করেন নাই বলিয়া মনে হইতেছে। তিনি বাচ্চা ও তাহার ১১ জন অনুচরের প্রাণদণ্ড করিয়াছেন। লোক বলে, আর্ক দুর্গে বাচ্চা রাজকোষের ধনরত্ন লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, মিষ্ট ব্যবহারে সে সন্ধান বাহির করিয়া লইতে নাদির তাঁহাকে কাবুলে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, তাহার পরে কার্য্যোদ্ধার হইলে তাঁহার প্রাণদণ্ড করিয়াছেন। সত্য হইলে ইহাতে নাদিরের হৃদয়হীনতারই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু হয় ত অন্য কোন গুরু কারণে নাদির এমন নিষ্ঠুর আচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভবিষ্যৎই সে কথা প্রকাশ করিবে।

বাচ্চা-সাকাও

বিমান-দুর্ঘটনা

কয় বৎসর যাবৎ—বিশেষতঃ জার্ম্মাণ যুদ্ধের পর হইতে—অন্তরীক্ষে বিমানযোগে ভ্রমণের যেরূপ দ্রুত উন্নতি হইতেছিল, তাহাতে মনে হওয়া আশ্চর্য্য ছিল না যে, অচিরকালমধ্যে জলে স্থলে ভ্রমণ যেরূপ নিরাপদ হইয়াছে, অন্তরীক্ষে ভ্রমণও সেইরূপ হইবে। কিন্তু মাসাধিকালমধ্যে ভারতীয় বিমান—ডাক-জাহাজের দুইবার যে শোচনীয় দুর্ঘটনা সংঘটিত হইল, তাহাতে মন সন্দেহাকুল হয় যে, ব্যোমপথে ভ্রমণ নিরাপদ হইতে এখনও বহুকাল অতিবাহিত হইবে, হয় ত উহা কখনও সম্পূর্ণ নিরাপদ হইবে না। অন্তরীক্ষে প্রকৃতির সহিত মানুষের যে যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা বড়ই কঠিন। অন্তরীক্ষের আবহাওয়া বহু ক্ষেত্রে দুর্জ্জেয়। তাহার পর বিমানপোতের কলকব্জাও অনেক ক্ষেত্রে মানুষের আয়ত্তাধীন থাকে না। জলে অথবা স্থলেও যে দুর্ঘটনা হয় না, এমন নহে। কিন্তু উহা কচিৎ কখনও ঘটিয়া থাকে, আর ঘটিলেও সাহায্য পাইবার অনেক সুযোগ আছে, অন্তরীক্ষে তাহা নাই। বিজ্ঞান জলে ও স্থলে ভ্রমণকালে প্রকৃতিকে স্ববশে আনয়ন করিবার জন্য যত প্রকার কৌশলজাল বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে, অন্তরীক্ষে এখনও তাহার শতাংশের একাংশও পারে নাই। তবে আশা আছে, যতই দিন যাইবে, ততই এ বিষয়ের উন্নতি সাধিত হইবে।

সে যাহা হউক, একটি কথা ভাবিলে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় হৃদয় ভরিয়া যায়। প্রতীচ্যের উদ্যোগী ও অধ্যবসায়শীল জাতিরা জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া কিরূপে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার-চেষ্টা করে, তাহা ভাবিলে কি বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয় না, শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হইয়া আসে না? গৌরীশঙ্করের চিরতুষারাবৃত শীর্ষদেশ আবিষ্কার করিবার জন্য এই প্রতীচ্যের বিজ্ঞানবিদ্ মনীষীরা বার বার আশাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও কিছুতেই সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত হন নাই! তাঁহাদের এই জ্ঞান আহরণের অদম্য উৎসাহ অধ্যবসায়ের কথা চিন্তা করিলে কি যথার্থ ই মনে

আনন্দ ও শ্রদ্ধার সঞ্চার হয় না ? এ বৎসরও এক জার্ম্মাণ বিজ্ঞান-বিদ্ পর্য্যটক দল কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গ আবিষ্কারের জন্য উদ্যোগী। আফ্রিকার সিংহাদি হিংস্র জন্তুসেবিত গভীর জঙ্গলে অথবা জলহীন বৃক্ষহীন সাহারা-মরুভূমিতে, নর-রাক্ষস-অধ্যুষিত পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপে, 'র‍্যাটল-স্নেক'-পীড়িত আমেরিকার এণ্ডিস পাহাড়ে,—কোথায় কোন্ দেশে তাঁহাদের জ্ঞান আহরণের চেষ্টা নাই ? তাই মনে হয়, ভারতীয় বিমান-ডাক-জাহাজের পর পর এই দুর্ঘটনা হইলেও তাঁহাদের অদম্য জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি হইবে না।

করাচি হইতে ক্রয়ডন প্রায় ৬ হাজার মাইল বায়ুপথ। গত বার ক্রয়ডন হইতে ভারতের করাচিতে যে ডাক আসিতেছিল, তাহা প্রায় ভারতের নিকটে আসিয়া যাস্ক নামক স্থানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ; উহাতে ৩ জন নিহত হয়। এবার করাচি হইতে ক্রয়ডন যাইতে ইটালীর জেনোয়া উপসাগরে ভীষণ বাত্যায় পড়িয়া বিমানপোত ধ্বংস হয়। আরোহীরা (৭ জন) সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, ডাকও নষ্ট হইয়াছে। আর এক বিমান ডাক-জাহাজ প্রত্যহ ক্রয়ডন হইতে প্যারী, ব্যাযান্ ও জুবিচ যাতায়াত করিত, উহাও ইংলিশ চ্যানেলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং উহাতে ৭ জন যাত্রী প্রাণত্যাগ করে। ৫ মাসের মধ্যে ৩টি দুর্ঘটনা বিশেষ শোচনীয়। তবে বিমান-বিহারের ইহা এখন শিশুকাল। সুতরাং এখন এই ভাবের দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। যতই দিন যাইবে, ততই উন্নতি হইবে, এইরূপই আশা করা যায়। যাস্কে যে দুর্ঘটনা হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে তদন্ত কমিটী বসিয়াছিল। তাহার সিদ্ধান্ত এখনও প্রকাশিত হয় নাই। বর্ত্তমান দুর্ঘটনারও নিশ্চিত তদন্ত হইবে। তখন বুঝিতে পারা যাইবে, কিসে কাহার দোষে এই ভাবের দুর্ঘটনা সম্ভবপর হয়, তখন তাহার প্রতীকারের চেষ্টাও হইবে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান

কয় বৎসর গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ-জয়ে প্রতীচ্য হইতে কয়টি অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল, এবার জার্ম্মাণী একটি অভিযান করিয়াছিলেন। কিন্তু উহার উদ্দেশ্য ছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা-জয়, গৌরীশঙ্কর নহে। এই অভিযানের কর্ত্তা ছিলেন, হার বয়ার ; হার এলভিন তাঁহার অন্যতম সহচর। কি অদম্য উৎসাহে তাঁহারা ভীষণ বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করিয়া প্রায় ২৫ হাজার ফুট উচ্চে উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় অন্তর ভরিয়া যায়। গৌরীশঙ্কর অভিযানের মত তাঁহাদের অভিযানও পূর্ণ সাফল্য-মণ্ডিত হয় নাই, এ কথা সত্য ; কিন্তু তাহা হইলেও বিজ্ঞানের জ্ঞান উন্নতির জন্য, জগতের বিদ্যার ভাণ্ডারে রত্ন আহরণের জন্য তাঁহাদের অমানুষিক পরিশ্রম, অধ্যবসায়, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, অসাধ্যসাধনে কৃতসঙ্কল্পতার কথা ভাবিলে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইতে হয়। প্রতীচ্যবাসীর সৎসাহস ও কর্ম্মানুরাগের অনুকরণ করিতে শিক্ষা করা আমাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা যেন প্রাচীর অতীত গৌরবও বিস্মৃত না হই—এক দিন এই দেশ হইতেই ধর্ম্মপ্রচারকরা তুষার-কিরীটী অভ্রভেদী হিমালয় পার হইয়া তিব্বত ও চীনে প্রবেশ করিতে এবং তথায় দেশবাসীর সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সমুদ্রপথে ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোজ ও পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জও এক দিন ভারতবাসীর বাণিজ্য ও ধর্ম্মপ্রচারের স্থল ছিল। বর্ত্তমানে প্রতীচ্যবাসীরা জ্ঞান-গবেষণার জন্য যে অসাধারণ আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন, প্রাচীনকালে ভারতেও সে চেষ্টা ছিল।

* হার বয়ার ও × হার এলভিন

সত্য ও সুখ

(কবীর)

সকল চেয়ে সত্য ভাল
সত্য যদি থাকে প্রাণে,
লক্ষ সুখের পন্থা খোঁজ
পাবে না সুখ ত্রিভুবনে।

সত্য যাহার অন্তরে গো
সেই সে সুখের অধিকারী,
কবীর বলে সাচ্চা সুখী
সত্যব্রতের যে পূজারী।

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার (বি, এল)।

জীবন-স্বপ্ন

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

সকাল বেলায়।

বৈশাখ মাসের সকাল। রৌদ্রে এখনো বেশ স্নিগ্ধতার আমেজ মিশানো। জীর্ণ একখানা গৃহের সামনে ছোট্ট বাগান। যত্নের কোনো লক্ষণ নাই। ঝোপ-ঝাড়ের অন্তরালে ইতস্ততঃ কয়েকটা ফল-ফুলের গাছ। আম, কাঁঠাল, লিচু, কালো জাম; এদিকে-ওদিকে চাঁপা ও টগর, করবী ও কল্কে, অত্যন্ত এলো-মেলো ধরণে বাড়িয়া উঠিয়াছে। পথ হইতে বাগানে আসিতে বাঁখারির একটা বেড়া। বেড়া দিয়া এই বাগানে আগে আসিতে হয়; তার পর বাগান মাড়াইয়া বাড়ী।

এক বর্ষীয়সী বিধবা স্নানান্তে বেড়া টানিয়া বাগানে প্রবেশ করিলেন; তাঁর হাতে গামছা ও নিংড়ানো ভিজা থান। বিধবার পিছনে তেরো বছরের একটি বালিকা, বালিকার পরণে একখানি পুরানো তসর শাড়ী। তসরের চেহারা দেখিয়া তার রং এককালে কি ছিল, নির্ণয় করা কঠিন। শাড়ীর গায়ে সূতার আঁশ উঠিয়াছে। মেয়েটির এক হাতে একখানি ছোট ভিজা লালপাড় শাড়ী, অপর হাতে একঘটি গঙ্গাজল। বাগানে প্রবেশ করিয়াই বর্ষীয়সী একখানা বড় পাতা ছিঁড়িয়া ঠোঙার মত করিলেন; তার পর টগর আর করবী-গাছ হইতে ফুল পাড়িয়া ঠোঙায় রাখিতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার না সূর্য্যের কার একটা স্তব বিড়বিড় করিয়া বলিতেছিলেন। মেয়েটি কাছে দাঁড়াইয়া আকাশের পানে চাহিল,—এমনি অকারণে।

আম-গাছটার ও-ডালটা থাকিয়া থাকিয়া নড়ে কেন? হনুমান? না। বালিকা গাছের দিকে চাহিয়া ডাকিল,—ও পিসিমা!

ফুল তুলিতে তুলিতে পিসিমা কহিলেন—কেন রে?

বালিকা কহিল—ওই খ্যাখো, বলাই-দা আবার ঐ গাছে উঠে আম পাড়চে!

—বটে! বলিয়া বর্ষীয়সী তাঁর স্তব ভুলিয়া আমগাছটার কাছে আগাইয়া আসিলেন, এবং গাছের দিকে চাহিয়া ডাকিলেন—বলাই···

তাঁর স্বরে বেশ ঝাঁজ। সে স্বর শুনিয়া গাছের উপর বলাই একেবারে কাঠ হইয়া রহিল। পিসিমা কহিলেন—আবার এই সকালে এসে গাছে উঠেচো!—একটা ফল পাকতে দিবি নে রে? পাকলে খাস্ না, বাবা! ও যে বড় ভালো জাতের আম রে। হিমসাগর।

বলাই নড়াচড়া রহিত করিয়া গাছের ডালে তেমনি বসিয়া রহিল।

বালিকা কহিল—নামো, বলচি। না হ'লে এখনি চৌধুরী জ্যাঠাকে ডেকে আনবো। কাল বিকেলে অত বকুনি খেলে, তবু লজ্জা হয় না! যেই দেখেচে বাড়ীতে কেউ নেই, অমনি এসে গাছে উঠেচে!

বালিকার উপর রাগে গুম্ হইয়া বলাই গাছেই বসিয়া রহিল।

বালিকা কহিল—ও পিসিমা, ওই খ্যাখো, তবু নামচে না!··· কথা গেরাহ্যিই নেই!···যেন কে কাকে বলচে!

পিসিমা স্বরটা শান্ত করিয়া কহিলেন—নেমে আয় ধন, লক্ষ্মী মাণিক আমার। যা পেড়েচিস্, তাই নিয়ে যা। আর পাড়িস নে!

বালিকা কহিল—তাই বা কেন নেবে? এঃ···পরের গাছের আম চুরি ক'রে নিয়ে কেন খাবে? আমরা যার একটি ফল ছুঁই না! নামো বলচি, বলাই-দা···

ঝুপ্ করিয়া বলাই-দা তখন গাছ হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল এবং নামিয়াই চকিতে আসিয়া বালিকার চুলের ঝুঁটি টানিয়া ধরিয়া কহিল—লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, আমি চোর! না? আম চুরি করতে এসেচি, বটে!

—না। চেয়ে নিচ্ছ! পরের গাছের ফল পাড়া চুরি নয়… আবার চোখ রাঙ্গাচ্ছেন!…ছাড়ো বলচি আমার চুল।

—ছাড়চি এই! বলিয়া বালিকার চুল ধরিয়া খানিকটা হড়হড় করিয়া তাকে টানিয়া আনিয়া বলাই ঝোপের মধ্য হইতে একটা বিছুটির পাতা ছিঁড়িয়া তা দিয়া শপাশপ্ বালিকার পায়ে আঘাত করিল। বালিকা পায়ের জ্বালায় আর্ত্তনাদ করিয়া লাফাইয়া উঠিল,—ও পিসিমা, ত্মাখো, বলাই-দা এই আমার পায়ে জলবিছুটি মারচে! ওরে বাবা রে মরে গেলুম রে…

পিসিমা বলাইকে গাছ হইতে নামিতে দেখিয়া আবার পুষ্প-চয়নে মনোযোগ অর্পণ করিয়াছিলেন। বালিকার আর্ত্তনাদ শুনিয়া চোখ তুলিয়া চাহিলেন, কহিলেন—হাঁা রে, ওকে অমনি ক'রে বিছুটি মারতে হয়? এই সক্কাল বেলা… ত্মাখো দিকি, বাছার লাগে না? পা-টা একেবারে… আহাহা, বাছারে!…

বালিকা তখন পিসিমার কাছে আসিয়া পায়ের উপরকার কাপড় ঈষৎ সরাইয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিল—ত্মাখো, এই কি-রকম লাল হয়ে ফুলে উঠলো!…এমন জ্বালা করচে!…বালিকার ছুই চোখে জলের ধারা।

বলাই চুপ করিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল। পিসিমা কহিলেন—ত্মাখ্ তো বাবা, কি করলি…

কাঁদিয়া বালিকা কহিল—আমি চললুম চক্করবর্ত্তী জ্যাঠার কাছে, এই পা দেখাই গিয়ে…তার পর তোমার কি হয়, দেখো তখন। বলিয়াই বালিকা তীব্র ঝাঁজে বাগানের বেড়া ঠেলিয়া একেবারে পথে গিয়া দাঁড়াইল। পিসিমা ডাকিতে লাগিলেন—ওরে শোন্, শোন্, ওরে অ বিন্দু…

আর শোন্! বিন্দু ততক্ষণে বাতাবি লেবুগাছটার অন্তরালে পথে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

পিসিমা কহিলেন—ত্মাখ্ তো, সকালেই কি অনর্থ বাধালি! এখনি কতগুলো গাল খাবি, মার খাবি। সকাল বেলায় মানুষ ঠাকুরদেবতার নাম করে—যাতে দিনটা ভালোয় ভালোয় যায়! আর এই সক্কালেই কি তোয় দৌরাত্মি স্থরু হলো, বাবা!

বলাই কোঁচড় হইতে কাঁচা আমগুলি সেইখানে ঢালিয়া দিয়া আক্রোশে ফুলিয়া ধীরে ধীরে বাগান হইতে বাহির হইয়া গেল। পিসিমা ফুল তুলিয়া অস্ফুট স্বরে কি-সব মন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

বালিগঞ্জ রেল-ষ্টেশনের পূব দিকে কশবা গ্রাম। নেহাৎ গ্রাম বলিলে ঠিক হইবে না। সহরের কোলে গ্রাম; কাজেই সহরের কতক ছোপ তার গায়ে লাগিয়া আছে। বেশ বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী। পুরুষের দল কলিকাতায় একটা-না-একটা কাজ করে—সকলেই প্রায় ডেলি প্যাসেঞ্জার। বেলা ন'টা হইতেই ষ্টেশনে ভিড় জমিতে থাকে; যারা বয়স্ক—তারা অফিসে যায়; অপেক্ষাকৃত কম-বয়সীর দলের কলেজ আছে, স্কুল আছে। ছুপুর বেলায় সমস্ত পল্লীটুকুতে নারীর রাজ্য গড়িয়া ওঠে। পুরুষদের দলে যারা রোগী, তারা দায়ে পড়িয়া ঘরে থাকে, আর যারা বেকার কুড়ের দল, তারা স্যাকরার দোকানে বসিয়া গল্প-গুজব করে, নয় তো গাছতলায় মাছুর বিছাইয়া তাস পেটে; অপেক্ষাকৃত সৌখীন বেকাররা ছিপ হাতে কোন্ পচা ডোবার কোণে বসিয়া যায়!…মাছ পায়, এ কথা বলা চলে না. তবে সময় এক রকমে কাটিয়া যায়।

এই কশবার এক পল্লীতে জীবন চক্রবর্ত্তীর বাস। কলিকাতার কি এক ফার্ম্মে সে চাকরি করে; তার উপর নিলামে এটা-সেটা কিনিয়া বেচিয়া বেড়ায়; এবং আরো নানান্ ধান্দায় ঘোরে। এমনি ভাবে মাসে স'দেড়েক টাকা কোন মতে উপার্জ্জন করে। মস্ত পরিবার। তিনটি ছেলে, ছুই মেয়ে, স্ত্রী, বিধবা পিসি, বিধবা বোন.—তার উপর বাড়ীতে গোরু আছে। চাকর রাখার ব্যয় কুলানো সম্ভব নয়। জীবন নিজে খড় কাটে, বোন্ গোরুর জাব দেয়, স্ত্রীকে রান্না-বান্না ও দাসীর কাজ সব করিতে হয়। বিধবা পিসি বসিয়া বসিয়া মালা জপ করেন, সময়ে-সময়ে বড়ি দেন, লাউগাছ পোঁতেন, সংসারে বিশৃঙ্খলা দেখিলে ভৎর্সনা করেন। বিধবা বোন্ ভাজের কাজে সহায়তা করিতে আসে, তবে ভাজ দরদ করিয়া তাকে হাল্কা কাজেই ডাকেন, ভারী কাজের বেলায় সরাইয়া দেন, বলেন,—না ভাই, তুই ছেলেমানুষ, যা, জিরুগে ততক্ষণ! বড় ছেলে ভুবন বরাবর স্কলারশিপ পাইয়াছে, এখন বি-এ পড়ে। মেজো স্থবল জলপানি পাইয়া ম্যাট্রিক দিয়া ইণ্টারমিডিয়েট পড়িতেছে। ছুজনেই কলিকাতার বড় কলেজে পড়ে। মাহিনা লাগে না। লেখাপড়ায় বেশ ভালো। ছোট ছেলে এই বলাই—ভারী ছুর্দ্দান্ত। লেখা-পড়ার সঙ্গে খোঁজ নাই। স্কুলের জন্য বাহির হইয়া কোনো দিন ঢাকুরিয়ায় বা মনোহরপুকুরে কারো বাগান লুটিতে যায়; কলিকাতায় পৌঁছিলে কোনোদিন

স্কুলে হাজিরা দেয়, কোন দিন বা গড়ের মাঠে আসর জাঁকাইয়া বসে; তার উপর জু, মিউজিয়ম, নিউ মার্কেট, খিদিরপুরের ডক—কলিকাতায় ফর্দ্দা মনে বেড়াইবার জায়গার অভাব নাই! তার একটি ছোট-খাট দল আছে। দলটি তাকে নেতৃত্বে বসাইয়া পরম আরামে দিন যাপন করে।

বলাইয়ের দৌরাত্ম্যে কশবায় কাহারও বাগানে ভালো ফল বাড়িয়া পাকিবার সময় পায় না। পুকুরেও তার উপদ্রব কম নয়। অর্থাৎ এই ছেলেটি কশবার স্থলে-জলে আপনার অমোঘ শাসন বিস্তার করিয়া ক্ষুদ্র পল্লীটিকে সচকিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

ছেলে-মেয়েদের দেখা-শুনার ভার জীবনের নয়। তার সে সময়ও নাই। বেলা ন'টায় মুখে ভাত গুঁজিয়া সে বাহির হইয়া যায়; ফেরে রাত ন'টা-দশটার পর। ছুটীর দিনে তার কাছে বহু লোক আসে। সকলে মিলিয়া তখন নানা বৈষয়িক আলোচনা চলে। সে-দলে বাঙালী আছে, ফিরিঙ্গী আছে, খোট্টা আছে। জীবনের বাহিরের ঘরে তখন রীতিমত আন্তর্জাতিক সভার অধিবেশন বসিয়া যায়। তারা কি করে, কিসের আলোচনা—কশবার কাক-পক্ষীরও তা অগোচর থাকে। তবে, এই সব অধিবেশনের পর জীবনের মুখে কখনো হাসির লহর বয়, কখনো বা দুশ্চিন্তায় গুম্ হইয়া সে বসিয়া থাকে।

জীবনের স্ত্রী সংসারের সুবৃহৎ যন্ত্রটাকে প্রাণপণে ঘুরাইয়া চলেন। রোগ নাই, শোক নাই, সে-যন্ত্র সমানে চলিয়াছে—মুহূর্ত্ত বিরাম জানে না। জীবনের যত আস্ফালন, ভর্ৎসনা, ছেলে-মেয়েদের আব্দার-উপদ্রব-জুলুম—মমতাময়ী দেবী ধরিত্রীর মতই নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁর উপর দিয়া অহরহ বহিয়া যায়——হাসি-মুখে অসীম সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি তিনি তা অম্লান চিত্তে সহিয়া চলেন। এমন লক্ষ্মী গৃহিণী…বনের পশুও বুঝি তাঁর বশ মানে! কিন্তু জীবন আর ছেলে-মেয়েরা প্রচণ্ড বিক্রমে তাঁর কাছ হইতে নিজেদের অতি-তুচ্ছ পাওনা-গণ্ডা আদায় করিয়াই সরিয়া যায়, তাঁর কোথায় কি বেদনা বাজিল, সে দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না। ত্রুটি ঘটিলে চোখ রাঙাইয়া তর্জ্জন তুলিতে কাহারো কিন্তু কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ নাই।

জীবন চক্রবর্ত্তীর গৃহের অদূরে মাধব ঘোষালের বাড়ী। মাধব নাই—তার ঐ একটি মেয়ে বিন্দু। বিন্দুর মা বিন্দুকে পৃথিবীতে ছাড়িয়া দিয়াই ইহলোকের কাজ চুকাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর মাধব চার-পাঁচ বছর বাঁচিয়া ছিল। ভাগ্য যে, আর-একটা স্ত্রী আনিয়া সংসারকে ভার-গ্রস্ত করে নাই। তার পরিত্যক্ত সংসারে এখন ঐ বর্ষীয়সী বিধবা ভগিনী…তিনিই বিন্দুর একমাত্র গার্জ্জেন। মাধবের কিছু জমি-জমা ছিল, চাষ-আবাদে সেখান হইতে কিছু আসে। তা ছাড়া কালীঘাটে একটা ছোট বাড়ী আছে, তার ভাড়া মাসে ত্রিশ টাকা, ইহাতেই পিসি-ভাইঝীর দিন এক রকমে চলিয়া যায়।…বিন্দুর ভবিষ্যতের কথা মনে জাগিলে পিসিমা আতঙ্কে শিহরিয়া ওঠেন। ভাবিয়াও যখন উপায় স্থির করা চলে না, তখন ও-দিকটা চাপা দিয়াই দিন কাটাইতে হয়। মেয়ের ভার বরাতের উপর চাপাইয়া রাখিয়া তিনি অন্নের গ্রাস মুখে তোলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংসার।

বিন্দু গিয়া ডাকিল—জ্যাঠাইমা…

জীবনের গৃহিণী যোগমায়া দেবী তখন গোয়ালের দেওয়ালে ঘুঁটে দিতেছিলেন, তাঁর কাজে সহায়তা করিতেছিল বড় মেয়ে শান্ত। যোগমায়া দেবী কহিলেন—কে? বিন্দু? এদিকে আয় মা…

বিন্দু তাঁর কাছে আসিল। আসিবামাত্র তার বেদনা একেবারে উথলিয়া উঠিল। পথে বেদনা ভুলিয়া রাগে সে ফুঁশিয়া উঠিয়াছিল, যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ! এখন যোগমায়া দেবীর কাছে সে রাগ জল হইয়া আবার বেদনা দেখা দিল।

পা দেখাইয়া বিন্দু কহিল—দেখেচো জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা দেখিলেন, তার পায়ের ডিমে দাক্ড়া-দাক্ড়া লাল দাগ…এবং পায়ের সে দাগে-দাগে রক্ত জমিয়া পা বেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে। যোগমায়া কহিলেন—তাই তো মা…এ কি ক'রে হলো? কোথায় গেছলি রে এই সকাল বেলায়?

বিন্দু কহিল—কোত্থাও যাইনি তো। বলাই-দার কীর্ত্তি!

বিস্মিত দৃষ্টিতে জ্যাঠাইমা কহিলেন—কি করেচে সে?

বিন্দু কহিল—জলবিছুটি মেরেচে।

জ্যাঠাইমা কহিলেন—তার সঙ্গে খেলেছিলি ফের? কাল না তোকে বারণ ক'রে দিলুম—

বাধা দিয়া বিন্দু কহিল—খেলিনি তো। আমি তো

পিসিমার সঙ্গে গঙ্গা নাইতে গেছলুম···সেই রাত থাকতে কখন্ উঠে গেছি। এসে দেখি, বলাই-দা সেই রাণী-গাছটায় উঠে আম পাড়চে। তাই পিসিমাকে বলতে বলাই-দা না গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে আমার চুলের ঝুঁটি ধরে বিছুটির বনে টেনে নিয়ে গিয়ে বিছুটি ছিঁড়ে পট্‌পট্ করে মারলে···

জ্যাঠাইমা কহিলেন—হুঁ। আচ্ছা, আসুক ফিরে, মজা দেখাবো'খন তাকে!···হতভাগা রাক্ষুসে কোথাকার! এত-টুকু ভয়-ডর নেই। হাতে দড়ি পড়বে যে এর পর!··· কাঁদিস্ নে মা। তাকে খুব শাসিত করে দেবো—হাড় এক ঠাঁই, মাস এক ঠাঁই করবো, তবে আমার নাম। তা, যা তো মা শান্ত···হাত ধুয়ে তেলের বাটিটা নিয়ে আয়। এনে ঐখানটিতে তেল দিয়ে দে···আহা-হা, কি কাণ্ড করেচে এ! এমন দুরন্ত হয়েচে যে···আর পারিও না। তোর জ্যাঠামশাইকে এত বলি যে, ওগো বোডিং-ফোডিং না কি আছে, ওকে তাতে রেখে এসো। তা তাঁর তো এ দিকে নজর নেই! শুধু পয়সাই রোজগার করচেন!···

শান্ত হাত ধুইয়া তেলের বাটি আনিল। যোগমায়া হাত ধুইয়া আসিয়া বিন্দুর পায়ের দাগে বেশ করিয়া তেল মালিশ করিয়া দিলেন, দিয়া কহিলেন—খাবি কিছু রে? কাল পাটিশাপ্‌টা করেছিলুম, দু'খানা আছে। তোর জন্যেই রেখেছিলুম······

—খাবো জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা শান্তকে আদেশ করিলেন—যা মা শান্ত— বিন্দু, তুইও ওর সঙ্গে যা বাছা···আমার ঘরে কাঁসী-ঢাকা আছে। ওকে দিগে যা। আর শোন রে শান্ত, কাল উনি সেই যে আঙুর এনেছিলেন, তা থেকে চারটে আঙুরও অমনি বিন্দুকে দিস্! যা মা, খেগে যা, কাঁদিস্ নে। আজ সে আসুক, তাকে আমি দেখে নেবো'খন। এমন ডানপিটে ডাকাত!

বিন্দু শান্ত হইয়া শান্তর সঙ্গে গেল পাটিশাপ্‌টা খাইতে। মা আবার গোবর ঘাঁটিয়া ঘুঁটে দিতে নামিলেন।

জীবন এমন সময় কোথা হইতে ব্যস্তভাবে আসিয়া কহিল—আমায় এখনি বেরুতে হবে গো···

যোগমায়া কহিলেন—দাঁড়াও···ভাতে-ভাতটা···

জীবন তেমনি ব্যস্তভাবেই কহিল—না, না, না···তার দার সময় নেই। আমি মাথায় একটু জল দিয়েই বেরুবো। ফিরে এসে খাবো'খন। তুমি গোটা বারো টাকা আমায় শুধু দাও···

যোগমায়া কহিলেন—চলো, দিচ্ছি। আর চার পয়সার মিষ্টি আনিয়ে দি···একটা ডাবের জল···খেয়ে তবে বেরোও। চান ক'রে খালি পেটে যায় না···ফিরতে কত বেলা হবে, তার তো ঠিক-ঠিকানা নেই।

—বেশ, বেশ—তা যা ইচ্ছে হয়, করো···আমার আর সময় নেই, আমি তেল মাখিগে।

জীবন চলিয়া গেল। যোগমায়া দেবী হাত ধুইয়া ডাকিলেন—ওরে ভুবন, ও বাবা···একবার শুনে যা···

দালানে তক্তাপোষে বসিয়া ভুবন তখন সেক্‌শপীয়র লইয়া মত্ত। আজ ক্লাশে এগ্‌জামিন আছে, ইংলিশ টেক্‌স্-টের; কাজেই ভুবন মায়ের ডাক শুনিয়াও শুনিল না।

মা আবার ডাকিলেন—শুনতে পেলিনে? ওরে ও ভুবন···

দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া ভুবন কহিল—কি?

মা কহিলেন—বাবাঃ, যেন মারতে উঠলো! কথার শ্রী ছ্যাখো না! শোন্, বই রেখে মিহিরের দোকান থেকে চট্ করে চার পয়সার মিষ্টি এনে দে···উনি এখনি মুখে দিয়ে বেরুবেন।

ভুবন কহিল—আমি পারবো না।

মা অবাক্! কহিলেন—তুই যদি পারবিনে তো কি আমি নিজে দোকানে যাবো? হাঁা রে?

ভুবন বলিল,—কেন, বলাকে বলো না···

মা কহিলেন,—সে বাড়ী নেই, তাই। না হ'লে ফাই-ফরমাসটা আর শো ন কে?

ভুবন কহিল—আমার আজ ক্লাশ-এগজামিন। আমি পড়া ছেড়ে নড়তে পারবো না।

মা কহিলেন—সেইটেই বড় কাজ হলো! আর এ কত-ক্ষণের মাম্‌লা, বাবা? উনি না খেয়ে বেরুবেন, সেটা হুঁশ হচ্ছে না?

ভুবন বিরক্ত চিত্তে কহিল—কেন, সুবল তো রয়েচে। রামু?

রামু যোগমায়া দেবীর দূর-সম্পর্কের এক ভাইপো— এখানে আশ্রয় পাইয়া লেখাপড়া করিতেছে।

মা কহিলেন—রামুকে উনি ডাক্তারের বাড়ী যেতে বলেছিলেন সকালে, মনে আছে? কমলির দু'দিন জ্বর,

ওষুধ আনতে হবে তার···তাই সে ডাক্তারের কাছে গেছে, বাবা···সে বিনা-পয়সায় খায় বটে, কিন্তু যা করে, তোরা বেইমান হোস্ যদি, তবেই মান্‌বি নে!

ভুবন কহিল—বাবা, বাবা, দু'দণ্ড নিশ্চিন্ত হয়ে পড়তে পারবো না তোমাদের জ্বালায়! বাড়ীর সরকারী করতে করতেই গেলুম!

মা কহিলেন—যতক্ষণ বকছিস্, ততক্ষণে ঢের চার পয়সার মিষ্টি এনে দিতে পারতিস, যোদ্ধা!

ভুবন কহিল—আমি যেতে পারবো না। যাবো না। এক দিন তোমাদের দয়া দেখালে তোমাদের আস্কারা বেড়ে যায় বড্ড, দেখচি।

মা স্তম্ভিত! কহিলেন—দয়া কি রে! এই বিদ্যে হচ্ছে বুঝি লেখাপড়া শিখে! উনি জলপানি পাচ্ছেন, না, আমার মাথা পাচ্ছেন! বাপ-মাকে এত হেনস্থা···তোব ও-সব পড়া ছাই হয়ে যাবে।

ভুবন ফোঁশ করিয়া উঠিল—শাপ দিচ্ছ মা হয়ে! কেন বলো তো···শুধু ছুটি তো খাই তোমাদের। পড়ার খরচ নিজের জোরে চালাচ্ছি···তোমাদের কাছে হাত পেতেছি কখনো?

মা কহিলেন—পড়ো বাবা, পড়ো···তোমার এগজ্জামিন নিয়েই তুমি থাকো! এত বড় ইতর মন নিয়ে ভদ্দর লোকের ঘরে এলি কি ক'রে, আমি তাই শুধু ভাবি!···ছি-ছি!

ভুবন এ কথার কোনো জবাব দিল না। নীল পেন্সিল ধরিয়া বইয়ের ক'টা লাইন দাগিয়া পাশে লিখিল, Imp.

মা তখন নিরুপায় হইয়া ডাকিলেন—ওরে সুবল···

সুবল দাদার কাছেই ছিল; খাতা খুলিয়া মস্ত একটা অঙ্ক ফাঁদিয়াছিল। মার ডাকে সে জবাব দিল না। মা কাছে আসিলেন, তার খাতাখানা টানিয়া লইয়া কহিলেন—রাখ্ তো দেখি তোর খাতা। যা, দৌড়ে এই চার পয়সার মিষ্টি নিয়ে আয়···ওঠ্, বলচি···

সুবল মহা-কলরবে তিড়্ বিড়্-করিয়া লাফাইয়া উঠিল, হাত-পা ছুড়িয়া কহিল—বাবা রে বাবা, নোকরি করতে করতে জান গেল। লেখাপড়ার সময়···একে কাল থেকে এ অঙ্কটা কিছুতে হচ্ছে না···

মা কহিলেন—না হোক। ওঠ্, বলচি। না হ'লে তোর বই-খাতা সব আজ উনুনে দেবো। সব লেখা-পড়া শিখচেন, পণ্ডিত হচ্ছেন—হতভাগা ছেলে!

সুবল পয়সা লইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে উঠিল, তার পর কাপড়ের কষিটা আঁটিয়া মার দিকে আগুন-ছড়ানো দৃষ্টিতে চাহিয়া বাহির হইয়া গেল। মা কহিলেন—কি বরাত করেই ভারতে এসেছিলুম! পেটের ছেলের খিঁচুনি খেতে খেতেই প্রাণটা গেল। চেয়ে গেল দ্যাখো না, যেন ভস্ম ক'রে ফেলবে!···

মা বাহিরের রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিন্দু ততক্ষণে পাটিশাপ্‌টা শেষ করিয়া হাত চাটিতে চাটিতে রোয়াকে আসিল, কহিল,—চমৎকার হয়েচে, জ্যাঠাইমা। কি ক'রে তৈরী করে? আমায় শিখিয়ে দেবে, জ্যাঠাইমা?

যোগমায়া দেবীর মনে এই মাত্র যে দুঃখের বান ডাকিয়াছিল, বিন্দুর এ-কথায় তা সরিয়া গেল। জ্যাঠাইমা কহিলেন—দেবো, আসিস্ মা এক সময়।···তোর পায়ের জ্বালা কমলো রে?···

—না জ্যাঠাইমা···এই দ্যাখো না···

লাল দাগগুলা একটু যেন কম! যোগমায়া দেবী কহিলেন—আস্তে আস্তে সারবে'খন। আজ আসুক বলা··· তার যে হাল করবো, আমার মনেই আছে।

ও-দিকে মাথা মুছিতে মুছিতে জীবন আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল; কহিল—তোমার ডাবের জল কৈ গো?··· আমার ট্রেণের বেশী দেরী নেই।

যোগমায়া দেবী হাসিয়া কহিলেন—ভিজে কাপড়েই বেরুবে না তো! কাপড় ছাড়ো···আমি সব ঠিক ক'রে রেখেচি।

জীবন ঘরে গিয়া ঢুকিল। যোগমায়া দেবী কহিলেন—হ্যাঁরে বিন্দু, বলা কোথায় গেল?···

বিন্দু কহিল—তা জানি না, জ্যাঠাইমা। আমগুলো বাগানে ফেলে রেখে চোখ পাকিয়ে কোথায় যে চ'লে গেল···

যোগমায়া কহিলেন—বোধ হয় ওই ক্যাবলাদের বাড়ী গিয়ে জুটেচে। আচ্ছা, গিলতে আসতে হবে তো।

বিন্দু কহিল—আমি গিয়ে দেখচি, জ্যাঠাইমা···

কথাটা বলিয়া বিন্দু কাছের বাল্‌তির জলে হাত ধুইয়া ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মা ডাকিলেন—শান্ত···

—কেন মা?

—দুটো পাণ ওঁর জন্যে চট্ করে সেজে আন্ মা···

উনি এখনি বেরুবেন।…সুবল এখনো এলো না? এই যে…কি আনলি রে?…

—পিণ্ডি! বলিয়া গুম্‌রাইয়া রোয়াকের উপর মিষ্টান্নের ঠোঙ্গা ফেলিয়া সুবল দালানে গিয়া ঢুকিল।

ছেলের কথা শুনিয়া মা শিহরিয়া উঠিলেন। রাগে তাঁর আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। এত বড় তেজ ছেলের…

দালানে আসিয়া তিনি ছেলেকে কহিলেন,—কি বললি! আস্পর্দ্ধার যে সীমা নেই! এত তেজ দেখাস কিসের? নোক্‌রি করা—বটে! এত বড়টা হলি কার অন্নে রে, মুখ-পোড়া ছেলে? নবাব! নিজেদের পড়ার খরচ জোগাও বলে এত কথা! আজ থেকে নিজেদের অন্ন নিজেরা রেঁধে নিয়ো। আমি তোমাদের মাইনে-করা বাঁদী নই!

কথাটা বলিয়া খাবারের ঠোঙ্গা লইয়া তিনি অপ্রসন্ন চিত্তে স্বামীর কাছে চলিলেন।…জীবন গলায় মিষ্টি ফেলিয়া জল খাইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

মা তখন কাজের স্রোতে গা ঢালিলেন। রান্না-বান্না, কমলির সাবু, ছেলেদের স্কুলের ভাত…একা যেন দশভুজা হইয়া সংসারের হাজার খুঁটিনাটী সারিয়া সকলের কর্ত্তব্য করিয়া চলিলেন। কাজের ভিড়ে ছেলেদের উপর রাগ কোথায় পড়িয়া গেল…যে-সুবলের দুর্ম্মুখতায় প্রাণ তাতিয়া উঠিয়াছিল, তাকেই সাধিয়া খাওয়াইয়া বিদায় দিলেন। দুই ছেলে কলেজে গেল। মা তখন শান্তর দিকে চাহিলেন; তার পর নিজের স্নান-আহ্নিক। নিত্য এমন হয়। আজো তার কোথাও ত্রুটি ঘটিল না। শুধু বলাইয়ের দেখা নাই।

শান্ত কহিল—কোথায় গেল মা, ছোটদা? দেখবো?

মা রাগিয়া কহিলেন—যে চুলোয় খুশী যাক, খুঁজিস্‌নে তাকে, খবর্দ্দার!……

বেলা প্রায় যখন পড়িয়া আসিয়াছে, বিন্দু আসিয়া ডাকিল—জ্যাঠাইমা…

যোগমায়া দেবী টেকো পাড়িয়া পৈতার সুতা তৈরী করিতেছিলেন। বিন্দু কহিল—আমায় ধরতে হবে?

যোগমায়া দেবী কহিলেন—না।

—শান্ত কোথায়, জ্যাঠাইমা?

—ঘরেই আছে। বোধ হয় দোতলায়।

—কমলী আজ কেমন আছে?

—একটু ভালো।

বিন্দু গিয়া উপরে উঠিল। কমলী দোতলার দালানে একটা মাছুরে বসিয়া, শান্ত তার কাছে একরাশ ছোপানো ছেঁড়া নেকড়া ও মাটীর পুতুল পাড়িয়াছে। বিন্দু কহিল—কি খেলচিস্ রে? তোর নন্দর বিয়ে হয়ে গেছে?

শান্ত কহিল—না ভাই। কমলীর অসুখ হলো যে! মা বললে, ও সেরে উঠুক…না হ'লে মেয়ের বিয়েয় শুয়ে শুয়ে সাবু খাবে কি?

বিন্দু কহিল—তা বটে।

বিন্দু চুপ করিয়া বসিল। শান্ত ও কমলী খেলিতে লাগিল। বিন্দু সে-খেলায় যোগ দিল না।…তার মন তখন…

অনেকক্ষণ পরে বিন্দু কহিল—বলাইদা খুব মার খেয়েচে আজ…না রে?

চোখ দু'টায় অভিমান ভরিয়া শান্ত কহিল—ছোটদা বাড়ীতে আসেও নি এখনো!

বিন্দু বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কহিল—আসেনি!

—না।

—কোথায় গেল তবে? ক্যাবলাদের বাড়ী আমি গিয়ে-ছিলুম, সেখানে যায়নি। কাঙালীর মা'র দোকানে নেই, রথতলার মাঠে নয়, গোবিদের ঘাটে না, ন্যাপলাদের বাগানেও না। তবে গেল কোথায়, ভাই?

শান্ত কহিল—মা বলেচে, তাকে খুঁজতে হবে না। মা ভারী রেগে আছে।

বিন্দু কহিল—জ্যাঠাইমারও তা হ'লে খাওয়া হয়নি?

—না।

বিন্দুর মনে ব্যথা লাগিল। পায়ের জ্বালায় রাগ করিয়া তখন সে নালিশ জানাইতে আসিয়াছিল—ব্যাপার তাহাতে এমন দাঁড়াইবে, তা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই! দু'ঘা কিল-চড়, নয় ঘণ্টা দুই-তিন ঘরে চাবি-বন্ধ! তা না হইয়া…! বলাইদার ঐ দোষ। আমড়া পাড়িতে, ফুল পাড়িতে, সাঁতার শিখাইতে অমন দরদ,…আজ কেন সে কিছুটি মারিল? তাই তো…নহিলে বলাইদার উপর মায়া কি তার নাই? কলিকাতা হইতে কত লজঞ্চুস আনিয়া দেয়, জলচুড়ি, ফিতা, তাস, পুতুল…

কিছু ভালো লাগিল না। বিন্দু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—জ্যাঠাইমার কাছে যাই। বলিয়া খেলার মায়া কাটাইয়া সে আসিয়া যোগমায়া দেবীর কাছে বসিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

নারীর উন্নতি

নিখিল ভারত নারী বৈঠকের ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ষাণ্মাসিক বিবরণ-পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণ পাঠে জানা যায়, আমাদের দেশের নারীরা কত দিকে কতরূপে উন্নতিসাধনের পথে অগ্রসর হইতেছেন। যে সকল শিক্ষিতা মহিলা নারীগণের উন্নতির জন্য প্রয়াস পাইতেছেন এবং সে বিষয়ে যে সকল কৃতবিদ্য মনীষী তাঁহাদিগকে সাহায্যদান করিতেছেন, তাঁহারা দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র। নারী-কর্ম্মীদিগের কার্য্যে উৎসাহ উদ্যম দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহারা উত্তরোত্তর তাঁহাদের কার্য্যে সাফল্যমণ্ডিত হউন, ইহাই প্রার্থনা।

প্রচার-কার্য্য না হইলে বর্ত্তমানযুগে কোন কার্য্যই সফল হয় না। আমাদের মনে হয়, এই রিপোর্টখানি বিভিন্ন প্রদেশের ভাষায় মুদ্রিত হইলে, জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। নারী-আন্দোলনকে সফল ও সজীব করিতে হইলে দেশের ঘরে ঘরে প্রত্যেক অন্তঃপুরে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও বাণীর কথা প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। দেশের নারীমাত্রেই যাহাতে জানিতে পারেন, তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য এই বৈঠক হইতে কি করা হইতেছে, এবং তাঁহারাও বৈঠকের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য কতটুকু সাহায্য প্রদান করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য, তাহা হইলে নারীর উন্নতি দ্রুত ও সহজসাধ্য হওয়া সম্ভবপর।

সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে এই নিখিল ভারত নারী-বৈঠকের বাণী প্রচারিত হওয়া—শাখা-সমিতি-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

সরকারের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট স্কুল-কালেজে ধর্ম্মহীন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকাতে আমরা যে বিজাতীয় ও বিধর্ম্মী ভাবাপন্ন—পরানুকরণপ্রয়াসী হইয়া পড়িয়াছি, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের নারী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমূহে যেন এই অবিমৃষ্যকারিতা—পরতন্ত্রের অনুসরণ করা না হয়। শিক্ষার্থিনীর পৈতৃকধর্ম্ম অনুসারে ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহের সারসঙ্কলন পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকা বিধেয়। এখনও কর্ত্তব্যনীতিশিক্ষাপ্রভাবে যাহাতে শুদ্ধান্তঃ-পুরচারিণী ভারতীয়া মহিলাগণ আর্য্য আদর্শে অনুপ্রাণিতা হইয়া ভবিষ্যৎ জীবনে সংসারে মঙ্গলময়ী করুণারূপিণীরূপে হিন্দুর গৃহ পবিত্র করিতে পারেন—সেবাধর্ম্মে আত্মনিবেদন করিতে পারেন, সেইরূপ আদর্শ শিক্ষাই ভারতীয় শিক্ষার্থিনী-গণকে প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা এক জন উচ্চশিক্ষিতা বিদুষী ভারতীয় মহিলারই অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি। ডাক্তার মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি এবার নিখিল ভারত জনহিতসাধক (Humanitarian) কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইনি আইন-বিশেষজ্ঞ এবং সমাজ-সংস্কারক বলিয়া মাদ্রাজ বিভাগে সুপরিচিত। সুতরাং তাঁহার মতের মূল্য সামান্য নহে। তিনি বলিয়াছেন, "হিন্দুধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ বিষয়ে আমরা অজ্ঞ বলিয়াই আমাদের সমাজে এত অবনতি ও অনাচার ঘটিয়াছে। আমাদের বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা ও শিক্ষাদীক্ষার আদর্শ চির-অঙ্কিত রহিয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত সদ্গ্রন্থ অনুশীলনে যে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিক উন্নতিবিধান সম্ভবপর হয়, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। এই সকল গ্রন্থের সদুপদেশ নীতিবিধানে আমরা যে চরিত্র-গঠনের অমূল্য সুযোগ প্রাপ্ত হই, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। যদি গীতা, উপনিষদ, বেদ, পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে সদুপদেশ-সমূহ সঙ্কলন করিয়া হিন্দু শিক্ষার্থিগণের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা যায়, তাহা হইলে হিন্দুদের মধ্যে ধর্ম্ম ক্রমশঃ প্রাণসম প্রিয় হইয়া উঠিবে এবং হিন্দুরা তাহাদের সনাতন ধর্ম্ম ও শিক্ষাদীক্ষায় অনুপ্রাণিত হইবে।" আশা করি, নারীর শিক্ষায় উদ্যোক্তৃবর্গ আর্য্য-হিন্দুর সনাতন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াই স্ত্রীশিক্ষার বিধিবিধান প্রণয়নে প্রয়াস পাইবেন।

পুরুষ ও নারী

প্রতীচ্যে পুরুষ ও নারীর অধিকার সম্পর্কে বর্ত্তমানে ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত। এক পক্ষ বলেন, পুরুষ—এ যাবৎ নারীকে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়া নিজ সুখ ও স্বার্থসাধনে তন্ময় হইয়া রহিয়াছে; অথচ নারী সকল কার্য্যক্ষেত্রেই পুরুষের সমকক্ষ; সুতরাং নারী ক্রমশঃ নিজের জন্মগত অধিকারের দাবী ও উপভোগ করিতে ক্ষান্ত হইবে না। এই হেতু এখন প্রতীচ্যের নারী পুরুষের মত মাথার চুল কাটিয়া ফেলিতেছেন, পুরুষোচিত আমোদ-প্রমোদ ও ব্যায়াম-ক্রীড়ায় অভ্যস্ত হইতেছেন। বিবাহ-বর্জ্জন বা সাময়িক বিবাহ ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইতেছে। পুরুষের মত তাঁহারাও এখন ঘর হইতে বাহিরের দিকেই সমধিক আকৃষ্ট হইতেছেন, এমন কি, গর্ভ-ধারণ ও সন্তানপালনও ক্রমে বর্জ্জন করিবার পন্থা আবিষ্কার করিতেছেন।

আর এক পক্ষ ঠিক ইহার বিপরীত অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, নারী ঘর ছাড়িয়া 'বাহির-মুখিনী' হওয়ায় 'পেশার' বাজার মাটী হইয়া গিয়াছে, সংসারের সুখও অন্তর্হিত হইতেছে। উভয়েই যদি ঘর ছাড়িয়া পেশার সন্ধানে ঘুরেন, তাহা হইলে ঘর থাকে কিরূপে, পেশার বাজারেও আর সুখ-সুবিধা থাকে কিরূপে? দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বিলাতের বড় ডাক-ঘরের কথা উল্লেখ করা যায়। সেখানে ক্রমশঃ বহুল পরিমাণে নারী কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইতেছে। সম্প্রতি পুরুষ কর্ম্মচারীদের এক ডেপুটেশন, পোষ্টমাষ্টার-জেনারলের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন যে, সম্প্রতি নারী কর্ম্মচারী বৃদ্ধি করার ফলে শ্রমের বাজার সস্তা হইয়া গিয়াছে; কেন না, তাহারা পুরুষ অপেক্ষা অল্প বেতনে কার্য্য করিতে সম্মত হয়, আর অল্প বেতনে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলে কাযের অবনতি ঘটে, ইহাতে পরিণামে সরকারের ক্ষতি হইতেছে।

এ দিকে নারীর পক্ষ হইতে দেখান হইতেছে যে, নারীর কায যদি অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা হইলে কানাডায় নারীকে সেনেটের সদস্য হইবার উপযুক্ত বলিয়া আদালত হইতে রায় দেওয়া হইত না। এ সম্বন্ধে একটা মামলাই হইয়া গিয়াছে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের নর্থ আমেরিকা এ্যাক্টের ধারা অনুসারে কানাডার গভর্ণর-জেনারল সেনেটের সদস্য হইবার জন্য 'উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে' আহ্বান করিতে পারেন। কানাডার সুপ্রিম কোর্ট বিচারে সিদ্ধান্ত করেন যে, "উপযুক্ত ব্যক্তিগণের" মধ্যে নারীদিগকে ধরা হয় নাই, তাঁহারা ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত নহেন। কিন্তু সম্প্রতি প্রিভি কাউন্সিল তাঁহাদের রায়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত নাকচ করিয়া আদেশ দিয়াছেন যে, "নারীরা কানাডার পার্লামেণ্টের সদস্য হইতে পারিবেন।" গত ১৮ই অক্টোবর এই রায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা যে নারীর অধিকার-সমর্থক দলের একটা মস্ত অস্ত্র হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উভয় পক্ষে এই ভাবে তুমুল বাদানুবাদ চলিতেছে। ইহার ফলে মনোবিবাদ অবশ্যম্ভাবী। সমাজের পক্ষে এই অবস্থা মঙ্গলকর কি না, সে সমস্যা সমাজ-সংস্কারকগণের বিবেচ্য। এ সমস্যার মীমাংসা করিবে কাল। কোন মনস্তত্ত্ব-বিদ্ সমাজ-তত্ত্বজ্ঞের দ্বারাও নিপুণ মীমাংসা সম্ভব বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তবে কেহ কেহ আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা যে না করিতেছেন, এমন নহে। সম্প্রতি বিলাতের ম্যাঞ্চেষ্টারের বিশপ, ম্যাঞ্চেষ্টার সহরে সমবেত গ্রেট বৃটেনের নারীগণের ন্যাশানাল কাউন্সিলে এক অভিভাষণ পাঠকালে বলিয়াছেন, "বর্ত্তমান যুগের স্ত্রী-স্বাধীনতা হইতে যে যৌন সমর বাধিবার আশঙ্কা সঞ্জাত হইয়াছে, তাহাতে সমাজের প্রভূত অমঙ্গল হইবারই সম্ভাবনা। পুরুষ কি নারী, যে পক্ষই হউক, কেহ যদি অপরের উপর অন্যায় প্রভুত্ব ও কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়, তাহা হইলে উহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। আমি এই হেতু বিবাহিত নর-নারীমাত্রকেই অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন বর্ত্তমান যুগের তরুণ-তরুণীকে বুঝাইয়া দেন যে, বিবাহই সংসারে উভয় পক্ষের অধিকারের সমতা রক্ষা করিবার পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায়।"

সমাজ-সমস্যার কথাটা যে আজ প্রতীচ্যের তরুণ-তরুণীকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন ও সময় উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতেই বুঝা যায়, প্রতীচ্যের সমাজ ও সভ্যতা কোন্ স্তরে উন্নীত হইয়াছে? সৌভাগ্যের বিষয়, ত্রিকালদর্শী আর্য্য ঋষিগণের বিধি-বিধানে সদাচারনিষ্ঠ হিন্দু সমাজের সকল সংস্কার—দাম্পত্য-বন্ধন এমনই সুনিয়ন্ত্রিত—সুমীমাংসিত যে, পরস্পরের অধিকার লইয়া

কোনদিন সীমানির্দ্দেশ-সমস্যার—মনোমালিন্যের অবকাশ নাই।

বর্ত্তমান যুগে যে সকল ভবিষ্য-চিন্তাহীন তরুণ লোক—স্ত্রী-স্বাধীনতার নামে এই সকল বিলাতী সভ্যতার যথেচ্ছাচার লীলা আমাদের সমাজে সাহিত্যে আমদানী করিবার প্রয়াস পাইতেছেন—আমরা কোন দিনই তাঁহাদের সেই বিকৃত রুচির সমর্থন করিতে—প্রশ্রয় দিতে পারিব না।

—

কলিকাতার স্বাস্থ্য

কলিকাতার হেলথ্ অফিসার সহর ও সহরতলীর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শেষে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট প্রকাশ করায় স্বাস্থ্য বিভাগের কৃতিত্বের বিশেষ পরিচয় পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইয়াছে। মানুষের পক্ষে স্বাস্থ্য পরম ধন বলিয়া বর্ণিত, কলিকাতাবাসীর স্বাস্থ্য সম্পর্কের তথ্য সুদীর্ঘ দুই বৎসর পরে প্রকাশ করিয়া স্বাস্থ্য বিভাগ করদাতৃগণের প্রতি যে সুবিচার করিয়াছেন, তাহা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য!

রিপোর্টখানি পাঠ করিয়া মনে হয়, স্বাস্থ্য বিভাগের কার্য্য সন্তোষজনক হইতেছে না; কারণ, সহর ও সহরতলীর মৃত্যুর হার ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে। বিশেষতঃ সহরতলীর অবস্থা খাস সহর হইতে আরও মন্দ। মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে সহরতলীর নূতন নূতন অংশ গ্রহণ করা হইতেছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহাদের উন্নতিসাধনের চেষ্টা হইতেছে না।

মৃত্যুর হার পুরুষের অপেক্ষা নারী ও শিশুগণের মধ্যে অনেক অধিক। বদ্ধ বায়ু ও আলোকহীন স্থানে বাসই যে ইহার মূল কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরুষ বাহিরের মুক্ত আলোকে ও বাতাসে যাইতে পারে, নারী ও শিশুরা পারে না। তাহাদিগকে অস্বাস্থ্যকর পল্লীর বস্তীর মধ্যে রুদ্ধ অবস্থায় বাস করিতে হয়। এ জন্য সহরের বস্তী ও ঘনবসতিপূর্ণ পল্লীসমূহ কতক পরিমাণে ফাঁকা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ভেজাল খাদ্য ও খাদ্যরূপে বিষের বিস্তারই সহরবাসীর স্বাস্থ্যহানির—অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ। স্বাস্থ্য বিভাগ খাদ্যদ্রব্যে ভেজালনিবারণে মধ্যে মধ্যে অভিযান করেন সত্য, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন স্থায়ী প্রতীকার তাঁহাদের দ্বারা সম্ভব হয় নাই, বোধ হয়, কোন কালে প্রতীকার সম্ভব হইবে না।

যক্ষ্মারোগ ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করিতেছে। এ দেশে যক্ষ্মারোগের প্রকোপের কথা ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে শুনা যায় নাই। এ রোগেও পুরুষ অপেক্ষা নারী অধিক সংখ্যায় আক্রান্ত হইতেছে। হেল্থ্ অফিসার বাল্যবিবাহকে ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও যখন বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল, তখন নারীর মধ্যে যক্ষ্মার প্রকোপ দেখা যায় নাই কেন? বরং সহরের বদ্ধ বায়ু ও আলোক, দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, অপুষ্টিকর এবং অপ্রচুর খাদ্য, ভেজাল বিষ প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধির কারণ। কলিকাতার আকাশে বাতাসে এবং ধূলিকণায় যক্ষ্মারোগ ছড়াইয়া রহিয়াছে। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, কলিকাতায় এই রাজ-রোগের কোন স্বতন্ত্র হাঁসপাতাল নাই। এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিপাত হওয়া আবশ্যক। দরিদ্র বস্তী বা পল্লীবাসিনীর জন্য সহরে আরও ফাঁকা স্থান, স্কোয়ার, গার্ডেন ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া দেওয়া উচিত। ভেজাল নিবারণ এবং খাদ্যদ্রব্যের—বিশেষতঃ দুগ্ধের মূল্য হ্রাস করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

—

ভারতের ভাগ্য সম্বন্ধে ঘোষণা

গত ৩১শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাজপ্রতিনিধি বড়লাট লর্ড আরউইন ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন। রাজপ্রতিনিধিরূপে—শাসক জাতির প্রতিভূরূপে শাসিত ভারতের পক্ষে ইহা যে বিশেষ প্রয়োজনীয় ঘোষণা, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। বিশেষতঃ এইরূপ একটা মনোভাবের স্পষ্ট অভিব্যক্তি সরকারের নিকট ভারতবাসী অতীব উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা সহকারে বহুদিন যাবৎ প্রতীক্ষা করিতেছিল। এ জন্য ইহার মূল্য সামান্য নহে।

গত কলিকাতা কংগ্রেসে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি করিয়া নেতৃবর্গ এই ভাবের মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন যে,—"নেহেরু রিপোর্টে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা স্পষ্ট করিয়া বিবৃত করা হইয়াছে। উহাই ভারতবাসীর সর্ব্বাপেক্ষা কম দাবী। ঐ দাবীতে ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত

শাসনের অধিকারপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছে। সুতরাং যদি শাসকজাতির প্রতিনিধি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতের এই শান্তির আহ্বান গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিন হইতে ভারতবর্ষ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ গ্রহণ করিবে এবং পূর্ণ স্বাধীনতাই তাহাদের চরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিবে।" বড়লাটের রাজপ্রতিনিধিরূপে এই ঘোষণা যে তাহারই ফল, তাহা অনুমান করিয়া লইতে কষ্ট হয় না।

ঘোষণায় দুইটি কথা লক্ষ্য করিবার মত আছে। প্রথম কথা এই যে,—"১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে বৃটিশ সরকার যে ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে যে দায়িত্বপূর্ণ শাসনপদ্ধতি ভারতে প্রবর্ত্তন করিবার কথা ছিল, তাহার প্রকৃত অর্থ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন।" দ্বিতীয় কথা, —"বর্ত্তমানে ভারতে যে শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, উহার স্থানে ভবিষ্যতে কিরূপ শাসনপদ্ধতি প্রচলিত হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে স্থির মীমাংসা করিবার নিমিত্ত সরকার একটি পরামর্শ-সভার আহ্বান করিবেন। সেই সম্মেলনের নাম Round table conference—গোল টেব্‌ল্ বৈঠক। এই সম্মেলনে দেশীয় রাজন্যবর্গ, বৃটেনের লোক এবং বৃটিশ ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদিগকে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে।" এই দুইটি বিষয়ই ঘোষণার সারাংশ।

বড়লাট লর্ড আরউইনের সদুদ্দেশ্যে সন্দেহ করিবার কোন কারণ ঘটে নাই। তিনি বিলাতে অবস্থানকালে সমস্ত রাজনীতিক দলের নেতৃবর্গকে ভারতের সঙ্কট-সঙ্কুল অবস্থা এবং তাহার প্রতীকারব্যবস্থা সম্বন্ধে যথাসাধ্য বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এইরূপই শুনা যাইতেছে। সুতরাং তিনি যে সরলভাবে ভারতের সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন এবং লর্ড বার্কেনহেড প্রমুখ অনুদারনীতিকগণের ভীষণ আক্রমণে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পূর্ব্বেই এই ঘোষণা করিয়াছেন, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। গত কংগ্রেসের ঘোষণামত কার্য্যারম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করিবার এই চেষ্টায় তাঁহার শান্তিকামনায় ও রাজনীতিকতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বড়লাটের তথা শ্রমিক সরকারের এই শান্তি-প্রয়াসের পথে অনর্থক বাধা দিবার অভিপ্রায় ভারতবাসীর নাই।

কিন্তু তাহা বলিয়া ঘোষণার অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্যের মর্ম্ম বিবৃতি না করিলেও দেশবাসীর নিকট প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ঘোষণায় যে "দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের" কথা বলা হইয়াছিল, তাহা যে "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনেরই" নামান্তর, ইহা সে সময়ে সকলেই বুঝিয়াছিলেন। কেবল যে দিন পাঞ্জাবের নামজাদা সার ম্যালকম হেলি স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন যে, ভারতের স্বায়ত্ত-শাসন ও উপনিবেশের স্বায়ত্তশাসন এক নহে, এবং যে দিন তখনকার দিনের বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী "ষ্টীল ফ্রেম" অথবা সিবিলিয়ানি লোহার বাঁধনের কথা দম্ভভরে ঘোষণা করিলেন, তখন হইতে লোকের মনে শাসকের প্রতিশ্রুতিতে সন্দেহের উদ্ভব হইয়াছে। আজ এই ঘোষণায় বড়লাট সেই সন্দেহ দূর করিলেন বটে, কিন্তু কবে কত দিনে সেই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ভারতে প্রবর্ত্তিত হইবে—ভারত বৃটিশ উপনিবেশগুলির মত আভ্যন্তরীণ রাজ্যশাসনব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবে, সে বিষয়ে তিনি ত বৃটিশ জাতি বা রাজার প্রতিভূরূপে কোন ইঙ্গিত—কোন আভাসই দিতে পারিলেন না। ইহার কারণ কি? যখন খোলাখুলি সকল কথা হইয়া যাইতেছে, যখন উভয়েই হৃদয়ের পরিবর্ত্তন করিয়া পরস্পর বন্ধুভাবে পরস্পরকে সম্ভাষণ করিতেছেন, তখন এই মনোভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ না করিলে ভারতবাসীর সন্দেহ সম্পূর্ণভাবে অপনোদিত হইবে কি?

অপর দিকে বড়লাট যে পরামর্শ-সভা (গোল টেবল্) বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতেও একটু সন্দেহের কারণ রহিয়া গিয়াছে। ব্যবস্থা পরিষদে জনগণের প্রতিনিধিপক্ষ হইতে যে পরামর্শ-সভার প্রার্থনা করা হইয়াছিল, এই পরামর্শ-সভাও কি তাহার অনুরূপ? শাসিতগণের প্রতিনিধিরা চাহিয়াছিলেন যে, যাঁহারা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বহুদিন আত্মনিয়োগ করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, সরকারপক্ষের প্রতিনিধিরা তাঁহাদেরই সহিত পরামর্শ করিবেন এবং তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিচার আলোচনার পর যে সিদ্ধান্ত হইবে, সেই সিদ্ধান্তের অনুরূপ শাসনব্যবস্থা

ভারতে প্রবর্ত্তিত হইবে। তাঁহারা সাইমন কমিশন—নায়ার কমিটী প্রমুখ কমিটী কমিশনের মুখ চাহিয়া সিদ্ধান্ত করিতে সম্মত ছিলেন না। বড়লাট তাঁহার ঘোষণায় পরামর্শ-সভা সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, এই সভা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির হইবে। ইহাতে দেশীয় রাজন্যগণের জন্য একটা বড় রকমের স্থান থাকিবে; তাহার পর সাইমন কমিশন ও নায়ার কমিটী তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিলে এবং সেই রিপোর্ট অনুসারে সরকার কোনরূপ কার্য্য করিবার পূর্ব্বে এ দেশের বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনীতিকগণকে এবং দেশীয় রাজন্যগণকে লইয়া একটি পরামর্শ-সমিতি গঠিত করিবেন।

শেষোক্ত ব্যবস্থায় এই 'খিচুড়ী পরামর্শ' সভা দ্বারা যে বিশেষ কোন উপকার সিদ্ধ হইবে, এমন ত মনে হয় না। রাজন্যগণ কি বৃটিশ ভারতীয় প্রজার আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ মনোভাব পোষণ করেন? কোন এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র বলিয়াছেন, "রাউণ্ড টেবল্ কনফারেন্সের অর্থ কি? ইহাতে যদি সকল শ্রেণীর ভারতীয় প্রতিনিধির স্থান না হইল, তাহা হইলে উহার সার্থকতা কি?" তাহাই যদি হয়, তবে ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দেওয়া হইবে, এ কথারই বা অর্থ কি? রাজন্যগণের কি বৃটিশ ভারতীয় প্রজার অবস্থা উপলব্ধি করিবার অবসর আছে, না গণতন্ত্র শাসনে মতামত দিবার অধিকার আছে? না তাঁহারা ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভিযোগ, মনোভাব অসঙ্কোচে অভিব্যক্ত করিবার মত মনোবল—সৎসাহস রাখেন? তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে, তাঁহাদের স্বৈরাচার শাসনের অনুযায়ী পরামর্শ দিতেই ত তাঁহারা সমুৎসুক হইবেন। সে ক্ষেত্রে তাঁহাদের পরামর্শে ভারতবাসীর আশা পূর্ণ হইবে বলিয়া ত মনে হয় না। ইহাতে ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের বিলম্বই অবশ্যম্ভাবী। প্রথমে ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদান করিয়া ক্রমে সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণে রাজন্যগণের রাজ্যে গণতন্ত্রমূলক শাসন প্রচলন করিলে ভারতবাসীর প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। এখন রাজন্যবর্গকে পরামর্শ-সভায় আহ্বান করিলে কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিবে বলিয়াই আমাদের ধারণা। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী বৃটিশ ভারতীয় প্রজারাই করিয়াছে, রাজন্যবর্গ করেন নাই। তবে তাঁহাদের সহিত পরামর্শের বিশেষ আবশ্যকতা কোথায়?

তাহার পর সার ওমর হায়াৎ খাঁ বা সার মহম্মদ সফি প্রকৃতির ভারতীয়কে অথবা সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষায় অতি-মাত্র অন্ধ রাজনীতিককে পরামর্শ-সভায় আহ্বান করিয়া ফল কি? তাঁহারা ত কখনই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের পক্ষপাতী হইতে পারিবেন না। সুতরাং যখন ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়াই স্থির হইয়াছে, তখন এই সমস্ত বিঘ্ন ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন কি?

দেশে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সরকারের মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তনের পরিচয় দিতে হইবে; দেশ হইতে দণ্ডনীতির সংহরণ করিতে হইবে। মহাত্মা গন্ধী প্রমুখ নেতৃবর্গের ঘোষণাতেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তিদান করিলে সরকারের মনোভাব পরিবর্ত্তনের পরিচয় পাওয়া যাইবে। তখন যে শান্তির আবহাওয়া বহিবে, তাহাতে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্তোষের উদ্ভব হইলে সকল জটিল সমস্যার মীমাংসা সম্ভবপর হইবে, অন্যথা নহে।

বিদেশী বর্জ্জন

ভারতে বিদেশী বস্ত্র আমদানীর হিসাব পর্য্যালোচনা করিলে বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশীপ্রচারে বিশেষ কায হইয়াছে ও হইতেছে বলিয়া মনে হয়। ১৯১৩—১৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে ৩ শত ৪ কোটি ৩০ লক্ষ গজ সূতার কাপড় বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল; ইহার মধ্যে এক গ্রেট বৃটেন হইতেই মাল আসিয়াছিল শতকরা ৯৩ গজ। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, ঐ বৎসরের হিসাবে দেখা যায়, বিদেশ হইতে আমদানী ১ শত ৭৬ কোটি ৭০ লক্ষ গজে নামিয়াছে এবং তন্মধ্যে বৃটেন হইতে আমদানী শতকরা ৮২.৫ গজে নামিয়াছে। বিদেশী পণ্যের কাটতি কয় বৎসরে এত কমিবার কারণ, ভারতে স্বদেশী পণ্যপ্রসারের প্রভাব, না লোকের ক্রয় করিবার শক্তি-হ্রাসের ফল, তাহা নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন। ১৯১৩—১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতীয় কলজাত কার্পাসপণ্য প্রস্তুত ৮০ কোটি গজ বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদি (হাতে বোনা স্বদেশী বস্ত্র) নির্ম্মাণ কি

পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তথাপি প্রদেশে প্রদেশে যে খাদির প্রচার ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে এবং খাদির ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। ১৯১৩—১৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবাসী যে পরিমাণ বিদেশী ও স্বদেশী কলজাত কার্পাসপণ্য ব্যবহার করিত, এখন তাহা হইতে ন্যূনাধিক ৭০ কোটি গজ কম ব্যবহার করিতেছে। এই কাপড় কোথা হইতে আইসে? যদি ধরা যায়, লোক তখনও যে পরিমাণ কাপড় কিনিত, এখনও তাহাই ক্রয় করে; তাহা হইলে এই ৭০ কোটি গজ নিশ্চয়ই তাঁতে বোনা খাদি বস্ত্র। সত্য হইলে ইহা আনন্দের কথা সন্দেহ নাই।

স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারে যদি ভারতবাসীর অনুরাগ এই ভাবে প্রবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বদেশমঙ্গলের সদিচ্ছায় তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন বুঝিতে হইবে; ইহাতে দেশের পরম কল্যাণ সংসাধিত হইবে।

সাম্প্রদায়িকতা

মওলানা হসরৎ মোহানী হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের সময় যে মনোভাব পোষণ করিতেন, দেখিতেছি, তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি এক ঘোষণা দ্বারা মুসলমানগণের ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান জমায়েৎ-উল-উলেমার সদস্য-পদ ত্যাগ করিয়াছেন। পদত্যাগের কারণ দেখাইয়া তিনি বলিয়াছেন,—"উলেমার সদস্যরা উন্নতির প্রতিরোধক। তিনি শরিয়তের অন্ধ শাসন মানিয়া চলেন, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস, ধর্ম্ম ব্যক্তিগত সাধনার জিনিষ, উহার জন্য গোঁড়ামী করিয়া জাতীয় স্বার্থ হানি করার কোন প্রয়োজন নাই। জমায়েৎ তাঁহার সহিত একমত নহেন, কোনও উন্নতিবিধায়ক কার্য্যে তাঁহাদের সম্মতি প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। অতএব যত দিন জমায়েতের মনোভাবের পরিবর্ত্তন না হয়, তত দিন তিনি উহার সভ্যশ্রেণী হইতে দূরে থাকিবেন।" সম্প্রতি "মোল্লাগণের" বিপক্ষে এক লীগ বা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বহু মুসলমান দেশপ্রেমিক ইহার সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। কাঠ-মোল্লাদের দ্বারা নিরীহ ধর্ম্মপ্রাণ নিরক্ষর মুসলমানদের কি সর্ব্বনাশ সাধিত হয়, তাহা ইঁহারা বুঝিয়াছেন এবং তাঁহাদের সমধর্ম্মীদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ধর্ম্মের নামে উত্তেজিত করিয়া ইহারা নিরক্ষর মুসলমানদিগকে সাম্প্রদায়িক হলাহলে ডুবাইতেছে, স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ হইতে দিতেছে না; এই জন্যই লীগের উদ্ভব। এখন জগতের প্রায় সমস্ত মুসলমান রাজ্যেই কাঠ-মোল্লাদের অনিষ্টকারিতা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। এখন আর তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। ইঁহাদের মুখের মুখোস খুলিয়া গেলেই সাম্প্রদায়িকতাও দূর হইয়া যাইবে, ইহাই আমাদের ধারণা।

তারকেশ্বর মামলা

তীর্থে অনাচার ও মোহান্তগণের যথেচ্ছাচার প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু জনসাধারণ কিছুকাল পূর্ব্বে তারকেশ্বরতীর্থ সংস্কারের জন্য যে বিপুল আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ করিয়াছিলেন, এত দিনে আদালতের বিচারে তাহা কতকাংশে সফল হইয়াছে। হিন্দু সাধারণের প্রতিনিধিরূপে ব্রাহ্মণসভা হুগলী জেলা কোর্টে তারকেশ্বরের মোহান্তের বিরুদ্ধে যে মামলা রুজু করিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল শুনানীর পর ৬ই নভেম্বর হুগলীর জেলা জজ মিঃ কে, সি, নাগ রায়ে ব্রাহ্মণসভার অনুকূলে ডিক্রী প্রদান করিয়া মোহান্তকে দেবোত্র সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন ও তাঁহার পদচ্যুতির আদেশ দিয়াছেন। মোহান্ত যে সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার নিজস্ব বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন, বিচারক উহাও দেবোত্র বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। রায়ের নির্দ্দেশ অনুসারে মোহান্তকে আদালত কর্ত্তৃক নিযুক্ত রিসিভারের হস্তে উহার দখল ছাড়িয়া দিতে হইবে।

মোহান্তের আবেদনে হাইকোর্ট এই আবেদন শুনানীর দিন পর্য্যন্ত রিসিভার নিয়োগ স্থগিত রাখিবার আদেশ দিয়াছেন। মামলা এখনও বিচারাধীন, এ সম্বন্ধে আমরা কোন মন্তব্য প্রকাশ করিব না। ব্রাহ্মণ-সভা জনসাধারণের হিতসাধনোদ্দেশে এই মামলা চালাইয়াছেন, এ জন্য জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাদের ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সর্দ্দা বিল

সরকারের পেন্সনভোগী ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী রায় সাহেব হরবিলাস সর্দ্দা ব্যবস্থা পরিষদে বিবাহ-সংস্কার আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুলিপির প্রধান উদ্দেশ্য

ছিল যে, নারীর বিবাহের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসরের ন্যূন বলিয়া আইনে নির্দ্দিষ্ট হইবে না। এই চতুর্দ্দশ বৎসর বলিতে চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইবার পর পঞ্চদশ বৎসরের আরম্ভকাল বুঝায়। এ দেশে নারী তাহার পূর্ব্বে সাধারণতঃ বয়ঃসন্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; সুতরাং তৎপূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া ভারতের ধর্ম্ম ও সমাজগত বিধির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইলে ভারতবাসীর সামাজিক ও ধর্ম্মগত সংস্কারে হস্তক্ষেপ করা হইবে, এই জন্য এই আইন বিধিবদ্ধ করিবার বিরুদ্ধে দেশে তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, জনমত পদদলিত করিয়া দেশের স্বয়ংসিদ্ধ 'প্রতিনিধিগণ' সরকারের সহায়তায় এই পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত করিয়াছেন।

বিবাহ হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের মধ্যে অন্যতম মুখ্য সংস্কার। ইহার উপর সংসারী গৃহীর সমস্ত জীবনের কার্য্য নির্ভর করে। শাস্ত্রজ্ঞ বহু হিন্দু পণ্ডিত শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, রজস্বলা হইবার পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ না দিলে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর পাতক হয়। শাস্ত্রে আছে, "দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা।" দশ বৎসর পর্য্যন্ত নারী কন্যা থাকে, তাহার ঊর্দ্ধ বয়স প্রাপ্ত হইলে রজস্বলা বলিয়া পরিগণিত; সুতরাং হিন্দুর ধর্ম্ম-সংস্কার অনুসারে যে বয়সে বিবাহবিধান পাপজনক বলিয়া হিন্দু সংহিতাকারগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই বয়সে আইন গড়িয়া বিবাহ দিতে বাধ্য করা কথনই হিন্দুধর্ম্ম অনুমোদিত হইতে পারে না। হিন্দুর বিবাহ ধর্ম্মের বিবাহ (sacrament), উহা ধর্ম্মসংস্কার; উহা নর-নারীর দেহভোগের একটা চুক্তি (contract) নহে। মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতেও বলা হইয়াছে যে, যাঁহারা ইসলাম ধর্ম্ম সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, যাঁহারা শরিয়ৎ ও কোরাণের অনুজ্ঞা মানিয়া থাকেন, তাঁহারা এই আইনের সহিত আপনাদের ধর্ম্মমতের সামঞ্জস্যসাধন করিতে পারিবেন না। সুতরাং হিন্দু-মুসলমানের দেশে যাঁহারা এই আইন বিধিবদ্ধ করিতে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহারা ভারতীয় নামে পরিচিত হইলেও ভারতের হিতকামী বন্ধু নহেন, ভারতীয় শিক্ষা, দীক্ষা ও ভাবধারার ঘোর শত্রু।

আমাদের মনে হয়, মার্কিণ নারী মিস মেয়োর এ দেশের আচার-ব্যবহারের কুৎসাপূর্ণ গ্রন্থ 'মাদার ইণ্ডিয়া'ই এই আইন বিধিবদ্ধ করাইবার মূল। এই নারীকে মহাত্মা গন্ধী ভারতের Drain Inspectress বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ইঁহার আর একখানি গ্রন্থ 'Slaves of the Gods'ও এই জাতীয়। ইহাতে তিনি প্রতীচ্য জগতের নিকট প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, ভারতীয়রা এতই নিকৃষ্ট চরিত্রের লোক যে, উহারা স্বায়ত্ত-শাসনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তাঁহার প্রেরণার উৎস কোথায়, তাহাও একরূপ বিদিত। এ দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষায় এতই অনুপ্রাণিত যে, স্বদেশের ধর্ম্ম ও সমাজগত অনুশাসনসমূহের গূঢ় অর্থের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বাল্যবয়সে বিবাহিতা কন্যা যে শ্বশুরগৃহে বাল্যকাল হইতে যাওয়া আসা করিয়া ক্রমে নূতন সংসারের এক জন হইয়া যায়, পিতৃগৃহের সহিত বিচ্ছেদের কষ্টে ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া যায়, সে কথা তাঁহারা জানিয়াও জানিতে চাহেন না। বয়ঃসন্ধি-প্রাপ্তি না হইলে, পুনর্বিবাহ না হইলে যে উহাদের স্বামীর সহিত যৌন-মিলনের সম্ভাবনা থাকে না, এ কথা তাঁহারা স্বেচ্ছায় ভুলিয়া গিয়াছেন এবং রাজনীতিক সুবিধা-সাধনের উদ্দেশ্যে তাহার উপকারিতার কথা স্বীকার করিতে চাহেন না। এখনও এ দেশের বহু স্থানে এই নিয়ম বলবৎ আছে। কচিৎ কোথাও কোন যুগে একটা হরি মাইতির মামলা ঘটিয়াছে বলিয়া তাহাকে নিত্য প্রত্যক্ষ সাধারণ ঘটনা বলিয়া ধরা যায় না। এরূপ শত শত পাশব প্রবৃত্তির পরিচয় খুঁজিলে, যে সকল দেশে যৌবন বিবাহ প্রচলিত, সে সকল দেশেও পাওয়া যায়।

কেবল ইহাই নহে, প্রতীচ্যের হ্যাভলক এলিস প্রমুখ একাধিক সমাজতত্ত্বজ্ঞ মনীষী লেখক ও লেখিকার মতে বাল্যবিবাহ সতীত্বরক্ষার মূল কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা বাল্যবিবাহের সুফলের কথা শতমুখে ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহাদেরও সিদ্ধান্তে বাল্যকালে বিবাহিত হইলে নর-নারীর প্রণয় গাঢ় ও চিরস্থায়ী হয়।

এ দেশে বাল্যবিবাহ বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। বাল্যবিবাহে বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে, বাল্যবিবাহের ফলে সন্তান-সন্ততি দুর্ব্বল, স্বাস্থ্য-সম্পদহীন হইয়াছে, এইরূপ জনরব সম্প্রতিই শুনা যাইতেছে। এ দেশের যে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত, তাহাদের মধ্যে সন্তান-সন্ততির অটুট স্বাস্থ্যের কথাও শুনা যায় নাই। দেশের আবহাওয়ার

পরিবর্ত্তনে, ম্যালেরিয়ার বিস্তারে ও দারিদ্র্যের প্রভাবে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়াছে, এ কথা সত্য, কিন্তু উহা যে বাল্য-বিবাহের অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহার কোন স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ নাই।

এ অবস্থায় দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা কেবল প্রতীচ্যের প্রভুদের মনস্তুষ্টিসাধনের জন্য অথবা রাজনীতিক সুবিধালাভের জন্য সরকারের সহায়তা করিয়া আইন বিধিবদ্ধ করিয়া কি বিষম অনিষ্টসাধন করিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। সংস্কার-প্রয়াসী কয়েক জন শিক্ষিত লোকের সন্তোষ-বিধানের জন্য সমগ্র দেশব্যাপী প্রতিবাদ এমনভাবে উপেক্ষা না করিয়া সরকারের বিশেষ বিবেচনা করিয়া এই চির-প্রচলিত সামাজিক আচারের পরিবর্ত্তন করা উচিত ছিল। মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার ঘোষণায় এ দেশের ধর্ম্মগত ও সামাজিক আচারে হস্তক্ষেপ করা হইবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান করা হইয়াছিল। দেশে এমন কি অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, যাহার জন্য মুষ্টিমেয় বিকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত পাশ্চাত্য হাবভাবাপন্ন 'প্রতিনিধিগণের' প্ররোচনায় অগণিত জনসাধারণের মনে ব্যথা দিয়া এই আইন প্রণয়ন করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইল?

যে বিলাত এই 'প্রতিনিধিগণের' আদর্শ, সে দেশেও দ্বাদশ বৎসরের পরে বালিকার বিবাহ জনমতের বিরুদ্ধে বিধিবদ্ধ করা সম্ভবপর হয় নাই। অথচ সে দেশে দ্বাদশ বৎসরের অনেক পরে প্রায়শঃ বালিকা বয়ঃসন্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, ধর্ম্মসংক্রান্ত অথবা সামাজিক ব্যাপারে জনমতের বিরুদ্ধে আইনের সাহায্যে কোন সামাজিক আচার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া সমাজের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর। তাহার পর এ দেশে চতুর্দ্দশ বৎসর-বয়স্কা (প্রকৃতপক্ষে তদতিক্রান্তা) বালিকা প্রায়শঃ পূর্ব্বেই বয়ঃসন্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বহুক্ষেত্রে যৌবন-রেখায় উপনীতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। একেই এ দেশে বিবাহিতা বা পতিবিরহিতা, আশ্রয় ও সহায়হীনা নারীকে দুর্ব্বৃত্ত লম্পটের পাশব আক্রমণ হইতে রক্ষা করা বহু দরিদ্র গৃহস্থের পক্ষে দুষ্কর, তাহার উপর অনূঢ়া বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যাকে সেই উপদ্রব হইতে রক্ষা করা কিরূপ সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাও কি আইনকারকদিগের স্মরণ করা কর্ত্তব্য ছিল না? এ দেশে জ্ঞাতিবিরোধ, সন্নিকানি বিবাদ অথবা সামাজিক মনোমালিন্যের অভাব নাই; তাহার উপর সর্ব্বশক্তিমান পুলিসের মধ্যেও অসাধুপ্রকৃতির লোক নাই, এমন কথা বলা যায় না। সে ক্ষেত্রে এতদুভয়ের যোগাযোগে কি অনর্থের উদ্ভব হইতে পারে না?

আগামী ১লা এপ্রেল তারিখ হইতে আইনের প্রয়োগ আরম্ভ হইবে। নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর লোক এখনও আইনের মর্ম্ম বুঝে নাই; সে সময়ে তাহাদের বিবাহকার্য্যে আইনমত বাধা পড়িলে কি অবস্থার উদ্ভব হইবে, তাহাও ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এখনও আইনের বিপক্ষে আন্দোলন প্রশমিত হয় নাই। ইহার অনিষ্টকারিতা লোকে যতই বুঝিতে আরম্ভ করিবে, ততই উত্তেজনার বৃদ্ধি হইবে। এখনও সে জন্য সরকারকে এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। শিক্ষিতগণের ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেও বিরোধের ব্যবধান প্রাচীর উত্থিত হইল। ইহাও কি দেশের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এখনও হিন্দু-মুসলমান এই অনিষ্টকর আইন বাতিল করিবার জন্য পূর্ণ আগ্রহ উৎসাহে আন্দোলন জাগাইয়া রাখিবেন। আমাদের ধারণা, সরকার এই আইন অনতিকালবিলম্বে বাতিল করিয়া দিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুগণের সহানুভূতি ও সন্তোষ লাভ করিবেন।

গোঁড়ামীর বিপক্ষে অভিযান

বাঙ্গালায় অজ্ঞ ধর্ম্মান্ধ মৌলভী-মোল্লাদের বিপক্ষে মুসলমান তরুণগণের একটি লীগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর মৌলভী-মোল্লারা কোরাণ ও শরিয়তের কদর্থ—ভুল অর্থ করিয়া সরল নিরক্ষর গ্রামবাসীদিগকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে,—সময়ে সময়ে স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে অপর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে উত্তেজিত করে। এই লীগ মুসলমান সম্প্রদায়কে এই বিপদ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। এই শ্রেণীর মোল্লা-মৌলভীরা সর্ব্ববিধ উন্নতির অন্তরায় এবং দেশের মঙ্গলের পরিপন্থী। ইহাদের চালাকী ধরিয়া দিতে পারিলে হিন্দু-মুসলমানে প্রকৃত মিলন সম্ভবপর হইবে।

সম্প্রতি এলাহাবাদে মৌলভী হাফেজ হিদায়াৎ হোসেনের নেতৃত্বে একটি মুসলিম সামাজিক বৈঠকের অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি উর্দ্দ ভাষায় বক্তৃতা করিয়া বুঝাইয়াছিলেন যে,—

"ইসলামের শিক্ষায় কোন মূলগত দোষ আছে বলিয়া মুসলমানের আজ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয় নাই, মুসলমানরা ইসলামের শিক্ষানুযায়ী পথে চলিতে অসমর্থ বলিয়াই তাহাদের এই দুর্দ্দশা। ইহার জন্য উলেমারাই দায়ী। বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাঁহাদের কোরাণ ও শরিয়তের উপদেশ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া উচিত। যে কোন সামাজিক সংস্কার করিতে গেলেই তাঁহারা যে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বাধা দেন, তাহাতেই অপকার হইতেছে।"

মুসলমানের এ জাগরণ কালধর্ম্মানুসারে হইয়াছে। গোঁড়ামী ও অজ্ঞতার ফলে কাবুলে রাজা আমানুল্লার সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, এ কথা মুসলমানরা কিছুতেই ভুলিতে পারিবেন না।

হাজত-আসামীদের প্রতি ব্যবহার

এ দেশে রাজনীতিক অপরাধে ধৃত হাজত-আসামী এবং দণ্ডিত কয়েদীদের প্রতি সময়ে সময়ে জেল-কর্ত্তৃপক্ষের লোক অথবা পুলিস যে ব্যবহার করে, তাহা কোন সভ্যতামানী হৃদয়বান্ নিরপেক্ষ ব্যক্তি সমর্থন করিতে পারেন না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার হাজত-আসামীরা বিশেষ বিচারক রায় সাহেব পণ্ডিত শ্রীকৃষেণের নিকট গত ২৫শে অক্টোবর তারিখে যে আবেদন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। আবেদনে বর্ণিত দুর্ব্যবহারের কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, স্থানীয় জেল বা পুলিস বৃটিশ আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করে নাই, ন্যায়বিচারকে পদ-দলিত করিয়াছে।

আবেদনের মর্ম্ম এইরূপ :—

"গত ২১শে তারিখে রাজ-সাক্ষী জয়গোপাল সাক্ষ্যদানকালে এমন কথা অভিযুক্তদের সম্বন্ধে ব্যবহার করিয়াছিল ও তাহাদিগের প্রতি এমন ভঙ্গী প্রদর্শন করিয়াছিল, যাহাতে সর্ব্বকনিষ্ঠ অভিযুক্ত আসামী প্রেমদত্ত ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তাহাকে চটিজুতা ছুড়িয়া মারিয়াছিল। সমস্ত অভিযুক্ত আসামী তাহার এই কার্য্য অনুমোদন করে নাই এবং সেই কার্য্যের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নাই বলিয়া জানাইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের বিবৃতি গ্রহণ করা হয় নাই। ইহার পর তাহারা সকলের স্বাক্ষরিত বিবৃতিপত্র দাখিল করিয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও তাহাদের সকলকে এক জনের অপরাধে অপমানিত—লাঞ্ছিত করা হইয়াছিল। পুলিস তাহাদের উভয় হস্তে শৃঙ্খল পরাইয়া আদালতে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, তাহারা অসম্মত হয় বলিয়া বহু পুলিস কনষ্টেবল ও ইনস্পেক্টর তাহাদিগকে আক্রমণ করে; কেহ কেহ তাহাদের দেহের উপর চাপিয়া বসে, কেহ কেহ তাহাদিগকে ঘুষা, চড়, কিল মারে এবং তাহাদিগকে টানিয়া হিঁচড়িয়া লইয়া যায়। ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাহারা জিজ্ঞাসা করে, তাঁহার আদেশে এইরূপ করা হইয়াছে কি না? সে কথায় কর্ণপাত করা হয় নাই। টিফিনের সময় যদিও তাহাদের এক হাতের হাতকড়া খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি টিফিনের পর আদালত বসিলে আবার তাহাদের উভয় হস্তে হাতকড়া পরাইবার চেষ্টা করা হয়। তাহারা উহাতে সম্মত না হইলে তাহাদিগকে ভীষণ প্রহার করিয়া হাতকড়া পরান হয়। তাহার পরেও তাহাদিগকে লাথি মারা হয়। মিঃ মর্গানের মত দায়িত্ববান্ রাজকর্ম্মচারীর সম্মুখে এইরূপ অনাচার অনুষ্ঠিত হয়।"

এইরূপ আরও অনাচারের—নিষ্ঠুর আচরণের অভিযোগ আছে। এগুলি কি সত্য? যদি সত্য না হয়, তবে সরকার পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ হইতেছে না কেন? অন্ততঃ এই অভিযোগ সম্বন্ধে একটা নিরপেক্ষ তদন্ত বসান অবিলম্বে কি উচিত ছিল না?

শিক্ষা-সংস্কার

ভারতের শিক্ষার প্রণালী ও পদ্ধতি কিরূপ হওয়া কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে বড়লাট লর্ড আরউইন দিল্লীর বিশ্ববিদ্যালয় বৈঠকে দেশের লোককে জানাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার অভিমত এইরূপ যে,—

"ভারতের লোক-সমাজ অতি প্রাচীন এবং জীবন্ত। উহাকে অত্যধিক ধাক্কা বা জোর না দিয়া আধুনিক জগৎকে যে গতিশীল ক্রমোন্নতি চক্র ঘুরাইয়া লইয়া যাইতেছে, তাহার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে শিক্ষা দেওয়াই ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম প্রধান সমস্যা। নূতন নূতন শক্তি, নূতন উৎসাহ ও কর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগাইয়া কোটি কোটি ভবিষ্যৎ ভারতীয় নাগরিকের আশা-আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিয়া দ্রুতগতি ধাবিত হইতেছে; যে বয়সে মানুষ সহজেই বাহিরের প্রেরণা দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেই বয়সেই এই কর্ম্মপ্রচেষ্টা, এই দ্রুত রক্তচালনকে কি গঠনমূলক লক্ষ্যের দিকে প্রধাবিত করা যায় না? অথবা উহা কি ধ্বংসমূলক লক্ষ্যের দিকে প্রসারিত হইয়া অভাব্য বিপদের দিকে দেশকে লইয়া যাইবে?"

সমস্যা গুরু, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু লর্ড আরউইনের সরকার এ যাবৎ তাঁহাদের কার্য্যের দ্বারা এ দেশের তরুণ শিক্ষার্থীদিগকে গঠনমূলক লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইবার জন্য কি করিয়াছেন? রিজলি সার্কুলার, কার্লাইল সার্কুলার প্রভৃতি সকল প্রকার বাধা-প্রদানই কি ইহার সদুত্তর? এ দেশের তরুণের উৎসাহ উদ্দীপনা, কর্ম্মপ্রচেষ্টা, দেশ ও দশের সেবায় আগ্রহ ও প্রবৃত্তি—তাহাদের প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষ হইবার বা ভবিষ্যৎ নাগরিক হইবার

আকুল আকাঙ্ক্ষা কি এই প্রকৃতির 'সার্কুলার' ও 'শৃঙ্খলা' রক্ষার আদেশের দ্বারা সঞ্জীবিত করিয়া রাখা হইয়াছে?

বড়লাট বলিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভবিষ্যৎ নাগরিক উদ্ভূত হয়। ভাল কথা। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হইতে যদি ভবিষ্যৎ ভারতীয় নাগরিক ও নেতা বাহির করাইয়া লইবার প্রকৃত অভিলাষ হয়, তবে কথায় কথায় ছাত্রগণকে "কেবল লেখাপড়া চর্চ্চা" লইয়া থাকিতে উপদেশ দেওয়া হয় কেন? সামান্য রাজনীতির সংস্পর্শে গেলেই তাহাদিগকে নানারূপ বাধা প্রদান করা হয় কেন? যে ভবিষ্যৎ নাগরিক হইবে, সে কি রাজনীতির সংস্পর্শে আসিবে না? জলে না নামিয়া সাঁতার শিখিবে? সরকারেরই কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় স্বয়ং দেশকর্ম্মী হইয়াও সে দিন পঞ্জাবের তরুণ ছাত্রগণকে 'প্রস্তুত না হইয়া' রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অথচ বড়লাট তরুণের যে বয়সটা বাহিরের প্রেরণা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার উপযুক্ত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, সে বয়সই যদি উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তবে ছাত্র কবে নাগরিক হইবার উপদেশ বা প্রেরণা গ্রহণ করিবে? কোন্ সভ্য ও উন্নত দেশে সে নিয়ম আছে?

হার্টগ কমিটী

ভারতের শিক্ষা ও শিক্ষার ব্যবস্থার সহায়তায় ভারতের রাজনীতিক ও নিয়মানুগ সংস্কার সম্পর্কে কি উন্নতিসাধন করা সম্ভবপর হইতে পারে, সাইমন কমিটীকে তাহা তদন্ত দ্বারা জানাইবার নিমিত্ত সাইমন কমিটীর লেজুড়রূপে হার্টগ কমিটী বসান হইয়াছিল। এই কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

হার্টগ কমিটীর একটি সিদ্ধান্ত এই যে, "শিক্ষা ব্যতীত কেহ সুবিবেচনার সহিত রাজনীতিক ভোটের সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। যাহারা লেখাপড়া ও হিসাব করিতে অনভিজ্ঞ, তাহারা ভোটের পাত্রের যোগ্যাযোগ্যতা বিচারে সমর্থ হইবে না।"

গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এ্যাক্টের মুখবন্ধে আছে যে, ভারতীয়ের শিক্ষার উন্নতির অনুযায়ী তাহার অধিকতর রাজনীতিক অধিকার উপভোগ করিবার ক্ষমতা ও সামর্থ্য বিবেচিত হইবে। বোধ হয়, এইটুকুর জন্যই হার্টগ কমিটী বসান হইয়াছিল। ভারতবাসীরা যে শিক্ষায় উন্নতিসাধন করিতে পারে নাই এবং সে জন্য যে তাহারা অধিকতর রাজনীতিক অধিকার পাইবার অনুপযুক্ত,—এইটুকুই হার্টগ কমিটী সিদ্ধান্ত করিয়া গেলেন। সুতরাং এখন "অধিকতর রাজনীতিক অধিকারের" দাবী আর ভারতবাসীরা করিতে পারিবে না, ইহাই হইল শেষ সিদ্ধান্ত।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, অন্যান্য সভ্যদেশে কি শিক্ষার মাপকাঠি দেখিয়া লোকের রাজনীতিক অধিকার উপভোগের সামর্থ্য নির্ণীত হয়? বিলাতে "রিফরম্‌স্ এ্যাক্ট"গুলি কি এই নীতি অনুসরণ করিয়া পাশ হইয়াছিল? মার্কিণ দেশ একটা বড় রকমের 'নিরক্ষর' (Illiterate) দেশ,—এ কথা এক জন মার্কিণ লেখকই স্বীকার করিয়াছেন। গত জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে যে মার্কিণদিগকে সৈন্যশ্রেণীতে ভর্ত্তি করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে শতকরা ২৫ জন লিখিতে পড়িতে জানিত না, ইহা সরকারী বিবরণে প্রকাশ। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারির রিপোর্টে প্রকাশ, মার্কিণের দশ বৎসর-বয়স্ক ৫৫ লক্ষ বালক লিখিতে পড়িতে জানিত না, মার্কিণ দেশের ৩৫ লক্ষ লোক ইংরাজীতে কথা কহিতে বা লিখিতে জানে না। এ সকল সার্ব্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের অভাব সত্ত্বেও কি মার্কিণবাসী স্বায়ত্ত-শাসন হইতে বঞ্চিত হইয়াছে? অনেক সময় দেখা যায়, মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি—সহজাত জ্ঞান—সংস্কার, ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। সুতরাং ইংরাজী শিক্ষাই যে শিক্ষার—জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পরিণতি, সর্ব্বসাধারণে ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত না হইলেই যে দেশ অশিক্ষিত, এমন অদ্ভুত ধারণা করিবার কোনও সঙ্গত কারণ ত' খুঁজিয়া পাই না।

ভয়-প্রদর্শন

বৃটিশ সিংহ নরম গরম উভয় নীতিরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। যে সময়ে লর্ড আরউইনের 'জগৎচমৎকারক' ঘোষণার দ্বারা ভারতবাসীকে শান্ত ও সন্তুষ্ট করা হইবে বলিয়া এ দেশের ও বিলাতের সংবাদপত্রে নিত্য অসংখ্য টিপ্পনী প্রকাশিত হইতেছে, ঠিক সেই সময়ে বিলাতের নামজাদা "টাইমস" লিখিলেন—

"বাঙ্গালাদেশে বর্ত্তমানে যে বিপজ্জনক আন্দোলনের সূত্রপাত হইতেছে, নূতন বৎসরে উহা ভীষণ আকার ধারণ করিবে এবং উহা হইতে মহা অনর্থের সৃষ্টি হইবে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় এই ভাবের হিংসার (violence) আন্দোলন বেঙ্গল অর্ডিনান্সের প্রয়োগ দ্বারা দলিত পিষ্ট করা হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে যে সকল নেতাকে আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাঁহারা এখন মুক্ত। সে সময়ে সরকার যেরূপ ক্ষিপ্রগতি অনাচারের মস্তকে বজ্র হানিয়াছিলেন, তাহাতে হিংসার আন্দোলন বাঙ্গালাদেশ ছাড়িয়া যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবকে আশ্রয় করিয়াছিল। বাঙ্গালার কংগ্রেস নেতারা বুঝিয়াছেন যে, যদি সরকারকে পঙ্গু ও কাবু করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে পাট ও চটকল আদির নিরক্ষর শ্রমিকদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব হস্তগত করা আবশ্যক। তাহা ছাড়া তাঁহারা ইহাও বুঝিয়াছেন যে, কম্যুনিজম-মন্ত্র দৃঢ়ভাবে প্রচার করিতে পারিলে সাম্প্রদায়িকতা বা হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বিধ্বংস করা যায়।"

এই উক্তির অন্তরালে কত কূট রাজনীতিক চালবাজী আছে, তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যায়। এই মিথ্যার জাহাজ গড়ার অন্তরালে আবার বেঙ্গল অর্ডিনান্স প্রবর্ত্তন করার কেমন সুন্দর ইঙ্গিত আছে! এ দিকে মুখে এ দেশের লোককে আকাশে তুলিয়া দেওয়া হউক—শাসক জাতির সাগরপারের জ্ঞাতি-কুটুম্বের সহিত সমান আসন দেওয়া হইবে বলিয়া আশান্বিত করা হউক,—কিন্তু কাযে প্রয়োজন হইলে যেমন বে-আইনী আইন চালাইয়া রাজ্য শাসন করা হয়, তেমনই চালান হউক—সুন্দর ব্যবস্থা! যেন দুই রূপ—কভু শ্যাম, কভু শ্যামা; কভু মুরলী করে মৃদু-মন্দ হাসি, কভু মুণ্ডমালিনী করে করাল অসি। চমৎকার!

নারীর দায়াধিকার

এ দেশের নারীর দায়াধিকার সম্বন্ধে ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত যোগিয়া এক আইনের খসড়া পেশ করিবার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন ও উহা পেশ করিবার মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে। দুর্গের প্রাচীর একবার কোন স্থানে ভেদ করিতে পারিলে আক্রমণকারীদের আরও অধিক প্রাচীর ভেদ করিবার আগ্রহ সঞ্জাত হওয়া স্বাভাবিক। সারদা বিল আইনে পরিণত হওয়ায় এ দেশের সমাজ-সংস্কারক দলের আগ্রহ উৎসাহ বাড়িয়া গিয়াছে। যোগিয়ার পাণ্ডুলিপি তাহারই পরিচায়ক। ইহাতে সমাজের কি অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা না ভাবিয়াই এই ভাবের আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

প্রস্তাবিত আইনের মর্ম্ম এইরূপ:—নারী তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্রের অর্দ্ধেক অংশ পাইবার অধিকারী হইবেন। কোন ব্যক্তির যদি একটি পুত্র ও একটি কন্যা থাকে, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তির দুই ভাগ পুত্র পাইবেন ও এক ভাগ কন্যা পাইবেন। যদি কাহারও দুই পুত্র ও দুই কন্যা থাকে, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুর পর সম্পত্তি ৬ ভাগে বিভক্ত হইবে; সম্পত্তির ৪ ভাগ দুই পুত্র পাইবেন এবং দুই কন্যা এক এক ভাগ পাইবেন। আরও একটা সর্ত্ত এই যে, কন্যা বিবাহিতা বা অবিবাহিতাই হউক, স্বধর্ম্মে থাকুক বা ধর্ম্মত্যাগিনী হউক, বন্ধ্যাই হউক বা নিঃসন্তানই হউক, ধনীই হউক বা দরিদ্রই হউক, সতীই হউক বা অসতীই হউক, বিধবাই হউক বা সধবাই হউক, পীড়িতাই হউক বা বিকলাঙ্গ বা বিকৃত-মস্তিষ্কাই হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই,—তাহার দায়াধিকারের পক্ষে কোন রীতি বা ব্যবস্থা থাকিলেও সে তাহার পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে।

ইহার ফলে শতধা বিচ্ছিন্ন হিন্দু সমাজের দৈন্য আরও পরিবর্দ্ধিত হইবে। আমাদের মনে হয়, ইহাতে সমাজের ঘোর অনিষ্ট সংসাধিত হইবে। দেশের চিরাচরিত শাস্ত্রসম্মত বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া বিকৃত শিক্ষার ফলে এই যে পরিবর্ত্তন প্রয়াসের আগ্রহ, ইহাতে কি কুফল ঘটিতে পারে, তাহা সমাজ ও দেশহিতকামী ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিবেন। একেই ত ক্রমাগত ভাগাভাগির ফলে লোক দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, তাহার উপর এই ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইলে দেশ কিরূপ অবস্থায় উপনীত হইবে, তাহা অনুমান করিয়া লইতে কষ্ট হয় না। তাহার উপর ধর্ম্মত্যাগ ও অসচ্চরিত্রতার যদি এই ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহা হইলে হিন্দু সমাজ কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহাও প্রণিধানযোগ্য। সম্পত্তি বিভাগের ফলে সমৃদ্ধিহ্রাসের আশঙ্কা করিয়া বিলাতী সম্ভ্রান্তগণ অনায়াসে অপরাপর পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সম্পত্তি দান করিয়া যান। আর আমাদের দেশে অযাচিত পরোপকারের মুখোসধারী সংস্কার-প্রয়াসিগণ হিন্দুর শান্তিময় সংসারে আরও মামলা বাধাইবার জন্য সম্পত্তি বিভাগের নূতন আইন প্রবর্ত্তনের প্রয়াস পাইতেছেন! এ সম্বন্ধে হিন্দু সমাজ অবহিত না হইলে বিষম অনর্থপাতের সম্ভাবনা।

অশ্রু-অর্ঘ্য

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জনপ্রিয়, কথা-সাহিত্যিক, বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ ভক্ত, আমাদের দীর্ঘদিনের প্রীতিভাজন সুহৃদ্ সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আকস্মিক বিয়োগে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। সুধীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাঁহার বিয়োগে সাহিত্য জননী এক জন শ্রেষ্ঠ সাধককে হারাইয়াছেন। করুণরসাত্মক রচনায় তাঁহার সমকক্ষ অতি অল্পসংখ্যক কথাসাহিত্যিকই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ঋষিপ্রতিম, সুপণ্ডিত পিতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সন্তান হিসাবে সুধীন্দ্রনাথ পিতার ন্যায়ই নিরহঙ্কার, অনাড়ম্বর, সরল-প্রকৃতি এবং খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিয়াও ফেরঙ্গ-আনার প্রভাবে তিনি বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দেন নাই। সুধীন্দ্রনাথ যেমন মিষ্টভাষী, শিষ্টাচারসম্পন্ন এবং উদারপ্রকৃতির বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহার বন্ধুবাৎসল্যও তেমনই প্রশংসনীয় ছিল। দক্ষতার সহিত তিনি অনেক দিন, তাঁহার দেশপূজ্য খুল্লতাত, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত "সাধনা" নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যভার সম্পাদন করিয়াছিলেন। কথাসাহিত্যে তাঁহার স্থান কোথায়, তাহা আলোচনার সময় এখনও আসে নাই সত্য; কিন্তু এ কথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, উত্তরকালের সুধী সমালোচককে সুধীন্দ্রনাথের প্রতিভার যোগ্য সমাদর অবশ্যই করিতে হইবে। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি কালের প্রভাব সহ্য করিয়াও বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারে সুদীর্ঘ কালের জন্য সম্পদরূপে সঞ্চিত থাকিবে, এ কথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। তাঁহার রচিত "করঙ্ক," "প্রসঙ্গ," "বৈতানিক," "মঞ্জুষা," "চিত্রলেখা" ও "চিত্রালী" রসপিপাসু বাঙ্গালী পাঠকের শুধু চিত্তবিনোদন করিবে না, চিরন্তন চিন্তার যথেষ্ট অবকাশও প্রদান করিবে। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে পীড়িত হইয়া সুধীন্দ্রনাথ ৬০ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্তা পত্নী, পিতৃবিয়োগ-বিধুরা কন্যা ও পুত্রদিগকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

সুরেন্দ্রনাথ রায়

হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যবহারাজীব, বঙ্গদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ ভূস্বামী সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় ২৫শে কার্ত্তিক তদীয়

সুরেন্দ্রনাথ রায়

বেহালার বাটীতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। ব্যবহারাজীবের কার্য্যে সুরেন্দ্রনাথ যথেষ্ট অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। দেশ-জননীর সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ না করিলে তাঁহার অর্থভাগ্য আরও সুপ্রসন্ন হইত। সুরেন্দ্রনাথ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি দক্ষিণ সহরতলী মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া আসিতেছিলেন। দেশের নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিগত ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সদস্যপদে কায করিয়া গিয়াছেন। ভগ্নস্বাস্থ্যবশতঃ বর্ত্তমানবর্ষে তিনি সদস্যপদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে সংস্কার আইন প্রযুক্ত হইবার পর তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম নির্ব্বাচিত ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। প্রায় ২০ মাস কাল তিনি বিনা পারিশ্রমিকে উক্ত সভায় প্রেসিডেণ্টের কার্য্যও করিয়াছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষাবিল বিগত ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনিই প্রথম বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করেন। তাঁহারই বিশেষ চেষ্টার ফলে উহা পরিগৃহীত হইয়াছিল। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে সুরেন্দ্রনাথ কিছুকাল সহকারী সভাপতির কার্য্য করেন। রাষ্ট্রনীতির বিঘ্নবহুল পথে বিচরণ করিবার অবকাশকালেও তিনি সাহিত্য-সেবায় অনবহিত ছিলেন না। বহুসংখ্যক পুস্তক ও পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াও তিনি সাহিত্যলক্ষ্মীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভারতের দেশীয় রাজ্য (গোয়ালিয়র), বঙ্গের আর্থিক অবস্থার কয়েকটি বিবরণ, বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে কয়েকটি অভিমত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সুরেন্দ্রনাথ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন, বঙ্গদেশের বহু ধনী ব্রাহ্মণ-পরিবারের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার প্রায় ৬৮ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তাঁহার দুই পুত্র ও কন্যা অধুনা জীবিত। তাঁহার বিয়োগে দেশবাসী এক জন অক্লান্তকর্ম্মার অভাব অনুভব করিতেছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, তাঁহার পরলোকগত আত্মা তৃপ্তিলাভ করুক। ভগবান্ পিতৃহারা সন্তানবর্গকে এই মহাশোকে সান্ত্বনা দান করুন।

শিবকেদার দাঁ

টিটাগড় কাগজের কলের সুপ্রসিদ্ধ মুচ্ছুদ্দী শিবকেদার দাঁ গত ১৯শে কার্ত্তিক সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। যাঁহাদের উদ্যমে—অক্লান্ত পরিশ্রমে টিটাগড় মিল বিলাতী কাগজের বিপুল প্রতিযোগিতার ভিতরও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে, শিবকেদার দাঁ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি প্রায় ৩৫ হাজার টাকা ব্যয়ে বরাহনগর মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া দান করিয়াছিলেন।—কয়েকটি

শিবকেদার দাঁ

স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের তিনি ডিরেক্টার ও বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। সরল মধুরস্বভাব—ভক্তিবিনম্র ব্যবহার, অকলঙ্ক চরিত্র তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল। সামান্য অবস্থা হইতে তিনি আত্মশক্তিবলে প্রতিষ্ঠা ও সম্পদ্ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

নট-শিল্পী প্রিয়নাথ

বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে যাঁহারা অভিনয়কলা-কৌশলে যশোলাভ করিয়াছেন, পরলোকগত প্রিয়নাথ ঘোষ তাঁহাদের অন্যতম। প্রাচীন যুগের নট-শিল্পীদের মধ্যে মহেন্দ্রলাল বসু এক জন প্রতিভাবান্ অভিনেতা ছিলেন। প্রিয়নাথ তাঁহারই অভিনয় দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া রঙ্গালয়ে প্রবেশ করেন এবং তাঁহারই আদর্শে অভিনয়কলা-নৈপুণ্যে উত্তরকালে যশোলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলায় তাঁহার 'নবকুমার', রিজিয়ায় 'বীরেন্দ্র সিংহ' সরলায় 'বিধুভূষণ', সাজাহানে 'সাজাহান', তপোবলে 'ত্রিশঙ্কু' প্রমুখ ভূমিকার অভিনয়-নৈপুণ্য তাঁহাকে যশস্বী করিয়াছিল।

প্রিয়নাথ ঢাকার দেওয়ান ৺তুলসীরাম ঘোষ হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। অভিনয়ে তাঁহার সাধনা ছিল। সে যুগে

নটবেশে প্রিয়নাথ ঘোষ

থিয়েটারের বেতনে পরিবার প্রতিপালন সম্ভব হইত না বলিয়া তিনি রাত্রিতে থিয়েটারের অভিনয় করিয়াও দিনে কারেন্সী আফিসে চাকরী করিতেন। শেষ জীবনে তিনি থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করিয়াও নাটক, অভিনয়-কলা ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চের উন্নতির চিন্তায় সমাহিত ছিলেন।

সতীশচন্দ্র ঘোষ

"চাকমা জাতি," "চট্টগ্রামের বিবরণ" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা সাহিত্যিক সতীশচন্দ্র ঘোষের অকাল-বিয়োগে আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ "চাকমা জাতির" ইতিবৃত্তে অপর্য্যাপ্ত গবেষণার পরিচয় পাইয়া তাঁহার রচিত এই গ্রন্থখানি পরিষদের গ্রন্থ বলিয়া প্রচার করেন। তাঁহার এই গ্রন্থখানি উপাদেয় বলিয়া দেশ-বিদেশের সংবাদপত্র-সমূহে উচ্চ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। সতীশচন্দ্রের রামায়ণ, মহাভারত ও গীতার সরল সংস্করণ স্কুল-কলেজের পুরস্কারের গ্রন্থরূপে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেছে। "চট্টগ্রামের বিবরণী" নামে তত্রত্য ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিবরণ তিনি তিন খণ্ডে রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভৌগোলিক খণ্ডের কিয়দংশ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ২৫ বৎসরব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে সতীশচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক অভিধান গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন—অর্থাভাবে তাহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই। ৪৯ বৎসর বয়সে সহসা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তিনি বৃদ্ধা জননী, পত্নী ও পুত্রকন্যাগণকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। আমরা এই শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। নবজাগ্রত বাঙ্গালী তাঁহার সাহিত্য-সাধনার ফলগুলিকে যোগ্য সমাদর করিবেন কি?

বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

শ্রীযুক্ত ত্রিগুণা সেন যাদবপুরের "বেঙ্গল টেক্‌নিকাল ইনষ্টিউটের" কৃতী ছাত্র। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি তথায় শিক্ষকতা করিতেছিলেন। জার্ম্মাণীর "ডিউট্‌স্‌কি একাডেমী, মিউনিক" এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষার জন্য ৩৪ জন প্রার্থীর মধ্যে তিনিই মনোনীত হইয়াছেন। এ জন্য জার্ম্মাণীর উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে তিনি বৃত্তিলাভ করিয়াছেন। মিউনিকের এঞ্জিনীয়ারিং য়ুনিভারসিটিতে তিনি সম্প্রতি কলের জল সংক্রান্ত পূর্ত্তকার্য্য বিষয়ে বিশেষভাবে গবেষণা ও অধ্যয়ন-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন।

মণীন্দ্র-স্মৃতি

"There is a greater man than the great man—the man who is too great to be great."

আজ যাঁহার জন্য বাংলার অনেক দীন-দরিদ্রের ঘরে মর্ম্মন্তুদ হাহাকার উঠিয়াছে, সে প্রশান্ত হাস্যময় সৌম্যদর্শন মণীন্দ্রচন্দ্র আর ইহ-জগতে নাই। নিষ্ঠুর কাল যে অমূল্য রত্ন অপহরণ করিয়াছে, গগনভেদী বিলাপরোল তুলিলেও আর তাহা ফিরাইয়া দিবে না। জন্মিলে মরে, মরিলে আর ফিরে না, এ দৈনন্দিন নিত্য সত্যের পুনরুল্লেখ করিতেছি কেন, তাহার কারণ—এ দেশে তাঁহার ন্যায় মুক্তহস্ত আদর্শ পুরুষ ও মহৎ চরিত্রের প্রয়োজন আছে বলিয়া। তবে ইহাও জানি—যেমনটি যায়, তেমনটি আর হয় না।

মণীন্দ্রচন্দ্রের পিতা ছিলেন বর্দ্ধমান জেলার মাথরুণ গ্রাম-নিবাসী নবীনচন্দ্র, মাতা কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথের কন্যা গোবিন্দসুন্দরী। নবীনচন্দ্রের ন্যায় নির্ব্বিরোধ, সরল, সহানুভূতি-সম্পন্ন, সাদা-সিধে মানুষ আমি দেখি নাই। অন্যদিকে মাতা ছিলেন তেমনি তেজস্বিনী।

নবীনচন্দ্রের তিন পুত্র, পাঁচ কন্যা। মণীন্দ্রচন্দ্র অষ্টম গর্ভের সন্তান। তাঁহার জন্ম শ্যামবাজার ২০নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে। ইঁহার জন্মের অল্পদিন পরে মাতা স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার মধ্যমা কন্যা স্তন্যদানে মণীন্দ্রকে মানুষ করিয়াছিলেন। মণীন্দ্রের জন্ম ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মাতামহ রাজা হরিনাথের সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্রচন্দ্রের স্বভাব ছিল অত্যন্ত 'কুনো' এবং একান্ত অধ্যয়নানুরাগী। তেমন 'রাশভারী' লোক সচরাচর দেখা যায় না। সন্ধ্যার প্রাকালে অন্দরের পুকুর-পাড়ে বসিয়া মাছকে ময়দার গুলি খাওয়ান ছিল তাঁহার একমাত্র আমোদ ও নিত্য সঙ্গী ছিল, রাশি রাশি পুস্তক আর এক দেশী কুকুর বাঘা। উপেন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব্বে ছুটিয়া ছুটিয়া ছাদে আসিয়া আকাশ পানে চাহিয়া সে কুকুরের কি চীৎকার ও কান্না! অধ্যয়ন-কীট হইলেও উপেন্দ্র প্রকৃষ্ট পরিমাণে হৃদয়বান্ ছিলেন।

মধ্যম যোগেন্দ্রচন্দ্রের আকৃতি ও প্রকৃতি রাজপুত্রের মত ছিল। অকালে তাঁহার কালপ্রাপ্তি ঘটে। এই দুর্ঘটনার পর ইঁহারা সপরিবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

শ্যামবাজার বঙ্গ-বিদ্যালয়ে পাঠ সাঙ্গ করিয়া মণীন্দ্র হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি হন। কিন্তু পঞ্চম শ্রেণী পার না হইতে তাঁহাকে নিদারুণ শিরঃপীড়া আক্রমণ করে। সে সময় একেবারে অচৈতন্য অবস্থায় থাকিতেন। এখন হইতে তাঁহাকে বিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া গৃহ-শিক্ষকের অধীনে বিদ্যাচর্চ্চা করিতে হয়। স্বয়ং বঞ্চিত হইয়া শিক্ষা-বিস্তারকল্পে তিনি বহু বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। শিক্ষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল ঐকান্তিক। এক্ষণে যাঁহারা কৃতবিদ্য হইয়া সমাজে গণ্যমান্য হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অন্ন, বস্ত্র এবং পরীক্ষার ফির জন্য তাঁহার নিকট ঋণী। কেবল তাহাই নহে, টেক্‌নিক্যাল্ এডুকেশনে উন্নতি এবং কৃতিত্ব লাভ করিবার জন্য তিনি অনেক শিক্ষার্থীকে পাশ্চাত্য জগতে প্রেরণ করিয়াছিলেন কেবল এক সর্ত্তে—শিক্ষিত হইয়া দেশের কাযে জীবন সমর্পণ করিতে হইবে। মণীন্দ্র বিদ্যালয়ে কঠোর শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরকে যমের ন্যায় ভয় করিতেন এবং উপেন্দ্রের নির্ম্মম শাসনের ভয়ে সময় সময় তাঁহাকে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। এই নিমিত্ত তিনি বলিতেন, শিক্ষকের দোষে ছাত্র মিথ্যাচার শিক্ষা করে।

এই আত্মত্যাগী পুরুষের সকল কার্য্যই ছিল পরার্থে এবং স্বদেশের হিতকল্পে। মাতামহ রাজা হরিনাথ কন্যার সংস ...র-খরচের নিমিত্ত প্রায় লক্ষ টাকা কলিকাতা হাইকোর্টে ...গচ্ছিত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, কালক্রমে কোম্পানীর কাগ...জের সুদ কমাতে তাহার আয়ে আর সম্পূর্ণভাবে ব্যয়-নির্ব্বা... হয় না। এ দিকে আত্মীয়-স্বজন-মুখাপেক্ষী মণীন্দ্রচন্দ্র সপ...বারে তাঁহার পৈতৃক বাস মাথরুণে স্থানান্তরিত হইলেন। কত লোক কত কথা বলিল; কিন্তু তিনি অটল। মা...থরুণে দীন-দরিদ্রের সহিত বাস করিয়া, তাহাদের সু...-দুঃখের ভাগী হইয়া মণীন্দ্র একটি অমূল্য সম্পদ পা...ইয়াছিলেন—দৈন্যের সহিত সহানুভূতি। এই মাথরুণে অবস্থানকালে এক দিন স্নান করিতে যাইবার সময় মণী...ন্দ্রের পায় একটি বৃহৎ কণ্টক বিদ্ধ হয়। অসহ্য যন্ত্রণায় মণী...ন্দ্র বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন, কার জন্য, কিসের ...জন্য এত সহ্য করি? কিন্তু তখনই আত্মীয়-স্বজনের মুখ মনে ...পড়িল। কলিকাতায় ফিরিবার

সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন। অতি দীন-দরিদ্র প্রজারাও তাঁহার কাছে অবারিতদ্বার। বড়লোকের দরবারে দাখিল হইতে হইলে কত বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই অবগত। তাঁহার দরবার হইতে বিদ্রোহী প্রজাও কখনও বিমুখ হয় নাই। অন্ত লোক ভয় পাইত, কি জানি কার মনে কি আছে! কিন্তু তিনি নির্ভীক ছিলেন। কেবল তাহাই নহে। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, ইঁহার কাছে কোন ভয় নাই। দরিদ্রের অভাব-অভিযোগ শুনিবার জন্য তাঁহার কর্ণ সর্ব্বদাই উৎকর্ণ হইয়া থাকিত।

পরোপকার, পরসেবার জন্য তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই ব্যগ্র ছিল। কৈশোরে দেখিয়াছি, এক বালক—রাতকাণা গাড়ী-ঘোড়ার ভয়ে চলিতে পারিতেছে না। এক পাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। পথের লোক জিজ্ঞাসা করিতেছে ও সম্পূর্ণ উত্তর না শুনিয়াই উদাসীনভাবে চলিয়া যাইতেছে। মণীন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া গৃহে পৌঁছাইয়া দিতেছেন। এমনি কটা কথা বলিব? আজ সকলই মনের ভিতর ওলোট্-পালট্ খাইতেছে।

লক্ষ লক্ষ মুদ্রা যিনি লোকহিতার্থে ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহার ত্যাগের কথা আর বলিতে হইবে না। অন্য দিকে তাঁর ক্ষমাও ছিল অসামান্য, ভৃত্য বা কর্ম্মচারী অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছে; লোক কর্ম্মচ্যুত করিবার ইঙ্গিত করিতেছে। মণীন্দ্র ধীরগম্ভীরস্বরে বলিলেন, তাই উচিত বটে, কিন্তু তা হ'লে ও খেতে পাবে না। তাঁহার এই উদারতায় ইতর লোক আস্কারা পাইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত, তথাপি ক্ষমার অন্ত নাই।

এমন পূত, সংযত চরিত্র আমি অল্পই দেখিয়াছি। তিনি অনেকবার অনেক পরীক্ষায় পড়িয়াছেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার পদস্খলন হয় নাই।

"জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন"—মহাপ্রভুর এই মহানীতি তাঁহাতেই মূর্ত্ত দেখিয়াছি।

মণীন্দ্রচন্দ্রের চরিত্র বুঝাইতে আমরা কয়েকটি ছোট ছোট ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি, কেন না, ছোট কাযেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়। এইবার তাঁহার দুই একটি বড় কাযের কথা বলিব। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ৭ই আগষ্ট তারিখে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদকল্পে টাউন হলে মহাসভা আহূত হয়। দেশের কোন ভূস্বামীই এ সভার সভাপতিত্ব গ্রহণে সম্মত হইলেন না। সে সঙ্কটের অবস্থায় কাশিমবাজারাধিপতি মূল সভাপতির পদ গ্রহণ না করিলে সকল আয়োজনই ব্যর্থ হইত। তিনি কলিকাতায় যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আমার বাসায় আসিয়া বলিলেন, "আর অমত কোরো না। কর্তৃপক্ষের ব্যবহার সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে।" তাঁহার নির্ভীক তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি দেখিয়া আমি আর কোন কথা বলিলাম না। বুঝিলাম, এই কার্য্যের জন্য যে তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে, সে নিমিত্ত তিনিও প্রস্তুত হইয়াছেন।

তিলি-জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমন্বয় মণীন্দ্রের দ্বিতীয় মহদনুষ্ঠান। এ দেশে সৎকার্য্য-সাধন করিতে গেলে যে সকল প্রতিবন্ধক ঘটে, এ ক্ষেত্রেও তাহার অভাব ছিল না। ছোট লোক ছোট কথা বলিয়া মুখের উপর মণীন্দ্রকে কতই না অপমান করিয়াছে। মণীন্দ্র হাসিয়াছেন মাত্র।

উপাধি ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া কত লোক তাঁহার কত অপবাদ ঘোষণা করিয়াছে। তিনি কোন দিনই কোন প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু আমি তাঁহার মনের সংবাদ জানি; বলিতেন, কি জান, খেতাবগুলো থাকলে রাজ-দরবারে কথার একটু গুরুত্ব হয়। দেশের কল্যাণ-সাধন ও রাজনীতিসম্বন্ধে তাঁর অভিমত ছিল, First deserve then desire, প্রথম যোগ্যতা, তার পর কামনা।

মণীন্দ্রচন্দ্রের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, পুনঃ পুনঃ নিরাশ হইয়াও নিরুৎসাহ হইতেন না। অসাফল্য বরং তাঁহাকে অধিকতর উত্তেজনা প্রদান করিত। কঠিন মাটী ভেদ করিয়া যেমন অঙ্কুরোদ্গম হয়, তাঁহার কর্ম্ম-প্রেরণাও তেমনি সর্ব্বপ্রকার বাধা অতিক্রম করিত।

মণীন্দ্রচন্দ্রের বন্ধু-প্রীতি সম্বন্ধে মহাকবি গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

> "বাল্য-প্রেম, বাল্য-বন্ধু, বাল্য-সংস্কার।
> যেই জন উচ্চাসনে বাল্য দিন রাখি মনে
> বাল্য-বন্ধু সনে করে বালক-ব্যাভার।
> সেইরূপ একান্তর, নাহি কভু ভাবান্তর,
> নিরন্তর সরল নির্ম্মল প্রেমধার।
> প্রেমপুষ্পে সুবাসিত হৃদয় আগার।"

যত দিন স্মৃতির উদয়, আমি তাঁহার এই নির্ম্মল স্বার্থশূন্য সৌহার্দ্দ্য উপভোগ করিয়াছি। আশৈশব সুদীর্ঘ সংস্রবে তাঁহার সহিত একত্র স্নান, ভ্রমণ, ক্রীড়া, বিহার করিয়াও তাঁহার বিশাল হৃদয়ের সম্যক্ পরিচয় পাই নাই, এই কয়েক ছত্রে তাঁহার কি চিত্র পরিস্ফুট করিব? তবে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পড়িয়াই তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। নহিলে আমার বর্ত্তমান অবস্থা তাহার অনুকূল নহে।

হায় অভিন্ন-হৃদয় সোদরাধিক সুহৃদ্বর! একবার রেলগাড়ীর তলদেশ হইতে দৈবরক্ষিত হইয়াছিলে; হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় পরের জীবন রক্ষা করিতে গিয়া নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া, তুমি আসন্ন-মৃত্যু হইতে দৈববলে রক্ষা পাইয়াছিলে, আর আজ সামান্য ঝড়ে বহু জনাশ্রয় মহাতরু নিপতিত হইল!

মণীন্দ্রচন্দ্র আর নাই! যে মহাপ্রাণ অনুক্ষণ দেশের ও দশের কল্যাণ ধ্যান করিত, তাহা মহাপ্রয়াণ করিয়াছে; যে হৃদয় নিরন্তর পরার্থে স্পন্দিত হইত, তাহা নিস্পন্দ হইয়াছে; শ্রান্ত কর্ম্মক্লান্ত জীবন মহানিদ্রা-মগ্ন! উৎসবে, শোকে, সম্পদে, বিপদে তোমাকে সকল অবস্থায় দেখিয়াছি, উপর্য্যুপরি শোকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ বুক ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে, লোককল্যাণ-চিন্তায় কখন বিরত—কখন ভাবান্তর দেখি নাই। আজ এ কি ভাবান্তর? অনাবিল স্নেহ, অপার্থিব ভালবাসা, অকৃত্রিম প্রীতি, অকপট সৌহার্দ্দ্য জীবনে যাহা কিছু দিয়াছিলে, মৃত্যুতে সকলই কাড়িয়া লইয়া, রাখিয়া গেলে, কেবল তোমার তুরপনেয় স্মৃতি আর আমার অফুরন্ত অশ্রু!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

কেবলমাত্র অর্থলাভাশায় আমার বিবাহিতা পত্নী শ্রীমতী নবদুর্গা দেবীকে শ্রীলশ্রীযুক্ত মোহান্ত মহারাজের হস্তে—'

মোহান্ত হাসিয়া বলিলেন, "পুষ্পাঞ্জলিস্বরূপ অর্পণ করিলাম।"

মাণিক মৃদু হাসির সহিত বলিল, "ঠিক ঠিক, বেশ বলেছেন, হুজুর। নব-দুর্গাকে এক অঞ্জলি ফুলের সঙ্গে তুলনা করা উপযুক্তই হয়েছে—বেশ কবিত্বও হয়েছে। আমি বলতে যাচ্ছিলাম, 'স্বামীর সকল অধিকার ত্যাগ করিয়া সমর্পণ করিলাম।' আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর কাশীদাসী মহাভারত পর্য্যন্তই বিদ্যের দৌড় বৈ ত নয়,—কত আর হবে বলুন!"

মোহান্ত বলিলেন, "কিন্তু ঐ—'স্বামীর সকল অধিকার ত্যাগ করিয়া'—ওটা থাকা চাই। কারণ, ফৌজদারী আইন অনুসারে, কোনও স্বামী যদি স্বেচ্ছায় তার স্ত্রীকে ও পথে যেতে দেয়, তা হ'লে ৪৯৭ ধারার মোকর্দ্দমা চলে না।"

মাণিক বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। এই রকম লিখিয়ে নিয়ে, তার পর, হুজুর তাকে বখশিস ১০ হাজার হুকুম করেছেন ত? অর্দ্ধেকটা টাকা, ৫ হাজার তাকে গুণে দিয়ে, টাকার রসিদ লিখিয়ে নেবো,—আর বাকী ৫ হাজার, এক বছর কেটে গেলে তাকে দেওয়া যাবে।"

"তা কি সে শুনবে? সেও ত ঝানু বড় কম নয়!"

"হুজুর না হয় একটা চিঠির মত লিখে তাকে দেবেন।"

মোহান্ত হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এই তুমি অত্যন্ত বোকার মত কথা বল্লে, মাণিকলাল! আমি লিখে দেবো নিজে হাতে ঐ কথা! ক্ষেপেছ? শতং বদ মা লিখ শোননি? তা ছাড়া, ও রকম চুক্তির কোনও মূল্যই যে আইনের চোখে নেই, সেটা সম্ভবতঃ সে জানে। ওকে 'ইম্মরাল কনট্রাক্ট' বলে কি না। বেশ্যা ভাড়াটে ভাড়া না দিয়ে চ'লে গেলে তার নামে বাড়ীওয়ালার নালিশ পর্য্যন্ত চলে না, তা জান ত?"

মাণিক বলিল, "আজ্ঞে না,—ও সব আইনের কি জানি আমরা?—যদি তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ৫ হাজারে রাজি করতে পারা যায় ত চেষ্টা করা যাবে। না শোনে ত টাকা ত মজুতই রাখা হয়েছে।"

মোহান্ত বলিলেন, "তার পর?"

মাণিক বলিল, "আজ রাতের ট্রেণেই অধরকে কাশী ছাড়তে হবে, সে কথা ত ব'লেই তাকে রাখলাম। বোধ হয়, দেশেই সে যেতে চাইবে। টিকিট কিনে, আমি নিজে গিয়ে তাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসবো এখন।"

"অধর ওদের কি ব'লে আসবে?"

"বলবে, 'ডুমরাওন থেকে হঠাৎ জরুরি তার পেলাম, কাল সকালেই একটা বিশেষ কাযে কাছারীতে দেওয়ানজী আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন, সে কাযটুকু সেরে পশু'ই আবার আমি ফিরে আসবো, তোমাদের কিছু ভয় নেই। বাড়ীওয়ালা লোকটি বড় ভদ্র, তাঁকেও ব'লে যাচ্ছি, তাঁর দ্বারবান্‌ও রইল, বাইরের ঘরে সে শুয়ে থাকবে, বাজার-হাটও সে ক'রে দেবে এখন। মস্ত সহর যায়গা, চারিদিকে পুলিস গিসগিস করছে, কিছু ভয় নেই।' তা অধর চালাক আছে,—আমড়াগেছে সে বিলক্ষণ করতে পারবে, সে জন্যে চিন্তা নেই।"

"তার পর?"

"তার পর খবর পাঠাতে হবে যে, অধর ডুমরাওনে হঠাৎ কলেরা রোগে মারা গেছে।"

মোহান্ত হাসিয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! একেবারে মেরেই ফেলবে বেচারীকে?"

মাণিক বলিল, "তা নইলে আর উপায় কি হুজুর?"

"তার পর, মেহের-উন্নিসাকে এনে রাজভবনে তুলবে ত?"

মাণিক বোকার মত চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "সে আবার কে?"

মোহান্ত বলিলেন, "কেন, তুমি ত সে ঘটনা জানো। বলেছিলে,—তোমার ছেলে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ছিল, তুমি তামাক খেতে খেতে ব'সে ব'সে শুনছিলে। সেই নূরজাহানের গল্প। আগে সে বিবির নাম ছিল মেহের উন্নিসা কি না।"

মাণিক বলিল, "ওঃ, তাই না কি? হ্যাঁ, তাকে রাজবাড়ীতে এনেই আশ্রয় দিতে হবে বৈ কি। তার পর, তাকে পোষ মানাবার কৌশল, হুজুরেরই হাতে।—এই ত আমার খসড়া, এখন মঞ্জুর করা না করা আপনার হাত।"

মোহান্ত বলিলেন, "হ্যাঁ, খসড়া যা তৈরী করেছ, ঠিকই হয়েছে। তবে, তাকে বাড়ী এনে, কাশীতে বেশী দিন থাকা চলবে না। এ হ'ল মস্ত সহর, চারিদিকে লোকজন,

পুলিস, থানা! 'তোমায় তোমার বাপের বাড়ী পৌঁছে দিই চল'—এই কথা ব'লে তাকে নিয়ে কোনও নির্জ্জন পাড়াগাঁয়ে গিয়ে কিছুদিন বাস কর্‌তে হবে। যা হোক, সে পরের কথা পরে বিবেচনা করা যাবে, এখন অধরটার কাছে একরারনামা লিখিয়ে নিয়ে ওকে ত ভাগানো যাক্।"

ক্রমে ট্রেণ মোগলসরাই ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। দীনু খানসামা কেলনারের এক খানসামাকে ডাকিয়া আনিল, আদেশমত মোহান্ত মহারাজের জন্য সে কিঞ্চিৎ জলযোগ আনিয়া দিল।

গাড়ী ছাড়িল। কাশী ষ্টেশনে পৌঁছিলে মোহান্ত জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, অধর নামিয়া জেনানা-গাড়ীতে গিয়া নবদুর্গা ও হরিশের মাকে নামাইয়া লইয়া, কুলীর মাথায় বাক্স বিছানা প্রভৃতি দিয়া, এক পাল যাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে ফটকের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আবার গাড়ী ছাড়িল। মোহান্ত বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে নামিবেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

অধরের কাণ্ড।

যথা উপদেশ, মোগলসরাই ষ্টেশনে অধর নামিয়া জেনানা-গাড়ীর নিকট গিয়া হরিশের মাকে বলিয়াছিল, "হরিশের মা, আমি একটা মৎলব করেছি। আমরা যেখানে নামবো, সেই ইষ্টেশন ত এখনও দূরে আছে। কাশীতে নেমে, বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন ক'রে যাওয়া যাক চল। তুমি ত কখনও দেখনি। আমাদের উপকারের জন্যে, তুমি তোমার দলছাড়া হলে, তোমার অদেষ্টে কাশী-দর্শনের সুযোগ আর ঘট্‌বে কি না, তাই বা কে জানে। চল, সেরেই যাওয়া যাক।"

হরিশের মা পরমানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

অধর বলিল, "আজই ত আমার সদরে হাজির হবার কথা। টেলিগ্রাফ আপিসে গিয়ে দেওয়ানজীর নামে একটা তার পাঠিয়ে দিই যে, আর তিন দিনের ছুটী দরকার, কাশীতে নেমে বাবা বিশ্বনাথকে একবার দর্শন ক'রে যাব। তোমরা খন কিছু খাবে কি? খাবার-টাবার কিছু এনে দেবো?"

হরিশের মা অবগুণ্ঠনবতী নবদুর্গাকে জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ বউদিদি, কিছু খাবে এখন?"

নবদুর্গা শিরশ্চালনা করিয়া জানাইল, সে কিছু খাইবে না।

হরিশের মা বলিল, "না দাদা বাবু, এখন কনে' কিছু খাবেন না। পাণ ফুরিয়েছে, কিছু পাণ আর দোক্তা যদি কিনে দেন।"

"আচ্ছা, পাণ এনে দিচ্ছি, দোক্তা পাওয়া যাবে কি না জানিনে। দেখি গে।"— বলিয়া অধর চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণমধ্যে দুই দোনা পাণ, কাগজে মোড়া কিঞ্চিৎ জর্দ্দা আনিয়া হরিশের মা'র হস্তে দিয়া, "যাই, তারখানা পাঠিয়ে আসি"—বলিয়া প্রস্থান করিল এবং দেখিতে দেখিতে ভিড়ের ভিতরে মিশিয়া গেল।

কাশী ষ্টেশনে পৌঁছিয়া অধর স্ত্রীলোকগণকে নামাইয়া লইয়া ফটকের বাহির হইবামাত্র একপাল পাণ্ডা তাহাকে ছেঁকিয়া ধরিল, এবং "বাবু আপনার বাড়ী কোন্ জেলায়?" প্রভৃতি প্রশ্নে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু অধর কাহারও চীৎকারে কাণ না দিয়া, যেখানে একা ও ছ্যাকড়া গাড়ীগুলি দাঁড়াইয়া ছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইল, কারণ, পূর্ব্বকথিত বাঞ্ছারামকে, সেখানে সে দণ্ডায়মান দেখিয়াছিল। বাঞ্ছারামও অধরকে দেখিতে পাইয়া, তাহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, আপনার বাড়ী দরকার?"

"হ্যাঁ, দরকার ত বটে। কিন্তু এক গাদা যাত্রীর সঙ্গে এক বাড়ীতে আমি থাকতে পারবো না। একটি ছোট নিরিবিলি বাড়ী পাওয়া যেতে পারে?"

"আজ্ঞে হাঁ, কেন পাওয়া যাবে না? কত দিন থাকা হবে?"

অধর উত্তর করিল, "এই—দিন তিনেক। তিন রাত্রি বাস না করলে ত তীর্থফল হয় না। তুমি কে?"

"আজ্ঞে, আমি বাড়ীওয়ালা বাবুর সরকার। এই কাশীতে আমার মনিবের ছোট বড় কয়েকখানি বাড়ী আছে, সে সব বাড়ী যাত্রীদের ভাড়া দেওয়া হয়। আমি রোজ ষ্টেশনে এসে যাত্রী নিয়ে যাই। যেমন বাড়ী আপনি খুঁজছেন, তেমন বাড়ী আমাদের আছে। পাকা দোতলা বাড়ী, নীচে দু'খানি, উপরে দু'খানি ঘর, ছাদে রান্নাঘর, জলের কল পাইখানা সবই আছে।"

"হ্যাঁ, ঐ রকম বাড়ীই আমার দরকার। তা, দৈনিক ভাড়া কত দিতে হবে?"

"খুব সামান্য, দিন দেড়টাকা হিসাবে ভাড়া।"

দরদস্তুরের ভাণ করিয়া অধর দৈনিক এক টাকা ভাড়া স্থির করিয়া বলিল, "আচ্ছা, তা হ'লে গাড়ী ঠিক কর একখানা।"

বাঞ্ছারাম গাড়ী ঠিক করিয়া আনিয়া, ইঁহাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া কোচম্যানকে বলিল, "চল রামাপুরা।"

বাড়ীতে পৌছিয়া অধর বলিল, "হ্যাঁ হরিশের মা, বাড়ী ত হ'ল, এখন রান্নাবাড়ার কি হবে ? ওহে বাঞ্ছারাম, এক জন রসুয়ে বামুন পাওয়া যেতে পারে ?"

বাঞ্ছারাম বলিল, "হ্যাঁ বাবু, রসুয়ে বামুন চান, রসুয়ে বামুন এনে দিতে পারি, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের বিধবা কত রয়েছে, তারা যাত্রীদের রান্না ক'রে দিয়ে দিন গুজরাণ করে, যদি বলেন ত সে রকমও নিয়ে আস্‌তে পারি, ঝি বলেন, চাকর বলেন,—কাশী হেন স্থান, অভাব কিসের ?"

অধর বলিল, "আচ্ছা, তা হ'লে এক জন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের বিধবা,—একটু ভারিখ্যে বয়সের—"

হরিশের মা ঘরের ভিতর হইতে বলিল, "দাদাবাবু বউদিদিমণি বলছেন, ব্রাহ্মণে দরকার নেই, তিনি নিজেই রাঁধবেন।"

অধর বলিল, "না না হরিশের মা, সেটা কি কাযের কথা হ'ল ? বিয়ের কনে, হাঁড়ি ঠেলবে কেন ? বিশেষ কাল সমস্ত রাত্তির রেলে ঘুম হয় নি, কষ্টের একশেষ হয়েছে। না হে বাঞ্ছারাম, তুমি এক জন ব্রাহ্মণের বিধবাই, পাকশাক করবার জন্যে নিয়ে এস। রাত্রে সে এখানেই শোবে ত ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, শোবে বৈ কি। তবে বাসন-টাসন সে মাজবে না।"

অধর বলিল, "বাসন কি আর এখানে আমরা সঙ্গে যাব। ও শালপাতা টালপাতা এনেই কায চালানো যাবে। তবে ঘর-দোর ঝাড় দেওয়া, কাপড়-চোপড় কাচা, সে সব হরিশের মা পারবে—কেমন পারবে ত গা হরিশের মা ?"

ভিতর হইতে হরিশের মা বলিল, "খুব পারবো, দাদাবাবু!"

বাঞ্ছারাম বলিল, "ছাদে জলের কল আছে। আপনারা একে একে চান-টান সেরে নিন্। আমায় বাজারের টাকা দিন, কি কি আনতে হবে ব'লে দিন, আমি আগে ঐ মোড়ের দোকান থেকে কিছু জলখাবার কিনে এনে দিই, চান ক'রে জলটল খান আপনারা—তার পর বাজার যাব, আর অমনি এক জন বামনীকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবো।"

অধর বাঞ্ছারামের হস্তে দুইটি টাকা দিয়া, যাহা যাহা আনিতে হইবে, তাহাকে বলিয়া দিল। বাঞ্ছারাম প্রস্থান করিল।

স্নান ও জলযোগ শেষ হইলে অধর একটা ঘরে বিছানা পাতিয়া বসিয়া তামাক ধরাইল। বলিল, "হরিশের মা, তোমরা দু'জনেও স্নান ক'রে একটু জল মুখে দিয়ে ও ঘরে বিছানা পেতে একটু গড়াও। বাজার নিয়ে, বামনী নিয়ে কখন্ সে ফিরবে, তা ত বলা যায় না। খাওয়া-দাওয়া হ'তে বোধ হয় বেলা গড়িয়ে যাবে।"—তামাকু সেবনান্তে অধর নিজেও শয়ন করিল এবং অতি শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙ্গিলে সে দেখিল, বেলা তখন পড়ন্ত হইয়া আসিয়াছে, ছাদে রান্নাঘর হইতে পাকের ছ্যাঁক-ছ্যাঁক শব্দও আসিতেছে।

অধর উঠিয়া ও ঘরে গিয়া দেখিল, হরিশের মা গভীর নিদ্রায় মগ্ন, কিন্তু নবদুর্গার বিছানায় নবদুর্গা নাই। সে তবে বোধ হয় উপরে রান্নাঘরে আছে।

অধর তখন শব্দ না করিয়া, পা টিপিয়া টিপিয়া ছাদে গিয়া দেখিল, সত্যই নবদুর্গা রান্নাঘরের ভিতর বসিয়া কুটনা কুটিতেছে, পাচিকা ভাত চড়াইয়াছে।

বরকে দেখিয়া নবদুর্গা ঘোমটা টানিয়া দিল। অধর বলিল, "ওগো শোন ; একবার বাইরে এস ত।"

নবদুর্গা নড়ে না। পাচিকা বলিল, "যাও মা, বাবু কি বলছেন, শুনে এস।"

তথাপি নবদুর্গা জড়বৎ। পাচিকা বলিল, "সাত পাকের বিয়ে করা স্বোয়ামী ত, ভয় কিসের মা ? যাও, তুমি শুনে এস, আমি ত এইখানে ব'সে রয়েছি।"

নবদুর্গা বাহির হইল। রান্নাঘরের পশ্চাতে একটা ভাঙ্গা তক্তোপোষ পড়িয়া ছিল, কোঁচার খুঁটে ধুলা ঝাড়িয়া অধর তাহার উপর বসিয়া বলিল, "তুমিও ব'স নবদুর্গা, তোমার সঙ্গে বিশেষ জরুরী কথা আছে। মুখের ঘোমটা খোল। লজ্জা কোরো না, এ লজ্জার সময় নয়,—কারণ, একটা মহা বিপদ আমাদের সম্মুখে। সে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার একটা কৌশল আমি মনে মনে ঠিক করেছি। তোমাকে সে সব কথা বুঝিয়ে বলা আমার দরকার।"

নবদুর্গা কয়েক মুহূর্ত্তকাল ঘোমটা খুলিবার কোনও লক্ষণ দেখাইল না। প্রথমাবধিই সে কাঁপিতেছিল—এখনও দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। তার পর ধীরে ধীরে মুখ হইতে অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া, বরের মুখের পানে নিমেষমাত্র চাহিয়া, নতমুখী হইয়া সেই তক্তপোষে, একটু দূরে বসিয়া পড়িল। [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-রোটারী-মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নর্ত্তন

বসুমতী-চিত্রবিভাগ]   [শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন।

৮ম বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ [২য় সংখ্যা

পারমার্থিক রস

৩

সংস্কৃত-সাহিত্যের রসনিরূপণ করিতে যাইয়া মহামুনি ভরত হইতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ পর্য্যন্ত আলঙ্কারিকগণ যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সার সংগ্রহপূর্ব্বক রস-তত্ত্বের বিশ্লেষণ যতদূর সংক্ষেপে সম্ভবপর, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধ কয়টিতে দেখান হইয়াছে; কিন্তু এই আলঙ্কারিকগণ-সম্মত রস মনুষ্যের আধ্যাত্মিক জীবনে কতদূর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তদ্বিষয়ে ঐ সকল আলঙ্কারিকগণ বিশেষ করিয়া কিছুই বলেন না। তাঁহাদের বর্ণিত রস সহৃদয়গণের হৃদয়-রাজ্যে অভিনয়-দর্শনকালে বা শ্রব্যকাব্যের অনুশীলনকালে ক্ষণিক আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়, তাহা কিয়ৎকালের জন্য রসাস্বাদনকারী সহৃদয়গণকে প্রাকৃত বাস্তব জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এক কল্পনাময় স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়, সে রাজ্যে সাংসারিক মানব কিছুকালের জন্য লৌকিক ব্যবহারের সীমা অতিক্রম করিয়া এক নবীন প্রাতিভাসিক সৃষ্টির আনন্দময় সত্তার অনুভব করিতে সমর্থ হয়, সেই আনন্দানুভূতির প্রবাহে লৌকিক অহমিকার আবর্জ্জনা কোথায় বহিয়া যায়; দ্বেষ, হিংসা ও কলহের অন্তর্দাহকর সন্তাপ অকস্মাৎ নিবিয়া যায়, রক্ত-মাংসের গড়া মানুষ কিয়ৎকালের জন্য চিন্ময় ও আনন্দময় মানুষ হইয়া উঠে—ইহা সত্য এবং সকল সহৃদয়েরই স্বানুভব-সংবেদ্য; কিন্তু এই প্রাকৃত রসের আস্বাদনে মানুষ একবারে চিরদিনের জন্য অপ্রাকৃত মানুষ হইতে পারে না—আবার তাহাকে পার্থিব ব্যবহার-রাজ্যে নামিয়া আসিতে হয়, রসাস্বাদসম্বলিত অপ্রাকৃত স্বপ্নরাজ্য তাহার ভাঙ্গিয়া যায়, থাকে কেবল তাহার উদ্দীপনা-মাখা স্মৃতিমাত্র। সেই স্মৃতিই তাহাকে আবার রঙ্গশালায় দর্শকরূপে লইয়া যায় বা মধুর কাব্যের অনুশীলনে কদাচিৎ প্রবৃত্ত করে; কিন্তু তাহাতে তাহার আশা পূর্ণ হয়

না—প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না, সে সত্য সত্যই প্রাকৃত মানুষভাব পরিহারপূর্ব্বক জীবনের শেষ শ্বাস পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত বা দিব্য মানুষ হইয়া থাকিতে পারে না।

লৌকিক বা প্রাকৃত রসের এই অসম্পূর্ণতা পরিহার করিয়া—ইহাকে আধ্যাত্মিক শান্তিপূর্ণ জীবনের প্রধান উপকরণরূপে পরিণত করিবার জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—তাহার ফলে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র নবজীবন লাভ করিয়াছে, ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের জন্য সহস্রাধিক বৎসর হইতে প্রবর্ত্তিত রসশাস্ত্র হিন্দু সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ আধ্যাত্মিক জীবন-সৃষ্টির সর্ব্বপ্রধান উপায়রূপে পরিণত হইয়াছে। এই বিষয়ের অনুসন্ধান ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আজ বাঙ্গালী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গালার অনেক চিন্তাশীল লেখক এখন এই বিষয়ে ভাল ভাল প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন; ইহা যে বাঙ্গালা সাহিত্যসমুন্নতির একটা বিশেষ সুলক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই কবি-কল্পনা-প্রসূত প্রাকৃত রসকে অপ্রাকৃত রসরূপে পরিণত করিয়া জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়সাধন দ্বারা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে ভাবমন্দাকিনীর প্রথম প্রবাহ যিনি বহাইয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষ শ্রীরূপ গোস্বামীর অসাধারণ কল্পনা ও ধীশক্তির পরিণতিস্বরূপ গ্রন্থনিচয়ের সহিত এখনও আমাদের রস-সাহিত্যের লেখকবৃন্দের পরিচয় নিতান্ত অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এ দিকে আমাদিগের যে ভাবে দেখা উচিত, তাহা আমরা বড় কেহই দেখিতেছি না। সুতরাং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের প্রকৃত উপাদেয়তা কি, তাহা আমরা ভাল করিয়া পরিষ্কারভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না—তাই বাঙ্গালীর বর্ত্তমান কালোপযোগী আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্যের বিকাশ সুশৃঙ্খলার সহিত হইয়া উঠিতেছে না। বাঙ্গালী নিজের সমাজকে ভাঙ্গিতেছে, কিন্তু গড়িতে পারিতেছে না। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, তাহার একমাত্র হেতু এই যে, এখনও বাঙ্গালী বাহিরের রস-তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া তৃষ্ণা মিটাইবার আশায় পরের মুখের দিকেই চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার গৃহে যে রসামৃতসিন্ধু রহিয়াছে, তাহার খবর এখনও সে ভাল করিয়া পাইতেছে না।

এ সংসারে রসের অনুভূতি বা আস্বাদনই হইতেছে মানবের পরম বা চরম পুরুষার্থ,—অনাদিকাল হইতেই প্রাকৃত কবিগণ কল্পিত বা ঐতিহাসিক স্ত্রী-পুরুষরূপ নায়িকা বা নায়ককে আলম্বনরূপে অবলম্বন করিয়া সামাজিক সহৃদয়গণের হৃদয়ে সেই রসানুভূতি করাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন এবং সময়বিশেষে এবং পাত্রবিশেষে তাদৃশ কবিজনোল্লিখিত রসের আস্বাদন পূর্ব্বকালে হইয়াছে, এখনও হইতেছে এবং ভবিষ্যৎকালেও হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই; কিন্তু এই প্রকার কবিকল্পনা-প্রসূত অনিত্য অথচ প্রাপঞ্চিক আলম্বনাদির ভাবনাময় আস্বাদন হইতে যে প্রাকৃত রস কিয়ৎকালের জন্য সহৃদয়-হৃদয়ে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে, তাহা সুখস্বরূপ হইলেও বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজনিত বৈষয়িক সুখ হইতে বিভিন্ন নহে; কারণ, তাহা অচিরস্থায়ী এবং পরিণামে হিতকর নহে, অথচ উপনিষদ্ বলিতেছে, "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী-ভবতি কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" (সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই রস, সেই রসস্বরূপ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া এই সংসারী মানব আনন্দের সহিত নিত্যসম্বদ্ধ হইয়া থাকে, এই রসরূপ আনন্দ যদি না থাকিত, তাহা হইলে এ সংসারে কে স্পন্দিত হইত—কেই বা জীবিত থাকিত? সেই আনন্দরূপ রসই আকাশ অর্থাৎ আকাশের ন্যায় অনাবৃত, অখণ্ড ও সর্ব্বব্যাপী।)

ইহাই যদি রসের স্বরূপ হয়, তাহা হইলে এই রস কবি-বর্ণিত কাব্য বা নাটকে নাই—হইতেও পারে না, ইহা কে অস্বীকার করিবে? রসের জন্যই আবহমান কাল হইতে কাব্যসৃষ্টি হইয়া আসিতেছে, অথচ সেই সকল কাব্যের অনুশীলনে যাহার সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে রস নাই—রসের গন্ধমাত্র আছে, রসের নামটি মাত্র আছে। ভক্তের অনুভূতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা পূর্ব্বক বলিতে গেলে বলিতে হয়, ঐ সকল প্রাকৃত কাব্যপ্রসূত উন্মাদনাময় চিত্তবিকার বা চিত্তবিক্ষোভ পারমার্থিক রসের তুলনায় রসাভাসব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। কেন এমন হইল? রসসৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত যুগযুগান্তরের কবিবৃন্দ রসের খবর এ পর্য্যন্ত এ সংসারে দিতে পারিলেন না কেন? এই দুরূহ প্রশ্নের উত্তর প্রথমে সুস্পষ্টভাবে যিনি নিজ গ্রন্থে দিয়াছেন, তিনিই শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী। তাঁহার সিদ্ধান্ত কি, তাহারই আলোচনা দ্বারা পরমার্থ-রসের প্রকৃতস্বরূপ কি, তাহাই বুঝাইবার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে; সেই আলোচনা অল্প বিস্তৃত

হইবে। বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া, আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ এই বিষয়ে অপেক্ষিত অবধান দিতে বিমুখ হইবেন না।

মানুষকে প্রাকৃত সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতময় অবস্থা-বৈষম্যের পঙ্কিল আবর্ত্ত হইতে উদ্ধৃত করিয়া শান্তিময়—প্রসাদময়, অনাবিল সুখসাগরে ডুবাইয়া রাখিবার জন্য ধীশক্তিসম্পন্ন প্রতিভাশালী মানব যতপ্রকার বাঙ্ময় বিবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে দুই প্রকার সাহিত্যই সভ্য সমাজে প্রধান বলিয়া বহুদিন হইতে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। প্রথম রস-সাহিত্য, দ্বিতীয় অধ্যাত্ম-সাহিত্য। প্রথম জাতীয় সাহিত্যের প্রভাব মানব-হৃদয়ের ভাবময় রাজ্যের উপর বিস্তারলাভ করিয়াছে, আর দ্বিতীয় জাতীয় সাহিত্যের অর্থাৎ অধ্যাত্ম-সাহিত্যের প্রভাব মানবের প্রমাণজনিত মনোবৃত্তি বা বিবেক-বিজ্ঞানের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এই উভয় প্রকার সাহিত্যের একটি ধারার নাম সাহিত্যশাস্ত্র, অন্য ধারাটির নাম অধ্যাত্মশাস্ত্র। প্রথমের অধিকার হইতেছে মানবের হৃদয়ে, দ্বিতীয়ের অধিকার হইতেছে মানবের মস্তিষ্কে। ভাবনিচয়ের বা feelingএর উৎকর্ষবিধান দ্বারা মানবকে আনন্দভোগ করানই সাহিত্যশাস্ত্রের উদ্দেশ্য; অপর দিকে ভাব বা feelingকে উপেক্ষা করিয়া প্রমাণ-বৃত্তির বা intellectএর সম্যক্ সমুৎকর্ষসাধন দ্বারা মানবের ত্রিবিধ দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির বিধান ও সেই সঙ্গে পরমানন্দের সম্মুখীকরণ হইতেছে অধ্যাত্মশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। একের উদ্দেশ্য—প্রমাণ-বৃত্তির উপেক্ষা সহকারে ভাবসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা; দ্বিতীয়ের উদ্দেশ্য—ভাবরাজ্যের বিধ্বংসসাধনপূর্ব্বক প্রমাণ-বৃত্তির সাম্রাজ্যসংস্থাপন। এই উভয়বিধ সাহিত্যের অর্থাৎ রস-সাহিত্যের ও অধ্যাত্মসাহিত্যের উপাসকগণ অনাদিকাল হইতেই বিভিন্নপথাবলম্বী হইয়া পরস্পর পরস্পরকে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় মতের প্রাধান্যরক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া আসিতেছেন। রস-সাহিত্যের উপাসকগণ আপনাদিগকে রসিক বলিয়া পরিচয় দিতে যেমন গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকেন, তেমনই অধ্যাত্মশাস্ত্রের ঐকান্তিকভাবে অনুশীলনকারিগণকে শুষ্ক দার্শনিক বলিয়া উপহাস করিয়া তৃপ্তির অনুভব করিয়া থাকেন। অপরদিকে অধ্যাত্ম-সাহিত্যের উপাসকগণ রস-সাহিত্যের ঐকান্তিকভাবে অনুশীলনকারিগণকে প্রাকৃত কামী পুরুষ বলিয়া নিন্দা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না এবং আপনাদিগকে জ্ঞানী পরমার্থদর্শী বলিয়া পরিচয় দিতে উল্লাস বোধ করিয়া থাকেন। এইরূপে এই বিভিন্ন পথাবলম্বী দ্বিবিধ সাহিত্যিকগণের মতবিরোধ অতি প্রাচীন কাল হইতেই শুধু ভারতে নহে, সকল সভ্য দেশেই বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; কোন কালে যে তাহা একবারে বিরত হইবে, সে আশাও সুদূরপরাহত।

মস্তকের সহিত হৃদয়ের এই বিরোধ, জ্ঞানের সহিত ভাবের কলহ উভয় প্রকার সাহিত্যের অর্থাৎ রস-সাহিত্য ও অধ্যাত্মসাহিত্যের অসম্পূর্ণতার হেতু হইয়া দ্বিবিধ সাহিত্যের পরিপূর্ণ বিকাশের বাধা প্রদান করিয়া আসিতেছে। এই বাধার বিষময় পরিণাম পূর্ব্বকালবর্ত্তী আচার্য্যগণ যে দেখেন নাই, তাহা নহে; কারণ, নব্য অলঙ্কারশাস্ত্রের উদ্ভাবয়িতা আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য—ভাবহীন জ্ঞান এবং জ্ঞানহীন ভাব এই উভয়ের কোনটিই মানুষের হৃদয়ে স্বতঃসিদ্ধ রসাস্বাদনাভিলাষকে চরিতার্থ করিতে পারে না, এই কথা তাঁহার 'ধ্বন্যালোক' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বড়ই সুন্দরভাবে একটি শ্লোকের দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন, সে শ্লোকটি এই—

"যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং ন বা
দৃষ্টির্যা পরিনিষ্ঠিতার্থবিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিতী।
তে দ্বে অপ্যবলম্ব্য বিশ্বমখিলং নির্বর্ণয়ন্তো বয়ং
শ্রান্তা নৈব চ লব্ধমব্ধিশয়ন! ত্বদ্‌ভক্তিতুল্যং সুখম্॥"

এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই যে,—(নানাপ্রকার রসকে আস্বাদন করাইবার জন্য সর্ব্বদা সমুদ্যত যে কবিগণের নিত্য নবীন প্রতিভাময়ী দৃষ্টি এবং অব্যভিচারি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ পারমার্থিক বস্তুতত্ত্বের প্রকাশ করিতে সমর্থ যে প্রমাণ-পরতন্ত্র জ্ঞানী পুরুষগণের দৃষ্টি, আমরা এই উভয় প্রকার দৃষ্টির সাহায্যে এই অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্ব-রহস্যের উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইয়া আজীবন পরিশ্রম করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। হে ক্ষীরোদশায়িন্ রসঘন চিদানন্দময় পুরুষ! তোমাকে ভালবাসারূপ যে ভক্তি-রস—সে রসাস্বাদনরূপ সুখ কিন্তু এই উভয় প্রকার দৃষ্টির সাহায্যে আমরা লাভ করিতে পারিলাম না।)

রসাস্বাদই মানবজীবনের চরম পুরুষার্থ; কারণ, রসই জীবের সারাজীবনের আকাঙ্ক্ষিত, সেই চিরবাঞ্ছিত রস আস্বাদন করিবার জন্য কবিদৃষ্টির সাহায্য যেমন নিষ্ফল,

সেইরূপ প্রমাণৈকশরণ শুষ্ক জ্ঞানীর দৃষ্টিসাহায্যও অকিঞ্চিৎকর; সুতরাং কেবল জ্ঞানমার্গে বা কেবল ভাবমার্গে রসকে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য যে খেদ করিয়াছেন এবং সেই খেদকে মিটাইবার জন্য, ভক্তিরসাস্বাদরূপ নিত্য সুখের আশায় অহর্নিশয়ন শ্রীভগবানের চরণাম্বুজে নিজের যে ব্যাকুলতাময় প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছেন, সেই খেদ ও প্রার্থনা নিবৃত্ত ও পূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্যের যুগে নহে, তাহা পূর্ণ হইয়াছিল আমাদের জন্মভূমির প্রিয় সন্তান কৌপীনমাত্র সম্বল শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর অমরকৃতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর আবির্ভাব হইবার পর, শ্রীগৌরাঙ্গচরণাশ্রিত শত শত ভক্তসাধকবৃন্দের। বাঙ্গালা গৌড়ীয় ভক্তিসম্প্রদায়ের ইতিহাস এ বিষয়ে জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে তাই নিঃসঙ্কোচে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বথৈব দুরূহোহয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে॥"

এই যে ভগবৎস্বরূপভূত রস, ভক্তিহীন মানবসমূহের দুরূহ, শ্রীভগবানের পাদপদ্মযুগলই যাহাদের সর্ব্বস্ব, সেই ভক্তগণই এই ভগবৎস্বরূপ রসের আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

এই শ্লোকটিতে শ্রীগোস্বামিপাদ সাক্ষাৎ ভগবান্‌কেই রস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ"—হৃদয়ে ভক্তি না থাকিলে, এই রসাত্মা ভগবানের আস্বাদন হইতে পারে না, ইহাও স্পষ্টভাবে এই শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—সেই ভক্তির অধিকারীকে তাহাই বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া গোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেই বলিয়াছেন,—

"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

ভোগলিপ্সা ও মুমুক্ষারূপ পিশাচী যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত সে হৃদয়ে ভক্তি-সুখের উদয় হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

এই শ্লোকটির ভিতর পারমার্থিক রসতত্ত্বের যে নিগূঢ় রহস্য রহিয়াছে, এইবার তাহারই আলোচনা করিব।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

শ্বেত-করবী

হেরিলাম বট-বিদ্ধ দেউল পশ্চাতে
শ্বেত করবীর গুচ্ছ লঘু চিত্ত-শোভা,
পূত যেন হরহাস্য ভক্ত-মনোলোভা
শিশির-সুধায় স্নিগ্ধ তরুণ প্রভাতে।

অমনি পড়িল মনে নীহারিকাচ্ছবি
নীলিমার স্বপ্নরাজ্যে শুভ্র রত্নরাজি
করবী মাধুরী স্থানে চিত্ত মোর আজি
হ'ল যেন লঘু শুভ্র,—তরুণ করবী,

নির্ম্মাল্য চন্দন-গন্ধে বিহঙ্গের গানে
ভাবাবেশে চিত্ত মোর হ'ল বিগলিত—
দেখিলাম ঊর্দ্ধলোকে দিব্য সুললিত
দেবীর চরণপদ্ম—ভাবলব্ধ ধ্যানে।

তুলি শ্বেত করবীরে ধরিলাম মাথে
বন্দন চন্দন আমি দিনু তার সাথে।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

স্রোতের মালা

সন্তান যখন মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া বিচিত্রা ধরণীর প্রথম আলোকরশ্মির নৃত্যলীলা দেখে, তখন তাহার চিত্তে কোন রেখাপাত হয় কি না, কে বলিবে? বিজ্ঞান বা দর্শন সে সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে কি না, জানি না, অন্ততঃ আমার এই পঞ্চদশ বর্ষ বয়সের স্বল্প জ্ঞান ও সামান্য বিদ্যাবুদ্ধির পরিধির মধ্যে সে সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত মীমাংসার পরিচয় পাই নাই। তবে এইটুকু বলিতে পারি, জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে, পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় আরম্ভের সূচনা হইতে মাতৃমূর্ত্তির দেখা পাই নাই; শুধু দেখিয়াছি, আমার পিতৃদেব একাধারে মাতা ও পিতার স্নেহ ও পালন-নৈপুণ্যে আমাকে কোলে পিঠে করিয়া রাখিতেছেন! তাহাতে তৃপ্তি জন্মিত, স্নেহের ক্ষুধা মিটিত; কিন্তু পূর্ণ মাত্রায় কি? মাতার আদর কিরূপ, পল্লীর অন্যান্য আমার বয়সী বালক-বালিকার গৃহচিত্র হইতে তাহার মধুর ও রৌদ্র রস মাঝে মাঝে আমার কাছে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে দেখিতাম। বুকের মধ্যে যখন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিত, পিতার স্নেহশীতল বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার ব্যথা জুড়াইতে চাহিতাম। বাবা বোধ হয় আমার ক্ষোভ বুঝিতেন। দেখিতাম, তাঁহার সদাপ্রসন্ন আননে রেখাপাত হইয়াছে। এমনই ভাবে শৈশব ও বাল্যের রঙ্গমঞ্চে পট-পরিবর্ত্তন চলিতে চলিতে কৈশোরের যবনিকা দুলিয়া দুলিয়া নূতন দৃশ্যের অভিনয় দেখাইবার জন্য উত্তোলিত হইল।

বাবা পণ্ডিত মানুষ ছিলেন কি না, জানি না; কিন্তু তাঁহার বসিবার ঘরে রাশি রাশি পুস্তক সজ্জিত ছিল এবং তিনি অবসরসময়ে পুস্তকরাশির মধ্যে সমাহিতচিত্তে বসিয়া থাকিতেন দেখিতাম। আমাকে কোনও দিন তিনি বিদ্যালয়ে যাইতে দেন নাই। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তিনি আমাকে স্বয়ং লেখাপড়া শিখাইতেন। তাঁহার কাছে পাঠ লইতে আমার এমন আনন্দ হইত, এত কিছু শিখিয়া ফেলিতাম যে, আমার বয়সী কোন মেয়েকে তেমনভাবে শিখিতে দেখি নাই।

বাবা কোনও চাকরী করিতেন না। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়াছিলাম, আমাকে একা বাড়ীতে রাখিয়া তাঁহার পরের কাছে চাকরী করিতে যাওয়ার সুবিধা নাই দেখিয়া তিনি নিয়মিতভাবে কোথাও চাকরী করিতে পারেন নাই। সাহিত্য রচনা করিয়া তিনি সংসার চালাইতেন। বাঙ্গালা দেশে সাহিত্য-সেবার বিনিময়ে অর্থাগমের সম্ভাবনা কত অল্প, তাহা বাবার সামান্য উপার্জ্জনের পরিমাণ দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম। দেখিয়াছি, বাবা সমস্ত দিন ও গভীর রজনীর অধিকাংশকাল কালি ও কলমের সাহায্যে যাহা রচনা করিতেন, তাহার বিনিময়ে যাহা ঘরে আসিত, কোনও রকমে কয়টি প্রাণীর তাহাতে চলিয়া যাইত মাত্র। কিন্তু সে জন্য সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি পিতৃদেবকে কোনও দিন ধৈর্য্যচ্যুত হইতে দেখি নাই।

পিতার শিক্ষার গুণে বয়সের অনুপাতে আমার জ্ঞান-ভাণ্ডারে সঞ্চয়ের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। দেশ-বিদেশের অনেক কথা আমি শিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। য়ুরোপ ও আমেরিকায় যাহারা সাহিত্যসেবা লইয়া থাকেন, তাঁহারা অপর্য্যাপ্ত অর্থ উপার্জ্জন করেন। যশঃ, প্রতিপত্তি, সম্মান যে কোনও সম্রাটের অপেক্ষা তাঁহাদের অল্প নহে। অতি সাধারণ শ্রেণীর সাহিত্যসেবক, তাঁহাদের লিপি-নৈপুণ্যের ফলে যে অর্থ-সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া থাকেন, বাঙ্গালাদেশে প্রতিভাশালী লেখক তাহার সহস্রাংশ পাইলেও ধন্য হইতেন।

বাবা কথা-সাহিত্যের প্রমোদোদ্যানে বিচরণ করিতেন। তাঁহার রচনা নানা মাসিকপত্রের পৃষ্ঠদেশ সুশোভিত করিত, বহু গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার সমাদর যে পরিমাণে ছিল, অর্থ সে পরিমাণে আসিতে

আমাদের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইত। কিন্তু বাঙ্গালার কবি ক্ষুব্ধহৃদয়ে গাহিয়া গিয়াছেন,—

"যে জন সেবিবে তোমার চরণ
সেই সে দরিদ্র হবে।—"

বাবাকে অনেক সময় সে কথা বলিতাম। তিনি বীণাপাণির সেবায় তনু-মন ঢালিয়া না দিয়া যদি অন্যভাবে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে এমন কঠোর পরিশ্রম, ভীষণ তপস্যা করিয়া শরীরকে ক্লান্ত, মনকে শ্রান্ত করিতে হইত না। অভাবের সঙ্গে এমনভাবে প্রতিদিন সংগ্রাম করিতেও হইত না।

বাবা হাসিতেন। তাহাতে দৃঢ়চেতা মানুষের অবিচলিত সঙ্কল্পই শুধু প্রকাশ পাইত। অনেক দিন হইতে তাঁহার মুখের হাসি শুকাইয়া গিয়াছিল। আমাদের দারিদ্র্যপীড়িত সংসারে আমরা অন্যের অপেক্ষা সন্তুষ্টচিত্তেই থাকিতাম; কিন্তু সে সন্তোষেরও অধিকারী হইবার সৌভাগ্য আমাদের সহে নাই। আমার দাদা—বাবার একমাত্র আশা ও ভরসাস্থল, আমার খেলার সাথী, আনন্দনির্ঝর জ্যেষ্ঠাগ্রজ রাজ-অতিথিরূপে পাষাণপ্রাচীর-বেষ্টিত, প্রহরিরক্ষিত দুর্গম প্রাসাদে নির্জ্জন বাস করিতেছিলেন। দাদা আমার অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের বড়। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া পিকেটিং করার সময় প্রথমে দাদা জেলে গিয়াছিলেন। কয়েক মাস পরে মুক্তিলাভ করিয়া দাদা আবার পড়াশুনায় মন দিয়াছিলেন। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় আবার তাঁহার ভাগ্যাকাশে শনিগ্রহের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। একবার খাতায় নাম লেখা হইয়া গেলে আর বুঝি উদ্ধারের আশা থাকে না। দেশজননীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলে মাঝে মাঝে পাষাণ-প্রাসাদে অতিথি হইবার অবকাশ কোন্ দিক্ দিয়া কি ভাবে সমুদিত হয়, তাহা কি কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারে?

আজ এক বৎসর দাদা আমাদের গৃহকোণ, বাবার স্নেহ-ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন। পিতা মুখে কিছু বলিতেন না, কিন্তু বুঝিতাম, কি গভীর বেদনার প্রবাহধারা তাঁহার বুকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। আমার স্নেহময় সহোদর, আমার গর্ব্ব ও আনন্দের আধার, আমার বুকে বিচ্ছেদের যে তীব্র ব্যথা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতেই বাবার মর্ম্ম-বেদনার কতকটা পরিমাণ করিতে পারিতাম।

কিন্তু উপায় নাই, উপায় নাই! যাহারা যত সহ্য করে, যন্ত্রণার, বেদনার অন্তহীন প্রবাহধারা তাহাদের বুকের উপর দিয়াই বহিয়া যায়, দুঃখের অগ্নি নিয়তই তাহাদিগকে দহন করে। ইহাই কি বিধিলিপি? কে জানে!

২

বসন্ত-প্রভাতের তরুণ-তপনরাগরঞ্জিত কুসুমকাননের বিচিত্র-বর্ণবিলাস ইন্দ্রজাল রচনা করে। যৌবন-বসন্তের স্নিগ্ধ-প্রভাত আমার মনকেও অভিভূত করিয়াছিল—যৌবনের ইন্দ্রজাল শুধু মোহই বিস্তার করে। অবস্থা, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন—কিছুই বিচার করে না। ইন্দ্রজালের মায়া মনকে আচ্ছন্ন করিয়াই চলে।

দাদা আরও ৩ বৎসর ধরিয়া পাষাণ প্রাচীরমধ্যে তাঁহার নিঃসঙ্গ যৌবনের কর্ম্মোদ্যম, উৎসাহ, উদ্দীপনার সমাধির গতি লক্ষ্য করিতেছেন। মুক্ত আলোক ও বাতাসে আমার বিকশিত-যৌবনের রঙ্গীন নেশা নয়নে-মনে প্রত্যহই শক্তিসঞ্চয় করিয়া উঠিতেছে। অদৃষ্টের বিচিত্র প্রকাশ নহে কি?

বাবার দুশ্চিন্তার কারণ বুঝিতে পারিতেছি। সুন্দরী বলিয়া আমার কোনও খ্যাতি না থাকিলেও দর্পণে প্রতি-বিম্বিত উদ্দাম যৌবনোচ্ছ্বাস-বিলসিতদেহ দেখিয়া বুঝিতাম, কেন পিতৃদেব দিন দিন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছেন। বহুদিন ধরিয়া তিনি আমাকে পাত্রস্থা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু অর্থহীন, সহায়সম্পদ্‌হীন, দরিদ্র, কথা-সাহিত্যিকের 'চলনসই' কন্যাকে কোন্ সুপাত্র বরণ করিয়া লইবেন? দেশ শুনিতেছি, আত্মবিস্মৃতি হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে। দেশের তরুণগণ দেশজননীর সকল-প্রকার দুর্দ্দশা মোচন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নেতৃগণ জ্বালাময়ী ভাষায় জনসাধারণকে ডাক দিয়া দেশের যাহা কিছু আছে, ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান করিতেছেন। দেশের নারীজাতি সহস্রপ্রকারে লাঞ্ছিতা বলিয়া প্রতীকার-কামনায় স্বাধীনতাকামী বহু বীরহৃদয় ফুলিয়া দুলিয়া উঠিয়াছে—সংবাদপত্রে প্রতিদিনই তাহার বিবরণ পড়িতাম। কিন্তু তথাপি দেখিতেছি, নারীধর্ষণ, নারীহরণ অবাধে এই হতভাগ্য বাঙ্গালাদেশে নিত্য-ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। আর কন্যাকে পাত্রস্থা করিবার জন্য ভাগ্যহীন জনক দ্বারে দ্বারে ব্যর্থ-মনোরথে ফিরিতেছে।

দেশের বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবক—সকলেই এ বিষয়ে নির্ব্বিকার। উপযুক্ত দর্শনী দাও, সুন্দরী সুশিক্ষিতা কন্যার গতি হইতে পারে। যাহাদের তাহা নাই—বিংশশতাব্দীর সভ্যযুগে তাহারা অপাংক্তেয়। জীবন-যুদ্ধে তাহারা অবশ্যই মরিবে, কে তাহাদের রক্ষা করিতে পারে?

সুদূর কারাগার হইতে দাদার পত্র মাঝে মাঝে আসিত। পড়িয়া বুঝিতে পারিতাম, বাবা মানসিক উদ্বেগের আভাস দাদাকেও জানাইতেছেন। দাদা উৎসাহ দিয়া পত্র লিখিতেন, কিন্তু তবু ছত্রের ফাঁকে ফাঁকে নৈরাশ্যের ম্লান রেখার দাগ পড়িয়াছে, বুঝিতাম।

নারীর যৌবনে ধিক্, অষ্টাদশ বর্ষ বয়সেও সহস্র ধিক্! পাড়ায় গ্লানিভরা যে জনশ্রুতি দিন দিন এই দরিদ্র পরিবারের উদ্দেশে প্রবল হইয়া বাতাসকেও ভারী করিয়া তুলিতেছিল, তাহার পূতিগন্ধে দেহ ও মনকে অশুচি করিয়া দিল।

ছাদে উঠিয়া বস্ত্রাদি রৌদ্রে দিতে গিয়াও নিস্তার নাই। লুব্ধদৃষ্টি—যুবক ও প্রৌঢ়, কাহাকেই বা বাদ দিব!—সকল সময়েই বিষাক্ত শরের ন্যায় আমাকে আহত করিত। যে বাঙ্গালী এক দিন শুধু মৃন্ময়ীকে মা বলিয়া নিরস্ত হয় নাই, বিশ্বের নারী-জাতিকে মা বলিয়া কায়মনোবাক্যে পূজা করিবার আয়োজন করিয়াছিল—প্রকৃতপ্রস্তাবে, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিকেই নানা ভাবের মাতৃরূপ দিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল, আজ তাহাদেরই বংশধরগণ নারীকে শুধু ভোগের বস্তু ব্যতীত অন্য কোনও ভাবে কল্পনা করিতে অসমর্থ! এই শ্রেণীর তরুণই কি দেশজননীকে মুক্তির স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইবে?

বাবার কাছে পল্লীর উৎপাতের সকল কথাই বলিতাম। বলিবার প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার সমগ্র দৃষ্টি তাঁহার মাতৃহারা কন্যার চারি পার্শ্বে অনুক্ষণই সতর্কভাবে সুদর্শন চক্রের ন্যায় আবর্ত্তিত হইত। সকল সংবাদই তিনি রাখিতেন।

অনূঢ়া যুবতী কন্যা একাকিনী পিতার সহিত বাস করে—বিবাহ দিবার কোন চেষ্টা নাই, ইত্যাকার নিন্দাবাদে কর্ম্মহীন, পরচর্চ্চাপ্রিয় মানুষের নিষ্ঠুর রসনার বিষ এমন তীব্র ও অসহনীয় হইয়া উঠিল যে, বাধ্য হইয়া, বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়া, পিতা পুরাতন পল্লী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাসা পরিবর্ত্তন করিলেন।

"মা, অতি হতভাগা তোর এই বাবা! মেয়েকে তার দুর্নাম—মিথ্যা গ্লানি থেকে অব্যাহতি দেবার শক্তিও পর্য্যন্ত হ'ল না!"

পিতৃদেবের সৌম্য আননে অশ্রুর বন্যা নামিয়া আসিল। এমন ভাবে বাবাকে কোনও দিন বিচলিত হইতে দেখি নাই। তিনি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন।

পুরুষ-জাতির প্রতি সমগ্র হৃদয় বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। কেন? নারী কি এতই উপেক্ষণীয়? আমার শরীরে জ্যোৎস্নার তরঙ্গ নাই; কিন্তু আমি ত অপ্রিয়দর্শনা নহি। শিক্ষা?—তাই বা কয় জন কলেজের ছেলে, এই বয়সে আমার মত সুশিক্ষা পাইয়াছে? সাহিত্য, ইতিহাস,—এ দেশী বিদেশী, বাবা ত আমায় ভাল করিয়াই পড়াইয়াছেন! বীজগণিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, মোটামুটি আমিও ত শিখিয়াছি। কালিদাস, ভবভূতি, সেক্সপীয়র, মিল্‌টন, ওয়ার্ডস ওয়ার্থ, সেলি, মাইকেল হইতে রবীন্দ্রনাথ, ডিকেন্স টলষ্টয় হইতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি বাবার কাছে এই বয়সে যতটুকু পড়িয়াছি, কলেজের কয় জন ছেলে তাহা জানে? তবে কেন আমি উপেক্ষণীয়া? গৃহকর্ম্ম?—গরীবের মেয়ে আমি, ইহাতে ত আমার জন্মগত অধিকার! তবে?

বাবার কণ্ঠলগ্ন হইয়া শুধু ডাকিলাম, "বাবা! বাবা!"

আত্মসংবরণ করিয়া বাবা আমার মাথায় হাত রাখিলেন।

৩

নূতন পল্লীর অপেক্ষাকৃত নিভৃত প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র একতল গৃহে আবার সংসার সাজাইয়া লওয়া গেল। বাবা ক্রমশঃই পরিশ্রমের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন। তাঁহার রচনায় আমিও কিছু কিছু সাহায্য করিতে লাগিলাম। সংশোধিত পাণ্ডুলিপির নকলের কার্য্য প্রধানতঃ আমিই করিতাম।

নূতন বাসায় আসিবার পর এক জন সুদর্শন যুবক মাঝে মাঝে বাবার কাছে আসিতে লাগিলেন। শুনিলাম, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। বাবার কথা-সাহিত্যে সুনাম আছে, তাই তাঁহার কাছে এই যুবক নিজের রচনা দেখাইয়া সে সম্বন্ধে দোষ-ত্রুটি সংশোধন করাইয়া লইতে আসিতেছেন। ছাত্র বা শিক্ষার্থী পাইলে বাবার আনন্দ ও উৎসাহের সীমা থাকিত না।

বাহিরের ঘরে কেহ উপস্থিত থাকিলে আমি কখনই

সেখানে যাইতাম না। অবশ্য এ বিষয়ে বাবার কোন নিষেধ ছিল না। তিনি আধুনিক মতের স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন না; কিন্তু আমার বাবার মত উদার—নারীজাতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল মানুষের সংবাদ আমি জানি না। তিনি কখনও আমার কোন কার্য্যে বাধা দিতেন না, তবে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পৃথিবীর মহীয়সী নারীদিগের জীবনাদর্শের কথা সকল সময়ে উল্লেখ করিতেন। দাদা আমাদের পরলোকগতা জননীর একখানি তৈলচিত্র রচনা করাইয়াছিলেন। দেখিতাম, বাবা প্রত্যহ দুই বেলা সেই তৈলচিত্রের সম্মুখে নিমীলিত-নয়নে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া কি ধ্যান করিতেন। তাঁহার রচনার মধ্যে কোথাও আধুনিক নারীপ্রগতির বিরুদ্ধে বা অনুকূলে কোনও তীব্র মন্তব্যের সমাবেশ দেখি নাই; তবে নারীর উচ্চতর, মহত্তর আদর্শের যে ছবি তাঁহার লেখনীতে ফুটিয়া উঠিত, বিংশ শতাব্দীর নারীপ্রগতির কথা তাহাতে যেন ম্লান হইয়া যাইত। তিনি আমার পিতা—এ জন্য তিনি আমার অসীম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজার পাত্র সত্য; কিন্তু তাহা ছাড়াও তাঁহার রচনার আমি ভক্ত শিষ্যা ছিলাম।

বাবার ছাত্রস্থানীয় এই যুবকটির ঘনঘন গতায়াতে আবার নূতন পল্লীতে জনরব গজাইয়া উঠিতে লাগিল। যে পল্লী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহার কুৎসিত জনশ্রুতিও কেমন করিয়া জানি না, এই পল্লীতেও আরব্যোপন্যাসে বর্ণিত বিপুলাবয়ব জিন্ দৈত্যের ন্যায় মাথা খাড়া দিয়া উঠিল।

এখানে আসিবার পর যে কয়স্থান হইতে বিবাহ-সম্বন্ধ আসিয়াছিল, পাকা দেখার পরও তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। বাবার মুখের হাসি একেবারেই নিভিয়া গেল। গৃহকোণের অন্ধকারকে সখীভাবে আলিঙ্গন করা ব্যতীত অন্য পথও রহিল না।

কয়েক মাস যাওয়া-আসার পর, বাবার যুবক শিষ্যটি অকস্মাৎ এক দিন যেন উধাও হইয়া গেলেন। সেই সঙ্গে জনরব সহস্রশীর্ষ অজগরের ন্যায় বিষের অনল উদ্গীর্ণ করিতে লাগিল। আমরা ত এমনই একঘরী হইয়া থাকিতাম। পাড়ার কেহই বাবার সহিত কোনও দিন যাচিয়া আলাপ করিতে আসেন নাই। অধিকাংশই কেরাণী বা ব্যবসায়ী ছিলেন। সাহিত্য-রসের সহিত বোধ হয় তাঁহাদের কোন পরিচয় ছিল না। পল্লীর কোন নারীই—তরুণী, বালিকা বা প্রৌঢ়া কেহই এই ভাগ্যহতা দরিদ্র-কন্যার সহিত বাক্যালাপের সুযোগ করিয়া লইতে পারে নাই। সেজন্য আমারও যে বিশেষ আগ্রহ অথবা দুঃখ ছিল, তাহাও সত্য নহে।

অষ্টাদশ বসন্ত পায় পায় আকাশের গাঢ় নীলিমা-সাগরে নিঃশব্দে ডুবিয়া গেল। প্রকৃতির কখনও পরিবর্ত্তন হয় না। তাহার হাস্য ও ক্রন্দন শুধু মানুষের মনে।

দাদার পত্র যথানিয়মে আসিতেছিল। বিংশ শতাব্দীর দৃঢ়মনা কর্ম্মী পুরুষ বাবাকে লিখিলেন, "সরমার ভাগ্যে যদি বিবাহ না-ই থাকে, তাহাতে হতাশ হইবার কারণ দেখি না। এ দেশে পুরুষ নাই, তাই তাহার যোগ্য পাত্রও মিলিতেছে না। বাঙ্গালী এখনও গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন। এত দিন বৃথাই আশা করিয়াছিলাম, দেশে জাগরণ আসিয়াছে। কুম্ভকর্ণের জাতির নিদ্রাভঙ্গের বিলম্ব আছে। আপনি উপনিষদ ও গীতার তপোবনে তাহার তপস্যার ব্যবস্থা করুন।"

কিন্তু পল্লীর অশান্ত তরুণ-দল শুধু আমাকে নহে, বাবাকেও অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কুমারী তরুণীর পাণিগ্রহণের পাত্র নাই; কিন্তু প্রথম রিপুর বাহুবন্ধনে নিষ্পিষ্ট করিবার লোকাভাব পল্লীগ্রাম কেন, সহরেও নাই। জানালার ফাঁকে হাতছানি, ছাদের উপর হইতে বিচিত্র ভঙ্গী—শ্লীলতা ও শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করিতে লাগিল। রসরাজের উল্লিখিত ভূতের দৌরাত্ম্য "কাঁচা বয়স" দেখিয়া দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। "গলায় দড়ির" অভিনয় পর্য্যন্ত নিরুপদ্রবেই অভিনীত হইয়া চলিল। লোষ্ট্র সহযোগে প্রণয়লিপির উৎপাতে বাড়ীর ছাদ ও অঙ্গন পর্য্যন্ত কলুষিত হইয়া উঠিল।

বাবার সহিষ্ণুতা দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। অহোরাত্র লেখনী অবিশ্রাম চলিতেছে। তাঁহার শীর্ণ আননে একটা বিচিত্র দীপ্তি ক্রমেই সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। আমি শঙ্কিত হইলাম।

সে দিন সন্ধ্যার পর বাবা গৃহে ফিরিয়াই বলিলেন, "মা জননী ছেলের জন্য বড় ভয় পেয়েছে, না, সরমা?"

অনেক দিন বাবার মুখে এমন প্রসন্ন হাসি দেখি নাই। বিস্মিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিলাম।

তেমনই প্রসন্নভাবে হাসিয়া তিনি বলিলেন, "চল্ মা, দিন কতক এই পাপ জায়গা ছেড়ে কোন এক তীর্থে গিয়ে বাস করি।"

বলিলাম, "তাই চল, বাবা! কিন্তু—"

বাবা হাসিয়া বলিলেন, "টাকা? সে হবে'খন।"

"কোথাও যেতে গেলে, অনেক টাকা খরচ। এত টাকা তুমি কোথায় পাবে, বাবা!"

পিতৃদেব আমার হাতে একতাড়া নোট দিলেন।

এ যে অনেক! একসঙ্গে এত টাকা জ্ঞান-সঞ্চারের সঙ্গে আমাদের হাতে আসিতে দেখি নাই। বিস্মিতভাবে বলিলাম, "এত টাকা তুমি কোথায় পেলে, বাবা?"

গণিয়া দেখিলাম, তিন শত টাকার নোট।

হাসিতে হাসিতে বাবা বলিলেন, "দু'খানা উপন্যাসের গ্রন্থস্বত্বের বিনিময়ে—আজ প্রকাশকের কাছে দু'খানা নূতন বই বেচে এলাম।"

দুইখানি মৌলিক উপন্যাসের বিনিময়-মূল্য তিন শত টাকা! হাঁ, বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যিকের অদৃষ্টে ইহার অধিক প্রাপ্য সাধারণতঃ দুর্লভ।

বাবা বলিলেন, "আর দেরী নয়, কালই রওনা হ'তে হবে। এ যায়গা সহ্য হচ্ছে না; অন্ততঃ মাস পাঁচেক ত জুড়িয়ে আসি।"

সেই ভাল। পশ্চিমের স্বাস্থ্যকর জলবায়ু বাবার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন।

৪

কোন বালাই নাই। সাঁওতাল পরগণার কোনও নিভৃত সহরের ক্ষুদ্র বাড়ীতে পিতা ও পুত্রীর বৈচিত্র্যহীন জীবনেও যেন একটা অনবদ্য শান্তির বাতাস বহিতেছিল। পরনিন্দা, পরচর্চ্চার অবকাশ ও সুযোগ—যাঁহারা বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য এ সকল স্থানে আসেন, তাঁহাদের বড় একটা থাকে না।

পিতার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে দেখিয়া তাঁহাকে শীঘ্র কলিকাতায় ফিরিতে দিলাম না। সঞ্চিত অর্থে ছয় মাস চালাইয়া দেওয়া গেল। এখানে বসিয়াই বাবা গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশকের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। সুতরাং সংসার একবারে শীঘ্র অচল হইবার সম্ভাবনা নাই।

দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরে পিতার সহিত মুক্তবায়ু সেবন করিয়া আমার মনেরও শান্তি ফিরিয়া আসিতেছিল। দেহে যৌবনশ্রী আরও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

বৎসর এইভাবে চলিয়া গেল। কিন্তু পিতাকে আবার অত্যন্ত বিচলিত ও চিন্তাশীল দেখিলাম। অনেক সময় তিনি আমার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠেন, বুঝিতে পারি। মুখে কোন কথা না বলিলেও, আমার জন্য প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, তাহা অনুমান করিয়া বাবার জন্য আমি আরও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। তিনি যে এত দিনের মধ্যে আমার একটা গতি করিতে পারিলেন না, এই দুর্ভাবনায় প্রতিদিন তাঁহার শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, ইহা বুঝিবার মত বয়স ও বুদ্ধি আমার যথেষ্টই ছিল।

হিন্দুর ঘরে উনিশ বৎসরের মাতৃহীনা কন্যাকে অবিবাহিতা রাখা যে কিরূপ গুরু সমস্যা, তাহা বুঝিতে পারি। কিন্তু উপায় কি? কেহই যখন আমাকে বরণ করিতে চাহে না, দরিদ্রের কন্যাকে কোনও ভদ্র ঘরের চরিত্রবান্ যুবকই যখন গৃহলক্ষ্মীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সম্মত নহেন, তখন সে জন্য আক্ষেপ করিয়া লাভ কি? পৃথিবীতে যত ফুল ফুটে, সবই কি দেবতা ও মানুষের কাযে লাগে? অনেক ফুলই ত অরণ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া, নিঃশব্দে অন্যের অগোচরে বিস্তৃত অরণ্যের ভূমিশয্যায় তাহার পুষ্প-জীবনের সমাধি লাভ করে! সে জন্য দুঃখ করিয়া কোন ফল নাই।

তবে বাবার জন্যই আমার সমস্ত অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিত। আমি যদি না জন্মিতাম, তাহা হইলে আজ তাঁহাকে প্রতিদিন অসহ্য যন্ত্রণার আগুনে দগ্ধ হইতে হইত না।

প্রভাতে বাবার জন্য চায়ের পেয়ালা লইয়া যখন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলাম, বাবা তখন নীরবে মুক্ত আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি হাত বাড়াইয়া পেয়ালাটা গ্রহণ করিলেন। তার পর বলিলেন, "মা, কাল কল্‌কাতায় যাচ্ছি। জিনিষ-পত্র সব গুছিয়ে রাখ।"

বলিলাম, "কেন বাবা, এখানে ত বেশ আছি। আবার কল্‌কাতা?"

বিস্মৃতপ্রায় গত জীবনের অনেক কথাই মনে পড়িল। শৈশবের সুখস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রথম-যৌবনের গ্লানিপূর্ণ

জীবন, নিন্দুকের অলস রসনানিক্ষিপ্ত মিথ্যা কুৎসা ও ইন্দ্রিয়-লালসায় অধীর, উচ্ছৃঙ্খল পুরুষের উৎপীড়ন! না, না,—এখানেই জীবনের অবশিষ্ট কাল, শেষ মুহূর্ত্ত, অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর নিকট বিদায় লইব। আমার সাধের বাঙ্গালার রাজধানীর বক্ষে ফিরিয়া গিয়া কায নাই। বাঙ্গালা মায়ের বুকে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারই বক্ষঃশোণিতে বর্দ্ধিত হইয়া, দেশ-জননীর আলিঙ্গনে ফিরিয়া যাইবার প্রবৃত্তি নাই, ইহা কি কম দুর্ভাগ্যের কথা! কিন্তু তথাপি ইহা সত্য—প্রদীপ্ত ভাস্করের ন্যায়ই অখণ্ড সত্য!

বাবাকে বলিলাম।

তিনি হাসিলেন। সে হাসি মর্ম্মান্তিক ব্যথারই দ্যোতক। বক্ষঃশোণিত গাঢ় হইয়া যেন ওষ্ঠপ্রান্তে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে! বাবা বলিলেন, "ওরে, পাগলী মেয়ে! তোর বাবা আর ক'দিন? তোর দাদার পরিণামও ত বুঝতে পাচ্ছিস্। অষ্টবাহু রাক্ষসের কবলে পড়লে তবু পরিত্রাণ আছে; কিন্তু সে যে জীবন-প্রবাহের আবর্ত্তে পড়েছে, তাকে তলিয়ে যেতে হবেই। কোন আশা নেই। তার পর এই নির্ম্মম, লুব্ধ, হিংস্র সংসারের মাঝখানে তোর অবস্থা কি হবে,ভেবে দেখ! আমরা থাক্‌তেই লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে তোকে রক্ষা করতে পারছি না, আর—"

বাবা শিহরিয়া উঠিলেন।

আমি বলিলাম, "তোমার চা জুড়িয়ে গেল, বাবা।"

"যাক্—" বলিয়া বাবা পেয়ালাটা এক পাশে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরের মধ্যে তিনি অত্যন্ত গম্ভীরভাবে পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলাম। বাবাকে চিন্তামুক্ত করিবার জন্য এই তুচ্ছ প্রাণ উৎসর্গ করা বিন্দুমাত্র কঠিন নহে; কিন্তু আমিও ত সম্পূর্ণ নিরুপায়!—ভগবান্! ভগবান্!

"না, সরমা!—কল্‌কাতায় যাওয়াই ঠিক। একটা সুবিধা হয়েছে. সেটা ছাড়া হবে না!"

আমি আর দাঁড়াইলাম না। বাবার জন্য আর এক পেয়ালা গরম চা আনিয়া দিতে হইবে।

৫

"অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়!"—এই কবি মানব-অদৃষ্টের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে নিশ্চিতই সুপরিচিত ছিলেন। কথাটা প্রতিবর্ণে সত্য।

কলিকাতার এক নূতন পল্লীতে আসিবার পর, পাত্রপক্ষ আমাকে দেখিয়া পছন্দ করিয়া গিয়াছিলেন। পাকা দেখার কথাও স্থির হইয়াছিল। কিন্তু অকস্মাৎ এক দিন সংবাদ আসিল,—এ বিবাহ হইবে না। পত্রযোগে তাঁহারা বাবাকে এ সংবাদ দিয়াই নিরস্ত হন নাই। বাবা যে সত্য গোপন করিয়া তাঁহার বিংশবর্ষীয়া ব্যভিচারিণী কন্যাকে তাঁহাদের গলায় ঝুলাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, এ জন্য শঠ, প্রবঞ্চক প্রভৃতি সুমিষ্ট বচন-প্রয়োগে তাঁহারা পিতাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। আমার জন্য দড়ি ও কলসীরও ব্যবস্থা দিয়াছিলেন।

বাবা আমাকে এ পত্রের বিষয় গোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার খাতা-পত্র গুছাইয়া রাখিবার সময় দৈবক্রমে আমি পত্রখানি আবিষ্কার করিয়াছিলাম। সে দিন তিনি বিশেষ কোন কাযে বাহিরে গিয়াছিলেন।

পড়িতে পড়িতে আমার সমস্ত রক্ত মাথায় আসিয়া জমা হইল। বাবার কোনও দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের নিকট সংবাদ লইয়া পাত্রপক্ষ জানিয়াছেন যে, বাবার কাছে এক জন যুবক সর্ব্বদাই আসিত। সেই যুবকের সহিত তাঁহার কন্যার অবৈধ-মিলন ঘটে। যুবক নিরুদ্দেশ। অবৈধ-মিলনের কুৎসিত ফলটিকে গোপন করিবার জন্য বাবা তাঁহার কন্যাকে লইয়া এত দিন অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। এখন আসরে নামিয়া সেই অচল কন্যাকে ভদ্রবংশে চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইত্যাদি।

হায়! বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরের কুমারী যুবতী!—ভাগীরথীর শীতল বক্ষেও তাহাদের স্থান হয় না!

সমগ্র শরীরে আগুন জ্বলিতে লাগিল। উঃ! এই জঘন্য পৃথিবীতে মানুষ থাকে!

কিন্তু জীবনের মোহ, পৃথিবীর আকর্ষণের মায়া ত্যাগ করিতে পারিলাম না। কিছুতেই দুর্ব্বলতাকে জয় করিয়া এ দেহের ধ্বংস করিবার শক্তি খুঁজিয়া পাইলাম না। আশা নাই, তথাপি নিভৃত মনের গুপ্তকোণে ও কাহার স্পন্দন?—বাঁচিয়া রহিলাম।

বাবা প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া আরও দুই স্থান হইতে ক্রমান্বয়ে পাত্রের সন্ধান করিয়া আনিলেন। বিস্ময়ের বিষয়, বিরাট রাজধানীতে পাশের বাড়ীতে মানুষ অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিলেও কেহ কাহারও সংবাদ রাখে না; কিন্তু

আমার বিবাহ-সম্বন্ধ আসিলেই আমার কুৎসার কথা রটনা করিবার লোকাভাব নাই। ক্রমে ভিত্তিহীন, মিথ্যা অপবাদ পল্লবিত হইয়া এমন ভাবে বিস্তৃত হইল যে, দিবালোকে বাবার গৃহ হইতে বাহির হওয়াও কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

এক দিন রুক্ষকেশে বাবা উন্মত্তের মত ঘরে আসিয়া বলিলেন, "আর পারি না, এক বাটি বিষও এখন অমৃত! প্রকাশকও আর বই নিতে চায় না! বলে—!"

কি যে বলে, তাহা বুঝিলাম। জন্মদাতা পিতা, পরমারাধ্য পিতৃদেব, অভাগিনী কন্যার জন্য অপযশঃ ও নিন্দার ভারে দিবাভাগেও লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারেন না! আমার জন্যই তাঁহার অন্ন-সংস্থানের পথও রুদ্ধ! আমার কি অপরাধ দেবতা! তুমি ত জান প্রভু, দেহ ত দূরের কথা, মনও কখনও কলুষস্পর্শ করে নাই! তবে কেন এই মিথ্যা, জঘন্য অপবাদ—লাঞ্ছনা! এমন জীবন বহন করার অপেক্ষা মৃত্যুও লক্ষবার বাঞ্ছনীয় নহে কি?

সমস্ত রজনী অনিদ্রার পর মুখ বুজিয়া সকালে বাবার খাবারের আয়োজন করিলাম।

স্নেহলতা!—স্নেহলতা! তুমি সহায়হীনা নারীর মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছ। ভগিনি, তোমার দেশে অকারণে লাঞ্ছিতা তোমার এই হতভাগিনী ভগিনীকে টানিয়া লও!

বাবা এখন বাড়ী নাই! তিনি এইমাত্র চন্দননগরে গিয়াছেন। নিশ্চয়ই সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিতে পারিবেন না। এখনই চমৎকার সুযোগ।

রক্ত কি চরণবিশিষ্ট জীব? মাথার ভিতর চরণবিন্যাসের দ্রুত, নির্ম্মম শব্দ অবিশ্রান্ত চলিয়াছে। পৃথিবী কি আজ রক্তাম্বর ধারণ করিয়াছে? সূর্য্যের আলোকে শোণিতধারার প্রবাহ কি ভীষণ!

চিরবিদায়ের পূর্ব্বে বাবার কাছে ক্ষমা চাহিয়া যাইব না? পাষাণ-প্রাচীরের আবেষ্টনমধ্যে দাদা চরম নিশ্বাস ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত—শোভাময়ী ধরণীর নিকট শেষ বিদায় লইবার পূর্ব্বে দাদার চরণে প্রণতি-নিবেদন অবশ্যই করিতে হইবে!

অন্তিম বলে লেখনী ধারণ করিলাম। হাত কাঁপিতেছে, পৃথিবী আবর্ত্তিত হইতেছে, মস্তিষ্কে অগ্নি গর্জ্জন করিতেছে! —তা করুক। শেষ কর্ত্তব্য এখনও বাকী!

* * * * * *

শক্তিহীনা নারীর চির-আশ্রয়—বোতলবাহী কেরোসিন্! তুমি অন্ধকার দূর কর, মুহূর্ত্তমধ্যে লোকাতীত স্থানে চির দুঃখীকে লইয়া যাও। আজ তোমাকে সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া আমি ধন্য।

উন্মত্তের ন্যায় প্রাণ খুলিয়া হাসিতে ইচ্ছা করিতেছিল। আর মুহূর্ত্ত পরে যেখানে যাইব, সেখানে কোন জ্বালা নাই! তাই পৃথিবীর নির্ম্মম, পাষাণ, ক্রূর মানুষগুলাকে ডাকিয়া বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল, এই ত তোমাদের ক্ষমতা! মানুষকে চূর্ণ করিতে পার, তাহার হৃদয়কে ছিন্ন, দীর্ণ করিতে পার, ধ্বংস করিতে পার, কিন্তু আশ্রয় দিতে পার না, গড়িতে পার না—রক্ষা করিবার শক্তি তোমাদের নাই। তবে এত বড়াই কিসের?

কিন্তু একটি শব্দও মুখ হইতে উচ্চারিত হইল না। সমস্ত পৃথিবী যেন শব্দহীন হইয়া আমার মস্তিষ্কমধ্যেই শব্দের অনন্ত কারখানা স্থাপন করিয়াছিল। তথা হইতে শব্দ-নিষ্ক্রমণের কোনও উপায়ই ছিল না।

মুহূর্ত্ত!—আর একটি মুহূর্ত্ত! প্রাচীরে জননীর তৈল-চিত্র! সে দিক্ হইতে প্রবল আয়াসে মুখ ফিরাইয়া লইলাম। তাঁহার প্রশান্ত আননে যে স্নিগ্ধ হাস্যের দীপ্তি রহিয়াছে, তাহার আলোকে আমার সংকল্প টুটিয়া যাইতে পারে।

দীপশলাকা তুলিয়া লইলাম।

কিসের শব্দ?—না, ও কিছু নহে! আমারই বিভ্রান্ত মস্তিষ্কের অন্তর্গত শব্দের গুরুগর্জ্জন।

এ কি! হাত কাঁপিতেছে কেন? দুর্ব্বলতা?—না, ভূমিকম্প হইতেছে! তৃতীয় বারেও শলাকা বাহির করিবার পূর্ব্বে দীপশলাকার আধার ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

সামান্য আধারের এমন প্রচণ্ড শব্দ! রুদ্ধ দরজাতেও প্রচণ্ড ঝঞ্জনা বাজিয়া উঠিল।

কম্পিত, আন্দোলিত, সিক্ত দেহকে নত করিয়া ভূমিতল হইতে দীপশলাকার বাক্স তুলিয়া লইবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিলাম।

আবার প্রচণ্ড ঝঞ্জনা!—ধপাস্, ধুপ্!

মাথা তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম, দুই বাহু দ্বারা পিতৃদেব আমাকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। দ্বার মুক্ত!— আরও যেন কাহার মূর্ত্তি বিস্ফারিত-নেত্রে আমার দিকে

চাহিয়া রহিয়াছে !—অন্ধকারে সমস্ত পৃথিবী আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

জানি না, কতক্ষণ এমনভাবে কাটিয়াছে! উন্মীলিত-নেত্রে চাহিয়া দেখিলাম, আমারই শয়নকক্ষে, আমারই শয্যায় আমি শায়িতা। উদ্বেগব্যাকুল-নয়নে বাবা আমার মাথার উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পার্শ্বে, কে গো তুমি? তোমাকে যেন স্বপ্নে কবে দেখিয়াছিলাম!

না, চিনিয়াছি, বাবারই শিষ্যস্থানীয় কথা-সাহিত্য-শিক্ষার্থী তিনি!

মুখ ফিরাইয়া লইলাম।

শুনিলাম, তিনি বলিতেছেন, "ব্যাপার এত দূর গড়িয়েছে, তা ত জান্‌তাম না। আমি রেঙ্গুনে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের কাঠের বড় ব্যবসা আছে। কাকাবাবু হঠাৎ মারা যাওয়ায় তাড়াতাড়ি যেতে হয়েছিল। আমার জন্য আপনাদের এই দুর্দ্দশা হয়েছে জান্‌লে—"

বাবা বাধা দিয়া বলিলেন, "সে দোষ তোমার নয়, আমাদের অদৃষ্ট।"

শুনিলাম, তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিতেছেন, "আমি অযোগ্য নই। আপনাদেরই স্বজাতি। সরমাকে আমায় দিন। এ ফুলের বোঝা আমিই সুখে বয়ে বেড়াব। এখানে এসেই আপনাদের অনেক সন্ধান করেছি। শেষে আপনার প্রকাশকের কাছে সংবাদ পেয়ে আসছিলাম। পথে দেখা। আর একটু দেরী হলেই—উঃ!—আশীর্ব্বাদ করুন।"

ধীরে ধীরে ফিরিয়া চাহিলাম। ধরণী বর্ণহীনা নহে। আর ভগবান্! তিনি সত্যই দয়াময়!

দেখিলাম, বাবা নতজানু তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াছেন।

ভগবান্! আত্মহত্যার মহাপাপ হইতে রক্ষা করিয়া এ কোন্ সুধাভাণ্ড অভাগিনীর জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলে প্রভু!

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

কালীপদ ঘোষ

কালীপদ ঘোষ

রাঁচির সুপ্রসিদ্ধ উকীল স্বদেশপ্রাণ নেতা কালীপদ ঘোষ এম এ, বি এল, গত ৯ই অগ্রহায়ণ পরলোক গমন করিয়াছেন। কালীপদ বাবু দরিদ্রের সন্তান হইয়াও স্বীয় প্রতিভা ও সাধনা-প্রভাবে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্যবহারাজীবের কার্য্যে যথেষ্ট সম্পদ্ ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়া তিনি গত ১৫।১৬ বৎসর ওকালতী ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশমঙ্গল জনসেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। রাঁচির সমস্ত জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সহিতই তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অর্থে ও সামর্থ্যে তিনি এই সকল প্রতিষ্ঠানকে সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া গিয়াছেন। কালীপদবাবু রাঁচির উকীল-সম্মিলন, ইউনিয়ান ক্লাব, মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয়, হরিসভা, প্রবাসী বাঙ্গালী সম্মিলনের সভাপতি—মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্ চেয়ারম্যান ছিলেন। দুইবার ছোট-নাগপুর উড়িষ্যা বিভাগের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ছোট-নাগপুরের প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ করাইবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাঁচিতে রেলবিস্তার ও সহরের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য কালীপদবাবু বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ২২ বৎসর বয়সে তিনি বিপত্নীক হইয়াছিলেন—রাঁচির দুর্গাবাড়ী তাঁহারই উৎসাহে—অধ্যক্ষতায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

মনস্তাপ

কংগ্রেসের মেলা। এগ্‌জিবিশনে কত দেশের কত জিনিষের দোকান। দোকানে দোকানে সুন্দর দুর্লভ দ্রব্যের সজ্জা। দোকানের সাম্‌নে সাম্‌নে কত লোকের ভিড়—ক্রেতা অল্প, দর্শক অনেক। দু' সারি মনোহারী দোকানের মাঝখান দিয়ে লাল-সুর্‌কীর পথ, যেন সুন্দরীর সীঁথিতে সিঁদূর ঢালা। সেই পথ দিয়ে কাতারে কাতারে লোক চলেছে নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়া কচুরী-পানার ঝাঁকের মতন, আর নদীর এপারে ওপারে বাঁকে বাঁওড়ে সেই পানা আট্‌কে যাওয়ার মতন লোকেরা এ-দোকানে সে-দোকানে থম্‌কে দাঁড়াচ্ছে। দোকানের সাম্‌নে দাঁড়ানো দর্শকদের মধ্যে দু-এক জন রমণী থাক্‌লে সেখানে ভিড় একটু ঘন হচ্ছে; সেই রমণীরা সুন্দরী না হ'লে ও দোকানের দ্রব্যসম্ভার নয়ন-রঞ্জক না হ'লে ভিড় আবার পাত্‌লা হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে—জনস্রোত জলস্রোতের মতন এগিয়ে চলেছে। যে দোকানে দ্রব্য সুন্দর, সেখানে এমনই লোকের ভিড় জম্‌ছে; তার মধ্যে সুন্দরীর সমাগম হ'লে তো ব্যূহ দুর্ভেদ্য হয়ে উঠছে। ধনের ঘরে রূপের বাসা! কত ধনি-গৃহের অন্তঃপুরিকা অবরোধ ছেড়ে অবগুণ্ঠন খাটো ক'রে মেলায় এসেছে। মেলায় রূপের আগুন লেগেছে! তাদের সঙ্গে সঙ্গে এসে জুটেছে কত রূপোপজীবিনী, তাদের রূপের চটক প্রচার ক'রে রূপের নেশায় পুরুষ-ভ্রমরদের বশ করতে। রূপের জেল্লায় তাদের কেউ কেউ গৃহস্থঘরের বৌঝিদের পরাস্ত করেছে; কিন্তু কুলবধূদের হ্রীমণ্ডিত স্নিগ্ধ শ্রীর কাছে তাদের শালীনতাশূন্য উগ্রতা নিতান্ত হীন প্রতিপন্ন হয়ে যাচ্ছে; দর্শকদের দৃষ্টি তাদের দিকে ফিরেই যেন ধিক্কার দিয়ে জানিয়ে যাচ্ছে, সৌন্দর্য্যের চেয়ে মাধুর্য্য অধিকতর মনোরম। এই রকমে কেবল লোকের ভিড় দেখতেই লোকের ভিড় দিন দিন বেড়েই চলেছে।

এক দিন সকাল-বেলা খবরের কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলো—

স্বয়ম্বর! স্বয়ম্বর!

কলিকালে অভাবনীয় ব্যাপার!

এক জন অশেষ-ঐশ্বর্য্যশালিনী অপূর্ব্ব রূপসী যুবতী

স্বয়ং স্বামী নির্ব্বাচন করিবেন!

কংগ্রেসের মেলায়

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত স্বর্ণকারের দোকানে

সেই মহিলা

তাঁহার শুভবিবাহের

অলঙ্কার

নির্ব্বাচন করিবার জন্য অদ্য হইতে সাত দিন ক্রমান্বয়ে

সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টার মধ্যে

কোনও সময়ে আসিবেন

এবং সেইখানে সমবেত পুরুষদের মধ্য হইতে

তাঁহার পছন্দসই বরও নির্ব্বাচন করিবেন।

স্বয়ংবরা সুন্দরী জাতিভেদ মানেন না,

তাঁহার ধনী নির্ধন বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই,

যাহাকে চোখে ধরিবে, তাহাকেই বরণ করিবেন!

অতএব আসুন যুবা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ,

আর আসুন

নূতন দৃশ্য দেখিতে আবালবৃদ্ধবনিতা!

এই বিজ্ঞাপন নিয়ে সহরে হুলস্থুল প'ড়ে গেল। কেউ বল্‌লে—এটা ঐ সেক্‌রার দোকানে লোক ডাক্‌বার ফিকির। কেউ বল্‌লে—হোক ফিকির, তবু এই হিড়িকে ঐ দোকানে লোক তো জম্‌বে দেদার, তার মধ্যে রোমান্স ঘটা আশ্চর্য্য কি। কেউ কেউ বল্‌লে—বিজ্ঞাপনটা সত্যিও তো হ'তে পারে? আজকালকার কালে সুন্দরীর স্বয়ম্বরা হওয়াটা খুবই সম্ভব।

শেষের মত যাদের, তাদের মধ্যে বরিশালের নবীন উকীল বিমল পাকড়াশী এক জন। সে সেই দিনই সেভিংস্ ব্যাঙ্ক্ থেকে টাকা তুলে এনে বাক্স-বিছানা নিয়ে কল্‌কাতা রওনা হলো। সে মনে মনে একরকম স্থির করেই ফেল্‌লে যে, তার 'নবং বয়ঃ কান্তমিদং বপুশ্চ' যখন আছে, আর তার পদবীটাও পাকড়াশী, তখন সেই স্বয়ম্বরা সুন্দরীর হৃদয় পাকড়াও ক'রে একাতপত্রং রমণী-প্রভুত্বং লাভ কর্‌বে। বিমল উৎফুল্ল মুখে আশাভরা মন নিয়ে কল্‌কাতায় এক হোটেলে গিয়ে উঠ্‌ল—কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ীতে গেল না, চেনা লোকের সাম্‌নে ইচ্ছা-মত প্রসাধন ও বেশভূষা ধারণ কর্‌তে সঙ্কোচ হবার আশঙ্কা তো আছে!

বিমল কল্‌কাতায় পৌঁছে হোটেলে জিনিষপত্র রেখেই বাজারে বেরিয়ে পড়্‌ল। সে চওড়া জরিপাড় শান্তিপুরে ধুতি, সিল্কের গেঞ্জি আর মোজা, তসরের শার্ট, নেভী-ব্লু রঙের সার্জের ওপ্‌ন্-ব্রেষ্ট্ কোট, কমলা-রঙের জমির উপর নীল পাড় দেওয়া জার্ম্মাণ শাল আর পেটেণ্ট্ লেদারের পাম্প্-শু কিনে বাবু-সজ্জা সংগ্রহ কর্‌লে। বাসায় ফিরে তার মনে পড়্‌ল, রঙীন ফুলকাটা রুমাল আর একটা সৌখীন ফ্যান্সী ছড়ি কিন্‌তে ভুল হয়ে গেছে। সে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে ছড়ি আর রুমাল কিন্‌তে আবার বাজারে দৌড়াল। পথে মনে পড়্‌ল এসেন্স্ আর ওটিন স্নোর কথা।

বিমল বাসায় ফিরেই তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে নিলে। তার পর ঘরে দরজা দিয়ে প্রসাধন আর বেশ-ভূষা কর্‌তে লেগে গেল।

ঝাড়া দু ঘণ্টা আয়নার সাম্‌নে বিচিত্র মুখভঙ্গী ক'রে সে সজ্জা শেষ কর্‌লে, তার পর আয়না মুখের এপাশে ওপাশে উপরে নীচে পিছনে সাম্‌নে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেশ ক'রে দেখে নিলে, কোথাও কিছু খুঁৎ আছে কি না; তার পর দৃষ্টি বুলিয়ে বুলিয়ে আপাদ-মস্তক দেখে নিয়ে প্রফুল্ল মুখে সন্তুষ্ট মনে সে দরজা খুলে বেরুল। নীচে নেমেই হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা; এখানে এই লোকটির সঙ্গেই বিমলের কিঞ্চিৎ আলাপ-পরিচয় হয়েছে হোটেলে ভর্ত্তি হবার উপলক্ষে; তাই সে এই স্বল্পপরিচিত লোকটির সাম্‌নে এসে প'ড়েই কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়্‌ল এবং লজ্জিতভাবে "একবার এক্‌জিবিশনটা দেখে আসি" বলেই ক্ষিপ্র পদে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌ল। ম্যানেজার একটু মুচ্‌কি হাস্‌লে।

বিমল কিন্তু সোজা মেলায় গেল না। সে গেল লরেন্স মেয়োর চশ্‌মার দোকানে—তার চাই একটা রীম-লেস্ প্যাঁস্-নে চশ্‌মা! সে দোকানদার ইংরেজের কাছে সটান মিথ্যা কথা বল্‌লে—"সে আজ রাত্রেই দেশে চ'লে যেতে চায়, এখনই তার চশ্‌মা পেলে ভাল হয়।" দোকানী বল্‌লে—"চশমা রীম-লেস্ হ'লেও নাক-চিম্‌টা স্প্রিংটা ফিট ক'রে দিতে তো একটু সময় লাগবে—চশ্‌মা কাল বিকালের আগে কিছুতেই রেডী হ'তে পারে না।" বিমল কাতর হয়ে মিনতির স্বরে বল্‌লে—"দাম বেশী দেবো যদি আজই ৬টার আগে দিতে পারেন।" দোকানী ইংরেজ গম্ভীরভাবে বল্‌লে—"আচ্ছা, চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ছি···কিন্তু এর জন্যে আপনাকে বেশী দাম দিতে হবে না।" বিমল ধন্যবাদ জানিয়ে আবার চশ্‌মাটা আজই দেবার অনুরোধ ক'রে দোকান থেকে বেরুল।

বিমল চশ্‌মার দোকান থেকে গেল ইংরেজ হেয়ার-কাটারের দোকানে। সেখানে চোদ্দ আনা-দু আনা চুল কাটিয়ে দাড়ি কামিয়ে গোঁপে কস্‌মেটিক লাগিয়ে নব-কার্ত্তিকটির বেশে বেরিয়ে এল।

ছটা বাজ্‌তে এখনও অনেক দেরি। এখন সে যায় কোথায়? পথে পথে ঘুরলে রোদে ধুলায় তার মুখশ্রী ম্লান হয়ে যাবার বিষম আশঙ্কা আছে। সে আস্তে আস্তে ইত-স্ততঃ কর্‌তে কর্‌তে গিয়ে ঢুক্‌ল পেলিটির দোকানে এবং এক কোণে ব'সে আইস্-ক্রীম আর ঠাণ্ডা পানীয় আন্‌তে ফর্‌মাস কর্‌লে। সে ব'সে ব'সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—সেই স্বয়ম্বরা সুন্দরীর কথা।—বিজ্ঞাপনে লিখেছে 'অপূর্ব্ব রূপসী'! বিজ্ঞাপনের অত্যুক্তি খানিকটা বাদ দিলেও নিশ্চয় সে রূপবতী হবেই। যুবতী, রূপসী, ঐশ্বর্য্যশালিনী!—একবারে ত্র্যহস্পর্শ। যদি আমাকেই তার পছন্দ হয়! এই কথা যেই বিমলের মনে হওয়া আর অমনি এই লোভনীয় সম্ভাবনার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ তার মন ছাপিয়ে চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়্‌ল, তার পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চ হতে লাগ্‌ল, সর্ব্বাঙ্গ শিউরে শিউরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

বিমল অস্থির হয়ে আইস-ক্রীম খাওয়া শেষ ক'রে

হোটেল থেকে বেরুল এবং আবার সে চশ্‌মার দোকানে ফিরে এল। চশ্‌মা-ওয়ালা বিমলকে দেখেই দুঃখ প্রকাশ ক'রে জানালে, আজ আর কিছুতেই চশ্‌মা তৈরি হয়ে উঠ্‌ল না; কাল বিকালে নিশ্চয়ই হবে। বিমল যদি কাল পর্য্যন্ত নিতান্তই থাক্‌তে না পারে, তবে ঠিকানা রেখে গেলে তারা তার চশ্‌মা ডাকে পাঠিয়ে দেবে, তার সমস্ত খরচ তারাই স্বীকার করবে, বিমলকে এর জন্য বেশী কিছু দিতে হবে না।

বিমল ক্ষুণ্ণ মনে ম্লান মুখে বল্‌লে—অগত্যা কালই সে নিজে এসে নিয়ে যাবে। কিন্তু কাল যেন সে নিশ্চয় চশমা পায়।

বিমল খুঁৎখুঁৎ মন নিয়ে মেলায় গেল। তখন ছটা বেজে গেছে; দোকানে দোকানে বিবিধ বর্ণের আলো জ্বল্‌ছে। সে প্রত্যেক দোকানের উপর কেবলমাত্র চোখ বোলাতে বোলাতে দ্রুতপদে লক্ষ্মীকান্ত স্বর্ণকারের দোকান কোন্‌ দিকে, তারই সন্ধান ক'রে চল্‌তে লাগ্‌ল। যতই দেরী হয়ে যাচ্ছে, ততই তার আকাঙ্ক্ষা বেড়ে উঠ্‌ছে যে, হয় তো এতক্ষণে সুন্দরী আর কাউকে পছন্দ ক'রে ফেল্‌লে বা! তাকে একবার দেখ্‌লে যে সুন্দরীর চোখে আর মনে আর কাউকে ধরবে না, সে সম্বন্ধে একটা অস্বীকৃত আশা ও বিশ্বাস বিমলের মনের তলায় ছিল বলেই সকলের আগে সুন্দরীর দৃষ্টিগোচর হবার তার এত আগ্রহ।

বিমল খানিকক্ষণ ঘুরতে ঘুরতে সেই সেক্‌রার দোকান দেখ্‌তে পেলে। তখন সেখানে একটু ভিড়ও জমেছে। বিমলের বুকের মধ্যে রক্তধারা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল, মুখ উজ্জ্বল ও চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠ্‌ল—তা হ'লে রূপসী দোকানে এসেছে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়্‌ল, তার চশ্‌মা সে আজ পায় নি, কিসের শোভায় সে কিশোরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে? ময়ূরের যেমন পুচ্ছ, কোকিলের স্বর, সিংহের কেশর, তাদের প্রেয়সীদের মন ভোলাবার আয়োজন, তেমন সঙ্গতি বিমলের কি আছে? তার সহজ শ্রী আছে ব'লে তার আয়না রোজ তার কাছে সাক্ষ্য দেয় বটে; কিন্তু সেই আয়নার প্রতিচ্ছায়া সে দেখে তার নিজের চোখে, পরের চেখে সেটা কেমন লাগে, তা কে জানে? তার পাড়ার বিধবা সৌদামিনী এক দিন তাকে দেখে মুচ্‌কি হেসে গা দুলিয়ে চ'লে গিয়েছিল বটে, আর তার মুরুব্বি সিনিয়র উকীল ক্ষিতীশ-বাবুর বালিকা পুত্র-বধূ এক দিন পাশের ঘরের জান্‌লা থেকে তাকে উঁকি মেরে দেখ্‌ছিল বটে, কিন্তু তাতেই তো প্রমাণ হয় না যে, স্বয়ম্বরা সুন্দরী সকলকে ছেড়ে তাকেই পছন্দ ক'রে বরণ করবে! সজ্জা যথোচিত জমকালো হয়েছে বটে—গা তো নয়, যেন সাপোলিন রঙের দোকানে নমুনার বিজ্ঞাপন—হরেক রকম রঙের পাটি-আঁকা পাটা! এর উপর চোখে ষ্টাইলিশ রীম-লেস্‌ প্যাঁস্‌-নে চশ্‌মাটা থাক্‌লে ক্যা খাপসুরৎ হতো—সুন্দরীর নজর অমনি খপ্‌ ক'রে রূপের খপ্পরে পড়্‌তো!

বিমল সত্বর এগিয়ে গিয়ে দোকানের সামনে ভিড়ের পিছনে দাঁড়াল এবং ব্যগ্র দৃষ্টিতে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে খুঁজতে লাগ্‌ল সেই স্বয়ম্বরা সুন্দরী কোথায় বিরাজ করছে।

দোকানে কোনো সুন্দরী নেই।

তবে কি ভিড়ের ভিতর মিশে থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বাছাই হচ্ছে?

বিমল তীক্ষ্ণ উৎসুক ব্যাকুল দৃষ্টিতে সেখানে সমাগত সকল স্ত্রীলোকের মুখ দেখ্‌তে লাগ্‌ল। বুড়ী—কালো—মোটা—ময়লা ছেঁড়া আলোয়ানের ঘোমটা-টানা মেয়েগুলোর দিকে দৃষ্টি হেনেই বিমল চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে নিচ্ছে—এ নয়, এ নয়, এও নয়। তবে কে? আহা মরি রূপসী তো এখানে এক জনও নেই? তবে কি ময়লা ছেঁড়া আলোয়ানের ঘোমটার আড়াল থেকে দৃষ্টি-সন্ধান চল্‌ছে? অলক্ষ্মীর ছদ্মবেশে কি সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর গোপন অভিসার হয়েছে? বিমল বেহায়ার মতন কুলবধূর ঘোমটার ফাঁকে দৃষ্টি প্রেরণ করবার দুশ্চেষ্টা করতে লাগ্‌ল এবং সেই ঘোমটার তলে তার কল্পিত সৌন্দর্য্যের আভাসটুকুও না পেয়ে তখনই সে হতাশ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে লাগ্‌ল! নেই—বিমলের কল্পনার ছবির মতন একটিও সুন্দরী নেই। তবে কি তিনি এখনও আসেন নি? স্বয়ম্বরের বিজ্ঞাপন দেখে কল্‌কাতায় এসে পৌছাতে তার দু'দিন দেরী হয়ে গেছে, তবে কি নির্ব্বাচন আগেই হয়ে গেছে?

বিমল ভ্রূম্নায়মান হয়ে স্বর্ণকারের দোকানের সাম্‌নে বেকুবের মতন দাঁড়িয়ে রইল।

আটটা বেজে গেল। কোনো বিশ্ববিলোচন-চোর সুন্দরীর শুভাগমন তো হ'লো না।

নটা বাজ্‌ল। তখন বিমল ইতস্ততঃ করতে করতে লজ্জিত অপ্রতিভ মুখে স্বর্ণকারকে চুপি চুপি

জিজ্ঞাসা কর্‌লে—হ্যাঁ মশায়, বাছাই কি হয়ে গেছে ?

দোকানী প্রশ্ন বুঝতে না পেরে পাল্টা প্রশ্ন কর্‌লে—কিসের বাছাই ?

বিমল আম্‌তা-আম্‌তা কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে—এই··· সেই যে···স্বয়ম্বরের···

দোকানী হাসি চেপে বল্‌লে—ও ! না।

—আজ কি তিনি আসেন নি ?

—আমাদের কিছু বল্‌তে বারণ আছে।

বিমল বিমর্ষ হয়ে চ'লে যেতে যেতে ফিরে এসে আবার দোকানীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আচ্ছা মশায়, তিনি ত রোজ হাজার হাজার লোককে দেখ্‌বেন, তার মধ্যে এক জনকে ধরুন পছন্দ হ'লো আজ; কাল আবার তার চেয়ে পছন্দসই আর কাউকে মনে হ'তে পারে, নাও পারে। ধরুন, শেষ দিন পর্য্যন্ত দেখে দেখে তাঁর মনে হ'লো, প্রথম দিনের ঐ লোকটিই সব চেয়ে ভালো; কিন্তু শেষের দিন সেই প্রথম লোকটি আর এল না; তখন তার সন্ধান তিনি পাবেন কি ক'রে ?

দোকানী এবার আর হাসি চাপ্‌তে পার্‌লে না; তার হাসি দেখে বিমল অপ্রস্তত হয়ে গেল। দোকানী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—যাঁকে যাকে তাঁর নজরে ধর্‌বে, তাঁকে তাঁকে একখানি ক'রে নিমন্ত্রণপত্র তখনই দেওয়া হবে···তাঁরা সেই রাজকুমারীর বাড়ীতে নির্দ্দিষ্ট দিনে যাবেন আর তার পর সেই পছন্দসই পুরুষদের মধ্যে থেকে বেছে সবার সেরা সুপুরুষটিকে তিনি বরমাল্য দেবেন এবং উভয় পক্ষের সম্মতি স্থির হলে বিবাহ হবে; যদি কোনো কারণে দুজনের মনের মিল না হয়, তা হ'লে পুনর্নির্ব্বাচন হবে। এমনি ক'রে যখন চোখের দেখার সঙ্গে মনের প্রীতির মিল হবে, তখনই বিয়ে স্থির হবে।

বিমল চিন্তাকুল-চিত্তে স্বর্ণকারের দোকান ছেড়ে চল্‌ল। মেলার মধ্যে পথে পথে সে বেড়াচ্ছিল বটে, কিন্তু সে কিছুই লক্ষ্য কর্‌ছিল না. মনে কেবলই ভাব্‌ছিল সেই সুন্দরীর কথা; আর তার নিজের সফলতার সম্ভাবনার পরিমাণ।

বিমল এগ্‌জিবিশনের কোনো দ্রষ্টব্যই মন দিয়ে দেখ্‌তে পারে না, তার মন প'ড়ে আছে সেই সেক্‌রার দোকানে। সে সেক্‌রার দোকান ছেড়ে বেশী দূর অগ্রসর হ'তেও পারে না; অল্প দূর গিয়েই তার মনে হয়, এতক্ষণে তিনি এলেন বুঝি! হয় তো তাঁর দৃষ্টি বিমলের অবর্ত্তমানে আর কোন্ হতভাগাকে সৌভাগ্যবান্ ক'রে ফেল্‌লে বা! বেচারা বিমল আবার ফিরে ফিরে আসে সেই সেকরার দোকানে।

এম্‌নি ক'রে রাত দশটা পর্য্যন্ত সেকরার দোকানের কাছা-কাছি ঘুরঘুর ক'রে শ্রান্ত-ক্লান্ত বিমল হোটেলে ফিরে এল।

রাত্রে স্বপ্ন দেখ্‌লে যে, স্বয়ম্বরা সুন্দরী তারই গলায় দেবে ব'লে বরমাল্য হাতে ক'রে তুলেছে, এমন সময় তাকে ঠেলে ফেলে সেইখানে এসে গলা বাড়িয়ে 'দাঁড়াল' বাচ্চা-ই-সাক্কো, আর তার গলার উদ্দেশে সুন্দরীর হস্তভ্রষ্ট বরণ-মালা গিয়ে পড়্‌লো সেই জবরদস্ত ভিস্তির বাচ্চার গলায়! এই দুঃস্বপ্ন দেখে বিমলের ঘুম ভেঙে গেল। সারা রাত সে হোটেলের বারান্দায় ছটফট ক'রে পায়চারি ক'রে কাটালে।

সকাল তো হ'লো, কিন্তু বিকাল তো হয় না। মডেল ভগিনীর কমলিনীর মতন বিমল ভাব্‌তে লাগ্‌লো—সূর্য্যের অধীন ঘড়ী না হয়ে ঘড়ীর অধীন সূর্য্য হ'লো না কেন? অনাগত ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক হয় তো সূর্য্যকে আজ্ঞাধীন কর্‌বে, কিন্তু তখন তো বিমল বিদ্যমান থাক্‌বে না!

বিমল দুপুর বেলাটা ঘুমে নিমগ্ন থেকে একেবারে বিকালের কোলে জেগে উঠ্‌তে চাইলে। কিন্তু ঘুম কি আর আসে? অনেক কষ্টে ঘুম যদি বা এলো, তবে দশ-পনেরো মিনিট পরে পরেই ছ্যাঁক-ছ্যাঁক ক'রে ঘুম ভেঙে যেতে লাগল—হয় তো বা সে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে শুভ লগ্ন উত্তীর্ণ ক'রে ফেলেছে। সে শঙ্কিত ব্যগ্র দৃষ্টিতে হাতঘড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করে আবার চক্ষু মুদ্রিত করে।

অনেক কষ্টে তিনটা বাজল। তখন সে উঠে চোখ-মুখ ধুয়ে বেশবিন্যাসে নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে দিলে।

গতকল্যের মতন প্রসাধনপরিপাটী চেহারা নিয়ে সে গেল চশ্‌মার দোকানে। এক মুঠি টাকা গুণে দিয়ে চোখে পাউয়ারলেস্ চশ্‌মা চড়িয়ে খুশী-মনে হাসিমুখে বিমল রওনা হলো এগ্‌জিবিশনে।

আজও তার ভাগ্যে আহামরি গোছের অপরূপ সুন্দরীর সন্দর্শন ঘট্‌লো না।

এমনই রোজ দিন আসে, রাত যায়। বিমল বিফল হয়ে ফিরে ফিরে আসে।

অবশেষে এক দিন বুঝি পরিহাস-রসিক প্রজাপতির প্রসন্ন দৃষ্টি বিমলের ভাগ্যের উপর পড়্‌লো।

বিমল মেলায় গিয়ে দেখ্‌লে, একটি অপরূপ রূপসী তন্বী ষোড়শী সেই স্বর্ণকারের দোকানের দিকে চলেছে। তাকে দেখেই বিমলের মন উল্লাসে ব'লে উঠ্‌ল—এই···এই···এ না হয়ে যায় না। এই তো পুরাণ-কল্পিতা তিলোত্তমা! একেই মনে কল্পনা ক'রে মহাকবি কালিদাস বলেছিলেন—সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ···বিধাতার আদি সৃষ্টি; একেই বিধাতা চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা···ছবিতে মনের কল্পনা ফুটিয়ে তুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন!

বিমল সুন্দরীর সঙ্গে শুভদৃষ্টি কর্‌বার জন্য ব্যাকুল ও ব্যগ্র হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু তার মতন শত শত পুরুষ সেই রমণীর রমণীয় কান্তি একটুখানি দেখে নেবার আগ্রহে ঝুঁকে পড়েছে, বেচারা বিমল আর আগাতে পারে না। যতই তার সুন্দরীর নিকটে যেতে বিলম্ব হচ্ছে, ততই তার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠ্‌ছে—হায় হায়! হয় তো কোন্ হতভাগা তার সৌভাগ্য আগেই লুঠ ক'রে নিলে!

বিমল ভিড় ঠেলে কষ্টেসৃষ্টে এগিয়ে গিয়ে সুন্দরীর দিকে চাইতেই তার বুক উঠ্‌ল কেঁপে, মুখ গেল শুকিয়ে—সুন্দরীর নজরে যদি সে না লাগে!

বিমল তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ফুলকাটা রেশমী রুমাল বা'র করে মুখ মুছলে—রুমালের এসেন্সের মৃদু সুরভিতে বাতাস ভুরভুরে হয়ে উঠ্‌ল—কস্তুরীমৃগের গাত্রগন্ধ তার আকাঙ্ক্ষিতা প্রণয়িনীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বিধাতার উপহার, আর বিমলের গাত্র-সৌরভ তার স্বোপার্জ্জিত। ময়ুর-পুচ্ছ বিস্তার ক'রে তার রূপের চটকে ময়ূরীর মনোহরণ কর্‌তে, বিমল তার রঙীন রুমাল পকেট থেকে বাহির করে···রঙীন শাল গা থেকে খুলে আবার গায়ে দেয়···প্যাঁস্‌-নে নাক থেকে নামিয়ে আবার নাকে লাগায় স্বয়ম্বরা সুন্দরীর নজরে পড়্‌বার জন্য।

বিমলের মনে হ'লো, সুন্দরী যেন তাকে দেখে মৃদু একটু গোলাপী হাসি হাস্‌লে—যেমন হাসি হাসে নিশার কোলে সদ্যোজাগ্রতা কিশোরী উষা, যেমন হাসি হাসে কোজাগরী পূর্ণিমার চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বক্ষণে স্বচ্ছ সুনীল আকাশ!

সুন্দরীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়্‌তে ইচ্ছা হলো বিমলের। তার মন করুণ স্বরে গেয়ে উঠ্‌ল—

"যহাঁ যহাঁ অরুণ-চরণ চলি যাত।
তহাঁ তহাঁ ধরণী হই এ মঝু গাত॥"

তরুণী রূপের তরণীর মতন মাধুর্য্যের হিল্লোল তুলে সেই বিজ্ঞাপনদাতা জহুরী মণিকারের দোকানে গিয়ে প্রবেশ কর্‌ল। এমন কোন্ জহুরী মণিকার আছে যে, এই অমূল্য রত্নের নিরিখ ঠিক কর্‌তে পারে!

কিছুক্ষণ পরে বিমলের রূপদর্শনবিহ্বল চিন্তাশক্তি ফিরে এলো—হ্যাঁ, সুন্দরী বটে! কি রূপ, কি সজ্জা, কি অলঙ্কার! ঐশ্বর্য্যশালিনী মহারাণী বটে! কাপড়ে জরির জলুস, অঙ্গে অঙ্গে জহরতের দীপ্তি! ভূষণ তাকে ভূষিত করেছে, না ভূষণকে সে চরিতার্থতা দান করেছে, কে নির্ণয় করবে!

এই মহীয়সী মহিলার চরণতলে আপনাকে সমর্পণ ক'রে দেবার জন্য বিমলের মন এমন ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল যে, সে নিজেকে আর সম্বরণ ক'রে রাখ্‌তে পার্‌ছিল না। তীর্থে গিয়ে ভক্তের হৃদয় যখন ভাবাবেশে বিহ্বল হয়ে ওঠে, তখন সে আপনাকে দেবতার চরণে সমর্পণ কর্‌তে চায়, এবং সেই বাসনা ব্যক্ত কর্‌বার চিহ্নস্বরূপ মহৎ ত্যাগের জন্য সে ব্যগ্র হয়ে ওঠে—ভক্ত তখন একটা ফল, একটা প্রিয় খাদ্য, একটা ভোগের দ্রব্য দেবতার নামে উৎসর্গ ক'রে দিয়ে তৃপ্তি পায়। বিমলও সুন্দরীকে আত্মসমর্পণের প্রতীক-স্বরূপ কিছু উৎসর্গ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। বিমল পকেট থেকে মনি-ব্যাগ খুলে দেখ্‌লে, তার সঙ্গে চল্লিশ টাকা সাড়ে দশ আনা আছে। সে মনিকারের দোকানের শো-কেসের উপর ঝুঁকে ঝুঁকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, চল্লিশ টাকার ভিতরে সুন্দর ফ্যান্সী কি জিনিষ ঐ রূপসীকে উপহারের যোগ্য পাওয়া যেতে পারে? এই বিমলের ভূষণ-সন্ধানের গৌণ অথবা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, রমণীর সঙ্গে সঙ্গে দোকানে ঘুরে বেড়ান এবং যদি কোনো সুযোগে স্পর্শমণির গুণে লৌহজন্ম কাঞ্চন হয়ে উঠে!

বিমলের মনে হলো, দোকানী তাকে দেখে হেসে নমস্কার কর্‌লে, এবং যেন কি ইঙ্গিত কর্‌লে। বিমল দোকানীর কাছে গিয়ে ধরা গলায় মৃদুস্বরে কুণ্ঠিত প্রশ্ন কর্‌লে—ইনি?

দোকানী ঈষৎ মাথা নেড়ে হেসে বল্‌লে—হ্যাঁ।

বিমল ঢোক গিলে বললে—আমি ওঁকে একটা কিছু উপহার দিতে পারি আপনার দোকান থেকে কিনে?

দোকানী বল্লে—স্বচ্ছন্দে।

বিমল একটু লজ্জিতভাবে বল্লে—আমার সঙ্গে আজ ত বেশী টাকা নেই, টাকা চল্লিশের মধ্যে একটা ফ্যান্সী কিছু ··· ···

দোকানী বল্লে—ভক্ত দেবতাকে পূজা করে সুলভ পুষ্প পত্র জল ফল দিয়ে, ভাবগ্রাহী দেবতা তাতেই বুঝে নেন তার ভক্তির গভীরতা। পূজাটাই আসল, পূজার সামগ্রীটা তুচ্ছ—উপলক্ষ মাত্র!

বিমলের মন লজ্জার সঙ্কোচ থেকে মুক্ত হয়ে ব'লে উঠ্‌ল,—ঠিক তো।

দোকানী বিমলকে বেছে দিলে একটা ব্রুচ—কাঞ্চনময় অন্ধ কন্দর্প মুক্তা-খচিত স্বর্ণধনু থেকে একটি স্বর্ণবাণ নিক্ষেপে উদ্যত হয়েছে, সেই বাণের পুষ্পগুলি রূপার, তার যষ্টিটি তারুণ্যের রং সবুজ দিয়ে মীনা করা এবং বাণের ফলার বুকের উপর বসানো আছে এক ফোঁটা বুক-ফাটা রক্তের মত লাল টকটকে একটা চুণি!

বিমলের মুখ উজ্জল হয়ে উঠ্‌ল,—ঠিক, ঠিক হয়েছে। মনের কথা অলঙ্কারে ব্যক্ত হয়েছে!

বিমল উনচল্লিশ টাকা পনেরো আনা দিয়ে ব্রুচটি কিনে রূপসীকে উপহার দেবার অবসর খুঁজতে লাগ্‌ল। বৈকুণ্ঠের খাতার অবিনাশের মতন তারও গদ্‌গদ স্বরে বল্‌তে ইচ্ছা করছিল,—'দেবীপদতলে বিমুগ্ধ ভক্তের পূজোপহার'।

কিন্তু বিমল তরুণীর কাছে যেতেই সে এমন স্নিগ্ধ মধুর স্মিত মুখে লাবণ্যবিচ্ছুরিত দৃষ্টিতে বিমলের দিকে চাইলে যে, বিমলের অন্তর থেকে সব কবিত্ব ও মস্তিষ্ক থেকে সব বুদ্ধি ঢাক্‌নি-খোলা কৌটা থেকে কর্পূরের মতন উবে গেল। সে নিতান্ত নীরস গদ্য ভাষায় ব'লে ফেল্‌লে—আপনি দয়া ক'রে এই তুচ্ছ উপহারটা যদি গ্রহণ করেন।

সুন্দরী তরুণী একবার বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রশ্ন তুলে বিমলের মুখের দিকে তাকালে; তার পর বিমলের যুক্ত-করের অঞ্জলিতে ব্রুচটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে; তার পর তার মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল, যেমন ফুলের হাসি ঝ'রে পড়ে ঊষার বাতাস লেগে শিউলী-বকুল গাছ থেকে, আগুনের চুম্বন পেয়ে ফুলঝুরির মুখ থেকে। রূপসী খিলখিল ক'রে হেসে উঠে চারিদিকে চকিত দৃষ্টি হেনে কি যেন খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল।

বিমল তো একেবারে কৃতার্থ হয়ে গেল—সুন্দরী রাগ করেন নি, ভক্তের পূজার অর্ঘ্য হাসির ধারায় অভিষিক্ত ক'রে পবিত্র নির্ম্মল ক'রে তুল্‌লেন। এই রমণীয়া রমণী যেন সাক্ষাৎ প্রীতি-প্রতিমা, মূর্ত্তিমতী করুণা, শরীরিণী সতীধর্ম্ম! বিমলের মন সাফল্যের আশায় রঙীন হয়ে উঠ্‌ল।

সুন্দরী তার আইভরির চুষিকাঠির মতন আঙুল দিয়ে যখন বিমলের হাত থেকে সেই উপহৃত ব্রুচটি তুলে নিলে, তখন বিমল তো আর নেই! সুন্দরীর আঙুলের স্পর্শ তার করতল থেকে বিষ-বিসর্পের মতন সকল দেহে মনে ইন্দ্রিয়ে চেতনায় ছড়িয়ে পড়্‌ল—তার সমস্ত অস্তিত্ব তখন গ'লে গিয়ে একবিন্দু আনন্দ-রস হয়ে সুন্দরীর চরণকমলে গড়িয়ে পড়্‌বার জন্যে টলটল করছে!

মনোহারিণী রমণী ব্রুচটিকে দু আঙুলে উঁচু ক'রে ধ'রে মিহি মধুর টানা সুরে বল্লে—এই শেঠজী, তোমার ভাণ্ডারে সিঁধ কাটা চল্‌ছে, তার খবর রাখো——

দোকানের অপর প্রান্তে এক জন মোটা বেঁটে কদাকার মাড়োয়ারী অলঙ্কার দেখছিল; সে সুন্দরীর কথা শুনে চম্‌কে উঠে তার খাটো খাটো দুই হাত দিয়ে তার ময়লা আধ-পুরানো কোটের দুই পাশ পকেট চেপে ধ'রে গম্ভীর গলায় গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল—কৌন পাকিটু কাটতা হায় রে!

সুন্দরীর শুক্তিপুটের মতন মুখ থেকে সুরের ঝরণা-ধারার মতন হাসি ঝ'রে পড়্‌ল। সে কথার গায়ে হাসি মাখিয়ে মাখিয়ে বল্লে—তোমার পকেট কেউ মারে নি শেঠজী, পকেটে কেউ নজর দেয় নি; তোমার ভাণ্ডারের সেরা জহর আমিই যে চুরি হয়ে যাচ্ছি!···এই বাবু আমাকে এই ব্রুচটি বায়না দিতে চাচ্ছেন, নেবো?

মাড়োয়ারীর কুৎসিত মুখখানা সেই মুহূর্ত্তে কঠোর হয়ে উঠ্‌ল, তার মুড়ো ঝাঁটার মতন গোঁপজোড়া ক্রুদ্ধ সজারুর কাঁটার মতন খাড়া হয়ে উঠ্‌ল; তার বিপুল স্ফীত ভুঁড়িটা বেলুনের মত ফুলে উঠ্‌ল। কিন্তু পরক্ষণেই সে বিমলের

ভয়বিহ্বল অপ্রতিভ ভাব দেখে হেসে উঠ্‌ল—যেন কে একটা পিতলের ঘটীর মধ্যে মোটা কাঠ ঢুকিয়ে ঘন ঘন নাড়া দিয়ে আচ্ছা ক'রে বাজিয়ে দিলে; তার পর সে বল্‌লে —বাবুজী, ওৎনা থোড়া কিম্মৎ এই জহরকা ঠাহরা আপ! হামি ওনাকে পচাশ হাজার রূপেয়ার এক মোকান সেণ্ট্রাল এভেনিউর উপর কিনিয়ে দিয়েসে, পচাশ হাজার রূপেয়ার জেবর দয়েসে, মাহিনামে হাজারো রূপেয়া দিয়ে ওনার মন পায় না। আপনি শক্‌বেন দিতে উসসে বেশী! আপনার ঐ ব্রুচটার কিম্মৎ কেতো?…বিশ…চালিশ…পচাশ…শও রূপেয়া?…ওৎনা তো ঐ আওরৎকা পয়েরকা জুতিকা দাম!…আপনাকা গহনা আপনি ওয়াপোস ফের্‌তা লিয়ে লিন, আপনাকা জরুকে দিবেন…

সুন্দরী শেঠজীর দিক্ থেকে হাসিমুখ ফিরিয়ে নিতে নিতে বল্‌লে—ফিরিয়ে নিন বাবু আপনার উপহার, নিতে পার্‌লুম না—শেঠজীর এটা পছন্দ হচ্ছে না…

যেখানে বিমল দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে দৃষ্টি ফিরিয়ে রমণী দেখলে, বিমল সেখানে নেই; কৌতুকভরা দৃষ্টি চকিতে চারিদিকে বুলিয়ে কোথাও বিমলকে দেখতে না পেয়ে তরুণী আবার খিলখিল ক'রে হেসে উঠে বল্‌লে—শেঠজী, বাবু পালিয়েছে, আমি এখন এটা নিয়ে কি করি?

বিমল লজ্জা থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ব্রুচের স্বয়ম্বরে বর-মাল্য লাভের মায়া একেবারে ত্যাগ ক'রে ভিড়ের ভিতর ডুব দিয়ে পলায়ন করেছিল। তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

শেঠজী বুল-ডগের ডাকের মতন হোঃ হোঃ ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে তরুণীকে বল্‌লে—বাবু তোমাকে উটা দিয়ে দিয়েসে, তুমি লিয়ে লও।

রূপসী আবার হেসে উঠ্‌ল।

বিমল তখন মেলা ছেড়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে চলেছে হোটেলে লুকিয়ে লজ্জা থেকে বাঁচ্‌বার জন্যে—আজই রাত্রের ট্রেণে সে দেশে রওনা হবে,—আর কোন্ মুখ নিয়ে সে মেলা দেখতে যাবে? স্বর্ণকারের দোকানটির আশে-পাশে ঘুরেই তার কদিন কেটেছে, মেলার কিছুই তার দেখা হয় নি, কিন্তু আর দেখবারও তার উপায় নেই। লজ্জায় তার চেতনা লুপ্ত হয়ে আস্‌ছিল, সর্ব্বাঙ্গ ঝিম ঝিম কর্‌ছিল,—অর্থনাশ ও মনস্তাপই তার সার হ'লো। বিমল বাসে উঠে বাসায় ফিরছে, তার চোখের সাম্‌নে সারা কল্‌কাতাটা মাতালের মতন টলমল কর্‌ছে, আর বিহ্বল বিবশতার ফাঁকে ফাঁকে তার কেবলই মনে হচ্ছে—হায় হায়, পাকা আম দাঁড়কাকে খায়! ঐ সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর সুবর্ণ-প্রতিমা বাঁধা আছে কদাকার কুবেরের কারাগারে!

বিমল দেশে ফিরে গেছে। তার বন্ধুরা সব জিজ্ঞাসা করে—কেমন এগজিবিশন দেখলে?

বিমল কোনমতে লজ্জা চেপে গম্ভীরভাবে কেবল বলে —চমৎকার!

বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করে—সে কি রকম?

বিমল বিব্রত হয়ে বলে—সে কথায় প্রকাশ করা আমার অসাধ্য, অনির্ব্বচনীয়।

যার সঙ্গে দেখা হয়, সেই বিমলকে জিজ্ঞাসা করে—তুমি চশমা নিলে কবে?

বিমল ম্লান মুখে কুণ্ঠিত হাসি ফুটিয়ে বলে—এইবার কল্‌কাতায় গিয়ে দৃষ্টির দোষটা ধরা পড়ল।

প্রশ্ন হয়—এমন বাহারে চশমার সখ গেল যে?

বিমল লজ্জা পেয়ে বলে—কুঁজোর কি আর চিত হয়ে শুতে সাধ যায় না!

কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ অনুমান ক'রে বিমলের মনে সন্দেহ হয়, কল্‌কাতার বোকামীর খবরটা কি কোনো সূত্রে বরিশালে এসে হাজির হয়েছে? সে নাক-চিম্‌টা চশমা নীল কোট আর কমলা-রঙের শাল বাক্‌সয় বন্ধ ক'রে রেখে দিলে, সেগুলো ব্যবহার কর্‌তে এখন তার ভয়ানক লজ্জা করে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সকালবেলা বিছানা ছাড়িয়া বাহিরের বসিবার ঘরে ঢুকিতেই বাড়ীর পুরাতন গোমস্তামশাইএর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল, একতাড়া জবাবী চিঠিপত্রের খসড়া করিয়া লইয়া সে মনিবের প্রতীক্ষা করিতেছিল। ডাক এখানে একটু সকালেই বাহির হইয়া যায়, সই করাইয়া জরুরী চিঠিগুলি ডাকে পাঠাইতে হইবে।

ইজি-চেয়ারে আলবোলার নল মুখে দিয়া শুইয়া পড়িয়া বসন্ত বাবু কয়েকখানা পত্রের জবাব শুনিয়া গেলেন ও ফাউন্টেন পেন আঙ্গুলে ধরাইয়া দিলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আপনার নামটি সই করিয়া পত্রগুলিকে প্রেরণযোগ্য করিলেন। কর্ম্মচারী কলমটি যথাস্থানে স্থাপনান্তে একটি প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছিল, বসন্ত বাবু সহসা সুপ্তোত্থিতের মত সজাগ হইয়া উঠিয়া ডাকিলেন, "ওহে জ্ঞান, শোন শোন—"

কর্ম্মচারীটি ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, প্রভুর আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বসন্ত বাবু কিছুক্ষণ ধরিয়া নীরবেই ধূমপান করিয়া যাইতে লাগিলেন। যাহা বলিতে ডাকিয়াছিলেন, তাহা বলাও যে কতকটা দ্বিধার, সেটুকু তখনও অনুভব করিতেছিলেন। অবশেষে জোর করিয়া মনকে শক্ত করিয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"রুকুমপুরের জমীদারবাড়ী থেকে যে মেয়ের কথা ওরা শশীর জন্য লিখেছিল, তাদের চিঠির কোন জবাব কৈ আমাদের দেওয়া হয় নি, না?"

জ্ঞানচন্দ্র একটুখানি ভাবিয়া দেখিয়া জবাব করিল, "আজ্ঞে না, সে ত বড়মায়ের মত হলো না। তিনি বল্লেন, ছোটদাদাবাবুর একজামিন হয়ে গেলে তখন বিয়ে দেওয়া হবে, তার জন্যে এখন থেকেই কথা দিয়ে রাখা ঠিক নয়, তা ছাড়া ওদের বাড়ীতে লেখাপড়ার মেয়ে-পুরুষে কোনই চর্চ্চা নেই, ছোটদাদাবাবুর ওরকম বাড়ী পছন্দ নয়, ওর আর কোনই জবাব দিতে হবে না। তাই দেওয়া হয় নি।"

বসন্ত বাবুর সঞ্চিত সাহস এই দৃঢ় যুক্তিতে ঈষৎ টলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই এই কথাগুলার মধ্যের একটা সত্য অথচ তিক্ত অংশ তাঁহাকে ঈষৎ উত্তেজিত করিয়া তুলিতে সহায় হইল। তিনি একটুখানি উষ্ণভাবে কহিয়া উঠিলেন,—"নবাবী আমল থেকে রুকুমপুরের জমীদারের রাজা খেতাব চলেছে, অতবড় বনেদী ঘরে আবার লেখাপড়ার চর্চ্চা কবে কার থাকে যে, ওদেরই থাকতে যাবে? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে খেতে ত আর ওবাড়ীর কারুকে কোন দিন হয় নি যে, পাশ ক'রে হাড় কালি করতে যাবে। যেমন তোমার বড়মা, তেমনই ছেলেই তাঁর হচ্ছেন শশে! না না জ্ঞান, অত বড়ঘরের কুটুম্বিতা আমি ছাড়া সঙ্গত বোধ করি না, মেয়ে শশের গর্ভধারিণীর নিজের চোখে দেখা, ওদের লিখে দাও, আমাদের মত আছে। দেনা-পাওনাও শশের মাতামহ লিখেছেন, বিশ পঁচিশের কম হবে না,—একেবারে পাকা দেখার দিন স্থির করতে লিখে দাও।"

এক নিশ্বাসে জজের রায় দেওয়ার মতই কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া যেন হাঁপ ফেলিলেন, তাঁর সটকার নলের সজোর টানে আলবোলার মধ্যের জলে বুদ্‌বুদ উঠিতে লাগিল, ধোঁয়ায় ঘরের মধ্যে ঝাপসা হইয়া আসিল।

এই যুদ্ধ-ঘোষণাকে তাঁর যেন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণ কাইসরের যুদ্ধ-ঘোষণার মতই বীরত্বব্যঞ্জক বোধ হইল। তিনি নিজের সাহসে নিজেই প্রীত ও বিস্মিত হইলেন। তিনি এবং তাঁর পিতৃপিতামহ মূর্খ ছিলেন বলিয়া বিদ্বান্ বংশের মেয়ে বিন্দু যে একটু শ্লেষ জানায়, সে তিনি জানিতেন এবং মনে মনে তার জন্য অবমানিতও বোধ করিতেন। মনে করিলেন, তার প্রতিশোধ এই রকম করিয়াই লইতে হইবে।

বাড়ীর পুরাতন কর্ম্মচারী কিন্তু এ আদেশে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। সে এ বাড়ীতে প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরিয়া চাকরী করিতেছে, বিন্দু তখন সত্ত এদের ঘরে পা দিয়াছে,

কর্ত্তামা তখনও জীবিতা, তার পর তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় বিশ বৎসর হইতে যায়, এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়াই সে বড়মাকে এ বাড়ীর একচ্ছত্রা কর্ত্রী বলিয়াই জানিয়া আসিয়াছে, তাঁর মতের বিরুদ্ধে কোন ছোট বড় কাযই সে কোন দিনই ঘটিতে দেখে নাই, তাই আজিকার এই উল্টা ব্যবস্থায় তার বিবেক যেন কিছুতেই সায় দিতে পারিল না। সে একটুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বিনীত কণ্ঠে কহিল,—"বড়মায়ের যখন মত নেই, তখন নাই বা হলো ওখানে ছোটদাদাবাবুর বিয়ে? কত হাইকোর্টের জজ ব্যারিষ্টার এখন সব হয়েছে, তারাই সব যেচে এসে ওঁনারে মেয়ে দেবেন, তার ভাবনা কি? দাদাবাবু আমাদের একে বড়লোক, তায় বিদ্বান্, ওঁর আবার ভাল কন্যের অভাব হবে?"

আবার প্রতিবাদ! বসন্ত বাবু হুকুম দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁর মনের অবস্থা এখনও ঘাতসহ হইতে পারে নাই, তাহা প্রতিক্ষণে নিজেই বুঝিতে পারিতেছিলেন। এই প্রতিবাদে হঠাৎ অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া সরোষে কহিয়া উঠিলেন,—"যা বলছি, কর গে ত, খবরদার দেরি না হয়, আজকের ডাকেই যেন চিঠি চ'লে যায়, না গেলে আমি বড্ডই বিরক্ত হবো।"

জ্ঞান বিস্মিতদৃষ্টিতে বারেক মনিবের অপরিচিত উত্তেজনায় উত্তেজিত মূর্ত্তি দেখিয়া লইয়া নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। একটা কোন অঘটনের আশঙ্কা কিন্তু তার মনকে একান্ত দুর্ব্বল করিয়া তুলিতেছিল। মনে মনে ঘাড় নাড়িয়া আপনাকে আপনিই বলিল ;—

"উঁহুঃ, এ ত ভাল নয়! বড়মার যাতে মত নেই,—বিশেষ এমন একটা শুভকর্ম্মে—"

সরযূ সে দিন অন্য দিনের চাইতে একটু ভোর-ভোর উঠিয়াছিল। সাধারণতঃ সে একটু বেলা পর্য্যন্ত ঘুমায়, কিন্তু সে দিন বেশী বেলায় বিন্দুর সামনে দিয়া বাহিরে যাইতে কেমন যেন একটুখানি সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। কালকের ব্যাপারটায় যে শরীরের রোগের চাইতে মনের রোগের আধিক্যই বেশী, সে কিছু আর বিন্দুর বুঝিতে বাকি নাই। তার উপর বাড়ীর কর্ত্তা যদি সত্য সত্যই এবার বড়গিন্নীকে এড়াইয়া ছোটগিন্নীর পক্ষাবলম্বন করিয়া থাকেন, সে বড় সহজ কাণ্ডটি হইবে না। সরযূর তীর্ক্তচিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। একবার সে মনে করিল, স্বামীকে বারণ করিয়া পাঠায় যে, কায নাই, বড়গিন্নী যা বলিতেছেন, তাই হোক। কিন্তু তখনই আবার প্রতিমার আদর ও আধিপত্য তার মনটাকে অপর দিকে দোলাইয়া দিল। মানুষের জীবন-মরণের কোনই হিসাব নাই, কার যে কখন্ ডাক আসে, তার কি কোন স্থিরতা আছে? বাপ বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতে শশাঙ্ক সংসারী হইয়া আপনার গণ্ডা বুঝিয়া লইলেই ভাল, এর পর তার ভাগ্যে কি যে হইবে, তার কি নিশ্চয় করিয়া বলা যায়? কথায় লোক বলে, 'সৎ মায়ের ছেন্দা, পান্তা ভাতে ঘি, চুলো মাথাটা মুড়িয়ে এস তো তেল পলাটা দিই।' এই ত! সে কি একবারেই মিথ্যা? সরযূর দিদিমায়ের ভাই অম্‌নি করিয়া সৎমায়ের চক্রান্তে বাপের বিষয়ে বঞ্চিত হইয়াছিল। বাপ বর্ত্তমানে সে সৎমাও সতীনপোকে খুব আর্ত্তি দেখাইত, অথচ তলেতলে সমস্ত সম্পত্তি নিজের নামে লিখাইয়া সতীনপোকে রাস্তার ভিখারী বানাইল! এ ছাড়া আরও কতই দৃষ্টান্ত দেখা যায়, সৎমা কখনও মা হইতে পারে না।

'মার চেয়ে যে দরদী, তারে বলি ডান' বিন্দু যে শরদিন্দুর চেয়েও শশাঙ্ককে বেশী আদর দেখান, এ নাকি আবার কখন সম্ভাব্য সত্য হইতে পারে? এ ডাইনীর মায়ার ভিতরে অনেক কিছুই উহ্য আছে, সময়মত বাহির হইয়া পড়িবে। অতএব শশাঙ্কের ভালমন্দ এখনও দিন থাকিতে তার সত্যকার আপনার মায়েরই দেখা উচিত।

মনকে কঠোর আঁখি ঠারিয়া সরযূ ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিল, তত সকালেই বড়গিন্নী স্নান সারিয়া নিজের ভিজা সাড়ী সদ্যোদিত প্রভাত-সূর্য্যের মৃদু কিরণে মেলিয়া দিতে দিতে মৃদু গুঞ্জনে আদ্যাস্তোত্র আবৃত্তি করিতেছেন। ঠিক সামনে দিয়া চলিয়া যাইবার সময় সরযূর বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া উঠিল। হয় ত এখনই বিন্দু তাহাকে ডাকিয়া কি বলিতে কি বলিয়া বসিবেন! হয় ত ছেলের বিয়ের কথায় থাকিয়া অনধিকারচর্চ্চায় ব্যাপৃত হওয়ার জন্য তিরস্কারই বা করিতে আরম্ভ করিয়া দেন। মুখামুখি দাঁড়াইয়া যে উহার কথায় বাদ-প্রতিবাদ করিতে পারে, এত বড় বুকের পাটা তার নয়!

বিন্দু কিন্তু কিছুই বলিলেন না, সে কাপড় টাঙ্গাইয়া দিয়া যেমন তেমনই "দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোহস্তু তে—" ইত্যাদি আবৃত্তি করিতে করিতে উঠান দিয়া

নামিয়া পূজার ঘরের উদ্দেশ্যে চলিয়া গেলেন। সরযূ যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, সেও একটু ত্বরিত-পদে অগ্রসর হইয়া স্নানের ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া খিল বন্ধ করিয়া দিল।

সকালবেলা নিশ্চিন্ত হইয়া পূজা করার অবসর বেশী থাকে না, চারিদিক্ হইতে নানা জনে নানা বিধি-বিধান লইয়া আদেশের অপেক্ষায় থাকে—যেটি তিনি না দেখিলে হইবে না। ভোরে উঠিয়া তাই তিনি প্রথমে শুচিবস্ত্রে মানসিক পূজা, জপ, গীতাপাঠ সারিয়া লইয়া তার পর স্নানান্তে দেব-পূজা সমাধা করেন, শোভাও বড়মার সঙ্গে উঠিয়া আসিয়া তাঁর পূজার ফুল চন্দন নৈবেদ্য গুছাইয়া সাজাইয়া দেয়। আজও সে তার নিত্যকার্য্য নিপুণভাবে করিতেছিল, বিন্দু আসিয়া ঘরে ঢুকিতেই সে তাঁর পদশব্দে মুখ না তুলিয়াই বলিয়া উঠিল—

"কি সুন্দর স্থলপদ্মগুলি ফুটেছে দেখ, বড়মা! রূপে যেন ঘর আলো ক'রে আছে।"

বিন্দুর স্তব বলা শেষ হইয়াছিল, গলবস্ত্র হইয়া প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তির উদ্দেশ্যে প্রণত হইয়া উঠিয়া শোভার দিকে চাহিয়া সস্নেহে হাসিয়া কহিলেন, "আমার শোভারাণীর রূপেও ওই রকম ঘরটি আলো হয়ে উঠেছে রে!"

শোভা ঈষৎ লজ্জা পাইয়া "আঃ তা বৈ কি! আমি ত বড় সুন্দর!" বলিয়া মুখ ফিরাইল, কিন্তু মনে মনে তার মনটা যে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, তা তার গালের রঙেই ব্যক্ত হইল।

বিন্দু স্নিগ্ধনেত্রে চাহিয়া কোমলকণ্ঠে কহিলেন, "সত্যি রে! এই রকম চেলি প'রে তুই যখন ঠাকুর-ঘরের কায করিস্, আমি তোকে বড্ড সুন্দর দেখি। মনে হয়, এমন সুন্দর বুঝি আর নেই!" বলিয়া নত হইয়া শোভার লজ্জানত ললাটে গভীর স্নেহে একটি চুম্বন করিলেন।

শোভা নত হইয়া বড়মার পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল, ঠাকুরের কাযে হাত জোড়া বলিয়া পায়ের ধূলা লইতে পারিল না, এই গভীর স্নেহের সামান্য উচ্ছ্বাসেই আনন্দে তার যেন দুটি চোখ ছলছল করিতে লাগিল।

ক্ষণ পরে নিজের স্বভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সে সহসা কি যেন একটা স্মরণ করিয়া লইয়া ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা বড়-মা! রুবিদি'কে ত তুমি পরশু দিন দেখেইছ? ওকে ছোড়দার বউ করলে কি রকম হয়? ও কিন্তু তোমার এই সত্যিকার স্থলপদ্মর চাইতে একটুখানিও কম সুন্দর নয়, এ আর আমার মতন জোর ক'রে মেলাতে হবে না, একেবারে রঙ্গে রঙ্গে মিশে যাবে! হেঁই বড়মা! তাই কর না, বড়মা!"

বিন্দু শোভার কথায় ঈষৎ একটুখানি হাসিলেন। ততক্ষণে পূজার আসনে বসিয়া তিনি আচমনের জন্য জল হাতে লইয়াছেন, উত্তর দিলেন না।

শোভা নিজের মনেই বকিয়া চলিল, "রুবিদি বউদি হ'লে কি মজাই যে হবে, বড়মা! সে আর আমি তোমায় কি বলবো? কালকে ওদের রিহার্সেল দেখতে গেছলুম ত? এসে সব কথা তোমায় ত বলাই হয়নি, আর বলবোই বা কেমন ক'রে? যা ছোড়দা আমায় জ্বালায়! এ দিকে ছেলে রুবিদির নামটি শুনলেই খরগোসের মতন কাণটি খাড়া ক'রে থাকবেন, কিছু না বল্লে আমায় চিমটি কেটে সুড়সুড়ি দিয়ে অস্থির করবেন, আবার যাই বলতে আরম্ভ করবো, অমনি সব কথায় এমন ভ্যাংচাবেন যে, আমার মাথা গরম হয়ে ওঠে, আর কিচ্ছুই বলতে মন লাগে না। এখন তুমি পুজো কর, এক সময় সে সব গল্প তোমার কাছে করবো, বড়মা! সে সব ভা—রি মজার কথা, বড়মা —এমন হাসির! রুবিদি কিন্তু বড্ড ভাল বড়মা! সত্যি বড়মা! ছোড়-দারও ত খুব ইচ্ছে, ওকেই বউ করো লক্ষীটি, বড়মা! বেশ বউ হবে।"

বিন্দু আচমন করিয়া আসনশুদ্ধির জন্য ফুল লইতে গিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা রে, সে ত আর আজই হচ্ছে না, এখন আমায় পুজো করতে দিবি কি না দিবি?"

শোভা ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেও সেই সঙ্গে প্রোৎসাহিত হইয়া হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "হুঁ, 'আচ্ছা রে' বলেছ! যেন মনে থাকে; আচ্ছা, এই আমি চুপ করলুম, এই আমি চ'লে যাচ্ছি, তুমি পুজো কর বাবু।"

পূজা শেষ করিয়া বিন্দুর বাহির হইতে স্বর সহিল না, জ্ঞান দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, প্রণাম করিয়া একটা খামে মোড়া চিঠি দেখাইয়া বলিল,—

"এই পত্তর ছোটমায়ের বাপের দেশের সেই জমীদারদের বাবু মশাই লিখতে বল্লেন। ছোট বাবুর পাকা দেখার দিন ঠিক ক'রে পাকা দেখা দেখতে আসতে। আসছে মাসেই বিয়ে

হয়ে যাবে। তা' এ চিঠি কি পাঠাবার কোন দরকার আছে, বড়মা ?"

তাহার কণ্ঠে অন্তরের কুণ্ঠা প্রকাশ পাইল।

বিন্দু বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া সহজ স্বরে উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ, পাঠাবে বৈ কি! বাবু যখন পাঠাতে বলেছেন।" বলিয়া সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

জ্ঞান আবার একবার মাথা চুলকাইয়া একটু কাসিয়া ঈষৎ মৃদু কণ্ঠে কহিল, "বাইরের লোকের সঙ্গে কথা, যদি আপনার তেমন মত না থাকে, তা হ'লে একটু দেরি করলে হতো না? বিশেষ ছোটদাদা বাবুর একজামিনের আর ত বেশী দেরিও নেই—"

বিন্দু চলিতে চলিতেই বাধা দিলেন, "তা হোক, কর্ত্তা যখন বলেছেন, তুমি চিঠি পাঠিয়ে দাও গে। হ্যাঁ, দেখ, জ্ঞান! চাকরদের চালটা বোধ হয় এইবার কিছু আনাতে হবে, আর লেপের জন্য কিছু কাপাস তুলো চাই।"

পুরাতন ভৃত্য থামিবার ইঙ্গিত বুঝিয়া আর দ্বিরুক্তি না করিয়াই "যে আজ্ঞে" বলিয়া সব কথারই জবাব শেষ করিয়া চলিয়া গেল।

বিন্দুও ঠাকুর-পূজার নৈবেদ্য হাতে নিজের নিত্য কার্য্যের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

হিন্দু

রূপে যারা করি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা পুতুলে দেবতা আনে,
অণু-পরমাণু-মাঝারে যাহারা আত্মা রয়েছে জানে,
ভয়ের মাঝারে যাহারা নিয়ত অভয়ের কথা কহে,
জানিয়াছে এই মৃতের ভুবনে অমৃতের ধারা বহে,
বিশ্বনাথের লাগিয়া যাহারা বিশ্বকে ভালবাসে—
পুতুল-পূজক বলিলে তাদিকে আবার কান্না আসে।

জীবে দেয় যেই দেবের মান্য, অমানীরে দেয় মান,
শক্ত হইয়া ক্ষমা করে যেই, দীন-ভাবে করে দান।
ভাবে পবিত্র যারা তরু-লতা তুচ্ছ মাটী ও জল,
ভক্ত-চরণ-রেণুর লাগিয়া পাতে হৃদি-শতদল।
চণ্ডালে গণে দ্বিজের শ্রেষ্ঠ ভক্তির বলে বলী,
কেমন করিয়া বল তাহাদিকে অনুদার মোরা বলি!

ধর্ম্মের সাথে অতি ঘনিষ্ঠ উঁহাদের পরিচয়,
অধিকারী-ভেদে উপাসক ভেদ ছাঁচের ধর্ম্ম নয়।
ওরাই প্রেমিক ওরাই ভাবুক অমৃতের কারবারী—
বিশাল ওদের বিরাট ধর্ম্ম বুঝিয়া বুঝিতে নারি।
ওদের নাগাল নিতে যে পারিনে দাঁড়াতে পারিনে পাশে,
তাদিকেও মূর্খ বলিলে আবার হাসি ও কান্না আসে।

অনুরাগে যার আলো করা বুক আলোকে কে যাবে লয়ে?
দার্শনিকের গোটা জাতিটাকে ভুলাবে কি কথা কয়ে?
কি শিক্ষা দিবে ধর্ম্মের নামে তুমি হে অসংযমী!—
বাচাল সরমে হয়ে যাও মূক, সম্ভ্রমে যাও নমি।
হৃদয় তাদের রয়েছে ভরিয়া প্রেম-কস্তূরী-বাসে,
উপহাস কর—তোমার লাগিয়া কান্না আবার আসে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

১৩

সীতা
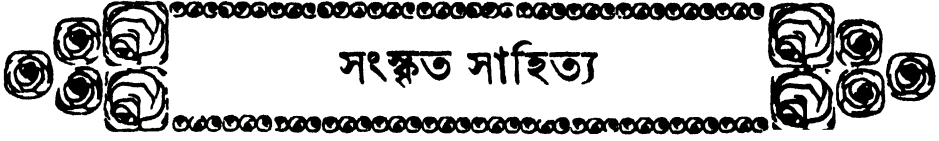
পূর্ব্বের কতিপয় প্রবন্ধে আদিকবির রামায়ণ হইতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সীতার বয়ঃক্রম বিবাহকালে কিছুতেই ছয় বৎসর হইতে পারে না। বাল্মীকি যে সমুদয় স্থলে রাম-সীতার প্রথম মিলনের বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে বিবাহকালে সীতা যে প্রাপ্তযৌবনা ছিলেন, এ কথা স্পষ্টই প্রতীত হয়। এ সম্বন্ধে মূল রামায়ণ গ্রন্থ হইতে, প্রমাণজ্ঞাপক আর কোন স্থল উদ্ধৃত করার পূর্ব্বে, অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে কি আছে, তাহাই এখন দেখা যাক্।

অধ্যাত্ম-রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখিতেছি,—মিথিলার রাজসভায় রামচন্দ্র সহাস্যবদনে হরধনুর্ভঙ্গ করিয়াছেন, রাজা জনক ও সমগ্র অন্তঃপুর আনন্দে বিহ্বল হইয়াছেন। আর সীতা স্বর্ণময়ী মালা হাতে লইয়া সস্মিত-মুখে ধীরপদসঞ্চারে রামের নিকটে গিয়া রামের গলায় মালা নিক্ষেপ করিয়া একবারে যেন প্রীতিসাগরে ডুবিয়া গেলেন।—সংস্কৃত ভাষায় সে সময়ের বর্ণনা অতি চমৎকার।

"সীতা স্বর্ণময়ীং মালাং গৃহীত্বা দক্ষিণে করে।
স্মিতবক্ত্রা স্বর্ণবর্ণা সর্ব্বাভরণভূষিতা। ২৯
মুক্তাহারৈঃ কর্ণপত্রৈঃ ক্বণচ্চলিতনূপুরা।
দুকূল-পরিসংবীতা বস্ত্রান্তর্ব্যঞ্জিত-স্তনী। ৩০
রামস্যোপরি নিক্ষিপ্য স্ময়মানা মুদং যযৌ।
* * * * * । ৩১

এই স্থলে "স্মিতবক্ত্রা" "স্ময়মানা মুদং যযৌ"—এই দ্বিবিধ বিশেষণেই সীতার বিবাহকালীন বয়ঃক্রমের পর্য্যাপ্ত আভাস পাইতেছি। ছয় বছরের মেয়ের পক্ষে ও সব উক্তি কদাচ প্রস্তুতানুগত হইতে পারে না। তার পর,—ঐ সমস্ত ছাড়িয়া দিলেও বা আইনের প্যাঁচে উহাদের অর্থান্তর করিবার পণ্ড-শ্রম করিলেও "বস্ত্রান্তর্ব্যঞ্জিতস্তনী"—(বস্ত্রের অভ্যন্তর হইতে তাঁহার স্তনযুগল প্রকাশ পাইতেছিল"—পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ, বঙ্গবাসী-সংস্করণ, ১৩৩৫ সাল)—বিশেষণের দ্বারা, বিবাহকালে সীতা যে প্রাপ্তযৌবনা ছিলেন এবং তাঁহার প্রকৃত বয়স যে বাল্মীকি-বর্ণিত "পতিসংযোগসুলভ" (মাসিক বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৩৫, পৃ ৩৭৪) ছিল, ইহাতে সংস্কৃতজ্ঞগণের দ্বিধা করিবার কোনই কারণ নাই এবং ছয় বছর বয়সে সীতার বিবাহ হইয়াছিল, এ কথার উত্থাপনই চলে না।

রামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়—স্ব স্ব পত্নী-সমভিব্যাহারে মিথিলা হইতে অযোধ্যায় ফিরিয়াছেন, রাজ-বাড়ীতে মহান্ উৎসব। সকলের সহিত আলাপ-আপ্যায়নের পর—

"রামলক্ষ্মণশত্রুঘ্নভরতা দেবসম্মিতাঃ।
স্বাং স্বাং ভার্য্যামুপাদায় রেমিরে স্ব-স্ব-মন্দিরে। ৪৯
মাতাপিতৃভ্যাং সংহৃষ্টো রামঃ সীতা-সমন্বিতঃ।
রেমে বৈকুণ্ঠভবনে শ্রিয়া সহ যথা হরিঃ। ৫০
অধ্যাত্ম-রামায়ণ, আদি, ৭ম, বঙ্গবাসী, ১৩৩৫।

দেবপ্রতিম রামলক্ষ্মণভরতশত্রুঘ্ন নিজের নিজের মন্দিরে ভার্য্যাদিগকে লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। বৈকুণ্ঠধামে লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণুর যেমন সুখে কাল কাটে, মাতাপিতার আদরে পরম আনন্দিত রাম-সীতার দিনও সেই-ভাবে কাটিতে লাগিল।

এ স্থলেও, দেখিতেছি, বাল্মীকির উক্তি (মাসিক বসুমতী আষাঢ়, ১৩৩৫, পৃঃ ৩৭৪) এবং ব্যাসের উক্তি একই প্রকারের। অযোধ্যায় ফিরিয়া নব-বধূরা স্ব স্ব স্বামীর সহিত নির্জ্জনে "রেমিরে"—অর্থাৎ আমোদ-আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। অধ্যাত্ম-রামায়ণের সীতা, বিবাহের পূর্ব্বেই, "বস্ত্রান্তর্ব্যঞ্জিতস্তনী",—বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে তাঁহার স্তন দেখা যাইতেছিল, সুতরাং এখানে "রেমিরে"—শব্দের অর্থ—'খেলা-ধূলা করিয়া সীতাকে জোর-জবরদস্তির দ্বারাও ছয় বছরে দাঁড় করানো সম্ভবপর নহে। বাল্মীকি রামায়ণে ওরূপ কোনও বিশেষণ অবশ্য নাই, কিন্তু "রেমিরে মুদিতা রহঃ" এবং "পতিসংযোগ-সুলভং বয়:"—এই সকল উক্তিতে সীতার বয়ঃক্রম যে যৌবনোল্লসিত ছিল, তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

কল্কিপুরাণের তৃতীয়াংশের তৃতীয়াধ্যায়ে দেখিতেছি—মিথিলার স্বয়ংবর-সভায় রামচন্দ্র যখন হরধনুর্ভঙ্গ করিতে উঠিলেন,—তখন জনকের সমাদরে এবং জানকীর কটাক্ষে তিনি সম্পূজিত হইলেন। অর্থাৎ রাম উঠিবামাত্র জনক তাঁহাকে অশেষ আদর প্রদর্শন করিলেন এবং জানকীও কটাক্ষের দ্বারা তাঁহার আতিথ্য করিলেন। সংস্কৃতটুকু এই :—

"স ভূপপরিপূজিতো জনকজেক্ষিতৈরর্চ্চিতঃ।
করালকঠিনং ধনুঃ কর-সরোরুহে সংহিতম্। ২২

পরে জনকের সমাদরে ও জানকীর কটাক্ষে সংকৃত হইয়া সেই অত্যন্ত কঠিন ধনু করে লইয়া দুই খণ্ড করিলেন।

এ স্থলে, ধনুর্ভঙ্গ করিতে রাম যখন উঠিলেন, তখন তাঁহার উৎসাহবর্দ্ধক, সীতার কটাক্ষ পাইতেছি; সীতার বয়ঃক্রম যে তখন ঠিক কত, তাহা নিশ্চিতরূপে না পাইলেও, তিনি যে ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ কিংবা ১৩ বছরেরও ছিলেন না, ইহা কতকটা বুঝিতেছি। ব্যাসের এই উক্তিতেও, সীতার বিবাহ-কালের বয়স ছয় বৎসর,—এই কথা উড়িয়া যাইতেছে। ছয় বছরের মেয়ের, ভাবী প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ কোনও আইনেই মঞ্জুরী পায় না।

দেবীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ে দেখিতেছি,—যতিবেশে রাবণ যখন সীতাকে হরণ করিতে আসিয়াছেন, তখন—উভয়ের কথাবার্ত্তার মধ্যে—সীতার প্রশ্নে রাবণ কহিতে-ছেন,—আমি প্রকৃতপক্ষে যতি নাহি, আমি লঙ্কার রাজা,

তোমারই জন্য আজ এই রূপ ধারণ করিয়াছি। তুমি আমাকে বরণ কর। পূর্ব্বে তোমার পিতার নিকট আমি তোমাকে চাহিয়াছিলাম, হরধনুর্ভঙ্গপণের কথা শুনিয়া—রুদ্রচাপের ভয়ে আমি আর তোমার স্বয়ংবর-সভায় যাই নাই। তদবধি আমি নিতান্ত আত্মবিমূঢ় ও আমার হৃদয় অত্যন্ত বিরহাতুর। আজ তুমি এই বনে আছ—জানিতে পারিয়া, সেই পূর্ব্বজাত অনুরাগে একান্ত বিমোহিত হইয়া তোমার নিকটে আসিয়াছি। তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর। রাবণ কহিতেছেন—

"লঙ্কেশোঽহমরালাক্ষি !—* * *
ত্বৎকৃতে তু কৃতং রূপং ময়েথং শোভনাকৃতে ! । ৬২
* * * *
পিতা তে যাচিতঃ পূর্ব্বং ময়া বৈ ত্বৎকৃতেঽবলে !
জনকো মামুবাচেথং—পণবন্ধো ময়া কৃতঃ । ৬৭
রুদ্রচাপ-ভয়ান্নাহং সম্প্রাপ্তস্ত স্বয়ংবরে।
মনো মে সংস্থিতং তাবন্নিমগ্নং বিরহাতুরম্ । ৬৮
বনেঽত্র সংস্থিতাং শ্রুত্বা পূর্ব্বানুরাগ-মোহিতঃ।
আগতোঽস্মাসিতাপাঙ্গি ! সফলং কুরু মে শ্রমম্ । ৬৯"

এ স্থলে, বিবাহের পূর্ব্বে যদি সীতার বয়স ছয় বৎসরই হয়, তবে লঙ্কেশ্বর রাবণ—সেই ছয় বছরের মেয়ে দেখিয়া একবারে ক্ষেপিয়া গেলেন ও তাহাকে না পাইয়া বিরহ-সাগরে ডুবিলেন, —এ সব উক্তি খাটিতেছে কৈ? ব্যাসেরও কি 'ভীমরতি' হইয়াছিল? তার পর,—ছয় বছরের মেয়ের উপর তখন রাবণের যে 'অনুরাগ' জন্মিয়াছিল, তাহার টানে—এত কাল পরেও, রাবণ আসিয়া হাজির হইলেন—সেই তাঁহাকেই লইতে! চমৎকার ছয় বছর ত। যাহার এত মাধুর্য্য, যাহাতে রাবণও গলিয়া গেলেন!

পদ্মপুরাণ—পাতাল খণ্ডের ২১ অধ্যায়ে একটি কৌতূহলোদ্দীপক উপাখ্যান দেখিতেছি। মিথিলার উপবনে কতিপয় সখীর সহিত সীতা এক দিন বিচরণ করিতে করিতে বৃক্ষোপরি এক শুকদম্পতির মধুর আলাপ শুনিতে পাইলেন। উহারা পতি-পত্নীতে, রামায়ণ-প্রসঙ্গই আলাপ করিতেছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে, উহারা বাল্মীকির তপোবনে ছিল, এবং তথায় ভাবী রামায়ণ-সঙ্গীত শুনিয়াছিল। আজ আনন্দভরে সেই সঙ্গীতেরই পুনরালোচনা করিতেছে। অনেকক্ষণ নীরবে শুনিয়া শুনিয়া সীতা বুঝিলেন যে, শুকমিথুনের সঙ্গীতে যে সীতার উল্লেখ আছে, তাহা তিনিই নিজে এবং মিথিলার রাজবাড়ীতে যে হরধনুর্ভঙ্গ পণের কথা এবং রাম কর্ত্তৃক সেই ধনুক ভাঙ্গার কথা, তাহাও তাঁহারই পিতার ধনুর্ভঙ্গপণ ও তাঁহারই বিবাহের প্রসঙ্গ। ইত্যাদি শুনিয়া, অতি কৌশলে, সখীদের দ্বারা সীতা ঐ শুকমিথুনকে ধরাইয়া আনিলেন এবং রাম সম্বন্ধে নানা খুটিনাটি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সীতা-কৃত রাম-বিষয়ক প্রশ্নে পক্ষিযুগলের মনে নানা সন্দেহ জন্মিল ও তাহারা সীতাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"ত্বং কা বা কিং সু-নামাত্র তব সুন্দরি ! বদ মাম্।
পরিপৃচ্ছসি বিদগ্ধ্যাদ্ রামকীর্ত্তনমাদরাৎ ।" ১৮৫

"সুন্দরি! আপনি কে? আপনার নাম কি? আপনি যে আগ্রহাতিশয়-সহকারে চাতুর্য্য প্রকাশ করত বারংবার শ্রীরামের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—আপনি কি সেই জানকী?" (পদ্ম পুং, বঙ্গবাসী, ১৩১৮ সাল, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, পৃঃ ২৬১)

প্রত্যুত্তরে সীতা কহিলেন—

"যা ত্বয়া জানকী প্রোক্তা সাহং জনকপুত্রিকা।
স রামো মাং যদাগত্য প্রাপ্স্যতে সুমনোহরঃ।
তদা বাং মোচয়াম্যদ্ধা নান্যথা বাক্য-মোহিতা।
লীলয়া চ সুখেনাস্তাং মদ্-গৃহে মধুরালকৌ।" ১৮৭, ১৮৮

তুমি যে জানকীর কথা কহিতেছ,—আমিই সেই জনক-নন্দিনী জানকী। সেই মোহনমূর্ত্তি শ্রীরাম যখন আসিয়া আমায় গ্রহণ করিবেন, তখনই আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিব, কারণ, তোমরা আমাকে কথায় প্রলোভিতা করিয়াছ। এক্ষণে তোমরা মদ্গৃহে সুমিষ্ট বস্তু ভোজনপূর্ব্বক ক্রীড়া করত সুখে অবস্থান কর।। (পদ্ম পুং, বঙ্গবাসী)

ছয় বছর বয়সে যদি সীতার বিবাহ হইয়া থাকে, তবে—এই উপবন-ভ্রমণ ও তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলি নিশ্চয়ই আরও ঢের পূর্ব্বে—তিন বছর কি জোর চারি বছর বয়সে ঘটিয়া থাকিবে। অথচ "বৈদগ্ধ্যাৎ" বিদগ্ধতা অর্থাৎ পাণ্ডিত্য ও চাতুর্য্য সহকারে এবং "আদরাৎ"—আগ্রহাতিশয়ে—সীতা স্বীয় ভাবী পতির বিষয় শুনিবার জন্য নানা প্রশ্ন করিতেছেন,—ইহা কি সম্ভবপর? সংস্কৃত-সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য, আদিকবিকৃত রামায়ণে এবং অন্যান্য পুরাণ, উপপুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতিতে সীতার বিবাহকালীন বয়ঃক্রমজ্ঞাপক বহু প্রমাণ-প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। সে সমুদয়ের পর্য্যালোচনায়, বিবাহকালে সীতা যে ছয় বছরের মেয়ে ছিলেন, ইহা কিছুতেই প্রতীত হয় না। মাসিক বসুমতীতে প্রদর্শিত প্রমাণাদির পর,—আর বচনোদ্ধারের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে, বিবাহকালে সীতা যুবতী অথবা প্রৌঢ়কৈশোরা ছিলেন,—এই সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে অনেকে বলেন,—শাস্ত্রে ত ঋতুমতী কন্যার বিবাহ নিন্দিত, এবং অনেকের মতে নিষিদ্ধ, তবে জনক ওরূপ নিন্দিত এবং নিষিদ্ধ কার্য্য করিবেন কেন? বিশেষতঃ, সীতার নিজের মুখেই, যোগিবেশী রাবণের নিকট পরিচয়প্রদানকালে যখন ছয় বৎসর পাইতেছি, তখন, তাহা উড়াইয়া দিয়া সীতাকে প্রাপ্তযৌবনা করিবার প্রয়োজন কি? তাঁহাদের এই উক্তিতে দুইটি আপত্তি পাইতেছি, যথা—

১। ঋতুদর্শনের পূর্ব্বে বিবাহই শাস্ত্রসম্মত।

২। সীতা নিজেই রাবণকে বলিয়াছেন, বিবাহকালে তাঁহার বয়স ছিল ছয় বৎসর।

ক্রমে আপত্তিদ্বয়ের সারবত্তা দেখা যাক্।

১ম আপত্তি খণ্ডন। যে সকল শাস্ত্রের বচনে সীতা-সম্প্রদানকর্ত্তা জনককে বাঁধিবার প্রয়াস করা হইতেছে, উহারা জনকের আবির্ভাবের বহুপরে নিশ্মিত। ঐ সব বচন অপৌরুষেয় বাক্যবৎ অপরিহার্য্য নহে। যেমন খৃঃ পঞ্চম বা সপ্তম শতকে আবির্ভূত কোন ধর্ম্মশাস্ত্রকারের বিরচিত বচনের বলে, খৃঃ ২য় বা তৃতীয় শতকে প্রাদুর্ভূত কোন ব্যক্তির কার্য্যের

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নির্ণয় করা চলে না, তদ্রূপ, অর্ব্বাচীন শাস্ত্র-বচনের জোরে প্রাচীনতম জনকের কার্য্যানিয়ন্ত্রণও চলিতে পারে না। আর তাহা ছাড়া, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে বর্দ্ধিতবয়স্কা কন্যার দানই প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অবশ্য বহুগ্রন্থে ইহার বিপরীত অর্থাৎ ৬।৭।৮ বৎসরে কন্যাদানের কথা দেখা যায়। প্রবন্ধান্তরে তাহার আলোচনার বাসনা রহিল। এখন প্রাপ্তযৌবনা কন্যার কথাই আলোচ্য।

অথর্ব্ববেদের একাদশ কাণ্ডের তৃতীয় অনুবাকের অষ্টাদশ মন্ত্রে দেখিতেছি,—কন্যা ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক যুবক পতিকে লাভ করিবেন।

"ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্।
অনড্বান্ ব্রহ্মচর্য্যেণ অশ্বো ঘাসং জিগীর্ষতি।"

এই মন্ত্রে যুবতী কন্যার বিষয়ই শ্রুত হইতেছে, ছয়-সাত-আট-নয়-দশ বছরের মেয়ের ব্রহ্মচর্য্য আবশ্যক হয় না। গোভিলগৃহ্য-সূত্রে অধিকবয়স্কা কন্যার বিবাহের উল্লেখ আরও স্পষ্টতরভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। গোভিল বলেন—

"নাজাতলোম্নোপহাসমিচ্ছেৎ।"

অজাতলোমিকা কন্যার পরিণয়ের দ্বারা উপহসিত হওয়া কদাচ উচিত নহে। কাত্যায়ন ঋষি এ সম্বন্ধে দৃঢ়তার সহিত বিধান দিয়াছেন যে,—

"প্রাগ্ রজোদর্শনাৎ পত্নীং ন ইয়াৎ।"

রজো-দর্শনের পূর্ব্বে কদাচ পত্নী সংগ্রহ করিবে না। এই স্থলে—গৌরীদান-বাদীরা "ইয়াৎ" শব্দের অভিগমন অর্থ করেন। ঋতুর পূর্ব্বে পতিপত্নীব্যবহার করিতে নাই। কিন্তু পূর্ব্বধৃত অথর্ব্ববেদ ও গোভিলগৃহ্যসূত্রের স্পষ্ট উক্তির পর, ওরূপ অর্থ সংলগ্ন হয় না। কন্যার রজোদর্শনের পর বিবাহ মনুও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—

"ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাৎ বিন্দেত সদৃশং পতিম্। ৯০
অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ্ যদি স্বয়ম্।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি।" ৯১
মনু—৯ম।

("পিতাদি যদি গুণবান্ বরকে কন্যা সম্প্রদান না করে, তবে কন্যা ঋতুমতী হইলেও তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবে, পরে স্বয়ংবরা হইবে। পিত্রাদি কর্ত্তৃক অদীয়মানা কন্যা যদি যথাকালে ভর্ত্তাকে বরণ করে, তাহাতে কন্যার কিছুমাত্র দোষ হয় না এবং উক্ত ভর্ত্তারও কোন দোষ নাই। "ভরত শিরোমণির অনুবাদ, বসুমতীর মনুসংহিতা")

যে কারণেই হউক, ঋতুমতী হইবার পরও যে বিবাহ হইত, এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রসম্মত,—তাহা এই সকল বচনে প্রমাণিত হইতেছে। গোপথ-ব্রাহ্মণে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে,—

"আসাং প্রথমে বয়সি রেতঃ সিক্তং ন সম্ভবতি।"
(অনুবাদ অনাবশ্যক)

রজোদর্শনের পর বিবাহের বিধান প্রাচীনকাল হইতেই শাস্ত্রাদিতে পরিদৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু ইহার বিপরীতও যথেষ্ট দেখা যায়। গৌরীদান, রোহিণীদান প্রভৃতির উল্লেখ আমাদেরই শাস্ত্রে দেখিতে পাই। ত্রিশবৎসরবয়স্ক পুরুষ, যদি রূপগুণসম্পন্না দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা বিবাহ করেন, তাহা যেমন শাস্ত্রসঙ্গত হয়, তদ্রূপ ষট্‌ত্রিশ বৎসরের পুরুষ যদি ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীর পাণিপীড়ন করেন, তবে তাহাও শাস্ত্রসঙ্গত হইবে।

"অথ তদ্ দ্বাদশাহানি ত্রিংশদ্বর্ষেণ সর্ব্বদা।
যদি দ্বাদশবর্ষা স্যাৎ কন্যা রূপ-গুণান্বিতা।
দ্বাত্রিংশদ্বর্ষপূর্ণেন যদি ষোড়শবার্ষিকী।"—ব্রহ্মপুরাণ।

সুতরাং—পৌরাণিক যুগে আট নয় বছরের মেয়ের বিবাহের প্রামাণ্য-জ্ঞাপক বহু সংবাদ পাইলেও, ঋতুমতী হওয়ার পর যে কন্যার বিবাহ হইত, তাহা পুরাণ-নামা গ্রন্থাবলীর মধ্যে এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বেদাদিতে এবং সূত্রগ্রন্থাদিতেও বহুলপরিমাণে দেখিতেছি। ইহা ছাড়া আবার ধন্বন্তরির শিষ্যপ্রবর মহর্ষি সুশ্রুত তদীয় সংহিতায় স্পষ্টই বলিতেছেন যে,—

"পঞ্চবিংশে ততো বর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে।
সমত্বাগতবীর্য্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্।
ঊনষোড়শবর্ষায়াম্ অপ্রাপ্তপঞ্চবিংশতিঃ।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং স কুক্ষিস্থ বিপদ্যতে।
জাতো বা ন চিরং জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ।"

(পঁচিশ বছরের পুরুষ এবং ষোলবছরের নারী তুল্যবীর্য্য-সম্পন্ন হইয়া থাকে, এ কথা প্রবীণ চিকিৎসক মনে রাখিবেন। পঁচিশ বছরের কম বয়সের পুরুষ যদি ষোল বছরের কম বয়সের নারীতে গর্ভাধান করেন, তবে সে গর্ভ কুক্ষিতেই নষ্ট হইয়া যায়। যদিই বা তাদৃশ ক্ষেত্রে সন্তান জন্মে, তাহা হইলেও সে সন্তান বাঁচে না বা বাঁচিলেও দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হয়। অতএব অত্যন্ত বালিকায় কদাচ গর্ভাধান করাইবে না।)

মহর্ষি সুশ্রুতের মতেও রজোদর্শনের বহুপরে কন্যার বিবাহের কথা পাইতেছি। অনেকে বলেন,—আট বছরে গৌরী দান করিয়া, ষোল বছর পর্য্যন্ত কন্যাকে পতি-সংযোগ-বঞ্চিতা রাখিলেই ত সকল আপদ চুকিয়া যায়; সকল শাস্ত্রেরই মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রকারান্তরে, তাঁহারা কিন্তু বর্ত্তমান সম্মতি আইনেরই সমর্থন করেন। তবে হয় ত তাহা অজ্ঞানপূর্ব্বক।

যাহা হউক, উদ্ধৃত শাস্ত্রীয় প্রমাণাদির দ্বারা এ কথা বুঝিতে পারিতেছি যে, "বয়স্যাত্ত্ব্যায়িতস্তনী" সীতার বিবাহ দিয়া রাজর্ষি জনক গৌরীদানবাদীদিগের কটাক্ষভাজন হইলেও প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই। ইহার দ্বারা আর একটা সত্যও প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে অত্যন্ত বালিকার এবং যুবতীর—উভয়েরই বিবাহ প্রচলিত ছিল। যে কোন চক্ষুষ্মান্ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি এ কথা কদাচ অস্বীকার করিবেন না বা করিতে পারেনও না।

একণে বলা যাইতে পারে যে, সীতার ছয় বছর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, রামায়ণের এক স্থলে এবংবিধ যে উক্তি আছে, তাহা রামায়ণেরই অন্যান্য সীতাসংক্রান্ত বর্ণনায় এবং অপরাপর পুরাণাদির লেখায় নিতান্ত অপ্রতিপন্ন হইতেছে এবং রজোদর্শনের পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ হইত, পরে হইত না, এ কথাও উদ্ধৃত শাস্ত্রাদিবলে নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইতেছে।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

নন্দ-কল্যাণী

(গাথা)

ছয়টি বছর অতীত হইল কুমার গিয়াছে চলি'
কপিলাবস্তু-প্রাসাদে সেই যে নিভিয়াছে দীপাবলী
আজো জলে নাই, পুরী-মাঝে আজো উঠিতেছে হাহাকার,
একটি একটি করি পুরবাসী গেরুয়া করি'ছে সার।
প্রাসাদ-কারায় করে ছটফট নৃপতি শুদ্ধোদন
ধীরে ধীরে দৃক্‌শক্তি গলায়ে ঝুরে তাঁর দু'নয়ন।

"জীবনের দিন শেষ হয়ে আসে, ক্ষোভ নাই, সে ত ভালো
এখনো নয়নে যায় নি ঘুচিয়া তপনের ক্ষীণ আলো।
এই আলোটুকু থাকিতে থাকিতে একবার এসো ফিরে,
শেষ-দেখা দেখে মুদি এ নয়ন রোহিণী নদীর তীরে।"—
কেঁদে কেঁদে কয় জীর্ণ নৃপতি।

মন্ত্রীরা কয়, "প্রভু,
আপনার মত এমন ভাগ্য কাহারো হয় না কভু।
সম্বোধি লভি কুমার মোদের আজিকে বিশ্বত্রাতা,
পীড়া-জরা-ব্যথা-মরণ-সাগরে জীবে আশ্রয়-দাতা।
বিশ্ব-জগতে আলো করে দান শাক্য-কুলের রবি,
শান্ত করুন চিত্ত, রাজন্ এই সান্ত্বনা লভি'।"

কুমারে পত্রী লিখিয়া জানায় মন্ত্রীরা বারবার,
"তোমারে না হেরে জনক তোমার করিতেছে হাহাকার।
দেশে দেশে কত বিলা'লে কুমার, অমৃতমন্ত্র তুমি
কোন্ অপরাধে অপরাধী এই ব্যথিত জনম-ভূমি?"
পত্রী বহিয়া চলেছে কতই দূতের উপরে দূত—
বৃথা পথ চাওয়া, কেহ ফিরে নাক। অপরূপ অদ্ভুত!

কুমার নন্দ গর্ব্বে কহিল, "শুনে মোর হাসি পায়,
যত নির্ব্বোধে দৌত্যে পাঠাও দুকথায় ভুলে যায়
হয় ত সেখানে ভূরি-ভোজ মিলে, শ্রম-ক্লেশ কিছু নাই,
নিঃস্ব লুব্ধ দূতেরা তোমার ফিরিয়া আসে না তাই।
দেখি একবার আমি নিজে গিয়ে, আনিবই নিশ্চয়
দাদারে সঙ্গে যদি নাহি আনি—নন্দই নাম নয়।
আমি আকণ্ঠ সম্ভোগ লাগি উন্মুখ দিবা-যামী—
এ রাজ-কুলের সব সম্পদ্ ভুঞ্জিতে চাই আমি
আমারে ভুলানো নয়ক সহজ। সে মূঢ় মুড়া'ক মাথা
ভোগের শক্তি নাহিক যাহার—আর যার সার কাঁথা।"

অশ্ব-পৃষ্ঠে চড়িল নন্দ দৃপ্ত বীরের বেশে
জননী বলিল, "হা বৎস, আর দূত মিলিল না দেশে?
সপ্তাহ পরে বিবাহ যে তোর, প্রস্তুত আয়োজন,
বহুকাল পরে উৎসব পুরে,—এ কি এ অলক্ষণ—
এ কি বাবা তোর দুর্ম্মতি হলো? কি জানি কপালে আছে!
অজ্ঞাত ভয়ে বুক কাঁপে মোর—দক্ষিণ চোক্ নাচে।"

"মা তুমি ক্ষেপেছ?"—কহিল নন্দ হাসিয়া উচ্চ রবে,
"দেখিলে আমায় সংসার-সুখে উদাসী বিরাগী কবে?
শৈশব হ'তে করুণা-কাতর তিনি গিয়াছেন ব'লে
আমি নিষ্ঠুর ক্ষত্রিয় শূর সব ফেলে যাব চ'লে?
বিবাহ, বেশ ত! বিবাহোৎসবে দাদাও র'বেন পুরে—
তা হ'তে ভাগ্য কি আছে আমার? শীঘ্র আসিব ঘুরে।"

চলিল নন্দ অশ্বারোহণে পৌর মার্গ ছাড়ি,
পুরপ্রান্তের উপবন হ'তে বাহিরিল তাড়াতাড়ি
তরুণী ললনা কুসুম-ভূষণা রূপে আলোকিয়া দিক্।
চাহিল নন্দ অশ্ব থামায়ে তার পানে অনিমিখ।
কহিল রমণী "এক্ষণি ফের,' কোথায় চলেছ নাথ?
আজ বাদে কাল তোমার সঙ্গে যাপিব বাসর-রাত।
শাক্যসিংহ ঐন্দ্রজালিক, কি যাদুমন্ত্র জানে
যারা যায় সেথা কেহ নাহি ফেরে র'য়ে যায় সেইখানে।
জীবনে আমার কত সাধ, প্রভু!—তবু যেতে চাও যদি
যাও তবে নাথ, শাণিত কৃপাণে এ নারী-জীবন বধি।"

হো-হো ক'রে হেসে কহিল নন্দ, "তুমিও পাগল হ'লে
শাস্ত্রের দুটা মামুলী বুলিতে পাহাড় যাইবে ট'লে?
যেথানেই যা'ন শুনি তাঁর কাছে জুটিতেছে সারা দেশ,
সবাই তারা কি হতেছে ভিক্ষু মুড়ায়ে মাথার কেশ?
নব-যৌবন, হৃদয়ে লালসা, ভোগ-সাধ মনে পুরো,
বিশেষ করিয়া তোমারে ছাড়িব? নইক এমন মূঢ়।
দাও চুম্বন, প্রেয়সী আমার। তোমার হাতের কুঁড়ি
শুকাবার আগে, কুমারে লইয়া আসিব ত্বরায় ঘুরি।"

ছুটিল অশ্ব দূর প্রান্তরে কশার আঘাত পেয়ে,
যত দূর তার দৃষ্টি চলিল তরুণী রহিল চেয়ে।

* * * *

গত দুই মাস,—কুমার নন্দ ধরেছে ভিক্ষু-বেশ
পরনে গেরুয়া, মুড়ায়ে ফেলেছে মাথার চাঁচর কেশ।
উরুবিল্বের বিহার-কক্ষে তৃণ-শয্যার' পরে
বিষম দ্বন্দ্বে সন্দেহ-দোলে শুধু হায় হায় করে।
গভীর রাত্রে স্মরে প্রেয়সীরে স্মরে যত ভোগসুখ,
নিজ বেশ পানে যত চায় তত ফেটে যায় তার বুক,
প্রেম-শুক তার ছটফট করে পিঁজরে চঞ্চু হানি—
চীর-গেরুয়ার বন্ধনে ভোগ-লালসার কাৎরানি।
প্রভাত হইতে প্রভুর শ্রীমুখে ধর্ম্ম-দেশনা শোনে,
প্রভুর আঁখির হুতাশনে 'মার' ম'রে রয় তার মনে।
পুন নিশীথের নির্জ্জন গৃহে গর্জ্জিয়া উঠে 'মার'—
বাসনা-দহন শত রসনায় ক'রে উঠে হাহাকার।

* * * *

ছয় মাস গত। নন্দে ডাকিয়া কহিলেন তথাগত,
"কপিলাবস্তু ফিরে যাবে না ক? আসে দূত শত শত।"
নন্দ কহিল, "হে জীবনগুরু, বুঝি না তোমার খেলা
কোনো অপরাধ করেছি কি পায়? কেন এত অবহেলা?
যে ধন পেয়েছি, অমৃতলোকের পেয়েছি যে সন্ধান
তার কাছে হেয় তুচ্ছ রাজ্য গৃহ-সুখ-ধনমান।
আজি মনে হয় শিশুর খেলানা নিয়ে ভুলেছিনু হায়,
পারিজাত-মধু যে পেয়েছে সে কি ক্ষতরস ফিরে চায়?
শাক্য-নগরে ফিরে যেতে হবে তবু মোরে একবার—
মোচন করিতে এক ঋণভার—পালিতে অঙ্গীকার।"

* * * *

কপিলাবস্তু নগরে নন্দ আবার এসেছে ফিরে
বটতরু-তলে পেতেছে আসন রোহিণী নদীর তীরে।
পুরবাসিগণ দলে দলে এসে ব'সে রয় জুড়ি' পাণি,
কহেন নন্দ-ভিক্ষু তাদের নবধর্ম্মের বাণী।

হোথা গৃহ-কোণে রহি কল্যাণী লুটায়ে লুটায়ে কাঁদে,
রুচে না অন্ন, চোখে নাই ঘুম, কেশ-পাশ নাহি বাঁধে।
হাতের কুঁড়িটি গুঁড়া হয়ে গেছে শুকায়ে এখন ধূলি—
আশার বৃন্তে হৃদয়-কুঁড়িও শুকায়ে পড়েছে ঢুলি—

একবার ভাবে 'এই কি ধর্ম্ম' গিয়ে কয় নিঠুরে,—
অভিমান এসে বাধা দেয় তারে গুমরে হৃদয় জুড়ে।
দুই মাস গেল এমনি করিয়া যাই-কি-না-যাই করি'—
হায় মূঢ়া নারী,—পুষিবে ও তেজ আর কত দিন ধরি?
শেষ কথা শেষে কহিতে দয়িতে বাহিরিল কল্যাণী,
সহচরীগণ ভূষিল অঙ্গ নানা বেশভূষা আনি'।
বহুদিন পরে বাঁধিল কবরী ভূষিয়া কুসুমদামে,
নয়নে কাজল, চরণে লাক্ষা কটিতে বাঁধিল কামে।
প্রতি অঙ্গের সুষমা ফুটায়ে সঞ্চারি' পরিমল,
সারা দেহ জুড়ি' তপোভঙ্গের ঘটা করে কোলাহল।
ক্ষণিক বিজলী হাসিল অঙ্গে বেদনার আঁধিয়ারে,
বিষ-শরাহত ময়ূরী চলিল মৃত্যুর অভিসারে।
সহচরী-সাথে কল্যাণী ধীরে ভুবনমোহিনী বেশে
নন্দের পায়ে করেন প্রণাম রোহিণীর কূলে এসে।

"আসুন ভদ্রে, কল্যাণ হো'ক্"—বলিয়া তাপস সুধী
পুন দশশীল-ব্যাখ্যানে মন দিলেন নয়ন মুদি'।
দণ্ডের পর দণ্ড বিগত,—ভিক্ষু নির্ব্বিকার!
শুনিতে লাগিল জনতা শ্রীমুখে মৈত্রী-তত্ত্বসার—
কহিল রমণী—"এসেছি হে প্রভু, পাই যদি নির্জ্জন
দুটি কথা শুধু ব'লে যাব আমি প্রাণের আকিঞ্চন।"
কহিল নন্দ "ভিক্ষু-জনের গোপন প্রকট নাই,
জনতায় যাহা নহে শ্রোতব্য শুনিতে তাহা না চাই।"
ডুহু ক'রে কেঁদে উঠিল রমণী ভূতলে পড়িল লুটি।
শূন্যের ধ্যানে বীরাসনে সাধু মুদিলেন আঁখি দুটি।
বলিল রমণী, "ওগো সন্ন্যাসী, কি হবে আমার গতি?"—
কহিল ভিক্ষু,—"বলিবেন তাহা মাতা মহাপ্রজাবতী—
তাঁর ভিক্ষুণী-বিহারে গেলেই জানিতে পারিবে সবি,—
রূপসম্পদ-মোহ দূর হবে উপসম্পদা লভি'।"

* * * *

ব্রত সমাপ্ত। অঙ্গীকারের ঋণ-পরিশোধ সারি'
পরদিন প্রাতে চলিল নন্দ কপিলাবস্তু ছাড়ি'।
পিছে চলে কে ও মুণ্ডিত শিরে যৌবন ঝাঁপি চীরে?
মেঘময়ী ঊষা অরুণের পিছে চলিয়াছে ধীরে ধীরে।
অশ্রুতরল পুরীর কণ্ঠে স্বর-গৌরব বয়—
"ধন্য ধন্য শাক্য-বংশ, শাক্যসিংহ জয়।"

শ্রীকালিদাস রায়।
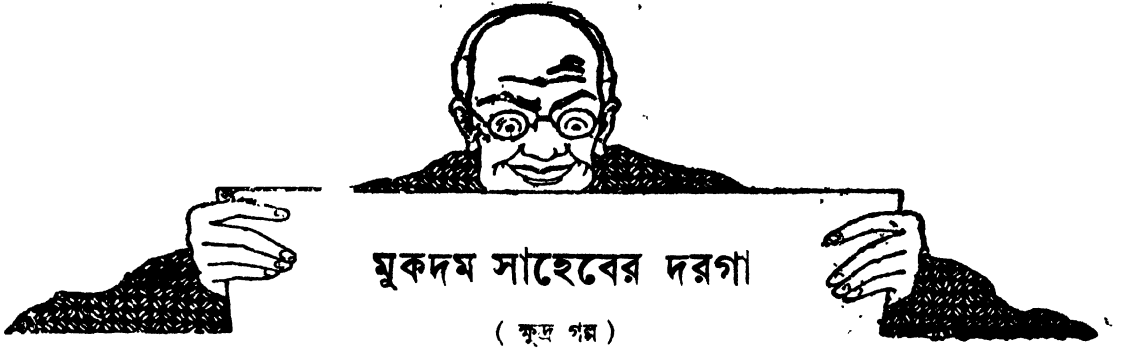
মুকদম সাহেবের দরগা

(ক্ষুদ্র গল্প)

পদ্মার এক পারে কাতলামারি—অন্য পারে বোয়ালিয়া। মধ্যে আবর্ত্তসঙ্কুলা তরঙ্গবিভঙ্গময়ী জলোচ্ছ্বাসচঞ্চলা কলনাদিনী স্রোতস্বিনী। এখানে পদ্মার বিস্তৃতি এক যোজনেরও অধিক। পদ্মার এক কূলে দাঁড়াইয়া অন্য কূল দেখা যায় না; বিশাল জলভাগ যেন দূরে দিক্‌চক্রবালে মিলিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনকার সম্বন্ধে ইতিহাসের সাক্ষ্য মূক, জনশ্রুতি নীরব, কল্পনা ও অনুমান আস্থার অযোগ্য। তবে ইহা ঠিক যে, বোয়ালিয়া তখনও বহুবিধ পণ্যপূর্ণ বন্দর অথবা অট্টালিকা-সুশোভিত নগরে পরিণত হয় নাই। কাতলামারিতে, এখন যেমন, তখন তেমন ইংরাজ বণিকের রেশম-কুঠী স্থাপিত হয় নাই। কাতলামারি ও বোয়ালিয়া পদ্মাতীরের দুইটি স্থানেই তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটি ধীবরপল্লী মাত্র ছিল। পদ্মা-পারাপারের জন্য একখানিমাত্র ডিঙ্গি নৌকা কাতলামারির ঘাটে থাকিত। মধ্যাহ্নে কাতলামারি ছাড়িয়া যাত্রী-বোঝাই এই ডিঙ্গি-নৌকাখানি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গিয়া বোয়ালিয়ার ঘাটে পৌঁছিত; আবার ঠিক ভোরবেলা বোয়ালিয়া ছাড়িয়া সেখানি দ্বিপ্রহরের মধ্যেই কাতলামারির ঘাটে আসিয়া লাগিত। নৌকার মাঝি ও মাল্লাদিগের বাড়ী কাতলামারির ঘাটের অদূরেই ধীবরপল্লীতে ছিল। দিবাভাগে তাহারা নিজের নিজের বাড়ীতে গিয়া আহারাদি করিত। সন্ধ্যায় তাহারা বোয়ালিয়ার ঘাটে নৌকা লাগাইয়া নৌকার উপরেই রন্ধনাদি করিয়া লইত। সারা দিন-রাত্রির মধ্যে এই একটিমাত্র খেয়া ও একখানি মাত্র নৌকা। সেই জন্য কাতলামারির ঘাটে প্রাতঃকাল হইতেই যাত্রীরা আসিয়া সমবেত হইত। কোন্ রাজা বা কোন্ নবাব অথবা বাদশা তখন বরেন্দ্রভূমে রাজত্ব করিতেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

এই গল্পটির অনেক স্থলে অসামঞ্জস্য, অস্বাভাবিকতা, দৈবের উপর বিশ্বাস ও ভগবানের উপর পরাভক্তির ভাব লক্ষিত হইবে। এক শতাব্দ হইতে শতাব্দান্তরে, এক শ্রেণীর লোক হইতে অন্য শ্রেণীর লোকের মুখে মুখে, এক আখ্যায়িকারচয়িতার কল্পনা ও খেয়াল হইতে অপর আখ্যায়িকাকারের কল্পনা ও খেয়ালের বশে, এক ঠাকুর-মায়ের মুখ হইতে অপর ঠাকুরমায়ের মুখে, এই গল্পটিতে নূতন নূতন রং ও রসান্ চড়ানোর ফলে ইহার আসল মূর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তবে এই উপাখ্যানটি যে সত্যঘটনামূলক, সে সম্বন্ধে এই গল্পলেখকের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই প্রদেশের লোকরা যুগপরম্পরায় ও বংশপরম্পরায় ইহা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। যাহারা ইহা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, সেই সমস্ত লোকই যে অজ্ঞান অথবা মূর্খ, ইহা কেমন করিয়া বলা যায়? এই গল্পটির যে সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বর্ণনা চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে যাওয়ার প্রচেষ্টা নিষ্ফল। অলঙ্কার অত্যুক্তি বাদ্ দিয়া মূল আখ্যায়িকাটি এইরূপ:—

ভাদ্রের এক মধ্যাহ্নে, পদ্মা যখন কূলে কূলে পূর্ণা, বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইতে না হইতেই কাতলামারির পারঘাটে বাঁধা পারের নৌকাখানি যাত্রীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নৌকা এখনই ছাড়া হইবে। মাঝি তাহার হালের কাছে গিয়া বসিয়াছে। এক জন দাঁড়ী প্রস্তুত হইয়া নিজের যায়গায় গিয়া লগী ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে। অপর এক জন দাঁড়ী কূলে উঠিয়া গিয়া পদ্মাতীরে মৃত্তিকায় প্রোথিত একটি মোটা কাঠের খোঁটায় বাঁধা নৌকার স্থূল কাছিটি খুলিয়া দিয়া নৌকা ভাসাইবার উদ্যোগ করিতেছে। মাঝি তাহার আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, সেইখানে দাঁড়াইয়া তীরে যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে, ততদূর পর্য্যন্ত সে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল যে, পারের যাত্রী আর কেহ আসিতেছে কি না। কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া সে তীরে দাঁড়াইয়া কহিল, "আর কেহ আসিতেছে না, নৌকা খুলিয়া দাও।"

সহসা ঘাট হইতে অদূরে জলদের ন্যায় গুরুগম্ভীর স্বরে কে যেন কহিল, "মাঝি ভাই! নৌকাখানা একটু রেখে যেও।" এই আগন্তুক সহসা কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল? সে কি আকাশ হইতে নামিয়া আসিল? না, পাতাল হইতে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিল? আগন্তুকের দেহযষ্টি দীর্ঘ, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত, গলায় স্ফটিকের মালা, তাহার মুখমণ্ডল সুশ্রী ও দীর্ঘগুম্ফ-শ্মশ্রুমণ্ডিত, নাসিকা সুগঠিত, ললাট আয়ত, চক্ষুর্দ্বয় অমানুষিক উজ্জ্বল। তাহার মাথায় কুঞ্চিত বাবরি চুল। জানু পর্য্যন্ত লম্বিত একটি নীলবর্ণের মোটা কাপড়ের আলখাল্লা তাহার গায়ে, একখানি স্থূল বক্র বংশযষ্টি তাহার বাম হস্তে। তাহার পায়ে একজোড়া খড়ম।

নৌকার ছইয়ের নীচে যে কয় জন আরোহী বসিয়াছিল, তাহারা কেহই এই নবাগত আগন্তুকের আগমনে সন্তুষ্ট হইল না। কারণ, তাহারা আরাম করিয়া সমস্ত স্থানটুকু জুড়িয়া বসিয়াছিল; পাছে আগন্তুককে বসিবার জন্য স্থান দিতে হয়, ইহাই তাহাদের অপ্রসন্নতার হেতু।

নৌকার খানিকটা ছিল ছই দিয়া ঢাকা, সম্মুখভাগ খোলা — পাটাতনের উপর আরোহী বসিবার স্থান। ছইয়ের নীচে [illegible]

সারিতে উপবিষ্ট ছিল সর্ব্বসমেত আট জন যাত্রী। বাম দিকের সারিতে প্রথমেই ছিল এক জন নব্য যুবক ভূম্যধিকারী, তাহার মাথায় বাঁকা টেড়ী, গোঁফের অগ্রভাগ পাকানো ও সূচ্যাকারে বিন্যস্ত, দাড়ীর সমস্তটাই কামানো, কেবল অধরের নীচে একটি ছোট্টো নূর। তাহার পরনে আঁটা পায়জামা, গায়ে মোটা আঙ্গরাখা, পায়ে নাগরা জুতা; তাহার হাতে একটি সেকেলে চকমকী পাথর লাগানো গাদা বন্দুক। সে বোয়ালিয়ার নীচে পদ্মার চড়ায় চকাচকী শিকার করিবার জন্য যাইতেছিল। এই যুবকের পার্শ্বেই বসিয়াছিল এক জন স্থূলোদর বাবাজী। সাঁতরাগাছির ওলের মত তাহার মাথাটি কামানো, মাথার মাঝখানে তরমুজের বোঁটার মত লম্বা টিকি। বাবাজীর ললাটে ও তাহার দেহের আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঘছাপা কাটা। তাহার কণ্ঠে তিনহারা মোটা মোটা তুলসীকাঠের মালা, তাহাতে একটি রৌপ্যনির্ম্মিত আঁকড়ায় ঝুলানো একটি হরিনামের মালার ঝুলি। ঝুলিটির উপর বিচিত্র রেশমী সূত্রে সূচীর কাযে লেখা "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।" বাবাজীর নিকটে বসিয়াছিল এক জন প্রৌঢ়া বিধবা। বিধবা যৌবনে সুন্দরীই ছিল বলিয়া বোধ হয়; কারণ, চল্লিশের কোঠায় পা দিলেও তাহার অঙ্গ হইতে যৌবন-সুষমা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয় নাই। বিধবার গলায় তিন কণ্ঠী খুব সরু সরু তুলসীর মালা। তাহার নাকে গঙ্গা মৃত্তিকায় নিপুণ হস্তে একটি ক্ষীণ রসকলি কাটা। বাবাজী ও এই বিধবার মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাহা হইতে বুঝা গেল যে, বাবাজী বোয়ালিয়ার নাতিদূরে প্রেমতলী নামক বৈষ্ণবপ্রধান গ্রামের একটি বড় গোছের আখড়ার মালিক ও বিধবাটি বাবাজীরই মন্ত্রশিষ্যা। বিধবার পার্শ্বেই বসিয়াছিল তাহার অবিবাহিতা কিশোরী কন্যা। তাহার অঙ্গে অঙ্গে স্ফুটনোন্মুখী কুসুমকলিকার শোভা, তাহার চকিত চাহনিতে ক্ষণপ্রভার দীপ্তি, তাহার গণ্ডযুগে বিকশিত সরোরুহের অরুণিমা। সে মাঝে মাঝে নৌকার অন্যতম যাত্রী সেই শিকারী যুবকের দিকে পুনঃ পুনঃ সলজ্জ অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। যুবকও সলালস ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ দৃষ্টিতে বার বার যুবতীর মুখের পানে চাহিতেছিল। ডানদিকের সারিতে সর্ব্বপ্রথমেই বসিয়াছিল এক জন বণিক্-জাতীয় কুসীদিক মহাজন। লোকটি এত মোটা যে, সে একাই দুই জন যাত্রীর স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। তাহার পার্শ্বে বসিয়াছিল সেই মহাজনের এক জন যমদূতের মত কৃষ্ণবর্ণ বলিষ্ঠ ইতরজাতীয় ভৃত্য। ভৃত্যটি দুই হাতে দুইটি রৌপ্যমুদ্রাপরিপূর্ণ চটের থলে শক্ত করিয়া ধরিয়া বসিয়াছিল। তাহার পার্শ্বে মুণ্ডিত আনন এক জন নৈয়ায়িক পণ্ডিত। নৈয়ায়িকের পার্শ্বে তাহারই এক জন তল্পীদার।

সেই নবাগত আগন্তুক ধীরে ধীরে আসিয়া গলুইয়ের উপর পা দিয়া উঠিল ও সম্মুখের পাটাতনের উপর দাঁড়াইয়া দেখিল যে, ছইয়ের নীচের সমস্তটুকু স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে কয়েক জন ভদ্রযুক্ত যাত্রী। সেখানে স্থান পাওয়া অসম্ভব। অগত্যা সে নৌকার সম্মুখে পাটাতনের উপরই একটু বসিবার স্থান সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। নৌকার এই অংশের আরোহিগণ সকলেই অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, নিরীহপ্রকৃতির লোক, আগন্তুককে দেখিয়া তাহারা সকলেই একটু সরিয়া সরিয়া গা ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া বসিল এবং আগন্তুকের বসিবার জন্য একটু যায়গা করিয়া দিল। তাহারা আগন্তুককে কি জানি কেন সাতিশয় ভক্তি দেখাইতে লাগিল। ছইয়ের নীচের লোকরা তাহা দেখিয়া নিজেদের মধ্যে গা-টেপাটেপি ও টিটকারী দিতে আরম্ভ করিয়া দিল। নবাগতের পার্শ্বেই বসিয়াছিল এক জন পশ্চিম-দেশীয় ছত্রী, বৃদ্ধ, অবসরপ্রাপ্ত প'ল্টনের সিপাহী। আগন্তুককে বসিতে স্থান দিবার জন্য সে সরিয়া একবারে নৌকার ধার ঘেঁসিয়া বসিল ও দাঁড়ের ঠেক্‌নোর গায়ে ঠেসান দিয়া কষ্টে-সৃষ্টে বসিয়া রহিল।

এক জন যুবতী স্ত্রীলোক, সম্ভবতঃ শ্রমজীবী শ্রেণীর, তাহার দেড়বৎসর-বয়স্ক শিশুকে খেলা দিতেছিল। আগন্তুককে দেখিয়া সে তাহার ছেলেটিকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া একটু সরিয়া বসিল। তাহার এই সরিয়া বসায় এতটুকুও দাম্ভিকতা অথবা অবজ্ঞার ভাব ছিল না। গরীব গরীবের দুঃখ দেখিয়া যেমন স্বতঃই গলিয়া যায় এবং সাধ্যমত পরস্পর পরস্পরের দুঃখ-নিবারণের চেষ্টা করে, এই স্ত্রীলোকটিরও কার্য্য সেইরূপ ভাবের দ্বারা প্রণোদিত বলিয়া বোধ হইল।

আগন্তুক তাহার স্বভাবসিদ্ধ সদাশয়তার সহিত তাহার উপকারকদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল ও সেই বর্ষীয়ান্ সৈনিক পুরুষ ও যুবতী জননী—এই উভয়ের মাঝখানে নিতান্ত জড়সড়ভাবে উপবিষ্ট হইল। তাহার পশ্চাতে বসিয়াছিল এক জন বলিষ্ঠ প্রৌঢ় কৃষক ও তাহার দশমবর্ষীয় পুত্র। নৌকার গলুইয়ের এক ধারে শেষ সীমায় এক জন বৃদ্ধা কুণ্ডলীকৃত নৌকাবাঁধা কাছির উপর অর্দ্ধশায়িত অর্দ্ধোপবিষ্টভাবে পড়িয়া ছিল। ইহার পরিধেয় ছিন্ন ও মলিন; এক টুকরা ছিন্ন কাঁথা দিয়া জড়ানো একটি পুঁটুলি ইহার কাছে ছিল। এই রমণী যৌবনে প্রেমতলীর প্রেমের হাটে এক জন পসারওয়ালী পসারী বলিয়া আদৃত ছিল। আজ বার্দ্ধক্যে তাহার এই দশা হইয়াছে। নৌকার এক জন দাঁড়ীর সহিত তাহার পুরাতন আলাপের সূত্রে সে আজ বিনা ব্যয়ে খেয়াপারের অধিকার পাইয়াছে।

মোচার খোলার মত এই ক্ষুদ্র জেলে-ডিঙ্গিখানি অনুকূল বায়ু পাইয়া পাল তুলিয়া দিয়া পদ্মার বক্ষে জলচর পক্ষিণীর মত তীব্রগতিতে বোয়ালিয়ার পারঘাটের অভিমুখে অগ্রসর হইতে-ছিল। সান্ধ্য সূর্য্যের রক্তিম আভা নদীবক্ষে পতিত হইয়া তরঙ্গগুলিকে যেন হিঙ্গুলরাগে রঞ্জিত করিতেছিল। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। বোয়ালিয়ার ঘাটের উপরেই ধীবর-পল্লীতে কুটীরে কুটীরে দুই একটি করিয়া সান্ধ্যদীপ জ্বালা হই-য়াছে। নৌকার আরোহিগণের হৃদয় দূর হইতে সেই দীপা-লোক দেখিয়া আশায় ও উল্লাসে ভরিয়া উঠিতেছে। সহসা একটা দমকা হাওয়া আসিয়া পালে লাগিল; সতর্ক মাঝি পালের কোণের দড়ি ঢিল করিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি পাল নামাইয়া দিল ও একবার আকাশের দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে দাঁড়ীদিগকে কহিল, "ওরে! চেপে থাবা মার্। বড় জোর ঝাঁপি আসতিছে।" দেখিতে দেখিতে পশ্চিম আকাশ ঘনকৃষ্ণ মেঘমালায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতে লাগিল। ঝটিকার বেগ ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। আকাশের অবস্থা দেখিয়া দাঁড়ীদিগেরও মনে শঙ্কার উদ্রেক হইল।

তাহাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহারা দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল। প্রাণপণ শক্তিতে দাঁড় টানার তাহাদের শরীরের পেশী-গুলি দড়ার মত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। তাহাদের মুখে শ্রমজনিত কষ্টের ভাব পরিস্ফুট হইতেছিল। দৈহিক পরিশ্রমে অনভ্যস্ত আলস্যপরায়ণ ছইয়ের নীচের যাত্রীরা দাঁড়ীদিগের কষ্টে সহানুভূতি করা দূরের কথা, তাহাদের মুখের আকুল ভাব ও তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আক্ষেপ দেখিয়া পরস্পরের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল। নৌকার সম্মুখভাগে পাটাতনের উপর উপবিষ্ট বৃদ্ধ সিপাহী, প্রৌঢ় কৃষক ও দুঃস্থা রমণী দাঁড়ীদিগের কষ্ট দেখিয়া মনে মনে সাতিশয় কষ্ট অনুভব করিতেছিল। কারণ, শ্রমের কষ্ট তাহারা জানে; কেন না, শ্রমলব্ধ অর্থে তাহাদিগকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। বিশেষ, উন্মুক্ত স্থলে বাস করিতে অভ্যস্ত তাহারা আকাশের অবস্থা বেশ বুঝিতেছিল ও সত্য সত্যই ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের সকলেরই মুখ গম্ভীর ও চিন্তাকুলিত। যুবতী সন্তান-জননী গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিয়া তাহার শিশুটিকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল।

বৃদ্ধ সিপাহী অনুচ্চস্বরে তাহার পার্শ্বস্থ সহযাত্রী কৃষককে কহিল, "ভগবান্ রক্ষা না করিলে এ যাত্রা আর রক্ষা নাই।"

বৃদ্ধা কহিল, "জানি না, তাঁহার মনে কি আছে। তবে অনেক দুর্য্যোগ দেখিয়াছি, কিন্তু এমনটি জন্মেও আর কখনও দেখি নাই। দেখিতেছ না, পশ্চিমদিক্‌টায় যেন আকাশে আগুন লাগিয়া গিয়াছে।" সত্যই পশ্চিমদিক্‌টা ভয়ানক লাল হইয়া উঠিয়াছিল। নদীর ভিতর হইতে একটি অব্যক্ত নাদ ধ্বনিত হইতেছিল।

ঠিক এই সময়ে আকাশের পটে ও তরঙ্গিণীর বক্ষে এমন একটি অসাধারণ দৃশ্য প্রকটিত হইল, যাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, যাহা চিত্রকরের তুলিকায় ফুটাইয়া তোলা যায় না। বৈসাদৃশ্য মানুষের কাছে চিরকালই প্রিয়। শিল্পী সেই জন্য প্রকৃতির শান্ত ও দৃপ্ত এই উভয় মূর্ত্তিই দেখিতে ভালবাসে। মলয়হিল্লোলিত মাধবী পূর্ণিমাযামিনী যেমন, ঝটিকাবিক্ষুব্ধ ঘোরান্ধকারময়ী প্রাবৃটের অমানিশাও সেইরূপ আমাদের হৃদয়ে আনন্দবিধান করে।

তখনই এক মুহূর্ত্তের জন্য নৌকার আরোহিগণের সকলের দৃষ্টিই একবার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে, আবার তরঙ্গবিক্ষুব্ধ নদীবক্ষে পতিত হইল। ভাবী দুর্নিমিত্তের আশঙ্কায়ই হউক, অস্তমান সূর্য্যের শোণিত-রঞ্জিত মূর্ত্তি দেখিয়াই হউক, অথবা ভীষণা রাক্ষসী মৃত্যুর আগমনের পূর্ব্বাভাসের জন্যই হউক, কি জানি কেন, নৌকার যাত্রিগণের সকলেরই মুখ যেন হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল।

সহসা আবার নদীবক্ষের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, মুহূর্ত্তমাত্র পূর্ব্বে যাহা রক্তিমারঞ্জিত ছিল, এখন তাহা পাথরের মত কালো দেখা যাইতে লাগিল। প্রকৃতির মুখের এই অনৈসর্গিক ভাবান্তর দেখিয়া নৌকার আরোহিগণের সকলেরই হৃদয় ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। তখনই আবার এমন একটা দমকা পশ্চিমে হাওয়া আসিয়া নৌকাটি এমনভাবে কাৎ করিয়া ফেলিল যে, নৌকার এক ধারের আরোহিগণ আসনচ্যুত হইয়া অপর ধারের আরোহী-দিগের উপর গিয়া গড়াইয়া পড়িল। এক ধারের দাঁড়টি জলের উপর প্রায় এক হাত উচ্চে উঠিয়া গেল। মাঝি মুখে 'সামাল' 'সামাল' শব্দ করিয়া হাল ঘুরাইতে লাগিল। সে সেই টাল্‌টা কোন প্রকারে সামলাইয়া লইল বটে, কিন্তু নৌকার গাত্রে তরঙ্গ প্রহৃত হইয়া তক্তাগুলির জোড়ের মুখ ফাঁক হইয়া গেল ও নৌকার খোলে জল উঠিতে লাগিল। ছইয়ের নীচের আরোহিগণের মুখ শুকাইয়া গেল। তাহাদের মুখ ছাইয়ের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহারা সকলেই ব্যাকুল চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল, "আর রক্ষা নাই; এবার গেলাম!"

মাঝি তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল, "ভয় নাই। আপনারা স্থির হইয়া বসুন। গোলযোগ করিবেন না। এ সময়ে নৌকা একপেশে হইয়া গেলে আর আমি আপনাদিগকে বাঁচাইতে পারিব না।" ঠিক এই সময়ে পশ্চিম আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘরাশি যেন কোন ঐন্দ্রজালিক দণ্ডস্পর্শে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। সেই দ্বিধা-বিভক্ত মেঘমণ্ডলের মধ্য হইতে অস্তমান সূর্য্যের শেষ রশ্মিজাল নদীবক্ষে ও নৌকার আরোহীদিগের বুকে, মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে পতিত হইয়া রক্ত-রঞ্জিত করিল। সেই আলোকে আরোহিগণ ক্ষণিকের জন্য পরস্পর পরস্পরের মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইল। ধনী, নির্ধন, নাবিক, আরোহী, পুরুষ, রমণী, বৃদ্ধ, যুবা সকলেরই মুখে ব্যাকুলতা, কেবল সেই শেষাগত যাত্রী ফকিরের মুখ দিব্য জ্যোতিঃপূর্ণ ও আশঙ্কার লেশশূন্য। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইল যে, তিনি মৃত্যুকে অবজ্ঞা করেন না; কিন্তু তিনি যে তখন মরিবেন না, সে সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত, সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ। ছইয়ের নীচের বিশিষ্ট আরোহীরা এতক্ষণ প্রাণভয়ে আত্মবিস্মৃত ও বিহ্বল হইয়া তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ সহজাত সংস্কার কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু ফকিরের মুখ দেখিয়া আবার তাহাদের মনে সেই স্বার্থপরতা ও জিঘাংসার ভাবগুলি উদ্রিক্ত হইতে লাগিল। নৈয়ায়িক তাহার লম্বা আর্কফলা দোলাইয়া, মুণ্ডিত মুখ ঘুরাইয়া সাধু-ভাষার বুক্‌নি দিতে দিতে কহিল, "ফকির সাহেব বোধ হয় উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না যে, আমাদের পরিণামটা কি, তাই ওরূপ নির্ব্বোধের ন্যায় চাহিয়া রহিয়াছেন অথবা লোকটা বোধ হয় পাগল।"

নৈয়ায়িকের কথা শেষ হইতে না হইতেই উল্টোপাল্টা হাওয়া বহিতে লাগিল। নৌকাখানি নদীবক্ষে চরকীর মত ঘুরিতে লাগিল।

নৌকার সম্মুখে পাটাতনের উপর উপবিষ্ট যুবতী তাহার শিশুটিকে কোলের মধ্যে আঁকড়িয়া ধরিয়া কাতরকণ্ঠে কহিল, "আমার ছেলে। কে আমার ছেলেটিকে বাঁচাইবে?"

ফকির শান্তভাবে কহিল, "কে আবার বাঁচাইবে? খোদা।" ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দ ও আরোহিগণের আর্ত্তনাদ ছাপাইয়া, ফকিরের ধীরোদাত্ত কণ্ঠস্বর রমণীর কাণের ভিতর দিয়া গিয়া মর্ম্ম স্পর্শ করিল। সে ফকিরের কথায় সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপন করিল ও শান্ত হইল।

মহাজন তাহার মুদ্রাপূর্ণ থলে দুইটি ভৃত্যের নিকট হইতে লইয়া নিজের কোলের মধ্যে রাখিয়া সভয়ে ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিল ও কহিল, "আজ গোবিন্দের কৃপায় কোনমতে আমার প্রাণটা আর এই টাকার তোড়া দুইটা রক্ষা পাইলে বাঁচি।"

প্রেমতলীর শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরের মাঝখানের চূড়াটি সোনার পাত দিয়া মুড়িয়া দিব; আর একটি জাঁকালো রকমের মালসা-ভোগেরও ব্যবস্থা করিয়া দিব।"

নৈয়ায়িক মায়াবাদী। ঈশ্বরে তাহার আস্থা নাই; চার্ব্বাক তাহার নৈতিক আদর্শ। মহাজনকে বিদ্রূপ করিয়া সে কহিল, "প্রেমতলী এখান হইতে অনেক দূর। গোবিন্দজী সেখানে বসিয়া তোমার কথা শুনিতে পাইতেছেন না; পাইলেও তাঁহার হাত এত বড় নহে যে, তোমার কাছে আসিয়া পৌঁছিবে।"

"তিনি এখানেই আছেন।" জলদনির্ঘোষে এই কথা কয়টি যেন পদ্মার গভীর গর্ভমধ্যে সুস্পষ্টভাবে ধ্বনিত হইল।

সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিল, "কে এ কথা বলিল?"

মহাজনের ভৃত্যটি নেড়ানেড়ী সম্প্রদায়ের এক জন গোঁড়া বৈষ্ণব। সে উত্তর দিল, "নিশ্চয় কোন ভক্তিহীন পাষণ্ড হইবে।" সহসা চক্ষু ধাঁধিয়া বিদ্যুৎ চমকিল। কড়্ কড়্ শব্দে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া বজ্র পতিত হইল।

মাঝি ভয়ানক রাগিয়া চটিয়া কহিল, "আরে রেখে দাও বাবাজী, তোমার ভক্তি। ও-দিকে যে মুক্তি পাবার যোগাড় হচ্ছে, তা দেখতে পাচ্ছ না? নৌকোর খোল যে জলে ভরতি হয়ে গিয়েছে। বাক্যি ছেড়ে সব্বাই মিলে জল না সেঁচলে কি নৌকো বাঁচানো যাবে?"

পরে মাঝিদিগের দিকে চাহিয়া সে কহিল, "ভাই সকল! একটু টেনে বেয়ে চল্। তা নইলে রক্ষে নেই। সামনেই আবার আভাকালীর দহ। পাকের মুখে পড়লে এখনই হাড় কালি ক'রে ছাড়বে। আমি এই গাঙ্গে মাঝিগিরি ক'রে চুল-দাড়ি পাকালাম। পদ্মার কোথায় চাচড়া, কোথায় চড়া, কোথায় পাক, সব আমার জানা আছে।" এই কথা বলিয়া মাঝি সজোরে হালে ঝিঁকে দিতে লাগিল ও এক একবার আকাশের দিকে, আবার তাহার গন্তব্য জলপথের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

এক জন দাঁড়ী কহিল, "মাঝি ভাই আমাদের বিপদকে ভ্রূক্ষেপ করে না। সব সময়েই তার ঐ এক ভাব।"

ছইয়ের নীচের সেই সুন্দরী ষোড়শী শিকারীর পরিচ্ছদ-পরিহিত যুবক ভূম্যধিকারীর দিকে সলাজ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "শেষটায় আমাদিগকেও কি ঐ সমস্ত ছোটলোকদিগের সঙ্গে এক সাথে ডুবিয়া মরিতে হইবে?"

যুবক তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "কিছুতেই না। আমি খুব ভাল সাঁতার জানি। আমি অক্লেশে তোমাকে লইয়া সাঁতরাইয়া তীরে উঠিব। কিন্তু একের অধিক লোককে বাঁচানো আমার পক্ষে অসম্ভব।"

যুবতী তাহার প্রৌঢ়া জননীর মুখের পানে একবার চাহিল, দেখিল যে, সে তখন তাহার গুরুদেব সেই স্থূলোদর বাবাজীর দিকে কাতরদৃষ্টিতে চাহিয়া কি কথা কহিতেছে। প্রৌঢ়া শিষ্যা জিজ্ঞাসা করিতেছে "গুরুদেব! কি হবে?"

বাবাজী নিজেই সাঁতার জানিতেন না। কাজেই তাঁহার বিধবা শিষ্যাকে বিপন্মুক্ত করিবার কোন বিশ্বাসযোগ্য আশ্বাস দিতে পারিলেন না; তবে কহিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই। আমি ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছি। ঝড় এখনই থামিয়া যাইবে।"

বাবাজী তাঁহার হরিনামের মালার ঝুলি কণ্ঠদেশ হইতে নামাইয়া লইয়া, মুখে বিড় বিড় করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার মন তখন মনোরথ-গতিতে তাহার প্রেমতলীর আখড়াগৃহে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমবিলাসিনী তাহার সুন্দরী যুবতী সেবাদাসী তাহার সেবার জন্য কিরূপ সুমিষ্ট ভোজ্যপেয়াদি, তাহার অঙ্গ-সুখের জন্য কিরূপ সুগন্ধি অঙ্গরাগাদি ও তাহার শ্রমাপনোদনের জন্য কিরূপ সুকোমল শয্যাদি প্রস্তুত করিতেছে, তাহাই কল্পনা করিয়া ও নিজের বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিয়া আন্তরিক যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল।

পদ্মার তরঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষুদ্র ডিঙ্গাখানি ক্রমাগত উঠিতে পড়িতে লাগিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই বুঝি ইহা বান্চাল্ হইয়া গেল, এই আশঙ্কায় নৌকার আরোহিগণ ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল, পরক্ষণেই আবার জড়-পুত্তলিকার মত বসিয়া হতাশভাবে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ছইয়ের তলে যে যাত্রীরা ছিল ও গলুইয়ে পাটাতনের উপর যাহারা বসিয়া ছিল, তাহাদের হাবভাবে যে একটি বিরাট পার্থক্য আছে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছিল। ডিঙ্গিখানির প্রত্যেক আলোড়ন ও উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে পাটাতনের উপর উপ-বিষ্ট সেই যুবতী সন্তান-জননী তাহার শিশুটিকে নিজের কোলের মধ্যে চাপিয়া চাপিয়া ধরিতেছিল। কিন্তু তাহার সেই অপ-রিচিত সহযাত্রী তাহাকে যে আশ্বাস দিয়াছিল, সেই আশ্বাস বাণীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতায় সে নির্ভীকচিত্তে বসিয়া ছিল। তাহার পার্শ্বেই বৃদ্ধ সিপাহী তাহাদের নবাগত সহযাত্রীর প্রশান্ত মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল ও সেই দিব্য আদর্শে নিজেকেও গঠিত ও অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। সে অচিরেই ফকিরের অভয়পূর্ণ আশ্বাসবাণীতে আস্থাস্থাপন না করিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার মুখে সেই উন্মাদনার ভাব ফুটিয়া উঠিল, যে উন্মাদনায় অধস্তন পর্য্যায়ের সৈনিক তাহার উপরিতন কর্ম্মচারীর আদেশে, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও অম্লানবদনে সমরানলে ঝাঁপ দেয়। ফকিরের আশার বাণীতে সেই বিশ্বাস ও নির্ভরতার ভাব তাহারও চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নৌকার গলুয়ের মুখের কাছে একান্তে বসিয়া দুঃস্থা বৃদ্ধা রূপ-জীবিনী অনুচ্চস্বরে কহিতেছিল, "কি পাপিনী আমি! এত কষ্টেও আমার যৌবনে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে না। ভগবান্! এইবার আমাকে মুক্ত কর।"

তাহার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ সিপাহী কহিল, "চুপ কর মা। ভগবান্ এত হিংসুটে নন যে, তুমি কখন্ কি পাপ করেছ, তিনি তাই মনে ক'রে ব'সে আছেন, আর সময় পেলেই তোমায় তার জন্য সাজা দেবেন। আমিও যে মিছে মিছি দুদশটা কাঁচা মাথা কেটে ফেলে দিই নি, তা মনে করবেন না। যখন পল্টনে কায করেছি, তখন দুচারটে পাপের কায করতেই হয়েছে। তাই ব'লে কি তিনি এই বিঘোরে আমাদের প্রাণটা নেবেন। কখনও না। তুমি চুপটি মেরে বসো। কোনও চিন্তা করো না, আমরা মরবো না।"

বৃদ্ধা কহিল, "আহা! ছইয়ের তলে ঐ বাবাজীর কাছে ব'সে আছে যে মেয়েছেলে দুটি, ওরা কত ভাগ্যবতী। ওরা মর-বার পূর্ব্বেও দুটো জ্ঞানের কথা শুনতে পাচ্ছে।"

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া ফকির তাহার দিকে মুখ ফিরাইল ও মিষ্টভাবে তাহাকে কহিল, "রমণি! ভগবানে বিশ্বাস কর। তুমিও উদ্ধার হইবে।" বৃদ্ধা কহিল, "আহা! কে বাছা তুমি? তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। আজ রক্ষা পাইলে আমি কালই মা জয়কালীর বাড়ীতে তোমার নাম করিয়া নগদ পাঁচ পয়সার একখানি ডালি চড়াইব।"

কৃষক ও তাহার পুত্র নিস্তব্ধভাবে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া ঝটিকার ক্ষিপ্তলীলা দেখিতেছিল।

নৌকার এক অংশে বিত্ত, আভিজাত্য, কু-জ্ঞান, লাম্পট্য—এক কথায় ধর্ম্ম ও নীতিবিবর্জ্জিত শিক্ষা ও কদর্য্য চিন্তার ফলে সমাজে যে সকল পাপ প্রবেশলাভ করে, তাহারই প্রকট মূর্ত্তি, সেই অংশেই আবার যন্ত্রণার হৃদয়-বিদারক চীৎকার, ভয়ের বিভীষিকা, ঈশ্বরে অবিশ্বাস ও ঐশ্বরিক শক্তিতে সন্দেহ।

নৌকার অপর অংশে পাটাতনের উপর বসিয়া ভগবদ্‌বাক্যে অটুট বিশ্বাসবতী যুবতী, তাহার ক্ষুদ্র শিশুটিকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে, আর শিশুটি ঝড় দেখিয়া হাসিতেছে; রূপজীবিনী বৃদ্ধবয়সে দারুণ অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে; এক জন বৃদ্ধ সৈনিক পুরুষ—যাহার সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্রের দাগ, যে আজীবন হৃদয়ের রক্ত ক্ষয় করিয়া তদ্বিনিময়ে এই অস্ত্রলেখাগুলি অর্জ্জন করিয়াছে, এখন বৃদ্ধবয়সে বহু কষ্টলব্ধ অন্নমুষ্টি অশ্রুজলে লবণাক্ত করিয়া খাইয়া যে কোনও মতে জীবনধারণ করিয়া আছে, তথাপি যাহার মুখে হাসি লাগিয়াই আছে, মরণভয়ে যে বিন্দুমাত্র ভীত নহে। অবশিষ্ট দুই জন কৃষক, শারীরিক শ্রমই যাহাদের একমাত্র বল, দুঃখ-দৈন্য প্রেম ও শ্রম যাহাদের হৃদয়কে ধৌত ও পবিত্র করিয়া তুলিয়াছে।

আর সকলের উপর উন্নত শিরে দাঁড়াইয়া সেই শক্তিশালী মানব—নৌকার মাঝি, যে বিশ্বাসে অটুট, যে চরম অদৃষ্টবাদী, যে আত্মনির্ভরতার জলন্ত দৃষ্টান্তরূপে দৃঢ়হস্তে নৌকার হাল চালনা করিতেছে, বিবদমান ঝটিকা ও তরঙ্গের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতেছে, আর মাঝে মাঝে যাত্রীদিগকে স্থির হইয়া বসিতে বলিতেছে।

ডিঙ্গিখানি যখন বোয়ালিয়ার ঘাটের অনুমান যাট পঁয়ষট্টি গজ দূরে, নৌকার আরোহিগণের হৃদয় যখন আশার আলোকে দীপ্ত, তখন সহসা একটি ভীষণ দম্‌কা বাতাস আসিয়া নৌকাখানিকে যেন তুলিয়া লইয়া নদীবক্ষে সজোরে আছাড়িয়া দিল। নৌকাখানি মাঝামাঝি বান্‌চাল হইয়া গেল। অতি অল্পকালমধ্যে নৌকার খোল জলে ভরিয়া গেল। আর কোনমতেই রক্ষা নাই।

সহসা শেষাগত সেই আগন্তুকের মুখে এক দিব্য জ্যোতি প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিল। তিনি খড়ম-পায়ে নৌকার গলুইয়ের পাটাতনের উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন ও তাঁহার ভয়াকুল সহযাত্রীদিগের পানে চাহিয়া জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "যাহাদিগের হৃদয়ে বিশ্বাস আছে, তাহারা নিশ্চয় রক্ষা পাইবে। যে যে বাঁচিতে চাও, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এস।"

এই কথা বলিয়া ফকির নৌকা হইতে নদীবক্ষে নামিয়া দাঁড়াইলেন ও অবলীলাক্রমে স্থির পাদবিক্ষেপে জলের উপর দিয়া তীর অভিমুখে চলিতে লাগিলেন।

তৎক্ষণাৎ সেই যুবতী সন্তানের জননী তাহার শিশুটিকে বক্ষে লইয়া ফকিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ জলের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। বৃদ্ধ সিপাহীও ফকিরের কথায় অটুট বিশ্বাসে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। নৌকার এক জন দাঁড়ীও তাহাদের দেখাদেখি পশ্চাদ্ধাবন করিল।

নির্ভীক মাঝি ও আর তিন জন দাঁড়ী প্রত্যেকে এক একখানি পাটাতনের তক্তার গায়ে জোঁকের মত লগ্ন হইয়া রহিল। তাহারা সকলেই সন্তরণপটু, কাযে কাযে সহজেই কূল পাইল।

মহাজন মহাপ্রভু টাকার থলি দুইটির মায়া কিছুতেই ছাড়িতে পারিল না। সে সেই থলি দুইটিকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিল, এবং তাহাদেরই ভারে নিজেও ডুবিয়া মরিল। নৈয়ায়িক প্রথম হইতেই ফকিরের বুজরুকী ও ফকিরের কথায় যাহারা আস্থাস্থাপন করিয়াছিল, তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া হাসিতেছিল। রাক্ষসী পদ্মাবতী তাহাকে কবলিত করিয়া ফেলিল। ছইয়ের তলের সেই সুন্দরী কিশোরী ও তাহার সদ্যোমনোনীত নাগর পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া পদ্মার আবর্ত্তে পড়িয়া মরিল। আখড়াধারী সেই বাবাজী ও তাহার বিধবা শিষ্যা তাহাদের আপন আপন পাপের ভারে বিঘোরে মারা পড়িল।

আগে আগে ফকির ও তাহার পশ্চাতে বিশ্বাসমুগ্ধ যাত্রী কয় জন পদ্মাতীরের ধীবরপল্লীর এক কুটীরপ্রাঙ্গণে প্রজ্বালিত সান্ধ্যদীপ লক্ষ্য করিয়া দৃঢ় ও অনার্দ্র পাদবিন্যাসে ঝটিকা-ক্ষুব্ধ নদীবক্ষের উপর দিয়া অনায়াসে তীরাভিমুখে চলিতে লাগিল। ঝঞ্ঝার রোল, বজ্রের নিনাদ, মেঘের গর্জ্জন তাহাদের কাণে পশিতে লাগিল; কিন্তু তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। তাহাদের হৃদয়ে অটুট বিশ্বাস। তাহারা সকলেই নির্ব্বাক্—নিঃশঙ্ক।

ফকির তীরে উঠিলেন। যাত্রিগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলেই গিয়া তীরে উঠিল। যে কুটীরের প্রাঙ্গণে মঞ্চের উপর দীপ জ্বলিতেছিল, সেইটিই ফকির মুকদ্দম সাহেবের আস্তানা।

* * * * *

উত্তরকালে, পুণ্যতোয়া পদ্মাবতীর তীরবর্ত্তী বিশাল বরেন্দ্রভূমি যখন মহারাজা রামকৃষ্ণ, রাণী ভবানী প্রভৃতির লীলানিকেতন হইয়া উঠিল, তখন বোয়ালিয়া একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদে পরিণত হইল। সেই সময়ে, কোন বিত্তশালী ভক্তের অর্থে ফকির মুকদ্দম সাহেবের আস্তানার সমীপে একটি ইষ্টকময় দেবায়তন রচিত হইয়াছিল। ইহাই আধুনিক মুকদ্দম সাহেবের দরগা। এই দরগার সম্মুখেই একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনিত হইয়াছিল। জনশ্রুতি এইরূপ যে, এই দীঘিতে এক জোড়া স্বর্ণবর্ণের কুম্ভীর ছিল। প্রতি বৎসর মহরমের শেষ দিন দ্বিপ্রহরে এই কুম্ভীর-দম্পতি জলের উপর ভাসিয়া উঠিত। মুকদ্দমের দীঘিটি এখন একবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় সরকার ইহা ভরাট করিয়া রাজসাহী কলেজের ছাত্রদিগের ক্রীড়াঙ্গনে পরিণত করিয়াছেন।

সেই পুরাতন ক্ষুদ্র ইষ্টকরচিত দেবায়তনটি মাত্র আজও অতীত যুগের সেই অভিমানবের স্মৃতিটুকু জাগরূক রাখিয়াছে।

শ্রীমনোমোহন রায়

পথের স্মৃতি

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বোধ হয়, বাঙ্গালা স্কুলে পড়িবার সময়েই এক দিন পণ্ডিত মহাশয় আমাদের 'স্বাস্থ্যে'র পড়া দিয়াছিলেন—পাঁচ পাতা! তাহাতে ক্লাশশুদ্ধ সব ছেলেই আমরা হৈ-চৈ করিয়া উঠিয়াছিলাম যে, পাঁচপাতা আমরা কিছুতেই মুখস্থ করিতে পারিব না। সকলের প্রতিবাদে পণ্ডিতমশাই তখন বলিয়া দিলেন—ঐ পাঠ সংক্ষেপে মুখস্থ করিতে। আমরা বলিলাম যে, সংক্ষেপেও আমরা পারিব না, পাঁচ পাতার সংক্ষেপ আর কতই হইবে, না হয় তিন পাতা, কি আড়াই পাতা, অন্ততঃপক্ষে দুই পাতা ত বটেই! অবশেষে পণ্ডিত মশাই বলিয়া দিলেন যে, খুব সংক্ষেপ করিয়া লইয়া মুখস্থ করিলেই হইবে এবং তাহার পর আমাদের সকলের পীড়াপীড়িতে তিনি নিজেই ঐ পাঁচপাতার সংক্ষিপ্তসার করিয়া আমাদের সকলকে যাহা লিখাইয়া দিলেন, তাহা এই:—'প্রত্যহ প্রভাতে একবার ও রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে একবার, এই দুইবার করিয়া দাঁত মাজিতে হয়। দাঁত মাজিবার পক্ষে দাঁতনই শ্রেষ্ঠ এবং দাঁতনের মধ্যে নিম্বই শ্রেষ্ঠ এবং খাদ্যদ্রব্যাদি খুব চিবাইয়া খাওয়া উচিত।' অনেক দিন পরে আমাদের পণ্ডিত মশায়ের সেই সংক্ষিপ্তসারের কথা আজ আমার মনে পড়িল। আমিও আজ আমাদের শ্রীরামপুর-ত্যাগের পর হইতে আট-দশ বৎসরের ঘটনাবলীর কথা সম্বন্ধে এরূপ সংক্ষিপ্তসার করিয়া লইব এবং তাহা করিয়া লইতে হইলে এইটুকু আমাকে বলিলেই চলে যে, বিমুদা ও আমি উভয়েই বি-এ পাশ করিয়া মা স্বরস্বতীর এলাকা ত্যাগ করিয়াছি, ঠাকুরমা ও বাবা গত হইয়াছেন, জ্যেঠামহাশয় আমাদের উপর সংসারের ভার ফেলিয়া দিয়া কয়েক বৎসর হইতে কাশীবাস করিতেছেন। মা কখনও কালীঘাট, কখনও রামপুকুর, কখনও বা কাশী, এই করিয়া বেড়াইতেছেন, আমাদের উভয়েরই বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু আমার বৌদিদি অর্থাৎ বিমুদার স্ত্রী বিবাহের পাঁচ বৎসর হইল মারা গিয়াছে। তখন হইতে বিমুদাকে সকলে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে জিদ্ করিলেও বিমুদা আর বিবাহ করে নাই, তৎপরিবর্ত্তে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী এক গুরুর শিষ্য হইয়া দুই বেলা জপ-তপ সুরু করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে সংসার ত্যাগ করিয়া বিবাগী হইয়া যাইবারই সকল সম্ভাবনা তাহাতে যে বর্ত্তমান, তাহা তাহার এখনকার কার্য্যাবলী দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। বিশেষতঃ প্রত্যহ সকালবেলা কুস্তি করিয়া উঠার পর ধূলিধুসরিত অঙ্গে যোগাসনে বসিয়া যখন তাহার বাদামের সরবৎ সেবনের আয়োজন হয়, তখন তাহাকে দেখিলেই পরমহংস যোগিবর ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না এবং সে সময়ে শ্রীমদ্ বিনোদানন্দ স্বামী বলিয়া দুই হাতে কবচ বিতরণ করিলেও কাহারও তাহার উপর কোন রকম সন্দেহ করিবার কিছু থাকে না।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমাকে জলখাবার দিয়া আমার স্ত্রী সন্ধ্যা সামনে আসিয়া বসিয়া কহিল,—"পাশের বাড়ীর সেই লোকটা আজও আবার সকালে ছাদে বেড়াতে বেড়াতে সেদিনকার মত চেয়ে চেয়ে হাসছিল।"

"লোকটার স্বভাবচরিত্র ত তা হ'লে বড্ডই খারাপ দেখছি। ও ওদের কে বল দেখি?"

"বোধ হয় গিন্নীরই ভাই-টাই কেউ হবে, কর্ত্তার অসুখে দেখতে এসেছে।"

"ওর নিজেরও ত দেখছি মহা-অসুখ এবং সে অসুখে আমাদেরও যে ওকে একটু দেখবার দরকার হয়ে উঠলো।"

কথাটা ও-ঘর হইতে বিমুদা শুনিতে পাইয়াছিল, হাঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কে রে, পঞ্চু?"

"পাশের বাড়ীর সেই লোকটা।"

"আজও আবার কিছু করেছে না কি?"

"তাই ত শুনছি।"

শঙ্করমাছের লেজের চাবুকগাছটা হাতে লইয়া বিমুদা বরাবর নীচে নামিয়া গেল। সন্ধ্যা কহিল,—"ও কি গো!

যাও—ফিরিয়ে নিয়ে এস, ভাল ক'রে ওদের বুঝিয়ে বল্‌লেই ত হবে।" জল খাইয়া একটা পাণ মুখে দিয়া তাড়াতাড়ি আমি নীচে নামিয়া আসিলাম।

পাশের প্রকাণ্ড বাড়ীখানা জোড়াসাঁকোর মিত্তিরদের সম্পত্তি, বরাবর ভাড়া দেওয়াই থাকে। মাস দুই তিন হইল, নূতন ভাড়াটিয়া যিনি আসিয়াছেন, তিনি এক জন পেন্‌সান-ভোগী সাবজজ্। ইঁহারা স্বামি-স্ত্রী দুই এক জন দাস-দাসী লইয়া এই বৃহৎ বাটীখানি অধিকার করিয়া আছেন। শুনিয়াছি, কর্ত্তার ছেলে নাই, একটিমাত্র কন্যা আছে, কিন্তু সে পিতার নিকট থাকিত না, কাশী না কোথায় ঐ দিকে মামার কাছে থাকিত।

নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিলাম, চাবুকগাছটি হাতে করিয়া বিনুদা বরাবর ইহাদেরই বাড়ীর অভিমুখে যাইতেছে। আমিও পিছু পিছু যাইলাম এবং লোহার ফটক ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিলাম। বাহিরের ঘরখানি খোলাই ছিল, প্রবেশ করিতেই একটি কুড়ি-একুশ বৎসরের মেয়ে ভিতর হইতে ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল এবং মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বিনুদার দিকে চাহিয়া কহিল,—"শিকার কিন্তু আপনার পালিয়েছে। চাবুক নিয়ে আমার মামাকে মারতে এসেছেন ত? তিনি এতক্ষণে বাংলাদেশের মাটী ছাড়িয়ে বোধ হয় সাঁওতাল পরগণায় গিয়ে পড়লেন। বসুন," বলিয়া গোল টেবিলের পাশের চেয়ার দুইখানি একটু টানিয়া দিল।

মেয়েটি শ্যামবর্ণা, কিন্তু চেহারায় তাহার এমন কিছু একটা জিনিষ ছিল যে, বার বার তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করে। মেয়েটি বিবাহিতা কি অবিবাহিতা, কি বিধবা, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। অবিবাহিতা খুব সম্ভব নহে। কারণ, হিন্দুর ঘরে কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে অবিবাহিত প্রায়ই থাকে না এবং ইহারা যে হিন্দু, তাহার পরিচয়ও পাইয়াছি; কয়েক দিন পূর্ব্বে রুগ্ন সাবজজ বাবুর জন্য প্রায়শ্চিত্ত কি চান্দ্রায়ণ এই রকম কিছু একটা ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, তাহা জানি। কিন্তু সধবার আয়তি-লক্ষণও কিছু দেখিলাম না। আবার পরিধেয় বস্ত্রাদিতে বিধবারও কোন চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল না।

মাদ্রাজী সাড়ীর আঁচলখানি পাকাইয়া আঙ্গুলে জড়াইতে জড়াইতে মেয়েটি কহিল,—"খুব চম্‌কে গেলেন বোধ হয়,—না? কি ক'রে আপনার মনের কথা জানতে পারলুম? ঠিক বলেছি কি না বলুন?"

মেয়েটি যে অতিমাত্রায় প্রগল্‌ভা, তাহায় আর কোন সন্দেহ নাই। দুই জন সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে ভদ্রঘরের কোন যুবতী মেয়ে যে প্রথম দেখাতেই এইরূপ অসঙ্কোচে এমন করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে পারে, ইতিপূর্ব্বে আমার জানা ছিল না, তাই চেয়ারে বসিয়া মনে মনে খুবই আশ্চর্য্য হইতেছিলাম। সম্ভবতঃ বিনুদার অবস্থাও আমার মত হইয়াছিল। মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া বিনুদা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কর্ত্তার কে হন?"

"মেয়ে। কিন্তু আমাকে আপনি ব'লে ডাকতে পারবেন না, আমার নাম ধরেই ডাকবেন, বিনু বাবু। আমার নাম সীতা।"

"সীতা?" বলিয়া খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিনুদা কহিল—"আপনি কি কাশীতে—"

"ধন্যবাদ। আপনি যে এরি মধ্যে আমায় একেবারে ভুলে যাবেন, এতটা আশা করিনি, কিন্তু দেখুন, আমি মোটেই ভুলিনি। তবে আপনার ভোলায় আর আমার ভোলায় তফাৎ আছে। বদ্‌মাইসদের হাত থেকে আমায় রক্ষে ক'রে আমার যে মহা উপকার আপনি করে-ছিলেন, তাতে কৃতজ্ঞ হয়ে চিরকাল আপনাকেই আমার মনে রাখার কথা, কিন্তু উপকৃতের কথা উপকারকের মনে না রাখলেও চলে, আর তা থাকেও না।"

"বাস্তবিকই প্রথমে আপনি আমায় চম্‌কে দেছলেন, সীতা!"

"নামটা ধ'রে কথা কইলেন, কিন্তু আপনিটা এখনও তবু ছাড়তে পারলেন না। এ রকম করলে কিন্তু আপনার সঙ্গে আর কথা কওয়া চলবে না।"

"তোমায় না চিনতে পারার দোষ অবিশ্যি একটু হয়েছে বটে, কিন্তু খুব বেশীও বোধ হয় হয়নি; কেন না, কাশীতে তোমায় যেমন দেখেছিলুম, তার তুলনায় তুমি এখন ঢের—"

"রোগা হোয়ে গেছি?"

"শুধু রোগা নয়, কালও হয়ে গেছ।"

সুমিষ্ট হাসির একটা রোল তুলিয়া সীতা কহিল,—"দুধে-আলতার রংটা আমার কাল হয়ে গেছে না কি, বিনু বাবু?"

"দুধে-আল্‌তা রংয়ের কথাই যে আমি বলছি, তা নয়, তবে তোমার রং কালও ত বলা যায় না।"

"তবে কি কি বলা যায় ?

"শ্যামবর্ণ,—না, শ্যামবর্ণও ত ঠিক নয়, অর্থাৎ—"

"অর্থাৎ যাকে বলে বিবর্ণ। থাক্—বর্ণ নিয়ে আর মাথা ঘামাবার এখন দরকার নেই, বিনু বাবু। এর পর যখন কোন কাব্য উপন্যাস লিখবেন, তখন এ নিয়ে বেশী ক'রে ভাববেন। তবে রোগা হয়েছি বটে। রোগা হবার আর দোষ কি বলুন। বাবার এই অসুখ, দিন-রাত তাঁর কাছেই আমায় ব'সে থাকতে হয়। মা ত একেবারে হাত-পা-ভাঙ্গা হয়ে পড়েছেন। ভয়, ভাবনা আর উৎকণ্ঠায় আমিও যে কি হোয়ে আছি, তা আর আপনাকে কি বলবো। ভগবান্ যে কি করবেন!" সীতার মুখের প্রফুল্লতা নিমেষে মিলাইয়া গেল। তাহার বড় বড় স্নিগ্ধ চক্ষু দুইটিতে জল জমিয়া আসিল। দেওয়ালের ওদিকে ফিরিয়া আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিয়া কহিল,—"এই খানিকক্ষণ একটু ঘুমিয়েছেন, তাই ত একটু ফুরসৎ পেয়েছি।"

"তোমার বাবার কি অসুখ, সীতা ?"

একটু পূর্ব্বে যাহার সুমিষ্ট সরস আলাপ এবং প্রফুল্লতায় মনে মনে মুগ্ধ হইয়া উঠিতেছিলাম, এক্ষণে তাহার বেদনাপ্লুত বিমর্ষ মুখের দিকে চাহিয়া অন্তরে ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলাম। সীতা কহিল,—"বাবার জ্বর আর পেটের অসুখ, কিন্তু সব লক্ষণই খারাপ। বোধ হয়, বাবা আর বাঁচবেন না, সেই জন্যে এক এক সময় আমার এত ভয় হচ্ছে যে, তা আর কি বলব। আপনারা এক একবার আসবেন, বিনু বাবু ?" তার পর আমার দিকে চাহিয়া কহিল,—"আপনারা ব'লে কেন বললুম, তা বুঝেছেন বোধ হয় ? অর্থাৎ আপনি আর আপনার দাদা দুজনে এসে যদি একটু আমাদের দেখে-শুনে যান, তা হ'লে তবু একটু ভরসা পাই, আসবেন পঙ্কু বাবু ?"

আমি কহিলাম,—"আপনি কিছু ভাববেন না, আমরা রোজ এসে আপনার বাবাকে দেখে যাবো, কিন্তু আপনি আমার নামটাও জানতে পারলেন কি ক'রে ?"

সীতার মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল, কহিল,—"কাশীতে মামার কাছেই বরাবর থাকতুম কি না, সেখানে পণ্ডিতদের কাছে জ্যোতিষ-শাস্ত্রটা ভাল ক'রে পড়েছি," বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর একটু-খানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—"দেখুন, আমাদের বাড়ী যে নূতন ঝিটা এসেছে, সে আর আপনাদের ঝি এক বাসায় থাকে। কাশী থেকে এসে যে দিন পশ্চিমের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে বিনু বাবুকে দেখতে পেয়ে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে যাই, সেই দিনই আমাদের ঐ ঝিকে জিজ্ঞাসা করতে সব জানতে পারি। তার পর সকল কথাই আপনাদের তার কাছ থেকেই শুনিছি। বাবার অসুখ না হ'লে এরই মধ্যে এক দিন ঝিকে সঙ্গে ক'রে আপনাদের বাড়ী গিয়ে পড়তুম। কিন্তু আজ ঘরে বসেই আপনাদের দেখা পাবার সৌভাগ্য আমি পেলুম। ভাগ্যিস্ মামাবাবু ছাদে বেড়াতে বেড়াতে আপনার স্ত্রীর দিকে চেয়ে চেয়ে হেসেছিলেন !"

আমি কহিলাম,—"কিন্তু এক জন ভদ্রলোকের পক্ষে সে কাযটা কি—"

"মোটেই ভাল নয়, কিন্তু আপনার স্ত্রী বা আপনারা মামার সম্বন্ধে ভয়ানক ভুল বুঝে ফেলেছেন। মামার সম্বন্ধে সব শুনলে আর তাঁর ওপর আপনাদের রাগ থাকবে না, বরঞ্চ আমারই মত তখন হাসবেন" বলিয়া আবার অনুচ্চ হাসির একটা তরঙ্গ তুলিয়া সীতা কহিল,—"কিন্তু আমার ঐ রোগা মামাটিকে মারবার জন্যে কুস্তিগীর পালোয়ানের হাতের একটা চড়ই ত যথেষ্ট, শঙ্করমাছের চাবুকের কি দরকার ছিল বলুন ত ?" তাহার কলহাস্যে ঘরখানি ভরিয়া উঠিল, পরক্ষণেই ঘড়ির দিকে চাহিয়া ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"বাবাকে ওষুধ খাওয়াবার সময় হয়েছে, একটু বসুন আপনারা, আমি আসছি।"

সীতা উপরে গেলে বিনুদাও উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আমাকে কিছুক্ষণ থাকিতে বলিয়া একটা বিশেষ কার্য্যের জন্য বিনুদাও চলিয়া গেল। আমি একাকী বসিয়া ঘরের আসবাবপত্রগুলি ও সেগুলি সাজাইবার শৃঙ্খলা দেখিয়া মনে মনে গৃহস্বামীর রুচির প্রশংসা করিতে লাগিলাম। প্রায় মিনিট পনর পরে সীতা উপর হইতে নামিয়া আসিয়াই কহিল,—"একলা ব'সে আছেন, দাদাটি বুঝি পালিয়েছেন ?" আমি কহিলাম,—"বিনুদার একটা জরুরী কায আছে ব'লে চ'লে যেতে হ'ল।"

"জরুরী কাযের ওঁর কামাই নেই। সে রাত্রেও আপ-নার বিনুদার জরুরী কায ছিল, কিন্তু আমাকে বিপদ থেকে

সম্পূর্ণ মুক্ত না ক'রে আর যেতে পারেন নি। আপনি আপনার দাদার কাছ থেকে সে কথা শুনেছেন কি না, জানি না, কিন্তু জীবনে আমি তা আর কোন দিনই ভুলতে পারব না, পঙ্কু বাবু।"

"বিনুদার কাছ থেকে কিছুই শুনি নি, কি হয়েছিল বলুন ত।"

"শুনবেন ? তবে বলছি।"

হঠাৎ সীতা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ভিতরের দরজার চৌকাঠে পা রাখিয়া কি যেন শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিল। পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া আবার চেয়ারখানি টানিয়া বসিয়া কহিল,—"বাবার অসুখের জন্যে সর্ব্বদাই মনটা আমার অস্থির হয়ে আছে। এক এক সময় আমার এত ভয় হয়, পঙ্কু বাবু. যে, বাবা যদি না বাঁচেন। বাড়ীতে বেটাছেলে কেউ নেই, মেশোমশাই ভবানীপুরে থাকেন, সকালে বিকেলে তিনিই এসে দেখাশুনা করেন, কিন্তু আজ তিনিও যে কেন আসতে পারলেন না, বুঝতে পারছি না।—যাক, যা বলছিলুম, শুনুন, বলি। মামা অনেক দিন থেকেই কাশীতে থাকেন, তিনি সেখানকার কলেজের প্রফেসার। শুধু যে প্রফেসারী ক'রে ছাত্রদেরই পড়ান, তা নয়, নিজেও চিরকাল তিনি এক জন ছাত্র। শাস্ত্রের পুঁথি-পত্তরের দপ্তরের মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে রেখে সর্ব্বদাই ঐ সব তত্ত্বেই তন্ময় হয়ে আছেন। প'ড়ে প'ড়ে আর ভেবে ভেবে মামা আমার মাথাটিকে এক রকম খারাপ করেই ব'সে আছেন বল্লেই হয়। আমার মাথাটিও খারাপ করবার মতলবে ছিলেন, আমি দেখলুম, মামার বড় মাথা খারাপ হ'লে হয় ত চলবে, কিন্তু আমার এ ছোট্ট মাথাটি বিগড়ে গেলে কিছুতেই চলবে না, তাই আমার পাততাড়ি গুটিয়ে মামার পাঠশালা থেকে স'রে পড়েছি।" বলিয়া সীতা আর একদফা খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া কহিল,—"এমন ধারা অদ্ভুত লোক কেউ কখনও দেখে নি। তার সাক্ষী এই দেখুন না কেন, ক'দিন এখানে এসে, ছাদে বেড়িয়ে, আপনার স্ত্রীর দিকে চেয়ে, দেখুন ত, কত না হাসি-ইসারা ক'রে গেলেন! কিন্তু মজার কথা এই যে, আমাদের এই বাসার পশ্চিম দিকে আপনাদের বাড়ী, কি মাঠ, কি আদিগঙ্গা, কি জঙ্গল, কি ধানের ক্ষেত, এ কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি হয় ত হাঁ করেই থাকবেন, কিছু বলতেই পারবেন না। এখানে এসে কোন দিন তিনি ছাদে পায়চারী করেছেন কি না, তাই হয় ত বলা তাঁর পক্ষে শক্ত হবে। সুতরাং ব্যাপারটা যে কি হয়েছে, তা বোধ হয় এইবার বুঝতে পেরেছেন অনেকটা ?" বলিয়া সীতা হাসিতে লাগিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মামার কাছেই বুঝি বরাবর থাকতেন ?"

"হ্যাঁ, একেবারে ছেলেবেলা থেকে। বাবা তখন ছিলেন মুন্সেফ, সাত যায়গায় ঘুরে বেড়াতেন, সেই জন্যে মামার কাছেই আমাকে বরাবর রেখে দিয়েছিলেন। মামার কাছেই মানুষ, যা সামান্য একটু-আধটু লেখাপড়া শিখেছি, তাও ঐ মামাই শিখিয়েছেন।"

"অমন মামা যখন আপনাকে ছেলেবেলা থেকে কাছে রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, তখন লেখাপড়াতে নিশ্চয় আপনি—"

"হ্যাঁ, একেবারেই দিগ্‌গজ, অর্থাৎ বি, সি, ডি, এম্, এন্, ও, পি, ভারতী, বিদ্যালঙ্কার, কাব্যশাস্ত্র-ঘড়ঘড়ি" বলিয়া সীতা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"আচ্ছা, মধ্যে এক দিন হার্ম্মোনিয়মের সঙ্গে কে গান গাচ্ছিল, সে নিশ্চয় আপনি ?"

"মিছে কথাটা আর বলব না, ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিশ্চয় গাধা থাকে না, কণ্ঠ আমারই, পঙ্কু বাবু! পরশু বাবা একটু ভাল অ ছেন, সন্ধ্যার সময় দু'খানা ঠাকুরদের নাম করতে বললেন, তাই সে দিন চীৎকার করেছিলুম। যাক—যা বলছিলুম, মামার কাছেই কাশীতে থাকি। সকাল-সন্ধ্যায় মন্দির ঘুরে বেড়ান আমার একটা রোগ আছে। সে দিন কি একটা কাযে মামাবাবু গিয়েছিলেন বিন্ধ্যাচল, আমি সীতারাম চাকরকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যার খানিক পরেই বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখতে গেলুম। বাড়ীতে কেউ নেই ব'লে মামা আর যেতে পারলেন না। কিসের জন্যে সে দিন মন্দিরে লোকের ভীড়ও যেমন হোয়েছিল অত্যন্ত বেশী, আর আরতি দেখে মন্দির থেকে যখন বেরুলুম, তখন রাতও হয়ে গেছলো তেমনি অনেক। মন্দিরের মত বিশ্বেশ্বরের গলিতেও সে দিন লোকে লোকারণ্য। খানিকটা আসার পর পেছন ফিরে দেখি, সীতারাম নেই। জার্ম্মাণ সিলভারের একখানা দোকানের এক পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তার জন্যে অপেক্ষা

করতে লাগলুম ; ভাবলুম, ভীড়ের মধ্যে বোধ হয় পেছিয়ে পড়েছে, কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম, সীতারামকে দেখতে পেলুম না।"

"কাশীর পথঘাট সব নিশ্চয়ই আপনার চেনা ছিল, অত দিন যখন ছিলেন ?"

"সব না হোক, অনেক পথই জানা ছিল, বিশেষ বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের পথ খুব ভালই জানতুম। তা ব'লে অতটা পথ একলা চ'লে আসতেও ভরসা হ'ল না। প্রায় মিনিট পনর সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে সীতারামের জন্যে আবার মন্দিরের দিকেই খানিকটা এগিয়ে গেলুম ; কিন্তু তার আর দেখা পেলুম না। তখন কি আর জানতুম যে, সীতারামই এক জন গুণ্ডো !"

"সে আপনাদের বাড়ী কত দিন ছিল ?"

"একেবারে নতুন, সবে কুড়ি পঁচিশ দিন সে এসেছিল।"

"তার পর কি হোল ?"

"তার পর তাকেই খুঁজতে গিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলুম। সেই সময় পাণ্ডা গোছের একটা মোটা-সোটা বেঁটে হিন্দুস্থানী আমার সামনে এসে বল্লে—'আপনার নোকর হারিয়েছে বুঝি ? সে আপনাকে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে, হামার সাথে আসুন, কোন ডর নেই।"

"আর অমনি তার সঙ্গে গেলেন ? এত দিন কাশীতে থেকে—"

"সেই কথাই ত ভাবি। সে দিন তার ঐ কথা শুনেই কেন যে সেই অপরিচিত লোকটার সঙ্গে গেলুম, একবার একটু ভেবেও দেখলুম না—"

চাকর আসিয়া টেবিলের উপর আলো দিয়া গেল। সীতা তাহাকে ডাকিয়া কহিল,—"অক্ষয়, রোজ তোমায় বলছি যে, আগে গঙ্গাজল দিয়ে তার পর আলো দেবে, এ কথাটা আর তোমার কিছুতেই মনে থাকে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তার পর কি হোল ?"

"তার পর, তার সঙ্গে সঙ্গে আসতে আসতে এই কথাটাই খালি ভাবতে লাগলুম যে, কাযটা ঠিক হচ্ছে কি না। কিন্তু ভাবতেও লাগলুম, তার সঙ্গে আসতেও লাগলুম। কে যেন আমায় তার সঙ্গে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। শেষকালে হঠাৎ যখন আমার চমক্ ভাঙ্গল, তখন দেখি, এমন একটা গলির মধ্যে তার সঙ্গে এসে পড়েছি, যেখানে এর আগে আর কখনও আসি নি। গলিটা একেবারেই নির্জ্জন, কোন দিকেই মানুষের সাড়া নেই। চারিদিকে চেয়ে দেখে একটাও লোক দেখতে পেলুম না। কাশীর এক শ্রেণীর লোকের কথা তখন আমার মনে প'ড়ে গেল। ভয়ে আমি কাঁপতে লাগলুম। বোধ হয় চীৎকার করতেই গেছলুম, সেই সময় সে পেছন ফিরে আমার হাত ধরতেই গলার রব গলার মধ্যেই আটকে গেল। হাতটা ধ'রে লোকটা বললে,—'বিবিসাহেব, বড্ড ডর লাগছে, না' ?"

"উঃ, বাঙ্গালীর মেয়েরা পথে ঘাটে কি রকম দুর্ব্বল, কি রকম অসহায়, তা আর বলবার নয় !"

"ইংরেজ হোলেই বা সে অবস্থায় কি করত, পঙ্কু বাবু ? আপনি ভাবছেন, সে লোকটা একলা ? তখনি কোত্থেকে আরও দুজন লোক এসে তিন জনে মিলে আমায় ঘিরে ফেল্লে। এক জন একখানা চাদর দিয়ে আমার মাথার সঙ্গে ফেরতা দিয়ে মুখটা বেঁধে ফেলতে লাগলো। কিন্তু মুখ বাঁধবার তাদের কোন দরকারও ছিল না, আমি 'ফেণ্ট' যাবার মতই হয়ে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ সেই সময় ভগবান্ যে মূর্ত্তিতে এসে আমায় রক্ষে করলেন, জীবনে কখন সে মূর্ত্তি আমি ভুলতে পারব না। তাঁর চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম ;—বিনু বাবুই আমার সে সময়ের সাক্ষাৎ ভগবান্" বলিয়া সীতা তাহার জোড় হাত বার বার মাথায় ঠেকাইতে লাগিল।

"সেই সময় বুঝি বিনুদা' এসে পড়ল ?"

"এসে পড়েন নি, ভগবান্ পাঠিয়ে দিলেন। খালি পা, গায়ে একটা হাতকাটা জামা, চাদরখানা মাথায় জড়ান। দূরে তাঁকে আসতে দেখেই প্রাণপণ শক্তিতে মুখের বাঁধনটা একটু আলগা ক'রে কোন রকমে ব'লে উঠলুম—'রক্ষে করুন।' শুনতে পেয়েই উনি ছুটে এলেন, আর এসেই মাথার চাদরটাকে খুলে কোমরে জড়িয়ে তিন জনকে তিনটে ঘুসি রগের ওপর এমন মারলেন যে, তিন জনেই ঘুরে পড়ল। তার পর আমায় একটু দূরে স'রে গিয়ে দাঁড়াতে ব'লে তাদের ঘুসি মারতে লাগলেন আর রদ্দা দিতে লাগলেন। তাদের দু একটা ঘুসি-ঘাসাও ওঁকে খেতে হয়েছিল। কিন্তু কি মারই যে ওঁর কাছ থেকে তারা খেলে, তা আর কি বলবো। তারাও খুব ষণ্ডা, তাই বিনু বাবুর সে মার খেয়েও তারা

বেঁচে রইল। কি অসীম শক্তি যে ওঁর গায়ে, তা সে দিন দেখেছিলুম বটে!"

"তার পর?"

"তার পর, আমার হাত ধ'রে উনি যেন 'ছুট কাটিয়ে' নিয়ে এসে যখন সদর রাস্তায় এনে ফেল্লেন, তখন দেখি, সামনেই চকের বাজার। সেখানে এসে, পথের এক ধারে দাঁড়িয়ে কত বকুনিই যে আমাকে বকতে লাগলেন! তার পর বললেন যে, তাঁর বিশেষ জরুরী কোন কায আছে, তা হ'লেও আমাকে আমাদের বাড়ীতে পৌঁছে না দিলে অন্য কাযে তিনি যেতে পারবেন না, ব'লে—আমায় সঙ্গে করে বরাবর রামাপুরায় আমাদের বাসা পর্য্যন্ত এলেন।"

"হ্যাঁ, গেল বারে জ্যেঠামশায়ের হঠাৎ অসুখের খবর পেয়েই বিনুদা কাশী চ'লে গেছলেন। জরুরী কায বোধ হয় আর কিছুই নয়, জ্যেঠামশায়ের অসুখ সম্বন্ধেই।"

"তাই হবে। কিন্তু কত ক'রে আপনার দাদাকে একটি দিন আমাদের বাসায় যাবার জন্যে বলেছিলুম, তা আর যান নি ক।"

এই সময় বাহিরে রাস্তায় গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইবার শব্দ হইতেই সীতা বাহিরের দিকে দেখিয়া কহিল—"ডাক্তার বাবু এসেছেন, চলুন না পন্টু বাবু, একবার বাবাকে দেখবেন চলুন না।" ডাক্তার বাবুটি ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইতেই আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং তিন জনেই উপরে আসিলাম।

—

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দিন পাঁচ ছয় পরে এক দিন রাত্রিতে হঠাৎ সীতার পিতার অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়িল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সেখানে থাকিয়া বাটী আসিয়া শুইতে সে দিন অনেক দেরী হইয়া গিয়াছিল, সেই জন্য সকালে উঠিতে পারি নাই, উঠি-উঠি করিয়াও শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতেছিলাম, সন্ধ্যা আসিয়া ঠেলা দিয়া কহিল,—"ও-বাড়ীর চাকর ডাকতে এসেছে, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।"

উঠিয়া বাহিরে আসিতেই সীতাদের অক্ষয় চাকর কহিল,—"মা একবার ডাকছেন।" তখনই চোখে মুখে জল দিয়া সীতাদের বাটী আসিয়া দেখিলাম, কর্ত্তার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। সীতার মা কাঁদিতে লাগিলেন। সীতা কাঠ হইয়া শয্যার এক ধারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। রাত্রি-জাগরণ ও দুশ্চিন্তার জন্য তাহার মুখের উপর একটা মলিন ছায়া পড়িয়া তাহাকে একবারে ম্লান দেখাইতেছিল। আমার আসিবার কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যাও খিড়কী দিয়া আসিয়া সীতার পাশে আসিয়া বসিল এবং তাহার হাত হইতে পাখাখানি লইয়া কর্ত্তার মাথায় ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল।

এ কয়দিনই সন্ধ্যা যখনই সময় পাইয়াছে, এ বাটীতে আসিয়া ইহাদের দেখিয়া শুনিয়া গিয়াছে। দিন দুই পরে বৈকালের দিকে ও-বাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যা কহিল,—"সময়টা ওদের বড্ডই খারাপ পড়েছে। এই আষাঢ়েই সীতার বিয়ের সব ঠিক-ঠাক, কিন্তু সে দিকেও আবার এক মহাবিপদ! এতদিনকার এত আয়োজন, এত বন্দোবস্ত, এত খরচপত্তর সবই ওদের বৃথা হোল!"

"সীতার কি এখনও বিয়ে হয়নি?"

"রোজ ওবাড়ী যাও, কিন্তু সে খবরও বুঝি রাখ না?"

"কার কাছ থেকে রাখবো? আর তা ছাড়া, কুড়ি একুশ বছরের মেয়ের যে বিয়ে হয়নি, তা কেমন ক'রে জানবো?"

"বিয়ে কি এত দিন হবার বাকী থাকতো। ছেলে ওদের দেখাশুনো হয়ে সব ঠিক-ঠাক, এমন কি, দিন পর্য্যন্ত স্থির হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ ছেলে বললে,—'বিলেত যাবো, ফিরে এসে বিয়ে হবে।' ছেলে নাকি হীরের টুক্‌রা ছেলে। মা বাপ কেউ নেই, সীতার বাপই একরকম তাকে মানুষ করেছেন। বিলেত যাবার জেদ যখন ধরলে, তখন ওরাই আবার খরচ-পত্তর ক'রে তাকে বিলেত পাঠালে, আর এই পাচ ছ' বছর সমানে সেখানে তার খরচ জুগিয়ে আসছে, কিন্তু হঠাৎ কাল ঐ খবর এসেছে।"

"কি খবর?"

"যে, সে সেখানে কিসের খুব বড় পাস্‌টাস্ ক'রে সেখানেই মস্ত কি এক চাকরী পেয়েছে আর এক মেম বে করেছে।"

"বল কি গো?"

"হ্যাঁ, তাই ত বলছি, মেয়েটার ভাগ্যি নেহাৎই মন্দ, নইলে বাপের অবস্থা ত এ দিকে এই, এখন যায়—তখন যায়, ওদিকে যার ভরসায় এত দিন আইবুড়ো থেকে—"

"এত ব্যাপার, কি ক'রে জানবো বল। আর এ সব

খুঁটিনাটি খবর মেয়েরা এক দিন গিয়ে যা টের পায়, বেটাছেলে এক মাস গিয়েও তা জানতে পারে না। এ সব খবর জানতেও তোমরা যেমন 'ফাষ্ট', খবর গেজেট কত্তেও তেমনই তোমরাই 'ফাষ্ট'।—আচ্ছা, ওরা একটা অনিশ্চিতের আশায় মেয়েকে এই এতবড় ক'রে রাখলে, ওদেরই বা কি রকম বুদ্ধিশুদ্ধি বুঝি না ত।"

"ওদের বুদ্ধির আর দোষ কি। ছেলেটি কর্ত্তারই না কি এক বন্ধুর ছেলে। বাপ যখন মারা যায়, তখন মা-মরা ঐ ছেলেটিকে কর্ত্তার হাতেই গছিয়ে দিয়ে যায়। তখন তার বয়স সাত বৎসর, সীতা তখন জন্মায়ও নি। তখন থেকে তাকে মানুষ-টানুষ ক'রে, লেখাপড়া শিখিয়ে নিজের ছেলের মত করেই ত ঘরে রেখেছিল। সে ছেলে যে এমন নেমক-হারাম—"

"যাক্,—সীতার বিষয় আজ একটা ঠিক পেলুম। এত দিন ত বুঝতেই পারি নি যে, ওর বিয়ে হয়েছে, কি হয় নি, বরঞ্চ বিধবা বলেই এত দিন মনে ক'রে এসেছি।"

এই সময় ও বাড়ীতে সীতার মামার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। তাঁহাকে টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল। বুঝিলাম, তিনি টেলিগ্রাম পাইয়া চলিয়া আসিয়াছেন। বৈকালে যাইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলাম। আমি যাইতেই তিনি কহিলেন,—"আপনার কথা সবই দিদির কাছে শুনলুম, কাশীতেও এক রাত্রে এক মহা গুরুতর বিপদ থেকে যিনি সীতাকে রক্ষা করেছিলেন, শুনলুম, সেই বিনু বাবু আপনারই দাদা। আশ্চর্য্য হই যে, আপনারাই আবার এই বিপদে—কিন্তু আশ্চর্য্য হবার কি-ই বা আছে? পূর্ব্বজন্মে আপনারা হয় ত—পূর্ব্বজন্ম বিশ্বাস করেন ত? বিশ্বাস আপনাকে করতেই হবে, না ক'রে উপায় নেই। এক সময়ে আমিও—আচ্ছা, ওসব কথা এখন যাক, কোবরেজী আপনি কি রকম মনে করেন, চাটুয্যে মশায়ের এ-অবস্থায় কোবরেজীই সুবিধে হবে ব'লে বোধ হয় না কি?"

অল্প দুইচারটি কথাতেই বুঝিতে পারিলাম, লোকটি অত্যন্ত অন্যমনস্ক এবং কতকটা অস্থিরচিত্তও বটে। প্রশস্ত ঘরখানির মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে কহিলেন,—"দেখুন পঙ্কু বাবু, একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। বিশৃঙ্খলভাবে এলোমেলো কথাগুলো ভাবলে কোন ফল হবে না। মনে করুন, যদি—হ্যাঁ, ভাল কথা, কৈ বিনু বাবু ত একটিবার এলেন না?"

"বিনুদা সকালে এসেছিলেন, আবার এখনই আসতে পারেন হয় ত! যদি বাড়ী থাকেন, তা হ'লে আপনার আসার খবর পেলেই—"

"আচ্ছা, চাটুয্যে মশা'য়ের সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়? কোন সুরাহার আশা দেখছেন কি?"

এ কথার যে কি উত্তর দিব, তাহাই ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। কিন্তু উত্তর যাঁহাকে দিতে হইবে, দেখিলাম, উত্তর পাইবার জন্য তিনি কিছুমাত্র ব্যস্ত নন, তিনি শুধু প্রশ্ন করিয়াই খালাস। কেন না, পরক্ষণেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, সতীর কোন্ অঙ্গটা কালীঘাটে পড়েছিল, পঙ্কু বাবু?" তবুও আমি কর্ত্তার সম্বন্ধেই ভাবিতে লাগিলাম। চোখের সামনে নিত্য নিত্য তাঁহার অবস্থার যে পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, তাহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, তাঁহার কাল ফুরাইয়া আসিয়াছে। সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা এবং আত্মীয়-অনাত্মীয়ের এই ঐকান্তিক যত্ন ও আগ্রহকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া তিনি যে ক্রমশঃ অনারোগ্যের পথেই আগাইয়া আসিতেছেন, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী নাই, সুতরাং সু-রাহার কথাই বা কেমন করিয়া বলি? কিন্তু কিছু আমাকে বলিতেও হইল না, নিজেই তিনি কহিলেন,—"দেখুন, হয় বাঁচবেন—না হয় বাঁচবেন না। বাঁচেন যদি, তা হ'লে ত কোন কথাই নেই, আর যদি নাই বাঁচেন, তা হ'লে—তা হ'লে—আর কিছুই নয়, মেয়েটার জন্যেই একটা ভাবনা। একটা নতুন হাঙ্গামা আবার বেধে উঠেছে। জগতের ব্যাপার কিছুই বোঝবার যো নেই, পঙ্কু বাবু! এ যে কি রহস্যভরা, কি গভীর, কি অতল! আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য! কেউ কেউ আবার এমন দিগ্‌গজ যে, সৃষ্টি-রহস্যের কণামাত্র বুঝতে না পেরে ব'লে বসলেন কি না যে, সৃষ্টি অসম্পূর্ণ, জগৎ-পদ্ধতিতে দোষ আছে, ত্রুটি আছে, উপরন্তু তিনি নিষ্ঠুর, তিনি পক্ষপাতী।"

"ও সব বাজে লোকের কথা ছেড়ে দিন, এখন—"

"ন—না—নেহাৎ বাজে নয়, যাঁরা বলেছেন, তাঁরা পণ্ডিতও বটেন, কিন্তু মনে হয়, অত্যন্ত বিচারক আর অকৃতজ্ঞ। আমি, পঙ্কু বাবু, এই কথা বলি যে, আমরা নিজেরা যখন 'পারফেক্ট' হ'তে পারি না, উপায়

সংস্কারে যখন এসে পৌঁছুতে পারি না, তখন সেই সর্ব্বশক্তিমানের বিচারই বা করতে যাই কি ব'লে আর তাঁকে পক্ষপাতী নিষ্ঠুর ব'লে তাঁর সৃষ্টির দোষই কি ব'লে দিতে সাহস করি ?"

এই সময় সীতা নীচে নামিয়া আসিয়া বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করিল। কয়দিনের পর আজ তাহার মুখে-চোখে পূর্ব্ব-প্রফুল্লতা যেন একটু ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটু আনন্দের—একটু উৎসাহের স্বরে কহিল,—"আজ বাবা অনেকটা ভাল ব'লে বোধ হচ্ছে। এ বেলা ত দেখেন নি পঙ্কু বাবু, চলুন না একবার দেখবেন," বলিয়া উৎসাহের ব্যস্ততায় নিজেই সর্ব্বাগ্রে ভিতরের দিকে অগ্রসর হইল।

উপরে আসিয়া কর্ত্তাকে দেখিলাম। কয়দিনের পর আজ তাঁহাকে একটু ভাল বলিয়াই বোধ হইল বটে, কিন্তু ইহা যে নির্ব্বাণের আগে প্রদীপের হঠাৎ উজ্জ্বলতা, তাহা শুধু আমিই মনে মনে বুঝিলাম এবং আমার বুঝিবার যে কোনই ভুল হয় নাই, তাহা সেই রাত্রিশেষেই প্রমাণিত হইল। হঠাৎ সন্ধ্যার পর হইতেই কর্ত্তার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া শেষরাত্রিতেই তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

সীতা যে খুব কান্নাকাটি করিল, তাহা নহে; কিন্তু বিষাদরাজ্যের সমস্ত বিষাদ একসঙ্গে আসিয়া যেন তাহার সর্ব্বদেহে আশ্রয় করিল। অসম্ভব গাম্ভীর্য্য আসিয়া তাহার পূর্ণপ্রস্ফুটিত মুখচ্ছবির সমস্ত কোমলতা, সমস্ত লাবণ্য, সমস্ত মাধুরী যেন হরণ করিয়া লইল। কয়দিন পর্য্যন্ত বড় একটা তাহার দেখা পাওয়া গেল না, নিজের শয়ন-ঘরখানির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া সীতা যেন জগৎ-সংসার হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিল।

মামা সীতাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া বলিলেন,—"দুঃখ করবার কি আছে মা, তুই জানিস্ ত যে, সুখ-দুঃখ দুই-ই অবিদ্যামূলক, আর বিদ্যা অবিদ্যা তাঁরই লীলার বিকাশ।" তাহার পর নীরবে পায়চারী করিতে করিতে খানিক পরে বিনুদার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"বিনু বাবু, যা হয়ে গেল, তা হয়ে গেল, তা নিয়ে আর খেদের আছে কি! ন্যায়ের কথা জানেন ত,—সংযোগ হলেই তার বিয়োগ হয়,—'মরণান্তং হি জীবিতম্।'—তবে এখন দুঃখু-টুকু নয়—ভাবনা একটু মেয়েটার জন্যে, সেই জন্যেই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—" বলিতে বলিতে তিনি ত্রস্তে রাস্তার দিকে বাহির হইয়া গেলেন এবং মিনিট দুই তিন পরে কোমরে কাপড় জড়াইতে জড়াইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন,—"এখন কথা হচ্ছে, যে, প্রার্থনা করাটা কি মিথ্যা, সত্যই কি প্রার্থনা করা চিত্তের একটা ব্যাধি ?"

বিনুদা কহিল,—"দেখুন সত্য মিথ্যা—"

"ঠিক বলেছেন বিনু বাবু, সত্যমিথ্যা বিচার করে কে? কিছুতেই না—কিছুতেই না—ওসব পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মাথার বিকৃতি! প্রাণের ভেতর থেকে যখন তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা আপনিই বেরিয়ে পড়ে, তখন নিশ্চয়ই—যাক্, বিনু বাবু, এখনকার অবস্থায় ব্যবস্থা হচ্ছে এই যে, এখানকার কাযের যখন শেষ হয়েই গেল, তখন আর এদের এখানে থেকে কি হবে, সকলকে নিয়ে বেনারস চ'লে যাই। আপনাকেও কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেতে হবে বিনু বাবু, কেন না, এদের সব নিয়ে যেতে আমি একলা পেরে উঠবো না।" তাহার পর একটু হাসিয়া কহিলেন,—"আমি এমনিভাবে বলছি, যেন হুকুম করছি, কি বলেন পঙ্কু বাবু? কিন্তু বাস্তবিকই আমার অন্য কিছু মনে হয় না, মনে হয় যেন, আপনাদের ওপর একটা দাবী সত্যিই আছে।"

বিনুদা কহিল,—"সত্যিই ত আছে, মামা। সকল মানুষের ওপরেই সকল মানুষের একটা দাবী আছে, সাহায্যের দাবী, সমবেদনার দাবী, ভালবাসার দাবী। আর তা আছে বলেই—"

"ঠিকই বলেছেন বিনু বাবু, আছে বৈ কি। আছেও যেমনই, পরস্পরের জন্যে পরস্পরের মনে একটা সাড়াও তেমনই দেয়। তা যদি না দিত, তা হ'লে না হয় বুঝতুম—যাক্, তা হ'লে বিশ্বনাথের ইচ্ছাই যখন, এদের সব নিয়ে গিয়ে একবারে তাঁর মন্দিরতলায় রাখেন, তখন, কি বলেন—আঁা? পঙ্কু বাবু, আপনাকেও যেতে হবে, যাবেন ত?"

আমি একক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে কেবল হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিয়াছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম যে, ইনি কি কথাকে টানিয়া কোথায় যে আনিয়া ফেলেন, তার আর কোন ঠিক-ঠিকানা নাই। সীতা যে প্রথমদিন পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছিল যে, সর্ব্বদাই ঐ তত্ত্বেই তন্ময়, এখন দেখিতেছি, সে কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তরে

কহিলাম,—"বিনুদা গেলেই আমার আর যাবার দরকার হবে না। আর তা' ছাড়া, হু'জনে আমরা গেলে বাড়ীতে থাকবার আর কেউ নাই।"

"আচ্ছা—আচ্ছা, বিনু বাবু গেলেই হবে'খন, উনি এক-লাই একশ। অমনি ওঁর বাবাকে দেখে আসাও হবে। এখন তাঁকে একটু ঘন ঘন দেখাও দরকার। এখন ধরতে গেলে, বিনু বাবুই বাপ আর তিনি ছেলে হয়ে দাঁড়িয়েছেন, কি বলেন, বিনু বাবু? জগতে সব জিনিষেরই প্রায় এক-রকম অবস্থা, পরিবর্ত্তন ঘ'টে থাকে।"

যাহা হউক, কয় দিন এখানে থাকিয়া কর্ত্তার পার-লৌকিক কার্য্যাদি শেষ করিয়া সকলে কাশী চলিয়া গেল। বিনুদাও সঙ্গে যাইল। যাইবার জন্য জ্যেঠামহাশয়ও চিঠি দিয়াছিলেন। আমাকেও একবার যাইবার জন্য তিনি লিখিয়াছেন, কিন্তু এই সময়ে এখানে আমার একটা ভাল চাকুরীর কথা হইতেছিল বলিয়া আমি কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে পারিলাম না। সীতাও আমার ও সন্ধ্যার যাইবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছিল, ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলাতে ও আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার সময় সকলে মিলিয়া আমরা যাইব কথা দেওয়াতে তবে নিরস্ত হয়। যাইবার দিন গাড়ীতে উঠিতে গিয়া সীতা সন্ধ্যার হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া কহিল যে, আশ্বিন মাসে না যাইলে সে নিজে আসিয়া এমনি করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইবে এবং—বলিয়া সন্ধ্যাকে কি একটা ইসারা করিল। তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া কহিল,—"আপনার সঙ্গে ত আমি কথা বল্‌ব না, যত দিন না আপনি দিদিকে নিয়ে কাশী যাবেন।"

দিন পাঁচ সাত পরে কাশী হইতে বিনুদার পত্র আসিল। লিখিয়াছে যে, জ্যেঠামশায়ের শরীর তেমন ভাল নহে বলিয়া বিনুদা এখন সেইখানে কিছু দিন ধরিয়া থাকিবে, আর আশ্বিনমাসে যাহাতে আমরা যাই, সে জন্য জ্যেঠামশায় অনেক করিয়া বলিয়াছেন। পত্র পড়িয়া সন্ধ্যা কহিল,—"বড়ঠাকুরের কাণ্ডই এক আলাদা। নিজেদের কথাই এক ঝুড়ি লিখলেন, কিন্তু সীতাদের কোন কথাই লিখলেন না। মেয়েটার জন্যে সত্যিই বড্ড মন কেমন করে।"

আমি কহিলাম,—"আচ্ছা, সীতা আর তুমি ত প্রায়ই সমবয়সী, বড় জোর দু'এক বছরের সে না হয় তোমার চেয়ে ছোট, কিন্তু সীতার সম্বন্ধে এমনি ভাবে তুমি কথা বল যে, তার চেয়ে তুমি যেন কতই না বয়সে বড়।"

"সে কথা ঠিকই, কিন্তু সীতা যে আমার চেয়ে দু'এক বছরেরই ছোট, তা কিন্তু আমার কিছুতেই মনে হয় না। তার কথাবার্ত্তা, তার চেহারা, তার ছেলেমানুষী স্বভাব দেখে মনে হয়, সে যেন আমার চেয়ে অনেক—অনেক বছরের ছোট।"

"তার মানে, দেহের বয়স তার একুশ হ'লেও, মনের বয়স তার—একুশের অর্দ্ধেক, অর্থাৎ মনটা তার কচি মেয়ের মতই কাঁচা, তোমাদের মত পাকার রং ধরেনি। কিন্তু এ-ও আবার দেখেছি যে, এক এক সময় সীতা এমন গম্ভীর হয়ে পড়ে, এমন সব পণ্ডিতী কথা বলতে সুরু করে যে, তখন তাকে আদ্যিকালের বুড়ো টোলের পণ্ডিত মশাই বলেই মনে হয়, সন্ধ্যা।"

"যাই হোক, তাকে কিন্তু আমি বড্ডই ভালবেসে ফেলেছি।"

"আমিও।"

"ঠাট্টা নয়, তুমিও এবং আরও এক জনও।"

"সে জন কে বল দেখি?"

"বড়ঠাকুর।"

"কিন্তু বড়ঠাকুর ত তোমার ওবাড়ীতে বড় বেশী একটা যেত না, সীতার সঙ্গে বেশী কথাও কইত না।"

"তুমিই কি বিয়ের পর বছরখানেক আমার কাছে বেশী আসতে, না বেশী কথা বল্‌তে?"

"তার মানে, তুমি কি বল্‌তে চাও যে, সেই বছরখানেকই তোমাকে আমি ভালবাসতুম, এখন আর বাসি না?"

"খুব বাস গো মশাই—খুব বাস, খুব—খুব—খুব। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, পূজোর সময় সব কাশী যেতেই হবে, যাবে ত?"

"আমি তোমার সঙ্গে কথা কব না—আড়ি।"

"কথা না কও, কিন্তু, কাশী ঠিক যেতে হবে। না গেলে আমারও তোমার সঙ্গে আড়ি।"

এই সময় মতির মা ঝি আসিয়া একখানা খামে আঁটা পত্র দিয়া গেল, শিরোনামায় সন্ধ্যার নাম লেখা। সুতরাং অনধিকারবোধে নিজে না খুলিয়া পত্রের মালিকের হস্তেই তাহা দিলাম। পত্রখানি পাঠ করিয়া সন্ধ্যা কহিল,—"এই দেখ, বোনটি আমার কত ভালবাসে আমায়, কত কথাই লিখেছে," বলিয়া চিঠিখানি আমার কোলের উপর ফেলিয়া দিল। দীর্ঘ পত্রখানির সবটাই পড়িলাম। পড়িয়া বুঝিলাম যে, সীতা সর্ব্বরকমেই আমাদের আপনার করিয়া লইতে চাহে। পত্রের শেষের দিকে লিখিয়াছে, পঙ্কু বাবুকে আমার নাম করিয়া বলিবেন যে, পূজার সময় এখানে আপনাকে না আনিলে তাঁর জরিমানার ব্যবস্থা হইবে।

সন্ধ্যা কহিল,—"দেখলে, সীতা আমাকে কত ভালবাসে!"

"সীতাই শুধু ভালবাসে, আর ত কেউ বাসে না।" বলিয়া কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া আমি নীচে নামিয়া গেলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৫ই মে রাত্রি ৪টার সময় আমরা শয্যাত্যাগ করিয়া হাত-মুখ ধুইয়া প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিলাম। ৬-১৫ মিনিটের মধ্যে আহার শেষ হইয়া গেল। আর ১৫ মিনিটের মধ্যে কোট-পেণ্ট্লুন পরিয়া, মাথায় উলের টুপী চড়াইয়া, পায়ে মোটা মোজা এবং বুট আঁটিয়া পটি বান্ধিয়া কুলীর মাথায় বোঝা চাপাইয়া দিলাম। যাত্রা পুনরায় আরম্ভ হইল। অদ্য আমাদিগকে ১৫।১৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ৪ হাজার ফুট উপরে উঠিতে হইবে।

অরণ্যের মধ্য দিয়া পূর্ব্বদিকে চলিতে আরম্ভ করিলাম। এইরূপে প্রায় ১॥ মাইল গমনের পর আমরা তারের ঝোলান পুল দিয়া তিস্তানদী পার হইলাম। এইবার আমাদের গতি উত্তরাভিমুখে। তারের পুলের সাহায্যে নদী পার হইবার পর আমাদিগকে দুরারোহ 'চড়াই' অতিক্রম করিতে হইল। পাহাড়ের গাত্রসংলগ্ন, কদর্য্য, অপরিসর পথে কখনও 'চড়াই,' কখনও বা 'উৎরাই'। ঘন জঙ্গলে গন্তব্য পথ সমাচ্ছন্ন। প্রায় ২ হইতে ২॥• মাইল পথ এইভাবে অতিক্রম করার পর আমরা এক পরিষ্কার যায়গায় উপস্থিত হইলাম। এখানে পুনরায় তিস্তানদীর একটি জীর্ণ কাঠের পুলের উপর দিয়া পার হইয়া চতুর্দ্দিকে উচ্চ শৈল-বেষ্টিত উপত্যকা-ভূমিতে পৌঁছিলাম। এখানে একটি গ্রাম আছে, তাহার নাম চুংটাং। চুংটাং উপত্যকাটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। এই অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি উপত্যকার তিন দিক্ বেষ্টন করিয়া তিনটি নদী প্রবাহিত। সোজা উত্তরদিকে পাহাড়, উত্তর-পূর্ব্বদিকে লাচুং নদী এবং উত্তর-পশ্চিমে লাচেন নদী। এই লাচেন নদী চুংটাঙ্গের দক্ষিণদিকে মিলিত হইয়া তিস্তানদী নামে অভিহিত হইয়াছে। উত্তর-পূর্ব্বদিকে অবস্থিত লাচুং নদীর পার দিয়া লাচুং এবং ইয়ামাথাং যাইবার রাস্তা। উত্তর পশ্চিমদিকের লাচেন নদীর পার দিয়া লাচেন ও থাঙ্গু অভিমুখে যাইবার পথ। এখানে একটি শাখা ডাকঘর দেখিলাম। অরণ্য বিভাগের এক জন কর্ম্মচারী, পূর্ত্ত বিভাগের এক জন ওভারসিয়ার এবং এক জন মুন্সি (clerk) এখানে

তিস্তা সেতু

থাকেন। কয়েক ঘর চাষী গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী জমী চাষ আবাদ করিয়া থাকে দেখিলাম। গ্রামের উত্তরে পাহাড়ের উপরে কিছু দূরে একটি গুম্ফা আছে। এখানে নদীর স্রোত খুব প্রবল, গ্রামে দুই একখানা দোকানও আছে দেখা গেল।

গ্রামে একটি ডাকবাংলো ছিল, কিন্তু গত বর্ষায় তাহা নদীর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। আমরা প্রথমে ইয়ামাথাং

যাইব স্থির করিলাম। তথা হইতে চুংটাং গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তনের পর সেখানে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তার পর লাচেন ও থাঙ্গু যাত্রা করিব। সে জন্য গ্রামের মধ্যে বাসের উপযোগী স্থান পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া রাখাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইল। আমাদের ব্যগ্রতা দর্শনে পুলিস ও পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগের মুন্সি আমাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিবে বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিল। আমরা তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া রওনা হইলাম।

চুংটাং প্রায় ৫ হাজার ৩ শত ফুট উচ্চে অবস্থিত। আমরা তখন টুং হইতে মাত্র ৫ শত ফুট উপরে উঠিয়াছি, আমাদিগকে আরও সাড়ে ৩ হাজার ফুট উপরে উঠিতে হইবে। সে জন্য ১০।১১ মাইল পথ অতিক্রম করা প্রয়োজন। কাযেই আমরা চুংটাংএ অধিক বিলম্ব না করিয়া লাচুং নদীর পাড় দিয়া উপর দিকে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। ২৸০ মাইল চলার পর আমরা একটি সুন্দর ঝরণার নিকট উপস্থিত

ঝরণা

হইলাম, ঝরণার জল প্রায় ১শত ৫০ ফুট উপর হইতে পড়িয়া কিছু দূর যাইয়া লাচুং নদীতে মিশিয়াছে। এখানে লাচুং নদীটিও খাড়াই ভাবে চলায় স্রোত খুব বেশী, এমন কি, সময় সময় জল পাথরের উপরে প্রবলবেগে পতিত হওয়ার ফলে তাহা হইতে ধূম্রজাল উত্থিত হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইল। নদীর অপর পারে শস্যশ্যামল তৃণক্ষেত্রসমূহ এবং মধ্যে মধ্যে চাষীদের বাসগৃহ।

নদীর এপারে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া চাষের উপযুক্ত সামান্য সামান্য ভূমিও দেখিতে পাইলাম। এই সব স্থানের চাষীরা একই জমী উপর্য্যুপরি ২ বৎসর চাষ করে না। এক বৎসর চাষ করিয়া উহা ফেলিয়া রাখে। পর-বৎসর ক্ষেত্রস্থ আগাছাসমূহ কাটিয়া আগুন দিয়া পুড়াইয়া নূতন জমীতে পুনরায় চাষ-আবাদ করে। এইভাবে এতদঞ্চলে চাষ হইয়া থাকে। আমি যে স্থানের কথা বলিতেছি, তাহা প্রায় ৭ হাজার ফুট উচ্চ। এখানে ধান হয় না; যব, মাখই (ভুট্টা), কুস্ত্রি এবং গম জন্মিয়া থাকে।

৫।৬ মাইল রাস্তা চলার পর আমরা যখন প্রায় ৮ হাজার ফুট উচ্চস্থানে উপস্থিত হইলাম, তখন পুষ্পভারাবনত অসংখ্য 'রোডোডেনড্রন' ফুলের গাছ অকস্মাৎ আমাদের দৃষ্টিকে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিল। ৭ হাজার ফুটের ঊর্দ্ধে উঠিয়াও এই সকল গাছ কোন কোন স্থানে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে ফুল ছিল না বলিয়া চিনিতে পারি নাই। কিছু দূর অগ্রসর হইলে রাস্তার দুই পার্শ্বে লাল, সাদা ও হরিদ্রাবর্ণের রোডোডেনড্রন ফুল আরও অনেক দেখিতে পাইলাম। এই ফুলের শোভা বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এই গাছের পাতা লম্বা, পুরু এবং গাঢ় সবুজ। গাছ ২০।২৫ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। ইহার প্রত্যেক সরু ডালের অগ্রভাগ পুষ্পমুকুলে সুশোভিত। ফুলগুলি দেখিতে করবীফুলের ন্যায়। সম্পূর্ণ গাছ পুষ্পভারে সমাচ্ছন্ন। রোডোডেনড্রন ফুল নানাপ্রকারের। গাঢ় রক্ত, ঈষৎ লাল, পাতলা হরিদ্রা এবং শ্বেতবর্ণের ফুলও দেখিয়াছি। পুষ্পিত রোডোডেনড্রন্ বৃক্ষরাজি-পরিপূর্ণ অরণ্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে লাচুং নদীতীরে অবস্থিত লাচুং গ্রাম আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

এই গ্রামটি একটি সমতল উপত্যকায় অবস্থিত। তবে এই প্রশস্ত উপত্যকাটি ক্রমোচ্চভাবে উত্তরদিকে প্রসৃত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব এবং পশ্চিম প্রান্তে অত্যুচ্চ পাহাড়। পশ্চিম দিকের শৈলদেহে একটি সুন্দর জলপ্রপাত আছে। এই পাহাড়টি বৃক্ষবর্জ্জিত। অল্পমাত্রায় তুষারাচ্ছন্ন। পূর্ব্ব-দিকের পাহাড়ে একটি গুম্ফা বিদ্যমান। গ্রামটি নদীর

জলপ্রপাত

পূর্ব্বপারে অবস্থিত। পশ্চিমপারে একটি ডাক-বাংলো। এখানে মাথই (ভুট্টা) চাষ হয় না। কেবল যব, গম ও আলুরই চাষ হইয়া থাকে।

আমরা প্রায় ৪ ঘটিকার সময় ১৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ডাক-বাংলোয় উপস্থিত হইলাম। কিছু সময় বিশ্রামের পর আমরা কোকো ও আটার রুটী আহার করিলাম। তার পর লাচুং গ্রাম দেখিবার জন্য কাঠের পুল পার হইয়া গ্রামে উপস্থিত হইলাম।

লাচুং গ্রামে কয়েক ঘর কৃষকের বাস। তথায় কোন বাজার নাই। এখানে একটি খৃষ্টান মিশন আছে। ঐ মিশনে তিন জন য়ুরোপীয় মহিলা বাস করেন। সম্প্রতি তাঁহাদের দুই জন গণ্টকের দিকে চলিয়া গিয়াছেন। ফিনিস দেশের একটি মহিলা তখনও তথায় ছিলেন। আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিছুক্ষণ আলাপ করিলাম। তিনি সুন্দর ইংরাজী জানেন। তাঁহারা তথায় খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন। খৃষ্টান মিশনে একখানা বড় টিনের বাংলো, তাহাতে কয়েকখানা কোঠা আছে, প্রত্যেক ঘরে শীত নিবারণের জন্য আগুন জ্বালিবার কুণ্ড আছে। চাকরদের থাকিবার এবং রান্নার জন্য পৃথক্ ঘর আছে। বাংলোর দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে ছোট বাগান, তাহাতে কিছু ফুলগাছ ও বিস্তর আপেল গাছ আছে।

মিশনের পশ্চিমে বালিকাদের বস্ত্রবয়ন শিক্ষার কারখানা এবং পাঠশালা। উলের কাপড় প্রস্তুত করিবার জন্য বালিকাদের একটি কারখানাও আছে। এই কারখানায় বালিকাদিগকে তাঁতে উলের কাপড় প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সকল পশমী কাপড় সামান্য লাভে সিকিম গভর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রয় করা হয়। কেহ ফরমাশ দিলে বালিকারা ঐ প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করে, নচেৎ নহে। আশপাশের গ্রামবাসীদিগকে ইঁহারা ঔষধও বিতরণ করিয়া থাকেন।

মিশন হইতে বাহির হইয়া আমরা গ্রাম দেখিতে অগ্রসর হইলাম। গ্রামের সকল বাড়ীই বন্ধ, গ্রামবাসীরা সকলেই কৃষক। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এই সময় চাষ-বাসে মন দিয়াছে। তাহাদের চাষের ৫ মাস মাত্র সময়। বৈশাখের মধ্যভাগ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত। আশ্বিনের শেষ ভাগেই তথায় তুষারপাত আরম্ভ হয়।

লাচুং গ্রামে চাষীদিগের ঘরের চারিদিকে কাঠের থাম, ঐ থাম মাটীতে পুতিয়া দেওয়া হয় না। জঙ্গল হইতে মোটা গাছ আনিয়া তাহা সামান্য পরিষ্কার করিয়া থাম লাগান হয়। বড় একখানা পাথরের উপর থাম খাড়া করিয়া থামের চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া পাথর দেওয়া হয়, উপরে কাঠের চালা এবং চারিদিকে পাথরের দেওয়াল কিংবা কাঠের বেড়া। প্রত্যেক ঘরেই কাঠের পাটাতন আছে। কোন ঘরেই জানালা-দরজার বাহুল্য নাই।

লাচুং বাংলোটি টিনের দ্বারা নির্ম্মিত। ঘরের মধ্যে কাঠের ছাদ, চারিদিকে কাঠের বেড়া। শয়ন ও বসিবার ঘরের বহির্ভাগে ডবল কাচের সাসি লাগান; এক জোড়া ভিতর দিকে খোলে এবং অপর জোড়া বাহিরের দিকে খোলা যায়। এই কাচের সাসির উপর মোটা পশমের পর্দ্দা আছে।

ঘরের মেঝে কাষ্ঠ দ্বারা আচ্ছাদিত। বাংলোর প্রত্যেক শয়ন ও বসিবার ঘরে আগুন জ্বালাইবার ব্যবস্থা আছে। বাংলোর চারিদিকে সামান্য ফুলের বাগান, কিন্তু আপেল গাছের সংখ্যা অপর্য্যাপ্ত। ঐ গাছে আমরা জ্যৈষ্ঠমাসে ফুল দেখিয়াছি। আশ্বিন মাসে ফল পাকিবে। এখানে আশ্বিন

মাসেও তুষারপাত হইয়া থাকে। তাহার পূর্ব্বেই শস্যাদি ক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত হয়। লাচুং গ্রাম দেখিয়া বাংলোয় প্রত্যাবর্ত্তনের পর আলোক-চিত্রগুলির কার্য্যে মন দিলাম। রাত্রিতে ঘর গরম করার জন্য ঘরে অগ্নি জ্বালাইবার ব্যবস্থা করা গেল।

১৬ই মে। অদ্য আমাদের মাত্র ৯ মাইল যাইতে হইবে। কিন্তু ৪ হাজার ২ শত ফুট উচ্চে উঠিতে হইবে,বাংলো হইতে বাহির হইয়া প্রথমতঃ সামান্য পথ নীচের দিকে নামিয়া আবার উৎরাই আরম্ভ হইল। প্রথম ১ মাইল পথের পর ৪ মাইল রাস্তা অত্যন্ত কদর্য্য—খাড়া উঠিতে হয়। ইহার পর রাস্তা যদিও ভাল নহে—তবে নিতান্ত দুরধিগম্য নহে। এই ৪ মাইল পথ অতি সাবধানে ধীরে ধীরে উঠিতে হয়। ৮ হাজার ফুটের উপরে কোন পরগাছা (orchids) এবং বাস-ছাপ দেখিলাম না। সমগ্র পথটি জঙ্গলের মধ্য দিয়া গিয়াছে। শীত ঋতুর শেষচিহ্নস্বরূপ এখনও তথায় তুষারস্তূপ বিদ্যমান দেখিলাম। এই ভাবে আমরা মনোরম জঙ্গলের মধ্য দিয়া কোন কোন স্থানে তুষার-চিহ্ন দেখিতে দেখিতে লাচুং নদীর পশ্চিম পার দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। জঙ্গলের মধ্যে অন্য এক প্রকার রোডো-ডেনড্রন্ ও অন্য এক প্রকার ঋজু দীর্ঘ গাছ এবং ভোজপাতার গাছ দেখিলাম। জঙ্গল ছাড়াইয়া আমরা স্বল্প তুষারাচ্ছন্ন পাহাড়ের উপত্যকায় পৌছিলাম। কোন কোন স্থানে সামান্য তুষারস্তূপ আছে, কিন্তু যেখানে রৌদ্র-কিরণ পড়িয়াছে, তত্রত্য তুষার দ্রব হইয়া গিয়াছে। পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি তখনও সম্পূর্ণরূপে তুষারাচ্ছন্ন অবস্থায় বিদ্যমান। বৈশাখ মাসের রৌদ্রে এই বরফ গলিতে আরম্ভ হয়। গলিত তুষার নদী-স্রোতের ন্যায় প্রবল বেগে পাহাড়ের উপর দিয়া নীচে প্রবা-হিত হইতেছে। রাস্তায় যাইতে যাইতে আমরা সময় সময় মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইলাম। জঙ্গলের মধ্যে চলিবার সময়ও আমরা এইরূপ গর্জ্জন শুনিয়াছিলাম। কিন্তু তখন ইহা কিসের শব্দ, তাহা স্থির করিতে পারি নাই। জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া মাঠের মধ্যে পড়িলাম। তখন মেঘের গর্জ্জন শুনিয়া পাহাড়ের দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, বড় বড় তুষারস্তূপ পাহাড় হইতে গড়াইয়া নীচের দিকে আসিতেছে, তাহাতেই মেঘগর্জ্জনবৎ শব্দ হইতেছে। সময় সময় উক্ত নালার মধ্য হইতে জলপ্রপাতের ন্যায় নিম্নভাগে আপতিত হইতেছে। পতনের সময় বাষ্পরাশি ধূম্রবৎ উপর দিকে উঠিতেছে। যে সকল তুষারস্তূপ এই ভাবে নীচে পড়িতেছে, তাহা প্রথমতঃ বালি ও পাথর বলিয়া আমাদের ভ্রম হইয়াছিল। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে, উহা বালি বা পাথর নহে, উপর হইতে পতিত তুষার-স্তূপমাত্র।

এই স্থানে আর একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। তুষার গলিয়া যাওয়ার পর বড় গাছ, চারা গাছ, এবং লতাসমূহ নব-কিসলয় ও পুষ্পকলিকায় সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, নূতন পল্লব বাহির হইবার পূর্ব্বেও গাছে এবং লতায় ফুল ফুটিয়াছে। কোন কোন গাছ দেখিলে মনে হয় যে, মৃত বৃক্ষে যেন কেহ পুষ্প বসাইয়া দিয়াছে। শীতের সময় সমস্ত স্থান তুষারে আবৃত ছিল। গাছ, পাতা, লতা, ঝোপ ইত্যাদি শীতের সময় তুষার-সমাধি লাভ করিয়াছিল। বসন্তের প্রারম্ভে যেমন শীতের প্রকোপ কমিয়া আসে, অমনই তুষার গলিতে আরম্ভ হয়। সেই সময় বৃক্ষলতাদির যে যে অংশ তুষার-অবগুণ্ঠন হইতে মুক্ত হয়, তাহাতেই নূতন পল্লব ও মুকুল ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ডের স্পর্শে যেন আবির্ভূত হইতে থাকে। এ দৃশ্য দেখিলে মনে হয় যে,প্রকৃতি-সুন্দরী নীল বসনে বিভূষিত হইয়া তাহার যৌবনের লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য বিকশিত করিবার জন্য যেন নিতান্ত ব্যস্ত। জঙ্গলে নানাবর্ণের আভাযুক্ত, রোডোডেনড্রন ফুল দেখিতে পাইলাম। মাঠের মধ্যে আর এক জাতীয় লাল ও সাদা ফুলবিশিষ্ট চারা গাছ দেখিলাম। সে ফুলের গন্ধ অতি মধুর। গাছের পাতা ছোট, মোটা, সবুজ এবং চিক্কণ। পাতাও সুদৃশ্য এবং সুগন্ধবিশিষ্ট, দগ্ধ করিলেও মধুর ঘ্রাণ বাহির হয়। ভুটিয়ারা এই গাছের পাতা ধূপের ন্যায় ব্যবহার করে। মাঠের মধ্যে তুষার গলিয়া গেলে ঘাস জন্মে। জঙ্গল ছাড়াইয়া মাঠের মধ্যে পড়িলাম। এখানে তুষার এখন নাই। মাঠে অল্প অল্প ঘাস জন্মিয়াছে। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে পাহাড় এবং মধ্যে প্রকাণ্ড বিস্তৃত উপত্যকা-ভূমি। এই উপত্যকার ভিতর দিয়া লাচুং নদী প্রবাহি[illegible] হইতেছে। পূর্ব্বদিকের পাহাড়ের নিম্ন এবং মধ্যদে[illegible] জঙ্গলাবৃত; কিন্তু উপরিভাগ এখনও তুষারাবৃত। ত[illegible] কিয়দংশ গলিয়া গিয়াছে। পশ্চিমদিকের পাহাড় খাড় কোন গাছ নাই। এই পাহাড় পূর্ব্বদিকের পাহাড় [illegible] নদীর

উচ্চ। এই পাহাড়ের পাদদেশে একটি মালভূমি আছে। এই মালভূমির উপর হইতে তুষারগলিত জলধারা আসিতেছে। উহার অনেক অংশ এখনও তুষারাচ্ছন্ন।

আমরা মাঠ দিয়া লাচুং নদীর পশ্চিমপার ধরিয়া ৮ মাইল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া তথায় একটি কাঠের সেতু দেখিতে পাইলাম। ঐ সেতুর অপর পারে পাহাড়ের সানুদেশে গরম জলের একটি গন্ধকের ফোয়ারা আছে। সেই ফোয়ারাটির চারিদিকে একটি কাঠের ঘর। এই ঘরের ভিতরে পাথরের মধ্যে একটি গর্ত্ত কাটা হইয়াছে। গর্ত্তে ফোয়ারার জল পড়িতেছে। ফোয়ারার চৌবাচ্ছাটি গোল, ব্যাস প্রায় ৮ ফুট এবং ৪ ফুট খাড়াই। ঘরের ভিতর প্রবেশ

তুষারাবৃত উপত্যকা

করিলে গন্ধকের তীব্র গন্ধ পাওয়া যায়। আমি দরজা বন্ধ করিয়া পোষাক ছাড়িয়া ঐ ফোয়ারার গরম জলে ডুব দিয়া স্নান করিলাম। সঙ্গে গামছা ছিল না, সম্বলের মধ্যে মাত্র ১ খানা ঝাড়ন। উহা দ্বারা গা মুছিয়া, পুনরায় পোষাক পরিয়া, পায় পটি আঁটিয়া ঐ ঘর হইতে বাহির হইলাম। আমার সঙ্গী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, দ্বারবান্ ও চাকরদিগকে স্নান করিতে বলিলাম। তাহারা ফিরিবার সময় স্নান করিবার বাসনা জানাইল। কিন্তু তাহাদের আর স্নান করা হইল না। কারণ, আমাদের ফিরিতে অনেক বেলা হইল, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মাথায় একটু ভার বোধ করিলেন। ঐ ফোয়ারার জলে এত গন্ধক যে, চৌবাচ্চা হইতে যে জল পাহাড়ের গা দিয়া গড়াইয়া নদীতে পড়িতেছে, তাহা বালির ও পাহাড়ের উপর

উপত্যকার অপর দৃশ্য

দিয়া যাওয়ায় সাদা দাগ পড়িতেছে। আরও এক মাইল অগ্রসর হইয়া আমরা ডাক-বাংলোয় পৌঁছিলাম।

ইয়ামথাং ১৩ হাজার ফুট উচ্চ। বড় বড় তুষারাবৃত পাহাড়ের উপত্যকায় অবস্থিত। চারিদিকে তুষারাবৃত পাহাড়, তাহার নিম্ন ও মধ্যদেশে বড় বড় গাছ আছে। উপত্যকায় নূতন ঘাস হইতেছে এবং ঘাসের মধ্যে বিস্তর একোনাইটের চারা মিলিয়া রহিয়াছে এবং তাহাতে

উপত্যকার অন্য দৃশ্য

হরিদ্রা রঙ্গের ফুল হইয়াছে। তথাকার চমরী গাই বা অশ্বতর ঘোড়া একোনাইট খাইয়া হজম করিতে পারে; কিন্তু নিম্নদেশ হইতে যে সকল ঘোড়া কি অশ্বতর তথায় যায়, তাহারা হঠাৎ উহা খাইলে বিষে তাহাদের প্রাণনাশ হওয়ার আশঙ্কা। কাযেই দার্জ্জিলিং ইত্যাদি স্থান

হইতে ঘোড়া কি অশ্বতর লইলে তাহাদিগকে মাঠে ঘাস খাইতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। আমাদের একটি ঘোড়া একোনাইট খাইয়াছিল, তাহার প্রাণনাশের উপক্রম হওয়ায় তদ্দেশীয় এক জন লোকের ঔষধে ঘোড়ার প্রাণ রক্ষা পায়।

পাহাড়ের উপরিভাগ কেবল তুষারাবৃত। লাচুং নদী সদ্য বরফগলিত জলসহ সাপের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া বালি এবং পাথরের উপর দিয়া প্রবাহিত। উত্তরদিকে চাহিলে বড় বড় তুষারাবৃত পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলোর চৌকিদার ১৮ হাজার ফুট উচ্চ ডাঙ্গিলা গিরিবর্ত্ম (গিরিসঙ্কট পথ) দেখাইল। উহা এখনও সম্পূর্ণ তুষারাচ্ছাদিত। এই ডাঙ্গিলার উপর দিয়া জুলাই মাস হইতে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বাণিজ্যের জন্য চমরী গরুর পৃষ্ঠে বিক্রেয় পণ্য লইয়া যাইবার ব্যবস্থা আছে। এই স্থান হইতে তিব্বতের জন্য বিক্রেয় পণ্যও চমরী গাইয়ের পৃষ্ঠদেশে লওয়া হয়। জঙ্গল হইতে অনেক কাষ্ঠও তথায় নীত হয়। ডাঙ্গিলার উপর দিয়া কেম্পাজাঙ্গ যাওয়া যায়। সেখানে যাইতে তিন দিনের পথ।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রিয়নাথ রায়।

কাহার দেশ?

(তুমি) "স্বদেশ স্বদেশ বল্‌ছ কারে, এ দেশ তোমার নয়।"
(দেশ) শাসন শোষণ করে যে জন, সেই তো মালিক হয়।

এটা তোমার স্বদেশ হ'লে
বিদেশীরা কুতূহলে,
(এত) জাহাজ বোঝাই রত্ন কেন সাগরপারে লয়?
তাদের আহার উপাদেয়
চর্ব্ব্য চুষ্য, লেহ্য পেয়,
(আর) তোমার ভাগ্যে সিদ্ধ কচু খুদ কুঁড়ো যে রয়।

তাদের তরে প্রাসাদ ওঠে,
তায় বিজলীর আলো ছোটে,
(আর) তোমার আঁধার ভাঙ্গা কুঁড়ে বর্ষায় জলময়।
রেলেতে কি ইষ্টিমারে
হায়ার ক্লাস যে তাদের তরে,
(আর) থার্ড ক্লাসেতে পশুর মত তোমার যায়গা হয়।

জল তুলে আর কাষ্ঠ কেটে
চিরকালটা মলে খেটে,
সাতশো বছর গোলামীতে করলে জীবন ক্ষয়।
বিদেশী যে পুরুষ মস্ত
চাবুকেতে সিদ্ধ-হস্ত,
(তাদের) লাথির চোটে পিলে ফেটে তোমার মোক্ষ হয়।

গোলামের জাত গোলাম হয়ে
সবুট লাথি থাকো স'য়ে,
(আর) দেশটা যে কার, তোমার, কি তার,
কায কি পরিচয়?
বিবেচনা ক'রে সদা
কথাবার্ত্তা কইবে, দাদা!—
(নৈলে) হাজার টাকা জরিমানা, কিম্বা কারাশ্রয়।

শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী।
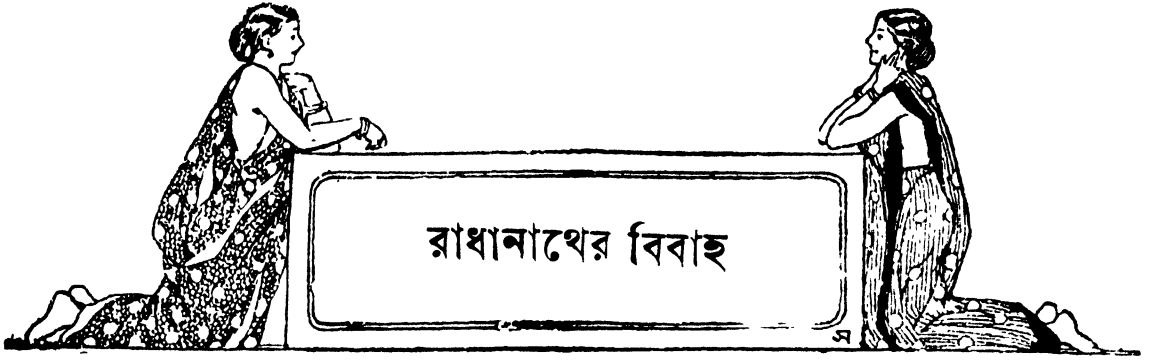
রাধানাথের বিবাহ

বিবাহ করিবার সখটি রাধানাথের বরাবরই প্রবল ছিল। কিন্তু প্রজাপতির এমনই নিবন্ধ যে, বিবাহের কথাবার্ত্তা কয়েকবার পাকা হওয়া সত্ত্বেও ঠিক শুভ-দিনটির পূর্ব্বেই অথবা বিবাহ-সভায় উপবিষ্ট হইয়াও এক একটি অনিবার্য্য অন্তরায় দুষ্টগ্রহের মত তাহার ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়া কল্প-লোকের অনাঘ্রাত প্রেম-কুসুমাস্তৃত সেই কাঙ্ক্ষিত শুভ-মুহূর্ত্তকে অতর্কিতভাবে একবারে তমোমণ্ডিত ও ব্যর্থ করিয়া ফেলিত। তখন মানস-লোকের মাধুর্য্য-সুষমামণ্ডিত কুঞ্জ-কাননে পৌঁছিবার হিরণ্ময় হর্ম্ম্যদ্বার হইতে প্রত্যাখ্যাত, ক্ষোভ ও বিষাদের যুগপৎ আক্রমণে বিভ্রান্ত, ভগ্নহৃদয় রাধানাথকে নিভৃত পাঠগৃহে কয়েক দিন অজ্ঞাতবাস করিয়া আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইত।—রাধানাথের জীবনের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঞ্ছিত দিনটি অবশেষে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ ও আশাভঙ্গের দিন বলিয়া তাহার রোজ-নামচার খাতায় বড় বড় হরফে ফুটিয়া উঠিত!

এমন অঘটন-ঘটনা উপর্য্যুপরি কয়েকবারই ঘটিয়াছে এবং রাধানাথকে তাহা সহ্য করিতেও হইয়াছে; কিন্তু তবুও তাহার বিবাহ করিবার সখ বা বাতিক কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। চাকরীর আশা পাইয়া বেকার যেমন আশা-উৎসাহ বুকে করিয়া কাম্য দিনটিতে কর্ম্মকর্ত্তার কামরায় প্রবেশ করে ও শেষে যথাযথভাবে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসে, রাধানাথও তেমনই জীবন-সহচরী সংগ্রহ করিবার আশায় একাধিকবার বিবাহ-মণ্ডপে বরাসনে বসিবার সৌভাগ্য পাইয়াও অবশেষে লজ্জা ও অপমান মাত্র সম্বল করিয়া বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে! কাযেই তাহার তরুণ জীবনে, চাকুরীজীবীর চাকুরীপ্রাপ্তি হেতু বারবার অভিযান ও নৈরাশ্যের মত, বিবাহজনিত এই অভিযান-গুলিও ক্রমশঃ সহ্য হইয়া গিয়াছিল।

রাধানাথ যদিও প্রেসিডেন্সী কলেজের এক জন মেধাবী ছাত্র, সাহিত্য ও গণিতে গুণানুসারে বি, এ উপাধি লাভ করিয়া একসঙ্গে এম, এ ও আইন পড়িতেছে এবং যদিও তাহার বয়স এক্ষণে সাতাশের গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছে,—কিন্তু তবুও বর্ত্তমানের সবুজের সংক্রামক হাওয়া এখনও তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতে পারে নাই। এখনও পর্য্যন্ত রাধানাথ তাহার পিতা-মাতার সংসারে 'খোকা' বলিয়া পরিচিত এবং এ পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে একটিবারের জন্যও পিতা বা মাতার বিরুদ্ধে এমন একটি কথা বলিতে শুনে নাই, যাহা এই উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত উপাধিধারী উপযুক্ত ছেলে-টির বয়স ও বিদ্যার দ্বার দিয়া অতর্কিতভাবে নির্গত হইলেও কিছুমাত্র দোষের বা তাহার পক্ষে বিশেষ কিছু অগৌরবের কারণ হইতে পারিত। কাযেই এই স্বল্পভাষী এ যুগের অসাধারণ পিতৃমাতৃভক্ত, অধ্যয়ন ব্যতীত অন্য সকল বিষয়েই উদাসীন রাধানাথের অদৃষ্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধির উপর প্রতিবেশীদের প্রদত্ত আর একটি উপাধি অনায়াস-লভ্যরূপে আসিয়া পড়িয়াছিল, সে উপাধিটির নাম 'আহাম্মুখ!'

যে সকল বিচক্ষণ প্রতিবেশী রাধানাথের নামকরণ করিয়াছিল—আহাম্মুখ, তাহারাই আবার তাহার পিতার নাম দিয়াছিল—বিয়ে-ভাঙ্গা কালাপাহাড়! নবাবী আম-লের ব্রাহ্মণ-কুলতিলক কালাচাঁদ রায় কতকগুলি হিন্দু দেব-মন্দির ও বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া মন্দির-মারী কালাপাহাড় আখ্যা পাইয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিমান্ উপাধিধারী ছাত্র শ্রীমান্ রাধানাথের পিতা বৈদ্য-নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইংরেজের আমলে (একমাত্র পুত্র রাধা-নাথের বিবাহ উপলক্ষ করিয়া) কতগুলি বিবাহ সম্বন্ধ ভঙ্গ ও সজ্জিত বিবাহমণ্ডপ মর্দ্দন করিয়াছিলেন, তাহার

যথাযথ ইতিহাস না থাকিলেও, মোটামুটি আভাস একটা পাওয়া যায়।

রাধানাথ যখন হিন্দু স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জলপানি পাইল, তখনই কন্যাদায়গ্রস্তগণ বৈদ্যনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেলঘরিয়ার বাড়ীখানি তীর্থমন্দির-জ্ঞানে এমন ঘন ঘন দর্শনার্থ আসিতে লাগিলেন যে, পল্লীর সকলেই শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। একে বৈদ্যনাথ গাঙ্গুলীর ধনের প্রবাদ ছিল, তাহার উপর তিনি প্রসিদ্ধ সওদাগরী আফিস আরথন কোম্পানীর মুৎসুদ্দী, পৈতৃক বসতবাড়ী, সর্ব্বোপরি একমাত্র প্রিয়দর্শন বয়স্ক পুত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া স্কলারসিপ পাইয়াছে! সুতরাং অবস্থাপন্ন কন্যাদায়গ্রস্তগণ এ হেন পাত্রের সন্ধান পাইয়া মধুগন্ধে লুব্ধ মক্ষিকার মত বেলঘরিয়ার গাঙ্গুলী-বাড়ীর উপর আকৃষ্ট হইয়া পড়িবেন, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

সহর ও সহরতলীর নানাস্থান হইতে রাধানাথের বিবাহ-সম্বন্ধ উপস্থিত হওয়ায় গাঙ্গুলী-গৃহিণী পুত্রের বিবাহ দিয়া একটি টুকটুকে বধূ গৃহে তুলিবার জন্য একান্ত জেদ করিয়া স্বামীকে ধরিয়া বসিলেন। গাঙ্গুলী মহাশয় যদিও প্রথম প্রথম এ বিষয়ে বিশেষ আস্থা প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু অবশেষে মনে মনে একটা মোটা রকম প্রাপ্তির অঙ্ক কসিয়া তিনি স্ত্রীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে অগত্যা সম্মত হইলেন। পুত্র রাধানাথ পিতামাতার অভিপ্রায় অবগত হইয়া মনে মনে তুষ্ট হইয়া কল্পনায় তাসের প্রাসাদ রচনা আরম্ভ করিয়া দিল। রাধানাথ বাল্যে বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়া একটু অধিক বয়সেই ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং যে বয়সে সে প্রবেশিকা পরীক্ষার সাগর পার হইয়া কলেজের দ্বারে পদার্পণ করিয়াছিল, তখন এ সম্বন্ধে কল্পনায় কল্প-লোকের সৃষ্টি করা তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক হইবার কথা নহে।

ভবানীপুরের দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বাদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যাই অবশেষে রাধানাথের জন্য মনোনীতা হইল। বলা বাহুল্য, গাঙ্গুলী মহাশয় সকল দিক্ দিয়া নিখুঁত হিসাব-পত্র কসিয়া যে দর হাঁকিয়াছিলেন, কন্যাপক্ষ তাহাই মানিয়া লইয়াছিলেন। কাযেই মহাসমারোহে উভয় পক্ষে বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল। শুভদিনে গাঙ্গুলী মহাশয় ঘটা করিয়া ভবানীপুরে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে বর লইয়া সদলবলে উপস্থিত হইলেন।' কন্যাপক্ষ সসম্ভ্রমে বর-পক্ষকে অভ্যার্থনাপূর্ব্বক সুসজ্জিত বিবাহমণ্ডপে লইয়া গেলেন। আদর-আপ্যায়ন ও গল্প-গুজবে মজলিস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সহসা এ হেন কলহাস্যময় মজলিসের মধ্যস্থলে দীর্ঘদেহ গাঙ্গুলী মহাশয় দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তীব্র-স্বরে বলিলেন,—"ওহে দিগম্বর চাটুয্যে! তোমার সাত পুরুষের ভাগ্য যে, বেগের গাঙ্গুলী-বংশের পায়ের ধুলো তোমার ভিটেয় পড়েছে! আমি স্বপ্নেও ভাবি নি যে, তুমি এ ভাবে আমাদের অমর্য্যাদা করবে।"—

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই চমকিত হইয়া উঠিলেন। কন্যাকর্ত্তা ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হয়েছে বেই মহাশয়? ব্যাপার কি?"

কন্যাপক্ষের এক জন ব্যাপারটি বেশ একটু অভিনয়-ভঙ্গীতেই বুঝাইয়া দিলেন। তাহা এই,—পণপ্রথা প্রসঙ্গে কন্যার খুল্লতাত না কি পরিহাসচ্ছলে গাঙ্গুলী মহাশয়কে চামড়ার দালাল বলিয়া উপহাস করিয়াছেন! তাহার উত্তরে গাঙ্গুলী মহাশয় ধৈর্য্য হারাইয়া ইতরের ভাষায় তাঁহাকে যথেচ্ছ গালি দিয়া শেষে কন্যাকর্ত্তাকে আক্রমণ করিয়াছেন।

আর যায় কোথায়? কথাটা প্রচার হইবামাত্র চারি-দিকে বহুকণ্ঠে গুঞ্জন উঠিল—"চামড়ার দালাল, চামড়ার দালাল!"

গাঙ্গুলী মহাশয় এবার ধৈর্য্য হারাইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ওরে, আমরা ছোটলোকের পাড়ায় এসেছি,—এখানে ভদ্দর কেউ নেই; সব শালা—ছোটলোক!"

কন্যার পিতা করযোড়ে তার-স্বরে বলিলেন,—"বেহাই, চুপ করুন; একের দোষে দশ জনকে গাল দেবেন না, অনেক গণ্যমান্য লোক এখানে উপস্থিত—"

গাঙ্গুলী মহাশয় আরও উষ্ণ হইয়া বলিলেন,—"কি, চুপ করব আমি! আর এই সব কুকুর আমার দিকে চেয়ে চীৎকার করবে? আমি বেগের গাঙ্গুলী,—কথায় এ বংশ মরে আর বাঁচে, তার খবর রাখেন?"

কন্যার খুল্লতাত মহাশয় শ্লেষের সহিত উত্তর দিলেন,—"কথায় মরা-বাঁচার খবর আমরা রাখি না বটে, কিন্তু গরুর

চামড়া বেচার দালালীর টাকায় যে বেগের গাঙ্গুলী মশাই বেঁচে আছেন, সে খবর অনেকেই রাখে !"

জ্যেষ্ঠ ক্ষিপ্রহস্তে কনিষ্ঠের মুখ চাপিতে গেলেন, কিন্তু কনিষ্ঠ ততোঽধিক ক্ষিপ্রতার সহিত মুখ ফিরাইয়া বক্তব্য সাঙ্গ করিলেন। তাঁহার অন্তরঙ্গগণ সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন,—"ঠিক হয়েছে—মুখের মত জুতো !"

এতক্ষণে বরপক্ষও রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু কন্যাপক্ষের দলপুষ্টির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা স্থানত্যাগই যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন। গাঙ্গুলী মহাশয় ক্রোধে মুহ্যমান হইয়া বরাসনে উপবিষ্ট পুত্রের দিকে চাহিয়া তর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"খোকা, উঠে আয় ওখান থেকে।"

পিতৃভক্ত পুত্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল। কতিপয় বয়োবৃদ্ধ ছুটিয়া আসিয়া গাঙ্গুলী মহাশয়ের হাত দুইখানি জোর করিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"বেহাই মহাশয়, করছেন কি ? ও সব কথায় কাণ দেবেন না, ক্ষমা-ঘেন্না করুন—"

গাঙ্গুলী মহাশয় তর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"বেগের গাঙ্গুলী-বংশের মানে সেখানে ঘা পড়ে, সেখানকার একটা কুটোর সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখে না।"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসল,—"পাটুলীর চাটুয্যে-বংশে চামড়ার দালাল চামারের ঘরে সম্বন্ধস্থাপন করতেও চায় না ?"

বরবেশী রাধানাথ বেচারীকে এক প্রকার টানা-হেঁচড়া করিয়া বিবাহ-মণ্ডপ হইতে বাহির করিয়া লইয়া গাঙ্গুলী মহাশয় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরদিন আফিসে বসিয়া তিনি শুনিলেন, কন্যার সেই জবরদস্ত খুল্লতাতের কোনও পরিচিত পাত্রের সহিত সেই রাত্রিতেই কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

২

সে বৎসর আর গাঙ্গুলী মহাশয় পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে মোটেই মনোযোগী হইলেন না। তিনি সকলকেই বলিয়া রাখিলেন, গ্রাজুয়েট না হইলে রাধানাথের বিবাহ দিবেন না, সুতরাং তৎপূর্ব্বে কেহ যেন তাঁহার কাছে রাধানাথের বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করেন। কিন্তু ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল বাহির হইলে যখন জানা গেল, রাধানাথ সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া স্কলারসিপ পাইয়াছে,—এবং সঙ্গে সঙ্গেই যখন কাশীপুরের বিখ্যাত ধনী রামধন রায়ের কন্যার সহিত রাধানাথের বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন গাঙ্গুলী মহাশয়ের দৃঢ় সঙ্কল্পও শিথিল হইয়া পড়িল। এখানেও দেনা-পাওনা লইয়া কোনও গণ্ডগোল হইল না ; কেন না, কন্যাপক্ষ একেই অবস্থাপন্ন, তাহার উপর গাঙ্গুলী মহাশয় অনেক বিবেচনার পর, ভবানীপুরের বিবাহভঙ্গের ক্ষতিপূরণ পর্য্যন্ত হিসাবপূর্ব্বক যোগ দিয়া যে মোটা ফর্দ্দ দিলেন, পাত্রীর পিতা রামধন রায় মহাশয় তাহাতেই সম্মত হইয়া সম্বন্ধ পাকা করিলেন।

আবার এক শুভদিনের সায়াহ্নে বরসজ্জায় সজ্জিত রাধানাথ পিতা ও আত্মীয়স্বজন-পরিবৃত হইয়া কাশীপুরের বিবাহমণ্ডপ অলঙ্কৃত করিল। বরাসনে বসিয়া রাধানাথ যখন মনে মনে গতবারের দুর্গতির কথা স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল, সেই সময় কন্যাকর্ত্তা বরকে সম্প্রদানস্থলে লইয়া যাইবার জন্য গাঙ্গুলী মহাশয়ের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

গাঙ্গুলী মহাশয় তখন নিবিষ্টচিত্তে ধূমপান করিতেছিলেন। রায় মহাশয়ের কথার উত্তরে ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিলেন,—"এত ব্যস্ত হবার প্রয়োজন ত নেই, বেই মশাই,—আগে আমাদের দেনা-পাওনাগুলোর হিসেব-নিকেশ হয়ে যাক না—"

রায় মহাশয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এ কথা বলবার অর্থ কি, তা ত বুঝতে পারছি না, বেই মশাই !"

পূর্ব্ববৎ হাসিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"বিষয়ী লোক হয়ে বিষয়কর্ম্মের অর্থও আপনি বুঝতে পারছেন না, বেই মশাই ? ভাল, অর্থটা না হয় আরও পরিষ্কার করেই আমি প্রকাশ করছি ;—কথা হচ্ছে কি জানেন, সম্প্রদানের আগে দেনা-পাওনার হিসেবটা আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া আপনার উচিত ; এই কথাই আমি বলছিলেম আর কি !"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"বেশ ত, তাই যদি আপনার অভিপ্রায়, সম্প্রদান-স্থলে চলুন ; সেখানে সমস্তই সাজান আছে, একটি একটি ক'রে সবই আপনাকে বুঝিয়ে দেব।"

মাথা নাড়িয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"উহুঁ, সেটি হচ্ছে না, রায় মশাই! সম্প্রদানের পীঁড়িতে ছেলেকে বসানো, আর হাড়ীকাঠে গলাটি বাড়ানো—একই কথা; তখন ছেলের বাপের কোনও এক্তিয়ার থাকে না; আপনি এক কায করুন, নগদ টাকা আর গহনা, বরাভরণ ইত্যাদি এখানে এনে আমাকে বুঝিয়ে দিন। দানসামগ্রী, খাট-বিছানা ও-সব আমি সম্প্রদানস্থলেই গিয়ে দেখবো।"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"সমস্ত গয়নাই ক'নেকে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে; সালঙ্কারা কন্যা-সম্প্রদানই বিধি,—আপনার কি এই ইচ্ছা বেই মশাই যে, আমি সালঙ্কারা কন্যার অঙ্গ থেকে সমস্ত গহনা খুলে নিয়ে আসি—"

রায় মহাশয়ের স্বর এই স্থলে আসিয়া সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল। তাঁহার দুই চক্ষু তখন অভিমানে ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু গাঙ্গুলী মহাশয় সে দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"আমার ইচ্ছাই এই বেই মশাই, এতে কোন সন্দেহ নেই, আমার বাড়ীর স্যাক্‌রা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে এসেছে,—আপনার-আমার সামনেই গহনাগুলো কসা ও ওজন হওয়া দরকার।"

এইবার রামধন রায়ের অন্তরের রুদ্ধ অভিমান দীপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিল; তাঁহার সনাতন বংশগৌরব, সর্ব্বজনমান্য সম্মান ও প্রতিপত্তির প্রভাব; তাঁহার পৃষ্ঠে যেন চাবুকের আঘাত করিল দৃপ্তস্বরে তিনি বলিলেন,—"রায়বংশের এখনও এতটা অধঃপতন হয়নি গাঙ্গুলী মশাই যে, কন্যা দান করতে বসেছি ব'লে তার সঙ্গে মান-মর্য্যাদা আত্মসম্মান পর্য্যন্ত ঢেলে দিতে হবে! ইচ্ছা হয়, সম্প্রদানস্থলে পাত্র নিয়ে চলুন, না হয়—আপনার যা অভিরুচি, তাই করুন।"

গাঙ্গুলী মহাশয়ের অর্থের দিকে যতখানি লোভ বা লালসা, নিজের সম্মানটিকে সর্ব্বসমক্ষে উচ্চ করিয়া তুলিবার লালসাও ঠিক ততখানি ছিল। কেহ কার্য্যে বা বাক্যে তাঁহার মানের মূলে সামান্য একটু খোঁচা দিলেই তিনি অধৈর্য্য ও একান্ত উষ্ণ হইয়া উঠিতেন; কাযেই আত্মসম্মানের অনুরোধে রায় মহাশয়ের স্পষ্ট কথা তাঁহার বক্ষে শূলের মত বিদ্ধ হইয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। স্থান-কাল ভুলিয়া তিনিও সতেজে উত্তর দিলেন,—"বৈদ্যনাথ গাঙ্গুলীর জান্ নড়ে ত কথা নড়ে না;—ও সব জমীদারী চাল আমার সঙ্গে চলবে না—"

রায় মহাশয়ের কণ্ঠ হইতে এ কথার উত্তর উঠিবার পূর্ব্বেই গাঙ্গুলী মহাশয়ের পশ্চাৎ হইতে চশমাধারী এক তরুণ যুবা শ্লেষদীপ্ত স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"তাই বুঝি গাঙ্গুলী মশাই চামড়া-বেচার চাল এখানে চালতে এসেছেন;—আরথন্ কোম্পানীর চামড়ার গুদোমে যে ভাবে কেনা-বেচা হয়?"

সভাস্থ সমস্ত লোক স্তম্ভিত! গাঙ্গুলী মহাশয়ের আত্মীয়গণের মুখ যেন মাটীর সহিত মিশিয়া গেল। পক্ষান্তরে, তাঁহারই স্বগ্রামবাসী প্রতিবেশী ও কন্যাপক্ষীয়গণের মুখগুলি হর্ষোচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! আর গাঙ্গুলী মহাশয়,—তিনি তখন রক্তনেত্রে বক্তার দিকে তাকাইয়া থাকিলেও, মনে মনে শিহরিয়া উঠিতেছিলেন! কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া যে হঠাৎ এ ভাবে ভয়াবহ সাপের সাক্ষাৎ মিলিবে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই!

বক্তা বলিলেন,—"আমাকে চিনতে পারছেন, গাঙ্গুলী মশাই? ভবানীপুরের দিগম্বর চাটুর্য্যের বাড়ীতে বিয়ে ভাঙ্গার কথা মনে আছে? সেখানেও সভাস্থলে দেনা-পাওনা মেটাবার কথা তোমায় আমার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব হয়।—আমি দিগম্বর বাবুর ভাই, আমার নাম—দ্বিজবর; সেবার আমার ঠেলায় বর নিয়ে উঠে এসেছিলেন, কিন্তু সে কনের বে আটকায় নি;—আজও যদি বর নিয়ে চ'লে যান, এখানকার কনের বে'ও আটকাবে না জানবেন।"

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় গাঙ্গুলী মহাশয় তখন আরক্ত নয়নে দেখিতেছিলেন, বক্তা ভক্তিভরে রায় মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিতেছে ও রায় মহাশয় প্রগাঢ় স্নেহভরে তাহাকে দুই হস্তে তুলিয়া লইতেছেন! ঠিক এই সময়ে সভাস্থ সকলেই সসম্ভ্রমে সরিয়া পথ দিতে লাগিলেন ও বহু কণ্ঠে মৃদুস্বরে গুঞ্জন উঠিল,—গিন্নীমা—গিন্নীমা—

পরক্ষণেই পট্টবস্ত্রপরিধৃতা এক তেজোময়ী বর্ষীয়সী নারী পরিচারিকার সহিত সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন,—তাঁহাকে দেখিয়া সভাস্থ সকলেই সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলেন।—তিনি কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলিয়া বলিলেন,—"রামধন, তুই চামারের ঘরে রাণীর বের সম্বন্ধ করেছিস্? রায়-বংশের মুখে এমনি ক'রে কালী দিবি রে? এতবড় আস্পর্দ্ধা এই মিন্‌ষের,

আমার নাতনীর গা থেকে গয়না খুলিয়ে স্যাকরা দিয়ে ওজন করাতে চায়—আমার বাড়ীতে ব'সে, আমাদের সামনে! ঝাঁটা মার—ঝাঁটা মার! বল্ ও কালাপাহাড় মিন্‌সেকে ছেলে তুলে নিয়ে যেতে। আমি ও ঘরে আমার নাতনীর বে দেব না! ভাবছিস্ কি?—রাণী যার হাঁড়ীতে চাল দিয়ে রেখেছিল—সে নিজে এসেছে, আয় ভেতরে আয়—"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধা নবাগত যুবা দ্বিজবরের হাতখানি ধরিয়া এক প্রকার টানিতে টানিতে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। রায় মহাশয় গম্ভীরভাবে তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরে একসঙ্গে বহু শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। সেই মধুর শঙ্খধ্বনি বজ্রের নির্ঘোষের ন্যায় আশাহত রাধানাথের শ্রবণপথ মথিত করিয়া তুলিল,—প্রত্যাখ্যাত প্রত্যাবৃত্ত বর রাধানাথ ও বরযাত্রিগণের কর্ণে বহুদূর পর্য্যন্ত শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কন্যাপক্ষীয়গণের অট্টহাস্য শবযাত্রীর কণ্ঠোচ্চারিত ভয়াবহ হরিধ্বনির মত ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

পরদিন বাড়ীতে বসিয়াই গাঙ্গুলীমহাশয় সংবাদ পাইলেন, ভবানীপুরের সেই দ্বিজবর চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং সেই রাত্রির বিবাহে তাঁহার পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে।

৩

ইহার পর আরও দুই বৎসর গত হইয়াছে। এই দুই বৎসরে আরও নানা স্থান হইতে রাধানাথের বিবাহের সম্বন্ধও আসিয়াছে। যথারীতি দর-দস্তুর, কথাবার্ত্তা, দিন স্থির পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে,—কিন্তু আশ্চর্য্য এই, কোনও স্থানেই শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইবার অবকাশ ঘটে নাই। কোনও সম্বন্ধ বিবাহের দুই দিন পূর্ব্বে, কোনটি বা এক দিন আগে, কোনও সম্বন্ধ বিবাহের দিনই ফাঁসিয়া গিয়াছে! তবে রাধানাথের পক্ষে এইটুকু সান্ত্বনার বিষয় ছিল যে, ক'নের বাড়ীতে অভিযান-পর্ব্বটা এই সকল সম্বন্ধ-সম্পর্কে আর অগ্রসর হয় নাই।

বলা বাহুল্য, গাঙ্গুলী মহাশয়ের খর মেজাজ ও অতিরিক্ত অর্থস্পৃহার ফলেই এইরূপ অঘটন বারবার সংঘটিত হইয়াছে। প্রতিবেশিগণ গাঙ্গুলী মহাশয়ের আচরণে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহার নামকরণ করিলেন,—'বিয়েভাঙ্গা কালাপাহাড়!' গাঙ্গুলী মহাশয়ের কর্ণে এই খেতাব উঠিতে বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু তিনি তাহাতে উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"এমন দিন আসবে, যে দিন আমার খোকার বিয়ের পাওনা-থোওনা দেখে পাড়ার সকলে অবাক্ হয়ে যাবে! বি, এটা পাশ করুক না, দেখি—তার পর কি কাণ্ডটাই না করি!"

বোধ হয়, পিতার এই আকাঙ্ক্ষিত কাণ্ডটি যথাকালে সমাধা করিবার সুযোগ দিবার জন্যই খোকা দুই বিষয়ে অনার্স লইয়া বি, এ, পাস করিল। পাড়াপ্রতিবেশিগণ বুঝিলেন, আর রক্ষা নাই! অর্দ্ধেক রাজ্যসহ রাজকন্যা এবার ঘরে না তুলিয়া কালাপাহাড় আর নিশ্চিন্ত হইতেছে না।

অবিলম্বে তালতলার এক ডাক্তার-দুহিতার সহিত রাধানাথের সম্বন্ধ স্থির হইল। পাকা দেখার সময়েই এবার গাঙ্গুলী মহাশয় সকল দিক দেখিয়া, বিবাহ-রাত্রিতে যে যে সমস্যা উঠিতে পারে, তাহা যত দূর সম্ভব স্মরণ করিয়া তুলিয়া, প্রত্যেকটির সমস্যা মীমাংসা করিয়া লইলেন।

স্থির হইল যে, বরপক্ষ বর লইয়া বেলঘরিয়া ষ্টেশন হইতে ট্রেণে উঠিয়া শিয়ালদহে নামিবেন এবং কন্যাপক্ষ ষ্টেশনে মোতায়েন থাকিয়া সমারোহ সহকারে তাঁহাদের অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বিবাহ-ভবনে লইয়া যাইবেন। তৎপরে বরকর্ত্তা বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইবামাত্র পণের টাকা, গহনা ও বরাভরণাদি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। কন্যাপক্ষ এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশপূর্ব্বক বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া গেলেন।

আবার এক শুভদিনের অপরাহ্ণে বরসজ্জায় সজ্জিত হইয়া রাধানাথকে জীবন-সহচরী সংগ্রহে অভিযান করিতে হইল। সর্ব্বসমেত পঁয়তাল্লিশ জন লোক লইয়া গাঙ্গুলী মহাশয় শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলেন, পাত্রীপক্ষের কেহই তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে ষ্টেশন প্লাটফরমে উপস্থিত নাই! ক্রোধে তাঁহার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল, ষ্টেশনে পা দিতে না দিতেই সর্ব্বভঙ্গ! ফটকে টিকিট দিয়া বাহিরে তাঁহারা আসিতে না আসিতেই দেখিতে পাইলেন, কন্যাপক্ষের এক জন ভদ্রলোক শশব্যস্তে ফটকের দিকে ছুটিয়া আসিতেছেন! গাঙ্গুলী মহাশয় তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন, "বেশ মশাই, এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিলেন বুঝি? খুব অভ্যর্থনা ত করতে এসেছেন দেখছি!"

কন্যাপক্ষীয় ভদ্রলোক করযোড়ে বলিলেন,—"আজ্ঞে

জোর লগনসা, চারদিকেই বিয়ে ; গাড়ী যোগাড় করা দায় হয়ে উঠেছিল ! তাইতে দেরী হয়ে গেছে, মাপ করবেন— বেই মশাই !”

কথায় কথায় তাঁহারা বাহিরে ষ্টেশনের হাতার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোক অদূরে দণ্ডায়মান একখানি বাসের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—“উঠতে আজ্ঞা হোক !”

গাঙ্গুলী মহাশয় বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে কন্যাপক্ষীয় ভদ্রলোকটির দিকে চাহিয়া তাচ্ছীল্যভাবে বলিলেন,—“বাস ? এই বাসে চ'ড়ে আমাদের বিয়ে দিতে যেতে হবে না কি ?”

ভদ্রলোক বলিলেন,—“ট্যাক্সি পাওয়া গেল না, তাই দু'খানা বাস ভাড়া করা হয়েছে ; বর আর পুরুত নাপিত নিয়ে আপনি মোটরে চলুন,—বাড়ীর মোটর আছে।”

এক জন বরযাত্রী নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—“ননসেন্স ! বরযাত্রীকে ত বাবা, কখন বাসে চড়তে দেখিনি !—ট্যাক্সিতে ওঠাও অপমান মনে করি ; বাড়ীর মোটর জোগাড় করতে পারেন নি ?”

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, “তোমার বাস জাহান্নমে পাঠাও, কেউ ওতে উঠবে না ;—প্রসেসেনের সঙ্গে বাস কখনও খাপ খায় ? ভাল কথা, প্রসেসনের ব্যবস্থা করা হয় নি ?”

ভদ্রলোক বলিলেন,—“আজ্ঞে, প্রসেসনের কথা ত কিছু শুনি নি, আর আজকাল ত প্রসেসনের হুজুগ উঠে গেছে !”

গাঙ্গুলী মহাশয় গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—“হুজুগের দোহাই দিয়ে এ ভাবে খরচ বাঁচান চলবে না,—ডেকে আনো তোমার ডাক্তারকে ; কি কি সর্ত্ত আমার সঙ্গে হয়েছিল, তা তাঁর মনে না থাকলেও, আমার মনে আছে। ষ্টেশন থেকে আমাদের সমারোহ-সহকারে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যাবার কথা,—তার নমুনা বুঝি—এই দু'খানা বাস, একখানা মোটর আর আপনি ? যান,—ডাক্তারকে গিয়ে বলুন, খানকতক প্রাইভেট কার জোগাড় ক'রে আমাদের নিয়ে যেতে,—আর এখন প্রসেসনের ব্যবস্থা করবার সময় নেই বটে, কিন্তু প্রসেসন বাবদে পাঁচশ টাকা আমাকে আরও ধ'রে দেওয়া চাই ; যান যান—আর দেরী করবেন না আপনি—”

ভদ্রলোক কিছু কিছু খেসারত দিয়া বাস দুইখানিকে অগ্রে বিদায় করিয়া দিলেন ; তাহার পর মোটরে উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে লইয়া মোটর ছুটিল।

* * * * *

তিন ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল, কিন্তু কন্যার বাটী হইতে কোনও সংবাদও আসিল না, বা কেহই তাঁহাদিগকে লইতে ফিরিল না। গাঙ্গুলী মহাশয় ভাবিয়াছিলেন, গোড়াতেই মেজাজ দেখাইয়া তিনি সহজেই বেহাইকে মাত করিয়া দিবেন, কিন্তু এক্ষণে বরযাত্রীদের উৎকণ্ঠা ও অধীরতা এবং কন্যাপক্ষের নীরবতা তাঁহাকে মহা সমস্যায় ফেলিল। অগত্যা বয়স্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, পাকা দেখার সময় কন্যাপক্ষের বাড়ীতে গিয়াছিলেন এমন দুই জন ভদ্রলোককে বাছিয়া, ব্যাপার কি জানিবার জন্য তালতলায় পাঠান হইল।

রাত্রি ১১টার সময় গাঙ্গুলী মহাশয়ের বয়স্যদ্বয় হাঁফাইতে হাঁফাইতে শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বর, বরকর্ত্তা ও বরযাত্রিগণ সংবাদ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা দুই জনে যে সমাচার দিলেন, তাহা এইরূপ—

যে ভদ্রলোক অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি বিবাহ-বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া সভাসমক্ষে বরকর্ত্তার সর্ত্ত প্রকাশ করায় কন্যাকর্ত্তা ও কন্যাপক্ষীয় সকলেই ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হইয়া উঠেন ; সকলেই সাব্যস্ত করেন, এমন চসমখোরের ঘরে কন্যা দেওয়া আর কন্যাকে জলে ফেলিয়া দেওয়া সমান কথা। শেষে পাড়ারই এক পাসকরা স্বজাতীয় গরীবের ছেলেকে পাকড়াও করিয়া তাহাকেই কন্যা দান করা হইয়াছে ; যৌতুকের দশ হাজার টাকা দিয়া সেই গরীব বরের বাড়ী করিয়া দেওয়া হইবে। এই জন্যই আর শিয়ালদহে লোক পাঠান তাঁহারা আবশ্যক মনে করেন নাই। কিন্তু ঘটনাচক্রে গাঙ্গুলী মহাশয়ের বয়স্য দুইটি কন্যাপক্ষীয়দের গোচরীভূত হওয়ায় তাঁহারা তাহাদিগকে রেহাই দেন নাই—জোর-জবরদস্তি পূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া বিবাহের ভোজ খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং ষ্টেশনবিহারী বর, বরকর্ত্তা ও বরযাত্রীদিগকে ভোজ খাইয়া যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন ইত্যাদি।

রাত্রি ১২৷৷০টার ট্রেণে দুর্ভাগ্য বর ও বরযাত্রিগণ

সমভিব্যাহারে গাঙ্গুলী মহাশয় যখন বেলঘরিয়া ষ্টেশনে নামিয়া বাড়ীর দিকে চলিলেন,—তখন শত শত শৃগালের সমবেত কণ্ঠনিনাদ দ্বিযাম রজনীকে বরণ করিতেছিল। দুর্ভাগ্য রাধানাথ ভাবিতেছিল, পিতা যদি তাহার সাধে বাদ না সাধিতেন —তাহা হইলে এতক্ষণে বাসর-আসরে শত শত ললনার মধুর হুলুধ্বনি তাহাকে কত তৃপ্তিই দিত! ঠিক এই সময় তাহার সমবয়স্ক এক তরুণ তাহার কাণে কাণে বলিয়া উঠিল,—"খোকা, ওই শোন্—বেলঘরের বনে তোর বিয়ের ফুল ফুটেছে, তাই শ্যালে হুলু দিচ্ছে!"

* * * * *

সেই রাত্রিতে বাড়ীতে পৌঁছিয়াই গাঙ্গুলী মহাশয় সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। সে মূর্চ্ছা আর তাঁহার ভঙ্গ হইল না। ডাক্তার বলিলেন, সহসা মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগায় 'হার্ট ফেল' করিয়াছে। নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া স্থগিত হইয়া গেল। গাঙ্গুলী মহাশয়ের মৃত্যুতে অনেকে নিশ্চিন্ত হইল, কেহ কেহ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—আহা, বেচারা বরাবর ছেলের বে ভেঙ্গে দিয়েই গেল, ছেলের বউ দেখে যেতে পারলে না!

পিতৃভক্ত রাধানাথ পিতার বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া গাঢ়স্বরে বলিল,—"কি অপরাধে এত শীগ্‌গির তোমার খোকাকে ছেড়ে চ'লে যাচ্ছ, বাবা? আমি ত কখন তোমার কথার ওপর কথা কই নি,—তোমার মুখ চেয়ে সমস্ত লজ্জা, অপমান, লাঞ্ছনা আমি যে বুক পেতে সহে এসেছি, বাবা!"

রাধানাথের মা কক্ষতলে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে সরোদনে বলিতে লাগিলেন, "ওরে, কি কুক্ষণেই তোর বের কথা আমি তুলেছিলুম রে! ওরে, এই যে উপলক্ষ করেই যে মনস্তাপে প্রাণটা খোয়ালেন রে!"

রাধানাথ দুই হস্তে চক্ষুজল মুছিতে মুছিতে গাঢ় দৃঢ়স্বরে বলিল,—"মা, মা, সে দুর্ভাগ্য আমার! বাবা শুধু আমার জন্যই লোকনিন্দা অপবাদ রেখে গেলেন?—জীবনে তাঁর সাধ যেমন পূর্ণ হ'ল না, আমিও মা, তেমনই—আমার সমস্ত সাধ আজ বাবার সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়ে দিলুম!"

তাহার পর সে নতজানু হইয়া পিতার মৃতদেহের সম্মুখে বসিয়া বলিল,—"শক্তি দাও বাবা, তোমার নিন্দা অপবাদ আমি যেন মুছে ফেলতে পারি।"

* * * *

রাধানাথ আর বিবাহ করে নাই। এখন সে প্রফেসারী করে, আর উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ কন্যাদায়গ্রস্তের সহায়তাকল্পে দান করে। দুঃস্থ কন্যাদায়গ্রস্তরা আশাতীত দান পাইয়া স্বর্গগত বৈদ্যনাথ গাঙ্গুলীর অক্ষয় স্বর্গকামনা করিতে করিতে চলিয়া যায়,—আর তাহা শুনিতে শুনিতে রাধানাথ স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে থাকে!

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিচিত্রা

কত মণি-মুক্তা নিয়ে গাঁথ রত্নহার,
বিচিত্র চিত্রের চারু রত্নাগারে বসি
রবিরশ্মি-রত্ন-রেখা ইন্দুলোকে পশি
জ্যোৎস্নার ইন্দ্রজালে মোহিছ সংসার।

শুকতারা স্বপ্নময় মুদিতার মায়া,
ছড়ায় রতন-রাগ উদিতার মুখে,
অভ্রে শুভ্র শুক্তি-শোভা অশোকে কিংশুকে।
অরুণের চারু হাসি সুসস্মিত ছায়া!

রতন স্বপন প্রাপ্ত ছায়াপথ রাতে
বীণালগ্ন মায়া যেন পড়ি পড়ি করে,
মহামন্ত্রে বাজে দিব্য উদীরিত স্বরে—
চেয়ে থাকি মুগ্ধ আঁখি দ্যুলোক-শোভাতে।

স্নেহে মোহে প্রেমে কামে সুখ-দুঃখ-শোকে—
চির স্থির তুমি নিজ জ্যোতির্ম্ময় লোকে।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।
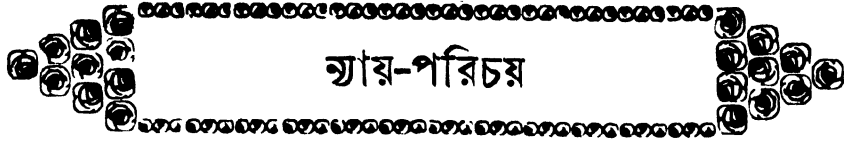
জীবাত্মা সর্ব্বব্যাপী

শিষ্য। অনাদিকাল হইতে জীবাত্মার নিজ কর্ম্মফলভোগের জন্য ইহলোকে নানাবিধ জন্মলাভ এবং কর্ম্মবিশেষের ফলভোগের জন্য অনেক সময়ে স্বর্গনরকাদি স্থানেও দেহ-বিশেষপ্রাপ্তি স্বীকার্য্য হওয়ায় জীবাত্মা যে অনাদি ও অবিনাশী, ইহা অবশ্যই যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন পদার্থ হইলে তাহার সর্ব্বব্যাপিত্ব কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হইবে, ইহা ত বুঝিতেছি না।

গুরু। তুমি শাস্ত্রানুসারে স্বর্গনরকাদি স্থান এবং সময়-বিশেষে সেই স্থানে জীবাত্মার দেহবিশেষপ্রাপ্তি স্বীকার করায় জীবাত্মা যে সর্ব্বত্রই সতত বিদ্যমান, ইহাও তোমার স্বীকার্য্য। কারণ, স্বর্গনরকাদি স্থানেও সেই জীবাত্মা বিদ্যমান না থাকিলে সেখানে তাহার দেহবিশেষপ্রাপ্তি ও কর্ম্মবিশেষের ফলভোগ হইতেই পারে না। কিন্তু জীবাত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলে তাহার নিজ কর্ম্মানুসারে যে স্থানেই যে দেহের সৃষ্টি হয়, সেই স্থানেই সেই দেহের সহিত তাহার বিলক্ষণ সম্বন্ধ হওয়ায় সেই স্থানেই সেই দেহে তাহার সেই কর্ম্মফলভোগ হইতে পারে।

অবশ্য জীবাত্মা অণু অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম, জীবাত্মাই এই লোক হইতে স্বর্গনরকাদি স্থানে অর্থাৎ পরলোকে গমন করিয়া সেখানে তাহার নিজ কর্ম্মানুসারে সৃষ্ট দেহবিশেষের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, ইহাও শাস্ত্রমূলক সুপ্রাচীন মত আছে। শ্রীমদ্-ভাগবতেও (১০।৮৭।৩০শ শ্লোকে) উক্ত মতের প্রকাশ হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শনেও (২।৩) উক্ত সুপ্রাচীন মতের সমর্থন হইয়াছে। ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর সেখানে উক্ত মতকে পূর্ব্বপক্ষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া পরে বাদরায়ণের সূত্রের দ্বারা উক্ত মতের খণ্ডন করিলেও রামানুজ ও মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণব ভাষ্যকারগণ উক্ত মতকে বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত-রূপেই গ্রহণ করিয়া সেই সমস্ত বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

জীবাত্মার অণুত্ববাদী সম্প্রদায়ের কথা এই যে, বেদাদি-শাস্ত্রে পরমাত্মাকেই মহান্ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বলা হইয়াছে। সুতরাং সেই সমস্ত শাস্ত্রবাক্য দ্বারা জীবাত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রতিপন্ন হয় না। পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু জীবাত্মা অণু, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। কারণ, মুণ্ডক উপনিষদে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে,—"এষোঽণুরাত্মা" (৩।১।৯) অর্থাৎ এই আত্মা অণু। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও স্পষ্ট কথিত হইয়াছে যে, (১) কেশাগ্রের শতভাগের একভাগ—আবার শতভাগে কল্পিত হইলে তাহার এক ভাগ যেমন সূক্ষ্ম, জীব তদ্রূপ সূক্ষ্ম, অর্থাৎ জীব অতি সূক্ষ্ম, তাহার অপেক্ষায় আর কিছু সূক্ষ্ম নাই। পরন্তু বেদাদিশাস্ত্রে মৃত্যুকালে শরীর হইতে জীবের উৎক্রান্তি এবং নানাস্থানে গতাগতি স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। কিন্তু জীবাত্মা সর্ব্বব্যাপী নিষ্ক্রিয় পদার্থ হইলে কাহারও শরীর হইতে তাহার উৎক্রান্তি ও নানাস্থানে গতাগতি সম্ভবই হয় না। সুতরাং জীবাত্মা যে অণু, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। জীবাত্মা অণু হইলে জীবের শরীরের সর্ব্বাংশে উহা বিদ্যমান না থাকায় শরীরের সর্ব্বাংশে কিরূপে জ্ঞানাদি জন্মে? তাহা ত সম্ভব নহে, এতদুত্তরে পূর্ব্বোক্ত সম্প্র-দায়ের কথা এই যে, যেমন হরিচন্দনবিন্দু শরীরের কোন এক স্থানে বিদ্যমান থাকিলেও সর্ব্বশরীরেই উহার কার্য্য হয়, উহা সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ অতি সূক্ষ্ম জীবাত্মা শরীরের কোন অংশবিশেষে বিদ্যমান থাকিলেও উহা তাহার সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহার সর্ব্বশরীরেই উহার কার্য্য হয়। উক্ত মত সমর্থন করিতে বেদান্তদর্শনে বাদ-রায়ণও সূত্র বলিয়াছেন—"অবিরোধশ্চন্দনবিন্দুবৎ"(২।৩।২৩), দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব ভাষ্যকার মধ্বাচার্য্য সেখানে ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের ঐ ভাবের একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াও সিদ্ধান্তরূপে উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন (১)। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণও মধ্বাচার্য্যের উদ্ধৃত সেই বচন গ্রহণ করিয়াও উক্ত মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন বৈষ্ণব দার্শনিকগণ জীবাত্মার অণুত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করি[illegible] আরও অনেক কথা বলিয়াছেন।

কিন্তু অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের ন্যায় দ্বৈতবাদী ন্যায়-বৈশেষিকাদি সম্প্রদায়ও—উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই বৈশেষিকদর্শনে মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন

"বিভবান্মহানাকাশস্তথা চাত্মা।" ৭।১।২২।

অর্থাৎ আকাশ যেমন মহান্, তদ্রূপ, জীবাত্মাও মহান্ কারণ, আকাশের ন্যায় জীবাত্মাতেও বিভব অর্থাৎ বি[illegible] আছে। সমস্ত মূর্ত্তদ্রব্যের সহিত সংযোগই বিভুত্ব।তাৎ[illegible] এই যে, সর্ব্বত্র সমস্ত মূর্ত্তদ্রব্যে যে সমস্ত ক্রিয়া জন্মে, ত[illegible] জীবাত্মার সুখ-দুঃখজনক অদৃষ্টজন্য। জীবাত্মার অদৃষ্ট [illegible] কারণ ব্যতীত তাহার ফলভোগার্থ নানাস্থানে পরমাণু প্রভৃ[illegible] দ্রব্যে ক্রিয়া জন্মিতে পারে না, সুতরাং নানাস্থানে [illegible]

---

(১) বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে।
—শ্বেতাশ্বতর।৫।৯

(১) অণুমাত্রোঽপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
যথা ব্যাপ্য শরীরাণি হরিচন্দনবিপ্রুষঃ।
মধ্বাচার্য্যের উদ্ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণব

দ্রব্যের সৃষ্টিও হইতে পারে না। কিন্তু জীবাত্মার অদৃষ্ট-জন্য নানাস্থানে যে সমস্ত মূর্ত্তদ্রব্যে ক্রিয়া জন্মে, সেই সমস্ত মূর্ত্তদ্রব্যের সহিত সেই জীবাত্মার সাক্ষাৎ সংযোগ সম্বন্ধ ব্যতীত তাহার অদৃষ্টের সহিত সেই সমস্ত দ্রব্যের আবশ্যক পরম্পরাসম্বন্ধবিশেষ সম্ভব হইতে পারে না। জীবাত্মার অদৃষ্টরূপ কারণের সহিত সমস্ত মূর্ত্তদ্রব্যের সেই সম্বন্ধ ব্যতীতও তাহাতে সেই অদৃষ্টজন্য কোন ক্রিয়া জন্মিতে পারে না। অতএব সর্ব্বত্র সমস্ত মূর্ত্তদ্রব্যের সহিতই সমস্ত জীবাত্মার সংযোগসম্বন্ধ আছে, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে জীবাত্মা অণু নহে, জীবাত্মা সর্ব্বব্যাপী মহান্, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। সমস্ত জীবাত্মাই আকাশের ন্যায় নিরাকার বা নিরবয়ব। সুতরাং সর্ব্বত্রই সমস্ত জীবাত্মার সত্তার কোন বাধা হইতে পারে না। মহর্ষি গৌতমের সূত্রের দ্বারাও তাঁহার মতে সমস্ত জীবাত্মাই যে সর্ব্বব্যাপী, ইহা বুঝা যায়। পরে তাহা বুঝিতে পারিবে।

পরন্তু কণাদ ও গৌতমের মতে জীবাত্মাতেই জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন এবং সুখ ও দুঃখ জন্মে এবং মনের দ্বারা জীবাত্মাতেই ঐ জ্ঞানাদির প্রত্যক্ষও জন্মে। প্রত্যেক জীবই নিজ নিজ অতি সূক্ষ্ম মনের দ্বারা নিজের আত্মাতে উৎপন্ন ঐ জ্ঞানাদির প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু জীবাত্মা অতি সূক্ষ্ম হইলে তদ্‌গত জ্ঞানাদির লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম পদার্থের যেমন লৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে না, তদ্রূপ তদ্‌গত কোন গুণ বা ধর্ম্মেরও লৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে না। সুতরাং লৌকিক প্রত্যক্ষমাত্রেই মহৎ পরিমাণ কারণ বলিয়া স্বীকার্য্য। পরন্তু জীবাত্মা অতি সূক্ষ্ম হইলে কাহারও শরীরের সর্ব্বাংশে তাহার ঐ আত্মা বিদ্যমান না থাকায় শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে সেই আত্মাতে জ্ঞান ও সুখ-দুঃখ জন্মিতে পারে না। জীবাত্মা ও তাহার মন এই উভয়ই অতি সূক্ষ্ম হইলে কাহারও সর্ব্বশরীরে কোন বোধও জন্মিতে পারে না। কিন্তু অনেক সময়ে সর্ব্বশরীরেও অনেক বোধ জন্মে। প্রবল শীতার্ত্ত ব্যক্তি সর্ব্বশরীরেই শীত বোধ করে। পীড়াবিশেষ হইলে রোগী সর্ব্বশরীরেই বেদনা বা ক্লেশ বোধ করে। সুতরাং তাহার সর্ব্বশরীরেই যে বোদ্ধা আত্মা আছে, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু জীবাত্মা অতি সূক্ষ্ম হইলে শরীরের সর্ব্বাংশে তাহার সত্তা সম্ভবই নহে।

পূর্ব্বোক্ত কারণে জৈন দার্শনিকগণ বলিয়াছেন যে, আত্মা দেহসম-পরিমাণ—সমস্ত জীবের আত্মাই তাহার সর্ব্বদেহব্যাপী। সুতরাং দেহের সর্ব্বাংশেই আত্মা বিদ্যমান থাকায় সর্ব্বদেহেই তাহার জ্ঞানাদি জন্মিতে পারে। দেহের বাহিরেও সেই আত্মার সত্তা-স্বীকার অনাবশ্যক। কিন্তু আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপন্ন হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত জৈনমত গ্রহণ করা যায় না। কারণ, যাহা নিত্য দ্রব্য, তাহা অতি সূক্ষ্ম অথবা অতি মহান্ হইবে। মধ্যম-পরিমাণ কোন দ্রব্যই নিত্য নহে। তাহার কোন দৃষ্টান্ত নাই। পরন্তু মধ্যম-পরিমাণ দ্রব্যমাত্রই অনিত্য, ইহাই বহু দৃষ্টান্ত ও হেতুর দ্বারা অনুমান-সিদ্ধ হয়। সুতরাং নিত্য আত্মাকে তাহার দেহের তুল্যপরিমাণ বলা যায় না। পরন্তু আত্মা দেহ-সমপরিমাণ হইলে পিপীলিকার আত্মা যখন হস্তিজন্ম লাভ করে, তখন ঐ আত্মা সেই হস্তীর বৃহৎ শরীর ব্যাপ্ত করিতে পারে না—এবং হস্তীর আত্মা যখন পিপীলিকা-জন্ম লাভ করে, তখন সেই বৃহৎ আত্মা পিপীলিকার ক্ষুদ্র দেহে স্থান পায় না, সুতরাং সেই ক্ষুদ্র দেহের বাহিরেও তাহার সত্তা স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে আত্মা দেহসম-পরিমাণ, এই সিদ্ধান্ত-রক্ষা হয় না।

অবশ্য আত্মার সঙ্কোচ ও বিকাশ সম্ভব হইলে হস্তীর আত্মা পিপীলিকা-দেহে সঙ্কুচিত হইয়া এবং পিপীলিকার আত্মা হস্তীর দেহে বিস্তৃত হইয়া সর্ব্বাংশে অবস্থান করিতে পারে। কিন্তু আত্মার সঙ্কোচ ও বিকাশ সম্ভবই নহে। কারণ, আত্মার কোন অবয়ব নাই। আত্মা নিরবয়ব নির্ব্বিকার নিত্য। সাবয়ব সবিকার দ্রব্যেরই সঙ্কোচ ও বিকাশ হইতে পারে এবং তাহাই দেখা যায়। নির্ব্বিকার নিরবয়ব পদার্থেরও সঙ্কোচ ও বিকাশ হয়, ইহার কোন দৃষ্টান্ত নাই। ফল কথা, আত্মার সঙ্কোচ ও বিকাশ স্বীকার করিলে তাহার নির্ব্বিকার নিত্যত্ব উপপন্ন হয় না। কারণ, ঐ সঙ্কোচ ও বিকাশ বিকারবিশেষ। কিন্তু আত্মার কোন বিকার নাই; আত্মা অবিকার্য্য। শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন—

"অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে" (গীতা ২।২৫)

পরন্তু জীবাত্মার নির্ব্বিকার নিত্যত্ববশতঃ তাহার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত চন্দনবিন্দু দৃষ্টান্তও সঙ্গত হয় না। চন্দনবিন্দুর ন্যায় জীবাত্মা শরীরের কোন অংশে বিদ্যমান থাকিলেও সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত করে, ইহা বলা যায় না এবং প্রদীপ যেমন গৃহের কোন অংশে বিদ্যমান থাকিলেও ঐ গৃহের সর্ব্বাংশ ব্যাপ্ত করে, তদ্রূপ, জীবাত্মাও শরীরের কোন অংশে বিদ্যমান থাকিলেও সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত করে—এই কথাও বলা যায় না। কারণ,—আত্মা চন্দনবিন্দু বা প্রদীপের ন্যায় সাবয়ব পদার্থ নহে, সবিকার পদার্থও নহে। সুতরাং আত্মার ঐরূপ বিস্তৃতি বা বিকাশ সম্ভব নহে। চন্দনবিন্দুর ন্যায় আত্মার কোন অংশ না থাকায় তাহার বিভিন্ন অংশবিশেষের অন্যত্র গতিও সম্ভব নহে। সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারাও জীবাত্মার অণুত্ব বা অতি সূক্ষ্মত্ব সমর্থন করা যায় না। মধ্বাচার্য্য ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বচন বলিয়া তদ্দ্বারা উক্ত মত সমর্থন করিলেও আমরা কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই—

"পুমান্ সর্ব্বগতো ব্যাপী আকাশবদয়ং যতঃ।
কুতঃ কুত্র ক্ব গন্তাসীত্যেতদপ্যর্থবৎ কথম্॥ ২।১৫।২৪

অর্থাৎ জীবাত্মা যখন আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, তখন তাহার সম্বন্ধে—তোমার কোথা হইতে আগমন,

কোথায় নিবাস, কোথায় যাইবে? এইরূপ বাক্যও কিরূপে সার্থক হইবে? অর্থাৎ যাহা সর্ব্বত্রই সতত বিদ্যমান, তাহার সম্বন্ধে ঐরূপ প্রশ্নই উপপন্ন হয় না। শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন—

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং
সনাতনঃ" (গীতা ২।২৪)

অর্থাৎ জীবাত্মা সর্ব্বব্যাপী নিত্য, জীবাত্মা সর্ব্বত্র স্থিরভাবে সতত বিদ্যমান, জীবাত্মা অচল অর্থাৎ গতিশূন্য। ফল কথা, পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মারও সর্ব্বব্যাপিত্ববোধক বহু শাস্ত্রবাক্য আছে।

আর যোগদর্শনে (৪।৮) মহর্ষি পতঞ্জলি যে যোগীর কায়ব্যূহ নির্ম্মাণের কথা বলিয়াছেন, তদ্দ্বারাও জীবাত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রতিপন্ন হয়। কারণ, যে যোগী যোগপ্রভাবে নানাস্থানে বহু শরীর নির্ম্মাণ করেন, সেই সমস্ত শরীরেই তাঁহার আত্মার বিলক্ষণ সংযোগ ব্যতীত সেই সমস্ত শরীরে তাঁহার সুখ-দুঃখ-ভোগ হইতে পারে না। জীবাত্মা অতি সূক্ষ্ম হইলে সেই যোগীর নানাস্থানে সৃষ্ট সেই সমস্ত শরীরের সহিত তাহার সংযোগ হইতে পারে না। কিন্তু জীবাত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলে সর্ব্বত্রই তাহার সত্তা থাকায় যে স্থানেই যোগী তাঁহার শরীর সৃষ্টি করেন, সেই স্থানেই তাহার সেই শরীরের সহিত তাহার আত্মার বিলক্ষণ সংযোগ সম্ভব হওয়ায় সেই সমস্ত শরীরেই তাহার সেই আত্মার সুখদুঃখভোগ হইতে পারে।

আর যোগবলে যোগী যে নানা স্থানে বহু শরীর নির্ম্মাণ করিয়া সমস্ত পৃথিবীতে বিচরণ করেন এবং তন্মধ্যে অনেক শরীরের দ্বারা বিষয় ভোগ এবং কোন কোন শরীরের দ্বারা উগ্র তপস্যা করেন এবং সময়ে স্বেচ্ছানুসারে আবার সেই সমস্ত শরীরেরই সংহার করেন, ইহাও ত শাস্ত্রে আছে। শৈবাচার্য্য ভাসর্ব্বজ্ঞ জীবাত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব সমর্থন করিতে পরে সেই শাস্ত্রবচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন (১)। শারীরক-ভাষ্যে (১।৩।২৮) ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও স্মৃতি বলিয়া ঐরূপ শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। "যোগশিখা" উপনিষদেও যোগীর নানা স্থানে নানা শরীরধারণ এবং স্বেচ্ছানুসারে সেই সমস্ত শরীরের সংহার কথিত হইয়াছে (২)।

(১) অণিমাদ্যুপেতস্য যুগপদসংখ্যাতশরীরাধিষ্ঠাতৃত্বাচ্চাত্মনো-ব্যাপকত্বসিদ্ধিঃ। তথা চোক্তং—

"আত্মনো বৈ শরীরাণি বহূনি মনুজেশ্বর।
প্রাপ্য যোগবলং কুর্য্যাৎ তৈশ্চ কৃৎস্নাং মহীং চরেৎ।
ভুঞ্জীত বিষয়ান্ ভোগান্ কৈশ্চিদুগ্রং তপশ্চরেৎ।
সংহরেচ্চ পুনস্তানি সূর্য্যস্তেজোগণানিব।"

"ন্যায়সার" আগম পরিচ্ছেদ।

(২) অচিন্ত্যশক্তিমান্ যোগী নানারূপাণি ধারয়েৎ।
সংহরেচ্চ পুনস্তানি স্বেচ্ছয়া বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥

যোগশিখা। ১ম অঃ। ৪৪

আর সৌভরি নামে যে মহাযোগী মুনি ছিলেন, তিনি যোগবলে সুসদৃশ বহু শরীর নির্ম্মাণ করিয়া বিভিন্ন স্থানে তাঁহার সমস্ত পত্নীর নিকটে সতত বিদ্যমান থাকিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত বিষয়-সুখ ভোগ করিয়াছিলেন, ইহাও পুরাণে বর্ণিত আছে। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সৌভরি মুনির উপাখ্যান পাঠ করিলে সহসা কেন তাঁহার পত্নীলাভের ইচ্ছা জন্মে এবং কিরূপে তিনি রাজা মান্ধাতার পঞ্চাশটি কন্যাকেই পত্নীরূপে লাভ করিয়াছিলেন ইত্যাদি অদ্ভুত বার্ত্তা জানিতে পারিবে। ফল কথা,—জীবাত্মা অতি সূক্ষ্ম হইলে যোগীর সেই অতি সূক্ষ্ম আত্মার নানা স্থানে নানা শরীরের সহিত সংযোগ হইতে পারে না। নানা শরীরের সৃষ্টি সম্ভব হইলেও আত্মার সৃষ্টি হইতে পারে না। কারণ, আত্মা নিত্য, আত্মার উৎপত্তি নাই এবং আত্মার যে বিকাশ বা বিস্তৃতিও সম্ভব নহে, ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি।

শিষ্য। জীবাত্মার সর্ব্বব্যাপিত্বই শাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ হইলে শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে যে, জীবাত্মাকে অতি সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে এবং মৃত্যুকালে স্থূলশরীর হইতে জীবের উৎক্রান্তি ও গতাগতি কথিত হইয়াছে, তাহা কিরূপে উপপন্ন হয়, ইহাও ত বক্তব্য।

গুরু। অবশ্যই বক্তব্য। শারীরক ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর নিজমতানুসারে জীবাত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব সমর্থন করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন যে, (১) অতএব শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে যে জীবাত্মাকে অতি সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে যে, জীবাত্মা অতি দুর্জ্ঞেয়, জীবাত্মা অতি সূক্ষ্ম পরিমাণ নহেন। অথবা জীবাত্মার উপাধির অতি সূক্ষ্মত্ব গ্রহণ করিয়াই জীবাত্মাকে অতি সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, জীবাত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও তাহার স্থূল শরীরের মধ্যে যে সূক্ষ্ম শরীর বিদ্যমান থাকে, তাহা অতি সূক্ষ্ম। সেই সূক্ষ্ম শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাই জীবাত্মা।—তাই ঐ সূক্ষ্ম শরীর জীবাত্মার উপাধি বলিয়া কথিত হইয়াছে। মৃত্যুর পরে স্থূল শরীর হইতে সেই সূক্ষ্ম শরীরই উৎক্রান্ত হয় এবং উহারই পরলোকে গতি ও তথা হইতে ইহলোকে আগতি হয়। জীবাত্মার উপাধি ঐ সূক্ষ্ম শরীরের উৎক্রান্তি ও গতাগতিই শাস্ত্রে জীবের উৎক্রান্তি ও গতাগতি বলিয়া কথিত হইয়াছে। কারণ, সর্ব্বব্যাপী নিষ্ক্রিয় আত্মার শরীর হইতে উৎক্রমণ ও গমনাগমন সম্ভবই নহে। যাহা অসম্ভব, তাহা শাস্ত্রার্থ হইতে পারে না।

দ্বৈতবাদী সাংখ্য পাতঞ্জলমতেও ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য জীবাত্মার পৃথক্ পৃথক্ এক একটি সূক্ষ্মশরীরই তাহার অতি সূক্ষ্ম উপাধি। কারণ, সেই সূক্ষ্মশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা বা পুরুষই জীবশব্দের বাচ্য। তাই শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে

(১) তস্মাদ্ দুর্জ্ঞানত্বাভিপ্রায়মিদমণুবচনমুপাধ্যভিপ্রায়ং বা দ্রষ্টব্যম্। শারীরক ভাষ্য ২।৩।২০

সেই সূক্ষ্মশরীরও "জীব" ও "পুরুষ" নামে কথিত হইয়াছে। সেই সূক্ষ্মশরীরই স্থূলশরীর হইতে উৎক্রান্ত হয় এবং গমনাগমন করে অর্থাৎ মৃত্যুকালে সেই সূক্ষ্মশরীরই তাহার সেই স্থূলশরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় এবং কর্ম্মফলানুসারে স্বর্গ-নরকাদি স্থানে গমন করিয়া সেখানে সৃষ্ট অন্য স্থূল দেহের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ইহলোকে পুনর্জ্জন্মকালেও সেই সূক্ষ্মশরীরই আবার আসিয়া অন্য স্থূলশরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। সেরূপে ঐ সূক্ষ্ম শরীর আবার অন্য স্থূল শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহা উপনিষদে বর্ণিত আছে। ফল কথা, জীবাত্মার উপাধি ঐ সূক্ষ্মশরীরের অতি সূক্ষ্মত্ব গ্রহণ করিয়াই শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে জীবাত্মাকে অতি সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে এবং উহার উৎক্রমণ ও গমনাগমনই শাস্ত্রে জীবের উৎক্রমণ ও গমনাগমন বলিয়া কথিত হইয়াছে। জীবাত্মা বস্তুতঃ অতি সূক্ষ্ম পরিমাণ নহে এবং তাহার উৎক্রমণ ও গমনাগমনও সম্ভব নহে। জীবাত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্বই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। স্মরণ কর—শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।"

কিন্তু মহর্ষি কণাদ ও গৌতম পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্মশরীরের কোন উল্লেখ করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে জ্ঞান ও সুখদুঃখাদি জীবাত্মারই বাস্তব ধর্ম্ম—উহা মনের ধর্ম্ম নহে। কিন্তু মনের সহিত বিলক্ষণ সংযোগ ব্যতীত জীবাত্মাতেও কোন জ্ঞানাদি জন্মে না। সুতরাং কোন শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট মনের সহিত সংযুক্ত আত্মাই "জীব" শব্দের বাচ্য। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদের উক্তির (১) দ্বারা ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত বুঝা যায় যে, মৃত্যুকালে যে জীবাত্মার যে ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্য তাহার স্থূলশরীর হইতে তাহার মন নিষ্ক্রান্ত হয়, সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্যই তখন তাহার "আতিবাহিক" নামে একটি শরীর উৎপন্ন হয়। সেই শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই মনই স্বর্গ বা নরকে অর্থাৎ পরলোকে গমন করিয়া সেখানে তখন তাহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে উৎপন্ন অভিনব স্থূলশরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। তাহা হইলে বুঝা যায়, ন্যায়-বৈশেষিকমতে প্রত্যেক জীবাত্মার নিত্যসিদ্ধ এক একটি অতি সূক্ষ্ম মনই তাহার সূক্ষ্মশরীরস্থানীয়। মৃত্যুকালে স্থূলশরীর হইতে সেই মনেরই উৎক্রান্তি হয় এবং তাহারই পরলোক ও ইহলোকে গতাগতি হয়। ইহলোকে সেই জীবাত্মার পুনর্জ্জন্মকালেও তাহার সেই মনই আবার আসিয়া অভিনব অন্য স্থূলশরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। জীবাত্মার অদৃষ্টবিশেষই তাহার সেই মনের ঐরূপ গতাগতির নিয়ামক। স্থূলশরীর হইতে সেই মনের উৎক্রমণ এবং পরলোকে ও ইহলোকে গমনাগমনই শাস্ত্রে জীবের উৎক্রমণ ও গমনাগমন বলিয়া কথিত হইয়াছে। কারণ, সর্ব্বব্যাপী নিষ্ক্রিয় জীবাত্মার উৎক্রমণ ও গমনাগমন সম্ভবই নহে।

ফল কথা, ন্যায়-বৈশেষিকমতেও জীবাত্মা পরমাত্মার ন্যায় সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু জীবাত্মা অতি দুর্জ্ঞেয়, এই তাৎপর্য্যে শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে জীবাত্মাকে অণু বলা হইয়াছে এবং কোন স্থলে মনের অণুত্ব গ্রহণ করিয়াই মনঃসংযুক্ত জীবাত্মাকে অণু বলা হইয়াছে। অথবা অধিকারিবিশেষ নিজের আত্মাকে আমি সেই পরম মহান্ পরমেশ্বরের দাস, অতি ক্ষুদ্র, এইরূপে ধ্যান করিবেন—এইরূপ উপদেশতাৎপর্য্যেই শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে জীবাত্মাকে অণু বলা হইয়াছে। বৈষ্ণব সাধকগণ ঐরূপে নিজের আত্মার ধ্যান করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য ঐরূপ ধ্যানের উপদেশের জন্যই বৈষ্ণবশাস্ত্রে জীবাত্মার অণুত্ব সিদ্ধান্ত উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাও বলা যাইতে পারে।

সে যাহা হউক, জীবাত্মা সর্ব্বব্যাপী অথবা অতি সূক্ষ্ম, এই বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতে শাস্ত্রমূলক মতভেদ থাকিলেও জীবাত্মা যে দেহাদি হইতে ভিন্ন এবং নিত্য, ইহা আমাদিগের সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত। মহর্ষি গৌতম বিচারপূর্ব্বক নানা যুক্তির দ্বারাও উক্ত সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। মুমুক্ষু, বেদাদি শাস্ত্র হইতে প্রথমে উক্ত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া পরে মহর্ষি গৌতমের পূর্ব্বোক্ত নানা যুক্তি এবং আরও অনেক যুক্তির দ্বারা আত্মা যে দেহাদি হইতে ভিন্ন ও নিত্য, এই সিদ্ধান্তের মনন করিবেন, ইহাই গৌতমের সেই সমস্ত বিচার ও যুক্তি প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য যাহাদিগের পূর্ব্বজন্মের উক্তরূপ শ্রবণ বা মনন জন্য সুদৃঢ় সংস্কারের সহসা উদ্বোধ হয়, তাঁহারা ইহজন্মে শীঘ্রই উক্তরূপে নিজের আত্মার ধ্যানাদি করিতে পারেন। কিন্তু সকলের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। মনন ব্যতীতও শ্রবণরূপ জ্ঞানজন্য সংস্কার সুদৃঢ় হয় না। তাহা না হইলেও উক্তরূপে আত্মার ধ্যানাদি করা যায় না। সুতরাং উক্তরূপে আত্মার শ্রবণের পরে তাহার মননও অবশ্য কর্ত্তব্য।

মননের পরে নিদিধ্যাসন

উক্তরূপে আত্মার দর্শন বা অলৌকিক প্রত্যক্ষ না হইলে কেবল পূর্ব্বোক্ত মননরূপ পরোক্ষজ্ঞানজন্য আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান বা নিজ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ অহঙ্কারের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। তাই পূর্ব্বোক্তরূপে বহু যুক্তির দ্বারা আত্মার বহু মনন করিলেও আবার সময়ে নিজ দেহাদিতে পূর্ব্ববৎ আত্মবুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। সাংখ্যসূত্রকারও বলিয়াছেন—

(১) ততঃ শরীরাদ্বহিরপগতং তাভ্যামেব ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং—সমুৎপন্নেনাতিবাহিকশরীরেণ সম্বধ্যতে, তৎসংক্রান্তঞ্চ স্বর্গং নরকং বা গত্বা আশয়ানুরূপেণ শরীরেণ সম্বধ্যতে তৎসংযোগার্থং কর্ম্মোপসর্পণমিতি"—ইত্যাদি প্রশস্তপাদ ভাষ্য "কন্দলী" সহিত কাশী সংস্করণ ৩০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্‌মূঢ়বদপরোক্ষাদৃতে ॥" ১।৫৯॥ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ব্যতীত দিঙ্‌মূঢ় ব্যক্তির ন্যায় যুক্তির দ্বারাও আত্মবিষয়ক মিথ্যা জ্ঞান বা অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, কোন ব্যক্তি পশ্চিমদিক্‌কে পূর্ব্বদিক্ বলিয়া ভ্রম করিয়া সেই দিকে গমন করিলে তখন কোন বিশ্বাসী বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই দিঙ্‌মূঢ় ব্যক্তিকে—সেই দিক্ পূর্ব্বদিক্ নহে, ইহা বলিয়া যুক্তির দ্বারা উহা তাহাকে বুঝাইয়া দিলেও যেমন তখনই তাহার সেই দিগ্‌ভ্রম নিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ, বহু যুক্তির দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপে আত্মার মনন করিলেও তখনই তদ্দ্বারা আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপে আত্মার মনন করিয়া পরে আত্মার দর্শনের জন্য যোগশাস্ত্রোক্ত উপায়ে আত্মার পূর্ব্বোক্তরূপে ধারণা ও ধ্যান কর্ত্তব্য। ধারণাই নিরন্তর হইলে তখন তাহাকে বলে ধ্যান। ঐ ধ্যানই পরে সমাধিরূপে পরিণত হয়। ঐ ধ্যান ও সমাধিই আত্মার নিদিধ্যাসন। চরম সমাধিরূপ চরম নিদিধ্যাসনের ফলে কোন কালে মুমুক্ষুর আত্মদর্শন জন্মে। ফল কথা, দিঙ্‌মূঢ় ব্যক্তি যেমন কোন আপ্ত ব্যক্তির উপদেশ শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার কথিত যুক্তির দ্বারা তাহার কথিত তত্ত্বের মনন করিয়া বিপরীত দিকে গমন করিলে তাহার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারে এবং সময়ে তাহার দিগ্‌ভ্রমও নিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ মুমুক্ষু ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপে আত্মার শ্রবণ ও মনন করিয়া যোগশাস্ত্রোক্ত উপায়ে আত্মার নিদিধ্যাসন করিলে সময়ে তাহার আত্মদর্শন জন্মে। তাই শ্রুতিতে মুমুক্ষুর আত্মদর্শনের জন্য আত্মার মননের পরে নিদিধ্যাসন বিহিত হইয়াছে। তদনুসারে মহর্ষি গৌতমও আত্মার মননের উপায় বলিয়া পরে বলিয়াছেন—

"সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ ॥" ৪।২।৩৮ ॥

অর্থাৎ সমাধিবিশেষের অভ্যাসপ্রযুক্ত মুক্তির চরম কারণ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার জন্মে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত নানা যুক্তির দ্বারা আত্মাদি পদার্থের মননের পরে মুমুক্ষুর যোগশাস্ত্রোক্ত উপায়ে সমাধিবিশেষের অভ্যাস কর্ত্তব্য। তাহার ফলে ক্রমশঃ চরম সমাধি হইলে তাহার অবসানে কোন কালে মুমুক্ষুর আত্মার পূর্ব্বোক্ত স্বরূপের অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে। উহারই নাম আত্মদর্শন। কিন্তু প্রথমেই কেহ ঐ সমাধিবিশেষের অভ্যাস করিতে পারে না। চিত্তশুদ্ধি ও বৈরাগ্যাদি ব্যতীত মুক্তিলাভে যোগ্যতাই হয় না। সুতরাং মুক্তিলাভে যোগ্যতালাভের জন্য প্রথমে অনেক কর্ত্তব্য আছে। তাই মহর্ষি গৌতমও পরে বলিয়াছেন—

"তদর্থং যমনিয়মাভ্যামাত্ম-সংস্কারো
যোগাচ্চাধ্যাত্মবিধ্যুপায়ৈঃ।"—৪।২।৪৬

অর্থাৎ মুক্তিলাভের জন্য প্রথমে শাস্ত্রোক্ত "যম" ও "নিয়মের" দ্বারা আত্ম-সংস্কার কর্ত্তব্য এবং যোগশাস্ত্র হইতে অধ্যাত্মবিধি ও অন্যান্য সমস্ত উপায় জানিয়া তদ্দ্বারাও আত্ম-সংস্কার কর্ত্তব্য। মুক্তিলাভে যোগ্যতাই আত্ম-সংস্কার। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাই যোগশাস্ত্রের প্রথম বক্তা। উপনিষদেও যোগের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। মহর্ষি গৌতম প্রাচীন যোগশাস্ত্রকেই উক্ত সূত্রে "যোগ" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া তাহা হইতেই অধ্যাত্মবিধি ও সমস্ত উপায় জানিতে বলিয়া গিয়াছেন। কারণ, যোগ ব্যতীত কাহারই ঈশ্বরদর্শন ও নিজের আত্মদর্শন সম্ভব হয় না। সুতরাং মুক্তি হইতে পারে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন—"যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্"। যোগিগণই যথার্থরূপে পরমেশ্বরকে দর্শন করেন। সুতরাং তাঁহারাই নিজের আত্মদর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করেন। শাস্ত্রবক্তা ঋষিগণ সকলেই পরম যোগী ছিলেন এবং তাঁহারাও ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর পক্ষে অনুষ্ঠেয় নানাবিধ যোগের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই সমস্ত ন্যায়দর্শনের প্রস্থান অর্থাৎ প্রতিপাদ্য নহে। সুতরাং মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনে তাহার বর্ণন করেন নাই। কিন্তু মুমুক্ষুর যে যোগশাস্ত্র হইতে অন্যান্য সমস্ত উপায় জানিতে হইবে এবং তদনুসারে সমস্ত কর্ত্তব্য করিতে হইবে, ইহা তিনি পূর্ব্বোক্ত সূত্রের দ্বারা বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং যোগশাস্ত্রোক্ত উপায়ে মুমুক্ষুর ঈশ্বরসাক্ষাৎকারও যে কর্ত্তব্য, ইহাও তাঁহার উক্ত সূত্রের দ্বারা সূচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ঋষিগণ স্বল্পাক্ষর বাক্যের দ্বারা বহু অর্থের সূচনা করায় উহার নাম সূত্র। শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্রও ঐ কথা বলিয়াছেন (১)।

বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদও বলিয়াছেন,—

"আত্মকর্ম্মসু মোক্ষো ব্যাখ্যাতঃ।"—৬।২।১৬

অর্থাৎ মুক্তির জন্য আত্মার কর্ত্তব্য সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইলে মোক্ষ হয়, ইহা কথিত হইয়াছে। কণাদ-সূত্রের ব্যাখ্যাতা মহামনীষী শঙ্কর মিশ্র উক্ত সূত্রে কণাদোক্ত আত্মকর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে মুমুক্ষুর পক্ষে শ্রবণ, মনন, যোগাভ্যাস, নিদিধ্যাসন, আসন, প্রাণায়াম, শম-দম-সম্পত্তি প্রভৃতির সহিত ঈশ্বরসাক্ষাৎকার ও নিজের আত্মসাক্ষাৎকারকে আত্মকর্ম্ম বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত কর্ম্মই সাক্ষাৎসম্বন্ধে মুক্তির কারণ বলা যায় না। সুতরাং মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ বা চরম কারণ কি, ইহা বিচার করিয়া বুঝা আবশ্যক

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহর্ষি কণাদ ও গৌতম দ্বৈতমতের উপদেষ্টা। দ্বৈতমতে জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা ঈশ্বর তত্ত্বতঃ ভিন্ন পদার্থ। সুতরাং মুমুক্ষুর নিজের আত্মার দর্শন ও

(১) সূত্রঞ্চ বহ্বর্থসূচনাৎ ভবতি—যথাহুঃ—
লঘূনি সূচিতার্থানি স্বল্পাক্ষরপদানি চ।
সর্ব্বতঃ সারভূতানি সূত্রাণ্যাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥
(বেদান্তদর্শনের প্রথমসূত্রভাষ্য-ভামতী দ্রষ্টব্য)।

ঈশ্বর-দর্শনও ভিন্ন পদার্থ এবং বস্তুতঃ ঈশ্বরবিষয়ক মিথ্যা-জ্ঞানই জীবের সংসারের নিদান নহে। কিন্তু নিজের আত্ম-বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ নিজ শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি প্রভৃতি ভ্রমজ্ঞানই জীবের সংসারের নিদান। সুতরাং উক্ত মতে নিজের আত্মার প্রকৃতস্বরূপ-দর্শনই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ত্তক হওয়ায় ঐ তাৎপর্য্যে উহাই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ন্যায়দর্শনে গৌতমের পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারাও ইহাই বুঝা যায়। ঈশ্বর-দর্শন ঐভাবে উহার সাক্ষাৎ কারণ হইতে পারে না। কারণ, ঈশ্বরদর্শন সাক্ষাৎসম্বন্ধে মুমুক্ষুর নিজের আত্মবিষয়ক ভ্রমের নিবর্ত্তক হয় না। এক বিষয়ের তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার তদ্‌ভিন্ন বিষয়ে সাক্ষাদ্‌ভাবে ভ্রমজ্ঞান নিবৃত্ত করে না। সুতরাং বেদাদি শাস্ত্রে যে, পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের দর্শন মুক্তির কারণ-রূপে কথিত হইয়াছে, তাহা মুমুক্ষুর নিজের আত্মার দর্শন উৎপন্ন করিয়া তদ্দ্বারা মুক্তির কারণ হয়—অর্থাৎ ঈশ্বর-দর্শন মুমুক্ষুর নিজের আত্মদর্শনেরই মুখ্য সাক্ষাৎ কারণ,—ইহাই পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বুঝিতে হইবে।

ফল কথা, মুমুক্ষুর নিজের আত্ম-দর্শনের জন্য পূর্ব্বোক্ত শ্রবণ-মননাদি যাহা যাহা অত্যাবশ্যক, সে সমস্তই ঐ আত্ম-দর্শনের সম্পাদক হওয়ায় উহা মুক্তির পরম্পরা কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ঈশ্বরদর্শনই চরম ও মুখ্য। কারণ, ঈশ্বরদর্শনের পরেই মুমুক্ষুর নিজের আত্মদর্শন হয়। সুতরাং তখন আর তাঁহার কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই শ্রুতিতে এক পরব্রহ্মবিজ্ঞানেই সর্ব্ববিজ্ঞান কথিত হইয়াছে। এক পরব্রহ্ম-দর্শনের মহিমায় মুক্তির চরম কারণ আত্মদর্শন অবশ্যম্ভাবী,—সুতরাং উহা হইলে তখন আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। ঈশ্বর-দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত আর কোন উপায়েই কাহারই নিজের আত্মদর্শন জন্মে না। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই শ্রুতি বলিয়াছেন—"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (শ্বেতাশ্বতর)। ঈশ্বরদর্শনই মুমুক্ষুর নিজের আত্মদর্শনের চরম কারণ বলিয়া ঐ তাৎপর্য্যেই শ্রুতি ঈশ্বরদর্শনকেই মুক্তিলাভের একমাত্র পন্থা বলিয়াছেন। মুক্তিলাভের পন্থা বলিলে তাহা মুক্তির চরম কারণ নহে, কিন্তু তাহার সাধন, ইহাই বুঝা যায়।

কিন্তু শৈব সম্প্রদায়ের নৈয়ায়িকগণ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত যুক্তি গ্রহণ না করিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি অনুসারেই মহেশ্বর শিবের দর্শনকেই মুক্তির চরম কারণ বলিয়াছিলেন এবং কোন নৈয়ায়িক সম্প্রদায় যে, উদয়নাচার্য্যের "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থ দ্বারাও ঈশ্বরদর্শনকেই মুক্তির চরম কারণ বলিয়া সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মধ্যেও পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে মতভেদ হইয়াছে।

কিন্তু ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গৌতমের "দুঃখ জন্ম" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্র এবং ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতির ব্যাখ্যাত পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে "আত্ম-তত্ত্ব-বিবেক" প্রভৃতি গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যও মুমুক্ষুর নিজের আত্ম-দর্শনই সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির দ্বারা মুক্তির চরম কারণ, ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি তাঁহার "কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে ঈশ্বরের মননকে মুক্তির মার্গ বলিয়া তাহার জন্য বহু বিচার ও যুক্তি প্রকাশ করিলেও তদ্দ্বারা তাঁহার মতে যে ঈশ্বরদর্শনই মুক্তির চরম কারণ এবং তজ্জন্যই তিনি মুমুক্ষুর পূর্ব্ব-কর্ত্তব্য ঈশ্বরমননের উপায় বর্ণন করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায় না। কিন্তু মুমুক্ষুর নিজের আত্ম-দর্শনের জন্য তাঁহার ঈশ্বরদর্শন অত্যাবশ্যক, তজ্জন্য তাঁহার প্রথমে বেদাদি শাস্ত্র দ্বারা ঈশ্বরেরও শ্রবণ করিয়া তাহারও মনন কর্ত্তব্য, তাহার পরে নিদিধ্যাসন কর্ত্তব্য, ইহাই উদয়না-চার্য্যেরও মত বুঝা যায়। তাই তিনি মুমুক্ষুর অবশ্যকর্ত্তব্য ঈশ্বরমনন-সম্পাদনের জন্য "কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে বিশেষ বিচারপূর্ব্বক ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপবোধক বহু যুক্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং ঈশ্বরের মননকেও তাঁহার শ্রবণের অনন্তর-কর্ত্তব্য উপাসনা-বিশেষ বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার "কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থের উদ্দেশ্য প্রকাশ করিতেও প্রথমে বলিয়াছেন—

"শ্রুতো হি ভগবান্ বহুশঃ শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণাদিষু,
ইদানীং মন্তব্যো ভবতি"—"শ্রোতব্যো মন্তব্য"ইতি শ্রুতেঃ॥"

অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র দ্বারা পরমেশ্বর বহুবার শ্রুত হইয়াছেন, সুতরাং এখন তাঁহার মনন কর্ত্তব্য। কারণ, "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ঈশ্বরেরও শ্রবণের অনন্তর মনন কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। উদয়-নাচার্য্যের এই কথার দ্বারা তিনি বৃহদারণ্যক উপনিষদের "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা আত্মস্বরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়কেই গ্রহণ করিয়াছেন বুঝা যায়। অনেক টীকাকারও ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও উদয়নাচার্য্যের মতেও মুমুক্ষুর ঈশ্বরদর্শন তাঁহার নিজের আত্ম-দর্শনেরই অত্যাবশ্যক সহায় বলিয়া মুক্তির কারণ। "কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থের প্রাচীন টীকাকার বরদরাজ ও পরবর্ত্তী বর্দ্ধমান উপাধ্যায় প্রভৃতি টীকাকারগণের ব্যাখ্যার দ্বারাও তাঁহার ঐরূপই মত বুঝা যায়।

মূল কথা, যে ভাবেই হউক, সমস্ত নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতেই ঈশ্বরদর্শন ব্যতীত মুক্তি হইতে পারে না। সুতরাং প্রথমে বেদাদি শাস্ত্র দ্বারা ঈশ্বরেরও শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের দ্বারা সেইরূপে ঈশ্বরেরও মনন কর্ত্তব্য। তাই ঐ জন্যই নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ঈশ্বর-বিষয়ে বহু অনুমান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরের মনন-সম্পাদনই তাঁহাদিগের ঐ সমস্ত অনুমান-প্রদর্শনের মুখ্য

দাঁড়ালো। মেঘলা হাওয়ায় একটা করুণ সুর ভেসে আসছিল,—মেঘের মতই অশ্রুপূর্ণ—

"তুমি কি জান না দেবি আমি কত অসহায়।"

গোপীর গান শোনা বাইটে ছিল। "হুঁ—ভৈরবীই তো, তা না তো এত মধুর,—শুনতে হয়েছে।"

রিষ্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে—"ইস, এগারোটা যে বেজে গেছে! বাসার কাছেই তো—আচ্ছা—আসবো'খন।

দেখতে পেলে—বাগানের একটি নিভৃত স্থানে চেয়ারে ব'সে একটি অতি সুন্দর যুবা আপন মনে গাইছিল। "আলাপ করতে হবে; বা, যেমন রূপ—তেমনি কণ্ঠ!"

ভাবতে ভাবতে এগিয়ে সুবর্ণ বাবুর বাসায় গেটে পৌঁছিতেই—সামনে ইরাণী।

"এতো দেরি হল যে, মামা?"

সে কথার উত্তর না দিয়ে গোপীনাথ জিজ্ঞাসা করলে, "কে গাইছে রে, ইরাণী? ঐ—ঐ বাগানে। ছেলেটি যেমন দেখতে, তেমনি মিষ্টি গলা, দেখেছিস্?"

"ও এক জন উড়ে গো মামা, বেশ বাংলা বলে। পুরীর পাণ্ডাদের কেউ হবে!"—

"না না—তুই জানিস না। অমন চুল ছাঁটা…"

"কলকেতার উড়ে ঠাকুররাও আজকাল তোমাদের মতই চুল ছাঁটে…"

"না না—হতেই পারে না—মুখের অমন ভাব…"

"পয়সা হ'লে সব হয় মামা, শুনেছি, কাছায় গিনি বেঁধে রাখে।"

"তা এখানে?"

"সাধু খোঁজা রোগ সারাতে এসেছে। ভারি ভক্ত, চোখে সে দিন জগন্নাথ পড়েছিলেন,—এখনো সামলাতে পারে নি। জগন্নাথের আঙ্গুল ছিল না, তাই রক্ষে—খোঁচা লাগলে…"

"থাম—তুই সেই পাগলীই আছিস দেখছি।"

"হ্যাঁ গো মামা সত্যি, তুমি জিজ্ঞেস ক'রে দেখো। চোক গিছলো আর কি, তাই এখন অন্য ঠাকুর ধরেছে।"

"ওঃ, তাই গাইছিলো…"

"কি?"

"তুমি কি জান না দেবি আমি কত অসহায়।"

"দেখলে—এখন দেবী পাকড়েছে।—তুমি ত বেশ উড়ে ভাষা বলতে পার, মামা। আহা, বেচারা এখানে এক জনকেও পায় না যে, কথা কয়ে বাঁচে, তাই মনমরা হয়ে থাকে। তোমাকে পেলে ভারি খুসী হবে। কিন্তু উড়ে কথা কওয়া চাই, জানতে দিও না যে, তুমি বাঙ্গালী। বাসায় বাঙ্গালী বাবুরাও আজ কেউ নেই, সব দেওঘর গেছেন।"

"বিকেলে ওইখানেই গিয়ে চা খাবো।"

ইরাণী সহাস্যে বললে—"ঐ কাযটি কোর না,—ওরা চায়ে চিনি দেয় না—ময়দা দেয়। তা হোক—আমি কাগজে চিনি মুড়ে তোমার পকেটে দেবো'খন, মিশিয়ে নিও।"

"তা কি হয়?"

"কেন হবে না, সকলেই তাই করে! উড়ে কথা কইলে দেখো তোমার কত আদর হয়।"

"তা খুব পারবো।"

মীরার গলা—"আজ কি নাওয়া-খাওয়া নেই,—ওখানে কি হচ্ছে?"

"আমাদের এ সব কথা কারুকে বোল না, মামা। ওরা সব নানকপন্থী…সকল বিষয়েই না না করেন।"

"আচ্ছা।"

গোপী ইরাণীকে বড় ভালবাসে, তার কথার অন্যথা ক'রে তাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না।

উভয়েই দ্রুত গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

* * * * *

স্নানাহারান্তে গোপীনাথ একটু গড়ালেন। ওটা দিশী দালালদের অভ্যাসের মধ্যে। চারটের পর উঠে গান শুনতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

ইরাণী সজাগ ছিল,—"এত বেলা থাকতে কোথা যাবে, মামা,—মা এখনো শুয়ে যে, জল খেয়ে না গেলে…

"ভদ্রলোকের ওখানে যাচ্ছি—শুধু কি আর খাবো।'

"উড়েরা তা জানে কি? দেয় তো ছুটি মহাপ্রসাদ দেবে, সে চিবুতে পারবে কি?"

"যখন চা খায়,—সব জানে। এই তো খেয়েছি, এখন কিছু খেতেও পারবো না।"

ইরাণী তাড়াতাড়ি কাগজের একটা মোড়ক এনে "এই চিনি রইলো" ব'লে পকেটে দিলে।

"ও আমি বার করতে পারবো না, দেখিই না ওদের চা কেমন হয়।"

"সে মুখে করতে পারবে না, দেখো। উড়ে কথাটা কিন্তু"...

"মনে আছে রে মনে আছে। নামটি কি জানিস?"

উড়েদের যেমন হয়, বাংলা দেশ খুঁজলে মিলবে না, সে এক বিদ্‌কুটে নাম, আমার মুখে আসবে না, মামা।"

গোপীনাথ বেরিয়ে পড়লো।

২৮

বেচারা সাদাসিদে সেকেলে ধরণের লোক। দালালী করে, পয়সা আসে, সেই তার সবার বড় নেশা। এক জন মেদিনীপুরের মুহুরী আছে—খাতা লেখে, হিসেব রাখে।—অধিকন্তু গান গায়। গোপীনাথ ফরমাজ ক'রে শোনে। মুহুরী বলে—"সুরে আপনার দখল এসে গেছে, সকলের আসে না, বাবু।" এই রুটিনই নিত্য চলে।

ইরাণীর কথায় গোপীনাথের সন্দেহ মাত্র জাগেনি।

গোপীনাথকে আসতে দেখে কিংশুক এগিয়ে এসে নমস্কারান্তে "আসুন—আসুন" ব'লে অভ্যর্থনা ক'রে নিজের কামরায় নিয়ে গিয়ে বসালে।

তাকে সুবর্ণ বাবুর বাসায় আসতে কিংশুক পূর্ব্বেই দেখেছিল,—নিশ্চয়ই ওঁদের কোন আত্মীয় বা বন্ধু হবেন।

গোপীনাথ উড়ে ভাষায় আরম্ভ করলে—"আপনার কাযের ব্যাঘাত করলুম না তো? ওবেলা আপনার ভৈরবী শুনে আমার বড় ভালো লেগেছিল—তাই আলাপ করতে এলুম। চা-ও খাওয়া হবে, গানও শোনা হবে।"

কিংশুক একদম অবাক্। সহসা যেন অভাবনীয় কিছু ঘটে গেল। গোপীনাথের কথা কতক বুঝলে, কতক বুঝলে না। ভাবলে—ও রে বাপ রে, ইনি যে খাজা উড়ে! বললে—"মাপ করবেন, আপনাকে দেখে আমি বাঙ্গালীই ঠাউরেছিলুম। দয়া ক'রে এসেছেন—যা জানি, নিশ্চয়ই শোনাবো,—জল ফুটছে, আগে চা-টা খাওয়া হোক।"

গোপীনাথ খুব অ্যাক্‌সেণ্ট দিয়ে দিয়ে বলতে আরম্ভ করলে —"পুরীর সমুদ্রতীর আমার বড় ভালো লাগে, অমন দৃশ্য আর কোথাও দেখিনি, বহু পুণ্য থাকলে ওসব স্থানে বাস হয়,...জগবন্ধু-দর্শন, মহাপুরুষ-দর্শন, মহাপ্রভুর পদরজলাভ কি কম ভাগ্যের কথা,"—ইত্যাদি।

কিংশুক চায়ে চিনি দিতে যাচ্ছে—

সহসা—"ময়দা দেবেন না, ময়দা দেবেন না, আমরা চিনি দিয়ে খাই, আমার কাছে চিনি আছে"—ব'লে পকেট থেকে মোড়ক বার করায়—

কিংশুক হতভম্ব মেরে গেল, হাতের চামচখানা চিনির কৌটোর মধ্যে প'ড়ে গেল!—

—"আপনাকে ময়দা কে বললে,—এও তো চিনি।"

"চিনি? তবে যে,...তবে দিন—তবে দিন"।

কিংশুক থ হয়ে গিয়েছিল, শেষ বললে—"এক মিনিট সবুর করুন, শুধু চা-টা খাবেন না, সামান্য কিছু..."

গোপীনাথের উড়ে ভাষার কামাই নেই—দুহাত তুলে মাথায় ঠেকিয়ে বললে,—"ক্ষমা করুন, চায়ের সঙ্গে আর মহাপ্রসাদ চিবুতে পারব না, তার চেয়ে একটা মুলতান কি গৌরী চালান, কাণে শুনি"।

কিংশুক বড়ই সমস্যায় প'ড়ে গেল—"উড়ে ভদ্রলোকটির মাথা খারাপ না কি।"

সে তাড়াতাড়ি কলকেতা থেকে আনানো দালমুট, নিম্‌কি আর দুটো দানাদার প্লেটে ক'রে এনে হাজির ক'রে দিলে।

"অ্যাঁ—এ যে আমাদের কলকেতার দানাদার। কলকেতায় ছিলেন বুঝি? আপনাদের পুরীর জল-হাওয়া ভালো হলেও—জলখাবার ভাল নয়। তবে আসল জিনিষ, এক জগন্নাথেই সব দাবিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ,—আপনার চক্ষু কেমন আছে,—তিনি চোখে পড়েছিলেন না কি? পাদরীরা চোখে কড়িকাঠ পড়বার কথা বলেন,—এ যে তার চেয়ে ভয়ঙ্কর! হুঁঃ, হিঁদুর ওপরে কারুকে আর যেতে হয় না! আপনাদের গা-সওয়া গৃহ-দেবতা, তাই রক্ষে;—আঙ্গুল থাকলে কিন্তু বাপ"—

গোপীনাথের মুখে দালমুট যেন উড়ে ভাষায় সান দিয়ে 'ড়' নিয়ে গড়িয়ে বেড়াচ্ছিল!

কিংশুক তখন ভাবছে—"ব্যাপার কি, এ কি বিপদ! ভালো পাগলের পাল্লায় পড়লুম! ডেপুটী বাবুর এটি কে? অভদ্রতা না হয়,—হাসতেও পারি না। এ সব কথাই বা পেলেন কোথায়?—আচার্য্য মশাইয়ের সঙ্গে আলাপ আছে না কি? ও বাড়ীর কেই বা এ সব কথা বলতে পারে?" মুখে একটু হাসির ভাবও এলো,—না,তা কি সম্ভব,—তিনি কি—

আর থাকতে না পেরে কিংশুক বললে,—"গানে যখন

আপনার এত অনুরাগ, আপনার পরিচয় যে জানতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে, যদি……"

"আমার নাম—'গোপীনাথো' নিবাসো সান্তড়াগছী।

শুনে কিংশুকের আর সন্দেহ রইল না,—উড়েই তো। নানা রকম ভাবছিলুম,—যাক্ রহস্য নয়। তবে আচার্য্য মশার……

গোপীনাথও পালটা পরিচয় শুনতে চাইলেন। কিংশুক বললে—"নিবাস কলিকাতা, বেণ্টিং ষ্ট্রীট্……"

গোপীনাথের ভ্যাবাচ্যাকা লেগে গেল। চীনে-ম্যান্ না কি ?—রংটা তাই বটে, চেনবার যো নেই! কিংশুক, মিংসুই, সিন্‌ফুং, এ সব তো চীনেদেরই নাম।—ওঃ, জুতোর ব্যবসা। তা না তো কাছায় গিনি বাঁধে!—পূজো গেছে কি না। ছি ছি, চা'টা খেলুম! ইরাণী যে বললে—উড়ে।—মেয়েমানুষ, এতো কি করেই বা বুঝবে! আমরাই পারি না।

গোপীনাথের মুখখানা কেমন ব্যাজার ব্যাজার হয়ে গেল।—কিংশুক সেটা লক্ষ্যও করলে।

গোপীনাথ জিজ্ঞাসা করলে,—"বেণ্টিং ষ্ট্রীটে তো দোকান রাখেন,—আদি নিবাস ?"

"শুনেছি, ইংরেজ আমলের আগে থেকেই কলকাতায় বাস।"

"ইংরেজ আমলের আগে থেকে! হতেই পারে না; চীনেরা তো তার অনেক পরে এসে দোকান করেছে। আমি ব্রাহ্মণ, আমাকে কিছু না বলেই চা, মিষ্টান্ন সবই…আমাকে সে বললে, আপনি উড়ে, এখানে স্বজাতি না থাকায় উড়ে ভাষা শুনতে পান না,—মন-মরা হয়ে থাকেন,—তাই তো আমি…"

কিংশুক এইবার হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলে,—"আপনি নিজে কি ?—উড়িষ্যাবাসী—উড়ে তো ?"

"আমি উড়ে হতে যাবো কেনো,—খাস্ বাঙ্গালী।—বললুম তো—নিবাস সাঁতারগাছি। এই পাশেই তো আমার দিদিদের বাসা; ভাগ্নীদের দেখতে এসেছি। ইরাণী দেখছি…"

কিংশুক সন্দেহ করেছিল,—এখন আর ব্যাপারটা বুঝতে তার বাকি রইল না। মনের উপভোগ্য আনন্দটা চেপে সে একটু সশব্দেই হেসে বললে,—

"তা আমাকে এখন ঠাওরালেন কি ?"

গোপীনাথ এতক্ষণ উড়ে কথা ছেড়ে বাংলা ধরলেন,—"কিছু ঠিক করতে পারছি না। বললে—উড়ে,—নাম-ধাম দেখছি চীনেদের,—কথা কইছেন বাঙ্গালীরই মত! আলাপ করতে এসে মনটা বিগড়ে গেল!—বেটী সেই ছেলেমানুষই আছে, কোনো আক্কেল হয় নি! বোধ হয়, সে নিজেও ঠাওরাতে পারে নি—আমরাই পারি না!—তা আপনি তো বেশ বাংলা কথা কন,—ধরবার যো নেই। বিবাহ হয়েছে ?"

"আজ্ঞে—না।"

"তা এ দেশে কি করেই বা হবে! তা হ'লে—বিবাহ-টিবাহ করতে দেশে যেতে হয় ?"

কিংশুক ও-বাসার মাতুলের সমীহ সম্মান রেখে কথা কওয়া উচিত বিবেচনায়, এ ব্যাপার আর বাড়তে দিলে না। বললে,—"আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, আপনাকে যিনি আমার সম্বন্ধে বলেছেন, তিনি বোধ হয় উড়ে,—দল বাড়াতে চান;—ওটা স্বাভাবিক কি না…"

"তবে আপনি কি ?—সত্য পরিচয়টা বলুন তো, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না, আমাকে বোকা বানিয়ে দিলে যে…"

"নাম আর নিবাস তো পূর্ব্বেই আপনাকে বলেছি। আমরা—বারেন্দ্রশ্রেণী—'কাপ্'।"

"তাই না কি ? তবে তো আমাদেরই ঘর—স্বঘর। মেয়েটা পাগল না কি, বেটী তো ভারি ঠকিয়েছে,—যাই আগে…"

উভয়ের হো হো শব্দে হাসি প'ড়ে গেল।

গোপীনাথ অপ্রস্তুত হয়ে বললে,—"ছি ছি—আপনি আমাকে কি মনে করছেন!"

"আপনার দোষটা কোথায় ? আপনি যেমন শুনেছেন। বরং অন্যের দুঃখে আপনার সহৃদয়তা ও সহানুভূতির পরিচয়ই পেলুম। আগাগোড়া ভিন্ন ভাষায় কথা কওয়া কি কম কসরৎ। খুব রপ্ত তো!"

গোপীনাথ মাথা নেড়ে—"ছি ছি, বড় লজ্জা পেলুম। কিছু মনে করবেন না…"

কিংশুকের মধ্যে তখন এমন একটা আনন্দ তাল পাকিয়ে মাথা-ভাঙা ঢেউয়ের মত তোল্‌পাড় আরম্ভ ক'রে দিয়েছে যে, সে আর সেখানে থাকতে পারলে না, চট্ পাশের ঘরে উঠে গেল।

গোপীও যেন পালাতে পারলে বাঁচে, গান শোনার কথা পর্য্যন্ত ভুলে গেছে।

"এখন গৌরীই লাগবে ভালো" বলতে বলতে এস্রাজ হাতে ক'রে এসে কিংশুক পরদা ঠিক্ করতে ব'সে গেল।

"—আমার কেবল সুর সাধা" ব'লে, ছড়ি টেনে গৌরীর মুখটা ভেঁজেই, কিংশুক গান আরম্ভ ক'রে দিলে। একে সুকণ্ঠ, তায় শেখা বিদ্যে—ক্রমে সন্ধ্যা যেন শুনতে এসে ঘরে ঢুকে পড়লো—জমে বসলো। কারও হুঁস নেই! চাকর আলো নিয়ে আসতে চটকা ভাঙ্গলো। কিংশুক স'মে এসে থামলো।

—"আর একটা শুনবেন কি ?"

মুছরীর গান-শোনা জহুরী তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন।—"এখনো যেন শুনতে পাচ্ছি,—বাঃ! অন্য গান আজ নয়।"

"বাঃ। আর নাঃ" ছাড়া গোপীনাথের আর কথা বেরুল না। সহসা দাঁড়িয়ে উঠে—"কালই চ'লে যাচ্ছি, আবার শীঘ্রই আসবো, বাবাজী,—তোমাকে ছাড়ছি না। আজ চললুম,—বাঃ!"

কিংশুক সঙ্গে সঙ্গে এসে সুবর্ণ বাবুর গেট পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে, নমস্কার ক'রে বিদায় নিলে।

* * * *

ইরাণী মামার প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়ে ছিল। সাদাসিদে মামাটির ওপর তার সব জোর—সব আবদারই অবাধে চলতো, সে জানতো—কলের সায়েব আর পাটের বাইরে মামার বুদ্ধি ডিক্‌টেসনের পথ ধ'রে চলে।

আলাপটা কি রকম হ'ল, শোনবার জন্যে তার প্রাণটা ছট্‌ফট্ করছিল। সে এগিয়েই ছিল।

"যাঃ, তুই ভারি ছেলেমানুষ। আমাকে বোকা বানিয়ে দিলি। ছি! সে উড়ে হ'তে যাবে কেন! তোর এ সব কি পাগলামী? অমন ভদ্র, অমন সুন্দর ছেলে? ছিঃ!"

"উড়ে নয়? তা কি ক'রে জানবো, মামা,—আমার তা হ'লে ভুল হয়ে থাকবে......"

গোপীনাথ বললে—"তাই তো বলি, ভুলই করেছিস্।"

বলতে বলতে বাড়ীর মধ্যে পৌঁছে গেল।

মন্দাকিনী দেবী বললেন,—"কোথায় এত ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে,—টৌণিদের বাড়ী বুঝি?"

"না, এই পাশের বাসায় গান শুনতে গিয়েছিলুম, দিদি। কি সুন্দর ছেলেটি, যেমন দেখতে, তেমনি বিনয়ী, আবার সুকণ্ঠও তেমনি,—হীরের টুকরো!—আমাদের স্বঘর গো দিদি! আমি কি খবর না নিয়ে আসি! ভগবান্ ঘরের পাশেই অমন এনে রেখেছেন, আর ইরার বর পাও না!"

ইরা ছুড়ুছুড়্ ক'রে অন্য ঘরে পালালো।

মন্দাকিনী দেবী মেরুদণ্ড সিদে ক'রে বললেন,—"ঐ যে চেয়ার জুড়ে ব'সে আছেন,—মানুষ কি!—ঢের বলেছি ভাই: এদ্দিন গাছ-পাথরকে বললে......"

সুবর্ণ বাবু একটু মিঠে হাসি টেনে শ্যালককে বললেন,—"তোমার দিদিকে একটু সবুর করতে বল,—অনেকটা হয়ে এসেছি,—অল্পই বাকি।"

"শুনলি!"

"না—ওসব কথা নয় দিদি,—ও-পাত্র ছাড়া হবে না। আমি শীগ্‌গিরই আসছি, এ করতেই হবে—তা যা লাগে আর যত লাগে।"

সুবর্ণ বাবু বললেন,—"ইস্, গৌরী সেন যে! তোমার ভগ্নীপতি তো পাটের দালালী করে না—"

"আপনাকে তো খরচের কথা ভাবতে বলছি না..."

"ম্যাথ ভাই—লক্ষ্মীটি আমার, তুই যদি পারিস। তা হ'লে বাছার কলকেতার বাড়ী সাতখানাও বাঁচে, সাতভূতে খাচ্ছে! শুনে পর্য্যন্ত—"

"তাই না কি, সা-ত খা-না! সে সব আমি দেখে নেবো, সে ভারও আমি নিলুম।"

সুবর্ণ বাবুকে লক্ষ্য ক'রে মন্দাকিনী দেবী বললেন, "শুনলে মানুষের কথা? শোনো—ভালো ক'রে শোনো..."

সুবর্ণ বাবু বললেন,—"বেইমানী করব না, তোমার কাছেও কম শুনিনি,—তা হোক্, আবার বলো গোপী—আরো শুনাও ভাই—"

মীরা চক্ষু নত ক'রে হাসলে।

তার পর রাত বারোটা পর্য্যন্ত কিংশুক সম্বন্ধে ভাই-বোনের কথা আর শেষ হয় না! মন্দাকিনী দেবী-কথিত সে একখানি বৃহৎ ও বিশুদ্ধ ভাগবত।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সতীত্ব

শিক্ষা, সতীত্ব, দুঃখ (২)

অদ্বিতীয় ভাষাকৌশলী, প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক শরৎ বাবু "নারীর মূল্য" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি অখণ্ডনীয় যুক্তি, অপূর্ব্ব ভাষা, এবং বহুল দৃষ্টান্তপ্রয়োগে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, নর শুধুই গায়ের জোরে নারীর উপর শত-সহস্র অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে এবং করিতেছে। আদিম যুগ হইতে আজও পর্য্যন্ত ধর-পাকড়, শুধু গায়ের জোর, জুলুম, অত্যাচার, ইহাই নারী নরের নিকট হইতে পাইয়াছে। নারী মোটামুটি নীরবে এ অত্যাচার সহিয়া আসিয়াছে এবং প্রতিদানে অজস্র ভালবাসা দিয়াছে এবং দিতেছে। যত রকম আইন-কানুন, বিধি-নিষেধ সবই পুরুষগুলা গায়ের জোরে নারীর উপর চালাইয়াছে। নিজের ঘাড়ে কোন দোষ লয় নাই। নারীর যথার্থ প্রাপ্য মূল্য নর কোন কালেই দেয় নাই, দিতেছেও না। শাস্ত্র, সমাজ, লোকাচার, বিশেষতঃ এ দেশের এই সব বিষয়ে তিনি চাবুক মারিয়া দেখাইয়াছেন যে, ইহা তাহাদের জঘন্য স্বার্থপরতা, গায়ের জোর, মূর্খতা, ধৃষ্টতা এবং দাম্ভিকতা। কিন্তু তিনিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, শুধু গায়ের জোরে নর নারীকে বশে রাখিলে এত দিন জগৎ থাকিত কি না সন্দেহ, নর নারীকে ভালও বাসিয়াছে। প্রতিদান নারী পাইয়াছে বটে, কিন্তু সেটাও নরের স্বার্থপরতা। এখন ইহা সকলকেই মানিতে হইবে যে, নারীর উপর সময় সময় নর অল্পাধিক পরিমাণে বলপ্রয়োগ করিয়া আসিয়াছে এবং আসিতেছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, নরের এই বলপ্রয়োগ শুধু নারীর উপরই চলিতেছে, আর কাহারও উপর কি বলপ্রকাশ হয় না? নারীকে নারী বলিয়াই এই অত্যাচার পাইতে হয়, এবং তাহার ন্যায্য মূল্য তাহাকে দেওয়া হয় না, এইটাই কি প্রকৃত? একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, দুর্ব্বলের প্রতি বলবানের অত্যাচার মানুষের স্বভাবসিদ্ধ—তা নারীই হউন বা নরই হউন। এজন্যই ইহাকে—পশুবৃত্তির একটা অঙ্গ বলিয়া ধরা হয়। এই যে "Survival of the fittest" অর্থাৎ যোগ্যতমেরই জয়লাভ, অযোগ্যের ধ্বংস, ইহা কি শারীরিক শক্তিরই কথা নহে? যুক্তি, বুদ্ধি, বিদ্যাও কি গায়ের জোরেরই সহায়তা করিয়া আজ এক জাতিকে অপর জাতির পদানত করিতেছে না? আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আন্দামান প্রভৃতি দেশের আদিম বাসীরা যে আজ প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছে, তাহার কারণ কি এই গায়ের জোর অথবা তাহারই সাহায্যকারী বিদ্যা, বিজ্ঞান, কামান, গোলা নহে? গায়ের জোরের সহিত বুদ্ধিকৌশলের সমবায়েই না আজ দেশে দেশে এত প্রভেদ বিদ্যমান? চীনবাসীদের আমেরিকায় দুর্দ্দশা, ক্রীতদাস-ব্যবসা, নিগ্রোদের প্রতি আমেরিকার আজও অত্যাচার (Ku klux klan ইহার দৃষ্টান্ত) কি এই গায়ের জোরেরই সাক্ষ্য দিতেছে না?

আবার এই যে, সভ্যজাতির অসভ্য দেশকে সুসভ্য করিবার অছিলায় রাজ্যবিস্তার-চেষ্টা, ইহাও কি গায়ের জোর নহে? এই যে য়ুরোপে মহা সমর হইয়া গেল, ইহা ত শুধু নারীর বিপক্ষে নহে, ইহা ত দেশের বিপক্ষে। তবে ইহা হইল কেন? আজ সভ্য সমাজ বলিতে চান যে, আদিম যুগের মত তাঁহারা গায়ের জোরের পরিবর্ত্তে যুক্তির জোরে সব করিতে চাহেন। এ কথা কতকটা সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু আজও "Might is the ultimate arbitrator" অর্থাৎ সকল বিবাদেই গায়ের জোরই এখনও শেষ নিষ্পত্তি। এই জন্যই এত League of Nations, conference সন্ধি, pact সত্ত্বেও সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধসজ্জার বৃদ্ধি। মন-কষাকষি সদাই আছে, কাযেই সতর্ক হইয়া ইহারা চলেন। "শক্তের ভক্ত" সবাই। এই জ্ঞান সকলেরই বিলক্ষণ আছে। এ জন্যই আজ জগতে কোন জাতিই শান্তির জন্য বা যুদ্ধের জন্য, বিজ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যাকে নিয়োজিত করিতে নিশ্চেষ্ট নহেন। বিজ্ঞান, মেধা, বুদ্ধি, আজ শত শত জগতের কল্যাণকর কায করিলেও, যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য আয়োজনেও সদাই ব্যস্ত।

১৮১২ অব্দে মস্কো নগরে যুদ্ধ-জয় করিয়া দিগ্বিজয়ী সৈন্যগণ যথেচ্ছ অত্যাচার করিয়াছিল। আবার ১৯১০ অব্দে অর্থাৎ এক শতাব্দী পরেও ত্রিপলি যুদ্ধের সময় এবং জর্ম্মাণদের দ্বারা আন্টওয়ার্প, ব্রুসেলস্ অধিকৃত হইলেও ঠিক এইরূপে আজও নারীর উপর এবং পুরুষের উপরও ভীষণ অত্যাচার সাধিত হইয়াছে। এই গেল বড় বড় দেশের কথা। আবার যখন ব্যক্তিগতভাবেও দেখা যায়, এই গায়ের জোরের প্রাদুর্ভাব সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পশুদের মধ্যেও বটে, নর-নারীর মধ্যেও তাহাই। দুর্ব্বল পাইলেই তাহার উপর আধিপত্য করার স্বভাব প্রত্যেক নর-নারীতে কম-বেশী আছে। গায়ের জোর নানা ভাবে দেখান হয়, ইহা সব সময়েই যে হাত, পা, গায়ের জোর, তাহা না হইতে পারে; বুদ্ধি, বিদ্যা, মান, অভিমান, কৌশল, চাতুরী ইত্যাদি নানারূপে ইহা প্রকাশ পায়। ইহারই জন্য দেশে দেশে অশান্তি, রাজায় প্রজায় অমিল, প্রভুর ভৃত্যের উপর গায়ের জোর, ধনীর দরিদ্রের উপর গায়ের জোর, পণ্ডিতের মূর্খের উপর গায়ের জোর, বলবান্ ছেলের দুর্ব্বল ছেলের উপর গায়ের জোর চিরকাল চলিয়া আসিতেছে এবং চলিবে, যত দিন না মানুষ প্রকৃত পথ মানিয়া ঠিক ঠিক ভাবে জীবন

সার্থক করিতে পারিবে। নারীই কি গায়ের জোর করে না? বালিকা বধূর উপর অত্যাচার, বৃদ্ধা খাশুড়ীর উপর অত্যাচার, দাসদাসীর উপর পীড়ন কি নারী করে না? ইহা কি গায়ের জোর নহে বা সম্পর্ক বা পয়সার জোর নহে? ইহাও কি দুর্ব্বল এবং বলবান্ সম্পর্কে নহে? গো-বেচারী স্বামীর পত্নীহস্তে কি নির্য্যাতন হয় না? অবশ্য পুরুষ দ্বারা স্ত্রী-নির্য্যাতন অপেক্ষা ইহা অনেক কম। কারণ, পুরুষ নারী অপেক্ষা সাধারণতঃ বলবান্। সাধারণতঃ ঘর-সংসার করিতে গেলেও কি প্রত্যেক গৃহস্থকে কমবেশী নারী দ্বারা সময় সময় তাড়িত হইতে হয় না? নারীর বুদ্ধি বা উৎসাহে নর কি অসৎ কাষ করে না? নারী কি নরকে আয়ত্ত করিতে নানা কৌশল করে না এবং এ কৌশলও কি গায়ের জোরেরই নামান্তর নহে?

এখনও অসভ্য জাতির মধ্যে মানুষ নরমাংস খায়। ফিজী জাতীয়রা তাহাদের দেশের নর-নারীর বয়স হইলে তাহাদের জীয়ন্ত কবর দেয়। এই প্রথা মেলানেশিয়ার সর্ব্বত্র প্রচলিত। নিউকালিডোনিয়া এবং পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জেও ইহা প্রচলিত। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম জাতি অকর্ম্মণ্য হইলে বৃদ্ধদিগকে হয় মারিয়া ফেলে, নয় ত তাহাদের মাংস খাইয়া ফেলে। জার্ম্মাণীর আদিম জাতিরা রোগগ্রস্ত বা বয়োবৃদ্ধ হইলে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিত। কোন কোন দেশে আজও সন্তান ত্যাগ করে বা মারিয়া ফেলে। কন্যাহত্যা রাজপুতদের মধ্যে ছিল, গঙ্গা-সাগরে সন্তান ভাসাইয়া দেওয়া এবং অনিচ্ছায় সতীদাহ এ দেশেও ছিল। কারীবিয়ান জাতি তাহাদের রাজার মৃত্যুর পরে তাহার কবরে ক্রীতদাসদিগকে হত্যা করে। গোল্ডকোষ্ট প্রদেশে এই প্রকারে দেশের বড় লোক মরিলে তাহার কবরে নারী এবং ক্রীতদাসদের হত্যা করে। আরও অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যায় যে, মানুষের মধ্যে দুর্ব্বলের উপর বলবানের অত্যাচার স্বাভাবিক নিয়ম এবং সকলেই সময়ে সময়েও অন্ততঃ শক্তের ভক্ত। বলবান্ যে দুর্ব্বলের উপর সর্ব্বত্র অত্যাচার করে, এই ধারণাই তাহার কারণ। নিজের জীবনেও লক্ষ্য করিলে সকলেই দেখিতে পান যে, এই নিয়ম সর্ব্বত্র। কিন্তু ইহা চলিয়াছে এবং আছে বলিয়াই ইহার সমর্থন করা যায় না। ইহা ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ অপরাধ। ইহাও পশুত্ব।

যেমন রূপজ মোহকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারা যায় না বলিয়া তাহাকে "সূর্য্যের আলোর মত সত্য" বলা হয়, যে রূপজ মোহকে "নীতিবাদিগণ বা হতবুদ্ধি বিজ্ঞের দল বুঝিতে না পারিয়া হেয়, ঘৃণিত, বীভৎস বলিয়া শান্তিলাভ করে" এবং তাহা সত্ত্বেও তাহার ক্ষমতা অসীম, ঠিক তেমনই এই গায়ের জোরকেও কেহ আজ পর্য্যন্ত ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই; ইহাকেও নীতিবাদিগণ ঘৃণিত হেয় বীভৎস বলিয়া শান্তি পায়; কিন্তু তথাপি ইহাও "সূর্য্যের আলোর মত সত্য"। "পাপ যত দিন এ সংসারে থেকে যাবে, তত দিন ভুলভ্রান্তিও থাকবে এবং তাকে ক্ষমা ক'রে প্রশ্রয়ও দিতে হবে।" এই উক্তি যদি রূপজ মোহ সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়, তবে পশুশক্তির অন্য বিকাশ জোর-জবরদস্তিকেই বা এ প্রশ্রয় দেওয়া না হইবে কেন? এ দুইটার কোনটাকেই ঠেকান যায় না। এ দুইটাই অত্যন্ত প্রবল, দুইটাই পশু, দুইটাই অবিশ্রান্ত মানুষকে উদ্ভ্রান্ত করিতেছে, দুইটাই অন্য বৃত্তি অপেক্ষা প্রবল। এতদুভয়ই নীতিবাদিগণের কাছে দোষাবহ, উভয়ই মানুষকে খর্ব্ব করিবার পথে টানিয়া লইয়া যায়। কাযেই একটার বেলা প্রশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থা আর অন্যটার বেলা তাড়াইবার বিধিমত চেষ্টা করিব, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কথায় আছে, "ওরে, পাঁঠা কাটতে পারিস?" "আজ্ঞে, কতক কতক।" পাঁঠা কাটার আবার কতক কতক কি? নিছক পশুত্বের আবার একার্দ্ধ ভাল—অপরার্দ্ধ মন্দ কি? পশুত্বেরও ভাল মন্দ আছে বটে, কিন্তু মন্দ দিক্‌টার আবার ভাল-মন্দ কি?

তবে যদি এই কথা উঠে যে, প্রণয়ে সার্থকতা আছে। ইহা মনে মাধুর্য্য আনে, সৃষ্টি রক্ষা করে, উন্মাদনা জন্মায়, সৎপ্রেরণা দেয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এই সমস্ত প্রসাদ গায়ের জোরের ফলেও আসিতে পারে। যাঁহারা বিশ্বাস না করেন, আমরা তাঁহাদের Bernhardi কৃত Germany and the next war, Emerson কৃত Power এবং Nietzeker গ্রন্থ পড়িতে অনুরোধ করি। নিটজের মত "Be hard" অর্থাৎ শক্ত হও; ইহা অবশ্য সংযম সূচিত করে, কিন্তু দুর্ব্বলের প্রতি বলবানের অত্যাচারও বাদ দেয় না। তাঁহাদের মতে গায়ের জোর সর্ব্বত্র। গায়ের জোরই পথ। এক মুষ্টি অন্ন যাহা আমি খাই, তাহাও আর এক জনকে বঞ্চিত করিয়া। নচেৎ সেই মুষ্টি অপর কেহ খাইয়া বাঁচিত। যুদ্ধের সময়ে সমস্ত জাতি একমন একপ্রাণ হইয়া রাজ্যকে (state) সেবা করে। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া গিয়া, সকলের জন্য, একটা আদর্শের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেয়। যাহারা অযোগ্য, তাহারা যুদ্ধে হারিয়া যায়। তাহার ফলে হয় তাহারা যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া পুনরায় জয়লাভ করে, নচেৎ জগতে থাকিবার অযোগ্য বলিয়া ক্রমে ক্রমে লোপ পায়। এই প্রকারে নানা প্রকার যুক্তি, দৃষ্টান্ত প্রভৃতির দ্বারা গায়ের জোর বা পাশব বলের প্রতিষ্ঠা, প্রাধান্য, উপকারিতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা অনেক দিক্ হইতে করা হয়; কিন্তু আমরা বলি যে, অবৈধ হইলেই দোষ। তাহা পাশব বলই হউক আর প্রণয়ই হউক।

আবার সতীত্ব নারীরই আছে, নরের নাই; পুরুষের সাত খুন মাপ, তাহা হইতে পারে না। গায়ের জোর ছাড়াও নারীর উপর বিধি-নিষেধ জারি করার অন্য কারণ আছে। নারীই সংসারের মূল, সমাজের মেরুদণ্ড, জগতের সৃষ্টি করিয়া পালন রক্ষণ করিতেছেন। সুতরাং ইহাদের মধ্যে সতীত্ব থাকা যতটা সব বিষয়ে প্রয়োজন, পুরুষের পক্ষে ততটা নহে। নারীর সতীত্ব আছে, নরেরও সৎত্ব আছে, তাহা কোন বিষয়ে, নরনারীর অবস্থার তারতম্য অনুসারে কম নহে। নরও উহা রক্ষা করিতে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ নারীরই মত বাধ্য। তাহারও প্রত্যবায় আছে, শাস্তি আছে, ব্যভিচার আছে। ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ পার্থক্য থাকা উচিত নহে; কারণ, পাপ পাপই, ব্যভিচার ব্যভিচারই, তা নরই করুক বা নারীই করুক। সমাজ নরকে ব্যভিচার-দোষ করিলে ক্ষমা করে সত্য। এ জন্য নারীকেও ব্যভিচার দোষ ঘটিলে ক্ষমা করাই উচিত, এই ব্যবস্থা চালান হইতেছে। কিন্তু বোধ হয়, নর-নারীর উভয়ের সমান সাজা দেওয়াই ইহার যথার্থ প্রতীকার। দোষ করিলে সাজা পাইতেই হইবে—তা তিনি যাহাই হউন। ইহা প্রকৃতির নিয়ম, মানুষ যাহাই করুক

না কেন, প্রকৃতি কাহাকেও রেহাই দেয় না; ক্ষমা অনেক সময় করে, কিন্তু সময়ে সময়ে একবারে ছাড়িয়া দেয় না। বিশেষতঃ অল্প পাপীকে গুরু সাজা দেওয়া তাহাকে একবারে শোধরাইবার জন্য। প্রত্যেকে এই সব কথার সত্যতা একটু ভাল করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। আজকালকার সভ্যতা বেশী সাজা দেওয়ার পক্ষপাতী নহে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে স্বার্থক্ষেত্রে সাজা না দিয়া মুক্তি দেওয়া আজও অনেক দূরে। সমাজ-শাসন, রাজার শাসন প্রকৃতির শাসন, ভগবানের ভয় না থাকিলে কি জগৎ অচল হইত না? ভয়-ভাবনাই কি আমাদের দোরস্ত রাখে না? ইহার দৃষ্টান্ত চারিদিকে। যখনই যে কোন কারণেই হউক, সব ভয় অপসৃত হয়, মানুষ নিজমূর্ত্তি যে নগ্ন পশুত্ব, তাহাই ধারণ করে, ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। আমরা এই সমস্ত বলিয়া ক্ষমাগুণের নিন্দা করিতেছি না। ক্ষমা যে কত বড় গুণ, তাহার বর্ণনা করিয়া ইহার মাহাত্ম্য শেষ করা যায় না। ইহার চন্দন যে দেয় এবং যে পায়—উভয়েকই স্নিগ্ধ পবিত্র করে। * দোষ ক্ষমা করা যে অনেক ক্ষেত্রে আবশ্যক, তাহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বুঝি। ক্ষমা না থাকিলে যে আমরা এক দণ্ডও বাঁচিতাম না, তাহা প্রতিদিন অনুভব করি। যদি সব পাপের সাজা আমরা পাইতাম, তবে এত দিন প্রতিপলে, প্রতিমুহূর্ত্তে গুঁড়া হইয়া গেলেও তাহার শেষ হইত না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও সত্য যে, শাস্তি-ভয় জগতের কল্যাণসাধন করিতেছে। সমাজ-শাসন, রাজার শাসন, নীতির শাসন, ধর্ম্মের শাসন—ইহারা যে জগতের প্রকৃত কল্যাণকর, তাহাও না মানিলে চলিবে না। ইহাদের মূলে জগতের কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। এই যে জগন্ময় দুঃখ, ইহাও ত শাসন। শ্রীভগবান্ ভ্রান্ত জীবের সুপথে থাকিবার জন্যই না এই তাপ-দুঃখ সৃষ্টি করিয়াছেন? অজস্র তাঁহার করুণা জগন্ময় জীবের উপর বর্ষিত হইতেছে। এ দানে বঞ্চিত মুহূর্ত্তের জন্য কেহই নহে। তাঁহার এই দান অফুরন্ত, তথাপি দুঃখই তাঁহার যথার্থ স্নেহের দান। নিতান্তই আপনার করিবার জন্য তিনি শোক-তাপ দেন। এত বড় হিতকর দান জীবের আর কিছুই নাই।

[ক্রমশঃ।

শ্রী-

* It blesseth him that gives and him that takes
—Shakespear.

মান-মন্দিরের ব্যথা

কত না গৌরব মোর ছিল এক দিন—
যে দিন ভারত ছিল সজীব স্বাধীন,
ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ ছিল সারা দেশ
নাহি ছিল অন্ন-চিন্তা দুঃখ-দৈন্য-লেশ,
ঘরে ঘরে ছিল শান্তি আনন্দ-উৎসব—
সতেজ মস্তিষ্কে ছিল জ্ঞানের বৈভব।
সুতীব্র আলোক লাগি নব সভ্যতার
সমস্ত গৌরব গেছে যা ছিল আমার,
হৃতমান মৃতপ্রায় আজি আছি প'ড়ে
পুঞ্জিত অতীত স্মৃতি লয়ে বক্ষপরে।
লঘুচিত্ত দর্শকের গুরু-পদভরে
জর্জ্জরিত দেহ মোর খসে আজি পড়ে,
তাহাদের অট্টহাস্য উচ্চ কোলাহল,
ভাঙে মোর স্মৃতি-ধ্যান জীবন-সম্বল।
তরল মানুষ তারা আসে যায় চলি
সারা দেহে রাখি মোর তুচ্ছ নামাবলী। *
কোথা আজি সে মেধাবী জ্যোতিষী-মণ্ডল—
যারা মোর অঙ্কে বসি নিয়ত কেবল
লইত সংবাদ নিত্য সূর্য্য-চন্দ্রমার,
নীহারিকা ধূমকেতু গ্রহ তারকার।
তারা গেছে একে একে আমি আছি হায়,
বিগ্রহ-বিহীন ভগ্ন মন্দিরের প্রায়!
কবে কাল-যবনিকা ঢাকিবে আমায়
ব'সে আছি নিশি-দিন সেই প্রতীক্ষায়।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

---

* অনেকেই কাশীর মান-মন্দিরের গায় নাম লিখিয়া আসেন।

আমার পূর্ব্বস্মৃতি

২

মানুষের বিচার বনাম ভগবানের বিচার

অনেক দিনের কথা, তখন আমি ওকালতির দ্বিতীয় অধ্যায়ে পদার্পণ করিয়াছি অর্থাৎ তখন কেবল এক-তরফা আমিই মক্কেল খুঁজিয়া বেড়াই না, দুই এক জন মক্কেলও আমায় খুঁজিতে আসে। সেই সময়ে রামশঙ্কর মিত্র এক দিন আমার বাটীতে আসিলেন। রামশঙ্কর আমার এক প্রতিবাসীর আত্মীয়। দুই বৎসর পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যালিটীর সহিত তাঁহার এক মামলা ছিল। সেই মামলায় আমার সেই প্রতিবাসীর অনুরোধে আমি তাঁহার পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলাম। মোকদ্দমায় আমার জয়লাভ হয়।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে মিউনিসিপ্যাল কোর্ট টাউনহলে ছিল না। লালবাজারে অন্য অন্য পুলিস আদালতের অবৈতনিক হাকিমদের আদালতে মিউনিসিপ্যাল মামলা হইত। তখন স্বতন্ত্রভাবে বেতনভুক্ মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন না। অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটরাই মিউনিসিপ্যাল মামলার বিচার করিতেন। তাহাতে বিচার ভাল হইত কি মন্দ হইত, তাহা বলা আমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, অতি শীঘ্র সকল মামলা শেষ না হইলেও বিচার বড় মন্দ হইত না। অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটরা ধীরে সুস্থে বিচার করিতেন। আসামীর সকল কথা শুনিতেন, নূতন উকীলেরও দুই কথা বলিবার সুবিধা ছিল এবং তাড়াতাড়ি বিচারের তরঙ্গাঘাতে আসল কথাটা তলাইয়া যাইত না। কারণ, আমার বেশ মনে আছে, এক দিন এক বৈতনিক হাকিমের কাছে একটা রাস্তা-বন্ধের মামলা হইতেছিল। রাস্তায় ইট ফেলিয়া চলাচলের অসুবিধা করার জন্যই এই মামলা উপস্থাপিত হইয়াছিল।

বিচারপতি মহাশয় সে সময়ে বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বরও ছিলেন। যে দিন কাউন্সিল বসিত, সে দিন তাঁহার আদালতে আসিতে প্রায় ১২টা বাজিত। তখন রাস্তা-বন্ধের মামলার আসামীদিগকে—তাহারা সংখ্যায় এত শত কি দেড়শত, কাটগড়ায় শ্রেণীবদ্ধভাগে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইত। সেই দলের অন্যান্য লোকের মধ্যে আমার প্রতিবাসী গাঙ্গুলী মহাশয়ও ছিলেন। তিনি কোন এক কনট্রাক্টরের অধীনে কাম করিতেন। সকালে আমার বাটীতে আসিয়া তিনি বলিলেন, "দেখ, বাবাজী, আমার মনিবের একটি রাস্তা-বন্ধের মামলা আছে—অজুহাত, রাস্তায় মাল রাখিয়া রাস্তা বন্ধ করা হইয়াছিল। এই মামলায় আমার খুব ভাল জবাব আছে। আমার মালিক রাস্তা-বন্ধের জন্য মিউনিসিপ্যালিটীর নিকট হইতে লাইসেন্স লইয়াছেন। এই সেই লাইসেন্স। যদি তুমি বিবেচনা কর, উকীল দেওয়া দরকার, তাহা হইলে তুমি এই মামলায় দাঁড়াইতে পার। আমার মনিব তোমার ফিয়ের জন্য দুটি টাকা দিয়াছেন।"

আমার কাছে সেই সময়ের দুই টাকা, পরবর্ত্তী সময়ের দুই শত টাকার সঙ্গে সমান। তাহা হইলেও তখন আমি নূতন উকীল। মনুষ্যত্ব একবারে হারাই নাই। অভাব থাকিলেও ধনলিপ্সা অতিশয় প্রবল হয় নাই। তখনও অন্যায়ভাবে উপার্জ্জন করিবার স্পৃহা একবারেই ছিল না। আমি বলিলাম, "গাঙ্গুলী মশাই, আপনার কাছে যে দলিলখানা আছে, সেইখানি হাকিমকে দেখাইলেই মামলা জয় হইবে। আপনি মামলার সময় হাকিমকে এই কাগজখানা দেখাইবেন।"

তখন জানা ছিল না যে, আসামী, ফরিয়াদী ও সাক্ষীর নিকট হইতে মামলার বিবেচ্য বিষয় বুঝিয়া লইবার সময় হাকিমদের একবারেই নাই। সেই জন্য পক্ষ-সমর্থন করিয়া সব বিষয় বুঝাইয়া দিবার জন্য উকীলের বিশেষ প্রয়োজন।

য হাকিমের কাছে গাঙ্গুলী মশাইয়ের বিচার হইবে, সেই হাকিমের ঘরে উকীল-শ্রেণীর মধ্যে আমি বসিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য, কিরূপ ভাবে হাকিমের কাছে মামলা-মোকর্দ্দমা হয়, তাহা দেখিয়া শিক্ষালাভ করা। এইখানে বলিয়া রাখি যে, ভাল উকীল হইতে হইলে কতকগুলি নিয়মের অনুবর্ত্তী হইবার প্রয়োজন। তার মধ্যে এইটি প্রধান নিয়ম—যখন কোন কায নাই, সেই সময় হাকিমের এজলাসে বসিয়া কিরূপভাবে মামলার বিচার হয়, তাহা দেখা ও শেখা। পুলিস আদালতে সকলেই ব্যস্ত, হাকিম হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিভাষী, বেঞ্চ-ক্লার্ক, কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর, পেয়াদা, চাপরাসী এবং অপরাপর লোক, সকলেই বিশেষ ব্যস্ত। কাহারও নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই।

হাকিমের সাহায্যের জন্য দ্বিভাষী গাঙ্গুলী মশাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন, রাস্তায় মাল ছিল?"

আদালত-ব্যাপারে অনভ্যস্ত গাঙ্গুলী মশাই বলিলেন—"হাঁ।"

হাঁ বলিয়া চাদরের খুঁটে বাঁধা লাইসেন্সখানি খুলিতে আরম্ভ করিলেন, উদ্দেশ্য হাকিমকে দেখাইবেন।

হাকিম রায় পাশ করিলেন—"দো রূপেয়া।'

হাকিম কিম্বা দ্বিভাষী কাহারও এতটুকু ধৈর্য্য ছিল না যে, জিজ্ঞাসা করেন, লাইসেন্স আছে কি না। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, যখন পুলিস চালান দিয়াছে, আসামী যখন রাস্তায় মাল ফেলা স্বীকার করিয়াছে, তখন ত মামলা হইয়া গেল। হাকিমের মুখ হইতে যেমন "দো রূপেয়া" হুকুম প্রকাশ, অমনই পাহারাওয়ালা দল হইতে তাঁহাকে লক্-আপে লইয়া গেল। চাদরের খুঁট হইতে তাঁহার লাইসেন্স খোলার সুবিধা আর হইল না। তিনি Lock-upএ জরিমানার দুইটি টাকা জমা দিয়া অব্যাহতি পাইলেন। তাড়াতাড়ি বিচার করিতে গেলে বিচার-ফল অনেক সময় এইরূপই হইয়া থাকে।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে মিউনিসিপ্যাল আদালতটি অন্যান্য পুলিস আদালতের সহিত একত্র থাকায় নূতন উকীলদিগের বিশেষ সুবিধা ছিল। ফৌজদারী মামলায় কেহ শীঘ্র নূতন উকীলকে নিয়োগ করিতে চাহেন না। সেই জন্য মিউনিসিপ্যাল আদালতের মামলায় হাত পাকাইবার বিশেষ সুবিধা। আমার বেশ মনে আছে, আমি যখন তিন দিনের উকীল, তখন রাস্তার উপর পর্দ্দা বাড়ানর দরুণ চারিটি মামলা পাইয়াছিলাম—প্রত্যেক মামলার ফিঃ এক-টাকা হিসাবে। আমার পাড়ার এক ময়রার একটি মামলা ও অপর তিনটি লোক তাহারই জানিত দোকানদার, এই চার জন আমাকে নিযুক্ত করিল এবং এক টাকা হিসাবে চার জন চারিটি টাকা দিল। সেই চারিটি টাকা আমার প্রথম তিন দিনের শুষ্ক মুখে হাসি আনিয়া দিয়াছিল। ছেলে-বেলা হইতে দেখিয়া আসিতেছি, অর্থই অনর্থের মূল। এই প্রবাদটি সত্যও হইতে পারে—মিথ্যাও হইতে পারে। তবে ভট্টাচার্য্য মহাশয়রা ও পণ্ডিতগণ বলেন, টাকাটা হাতের ময়লা। ইহা কিন্তু সম্পূর্ণ অমূলক। যদি কোন কিছু দ্রব্যের গুণে হাত বেশ সাফ্ হয়, তাহা হইলে টাকা, টাকা, টাকা।

এক দিন একটি ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমার মনিব-বাড়ী একটি মামলা হইয়াছে, মামলাতে বড় বড় উকীল কৌন্সলি হাজির থাকিবেন, এই মামলা-যজ্ঞে আপনিও এক জন হোতা হইবেন।" আমি তাঁহার প্রস্তাবে বিশেষ খুসী হইলাম এবং মামলার হাল তাঁহার মুখ হইতে যাহা কিছু শুনিলাম, তাহা হইতে বুঝিলাম, মামলাটি এইরূপ :—

তাঁহার মনিব এক জন বিখ্যাত জমীদার, মফঃস্বলে বিস্তৃত জমীদারী আছে, অন্যান্য মফঃস্বলের জমীদারের ন্যায় তাঁহার আয়ের স্থল মফঃস্বলের জমীদারী, ব্যয়ের স্থল সহর কলিকাতা। তিনি কলিকাতার ক্রিক্ রোর নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করেন, নাম—রামেন্দ্রসুন্দর মুখোপাধ্যায়। তাঁহার এক কন্যার বিবাহ উপস্থিত। সেই জন্য দেশ-বিদেশ হইতে তাঁহার অনেক আত্মীয়স্বজন আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিল। সামাজিক নিয়ম অনুসারে, আত্মীয়তা হিসাবে, ধনী নির্ধন উভয় দলকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ধনীদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল—কলিকাতায় আসিয়া বিবাহ-কার্য্যে যোগ দিয়া নিজেদের এবং অপরের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে। গরীব আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল—প্রথম কারণ তাঁহার আত্মীয়, দ্বিতীয় কারণ, তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া দেখিয়া যান—তাঁহাদের ধনী আত্মীয় কেমন সুন্দরভাবে জীবন যাপন করিতেছেন। অন্যান্য গরীব আত্মীয়-আত্মীয়ার মধ্যে সরোজিনী বলিয়া এক বিধবা

ভুবনেশ্বরের মন্দির

[শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের সৌজন্যে]   [শিল্পী—শ্রীসন্তোষ মিত্র]

াহ্মণ-কন্যাও আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি অতি গরীব, দশেও "দিন কান্না পেটে ভাত।" কলিকাতার ধনী াত্মীয়ের বাড়ীতে আসিয়াও সেই অবস্থা। তাঁহার শুষ্ক ীবনকে সরস করিবার জন্য একমাত্র পিতৃহীন পুত্র সুপ্রসন্ন ান্দ্যোপাধ্যায়। বালকটির বয়স ১২ বৎসর। মা যখন াদেন, বালকটি তখন মা'র চোখ মুছায়, আর বালকটি খন কাঁদে, মা তাহাকে কোলে টানিয়া লয়েন। এইরূপে রস্পর পরস্পরকে অসহনীয় দুঃখেও সান্ত্বনাদান করিত।

তাহাদের কলিকাতায় আসিবার চারি পাঁচ দিন পর সই বাড়ীর অন্য একটি বালিকার কণ্ঠ হইতে এক ছড়া হার রি গেল। নিমন্ত্রিত লোক অনেক আসিয়াছিল। চাকর-াকরাণীও অসংখ্য, তাহা ছাড়া সরকার, গোমস্তা, কাচম্যান, সহিস, প্রতিবাসী, প্রজাবর্গ, অনেক লোকই সেই বাড়ীতে যাতায়াত করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই গরীব ছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গরীব সেই, যাহার পিতা জীবিত নাই, অর্থ নাই ও মাতা অতি গরীব, আর াতার পিতাও জীবিত নাই।

চাকর-চাকরাণীদের অযত্ন করিলে তাহারা এক মনিব াড়িয়া অপর মনিবের কাছে যাইবে। ধনী আত্মীয়দের কিছু বলিলে তাঁহারা বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইবেন। কেবল নির্ম্মমভাবে পেষণ পিতৃহীন বালক ও তাহার গরীব বিধবা মাতার উপরই সম্ভব। কাযেই যখন হার পাওয়া গেল না, তখন সেই পিতৃহীন বালকের বিধবা মাতার উপর সন্দেহ হইল। তবে কি উপায়ে এই চৌর্য্য-সন্দেহ তাহার উপর পড়িল, তাহার কোন বিশেষ যুক্তি-তর্ক পাওয়া গেল না। আর যে বাড়ীতে ধনী, নির্ধন লইয়া ১ হাজার লোক মজুত, সেই বাটীতে কেন এই বিধবার উপর সন্দেহ হইল, তাহা স্থির করা গূঢ় সমস্যা। তবে যদি ধরা যায়, স্ত্রীলোকটি অনাথা বিধবা, এই বিস্তৃত দুনিয়াতে তাহার পক্ষ-সমর্থন করিবার লোক কেহ নাই, তাহা হইলে এ সমস্যার মীমাংসা অতি সহজেই হইয়া যায়।

মাল পাওয়া যায় নাই, তাহাতে কি হইল? সে কোথাও লুকাইয়া ফেলিয়াছে।

কোথায় রাখিবে? কলিকাতায় ত তাহার কেহ নাই!

তাহা নাই বা রহিল? যেমন করিয়াই হউক, সে াল সরাইয়া ফেলিয়াছে। তিনি ভদ্রবংশজাত মহিলা, তোমারই আত্মীয়া, তিনি কি এমন নীচ ঘৃণ্য কায করিতে পারেন?

আরে, রাধামাধব! ভদ্রবংশের গরীব লোকরাই—পৃথিবীতে যত দুষ্কর্ম্ম হয়, তাহার জন্য দায়ী! তাহারা না থাকিলে সংসার কত সুখের হইত! তাহাদের জন্য অসুবিধা অনেক, মাসে মাসে কিম্বা সময়ে সময়ে কিছু সাহায্য করিতে হয়! তাহাদের কাতর প্রার্থনা তোমার কাণে আসিলেই তোমার মেজাজ খারাপ হইয়া যায়, তাহা ছাড়া সময়ে সময়ে এরূপ চুরিও হয়।

গৃহকর্ত্তা স্থির করিলেন, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও পার্শ্ব-চররাও স্থির করিল, এই সরোজিনীই হার চুরি করিয়াছে। কারণ, দুনিয়াতে আপন বলিবার তাহার কেহ নাই।

যে হারটি চুরি গিয়াছে—তাহার মূল্য ১ শত টাকার বেশী নহে। সেই বিবাহে ৫০ হাজার টাকার খরচের বরাদ্দ, সেই মহোৎসবে ১ শত টাকার দ্রব্য চুরি গেলেও রামেন্দ্র-সুন্দর বাবুর অধীর হইবার বিশেষ কারণ ছিল না। কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়? বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা, প্রবল-প্রতাপান্বিত প্রবল-পরাক্রান্ত জমীদারপুঙ্গব রামেন্দ্রসুন্দরের বাড়ী চুরি!

রামেন্দ্রসুন্দর দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন। তবে অত্যন্ত অহঙ্কারী ও একগুঁয়ে। তিনি যাহা অপছন্দ করেন, তেমন কোনও ব্যাপার ঘটিলে তিনি কখনই তাহা সহ্য করিতে পারেন না। তিনি এই বিবাহ উপলক্ষে অম্লান-মুখে ৫ হাজার টাকা দান করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহার দুঃস্থা আত্মীয়া তাঁহার বাড়ী হইতে ১ শত টাকা মূল্যের দ্রব্য চুরি করিবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি যাহার তাহার সহিত বড় একটা মিশিতেন না, যাতায়াতও যেখানে সেখানে ছিল না। জমীদার বাবু খুব সাজিয়া গুজিয়া দমদম নাগের বাজারে নিজের বাগানে, ১৯ নং পার্ক ষ্ট্রীট, গ্রাণ্ড ডিষ্ট্রীক্ট লজ ভবনে যাইতেন আর যাইতেন কলিকাতা, বারাকপুর ও টালিগঞ্জের ঘোড়-দৌড়ের মাঠে।

সাধারণতঃ অন্যত্র তাঁহার গতিবিধি ছিল না। তবে মাঝে মাঝে থিয়েটার ও বায়স্কোপে তাঁহার শুভগমন হইত। যখন ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, সরোজিনী চোর, তখন তাহার ও তাহার অনাথ বালকের উপর জুলুম আরম্ভ হইল। প্রথমে দোষারোপ, দ্বিতীয় ঐ দোষারোপের পুনরাবৃত্তি,

তৃতীয় গালিবর্ষণ, চতুর্থ ভয়প্রদর্শন, পঞ্চম শরীরের উপর আক্রমণ অর্থাৎ চড়, কিল, ঘুষি-বর্ষণ। ষষ্ঠ খানসামা ও কোচম্যানের দ্বারা প্রহার ও নির্য্যাতন। যখন এই সব চলিতেছে, তখন এক জন নীচপ্রকৃতি পার্শ্বচরের মাথায় আসিল যে, রমণী চুরি করিয়া তাঁহার শরীরের কোন গুপ্ত-স্থানে হারটি রাখিয়া দিয়াছেন। বাবুর কাছে এই মত প্রকাশ হইবামাত্র বাবু বুঝিলেন, এতক্ষণ পরে গূঢ় রহস্যের বিশ্লেষণ হইল। প্রথমে স্ত্রীলোকের দ্বারা তল্লাসী করা হইল, তার পর ছেলেদের খাতায় লাইন কাটিবার রুলের দ্বারা হারের সন্ধান লওয়া হইল। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অত্যাচার, অমানুষিক নির্য্যাতনফলে বিধবা সরোজিনী ভগবানের শরণ লইলেন, অর্থাৎ যতই তাঁহার উপর প্রহার ও নির্য্যাতন হইতে লাগিল, ততই তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন, "ভগবান্ রক্ষা করুন, ভগবান্ রক্ষা করুন।" ভগবান্ তাঁহার সকরুণ প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন।

সকলেরই একটা সীমা আছে। মানুষের শরীরে সহ্য করিবার ক্ষমতারও সীমা আছে। প্রবাদ—"শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াও তাই সয়।" কিন্তু ইহারও ব্যতিক্রম আছে। সেই ব্যতিক্রম সরোজিনীর উপর খাটিল, অর্থাৎ মৃত্যুদেবী তাঁহাকে কোলে টানিয়া লইলেন। অত্যাচারিতা, প্রপীড়িতা সরোজিনীর সকল কষ্টের অবসান হইল, কিন্তু অত্যাচারী প্রপীড়কের কষ্টের ভোগ আরম্ভ হইল।

এই অত্যাচারের কথা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সকলেই এই কথা লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিল। এই আন্দোলনকারীদের মধ্যে কেহ পুলিস কমিশনারের কাছে নাম-ধাম না দিয়া একখানি দরখাস্ত করিল। যদিও অনেক সময় এইরূপ দরখাস্তের ফলে দরখাস্তখানি ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলিয়া দেওয়া হয়, সময়ে সময়ে পুলিসের লোক এইরূপ দরখাস্তের উপরে নির্ভর করিয়া অনুসন্ধানও করে। বিশেষ যখন এইরূপ চিঠিতে গুমখুন ইত্যাদি কথা লেখা থাকে। নাম-ধাম না থাকিলেও এই দরখাস্তের ফলে পুলিস তদারক আরম্ভ করিল এবং করোনারের কাছে মৃত্যুর কারণ অন্বেষণের জন্য কাগজ পেশ করা হইল। করোনার মহাশয় চিরন্তন প্রথা অনুসারে জুরী আহ্বান করিলেন। লাস পরিদর্শন করিলেন এবং অনুসন্ধানের দিন স্থির করিলেন। সেই অনুসন্ধানের দিন ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্থিরীকৃত ছিল। সেই তদন্তের সময় হাজির থাকিবার জন্য জমীদারের কর্ম্মচারী রামশঙ্কর মিত্র আমার কাছে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "মহাশয় আমার মামলায় অনুগ্রহ করিয়া আমি গরীব বলিয়া কোন পয়সা লন নাই, বর্ত্তমান মামলা বড় লোকের, আপনি যেমন ইচ্ছা ফি লইবেন, তাহাতে আমার বলিবার কিছুই নাই।" তিনি আরও বলিলেন যে, ফৌজদারীর সুযোগ্য ব্যারিষ্টার মিঃ পি, এল, রায় মহাশয় এই মামলায় নিযুক্ত আছেন।

তাহার পরদিন রায় মহাশয়ের সহিত এই মামলা কিরূপভাবে চালাইতে হইবে, তাহার পরামর্শ হইল। এই পরামর্শের দরুণ আমি একটি ফি পাইলাম। শুনিলাম, রায় মহাশয়ও একটি ফি পাইবেন। জমীদার মহাশয় পরামর্শ-স্থলে উপস্থিত থাকিয়া বলিলেন, "দেখুন মহাশয়, টাকার জন্য আমি গ্রাহ্য করি না, মোকর্দ্দমা যত দিন ইচ্ছা চলুক, কিন্তু শেষে যেন আমাকে বিপদে না পড়িতে হয়।" আমরা দুই জনেই তাঁহাকে বলিলাম, "যতদূর সম্ভব, আপনাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিব।"

মামলা খুব জোরে চলিতে লাগিল। মামলার দরুণ পরামর্শ খুব হইতে লাগিল। দুই দিন গিয়া জমীদারের বাড়ীর অকুস্থানটি দেখিয়া আসা গেল। ষোড়শ উপচারে মামলা উপদেবীর পূজা হইতে লাগিল। করোনারের কাছে তিন দিন মামলা চলিল। দুঃখের বিষয়, চতুর্থ দিনে এই মামলার শেষ পরিচ্ছেদের শেষ অঙ্কে যবনিকাপাত হইল। করোনারের আদালত অনেক দিন হইতেই আছে। এই কোর্ট সহরের জন্য। কলিকাতা বড় সহর, কাযে-কাযেই এখানে করোনারের আদালত আছে। করোনার 'সাহেব' যৎসামান্য পারিতোষিক লইয়াই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। অধিকাংশ কার্য্যকলাপই সেই কোর্টের দ্বিভাষী প্রিয়নাথ বসু মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এই আদালতের উপকারিতা কি, তাহা এই আদালতের সংশ্লিষ্ট লোকগুলি ছাড়া আর কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। প্রিয়নাথ বাবুই সেই আদালতের একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। তবে লোকটি অতি ভদ্র। সাধারণের উপকারের জন্য সদাই ব্যস্ত ও প্রস্তুত। লোকের বিপদে তিনি তাঁহার সুবিধা খোঁজেন না, বরং তাহাদের সাহায্যই করেন

প্রত্যেক বিচারালয়ে এইরূপ লোক থাকিলে জনসাধারণের অনেক সুবিধা হইত।

অধুনা যাঁহারা করোনার আদালতে গিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, চারিটা বর্শা উক্ত আদালতে রক্ষিত আছে। যখন কোন মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর বিষয় বিচারের জন্য করোনারের ডাক পড়িত এবং সে সময়ে এ জন্য কোন নিরূপিত আদালত-গৃহ ছিল না, তখন করোনারের লোকরা ঐ চারিটা বর্শা লইয়া মৃতদেহের চারিদিকে পুঁতিয়া দিত। যতটা যায়গা লইয়া বর্শা পোতা হইত, ততটা সেই সময়ের জন্য করোনারের অধিকারভুক্ত হইত এবং সেই যায়গাতেই করোনারের আদালত বসিত।

করোনার আদালতের প্রথম দিনের অধিবেশনটি, সেই প্রাচীন যুগের প্রবর্ত্তিত প্রথা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এখানে লিপিবদ্ধ হইল।

করোনারের প্রধান কর্ম্মচারী বা "ক্লার্ক" জুরীদিগকে সম্বোধন করিয়া এই বলিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন :—

"Yez Yez Yez (ও ইয়ে ও ইয়ে ও ইয়ে) You good men of this Town of Calcutta and Factory of Fort William summoned to enquire this day touching the death of—— answer to your names every man at the first call upon the pain and peril that shall fall theron."

প্রথম দিনের কার্য্য শেষ হইয়া গেলে উক্ত আদালতের কর্ম্মচারী এই বলিয়া কার্য্য শেষ করেন :—

"Gentlemen, the Court doth dismiss you for this time, but requires you severally to attend this Court on ——. When all persons cognisant of the circumstances of the death of this person will come forward and they will be heard."

দ্বিতীয় দিবসে কর্ম্মচারী এই বলিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন :—

"Yez Yez Yez all manner of persons who have anything more to do at this inquest touching the death of——come forward and they wlll be heard, and you gentlemen of the Jury who have been empanelled and sworn upon this inquest touching the death of——answer to your names and save your recognizances" (Jervis—"On the duties cf Coroners").

করোনার কোর্টের ইতিহাস-পুস্তক হইতে দেখা যায়, পূর্ব্বে এই কার্য্যপ্রণালীটি প্রাচীন ইংরাজীতে পঠিত হইত। মিঃ এফ, জি, উইগ্‌লি এক সময় করোনার ছিলেন। পরে লেজিস্‌লেটিভ বিভাগের সেক্রেটারী ঐ পদ অধিকার করেন। তিনি পুরাতন ইংরাজীর বয়ানটি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, মামলাটিতে আমাদের জিত হইল অর্থাৎ আমাদের জমীদার বাবুটি যে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে এই স্ত্রীলোকটির মৃত্যুর জন্য দায়ী, তাহার কোনই প্রমাণ পাওয়া গেল না। অর্থাৎ হচ্ আদালতের ভাষায় মোকর্দ্দমাটিতে প্রমাণরাহিত্য দেখা গেল।

এই মামলার সাক্ষিগণের মধ্যে একটি সাক্ষীর কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। সে সাক্ষীটি আর কেহই নহে—হতভাগিনী মৃত স্ত্রীলোকটির পুত্র সুপ্রসন্ন বাঁড়ুয্যে, বয়স ১২ বৎসর। জমীদার মহাশয়ের নায়েব ও কার্পরদাজ ও আত্মীয়রা সকল সাক্ষীকেই শিখাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাহাদের বিশেষ গুণপনা প্রকাশ পাইয়াছিল মৃত অভাগিনীর জীবন্ত পুত্র সুপ্রসন্ন বাঁড়ুয্যে সাক্ষীকে শেখান। অপর অপর সাক্ষী আসিয়া বলিল—স্ত্রীলোকটি কিরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা তাহা জানে না। বার-বাটীতে যেখানে দূর ও গরীব আত্মীয়রা থাকিত, এই স্ত্রীলোকটি সেই স্থানে থাকিত। চাকর, চাকরাণী ও দূর-আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎ হইত, জমীদার বাবুর সহিত সাক্ষাতের সুবিধা তাহার একবারেই ছিল না। বাটীর যে অংশে ইহারা থাকিত, সে অংশে জমীদার বাবুর পদার্পণ একবারেই সম্ভবপর নহে। আমি জমীদার বাবুর প্রধান তদ্বিরকারের মুখে এই সাক্ষীদের কথা যখন শুনিয়াছিলাম, তখন বলিয়াছিলাম, "মিত্র মহাশয়, হাকিম কি এ সাক্ষ্য বিশ্বাস করিবেন?"

তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "উকীল বাবু! আপনাদের কলিকাতার ফৌজদারী আদালতের উকীল, কৌন্সলি ও এটর্ণীরা বড়ই ভীরু। তাঁহারা দেখেন, হাকিম কি ভাবিবে, জুরী কি ভাবিবে ইত্যাদি। আরে মশাই, কতক পরিমাণে প্রমাণ হইলে তবে এ সব কথার সার্থকতা হইতে

পারে, সম্ভবপর কি অসম্ভবপর। কিন্তু মোটেই যখন প্রমাণ হইল না, তখন হাকিমই বা কি করিবেন, জুরীই বা কি করিবে? আর তাঁহারা যা-ই ভাবুন না কেন, তাহাতে কাহারও কিছু লাভ-লোকসান নাই। আমাদের দেশে ফৌজদারি আদালতের আইন-ব্যবসায়ীরা কেটে জোড়া দেন। সাক্ষীর জবানবন্দীর ভার তাঁহারা নিজেই লন। আর আপনাদের কলিকাতায় উকীল বাবুরা সাক্ষীর জবানবন্দীর ভার ত একেবারেই লন না, বরং বলেন, এটা জজ বিশ্বাস করিবেন না, ওটাতে হাকিমের মনে সন্দেহ হইবে ইত্যাদি।"

সেইখানে রামেশ্বর বর্ম্মন্ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, "আরে মশাই, কলিকাতায় আর কলিকাতার বাহিরের প্রভেদ আকাশ-পাতাল। কলিকাতার উকীলদের কাছে একটি মামলা লইয়া যান, তাঁহারা বলিবেন, কি প্রমাণ আছে, কি সাক্ষী আছে। আপনি যে কথা বলিতেছেন, তাহা প্রমাণ করিবেন কি সাক্ষীর দ্বারা? আর কলিকাতার বাহিরে যান, অনেক উকীল বাবু আছেন—যাহারা বলেন, মশাই ভাল করিয়া ফুরণ করিয়া দিন, সাক্ষী-সাবদের ভার আমার টুর্ণীর উপর দিন। সে সব দেখিয়া শুনিয়া ঠিক করিয়া দিবে।"

যাহা হউক, সেই দ্বাদশ বর্ষের মাতৃহারা সন্তান যখন সাক্ষ্য দিতে কাঠগড়ায় উঠিল, জমীদার বাবুর নিয়োজিত চার জোড়া চোখ তাহার উপর সিংহের দৃষ্টির ন্যায় পড়িয়া রহিল। বালকটি কাঠগড়ায় চড়িয়া আশু বলিদানের জন্য প্রস্তুত ছাগশিশুর ন্যায় কাঁপিতে লাগিল

প্রঃ। তোমার নাম কি?

উঃ। সুপ্রসন্ন।

প্রঃ। কার ছেলে?

উঃ। মায়ের।

প্রঃ। তোমার বাপের নাম কি?

উঃ। জানি না।

প্রঃ। তোমার মা জীবিত না মৃত?

উঃ। মৃত।

প্রঃ। কবে মরিলেন?

উঃ। দিন কতক আগে।

প্রঃ। কোথায় মরিলেন?

উঃ। বাবুদের বাড়ীতে।

প্রঃ—তোমরা কি এইখানে বাস কর?

উঃ—না, বিয়ের নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলাম।

প্রঃ—তোমার মা ম'ল কেন?

উঃ—তা ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

প্রঃ—কেউ কি তার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল?

(বালক ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল)

প্রঃ—কেউ কি তাহাকে মারিয়াছিল?

উঃ—(বালক কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল)—আমরা অত্যন্ত গরীব।

প্রঃ—কিছু বেয়ারাম হইয়াছিল?

উঃ—তা জানি না।

প্রঃ—তবে কেন মরিল?

উঃ—(বালক কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল) আমরা অতি গরীব। তিনি মরিয়া সকল জ্বালার হাত হইতে এড়াইয়াছেন।

প্রঃ—তুমি আর কিছু জান?

পাশ হইতে দুই জন কাপরদার ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিয়া উঠিল—ছোট ছেলে আবার কি জান্‌বে? তার আশে-পাশে যে সকল লোক ছিল, সকলেরই উগ্রমূর্ত্তি, বালক বিশেষ ভীত হইল—বলিল—"না।"

করোনার কোর্ট বক্তৃতার যায়গা নহে। উকীল-কৌন্সলি কেহই বক্তৃতা করিবার বড় একটা সুবিধা পান না, সকল পক্ষেই সেই ব্যবস্থা। বক্তৃতা করেন কেবল করোনার নিজে। অধিকাংশ সময়েই তিনি যেরূপ চার্জ্জ দেন, জুরী সেইরূপভাবেই মাথা নাড়ে। দুই এক জন জুরর মামলার সময় প্রশ্ন করেন বটে, কিন্তু রায় দিবার সময় করোনারের মতে মত দেন। এই প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে পড়িল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বরাইচ জেলায় সেসন আদালতে আমি একটি মামলা করিতে যাই। মামলার 'চার্জ্জ' ছিল বিশ্বাসঘাতকতা, তহবিল তছরূপ, প্রতারণা ও খাতা জাল করা। এ স্থানটি লক্ষ্ণৌ হইতে ৭০ মাইল দূরে এবং নেপাল সীমান্ত হইতে ৩০ মাইল পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। সেখানে বিচার এসেসরের সাহায্যে হয়। জেলা-জজ অল্পবয়স্ক এক জন ইংরাজ—অতি ভদ্রলোক—স্থানটি আমাদের এখানকার non-regulated provinceএর মত।

প্রথম যে দিন বিচার আরম্ভ হইল, বিচারক আসিয়

তাঁহার মঞ্চে বসিলেন। এসেসর কয় জন জুতা খুলিয়া শুধু পায় বিচারকের দুই পার্শ্বে ও মঞ্চের পশ্চাদ্ভাগে গিয়া বসিলেন। একটি বৃদ্ধ মুসলমান মোক্তার—আমি যে তরফের জন্য হাজির হইয়াছিলাম, তিনিও সেই তরফ হইতে আমায় সাহায্য করিতেছিলেন। তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয়, এখানকার এসেসরগুলি সাধারণতঃ কি রকম?' তাহাতে তিনি বলিলেন—'মশাই, এরা সকলেই 'যো হুকুমবাজ'। রায়েতে বলেন, হুজুরের যা মত, আপাততঃ আমাদেরও তাই মত। পরে যদি হুজুরের মত বদ্‌লায়, তা হ'লে আমাদের মত বদ্‌লাইবে, অর্থাৎ হুজুরের যখন যা মত, আমাদেরও তখন তাই মত।' করোনারের জুরীদিগের সব সময়ে সেইরূপ মত কি না, জানি না, তবে অনেক সময়েই সেইরূপ।"

করোনার আদালতের অস্তিত্বের উপকারিতা যে কি, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কয় জন ভদ্রলোক এজন্য প্রতিপালিত হন, ইহা ছাড়া এ আদালতের প্রয়োজনীয়তা জানি না। যাক্, করোনারের রায়ে জমীদার মহাশয় অব্যাহতি পাইলেন। পুলিস আর এ বিষয়ে কিছু হস্তক্ষেপ করিল না. আর হস্তক্ষেপের প্রয়োজনও ছিল না। মানুষের বিচারে জমীদার মহাশয় অব্যাহতি পাইলেন—অবশ্য কিঞ্চিৎ অর্থ-দণ্ডের পর। কিন্তু ভগবানের বিচারে তাহা হইল না।

আমার মনে কিন্তু একটা আক্ষেপই রহিয়া গেল। তাহা ছাড়া মানুষের বিচারের উপর অনাস্থাও জন্মিল। একটি গরীব অনাথা স্ত্রীলোক প্রাণ হারাইল, অথচ কে প্রকৃত দোষী, ইহার কোন কিনারা হইল না। আমার মনে হইতে লাগিল, ধর্ম্ম ও বিচার বলিয়া কোন জিনিষ নাই। তাহা যদি থাকিত, তাহা হইলে জমীদার মহাশয় কৌন্সলি রায় মহাশয়কে এবং উকীল আমাকে এবং অপর কয় জনকে অর্থদণ্ড দিয়া মানুষের বিচারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া এখন সুখে দিনযাপন করিতে পারিতেন না।

এই ঘটনার প্রায় ৮ মাস বাদে এক দিন জমীদার মহাশয়ের সরকার মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। কৌতূহল-প্রণোদিত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, আপনাদের বাবু কেমন আছেন?" তিনি বলিলেন, "শোনেননি মশাই? আজ তিন মাস হইল, তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।"

জমীদার মহাশয়ের গন্তব্য স্থান বিষয়ে মিত্র মহাশয়ের সহিত আমার মতদ্বৈধ থাকিলেও আমি প্রকাশ্যে তাঁহার গন্তব্য স্থানের কথা কিছু বলিলাম না, কিন্তু এটা আমার মনে হইল, কালের নিয়মে প্রত্যেক মানুষ ত মরিবে। ইহা হইতে ভগবানের বিচার ত কিছু বুঝা গেল না। আমি উৎসুক হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, কিসে তিনি মারা যান?"

তখন মিত্র মহাশয় বলিলেন, "তবে শুনুন, ঐ মোকর্দ্দমার রায় বেরুবার পরে তিনি তাঁর দমদমার নাগের বাজারের নিকট 'প্রমোদ-কাননে' গেলেন, সেখানে তাঁর সঙ্গে দুটো কুকুর ও দুটো কুকুরের বাচ্ছা লইয়া গেলেন। তিনি নিজেই সেই বাচ্ছা দুটোকে সাবান দিয়া স্নান করাইতেছিলেন,—হায় রে! গরীবের অনেক ছেলে এরূপ ভাবে স্নান করিতে পায় না, আর মহান্‌প্রকৃতি মানবরা তাহার কোন সাহায্য করেন না। যাই হোক্, যখন তিনি কুকুরকে স্নান করাইতেছিলেন, একটা কুকুরের বাচ্ছা তাঁহাকে কামড়াইয়া দিল। কয় দিন বাদে তিনি জলাতঙ্ক পীড়ায় প্রপীড়িত হইলেন। যে কয় দিন তিনি পীড়িত ছিলেন, ডাক্তাররা যমযন্ত্রণা অপেক্ষাও তাঁহাকে যন্ত্রণা দিলেন—অবশ্য পয়সা লইয়া। একে বড় লোক, পয়সা অনেক, তাতে সরকার-গোমস্তা অনেকগুলি, কোন ডাক্তারই তাঁহার নিজের নিজের অংশ হইতে বঞ্চিত হইলেন না। খুব ঘটা করিয়া চিকিৎসা হইল বটে, কিন্তু ফলে কিছু বিশেষ সুবিধা হইল না। তিনি যখন এই ব্যারামে পড়িয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, তখন প্রায়ই বলিতেন, আমি অনাথা বিধবা স্ত্রীলোককে যে যন্ত্রণা দিয়াছি, তাহার চতুর্গুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। শেষে এক দিন কুকুর-ডাক ডাকিতে ডাকিতে তিনি দেহত্যাগ করিলেন।"

এই কথা শুনিয়া আমার মনে হইল, অর্থ-ব্যয় করিয়া মানবের বিচার ক্রয় করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ভগবানের বিচার ক্রয় করা যায় না। লোক যখন মোকর্দ্দমা করে, অধিকাংশ সময়েই তাহারা ভুলিয়া যায় যে, অর্থের দ্বারা মানুষকে ভুলান সম্ভব, কিন্তু ভগবান্ নিত্য বিদ্যমান।

শ্রীতারকনাথ সাধু (সি, আই, ই, রায় বাহাদুর)।

(১৪) ভোলানাথের প্রতিপত্তি ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি

কোন এক আসরে ভোলানাথ কবি-গান করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে কর্ত্তারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাঙ্গালা-দেশের কোন্ স্থানে কি ভাল জিনিষ পাওয়া যায়? তদুত্তরে ভোলানাথ এই উত্তর দিয়াছিলেন (১):—

ময়মন্‌সিংহের মুগ ভাল, খুলনার ভাল খই,
ঢাকার ভাল পাত-ক্ষীর, বাঁকুড়ার ভাল দই।
কৃষ্ণনগরের ক্ষীর-পুরী ভাল, মালদহের ভাল আম,
উলোর ভাল বাঁদর-বাবু, মুর্শিদাবাদের জাম।
রংপুরের শ্বশুর ভাল, রাজসাহীর জামাই,
নোয়াখালির নৌকা ভাল, চট্টগ্রামের ধাই।
শান্তিপুরের শাড়ী ভাল, গুপ্তিপাড়ার মেয়ে,
মাণিককুণ্ডের মূলো ভাল, চন্দ্রকোণা ঘিয়ে।
দিনাজপুরের কায়েত ভাল, হাবড়ার ভাল শুঁড়ি,
পাবনা-জেলার বৈষ্ণব ভাল, ফরিদপুরের মুড়ি।
বর্দ্ধমানের চাষী ভাল, চব্বিশ-পরগণার গোপ,
পদ্মানদীর ইলিস ভাল,—কিন্তু বংশ-লোপ।
হুগলীর ভাল কোটাল লেটেল, বীরভূমের ভাল ঘোল,
ঢাকের বাদ্যি থাম্‌লেই ভাল,—হরি হরি বোল!

(১৫) ভোলানাথ ও মহারাজ নবকৃষ্ণ

কবি-গুরু হরু ঠাকুর (হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী বা দীর্ঘাড়ি) কলিকাতা শোভবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। ভোলানাথও হরু ঠাকুরের দলে প্রথমে "জিল" দিতেন। তৎপরে স্বীয় কবিত্ব-শক্তি ও প্রতিভাবলে তাঁহার বিশেষ স্নেহ-ভাজন হন। স্নেহ-সূত্রে ভোলানাথও ক্রমে ক্রমে মহারাজ নবকৃষ্ণের নজরে পড়িয়াছিলেন। মহারাজের জীবনের শেষ দশায় ও হরু ঠাকুরের স্বীয় দল ত্যাগ করিবার শেষাবস্থায় ভোলানাথ তাঁহার বাটীতে কয়েক আসর কবি-গান করিয়াছিলেন। মহারাজ নবকৃষ্ণের মত অন্য কোন কলিকাতার ধনাঢ্য লোক মহা-সমারোহে দোল ও দুর্গোৎসব করিতে পারেন নাই। রাজবাটীতে কোনরূপ উৎসব হইলে মহারাজ নবকৃষ্ণ ভোলানাথকে সন্দেশ, মিঠাই প্রভৃতি মিষ্টান্ন দিবার আদেশ দিতেন। এক বৎসর মহারাজ, ভোলানাথকে মিষ্টান্ন দিবার আদেশ না দিয়া বালাখানার কোন এক ময়রাকে ইহা দিবার আদেশ দিয়াছিলেন। কেবল মুড়ি, মুড়কি, খই ও বাতাসা প্রভৃতি সামান্য জিনিষগুলি দিবার ভার ভোলানাথের উপরি অর্পিত হইয়াছিল। সেই বৎসরেই দুর্গা-পূজার রাত্রিতে ভোলানাথের দলের বায়না হইয়াছিল। মিষ্টান্নের অর্ডার না পাওয়ায় ভোলানাথের বিষম মনঃকষ্ট হইয়াছিল। ভোলানাথ আসরে দাঁড়াইয়া মনের দুঃখে মহারাজ নবকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া গাহিলেন :—

লাগলো ধূম, গুড়্ ম গুড়্ ম্, দশ-ভুজার পূজা,
বহু বায়, লোকে কয়, কর্ব্বেন্ শোভা-বাজারের রাজা।
লুচি পুরী খাজা গজা আর সরভাজা,
বাবু-ভায়ারা খাবেন নানা বস্তু তাজা তাজা।
কারো ভাগ্যে হ'লো ভুজা, কারো ভাগ্যে মজা, (১)
এই সব দেখে ভোলার হাড় ভাজা ভাজা।
আসরে বুঝিয়া লব, কেন ভোলার সাজা,
বিচার করুন নবকৃষ্ণ মহারাজা!

---

(১) ভোলানাথের প্রসার-প্রতিপত্তি কিরূপ ছিল, তাহা উল্লিখিত কবিতা হইতেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। ময়মনসিংহ, খুলনা, ঢাকা, বাঁকুড়া, নদীয়া, মালদহ, চব্বিশ-পরগণা, মুরশিদাবাদ, রঙ্গপুর, রাজসাহী, নোওয়াখালি, চট্টগ্রাম, হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, দিনাজপুর, হাওড়া, পাবনা, ফরিদপুর, বীরভূম—এই সকল জেলায় ভোলানাথ কবি-গাহনা করিতে যাইতেন। তাঁহার এরূপ বলবতী তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল যে, কোন্ জেলা কিসের জন্য প্রসিদ্ধ, তাহারও প্রতি বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়াছিলেন।—লেখক

(১) "কারো ভাগ্যে হলো ভুজা"—ভোলানাথের দুরদৃষ্টে ভুজার (মুড়ি, মুড়কী, খই, বাতাসার) অর্ডার হইল। ইহাতে ভোলানাথের সামান্য লাভ হইবে। "কারো ভাগ্যে মজা"—বালাখানার দোকানদার মিঠাই, সন্দেশের অর্ডার পাইয়াছে, এ জন্য তাহার বিলক্ষণ লাভ হইবে।

স্বর্গত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে উক্ত প্রস্তাব ও ছড়াটি শুনিয়াছিলাম। সিমলার প্রসিদ্ধ সন্দেশওয়ালা স্বর্গত তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ও উক্ত গল্প এবং ছড়াটি আমাকে এক দিন বলিয়াছিলেন। প্রায় ৫।৬ বৎসর হইল, ৮৬ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ভোলানাথের সম্বন্ধে তিনি আমাকে দুই তিনটি গান ও গল্প বলিয়াছিলেন।—লেখক

(১৬) ভোলানাথ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়

যখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে "সংস্কৃত উদ্ভট-কবিতা" সংগ্রহ করিতে যাইতাম, তখন তিনি মধ্যে মধ্যে ভোলানাথের গল্প বলিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে ভোলানাথের প্রশংসা ধরিত না। এক দিন মদীয় অধ্যাপক স্বর্গত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রামগতি ন্যায়রত্ন ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের পূর্ব্বেই সেখানে গিয়া বসিয়াছিলাম। সে আজ ৪৭ বৎসরের কথা। কথায় কথায় রাজকৃষ্ণ বাবু ভোলা ময়রার কথা তুলিলেন। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় স্পষ্টাক্ষরেই বলিলেন, ভোলার মত তেজস্বী, বুদ্ধিমান্ ও উপস্থিত কবি আমি দেখি নাই। ভোলার জুড়ি মেলা ভার। আসরে দাঁড়াইয়া সে যে কি করিয়া তৎক্ষণাৎ উপস্থিত জবাব দিত, তাহা এখন ভাবিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়।" তিনি তৎকালে আরও বলিলেন, বাঙ্গালা দেশে সমাজের অবস্থা দিন দিন কলুষিত হইয়া যাইতেছে। এখন ভোলা ময়রা নাই যে, দু-কথা কয়।" বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই দিন একটি পাকা কথা বলিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, "ভোলার গান ও কবিতায় খাঁটি ভাব ও ভাষা আছে। বর্ত্তমান সময়ের কবিগণের মত ভোলানাথ 'ধোঁয়া কবি' বা 'কোয়াসা কবি' ছিল না। যেটুকু বলিবার কথা, তাহা সে অতি সরলভাবে ব্যক্ত করিতে পারিত।" রাজকৃষ্ণ বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধোঁয়া-কবি" বা "কোয়াসা কবি" কাহাকে বলেন? তদুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় কহিলেন, "ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু ও বঙ্কিম যাহাকে 'কোয়াসা-কবি' বলে, আমি তাহাকেই 'ধোঁয়া' কবি বলি। অর্থাৎ যে কবিতার ভাব অস্পষ্ট ও বিকলাঙ্গ, তাহাই এই দুই নামে অভিহিত হয়।" রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এরূপ কবিতাকে 'কপিতা' বলাও চলিতে পারে।" তৎকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে ৮।১০টি ভোলা ময়রার গান সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নিম্ন-লিখিত গানটি ভিন্ন অন্য গানগুলি খুঁজিয়া পাইতেছি না। কয়েক বৎসর হইল, তাঁহার দৌহিত্র স্বর্গত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মুখেও উক্ত গানগুলির ২।৩টি শুনিয়াছিলাম; কিন্তু আলস্য করিয়া লিখিয়া লই নাই। এখন ইহার অভাব অনুভব করিতেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় আরও বলিয়াছিলেন, "ভোলা ময়রার কবি-গাওনা শুনিতে আমি বড়ই ভালবাসিতাম। এক দিন হালসি-বাগানে তাহার কবি-গান শুনিতে গিয়াছিলাম। শুনিলাম, ভোলা ও এণ্টনি সাহেবের লড়াই হইবে। সেই আসরে লোকের এত ভিড় হইয়াছিল যে, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। ভোলা, এণ্টনি-সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিল" :—

ওরে সাহেবের পো এণ্টনি!
তোর কটা বাপ, বল্ শুনি;
না বল্‌তে পারলে দেখবি আজ, ভোলার কেমন শক্ত ঘানি॥
বিলাতে তোর আসল বাবা, এখানে তোর পাদরী বাবা,
তোর মত হাবা-গোবা, আমি আর দেখিনি॥
পথে ঘাটে দেখিস্ যারে, বলিস্ বাপ অমনি তারে,
যেতে হবে শীঘ্র গোরে, তার কিছু তুই কর্‌লিনি॥
শোন্ রে গুণধর, তোর নাই বংশধর,
তোর বংশ-রক্ষার বন্দোবস্ত করবে তোর বাম্‌নী। (১)
তোর রসবতী গুণবতী ঘরের শ্রীমতী,
জুটবে তার শত শত সুরসিক পতি,
কফিনে পা দিবি পুরে, ঢ়ক্‌বি গিয়ে অমনি গোরে,
যিশু বল্‌বি বদন-ভরে, তার উপায় কি বল্ শুনি॥
না ভজিলে বিষ্ণু-নাম, তোর গোরে ডাক্‌বে ব্যাঙ,
ভেঙে দেবে তোর ঠ্যাং, যত মাম্‌দো ভূত আর পেতিনী॥

ভোলানাথ যে ঘোর বৈষ্ণব ছিলেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কথায় কথায় তিনি 'কৃষ্ণ' নাম করিতেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি নিত্য গঙ্গাস্নান করিতেন। তাঁহার মিঠাইএর দোকানে বসিয়াই তিনি গঙ্গা দর্শন করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, ভোলানাথ বৈষ্ণবোচিত তিলক-সেবা ও তুলসীর মালা ধারণ করিতেন। ভোলানাথের স্বরচিত গান ও ছড়া হইতেই এই সকল বিষয় সপ্রমাণ হয়।

(১) "জাতি পাতি নাহি মানি,
(ওগো মোর) কৃষ্ণ-পদে আশ।"

(২) "বসন্তের কুহু শুনে, ভক্তি-চন্দন সনে,
কৃষ্ণপদে মন-ফুল সাজি।"

(৩) "কৃষ্ণ হওয়া কি সহজ কথা, কৃষ্ণ বলিস্ কারে?
সংসার-সাগরে যিনি জগা! তরাইতে পারে।"

(৪) "স্মরিলে কৃষ্ণের পদ, পদে পদে যায় বিপদ,
না আছে অন্য সম্পদ, কিছুমাত্র ভুবনে।"

(১৭) ভোলানাথ ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

"রিজ এণ্ড রাইয়ৎ" নামক ইংরাজী সংবাদ-পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, সুবিদ্বান্, সুলেখক, সুরসিক ও সুবিজ্ঞ স্বর্গত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভোলানাথের বিষম গোঁড়া ছিলেন। ভোলার কথা উঠিলেই তিনি তাঁহার সম্বন্ধে অনেক গল্প বলিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত তাঁহারও মুখে ভোলানাথের প্রশংসা ধরিত না। মধ্যে মধ্যে আমি শম্ভু বাবুর নিকটে যাইতাম। ভোলার কথা উঠিলেই তিনি বিহ্বল হইয়া কহিতেন,—"Bhola's exodus, Bhola's presence of mind." তিনি আমার "উদ্ভট কবিতা" শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। তিনি

(১) এই "বাম্‌নী" একটি ব্রাহ্মণ-কন্যা। তাহার নাম সৌদামিনী। এণ্টনি-সাহেব এই বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে লইয়া গরিটীর বাগান-বাড়ীতে আজীবন বাস করিয়াছিলেন। মদীয় পরম-সুহৃৎ শ্রীযুত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ মহাশয় কহেন যে, এই স্ত্রীলোকটির নাম "নিরুপমা।" পঞ্চানন বাবু সুপণ্ডিত, সুরসিক, সুলেখক ও অনুসন্ধিৎসু। তিনি কবি-গান সংগ্রহ করিতে এক দিন বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু বিষম দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি সাধারণের সমীপে ইহা প্রচার করিলেন না।—লেখক

আমাকে ভোলানাথের ১০।১২টি গান ও ছড়া দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি মাত্র ছড়া ও গান এখন খুঁজিয়া পাইতেছি। যাহা পাইয়াছি, তাহা এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইল।

শম্ভু বাবু বলিয়াছিলেন, "আমি একবার শ্রীরামপুরে এক আত্মীয় লোকের বাটীতে গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া শুনিলাম, অদ্য রাত্রিতে ভোলা ময়রা, যজ্ঞেশ্বর দাস (যগা ধোপা বা বেণে ?) এবং এণ্টনি-সাহেবের দলের বায়না হইয়াছে। শুনিবামাত্র আহারাদি করিয়া রাত্রি ৮টার সময় আসরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন গ্রীষ্মকাল, বৈশাখ মাসের শেষ। কালবৈশাখী হওয়ায় কবিওয়ালা যজ্ঞেশ্বর দাস উপস্থিত হইতে পারে নাই। কেবল ভোলা ময়রা ও এণ্টনি-সাহেব উপস্থিত হইয়াছিল। ভোলা প্রথমেই আসরে গিয়া এণ্টনিকে এই দুরন্ত সমস্যা পূর্ণ করিতে দিল :—

নাটুর নীচে নাড় নড়ে, লাড্ডু নয় ভাই !
বৃন্দাবনে ব'সে দেখ, বসু ঘোষের রাই।
ঘোমটা খুলে, চোমটা মারে, কোন্‌টা বড় ভারি,
তিন লম্ফে লঙ্কা পার, হাস্‌চে শুক সারী।
বাঁঝা মেয়ের ব্যাটা হ'লো, অমাবস্যার চাঁদ,
এণ্টনি জবাব দাও, নইলে বাঁধবে বিষম ফাঁদ !

উক্ত হেঁয়ালীর (প্রহেলিকার) উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, এণ্টনি ইহার অর্থও বুঝিতে না পারায় তাহার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। এণ্টনি অধোবদনে বসিয়া রহিল। চতুর্দ্দিকে ভোলার বিজয়-ঘোষণা হইতে লাগিল।" (১)

ডক্টার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ভোলানাথের রচিত আর একটি গান আমাকে দিয়াছিলেন। গানটি এই :—

কে গো বাজায় বাঁশী ঐ নিবিড় কাননে।
এমন মধুর ধ্বনি কর্ণে কভু শুনিনে।
ধ্বনি কর্ণে প্রবেশিয়ে, মরমে আছি মরিয়ে,
আম'দের যায় গো নিয়ে, যন্ত্রী আছে যেখানে।
শ্রবণে শুনিলে ধ্বনি, কুল শীল নাহি গণি,
ইচ্ছা হয় তাই শুনি, ছুটে যাই সেখানে।
কোথা সে মুরলীধর, যাঁর মুরলীর স্বর,
রাধা ব'লে নিরন্তর, ডাকিতেছে সঘনে।
স্মরিলে কৃষ্ণের পদ, পদে পদে যায় বিপদ,
না আছে অন্য সম্পদ, কিছু মাত্র ভুবনে।

(১৮) কাশিম-বাজারে ভোলানাথ

যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে, ভোলানাথ কোন আসরে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকটেই পরাজয় স্বীকার করেন নাই। একবার কাশিমবাজার-রাজবাটীতে তিনি কবি-গাওনা করিতে গিয়াছিলেন। সেবার হোসেন সেখ তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তৎকালে মুরশিদাবাদ-অঞ্চলে হোসেন সেখের বিশেষরূপ প্রসার ও প্রতিপত্তি ছিল। কবিওয়ালাদিগের এইরূপ প্রথা ছিল যে, যে ব্যক্তি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে যাইবেন, তিনিই সর্ব্ব-প্রথমে আসরে নামিয়া 'ধরতা' ধরিবেন। 'ধরতা' শব্দের অর্থ প্রশ্ন, পূর্ব্বপক্ষ বা 'চাপান্'। আসরের বড় বড় লোক ভোলানাথকে কহিলেন, "হোসেনের সহিত লড়াই করিতে হইলে মুসলমানী ভাষায় তাহার উপর 'চাপান্' দেওয়া উচিত। নচেৎ তোমার মান থাকে না।" তখন ভোলানাথ নিজমূর্ত্তি-ধারণ-পূর্ব্বক হোসেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :—

জরু, জরু, জমীন্, ক্যায়সে খৎরে আনে,
খুন্, মুন্ সুন্, ক্যায়সে পৎরে জানে।
জো-ওয়ালা, মো-ওয়ালা কালা কেনে ভাই,
হিজরী পিজরী কেন হজের সঙ্গে নাই।
যবনে ব্রাহ্মণে বল কোন্ ভেদটা দেখি,
ভোলার টাকা সদাই খাঁটি, (এবার) হোসেনের মেকি।

ভোলানাথের সময়ে বাঙ্গালা দেশে স্কুল ও কলেজের তত প্রাদুর্ভাব ছিল না। তৎকালের প্রথানুসারে তাঁহাকে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় যৎকিঞ্চিৎ পড়াশুনা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কিরূপে যে ভোলানাথ আসরে দাঁড়াইয়াই মুসলমানী ভাষায় এরূপ পদ্য রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। উক্ত কবিতায় ভোলানাথ ভাষাজ্ঞানের অদ্ভুত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে হিন্দী, পারসী ও আরবী শব্দের যথাযথ সমাবেশ রহিয়াছে। বোধ হয়, তাৎকালিক রীত্যনুসারে ভোলানাথকেও একটু হিন্দী ও উর্দ্দু শিখিতে হইয়াছিল। উক্ত কবিতাটির অর্থ আমরা বুঝিতে পারি নাই। এখন পাঠক মহাশয়গণ ইহার অর্থ করিয়া লউন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে (কবিভূষণ, কাব্যরত্ন, উদ্ভটসাগর বি এ)।

(১) এণ্টনি-সাহেব এই হেঁয়ালীর অর্থ করিতে পারেন নাই। আমরাও পারিলাম না। পাঠক মহাশয়গণের উপরেই অর্থ করিবার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম।—লেখক

জমীর মালিক

১

পাঁচ দিন আড়াআড়ি চরণ দাস ও তাহার স্ত্রী যে দিন ইহকালের হিসাব-নিকাশ শেষ করিয়া পরকালের অজানা রাজ্যে চলিয়া গেল, সে দিন তাহাদের পরিত্যক্ত পাঁচ বৎসরের শিশুপুত্র বলাইকে তাহার জ্যেঠামহাশয় মাধব দাস—সব বিবাদ ভুলিয়া আপনার পুত্রের মতই সস্নেহে কোলে তুলিয়া লইলেন। গ্রামের মোড়ল তিনি, অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল, ২টা লাঙ্গল, ৩।৪টি ধানের মরাই, গুটিকয়েক দুগ্ধবতী গাভী, জমীর প্রচুর তরিতরকারী,—পুষ্করিণীর মৎস্য, হাস্যভরা গৃহিণী, ছুইটি ছেলে, সর্ব্বোপরি নিজের ৫০ বৎসরের অটুট স্বাস্থ্য। সংসারীর যাহা কিছু কাম্য, তাহার অতিরিক্তই ভগবান্ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। গ্রামের সকলেই চাষ আবাদ করিয়া দিনপাত করে, তাহাদের মধ্যে মাধবের বেশ মান-সম্ভ্রমও ছিল।—যে দিন চরণ তাঁহার সহিত তুচ্ছ কথায় বিবাদ করিয়া পৃথক্ হইয়া যায়, সেই দিন প্রথম দুঃখের আঘাতে তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন। কালে সবই সহিয়া যায়! বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল,—তিনিও হৃদয়ের ক্ষতে সান্ত্বনার প্রলেপ লাগাইয়া সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তার পর, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার আকস্মিক মৃত্যু—তাহাদের আশ্রয়হীন দুর্ভাগা শিশুটিকে তাঁহারই করুণার স্নেহচ্ছায়াতলে দাঁড় করাইয়া সকল বিবাদের অবসান করিয়া দিল।

মাধব দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে গৃহিণীকে ডাকিলেন। গৃহিণী তখন ঘরের মধ্যে মুড়ি ভাজিতেছিলেন। সেইখান হইতে উত্তর দিলেন, "কি গো?"

"একবার এ দিকে এসো ত।"

উত্তর আসিল,—"একটু দাঁড়াও। আর দু'খোলা চাল আছে,—ভেজে নিয়ে যাচ্ছি।"

মাধবের আর বিলম্ব সহিতেছিল না। অধৈর্য্যভাবে নিরন্তর হুঁকাটায় ঘন ঘন টান দিয়া তিনি ধূম উদ্গিরণের বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গৃহিণী আসিয়া সে দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও মা, ও কি গো! খালি হুকোটা ভড়্‌ভড়্ ক'রে টানছো! আগুন নিবে গেছে যে গো! দাঁড়াও, সেজে আনি।"

মাধব সে দিকে একবার চাহিয়া নলটা মাটীতে রাখিয়া বলিলেন, "থাক, আর কায নেই। ব'স। একটা কথা আছে।"

গৃহিণী দাওয়ায় পা ঝুলাইয়া বসিয়া বলিলেন, "বল।"

মাধব বলিলেন, "এখন ছোঁড়াটার কি করা যায় বল দিকি?"

গৃহিণী বুঝিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা হইতেছে। বলিলেন,—"দুধের ছেলে—এরই মধ্যে আবার করবে কি? আরও দু'চার বছর যাক্—তার পর ওকে মাঠে দিয়ো।"

মাধব একটু বিজ্ঞভাবে হাসিয়া বলিলেন,"না, সে কথা বলছি না—মাঠে আমি ওকে দেব না।"

আশ্চর্য্যান্বিতা গৃহিণী বলিলেন, "মাঠে দেবে না ত ছেলে কি করবে শুনি? ধান ভানবে?" হো হো করিয়া মাধব হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "না বড় বৌ, সে কাযটা তুমি না হয় বলাইয়ের বৌকে শিখিয়ে দিয়ো। আমি ভাবছি, মাঠের কাযে কানাই রয়েছে, না হয় কেষ্টাকেও লাগিয়ে দেব। ওকে—"

গৃহিণী অধীর হইয়া বলিলেন, "জজ ম্যাজিষ্টার ক'রে দেবে?"

মাধব গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "ঠাট্টা নয়। আমার ইচ্ছে ও লেখা-পড়া শিখুক।"

গৃহিণী যদি এইমাত্র আকাশ হইতে পড়িতেন, তাহা

হইলেও ততটা বিস্মিতা হইতেন না! গালে হাত দিয়া একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া তিনি বলিলেন, "বল কি গো? নেকা-পড়া শেখাবে? ও মা, শুনিছি, মানুষ নেকা-পড়া শিখলে গুরুনোককে মান্যি করে না,—জাত যায়!"

মাধব মৃদু হাসিয়া গৃহিণীকে আশ্বাস দিলেন, "ভয় নেই, বড়বৌ। আমাদের বলাই আমাদেরই থাকবে,—জাত যাবে না। কি বলে,—সমুদ্দুর পেরুলে জাত যায়। আচ্ছা, কাল পুরুতঠাকুরের কাছে বিধান নিয়ে আসছি। তিনি যদি বারণ করেন, তা হ'লে মাঠের কাযই করবে।"

গৃহিণী এই কথায় আশ্বস্তা হইলেন। কালী দুর্গাকে মনে মনে ডাকিয়া কর্ত্তার সুমতি ফিরাইয়া দিবার জন্য ষোল আনা পূজা মানত করিলেন,—সত্যপীরের সিন্নি মানিলেন। প্রকাশ্যে শুধু বলিলেন, "তাই ক'রো। ঠাকুর মশাইকে জিজ্ঞেস না ক'রে কোন কায ক'রো না।"

পরদিন ঠাকুর মহাশয়ের মত লইয়া মাধব বলাইকে গ্রামের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

স্কুল হইতে ফিরিতেই গৃহিণী ছুটিয়া আসিয়া বলাইকে কোলে তুলিয়া মুখচুম্বন করিলেন,—"আহা, কচি ছেলে! মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে!—এস বাবা,—খাবার দিই গে।" বলিয়া তাহাকে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসাইয়া—খানিকটা গুড়—ও দুইখানা রুটি দিয়া কাছে বসাইয়া যত্নসহকারে খাওয়াইতে লাগিলেন।

কানাই উঠান হইতে ভ্রাতার আদর দেখিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "মা, আমায় খাবার দে।"

মা বলিলেন, "কেন, মাঠে ত একধামি মুড়ি পাঠিয়ে দিছলাম—। সব গিলে-কুটে আবার পেটে আগুন নেগেছে?"

কানাই মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল, "হ্যা—আগুন লেগেছে। রোজ রোজ শুক্‌নো মুড়ি খাওয়া যায় কি না? রুটি দে।"

মা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "দেব না—দূর হ রাক্ষস!"

ক্ষুণ্ণ অভিমানে বালক উত্তর দিল,—"ইঃ। দূর হবে! কেন?—ও খাবে রুটি—আর আমরা খাব মুড়ি।"

গৃহিণী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ও—আর তুই? নেকা-পড়া শিখছে—তা জানিস?"

পুত্র বলিল, "ওঃ, ভারী কায করছে! রুটি দিবি কি না বল্?"

গৃহিণী একবারে সপ্তমে চড়িয়া বলিলেন, "দেব না—বেরো। বাছা সারাদিন কিছু খায় নি—সবে এক টুকরো মুখে দিয়েছে—অমনি রাক্ষস এলো খাই খাই ক'রে!"

কাঁদিতে কাঁদিতে অভিমানে বালক চলিয়া গেল।

বলাই বলিল, "কেন মা দাদাকে দিলিনে?"

গৃহিণী তাহাকে সোহাগ করিতে করিতে বলিলেন, "না বাবা, তুমি খাও।"

সন্ধ্যাবেলা মাধব মাঠ হইতে ফিরিলে গৃহিণী বলিলেন, "দেখ, কাল থেকে দুপুরবেলায় দুধ আর নারকেল-নাড়ু নিয়ে ওকে ইস্কুলে খাইয়ে এসো।—নেকা-পড়ায় ছেরোম কত!—বাছার মুখ শুকিয়ে গিছলো।"

মাধব আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "তা যেতে হবে বৈ কি। আচ্ছা বড়বৌ—লেখা পড়ায় বলাইয়ের কেমন ঝোঁক দেখলে!—খুব ভাল—নয়? হেঁ—হেঁ—" বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া আপনার বুদ্ধির গৌরবে আপনি হাসিয়া উঠিলেন!

২

বলাই গ্রামের মাইনর স্কুলের পাঠ প্রশংসার সহিত শেষ করিয়া তিন ক্রোশ দূরে জেলার হাই স্কুলে নিত্য যাতায়াত করে। এইবার সে ম্যাট্রিক দিবে। গৃহিণী ও কর্ত্তা আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। গ্রামের স্ত্রীমহলে ছেলের জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটী খবর বারবার শুনাইয়াও গৃহিণী তৃপ্ত হইতেন না। কর্ত্তাও ভিন্ন গ্রামের লোক ডাকিয়া দাওয়ায় বসিয়া তামাকু-সেবনের নিমন্ত্রণের সঙ্গে এই সুখবরটা দিয়া আপনার বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও বংশের গরিমায় শতমুখ হইতেন। কানাই, কেষ্ট—মাঠের কাযে লাগিয়া আছে,—ভাইয়ের উন্নতিতে তাহারাও সুখী।

কিন্তু, এই সব আনন্দকে ঢাকিয়া দিবার জন্য অলক্ষ্যে যে একখানা কালো মেঘ ধীরে ধীরে ঈশান কোণে মাথা তুলিয়াছিল—তাহা আত্মহারা বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দৃষ্টিগোচর না হইলেও—কানাই ও কেষ্ট ইহা লক্ষ্য করিল। আশ্বিন-কার্ত্তিকে আকাশ বিন্দুমাত্র বারি বর্ষণ করিল না। মাঠ-ভরা সবুজ ধানের গাছগুলি কচি কচি শীষ সমেত জ্বলিয়া পুড়িয়া শুকাইয়া গেল। দেশময় হাহাকার উঠিল। কানাই

শুষ্কমুখে আসিয়া পিতাকে এ সংবাদ জানাইল। বৃদ্ধ চমকিত হইয়া মাথা নাড়িলেন, যেন সে কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই।

কানাই নতমুখে ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "দেশ জুড়ে এই কথা, আর আপনি বিশ্বাস করছেন না? কাল একবার বাইরে গিয়ে দেখে আসবেন।"

সুখৈশ্বর্য্যের সফল স্বপ্নে বিভোর পিতার মাথায়—এই দারুণ দুঃসংবাদ—বজ্রের বেদনা লইয়াই চাপিয়া বসিল। ভবিষ্যতের আশায় গত বারই তাঁহার গোলা কয়টি শূন্য হইয়া গিয়াছিল। প্রতিবারই এমন হইত। তিনি গ্রামের মোড়ল। বিপদে আপদে গ্রামবাসীদের সাহায্য না করিলে,—তাহারা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া কি করিয়া সারাটি বছর সংসার প্রতিপালন করিবে? পৌষের শেষে—তাহারা হাসিমুখে তাঁহার বাড়ী বহিয়া ঋণের ধান্য পরিশোধ করিয়া যাইত। আবার হয় ত ভাদ্র আশ্বিনে তাঁহারই দ্বারে হাত পাতিত।—তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন!

বলাই আসিয়া বলিল, "আর পড়া-শুনোয় কায কি, জ্যেঠা মশায়। শুধু শুধু এতগুলো টাকা খরচ।" অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িলে যেমন জ্বলিয়া উঠে, তেমনই দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া মাধব কহিলেন, "লেখা-পড়া ছেড়ে দিয়ে কি করবি শুনি? জন-মজুরগিরি?"

বলাই জ্যেঠা মহাশয়ের রাগ দেখিয়া থতমত খাইয়া গেল। যাহা গুছাইয়া বলিবে ভাবিয়াছিল, সব খেই হারাইয়া ফেলিল; বলিল, "না—না—তবে এই অজন্মা—, খাজনা আছে—তার ওপর—"

মাধব চীৎকার করিয়া কহিলেন, "বাঃ! বাঃ! খুব বক্তিমে দিচ্ছিস! লেখা-পড়া শিখে একেবারে গোল্লায় গেছিস? ধান হয় নি—খাজনা দিতে হবে! হয়নি ধান, নেই হয়েছে—তোর কি?—তুই বছর বছর খাজনা দিয়ে আসছিস কি না? তাই যত ভাবনা তোর—হতভাগা কোথাকার! যেমন ইস্কুলে যাচ্ছিস—তেমনি যাবি। এ সব কথায় মোটেই কাণ দিবিনে। যদি ফের আমার সামনে এ সব কথা তুলিস ত—সব ছেড়ে ছুড়ে এক দিক পানে টেনে দৌড় দেব,—হ্যাঁ।"

কাযেই বলাইয়ের আর কিছুই বলা হইল না। আপনার পড়িবার ঘরে আসিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতে বসিল, কিন্তু স্নেহশীল জ্যেঠামহাশয়ের ভর্ৎসনার অন্তরালে কতখানি অমৃত লুকাইয়া আছে, তাহা আস্বাদ করিয়া আনন্দে,—কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া বারবার তাহার অবাধ্য নয়ন অশ্রুর কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল—বাষ্পধারায় সব ঝাপ্সা হইয়া গেল। পাঠ্য বিষয় বিশেষ কিছু অগ্রসর হইল না।

* * * *

পৌষের শেষ। বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে অজন্মায় কয়েক মুঠা ধান বিভীষিকা বিস্তার করিয়া অবহেলায় ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। জমীদার তরফের দুই জন পাইক অদূরে ছায়াশীতল অশ্বত্থতলায় বসিয়া সে দিকে শ্যেন-দৃষ্টি রাখিয়াছে—পাছে কেহ তাহা হইতে এক মুঠা লইয়া জমীদারের প্রাপ্য খাজনার কমতি করিয়া দেয়! চাষীরা চোখে অন্ধকার দেখিয়া, লাঙ্গল ছাড়িয়া, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। সম্মুখে অনশন-রাক্ষসী করাল দংষ্ট্রা মেলিয়া নিরক্ষর সরল প্রাণের মর্ম্মস্থল হইতে রক্ত শোষণ করিয়া হীনবল করিয়া দিতেছে। কোথায় মহাজন মিলিবে, কি করিয়া সারা বৎসর রৌদ্র-হিমে যুঝিয়া পুত্র-পরিবারের মুখে এক মুঠা অন্ন যোগাইবে, এই চিন্তাতেই চাষী-সমাজ বিভোর। গৃহে গৃহে পৌষালীর মধু-উৎসব এমনই দুশ্চিন্তার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া অন্ধকারে গা ঢাকিয়াছে!

দাওয়ায় বসিয়া মাধব ঘন ঘন হুঁকায় টান দিতে দিতে এ ধাক্কাটা সামলাইয়া লইতেছিলেন। গৃহিণী বিষণ্ণ মুখে দাওয়ার খুঁটিটা চাপিয়া ধরিয়া নির্নিমেষনেত্রে সে দিকে চাহিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিলেন।

সহসা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া তিনি কহিলেন,—"কি করবে ঠিক করলে?"

হুঁকাটায় প্রবল টান দিয়া মাধব উত্তর দিলেন,—"যাই হোক, ভগবানের মার,—সইতেই হবে। তা ব'লে ছেলেটার পড়া মাটী করতে পারি না।"

গৃহিণী বলিলেন,—"তা ত ঠিক, কিন্তু, এতগুলি টাকা কোথা থেকে যোগাড় করবে?"

কর্ত্তা একটু ভাবিয়া উত্তর দিলেন, "দেখি ভেবে। কোথাও ধার করা ছাড়া আর উপায় কি?"

গৃহিণী বলিলেন, "দেখ, আমার একটা কথা রাখ যদি, তা হ'লে ধার করতে হয় না।"

মাধব সে দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"কিছু লুকোনো কড়ি আছে নাকি ?"

"আছে। তা নৈলে কথাটা আর পেড়েছি।"

আগ্রহে মাধব বলিলেন, "বল কি ? কোন দিন একটা পয়সা পর্য্যন্ত আমার কাছ থেকে নাও নি। জোর ক'রে হ'তে গুঁজে দিয়েছি, ফিরিয়ে দিয়েছ। কোত্থেকে জমালে ? আমার বড় ইচ্ছে হচ্ছে শুনতে !"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "কখনও আমায় কিছু দাও নি ? বেশ ভাল ক'রে মনে ক'রে দেখ দেখি।"

কর্ত্তা আকাশ-পাতাল ভাবিয়াও কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে পত্নীর দিকে চাহিলেন।

গৃহিণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আ—আমার পোড়া কপাল ! এমনও ভুলো মন তোমার !"

পরে হাত দুইখানি আগাইয়া দিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি। মনে হয় ?"

মাধব দারুণ বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করিয়া বলিলেন, "বল কি ! রূপোর পৈঁছে দু'গাছা বেচবে নাকি ?"

গৃহিণী বলিলেন, "টাকা ধার করার চেয়ে বেচে দেওয়া ঢের ভাল। কিছু বেশী টাকা পাওয়া যাবে।"

মাধব ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "তা হয় না, বড়বৌ ! ও জিনিষ আমি প্রাণ থাকতে খোয়াতে পারব না।"

গৃহিণী দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "কেন পারবে না ? খুব পারবে। যদি তোমার কোন জমী নীলেমে উঠতো—বা কেষ্টার ভয়ানক অসুখ করতো—তা হ'লে নিতে না ?—গহনা-পত্তর ত সময়-অসময়ের তরেই। নৈলে কোন্ মেয়েমানুষ—বাহার খুলতে এগুলো গায়ে জড়িয়ে বেড়ায় ! মনে করো, খুব বিপদে পড়েই নিচ্ছ !" পরে একটু থামিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বলাই মানুষ হোক—সোনার পৈঁছে আমি আদায় করবো।" বলিতে বলিতে হাত হইতে পৈঁছে দুই গাছি খুলিয়া দাওয়ার মাদুরের উপর রাখিয়া দিলেন।

মাধব বিষাদ-খিন্ন কণ্ঠে কহিলেন, "নিরুপায় হয়েই তোমার জিনিষ নিচ্ছি। ছোঁড়াটা যাতে মানুষ হয়—শুধু এইটুকু ভেবে। তুমি জান না বড়বৌ, এ নিতে আমার বুকে কি রকম বাজছে। ওঃ, গাঁয়ের মোড়ল আমি—গোলা কটা শেষ করেও জমীদারের খাজনা শোধ ক'রে উঠতে পারলাম না ! যা ধান রইলো, তাতে বড় জোর আর পাঁচ মাস চলবে ! তার পর কি হবে বড়বৌ ?"

গৃহিণী বলিলেন, "ভগবান্ মুখ তুলে চান—আউস ধান কিছু হ'লে আর অভাব থাকবে না। এখন ত চলুক।"

৩

মাধবের ইচ্ছা ছিল, কলিকাতায় রাখিয়া বলাইকে আরও লেখাপড়া শিখাইবেন ; কিন্তু পরীক্ষান্তে বলাই ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া বসিল, সে আর পড়িবে না। কাকুতি-মিনতি, ভৎর্সনা সবই যখন একে একে তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বর্ম্মে ঠেকিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখন মাধব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ও আমি সেই কালেই জানি—এঁটো-কুড়ের পাতা কখনও স্বর্গে যায়, বড়বৌ !"

গৃহিণী বলিলেন,—"তা, এতই যদি ওর অমত, নাই বা পড়লে ? যা বিদ্যে হয়েছে—তাতে বড় চাকরী নিশ্চয়ই হবে—"

মাধব মুখ-বিকৃতি করিয়া বলিলেন,—"ছাই হবে চাকরী—মুটেগিরিও জুটবে না। জানি আমি—'চন্না' চিরকালটা শত্রুতা সেধে এলো—তার ছেলে কখনও ভাল হয় ? যতই কর না কেন—জ্ঞাত-সম্পর্ক যে।"

বলিয়া রাগে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মাধব বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শেষের কথা কয়েকটি বলাইয়ের সদা-প্রফুল্ল অন্তরে বড়ই আঘাত করিয়াছিল। সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল,—"জ্যাঠাইমা, ও-সব কথা যদি আমি স্বপ্নেও ভেবে থাকি ত—" কি একটা কঠিন শপথ করিতে যাইতেছিল, জ্যাঠাইমা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া তিরস্কারপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "ষাট্ ষাট্ ! কথার ছিরি দেখ ! ওঁর ওই রকম। রাগলে আর জ্ঞান থাকে না—কাকে কি ব'লে বসেন—ঠিক নেই। আয়, খাবি আয়।"

সেই দিন অপরাহ্ণে জমীদারের নায়েব মাধবকে কাছারীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলাই বলিল,—"জ্যাঠামশায়, আমিও সঙ্গে যাব।"

সকালে রাগের মুখে কতকগুলা রূঢ় কথা বলিয়া মাধবও মনে মনে কম অনুতপ্ত হইতেছিলেন না। থাকিয়া থাকিয়া তাহার ম্লান মুখখানি তাঁহার অন্তরে ব্যথার খোঁচা

দিতেছিল। তাই সে আসিয়া যখন বলিল,—'আমিও সঙ্গে যাব'—তখন বেশ একটু উল্লাসের সঙ্গেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বেশ ত, চল্।"

নায়েব গ্রামের মোড়লকে বসিবার আসন পর্য্যন্ত দিলেন না। রুক্ষ কণ্ঠে বলিলেন,—"বাকী খাজনা না দিলে ঘটি-বাটি বাঁধা দিয়ে সব আদায় করবো। জমীদারের কড়া হুকুম—লাটের কিস্তী যোগান চাই।"

মাধব করযোড়ে বলিলেন,—"দেখছেন ত গ্রামের অবস্থা। বার বার দু'সন অজন্মা গেল। আধ পেটা খেয়ে কোন রকমে লোক বেঁচে রয়েছে। এ অবস্থায় জুলুম করলে—"

ধমক দিয়া নায়েব বলিলেন,—"জুলুম কিসের? বরং দয়া দেখিয়ে জমীদার এক মাস পরে খাজনা আদায় করছেন! ও-সব চালাকী খাটবে না,—যেমন ক'রে হোক, কাল সকালেই টাকা চাই—নৈলে জোর-জুলুমই করতে হবে।"

মাধব পুনরায় করযোড়ে অশ্রুভরা কণ্ঠে কহিলেন,—"আপনারা মা বাপ। গরীব প্রজার মুখ না চাইলে কার কাছে দাঁড়াব বলুন।"

মুখ খিঁচাইয়া নায়েব বলিলেন,—"জমীদারীটা ত দানছত্তর নয় যে, মুঠো মুঠো টাকা দান-খয়রাৎ করবো। কাঁদুনি ও-রকম ঢের শোনা আছে—ঠ্যালায় পড়লে 'বাপ বাপ' বলে ব্যাটারা টাকা দিতে পথ পাবে না।"

বলাই পাষাণ-মূর্ত্তির মত এতক্ষণ সেই সব কথা শুনিয়া যাইতেছিল। নায়েবের শেষ কথাটায় তাহার সারা অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সহসা যুক্তকর জ্যেঠামশায়ের হাত দুইখানা ধরিয়া টানিয়া উঠাইল ও তিক্তকণ্ঠে কহিল,—"যথেষ্ট হয়েছে, আর কেন, এখন বাড়ী চলুন।"

নায়েব সে দিকে ফিরিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন,—"কে হ্যা ছোক্‌রা, নবাব খাঞ্জা খাঁ! ভারী যে চাল দেখছি!"

বলাই দৃঢ়স্বরে জবাব দিল, "না নায়েব মশাই, চাল-চুলোহীন গরীব চাষা আমরা, চাল কোথায় পাব? গ্রামের মোড়ল ব'লে জ্যেঠামশায়ের একটা মান-সম্ভ্রম আছে, এমন ক'রে তাঁকে অপমান করাটা কি ভাল হ'ল, নায়েব মশাই?"

নায়েব হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন,—"বটে, ছোট লোক!—আমায় চোখ-রাঙানি! আবার উপদেশ দেবার চেষ্টা। চাষার ছেলে লেখাপড়া শিখে একেবারে মাথায় উঠেছে—কুকুরের জাত কি না?"

বিশাল-দেহ যুবকের দেহ ক্রোধে ফুলিয়া উঠিল। তথাপি সংযতস্বরে বলাই বলিল,—"জাত তুলে কথা বলবেন না, নায়েব মশাই। আমরা মানুষ, সেটা মনে রাখবেন।"

"চোপরাও, শূয়ারকা—"

প্রচণ্ড ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে ঘুসি তুলিয়া বলাই এক পদ অগ্রসর হইল।

নায়েব সভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন,—"পাকাড়ো উস্কো—লাগাও জুতি।"

কিন্তু বলাইয়ের পার্শ্বে ৩০।৪০ জন অত্যাচারিত প্রজাকে লাঠি বাগাইয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া ৫।৬ জন জমীদারী-পাইক অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল মুহূর্ত্তের মধ্যেই। মাধব বাধা দিবার অবসর পাইলেন না। যখন তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন বোধ হয়, ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। হাত তুলিয়া গ্রামবাসীদিগকে নিষেধ করিয়া নায়েবের চরণতলে হাঁটু পাড়িয়া বসিয়া বলিলেন, "হুজুর মাফ্ করুন। বলাই ছেলেমানুষ—বুদ্ধি-শুদ্ধি ওর নেই—আপনি দয়া না করলে—"

'হুজুর' বিষয়টি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিলেন! প্রকাশ্যে কিন্তু আস্ফালন করিয়া কহিলেন,—"তুমি না থাকলে মোড়ল—ওই কটা লোককে আজ আচ্ছা শিক্ষে দিয়ে দিতাম। শুধু তোমার খাতিরে মাফ করলাম।—কিন্তু এত বাড় ভাল নয়—ঘর শাসন ক'রে দিও বলছি। কোন্ দিন ছোঁড়া মার খেয়ে মরবে।"

বলাই নায়েবের নিকট মোড়লের 'সম্মান' দেখিয়া মনে মনে হাসিল। জ্যেঠামহাশয়কে শুধু বলিল, "তবে আপনি থাকুন—আমি চল্লাম। এস মধুখুড়ো—কান্তিদা।" সকলে তাহার সঙ্গে কাছারী হইতে বাহির হইয়া গেল। নায়েব তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিলেন ও নিবন্ত গড়-গড়াটায় একটা টান মারিয়া বলিলেন, "বুঝলে, মোড়লের পো—এ সব কথা যদি জমীদারের কাণে ওঠে,

তা হ'লে মহা অনর্থ হবে। গাঁ-কে গাঁ জ্ব'লে যাবে;—আমি কেবল তাই ভাবছি—হতভাগারা রক্ষে পাবে কি ক'রে?" কপট সহানুভূতির এক বিন্দু অশ্রুও বোধ হয় তাঁহার নয়ন-প্রান্তে চক্‌ চক্‌ করিয়া উঠিল।

মাধব শশব্যস্তে মিনতিভরা কণ্ঠে বলিলেন, "দোহাই আপনার—এ বিপদে রক্ষে করতেই হবে। আপনাকে 'পাণ' খেতে কিছু দোব।"

দাঁতে জিব কাটিয়া নায়েব বলিলেন, "রাম! রাম! সে কি কথা! তোমাদের কাছে টাকা নেব আমি!"

মাধব কাতরস্বরে বলিলেন, "না, না,—টাকা নয়। আমাদের ইচ্ছে হয়েছে আপনাকে খাওয়াতে, না নিলে বড়ই কষ্ট পাব।"

নায়েব নিতান্ত নিরীহের মত যেন নিরুপায় হইয়াই বলিলেন, "অবিশ্যি এত পেড়াপীড়ি যখন কচ্ছ, তখন 'না' বলতে পারি না—তোমাদের মনে আর কষ্ট দেব না, কিন্তু সাবধান, কথাটা যেন প্রচার না হয়।"

মাধব বলিলেন, "সে কি কথা! কাকে পক্ষীতে এ কথা জান্‌তে পারবে না। গরীবের ওপর এই দয়াটি করবেন—যেন জমীদার এ কথার বাষ্পবিন্দুও না জান্‌তে পারেন।"

নায়েব তাঁহাকে অভয় দিলেন।

তিনি হৃষ্টমনে বাটী ফিরিতে ফিরিতে আপন মনে বলিলেন, "ভাগ্যে নায়েবটা বুঝলে—লোক ভাল, অন্য কেউ হ'লে খুনোখুনি হয়ে যেত। কি আক্কেল দেখ দিকি গোঁয়ার ছোঁড়াটার! লেখাপড়া শিখে ধিঙ্গি হয়েছে,—একটু সমীহ নেই গা।"

৪

গ্রামের বারোয়ারীতলায় একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছ ছিল। তাহারই তলায় আসিয়া বলাই গ্রামবাসিগণকে বুঝাইতে লাগিল—এ ভাবে নীরবে অত্যাচার সহিয়া যাওয়া হীন মেষ-ছাগলেরই শোভা পায়। তাহারা মানুষ,—তাহাদের সুখ-দুঃখ-বোধ আছে,—কেন তাহারা এ অন্যায় জুলুম সহ্য করিবে? ধান হয় খাজনা দিবে—না হয় কোথায় পাইবে? ইংরাজের রাজত্বে জোর-জুলুম চলে না যে, দুই-দশটা 'খুন' করিয়া গাপ করিয়া ফেলিবে? সকলে যদি একমত হয় ত কাহার সাধ্য গায়ে হাতটি তোলে! কত দেশের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সে গ্রামবাসীদিগের দুর্ব্বল প্রাণে শক্তিসঞ্চার করিল। উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিল, "আমরা মিথ্যা মোহে ভুলিব না। সত্য পথই ধর্ম্মপথ,—সে পথ অবলম্বন করিয়া যাহা হয় হৌক অদৃষ্টে।" একে একে গ্রামবাসীরা আসিয়া ৺পূজার ঘট স্পর্শ করিয়া জীবন পণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিল।

অবশেষে নবীন দুলে বলিল, "খোকাবাবু! তুমি যা বলবা—আমরা তাই করবো, কিন্তু তোমার জ্যেঠা যদি নিবুধ করে?"

বলাই বলিল, "তোমরা নিশ্চিন্ত হও—সে ভার আমার। মোট কথা, নায়েব আজকের ব্যাপারে অল্পে চুপ ক'রে যাবে না, শীগ্‌গিরই যা হয় একটা কিছু করবে। তোমরা সব তৈরী হয়ে থেকো।

তাহারা সমস্বরে লাঠি ঠুকিয়া সায় দিল।

বলাই পুনরায় বলিল, "কাল একবার জেলায় গিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাণে এ কথা তুলতে হবে—পথ বাঁচিয়ে রাখা ভাল।"

সকলে দ্বিগুণ উৎসাহে শতমুখে বলাইয়ের লেখাপড়ার সুখ্যাতি করিতে করিতে চলিয়া গেল। বলাইও ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী চলিল।

পথের মাঝে মাধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনি বলাইকে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, "হতভাগাটা! এম্‌নি ক'রে সব ডুবুলি!"

বলাই তাঁহার পানে চাহিয়া বলিল, "জ্যেঠামশায়, আর ওরকম হীন হয়ে থাকবেন না। যত নীচু হবেন, ওরাও তত পেয়ে বসবে। দেখলেন ত, কি অপমানটাই না করলে।"

মাধব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "অপমান! কিসের অপমান? জমীদার দেবতার তুল্য—তাঁরই খাচ্ছি-পরছি, দু'কথা শুনলে কি মান খোয়া যায়?"

বলাই হাসিয়া বলিল, "জ্যেঠামশায়, প্রজার যেমন কর্ত্তব্য আছে—রাজারও তেমনি কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকা চাই। জানেন ত রাজা রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনের জন্য সীতাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন। প্রজা পুত্রতুল্য। যে রাজা তাদের সুখের পানে চায় না—সে কিসের রাজা?"

মাধব বলিলেন, "ও সব বিদ্যে তুলে রেখে দে! জ্যেঠার

উপদেশ দেওয়া হচ্ছে! সাধে কি বলে, লেখাপড়া শিখে মানুষ গোল্লায় যায়।"

যখন-তখন এই লেখাপড়া শেখার খোঁচাটা বলাইকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিত। সে অতি কষ্টে সে ভাব দমন করিয়া লইত, কিন্তু আজ আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না। —এই লেখাপড়ার উপর কটাক্ষ করিয়া সকালে একচোট্ হইয়া গিয়াছে,—আবার এখনও—

বলাইও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "যখন-তখন লেখাপড়া শেখার খোঁটা দেন,—শিখিয়েছিলেন কেন লেখাপড়া?"

মাধব করযোড়ে কহিলেন, "আমার ঘাট হয়েছিল—বুঝতে পারিনি, বাপু।"

বলাই আরও রাগিয়া গিয়া কহিল, "বুঝতে আপনি কিছুই পারবেন না। নইলে নায়েবের পায়ে অমন ক'রে লুটিয়ে পড়তেন না! লেখাপড়ার আর যত দোষই থাকুক—মানুষকে তার স্বরূপ চিনিয়ে দিতে সে ভুল করে না।" বলিয়া হন্ হন্ করিয়া সে চলিয়া গেল।

মাধব স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এ কি সেই বলাই! মুখে কথাটি নাই—গোবেচারী। জ্যেঠার সামনে মাথা উঁচু করিয়া কথাটি পর্য্যন্ত কহিতে পারিত না! আর আজ!—না কালের ধর্ম্ম—উহার দোষ কি?"

* * * *

দুই দিন পরে গ্রামবাসীরা সভয়ে দেখিল, কাতারে কাতারে পাগড়ীধারী মোটা লাঠি হাতে জমীদারের পাইক আসিয়া কাছারী ছাইয়া ফেলিল। অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহাদের দুর্ব্বল মন আচ্ছন্ন হইল, অষ্টমীর ছাগশিশুর মতই দেহ কাঁপিতে লাগিল।

নবীন দুলে সাহস দিয়া বলিল, "ভয় কি! তোরা ত মরদবাচ্ছা। দিতে হয়, জান্ দেব। তবু কার সাধ্য হাতে লাঠি থাকতে মেয়েছেলে বে-ইজ্জত করে!"

কান্তি ঘোষ বলিল, "কিন্তু নবীনদা—দেখলে ত ওরা দলে ভারী। বোধ হয়, দেড়শ' দু'শ লোক হবে। শেষকালে কি ধনে প্রাণে মারা যাব?"

দলের মধ্যে হরি মাইতি ছিল জোয়ান—সে বুকের ছাতায় কিল মারিয়া সদম্ভে কহিল, "একবার বৈ ত দুবার মরতে হবে না, কান্তি খুড়ো! এমনিই ত না খেয়ে শুকিয়ে মরছি—তার চেয়ে—"

কথাটা শেষ না করিলেও তাহার বক্তব্য সকলেই বুঝিয়া লইল। বিশু ঠাকুরদা প্রবীণ মানুষ, তিনি বলিলেন, "তোমাদের এখন রক্ত গরম—আগু-পাছু ভেবে ত কথা বল না। বলাইটা ত নাচিয়ে দিয়ে স'রে পড়লো,—এখন ঠ্যালা সামলায় কে? আমি সেই কালেই বলেছিলাম—"

হরি ক্রোধে চীৎকার করিয়া কহিল,—"থাম ঠাকুর, থাম, তোমাকে আমরা ঢের জানি। গাঁজায় দম দাও গে—এখানে কেন?"

ঠাকুরদাও চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি—আমি গাঁজাখোর? বাউণ্ডুলে ছোঁড়া কোথাকার—তোর বাবা যে সেবার মদ খেয়ে চণ্ডীপুরের বারোয়ারীতলায় ঢলাঢলি ক'রে এলো—"

হরি বিশ্বেশ্বরের গলা ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "ফের মিথ্যে কথা, বিশ্বনিন্দুক কোথাকার, থাবড়ে মুখ ভেঙ্গে দেব—"

সকলে মাঝখানে পড়িয়া উভয়কে ছাড়াইয়া দিল। বিশ্বেশ্বর হরির পিতৃ-মাতৃকুল উদ্ধার করিতে করিতে শাসাইয়া গেলেন যে, এখনই জমীদারের কাছারীতে যাইয়া সব কথা বলিয়া দিয়া তাহাদের আস্ফালন ভাঙ্গিয়া দিবেন। হরিও মাঝে মাঝে অকথ্য ভাষায় তাঁহাকে গালি দিয়া পাঁচ সাত জন লোকের বাহু-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য এক একবার ঝাঁকানি দিয়া উঠিতেছিল।

বহু কষ্টে তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া নবীন বলিল, "ভাবনার কথা বটে। খোকা বাবু এখনও জেলা থেকে ফিরে এলো না।"

তিনু মণ্ডল বলিল, "যাই হোক, সকলকে ব'লে দাও তৈরী হয়ে থাকতে। যে ঘরভেদী বিভীষণ গেল, হয় ত আজ রাতেই একটা কিছু হ'তে পারে।"

দারুণ দুশ্চিন্তা লইয়া যে যাহার কাযে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা কানাই এবং কেষ্টকে লাঠি হাতে বাহির হইতে দেখিয়া মাধব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় যাচ্ছিস?"

তাহারা উত্তর দিল, জমীদারের পাইক আসিয়া গাঁ ছাইয়া ফেলিয়াছে, রাত্রিতে বিপদের সম্ভাবনাও আছে। সুতরাং পাহারার জন্য গ্রামের প্রত্যেক যুবকই সারারাত্রি জাগিয়া থাকিবে।

পিতা নিষেধ করিয়া বলিলেন, "পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরবার তরে। খবরদার! জমীদারের বিপক্ষে লাঠি তুলেছিস কি তোদের ত্যজ্য পুত্তুর করবো।" কানাই কেষ্ট পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

এমন সময় বলাই আসিয়া তাহাদের সব সংশয় কাটাইয়া দিয়া বলিল, "চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন, দাদা? ঘোষেদের চণ্ডীমণ্ডপে সব জড়ো হয়েছে—তোমরা আর দেরী ক'রো না—এগোও।"

তাহারা পা তুলিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় মাধব দাওয়া হইতে নামিয়া ছুটিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, "খবরদার! বাড়ীর ভাত মুখে তুলতে চাস্ ত বার হস নে বলছি।"

বলাই জ্যেঠামহাশয়কে দেখিয়া এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল। তার পর উদ্দীপ্ত কণ্ঠে কানাইকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"গাঁয়ের শত শত মেয়ে—ছেলে আজ তোমাদের মুখ চেয়ে বুক বেঁধে আছে। যদি তাদের এতটুকু অপমান হয় ত জানবে, তার জন্য দায়ী তোমরা। দেহে বল থাকতে, মরদ-বাচ্চা হয়ে, এখন চুপ ক'রে বাড়ী ব'সে থাকলে ভগবান্ কখনই তোমাদের ওপর খুসী হবেন না। যাও।" পিতার ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করিয়া—একলম্ফে তাহারা উঠান পার হইয়া চলিয়া গেল।

বলাই জ্যেঠামহাশয়ের পানে চাহিয়া মৃদু বিনীত স্বরে বলিল, "মাপ করবেন, জ্যেঠামশায়—আপনার মনে কষ্ট দিলাম। কিন্তু দেশের ভাই-বোন্দের মুখ চেয়ে হয় ত ভবিষ্যতে এর চেয়ে ঢের বেশী কষ্ট আপনাকে দেব। আমার প্রতিজ্ঞা, যেমন ক'রে হোক, নায়েবের অনাচার থেকে এই সব নিরীহদের রক্ষা করবো। তাতে যদি প্রাণ যায়, বা আপনারা ত্যাগ করেন—সেও স্বীকার।"

মাধব ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "দূর হ পাজী আমার সুমুখ থেকে! এত দিন দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছিলাম! ওঃ—নেমকহারাম—বেইমান!—" বলাই ততক্ষণ দৃষ্টিসীমার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। গৃহিণী আসিয়া তাঁহার হাত ধরিতেই ক্রোধে চীৎকার করিয়া তিনি বলিলেন, "উচ্ছন্ন যা,—গোল্লায় যা! তোদের সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই রাখবো না। আর যদি এ বাড়ীতে পা দিস্—ত মরা—"

গৃহিণী তাড়াতাড়ি তাঁহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিলেন, "ছিঃ ছিঃ, পাগল হ'লে না কি?"

মাধব উন্মত্তের মত বিকট হাসি হাসিয়া উঠিলেন। পরমুহূর্ত্তে নিজের অট্টহাসির প্রতিধ্বনিতে লুপ্ত সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতেই—তাঁহার দুই নয়ন বহিয়া ঝর-ঝর করিয়া অশ্রুর ধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

৫

একটা ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে—তবে কেহ প্রাণ হারায় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলাই পূর্ব্বেই গরীব প্রজার দুঃখের কথা—জমীদারের অত্যাচারের কথা এবং দাঙ্গার পূর্ব্বাভাসটুকু জানাইয়া আসিয়াছিল।

দাঙ্গার সংবাদ পাইয়াই তিনি স্বয়ং তদন্তে আসিলেন। জমীদারপক্ষ উদ্যোগ-আয়োজন করিবার অবকাশ পর্য্যন্ত পাইলেন না। অনুসন্ধানে প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট লিখিতে বসিলেন। সংবাদ পাইয়া জমীদার স্বয়ং আসিলেন। তিনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, এবং বিবেচক। নায়েবের ভ্রমপূর্ণ রিপোর্টে তিনি বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন, আসল কথা জানিতে পারেন নাই, ইত্যাদি কথা বলিয়া কাকুতি-মিনতি করিলেন। ভবিষ্যতে প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দায়িত্ব গ্রহণের শপথ করিয়া—ও নায়েবকে পদচ্যুত করিয়া কোন প্রকারে এ দায় হইতে তিনি অব্যাহতি লাভ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট যখন ফিরিয়া গেলেন, তখন গরীব প্রজারা মুক্তকণ্ঠে তাঁহার জয়গান করিয়া, ঊর্দ্ধে হাত তুলিয়া সত্য সত্যই নৃত্য করিতে লাগিল—এই ভাবে অত্যাচারপর্ব্বের অভিনয় সমাপ্ত হইল।

তার পর ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে,- বলাই আর তাহার জ্যেঠামহাশয়ের গৃহে ফিরিয়া যায় নাই। সে দিনের কঠিন শপথ তাহার রুদ্ধ অন্তরে যে প্রবল অভিমানের তরঙ্গ তুলিয়াছিল, তাহাই তাহার স্নেহবুভুক্ষু হৃদয়তটে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতেছিল। দুর্জ্জয় অভিমানবশে সে পিতা[illegible] অধিক ভক্তিভাজন জ্যেষ্ঠতাতের সান্নিধ্য হইতে আপনাকে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিয়াছিল।

সে বহুকাল পরিত্যক্ত আপনার ভগ্নকুটীরে আসি[illegible] আবার বাসা বাঁধিয়াছিল। গ্রামের সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত- আপদ-বিপদে আসিয়া পরামর্শ ভিক্ষা করিত, সেও আপনার সমস্ত শক্তি সামর্থ্য নিয়োজিত করিয়া দিন

দিন পল্লীর শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতেছিল। মাধব ক্রোধের বশে তাহার জমী-জমা সমস্তই ফিরাইয়া দিয়াছিলেন—দারুণ অভিমানে সেও তাহা গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার ক্ষুদ্র শক্তির সাহায্যে ভগবান্ গ্রামের এত বড় একটা উন্নতি-সাধনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, আর জ্যেঠামহাশয় পূর্ব্বের তুচ্ছ ক্রোধকে মনে পুষিয়া রাখিয়া অনায়াসে তাহাকে পৃথক্ করিয়া দিলেন! সকলে তাহাকে ধন্য ধন্য করিল, কিন্তু তিনি ওষ্ঠাগ্রে সে কথা উচ্চারণ ত করিলেনই না, উপরন্তু আজন্মের স্নেহ-সম্বন্ধ অনায়াসে ছিন্ন করিয়া দিলেন! সে ত জানে না, কে তাহার পিতা; মাতাই বা কে? তাহারই স্নেহময় ক্রোড়ে শৈশবের পর যৌবন আসিয়াছে, তাহারই আগ্রহে লেখা-পড়া শিখিয়া সে মানুষ হইয়াছে,—জমীদারের অত্যাচার-জাল ছিন্ন হইয়াছে। অপরিমেয় স্নেহভাণ্ডার উজাড় করিয়া জ্যেঠামহাশয় তাহাকে মানুষ করিয়াছেন, প্রতিদিন-বর্দ্ধিত শত সোহাগের গ্রন্থি, তাহার অনাথ-জীবনের পরতে পরতে দৃঢ় অক্ষয় হইয়া আছে—দৃঢ় বেষ্টনে অস্থি, মাংস, মজ্জা, স্নায়ু জড়াইয়া ধরিয়াছে! তুচ্ছ এই বিষয়-বৈভব! তুচ্ছ এই খ্যাতি-সম্ভ্রম! এই সকল যে প্রতিনিয়ত বেদনার হাহাকারে তাহার তৃষা-জর্জ্জর অন্তরে গুমরিয়া মরিতেছে!

চাষের জমী বাড়িয়াছে—কলের লাঙ্গল আসিয়াছে। চাষের আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সে জমীতে জমীতে সোনা ফলাইয়া সারি সারি মরাই বাঁধিয়া উটজাঙ্গন পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেছে। কিন্তু হর্ষের সে তৃপ্তি, সাফল্যের সে গৌরব কৈ?

* * * * *

বৃদ্ধ মাধবের দৃঢ় শরীরও এত বড় বিপ্লবে একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। গোলযোগ মিটিয়া গেল, কানাই কেষ্ট আসিয়া পায়ে ধরিয়া মাপ চাহিল, কিন্তু যাহার জন্য তাঁহার তৃষিত অন্তর আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল, সে আসিল না। দিন গেল, মাস গেল—কিন্তু সে আসিল না। রোজই মনে হয়, সে আসিবে, সব ভুলিয়া জ্যেঠামশাই বলিয়া পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িবে—কিন্তু কুহকিনী আশা কল্পনায় মিলাইয়া যায়—সে আসে না। বুক ঠেলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহিরে আসে—তিনি আবার নূতন দিনের প্রতীক্ষা করেন।

এইরূপে আশাহত প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বর্ষার শেষে ম্যালেরিয়া আসিয়া সেই চিন্তাগ্রস্ত হাড় কয়খানিকে কাঁপাইয়া শয্যাশায়ী করিয়া আপন আধিপত্য বিস্তার করিল। প্রথম প্রথম অনিয়ম অত্যাচার রীতিমতই চলিয়াছিল, শেষে প্রবল জ্বর সেটুকুর পথও বন্ধ করিয়া দিল। বিছানায় শুইয়া তিনি শেষের দিনের প্রতীক্ষায় দিন গণিতে লাগিলেন।

সে দিন জ্বরটা একটু কম ছিল। গৃহিণী শিয়রে বসিয়া পাথরবাটিতে সাগুর সঙ্গে লেবুর রস মিশাইতেছিলেন। মাধব সে দিকে চাহিয়া বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলিলেন—"আর দিন রাত ওই ছাই-পাঁশগুলো খাওয়াচ্ছ কেন? মনে ভেবেছ, অমনি ক'রে বাঁচিয়ে রাখবে!"

গৃহিণী কোপকটাক্ষে মাধবের পানে চাহিয়া বলিলেন, "বেশী ব'কো না, খেয়ে ফেল।"

অগত্যা অনেক কথা-কাটাকাটি করিয়া মাধব সাগুর বাটিটি নিঃশেষ করিলেন। আঁচলে মুখ মুছাইয়া গৃহিণী বাটিটি তক্তপোষের তলায় রাখিয়া বলিলেন,—"দেখ, একটা কথা বলবো—যদি রাখ।"

মাধব বলিলেন,—"যা বলবার, এই বেলা ব'লে নাও, কি জানি—"

রাগ করিয়া গৃহিণী মুখ ফিরাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভারী গলায় জবাব দিলেন, "তোমার সঙ্গে কথা বলাই ঝকমারী! কিছু একটা বলতে গেলেই খালি ওই কথা।"

মাধব ম্লান হাসিয়া বলিলেন,—"মিছে রাগ কর কেন, বড়বৌ! যতই কর—মরণকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না!"

পরে মৃদু বিষাদখিন্নকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "মরণ ত দূরের কথা,—সংসারে বাস ক'রে কত অশান্তিই না পোয়াতে হয়! সে সব ত কৈ, শত চেষ্টাতেও রোধ করা যায় না! নাঃ, বড়বৌ, সংসারটাই নিমকহারাম!"

গৃহিণী বুঝিলেন, কোন্ বেদনার করুণ রাগিণীতে এই কয়টি বুকভাঙ্গা মর্ম্মভেদী কথা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

আঁচলে নয়নের বিগলিত অশ্রু মুছিয়া গৃহিণী বলিলেন, "তাই বলছিলুম কি, ছোঁড়াকে একবার ডাক। সে কি কম কষ্ট পাচ্ছে—"

ঝাঁঝিয়া উঠিয়া মাধব বলিলেন, "কেন? সে ভিন্ন কি আমার দিন চলে না? লেখাপড়া শিখে যে এমন

চণ্ডাল হ'তে পারে,—মাধব মোড়ল—তার মুখদর্শন করে না।" বলিয়া শ্রান্তিতে তিনি হাঁফাইতে লাগিলেন।

গৃহিণী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরস্বরে বলিলেন, "কিন্তু সবাই বলে, লেখাপড়া শিখেছিল বলেই গাঁয়ের লোককে জমীদারের রাগ থেকে বাঁচিয়েছে সে।"

মাধব উষ্ণস্বরে বলিলেন, "সে মিথ্যে সান্ত্বনায় তারা মন ভুলোতে পারে—আমি নয়। জমীর ন্যায্য মালিক জমীদার,—তাঁকে খাজনা ফাঁকি দেওয়া জুয়োচুরী ছাড়া আর কিছুই নয়। লেখাপড়া তাকে ফন্দীবাজই করেছে, বড়বৌ—মানুষ করেনি।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা সে যাই হোক্, একবার তাকে ডাক। সে ত কোন দিন তোমার কথা ঠেলেনি—তুমিই তাকে পৃথক্ ক'রে দিয়ে—"

মাধব বলিলেন, "ঠিক করেছি। আমার কর্ত্তব্য করেছি। এত দিন আদর-যত্ন ক'রে মানুষ করলাম— কে জান্‌তো যে, এক দিন আমারই বুক ছুব্‌লে তার শোধ নেবে? নৈলে বড়বৌ, 'চন্না' মারা যেতেই বুক দিয়ে প'ড়ে ছোঁড়াটাকে নিয়ে এলাম—" বলিতে বলিতে রুদ্ধ অভিমান কণ্ঠ ঠেলিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

গৃহিণী বাধা দিলেন না। বহু দিনের সঞ্চিত বেদনা—অশ্রুধারায় ধুইয়া মুছিয়া মনকে হাল্‌কা করিয়া দিবে ভাবিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। প্রায় ১০।১২ মিনিট পরে মাধব ব্যথার বোঝা নামাইয়া শ্রান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "না, বড়বৌ—তার মুখদর্শন করতে চাই না আমি। খবরদার, ডেকো না।" বলিয়া শ্রান্তিভরে চক্ষু মুদিলেন।

তিন দিন পরে জ্বরটা আর একবার প্রবলভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া সংজ্ঞাহারা করিয়া দিল। বিকারের ঘোরে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে তিনি বারংবার বলাইয়ের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কখনও সোহাগ,—কখনও ভর্ৎসনা, কখনও বা অনুনয়-বিনয়, তর্জ্জন! যেন সম্মুখে সেই অপরাধীকে পাইয়া, তাঁহার নিরুদ্ধ অভিমান শতফণা বিস্তার করিয়া স্নেহ-ক্রোধে মিশিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে!

গৃহিণী ভীত হইয়া পুত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বলাইকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলাই জেলায় গিয়াছিল। অপরাহ্ণে আসিয়া সংবাদ শুনিয়া সে উন্মত্তের মত জ্যেঠা-মহাশয়ের বাড়ীর দিকে ছুটিল।

মাধব সেই মাত্র শয্যায় নিথর হইয়া অবসন্ন চক্ষু দুইটি মুদিয়া পড়িয়া ছিলেন। বলাই ধীরে ধীরে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রসারিত পা দুইখানির উপর মুখ লুকাইয়া আকুল স্বরে কাঁদিয়া উঠিল। মাধব উষ্ণ অশ্রুধারার স্পর্শে চমকিত হইয়া চাহিলেন।

তখন বিকার কাটিয়া ধীরে ধীরে জ্ঞানোন্মেষ হইতেছিল। ক্ষীণকণ্ঠে গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পায়ের কাছে প'ড়ে কাঁদে কে, বড়বৌ?"

গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে জবাব দিলেন, "বলাই।"

বৃদ্ধের নয়ন ছাপিয়া অশ্রু-পারাবার উথলিয়া উঠিল। রুদ্ধকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "কাঁদে কেন? এ দিকে আসতে বল, বড়বৌ। ওখানে পায়ের তলায় নয়, এই বুকে একটু মাথা রেখে ও কাঁদুক—আমার সব যন্ত্রণা জুড়িয়ে যাবে।"

বলাই পা হইতে মাথা তুলিয়া বৃদ্ধের শীর্ণ, লোল বক্ষের উপর সেই অশ্রুনির্ঝর মুক্ত করিয়া দিয়া আকুলকণ্ঠে কহিল, "জ্যেঠামশাই, এমনি ক'রে কি শাস্তি দিতে হয়?"

পরম আদরে তাহার মাথায় কম্পিত হাতখানি বুলাইতে বুলাইতে মাধব বলিলেন, "শাস্তি কি রে, ক্ষেপা ছেলে, এ যে তোর পরীক্ষা।"

বলাই মাথা তুলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "তবে এখনি ও পরীক্ষার শেষ হোক।" পরে পকেট হইতে এক তাড়া কাগজ বাহির করিয়া তাঁহার বুকের উপর রাখিয়া বলিল, "এই নিন আপনার জমীর দলিল। ওর এক কণাও আর আমার নয়। আপনার দেওয়া ভার মাথায় নিয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে জর্জ্জরিত হয়ে পড়েছি—আর নয়। আমায় মুক্তি দিন, জ্যেঠামশায়।"

মাধব হাসিয়া বলিলেন, "তা কি হয় রে, পাগল! এ বুড়ো হাড়ে ও-সব সইবে কেন? সেরে উঠি, তার পর সব জমী এক ক'রে তোরই হাতে তুলে দেব। আমি কি আর জানি না—লেখাপড়া শিখিয়ে তোকে কতটা মানুষ ক'রে তুলেছি!"

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়।

কোষ্ঠীর ফলাফল *

(পরিচয়)

বাঙ্গালীর মুখ হইতে হাসি বস্তুটা বেমালুম উবিয়া যাইতেছে। সমাজে, সাহিত্যে সর্ব্বত্রই চিন্তা আর গুরু-গবেষণার বিরাট গাম্ভীর্য্য! দেহের রক্ত অত গাম্ভীর্য্যে শুকাইয়া যায়!

সমস্যা চারিদিকে, এ কথা মানি। গম্ভীর মুখে তার সমাধানের উপায়-সন্ধানও চাই, তা'ও নয় মানিলাম। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা এ গাম্ভীর্য্যের চাপ প্রাণ মানিবে কেন?

আমাদের একটা বিষম গুণ এই—বর্ত্তমানের পানে আমরা ফিরিয়া চাহি না। হয় অতীতের গৌরব-গাথায় মসগুল হই, নয় ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন ভাবিয়া নাচিয়া উঠি! কালনেমির লঙ্কাভাগ-স্বপ্ন সফল হয় নাই—তার একটা কারণ, কালনেমি তার বর্ত্তমানের কথা ভাবিতে একেবারেই ভুলিয়াছিল। সে দিকে খেয়াল রাখিলে হয় তো বেচারী অমন নাকাল হইয়া প্রাণ হারাইত না!

সাহিত্যে জাতির প্রাণের পরিচয় ফোটে। সাহিত্যে যিনি প্রাণের কথাটুকু গোপন করিয়া ধার-করা বড় কথা চালাইতে যান, তাঁর কোন কথাই লোকের প্রাণে গিয়া পৌঁছায় না! সাহিত্যও তাহাতে কৃত্রিম হইয়া ওঠে। কৃত্রিম সাহিত্য প্রাণহীন।

যে সমস্যা দেশে নাই, তার কথা পাড়িয়া সাহিত্য গড়িতে গেলে সাহিত্য ছাইয়ে পরিণত হয়। কিন্তু এ কথার আলোচনা আজ করিতে বসি নাই। কথা হইতেছিল বাঙ্গালীর হাসি লইয়া। আমাদের মুখে ও মনে এই যে গাম্ভীর্য্য আসিয়া প্রকট হইয়াছে, সেটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। আনন্দই জীবন—কথাটা পুরানো হইলেও চিরন্তন সত্য। বাংলার প্রহসন-কার বড় দুঃখেই বলিয়া গিয়াছেন—আমরা দিবারাত্র বেজার, বিরক্ত, গম্ভীর! ছেলের বিয়েয় লোক খাওয়ানো একটা আনন্দের ব্যাপার—তাতেও বলি, আঃ, আর এই ক'জনকে খাওয়াতে পারলেই বাঁচি!... এতই যদি বিরক্তি তো কাজ কি লোক খাওয়ানোয়!

সংসারে যেমন বাজারের ফর্দ্দ, পাওনাদারের তাড়া, সাহেবের বকুনি আছে, তেমনি সন্ধ্যার পর ছেলেমেয়ের মুখের সরল হাসি, প্রিয়ার প্রীতি—এগুলাও আছে। এ না থাকিলে পাওনাদারের তাড়া আর মনিবের বকুনির গুঁতায় প্রাণ রাখার সাধ্য থাকিত না! সাহিত্যেও তেমনি...বেদান্তের ভাষ্য রচনা করো, দেশের কথা কও, দুটো গল্পও বলো, হাসিও একটু ছিটাও! পল্লী-সংস্কারের ব্যাপারে শুধু জঙ্গল সাফ বা পুকুর কাটাইলেই পল্লীবাসীর দুঃখ ঘুচিবে না—সেই সঙ্গে তাদের হরি-সভা মেরামত করাইয়া দাও, যাত্রার আখড়াটাও যাহাতে চলে, সে দিকে লক্ষ্য রাখো—নহিলে পল্লীর পুরাপুরি সংস্কার হয় কৈ?

বাংলার সে দিলখোলা বৈঠক মজলিশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—ঠাকুর্দ্দা-ঠানদির পরিহাসের সে সরস বুলি আজ স্বপ্ন-কথা! তাই বিবিধ সমস্যা-পীড়িত মন আনন্দ ও সরসতা পাইবার লোভে সাহিত্যের পানে তাকায়। সেখানেও যদি কেবল সমস্যার ঘনঘটা থাকে, তাহা হইলে আরাম মিলিবে কোথায়?

বাংলা সাহিত্যে তাই শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জ্যোৎস্নার সুধাধারা বর্ষণ করিয়া দু'দিনেই বাঙালীর চিত্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। তাঁর রচনার এত যে আদর, ইহার দ্বারা আমাদের ঐ কথাই প্রমাণিত হয়—যে, মানুষের মন আনন্দ চায়, হাসি চায়...গবেষণার গুরুভারে চট করিয়া এ্যাপোপ্লেক্সি বাধাইয়া মরিতে নারাজ!

সম্প্রতি তাঁ'র লেখা 'কোষ্ঠীর ফলাফল' পড়িতেছিলাম। পড়িয়া চমৎকৃত হইয়াছি বলিলে বোধ হয়, মনের ভাব ঠিক প্রকাশ করা যাইবে না। পড়িতে পড়িতে লেখকের লিখিবার আশ্চর্য্য সহজ সরল ভঙ্গী, দেখিবার অপূর্ব্ব অসাধারণ শক্তি, হাসি ও অশ্রুকে পাশাপাশি গাঁথিবার অপরূপ কৌশল এবং বাঙালীর প্রতি দরদ আর ভালোবাসা দেখিয়া বার বার তাঁ'র লেখনীকে প্রণতি জানাইয়াছি। হাসির এমন অমল জ্যোৎস্না-ধারা, ভাবের এমন আকাশজোড়া একাগ্রতা, অশ্রুর এমন স্নিগ্ধ সজল কোমলতা একাধারে বাংলা সাহিত্যে বিরল। অথচ অল্প আয়োজনে এমন প্রচুর ভাব ফুটানো, দুই দিকে হাসি-অশ্রুর এমন স্বচ্ছন্দ স্রোত বহানো...দিগ্বিজয়ীর শক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। Vini vidi vici—শ্রদ্ধেয় কেদার বাবুর রচনার পক্ষে এ গর্ব্ব যেমন অনায়াস, সাজেও তেমনি সত্য। পাঠকের চিত্তকে এক নিমেষে জয় করিয়া বসে...গতি অবলীলায়, তর্জ্জনীর অতি মৃদু নিঃশব্দ ইঙ্গিতে!

'কোষ্ঠীর ফলাফল' উপন্যাস? না, কাব্য? না, চরিত্র-সমালোচনা? না, ব্যঙ্গ-রচনা? এ প্রশ্ন যদি কেহ করেন, তাহা হইলে আমি বলিব, 'কোষ্ঠীর ফলাফল' নব্য বাঙালীর ফটো। তা'র জীবনের ফটো, তার সুখের ফটো, দুঃখের ফটো, স্বপ্নের ফটো, তার বুদ্ধির ফটো, বেকুবির ফটো; বাঙালীর জীবনের কাব্য, রোমান্স, উপন্যাস, ইতিহাস সবই। ইচ্ছা হয়, গোটা বইখানা বাঙালী যে যেখানে আছেন, সকলকে জড়ো করিয়া পড়িয়া শুনাই।

অতি তুচ্ছ আয়োজন—নায়ক পেন্সনার, কাশীবাস করিতেছিলেন, তাঁর উপর পরোয়ানা আসিল, এখনি পূর্ণিয়ার আত্মীয়-সমাজে হাজির হইতে হইবে। তিনি ছুটিলেন। যেমন পূর্ণিয়ায় পৌঁছানো, অমনি দ্বিতীয় আদেশ,—দেওঘরে যাইতে হইবে এই মুহূর্ত্তে! আদেশ গৃহিণীর—কাজেই তদ্দণ্ডে শিরোধার্য্য করা ছাড়া উপায়ও ছিল না! তার পর দেওঘরে নর-নারীর যে মেলা দেখিয়াছেন, তারি ছবি আঁকিয়া আমাদের উপহার দিয়াছেন। সে ছবিতে কি বৈচিত্র্য, ছবি দেখিয়া তার পরিচয় লওয়া চাই...

---

* কোষ্ঠীর ফলাফল—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ২।০ টাকা—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত।

সে ছবির বিচিত্র সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝানো সহজ নয়। ছাঁটা-কাটা দু'চারিটি টুক্‌রা মাত্র আমরা সাধারণকে উপহার দিতে পারি।

'যাত্রার পূর্ব্বে পঞ্জিকা দেখার প্রয়োজন ছিল না—পেন্সন-প্রাপ্ত লোকের আর শুভ-অশুভ দিন কি! তাহার আবার বিপদ-আপদ কি? তাহার বাঁচিবার যত্নটাই যে হাসির কথা, যেহেতু জান্ থাকিতে সরকারী-দান যোটে না! তাই পঞ্জিকার পরিবর্ত্তে টাইমটেবলেই টান ধরিল।' তাহা হইতে 'পথের পাণ্ডা লাগিল, কিন্তু আত্মা শুকাইয়া গেল। পূর্ণিয়া হইতে কাটিহার, কাটিহার হইতে মনিহারী-ঘাট; পরে ষ্টীমারে গঙ্গা পার হইয়া সকরিগলি-ঘাট, তথা হইতে সাহেবগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ ছাড়িয়া কিউল; কিউল হইতে যশিডি, যশিডি হইতে destination অর্থাৎ ঠিকানায়। উল্লিখিত প্রত্যেক স্থানেই নাবা-ওঠা', যান-পরিবর্ত্তন, অর্থাৎ আমার (নায়কের) পক্ষে 'জান-পরিবর্জ্জন' এই 'পাড়ির' পথে এক সঙ্গী মিলিল—জয়হরি। এই সঙ্গীটি একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাশ। আমাদের আগাগোড়া হাসাইবা মশ্‌গুল্ রাখিয়াছেন।

পূর্ণিয়া হইতে যশিডির destination—খাশা। হাসিতে হাসিতে পথের কষ্ট মনেও জাগে না। বাঙলার একটা চলিত ছড়া—আম-কাঁঠালের বাগান দেবো ছায়ায়-ছায়ায় যেতে। তা লেখক পথে যে হাসির ফুল অজস্রধারে বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন, সে পথে কি আরাম, তা যিনি লেখকের সঙ্গে চলিয়াছেন, তিনিই জানেন!

দেওঘরের ষ্টেশনে পাণ্ডার ভিড়। পাণ্ডার নামে শিক্ষিত নব্য বাঙালী খড়্গহস্ত! এই পাণ্ডার প্রতি লেখকের দরদ অপরিসীম। প্রাণ খুব দরাজ না হইলে এ দরদ ফরমাশে রচা যায় না। তাঁর দরদের কথায় পাণ্ডার প্রতি আমাদের মনও সমবেদনায় গলিয়া পড়ে। যশিডির বাড়ীতে আত্মীয়-গৃহে আতিথ্যের কাহিনী দীর্ঘ, কিন্তু বৈচিত্র্য এমনি মনোরম যে, আমাদের বার বার মনে হইয়াছে, আরও দু'দিন যদি বেশী থাকিতেন, আমরা আরো বেশী আনন্দ পাইতাম।

যশিডিতে একটু অশান্তি বাঁধাইল কিন্তু জয়হরির নাসিকা-ধ্বনি। এ নাসিকা-ধ্বনি আমরা কখনো ভুলিব না। লেখক দেখেন, পরদিন সকালে "বাড়ীর সকলেরই মুখে হাসি—তাহাতে শব্দের সংমিশ্রণ না থাকিলেও বেশ eloquent, কারণটা পরে প্রকাশ পাইল। জয়হরির নাসিকা-ধ্বনির তাড়নায় বাড়ীর কেহই ঘুমাইতে পারে নাই। বাড়ীর কৃতজ্ঞ কুকুরটা এই আকস্মিক উৎপাতের কারণ আবিষ্কার করিতে না পারিয়া প্রভুদের সজাগ রাখিবার জন্য যথাশক্তি চীৎকার করিয়াছে। অবশেষে স্বয়ং ভয় পাইয়া কোন প্রকারে প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক আত্মরক্ষার্থ কোথায় যে পলাইয়াছে, তাহার পাত্তা পাওয়া যাইতেছে না! প্রাণভয়ে পলায়নের সুদীর্ঘ নখচিহ্ন সকল প্রাচীরগাত্রে প্রমাণস্বরূপ রাখিয়া গিয়াছে মাত্র।"

তার পর চা-পানান্তে বেড়াইতে বাহির হওয়া। পশ্চিমে গেলে এটুকু চাই-ই—চাই। "বেড়াইয়া ফেরার মুখে দেওঘরের আত্মীয় বলিলেন, 'পোষ্ট আফিস হ'য়ে যে যেতেই হবে।... window-delivery না নিলে চিঠি পেতে সেই দুটো-তিনটে।'

বলিলাম,—তাড়ার কিছু আছে না কি? না—'কেমন আছ' আর 'কেমন আছির' আদান-প্রদান?

শ্রীমান্—সকলে কেমন আছে, সেটা জানবার একটা ব্যাকুলতা থাকে না?

বলিলাম,—কিছু না, আমাদের আবার কেমন থাকাথাকির এত খোঁজ কেন? সব বেশ আছে। বড় জোর জ্বর, না হয় সর্দ্দিকাসি। শাকপাতাড় খেয়ে বাঁচতে হ'লে দু'বারের জায়গায় না হয় চারবার দাস্ত। আজো এ সব স্বাভাবিক ব'লে ভাবতে শিখলে না!"

ক'টি মাত্র ছত্র! কিন্তু বাঙালীর স্নেহাতুর মন আর অন্ন-কষ্টের কতখানি আভাস ইহার মধ্যে! যাঁরা পশ্চিমে যান, তাঁরাই এই windowdeliveryর প্রত্যাশী পোষ্ট আপিসের পথের পথিক! লেখক মৃদু ইঙ্গিতে বাঙালীর এই প্রকৃতির কি ছবিটুকু আঁকিয়া দিলেন। ছবিতে হাসির দু'একটা রেখার পিছনে ঐ যে দীর্ঘশ্বাসের একটু কালো ছায়া...কোষ্ঠীর ফলাফলের পটে এমন ছবি হাজার রকম হাজার বর্ণে ফুটিয়াছে।

পোষ্ট অফিসে আসিতে হইল। আসিয়া দেখেন, "নানা বয়সের ৩০।৪০ জন বাঙালী—কেহ পথে, কেহ বারান্দায় দাঁড়াইয়া একত্রে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া হাস্যালাপ করিতেছেন।... তরুণ, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ,—নিজের নিজের দল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।" লেখক বিস্ময় বোধ করিতেছেন, "আজিও পিক-পকেট বা গাঁটকাটারা এ শুভ" সুযোগ আয়ত্ত করে নাই দেখিয়া!

চিঠিপত্র-সমেত গৃহে ফেরা হইল। স্নান সারিয়া আহারে বসা। গৃহকর্ত্তা তাড়া দিলেন—খাইতে বসিয়া দেখেন, কর্ত্তার ভৃত্য বাণেশ্বর বাড়ীর চিঠি না পাইয়া মহা চিন্তিত, বলিতেছে,—"দেড় মাস হ'য়ে গেছে বাবু, আমি তো পত্তর পেয়েছ্যান্ আমার মায়ের আমাশা লেগেছে, আর কোন খপর পাইনি....."

"বাবু একটু মোলায়েম হইয়া বলিলেন,—যেখানে থাকিস্, সেখানে ডাক্তার-বদ্দি নেই ত!"

"বাণেশ্বর কাতর কণ্ঠে বলিল,—না, হুজুর—সাত কোশের ভিতর কেউ নেই।"

বাবু। যাঃ, বেঁচে গিছিস্! তোর আর ভাবনা কি—কিছু ভাবিস্‌নি। তোর মাকে মারে কে! মারবার কেউ নাই ত!

বাণেশ্বর। আপনি তবে অত ভাবচেন কেন?

বাবু। আমি ভাববো না ত ভাববে কে রে গোমুক্খু! কল-কেতা যে ডাক্তার-বদ্দির আড্ড। তাদের মোটরগুলো মেটেগ্রহের মত কোসে মাটী চোষে বোঁ বোঁ ঘুরচে। সে চক্রে পড়তেই হবে। তার ওপর বাবুদের ঠিকা আছেন। আর কি বাঁচোয়া আছে? দু'য়ে মিলে রোগও দু'দিন জোম্‌তে দেয় না, রুগীও জোম্‌তে দেয় না—হয়েছে কি গেছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর মামার প্রবেশ। মামার বয়স ৪৫ বছরের মধ্যে—বেশ পুষ্ট ও সবল—মাথায় ক্রসের সযত্ন পরশ, —কেতাদুরস্ত লোক। মামা লেখকের বাল্যবন্ধু অমরের বৈবাহিক। মামার সঙ্গে অমরও ছিলেন। আলাপ-পরিচয় হইল।

কথায় কথায় অমর বলিল;—"এত দিন যে চাকরী করলে —করলে কি ?

বলিলাম,— "চাকরী করলে যা যা করতে হয়, সবই করেছি···দরকার হ'লে মিথ্যা আটকায়নি, কারণ, চাকরীর চ্যাপটারে সত্যের মর্য্যাদা কমই—কমাও নাই। চাকরীর উপর হাড়ে হাড়ে চটেওচি—চাকরীও করেচি। ফাঁক পেলে ফাঁকিও কম দিইনি ! কেবল বড়বাবু হবার চেষ্টাটি পাইনি, অনেকের অন্ন মারতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে শিশুহত্যাও হ'য়ে যায়—আর ওই দুয়ে মিলে দুঃখিনী পত্নী ও মায়ের দীর্ঘনিশ্বাস আর চোখের জল নীরবে আর নিভৃতে পড়লেও—সে ব্রহ্মাস্ত্র যে ব্যর্থ হয়, এটা আমি ভাবতেই পারি না।

তা হ'লেও কেরাণী জাতের মুখ হেঁট করি নাই। চল্লিশ টাকা বেতনে ষাট টাকার স্যুট্ চালিয়েছি ; ভাল খেয়েছি, ভাল পরেছি, ভাল থেকেছি—অবশ্য স্ত্রী-পুরুষে। নির্ভীকের মত দেনা করেছি, কেউ কাপুরুষ বলতে পারবে না। টাকায় তিনটে ল্যাঙড়া, দেড় টাকা সের পটোল, সাত সিকেয় একটা ইলিশ, এক টাকা কুড়ি এগুওলা তোপসে, চায়ের সঙ্গে Lady's Afternoon Biscuit খেয়েছি। ফার্ষ্ট ক্লাশ এসেন্স মেখেছি, বাউটি ঘড়ি (Wrist-watch), সোনার চশমা পরেছি—একটা গ্রামোফোনও কিনেছি ! আর কি করতে বলো ?

—রেখেছ কি ?

বলিলাম, আগেও যা ছিল—কিঞ্চিৎ ঋণ। তার কিছুমাত্র নষ্ট হ'তে দিইনি,—ঠিক তাই আছে।"

বাঙ্গালীর চিত্ত-দাহের, এই গোপন কারণটুকু এমন করিয়া কোথায় আর দেখিয়াছি ! অন্নসমস্যা, অর্থ-সমস্যা, চাকুরের ব্যথার এমন মর্ম্মছবি কোন্ বক্তা চোখে ধরাইয়া দিতে পারিয়াছেন ! বাঙ্গালীর অন্তরের অতি-গোপন বেদনার দীর্ঘশ্বাসের খবর এমন করিয়া কে-বা জানিয়াছে, কে-বা বলিয়াছে ? পাশের বাড়ীর তরুণীর ঘোম্‌টার সৌন্দর্য্য লইয়া তরুণ কবি ছন্দে ঘোর-প্যাঁচের সৃষ্টি করিতে মত্ত, খদ্দর লইয়া স্বরাজী ছোকরাকে দেশের বেদনা ঘুচাইতে নেতা আদেশ করিতেছেন, আর মোটরে চড়িয়া পার্কে আসিয়া মস্ত ঝুলি বাহির করিয়া চাঁদা-সংগ্রহ করিতেছেন। দেশের সব দুঃখ যেন তাহাতেই দূর হইবে ! বাঙলা আর বাঙালীকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখার শক্তি এমন ক'জনের—এ বই পড়িতে পড়িতে বার বার সে কথা মনে হইয়াছে।

লেখক cynic নন্—তিনি বাঙলা দেশকে প্রাণ দিয়া ভালোবাসেন ; বাঙালীকেও সেই সঙ্গে। ঘৃণা বস্তুটা কি, তা তিনি জানেন না !···ক'য় ছত্র তুলিয়া দিলে পরিচয় মিলিবে। "বাঙলা দেশের মত দেশ আছে···সব পদ্ধতিদুরস্ত। এই মায়েদের শিবমন্দির, গায়েই বিলেতী কেষ্টচূড়ো, পরেই আমলকী, তার পর কদম,—পাশেই কামিনী বষ্ট মী বেগুনী ভাজচে, ধারেই নিমগাছ, তার পর বকুল ;—তলাতেই পল্টুর পানের দোকান—একদোনা নিন্—জর্দ্দা আর পানের বোঁটায় চূণ—চাইতে হয় না। তার পর গলিতে পা দিয়েই চুপ্ ক'রে বাড়ী ঢুকে পড়ুন—হাস্না-হেনা ভর্ ভর্ ক'রে গন্ধ ছড়াচ্ছে !" এ কয় ছত্র সত্যই রবীন্দ্রনাথের সে ছত্রগুলির পাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার এক্তিয়ার রাখে,—

"নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি !
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগন-ললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি···
* * * পঁহুছিনু নিজ গ্রামে,
কুমোরের বাড়ী দক্ষিণে ছাড়ি রথতলা করি বামে
রাখি হাটখোলা, নন্দীর গোলা মন্দির করি পাছে···"

শুধু এখানে-ওখানে ছবির টুক্‌রা নহে—বইখানি যেন এক বড় landscape ; ইহাতে নদী আছে, পাহাড় আছে, কানন আছে, শ্যামল ক্ষেত আছে, কুটীর আছে,—আবার ধনীর মস্ত প্রাসাদ (House of Lords)—সব আছে এবং সবগুলি মিলিয়া একটি সমগ্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। তার পর চরিত্র··· অনেক রকমের বাঙালীর দেখা পাইয়াছি। গ্রামের সিদ্ধেশ্বর ভটচাযি্য আচারনিষ্ঠ, নিজের মাচার বিশুদ্ধ লাউগাছ-রক্ষায় এমন তৎপর যে, একটি গাভী সেই লাউগাছ খাইতেছিল বলিয়া তাকে এমন বংশদণ্ড প্রহার করেন যে, গোরুর শিঙ ভাঙ্গিয়া যায় এবং তার প্রাণ যাইবার জো ! সে ব্যাপারে গ্রামের দুরন্ত ছেলে মানবের আকাশের মত দরাজ ছাতি ; দিলদার মানুষ আজিজ্ কাবুলীওয়ালা ; পল্লীর সমাজপতির দল ; স্বদেশী ইনসিওরেন্স দল, চা-ওয়ালা এবং তার ছোকরাটি ;—সকলেই এমন নিখুঁত জীবন্ত মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাদের কণ্ঠস্বরটুকু অবধি আমাদের কাণে আসিয়া লাগে !

চায়ের দোকানটি এমন জীবন্ত যে, তার একটু পরিচয় না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না—"রাস্তার উপরেই দোকান। সাত হাত লম্বা, চার হাত চওড়া ঘর। ঘরের মাঝখানে আপিসের দপ্তরীপরিত্যক্ত একটি নিরেট টেবিল।···তাহার উপর নিত্যই চায়ের এক এক পোঁচ ছোপ ধরিয়া দৃশ্যে ও গন্ধে সেটিকে এমন অবস্থায় দাঁড় করাইয়াছে যে, মহাত্মা গন্ধীও তাহাকে অস্পৃশ্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য।···সেই ঘরসংলগ্ন একটি দ্বারে চটের একখানি ছেঁড়া পর্দ্দা···শত ছিদ্র লইয়া একাকারের বিরুদ্ধে যুঝিতেছে।···চেয়ার দু'খানি ছারপোকার ধর্ম্মশালা।···শিবু পণ্ডিতকে মনে পড়িল। বাল্যকালে তিনি কয়েকবার জলবিছুটির ইঞ্জেকশন্ দিয়া না বাখিলে এ কামড়ে আর রক্ষা ছিল না—মরিয়াই যাইতাম।"

তার পর চা।···"প্রথমে দাঁড়া-চুমুক মুখে লইতেই তাহা বহির্ম্মুখী হইয়া পড়িল, যেমন বিটকেল স্বাদ, তেমনই একটা ন্যাতা-জড়ানো গন্ধ। তুলনা-রহিত,—বোধ হয় ব্রহ্মদেশের নাপ্পীর বাপ্পী !"

চা ফেলিয়া দিতে যাইতেছিলেন, দোকানের ছোকরা বলিল, "ফেলবেন না মশাই, আমাকে দ্যান। বলিয়া কাপ দুইটি লইয়া পর্দ্দার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। পরক্ষণেই আসিয়া বলিল,—ছাগলের দুধ দেওয়া হয় কি না—তাই আপনকারদের ভালো লাগে নাই। কুতুমশাই (দোকানের মালিক) বলেন, ওটা ভারী উপকারী, চায়ের অপকারিতা ত নষ্ট করেই, তা ছাড়া 'থাইসিস' হতি দেয় না। তেনা যে ডাক্তার গো বাবু।

জ্বালায় মনোভঙ্গে প্রাণটা বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল, বলিলাম, আমরা ত ডাক্তারখানায় আসি নাই বাবা ইত্যাদি।"

এ বইয়ের সমালোচনা করিতে বসি নাই। পড়িয়া খুব ভালো লাগিয়াছে, তাই অপরের কাছে দু-চারি কথায় পরিচয় মাত্র দিতেছি।

ইংরাজীনবীশ নব্যের ছবিও দু-একটি ইঙ্গিতে কেমন ফুটিয়াছে, তার একটু পরিচয় দি—"সে বাড়ীতে পুরুষের মধ্যে গিন্নীর এক বিলিতি ফ্রেম-আঁটা ব্রাদার থাকেন। তাঁর খাকি হাপ্-প্যাণ্ট, খাকি সার্টের আধখানা গিলে রয়েছে, নীল রংয়ের 'টাই' ঝুলছে, আস্তিন কনুয়ের ওপর গোটানো। কামার মুড়ির আশায় পাঁঠার সামনের পা ঘেঁসে কোপ মারে, নাপিত যে কি আশায় ঘাড়ের চুলে ঝেড়ে কোপ চালিয়েছে জানি না। বারাণ্ডায় ইজি-চেয়ারে ব'সে ইংলিসম্যান দেখছিলেন।"

এই কটি ছত্রে কি জীবন্ত ছবিই না ফুটিয়াছে! এমনি ছবি ছত্রে ছত্রে···যাঁর দেখিবার চোখ আছে, তিনিই দেখিবেন। এ রঙ্গ-চিত্রে বুকের কতখানি বেদনা, অশ্রুর কত সজল রেখায় ফুটানো!

যাঁরা পুরোপুরি রস উপভোগ করিতে চান, তাঁরা সম্পূর্ণ বহিখানি পড়ুন। বহি পড়িয়া এমন আনন্দ মেলে,—ভাবিয়া বিস্মিত হইবেন। আমরা আর একটি ছবি দেখাইয়া বিদায় লইব। সে ছবি ষ্টেশনের ছোকরা বাবুর। "লম্বা ছিপছিপে যুবা···মাঠ-মুখো চেয়ার টানিয়া···এক চুমুক চা খাইতেছেন। সামনে একখানি খাতা খোলা। দেখিলেই বোঝা যায়, আপিসেরও নয়, ধোপার হিসাবেরও নয়—সখের। হাতে ফাউণ্টেন পেন, মুখে হুঁ-হুঁ-হুঁ!"

তিনি কবি। বলিলেন,—"···নেশা। তা যে চাকরী, সময় তো পাই না। এই সময়ে যা দু'লাইন! তাও বেরুতে কি চায়! রেলের আওয়াজে মগজ ভরা। মিলের তরে মাথা খুঁড়ছি।

নায়ক বলিলেন,—ওর আনন্দ যে একবার পেয়েছে, তার কি আর ইহকাল পরকাল থাকে ভাই—সে বাপের সঙ্গে সাপ, ধর্ম্মের সঙ্গে চর্ম্ম, না হয় অধর্ম্ম পর্য্যন্ত জুটিয়ে দেয়। শুধু মিললেই হবে না—মিলের কথা দুটি—এক ওজন আর এক আওয়াজ দেওয়া চাই।···এই বাড়ন্ত যুগে তার কমে কি মানায়? ছাগলের সঙ্গে পাগলকে এক খোঁটায় বাঁধা বরং চলে, কিন্তু 'জল'-এর সঙ্গে অচল।···

ছোকরা কবি বলিলেন,···চণ্ডীর স্তব লিখতে আমারি একবার প্রথম লাইনের শেষে 'উপচিকীর্ষা'রূপ উৎপাত এসে পড়ে, শেষ 'গুঁপো নাদীর শা' বসিয়ে সে যাত্রা বাঁচি।···"

সমাজ, সাহিত্য, পলিটিক্স—কোনো বিষয়ই কুশলী লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নাই!···

বাঙলায় লিখিতে বসিলেই শতকরা ৯৯ জন লেখক গাম্ভীর্য্যের মুখোস আঁটেন দেখিতে পাই, জীবনের সহজ স্বাভাবিক নিত্যকার যা-কিছু, তাহা হইতে বহু দূরে পাড়ি দিয়া এমন কৃত্রিমতার সৃষ্টি করেন, নর-নারীর স্বাভাবিক প্রকৃতির কোনো সন্ধান না করিয়া abnormal conditions ভাবিয়া abnormal জীবের সৃষ্টি করিয়া বসেন,—তার কুফল যে কত দিকে কত ভাবে বিস্তারিত হয়, সে সংবাদ যদি রাখিতেন, তবে আজ যে ন্যাকামি, যে অবাস্তব সমস্যার জঞ্জাল মাথায় বহিয়া বহু প্রতিভা তার চাপে অকালে মরিতে বসিয়াছে, সে দুর্ঘটনাটুকু অন্ততঃ ঘটিবার অবসর পাইত না।

এই কৃত্রিমতার যুগে 'কোষ্ঠীর ফলাফল' সাহিত্যে ও মনে সজীবতা আনিয়াছে; এবং স্বাস্থ্যের আবহাওয়ায় মনকে বলিষ্ঠ করিবার কার্য্যে যে প্রচুর সহায়তা করিবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

পড়িতে বসিয়া বার বার রসরাজ অমৃতলালের কথা মনে জাগিয়াছে। তাঁর তিরোভাবে বাঙলার রস-সাহিত্য শুকাইবে বলিয়া যে আশঙ্কা হইয়াছিল, তা দূর হইয়াছে। তাই প্রার্থনা করি, শ্রদ্ধেয় কেদার বাবু সুস্থ দেহে-মনে বহু—বহু কাল ধরিয়া বাঙালীর প্রাণে এমনি নির্ম্মল অনাবিল শুভ্র রসধারা সিঞ্চন করুন—dying race বাঙালী যদি প্রাণ পায় তো তাঁর মত এমনি দরদী ও অসামান্য শক্তিধর লেখনীর সরস পরশেই পাইবে!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আঁধি

খেলার ছলে দুই তরীতে দিলাম পাড়ি দু'জনে,
আমি গেলাম—ভাটার মুখে তোমায় ছাড়ি,' উজানে;
ওগো আমার খেলার সাথী জীবন-সাথী গো,—
হেলায় নিধি হারিয়ে ফেলে' এখন কাঁদি শোচনে!

আকাশ ছিল অমেঘ অমল, রৌদ্র-উজল ধরণী
পার হয়ে যে গেলাম কত অজানা জলসরণী;
হঠাৎ কখন্ উঠল আঁধি অকাল আঁধি গো,—
তাকিয়ে দেখি, হারিয়ে গেছ!—কোথায় বাঁধি তরণী?

দিনের আলোয় ভাবিনি হায় রাত্রি যে এর পিছনে,
চক্রবাকের মতন জাগি নদী-চরের বিজনে;
কোথায় তুমি কোন্ অপারে কোন্ অকূলে গো,—
আর কি মোদের প্রভাত হবে আলোয়-ফুলে-কূজনে!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

মাছধরা—

সারাটা দিন রোদে ফেটে ঠিক্‌রে গেলো চোক।
রুইটা পাছে ঠুক্‌রে পালায়, সেই দিকেতেই ঝোঁক।

ছেলেধরা—

নিজে বুড়ো হ'লে কি হয়, মা ষষ্ঠীর বরে।
নেড়ি-গেঁড়ি কুঁচো ছেলে ধরে না কো ঘরে॥
গিন্নী একা—ফুর্স্‌ৎ নেই, ছেলে কখন্‌ রাখে?
কাযেই নিজে সাম্‌লাই সব নিয়ে কোলে-কাঁখে॥
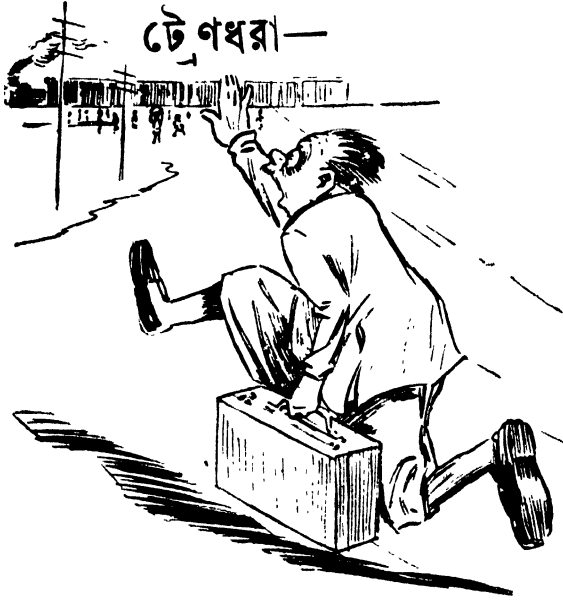
প্রাণপণেতে ছুটছি আমি ট্রেণটা যাতে পাই।
ট্রেণ ধরতে মরি যদি তাতেও ক্ষতি নাই॥

গিন্নীর যে ধর্‌লো মাথা—হায়-হায়-হায় হায়।
কি করি গো, এবার বুঝি সংসারটা যায়!

শানাইদারকে আনলে বেছে, দেশ যুড়ে তার মান।
বাহবা দেয় সবাই শুনে শানাইয়ে তার গান॥
পোঁ ধরেছেন যিনি তাঁহার মনে অহঙ্কার।
আমি না স্বর রাখ্‌লে বজায়, গায় সাধ্য কার?

পেটের দায়ে তোমার ঘরে খাটতে এলো ঝি।
তার সঙ্গেও বুড়ো তোমার এত ইয়ারকি?
ফাঁদি নথে ঘোরালো মুখ রুদ্ররসে ছেয়ে।
পিছনে যম দাঁড়িয়ে তোমার দেখ ছো না তা চেয়ে

তানধরা—

ওস্তাদজীর যদ্রূপ হাঁ, তদ্রূপ চীৎকার।
ডাহিন হাতে তাল দিচ্ছেন কিবা চমৎকার!
আপ্‌নার কাণ রক্ষে করেন বাঁ-হাত চেপে তাতে।
শ্রোতাগুলির কাণ রক্ষা ভগবানের হাতে!

বায়নাধরা—

চক্ষু বুজে কাঁদ্‌ছে খোকা, গিন্নী আঁতুড়-ঘরে।
ভুলুতে যে পাচ্ছি না গো, রাখি কেমন করে'!

রোগেধরা—

জ্বর রয়েছে ঘুটেপেটে, হয় না জ্বরত্যাগ।
পাঁচ ডিগ্রী এখন, কাযেই মাথায় আইস্ ব্যাগ!

টানধরা—

শিয়রে যম—ওষধেতে হলো না আর ফল।
ভরসা করে' এখন মুখে দাও গঙ্গাজল!

শিল্পী—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু।

মাদকতা-নিবারণ

মার্কিণ যুক্তপ্রদেশের সরকার মাদক-নিবারক আইনের প্রভাবে মাদকতা দমনের প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য যে মহৎ, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু মানুষের স্বভাবই এই, কেহ জোরজবরদস্তি করিয়া তাহাকে বহু-দিনের অভ্যাস হইতে বিচ্যুত করিতে চেষ্টা করিলে সে তাহাতে কায়মনে বাধা দেয়। এই হেতু মার্কিণ দেশ হইতে যেমন পুসিফুট জনসনের মত নীতিকথার প্রচারকের উদ্ভব হইয়াছে, তেমনই অসমসাহসী 'বুটলেগার' নামক জীবেরও অভ্যুদয় হইয়াছে। ইহারা যে কত রকমে কৌশলে আবকারী শান্তিরক্ষক-দিগকে ফাঁকি দিয়া নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য মার্কিণ রাজ্যের মধ্যে আনয়ন করে, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। মার্কিণদেশে এই বুটলেগারদের লইয়া কত যে গল্প ও নভেল নাটক রচিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ইহাদের আর একশ্রেণীর গুপ্ত ব্যবসায়ীর নাম 'রামরাণার্স'।

ইহা হইতে বুঝা যায়, ইহাদের চেষ্টায় মার্কিণদেশে অবৈধ উপায়ে প্রতিবৎসর কত মাদকদ্রব্য আমদানী হয়! ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ৫৭ হাজার লোক মাদক-নিবারণের আইন ভঙ্গ করিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে যাহাদের জরিমানা হইয়া-ছিল, তাহাদের জরিমানার পরিমাণ হইয়াছিল ১২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে এ যাবৎ এই অপরাধে মোট ৪ লক্ষ লোক অভিযুক্ত হইয়াছে! ব্যাপার এমনই ভীষণ! একে জবরদস্তির আইন বলিয়া ধারণা, তাহার উপর স্ফূর্ত্তি ও নেশা ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়,—কাযেই লোক কি ভাবে এই আইন গ্রহণ করিবে, তাহা পূর্ব্বেই জানা ছিল। ধর্ম্মই হউক, আর নীতিই হউক, মানুষের মনই সব। খৃষ্টান মিশনারীদের এখন নাগা-কুকীদের দেশে শিক্ষা ও ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা দিন কতক স্থগিত রাখিয়া মার্কিণ দেশে উহা চালাইলে হয় না? সেখানে অধিকাংশ লোক নিরক্ষর বলিয়া সরকারী বিবরণেই জানা যায়।

আইরিশ দেশপ্রেমিক ওকোনার

সম্প্রতি আয়ারল্যাণ্ডের বিখ্যাত লেখক ও দেশপ্রেমিক মিঃ টমাস পাওয়ার ওকোনারের ৮১ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি সংবাদপত্র-সম্পাদকরূপে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি জগতের বড় বড় মনীষীর মৃত্যুসংবাদ এত অধিক লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার নামই হইয়া গিয়াছিল,—Obituary Editor অর্থাৎ পরলোকগত মনীষিগণের গুণকীর্ত্তনকারী সম্পাদক। তিনি কেবল সংবাদপত্র-লেখক ছিলেন না, তিনি বহু গ্রন্থেরও রচয়িতা ছিলেন। এক সময়ে তাঁহার গ্রন্থের সমাদর ও বহুল প্রচার ছিল।

ইহা ব্যতীত তিনি আর এক বিষয়ে নাম রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বদেশপ্রেমিক রাজনীতিক ছিলেন। পার্লামেণ্টের সদস্যরূপে তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত স্বদেশবাসীর সহায়তা করিয়াছিলেন। বিখ্যাত রাজনীতিক গ্লাডষ্টোন ও ডিসরেলির সংস্রবে আসিয়া তিনি রাজনীতিতেও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং বহু-দিন পার্লামেণ্টের সদস্যপদ অধিকার করিতে সমর্থ হওয়ায় তিনি Father of the House of Commons অর্থাৎ 'কমন্স সভার পিতা' বলিয়া অভিহিত হইতেন। তিনি ডিসরেলির একখানি জীবন-চরিত লিখিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বযুগের ইংলণ্ডের রাজ-নীতির ইতিহাস এই গ্রন্থে প্রভূত পরিমাণে সঙ্কলিত বলিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ে গ্রন্থখানি সমাদৃত হইয়াছে।

সভ্যতার মাপকাঠি

বর্ত্তমান যুগের সভ্যনামধেয় শক্তিশালী প্রতীচ্য জাতিরা তাঁহা-দের শিক্ষা-দীক্ষা ও ভাবধারার অনুপাতে সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই ধারণার প্রতিকূল পক্ষে যাহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সমাজ ও ধর্ম্ম গঠন করে, তাহারাই তাঁহাদের বিচারে অসভ্য। প্রতীচ্য জাতিদের মধ্যে অবশ্যই মেক্সিকোর অধিবাসীকে ধরিতে হইবে; কেন না, তাহারাও শ্বেতজাতির বংশধর। সম্প্রতি এই দেশের প্রেসিডেণ্ট জাতীয় কংগ্রেসের প্রদত্ত ক্ষমতার বলে এক নূতন দণ্ডবিধি আইন গঠন করিয়াছেন। এই আইনের একটি ধারায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, যদি কোন কন্যা পিতার অনিচ্ছাসত্ত্বে বা অজ্ঞাতসারে তাহার প্রেমিকের নিকট দেহ দান করে, তাহা হইলে ঐ কন্যা ও তাহার সতীত্বনাশক প্রেমিককে হত্যা করিবার কন্যার পিতার আইন অনুসারে অধিকার থাকিবে। আর একটি ধারা অনুসারে স্বামী তাহার বিশ্বাসঘাতিনী পত্নীকে এবং পত্নী তাহার বিশ্বাসঘাতক পতিকে হত্যা করিতে পারে।

তথাকথিত সভ্য নামধেয় জাতিদের আইনে কিন্তু এই অধি-কার দেওয়া হয় না। তাহাদের দেশে মানুষ কেবল আত্মরক্ষার্থ অপরের জীবন লইতে পারে, অন্যথা নহে। মেক্সিকোও কেতা-দোরস্ত আইন অনুসারে শ্বেতজাতির দেশ বলিয়া পরিগণিত।

মেক্সিক্যানদের পূর্ব্বপুরুষরা ছিলেন প্রায়শঃ স্পেনীয়। স্পেনীয় জাতি চিরদিনই গর্ব্বিত, সন্দেহপরায়ণ, প্রতিহিংসাপরায়ণ বলিয়া খ্যাত। স্পেনীয় স্বামীরা অতীব সন্দিগ্ধচেতা, এইরূপই প্রতীচ্যের কাব্যে পুরাণে ও ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা কথায় কথায় বিশ্বাসঘাতিনী পত্নী ও তাহার উপপতিকে হত্যা করিত বলিয়া গ্রন্থের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়। মেক্সিকোবাসীরা, তাহাদের এই গুণটি (?) উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছে, তাই তাহাদের দেশে এমন আইন গঠিত হওয়াই স্বাভাবিক। মানুষের মনের গতি-প্রকৃতির অনুরূপ হইয়াই তাহার সমাজ, ধর্ম্ম, আইনকানুন, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি গড়িয়া উঠে। মেক্সিকোবাসীদেরও তাহাই হইয়াছে। কিন্তু মার্কিণ, ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি তথাকথিত সভ্যজাতি কি মেক্সিকোর এই আইন মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন—তাহারাও ত সভ্যজাতি! মানিয়া লওয়া ত দূরের কথা, তাঁহারা ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিয়া বলিবেন, ছি, ছি, কি জঙ্গলী জাত! কেন, বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন আছে, আইন-আদালত আছে, খেসারত আছে, খুনোখুনি কেন?

কিন্তু মেক্সিকোবাসীরা যদি সুসভ্য মার্কিণ জাতিকে বলে, তোমরা নিগ্রো কাফ্রিকে 'লিঞ্চ ল' নামক ভাণ আইনের সাহায্যে নিষ্ঠুররূপে হত্যা কর কেন, তোমাদেরও ত আইন-আদালত আছে, খেসারত আছে, তবে এই পিশাচ প্রবৃত্তি কেন,—তাহা হইলে প্রতীচ্যের মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠ সভ্য মার্কিণ-জাতি কি জবাব দিবেন?

আমাদের ভারতের শাসক জাতি ইংরাজ সুসভ্য বলিয়া জগতে পরিচিত। তাঁহারা আমাদিগকে নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া মনে করেন। এরূপ মনে করিবার একটা প্রধান কারণ এই যে, আমাদের মধ্যে জাতিভেদ আছে। অথচ সে দিন ইংরাজী সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হইয়াছে যে, মার্কিণ দেশের এক সম্রান্ত শিক্ষিত নিগ্রো লণ্ডনের পর পর ২০টা হোটেলে গিয়াও স্থান পান নাই—সকল স্থানেই এক কথা—নিগ্রোকে যায়গা দিলে হোটেলে আর খরিদ্দার আসিবে না! ইহার অপেক্ষা মর্ম্মান্তিক জাতিভেদ আর কিছু জগতে আছে না কি?

দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-আফ্রিকায় ইংরাজ উপনিবেশিকরা দেশীয় ও ভারতীয় প্রবাসীদের গণ্ডীঘেরা করিয়া রাখিয়াছেন কেন, তাহাও সকলে জানে। সে গণ্ডী ছাড়াইয়া উহারা এক পা বাহির হইলেই শ্বেতকায় প্রবাসীদের জাতি যায়। কানাডা, মার্কিণ, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি দেশে এসিয়াবাসীর প্রবেশে নানারূপ বেড়া দেওয়া আছে। এই প্রতীচ্যজাতিরা জগতের যে কোনও দেশে যাইতে ও বসবাস করিতে পারেন, তাহাতে বাধা নাই; কিন্তু অশ্বেত জাতিরা তাঁহাদের দেশে পা দিতে গেলেই গণ্ডী কাটিয়া ও গোবর-ছড়া দেওয়ার এবং গঙ্গাজল ছিটাইবার ব্যবস্থা করা হয়!

সুতরাং জাতিভেদের কথা লইয়া বড়াই করা চলে না, উহার দ্বারা সভ্যতার মাপও করা যায় না। সভ্যতার পরিমাপ করা কোন জাতির একচেটিয়া অধিকার নহে—সে অধিকার কেহ কোন জাতিকে দেয় নাই। তবে গায়ের জোরে ফতোয়া দেওয়া? সে স্বতন্ত্র কথা।

নাদির শা

বৃটিশ, মার্কিণ, পারসীক এবং তুর্কী সরকার আফগানিস্থানের নব-প্রতিষ্ঠিত সরকারকে মানিয়া লইয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারা জেনারল নাদির খাঁকে আফগানিস্থানের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বৃটেনের বৈদেশিক সচিব মিঃ হেণ্ডার্স‍ন নাদির খাঁকে 'নাদির শা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

নাদির শা

এত দিনে সত্য সত্যই অশান্ত ও অরাজক আফগানিস্থানে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সরকারের অস্তিত্ব বহির্জগতের প্রবল শক্তিপুঞ্জের মধ্যে কাহারও কাহারও দ্বারা স্বীকৃত হইল। ইহা বস্তুতঃই এসিয়াবাসী—বিশেষতঃ ভারতবাসীর আনন্দের কথা। আফগানিস্থান আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য। এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে

মিষ্টার হেণ্ডার্স‍ন

আমরাও উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাশূন্য হইয়া নিরাপদে বাস করিতে পারি, বিশেষতঃ আর একটি এসিয়াবাসী প্রাচ্য জাতি স্বাধীনতা

অর্জ্জন করিয়া ক্রমোন্নতিমার্গে ধাবিত হইতেছে, ইহা মনে করিয়া সন্তোষ লাভ করিতে পারি।

মধ্যে যে কয় মাস বাচ্চা-সাক-আও সিংহাসনে বসিয়াছিল, সে কয় মাস যেন দুঃস্বপ্নের মত আফগান প্রজার বুকে চাপিয়া বসিয়াছিল। চারিদিকেই অরাজকতা, পথঘাট বিপৎসঙ্কুল, কে রাজার এজেণ্ট, তাহারও নিশ্চয়তা নাই, কোন্ প্রজা নিরাপদ, তাহা বিপদে পড়িবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কেহ বুঝিত না। লোকের ধন-প্রাণ মান-ইজ্জৎ সর্ব্বক্ষণই শত্রু দ্বারা ধর্ষিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় রাত্রিকালে অনেক আফগান নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারিত না। এখন নাদির শার শাসনকালে সে সমস্ত ভয় ঘুচিয়াছে।

মধ্যে জনরব রটিয়াছিল, নাদির শা গুপ্তঘাতুকের গুলীতে নিহত হইয়াছেন। এ সংবাদে জগৎ চমকাইয়া উঠিয়াছিল—আবার কি আফগানিস্থান রক্তস্রোতে ভাসিবে, আবার কি দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় কাল কাটাইতে হইবে? সৌভাগ্যক্রমে প্রকাশ পাইয়াছে, জনরব মিথ্যা। নাদির শা দীর্ঘজীবী হইয়া আফগানজাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করুন, আফগানরাজ্যকে উন্নত ও সভ্যরাজ্য-শ্রেণীভুক্ত করিতে সমর্থ হউন, ইহাই কামনা।

চীনের অদৃষ্ট

মহাচীনের জাতীয় দলের চেষ্টায় ক্রমশঃ বৈদেশিক শক্তিরা একে একে চীন সরকারের সহিত উভয়পক্ষের সম্মানকর সন্ধিসর্ত্ত করিতে সম্মত হইতেছেন। অনেকের সহিত সন্ধি হইয়া গিয়াছে; কাহারও কাহারও সহিত বা হইতেছে, আর বাকী যাহা থাকিবে, তাহা শীঘ্রই হইয়া যাইবে বলিয়া প্রকাশ। Concession, customs, Extra-territoriality, Foreign court,—এই কয়টি বিষয়ে চীনের জাতীয় সরকার বৈদেশিকের অন্যায় অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইতে চাহেন।

চীন যখন দুর্ব্বল ছিল, চীনের রাজা ও রাজপুরুষগণ কেবল ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকিতেন, চীনের প্রজা যখন পশুর ন্যায় উৎপীড়িত হইত, তখন চীনে প্রথমে বিদেশী মিশনারী, তাহার পর ব্যবসায়ী ও শেষে সৈন্য অবতরণ করিয়া একে একে তাহার অনেক অধিকার দখল করিয়া বসিল। উহা করিবার ছলের অসদ্ভাব ছিল না। বক্সার যুদ্ধটাই একটা প্রকাণ্ড ছুতা। চীনকে অহিফেন খাওয়াইবার প্রবল আগ্রহ যে অনেক অনর্থের মূল, তাহা বহু য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকই স্বীকার করিয়াছেন। যুদ্ধ অবসানে বৈদেশিকরা বক্সার যুদ্ধের খেসারৎ বাবদে চীনের কতক কতক জমী ভাগাভাগি করিয়া লইলেন, সেগুলির নাম হইল concession. আরও একটা সুবিধা করিয়া লইলেন যে, চীনের অন্তর ও বহির্ব্বাণিজ্যের শুল্ক আদায়াদি কার্য্যে কোন কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বৈদেশিকদিগের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। বৈদেশিক দূতাবাসে বৈদেশিকদিগের মামলার বিচার হইবে, এরূপ বিশেষ ব্যবস্থাও করাইয়া লওয়া হইল।

নভেম্বর মাসের মধ্যে চীনদেশে একটা বৈঠক বসিবার কথা ছিল। সে বৈঠক বসিয়াছে বলিয়া কিন্তু খবর পাওয়া যায় নাই। না হইলেও বৈঠকে (Extra-territorialityর) সম্বন্ধে চীন ও বৈদেশিক শক্তিগণের মধ্যে একটা পাকা আপোষ-বন্দোবস্ত হইয়া যাইত। কিরূপ বন্দোবস্ত হইত, তাহার আভাসও পাওয়া গিয়াছিল। উহা দেখিয়া কিন্তু মনে হয় না যে, বিদেশী শক্তিপুঞ্জ তাঁহাদের এত কালের একচেটিয়া অধিকার সহজে ছাড়িয়া দিবেন। বৃটিশ সরকার আগষ্টমাসে এ সম্বন্ধে চীন সরকারকে যে কথা জানাইয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

চীনের রাজা প্রজা উভয়েরই প্রতীচ্য আইন-কানুনের বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা চাই এবং সেই আইন তাহাদের মানা চাই। যে সকল আদালতে বিদেশিসংশ্লিষ্ট মামলার বিচার হইবে, তাহাদের উপর চীনের সামরিক কর্ত্তাদের বা কোন দল বা সমিতির কোনও কর্ত্তৃত্ব ও প্রভাব থাকিবে না—অর্থাৎ ঐ সকল স্বার্থচালিত দল, সমিতি বা কর্ত্তার হুকুম মত আদালতগুলি চলিবে না। চীনদেশের অনেক স্থানে War lordরা—সামরিক প্রভুরা অথবা বড় বড় রাজনীতিক দলের কর্ত্তারা দুর্ব্বলের উপর নানা অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বেচ্ছামত নিজেদের আদালত খাড়া করিয়াছেন, এবং ঐ সকল আদালতে অন্যান্য জাতির সহিত বৈদেশিকদিগের বিচার করিয়া থাকেন। রাজনীতিক উদ্দেশ্যসাধনই এই প্রকার বিচারের উদ্দেশ্য। এই হেতু চীনা ও চীনার মধ্যে অথবা চীনা ও বিদেশীর মধ্যে ঠিক ন্যায়বিচার হয় না। যদি চীনের জাতীয় সরকার বিচারের সকল দোষ-ত্রুটি সংশোধন করিতে পারেন, তাহা হইলে চীনা আদালতে বিদেশীরা মামলার বিচার করিতে স্বীকার করিবেন, অন্যথা নহে। এরূপ ব্যবস্থা করিয়া না লইলে বৃটিশ ব্যবসায়ীদের চীনদেশে বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্য করা অসম্ভব হইবে; জমীজমা ভোগ-দখল করাও সম্ভবপর হইবে না। চীনারা বৃটেনে বাস করিয়া যে স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করে, ঠিক সেইমত অধিকার বৃটিশজাতি চীনদেশে না পাইলে Extra-territorial অধিকার ছাড়িতে পারেন না।"

সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, আজ না হউক, দুই দিন পরে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যেরূপে হউক, বৃটেন ও অন্যান্য প্রতীচ্য শক্তিকে চীনদেশে অন্যায় অধিকার ছাড়িয়া দিতে হইবে। বৃটেন যদিও এই 'নোট' বা বিজ্ঞপ্তিপত্রে প্রথম মুখেই এই সব অন্যায় অধিকার ছাড়িবেন না বলিয়া জানাইয়াছেন, তথাপি তাঁহাকে এইটুকু স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, চীনা আদালত তাঁহাদের নিজের দূতাবাসের আদালত নহে। বৃটিশ প্রজারও বিচার চলা আইনসঙ্গত, তবে আদালতটা সংস্কৃত করিয়া লইতে হইবে। এখানে যে চীনের মূল নীতিই মানিয়া লইতে হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

স্বাধীন চীনের নিজের দেশে নিজের আদালতে দেশীয় বিচারকের নিকট সকল জাতির লোকেরই অপরাধের বিচার হওয়া আইনসঙ্গত, অবশ্য যদি প্রতীচ্য শক্তিনিচয় চীন সরকারের রাজ্যে বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। দুর্ব্বল চীনের আমলে এই নীতি প্রবল বৈদেশিক শক্তিরা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এখন ক্রমে তাঁহাদিগকে সেই নীতি গ্রহণ করিতে হইতেছে। চীন যে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, ইহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু এমনই চীনের দুরদৃষ্ট যে, যে সময়ে চীন একটু মাথা কাড়া দিয়া উঠিতেছে, যে সময়ে জগতের পাঁচ জন তাহাকে

প্রবল বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইতেছে,—ঠিক সেই সময়ে আবার চীনে গৃহ-বিবাদের সূচনা হইয়াছে। ইহা কেবল চীনের নহে, সারা প্রাচ্যেরই বৈশিষ্ট্য! এখানে জয়চাঁদ মীরজাফরের অভাব নাই। আর এই গৃহবিবাদের ফাঁক পাইয়া শত্রু রহলে-সহলে গৃহে প্রবেশ করিতেছে।

জেনারল চিয়াং কাইসেক বর্ত্তমান চীনের জাতীয় সাধারণতন্ত্র সরকারের প্রেসিডেণ্ট, ইহা সকলেই জানেন। তাঁহার বিপক্ষে একটা সম্মিলিত দল (coalition) চীনদেশে দেখা দিয়াছে। ইহারা বলেন, চিয়াং কুওমিণ্টাং-এর প্রথম প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার সান-ইয়াট সেনের নির্দ্দেশমত কাজ করিতেছেন না, পরন্তু চীনের প্রবল বৈদেশিক শত্রুগণের মনস্তুষ্টিসাধনের জন্য কম্যুনিষ্টদলীয় দেশবাসীর উপর অনাচার আচরণ করিতেছেন এবং তাহার ফলে রুসিয়ার সোভিয়েট সরকারকে প্রকাশ্য শত্রুরূপে পরিণত করিয়াছেন।

ডাক্তার সান-ইয়াটসেন

এই বিদ্রোহী দল Left-wing Kuomintang নামে পরিচিত। ইঁহারা বর্ত্তমানে 'Reorganisationists' নাম ধারণ করিয়াছেন, এবং দক্ষিণ-চীনে জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া ঐ সরকারের সংশোধন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। ইঁহাদের দলপতিদের নাম হইতেছে,—ওয়াং চিংওয়েই এবং চেং কুংপো। ইঁহাদের সহিত চিয়াং কাইসেকের বিরুদ্ধে যোগদান করিয়াছেন,—(১) উত্তর-পশ্চিম-চীনের খৃষ্টান সেনাপতি জেনারল ফেং উসিয়াং; তাঁহার মিত্র ও সাহায্যকারী হইতেছেন উত্তর-চীনের শানশি বিভাগের গভর্ণর জেনারল ইয়েং শিসান। (২) কোয়াংসি প্রদেশের দুইটি দল। (৩) দক্ষিণ-চীনের কোয়াংসির যে সকল সেনাপতি ইতিপূর্ব্বে একবার চিয়াং কাইসেকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতরণ করিয়াছিলেন। এই কয়টি দল চিয়াংএর বিরুদ্ধে একসঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়াছে।

ইহা ছাড়া উত্তরের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশের মার্শাল চাং সুয়েলিয়াংও জাতীয় সরকারের প্রেসিডেণ্ট চিয়াং কাইসেকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, এই চাং পিকিংএর সর্ব্বেসর্ব্বময় কর্ত্তা মাঞ্চুরিয়ার War Lord চাং সো-লিনের পুত্র। চাং সো-লিনের মৃত্যুর পর পুত্র চাং সুয়েলিয়াং নানকিং গভর্ণমেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি সেই সময়ে জাপানীদের নানা প্রলোভন সত্ত্বেও প্রকৃত দেশপ্রেমিকের ন্যায় বহু ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন, দেশের মঙ্গলের জন্য শত্রু চিয়াংকেও বড় বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন, সমগ্র চীনকে এক জাতীয় সরকারের শাসনাধীনে আনয়নে সহায়তা করিয়াছিলেন। আজ তিনিও চিয়াংএর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। সংবাদপত্রে প্রকাশ, রুসিয়ার সোভিয়েট সরকারের সহিত চীনের জাতীয় সরকারের মাঞ্চুরিয়ার রেল লইয়া মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। রুসিয়ান সৈন্য মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিয়া চীনের কয়েকটি স্থান ধ্বংস করিয়া দিয়াছে ও অধিকার করিয়াছে। এ আক্রমণে বাধা দেওয়া উচিত ছিল চাং সোয়েলিয়াংএর, কেন না, তিনিই বর্ত্তমানে নানকিংএর জাতীয় সরকারের প্রতিনিধিরূপে মাঞ্চুরিয়া শাসন করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি সেই কর্ত্তব্য পালন করেন নাই, পরন্তু নানকিং গভর্ণমেণ্টকে ছাটিয়া ফেলিয়া নিজে সোভিয়েট সরকারের সহিত স্বতন্ত্র সন্ধি করিতেছেন।

জেনারল ইয়াংসেন

ভূতপূর্ব্ব জেনারল চাং সো-লিন

এই কয়টি দলের সমবায়ে চিয়াং কাইসেকের বিরুদ্ধে একটি ভীষণ ষড়যন্ত্র চলিতেছে। ইহাদের উদ্দেশ্য,—চীনদেশে চিয়াংএর নিয়ামকত্বের অবসান করিতে, জাতীয় সরকারের সংশোধন পরিবর্ত্তন করিতে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বিপক্ষে যে আন্দোলন চিয়াংএর ন্যাশানাল গভর্ণমেণ্ট চণ্ডনীতি দ্বারা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে।

চিয়াংএর বিপদ সামান্য নহে। তাঁহার ভরসা অর্থ ও সৈন্য, নতুবা সুশাসন দ্বারা লোকের মন আকর্ষণ করা এ যাবৎ ঘটিয়া উঠে নাই। এই হেতু তাঁহাকে প্রবল শক্তিপুঞ্জের মন যোগাইয়া চলিতে হয়। এই জন্যই তাঁহার আশে-পাশে সংস্কার

ও উন্নতির পরিপন্থী সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী পরামর্শদাতারা আড্ডা গাড়িয়াছে; এই জন্যই তিনি বিদেশীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ঋণের চেষ্টা করিতেছেন। চীনের মধ্যে যে সকল ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী, মহাজন ও ধনী আছেন, চিয়াংকে তাঁহাদেরও মন যোগাইতে হয়। এই হেতু চিয়াং এত শত্রু করিয়াছেন।

হইতে পারে, চিয়াং-এর উদ্দেশ্য মহৎ। তিনি হয় ত বুঝিয়াছেন যে, আপাততঃ রণক্লান্ত হৃত-সর্ব্বস্ব চীনকে গড়িয়া তুলাই দেশ-প্রেমিকের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। তাই তিনি এখন কোনরূপে বিদেশী শক্তিদের সহিত কলহ-বিরোধ বাধাইতে চাহিতেছেন না, আর সেই হেতু তিনি বিদেশীদের বিপক্ষে আন্দোলন চালাইতে দিতেছেন না। এ দিকে বিদেশী ব্যাঙ্কাররাও চিয়াংকে সমর্থন করিতেছেন। কেন না, তাঁহারা নানকিং গভর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত বণ্ডসমূহে অনেক টাকা ফেলিয়াছেন। নানকিং সরকার পূর্ব্বে পূর্ণ কুওমিণ্টাং দলই ছিলেন; কিন্তু ক্রমশঃ কম্যুনিষ্ট ও অবাঞ্ছনীয় লোক দল হইতে ছাড়াইয়া দেওয়ার ফলে এখন আর চীনারা ইহাকে জাতীয় সরকার বলিয়া মানিতেছে না। সুতরাং কুওমিণ্টাং এখন মাত্র ১ লক্ষ ৩৯ হাজার নর-নারীর সমবায়ে গঠিত বলিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই সরকারী কর্ম্মচারী; জনসাধারণের সহিত তাঁহাদের সংস্পর্শ নাই বলিলেও হয়। বিশেষতঃ চীনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৈন্যদল Iron Army জাতীয় দলের বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়াছে, তাহাদের সেনাপতি জেনারল চ্যাংফাকোয়ে সদলবলে চিয়াংকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অনেকে বোধ হয় জানেন না যে, এই সেনাদলই মহাচীনের মধ্যে ভাড়াটিয়া প্রবৃত্তির নহে, ইহারা যথার্থ দেশপ্রেমিক, রুসিয়ার বোরোডিন প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিগণের নিকট ইহারা রণশিক্ষা করিয়াছে। আরও এক বিষম কথা যে, চিয়াং যে কোন সেনাদলকে এই বিদ্রোহী Irons Armyর বিপক্ষে প্রেরণ করিতেছেন, সেই দলই Iron Armyর সহিত যোগদান করিতেছে। সুতরাং চিয়াং-এর বিপদ বড় সামান্য নহে।

চাং সুয়েলিয়াং

অবশ্য নানকিং সরকার এ সকল কথা মিথ্যা জনরব বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। তাঁহাদের কথা সত্য হইলেই চীনের মঙ্গল; কিন্তু চীনের দক্ষিণে ও উত্তরে যে সংঘর্ষ চলিতেছে, এ কথা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জেনারল ফেং উসিয়াং ও জেনারল ইয়েন সিসান যে শানসি প্রদেশে বিদ্রোহধ্বজা উড্ডীন করিয়াছেন, তাহার খবরও কেহ আটক করিয়া রাখিতে পারে নাই। উত্তরে মাঞ্চুরিয়ার শাসনকর্ত্তা জেনারল চাং সুয়েলিং শত্রু সোভিয়েট সরকারের সহিত স্বতন্ত্র সন্ধি স্বাক্ষর করিতেছেন, এ সংবাদ ত বিশ্বদূত রয়টারই প্রকাশ করিয়াছেন।

তাই মনে হইতেছে, চীনের অদৃষ্ট ভাল নহে। যে গৃহ-বিবাদের ফলে প্রাচ্যের অনেক দেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে এবং অনেক স্থানে হইতেছে, চীনও যে তাহার সর্ব্বনাশা প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, এমন কিছু অদৃষ্ট করিয়া আসিয়াছে কি?

তবে একটা সুসংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দেশের এই বিপদ দেখিয়া চীনের দলপতিগণ সম্মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা গৃহযুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন। উত্তরে চাং সুয়েলিন, মধ্যচীনে চিয়াং কাইসেক, দক্ষিণে কুওমিণ্টাং লেফট উইং এবং উত্তর-পশ্চিমে ফেং উসিয়াং ও ইয়েন সিসান,—সকলে এক হইয়া যাইতেছেন। এই সঙ্কল্প যদি কার্য্যে পরিণত হয়, তবেই চীনের জগতের শক্তিপুঞ্জের মধ্যে শ্রেষ্ঠের আসন পাইবার সৌভাগ্য হইবে, অন্যথা নহে।

বিবাহ-বিচ্ছেদ

সরকারী হিসাবে প্রকাশ, বিলাতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা গত জার্ম্মাণ-যুদ্ধ হইতে ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। এ বৎসর যে মাসে সরকারী বৎসর শেষ হইবে, সেই সময়ের মধ্যে ৪ হাজার ৫ শতেরও উপর বৃটিশ দম্পতির মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইবে।

ইহার দুইটি কারণ দেখান হইয়াছে। প্রথম,—আদালতে মামলা রুজু করার পূর্ব্বে ব্যয়াধিক্য ছিল, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ জার্ম্মাণ-যুদ্ধারম্ভের বৎসর হইতে এ বিষয়ে আইনের কাঠিন্য শিথিল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, ফলে যে সকল দরিদ্র বিবাহিত নর-নারী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে ইচ্ছা করিত, খরচের ভয়ে তাহারা সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিত না। এখন দরিদ্রেরও এ বিষয়ে সুবিধা হইয়াছে, তাই ইচ্ছা হইলেই স্বামী স্ত্রী হুড় হুড় করিয়া আদালতে ছুটিতেছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে ছাড়াছাড়ির প্রবৃত্তিটা ছিল কি ছিল না, জানিবার উপায় নাই, এখন বে-পরোয়া প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে! অনেক ক্ষেত্রে অতি দরিদ্ররাই আদালতে নালিশ করিতে আসে, ইহাদের নিকট ফি ইত্যাদি লওয়া হয় না। দ্বিতীয়তঃ, জুডিসিয়াল প্রসিডিংস এ্যাক্ট ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বলবৎ হওয়ায় অনেকে এই ভাবের মামলা করিতে সাহসী হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন আইন পাশ হয় নাই, তখন বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলারও অন্যান্য সাধারণ মামলার মত রিপোর্ট প্রকাশিত হইত। এই আইন পাশ হইবার পর বিবাহ-সংক্রান্ত মামলার রিপোর্ট প্রকাশ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কাযেই এখন আর লজ্জা-সরমের কোন বালাই নাই—বে-পরোয়া আদালতে যাও আর চুক্তি-বিবাহ নাকচ করিয়া লইয়া আইস!

তবে এখনও বিলাতে মার্কিণের অবস্থা উপস্থিত হয় নাই। বিলাতে যত বিবাহ হয়, তাহার শতকরা ১টা মাত্র বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা হয়, মার্কিণে শতকরা ১৫টা। মার্কিণ সকলের অপেক্ষা আধুনিক তরুণ আর 'সভ্য' কি না!

ইণ্ডিয়া-ইন-বণ্ডেজ

ডাক্তার সাণ্ডার্ল্যাণ্ডের "ইণ্ডিয়া-ইন-বণ্ডেজ' গ্রন্থের প্রচার এ দেশের সরকার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্বদেশে এই গ্রন্থ মিঃ লুই কোপল্যাণ্ড কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। যদি এ সংবাদ সত্য হয়, তাহা হইলে মার্কিণ

জাতি ও তথা তাঁহাদের মারফতে য়ুরোপীয় জাতিরা এত দিনে এই গ্রন্থ হস্তগত করিয়াছে। তাহা হইলেই ডাক্তার সাণ্ডার্ল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইল বলিতে হইবে। এই সম্পর্কে এমন একটা ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা বিশেষরূপে উপভোগ করিবার যোগ্য। বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিঃ রামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড যখন মার্কিণ দেশে যাইবার জন্ম আটলান্টিক মহাসাগর পার হইতেছিলেন, তখন মার্কিণদেশ হইতে কয় জন খ্যাতনামা মনীষী পণ্ডিত তাঁহাকে জাহাজে বেতার-যোগে খবর পাঠাইয়াছিলেন যে, এখনই যেন তিনি ঐ গ্রন্থের পুনঃপ্রচারের অনুমতি দেন। তাঁহাদের নাম অধ্যাপক ডিউই, অধ্যাপক ওয়ার্ড, 'নিউ রিপাবলিক' পত্রের সম্পাদক অধ্যাপক লোভেট, ঔপন্যাসিক মিঃ থিওডোর ড্রিজার ইত্যাদি। তাঁহারা জানাইয়াছিলেন যে, "এই গ্রন্থের মতামত বৃটেনের বিরুদ্ধ নহে, বরং আপনি ও আপনার শ্রমিক দল যাহা চিরদিন প্রচার করিয়া আসিয়াছেন, এই গ্রন্থ তাহারই সমর্থন করিতেছে। অর্থাৎ ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে কানাডার মত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রাপ্ত হইবার অথবা স্বাধীনতা পাইবার অধিকারী, এই গ্রন্থে ইহাই বলা হইয়াছে।"

এই সংবাদ পাইয়া মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড কোন জবাব দিয়াছিলেন কি না, জানা নাই, অন্ততঃ কোন সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ নাই। তাঁহার জবাব কিরূপ হইল, জানিতে কৌতূহল হয়।

সিঙ্গাপুরের নৌ-আড্ডা

শ্রমিক সরকার এই আড্ডা নির্ম্মাণের কার্য্য স্থগিত রাখিলেন বলিয়া মনে হইতেছে। তাঁহাদের নৌবিভাগের লেফটানেণ্ট কর্ণেল আলেকজাণ্ডার কমন্স সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন,—"পাঁচটি শক্তির সমবায়ে নিরস্ত্রীকরণ-সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে যে বৈঠক বসিয়াছে, তাহার সিদ্ধান্ত সমাপ্ত না হইলে সিঙ্গাপুরের নৌ-আড্ডা-নির্ম্মাণে আর অর্থব্যয় করা হইবে না। তবে পূর্ব্ব হইতেই যে সকল কার্য্যের চুক্তি হইয়া গিয়াছে, তাহা ধীরে ধীরে সম্পন্ন করা হইবে। যে সকল কার্য্য স্থগিত রাখা যায়, তাহা স্থগিত থাকিবে, পরন্তু নূতন কোন কার্য্য আর আরম্ভ করা হইবে না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে যখন শ্রমিক সরকার শাসনপাটে বসিয়াছিলেন, তখনও সিঙ্গাপুরের নৌ-আড্ডা পরিত্যক্ত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল, কিন্তু রক্ষণশীল দল শাসনপাটে বসিয়া সিঙ্গাপুরে ডক-নির্ম্মাণাদি কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রমিক সরকার উহা আবার বন্ধ করিয়া দিলেন; কারণ, শক্তিপুঞ্জের মধ্যে নিরস্ত্রীকরণের পরামর্শ চলিতেছিল।"

তবে কি সত্যই শ্রমিক সরকার জগতে শান্তি-প্রতিষ্ঠার কামনা করেন? তাঁহাদের এ শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হউক, এ প্রার্থনা সকলেই করিবেন। কিন্তু তবে ভারতের বেলা রাজপ্রতিনিধির ঘোষণার অপরূপ ব্যাখ্যা করা হইতেছে কেন? পার্লামেণ্টকে ভারতের সর্ব্বময় প্রভু বা ভাগ্যনিয়ন্তা বলিয়া ঘোষণা করা হইতেছে কেন? তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

ইরাকের মন্ত্রীর আত্মহত্যা

ইরাকের প্রধান মন্ত্রী সার আবদুল মহসিন আত্মহত্যা করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। রয়টারের খবরে প্রকাশ—তিনি আত্মহত্যার পূর্ব্বে এক পত্রে তাঁহার পুত্রকে লিখিয়া গিয়াছেন, "আমার দেশবাসী দুর্ব্বল, স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্ত হয় নাই। আমি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় দেশের উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করিতেছিলাম। ইহাতে দেশবাসীরা আমার জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল,—আমাকে দেশদ্রোহী, বিশ্বাসহন্তা ইত্যাদি বলিয়া গালি পাড়িয়াছিল। তাই আমি মনের দুঃখে আত্মহত্যা করিতেছি।" ইহার উপর টিপ্পনী কাটিয়া কোন এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্র ভারতবাসীর উপর বিদ্রূপ-কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছেন,—"বাপু হে, তোমরা স্বাধীনতা চাও, অতএব ইরাকবাসীর সহিত তোমাদের অবস্থাটা একবার তুলনা করিয়া দেখ দেখি।" তাহার পর ইঙ্গিত করিয়াছেন,—"তোমরা দুর্ব্বল, তোমরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন, পরনির্ভরশীল, স্বাধীনতার উপযুক্ত ত একবারেই হও নাই। অথচ তোমরা এখনই মুক্তি চাও। ইহা কি লজ্জার কথা নহে? তোমরা উপযুক্ত হও, তোমরাও উপযুক্ত সময়ে অন্যান্য স্বাধীন জাতির মত স্বাধীনতা পাইবে।"

চমৎকার উপদেশ—যেন মথিলিখিত সুসমাচার! কিন্তু লজ্জাহীন ভারতবাসীরা যদি বলে, ইরাকবাসী মাত্র ১০।১২ বৎসর উপদেশ পাইতেছে, অভিভাবকের আওতায় ধীরে ধীরে তাহাদের স্বাধীনতার অঙ্কুর সবে মাত্র গজাইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু ভারতবাসীরা ত পুরাতন পাপী—দুই শত বৎসরের উপদেশ-সুধাবর্ষণেও কি তাহাদের অঙ্কুরের বৃদ্ধি হইল না? একজামিনও তাহারা অনেক দিতেছে, গুটিগুটি পা বাড়াইতেও শিখিয়াছে—এখন 'উপযুক্ত' হইতে তাহাদের আর কত দিন লাগিবে, তাহা সহযোগী বলিয়া দিবেন কি? সহযোগীর দেশে বেকার-সমস্যা থাকিতে ভারতীয়রা উপযুক্ত একবারে হইবেই কি না, তাহারও ঠিকঠিকানা আছে কি?

চৈনিক তুর্কীস্থান

চীনদেশের দুর্গম প্রদেশ-সমূহের সহিত পাশ্চাত্য মঙ্গোলিয়া এবং তুর্কীস্থানের বাণিজ্য-সম্বন্ধ বহুপূর্ব্বকাল হইতে বিদ্যমান ছিল। বর্ত্তমান সভ্যযুগের পরিব্রাজকগণ এই দুর্গম প্রদেশ-সমূহে গমনাগমন করেন না। নানা দুর্গম গিরি, কান্তার ও মরুভূমির মধ্য দিয়া প্রাচীন যুগের সার্থবাহগণ ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে গতায়াত করিত। চীনদেশজাত রেশম

মরু-মধ্যে শিবিরসন্নিবেশ

লইয়া ব্যবসায়িগণ ভূমধ্যসাগরসমীপবর্ত্তী দেশসমূহে—রোম সাম্রাজ্যে গমন করিত। আবার তাহারা গ্রীস, পারস্য, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন দেশজাত নানাবিধ কারুকার্য্য-সমন্বিত দ্রব্যসম্ভার লইয়া চীনদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইত। সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল দেশের শিক্ষা-দীক্ষার ভাবও তাহারা চীন-দেশে প্রচারিত করিত। যে দুর্গমপথে প্রাচীন যুগের সার্থবাহগণ গতায়াত করিত, সে পথে যাত্রা করিলে বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কার সম্ভবপর, ইহা ভাবিয়া মার্কিণ পরিব্রাজকগণ অধুনা সেই পথে নানাতত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য গমন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বিগত ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ ওয়েন লাটিমোর নামক জনৈক ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উল্লিখিত দুর্গম পথে চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশসমূহ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন পথে প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে যাত্রারম্ভ করেন। তাঁহার এই ভ্রমণকাহিনী কৌতূহলোদ্দীপক এবং নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। "মাসিক বসুমতী"র পাঠক-বর্গের অবগতির জন্য এই মনোজ্ঞ ভ্রমণকাহিনী সংক্ষিপ্ত-ভাবে সঙ্কলিত হইল।

মিঃ লাটিমোর চীনদেশে ৭ বৎসর যাপন করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে পিকিং (বর্ত্তমান পাইপিং) হইতে যাত্রা করিয়া কোয়েচোয়াটিং নামক স্থানে গমন করেন। রেলপথ এইখানেই শেষ হইয়া গিয়াছে। মঙ্গোলিয়ার দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত এই রেলপথ বিস্তৃত। কয়েক মাস পরি-ভ্রমণের পর তিনি সমগ্র মঙ্গোলিয়া পর্য্যটন করিয়া চৈনিক তুর্কীস্থানে প্রবেশলাভ করেন।

কোয়েচোয়াটিংএ তিনি 'কাফিলা'দিগের নিকট হইতে

উষ্ট্রের ভোজনপদ্ধতি—মরু-মধ্যে

গন্তব্য পথের পরিচয় গ্রহণের চেষ্টা করেন; কিন্তু যে পথে তিনি পরিভ্রমণ করিতে চাহেন, সার্থবাহগণ তাহার সবিশেষ সংবাদ তাহাকে দিতে পারে নাই। চীনদেশ হইতে দুইটি প্রসিদ্ধ পথ মধ্য-এসিয়ার দিকে প্রসৃত। একটি

তুর্কীস্থানে ঘোড়া-চোরের শাস্তি

মধ্যচীন হইতে সেন্‌সি ও কাম্‌সু অতিক্রম করিয়া গোবি মরু-ভূমির পশ্চিমাংশে গিয়া মিশিয়াছে। তথা হইতে চৈনিক তুর্কীস্থানে মঙ্গোলিয়া প্রদেশ স্পর্শ না করিয়া যাওয়া যায়। অপর পথটি উত্তর-চীন হইতে মঙ্গোলিয়ার উত্তরভাগে গিয়াছে; তার পর পশ্চিমদিকে বাঁকিয়া চৈনিক তুর্কীস্থানে চলিয়া গিয়াছে।

প্রথম পথে মিঃ লাটিমোর যাওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই। কারণ, সে পথে ভীষণ দস্যুভয়, গৃহবিবাদের অগ্নিও তথায় প্রজ্বালিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ বৈদেশিকদিগের

ভৃত্য মোজেস্‌ সহ মিঃ লাটিমোর

উপর সে সকল অঞ্চলের লোকের ভীষণ বিদ্বেষ ছিল বলিয়া তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পথটিও তাঁহার পক্ষে নিরাপদ ছিল না। খাস মঙ্গোলিয়ার বহির্ভাগস্থিত অন্যান্য জাতি, রুসিয়ার প্রভাববশতঃ তখন চীনদেশ হইতে আপনা-দিগকে বিচ্যুত করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং তাহারা কোনও কাফিলাকে তাহাদের দেশের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিবার অধিকার প্রদান করিতে সম্মত ছিল না।

সুতরাং মিঃ লাটিমোর নূতন, অপরিচিত পথে যাত্রা করাই সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। এই পথ মরুভূমির মধ্য

দিয়া তুর্কীস্থান অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। চীন ও মঙ্গোলিয়ার বহির্ভাগস্থিত জাতিদিগের সহিত কোন প্রকার বিরোধ না করিতে হয়, এই উদ্দেশ্যে 'কাফিলা' এই পথে যাতায়াত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। মঙ্গোলিয়ার মধ্য দিয়া পথটি প্রস্তুত। এই প্রদেশ নামে চীনের প্রভুত্ব স্বীকার করিত। পথটি মঙ্গোলিয়ার অনুর্বর প্রদেশ-সমূহ ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। এই কারণেই এই পথে ইদানীং বড় কেহ যাতায়াত করিত না, সুতরাং পথটি সাধারণের কাছে একরূপ অজ্ঞাতই ছিল।
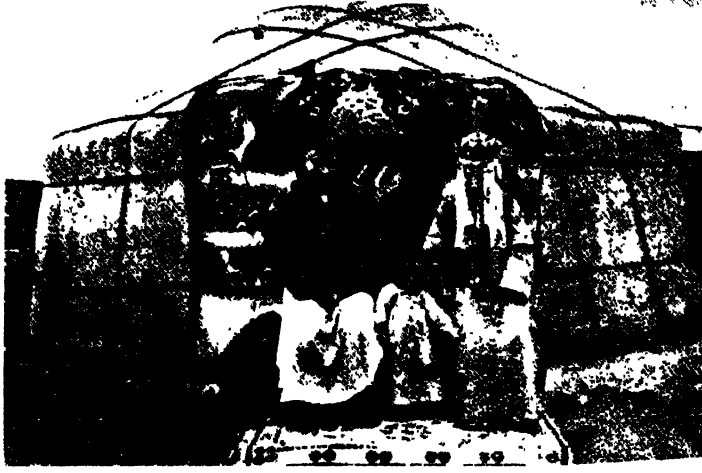
সস্ত্রীক মঙ্গোল কর্ম্মচারী

মিঃ লাটিমোর মঙ্গোলিয়া ও চৈনিক তুর্কীস্থানের এই দুইটি প্রদেশ এই পথে পরিভ্রমণ করিয়া অপর দুইটি প্রসিদ্ধ পথের সহিত এই বর্ত্মের পার্থক্য কোথায়, তাহা অবগত হইবার জন্যই এই পথটি বাছিয়া লইয়াছিলেন। ইহাকে মরুপথ বলিলেই ঠিক হয়। কারণ, পথটি মরুভূমি এবং অপরিচিত প্রদেশ-সমূহের মধ্য দিয়া বিসর্পিত। এই পথের কোনও মানচিত্র এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এই পথে চলিবার সময় তিনি প্রমাণ পাইয়াছিলেন যে, প্রাচীন যুগে এই পথে ব্যবসা-বাণিজ্যের

মরুপথে সার্থবাহ-দল

বিশেষ প্রচলন ছিল এবং নানা-দেশের জনগণ এই পথে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বাসপরিবর্ত্তনও করিয়াছিল। সার্থবাহগণ উষ্ট্র, অশ্বতর প্রভৃতির পৃষ্ঠে পণ্যদ্রব্য বোঝাই দিয়া মরুভূমির মধ্য দিয়া প্রায় ১ হাজার ৬ শত মাইল পর্য্যটন করিত।

ভ্রাম্যমাণ টাঙ্গুটি মঙ্গোল-পরিবার

মিঃ লাটিমোর দীর্ঘকাল চীনদেশে যাপন করার ফলে, চৈনিক ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি তদ্দেশীয় রীতিনীতি, বাণিজ্য-পদ্ধতি প্রভৃতির সহিত সুন্দররূপে পরিচিতও ছিলেন। এ জন্য তিনি সার্থবাহগণের সহিত মিলিত হইলে কেহ তাঁহাকে বৈদেশিক বলিয়া বুঝিতেও পারে নাই। কোয়েওয়াটিং হইতে তিনি একখানি রুদ্ধদ্বার গাড়ীতে আরোহণ করিয়া যাত্রা করেন। তাঁহার সঙ্গে ৯টি ভাড়া করা উষ্ট্র ছিল। উল্লিখিত উষ্ট্রগুলির মালিক মোজেস্‌ও তাঁহার সহচররূপে যাত্রা করিয়াছিল। এই লোকটি তাঁহারই চৈনিক ভৃত্য। বহুকাল ধরিয়া সে মিঃ লাটিমোরএর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। এই লোকটি পূর্ব্বে তাঁহার পিতারও ভৃত্য ছিল। লোকটি যেমন

কুচেংজি সহর

শ্রমসহিষ্ণু, তেমনই সৎস্বভাব ও বিশ্বাস-ভাজন। উষ্ট্রগণের জন্য কয়েক জন পরিচারককেও তিনি সঙ্গে লইয়াছিলেন।

একটা বড় সার্থবাহদল বা 'কাফিলা'র সহিত মিঃ লাটিমোর মিলিত হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের সহিত এমন ভাবে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিলেন যে, কেহই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অবগত হইতে পারে নাই। তাঁহার বস্ত্রাবাস, আহার্য্য অবিকল তাহাদিগেরই অনুরূপ ছিল, এমন কি, সার্থবাহগণ যে সময়ে গাত্রোত্থান করিত, আহার বা শয়ন করিত, তিনি যথাযথভাবে সেইরূপ অনুকরণ করিতেন—কোন পার্থক্যই ছিল না।

ভ্রাম্যমাণ কাজাক

মিঃ লাটিমোর এবং সার্থবাহদল রাত্রিকালেই পথাতিবাহন করিতেন। দিবাভাগে উষ্ট্রগুলি চরিয়া বেড়াইত। তবে তাহারা যাহাতে দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে না পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখা হইত। অপরাহ্নের শেষ সময়ে তাঁহাদের যাত্রারম্ভ হইত এবং দ্বিযামা রজনীর শেষ অর্থাৎ প্রায় ৭।৮ ঘণ্টাকাল তাঁহারা পথ চলিতেন। ইহাতে প্রায় ২০ মাইল পথ প্রত্যহ তাঁহারা অতিক্রম করিতেন। উষ্ট্রগুলির প্রত্যেকের পৃষ্ঠদেশে প্রায় সওয়া ৭ মণ ওজনের দ্রব্যসম্ভার থাকিত। ঘণ্টায় এ জন্য তাহারা আড়াই মাইলের বেশী কখনই চলিতে পারিত না। বিশ্রামকাল উপস্থিত হইলে উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে দ্রব্যভার নামাইয়া বস্ত্রাবাসের সম্মুখে শ্রেণিবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। বাহনগণ জানু পাতিয়া বস্ত্রাবাসের কাছে উষাকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিত। তার পর দুই জন লোকের নেতৃত্বে উষ্ট্রগণকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত।

মঙ্গোলিয়া সীমান্তে তোরণদ্বার

মিঃ লাটিমোর সার্থবাহগণের ন্যায় সাধারণ অথচ পুষ্টিকর আহার্য্যই গ্রহণ করিতেন। পানীয় জল ভাল নহে বলিয়া অনেকবার চা পান করিতে হইত। স্রোতের জল এ অঞ্চলে ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পথের মাঝে মাঝে কূপ মিলিত—অগভীর এবং জল প্রায়শঃ নীলবর্ণ। সাধারণতঃ

সিংকিয়াংএর অশ্ববাহিত গাড়ী

দুই দিন অন্তর একটি কূপের দেখা মিলিত। একবার ১ শত মাইল যাত্রা করিবার পর তবে কূপের সাক্ষাৎকার-লাভ হইয়াছিল। সার্থবাহগণকে সকল সময়েই জল সঙ্গে রাখিতে হয়। বড় বড় কাঠের পিপায় জল ভরিয়া উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতে হয়। এইরূপ দুইটি জলপূর্ণ পিপা প্রত্যেক উষ্ট্র বহন করিতে পারে।

মিঃ লাটিমোর স্বল্পভারবাহী উষ্ট্রের পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিয়া দীর্ঘপথের অর্দ্ধাংশ গমন করিতেন। বাকীটা পদব্রজে চলিতেন। মরুভূমি অতিক্রমকালে উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে অনেকের সামুদ্রিক পীড়া দেখা দেয়, কিন্তু মিঃ লাটিমোর কখনও উহার প্রভাবে পতিত হন নাই।

যাত্রার প্রারম্ভে মিঃ লাটিমোর পথিমধ্যে কতিপয় মঙ্গোলীয় মঠ দেখিয়াছিলেন। কিন্তু যখন খাঁটি মরুভূমির মধ্য দিয়া তাঁহাদের যাত্রারম্ভ হইল, তখন আর জনমানব বা বসতির কোন চিহ্নই মিলিল না। কদাচিৎ কোনও মরুনিবাসীর দেখা মিলিলেও তাহারা এমনই লজ্জাশীল যে, কাহারও সহিত আলাপ করা দূরে থাকুক, উঁহাদিগকে পরিহার করিয়া চলিত। তাঁহারা যে সময়ে উল্লিখিত প্রদেশ অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন চারিদিকে অশান্তি ও উপদ্রব বিরাজ করিতেছিল। গৃহবিবাদ আরব্ধ হওয়ায় সীমান্ত প্রদেশ এবং মঙ্গোলিয়ার মধ্যভাগে দস্যুতার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। জনরব মঙ্গোলিয়া অতিক্রম করিয়া পল্লবিতভাবে দিকে দিকে এমন ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল যে, কে শত্রু, কে-ই বা মিত্র, ইহা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিত না; সুতরাং নবাগতমাত্রকেই সকলে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিত।

মরুপর্য্যটনকালে মিঃ লাটিমোর এবং তাঁহার সহযাত্রী সার্থবাহদল বিপরীত দিক্ হইতে সমাগত 'কাফিলার' দেখা পাইলে পথিমধ্যে কোন্ কোন্ স্থানে দস্যু-তস্করের দেখা পাওয়া গিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্ধান লইতেন। সংবাদ

মিঃ লাটিমোর ঘোটকীদুগ্ধ পান করিতেছেন

সংগ্রহের জন্য মিঃ লাটিমোর সংবাদদাতাকে অর্থ প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা শিষ্টাচার সহকারে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিত, গোবি মরুভূমির ইহা অবশ্য জ্ঞাতব্য সংবাদ। এমন লোক কেহ নাই যে, পরস্পর পরস্পরকে এ বিষয়ে সাহায্য করিবে না।

মিঃ লাটিমোর যে সকল 'কাফিলার' সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, তাহারা পশম, তূলা, চামড়া, পেঁয়াজ প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য চৈনিক তুর্কীস্থান হইতে লইয়া কফিন বা মৃতদেহবাহী কাঠের বাক্সে, উষ্ট্রপৃষ্ঠে চাপাইয়া লইয়া আসে। এই ভাবে একটি উষ্ট্রপৃষ্ঠে চারিটি শবদেহ বহন করা চলে। মরুভূমি পার হইবার পর যে দেশের মৃতদেহ, তথায় প্রেরণ করা হয়।

মিঃ লাটিমোর এই শববাহী 'কাফিলা' সম্বন্ধে একটি রোমাঞ্চকর বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমাদের শিবিরের পার্শ্ব দিয়া শববাহী কাফিলা চলিয়া যাইবার কিছু পরেই আমাদের প্রকাণ্ড দলের এক ব্যক্তি

মরুসমুদ্রে পরিত্যক্ত উষ্ট্র

যাইতেছিল। কেহ কেহ মৃতদেহও বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল।

চৈনিক ব্যবসায়ীদিগের কেহ তুর্কীস্থানে গিয়া ঘটনাক্রমে মারা পড়িলে, সে দেশে সমাহিত হওয়ার বিরোধী ছিল। দূরদেশে সমাহিত হওয়ায় তাহাদের ঘৃণা ছিল। সুতরাং সহযাত্রীরা এইরূপ মৃতদেহ স্বদেশে বহন করিয়া আনিতে অনুরুদ্ধ হইত। বিদেশে কাহারও মৃত্যু হইলে, প্রথমতঃ মৃতদেহকে অস্থায়িভাবে মাটীর ভিতর সমাহিত করিয়া রাখা হইত। তার পর অধিকাংশ মাংস-মেদ পচিয়া ঝরিয়া গেলে, মৃত্তিকা হইতে দেহাবশেষ তুলিয়া ছোট পেটের বেদনায় অস্থির হইয়া পড়ে। ঠিক এই সময়েই উল্লিখিত কাফিলার গতিপথে একটা শূন্যগর্ভ শবাধার দৃষ্টি-গোচর হয়। অন্ধকারে আমরা যখন শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলাম, তখন উহা আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। যাহা হউক, শূন্য শবাধার দেখিবামাত্র দলের মধ্যে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইল। শশব্যস্তে তাঁবু উঠাইয়া, স্ব স্ব উষ্ট্রগণকে তাড়া দিয়া প্রাণভয়ে সকলেই সে স্থান ত্যাগ করিল। পীড়িত ব্যক্তিকে সেইখানে ফেলিয়া রাখিয়া একটা উষ্ট্রকে সেখানে বাঁধিয়া রাখিয়া গেল। লোকটা তখন যন্ত্রণার আতিশয্যে ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতেছিল।

"উল্লিখিত শবাধারটি শববাহী 'কাফিলা' ফেলিয়া গিয়াছিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া বুঝা গেল, উহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ আধারমধ্যস্থিত শবটিকে তাহারা অপর শবাধারে অন্য শবের সহিত রক্ষা করিয়া থাকিবে, আমাদের দলের লোকরা মনে করিয়াছিল যে, অন্য শবাধারে রক্ষিত হওয়ায় শবের ভূতদেহ ক্রুদ্ধ হইয়া শবাধার হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। পরে মরুমধ্যে কোনও আশ্রয় না দেখিয়া, ভীত হইয়া থাকিবে। তাই সে আমাদের দলের এক জনের দেহে ভর করিয়াছে। উহারই ফলে লোকটি পীড়ায় আক্রান্ত অর্থাৎ ভূতপ্রাপ্ত হইয়াছে। মানুষটি যে যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছে, তাহার কারণ, ভূতের সহিত লোকটার দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মার যুদ্ধ বাধিয়াছে।

"লোকটা যদি মরিয়া যায়, তাহা হইলে ভূত অন্য দেহে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিবে। সুতরাং এই স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন না করিলে, রক্ষার কোন উপায় নাই। পীড়িত লোকটা যদি দৈবক্রমে সুস্থ হইয়া উঠে, তাহা হইলে সে উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দলের সহিত মিলিত হইতে পারিবে। যদি সে প্রত্যাবর্ত্তন না করে, তাহা হইলে পরবর্ত্তী শিবির হইতে লোক পাঠাইয়া, তাহারা লোকটার পরিণাম-ফল কি হইল, তাহা জানিবার ব্যবস্থা করিয়া লইবে। উষ্ট্রটাকে অন্ততঃ রক্ষা করা প্রয়োজন!

"দল-বল-পরিত্যক্ত পীড়িত লোকটি ভয়ে ও নৈরাশ্যে হয় ত প্রাণত্যাগ করিত। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে দিন আমি আমার দলের এক জনকে লইয়া একটি কূপ হইতে জল আনিতে গিয়াছিলাম। সে কূপটি আমাদের শিবির হইতে কিছু দূর পশ্চাতে অবস্থিত ছিল। প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলাম যে, যেখানে শিবির সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, তথায় উক্ত পীড়িত লোকটি একটি উষ্ট্রসহ পড়িয়া আছে—যন্ত্রণায় সে পরিত্রাহি চীৎকার করিতেছে।

"সে আর্ত্তনাদ সহকারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছিল, 'মা, মা! আর তোমার সঙ্গে দেখা হইল না, আমাকে এখানেই মরিতে হইবে! হা ভগবান্! এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। মা! মা গো! মৃত্যুদূত আমাকে লইতে আসিতেছে!'

"নানারূপ প্রশ্ন করিয়া, আমি তাহাকে অপেক্ষাকৃত শান্ত করিতে সমর্থ হইলাম। আমি বুঝিলাম, লোকটির উদর-পীড়ার ব্যথা ব্যতীত অপর কোন উপসর্গ নাই। পেটে ঠাণ্ডা লাগিয়া ব্যথা জন্মিয়াছে। আমার সঙ্গী লোকটিকে সার্থবাহ কাফিলার উদ্দেশে প্রেরণ করিলাম। আমার সঙ্গে ঔষধ ছিল। একটা ভাল ঔষধ সেখান হইতে আনিবার জন্য লোকটিকে পাঠাইয়া দলটিকে অপেক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলাম।

সিংকিয়াংএর তরমুজ-বিক্রেতা

"এ দিকে পীড়িতকে ভালভাবে শোয়াইয়া, তাহার উদরে উত্তমরূপে হস্তাবমর্ষণ করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর লোকটা অনেকটা আরাম অনুভব করিল, বুঝিতে পারিলাম।

"আমার সংবাদ-প্রেরণের ফলে ভীত সার্থবাহ-দল

আর অগ্রসর হইল না। আমি পীড়িত ব্যক্তিকে ঔষধ প্রদান করিলাম। কিন্তু দলের লোকগুলি তখনও নিঃশঙ্ক হইতে পারে নাই। আমি তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ বুঝাইতে লাগিলাম যে, লোকটা ভূতপ্রাপ্ত হয় নাই—শুধু উদরপীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। ভূতগ্রস্ত হইলে লোকটার কি কি লক্ষণ প্রকাশ পাইত, তাহাও মন-গড়া করিয়া শুনাইয়া দিলাম।”

কাজাক সর্দ্দার

উল্লিখিত ঘটনার কিছু কাল পরে, চৈনিক তুর্কীস্থানের সীমান্ত-প্রদেশে উপস্থিত হইলে মিঃ লাটিমোর সীমান্ত-পুলিসের হস্তে বন্দী হন।

এই প্রদেশের আইন এমনই কঠোর যে, নবাগত, অপরিচিত কোন ব্যক্তিকেই তাহারা দেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিতে চাহে না। চীনদেশের কোন লোকের অপেক্ষা ভারতীয় কোনও অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি তাহারা অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহাদের ধারণা, ভারত সরকারকে বন্ধুরূপে স্বীকার করা যায়, কিন্তু চীন সরকারকে তদ্রূপ করা চলে না। বিশেষতঃ খাঁটি চীনদেশের লোককে তাহারা আদৌ বিশ্বাস করিতে সম্মত নহে।

চৈনিক তুর্কীস্থানের প্রাচীনতন্ত্রাবলম্বী শাসকের শাসনাধীন লোকরা সর্ব্বদাই এইরূপ আশঙ্কায় কালযাপন করে যে, চীনদেশের কোনও সেনাপতি তাহাদের মধ্যে গৃহবিবাদের বীজ উপ্ত করিয়া দিবেন। তার পর সুযোগ পাইয়া তাহাদের দেশ আক্রমণ করিবেন। এই দেশের লোক বিশেষ অবগত আছে, মরুভূমি তাহাদের দেশকে রক্ষা করিবার একটি প্রধান অবলম্বন। চীন ও মঙ্গোলিয়া হইতে এই পথ ব্যতীত এ দেশে আসিবার কোনও উপায় নাই। সুতরাং মরুভূমির প্রতি তাহাদের খরদৃষ্টি সর্ব্বদাই বিদ্যমান। এ জন্য মরুভূমি-পথে কোনও লোক চৈনিক তুর্কীস্থানে আসিলে, পুলিস তাহাকে দেশের মধ্যে সহসা প্রবেশ করিতে দেয় না। নবাগতের কাগজপত্রাদি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া, প্রয়োজন হইলে শাসকের নিকট সকল ব্যাপার নিবেদন করিয়া, যখন তাহারা বুঝে, আগন্তুকের দ্বারা কোনও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, তখন তাহাকে দেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয়।
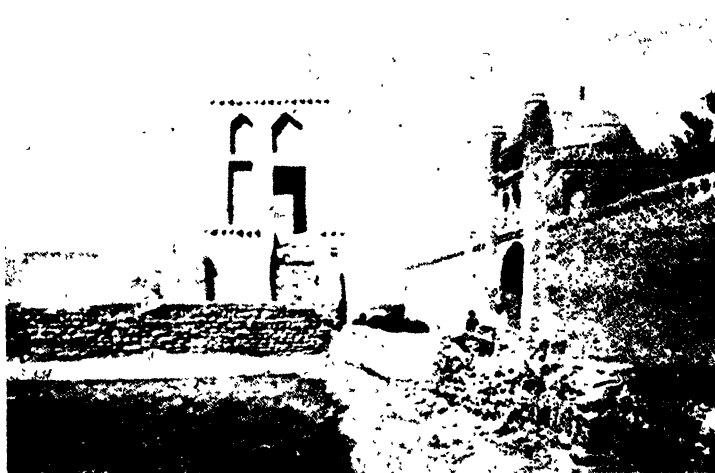
প্রাচীরবেষ্টিত টক্সুন নগরের ধ্বংসাবশেষ

দুর্ভাগ্যক্রমে মিঃ লাটিমোর একটি ক্ষুদ্র পুলিস-থানায় আসিয়া পড়িয়াছিলেন। যে দুই জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এখানে ছিলেন, তাঁহাদের এক জন মহামূর্খ, অপর ব্যক্তি কোনও রকমে সামান্য একটু

পড়িতে পারে। এই লোকটা মিঃ লাটিমোরকে কারাগারে রাখিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিল। প্রথমতঃ সে তাঁহাকে জাপানের গুপ্তচর বলিয়া মনে করিয়াছিল। মিঃ লাটিমোর যখন বিদ্রূপ-ভরে হাসিয়া তাহার সেই উদ্ভট ভ্রান্ত ধারণার জন্য তাহাকে উপেক্ষা করিলেন, তখন সে বলিল যে, তবে তিনি জেনারল ফেঙ্গ-উসিয়াংএর নিযুক্ত কোনও রুসীয় কর্ম্মচারী। জেনারল তাহাদের দেশ আক্রমণ করিতে চাহেন, তাই তাহাকে ছদ্মবেশে সকল সংবাদ জানিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। সে সময়ে অবশ্য জেনারল ফেঙ্গ-উসিয়াং-এর পক্ষে চৈনিক তুর্কীস্থান আক্রমণ করা অসম্ভব ছিল না।

শিকারী ঈগলসহ কাজাক

মিঃ লাটিমোর দেখিলেন যে, সহসা তাঁহার এ বিপদ হইতে উদ্ধারের আশা নাই। তাহারা তাঁহাকে রুসীয় গুপ্তচর বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিল। তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য মোজেস তাঁহাকে এই বিপদে সুপরামর্শ না দিলে সত্যই তাঁহাকে আরও বিপন্ন হইতে হইত। সে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে, ভ্রমণকারীর পক্ষে কখনই সত্য কথা বলা, আসল উদ্দেশ্যের কথা বলা কর্ত্তব্য নহে। সে আসল অবস্থাটি ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল। তাই সে প্রভুকে পরামর্শ দিল যে, বাস্তবিকই তাঁহারা কোনও মন্দ অভিপ্রায় লইয়া আসেন নাই, এই কথা বুঝাইতে গেলেই তাহাদের সন্দেহ আরও বর্দ্ধিত হইবে। তাহারা ভাবিবে যে, নিশ্চয়ই তাঁহাদের কোনও মন্দ অভিসন্ধি আছে, নহিলে আপনাদিগকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য এত চেষ্টা করিবেন কেন?

মোজেসের পরামর্শানুসারে মিঃ লাটিমোর আপনাকে মার্কিণ দূতের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া পরিচয় দিলেন। এই কথাটি প্রচারিত হইবার পর, তিনি ক্রমে মার্কিণ যুবরাজরূপে পরিগণিত হইলেন। মার্কিণ সম্রাটের সহিত রক্তসম্বন্ধ আছে, এই কথাটাও ক্রমে রটিয়া গেল!

মোজেসের সুপরামর্শ সফল হইল। সকলেই তাঁহাকে বড় দরের লোক মনে করিয়া তাঁহার প্রতি ভাল ব্যবহার করিতে লাগিল। তাঁহার অস্ত্র-শস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইল না। রক্ষিপরিবৃত হইয়া তিনি দিবাভাগে কারাগারের বাহিরে বেড়াইবার অধিকারও পাইলেন। মৃগ শিকারের স্বাধীনতাও তাঁহাকে দেওয়া হইল। তিনি যে সকল হরিণ শিকার করিতেন, তাহার মাংস প্রহরী বা সেনাদল ভোজন করিতে পাইয়া সকলেই তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়া উঠিল। রাত্রিকালে ভৃত্য ও দলবলসহ মিঃ লাটিমোরকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত।

আকসুগ্রামের গাড়ী

সীমান্ত-প্রদেশ হইতে বার্‌কুল নগর ৮০ মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানে মিঃ লাটিমোরের গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল। তথা হইতে চৈনিক তুর্কীস্থানের রাজধানী উরুম্‌চিতে সে সংবাদ পাঠান হইল। মিঃ লাটিমোরকে সরাসরি ভাবে কোনও আবেদন-নিবেদন পাঠাইবার অধিকার প্রদত্ত হয় নাই। কারণ, রক্ষীদিগের আশঙ্কা ছিল, পাছে মিঃ লাটিমোর তাহাদিগের বিরুদ্ধে কোনও কথা লিখিয়া পাঠান।

যাহা হউক, তিনি নানা কৌশলে কোনও বিশ্বাসভাজন সার্থবাহের দ্বারা উরুম্‌চিস্থিত দুই জন ইংরাজ ধর্ম্ম-যাজকের নিকট পত্র পাঠাইয়া দিলেন। মিঃ লাটিমোর জানিতেন, উক্ত দুই জন ধর্ম্মযাজক তখন উরুমচিতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার জনৈক চৈনিক বন্ধুও সেই নগরে ছিলেন, তিনি জানিতেন। এই চৈনিক ভদ্রলোকটি এক জন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টার ফলে এক পক্ষের পরে মিঃ লাটিমোরকে ছাড়িয়া দিবার জন্য গবর্ণর আদেশলিপি প্রেরণ করিলেন।

কিন্তু তখনও তাঁহাদের কষ্টের অবসান হয় নাই। সীমান্তপ্রদেশ হইতে বার্‌কুল ৮০ মাইল দূরবর্ত্তী হইলেও তখন তুষারাচ্ছন্ন ও দুর্গম পথে তথায় গমন করা অসম্ভব। বার্‌কুল পর্ব্বতমালা-পরিবেষ্টিত নগর। সুতরাং পর্ব্বত বেষ্টন করিয়া তাঁহারা মরুভূমির মধ্য দিয়া যাইবার সংকল্প করিলেন। কুচেংজি সেখান হইতে ২ শত মাইল দূরে অবস্থিত।

বাজপক্ষী ও কাজাক সর্দ্দার

তখন ডিসেম্বর মাসের প্রারম্ভ। শীত অত্যন্ত প্রচণ্ড। মিঃ লাটিমোরের উষ্ট্রযূথ তিন মাসব্যাপী পর্য্যটনে শীর্ণ ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অবশ্য তাহারা পনের দিন ধরিয়া বিশ্রামের অবকাশ পাইয়াছিল সত্য; কিন্তু প্রয়োজনানুরূপ আহার্য্য তাহারা সেখানে পায় নাই। বিশেষতঃ তাঁহার সহযাত্রী সার্থবাহদল তখন অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। দীর্ঘ, বিপৎসঙ্কুল পথে সাহায্য করিবার কেহ নাই।

তুষারাচ্ছন্ন পথে শকটারোহণে পরিব্রাজক

কিন্তু তথাপি যাত্রারম্ভ করিতে হইল। পথিমধ্যে তাঁহারা দেখিলেন, মাঝে মাঝে শ্রান্ত উষ্ট্র মরুবক্ষে পড়িয়া রহিয়াছে। অব্যবহার্য্য বলিয়া সার্থবাহদল তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তুষার-ঝটিকার আক্রমণ হইতে মধ্যে মধ্যে অগ্রগামী সার্থবাহদল আত্মরক্ষার জন্য শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। তুষারচিহ্ন দেখিয়া তাহাও তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন।

পরিত্যক্ত উষ্ট্রগুলির মধ্যে অনেকগুলি তখনও জীবিত

ছিল। অত্যন্ত শ্রান্তিতে উষ্ট্র ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিতে পারে না, চলিতে পারে না সত্য; কিন্তু উহাদের জীবনধারণের অসাধারণ শক্তি আছে। ভীষণ শীতের মধ্যেও তাহারা অনেক দিন জীবন ধারণ করিয়া থাকিতে পারে। কাফিলার লোকজন ইহাদিগকে হত্যা করে না—পাছে কোনরূপ দুর্ভাগ্য তাহাদের ঘটে। মরু-শার্দ্দূল—নেকড়ে বাঘও জীবিত উষ্ট্রের প্রাণনাশ করে না। যতক্ষণ উষ্ট্র জীবিত থাকে, ততক্ষণ দূরে থাকিয়া লক্ষ্য করিতে থাকে। যখন প্রাণ আর জড় দেহে থাকে না, তখন তাহার মাংস ভোজন করে।

তাঁহাদিগকে চলিতে দেখিয়া পরিত্যক্ত জীবিত উষ্ট্রগুলি শুধু বিস্ফারিত-নেত্রে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহাদের দেহের একাংশ তুষারাচ্ছন্ন, দেহস্পন্দনের শক্তি পর্য্যন্ত তাহাদের ছিল না।

কুচেংজি পৌঁছিবার পূর্ব্বে ২০ দিন ধরিয়া তুষার-ঝটিকার প্রবল আক্রমণ হইতে তাঁহাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে [হই]য়াছিল। আরও কয়েক দিন পরে, নানারূপ প্রাকৃতিক [দুর্যো]গ হইতে অনেক কষ্টে রক্ষা পাইয়া তাঁহারা কুচেংজি [নগ]রে প্রবেশ করিলেন। ১ হাজার ৬ শতাধিক মাইল তাঁহাদিগকে পর্য্যটন করিতে হইয়াছিল। তথা হইতে দেড়শত মাইল অতিক্রম করিয়া অবশেষে তাঁহারা সাড়ে তিন দিনে উরুম্‌চিতে উপনীত হন। এই নগর সমুদ্র-তীর হইতে বহু বহু শত ক্রোশ দূরে বিদ্যমান। পৃথিবীর কোনও নগর সমুদ্রতীর হইতে এত দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত নহে। এখানকার অধিবাসীদিগের জীবনযাত্রায় বহু শতাব্দী ধরিয়া কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

কিরঘিজ সৈনিকের লবণসংগ্রহ

কিন্তু তথাপি উরুম্‌চিতে বেতার সংবাদ অপরিজ্ঞাত নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোন একটা কোম্পানী ওখানে বেতার সংবাদ আদান-প্রদানের কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছে। আধুনিক সভ্যতাদ্যোতক এই সকল ব্যাপার উরুম্‌চির মত স্থানে অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়াই মনে হইতে পারে—এখানকার জীবন-যাত্রা-প্রণালীর সহিত আদৌ খাপ খায় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বেতার যন্ত্র সন্নিবিষ্ট হইলেও বর্ত্তমানে গৃহবিবাদের ফলে উহার সংস্কার প্রভৃতি কার্য্য স্থগিত আছে। বহির্জ্জগতের সহিত শীঘ্র সংবাদ আদান-প্রদানে রেডিও যন্ত্রই একমাত্র ভরসাস্থল।

তুর্‌ফানের দ্রাক্ষাকুঞ্জ

এতদঞ্চলে ডাকযোগে পত্রাদির আগম-নির্গম করিবার ব্যবস্থা আছে সত্য; কিন্তু অত্যন্ত বিলম্বে ডাক যাতায়াত

করিয়া থাকে। বাহক ডাক লইয়া সাইবেরিয়া পর্য্যন্ত গমন করে; তথা হইতে রেলযোগে উহা চীনদেশে প্রেরিত হয়। পিকিং সহরে পৌছিতে এক মাস সময় লাগে।

টেলিগ্রাফ যন্ত্রের ব্যবস্থা থাকিলেও গৃহবিবাদের ফলে উহার সংস্কার ঘটে না। সুতরাং তারযোগে কোনও সংবাদ প্রেরণ করিলে ৩ হইতে ৬ মাসের মধ্যে সে সংবাদ বহির্জ্জগতে পৌছায়।

উরুম্‌চির শাসক রাষ্ট্রনীতি-সংক্রান্ত সকল সংবাদই গোপন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সামান্য কোন প্রসঙ্গ থাকিলেই সে সংবাদ নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

কাশগরের পথে অবগুণ্ঠনাবৃতা নারী

মিঃ লাটিমোর লিখিয়াছেন যে, সংবাদপত্রের প্রবেশ এ দেশে নিষিদ্ধ। দেশের মধ্যেও কোনও সংবাদপত্র নাই, মুদ্রিত করিবার সুযোগও কাহারও নাই। চৈনিক তুর্কীস্থান ক্ষুদ্র প্রদেশ নহে। ফ্রান্স, জার্ম্মাণী ও স্পেন দেশের সমষ্টিভূত স্থান একত্র করিলে যত বড় হয়, ইহার আয়তন তদনুরূপ। কিন্তু এত বড় প্রশস্ত প্রদেশে কোনও মুদ্রাযন্ত্র নাই। শুধু সরকারী কাগজের মুদ্রা ছাপিবার জন্য কতিপয় মুদ্রাযন্ত্র আছে মাত্র।

কার্ঘালিকের মণ্ডল ও দ্বিভাষী

এইরূপ উপায়ে শাসিত হইলেও সিন্‌কিয়াং বা চৈনিক তুর্কীস্থানের শান্তি অব্যাহত আছে। দেশের অধিবাসীরা সন্তুষ্ট, উন্নতিশীল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের চীন-বিদ্রোহের সময় হইতেই এ দেশের এই প্রকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এ দেশের অন্যান্য স্থানে গৃহবিবাদ ও দস্যুতস্করের উপদ্রব বৃদ্ধি পাইলেও উল্লিখিত স্থানে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই।

দেশের শাসনকর্ত্তা ৭০ বৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধ। শাসক স্বৈরশাসনের পক্ষপাতী, কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় অধিবাসি-সমন্বিত এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ তিনি দক্ষতার সহিত শাসন করিয়া আসিতেছেন। অনেক অসভ্য জাতিও তাঁহার অধিকারে বাস করে। তাহারা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত এবং এই সকল উচ্ছৃঙ্খল জাতিকে সুশাসিত রাখাও সহজ ব্যাপার নহে। শাসক কিন্তু এমন বস্তুতন্ত্রমূলক শাসননীতির

ইয়ার্কান্দের গালিচা-বিক্রেতা

পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন যে, অরাজকতা দেশের মধ্যে নাই বলিলেই চলে। ব্যক্তিগত হিসাবে লোকটি অত্যন্ত রক্ষণশীল।

এই শাসকের কার্য্য সম্বন্ধে মিঃ লাটিমোর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। লোকটি তাঁহার সহোদরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করেন। এই সহোদরটি স্বপ্নতত্ত্বের ব্যাখ্যায় পারদর্শী, নক্ষত্রাদির গতিবিধি দেখিয়াও তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারেন। মিঃ লাটিমোর যখন রাজধানীতে ছিলেন, তখন শাসকের পুত্র পিকিং সহরে যাপন করিতেছিলেন। শাসক সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্র ঠাণ্ডা লাগিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। এই সংবাদে ব্যস্ত হইয়া তিনি সহোদরের পরামর্শ গ্রহণ করেন। ভ্রাতা গ্রহনক্ষত্রাদির সহিত পরামর্শ করিয়া যে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন, বেতারযোগে সেই ব্যবস্থানুসারে সন্তানের চিকিৎসা করিবার আদেশ তিনি সন্তানের কাছে প্রেরণ করেন।

মিঃ লাটিমোর বেতার সংবাদ তাঁহার পত্নীর নিকট প্রেরণ করেন। পত্নী স্বামীর সহিত মিলিত হইবার জন্য সাইবেরিয়ার পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল যে, মিঃ লাটিমোর চৈনিক তুর্কীস্থানে উপনীত হইয়াছেন, এই সংবাদ পাইলে তিনি সাইবেরিয়ার পথে সেখানে আসিবেন। রেলপথ যেখানে শেষ হইয়াছে, তথা হইতে উরুম্‌চি পর্য্যন্ত রুসীয় মোটর-গাড়ীসমূহ যাতায়াত করিয়া থাকে। তিন চারি শত পথ মোটরযোগে আগমন করা বিশেষ কঠিন নহে; তিন দিনেই এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করা যায়।

মিঃ লাটিমোর-পত্নী উল্লিখিত পথে চৈনিক তুর্কীস্থান অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে তুষার-ঝটিকার জন্য কিছু ক্লেশভোগও তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। অতঃপর তিনি পতির সহিত চুহচক্ নামক স্থানে মিলিত হন।

চৈনিক তুর্কীস্থানে প্রবেশপথে টিন্‌সান্ বা সিলেসটিয়াল পর্ব্বতমালা বিদ্যমান। পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এই পর্ব্বতমালার

অবগুণ্ঠনাবৃতা পরিবারসহ বৃদ্ধ তুর্কী

উত্তর ও দক্ষিণদিকে দুইটি পথ আছে। সেই পথ দিয়াই শত শত বর্ষ ধরিয়া জনগণ চৈনিক তুর্কীস্থানে গমনাগমন করিয়া থাকে।

এই প্রদেশটি সাধারণতঃ মরুভূমিসমন্বিত। বৃষ্টিপাত এ অঞ্চলে অত্যন্ত সামান্য। কৃষিকার্য্য নদীর জলেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। পর্ব্বতশৃঙ্গস্থ গলিত তুষাররাশি নদীপথে প্রবাহিত হয়, এ জন্য জলের একান্ত অভাব হয় না। মরুভূমির মধ্যে মধ্যে এক একটি মরু-উদ্যান আছে। খাল কাটিয়া নদীর জলধারা এই সকল মরু-উদ্যানে প্রবাহিত করা হয়।

লাদকের বিবাহিতা যুবতী

খালের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে চাষ-আবাদ হইয়া থাকে। প্রত্যেক মরু-উদ্যানের মধ্যে এক একটি নগর আছে। এই সকল সহরেই ব্যবসায়ের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত।

প্রদেশটি চৈনিক উপনিবেশ; কিন্তু বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের প্রচুর-সংখ্যক অধিবাসীরা চীনদেশী নহে। উত্তর দিকের পথের সন্নিহিত কোনও কোনও স্থানে চীনারা কৃষক-জীবন অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই চীনারা হয় বণিক্‌, নয় ত রাজকর্ম্মচারী।

যে সকল জাতি এই প্রদেশে বসবাস করিতেছে, তন্মধ্যে দুইটি প্রধান;—তুঙ্গান্ বা দুঙ্গান্ এবং তুর্কী। এতদ্ব্যতীত দুলানী, তাজিক্, কিরঘীন্, তরুগুট, চাহার ও কাজাক্ প্রভৃতি জাতিরও বসবাস রহিয়াছে।

কাজাক জাতি ঈগল-শিকারে অত্যন্ত দক্ষ। বৃদ্ধের দল মূল্যবান্ শিকারী ঈগলপক্ষী মণিবন্ধে বসাইয়া পথে বাহির হয়। মণিবন্ধ পাছে তীক্ষ্ণ নখরে ক্ষত-বিক্ষত হয়, এ জন্য তুলা দ্বারা মণিবন্ধ সুরক্ষিত করা হয়। একটা ভাল ঈগল পক্ষীর মূল্য এক জোড়া উৎকৃষ্ট ঘোটকের অপেক্ষাও অধিক। কিন্তু ঈগলপক্ষী কদাচিৎ বিক্রীত হইয়া থাকে।

লাদকের নারী—পৃষ্ঠে সন্তান

সর্দ্দার বা কোনও মাননীয় ব্যক্তিকে উহা উপহৃত হইতে দেখা যায়।

শিকারী ঈগলপক্ষী বড় বড় হরিণ, নেকড়েবাঘ পর্য্যন্ত অনায়াসে মারিয়া ফেলে। ইহাদের নখর যেমন তীক্ষ্ণ—তেমনই দৃঢ়। নেকড়ে বাঘকে শিকার করিতে ঈগলপক্ষীকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।

পত্নীসহ মিঃ লাটিমোর যখন উরুমচিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন বসন্তঋতু আসন্নপ্রায়। গাড়ী ত্যাগ করিয়া তাঁহারা টাট্টু ঘোড়া কিনিয়া লইলেন। চৈনিক তুর্কীস্থানের পার্ব্বত্য টাট্টু ঘোড়ার বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে।

কাশগরের পল্লীনারী

লাদকের কুলী

তুর্ফান নামক স্থানটি আঙ্গুর প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ। ইহা সমুদ্রতটেরও নিম্নরেখায় অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের দর্শনীয় অনেক ধ্বংসস্তূপ এখানে বিদ্যমান। প্রাচীন নগর ও প্রাচীনতম সভ্যতার বহু নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়।

তথা হইতে লাটিমোর-দম্পতি ইলি উপত্যকা এবং ইলি নদীর উৎপত্তিস্থল দেখিয়া কুলডাজা নামক স্থানে গমন করিলেন। এখানে ব্যবসায়ের কেন্দ্র আছে। তত্রত্য চীনা ও রুসীয়গণ তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিল, জনৈক জার্ম্মাণ ধর্ম্মযাজকও তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

লাদকের মঠ

তার পর সিলেস্টিয়াল পর্ব্বতমালার দিকে তাঁহারা অভিযান করিলেন। এই অংশের পার্ব্বত্য-জাতিদিগকে জনৈক চীনা সেনাপতি শাসন-সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। তিনি পরিব্রাজক দিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দুইজন সশস্ত্র প্রহরী প্রেরণ করিলেন।

ইলি নদী অতিক্রম

পীড়ার উপশম হয় বলিয়া সে দেশের জনসাধারণ ঘোটকী-দুগ্ধের বিশেষ ভক্ত। এই দুগ্ধ অত্যন্ত তরল ও অম্লরসযুক্ত।

সমগ্র পার্ব্বত্যপ্রদেশ ভ্রমণ করিয়া মিঃ লাটিমোর আকলুর দিকে অগ্রসর হইলেন। তথা হইতে কাশগর অভিমুখে জুলাই মাসে যাত্রা করিলেন।

তুর্কীস্থানের নারী ও ফলের বিশেষ সুখ্যাতি আছে। চীনাদের মধ্যে এ সম্বন্ধে একটা প্রবাদবাক্যই আছে যে, তুর্‌ফানের আঙ্গুর, হামির

ভারবাহী যাক্

পার্ব্বত্য জাতিরা তরবারি ব্যবহার করিতে পাইত না। যদি কাহারও হস্তে তরবারি থাকে, তাহা হইলে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, সে ব্যক্তি সরকারী লোক। সুতরাং পার্ব্বত্য জাতি তাহাকে আহার্য্যাদি সরবরাহ করিতে বাধ্য।

যে সকল জাতি কোথাও স্থায়িভাবে বসতি করে না, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বেদিয়া-জীবন যাপন করে, তাহারাই অধিকাংশ করভার বহন করিয়া থাকে। অবশ্য এই কর নগদ না দিয়া তাহারা নানাবিধ পশু উপঢৌকন দিয়াই সরকারের প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া থাকে।

ভ্রাম্যমাণ জাতিরা লাটিমোর-দম্পতিকে সরকারী ভ্রমণকারী মনে করিয়া তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট সমাদর ও আতিথ্যবাৎসল্য প্রদর্শন করিয়াছিল। নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য তাহারা উপঢৌকনও দিত।

ঘোটকী-দুগ্ধ মধ্য-এসিয়ায় বিশেষভাবে প্রচলিত। এই দুগ্ধপানে পরিপাকশক্তি-সংক্রান্ত অনেক প্রকার

তরমুজ, কুচার সুন্দরী—ইহাদের তুলনা নাই। তুর্কী নারীরা স্বচ্ছন্দগতিতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে পারে, প্রচুর খাদ্যদ্রব্য পায়—পুরুষের আক্রমণে তাহাদিগকে কখনও বিপন্ন হইতে হয় না। সুতরাং নারীর সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

মুসলমান পুরুষ একই সময়ে একাধিক পত্নী গ্রহণ করিতে পারে, আবার তালাক দিতেও পারে। তুর্কীস্থানে পুরুষের ন্যায় নারীরও স্বামীকে তালাক দিবার তুল্য অধিকার আছে। ইহার ফলে দেখা যায়, তুর্কীস্থানে কোনও ধার্ম্মিক, ন্যায়নিষ্ঠ এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সমগ্র জীবনে ৪০টি বৈধ পত্নী লাভ করিতে পারেন। আবার কোনও ধর্ম্মশীলা মহিলাও ঠিক ঐ ভাবে অসংখ্য পতিও লাভ করিতে পারেন।

দুই সপ্তাহ পরে মিঃ লাটিমোর কাশগরে পৌঁছিলেন। তখন মেজর জিল্লান সস্ত্রীক অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন। তবে অতিথি-সংকারের যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়া যাইতে ভুলেন নাই। কয়েক দিন বিশ্রামের পর তাঁহারা কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করেন। ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া তাঁহারা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

আশাহত

বনে বনে আজ ফুটেছে কুসুম,
মনে মনে আশা কত!
সকলের প্রাণে জেগেছে কামনা—
আমি আজি আশাহত!
'পূবালি' বাতাস এসে ফিরে যায়,
ডেকে তবু মোর সাড়া নাহি পায়—
আমি শুনি আর করি হায় হায়
ঝরা শেফালির মত!
আমি আজি আশাহত!

দূরের আকাশ হাতছানি দেয়
মোর পানে চেয়ে চেয়ে!
বুঝি না ত' তার নির্ব্বাক্ ভাষা
জল ঝরে চোখ বেয়ে!
বাহিরের আলো ডেকে কয় ধীরে—
'বসে' কেন কবি—এস গো বাহিরে,
তবু তার পানে চাহি না ত' ফিরে,
মাথা করি মোর নত!
আমি আজি আশাহত!

মালতী বকুল ডেকে কয় মোরে,
'ওগো ও ফুলের কবি!
যাবার সময় হ'ল যে এবার
আঁক গো মোদের ছবি!'
আমি বলি ধীরে, 'নেই অবসর';
তারা ঝরে' যায় ব্যথায় কাতর!
মোর প্রাণে তবু রেখে যায় তারা
হাহাকার শত শত!—
আমি আজি আশাহত!

ওগো ও আকাশ আলো ও বাতাস,
ওগো ও মালতী বঁধু!
মোরে ডেকে ডেকে কেন শুধু মর—
এ বুকে পাবে না মধু!
হেথা আছে শুধু পউষের শীত,
ফাগুন আসেনি গাহেনিক গীত—
তোমাদের রূপে জুড়াবার নহে
মোর হৃদয়ের ক্ষত!—
আমি আজি আশাহত!

শ্রীবিমল মিত্র।

জীবন-স্বপ্ন

(উপন্যাস)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধি

যোগমায়া দেবী নিঃশব্দে সুতা টানিতেছিলেন,—তাঁর সে মৌন স্থির মূর্ত্তি বিন্দুর চিত্তকে বিচলিত করিল। কিছুক্ষণ তাঁর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বিন্দু কহিল—তুমি এখনো কিছু খাওনি, জ্যাঠাইমা ?

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—না মা, তোর জ্যাঠামশাই এখনো ফেরেন নি। সেই যে সকালে বেরিয়েচেন—

বিস্মিত কণ্ঠে বিন্দু কহিল—ও মা, এখনো ফেরেন নি! এ যে রাত হতে চললো, জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা কোনো জবাব দিলেন না। তাঁর হাতের ঘূর্ণন-কৌশলে সুতার-কাঠি চীনামাটীর ছোট বাটির মধ্যে ঘুরুর-ঘুরুর শব্দে ঘুরিয়া সূক্ষ্ম সুতা জড়াইয়া চলিল।

বিন্দু একবার চারিদিকে চাহিল, তার পর অত্যন্ত কুণ্ঠিত স্বরে কহিল,—বলাই-দাও বাড়ী ফেরেনি সারাদিন ?

গম্ভীর মুখে জ্যাঠাইমা কহিলেন—না!

এই ছোট্ট জবাবটুকু বিন্দুর মনে ভারী পাথরের মত প্রচণ্ড আঘাত দিল। নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী ভাবিয়া সে একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। কেন সে নালিশ করিতে আসিয়াছিল ? গাছের তুচ্ছ দুটা আম—না হয় লইয়াই ছিল! বিছুটির আঘাত—তাও মিলাইয়া গিয়াছে! রহিল শুধু শাস্তির আশঙ্কা—যার জন্য বলাইদা গৃহে ফিরিল না! না খাইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া শ্রান্তির ঘোরে এখন কোথায় যে পড়িয়া আছে! বেদনায় তার মন একেবারে ব্যথিত আতুর হইয়া উঠিল।

সে চুপ করিয়া সেইখানে বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলো-ছায়ায় ভর করিয়া তার মন পল্লীর পথে-ঘাটে মাঠে-বাটে বলাইয়ের সন্ধানে ছুটিয়া ফিরিতে লাগিল।

হঠাৎ পিসিমা আসিয়া ডাকিলেন—ও বৌ, কি করছিস্ লো ?—এবং কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আসিয়া দালানে ঢুকিলেন, কহিলেন—পৈতে করচিস্! এই যে বিন্দু—ও মা, একবার ওই দাশুদের ওখানে যে যেতে হবে। ওদের বাড়ী মানতের সত্যনারায়ণ আছে—আমি আর পারচি না। তুই যা,—পূজো দেখে কথা শুনে সিন্নি-বাতাসা আর পেসাদ নিয়ে আসিস্।

বিন্দু যেন বাঁচিল। বেশ হইয়াছে—এই তক্কে অমনি বলাইদারও একবার সন্ধান করিবে। সত্যিই তো, মানুষটা কোথায় গেল ?

বিন্দু কহিল—তা হলে যাই, পিসিমা।

পিসিমা কহিলেন—যা।…মোদ্দা, ওই গোবরাদের বাড়ীর কাছটায় মা সাবধান হোস্, সেই তেঁতুল-গাছটা পড়ে পথ একেবারে বন্ধ করে রেখেচে।

—আচ্ছা। বলিয়া বিন্দু নিমেষে প্রস্থান করিল।

পিসিমা তখন ছোট টিনের কৌটা হইতে তামাকের গুল লইয়া ঠোঁটের পিছনে টিপিয়া যোগমায়া দেবীকে প্রশ্ন করিলেন,—কি রান্না-বান্না হলো তোর, বল্ ভাই ?

যোগমায়া দেবী রান্নার ফিরিস্তি দিলেন এবং দিয়া দু'জনে তখন সংসারের সুখ-দুঃখের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

বাড়ীর বাহির হইয়া বলাইয়ের যে-সব আস্তানা জানা ছিল, বিন্দু সে-সব জায়গায় বলাইয়ের সন্ধান লইল। কোনো ফল হইল না। সকলেই বলিল, বলাই আজ সারা দিন সেদিকে ঘেঁসে নাই।

উদ্বেগাকুল চিত্তে বিন্দু তখন দাশুদের বাড়ী চলিল। তবে কি কলিকাতায় গিয়াছে ? আর ফেরে নাই ? কিন্তু সামনে রাত্রি—রাত্রে সেখানে কোথায় থাকিবে ?—ফিরিতেই হইবে। বোধ হয়, দিনের আলোয় আসিবার

ভরসা হয় নাই! পাছে বিন্দুও তার সাজা দেখিতে আসিয়া দাঁড়ায়, সেই লজ্জায়! তাই ঠিক।

অদূরে পরিত্যক্ত ভাঙ্গা শিব-মন্দির। পাড়ার বোসেদের যখন অর্থ-প্রতিপত্তি ছিল, তখন কে এই মন্দিরে দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, স্বর্গে মৌরুশী খানিক জায়গা দখল পাইবার বাসনায়; তার পর বোসেদের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার দেবতা ও মন্দির দুই গিয়াছে। সেখানে প্রতিষ্ঠাতার জমি মিলিয়াছে কি না, সে খপর সকলেরই অবিদিত; তবে এখানকার ভাঙ্গা মন্দিরে এখন পাড়ার যত দুর্দ্দান্ত ছেলে আসিয়া লুকাইয়া তাস খেলে, তামাক খায়, যাত্রার আখড়া বসায়! শিবের মন্দিরে বসিয়া তাদের দৌরাত্ম্যের নানা ফন্দী-ফিকির আঁটা চলে।

মন্দিরের রোয়াকে একটা কলরব। চার-পাঁচটি ছেলে বসিয়া কিসের মহা তর্ক তুলিয়াছে। বিন্দু দূর হইতে দেখিল, ঐ যে, ঐ দলে বসিয়া বলাইদা!

সে ডাকিল—বলাইদা···

তর্ক থামাইয়া বলাই বিন্দুর পানে চাহিল। অমনি সকালের সেই ঘটনা তার মনে পড়িল। সে আহ্বানে কোনো সাড়া না দিয়া সে তখনি তাদের তর্কের খেই ধরিল! বিন্দু কাছে আসিয়া কহিল—এখনো বাড়ী যাওনি বলাইদা! ···জ্যাঠাইমা খায়নি, কত ভাবচে!

মুখখানা বিকৃত করিয়া ঝাঁজালো স্বরে বলাই কহিল—তোমায় আর গার্জ্জেনগিরি করতে হবে না। তুমি নিজের কাজে যাও।

দলের ছেলেরা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ইহাদের সাম্‌নে তিরস্কার! বিন্দুর মনের মধ্যকার মানুষটি বিদ্রোহে ফুঁশিয়া উঠিল। কিন্তু তাকে দাবিয়া রাখিয়া অত্যন্ত সহজভাবেই বিন্দু কহিল—গার্জ্জেনগিরি এ নয়, মশাই। জ্যাঠাইমা ভাবচে, তাই আমার বলা। আমি তোমায় খুঁজতেও বেরুই নি। দাশুদের বাড়ী সত্যনারাণ আছে—আমি সেখানে যাচ্ছি। তোমায় এখানে দেখলুম, তাই···

বলাই কহিল,—আচ্ছা, আচ্ছা, যাও, পুজোবাড়ী নেমন্তন্ন খাও গে! বাবা সত্যনারাণ উপোসী বসে আছেন, তুমি না গেলে সিন্নি মুখে তুলবেন না। তুমি একটু পা চালিয়ে গিয়ে তাঁর উপকার করলে ভালো হয়।

বিন্দু কহিল—তোমার হুকুমে যাবো না তো! আমার খুশী হ'লে যাবো।···আমি যদি না যাই, তুমি কিছু করতে পারো?

বলাই কহিল—বেশ, দাঁড়াও তবে। যখন তোমার খুশী হবে, যেয়ো···

বিন্দু কহিল—আমার যাবার কথা তুমি কেন বলবে? ওঃ—দলে সর্দ্দারী করেন ব'লে সবার কাছে সর্দ্দারী করতে এসেচেন!···আমি যাবো না, কক্ষনো যাবো না।

বলাই কহিল—তোমার যা-খুশী করো গে, আমার তো তাতে ভারী বয়ে গেছে!

বিন্দু কহিল—এই মন্দিরে ব'সে সব বাড্‌শাই খাওয়া হয়। বুঝেচি। আমি তোমার বাড়ীতে ব'লে দেবো, রাজুদা···

রাজুদা ওরফে রাজকুমার ভয়ে সিঁটকাইয়া উঠিল। সে কহিল—কখন্ আমি বার্ডশাই খেয়েচি! চোখে দেখেচো কোনো দিন? এখনই ত্থাখো না এসে, কার কাছে এখানে বার্ডশাই আছে! চালাকি!

বলাই কহিল—তুই বক্‌চিস্ কেন! ওঃ, গোয়েন্দা! গোয়েন্দা মেয়ের লাগানি! একদিন ধরে এমন কষে গাঁট্টা দেবো যে, লাগানি ছিরকুটে যাবে!

বিন্দু তাতিয়া ঝাঁজিয়া কহিল—মারো দিকিনি গাঁট্টা! দেখি, কেমন পারো! ওঃ, ভারী বীর-পুরুষ! মারের ভয়ে সারাদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো হচ্ছে, উনি আবার চোখ রাঙাতে আসেন!···

বলাই বিরক্ত স্বরে কহিল—য্যাঃ, য্যাঃ, ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করতে হবে না। এখানে আমাদের কাজ হচ্ছে। শোন্ রাজু, ও লাগাক্-গে যাক্···তুই বাড়ীতে গিয়ে মুখের হা দিস্··· বার্ডশাই খেলে মুখে গন্ধ থাকবে না?···উনি লাগাবেন—অমনি লাগালেই হলো আর কি!

ভরসা পাইয়া ভীত রাজু কহিল—মিছে ক'রে লাগালে হবে না তো। বার্ডশাই খেলে মুখে গন্ধ থাকবে··· অমনি নয়।

হারিয়া বিন্দু তখন সারদার পানে চাহিল, কহিল—রাত হয়ে গেচে, সারুদা, এখনো বাড়ীর বাইরে আছো! সে দিনের কথা ভুলে গেছ, না? ওদিকে মামাবাবু ফিরেচে আপিস্ থেকে—মজা দেখো তখন বাড়ী গিয়ে। আমি বলে দেবো যে, এই ভাঙ্গা মন্দিরে সব জটলা হচ্ছিল।

সারদার চমক হইল। তর্কের মুখে রাত কত হইয়াছে, সেদিকে হুঁশ ছিল না। এখন বিন্দু সেদিকে হুঁশ করাইয়া দিতে সে লাফাইয়া উঠিল, কহিল—সত্যি কথা, আর না। রাত হয়ে গেছে, ভাই! মামাবাবু ভারী strict. সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাইরে···

এই অবধি বলিয়া সে শিহরিয়া উঠিল, কহিল,—না ভাই, আমি চললুম। এর পর বড়-মামা সদর দরজা বন্ধ ক'রে দেবে, বাড়ীতে ঢুকতেও দেবে না!

বলাই কহিল—দেয়, এখানে চ'লে আসবি। রাত্তিরটা এখানে ব্যোম্-ব্যোম্ ক'রেই ক'জনে কাটিয়ে দেবো। এ মন্দির ভাঙ্গা হ'লে কি হয়, বোসেদের শিব শুনেচি সেকালে খুব জাগ্রত ঠাকুর ছিলেন। তাঁর পুজোয় বিঘ্ন ঘটেছিল বলেই না বোসেদের সব গেছে। সে শিব তাঁর পুরোনো এ মন্দিরে খুব বেশী রাত্তির হলে নাকি এখনো আসেন,—ভট্‌চায্যি-জ্যাঠা শিবরাত্রির সময় বলেছিল···

এ কথায় সারদা আরো ভড়কাইয়া গেল। শিবের আসা তো এমন-কিছু নয়, দেবতা! কিন্তু তাঁর সঙ্গে যে নন্দী ভৃঙ্গীরা ফেরে, তারা কি অত রাত্রে ঠাকুরকে একা বলদের পিঠে ছাড়িয়া দিবে, সঙ্গে আসিবে না? পাশে বড় বটগাছটার পাতাগুলা এই সময় এলো-মেলো বাতাসে কেমন মর্ম্মরিয়া উঠিল। এতক্ষণ ওদিকে তার চেতনাও ছিল না, এখন শিবের কথায় সে-চেতনা ফিরিল। ভয় আরো বাড়িল। চঞ্চল হইয়া সে কহিল,—না ভাই, মামাবাবুকে তো জানো না···আমি যাই। খিড়কী দিয়ে বাড়ী ঢুকতে হবে। ঢুকে একদম্ রান্নাঘরে গিয়ে বসবো। তার পর চুপি চুপি···কথাটা শেষ না করিয়াই সারদা বাড়ীর দিকে ছুটিল।

দলের এক জন খসিতে বাকীরাও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তারা এখনো বলাইয়ের মত নিষ্পরোয়া হয় নাই, যেহেতু তাদের বাড়ীতে তাদের উপর পুরাপুরি মুরুব্বির শাসন! বলাইয়ের বাপ জীবন চক্রবর্ত্তীর মত গৃহ-সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত উদাসীন নন্। বলাই বহু লোভ দেখাইয়াও তাদের ধরিয়া রাখিতে পারিল না। একে একে তারা দল ভাঙ্গিয়া সরিয়া পড়িল।

বলাই গর্জ্জন করিল ঐ লক্ষ্মীছাড়ী বিন্দুটার জন্যই শুধু!···সভা তাদের কেমন জমিয়াছিল! কত করিয়া সে উহাদের এখানে ধরিয়া আনিয়াছিল···বেশ গল্প-সল্প চলিতেছিল···আর বিন্দু আসিবামাত্র···

বিন্দুর পানে ফিরিয়া বলাই কহিল—তোমার ভারী বাড় হয়েচে···না? বিছুটিতে শানায়নি···দেখচি।

বিন্দু কোন জবাব দিল না—স্থির অচঞ্চল মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া রহিল।

বলাই কহিল,—যাও না। সিন্নি যে ফুরিয়ে যাবে সেখানে।···

বিন্দু ম্লান চোখে বলাইয়ের পানে চাহিল···যেন সে মস্ত অপরাধী, বিছুটি যেন তার অঙ্গে লাগে নাই, বিন্দুই যেন বলাইয়ের অঙ্গে বিছুটি মারিয়াছে! অত্যন্ত করুণ স্বরে সে ডাকিল—বলাইদা···

বলাই হুঙ্কার দিয়া কহিল—কি?

বিন্দু কহিল—আমায় মাপ করো, বলাইদা!

বলাই উচ্চ হাস্য করিল, কহিল—মাপ! কিসের মাপ? জামার, না, জুতোর? আমি তো দর্জ্জীও নই, মুচিও নই যে, তোমায় মাপ করবো!

কথার সঙ্গে বিদ্রূপের হাসি!

বিন্দু ধীর-পায়ে আগাইয়া আসিয়া বলাইয়ের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। তার মুখে কোনো কথা ফুটিল না। আর্ত্ত ক্রন্দনে সে একেবারে লুটাইয়া পড়িল।

বলাই সে-মূর্ত্তির সামনে যেন কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া!··· বিন্দু কাঁদিতে কাঁদিতে মুখ তুলিল। জ্যোৎস্নার পরিপূর্ণ আলোয় বলাই চাহিয়া দেখে, চোখের জলে বিন্দুর মুখ ভাসিয়া গিয়াছে!

বিন্দু কহিল—আর কখ্‌খনো তোমার নামে কিছু বলবো না, বলাইদা···এবারটি মাপ করো। তুমি বরং আর একবার বিছুটি মেরে দ্যাখো, আমি লাগাই কি না!···

বলাইয়ের প্রাণ গলিয়া গেল। সে কহিল,—তা কাঁদিস কেন? চোখের জল মোছ্···

বিন্দু চোখের জল মুছিতে মুছিতে অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে কহিল—মাপ করেচো?

বলাই কহিল—করেচি রে, মাপ করেচি।

বিন্দু কহিল—তা হ'লে বাড়ী যাও, লক্ষ্মীটি। জ্যাঠাইমা সারাদিন কিছু খায় নি···তার মুখখানি এমন শুকিয়ে আছে

…বিন্দুর কথা শেষ হইল না। দুই চোখে হু-হু করিয়া আবার জল ঠেলিয়া আসিল।

সস্নেহে তার চোখের জল মুছিয়া বলাই কহিল—বাড়ীতেই যাবো।

বিন্দু কহিল—চলো। আমার সঙ্গে চলো। আমি জ্যাঠাইমাকে বারণ করবো…

হাসিয়া বলাই কহিল—সেজন্য তোকে ভাবতে হবে না রে। সারাদিন কিছু খাই নি আমি…এখন মা মারবে না। আর একটু রাত হলেই ফিরবো ভেবেছিলুম।

বিন্দু কহিল—না, আর রাত করে না! এখনি চলো।

বলাই কহিল,—বেশ, চ' তবে। কিন্তু তুই দাশুদের বাড়ী যাচ্ছিলি না?

বিন্দু কহিল,—তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যাবো'খন।

বলাই কহিল—এই পথ আবার মিছি-মিছি দু'বার ঘুরবি।

হাসিয়া বিন্দু কহিল,—তাতে কি!

বলাই উঠিল। বিন্দু কহিল,—হ্যানো জায়গা নেই যে তোমায় খুঁজিনি…এই মন্দিরেই ছিলে বলাইদা, সমস্ত দিন?

বলাই কহিল,—দূর! হানিফের খড়ের গোলায় খড়ের নীচে শুয়ে তোফা ঘুম দিয়েচি…

বিন্দু কহিল,—মা গো…তোমার অসাধ্যি কিছু নেই, দেখচি, বলাইদা…

—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভাই-ভাই

পাঁচ-ছ'দিন পরের কথা।

বেলা ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। ছেলেরা আহার করিতে বসিয়াছে। স্কুল-কলেজের তাড়া। খাইয়া এখনি সব বাহির হইবে। মা'র ব্যস্ততার সীমা নাই।

ভুবন হাঁকিল,—দুটি ভাত…শীগ্‌গির…

রান্নাঘর হইতে মা কহিলেন,—যাই রে। এই অম্বলটা চড়িয়েচি বাবা, একটু বসে খা…কাঁচা আমের ঝোল, নতুন জিনিষ…

ভুবন কহিল,—আমার অত সময় নেই। ভাত দাও শীগ্‌গির…

মা কহিলেন,—এক মিনিট বোস্, বাবা। না হ'লে ধরে পুড়ে অম্বলটা ছাই হয়ে যাবে।

ভুবন কহিল,—তা হ'লে আমায় আধপেটা খেয়েই উঠতে হলো।…

বলাই কহিল,—ট্রেণের ঢের সময় আছে। দশটায় কলকাতায় পৌঁছুলেই…

আর বলিতে হইল না। বারুদে আগুন পড়িলে যেমন ফশ্ করিয়া তা জ্বলিয়া ওঠে, ভুবন তেমনি জ্বলিয়া উঠিল, কহিল,—থামো নন্দদুলাল, ও সব সৌখীন খানা তুমি খেয়ো। পেটটাই সার বুঝেচো! আমাদের অত তো চলে না। আমাদের পড়া-শুনা আছে।

বলাই কহিল,—কলেজ তো এগারোটায়। অত আগে না গেলে কি ক্ষতিটা হবে?

ভুবন কহিল,—সে হিসেব তোমায় দেবার দরকার দেখি না! আমার প্রোফেশর এলেন যেন!…

বলাই কহিল,—থামো। বিশ্বের জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলে যাবে না দু' মিনিটে।

ভুবন রাগিয়া উঠিল, কহিল,—চুপ কর্ রাস্কেল! আমার উপর কর্ত্তালি করতে আসিস্‌নে বল্‌চি, খবর্দ্দার! জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবো।

বলাই কহিল,—ইঃ, ভারী জুতো হয়েচে! একবার জুতিয়ে স্থাখো না, কি ফল হয়! আমিও কচি খোকা নই।

—কি করবি, শুনি? মারবি না কি?

বলাই কহিল,—আমি তো বলিনি, তুমিই জুতিয়ে মুখ ছিঁড়বে বলচো। একবার মেরে স্থাখো না!…

—আমি বড় ভাই, একশোবার মারবার right (অধিকার) আছে আমার!…

বলাই কহিল,—ওঃ, আমার শ্রীরামচন্দ্র দাদা রে…

—কি!—যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা রে ছুঁচো! বলিয়া সক্রোধে উঠিয়া ভুবন বলাইয়ের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিয়া দিল। বলাই সে আঘাত হজম করিবার পাত্র নয়। সেও ভুবনের হাত ধরিয়া এমন জোরে ধাক্কা দিল যে, পা পিছলাইয়া পড়িয়া দেওয়ালের কোণে ভুবনের রগ ঠুকিয়া গেল। ভুবন চীৎকার করিয়া ডাকিল,—মা…

মা ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পিতলের সরায় করিয়া ভাত আনিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। ভুবন তখন প্রচণ্ড

মুষ্টি তুলিয়া বলাইকে আক্রমণের উদ্যোগ করিয়াছে। মা চীৎকার করিয়া কহিলেন—বড়-বড় ছেলে সব, এখনো এই শুম্ভ-নিশুম্ভর যুদ্ধ করতে লজ্জা হয় না রে তোদের! বাবা, বাবা—

ভুবন সগর্জ্জনে কহিল—তোমার ঐ আহ্লাদে পুত্তুরটি যা-নয়-তাই বলবে আমাকে! কেন? কিসের জন্যে? আমি না বড় ভাই!

মা কহিলেন—তোর জন্যে মাথা-মুড় খুঁড়ে মরবো কি রে, বল? কারো সুস্থির হবার জো নেই তোর জন্যে?

বলাই কহিল—আমি কি বলেচি যে, শ্রীরামচন্দ্র একেবারে ধনুকে মৃত্যুবাণ জুড়লেন! শোনো তুমি, শুনে বিচার করো···

ভুবন কহিল—আমায় এমন ঠেলে দিলে যে, দেওয়ালে মাথা ঠুকে···এই ভাখো, রগ ফুলে আঁটি হয়ে উঠলো দেখতে দেখতে! কলেজে কোন্ মুখে যাবো আমি এখন এই রগ নিয়ে?

ভুবন রগের ফুলায় বাঁ-হাত বুলাইতে লাগিল।

মা চাহিয়া দেখেন, সত্যই রগটা মার্ব্বেলের মত ফুলিয়া উঠিয়াছে! মা কহিলেন—হ্যাঁ রে ও খুনে, তুই কি একটা খুন না ক'রে ছাড়বিনে? ভয় নেই? হাতে দড়ি পড়বে যে! আজ এর বিহিত না ক'রে আমি ছাড়বো না···

সুবল নিঃশব্দে খাইতে খাইতে মজা দেখিতেছিল এবং অবসর খুঁজিতেছিল, কি করিয়া এ রণ-কোলাহলে দু'ভাইকে আরো উস্কাইয়া তোলা যায়। এমন সময় বলাই কহিল,—মেজদাকে জিজ্ঞাসা করো আগে, কার দোষ!···

মা কহিলেন,—কার দোষ রে, সুবল?···

এক গ্রাস ভাত মুখে পুরিয়া সুবল কহিল—বলাইয়ের।

—আমার দোষ! তবে রে মিথ্যুক!···বলিয়া বলাই একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল; সগর্জ্জনে কহিল—মিটমিটে ডান ব'সে ব'সে খাচ্ছেন—আর কোঁদলের মতলব ভাঁজচেন! সাক্ষী দিতে উঠলেন···ওরে আমার শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল!

সুবল চীৎকার করিল,—ছোটলোকের মত কথাটা মা শুনলে তো।

মা কহিলেন,—যেমন সব শিক্ষা! মুখ সকলের সমান!

মা'র কাছে বিচার না পাইয়া সুবল গর্জ্জিয়া উঠিল,—তোর কি ধার ধারি রে, উল্লুক? বলিয়াই এঁটো হাতে বলাইয়ের গালে সে ঠাশ করিয়া এক চড় মারিল।

আচম্কা মার খাইয়া বলাই একটু কেমন থ হইয়া রহিল, তার পর-মুহূর্ত্তেই ঝোলের বাটিটা তুলিয়া সুবলের মাথায় সজোরে আঘাত করিয়া সামনে হইতে উঠিয়া একেবারে অনেকখানি দূরে গিয়া দাঁড়াইল।

মা হতভম্ব! কহিলেন—এ কি এ কাণ্ড! কুরুক্ষেত্তর ব্যাপার! ছি, ছি, আমার জীবনে ধিক্কার ধরে গেল!···নাঃ, আর নয়! থাক্ তোদের সংসার প'ড়ে—কর্ তোরা যা-খুশী—আমার আর সহ্য হয় না। আমি পুকুরে ডুবে মরবো আজ। দেখি, কে ঠ্যাকায়।···বলিয়া মা ভাতের সরা সেইখানে রাখিয়া দুম্ দুম্ করিয়া খিড়কীর ঘাটের দিকে অগ্রসর হইলেন।

কোলাহল শুনিয়া শান্ত আর কমলা নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তারা মা'র কথা শুনিয়া ও কথানুরূপ ভঙ্গী দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—ও বড়দা, ভাখো না, মা কোথা গেল!

বড়দা মুখ বাঁকাইয়া কহিল—আমি পারি না আর এ সব খেলা দেখতে। আমার কলেজের বেলা হয়ে যাবে। আগে না গেলে ফার্ষ্ট বেঞ্চে জায়গা পাবো না। বলিয়া সহসা সব রাগ-দ্বেষ থামাইয়া সে মুখ-হাত ধুইতে গেল।

—ওগো মা গো!···বলিয়া একটা আর্ত্ত রব তুলিয়া শান্ত খিড়কীর ঘাটের পথে মা'র অনুসরণ করিল।···

সুবল চুপ-চাপ ভাতের গ্রাস মুখে তুলিতে লাগিল। বলাই একলাফে বাহিরের উঠানে পড়িয়া খিড়কীর ঘাটে ছুটিল। মা তখন জলের কাছে নামিয়া গিয়াছেন। বলাই দ্রুত ছুটিয়া গিয়া মা'র হাত ধরিল, ডাকিল—মা···

মা কহিলেন—না, হাত ছাড়্ বলচি, হতভাগা। মা ব'লে ডেকে আর আদর কাড়াতে হবে না। কে তোর মা? তোর মা নেই, মরে গেছে···

বলাই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—তোমার পায়ে পড়ি মা, এবারকার মত মাপ করো···

মা কহিলেন,—ঢের মাপ হয়েচে। তোর ঢংয়ের মাপ রেখে দে তুই···

বলাই কহিল,—না মা, এই তোমার পা ছুঁয়ে বলচি, সত্যি। বাড়ী চলো।

মা কহিলেন,—বড় ভাইয়ের গায়ে আর কখনো হাত তুলবি ?

বলাই কহিল,—আর কখনো ওদের গায়ে হাত তুলবো না...ওরা আমায় মেরে ফেললেও না।

মা কহিলেন,—ঠিক বলচিস্ ?

বলাই কহিল,—ঠিক বলচি।

মা কহিলেন,—আমি মা, আমার পা ছুঁয়ে বলচিস্ ?...

বলাই মা'র পায়ে দুই হাত রাখিয়া কহিল,—এই তোমার দু'পা ছুঁয়ে বলচি। এবারটি শুধু মাপ করো...

মা কহিলেন,—মনে থাকে যেন!...আজ তা হ'লে উঠচি। কিন্তু আবার যদি কোনো দিন এমন দেখি, কেউ আমায় ধ'রে রাখতে পারবে না কিন্তু...

কোঁচার খুঁটে চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলাই কহিল, —আচ্ছা।

মা কহিলেন,—দাদাদের কাছে মাপ চাইবি, চ'... পারবি চাইতে ?

ঘাড় নাড়িয়া বলাই জানাইল, পারিবে।...

মা ফিরিলেন, পিছনে বলাই। সুবল তখনো ভাতের থালার সামনে বসিয়া। কমলা অনুযোগ তুলিতেছে,—তুমি যাও না মেজদা...মেজদা তার কোনো উত্তরই দেয় না। মাকে ফিরিতে দেখিয়া সে কহিল,—অম্বল দেবে, না, উঠবো ?

মেজদার নির্লিপ্ততা দেখিয়া বলাই অবাক্! যেন কোন ঘটনা ঘটে নাই...আবার অম্বল চায়!

মা কহিলেন,—হ্যাঁ, দি এনে, বোস্। ভুবন কোথা ? বেরিয়ে গেছে ?

সুবল কহিল,—হ্যাঁ। বাবুর সব-তাতেই তাড়া। আমাদের ক্লাশও তো এগারোটায়। বি-এর পড়া বেশী ভারী কি না, আমরা নীচের ক্লাসে পড়ি, সে ভারীত্ব বুঝবো কি ক'রে......

নিজের মনেই সে বকিয়া চলিল। মা রান্নাঘরে ঢুকিলেন। শান্ত ও কমলা ধীরে ধীরে দোতলায় চলিয়া গেল। বলাই কাঠ হইয়া রোয়াকে দাঁড়াইয়া! মা আমের অম্বল লইয়া আসিয়া কহিলেন,—বলাই, খেতে বোস্ হাত ধুয়ে...

—আবার ?...

—তাতে দোষ নেই! বামুনের সব নিয়মই রক্ষা করে চল্‌ছিস কি না!...না হয় শান্তর ঐ ছোট থালাখানা নিয়ে বোস্...আমি ভাত এনে দি, অম্বল দি...

সুবল কহিল—ব'সে যা! তোর তো ইস্কুলে না গেলেও চলে! তোর ভাবনা কি ?

বলাই কোনো জবাব দিল না।

মা বলিলেন,—আবার তুই কথা কচ্ছিস কেন ?... কুঁচুলে নাড়ী কি না, কট্-কট্ ক'রে ওঠে! ও সব সমান! মানুষের পাঁচটা আঙল যে সমান হয় না রে—তা, তোদের কি সব বিপরীত!

সুবল কহিল—আমি মিথ্যা কথা বলিনি। কাল ওদের মাষ্টার শ্রীপতিবাবুর সঙ্গে দেখা হলো ট্রেণে—তিনি বারুইপুর যাচ্ছিলেন। তা বললেন কি না আমায় যে, তোমার ভাই বলাই কি স্কুল ছেড়ে দিলে ? আমি বললুম, না। তিনি বললেন, সাত-আট দিন স্কুলে তার টিকিও দেখা যায় নি!...জিজ্ঞাসা করো না তোমার গুণধর পুত্তুরকে।...

মা বলাইয়ের পানে চাহিলেন, কহিলেন—হ্যাঁ রে, সত্যি ? ইস্কুলের মাষ্টার এ কথা বলে কেন ?

সুবল মৃদু হাস্যে কহিল—তারা তো ওর দাদা নয় যে, ওর সঙ্গে শত্রুতা আছে!...আমাদের মাথা হেঁট করালে ঐ ছেলে!

মা বলিলেন—তুই থামা না বাপু তোর বড়বড়ানি।... হ্যাঁ রে বলা, ইস্কুলে যাসনি কেন ?...বাড়ী থেকে ঠিক তো বেরিয়ে যেতিস!

বলাই কহিল—আমার এগজামিন ছিল...

মা কহিলেন—এগজামিন ছিল তো কি ?

বলাই কহিল—পড়া তৈরী হয় নি, এগজামিনে কি লিখবো ? তাই।

সুবল আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—শুধু তাই নয়। কালকের কথা তবু বলিনি, আমাদের অঙ্কর প্রোফেশর আসে নি, তাই আমাদের সকাল সকাল ছুটী হয়েছিল। আমরা চার-পাঁচজনে মিলে মিউজিয়মে গেছলুম। ট্রাম থেকে যেখানে নামতে হয়, নেমে দেখি, তিন জন সঙ্গী নিয়ে আমাদের বলাই বাবু মাঠে ঘাসের উপর ব'সে দিব্যি তাস খেলচেন। দেখে আমাদের ক্লাশের ব্রজেন

বললে, তোর ভাই না? আমি বললুম, হ্যাঁ। তারা বললে, তোর ভাই এমন!...লজ্জায় আমার মাথা একেবারে নুয়ে পড়লো।...

বলাই কহিল—নাই বা বলতে ভাই। বললেই পারতে, তোমাদের বাড়ীর চাকর, গোরুর খড় কাটে, জাব মেখে দেয়। ওঃ!...বলাই আরো কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

সুবল কহিল—আমার মাথায় যে এই মারলে মা, তার বিচার তুমি করলে না!...

মা কহিলেন,—বিচারের যিনি মালিক, তাঁর কাছে নালিশ করো, তিনি বিচার করবেন।...আমি করবো তোমাদের বিচার? বাবা—তা হ'লে আমার হাড়-মাস থাকবে? এইখানেই আমায় কজনে প'ড়ে খুন ক'রে রাখবে!...

সুবল কহিল—তা তোমার গোপাল-ধনকে একজোড়া তাস কিনে দিয়ো...কালকের সে তাসজোড়া যদি ছিঁড়ে গিয়ে থাকে...

বলাই কহিল,—মা...আমার সঙ্গে দেখচো তো কেমন ক'রে লাগতে আসে। আমি প্রতিজ্ঞা করেচি, তাই... তুমি কিন্তু ওদের সাবধান ক'রে দিয়ো! বন্ধুদের কাছে ভাইয়ের পরিচয় দিতে লজ্জা হয়...এদিকে আবার সহোদর সেজে সদুপদেশ ছড়াতে এসেচেন!

মা কহিলেন,—সুবল, যা, তোর খাওয়া হয়েচে তো— কলেজ যা...

সুবল কহিল,—তা যাচ্ছি। কিন্তু উনি কি স্কুল ছাড়লেন? সত্যি, কেন যে মিছিমিছি মাইনে গোঁজো...সে টাকাটা থাকলে...

বলাই কহিল,—সে টাকাটা থাকলে ওঁর বাদাম-পেস্তা কেনা হ'তে পারে, না মেজবাবু?...

মা হাঁকিলেন—বলা, আবার...

—না মা, আমি চুপ করলুম।...মাপ, মাপ করলুম তোমায় মেজদা, শুধু মা'র কথায়...

—ওরে আমার মাতৃভক্ত রে...বলিয়া সুবল উঠিয়া আঁচাইতে গেল।

মা কহিলেন—তুই তা হ'লে থালা নিয়ে বোস্ বলা, আমি ভাত দি।...তার পর আজ ভাত খেয়ে ইস্কুলে যা... সত্যিই তো, ওরা পড়াশুনায় অমন! কত সুখ্যাতি করে লোকে, আর তুই ওদের ভাই হয়ে মুকুখ্যু থাকবি রে?... তোর নিজেরও কি একটু লজ্জা হয় না?...ছি!

বলাই মা'র কথার কোনো জবাব দিল না; একটা থালা টানিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল—খুব ছুটিখানি ভাত দিয়ো মোদ্দা, আর তোমার ঐ কাঁচা আমের অম্বল, মা।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

শেষ সম্বল

বড় সাধ ছিল মনে দিবসের অবসানে
সন্ধ্যা-দীপ জ্বালিব হরষে,
শুদ্ধ পরিস্নাত হয়ে সকলি ফেলিব ধুয়ে—
ধূলা-মলা যাহা কিছু লেগেছে দিবসে।
সুগন্ধি কুসুম তুলে ধুপ-ধুনা দিব জেলে—
সৌরভে গৌরবে ধন্য হইবে জীবন!
পবিত্র পুষ্পের সম দেহ সনে প্রাণ মম
দিবাশেষে তব পায় করিব অর্পণ।
কিন্তু হায় এ কি দেখি সকলি রহিল বাকি,
জীবনের কোন সাধ হ'ল না পূরণ!—
কল্পনা-কাননে বসি রচিনু যা দিবানিশি
বাস্তবে চাহিয়া দেখি সকলি স্বপন!

মুকুলে ঝরিয়া প'ল বিকশিত নাহি হ'ল
চেয়েছিনু যে কুসুম করিতে চয়ন;
সন্ধ্যায় ব্যথিত প্রাণে ফিরিলাম ক্ষুণ্ণ-মনে—
ব্যর্থতার বেদনায় দহিল জীবন।
উতলা বাতাসে ভেসে এ কি সুর কাণে আসে—
হৃদয়ে বাজিছে আজি করুণ রাগিণী!—
কোন্ সে সুদূর দূরে কে ডাকে করুণ সুরে,
শুনি কাণে দিবানিশি বিদায়ের বাণী।
দিবালোক হয় ক্ষীণ, ধীরে ধীরে যায় দিন—
সাঙ্গ নাহি এ জীবনে হলো কোন কায;
কি নিয়ে যাইব বল? হতাশার আঁখি-জল
আছে শুধু, তাই নিয়ে যেতে হবে আজ!

শ্রীমতী সরোজবাসিনী বসু

নারীর অধিকার

শিক্ষা মনুষ্য-চরিত্রের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তৃত করে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। অবশ্য মানব-চরিত্রের উপর কৌলিক শক্তির প্রভাব যে অধিক, তাহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু শিক্ষার অভাবে সেই কৌলিক শক্তি স্ফূর্ত্তি পায় না। মানুষ যদি তাহার কৌলিক শক্তিবিকাশের অনুরূপ শিক্ষা না পায়, তাহা হইলে তাহার সেই শিক্ষা তাহার জীবনের কোন উপকারেই আইসে না। সেই জন্য জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। বিজাতীয় শিক্ষা লোকের পক্ষে অতিশয় ভয়াবহ, তাহা একটু একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। আজকাল আমাদের দেশে যে বিজাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে,—তাহার প্রভাব নর এবং নারীর মধ্যে কিরূপ ক্ষতিকর হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বুঝিবার শক্তি এখন অনেকেরই নাই। তাহার কারণ, আমরা সকলেই এখন বিজাতীয় শিক্ষালাভ করিয়া অল্পবিস্তর বিজাতীয় প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া পড়িতেছি। তবে কেহ কেহ সেই প্রভাবে এত অধিক পতিত হইয়াছেন যে, তাঁহারা দিগ্‌বিদিক্‌-জ্ঞানহারা হইয়া মৃগতৃষ্ণিকালুব্ধ বিভ্রান্ত মৃগের মত আত্মজ্ঞানশূন্য হইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহমরীচিকার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইতেছেন। লক্ষণ দেখিয়া উহার পরিণাম কি হইবে, তাহা বুঝিবার মত শক্তি ইঁহাদের নাই। এই শ্রেণীর ভারতবাসীরা যে অত্যন্ত করুণার পাত্র, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু সকলেই যে এই বিজাতীয় শিক্ষায় সমানভাবে ভ্রান্ত এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা নহে। ইঁহাদের মধ্যে ভ্রান্তিরও একটা ক্রম আছে। সেই জন্য দেখিতে পাই যে, আমাদের ধর্ম্ম-সাধনপদ্ধতি এবং সমাজ-বিন্যাসপদ্ধতি লইয়া নানা লোকের মধ্যে নানা মত অতিশয় প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহাতে সমাজে বিলক্ষণ আত্মকলহেরও উদ্ভব হইতেছে। এক দল অন্য জনকে ভ্রান্ত এবং অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিতেছেন। সমাজে নানা মতের কোলাহলে সত্যপথ এবং জাতীয় পথ নির্দ্দেশ করা কঠিন হইয়া উঠিতেছে। সমাজের পক্ষে ইহা অতিশয় দুর্দ্দিন। কারণ, যে জাতি জাতীয় ধারা ছাড়িয়া বিজাতীয় পথে বিচরণ করিতে বাধ্য অথবা প্রলুব্ধ হয়, সে জাতি অতি শীঘ্রই অন্তঃসারশূন্য হইয়া ধ্বংসপথের পথিক হইয়া থাকে। বিজাতীয় পথ কখনই উন্নতির কারণ হইতে পারে না। সেই জন্যই আমরা সমাজ-সংস্কারকদিগের পক্ষে অরুচিকর হইলেও নারীর এবং নরের অধিকার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ব্যষ্টি হিসাবে প্রত্যেক মানুষের জীবনের গতি গড়িয়া উঠিবার যেমন একটা বিশিষ্ট ধারা থাকে, আন্তর এবং বাহ্য প্রভাবের দ্বারা উহা যেমন গড়িয়া উঠে,—সমষ্টি হিসাবে অর্থাৎ সমাজের দিক্ দিয়াও সেইরূপ প্রত্যেক জনসমাজ একটা বিশিষ্ট ধারা ধরিয়া বিকাশলাভ করিয়া থাকে। দুই দফা কারণ মানব-সমাজকে সেই ধারা ধরাইয়া দেয়। এক দফা কারণ বাহ্য, আর এক দফা কারণ আন্তর। এই দুই দফা কারণ যেমন ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক মানুষের জীবনগতি নির্ণয়ে সহায়তা করে, সেইরূপ ঐ দুই দফা কারণই মানব-সমষ্টির বা সমাজের জীবনগতি নির্ণয় করিয়া দেয়। বাহিরের জলবায়ু, ঋতু-বিপর্য্যয় প্রভৃতি, শিক্ষার ধারা, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পদ্ধতি, ইত্যাদি বহু বহিঃস্থ কারণ যেমন ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক মানবের উপর প্রভাব বিস্তৃত করিয়া থাকে,—সেইরূপ সমষ্টিভাবে সেই দেশবাসী সমস্ত মানবসমাজের উপরও প্রভাব প্রকাশ করে। এই কারণগুলিকে প্রত্যেক জনসমাজের সভ্যতানির্ণায়ক বাহ্য কারণ বলা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন মনুষ্যের সভ্যতা-নির্ণয়ের আর এক দফা কারণ আছে। তন্মধ্যে কৌলিক শক্তিই সর্ব্বপ্রধান। তদ্ভিন্ন মস্তিষ্কের গঠন, স্নায়বিক অবস্থা যেমন ব্যষ্টি-ভাবে প্রত্যেক মানুষকে তাহার বৈশিষ্ট্য প্রদান করে, তেমনই সমষ্টিভাবে প্রত্যেক দেশবাসী জনসাধারণকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। মানুষের এই বৈশিষ্ট্যগঠনে বাহ্য কারণের প্রভাব অধিক কি আন্তর কারণের প্রভাব অধিক, তাহা লইয়া বিতণ্ডা করিবার ভার আমরা বাহ্য প্রভাববাদী (environist) এবং আন্তর প্রভাববাদী (eugenist) দিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া এইমাত্র বলিতে চাহি, উহার কোনটির প্রভাবই নগণ্য নহে। ফলে কোন ব্যক্তি যেমন তাহার দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিতে পারে না,—সেইরূপ প্রত্যেক মানবসমাজের ত এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা সেই সমাজ সহজে পরিহার করিতে পারে না,—পরিহার করিলেও তাহারা নিজ নিজ স্থায়িত্ব রক্ষা করিতে পারে না।

ব্যক্তিগত হিসাবে আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষের বয়স যত অধিক হয়, ততই যেমন তাহার পক্ষে চিরাগত অভ্যাস পরিহার করা কঠিন হইয়া থাকে, এবং সেই অভ্যাস পরিত্যাগ করিলে অনেক সময় উহা তাহার অনিষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়ায়; সমষ্টি ভাবে সেইরূপ যে সমাজ বহুকাল ধরিয়া বিকাশের একটা নির্দ্দিষ্ট ধারা অবলম্বন পূর্ব্বক গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই ধারা ছাড়িয়া দিয়া অন্য দেশের অনুকরণে আবার একটা নূতন ধারা অবলম্বন করিতে গেলেই সেই সমাজকে ঘোর বিড়ম্বনায় পড়িতে হয়। যে সমাজের বিকাশধারা যত পুরাতন, সেই সমাজের পক্ষে তাহার সেই চির-অবলম্বিত বিকাশধারা ছাড়িয়া দেওয়া তত অপরিণামদর্শিতার কার্য্য। ইহার ফলে সেই সমাজস্থ লোক অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। তাহাদের চরিত্রবল বিশেষভাবে লোপ পায়। তাহারা জীববিশেষের ন্যায় কেবল অনুকরণপ্রিয় হইয়া উঠে। অতিপ্রাচীন জাতির পক্ষে এইরূপ নূতন জাতির বিকাশধারা-গ্রহণ তাহার পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে, তাহা প্রাচীন জাতির ইতিহাস পড়িলে যে মনে হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে জাতি যত প্রাচীন, সে জাতির পক্ষে ঐ প্রকার পরধর্ম্ম বা পরের সভ্যতা তত ভয়াবহ।

ভারত অতি প্রাচীন দেশ। ভারতীয় হিন্দুরা অতি প্রাচীন জাতি। এই জাতি যে কত প্রাচীন, তাহা বুঝিয়া উঠাই কঠিন।

য়ুরোপীয়রা এই জাতি-সভ্যতার কাল ৩ হইতে ৫ হাজার বৎসর নির্ণয় করিয়া থাকেন। কোন কোন জার্ম্মাণ পণ্ডিত ইহার কাল আরও অধিক বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে এবং যতই অতীতের অন্ধকারময় গুহায় অনুসন্ধানের বর্ত্তিকা লইয়া লোক অগ্রসর হইতেছে, ততই আর্য্য সভ্যতার ও বেদের প্রাচীনতা সপ্রমাণ হইতেছে। ভারতবাসী ব্রাহ্মণগণই এক সময়ে বাবিরুষ এবং ফিনীসিয়ায় যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ অঞ্চলের সভ্যতা ভারতীয় হিন্দুগণ দ্বারা যে গঠিত, তাহা অনুমান করিবার কতকগুলি বলবৎ কারণ পাওয়া যায়। ফরাসী দার্শনিক কক্সিন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, প্রাচ্য দেশই গ্রীক এবং রোমক সভ্যতার আদি স্থান। ইহার জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভাষা, বর্ণমালা, ধর্ম্ম, দেব-দেবী সমস্তই প্রাচীন আদর্শে গঠিত; তাঁহারা যখন প্রাচীর, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কাব্য বিজ্ঞান দর্শন পুরাণ প্রভৃতি পাঠ করেন, তখন উহার তুলনায় প্রতীচীর কাব্য-দর্শনাদি অতি তুচ্ছ এবং নগণ্য বোধ হয়। কাযেই প্রাচ্য জ্ঞানের নিকট তাঁহাদের জানু স্বতঃ অবনত হইয়া পড়ে।

এই ভারতীয় হিন্দু জাতির বেদের বয়স স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক অন্ততঃ ৬ হাজার বৎসর সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, উহা তদপেক্ষাও অধিকতর প্রাচীন। আমাদের কেন এ ধারণা হইল, সে প্রশ্ন এখানে তুলিলে পুথি বাড়িয়া যাইবে। তবে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, ঋগ্বেদে যে সকল জ্যোতিষতত্ত্ব প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ঋগ্বেদের সময় ভারতীয় সভ্যতা অনেক উন্নত হইয়াছিল। য়ুরোপীয়গণ যে ভাবে বিচার করিয়া থাকেন, সেই ভাবে বিচার করিয়া দেখিলেও ভারতের এই সভ্যতা ৮।৯ হাজার বৎসরেরও প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। এই দীর্ঘকালের ইতিহাস যত দূর পাওয়া যায়, নিরপেক্ষ-ভাবে তাহার আলোচনা করিলে আমাদের জাতীয়তার স্বরূপ কি, কোন্ বনিয়াদের উপর ভর করিয়া উহা গজাইয়া উঠিয়াছিল, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। উহা না বুঝিয়া আমাদের কোন সামাজিক বা ধর্ম্ম্য ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে যাইলেই ঘোর বিভ্রাট উপস্থিত হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতে যে যুবক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার গতি দেখিয়া আমাদের শঙ্কা জন্মিয়াছে যে, এই আন্দোলনের ফলে বুঝি এইবার ভারতের প্রাচীন ভাবধারা একবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায়। যাঁহারা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতেছেন, তাঁহারা কোন প্রকারেই এই প্রাচীন জাতির ও প্রাচীন সভ্যতার ভাবধারার সহিত পরিচিত হইবার জন্য মুহূর্ত্তের নিমিত্ত যে বিন্দুমাত্রও আলোচনা করিয়াছেন, তাহা ইঁহাদের উক্তি হইতে বিন্দুমাত্রও পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহারা য়ুরোপীয়-দিগের উদ্দাম কল্পনাপ্রসূত সাম্যবাদে মুগ্ধ হইয়া যে আদর্শের অনুবর্ত্তন করিতেছেন, তাহাতে যে তাঁহারা সমাজে একটা ঘোর উপপ্লব উপস্থিত করিবেন, এই আশঙ্কা কেবল আমার মনে নহে, অনেক চিন্তাশীল লোকের মনেই উদিত হইতেছে। ইহা যে দারুণ শিক্ষা-বিভ্রাটের বিষপূর্ণ ফল, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আরও আশঙ্কার কথা এই যে, এই যুবক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আবার যুবতী আন্দোলনও আরম্ভ হইয়াছে। সোনার সহিত সোহাগা মিশিয়াছে। সম্প্রতি মাদ্রাজ অঞ্চলে নারীদিগের শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের সভায় নারীরা যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার ফল কিরূপ শোচনীয় হইতেছে, তাহা বিলক্ষণ বুঝা যাইবে। ইঁহারা এই দুইটি দাবী করিয়াছেন :—

(১) নর এবং নারীর পক্ষে যৌন-নীতির মানদণ্ড একই প্রকার করিতে হইবে।

(২) নারীরা আইন অনুসারে পুরুষের সহিত স্বতন্ত্র থাকিবার তুল্য অধিকার পাইতে এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আইন করিতে চাহেন।

যদি নর এবং নারীকে সর্ব্ববিষয়ে তুল্য মনে করা হয়, তাহা হইলে এই দাবী যে অন্যায় হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সর্ব্বাংশে স্ত্রী এবং পুরুষ যে তুল্য, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নাই,—এমন কথা কোন দুঃসাহসিক ব্যক্তিই বলিতে পারিবেন না। এরূপ ক্ষেত্রে সর্ব্ববিষয়ে অধিকারের তুল্যতা কিরূপে লাভ হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। অথচ মনুষ্য বলিয়া নর ও নারীর মধ্যে অনেক বিষয়ে সমতা আছে। যে যে ব্যাপারে উভয়ের সমতা আছে, সেই সেই ব্যাপারে নর-নারীর যে তুল্যাধিকার বিদ্যমান থাকা উচিত, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। যথা উভয়ের ক্ষুধা আছে এবং খাদ্যদ্রব্যের রসগ্রহণের তুল্য ক্ষমতা আছে; সুতরাং খাদ্য-গ্রহণে উভয়ের তুল্য অধিকার থাকা আবশ্যক, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আনন্দলাভ প্রভৃতি ব্যাপারে নারীর অধিকারে এবং পুরুষের অধিকারে কোন পার্থক্য রাখা যাইতে পারে না, সে পার্থক্য বোধ হয় কেহই করে নাই। বরং গর্ভিণী ও প্রসূতি নারীর জন্য উৎকৃষ্টতর খাদ্যের ব্যবস্থা করিবার কথা অনেকে বলিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া সাহসের কার্য্যে ও বলের কার্য্যে নারী ও পুরুষের তুল্যাধিকার হইতে পারে না। পুরুষই নারী এবং তাহার সন্তানাদি রক্ষার ভার লইয়া থাকে। এ ব্যবস্থা কেবল মনুষ্য-সমাজেই লক্ষিত হয় না, সমাজবদ্ধ তির্য্যক্ প্রাণীদিগের মধ্যেও এই ব্যবস্থা লক্ষিত হইয়া থাকে। হস্তী যূথবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ জীব। উহারা দলবদ্ধ হইয়াই বিচরণ করে। উহারা যখন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়, তখন উহাদের মধ্যে দন্তী পুরুষ হস্তীরাই অগ্রগামী হইয়া থাকে, নারী হস্তীরা মধ্যস্থলে থাকে। কোন শত্রু আসিয়া তাহাদের দল আক্রমণ করিলে পুরুষ হস্তীরা—দন্তীরাই তাহার সম্মুখীন হয়; প্রকৃতি সেই জন্য তাহাদিগকে তাহাদের আত্মরক্ষার অস্ত্রস্বরূপ দুইটি বৃহৎ দন্ত দিয়াছেন। মহিষরাও বন্য অবস্থায় দলবদ্ধ হইয়া থাকে। উহারা যখন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়, তখন পুরুষ মহিষগুলিই দলের অগ্রে এবং পশ্চাতে যায়। মধ্যস্থলে স্ত্রী-মহিষ ও তাহাদের শাবক সকল থাকে। কোন শত্রু কর্ত্তৃক সেই মহিষ-দল আক্রান্ত হইলেই পুরুষ মহিষগুলিই উহাদিগকে আক্রমণ করে। বানর, সিম্পাঞ্জি প্রভৃতি যে সকল জীব মানুষের কতকটা সদৃশ, সেই সকল জীবের মধ্যে দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে পুরুষগুলিই যোদ্ধা হইয়া থাকে। সুতরাং এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রকৃতি দেবীই পুরুষ জাতিকে

নারীরক্ষার ভার দিয়াছেন। সুতরাং এই বিষয়ে নর-নারীর তুল্যাধিকার স্থাপন করিতে যাইলে চলিবে না। ডাহোমীতে নারী সেনা আছে, অতএব নারীদিগকে সৈনিক বিভাগে লইতে হইবে, এ যুক্তি চলে না। গর্ভাবস্থায় বা আসন্নপ্রসবকালে নর কর্ত্তৃক নারীরক্ষার প্রয়োজন হইয়া থাকে। সুতরাং নর-নারীর সর্ব্বতোমুখ সাম্য কখনই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। নারীকে লইয়াই মনুষ্য-সমাজের পত্তন। আমাদের দেশেও এককালে নারীরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তথায় নারী রাণী ও নারী সেনা ছিল। মহাভারতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সে পদ্ধতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই বলিয়া তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমরা দেখাইয়াছি যে, নর-নারীর শক্তিগত সুতরাং অধিকারগত বৈষম্য তির্য্যক্ প্রাণী হইতে মনুষ্যজাতি পর্য্যন্ত প্রসৃত। শক্তির সমতার উপরই অধিকারের সমতা ন্যায়তঃ প্রতিষ্ঠিত। শক্তিহীনের অধিকার কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। এ বিষয়ে এই প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থানাভাব।

মাদ্রাজের নারীরা যৌন-ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে নর-নারীর তুল্যাধিকার চাহিয়াছেন। ইহা যে তাঁহাদের অত্যন্ত অসঙ্গত আব্দার, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যৌন ব্যাপার লইয়া আলোচনা করা বিশেষ সুরুচিসঙ্গত নহে। কারণ, নর-নারীর যৌন সম্বন্ধের উপরই যৌন-ধর্ম্মনীতি প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এ বিষয়ের অবাধ আলোচনা সম্ভবে না। ইহা করিতে হইলে কতকগুলি লজ্জাজনক কথার অবতারণা অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। কিন্তু কথাটা যখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তখন ইহার আলোচনা আবশ্যক। আমরা যথাসম্ভব শ্লীলতা অক্ষুন্ন রাখিয়া এই বিষয়টি আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

মনে করুন, একটি ফলপুষ্প-সুশোভিত নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য-সমন্বিত বিশাল দ্বীপ আছে। কিন্তু তথায় মনুষ্য নাই। কোন সরকার সেই দ্বীপে ৫টি নর ও ১ শত নারীকে নির্ব্বাসিত করিলেন। নারীরা সকলে একনিষ্ঠ পতিব্রতা। কিন্তু পুরুষদের বহু বিবাহে আপত্তি নাই। এক শত বৎসরে সেই দ্বীপে কত জন প্রজা পাওয়া যাইবে?

আর একটি ঐরূপ দ্বীপে ১ শত পুরুষ ও ৫টি নারীকে নির্ব্বাসিত করা হইল। ৫টি পুরুষের প্রত্যেকেই একমাত্র নারীতে অনুরক্ত! কিন্তু নারীদিগের বহু বিবাহে আপত্তি নাই। এরূপ ক্ষেত্রে ১ শত বৎসরে তথায় কয়টি প্রজা পাওয়া যাইবে?

আমরা এইটুকু বলিয়াই পুরুষ ও নারীদিগের বহু বিবাহের পার্থক্য কোথায়, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ইহাতেই বুঝা যায় যে, সৃষ্টির প্রবাহ-রক্ষায় নর-নারীর যৌন ধর্ম্মনীতি একই প্রকার হইতে পারে না। প্রকৃতি যেখানে মূলে প্রভেদ করিয়া দিয়াছেন, ধর্ম্মনীতি সেখানে সাম্য-প্রতিষ্ঠায় কখনই সমর্থ হইতে পারে না।

প্রথমোক্ত দ্বীপে যদি একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম নারীরা গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের গর্ভসম্ভূত সন্তান যে কাহার, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন হইবে। সুতরাং সেই সন্তান সম্বন্ধে পুরুষের কোন দায়িত্ব নির্দ্দেশ করা সম্ভব হইবে না। সে সন্তান কাহার পূর্ব্ব-পুরুষের কৌলিক শক্তি বহন করিবে, তাহাও বুঝা যাইবে না। সন্তান যে ঠিক পিতার ন্যায় হইবেই, এমন কোন কথা নাই। অবশ্য আকৃতিগত সাম্য দেখিয়া পিতৃত্ব-নির্ণয় কতকটা সম্ভব হইতে পারে,—কিন্তু সর্ব্বত্র তাহা হয় না। বহু পতিতা নারীর এক স্বামীর ঔরসজাত পুত্র অনেক সময় অন্য স্বামীর কতকগুলি মানব লক্ষণ প্রকটিত করে। দেখা গিয়াছে যে, কোন নারী বিধবা হইবার পর আবার পত্যন্তর গ্রহণ করিলে সেই দ্বিতীয় পতির ঔরসে তাহার যে সন্তান জন্মিয়াছে,—তাহার তনুতে তাহার প্রথম পতির কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। একবার আমেরিকায় সংঘটিত এইরূপ একটি ব্যাপার তথায় ঘোর চাঞ্চল্যের এবং কৌতূহলের উদ্রেক করিয়াছিল। তথাকার জনৈক শ্বেতাঙ্গী মহিলা কোন এক কৃষ্ণাঙ্গ কাফ্রীকে বিবাহ করে। বিবাহের পর সেই কৃষ্ণাঙ্গের ঔরসে শ্বেতাঙ্গীর কয়েকটি সন্তান জন্মে। তাহার পর কাফ্রী মরিয়া যায়। বিধবা হইবার পর সেই শ্বেতাঙ্গী আবার জনৈক শ্বেতাঙ্গকে বিবাহ করে। বিবাহের পর তাহার দ্বিতীয় স্বামী সেই শ্বেতাঙ্গের ঔরসে তাহার যে সন্তান হইল, সে দেখিতে তাহার পূর্ব্ব-স্বামীর ন্যায় হইয়াছিল। ইহাতে তাহার দ্বিতীয় স্বামীর মনে ঘোর সন্দেহ জন্মে। তখন তাহার দ্বিতীয় স্বামী যে অঞ্চলে কাফ্রী নাই, এমন কোন অঞ্চলে যাইয়া বাস করে। কিন্তু সেখানেও সেই মহিলার যে সন্তান জন্মিল, সেও অনেকটা তাহার সেই প্রথম স্বামীর অনুরূপ। এই ব্যাপার লইয়া তথায় বিলক্ষণ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং ব্যভিচারিণী নারীর সন্তান দেখিয়া তাহার পিতৃনির্ণয় অত্যন্ত কঠিন। দ্বিতীয় সন্তান যে ঠিক পিতার মত হইবে, এমন কোন কথা নাই। অনেক সময় সন্তান পিতার, পিতামহের, প্রপিতামহের, বৃদ্ধপ্রপিতামহের, অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের বা তাহার ঊর্দ্ধতন চারি পাঁচ পুরুষের কোন ব্যক্তির অথবা মাতামহের বংশধারার কোন ব্যক্তির অনুরূপ হইতে পারে। অনেক সময় সন্তান তাহার পিতৃকুল এবং মাতৃকুলের কোন না কোন ব্যক্তির সহিত মিশ্রভাবাপন্নও হইতে পারে এবং সচরাচর তাহাই হইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে আকৃতি দেখিয়া পিতৃনির্ণয় করিতে গেলে পদে পদে ভুলই জন্মিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে, পুরুষ যদি ব্যভিচারী হয় এবং নারী যদি ব্যভিচারিণী না হয়, তাহা হইলে সন্তানের পিতামাতানির্ণয়ে কোন গোল হইতেই পারে না। সুতরাং সমাজরক্ষার্থ নারীর পক্ষে যৌন পবিত্রতা রক্ষা করা যত আবশ্যক, পুরুষের পক্ষে তত প্রয়োজনীয় নহে।

আর একটা দিক্ দিয়া এই বিষয়ের বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। সেটা নর-নারীর প্রকৃতিগত প্রবৃত্তির বলাবলের দিক্। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, নারী অপেক্ষা পুরুষের কামাদি রিপুর প্রাবল্য অনেক অধিক। আহার্য্য এবং পানীয় উপভোগের ইচ্ছা এবং ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতাসাধনে নারীদিগের স্বাভাবিক ইচ্ছা পুরুষ অপেক্ষা অনেক অল্প। * ইহার দৃষ্টান্ত আমরা

*Passions in all respects less than man's smaller desire for food and drink, and less intense sensual cravings—Aspects of Social Evolution, p. 170.

সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। তির্য্যক্ প্রাণীর মধ্যে স্ত্রীজাতির ভোজনাদিস্পৃহা অল্প হইয়া থাকে দেখা যায়। অনেক স্ত্রীজাতীয় জীব স্বয়ং না খাইয়া সন্তানদিগকে খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। হস্তী, গণ্ডার, অশ্ব প্রভৃতি কতকগুলি জীব বিষোড় অবস্থায় থাকিলে মধ্যে মধ্যে ক্ষেপিয়া উঠে, হস্তিনী প্রভৃতি তাহা উঠে না। ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রবৃত্তিচরিতার্থতা সম্বন্ধে নারীদিগকে সংযত রাখিবার জন্যই প্রকৃতি তাহাদের প্রবৃত্তিকে দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছেন।

পুরুষের প্রবৃত্তি যেরূপ স্বতঃস্ফূর্ত্ত, নারীর তাহা নহে। পুরুষ নারীর কতকগুলি প্রবৃত্তি না জাগাইয়া দিলে তাহা জাগিয়া উঠে না। এ সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিকরা বহু অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন। * নারী যদি আপনাকে পুরুষ হইতে দূরে রাখেন, প্রবৃত্তির উত্তেজক নভেল-পাঠে বিরত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মচারিণীরূপে জীবন যাপন করা যত সহজ, পুরুষের পক্ষে সেইরূপ নারীসঙ্গবর্জ্জিত হইয়া থাকিলেও ঐভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা তত সহজ নহে। নারীদিগের যে প্রবৃত্তির তাড়না নাই, এমন কথা আমি বলিতেছি না; কিন্তু নারীদিগের উত্তেজনা অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প হয়, ইহাই আমার বক্তব্য। পুরুষের সংসর্গ এবং সাহচর্য্য ব্যতীত সে উত্তেজনা প্রবল হইতে পারে না। সেই জন্য আমাদের দেশের প্রাচীন মনস্বীরা নর-নারীর অবাধ মিশ্রণে প্রবল আপত্তি করিয়া গিয়াছেন এবং তাহা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। নর-নারীর এই অবাধ মিশ্রণের ফলে নারী-জাতির প্রবৃত্তি অস্বাভাবিকভাবে উত্তেজিত হইয়াছে, কত প্রকারের স্নায়বিক পীড়ার সৃষ্টি করিতেছে, তাহা যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা Poul Byerre M D লিখিত The History and Practice of Psychoanalysis (Elezabeth Barrow কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনূদিত) নামক গ্রন্থ পড়িয়া দেখিতে পারেন। এই

* নারীদিগের মানসিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে Lionel Tayler লিখিয়াছেন :—

*In a very large number of women the sexual impulse remains latent until aroused by a lover's caress. The youth spontaneously becomes a man; but the maiden, as has been said, must be kissed into a woman. In women also specially in those who live a natural and healthy life, sexual excitement also tends to occur spontaneously, but by no means so frequently as in men. * * * * The fact, it is normally the function of the male to arouse the female and that the greater complexity of the sexual mechanism, produces a simulation of organic sexual mechanism in women leads to more frequent disturbance of organic sexual coldness which has deceived many.—Studies in the Psychology of Sex. Vol. 3, p. 241.

সকল ব্যাধিকে কেহ কেহ সভ্যতার মাশুল বলিয়া থাকেন, কিন্তু আমার মনে হয়, ইহা সাম্যবাদেরই মাশুল বলিলে ঠিক বলা হয়। যুরোপের বর্ত্তমান নর-নারীর সম্বন্ধে ব্যবস্থা অস্বাভাবিক সাম্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহার ফল অতি মন্দ হইয়াছে। তথায় বিবাহবন্ধন অতিমাত্র শিথিল হইয়া পড়িয়াছে এবং ক্রমাগতই ঐ সম্বন্ধে আইন-কানুনের পরিবর্ত্তন করিতে হইতেছে। আর আমাদের দেশের মনীষীরা স্বাভাবিক বেদিকার উপর নরনারীর সম্বন্ধ দাঁড় করাইয়াছিলেন বলিয়া আমরা অসভ্য বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছি। কিন্তু আমাদের দেশের লোকরা যে সেই সুব্যবস্থার জন্য তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে নিন্দা করিতেছেন,—ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে ?

প্রকৃতপক্ষে একই যৌননীতির দ্বারা নর এবং নারী পরিচালিত হয়, ইহা প্রকৃতির অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, যেখানে প্রকৃতি নর-নারীর গণ্ডী পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, সেখানে মানুষের পক্ষে সাম্যপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা বাতুলতা। নর এবং নারী এই দুই জাতির মধ্যে মানসিক ভাবেরও বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। অধ্যাপক রোমানিস সেই কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া বিলাতের মহিলা-সমাজ তাঁহার উপর বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। অতঃপর আমরা মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা করিব।

মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সভ্য সমাজে নর ও নারীর মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। অসভ্য অবস্থায় যে পার্থক্য আংশিকভাবে এবং অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, সভ্য অবস্থায় সেই পার্থক্য বিকশিত এবং ব্যক্ত হইয়া উঠে। স্বভাবতঃ নারীদিগের কামক্রোধাদি রিপুর প্রাবল্য অল্প হইয়া থাকে, উহারা সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকে। পুরুষ অপেক্ষা ইহারা অধিক আলস্যপ্রিয়, সহিষ্ণু এবং মন্থরগতি হইয়া থাকে। উচ্চস্তরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নারীরা সামাজিকতায় এবং পরোপচিকীর্ষায় পুরুষ অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরে অবস্থিত। স্বাভাবিক অবস্থায় নারীদিগের আত্মম্ভরিতা এবং স্বার্থপরতা অনেক অল্প হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা হৃদয়ের আবেগপ্রবণতার দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হইয়া উঠে। ফলে প্রতিবেশ শক্তির এবং প্রভাব দ্বারা তাহারা সহজেই চালিত হইয়া থাকে। ইহারা যদি কুসংসর্গে না পড়ে, তাহা হইলে কখনই দুষ্টপ্রকৃতি ও পশুধম পুরুষের ন্যায় অধোগামী হয় না। কি বাহ্য—কি আন্তর জগতে নিঃসঙ্গ পথে ইহারা কখনই একাকী ভ্রমণ করিতে পারে না, কিন্তু ইহাদের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে ইহারা দেবীরূপে বিরাজ করিতে পারে। ইহা যে কেবল আমরাই আমাদের সমাজে দেখিতে পাইতেছি, তাহা নহে। যাঁহারা নর-নারীর মনস্তত্ত্ব বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিয়াছেন। *

*Broadly, therefore, females differ from all males in being less passionate, generally weaker, more dependent and more sluggish and passive than males. But higher woman differs from higher man in being more

আসল কথা, প্রকৃতি দেবী কাহারও উপর পক্ষপাতিনী নহেন। তিনি যাহার দ্বারা যে কার্য্য সিদ্ধ করিয়া লইবেন, তাহাকে সেই গুণই দিয়াছেন। জল অতি শৈত্যে জমাট বাঁধিয়া ভাসিয়া উঠে, জলজন্তুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অন্যান্য দ্রব্য জমাট বাঁধিলে যেমন ডুবিয়া যায়, জল যদি বরফ হইয়া সেইরূপ ভাবে ডুবিয়া যাইত, তাহা হইলে মেরুপ্রদেশের বিশাল ও বিস্তীর্ণ বারিধি-বাসী অন্যান্য জলচর একবারে ধ্বংসপথে পড়িত। এইরূপ সর্ব্ববিষয়ে প্রকৃতির বা মহামায়ার অনন্ত বুদ্ধির ও অসাধারণী দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা অসমগ্রদর্শী মানব তাহা বুঝিতে পারি না বলিয়া সফরীর ন্যায় গণ্ডূষমাত্র জলে যতই ফরফর করি না কেন, তাঁহার ব্যবস্থার কোন দোষ নাই। তিনি স্ত্রীজাতিকে এবং পুরুষদিগকে কতকগুলি গুণ পরস্পরের ত্রুটিপূরক-(complementary) ভাবে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। কাহাকেও কোন গুণে বঞ্চিত না করিলেও উহার আনুপাতিক তারতম্য করিয়া যে বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন,—তাহাই পরস্পরের চিত্তাকর্ষী হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ভিন্নধর্ম্মী চুম্বক বা বিদ্যুতের ন্যায় আকৃষ্ট করে। মানুষ যদি আপনার ক্ষীণ বোধশক্তির মোহে অন্ধ হইয়া সেই বৈষম্য নষ্ট করিয়া জোর করিয়া সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে যায়, তাহা হইলে তাহাকেই ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্ট হইয়া বিধ্বস্ত হইয়া যাইতে হইবে। নারীকে সন্তান-পালন এবং সে জন্য সংসারপালন করিতে হইবে,—সেই জন্য তিনি নারী-হৃদয়ে প্রেম, প্রীতি, প্রণয় ও ভক্তির মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহা যেমন গভীর—তেমনই দৃঢ়। পুরুষের প্রণয়ের ন্যায় তাহা চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী নহে। এ কথা মনস্তত্ত্ববিশারদ পণ্ডিত-গণ প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। মাত্রা-জ্ঞের ঐ শ্রেণীর মহিলারা যদি কুশিক্ষাবিজৃম্ভিত বুদ্ধির প্রভাবে কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক প্রকৃতিপ্রদত্ত সেই সদ্‌গুণগুলিকে বিসর্জ্জন দিয়া একটা ঘোর সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টি করিতে চাহেন,—তাঁহারা সমাজের বাহিরে গিয়া তাহা করিতে পারেন,—কিন্তু সামাজিক-বুদ্ধিমতী নারীরা তাহা করিতে সম্মত হইবেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাদের দাবী নিতান্ত অস্বাভাবিক। উহা সমাজের মূলভিত্তিনাশক। কুশিক্ষার প্রভাবে নারীরা সকলেই যখন তাহা চাহিবেন,—তখন সমাজের যে অবস্থা ঘটিবে, তাহা যে আমাদের দেখিতে হইবে না,—ইহাই অত্রানন্দপরং। যখন নারী জগজ্জননী গণেশজননীরূপ পরিত্যাগ করিয়া লোলবসনা, বিকটদশনা ও খড়্গধারিণীরূপে শবরূপ পুরুষের বক্ষোপরি নৃত্য করিতে আরম্ভ করিবেন, তখন বুঝিতে হইবে, মানব-সমাজের প্রলয়ে বিলীন হইবার আর বিলম্ব নাই।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

---

social depending more on other and therefore willing to sacrifice herself to a greater extent for social ends. Woman is becoming progressively altruistic, and in this she has been, is and probably always will be, superior to her companion. She is however less individualistic, and, on account of greater emotional susceptibility and what Laycock has termed greater 'affectability' is more influenced by surroundings. She is, therefore, less capable of taking those isolated paths that lead, on the one hand, to the heights reached by genius, and on the other to those savage descents to brutedom of the criminal. etc.—Aspects of Socia' Evolution (First Series, p. 166.)

কৈশোর-যৌবন

ঢেউ উঠেছে মৃদুল স্রোতে মিশ্‌বে ব'লে নদীর সাথে,
বীণায় বুঝি জাগ্‌ল গীতি বাদল-ভেজা নীরব রাতে।
ইতিহাসের ধীর বারতা দ্বন্দ্ব-মাঝে মূর্ত্তি মাগে,
শিউলি-ঝরা ভোরের গায়ে জাগরণের রশ্মি লাগে।
শিউরে উঠি' সরম আজি ঘোম্‌টা টানি রয় যে থামি',
চরণ'পরে সলাজ আঁখি ভাব্‌ছে কি না থাক্‌বে নামি'!

কুঞ্জে কোকিল ভাব্‌ছে কেন পায় না খুঁজে কণ্ঠে গান,
চন্দ্রালোকে দূর বনানী আলো-ছায়ায় করছে স্নান।
মলয় গাহে বাউল হয়ে নূপুর করি' ভ্রমর-দলে—
"স্বপ্ন-পুরে কাহার লাগি' রয় গো ব'সে রাজার ছেলে।"
অশোক আজি স্তবক-মাঝে আপন রূপে হয় বিভোল,
কল্পলোকে হিন্দোলাতে ভাব-তুফানে দিচ্ছে দোল।

সিন্ধু সেথা উথ্‌লে ওঠে বাঁধন-হারা ভাব্‌ছে যেন,
ডাক্ শুনেছে কিশোরী কার শবরী আর রইবে কেন!
গন্ধ ভাবে কুঁড়ির বুকে—আজিও কেন বন্ধ রয়,
চরণ চাহে পুলক্-লাজে চপলতায় রাঙিয়ে লয়।
বসন যদি শাসন মানে আঁচল তবু ধরায় লুটে,
বিধির হাসি কায়-প্রয়াগে মধুর হয়ে উঠ্‌ল ফুটে!

শ্রীসর্ব্বরঞ্জন বরাট বি.

চিকিৎসক ও জনসাধারণ
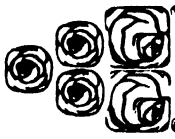
(১) ডাক্তারদের সঙ্গে সাধারণের সহানুভূতির অভাব

বাঙ্গালা দেশের স্বাস্থ্যের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে "ডাক্তার" বা "ডাক্তারির" কথা বিশদ-ভাবে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। দুই চারিটি কথায় এ সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা করা অসম্ভব। সুতরাং ধারাবাহিকভাবে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে। আমার বিশ্বাস, পাঠক-সমাজ ধৈর্য্য সহকারে বক্তব্যগুলি পাঠ করিলে, সমস্যা-সমাধানের উপায় নির্ণয় করিতে পারিবেন।

মানুষ সাধারণতঃ ডাক্তারদের কথা কাণে তুলিতে চাহে না, কেন? তাহার অনেকগুলি কারণ। (১) প্রথমতঃ, আবহমানকাল হইতে সকল দেশেই, "চিকিৎসা ব্যবসায়"টা জনসাধারণের-মত করিয়া, কখনও "প্রচার" করা হয় নাই—বরঞ্চ একটা খুব গুহ্য বিষয়রূপে রক্ষিত হইয়াছে। তাহার উপরে, এ দেশে, চিকিৎসাকে এক প্রকার বেদের ও তন্ত্রের অংশরূপে পরিগণিত করিয়া, দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত (নিরুক্তান্তর্গত) ভাষায়, সাঙ্কেতিক আকারে লিখিয়া, ও অনেকশঃ "গুরুমুখী" করিয়া রাখা হইয়াছে; এবং এমন কি, টোটকা, "জড়ি বুটি" প্রভৃতি ব্যক্তি বা বংশবিশেষে গুপ্ত রাখিয়া জনসাধারণ হইতে বহু দূরে, যেন সপ্তম স্বর্গের নিভৃত রত্নমন্দিরের সিংহাসনে স্থাপিত করা হইয়াছে! যাহাকে এত সংগোপনে গুহ্যাতিগুহ্য করিয়া রাখা হয়, সে দিকে জনসাধারণ কেন মন দিবে? (২) দ্বিতীয়তঃ, যদিও এ দেশের টিকটিকিটি পর্য্যন্ত যে-কোনও ব্যারামের অসংখ্য টোটকার ব্যবস্থা করিতে চাহে, তাহা হইলেও, শক্ত বলিয়া, দুর্ব্বোধ্য বলিয়া, গুহ্য বলিয়া, এ দেশের লোকরা শরীর-সম্বন্ধীয় সর্ব্ব-বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিতে পছন্দ করে। "ও-সব ডাক্তারি ব্যাপার, এ সকল কথা লইয়া আমাদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? ও-সব ব্যাপার ডাক্তাররা বুঝুন," ইত্যাকার আলস্যসুলভ কথা শ্রমবিমুখ লোকের মুখেই শুনা যায়। বর্ত্তমান সময়ে, ইংরাজদের কলকারখানার যুগে, সহরে, কর্ম্মস্থলে একত্র বহু লোকের সমাবেশ হয় বলিয়া, mass hygiene বা public hygiene (অর্থাৎ, "সাধারণের" নিমিত্ত স্বাস্থ্যবিধি) প্রবর্ত্তিত আছে; কিন্তু, স্বাস্থ্যসম্পন্ন, কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে, হিন্দুদের চিকিৎসাশাস্ত্র যে-কালে রচিত হইয়াছিল, তখন লোকরা খুব ফাঁক-ফাঁক হইয়া বাস করিতেন বলিয়া, এবং নগর-গুলিও অপেক্ষাকৃত জনবিরল ছিল বলিয়া, হিন্দুর চিকিৎসাশাস্ত্রে personal hygiene (বা "ব্যক্তিগত" স্বাস্থ্যানুশাসন) এর বেশী আদর দেখা যায়। হিন্দুর দৈনিক জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে কি ভাবে থাকিতে হইবে, সেই ধর্ম্মানুশাসন সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যতত্ত্বানুমোদিত; হিন্দুর অশৌচ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমানের germ-infection theory (অর্থাৎ, জীবাণুঘটিত "ছোঁয়াচে ব্যারাম"-তত্ত্বের) উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত। হিন্দুশাস্ত্রে অনুশাসনের প্রত্যেক পদে ব্যাখ্যা না থাকিলেও, হিন্দুর জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, সকল দিনের, সকল কর্ম্মের তথাকথিত ধর্ম্মানুশাসন প্রচ্ছন্ন স্বাস্থ্য-তত্ত্বের অনুশাসন ব্যতীত আর কিছুই নহে। কলের মত দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যতত্ত্বগুলি প্রতিপালিত হওয়ায় ও অন্যান্য অনেকগুলি কারণে—দেহ ও দেহের ব্যাধির কথা এক দিনের জন্যও হিন্দুজনসাধারণকে চিন্তা করিতে হয় নাই বলিয়াই, বোধ হয়, আজ স্বাস্থ্যতত্ত্ব জানিবার জন্য হিন্দুজনসাধারণ আদৌ উৎসুক নহেন। (৩) তৃতীয়তঃ, কেবল এ দেশে বলিয়া নহে, জগতে সর্ব্বত্রই জনসাধারণের মধ্যে দুইটি ভ্রমাত্মক ও মারাত্মক ধারণা প্রবলভাবে বর্ত্তমান আছে, দেখা যায়। প্রথমটি এই যে, ব্যারাম না হইলে, চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে নাই; এবং দ্বিতীয়টি এই যে, চিকিৎসকমাত্রেই ব্যারাম "সারাইতে" পারেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এ দেশের লোকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যানুমোদিতভাবে নির্ব্বাহ হইত বলিয়া, জনসাধারণের স্বাস্থ্য ভাল ছিল; কাযেই ব্যারাম না হইলে, কেহ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতেন না। তদুপরি দর্শনীর বালাই ছিল না বলিয়া, কবিরাজ মহাশয় নিত্যই গ্রামের সকলের তত্ত্ব লইতেন। এ দেশে যতই কেন "রাষ্ট্র"বিপ্লব ঘটুক না, "সমাজ"তন্ত্র অটুট থাকিত। প্রত্যেক গ্রাম যেমন নিজ সমাজের শাসনে থাকিত, তেমনই সমাজের

কল্যাণস্পর্শে সঞ্জীবিত ও সংঘবদ্ধ থাকিত। প্রত্যেক গ্রামের পুরোহিত, কবিরাজ ও অধ্যাপক নিত্যই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে অত্যন্ত আত্মীয়ভাবেই মেলা-মেশা করিতেন। আর ভূস্বামীরা অর্থ ও ভূমিদান দ্বারা এই তিন শ্রেণীকে নিশ্চিন্ত রাখিতেন। কিন্তু, পূর্ব্বকার সুখ-স্বচ্ছন্দ জীবন, পূর্ব্বকার স্বচ্ছলতা ও সরলতা, পূর্ব্বকার স্বাস্থ্যকর, * জনবিরল স্থানসমূহ এবং তৎসঙ্গে একান্ন-বর্ত্তিতা ও হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত জীবনযাত্রার প্রথা—সকলই গিয়াছে। কাযেই এখনকার হিন্দুকে আর নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। দ্বিতীয় কথাটি, ব্যারাম "সারানর" কথা। আমি কবিরাজী বা হাকিমীশাস্ত্র জানি না, বলিতে লজ্জিত হইতেছি—কিন্তু কথাটি সত্য। জানি না, বায়ু-পিত্ত-কফ-শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচারে ব্যারাম যথার্থ "আরাম" হয় কি না। কিন্তু এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রাচীন হইয়া, মুক্তকণ্ঠে এ কথা স্বীকার করিতেছি যে, এলোপ্যাথিক চিকিৎসক কোনও দুরারোগ্য ব্যারাম সারাইবার স্পর্দ্ধা করেন না। আমরা ব্যারামের নিদান ধরিয়া, প্রকৃতি-চালিত পথে চলিয়া, ব্যারামের মোড় ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করি মাত্র। আজও ক্ষয়কাস, কর্কটরোগ, মধুমেহ, হৃদ্‌রোগ, উন্মাদ, বায়ুরোগ—এমন কি, তুচ্ছ সর্দ্দি-কাসি—আমাদিগকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছে! এই যে জনসাধারণ এবং এমন কি, শিক্ষিত-দের মধ্যেও একটা ধারণা আছে যে, ব্যারাম হইলেই ডাক্তাররা "আরাম" (নিরাময়) করিয়া দিবেন, এ ধারণা ভ্রান্ত; কারণ, নিত্যই অকালমৃত্যু, অকাল জরা দেখিতেছি, অথচ গড্ডলিকা মনোবৃত্তি লইয়া, ব্যারাম হইলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হই; যত দিন শয্যাশায়ী না হই, তত দিন চিকিৎ-সক ও চিকিৎসা-তত্ত্ব বহু দূরে রাখি! (৪) চতুর্থতঃ, বর্ত্তমান যুগে বহু রকমের চিকিৎসক পল্লীগ্রামেও পাওয়া যায়। কবিরাজ, হাকিম, টোটকা-ওয়ালা, অ্যালোপ্যাথ, হোমিও-প্যাথ—বহু রকমের চিকিৎসা বর্ত্তমান সময়ে পরিদৃষ্ট হয়। জনসাধারণ ত বটেই, এমন কি, তথাকথিত উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিরাও চিকিৎসক ও চিকিৎসাপ্রণালী নির্ব্বাচন বিষয়ে একবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন। "এটায় সুবিধা হইল না, ওটা দেখ," "হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাইতে বেশ;" "কচি ছেলেদিগকে ও গর্ভিণীকে অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ দিতে নাই;" "অমুক মতে চিকিৎসা করান খুব সস্তায় হয়;" ইত্যাদি নানা রকমের চিন্তার বশে এ দেশের লোকরা চিকিৎসা করিয়া থাকেন এবং যে চিকিৎসক যত বাক্যবাগীশ—অর্থাৎ ধাপ্পাবাজ—যে আপনাকে যত "জাহির" করিতে পারে, যাহার চটক বেশী তাহারই সাধারণের নিকটে আদর বেশী।

এরূপ খোলাখুলিভাবে কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, আমার দেশবাসিগণ যাহাতে আপনার স্বার্থবিষয়ে অবহিত হন, সেই চেষ্টা করা। আত্মরক্ষার চেষ্টা সকল প্রাণীরই স্বধর্ম্ম; কিন্তু এই দুর্ভাগ্য, রোগক্লিষ্ট, অকাল-জরা ও মরণগ্রস্ত বাঙ্গালাদেশের অধিবাসীরা অদৃষ্টের উপরে অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করিয়া, সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট বসিয়া আছেন! আজ বাঙ্গালায় স্বাস্থ্য নাই, কাযেই সম্পদ নাই,—গোলাভরা ধান ও গোয়ালভরা গোরু নাই—আছে ম্যালে-রিয়া, কলেরা; আছে দৈন্য ও দুশ্চিন্তা; আছে ভীষণ অজ্ঞতা ও অতিবড় ভীষণ জড়তা। আমি মনে করি, এ দেশের বড় শত্রু ম্যালেরিয়া-কলেরা নহে, দৈন্যও নহে—অজ্ঞতাই এ দেশের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু। আমরা আমাদের দেহের সম্বন্ধে অজ্ঞ স্বাস্থ্য-বিষয়ে অজ্ঞ, কোন রোগ হইলে তদ্বিষয়ে অজ্ঞ, কি করিয়া যথার্থপক্ষে শিশু পালন করিতে হয় তদ্বিষয়ে অজ্ঞ, গর্ভিণীচর্য্যা-বিষয়ে অজ্ঞ, খাদ্যাখাদ্য-বিষয়ে অজ্ঞ, নিজের ন্যায্য প্রাপ্য বিষয়ে অজ্ঞ, নিজ ন্যায্য অধিকার-বিষয়ে অজ্ঞ। আমরা দর্শন, মীমাংসা, বেদ, উপ-নিষদ, জ্যোতিষ প্রভৃতির চর্চ্চা করি। কিন্তু আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকট ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এই যে দেহ, ইহার বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ থাকি—ইহার অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

বাঙ্গালায় একটা কথা আছে—"কাণ টানিলে মাথা আসে।" সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ভারতবর্ষের একাংশে ঢেঁকি পড়িলে অপরাংশে মাথাব্যথা করিবার কথা ছিল না। কারণ, তখন এ দেশে যাতায়াতের তাদৃশ সুযোগ ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে ও বর্ত্তমান যুগে, পৃথিবীর দূরাতিদূর ও ক্ষুদ্রতম অংশে কোনও ঘটনা ঘটিলে, তাহার ফল জগৎ-প্রসারী হইয়া থাকে। অথচ, এই যুগের মানুষ হইয়া, আমরা (বাঙ্গালীরা) আমাদেরই দেশের লোক

* De Parrow (Portuguese Traveller) speaks fo "Bengal s wonderful health."

এবং আমাদের স্বকীয় চিকিৎসা বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন! তাহার ফলে, গুণগ্রাহিতার অভাবে, টোলে সুশিক্ষিত, যথার্থ নাড়ীজ্ঞানী কবিরাজের পরিবর্ত্তে, স্বয়ংসিদ্ধ, কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত, সাইনবোর্ডধারী, তথাকথিত কবিরাজের ছড়াছড়ি; তাই আজ একটি সুদক্ষ, বিচক্ষণ, পাস-করা অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের চতুর্দ্দিকে, সহস্র ক্যাম্বেল ও বেসরকারী স্কুলের পাস-করা ও অযুতটা আনাড়ী, হাতুড়ে আমাদিগকে ঘিরিয়াছে! ইহা দেখিয়া, এই সব ভাবিয়াও কি আমরা আজ সচেতন হইব না? একটা তুচ্ছ গাছকে কত যত্ন করিলে, তবে সেটা বাড়ে ও সুফল প্রদান করে। একটা ব্যবসায়কে অযত্ন করিলে, তাহার সুফল কোথায়? পুরাকালে রাজার নিকট হইতে নিষ্কর ভূমি ও অর্থ পাইয়া পুরোহিত, বৈদ্য ও অধ্যাপক এক রকম অবৈতনিকভাবেই গ্রামের কল্যাণ করিয়া বেড়াইতেন; আজ বোধ হয়, সেই অভ্যাস বশতঃই হিন্দুরা ঐ তিন ব্যবসায়কে যত্ন করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। সে ভুল ভাঙ্গিতে হইবে। আপনার স্বার্থ বুঝিতে হইবে। আপনার জনকে বুকে তুলিয়া লইতে হইবে। অঙ্গাঙ্গিভাবে সকলেরই সঙ্গে একত্র চলিতে, উঠিতে ও বসিতে হইবে। আপনার স্বার্থ আপনি না বুঝিলে, আপনার কার্য্য আপনি না করিলে, জগতে অপর কাহার সে জন্য মাথাব্যথা হইবে? চিকিৎসকদিগকে দূরে ফেলিয়া রাখিলে, জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন—কাযেই আপামর সাধারণকে যাহাতে চিকিৎসকদিগের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ হয়, তদ্বিষয়ে এখন হইতে মনোযোগী হইতেই হইবে। চিকিৎসা ও চিকিৎসক বিষয়ে অবহেলার জন্য জনসাধারণ অনেক মাশুলই দিয়াছেন—আর যেন তাঁহারা তাহা না দেন, এই উদ্দেশ্যেই কলম ধরিয়াছি।

২

বাঙ্গালার "সমাজের" মৃত্যুই বাঙ্গালীর মৃত্যুর হেতু

অনেক রকম আজগবী শিক্ষার মধ্যে আমাদের একটা শিক্ষা এই:—"মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।" এই যে না বুঝিয়া মানুষ-পূজা, ইহাই আমাদের কালস্বরূপ হইয়াছে। গুণী ও মানী ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে—কিন্তু তাই বলিয়া, তাঁহাকে একবারে দেবতা (Superman) বানাইয়া নিজের মনুষ্যত্ব, ব্যক্তিত্ব তাঁহার পায় বলি দিয়া, নিজের আত্মোৎকর্ষ না করিয়া, তাঁহারই পূজা করাটাকে বড় করা সঙ্গত নহে। জ্ঞানী ও গুণীর পূজা, তাঁহাদের জ্ঞান ও গুণের অনুসরণে,—মূঢ়ভাবে চরণ-পূজায় নহে। এই মূঢ়তাই আমাদিগকে জড় ও অমানুষ করিয়াছে—এই মূঢ়তাই দলাদলি, ভেদাভেদ, আচারনিষ্ঠা প্রভৃতির হেতু। সকলকেই মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহার ভিতরে স্বয়ং ভগবানের অংশ বিরাজিত;—অর্থাৎ, দেহটাকে বাদ দিলে, "আমিটা" স্বয়ং ভগবান্। "আমি" কোনও অংশে ছোট নহি। চেষ্টা করিলে, অনন্যজ্ঞানে সাধনা করিলে, আমিও গুণী ও জ্ঞানী হইতে পারি। মনুষ্যত্বলাভই মানবের উদ্দেশ্য, ক্লৈব্য বর্জ্জনীয়, নিন্দনীয়। তবে আজকালকার দিনে "মানুষ হওয়ার" ধারণা অন্যরূপ হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া, "মানুষ হওয়া" মানে প্রাইজ মেডেল স্কলারশিপ পাওয়া নহে; "মানুষ হওয়া" মানে, 'হাকিম হুকুম' হওয়া নহে; "মানুষ হওয়া" মানে ধন-সম্পদ্ বৃদ্ধি করা নহে; "মানুষ হওয়া" মানে, আপনাকে অমৃতের পুত্রজ্ঞানে সর্ব্বদা অবহিত রাখিয়া, সর্ব্বদাই ভগবৎসান্নিধ্য অনুভূতি রাখিয়া, দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে বিশ্বহিতে আত্মনিয়োগ করা।

আদর্শটাকে প্রথম প্রথম খাটো করিয়া ধরাই যাউক। আমাদের জন্মগত অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—"যাহা পাইতেছ, তাহাই হাসিমুখে গ্রহণ করিয়া, খুসী হও।" কাযেই, কি শিক্ষাবিষয়ে, কি চিকিৎসাবিষয়ে, আমরা চোখ বুজিয়া যাহা পাই—তাহাকেই গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হই। অথচ, আমাদের শিক্ষা ও চিকিৎসা যে কতদূর পিছাইয়া আছে, কতদূর অবনত হইয়া আছে, কতটা অনর্থকারী হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আমরা ভাবিয়াও দেখি না। আমার শুধু চিকিৎসা সম্বন্ধেই কথা বলা প্রয়োজন বলিয়া, বর্ত্তমান প্রবন্ধে শুধু সেই বিষয়ক ব্যাপারেরই উল্লেখ করিব।

বর্ত্তমান সময়ে, এই বাঙ্গালাদেশে, শতকরা ৯০ জন (তাহাদের মধ্যে অশিক্ষতই বেশী) পল্লীবাসী বৈদ্য বা হাকিম, টোটকা চিকিৎসা, ঝাড়-ফুঁক প্রভৃতির আশ্রয়গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর "চিকিৎসক" প্রায় কেহই কোনওরূপ "বিদ্যার" ধার ধারেন না। "বিদ্যা" বলিতে কেতাবতী শিক্ষাকে বুঝিব না; "বিদ্যা" বলিলে, আলোচ

বিষয়ের মূলতত্ত্বজ্ঞান, এবং সেই সঙ্গে, সম-জাতীয়-বিষয়-সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাকেও একত্র বুঝিব। বৈদ্যক বিদ্যা বলিলে,—হাতে-হাতিয়ারে ভৈষজ্যজ্ঞান, রসায়নজ্ঞান, জারণ-মারণ প্রভৃতি জ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্রে ও কবিরাজী পরিভাষায় ব্যুৎপত্তি, নিদানজ্ঞান, দেহতত্ত্ব ও শারীর-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞান, বায়ুপিত্ত-কফজ্ঞান, জ্যোতিষ-জ্ঞান, স্বরোদয়-জ্ঞান, অন্নপরি-চালনাজ্ঞান.—ইত্যাকার অনেকগুলি জ্ঞানকেই বুঝায়; বলা বাহুল্য, পল্লীগ্রামের ভুঁইফোড় কবিরাজরা এ সব কোনও জ্ঞানের দিক্ মাড়ান নাই। তাঁহাদের না আছে নাড়ীজ্ঞান, না আছে শাস্ত্রজ্ঞান। তাঁহাদের মূলধন—অধ্যবসায় ও অসমসাহসিকতা এবং বাক্‌পটুতা।

পল্লীগ্রামে দুই চারি জন পাশকরা বা না-পাশ-করা এলোপ্যাথিক চিকিৎসকও থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই কম্পাউণ্ডার ছিলেন, অথবা আগেকার "আর, জি, করের স্কুলের" (বেলগাছিয়ার ক্যালক্যাটা মেডিক্যাল স্কুলের) তথাকথিত পাশ করা ছাত্র। বলা বাহুল্য যে, কলিকাতার মত সহরে, যথারীতি পাশ করিয়া প্র্যাকটিশ করিয়া প্রাচীন হইয়াও, আমি নিজেকে "গো-চিকিৎসক" মনে করিলেও, উপর্য্যুক্ত কম্পাউণ্ডার হইতে স্বয়ংসিদ্ধ "ডাক্তার" মহোদয়রা আপনাদিগকে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদরূপে জাহির করেন। পল্লীগ্রামের লোকরা অধিকাংশই দুঃস্থ; এ কারণে, সেখানে ২৲ টাকাও দর্শনী পাওয়া যায় না। কাযেই মূর্খ, হাতুড়ে ও অকর্ম্মণ্য ধূর্ত্ত লোকরা পল্লীগ্রামে চিকিৎসক সাজে। সৌভাগ্যবশতঃ যাহারা পল্লীগ্রামে ভুঁইফোড় ডাক্তার সাজে, তাহারা পূর্ব্বাহ্ণেই ভাল চিকিৎসকের নিকট হইতে চিকিৎসা-"পদ্ধতিটা"—মাত্র পদ্ধতিটা—শিখিয়া লয়। পাশকরা ডাক্তারদের মনে পাশের একটা অহঙ্কার থাকে—নিজের সাজ-পাট, গাড়ী-ঘোড়া ও ক্রমশঃ-বর্দ্ধমান-দর্শনীর সুখস্বপ্ন তাঁহাদিগকে পল্লীগ্রামে যাইতে দেয় না। কিন্তু যদি পাশ-করা ডাক্তাররা সাদাসিধা পোষাকে ও স্বল্প-দর্শনীতে (এমন কি, অবস্থাবিশেষে বিনা দর্শনীতে) পল্লীগ্রামে ব্যবসায় সুরু করেন, তবে তাঁহাদিগের কোনও অসুবিধা হয় না—বরং পল্লীগ্রামের লোকগুলি বাঁচিয়া যায়। সহরে দেখা যায় যে, যাহার অবস্থা ফিরিয়াছে, সে ক্রমশঃই আরও অবস্থা ফিরাইতে থাকে, এবং যাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, সে চরম অবস্থায় যাইয়া পৌঁছায় (those who have grown rich, daily grow richer; those who have grown poor, grow poorer). কিন্তু কয় জনের সহরে তেমন করিয়া বরাত ফেরে? সহরে কাড়া-কাড়ি, "চুকলি-খাওয়া," পরনিন্দা, নীচ-প্রবৃত্তি প্রবল; অথচ, এত করিয়াও, গাড়ী-ঘোড়ার মোটর-টেলিফোনের খরচ উঠে না। সহরে মাসিক এক শত টাকা রোজগার করিলে, বাড়ী ও গাড়ী, পোষাক ও ভড়ং ইত্যাদিতে ৮০৲ ব্যয়িত হয়—খাইবার জন্য থাকে মাত্র ২০৲। পল্লীগ্রামে, আট আনা এক টাকা দর্শনী লইয়া, তেজারতির ব্যবসায়ে, চাষ-আবাদে, জমী-জমাতে কত হাতুড়ে ধনীর মত সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে, "কোম্পানীর কাগজ"ও করে। সহরের বিলাসী, পাশকরা, ছোকরা ডাক্তাররা এ কথা একবার ভাবেন না এবং সহরের মোহ কাটাইতে পারেন না। তাঁহাদের দুঃখও ঘোচে না। এই কারণেই পল্লীগ্রামে যত হাতুড়ের বাড়াবাড়ি।

পল্লীগ্রামের হাতুড়েদের চিকিৎসায় উপকার না হইলে, রোগীরা মহকুমার (sub-division) সরকারী ডাক্তারের কাছে আসে। অধিকাংশ মহকুমায় দাতব্য চিকিৎসালয়ে ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে পাশ-করা সাব্-অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনরা থাকেন। অধিকাংশ মহকুমার সদরে ১।৪ জন বেসরকারী অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন (অর্থাৎ, মেডিকেল কলেজের পাশকরা) ও সাব-অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন (অর্থাৎ ক্যাম্বেলের পাশ-করা) এলোপ্যাথি ও ঘরে-পড়া বা তথাকথিত হোমিওপ্যাথিক স্কুলের তেমনই পাশ-করা হোমিওপ্যাথও থাকেন। তাহা হইলেও, এ দেশে, রোগীর চিকিৎসা শতকরা ৯০ ভাগ হাতুড়ের হাতেই রহিয়া যায়।

মহকুমায় উপকার না পাইলে, পল্লীগ্রাম হইতেও রোগীরা জেলার সদরে, সহরের বড় হাঁসপাতালে, সিভিল সার্জ্জন বা বহুদর্শী প্রবীণ অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনের দ্বারা চিকিৎসিত হইতে আসেন। সহরে অবসরপ্রাপ্ত সিবিল সার্জ্জন ও অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নানা রকমের "ডাক্তার," বৈদ্য, হাকিম, হোমিওপ্যাথ থাকেন। এই গেল এ দেশের বর্ত্তমান যুগে চিকিৎসার ইতিহাস। মোটামুটি কি কি জাতীয় "চিকিৎসক" এ দেশে এখন দেখা যায়, তাহার তালিকা কোষ্ঠকাকারে দিলাম।

(১) পাশ্চাত্য মতে শিক্ষিত—

জেলার সদরে—
(ক) বিলাতী ডিগ্রিধারী, আই এম্, এস্, সিভিল সার্জ্জন।
(খ) বিলাতী পাশ-করা বে-সরকারী চিকিৎসক।
(গ) মেডিকেল "কলেজের" পাশ-করা অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন।

মহকুমার সদরে—
(ঘ) ডাক্তারি "স্কুলের" পাশ করা "সাব" অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন।
(ঙ) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক—আমেরিকা-প্রত্যাগত বা আমেরিকা হইতে অর্থবিনিময়ে "ডিগ্রি"প্রাপ্ত, ঘরে পড়া, অথবা হোমিওপ্যাথি "স্কুলে"র পাশ-করা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।

পল্লীগ্রামে—
(চ) কম্পাউণ্ডার হইতে ভুঁইফোঁড় ডাক্তার।

(২) দেশীয় মতে—

পল্লীগ্রামে—
(ক) রীতিমত টোলে-পড়া কবিরাজ।
(খ) স্বয়ংসিদ্ধ কবিরাজ।
(গ) কবিরাজী "কলেজের" পাশ-করা বৈদ্য।
(ঘ) টিব্বি কলেজের পাশ-করা হাকিম।
(ঙ) ভুঁইফোঁড় হাকিম।
(চ) টোটকা চিকিৎসক। "বেদে।"

বলা বাহুল্য, "ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড়" হইবার মত অবস্থা বাঙ্গালার হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে কে ভাল কে মন্দ, সে বিচার করিব না। তবে, এখানে বলিয়া রাখি যে, "পাশ"করা ডাক্তার হইলেই সকলে ভাল "চিকিৎসক" হন না—"চক্‌চকে হ'লেই হয় না সোনা।" নিজ প্রতিভা (genius), সহজ-জ্ঞান (instinct) ও বহুদর্শিতাই সুচিকিৎসক সৃষ্টি করে। "পড়া-বিদ্যা," বনিয়াদটি দিয়া দেয় মাত্র; সে বনিয়াদকে কায়েমী করা ব্যক্তিগত ধীশক্তি, মেধা ও সহজজ্ঞানের একত্র সমন্বয়ের কায। কারণ, আসল কথা বলিতে গেলে, নিজ গুণে ভিন্ন সুচিকিৎসক হওয়া যায় না। কিন্তু স্থূলভাবে দেখিতে গেলে বেশ বুঝা যায় যে, বাঙ্গালার শতকরা ৯০ জন লোক প্রকৃত চিকিৎসা পায় না;—সহরে বা সদরে যেথানে প্রকৃত শিক্ষিত সুচিকিৎসকরা থাকেন,—সেখানে শতকরা ১০ জন মাত্র অনেক অর্থব্যয় করিয়াও আয়াস স্বীকার করিয়া তবে যথার্থরূপে চিকিৎসিত হইতে পায়। এই বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর কোনও সভ্যদেশে এরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে কি? সুচিকিৎসা লোকরা "চায়" না—কাযেই পায় না। তাহাদের না চাওয়ার মূলে—(১) অজ্ঞতা, (২) দৈন্য, (৩) উপযুক্ত পথ-ঘাটের অভাব এবং সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভাব—(৪) পল্লী-জীবন, পল্লীসমাজ, একান্নবর্ত্তিতা আজ নাই! আজ তাই সবাই গবর্ণমেণ্টের মুখ চাহিয়া রহিয়াছে—নিজেরা জড়বৎ রহিয়াই গিয়াছে!

[ক্রমশঃ।

শ্রীরমেশচন্দ্র রায় (এল, এম্, এস্)।

দেখা

তোমার সাথে নাই বা হ'ল দেখা
আলোয় ঘেরা, বন্ধু হে! মোর দ্বারে!
একটি কথা, হে মোর প্রিয়তম—
ঠেলো না মোর প্রাণের বন্দনারে!
আলোয় ঘেরা, বন্ধু হে! মোর দ্বারে!
পথের ধূলির পরাণ টুটে
হৃদয় যখন পড়বে লুঠে
তখন তুমি আস্‌বে ছুটে গভীর অন্ধকারে!
তোমার সাথে নাই বা দেখা হ'ল
আলোয় পাগল বন্ধু হে! মোর দ্বারে!

তখন আমার হারিয়ে যাবে
যা কিছু সব পাওয়া—
বন্ধু আমার! ফুরাবে গো!
ফুরাবে গান গাওয়া!
তখন আমি তোমার তরে
আমার হৃদয়পদ্ম'পরে
পাতবো প্রেমের সজল আসন
উছল অশ্রু-ধারে!
তোমার সাথে নাই বা হ'ল দেখা
আলোয় ঘেরা বন্ধু হে! মোর দ্বারে!

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।

রহস্যের খাসমহল

অষ্টম প্রবাহ

শরতের সন্ধ্যায়

আমারই একখানি চিঠির কাগজে সুপরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে যাহা লিখিত ছিল, আমি তাহা রুদ্ধ নিশ্বাসে পাঠ করিতে লাগিলাম; তাহা যে রমণীর হস্তাক্ষর, এ বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ হইল না।

পত্রখানি এই—

"প্রিয় মিঃ কোলফাক্স, আপনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়াই চাই। হাঁ, 'ইহা অপরিহার্য্য। আমি আপনার প্রতীক্ষায় এখানে বসিয়া ছিলাম, কিন্তু আপনি আসিলেন না। আমাকে লণ্ডন ত্যাগ করিয়া ডিভনসায়ারে যাইতে হইতেছে; বাধ্য হইয়াই যাইতে হইবে। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল না—এ জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত; কিন্তু কি করিব বলুন, আজ রাত্রিতেই আমাকে লণ্ডন ত্যাগ করিতে হইবে। কা'ল সন্ধ্যা পাঁচটার সময় আপনি আমার সঙ্গে হেক্সওয়ার্দ্দিতে দেখা করিতে পারিবেন কি? পুরাতন সাঁকোর ধারে আমি আপনার অপেক্ষা করিব। আপনি কোন কারণে স্থানীয় হোটেলে যাইবেন না; না, কেহই যেন সেখানে আপনাকে দেখিতে না পায়। হেক্সওয়ার্দ্দি ডার্টমুরের তীরস্থ একখানি ক্ষুদ্র পল্লী। টট্‌নেস্ ষ্টেশন হইতে মোটরকার লইয়া আপনি অনায়াসেই সেখানে যাইতে পারিবেন; কিন্তু গ্রামের ভিতর হাঁটিয়া যাইবেন। ডিভনের হেক্সওয়ার্দ্দি পল্লীর 'ফরেষ্ট ইন্'এ পূর্ব্বেই আমাকে টেলিগ্রাম করিবেন। আপনাকে আমার দুই একটি জরুরী কথা বলিবার আছে; সুতরাং আশা করি, আপনি আমাকে নিরাশ করিবেন না। ওখানে আপনার সঙ্গে আমার দেখা না হইলে জীবনে আর কখন দেখা না হইতেও পারে!—

আপনার বিশ্বস্ত—যোয়ান কুপার।"

আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী না আসিয়া ক্লাবে বসিয়া কেন গল্প করিতেছিলাম ভাবিয়া নিজের উপর অত্যন্ত রাগ হইল। কিন্তু সে কেন আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল, তাহার এমন কি জরুরি কথা থাকিতে পারে? কা'ল সন্ধ্যাকালে তাহার সঙ্গে দেখা না হইলে জীবনে দেখা না হইতে পারে—এ কথারও মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না।

আমি ডেক্সের উপর হইতে 'টাইম টেবল' তুলিয়া লইয়া তাহা খুলিয়া দেখিলাম—যদি আমি পরদিন বেলা সাড়ে এগারটার সময় প্যাডিংটন হইতে যাত্রা করি, তাহা হইলে বেলা চারিটার পূর্ব্বেই টট্‌নেসে পৌছিতে পারিব। তাহার পর একখানি 'ডাইরেক্টরী' সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে জানিতে পারিলাম, ডার্টমুর নদীতীরস্থ হেক্সওয়ার্দ্দি পল্লী টট্‌নেস হইতে পনের মাইল দূরে অবস্থিত। সুতরাং ভাবিয়া দেখিলাম, যদি টট্‌নেস ষ্টেশনে নামিয়াই একখান ট্যাক্সি লইয়া সেখান হইতে যাত্রা করি, তাহা হইলে সন্ধ্যা পাঁচটার পূর্ব্বেই হেক্সওয়ার্দ্দিতে উপস্থিত হইতে পারিব।

আমি যোয়ানের পত্রখানি কুড়ি পঁচিশবার পাঠ করিলাম। আমার ধারণা হইল, সে কোনরূপে বিপন্ন হইয়াছে। তাহার দুশ্চিন্তার কোন কারণ আছে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইলাম। কিন্তু সে কি উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সে কিরূপেই বা আমার বাড়ীর ঠিকানা জানিতে পারিল?

তাহার পর হঠাৎ আমার মনে পড়িল, আমাকে যে দিন অচেতন অবস্থায় নদীর ধারে রাখা হইয়াছিল, সে দিন কেহ আমার কোটটি খুলিয়া লইয়া আমাকে একটা ছেঁড়া জামা পরাইয়া দিয়াছিল। আমার সেই কোটের পকেটে আমার পকেট-বহি, কতকগুলি চিঠিপত্র, একখানি পাঁচ পাউণ্ডের নোট, এবং আমার ঠিকানা-সম্বলিত নামের কার্ড ছিল। আমার যে সার্টের 'কলারে' আমার নাম লেখা ছিল, সেই সার্টটিও জোর করিয়া খুলিয়া লওয়া হইয়াছিল।

হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পড়িল, যোয়ান যদি আজ রাত্রিতেই লণ্ডন ত্যাগ করে, তাহা হইলে ত ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্বে প্যাডিংটন ষ্টেশনেও তাহার দেখা পাইতে পারি। আমি 'টাইম টেবল' দেখিয়া জানিতে পারিলাম, টট্‌নেসে যাইতে হইলে রাত্রি বারটার সময় প্যাডিংটন ষ্টেশনে ট্রেণে চাপিতে হইবে, সেই ট্রেণ প্রত্যূষে ছয়টার সময় টট্‌নেস ষ্টেশনে পৌঁছিবে।

প্যাডিংটন ষ্টেশনে যোয়ানের সহিত দেখা করিবার সঙ্কল্প করিয়া, আমি একখানি ট্যাক্সি লইয়া রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটার সময় সেই ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। রাত্রি বারটায় যে ট্রেণ ছাড়িবার কথা, তখন তাহা প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; আমি প্ল্যাটফর্ম্মে উপস্থিত হইয়া ঘুমাইবার গাড়ীর 'কনডক্টর'কে জিজ্ঞাসা করিলাম—কুপার নাম্নী কোন মহিলা গাড়ীতে শয়ন করিয়া আছে কি? কিন্তু 'কনডক্টর' মাথা নাড়িল। আমি তাহার কথায় নির্ভর না করিয়া ট্রেণের সমস্ত গাড়ী খুঁজিয়া দেখিলাম, কিন্তু যোয়ানের সন্ধান পাইলাম না। ক্রমে রাত্রি বারটা বাজিল, গার্ড বাঁশী বাজাইয়া লণ্ঠন আন্দোলিত করিয়া ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

আমার মনে হইল, যোয়ান কোন পূর্ব্ববর্ত্তী ট্রেণে চলিয়া গিয়াছে, এবং সম্ভবতঃ সে ব্রিষ্টলে বা একিসটারে রাত্রিবাস করিতেছে। কুপও তাহার সঙ্গে গিয়াছে কি না, কে বলিবে?

ঙেক্সওয়ার্দ্দির 'ফরেষ্ট ইন্' নামক পান্থ-নিবাসে সে আমাকে যাইতে নিষেধ করিল কেন? সে লিখিয়াছিল, সেখানে যেন আমাকে কেহ দেখিতে না পায়। ইহার একমাত্র কারণ, তাহার পিতার অথবা ইব্রাহিমের হয় ত সেখানে থাকিবার সম্ভাবনা আছে; যদিও তাহারা জানে, আমার মৃত্যু হইয়াছে, তথাপি আমাকে দেখিলেই চিনিতে পারিবে। তাহারা আমাকে চিনিতে পারিলে আমার জীবন পুনর্ব্বার বিপন্ন করিতে পারে ভাবিয়াই যোয়ানের এই সতর্কতা।

এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে আমি জার্ম্মিন ষ্ট্রীটে ফিরিয়া আসিলাম। আমি ভাবিলাম, যোয়ান তাহার পিতার পরামর্শে আমাকে সেই নির্জ্জন পল্লীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করে নাই ত? সম্ভবতঃ তাহারা জানিতে পারিয়াছে, আমি মৃত্যুকবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি এবং ভবিষ্যতে তাহাদের অনিষ্ট করিতে পারি; এই ভয়ে আমাকে সেখানে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া হত্যা করিবে! কুপ তাহার দুরভিসন্ধি-সিদ্ধির জন্য কোন অপকর্ম্মেই কুণ্ঠিত নহে, তাহা আমি জানিতাম। যোয়ান কি এ বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করিবে?

আমি শয্যায় শয়ন করিয়া মনে মনে সকল অবস্থার কথা আলোচনা করিতে লাগিলাম; অবশেষে স্থির করিলাম, সেখানে যাইবার সময় আমার ব্রাউনিংটা পকেটে করিয়া লইয়া যাইব। যদি পরদিন রাত্রিতে আমাকে কোন নির্জ্জন স্থানে একাকী বাস করিতে হয়, তাহা হইলেও পিস্তলটা আমার সঙ্গে থাকিলে আমি অনেকটা নিরাপদ হইব।

পরদিন বেলা এগারটার সময় আমার হাতব্যাগে কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিষ লইয়া আমি প্যাডিংটন ষ্টেশনে যাত্রা করিলাম, আমি যে ট্রেণের আরোহী হইলাম, তাহা একস্‌প্রেস্ ট্রেণ, লণ্ডন ছাড়িয়া তাহা একিসটারে পৌঁছিবার পূর্ব্বে কোন ষ্টেশনে দাঁড়ায় না। আমি পূর্ব্বেই টট্‌নেসের সেমুর হোটেলে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়াছিলাম, ষ্টেশনে একখান মোটর কার যেন আমার প্রতীক্ষা করে।

হোটেলের ম্যানেজার আমার অনুরোধে একখানি উৎকৃষ্ট পীতবর্ণ নূতন গাড়ী রাখিয়াছিল। আমি টট্‌নেস ষ্টেশনে নামিয়া সেই মোটরকারে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

গাড়ীতে বসিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম—আমি যোয়ানের সঙ্গে আবার দেখা করিতে যাইতেছি, এবার তাহার নিকট সকল কথা শুনিতে পাইব। প্রেয়সী নারীর প্রতি পুরুষের হৃদয়ের আকর্ষণ কিরূপ প্রবল, তাহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা আমার কার্য্যে বিস্মিত হইবেন না; কিন্তু

আনন্দের সহিত ভয় ও বিষাদও আমার ব্যাকুল চিত্তকে আন্দোলিত করিয়া তুলিল। যদি যোয়ানের নিষ্ঠুর পিতার ষড়যন্ত্রে আমি তাহার কবলে পড়িয়া পুনর্ব্বার বিপন্ন হই? সকল ব্যাপারই দুর্ভেদ্য রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

যোয়ানের যদি কোন বিপদ ঘটিয়া থাকে! সে আমার সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছে, তাহাকে সাহায্য করিতেই হইবে।

আমি রেলওয়ে ব্রীজ অতিক্রম করিয়া সুদৃশ্য পার্ব্বত্য-পথে প্রবেশ করিলাম। পথটি সঙ্কীর্ণ এবং অত্যন্ত আঁকা-বাঁকা হইলেও সমগ্র ডিভনসায়ারের মধ্যে এরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-বেষ্টিত পথ অতি অল্পই আছে। তখন শরদপ-রাহ্নের শ্রান্ত তপন পর্ব্বতান্তরালে অদৃশ্য হইয়াছিল। গিরি-উপত্যকা হইতে ধূসর কুজ্ঝটিকারাশি ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া সেই পার্ব্বত্য কান্তার আচ্ছাদিত করিতেছিল, তাহার উপর অস্তমিত তপনের লোহিত রাগ প্রতিফলিত হইয়া যেন কি এক অব্যক্ত রহস্যের সৃষ্টি করিতেছিল। ক্রমে আমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী ও ক্রমনিম্ন প্রান্তরের প্রান্ত দিয়া ডার্ট নদীর তটে আসিলাম এবং শৈবালরাশি-সমাচ্ছাদিত একটি পুরাতন সেতুর সাহায্যে এই খরস্রোতা প্রবাহিণীর অপর তীরে উপস্থিত হইলাম।

আমার উদ্বেগ ও ব্যগ্রতা অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি যোয়ানকে টেলিগ্রাম করিয়া আমার আগমনের সংবাদ জানাইয়াছিলাম। আর অল্পকাল পরেই পাঁচটার সময় তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে।

অবশেষে আমার মোটর ধীরে ধীরে পাহাড়ের উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, আমি মুগ্ধ নেত্রে ডার্টমুরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। গোধূলির ম্লান আলোকে তাহার মনোহর দৃশ্য-গৌরব সন্দর্শন করিয়া আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলাম। এই স্থানের অপরূপ সৌন্দর্য্য আমি পূর্ব্বে কখন নিরীক্ষণ করি নাই।

প্রস্তরবদ্ধ পার্ব্বত্যপথ দিয়া ক্রমশঃ আমরা পাহাড়ের বহু উর্দ্ধে আরোহণ করিলাম। তাহার পর দেখি, সম্মুখে ভীষণ 'উৎরাই', সেই উৎরাই দিয়া নীচে নামিবার সময় আরও নীচে অথচ অনেক দূরে গিরি-উপত্যকা দেখিতে পাইলাম, তাহার চারিদিকে গহন কানন; কিন্তু সেই কাননবেষ্টিত স্থানে অন্ধকারের মধ্যে আমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক-স্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাইলাম। আমার মোটর-কারের চালক বলিল, হেক্সওয়ার্দ্দি পল্লী ঐ স্থানেই অবস্থিত।

আমার বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতে লাগিল; সে আসিয়াছে—ঐ স্থানে আমার প্রতীক্ষা করিতেছে! আমার মন যেন তখন চুম্বকাকৃষ্ট লৌহ!

আমি ভাবিলাম—সে এই সুদূর আরণ্য প্রদেশে আসি-য়াছে। লণ্ডন ত্যাগ করিয়া তাহার এখানে আসিয়া লুকাই-বার কি প্রয়োজন ছিল? তাহার পিতা কি লণ্ডনে ধরা পড়িবার ভয়ে তাহাকে লইয়া এখানে আসিয়া লুকাইয়াছে?—সকল ব্যাপারই রহস্যান্ধকারে সমাচ্ছন্ন!

চিন্তার শেষ নাই; আমি গিরিপাদমূলে মোটরকার হইতে অবতরণ করিলাম। আমি মোটর-চালককে বলি-লাম, "আমার কায শেষ করিতে ঘণ্টাখানেক বিলম্ব হইতে পারে, ততক্ষণ তুমি ধূমপান ও বিশ্রাম কর।"—আমি তাহাকে এক জোড়া উৎকৃষ্ট চুরুট উপহার দিলাম।

আমি চলিতে লাগিলাম, কিছু দূরে একখানি ক্ষুদ্র অট্টালিকা দেখিলাম, বাড়ীখানি সাদাসিধা, গৃহপ্রাচীর ধূসর-বর্ণে রঞ্জিত, তাহার বাতায়নগুলিতে সাদা খড়খড়ির অন্তরালে তেলের ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। তখন অন্ধকার বেশ গাঢ় হইয়াছিল। আমি সেই অট্টালিকা অতিক্রম করিবার সময় জানিতে পারিলাম—তাহাই 'ফরেষ্ট ইন্'—গ্রাম্য পান্থনিবাস।

বুঝিলাম, এই অট্টালিকায় সে লুকাইয়া থাকিবে, কিন্তু এখানে আমার 'প্রবেশ-নিষেধ।'

আমি সেই অট্টালিকার পাশ দিয়া যাইবার সময় ইহার নীচের জানালা পরীক্ষা করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। সেই বাতায়নটি পথের ধারে থাকায় তাহা পরীক্ষা করা তেমন কঠিন মনে হইল না। সেই কক্ষটি উপবেশন-কক্ষ বলিয়াই আমার ধারণা হইল। আমি তাহার কাছে দাঁড়াইয়া কক্ষের ভিতর কাহারও কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম; তাহা পুরুষের কণ্ঠধ্বনি। আমি যোয়ানের সাড়া না পাইয়া একটু হতাশ হইলাম, কিন্তু ধরা পড়িবার ভয়ে আর অধিক কাল সেখানে দাঁড়াইতে সাহস করিলাম না, আঁকা-বাঁকা পথ দিয়া দূরে প্রস্থান করিলাম; সেই সময় আমি আরও কয়েকখানি ক্ষুদ্র কুটীর অতিক্রম

করিলাম। এই সকল কুটীরসমষ্টি দ্বারা সেই পল্লীখানি গঠিত, সুতরাং বুঝিলাম, ইহা নিতান্ত ক্ষুদ্র পল্লী।

আমি সেই পথে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইতেই ডার্ট নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম, এবং প্রস্তর-নির্ম্মিত পুরাতন সেতু দেখিতে পাইলাম। এই সেতুর সাহায্যে লোক নদী পার হয়।

সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় নদীর অশ্রান্ত কলধ্বনি ভিন্ন কোন দিকে অন্য কোন শব্দ ছিল না। আমি চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, কিন্তু জনপ্রাণীও দেখিতে পাইলাম না। চতুর্দ্দিকে অরণ্য, সম্মুখে নদী, অদূরে পর্ব্বত, আমি সন্ধ্যাকালে সেই নির্জ্জন স্থানে একাকী, আমার গা ছম্-ছম্ করিতে লাগিল।

অবশেষে আমি নদীকূল হইতে সেই সেতুর উপর উঠিয়া তাহার রেলিংএ ভর দিয়া দাঁড়াইলাম এবং একটি সিগারেট বাহির করিয়া ধূমপান করিতে লাগিলাম। আমি তখন এরূপ অধীর ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম যে, আমার বক্ষের স্পন্দনধ্বনি সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পাইলাম। তখন অন্ধকারে কিছুই দেখা যাইতেছিল না, ঘড়ি দেখিবার জন্য আমাকে ম্যাচ জ্বালিতে হইল। দেখিলাম, তখন পাঁচটার পর পনের মিনিট অতীত হইয়াছিল।

আরও দশ মিনিট অতীত হইল, কিন্তু এক একটি মিনিট আমার নিকট এক এক ঘণ্টার মত দীর্ঘ মনে হইতে লাগিল। যোয়ান পাঁচটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করিবে লিখিয়াছিল, এখনও সে আসিল না কেন? তাহার কি কোন বিপদ ঘটিয়াছে, না আমাকে সে প্রতারিত করিল? এত দিনেও নারীচরিত্র বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না!

সহসা আর একটা কথা আমার মনে হইল। ভাবিলাম, আমি পূর্ব্বে কোন দিন যোয়ানের হস্তাক্ষর দেখি নাই। আমি তাহার যে পত্রে নির্ভর করিয়া এত দূরে এই অপরিচিত স্থানে আসিয়াছি, সেই পত্রখানি হয় ত তাহার স্বহস্ত-লিখিত পত্র নহে। যোয়ানই যে আমার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? হয় ত অন্য কেহ যোয়ান কুপারের ছদ্মবেশে আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আমাকে বিপন্ন করিবার জন্য এই ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছিল। মুগ্ধ, মূঢ় আমি—তাহার ছলনা বুঝিতে পারি নাই!

আমি দৈবানুগ্রহে কূপের কবল হইতে উদ্ধারলাভ করিয়াছিলাম, অতি কষ্টে আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। সে তাহা জানিত; আমি তাহার গুপ্তরহস্য ভেদ করিয়া ভবিষ্যতে তাহাকে বিপন্ন করিতে পারি ভাবিয়া সে আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে না—ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করি? "মরা মানুষের মুখ হইতে কথা বাহির হয় না"—এই বহু পুরাতন প্রবচনটি কি তাহার অজ্ঞাত?

স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া এই সকল কথা চিন্তা করিতেছি, সেই সময় সহসা অদূরে কাহার মৃদুপদধ্বনি শুনিতে পাইলাম। পান্থ-নিবাসের দিক হইতে কেহ নদীর ধার দিয়া সেই পুলের উপর আসিতেছিল।

আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আমাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য কেহ কি চাতুর্য্য-জাল বিস্তার করিতে আসিতেছে? পদশব্দ আরও নিকটে আসিলে অন্ধকারের মধ্যে সুবেশধারিণী একটি নারী-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। আমি তাহার মুখ চিনিতে পারিবার পূর্ব্বেই সে আমার দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিল। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চিনিতে পারিলাম—সে যোয়ান।

আমি তাহার দস্তানা-মণ্ডিত হাতখানিতে মৃদু ঝাঁকুনী দিলাম। যোয়ান মৃদুস্বরে বলিল, "মিঃ কোলফাক্স, আপনি দয়া করিয়া আসিয়াছেন—ইহা আমার পরম সৌভাগ্য মনে করিতেছি; আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে—কিন্তু এখানে কোন কথা বলিতে আমার সাহস হয় না; কেহ আমাদিগকে দেখিতে পাইলে আমরা উভয়েই বিপন্ন হইব। আমি ঐ পাহাড়ে উঠিব, আমি আগেই যাইতেছি, আপনি দুই এক মিনিট পরে আসিবেন। আমাদের একত্র না যাওয়াই ভাল!"

আমি বলিলাম, "উত্তম। তুমি আগে চল।"

যোয়ান ধীরে ধীরে সেতু পার হইয়া অদৃশ্য হইল।

আমি মনে মনে বলিলাম, "হাঁ যোয়ান সুন্দরী বটে; অপরূপ তাহার রূপ। সে আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে; কিন্তু সে দিন তাহার পিতৃগৃহে যে ভীষণ নিষ্ঠুর ব্যবহার পাইয়াছি, তাহা জানিয়াও সে আমাকে আবার এখানে ডাকিয়া আনিল কেন?"

যোয়ান যে দিকে গিয়াছিল, আমিও সেই দিকেই

চলিলাম। প্রস্তর-নির্ম্মিত পথ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে পাষাণ-প্রাচীর। পথের শেষে পার্ব্বত্য প্রান্তর, কন্‌কনে শীত, শীতল নৈশ বায়ু প্রবল বেগে বহিতেছিল।

পথের শেষে ওকগাছের একটি শুষ্ক গুঁড়ির পাশে দাঁড়াইয়া যোয়ান আমার প্রতীক্ষা করিতেছিল। আমি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে সে বলিল, "পাছে আমাদিগকে কেহ দেখিতে পায়, এই ভয়ে আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে; আপনি কষ্ট করিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন, আপনার এই দয়া কখন ভুলিতে পারিব না।"

আমি বলিলাম, "গত রাত্রিতে আমার বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায় তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই, এ জন্য আমি দুঃখিত। আমার ভৃত্য ক্লাবে টেলিফোনে আমাকে ডাকিয়াছিল, কিন্তু ক্লাবের আরদালী আমার সন্ধান পায় নাই। বড় বড় ক্লাবে এই রকমই হইয়া থাকে।"

যোয়ান বলিল, "আমি আপনার ঘরে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া ফিরিতেছিলাম। আপনাকে কষ্ট করিয়া এত দূর আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা না করিলেই নয়। ইচ্ছা ছিল, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব—" যোয়ান হঠাৎ নীরব হইল।

আমি আগ্রহভরে বলিলাম, "আমাকে কি কথা জিজ্ঞাসা করিতে তোমার ইচ্ছা হইয়াছিল, মিস কুপার?"

যোয়ান জড়িতস্বরে বলিল, "কি যে ইচ্ছা হইয়াছিল, সে কথা বলা বড় শক্ত, মিঃ কোলফাক্স!"—তাহার কণ্ঠস্বরে আতঙ্কের আভাস ছিল।

আমি কোমল স্বরে বলিলাম, তুমি তোমার মনের কষ্ট সরলভাবে আমার নিকট প্রকাশ করিতে পার। আমি তোমাদের বাড়ীতে গিয়া যে সাংঘাতিক ফাঁদে পড়িয়াছিলাম, তাহাতে আমার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল, অতি কষ্টে আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে, কিন্তু আমি তোমার প্রতি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট নহি, মিস্ কুপার! তোমার পিতা তোমাকে কফি-পানের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে তুমি সহজে তাহা পান করিতে সম্মত হও নাই, তোমার অনিচ্ছা ও আপত্তি দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তুমি তাহার দুরভিসন্ধি জানিতে।"

যোয়ান আবেগভরে বলিল, "হাঁ, জানিতাম; আপনার মনে সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি ভয়ানক, তাহা কল্পনা করিবারও আপনার শক্তি ছিল না।"

আমি বলিলাম, "না, আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই, বুঝিতে পারিলে জেসিকে সঙ্গে লইয়া নিশ্চয়ই সেখানে যাইতাম না। যাহা হউক, তুমি এখন সকল কথা অসঙ্কোচে আমার নিকট প্রকাশ কর। তাহারা কি উদ্দেশ্যে ঐরূপ পৈশাচিক ব্যবহার করিয়াছিল?"

যোয়ান বলিল, "হাঁ, তাহাদের একটা মতলব ছিল, কিন্তু সেই মতলবটি কি, তাহা আপনি জানেন না, তাহা কল্পনাও করিতে পারিবেন না। আমার বিশ্বাস, অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই আপনার উপর তাহাদের দৃষ্টি ছিল। আমার বাবা ভারী খেলোয়াড় লোক, তিনি গোড়া বাঁধিয়া সকল কায করেন, এবং যে চা'ল চালেন, তাহা অব্যর্থ।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "আমার উপর দৃষ্টি ছিল! কেন? আমি ত জ্ঞাতসারে কোন দিন তাহার কোন অনিষ্ট করি নাই, তাহার সঙ্গে আমার পরিচয় পর্য্যন্ত ছিল না। যদি চুরির মতলবেই আমার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে—তাহা হইলে তাহাতে তাহার লাভের কোন আশা ছিল না; কারণ, আমি কখন বেশী টাকা লইয়া বাহিরে যাই না। সে দিন আমার সাটের পকেটে সামান্য পাঁচ পাউণ্ডের একখানি নোট ছিল। আর চুরির জন্য ঐ রকম দুষ্কর্ম্ম যেন খুব বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হয়।"

যোয়ান ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আপনার এই অনুমান সত্য নহে মিঃ কোলফাক্স, বাবাকে ইতর তস্কর মনে করিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। আপনি কি তাঁহার গৃহে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পান নাই? তাঁহার গুপ্ত অভিসন্ধি ছিল, এবং আপনার মৃত্যু ভিন্ন তাহা সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।"

তাহার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম, মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলাম, "আমাকে হত্যা করিতে না পারিলে তাহার গুপ্ত অভিসন্ধি সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ছিল না? কেন মিস্ কুপার, আমার অপরাধ কি?"

যোয়ান ক্ষীণস্বরে বলিল, "আমি তাহা জানি না। যে কথা জানি না, তাহা আপনাকে কিরূপে বলিব? আমি এইমাত্র জানি, কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে তাঁহার ষড়যন্ত্র

চলিতেছিল। আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, একটি শিকার বাছিয়া রাখা হইয়াছিল, কিন্তু কে তাহাদের লক্ষ্য, তাহা তখন জানিতে পারি নাই। যদি বুঝিতাম, সেই শিকার আপনি—তাহা হইলে আপনাকে সতর্ক করিতে পারিতাম।"

আমি সাগ্রহে বলিলাম, "তবে ত তুমি আমার বন্ধু মিস্ কুপার! তোমাকে আমি শত্রু মনে করিতে পারি কি?"

যোয়ান অবনত-মস্তকে বলিল, "হাঁ, আমি আপনার বন্ধু, কিন্তু যে সকল ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার পর আমি কিরূপে আশা করিতে পারি যে, আপনি আমার বন্ধু হইবেন?"

আমি স্পন্দিত বক্ষে বলিলাম, "কিন্তু আমি তোমারই। এই জন্যই আশা করিতেছি, তুমি আমার নিকট সকল কথা সরলভাবে প্রকাশ করিবে।"

তথাপি যোয়ান স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, যেন সে আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না! তাহার এই কুণ্ঠিত ভাব দেখিয়া আমি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "আমি তোমার নিকট সরলভাবেই প্রত্যাশা করি, কেন তুমি মনের ভাব গোপন করিতেছ?"

যোয়ান বলিল, "আপনি আমাকে ভুল বুঝিয়াছেন; আপনার নিকট কোন কথা গোপন করিবার আমার ইচ্ছা নাই, কিন্তু আমার সুনাম, আমার জীবনরক্ষার জন্য আমাকে মুখ বুজিয়া সকল নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে। আমার মুখ যে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

আমি অধীরভাবে বলিলাম, "কে তোমার মুখ বন্ধ করিয়াছে? তোমার বাবা?"

যোয়ান দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "হাঁ, আমার বাবা।"

নবম প্রবাহ

ক্রেভেনহিলের বাড়ী

আমি বলিলাম, "ইহার কারণ কি? তোমার পিতা তোমার ক্ষতি করিবে? তুমি কিরূপ ক্ষতির আশঙ্কা করিতেছ?"

যোয়ান বলিল, "তিনি তাঁহার মুখের একটিমাত্র কথায় আমার মান-মর্য্যাদা নষ্ট করিতে পারেন, এমন কি, আমার প্রাণ যাইতেও পারে।"

আমি বলিলাম, "আর তুমিও একটি কথা বলিলেই তাহার হাতে দড়ি পড়িতে পারে।"

যোয়ান অধীরভাবে বলিল, "না মিঃ কোলফাক্স, আমার অবস্থা কিরূপ সঙ্কটপূর্ণ, তাহা আপনি জানেন না, তাহা আপনাকে বুঝাইতেও পারিব না। তাঁহার প্রতিকূলে কোন কথা বলা আমার অসাধ্য।"

আমি বলিলাম, "তোমার কথাগুলি হেঁয়ালীর মত যোয়ান! মিঃ কুপকে তোমার এত ভয় করিবার কারণ কি? সে তোমার পিতা ত?"

যোয়ান অবজ্ঞাভরে বলিল, "পিতা! সমস্ত ইংলণ্ডে অন্য কোন মেয়ের তাহার মত বাপ আছে না কি? অন্য কোন নারী কি নিজের ভাগ্যকে আমার মত ঘৃণা করে? আপনার সাহায্য-প্রার্থনায় কাল আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "যদি তোমাকে সাহায্য করা আমার অসাধ্য না হয়, তাহা হইলে আমি আনন্দের সঙ্গে তোমাকে সাহায্য করিব। কিন্তু কোন কথা গোপন না করিয়া সকল কথা তোমাকে আমার নিকট প্রকাশ করিতে হইবে।"

যোয়ান আতঙ্কবিহ্বল স্বরে বলিল, "আমি ভয়ঙ্কর বিপদে আচ্ছন্ন হইয়া আছি। সকল সময়েই আমার মনে হয়, মৃত্যুকে বরণ না করিলে এ বিপদ হইতে আমার নিষ্কৃতিলাভের উপায় নাই।"

তাহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, কখন কখন আত্মহত্যা করিতেও তাহার ইচ্ছা হয়। কিন্তু সে তাহার পিতার অপরাধের কথা সকলই জানিত, তাহাকে পুলিসে ধরাইয়া দিলে সে কি নিরাপদ হইতে পারে না? তাহার কথা ও ব্যবহার সকলই রহস্যপূর্ণ। আমি তাহাকে বলিলাম, "তোমার মনের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইবার কারণ কি? আমি জানি, যে রাত্রিতে তোমাদের বাড়ী গিয়া তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, সেই রাত্রিতে নানা অদ্ভুত ঘটনার পর তুমি আমাকে একখান মোটর-গাড়ীতে তুলিয়া,—আমি মরিয়াছি ভাবিয়া নদীতীরে বাঁধের উপর ফেলিয়া আসিয়াছিলে! তুমিই ত—"

সে আমার কথায় বাধা দিয়া ভগ্নস্বরে বলিল, "এ কথা আপনাকে কে বলিল?"

'তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা ?'

—রবীন্দ্রনাথ।

আমি ধীরভাবে বলিলাম, "সেই সময় যে তোমাকে দেখিয়াছিল, তোমাকে চিনিতে পারিয়াছিল, তাহারই কাছে এ কথা শুনিয়াছি।"

যোয়ান বলিল, "আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল? কেবল দেখা নয়, আমাকে চিনিতেও পারিয়াছিল? তবে কি সত্য কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে?"

আমি বলিলাম, "তুমি আমাকে কি ভাবে লইয়া গিয়া মৃত মনে করিয়া সেখানে ফেলিয়া আসিয়াছিলে—তাহা পুলিসেরও অজ্ঞাত নহে।"

যোয়ান বিহ্বল স্বরে বলিল, "পুলিস! সেই ঘটনার সহিত আমার সংস্রব আছে, ইহা কি পুলিস জানিতে পারিয়াছে?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, তা কতকটা জানিতে পারিয়াছে বৈ কি! গত সেপ্টেম্বর মাসে একটি যুবতীর লা-ওয়ারিশ মৃতদেহ বাঁধের উপর পড়িয়া ছিল; সেই মৃতদেহ কাহার এবং কে তাহা সেখানে ফেলিয়া গিয়াছে, তাহার সন্ধান লইবার জন্য পুলিস যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। শুনিয়াছি, সেই যুবতীটিকেও জেসি পথ হইতে আমারই মত করিয়া ভুলাইয়া তোমাদের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেই যুবতীর বন্ধুগণ বহু অনুসন্ধানেও তাহাকে দেখিতে পায় নাই।"

যোয়ান ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কম্পিত স্বরে বলিল, "হাঁ, আমারও ঐরূপ ধারণা হইয়াছিল। সন্দেহ বশতঃ আমার উপর দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। পুলিস সকল কথা জানিতে পারিয়াছে, সত্য প্রকাশিত হইয়াছে!"—সে হতাশ-ভাবে উভয় করতল নিষ্পেষিত করিতে লাগিল।

আমি সদয়ভাবে বলিলাম, "কিন্তু তুমি আমার সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিলে; আমি কি তোমাকে এই সকল পাপ ও কলঙ্ক, এই সাংঘাতিক বিপজ্জাল হইতে উদ্ধার করিতে পারি না? তোমাকে কিরূপ বিপদ্‌রাশি দ্বারা আচ্ছন্ন হইতে হইয়াছে, তোমার আতঙ্কের কারণ কি, তাহা কি তুমি আমার নিকট প্রকাশ করিতে পারিবে না? আমার বিশ্বাস হইয়াছে, তুমি এমন কোন ভীষণ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছ, যাহা হইতে নিজের চেষ্টায় তোমার মুক্তিলাভ করা অসাধ্য। এ জন্য তোমাকে আমার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু তোমাকে এই সকল বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে হইলে তোমার পিতার গুপ্তকথা আমার জানা প্রয়োজন। তাহা জানিতে পারিলে আমি তোমাকে উদ্ধার করিবার শক্তি লাভ করিব।"

যোয়ান বলিল, "আপনি আমাকে আমার পিতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে অনুরোধ করিতেছেন? কিন্তু আমি তাহা পারিব না; যদি করি, তাহা হইলে আমাকে অতি কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তিনি আমার সর্ব্বনাশ করিবেন।"

আমি বলিলাম, "তুমি আমাকে সাহায্য না করিলে আমি পুলিসের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব। তখন তোমার ঐ সঙ্কল্প কোথায় থাকিবে?"

যোয়ান ব্যাকুল স্বরে বলিল, "না, না, ঐ কাযটি আপনি করিবেন না, করিতে পারিবেন না। আপনি আমার নিকট অঙ্গীকার করুন, আপনি কখনও পুলিসের সাহায্য গ্রহণ করিবেন না?"—সে আবেগভরে আমার হাত চাপিয়া ধরিল।

আমি তাহার ব্যাকুলতায় বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "এ কায করিতে তুমি আমাকে নিষেধ করিতেছ কেন?"

যোয়ান বলিল, "অনেকগুলি কারণে, কিন্তু সেই সকল কারণ আপনার নিকট প্রকাশ করিতে পারিব না। আপনি ঐরূপ কায করিলে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য; যে সকল কথা পুলিসের গোচর হইলে আমার মৃত্যু অপরিহার্য্য, তাহা কি আপনি তাহাদের নিকট প্রকাশ করিতে সাহস করিবেন?"

আমি কিঞ্চিৎ আবেগের সঙ্গে বলিলাম, "ও রকম অঙ্গীকার আমি কেন করিব? আমি জানিতে পারিয়াছি, তোমার বাবা ভয়ঙ্কর অপরাধী, কোন অপকর্ম্মে তাহার কুণ্ঠা নাই; তাহার অপরাধের সংবাদ প্রকাশ করা, তাহাকে পুলিসের হস্তে অর্পণ করা আমার ন্যায় নাগরিকের অবশ্য কর্ত্তব্য।"

যোয়ান বলিল, "আপনি এ কায করিলে আমারই সর্ব্বনাশ করিবেন।"

কয়েক মিনিট আমি নিস্তব্ধ রহিলাম, নৈশ অন্ধকার আমাদের চারিদিকে ঘনীভূত হইতে লাগিল, দুই একটা নিশাচর পক্ষী অদূরবর্ত্তী বৃক্ষশাখায় ছুটপাট্ করিয়া উঠিল; গিরিপাদমূলস্থ নদীর কল্লোলধ্বনি সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পাইলাম।

বুঝিলাম, আমার কর্ত্তব্য কঠিন হইয়া উঠিয়াছে! আমি

যোয়ানের শুভাকাঙ্ক্ষী, তাহাকে আমার বান্ধবী বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, কিন্তু এরূপ করায় তাহার মহা পাপিষ্ঠ পিতার অপরাধের কথা গোপন রাখিতে আমাকে বাধ্য হইতে হইবে। কারণ, আমি পুলিসের নিকট সে সকল কথা প্রকাশ করিলে যোয়ানের প্রতি শত্রুতা-সাধন করা হইবে।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমি যোয়ানকে বলিলাম, "মিস্ যোয়ান, তোমার যাহাতে অনিষ্ট হয়, এরূপ কোন কায করিতে আমার ইচ্ছা নাই; কিন্তু তোমার স্মরণ থাকা উচিত—আমি একটা ভীষণ ষড়যন্ত্রে জড়ীভূত হইয়া মরিতে বসিয়াছিলাম, কেবল আমার নহে, অনেকের অবস্থা তাহা অপেক্ষাও শোচনীয় হইয়াছিল। আমি যখন দ্বিতলের কক্ষে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, সেই সময় সেখানে একটি নারীর মৃতদেহ দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

যোয়ান সবিস্ময়ে বলিল, "নারীর মৃতদেহ? অসম্ভব! আপনি কিরূপে জানিলেন, তাহা নারীর মৃতদেহ?"

আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "কিরূপে জানিলাম? তাহার দেহ স্পর্শ করিয়া আমি সভয়ে সম্মুখে ঝুঁকিয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে বুঝিতে পারিলাম, তাহা কোন নারীর মৃতদেহ; তাহার মুখে আমার হাত ঠেকিয়াছিল, সেই শীতল মুখে হাত পড়িবামাত্র আমি ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম।"

যোয়ান বলিল, "সত্যই কি এরূপ হইয়াছিল, না তাহা আপনার কল্পনার বিকারমাত্র?"

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম, "না, কল্পনার বিকার নহে, ইহা কঠোর সত্য। একখানি চিত্রপটের পশ্চাতে যে গহ্বর ছিল, তাহারই ভিতর মৃতদেহটি দেখিতে পাইয়াছিলাম, না, ঠিক দেখিতে পাই নাই—অন্ধকারে তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছিলাম।"

যোয়ান হতাশভাবে বলিল, "সেই স্থানটি আপনি দেখিতে পাইয়াছিলেন! কিরূপে তাহা আবিষ্কার করিলেন?"

আমি বলিলাম, "দৈবাৎ, আমি অন্ধকারে হাতড়াইতেছিলাম, সেই ছবিখানি হঠাৎ আমার হাতে ঠেকিল, আমার হাতের ধাক্কায় তাহা সরিয়া যাইতেই তাহার অন্তরালস্থিত গহ্বরে আমার হাত পড়িল, এবং সেই স্ত্রীলোকটির মৃতদেহ আমার হাতে ঠেকিল।"

যোয়ান জড়িত স্বরে বলিল, "মিঃ কোলফাক্স, আ-—আমি এ কথা সত্যই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। কে সেই স্ত্রীলোক! আমি ত তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না।"

আমি বলিলাম, "এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে কোন কথাই তুমি জান না?"

যোয়ান দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, আমি কিছুই জানি না, স্ত্রীলোকটা কে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না।"

সেই নিহতা স্ত্রীলোকটির কণ্ঠহার ও তৎসংলগ্ন কবচের কথা হঠাৎ আমার মনে পড়িল। আমি বলিলাম, "সেই স্ত্রীলোকটির গলায় একগাছা সরু হার ছিল, সেই হারে কি একটা জিনিষ বাঁধা ছিল, তাহা এক হাত দীর্ঘ, আধ ইঞ্চি প্রশস্ত, তাহার উপর কতকগুলি অক্ষর ক্ষোদিত ছিল বলিয়াই মনে হইল; বোধ হইল, সেই জিনিষটি প্রস্তর-নির্ম্মিত, তাহার মধ্যস্থল ছিদ্র করিয়া সেখানে একটি পিন বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই পিনটি গোলাকার করিয়া হারের সঙ্গে আবদ্ধ করা হইয়াছিল।"

যোয়ান বলিল, "আপনার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, সেই পাথরখানি প্রাচীন মিশরদেশীয় কবচ। ঐরূপ কবচের চারিধারে প্রাচীন মিশরের দেবদেবীগণের চিত্র ক্ষোদিত থাকে। হাঁ, উহা প্রাচীন মিশরের কার্ণেনিয়ান কবচ।"

আমি বলিলাম, "কবচখানির উপর কোন চিত্র বা অক্ষরাদি ক্ষোদিত ছিল, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, অঙ্গুলীস্পর্শে আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।"

যোয়ান মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিন্তু এ যে বড়ই অসম্ভব ব্যাপার!—সে এ ভাবে জীবন বিপন্ন করিতে কখন সম্মত হইত না। ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

আমি বলিলাম, "কে সে? কাহার কথা বলিতেছ?"

যোয়ান তাড়াতাড়ি বলিল, "না, কেহ নয় সে। আমার মনে সন্দেহের একটা ছায়া পড়িয়াছিল মাত্র, অন্য কিছুই নহে।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু তোমার জ্ঞাতসারে হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, একটি যুবতীর মৃতদেহ সেখানে ছিল। সম্ভবতঃ সেই নারীকে গোপনে হত্যা করা হইয়াছিল। আমি সেই মৃতদেহের অস্তিত্ব অবগত হইয়াছিলাম। এ জন্য এই দুর্ঘটনার সংবাদ পুলিসের গোচর করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

যোয়ান গম্ভীরস্বরে বলিল, "হাঁ মিঃ কোলফাক্স, ইহা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য; আপনি এই কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন—যদি আমার মত অভাগিনীর জীবন বিপন্ন করিতে আপনার কুণ্ঠা না হয়।"

আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলাম, "দেখ মিস্ যোয়ান! তোমার জীবন বিপন্ন হয়, এরূপ কায করিতে আমার এক বিন্দুও ইচ্ছা নাই; কিন্তু তোমার পিতা ও তাহার আরব অনুচরটা সহরের বুকে বসিয়া যে সকল পৈশাচিক কাণ্ড করিতেছে, জানিয়া শুনিয়া তাহাদের সেই অপরাধ গোপন রাখা আমি অনুচিত মনে করি। আমি তাহা উপেক্ষা করিতে পারিব না। আমি—"

যোয়ান আমার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আপনি ইব্রাহিমের কথা বলিতেছেন? সে মানুষ নয়—পিশাচ, আমার পিতার অপেক্ষা সে ভীষণপ্রকৃতি দানব।"

আমি বলিলাম, "আমি যে রমণীর মৃতদেহ আবিষ্কার করিয়াছিলাম, তাহাকে কি তুমি চিনিতে পারিয়াছ? তাহার গলায় যে কবচ ছিল, সেই কবচখানি তোমার পরিচিত বলিয়াই মনে হইল।"

যোয়ান কোন কথা না বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, কিন্তু সে যে সেই কবচধারিণী নিহতা যুবতীকে চিনিত, অন্ততঃ সেই কবচখানি কাহার—ইহা তাহার অজ্ঞাত নহে, এই ধারণা আমি ত্যাগ করিতে পারিলাম না। এই জন্য আমি তাহাকে বলিলাম, "শোন যোয়ান, আমি বুঝিয়াছি, সেই কবচধারিণী দুর্ভাগিনী নিহতা রমণী তোমার পরিচিতা। তুমি বলিতেছিলে, উহা প্রাচীন মিশরের দেবদেবীগণের মূর্ত্তি-ক্ষোদিত কবচ, মিশর দেশের জিনিষ, কিন্তু ইব্রাহিমও মিশর দেশের লোক। এই উভয়ের মধ্যে কি সংস্রব আছে, তাহাই আমি জানিতে চাই।"

যোয়ান অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিল, তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিল, "আমি তাহা জানি না মিঃ কোলফাক্স, আমার মনে মুহূর্ত্তের জন্য যে সন্দেহ হইয়াছিল, তাহার কোন মূল্য নাই।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু তুমি যে রমণীর গলায় সেই কবচখানি দেখিয়াছিলে, সে কে?"

যোয়ান বলিল, "আমাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। সে অতি ভয়ঙ্কর, আতঙ্কজনক বিষয়!"

আমি উত্তেজিতস্বরে বলিলাম, "শীঘ্র তাহার নাম বল। আমি তাহা জানিতে চাই, আমি নিজেই তদন্ত করিব।"

যোয়ান বলিল, "বেশ, আপনি নিজেই তদন্ত করিবেন, তাহার নাম ফসেট—আইভি ফসেট। ১১৬ নং ক্রেডেন হিলে সে তাহার পিতার নিকট বাস করে।"

আমি বলিলাম, "ক্রেডেন হিল?"

যোয়ান বলিল, "হাঁ। আপনি কি সেই বাড়ী চেনেন?"

আমি কুপকে যে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া মোটর-কারে পলায়ন করিতে দেখিয়াছিলাম, সেই বাড়ী! আমি দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণ করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারি নাই। আমি যোয়ানকে এ কথা বলিতে উদ্যত হইয়াও কথাটা প্রকাশ করিলাম না, মনের ভাব গোপন করিয়া সহজস্বরে বলিলাম, "ক্রেডেন হিলের সেই বাড়ীর অদূরে আমার একটি বন্ধু বাস করেন। আমি নিজে গিয়া সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিব।"

যোয়ান বলিল, "কিন্তু আপনি এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না; আপনি সন্ধান লইয়া যদি জানিতে পারেন, আইভি জীবিত আছে, তবে আমাকে দয়া করিয়া তাহা জানাইবেন।"

আমি বলিলাম, "আইভি কি তোমার বন্ধু?"

যোয়ান বলিল, "হাঁ, সে আমার পরম বন্ধু, আমার তেমন হিতৈষিণী আর কেহই নাই। কিন্তু সে যে আমা-দের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে সাহস করিয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না।"

আমি বলিলাম, "কেন? সে কি তোমার পিতার গুপ্ত কথা জানিত?"

যোয়ান বলিল, "বোধ হয় জানিত।"

আমি। তবে ত তাহার নিহত হইবার কারণই ছিল: তুমি কত দিন পূর্ব্বে তাহাকে শেষবার দেখিয়াছিলে?

যোয়ান। প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে, আমি তাহাদের বাড়ী গিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম; তাহার সঙ্গে চা-পান করিয়াছিলাম।

আমি। তোমার পিতা কোন দিন সেখানে গিয়া-ছিলেন কি?

যোয়ান। না, কোন দিন তাঁহাকে সেখানে দেখা

যায় নাই; কার্ল কৃপ পরিচয়ে তিনি কাহারও সঙ্গে দেখা করেন না।

আমি। তাহা হইলে তাঁহার অন্য পরিচয়ও আছে, অর্থাৎ কাহারও সহিত দেখা করিতে হইলে ছদ্মনাম ব্যবহার করেন?

যোয়ান অনিচ্ছার সহিত এ কথা স্বীকার করিল।

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে তাহার সেই ছদ্মনামটি কি?— দেখ যোয়ান, তুমি আমাকে বন্ধু মনে কর, এ কথা আমার নিকট প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইও না।"

যোয়ান বলিল, "কিন্তু সেই নাম প্রকাশ করিলে সকলেই তাঁহাকে চিনিতে পারিবে, তাঁহার ব্যক্তিত্ব, তাঁহার বাসস্থান প্রভৃতি আর গোপন করা চলিবে না।"

আমি। কিন্তু তুমি কি তাহা গোপন রাখিতে চাও?

যোয়ান। হাঁ, গোপন রাখিতে চাই; কারণ, আমার সে কথা প্রকাশ করিবার অধিকার নাই; এক দিন হয় ত তাহা আপনাকে বলিতে পারিব মিঃ কোলফাক্স! কিন্তু আজ তাহা আপনার নিকট প্রকাশ করিতে পারিব না, তাহা আমার অসাধ্য।

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম, "তাহা হইলে আমাকে পুলিসের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে; পুলিস সেই গুপ্ত-গৃহে প্রবেশ করিয়া খানাতল্লাস করিবে। আমাকে হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা করা হইল, আর আমি সেই অত্যাচার নীরবে সহ্য করিব, তুমি আমার বন্ধু হইয়া ইহা কিরূপে প্রত্যাশা কর?"

যোয়ান বলিল, "পুলিস তাহার সন্ধান পাইলে ত খানাতল্লাস করিবে?"

আমি। সেই বাড়ী সহজে কেহ খুঁজিয়া না পায়, তোমার পিতা তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে, তাহাও তুমি জান?

যোয়ান বলিল, "হাঁ, জানি। আমি ত আপনাকে বলিয়াছি, আমার পিতা তাঁহার ভবিষ্যৎ বিপদের সকল পথ রুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার বিপন্ন হইবার আশঙ্কা নাই। আমাদের বাড়ীর নাম 'রহস্য-নিকেতন।' বাহিরের কোন লোক সেই বাড়ীর সন্ধান জানে না, কেবল আমরাই জানি। বাবা এরূপ কৌশলে নিজের ব্যক্তিত্ব গোপন রাখিয়াছেন যে, পুলিস যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাঁহার অথবা তাঁহার বাসগৃহের সন্ধান পাইবে না।"

আমি স্থিরদৃষ্টিতে যোয়ানের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "তোমার কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।"

যোয়ান। আমি সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতে পারি— আপনি সেই রাত্রিতে বেজ্‌ওয়াটারের কোন্ বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা আপনি জানেন না; আপনি পর পর কয়েক দিন সেই বাড়ীর সন্ধান করিয়াছিলেন, সে সময় বাবা আপনাকে দেখিয়াছিলেন, আমিও দেখিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি চিরজীবন ধরিয়া খুঁজিয়া বেড়াইলেও সেই বাড়ী চিনিতে পারিবেন না।

আমি। পথে তোমাদের দেখিয়া যদি তোমাদের অনুসরণ করি, তাহা হইলেও সেখানে যাইতে পারিব না? বিশেষতঃ ইব্রাহিম কৃষ্ণাঙ্গ, বেজ্‌ওয়াটারের অনেকেই তাহাকে জানে।

যোয়ান। অনেকেই তাহাকে চেনে কি না—বেজ্‌ওয়াটারে গিয়া পল্লীবাসীদের জিজ্ঞাসা করিলেই তাহা জানিতে পারিবেন। আপনি যদি আমার অনুসরণ করেন, তাহা হইলেও আপনার চেষ্টা সফল হইবে না। আপনি সেই রহস্য-নিকেতনের সন্ধান পাইবেন না।

আমি সবিস্ময়ে উত্তেজিতস্বরে বলিলাম, "তোমার এই স্পর্দ্ধা অসহ্য।"

যোয়ান বিনীতভাবে বলিল, "না, আমি স্পর্দ্ধা করিতেছি না। আমি এইমাত্র বলিতেছি, যদি আপনি সেই রহস্য-নিকেতন খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আপনার সকল চেষ্টা বিফল হইবে। আপনি কেন অনর্থক সময় নষ্ট করিবেন? আপনার সময় মূল্যবান্।"

আমি। আমার চেষ্টা বিফল হইবে কেন?

যোয়ান। কারণ, কার্ল কৃপের গুপ্তরহস্য অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সংরক্ষিত। আমার পিতার সকল কার্য্যই এরূপ চাতুর্য্যের সহিত সুকৌশলে সম্পন্ন হয়, এবং ইব্রাহিম তাঁহার এরূপ চতুর অনুচর যে, তাহার সাহায্যে পুলিসকে প্রতারিত করা তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে; এমন কি, তাঁহার রহস্য ভেদ করা সকলেরই অসাধ্য।

আমি। তাহা হইলে তাহার বাড়ীঘর, তাহার গুপ্তরহস্য সমস্তই দুর্ভেদ্য রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন; তাহার দৃঢ়বিশ্বাস, সেই রহস্যজাল ভেদ করিয়া কেহই তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। লণ্ডনের বুকে বসিয়া সে যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহার প্রতিবিধান হইবে না?

যোয়ান। হাঁ, সেইরূপই তাঁহার বিশ্বাস, জীবনের প্রতি আপনার বিন্দুমাত্র মমতা থাকিলে আপনি তাঁহার রহস্যভেদের বা শত্রুতাচরণের চেষ্টা করিবেন না। আপনি অবিলম্বে আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করুন। আমাদের সকল কথা ভুলিবার চেষ্টা করিবেন।

আমি। তোমার এই অনুরোধ রক্ষা করিতাম, কিন্তু মিস্ যোয়ান, তোমার জন্যই তাহা রক্ষা করা আমার অসাধ্য।

যোয়ান আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার জন্যই অসাধ্য?"

আমি আবেগভরে বলিলাম, "আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে ভুলিবার সাধ্য আমার নাই; চিরজীবনের ম[illegible] বিদায় লওয়াও অসম্ভব।"

যোয়ান দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমার প্রতি যদি আপনার বিন্দুমাত্র অনুরাগ থাকে, এই অভাগিনী[illegible]

জীবন রক্ষা করিতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আপনি রহস্যভেদের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া আমার বন্ধুর মত কায করুন। আপনি আমার বাবাকে বিচারালয়ে অর্পণের চেষ্টা করিয়া প্রাণ হারাইবেন না; আপনার কৃতকার্য্য হইবার আশা নাই, কেবল আপনারই জীবন বিপন্ন হইবে। বাবার চাতুর্য্যজাল ভেদ করা আপনার অসাধ্য।"

আমি। কিন্তু আমাকে রহস্যভেদ করিতেই হইবে, তাহার পর আমি কর্ত্তব্য স্থির করিব।

যোয়ান। নিজের অবস্থাটা আপনি একবার ভাবিয়া দেখিবেন। আপনি পুলিসের নিকট অভিযোগ করিলে তাহারা কি আপনার কথা বিশ্বাস করিবে? আপনার অভিযোগ সত্য, ইহার প্রমাণ কোথায়? এমন কি, জেসি আপনাকে যে বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল, সেই বাড়ী পর্য্যন্ত আপনি দেখাইতে পারিবেন না।

যোয়ানের কথা মিথ্যা নহে। বিশেষতঃ কুপ জানিতে পারিয়াছে যে, আমি জীবিত আছি। আমি ভবিষ্যতে তাহার শত্রুতাচরণ করিতে না পারি, এই উদ্দেশে সে পুনর্ব্বার আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে—তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম। এ অবস্থায় আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা হঠাৎ স্থির করা কঠিন হইল।

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলাম, "যোয়ান, তুমি আমার সাহায্যপ্রার্থিনী, আমি কি ভাবে তোমাকে সাহায্য করিতে পারি, তাহা বলিবে কি?"

যোয়ান বিচলিত স্বরে বলিল, "সে কথা আপনাকে বলিতে পারিব না। আমি ভয়ে অভিভূত হইয়াছি, লজ্জাও আমার অল্প হয় নাই। আপনি আমাকে জানেন না, কি গভীর পাপে আমার এই ব্যর্থ জীবন কলঙ্কিত, তাহাও আপনার ধারণা করিবার শক্তি নাই। তথাপি আমি কোন দিকে বিপৎসমুদ্রের কূল-কিনারা না দেখিয়া আশা করিয়াছি, আপনি হয় ত আমাকে দয়া করিবেন, শোচনীয় মৃত্যুর কবল হইতে আমাকে রক্ষা করিবেন।"

আমি। কিন্তু কিরূপে তোমাকে রক্ষা করিব?

যোয়ান। আপনার স্বাধীন ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া আমার হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া।

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "তুমিই বিপন্ন, তোমার হাতে আমাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে? অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইবে? তোমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না, মিস্ যোয়ান!"

যোয়ান। আমিও তাহা আপনাকে বুঝাইতে পারিব না। আমি জানি, আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না। সকল কথা শুনিয়া আপনি হয় ত আমাকে ঘৃণাই করিবেন। আপনার মত সৎলোক আমার মত পাপিষ্ঠাকে ঘৃণা করিবেন, ইহা স্বাভাবিক।

আমি। কিন্তু তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও নাই মিস্ যোয়ান! তোমাকে আমি কি উপায়ে রক্ষা করিব বল।

যোয়ান ব্যাকুল স্বরে বলিল, "তবে দয়া করিয়া আমার সকল কথা শুনুন। জানি না, সকল কথা শুনিলে আপনি আমাকে ঘৃণা করিবেন কি না।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অদূরে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। আমি পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিবার পূর্ব্বেই যোয়ান সভয়ে আর্ত্তনাদ করিল। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে দুইখানি সুদৃঢ় হাত লোহার সাঁড়াশীর মত আমার গলা টিপিয়া ধরিল। আমি চীৎকার করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না। আমার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল।

আমার আততায়ী দীর্ঘকায় বলবান্ জোয়ান। আমি তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। অতি কষ্টে মুখ তুলিয়া দেখিতে পাইলাম, সে ইব্রাহিম!

যোয়ান আমাকে ইব্রাহিমের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল; কিন্তু ইব্রাহিমের দেহে অপরিমিত বল, আমি তাহার হাত ছাড়াইতে পারিলাম না; তাহার হাতের চাপে আমার মুখ দিয়া রক্ত উঠিবার উপক্রম হইল।

আমার জীবন বিপন্ন হইল, বুঝিলাম, পুনর্ব্বার কুপের ফাঁদে পড়িয়াছি। বুঝিলাম, এবার আর আমার নিষ্কৃতি নাই; ইব্রাহিম আমার সন্ধান পাইয়া আমাকে হত্যা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াই এখানে আসিয়াছে। গভীর যন্ত্রণায় আমি গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিলাম।

যোয়ান চীৎকারশব্দে পল্লীবাসীদের সাহায্য প্রার্থনা করিল; কিন্তু পল্লী সেই স্থান হইতে বহু দূরে, তাহার আর্ত্তনাদ কাহারও শ্রবণগোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

ইব্রাহিম আমার গলা চাপিয়া ধরিয়া একটা পাথরের প্রাচীরের নিকট লইয়া গেল। বোধ হয়, সেই পাষাণপ্রাচীরে আমাকে নিষ্পেষিত করাই তাহার ইচ্ছা।

বুঝিলাম, যোয়ানের আশঙ্কা অমূলক নহে। কুপ আমাকে হত্যা করিবার জন্যই তাহার অনুচর ইব্রাহিমকে আমার অনুসরণ করিতে পাঠাইয়াছিল। কিন্তু সে কিরূপে জানিল, আমি এখানে আসিয়াছি? সে কি পূর্ব্ব হইতে এ জন্য প্রস্তুত ছিল?

আমি জীবনের আশা ত্যাগ করিলাম, আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইল; ঠিক সেই সময় হঠাৎ এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল! যেমন অদ্ভুত, সেইরূপ অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

শয়তান-মৎস্য

শয়তান-মৎস্য

সমুদ্রমধ্যে কত প্রকার ভীষণ জন্তু বিদ্যমান আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। মিঃ এন্, হেডেল্ গেষ্ট নামক লণ্ডনের জনৈক শিকারী দক্ষিণ-সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে নানাবিধ শিকার সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। দ্বীপপুঞ্জের সন্নিহিত সমুদ্রে তিনি একটি শয়তান-মৎস্য ধৃত করেন। এই অপূর্ব্ব জীবটিকে মৎস্যজাতীয় জীব বলিয়া ধারণা করা দুঃসাধ্য; কিন্তু প্রকৃতই এই রাক্ষসটি মৎস্য-জাতীয়। ইহার মস্তকের অংশ চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

আলোকিত চিঠির বাক্স

রাত্রিকালে কোনও বাড়ীতে চিঠিপত্র বিলি করিতে হইলে, বাড়ীর নম্বর খুঁজিয়া লইতে অসুবিধা হইতে পারে। এজন্য আমেরিকার ধনীরা নিজ নিজ বাড়ীর বাহিরে চিঠি ফেলিবার বাক্স রাখিয়া থাকেন। এই সকল বাক্স রাত্রিকালে বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত থাকে। বাড়ীর নম্বর বাক্সের গায় অঙ্কিত থাকে।

আলোকিত ডাকবাক্স

দূর হইতে সেই নম্বর দেখিয়া তন্মধ্যে পত্র নিক্ষেপ করা যায়। মাসিক পত্রাদির জন্য উক্ত বাক্সের নিম্নভাগে প্রশস্ত স্থান আছে। চিঠি-পত্র ফেলার সুবিধা এবং গৃহদ্বার আলোকিত উভয় কার্য্য একসঙ্গে সাধিত হইয়া থাকে।

বিচিত্র মানচিত্র

মোটর-যোগে যাঁহারা দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন, তাঁহাদে

বিচিত্র মানচিত্র

অবগতির জন্য লণ্ডনের মোটরওয়ালাসমিতি আবহ সংবা সংক্রান্ত ইংলণ্ডের মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। এই মানচি কোন্ সহরে কিরূপ আবহাওয়ার অবস্থা, তাহা সংক্ষেপে ব হইয়া থাকে। অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে, পরিবর্ত্তিত অবস্থা সংবাদও প্রত্যহ তাহাতে প্রদত্ত হয়। উহা পাঠে যে কো ব্যক্তি সকল সংবাদ অবগত হইতে পারেন।

দ্রুতগামী মোটর-দ্বিচক্রযান

মোটর-চালিত দ্বিচক্রযান দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া থাকে সত্য; কিন্তু তদপেক্ষা দ্রুতগতিতে গাড়ী চালাইবার জন্য জনৈক মার্কিণ
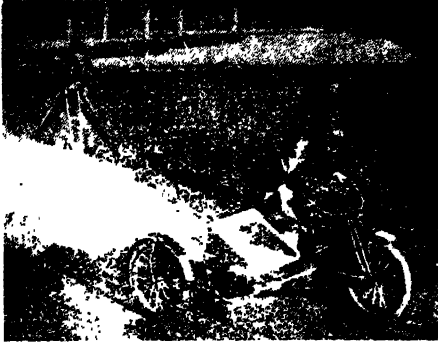
দ্রুতগামী মোটর-দ্বিচক্রযান

বৈজ্ঞানিক নূতন উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছেন। হাউই যে প্রণালীতে আকাশপথে উত্থিত হয়, সেই প্রণালীর দ্বারা মোটর-দ্বিচক্রযান চালাইলে গতিশক্তি আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। তবে ইহাতে একটা অসুবিধা আছে। হাউই-প্রণালী অবলম্বিত হইলে, গাড়ী হইতে প্রচুর ধূম নির্গত হইয়া থাকে। এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্যও বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বর্ণিত চিত্রে দ্বিচক্রযানের পার্শ্বে একটি ছোট আধার আছে। ইহাতে ইন্ধন বা জ্বালানি পদার্থ রক্ষিত থাকে।

বন্দুক ও রেডিওযুক্ত পুলিস

নিউ ইয়র্কের পুলিস দ্বিচক্রযানে রেডিও যন্ত্র ও বন্দুক লইয়া ভ্রমণ
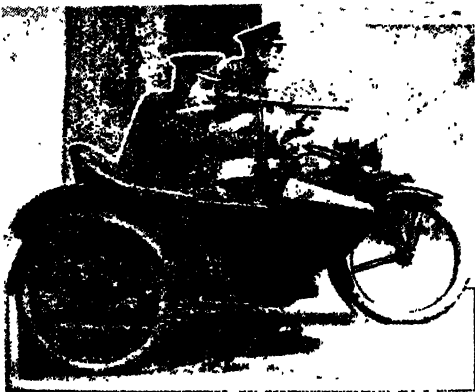
বন্দুক ও রেডিওযুক্ত পুলিস দ্বিচক্রযান

করে। দ্বিচক্রযানের সহিত একখানি গাড়ী সংলগ্ন থাকে। তথায় দ্বিতীয় পুলিস-প্রহরী বসিয়া থাকে। তাহার সম্মুখে কলের বন্দুক স্থাপিত, পার্শ্বে রেডিও যন্ত্র। এই বন্দুক হইতে মিনিটে ১ শত কুড়িবার গুলী নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

মোটর-বাহিত সামুদ্রিক পোত

ডেট্রয়েব জনৈক শিল্পী মোটর-চালিত একপ্রকার পোত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহার ডানার উপরে দুইটি মোটর সন্নিবিষ্ট থাকে।

মোটর-বাহিত সামুদ্রিক পোত

পোতখানি জলের উপর দিয়া যেন পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া উড়িয়া চলিতে থাকে। জলের উপর দিয়া যখন উহা চলিতে থাকে, সেই সময় তীরে উঠিবার চাকাগুলি উপরে গুটাইয়া রাখা হয়। কল ঘুরাইলেই চক্রগুলি নীচের দিকে নামিয়া আসে। এই পোতে ৬ জন আরোহী অনায়াসে অবস্থান করিতে পারে। দেড়শত ঘোড়ার শক্তিবিশিষ্ট মোটরযন্ত্রে ইহা পরিচালিত হয়। ঘণ্টায় এই পোত ১ শত ১৫ মাইল অতিক্রম করিয়া থাকে।

আবর্জ্জনাবাহী নূতন মোটর-ট্রাক্

বার্লিন নগরের রাজপথের আবর্জ্জনা সংগ্রহের জন্য একপ্রকার মোটরবাহিত গাড়ী ব্যবহৃত হইতেছে। এই ট্রাকের পার্শ্বের প্রশস্ত দ্বারপথে আবর্জ্জনা সঞ্চিত হয়। গাড়ী বোঝাই হইলে উহা স্থানান্তরে নীত হয়। আবর্জ্জনা ঢালিবার জন্য কোনপ্রকার অতিরিক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। ট্রাকের পার্শ্বস্থ আবরণ মুক্ত করিলে আপনা হইতেই সমস্ত আবর্জ্জনা নীচে পড়িয়া যায়। অবশ্য একটা কল ঘুরাইলেই ট্রাকের

আবর্জ্জনাবাহী নূতন মোটর-ট্রাক

মাথা উপরের দিকে উত্থিত হয়। মোটর সংলগ্ন থাকায় ট্রাক দ্রুত যাতায়াত করিয়া থাকে।

বিচিত্র মৎস্য

বিচিত্র মৎস্য

বর্ণিত চিত্রে মিঃ গেষ্ট এক জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্যের পরিচয় দিয়াছেন। এই মৎস্যটির নামকরণ হইয়াছে, ঈগল-মৎস্য। ইহার পুচ্ছটি দীর্ঘ এবং বেত্রদণ্ডের ন্যায়। অনেকটা শঙ্কর মাছের পুচ্ছের মত। মৎস্যটির ডানা ৫ ফুট বিস্তৃত।

বিশুদ্ধ বায়ুসঞ্চালন

রাজপথের বড় বড় ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি পরীক্ষা ও পরিষ্কারের জন্য মাঝে মাঝে মানুষ নামাইয়া দিতে হয়, কিন্তু অনেক সময় বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে ও বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে নানাবিধ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। কখনও কখনও পয়ঃ-প্রণালীর মধ্যে অগ্নিকাণ্ডও ঘটে। এ জন্য আমেরিকার মিনেসোটা অঞ্চলের কতিপয় বৈজ্ঞানিক পয়ঃপ্রণালীসমূহে কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে বিশুদ্ধ বায়ুপ্রবাহ সঞ্চালিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। একটি নল, গর্ত্তের মুখে প্রবিষ্ট করিয়া বাতাস সঞ্চালিত হয়। তাহাতে দুর্গন্ধ ও বিষাক্ত বাষ্প বাহির হইয়া অভ্যন্তরভাগে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করে। তখন শ্রমিকরা তন্মধ্যে অবাধে নামিয়া যায়। যতক্ষণ তাহারা তথায় কায করে, বিশুদ্ধ বায়ুপ্রবাহ অবিশ্রান্ত তন্মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া থাকে।
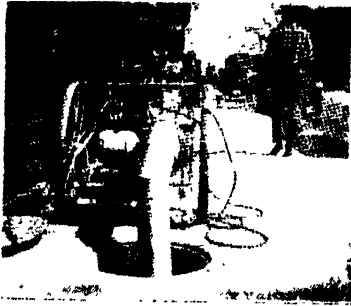
পয়ঃপ্রণালীমধ্যে বিশুদ্ধ বায়ুসঞ্চালন

কাগজের ঠোঙ্গায় খৈ ভোজন

ভুট্টা প্রভৃতির খৈ যে শুধু ভারতবাসীই ভোজন করে, তাহা নহে; শ্বেতাঙ্গ জাতিরাও মাখন সংযোগে উহা ভোজন করিয়া থাকে। তবে ভারতবাসীর মত হাতের সাহায্যে ভোজন করাটা প্রতীচ্য দেশের সভ্যতার বিরোধী। অধুনা পাতলা কাগজের কোণাকৃতি একপ্রকার ঠোঙ্গা প্রস্তুত হইতেছে। তন্মধ্যে মাখনমাখান ভুট্টা প্রভৃতির খৈ রাখিয়া সুসভ্য নর-নারী ভোজন করিয়া থাকেন। এক হাতে ঠোঙ্গাটি ধরিয়া তলদেশে ঈষৎ চাপ দিলেই খৈগুলি উপরের দিকে উঠে, তখন বিলাসী ও বিলাসিনীরা উহা মুখে লইয়া চর্ব্বণ করিতে থাকেন। ভামিনী-দিগের শুভ্র করকমল তাহাতে মাখনের দ্বারা কলুষিত হয় না।
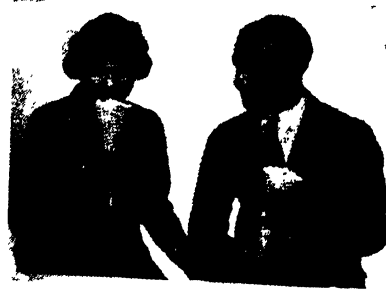
কাগজের ঠোঙ্গায় খৈ ভোজন

চালকপার্শ্বে শিশুর আসন

মোটরগাড়ী চালাইবার সময় শিশুকে নিরাপদে পার্শ্বে রাখিবার জন্য নানা নূতন প্রণালী উদ্ভাবিত হইতেছে। সম্মুখের আসনের উপর শিশুকে পার্শ্বে বসাইয়া রাখিবার জন্য ব্যবস্থা আছে এই চেয়ার ইচ্ছামত যে কোনও দিকে ঘুরান ফিরান যায়। এ আসনে শিশুকে বসাইয়া দিলে, তাহার পড়িয়া যাইবার কো সম্ভাবনাই থাকিবে না।

চালকপার্শ্বে শিশুর আসন

চশমা-সংলগ্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্র

চশমার ফ্রেমের সহিত ধারণ-যন্ত্রের (clip) দ্বারা সং একপ্রকার অণুবীক্ষণ যন্ত্র ইদানীং নির্ম্মিত হইয়াছে। ই

চশমা-সংলগ্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্র

অণুবীক্ষণ যন্ত্র ঘড়ী মেরামতের কার্য্যে শিল্পীর বিশেষ প্রয়োজনীয়। চিকিৎসক প্রভৃতিও এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা অনেক প্রকার কার্য্য করিতে পারেন। ইহাকে সহজে ব্যবহার্য্য অবস্থায় আনয়ন করিবার ব্যবস্থা আছে। চশমার সহিত সংলগ্ন থাকায় হস্তযুগল স্বাধীন-ভাবেই থাকে। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষুদ্রতম পদার্থও বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

নূতন প্রণালীর বর্ম্মাচ্ছাদিত গাড়ী

সম্প্রতি নূতন ধরণের বর্ম্মাচ্ছাদিত গাড়ীর গতিবেগ পরীক্ষিত হইয়াছে। উচ্চাবচ ভূমির উপর দিয়া এই মোটর-চালিত গাড়ী ঘণ্টায় ৬৫ মাইল ধাবিত হইয়া থাকে। সমতল পথে ঘণ্টায় ৮০ মাইল চলে। এই গাড়ীতে কলের কামান, বিমানপোত-বিধ্বংসী কামানও সন্নিবিষ্ট থাকে।
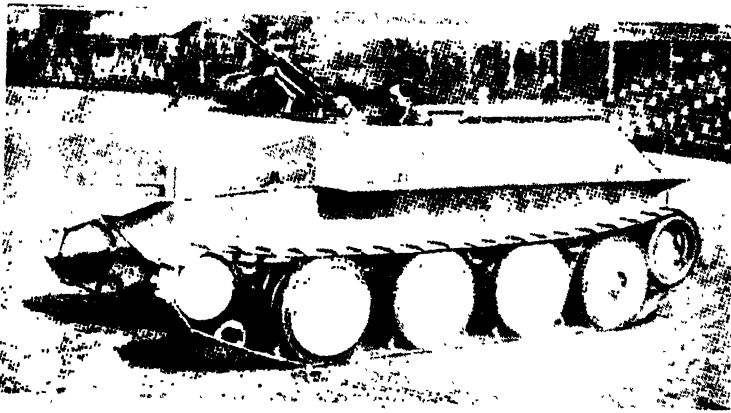
বর্ম্মাচ্ছাদিত কলের গাড়ী

চলমান জুতার দোকান

লস্ এঞ্জেলেস্ হইতে ৬০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে এক জন মুচীর জুতার দোকান আছে। এই দোকানটি একটি কাঠের গাড়ীর উপর স্থাপিত। প্রয়োজনমত এক স্থান হইতে স্থানান্তরে এই দোকান সরাইয়া লইয়া যাওয়া যায়। মুচীর কতিপয় অশ্বতর আছে। যে অঞ্চলে এই মুচী জুতা সরবরাহ বা মেরামত করে, সে দিকে কোন নগর বা গ্রাম নাই। শুধু শ্রমিকরা কোন না কোন কাযে এখানে দলবদ্ধ হইয়া আসে, তাহাদিগের জন্যই এই বিনা মা-নির্ম্মাতা দোকান করিয়াছে। যখন কোন কায না থাকে, তখন অশ্বতর-যোজিত চলমান দোকান অন্য স্থানে চলিয়া যায়।

চলমান জুতার দোকান

বিপুলদেহ ঘণ্টা

বৃহদাকার ঘণ্টা

ক্রয়ডনে একটি নূতন বৃহৎ ঘণ্টা নির্ম্মিত হইয়াছে। পৃথিবীর বিরাটকায় ঘণ্টাগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। ইহার ওজন প্রায় ৫ শত ২৩ মণ। নিউইয়র্ক সহরের কোন ধর্ম্মমন্দিরে এই ঘণ্টাটি সন্নিবিষ্ট হইবে বলিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। ঘণ্টাটির দেহে নানা প্রকার কারুকার্য্যও বিদ্যমান।
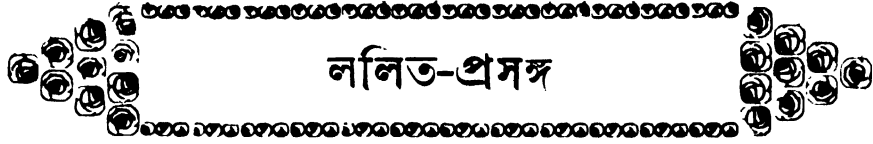
ললিত-প্রসঙ্গ

অধ্যাপক ললিতকুমারের তিরোধানে বাঙ্গালার শিক্ষাক্ষেত্র হইতে এক জন দিক্‌পাল অন্তর্হিত হইলেন,—সাহিত্যগগনের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক চিরতরে অনন্তের ক্রোড়ে মিশাইয়া গেল! ললিত বাবুর পরলোকগমনে প্রধানতঃ এই কথা মনে হয় যে, বিগত যুগের মনীষিবৃন্দের মধ্যে যে কয় জন প্রধান চিন্তাশীল লোকশিক্ষক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে এক জন। এই অতিকায় মনীষিসম্প্রদায়ের (race of giants) প্রায় সকলেই একে একে অন্তর্হিত হইতেছেন; তাঁহাদের দেখিয়া আমরা আপনাদিগকে খর্ব্বকায় (pigmies) মানব ভিন্ন আর কিছু ভাবিতে পারি না। অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য, কুঞ্জলাল নাগ, সারদারঞ্জন রায় এবং কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় চলিয়া গিয়াছেন, অধ্যাপক ললিতকুমারও এই পরলোকগত মনীষিসঙ্ঘের অনুগামী হইলেন। শিবরাত্রির সলিতার ন্যায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ ও অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র ও জ্ঞানরঞ্জন, বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রহিয়াছেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে দীর্ঘজীবী করুন এবং তাঁহারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তারে কল্যাণসাধন করিতে থাকুন।

অধ্যাপক ললিতকুমার অতি অল্পবয়সেই এম্‌-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া অধ্যাপনাকার্য্যে ব্রতী হন। তিনি বরিশালে রাজচন্দ্র কলেজ, কুচবিহার কলেজ, বহরমপুর কলেজ, রিপণ কলেজ ও তদানীন্তন মেট্রোপলিটান (অধুনা বিদ্যাসাগর) কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া শেষোক্ত কলেজে কার্য্য করিতে করিতেই বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রায় ৩২ বৎসর তিনি বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন; ফলতঃ তিনি 'বঙ্গবাসীর ললিত বাবু' বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। অধ্যাপক হিসাবে তিনি যে যশঃ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক শিক্ষকের স্পৃহা ও ঈর্ষ্যার বিষয়; কিন্তু ইহাও স্মরণীয় যে, ললিতকুমার যে প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ভগবানের দান ও পূর্ব্বজন্মের সাধনার নিদর্শন। চেষ্টার ফলে প্রতিভার সাক্ষাৎকার মিলে না—প্রতিভা লইয়াই মানব জন্মগ্রহণ করে ও অধ্যবসায়ে তাহার বিকাশমাত্র ঘটে। অধ্যাপক ললিতকুমার ছাত্রবৃন্দের প্রাণস্বরূপ ছিলেন; তাঁহার ক্লাশে বক্তৃতা শুনিবার জন্য ছাত্রবৃন্দ সেই ঘণ্টার আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। অন্যান্য কলেজের বহু ছাত্র তাঁহার অধ্যাপনা শুনিবার জন্য বঙ্গবাসী কলেজে সমবেত হইত। ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা এই তিনটি সাহিত্যে তাঁহার সমান অধিকার ছিল। সেক্‌সপীয়ারের নাটক অধ্যাপনায় তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল—তিনি কলেজে অমর কবি সেক্‌সপীয়ারের নাটকই পড়াইতেন এবং অধ্যাপনাকালে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত নাটকে যে স্থলে অনুরূপ ঘটনা বা ভাব পাইতেন, তাহাও বলিয়া যাইতেন। তাঁহার অধ্যাপনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি একবার পড়াইয়া গেলে তাহার উপর নূতন কিছু জ্ঞাতব্য বা শ্রোতব্য বিষয় অবশিষ্ট থাকিত না। যত দিক্ হইতে বিষয়ের আলোচনা করা যায়, তাহা করিয়া তবে তিনি নিবৃত্ত হইতেন। তাঁহার অধ্যাপনার মধ্যে যে আন্তরিকতা ছিল, তাহা অপরে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। তাঁহার সেক্‌সপীয়ার অধ্যাপনা অধ্যাপকের অধ্যাপনা ছিল না—প্রকৃতপক্ষে তাহা ভক্ত সমালোচকের আলোচনা ছিল। পঠনীয় বিষয়ে আন্তরিক ভক্তির জন্যই তাঁহার অধ্যাপনা এরূপ প্রাণস্পর্শিনী হইত। তিনি স্বয়ং এক জন ভাবুক রসগ্রাহী সমালোচক ছিলেন; সুতরাং তাঁহার উপদেশও সরস ও ভাবময় হইয়া উঠিত—অধ্যাপনাকালে তিনি বহুসময়ে স্থানকালপাত্র ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া পড়াইয়া যাইতেন। রিপণ কলেজের অধ্যাপক জানকী বাবুরও ঠিক এই ভাব ছিল। তিনিও সেক্‌সপীয়ার অধ্যাপনায় ললিত বাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—এই দুই বাঙ্গালী অধ্যাপক সেক্‌সপীয়ার অধ্যাপনায় অতুলনীয় যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ললিত বাবুর বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁহার রসিকতা। ললিত বাবুর ক্লাশে স্কুল-কলেজের ভীতিপ্রদ গাম্ভীর্য্য ছিল না, বরং তাহা আনন্দ-হাটে পরিণত হইত। তিনি এমন সরসভাবে পড়াইতেন এবং অধ্যাপনাকালে এমন সরস মন্তব্য প্রকাশ করিতেন যে, ছাত্রগণ হাসিয়া

আকুল হইত। এই কারণে ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে ক্লাশে পাইলে বিশেষ আনন্দিত হইত; অতি অশান্ত ও অনাবিষ্ট ছাত্রও তাঁহার ক্লাশে শান্ত হইয়া নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার অধ্যাপনা শ্রবণ করিত। অধ্যাপক হিসাবে তাঁহার আর একটি বিশেষ নিয়ম দেখিয়াছি যে, তিনি পড়াইবার পূর্ব্বে প্রাতঃকালে বিশেষভাবে পড়িয়া আসিতেন। যে পুস্তক তিনি পড়াইতেন, তাহার উপর যত সমালোচনা, টীকা বা টিপ্পনী আছে, তাহার কোনটিই বাদ পড়িত না। প্রাতঃকালে এই কাযে ব্যস্ত থাকিতেন বলিয়া এই সময়ে তাঁহার সহিত কেহ সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি একটু অসুবিধা বোধ করিতেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনার্থ শান্তিনিকেতনযাত্রী সাহিত্যিক-সঙ্ঘের মধ্যে অধ্যাপক ললিতকুমার ও চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদক গৌরহরি সেন হাওড়া প্লাটফর্ম্মে অপেক্ষা করিতেছেন। উভয়েই এক দিনে জন্মিয়াছিলেন।

অধ্যাপক ললিতকুমার যে কেবল শিক্ষকের প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার অপর বৈশিষ্ট্য—সাহিত্যসাধনা। তিনি যেরূপ বিদ্যা-মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন, অপর দিকে সেইরূপ বঙ্গবাসীর সারস্বত-পীঠের এক জন বিশিষ্ট পূজারী ছিলেন। কালে হয় ত অধ্যাপক ললিতকুমারকে লোক ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু সাহিত্যিক ললিতকুমার বাঙ্গালার সাহিত্য-গগনে উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে চিরকাল বিরাজ করিবেন। নট, ব্যবহারাজীব, চিকিৎসক, নেতা ও শিক্ষকের যশ চিরস্থায়ী নহে; কিন্তু বাণী-মন্দিরের সেবকবৃন্দ কল্পকল্পান্ত জয় করিয়া অমরত্ব লাভ করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার প্রধান দান—সমালোচনা ও রসরচনা। তিনি বিশেষভাবে সেক্স্পীয়ার ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। অধ্যাপনাকালে কোলরীজ, হ্যাজলিট, ল্যাম্ব, ডাউডেন, ব্র্যাডলী, ষ্টপফোর্ড-ব্রুক প্রভৃতির সমালোচনা পাঠে বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর লেখক সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাগুলির সমালোচনার ইচ্ছা জন্মে এবং তাহার ফলে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের অমর গ্রন্থরাজির নিষ্পীড়িত সুধা সংগৃহীত 'কাব্য-সুধা' নামক অতুলনীয় সমালোচনা-পুস্তক লাভ করিয়াছি। ললিত বাবু যে সময় 'কাব্যসুধা' প্রণয়ন করেন, সেই সময় এক শ্রেণীর সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যে বিকট বিলাতী গন্ধ পাইয়া যথাতথা সাহিত্যগুরুর নিন্দা রটাইতেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে রাহুমুক্ত করিবার জন্য ললিতকুমার তাঁহার অতুল লেখনী অবলম্বন পূর্ব্বক বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকার চারিটি চাকচিত্র নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিলাতী মনীষী সমালোচকবৃন্দ কাব্যসমালোচনায় তাঁহার আদর্শ ছিল। তিনি চরিত্রচিত্র-প্রদর্শনে কদাপি স্বাধীন ভাব না দেখাইয়া আলোচ্য চরিত্রের ভিতর দিয়া কি ভাবে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই দেখাইতেন। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনায় তাঁহার 'কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব' সাহিত্যে স্থায়িস্থান অধিকার করিয়াছে। তাঁহার শেষ সমালোচনা—'কৃষ্ণকান্তের উইলের আলোচনা'; নানা কারণে এই গ্রন্থ তিনি মনের মত করিয়া লিখিতে পারেন নাই, এ কথা তিনি প্রায়ই বলিতেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন এবং বঙ্কিমসমালোচকবৃন্দের মধ্যে যে তাঁহার স্থান প্রথম ও প্রধান, তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবসর নাই। এতদ্ভিন্ন 'সখী', 'প্রেমের কথা' গ্রন্থেও বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা আছে। তাঁহার সাহিত্যে অধিকার যে কি বিশাল, তাহা প্রত্যেক সমালোচনার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালা, ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে এমন সমান অধিকার অতি অল্প সমালোচকের মধ্যে দেখা যায়। তিনি নানা সাহিত্যের আলোচনা করিলেও তাঁহার বিশেষ ঝোঁক সেক্সপীয়ার ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপর দেখা যাইত। অধুনাতন ইবসেন, বার্ণার্ড-শ, মেটারলিঙ্ক প্রভৃতির কথা তাঁহার নিকট উল্লেখ করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু তিনি সাহিত্যরসে সেক্সপীয়ারের উপর কাহাকেও কোন দিন স্থান দেন নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে যে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইয়াছে, তাহার জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন।

স্থানে অস্থানে প্রেমের পসার দেখিয়া তিনি চক্ষুরোগের ব্যবস্থা খুঁজিয়াছেন। সাহিত্যে গণিকাতন্ত্র প্রবন্ধে ইহার জন্য চিন্তিত হইয়াছিলেন। যখন এই অনাচার 'নারায়ণ' পত্রে প্রথম আরম্ভ হয়, তখন তিনি 'ডালিম' গল্পের উত্তরে 'মস্কট' গল্প লিখিয়াছিলেন ; কিন্তু কি জানি, কি কারণে তাহা প্রকাশ করেন নাই। সাহিত্যে অনাচার দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বিকট রুচিবাগীশও ছিলেন না। ভাষা-সংস্কার প্রবন্ধে তিনি রুচিবাগীশদের প্রতি যে তীব্র কশাঘাত করিয়াছিলেন, তাহা সাহিত্যপ্রিয় অনেকেই ভুলেন নাই। এই প্রবন্ধ তিনি সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত হওয়ার পর আর ছাপান নাই। ইহার মূলে একটু ইতিহাস ছিল, সে অপ্রীতিকর বিষয়ের আলোচনা করিলাম না।

আমার মনে হয়, সকল বিষয়ে তিনি মধ্যম পথ (golden mean) অবলম্বন করিয়া চলিতেন। কি সাহিত্যে, কি ধর্ম্মে, কি সমাজে, কি রাজনীতিতে সর্ব্বত্রই তাঁহাকে একটি মাঝামাঝি পথ ধরিয়া চলিতে দেখিয়াছি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের সংঘাতকালে এইরূপ একটা সামঞ্জস্য (compromise) রাখাই চিন্তাশীলতার লক্ষণ। তিনি চলিতভাষা বনাম সাধুভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ অনুসরণের উপদেশ দিতেন ; বানান, সমাস, সংস্কৃতজ শব্দে সংস্কৃত বানান রাখিবার পক্ষপাতী ছিলেন, শ্লীল ও অশ্লীল বিচারেও এইরূপ একটা সামঞ্জস্যের পক্ষপাতী ছিলেন। উৎকটরুচি-বাগীশতা বা বেপরোয়া বিপর্য্যয় কাণ্ড এই দুই-ই তিনি ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন।

সাহিত্য-সমালোচনায় তিনি যেরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, রসরচনায় তিনি সেইরূপ সুনিপুণ ছিলেন। তাঁহার লেখার মধ্যে যেরূপ, কথাবার্ত্তায় পর্য্যন্ত সেইরূপ সরস পরিহাসপটুতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। কেবল তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য এবং তাঁহার সহিত গল্প করিবার লোভে আমরা অনেক ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই অধ্যাপকগণের গৃহে আসিয়া বসিতাম। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে যে হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেটি তাঁহার অপর মৌলিক দান। তাঁহার রসিকতার মধ্যে একটা মার্জ্জিত ভাবের পরিচয় পাওয়া যাইত। এই রসিকতা শ্লেষপূর্ণ বা বিদ্রূপাত্মক ছিল না—ইহা সম্পূর্ণতঃ শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত (intellectual)। ললিত বাবুর যে রসিকতা (humour), তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে নানা সাহিত্যে বিশেষ অধিকার থাকার প্রয়োজন। বিশেষভাবে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যের ভাল ভাল গ্রন্থের সহিত পরিচয় না থাকিলে তাহার সূক্ষ্ম রস হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। প্রকৃত কথা বলিতে কি, মার্কপ্যাটিসন মিল্টন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সে কথা ললিত বাবুর রসরচনা সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। তাঁহার রচনা সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম করা পাণ্ডিত্যের প্রমাণ-স্বরূপ (test of scholarship)। রস-রচনায় তিনি তিন জন ইংরাজ গ্রন্থকারকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন —ল্যাম্ব, ষ্টিভেন্‌সন্ ও ষ্টার্ণ ; কিন্তু ল্যাম্বই তাঁহার বিশেষ আদর্শস্বরূপ ছিলেন। অনেকেই অনুযোগ করিতেন যে, ললিত বাবু অত বড় পণ্ডিত হইয়া, গরুর গাড়ী, পাণ, ভোজন সাধন প্রভৃতি সামান্য রচনায় তাঁহার প্রতিভার অবমাননা করিলেন। তাঁহার মুখ হইতেই ইহার উত্তর পাইয়াছিলাম যে, সামান্য বিষয় লইয়া যে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে পারে, তাহার প্রমাণ ল্যাম্ব এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ ল্যাম্বের Dissertation on Roast pigএর উল্লেখ পূর্ব্বক বলেন যে, এত ছোট বস্তু লইয়াও Lamb কি অদ্ভুত সাহিত্য-সৃষ্টিই না করিয়াছেন। সত্যই ললিত বাবুকে বাঙ্গালা সাহিত্যের চার্লস ল্যাম্ব বলা যায়—সেই রীতিতে লেখা, সেই পাণ্ডিত্য, সেই সেক্সপীয়ারপ্রীতি, সেই রহস্যের ভাব (mystification) সমস্তই ললিতকুমারে বর্ত্তমান। তাঁহার রসরচনায় ইন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলালের কশাঘাত নাই, রবীন্দ্রনাথের তীব্রতা নাই, দীনবন্ধুর বন্ধুর ভাব (roughness) নাই, বা ত্রৈলোক্যনাথের অদ্ভুত (old and grotesque) রস নাই —ইহার মধ্যে কেবল পাণ্ডিত্যের স্মিতশোভা বিরাজমান। তিনি যেরূপ হাসিতে হাসিতে পড়াইতেন, আবার সেইরূপ সরস হাস্যরসের সহিত শিক্ষা দিতেন ; প্রমাণ তাঁহার 'ব্যাকরণ বিভীষিকা,'—তিনি ব্যাকরণের বিভীষিকা উড়াইয়া দিয়া কি সরসভাবে যে ব্যাকরণসমস্যার সমাধান করিয়াছেন, এই গ্রন্থ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ব্যাকরণ-বিভীষিকায় তাঁহার ক্ষমতা যে কি অসাধারণ ছিল, তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। আমার মনে হয় যে, তাঁহার জীবনের একটি লক্ষ্য ছিল—শিক্ষার সহিত আনন্দ-দান এবং আনন্দের সহিত শিক্ষাদান। এই আনন্দের সহিত শিক্ষাদানের উদ্দেশে তিনি 'ছড়া ও গল্প,' 'আহ্লাদে আটখানা' প্রভৃতি শিশুপাঠ্য

গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে যে দিন 'অনুপ্রাসের অট্টহাস' প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে সভাগৃহ প্রতি মিনিটে হাস্যরোলে বিকম্পিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদকতায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে যে সকল সাহিত্য-সভার অধিবেশন হইত, পূর্ণিমা-সম্মিলনে যে আনন্দের উৎস খুলিত, কলিকাতায় আর সে দৃশ্য এখন দেখা যায় না। ললিত বাবু যে কয়টি সভায় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে যেরূপ লোকসমাগম হইত ও যে ভাবে পরে আলোচনা চলিত, সে ভাবের সভা এখন অতি বিরল। এক্ষণে রাজনীতির খোলকরতালে সহর মশগুল, সাহিত্যের বৈঠক এখন আর জমে না।

সাহিত্যের বৈঠক গড়িয়া তোলাতেও ললিত বাবুর একটা বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত। পূর্ব্বে প্রায় সাহিত্য-সম্মেলনের প্রত্যেক বৈঠকে উপস্থিত থাকিতেন এবং বহু সাহিত্য-সভায় যোগদান করিতেন। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের গৃহে প্রায় সাহিত্য-রথিবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া নানারূপ সাহিত্য আলোচনা করিতেন; অধ্যাপক ললিতকুমারও তথায় উপস্থিত থাকিতেন। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের জন্য তাঁহাকে বহু সময় আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি; তিনি রামেন্দ্রসুন্দরকে friend, philosopher, guide মনে করিতেন। আমাদের কলেজে একটি অধ্যাপক-সঙ্ঘ তাঁহার উদ্যমে ও অন্যান্য সহকর্ম্মীর সাহচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতিমাসে সকল অধ্যাপক মিলিত হইয়া নানা আলোচনা করিবেন ও পরস্পরের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিবেন, ইহাই ছিল সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। এই সমিতির অধিবেশনে ভূরিভোজনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ইহার প্রধান আকর্ষণ ছিল ললিত বাবুর প্রবন্ধ-পাঠ। তাঁহার যে সকল প্রবন্ধ মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইত, পূর্ব্বে তাহা অধ্যাপক-সঙ্ঘের অধিবেশনে পঠিত হইত। নূতন লেখকদিগকে তিনি উৎসাহ পরামর্শ দিয়া লেখাইবার বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, অধ্যাপকের জীবনে একটা hobby বা ঝোঁক থাকা মন্দ নহে। এ কার্য্যে সকলকেই কিছু পড়াশুনা করিতে হয়; কিন্তু ইহার সহিত যদি একটু লেখার চর্চ্চা করেন, তাহা হইলে এই পড়াশুনা পূর্ণতা লাভ করে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখককেও তিনি 'সহজিয়া,' 'আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য', 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' প্রভৃতি বহু প্রবন্ধ রচনায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। কোন কোন প্রবন্ধ তিনি সংশোধন পর্য্যন্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি প্রবন্ধ-লেখকদিগকে যেরূপ উৎসাহ দান করিতেন, তাহাতে প্রবন্ধ রচনা করিয়া ললিত বাবুকে না শুনাইতে পারিলে কেহই আনন্দ লাভ করিতেন না।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ললিতকুমার

কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি আমাদিগের 'গুরূণাং গুরুতমঃ' ছিলেন—আমরা অনেকেই তাঁহার শিষ্যের শিষ্য-স্বরূপ ছিলাম; কিন্তু তাঁহার সহৃদয় ও অমায়িক ব্যবহারে আমরা ছোট-বড়'র ভেদ কোন দিন বুঝিতে পারি নাই। তিনি সকলের সহিত সমানভাবে মিশিতেন ও সমানভাবে কথা কহিতেন, পরিহাস-বিদ্রূপ করিতেন অথচ তাঁহার নিকটে আমরা বালকের ন্যায়। তিনি আমাদের সকল কার্য্যে সহায়, সুহৃদ্ ও পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত ন্যায়-নিষ্ঠা, বিচারবুদ্ধি, সত্যপ্রিয়তা ও সহানুভূতির জন্য তিনি সকল সহকর্ম্মীর একান্ত প্রিয় ও আত্মীয় হইয়াছিলেন। সত্যপ্রিয়তার জন্য সময় সময় তাঁহাকে অপ্রিয় ও কঠোর হইতে দেখা গিয়াছে; কিন্তু তাহার জন্য কখন তাঁহার মধ্যে সহৃদয়তার অভাব দৃষ্ট হয় নাই। আমরা তাঁহাকে হারাইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে পরম আত্মীয় হারাইয়াছি।

তিনি আমাদের সহিত কিরূপ ভাবে পরামর্শ

মিশিতেন, কিরূপ ভাবে আপনার করিয়া লইতেন, অনেকে তাহা ধারণা করিতে পারিবেন না। আমি যখন বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপকতা-কার্য্যে প্রথম নিযুক্ত হই, সেই মাসের অধ্যাপক-সঙ্ঘের অধিবেশনে তিনি আমায় বিদ্রূপচ্ছলে বলিলেন—"আমি বাঁড়ুয্যে ও আপনি মুখুয্যে, আমরা পাল্টী ঘর।" আমি বলিলাম,—"আপনি নিকষ কুলীন," —বাস্তবিক পাণ্ডিত্যের নিকষে তিনি খাঁটী সোনা, তাঁহার পার্শ্বে আমি খাদ বা মেকী মাত্র। এরূপভাবে আমাদের ন্যায় বয়ঃকনিষ্ঠেরও সহিত কত বিদ্রূপ-উপহাস চলিত! কোন পুস্তক পড়িয়া ভাল লাগিলে, তিনি কলেজের অন্যান্য অধ্যাপককে তাহা পড়িতে দিতেন এবং পরে সেই বিষয়ে আলোচনা করিতেন। তিনি এই ভাবে তাঁহার নিম্নতন সহকর্ম্মিবর্গকে গড়িয়া তুলিতেন। কোন পুস্তক অধ্যাপনার জন্য কেহ তাঁহার নিকট সাহায্য চাহিলে, তিনি আপনার সংগৃহীত পুস্তক ও আপনার লিখিত মন্তব্য ও টিপ্পনী প্রভৃতি দিয়া পাঠকার্য্যের সহায়তা করিতেন। একাধারে তিনি আমাদিগের গুরু ও সুহৃদ্ ছিলেন—কথাবার্ত্তায়, হাস্য-পরিহাসে, সাহিত্য-আলোচনায়, সামাজিক প্রসঙ্গে, লোক-চরিত্র-বিশ্লেষণে, শিক্ষাসংক্রান্ত আলাপে তিনি বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক-'গোষ্ঠী' সজীব করিয়া রাখিয়াছিলেন। কোন কোন সময় তিনি বয়সের পার্থক্য না মানিয়া আমা-দের সহিত অনেক সরস কথার অবতারণা করিতেন, এ জন্য কেহ কেহ, বিশেষতঃ প্রবীণ পণ্ডিত মহাশয় সামান্য বিরূপ হইতেন। তাহার উত্তরে ললিত বাবু হাসিয়া বলিতেন—এ সকল রসিকতা নষ্ট হইবে, ইহাদেরও কিছু দেওয়া চাই, এবং এই বলিয়া তিনি আচার্য্য কৃষ্ণকমলের নিকট যে সকল গল্প শুনিয়াছিলেন, তাহা বলিতে আরম্ভ করিতেন।

জীবনের শেষভাগে তাঁহার রসধারা ক্ষীণ হইয়া যাইতে-ছিল। উপর্য্যুপরি শোকে-তাপে তাঁহার রসের ফোয়ারা শুকাইয়া শোকের সাহারায় পরিণত হইতেছিল। ভিতরে তীব্র অনুভূতি, কিন্তু বাহিরে সহাস্য মুখ, সহজে লোক তাঁহার হৃদয়ের ভাব ধরিতে পারিত না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সে মর্ম্মন্তুদ অসহ্য যন্ত্রণা কথাবার্ত্তা বা লেখার মধ্যে ফুটিয়া উঠিত। তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের শোকাকুল কাহিনীর উল্লেখে তিনি চঞ্চল হইয়া পড়িতেন। আমরা কদাপি এ সকল ঘটনার উল্লেখ তাঁহার সম্মুখে করিতাম না। তিনি ইদানীং রোগজীর্ণদেহ ও শোকদীর্ণ হৃদয়ে মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন—মৃত্যু তাঁহার নিকট যেন পরম মিত্র বলিয়া বোধ হইত। "আমি আবার মরিব?" "আমার আবার মরণ হইবে?" "এখনও কত দেখিতে হইবে?"—এই ভাবের কথা তাঁহার মুখে শুনা যাইত। প্রথমতঃ নববিবাহিত কৃতী জ্যেষ্ঠ পুত্রের মরণ, পশ্চাৎ কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু, পরে বিবাহিতা কন্যার মৃত্যু ও শেষে সহধর্ম্মিণীর বিয়োগে তিনি অত্যন্ত আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বারাণসীধামে নানা রোগে ভুগিয়া যখন তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন, তখন ললিত বাবুর জীবনে ধর্ম্মবিষয়ে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। তিনি অল্পবয়সে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং ধর্ম্মবিষয়ে রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন। তবে সব বিষয়ে তিনি মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করিতেন—তাঁহার মধ্যে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের গোঁড়ামিও ছিল না, অপরন্তু 'ইয়ং বেঙ্গলের' বিকট অনাচারও ছিল না। নানা তীর্থস্থানে তিনি যখন ভ্রমণ করিতে যাইতেন, তখন নৈষ্ঠিক হিন্দুর ন্যায় তিনি তথাকার তীর্থকৃত্যাদি করিতেন। বৃদ্ধবয়সে বারাণসীবাসের সঙ্কল্প তাঁহার মনে সর্ব্বদা বিরাজ করিত; পুত্র উপার্জ্জনক্ষম হইলে সস্ত্রীক বারাণসী-বাস করিবেন, এ কথা প্রায়ই বলিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী অত্যন্ত ধর্ম্মচারিণী ছিলেন—তাঁহারও কাশী-প্রাপ্তির মনোবাসনা খুব দৃঢ় ছিল। সাধ্বী স্ত্রী পতির পূর্ব্বেই দিব্যলোকে গমন করিলেন—কিন্তু পরলোকে তাঁহাকে বহু দিন পতিবিরহ সহ্য করিতে হইল না, পতিও অনুগামী হই-লেন। ললিত বাবু সস্ত্রীক 'কেদার-বদরী' তীর্থযাত্রা করিয়া-ছিলেন, তাহার বিবরণ 'মাসিক বসুমতী'র পাঠকবৃন্দ জানেন। বারাণসীতে রোগভোগের পর কলিকাতায় আসিয়া তিনি কয়েকখানি পুরাণ আনিয়া পাঠ আরম্ভ করেন এবং ব্রাহ্মণের করণীয় কর্ম্মে অধিকরূপে মনোযোগ দেন। তিনি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন এবং ভগবতীর মাতৃমূর্ত্তির প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল। কিন্তু উপাসনায় শাক্ত হইলেও তিনি কীর্ত্তনের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। আমাদিগের সহকর্ম্মী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কীর্ত্তন শ্রবণে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন; বিরহের পদ শুনিতে শুনিতে তাঁহাকে অশ্রুবর্ষণ করিতে দেখিয়াছি।

ললিত বাবু কখনও রাজনীতির আসরে নামেন নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি যে রাজনীতি ভয়ের সহিত

দেখিতেন, এমন নহে। তিনি বলিতেন যে, যত দিন শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে নিযুক্ত আছি, তত দিন সাক্ষাৎসম্বন্ধে রাজনীতির আসরে নামিতে পারি না, কিন্তু এখন জলে বাতাসে রাজনীতির প্রভাব—দেশের এরূপ সময়ে রাজনীতি আলোচনায় যোগদান না করিয়া থাকিতে পারা অসম্ভব। বর্ত্তমান যুগের সকল রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁহার সহানুভূতি ছিল। তিনি মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলনে খদ্দর পরিয়া যোগদান করিয়াছিলেন—বিলাতী বর্জ্জন স্বদেশী আমল হইতেই করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রসূত দাস-মনোভাবের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা ছিল। তিনি স্বাধীনতা-মন্ত্রের উপাসক ছিলেন—নির্ভীকতা ও তেজস্বিতা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন; মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে তাহাই তাঁহার মূল বিষয় ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী হুমকির উপর তিনি খড়্গ-হস্ত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়েও বহু অনাচার প্রবেশ করায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিতেন। আসল কথা, ভণ্ডামী বা স্বার্থপরতা তিনি মোটেই দেখিতে পারিতেন না। রাজনীতিক্ষেত্রে কপটাচার, স্বার্থপরতা, দলাদলি দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন। স্বাধীনতা বনাম ডমিনিয়ন ষ্টেটাসের কথা উঠিলে তিনি বলিতেন যে, ইংরাজ-রাজের কাছে দুই বস্তুই সমান, প্রাপ্তির আশাও তথৈবচ; এ ক্ষেত্রে 'খোসখবরের ঝুটাও ভাল'র মত যেটি মহত্তর ও উচ্চতর, সেইটাই ধরা ভাল—ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ছাড়িয়া ডমিনিয়ন ষ্টেটাস কেন?

অধ্যাপক ললিতকুমারের পরলোকগমনে আমরা এক জন সুপণ্ডিত শিক্ষক, বঙ্গভাষার অকৃত্রিম সেবক এবং নির্ভীক কর্ত্তব্যনিষ্ঠ তেজস্বী মানুষের আদর্শ হারাইলাম। তিনি একাধারে গুরু, উপদেষ্টা, বন্ধু, হিতৈষী ছিলেন; তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, সত্যপ্রিয়তা, ন্যায়নিষ্ঠা, সরস আলাপ, পরিহাসপটুতা তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি ছাত্রবর্গের হৃদয় কি ভাবে অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মহাপ্রস্থানের পর বিশেষভাবে দেখিয়াছি। তিনি যেরূপ ছাত্রবর্গকে পুত্রের মত ভালবাসিতেন, ছাত্রগণও সেইরূপ তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করিত। তাঁহার শেষের দিন যে নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, এ কথা তিনি পূর্ব্ব হইতে যেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পূজার পূর্ব্বে তিনি একটি ক্লাশে পড়াইতে পড়াইতে বলেন—"কি জানি, পূজার পর আর ফিরিয়া আসিয়া পড়াইতে পারিব কি না, টেম্পেষ্ট নাটকের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল দৃশ্যটি পূজার ছুটীর পূর্ব্বেই পড়াইব।" এই বলিয়া তিনি কয়েকটি দৃশ্য বাদ দিয়া 'ফার্দ্দিনান্দ ও মিরান্দার বিবাহের বাগদান' পড়াইতে আরম্ভ করেন। এরূপ তিনি কখন করিতেন না—তাঁহার আত্মা পূর্ব্ব হইতে কি ভবিষ্যৎ জানিতে পারিয়াছিল? ছুটীর দিন ললিত বাবু ও আমি একসঙ্গে কলেজ হইতে বাহির হই, বিদায়কালে আমি বলিলাম—"আবার এক মাস পরে দেখা হইবে।" তিনি উত্তর করিলেন—"যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে।" কি কুক্ষণেই এ কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল, পূজার পর তিনি আর কলেজে আসিতে পারেন নাই। অবশ্য আর একবার রোগ-শয্যায় তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন তিনি অতি দুর্ব্বল, কথা বলিতে অসমর্থ বলিলেই হয়। তিনি আজ চলিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার উপদেশ শুনিতে পাইব না, তাঁহার সরস আলোচনা আর শুনিব না; তাঁহার অভাবে আজ বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক-গৃহ প্রাণহীন হইয়া গেল। তিনি বঙ্গবাসী কলেজে সর্ব্বত্রই আনন্দের

পরিণত বয়সে ললিতকুমার

ধারা প্রবাহিত করিয়া রাখিতেন—আজ সে আনন্দের জ্যোতিঃ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। ললিত বাবুর মৃত্যুর পর ছাত্রবর্গ তাঁহার দেহ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া শোকাবনত-হৃদয়ে শব বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রায় সকল অধ্যাপক ও সহস্র-সংখ্যক ছাত্র তাঁহার মৃতদেহের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি-প্রদর্শনের জন্য অনুগমন করিয়াছিল। সে দৃশ্য দেখিয়া মনে হইয়াছিল, এ যেন কৃতী অধ্যাপকের বিজয়া। যে ভক্তিসহকারে ভক্ত দেবদেহ পবিত্র জাহ্নবীসলিলে বিসর্জ্জন করে, সেই ভক্তি লইয়া আমরা তাঁহার অন্তিমকৃত্য করিয়া আসিয়াছি। ছাত্রবর্গ স্কন্ধে করিয়া কাষ্ঠ লইয়া আসিয়া তাঁহার চিতা সাজাইয়াছে—অধ্যাপক-জীবনের চরম কাম্য যাহা, সেই ছাত্রগণের সুবিমল ভক্তি তিনি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তিনি আজ আমাদের স্থূল চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার দেবমূর্ত্তি আমাদের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। আমরা হিন্দু, স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে—ইহলোক ও পরলোক দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ, ইহা বিশ্বাস করি; তিনি পরলোকগত হইলেও আমাদের সহিত তাঁহার যে সুমধুর সম্পর্ক, তাহা ছিন্ন হয় নাই। তিনি গিয়াছেন বটে, তবে তাঁহার সাধনার আদর্শ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। তিনি তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্যের হৃদয়-মন্দিরে অধিষ্ঠিত আছেন। তাহাদের হৃদয়ে যে প্রেরণা দিয়া গিয়াছেন, জ্ঞানজীবনে তাহাদের মধ্যে যে রসানুভূতির উদ্বোধ করিয়াছেন, যে সাহিত্য-প্রীতির সঞ্চার করিয়াছেন—সেই কর্ম্মধারা ত নষ্ট হইবার নহে, নিত্য প্রবহমান। এই কর্ম্মপ্রবাহ অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি তাঁহার ছাত্র ও সহকর্ম্মীদের মধ্যে নিত্য সজীব রহিয়াছেন। আমরা যদি এই মহৎ ও উচ্চ আদর্শ নিজের জীবনে অনুসরণ করিতে পারি, তবেই আমরা ধন্য—কৃতার্থ হইব।

বামপার্শ্ব হইতে—
জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺শিশিরকুমার, কোলে জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান্ কমলকৃষ্ণ, স্ত্রী ৺জগৎ-তারিণী, সম্মুখে কনিষ্ঠা কন্যা ৺অন্নপূর্ণা, পুত্র শ্রীমান্ সলিলকুমার।

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (অধ্যাপক)।

অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যে সকল কীর্ত্তিমান্ পুরুষ হঠাৎ নক্ষত্রের মত এক দিন অন্ধকার গগনের গায়ে জ্যোতির রেখা টানিয়া দিয়া অদৃশ্য হইয়া যান, তাঁহাদিগকে হারাইয়াছি, এ কথা বুঝিতে বিলম্ব হয়। ইঁহাদের মৃত্যুতে ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে যে সীমারেখা, তাহা বিলীন হইয়া যায়, জীবন-মরণের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া যায়। অধ্যাপক ললিতকুমার যে নাই, ইহা সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সে দিনও তিনি পূর্ণ গৌরবে অধ্যাপনায়, হাসিতে, গল্পে ছাত্র-সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছেন, সে দিনও তিনি সাহিত্যের মধ্যে রসের ফোয়ারা ছুটাইয়া জীবন্ত প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছেন, আর আজ তিনি নাই!

অধ্যাপক ললিতকুমারের পাদপীঠতলে বসিয়া তাঁহার জ্ঞানগর্ভ অথচ সরস সাহিত্য-রসের বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তথাপি তাঁহাকে বহু দিন হইতে জানিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। বঙ্গের সাহিত্য-সেবীদের মধ্যে অতি অল্প লোকই আছেন, যিনি পরলোকগত অধ্যাপক মহাশয়কে তাঁহার সাহিত্যের মধ্য দিয়া জানিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। আমার সহিত পরিচয় আরও একটু ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ হইয়াছিল। আমি যখন কলিকাতা য়ুনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক, তখন আমি তাঁহার সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলাম, উৎসাহ ও সহানুভূতি পাইয়াছিলাম। আমারই অনুরোধে তাঁহার 'অনুপ্রাসের অট্টহাস' ও 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা' প্রভৃতি বক্তৃতা জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। যাঁহারা সে সকল বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা জানেন যে, অধ্যাপক ললিতকুমারের বক্তৃতা শুনিবার জন্য কিরূপ জনসমাগম হইত। সুপ্রশস্ত হলে লোকের দাঁড়াইবার স্থানও কুলাইত না। শ্রোতৃবর্গের করতালি ও অট্টহাসিতে বক্তাকে বহুক্ষণ থামিয়া বক্তৃতা শেষ করিতে হইত। এর পরে আমার একখানি পুস্তক তিনি 'আর্য্যাবর্ত্ত' নামে মাসিক পত্রিকায় সমালোচনা করেন। তাঁহার সমালোচনায় উৎফুল্ল হইয়া আমি তাঁহাকে লিখিলাম যে, 'আমার পরম সৌভাগ্য যে, ব্যাকরণ-বিভীষিকাকারের কবল হইতে এত সহজে নিষ্কৃতি পাইয়াছি।' তাহার উত্তরে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা ললিত বাবুর সূক্ষ্মদৃষ্টিরই পরিচায়ক। তিনি আমার লেখার মধ্যে কয়েকটি ব্যাকরণের ভুল দেখাইয়া লিখিলেন, 'এগুলি আমার দৃষ্টি এড়ায় নাই। কিন্তু ব্যাকরণের ভুল ধরা ব্যতীত সাহিত্যের আরও বড় কায আছে। আপনার অনুরোধেই ভুলগুলি দেখাইলাম, কিছু মনে করিবেন না। পরবর্ত্তী সংস্করণে উপকারে আসিবে।' কিছু ত মনে করিলামই না, শিক্ষালাভ করিলাম যথেষ্ট। অহঙ্কার কিছু খর্ব্ব হইলেও ললিত বাবুর পাণ্ডিত্য।

সাহিত্য-রস-সুরসিক সমালোচক ললিতকুমার

সঙ্গে অপরিসীম সংযম ও উদারতা দেখিয়া তাঁহাকে মনে মনে ধন্যবাদ না দিয়া পারিলাম না।

ইনষ্টিটিউটে বক্তৃতার প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় মনে হইতেছে—ললিত বাবুর তীক্ষ্ণ আত্মসম্মানবোধ। আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, এমন কোনও কায তিনি করিতে চাহিতেন না। কুলীন ব্রাহ্মণ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের আধার, বিপুল যশের অধিকারী ললিতকুমার কখনও কাহারও নিকট মাথা নোয়াইতে রাজি হয়েন নাই। আমার বোধ হয়, এই জন্যই তিনি কোনও কার্য্যে অগ্রসর হইয়া আসিতে কুণ্ঠিত

ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনায় যে তিনি প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, ইহা শিক্ষিত সমাজে সকলেই স্বীকার করিবেন। তিনি সাহিত্যের সহিত যে সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্য রসবস্তু। ইহা নীরস অর্থ-তালিকার পৌনঃপুনিক আবৃত্তিমাত্র নহে; কিন্তু সাহিত্যের অধ্যাপনায় এই রস কত জন ফুটাইয়া তুলিতে পারেন? ললিত বাবু সাহিত্যকে সাহিত্যের মত করিয়াই পড়াইতেন। রসের স্ফুরণে তাঁহার অধ্যাপনা স্বভাবতঃই সরস হইত,

মেট্রোপলিটান কলেজের ১৯০০ খৃষ্টাব্দের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ।
উপবিষ্ট (বাম পার্শ্ব হইতে) (১) জ্ঞানরঞ্জন ব্যানার্জ্জি (২) কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য (৩) এন্. ঘোষ (৪) নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন (৫) ক্ষেত্রনাথ ঘোষ (৬) মোহিতচন্দ্র সেন।
পশ্চাতে দণ্ডায়মান (বাম পার্শ্ব হইতে) (১) শ্রীযুত মুক্তিদারঞ্জন রায় (২) শ্রীযুত বরুণচন্দ্র দত্ত (৩) সুধামাধব মল্লিক (৪) সারদারঞ্জন রায় (৫) শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (৬) ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তৎপশ্চাতে ছাত্রবৃন্দ।
প্রসিদ্ধ প্রকাশক শ্রীযুত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র হইতে।

হইতেন। জনসাধারণের করতালির লোভে তাঁহাকে নানা অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে কেহ দেখে নাই। তিনি যশকে খুঁজিয়া হয়রান হইতেন না; যশ তাঁহাকে খুঁজিবে, এইরূপ তাঁহার মনোবৃত্তি ছিল।

শুনিয়াছি। এই সরসতা সামান্য সাধনার ফলে সম্ভবপর হয় না। যে অসামান্য গুণে তিনি এই রসের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহার মূল তাঁহার নিরলস সাহিত্য-সাধনা, ভাবুকতা ও মহাপ্রাণতা। এ সকল গুণের একত্র সমাবেশ

না হইলে, তিনি কখনও এমন করিয়া তাঁহার বক্তৃতায় ও সাহিত্যে রসসঞ্চার করিতে পারিতেন না বলিয়া আমার বিশ্বাস।

এই কারণেই তিনি বাঙ্গালার রস-সাহিত্য-রচনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। রস-সাহিত্য সৃষ্টি করা যে কত কঠিন, তাহা লেখকমাত্রেই জানেন। গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ রচনা করিয়া নানা দার্শনিক সমস্যার কূটতর্কজালের অবতারণা করা অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার; কিন্তু বিশুদ্ধ রসসৃষ্টি করা সাহিত্যের আসরে বড়ই কঠিন। এই রসসৃষ্টির দ্বারা কোনও জাতির সাহিত্যের উন্নতির পরিমাণ সূচিত হয়। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন সাহিত্যে রসের অভাব ছিল। অনেক সময়ে রসসৃষ্টির চেষ্টা কুরুচি অথবা বাচালতায় পরিণত হইত। এখনও যে আমরা এ বিষয়ে খুব বহুদূর অগ্রসর হইয়াছি, তাহা বলা যায় না। ইংরাজি সাহিত্যেও এই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে পরিহাস-রসিকতা wit or humour অতি প্রাথমিক অবস্থায় ছিল। সাহিত্যের পরিপুষ্টির সঙ্গে রসপারিপাট্যও উন্নতিলাভ করিয়াছে। রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগরের সাহিত্যে যে ভাবগাম্ভীর্য্য আমরা দেখিতে পাই, তাহা জ্ঞানলাভের পক্ষে মূল্যবান্ হইলেও বঙ্কিম-সাহিত্যে যে রসের জীবন্ত ধারা পাওয়া যায়, তাহাতে একটা সজীবতার আস্বাদন প্রদান করে। ঈশ্বর গুপ্ত, টেকচাঁদ ঠাকুর, দীনবন্ধু—এই রসের সুরধুনীকে অনেক দূর লইয়া গিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথে এবং পরে শরচ্চন্দ্র প্রভৃতির সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে রসের আরও সূক্ষ্ম অনুভূতি আমরা পাইয়াছি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আমাদের রস-সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং সে দিক্ দিয়াও বঙ্গসাহিত্যে ললিতকুমারের দান বহুমূল্য।

ললিতকুমারের চরিত্রের আর একটি দিকের বিষয় উল্লেখ করিয়া আমি বিদায় লইব। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন কি না, তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা আমা অপেক্ষা ভাল বলিতে পারিবেন। শেষজীবনে তিনি যে তীর্থপর্য্যটন করিয়াছিলেন এবং ধারাবাহিকরূপে যাহার কাহিনী বিবৃত করিয়া তিনি পাঠক সমাজের তৃপ্তিসাধন করিতেছিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায়, হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল। আমি সাধারণতঃ তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, ইহাই বিশেষভাবে আমার বক্তব্য। পণ্ডিত ললিতকুমার, চিন্তাশীল অধ্যাপক ললিতকুমার, পরিহাস-রসিক ললিতকুমার ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনিয়া গলিয়া যাইতেন, কীর্ত্তনে দরবিগলিত-ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, ইহা না দেখিলে আমার বিশ্বাস করা কঠিন হইত। কিন্তু তাঁহার প্রাণে ধর্ম্মের যে অন্তঃসলিলপ্রবাহ বহিত, তাহার পরিচয় পাইয়া এক দিন আমি ধন্য হইয়াছিলাম।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (রায় বাহাদুর)।

পরলোকে দেবকুমার রায় চৌধুরী

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি বরিশাল লাকুটিয়ার জমীদার দেবকুমার রায় চৌধুরীর আকস্মিক বিয়োগে আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। দেবকুমার বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ ভক্ত ও সেবক ছিলেন। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতির সহিত দেবকুমার দীর্ঘকাল রস-সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছিলেন। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জীবন-চরিত রচনা করিয়া দেবকুমার অমর হইয়া থাকিবেন, এ কথা বলিলে অতিশয়োক্তি হইবে না। কৈশোর হইতেই দেবকুমার কাব্যোদ্যানে প্রবেশ করিয়া তপস্যা আরম্ভ করেন। ইঁহার জননী-দেবী বঙ্গ-সাহিত্যে নানা উপন্যাস রচনা করিয়া প্রভূত যশঃ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন! মাতৃ-অঙ্কে লালিত হইয়া, মাতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেবকুমার বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে বিবিধ কুসুমরাজি চয়ন করিয়া গিয়াছেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রিয়তমা পত্নী ও জ্যেষ্ঠা কন্যার অকালবিয়োগে কবির হৃদয় চূর্ণ হয়। তখন হইতেই হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। রক্তের চাপবৃদ্ধি হেতু হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া সুচিকিৎসকের সাহায্য সত্ত্বেও উপশমিত হয় নাই। সেই রোগেই তিনি অকালে, ৪৫ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। কবি শুধু কাব্যালোচনাতেই মগ্ন থাকিতেন না। দেশের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক সকল প্রকার আন্দোলনেই তাঁহার আগ্রহ প্রকাশ পাইত। আবৃত্তিবিষয়ে দেবকুমারের অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত "পূর্ণিমা-মিলনে" কবি দেবকুমার সাহিত্যিকবৃন্দকে তাঁহার সুললিত কণ্ঠের আবৃত্তির দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন। সে যুগের যে সকল সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক এখনও জীবিত আছেন, তাঁহারা দেবকুমারকে ভুলিতে পারিবেন না। আমরা বন্ধুজনবিয়োগে তীব্র বেদনা অনুভব করিতেছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, তাঁহার আশীর্ব্বাদে কবি যেন পরলোকে তৃপ্তিলাভ করেন।
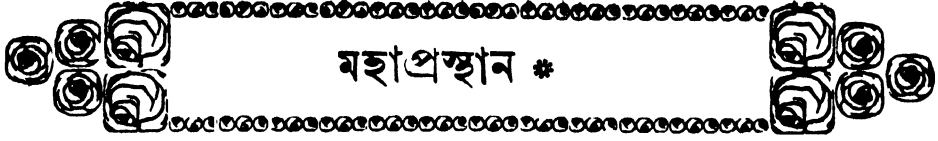
মহাপ্রস্থান *

সন্ধ্যা না হ'তে তোমার ঘাটেতে এ'ল ওপারের সোনার না',
অমনি সহসা হাসিমুখে তুমি তাহার উপরে রাখিলে পা।
বুঝিলে না, হায়, তোমার বিদায়—অচিন রাজ্যে যাত্রা আজ
হানিল মোদের বক্ষের'পরে কি যে দুঃসহ, দারুণ বাজ!

অন্তর ঘনবেদনা-বিধুর বাধা নাহি মানে চোখের জল,—
তুমি যে মোদের ছাড়িয়া চলিলে, আঁধার করিলে হৃদয়-তল!
নির্ম্মম এত, নিষ্ঠুর এত, নিদ্দয় তুমি জানিনে যে!
জানিলে তোমারে আপনার করি বক্ষের 'পরে টানিত কে?

চ'লে গেলে তুমি! কোথাও তোমারে খুঁজিয়া পাব না,—
এ কথা ঠিক,
অশ্রু-পাথেয় ল'য়ে তবু মন ঘুরিয়া মরিছে দিগ্‌বিদিক্।
বাঙ্গালীর তুমি কি ধন ছিলে যে, কত অনর্ঘ রত্ন যে,
ভাষা দিয়ে তা'র স্বরূপ প্রকাশ অতি নিষ্ফল যত্ন সে!

পাশ্চাত্যের চিন্তাধারায় নিষ্ণাত তুমি অসাধারণ,
ইউরোপ—সেও ধন্য হইত তোমারে বক্ষে করি ধারণ!
তবু কোনো দিন পলকেরো তরে বিশ্বগ্রাসী শক্তি তা'র
টলা'তে জীবনে পারেনি তোমার প্রাচ্যচিত্ত দুর্নিবার!

তুমি ছিলে খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে স্বধর্ম্মৈকনিষ্ঠ-প্রাণ,
আজীবন তুমি মানিলে তাহার আচার বিচার অনুষ্ঠান।
সিন্ধুপারের জ্ঞান-সম্পদ্ আহরণ করি যতনে, তায়
আপনার দেশে বিতরিলে তুমি পুণ্যমধুর মা'র ভাষায়।

সেক্ষপীরের অতল প্রতিভা ক্ষীরোদসিন্ধু মন্থি তা'র
অন্তর হ'তে আহরি অমৃত তরুণ সমাজে এ বাঙলার
করিয়াছ পরিবেষণ যতনে;—কেউ নাই আর বঙ্গে, হায়,
তোমার ত্যক্ত শূন্য আসন পূর্ণ করিয়া বসিবে তায়!

নহ নহ তুমি কভু নহ শুধু সুপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক,—
তা'র চেয়ে তুমি ঢের বড়, যার সীমার নাইক নির্দ্ধারক!
আজীবন ছিলে বঙ্গবাণীর ভক্তপূজারী নিষ্ঠাবান্,—
মন-বনফুলে অর্ঘ্য রচিয়া চরণ-কমলে ক'রেছ দান।
সরস্বতীর তন্ত্রীতে তুমি পরায়ে দিয়াছ নূতন তার,
লহরে লহরে ঝঙ্কার উঠে ভুবন-ভুলানো মাধুরী যা'র!

নহ তুমি শুধু গতানুগতিক পথের পথিক সাহিত্যিক,—
নবীন-মন্ত্র-দ্রষ্টা যে তুমি, স্রষ্টা যে, তুমি, হে ঋত্বিক্!
বাঙ্গলার তুমি 'রাবেলে' ছিলে যে, রসপণ্ডিত রসিকরাজ,
চিরদিন তব গৌরবগান গাহিবে দেশের সুধী সমাজ!

মরু-ভূমি সম বাঙ্গালী-বক্ষ বেদনা-বিধুর দাস্যবশ,—
তা'র 'পরে তুমি 'ফোয়ারা' বহালে, ঝরালে মধুর হাস্যরস!
'পাগলা ঝোরা'র বেতাল-নৃত্যে ব্যথার বাঁধন করিলে চূর!
'সাহারায়' দিলে সাহারার বুকে অশ্রুর সাথে হাসির সুর!

বিভীষিকা শুধু বিভীষিকা নয়, সুন্দরো আছে মিলায়ে তায়,
রূপখানি তা'র দেখা'লে নিপুণ তব 'ব্যাকরণ-বিভীষিকায়'!
কহি 'ককারের অহঙ্কারে'র কঠোর কাহিনী, 'অনুপ্রাস,'
রসতত্ত্বের ইঙ্গিত দিয়ে, মুখে ফুটাইলে অট্টহাস!

তুচ্ছ কথারে ফেনাইয়া তুলি রচিতে বিপুল ইন্দ্রজাল,
তোমার মতন যাদুকর আর ধরেনি বুকে এ দেশ বিশাল!
সুসমঞ্জস সমালোচনায় ছিলে অতুলন সুপণ্ডিত—
বিচারে তোমার কোনো ত্রুটি নাই, প্রকাশ প্রতিভা-বিমণ্ডিত!

পুরুষের, আর বিশেষ করিয়া নারী-চরিত্র বিশ্লেষণ
যে ভাবে ক'রেছ সূক্ষ্মদ্রষ্টা—মহাশক্তির নিদর্শন!
বঙ্কিমে তুমি ধন্য করেছ পূরাইয়া তাঁর মনের সাধ,—
লভিয়াছ শিরে, গৌরবী, তাঁর ভালবাসা মাখা আশীর্ব্বাদ!

সারা বিশ্বের সাহিত্যে কবে কোথা কোন্ নারী পুরুষবেশ,
কোন্ সে পুরুষ নারীর ছদ্ম ধরেছিল কবে কোন্ সে দেশ,—
তোমার কৃপায় অতি অপরূপ সে কথা বঙ্গে হ'ল প্রচার—
তোমার জ্ঞানের পরিধি মাপিতে বাঙ্গলায় আছে শক্তি কা'র?

শিশুরেও ভালবাসিতে কত যে, রহিয়াছে তা'র নিদর্শন,
তাদের প্রাণেও ব্যথা দিল আজ তোমার এ চির-অদর্শন।
চপল চিত্ত বশ করা মিঠে 'রসকরা' দিয়ে শিশুর দল
আপন করিলে, তাদের হাসিতে মুখরিলে তব হৃদয়তল!

'সাতনদী' হ'তে পুণ্যসলিল যতনে আনিয়া তাদের মন
ধৌত করিয়া অমল করিলে, তীর্থ করিলে চিরন্তন!
হে মহামনীষী, চরণে তোমার লক্ষ লক্ষ প্রণাম মোর,
লহ এ আমার পূজার অর্ঘ্য—বেদনাতপ্ত নয়নলোর।

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী।

---

* অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিরোধান উপলক্ষে।
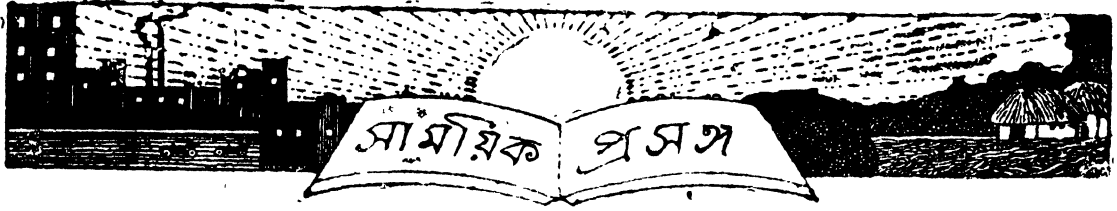
বাঙ্গালায় ভাঙ্গন

বাঙ্গালার অতি বড় দুর্ভাগ্য যে, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ভিন্‌দেশ হইতে কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত পট্টভি সীতারামিয়াকে বাঙ্গালার কংগ্রেস স্বরাজীদের দলাদলি মিটাইতে বাঙ্গালায় পাঠাইয়াছিলেন। স্বরাজী দল বাঙ্গালাকে কোথায় নামাইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন কি? তাঁহারা হয় ত উটপক্ষীর মত বালুকারাশির মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সাইমুমের অস্তিত্ব উড়াইয়া দিবার প্রয়াস পাইবেন, কিন্তু বাঙ্গালার জনগণের উৎসুক দৃষ্টি ত অতিক্রম করিতে পারিবেন না।

রাজনীতিক কার্য্যপদ্ধতি লইয়া মতবিরোধ থাকা সম্ভব, সকল দেশেই থাকে। কিন্তু বাঙ্গালায় দলাদলির ফলে যে ভাবে বাঙ্গালার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য ও প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন কাণ্ডের উপর যবনিকাপাত হইল, তাহাতে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর উচ্চ মাথা কি হেঁট হইল না? এক দিন ছিল, যখন এই বাঙ্গালার বাঙ্গালী যাহা ভাবিয়াছে, যাহা বলিয়াছে—যাহা করিয়াছে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশ তাহাই অবনতমস্তকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সে দিনের বাঙ্গালী আপনার জন্মভূমিকে দশের সম্মুখে বড় করিয়া ধরিতে সমর্থ হইয়াছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে বাঙ্গালী প্রবল-প্রতাপ বৃটিশ শক্তিকেও চমকিত করিয়া দিয়াছিল, সে সময়ে মহামতি গোখ্‌লে ব্যবস্থা পরিষদে বড়লাটকে সম্বোধন করিয়া জলদগম্ভীরনাদে বলিয়াছিলেন,—বাঙ্গালীকে সন্তুষ্ট করুন, বাঙ্গালী মহৎ জাতি, এই জাতির মনীষিগণের মত মহৎ ব্যক্তি কোথায় পাইবেন? বাঙ্গালী একা সেই সময়ে স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন করিয়া আন্দোলন সফল করিয়াছিল, ভাঙ্গা বাঙ্গালা আবার যোড়া লাগিয়াছিল—ভাবের প্রবাহে যুগযুগান্তরে সঞ্চিত শৈবাল-দাম ভাসিয়া গিয়াছিল।

স্বরাজ্য দলই অধুনা সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনীতিক দল। তাঁহাদের সহিত অনেকের মতবিরোধ আছে সত্য; কিন্তু তাঁহারা যে ভাবে সরকারের বিপক্ষে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে তেমনভাবে আর কোন রাজনীতিক দলই পারেন নাই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহার অসাধারণ ত্যাগ ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে স্বরাজ্য দলটিকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সকলেই আশা করিয়াছিলেন, তাঁহার অবিদ্যমানেও তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই দল সঙ্ঘবদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বরাজসাধনার পথে ব্যুরোক্রেশীর বিপক্ষে সংগ্রাম করিতে থাকিবেন।

কিন্তু তাহা ত হইল না। যেখানে ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থ ও প্রভুত্বলালসা আত্মপ্রকাশ করে, সেখানে সংহতি-শক্তির স্বতঃই অপচয় ঘটিয়া থাকে। আজ তাই স্বরাজী পুরাতন কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির পরিচালকবর্গের সহিত তাঁহাদের বিপক্ষ দলের কথার 'চিতেন' 'উতোরের' পর দল-ভাঙ্গাভাঙ্গি হইয়া গেল; কংগ্রেস য়ুনিয়ন পার্টি নামে এক স্বতন্ত্র দলের উদ্ভব হইল! আর সেই সুযোগে বাহিরের লোক আসিয়া আমাদের ঘরের কথায় কথা কহিবার কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ব্যুরোক্রেশী আমাদের জাতীয় একতার পরিবর্ত্তে মনোমালিন্য—মতবিরোধ দেখিয়া পরিহাসের হাসি হাসিবার যথেষ্ট অবকাশ পাইলেন! ইহা অপেক্ষা লজ্জা ও কলঙ্কের কথা বাঙ্গালীর পক্ষে আর কি হইতে পারে?

পঞ্জাবেও বাঙ্গালার মত কংগ্রেসে মতবিরোধ হইয়াছিল। কিন্তু পরলোকগত দেশনায়ক পঞ্জাবকেশরী লালা লাজপৎ রায়ের স্মৃতিরক্ষার দিনে তাঁহাকে শ্রদ্ধাপ্রীতির অঞ্জলি প্রদান উপলক্ষে উভয় পক্ষ যে উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালার কংগ্রেস স্বরাজীদের সর্ব্বথা অনুকরণীয়। এক পক্ষের দলপতি ডাক্তার সত্যপাল সেই স্মৃতিরক্ষার সভায় মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন,—

"আমি জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়াই লাহোর কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ডাক্তার কিচলুর হস্তে আমাকে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিতেছি, তিনি আমাকে কংগ্রেসের যে কোন সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, আমি তাহাতেই সন্তুষ্টচিত্তে

সম্মত আছি। আমার দলের সকলেই আমার সহিত এ বিষয়ে একমত। আমরা প্রত্যেকে লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনের সাফল্যের জন্ম আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত এবং আমাদের সমস্ত আগ্রহ উৎসাহ নিয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প। বিরোধের কথা আর কেহ যেন উল্লেখ না করেন।"

অপর পক্ষ হইতে লালা ছুনীচাঁদও ঠিক এই সুরে এই উক্তির উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।

'মোষের শিং বাঁকা, যোঝবার বেলা একা,'—এই মহান্ নীতি আমরা পদে পদে বিস্মৃত হইয়া থাকি বলিয়াই আমাদের এত দুর্গতি—এত লাঞ্ছনা।

ভারতীয় নিয়োগ

স্বাস্থ্য-ভঙ্গাদি কারণে বাঙ্গালার শিক্ষানিয়ামক মিঃ ওটেন ছুটীর পর আর ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। তাঁহার স্থানে কে নিযুক্ত হইবেন, ইহা লইয়া শিক্ষাবিভাগে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। শুনা যাইতেছে, মিঃ ষ্টেপলটন তাঁহার শূন্যস্থান পূর্ণ করিবেন। এই সংবাদ সত্য হওয়াই সম্ভব। কেন না, তাঁহার ন্যায় কর্ম্মচারীর নিয়োগে আর কিছু হউক বা না হউক, ছাত্রগণ 'ধাতুস্থ' থাকিবে। শিক্ষক যদি একাধারে ছাত্রদের অভিভাবক ও 'শান্তিরক্ষক'রূপে বিরাজ করেন, তাহা হইলে এ দেশে সরকারের মনের মত হইতে পারেন। সকলেই জানেন, মিঃ ষ্টেপলটন ও ছাত্রদের মধ্যে সম্বন্ধ কেমন। এমন লোককে বাছিয়া যদি শিক্ষানিয়ামক করা হয়, তাহা হইলে কি মনে হয়? ইহাতে কি বুঝিতে হইবে না যে, যে সকল কর্ত্তব্যপরায়ণ অধ্যাপক ছাত্রবন্ধুরূপে পরিচিত, তাঁহাদের এই উচ্চপদে উন্নীত হইবার সম্ভাবনা নাই? বর্ত্তমান যুগে রিচার্ডসন, ডিরোজিও, সাটক্লিফ্, টনি, ম্যান, রো প্রমুখ বিদেশী অধ্যাপক ত নাই বলিলেই হয়, তথাপি যাঁহারা এখনও আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক রাম্‌সবোথামের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁহার মত উপযুক্ত শিক্ষকের প্রতিভা ও পরিশ্রমের কোন পুরস্কার নাই!

এই সম্পর্কে আর একটি কথা বিশেষরূপে উল্লেখ-যোগ্য। সরকারী উচ্চ চাকুরীতে যথাসম্ভব ভারতীয় নিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। সেই প্রতি-শ্রুতিমত বাঙ্গালার শিক্ষানিয়ামকের মত উচ্চ সরকারী পদে ভারতীয় নিয়োগ হয় না কেন? বাঙ্গালী অধ্যাপক-গণের মধ্যে এমন কি কোনও প্রতিভাবান্ শিক্ষক বা শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ নাই, যিনি এই পদে বসিয়া কর্ত্তব্যপালন করিতে পারেন? কেহ যদি এ কথা বলেন, তাহা হইলে আমরা নিশ্চিতই বলিব, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক সত্যের অপলাপ করিতেছেন।

চাকরীতে বর্ণ বৈষম্য

প্রায়ই দেখা যায়, বড় বড় সরকারী চাকুরী বিদেশীরই এক-চেটিয়া সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, চক্ষুর সমক্ষে বহুতর প্রমাণ—দৃষ্টান্ত থাকিতেও য়ুরোপীয়রা তারস্বরে ঘোষণা করিয়া থাকেন যে, শাসনব্যাপারে জাতি-বৈষম্য আদৌ অবলম্বিত হয় না। পরন্তু যদি কোন ভারতীয় ইহার প্রতিবাদ করিতে যান, অমনই তাঁহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী, কলহপরায়ণ, স্বার্থপর ইত্যাদি সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। সে দিন হুইটলে কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্যদানকালে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলের এজেণ্ট মিঃ বার্ণ জোর গলায় অস্বীকার করেন যে, তাঁহার রেলে য়ুরোপীয় ও ভারতীয় কর্ম্মচারীদের মধ্যে পার্থক্য বা জাতিবৈষম্য রাখা হয় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁহাকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইল যে, তাঁহার লাইনে প্রথম শ্রেণীর ষ্টেশন মাষ্টারের মধ্যে সবই য়ুরোপীয়, একটিও দেশীয় নাই, তখন তিনি অম্লানবদনে বলেন যে, 'য়ুরোপীয়রা ভারতীয় অপেক্ষা অধিকতর যোগ্য।' স্পর্দ্ধা ও নির্লজ্জ-তারও একটা সীমা আছে। কিন্তু বহুকাল একচেটিয়া অধিকার উপভোগ করিয়া এই শ্রেণীর শ্বেতকায়ের বুক বলিয়া গিয়াছে, নতুবা তাঁহারা কোট বজায় রাখিবার জন্য অম্লানবদনে নির্জ্জলা মিথ্যা উচ্চারণ করেন কেন? অবশ্য ভারতীয় যাত্রিগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের সুব্যবস্থার পরিবর্ত্তে নির্য্যাতন—লাঞ্ছনাই যদি রেল কোম্পানীর অভি-প্রেত হয়, তবে মোটা মাহিনা দিয়া শ্বেতাঙ্গ ষ্টেশন-মাষ্টার নিয়োগের যে সার্থকতা আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করি-বেন না। কিন্তু এমন প্রাচীন ও অভিজ্ঞ দেশীয় ষ্টেশন-মাষ্টার আছেন, যাঁহাদের নিকট বিশ বৎসর ছোকরা ধলা ষ্টেশন

মাষ্টার, ষ্টেশন-মাষ্টারের অভিজ্ঞতা—কর্ত্তব্যপরায়ণতা—নিয়মানুবর্ত্তিতা, যাত্রিগণের সুবিধা-বিধান ইত্যাদি শিক্ষা করিতে পারে। এমন দক্ষ দেশীয় গার্ড ও ড্রাইভার আছে, যাহারা অনায়াসে মেল ট্রেণ চালাইতে পারে, কিন্তু এই সকল চাকরীতে শ্বেতাঙ্গগণেরই একচেটিয়া প্রতিপত্তি। তাহার পর বেতন,ভাতা, ছুটী, বাসাভাড়া, সফর ইত্যাদি ব্যাপারে কালায় ধলায় কি পার্থক্য করা হয়, তাহা কি তাঁহারা জানেন না?

—

জাতি-বৈষম্য

যুক্তপ্রদেশের জেল-কমিটীর ভারতীয় সদস্য পণ্ডিত জগৎনারায়ণ এবং মৌলভী হাফেজ হিদায়েৎ হোসেন সাহেব তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছিলেন যে, খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র এবং থাকিবার স্থান সম্পর্কে ভারতীয় ও য়ুরোপীয় কয়েদীদের মধ্যে যে ব্যবস্থার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা জাতি, ধর্ম্ম ও বর্ণ-বৈষম্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য তাঁহারা পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, য়ুরোপীয় কয়েদীদের যে খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র বা থাকিবার স্থান দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, তাহার পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন নাই, তবে বিশেষ শ্রেণীর ভারতীয় কয়েদীকেও ঐরূপ ব্যবস্থার সুযোগ দিতে হইবে। যাহাতে বিশিষ্ট শ্রেণীর ভারতীয় কয়েদীরা য়ুরোপীয়দের মত বিশেষ অধিকার পায়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

ভারতীয়ের পক্ষ হইতে পঞ্জাব জেল-কমিটীর সদস্যরা আরও সুস্পষ্টভাবে কথাটা বলিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা পরামর্শ দিয়াছেন, যে সকল ভারতীয় কয়েদী য়ুরোপীয় প্রথায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, অথচ জেলবাসের পূর্ব্বে উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় ভদ্রলোকের মত জীবনযাত্রা চালাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদেরও জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এই পরামর্শ সমগ্র ভারতের লোকই পূর্ণ সমর্থন করিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ভাগ্যচক্রে অথবা অবস্থা-বৈগুণ্যে হয় ত কেহ সমাজের দৃষ্টিতে সরকারের বিচারে অপরাধী হইয়া থাকিতে পারেন,—কিন্তু সে জন্য তাঁহার সম্ভ্রান্তত্ব ভদ্রলোকত্ব ত লোপ পায় না। সুতরাং জেলে তাঁহাদের প্রতি যতদূর সম্ভব অবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা করা সঙ্গত।

কিন্তু যুক্তপ্রদেশের জেল-কমিটীর চেয়ারম্যান সার লুই ষ্টুয়ার্ট এই পরামর্শে আপত্তি তুলিয়া বলিয়াছেন,—

"আমি ভারতীয় কয়েদীদের মত য়ুরোপীয় কয়েদীদের প্রতি ব্যবহার করার পক্ষপাতী নহি। আমার এই আপত্তি জাতিগত পার্থক্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। য়ুরোপীয় কয়েদীরা যদি ভারতীয় কয়েদীদের অনুরূপ অপরাধ করে, তাহা হইলে তাহাদের শাস্তি কম হইবে, এমন কথা আমি কখনও বলি না। তবে এইরূপ পার্থক্য না রাখিলে য়ুরোপীয় কয়েদীদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে পারে এই জন্য আমি পার্থক্য রাখিতে বলি। নতুবা তাহারা য়ুরোপীয় বলিয়া বিশেষ ও স্বতন্ত্র ব্যবহার পাইবে, এই নীতি আমি সমর্থন করি না।"

যার নাম ভাজা চাউল, তার নাম মুড়ী। কি চমৎকার যুক্তি! স্বাস্থ্যভঙ্গ কি কেবল য়ুরোপীয় কয়েদীদের হয়—উহাও কি সরকারী চাকুরীর মাছের মুড়া দুধের সরের মত উহাদের একচেটিয়া? এমন অনেক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভারতীয় কয়েদী থাকেন, যাঁহারা গ্রহবৈগুণ্যে বা সাময়িক উত্তেজনার ফলে জেলের কয়েদী হইয়া থাকেন। অথচ তাঁহারা ধনে-মানে কুলে-শীলে বহু ইঙ্গ পিঙ্গ ধলা কয়েদীর অপেক্ষা সামাজিক অবস্থায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। জেলবাসের পূর্ব্বে তাঁহারা এই শ্রেণীর য়ুরোপীয় অপেক্ষা বহুগুণ ভাল অবস্থায় জীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি জেলে যে ব্যবহার হয়, তাহা এই ইঙ্গ-পিঙ্গরা ভ্রমেও কখনও পায় না। এ সকল ক্ষেত্রে যদি ভারতীয় কয়েদীর প্রতি বিশেষ ব্যবস্থা করা না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের কি স্বাস্থ্যনাশ তথা মনোভঙ্গের সম্ভাবনা হইতে পারে না? এরূপ স্বাস্থ্যভঙ্গের অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সুতরাং তাঁহাদেরও প্রতি যদি য়ুরোপীয় কয়েদীর মত ব্যবহার না করা হয়, তাহা হইলে লোক কি মনে করিতে পারে? অথচ ভারতীয়গণের প্রদত্ত কর-সম্ভারেই কি য়ুরোপীয় কয়েদীগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সুব্যবস্থা করা হয় না? শাক দিয়া সকল সময়ে মাছ ঢাকা পড়ে না। জাতি-বৈষম্য যে এই এই ভাবে ভারতের সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা কে না জানে? সেটুকু অস্বীকার করিবার জন্য এত কৌশলের অবতারণা কেন?

—

ঠেকিয়া শিক্ষা

আলি-ভ্রাতৃদ্বয় দক্ষিণ-আফরিকার বৃটিশ উপনিবেশ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে চাহিলে য়ুনিয়ন গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে

বিনাসর্ত্তে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন নাই, আর সেই অপমানে তাঁহারা বিফল-মনোরথ হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন।

আলি-ভ্রাতৃদ্বয় দক্ষিণ-আফরিকা যাত্রার পূর্ব্বে যখন বোম্বাইএ ফরাসী ও পোর্টুগীজ দূতদ্বয়ের অনুমতি প্রার্থনা করেন, তখন তাঁহারা কোন সর্ত্ত না দিয়া তাঁহাদের আফরিকার উপনিবেশে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করেন।

ইহা দেখিয়া আলি-ভ্রাতৃদ্বয় মনে করেন, দক্ষিণ-আফরিকার য়ুনিয়ন গভর্ণমেণ্টও কোন আপত্তি তুলিবেন না। কেন না, ফরাসী ও পর্টুগীজ সরকার বিদেশী, তাঁহারা যখন বিনাসর্ত্তে তাঁহাদের উপনিবেশে প্রবেশে অবাধ আজ্ঞা দিতে পারিয়াছেন, তখন য়ুনিয়ন গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ সাম্রাজ্যেরই অঙ্গীভূত বলিয়া তাঁহাদিগকে নিশ্চিতই তথায় প্রবেশানুমতি দিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। আশ্চর্য্যের বিষয়, য়ুনিয়ন গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে এমন কড়াকড়ি সর্ত্ত দিলেন যে, তাঁহারা আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সেই সকল সর্ত্ত পালন করিতে পারেন না। তাঁহারা বুঝাইলেন, তাঁহারা ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষিণ-আফরিকায় যাইতেছেন। রাজনীতির সহিত এ ক্ষেত্রে তাঁহারা কোন সম্পর্ক রাখিবেন না। কত বুঝান হইল, কিন্তু ভবী ভুলিবার নহে, য়ুনিয়ন গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি তাঁহাদের জন্য এসিয়াবাসীর সহিত ব্যবহারের নিয়ম-কানুন কড়ায়-গণ্ডায় খাটাইয়া না লইয়া তাঁহাদিগকে আফ্রিকার উপনিবেশে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিতে পারিলেন না।

এই অপমান—লাঞ্ছনার পরেও কিন্তু আমাদের দেশের এক শ্রেণীর রাজনীতিক একতার মহিমা—মিলনের মহিমা—শক্তিসঞ্চয়ের সার্থকতা বুঝিতে চাহেন না,—তাঁহারা চক্ষু থাকিতে অন্ধ সাজিয়া থাকিতে চাহেন। পদে পদে এমন কত দৃষ্টান্তেরই না উদ্ভব হইতেছে, অথচ আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়িয়া রহিয়াছি। সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়গত স্বার্থের অঞ্জন চক্ষুতে প্রলেপ দিয়া দৃষ্টিশক্তি হারাইতে বসিয়াছি! আমাদের মঙ্গল কোথা?

দেশীয় রাজন্যের মনোবৃত্তি

বিলাতের এক সংবাদপত্র রটাইয়াছিলেন, মহারাজা সার হরি সিং তাঁহার কাশ্মীর রাজ্য বৃটিশ সরকারকে বেচিয়া ফেলিবেন! বিনিময়ে তিনি মোটা পেন্‌সন লইয়া রাজ্যসুখ ত্যাগ করিবেন। তবে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন, কি লণ্ডন বা বিলাসলীলাময়ী প্যারীর হোটেলে বাস করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়া দিবেন, তাহা কিছু প্রকাশ পায় নাই।

জনরব সর্ব্বৈব মিথ্যা। মহারাজার পক্ষ হইতে এ সম্বন্ধে কোন কথা প্রচারিত হয় নাই। তবে এমন কথা উঠে কেন? বিলাতী পত্রখানা লিখিয়াছে, ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেওয়া হইতেছে, তাই ভয়ে রাজন্যরা রাজ্য বেচিয়া ফেলিতেছেন! ভারতও ঐ অধিকার পাইতেছে, রাজন্যরাও রাজ্য বেচিতেছে—হাসির কথা নহে কি?

কিন্তু এই মিথ্যা সংবাদের মূলে একটি সত্য নিহিত আছে। রাজন্যরা কি সত্যই স্বায়ত্তশাসনকে বাঘের মত দেখেন না? বৃটিশ ভারতে যুগপরিবর্ত্তনে যে মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া—তাঁহারা চলিতেছেন কি? গণতন্ত্রের নামে তাঁহারা আতঙ্কিত হন না কি? যদি তাহা না হয়, তবে তাঁহারা বৃটিশ সার্ব্বভৌম শক্তির সহিত তাঁহাদের প্রাচীন সন্ধি ঝালাইয়া লইবার জন্য এত উদ্‌গ্রীব কেন? রাউণ্ড টেবল বৈঠকে যদি তাঁহাদের প্রজা-প্রতিনিধিদের স্থান হয়, তাহা হইলে তাঁহারা তাহাতে সন্তুষ্ট হন কি?

সে দিন পাতিয়ালার মহারাজা তাঁহার জন্মোৎসব উপলক্ষে এক ভোজ-সভায় বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—

"রাজন্যগণ যেন গৃহস্থের কন্যা। বাপের ঘরে তাঁহারা বাপ-মায়ের অধীন, কিন্তু নিজের ঘরে—স্বামিগৃহে তাঁহারা গৃহিণী, সর্ব্বেসর্ব্বময়ী কর্ত্রী।"

তিনি এই সম্বন্ধের উপমা দিয়া বৃটিশ সার্ব্বভৌম শক্তির সকাশে দাবী করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে শাসনবিষয়ে যে কোনও ব্যবস্থাই করা হউক না, রাজন্যগণ যেন গৃহস্থের কন্যার মত পিতৃগৃহে (অর্থাৎ বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে) অধীনে থাকেন, কিন্তু নিজগৃহে (অর্থাৎ তাঁহাদের নিজ নিজ রাজ্যে) যেন গৃহিণী—সর্ব্বেসর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইতে পারেন।

মহারাজার পিতৃভক্তি প্রশংসনীয়! কিন্তু তাঁহার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কেবল পিতার মন যোগাইয়া চলিলেই নারী-জন্ম সার্থক করা যায় না। স্বামিগৃহে গৃহিণী হইতে হইলেও

অনেক গুণের অধিকারিণী হইতে হয়। হিন্দু গৃহিণীকে পাঁচ জনকে লইয়া ঘর করিতে হয়। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ভৃত্য, পরিজন, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, অতিথি-অভ্যাগত, আহূত-অনাহূত,—এমন কত পোষ্য তাঁহাকে পালন করিতে হয়। তাহা ছাড়া, দেবতা-ব্রাহ্মণ আছেন, গো-মাতা আছেন, পল্লী-প্রতিবেশী আছেন। সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাঁহাকে খরদৃষ্টি রাখিতে হয়, সকলকে খাওয়াইয়া, সেবা-পরিচর্য্যা করিয়া, তাঁহাকে সর্ব্বশেষে অন্নগ্রহণ করিতে হয়, সংসারের সুখে দুঃখে আপনাকে বিলাইয়া দিতে হয়।

রাজন্যগণকেও তেমনই নিজগৃহে অর্থাৎ স্বরাজ্যমধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া প্রজারঞ্জন করিতে হয়। গৃহে অসন্তুষ্ট আত্মীয়-স্বজনাদি থাকিলে প্রকৃত গৃহিণী নামের অধিকারিণী হওয়া যায় না, এ কথাটা রাজন্যগণ স্বীকার করেন ত? রাজপুতানায় ও অন্যান্য রাজন্যরাজ্যে 'কিষাণ সভা' ও 'প্রজা-প্রতিনিধি সভা' ইত্যাদির উদ্ভব হইয়াছে কেন, তাহা পাতিয়ালার মহারাজা নিশ্চিতই অবগত আছেন। এই অসন্তুষ্ট আত্মীয়স্বজন তাঁহাদের ঘরে থাকিতে তাঁহারা কিরূপে গৃহিণী পদের দাবী করিতে পারেন?

স্মৃতির অপমান

পঞ্জাবের রাবী নদীতীরে পরলোকগত পঞ্জাবকেশরী লালা লজপৎ রায়ের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা স্বদেশ-প্রেমিক জনসেবক স্বার্থত্যাগী নেতার পুণ্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া আদর্শ পূজারই নিদর্শন। কে বা কাহারা এই প্রতিমূর্ত্তি বিকলাঙ্গ করিয়া দিয়াছে। প্রকাশ, যাহারা এই ঘৃণিত কার্য্য করিয়াছে, তাহারা মুসলমান-বেশে সজ্জিত ছিল। কিন্তু কোন হিন্দু বা মুসলমান, অথবা কোন ভারতবাসী লালাজীর স্মৃতি-পূজার এমন অবমাননা করিতে পারে বলিয়া আমরা ধারণা করিতে পারি না। সাইমন কমিশনের লাহোরে পদার্পণকালে তিনি কমিশন-বিরোধী দলের নেতৃরূপে পুলিসের লাঠির সম্মুখে বুক পাতিয়া দিয়াছিলেন। সে সময়ে হিন্দু-মুসলমান একই উদ্দেশ্যে মিলন-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার নির্দ্দেশ মানিয়া চলিয়াছিল। দেশের কার্য্যে সেই তাঁহার শেষ আত্মদান! তিনি আজীবন যাহা উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রায় সমস্তই দেশের ও দশের সেবায় দান করিয়া গিয়াছেন। দেশের মুক্তি-সমরে এই অক্লান্তকর্ম্মা পুরুষব্যাঘ্র প্রবলপ্রতাপ ব্যুরোক্রেশীর সহিত অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন,—সে জন্য বহু কষ্ট, বিপদ্ ও লাঞ্ছনা সাদরে বরণ করিয়াছেন। বৃটিশ কারাগারে বাস, দেশ হইতে নির্ব্বাসন, এ সকল তাঁহার অঙ্গের ভূষণ ছিল। তিনি বর্ত্তমান ভারতের মুক্তিমন্ত্রের সাধক—স্বদেশ-সেবার জন্য তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার পুণ্যস্মৃতি ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য কোন ভারতবাসী এমন হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে কল্পনা করিতেও হৃদয় নিরাশায় অবশ হয়—মন ব্যথায় বিবশ হয়।

স্বদেশ-সেবক দেশ-নায়কের পুণ্যমূর্ত্তি যাহারা ভঙ্গ করিতে পারে, তাহারা যে নিশ্চিতই পরের ইঙ্গিতে পরের অর্থপুষ্ট হইয়া এই নীচ কাপুরুষোচিত কাম করিয়াছে এবং তদ্দ্বারা হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

কোন্ পথে?

রাজপ্রতিনিধি লর্ড আরউইনের ঘোষণার পর বিলাতে অনেক কিছু ঘটিয়াছে। লর্ড বার্কেণহেড, লর্ড রেডিং এবং মিঃ লয়েড জর্জ্জ পার্লামেণ্টে এ বিষয়ে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন, 'ডেলি মেল' প্রমুখ সংবাদপত্র এ বিষয়ে ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল। বস্তুতঃ বিলাতে এমন একটা ভাবের আন্দোলন হইয়াছে, যাহা লক্ষ্য করিলে মনে হয়, বুঝি বা তথাকার লোক মনে করিয়াছে, এই ঘোষণার ফলে বুঝি বা ভারতসাম্রাজ্য হাত-ছাড়া হইয়া যায়!
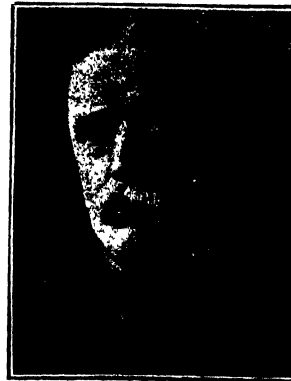
লয়েড জর্জ্জ

এই 'গেল রাজ্য, গেল মান' চীৎকারের ফলে প্রধান মন্ত্রী মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড ও ভারত-সচিব মিঃ ওয়েজ্‌উড বেন হইতে শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের তাবৎ সদস্যমাত্রেরই

প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাদের মনে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল, বুঝি বা তাঁহাদের বিরুদ্ধে censure motion অথবা নিন্দাজ্ঞাপক মন্তব্য গৃহীত হয়, আর তাহার ফলে তাঁহাদের সাধের মন্ত্রিত্বের দণ্ড খসিয়া পড়ে!

যাহা হউক, তাঁহাদের কিন্তু ভয়ের এত কারণ কিছুই ছিল না। প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড নিজে এবং লর্ড সভায় লর্ড পারমুর অবস্থাটা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিলেন এবং তাহাতেই আগুনে জল পড়িল। তাঁহাদের কৈফিয়ৎটা মোটামুটি এইরূপ :—

লর্ড রেডিং

মহাত্মা গন্ধী বলিয়াছেন—

"আমরা বর্ত্তমানে দুর্ব্বল, সুতরাং আমরা যে অধিকার পাইবার আশা করি, তাহা ইংরাজের দয়ার (generosity) উপর নির্ভর করে। আমার বিশ্বাস আছে, পরামর্শ বৈঠকে ইংরাজ সেই দয়া দেখাইতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।"

সম্ভবতঃ এই আশায় আশান্বিত হইয়া নেতৃবর্গ বিলাতের গোল টেবল বৈঠকে যাইতে সম্মত হইয়াছেন। মহাত্মা গন্ধী বলিয়াছেন, শেষ একবার দেখা উচিত, বৈঠকে আমাদের দাবী স্বীকৃত হয় কি না। যদি না হয়, তখন যাহা করা কর্ত্তব্য, তাহা ত আমাদের হাতে পড়িয়াই আছে। তখন স্বাধীনতা চরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অস্ত্ররূপে গ্রহণ করিতেই হইবে।

(১) ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ভারত-শাসনের চরম লক্ষ্য, ইহা ঘোষণা দ্বারা স্বীকার করা হইল।

(২) গোল টেবল বৈঠকে বৃটিশ ভারতের সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের এবং রাজন্য-ভারতের রাজন্যগণের মতামত সংগ্রহ করিয়া জানা হইবে, সেই সমস্ত মতামতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সামঞ্জস্য কোথায়, সেইটি অবধারণ করিয়া পার্লামেণ্টের সকাশে সরকারের সিদ্ধান্ত পেশ করা হইবে। পার্লামেণ্ট সাইমন রিপোর্টের সহিত মিলাইয়া শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন এবং তদনুসারে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতি নির্ণীত হইবে।

(৩) পার্লামেণ্টই ভারতের শেষ ভাগ্যবিধাতা।

(৪) ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ঘোষণা এবং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সংস্কার আইনের নীতিই অনুসৃত হইবে, উহার কোন পরিবর্ত্তন এই ঘোষণার দ্বারা অনুসূচিত হয় নাই।

ইহাই যদি ঘোষণার মর্ম্ম হয়, তাহা হইলে আমাদের নেতৃবৃন্দ প্রথমে দিল্লীতে ও পরে এলাহাবাদে এই ঘোষণা পূর্ণ সমর্থন করিয়া গ্রহণ করিয়া ভাল করিলেন কি না, ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

কিন্তু কথা এই, গোল টেবল বৈঠকে ভারতের জাতীয় দলের সহিত ভারতের ভবিষ্যৎ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে বিলাত গভর্ণমেণ্টের আদৌ কোন কথাই হইবে কি না। পার্লামেণ্টে ও অন্যত্র যে সব কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, এরূপ পরামর্শ হইবেই না। বৃটিশ সরকার ত পরামর্শ করিবেনই না, তাঁহারা কতকটা বিচারকের অথবা সালিসী মীমাংসকের মত বিচারাসনে বসিয়া সকল পক্ষের মতামত গ্রহণ করিবেন মাত্র, তার পর তাহার মধ্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সামঞ্জস্যের পথ খুঁজিয়া বাহির করিবেন। সে ক্ষেত্রে সাক্ষীর মত গোল টেবলে যাওয়া আমাদের পক্ষে সমীচীন কি না, দেশের লোক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আগামী লাহোর

কংগ্রেসে এই বিষয়ের বিচার হউক,—আমরা কোন্ পথে যাইব—কোন্ পথ গ্রহণ করা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় কর্ত্তব্য!

—

ভারত রক্ষায় ভারতবাসী

প্রায়ই শুনা যায়, ভারতবাসী নিজের দেশ-রক্ষায় অসমর্থ, সে জন্য তাহাকে পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়,—সুতরাং সে স্বায়ত্ত-শাসনের অনুপযুক্ত। ভাল কথা। কিন্তু নিজের দেশরক্ষায় তাহাদিগকে উপযুক্ত করিবার মত তাহাদিগকে কি সুযোগ দেওয়া হয়? শিখ রাজপুত মারাঠা পাঠানদের মত সামরিক জাতির কথা ছাড়িয়া দিলেও 'বে-সামরিক' জাতি বলিয়া খ্যাত এই বাঙ্গালী জাতি হইতেও জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে পল্টন তৈয়ার হইয়াছিল এবং তাহারা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরেরই সন্তান ছিল; পরন্তু তাহারা উপরওয়ালাদের নিকট তাহাদের সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, কষ্টসহনক্ষমতা, নির্ভীকতা, সাহস প্রভৃতির জন্য প্রশংসাও প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখনও য়ুনিভার্সিটির আই, ডি, এফ সৈন্যদলে বহু শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী যুবক সমরশিক্ষা করিতেছে। সুতরাং অবসর ও সুযোগ পাইলে যে এ দেশীয়রা সমরবিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারে না, তাহা নহে, সামরিক শিক্ষা-সুযোগের অভাবেই তাহারা দেশরক্ষায় অসমর্থ বলিয়া পরিগণিত।

একটা দৃষ্টান্ত দিলে অবস্থাটা আরও পরিষ্কার হইয়া যাইবে। কমাণ্ডার কেনওয়ার্দি পার্লামেণ্টে ভারত-সচিব মিঃ ওয়েজউড বেনকে জিজ্ঞাসা করেন, রয়্যাল এয়ার ফোর্সে (সামরিক বিমান বিভাগে) ভারতীয়দিগকে রণশিক্ষা করিবার কিরূপ সুযোগ দেওয়া হইতেছে? মিঃ বেন জবাব দেন,—"ক্রানওয়েলের এয়ার ফোর্স কলেজে যে সকল ভারতীয় যুবক ভর্ত্তি হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহই স্থলযুদ্ধে ও ব্যোম-সমর পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।" অর্থাৎ ভারতীয়গণ ব্যোম-সমরশিক্ষার অযোগ্য। এ কথা কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? পরলোকগত ইন্দ্র রায় এবং কাবালির মত ভারতীয় যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিমান-বিদ্যায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সে দেশে অন্য ভারতীয়ও যে বিমানবিদ্যা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন না, ইহা কি সম্ভব? তাহা হইলে নিশ্চিতই পরীক্ষার ব্যবস্থায় কোন গোলযোগ ছিল। পরন্তু যে সকল ক্যাডেট (ভারতীয় শিক্ষার্থীকে) বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহারা হয় ত পরীক্ষার অনুপযুক্ত। নতুবা যে দেশের মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থ-সন্তান জগতের যে কোনও পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে, যুগযুগান্তর হইতে সমরশিক্ষায় বঞ্চিত হইয়াও যদি বাঙ্গালী যুবক ফ্রান্সের—মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সমর অভিযান করিতে পারে, তাহা হইলে এয়ার ফোর্সে কোন ভারতবাসীই যোগ্যতা দেখাইতে পারিবেন না, এমন কথা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় কি?

মিঃ বেন আর একটি চমৎকার কথা বলিয়াছেন:—'যদিও ভারতীয় ক্যাডেটরা (শিক্ষার্থীরা) ক্রানওয়েলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহা হইলেও তাহারা বিলাতের রয়্যাল এয়ার ফোর্সে প্রবেশ করিতে পারিবে না, তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে।' অর্থাৎ 'কালা আদমীকো নীচু যানেই হোগা!'

ভূতপূর্ব্ব রক্ষণশীল দল ভারতীয়ের সেনা-দলে প্রবেশের যে আইন বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে য়ুনিটই ভারতীয়দের অদৃষ্টে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; ইহা ছাড়া তাঁহারা আইন বাঁধিয়া দিয়াছিলেন যে, ভারতীয় শিক্ষার্থী স্যাণ্ডহার্ষ্টের সামরিক বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও এক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। শ্রমিক সরকারও এ বিষয়ে তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন। আমরা তাই বলি, প্রভেদ কিছুই নাই, এ-পিঠ আর ও-পিঠ!

—

অশ্রু-অর্ঘ্য

বঙ্গভাষার একনিষ্ঠ সাধক, পরিহাস-রসিক, জনপ্রিয়, অধ্যাপক, সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৬২ বৎসর বয়সে সাধের সাহিত্যসেবা ত্যাগ করিয়া প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর অনুগমন করিয়াছেন, ইহলোক হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর এমনই দুর্ভাগ্য যে, যাহা যাইতেছে, তাহার স্থান আর পূর্ণ হইতেছে না। রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য—সকল ক্ষেত্রেই এই অভাব অনুভূত হইতেছে।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এই বাঙ্গালার বহু শিক্ষার্থীই তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া ভাষাজননীর আরাধনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারাই জানেন, কি অদ্ভুত শক্তি-সম্পদের অধিকারী হইয়া তিনি তাঁহার অধ্যাপনাকে প্রাণময় করিয়া তুলিতে সমর্থ হইতেন। দেশীয় ও বিদেশীয় শ্রেষ্ঠ কবিগণের মধ্যে ভাবের সামঞ্জস্য অনুরূপ রচনার দ্বারা উদ্ধার করিয়া সপ্রমাণ করিতে তিনি যেরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, বোধ হয়, এ দেশের অধ্যাপকগণের মধ্যে সেরূপ আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

প্রথম-যৌবনেই ললিতকুমার বিদ্বজ্জন-সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। তখন হইতেই তিনি ভাষা-জননীর সেবায় কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রে তাঁহার 'গোরুর গাড়ী' প্রমুখ সরস রচনাসমূহ তখন হইতেই বাঙ্গালী সাহিত্যামোদীকে পরম আনন্দ প্রদান করিয়াছিল। সামান্য বিষয়-বস্তু অবলম্বনে বিশুদ্ধ আনন্দদায়ক সরস রচনায় এমন সিদ্ধহস্ত লেখক অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'ফোয়ারা,' 'ককারের অহঙ্কার,' 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা,' 'বানান-সমস্যা' 'অনুপ্রাসের অট্টহাস' বা 'রসকল্লা' প্রভৃতি রচনায় তাঁহার বিশেষত্ব সম্যক্ পরিস্ফুট। এ সকল রচনা পাঠ করিলে পাঠকের মনে অভূতপূর্ব আনন্দের প্রস্রবণ সহস্রধারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

এক দিকে তিনি যেমন রস-সাহিত্য-রচনাকার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, অন্য দিকে তিনি অমর গ্রন্থসমূহের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন

অধ্যাপনায়, বিশুদ্ধ মার্জ্জিত মধুর হাস্যরস-রচনায়, অমর কাব্য-সমালোচনায় সিদ্ধ সাধক ললিতকুমার চলিয়া গেলেন, তাঁহার শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার মত কয় জন মেধাবী বাঙ্গালী অবশিষ্ট রহিলেন, তাহা ত নির্ণয় করিয়া বলা যায় না।

ললিতকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুজ্জ্বল রত্ন—সাহিত্যে তাঁহার কৃতিত্ব সর্ব্বজনবিদিত। ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যের পরীক্ষায় তিনি যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা কয় জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? তাঁহার সেই সাধনা ভবিষ্যতে তাঁহাকে অধ্যাপনায় শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিল।

করিয়াছিলেন। তিনি 'সখী,' 'ননদভাজ,' 'কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব,' 'কৃষ্ণকান্তের উইলের আলোচনা' প্রভৃতি রচনায় ইহার সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'সাহারা,' 'ছড়া ও গল্প,' 'পাগলা ঝোরা,' 'সাধু ভাষা বনাম চলতি ভাষা' প্রভৃতি রচনা যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার অদ্ভূত গবেষণা-শক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার রচনা-সমূহ বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ।

তিনি 'মাসিক বসুমতীর' পরম শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। তাঁহার শেষ জীবনের রচনা 'ভোজন সাধন' ও 'কেদারবদরী'-ভ্রমণ প্রবন্ধ-গৌরবে 'মাসিক বসুমতী'কে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। এ সকল রচনায় তাঁহার সরস রঙ্গরস ও পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি খাঁটি বাঙ্গালী হিন্দু ছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কিন্তু প্রতীচ্য শিক্ষার মন্দ প্রভাব ও মোহ হইতে আপনাকে অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাই তিনি শেষ জীবনে হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থরাজি পাঠে নিমগ্ন ছিলেন—অবকাশ পাইলেই পবিত্র তীর্থসমূহে পবিত্রমনে যাত্রা করিতেন। 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ' কথাটির সার্থকতা তিনি নিজ জীবনে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন।

শেষ জীবনে শোকের উপর শোকের আঘাত পাইয়া তাঁহার সদানন্দ হৃদয় জীর্ণ-দীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কৈশোরে মিলিত সহধর্ম্মিণীকে বার্দ্ধক্যের সীমারেখায় হারাইয়া তিনি জীবন্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে তাঁহার সুশিক্ষিত কৃতী পুত্রের বিয়োগ তাঁহাকে যে আঘাত দিয়াছিল, তাহার চিহ্ন কখনও লুপ্ত হয় নাই। তাহার উপর এই আঘাত—মানুষ কত সহ্য করিতে পারে?

আজ তাঁহার বিয়োগব্যথায় শোক করিবার জন্য সন্তানগণের মধ্যে পুত্র সলিলকুমার ও কন্যা সুধাবালা রহিয়া গেলেন। তাঁহাদের শোকে সান্ত্বনা দিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাই না। তবে তাঁহাদের এইমাত্র সান্ত্বনা যে, তাঁহাদের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বাঙ্গালাভাষাভাষী সাহিত্যামোদীমাত্রেই রহিয়াছেন। আর সাহিত্যের আধারে তাঁহাদের পিতৃদেবের ভাষার আদর্শ—আত্ম-নির্দ্দেশিত সাধনা রহিয়াছে। প্রার্থনা করি, পুত্র সলিলকুমার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহার সুনাম-রক্ষায় সফল-প্রযত্ন হউন।

বাঙ্গালায় মন্ত্রিমণ্ডল

কলিকাতার বাৎসরিক সেণ্ট এণ্ড্রুজ ভোজোৎসবকালে খানা-পিনার পর বাঙ্গালার গভর্ণর এ দেশের লোককে দুইটি ভয় দেখাইয়াছেন, (১) কংগ্রেসে 'স্বাধীনতা' মন্তব্য গৃহীত হইলে সরকারও সে অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন, (২) বাঙ্গালায় মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে আবার বাধা পড়িলে বড়লাটের অনুমতি লইয়া হস্তান্তরিত বিভাগগুলি আর হস্তান্তর করিবেন না, খাসেই সংরক্ষিত করিবেন।

মধ্যে সার ষ্টানলি জ্যাকসন দিল্লী বেড়াইয়া আসিয়াছেন। সুতরাং ইহা অনুমান করা কঠিন নহে যে, বড়লাটের সহিত পরামর্শের ফলে তিনি এই বিভীষিকা দেখাইতেছেন। কিন্তু এই ভয়প্রদর্শনের ত কোন কারণই নাই। বড়লাটের ঘোষণামত যদি প্রকৃত কায হয়, তাহা হইলে স্বাধীনতা-মন্তব্য গ্রহণের ত কোন প্রয়োজনই হইবে না। যদি গোল টেবল বৈঠকে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসননীতি-সম্পর্কে উভয় পক্ষে পরামর্শ হয়, তাহা হইলে সেই সিদ্ধান্ত ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ হইলে, ভারতবাসী কেন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিবে? ভারতবাসী ত সাম্রাজ্যের ভিতরেই থাকিতে চাহিয়াছে, ইহা ত গত কলিকাতা কংগ্রেসের মন্তব্যেই সুপ্রকাশ। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে থাকিবার যে সর্ত্ত তাঁহারা দিয়াছেন, তাহা পালিত হইলে ত কোন গোল থাকে না।

আর মন্ত্রিমণ্ডল-গঠনের কথায় বলা যাইতে পারে যে, বার বার ঠেকিয়াও যদি বাঙ্গালা সরকার শিক্ষালাভ না করেন, তাহার জন্য দায়ী বাঙ্গালার লোক হইবে না। বাঙ্গালায় মন্ত্রিমণ্ডল-গঠনের চেষ্টা বার বার বিফল হইয়াছে, বাঙ্গালায় দ্বৈত-শাসন যে চিরস্থায়ী হইতে পারে না, তাহা ত একাধিকবার সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে। যে মন্ত্রিমণ্ডলের উপর দেশবাসীর আস্থা নাই, সেই মন্ত্রিমণ্ডল থাকিলেই বা কি, আর গেলেই বা কি? যাঁহাদের সরকারী তহবিলের উপর কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, যাঁহারা স্বেচ্ছামত জনহিতকর কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন না, তাঁহাদের পদের অস্তিত্ব লোপ হইলেও দেশের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

গভর্ণর যদি সংরক্ষিত বিভাগের দ্বারা দেশ শাসন করেন, তাহাতেই বা কি ভয়ের কথা আছে? এখনও ত সংরক্ষিত বিভাগের দ্বারাই দেশ শাসন করা হইতেছে। হস্তান্তরিত বিভাগ দ্বারা ইহার অধিক আর কি হইবে?

(উপন্যাস)

একবিংশ পরিচ্ছেদ

মোহান্তের উদারতা

অপরাহ্নকাল। কাশীর "সাহেব-পাড়া" অর্থাৎ সিক্‌রৌল পল্লীতে উদ্যান-বেষ্টিত ঐ সুরম্য অট্টালিকার দ্বিতলের বারান্দায়,রেশমী পায়জামা সুট-পরিহিত যে প্রৌঢ় পুরুষ ঈজি-চেয়ারের দুই হাতলের উপর পদদ্বয় সংস্থাপিত করিয়া লম্বমান রহিয়াছেন, উনিই কেদারেশ্বরের মোহান্ত অম্বিকাচরণ পুরী মহারাজ—ওরফে মিষ্টার পি, রায়, কলিকাতা হাইকোর্টের তথাকথিত ব্যারিষ্টার। স্নান আহার সমাধা হইয়া গিয়াছে। চেয়ারে পড়িয়া মহারাজ চুরট ফুঁকিতেছেন, আর একাগ্র-দৃষ্টিতে প্রবেশের ফটকের পানে চাহিয়া আছেন। মাণিক ঘোষেরও ভোজনক্রিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে, সে মহারাজের অনুমতি গ্রহণানন্তর এই বারান্দা-সংলগ্ন কক্ষটিতে একটু "গড়াইয়া" লইতেছে। বাঙ্গারাম দাসের প্রতি আদেশ আছে, অধরের আহারাদি হইয়া গেলেই, সে তাহাকে গাড়ী করিয়া এখানে লইয়া আসিবে, মোহান্ত তাহারই প্রতীক্ষায় উৎসুক হইয়া রহিয়াছেন। মাঝে মাঝে হাত উঠাইয়া সোনার রিষ্টওয়াচটি দেখিতেছেন।

চুরট পুড়িয়া শেষ হইয়া গেল, কিন্তু বাঙ্গারামের ত দেখা নাই! মোহান্ত চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া অধীরভাবে বারান্দায় পদচারণা করিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, মাণিককে জাগাইয়া উহাদের খোঁজে পাঠান, কিন্তু ও যে ছাই কাশীর পথ-ঘাট চেনে না, আর, রামাপুরাতে কোথায় সে বাড়ী, তাহাও যে অজ্ঞাত। গত রাত্রির অতিরিক্ত মদ্যপানে দেহ বড় ক্লান্ত ছিল, খানিকক্ষণ পাইচারি করিয়া মোহান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, আবার চেয়ারে আসিয়া বসিলেন।

ফটকের বাহিরে, রাস্তার উপর দিয়া কত মোটর গাড়ী, হাতায় প্রবেশ করে না! অধর হতভাগা কি তবে নিমক-হারামী করিল না কি? নববধূর অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে, সে কি দশ হাজার টাকার মায়া পরিত্যাগ করিয়া, বধূকে লইয়া চম্পট দিল?—তাহা যদি অধর করিয়া থাকে, তবে মোহান্তের হাত হইতে সে কি নিস্তার পাইবে? তাহার মৃত্যুবাণ যে মোহান্তের দপ্তরখানায় বিরাজ করিতেছে। তহবিল তছরুপের অকাট্য প্রমাণ যে তাঁহার হাতে। নববধূর রূপলাবণ্য ত অধরকে শ্রীঘর হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না! অধর প্রস্তাব করিয়াছিল বটে যে, এ কার্য্যে হাত দিবার পূর্ব্বে, একটা সার্টিফিকেটের মত লিখিয়া দিয়া, দেওয়ানী বা ফৌজদারী সকল প্রকার দায়িত্ব হইতে তাহাকে রেহাই দেওয়া হউক, কিন্তু মাণিক ঘোষের পরামর্শেই সেরূপ কাগজ তাহাকে লিখিয়া দেওয়া হয় নাই —ভালই হইয়াছে।

মোহান্ত ঘড়ি দেখিলেন, পাঁচটা বাজিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। দেখিয়া, তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া মাণিকের গায়ে ঠেলা দিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওহে, ঘোষজা, ওঠ ওঠ আর কত ঘুমোবে? বেলা যে এ দিকে প'ড়ে এল। ওঠ।"

"আজ্ঞে"—বলিয়া মাণিক ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল।

মোহান্ত বলিলেন, "সে টেলিগ্রামখানা কোথা, বের কর দেখি!"

"কোন্ টেলিগ্রাম মহারাজ?"

"সেই যেখানা, বাড়ী ঠিক করবার পর বাঙ্গারাম এখান থেকে পাঠিয়েছিল।"

"ওঃ—আচ্ছা।"—বলিয়া মাণিক কক্ষান্তরে গিয়া, তাহার বাক্স হইতে টেলিগ্রামখানি বাহির করিয়া আনিয়া

মোহান্ত সেখানি লইয়া, বারান্দায় ফিরিয়া গিয়া চেয়ারে বসিয়া, পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া চোখে লাগাইয়া টেলিগ্রামটি পাঠ করিলেন। বাঞ্ছারাম তাহাতে লিখিয়াছে, উভয় বাটীই ঠিক করা হইয়াছে, একখানি সিকরৌলে মাসিক ১৫০৲ দেড় শত টাকায়, অপরখানি রামাপুরায় মাসিক ২৫৲ টাকা ভাড়ায়। উভয় বাটীর মালিকদের নামও লিখিত আছে।

মাণিক কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মোহান্ত বলিলেন, "তুমি একখানা গাড়ী ভাড়া ক'রে রামাপুরায় গিয়ে, যুগলকিশোর সাহুর বাড়ী তল্লাস ক'রে একবার খবর নিতে পার ?"

"অধরের খবর ?"

"হাঁ হাঁ, অধরের খবর। পাঁচটা বাজতে চল্ল, এখনও তার দেখা নেই কেন ? মনে কোনও কুমৎলব আছে না কি ?"

মাণিক বলিল, "তা বোধ হয় নয়। নূতন যায়গায় গিয়ে উঠেছে, নাওয়া-খাওয়া করতে বোধ হয় দেরী হয়ে থাকবে।"

"এত দেরী ! তুমি তাকে বলেছ ত যে, আজ রাত্রি ১০টার গাড়ীতে তাকে কাশী ছেড়ে যেতে হবে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজের মোকাবিলাতেই ত সে কথা আমি তাকে বলেছি।"

"তবে !—আর দেরী কোরো না, বেরিয়ে পড় চট্‌পট। কোচম্যানকে বল্লেই সে ঐ বাড়ী খুঁজে বের ক'রে দেবে এখন। যাও।"

"যে আজ্ঞে।"—বলিয়া মাণিক জুতা-জামা পরিয়া প্রস্তুত হইতে গেল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এ বাড়ীর মালী রামাপুরায় যুগলকিশোর বাবুর যাত্রি-বাড়ী চেনে, তাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।"—বলিয়া সে মোহান্তের পদধূলি গ্রহণ করিয়া, নামিয়া গেল।

মোহান্ত বারান্দায় বসিয়া দেখিতে লাগিলেন, মাণিক চটিজুতা ফট্‌ফট্‌ করিতে করিতে ফটকের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বাগানের মাঝামাঝি সে যখন পৌঁছিয়াছে, তখন একখানি এক্কা ঝম্‌-ঝম্‌ করিতে করিতে ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল। বাঞ্ছারাম ও অধর তাহাতে বসিয়া আছে, স্পষ্ট দেখা গেল। মাণিক তাহা দেখিয়া দাঁড়াইল, এবং বাড়ীর দিকে ফিরিল।

এক মিনিট পরে অধরকে সঙ্গে লইয়া মাণিক আসিয়া মোহান্তের নিকট পেশ করিল। অধর কপট ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ হইয়া মোহান্তকে প্রণাম করিল।

মোহান্ত বলিলেন, "কি হে অধর, এত বিলম্ব যে ?"

অধর বিনীতভাবে নতমস্তকে বলিল, "আজ্ঞে, স্নান আহার করতে—"

"আচ্ছা, ঘরের ভিতরে চল।"—বলিয়া মোহান্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মাণিক ও অধর মোহান্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিল। এইটিই মহারাজের শয়ন-কক্ষস্বরূপ ব্যবহৃত হইবে। সমস্ত মেঝে জুড়িয়া সতরঞ্চ পাতা আছে। পালঙ্কের পার্শ্বে চেয়ার-টেবল আছে। মহারাজ চেয়ারে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "মাণিক, ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে তোমরা ব'স।"

মাণিক আদেশ প্রতিপালন করিল।

মোহান্ত বলিলেন, "তার পর অধর, তুমি কি করবে স্থির করেছ ?"

অধর বলিল, "হুজুর, উপস্থিত আমায় বাড়ীই যেতে হবে। পূর্ব্বে হুজুরকে যে নিবেদন করেছিলাম যে, এ ঘটনার পর দেশে বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব হবে, লোকলজ্জার ভয়ে কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে কোনও দূরদেশে গিয়ে নাম ভাঁড়িয়ে আমায় বাস করতে হবে ; তা দেখছি, এখন আর দরকার হবে না ; কারণ, হুজুরের কৃপায় কাযটা এতই গোপনে সমাধা হয়ে গেছে যে, দেশের কেউ কোনও দিন ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না যে, আমি কালীঘাটে ব'সে বর্দ্ধমান জেলার জুড়নপুর গ্রামের কৈলাস ভট্‌চায্যির মেয়েকে বিয়ে করেছিলাম।"

মাণিক হাসিয়া বলিল, "শ্বশুরকে তোমার দেশের ঠিকানা কি বলেছ অধর ?"

"ফরিদপুর জেলার কুণ্ডুপুকুর গ্রামে।"

মাণিক হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, "কোথায় ২৪ পরগণা, কোথায় ফরিদপুর জেলা। তোমার বাড়ী ২৪ পরগণায় না হে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, হালিসহর, নৈহাটি থেকে ক্রোশ দুই হবে।"

"আর তুমি চাকরী কর, ডুমরাওন রাজ এষ্টেটে !"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ডুমরাওন [illegible]

তসিলদার।—" বলিয়া অধর মাথা নত করিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

মোহান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেশেই থাকবে তা হ'লে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। হুজুরের কৃপায় যখন আমার দারিদ্র্যই ঘুচে গেল, স্থির করেছি, দেশে কিছু জমিজিরাৎ কিনে চাষ-বাসও সুরু করবো, আর বাকী টাকাটা তেজারতিতে খাটাব।"

মোহান্ত বলিলেন, "তা এ পরামর্শ ভালই করেছ। ওহে মাণিক, বাজে কথায় সময় নষ্ট হচ্ছে। অধর যে রকম চায়, সেই রকম একখানা সার্টিফিকিট লেখ, আমি সই ক'রে দিচ্ছি।"

মাণিক ঘোষ, কেদারেশ্বর মোহান্ত এষ্টেটে অধরের কার্য্যকালীন তাহার সচ্চরিত্রতা, কর্ম্মদক্ষতা, এবং হিসাব-পত্র ঠিকভাবে বুঝিয়া পাওয়ার একখানা সার্টিফিকেট লিখিয়া, মোহান্তকে পড়িয়া শুনাইল। মোহান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে অধর, সার্টিফিকিট তোমার মনোমত হয়েছে ত ?"

অধর হাত যোড় করিয়া কহিল, "আজ্ঞে হুজুর।"

মাণিক বলিল, "অধর, এই কাগজ-কলম নাও। স্ত্রী সম্বন্ধে তোমার না-দাবী-নামা লিখে দাও। আমি যা বলি, লেখ।"

অধর, মাণিকের কথামত লিখিল :—

"লিখিতং শ্রীঅধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়স্য না-দাবী-নামা পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে। আমি জেলা বর্দ্ধমান জুড়নপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে কন্যা-দায় হইতে মুক্তিদান জন্য তাঁহার কন্যা শ্রীমতী নবদুর্গা দেবীকে বিগত ২৬শে বৈশাখ তারিখে মোকাম কালীঘাটে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিয়াছি। কিন্তু যেহেতু আমার অপর এক স্ত্রী বর্ত্তমান, এবং আমি অতি গরীব, দুই পরিবার প্রতিপালনে অক্ষম বিধায়, আমি স্ব-ইচ্ছায় আমার বিবাহিতা পত্নী শ্রীমতী নবদুর্গা দেবী মজকুরাণকে শ্রীল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ পুরী, কেদারেশ্বরের মোহান্ত মহারাজের হস্তে সমর্পণ করিলাম। প্রকাশ থাকে যে, মোহান্ত মহারাজ মজকুর নবদুর্গা দেবী মজকুরাণকে নিজ উপপত্নীস্বরূপ ব্যবহার করিবেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ওজর আপত্তি নাই এবং আমি যদি ভবিষ্যতে তাঁহার বিরুদ্ধে এই জন্য কোনও দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা আনয়ন করি, তাহা রদ-বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে। এতদর্থে আমি সুস্থ শরীরে খোস মেজাজে বাহাল তবিয়তে বিনা কাহারও উৎপীড়ন বা অবৈধ উত্তেজনায় এই না-দাবী-নামা-পত্র লিখিয়া দিলাম।"

কাগজখানি লেখা হইলে মাণিক বলিল, "তোমার নাম সই ক'রে দাও।"

অধর নাম স্বাক্ষর করিলে, মাণিক তাহার বাক্স হইতে টিপ সহি লইবার প্যাড বাহির করিয়া, অধরের ডান হাতের বুড়া আঙ্গুল ধরিয়া, প্যাডে ঘষিয়া কাগজে ছাপ লইল।

মোহান্ত বলিল, "মাণিক, ঐ কাগজের এক পাশে, সাক্ষী ব'লে তোমার নাম সই কর।"

মাণিক আদেশ প্রতিপালন করিয়া, কাগজখানি মোহান্তের হাতে দিল। মোহান্ত উহা পড়িয়া বলিলেন, "মাণিক, এইবার অধরের টাকাকড়ি ওকে বুঝিয়ে দাও।"

মাণিক বাক্স হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া বলিল, "অধর, তোমার পুরস্কারের দশ হাজারের সমস্ত টাকাটা এখন দিতে পারছিনে। পাঁচ হাজার এখন নিয়ে যাও, বাকী পাঁচ হাজার, মহারাজ ফিরলে, এক সময় কেদারেশ্বরে এসে নিয়ে যেও, কেমন ?"

অধর হঠাৎ মোহান্তের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "হুজুর মা-বাপ, গরীবকে মারবেন না।"

মোহান্ত এই না-দাবী-নামা পত্র হাতে পাইয়া এতই খুসী হইয়াছিলেন যে, উদারতা-বশে বলিয়া ফেলিলেন, "না না, ওকে সব টাকা মিটিয়ে দাও।"

মাণিক বলিল, "হুজুর, কাশীর খরচপত্র, শেষে যদি অকুলান পড়ে, তাই বলছিলাম—"

মোহান্ত বলিলেন, "অকুলান পড়ে, দেশে টেলিগ্রাফ ক'রে টাকা আনলেই হবে। ও গরীব মানুষ, ওর পাই-পয়সা মিটিয়ে দাও।"

"যে আজ্ঞে হুজুর।"—বলিয়া মাণিক অধরকে দশ হাজার টাকার নোট গণিয়া দিল।

মোহান্ত বলিলেন, "সব বুঝে পেলে ত ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আচ্ছা, এখন যাও। বাসায় গিয়ে ওদের ব'লে এস যে, হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে তোমায় ডুমরাওন যেতে হচ্ছে, তিন দিন পরেই ফিরবে। তোমার জিনিষপত্র নিয়ে বাঙ্গারামের সঙ্গে সোজা এখানে চ'লে এস। মাণিক গিয়ে টিকিট কাটিয়ে, তোমায় দশটার ট্রেণে উঠিয়ে দেবে এখন।"

"যে আজ্ঞে মহারাজ"—বলিয়া অধর মোহান্তকে আবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, বিদায় লইল।

"দীনে ব্যাটা গেল কোথা ? একটা পেগ দিতে বল ত মাণিক।"—বলিয়া মোহান্ত, অধর-লিখিত না-দাবী-নামা পত্রখানি বুকপকেটে রাখিয়া বারান্দায় গিয়া বসিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-রোটারী-মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নবীন-সুকুমার বপু ললিত

বাজিয়া উঠে প্রেম-লাজে গো।—রবীন্দ্রনাথ।

বসুমতী-চিত্রবিভাগ]

[শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ।

৮ম বর্ষ] পৌষ, ১৩৩৬ [৩য় সংখ্যা

পারমার্থিক রস

৪

নাট্যশাস্ত্রকার মহামুনি ভরতের সময় হইতে পণ্ডিতরাজ রসগঙ্গাধর-রচয়িতা জগন্নাথ কবির সময় পর্য্যন্ত অলঙ্কার-শাস্ত্রের সহিত দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় করিবার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা বিরাট সংস্কৃত-সাহিত্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। কল্পিত বা ঐতিহাসিক নায়ক-নায়িকার প্রাকৃত অনুরাগকে প্রধানভাবে অবলম্বনপূর্ব্বক বিরচিত রস-সাহিত্যের বিশ্লেষণ ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টির জন্য এই দীর্ঘকাল ধরিয়া সংস্কৃত ভাষার আলঙ্কারিক পণ্ডিতগণ প্রভূত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

অপর দিকে ঔপনিষদ্ যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্রের রচয়িতা রঘুনাথ শিরোমণির সময় পর্য্যন্ত বড় বড় দার্শনিক আচার্য্য ও প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিতকুল দার্শনিক চিন্তার সাহায্যে মানবের মানসিক বৃত্তিনিচয়ের বিশ্লেষণপূর্ব্বক মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য মুক্তি বা নির্ব্বাণের পথ কি, তাহাই দেখাইবার জন্য বিশ্ব-বিস্ময়াবহ প্রযত্ন করিয়া গিয়াছেন. এক কথায় বলিতে গেলে আলঙ্কারিকগণ মানব-হৃদয়ের সুকোমলবৃত্তিনিচয়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও পরিস্ফুট করিয়া রসসৃষ্টির অদ্ভুত কৌশল দেখাইয়া গিয়াছেন. আর ভারতের দার্শনিক পণ্ডিতগণ মানব-হৃদয়ের সকল প্রকার সুকোমল বৃত্তিনিচয়কে সংসারবন্ধনের হেতু বলিয়া উপেক্ষাপূর্ব্বক কেবল শুষ্ক জ্ঞানেরই উপর নির্ভর করত পরমপুরুষার্থ-লাভের প্রকৃষ্ট পন্থার অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। আলঙ্কারিক-গণ মানবের হৃদয় লইয়াই লীলা-খেলা করিয়া গিয়াছেন, আর দার্শনিকগণ হৃদয়কে উপেক্ষা করিয়া কেবল মস্তিষ্কের উৎকর্ষসাধন করিবার চেষ্টায় জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ, মানব-জন্মলাভের চরিতার্থতা, দুঃখময় সংসারকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করা মস্তিষ্কহীন হৃদয়ের দ্বারা হয় না, অথবা হৃদয়হীন মস্তিষ্কের দ্বারাও হয় না, এই জাজ্জল্যমান অখণ্ডনীয় সত্যের উপর বিশ্বাস প্রাচীন আলঙ্কারিক ও প্রাচীন দার্শনিকের মধ্যে কাহারও ছিল না।

এই কথা শুনিলে অনেকে হয় ত বিস্মিত হইবেন, কেহ বা ক্রুদ্ধ হইবেন, অন্যে হয় ত এই প্রকার উক্তিকারীর প্রতি অবজ্ঞার ভ্রূকুটিপাতও করিবেন, ইহা আমি অস্বীকার করি না; কিন্তু যুগযুগান্তব্যাপী সংস্কৃত দর্শন ও সাহিত্যের ইতিহাস অনুশীলন করিলে এইরূপ উক্তির সার্থকতা বিস্পষ্টভাবে যে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, তাহা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা বড়ই শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় যে, ৪ শত বৎসরের পূর্ব্বে বাঙ্গালার এক জন কন্থা-কৌপীন-সম্বল বৈরাগী এই মহান্ সত্য জগতে প্রথম প্রচার করিয়া বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের ও বাঙ্গালীর হৃদয়ের কল্পনাকুশলতা ও ভাবপ্রবণতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বিভিন্ন পথে ধাবমান আলঙ্কারিকতা ও দার্শনিকতাকে একই উদ্দেশ্যের দিকে প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ শ্রীরূপ গোস্বামিপাদই সেই বাঙ্গালী জাতির কন্থা-কৌপীনসম্বল বৈরাগী। তাই তিনি 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' নামক স্বরচিত গ্রন্থে বলিয়াছেন—

> "ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
> তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

অর্থাৎ মানবের হৃদয়ে যত কাল পর্য্যন্ত ভোগের স্পৃহা ও নির্ব্বাণ-মুক্তির আকাঙ্ক্ষারূপ পিশাচী বিদ্যমান থাকে, সে পর্য্যন্ত সে হৃদয়ে ভক্তিরূপ যে অতুলনীয় সুখ, তাহার উদয় হইতে পারে না। শ্রীরূপ গোস্বামীর এইরূপ উক্তির মধ্যে যে কি গভীর তাৎপর্য্য নিহিত আছে, তাহার একটু বিস্তৃত আলোচনার আবশ্যক মনে করি।

ভোগের স্পৃহা কাহাকে বলে? দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে যাহার আত্মাভিমান আছে বা আত্মীয়ত্বের অধ্যাস হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তির যে পর্য্যন্ত প্রকৃত বিষয়নিবহের বিনশ্বরতা ও ঐকান্তিক দুঃখরূপতা অনুভূত না হয়, সেই পর্য্যন্ত প্রাকৃত বিষয়নিবহের সেবনে আমি সুখী হইব, সুখভোগই আমার জীবনের পরম উদ্দেশ্য, এইরূপ বুদ্ধিবশে বিষয়ভোগ করিবার জন্য যে ঐকান্তিক অভিলাষ, তাহারই নাম ভোগের স্পৃহা। অপর দিকে বিবেকের সাহায্যে যে ব্যক্তি প্রাপঞ্চিক বিষয়সমূহের বিনাশশীলতা ও দুঃখময়তা উপলব্ধি করিয়া এই সংসারের ভোগ্য বিষয়নিবহে বৈরাগ্য-যুক্ত হয়, তাহার হৃদয়ে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য যে ইচ্ছা সমুদিত হয়, তাহারই নাম মুক্তির স্পৃহা।

ভুক্তির স্পৃহা অপরাবিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করে, সেই অপরাবিদ্যার সাহায্যে নিজের সংস্কার ও অভিরুচির অনুকূল ভোগ্য বিষয়নিবহের সম্পাদনের জন্য সর্ব্বপ্রকারে প্রযত্ন-পরায়ণ হইয়া থাকে। এই সকল ভোগস্পৃহাসম্পন্ন ব্যক্তি-গণের মধ্যে যাহারা সুকোমলমতি, তাহাদিগের আনন্দ দিবার জন্য অভিলষিত ভোগনির্ব্বাহের জন্য অপরাবিদ্যার অন্যতম শাখাস্বরূপ লৌকিক রসশাস্ত্র বা অলঙ্কারশাস্ত্র রচিত হইয়াছে। সেই অলঙ্কারশাস্ত্রের রাজ্য ভোগপরায়ণ মানবসমূহের হৃদয়ের উপর আবহমানকাল হইতে সুপ্রতি-ষ্ঠিত আছে। অপর দিকে আত্যন্তিক দুঃখানবৃত্তির স্পৃহা বা মুমুক্ষা যাহাদিগের হৃদয়ে সত্য সত্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহারা ঐকান্তিকভাবে পরা বিদ্যা বা অধ্যাত্মশাস্ত্রের শরণাপন্ন হইয়া থাকে। এই অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনুশীলন-ফলে প্রাপঞ্চিক বিষয়সমূহের অনিত্যতা, অসারতা ও দুঃখ-ময়তার অনুভূতি যতই প্রবল হইতে থাকে, সেই পরিমাণে মানবহৃদয়ে মোক্ষের স্পৃহা প্রবল হইয়া থাকে, এ বিষয়ে বোধ হয় কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতবৈষম্য নাই।

শ্রীরূপ গোস্বামী উক্ত শ্লোকে ইহাই প্রদর্শন করিয়া-ছেন যে, এই ভোগস্পৃহা বা মোক্ষের স্পৃহা কোনটিই পারমার্থিক রসাস্বাদনের অনুকূল নহে—প্রত্যুত প্রতিকূল। মনুষ্যত্বের পূর্ণতা যেমন ভোগস্পৃহা ও ভোগসাধনের সামগ্রী সম্পাদনের উপর নির্ভর করে না, সেইরূপই মোক্ষস্পৃহা ও মোক্ষের সাধনস্বরূপ অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান-সম্পাদনের উপরও মনুষ্যত্বের পূর্ণতা বা সফলতা নির্ভর করে না। পারমার্থিক রসের নিরন্তর আস্বাদনই মনুষ্যজীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া থাকে। কারণ, এই পারমার্থিক রসের আস্বাদনেই মানবের সকলপ্রকার বিশুদ্ধ মনোবৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের পরিপূর্ণতা লাভ হয়; এবং সেই পার-মার্থিক রসই হইতেছে ভগবদ্ভক্তি। এই ভক্তির উদয় হইলে মানুষ প্রকৃত জীবসেবা করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, দেহাত্মাভিমানের করালগ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করে, বিশ্ব-জনীন প্রেমের অমৃতময় হ্রদে নিরন্তর নিমগ্ন হইয়া সকল প্রকার ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। তাহার জীবন

নিজের ভোগ বা মোক্ষের জন্য থাকে না, কিন্তু তাহা বিশ্বমানবের দুঃখনিবারণ ও সকলেরই চিত্তের নির্ম্মলতা-সম্পাদনপূর্ব্বক বিশ্বজনীন প্রেমের অতুলনীয় আনন্দানুভবের উপায়সম্পাদনে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকে। সে পারমার্থিক রস কি, এবং তাহার কার্য্যই বা কি, কে তাহাতে অধিকারীই বা হইয়া থাকে, তাহাই 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' নামক বিস্তৃত গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ নিরূপণ করিয়াছেন।

এই পারমার্থিক রসের বন্যা বহাইবার জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অনেকেই এ রহস্য অবগত না হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উপর অযথা নিন্দা ও বিদ্রূপের কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ও স্বরূপ না জানাই এই সকল নিন্দা ও বিদ্রূপের হেতু হইয়া থাকে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম মানুষকে সংসার ত্যাগপূর্ব্বক একান্তে বসিয়া জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া পারিপার্শ্বিক জীব-নিবহের সুখে-দুঃখে সহানুভূতিবিরহিত হইয়া নিজের জন্যই আনন্দানুভব করিবার সাধন নহে। এই তত্ত্বের সহিত যাহার পরিচয় নাই, তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি কুটিল-কটাক্ষ করিয়া থাকেন, কিন্তু 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'কার স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এ প্রকার আত্মতৃপ্তির সাধন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে। তাই তিনি বলিয়াছেন—

"যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যাপ।"

অর্থাৎ যে হরির অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হয়, তাহার দ্বারা জগতের তৃপ্তি সাধিত হইয়া থাকে। শুধু তিনিই এ কথা বলিয়াছেন, তাহা নহে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলপ্রমাণ গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহাই লিখিত হইয়াছে—

"যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন—
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, শাখা, স্কন্ধ, প্রকাণ্ড প্রভৃতির তৃপ্তি ও পুষ্টিসাধন করিতে হইলে তাহাদিগের উপর জলবর্ষণ করিলে কোন কায হয় না; কিন্তু বৃক্ষের যাহা মূল, তাহাতেই যদি বিহিতভাবে জলসেক করা যায়, তাহা হইলে তাহাদিগের তৃপ্তি, পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে; এবং যেমন চক্ষু, নাসা, ত্বক্ ও শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-নিচয়ের পুষ্টি ও তৃপ্তিসাধন করিতে হইলে কেবল সেই সেই ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়-নিচয়ের সংগ্রহমাত্রে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রাণের প্রতি বা ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের মুখ্য উপাদান জীবনী-শক্তির পুষ্টি-বিষয়ে উদাসীন হইলে কোন ইন্দ্রিয়েরই ভোগ বা পুষ্টি হয় না; কিন্তু ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের প্রতি প্রাতিস্বিক-ভাবে লক্ষ্য না করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের উপাদানভূত মূল প্রাণশক্তির পুষ্টিসম্পাদন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ঐ সকল ইন্দ্রিয় স্বতঃই পুষ্টিলাভপূর্ব্বক অভিলষিত বিষয়-ভোগে সমর্থ হয়, সেইরূপ এ সংসারে যদি সকল মানুষকে তৃপ্ত করিতে চাহ—সকলের অভাব মিটাইয়া সকলকে দুঃখ-মুক্ত করিতে চাহ, তাহা হইলে সকলের আত্মার সহিত অচ্যুতভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া যে পরমাত্মা এ সংসারে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন, তাঁহারই পূজা করিবে এবং তাহা হইলেই তোমার সকলেরই পূজা করা হইবে, সকলেই তোমার উপর প্রীত হইবে, সকলেই সকল প্রকার তৃপ্তি-সাধনের প্রধান হেতু বলিয়া তোমাকে বোধ করিবে।

এই যে সর্ব্বপূজার দ্বারস্বরূপ শ্রীভগবানের পূজা, ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম। এই পূজার পরম সাধন হই-তেছে যে পারমার্থিক রস, তাহাই 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। এই পরমার্থ-রস বা ভগবদ্ভক্তি মানুষকে প্রাকৃত মনুষ্যত্বাভিমান হইতে দূরে লইয়া যায়। এক কথায় বলিতে গেলে মানুষকে শ্রীভগবানের পার্ষদরূপে পরিণত করে। এই পার্ষদ অবস্থার বর্ণন করিতে যাইয়া ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্যগণ কি বলিয়া থাকেন, তাহা শুনুন :—

"ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরাং
অষ্টর্দ্ধিযুক্তাং অপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজাং
অন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিবার পর তিনি যখন আমাকে বর দিতে উদ্যত হইবেন, আমি তখন তাঁহার নিকট হইতে ইন্দ্রাদিলোকপ্রাপ্তিরূপ পরম গতিকে প্রার্থনা করিব না—যে গতিলাভ হইলে মানুষ অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া থাকে। আমি তাঁহার নিকট হইতে আমার আত্যন্তিক

দুঃখনিবৃত্তিরূপ নির্ব্বাণেরও কামনা করিব না। আমি প্রার্থনা করিব—হে ভগবন্! এ সংসারে যত প্রাণী আছে, তাহাদের সকল প্রকার দুঃখ—সকল প্রকার মনের পীড়া যেন আমাতে সংক্রান্ত হয়, তাহাদের সকল পীড়া আমি নিজে গ্রহণ করিব এবং তাহারা যেন সকল প্রকার দুঃখ হইতে আমার সাধনার ফলে সম্পূর্ণভাবে মুক্তিলাভ করে।

এই যে বিশ্বজনীন প্রেম—ইহাই হইল পারমার্থিক রস, প্রাকৃত রসের ন্যায় এ রসেও স্থায়িভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাব ও উদ্দীপনবিভাব এবং আবলম্বনবিভাব—সকলই আছে। কি ভাবে কিরূপ অবস্থায় কোন্ সাধনার বলে সেই স্থায়িভাব ও বিভাব প্রভৃতি পারমার্থিক রসরূপে পরিণত হইয়া মানুষকে সর্ব্বজীবসেবার প্রকৃত সাধনস্বরূপ শ্রীভগবানের সেবাকার্য্যে অধিকারী করিয়া তোলে, তাহারই আলোচনা অতি বিস্তৃতভাবে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে' শ্রীরূপ গোস্বামী করিয়াছেন, এই প্রবন্ধে এক্ষণে তাহারই পরিচয় দিবার জন্য প্রযত্ন করা যাইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)

বিরহে

রত্নাঙ্কিত স্বর্ণ মেঘ সে গিয়াছে স'রে,
স্মৃতি তার সন্ধ্যা-তারা সূর্য্যাস্তের পরে।
চুম্বন-আরক্ত-আভা হৃদি-শতদলে
মিলায়েছে স্বপ্নমোহে, হেথা অশ্রুজলে

করিতেছি আমি তব স্মৃতির তর্পণ,
এই কি সাধের প্রেম? লোভন মোহন!
প্রেম যায় প্রিয়তমে বুকে থাকে ক্ষত,
লুটায় কানন-তলে মৃগ বাণাহত

বঞ্চি নিয়তিরে যেন সুখরত্ন-রাজি
কেড়ে নিয়েছিনু কিন্তু বুঝিতেছি আজি
এ জগতে বঞ্চনার আছে প্রতিশোধ—
নিয়তির সনে কভু সাজে না বিরোধ।

ধিক প্রেম, অভিশাপ ভোগের গরল
হৃদয় বিষাদ-নত চিত্তে শোকানল!
প্রথম চুম্বন-সুখ-স্মৃতিমাঝে যদি
মরিতাম বহিত কি শোক-অশ্রুনদী!

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

নারীর অধিকার

পূজার্হা গৃহদীপ্তি বলিয়া যাঁহাদিগকে আমরা গৃহের শান্ত-ছায়ায় ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলাম, তাঁহারা আর আজ ঘরে থাকিতে চাহেন না। বাহিরের আকাশ-বাতাস আজ তাঁহাদিগকে ডাক দিয়াছে। কল্যাণময়ী স্নেহময়ী গৃহিণীর গৌরবের কমলাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কমলার মত যাঁহারা গৃহকে মধুর ও প্রীতিময় করিয়া রাখিতেন, তাঁহারা আজ সগর্ব্বে বলিতেছেন—"গৃহই আমাদের সব নয়, বাহিরও আমাদের চায়। ঘর ও বাহিরের সামঞ্জস্য করিয়া আমরা নিজেকে জানিতে চাই। আমাদেরও মধ্যে যে আত্মা আছেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তিতেই আমাদের অভীষ্টসিদ্ধি, আর এই পরিপূর্ণ বিকাশই আমাদের কাম্য।"

শান্ত সরল ও নিরুদ্বেগ জীবনে এ কি বিরক্তিকর কোলাহল! যে অচঞ্চল আরাম, যে স্নিগ্ধ মাধুরী আমাদিগের চারিধারে প্রদীপ্ত প্রভায় বিরাজ করিতেছিল, তাহার মধ্যে এ কি অশান্তির ছায়া, এ কি বিদ্রোহের রণডঙ্কা! প্রেয়সী প্রিয়া করিয়া যাঁহাদিগকে মধুরহাসিনী মধুবভাষিণী চন্দ্রবদনী পিকবচনী প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া সুখী করিতাম, তাঁহারা আজ বলিতেছেন, "তোমাদের কবিতা থাক, আমাদের মুক্তি দাও!"

নারীর মনে এই ভাব আজ বেশী দিন সক্রিয় হইয়া উঠে নাই। হেনরিক ইবসনের Doll's House নামক জগদ্বিখ্যাত নাটকে নায়িকা নোরা আট বৎসর বিবাহের পরে আবিষ্কার করিল যে, তাহাদের বিবাহ সত্যকার প্রেমে গঠিত নহে। অথচ তাহাদের সম্বন্ধ প্রীতিতে নিগূঢ় ও স্নেহে মধুর ছিল।

জীবনের এক সন্ধিক্ষণে নোরা বুঝিতে পারিল, তাহাদের মিলন বালুতীরের সৌধের মত, দুর্দ্দিনের বাত্যার প্রথম বেগেই তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। এই খেলাঘরের খেলার মোহ যে দিন ভাঙ্গিল, সে দিন সে স্বামীকে বলিল, "দেখ, আমাদের মোটেই বোঝাপড়া হয় নাই।"

মনুর কাছে আমরা শিখিয়াছি :—

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রো রক্ষতি বার্দ্ধক্যে স্ত্রিয়ো নাস্তি স্বতন্ত্রতা॥"

নোরা এই সনাতনী সহজ প্রথার বিরুদ্ধে বলিয়া উঠিল, পিতা ও স্বামী নারীর ব্যক্তিত্বকে অবহেলা করিয়া পাপ করিতে বসিয়াছে। আহতা ফণিনী গর্জ্জিয়া উঠিল, "You and papa have commited a great sin against me. It is your fault that I have made nothing of my life."

নোরার স্বামী বলিল, স্বামীর ও পুত্রকন্যার প্রতি তাহার কর্ত্তব্য সর্ব্বপ্রথম। কারণ, পত্নী ও মাতা হওয়াই তাহার চাই—উহাই তাহার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। Before all else, you are a wife and a mother."

এইখানেই সত্যকার দ্বন্দ্ব ও বিরোধ। চিরাচরিত প্রথাকে মানিয়া লইতে নোরা চাহে না। নোরার উত্তর আধুনিক সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে।

"I believe that before all else, I am a reasonable human being just as you are or at all events, that I must try and become one."

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ইবসেন এই বাণী প্রচার করিলেন, মনুষ্যত্বের অধিকারই নারীর প্রথম দাবী, পত্নী ও জননী হওয়া পরের কথা।

কি নারী, কি পুরুষ প্রত্যেককেই পরিপূর্ণ আত্ম-বিকাশের সুযোগ ও অধিকার দিতে হইবে। এই যে আদর্শ, ইহাকে পৃথক্ করিয়া দেখিলে চলিবে না। ফরাসী-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাজগতে যে গভীর পরিবর্ত্তন দেখা দিয়া মানুষের সত্যকার নবজন্ম দিয়াছে, সেই স্বাধীনতার আনুষঙ্গিক ভাবধারাই নারীচিত্তে এই মুক্তির আহ্বান জাগাইয়াছে।

ফরাসী-বিপ্লবের রথীরা বলেন, ফরাসী-বিপ্লব হইতে নবযুগের প্রথম বর্ষ গণনা করা হইবে। ইহার

অতিশয়োক্তির অন্তরালে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা এই, পুরাতন রাষ্ট্রে গোষ্ঠী পরিবার ও রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যক্তিকে বলি দেওয়া হইয়াছিল।

ফরাসী-বিপ্লবই উচ্চ কণ্ঠে বলিল, ব্যক্তিই বড়, ব্যক্তিকে পিষিয়া ফেলিয়া রাষ্ট্রগঠন নহে, ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুট বিকাশই বর্ত্তমানের বাণী, লক্ষ্য ও আদর্শ।

প্রাচীন সমাজ ও বর্ত্তমান সমাজের পার্থক্য এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা যদ নবযুগের এই আদর্শকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে নারীকেও তাহার স্বভাবজ বৃত্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তির অধিকার দিতে হইবে।

এ কথা যখনই মনে জাগে, তখনই প্রাচীন ভাবের সহিত তাহার সংঘর্ষ ও বিরোধ লাগে। এত কাল আমরা নির্ব্বিবাদে রাম ও সীতার চরিত্র মনোজ্ঞ ও মহিমময় মনে করিয়া যাত্রাপথের সম্মুখে ধরিয়াছিলাম। Feminist বলিতেছেন, না, এ আদর্শ চলিবে না।

সীতাকে বনবাস দেওয়ায় রামের অধিকার নাই। আত্মগৌরব ও যশোবৃদ্ধির জন্য তিনি সীতার আত্মা লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে পারেন না। প্রজার প্রতি তাঁহার যতটুকু কর্ত্তব্য ছিল, সীতার প্রতি তাহার অপেক্ষা অধিক থাকা উচিত।

শুধু রামায়ণের সীতা নহে, মহাভারতেও যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর প্রতি অবিচার করিয়াছেন। দ্যূতক্রীড়ায় দ্রৌপদীকে পণ রাখা তাঁহার পক্ষে ভয়ানক অন্যায় হইয়াছিল। অবশ্য এই দুই ক্ষেত্রেই স্বামী মহারাজ পত্নীর উপর অক্ষুণ্ণ একাধিপত্যের দোহাই দিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু বর্ত্তমানের নারী তাহা মানিতে প্রস্তুত নহে।

বিশ্বজগতের এই ভাবের তরঙ্গদোলা আমাদের দেশের শান্ত তটেও আঘাত করিয়া বিপ্লব সুরু করিয়াছে। নারী-জাগরণ, নারী-প্রগতি লইয়া চারিদিকে একটি কল কোলাহল উঠিয়াছে।

ইহাকে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া গেলে চলিবে না, এই সমস্যার সমাধান চাই। অনাগত ভবিষ্যতের মহিমা জাতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহারা চলিয়াছে, সেই সব প্রাণবান্ মানুষ জানে, এই দ্বন্দ্বের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য না আনিলে ভাবী জয়যাত্রা সুকর ও সহজ হইবে না।

এই সমস্যা-সমাধানের জন্য মানুষের জীবনের ঈপ্সিত আদর্শ নির্দ্দিষ্ট করা প্রয়োজন। চাক্‌চিক্যময় য়ুরোপীয় সভ্যতার মূল সুর ভোগ; প্রকৃতিকে পরাজয় করিয়া মানুষের অক্ষুণ্ণ অধিকার বিস্তার। সে সভ্যতার পতাকা সংঘর্ষ ও যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন ঘোষণা করিতেছে। যে দুর্ব্বল, তাহার প্রতি তাহার সহানুভূতি নাই, গায়ের জোরে যে দাবী করে, তাহার দাবীই সে শোনে। বস্তুতান্ত্রিক কলকারখানার এই সভ্যতা মানুষকে স্বার্থপর যন্ত্রই গড়িয়া তুলিতেছে। য়ুরোপের নারী-জাগরণের ভিত্তি এই স্বার্থবুদ্ধির উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করিয়াছে।

কিন্তু আমাদের দেশের আদর্শ কি?

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্॥"

আমাদের ক্ষীণ দৃষ্টির প্রসার করিয়া আমাদিগকে অনুভব করিতে হইবে, যেন আমরা বিশ্বচরাচরে ব্রহ্মের স্পর্শ অনুভূতি করিয়াছি। মনে করিতে হইবে, যেন ভাগবত অমৃতে সমস্ত জগৎ পরিপ্লুত। অতএব ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিতে হইবে, কাহারও ধনে লোভ করা চলিবে না।

ভারতীয় সভ্যতার মর্ম্মধারা এই ব্রহ্মজীবন ও ব্রহ্মার্পণের মাঝেই প্রকাশমান, ত্যাগেনৈব অমৃতত্বমাশুঃ—ত্যাগের দ্বারাই অমৃতলাভ করিবে। এই আত্মবিসর্জ্জন ও স্বার্থবিলোপ আমাদের সমাজ-জীবনের মূলমন্ত্র।

মুক্তি, নির্ব্বাণ, পরা শান্তি মোক্ষ যাহাই আমাদের কাম্য হউক না কেন, আমাদিগকে ত্যাগী ও কর্ম্মী হইতে হইবে।

আমাদের গৃহ-জীবন গীতোক্ত নিষ্কাম ও নিরাসক্ত কর্ম্মের আদর্শে গঠিত, সে আদর্শ আমাদিগকে মানিয়া চলিতে হইবে। তৃষ্ণা ও কামনার লক্ষ বেড়াজাল-ঘেরা য়ুরোপীয় সভ্যতা গ্রহণ করিয়া কি আমরা চির-অতৃপ্তিকে বরণ করিব এবং "to want more wants" নামক ভদ্রতা শিখিব, না আমাদের অমৃতময় ত্যাগোজ্জ্বল ভাগবত জীবন গ্রহণ করিব?

আমার মনে হয়, সকলেই একবাক্যে বলিবেন যে, তাঁহারা চিরন্তন জাতীয় সংস্কার, চিরন্তন আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য অটুট রাখিবেন। কল্যাণের দ্বারা প্রকৃতিকে আপন করিয়া, প্রেমের দ্বারা আত্মবিকাশ করিয়া, সত্যের দ্বারা বোধিলাভ করিয়া সকলেই শাশ্বত আনন্দলাভের প্রাচীন মার্গকে অনুসরণ করিবেন।

আমার কথার অর্থ এই নহে যে, বিপুলা পৃথ্বীর বিপুল গতিবেগের সহিত ভারতবাসীরা চলিবেন না, নূতনকে ও অভ্যুদয়কে তাঁহারা মানিবেন না, জড় ও সনাতনী কূপমণ্ডূক হইয়া সকলেই বসিয়া রহিবেন।

আমার বক্তব্য—ভারতের অতীত ইতিহাস মহামনীষী ও সাধকদের অবদানে সমৃদ্ধ, বহুস্খলন ও চ্যুতির মধ্য দিয়া তাহা যে আদর্শকে আপন বিশিষ্ট সংস্কৃতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমাদের বিশেষ উপযোগী ও বিশেষভাবে আপনার। সেই আত্মপ্রতিষ্ঠার উপর দাঁড়াইয়াই আমরা বহির্ভারতের সভ্যতাকে পরিপাক করিতে চেষ্টা করিব।

সার জন উডরফ্ তাঁহার Is India Civilized নামক পুস্তকেও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন,

"What I urge is that the Indian spirit should be itself and thus have cultural freedom. When it has regained this by study and appreciation of its own inherited ancient and grand culture and by the cutting away of all unassimilated foreign borrowings it may go where it will.

আমাদের এই চিরন্তন জাতীয় আদর্শ অনুসারে প্রত্যেকেরই জীবন জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এক বিরাট ধর্ম্মবোধের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। সেই ধর্ম্মজীবন মানুষকে তাহার ক্ষুদ্রত্বের পরিধি হইতে টানিয়া ধীরে ধীরে প্রেমের বিস্তার দ্বারা আমিত্বের প্রসার করাইয়া বৃহৎ ভূমার স্পর্শলাভ করাইবার জন্য পরিকল্পিত। কারণ "যো বৈ ভূমা তৎ বৈ সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি।"

এই ধর্ম্মজীবন ধর্ম্ম-বিবাহের দ্বারা মিলিত পতি ও পত্নীর সাধনায় সৃষ্ট পবিত্র গৃহ-জীবনের আশ্রয়েই পরিপুষ্ট। বাল্যে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা শক্তিসম্পন্ন নর ও নারী যখন প্রেমে সুখের নীড় বাঁধেন, তখন কামনা ও তৃপ্তির উপর তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে না, নিঃশ্রেয়সলাভের বাসনাই তাঁহাদিগকে জীবন-পথে, গন্তব্য স্থানের অভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে। মানুষের মনে যে 'নগ্ন কামনার লেলিহান শিখা জ্বলে', তাহাকে ভোগরূপ বাতাসের দ্বারা দ্বিগুণিত করিবার ইচ্ছা ঘুণাক্ষরেও আমাদের চিত্তে নাই। আমরা জানি, "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।" তাই companionate marriage (সঙ্গিমূলক বিবাহ) divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ) প্রভৃতির কল্পনাও আমাদের পক্ষে তীব্র পীড়াদায়ক। কামনা ও ইন্দ্রিয়-ক্ষুধাকে সংযত ও শান্ত করিয়া পতি ও পত্নী যে মিলনে মিলিত হন, সে মিলন সৃষ্টিপ্রবাহকে অব্যাহত রাখিয়া মর্ত্ত্যে নন্দন গড়িয়া তুলিতে চাহে। অবশ্য সন্ন্যাসের আদর্শ ভারতবর্ষ অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছে। জনহিতব্রত লইয়া যে সব নর-নারী ত্যাগী, চিরকুমার ও চিরকুমারী থাকিবেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র বহু ব্যাপক ও অব্যাহত। আচার ও ব্যবহারের নিগড় তাঁহাদিগের জন্য নহে।

কিন্তু যাহারা গৃহী, তাহাদের জন্য নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন। পতি ও পত্নী হিন্দু বিবাহে মিলেন, বিভিন্ন সত্তা লইয়া নহে, একাত্ম হইবার একাগ্র সাধনায়। আপন আপন ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পরস্পরের নিকট সুখভোগের তৌল করিয়া নিজের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে চাহেন না। তাঁহাদের বিবাহের মন্ত্র,"যদিদং হৃদয়ং মম তদিদং হৃদয়ং তব।" পুরুষের শক্তি ও নারীর কোমলতা, পুরুষের চলিষ্ণু তেজ আর নারীর সহিষ্ণু করুণা, পুরুষের বহির্মুখী প্রতিভা আর নারীর অন্তর্মুখী গতি, উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া মানুষকে পরিপূর্ণ বিকাশের পথে লইয়া চলে। জীবনের সম্যক্ পূর্ণতার জন্য, অভীষ্টলাভের জন্য নর ও নারী উভয়েই যাত্রী—নারী অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী। "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ," অতএব নারীর অধিকার আমরা কোথাও ক্ষুণ্ণ করি নাই, তাহাকে ছোট করি নাই। পতির যে কর্ত্তব্য, যে ধর্ম্ম, যে যাত্রা-পথ—পত্নীরও তাহাই কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম ও যাত্রাপথ।

নারীকে আমরা বড় করিয়া দেবীরূপেই দেখিয়াছি। প্রতি নারীই মা, ইহাই ভারতীয় আদর্শ। যে কোন নারীই হউক, সে আমাদের মা, তাহার সহিত flirt করিবার সদিচ্ছা বা অসদিচ্ছা আমরা পোষণ করি না এবং এই flirt করিবার অধিকার দিতে আমরা নারাজ। "পরদারেষু মাতৃবৎ" আমাদের শুধু পুস্তকস্থ নীতি নহে। মাসীমা, পিসীমা, জ্যেঠাইমা, খুড়ীমা, দিদিমা, ঠাকুরমা, বুড়মা, আয়িমা, বৌমা প্রভৃতি সমস্ত সম্বন্ধবাচক পদমাত্রেই মায়ের যোগ, এই উক্তির সমর্থন করিবে।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" হয় ত তর্ক উঠিবে, ইহা কেবল আদর্শই রহিয়া গিয়াছে, কার্য্যে পরিণত

হয় নাই। তর্কস্থলে যদিও স্বীকার করি যে, তাহাই সত্য, তথাপি আমরা আমাদের এই সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণীর আদর্শ উপেক্ষা করিয়া, প্রতীচ্যের আদর্শ গ্রহণ করিব না, বরং আমাদের গৌরবময় মহিমার আদর্শ যাহাতে জনসাধারণের জীবনে সত্য হইয়া উঠে, সে জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব।

সতীত্ব ও মাতৃত্বের উপর ভারতীয় সভ্যতার খর দৃষ্টি। আমাদের মনে হয়, ইহার অপেক্ষা অমূল্য ধন আর নাই। নারীকে যেমন একনিষ্ঠ প্রেমে স্বামীকে গ্রহণ করিতে হইবে ও সতীত্বমর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে, পুরুষকে তেমনই একনিষ্ঠ হইতে হইবে। সীতাকে বনবাস দিয়া রাম স্বর্ণসীতা লইয়াই অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়াছিলেন, পুনর্বিবাহ করেন নাই। নারীকে যেমন আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ পত্নী ও আদর্শ মাতা হইতে বলা হয়, পুরুষকেও তেমনই আদর্শ গৃহী, আদর্শ পতি ও আদর্শ পিতা হইতে অনুজ্ঞা দেওয়া হয়। বস্তুজগতে ইহার কিছু কিছু ব্যত্যয় হইয়া থাকিলেও আদর্শের মূল্য তিলমাত্র কমে নাই।

যে সঞ্জীবনী প্রেম নর ও নারীকে এক অলৌকিক জীবনের স্পর্শ আনিয়া দেয়, সে প্রেম কামক্ষুধা নহে,ইন্দ্রিয়জ আকর্ষণ নহে, তাহা কল্যাণে মণ্ডিত, সমাজ-জীবনের আশীর্ব্বাদে পুষ্ট ও ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাহি।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা-সাহিত্যে অদূরদর্শী কতিপয় সাহিত্যিক বাঙ্গালীর মনের এই সতীত্ব-সংস্কার দূরীভূত করিবার জন্য "নগ্ন কামনাকে, রূপতৃষ্ণাকে ও ইন্দ্রিয়-পিপাসাকে" প্রেমের নামে চালাইতে চাহিতেছেন। তাঁহারা যে কি মহানিষ্টকর গরল, জাতীয় জীবনে প্রবেশ করাইতেছেন, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখেন না।

সাধু নর ও সতী নারী সত্য-ধর্ম্মজীবনের দুইটি সবল স্তম্ভ। সতীত্বের মহোচ্চতম আদর্শকে হেয় করিয়া তাঁহারা আমাদের গৃহজীবনের অকলঙ্ক শুচিতা ও অনুপম পবিত্রতার ক্ষতি করিতেছেন।

ভারতবর্ষের নারীত্ব, সতীত্ব ও মাতৃত্বকে বরণ করিয়া যে কোনও আশা ও আদর্শকে গ্রহণ করিতে পারে। দূরেই হউক আর নিকটেই হউক, স্বর্গেই হউক আর মর্ত্তেই হউক, সতী নারী পতির চির-সহযাত্রী—পতির কর্ম্মে কর্ম্মী, পতির ধর্ম্মে ধর্ম্মী।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। ঋষিকন্যা ও ঋষিপত্নী ঘোষা ও বিশ্ববারা বেদমন্ত্রদ্রষ্টা, অর্জ্জুন-প্রেয়সী সুভদ্রা তাঁহার রথচালিকা, সীতা ও দ্রৌপদী পতির সহিত বনবাসিনী, মিহির-প্রিয়া খনা জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শিনী। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিচিত্র আচারের মধ্যেও ভারতবর্ষের নারী আপন আপন প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রহ্মবাদিনী গার্গী ও মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী ও উভয়ভারতী, সীতা, সতী, দময়ন্তী ও শৈব্যা, জনা ও সুভদ্রা, ধর্ম্মপ্রচারিকা সঙ্ঘমিত্রা, ভিক্ষুণী অধিনায়িকা মহাপ্রজাপতী গৌতমী, সংযুক্তা, পদ্মিনী, যোধাবাই, তারাবাই ও অহল্যা প্রভৃতি মহীয়সী নারী স্বীয় স্বীয় প্রতিভার মহিমায় ভারতবর্ষকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন।

এই সব প্রাচীন আদর্শ অনুসরণ করিয়া ভারতবর্ষের বর্ত্তমান নারী ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করুন, তাহা হইলেই সত্য প্রগতি হইবে। নচেৎ যদি কেবল আমরা পশ্চিমা বুলি আওড়াই আর পশ্চিমা 'ফ্যাসনের' নকল করি, তবে আমরা প্রাণহীন মোমের পুতুল গড়িয়া তুলিব, প্রাণবন্ত ও শক্তিমন্ত নারী তৈয়ার করিতে পারিব না।

পশ্চিমের যাহা কিছু, তাহাই ভাল, এ অন্ধবিশ্বাসে যেন আমরা না চলি। তাহাদের আদর্শ এখনও পরীক্ষার বিষয় হইয়া রহিয়াছে; সেই পরীক্ষাধীন আদর্শ গ্রহণ করিয়া যেন আমরা ধ্রুব ও অধ্রুব উভয়কে না হারাই। বিলাতের sex question ও sex abnormalityর যে সব অরুন্তুদ বর্ণনা পড়ি, তাহাতে আমার মনে হয়, অগ্নিপরীক্ষিত আমাদের গরীয়ান্ ও মহীয়ান্ আদর্শ ত্যাগ করিলে আমাদের ভাগ্যে বঞ্চনা ও লাঞ্ছনাই জুটিবে। রিরংসার ও যৌনতৃপ্তির ক্ষুধিত কল্পনা ও আদর্শ আনিলেই আমরা আমাদের প্রাচীন কীর্ত্তি ও বৈশিষ্ট্য হারাইয়া বিস্মৃতির অতল রসাতলে মিলাইয়া যাইব। যে দেশের নারী এক দিন সগর্ব্বে বলিয়াছিল,—

"যেনাহং নামৃতা স্যাম তেনাহং কিং কুর্য্যাম্"

ধন, জন, ঐশ্বর্য্য কিছুই মৈত্রেয়ীকে ভুলায় নাই। তিনি চাহিলেন, অমৃত-জীবনের অধিকার।

ভারতবর্ষের নারীর অধিকার এই অমর জীবনের—এই ব্রহ্মানন্দময় ভাগবত সঞ্চারের আত্মঘোষণা বা স্বার্থপরতার

নহে, সংঘর্ষ ও কলহের নহে, ভোগের ও পিপাসার নহে। ভারতের নারী ভারতবর্ষের সেই অপূর্ব্ব ত্যাগোজ্জ্বল দিব্য জীবনের যজ্ঞবেদীমূলে কল্যাণী পরিচারিকা ও ক্লান্তিহীনা সেবিকা। যে মঙ্গল দৃষ্টি সমস্ত জগৎকে মিলনের ঐক্যে অখণ্ড দেখে, যে সাধনা প্রার্থনা করে, যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ, য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমঃ; যে ধর্ম্ম সত্য, ঋত, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত, সেই দৃষ্টি সাধনা ও ধর্ম্ম ভারতের নর-নারীকে মহা গৌরবময় ও দিব্যতর ও সুন্দরতর ভবিষ্যতে লইয়া চলিবে।

এই আদর্শ—এই ভাব-জীবন—এই সুমধুর কল্পনা আমাদের যেন শুধু কাব্যের উৎস না হয়, ইহা যেন ভারতের গৃহে গৃহে সন্ধ্যার মঙ্গল-দীপের মত প্রতিদিন নব নব ঔজ্জ্বল্যে প্রতিভাত হয়।

য়ুরোপের ভোগের বাণী, য়ুরোপের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা, য়ুরোপের বাহিরের আড়ম্বর ও সমারোহ তাহার বিদ্যুজ্জ্বালা লইয়া চক্ষু ঝলসাইতে পারে, কিন্তু আমরা যেন মনে রাখি, চকচক করিলেই সোনা হয় না।

আমি যে কথা বলিতেছি, য়ুরোপের বহু মনীষীও তাহার পক্ষপাতী। দৃষ্টান্তস্বরূপ Sibly লিখিত Youth and Sex হইতে কিছু উদ্ধার করা গেল।

"Speaking specially with regard to girls, let us first remember that the highest earthly ideal for a woman is that she should be a good wife and a good mother. She ought to be so educated, so guided as to instinctively realise that wifehood and mother-hood is the flower and perfection of her being. This is the hope and ideal that should sanctify her lessons and sweeten the right and proper discipline of life. All learning, all handicraft, and all artistic training should take their place as preparation to this end."

এরূপ বহু মনীষীর মতই উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধটি অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘ হইয়া পড়ে বলিয়া তাহাতে ক্ষান্ত হইলাম।

আমি আশা করি, ভারতের নারী ভারতীয় সভ্যতার মর্ম্মধারাকে মর্ম্মে মানিয়া, সতীত্বের ও মাতৃত্বের অমর আদর্শকে বরণ করিয়া নব নব পথে নব নব অভ্যুদয় লাভ করিবে। ভারতীয় ব্রহ্মবোধ ত্যাগ ও সেবার সহিত য়ুরোপের নব নবোন্মেষশালিনী গতি, নিয়মানুগত্য ও দৃঢ়তার সমন্বয় ও সামঞ্জস্য করিয়া ভারতের নারী বিশ্বের আদর্শ-স্থানীয়া হইবেন। "অধিকার" "অধিকার" বলিয়া শুধু উচ্চ চীৎকার না করিয়া প্রেমে ও ত্যাগে, কল্যাণে ও সেবায় জগৎকে মধুময় ও মঙ্গলময় করিয়া আপন প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা করিবেন। পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষে নহে, বরং সহযোগিতায় ও সম্মিলনে নারীর ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুট হইবে। পুরুষের ও নারীর উভয়ের সমবেত সাধনায় উভয়ের আত্ম-বিকাশ হয়। কি পুরুষ কি নারী কেহই স্বতন্ত্রভাবে আপন আত্মার পরিপূর্ণ প্রকাশ ও পুষ্টিলাভ করিতে পারেন না। পুরুষের শক্তি আর নারীর প্রীতির সংযোগে আনন্দময় গৃহের প্রতিষ্ঠা, আর সেই গৃহে নারী গৃহশ্রী ও উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী মহিমময়ী সম্রাজ্ঞী।

ভারতবর্ষের সেই সংযমোজ্জ্বল ও আত্মত্যাগে বরেণ্য গৃহধর্ম্ম ফিরিয়া আসুক, আর সেই গৃহে ভারতের নারী ভারতের শক্তিরূপে—ভারতের মুক্তিরূপে—ভারতের স্ফূর্ত্ত আনন্দরূপে দীপ্তিলাভ করুন।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম, এ, বি, এল)।

জীবন-স্বপ্ন
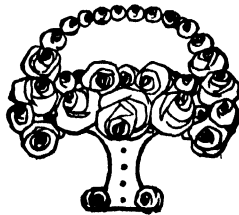
পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ছেলেবয়সের খেলাধুলা

ছেলেদের স্কুল-কলেজের ছুটী আসন্ন হইয়াছে। বলাইয়ের মর্ণিং-স্কুল। স্কুলের পর সে কলিকাতায় লম্বা পাড়ি সারিয়া বেলা ছটা-তিনটায় বাড়ী ফেরে।

সেদিন বেলা প্রায় তিনটার সময় বলাই সদল-বলে গিয়া গোঁসাইপুকুরে ছিপ ফেলিয়া বসিল। আগের দিন হইতে বিবিধ চার সংগ্রহ ও তৈয়ার হইয়াছিল। তাদের সমারোহের চোটে গোঁসাইপুকুর তোলপাড় হইয়া উঠিল।

বলাইয়ের ফাৎনা যখন খাড়া হইয়া জলের কোলে ডুবিতেছে, উঠিতেছে, বলাই একাগ্র চিত্তে ফাৎনার দিকে চাহিয়া—চারিদিক্ স্তব্ধ, তখন সহসা বিন্দু কোথা হইতে আসিয়া কহিল,—ও বাবা, আজ দেখচি, পুকুরের জলটুকু অবধি তোমরা রাখবে না। এই তো পুকুর—পাঁচটা ছিপ পড়েচে! কথাটা বলিয়া করতালি দিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

বিন্দুর কথার সঙ্গে সঙ্গে বলাইয়ের ছিপের ফাৎনা আবার সোজা ভাসিয়া উঠিল।—যা, মাছ পালিয়েচে। যে চীৎকার পোড়ারমুখীর! বলিয়া সবেগে ছিপ তুলিয়া বলাই দেখে, টোপ্ সাফ! খিঁচাইয়া সে ডাকিল,—হতভাগী বিন্দী···

বিন্দু চেঁচাইয়া কহিল,—গাল দিয়ো না, বলচি, খবর্দ্দার! এঃ, আস্পর্দ্ধা ভাখো না···

রাগিয়া বলাই বিন্দুর পানে চাহিল; বিন্দুর পাশে চৌদ্দ-পনেরো বছরের আর একটি ছেলে দাঁড়াইয়া ছিল। তার গায়ে জালি গেঞ্জি, পরণে দেশী ধুতি, পায়ে সাদা নাগ্‌রা। এক-মুহূর্ত্তে বলাই তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া লইল, তার পর কহিল—ষাঁড়ের মত চ্যাচালি কেন? আবার চোখ রাঙাচ্ছেন! তোর চীৎকারেই তো আমার মাছ পালালো···

বিন্দু কহিল—ওঃ, ওঁর কোথায় মাছ পালাবে ব'লে মানুষ কথা কবে না···বটে!

—না। কথা কবে না। বলিয়া বলাই রাগের ভরে একেবারে বিন্দুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া কহিল—কি এমন সাপের পাঁচ পা দেখেচো যে অত লম্বা লম্বা কথা কইচো!···সেদিনকার বিছুটির জ্বালা এর মধ্যেই ভুলে গেলে!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মুখ ঘুরাইয়া বিন্দু কহিল—থামো, থামো···সেই বিছুটির জন্যে না খেয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছিলেন সারাদিন···ভারী তো মুরোদ!

—বটে! বলিয়া পায়ের কাছ হইতে ছোট একটা গাব্‌ভ্যারাণ্ডার চারা তুলিয়া লইয়া তার সরু ডালটা দিয়া শপাং করিয়া বলাই বিন্দুর গায়ে আঘাত করিল।

বিন্দু লাফাইয়া হু'পা পিছাইয়া আসিল। পুকুর-পাড়ে কুলের এক টুক্‌রা শুক্‌নো ডাল পড়িয়া ছিল—সেটা ক্ষিপ্র তুলিয়া লইয়া বলাইয়ের মুখে তাই দিয়া সে আঘাত করিল। ডালে কটা কাঁটা ছিল, একটা কাঁটা বলাইয়ের কপালে ফুটিল, অমনি কপাল ছড়িয়া রক্ত ঝরিল।

অতর্কিত আঘাতে বলাই প্রথমটা কেমন চমকিয়া উঠিল, তার পর খপ্ করিয়া বিন্দুর একখানা হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া রাগে ফুঁশিয়া কহিল—এবারে কি হয়? নাই পেয়ে পেয়ে মাথায় চড়েছো—না! জোর্‌সে ছুটি পাক্ ঘুরিয়ে ঐ জলে যদি ফেলে দি এখন···?

বিন্দু সভয়ে ডাকিল—ও শম্ভুদা, ছাখো,···

পাশের জালি-গেঞ্জি-পরা ছোকরাটি শম্ভুদা। শম্ভু বিন্দুর পিশিমার ভাসুরপো; কলিকাতায় থাকে, সৌখীন বলিয়া মনে মনে বেশ একটু জাঁকও আছে। গোরাদের সঙ্গে গড়ের মাঠে মারামারির দু-চারিটা গল্প আজই বিন্দুকে শুনাইয়া দিয়াছে। বিন্দুর আহ্বানে সে একবার নড়িল—নিশ্চেষ্ট থাকা না কি শোভা পায় না, তাই

কিন্তু এ লোকটা যে-রকম গোঁয়ার···সহুরে বলিয়া তার কোনো খাতির যদি না রাখে? সাত-পাঁচ ভাবিয়া সে বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

বিন্দু আবার কহিল—ন্যাখো শম্ভুদা, আমি বুঝি গেলুম···

শম্ভু চাহিয়া দেখে, বিন্দুকে বলাই তখন বেশ জোরে এক পাক ঘুরাইয়া দিয়াছে।

শম্ভু এক পা নড়িয়া ঈষৎ মুরুব্বীর ভঙ্গীতে কহিল—এই, ছেড়ে দে ওকে···

বলাই থামিল, থামিয়া অত্যন্ত তাচ্ছল্যের দৃষ্টিতে শম্ভুর পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল,—ক্ষমতা থাকে, ছাড়াও না এসে। হুকুম করচেন···মহারাজ জগৎসিংহ রে আমার···

তার পর বিন্দুর পানে চাহিয়া বলাই আবার হুঙ্কার ছাড়িল,—ডাক্ আর একবার শম্ভুদা ব'লে—এবং কথা শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুকে সে আরও দুপাক ঘুরাইয়া দিল। শম্ভুর পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা শক্ত হইল। সে আসিয়া বলাইকে ধাক্কা দিল। বলাই হঠিল না—তবে ধাক্কা খাইয়া বিন্দুকে ছাড়িয়া শম্ভুর মাথায় সবলে এক গাঁট্টা দিল। শম্ভু সে গাঁট্টার বেগ সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল। পায়ের নাগরা ছিটকাইয়া এক পাটি পড়িল পুকুরের জলে, আর এক পাটি পাড়ের এক ধারে।···এবং শম্ভুও গড়াইয়া একেবারে পাঁকের উপর।

ব্যাপার সামান্যই। কিন্তু শম্ভুর যা দশা হইল, তা দেখিয়া বিন্দুর দুই চোখ কপালে উঠিল। অমন মানী সৌখীন মানুষ···জুতা জোড়া···বলিল, সাত টাকা দাম দিয়া সে কোন্ দিল্লী না আগ্রা হইতে ফরমাস দিয়া আনাইয়াছে—সেই জুতা!···বিন্দু কহিল—ও কি হলো বলাইদা?···আমাদের সঙ্গে মারামারি করো ব'লে কুটুম মানুষ আমাদের বাড়ী বেড়াতে এসেচে, তার এই হাল করলে! বাড়ীর কথা ভুলে গেছ একেবারে—না?

বলাই কহিল,—যা, যা, না হয় লাগাবি বাড়ী গিয়ে—এই তো! আমি তাতে কাতর নই! ঐ পুতুলের মত এ ননীর গা নয়···দু'ঘা লাঠি জুতো বেমালুম বরদাস্ত করতে পারি··· বুঝলি!···

বিন্দু কহিল,—ওর গায়ে হাত দিলে কি ব'লে তুমি?···

বলাই কহিল,—আমি তো আগে দিতে যাইনি···সখ ক'রে বীরত্ব দেখাতে এলো কেন?···আমায় এসেচেন ধাক্কা দিতে, কলকাতার দু'পয়সার জিলিপি-খেকো ছোঁড়া··· ওঃ, জালিগেঞ্জি প'রে বাবুগিরী ফলাতে এসেচেন···

বিন্দু শম্ভুর কাছে গিয়া তার হাত ধরিয়া কহিল,—ওঠো তো শম্ভুদা। ও ডাকাত, খুনে। বাপ রে বাপ, কাকেও গ্রাহ্য নেই!···

ভূশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়াই শম্ভু কহিল,—আমার জুতো···?

বিন্দু কহিল—এক পাটি ওপরে আছে, আর এক পাটি জলে পড়েচে—ঐ যে···

শম্ভু কহিল,—সাত টাকা দাম! ওঃ, বকুনি খেতে হবে কম ওর জন্যে?

বিন্দু কহিল,—আমি এনে দিচ্ছি···বলিয়া সে জলে নামিল।

বলাই কহিল,—তোকে নামতে হবে না, বিন্দী··· আমি ছিপ দিয়ে টেনে তুল্‌চি...

বিন্দু কহিল,—অত দয়া নাই বা করলেন আপনি···

বলাই কহিল,—তবে যা, জলে নাম্। ভালো কথার কেউ নোস্, দেখচি।···

বিন্দু কহিল,—থাক্, তোমার ভালোয় আমার কাজ নেই!···

বিন্দু জুতা কুড়াইয়া জল ঝাড়িয়া আঁচলে বেশ করিয়া জল মুছিল, তার পর শম্ভুর হাতে জুতা দিয়া কহিল,—কাকেও বলো না. ধরো। উনুনে আগুন দেওয়া হ'লে আমি সেঁকে দেবো'খন···ইঃ···কাপড়টায় কাদা যে···দাঁড়াও, আমি আঁচল ভিজিয়ে রগড়ে কাদা তুলে দি···

শম্ভু কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিল,—আমার জন্মতিথির নতুন কাপড়···একটু ছিঁড়েও গেছে···

নিরুপায় অসহায় দৃষ্টিতে বিন্দু শম্ভুর পানে চাহিল, কহিল,—কি হবে?

শম্ভু তার শোকের করুণ কাহিনী আবৃত্তি করিয়া চলিল—মা বলেছিল্ ছেড়ে রাখিস্ গিয়ে। আমি ভাবলুম, পাড়া-গাঁ দেখতে বেরিয়েছি—ফিরে গিয়ে ছেড়ে ফেল্‌বো···

বিন্দু তেমনি নিরুপায় দৃষ্টিতেই শম্ভুর পানে চাহিয়া রহিল। তার মুখে কোনো কথা ফুটিল না। এমন বিপদে মানুষকে এর পূর্ব্বে সে আর কখনো পড়িতে দেখে নাই!···

শম্ভু কহিল,—এই কাদাটা মুছিয়ে দাও ভাই···

বিন্দু কহিল,—দি···বলিয়া সে আবার জলে নামিল এবং নিজের আঁচলটুকু জলে ভিজাইয়া সেই জল দিয়া শম্ভুর কাপড়ের কাদা মুছিতে প্রবৃত্ত হইল।

বলাই ওদিকে তখন ছিপ লইয়া বঁড়শীতে টোপ গাঁথিয়া আবার জলে ছিপ ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছিল। এ দৃশ্য দেখিয়া সে বিকৃত কণ্ঠে সুর তুলিল —ওরে আমার বাবু রে—খান্ পলা সাবু রে! ছোট মেয়েটাকে দিয়ে কাদা ধোয়াচ্ছে, ন্যাখো···নিজে পারে না!···

বিন্দু চোখ রাঙাইয়া কহিল,—আবার বলাইদা লাগচো কেন! তোমার সঙ্গে আমরা তো লাগতে যাইনি ··

বলাই কহিল,—আমি গান গাইচি—

বিন্দু বিদ্রূপের সুরে কহিল,—গান! ওঃ, তবু যদি গলা থাকতো!···

বলাই ছিপ ফেলিল, ফেলিয়া আবার চুপ করিয়া বসিল। বিন্দু শম্ভুর কাণে কাণে কহিল,—মাছধরা দেখাচ্ছি, দাঁড়াও না···

শম্ভু কহিল,—না ভাই, কিছু করো না—ও ভারী অসভ্য···শেষে যদি···

বিন্দু কহিল,—ওঃ, কি করবে! দু'ঘা মারে যদি? মারুক্ গে—একেবারে মেরে ফেলতে পারবে না তো···

শম্ভু কহিল,—না, না, আমি তা হ'লে চ'লে যাই···

বিন্দু বিস্ময়-ভরা স্বরে কহিল,—তুমি ওকে ভয় করচো শম্ভুদা···গড়ের মাঠে তুমি না গোরা ঠেঙিয়েছিলে!···

শম্ভু ভড়কাইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই কোনোমতে কথা খুঁজিয়া জবাব দিল—আরে, তারা কশরৎ জানে, তাগ-বাগ মানে। বুঝলি, তারা হলো মিলিটারী লোক। বুনো চাষার মত মাথায় অমন আচম্‌কা গাঁট্টা চালায় না···তাদের মারধরের সব আইন-কানুন আছে···

বিন্দু অবাক্ হইয়া শম্ভুর পানে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া কহিল,—তুমি তা হ'লে ঘরেই যাও। আমি কিন্তু এম্‌নিতে ছাড়চি না···এত লাঞ্ছনা করলে—আমি ওকে মাছ ধরতে কখ্‌খনো দেবো না কিন্তু···

শম্ভু অবাক্! এ মেয়েও তো ডানপিটে কম নয়!··· তার কিন্তু থাকিতে ভরসা হইল না। অথচ সে-ভাব বিন্দুর কাছে প্রকাশ করাও যায় না। বুদ্ধি করিয়া শম্ভু কহিল,—আমি ভাই তা হ'লে বাড়ী থেকে কাপড়টা ছেড়ে আসি বরং···ভিজে গেছে পুকুরের জলে—শেষে যদি ম্যালেরিয়া ধরে···

কথাটা বলিয়া বিন্দুর উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া শম্ভুচরণ ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। বিন্দু গিয়া চুপ করিয়া পুকুরের পাড়ে বসিল।

বলাইয়ের ফাৎনা ঐ আবার ডোবে, আর ভাসে, ভাসে আর ডোবে! বুঝি···ফাৎনার দিকে বলাইয়ের আবার সেই একাগ্র দৃষ্টি!···

সহসা ফাৎনার গা ঘেঁসিয়া একরাশ মাটীর ঢেলা পড়িল—ঝড়্‌ঝড়্!···বিষম বিরক্ত হইয়া বলাই পিছনে ফিরিল—কেহ নাই···না থাকিলেও কি করিয়া ঐ মাটীর ঢেলাগুলা আসিল, তা বুঝিতে বলাইয়ের বাকী রহিল না!···সে শুধু হাঁকিল—বিন্দী···

সে ছিপ তুলিল, টোপ ঠিক আছে···আবার ফেলিল।···

দু'মিনিট পরে ফাৎনার তেমনি নৃত্য—সঙ্গে সঙ্গে জলে আবার একরাশ মাটীর ঢেলা!···

মানুষের মন—তার ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। বলাই ছিপ ফেলিয়া উঠিল।···ঠিক! ঐ বড় তেঁতুল গাছটার আড়ালে দাঁড়াইয়া বিন্দু!···

দ্রুত আসিয়া বিন্দুর হাত চাপিয়া ধরিয়া তীব্র কণ্ঠে বলাই ডাকিল,—বিন্দু···

বিন্দু মন্ত্র পড়া সাপের মত একেবারে বলাইয়ের পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকাইয়া লুটাইয়া পড়িল, কহিল,—ছাড়ো, ছাড়ো, বলাইদা—ও কি হয়েচে! ইঃ, তোমার কপালে রক্ত জমাট বেঁধে রয়েচে যে—মা গো···

বলাই হাত দিয়া কপাল রগড়াইল···রক্তের শুষ্ক চাপ সরিয়া গিয়া ঝরঝর করিয়া আবার তরল রক্ত গড়াইয়া পড়িল। বলাই কহিল,—তোর কুলের ডালের কাঁটায় ছড়ে গেছে···আমার হুঁশ ছিল না রে···

—দাঁড়াও, আমি জল এনে ধুইয়ে দি ··

বলাই কহিল,—কোনো দরকার নেই···আমি নিজে জল দিচ্ছি···

বিন্দু কহিল,—এখনি তবে ধুয়ে ফ্যালো···আমি ঘা এনে থেঁতো ক'রে দি···ওর উপর চেপে দাও···

বলাই হাসিল, কহিল,—তোর শম্ভুদা খুব শিক্ষা পেয়ে গেছে মোদ্দা, না?

বিন্দু কহিল,—তোমার ভারী অন্যায়। আমার গায়ে হাত তোলো ব'লে ওর গায়েও? ছি···কুটুম মানুষ এসেচে···

বলাই কহিল,—ভারী দরদ দেখচি যে···কাল উনি এসেচেন বোধ হয়?

বিন্দু কহিল,—হ্যাঁ।

বলাই কহিল,—তা বুঝেচি। তাই!···কাল তোমার কি কথা ছিল আমার সঙ্গে?···আমার জন্যে এক ধামী কুঁড়ো জোগাড় করবি বলেছিলি না?

বিন্দু কহিল,—ভুলে গেছলুম বলাইদা, সত্যি··· তা, আনবো?···এখনি আনতে পারি।

বলাই কহিল,—তোমার কুঁড়ো আমি নেবো না···মিছি মিছি এনে কি হবে?

—নেবে না? বিন্দুর চোখ ম্লান হইল।

বলাই কহিল,—না। তুমি যাও, তোমার শম্ভুদার খাতির করো গে। আমার মাছ ধরা হলো কি না হলো, তাতে তোমার কি এসে যাবে! আমি পাড়াগাঁর চাষা-ভুষো লোক, যার-তার সঙ্গে মারামারি ক'রে বেড়াই, আর শম্ভুদা হলো সহুরে ছেলে···জালি-গেঞ্জি গায়ে দেয়, পায়ে নাগরা পরে···

বিন্দুর মুখে নিমেষে হাসির দীপ্তি ফুটিল। হাসিয়া বিন্দু কহিল,—তুমি ভারী হিংসুটে তো বলাইদা···না, না, তুমি মাছ ধরো—আমি আর কিচ্ছু করবো না।

বলাই কহিল,—আমি মাছ ধরবো না আর।

—কেন?

—আমার খুশী!···তোমার খুশী হ'লে তুমি কুঁড়ো আনা ভুলে শম্ভুদার কাছে গল্প শোনো না? তা ছাড়া আজ মাছ ধরবো জানো, অথচ তোমার এখানে আসবার নামটি নেই···

স্বরে মিনতি ভরিয়া বিন্দু কহিল,—সত্যি বলাইদা, শম্ভুদা বল্লে, পাড়া-গাঁ দেখবে—তাই ওকে সঙ্গে ক'রে একটু বেরিয়েছিলুম···

বলাই কহিল,—বেশ তো বাবু, যাও না—কুটুম-মানুষ বাড়ীতে একা ফিরে গেলেন, তাঁর মানের হানি হবে যে তুমি এখানে থাকলে!···

বলিয়াই সে উচ্চ কণ্ঠে হাঁকিল,—ওরে সারু, ঢের হয়েচে···ওঠ্···আর ব'সে ব'সে মশার কামড় সহ্য করা যাচ্ছে না। একবার কালীঘাটে যাবার বাসনা হচ্ছে—চ'না, একবার মাকে দর্শন ক'রে আসি গে···না হলে তিনি কি ভাববেন!

হাসিয়া বিন্দু কহিল,—হঠাৎ ভক্তি জেগে উঠলো যে···

বলাই কহিল,—তা নয়। আমাদের ক্লাশের একটা ছেলে থাকে কালীঘাটে,—সে লাল মাছ দেবে বলেচে, আর বেশ ভালো ডবল জুঁইয়ের চারা···

বিন্দু কহিল—তাই বলো! আমি ভাবছিলুম, এত ভক্তি হঠাৎ···তা, আমায় দুটো লালমাছ দিয়ো না বলাইদা···

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দুঃখ-সুখের জের

পরের দিন ছিল রবিবার। সকালেই বলাই গিয়া ডাকিল—বিন্দু···

—কে? বলাইদা? বলিয়া ঘরের মধ্য হইতে বিন্দু আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইল।

বলাই কহিল,—কাল কালীঘাট থেকে তোর জন্যে কতকগুলো পুতুল এনেচি···

—কৈ? দেখি, দাও···বলিয়া বিন্দু একেবারে আসিয়া বলাইয়ের হাত ধরিল।

বলাই কহিল,—এখানে আনি নি, বাড়ীতে আছে··· এখনি চাই?

—হ্যাঁ, চাই, এখনি···আর আমার লালমাছ?··· বলিয়া বলাইয়ের হাত ধরিয়া বিন্দু একেবারে তিড়বিড় করিয়া নাচিয়া উঠিল।

বলাই হাসিয়া কহিল—লালমাছ দু'দিন আমার কাছে থাকুক, একটু চেনা-শোনা করি, তার পর নিস্। আর পুতুল যদি চাস্ তো চ' আমার সঙ্গে।

বিন্দু কহিল,—চলো···বলিয়া সে পা বাড়াইল।

কণ্ঠস্বর একটু মৃদু করিয়া বলাই কহিল—সেই সহুরে বাবুটি কোথায়? তোমার শম্ভুদা?

পাশেই ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বিন্দু কহিল, —ঐ ঘরে···

বলাই কহিল—আজ পাড়া-গাঁ দেখতে বেরোন নি যে? জুতো ভিজে ব'লে বুঝি? বলাই হাসিল।

বিন্দু কহিল—কালকের সে কথা কেউ টের পায় নি। আমায় বারণ ক'রে দেছে, কাকেও যেন না বলি···

হাসিয়া বলাই কহিল—বুঝেচি···পাছে কীর্ত্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে!···

বিন্দু কহিল—চলো ভাই, পুতুল দেবে, চলো। আমায় আবার এসে শম্ভুদার জন্যে হালুয়া তৈরী ক'রে দিতে হবে।

বলাই কহিল—হঠাৎ?

বিন্দু কহিল—পিশিমা খাবার আনিয়ে দেবার কথা বলেছিল, তা পাড়াগাঁর খাবার খেলে পাছে অসুখ করে, তাই···

—ওঃ! নবকার্ত্তিক আমার! তোমার ঐ শম্ভুদাদাটি দেখচি, একের নম্বরের একটি ফাতুশ! তা, যাই বলো···

বিন্দু চারিধারে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিল, চাহিয়া কহিল—চুপ করো ভাই···শুনতে পাবে।

বলাই কহিল—শুনতে পেলে আমায় ফাঁশি দেবে, না?···

বিন্দু কহিল—তোমায় ফাঁশি না দিক, আমায় বকবে খামোকা। তুমি চলো বলাইদা···আমায় এখনি ফিরতে হবে। উনুনে আগুন দেওয়া হয়েচে—উনুন এখনও ধরেনি···

বলাই ও বিন্দু দুজনে বাহির হইয়া পড়িল। পথে আসিয়া বলাই কহিল,—একটা মতলব করছিলুম, তা, দেখচি, সে আর হবে না।

—কি মতলব, বলাইদা?

বলাই কহিল—সে আর ব'লে কি হবে? তুমি তো ঐ প্রবলপরাক্রান্ত শম্ভুদার পরিচর্য্যা করবে!···

—আঃ, বলোই না···

বলাই কহিল—শ্যামা বাগ্দীর গাছে ইয়া বড় বড় আম ফলেচে···শ্যামা বলেছিল, আমায় গোটাবারো আম দেবে, তাই ভেবেছিলুম, কাঁচা আম ছেঁচে লঙ্কাবাটা দিয়ে খাবো··· আর কাঁচা আমের সরবৎ করবো···তা, কে বা লঙ্কা বেটে দেয়—কে বা তৈরী করে···

বিন্দুই এ-সব কাজে তার সহায়তা করিয়া থাকে। বিন্দু বুঝিল, আজ শম্ভুদার পরিচর্য্যায় সে আট্‌কাইয়া হয়াছে। তাই···

সে কহিল,—তা, আমি জোগাড় ক'রে দেবো সব··· তুমি আম নিয়ে এসে আমায় দিয়ো···

বলাই কহিল—বাড়ীতে ব'সে খেতে কি মজা আছে!··· তৈরী ক'রে সেই রথতলার ঘরের শানে ব'সে তোফা খাওয়া যেতো—তা ছাড়া আমাদের থিয়েটারের রিহার্শালও দিতুম···

বিন্দু কহিল—কি করবো ভাই, শম্ভুদার পাঁচশো ফরমাশ—জল দাও, পাণ দাও, হাওয়া করো···

রাগিয়া বলাই কহিল—এত যদি তো নিজের বাড়ীতে গিয়ে ফরমাশ চালাক না। পরের বাড়ী এসে পরের উপর এ জুলুম কেন? ওঁর বাঁদী নোস্ তো তুই!

বিন্দু কহিল—পিশিমাকে নিতে এসেচে—তাই··· পিশিমা আজ যেতে পারবে না, আজ একাদশী কি না, কাল পারণ ক'রে সকালেই ওর সঙ্গে যাবে।

বলাই কহিল—তুমিও যাবে তো?

বিন্দু কহিল—তা যেতে হবে বৈ কি। একলা কার কাছে এখানে থাকবো?

বলাই কহিল—কেন, আমাদের বাড়ী? পোষমাসে যখন পিশিমা গঙ্গাসাগর গেছলো, তখন তুমি সঙ্গে গেছলে কি?

বিন্দু কহিল—সে হলো গঙ্গাসাগর···

তার মুখের কথা লুফিয়া বিদ্রূপের সুরে বলাই কহিল—আর এ একেবারে স্বর্গের ইন্দ্রভবন···না?

বিন্দু এ কথার কোন জবাব দিল না। বলাই কহিল,—নেমন্তন্ন-বাড়ী কত কি খাবে, তা কি বুঝি না? বুঝি!···

বিন্দু কহিল,—আঃ, কি যে পাগলের মত বকো তুমি! আপনার লোকের বাড়ী মানুষ নেমন্তন্ন যায় না?···

বলাই কহিল,—ভারী তো আপনার লোক! পিশির ভাশুরের বাড়ী! কথায় বলে,—মামার শালা পিশের ভাই, তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই।

কথায় কথায় দুজনে বলাইয়ের বাড়ী আসিয়া পৌঁছাইল। বলাই একগাদা মাটীর পুতুল, ভাঁড়, খুরি, উনুন প্রভৃতি বিন্দুর সামনে ধরিয়া দিল। মহানন্দে বিন্দু সেগুলা আঁচলে বাঁধিয়া কহিল,—এখন তা হ'লে চললুম ভাই বলাইদা···হালুয়া করতে হবে কি না। তুমি কমলাকে দিয়েচ তো?···

—হ্যাঁ রে, হ্যাঁ, দিয়েচি···তোমার উপদেশের তোয়াক্কা রাখতে হয়নি।···

পুতুল প্রভৃতি লইয়া বিন্দু কহিল,—তা হ'লে লঙ্কাবাটা-টাটা সব তৈরী রাখবো বলাইদা—তুমি এসো ঠিক··· কথাটা বলিয়াই সে ছুট্ দিল।···

বেলা এগারোটায় বলাই আবার গিয়া ডাকিল,—বিন্দু···

বিন্দু কহিল,—কেন?···

বলাই কহিল,—আম পাড়তে যাচ্ছি—চ'···

বিন্দু ঠোঁট বাঁকাইয়া কহিল,—আমার যে ভাই মুস্কিল··· শম্ভুদা নাইতে গেছে, নেয়ে সে খেতে বসবে, তখন আমায় তাকে বাতাস করতে হবে।

বলাই কহিল,—ওঃ, খাণ্ডাখাঁ—বাঁদী পাঙ্খা না ঢুলোলে খাওয়া হয় না!···এত তাঁবেদারী করচো যে, কি পাবে?···

বিন্দু সে-কথা কাণে না তুলিয়া কহিল,—তুমি দাঁড়াও, আমি লঙ্কা বেটে ঠিক ক'রে রেখেচি সব···আমাকেও একটু দিয়ে যেয়ো···বলিয়াই সে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ সদ্যঃস্নাত শম্ভুদা আসিয়া সেখানে উপস্থিত। শম্ভুদা কহিল,—কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস্ রে?···ওঃ, সেই হতভাগাটা···শম্ভু শিহরিয়া উঠিল।

—কি বল্লি? বলিয়া বলাই এক লাফে চৌকাঠের উপর আসিয়া দাঁড়াইল।

ওগো খুড়িমা গো, একটা খুনে—বলিয়া শম্ভু এক-দৌড়ে অন্দরের মধ্যে অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল।

ভিতর হইতে পিশিমার সাড়া পাওয়া গেল। পিশিমা কহিলেন,—কি রে, শম্ভু···কি হলো বাবা?···

শম্ভু কহিল,—একটা হতভাগা ছোঁড়া তেড়ে মারতে এসেছিল···

—কে রে? কে? বলিয়া পিশিমা আসিয়া রঙ্গস্থলে উদয় হইলেন। বলাই পলায় নাই, দাঁড়াইয়াছিল। হাসিয়া সে কহিল,—আমি, পিশিমা···

—তুই! বলাই! বাবাঃ, যে ভাবে ছেলে আঁত্কে চেঁচিয়ে উঠলো, আমি ভাবলুম, কি না কি হলো!··

বলাই কহিল,—আহ্লাদে ননীর পুতুল!···শুধু তাই নয়। ভারী স্বার্থপর আর অসভ্য কিন্তু পিশিমা তোমার ঐ শম্ভু বাবুটি!···

দুই চোখে সতর্ক-সঙ্কেত তুলিয়া পিশিমা বলাইয়ের পানে চাহিলেন। বলাই কহিল,—তোমরা কাল কলকাতায় যাচ্ছ নাকি?···

পিশিমা কহিলেন,—হাঁ বাবা। বড় যা'র ছেলে এসেচে নিতে,—তার দৌত্তুরের পৈতে পরশু। যেতুম না, তা ব'লে পাঠিয়েচে, তোমার ভাইঝীটিকেও সঙ্গে এনো···একটা সম্বন্ধ লাগলেও লাগতে পারে! দেখি বাবা, তাই আমার যাওয়া···যদি মেয়েটার কোনো···

বলাই কহিল,—ওঃ!···

সে চলিয়া যাইতেছিল, বিন্দু আসিয়া কহিল,—বা রে ছেলে!···আমি লঙ্কা বেটে আনলুম, না নিয়ে চ'লে যাওয়া হচ্ছে! আমি···

তার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শম্ভু বাবুর সবল আহ্বান জাগিল—বিন্দু, শীগ্‌গির এসে ঠাঁই ক'রে দাও। ও খুড়িমা···

পিশিমা কহিলেন,—ও মা বিন্দু, চ', মা, ওদিকে···

বলাই কহিল—হ্যাঁ, যাও, না হ'লে বীরেন্দ্রকেশরীর ওধারে খিদের চোটে মূর্চ্ছা হ'তে পারে!···

বিন্দু কহিল,—যাই, তোমার এই লঙ্কা-বাটা নাও···

—থাক গে, দরকার নেই!···বলিয়া এক পাক্ ঘুরিয়া বলাই চক্ষের নিমেষে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

বিন্দু থ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া লঙ্কা-বাটার তালটা ছুড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিল; দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

ভিতরে আসিবামাত্র শম্ভুদা কহিল,—ছুঁচোটা গেছে?···

বিন্দু কহিল,—ছুঁচো বলো না, শম্ভুদা···এ দিকে গোঁয়ার হলেও বলাইদার মত লোক দেখা যায় না! পাড়ার সকলে তাকে ভালোবাসে!···

শম্ভু তাচ্ছল্যের ভাবে কহিল,—থাক্···যেমন তোমার পাড়া, তেমনি তার ভালোবাসা! হতো আমাদের পাড়ায় তো থামে বেঁধে জুতিয়ে দিতুম। সেখানে আমাদের প্রতি-পত্তি বড় কম নয়···থানা-পুলিশ অবধি আমাদের হাতে। ইনস্পেক্টর রোজ রাত্রে তাস খেলতে আসে বড়দার কাছে! ডকের কত গোরা···

বিন্দুর রাগ হইল। রাগে সে মুখ ফিরাইল। যত বড় কথাই কও তুমি, তা বলিয়া বলাইদার অপমান সহ্য করিব না! এমনি ভাব!

মুখে সে কিছু বলিল না। ঝপ করিয়া একখানা আসন পাতিয়া দিয়া কহিল,—খেতে বসো…তার পর ডাকিল,—ও পিশিমা, ভাত দিয়ে যাও গো, শম্ভুদা বসেচে!…

শম্ভু কহিল,—কৈ, পাখা কোথায়…? বড় গরম তোমাদের এখানে…তা যাই বলো, বাবু!…হুঁ, বলে, Town life and Country life—আরে, Townএর কাছে Country…যেন স্বর্গের কাছে নরক!…

পিশিমা ভাতের থালা আনিয়া আসনের সামনে ধরিয়া দিলেন। শম্ভু খাইতে বসিল।

বিন্দু দুম-দুম শব্দে ঘর হইতে পাখা আনিয়া বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। সে গুম্ হইয়া রহিল।

শম্ভু কহিল,—লাইনের ওধারটায় একবার যাবো ভাবচি…যাবে বিন্দু?

বিন্দু গম্ভীর স্বরে কহিল,—না। আমার কাজ আছে।…

তার কিছু ভালো লাগিল না—লঙ্কাবাটা চাহিয়া বলাইদা যে লইল না, নিশ্চয় তার কোথাও বেদনা বাজিয়াছে, তাই!…বয়সে ছোট হইলেও বিন্দু এটুকু বেশ বুঝিল; বুঝিয়া শম্ভুর উপর তার রাগ ধরিল। রাগে সে গুম হইয়া রহিল; হাতের পাখা কলের মত নড়িতে লাগিল।…

বলাইয়েরও কেমন সব গোলমাল হইয়া গেল। এই মেয়েটি নির্ব্বিচারে তার কত অত্যাচারই যে সহিয়া আসিতেছে! রাগে যা-তা বলে, মা'র কাছে গিয়া নালিশ করে, তবু বলাইয়ের মুখ ভার দেখিলে নিজেই আবার কত বড় অপরাধীর মত আসিয়া সেই অত্যাচার মানিয়া চলে!…রাগ ধরিল ঐ শম্ভুর উপর—বাবু-চালে বিন্দুর উপর সে যদি প্রতিপত্তি গড়িয়া তোলে! বিন্দু বলাইকেই শুধু আজ পর্য্যন্ত সব-দিকে-বড় বলিয়া মানিয়া পাড়ার আর সকলের কাছে তার মাথা কতখানি উঁচু করিয়া দিয়াছে!…সেই বিন্দু ঐ সহুরে চালে মুগ্ধ হইয়া যদি ভাবে, ঐ লোকটির পাশে বলাই নেহাৎ ছোট, গেঁয়ো চাষার মত!…

তার দুশ্চিন্তা ধরিল। সে দুশ্চিন্তায় পড়িয়া শ্যামা বাগ্দীর কথা, তার কাঁচা আমের কথাও সে ভুলিয়া গেল। সারা দিনটা উদাসীর মত এপথে ওপথে সে ঘুরিয়া কাটাইয়া দিল। খাওয়া হয় নাই—সে কথাও তার মনে পড়িল না।…

সন্ধ্যার পর বলাই বাড়ী ফিরিল শুধু মা'র কথা মনে করিয়া। মা ভাবিতেছেন, হয় তো খান নাই।

গৃহে ফিরিয়া দেখে, বাহিরের ঘরে জটলা। বাপ আছে, একটা খোট্টা লোক, দুটি বাঙালীও সেই সঙ্গে। একটা তর্ক-কলরব চলিয়াছে! একটা কথা তার কাণে গেল—এক জন বাঙালী বলিতেছিল,—আমরা কেউ গাড়োয়ানের সাথে থাকৃবু না…সঙ্গে সঙ্গে খোট্টা কহিল,—ঠিক বাৎ জীয়ন বাবু…

সে কথা বিস্তারিত শুনিবার বলাইয়ের ইচ্ছা ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। সে সোজা অন্দরে ঢুকিয়া ডাকিল, মা…

মা বলিলেন,—বাড়ীর কথা মনে পড়েচে! তবু ভালো। তোর জ্বালায় ইচ্ছা করে বিবাগী হয়ে যেদিকে দু'চক্ষু যায় চ'লে যাই! কি ছেলেই পেটে ধরেছিলুম…হাড় কালি মাষ কালি ক'রে ছাড়লি রে আমার।…খাস্‌নি তো সারাদিন…?

বলাই কহিল,—না।

মা বলিলেন,—কেন? কোন্ চুলোয় গেছলি রে হতভাগা?…এমন মত্ত যে খাওয়ার কথা হুঁস থাকে না।

বলাই কহিল,—তুমিও খাওনি, মা?

মা বলিলেন,—কেন খাবো না! ওঃ, ভারী ছেলে রে আমার—স্বর্গে বাতি দেবেন কি না…

বলাই কহিল,—বুঝেচি মা, দু'জনের ভাত বাড়ো… তোমার সঙ্গে ব'সে খাবো…

মা বলিলেন,—আমি খাবো না তো…কখ্খনো খাবো না।

বলাই কহিল,—তুমি না খেলে আমিও খাবো না… ভালোই হবে সে। গেরোস্তোর এক দিনের খরচের সুসার হবে।

মা বলিলেন,—কথায় পাকামো খুব! বুদ্ধি পাকে না কেন?…

বলাই কহিল,—খাবো ভাত—দাও না, সত্যি ভারী খিদে পেয়েচে। খাওয়া হ'লে তার পর যত পারো বকো, গালাগাল দিয়ো, ঠেঙিয়ো…ভরা পেটে সব সহ্য হবে মা।…

মা বলিলেন,—কি বরাত করেই এসেছিলুম!…

গজ গজ করিতে করিতে মা রান্নাঘরে গেলেন এবং দু'থালা অন্ন বাড়িয়া ডাকিলেন—আয় বলা, এই রান্নাঘরেই এসে বোস, আর নিয়ে যেতে পারি না বাবা…

বলাই খাইতে বসিল, মা'ও সেই সঙ্গে বসিলেন।…

উঠান হইতে জীবন চক্রবর্ত্তী ডাকিলেন,—বলা আছিস রে?…

বলাই কহিল,—খাচ্ছি রান্নাঘরে…

জীবন আসিয়া কহিলেন,—তোর কাল মর্ণিং স্কুল, না?

বলাই কহিল,—হ্যাঁ।

জীবন কহিল,—তা শোন্, কাল স্কুলের ছুটীর পর আমার সঙ্গে তোকে একবার খিদিরপুরে যেতে হবে। একটা হোটেলে তোকে খাইয়ে নিয়ে যাবো'খন, খাবার জন্য ভাবতে হবে না। তার পর এক গাড়ী মাল চালান আসবে—তুই সেই গাড়ীর সঙ্গে আসবি, বুঝলি? দু'টাকা প্রাইজ দেবো। কেমন, পারবি?

দুইটি টাকার লোভে মহা খুশী হইয়া বলাই কহিল,—পারবো।

জীবন কহিল,—তোর দশটায় ছুটী তো…দশটার সময় তোদের স্কুলের দরজায় আমি তোর জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবো'খন।

বলাই কহিল,—আচ্ছা। [ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

পথের স্মৃতি

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে কয়টা মাস কাটিয়া গেল। পূজা আসন্ন হইয়া আসিল। জ্যেঠামহাশয়কে পূর্ব্বে পত্র দিয়া দুর্গা-পূজার কয়েক দিন আগে আমরা কাশীযাত্রা করিলাম। বিনুদা আমাদের দেখিয়া কহিল,—"এসেছিস্, ভালই হয়েছে। বাবা তোদের জন্যে বড্ড অস্থির হয়ে পড়েছিলেন।"

পরদিন প্রভাতেই বিনুদাকে সঙ্গে লইয়া সীতাদের বাড়ী আসিলাম। উপর হইতে দেখিতে পাইয়াই ছুটিয়া নীচে আসিয়া সীতা কহিল,—"ফাইন্ হব-হব হয়ে আসছিল, এসে প'ড়ে বড্ড রক্ষে পেয়ে গেলেন। দিদিকে এনেচেন ত? নইলে আবার ডবল ফাইন্ দিতে হবে। তার পর? আছেন কেমন সব বলুন ত? দিদি ভাল আছেন?" তাহার পর বিনুদার দিকে চাহিয়া কহিল,—"বিনু বাবু হলেন আমাদের একেবারে কুটুম্ব, বসতে না বললে ত আর কিছুতেই বসবেন না। আর, উনি এ বাড়ীতে বড় একটা আসেনও না। আগে দু'বেলাই আসতেন, আজকাল আসা-টাসা একেবারেই ত্যাগ করেচেন। মামা বাবু এক এক দিন জোর-জবরদস্তি ক'রে ধ'রে নিয়ে আসেন, তাই, নইলে হয় ত মোটেই এ-মুখো হ'তেন না। কি? কট্মট্ ক'রে চেয়ে রয়েছেন যে বড়? বলুন না—আসেন?"

বিনুদা একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া কহিল,—"আগেকার মত আজকাল আর বেশী তেমন আসতে পারি না বটে, কিন্তু না-পারার কারণও ত তুমি জান, সীতা। আজকাল কাযের—"

"আর আপনার অন্ত নেই,—রান্না-বান্না, বাসন-মাজা, জলতোলা—আর কি, বিনু বাবু?—ছেলে ধরা, বাজার-হাট করা।" অনেক দিন পরে সীতার সেই অনুচ্চ সরল হাসির লহরী কাণ ভরাইয়া দিয়া ঘরময় তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। বিনুদা মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিল,—"আসতে ত রোজই পারি সীতা, কিন্তু ইচ্ছা হয় না; কারণ, অতিথির আদর যেমন হওয়া উচিত—তেমন হয় না। যা'ও দু'এক দিন অন্তর আসি, তা'ও আর আসব না।" সীতা সাশ্চর্য্যে বিনুদার মুখের দিকে ঠায় চাহিয়া রহিল। বিনুদা কহিল,—"এতে লাভের মধ্যে তিনটে জিনিষ হচ্চে। প্রথম, অতিথির অপমানও হচ্চে, তার পর, হার্ম্মোনিয়মটাও প'ড়ে প'ড়ে খারাপ হয়ে যাচ্চে, আর তোমারও গলা বন্ধ হয়ে যাচ্চে।"

হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া সীতা কহিল,—"উঃ, আমার এমন ভয় হয়েছিল, বাস্তবিক বলচি! কিন্তু আর যাই হোক্, গলা আমার কিছুতেই বন্ধ হচ্চে না, সে বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত। এমন চেঁচাতে পারি আমি যে, আপনাদের গলাও তার কাছে হার মানবে।"

"হ্যাঁ, তার প্রমাণ ত সেই সে-রাত্রে পাওয়া গেছে, যে রাত্রে গুণ্ডোদের হাতে পড়েছিলে।"

"তা' কি করব বলুন, তখন যে চেঁচাতে পারি নি। তার কারণ হচ্চে—"

"কি হচ্চে?"

"তারা যে গলায় চুপিলী দিয়েছিল।"

কৌতুক-দৃষ্টিতে সীতার মুখের দিকে চাহিয়া বিনুদা জিজ্ঞাসা করিল,—"চুপিলী?"

"হাঁ। চোররা যেমন মন্তর প'ড়ে চোখে নিদিলী দিয়ে চুরী করে, ওরাও তেমনি গলায় যে চুপিলী দেয়, আর চেঁচাতে পারা যায় না, একেবারেই রব বন্ধ হয়ে যায়।"

"কিন্তু তোমার সে চুপিলীর জের কি এখনো রয়েচে, সীতা?"

"কি মুস্কিল! যে দিন আসেন, সেই দিনই ত গান গাই।"

"মিথ্যা কথা বললে যে পাপ হয়, তা বোধ হয় নিশ্চয় জান।"

আমি কহিলাম,—"আচ্ছা, অত গণ্ডগোলে কায কি, দু'একখানা গান গাইলেই ত আর বিনুদার বলবার কিছু

থাকবে না।" আমার দিকে চাহিয়া, সীতা, কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া কহিল,—"আপনিও কম দুষ্টু নন।"

অক্ষয় ভিতর হইতে হার্ম্মোনিয়ম দিয়া গেলে, সীতা সুর দিতে দিতে কহিল,—"বিনু বাবুর সবই অদ্ভুত। এমন সুন্দর সকালবেলাতে ষাঁড়ের চেঁচানি শোনবার সাধ যে কেন, তা বুঝতে পারি না।"

বিনুদা কহিল,—"তুমি যদি বিনু বাবু হ'তে আর আমি যদি সীতা হতুম, তা হ'লে তুমিও এই রকম অদ্ভুত হ'তে, সীতা।"

যাহা হউক, সীতা গান ধরিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া খুব মস্ত বড় একটা কীর্ত্তন গাহিয়া, সীতা জোরে হার্ম্মোনিয়মটাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল,—"হয়েচে ত, আর কখনো গান শুনতে চাইবেন? কাণের ভেতর জ্বালা করচে?"

"হ্যাঁ,—পিপাসার জ্বালা, অর্থাৎ—"

আমি কহিলাম,—"আচ্ছা, এ সব কীর্ত্তন আপনাকে কে শিখিয়েছেন?"

"এ সব মামাবাবুর কীর্ত্তি। গান শেখাবার জন্যে মামা যাঁকে ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন, তাঁর ইচ্ছামত গান ত মামা তাঁকে শেখাতে দিতেন না। নিজেই সব গান বেছে পছন্দ ক'রে দিতেন।"

বিনুদা কহিল—"মামা কোথায়, সীতা?"

"মামা যে কোথায়, তা বলা যে বড় শক্ত বিনু বাবু; সে ত আপনিও জানেন। বাড়ীতে যে নেই, এইটুকুই শুধু বলা যেতে পারে। বাজারের নাম ক'রে কোথায় যে গেছেন, তা মামা বাবু ছাড়া আর কার' ত বলবার শক্তি নেই। বাজারে গিয়ে থাকতেও পারেন, গঙ্গার কোন একটা ঘাটে গিয়ে ব'সে থাকতেও পারেন, রাস্তায় সাপ-খেলা বাঁদর-খেলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেও পারেন। কিম্বা কোন সাধু-সন্ন্যাসীর আড্ডায় গিয়ে ব'সে ব'সে তত্ত্ব-আলোচনা ক'রে ক্ষিদে বাড়াতেও পারেন", বলিয়া ঘরের মধ্যে একটা সরল সুমিষ্ট হাসির প্রতিধ্বনি তুলিয়া সীতা চুপ করিল।

আমি হার্ম্মোনিয়মটাকে টানিয়া তাহার দিকে ঠেলিয়া দিয়া কহিলাম,—"কিন্তু আপনি যে ঐ একখানি গেয়েই এই সব বাজে কথা আরম্ভ করলেন বড়? আর গাইবেন না নাকি?"

সীতা প্রথমে একটু হাসিয়া তাহার পর কৃত্রিম ক্রোধের সহিত কহিল,—"নিশ্চয় গাইব, দাঁড়ান ত, দশখানা, বিশ-খানা, পঞ্চাশখানা, একশখানা;—আপনাদের কাণ একে-বারে ঝালাপালা ক'রে দেবো। চিল-চীৎকারের চোটে ছুটে যদি না পালাতে হয় ত আমার নামই—" বলিয়া সীতা আর একখানি গান ধরিল। ইহা ভজন-শ্রেণীর গান, বড় মধুর, বড়ই ভাবময়। শুনিয়াছিলাম, সঙ্গীত ঠিকমত গাওয়া হইলে তাহার সুর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। আমার মনে হইল, সীতার সুমিষ্ট কণ্ঠ, তাহার শিক্ষা এবং অন্তর্নিহিত ভাবের সহিত মিলিত হইয়া সেই ভজনের সুরখানিও যেন প্রাণময় হইয়া সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। লক্ষ্য করিলাম, গাহিবার কালে সীতার মুখের ভাব, চোখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এ যেন একটু আগের সীতার সে মুখ-চোখ নহে। গানের ভাবের সহিত মিলিত হইয়া তাহার অন্তরাত্মাও যেন গানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগামী হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রায় মিনিট পনর ধরিয়া গাহিবার পর সীতা গানখানি শেষ করিয়া শাড়ীর আঁচল দিয়া কপালের ঘাম মুছিল। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও মুখ হইতে কোন কথাই বাহির হইল না। এই সময় বাহির হইতে মামা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার এক হাতে একটা রুই মাছ আর এক হাতে একটা খাবারের চোবড়া। আমাকে দেখিয়াই চমকাইয়া উঠিয়া কহিলেন,—"এই যে, এসে পড়েছ, বাবাজী। ক'দিনই মনে কচ্ছিলুম যে—বৌমাদের সব এনেচো ত? সীতা, এগুলো ভেতরে নিয়ে যা ত মা। বিনু, পালিও না যেন, আমি এখনি আসচি।"

মাছ ও খাবারের চোবড়াটি হাতে করিয়া লইয়া সীতা জিজ্ঞাসা করিল,—"আবার আপনি কোথায় যাবেন, মামা?"

"এক কাণ্ড ক'রে এসেছি মা, এখনি আবার ছুটতে হবে।"

"কি, মামা বাবু?"

"দশ আনার খাবার নিয়ে একখানা নোট দিলুম. বাকী টাকা কৈ সে ত দেয়নি। পঞ্চু, অনেক কথ আছে, চ'লে যেয়ো না, এখনি আমি আসচি।" বলিয় মামা দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। সীতা কহিল,—"আমার কথা ত' আর নয়, মামা বাবুর কথা নিশ্চয়ই ঠেলতে পারবেন না। বসুন, পালিয়ে যাবেন না। অন্ততঃ মিনিট পাঁচেক, আমি ভেতর থেকে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত"—

বলিয়া সীতা ভিতরে চলিয়া গেল ও কিছুক্ষণ পরেই দুই-খানি রেকাবীতে খাবার সাজাইয়া দুই হাতে ধরিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল ; কহিল,—"অতিথির সৎকার গান এবং পান অর্থাৎ সামান্য একটু জলপান। তা' হবে না, পঙ্কু বাবু, ঠেলে রাখচেন কি, তা হ'লে আর কথ্খনো আপনার সঙ্গে—"

"কথা কইবেন না?"

"না।"

"তা হ'লে ত খেতেই হবে, কিন্তু অত বড় ভয়টা আর দেখাবেন না।"

মৃদু হাসিয়া সীতা কহিল,—"বিনু বাবু এ বিষয়ে অসম্ভব লক্ষ্মী, কখনো একটি কথাও বলতে হয় না ওঁকে। বলতেও যেমন হয় না, এ সব কাযে তৎপরও উনি তেমনি। দেখুন, লক্ষ্মী ছেলেটির মত রেকাবিটি কত শীগগির খালি ক'রে আনলেন। বাস্তবিক বলচি, আমার এইটি বড্ড ভাল লাগে। আমার ইচ্ছে করে, রোজ বিনু বাবুকে সামনে ব'সে ভাল ক'রে খাওয়াই। —আর কিছু খাবার এনে দি বিনু বাবু"—বলিয়া সীতা ভিতরের দিকে যাইবার উপক্রম করিতেই বিনুদা বলিল,—"ছেলেমানুষী কোরো না, সীতা।"

"এখন করি, বুড়ো হ'লে আর করব না"—বলিয়া সীতা দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল এবং আরও কিছু খাবার আনিয়া বিনুদার বার বার নিষেধ সত্ত্বেও তাহার রেকাবীতে একটি একটি করিয়া দিয়া দিল।

মামা বাবু তখনো ফিরিলেন না। জলযোগ শেষ করিয়া আমরা বাড়ী আসিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সীতা কহিল,—"বসুন না বিনু বাবু, ঘরে গিয়ে সেই ত গঙ্গার দিকে চেয়ে ব'সে থাকবেন? জানেন পঙ্কু বাবু, সে দিন মামার সঙ্গে জ্যোঠামশাইকে দেখতে গেছলুম, গিয়ে দেখি—গঙ্গার দিকে মুখ ক'রে বিনু বাবু ওদিকের বারান্দায় ব'সে আছেন। পেছনে গিয়ে দাঁড়ালুম, কাসলুম, বিনু বাবুর হুঁস নেই, পা দিয়ে দুএকবার দুম্ দুম্ শব্দ করলুম, বিনু বাবু সেই গঙ্গার শোভা দেখতেই বিভোর। ভাবলুম, মামা বাবুর আজকাল শিষ্য হয়ে পড়েচেন, এই রকম হবারই ত কথা। আবার ভাবলুম, বাঙলা দেশ থেকে এসে কাশীর নতুন শোভা দেখে হঠাৎ কবি হয়েও উঠতে পারেন।"

বিনুদা কহিল,—"না সীতা, ও জিনিষটা আমার ধাতে একেবারেই খাপ খায় না, খায় বরঞ্চ ঐ ওর"—বলিয়া আঙ্গুল দিয়া আমায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া কহিল—"ওর এক গল্প বলি, শোন সীতা। তখন আমরা শ্রীরামপুরে থেকে পড়াশুনা করি। ওর এক কবিতার খাতা ছিল, মাঝে মাঝে তাতে কবিতা লিখতো। সে দিন ছিল স্কুলের ছুটী। সমস্ত দুপুর ব'সে ব'সে ও এক কবিতা লিখেচে, কবিতার নাম—'শেষ—' কি রে পঙ্কু, নামটা কি দিয়েছিলি?"

আমি বিনুদার হাত ধরিয়া একটা হেঁচকা টান দিয়া কহিলাম,—"যত সব বাজে কথা তোমার। বেলা কত হয়ে উঠলো দেখচো?"

সীতা কহিল,—"কি হ'ল তার পর, বলুন বিনু বাবু, আমার দিব্বি।"

আমি বিনুদাকে হিড়্হিড়্ করিয়া টানিয়া বাহিরে আনিলাম। চলিতে চলিতে সীতার দিকে ফিরিয়া বিনুদা কহিল,—"বলবো এক দিন সীতা, ওর কাব্য-সাধনার সেই গল্প এক দিন করবো।"

এই যে মেয়েটি সীতা, পথে আসিতে আসিতে ইহার কথাই ভাবিতে লাগিলাম। ইহার আত্মীয়তা, সারল্য, সদা প্রফুল্লভাব—ইহার সরস বাক্পটুতা, শিক্ষা-দীক্ষা এবং সর্ব্বোপরি আমাদের সহিত ইহার এইরূপ নিঃসঙ্কোচ মেলা-মেশাতে বাস্তবিকই আমরা ক্রমেই মুগ্ধ হইয়া উঠিতে-ছিলাম। আমাদের সহিত ইহার পরমাত্মীয়ের মত ব্যবহার সত্যই আমাদের পরস্পরকে দিন দিন নিকট হইতে নিকটে টানিতেছিল। তাই বোধ হয়, ইহাদের সম্পর্কে আনন্দও যেমন পাইতাম, কোন কিছুর নিরানন্দও তেমনি ঠেলিয়া রাখিতে পারিতাম না। হিন্দুর ঘরের এই একুশ বছরের অবিবাহিত মেয়েটির জটিল ভবিষ্যৎ ভাবিতে গিয়া নিরা-নন্দটাই বার বার আসিয়া অন্তরকে আঘাত করিয়া যাইত। কিন্তু দুর্ভাবনাও সে জন্য বিশেষ কাহারও ছিল না। বিশেষ যাহাকে লইয়া এই দুর্ভাবনা, তাহার ত সে জিনিষটি বাহিরে কিছুই প্রকাশ পাইত না। সীতা সে প্রকৃতিরই মেয়ে নহে,—যাহার বাহির দেখিয়া ভিতর বুঝা যায়। তাহার সদানন্দ, হাস্য-কৌতুকের ভিতরে কোন দুঃখ—কোন বেদনা আছে কি না, তাহা অন্তর্য্যামী ছাড়া আর কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না।

বেলা অনেক হইয়া গিয়াছিল। পথে আসিতে আসিতে বিনুদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা, বিলেত থেকে সে ছেলেটি ত আর দেশে ফিরল না, তা হ'লে সীতার বিয়ে—"

"অন্য ছেলে দেখাশুনো হচ্চে, বোধ হয়, অগ্রাণ মাসে এইখানেই হ'তে পারে।"

"কে ছেলে, বিনুদা?"

"মামার কলেজেরই এক প্রফেসারের ভাইপো।"

"তাদের মত হয়েছে?"

"প্রফেসারের মত আছে, তবে খুব বেশী বয়েস ব'লে মেয়েরা একটু অমত কচ্চে।"

বাটী ফিরিয়াই শুনিলাম, জ্যেঠামহাশয়ের জ্বর হইয়াছে। আজকাল জ্যেঠামহাশয়ের শরীর প্রায়ই এইরূপ খারাপ হয়। দু'দশ দিন ভাল থাকেন, আবার অসুস্থ হইয়া পড়েন। হয় একটু জ্বর, কি গা-গতর ব্যথা, কিম্বা সর্দ্দি, অথবা পেটের অসুখ, একটা না একটা উপসর্গ লাগিয়াই আছে। সে দিন বৈকালের দিকে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"পঙ্কু, তালি-তালা দিয়ে আর চলবে না, শীগ্‌গিরই আমাকে যেতে হবে, বাবা। তোরা যে একবারটি কলকাতায় যাবার জন্যে আমায় লিখতিস, কিন্তু আমার কি এখন বিশ্বনাথের পা ছেড়ে কোথাও আর একটি দিন যাবার যো আছে রে। কোন্ ফাঁকে যে মরণ এসে মাথার শিওরে দাঁড়াবে, তা কি বলা যায়!" মুক্ত জানালার ফাঁক দিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আমি নীরবেই বসিয়া রহিলাম। সম্মুখেই বর্ষার গঙ্গা, পাহাড়ের ঘোলাজল বুকে করিয়া বিদ্রোহীর মত উদ্দামগতিতে ছুটিয়াছে। আরাম-কেদারাখানির উপর বসিয়া জ্যেঠামহাশয় নিবিষ্টমনে গঙ্গা দেখিতে দেখিতে আবার কহিলেন,—"আমার বোধ হয়, মরবার আগে মরণের একটা সাড়া পাওয়া যায়। আমি তা পেয়েছি বাবা, আর তা পেয়েছি বলেই বার বার তোদের এখানে আসতে লিখছিলুম। কিন্তু একটা নতুন কাযের তাড়া এসেচে, এই কাযটা কোন রকমে আমায় সেরে যেতে হবে। তোরা আজ ও-বাড়ী গিয়েছিলি কি? সীতার মামাকে একবার—"

এই সময় নীচে হইতে পরিচিত কলহাস্যের একটা ধ্বনি কাণে আসিয়া পৌঁছিল। জ্যেঠামহাশয় কহিলেন,—"আমার সীতা মা এসেছে বুঝি। দু'দিন এ বাড়ীতে আসে নি, তাই মায়ের আমার মুখখানা বারবারই মনে পড়ছিল।" তাঁহার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সীতা আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিল,—"আবার আপনার জ্বর হ'ল জ্যেঠামশাই, আপনাকে নিয়ে কি করি বলুন ত?"

জ্যেঠামহাশয় সীতার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"করবার যা রয়েছে, তা ত করতে পারচিস্ না বেটী। এখন এরা সব এসেচে, দলে ভারি হয়েচিস, সকলে মিলে ঠেলে ঠুলে ঐ মণিকর্ণিকায় নিয়ে গিয়ে ফেল্ না মা, তা হলেই ত সব চেয়ে বড় করার কাযটা হয়ে যায়।"

সীতা কহিল,—"জ্যেঠামশাই, আপনিও বড্ড দুষ্টু হচ্চেন।"

"দেখ্ পঙ্কু, মামার সঙ্গে প্রথম প্রথম এসে সীতা আমায় ডাকতো কি ব'লে জানিস?—কর্ত্তা বাবু। রোজ ব'লে ব'লে আর ধম্‌কে তবে তা ছাড়িয়েছি।—হ্যাঁ গো লক্ষ্মি, আজকে তোর বিষ্ণুপুরাণ আনিস্ নি, ক' দিন যে শোনা বন্ধ রয়েচে!"

"না জ্যেঠামশাই, আজ দিদিকে নিয়ে বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখতে যাব ব'লে মামীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলুম, কিন্তু আপনার জ্বর হয়েচে, আজ আর ত যেতে পারব না" বলিয়া সীতা জ্যেঠামহাশয়ের পা দু'খানি লইয়া হাত বুলাইতে লাগিল।

তখন সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব ছিল না। ও-পারের প্রান্তর, গাছপালা, দিগন্তরেখা ক্রমেই অন্ধকারে ঝাপসা হইয়া আসিতেছিল। চারিপার্শ্বের দেবমন্দির হইতে সান্ধ্য-নহবতের মধুর সুর মনের মধ্যে অপূর্ব্ব পবিত্রতা এবং স্বর্গীয় ভাব জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম এই যে, দুইটি সম্পূ[র্ণ] অপরিচিত পরিবারের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়া পড়ি[ল] কি করিয়া? ছয় মাস আগে কে ভাবিয়াছিল যে, সীতাদে[র] সহিত আমাদের সম্পর্ক এমনভাবে নিবিড় হইয়া উঠিবে [?] কিন্তু জানি যে, এমন ধারাই হয়। পরম আত্মীয়ও পর হই[য়া] যায়, আবার সম্পূর্ণ অজানিত পরও এই রকম আপনার হয়[।] লীলাময়ের রাজত্বে কি যে হয়, আর কি যে হয় না, মানু[ষ] তাহার কি ঠিক করিবে? সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে, জগ[ৎ] ও জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা সেই অনন্ত লীলাময় শ্রীভগবানের চর[ণে]

মাথা আপনি নত হইয়া পড়িল। সেইখানে বসিয়া মনে মনে বার বার তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলাম।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

দিন চারি পাঁচ পরে এক দিন দ্বিপ্রহরে আহারাদি করিয়া একটু দিবানিদ্রার আয়োজন করিতেছিলাম। এ অভ্যাসটা আমার কোন কালেই ছিল না, সুতরাং শয্যায় শুইয়া দেবীর কৃপালাভ করিতে সাধনা যথেষ্টই করিতে হইতেছিল। সাধনায় দেবীর প্রসন্নতা-লাভ যদিও সম্ভব হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু অন্তরায় হইল আসিয়া বিনুদার পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা পদ্মা। সে তাহার বাপের কাছে বড় একটা ঘেঁসিত না, আমার সহিতই তাহার যত ভাব-ভালবাসা, কথা-বার্ত্তা, আলাপ-আলোচনা। পদ্মা আসিয়াই আমার পিঠের উপর শুইয়া পড়িয়া কহিল,—"কাকু, কি করচ?" ভাবিলাম, উত্তর দিলেই আর রক্ষা থাকিবে না, তাহা হইলেই অনবরত প্রশ্নের উপর প্রশ্ন আসিয়া ঘুমকে আমার বর্ষার বিস্তৃত গঙ্গা পার করাইয়া ও-পারের ব্যাস-কাশীর প্রান্তরে পাঠাইয়া দিবে। সুতরাং চোখ বুজিয়া চুপ করিয়াই রহিলাম। পুনরায় প্রশ্ন হইল—"কাকু, তুমি ঘুমিয়েছ? কেন ঘুমিয়েছ?" নিরুত্তর থাকিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, এদের বুদ্ধি-বিবেচনা এতই কম কেন। যাকে ঘুমন্ত বলিয়াই ঠিক করিয়া লইল, সে আবার তার এই 'কেন'র উত্তর, ঘুমন্ত অবস্থায় কি ক'রে যে দিতে পারবে, তা এরা বুঝতে পারে না কেন? যাহা হউক, পরিত্রাণ আর পাইলাম না। পিঠের উপর ঘোড়া হইয়া বসিয়া পদ্মা আমার মাথার চুলগুলি খামচাইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কাকু, তোমার মাথা আমার চেয়ে এত বড় কেন? বল না, কেন? ও কাকু!" আমি দেখিলাম, আর বিনা উত্তরে চলে না, অন্ততঃ খুব সংক্ষিপ্ত একটা সাড়া দিতেই হইবে, তাই চোখ বুজাইয়াই কহিলাম—"উঁ!"

"আমাদের ঘোড়া নেই কেন, কাকু?"

"হুঁ।"

"কাকু, আমায় একখানা নৌকো কিনে দেবে, ঐ রকম বড়? ঐ দেখ না, কত বড় নৌকো যাচ্চে। কোথায় যায়, কাকু?"

"হুঁ।"

"দিনের বেলায় চাঁদ ওঠে না কেন?—কোথায় বাঁশী বাজচে?"

"হুঁ।"

ইহার পর হঠাৎ পদ্মার কি সুমতি হইল, আমার পিঠের উপর হইতে নামিয়া জানালার ধারে গিয়া বসিল এবং বসিয়া নিজের মনে বকিতে লাগিল—"ড়ুম ড়ুম্ ফটাস ড়ুম্—ড়ুম্ ড়ুম্ ফটাস্ ড়ুম—কে রে?—জুজুবুড়ী ধরলে—দাঁড়া, দাঁড়া, যাচ্চি—"একটুখানি নীরব থাকিবার পর হঠাৎ পদ্মা কোকিল ডাকিতে আরম্ভ করিয়া দিল—"কুহু—কুহু—কুহু—কু—কু—উ—উ—উ—"

একটু ধমক দিয়া বলিলাম,—"কি হচ্চে পদ্মা?"

"কাকু, কোকিল আসে না কেন?"

"আসবে। পাজি মেয়ে কোথাকার, ঘুমু গে যা!"

ধমক খাইয়া পদ্মা খোলা বারান্দার ওদিকে চলিয়া গেল এবং সেইখানে গিয়া নিজের মনে গান করিতে লাগিল—"শ্যামাপদ ঘুড়িতে আকাশের মন উড়িয়ে গেল—গেলো-লো-লো-ও-ও-ও।" পরক্ষণেই ড়ুম্ ড়ুম্ শব্দে বোঝা গেল, গায়িকা সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া যাইতেছে। হাঁফ ছাড়িয়া, পাশের বালিসটাকে বুকে চাপিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, ঝনাৎ করিয়া দরজার শব্দে তন্দ্রাটুকু ছুটিয়া গেল। চাহিয়া দেখি,—একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর—পদ্মার সহিত আমারই শ্রীমান্‌টির শুভাগমন হইয়াছে। আসিয়াই দুই জনে গোলমাল সুরু করিয়া দিল।

পদ্মা কহিল,—"ওরে ভাই বুবু, বাঘ দেখেছিস্—ডোরা কাটা?"

"দেখেচি, দেখেচি—তুই ত দেখিস নি। মানুষ দেখলেই বাঘ খেয়ে ফেলে।"

"কেন, ভাই, ভাত খায় না কেন?"

"ভাতও খায় না, খাবারও খায় না। ভাল্লুক দেখেছিস পদ্মা? শ্বশুরবাড়ী যায় কেমন। তুই কিছুই জানিস না—তুই যে ছেলেমানুষ।"

"ছেলেমানুষ বৈ কি,—আমি ত বড়।"

"আমার চেয়ে বড়? মারবো এক্ষুণি ছ্‌পিড।"

"হ্যাঁ, বড় ত। কাকীমাকে জিজ্ঞেস করবে চল না।"

"মারবো বলচি, পদ্মা—মারবো—বো—ও—ও—ও—ও।"

বাপ রে বাপ, কাণের পোকা বাহির হইবার উপক্রম হইল। উঠিয়া পড়িবার মতলব করিলাম। এ দিকে বুবু পদ্মার সহিত আপোষ করিয়া লইয়া কহিল,—"আয় পদ্মা, যাত্রা করি। তুই গান গা, আমি বাজাই,—কেমন ভাই?" দেখিলাম, গতিক মোটেই ভাল নয়। ঘরে একটা কেরোসিনের খালি টীন ছিল, বুবু দুই হাতে সেইটি বাজাইতে সুরু করিয়া দিল, আর পদ্মা তাহার গান ধরিল—"শ্যামাপদ ঘুড়িতে আকাশের মন উড়িয়ে গেল।" আকাশের মন উড়ুক, না উড়ুক, আমার ঘুম একেবারেই উড়িয়া গেল। উঠিয়া পড়িয়া, বুবুকে একটি চড়, পদ্মাকে একটি চড় বসাইয়া দিতেই তাহারা ছুটিয়া নীচে পলাইয়া গেল। আমি আবার আসিয়া শয্যায় শুইলাম, কিন্তু বেলাও বোধ হয় তখন তিন প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। খানিকক্ষণ শুইয়া থাকিতেই তন্দ্রা আসিল ও ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। স্বপ্ন দেখিলাম, যেন—বাড়ীতে সমারোহ ব্যাপার, ভূরি-ভোজনের মহা আয়োজন। আহারীয় দ্রব্যাদিতে ভাঁড়ার, ঘর-দোর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। উঠানের এক ধারে প্রকাণ্ড চুল্লাতে, জ্যেঠামহাশয় নিজেই লুচি ভাজিতে বসিয়াছেন। তাঁহার এক পাশে বুবু বসিয়া, লুচি ভাজিবার ঝাঁঝরি দিয়া ঘিয়ের টীনটি বাজাইতেছে, আর এক পাশে একখানি উপুড় করা ঝুড়ির উপর বসিয়া পদ্মা গান ধরিয়াছে—'শ্যামাপদ ঘুড়িতে আকাশের মন উড়িয়ে গেল।' দোতলার দালানের এক ধারে বিনুদা যেন খাইতে বসিয়াছে, সীতা সামনে বসিয়া বিনুদাকে খাওয়াইতেছে আর বলিতেছে,—'আমার এইটি বড্ডই ভাল লাগে, ইচ্ছে করে,রোজ বিনু বাবুকে সামনে ব'সে এই রকম ক'রে খাওয়াই।" বিনুদা কহিল,—'খাওয়ালেই ত পার।' সীতা কহিল—'পারি? আচ্ছা, পঞ্চু বাবুকে জিজ্ঞাসা করি' বলিয়া, অদূরে যেখানে বারান্দার রেলিং ধরিয়া আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম, সীতা সেইখানে আসিয়া আমায় ডাকিতে লাগিল,—"পঞ্চু বাবু, পঞ্চু বাবু, ও পঞ্চু বাবু!"—স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

ধড়মড় করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া পড়িতেই দেখি, সীতা সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে—"পঞ্চু বাবু, পঞ্চু বাবু, ও পঞ্চু বাবু! বাবা, দিনের বেলাতেই এত ঘুম!"

কোঁচার কাপড়ে চোখ মুছিয়া কহিলাম—"ঘুমুচ্ছিলুম কোথা? একটু খালি তন্দ্রা এসেছিল। তার পর, কতক্ষণ এসেচেন? কার সঙ্গে এলেন, মামা বাবু এসেচেন নিশ্চয়।"

সীতা কহিল—"মামা বাবু, মামীমা এবং খোদ আমি, সকলেই এসেচি। খাবার-দাবার আয়োজন করুন, সকলে আজ এইখেনে খাব আমরা।"

"এর আর বেশী কথা কি। আয়োজন আজ যথেষ্ট,—উঠোনে বোধ হয় জ্যেঠামশাই নিজেই লুচি ভাজতে লেগেচেন, দেখে এলেন না?"

"স্বপ্ন দেখছিলেন না কি, পঞ্চু বাবু?"

"বাস্তবিকই তাই, কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ওই ইজি-চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসুন।"

ঈষৎ হাসিয়া সীতা কহিল,—"এখনো এতটা এগুই নি, পঞ্চু বাবু। পুরুষমানুষরা সামনে মেজের ওপর ব'সে থাকবে, আর আমি মেমসাহেব হয়ে পা ঢুলিয়ে ইজি-চেয়ারে ব'সে কথা কইব, এখনো এতটা নিজেকে তৈরী করতে পারি নি।"

"এতে আর দোষটা কি?"

"দোষের কথা ত বলচি না। নিজের গুণ এখনো অতটা বাড়েনি, তাই বলচি" বলিয়া মেজের উপরেই সীতা বসিয়া পড়িয়া, বাহিরে বারান্দার দিকে চাহিয়া কহিল,—"আপনাদের বাসাটি দেখলে সত্যিই লোভ হয়, একেবারে ঘরে বসেই মা-গঙ্গাকে চব্বিশ ঘণ্টা দর্শন—আচ্ছা, আসুন, এক কায করা যাক, আমাদের সঙ্গে আপনারা বাসা-বদল করুন।"

"বাসা-বদলেরই বা দরকার কি? মা গঙ্গার দর্শন নিয়ে কথা ত? আপনি এসে এইখেনেই থাকুন না কেন, তা হ'লেই চব্বিশ ঘণ্টা দর্শন হ'তে পারবে।"

"তা থাকলেও হয়, কিন্তু থাকতে দেবেন ত? শেষকালে হয় ত লাঠি নিয়েই তাড়া করবেন, অন্ততঃপক্ষে শঙ্করমাছের চাবুক।"

"আপনি দেখছি কিছুই ভোলেন না, আপনার স্মরণ-শক্তি খুব!"

"খুব। নইলে আর বি-সি-ডি—এম্-এন-ও-পি পাশ

করতে পারি ? তা ব'লে আর একচোখটা ও রকম ক'রে দেখাবেন না, পঞ্চু বাবু, ঝগড়ার ভয়টা বড্ড বেশী আমার” বলিয়া তাহার স্বভাবমধুর কণ্ঠে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি দুচোখ বুজাইয়া কহিলাম—“এইবার ত হয়েচে ?”

“হয়েচে—হয়েচে—আপনি চোখ চান। দু'চোখ বুজিয়ে ঐ রকম ক'রে ভ্যাংচাতে ত আপনাকে বলিনি।”

হাসিয়া কহিলাম,—“খালি ত চোখ বুজিয়েছিলুম, আপনাকে ভ্যাংচালুম কৈ ?”

“বিশ্বাস না হয়, আরসী ধ'রে দেখুন।”

“চোখ বুজিয়ে, আরসীতে দেখবো কি ক'রে ?”

“তবে আমার কথাই বিশ্বাস ক'রে নিন।”

“না, আপনার সঙ্গে আর পারবার জো নেই। আপনাকে দেখচি এক দিন বিশ্বনাথের আরতি দেখতে নিয়ে গিয়ে একলা ফেলে পালিয়ে আসতে হবে !”

“দাঁড়ান, জ্যাঠামশাইকে গিয়ে ব'লে দিচ্চি যে, আপনি আবার কবিতার খাতা করেচেন।”

আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম—“বেশ, চলুন বলবেন।”

সীতাও উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—“বেশ, আপনিও চলুন। কিন্তু মামা বাবু সেখানে যা গল্প জুড়েচেন !”

“আপনারা কতক্ষণ এসেচেন ?”

“ঘণ্টাখানেকের ওপর। এতক্ষণ ত মামীমা, দিদি, আমি তিন জনে ব'সে ব'সে গল্প কচ্ছিলুম। আচ্ছা, দিদির আজ কিসের ব্রত বলুন ত, রেকাবীতে ধান, দূর্ব্বা, ফুল, চন্দন সাজাতে ব'সে গেলেন ? জিজ্ঞাসা করলুম, কিছু না ব'লে শুধু হাসতে লাগলেন।”

“ব্রত ? আশ্বিন মাসে ? তবে, আমি এক গরীব ভিখিরী প'ড়ে আছি, সেই জন্যে তিনি যদি কোন সদাব্রতের ব্যবস্থা—”

“আপনি আরবারে ভাল মানুষ ছিলেন, এবার দেখছি ভয়ানক দুষ্টু হয়েচেন। দাঁড়ান, দিদিকে ব'লে দিচ্চি।”

“ব্রতের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তাই বলচি। এ সময় আর কিসের ব্রত হবে বলুন ? কোন পাল-পার্ব্বণ পূজোও আজ নেই। লক্ষ্মীপূজো—সেও ত এখনো দেরী আছে। তবে, আজ বোধ হয় —ফতেয়া-দোয়াজ্-দম্ হ'তে পারে।”

“চলুন, আর ফাজলামী করতে হবে না আপনার।”

তেতলায় জ্যেঠামহাশয়ের ঘরে আসিয়া দেখিলাম, মামা বাবু অনর্গল বকিয়া যাইতেছেন। বিষয়টা দৈব ও পুরুষকার লইয়া। যেখানে মামা বাবু পাটীর উপর তাকিয়া ঠেশান্ দিয়া বসিয়াছিলেন, সেইখানে, তাঁহারই পায়ের কাছে ধূলার উপরে বসিয়া পড়িয়া সীতা জ্যেঠামশাইকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল,—“আপনার পদ্মা আজ আমাকে এক শক্ত প্রশ্ন করেছে, জ্যেঠামশাই।”

“কি প্রশ্ন, মা ?”

“প্রশ্ন এই যে, বাঘ ভাত আর দুধ খায় না কেন, মানুষ খায় কেন ?”

জ্যেঠামশাই কহিলেন,—“তাই ত মা, প্রশ্ন শক্তই ত বটে !”

মামা বাবু নিজের মনে বারকয়েক ধীরে ধীরে কহিলেন,—“মানুষ খায় কেন ? হুঁ—'আত্মম্ভরিস্তং পিশিতৈর্নরাণাং......' তা সীতা, তুই বল্লি না কেন—'ধর্ম্মো হ্যয়ং দাশরথে নিজো নঃ'...... ?”

সীতা মামা বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল,—“এ কথা কাকে বলবো, মামা বাবু, পদ্মাকে ?”

“ওহো, তা'ও ত বটে ! আচ্ছা, এই শ্লোকাংশ দুটো কিসে থেকে বললুম, বল্ দেখি। তুই কিন্তু তা খানিক খানিক পড়েছিলি—মনে করতে পারিস ?”

খুব পারি, মামা বাবু। বলবো ? ভট্টির রাম আর মারীচের কথা।”

“ঠিক মনে আছে ত ! তোর খুব স্মরণশক্তি রে !”

“কিছু আগে পঞ্চু বাবুও ত এই কথা বলছিলেন”—বলিয়া সীতা হাসিতে লাগিল। হঠাৎ মামা বাবু উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে করিতে কহিলেন,—“যাক, এখন কথা হচ্চে, গুরুচরণ বাবু যা' তখন জিজ্ঞেস করছিলেন, কাশীতে একখানা বাড়ী থাকা খুবই দরকার। এই মনে করুন, আপনি যে বত্রিশটা ক'রে টাকা ফি মাসে ভাড়া দিচ্ছেন—ওহো-হো ! যাঃ !”

জ্যেঠামশাই তাড়াতাড়ি কহিলেন,—“কি বলুন দেখি ?”

“আরে, ভয়ানক ভুল ক'রে ফেলেছি ত ! আজ সকালে গৈবী যাব বলেছিলুম, সেখানে এক বাঙ্গালী সাধু এসে রয়েচেন, ক'দিন থেকে কথা রয়েচে যে, আজ—

ঐ যাঃ! ও মা সীতা, আজ শুক্রবার না? মিশনের সেই ছেলেটি—"

"তিনি সকালে এসেছিলেন মামা বাবু, আপনি তখন পূজো কচ্ছিলেন। আমি তাঁকে দু' টাকা দিয়ে দিয়েছি।"

"বেশ করেছিস্ মা, আমি ত একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। যাক্—কি বলছিলুম, বামাচরণ বাবু? হাঁ, বাড়ী—বাড়ী কাশীতে একখানা ক'রে রাখা খুবই ভাল বৈ কি। পারেন যদি, তা হ'লে আর ছাড়বেন না, বিশেষ এ বাড়ীখানি বড়ই পছন্দসই, একেবারে গঙ্গার ওপর।"

"হ্যাঁ, গঙ্গাস্নানের পক্ষে খুবই সুবিধে।"

"সে কথা আর বল্‌তে। আমার একটু দূর হয় ব'লে, কলেজের তাড়ায় রোজ অবিশ্যি ঘটে ওঠে না। গঙ্গাস্নান ত পরের কথা, কত দিন সন্ধ্যাহ্নিকই করতে সময় হয়ে ওঠে না। এই চাকরীই হয়েছে আমাদের সর্ব্বকর্ম্মনাশা—এই জন্যেই শাস্ত্রের বিধি যে ব্রাহ্মণের পক্ষে—" তাহার পর হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"তবে, একটা কথা আছে বামাচরণ বাবু, কলিতে ভগবান্‌কে বছরে এক দিন ডাকলেই কায হয়, এইটুকুই যা ভরসা।"

"তাই হয় না কি?"

"হ্যাঁ। শুনুন তবে। এক দিন দেবতাদের সভায় নারদ হঠাৎ এসে আনন্দে অধীর হয়ে ভয়ানক রকম নাচতে গাইতে সুরু ক'রে দিলেন। দেবতারা বল্লেন,—'এ কি, নারদের আজ হঠাৎ এত আনন্দ হবার কারণ কি?' নারদ বল্লেন—'আনন্দ হবে না, কলিযুগ আস্‌চে যে!' দেবতারা কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন,—'তাতে এত আনন্দের কি আছে, নারদ?' নারদ বল্লেন—'আনন্দ নয়? সত্যযুগে এক বৎসর হরিস্মরণ ক'রে ধর্ম্মাদি কার্য্যকল্পে যে ফল হ'ত, ত্রেতায় তা এক মাস করলেই পাওয়া যেত, তার পর দ্বাপরে সেই ফল পক্ষকালের কর্ম্মেই পাওয়া যায়, আর কলিতে, নিজেদের সংযত রেখে মাত্র এক দিনের অনুষ্ঠানেই সেই সমান ফল পাওয়া যাবে। যে কলিতে এত সুবিধে, সেই কলি যখন শীগ্‌গিরই আসচে, তখন আনন্দ করব না'?"

সীতা কহিল,—"দেখুন, জ্যেঠামশাই, আমাদের মুনি-ঋষিরা শাস্ত্রের ভিতরও কি রকম চাতুরী চালিয়েছেন! সাধারণ লোককে ধর্ম্মকর্ম্মে মতি দিতেই শুধু তাঁদের এই সব সহজ ব্যবস্থা। কেন না, ব্যবস্থা কঠিন হ'লে সাধারণতঃ বড় একটা কেউ ত আর এগুবেন না! নয় কি না, মামা বাবু, বলুন।"

"তা ত সত্যিই মা। কলির দুর্ব্বল মানুষদের পক্ষে একটু সোজা ব্যবস্থা না দিলে তারা পেরে উঠবে কেন, পাগ্‌লী—?" বলিয়া মামা বাবু গুন্ গুন্ করিয়া কি একটা গান গাহিতে লাগিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"শাস্ত্রকাররা এই রকম চারিদিকে নজর রেখে ব্যবস্থা করেছিল বলেই ত হাজার রকমের ঝড়-ঝাপ্টা খেয়েও এই সনাতন ধর্ম্মটার শেকড় এখনো এত শক্ত রয়েচে, কিন্তু য়ুরোপের দিকে চেয়ে দেখ, এ জিনিষটা ওদের কত শিথিল হয়ে পড়েচে। পাদরীরা আজ—ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল ব'লে দেশ জুড়ে কি ভয়ানক হাহাকার তুলেছে।"

জ্যেঠামশাই কহিলেন,—"কিন্তু আর এক দিকে যে তেমনি ওরা যথেষ্ট উন্নতি করেচে।"

"কোন্ দিকে?"

"বিজ্ঞান।"

"হ্যাঁ, তা করেচে বটে" বলিয়া মামা বাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—"ওরা আধুনিক হাজার রকমের যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে, লক্ষ রকম অঙ্ক কসে হিসেব ক'রে যে সব তত্ত্ব নূতন ব'লে বা'র করেচে, আমাদের মুনিঋষিরা হাজার দু'হাজার বছর আগে, শুধু ধ্যানে বসেই সে সব জানতে পেরেছিলেন, আর বলেও দিয়ে গিয়েচেন। লোকে শাস্ত্র না পড়লে এ সব খবর কি ক'রে জানবে বলুন? আড়াই শ' বছর আগে মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব য়ুরোপে বা'র হ'ল, কিন্তু আমাদের এ এমনি দুর্ভাগ্য দেশ যে, সেই একই কথা হাজার বছর আগে জ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্করাচার্য্য বেচারা যে ব'লে গেলেন, সে কথা কে-ই বা শোনে আর কে-ই বা ভাবে তার পর আর্য্যভট্ট"—বলিয়া মামা বাবু আরও কি সব বলিতে যাইতেছিলেন, জ্যেঠামশাই বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সময়টা এইবার একবার দেখুন দেখি, পাঁচটা বাজেনি কি?

মামা বাবু পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া কহিলেন,—"হ্যাঁ, সওয়া পাঁচটা, এইবার আপনি আয়োজন করুন।" জ্যেঠামশাই উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"পঞ্চু, ব'স এইখানে, কোন যায়গায় এখন বেরিও না" বলিয়া তিনি নীচে নামিয়া গেলেন এবং

খানিক পরে ধান-দূর্ব্বা-চন্দনাদি সমেত একখানি রেকাবী হাতে করিয়া আসিলেন, তাঁহার পিছনে পিছনে সন্ধ্যাও প্রবেশ করিল। সন্ধ্যার হাতে দুইখানি কার্পেটের আসন।

মামা বাবু সীতার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"ওই আসনখানায় বস ত মা।"

"কেন, মামা বাবু?"

জ্যেঠামশাই হাতের রেকাবীখানি আসনের সামনে মেজের উপর রাখিয়া কহিলেন,—"বসতে বলচেন, বস্ না, বেটী।"

সীতা আর কোন প্রশ্ন না করিয়া, কতকটা বিস্ময় এবং কতকটা কৌতূহল লইয়া আসনখানির উপর আসিয়া বসিলে, জ্যেঠামশাই সম্মুখের আসনখানিতে বসিয়া সীতার মাথায় ধান-দূর্ব্বা-পুষ্প, কপালে চন্দন ও হাতে একখানি গিনি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বাহিরের দালান হইতে সেই সময় শাঁখ বাজিয়া উঠিল। জ্যেঠামশাই কহিলেন,—"আজ তোকে আশীর্ব্বাদ করলুম, মা। ঘরের লক্ষ্মীকে ঘর ছেড়ে আর কত দিন রাখবো বল?—পঙ্কু, বাবা, কিছু আশ্চর্য্য হয়ে গেছিস্, না? বলবার ইচ্ছে থাকলেও, এর আগে কোন কথা তোদের কাছে প্রকাশ করতে পারি নি, সবই এইবার শুনবি।"

মামা বাবু সীতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"স্বামীজীর নিষেধে তোর কাছেও কোন কথা, আজকের এই আশীর্ব্বাদের আগে জানাতে পারি নি, মা। কিন্তু, যার হাতে তোকে আজ দিতে যাচ্ছি, এমন হাত খুবই ভাগ্যে মেলে। তা' হ'লে বামাচরণ বাবু, বিনুকে এইবার নীচে থেকে ডাকুন, আমিও আমার কায শেষ করি,—বাবাজীও আমার একটু চম্‌কে যাক্!" বলিয়া মামা বাবু রামপ্রসাদী সুরে কি একটা গানের একটা কলি গুন্ গুন্ করিয়া বার বার গাহিতে লাগিলেন। ইঁহাদের এই আয়োজনটি ভিতরে ভিতরে যে এত দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা আজিকার দিনের আগে বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারি নাই। সেই যে দিন প্রথম কাশী আসি, তাহার পরদিন বৈকালে জ্যেঠামশাই আমাকে যে বলিয়াছিলেন,—'একটা নতুন কাযের তাড়া এসেচে, এইটে কোন রকমে আমায় সেরে যেতে হবে,' ভাবিতে লাগিলাম, সে কি এই কাযই? কিন্তু তাহার পর কেন যে তিনি আর সেই কথা আমাদের কাহাকেও বলিতে পারেন নাই, তাহার কারণও শুনিলাম। মামার গুরুদেব স্বামীজী মহারাজ বিনুদার ও সীতার কোষ্ঠী মিলাইয়া দেখিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে,—আশীর্ব্বাদের পূর্ব্বে বর কন্যা কেহই যেন এ বিবাহের কথা জানিতে না পারে। না পারিলে এ যোগাযোগ খুবই মঙ্গলের, কিন্তু জানিতে পারিলে, ইহা সেরূপ মঙ্গলের না-ও হইতে পারে। এই কারণেই ব্যাপারটি আমাদেরও কাছে পর্য্যন্ত এমন করিয়া গোপন রাখা হইয়াছিল। কিন্তু সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে আসিয়া, দশাশ্বমেধ ঘাটের পৈঠার উপর বসিয়া বিনুদা কহিল,—"এ আমি আগেই জানতে পেরেছিলুম, পঙ্কু।" আমি সাশ্চর্য্যে কহিলাম,—"এ যে তোমার জানতে নেই; কি করেই বা জানতে পেরেছিলে, বিনুদা?"

"সে দিন কথায় কথায় হঠাৎ মামার মুখ থেকেই একটু আভাস বেরিয়ে পড়েছিল। যদিও থতমত খেয়ে, টপ ক'রে কথাটাকে তিনি ঘুরিয়ে নিলেন, কিন্তু তাই থেকেই আমি বুঝে নিয়েছিলুম।"

"কিন্তু, স্বামীজী যে বলে দিয়েছিলেন—"

"কি?

"যে, আশীর্ব্বাদের আগে তোমাদের দু'জনের মধ্যে কেউ এ বিষয় জানতে পারলে—"

"অমঙ্গল হবে?"

"হ্যা।"

"ছাই হবে, তুমিও যেমন!"

"তা যাক্ গে। কিন্তু বৌদি মারা যাবার পর তখন অত ক'রে যে জেদ ধরলে যে, কিছুতেই বিয়ে করবে না, আর করলেও না, কিন্তু আজ আশীর্ব্বাদের সময় হঠাৎ যে একেবারে নীরবে মাথাটি নুইয়ে দিলে, এইটেই এখনও আমি ঠিক বুঝতে পারচি না।"

"কি করি বল্। আজ বাদে কাল হয় ত বাবা ম'রে যাবেন, তাঁর মনে এ সময়ে একটা কষ্ট দেওয়া—বুঝলি না?"

যাহা হউক, বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল। প্রথম অগ্রহায়ণেই দিনস্থির হইয়াছিল। কিন্তু আমার ছুটী শেষ হইয়া আসাতে আমি আর থাকিতে পারিলাম না। অগ্রহায়ণ মাসে পনর দিনের ছুটী লইয়া আবার আসিবার পরামর্শ করিয়া, সন্ধ্যাকে কাশীতে রাখিয়া আমি একেলাই কলিকাতা চলিয়া আসিলাম। আসিবার দিন প্রভাতে

সীতাদের বাটী দেখা করিতে যাইলাম। মামা বাবু বাটী ছিলেন না, সীতার মা কহিলেন,—"পৌছেই ও-বাড়ীতে যেমন চিঠি দেবে, তেমনি এ-বাড়ীতেও একখানা চিঠি দিতে ভুলো না, বাবা।" তাহার পর মামীমার সহিত দু'একটা কথা কহিয়া সীতার খোঁজ করিলাম, মামীমা কহিলেন—"তোমার সাড়া পেয়েই সে পালিয়েছে।" সে দিনের আশীর্ব্বাদের পর হইতেই সীতা আর একটি দিনও আমাদের সম্মুখে আসে নাই। তথাপি তাহার ঘরের সামনে আসিয়া দরজা ঠেলিলাম; দেখিলাম, ভিতর হইতে তাহা বন্ধ। বাহিরে দাঁড়াইয়া কহিলাম—"এখন আর 'আপনি' নয়—এখন 'বৌদি'। কিন্তু কত দিন এই রকম পালিয়ে পালিয়ে থাকেন, তাও দেখবো। অবিশ্যি আজ কাশী থেকে যদিও চল্লুম, কিন্তু আবার ত শীগ্‌গিরই আসচি।" এই সময় মামীমা বারান্দা দিয়া যাইতে যাইতে কহিলেন—"পাগলী লজ্জায় বুঝি খিল দিয়েছে?" তাহার পর সীতার উদ্দেশ্যে কহিলেন—"দুদিন বাদে এ লজ্জা কোথায় রাখবি, মা?" বলিয়া তিনি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন, আমিও নীচে নামিয়া আসিলাম।

সেই দিন রাত্রিতে ট্রেণে উঠিয়া পরদিন কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলাম। আফিস বন্ধ থাকায় কায-কর্ম্ম এত জমিয়া গিয়াছিল যে, তাহা আর বলিবার নহে। কাযের তাড়ায় সমস্ত কার্ত্তিক মাস কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল, তাহা জানিতেও পারিলাম না। অগ্রহায়ণ মাস পড়িতেই, পনর দিনের ছুটী লইয়া আবার কাশী আসিলাম। যথাদিনে বিনুদার সহিত সীতার বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। সীতা আমার ভ্রাতৃজায়ারূপে এ বাটীতে আসিয়া আমাদেরই মধ্যে তাহার নিজের স্থান অধিকার করিয়া লইল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

ব্যর্থ জীবন

হে চির-সুন্দর, নিখিল নির্ভর,
নীরব বিশ্বরাজ।
এ বিপুল ভবে, পাব দিন কবে,
সাধিতে তোমার কায।

ব্যর্থ জীবন জনম বিফল,
ফিরিব কি লয়ে শুধু কোলাহল,
কবে সে ফুটিবে আলো শতদল,
মলিন-মঞ্চ-মাঝ।
আমার বাসনা ডুবায়ে অতলে
খুলিবে দীনের সাজ।

কি কাযে আমারে পাঠালে এ দেশে,
অকারণে শুধু যেতে ভেসে ভেসে,
শুধু যাওয়া-আসা, শুধু স্রোতে ভাসা,
শুধু কি বহিতে নিলাজ লাজ?

থাকি তোমা হ'তে কত দূরে দূরে,
ফিরিব কি শুধু মরণের পুরে?
বহি কত কাল, এ ঘোর জঞ্জাল,
রব পথ চেয়ে সকাল সাঁঝ।

মঙ্গলরূপে ভেদি তমোজাল,
মরম-মন্দিরে এস মহাকাল!
এস মনোহারী, মোহ অপসারি,
লাজ, মান, ভয় ঘুচাতে আজ।

শ্রীমতী উষাপ্রমোদিনী বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)
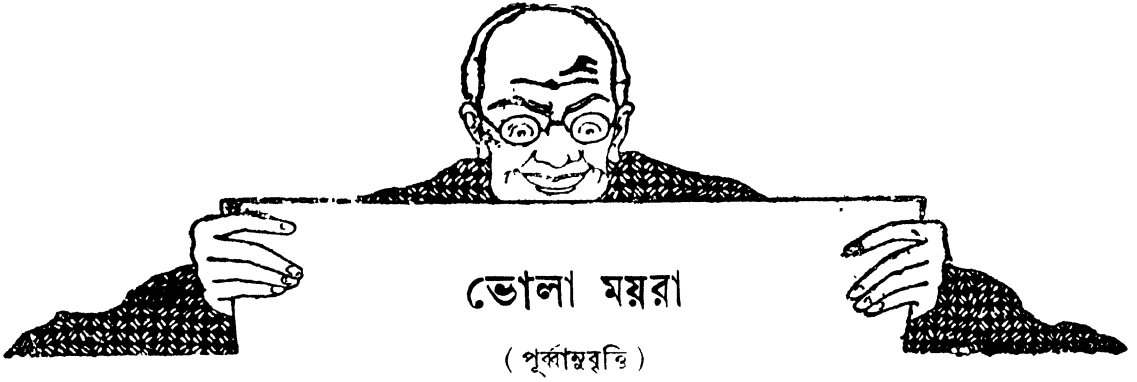
(১) ভোলানাথ ও এণ্টনি-সাহেব

একবার বাগবাজারে বারুদ-খানায় (১) ভোলানাথ ও এণ্টনি-সাহেবের কবির লড়াই হইতেছিল। এণ্টনি-সাহেব স্বয়ং দুর্গা সাজিয়া ও ভোলানাথকে শিব কল্পনা করিয়া এই শাস্ত্রীয় প্রশ্নটির উত্তর দিতে বলিলেন :—

যে শক্তি হ'তে উৎপত্তি, সেই শক্তি তোমার পত্নী কি কারণ,
কহ দেখি, ভোলানাথ! এর বিশেষ বিবরণ॥
জান না কি শিব! আমি তোমার শিবানী,
তোমায় গর্ভে ধ'রে আমি, এখন হলেম তোমার রমণী॥
সমুদ্র-মন্থন-কালে, বিষ-পান ক'রেছিলে,
তখন ডেকেছিলে দুর্গা ব'লে, রক্ষা কর আপনি॥
ঢ'লে ছিলে বিষ-পানে, বাঁচালেম স্তন্য-দানে,
সেই দিন কি ভুলে আমায় ব'লেছিলে জননী?

তখন ভোলানাথ নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া এণ্টনির মুখের মত এই জবাব দিয়াছিলেন :—

(ওরে) আমি সে ভোলানাথ নই,
(আমি সে ভোলানাথ নই)
আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা,
বাগবাজারে রই;
চিন্তামণির চরণ চিন্তি'
ভাজনা-খোলায় ভাজি খই।
আমি যদি সে ভোলানাথ হই,
সবাই পূজে ভোলার *
আমার * পূজে কই॥
নে যা আমার খই, নে যা ঘাঁটালের দই,
পেরিং, এর মুখে গিয়ে গাছে লাগাও মই।
(কাছে) বাগবাজারের খাল, আজ তোর বিষম জঞ্জাল,
দড়ি কলসী নিয়ে ব্যাটা! হোগে জল-সই।

একবার কাশিমবাজার-রাজবাটীতে এণ্টনি-সাহেবের সহিত ভোলানাথের কবির লড়াই হইয়াছিল। এণ্টনি-সাহেব কোর্ত্তা-টুপি ছাড়িয়া বাঙ্গালীর বেশে আসরে দাঁড়াইয়া বাঙ্গালা ভাষায় ছড়া বাঁধিতেছেন ও গান ধরিয়াছেন, ইহা দেখিলে বিস্ময়-জনক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। এণ্টনি অত্যন্ত পেটুক ছিলেন, ইহা শুনিতে পাওয়া যায়। ধনাঢ্য লোকের বাটীতে গাইতে যাইলে এণ্টনি প্রাণ ভরিয়া আহার করিতেন। গরিটির বাগান-বাড়ীতে এক রক্ষিতা ব্রাহ্মণীর সাহচর্য্যে থাকায় বাঙ্গালীর মত তাঁহার আহার ও আচার-ব্যবহার হইয়া আসিয়াছিল। এ কথা ভোলানাথ স্বরচিত একটি গানেও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, পাঠক-গণ ইহা দেখিতে পাইবেন। তিনি আসরে দাঁড়াইয়া এণ্টনিকে বলিলেন :—

পেদরু ফিরিঙ্গী ব্যাটা, পেরু কাটা,
ব্যাটা কি সাহেব ফলিয়েছে।
ব্যাটা ছিলো ভালো, সাহেব ছিলো,
হলো বাঙ্গালী,
এখন কবির দলে, এসে মিলে,
ব্যাটা পেটের কাঙ্গালী।
জন্ম যেমন যার, কর্ম্ম তেমন তার,
এ ব্যাটা ভেড়ের ভেড়ে, নেমোক (১) ছেড়ে,
কবির ব্যবসা ধ'রেছে।

---

(১) বাগবাজারে "বারুদ-খানা" কোথায়, তাহাও বলিয়া দেওয়া উচিত। উত্তরে মারহাট্টা ডিচ, দক্ষিণে ওলড পাউডার মিল রোড (বর্ত্তমান বাগবাজার ষ্ট্রীট), পূর্ব্বে হরলাল মিত্রের ঘাট, পশ্চিমে গঙ্গা ও চিৎপুর রোড,—এই চতুঃসীমান্তর্গত স্থানকে পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে "বারুদ-খানা" বলিয়া ডাকা হইত। এই স্থানটি বাঙ্গালার ইতিহাসে অতি প্রসিদ্ধ। সিরাজউদ্দৌলা যখন ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুন, বুধবার, বেলা ১২টার সময় কলিকাতা আক্রমণ করিবার আদেশ দেন, তখন তাঁহার সর্ব্ব-প্রধান সেনাপতি মীরজাফর বরাহনগর, কাশীপুর, টালা ও ...কপাড়ায় ছাউনী করিয়া চিৎপুর ও মারহাট্টা-ডিচের দিক্ হইতে আসিয়া বাগবাজারে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করেন। ...ক্ত ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ Ensign Piccard ও Captain Blagg ...রা পরাজিত হইয়া দমদমার দিকে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

(১) কবি এণ্টনির পিতামহ বৃদ্ধ এণ্টনি-সাহেব, বেহালা-বড়িষার সাবর্ণ-চৌধুরী মহাশয়দিগের জমীদারীর ম্যানেজার ছিলেন। তখন ইংরাজ-রাজত্ব হয় নাই। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে, ২৪শে আগষ্ট, রবিবার জব-চার্ণক সাহেব কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই ইংরাজ-রাজত্বের সূত্রপাত। বৃদ্ধ এণ্টনি, লবণের ব্যবসায় করিতেন। এই হেতুই "নেমোক ছেড়ে" বলা হইয়াছে। এখন যেখানে West End Watch কোম্পানির

কেউ বা কচ্ছেন ব্যারিষ্টারী, কেউ বা ম্যাজিষ্টারী,
এলেমের জোরে কেউ বা কচ্ছেন্ জজগিরি,
আর এ ব্যাটা পূজোর বাড়ী, ভুজোর লোভে
* নাচাতে এসেছে ॥

—

একবার ভোলানাথ ও এণ্টনি-সাহেব ফরাসডাঙ্গায় কবি-গান করিতে গিয়াছিলেন। একখানি বাটীর ভিতরেই দুই দলের লোক বাসা পাইয়াছিলেন। ভোলানাথ এণ্টনির বিশেষ বন্ধু ছিলেন। এণ্টনি-সাহেব হাসিতে হাসিতে ভোলানাথকে "ময়রা" বলিয়া তাঁহার জাতি-নিন্দা করিলেন। তখন ভোলানাথও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আচ্ছা, আসরে ইহার জবাব দিব।" আসরে গিয়াই ভোলানাথ গাহিলেন :—

বামুন বলে, 'আমি বড়,' কায়েত বলে 'দাস,'
বদ্যি বলে, 'দ্বিজ আমি, ঢাকা-জেলায় বাস'।
যুগী বলে, 'যোগী' আমি, চাষা বলে, 'বৈশ্য',
শূদ্রও শূদ্রত্ব ছাড়ে, যথা কালীঘাটের নস্য।
বলে উগ্র 'নহি শূদ্র, ধরি তলোয়ার,'
হ'লে রাত্রি, উগ্রক্ষত্রী, ভয়ে পগার পার।
চাষা ধোপা 'সচ্চাষী' বলে, কৈবর্ত্ত 'মাহিষ্য,'
সবাই বড় হ'তে চায়, কেউ কারো নয় বশ্য।
এণ্টনি ফিরিঙ্গি-বাচ্ছা, না আছে তার কাচ্ছা-বাচ্ছা,
ব্যাটা বড় নচ্ছারের শেষ,
(তার) বাপ-মায়ের খপর নিলে, কিছু না মিলে ধরাতলে,
ব্যাটার যেমন ধর্ম্ম, কর্ম্ম তেমন বেশ!
আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা, ময়রাই বারমাস,
জাতি পাতি নাহি মানি, ওগো মোর কৃষ্ণপদে আশ!

—

একবার তেলিনীপাড়ায় প্রসিদ্ধ বাঁড়ুয্যে-বাবুদের বাটীতে এণ্টনির সহিত ভোলানাথের কবি-লড়াই হইতেছিল। এণ্টনি গান ধরিল :—

ও মা শিবে মাতঙ্গি।
ভজন সাধন জানি না মা
আমি জেতে ফিরিঙ্গী॥
(ইত্যাদি)

উক্ত গানটি শুনিয়া ভোলানাথ ভগবতী সাজিয়া এণ্টনিকে উত্তর দিলেন :—

তুই জাত ফিরিঙ্গী, জবড়-জঙ্গী,
আমি পার্‌বো না কো তরাতে।
যিশু খৃষ্ট ভজ গে যা তুই শ্রীরামপুরের গির্জ্জেতে॥

—

ঘড়ীর দোকান রহিয়াছে, সেইখানেই সাবর্ণ-বাবুদের কাছারী-বাড়ী ছিল। দোলোৎসব-উপলক্ষে বৃদ্ধ এণ্টনির সহিত জব-চার্ণকের দাঙ্গা হইয়াছিল। তাহাতে জব-চার্ণক বৃদ্ধ এণ্টনিকে বিলক্ষণ প্রহার করিয়াছিলেন।

(২০) ভোলানাথের দলে গান

(১)

ভোলানাথের কবির দলে কয়েকটি পালা ছিল; তন্মধ্যে একটির নাম "বিরহ-বিষাদ"। বিরহিণী রাধিকা নির্জ্জনে বসিয়া মালা গাঁথিতেছেন। এমন সময়ে তাঁহার সখী নিকটে আসিয়া যাহা কহিলেন, ভোলানাথ তাঁহারই কথায় এই গানটি ধরিলেন :—

কার জন্যে, এ অরণ্যে ও সুধন্যে! গাঁথ মোহন-মালা।
আর কি আছে সে গোকুল, শুকায়ে গেছে বসন্ত-মুকুল,
বিরহে বিষাদে ব্রজে হুলুস্থুল, আস্‌বে না আর কালা।
(কার তরে আর গাঁথ মোহন-মালা॥)
মালা-গাঁথনীর মুখের কালী, হের্‌বে না আর সে বনমালী,
এখন কেবল হরি হরি বলি, জ্বালায় কর জপমালা॥

(২)

নিম্ন-লিখিত গানটি ভোলানাথের দলে গীত হইয়াছিল; প্রসিদ্ধ বাঁধনদার সাতু রায় ইহা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন্ আসরে ভোলানাথ ইহা গাহিয়াছিলেন, এবং তৎকালে কে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই গানটি এই :—

সাতু রায়ের প্রণীত

ভোলা ময়রার দলে গীত।

১ চিতান।	হাঁগো বৃন্দে শ্রীগোবিন্দের পায়
	ক'রে প্রাণ সমর্পণ
২ পরচিতান।	হ'ল এ গোকুল, আমার প্রতিকূল,
	অনুকূল কেবল শ্যাম-ধন।
১ ফুকা।	সে ধন-সাধনে হই বুঝি নিধন,
	পাপলোকে তা বুঝে না, কৃষ্ণ-ধন কি ধন।
১ মেল্‌তা।	আমার মিথ্যাবাদ অপবাদ
	দেয় কালার পরিবাদ সই,
	আমি কিরূপে গৃহমাঝে তিষ্ঠে রই!
মহড়া।	এখন শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি বল সই!
	যদি ত্যজি গো! কুল, তবে হাসে গোকুল,
	যদি রাখি গো কুল, কৃষ্ণে বঞ্চিত হই! (১)

(১) কলিকাতা-ভবানীপুর এক দিন কবি-গাহনার দ‹ জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। স্বর্গত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহা এক জন সুকবি ও উৎকৃষ্ট বাঁধনদার ছিলেন। ১২৯১ বঙ্গাব্দে কার্ত্তিক রাত্রিকালে বাগবাজার-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জমীদার স্ব রায় নন্দলাল বসু ও রায় পশুপতিনাথ বসু মহাশয়ের সু প্রাসাদে যে "হাফ আকড়াই" হইয়াছিল, তাহা দেখিবার গোপাল বাবু আসিয়াছিলেন। আমিও সে সময় সেখানে উপ ছিলাম। সেই সূত্রে গোপাল বাবুর সহিত আমার বিশেষ আ হইয়াছিল। তিনি কবি-ওয়ালাদিগের গান সংগ্রহ করিয়া এক পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই পুস্তক হইতে ভোলানা কয়েকটি গান উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধে দিলাম।—লেখক

(৩)

আর একটি গান পাওয়া গিয়াছে। ইহা ভোলানাথের দলে গীত হইয়াছিল। গদাধর মুখোপাধ্যায় ইহা রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে কোন্ কবি ভোলানাথের প্রতিপক্ষ ছিলেন এবং কোথায় এই কবির লড়াই হইয়াছিল, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। এই ধব্‌তার উত্তরও পাওয়া গেল না।

ধরতা।

গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ভোলা ময়রার দলে গীত।

১ চিতান। এস এস এস দেখি প্রাণ। এ কি চমৎকার;
১ পরচিতান। অপরূপ আগমন হইল তোমার!
১ ফুকা। শশি-সঙ্গে প্রাণ! তুমি করিলে গমন,
ভানু-সঙ্গে পুনঃ আসি' দিলে দরশন।
১ মেল্‌তা। আমারে বঞ্চনা ক'রে কোথায় পোহাইলে নিশি,
মহড়া। সেই গে'লে প্রাণ! আসি' ব'লে, এই কি সেই আসি,
সুখের আশে দুখে ভাসে, বঁধু তোমার প্রাণ-প্রেয়সী।
খাদ। বল কেমন পেয়েছিলে নব-রূপসী।
২ ফুকা। তার আশায় যদি বশ হ'লে রসময়।
আশা দিয়ে আমারে হে যাওয়া উচিত নয়।
২ মেল্‌তা। আশা-পথ চে'য়ে আমি নয়ন-নীরে ভাসি।

---

(৪)

নিম্ন-লিখিত গানগুলি ভোলানাথের দলে গীত হইয়াছিল। কিন্তু তত্তৎকালে কে কে তাঁহার প্রতিযোগী ছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় না। গানগুলি এই:—

সাতু রায়ের প্রণীত (১)

ভোলানাথের দলে গীত।

মহড়া। দেখে এলাম শ্যাম। তোমার বৃন্দাবন-ধাম
কেবল নাম আছে।
তথা বসন্ত-ঋতু নাই, কোকিল নাই, ভ্রমর নাই,
জলে কমল নাই,
কেবল রাই-কমল ধূলায় প'ড়ে র'য়েছে॥
চিতান। বসন্ত-কালে ব্রজে আসিয়া দেখিয়া দুঃখ-সমুদায়,
পুনরায় মথুরায়, রাজ-সভায় উপনীত হয়ে উদ্ধব কয়।
শুন ওহে বনমালি! বৃন্দাবনের বার্ত্তা বলি,
পত্রাবলী ক'রে এনেছি।
ভাণ্ডীর-বন তমাল-বন, মধু-বন আর নিধুবন,
নিকুঞ্জ-বন ভ্রমণ করেছি।
মেল্‌তা। করতে গোচারণ যে বনে, সে বন বন হয়েছে এক্ষণে,
তোমা বিহনে বনের শোভা গিয়াছে।
খাদ। বনের কথা, মনের কথা, কই তোমার কাছে।
দোলোন। ফুলে মূলে জলে স্থলে, সকলেতে সমান জ্বলে,
নয়ন-জলে ভাসে অনিবার।
হাহাকার সবাকার, গোপিকার প্রেম-বিকার,
বিরহ-বিকার, না হয় প্রতীকার।
মেল্‌তা। তোমা বিহনে গোপিকার, হয়েছে দেহ শীর্ণাকার,
দুঃখের অলঙ্কার, সবাই গলে প'রেছে।
অন্তরা। সুখ-শূন্য সবাই শোকাকুলী, তোমা বিচ্ছেদে বনমালি হে!
যেমন শ্রীরাম বিহনে অযোধ্যা-ভবন হয় শ্রীহীনে,
ব্রজ গোপী-গণ তদ্রূপ প্রায় সকলি।
পরচিতান। সানন্দ উপানন্দ, শ্রীনন্দ দহিছে মনের বিষাদে,
গোবিন্দ গোবিন্দ বলে গোবিন্দ! কোথা দেখা দে।
যশোদা-রোহিণী আদি, রোদন করে নিরবধি,
বলে বিধি কি করিলে হায়!
মূর্চ্ছা যায়, চেতন পায়, পুনরায় বলে আয়,
আয় আয় কোলে আয়, আয় রে গোপাল আয়।
মেলতা। তুমি গোপাল, হেথা ভূপাল, তোমা বিহনে দহে গোপাল,
ব্রজ রাখাল সব, গোপাল ব'লে কাঁদিছে।

(৫)

সাতু রায়ের প্রণীত

ভোলানাথের দলে গীত।

মহড়া। কও কথা বদন তুলে, হও সদয়, এই ভিক্ষা চাই।
রাধার অধৈর্য্যে, এলেম অপার্য্যে,
তোমার কংস-রাজ্যের অংশ ল'তে আসি নাই।
চিতান। রঙ্গিণী যে জনা, সঙ্গিনী-প্রধানা,
বাক্য-চ্ছলে কৃষ্ণে কয়।
ছিলে ব্রজের রাখাল, হ'লে ভব্য ভূপাল,
সভা এখন কংসালয়।
আমার এই দশা এখন, আমি সেই বৃন্দে,
বিক্রীত শ্রীমতীর পদারবিন্দে;
মেল্‌তা। পার ত চিন্তে, কেন সচিন্তে,
তোমার চিন্তা কি? চিন্তামণির চিন্তা নাই।
খাদ। অধোবদনে মদনমোহন! রও যদি, কুব্জার দোহাই।
দোলন। তোমার সহাস্য বদনে নাই রহস্য,
কি জন্য হলো এত ঔদাস্য;
মেল্‌তা। চারু চন্দ্রাস্য, নহে প্রকাশ্য,
যেন সর্ব্বস্ব ল'তে এলাম, ভাব্‌ছ তাই।
অন্তরা। অন্যমনে কেন রইলে, কথা কইলে
ক্ষতি কি তোমার শ্যাম হে!
যেতে হবে না পুনঃ বৃন্দাবন,
ল'তে হবে না রাধার ভার।

---

(১) কেহ কেহ কহেন, এই গানটি প্রসিদ্ধ বাঁধনদার স্বর্গত সীতানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত। এই গানটি প্রথমতঃ ভোলানাথের দলে গীত হইত। তৎপরে তাঁহার পুত্র চিন্তামণি ও মাধবচন্দ্র এই গানটি নিজ নিজ দলে গাহিতেন।—লেখক

পরচিতান। রাজত্ব হয়েছে, প্রভুত্ব বেড়েছে,
তত্ত্ব ল'তে হয় একবার।
অতি শত্রু এসে যদি শরণ লয়,
সম্ভাষণ করতে হয়,
তাতে মহতের বাড়ে আরো মহত্ত্ব,
লঘু তরালে হয় না লঘুত্ব,
তোমায় কি ধর্ম্ম, তোমায় কি কর্ম্ম,
জানতে সেই মর্ম্ম, পাঠায়েছেন ব্রজের রাই।

(৬)

সাতু রায়ের প্রণীত

ভোলানাথের দলে গীত।

মহড়া। বল উদ্ধব! তোমার মনে আবার কি আছে।
একবার এসে অক্রূর মুনি, কল্লে কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী,
ব্রজের ধন নীলকণ্ঠ-মণি হ'রে ল'য়ে গিয়েছে।
চিতান। উদ্ধবের আগমন দেখে বৃন্দাবনেতে,
বৃন্দে ধায়, গিয়ে খেদ জানায় পথ-মধ্যেতে।
কও হে উদ্ধব! কও কি জন্য আগমন,
আসা সুলক্ষণ, কি বা বৈলক্ষণ,
কোন্ ছলে গোকুলে আসি' কর্‌লে পদার্পণ।
দেখে মথুরা-নিবাসী ভয় হয়,
এক জন এসে ছদ্মবেশে
প্রেম ভেঙ্গে বাদ সেধেছে।
খাদ। সাধু হও যদ্যপি, তথাপি সন্দ হ'তেছে।
দোলন। যেমন সেই অক্রূর দেখতে সুধার্ম্মিক,
তোমায় ততোধিক, দেখছি শতাধিক,
সুধারা বৈষ্ণবের ধারা, সজ্ঞান সাত্ত্বিক;
কিন্তু কুগ্রাম-নিবাসী যারা হয়,
ধর্ম্ম-রহিত, তাদের চরিত,
ধর্ম্ম-শাস্ত্রে লিখেছে।

(৭)

সাতু রায়ের প্রণীত পাল্টা গীত

ভোলানাথের দলে গীত।

মহড়া। ফের উদ্ধব! শূন্য ব্রজে প্রবেশ ক'রো না।
কৃষ্ণ বিনে গোষ্ঠ শূন্য, কানন শূন্য, নগর শূন্য,
কমলিনীর কুঞ্জ শূন্য, সকল শূন্য দেখ না!
চিতান। কৃষ্ণের কথায়, আজ হেথায়, আগমন তোমার,
গোপিকার বিরহ-বিকার করতে প্রতীকার।
কৃষ্ণ-প্রেমানল, মনানলময়,
সে কি নির্ব্বাণ হয়, দেখ গোকুলময়,
হ'তেছে খাণ্ডবের মত অগ্নি-বৃষ্টিময়,
দিলে প্রবোধ বারি, কি হইবে তায়!
দাবানলে যে বন জ্বলে, জল দিলে তা নেবে না।
খাদ। করি' কৃতাঞ্জলি বলি হে, কথা ঠেল না।
দোলন। দেখলে ত উদ্ধব! ব্রজের দুঃখ সব,
আমরা গোপী সব, জীবন থাকতে শব,
সবার দশা, সমান দশা, ক'রেছেন কেশব;
ঘুচবে সকল জ্বালা, এলে সেই কালা,
নইলে বেঁচে কি সুখ আছে,
ম'লেই ঘোচে যন্ত্রণা।

(৮)

গদাধর মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত

ভোলানাথের দলে গীত।

উত্তর।

চিতান। চিন্তা নাই, চিন্তামণির বিরহ
ঘুচিল এত দিনের পর।
পরচিতান। অন্তর জুড়াও গো কিশোরি!
হে'রে অন্তরে বাঁকা বংশীধর।
যে শ্যাম বিরহেতে কাতরা ছিলে নিরন্তর,
সেই চিকণ কাল', হৃদি উদয় হ'ল,
এখন সুশীতল কর গো অন্তর।
মেলতা। যদি অন্তরে অকস্মাৎ, উদয় হ'লেন রাধানাথ,
আছে এর চেয়ে বল, কি আর সুমঙ্গল।
মহড়া। বুঝি নিবলো রাধে। তোমার
অন্তরের কৃষ্ণ-বিরহ-অনল।
হে'রে অন্তরে কালাচাঁদ, অন্তরের পূরাও সাধ,
অন্তর ক'রো না আর নীল-কমল।
খাদ। এ সময় পরশিতে ব'ল না, হয় পাছে অমঙ্গল।
বিধি এই করুন, ঘুচুক্ শ্যাম-বিরহ, রাই তোমার;
ওগো চন্দ্রমুখী, কৃষ্ণসুখে সুখী,
তোমায় সদা দেখি, সাধ সবাকার।
মেলতা। রাধে! তোমার দুঃখ আর, নাহি সহে গোপিকার,
করিলেন মাধব আজি, বিরহানল বুঝি সুশীতল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে (কবিভূষণ, কাব্যরত্ন, উদ্ভটসাগর বি-এ)।

লাভ-লোকসান্

১

শশী বাবু কালনা বারের পুরাতন উকীল। পসার-প্রতিপত্তিও ভালই; কিন্তু তেমন গুছাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে বড় ছেলে নলিনীনাথকে এম্, এ পাশ করাইয়াছেন। ছেলেটি যেমন শান্তশিষ্ট, আবার তেমনই মেধাবী। প্রবেশিকা হইতে আরম্ভ করিয়া এম্ এ পর্য্যন্ত সে উচ্চ সম্মানের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

রায় বাহাদুর অবিনাশ চট্টোপাধ্যায় যখন কালনার সব-ডিভিসনাল অফিসার, নলিনী সেবার বি-এ পরীক্ষা দিয়াছিল। পরিচয় পাইয়া হাকিম বাহাদুর ফল বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র কন্যা লাবণ্যপ্রভার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন।

এই ঘটনার পর কালনায় একেবারে হৈ-হৈ পড়িয়া গিয়াছিল। শশী উকীলের ছেলের চাকরীটা কি পরিমাণ মোটা হইবে, ইহার জল্পনা-কল্পনা লইয়া অনেকেরই ভুক্ত অন্ন যথাযথ হজম হইত না।

বারলাইব্রেরীতেও উকীল বন্ধুরা পর্য্যন্ত আশ্বাস দিয়া কহিতে লাগিলেন, "শশী বাবু, নলিনীর এম, এর রেজাল্ট দেখেও আমাদের তেমন আশা-ভরসা ছিল না। কারণ, ও বস্তুটার মূল্য আজকাল আর নেই। কিন্তু এখন সে ভয় আমাদের গিয়েছে। রায় বাহাদুরের যে গভর্ণমেণ্টের কাছে খাতির কি, সে ত কালনার অজানা নেই কারও।"

শশী বাবু নিজেও ভিতরে ভিতরে একটা বড় গোছের আশাই পোষণ করিতেছিলেন। কিন্তু সব মাটী হইয়া গেল—যে দিন নলিনী আইনের শেষ পরীক্ষা না দিয়া বাড়ী আসিয়া বসিল। তার পর যখন সে হাজারিমল মাড়োয়ারীর গদীতে ব্যবসা শিখিবার জন্য রীতিমত ঘোরাফেরা আরম্ভ করিয়া দিল, তখন তিনি আরও দমিয়া গেলেন।

শশী বাবু অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতি মানুষ। মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেও বাহিরে তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু তিনি চুপ করিলে কি হয়, তাঁহার উকীল বন্ধুরা ইহাতে একেবারে তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। তাহাদের ধিক্কারের প্রকোপে শশী বাবুর কাছারী যাওয়া ভার হইয়া উঠিল। দুই এক জন শুভানুধ্যায়ী বন্ধু শেষ পর্য্যন্ত স্পষ্ট করিয়াই শুনাইয়া দিলেন, "এম, এ পাশ ক'রে মেড়োর তাঁবেদারী না ক'রে ফাইনালটা দিয়ে বারে এসে ঘুরে বেড়াতে বলুন। সে এর চেয়ে ঢের ভাল। তাতে বরঞ্চ ইজ্জত বজায় থাকবে। কিন্তু এ যা হচ্ছে, তাতে বাঙ্গালীর আর মুখ দেখাতে হবে না।"

ব্যাপারটা শশী বাবুর প্রাণেও যে ভীষণ আঘাত না করিয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু তিনি তাঁহার মাতৃহীন পুত্র-কন্যাদের কোন দিনই জোর করিয়া কিছু বলিতে পারিতেন না; এখনও পারিলেন না। এত বড় আলোচনার পরও নিঃশব্দে মুখ বুজিয়া সমস্তই সহ্য করিতে লাগিলেন।

সহৃদয় বন্ধুবান্ধবদের সহানুভূতির তাড়না যে কেবল শশী বাবুর উপর দিয়াই শেষ হইয়া গেল, তাহা নহে, নলিনীর উপর গিয়াও পড়িল। তাহাদের অনুরোধ, উপরোধ, আদেশ, উপদেশ, শেষ পর্য্যন্ত অনুযোগের উৎকট তাড়নায় ব্যবসা ও চাকরীর মাঝখানে পড়িয়া সে বেচারা হাঁপাইতে আরম্ভ করিল।

মেয়ে-মহলেও একটা কদর্য্য ঢি-ঢি পড়িয়া গেল। নলিনীর স্ত্রী লাবণ্য একে প্রথম শ্রেণীর ডেপুটীর কন্যা, তার পর একটু জাঁকজমকে থাকাই তাহার ইচ্ছা ও অভ্যাস। মেজাজটাও একটু রুক্ষ। বিশেষতঃ য়ুরোপীয় আচার-পদ্ধতির অনুরক্ত পিতা ও বৃদ্ধ শ্বশুরের আদরে সে পৃথিবীর রঙ্গীন দিকটাই ভাল করিয়া দেখিতে শিখিয়াছিল। স্বামী ধড়া-চূড়া বাঁধিয়া কাছারী যাইবে, ইহাই ছিল তাহার একমাত্র কামনার বস্তু। এখন এই ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে তাহার গায়ে একেবারে বিষ ছড়াইয়া দিল।

আজ বদ্রনাথগঞ্জে মাল ক্রয় করিবার কথা। নলিনী প্রত্যুষেই জামা-কাপড় পরিয়া একেবারে প্রস্তুত হইয়াই বাহির হইতেছিল, এমন সময় স্ত্রী লাবণ্য আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, "এখনই বেরুচ্ছ যে! চা খাওয়াও ত হয়নি তোমার। সত্যি বলছি, এ সব আমার আর ভাল লাগছে না।" বাড়ীতে শাশুড়ী-ননদ কেহ ছিল না। সংসারের ভার ছিল লাবণ্যের উপর। সে ঘড়ীটার দিকে তাকাইয়া পুনশ্চ কহিল,—"এখন ত ৭টাও বাজে নি। ঠাকুরই বা আসবে কেন!"

নলিনী সস্নেহে স্ত্রীর কোমল বাহুযুগলে একটু চাপ দিয়া কহিল, "ওর জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না, বাবু। আমরা হলাম ব্যবসাদার মানুষ। আমাদের কি আর খাওয়া-শোওয়ার ঠিক আছে?—না তাই ভাবলে চলে?" বলিয়াই মৃদু হাসিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়াই অবাক্ হইয়া গেল। কা'ল মুন্সেফ বাবুর বড়মেয়ে বেড়াইতে আসিয়া হিতোপদেশের ছলে যেমন করিয়া নাক সিঁটকাইয়া গিয়াছিলেন, এখন লাবণ্যের কাণের কাছে সেই কথাগুলি তেমনই ঝম্-ঝম্ করিয়া বাজিতেছিল। সেই ব্যবসার পুনরুল্লেখে সে আর সহিতে পারিল না, কহিল,—"ওঃ, তাই এত তাড়াতাড়ি! তবু ভাল যে, এ অফিসও নয়, আদালতও নয়! কিন্তু তিসিই ওজন কর, আর ভুসিই

মেপে বেড়াও, বাপ আর শ্বশুরের সম্ভ্রমটার দিকে একটু দৃষ্টি রেখো। তাঁদের এক জন হাকিম,—আর এক জন উকীল।—তোমার ভুসিমালের তলায় যেন সে কথাটা চাপা প'ড়ে না যায়।" লাবণ্য ভিতরের দালানে পা দিতেই সদুঝি আসিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। ঝিটি লাবণ্যের বাপের বাড়ীর। আবার কতকটা সমবয়স্কাও বটে। এই ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারটা যে এ বাটীতে একটা হাসি-তামাসার বস্তু, তাহা সে জানিত। সে ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল,—"জামাই বাবুকে বল না, মাড়োয়ারী বাবুর দরোয়ান এসেছে ডাকতে।"

কথাগুলি আর হাসিটুকু সমস্তই নলিনীর কাণে গেল। কিন্তু ভাবে বুঝা গেল, যেন ইহার এক বর্ণও এই মানুষটার শ্রুতিগোচর হয় নাই। কারণ, নলিনী যখন ধীরে সুস্থে ছাতা লইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে বাহির হইল, তখন বুঝা গেল, এতখানি ধৈর্য্য শুধু এই লোকটাতেই সম্ভব। কিন্তু লাবণ্য আর সহিতে পারিল না। দ্রুতপদে সম্মুখে আসিয়া কহিল, "আচ্ছা, লোকের ঠাট্টা-বিদ্রূপও কি তোমার কাণে যায় না?"

"গেলেও তার কোন মূল্য আছে ব'লে আমি মনেই করি না। ঐ উক্তিগুলি যাঁরা করেন, তাঁরা চিরকাল না ভেবে-চিন্তেই ক'রে আসছেন, ওতে দুঃখ করবার কোন কারণ নেই তোমার!"

লাবণ্য পুনশ্চ তেমনই ভাবে প্রশ্ন করিল, "কিন্তু দেহের অবস্থা কি হচ্ছে, সে দিকেও ত দৃষ্টি দেওয়া তোমার উচিত। সে ত সকলেরই চোখে পড়ছে।"

নলিনী কহিল, "দেহের চেয়ে তার ভিতরের মানুষটাকে সুস্থ রাখাই আমি বড় ব'লে মনে করি।—আর দেহ তাতে ক্রমশঃ সুস্থই হবে।" নলিনী কোন দিকে না চাহিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল।

রাত্রি তখন আটটা। হাজারিমলের প্রকাণ্ড জুড়ি আসিয়া নলিনীনাথকে নামাইয়া দিল। শশী বাবু বাহিরেই ছিলেন। ছেলের দিকে তাকাইয়া উৎকণ্ঠায় স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাহার আরক্ত মুখমণ্ডল,—চোখ দুইটি ছল ছল করিতেছে। বোধ করি, জ্বরের প্রকোপটা বেশীই ছিল। রুমাল দিয়া মাথাটা তখনও শক্ত করিয়া বাঁধা। এই অবস্থায় নলিনী যখন উপরে আসিয়া দাঁড়াইল, শশী বাবু তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অতিশয় দুর্ব্বল-প্রকৃতির মানুষ। ছেলের কপালে হাত দিয়া ভয়ে চেঁচাইয়া উঠিলেন।

সে বেচারার এমন কোন মারাত্মক অসুখ হয় নাই, ম্যালেরিয়া জ্বর ও শিরঃপীড়া। কিন্তু কে শোনে কাহার কথা। শশী বাবু বুক চাপড়াইয়া হা-হুতাশ জুড়িয়া দিলেন। মনিবের চীৎকারে চাকর-বাকর, লোক-লস্কর ছুটিয়া আসিল। মুহূর্ত্তে বাড়ীতে যেন একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। নলিনীকে আর অগ্রসর হইতে দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা হইল না। কি জানি, যদি মাথা ঘুরিয়াই পড়িয়াই যায়। ওখানেই বাহিরের ফরাসের উপর জোর করিয়া শোওয়াইয়া দেওয়া হইল। ব্যাপার দেখিয়া তাহার আর প্রতিবাদ করিবার প্রবৃত্তি হইল না, চুপ করিয়া রহিল। লাবণ্য ছুটিয়া আসিয়া কিছু না জানিয়াই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ওদিকে শশী বাবু তখনও ক্রমাগত হা-হুতাশ করিতেছেন।

পাশের বাড়ীটা রাজীব মোক্তারের। নাড়ীজ্ঞান আছে বলিয়া মোক্তার বাবুর সুনাম ছিল। তিনিও ছুটিয়া আসিলেন। নাড়ী টিপিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, "বায়ুর প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। আপনি আর দ্বিধা করবেন না, শশী খুড়ো, বিমান ডাক্তারকেই ডেকে পাঠান। ও ছোট-খাটোদের দিয়ে হবে না দেখছি।"

নলিনীর ইচ্ছা হইল, চীৎকার করিয়া বলে, আর নন্দদুলাল সাজাইয়া কায নাই। যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যেমন উঠিতে যাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্য তাহার স্বামীর মাথাটা বালিসের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শশী বাবু নিজে আসিয়া বুক দিয়া আগলাইয়া পড়িলেন। বাবুর সঙ্গে সঙ্গে চাকর-বাকরও আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। তার পর ওডিকলোন, জলপটি, পাখার বাতাস—সেও আর এক কুরুক্ষেত্র ব্যাপার! নলিনী ভাবিতে লাগিল, এমন ভাবে যাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা, তাহাদের প্রাণবায়ু শুধু দেহের পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকে—মানুষের মত বাঁচিবার শক্তি তাহাদের থাকে না, থাকিতে পারে না।

২

এই সৃষ্টিছাড়া খেয়াল এই কলেজে গড়া ছোকরাটির মগজের ভিতর কেমন করিয়া ঢুকিয়া গিয়াছিল, সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা আবশ্যক।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মিঃ রে ছিলেন বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার। এই কমিশনারের উদ্যোগ ও সভাপতিত্বে কালনার হাঁসপাতালটির উন্নতিকল্পে চাঁদা-সংগ্রহের জন্য, স্থানীয় স্কুলপ্রাঙ্গণে যে বিরাট সভা আহূত হইয়াছিল, সেই সভাই হইয়াছিল নলিনীর মত অনিষ্টের মূল। এই সভায় বসিয়া যে দৃশ্যটি সে দিন নলিনীর চোখে পড়িয়াছিল, তাহা সে এ জীবনে ভুলিতে পারিল না, এমন কি, প্রত্যেক তুচ্ছ ঘটনাটিও এই তরুণ যুবকটির বুকের ভিতর দাগ কাটিয়া বসিয়া রহিল।

হাকিমদের উদ্যোগে সভা। সুতরাং পয়সা-কড়ির ব্যাপার থাকিলেও সকলেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় উপস্থিত হইয়াছিলেন

সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বত্র যে প্রকার ঘটিয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। চীৎকারে হট্টগোলে সমস্ত সভামণ্ডপ গম্ গম্ করিতেছিল। অকস্মাৎ এই বিরা[ট] জনতা পলকের জন্য চঞ্চল হইয়াই নিস্তব্ধ হইয়া গেল এ[বং] সঙ্গে সঙ্গে হাজারিমলের প্রকাণ্ড জুড়ি, সমস্ত রাস্তা প্রকম্পি[ত] করিয়া আসিয়া অদূরে গেটের সম্মুখে খাড়া হইয়া দাঁড়াইল জমকাল পোষাকপরা সহিস দরজা খুলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল হাজারিমল নিজে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া কমিশনার[কে] অবতরণ করাইলেন। পাঁচ সাত জন মুরুব্বী গোছের উকী[ল] মোক্তার হাকিম মিলিয়া অভ্যর্থনা করিতে ছুটিয়া আসিলে[ন] এবং দাঁত বাহির করিয়া একটুখানি হাসিয়া দুই চারিটা বাঁ[ধা] বুলি আবৃত্তি করিলেন। বস্, ঐ পর্য্যন্তই। তার পর সেই [...] চোরের মত এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইলেন, ঠিক তেমনই ভা[...]

রহিলেন। মিঃ রে সামান্য দুই একটা কথায় তাঁহাদের আপ্যায়িত করিয়া হাজারিমলের সঙ্গেই আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। আর এই কয়টি মহামাননীয় ব্যক্তি ঠিক কলের পুতুলের মত তাঁহাদের পশ্চাতে পা গণিয়া আসিতে লাগিলেন। ও দিকে সভামণ্ডপেও তখন একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। প্রত্যেকে নিজের নিজের পোষাক-পরিচ্ছদ, হাব-ভাব ইত্যাদির কোথায় কি ত্রুটি রহিয়াছে, এই চিন্তায় অস্থির হইয়াছিলেন। কিরণ বাবু নূতন সবডেপুটী, এতক্ষণ তিনি বেশ ছিলেন; এখন ঘামিতে আরম্ভ করিলেন। রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে তাহা রক্তবর্ণ করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু স্বেদধারা বাধা মানিল না। ও দিকে বারের সম্ভ্রান্ত উকীল অমৃত বাবু তখন সোনার চেন্‌টা লইয়া অতিশয় বিব্রত। কোনমতেই সে জিনিষটা স্ফীতোদরের উপর ধনুকাকার থাকে না। পাছে স্থানভ্রষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় তিনি বসিয়াই রহিলেন। সাবরেজিষ্ট্রার বাবু অত্যন্ত স্থূলকায়, বর্ণও কিঞ্চিৎ চাপা, অতিরিক্ত স্বেদ-নির্গমে যেন আলকাতরার পিপা সাজিয়া বসিলেন। নিশি ডাক্তার তখনও কাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন, রাজীব মোক্তারের দৃষ্টি পড়ায়, "হুজুর আসছেন যে" বলিয়া ডাক্তারের কোটের কোণ ধরিয়া সজোরে এমন এক টান দিলেন যে, পড়্-পড়্ করিয়া আল্‌পাকার কোটটা ছিঁড়িয়া পিঠের খানিকটা বাহির হইয়া পড়িল, ডাক্তার রাগিয়াই খুন, কিন্তু হুজুর তখন তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছেন। ছিন্ন অংশের গতি করিতে গিয়া ডাক্তারের সমস্ত আশাভরসা নির্ম্মূল হইয়া গেল। অথচ সারা দিনটা এই সময়টুকুর জন্য কি ভাবেই না কাটাইয়াছেন!

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই মাড়োয়ারীটি। লক্ষ লক্ষ মুদ্রার অধীশ্বর—পোষাক-পরিচ্ছদের বিশেষত্ব তাঁহার কিছুই ছিল না। অথচ নিতান্তই সাধারণ জামা-কাপড়ে কি চমৎকারই না লোক-টাকে মানাইয়াছিল! তাঁহার সহজ সুন্দর নিঃসঙ্কোচে চলিবার ভাবটুকুর ভিতর দিয়া তাঁহার বিশেষত্ব ফুটিয়াছিল। কিন্তু হাজারিমলের অনাড়ম্বর, নিঃসঙ্কোচ ভাব এবং কমিশনারের সহিত বন্ধুভাবের আলাপ-পরিচয় প্রতিভাশালী উকীল অমৃত বাবু বরদাস্তই করিতে পারিলেন না। সবরেজিষ্ট্রার বাবুকে ডাকিয়া চুপি চুপি কহিলেন, "মাড়োয়ারী জাতটা টাকা রোজ-গার করতেই শিখেছিল। এটিকেট ব'লে বস্তু যে একটা সংসারে আছে,—সাহেবদের সঙ্গে যে কি ক'রে চল্‌তে ফিরতে হয়, এ জাতটা আজও তার হদিসই পেলে না।"—ঠিক এমনই সময় 'সাহেবের' কি একটা কথায় হাজারি বাবু হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিতেই হাকিম, উকীল সকলেই উষ্ণ হইয়া রক্ত-চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া রহিলেন। ভাবটা এই যে, ঐ ইতরটাকে ধরিয়া চড়াইয়া দেন। কিন্তু পরক্ষণেই সাহেবও যখন হাসির জবাবে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া হাজারিমলের হাতে একটা চাপ দিয়া নিজের আসনে গিয়া বসিলেন, তখন এই কয়টি এটিকেট দুরস্তকে কে যেন চড় মারিয়া বসাইয়া দিল। ইহাও কোনমতে ভদ্রমহোদয়গণ বরদাস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু তার পর হাজারিমল যখন এ দিকের বাবু-ভায়াদের সঙ্গে বসিতে গিয়া সাহেবের আহ্বানে তাঁহার ঠিক্ পাশের আসনটাই অধিকার করিয়া বসিলেন, তখন টাই-আঁটা বড় ডেপুটী—চসমাধারী ছোটটি পর্য্যন্ত, এমন কি, স্থূলকায় সবরেজিষ্ট্রার হইতে আরম্ভ করিয়া চাপকানধারী উকীল এবং গাউনওয়ালা জুনিয়ার পর্য্যন্ত নত-শিরে বসিয়া রহিলেন। কেবল অপরাজেয় অমৃত বাবুর কিছু-তেই কিছু হয় না। তিনিই মৃদুস্বরে কহিলেন, "টাকার খোসা-মোদ আজকালকার জগতে করে না, এখন লোক আর নেই বল্লেই হয়। তা না হ'লে—"

কমিশনার সংক্ষেপ বক্তৃতায় সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া চাঁদার খাতা মেলিয়া ধরিলেন। ১০, ২০, ২৫ সকলেই বড় বড় অক্ষরে নাম ও চাঁদার অঙ্ক তাহাতে লিখিয়া দিতে লাগিলেন: অমৃত বাবু ভিতরে ভিতরে নিজের নামের সঙ্গে একটা বাহাদুর জুড়িবার আশা বহুদিন হইতেই পোষণ করিতেছিলেন। তাই পাশের জুনিয়ারকে ডাকিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "কত দেবো বল দেখি, জ্যোতিষ! তোমরা যে আমাকে আবার", বলি-য়াই ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "সে সব পেতে হ'লে এই ত সময়! এঁর সুপারিসই ত সব! কি বল!—"

জ্যোতিষ কহিলেন, "নিশ্চয়ই! এ ক্ষেত্রে অন্ততঃ শ'দুয়েক টাকা আমাদের দান করতে হবে। ওর কমে ত সাহেবের দৃষ্টি আমাদের দিকে আকৃষ্ট করান যাবে না!—তার পর ধরুন গিয়ে এটা সংকার্য্যের জন্য যে দান, সে বিষয়ে ত আর সন্দেহ নাই।"

অমৃত বাবু মুখ কালো করিয়া কহিলেন, "রেখে দাও তোমার সংকার্য! দু'দুশ' টাকা পকেট থেকে বের করে! তুমিও যেমন! হ্যাঁ, তবে সাহেবের ঐ যে তুমি বল্লে—সে একটু ভাববার কথা বটে।" বলিয়াই চিন্তিতভাবে উঠিয়া গেলেন এবং ঐ টাকা-টাই লিখিয়া আসিলেন। এ পর্য্যন্ত খাতায় এত বড় অঙ্কপাত কেহ করেন নাই। সাহেব মৃদুহাস্য সহকারে অমৃত বাবুকে আপ্যায়িত করিলেন। অমৃত বাবু আর আনন্দ রাখিতে পারেন না। জ্যোতিষের একবারে ঘাড়ে পড়িয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"খুব মাথা খাটিয়েছ হে জ্যোতিষ!—বোধ করি, আমাদের ও আশাটাও—" বলিয়াই বাকিটুকু হাসি দিয়া শেষ করিয়া দিলেন। একে একে সকলেরই লেখা শেষ হইয়া গেল। সাহেব নিজেও তিন শত লিখিয়া হাজারি বাবুর দিকে খাতা আগাইয়া দিলেন।—হাজারি খাতাখানা সাহেবের দিকে সরাইয়া পরিষ্কার বাঙ্গালা করিয়া কহিলেন, "এ ত আমারই দেশ-ভাই-দের চিকিৎসার জন্য!—কুছু ত দেনেই হোগা।"—বলিয়াই একটুখানিক চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কথা কাণে যাইবামাত্র যাঁহারা চিরকাল মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভাল করিয়াই বুঝিলেন এবং বুঝিয়া মুখ টিপিয়া বিদ্রূ-পের ভঙ্গীতে হাসিতে লাগিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হাজারি বাবু কহিলেন, "দশ হাজার লিখ লিজিয়ে, ফিন্ জরুরৎ হোগা ত আউর দশ হাজার দেয়েঙ্গে।"—সভা শুদ্ধ লোক যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। মায় দুর্ভেদ্য অমৃত বাবু পর্য্যন্ত বুকে হাত দিয়া একবারে হাঁ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই একটা হর্ষসূচক আনন্দ-ধ্বনিতে সমস্ত সভা কম্পিত হইয়া উঠিল। কমিশনার নিজেও হাততালি দিয়া সমর্থন করিলেন এবং পরক্ষণেই সভার কার্য্য শেষ করিয়া 'সাহেব' হাজারিমলের সঙ্গে বিদায় হইলেন।

এই সভায় বসিয়া নলিনী হাজারিমলকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার অনাড়ম্বর পোষাক-পরিচ্ছদ,—

নির্ভীক অথচ নিরহঙ্কার ব্যবহার,—সর্ব্বোপরি এই লোকটার মুক্তহস্তে দান,—কিছুই তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। কিন্তু কোন্ শক্তির বলে এই অশিক্ষিত মাড়োয়ারী এই এতগুলি শিক্ষিত ভদ্রলোকের মাথার উপরে তাহার আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া চলিয়া গেল? রাত্রিতে শয্যায় শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ সমস্ত জিনিষটাই তাহার কাছে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইল। সমস্যার সমাধান করিতে কষ্ট হইল না। স্বাধীনভাবে উপার্জ্জনের মূল্যই ত এই। তাই ত তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত হইয়া তাঁহার ভিতরের মানুষটিকে মর্য্যাদা দিতে শিখিয়াছে।

ইহার পর নলিনীর জীবনে কত পরিবর্ত্তনই না হইয়া গেল। রায় বাহাদুর শ্বশুর হইলেন। এম, এ পরীক্ষায় সে উচ্চ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া গেল। পদস্থ শ্বশুরের কৃপায় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইল। তাঁহাদের সঙ্গে কত গার্ডেন পার্টি, টী-পার্টিতেই না সে যোগ দিল. কিন্তু এ জীবনে সে হাজারিমলকেও ভুলিতে পারিল না। সেই সভার দৃষ্টান্তটাও স্মৃতি হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিল না। আর তাহার ফলে সে দাসত্ব না করিয়া হাজারিমলের ব্যবসায়ে কায শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

৩

চারি পাঁচ দিনেই নলিনী ভাল হইয়া গেল। ছেলের অসুখে শশী বাবু যতই বিচলিত হউন, সুস্থ হইয়া সে যখন কাযে বাহির হইতে আরম্ভ করিল, তখন শশী বাবু অভিমান করিয়া বসিয়া রহিলেন। মুখ ফুটিয়া পুত্রকে নিষেধ করিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। যে দিন কেবল নিতান্তই দৃষ্টিবিনিময় হইত, সে দিন মুখখানা ভারি করিয়া তিনি অন্য দিকে চাহিতেন।

স্বামীর সমস্ত কায লাবণ্য স্বহস্তেই করিত। এ কাযটুকু অন্যের হাতে দিয়া সে স্বস্তি পাইত না। এখনও ইহার ব্যতিক্রম হইল না। কিন্তু সে মুখও তুলিত না, কথাও বলিত না। নিঃশব্দে কর্ত্তব্যটুকু শেষ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

আজ দ্বিপ্রহরে জরুরি একটা কাযে বাহির হওয়া নলিনীর প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল পান করিয়া বাহির হইবে বলিয়া সে দাঁড়াইয়া ছিল। এ সকল কায লাবণ্যই করে। কিন্তু আজ দেখিল, লাবণ্য নহে, ঝি আসিয়া পাণ ও জল রাখিয়া চলিয়া গেল। অথচ অনতিদূরে দাঁড়াইয়া লাবণ্যই যে ঝির হাতে দিয়া কাযটা সম্পন্ন করাইয়া লইতেছে, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝিয়া আজ তাহার উদ্যম ও উৎসাহবহ্নি যেন নিবিয়া গেল। আকণ্ঠ পিপাসার কথা আর তাহার মনেও পড়িল না। শুধু নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ঐ জিনিষ দুইটার উপর তাকাইয়া থাকিয়া বাহিরে যাইতেছিল। সেই সময় লাবণ্য আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, "আমাকে জব্দ করাই কি তোমার মতলব?"

এই অদ্ভুত প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া নলিনী কহিল, "কেন? কি হ'ল বল দেখি?"

লাবণ্য কহিল, "তুমি জানো, তোমার দেহটা মোটেই ভাল নেই; বাবা পর্য্যন্ত ব্যস্ত হয়ে তোমায় হাওয়া বদলাতে যেতে লিখেছেন, সমস্ত ঠিকও তিনি ক'রে ফেলেছেন।"

বস্তুতঃ নলিনী কিছুই জানিত না। মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, আমি জানি না, আর জানলেও হাওয়া খেয়ে বেড়ানর মত অপর্য্যাপ্ত সময় আপাততঃ আমার নেই।"

"তা থাকবে কেন? অপমান করবার আর একটা সুযোগ যখন এমন পেয়েছ? মাড়োয়ারীর খাতা লেখা ত আমাকেই দশের কাছে, দেশের কাছে ছোট করবার জন্য!"

ইহার উত্তর প্রদান করিবার প্রবৃত্তি নলিনীর হইল না। সে ব্যথিতচিত্তে ভাবিল, শিক্ষার অভাব মানুষকে যে কত সংকীর্ণ করে, তাহা এইরূপ মানুষের সংস্পর্শে না আসিলে বুঝাই যায় না।

ভাবিতে ভাবিতে নলিনী যখন অগ্রসর হইল, লাবণ্য কাতরকণ্ঠে কহিল, "এই রোগা দেহ নিয়ে তবু তুমি এই দুপুর রোদ্দুরে বেরুবে?—বেশ!" বলিয়াই স্বামীর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া ঝর্-ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

নলিনী দাঁড়াইয়া ছিল। সেইখানেই একবারে বসিয়া পড়িল। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "উঃ, এ আর পারা যায় না।"

নলিনীর অন্তরের ব্যথা অন্তর্য্যামীই জানেন। কিন্তু তবুও সে কাযে বাহির হইল। গঙ্গের পশ্চিমদিকে হোরমিলার কোম্পানীর ষ্টীমার-ঘাট। প্রকাণ্ড একখানা ফ্লাটে মাল বোঝাই হইতেছিল। হাজারি বাবুর ভাই কুলীদের তদারক করিয়া ফিরিতেছিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য নলিনী কি যেন একটু ভাবিল এবং পরক্ষণেই ষ্টেশন-ঘরটির পাশেই একটা মাল-বোঝাই বোরা দিয়া আসন ও আর দুই দিকে টেবলের মত করিয়া সাজাইয়া কাযের ভিতর নিমগ্ন হইয়া গেল।

বেলা যে কখন্ মাথার উপর হইতে ঢলিয়া পড়িয়া শেষ হইতে বসিয়াছে, কিছুই তাহার খেয়াল ছিল না। অকস্মাৎ নারী-কণ্ঠের তীব্র পরিহাসের শব্দে তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল।

ষ্টীমার ষ্টেশনটা সহরের ঠিক বাহিরেই। গঙ্গায় চড়া পড়ায় এই অংশে ভ্রমণের বিশেষ সুবিধা। সহরের বাহিরে বলিয়া অনেকটা জনবিরলও বটে। গাড়ী করিয়া অনেকেই প্রায় এই দিকটায় বেড়াইবার জন্য আসেন। ষ্টেশন-ঘরের সম্মুখের রাস্তায় গাড়ী রাখিয়া তাঁহারা জনবিরল অংশে ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন।

আজও কাহারা আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ভ্রমণের পরিবর্ত্তে গাড়ীতে বসিয়া যে আলোচনা সুরু করিয়াছিলেন, নলিনীর কপাল ভাল, তাই সবটুকু তাহার কাণে যায় নাই। যে আলোচনাটা চলিতেছিল, তাহা এই,—কে এক জন বর্ষীয়সী প্রশ্ন করিলেন, "শশী উকীলের ছেলে না ও? তা না হ'লে অমন বাঁদর আর ভূভারতে কে আছে? দেশে কি আর তিলী ছিল না, না বেণেরা সব ম'রে ছেড়ে গিয়েছে যে, তুই বামুনের ছেলে পৈতে ঝুলিয়ে গিয়েছিস্ এই কায করতে!" আর এক জন হাসি চাপিতে চাপিতে অকস্মাৎ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কহিল, "কিন্তু দিদিমা, ও খুব পণ্ডিত। এ তল্লাটে ওর মত বিদ্বান্ নাকি আর নেই।"

দিদিমা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "তুই আর

জ্বালাস নে নিমি, অমন লেখাপড়ার মুখে আগুন! যদি চাকরী-বাকরিই না করল ত পড়াশুনা ক'রে লাভ? লেখাপড়া মানুষে আবার শেখে কেন লা! মাঠে মাঠে হাল চায করতে, না গঞ্জে ব'সে মাল ওজন করতে! তোর কথা শুনলে গা জ্বালা করে।"

সঙ্গে সঙ্গে সু-উচ্চ হাসির লহরে গাড়ীর ছাদ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। দিদিমা মাঝে মাঝে কহিতে লাগিলেন, "নে, তোরা আর হাসিস নে, নিমি! আমার সর্ব্বদেহ জ্ব'লে যাচ্ছে ঐ ভূতটাকে দেখে।"

হাসির ঘটা তাহাতে কিছুমাত্র কমিল না, বরং সমানভাবেই চলিল। তাহারই ভিতর একটু ফাঁক পাইয়া দিদিমা পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন, "এই যে আমাদের নিকর বর—খাসা ছেলে! দুটো পাশ দিয়ে আর পারল না। গুটিতিনেক কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে বিব্রত হয়েই পড়েছিল। চাকরীর জন্যে চেষ্টা-বেষ্টা করলে। রেলে চল্লিশ টাকার চাকরী পেয়েই নিরুকে বাসায় নিয়ে গিয়েছে। ছেলে বলি একে। এমন ছেলের মা-বাপ হওয়াও সার্থক। কিন্তু এ কি ঘেন্না বল ত? বুড়ো বাপটার অবস্থা একবার ভাব দেখি। আর বউটাই বা পাঁচ জনের কাছে মুখ দেখায় কি ক'রে, তাই শুনি? হাজার হোক একটা মানী লোকের মেয়ে ত সে।" বলিয়াই তিনি সমবেদনায় আকুল হইয়া ফোঁস করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

এমনই করিয়া বেড়ানর পর্ব্বটা শেষ করিয়া দেহটাকে অনেকটা সুস্থ করিয়া দিদিমার দল বিদায় হইলেন। ফিরিবার মুখে এটুকুও বুঝা গেল যে, বউটাকেও আশ্বাস না দিয়া তাঁহারা ঘরে ফিরিবেন না। আলোচনার যতটুকু অংশ নলিনীর কাণে গিয়াছিল, তাহাতেই তাহাকে অসাড় করিয়া ফেলিয়াছিল। পেন্সিলটা যে তাহার অজ্ঞাতসারে কখন্ খসিয়া পড়িয়াছে, কিছুই তাহার মনে নাই। চমক ভাঙ্গিল তখন—যখন হাজারি-বাবুর ভাই জহুরী বাবু আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "বাবুজী, কেত বোরা হয়েছে?" নলিনী স্বপ্নোত্থিতের মত ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল।

জহর বাবু নলিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ধীরে ধীরে তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া কহিলেন, "বাবুজী, আপ ঘর যাইয়ে। আপকে তবিয়ৎ আচ্ছা নেহি।" গাড়োয়ানকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই, জলদি গাড়ী লে আও।"

নলিনী হাত নাড়িয়া নিষেধ করিয়া কহিল,—"না, থাক—আমি নিজেই যেতে পারব।"

৪

বাজারের ভিতর খানিকটা অগ্রসর হইয়াই নলিনী অকস্মাৎ আশ্চর্য্য হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, যদু কুণ্ডুর কাপড়ের দোকানের বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহার বাল্যবন্ধু নিতাই তাহাকে ডাকিতেছে।

নিতাই আজকাল আর বাড়ীতে আসে না। এখন সে রিষড়াতে এল্‌গীন কোম্পানীর পাটের কলের ডাক্তার। এম্, বি পাশ করিবার পর আজ দুই বৎসর যাবৎ সেখানেই চাকরী করিতেছে। যদি কখনও বা কালে ভদ্রে বাড়ীতে আসে ত অতি সামান্য সময়ের জন্যই। রাত্রিতে আসিয়া আবার ভোরের গাড়ীতে ফিরিয়া যায়।

বহুদিন বাদে দুই বন্ধুতে সাক্ষাৎ। অনেক কথাই বোধ করি বলিবার মত ছিল। দেখিতে দেখিতে দোকানের বারান্দার কোণ-স্থিত বেঞ্চিটার উপর বসিয়া সুখ-দুঃখের আলোচনা করিতে করিতে উভয়ে একবারে মগ্ন হইয়া গেল। নিতাই উৎসাহ দিয়া কহিল, "হরেনের কাছে আজ সব শুনলাম। শুনে যে কি পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা তোর উপর আমার হয়েছে! আমাদের দেশে লেখা-পড়া শিখে আর পাঁচ জন যা করে, তুইও যে তাদেরই মত না হয়ে মানুষের মত চলতে চেষ্টা করছিস্, এর লাভ-লোক-সান আজ হয় ত দেশের লোক বুঝতেই পারবে না, হয় ত সঙ্গে সঙ্গে ভুলই তারা করবে, কিন্তু যখন বুঝেছিস্, এ ছাড়া বাঙ্গালীর মুক্তি পাবার আর রাস্তা নেই, তখন আমি ত বলি, কোন অবস্থাতেই এ শুভ-সঙ্কল্প তুই ত্যাগ করিস নে।"

নলিনী ম্লানমুখে কহিল, "না ভাই, যথেষ্ট হয়েছে, আর ভাল লাগছে না। জড়ত্বকে যারা জীবনের চরম উপাসনা করবার বস্তু ব'লে ধ'রে নিয়েছে, মান বল, সম্ভ্রম বল, মনুষ্যত্বই বল, সমস্ত নির্ভর করে যাদের ঐ জিনিষটা বজায় থাকার উপরে, কোন আদর্শই তাদের গ'ড়ে তুলতে পারবে না—যতক্ষণ না ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ওখান থেকে স'রে এসে পড়বে।"

নিতাই কহিল, "কিন্তু তার আর বাকী আছে না কি?"

"আছে বৈ কি। কাষই যে মানুষের প্রাণ, জগতে বেঁচে থাকবার প্রয়োজন যে শুধু কর্ম্ম করবার জন্যই, এই সত্যটা তারা আজও বুঝে উঠতে পারে নি।" বলিয়াই হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া কহিল,—"তাই ত চাকরীর এত মর্য্যাদা হে! অনেক গবেষণার পর তবে এমন স্থানটি এঁরা আবিষ্কার করছেন। স্বল্পশ্রমে কোনমতে পেট চালাতে পারলেই যারা খুসী, তারা যদি সব কিছু ভুলে পরের দাসত্বকেই চরম লক্ষ্যস্থল ব'লে স্থির ক'রে থাকে ত দোষ দেবারই বা আছে কি, ভাই?"

নিতাই বন্ধুকে একটা ধাক্কা দিয়া কহিল, "ধ্যাৎ। অপমান ও লাঞ্ছনার বোঝা মাথায় নিয়ে! তুই বলিস্ কি? আমি ত ঠিক করেছি, ও ছাই ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করব।—সত্যি বলছি—ও বস্তুর ওপর ঘেন্না ধরেছে আমার। এক এক সময় এমনি ধিক্কার আসে।"

অকস্মাৎ দোকানের ভিতর হইতে গম্ভীর কণ্ঠে আহ্বান আসিল, "নিতু! কাপড়-চোপড় কেনবার সময় তোমার যদি না থাকে ত এখন না হয় থাক। মিথ্যে আমি কেন দেরী করি?" মন্তব্য শুনিয়া উভয়েই একটু লজ্জিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। নলিনী কহিল, "তোর বাবা সঙ্গে রয়েছেন, সে কথা বলিসনি কেন গাধা কোথাকার? ছিঃ ছিঃ ছিঃ, বড্ড অন্যায় হয়ে গিয়েছে।"

"না—না! কিছু হয় নি। তুই বোস্, আমি এক্ষুণি আসছি" বলিয়াই নিতাই ভিতরে চলিয়া গেল।

নিতাইএর পিতা যোগেন রায় জোড়া চারেক কাপড় কোলের উপর রাখিয়া বসিয়া ছিলেন, ছেলের দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কহিলেন,—"ওটা আবার জুটল কি ক'রে?" বাহিরে দুই বন্ধুতে যে আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল—বোধ করি, রায় মহাশয়ের সমস্তই শ্রুতিগোচর হইয়াছিল।

দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কহিলেন,—"নিজে ত উচ্ছন্ন গিয়েছেন, এখন আর যারা একটু ক'রে কর্ম্মে থাচ্ছে, এসে লেগেছেন তাদের পিছনে। ভাল এক আপদ এসে জুটেছে কালনায়।" বলিয়াই ক্রোড়স্থিত বস্ত্রগুলি পুত্রের দিকে ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, "ছাখো দেখি এইগুলো, পছন্দ হয় কি না ?"

সামান্য একটা প্রাচীরের ব্যবধান মাত্র। তাও মাঝে মাঝে পাঁচ ছয়টা বড় বড় দরজা খোলা রহিয়াছে। অতি মৃদু শব্দও কাণে যাইতে আটকায় না। নিতাই বন্ধুর অবস্থাটা উপলব্ধি করিয়া একবারে বসিয়া পড়িল। তবে কাপড় পছন্দ করিতে লাগিল কি লজ্জার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে ঘাড় গুঁজিয়া কাপড়গুলি নাড়াচাড়া করিতে লাগিল, সে খবর তাহার অন্তর্য্যামীই জানেন। কিন্তু বাহিরে বসিয়া ঐ কালনার আপদটা অপমানে ও লজ্জায় একবারে মরিয়া গেল; আর মাথা তুলিতে পারিল না। চারি পাঁচ জন ক্রেতা উঁকি মারিয়া দেখিয়া লইল। দোকানের একটা ছোকরা কায-কর্ম্ম ফেলিয়া দরজার উপর দাঁড়াইয়া হিঃ হিঃ করিয়া হাসিতে লাগিল।

অপমানে নলিনীর কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিল। তাহার হৃদয়-তন্ত্রীতে তীব্র যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। কোনওরূপে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া নলিনী দোকানের সান্নিধ্য হইতে সরিয়া গেল।

ঘণ্টা দুই নির্জ্জনে গঙ্গার ঘাটে কাটাইয়া বাড়ীর মোড়ের কাছে আসিতেই সহসা আশঙ্কায় তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। আলো ও গাড়ীতে তাহাদের বাড়ীর সম্মুখটা গম্ গম্ করিতেছে। দ্রুতপদে আর একটু অগ্রসর হইয়াই সে দেখিল, সে অঞ্চলের সকল ডাক্তারের গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে !

তাহার মাথার ভিতর ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল। পা দুইটা এমন ভারী হইয়া উঠিল যে, ক্লান্ত দেহটাকে আর সে বহিতে পারে না। সেই অবস্থায় সে যখন বাহিরের দালানে আসিয়া পা দিল, বিপিন ডাক্তার পাশেই ছিলেন, খপ করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "বাবাজী! একবার এই দিকে শোন দেখি।" গৃহকোণে লইয়া গিয়া কহিলেন, "আর আশঙ্কার কারণ নেই তোমার। বউ-মা, এখন ত মনে হয়—অনেকখানি সামলেই নিয়েছেন।"

এতক্ষণে নলিনী যেন একটুখানি সাহস পাইয়া কহিল, "কি হয়েছিল তাঁর ?"

বিপিন বাবু শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন, "ওরে বাপ্ রে, ভয়ঙ্কর ব্যপার! ব্লাডপ্রেসারে ব্রেণের অবস্থা যে রকম হয়ে পড়েছিল, তাতে ক'রে যে কোন মুহূর্ত্তেই—"

নলিনী চিন্তিতভাবে কহিল, "উনি ত ভালই ছিলেন দেখে গিয়েছিলাম, তখন ত ঠিক বুঝতে—"

বিপিন বাবু বাধা দিয়া কহিলেন, "সে ত বটেই। শুনলাম, সন্ধ্যেবেলায় মুন্সেফ বাবুর বাড়ীর মেয়েরা সব বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে বসেও না কি গল্প করেছেন। তার পর তাঁদেরও বেরিয়ে যাওয়া—আর সঙ্গে সঙ্গে এই বিপদ! যাক্, সে যা হবার, তা হয়েছে। এখন শুধু তোমার কায হচ্ছে ওঁর মনটাকে প্রফুল্ল রাখা। কোনমতেই ওঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু না হয়। বুঝলে বাবাজী ?"

নলিনী ঘাড় হেঁট করিয়া কহিল, "বেশ, তাই হবে।"

হইলও তাহাই। মাস তিনেক বাদে এক দিন শচীন উকীল কলিকাতা গেজেটখানা ধপাস্ করিয়া বার লাইব্রেরীর টেবলের উপর ফেলিয়া দিয়া কহিল, "কেমন! আমি তখন বলেছিলাম না! এই দেখুন, নলিনীনাথ মুখুয্যে সবরেজিষ্ট্রার, গাইবান্ধা—রঙ্গপুর।"

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়।

শ্যামলী

কে কচি কিশোরী খেলাতে আসিয়া, ভুলে'
ধুলাতে প্রাণের পুলক ছড়িয়ে দিলে;
নিখিল ধরার ঊষর বেদনা-মূলে
কোন্ মা কোমল আঁচল জড়িয়ে নিলে।

কে জাগে জরার তুষার-সমাধি-বুকে
জাগাইয়া জগ-যৌবন যুগে যুগে,
কে ধূ-ধূ ধূসর মর্ত্ত্য-মরুভূ-কূলে
শ্যামল জীবন-জোয়ার ভরিয়ে দিলে!

কে নারী টিয়ার পালকের পাখা ঘুরিয়ে
ফিরিছে বিজন তটিনীর তীরে তীরে,
কে গিরি-শিখরে আকুল অলক উড়িয়ে
খেলিয়া বেড়ায় ল'য়ে মায়া-শিখীটিরে।

শৈবাল-আলিপনা দেয় ঘাটে-ঘাটে কে,
সলিলে শয়ন পাতিছে পদ্ম-পাতে কে,
পথের পাত্রে দূর্ব্বার সুধা বাঁটে কে—
ধরণীর ক্ষুধা মরে' যায় ধীরে ধীরে!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

মহাপুরাণের সর্গাদি পঞ্চলক্ষণ বিচার

(পুরাণপ্রসঙ্গ প্রবন্ধের অনুবৃত্তি)

৪। মন্বন্তর

মনু, দেবতা, মনুপুত্র, ইন্দ্র, ঋষিগণ ও হরির অংশাবতার—এই ছয়টির সমবায়কে মন্বন্তর কহে। ইহাই ষটসন্দর্ভান্তর্গত ভাগবত-সন্দর্ভে বলা হইয়াছে।

এই মন্বন্তর মার্কণ্ডেয়পুরাণে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বিষ্ণু ও কূর্ম্মপুরাণে সংক্ষেপে অথচ সুন্দর একরূপ মন্বন্তর বলা হইয়াছে। উহার মধ্যে বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। অনেকগুলি শ্লোকের আনুপূর্ব্বী একইরূপ। বিষ্ণুপুরাণের ৩য়াংশের প্রথমাধ্যায়ে, কূর্ম্মের পূর্ব্বভাগে পঞ্চাশত্তমাধ্যায়ে মন্বন্তর কথিত হইয়াছে।

বায়ুপুরাণে—অন্যপ্রকারে মন্বন্তর কথিত। উহাতে প্রথম ছয়টি মন্বন্তর বাদ দিয়া সপ্তম হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যদিও অন্য পুরাণেও প্রায়শঃ এই নীতিই অবলম্বিত হইয়াছে, তথাপি বিষ্ণু ও কূর্ম্মে প্রথম ছয়টি মনুর নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভাগবতে বিষ্ণুবৎ, মৎস্যপুরাণে মন্বন্তর কথনাবসরে কেবল কালসংখ্যাই প্রদত্ত হইয়াছে।

বামনপুরাণে—মন্বন্তর বর্ণনের প্রথমে কিরূপে ধ্বংস হয়, তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে—(উহাই প্রতিসর্গ)। পরে—বিষ্ণু-কূর্ম্মবৎ বর্ণন কোন কোন শ্লোক একরূপ—অভিন্ন।

অগ্নিপুরাণে—সংক্ষেপে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর বিস্পষ্টভাবে অভিহিত হইয়াছে।

শিবপুরাণেও সংক্ষিপ্তভাবে মন্বন্তর বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন পুরাণে মন্বন্তরের কথা নাই, ইহাতে বোধ হয়, সেই সেই পুরাণে তত্তদংশ লুপ্ত হইয়াছে।

মন্বন্তরের কাল মৎস্যপুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—পঞ্চদশ নিমিষে এক 'কাষ্ঠা', ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক 'কলা', ত্রিংশৎ কলায় এক 'মুহূর্ত্ত' এবং ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক দিবারাত্র হয়। লৌকিক মানের এক মাসে পিতৃগণের এক অহোরাত্র হয়। মানুষ মানের ত্রিংশৎ মাসে পিতৃগণের এক মাস হয়। মানুষ মানের তিন শত ষষ্টি মাসে পিতৃগণের এক বৎসর হয়। মানুষ মানের শত বর্ষে পিতৃগণের তিন বর্ষাধিক কাল হয়। লৌকিক মানের এক বৎসরে দেবগণের এক অহোরাত্র হয়। লৌকিক ত্রিংশদ্বর্ষে দেবগণের এক মাস এবং শতবর্ষে দিব্য তিন মাস দশ দিন হয়। মানুষ মানের তিন শত ষষ্টি বর্ষে দিব্য বর্ষ হয়। তিন হাজার ত্রিংশৎ মানুষ বর্ষে সপ্তর্ষিগণের এক বৎসর হয়। লৌকিক তিন লক্ষ ষষ্টি সহস্র বৎসরে দিব্য সহস্র বৎসর হয়।

দিব্য মানেই যুগসংখ্যা কল্পিত হয়। ভারতবর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটি যুগ। ৪ হাজার ৮ শত বৎসর কৃতযুগ ও তৎসন্ধ্যা-সন্ধ্যাংশমান। ত্রেতা তিন হাজার ৬ শত। দ্বাপর ২ হাজার ৪ শত। কলি ১ হাজার ২ শত বর্ষ। এই ১২ হাজার বৎসর চতুর্যুগের পরিমাণ—এই চারিযুগের একসপ্ততিবার আবর্ত্তনে একটি মন্বন্তর হয়। এইরূপ এক একটি মন্বন্তরে মানুষ-মানের একত্রিংশৎকোটি দশ লক্ষ দ্বাত্রিংশৎ সহস্র অষ্টশত অশীতিবর্ষ ছয় মাস সময় হয়। ইহার চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক কল্পকাল হয়। ইহার পরে জগতের সম্পূর্ণ প্রলয় হয়। ইহারই নাম মহাপ্রলয়।

মন্বন্তর যে সকল পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে চতুর্দ্দশ মনুই বর্ণিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে ছয় জন অতীত বর্ত্তমান বৈবস্বত মনুর সময়, এবং ভবিষ্যৎ সাত জন। স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণিক, দক্ষসাবর্ণ, ব্রহ্মসাবর্ণ, ধর্ম্মসাবর্ণিক, রুদ্রসাবর্ণ, রৌচ্য, ভৌত্য।

১ম স্বায়ম্ভুব মনু—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ মনুর পুত্র। যাম্য নামে যজ্ঞের দ্বাদশপুত্র দেবতা। ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, বশিষ্ঠ, ইহারা ঋষি। শতক্রতু ইন্দ্র। যজ্ঞ অবতার।

২। স্বারোচিষ মনু—পারাবত তুষিত আদি দেবতা, বিপশ্চিৎ নামক ইন্দ্র। উর্জ্জ, স্তম্ব, প্রাণ, দম্ভোলি, বৃষভ, তিমির, অর্ব্বরীবান, এই সপ্তর্ষি। চৈত্র,কিম্পুরুষ মনুপুত্র,অজিত অবতার।

৩। উত্তম মনু—সুশান্তি দেবেন্দ্র; সুধামা, সত্য, শিব, প্রতর্দ্দন, বশবর্ত্তী—দেবতা, এই পাঁচ ভাগে দ্বাদশ গণে বিভক্ত। রজঃ, গোত্র, ঊর্দ্ধবাহু, সবল, অনঘ, সুতপা, শুক্র ইহারা সপ্তর্ষি, ইহারা সকলেই বশিষ্ঠপুত্র। অজ, পরশু, দিব্য, প্রভৃতি মনুর পুত্র। সত্য অবতার।

৪। তামস মনু—সুরূপগণ, সত্যগণ, হরিগণ ও সুধীগণ—ইহারা প্রত্যেকে সপ্তবিংশতিসংখ্যক; এই সকল দেবতা, শিবি রাজা ইন্দ্র; জ্যোতির্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বলক ও পীবর—ইহারা সপ্তর্ষি। নর, খ্যাতি, শান্তহয়, জানুজঙ্ঘ আদি মনুর পুত্র। হরি অবতার।

৫। রৈবত মনু—বিভু ইন্দ্র; অমিতাভ, বৈকুণ্ঠ (ভূতরজ), সুমেধাগণ দেবতা, ইহারা প্রত্যেক গণে চতুর্দ্দশসংখ্যক। হিরণ্যরোমা, বেদশ্রী, ঊর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, সুধামা, পর্জ্জন্য, মহামুনি ইহারা সপ্তর্ষি। বলবন্ধু, সুসম্ভার, সত্যক আদি মনুর পুত্র। স্বারোচিষ, উত্তমি, তামস ও রৈবত এই চারি জন মনু—প্রিয়ব্রতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। হরি অবতার।

৬। চাক্ষুষ মনু—মনোজব ইন্দ্র। আদ্য, প্রসূত, ভব্য, পৃথুগ ও লেখগণ দেবতা। এই পাঁচটি গণের প্রত্যেকটি আট ব্যক্তিতে পূর্ণ। সুমেধা, বিরাজ, হবিষ্মান্, উত্তম, মধু, অতিনামা ও সহিষ্ণু ইহারা সপ্তর্ষি। উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন প্রভৃতি চাক্ষুষ মনুর পুত্র। বৈকুণ্ঠ অবতার।

৭। বৈবস্বত মনু—আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ দেবতা; পুরন্দর ইন্দ্র; বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ—ইহারা সপ্তর্ষি। ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যান, নাভ, করুষ, পৃষধ্র ও লোকবিশ্রুত বসুমান—ইহারা বৈবস্বত মনুর পুত্র। বামন অবতার।

৮। সাবর্ণিক মনু—সুতপ, অমিতাভ ও মুখ্যাণ দেবতা; ইহাদের প্রত্যেক গণে একবিংশতিসংখ্যক দেবতা। দীপ্তিমান, গালব, রাম, কৃপ, অশ্বত্থামা, ব্যাস ও ঋষ্যশৃঙ্গ সপ্তর্ষি। বলি ইন্দ্র।

বিরজাঃ, আর্ব্বরীবান, নির্মোহ প্রভৃতি মনুর পুত্র। সার্ব্বভৌম নামক অবতার।

৯। দক্ষসাবর্ণি মনু—পার, মরীচিগর্ভ ও সুধর্ম্ম এই ত্রিবিধ গণ দেবতা; ইঁহাদের প্রত্যেক গণে দ্বাদশ দেবতা। অদ্ভুত ইন্দ্র। সবল, দ্যুতিমান, ভব্য, বসু, মেধা, ধৃতি, জ্যোতিষ্মান্ ও সত্য—ইঁহারা সপ্তর্ষি। ধৃতকেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত নিরাময় ও পৃথুশ্রবা ইঁহারা মনুর পুত্র। ঋষভ অবতার।

১০। ব্রহ্মসাবর্ণি দশম মনু—সুধাম ও বিরুদ্ধগণ দেবতা; ইহার প্রত্যেকটি শতসংখ্যক। শান্তি ইন্দ্র। হবিষ্মান্, সুকৃতি, সত্য, অপামূর্ত্তি, নাভাগ, অপ্রমিতৌজা, সত্যকেতু—ইঁহারা সপ্তর্ষি। সুক্ষেত্র, উত্তমৌজা, হরিষেণ প্রভৃতি দশ জন মনুপুত্র। বিষক্সেন অবতার।

১১। ধর্ম্মসাবর্ণি মনু—বিহঙ্গমগণ, কামগমগণ ও নির্ম্মাণরতিগণ দেবতা। এই গণের প্রত্যেকটি ত্রিংশৎসংখ্যক। বৃষ ইন্দ্র। নিশ্চয়, অগ্নিতেজা, বপুষ্মান্, বিষ্ণু, আরুণি, হবিষ্মান্ ও অনঘ—ইঁহারা সপ্তর্ষি। সর্ব্বগ, সর্ব্বধর্ম্ম ও দেবানীক প্রভৃতি মনুর পুত্র। ধর্ম্মসেতু অবতার।

১২। রুদ্রসাবর্ণি মনু—ঋতধামা ইন্দ্র। হরিত, লোহিত, সুমন, সুকর্ম্ম ও তার নামক পঞ্চগণ দেবতা। প্রত্যেকটি দশ সংখ্যক। তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি, তপোরতি, তপোধৃতি, তপোদ্যুতি ও তপোধন সপ্তর্ষি। দেববান, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ—ইঁহারা মনুর পুত্র। সুধামা অবতার।

১৩। রৌচ্য মনু—সুত্রাম, সুধর্ম্ম, সুকর্ম্মগণ দেবতা। ইঁহার প্রত্যেকটি ত্রয়স্ত্রিংশৎসংখ্যক। দিবস্পতি ইন্দ্র। নির্ম্মোহ, তত্ত্বদর্শী, নিষ্প্রকম্প, নিরুৎসুক, ধৃতিমান, অব্যয় ও সুতপাঃ—ইঁহারা সপ্তর্ষি। চিত্রসেন, বিচিত্র আদি মনুর পুত্র। যোগেশ্বর অবতার।

১৪। ভৌত্য মনু—শুচি ইন্দ্র। চাক্ষুষ, পবিত্র, কনিষ্ঠ, ভ্রাজি ও বচোবৃদ্ধগণ দেবতা। অগ্নিবাহু, শুচি, শুক্র, মাগধ, অগ্নীধ্র, যুক্ত ও অজিত, সপ্তর্ষি। উরু, গভীর, ব্রধ্ন আদি মনুর পুত্র। বৃহদ্‌ভানু অবতার।

সকল পুরাণে এই মন্বন্তরের ও মনুগণের কথা পাওয়া যায় না। কূর্ম্মপুরাণে প্রথম সাতটির কথা আছে; বিষ্ণুতে সকল মনু ও মনুপুত্র, সপ্তর্ষি, দেবতা, ইন্দ্র প্রভৃতির কথাই আছে। ১ম সাতটির বর্ণনার সহিতই কূর্ম্মপুরাণের ও বিষ্ণুপুরাণের মিল আছে, অধিকাংশ শ্লোকই এক। মন্বন্তরের নাম ও কালমধ্যে মতভেদ প্রায়ই নাই, তবে কোন কোন পুরাণের লিপিকর প্রমাদবশে সামান্য সামান্য ভেদ পরিলক্ষিত হয়। অনেক পুরাণে এই স্বরূপনির্ব্বাহক অঙ্গটির বিষয় কিছুমাত্র উল্লিখিত হয় নাই, এবং ইহার সময় সম্বন্ধেও এতবড় দীর্ঘ অঙ্ক বলা হইয়াছে, যাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ন্যায় দেশীয় অধ্যাপকবর্গও সত্য বলিয়া মানেন না। এই অংশটি বহিরঙ্গ-সমালোচকদিগের নিকট বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে, তাই তাঁহারা এই অংশ অবিশ্বাস্য বলিয়াই অব্যাহতি পাইয়াছেন। পার্জ্জিটার সাহেব বলেন, "মন্বন্তরের সময়নির্দ্দেশ ব্রাহ্মণ জাতির কল্পিত, উহার কোন অর্থ নাই।" এই সকল সম্বন্ধে আমাদেরও অধিক বক্তব্য নাই। কেন না, যাঁহারা পুরাণের এই দীর্ঘ সময় নির্দ্দেশে আস্থাবান্ নহেন, তাঁহারা অবিশ্বাসের কোন বলিবার মত কারণ দেখাইতে পারেন না, সুতরাং খণ্ডন করিব কাহার? আমরা পুরাণকারের সকল কথাতেই বিশ্বাসবান্, কিন্তু সকল কথা বুঝিতে বা ধারণা না করিতে পারি, তাই বলিয়া তাহার অস্তিত্ব লোপ করিবার শক্তি আমাদের কোথায়? অনন্ত বৈচিত্র্যময় জগতের মধ্যে কয়েকটি পদার্থের কার্য্য-কারণভাব আমরা কল্পনা করিতে পারি?

৫। বংশানুচরিত বা বংশ্যানুচরিত

এই পুরাণের পঞ্চমাবয়ব, বংশানুচরিত পদে সোমসূর্য্যপ্রভব ত্রৈকালিক রাজগণের ও তদ্বংশধরগণের সব বৃত্তান্ত বুঝিতে হইবে। ষট্‌সন্দর্ভান্তর্গত ভাগবত-সন্দর্ভে জীব গোস্বামী বলিয়াছেন, সেই রাজাদের এবং তাঁহাদের বংশধরগণের বৃত্তান্তই বংশানুচরিত।

"বংশানুচরিতং তেষাং বৃত্তং বংশধরাশ্চ যে।
তেষাং রাজ্ঞাং যে চ তদ্বংশধরাস্তেষাং বৃত্তং বংশানুচরিতম্॥"
ষট্‌সন্দর্ভ।

"তেষাং বংশানুকথনং বংশানুচরিতং স্মৃতম্॥"
দেবীভাগবত। ১।২।২৫

বংশ ও বংশানুচরিতই রাজগণের ও তৎসংসৃষ্ট ব্রাহ্মণগণের ইতিহাস। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরমধ্যে স্বায়ম্ভুব ও বৈবস্বত এই দুইটি মন্বন্তরের রাজগণের নাম ও তন্মধ্যে কাহারও কাহারও চরিত্র-বর্ণন পাওয়া যায়. কেবল মার্কণ্ডেয়পুরাণেই চতুর্দ্দশ মনুর ও তদ্বংশধরগণের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

স্বায়ম্ভুব মনু, প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, ধ্রুব, উত্তম, অঙ্গ, বেণ, পৃথু, প্রচেতাগণের ও ঋষভ, নাভি, ভরত প্রভৃতির চরিত্র ভাগবতে ও বিষ্ণু, বায়ু প্রভৃতি পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।

বিবিংশ
খনিনেত্র
করন্ধম
আবিক্ষিৎ
মরুত্ত
নরিষ্যন্ত
দম
রাষ্ট্রবর্দ্ধ
সুধৃতী
নর
কেবল
বন্ধুমান্
বেগবান্
বুধ
তৃণবিন্দু
বিশাল
হেমচন্দ্র
সুচন্দ্র
ধূম্রাশ্ব
* সৃঞ্জয়
সহদেব
কৃশাশ্ব
সোমদত্ত
জনমেজয়
প্রমতি
যুবনাশ্ব
১০ শ্রাব
* শ্রাবস্তক (শ্রাবস্তী)
বৃহদশ্ব
* কুবলয়াশ্ব (ধুন্ধুমার)
দৃঢাশ্ব
হর্য্যশ্ব
নিকুম্ভ
সংহতাশ্ব (হৈমবতী)
কৃশাশ্ব
অক্ষয়াশ্ব
প্রসেনজিৎ
* যুবনাশ্ব (গৌরী)
(বিন্দুমতী) ২০ * মান্ধাতা (চৈত্ররথী)
পুরুকুৎস
অম্বরীষ
মুচকুন্দ
ত্রসদস্যু
যুবনাশ্ব
সম্ভূত
হরিত
* অনরণ্য
ত্রসদশ্ব
হর্য্যশ্ব
বসুমত
ত্রিধন্বা
ত্রয্যারুণ
৩০ * সত্যব্রত (ত্রিশঙ্কু) (সত্যবতী)
* হরিশ্চন্দ্র
* রোহিত
হরিত
চঞ্চু
৪০ বিজয়
সুমেরু
রুরুক (কারুক)
ধৃতক (বৃক)
* বাহু
* সগর
৪০ * অসমঞ্জ
* অংশুমান
* দিলীপ
* ভগীরথ
শ্রুত
নাভাগ
* অম্বরীষ
সিন্ধুদ্বীপ
আযুতায়ু
* ঋতুপর্ণ
৫০ সর্ব্বকাম
* সুদাস (মিত্রম্)
* সৌদাস (কল্মাষপাদ)
* অশ্মক
উরুকাম
* মূলক (নারীকবচ)
শতরথ
ঐলিবিলি
বৃদ্ধশর্ম্মা কৃতশর্ম্মা
বিশ্বমহৎ
৬০ * দিলীপ খট্বাঙ্গ
দীর্ঘবাহু
* রঘু
* অজ
* দশরথ
* রাম
কুশ (কুশস্থলী) লব (শ্রাবস্তী)
অতিথি
নিষধ
নল
৭০ নভ
পুণ্ডরীকাক্ষ
ক্ষেমধন্বা
দেবানীক
অহীনগু
পারিপাত্র
দল
বল
উক্থ
বজ্রনাভ
৮০ শঙ্খন
ব্যুষিতাশ্ব
বিশ্বসহ
হিরণ্যনাভ কৌশল্য
বশিষ্ঠ
পুষ্প
ধ্রুবসন্ধি
সুদর্শন
অগ্নিবর্ণ
শীঘ্র
৯০ * মনু মরু
প্রসুশ্রুত
সুগন্ধি
মর্ষ—সহস্বান
বা মহস্বান
বা চন্দ্রাবলোক
বা তারাপীড়
বা চন্দ্রগিরি
বা ভানুচিত্র
বা শ্রুতায়ু
(কূর্ম্মপুরাণ)

বিশ্রুতবান
|
* বৃহদ্বল
|
বৃহতাক্ষ বৃহৎক্ষণ
|
গুরুক্ষেপ
|
* বৎস
|
বৎসব্যূহ
|
১০০ প্রতিব্যোম
|
দিবাকর
|
সহদেব
|
বৃহদশ্ব
|
ভানুরথ
|
সুপ্রতীক
|
মরুদেব
|
সুনক্ষত্র
|
কিন্নর
|
অন্তরীক্ষ
|
১১০ সুবর্ণ
|
অমিত্রজিৎ
|
বৃহদ্রাজ
|
ধর্ম্মী
|
কৃতঞ্জয়
|
রণঞ্জয়
|
সঞ্জয়
|
শাক্য
|
শুদ্ধোদন
|
রাহুল
|
১২০ প্রসেনজিৎ
|
ক্ষুদ্রক
|
কুণ্ডক
|
সুরথ
|
১২৪ সুমিত্র

চন্দ্রবংশ

বুধ
|
পুরোরবা
|
আয়ুঃ
|
নহুষ
|
যযাতি
|
পুরু
|
জনমেজয়
|
অবিদ্ধ
|
১০ প্রবীর
|
মনস্যু
|
জরদ
|
ধুন্ধু
|
বহুগবী
|
সম্যাতি
|
রৌদ্রাশ্ব
|
রজেয় (অনাধৃষ্ট)
|
রিবেয়ু
|
* রন্তিনার
|
২০ তংসু
|
ইলিন
|
* দুষ্মন্ত
|
ভরত
|
বিতথ
|
ভুবমন্যু
|
বৃহৎক্ষত্র
|
সুহোত্র
|
* হস্তী
|
অজমীঢ়
|
৩০ ঋক্ষ
|
সংবরণ
|
* কুরু
|
পরীক্ষিৎ
|
জনমেজয়
|
সুরথ
|
ভীমসেন
|
জহ্নু
|
সুরথ
|
বিদূরথ
|
৪০ সার্ব্বভৌম
|
জরৎসেন
|
আরাধি
|
অযুতায়ু
|
অক্রোধন
|
দেবাতিথি
|
ঋক্ষ
|
দিলীপ
|
প্রতীপ
|
শান্তনু
|
৫০ বিচিত্রবীর্য্য
|
পাণ্ডু
|
অর্জ্জুন
|
অভিমন্যু
|
পরীক্ষিৎ
|
জনমেজয়
|
শতানীক
|
৫৭ অশ্বমেধদত্ত

বায়ুপুরাণে অধিসোমকৃষ্ণের পুত্র হইতে ভবিষ্যরাজগণের কথা বর্ণিত হইয়াছে এবং পরে বলা হইয়াছে যে, এই ২৫ জন রাজা পুরুবংশে ভবিষ্য অথচ গণনায় ১৬ জন মাত্র হয়। বিষ্ণুপুরাণের প্রদত্ত সংখ্যায় ও নামে অধিসোমকৃষ্ণ হইতে ঠিক ২৫ সংখ্যক হয়, সুতরাং বুঝিতে হইবে, বায়ুপুরাণের নাম বলিবার শ্লোক মধ্য হইতে লুপ্ত হইয়াছে।

মৎস্যপুরাণমতে

অধিসোমকৃষ্ণ
|
৫৮ বিবক্ষু
|
ভূরি
|
৬০ চিত্ররথ
|
৬১ শুচিরথ
|
বৃষ্ণিমান
|
সুষেণ
|
সুনীথ
|
নৃচক্ষু
|
সুখীবল
|
পরিপ্লব
|
সুতপা
|
মেধাবী
|
পুরঞ্জয়
|
ঊর্ব্ব
|
তীগ্ম
|
বৃহদ্রথ
|
বসুদাম
|
শতানীক
|
উদয়ন
|
অহীনর
|
দণ্ডপাণি
|
৭৭ ক্ষেমক

শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন (কাশীরাজ-সভাপণ্ডিত

সত্য-মিথ্যা

বিধবা সাবিত্রী ঠাকুরাণীর বয়স হইয়াছিল, কিন্তু সে বয়স যে ঠিক কত, সে কথা গ্রামের কেহ বলিতে পারিত না; সাবিত্রী নিজেও পারিতেন না। কেহ বলিত, বয়স তাঁহার পঞ্চাশের বেশী নহে, শোকে তাপে আশী-পঁচাশী বলিয়া ভুল হয়; কেহ বলিত, সাবিত্রীর বয়স কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই একশ' অতিক্রম করিয়াছে। এই গোলযোগের কারণ, বাল্যাবস্থায় সাবিত্রীকে যাঁহারা এই কুড়িগ্রামের ধূলায়, মাঠে ও জঙ্গলে ছুটাছুটি করিতে দেখিয়াছেন, আজ তাঁহাদের কেহ বাঁচিয়া নাই, সাবিত্রীর সমবয়সীরাও একে একে পরলোকের মহামান্য শমন মাথায় করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কুড়িগ্রামের জীবন-ইতিহাসে যে প্রাচীন ধারাটি ক্রমে নিশ্চিহ্ন হইবার উপক্রম করিতেছে, সাবিত্রী ঠাকুরাণী তাহারই সঙ্কীর্ণতম শেষ রেখা।

পাড়ার ঘরে ঘরে সাবিত্রী ঠাকুরাণীর যাতায়াত ছিল। সকলের কাছে বসিয়া, শুধু অতীত দিনের অসম্ভব সুখ-সমৃদ্ধির কথা গল্প করিয়া বলার মত আনন্দ তিনি আর কিছুতেই পাইতেন না।

ঘোষেদের মেজ-বৌ খাস কলিকাতা সহরের মেয়ে। চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, থিয়েটারের গল্প তাহার মুখে লাগিয়াই থাকে। সাবিত্রী বলিতেন, "কি যে কল্‌কেতার বড়াই করিস মেজ-বৌ, হেসে বাঁচিনে! সে পেরায় তিরিশ বচ্ছর আগেকার কথা, এই গেরামেই রাস-পুন্নিমের দিন মেলা বসত, পশু-পাখী, জিনিষ-পত্তর, লোকজন, সে যে কত, তা তোরা আন্দাজও করতে পারবি নে! আর রাখু বোষ্টমের যাত্রা—'মাথুর' শুনে তিন দিন চোখের জল শুকোয় নি; তার কাছে কলকেতার থেটার! বলিসনে, বলিসনে!"

মেজ-বৌ হাসি চাপিয়া বলিত, "তবু ত' একবার কলকেতায় পা দাওনি।"

সাবিত্রীর সে সম্বন্ধে ব্যগ্রতা ছিল না। এই ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত, উৎসন্নপ্রায় কুড়িগ্রামের মাটীতে বসিয়া তিনি এক অতীত দিনের স্বপ্ন দেখিতেন—যে দিন এই গ্রামের ডোবা, খাল, বিলের জল পচিয়া ম্যালেরিয়ার জন্ম দেয় নাই, যখন বিলের বুকে ফোটা পদ্মের রাশি শিশুর হাসির মত তরঙ্গায়িত হইত—চারিদিক আলো করিয়া রাখিত,—যখন এ গ্রামে দুই মাইল দূরে কোম্পানীর রেলগাড়ীর লাইন বসে নাই, যখন বেলা আটটায় নাকে-মুখে ভাত গুঁজিয়া ঐ গ্রামের যুবক ও প্রৌঢ়ের দল ডেলী প্যাসেঞ্জারি করিতে ছুটিত না। সভ্যতার গতির সঙ্গে সঙ্গে এই অখ্যাত পল্লী-গ্রামেও কত বড় বড় পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বৃদ্ধা সাবিত্রী আজও সেই স্মৃতির স্তূপের উপর একাকিনী বসিয়া আছেন। সহর কলিকাতা দেখিবার সাধ তাঁহার নাই।

তেইশ বৎসর পূর্ব্বে সাবিত্রী একমাত্র ছেলে হরিবিলাসকে সহর কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন,—কিম্বা, সে নিজেই গিয়াছিল চাকুরী করিতে। হরিবিলাসের লেখা-পড়া বোধোদয়ের সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই, সে বিদ্যায় কেরাণীগিরি হয় না। তখন কলিকাতায় নূতন মোটর-গাড়ীর প্রচলন হইয়াছে, হরিবিলাস ড্রাইভারি শিখিতে গেল।

সাবিত্রী নিষেধ করিয়াছিলেন—'ম্লেচ্ছ যন্তর-পাতি ঘেঁটে কায নেই, বাবা! কখন্ কি হবে শেষকালে!' হরিবিলাস সাবিত্রীর নিষেধ অবহেলা করিয়া সেই যে কলিকাতায় গেল, তার পর আজ পর্য্যন্ত ফিরিবার অবসর আর হইল না।

কুড়িগ্রাম সাবিত্রীর শ্বশুরের দেশ নহে; পিতৃভূমি—জন্মস্থান। এই গ্রামেই তাঁহার শৈশব কাটিয়াছে। এই গ্রামেরই কোন একটি ক্ষুদ্র কুটীরে এক দিন এক ব্যক্তি তাঁহাকে মাল্য দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিল,—এই গ্রামেই আজ তিনি বৃদ্ধা।

তখনও কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে বহু বিবাহের প্রথা প্রবল। সাবিত্রী নিজেই বলিতেন, তাঁহার স্বামী সর্ব্বসমেত ৭১টি অরক্ষণীয়া কন্যার কুমারীত্ব মোচন করিয়াছিলেন এবং কোন দিন শ্বশুরগৃহে যাইবার সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই। না-ই হউক, বাপের একটিমাত্র মেয়ে, অন্নকষ্টের সম্ভাবনা ছিল না। স্বামী বৎসরের মধ্যে ৫।৭ বার দেখা দিতেন এবং কোনবারই ত্রিরাত্রির অধিক শ্বশুরভবনে বাস করিতেন না। না-ই করুন, তিন বৎসর পরে সাবিত্রীর সন্তান জন্মিল, দাদামহাশয় নাতির নাম রাখিলেন হরিবিলাস। হরিবিলাস যখন সাত বৎসরের, সেই সময় সাবিত্রীর এয়ন্ত্রীর চিহ্ন ঘুচিল এবং তাহারই কিছু দিন পরে পিতাও পৃথিবীর মায়াপাশ ছেদন করিলেন। তার পর ঐ গ্রামের কত প্রাচীন গেলেন, কত নূতন আসিল; হরিবিলাস বড় হইল।

কলিকাতায় মাস দুই কাটাইবার পর হরিবিলাস পত্র লিখিয়া জানাইল, মোটরের কায শিখিবার জন্য তাহার দুই শত টাকার একান্ত প্রয়োজন, নতুবা কায শিখা দূরে থাকুক, সে আত্মহত্যা করিবে। কিন্তু টাকা কোথায়?

সম্বলের মধ্যে পৈতৃক চালাঘর দুইখানি, আশেপাশে কাঠা কয়েক জমী। সাবিত্রী সে দুইখানি বাঁধা দিয়া ছেলের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন। সহায়-শূন্যতার ভয় সাবিত্রীর মাতৃ-হৃদয়কে ঐ কাযে বাধা দিতে পারিল না।

সাবিত্রী বলিলেন, "কি হবে বাছা ঘরের মায়া ক'রে, যদি হরি না মানুষ হয়? বলি, ঘর-দোর সবই ত ওরি। সত্যি যদি মানুষ হ'তে পারে, তখন কি আর ঘর খোলসা করবার জন্যে ভাবতে হবে! এই ক'টা দিন এর ওর কাছে কেটে যাবে বৈ কি!"

কিন্তু, সে কটা দিন কাটিয়া যাওয়া সত্ত্বেও ঘর আর খোলসা হইল না, মহাজনের সুদের অঙ্ক ভারি হইতে লাগিল। হরিবিলাস কায শিখিল, চাকুরী গ্রহণ করিল, কিন্তু না আসিল দেশে ফিরিয়া, না করিল ঘর দুইখানি উদ্ধারের কোন চেষ্টা! কেবল মাতৃত্বের ঋণ-শোধস্বরূপ মাসে মাসে সাবিত্রীকে পাঁচটি করিয়া টাকা পাঠাইতে লাগিল।

তাহার পর কত কাল গিয়াছে, কুড়িগ্রামের দশা আরও জীর্ণ হইয়াছে, সেকালের আর সব কয়টি প্রাণ-শিখা একে একে মৃত্যুর নিশ্বাসে নিভিয়া গিয়াছে, সুদ ও আসলের দায়ে মহাজন সেই ঘর দুইখানি ও তৎসংলগ্ন জমীটুকু ডিক্রীর জোরে আদায় করিয়া লইয়াছে; কিন্তু হরিবিলাস আজও গ্রামে ফিরে নাই। কত বৃদ্ধার ছেলে কলিকাতায় যায় এবং ফিরিয়া আসে, সাবিত্রীর ছেলে শুধু ফেরে না। কলিকাতা হইতে আসিয়া কত লোক হরিবিলাসের নামে কত প্রকার কুৎসা প্রচার করে, সাবিত্রী সে সব বিশ্বাস করিতে চাহেন না, পারেন না। প্রত্যেক দিন ঘুম ভাঙ্গিয়া—মনে হয়, আজ সে নিশ্চয় আসিবে, কিন্তু মাসে একটিবার মণিঅর্ডার ও মধ্যে মধ্যে দুই এক ছত্রের চিঠি ছাড়া আর কিছুই আসে না।

এমনই করিয়া সাবিত্রী ঠাকুরাণীর তেইশটি বৎসর কাটিয়াছে।

সদাশয় চক্রবর্ত্তী সাবিত্রী ঠাকুরাণীর ঠিক পরের যুগের লোক এবং গ্রামের শীর্ষস্থানীয়। আট বৎসরের বালক হইতে আটচল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ় পর্য্যন্ত তাঁহার নাতি, তিনি তাহাদের ঠাকুর্দ্দা। গ্রামের কোন্ ছেলেটি স্কুল পলাইয়া মাঠে ঘুড়ি উড়াইয়া বেড়াইয়াছে, কোন্ বাটীর বিধবা বধূ ঘাটে যাইবার বেলা ঠিক আব্রু রাখিয়া চলিতে পারে নাই—এই সব খবর তাঁহার নখ-দর্পণে। পল্লীগ্রামের বারোয়ারী তলায় এক এক জন মানুষ কোমরে চাদর বাঁধিয়া যেমন নিরর্থক হাঁকডাক করিয়া বেড়ায়, কেহ তাহার কথা কাণ দিক বা না দিক,—চক্রবর্ত্তী মহাশয় গ্রামের শুচিরক্ষার জন্য সর্ব্বদাই সেইভাবে ব্যস্ত হইয়া থাকিতেন।

কি একটা প্রয়োজনে সে দিন তাঁহাকে কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল। সপ্তাহখানেক পরে গোটা চারেক ফুলকপি, একটা নূতন হুঁকা এবং কালীঘাটের একখানা পট সঙ্গে করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াই চক্রবর্ত্তী প্রচার করিয়া দিলেন, সাবিত্রীর ছেলের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল। সাবিত্রী ছুটিয়া গেলেন।

"কি বললে, বাবা?"

"বলবে আর কি? শ্যালদার মোড়ে ট্যাক্সিতে দে[illegible]। ভাবভঙ্গী দেখে বোঝা গেল,—মদ টেনেছে পিপেখানে[illegible], চোখ দুটো করমচার মত রাঙ্গা। বললুম, বুড়ীর দি[illegible]

শেষ হয়ে এলো, একবার দেখাশুনা করতে যাওয়া ত উচিত। বয়েসও ত নেহাৎ মন্দ হ'ল না, বে'থা' একটা—বংশরক্ষের জন্যে—' তা সে কথা শোনে কে! হাত-মুখ ঊচিয়ে এই মারে ত' এই মারে! বললে কি না,—'এ কাযে ছুটা-ছাটা নেই, আর—দেশে গিয়ে ম্যালেরিয়ার বোঝা সঙ্গে ক'রে আনবার ইচ্ছেও তেমন নেই!' এর পর কি বলবো বল! মদের গন্ধে গা বমি বমি করতে লাগলো, নাকে গামছা দিয়ে পালিয়ে বাঁচলাম!"

সাবিত্রী কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন, "ও সব রাগের কথা, বুঝলে না বাবা, সত্যি কি আর দেশমুখো হবে না?"

চক্রবর্ত্তী এ কথায় উল্লসিত হইলেন না, উষ্মা প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "তোমাদের মা-বেটার ব্যাপার, তোমরা বোঝ। আমি খবর দিয়েই খালাস।"

দিন চারেক পরেই সাবিত্রী জ্বরে পড়িয়া গেলেন। শেষ বয়সের ব্যারাম—কখন্ কি হয়, বলা যায় না। চক্রবর্ত্তী হরিবিলাসকে টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন। তেইশ বৎসর পরে হরিবিলাস আবার গ্রামে পা দিল এবং মায়ের শিয়রে গিয়া বসিল। বুড়ীর চোখ দিয়া নিঃশব্দে বহুক্ষণ ধরিয়া জল ঝরিল, তার পর নিজের ক্ষীণ মুঠির মধ্যে ছেলের একখানি হাত টানিয়া লইয়া বলিলেন, "আমি জানতাম, না এসে থাকতে পারবি না। কত লোক কত কথা ব'লে গেছে, আমি তার একটা কথাও বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এ গাঁয়ে যে ভিটেটুকুও আর নেই, কোথায় দাঁড়াবি, বাবা?"

হরিবিলাসের মনের অবস্থা ঐ কথায় কি আকার ধারণ করিল, ঠিক জানি না,—মাথা হেঁট করিয়া অপরাধীর মত সে বসিয়া রহিল।

সাবিত্রীর অসুখ সারিল, হরিবিলাসও কলিকাতার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কহিল, "হঠাৎ চ'লে আসতে হ'ল—বেশী ছুটী নেওয়া হয়নি। কালই ফিরতে হবে। গোটা দশেক টাকা বেশী রাখো,—কিছু ফল-টল, ওষুধ-পত্তর—"

সাবিত্রীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট! আনন্দে চক্ষু বহিয়া তাঁহার জল নামিল; কহিলেন, "এমন ক'রে আর কত দিন কাটবে, বাবা?"

হরিবিলাস কহিল, "কেমন ক'রে?"

সাবিত্রী কহিলেন, "চাল নেই চুলো নেই,—এমন ক'রে মানুষ ক'দিন থাকে? তুই মত দিয়ে যা, আমি বন্দোবস্ত করি।"

হরিবিলাস কিছুই বলিল না। সাবিত্রী বুঝিলেন, মৌনই সম্মতির লক্ষণ।

নির্দ্দিষ্ট দিনে হরিবিলাস কলিকাতায় ফিরিয়া গেল।

তার পর হইতে সাবিত্রীর উৎসাহ সহসা অফুরন্ত হইয়া উঠিল। পাড়ার ঘরে ঘরে বলিয়া আসিলেন, "তাই ত' বলি বাছা, মানুষে কি তা' পারে? সাদা কথাটা তোমরা এত দিন বোঝ নি, ব'সে ব'সে টাকা জমাচ্ছিল। বাস্তু-ভিটের মায়া কি সহজে ভোলা যায়! পষ্টই ত' বললে, ভিটে-টুকু যা'তে মহাজনের নিকট আবার কিনে নিতে পারি, তারি জন্যে এত দিন সঞ্চয় করছিলুম! সেটুকু উদ্ধার না ক'রে বিয়ে করি কোন্ লজ্জায়?"

ঘোষেদের মেজবৌ জিজ্ঞাসা করিল, "তা' হ'লে টাকা-কড়ি কিছু করেছে বলো?"

সাবিত্রী অকৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত উত্তর দিলেন, "শোন কথা! এত কাল চাকরী করলে, টাকা করেনি আবার! —ঘরটি উদ্ধার ক'রে নিয়েই বিয়ে করবে ব'লে গেছে।"

অতঃপর সাবিত্রী মেয়ে দেখিবার জন্য আশ-পাশে পাঁচটি গ্রাম ঘাঁটিয়া ফেলিলেন,—বিশ্রামের অবসর রহিল না। মাথায় গামছা, হাতে লাঠি—সাবিত্রী ধীরে ধীরে মাঠের পথ ধরিয়া পুত্রবধূর খোঁজে বাহির হইতেন। পথে যাহার সহিত দেখা হইত, তাহাকে সু-খবরের সম্ভাবনাটুকু জানাইয়া দিতেন। অবশেষে নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে কোন একটি মেয়েকে পছন্দও হইয়া গেল। বয়স পনরো ষোল,—পল্লী-গ্রামে সে বয়সের মেয়ে সাধারণতঃ অবিবাহিত থাকে না, কিন্তু হরির বয়সও ত অল্প নহে! তাহা ছাড়া মেয়েটির চোখ দুইটি ভারি চমৎকার, দরিদ্র-সংসারে মানুষ, তেজ-অহঙ্কার কিছুই নাই! আহা, এই বেশ!

সাবিত্রী কলিকাতার বাসায় হরিবিলাসকে চিঠি দিলেন, লিখিল অবশ্য ঘোষেদের মেজবৌ। তার পর সাবিত্রী অধীর ঔৎসুক্যের সহিত দিন কাটাইতে লাগিলেন;

প্রতিদিন প্রভাতে গঙ্গাস্নানের ছল করিয়া ষ্টেশনে গিয়া পুত্রের প্রতীক্ষা করিতেন; কেহ আসিত না।

এক মাস কাটিয়া গেল।

সাবিত্রী ঠাকুরাণী আবার অসুখে পড়িলেন;—কলিকাতায় আবার টেলিগ্রাম গেল, কেহ আসিল না। সবাই আশা করিয়াছিল, এ যাত্রায় সাবিত্রীর রক্ষা নাই, কিন্তু এক মাস পরে সাবিত্রী সারিয়া উঠিলেন বটে; কিন্তু লোক বলিল, বুড়ী হঠাৎ পাগল হইয়া গিয়াছে।

সদাশয় চক্রবর্ত্তী হাট হইতে ফিরিতেছিলেন,হাতে হুঁকা। সাবিত্রী ছুটিয়া গিয়া চক্রবর্ত্তীর হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, "আচ্ছা, তুমিই বলো চক্কোত্তি, তুমি ত সব জানো,—এই কি ধর্ম্ম?".

চক্রবর্ত্তী বিস্মিত হইলেন যথেষ্ট। কহিলেন, "কেন, অধর্ম্মটা দেখলে কোথায়?"

সাবিত্রী বলিলেন, "তুমি ত আর আজকের নও, বাবা —আমার বেটার চেয়ে দশ বছরের বড়, তুমিই বলো, আমার সাত পুরুষের ভিটে আমি বিক্রী করেছি?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "না, ঠিক বিক্রী করোনি, বন্ধক রেখেছিলে, তার পর মহাজন সুদে-আসলে ডিক্রী ক'রে নিয়েছে।"

সাবিত্রী ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! বলি, হ্যাঁ গা চক্কোত্তি, চন্দর-সূয্যি কি উঠছে না,— এমন কথা তুমি বল্‌লে কেমন ক'রে? বলি, এটা মহারাণীর রাজত্ব, তা ত জানো,—এমন অধর্ম্ম সইবে না!"

চক্রবর্ত্তী হাত ছাড়াইয়া, রাগতঃ ভাবে বলিলেন, "যাও, যাও, পথের মাঝখানে পাগলামী করতে হবে না। অসুখ থেকে উঠে তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।"

সাবিত্রী সে কথায় কাণ দিলেন না; বলিতে লাগিলেন, "আমি দশরথ গাঙ্গুলীর মেয়ে, বাবার পায়ের ধুলো পেলে সাতটা গাঁয়ের লোক উদ্ধার হয়ে যেত? সেই গাঙ্গুলীর বেটী আমি কি না আজ—তুমিই বলো চক্কোত্তি, উদ্ধারণ চাটুয্যে অনেক ভিটে-বাড়ী মিথ্যে দেনার দায়ে 'নিজ' ক'রে নেয়নি?"

চক্রবর্ত্তীর বিস্ময়ের অবধি রহিল না, বলিলেন, "সে আবার কি! চাটুয্যেদের পয়সার কি অভাব যে তা'রা—"

সাবিত্রী বলিলেন, "অভাব নয় বাছা, স্বভাব। সেই যে কথায় বলে—'যার ছেলে যত খায়' এ যে তাই! মিথ্যে করেই যদি না নেবে, তবে নিলে কেমন ক'রে? বলি, আমিও মরিনি, তুমিও বেঁচে,—পথ-ঘাটে চলতে ফিরতে দেখা ত' হ'বেই, সত্যি কথাটা বললেই বা?"

চক্রবর্ত্তী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমার এখনও ভীমরতি ধরেনি, ঠাকরুণ, ধর্ম্মাধর্ম্মের ভয়ও আছে। তোমার সঙ্গে পাগলামী করবার ফুরসুৎ নেই,—পথ ছাড়ো, বাড়ী যাই।"

সাবিত্রী পথ ছাড়িয়া দিলেন এবং দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পিতৃপিতামহের নাম স্মরণ করিয়া এই ধর্ম্ম-হীন কলিকালকে অভিশাপ দিতে লাগিলেন।

কথাটা এক ঘণ্টার মধ্যে গ্রামের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত অবধি প্রচারিত হইয়া গেল। সাবিত্রী বলিতেছেন, উদ্ধারণ চাটুয্যে মিথ্যা দেনার দায়ে তাঁহার পৈতৃক ভিটাটুকু কিনিয়া লইয়াছে।

কথাটা কেহই প্রত্যাশা করে নাই; কারণ, সবাই জানিত, সাবিত্রী সেটা বন্ধক রাখিয়াছিলেন, তার পর যথা রীতি নীলামে উহা বিক্রীত হইয়া যায়। সবাই আশ্চয্য হইয়া গেল।

ঘোষেদের মেজবৌ বলিল, "তা' এত কাল ও কথা ত' বলতে শুনিনি, আজই বা হঠাৎ—"

বামুনটোলার মাতঙ্গী বলিলেন, "শক্ত ব্যারামে পড়লে অমন কত হয় গো,—দেখে দেখে চক্ষু প'চে গেল। এ ত' সেই,—আমার নাটুগোপাল যখন কোলে,—সেইবা[illegible] আমার মেজ ভাশুরঝির দেওরের শালা 'টাইফাট' থেকে উঠে লোটা-কম্বল নিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেল।"

আরও কত লোক কত রকমের অনুমানের দ্বারা নিজ নিজ বিজ্ঞতা প্রতিপন্ন করিল। কেহ বা আইনের তর্ক তুলি[illegible] বলিল, "বললেই ত ভিটেবাড়ী পাওয়া যায় না, আদাল[illegible] তার প্রমাণ আছে।" এবং আরও কত কি! কি[illegible] সাবিত্রীর অন্তরের দিকে চাহিয়া দেখিবার প্রয়োজন কে[illegible] বোধ করিল না!

উদ্ধারণ চাটুয্যে পুত্র-পরিবার লইয়া কলিকাতায় থা[illegible]তেন। দেশের কায-কর্ম্ম দেখা-শুনা করিবার জন্য না[illegible]

নিযুক্ত ছিল। সাবিত্রী যে সময় হঠাৎ আবিষ্কার করিলেন, উদ্ধারণ ফাঁকি দিয়া তাঁহার পিতৃ-পিতামহের ভিটাটুকু কাড়িয়া লইয়াছেন, তাহার মাস কয়েক পরে সংবাদ আসিল, হৃদ্‌রোগে উদ্ধারণ চট্টোপাধ্যায় হঠাৎ ৺গঙ্গালাভ করিয়াছেন।

সদাশয় বলিলেন, "এ যদি ঐ সাবিত্রী ঠাকরুণের শাপে না হয়ে থাকে ত' কি বলেছি! আহা, লোকের মত লোক ছিলেন এই চাটুয্যে" ইত্যাদি।

কুড়িগ্রামের অধিকাংশ নর-নারীই চক্রবর্ত্তীর এই উক্তি অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। সাবিত্রী মৌন রহিলেন।

দিন কয়েক পরে সংবাদ পাওয়া গেল, বিধবা চট্টোপাধ্যায়ের গৃহিণী এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র বিমল কুড়িগ্রামে আসিতেছেন—উদ্ধারণের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য। 'লুচি'র সম্ভাবনায় ছেলে-বুড়া সেই দিন হইতে চঞ্চল হইয়া উঠিল, স্বর্গীয় ব্যক্তিটির জন্য কে কি ভাবে বিধবার নিকট শোক প্রকাশ করিবে, তাহার জন্য মনে মনে মহলা চলিতে লাগিল; চাটুয্যেদের পৈতৃক বাড়ীতে বহুদিন পরে 'কলি' ফিরানো হইল,—একটিমাত্র লোকের মৃত্যুতে এত দিন পরে কুড়িগ্রাম সহসা শোকে অধীর হইয়া উঠিল।

তার পর এক দিন সন্ধ্যাবেলা পাল্কী চড়িয়া তাঁহারা গ্রামে প্রবেশ করিলেন। যাহারা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবিতকালে দুই বেলা গালাগালি না দিয়া শান্তি বোধ করিতেন না, তাঁহারাও মহাজন-গৃহিণীর প্রত্যুদ্‌গমনে বাহির হইলেন এবং একযোগে কান্না জুড়িয়া দিলেন। সাবিত্রী দূরে দাড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিলেন। এমনই কত বিধবার ক্রন্দনে এই গ্রামের পথ কতবার চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে,—নিজেও এক দিন হয় ত চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণীর মত কাঁদিয়াছিলেন, সন্ধ্যার নিরানন্দ অন্ধকারে আজ সেই কথাই তাঁহার মনে পড়িল কি না, কে জানে!

দিন দুই পরে।

বিমল বাহিরের ঘরে বসিয়া ব্যবসা-বিষয়ের কি একটা সংবাদপত্র পড়িতেছে। রাত্রি প্রায় ৯টা!

"বিমল বাবাজী কোথায়?"

বিমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এই যে, ভিতরে আসুন, চক্রবর্ত্তী কাকা।"

চক্রবর্ত্তী ভিতরে আসিয়া চৌকীর উপর বসিয়া পড়িলেন; "হ্যাঁ, সকলকে ব'লে এলুম ছেলে-বুড়ো সব। ছোট লোক বেটারা আজ থেকেই উপোস দিতে সুরু করবে, বুঝলে না বাবাজী! বলে, ফলার পেলে 'নাল' গড়ায়,—এ ত লুচি, তাও ঘিয়ে ভাজা!" নিজের রসিকতায় নিজেই এক চোট হাসিয়া লইয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন,—"নেমন্তন্ন কাযটিকে তুচ্ছ মনে করো না, বিমল। এত বড় কঠিন কায আর নেই। এই দেখ না, সাবিত্রী ঠাকরুণ—তোমার বাবা যার মেটে ঘর দু'খানা কিনে নিলেন, তাকে নিয়েই এক ফ্যাসাদ! বুড়ীর তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে,—বললে কি না—আমাদের রামাবতার চাটুয্যে ম'শায়—না, না, সে কথা মুখে আনাও পাপ।"

পাপ হইলেও ক্রমে ক্রমে চক্রবর্ত্তী সব কথাই বিমলের নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন।

"এখন বল ত' বাবা—তুমি ত' কালেজে পড়েছো,—জানবন্ত, তুমিই বলো, সাবিত্রীকে কখনও এ কাযে বলা চলে?"

বিমল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কেন চলে না, খুড়ো মশাই? ঐ কথার জন্যে তিনি কি 'পতিত' হলেন?"

"আহা, তা নয়। ছেলেমানুষ তুমি—বুঝবে না। বলি, কর্ত্তার অপমান কি তা'তে কম হয়েছিল, বাবাজী?"

"ঠিক জানি না, কিন্তু তাঁকে আসতে বলা চাই।"

চক্রবর্ত্তীর টিকি দুলিয়া উঠিল। দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "তা হ'লে তুমি ঘর দু'খানা ওকে ফিরিয়েও দিতে পারো?"

বিমল কহিল, "পারি। তাতে দোষ কি?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "দোষ কি? কলিকাল, কলিকাল! তা' হ'লে লোকে বলবে—স্বর্গীয় কর্ত্তা মশায় ওটা সত্যি সত্যি ঠকিয়ে কিনেছিলেন, সেটা ভেবেছো?"

বিমল চুপ করিয়া রহিল। এতটা সে ভাবে নাই। বস্তুতঃ, কথাটা সে তর্কের খাতিরেই বলিয়াছিল। শান্ত হইয়া কহিল, "সত্যিই সেটা তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় কি না,—সে বিচার মা করবেন। তিনি এখনও বেঁচে। কিন্তু আসা তাঁর চাই-ই। এ বিষয়ে মায়ের কোন অমত হবে না,—আমি জানি।"

শ্রাদ্ধ-শান্তি যথোচিত ঘটার সঙ্গেই শেষ হইয়া গেল। পিলে-জোড়া পেট লইয়া বাল-বৃদ্ধ নর-নারী আকণ্ঠ আহার করিল এবং দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল। সাবিত্রী আসেন নাই; শোনা গেল, তিনি পুনর্ব্বার শয্যাশায়ী হইয়াছেন। বার বার রোগের সেবা করিয়া পাড়া-প্রতিবেশী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কেহ আশ্রয় দিতে রাজী হয় নাই—কোন তাঁতির ঘরে সাবিত্রী আশ্রয় লইয়াছেন। বিমলের মা অরুন্ধতী সে কথা শুনিলেন, বেদনায় মুখ তাঁহার ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল।

রাত্রি ৯টা।

দীপালোকের সম্মুখে বসিয়া অরুন্ধতী ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। বিমল শ্রাদ্ধের হিসাবপত্র দেখিতেছে। খড়মের শব্দে উভয়কে চকিত করিয়া চক্রবর্ত্তী প্রবেশ করিলেন। তিনি ক্রিয়া-কর্ম্মের এক চোট প্রশংসা করিয়া লইয়া বলিলেন, "সাবিত্রী ঠাকরুণ ত' যেতে বসেছে, বৌ-ঠাকরুণ কি সে কথা শুনেছো?"

অরুন্ধতী সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "শুনেছি।"

ললাটে করাঘাত করিয়া চক্রবর্ত্তী বলিতে লাগিলেন, "শাস্ত্রে বলেছে, কলিকালে ব্রাহ্মণের অসম্মান হবে। সাবিত্রী ঠাকরুণকে দেখে তাই মনে হ'ল। কুলীনের মেয়ে, পায়ের ধুলো পেলে পাপী ত'রে যায়, তুই গিয়ে কি না আশ্রয় নিলি এক তাঁতি বাড়ী? কি বলব বৌ-ঠাকরুণ, নিতান্ত মৃত্যু-শয্যেয় পড়েছে, নইলে,-- "

অরুন্ধতীর মুখের ভাবটা হঠাৎ সে কথায় এমনই আশ্চর্য্যভাবে অন্ধকার হইয়া গেল যে, চক্রবর্ত্তী কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না। অরুন্ধতী কিছুই বলিলেন না দেখিয়া চক্রবর্ত্তী পুনর্ব্বার সুরু করিলেন,—

"অথচ বুঝলে বৌ-ঠাকরুণ, দেমাকে সে দিনও পা পড়তো না। বামুনের মেয়ে ব'লে গর্ব্ব কত! গিয়ে দেখলুম কি জানো? র'কের ধারে একটুখানি ছেঁড়া কাঁথার ওপর প'ড়ে আছেন, তাঁতি মাগী মুখে জল ঢেলে দিচ্ছে। ওষুধ-পত্তর চুলোয় থাক, এক ফোঁটা দুধও পেটে পড়ে নি। আরে, এ যে হ'তেই হবে। সে দিন পথের ধারে আমায় বললে কি না—সে মিথ্যে কথার ফল ফলবে না? চাটুয্যে মশাই,—সে শাপভ্রষ্ট ইন্দ্রদেব, তিনি কি না—আচ্ছা, তুমিই বলো, বৌ-ঠাকরুণ?"

বৌ ঠাকুরাণী বলিলেন, "সে সব কথায় কায কি, ঠাকুরপো?"

"কায নেই! তুমি বলছ কি, বৌ-ঠাকরুণ? উদ্ধারণদার নামে মিথ্যে অপবাদ?"

অরুন্ধতী বলিলেন, "যদি বলি, মিথ্যে না হয়?"

তাঁহার মুখভাবে উত্তেজনা ছিল না, কণ্ঠস্বর শান্ত।

চক্রবর্ত্তীর হঠাৎ বিশ্বাস হইল না যে, কথাটা তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছেন। কিছুক্ষণ বিস্মিতের মত চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মিথ্যে নয়? এই অপবাদ?"

অরুন্ধতী বলিলেন, "অপবাদ মিথ্যে, কিন্তু—সাবিত্রীর কথা মিথ্যে নয়।"

কথাটা হেঁয়ালীর মত শুনাইল; চক্রবর্ত্তী তাহার মর্ম্ম ভেদ করিতে পারিলেন না। অরুন্ধতী স্বভাবগম্ভীর, স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু সে কথা তুমি বুঝবে না, ঠাকুরপো. সে চেষ্টাও করো না। রাত বড় কম হয় নি, এসো।"

অরুন্ধতী কথা কহিতেন কম। এই শান্ত সংযত রমণীর সম্মুখে সে জন্য কথা-কাটাকাটি করিবার সাহসও কাহারও হইত না। কি এক অনির্দ্দেশ্য, অপূর্ব্ব মহিমায় তাঁহার মূর্ত্তিখানি সকল সময় দেবতার মত কঠিন দেখাইত। আর যাহারই থাক, অরুন্ধতীর ঐ কথার উত্তরে বাদ-প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা চক্রবর্ত্তীর ছিল না।

সদাশয় চলিয়া গেলে বিমল বলিল, "চক্রবর্ত্তী কাকাকে তুমি যে কথা বললে, সে কি সত্যি সত্যি, মা?"

"কি কথা, বিমল?"

"বাবা কি সত্যিই কোন অন্যায় ক'রে—"

"সে কথা ত' আমি বলিনি, বিমল।"

"তবে?"

"সাবিত্রী ঠাকরুণের ভিটেটুকু আমায় ফিরিয়ে দি[illegible] হবে।"

"কেন শুনি? দলীল-পত্তর কি তবে জাল?"

"পাগল! সে কথা কে বললে?"

বিমল কিছুই বুঝিল না। বলিল, "সাবিত্রীর [illegible] আজ কোঠায় দাঁড়িয়েছে, আমাদের টাকাও বড় কম [illegible] হয় নি। সেটা যে কেন তুমি,—আজ ফিরিয়ে দিলে লো[illegible] কি ভাববে, সেটা ভেবেছো?"

"ভেবেছি। কিন্তু ভয় করব কা'কে, বিমল? যেটা [illegible]

আমি মনের মধ্যে সত্যি ব'লে জানি, এই চক্রবর্ত্তীর মত পাঁচটা লোকের কথায় তা' মিথ্যে হয়ে যাবে ?"

"তবু, দেবে—?"

"হ্যাঁ, বাবা।"

"কিন্তু, কেন ?"

অরুন্ধতী অল্পকাল নীরব থাকিয়া কি যেন ভাবিলেন; বলিলেন, "আমার বৌমার বয়েস যখন আমার মত হবে,—যখন তিনি ছেলের মা হবেন, তখন এ কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করিস।"

পরদিন বেলা ৯টা। অরুন্ধতী আহ্নিকে বসিয়াছিলেন। চক্রবর্ত্তী ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "শুন্‌ছো বৌ-ঠাকরুণ, 'হরি' এসেছে যে!"

অরুন্ধতী বলিলেন, "এয়েছে ? কবে ?"

"এই আজ সকালে। যাক্, বুড়ী তবু—জল-গণ্ডূষটা ছেলের হাতের পাবে। কিন্তু, ধন্য বুড়ীর প্রাণ! কা'ল রাত থেকে টান উঠেছে, এখনও তাজা! এখনও যাকে দেখছে, তারই হাত ধ'রে বলছে,—'হেই বাবা, তোর ছটি পায়ে পড়ি, একবার ভিটেটুকুর সামনে নে' চ'। বাবা যেখানটিতে তুলসীগাছ পুতেছিলেন,—ঠিক সেইখানটিতে শুইয়ে দিস বাবা, আর কিছু নয়।' আর গুণধর ছেলে কি করছেন জানো ? মাথায় হাত দিয়ে হায় হায় করছেন! কিন্তু বৌ-ঠাকরুণ, কা'ল রাত্তিরে তুমি যে কথা বললে, আমি তার মানেই খুঁজে পাইনে! সত্যি,—"

অরুন্ধতী হাসিলেন। সে হাসি দ্বিতীয়ার চন্দ্রলেখার মত ক্ষীণ,—কিন্তু পরিপূর্ণ পূর্ণিমার আভাস দেয়।

বিমলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "সাবিত্রীর বাড়ী দখলের কাগজপত্তরগুলো বা'র ক'রে আনো, বিমল।"

"কি হবে সেগুলো ?"

চক্রবর্ত্তী এবং বিমল একসঙ্গে প্রশ্ন করিল।

অরুন্ধতী কহিলেন, "নিয়ে এস বলছি।"

কাগজপত্র আনা হইলে অরুন্ধতী বলিলেন, "চক্রবর্ত্তী ঠাকুরপো, তুমি একটা পাল্কী ডেকে আনো। আমি একবার তাঁতি-বাড়ী যাবো।"

"তাঁতিবাড়ী যাবে,—তুমি ? কি জন্যে ?"

চক্রবর্ত্তীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বিমল,—তুমি সরকার মশাইকে সাবিত্রী ঠাকরুণের ঘর ছু'খানি খুলে দিতে বল গে। আধ-ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে নিয়ে আমি ওখানে পৌছব।"

বিমল হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল—কথা বলিতে পারিল না।

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "তুমি কি পাগল হ'লে বৌ-ঠাকরুণ ? এই দিনের বেলা তুমি তাঁতি-বাড়ী যাবে সেই ছোট-লোকের বেটী—"

চক্রবর্ত্তীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে অরুন্ধতী কহিলেন, "তিনি ব্রাহ্মণের মেয়ে ঠাকুরপো, তাঁর মান রেখে কথা কইবার চেষ্টা ক'রো। তোমার তিনি এতটুকু ক্ষতি করেছেন ব'লে শুনি নি।"

চক্রবর্ত্তী কিছুকাল পাথরের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন, "কি জন্যে তুমি এ কায করতে চলেছো, তা' তুমিই জানো, বৌ ঠাকরুণ, কিন্তু এ ব্যাপারের পরও কেউ যদি বলে, উদ্ধারণ-দা মিথ্যে দেনার খতে সাবিত্রীর ভিটে ডিক্রী ক'রে নিয়েছিলেন, তবে কোন যুক্তিই কেউ শুনবে না। আমায় যেন তখন দোষী হ'তে না হয়।"

সদাশয় বিমর্ষমুখে পাল্কীর সন্ধানে বাহির হইয়া গেলেন।

তাহার পর কি হইল, সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রায় চব্বিশ বৎসর পরে পৈতৃক ভিটায় আসিয়া সাবিত্রী ঠাকুরাণী অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং হরিবিলাস বহুদিন পরে সেটি অধিকার করিয়া বসিল। এ দিকে চাটুয্যে-গৃহিণী কেন যে খামখা এত দিন পরে সেটা ফিরাইয়া দিয়া গেলেন, তাহা লইয়া পাড়ার ঘরে ঘরে বহু প্রকার কল্পনা চলিতে লাগিল।

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "ব্যাপারটা গোড়াগুড়ি বোঝা গিয়েছিল, উদ্ধারণ-দা ফাঁকি দিয়েই ওটা—বুঝলে কি না,—"

ঘোষেদের মেজ বৌ বলিল, "বুঝি গো, সবই বুঝি! বুড়ো বয়সে ধর্ম্ম-ভয় প্রেবল হওয়াতে দান ক'রে ছুই কুল রক্ষে করলে।"

ভাদুড়ী-গিন্নী বলিলেন, "পাপ কায কি আর চাপা থাকে মা, হাওয়ার আগে উড়ে আসে। কিন্তু চতুর লোক

ছিল উদ্ধারণ চাটুয্যে, কথাটা এত দিন কাউকে জানতেও দেয় নি!"

আরও কত লোক কত প্রকার বলিল।

শুনিয়া শুনিয়া বিমল অস্থির হইয়া উঠিল! সকলের মুখেই কেমন একটা চাপা হাসি, সবাই যেন ব্যঙ্গ চোখে চাহিয়া আছে।

অরুন্ধতীর সম্মুখে গিয়া বিমল বলিল, "আমি কা'লই কলকাতায় ফিরব, মা। এদের হাসি সহ্য করবার ক্ষমতা আমার নেই। আর কেনই বা যে ঐ লম্পট হতভাগাটার জন্যে তুমি ঘর দু'খানা ছেড়ে দিতে গেলে, তাও আজও বুঝলাম না। বাবা সাবিত্রীকে ঠকিয়েছিলেন ভেবে সবাই আমাদের কুৎসা করছে।"

অরুন্ধতী হাসিলেন,—সেই অদ্ভুত, রহস্যময় হাসি! কহিলেন,—"আমার একটিমাত্র ছেলে, পয়সারই বা অভাব কি! লোকে কুৎসা করছে, করলেই বা। আমার সান্ত্বনা এইটুকু যে, সাবিত্রীর অন্তরের কান্না আমি শুনতে পেয়েছিলুম, তিনি আমায় আশীর্ব্বাদই করবেন। আর যাকে তুই হতভাগা, লম্পট বললি, সে যে সাবিত্রী ঠাকরুণেরই ছেলে, বিমল! মা'র কাছে ত' তা'তে—তোমাতে তফাৎ নেই, বাবা! তাঁর বাস্তুভিটেয় হরি এক দিন বৌ-ছেলে নিয়ে ঘর বাঁধবে, এই ত তিনি চেয়েছিলেন, আর সেই জন্যেই ত' তাঁর মিথ্যে কথা বলা। আমি জানি, ঘর দু'খানা ছেড়ে দিয়ে আমি কোন অপরাধ করিনি, তোর বাবাও স্বর্গ থেকে এর জন্যে আমায় আশীর্ব্বাদ করবেন। আদালতের ডিক্রী আর কতকগুলো স্বার্থপর লোকের ধারণাই সব চেয়ে বড় সত্যি নয় বাবা, তোমার দেশ ছেড়ে পালাবার কোন দরকার নেই!"

শ্রীপাঁচগোপাল মুখোপাধ্যায়।

ভাঙ্গা বাগান

কালকে হ'তে মোর বাগানে ফুরিয়ে যাবে ফুল ফোটা!
সঙ্গে তারও সাঙ্গ হবে ভোমরা-বঁধুর চুম্ লোটা!
যূঁই ও বেলা নিত্য প্রাতে ঘোমটা ত আর খুলবে না,—
সূর্য্যমুখীর সবুজ শাখা আর ত হাওয়ায় দুলবে না।

১

ওই যেখানে বেড়ার ধারে কনকচাঁপার ঠিক পাশে
তরুণ রবির অরুণ আলো পাতার ফাঁকে রোজ হাসে;—
লাল দোপাটির রঙিন্ চারা হোথায় ত আর রইবে না;
নূতন ক'রে নিত্য কুঁড়ির প্রসব-ব্যথা সইবে না!

হয় ত কত প্রজাপতি আসবে হেথায় পথ ভুলে!
হয় ত বা জল উঠবে ভরি' চপল চোখের দুই কূলে!
ওদের বুকের গোপন ব্যথা হয় ত বা কেউ বুঝবে না!
হারিয়ে-যাওয়া স্মৃতির কথা কেউ ত ওদের পুছবে না।

৪

এই বাগানে আসত কত পাড়ার মেয়ে ফুল নিতে!
হয় ত শুধু খেলার তরে—নয় দেবতায় অর্চ্চিতে!
তা'দের আসা বন্ধ হ'ল—কা'ল ত তারা আসবে না!
যাবার বেলায় তেমনি ক'রে পিছন ফিরে হাসবে না!

এবার থেকে আমার ছুটী;—বন্ধ হ'ল রাত জাগা!—
সাধের বাগান ভাঙল আজি! ভাঙলো রে সব, সব ফাঁকা
হাস্নুহানার সবুজ দানা আর ত হোথায় ঝরবে না;—
বাউল বাতাস সৌরভে আর বাগান ত মোর ভরবে না!

শ্রীবিমল মিত্র।

সতীত্ব

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

আমরা ভ্রমের বশেই দুঃখ পাইলে তাহা দূর করিতে ব্যগ্র হই, কিন্তু ভুলিয়া যাই যে, দুঃখ পাই বলিয়াই, অথবা দুঃখ পাইবার ভয়েই, আমরা সোজা পথে চলি, নচেৎ বাঁকা পথে গতিই যে আমাদের স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণ একবার পাণ্ডবদের নিকটে কিছু কাল থাকিয়া মথুরায় আসিবার জন্য তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইতেছিলেন। সকলে যথাযোগ্য আদর, আপ্যায়িত করিবার পরে কুন্তী দেবী আসিয়া বলিলেন, "বাবা! তোমায় আর কি বলিব। তুমি আমার এই ব্যবস্থা কর, যাহাতে সর্ব্বদাই দুঃখের মধ্যে থাকিতে পারি—কেন না, দুঃখের মধ্যে পড়িলেই যে তোমায় স্মরণ করিতেই হইবে। দুঃখ না থাকিলেই যে তোমাকে ভুলিয়া যাই। শ্রীভাগবতের এই কথা যে কত বড় সত্য এবং মানবজীবনে কতখানি কার্য্যকর, তাহা সকলেই দুঃখ-বিপদে অনুভব করিয়াছেন। যিনি কখন ভগবানের কথা স্মরণ করেন না, তিনিও বিপদে পড়িয়া যখন "হালে পানি" না পান, তখন তাঁহার শরণাপন্ন হন। ইহা মর্কট-বৈরাগ্য বটে, কিন্তু বৈরাগ্য। জগতের যাহা কিছু বড়, সকলের মূলেই এই অনন্ত দুঃখ আছে। "Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts, our sincerest langhter with some fain is fraught" অর্থাৎ আমাদের সমধিক মিষ্ট গানগুলি সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখভাববাহী ভাবে পূর্ণ, প্রাণ-খোলা হাসির মধ্যেও দুঃখ অন্তর্নিহিত আছে। এই দুঃখ আছে বলিয়াই আমরা জীবনের যাহা কিছু অমূল্য, যাহা কিছু স্থায়ী, যাহা কিছু অপার্থিব, তাহা সঞ্চয় করিতে সমর্থ হই। সুতরাং শোক-দুঃখ আমাদের নিতান্ত আবশ্যক। সোনা যেমন না পুড়িলে খাঁটি হয় না, তেমনই দুঃখ শোক কষ্টের মধ্য দিয়া না আসিলে মানুষের মনের ময়লা-মাটী কাটে না; মনের প্রসার হয় না। পরদুঃখকাতরতা, প্রেম, সহ্যশক্তি, বৈরাগ্য, অহঙ্কারশূন্যতা, দাম্ভিকতাশূন্যতা,—এক কথায় মানুষকে অতিমানুষ করিবার দুঃখই একমাত্র শিক্ষার আগার। এ জন্যই বলা হয় যে,শাস্তি দুঃখ পাওয়া চাই-ই, নচেৎ মানুষ কোন রকমে কোন উচ্চ গতি লাভ করিবে না। কিন্তু দুঃখ যতই আমাদের অবশ্যম্ভাবী হউক না, যতই উপকারী হউক না, দুঃখ-তাড়নাই আমাদের কাম্য এবং ইচ্ছা, ইহারই জন্য বিধিনিষেধ অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে সাবধান করা।

ঠেকিয়া শিক্ষা করার মত উত্তম শিক্ষা আর নাই সত্য, কিন্তু Prevention is better than cure রোগ হইয়া আরোগ্য লাভ করার অপেক্ষা রোগ হইতে না দেওয়াই কি ভাল নহে? বেশী বলিয়া কি হইবে? তর্কের শেষ নাই। যুক্তির উভয় দিকই আছে। সংসারে যাহাই কেন মানুষ করুক না, শ্রীভগবানের নিয়ম অলঙ্ঘ্য। "A devil can cite scriptures for his purpose" সয়তানও তাহার কার্য্যকলাপ ধর্ম্ম ও নীতিসঙ্গত, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র-বচন উদ্ধার করিতে পারে। যুক্তি কিন্তু শাঁখের করাত। ইহা দুই দিকেই সমান খাটে। যে কোন বিষয়েই হউক না কেন, তাহা লোকলোচনে যত ভাল বা যত মন্দই হউক, তাহার স্বপক্ষে যুক্তি সংগ্রহ করা দুষ্কর নহে। সুতরাং এই যুক্তিবাদ-প্রধান যুগেও একমাত্র যুক্তিই যে সৎ, বা প্রকৃত পথ কি না, তাহা কি বিবেচ্য নহে? আবার যুক্তি-তর্ক করিবার স্পর্দ্ধাই বা আমাদের কেন? ক্ষমতাই বা কতটুকু আছে? আমাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধিই বা কতদূর যাইতে সমর্থ? যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়া আজ আমরা সরল বিশ্বাস হারাইয়াছি। আজকাল সরল বিশ্বাসকে নাম দেওয়া হয় "অন্ধ বিশ্বাস।" ইহা বিলাতী "Blind faith"এর অনুবাদ। * ইহা "সোনার পাথরবাটি"র মত কথা। বিশ্বাস কখন অন্ধ হইতে পারে কি? প্রকৃত বিশ্বাস যিনি করেন, তিনি বিশ্বাসকে অন্ধ বলিয়া কখন মানিতে পারেন না। আমি যদি ঠাকুর-দেবতা বিশ্বাস করি যথার্থভাবে, তবে অন্ততঃ আমার কাছে সেই বিশ্বাসই যুক্তি, অপর যুক্তির আবশ্যকতা নাই। ইহা আমার কাছে জীবন্ত সত্য। আজ আমরা এই বিশ্বাস হারাইয়া তাহার পরিবর্তে যুক্তিকে প্রাধান্য দিতেছি। ফলে জীবনের অনেক সন্তোষ, যাহা শত শত যুক্তি আমায় আনিয়া দিতে কিছুতেই পারিবে না, (কারণ উপরে দেওয়া হইয়াছে) তাহা জন্মের মত হারাইয়াছি। রোগ, শোক, বিপদ, ✝ ভয়, ভাবনা, ভুল-চুক, আপদ, হৃদয়হীনতা, অত্যাচার ত জীবনে লাগিয়াই আছে, দৃষ্টি, বুদ্ধি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, এ হেন প্রাত্যহিক জীবন-সংগ্রামে, বিশ্বাস—জীবন্ত সত্য বিশ্বাস—ভিন্ন কে আমায় দগ্ধহৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিবে? কে আমায় আশার

---

* Belief is primitive and natural, doubt acquired and artificial (J Sully, Outlines of Psychology) বিশ্বাস আদিম ও স্বাভাবিক, সন্দেহ শিক্ষার ফল ও অপ্রাকৃত।

✝ Belief and love, a believing love will relieve us of a vast load of care, O my brothers, God exists in the whole course of things goes to teach us faith we need only obey—P. W. Emerson on Spiritual Laws,

আলোক দিবে, কে আমার ক্ষয়-ক্ষতে প্রলেপ দিবে? তাই বলি, শুধু যুক্তিবাদ ধরিলে কি হইবে? মনুষ্যচিত্তজ্ঞ ব্যক্তিরা এ জন্যই যুক্তির সহিত একটু ভক্তি বা বিশ্বাস রাখিতে বলেন। এই জন্যই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মসমন্বয় শাস্ত্রে আছে। ইহাই সনাতন পথ।

সার অর্থার কিথ্ বলিয়াছেন যে, যদি আমরা শুধু যুক্তির দ্বারা চালিত হই, তবে বাঁচিতে পারি না। জগতে মৃত্যু অনিবার্য্য, সবই ক্ষণস্থায়ী, এ জন্য জীবন অসহ্য হইয়া উঠে এবং বোধ হয় Mailander (?)এর মত সকলেই আত্মহত্যা করিয়া জীবন অবসান করে। ইহারই জন্য আমরা যুক্তি বা জ্ঞান এবং সমকালে বিশ্বাস ভক্তিও সর্ব্ববিষয়ে রাখিতে বলি। শুধু যুক্তি দ্বারা চালিত হইয়া মানবজীবন সম্বন্ধে সোপেনহায়র বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, "আমরা সব চেয়ে বড় ভুল করি কখন্? না যখন মনে করি যে, আমরা এ জগতে সুখী হইতে আসিয়াছি। সত্য কথা এই যে, সুখ অপেক্ষা দুঃখই জীবনের গতি। মানুষের জন্মের একমাত্র দুঃখই শেষ মীমাংসা বলিয়া বোধ হয়। The greatest mistake we can make is to imagine that we are placed here to be happy. It will be nearer the truth to regard pain as the end of life, rather than happiness, the destiny of all human existence seems to be suffering (Die welt als wille and vorstellung vol. II. p. 725) Maeterlinckও এই কথাই বলেন। জীবনের দুঃখ অনেক, তাহা স্পষ্ট এবং অশেষ। অপর দিকে শান্তি দুষ্প্রাপ্য এবং ক্ষণস্থায়ী। The miseries of life are many, obvious and never failing, where as the consolations are rare, hard to seek and precarious (Le Temple Enseveli.)

যদি ইহাই মানুষের জীবন হয়, তবে ইহার মধ্যে দুই দিনের প্রণয়, চারি দিনের ভালবাসা, পাঁচ দিনের জোর-জবরদস্তি, তিন দিনের মারামারিকে তুচ্ছ করাই কি সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ, সার্থক এবং কল্যাণকর নহে? এই ক্ষণস্থায়ী, দুঃখবহুল জীবনে এই সার্থকতা আহরণই যথার্থ কাম্য হওয়া কি উচিত নহে? এবং এই সার্থকতার অনুকূল দেবভাবই কি প্রশ্রয় পাইবার উপযুক্ত নহে? ইতর ভাবগুলিকে আমাদের যথাস্থানে রাখিয়া, যাহাতে তাহারা অন্য বৃত্তিগুলির উপরে স্থান না পায়, এইরূপে সমুন্নত বৃত্তিগুলির উৎকর্ষসাধনই কি জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া সঙ্গত নহে? যদি ইহাই ঠিক হয়, তবে সতীত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখাই চাই, ইহা ভিন্ন জগৎচক্র ঠিক ঠিক চলিতে পারে না। যাহা ইহার অনুকূল, তাহারই সম্বর্দ্ধনা করিয়া অপর পক্ষকে যথাস্থানে রাখা চাই। সর্ব্বোপরি চাই ঈশ্বরবিশ্বাস। ঈশ্বর-জ্ঞান, ভক্তি, ত্যাগ, তপস্যা অর্থাৎ এক কথায় সনাতন ঋষিদের পথ পুনরনুসরণ—ইহা না হইলে অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে না জানিলে "ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽনায়," তোমাকে জানাই [এই জগতের নানারূপ] মৃত্যু অতিক্রম করা, ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই, ইহাই শ্রুতির কথা।

ইহার বিপক্ষে আচরণ করিবার এবং তৎপক্ষে যুক্তি অবতারণা করিবার ভার লইয়াছেন জগতের অনেক শীর্ষস্থানীয় লোক। সূর্য্যের বিপক্ষে জোনাকির আলো যেরূপ হাস্যকর, সেইরূপ উক্ত ধুরন্ধরদের বিপক্ষে আমাদের কথা বলার ধৃষ্টতা। সাহিত্যিক, কবি, মনস্তত্ত্ববিদ্, চিকিৎসক ইঁহারা আজ সকলেই বলেন যে, নীতিশিক্ষা দেওয়া তাঁহাদের কায নহে, ইহা নীতিবাদী, শাস্ত্রকার, শিক্ষক, মাতা, পিতা প্রভৃতির কর্ত্তব্য। ব্যবসা হিসাবে তাঁহারা নীতিশিক্ষা দিতে বাধ্য না হইতে পারেন, কিন্তু মানুষ হিসাবে, কর্ত্তব্য হিসাবে কি নীতিশিক্ষাদান সকলেরই কর্ত্তব্য নহে? সতীত্ব কি তাঁহাদিগকেও রক্ষা করিতেছে না?

আর কত বলা যাইবে? বলিলেই বা আমাদের মত সামান্য লোকের কথা এত মহারথদের ছাড়িয়া কে গ্রাহ্য করিবে? আমরা যখন মরিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইব, তখনও এই নবীনের ভাব সজীব থাকিবে বলিয়াই বোধ হয়। অথচ যদি যথার্থ কৃতবিদ্য কেহ এই সব ভাব বিচার করিয়া জগতের সম্মুখে ধরেন, একটা কায হইতে পারে। ব্যভিচার-স্রোত বন্ধ হইতে পারে।

যাহার জোরে আজও হিন্দু, হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেছে, যে সতীত্ব অক্ষত রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া এতবার বিজিত হইয়াও আজও হিন্দু জাতি অন্য জাতির ন্যায় কালগর্ভে বিলীন হয় নাই, ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত শত সহস্র বৎসর সহ্য করিয়াও যে হিন্দুর ঘরে আজও সতীত্ব-আলোক জ্বলিতেছে, যে সতীত্বতেজে হিন্দুরমণী হাসিমুখে প্রাণ পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিতে বিমুখ হন নাই, যে সতীত্ব হিন্দুরমণীকে সহমরণে প্রবৃত্তি দিত— স্বামী ছাড়িয়া জীবনধারণ অসম্ভব বলিয়া যে সহমরণের কথা দুই একটা শুনিয়া আজও শরীরে রোমাঞ্চ হয়, মন-প্রাণ স্বতঃ প্রণত হইয়া পড়ে, কোথায় আজ সে সতীত্বের মহিমা? সে তেজ, সে গৌরব, সে পবিত্রতা, সে বিশ্বব্যাপী স্বার্থত্যাগ, সে সেবা, সে মাতৃত্ব, সে ধৈর্য্য? আবার কি তুমি ফিরিয়া আসিবে না? আবার কি এই জরাজীর্ণ দেশে নিজের তেজোদৃপ্ত মাতৃমুখ দেখাইয়া, এই নিজ্জিত জাতির শীতল শোণিতে প্রাণ-সঞ্চার করিবে না?

এখনও আশা আছে, এখনও পুরুষের মত হিন্দুনারী তোমরা ব্যভিচারদুষ্ট হও নাই, এখনও স্বার্থ, বিলাসিতা, ঈশ্বর-অবিশ্বাস তোমাদের সকলকে গ্রাস করে নাই, তাই এই আবাহন। তুমি আবার ফিরিয়া এস! আসিয়া দেখাও যে, তুমি [illegible] সনাতন, তুমি মরিতে পার না, অন্ততঃ এই পূত দেশে [illegible] অমর! তুমি আবার আসিয়া দেশে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়া এ হতভাগ্য দেশের সন্তানদের যথার্থ প্রেরণা দাও, তাহারই সার্থকতায় দেশ, জগৎ ভরিয়া যাউক। তাহাদের যথার্থ সৎসাহস দাও, ধর্ম্ম দাও, পবিত্রতা দাও, বৈরাগ্য, ত্যাগ, তপস্যা, সংযম দাও। সকলকে দেখাও যে, সেই সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, সতী, শৈব্যা প্রভৃতির রক্ত তোমাদের ধমনীতে [illegible] প্রবাহিত হইতেছে। এখনও তোমরা তাহাদেরই মত প্রাণ সব তুচ্ছ করিতে পার, জীবন তুচ্ছ করিতে পার, আবশ্যক হইলে যমরাজের হস্ত হইতেও মৃত স্বামীকে ছিনাইয়া আনিতে পার। এখনও যেন ভারতবাসী সতী মায়ের সন্তান বলিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। তোমরা শক্তিস্বরূপিণী, তোমরা মনে করিলে সবই পার, পুরুষ না পারিতে পারে, কিন্তু তোমরা [illegible] তুচ্ছ বাহ্যসম্পদের কুহকে ভুলিয়া এত বড় গৌরব, এত বড়

সার্থকতা, এত বড় প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইতে নিজেকে অযথা বঞ্চিত করিও না। পাশ্চাত্য সভ্যতার উন্মাদনায় "হাতক লছমী চরণপর ডারসি", হাতের লক্ষ্মী চরণে দলিও না। এস! আসিয়া আবার জগৎকে স্তম্ভিত কর। ভ্রমে পড়িয়া এক এক জন বল যে, তোমরা দেবী হইতে চাও না, দেবীর মর্য্যাদা ইচ্ছা কর না। কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি যে, দেবী না হইলে দানবনাশ কে করিবে? আজ দানব যে ঘরে ঘরে। নরের উদ্ধার কে করিবে? ত্রেতা বা সত্যযুগে যাহা স্বয়ং ভগবতী করিয়াছিলেন, এই কলিতে ঘরে ঘরে তোমাদেরই তাই কায। তাহারই জন্ম যে তোমরা আসিয়াছ। বৃথা ভুল বুঝিয়া নিজেকে খর্ব্ব করিও না। তুমি দেবী আছ, দেবীই থাকিবে। তাই বলা হয়—

"অবিনয়মপনয় বিষ্ণো দময় মনঃ শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণাম্।"

হে বিষ্ণো! আমাদের অবিনয় অপনোদন কর, মনকে দমন করিবার ক্ষমতা দাও এবং এই মৃগতৃষ্ণিকার মত বিষয়-সুখের শমতা কর। তাই বলিতে হয়—

"যেন দৃষ্টিবিশালা স্যাৎ স মন্ত্রো মম দীয়তাম্।"

যে মন্ত্রে আমার দৃষ্টির বিশালতা জন্মায়, আমায় তাহাই দাও।

শ্রী—

সমাপ্ত

শেষের রাত

ভাদ্র মাস;
দূর প্রবাস;
পরের দাস;
সঙ্গিহীন;
দ্বিপ্রহর;
স্তব্ধ ঘর;
শূন্য চর;
দীর্ঘ দিন!
গ্রন্থ নাই
কম্ম—ছাই;
ঘনায় মেঘ;
বন্ধ দ্বার;
বিরামহীন
বর্ষা-দিন;
অন্ধকার—
অন্ধকার!
রুগ্ন কায়;
নিদ্রা নাই;
দীর্ঘ রাত—
একলা তা'য়;
বারম্বার
মুষল-ধার
বৃষ্টি হয়,
নিঃসহায়!

দম্‌কা বায়—
চম্‌কে চাই;
কে দেয় ডাক
হয় তো সেই!
দ্বারের ফাঁক;
হাওয়ার হাঁক;
নয় গো নয়—
কৈ সে নেই
বাড়ছে ঝড়;
কড়াৎকড়—
বজ্রাঘাত—
দগ্ধ বন!
কোথায় যাই—
উপায় নাই;
লাগ্‌ছে ভয়,—
শূন্য মন!
হাওয়ার হাঁক্;
ব্যাঙের ডাক;
ঝিঁঝির শাঁখ
চিরছে বুক,
যায় যে রাত—
দাও গো হাত;
আর কখন?—
দীপ নিবুক।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।
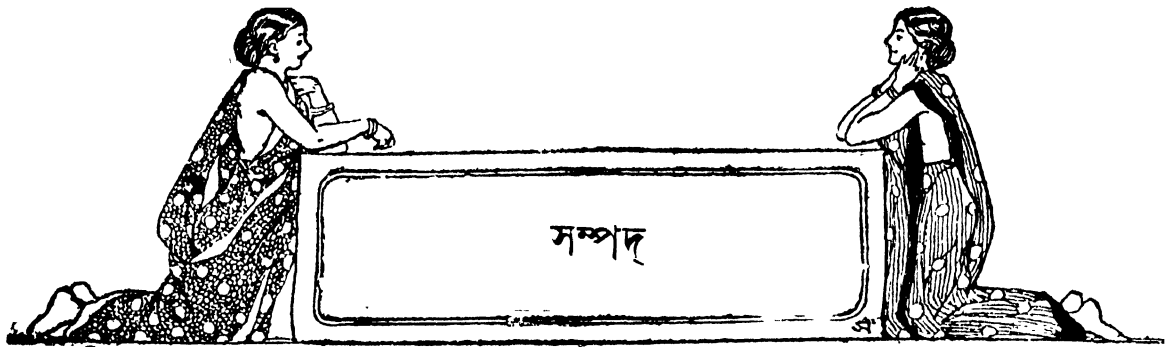
ক্যাশিয়ার সুরেশ বাবুর মোটর, প্রতিদিনকার মত বৈকাল পাঁচটায়, তাঁহার প্রাসাদদ্বারে আসিয়া থামিল। শঙ্খ-ধ্বনিতে ত্রস্ত দ্বারবান্ সেলাম ঠুকিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল ও ছোট সুটকেশটি গাড়ী হইতে নামাইয়া লইল।

সুরেশ বাবু শব্দ করিতে করিতে দ্বিতলে উঠিয়া গেলেন এবং ত্রিতলের সিঁড়িতে উঠিবার মুখে সহসা গতিবেগ হ্রাস করিয়া দিলেন।

সিঁড়ির উপরে ত্রিতলের প্রথম ঘরখানিতেই বাবুর মা শয়ন করেন। বারোমাস বাতের বেদনায় তিনি শয্যাশায়ী—দাসী-চাকর, পুত্র কন্যারা দিবারাত্র ঔষধ, মালিশের তৈল, আগুনের মালসা, ফ্লানেল, কদমপাতা প্রভৃতি লইয়া সর্ব্বক্ষণই তাঁহার শুশ্রূষা করিয়া থাকে। মাথার উপর বৈদ্যুতিক পাখাটা অনবরত চলিতে থাকে,—সেক-তাপ,—ডলাই-মলাইয়েরও অভাব নাই। তথাপি, তাঁহার যন্ত্রণা-কাতর মিহি সুরের মুহূর্ত্তমাত্র বিরাম নাই।

সন্তর্পণে কক্ষদ্বার পার হইয়া সুরেশ বাবু নিজের ঘরে আসিয়া দেখিলেন,—পত্নী বিশেষরকমের বেশভূষা করিয়া বড় আয়নাটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কোঁচান বেনারসী সাড়ীর উপর হীরার ব্রুচটা আঁটিতেছে। দেড় বছরের ছেলেটা মেঝেয় পড়িয়া—অনবরত চীৎকার করিতেছে,—সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।

শ্রান্ত সুরেশ বাবু একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—"ছেলেটা যে ককিয়ে গেল, একবার কোলে নাও—না হয়।"

পত্নী ঘাড় বাঁকাইয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিল, "আর পারি না বাপু,—ঘ্যানঘেনে ছেলে রাতদিনই কাণ ঝালা-পালা ক'রে দিলে। গোলাপী গেল কোথায়? গোলাপী—অ—গোলাপী—"

অন্য কক্ষ হইতে গোলাপী উত্তর দিল, "গিন্নীমা'র কোমরে সেক দিচ্ছি, মা—"

পত্নী বলিল,—"মরণ! ক্ষান্তর মা-ই বা গেল কোথায়—? খোকাকে একটু কোলে নিক না—!"

নিম্নতল হইতে ছোট বাবুর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, "সব হ'লো?—নাঃ,—এ দিকে ছ'টা বাজে, কখন্ যে কি হবে বুঝতে পারি না! ও মেজ বৌদি—"

সুরেশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাবে?" পত্নী তৎক্ষণে ব্রুচটা আঁটিয়া লইয়াছিল; মাথায় খানিকটা সেন্ট ঢালিতে ঢালিতে তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "আজ যে ক্রাউনে 'কপালকুণ্ডলা' দেখতে যাচ্ছি। বড়দি, ছোট্-ঠাকুরপো, ন'ঠাকুর জামাই, মিনি, সেজ ঠাকুরঝি—সবাই যাবে।—" বলিতে বলিতে চঞ্চলচরণে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

জামাজুতা খুলিয়া সুরেশ বাবু—জানালার ধারে পাতা ইজি-চেয়ারটায় শুইয়া পড়িয়া একটা চুরুট ধরাইলেন এবং মৃদু মৃদু টান দিতে দিতে ডাকিলেন, "ঠাকুর!" গরম চা এবং রেকাবীতে আটখানি ফুলকা লুচি,—গুটি দুই নূতন খেজুর-গুড়ের সন্দেশ ও খানিকটা আলুর দম লইয়া, ঠাকুর অবিলম্বে দর্শন দিল।

ছোট টিপয়টাতে খাবারের রেকাবী ও চায়ের পেয়ালা রাখিয়া বিষ্ণু ঠাকুর বলিল, "চা-টা একটু ঠাণ্ডা হয়ে গেল বাবু, আর এক কাপ আনবো কি?"

সুরেশ বাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "চা খেয়ে এসেছি-রেষ্টুরেণ্টে, পেয়ালাটা তুলে নিয়ে যাও। দেখি লুচি থালাটা—"

ঠাকুর থালাটা বাবুর হাতে তুলিয়া দিল। আলুর দম মুখে দিয়াই বাবু বলিয়া উঠিলেন, "থুঃ! থুঃ! এ কি করেছ ঠাকুর?—নুণে বিষ—!"

ঠাকুর মুখ কাঁচু-মাচু করিয়া জবাব দিল, "কি করি বাবু, মায়েরা যা তাড়া দিলেন,—শীগ্‌গির নামাতে বল্লেন! সব জল খেয়ে বেরুলেন কি না—!"

সুরেশ বাবু বিরক্তিভরে কহিলেন,—"আর কিছু আছে, হালুয়া-টালুয়া?"

ঠাকুর নতমুখে জানাইল, আর কিছুই নাই।

"নিয়ে যাও" বলিয়া সন্দেশ দুইটি মুখে পুরিয়া এক গ্রাস জল পান করিয়া আবার চেয়ারটায় দেহভার এলাইয়া দিলেন।

খোকার কান্না থামিয়াছে।

গোলাপী ঝি আসিয়া জানাইল, সেজ বাবু থিয়েটারে যাইবেন, মায়ের কাছে কেহ নাই,—একবার বসিতে হইবে!

সজোরে সিগারটায় একটা টান মারিয়া মহা বিরক্তিভরে সেটি জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিলেন এবং ফটাস ফটাস চটি-জুতার শব্দ করিতে করিতে সুরেশ মায়ের কক্ষদ্বারে আসিয়া সেজ বাবু রমেশকে রুক্ষস্বরে বলিলেন, "আজ আর না-ই বা গেলে থিয়েটারে, মায়ের এই অসুখ!"

রমেশও উচ্চকণ্ঠে জবাব দিল, "নাঃ, তা যাবে কেন? দিনরাত কেবল রুগীর কাছে ব'সে থাকবে! তুমি থাক না একটু।" বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

মায়ের বোধ করি একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। সুরেশের উচ্চকণ্ঠে ও রমেশের দ্রুত পদশব্দে চমকিয়া উঠিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "উঃ বাবা রে,—চেঁচাস কেন?" সুরেশ কণ্ঠস্বর নামাইয়া কহিল, "চেঁচাই সাধে! বাবুরা কেউ গেলেন থিয়েটারে, কেউ বায়স্কোপে, কেউ ফুটবল খেলা দেখতে; আর আমি শালা দশটা পাঁচটা অফিসে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে এসে, না খাওয়া, না বিশ্রাম—"

বাকী কথাটা মায়ের মুখপানে চাহিয়া আর শেষ করিতে পারিলেন না। সহসা অন্য প্রসঙ্গ পাড়িলেন, "আজ কেমন আছ, মা?"

মা ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিলেন, "থাকাথাকি আর কি, একই রকম! শশী কোবরেজকে আনাও, না হয় সায়েব ডাক্তার ডাকাও, অত পয়সার মায়া করলে হবে কেন? আমি বাঁচলে তবে ত পয়সা। খেয়ে-দেয়ে, খরচ-খরচা ক'রে যা থাকবে, দিয়ে যাব পাঁচ ভাইকে সমান ভাগ ক'রে।"

সুরেশ অভিমানভরে জবাব দিল, "তোমার টাকা চাই না মা,—ওদেরই দিয়ে যেয়ো।"

মা ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "সে কথা ত আগেই ব'লে রেখেছি, যে বেশী সেবা-যত্ন করবে—তার ভাগেই বেশী পড়বে। এতে রাগই কর—আর দুঃখই কর বাছা, আমি নাচার। উহু-হু—মাজাটা কন্‌-কন্‌ ক'রে খ'সে গেল গো—"

কক্ষে কেহই ছিল না। সুরেশ তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা গুণের পুঁটুলিটা সেখানে চাপিয়া ধরিতেই মা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "-- ওরে মা রে,—মেরে ফেল্লে রে, ও মণি —ওরে গোলাপী—ওরে—অ—"

দাসদাসীরা ছুটিয়া আসিল। কেহ পাখা, কেহ ফ্লানেল, কেহ পুঁটুলি লইয়া আপন'দের দীর্ঘ অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ ও পরস্পর পরস্পরের স্কন্ধে দোষারোপ করিতে করিতে গৃহিণীর শুশ্রূষায় মনোযোগ দিল।

সুরেশ ধীরে ধীরে উঠিয়া কক্ষের বাহির হইয়া গেল এবং আপন কক্ষে জানালার ধারে আসিয়া সেই ইজি-চেয়ারটায় আশ্রয় লইল।

গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ। রৌদ্র না থাকিলেও উত্তাপটা তখনও পর্য্যন্ত প্রখর ছিল, এবং সে প্রখরতা অনুভূত হইতেছিল শুধু গন্ধবহের উষ্ণশ্বাসে। আকাশের প্রান্তসীমায় এক দল বলাকা শুভ্র রেখার মত উড়িয়া যাইতেছিল। কৃষ্ণপক্ষে চাঁদ ছিল না, দুই একটি নক্ষত্র সবে মাত্র গগনের ধূসর যবনিকা-প্রান্তে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সারাদিনকার উত্তপ্ত পৃথিবী অবসন্ন শ্রান্ত নয়ন মেলিয়া শীতল নিশীথের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। দিবসের মরীচিকালুব্ধ তৃষ্ণার্ত্ত পৃথিবী, যেন নিশীথের সান্নিধ্যে আসিয়া তাহার প্রবল পিপাসার শান্তি করিতে চাহে। আলো তাহাকে ছলনা করিয়াছিল, অন্ধকার সে মায়াজাল ছিঁড়িয়া সত্যকে প্রকাশ করিবে,—তাহার আশঙ্কা মিটিবে।

সুরেশের ক্লান্ত নয়ন আকাশের প্রান্ত হইতে নামিয়া আসিয়া, বাতায়ন-নিম্নে এক ভগ্ন কুটীরের অঙ্গনে গিয়া পতিত হইল।

সেখানেও এক সংসার;—দরিদ্র নিরন্নের সংসার। জননী, ভগিনী, পুত্র, কন্যা সবই আছে। এই বিশাল গগনস্পর্শী অট্টালিকার পার্শ্বে জীর্ণ ভগ্নকুটীরে এক গৃহস্থ সংসার।

রৌদ্রের তীক্ষ্ণতা হয় ত ভগ্ন খোলার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া সেখানকার দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করে, বর্ষার বারি-ধারাও তাহার ফাঁকে ঝরিয়া পড়ে। হেমন্তের শিশিরকণা, শীতের কজ্জল, বসন্তের মলয়—সকলেরই অবাধ গতায়াত সেখানে। ঐ বাহুল্যবর্জ্জিত কুটীরকক্ষে কোন দিনই বিজলীর আলো জ্বলিয়া উঠে না, কোন দিনই উহার দ্বারান্ত-রাল দিয়া সুরের সঙ্গে যন্ত্রের শব্দ ভাসিয়া আসে না, কোন প্রভাত বা সন্ধ্যায় উহার অঙ্গনতলে উৎসবের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে না। তবু, কোলাহলময় অট্টালিকার ছায়ায় এই জীর্ণ কুটীরখানি কালের নখরাঘাত সহিয়া বাচিয়া আছে।

ইহা যে মানুষের লক্ষ্যপথে আসিবার যোগ্য, এ ধারণা এত দিন সুরেশের ছিল না। আজ সন্ধ্যার ম্লানান্ধকারে, স্নিগ্ধ স্বল্পালোকিত কুটীরখানি,—সংসারের বাহিরে কোন মায়া-রচনা বলিয়াই তাহার বোধ হইল। কোলাহলশূন্য সুচারু কর্ম্মপ্রণালী যেন সত্যকারের কোন সংসারীরই আরব্ধ।

লক্ষ্মী বসতি করেন এই অট্টালিকায় সৌধশ্রেণীতে, কিন্তু তাঁহার আসনখানি পাতা থাকে,—বুঝি ঐ গোময়লিপ্ত পরিচ্ছন্ন মনোরম অঙ্গনখানিতে। রমার খ্যাতি-বৈভব ঐ উচ্চে,—কিন্তু পূজা-উপচার বুঝি নবাঙ্কুর দূর্ব্বাদলে, ক্ষুদ্র আড়ম্বরহীন গন্ধপুষ্পে!

সন্ধ্যাসমাগমে তীব্র বিজলী-আলোর পাশে অদৃশ্যপ্রায় স্নিগ্ধ মাটীর প্রদীপটি জ্বলিয়াছে। দাওয়ার এক পাশে কর্ম্মব্যস্ত বধূ, কর্ম্মক্লান্ত পরিজনের সুখ-পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিতেছে। জ্বরগ্রস্ত, রোগজীর্ণ গৃহিণী দাওয়ায় পিঁড়ি ঠেসান দিয়া বসিয়া—তাহাকে কত মধুর উপদেশ দিতেছেন। ছেলে-মেয়েরা চারিপাশ ঘিরিয়া ঠাকুরমা'র গল্প শুনিতেছে। কেহ কেহ বা মায়ের সাহায্য করিতেছে।

গৃহকর্ত্তা গৃহে ফিরিল। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর,—শুষ্ক ম্লান মুখে অবসন্নপদে দাওয়ায় বিছান মাদুরটার উপর আসিয়া বসিল। ছোট ভাই হাত হইতে ছিন্ন ছাতাটি লইয়া ঘরের মধ্যে রাখিতে গেল, গাড়ু-গামছা লইয়া ছোট বোন্ দাওয়ার নিম্নে দাঁড়াইল। রুগ্না জননী তাড়াতাড়ি গায়ের কাঁথাখানা ফেলিয়া—একখানা জীর্ণ তালবৃন্ত লইয়া শ্রান্ত পুত্রের অঙ্গে বীজন করিতে লাগিলেন।

পুত্র এ পকেট ও পকেট হইতে ছোট ছোট কাঠের খেলনা, পয়সায় দুইখানা চামচে, একমুঠা লজেনচুষ, একটা ছোট পাতি-নেবু, আধখানা বেদানা—এবং আরও কয়েকটা কাগজের ছোট ছোট মোড়ক বাহির করিয়া মাদুরের উপর রাখিল। ছেলে-মেয়েরা যে যাহার জিনিষ পাইয়া আনন্দে কলরব করিয়া উঠিল।

মা বলিলেন, "আবার বেদানা আনলি কেন বাছা, একে এই খরচেই কুলোয় না।"

পুত্র মায়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কত রোগা হয়ে গেছ তুমি মা,—একটু বেদানার রস না খেলে সেরে উঠতে পারবে কেন?"

মা হাসিয়া বলিলেন, "পাগল ছেলে! আমায় কি চির-কালটাই ধ'রে রাখবি?"

পুত্র উঠিয়া জামা খুলিয়া মুখ-হাত ধুইয়া ফেলিল। বধূ ঈষদ্দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া একখানা কলাই ওঠা ছোট থালায় খানিকটা লাল হালুয়া ও পরিষ্কার গ্লাসে এক গ্লাস জল—দাওয়ার এক প্রান্তে রাখিয়া গেল।

পুত্র আসনে বসিয়া, ছেলে মেয়েদের অল্প-অল্প বণ্টন করিয়া দিয়া, পরম সুখে মায়ের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে সেই অমৃত আস্বাদ করিল।

জলপানান্তে মায়ের পানে ফিরিয়া হাসি-মুখে বলিল, "আর শুনেছ মা—এই মাস থেকে আমার পাঁচ টাকা মাইনে বেড়েছে। আজ হুকুম হ'লো।"

মা উদ্দেশে দেব-দেবীদের প্রতি নতি জানাইয়া বলিলেন, "মা সিদ্ধেশ্বরীর জন্যে ওরই মধ্যে একটা টাকা তুলে রাখতে হবে, সওয়া পাঁচ আনা সত্যনারায়ণের সিন্নি—এই আসছে মাসে দোব, আর বুড়ো শিবতলায় কিছু ফল-মূল দিয়ে পুজো দিয়ে আসবো। আর দেখ বাছা, বৌমার এক জোড়া কাপড় এ মাসে না হ'লেই নয়।"

বধূ এ দিকে পিছন ফিরিয়া দাওয়ার অপর প্রান্তে রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছিল। মায়ের কথায় মৃদু প্রতিবাদ করিয়া, অল্প একটু ফিরিয়া আপন পরিধেয় সাড়ীর অঞ্চল-খানি তুলিয়া বলিল, "না মা, এখন দু'চার মাস এতেই চ'লে যাবে। তুমি বরং সেজ ঠাকুরঝির ১ জোড়া ৯ হাতি সাড়ী আনতে ব'লে দিয়ো।"

পুত্র সে দিকে চাহিয়া মৃদু তৃপ্তির হাসি হাসিয়া বলি—

"সেই ভাল। দুর্গার কাপড়টা এক দম ছিঁড়ে গেছে।" পরে মা'র পানে চাহিয়া বলিল, "আর কতক্ষণ বাতাস করবে মা! রোগা মানুষ— শুয়ে পড়।"

মা বলিলেন, "এটুকুতে ত হাত ক্ষয়ে যাবে না, বাবা! তুই তেতে পুড়ে আফিস থেকে এলি, একটু ঠাণ্ডা হ।" বলিয়া পাখা রাখিয়া পুত্রের গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

পুত্র মায়ের কোলের মধ্যে ছোট ছেলেটির মত মাথা গুঁজিয়া দুই হাতে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া কহিল, "তুমি বড্ড রোগা হয়ে গেছ, মা।"

* * * *

ইহাই স্বর্গ। স্নেহলুব্ধ অন্তর উপরের বাতায়নে বসিয়া হা হা করিয়া উঠিল।

সারা দিবসের দারুণ ক্লান্তি, অর্থের দুশ্চিন্তা, দারিদ্র্যের দুর্ব্বহ বেদনা ইহার স্পর্শে মুহূর্ত্তে গলিয়া যায়, প্রাণপূর্ণ শান্তি ও উল্লাসের তরঙ্গ সারা দেহকে তৃপ্তির মুক্তি-স্নান করাইয়া দেয়।

এ স্বর্গ মাটীর,—সংসারের স্নেহ-ভালোবাসার সম্পর্কে ইহার জন্ম, প্রাণের কামনা-বাসনায় ইহার লয় স্থিতি।

আজন্ম বিলাসপুষ্ট ধনীর দীর্ঘনিশ্বাস সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

* * * রাত্রি বাড়িল। সেই দাওয়াখানিতে ক্ষুন্নিবৃত্তির আয়োজন। ছেঁড়া কম্বলের আসন পাতা, পরিস্রুত কলাইকরা থালায় কদর্য্য লাল অন্ন, এলুমিনিয়মের বাটিতে কিসের জলবৎ ডাল, একটা তরকারী ও ভাতের এক পাশে হলুদ-ঝালের মাছের এক টুকরা বোধ হয়। একটি লের সাত টুকরা করিয়া প্রত্যেকের পাতে এক এক কুচি দেওয়া হইয়াছে। সকলে হাসি-গল্পে মাতিয়া আহারের পর্ব্ব সারিয়া লইতেছে।

কদর্য্য মোটা চাউলের ভাত, এ বাড়ীর দাসী-চাকরে যাহা মুখে তুলিতে ঘৃণা বোধ করে, তাহাই সামান্য ব্যঞ্জন-সহযোগে অপূর্ব্ব তৃপ্তিতে উহারা মুখে তুলিতেছে! শুধু তাহাই নহে, থালা-ভরা অন্ন কয়েক মিনিটের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া গেল, বধূ আবার প্রত্যেক পাতে অন্ন পরিবেষণ করিল।

কেহ হাত নাড়িল, আর খাইতে পারিবে না। মা অনুযোগ করিলেন,—"দিন দিন না খেয়ে চেহারা হচ্ছে দেখ না! ও ক'টি ভাত, ডাল দিয়ে মেখে নাও। খাওয়ার মধ্যে ত দুবেলা দু'মুঠো ভাত —" ইত্যাদি।

* * * সুরেশ বাতায়নে বসিয়া ভাবিল,—ওই কদর্য্য অন্নের সঙ্গে যে মধুর সুধা মাখান রহিয়াছে, তাহার মূল্য বিশ্ব-সংসারে কয়টি লোক দিতে পারে? ঐ মর্ম্মভেদী দৈন্য অভাব-অনটনের মধ্যে, যে অপার্থিব সম্পদ,—দৈনন্দিন ছোট বড় কর্ম্মে মিশিয়া, তীব্র দুঃখকেও বিচিত্র মধুর করিয়াছে, তাহার তুলনা স্বর্গে আছে কি না জানি না, বিশ্ব-জগতে ত বিরল। যাহার ভাগ্যে এমন অমূল্য সম্পদ মিলিয়াছে, সেই যথার্থ ভাগ্যবান্ সুখী।

অকস্মাৎ কক্ষে দপ করিয়া বিজলী বাতি জ্বলিয়া উঠিল— পত্নীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল।

—"ও মা, এখনও তুমি জানালার ধারে শুয়ে আছ? ঠাকুর যে টেবিলের উপর লুচি রেখে গেছে কখন্। সব জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।"

পরে আপন মনে কহিল, "কি সুন্দরই যে প্লে হ'ল। সত্যি, যেয়ো এক দিন কিন্তু। কপালকুণ্ডলার পার্ট যা হয়েছে—"

সুরেশ বাহিরের পানে চাহিয়া দেখিল, বিজলী বাতির তীব্র আলোকে মাটীর প্রদীপ ম্লান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দাওয়ার উপর বসিয়া কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী নিপুণ করে উচ্ছিষ্ট স্থান মার্জ্জনা করিতেছে। বিজলী আলোর উজ্জ্বল দীপ্তি লাল-পাড় সাড়ীর ফাঁকে সীঁথির সিন্দূররাগকে আরও দীপ্তিশালী করিয়াছে। কক্ষান্তরালে—জননীর স্নেহ-মন্দাকিনীধারায় অবগাহন করিয়া, উহারাও সুখ-শয়নের মধু-সুপ্তির আয়োজন করিতেছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়।

(৩) কবিরাজী নষ্ট ও ডাক্তারীর প্রাধান্য কেন?

"অমুকের হাত-যশ বেশী", "অমুক অনেক বড় বড় পাশ করিয়াছেন," "অমুক অনেক টাকা দর্শনী লন," "অমুকের অনেক পসার হইয়াছে," "অমক অমুকের বাড়ীতে অমুক ব্যারাম ভাল করিয়াছেন"—ইত্যাকার ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, এ দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সকলেই চিকিৎসক-নির্ব্বাচন করেন। "সস্তা ও ঔষধ খাইতে কষ্ট নাই" বলিয়া, কেহ-কেহ হোমিওপ্যাথির আশ্রয় গ্রহণ করেন। সরকারী ডাক্তার বলিয়া, হাসপাতালের চিকিৎসক বহুস্থলে অতি উচ্চ আসন পান। "তরুণ" ব্যাধিতে এলোপ্যাথি, ও পুরাতন ব্যাধিতে কবিরাজী কার্য্যকরী; "কলেরায় হোমিওপ্যাথ কার্য্যকরী";—ইত্যাকার ধারণা এ দেশে প্রবল। ফল কথা, এ দেশে চিকিৎসক ও চিকিৎসা-প্রণালী নির্ব্বাচনের মূলে জ্ঞান, অনুসন্ধিৎসা, বিচারক্ষমতা—কিছুরই প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ, সেই লোকদিগের বাড়ী করিবার সময়ে, জিনিসপত্রের যাচাইএর ত্রুটি নাই; মোকদ্দমা করিবার সময়ে, প্রাণপাত তদ্বিরের অভাব নাই,এবং সে তদ্বিরের মূলে কত জ্ঞান, কত অনুসন্ধিৎসা, কত বিচার, কত একনিষ্ঠা নিহিত থাকে! আবার শুধু তাহাই নহে;—অদৃষ্টবাদিতা ও পৃথিবীর নশ্বরতার জ্ঞান, দেহ ও প্রাণকে লইয়া এ দেশে যত পরিস্ফুট হয়, তত আর কোনও বিষয়ে লক্ষিত হয় না! "তুচ্ছ দেহটার জন্য," "তুচ্ছ প্রাণটার জন্য," "তুচ্ছ পেটটার জন্য" বাঙ্গালী মাথা ঘামাইতে ঘৃণা বোধ করে! হা ভণ্ডামি!

এ দেশে, বর্ত্তমান সময়ে, "প্রকৃত" কবিরাজ বোধ হয় অল্পই। কিন্তু কবিরাজী শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় ঔষধগুলির এতই সুন্দর বনিয়াদ যে, এমন কি, অ-কবিরাজের হাতে পড়িয়াও তাহারা ফলপ্রসূ হইতেছে। যাহারা কবিরাজী গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, অনেক গ্রন্থই কোনও "মেডিকেল কন্‌ফারেন্সের", (বা বৈদ্যক সম্মেলনের) বিবরণী (বা রিপোর্ট) স্বরূপ; অর্থাৎ, চরক, সুশ্রুত প্রভৃতির গ্রন্থ ব্যক্তিবিশেষের মতামত বা অভিজ্ঞতার ফল নহে,—বহু ঋষিকল্প বৈদ্যকের মতামত ও অভিজ্ঞতার সমষ্টি-ফল। এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ঋষিরা গুহায় বসিয়া কল্পনার সাহায্যে, সাপ-ব্যাং লিখিতেন না,—পরস্পরের মতের আদান-প্রদান করিতেন—তাঁহারা উদারনীতিক ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রায় সহস্র বর্ষ অতীত হইতে চলিল, সে সম্মেলন আর ঘটে নাই, এবং প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী গত হইল, বাঙ্গালার ঋষিকল্প গঙ্গাধর বহরমপুরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে বাঙ্গালার কবিরাজী প্রাসাদের চূড়া খসিয়াছে। কিন্তু বলিয়াছি ত, কবিরাজীর বনিয়াদ অতীব দৃঢ় এবং বিজ্ঞান-সম্মত। বায়ু পিত্ত-কফ কি, এখনও বুঝিলাম না; কিন্তু বর্ত্তমান কালের আবিষ্কার "এণ্ডোক্রাইনলজী" (অর্থাৎ অন্তঃসলিলা দৈহিক গ্রন্থিরস) বায়ু-পিত্ত-কফের সুন্দর আভাস আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে আনিয়াছে। বিরুদ্ধ-ভোজনে যে কুষ্ঠব্যাধি ঘটিতে পারে, এ কথা জোর গলায় স্বীকার না করিলেও, আজ জোর গলায় উড়াইয়া দিতে পারি না। দুধের সঙ্গে লবণাক্ত খাদ্য ভোজন যে গোমাংস-ভক্ষণতুল্য, তাহা এখন বেশ বুঝি। কপ্যপক্ব জল, তৈল, ঔষধাদির গুণ যে কেন বেশী, তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হয় না। এক কথায়, আজ আমরা হেটমণ্ডে স্বীকার করিবই যে, কবিরাজী "বড় বাপের বেটা;" যদিও প্রকৃত "কবিরাজ" বিরল।

পক্ষান্তরে, ডাক্তারীর কথা ধরা যাউক। "ডাক্তারী" বলিতে এলোপ্যাথিকেই বুঝিব। এই "এলোপ্যাথির' শিক্ষক কাঁহারা? যাহারা জীবনে কখনও এ দেশ ও এ দেশীয় রোগী দেখেন নাই! এই ঔষধগুলি কোথাকার? এ দেশ ছাড়া প্রায় অপর সকল দেশ হইতেই সংগৃহীত। যদিও কতকটা ঠিক, তবু আমি স্বীকার করিতে রাজী নই যে, যে দেশে ব্যারামী—তাহার ঔষধ সেই দেশে পাওয়া যাইবে, অন্যত্র পাওয়া যাইবে না। জগতের সর্ব্বদেশ হইতে ঔষধ আসুক, আমার তাহাতে আপত্তি নাই কিন্তু আমদানী করা ঔষধমাত্রেই আমার আপত্তি তিনটি। প্রথমতঃ, ঔষধগুলি "সার"রূপে (alcoholic or watery extract) আসায় তাহাদের তেমন ফল হয় না, যেমন, অর্জ্জুনছালের বা লোধের টাটকা চূর্ণ সেবনে ক

হয়, কিন্তু উহাদের "সারে" কিছুই হয় না। দ্বিতীয়তঃ, লোহিতসাগরের উত্তাপে জাহাজের খোলে বোঝাই ঔষধগুলির বীর্য্যনাশ অবশ্যম্ভাবী ; কাযেই, কাঁচা-মাল ও তৈয়ারী বিদেশী ঔষধ মাত্রেই, এ দেশে refriegerating chamber বা বরফ-ঘরে আনীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তৃতীয়তঃ, বিদেশীয় ঔষধগুলি আমাদের দৈন্য বাড়াইতেছে। একবার দেশপূজ্য সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং দ্বিতীয় দফায়, মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মন্ত্রিদ্বয়কে এতৎসম্বন্ধে খুব বিশদভাবে লিখিয়াছিলাম, যাহাতে এ দেশেই ঔষধ তৈয়ারীর ব্যবস্থা হয়। (vide letters dated 26th July 1921 and 17th February 1927 ; ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসের ভারতবর্ষ দেখুন।) কিন্তু তাহা অরণ্যে রোদন হইয়া গেল।

বিধাতার কি পরিহাস যে, এ দেশে চিকিৎসক গড়িবার জন্য, খাস বিলাতী সাহেব বিলাতে পাশ করিয়া আসিয়া, তবে শিখান। আর, ২০।৩০ বৎসর এ দেশে থাকিয়া এতদ্দেশীয় রোগ ও রোগীর সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া, একটু মানুষ হইতে না হইতেই, এ দেশ হইতে বিলাতী শিক্ষকরা অবসর গ্রহণ করেন।—ভারতবর্ষের টাকাও যায়—অভিজ্ঞতাও যায়। এই বিলাতী চিকিৎসকদের নিকটে অধ্যয়ন করার ফলে, আমরাও জামাজোড়ার বাহুল্যের ব্যবস্থা দিই ; আমরাও সার্সি আঁটিয়া, কার্পেট পাতিয়া, পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া, ঘরে থাকি ; আমরাও দুধ-ঘিকে ফেলিয়া, মাংসকে প্রাধান্য দিতে শিখি ; আমরা কথায় কথায় "পেটেণ্ট ফুড", প্যানোপেপটোন্, ব্র্যাণ্ডস্ এসেন্স, স্যানাটোজেন, ভাইব্রোনা, ম্যানোলার শ্রাদ্ধ করি ; তেল ছাড়িয়া, সাবান মাখিতে পরামর্শ দিই ; জুতাশুদ্ধ বিছানায় উঠিতে ও খাবারের ঘরে ঢুকিতে দ্বিধা বোধ করি না।

বিলাতী শিক্ষার ফলে বিলাতী বেশভুষা, বিলাতী চাল-চলন, বিলাতী খানা-পিনা ত লইয়াছিই ; সেই সঙ্গে, দেশীয় সকল জিনিষকে সেকেলে ও অকেযো বলিয়া ঘৃণা করিতেও শিখিয়াছি ! আমাদের বাড়ীর আনাচে-কানাচে কত অমূল্য ও পূর্ণবীর্য্য ভেষজ রহিয়াছে, তাহা আমরা জানি না বলিয়া, লজ্জিতও হই না। আমরা অশনে, বসনে, ভূষণে, চিন্তায় বিদেশী হইয়াছি, ইহা অনেকটা ইংরাজী শিক্ষার ফল। ইংরাজী পড়ার ফলে, আজ ঘরের ঠাকুর বিতাড়িত ! ইংরাজী শিখিয়া, আজ আমাদের জাতি গিয়াছে—অর্থাৎ, জাতীয় স্বার্থ-হানি করিয়াছি !

এই দুইটি কথা—কবিরাজীর অবনতি ও নিছক বিলাতী ডাক্তারীর ক্রমশঃ প্রসার—এই দুইটি বিষয় কি দেশের লোকরা এত দিন লক্ষ্য করেন নাই ? করিয়া থাকেন ত, ইহার প্রতীকারের চেষ্টা করা হয় নাই কেন ? প্রতীকারের চেষ্টা না হওয়ার দুইটি প্রধান কারণ ;—প্রথমটি, দেশীয় এলোপ্যাথদিগের সাহেব-মোহ—অর্থাৎ, যাহা কিছু সাহেবী, তাহাই ভাল এবং যাহা কিছু দেশীয় (কবিরাজী, হাকিমী), তাহাই ঘৃণ্য ; এবং দ্বিতীয় কারণটি, জনসাধারণের চিকিৎসা-বিষয়ে সহানুভূতির অভাব অর্থাৎ, ভেদনীতি, দলাদলি !

এখন "কবিরাজ" আছেন, তাঁহারা সেকেলে ; ডাক্তার আছেন, তাঁহারা বিলাতী চশমা নাকে দিয়া দেশীয় লোককে দেখেন। দেশবাসী জনসাধারণের এই উভয়-সঙ্কটে, কবিরাজ ও চিকিৎসক অর্থের দিক্ হইতে সম্পূর্ণ লাভবান্ হন ;—কিন্তু মারা পড়িতেছেন, জনসাধারণ (শিক্ষিত ও অশিক্ষিত)। এখন উপায় কি ? উপায়গুলি খুব সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি :—

(১) এ দেশে ডাক্তারী শিক্ষকতা বা চিকিৎসা করিবার জন্য যে সব সাহেব চাকুরী গ্রহণেচ্ছু, তাঁহাদিগকে এ দেশে কোনও বড় হাঁসপাতালে ও ট্রপিকাল স্কুলে অন্ততঃ দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়া, তবে এ দেশে বসিয়া, আই-এম্-এস্ পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা চাই। গোঁজামিল দেওয়া "মিলব্যাঙ্ক কোর্স" যথেষ্ট নহে। এ দেশে গৃহীত I. M. S. পরীক্ষার পরে, তাঁহাদিগকে আরও দুই বৎসর রিসার্চ (মৌলিক গবেষণার) কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। শিক্ষকদিগের পক্ষে প্র্যাকটিশ করা নিষিদ্ধ হইবে।

(২) এ দেশে, প্রত্যেক এলোপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা-মন্দিরে—

(ক) পথ্যাপথ্য, (dieto therapy) এবং

(খ) দেশী গাছ-গাছড়ার গুণাগুণ

শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। একখানি ভারতীয় ফার্ম্মাকোপিয়াও প্রস্তুত করিতেই হইবে।

(৩) ডাক্তারীবিদ্যা শিক্ষার জন্য ফ্যাকাল্টিভুক্ত "স্কুল" ও "কলেজ" বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানদ্বয় থাকিবে না। "স্কুলে," শিক্ষা নিরেস হয় এবং শীঘ্র ও সস্তায় হয়,

কাযেই, স্কুল হইতে অধিক সংখ্যক ছাত্র বৎসরে বৎসরে নিষ্ক্রান্ত হয়। তাহাদের সংখ্যাধিক্য ও দর্শনীর স্বল্পতা নিবন্ধন, উচ্চশিক্ষিত "কলেজ"-পাশ করা ডাক্তারদের অন্নের হানি হয়। আধা-পণ্ডিত চিকিৎসকের অপেক্ষা হাতুড়ে নিরাপদ।

(৪) কয়েক বৎসর হইতে, মেডিকেল কলেজে ছয় বৎসর অধ্যয়নের নিয়ম আছে; এবং এই ছয় বৎসরের মধ্যে, সকল ছাত্রকেই বিশ্ব-পণ্ডিত করিবার দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষার অস্তিত্ব দেখা যায়। প্রথম বৎসরের পাঠ্য—পদার্থ বিদ্যা (ফিজিক্স), রসায়ন (কেমিষ্ট্রি), বাইওলজী (প্রাণিবিদ্যা), উদ্ভিদ্‌বিদ্যা (বটানী)—এই গুলিকে আই-এস্-সি কোর্সের অন্তর্গত করিয়া দেওয়া উচিত। যাঁহারা ভবিষ্যতে বৈদ্যুতিক চিকিৎসায় মনোনিবেশ করিবেন, সুধু তাঁহাদেরই গণিতশাস্ত্রে বেশী ব্যুৎপত্তি থাকা চাই; এই হেতু সকল ছাত্রকেই গণিত-বিশেষজ্ঞ করিবার প্রয়াস, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে নিন্দনীয়।

(৫) বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পাটনা, আসাম, ডিব্রুগড়, নাগপুর, এলাহাবাদ প্রভৃতি প্রত্যেক প্রদেশীয় রাজধানীতে "ট্রপিকাল স্কুল" ব্যাপকভাবে স্থাপিত করা উচিত; এবং ঐ বিদ্যালয়গুলিতে এতদ্দেশীয়দিগের প্রাধান্য থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রত্যেক ট্রপিকাল স্কুলে অন্ততঃ দুই জন দেশীয় চিকিৎসককে দেশী গাছ-গাছড়ার গুণাগুণ পরীক্ষায় নিযুক্ত রাখা উচিত। কলেজ হইতে পাশ করিয়া স্বদেশী ও বিদেশীকে এই সব ট্রপিকাল স্কুলে অধ্যয়ন করিতে বাধ্য করা কর্ত্তব্য।

এই গেল বর্ত্তমানের এলোপ্যাথিক চিকিৎসাপ্রণালী-সম্পর্কিত অতীব আবশ্যক পরিবর্ত্তনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আমার বিশ্বাস, কবিরাজ ও এলোপ্যাথ উভয়ে হাত ধরিয়া চলিতে যাহাতে পারেন, সেটি করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ। সেই জন্য, প্রথমতঃ এলোপ্যাথির কথা পাড়িলাম।

কবিরাজ ও হাকিমদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিলে লাভ নাই, বরং সমূহ ক্ষতি। এই জন্য, কবিরাজী ও টিব্বি বিদ্যালয় স্থাপিত করিতে হইবে। কিন্তু স্বতন্ত্র এলোপ্যাথি, কবিরাজী ও হাকিমী বিদ্যালয় ও হাঁসপাতাল করিতে গেলে, প্রভূত অর্থব্যয় হইতে থাকিবে। অথচ এই তিনটি বিদ্যালয় একই বাটীতে হইলে, একসেট্ শিক্ষক দ্বারা পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, দেহতত্ত্ব, শবব্যবচ্ছেদ, পথ্যবিচার-তত্ত্ব, শারীর-বিধান, স্বাস্থ্য-বিদ্যা, অস্ত্রোপচার-বিদ্যা, জুরিসপ্রুডেন্স, নিদান-তত্ত্ব, প্রভৃতির অধ্যাপনা এবং ল্যাবরেটারীর কার্য্য সহজেই সাধিত হইতে পারিবে। এইরূপ বন্দোবস্তের ফলে, ব্যয়ের লাঘব ঘটিতে পারে এবং একত্র অধ্যয়নের ফলে, হৃদ্যতা ও প্রতিযোগিতা করিয়া পরস্পর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন। ভাব ও হৃদয় বিনিময় ঘটাইতে পারিলে, ভারতে সুদিন দেখা দিবে।

এই ভাবে, হাঁসপাতালে চক্ষু,কর্ণ, নাসিকা ও সাধারণ "অস্ত্রচিকিৎসা" এবং "পোয়াতি হাঁসপাতাল" একত্র চলিতে পারে। কেবল সুধু "মেডিক্যাল" ওয়ার্ড তিন জাতীয় শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এক্ষণে, কথা হইতেছে—শিক্ষার বাহন বাঙ্গালা হইবে, না ইংরাজী? বহু বর্ষ বেসরকারী-চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার ফলে, আমার মত এই যে, যদি উপযুক্ত বাঙ্গালী শিক্ষক পাওয়া যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালায় শিক্ষাদানেরই আমি অত্যন্ত পক্ষপাতী। কেবল পারিভাষিক শব্দগুলিকে (technical terms) ইংরাজী, সংস্কৃত অথবা উর্দ্দুতে পাশাপাশি ছাপাইয়া ছাত্রদিগকে দিলে, বাকী বক্তৃতা বাঙ্গালায় চলান যাইতে পারে। যেখানে তেমন ভাল বাঙ্গালী শিক্ষক পাওয়া যাইবে না, (এবং প্রথম-প্রথম) ডাক্তার, হাকিম ও কবিরাজ মহাশয়গণ দ্বারা নিজ নিজ ভাষায় বক্তৃতা করাইতে হইবে। বলা বাহুল্য, আমার মতে—

এলোপ্যাথদিগকে—কবিরাজী মতামত, ভৈষজ্যতত্ত্ব এবং বায়ু পিত্ত কফ জানিতে হইবে এবং দেশী পথ্যবিচার শিখিতে হইবে;

কবিরাজ ও হাকিমদিগকে—পদার্থবিদ্যা, রসায়ন,প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, শারীরবিদ্যা, শারীর-বিধানতত্ত্ব, স্বাস্থ্যবিদ্যা, অস্ত্রোপচার-বিদ্যা, প্রসূতিতন্ত্র, নিদান, জুরিসপ্রুডেন্স এবং হাতে-হাতিয়ারে বর্ত্তমান সময়োপযোগী সকল রকম ল্যাবরেটারী পরীক্ষা, গবেষণা, এলোপ্যাথিক পথ্যবিচার প্রভৃতি শিখিতে হইবে।

অর্থাৎ, পাশাপাশি দাঁড়াইয়া, হাত ধরিয়া, এলোপ্যাথ ও কবিরাজকে (এবং হাকিমকে) ভারতের উন্নতিকল্পে একত্র অগ্রসর হইতে হইবে। গোঁড়ামি, ভণ্ডামি, ব্যবসাদারী, পাটোয়ারীবুদ্ধি, হীনতা, দলাদলি—সকলই ভুলিতে হইবে। অন্ততঃ কিছুকাল এই ভাবে পাশাপাশি না দাঁড়াইলে, কাহারও মঙ্গল নাই। তাহার পরে, কয়েক বৎসর ভাবের ও বহুদর্শিতার মেলামেশা ও আদান-প্রদানের পরে, যদি আবশ্যক হয়, তখন পূর্ণ যৌবনের উদ্দাম শক্তিতে, উভয়েই স্বেচ্ছায় স্বতন্ত্র হইয়া, নিজ নিজ মতে, স্ব-স্ব পুষ্টি ও বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে পারেন। এখন দুইটি স্রোতকে একত্র করা চাই-ই—চাই।

বিশ বৎসর পূর্ব্বে, কলিকাতার বুকের উপরে, অবাধে, ডাক্তারী-স্কুলের ব্যবসায় চলিয়াছিল। সে ব্যবসায়ে, বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়রা যতটা লাভবান্ হইয়াছিলেন, ছাত্ররা বা জনসাধারণ তাহার শতাংশও লাভ করিতে পারেন নাই। এই ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, আমার ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। তাৎকালিক আন্দোলনের ফলে, গবর্ণমেণ্ট ডিপ্লোমাবেচার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করেন ও "ষ্টেট মেডিকাল ফ্যাকাল্‌টির" সৃষ্টি করেন। এতদুভয়ের ফলে, আজ বে-সরকারী-ডাক্তারী-স্কুলগুলি ধর্ম্মপথে থাকিয়া, সমাজের যথেষ্ট উপকার করিতেছে।

কয়েক বৎসর হইল, অকস্মাৎ একসঙ্গে কতকগুলি আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নানা রকম কথা শুনা যাইতেছে। কে জানে, কালে ইহাদেরও ফল বিষময় হইবে কি না? যদি হয়, তখন গভর্ণমেণ্টকে সে কুফল দমন করিবার জন্য আবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। এখন, গভর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ আছেন এবং থাকা উচিতও; কিন্তু এটাও গবর্ণমেণ্টের ন্যায্য কায—মেকি ধরাইয়া দেওয়া এবং দেশের শাস্ত্রানুযায়ী শিক্ষাকে উৎসাহিত করা।

বাঙ্গালা-সরকার হাকিমীর বিরুদ্ধে রায় দিয়াছেন এবং আয়ুর্ব্বেদের কথা ধামাচাপা দিয়া রাখিয়াছেন। মান্দ্রাজে চালাকি চলে নাই—আয়ুর্ব্বেদীয় ও হাকিমী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এবং বিহার ও উড়িষ্যাপ্রদেশে,—উভয়েরই আদর হইয়াছে। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আয়ুর্ব্বেদীয় শিক্ষার, এবং হায়দরাবাদের ইস্‌লামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হাকিমী শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। দিল্লীতে, হাকিমী ও আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজের দ্বার স্বয়ং লর্ড হার্ডিং খুলিয়া যান। চীন মহাদেশে,দানবীর রকফেলারের অর্থে, একত্র এলোপ্যাথিক ও চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপনা চলিতেছে। তাতে না শুধু এই অভিশপ্ত ভারতদেশের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের গাত্র! অথচ, এটা গবর্ণমেণ্টেরও যেমন কর্ত্তব্য, দেশের লোকেরও তেমনি কর্ত্তব্য—যাহাতে আয়ুর্ব্বেদের মরা-গাঙ্গে জোয়ার আসে। এ দেশে ডাক্তারীর যত প্রসার বাড়িবে—দেশ তত দীন হইতে থাকিবে। বাঙ্গালাদেশে ছিল একটা মেডিক্যাল "কলেজ;" হইল দুইটা; কলিকাতায় ছিল একটা মেডিক্যাল "স্কুল," হইল তিনটা, এবং ক্রমশঃ প্রত্যেক জেলায়, মেডিক্যাল "স্কুল" স্থাপিত হইতে চলিল এবং প্রত্যেক থানায় এলোপ্যাথিক দাতব্য ঔষধালয় স্থাপিত হইতে চলিল। ইহাতে বিলাতের জয়-জয়কার—বিলাতের বেকার-সমস্যার ক্রমশঃই সমাধান হইবে এবং আমরাও দীন হইতে দীনতর হইতে থাকিব। একটা এলোপ্যাথিক হাঁসপাতালে যত ব্যয় হয়, একটা এলোপ্যাথিক দাতব্য-চিকিৎসালয়ে যত ব্যয় হয়, একটা এলোপ্যাথিক চিকিৎসকের বেতন বাবদ যত ব্যয় হয়, কবিরাজী সেই সেই প্রতিষ্ঠানে এবং লোকপিছু তাহার সিকি ব্যয়ে কায চলে; অথচ, সে টাকা ও সেই সেই প্রতিষ্ঠানের ও ব্যক্তিগণের অভিজ্ঞতা, এ দেশেই থাকিয়া যায়। পৃথিবীতে এমন আবহাওয়া নাই—যাহা ভারতে নাই,ভারতের ভৈষজ্য ও খনিজ সম্পদ্ এখনও প্রচুর। তবে কেন কোটি কোটি টাকা আমরা সাগর-পারে দিই?

এই জন্য, আজ আমার স্বদেশবাসীর নিকটে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, তাঁহারা ভারতীয় চিকিৎসক ও চিকিৎসা-জগতের হিতার্থে অবহিত হউন। তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া একখানি ভারতীয় ফার্ম্মাকোপিয়া পাশ করাইয়া লউন। তাঁহারা যাহাতে প্রত্যেক ডাক্তারী কলেজের সঙ্গে একটি করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় ও হাকিমী বিদ্যালয় সংলগ্ন হয়, এরূপ ব্যবস্থা করুন। মেডিক্যাল রেজিষ্ট্রেশন আইন কবিরাজদিগের প্রতিও প্রযুক্ত হউক। সুধু এলোপ্যাথদিগের মধ্যে আসল ও নকল জানাইলেই গভর্ণমেণ্টের সকল কর্ত্তব্যের অবসান

হইবে না। যাহাতে প্রত্যেক থানায় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় সংযুক্ত হয়, তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করুন। কারণ, এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের পরামর্শদাতা শ্বেতাঙ্গ আই-এম্-এস্ দল। তাঁহাদের দল অত্যন্ত দৃঢ়, তাঁহাদের স্বার্থ বিলাতী স্বার্থ। সেই কঠিন স্বার্থব্যূহকে ধ্বংস করিতে হইলে, সমগ্র দেশবাসীর বহু বর্ষব্যাপী তুমুল আন্দোলন চাই। এলোপ্যাথিই উন্নতির পথিপ্রদর্শক হউক—কিন্তু এলোপ্যাথিকে কবিরাজীর হাত ধরিয়া চলিতেই হইবে, এরূপ ব্যবস্থা করা হউক।

ধূমকেতুর উদয়

এ দেশে, ইংরাজদিগের প্রথম আমলে, "নেটিভ হস্‌পিটাল-অ্যাসিষ্ট্যাণ্টের" সূচনা করা হয়। এই জাতীয় কর্ম্মচারীরা রোগীর সেবা করা, পথ্য দেওয়া ও ঘা-ফোড়া ড্রেস করা—এই সামান্য কর্ম্মমাত্র করিবার জন্য, অতীব স্বল্প বেতনে বাহাল হইতেন। ক্রমশঃ, তাঁহাদিগকে ডাক্তারীর গোড়ার দুই চারিটি কথা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হওয়ায়, মেডিক্যাল কলেজের বাড়ীতেই "নেটিভ হস্‌পিটাল অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট" ক্লাশ খোলা হয়। এখান হইতে পাশ হইলে, C.H.A. (সিভিল হস্‌পিটাল অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট) এই পদবী দিয়া, তাঁহাদিগকে সামান্য অধিক বেতনে চাকুরীতে বাহাল করা হইত। বর্ত্তমান কালে, শিয়ালদহের নিকটে যে বাটীটিতে ক্যাম্বেল হাঁসপাতাল আছে, ঐ জমীটিতে সরকারী বাজার স্থাপন করিবার মতলব ছিল। মাতলা বা ক্যানিং-টাউনে, কলিকাতার বন্দর সৃষ্টি করিয়া, সেই বন্দরের মাল নামাইবার নিমিত্ত, ঐ যায়গায় সমস্তই বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। মাতলা-বন্দরের মতলব ফাঁসিয়া যাওয়ায়, ক্রমে মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতাল গৃহের নিম্নতলা হইতে ঐ বাজারের স্থানে "ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল" নাম দিয়া বিদ্যালয়টিকে স্থানান্তরিত করা হয় এবং C.H.A. পদবীকে প্রথমে S.A.S. (সাব্ অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন) ও পরে L.M.P. (লাইসেন্স্‌ট্ মেডিক্যাল প্র্যাক্‌টিসানারে)তে পরিবর্ত্তিত করা হয়। তাহার পরে, ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্‌টি স্থাপিত হওয়ায়, এখন সেই পদবী L.M.F. (লাইসেন্সিয়েট অফ ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্‌টি)তে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইংরাজী ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়।

বর্ত্তমানে, এ দেশে ডাক্তারী কার্য্য পরিচালনার জন্য, গভর্ণমেণ্ট দুই দফা বিলাতী-আমদানী, ও দুই দফা দেশী-তৈয়ারী ডাক্তার নিযুক্ত করেন, যথা—

বিলাতী-আমদানী—আই-এম্-এস্ (ইণ্ডিয়ান্ মেডিক্যাল সার্ভিস), আর-এ-এম্-সি, (রয়াল আর্মি মেডিক্যাল কোর)।

দেশী-তৈয়ারী—কলেজের পাশ—অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন, (সিভিল ও মিলিটারী) এবং স্কুলের পাশ সাব-অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন।

এই চারিটি দলের মধ্যে, আই-এম-এস্‌দেরই প্রাধান্য খুব বেশী। এই শ্রেণীর চিকিৎসকরা বিলাতী-পাশ-করা, এবং এ দেশের ডাক্তারী সকল বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের পরামর্শ-দাতা এবং দক্ষিণহস্তস্বরূপ। বেশী দিনের কথা নহে—বিশ বৎসর পূর্ব্বে, ইঁহাদের প্র্যাক্‌টিস বা পসার একচেটিয়া ছিল। কঠিন ব্যারাম হইলেই, "সাহেব ডাক্তার" ডাকা এ-দেশীয়দের প্রথা ছিল। চাকুরীতে প্রবেশ করিতে হইলে, চাকুরীতে সুখ-সুবিধা যোগাড় করিতে হইলে, পরীক্ষায় সুবিধা করিয়া লইবার জন্য, দেশীয় ডাক্তারী ছাত্র এবং কর্ম্মচারীরা দুচোখো "সাহেব ডাক্তারদের" দালালি করিতেন। যত দিন এইভাবে একচেটিয়া পসার চলিয়াছে, তত দিন আই-এম্-এস্ মহাপ্রভুরা আমাদিগের প্রতি খুব প্রসন্ন ছিলেন। গত বিশ বৎসরের মধ্যে, বহু বাঙ্গালী চিকিৎসক এরূপ কৃতবিদ্য ও বিচক্ষণ হইয়া উঠিয়াছেন যে, আজকাল বাঙ্গালী পাড়ায় "সাহেব ডাক্তারের" মুখ বিরল হইয়া পড়িয়াছে। ভাতে হাত পড়ায়, I.M.S. প্রভুরা খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছেন। প্রকাশ্যে কিছু না বলিয়া, অনেক জল বেড়িয়া, এ দেশী ডাক্তারদের পথ কণ্টকিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

এ দেশের স্কুল বা কলেজ হইতে যতই কৃতিত্ব লইয়া পাশ কর না কেন, একটা "বিলাতী" ডাক্তারী ডিগ্রি না থাকিলে এ দেশে ডাক্তারী বিভাগে বড় চাকুরী পাওয়া যায় না। এ দেশের এম্-ডি হইলেও, তুমি এ দেশের কেহ নহ—কিন্তু যদি নিদেন পক্ষে বিলাতী ক্যাম্বেল স্কুলের মত L.R.C.P.ও হও, তবে তুমি অনায়াসে সহস্র এম্-ডির' মাথার উপরে পা দিয়া চলিতে পার,—এই হইল এ দেশের আইন। আবার মজা এমনই যে, "এ দেশের" এম্, ডি হইলেও, তুমি "বিলাতের" তুচ্ছাতিতুচ্ছ কোনও বিদ্যালয়ের চরম পরীক্ষা দিতে পার না—যতক্ষণ না সেখানে অন্ততঃ ছয়মাস সাকরেতি

কর। গোদের উপরে বিষফোড়া,—তুমি বিলাতী কোনও ডাক্তারী স্কুলে বা হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হইতেও পার না, যদি তুমি বিলাতী "জেনারেল মেডিক্যাল কাউন্সিলের" অনুমোদিত কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষিত না হইয়া থাক। অর্থাৎ কথা, বিলাতের G.M.C. (জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল) সাত হাজার মাইল দূর হইতে, এখানকার ডাক্তারী পঠন ও পাঠন তদ্বির ও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন! এবং যদি তাঁহাদিগকে তুষ্ট রাখিতে পার, তবেই তোমার বিলাতে যাওয়া, বিলাতী ডিগ্রি জোগাড় করা এবং এ দেশে কেষ্ট-বিষ্ণু হইবার পথ খোলসা—নতুবা তুমি "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হইয়া হীনতাপঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাক।

আই, এম্, এস্ মহাপ্রভুদের প্র্যাকটিশ হ্রাস হওয়ায়, ১৯২২ খৃষ্টাব্দে, তাঁহারা হঠাৎ ধুয়া তুলিলেন যে, এ দেশের ডাক্তারী শিক্ষা কি রকম হইতেছে, তাহা G.M.C.র—অর্থাৎ, তাঁহাদিগের, এক জন প্রতিনিধি রীতিমত "তদ্বির" করিবেন। তখন সার আশুতোষ জীবিত। তিনি সে অপমানে—এদেশীয় পরীক্ষার বিলাতী-পরীক্ষায়—অস্বীকৃত হইলেন; ফল হইল, সেই অবধি কয়েক বৎসর ধরিয়া, এ দেশীয় ডাক্তারী কলেজের পাশ করা কেহই বিলাতী কোনও স্কুল বা কলেজে ভর্ত্তি হইতে পারিতেছেন না। প্রত্যেক বৎসরে, সর্ব্বসাকল্যে, ১০।২০টি এ দেশীয় ডাক্তার বিলাতী ডাক্তারী ডিগ্রির জন্য সাগরপারে যান। এই ব্যবহার বন্ধ করার ফলে, কাযেই, সাধারণের কোনও অসুবিধা হইল না। কিন্তু কর্ত্তারা চুপ করিয়াও রহিলেন না। একসঙ্গে খিড়কীর অন্য পথে, দুই দিক দিয়া আক্রমণ সুরু হইল :—

এ দেশপ্রবাসী সাহেবদের মেমরা হঠাৎ বাহানা তুলিলেন যে, তাঁহারা কালা ডাক্তারের হাতে আর চিকিৎসিত হইতে চাহেন না;—অর্থাৎ, প্রত্যেক সদরে, অন্ততঃ ২।৪ জন মুষ্টিমেয় মেমদের চিকিৎসার জন্য, গভর্ণমেণ্টকে শ্বেতকায় চিকিৎসক রাখিতেই হইবে;—অর্থাৎ, সদরে, ভাল ভাল ষ্টেসনে, ভবিষ্যতে কোনও দেশীয় চিকিৎসক রাখা হইবে না;—নোয়াখালি, যশোহর, বাখরগঞ্জই নেটিভদের কৃতিত্ব ফলাইবার স্থান। দ্বিতীয় পন্থা—"অল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল বিল" (সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য চিকিৎসা-বিষয়ক ব্যবস্থা) অকস্মাৎ গগনে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই আইনখানির উপরটি মখমলে ঢাকা, ভিতরে "বাঘ-নখের" ছড়াছড়ি। এই আইনের "মোদ্দা কথা" হইতেছে—প্রথমতঃ, ভারতবর্ষে I. M. S.-বিড়ম্বিত একটি G. M. C. (জেনারল মেডিক্যাল কাউন্সিল) স্থাপন করা; দ্বিতীয়তঃ, সেই ভারতীয় G. M. C.-টি বিলাতী G. M. C.র অপ্রকাশ্যভাবে তাঁবেদারী করিবে; এবং তৃতীয়তঃ, এই আইন আমলে আসিলে, চিরকালের জন্য কবিরাজী ও হাকিমী জাহান্নমে যাইবে। কেন, বলিতেছি।

G. M. C.র মোটামুটি দুইটি কার্য্য। প্রথম কার্য্য,—সারা দেশময় কোন্ বিদ্যালয়ে কি পাঠ্য হইবে ও কি মানদণ্ডের অনুসারে পরীক্ষা গৃহীত হইবে.—তাহা নির্দ্দেশ করা। বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা গ্রহণ করুক—কিন্তু যাহাতে সমস্ত দেশের সমস্ত ডাক্তারী বিদ্যালয় একই ধাঁচে চলে, তাহা দেখাই G.M.C.র কর্ত্তব্য। ইহার দ্বিতীয় কার্য্য,—চিকিৎসকদিগের উপরে আদালতের মত কার্য্য করা। কোনও চিকিৎসকের বিরুদ্ধে চিকিৎসাব্যপদেশে চরিত্রহানির দোষারোপ করিলে, এই G. M. C. তাহার আদালত। এই G. M. C.-রূপী চিকিৎসকদিগের আদালতে যদি চিকিৎসকদিগের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়,—অর্থাৎ যদি এমন প্রকাশ পায় যে, কোনও চিকিৎসক তাঁহার কার্য্যে বা ব্যবহারে বা চিকিৎসাব্যাপারে কোনও গর্হিত, নিন্দনীয় বা অভদ্রোচিত কার্য্য করিয়াছেন,—তবে, তাঁহার নাম কাটিয়া দেওয়া হয়। এই G. M. C.র হাতে একখানি খাতা থাকে (মেডিক্যাল রেজিষ্টার); যাঁহারা সেই খাতাভুক্ত হন, তাঁহারাই আইনের দৃষ্টিতে ভদ্র (কোয়ালিফায়েড) চিকিৎসক, এবং শুধু এই রেজিষ্টারিভুক্ত চিকিৎসকরা সরকারী বা বেসরকারী চাকুরী পান, তাঁহারাই সুধু মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিতে পারেন এবং ফি পাওনা থাকিলে, আদালতের আশ্রয় লইতে পারেন। কাযেই, যদি কোনও ডাক্তারের ঐ খাতা হইতে নাম কাটিয়া দেওয়া যায়, তবে তিনি কোন সরকারী বা আধাসরকারী চাকুরী পান না, রোগীকে সার্টিফিকেট দিবার অধিকার তাঁহার থাকে না এবং তিনি আদালতে বাকী-ফিয়ের নালিশ রুজু পর্য্যন্ত করিতে পারেন না।

কাযেই যদি এ দেশে G. M. C. স্থাপিত হয়—তবে ঘটিবে কি? তাহার ফল হইবে এই :—

(১) আই, এম্, এস্‌দের ক্ষমতা অসীম ও কায়েমী হইবে। তাঁহারা এ দেশের G. M. C. মারফৎ, এবং আবশ্যক হইলে, বিলাতী G. M. C.র সহিত একজোট হইয়া, এ দেশের চিকিৎসা-শিক্ষা এবং চিকিৎসাব্যবসায়ের উপর যথেচ্ছাচারিতা করিতে পারিবেন। এমন কি, এ দেশীয় পাশকরা চিকিৎসকদিগের ফি কত হইবে, তাহারও হয় ত নিরিখ বাঁধিয়া দিতে পারিবেন! এবং যে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন-দল প্র্যাকটিশে আজ সাহেবদিগের অপ্রতিহত প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছেন, সেই দলকে-দল এমন দাবিয়া দিতে পারিবেন, যেন তাঁহারা আর কখনও সাহেবদের প্র্যাকটিশ কাড়িয়া লইতে না পারেন! কলেজের অধ্যয়নকাল, মাহিনা, ও পাঠ্য কাল বাড়াইয়া, অথবা সারা দেশময় সাব-অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনদের চেয়েও সহজ ও সস্তার, বাজে, তথাকথিত ডাক্তার ছড়াইয়া দিয়া, সারা দেশটাকে ছাইয়া ফেলিতে পারিবেন। ল্যুকিস্ সাহেব শেষোক্ত পথের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে একবার তাকাইয়াছিলেন—ইংরাজ আমলের প্রথম অবস্থায় নেটিভ অ্যাসিষ্ট্যাণ্টকে পুনর্জ্জীবিত করিতে চাহিয়াছিলেন। আগে, দুই বৎসর অন্য পাঠ পড়িতে পড়িতে, উকীল হওয়া যাইত—এখন সে পথও বন্ধ হইয়াছে; এবং, যে-যে আদালতে এক যায়গায় বসিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করা চলিত, সে সব আদালত নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। কংগ্রেস-পন্থী উকীলদের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আর দুইটা হইল না—কিন্তু কামার-গড়িবার স্কুল, ২।৪টা হইয়াছে। জেলায় জেলায় কোথায় মেডিক্যাল "কলেজ" হইবে—তা না হইয়া, "স্কুল" বসিতে চলিল! এখনই হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে, এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে; G. M. C. হইলে, "অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি!"

(২) তাঁহারা তাঁহাদের রেজেষ্টারীতে সুধু এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের নাম তুলিয়া এমন ভাবে আয়ুর্ব্বেদ ও হাকিমী চিকিৎসাকে কোণঠাসা করিতে পারিবেন—যে, আর কখনও উহারা সরকারী সাহায্য পাইবে না এবং পরোক্ষে বা লুকাইয়াও, কোনও ডাক্তার কবিরাজের আনাচে কানাচে পর্য্যন্ত যাইতে পাইবেন না। কাপ্তেন মূর্ত্তির তত্ত্বাবধানে, মান্দ্রাজে যে দেশীয় চিকিৎসার বিদ্যালয় সরকারী সাহায্যে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার বুঝি লীলা সাঙ্গ হয়! তবু এখনও সে আইন পাশ হয় নাই। ভবিষ্যতে হাকিম, বৈদ্য বা হোমিওপ্যাথরা কোনও কালে জেলাবোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটীর সঙ্গে কখনও সংশ্লিষ্টও হইতে পাইবেন না এবং সাহায্যও পাইবেন না। কাযেই, উপরে নির্দ্দিষ্ট একত্র ডাক্তারী, কবিরাজী ও হাকিমী শিক্ষার সুখস্বপ্ন চিরকালের মত নষ্ট হইবে।

সুধু এইখানেই এ শ্রাদ্ধ-গড়ানর শেষ হয় নাই। অপর দিক্ দিয়া আর এক রকম চেষ্টা হইতেছে।

বিলাতের জেনারল মেডিক্যাল কাউন্সিল নির্ব্বিবাদে বিগত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া, এ দেশীয় ডাক্তারী বিদ্যালয়-গুলিকে মানিয়া চলিতেছিলেন। সম্প্রতি, এখানকার পেন্সন-প্রাপ্ত কতকগুলি I. M. S ডাক্তার G. M. C.কে উস্‌কাইয়া দেন। সেটি ১৯২২ খৃষ্টাব্দের কথা; তখন সার আশুতোষ তাঁহাদিগকে আমলে না আনায়, রাগ করিয়া বিলাতের G. M. C. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তাহার পরে, এ দেশের মহাপ্রভুরা লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্বলি মারফতে, এক জন "কমিশনার অফ মেডিকেল এড়ুকেশন" নামক বিলাতী-জেনারল-মেডিকেল-কাউন্সিলের তরফের কর্ত্তা নিযুক্ত করিবার আশা করিয়াছিলেন; বিলাতী G. M. C.ও সেই আশায়, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মে মাসের পরে এ দেশে যাহারা ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পাংক্তেয় করিয়া লয়েন। কিন্তু সে গুড়ে বালি পড়ায়, আগামী ফেব্রুয়ারী মাস (১৯৩০) হইতে, আবার কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়কে অপাংক্তেয় করিবার ভয় দেখাইয়াছেন। এ দেশের গভর্ণমেণ্ট কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নন। সমগ্র ভারতের জন্য G. M. C.র প্রতিনিধি এক জন (কর্ণেল নীডহাম) কমিশনর নিযুক্ত না হইলেও, সুধু হতভাগ্য বাঙ্গালার জন্য, গভর্ণমেণ্ট উপর-পড়া হইয়া, কর্ণেল প্রকটারকে উক্ত কার্য্যে বাহাল করিয়াছেন, দেখা যাউক, যদি ধাপে ধাপে উঠা যায়। আপাততঃ ছুঁচই প্রবেশ করুক!

কাযেই, এখন হইতে সুধু যে ডাক্তারগণ উক্ত বিলের বিরুদ্ধে তোলপাড় করিবেন, তাহা নহে—আসমুদ্র-হিমাচলব্যাপী আন্দোলন করিয়া তোলা চাই—এবং তাহাতে জনসাধারণের যোগদান অতীব প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য।

ভাই দেশবাসি, "উদর ও অন্যান্য অবয়বের" কথা স্মরণ কর, "উদরের" জন্য "অন্যান্য অবয়ব" সকলকেই এখন হইতে সমানে পরিশ্রম করিতে হইবে। [ক্রমশঃ।

শ্রীরমেশচন্দ্র রায় (এল, এম, এস্)।

নটীর খেয়াল

(বিদেশী গল্পের অনুসরণে)

দুই বৎসর পূর্ব্বে বসন্তকালে, এক দিন আমি মধুপুরে আমাদের বাংলো হইতে পদব্রজে পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলাম। মধুপুর হইতে গিরিডি পর্য্যন্ত যে দীর্ঘ পথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত ও বিস্তৃত প্রান্তর-কান্তারাদি অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, যে পথের অপূর্ব্ব ও পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্যগুলি হইতে সাহিত্যের বহু ভালবাসার কবিতা-গুলির উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে, আমি সেই পথ ধরিয়া যাইতে-ছিলাম। মানুষ দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থানে যায় সাধারণতঃ ভঙ্গী দেখাইবার জন্য; কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে অনেকে গমন করে, দেশে যাহা দুর্ল্লভ সেই সকল স্থানে যাহা সহজলভ্য, সেই সকল কলুষিত আমোদ-প্রমোদের সুবিধার জন্য। আমার ধারণা, এখানে যাহারা আসে, তাহাদের অনেকেই সুন্দর, পরিষ্কার, মেঘ-হীন আকাশের তলে, বিকশিত গোলাপের বাগানে, তাহাদের অসার ধনগর্ব্ব দেখাইয়া, নির্ব্বুদ্ধিতাপূর্ণ দাম্ভিকতা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়। কেহ কেহ জঘন্য পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেও যে এখানে না আসে, এমন নহে।

এই পথে চলিতে চলিতে খর্ব্বশির পাহাড়গুলির আশে-পাশে যে রমণীয় প্রান্তরগুলি বিদ্যমান দেখিলাম, তাহারই একটির মধ্যে চারি পাঁচখানি সুন্দর বাগানবাড়ী আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। উদ্যানবাটিকাগুলির প্রত্যেকটিরই প্রবেশদ্বার পথের দিকে। বাড়ীগুলির পশ্চাতে বিস্তৃত আরণ্য শালের জঙ্গল। এই অরণ্যের আগম-নির্গমের কোন পথই দৃষ্টিগোচর হইল না! একটি উদ্যান-বাটিকার মনোরম বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি সহসা মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া দাঁড়াইলাম। বাড়ীটি ছোট। ইহার বহির্ভাগ শ্বেতধবল—চূণকাম করা, ঘরের ভিতরের দেয়ালগুলি মেজে হইতে এক কোমর উঁচু পর্য্যন্ত ময়ূরকণ্ঠী রংয়ের বিচিত্র মোজাইক্ ষ্টোন্ দিয়া মোড়া, বাহিরের প্রাচীরগাত্রে ও ঢালু ছাদে বহু লতানে গোলাপগাছ উঠিয়াছে, তাহাতে গুচ্ছে গুচ্ছে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে।

বাড়ীর সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যানের কি বিচিত্র শোভা! দেখিয়া মনে হইল, ইহা যেন উদ্যান নহে; বিচিত্র বর্ণের সমবায়ে কে যেন একখানি ফুলের গালিচা পাতিয়া দিয়াছে। তৃণহরিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ময়দানগুলির মধ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মরসুমি ফুলগাছের জঙ্গল। সেগুলি দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, যেন গাঢ় নীল আকাশের বুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকা উঁকি মারিতেছে। ঘরের সন্নিহিত প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলীর দুই ধারে ফুলগাছের ঝোপ। জানালাগুলির বাহিরে নানাজাতীয় লতা দুলিতেছে; সেগুলি পুষ্পগুচ্ছের ভারে অবনতদেহ। বাড়ীর চারিধারে ইষ্টক-রচিত নক্‌সা-কাটা অনুন্নত প্রাচীর, তাহার উপর পুষ্পিত লতাবলীর কি বিচিত্র শোভা! বাড়ীর পশ্চাতে পর্ব্বতের প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি পথ। এই পথের দুই ধারে কামিনীফুলের বৃক্ষশ্রেণী। প্রস্ফুটিত কামিনীফুলের সৌরভে চারিদিক্ আমো-দিত। এই সুন্দর উদ্যানবাটিকার তোরণের এক ধারের স্তম্ভের গায় একখানি মর্ম্মরফলকে সোনালী অক্ষরে লেখা "অভিনেত্রীর সুখময়ী স্মৃতি"; অপর ধারের স্তম্ভের গাত্রে বসানো একখানি কষ্টিপাথরের উপর নিকেলের কাযে লেখা, "স্বাগত।" আমার মনে সংশয় হইল যে, এই ফুলরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী অভিনেত্রী কি কোনও মানবী, না কোনও অপ্সরাকন্যা! কে সেই দেবাম্বু-প্রাণিত জীব, যে পৃথিবীর এই নির্জ্জন মনোরম কোণটি বাছিয়া বাহির করিয়া, কি এক অপূর্ব্ব ইন্দ্রজালবলে একটি প্রকাণ্ড ফুলের তোড়া কাটিয়া ছাঁটিয়া এই স্বপ্নমন্দিরটি রচিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে? কে সে?

ভাবিতে ভাবিতে সেই বাড়ীখানি ছাড়িয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে, এক জন মজুর পথে বসিয়া পাথর ভাঙ্গিতেছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই বাড়ীখানি কাহার?"

মজুর উত্তর দিল, "রাজরাণী বিবির।"

রাজরাণী! এই নামটি যে আমার নিকট অতি পরিচিত—যে আমার কিশোর হৃদয়ের একমাত্র উপাস্যা দেবী, আমার যৌবনের একমাত্র আরাধনার সামগ্রী। আমার কৈশোরে এ নাম যে আমি বহুবার শুনিয়াছি। সাময়িক সংবাদপত্রে রঙ্গালয়-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপনস্তম্ভে এই অভি-নেত্রীর কথা যে আমি সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ ধরিয়া ঘোষিত হইতে দেখিয়াছি। এই সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী যে তাহার যুগে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিল। কোনও কালে, কোনও দেশে, কোনও রমণীই যে রাজরাণীর মত এত প্রশংসা—এত ভালবাসা—এত খ্যাতি লাভ করে নাই! এই অভিনেত্রীর প্রেম লইয়া প্রেমিকে প্রেমিকে কত মারামারি কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে; এই অভিনেত্রীর অনুগ্রহলাভে ব্যর্থকাম হইয়া কত হতাশ প্রেমিক আত্মহত্যা করিয়াছে। এই অভিনেত্রীকে লইয়া পলায়ন, সঙ্গোপনে খণ্ডযুদ্ধ ও আরও কত কত অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটিয়াছে? এই যাদুকরীর বয়স এখন কত? ষাট—সত্তর—না আশী বৎসর? রাজরাণী! রাজরাণী এখানে—এই বাড়ীতে? এই রমণী, যাহার প্রেমে আমাদের যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি পাগল হইয়া গিয়াছিল, যাহাকে আমা-দের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়ক সাদরে হৃদয়ে ধরিয়াছিল। আমার বয়স তখন মাত্র ১২ বৎসর। এই অভিনেত্রী যখন তাহার

পূর্ব্বতন প্রেমিককে পরিত্যাগ করিয়া নবীন প্রেমিককে লইয়া কাশ্মীরে পলায়ন করে, তখন সমগ্র বাঙ্গালায় যে একটা হুলস্থুল পড়িয়া যায়, সেই কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়িল।

একখানি নূতন নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনীতে দর্শকগণ তাহার অভিনয়দর্শনে এত অভিভূত ও এত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, দর্শকদিগের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে একটি দৃশ্যের একই অংশে তাহাকে একাদশবার পুনরভিনয় করিতে হইয়াছিল। সেই রাত্রিতেই অভিনয়ান্তে কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাজরাণী তাহার নবীন প্রেমিক কবি-ভায়ার সহিত পলায়ন করিয়াছিল। তাহারা একবারে দেশ ছাড়িয়া, ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষে এই জনশূন্য পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়া পাকাপাকিভাবে বাসা বাঁধিয়াছিল ও একান্তে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া প্রণয়চর্চ্চায় দিন-যাপন করিয়াছিল। এই খেয়ালী প্রণয়িযুগলের পরেশনাথের উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ ও দুই জনে পাশাপাশি বসিয়া পরস্পরের মুখের দিকে তন্ময় হইয়া চাহিয়া পর্ব্বতের পাদ-মূলস্থ গ্রাম, প্রান্তর, সরিৎ, কান্তার প্রভৃতির দৃশ্যদর্শন-ব্যাপারটি সমগ্র জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। যে সকল লোক তাহাদিগকে সেই অবস্থায় দেখিত, তাহারা মনে করিত যে, এই উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকযুগল বুঝি প্রেমের অত্যধিক আবেগে,পরস্পর পরস্পরের সহিত আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া, সেই উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হইতে নীচে খদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

সেই উদ্ভট ভাবের কবি কবে ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত দুর্ব্বোধ্য ও বিচিত্র ব্যঞ্জনা ও হেঁয়ালি-পূর্ণ কবিতাগুলি বর্ত্তমান রসিক পাঠকদিগকে প্রভূত আনন্দের উপকরণ যোগাইয়া দিতেছে। এই কবির কবিতাগুলি এমনই জটিল, এমনই প্রহেলিকাময় যে, সেগুলি কাব্যজগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। এই পুরাতন কবি আধুনিক কবিদিগের জন্য ভাবজগতের একটি নূতন যবনিকা তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। রাজরাণীর সেই পরিত্যক্ত প্রেমিক, সেই গায়ক নাগরও আর এই সংসারে নাই। তিনি কবে মরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহার রচিত ও তৎকর্তৃক গীত গানের ছন্দ ও সুরের ঝঙ্কার আধুনিক যুগের কলানুরাগিগণের স্মৃতিপটে আজিও জাগরূক রহিয়াছে। সেই গানের ছন্দ কখনও বিজয়-উল্লাসে উল্লসিত, কখনও নৈরাশ্যে নিপীড়িত, কখনও উত্তেজনায় দীপ্ত, কখনও আবার দুঃখে ভগ্ন।

আর রাজরাণী? রাজরাণী এই ফুলের বাগানে ফুলরাণী সাজিয়া বসিয়া আছে!

আমি আর দ্বিধা করিলাম না। সেই বাগানবাড়ীর ফটকের কড়া ধরিয়া সজোরে নাড়িতে লাগিলাম। এক জন বালক ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। বালকের বয়স অনুমান ১৮ বৎসর, তাহার হাত দুইখানি কদাকার, তাহার হাব-ভাব অমার্জ্জিত। সেই বালকের নিকট উচ্ছ্বসিত ভাষায় সেই প্রাচীনা অভিনেত্রীর গুণকীর্ত্তন ও তাহার সহিত সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিয়া আমি আমার নাম-ধাম একখানি কাগজে লিখিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, আমার নাম বোধ হয় সে জানে এবং আমার সহিত দেখা করিতে বোধ হয় সে অমত করিবে না। কারণ, আমিও আধুনিক যুগের খ্যাতনামা নটদিগের অন্যতম ছিলাম।

যুবক ভৃত্যটি আমার নামের কাগজখানি লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেল। সে আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া বৈঠকখানা-ঘরে বসাইল। ঘরটি বেশ পরিচ্ছন্ন ও রুচিকরভাবে সজ্জিত। ঘরের আসবাবগুলিও সেকেলে ধরণের। ষোড়শ-বর্ষীয়া এক জন তন্বঙ্গী ও সুমধ্যমা সুন্দরী পরিচারিকা সেই সময়ে আসবাবগুলির উপরকার আবরণ খুলিয়া লইতেছিল। তাহার কায শেষ হইলে সে চলিয়া গেল।

আমি একাই বসিয়া রহিলাম।

ঘরের দেয়ালের গায় তিনখানি চিত্র বিলম্বিত। মধ্যের ছবিখানি অভিনেত্রীর নিজের,—একটি বিখ্যাত নাটকের ভূমিকায়। তাহার ছবির এক পার্শ্বে তাহারই কবি-প্রেমিকের একখানি ছবি। অভিনেত্রীর ছবির অপর পার্শ্বের ছবিখানি তাহার গায়ক-প্রেমিকের। কবির চেহারা দোহারা, মুখখানি সুশ্রী, মাথায় দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ, মাঝখানে চেরা সীঁথি। কবির হাতে একখানি মোটা বাঁধানো গানের স্বরলিপির বহি। বহিখানি কবির নিজের গানের, নিজের দেওয়া স্বরলিপি। তাহার পরিধানে মিহি কালাপেড়ে ধুতি, গায় ফ্যাসান-দোরস্ত চুড়িদার পাঞ্জাবী, চরণে বার্ণিস করা সেলিম-সু। গায়ক মহাশয়ের কলেবর ঈষৎ স্থূল, নাদুস্‌-নুদুস্ ও ভুঁড়িযুক্ত; তাহার মুখখানিও সুন্দর, মাথায় বাবরি চুল, মাঝখানে সীঁথি, সীঁথিটি একটি পাতলা ঢাকাই মসলিনের টুপিতে অর্দ্ধাবৃত। তাহার অঙ্গে ছিটের মেরজাই, হাতে একটি বীণা। চেহারা এবং পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইল যে, গায়ক লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের অধিবাসী। অভিনেত্রী রাজরাণী, রাজরাণীর ন্যায় রূপসী, রাজরাণীর ন্যায় দৃপ্তা, রাজরাণীর ন্যায় গর্ব্বিতা ও কালোপযোগী পরিচ্ছদে সজ্জিতা। তাহার শোভন আস্যে মধুর হাস্যের রেখা। তাহার চক্ষুর্দ্বয় আকাশের মত ঈষন্নীল ও নিবিড় কৃষ্ণতার। তাহার ছবিখানি সুচিত্রিত ও মনোজ্ঞ। কবি ও গায়কের ছবি দুই-খানি কালের হাত এড়াইতে পারে নাই, একটু মলিন হইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু অভিনেত্রী রাজরাণীর ছবিখানি সম্পূর্ণ সজীব বলিয়া মনে হইতেছিল।

অভিনেত্রীর ঘরের সমস্ত জিনিস ও আসবাব-পত্র বিগত যুগের স্মৃতি উজ্জীবিত করিতেছিল। সেই স্মরণীয় যুগ, যাহার দিনগুলি ধীরে ধীরে কালের গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে, যে যুগের প্রায় সমস্ত লোকই একে একে পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। এই ঘরের জিনিষগুলি যেন তাহাদেরই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। আমি বসিয়া বসিয়া কত কি কল্পনা করিতেছিলাম, কত কি জাগ্রত স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, সহসা বৈঠকখানার এক ধারের একটি দরজা খুলিয়া এক জন কৃশাঙ্গী বর্ষীয়সী রমণী সেই গৃহে প্রবেশ করিল। রমণী নিতান্ত ক্ষীণা ও নিতান্ত বৃদ্ধা। তাহার মস্তকের কেশগুলি রজতের ন্যায় শুভ্র, তাহার ভ্রূযুগল ধবধবে সাদা। তাহার চলন ক্ষুদ্র শুভ্র মূষিকের ন্যায় ক্ষিপ্র, সতর্ক ও প্রচ্ছন্ন।

রমণী দূর হইতে আমাকে নমস্কার করিয়া অভিনেত্রী-সুলভ মিষ্ট ও স্পষ্ট স্বরে কহিল, "মহাশয়! আপনাকে ধন্যবাদ। আজকালকার লোকের পক্ষে এক জন গত যুগের রমণীর কথা

স্মরণ করিয়া তাহার সহিত দেখা করিতে আসাটা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়।"

এই বৃদ্ধা অভিনেত্রীর সৌজন্যে পরম আপ্যায়িত হইয়া আমি কহিলাম, "ভদ্রে! এই পথে যাইতে যাইতে এই বাড়ীখানি দেখিয়া আমি সত্য সত্যই মুগ্ধ হইয়া গেলাম। এই গৃহের স্বত্বাধিকারী কে, তাহাই জানিবার জন্য আমার প্রবল কৌতূহল জন্মিল। পথে এক জন মজুর বসিয়া পাথর ভাঙ্গিতেছিল, তাহারই মুখে আপনার নাম শুনিয়া আপনার সহিত আলাপের প্রলোভন আমি কিছুতেই এড়াইতে পারিলাম না; আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিলাম। আপনি আপনার যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী; আমি আধুনিক যুগের এক জন যশঃপ্রার্থী নট। আপনার নিকট হইতে আমার অনেক কিছু শিখিবার আছে, অনেক কিছু বুঝিবার আছে।"

সে কহিল, "মহাশয়! আপনি যেরূপ বলিলেন, সেরূপ ঘটনা আমি যত দিন এখানে আসিয়াছি, তাহার মধ্যে আজই প্রথম ঘটিল। সেই জন্য আমি আরও অধিক বিস্মিত হইয়াছি। যখন আমার ভৃত্য গিয়া আমার হাতে আপনার কার্ডখানি দিল, তখনই আমার মনে হইল যে, আমার এক জন পুরাতন অন্তরঙ্গ বন্ধু আজ অর্দ্ধশতাব্দীর পরে আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। আমি এখন একরূপ মৃত। একরূপ কেন, আমি সত্য সত্যই মৃত। কেহই আমাকে এখন স্মরণ করে না। কেহ আমার কথা মনেও একবার ভাবে না। যত দিন না আমার মৃত্যু হইবে, তত দিন এইরূপই চলিবে। আমার মৃত্যুর পরে হয় ত দুই এক দিন খবরের কাগজে আমার গুণপণা, আমার জীবনকাহিনী, আমার কার্য্যকলাপ, আমার কলানিপুণতা লইয়া খুব ব্যাখ্যানা, খুব টীকা-টিপ্পনী চলিবে। তার পরই চুপচাপ। আমারও সব শেষ।"

এই কথা বলিয়া সে একটু চুপ করিল। পরে আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "সেই দিনেরও আমার আর অধিক দেরী নাই। কয়েক মাস—কয়েক দিন—অথবা তারও চেয়ে অল্প সময়ের মধ্যে এই ক্ষুদ্রা রমণীর ক্ষুদ্র স্মৃতি ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।"

এই কথা বলিয়া সে তাহার চিত্রখানির পানে আবেগপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহারই নিজের প্রতিকৃতি যেন তাহার ঐহিক দেহের বিকৃত পরিণতি দেখিয়া ঘৃণাভরে বিদ্রূপ করিতেছিল। তার পর সে একে একে তাহার নাগর-যুগলের ছবির দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। সেই উদ্ধত বিশ্ব-অবজ্ঞাকারী কবি ও প্রত্যাদিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ যেন গর্ব্বভরে পরস্পর এই কথা বলাবলি করিতেছিল যে, "এই বৃদ্ধা কি চায়? এই ধ্বংসপ্রাপ্ত জীবটি কেন অমন করিয়া আমাদের পানে চাহিয়া আছে?"

একটি অব্যক্ত দুঃখ শল্যের ন্যায় তীব্র ও অনিরুদ্ধভাবে আমার হৃদয় বিদ্ধ করিতে লাগিল। জলের মধ্যে ডুবাইয়া দিলে শ্বাসরোধ হইয়া মানুষের যেমন ভয়ানক কষ্ট হয়, আমারও মনে সেইরূপ কষ্ট হইতে লাগিল।

আমি যেখানে বসিয়া ছিলাম, সেইখানে বসিয়া বসিয়াই দেখিতে লাগিলাম, রাজপথে সুন্দর সুন্দর বগী গাড়ী মধুপুর হইতে গিরিডি অভিমুখে যাইতেছে। গাড়ীর মধ্যে মেয়েমানুষের দল, যুবতী সুন্দরী হাস্যময়ী ঐশ্বর্য্যশালিনী ও সুখী; যুবকের দল প্রফুল্ল ও রমণীদিগের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত।

রাজরাণী আমার কটাক্ষ হইতে আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ও ম্লান হাসি হাসিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, "অতীতে ও বর্ত্তমানে এক ভাবে কেহ জীবন অতিবাহিত করিতে পারে না।"

আমি কহিলাম, "আপনার অতীত জীবন বোধ হয় খুব সুখময় ছিল?"

সে উত্তর দিল "হাঁ, মহাশয়! খুব সুখময় ও খুব মধুর। সেই জন্যই অতীতের কথা স্মরণ করিলে আমার চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া আসে।"

আমি দেখিলাম যে, সে নিজের কথা কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছে। নিপুণ অস্ত্রচিকিৎসক যেমন রোগীর ক্ষতস্থান অতি সন্তর্পণে এমন ভাবে স্পর্শ করে যে, রোগী যেন কোন বেদনা না পায়, আমিও তেমনই সতর্কভাবে তাহাকে দুই একটি প্রশ্ন করিতে লাগিলাম।

সে রঙ্গালয়ে তাহার সাফল্যের কথা বলিয়া যৌবনে কোন্ কোন্ দ্রব্যের—কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, কাহার কাহার সহিত তাহার প্রণয় বা বন্ধুত্ব ছিল, সমগ্র জীবন ধরিয়া কেমন জয়ডঙ্কা বাজাইয়া সে সংসারে চলিয়াছিল, সেই সকল কথা বলিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ, প্রকৃত সুখ কে বিধান করিয়াছিল? রঙ্গালয়?"

সে তাড়াতাড়ি কহিল, "না।"

আমি ঈষৎ হাসিলাম। সে তাহার যুগল প্রেমিকের প্রতিকৃতির পানে বিষাদপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া তর্জ্জনীনির্দ্দেশে তাহাদিগকে দেখাইয়া কহিল, "ঐ দুই জন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঐ দুই জনের মধ্যে কে বেশী?"

সে উত্তর করিল, "দুই জনেই তুল্যভাবে। এখন আমার এই পরিণত বয়সের স্মৃতিতে আমি কাহার জন্য কাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, সে সম্বন্ধে ভ্রম হয়। যখনই সে কথা আমার মনে হয়, তখনই আমার পরিত্যক্ত প্রেমিকের অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া আমি নিদারুণ অন্তর্দ্দাহ ও অনুশোচনা অনুভব করি।"

আমি কহিলাম, "তাহা হইলে আপনার সুখবিধানের কর্ত্তা ইঁহারা নহেন—আপনি নিজে, আপনার ভালবাসাই ইহার নিয়ন্তা, উঁহারা আপনার সেই ভালবাসারই ব্যাখ্যাকার মাত্র।"

রাজরাণী কহিল, "তাই বটে। উঁহারা দুই জনেই ভালবাসার ব্যাখ্যাকার বটে; কিন্তু ঐ দুজনের মত নিপুণ ব্যাখ্যাকার আমি আর দেখি নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি ঠিক বলিতে পারেন যে, ইহারা না হইয়া অন্য এক জন সাদাসিদে লোক যদি তাহার সমস্ত প্রাণ, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত জীবন, সমস্ত সত্তা দিয়া আপনাকে ভালবাসিত, তাহা হইলে আপনি অধিকতর সুখী হইতেন না? এই দুই জনকে—গায়ক ও কবি, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী, মূর্খ ও বিদ্বান্ দুই জন ঘোরতর পরস্পরবিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বীকে

সর্ব্বস্ব দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, সেইরূপ তাহাকে ভালবাসিতে পারিতেন।"

যে স্বরের কম্পন শ্রোতার অন্তরের অন্তস্তলে গিয়া প্রবেশ করে, সেই যুবতীসুলভ মিষ্ট স্পষ্ট স্বরে রাজরাণী কহিল, "না, মহাশয়, না। অন্য কেহ আমাকে অধিকতর ভালবাসিতে পারিত বটে, কিন্তু এই দুই জন যেমন ভাবে আমার প্রতি তাহাদের ভালবাসার অভিব্যক্তি দেখাইয়াছিল, অন্য কেহ কি তেমন দেখাইতে পারিত? আহা! তাহারা যেমন আমার উদ্দেশে ভালবাসার কবিতা রচনা করিয়া, ভালবাসার গীত গাহিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া গিয়াছে, আর কেহ কি তেমন পারিত? কি ভয়ঙ্কর, কি উৎকট, কি মদির ভালবাসার নেশায় তাহারা আমাকে উন্মত্ত করিয়া দিয়াছিল! সুরের মধ্যে ও ছন্দের মধ্যে যে কি শক্তি লুক্কায়িত আছে, তাহা এই দুই জন যেমন বুঝিত, জগতে আর কেহ তেমন বুঝে নাই, বুঝিবে না। মহাশয়, আমার প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন; কিন্তু আমার ধারণা এই যে, কেবল নিজের সুখের জন্য, নিজের তৃপ্তির জন্য ভালবাসিলেই যথেষ্ট হয় না। স্বরে স্বর মিলাইয়া ভালবাসিতে হয়। জগতের ভালবাসার সুরে ও ছন্দে অমরার ভালবাসার ছন্দ ও স্বর মিলাইয়া ভালবাসা চাই। এই দুই জন প্রেমিকই বিশেষভাবে জানিত, কেমন করিয়া তাহা করিতে হয়। হাঁ, হয় ত আমাদের এই ভালবাসার মধ্যে বাস্তব অপেক্ষা অবাস্তবই অধিক ছিল, কায়ার অপেক্ষা ছায়াই বেশী ছিল। হয় ত ইহা সত্য! কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে, বাস্তব বা কায়া আপনাকে জড়-জগতেই রাখে, আর অবাস্তব বা ছায়া আপনাকে আকাশে তুলে। কায়া ও ছায়ার মধ্যে এই প্রভেদ। এই দুই জনের ভালবাসা ও অন্য কোন লোকের ভালবাসার মধ্যে ইহাই পার্থক্য। অন্য কোন লোক আমাকে অধিকতর ভালবাসিতে পারিত সত্য, কিন্তু এই দুই জনের নিকট হইতেই আমি শিখিয়াছি—ভালবাসা কাহাকে বলে। এই দুই জনের নিকট হইতেই আমি নিজে অনুভব করিয়াছি যে, ভালবাসা কি মধুর। এই দুই জনের নিকট হইতেই আমি ভালবাসাকে আদর করিতে শিখিয়াছি, ভালবাসার পূজা করিতে শিখিয়াছি।"

এই কথা বলিতে বলিতে সহসা রাজরাণীর চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া আসিল। সে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত, একান্ত হতাশের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। আমি যেন তাহার কান্না দেখিতে পাইলাম না, এইরূপ ভান করিলাম ও আমার দৃষ্টি অন্যদিকে দূরে নিক্ষেপ করিলাম। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সে আবার বলিতে লাগিল,—

"দেখুন মহাশয়! প্রায় লোকেরই দৈহিক বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু আমার সেরূপ হয় নাই। আমার দেহের বয়স উনসত্তর বৎসর অতিক্রম করিয়াছে বটে, কিন্তু আমার মনের বয়স কুড়ির চেয়েও কম। এখন আপনি বুঝিতে পারিবেন যে, কেন এই ফুলরাশির মধ্যে, এই কল্পনারাজ্যে, এই স্বপ্নরাজ্যে, আমি একাকী বাস করি।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া আমাদের দুই জনের কেহই আর কোন কথাবার্ত্তা কহিলাম না।

সেই সময়ের মধ্যে সে তাহার হৃদয়াবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া লইল ও ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "যে দিন আকাশ বেশ পরিষ্কার থাকে, সেই দিন আমি সন্ধ্যাকালটা কি করিয়া কাটাই, সে কথা শুনিলে আপনি হয় ত খুব হাসিবেন। এক এক সময় আমি নিজেই সে জন্য মনে মনে লজ্জা অনুভব করি।"

সেই কথাটি কি, তাহা বলিবার জন্য আমি বারবার তাহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলাম। সে কিছুতেই তাহা বলিল না। আমি তাহার নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

সে কহিল, "এখনই উঠিতেছেন কেন?"

আমি কহিলাম, "আমি গিরিডিতে যাইয়া সান্ধ্যভোজন করিব স্থির করিয়াছি।"

সে কি যেন একটা ভয়ানক অপরাধ করিতেছে, সেইরূপ ভীতভাবে কহিল, "তাহা হইলে আপনি আমার এখানে আহার করিবেন না? আমার এখানে আজ রাত্রে আহার করিলে আমি অত্যন্ত তৃপ্তি অনুভব করিতাম।"

আমি তৎক্ষণাৎ তাহার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। সে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া তখনই তাহার পরিচারিকাকে ডাকিল ও তাহার কাণে কাণে কি আদেশ দিয়া, আমাকে সঙ্গে করিয়া তাহার বাড়ীর চারিধারে ঘুরিয়া ফিরিয়া আমাকে দেখাইতে লাগিল। একটি লম্বা খোলা বারান্দা দিয়া খাবার ঘরে যাইতে হয়। সেই বারান্দাটি টবে লাগানো ছোট ছোট ফুলের গাছ, পাতাবাহারের গাছ ও লতানে ফুলের গাছে পূর্ণ। বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছোট ছোট পাহাড়ের একটি দীর্ঘ কামিনীপুষ্প-বীথি আমার নিকট অতি মনোরম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই বীথির সর্ব্বশেষ প্রান্তে, একখানি নীচু আসন ফুলগাছের ও লতাপাতার জঙ্গলে প্রায় আচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইল। সেই আসনটির অবস্থা দেখিয়া আমার মনে হইল যে, কেহ [illegible] সেইখানটিতে প্রায়ই যাপন করে।

তার পর আমরা বাগানে প্রবেশ করিয়া ফলের গাছ [illegible] দেখিতে লাগিলাম। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। আজিকার সন্ধ্যা—সেইরূপ একটি উষ্ণ মৌন শান্ত সন্ধ্যা—[illegible] সন্ধ্যায় মাটীর ভিতরকার সমস্ত সৌরভটুকু পর্য্যন্ত টানিয়া [illegible] করে। যখন আমরা আহার করিতে বসিলাম, তখন বেশ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। রাত্রি ৮টার সময় আমরা আহারে বসিলাম। আমাদের আহার্য্য উপাদেয় ও আহারকাল দীর্ঘ হইয়াছিল। নানারূপ কথাবার্ত্তায় ক্রমেই আমাদের পরস্পরের পরস্পরের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও সমপ্রাণতা বর্দ্ধিত হইয়া প্রগাঢ় সৌহৃদ্যে পরিণত হইল। অত্যধিক আবেগবশে সে প্রাণ খুলিয়া আমাকে তাহার রহস্যময় জীবনের অনেক গুপ্ত [illegible] বলিয়া ফেলিল।

সে কহিল, "চলুন, আমরা বাহিরে গিয়া একটু চন্দ্রা[illegible] বসি। নির্ম্মল পূর্ণিমার চাঁদ আমি বড় ভালবাসি। [illegible] কারণ এই যে, জীবনে আমি যত আনন্দ উপভোগ করি[illegible] চাঁদই আমার সে সকলের একমাত্র সাক্ষী। আমার [illegible] যে, সেই সমস্ত সুখময় স্মৃতি যেন ঐ চাঁদের মধ্যে [illegible] রহিয়াছে। চাঁদ দেখিলেই সেই সব কথা আমার মনে [illegible]

এখনও মাঝে মাঝে—মেঘমুক্ত আকাশতলে—একটি কৌতুক-পূর্ণ দৃশ্য রচনা করিয়া—আমি তাহাই দেখি—সে যে কি সুন্দর তামাসা!—না—না—আপনাকে তাহা বলিব না—আপনি হয় ত তাহা শুনিয়া আমাকে উপহাস করিবেন—আপনাকে সে কথা বলিতে, সেই দৃশ্য দেখাইতে আমার সাহস হয় না—না, না—কিছুতেই না।"

সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। আমি তাহার হাত দুই-খানি আমার হাতে লইলাম—তাহার সেই ক্ষুদ্র হাত দুইখানি অতি শীর্ণ, অতি পাতলা ও অতিশয় শীতল। তাহার হাত দুইখানি আমার হাতে লইয়া, একখানির পর আর একখানিতে আমি অজস্র চুম্বন করিলাম, ঠিক তেমনই প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত আমি অভিনেত্রী রাজরাণীর হাত দুইখানি চুম্বন করিলাম, যে অনুরাগের সহিত তাহার কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ নাগর-যুগল এক দিন তাহা চুম্বন করিয়াছিল। সে মর্ম্মস্পৃষ্ট হইল বটে, কিন্তু তখনও ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে আমার দিকে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসিল, "আপনি সত্য বলুন, আমাকে পরিহাস করিবেন না ত?"

আমি কহিলাম, "শপথ করিতেছি, পরিহাস করিব না।"

সে কহিল, "আচ্ছা। তাহা হইলে আমার সঙ্গে আসুন।"

এই কথা বলিয়া রাজরাণী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার ফিরোজা রঙ্গের পোষাক-পরা বালক ভৃত্য তাহার চেয়ারখানি সরাইয়া রাখিল। সেই সময় রাজরাণী ভৃত্যের কাণে কাণে কি কথা কহিল। ভৃত্য উত্তর দিল, "হাঁ বিবি। এখনই।"

রাজরাণী আমার হাত ধরিয়া আমাকে বারান্দায় লইয়া গেল। বারান্দা হইতে কামিনী-বীথিটি বড়ই সুন্দর দেখাইতে-ছিল। চাঁদ আকাশে অনেক দূর উপরে উঠিয়াছিল—পূর্ণিমার চাঁদ। তাহার শুভ্র কৌমুদীগলিত রজতধারার ন্যায় সেই কামিনী-কুঞ্জের কঙ্করময় পথটি প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছিল। কুসুমিত কামিনীফুলের গাছগুলির অর্দ্ধ-গোলাকৃতিভাবে ছাঁটা-শিরোপরে চাঁদের জ্যোৎস্না পড়িয়াছিল। সেই গাছগুলির কৃষ্ণবর্ণ চিক্কণ পত্রগুচ্ছের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকী পোকা ক্ষুদ্র নক্ষত্রের ন্যায় মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমাভিনয়ের উপযোগী কি সুন্দর দৃশ্য।

উল্লসিত কণ্ঠে সে বলিল, "আপনি এখনই একটি মনোরম দৃশ্য দেখিতে পাইবেন।" পাশাপাশি দুইখানি সুকোমল গদিযুক্ত চেয়ার সজ্জিত ছিল। আমি একখানিতে উপবিষ্ট হইলাম। রাজরাণী আমার পার্শ্বের চেয়ারখানিতে আসিয়া বসিল। সে কহিল, "এই সকল জিনিষই হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিয়া আমাকে এত আকুল করিয়া তুলে; কিন্তু এ কালের লোক আপনারা, আপনারা এ দিকে বড় খেয়াল রাখেন না। আপনারা হয় দালালী, না হয় মহাজনী, না হয় ওকালতী, টুর্নী-গিরি, ডাক্তারী অথবা চাকরী-বাকরী করেন। আপনারা আমা-দের সহিত প্রেম করা ত দূরের কথা, ভালভাবে কথাবার্ত্তাও কহিতে জানেন না—আমাদের অর্থে যাহারা প্রকৃত প্রেমিকা, তাহাদের; যাহারা শাশ্বত প্রেমদেবতার উপাসিকা, তাহাদের।"

এই কথা বলিয়া রাজরাণী আমার ডান হাতখানি তাহার বাম হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী নির্দ্দেশে কামিনী-কুঞ্জের প্রান্তদেশ দেখাইয়া উৎফুল্লভাবে কহিল, "ঐ দেখুন!"

আমি কৌতূহলাক্রান্ত ও বিস্মিতভাবে চাহিয়া দেখিলাম—দূরে কামিনীবীথির শেষ প্রান্তভাগে চন্দ্রালোকে এক জন যুবক ও এক জন যুবতী কোন কল্পিত নাটিকার নায়ক-নায়িকার সাজ-সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া পাশাপাশি হইয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের এক জন অপরের কটিদেশ বাহুপাশে আলিঙ্গিত করিয়া ধীরে ধীরে সেই উপবনপথে পরিক্রমণ করিতেছে। তাহারা বেড়া-ইতে বেড়াইতে গাছের আড়ালে গিয়া পড়িল। আমি উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতে লাগিলাম, যুবকের পরিধানে একটি সুন্দর চিক্কণ রেশমী পরিচ্ছদ, উহার কাট-ছাঁট পৌরাণিক যুগের। তাহার মস্তক অনাবৃত ও প্রচুর কুঞ্চিত কেশদামে ভূষিত। যুবতীর পরিচ্ছদও খুব জাঁকালো; তাহার কেশপাশ বেণীবদ্ধ ও সর্পীর ন্যায় তাহার পৃষ্ঠদেশে লম্বিত। বিগত যুগের আভিজাত-ঘরণীদিগের বেশ-বিন্যাস ও অঙ্গরাগাদির পদ্ধতি যেরূপ ছিল, এই যুবতীরও তাহাই।

যুবক-যুবতী বেড়াইতে বেড়াইতে কামিনী-কুঞ্জের ঠিক মাঝখানে আসিল। আমরা যেখানে বসিয়া ছিলাম, সেখান হইতে মাত্র এক শত হাত আন্দাজ দূরে পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তাহারা পরস্পর দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ হইল। যুবক অত্যধিক আবেগে তাহার প্রণয়িনীর সম্পুটিত অধরোষ্ঠে একটি দীর্ঘ তীব্র লালসো-দ্দীপক চুম্বন অঙ্কিত করিল। ইতঃপূর্ব্বে আমি এই যুবক-যুবতীকে আদৌ চিনিতে পারি নাই। এখন আমি তাহাদিগকে চিনিতে পারিলাম। যুবক রাজরাণীর সেই পরিচারক, যুবতী রাজরাণীর সেই পরিচারিকা। এই অভিনয় দেখিয়া আমার এমন ভয়ঙ্কর হাসি পাইল যে, সেই হাসি চাপিয়া রাখিতে আমার দম বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইল। ভিষকের অস্ত্রোপচারকালে রোগীর অবস্থা যেরূপ হয়, আমার অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইল। আমি অতি কষ্টে আমার দৈহিক আক্ষেপ প্রশমিত করিলাম।

যুবক-যুবতী আবার পাশাপাশি হইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে উপবনবীথির শেষ প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইল। আবার তাহাদিগকে স্বর্গলোক হইতে সমাগত অপ্সরোঽপ্সরীর মত বোধ হইতে লাগিল। তাহারা ধীরে ধীরে দূরে—আরও দূরে—সরিয়া যাইতে লাগিল এবং স্বপ্নের মত আস্তে আস্তে অন্তর্হিত হইয়া গেল। তখন সেই শূন্য কামিনী-বীথি আমার নিকট নিতান্ত নিরানন্দময় বোধ হইতে লাগিল।

আমিও তখনই সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। রাজরাণীর নিকট আমার পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া আর সেখানে বসিয়া থাকিতে আমার সাহস হইল না। এই যুবক-যুবতীর রঙ্গক্ষেত্রে পুনরাবির্ভাবের পূর্ব্বেই আমি সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম। কারণ, আমার মনে হইল যে, এই লীলা শীঘ্র থামিবে না, আরও অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিবে।

এই কৌতুকজনক অভিনয়ের মধ্য দিয়া এই প্রাচীনা অভিনেত্রী, এই বৃদ্ধা প্রেমিকা, তাহার জীবনে সংঘটিত যথার্থ অথবা কাল্পনিক সমস্ত প্রেমস্বপ্নকে ফুটাইয়া তুলিয়া গতপ্রাণ অতীতকে সঞ্জীবিত ও প্রাণময় করিয়া নিজের মনে নিজে পরম আনন্দ উপভোগ করিত।

শ্রীমনোমোহন রায়।

তিব্বত

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ইয়োমিথিনের ডাকবাংলোটি চতুষ্কোণ টিনের ঘর। তিন দিকে বারান্দা আছে। দক্ষিণদিকের বারান্দায় এবং পূর্ব্বদিকের কতক অংশে কাচের বেড়া দেওয়া। বাংলোটি উপত্যকা হইতে কিছু উচ্চ পাহাড়ের গায় অবস্থিত। ইহাতে দুইটি শয়নঘর, আহার ও উপবেশনের জন্য একখানা ঘর আছে। বাংলোর অদূরে পাকের ঘর, চাকর ও কুলীদের থাকিবার এবং ঘোড়া রাখিবার জন্য আরও দুইখানা স্বতন্ত্র ঘর আছে। যাহাতে বাতাস কোনও প্রকারে ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য প্রত্যেক ঘরে ডবল কাচের জানালা এবং জানালার সম্মুখে মোটা পশমের পর্দ্দা বিরাজিত।

ইয়োমিথিনে এক চৌকিদার ভিন্ন অন্য মানুষের বাস

চুমরী-গাই

নাই। বাংলোর নীচে উপত্যকায় কতকগুলি পাথরের চালাঘর আছে। ডাঙ্কিলার পথ গমনাগমনের উপযুক্ত হইলে চুমরী-গাইয়ের বাহকগণ ঐ ঘরে বাস করে। নদীর পারে ও পাহাড়ের গায় চুমরী-গাই দলে দলে আনন্দভরে তৃণ ভোজন করিয়া বেড়াইতেছে, দেখা গেল।

এই স্থানের বায়ুর উত্তাপ দ্বিপ্রহরে ৬০ ডিগ্রি এবং রাত্রিকালে ৩৫ ডিগ্রির নিম্নেও নামিয়া যায়। প্রাতঃকালে বায়ুর গতিবেগ অনুভূত হয় না; কিন্তু দ্বিপ্রহরের পর হইতেই ক্রমে বায়ুর গতি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অপরাহ্নে চারিদিক্ অন্ধকার করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল। রাত্রিতেও খুব বৃষ্টি হইল। তুষারস্তূপের উপর বৃষ্টি পড়িলে উহা সহজে গলিয়া যায়।

১৭ই মে প্রাতঃকালে উঠিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া আলোক চিত্র গ্রহণ করিলাম। তাহার পর আহারাদি সারিয়া ইয়োমিথিন হইতে বিদায় লইলাম। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। এমন দৃশ্য অন্যত্র দেখি কি না, জানি না। হয় ত এ জীবনে পুনরায় এই স্থানে আসিবার সুযোগ ঘটিবে না। এ জন্য ইয়োমিথিন হইতে বিদায়গ্রহণকালে মন ঈষৎ ভারাক্রান্ত হইল।

বেলা ২টার সময় লাচুং পৌছিলাম। রাস্তায় কিছু রোডোডেনড্রন্ ফুল এবং ভোজ-পত্র সংগ্রহ করিয়া লইলাম। অনেক স্থানে কৌতূহলভরে তুষাররাশির উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। আমার ভৃত্য বলিল, আমরা কলিকাতায় বরফ কিনিয়া খাই, কিন্তু এখানে দেখি, বরফের অভাব নাই। লাচুং হইতে যে ভোজ ও লিলি ফুলগাছ আনিয়াছিলাম, তাহা কুলীরা বোঝা কমাইবার জন্য আমাদের অজ্ঞাতসারে ফেলিয়া দিয়াছিল। তখন তাহা জানিতে পারি নাই।

১৮ই মে লাচুং হইতে বেলা ৯টার সময় রওনা হইল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে রাস্তায় বিলম্ব হইল। বেলা ৩টার সময় চংটংএ পৌছিলাম। গত সন

এই স্থানের ডাকবাংলো নদীর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল, আমাদের পূর্ব্ব-ব্যবস্থানুসারে অরণ্যরক্ষক ও পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগের ওভারসিয়ার মুন্সীর ঘরে আমাদের রাত্রি-বাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার বড় কামরাটি আমা-দিগকে ছাড়িয়া দিয়া তিনি ছোট কামরায় থাকিবেন। ঘরখানা টিনের, চারিদিকে কাঠের বেড়া ও পাটাতন। আমি ও শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সেই ঘরে শয়ন করিলাম। চাকর ও দ্বারবান্ যেরা বারান্দায় শয়ন করিল। কুলীরা পাথরের নীচে গর্ত্তের ভিতর রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এখান হইতে লাচেন ও থাঙ্গু যাইবার রাস্তা আছে। বৃষ্টিধারায় এবং লাচেন নদীর স্রোতোবেগে এই পথের দুই মাইল পর্য্যন্ত স্থান ধ্বসিয়া গিয়াছিল; সুতরাং এই দুই মাইল পথ অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য। রাত্রিতে আমার সামান্য জ্বর হইয়াছিল, রাস্তাও খারাপ; সুতরাং লাচেন ও থাঙ্গু যাওয়ার বাসনা পরিত্যাগ করিলাম।

১৯শে মে প্রাতঃকালে উঠিয়া সুস্থবোধ করিলাম। উত্তাপ লইয়া দেখিলাম, জ্বর নাই। মুন্সীজী আমাদিগের জন্য নিজের ঘর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কিছু বক্‌শিস্ দিলাম। তার পর আমরা ৫ মাইল দূরে অবস্থিত টুং বাংলোয় গিয়া সে দিন কাটাইলাম। বস্ত্রাদি মলিন হইয়া গিয়াছিল, সেগুলি ধৌত করিবার ব্যবস্থা করা গেল।

২০শে মে অন্ন পথ্য করিলাম। যদিও দুই দিন অন্ন পথ্য করি নাই, তথাপি কালবিলম্ব না করিয়া সিঙ্গিক বাংলোর অভিমুখে যাত্রা করা গেল। পরদিন সিঙ্গিক হইতে ডিকেচুর অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। বেলা ২৷৷০টার সময় তথায় পৌছিলাম। গণ্টকের অরণ্য বিভাগের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ভীম বাহাদুর তখন সেইখানেই ছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ হইল, লোকটি অতি ভদ্র। তিনি সিকিমের এক জন নেপালী জমীদার।

২২শে মে। অদ্য ডিকচু হইতে পুনরায় গণ্টকে পৌছিব, কাযেই আমাদের উপরে উঠিতে হইবে। ১৩ মাইল পথ আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হইবে বলিয়া তাড়াতাড়ি আহারাদির পর রওনা হইলাম। আমরা ৩টার সময় গণ্টকে পৌছিলাম। ফিরিবার সময়ও পথে অনেক বৃষ্টি পাইলাম। অদ্য রবিবার। আজ গণ্টকে হাট বসে। আমরা উহা দেখিতে গেলাম। গণ্টকের বাজার পাহাড়ের গায় একটি প্রশস্ত স্থানে অবস্থিত। চারিদিকে ঘর, মধ্যে একটি প্রাঙ্গণ। বাজার খুব বড়, প্রায় ৭০।৭৫ খানা ঘর এখানে বিদ্যমান। তন্মধ্যে মাড়োয়ারীর দোকানই অধিক, দুই চারিখানি বেহারীর দোকান দেখিতে পাওয়া গেল। ঢাকা জেলার এক জন মুসলমানের একখানা দোকানও আছে, বাকী নেপালী এবং ভুটিয়ার। মাড়োয়ারীরা চাউল, ডাল, আটা, লবণ, মসল্লা, চিনি, কেরোসিন তৈল, আলু, কাপড়, মনোহারী জিনিষ, ল্যাম্প, লণ্ঠন, চুরুট, বিড়ি, টিনের বিলাতী খাদ্য, যথা—বিস্কুট, রাই, সিক্কা ইত্যাদি বিক্রয় করে। মাড়ো-য়ারীদের মধ্যে জেট্‌মল বড়। ইঁহার দোকানকে ব্যাঙ্ক বলে। কারণ, ইনি টাকা লগ্নী করেন। সিকিম রাজ্যের সহিত ইঁহার টাকার কারবার আছে। মাড়োয়ারীরা চিরতা, এলাচ, শিলাজতু, মৃগনাভি ইত্যাদি খরিদ করিয়া কলি-কাতায় চালান দেয়। কেহ কেহ মাখন খরিদ করিয়া ঘৃতও প্রস্তুত করিয়া থাকে। সেই ঘৃত অন্যত্র চালান দেওয়া হয়। কমলালেবুও কিছু কিছু চালান হয়। কলিকাতা হইতে টিন আমদানী করিয়া গণ্টকে বিক্রীত হইয়া থাকে। দেশী মদ এবং মহুয়ার মদ দেশী লোক এবং বেহারীরা বিক্রয় করে। বিলাতী মদও সামান্য পাওয়া যায়। বাজারে কয়েকখানা চা, রুটীর দোকান। পাণ, চুরুট এবং বিড়ির দোকানও এখানে আছে। বাজারে একখানা খাবারের দোকান দেখিলাম। বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব বশতঃ বাজারে অদ্য লোক কম। কিন্তু তিন বৎসর পূর্ব্বে হাট-বারে বহু জনতা এবং বিস্তর আলগা দোকান দেখিয়াছি। বাজারে কপি, মটর, শিম, লাউ, ঝিঙ্গা, কুমড়া, আলু এবং বিস্তর সরিষা-শাক পাওয়া যায়। শাক-সব্জী, চাউল, মাখে, মনোহারী জিনিষেরও অনেক আলগা দোকান হাট-বারে আইসে। ভুটিয়া জুতা, টুপী, জামার দুই একখানা দোকান এবং ঝুটা পাথর, স্ফটিকের মালা, ঝুটা পাথরের মালার দুই একখানা দোকানও আছে। উপরের দূরবর্ত্তী পাহাড় হইতে শুষ্ক আপেল আমদানী হয়, স্থানীয় আখরোট বাজারে পাওয়া যায়। বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হইয়া গেলেও অনেক ভুটিয়া বসিয়া বসিয়া হাসি-গল্প করে। কাজী অর্থাৎ ভুটিয়া জমীদার তাহার অধীনস্থ প্রজার নিকট হইতে কাহারও খাজানা আদায় না করিতে পারিলে তাঁহাকে সিকিম

দরবারে জানাইতে হয়। সিকিম দরবার ঐ খাজনা জমীদারকে দিবার জন্য প্রথমে প্রজাকে কিছু দিনের সময় দেন। যদি নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রজা জমীদারের পাওনা খাজনা শোধ না করে, তবে ঐ সময় অন্তে সিকিম দরবার হইতে লোক দিয়া প্রজার মালপত্র বাজারে আনিয়া নীলাম করান হয়। সিকিম দরবারের পিয়ন প্রভৃতি বাজারের এক স্থানে এই ভাবে প্রজার মাল নীলাম-বিক্রয় করিতেছে দেখিলাম। বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব বশতঃ অদ্য হাট ভালরূপে বসে নাই। আমরাও বহু বিলম্বে হাটে গিয়াছিলাম, এ জন্য একমাত্র শুষ্ক বেগুন, সরিষা-শাক এবং আলু ভিন্ন অন্য কিছু তরকারী দেখিতে পাইলাম না। ভুটিয়াদের নিকট সরিষা-শাক বড় প্রিয়। সুতরাং তাহারাই পূর্ব্বে সমস্ত খরিদ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমরা আর কিছু না পাইয়া কিছু বেগুন ও আলু খরিদ করিয়া লইলাম। কিন্তু অনেক দিনের পর এই শুষ্ক বেগুনই আহারকালে উপাদেয় বলিয়া বোধ হইল।

২৩শে মে ভোর ৫টায় ঘুম হইতে উঠিলাম। এখান হইতে আমাদের তিব্বতের পথে পলিটিকাল অফিসারের নিকট হইতে পাশ লইতে হইবে। তিনি পূর্ব্বেই পত্র দ্বারা তিব্বত গমনের সম্মতি জানাইয়াছিলেন। আমাদের চাউল, আটা, ডাইল, মশল্লা ইত্যাদি প্রায়ই কমিয়া আসিয়াছিল। কবির বাক্য—"ঘৃত-লবণ-তৈল-তণ্ডুল-বস্ত্রেন্ধনচিন্তয়া সততং" ইত্যাদি। কাযেই আমরা যে ঐ সকল জিনিসের জন্য ব্যস্ত হইব, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? এই দুই কার্য্যের জন্য আমরা অদ্য গণ্টকে অপেক্ষা করিলাম। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য চাউল, দাইল, ইত্যাদি আবশ্যক জিনিষ খরিদ করিতে হাটে গেলেন। আমি সিকিমের পলিটিকাল অফিসার লেফটেনাণ্ট কর্ণেল, এফ, এস, বেলি মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য গেলাম। তিনি প্রকাশ করিলেন যে, নাথুলা গিরিবর্ত্ম এখনও সম্পূর্ণ তুষারাবৃত, কাযেই আমরা নাথুলার উপর দিয়া যাইতে পারিব না। তিনি আমাদিগকে জালাপালা গিরিবর্ত্ম দিয়া যাইবার জন্য উপদেশ দিলেন। জালাপালা নাথুলা হইতে কিছু নিম্নভাগে অবস্থিত এবং তুষারাবৃত হইলেও মাল-বোঝাই অশ্বতর চলাচলের জন্য ঐ রাস্তা দিয়া যাওয়া অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক। ইহাতে আমাদের এক দিনের রাস্তা বেশী চলিতে হইবে। কারণ, নাথুলা দিয়া ইয়াটুং পৌছিতে আমাদের তিন দিন লাগিত, এই রাস্তায় তিন দিনের স্থলে ৪ দিন লাগিবে। তদনুসারে আমি জালাপালা দিয়া যাওয়ার জন্য ইয়াটুং পর্য্যন্ত ছাড়পত্র লইলাম। ইয়াটুংকে ঐদেশী লোক শাশী বলিয়া থাকে।

এ দিকে রেসিডেন্সী অপিসের হেডক্লার্ক ইয়াটুং হইতে গিয়াংসি পর্য্যন্ত ডাক-বাংলোর পাশ দেওয়ার জন্য ইয়াটুংএ টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন। আমার সঙ্গে যে সমস্ত কুলী ছিল, তাহার মধ্যে ১১ জন কুলী তিব্বত যাইতে অস্বীকার করিল। ৪ জন মাত্র আমাদের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইল। আমাদের আসবাব বহনের জন্য সিকিমের নজঙ্গের কাজী সাহেব ৮টি অশ্বতর দিলেন। প্রত্যেক অশ্বতরের ভাড়া প্রতিরোজ ২৷৷০ টাকা হিসাবে স্থির করিলাম। আমরা দার্জ্জিলিং হইতে দুইটি চড়িবার ঘোড়া সঙ্গে লইয়াছিলাম। গণ্টক হইতে আর একটি ঘোড়া লইতে হইয়াছিল। এই ঘোড়াটি ছাড়িয়া দিয়া এখান হইতে চড়িবার জন্য একটি অশ্বতর লইলাম। মোট আমাদের ৮টি ভারবাহী অশ্বতর, দুইটি চড়িবার ঘোড়া, ১টি চড়িবার অশ্বতর, একখানা ডাণ্ডী, ৬ জন ডাণ্ডী-বেহারা, ৫ জন কুলী, ১ জন সহিস, ১ জন মেথর এবং ৩ টাকা রোজে একটি কুলীর সর্দ্দার সঙ্গে চলিল। এই কুলীর সর্দ্দার দার্জ্জিলিং হইতে বরাবর আমাদের সঙ্গে আছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ঢাকা জেলার এক জন মুসলমানের গণ্টক বাজারে একখানি মনোহারী দোকান আছে। সে আমাদের কথা শুনিয়া দেশী লোক বলিয়া আসিয়া সাক্ষাৎ করিল এবং আমাদের জিনিষ-পত্রাদি ক্রয়-ব্যাপারে অনেক সাহায্য করিল। ২৪ পরগণা-নিবাসী শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক জন ভদ্রলোক গণ্টকে পশু-চিকিৎসার ডাক্তার। সিকিম-রাজের কর্ম্মচারীর মধ্যে তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী আছেন। বাঙ্গালী যাত্রীও সেখানে খুব কম। তিনি বাঙ্গালী পাইলে ভারী যত্ন করেন এবং তাহাদিগকে সাহায্য করিতে ব্যস্ত হন। লোকটি অতীব ভদ্র। এমন কি, যাত্রীদের অসুখ-বিসুখ হইলে তাঁহার গণ্টকের নিজ বাসা-বাড়ীতেও লইয়া তাহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের নাম শুনিয়া আমাদিগকে দেখিতে আসিলেন

এবং রাত্রিতে তাঁহার বাড়ীতে আহারের জন্য আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। রাত্রিতে মুষলধারায় বৃষ্টি হইল। বাংলো হইতে তাঁহার বাড়ী প্রায় ৩।৪ মাইলের উপর। বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে ওয়াটার-প্রুফ পরিয়া, ছাতা মাথায় দিয়া, ভোজন করিতে তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। প্রায় রাত্রি ১১টার সময় বাংলোয় ফিরিয়া আসিলাম।

২৪শে মে। প্রভাতে ভগবানের নাম স্মরণ পূর্ব্বক শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়া সমাপ্ত করিলাম। জিনিষপত্র বাঁধিয়া আহারান্তে ৯৷৷০টার সময় রওনা হওয়া গেল। অদ্য আমাদের মাত্র ১১ মাইল রাস্তা যাইতে হইবে। বাংলো হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলাম। গণ্টকের প্রাসাদ বামে এবং বাজার দক্ষিণে রাখিয়া নীচের দিকে যাইতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় ৩ মাইল যাওয়ার পর পাকিয়াং ও রংপু যাইবার রাস্তার মোড়ে উপস্থিত হইলাম। আমরা রংপু রাস্তা দক্ষিণদিকে রাখিয়া পাকিয়াংএর পথ ধরিলাম।

এই সময়ে বেলা দ্বিপ্রহর। নীল আকাশে সূর্য্য উঠিয়াছে। দ্বিপ্রহরে আমরা উপর হইতে নীচে নামিলাম। সূর্য্যের উত্তাপ বড় প্রবল বোধ হইতে লাগিল; কাযেই আমরা গায়ের গরম কোট খুলিয়া ফেলিলাম এবং বৃক্ষচ্ছায়া দিয়া চলিলাম। এ দিকে দক্ষিণ এবং পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলে স্তরে স্তরে পাহাড়, পাহাড়ের উপর দিয়া মেঘ-তরঙ্গ গড়াইয়া আসিতেছে। কোন সময় বা মেঘে পাহাড় একবারে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। পাহাড় এবং মেঘের দিকে চাহিলে মনে হয়, পাহাড় এবং মেঘ যেন লুকোচুরি খেলিতেছে। কখনও পাহাড় মেঘের অন্তরালে পড়িতেছে আবার কখনও বা পাহাড় মেঘ হইতে উন্মুক্ত হইতেছে। কোন সময়ে মেঘ পাহাড়কে ঢাকিয়া বারিবর্ষণ করিতেছে। পাহাড়ে বৃষ্টি হওয়ার পর মেঘ হইতে উন্মুক্ত হইলে তাহাকে সদ্যোস্নাতা যুবতী কুলবধূর ন্যায় নীল আর্দ্র বসনে কি সুন্দরই দেখাইতেছে!

এখানে জঙ্গলের মধ্য দিয়া রংপু নদীটি অতি সুন্দর দেখাইতে লাগিল। রংপু নদী সর্পের ন্যায় লীলায়িত বক্রগতিতে পাহাড়ের উপত্যকা দিয়া দ্রুতবেগে নীচের দিকে বহিয়া চলিতেছে। নদীর বাঁকে জঙ্গল। উপর হইতে এই জঙ্গলের মধ্য দিয়া আঁকা-বাঁকা নদীটি বড়ই সুন্দর

রংপু নদী

দেখায়। কোন স্থলে জঙ্গলের মধ্য দিয়া নদী উঁকিঝুঁকি মারিতেছে; আবার কোথাও বা নদী আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি; আবার কোন স্থানে পাহাড়ের অন্তরালে নদী অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। নদীর পারে জঙ্গল এবং জঙ্গলের পর শস্যশ্যামল চাষীভূমি পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে চলিয়া আসিয়াছে। এই স্থান অনেক নিম্ন। কাযেই এখানে ধান্য, মাথৈ চাষ হয়। ধান্য-চাষের জন্য পাহাড় কাটিয়া স্তরে স্তরে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে। যেখানে শুধু পাথর, সে স্থান ছাড়িয়া মৃত্তিকা চাষ হইতেছে। ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে বড় পাথর খাড়া হইয়া রহিয়াছে। ক্ষেত্রের চারিদিকে আলিবন্ধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পাহাড়ের ঝরণা হইতে নালা কাটিয়া ক্ষেত্রে চাষের জন্য জল লওয়া হইতেছে। চাষাদের ঘর-বাড়ী মধ্যে মধ্যে বিরাজমান। কোথাও বা কয়েক ঘর চাষী এক যায়গায় একটি ছোট গ্রামের সৃষ্টি করিয়াছে। রাস্তার দুই দিকে বৃক্ষ। আমরা এই দৃশ্যের মধ্য দিয়া ক্রমে নীচের দিকে নামিতে নামিতে প্রায় ৩ হাজার ফুট নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এখানে একটি তারের পোলের দ্বারা নদীপার হইয়া উপরের দিকে উঠিতে লাগিলাম। এই সকল স্থানে প্রায়ই চাষবাস আছে। রাস্তার ধারে অনেক ঢেঁকিলতা জন্মিয়াছে। আমরা শাক খাইবার জন্য কিছু ঢেঁকিশাক উঠাইয়া লইলাম। ক্রমে উপরে উঠিতে উঠিতে প্রায় বেলা ২৷৷০টার সময় পাকিয়াং বাংলোয় পৌঁছিলাম।

পাকিয়াং ৪ হাজার ৭ শত ফুট উচ্চে অবস্থিত।

স্থানটিতে অধিক শীত নাই। পাকিয়াংয়ের বাজার দেখিতে গেলাম। পাকিয়াংএর ডাক-বাংলো হইতে পূর্ব্বদিকে একটু অগ্রসর হইলেই বাজার পাওয়া যায়। বাজারটি পূর্ব্বপশ্চিম-দিকে অবস্থিত। বাজারের চারিধারে দোকান, মধ্যে ১টি প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণটির উত্তরে একটি রাস্তা পূর্ব্বপশ্চিমদিকে চলিয়াছে। ঐ রাস্তাটি প্রাঙ্গণ হইতে ৮।৯ ফুট নিম্নভাগে অবস্থিত। রাস্তার উত্তর পারে একসারি দোকান-ঘর। সেখানে মাড়োয়ারীর দোকানই বড়। কয়েকখানা নেপালী ও ভুটিয়াদের দোকানও আছে। বাজারের পশ্চিমদিকে কয়েকঘর মাড়োয়ারী তাহাদের পরিবার লইয়া তথায় বাস করিতেছে। বাজারে সিকিমের অন্যান্য বাজারের ন্যায় চা, রুটী, মদের দোকান আছে। ভুটিয়া এবং নেপালী স্ত্রী-পুরুষ এই চা-রুটী আদির দোকান চালায়। পাণ-চুরুটের দোকানও ২।৩খানি আছে। এখানে বাজারের উপর এক জন তালুকদার আছেন, তাঁহার একখানা বড় দোকানও আছে। তাঁহার ঘরের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলাম। লোকটি নেপালী। এখন সিকিমে বাড়ী করিয়া বসবাস করিতেছেন। আমার সম্মুখে তাঁহার এক ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "ডাক্-বাংলোকে এতনা আসবাব লেকে কোন্ আয়া রে।" আমি বলিলাম, আমি আসিয়াছি। তিনি আমাকে বসিতে বলিলেন না। বাজারে একটি পোষ্ট আফিস ও অনেক চায়ের দোকান আছে। ঐ নেপালী ভদ্রলোকটি তৎপরে বাংলোয় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আমি তাঁহাকে যথোপযুক্ত আদর-অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলাম। তখন তিনি আমাদিগকে বলিলেন যে, আমাদের কিছু আবশ্যক হইলে তাঁহাকে জানাইলে তিনি তাহার বিহিত করিবেন। পাকিয়াং ডাক-বাংলোয় দুইটি শয়ন-ঘর, চারখানা নেওয়ারের খাটিয়া, একটি বসিবার ঘর, সম্মুখে দুইটি খোলা বারান্দা। ইহা ছাড়া ঘোড়ার আস্তাবল, চাকর-কুলীদের থাকিবার আলাদা ঘর, এবং পাকশালা আছে। বাংলোর চারিদিকে সুন্দর বাগান। চৌকীদারটি বাগানের জন্য যত্ন করে। বাংলো হইতে কিছু অগ্রসর হইলেই বাজার।

২৫শে মে। অদ্য আমাদের ১১ মাইল রাস্তা চলিতে হইবে এবং আরও নিম্নে আসিতে হইবে। বাজারের মধ্যের রাস্তা দিয়া চলিলাম। অদ্য রাস্তায় প্রায়ই চাষী ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ৪ মাইল অবতরণের পর তারের ঝোলান পোলের উপর দিয়া নদী পার হইলাম। সমতল উপত্যকায় আরও এক মাইল চলার পরে ক্যান্টিলিভার পুলের উপর দিয়া রংপু নদীর অপর পারে উপস্থিত হওয়া গেল। এখান হইতে একটি রাস্তা উপর দিকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত রেনফ নামক স্থানে গিয়াছে। অপরটি নদীর পার দিয়া বরাবর রঙ্গলীর দিকে চলিয়া গিয়াছে। পুলের নিকটে নদীর উভয় পারে দোকান। পূর্ব্বপারে একখানা দোকান এবং পশ্চিম-পারে দুইখানা দোকান-ঘর। দোকানে চা, রুটী, চাউল, দাইল, চিঁড়া, ভুট্টাভাজা, ছাতু ইত্যাদি পাওয়া যায়। পুলের উপর হইতে নদীটির দৃশ্য চমৎকার। ইহার স্রোত বেশী। জল কলকল নিনাদ করিয়া বেগে বড় বড় পাথর মধ্যে রাখিয়া এবং কুচা পাথরের উপর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া অপ্রতিহত গতিতে চলিয়াছে। পশ্চিমপারে স্তরে স্তরে পাহাড়ের গায় চাযের ক্ষেত্র উপর দিকে উঠিয়াছে। আমরা এই রঙ্গলী নদীর পার দিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। রাস্তা নদীর দক্ষিণ পারে উপত্যকার মধ্য দিয়া কখনও কিছু উপরে, কখনও কিছু নিম্নভাগে নদীর বাঁকে বাঁকে গিয়াছে। রাস্তার পার্শ্বে কখনও জঙ্গল, কখনও বা চাষী জমী। চাষী জমীর মধ্যে নেপালী চাষীরা খড়ের ঘর প্রস্তুত করিয়া বসবাস করিতেছে। এই সকল ক্ষেত্রে ধান্য, মাকৈ ও আলুর চাষ এবং কৃষকের বাড়ীর নিকটে ক্ষেত্রে লাউ, কুমড়া, শিম, ঝিঙ্গা, বরবটী, লঙ্কা, মরিচ, বেগুন, ডাঁটা শাক ইত্যাদি চাষ হইতেছে। নদীর উভয় পারে জঙ্গলাবৃত শৈলশ্রেণী উপরদিকে উঠিয়া গিয়াছে। আমরা রঙ্গলীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। রাস্তায় নেপালীদের নিকট হইতে কিছু ডাঁটা, কুমড়া, কুমড়ার ডগা, শিম, কাঁচা মরিচ ও বেগুন খরিদ করিলাম। আগামী পরশ্ব ২৭শে তারিখ একাদশীর উপবাস, সে জন্য কিছু পেঁপেও সংগ্রহ করিলাম। জঙ্গল হইতে কিছু লেবু লইলাম। রাস্তায় যাইতে যাইতে একপ্রকার পরগাছার সুন্দর সাদা ফুল দেখিয়া তাহা লইলাম এবং রঙ্গলীর ডাকঘর হইতে উহা বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। বেলা ৩ ঘটিকার সময় রঙ্গলী ডাক-বাংলোয় পৌঁছিলাম।

স্থানটি একটি উপত্যকা—২ হাজার ৫ শত ফুট

উচ্চে অবস্থিত। এখানে বেশ গরম, উত্তাপ রাত্রিতে ৭০ ডিগ্রী, দিনে আরও ৮।১০ ডিগ্রী বেশী। রঙ্গলী ২ হাজার ৫ শত ফুট উচ্চে হইলেও উহা একটি উপত্যকায় অবস্থিত। নদীর পূর্ব্ব পারে একটি পাহাড়ের পাদদেশে ডাক-বাংলো অবস্থিত। ডাক-বাংলোর চারিদিকে দেওয়াল,—উপরে টিনের ছাউনী এবং কাঠের ছাদ। বাংলোর দুইটি শয়ন-ঘরে চারি জনের শয়নের ব্যবস্থা আছে। একটি খাওয়ার ঘরও দেখিলাম। চাকর, কুলী ও ঘোড়ার জন্য পৃথক্ স্নানাগার আছে। রন্ধনাগারও স্বতন্ত্র। বাংলোর সম্মুখে ফুলের বাগান। বাংলোর পূর্ব্ব ও উত্তরদিক্ হইতে একটি নদী বাংলোকে বেষ্টন করিয়া পশ্চিমদিক্ দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে চলিয়া গিয়াছে। সম্মুখের রাস্তা ধরিয়া এক পুলের উপর দিয়া নদী পার

রঙ্গলী-নদীর সেতু

হইলে উত্তর-পূর্ব্বদিকে রঙ্গলীর বাজার পাওয়া যায়। বাজারের মধ্যে পাথরের পথ। রাস্তার দুই পার্শ্বে দোকান-ঘর। তাহাতে চাউল, দাইল, আলু, ছাতু, কাপড় ইত্যাদি পাওয়া যায়। বাজারে কয়েকখানা চা-রুটীর ও মদের দোকান আছে। দোকানদার মাড়োয়ারী, বেহারী ও নেপালী। বাজারে একটি ব্রাঞ্চ পোষ্ট আপিস আছে। এই রাস্তা দিয়া অশ্বতরের পৃষ্ঠে তিব্বত হইতে জালাপলা পার হইয়া বহু পশম কালিম্পংও যায়। কাযেই এখানে অশ্বতরসমূহের রাত্রিবাসের জন্য ডেরা আছে এবং পশম রাখিবার ঘরও বিদ্যমান। অশ্বতরবাহীদিগের অবস্থানের জন্যও স্বতন্ত্র ঘর আছে। অশ্বতরসমূহের ভিড়ে বাজারটি বড় অপরিষ্কার এবং দুর্গন্ধময়। এখানে মশা আছে, কাযেই রাত্রিতে মশারি ব্যবহার করিতে হয়।

২৬শে মে। অদ্য রাত্রি ৪-৩০ মিনিটের সময় ঘুম হইতে উঠিলাম এবং যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। গতকল্য যে সমস্ত তরকারী কিনিয়াছিলাম, তাহাতে আমাদের ২।১ পদ বেশী রান্না করিতে এবং আহার করিয়া রওনা হইতে ৯টা বাজিল। অদ্য আমাদের ৮ মাইল রাস্তা মাত্র চলিতে হইবে। কিন্তু ৪ হাজার ফুট উপরে উঠিতে হইবে। বাংলো হইতে বাহির হইয়া পুলের উপর দিয়া নদী পার হইয়া রঙ্গলীর বাজারের মধ্য দিয়া উহার দক্ষিণপ্রান্ত হইতে উঠিতে লাগিলাম। আজ সম্পূর্ণ পথটি 'উৎরাই।' রাস্তায় শুধু পাথর সাজান। চুণ প্রভৃতি কোনও প্রকার দ্রব্যের দ্বারা উহা দৃঢ়ীভূত নহে। পথের দুই ধারেই জঙ্গল, মধ্যে মধ্যে দুই একখানা ঘর ও চাষী জমী আছে। রাস্তার দক্ষিণদিকে পাহাড় ও বামদিকে উপত্যকা। উপত্যকায় একটি ছোট পাহাড়ে-নদী প্রবাহিতা। উপত্যকার অপর পারে আবার জঙ্গলাবৃত পাহাড় উঠিয়াছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে সিকিমরাজ হইতে যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে। ছায়াশীতল পথে যাত্রীরা গমন করে। এই রাস্তার ১।০ মাইল চলিবার পর উপত্যকার নদী ডান দিকে রাখিয়া আমরা ঘুরিয়া বামদিকে চলিলাম। আরও ১।১॥০ মাইল চলিয়া পাহাড়ের উপর কিছু পরিষ্কার স্থানে পৌঁছিলাম। এখানে কতকগুলি কৃষকের বাস এবং চাষী জমী আছে। কৃষকগণ এই সময়ে সকলেই চাষে ব্যস্ত।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রিয়নাথ রায়।
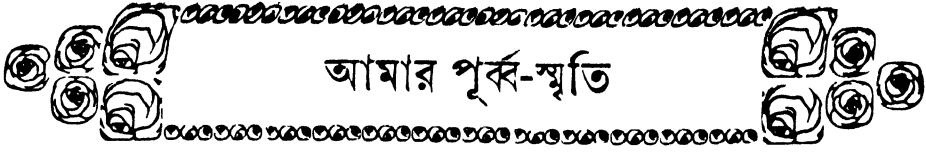
আমার পূর্ব্ব-স্মৃতি

বিচারক মানুষ, দেবতা নহে

মনুষ্য সকল অবস্থাতে ও সকল সময়েই অসম্পূর্ণ। রক্ত-মাংসে গঠিত মানবদেহ সকল অবস্থাতেই রিপুদল দ্বারা পরিচালিত। কাম-ক্রোধাদি দ্বারা পরিচালিত মনুষ্য বিচারালয়ের শোভাই সম্পন্ন করুন, বা মাঠে লাঙ্গল চালনাই করুন, ভিষক্‌-শিরোমণি হউন বা অপর মনুষ্যের রোগনির্ণয়ই করুন বা উকীল হইয়া আইনের বিশ্লেষণই করুন—কোন অবস্থাতেই তিনি সম্পূর্ণ নহেন। এই ধ্রুব সত্যটি মনে রাখিলে অনেক সময় সংসারে চলা-ফেরার বিশেষ সুবিধা হয়। মানুষ যদি বুঝে যে, সে স্বয়ং অসম্পূর্ণ জীব, এবং মনুষ্যমাত্রই দোষ-গুণসমন্বিত, সুতরাং অসম্পূর্ণ—তাহা হইলে এক জন অপরের সহিত সেই ভাবেই ব্যবহার করিবে, অধিক আশা করিবে না, কাযেই অধিক প্রতারিতও হইবে না। কোন মনুষ্যকে দেবতার স্থানে না বসাইলে হতাশ্বাস হইতে হইবে না। মানুষ দেবতা নহে, শুধু এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সংসারে চলিলে অকারণ দুঃখভোগ করিতে হয় না।

অনেক দিনের কথা বলিতেছি। প্রায় ৩০ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, আমি তখন এক জন নূতন নাম-লেখান উকীল। অনেক উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া সংসারক্ষেত্রে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছি। বলা বাহুল্য, আমি সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করি নাই যে, এক যায়গায় এক মুষ্টিমাত্র ভিক্ষা পাইলেই তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিব। ব্যবহারাজীবের পেশা গ্রহণ করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, এক জনের কাছে হাত পাতিলেই চলিবে না, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে হাত পাতিতে হইবে, লক্ষ লক্ষ লোকের মাথায় হাত বুলাইতে হইবে। তাহা না করিলে লক্ষপতি হওয়া যায় না। সেই কারণে, যদিও আমি সাধারণতঃ কলিকাতার পুলিস আদালতে ওকালতী করিতাম, তথাপি আমার ওকালতী ব্যবসার ভিক্ষাপাত্র লইয়া যে শুধু বাঙ্গালার সব স্থানে ঘুরিয়াছিলাম, তাহা নহে, বাঙ্গালার বাহিরেও অনেক স্থানে গিয়াছিলাম। আমার মনে পড়ে, আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার কিছু দিন পরে আরা জেলায় একটি ফৌজদারী কেস পাইয়াছিলাম। আমি সেই মোকর্দ্দমা বেশ ভাল করিয়া পরিচালনা করিয়াছিলাম বলিয়া পরে আরা জেলায় আরও ১০।১২টি কেস পাই। তখন আমার পরম বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের খুল্লতাত শ্রীযুক্ত তারকনাথ দত্ত আরার মুন্সেফ ছিলেন। তাঁহার বাটীতে গিয়া উঠিতাম ও সেইখানে স্নান আহার করিয়া ১০টার সময় আদালতে যাত্রা করিতাম। বেলা ৫টার মধ্যে আদালতের কায শেষ করিয়া আবার ৬টার ট্রেণে আরা ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিতাম এবং পরদিন প্রভাতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিতাম। অর্থাৎ এক দিন পাঁচ ঘণ্টা আদালতে কায করিবার জন্য দুই রাত্রি রেল-গাড়ীতে কাটাইতে হইত। তখন আমি যুবক মাত্র। বাড়ী ছাড়িয়া রেল-গাড়ীতে রাত্রিযাপনের স্পৃহা সে বয়সে থাকিতে পারে না। সব সময়েই সব ক্ষেত্রেই কৃতকার্য্য হইলে মানুষ সুখী হয় না। আমারও আরায় মোকর্দ্দমা করা বিষয়ে সেইরূপ হইয়াছিল। অর্থাৎ মোকর্দ্দমা-পরিচালনে যশঃ ও অর্থ উপার্জ্জন করিতে থাকিলেও প্রত্যেক সপ্তাহেই চারি রাত্রি নিজের বাটীর বিছানা ছাড়িয়া রেল-গাড়ীতে শয়ন—ইহা বিশেষ প্রীতিপদ ছিল না। প্রথম দুই সপ্তাহ বেশ ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু যখন এই অবস্থা দুই মাস ধরিয়া চলিল, তখন আমি একবারে উত্ত্যক্ত হইয়া পড়িলাম।

এক দিন কলিকাতা-প্রত্যাবর্ত্তনকালে সন্ধ্যায় আরা ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতেছি, হু হু করিয়া হাওয়া বহিতেছে, এক জন সহযাত্রী খবর দিল, ট্রেণ লেট আছে। আমি শুনিয়া ভাবিতে লাগিলাম, যদি কোন কারণে ট্রেণ না আসে, তাহা হইলে আমার অবস্থা কি হইবে! কত দিনে হাঁটিয়া কলিকাতায় পৌঁছিব! আর কলিকাতায় পৌঁছিব কি না, তাহারই বা স্থিরতা কোথায়? কিঞ্চিৎ অর্থের লোভে আমার স্ত্রী, পুত্র, অন্যান্য আত্মীয় ছাড়িয়া এইখানে আসিয়া—অপর পক্ষের সহিত বাগ্‌-বিতণ্ডা করিতেছি এবং নিজের প্রতি নিষ্ঠুর নির্ম্মম ব্যবহার করিতেছি। এই সামান্য পয়সার জন্য যখন এত দূর ক্লেশ সহ্য করিতেছি, আর কিছু পয়সা পাইলে হয় ত আমি

অপরের প্রতি নির্ম্মম ব্যবহার করিতে রাজী হইব, এমন কি, প্রয়োজন হইলে, মানুষ খুন করিতেও আপত্তি হইবে না। যাহা হউক, এই নিভৃত চিন্তার ফলে আমি আবার ব্রিফ লওয়া বন্ধ করিলাম। যদিও ইহার পরবর্ত্তী সময়ে মফঃস্বলে মামলার ব্রিফ লইয়াছিলাম, তাহা বছরে একবার কি দুইবার।

আমি যখন পেশার ভিক্ষাপাত্র লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য ব্যস্ত, সেই সময়ে দমদম ক্যাণ্টনমেণ্টে ক্যাপ্টেন বার্টনের আদালতে একটি মোকর্দ্দমা পাইলাম। দুই জন বেহারদেশীয় লোক পয়সার আশায় দেশ ছাড়িয়া দমদমায় আসিয়া বাস করিতেছিলেন। আমার ন্যায় দুই জনকারই উদ্দেশ্য মহান্—যেমন করিয়া হয় কিঞ্চিৎ অর্থাগম। এক জনের নাম কুমার সিং, অপরের নাম ভরত মাহাতো। ভরত মাহাতো বলেন, কুমার সিং অতিশয় অসজ্জন লোক, সে পয়সার জন্য পারে না, এমন কায নাই। সে ব্যবসার খাতিরে আইন অমান্যজনক কার্য্য করিতে প্রস্তুত। কুমার সিং ভরত মাহাতোর এই অন্যায় ব্যবহার সহ্য করিতে পারেন নাই, তাহার ফলে উভয়ের মধ্যে মারপিট এবং সেই মারপিটের ফলে ভরতের ভগবান্-দত্ত পাঁচটি আঙ্গুলের মধ্যে কনিষ্ঠ আঙ্গুল মানুষের প্রহারে ভাঙ্গিয়া যায়। ভরতের দেহের আঘাত সাংঘাতিক নহে এবং হয় ত ঐ আঘাতের জন্য আসামীকে অনেক হাকিম শমন ধরাইবার অনুমতি দিতেন না। খুব বেশী যদি হইত, তবে ম্যাজিষ্ট্রেট হুকুম দিতেন যে, পুলিস যাইয়া অপর পক্ষকে যেন সতর্ক করিয়া দেয় যে, সে ভবিষ্যতে এমন কায যেন না করে। অর্থাৎ হাকিমের হুকুম, অপর পক্ষের হাত, পা, নাক, কাণ, মাথা প্রত্যহ যেন না ভাঙ্গে। পুলিসকে এই ভাবে ধমকাইবার হুকুম প্রদান করা কোন আইন-মতাবিক নহে। তাহা না হইলেও অনেক সময়েই হাকিম আইনের অজুহাতে এই হুকুম দেন। উদ্দেশ্য, প্রাত্যহিক কার্য্য শেষ করা। শমন দিলেই একটি মোকর্দ্দমা জন্মাইল, সেই মোকর্দ্দমার বিচার হইবে, দুই পক্ষের সাক্ষী-সাবুদ লইতে হইবে, তাহা ছাড়া উকীলদের অত্যাচার আছেই। তাঁহারা যেন-তেন-প্রকারেণ দুই একটি দিন ফেলাইবেন। হয় আসামীর অসুস্থতা, সাক্ষীর অনুপস্থিতি, পাঁচ জন ভদ্রলোকের চেষ্টায় মামলার মিটমাটের সম্ভাবনা ইত্যাদি। এই পাঁচ জন ভদ্রলোকের অস্তিত্ব অনেক সময়ে শুধু উকীল বাবুদের মস্তিষ্কের মধ্যেই থাকে। তাহারা অশরীরী হইলেও মোকর্দ্দমার অনেক কাযে লাগে। প্রথম, তাহাদের সাহায্যে মোকর্দ্দমা মিটাইবার জন্য সময়ের প্রার্থনা; দ্বিতীয়, যখন মোকর্দ্দমা সত্যই মিটিয়া যায়, তখন প্রায়ই মিটাইবার দরখাস্তে লেখা থাকে, এই পঞ্চ জনের (অশরীরী হইলেও) সাহায্যে মোকর্দ্দমা মিটিল। কোন পক্ষই বলিতে চাহে না যে, সে মোকর্দ্দমা মিটাইল। পাছে ভাবে, তাহারই গরজের জন্য এই মোকর্দ্দমার যবনিকাপাত হইল।

যাহা হউক, ভরতের পক্ষ নেহাৎ কম বলশালী ছিলেন না। ভরতের ব্যবসায়ে পয়সা আছে, অতএব আজ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন কর্ম্মে, বিপদে, আপদে, সম্পদে, সুখে, দুঃখে, তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার লোকের কখনও অভাব হয় নাই।

আমার মক্কেল কুমার সিং। তাঁহার ব্যবসাও বেশ চলিতেছিল। তিনিও সম্পত্তিশালী ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহারও দলে লোকাভাব ছিল না। তাঁহারই এক জন বন্ধু আমাকে ভালরূপ জানিতেন এবং তিনি বন্ধুবৎসল হইয়া এক বন্ধুকে অপর বন্ধুর কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। অর্থাৎ তিনি আমাকে কুমার সিংয়ের উকীল নিযুক্ত করিলেন। শুনিলাম, আমাকে নিয়োগ করিবার পুর্ব্বে কুমার সিংকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার এক জন নামজাদা বড় উকীল বন্ধু আছেন। তিনি তাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন। বন্ধু হিসাবে ফি কুমার সিংকে দিতে হইবে না, তাঁহার সেই বন্ধুটি আমার ফি দিবেন। কুমার সিংয়ের প্রাণ ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিল, তিনি ভাবিলেন, কলিতে এমন বন্ধু আছে যে, পয়সা দিয়া বন্ধুর উপকার করে।

মোকর্দ্দমা শেষ হইবার পরে আমি জানিয়াছিলাম যে, আমার ও কুমার সিং উভয়ের বন্ধুটি আমার নাম করিয়া ২ শত টাকা কুমার সিংয়ের কাছে আদায় করিয়াছিলেন। তবে কার্য্যের ভিড়ে সেই টাকা হইতে অর্দ্ধেক টাকা আমাকে দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এরূপ বন্ধু অধিকাংশ লোকেরই আছে। কুমার সিংয়েরও ছিল, আমারও আছে। ইহা সত্ত্বেও আমি বন্ধুটির নিকট হইতে অনেক উপকার পাইয়াছি। অর্থাৎ তিনি চেষ্টা-চরিত্র করিয়া অনেক মক্কেল প্রথম প্রথম আনিয়াছিলেন, এবং মক্কেলের নিকট হইতে

আমার ফি ছাড়া কিছু কিছু আদায় করিয়াও লইতেন। তিনি বাস্তবিক দুই পক্ষের প্রতি বন্ধুর কায করিয়াছিলেন। আমাকে ভাল মক্কেল দিয়াছেন, আর মক্কেলকেও ভবিষ্যতের ভাল উকীল দিয়াছেন। ইহা ভবিতব্যের লিখন। "উভয় পক্ষের বন্ধুর" কোন দোষ নাই।

এখন আমি অবান্তর কথা রাখিয়া কাযের কথাই বলি, আমি ১১টার মধ্যে দমদমার ক্যাণ্টনমেণ্টে চোগা-চাপকান পরিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার মক্কেলের পক্ষে এক জন মোক্তার ছিলেন, বয়সে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের সমসাময়িক হইবেন। তাঁহার বয়সের উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিয়া মোকর্দ্দমাটি যথাসম্ভব বুঝিয়া লইলাম। মোক্তার মহাশয় আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, আমাদের মক্কেলটি অবস্থাপন্ন "ভদ্রলোক।" মোকর্দ্দমা দু দশ পেশী বেশী চলে, তাহাতে ক্ষতি নাই, তবে মামলা জেতা চাই। আমি তাঁহার উপদেশ পাইয়া বিশেষ আপ্যায়িত হইলাম এবং তাঁহাকে এবং আমাদের মক্কেলকে বেশ স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিলাম, আমার মত উকীলের হাতে ও তাঁহার মত লোকের সাহায্যে মোকর্দ্দমা কখন খারাপ হইতে পারে না। মোক্তার মহাশয় কায়মনোবাক্যে আমার সদুদ্দেশ্যের সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? ভগবান্ অন্যরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমার সদুদ্দেশ্য সত্ত্বেও আমি মামলাটি বেশী দিন চালাইতে পারিলাম না। কারণ, এতটুকু ধর্ম্মজ্ঞান ছিল, যদি তারিখ লইলে মোকর্দ্দমার ক্ষতি না হয়, তাহা হইলে তারিখ লইতে সর্ব্বদাই রাজী ছিলাম। কিন্তু যদি তারিখ লইলে মক্কেলের ফি লোকসান ছাড়া মোকর্দ্দমার অন্য কোন ক্ষতি হয়, সে অবস্থায় মোকর্দ্দমার দিন ফেলিয়া উহা চালাইতে কখনই রাজী ছিলাম না।

আমি ত গিয়া পৌছিয়াছিলাম ১০-৩০টায়। বেলা প্রায় ১১৷৷টায় কাপ্তেন বার্টন ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে আদালতে আসিলেন। সমস্ত আদালত ত্রস্ত-ব্যস্ত-সন্ত্রস্ত-ভাব ধারণ করিল। এতক্ষণ এই আদালতগৃহ ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানসমূহ যেন প্রাণহীনভাবে বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট আসিতেই সমস্ত স্থানটির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল।

হাকিম এজলাসে উপবিষ্ট হইলেই কোর্টের পিয়াদারা দরখাস্তকারীদিগকে আহ্বান করিল। ১০।১২টি দরখাস্তকারী এই আহ্বানে সাড়া দিল। হাকিম খাঁটী ইংরাজ—বিলাতী 'সাহেব।' আমি "বিলাতী সাহেব" এই কথাটি কেন ব্যবহার করিলাম, তাহার একটা বিশেষ কারণ আছে। 'সাহেব' বলিলে আজকাল কাহাকে না বুঝায়, তাহা বলা বড় শক্ত। 'সাহেব' অনেক রকম, যথা—'বাঙ্গালী সাহেব', 'চীনা সাহেব', 'পার্শী সাহেব' ইত্যাদি। আমার এক বন্ধুর গাত্রবর্ণ আমা অপেক্ষাও এক পোঁচ মলিন। তিনি·········ষ্ট্রীটে থাকিতেন। তাঁহার পুত্রের বিবাহে—"মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ" হিসাবে আমারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। আমি তাঁহার ইংরাজটোলার বাটীতে পূর্ব্বে কখনও যাই নাই। সেই পাড়ায় গিয়া এক বাটীর উড়িয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হিঁয়াপর মল্লিক সাহেব কোন্ কুঠীমে রয়তা?"

উড়িয়া ভৃত্য এক গাল হাসিয়া বলিল,—"আপ বাঙ্গালী সাহেবকো কুঠী ঢুঁড়তা?" এই বলিয়া মল্লিক সাহেবের কুঠী দেখাইয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিল।

দ্বিতীয় 'চীনা সাহেব।' এক দিন আমি, রায় বাহাদুর পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী ও সার রেজিন্যাল্ড ক্লার্ক, লালবাজারের পুলিস অফিস হইতে চিৎপুরের রাস্তার দিকে নামিতেছিলাম। ঠিক সিঁড়ির তলায় ফুটপাতের পার্শ্বে একখানি রিক্স দাঁড়াইয়া ছিল। সে আমাদিগকে দেখিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "সাহেব রিক্স।" এখানে বলা উচিত, আমাদের তিন জনেরই সাহেবী পোষাক। ইহা শুনিয়া আমরা চুপ করিয়া রহিলাম, কিন্তু সার রেজিন্যাল্ড ক্লার্ক বলিয়া উঠিলেন, "কিয়া, হামকো 'চীনা সাহেব' সমজা?"

তৃতীয় 'ইহুদী সাহেব।' যদিও তাহারা সাহেবদেরই মত থাকে, পোষাক ব্যবহার করে এবং গাত্রবর্ণও সাদা, তথাপি লোক এই শ্রেণীর 'সাহেবকে' ইহুদী সাহেব বলিয়া বর্ণনা করে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, এই হাকিম বিলাতী সাহেব।

প্রথমে তিনি অন্যান্য কাযে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রায় এক ঘণ্টা বাদে এই মামলার প্রধান সাক্ষী সিভিল সার্জ্জন ঘোড়ায় চড়িয়া আদালতের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। মক্কেল আমাকে এই সিভিল সার্জ্জনকে জেরা করিবার জন্যই লইয়া গিয়াছিল। এই ডাক্তারটি এক জন ইংরাজ।

তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের কামরায় আসিলেন। দশ মিনিটের মধ্যে মোকর্দ্দমা সুরু হইয়া গেল। নূতন উকীলের জেরা, সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। তুবড়ীর ফোয়ারার মত অনর্গল বকিতেছি। পূর্ব্ব-রাত্রিতে Lyons Medical Jurisprudence for India, Taylor's Principles and Practice of Medical Jurisprudence এবং অন্যান্য আরও কয়েকখানি মেডিক্যাল জুরিস্-প্রুডেন্স পুস্তক পাঠ করিয়া যত কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় হইতে পারে, তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলাম।

আমার মক্কেল কুমার সিং কাঠগড়ায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। অপর পক্ষে কোর্ট ইনেস্পেক্টর প্রমুখাৎ দুই জন উকীল ও দুই জন মোক্তার। কেস চালাইতে লাগিলেন, কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর। আইনের কথা কোর্ট ইনস্পেক্টর বাবুকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন উকীল বাবুর দল। আর ফোড়ন দিতেছিলেন মোক্তার-দল। এই মামলা পূর্ব্বে তিন দিন চলিয়াছিল, আজ তাহার চতুর্থ দিন। সিভিল সার্জ্জন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইলেন ; আদালতের সাক্ষীর কাঠগড়াটি বড় ভয়ঙ্কর স্থান।

উপর্য্যুপরি জেরাতে এত প্রশ্ন হয় যে, সাক্ষী বিশেষ অভ্যস্ত না হইলে আদালতে ঠিক থাকা অনেক সময়ে অসম্ভব। এমনও দেখা গিয়াছে, ভাল উকীল এবং কৌন্সলী, যাঁহাদের ভাল জেরা করার জন্য নাম আছে, তাঁহারাও যখন সাক্ষীর কাঠগড়ায় উপস্থিত হন, প্রতিপক্ষের উকীল বা কৌন্সলীর জেরায় অনেক সময়ে বাণবিদ্ধ পক্ষীর ন্যায় তাঁহারা ছটফট্ করেন।

যাহা হউক, দশ মিনিটের মধ্যেই সাহেবের ফরিয়াদীর পক্ষের এজাহার শেষ হইয়া গেল। তখন আমি জেরা করিতে সুরু করিলাম। প্রায় দেড় ঘণ্টা, পৌনে দুই ঘণ্টা জেরার পর, শুধু যে সাক্ষী উত্ত্যক্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে, হাকিমও বিশেষ উত্ত্যক্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেড় ঘণ্টা ধরিয়া আমার জেরা সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি আমাকে উদ্দেশ করিয়া ইংরাজীতে বলিলেন—"দেখুন বাবু, আপনি যত ইচ্ছা এই সাক্ষীকে জেরা করিতে পারেন, আমি তাহাতে বাধা দিব না। তবে আপনাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি যে, আপনার মক্কেল এক জন বদমায়েস।"

এই কথা শুনিয়াই আমি মনে মনে ভাবিলাম, আমার করিলেন, আমার মক্কেল বদমায়েস? যদি। আমাকে বদমায়েস মনে করিতেন, তাহা হইলে পারিতাম, কিন্তু ডাক্তারের জেরা শুনিয়া তিনি কি করিয়া আমার মক্কেলকে বদমায়েস বলিয়া স্থির করিলেন, তাহা আমি যতদূর "ন্যায়শাস্ত্র" পড়িয়াছিলাম, তাহার গণ্ডীর ভিতর ইহা পাইলাম না ; যাহাই হউক, মাথা ঠাণ্ডা করিয়া তখনই একটা রাস্তা ঠিক করিয়া লইলাম। মনে মনে ঠিক করিয়া লইলাম, ইঁহার সহিত ঝগড়া করিয়া কোন সুবিধাই হইবে না। মোকর্দ্দমা স্থানান্তরিত করিবার দরখাস্ত করিয়া আমার দুই পয়সার সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু মক্কেলের একবারেই নহে। তখন একবার ফরিয়াদীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম। চেহারা সম্বন্ধে আসামী ও ফরিয়াদীর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। উভয়েই ময়ূর ছাড়িয়া আদালতে আগমন করিয়াছেন ; উপরন্তু ফরিয়াদীর মুখে বসন্তের গোটা গোটা দাগ আছে।

আমি হাকিমপুঙ্গবের দিকে চাহিয়া বলিলাম—"হুজুর, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, তবে আমার একটি কথা বলিবার আছে। আপনি যদি ফরিয়াদীকে বেশ করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, সে-ও এক জন বদমায়েস, দু'পক্ষই মারপিট করিয়াছে, পুলিস যদি দুপক্ষকেই চালান দিত, আমার কিছুই বলিবার থাকিত না ও একযাত্রায় পৃথক্ ফল হইত না।" ম্যাজিষ্ট্রেট 'সাহেব' অমনই ফরিয়াদী ও আসামী উভয়কেই বেশ করিয়া দেখিয়া লইলেন। তার পর এক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "হাঁ বাবু, আপনি ঠিক বলিয়াছেন, ইহারা দুজনেই বদমায়েস।" তাহার পর কোর্ট ইন্‌স্পক্টারের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কোর্টবাবু, দুজনকেই চালান দেওয়া হয় নাই কেন? আমার মতে বদমায়েসীতে দুজনেই তুলামূল্য।"

আমি শুনিয়া ধড়ে প্রাণ পাইলাম। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম এবং ভাবিলাম, হাকিম ত মানুষ, তিনি ত আর দেবতা নহেন। তাঁহার যে ধারণা হইয়াছে, তাহার বিপক্ষে মত প্রকাশ করিলে তিনি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইবেন। কারণ, কোন মানুষই তাহার ধারণা যে ভুল, ইহা স্বীকার

করিতে প্রস্তুত নহে। আদালতের বিচারকরাও মানুষের গণ্ডীর মধ্যে। তার পর হাকিম বলিলেন, "কোর্টবাবু, যখন ক্যাণ্টনমেণ্টের অধিকারের মধ্যে দু'জনে মারপিট করিয়াছিল, তখন দুজনকেই চালান দেওয়া উচিত ছিল। কেবল দুর্ভাগ্যক্রমে এক জন অপরের চেয়ে বেশী চোট খাইয়াছিল। ভবিষ্যতে এ রকম ঘটনা ঘটিলে দু'পক্ষকেই চালান দিবে।" তার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বাবু, তুমি একবার বাহিরে যাও, দুপক্ষকেই পরামর্শে বুঝাইয়া বল, যাহা হউক করিয়া মামলা মিটাইয়া ফেল।" এই বলিয়া তিনি অপর পক্ষের উকীল ও মোক্তারদের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিলেন। তিনি হুকুম দিলেন, মোকর্দ্দমা দশ মিনিটের জন্য মুলতুবী রহিল। দশ মিনিট সময় দিবার সময় আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বেশী সময় পাইলে, অনেক পরামর্শদাতা জুটিবে; যত শীঘ্র পার, এর একটা ফয়শলা কর।" আমরা সকলেই বাহিরে আসিলাম। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ভাবগতিকে ফরিয়াদী ও তাহার পরামর্শ-দাতারা ভাবিয়াছিল, আসামীর ৩ মাস কি ৬ মাস জেল হইবে; কারণ, ফৌজদারী আইনের ৩২৫ ধারা, ইহার সাজা শুধু জরিমানায় হয় না, জেল অনিবার্য্য। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ফরিয়াদী মামলা মিটাইতে কিছুতেই রাজী হইল না। আমার মক্কেল দুই শত টাকা পর্য্যন্ত দিতে রাজি হইয়াছিল এবং মাপ চাহিতে রাজী ছিল। কিন্তু ফরিয়াদী বলিল, "টাকা আমি চাহি না, কুমার সিংকে আমি জেলে দিব, তবে আমার নাম।" অধিকাংশ মোকর্দ্দমা, বিশেষ ফৌজদারী মোকর্দ্দমার উৎপত্তি জেদ হইতে; খুব কম মোকর্দ্দমাই আছে, যাহা অন্যায় ব্যবহারের প্রতীকারের জন্য আদালতে আসে। কিছুদিন পূর্ব্বে আসামী-ফরিয়াদীতে বচসা হয়, আর সেই বচসার সময় আসামী ফরিয়াদীকে অমর্য্যাদা-সূচক কোন বাক্য বলে। ফরিয়াদী তাহা মনে করিয়া রাখিয়া একটা নূতন কিছু সুযোগ পাইয়া ফৌজদারী মামলা রুজু করিয়া দেয়। যে অসুবিধা অপনয়নের জন্য সে মামলা করিয়াছে, হয় ত সেটা অতি অকিঞ্চিৎকর; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? আমি যে তোমার অপেক্ষা বড়, আর ইচ্ছা করিলে তোমাকে চাপিয়া দিতে পারি, এই ভাব লইয়াই মানুষ ব্যতিব্যস্ত। তাহার উপর পরামর্শদাতাদের ফোড়ন আছে, এই সব কারণে বাহিরে আসিয়া অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও মোকর্দ্দমা মিটিল না। উহার মধ্যে যে প্রবীণ উকীলটি ছিলেন, তিনি পরামর্শ দিলেন, মোকর্দ্দমার হাওয়ার গতি কখন্ কোন্ দিকে ফেরে, কিছুই বলা যায় না। অতএব মিটাইয়া লইলে মান ইজ্জৎ দুই-ই বজায় থাকে, বিশেষ যখন হাকিমের ইচ্ছা, মামলা মিটিয়া যায়। ছোট উকীলটি ও দুই জন মোক্তার, মক্কেলকে একটু আড়ালে লইয়া গিয়া বুঝাইয়া দিল, মামলাতে তাহাদের জিত হইবারই সম্ভাবনা; আসামীর জেল অনিবার্য্য। অতএব, মামলা মিটাইবার প্রয়োজন নাই। আর আসামী যদি ছয় মাসের জন্য জেলে যায়, ফরিয়াদীর ব্যবসার বিশেষ সুবিধা হইবে; কারণ, আসামী জেলের ভিতর থাকিলে আসামীর ব্যবসার ক্ষতি অনিবার্য্য।

কোর্ট-বাবু কোন পক্ষেই বিশেষ টানাটানি করিলেন না। এমন কি, আদালতের বাহিরেও আসিলেন না, অন্য মোকর্দ্দমা করিতে লাগিলেন। দশ মিনিটের স্থানে পনর মিনিট হইয়া গেল, আমি আদালতের হুকুম অনুসারে ভিতরে আসিলাম এবং হাকিমকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম, "আমার মক্কেল ফরিয়াদীর কাছে মাপ চাহিল, খেসারতের দরুণ ২ শত টাকা দিতে রাজী হইল, অনুতপ্ত হইয়া ক্রন্দনও করিল, কিন্তু ফরিয়াদী ও তাহার পরামর্শদাতাদের বিশ্বাস, এ মামলায় আসামীর জেল অনিবার্য্য, তাহারা আসামীর শরীরের আধসের মাংস চায়। তাহার জেল না হইলে উহারা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবে না।" এই কথা শুনিয়া হাকিম ফরিয়াদী ও তাহার উকীল-মোক্তারদের দিকে ভ্রূকুটি করিয়া চাহিলেন ও আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "বাবু, আমি মোটামুটি মামলার অবস্থা বুঝিতে পারিতেছি, ফরিয়াদী চায়, আসামী অধিক দিনের জন্য জেল খাটিলে তাহার ব্যবসার সুবিধা হইবে। যাহা হউক, তুমি জের সংক্ষেপ কর, এ অবস্থায় কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা আমি বেশ জানি।"

এই কথা শুনিয়া আমি মনে মনে স্থির করিলাম এখন সুবাতাস বহিতেছে; এই হাওয়া ধরিয়া চলাই শ্রেয়স্কর। মক্কেল এবং তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয় আমি আদালতকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলিলাম, "হুজুর, কোর্ট-বাবু অতি ভদ্রলোক, তিনি মেটামিটির বিষয়ে কো রূপ বাধা দেন নাই, বরং যতদূর বুঝিলাম, তাঁহার ইচ্ছা

এই মামলা মিটিয়া যায়। কারণ, তাঁহার বিশ্বাস যে, দুপক্ষই দোষী, কিন্তু ফরিয়াদী ও তাহার পরামর্শদাতারা তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ মামলা মিটাইবে না। এই সামান্য মামলা লইয়া আমি আপনার মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিতে চাহি না। আমার আসামী ঘটনাচক্রে পড়িয়া সে যে ফরিয়াদীর আঘাতের জন্য কতকটা দায়ী, তা স্বীকার করিতেছে। আর আপনার দয়ার উপর সে আত্মসমর্পণ করিতেছে। তবে সে ইহাও বলে যে, তাহার শরীরে যে চোট আছে, তাহার জন্য ফরিয়াদী দায়ী। ঘটনাচক্রে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।"

আমি কথাগুলি বলিয়া মক্কেলের তরফ হইতে দোষ স্বীকার করিয়া বসিয়া পড়িলাম। আমি যে পন্থা ধরিলাম, তাহাতে মক্কেলের ছয় মাস সশ্রম জেল হইলেও আমার আশ্চর্য্য হইবার কিছু বিশেষ কারণ থাকিত না। আমি বসিয়া আড়-নয়নে ফরিয়াদীর ও তাহার দলবলের দিকে চাহিলাম। তাহারা কমবেশী সকলেই আহ্লাদে আটখানা। কেবল প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ছিলেন সেই বৃদ্ধ উকীলটি—তিনি গভীর জলের মাছ, তাঁহাকে দেখিলে তিনি আহ্লাদিত বা দুঃখিত, ইহা একবারেই বুঝা যায় না। তবে এটা ঠিক, তাঁহাকে দেখিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি সকল সময়েই ও সকল অবস্থাতেই স্থির, ধীর ও প্রশান্ত।

হাকিম রায় লিখিতে সুরু করিলেন। সকলেই নির্ব্বাক্। সকলেরই মনোভাব "কি হয় কি হয় রণে জয়-পরাজয়।" পাঁচ মিনিট বাদে তিনি রায় দিলেন। প্রথমেই আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন—"তুমি আমার হাতে মামলা ছাড়িয়া দিয়া বিশেষ বুদ্ধিমানের কায করিয়াছ। তোমার মক্কেলকে আমি দোষী সাব্যস্ত করিলাম; কিন্তু সকল বিষয়ে ভাবিয়া আমি তাহাকে দশ টাকা জরিমানা করিলাম ও আজ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আদালতের কার্য্য শেষ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে আদালতের নজরবন্দী থাকিবে।" তিনি যে আসনে বসিয়া ছিলেন, তাহা চারিদিকে আবর্ত্তিত হইতে পারে। খাস-কামরার দিকে উহা ঘুরাইয়া তড়াক্ করিয়া চেয়ার ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "আদালতের কার্য্য শেষ হইল।"

মোটের মাথায় আমার মক্কেল দশ টাকা অর্থ-দণ্ড দিয়া অব্যাহতি পাইলেন। আমার মক্কেলকে বদমায়েস-পদবাচ্য করিলে আমি তাহা সহ্য করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়াই কি এই সুফল ফলিল? বলা বাহুল্য, ক্যাপ্টেন বার্টনের কোর্টে আমি ইহার পর অনেকগুলি মোকর্দ্দমা পাইয়াছিলাম এবং প্রত্যেক মোকর্দ্দমায় কমবেশী সুফল ফলিয়াছিল। তবে তাঁহার কোর্টে আমার এই অসুবিধা হইয়াছিল, সদাই ভাবিতাম, যতদূর সম্ভব যেন তাঁহার সুনজরে থাকি। ভগবান্ জানেন, নিম্ন ফৌজদারী আদালতে ওকালতী করা কিরূপ কঠিন। কমবেশী ইহা সাপ-খেলানর মত। সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়, কোনরূপে যেন পদস্খলন না হয়।

শ্রীতারকনাথ সাধু।

কবে ?

আমার নয়নে তোমার নয়ন
পড়িবে কবে?
নয়নের জলে করুণা-কিরণ
ক্ষরিবে কবে?
হৃদি-ঝরণার শত ধারা মম
পড়িছে ঝরিয়া, এ যে প্রিয়তম,
তোমারি রক্ত কমল-চরণে
ঝরিবে বলে'—
হৃদয়-বেদনা তোমার পরশে
মরিবে বলে'।

আমার নয়নে তোমার নয়ন
পড়িবে কবে?
মনের তিমিরে তোমারি কিরণ
ক্ষরিবে কবে?
আঁখি-পথে আসি কিরণ তোমার
উজলিবে কবে পরাণ আমার?
আমার সাধের প্রেমের কমল
ফুটিবে কবে?—
আশার বাতাসে প্রেমের সুবাস
ছুটিবে কবে?

শ্রীদীপা চক্রবর্ত্তী।

নারী-শিক্ষা *

মতভেদ যেখানে যতই থাক, ধারা যে রকমই হোক, উদ্দেশ্যের পার্থক্য যতটাই থাকুক, পুরুষের শিক্ষা যেমন অনিবার্য্য,—নারীর শিক্ষাও তেমনই দরকার, এ কথা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আর কেহই অস্বীকার করেন না। এখন এই শিক্ষার ধারা বা বিষয়াদি লইয়াই যা কথা। অপর দেশের কথা যাহাই হোক, আমাদের দেশে নারীর শিক্ষার প্রকৃষ্ট স্থান গৃহ। সকল দিক্ হ'তে ভেবে দেখলে বাপ-মা ভাই-ভগিনী প্রভৃতি পরিজনের মধ্যে থেকে মেয়েরা যেমন নির্ব্বিঘ্নে সহজে সুন্দর শিক্ষা পেতে পারে, বাটীর বাহিরে তেমন সম্ভাবনা অল্প। গৃহকার্য্য, মিতব্যয়িতা, সেবাপরায়ণতা, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, গার্হস্থ্যনীতি, গৃহশৃঙ্খলা-নিপুণতা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার জন্য আমাদের গৃহসংসার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শিক্ষার স্থান অন্যত্র নাই। পুস্তকগত শিক্ষার মধ্যে যাহা অপূর্ণ থাকে, তাহা একমাত্র এইখানেই শিক্ষা হ'তে পারে। মেয়েদের শিক্ষা-বিষয়ে পরিজনবর্গের লক্ষ্য থাকিলে এ সব বিষয় তাহারা ভালরূপই শিক্ষা পেতে পারে। কিন্তু সাহিত্য, অঙ্ক, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ আবশ্যক বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য সেখানে সুযোগ থাকে না বলিয়াই আমাদের বাহিরের শিক্ষালয়ের সহায়তা অনিবার্য্য হয়।

এই শিক্ষালয়ের শিক্ষার বিষয়, ব্যবস্থা, সুযোগ প্রভৃতিই আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হওয়া আবশ্যক এবং সুপরীক্ষিত উন্নত প্রণালীর নারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের পাঠান যাহাতে অনায়াসসাধ্য হ'তে পারে, সেই বিষয়ে চেষ্টিত হওয়াই উচিত। শুধু উচিত বলিলেই সব বলা হয় না, আমি মনে করি, বর্ত্তমানে এই নারীশিক্ষার ব্যবস্থাই সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। যাঁরা এই কার্য্যে আত্মনিয়োজিত করেছেন, তাঁরা জাতির ধন্যবাদের পাত্র। যাঁরা এখনও স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা স্বীকার করেন না বা উহার বিপরীত কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা হয় ভ্রান্ত, না হয় হীন স্বার্থপ্রণোদিত হয়েই ব'লে থাকেন।

মেয়েরা শিক্ষিতা হন—ইহা যাঁহারা চাহেন না, হয় তাঁহারা মনে করেন, শিক্ষিতা হইলে তাহারা জ্ঞান ও বিদ্যাবতী হয়ে নিজেদের হিতাহিত বিবেচনা ক'রে তার প্রতীকার করতে চেষ্টিত হবেন এবং পুরুষ যেস্থানে তাঁদের উপর অযথা অবিচার অত্যাচার ক'রে থাকেন, তাঁদের ত্যাগ ও সহনশীলতা প্রভৃতি গুণগুলির সুযোগ নিয়ে নিজেদের সুখের চেষ্টায় তাদের নিপীড়িতা করেন, সে স্থানে তাঁরা বাধা দিবেন, পুরুষদের ক্রীড়নকস্বরূপ হয়ে আর থাক্‌তে চাইবেন না। আর না হয় একটা সংস্কারবশতঃ মনে মনে ধারণা ক'রে রেখেছেন, লেখাপড়া শিখিলে বিলাসিনী হয়ে বিবি ব'নে যাবে। গৃহসংসারে মন থাকবে না, শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনদের মানবে না, সুতরাং সংসার অশান্তির ক্ষেত্র হয়ে উঠবে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর স্বার্থান্ধ লোকদের কথা বিস্তারিত বলবার আবশ্যক নাই। যে মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য অপর মানুষকে অজ্ঞান-অন্ধকারে চিরনিমজ্জিত রাখতে ব্যস্ত, মানুষের জ্ঞান ও মনের পূর্ণতাসাধনের পথে প্রতিবন্ধক, নিজের সহধর্ম্মিণী অর্দ্ধাঙ্গিনী ব'লে যাঁদের আখ্যা দেন, তাঁদের মনুষ্যত্বের পূর্ণতাসাধনে যত্নবান্ হওয়ার পরিবর্ত্তে তাঁদের শুধু নিজেদের সংসার-পরিচালনার অস্ত্র, না হয় বড় জোর গৃহের আবশ্যক আসবাবপত্রের মত মনে করেন, তাঁদের কথা আলোচনার বহির্ভূত।

আর শেষোক্ত সম্প্রদায়ের যে আশঙ্কা, তাহাও অনেক সময় ভ্রান্ত, কিন্তু একবারে মিথ্যা নয়। এ বিষয়ে চিন্তা করবার আছে। বিরুদ্ধবাদী সরলপ্রাণ পল্লীবাসীদের বদ্ধমূল ধারণাকে সব ক্ষেত্রে একবার মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সত্যই যে শিক্ষায় নারীকে জ্ঞান ও বিবেকের পরিবর্ত্তে বিলাসিতা আনিয়া দেয়, বিলাসিতা বা পরের অনুকরণে বিবি করিয়া তুলে, সাংসারিক কর্ত্তব্যপালনে বা গুরুজনদিগের যোগ্য শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের পথে বাধা আনয়ন করে, যে শিক্ষার ফলে আমাদের বৈশিষ্ট্যকে হারাইতে হয়, সে শিক্ষা আমাদের অনাবশ্যক ও পরিত্যাজ্য উহা আমাদের শিক্ষা নহে—অশিক্ষা। এ কথা নারীর সম্বন্ধে যেমন—পুরুষের পক্ষেও তেমনই প্রযোজ্য।

মেয়েদের লেখা-পড়া শিখান অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করা অপেক্ষা ইহা এখনও কতকটা সখের বিষয়ের মত আছে। তা ছাড়া তাঁরা শিক্ষা ক'রে অর্থ উপার্জ্জন ক'রে আনেন না, সেই জন্য শিক্ষা পেতে বা শিক্ষার ফলে তাঁদের মধ্যে যদি কোন বিকৃতি আনে, তবে তাহা তাঁহাদের অসহনীয় হয়। কিন্তু তাঁহারা একবার বুকে হাত দিয়া বলুন দেখি—তাঁদের শ্রীমানরা অনেকেই বি, এ, এম, এ পাশ ক'রে আসছেন; অনেকেই অল্প হোক বেশী হোক অর্থ উপার্জ্জন করছেন, কেহ বা তা পাচ্ছেন না। যাহাই হোক, তাদের সকলের আচরণ, কথা, কায, হাবভাব সর্ব্বক্ষেত্রে কি তাঁদের সুখ-শান্তি দিচ্ছে? তা যদি না হয়

---

* ভদ্রেশ্বর ধর্ম্মতলা বালিকা-বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব ও পুরস্কার-বিতরণ সভায় সভাপতির অভিভাষণ। গত ১৭ই নভেম্বর এই সভা হয়।

তবে কি বল্‌ব, উহা কি শিক্ষার ফল নয় ? বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিতে ভূষিত হয়ে সাহিত্যে সুপণ্ডিত, অঙ্কশাস্ত্রে ধুরন্ধর অথবা বিজ্ঞান বা অর্থনীতিতে বিশারদ হয়েও অভিভাবকদের তৃপ্তির কারণ হচ্ছে না কেন ? এ বিষয় ধরতে হলে একই কথা, মেয়েদেরও যাহা—ছেলেদেরও তাহাই। উহা উভয় ক্ষেত্রেই প্রধানতঃ শিক্ষার ত্রুটি। তবে ছেলেদের বেলা অনেক সময়, দুগ্ধবতী গাভীর পদাঘাত, পার্থক্য এই যা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে সচ্চরিত্র সুসন্তানের অবশ্য অভাব নাই। তাঁদের নম্রস্বভাব, সুন্দর আচরণ, মানুষ্যোচিত কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রভৃতি সদ্গুণ সর্ব্বথা প্রশংসনীয়, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তা হলেও যা দিবালোকের মত সত্য, তা অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করা দরকার। বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও শিক্ষিতদের মধ্যে যে সংস্কারের দ্বারা এই ত্যাজ্য অংশটুকু বাদ দেওয়া যেতে পারে, তার জন্য চেষ্টিত হওয়া দেশনায়কগণের অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এ বিষয় দেশপ্রাণ সুধীগণ অনেকেই উপলব্ধি করছেন সন্দেহ নাই এবং আশা করা যায়, সময়ে প্রতীকার হ'তে পারবে।

শিক্ষা-সম্পর্কে কথায় তাহার দিক্ হতে যে ত্রুটি, সেই কথাই বললাম, কিন্তু যুবক-যুবতীদের মধ্যে সাধারণ অবাঞ্ছনীয় হাবভাব, আচরণ প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক অন্য কারণ হইতেও যে উদ্ভূত না হচ্ছে, ইহা বলা যায় না। সে কারণও যথেষ্ট বিদ্যমান আছে। যেমন এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে এমন কিছু থাকে না, যা এখানকার জন্য বিশেষভাবে সৃষ্ট। স্বাধীন দেশ ইংলণ্ডের যুবকগণ সেখানে যে সব পুস্তক প'ড়ে থাকে, এখানেও প্রায় তাই, তা হলেও সাধারণভাবে তথাকার লোকের দেশাত্মবোধ, স্বদেশপ্রীতি, স্বজাতিপ্রীতির সহিত এখানকার ঐ সকল গুণের তুলনা হয় না। ইহার জন্য যেমন বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধু দায়ী করা যায় না, অন্য কারণও সুস্পষ্ট, সেইরূপ মেয়েদের সাধারণ শিক্ষামন্দিরে পাঠিয়ে তাদের যে সব চরিত্রগত ত্রুটির আশঙ্কা থাকে, তাহার কারণও অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষালয়ের পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন-ত্রুটি বা তথাকার বিধি-ব্যবস্থা নয়, কতকটা পারিপার্শ্বিক অবস্থা আর কতকটা যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর অভাব। পারিপার্শ্বিক অবস্থা হ'তে লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে মেয়েদের মনোমধ্যে যে সব অনর্থ নিবিষ্ট হয়, তা শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নয়, যাঁদের সঙ্গে কোন দিন কিতাবি শিক্ষার সম্পর্ক হয় নাই, তাঁহারাও সে সব দোষমুক্ত হন না। উহা কতকটা দেশকালের প্রভাব, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু তাহা ছাড়াও আমাদের অপেক্ষা যাঁরা প্রবল, আমরা যাঁদের কাছে রাষ্ট্রগত পরাধীনতা মেনে নিয়েছি, তাঁরা আমাদের সেই মতই চান। এই যে আমরা চন্দননগরে বাস করি, এটা ফরাসী প্রজাতন্ত্রের অধীন। সত্য বটে, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ইহা ফরাসীজাতির মূলমন্ত্র। আপনারা বাহির হ'তে অনেকেই মনে করেন, পরাধীনতার জ্বালা আমাদের তত তীব্রভাবে অনুভব করতে হয় না, কিন্তু এটা বোধ হয় জানেন না যে, তাঁরা আমাদের সর্ব্বতোভাবেই ফরাসীভাবাপন্ন দেখতেই ইচ্ছা করেন। তা অনুমানের সহায়তায় নির্ণয় করা নহে, সত্যই যাঁরা 'রেনসাঁ' হ'তে পারেন, অর্থাৎ যাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত কতিপয় বিষয় renounce অর্থাৎ ত্যাগ করতে পারেন, তাঁরা কোন কোন বিশেষ চাকুরী ও বিশেষ নির্ব্বাচন-অধিকার প্রাপ্ত হন। এবম্প্রকার প্রলোভনও যে অনেকটা কায করে,তা বলাই বাহুল্য। লর্ড মেকলে, ট্রাভেলগান্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাজনীতিক স্পষ্ট ভাষায় বহু পূর্ব্বে যে বাণী প্রকাশ ক'রে গেছলেন, আজ তাহাই সফল হ'তে চলেছে। শাসকগণের শাসিতের প্রতি এবম্প্রকার মনোভাব থাকলে তা পূর্ণ হ'তে বাধ্য, সে কথা বলাই বাহুল্য। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা কোন প্রবলতর প্রভাব হ'তে বাঁচাইয়া চলা খুবই কঠিন।

শিক্ষয়িত্রীদের হাব-ভাব চাল-চলনও ছাত্রীদের নবীন মনের উপর একটা ছাপ দেয়, ইহা খুবই স্বাভাবিক। ছেলেরা এখানে সেখানে বেড়ায়, বহু প্রকারের লোক দেখবার সুযোগ পায়। তাদের শিক্ষকের কাছে হাব-ভাব, আদব-কায়দা, বেশ-বিন্যাস অনুকরণ করবার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয় না। বালিকা ও কিশোরীদের সে সুযোগ কম। তাহারা কোন দিকে কোন নূতনত্ব বা বৈচিত্র্য দেখিলে তাহা অনুকরণের স্পৃহা বলবতী হয়। সুতরাং তাদের কাছে আদর্শ সাবধানে স্থাপিত করতে হয়। সে দিকে দৃষ্টি রেখে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী নিয়োজিত করা উচিত। সেরূপ আদর্শচরিত্রা শিক্ষয়িত্রীর অভাব যে সর্ব্বত্রই, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

একটা কথা তুচ্ছ হলেও আমি এখানে বলি। স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে যাঁরা কথা কন, তাঁদের মধ্যে অনেককে জামা-জুতা-পরা শিক্ষয়িত্রীদের বেশভূষার প্রতি কটাক্ষ করতে প্রায় দেখা যায়। যেন সকল আপত্তির মূল এইখানেই। মহীয়সী মাতাজীর মত শুদ্ধান্তঃকরণা সুবেশা নারীকে সর্ব্বক্ষেত্রে শিক্ষয়িত্রীর আসন দিতে পারলে যে খুবই ভাল হয়, সে বিষয়ে সন্দেহই নাই। কিন্তু মাতাজীর মত বেশধারিণী মহিলার সচ্ছলতা না থাকলেও, শুদ্ধচরিতা অনেক পাওয়া যায়। তাঁহাদিগকেই এই পবিত্র ব্রত গ্রহণের জন্য নিয়োজিত করতে হবে ; কিন্তু পায়ে পাদুকা, গায়ে জামা—যাহা অন্তঃপুরমধ্যে সাধারণ পল্লীললনার দেহে দেখা যায় না, তাহা দেখে চমকাইলেই চলিবে না। অন্তঃপুরের গণ্ডীর বাহিরে এসে যাঁদের সাধারণভাবে বিচরণ করার আবশ্যক হয়, তাঁদের পক্ষে ব্লাউজ, বডি, সায়া, সেমিজ একপ্রকার অপরিহার্য্য। কাহারও কাহারও মুখে তাঁদের কাপড় পরার পদ্ধতি লক্ষ্য ক'রে শুনা যায় যে, মেয়েরা স্কুলে গিয়ে কেবল 'ফেরতা' দিয়ে কাপড় পরতে শেখে। বাউটি, কাণবালা, চন্দ্রহারের পরিবর্ত্তে ব্রাশলেট, ইয়ারিং, নেক্‌লেশে যাঁদের আপত্তি আসে না, বুঝতে পারি না, তাঁদের এতে এত আপত্তি কেন। 'ফেরতা' দিয়ে কাপড় পরার মধ্যে যে কি দোষ থাকতে পারে, অনেকবার ভেবেও তা ত আমি বুঝে উঠতে পারি নাই। আমার ত মনে হয়, উহাতে দেহের অনেকটা অংশ যে ভাবে আচ্ছাদিত হয়, আমাদের সাধারণ বাঙ্গালীর মেয়েদের পরিহিত বস্ত্রে তা হয় না। এইভাবে কাপড় পরা মেয়েদের পক্ষে বরং অধিকতর উপযোগী, সুতরাং শোভন। যদিই বালিকারা তাদের কোন শিক্ষয়িত্রীর বেশ হ'তে ইহা শিখে, তাতে দোষের ত কিছু নাই।

যে ভাবের অভিযোগটা বিরোধী দলের কাছে প্রধানতঃ শুনতে পাওয়া যায়, মোটামুটি আমি সেই দিক্‌টার প্রসঙ্গেই কিছু

বললাম। লেখাপড়া শিখিবার সঙ্গে স্থলবিশেষে মেয়েদের মধ্যে যে সময় সময় ভাবান্তর না আনে, তা আমি বলি না। উহা প্রধানতঃ শিক্ষার আত্মাভিমান হ'তে উদ্ভূত। সেটা যে আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়, এ কথা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু শিক্ষার মধ্যে যে উপকারিতা আছে, তার মূল্যের কথা ভাবলে মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারের জন্য উহার বিরোধী বা উদাসীন থাকা চলে না। শিক্ষার মধ্যে যেখানে আবিলতা আছে, সেইখানেই অনিষ্টের আশঙ্কা। সে আবিলতা অপসারিত ক'রে শিক্ষার বিষয় ও ব্যবস্থা আবশ্যকমত সংস্কৃত ক'রে নিয়ে এখন দেশমধ্যে নিত্য নব স্ত্রী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলতে হবে। সুমাতা ভিন্ন কখন সুসন্তান হ'তে পারে না। গর্ভধারিণী জননীর যে সুসন্তান নয়, সে কখন দেশমাতার সুসন্তান হ'তে পারে না। লেখা-পড়া শিখলেই যে বাবু বা বিবি হয়ে যাবে, এ কথাই নয়। এমন শিক্ষিতা নারী অনেক আছেন, যাঁরা সাধারণ পুরনারী ভিন্ন আর কিছু নন। তাঁরা তাঁদেরই মত গৃহ-সংসার চালাইয়া পরিজনবর্গের সংসারপালনের ভার অনেক লাঘব কচ্ছেন। শিক্ষার দ্বারা নারীকে যেমন সমাজ ও সংসারের অশেষ কল্যাণময়ী ক'রে তুলে, তেমন তদ্দ্বারা তাঁদের নিজ নিজ জীবনকেও মধুময় করে। সুশিক্ষা পাইলে স্নেহময়ী নারী সংসারে শান্তির আধার-স্বরূপা হইয়া থাকেন। পূর্ব্ববঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন এ দিকের অপেক্ষা অনেক বেশী। সেখানে ঘরে ঘরে শিক্ষিতা মহিলা তাঁদের নিত্য গৃহকর্ম্ম রাঁধা-বাড়া, ঘরনিকান, এমন কি, গোবর দেওয়া বা এই রকম অতি সামান্য কাযে লিপ্ত আছেন, এ দৃশ্যের অভাব নাই।

আর এ কথাটাও মনে রাখতে বলি, জগতে প্রায় সকল কাযের মধ্যেই কিছু না কিছু মন্দও লুকান থাকে। এই যে ট্রেণ, ষ্টীমার, মোটর, বিমানপোত—ইহার দ্বারা জগতে কত উপকারই না সাধিত হচ্ছে, কিন্তু উহাই কি শত শত লোকের জীবন-নাশের কারণ হচ্ছে না? অহিফেন আর্শেনিক লক্ষ লক্ষ লোকের সহস্র সহস্র ব্যাধি-বিনাশনের সহায়তা করলেও উহাই কি আবার বহু লোকের জীবন-বিসর্জ্জনের হেতু হয় না? কেরোসিন না হ'লে আমাদের আর চলে না, কিন্তু আজকাল কত নারীই না উহার সাহায্যে তাঁদের অমূল্য প্রাণ ত্যাগ কচ্ছেন। এই যে সব অমঙ্গল, এ ত সহজ কথা নয়। তা হ'লেও যেমন ঐ সকলের ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া চলে না, তেমনই যদিই বা মেয়ে-দের শিক্ষালয়ে পাঠানর ফলে কারও কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তাহা হলেও কল্যাণের অনুপাতে তার কথা মনে স্থান না দেওয়াই সমীচীন।

মোট কথা, দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে আমাদের কোন একটু শক্তিও অপচয় হ'তে দেওয়া উচিত নয়। আমাদের সমস্ত জাতির অর্দ্ধেক অংশকে অজ্ঞানের তিমিরে ডুবিয়ে রাখলে চলবে না। সময়ের সঙ্গে অনেক কিছু সংস্কৃত হয়েছে, অনেক কিছুর সংস্কার এখনও হ'তে বাকি আছে। মেয়েদের শিক্ষার মধ্যে যে সংস্কার দরকার, তা ক'রে নিয়ে তাঁদের সর্ব্বাংশে শিক্ষিতা হবার সুযোগ দিতে হবে। তাঁদের আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করতে হবে, কিন্তু বিলাসিতা, আত্মম্ভরিতা ছাড়তে হবে। পবিত্র সংসারধর্ম্ম বা সাংসারিক কর্ত্তব্য যাঁর যা—তা পালন ক'রে দেশের ও দশের সেবায় তাঁদের কাযে আত্মসমর্পণ করতে হবে। পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে মুক্তি-সাধনার কাযে তাঁদেরও অংশ নিতে হবে।

এখানকার মত স্থানে নানা প্রকার মত ও বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে একটি নারী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলা যে কতদূর কঠিন কায, তা যাঁরা সেই কাযে লিপ্ত থাকেন, তাঁরাই জানেন। এ অবস্থায় যদি সাধারণের সহানুভূতির অভাব হয়, তবে সে কার্য্যের পূর্ণতা-সাধন করা একপ্রকার অসম্ভব বললেই হয়। সুতরাং সকলেরই এ কল্যাণকর কার্য্যে সহায়তা করা আবশ্যক। আর এক কথা, কোন বিরুদ্ধ মত ও বিষয়ের বিরুদ্ধ সমালোচনা লইয়া উহা হইতে নির্লিপ্ত থাকলে তাহাকে দোষশূন্য করা কঠিন, কিন্তু তাহার সহিত মিলিত হয়ে তার কল্যাণকামনায় ত্রুটি-বিচ্যুতির স্খলন চেষ্টা করলে অচিরে শুভফল পাওয়া যায়।

আজিকার দিনে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতাপ্রসঙ্গে এখানে আমার কিছু বেশীই বলা হ'ল। স্ত্রীশিক্ষার ধারা সম্বন্ধে আমি যে ভাবে চিন্তা ক'রে থাকি, সে সম্বন্ধে কিছু ব'লে আমার বক্তব্য শেষ করব। আমাদের দেশে নারীর শিক্ষা ঠিক কিরূপ হওয়া উচিত, এ বিষয় সুধীগণ দ্বারা এখন পর্য্যন্ত একটা কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। কোন দিন হবে কি না, জানি না। আমার মনে হয়, অল্পসংখ্যক মহিলা—যাঁদের সুযোগ ও সামর্থ্য আছে, যতদূর পারেন, তাঁরা বিবিধ বিষয়ে শিক্ষালাভ করুন। উচ্চ শিক্ষায় পুরুষের শিক্ষার সহিত নারীর শিক্ষায় পার্থক্যের বিশেষ আবশ্যক আছে বলিয়া মনে করি না, কিন্তু যাদের পক্ষে সে শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া সম্ভবপর নয় বা আবশ্যক নাই, তাদের জন্য ব্যবস্থা কিছু স্বতন্ত্র হওয়া আবশ্যক এবং তাহা প্রথম হইতে হওয়াই উচিত। বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ সাধারণতঃ চৌদ্দ পনের বৎসর পর্য্যন্তই আমাদের মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়। যাহাতে সাহিত্য, অঙ্ক, ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা করিতে এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব, গার্হস্থ্যনীতি ও বিজ্ঞান, রোগি-পরিচর্য্যা, সমাজনীতি এবং বড় মেয়েদের সন্তানপালন, ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতি আবশ্যক বিষয়গুলিতে ঐ সময়ের মধ্যে মোটামুটি জ্ঞানলাভ করতে পারে, এ দিকে লক্ষ্য রেখেই শিক্ষার ব্যবস্থা কর[illegible] উচিত। হাতের লেখার দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার।

দৈহিক সুষমা-লাভ বা কিছু লেখাপড়া শিখাই শুধু নারী[illegible] চরম কাম্য নহে। উক্ত সব শিক্ষার সহিত যাহাতে উত্তরকা[illegible] তাঁহাদের জীবন-মন ভারবহ না হয়ে সুখ-শান্তির আধার হ'[illegible] পারে, সে দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। এ জন্য শিক্ষায় জন্মগত বা জাতীয় বিশিষ্টতা খর্ব্ব করে, যাতে ধ[illegible] সংস্পর্শ নাই, কর্ম্মের স্পৃহা আনে না অথবা স্বাবলম্বী কর[illegible] পারে না, এমন সব শিক্ষা তাদের পক্ষে অনুপযুক্ত, সু[illegible] পরিত্যাজ্য। সর্ব্বপ্রকারে স্বাবলম্বন-শিক্ষা মানুষমাত্রেরই কর্ত্ত[illegible] স্বাধীনতালাভের ইহাই প্রথম সোপান। যদি আবশ্যক [illegible] মেয়েরা যাতে ভদ্রভাবে তাঁদের জীবিকা অর্জ্জন করতে পা[illegible] এ শিক্ষা দেওয়া একান্ত আবশ্যক। মাত্র শিক্ষার্থ শিক্ষা ন[illegible] যাতে আবশ্যকমত জীবনে তাহা ফলপ্রসূ করতে পারেন, [illegible] দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

খুব বিশদভাবেই এখানে আমি স্বাবলম্বনের কথা বল[illegible] বহির্দৃষ্টিতে জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা দূরীকরণার্থ আজীবন পুরু[illegible]

গলগ্রহ না হয়েও যাতে মানুষের মত বেচে থাক্‌তে পারা যায়, যাতে স্বাবলম্বন দ্বারা নিজের প্রতি অমোঘ বিশ্বাস ফিরিয়ে এনে অবলা নাম ঘুচাতে পারে, তা করতে হবে। আর সেই সঙ্গে তাঁদের চিন্তারাজ্যে অর্থাৎ মনের মধ্যেও স্বাবলম্বী ক'বে তুল্‌তে হবে। নিজেদের চিন্তার ভার যাতে নিজেরা গ্রহণ করবার উপযুক্ত হ'তে পারেন, তা করতে হবে। এ বিষয়ে পুরুষের কোন সংকীর্ণতা থাকা উচিত নহে। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যায়, মেয়েদের ভাল ক'রে শিক্ষা দিলে, তাদের স্বাবলম্বী করতে পারলে পুরুষের দায়িত্ব ক'মে গিয়ে লাভ ভিন্ন ক্ষতির কথা কিছুমাত্র নাই। এখানে একটা কথা বলা দরকার, পুরুষকে যেমন এ বিষয়ে সর্ব্বসঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করতে হবে, নারীর মধ্যেও তেমনি স্বাবলম্বী হয়ে যাতে পুরুষের প্রতি বিদ্বেষভাবের স্থান না থাকে, শিক্ষা এমন ভাবেই দিতে হবে।

শিক্ষিতা-নারী-সমাজের কতকগুলিকে কেন্দ্র ক'রে সহরাঞ্চলে নারীদের মধ্যে যে একটা বিশিষ্ট আন্দোলন দিনের দিন ফুটে উঠছে, ইহার জন্য নারীকে যাঁরা যে ভাবেই দোষারোপ করুন, ইহার মূলে পুরুষের সঙ্কীর্ণতা ও অত্যাচার যে নাই, এ কথা বলতে পারি না। মাতৃত্ব, সতীত্ব, শাস্ত্র, ধর্ম্ম, সমাজ—আমরা যাহারই দোহাই দি, পুরাতন দিনের কথা বলতে পারি না, এখন যে পুরুষের দ্বারা নারীত্বের অবমাননা কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, এ কথা সুনিশ্চিত। কিন্তু দোষ-ত্রুটি যে পক্ষে যাহাই থাকুক, ইহার জন্য বতণ্ডা বাড়িয়ে বা সংঘর্ষ সৃষ্টি ক'রে লাভ কাহারও নাই। এক দল নারী স্বাধীনতালাভের জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। স্ত্রী-স্বাধীনতার অর্থ কি, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। যদি পুরুষের বন্ধনমুক্ত হওয়ার নাম স্বাধীনতা হয়, তবে ইহা নিশ্চিত, যত দিন বিধাতার চরন্তন ব্যবস্থার স্ত্রী-পুরুষসংক্রান্ত অধ্যায়ের আমূল পরিবর্ত্তন না হয়, তত দিন সে মুক্তি কখন সম্ভব হবে না। নারীকে ত্যাগ করা পুরুষের পক্ষে যেমন সম্ভবপর নয়, নারীর পক্ষেও তেমনই পুরুষের সাহচর্য্য ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। অতএব নর-নারী উভয়ে মিলিত হয়ে সমাজকে রক্ষা ও উহার উন্নতিসাধান করতে হবে। নর বা নারীর শিক্ষার বিষয় যাহাই হউক, তাহার ধারা এইরূপই হওয়া আবশ্যক, যাহা দ্বারা সমাজের কল্যাণসাধন হ'তে পারে।

মেয়েদের শিক্ষার বিষয় সম্বন্ধে বলছিলাম। ধর্ম্মবর্জ্জিত শিক্ষা আমাদের পক্ষে উপযোগী নহে, এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। কিন্তু তা ব'লে ধর্ম্মবিষয়ে সাম্প্রদায়িকতা বা গোঁড়ামি, এ উভয়েরই স্থান থাকা উচিত, নয়। এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা এইরূপই থাকা উচিত, যে—যে ধর্ম্মবিশ্বাসীই হোক, যাতে তারা নিজ ধর্ম্মে অধিকতর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, তাহা করা। ধর্ম্মবিশ্বাস কারও ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে, এমন কোন ব্যবস্থা থাকা আদৌ সঙ্গত নয়। পূজাদির পদ্ধতি বা ব্রতাদি শিক্ষা দেওয়া শিক্ষামন্দিরে সাধ্য নহে; গৃহই এ শিক্ষার উপযুক্ত স্থান। ধর্ম্মের মূল নীতিসকল ও বিবিধ ধর্ম্মের সার কথা সকল ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া চাই। ধর্ম্মের নামে কতকগুলি স্তোত্রাভ্যাস করান বা বিদ্যালয়ে পূজাদি শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ সার্থকতা আমি বুঝতে পারি না। ধর্ম্মবিষয়ে যাঁর নিজের আস্থা নাই, এমন শিক্ষয়িত্রীর দ্বারা শিক্ষা দেওয়া চলতে পারে না।

নৃত্য ও কণ্ঠ-সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা ও কোন কোন শিল্প এবং ছোট মেয়েদের মাটীর কায, তুলির কায—শিক্ষণীয় বিষয় হওয়া দরকার। আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে যে সকল গৃহশিল্পের দ্বারা ঘরে ব'সে আপন আপন চেষ্টায় যাতে কিছু সংস্থান হ'তে পারে, সে সব শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা দরকার। এ জন্য শুধু সৌখীন বা চারুশিল্পই যে গ্রহণীয়, তা নয়। বয়স ও ক্ষমতা বিবেচনা ক'রে বুননের কায, বেতের কায, লেসের কায, রংয়ের কায, কাটছাঁট প্রভৃতি বিবিধ বিষয় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। পল্লীগ্রামে আধুনিক শিক্ষাবিরোধী কোন কোন সম্প্রদায়ের কাছে মেয়েদের উলবোনা সৌখীন সেলাই করাও একটা নিন্দার বিষয়। আমি তাহা বলি না, মেয়েরা কাটছাট সাধারণ সেলাই—এ সব ত শিখবেই, অধিকন্তু সূচী-শিল্পের বর্ত্তমান রুচিকর সৌখীন কায সকল শিক্ষাও আবশ্যক, তাতে উপকারই সম্ভব। যে শিল্পের মূল্য বেশী অথচ চাহিদা আছে, সেই শিল্প-সৃষ্টিতেই লাভ অধিক, আর তা ছাড়া ভাল জিনিষ নিজ হাতে উৎপন্ন করায় একটা তৃপ্তিও আছে। আমার এমনও মনে হয়, যে সব মেয়েদের শিল্পশিক্ষার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ও আগ্রহ দৃষ্ট হয়, তাদের অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক বা অন্যবিধ শিল্প শিক্ষা দিলে ভালই হয়।

ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা বিদ্যালয়কর্তৃপক্ষের একটা অবশ্য কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে শুধু একটু স্বাস্থ্যতত্ত্ব বা শারীর-বিজ্ঞান পড়াইয়া কর্ত্তব্য শেষ করা হ'তে পারে না। তাদের জন্য তাদের উপযোগী ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বিষয়টি বেশ সহজসাধ্য নয় এবং বিদ্যালয়ের সময় দশ বা এগারটা হ'তে বারটার মধ্যে হওয়া উচিত কি না, তাহা বিশেষজ্ঞের কাছে পরামর্শ লওয়া উচিত।

বিদ্যালয়ে মেয়েদের বেশভূষা পরিচ্ছন্ন হলেও নিতান্ত সাধারণ হবে। অনাবশ্যক সাজসজ্জা একবারে নিষিদ্ধ থাকাই উচিত। মেয়েদের শিক্ষার কাল অল্প, মাত্র ছয় সাত বৎসর, অথচ শিক্ষার বিষয় নিতান্ত কম নয়, এ কথাটা সর্ব্বদা ভাল ক'রে মনে রেখে পাঠ্যতালিকা নির্দ্ধারণ করা দরকার। এ জন্য তাদের উপযোগী এবং আবশ্যকের অতিরিক্ত বাড়িয়ে যাতে সময় নষ্ট না হ'তে পারে, তা দেখা উচিত। আর এক কথা, উপযুক্ত মনে হ'লে বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা না ক'রে তাহার মধ্যেই তাকে উপরের শ্রেণীতে উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা থাকা দরকার। যে ছাত্রী যে বিষয়ে যে শ্রেণীতে পড়বার উপযুক্ত, তাকে সেই শ্রেণীতে পড়াবার উপায় করতে পারলে ভালই হয়; কিন্তু তাহা ব্যয়সাধ্য।

অনেকটা সময় আমি নষ্ট করলাম, আর দু-একটা কথা ব'লে আমার বক্তব্য শেষ করব। নারী-শিক্ষার ভার যাঁরা হাতে নিয়েছেন, তাঁদের দায়িত্ব খুব বেশী, বিশেষ এ সব স্থানে। ভালমন্দ যা-ই হোক, উপযোগী অনুপযোগী যা-ই হোক, ছেলেদের শিক্ষার চরম লক্ষ্য থাকে অনেক সময়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করা, সুতরাং তাহা পাবার উপযোগী গতানুগতিক শিক্ষার জন্য ছেলেদের একটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ার মধ্যে দায়িত্ব বেশী নাই। সাধারণ গৃহস্থ-কন্যাদের জন্য সেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা চলতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ করানই সেখানে

মুখ্য উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। পুনরায় বলি, মনে রাখতে হবে, সেখানকার শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য থাকবে সমাজে ও সংসারে শ্রী, শান্তি ও শৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। কলিকাতার মত স্থানে, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বিবিধ প্রকার শিক্ষালয় বর্ত্তমান, সেখানে অভিভাবকদের রুচি অনুসারে যেখানে ভাল মনে হবে, মেয়েদের সেখানে পাঠাতে পারেন, কিন্তু এখানে সে উপায় নাই। সুতরাং একই প্রতিষ্ঠানকে সকল শ্রেণীর লোকের মনোমত ক'রে গড়া সুকঠিন, অথচ এখানে বহুতর প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়। এই সকল কারণে এখানে পরিচালকবর্গের অসুবিধা ও দায়িত্ব তুলনায় অনেক বেশী। আরও এক কথা, এ দেশে নারী-শিক্ষা এখনও একটা সামাজিক সংস্কারের মত। সংস্কারের পথ কোন দিনই প্রায় কুসুম-সুকোমল হয় না, অতএব এখানেও যে অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হ'তে হবে, কখন কখন কাহারও অপ্রিয়ভাজন হ'তে হবে, তাতে বিচিত্রতা কিছু নাই। সুতরাং কর্ম্মিবৃন্দকে অনুরোধ করি, তাঁরা যেন ইহাতে বিচলিত বা নিরাশ না হন, ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হ'তে থাকুন।

শ্রীহরিহর শেঠ।

মেনান্দরের মহাপ্রস্থান

(ঐতিহাসিক চিত্র)

ভুবনবিখ্যাত গ্রীক্ সম্রাট আলেকজাণ্ডার সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণপূর্ব্বক ভারতের উপর পাশ্চাত্য অভিযানকারীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহার পরবর্ত্তী আক্রমণকারিগণ ভারতের বক্ষে বীরদর্পে আপতিত হইয়াছিলেন, ইতিহাসগত পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন।

আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন হিমালয়পর্ব্বতের পরপারেও ভারতের সীমা বিস্তৃত ছিল। আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও হিন্দুকুশ পর্ব্বতের সন্নিহিত প্রদেশসমূহও ভারতের অন্তর্গত ছিল। বহুল আয়াসে ও অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে এই সকল স্থানের দুর্দ্ধর্ষ অধিবাসীদের সহিত যুদ্ধ করিয়া আলেকজাণ্ডার পঞ্চনদ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং পঞ্চনদের ঝিলাম নদীতীরে রাজা পৌরব (মতান্তরে পুরু বা পোরাস)এর সহিত ভীষণ যুদ্ধে ভারতবাসীর প্রচণ্ড শক্তি ও সাহসের পরিচয় পাইয়াছিলেন। যদিও ভাগ্যচক্রে রাজা পৌরব পরাস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের দৃপ্ত বাহিনী যাহারা ইতিপূর্ব্বে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াই হেলায় জয়মাল্যে ভূষিত হইয়াছে, তাহারা এই প্রথম প্রচণ্ডশক্তির সম্মুখীন হইয়া জীবনসঙ্কটযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অবকাশ পায়। এই যুদ্ধে তাহাদের বীরহৃদয় এভাবে আর্ত্ত হইয়া পড়ে যে, আলেকজাণ্ডারের আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহারা আর ভারতের অভ্যন্তরে অগ্রসর হইতে সম্মত হয় নাই। সুতরাং আলেকজাণ্ডার বিয়াস নদী অতিক্রম পূর্ব্বক ভারতের সম্পদগর্ব্বে গৌরবান্বিত সমৃদ্ধ প্রদেশসমূহে অভিযান করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর, তাঁহার এসিয়ার রাজ্যগুলির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারই প্রিয় সেনাপতি সেলুকাস্। ইনিও দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন। ৩২৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, আর সেলুকাস্ ৩০৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে সিন্ধু নদতীরে উপস্থিত হইয়া রণভেরী নিনাদিত করিলেন, কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে আর ভারতের সৌভাগ্যবশে, তখন ভারতের সার্ব্বভৌম সম্রাট মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁহার উপদেষ্টা অদ্বিতীয় রাজনীতিক পণ্ডিত চাণক্য। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-সীমান্তে উপর্য্যুপরি কয়েকটি মহাসমর সংঘটিত হয় এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই সেলুকাস পরাজিত হন। শেষে চন্দ্রগুপ্তের রণকৌশলে তিনি আবদ্ধপ্রায় হইয়া সন্ধিপ্রার্থনা করেন। এই যুদ্ধের ফলে ও সন্ধির সর্ত্তানুসারে সেলুকাসকে, আলেকজাণ্ডারের অধিকৃত এসিয়া রাজ্যের অন্তর্গত কাবুল, হিরাট ও কান্দাহার হারাইতে হয়, ঐ তিনটি রাজ্য চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তাঁহার অধিকার উত্তরে হিন্দুকুশ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করিয়া রাজা পৌরব বা পুরুর প্রতি রাজার যোগ্য ব্যবহার করিয়া ভারতবাসীর সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেলুকাস ভারত আক্রমণ করিতে আসিয়া, সন্ধিপত্রে আপনার কন্যাকে বিজয়ী চন্দ্রগুপ্তের হস্তে সম্প্রদান করিয়া ভারতের সহিত গ্রীসের মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই রাজকন্যার গর্ভেই সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসা[র] জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মধুর সম্বন্ধস্থাপনের পর গ্রীসে[র] সহিত ভারতের সম্বন্ধও মধুরতর হইয়াছিল। তাহার ফলে গ্রীকদূত বিখ্যাত মেগাস্থিনীস সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা[য়] প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইঁহারই স্বহস্তলিখিত ভারতের তা[ৎ]কালীন বিবরণ বর্ত্তমানে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

সম্রাট বিন্দুসারের শাসনকালেও এই দুইটি রাজ্য ও জাতি[র] মধ্যে সৌহার্দ্দ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। বিন্দুসারের সভায় যে গ্রীক দূ[ত] স্থান পাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম ডিমাকো।

পরবর্ত্তী কালে যিনি আলেকজাণ্ডারের ন্যায় বিপুল সৈন্য বিরাট রণসম্ভারসহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন—তাঁহার ন[াম] মেনান্দর। এই মেনান্দর ভারতের উপর আপতিত হ[ইয়া] তৎকালে সমগ্র ভারতে কিরূপ বিভীষিকার সঞ্চার করিয়াছিলে[ন,] আলেকজাণ্ডারের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ত[িনি] প্রলয়-ঝটিকার মত কিরূপ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে ভারতভূমি প্রকম্পি[ত] করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং অবশেষে নিয়তির নির্ব্বন্ধে তাঁ[হার] পূর্ব্ববর্ত্তী দুই আক্রমণকারীর ন্যায় ভারতের সহিত কি অচ্ছে[দ্য] সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করি[লে] চমৎকৃত হইতে হয়।

১৫৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে এই মেনান্দর সেলুকাসের সাম্রাজ্য [ও] গ্রীক্-বাক্ত্রিয় রাজ্যের আধিপত্যলাভ করিয়াছিলেন। [ইঁ]

এক জন কূটরাজনীতিবিশারদ ও রণপণ্ডিত বলিয়া সাম্রাজ্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই রাজা মেনান্দর ঘোষণা করিলেন,—সমৃদ্ধ ভারতবর্ষের উপর গ্রীক আধিপত্য-প্রতিষ্ঠা, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। কেবল তাঁহার সৈন্যদলের অবাধ্যতাই তাঁহাকে তৎকালে পঞ্চনদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য করিয়াছিল। অকালমৃত্যু না হইলে তাঁহার সঙ্কল্প অপূর্ণ থাকিত না। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার সেনাপতিগণকে ভারতবর্ষ অধিকার করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কাপুরুষ সেলুকাস পরাজিত হইয়া শুধু প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই—গ্রীক্‌কন্যাকে বিজেতার হস্তে সমর্পণ করিয়া গ্রীকজাতির মস্তকে দুরপনেয় কলঙ্কের পসারা তুলিয়া দিয়াছেন। এই কলঙ্কের ক্ষালন আমাদিগকে করিতে হইবে,—ভারতবর্ষের উপর গ্রীকের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া, ভারতবাসীকে গ্রীকের অধীনতাপাশে বন্দী করিয়া, আমাদিগকেই সেলুকাসের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সঙ্কল্প আমরা কার্য্যে পরিণত করিব।

মহাসমারোহে রাজা মেনান্দর বিশাল বাহিনী গঠন আরম্ভ করিলেন। আলেকজাণ্ডারের আদর্শে দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্যগণকে সৈন্যদলভুক্ত করিয়া সৈন্যসংখ্যা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত করিতে তিনি ভারত-সীমান্তে উপনীত হইলেন। তাঁহার বিরাট আয়োজনে এবং ভীষণ সঙ্কল্পের কথা অবিলম্বে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া এমন একটা বিভীষিকার সঞ্চার করিল যে, সীমান্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতিগণ সহজেই মেনান্দরের বাধ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চনদের যে সকল তেজস্বী সাহসী রাজা, মেনান্দরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন, তাঁহারা সকলেই মেনান্দরের অপূর্ব্ব রণকৌশলে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। দেখিতে দেখিতে সমগ্র পঞ্চনদ মেনান্দরের করতলগত হইয়া পড়িল। আলেকজাণ্ডার যে বিয়াসতীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই বিয়াস বিনা বাধায় অতিক্রম করিয়া বিজয়ী মেনান্দর যখন ভারতের বিভিন্ন সমৃদ্ধ জনপদগুলি আক্রমণ করিলেন, তখন চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। সকলেই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, বিদেশী দিগ্বিজয়ী মেনান্দর বুঝি ভারতের সার্ব্বভৌম সম্রাট হইলেন! ফলতঃ ভারত আক্রমণ করিতে আসিয়া মেনান্দর বিখ্যাত সীজারের গর্ব্বিত কথার যেন পুনরুক্তি করিলেন,—'আসিলাম, দেখিলাম, জয় করিলাম!'

পঞ্চনদ হইতে অযোধ্যার সন্নিহিত সাকেত নগরী, সৌরাষ্ট্র হইতে মথুরাপুরী ও সমগ্র মধ্যভারত অধিকারপূর্ব্বক বিজয়ী মেনান্দর ভারতের রাজধানী পাটলিপুত্রের দিকে তাঁহার বিজয়-বাহিনী পরিচালিত করিলেন।

ভারতের রাজধানী পাটলিপুত্র, চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের বিশাল মগধ-সাম্রাজ্য তখন পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠা হারাইয়া নাম-গৌরবটুকু মাত্র অবলম্বন করিয়াছিল। মৌর্য্যবংশের কুলাঙ্গার বৃহদ্রথ অশোকের সমদর্শিতা বিস্মৃত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজকগণের ক্রীড়া-পুত্তলিরূপে সিংহাসনে বসিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের লাঞ্ছনাই তাঁহার রাজবিধি বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন। এই সময় ভারতের সৌভাগ্যক্রমে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন সর্ব্বদিক্‌-প্রসারিণী প্রতিভার বরপুত্র এক ক্ষণজন্মা বীর মগধ-সাম্রাজ্যের রক্ষকরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। ইতিহাসে ইনি সুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্পমিত্র নামে বিখ্যাত।

মেনান্দর যখন ভারত-আক্রমণের উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছিলেন এবং তাঁহার এই ভয়াবহ অভিযানের গুরুত্বসংবাদ ভারতবাসীকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল, পুষ্পমিত্র তখন মগধ সাম্রাজ্যের সেনাধি-নায়করূপে এক অজেয় বাহিনীগঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মেনান্দরের আগমনবার্ত্তা যখন বজ্রনাদে বিঘোষিত হইল,—পঞ্চনদ তাঁহার পদানত হইয়াছে সংবাদ আসিল, তখনও মগধ-সম্রাট বৃহদ্রথ নিশ্চেষ্ট, তাঁহার যাবতীয় উদ্যম ও উত্তেজনা তখন ধর্ম্মবিদ্বেষরূপে বিক্ষুব্ধ হইতেছিল। পুষ্পমিত্র সম্রাটকে অনুরোধ করিলেন, এই সঙ্কটসময় সম্রাট সমদর্শিতা প্রচারপূর্ব্বক জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমস্ত প্রজার হৃদয় অধিকার করুন; ভীষণ শত্রু সাম্রাজ্যের সিংহদ্বারে উপস্থিত; এ সময় সম্রাট হিন্দু বৌদ্ধ সকল প্রজাকেই অপক্ষপাতে গ্রহণ করুন। পুষ্পমিত্রের এই অনুরোধ অরণ্যে রোদন হইল, তিনি শুধু উপেক্ষিত হইলেন না, লাঞ্ছিত হইলেন। এইবার বিক্ষুব্ধ বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সমগ্র সেনাদল পুষ্পমিত্রের এরূপ বাধ্য ও বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা তাহাদের উপাস্য দেবতা-তুল্য সেনাপতির অবমাননায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। পুষ্পমিত্রও এ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। অতি অল্প আয়াসেই তিনি সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং মগধ-সাম্রাজ্যের সম্রাটরূপে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিলেও, পুষ্পমিত্র সৈনিকের ব্রত বিস্মৃত হইলেন না। বিজয়ী মেনান্দরের বীরবাহিনী তখন বিয়াসনদী অতিক্রম করিয়া বন্যার ন্যায় ভারতের সমৃদ্ধ জনপদ-সমূহের উপর আপতিত হইতেছিল। পুষ্পমিত্র বুঝিলেন, নাম-সর্ব্বস্ব হইলেও, তখনও পাটলিপুত্র মগধ-সাম্রাজ্যের রাজধানী। মেনান্দরের দুর্দ্ধর্ষ বাহিনী অবিলম্বে সমৃদ্ধ পাটলিপুত্রের অভিমুখে অগ্রসর হইবে এবং পাটলিপুত্রের পতন হইলেই সমগ্র ভারতের পতন হইবে। মেনান্দর ভারতের সার্ব্বভৌম সম্রাট হইবে।

সেনাকর্ত্তা, সেনাদলের প্রিয়, সৈনিকের ব্রত-পরায়ণ, সেনাপতি সম্রাট দৃপ্তস্বরে দেশের এই শোচনীয় অবস্থার কথা তাঁহার সেনাদলে প্রচার করিয়া দিলেন। মগধ সাম্রাজ্যের গৌরবরক্ষার জন্য সম্রাট প্রত্যেক সেনাকে, প্রত্যেক সাহসী প্রজাকে শেষ রক্ত-বিন্দু উৎসর্গ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। মগধসীমান্তে সম্রাট সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া সৈন্যস্থাপন করিলেন। বিজয়-গর্ব্বে প্রমত্ত বিজয়ী মেনান্দর তাঁহার অপ্রতিহতশক্তিসম্পন্ন অজেয় বাহিনী লইয়া সম্রাট-শিবিরের পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন। যে কূটবুদ্ধি, সাহস, দৃঢ়তা ও রণকৌশল মেনান্দরের হেলায় জয়লাভের অস্ত্রস্বরূপ ছিল,—প্রথম আক্রমণেই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী পুষ্পমিত্রের রণকৌশল দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, এত দিনে তিনি যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইয়াছেন—সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের শক্তির অবদান এইবার তাঁহার স্মৃতিপথে জাগরূক হইল!

দুই কূটবুদ্ধিপরায়ণ রণপণ্ডিতের নেতৃত্বে পরিচালিত বিশাল বাহিনীর এই ভয়াবহ সংঘর্ষ মহাসমররূপেই পরিগণিত হইয়াছিল।

বিপুল বাহিনী লইয়া মেনান্দর জয়যাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন; যুদ্ধের পর যুদ্ধ হেলায় জয় করিয়া তিনি এতদূর উল্লসিত ও গর্ব্বিত হইয়াছিলেন যে, পরাজয়ের কল্পনাকেও অন্তরে স্থানদান করেন নাই এবং এত দূরে আসিয়া যদি পরাজয় ঘটে, পরিত্রাণের উপায়টুকু পর্য্যন্ত চিন্তা করেন নাই। অধিকাংশ স্থলে বড় বড় রাজনীতিবেত্তার যে ভুল হইয়া থাকে, মেনান্দরেরও সেই ভুল হইল। তাঁহার বিজয়ী সৈন্যদল মগধ সেনার প্রচণ্ড বিক্রমে অবশেষে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। পলায়ন করিবারও পথ তাহারা পাইল না,—দলে দলে মৃত্যু বরণ করিতে লাগিল।

এই ভয়াবহ যুদ্ধে মেনান্দরের অধিকাংশ সৈন্যই বিধ্বস্ত হয়। তাঁহার দুইটি প্রিয়পুত্র এই যুদ্ধে আত্মবিসর্জ্জন করেন। এই মহাসমরের শোণিতময় স্মৃতি, মদগর্ব্বিত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী বীর মেনান্দরের দৃপ্ত হৃদয়ের উপর এমন এক অপূর্ব্ব অবসাদের সঞ্চার করিল যে, তিনি এই শোচনীয় পরাজয়ের পর আর স্বীয় সাম্রাজ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন না,—তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা—ভারতের উপর অখণ্ড আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা, সমস্তই অপসৃত হইয়া গেল,—মানব-জীবনের নশ্বরতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া তিনি সংসারে বীতস্পৃহ হইলেন। সাম্রাজ্যের প্রলোভন, বিজয়ী বীর সেনার রণনর্ত্তন আর তাঁহাকে উল্লসিত করিতে পারিল না,—রাজ্যলিপ্সার পরিবর্ত্তে তাঁহার অন্তরে এমন অপূর্ব্ব ধর্ম্মলিপ্সা ভাসিয়া উঠিল যে, তাঁহার অন্তর নির্ম্মল শান্তির জন্য বৈরাগ্যের পথে অভিনব জয়যাত্রার অভিযান করিল!

আলেকজাণ্ডার ও সেলুকাসের ন্যায় এই মেনান্দরও ভারতের সহিত শেষে এক অপূর্ব্ব সম্বন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নির্ব্বাণকামনায় বৌদ্ধধর্ম্মের শান্তিময় ছায়াতলে আশ্রয়প্রার্থী হইলেন এবং ভারতের তৎকালীন মহাপ্রাণ বৌদ্ধ শ্রমণ নাগসেন তাঁহাকে সাদরে আশ্রয় প্রদানপূর্ব্বক ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। ভারতের বিভীষিকাস্বরূপ এই মহাবীর মেনান্দরই উত্তরকালে ভারতের বৌদ্ধধর্ম্মের একনিষ্ঠ সাধকরূপে মহানুভব 'মিলিন্দ' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের সার লক্ষ্য নির্ব্বাণসম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসামূলক প্রশ্নসমূহ ইঁহারই কণ্ঠ হইতে উদ্গত হইয়া 'মিলিন্দ পঞ্হ' নামে পালি ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্মের অমূল্য সম্পদ্‌রূপে স্থানলাভ করিয়াছে।

ফলতঃ সাম্রাজ্য ও বিজয়লিপ্সার শোণিতসমুদ্রের তটভূমি হইতে বৈরাগ্যের আহ্বানে নির্ব্বাণের তপোবনে দুর্দ্ধর্ষ গ্রীকবীর মেনান্দরের মহাপ্রস্থান,—ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের এক মধুর মনোরম আখ্যান।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাতৃ-পূজা

নূতন অর্ঘ্য ভার—
মা তোর প্রীতির পূজার লাগিয়া
আনিয়াছি এইবার!

নান্দী-আচারে করি উপবাস
মৃত্যু-জয়ীরা ফেলে নিশ্বাস,
ধূপ-শিখা জলে চিতা-ধূমমাঝে—
আঙ্গিনা অন্ধকার!
পূজার নূতন অর্ঘ্যোপহার
নে মা হেসে এইবার!

ধৌত করিতে মন্দির-তল
আনি নি এবারে জাহ্নবী-জল;
সাধন-লব্ধ ভক্তিপ্রবাহ—
ছিল শেষ সম্বল,—
এনেছি মা তাই মার্জ্জিতে তোর
পূত মন্দির-তল!

পুণ্য পূজার সাজি,—
রক্ত জবায়,—কানন-কুসুমে—
আনি নি ভরিয়া আজি!

সুত, সহোদর, প্রিয়-পরিজন,
তারা যে রক্ত-জবারি মতন—
এনেছি তা সবে অর্পিতে পায়ে
ভক্তি-সলিলে মাজি,—
সে ফুলে মা তোর পুণ্যের পূজা—
পূর্ণ হউক আজি!

চাহি না'ক বর, করুণায় এসে—
নে মা অঞ্জলি স্নেহে, ভালবেসে;—
তবে যদি কিছু দিতে চা'স মা গো—
এ মহাপূজার শেষে,—
মৃত্যু-বিজয়ী দীপ্ত তিলক
ললাটে আঁকিস হেসে!

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল (বি, এ)।

উপন্যাসের মর‍্যাল্
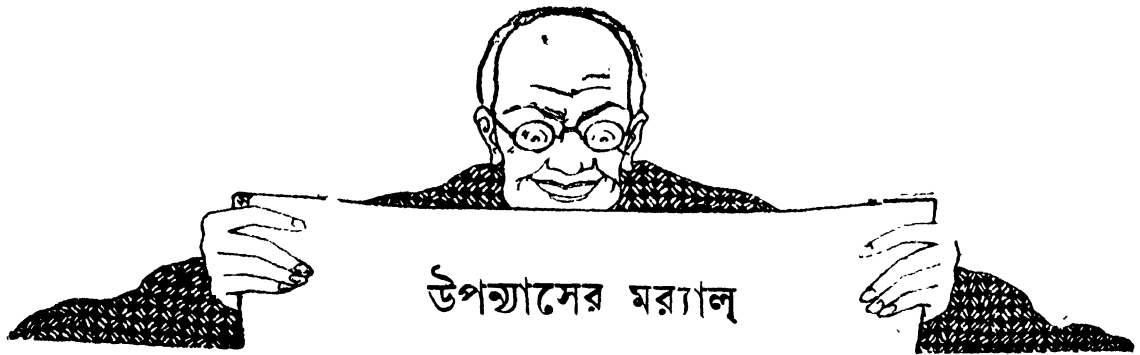
(গল্প)

বি, এ পরীক্ষার পর লম্বা ছুটা। এ ক'মাস অবু দুনিয়া ভুলিয়া কেবলি বইয়ের পাহাড়ে আড়াল তুলিয়া তার পিছনে পড়িয়াছিল। এগ্‌জামিন চুকিলে সে বাঙলা মাসিক-পত্র খুলিয়া বসিল। সাহিত্যের প্রতি তার একটা রীতিমত টান আছে।

গল্পগুলা নেহাৎ কেমন একঘেয়ে মনে হইল। সেই অসম্ভব ঘটনার নিবিড় ব্যূহ ভেদ করা কঠিন। আর ভিতরে সেই মামুলি ব্যাপার, প্রেম। বইয়ের পাতা হইতে চোখ তুলিয়া অবু আকাশের পানে চাহিল। সকালের সোনালি রৌদ্রে আকাশের বর্ণ পীতাভ লাল। অবু ভাবিল, এই প্রেম বস্তুটার দর্শন কি সংসারে সত্যই মিলে? বিশেষ বাঙালীর ঘরে? না, ও বস্তুটি নিছক কবি-কল্পনা? একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে মাসিকের পাতা উল্টাইতে লাগিল। দৈহিক ব্যায়াম-চর্চ্চার উপর সচিত্র এক মস্ত প্রবন্ধ নজরে পড়িল। হাতের মাশ্‌ল্-এর বিবিধ ছবি। প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক লিখিয়াছেন,—হে বাঙালী তরুণ-তরুণী, যদি সুশ্রী ও সুন্দর হইতে চাও তো ব্যায়াম-চর্চ্চা করো। সুডৌল হাত-পা, ইয়া গুলি, সবল পেশী—ইহারাই শুধু নর-নারীর শরীর স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্য্যে ভরাইয়া তুলিতে পারে। স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য্য, এ কথা মনে রাখিয়ো।

ঠিক কথা! এই ব্যায়ামের কথাটাই অবু ভুলিয়া আছে। নহিলে সাহিত্য—যে সাহিত্য মনের স্বাস্থ্য গড়িয়া তোলে, তার চর্চ্চা সে বহুকাল করিয়াছে। কিন্তু স্বাস্থ্যচর্চ্চা···

এটার দিকে মন দেয় নাই বলিয়াই আজ মাথা-ধরা, কা'ল অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, পরশু গায়ে ব্যথা—নানা উপসর্গের উপদ্রব ঘটে! ভালো কথা নয় তো! এমন করিয়া শরীরকে মৃত্যুর পথে আগাইয়া দেওয়া বেকুবি!···

বই রাখিয়া অবু পকেটে পার্শ ফেলিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া উঠিল গিয়া একেবারে ধর্ম্মতলায় এক স্পোর্টিং গুড্‌স্‌এর দোকানে। স্যাণ্ডোর বই, গ্রিপ ডাম্বেল, মুগুর প্রভৃতি কিনিয়া সে একখানা ফিটন ডাকিল, এবং সেই ফিটনে চড়িয়া সটান বাড়ী ফিরিল।

বাড়ী ফিরিয়া চাকরকে ডাকিল, কহিল,—সর্ষের তেল নিয়ে আয়।

তরুণ মনিবের পানে চাহিয়া চাকর তেলের বাটি আনিল। অবু কহিল—একটি ঘণ্টা কষে আমার গায়ে ঐ তেল মাখা···বেশ ডলে-ডলে রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে! তেলে জলেই বাঙালীর শরীর, বুঝলি রে···

ভৃত্য আদেশ পালন করিল।

এক্সারসাইজ করিতে হইবে সকালে—বই দেখিয়া সে বিস্তর নোট লিখিল, তার পর কশরতের চার্টখানা নিজের পড়ার ঘরে টাঙাইল। কাল হইতে···বেশ নিয়মে এক্সার-সাইজ! আর অবহেলা নয়।···এ্যাপলো সৌন্দর্য্যের আদর্শ। নিটোল হাত-পা, দরাজ ছাতি,···দু' মাসে না হোক্, ছ'মাসে আয়ত্ত হইবেই। বাঙালীর দুর্নাম সে ঘুচাইবে। বুকে পাথর ভাঙ্গা—সেটা গোঁয়ার্ত্তুমি! শিল্কের সার্ট বা পাঞ্জাবির তলায় বলিষ্ঠ পেশীযুক্ত দেহ অথচ বাহিরে মুখে-চোখে-অবয়বে কোমল লালিত্য—এই তো সুপুরুষের লক্ষণ! ভুঁড়ি থাকিবে না, মুখ চাপ্টা হইবে না—সে সব দিকে দস্তুর-মত লক্ষ্য রাখা চাই।

আহারাদি সারিয়া অবু খবরের কাগজ খুলিল। সকালে কাগজখানা পিতা ও পিতৃব্যের হাতে ঘোরে, দেখার সুযোগ ঘটে না—তার পক্ষে এই সময়টাই খবরের কাগজের পক্ষে সুপ্রশস্ত।

একটা খবর চোখে পড়িল, নোয়াখালির ওদিকে ষ্টীমার-ঘাটে এক ফিরিঙ্গি মাতাল এক বাঙালী মহিলাকে অপমান

করিতে গিয়াছিল, আর-এক জন বাঙালী তাকে দুই গাঁট্টায় সিধা করিয়া দিয়াছে! এই তো চাই! বাঙালীর মনুষ্যত্ব জাগাইতে হইলে তার শরীরে বল থাকা প্রয়োজন—এবং ব্যায়াম নহিলে এই বল পাওয়া দুষ্কর।

অবুর কল্পনা-নেত্রের সামনে বাঙলা দেশ ও বাঙালীর ভবিষ্যতের ছবি ফুটিয়া উঠিল। বাঙলার সবুজ শ্যামল মাঠের উপর দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বাঙালী ছুটিয়া চলিয়াছে দুর্মদ বেগে·· ঘোড়ার পিঠে লাঞ্ছিতা আশ্রয়-পাওয়া বাঙালী তরুণী—অত্যাচার-ব্যাঘ্রের থাবার ঘায়ে জর্জ্জর তার দেহ ও মন, আতঙ্কে উত্তেজনায় বরতনু এখনো থর-থর কাঁপিতেছে···আর ঐ পুকুরের পাড়ে দশাননের মত পাঁচ-সাতটা পাষণ্ড মাটীতে লুটাপুটি খাইতেছে–তাদের কারো হাত ভাঙ্গা, কারো মাথায় চোট, কারো বা পায়ের হাড় চূর হইয়া গিয়াছে! ঝোপগুলার আড়ালে বঙ্গমাতা জাগিয়া উঠিয়া বসিয়াছেন, তাঁর চোখে আনন্দাশ্রু! অবুর প্রাণ জয়ের উল্লাসে নাচিয়া উঠিল!

বেলা প্রায় তিনটা···সুকু আসিয়া ডাকিল,—অবু।

অবু উঠিয়া বসিল, কহিল,—কি?

সুকু কহিল,—বায়োস্কোপে যাবি?

অবু কহিল,—কি ছবি আছে?

সুকু কহিল,—ভেনাস্···

অবু কহিল,—কাব্যি?

সুকুর দুই চোখে বিস্ময় ফুটিল। সে কহিল,—তার মানে?

অবু কহিল,—ও সব বাজে সেণ্টিমেণ্টের ছেলে-খেলা দেখার প্রবৃত্তি আর নেই। কোনো heroic theme যদি—

সুকুর বিস্ময় মাত্রা ছাপাইয়া উঠিল। সে অবাক্ হইয়া অবুর পানে চাহিল। তার মুখে কথা নাই।

অবু কহিল—বল বল, শারীরিক বল। তারি চর্চ্চা করো, বন্ধু। অসার কাব্য-নাটক ছেড়ে heroic ideasএ বুক ভরিয়ে তোলো। দেশের কথা ভাবো। দেশকে তুলতে হ'লে দেশের লোকের শরীরের শ্রী আর শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে আগে।

অবুর চোখের সামনে তখনো বাঙলার প্রান্তরের ছবি জাগিয়া আছে! পচা থানা-ডোবা বুজাইয়া সেখানে কুস্তির বড় বড় আথ্ড়া গড়িয়া উঠিয়াছে, মুদির দোকানের পাশে ব্যায়াম-সমিতির বার্ষিক অধিবেশন চলিয়াছে, ফুলের মালায়-পাতায় লাল নিশানে সে এক সমারোহ ব্যাপার!

সুকু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তাকিয়ায় মাথা দিয়া তক্তাপোষের উপর শুইয়া পড়িল, শুইয়া একখানা বই খুলিল।

অবু কহিল,—কি বই হে? গোলেন্দামের অভিসার? না, আরব-রজনীর এক টুকরো?

সুকু কহিল,—না। "বিপদের মুখে বেচারাম।" কি এ কাহিনী···ওঃ, পড়তে পড়তে রক্ত নেচে ওঠে!

—বটে! বলিয়া অবু হাত বাড়াইল।

সুকু তার হাতে বই দিল। অবু মলাট উল্টাইয়া দেখে, প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীকানাই চক্রবর্ত্তী প্রণীত লোমহর্ষণকারী নবন্যাস।

বাঃ! অবু কহিল,—দাও তো, একটু পড়ি।

সুকু কহিল,—আমার আর কটা পাতা বাকী আছে, ভাই! বায়োস্কোপ দেখতে যাবার সময় লাইব্রেরীতে ফেরত দিয়ে যাবো, ভেবেচি।

২

সুকুর পড়া শেষ হইলে সে কহিল,—এই নাও। Grand বই। কমলকুমারীর প্রেমের গল্প প'ড়ে প'ড়ে হায়রাণ হয়ে গেছি। এ একেবারে নতুন আবহাওয়া···

মহা উৎসাহে অবু "বিপদের মুখে বেচারাম" খুলিল। প্রথম পরিচ্ছেদের আরম্ভে টাইটেল, 'সাগর-বক্ষে বেচারাম'। সে পড়িতে বসিল। বইয়ের অক্ষরগুলা তীরের গতিতে চোখের সামনে দিয়া ছুটিয়া চলিল। চোখ একেবারে লিনো-টাইপ যন্ত্রের মত লাইনগুলাকে বইয়ের পাতা হইতে তুলিয়া তার মনের উপর সুস্পষ্ট ছাপিয়া ধরিতে লাগিল!···মাঝে মাঝে অবু বইয়ের পাতা হইতে চোখ তুলিয়া উদাসভাবে চাহিয়া থাকে—সে শুধু বইয়ে লেখা বিপদগুলার ছবি ভালো করিয়া তলাইয়া বুঝিবার উদ্দেশ্যে। হু-হু বেগে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ মনে দাগ টানিয়া গেল। খাশা! নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসে!···বাঙলায় এমন বই সে আর কখনো পড়ে নাই! ওস্তাদ লেখকের ঘটনার ব্যূহচক্র রচার শক্তি দেখিয়া তার তাক্ লাগিয়া গেল! বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রের যে আদর ছবি মনে ফুটিল, তা অপরূপ! সে ক্ষেত্র হইতে বঙ্কিম, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ কোথায় ছিটকাইয়া দূরে সরিয়া

গিয়াছেন, আর ক্ষেতের বুকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, শুধু শ্রীযুক্ত কানাই চক্রবর্ত্তী—তাঁর হাতে মস্ত একটা কলম। সেই কলমের খোঁচায় বাঙলার মাটী ফুঁড়িয়া রাশি রাশি শয়তান, পাষণ্ড, বদমায়েস, ঠগ, ডাকাত, বাটপাড় সাঁ-সাঁ করিয়া দৈত্যের মত ভীষণ মূর্ত্তিতে মহা-আস্ফালনে উঠিয়া দাঁড়াইতেছে!

প্রেমও আছে! ঐ বদমায়েসদের বেঁটে সর্দ্দার ছট্টুলালের তরুণী মেয়ে সুশুভ্রা—আহা, এক হাতে তার ফুলের মালা, অপর হাতে রক্ত-মাখা শাণিত খর্পরে দোদুল নরমুণ্ডমালা! হরি-হর মূর্ত্তির কল্পনা হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে। কিন্তু সুশুভ্রা? যেন আধ-রতি, আধ-শ্যামা! তার এক চোখে প্রেমের আবেশ, অপর চোখে প্রলয়-দাহ-যজ্ঞের বিরাট অগ্নি জ্বালা!··

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অবু ডাকিল,—সুকু···

সুকু খপরের কাগজ দেখিতেছিল, কহিল,—কি?

অবু কহিল,—এই বই বাঙালীকে জাগাবে। এর ক'টা edition হয়েচে?

মলাট খুলিয়া নিজেই দেখিল, প্রথম সংস্করণ, ১৩২৫ সালে ছাপা। আর এডিসন হয় নাই? সুকু কহিল,—জানি না।

বইয়ের ভূমিকা খুলিয়া সে দেখে, গ্রন্থকার থাকেন ডায়মণ্ড-হারবারে। ঠিকানাও ছাপা,—আরাম-কুটীর, ডায়মণ্ড-হারবার।

উত্তেজনার ঝোঁকে সে একখানা কাগজ টানিয়া গ্রন্থকারকে এক চিঠি লিখিয়া বসিল। অবু লিখিল,—

মহাশয়,

আপনার লেখা "বিপদের মুখে বেচারাম" পড়িয়া যে কি খুশী হইলাম, বলিতে পারি না। এ বই বাঙলার গীতা। বাঙালীর মোক্ষ-মন্ত্র আপনিই গল্পচ্ছলে প্রথম প্রচার করিলেন। ধন্য আপনি!

ভবিষ্যতের যে স্বপ্ন আমি দেখিতাম, এ বই পড়িয়া বুঝিতেছি, তা নিতান্ত অসার, অলীক। আমি এবার বি, এ এগজামিন দিয়াছি। বাবা হাইকোর্টের বড় উকীল। তাঁর ইচ্ছা, আমিও উকীল হই। আমারও সেই সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু আপনার বই পড়িয়া সে সঙ্কল্প আর নাই। বেচারামের মত দুনিয়ার বুকে আমি বিপদ খুঁজিয়া বেড়াইব। যদি একটি আর্ত্ত অসহায়কেও উদ্ধার করিতে পারি, তবেই আমার এ জীবন সফল হইবে। দয়া করিয়া পত্রোত্তরে যদি আমায় এক ছত্র লিখিয়া জানান, কবে এবং কোন্ দিকে এই বিপদের সন্ধানে বাহির হইব, তাহা হইলে পরম আপ্যায়িত হই। পূর্ব্ববঙ্গে নারীর উপর প্রচুর অত্যাচার চলিয়াছে,—সেই দিক হইতে সুরু করিব? তবে একটু সময় চাই। সদ্য স্যাণ্ডো আনাইয়াছি; কাল হইতে ব্যায়াম-চর্চ্চায় মন দিব। এক মাস পরে বোধ হয় অভিযানে বাহির হইবার যোগ্য হইব। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত জানাইয়া আমাকে চির-অনুগৃহীত করিবেন। ইতি

একান্ত ভক্ত
শ্রীঅবনীলাল মুখোপাধ্যায়।

সুকু কহিল—কি লিখচিস?

অবু কহিল—একখানা চিঠি।

সুকু কহিল—দেখি।

—না। এ আমার গোপন-মনের কথা।···

কথাটা বলিয়া খামে টিকিট আঁটিয়া অবু ডাকিল—ন্যাপলা···

ভৃত্য ন্যাপলা আসিলে তার হাতে চিঠি দিয়া অবু কহিল,—এখনি ডাকে দিয়ে আয়।···বুঝলি?

ঘাড় নাড়িয়া ন্যাপলা চিঠি লইয়া ডাকঘরে ছুটিল।

অবু কহিল,—এ্যালবিয়নে কোনো সিরিয়াল ছবি নেই?

সুকু কহিল,—আছে। এডি পোলো—থার্ড পার্ট।

অবু কহিল,—চ' তবে এ্যালবিয়নে।

সুকু কহিল,—যা বললি! ছেলেমান্সী ছবি!

অবু কহিল,—তা হোক···full of thrills···এই তো জীবন! আমি এ্যালবিয়নেই যাবো।···

সুকু কহিল,—বেশ। আমি যাবো গ্লোবে।

৩

চার-পাঁচ দিন পরের কথা।

সকালে চার্ট দেখিয়া ডেভেলপার লইয়া অবু কশরৎ করিতেছিল, ডাকে চিঠি আসিল। খামে চিঠি।

ব্যায়াম-চর্চ্চা শেষ করিয়া অবু চিঠি খুলিল। লেখকের নাম দেখিয়া প্রাণ খুশীতে ভরপুর হইয়া উঠিল। কানাই চক্রবর্ত্তী জবাব দিয়াছেন,—

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দ পাইলাম। আমার বই আপনার ভালো লাগিয়াছে জানিয়া খুশীও হইলাম।

গল্পটি নিছক কাল্পনিক, বানানো। ও-রকম ঘটনা বাস্তব-জগতে ঘটে কি না, সে সম্বন্ধে আমার নিজের মনে প্রচুর সন্দেহ আছে। সুতরাং মিথ্যা কাহিনী পড়িয়া তেমন ঘটনার সন্ধানে ছোটা বুদ্ধির কায হইবে না।

আপনি এবার বি, এ পরীক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং বয়সে আপনি তরুণ। এ-বয়সে খেয়ালের ঝোঁকে যা'-তা করা ঠিক নয়। আমার বয়স হইয়াছে, এ উপদেশটুকু কাযেই বোধ হয় অনায়াসে দিতে পারি। পাশ করিয়া ওকালতী পড়ুন। তার পর বিপদের জন্ম ভাবিতে হইবে না। ভগবান্ না করুন, সংসারে এমনিই বহু বিপদ আমাদের আক্রমণ করে। বেচারাম বইয়ের পাতার লোক—তাই সব বিপদেই বাঁচিয়াছে। এমন বিপদে বাস্তব-জীবনে বাঁচিয়া ওঠা খুব কঠিন; বোধ হয়, অসম্ভবও। আমার কথাগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ইতি

শুভার্থী
শ্রীকানাইলাল চক্রবর্ত্তী।

চিঠি পড়িয়া অবু দমিয়া গেল। এ সব ঘটনা জীবনে অসম্ভব কিসে? ঐ তো এডি পোলোর ঘটনা!···বাস্তবের উপর অনেকখানি রঙ চড়ানো শুধু! নহিলে একেবারে অসম্ভবের উপর কিছু গড়া যায় না—গল্পও না। আকাশে যেমন প্রাসাদ রচনা সম্ভব নয়, অসম্ভব প্লট লইয়া সম্ভবপর গল্পও তেমনি জমানো যায় না।···কানাই চক্রবর্ত্তী মহাশয় যা লিখিয়াছেন, ওটা নিছক বুড়া বয়সে হিতোপদেশ দিবার দুর্দ্দম আগ্রহ-বশে! বিনয়ও তো হইতে পারে!···

অবুর চোখের সামনে সমুদ্রের বুকে বেচারাম তেমনি ভাসিয়া বেড়ায়···ছোটনাগপুরের জঙ্গলে বাঘের সম্মুখে বেচারাম···গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া বাঘকে দুম করিয়া এক ঘা সে বসাইয়া দিল,—বাঘ ভয় পাইয়া ছুটিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেল!···

অবু ভাবিল, অসম্ভব এর কোন্খানে?···শুধু সাহস আর শক্তি···শরীরের, মনেরও! ব্যস্!

আরো এক সপ্তাহ পরে বন্ধুর দল আসিয়া কহিল,—চন্দননগর যাচ্ছি সকলে মোটর-বোটে। চলো হে!···

অবু কহিল,—না।

এই ইঙ্গিতটুকু। অবু ভাবিল,—একবার ডায়মণ্ড-হারবারে গিয়া আরাম-কুটীরে কানাই চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলে হয় তো! মুখের কথায় তর্ক তুলিয়া সে তাঁকে বুঝাইয়া দিবে···

তাই ঠিক!

বন্ধুরা চলিয়া গেল। অবুও আহারাদি সারিয়া চলিল বেলেঘাটা ষ্টেশনে। ইণ্টার ক্লাশের একখানা টিকিট কিনিয়া সে ডায়মণ্ড-হারবারে রওনা হইল।

ষ্টেশনে নামিয়া ঠিকানা সংগ্রহ করিতে একটু বেগ পাইতে হইল। ষ্টেশনের লোক-জন বাঙলার এত বড় লেখকের কোনো সন্ধান রাখে না! হা রে, বেকুব বাঙালী!···অন্ন-বস্ত্রের চিন্তায় এমনি কাতর যে···ছিঃ! এ বাঙলার উন্নতি কখনো সম্ভব?···

পথে আসিয়া দোকানী-পসারীর কাছে সন্ধান লইল; তারা অম্লান বদনে কহিল,—জানি না মশাই, কে কানাই চক্রবর্ত্তী।

অবু কহিল,—মস্ত বাঙালী লেখক।

মুদি কহিল,—ওঃ! তা হ'লে কাছারিতে খোঁজ নিন্ দিকিনি···মুহুরি-লেখক যত, ঐখানেই পাবেন!

অবু কহিল,—মুহুরি-লেখক নন্। তিনি গ্রন্থকার। তাঁর লেখা অনেক ভালো ভালো বই আছে।

মুদি কহিল,—না মশাই, বলতে পারলুম না।

অবুর মনে হইল, একটি চড়ে মুদির এ নির্লজ্জতা ঢিট্ করিয়া দেয়! এমন মূর্খ এরা··

সে পোষ্ট অফিসে গেল। এক ডাক-পিয়ন কহিল,—আরাম-কুটীরে সে বুড়ো বাবু থাকেন···ঠিক! তা ঐ গঙ্গার ধারে যান। লক গেটের পাশ দিয়ে সোজা·· একটা বাবলা ঝোপ দেখবেন, তার ঠিক পিছনে আরাম-কুটীর।···

খুশী-মনে অবু তখন বাবলা-ঝোপের উদ্দেশে যাত্রা করিল। ঐ বাবলা-ঝোপ! দেবী বীণাপাণি কমল-বন ছাড়িয়া ঐ বাবলা-ঝোপের পাশে এখন আস্তানা বাঁধিয়াছেন·· ঐ বাবলার কাঁটার থাকে থাকে এবার রক্ত-কমল ফুটিবে!···

বাবলা-ঝোপ মিলিল; সুতরাং আরাম-কুটীর মিলিতেও বাধিল না। একতলা ছোট বাড়ী; পথের ধারে বাঁখারি বেড়া-দেওয়া ছোট্ট ফটক। সামনে কতকগুলা ফুলে গাছ···বেড়ার ধারে বড় বড় কাঁটা-বাবলার ফাঁকে-ফাঁকে বাতাবি লেবু, কালো জাম, জামরুল, পেঁপে ও খেজুরগাছ তার পিছনে গঙ্গার বুকে মস্ত চড়া।

ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া অবু ডাকিল—বেয়ারা···

ডাক শুনিয়া একটি মেয়ে আসিয়া বাড়ীর বারান্দা দাঁড়াইল। মেয়েটি ময়লা নয়, সুন্দরীও নয়। বয় তেরো-চোদ্দ বছর। মুখে-চোখে বয়সোচিত ব্রীড়ার চিহ্ন মাত্র নাই। মেয়েটি কহিল,—কাকে খুঁজচেন?

অবু কহিল,—কানাই বাবু থাকেন এ-বাড়ীতে?

মেয়েটি কহিল—হাঁ্যা। তাঁর অসুখ করেচে।

অসুখ! বাঃ! অবু কহিল,—তাই দেখতে এসেচি।

মেয়েটি কহিল,—দাঁড়ান।

অবু দাঁড়াইয়া রহিল। তার মনে ক্ষোভের উদয় হইল। হায় বেচারী বাঙলার গ্রন্থকার! বাঙালীর অলস অবসরে তাকে কতখানি আনন্দ দান করো, আর সে আনন্দের পরিবর্ত্তে তারা তোমায় কি দিয়াছে! লোকালয়ের বাহিরে এই জীর্ণ ঘরে পড়িয়া তুমি রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ, আর তারা ইলেক্‌ট্রিক্ ফ্যানের তলায় আরাম-কৌচে বসিয়া তোমারই লেখা বই পড়িয়া আনন্দে মশগুল্ হইতেছে! নাঃ, কোনো দিক দিয়াই বাঙালীর হৃদয়বৃত্তি-বিকাশের চেষ্টা নাই! কবি সত্য কথাই লিখিয়া গিয়াছেন, ভূতলে বাঙালী অধম জাতি! কৃতজ্ঞতা কথাটাও বুঝি বাঙালী কোনো বাঙলা অভিধানেও পড়িয়া দেখে নাই···

মেয়েটি ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—আসুন···

অবু গৃহে প্রবেশ করিল। দালানের পর ছোট ঘর। মেঝের এক ধারে তক্তাপোষ পাতা—অপর দিকে মস্ত একটা শেল্‌ফ, বইএ ঠাশা। তা ছাড়া কাঠের আলমারী একটা; একটি কাচের আলমারীও আছে। সেগুলার কাঠের রঙ কত কালের পালিশের অভাবে উঠিয়া গিয়াছে···অঙ্গে দাক্‌ড়া-দাক্‌ড়া ছোপ্—ঠিক যেন শ্যাম-বর্ণ বাঙালীর গায়ে ছুলি বাহির হইয়াছে!···

তক্তাপোষে এক প্রৌঢ় বাঙালী অর্দ্ধ-শায়িত। অবুকে দেখিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে তিনি কহিলেন,—আপনি কোথা থেকে আসচেন?

মৃদু হাস্য-রেখা মুখে টানিয়া অবু কহিল,—কলকাতা। আপনিই কানাই বাবু?

প্রৌঢ় কহিলেন,—হাঁ। আপনি···

অবু কহিল,—আমার নাম অবনী মুখুয্যে। ক'দিন আগে আপনার লেখা 'বিপদের মুখে বেচারাম' বই প'ড়ে আপনাকে চিঠি লিখে বিরক্ত করেছিলুম।

কানাই চক্রবর্ত্তীর মুখ-চোখ আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অবু তা লক্ষ্য করিল।

প্রৌঢ় ডাকিলেন,—মা গৌরী···

এ-আহ্বানে সেই মেয়েটি আসিয়া কহিল,—কেন বাবা?

কানাই চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—গঙ্গার ধারের বারান্দা থেকে সেই চেয়ারখানা মা এনে দাও···বাবু বসবেন।

গৌরী চেয়ার আনিতে যাইতেছিল, অবু কহিল,—না, না। আমি আনচি। বলিয়া সে গৌরীর অনুসরণ করিয়া বারান্দায় আসিল। একখানি কাঠের চেয়ার—পালিশ-ওঠা। চেয়ারখানা নিজেই বহিয়া ঘরে আনিল। কানাই চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—বসুন···

অবু বসিল। গৌরী কাঠ হইয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। মধ্যাহ্ণ-রৌদ্রের হল্‌কা তার মুখে পড়িয়াছে। অবুর মনে হইল, বিরাট তেজোবহ্নির একটা স্ফুলিঙ্গ! যে শক্তি বেচারামের দেখিয়াছি—বুঝি সেই শক্তির তেজই বালিকার মুখে-চোখে অমন দীপ্ত রাগে ফুটিয়া রহিয়াছে! অবু কহিল,—আপনার অসুখ···?

কানাই চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—হাঁ, বাতের ব্যথা। আজ পাঁচ-সাত দিন ধ'রে চলেছে, তবে কাল থেকে কিছু নরম।

অবু কহিল,—চিকিৎসা?···

হাসিয়া কানাই চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—এর আর চিকিৎসা কি! ঐ গৌরীই হ্যারিকেন জ্বেলে ফ্লানেলের সেঁক দেয়—তা ছাড়া আকন্দপাতা চাপিয়ে রাখি। এ তো নতুন নয়। আজ পাঁচ-সাত বছর ধ'রে রোগও এমনি ধরচে আর সেবাও এমনি চলছে!···

ধিক্কারে অবুর মন ভরিয়া উঠিল। অজস্র আনন্দের পশরা···কি বেদনা কি ব্যথা শরীরে বহিয়া বিলাও তুমি, ওগো, বাঙলা দেশের হতভাগা লেখক!···এক টাকা দিয়া একখানা বই কিনিয়াই আমরা পাঠক দায়ে খালাস! কখনও ভাবি না, যে লোকটি এ আনন্দ জোগাইতেছেন, তার শরীরে-মনে···

কানাই চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—এখানে কোথায় এসেচেন?

অবু কহিল,—আপনার কাছেই এসেচি···আপনাকে দেখতে, আপনার সঙ্গে পরিচয় করতে। আপনার বই প'ড়ে আমি খুব আনন্দ পাই,—আমি আপনার এক জন ভক্ত!···

কানাই চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—ছি, ছি, ও-কথা বলবেন না। আমার আবার লেখা! দেশে বড় বড় সব রথী, মহারথী লেখক রয়েচেন—মানুষের প্রাণ-মনের কত সূক্ষ্ম নিখুঁত ছবি আঁকচেন। আমার এ পেটের দায়ে দু'

ছত্তর লেখা বৈ তো নয়! কোনো দিকে কিছু হলো না, তাই। ফাঁকির কারবার, মিথ্যার বেসাতি মাত্র! একটু চমক দিয়ে ছ'পয়সা ভিক্ষে সংগ্রহ!…

অবু চিত্তে বেদনা বোধ করিল। এ কথাগুলার পিছনে কতখানি ব্যথা-বেদনা, কি প্রচুর দীর্ঘশ্বাস যে পুঞ্জিত আছে! কানাইয়ের এই অতি-বিনয়ের ভঙ্গী নিমেষে এমন একখানি করুণ ছবি ফুটাইয়া তুলিল যে, তেমন ছবি অবু পূর্ব্বে আর কখনো দেখে নাই!…

অবু কহিল,—সে সব রথী মহারথী যতই থাকুন, আপনার লেখা বই আমার ভালো লেগেচে…

বাধা দিয়া কানাই চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—আপনার অনুগ্রহ!

তার পর কথায় কথায় পরিচয়াদি চলিল। কানাই কহিলেন,—আপনাদের তরুণের দলেই জীবনের যা সাড়া পাই। বুড়োদের কাছে, বিজ্ঞ বিষয়ীদের কাছে আমাদের এই সব লেখার পাট, সাহিত্য-চর্চ্চা…ছেলেখেলার সামিল বৈ নয়। তাঁরা বলেন, ওতে কার কি ছঃখ ঘোচে? শুধু কুড়ের সময় কাটানো। যে-সময়টা ব'সে বই লিখি, তাঁরা বলেন, সে-সময়টা পরের ছ'টো মোট বয়ে দিয়ে এলেও ছ'পয়সা তবু রোজগার হয়!…

অবু কহিল,—সৌভাগ্যক্রমে যখন এই সব বিজ্ঞ বিষয়ীদের ধন-সম্পত্তি আদালতের গর্ভে এবং তাঁদের প্রাসাদসমান অট্টালিকা ভাটিয়া বা মাড়োয়ারীর কবলে, এবং নাম বিস্মৃতির অতল সাগরে ডুবে যাবে, তখনো সেক্সপীয়র, স্কট, বায়রণ, শেলি, বঙ্কিম, মাইকেল—আপনারা…অমর হয়ে এই মর্ত্ত্যলোকে জেগে থাকবেন—অনন্ত শক্তি কালও আপনাদের স্মৃতির বিলোপ-সাধন করতে পারবে না।…

কানাই চক্রবর্ত্তী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, কহিলেন, —কিন্তু এই স্মৃতি যা থাকে, তা ঐ সব ক্ষমতাশালী লেখকদের মৃত্যুর পর। বেঁচে থাকতে হেম-মাইকেলকে যে দারিদ্র্য-ছঃখ ভোগ করতে হয়েছিল, তাতে মনে হয়, মাইকেল 'মেঘনাদ-বধ' না লিখে এই সব বিষয়ী লোকের পরামর্শে যদি কোনো মাড়োয়ারী মহাজনের খাতা লিখতেন, তা হ'লে মাসের শেষে বাঁধা তঙ্কা হাতে পেয়ে পেট ভ'রে খেতে পেতেন …অন্ততঃ, দাতব্য চিকিৎসালয়ে ও-ভাবে…

অবু বেশ উত্তেজিত স্বরেই কহিল,—জ্ঞানের প্রতি বাঙালীর এই যে অবহেলার পাপ, আপনি কি ভাবচেন, বাঙালীকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না? না, সে-প্রায়শ্চিত্ত হচ্চে না? বাঙালী ধনীর ধন তার পুত্র-পৌত্র এই যে অকস্মাৎ উড়িয়ে দিচ্ছে,—এ ওই অবহেলা-পাপেরই শাস্তি নয় কি? শুধু cultureএর অভাব, শিক্ষার অভাব…

তর্ক থামিতে চায় না, কথায় কথা বাড়ে। দরদী তরুণকে বুকের এত কাছে পাইলে প্রাণের বহু নৈরাশ্য, রুদ্ধ বহু অভিমান কি ভারী আবরণ ঠেলিয়াই না অবাধে উৎসারিত হইয়া পড়ে!…

মাথামুণ্ড নানা কথায় বেলা পড়িয়া আসিতেছিল। কানাই চক্রবর্ত্তী ডাকিলেন,—মা গৌরী…

গৌরী এক ধারে দাঁড়াইয়া এ-তর্ক সমানে শুনিতেছিল। কি বুঝিতেছিল, সে-ই জানে। বাপের আহ্বানে গৌরী কাছে আসিল। কানাই চক্রবর্ত্তী কহিলেন—অবনী বাবুর জন্য জলখাবারের কিছু জোগাড় ছাখো মা!

গৌরী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বাপের পানে চাহিয়া রহিল।

কানাই কহিলেন,—তা লজ্জা কি, মা! তোমার ঘরে যা আছে, ফল,—ঐ কলা, পেঁপে, ডাব, মুড়ি, নারকেল,… তোমার তৈরী নাড়ুও তো আছে…সে যে বেশ দেশী টিফিন, মা…

মুখ রাঙা করিয়া গৌরী সে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

৪

অবু কহিল,—আপনারা ছ'জনে মাত্র এখানে থাকেন?…

কানাই কহিলেন,—ছ'জন ছাড়া তিন জন আর পাবে কোথায়, বলো? আমার স্ত্রী মারা গেছেন…সে অ… প্রায় পাঁচ বছর হলো।…আমি তখন চাকরি করতুম, ঐ ই… বেঙ্গল রেলের ছোট একটা ষ্টেশনে ষ্টেশন-মাষ্টারী। তাঁ… মৃত্যুর পর চাকরী আর ভালো লাগলো না। এখা… চ'লে এলুম। জ্ঞাতির দল আমার বাড়ীর আশ্রয়টুকু দ… ক'রে বসেছিলেন, আমায় আসতে দেখে মহা-বিরক্ত হ… —আমোল দিতে নারাজ! মেয়েটার উপর একটু ঝাঁ… ফুটতে দেখলুম। তখন বাড়ী ছেড়ে এইখানে খালি জমী… যা পড়েছিল, তার উপর এই ইট-কাঠ চড়িয়ে একটু আস্ত… বাঁধলুম।…অভাব চারিদিকে হি-হি ক'রে ফুটে উঠ… মেয়েদের পাকা গেরস্থালীর মধ্যে এমন পারিপাট্য থাকে

অভাবের ফাঁকটা চোখের সামনে তেমন মূর্ত্তি নিয়ে দেখা দিতে পারে না। তাঁর অবর্ত্তমানে তাই সে অভাবের চেহারা দেখে আমি শিউরে উঠলুম।···সে অভাব ঘোচাবার জন্য, আর মেয়েকে কতক ভুলিয়ে রাখবার জন্য ঐ গঙ্গার পানে আর আকাশের অসীমতার পানে চেয়ে গল্প লিখতে সুরু করলুম। ···প্রথমে ছেপে দাঁড়াতে একটু বেগ পেয়েছিলুম। তার পর ভগবান্ দয়া ক'রে আপনাদের মতই দরদী বন্ধু এনে দিলেন। আপনাদের দয়ায় আমার দিন এক-রকমে চ'লে যাচ্ছে। তবে ভাবনা এখনো আছে; আর সে ভাবনা এই আমার গৌরী মাকে নিয়ে। আমার অবর্ত্তমানে···নাঃ, সে কথা থাক!

কানাই চক্রবর্ত্তী অতি আয়াসেও একটা বড় নিশ্বাস রোধ করিতে পারিলেন না।

এ প্রসঙ্গ চাপা দিবার অভিপ্রায়ে অবু কহিল,—এখন আর কোনো বই লিখচেন না কি?

কানাই চক্রবর্ত্তী কহিলেন—লিখচি বৈ কি, বাবা। লিখতে হয় দায়ে প'ড়ে। না লিখলে চলে না। তা ছাড়া সঞ্চয়ও কিছু চাই তো গৌরীর বিবাহের জন্য। আপনারা দয়া ক'রে আমার বই পড়েন, আমার সৌভাগ্য! না হ'লে ঐ যে আর্ট ব'লে কথা আছে, তার কোনো ধার ধারি না। অত-বড় স্পর্দ্ধাও কোনো দিন হয়নি। এ গরীবের অন্ন-দায়ের লেখা, বাবা···এর মধ্যে কিছু পাবার আশা রাখবেন না—শুধু গরীবকে সাহায্য করচেন, এই ভেবেই···

অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া অবু কহিল,—আপনি ও-সব কথা দয়া ক'রে বল্‌বেন না। সত্যি বল্‌তে কি, আপনার লেখা প'ড়ে আমি কল্পনার যে অবাধপ্রসারী রাজ্য দেখেচি, তা ভোলবার নয়। আমার ক' দিন কেবলি মনে হচ্ছে যে, বাঙালীর জীবন কি বৈচিত্র্যহীন! শুধু কি কেরাণীগিরি, ওকালতী, ডাক্তারী, স্কুলমাষ্টারী করেই বাঙালী এত-বড় মনুষ্য-জন্মটা কাটিয়ে যাবে! বাইরে যে বিরাট পৃথিবী প'ড়ে আছে—কোথাও দিগন্তপ্রসারী মরু, কোথাও সাগরের উত্তাল তরঙ্গ···সে-সবের কোনো পরিচয় না নিয়ে? সে-হিসাবে আপনার কাছে আমি ঋণী। সাহিত্য একটু-আধটু দেখি—হয়, বেদান্তের তত্ত্ব, নয়, পাড়ার কারো বাড়ীর জানলায় ভদ্দর লোকের মেয়ে দেখে কবিতায় কে প্রেম জাগাচ্ছে—সে-সব কদর্য্য, বিশ্রী, লক্ষ্মীছাড়া ব্যাপার! এমনি এ্যাড্‌ভেঞ্চার যদি জীবনে একটাও না ঘটলো তো সব যে মিথ্যা হয়ে গেল!

গৌরী একটা কাঁশিতে মুড়ি ও কাঁচালঙ্কা লইয়া আসিল, কহিল,—পেঁপে তো ভালো পাকেনি, বাবা। আক্ ছাড়িয়ে আনবো?

কানাই কহিলেন,—নিশ্চয় আনবে, মা। অমন উপকারী জিনিষ আর আছে! যেমন স্নিগ্ধ, তেমনি···

অবু কহিল,—এ আপনি কি করচেন? কেন, অনর্থক··

কানাই কহিলেন,—সে কি হয়, বাবা! এ তো কিছুই নয়—বিদুরের খুদ। তা আমার কোনো লজ্জা নেই। দেশের ছেলে, তার সামনে দেশের জিনিষই ধ'রে দিচ্ছি।···এতে কোনো অসুখও হবে না। উপস্থিত এর বেশী সংগ্রহ করাও কঠিন। আমি প'ড়ে আছি বিছানায়···তবু মা আমার যা করচে···দাও মা, আক এনে দাও। আর ডাব আছে তো? ডাবের জলও খাশা হবে।

গৌরী আবার আদেশ-পালনে ছুটিল।

কানাই কহিলেন,- হাত-মুখ ধুয়ে ফেলুন,···ওই বাইরে বাল্‌তিতে জল আছে, বোধ হয় ·

অবু কহিল,—আমার একটি অনুরোধ আছে···

—বলুন।

—দয়া ক'রে আমায় স্নেহ দিয়েচেন যদি তো ঐ 'আপনি' সম্বোধনটুকুও রহিত করুন।

হাসিয়া কানাই কহিলেন,—ওটা কালের দস্তুর, বাবা। কাঁচা-পাকায় এইখানেই বিরোধ জাগে। মাঝে যেন মস্ত ব্যবধান। পাকা হাত বাড়িয়ে আছে সর্ব্বক্ষণ, কাঁচাকে বুকে নেবার জন্য। সব কাঁচা তা বোঝে না, বাবা—এইটেই পাকার বড় দুঃখ···

আহারের অল্প আয়োজন ও তার সঙ্গে প্রচুর স্নেহ দেখিয়া অবু তৃপ্তি বোধ করিল। এর কাছে বড়লোক আত্মীয়-গৃহের চায়ের পেয়ালা, গরম লুচি, মটন্-কারীও অতি তুচ্ছ!···

বিদায়ের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে অবুর উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া কানাই কহিলেন,—ও পাগ্‌লামির চিন্তা মনেও এনো না, বাবা। সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে আছে! জানা পথ, পাকা,···প্রশস্ত··· তা ছেড়ে না-জানা কোন আঁধার-ভরা

গলিতে অগ্রসর হওয়া সুবুদ্ধির কায হবে না। বইয়ের পাতায় যে-দুনিয়া দ্যাখো, তাকে ঐ মানস-লোকের পাশে রেখেই নিশ্চিন্ত থেকো— আর চলার বেলায় এই সত্যিকার কড়া কঠিন দুনিয়া···এ ভুলো না। মানুষের ধাক্কা খেয়ে, মানুষকে ধাক্কা দিয়ে পথ ক'রে এগুতে হবে। অভাবের উর্দ্ধে ব'সে অভাবের কল্পনায় আরাম আছে, কিন্তু অভাবের শত-তালি-দেওয়া কাঁথায় ব'সে অভাবের বেদনা জগতের সামনে ধরা···অপরে তা দেখে যা-ই পাক, নিজের বেদনার তাতে সীমা থাকে না!

অবু কহিল,—কিন্তু আন্তরিকতা না থাকলে সব যে ভুয়ো হয়ে যাবে।

কানাই কহিলেন,—অভাবের উপর ব'সে আর যাই করো, তাতে সাহিত্য গড়তে পারবে না, এ কথা ঠিক। দুনিয়ার উপর অভিশাপে-অভিমানে বুক ভ'রে ভারী হয়ে থাকবে··· নিরপেক্ষ হয়ে দুঃখের ঠিক রঙটুকুও হয় তো তাতে লাগানো সম্ভব হবে না! এই সংসার···সেখানে অভাব থাকলে অভিযোগ উঠলে নিশ্চিন্ত হয়ে লেখা কি সম্ভব, ভাবো?

অবু কহিল,—কিন্তু প্রকৃত যে আর্টিষ্ট—সে তার বুকের রক্ত-লেখায় নিজের বেদনা দুনিয়াকে দেয়।

কানাই হাসিয়া কহিলেন,—সে বেদনা প'ড়ে বিশ্বের পাঠক-পাঠিকা রচনা-কৌশলের তারিফই শুধু করে, বাবা! বিশ্বের দুঃখে কারো বুক দরদে দোলে নি, কোনো দুঃখীর দুঃখ-বেদনাও তাতে এক তিল ঘোচেনি। একটা দৃষ্টান্ত দি—গিরিশ বাবুর 'বলিদান' নাটক পড়েচো তো? কন্যা-দায়ের ঐ মর্ম্মান্তিক ছবি দেখে বাঙালী নাট্যকারের লিপি-কুশলতায় লোকে মুগ্ধ হলো, কন্যাদায়গ্রস্ত বাঙালীর পানে দরদের চোখে কেউ কি চাইতে পেরেচে?

অবু কহিল,—সমস্যার কথা!···

কানাই কহিলেন,—শুধু চারু-চিত্র আঁকা—চোখে-মনে তৃপ্তির বস্তু! কিন্তু আর্টের বৃহত্তর কর্ত্তব্য, আমার মনে হয়, দুনিয়ায় দরদ বাড়িয়ে তোলা, মানুষের দুঃখ-অভাব ঘুচোনো।···মানুষের মনে দুশ্চিন্তার কাঁটা দিবারাত্র ফুটে থাকলে শিল্পের সূক্ষ্ম-সৌন্দর্য্য উপভোগ করা শক্ত হয় না কি? যে গরীব ভিখারী অনাহারে দুর্ব্বল, দাঁড়াতে পারচে না, তাকে তাজমহলের ধারে পূর্ণিমা-রাত্রে দাঁড় করালে তাজমহল কি কখনো তাকে মুগ্ধ করতে পারবে?

গম্ভীরভাবে অবু কহিল,—সত্যি, এ সমস্যার কথা!···

ইহার পর হইতে অবু প্রায়ই ডায়মণ্ড হারবারে আসিতে লাগিল। আরাম-কুটীরে আরাম যে প্রচুর সঞ্চিত ছিল, সেজন্য নয়। এমনি···দুঃখের, অভিযোগের এমন জীবন্ত ছবির সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ-পরিচয় ছিল না। এ পরিচয়ে প্রাণে বেদনা জাগে,—তবু বেদনার যে মোহ, সেই মোহই তা'কে এখানে টানিয়া আনিত।

গৌরীর সঙ্গেও তার পরিচয় হইল। গৌরীর মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য ছিল না, যা তরুণ-চিত্তে রেখাপাত করে। দারিদ্র্যে লালিত, বাঙলার অতি-সাধারণ একটি বালিকা··· রুগ্ন বাপের পাশে বসিয়া তাঁ'র সেবা করে, শুশ্রূষা করে, তাঁ'র জন্য অন্ন রাঁধিয়া দেয়—নিপুণ অভিভাবিকার মত বাপের খবরদারী করে। সাতানব্বইটা বাঙালী পরিবারে নিত্য যেমন দেখা যায়, তেমনি! তা'র মধ্যে রোমান্স নাই, কাব্য নাই! এ ঘরের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ পরিচয়, সে ডাকিয়া দু'টি কথা কয়, তা'র দুটো কাযের বা তারিফও করে!···

বাপের মুখে তা'র ভবিষ্যৎ-চিন্তার কথা শুনিয়া গৌরীর উপর দরদে একবার হয় তো অবুর বুকখানা দুলিয়াও ওঠে! সে সময় একবার অবু গৌরীর পানে তাকায়, তাকাইয়া বাঙলার সুপাত্র-সভার একটা আদরা ছবি মনে পড়ে। যদি এমন একটি পাত্র ধরিয়া তার হাতে···কানাই চক্রবর্ত্তীর দুশ্চিন্তা তাহা হইলে দূর হয় এবং এত বড় দুশ্চিন্তা দূর হইলে কোনো একখানা বই যদি তিনি লিখিতে পারেন— নিছক দরদের ব্যাপার, তা ছাড়া আর কিছু নয়।

৫

প্রায় এক মাস পরের কথা।

বাড়ীতে অসুখ-বিসুখের গোলমালে অবু এক হপ্তা আর আরাম-কুটীরে যায় নাই। অসুখ সারিতেই সে বেলা দশটার ট্রেণে সে দিন যাত্রা করিল।

কানাই চক্রবর্ত্তী গৃহে ছিলেন না। গৌরী গঙ্গার ধারের বারান্দায় সিঁড়িতে বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিল।

অবু আসিয়া ডাকিল,—গৌরী···

গৌরী বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অবু কহিল,— তোমার বাবা কোথায়?

গৌরী কহিল—বেরিয়েচেন।

—কখন্ ফিরবেন?

—সকালেই বেরিয়েচেন, এসে খাবেন। না খেয়েই গেছেন।

অবু কহিল,—বটে! নিমেষের জন্য আকাশের পানে চাহিয়া সে কি ভাবিল। তার পর সিঁড়ির এক ধারে বসিয়া পড়িল, কহিল,—কি বই পড়ছিলে ওটা?

গৌরী কহিল—অগ্নিচক্র।

—তোমার বাবার লেখা, না?

মাথা নাড়িয়া গৌরী জানাইল, হাঁ।

—দেখি।

গৌরী বই দিল। অবু তার কয়েকখানা পাতা উল্টাইয়া দেখিল, কহিল—ও, এ সেই পিনাকিলালের গল্পটা—না? পিনাকিলাল বাড়ীতে তাড়া খেয়ে আসামে গেল চাকরির সন্ধানে—তার পর নাগাদের দলে ভিড়ে…

গৌরী কহিল—হ্যাঁ।

অবু কহিল,—তোমার বাবার লেখায় বাঙালী-জীবনের ভারী একটা বৈচিত্র্যের ছবি পাই। মামুলি ঘর-কন্না, মান-অভিমান, এ সব ঢের লেখা হয়েচে। বাঙালীর মন তাতে এক তিল উন্নত হয়ে ওঠে নি। সে তার সেই হিংসা, দম্ভ, দ্বন্দ্ব নিয়ে সমান আস্ফালন ক'রে চলেছে।…সাহিত্য কি? মানুষের cultured মনের অভিব্যক্তি—জ্ঞানের প্রকাশ! কিন্তু এ জ্ঞান বৃথা বিতরিত হচ্ছে, মানুষের প্রতি মানুষের এক তিল দরদ সহানুভূতি জাগাতে পারচে না!…

আবেগে উচ্ছ্বসিত অবু নানা কথা বলিয়া চলিল; গৌরী অবাক্ হইয়া তার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।…উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে অবুর খেয়ালও হইল না, এ কথাগুলা কোনো সভা ডাকিয়া বলিলে হয় তো একটু আলোচনা বা তর্কের সৃষ্টি করিত—এবং গৌরী এ কথাগুলার ঠিক যোগ্য শ্রোতা নয়!…

হঠাৎ তার বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া গৌরী কহিল,—আপনি একটু বসুন—আমি এখনি আসচি।

অবু কহিল—কোথায় যাবে?

গৌরী কহিল,—ধনীরামের দোকানে।

ধনীরাম? অবুর সপ্রশ্ন দৃষ্টি বুঝিয়া গৌরী কহিল—মহাজন। বাবা বই ছাপাবার জন্য তার কাছ থেকে টাকা ধার নেয়, তার পর বই বিক্রী হ'লে আস্তে আস্তে সে টাকা শোধ করে।…

ওঃ! এমনি করিয়া বইয়ের ব্যবসা চালাইতে হয়!

অবু কহিল,—তা…

গৌরী কহিল—এ মাসে ঠিক সময়ে তার কিস্তী দেওয়া হয়নি। দু'বার সে তাগাদা ক'রে গেছে। কাল বাবা এক জায়গা থেকে কিছু টাকা পেয়েচেন, তা থেকে কিছু দিয়ে আসবো।…

—বেশ।

গৌরী টাকা লইয়া মহাজনের কাছে গেল।

অবু চুপ করিয়া সেইখানে বসিয়া 'অগ্নিচক্র' বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল। বইয়ের পাতায় মন কিন্তু বসিতে চাহিল না। এই নানা কথা আর ঘটনার সঙ্গে কল্পনার ভাণ্ডার হইতে সে আরো কথা, আরো ঘটনা বাহির করিয়া সেগুলা সব একসঙ্গে জুড়িয়া এক মস্ত ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইল।

লোকালয়ের বাহিরে এই নির্জ্জন প্রান্তরে বসিয়া এক বেচারা বাঙালী গ্রন্থকার দুই হাতে অভাব-অভিযোগের বিরুদ্ধে কি-ভাবেই না সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে।…এ জীবন তাহা হইলে সংগ্রামই! নিজের বিলাস-লীলার ক্রীড়া-কুঞ্জটির বাহিরে কি অভাব, কি অভিযোগই না হাহাকার করিতেছে! বইয়ের পাতায় লেখা নর-নারীর দুঃখ-বেদনা বাস্তব জীবনে যে কতখানি মর্ম্মান্তিক—দারিদ্র্যে জর্জ্জর বাঙালী কি লইয়া আজ বিশ্ব-সভায় দাঁড়াইতে চায়! এক জনই শুধু ঐশ্বর্য্য-প্রাচুর্য্যের উপর বসিয়া! কিন্তু বাকী নিরানব্বুই জনে যে অস্থিচর্ম্মসার কঙ্কালের সমষ্টিমাত্র!…

অদূরে গঙ্গার বুক হইতে তীর অবধি বিস্তীর্ণ চড়া। সেই চড়ায় কতকগুলা ছেলে-মেয়ে কাদা ঘাঁটিয়া মাতামাতি করিতেছে। তাদের পরনে জীর্ণ বাস। অবু ভাবিল, মানুষ হইয়া জন্মিয়া এরা কি ভাবেই না জীবনটাকে তুচ্ছ করিতেছে! জীবনের কোনো স্বাদ না জানিয়া, কোনো পথের সন্ধান না করিয়া…বেচারা, অভিশপ্তের দল! এমনি চিন্তায় তার মন উদাস হইয়া উঠিল। দুনিয়ার নানা দুঃখ জমাট বাঁধিয়া ভারী পাথরের মত তার বুকে চাপিয়া বসিল।…

হঠাৎ গৌরীর স্বরে তার চমক ভাঙ্গিল। গৌরী কহিল,

—বাবা আর একখানা বই লিখেছেন···বল্‌লেন, আপনি যেমন বলেছিলেন, সেই ভাবে···

অবু কথাটা ঠিক বুঝিল না। সে অনেক কথাই বকিয়াছে, লেখা সম্বন্ধে তার কোন্ কথাটা···?

গৌরী কহিল,—একটা ট্রেণ তো এলো। দেখি, বাবা যদি আসে। আপনি একটু বসুন। আমি উনুনে আগুন দি···

অবু কহিল,—রান্না এখন হবে?

গৌরী কহিল,—রেঁধে রাখলে সে ভাত কড়্‌কড়ে হয়ে যেতো, তাই···

ঠিক! গৌরীর মুখখানি তাই আজ এমন ম্লান দেখাইতেছে। সেও তাহা হইলে···

অবু কহিল,—তুমিও খাওনি?

গৌরী কহিল,—না।

কথাটা অবুর গায়ে যেন চাবুক ছোঁয়াইল! ছুনিয়ার দুঃখ-বেদনার কথা ভাবিতে সে তন্ময়, আর তার পাশেই এই বালিকা এত বেলা অবধি অনাহারে আছে! সে খবর না লইয়া তার কাছে সে ভাষার ভাবের উচ্ছ্বাস বহাইয়া দিয়াছে!

অবু কহিল,—ছি গৌরী, এত বেলা অবধি না খাওয়া ঠিক হয় নি। অসুখ করবে···

মৃদু হাসিয়া গৌরী কহিল,—না।

গৌরী উনুন ধরাইতে গেল। অবু কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। সহসা বাহিরে জুতার শব্দ ও সঙ্গে সঙ্গে কানাইয়ের স্বর—ও মা গৌরী···মা গো···

—যাই বাবা। বলিয়া গৌরী ছুটিয়া আসিল। অবুও উঠিয়া বাহিরে আসিল। কানাই একেবারে রৌদ্রদগ্ধ হইয়া ফিরিয়াছেন! অবুকে দেখিয়া কহিলেন—এই যে বাবা, এসেচো! এত দিন আসোনি, বড় ভাবনা হয়েছিল! ···গেছলুম কলকাতায় একটা কাযে। ভাবলুম, একবার যাই। তা পারলুম না। বড্ড বেলা হয়ে গেল—রোদের ঝাঁজে আর হাঁটতে পার্‌লুম না।··তা, অসুখ-বিসুখ করেনি তো?

গৌরী হাত-পা ধুইবার জল আনিয়া দিল, গামছা ভিজাইয়া আনিল, তার পর একখানা হাত-পাখা আনিয়া বাপকে বাতাস করিতে লাগিল।

কানাই মুখ-হাত ধুইয়া বিছানায় আসিয়া বসিলেন। গৌরী কহিল,—ডাবের জল আনি, বাবা···

যেন একটা যন্ত্র চলিতেছে! গৌরী এ কাযগুলি এমন সহজ অনায়াস ভঙ্গীতে করিতেছিল যে, অবুর সম্ভ্রম হইল—পাকা গৃহিণীর মত রীতিমত অভ্যাসের হাত এ যে! বাঃ! দারিদ্র্যে এইটুকুই পরম সান্ত্বনা!···এর দাম···

কানাই ডাবের জল খানিকটা পান করিয়া মেয়ের সামনে ধরিয়া কহিলেন,—এটুকু তুমি খেয়ে ফ্যালো, মা। ভাতের কত দূর?

গৌরী কহিল,—তরকারী তৈরী। শুধু ভাতটা·· চড়িয়ে দি। উনুন ধ'রে উঠেচে।

গৌরী চলিয়া গেল।

কানাই কহিলেন,—একটু বিশেষ কাযে যেতে হয়েছিল, বাবা। মানে, একটি পাত্র পেয়েচি। খিদিরপুর ডকে কায করে—পঁয়ত্রিশটি টাকা পায়। দোজবরে—একটি ছেলে আছে—অবোলা শিশু! একখানি ছোট বাড়ী আছে, ঐ দুর্গাপুরে। বাপ নেই, মা আছে। ছোট সংসার·· কিছু দিতে হবে না। প্রথমপক্ষের গহনাপত্র দু'চারখানা আছে। খেতে-পরতে পাবে—একটু সংস্থানও—তা এর চেয়ে আর বেশী কামনাই বা কি কর্‌তে পারি!

কানাই একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

অবু চুপ। বহুক্ষণ পরে সে-ও একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—কত বয়স?

—বয়স বছর তিরিশেক। তা, বেশ জোয়ান ছেলে···

না—না—না! অবুর মন বিদ্রোহে তাতিয়া উঠিল অবু কহিল,—না, ও পাত্রে দেবেন না।

কানাই সখেদে কহিলেন,—এর বড় পাত্র যে আমার পক্ষে রাজপুত্র, বাবা। বামনের চাঁদ চাওয়ায় প্রয়াস সে যে।···বুঝি সব। কিন্তু তোমাদের কবির সেই কথাই মনে পড়ে,—সংসার কঠিন বড়, কারেও সে দেখে না!···তা ছাড় কবে আছি, কবে নেই, বিলম্বও তো আর করতে পারি না।

অবুর মনে হইল, ঠিক কথা! সংসার কঠিন বড় কারেও সে দেখে না!···অবুও তো মুখে বহু দরদ দেখাইয়াছে, কিন্তু···

কানাই কহিলেন,—বুক ভেঙ্গে যায় যখন ভাবি, এ নিরালা ঘরে আমি—মা'কে আমার কোথায় কোন্ অজান

ঘরে পাঠিয়ে দিছি!···অদৃষ্টে কি ঘটবে!···অদৃষ্ট দেখা যায় না! যতদূর সম্ভব, দেখচি,—তার পর···উঃ, এক এক সময় মনে হয়, ইংরেজের সমাজে ঐ যে ভালোবেসে বিবাহের রীতি আছে—ও বেশ! অন্ততঃ স্ত্রী স্বামীর যত্নটুকু পাবে। আমাদের সমাজে সেটুকুও বরাতের উপর ছেড়ে দিয়ে কায!···

অবু কোনো জবাব দিল না। মুখে জবাব কিছু আসিল না। মনের মধ্যটা রাশি রাশি চিন্তার বাষ্পে এমন গাঢ় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল যে, সে-অবস্থায় মানুষ কথা কহিতে পারে না।

অনেক কথা সে ভাবিতেছিল—এই কানাই চক্রবর্ত্তী, এই কানাই চক্রবর্ত্তীর কন্যা ঐ গৌরী···প্রথম যে-দিন সে এখানে আসিল, সে-দিনকার সেই প্রথম পরিচয়টুকু হইতে কেবলই ভাবিয়াছে, দারিদ্র্যের কথা, বাঙালীর হৃদয়-হীনতার কথা······

গৌরী আসিয়া ডাকিল,—বাবা···

সে-আহ্বানে চমকিয়া অবু গৌরীর পানে চাহিল। সদ্য আগুন-তাত হইতে সে উঠিয়া আসিয়াছে—মুখ-চোখ রাঙা! অবু ভাবিল, গৌরী সুন্দরী? না। ময়লা? তাও নয়! ইহাকে যদি সে··অর্থাৎ, আর কোনো উদ্দেশ্যে নয়—সে যে গল্পের নায়কের মত প্রেমে পড়িয়াছে, তা নয়—প্রেমের কথা ভাবিবার খেয়ালও ছিল না! তা নয়, শুধু দরদ···এই বিপন্ন পরিবারটির দুঃখে একটু সহানুভূতি! জীবনে তার কি এমন মস্ত আকাঙ্ক্ষা? আমেরিকার প্রেসিডেণ্টও হইবে না, মিনিষ্টারও নয় যে, অসীম প্রতাপশালিনী, বিদ্যাবুদ্ধিতে-সেরা, রূপসী নূরজাহাঁ বেগমের মত পত্নী নহিলে তার জীবন একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইবে! ওকালতীর চরম···হাইকোর্টের জজ··· তাহাতেও স্ত্রীর অসাধারণ পাণ্ডিত্য বা অনুপম রূপশ্রীর এমন অতি প্রয়োজনও নাই যে···

বাপকে গৌরী কি বলিল, চিন্তার অরণ্যে পড়িয়া অবুর তা শুনা হইল না।···তবে চেতনা ফিরিল কানাইয়ের কথায়। কানাই বলিলেন,—ওরা এই মাসেই বিয়ের কথা বলচে···

গম্ভীর স্বরে অবু কহিল,—হুঁ!

কানাই কহিলেন,—দিতেই যখন হবে, তখন দু'দিন আগে আর পরে, কিছুই এসে যায় না!···কি করবো, বুঝতে পারচি না। আরো দু' তিনটি পাত্র এসেছিল, পড়চে,—কিন্তু অনেক চায়। সে সামর্থ্য নেই। তার উপর কলেজে-পড়া ছেলে—কে জানে, কতদূর দৌড়ুবে! এ তবু যা হোক্ একটা চাকরী করচে।···এরা এটুকু বোঝে না যে, আমার যা কিছু আছে, সে-সবই ঐ গৌরী আর জামাই পাবে। যত তুচ্ছই হোক—একটা এই আস্তানা, আর যৎ-সামান্যও কিছু তো···তা নয়, উপস্থিত কেবল নগদ টাকার টাঁক করে!··

অবু ইতিমধ্যে অনেকগুলা চিন্তাকে একত্র করিয়া কোনোমতে বলিল,—এও পঁয়ত্রিশটি মাত্র টাকার উপর নির্ভর ক'রে জীবন সুরু—একটি ছেলে আছে—তার পর আরো পাঁচটি হ'লে বিষম মুস্কিল বাধবে না?···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কানাই কহিলেন,—নিরুপায়!···

পাশের ঘর হইতে গৌরী ডাকিল,—ভাত দেওয়া হয়েচে, বাবা।

কানাই কহিলেন,—তোমারও ভাত বেড়েচো?

—বেড়েচি।

—আচ্ছা।

কানাই উঠিলেন। অবু ঘরে বসিয়া আবার চিন্তার সূতা ছাড়িয়া দিল—সে কোন্ অসীম রহস্য-লোকে!··· গৌরীকে নানা মূর্ত্তিতে কল্পনা করিয়া মনকে সে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল, যদি ঐ গল্প উপন্যাসের মত তাকে সরস প্রেমার্দ্র করিয়া তুলিতে পারে!···কিন্তু···

নাই বা ঘটিল গল্পের প্রেম, সোজা মামুলি ভাবে বিবাহের প্রস্তাব!···লজ্জায় তার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ কি বলিয়া এ প্রস্তাব—? না, সে বড় বিশ্রী শুনাইবে! ইনি ভাবিবেন, এই মতলবেই ছোকরা এখানে যাতায়াত সুরু করিয়াছে!···তা যে নয়, কি করিয়া সে কথা?···না, আজ থাক্—ভাবিয়া-চিন্তিয়া দু'দিন পরে না হয়···

সেই ভালো!

৬

গৌরীর বিবাহের দিন আসন্ন হইয়া আসিল। নানা কথায় নানা আলোচনার মধ্যে অবু নিজের কল্পিত অভিপ্রায়টুকু খুলিয়া বলিতে পারিল না, এবং নিতান্ত যন্ত্রচালিতের মত

বিবাহের দিন বরের জন্য সে একটি রিষ্ট ঘড়ি ও গৌরীর জন্য এক জোড়া ভালো রেশমী শাড়ী ও ফ্যান্সি এক ছড়া সোনার মভ্ চেন আনিয়া কানাই চক্রবর্ত্তীর হাতে দিল। আনন্দে কানাইয়ের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। অবুর হাত ধরিয়া কানাই কহিলেন,—সব হচ্ছে, বাবা। তোমার এ স্নেহ মায়া, সব বুঝি। ভগবান্ তোমার ভালো করুন!··· কিন্তু আমি কাল থেকে যে একেবারে নিঃস্ব নিরাশ্রয় হ'তে বসেচি···

এ বেদনায় সান্ত্বনা নাই! যুগ-যুগ ধরিয়া এই বেদনা গভীরতম আনন্দের মুহূর্ত্তকে বেদনায় কাতর, উদ্বেল করিয়া আসিতেছে!···

যথাসময়ে বর আসিল এবং বিবাহ হইয়া গেল। শুধু অনুষ্ঠানটুকু—কোনো সমারোহ নাই, কিছু না। মাঙ্গল্য যেটুকু না করিলে নয়, সেইটুকুই। পাড়ার দু'চার জনকেও ডাকা হইয়াছিল। তার পর অশ্রুর সাগর বহাইয়া গৌরী চলিয়া গেল স্বামীর গৃহে, তার নূতন সংসার পাতিতে, মা-হারা শিশুর মা হইয়া তাকে বুকে লইতে!···

অবু বিবাহ দেখিয়া বুকে পাথর চাপিয়া গৃহে ফিরিল। তারো জীবনে যেন অনেকখানি কি উলট্-পালট্ হইয়া গেল। থাকিয়া থাকিয়া তার বুকেও কাঁটার আঘাত বাজিতেছিল। ঐ সেবা-নিপুণা সুশীলা বালিকা···জগতের বিরাট কলরব-কোলাহলের মধ্যে বুঝি চিরদিনের জন্যই হারাইয়া গেল! কি-ভাবে সেখানে ওর দিন কাটিবে, মাতৃ-হারার অন্তরের নিগূঢ় বেদনা সেখানে কে বুঝিবে, বুঝিবে কি না, তারও স্থিরতা নাই। আর কানাই চক্রবর্ত্তী? নদীর বারি-প্রসারের দিকে চাহিয়া থাকিবে···শূন্য ঘর, শূন্য শয্যা···হাসির যে মৃদু জ্যোৎস্নাটুকু তাঁর জীবনের পথে ঝরিয়াছিল, সেটুকুও আজ উবিয়া গিয়াছে!···

আরাম-কুটীরে যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াও অবু দু'দিন যাইতে পারিল না। সেই ব্যথাতুর চিত্তের সামনে কি সান্ত্বনা লইয়া সে দাঁড়াইবে! ঘরে বসিয়া কল্পনায় আপনাকে সে সেই কুটীরের দিকে ভাসাইয়া দিত···দীন শুষ্ক মূর্ত্তি··· হয় তো লেখা অক্ষরে কাগজের পর কাগজ ভরাইতেছেন, যদি লেখার মধ্যে মনের এই গভীর বিরহ-বেদনা ঢাকিয়া দিতে পারেন!···

দিনগুলা হু-হু করিয়া কোথা দিয়া যে কাটিয়া চলিল, সেদিকে তার খেয়ালও ছিল না।···সহসা পরীক্ষার ফল বাহির হইল, এবং তার পরেই আচম্বিতে সে শুনিল, তার বিবাহ। হাইকোর্টের এক নামজাদা উকীলের কন্যা বধূ হইবে। শ্বশুর তার পিতার বন্ধু। মেয়েটিও রূপসী, শিক্ষিতা, অর্থাৎ একালে যেমন হইতে হয়!···

তরুণ বয়সের মোহ! তবু সে কানাইকে ভুলিল না, গৌরীকেও না। মাকে বলিয়া ফেলিল, তাদের এ বিবাহে আনিতে হইবে। মা বলিলেন,—বেশ।···

বিবাহের দু'দিন পূর্ব্বে অবু আরাম-কুটীরে যাত্রা করিল, কানাই বাবুকে নিমন্ত্রণ ও সেখান হইতে তাঁকে লইয়া খিদির-পুরে গৌরীর শ্বশুরবাড়ী যাওয়া···

বাবলা-ঝোপের পাশে সেই বাড়ী! সেই বেড়া গলিয়া ভিতরে ঢুকিতে দেখে, বারান্দায় দু'তিন বছরের একটি শিশু, আর তার সামনে দাঁড়াইয়া···শুভ্র-বসনা এক তরুণী···

গৌরী? তার এ বেশ? অবুর সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল!···ইহারি মধ্যে?···

তাই। কানাই চক্রবর্ত্তী কাঁদিয়া কহিলেন,—আজ এক মাস হলো, সব চুকে গেছে।···কি দরকার ছিল? ওর জন্যই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ওকে কোনো মতে একটা আশ্রয়ে তুলে দিলুম, নিজের খালি বুকের কথা না ভেবে, সব সহ্য ক'রে···! কিন্তু মা আমার দুশ্চিন্তার তুফান তুলে আমার ঘরে ফিরে এলো! এই সংসার···!

অবুর পকেটে বিবাহের ছাপানো চিঠি ছিল—সে চিঠি যেন অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। অবুর চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। ভণ্ড, সে ভণ্ড···দুনিয়ার বেদরদ বুঝিয়া দুনিয়ার উপর চটিয়া আগুন হইয়া ছিল, অথচ নিজে দরদ দেখাইয়া কি না করিতে পারিত!···মন ধিক্কার তুলিয়া কহিল,—তুই যদি গৌরীকে বিবাহ করিতিস—তাহ হইলে তার আজ এ দশা তো ঘটিত না! গৌরীর সমস্ত ভবিষ্যৎ নিমেষে চুর হইয়া গেছে—অথচ কোথা হইতে ঐ শিশুর ভার—বুড়ারও চিন্তার উপর এ কি আরো গভীর চিন্তা!···

অবু কহিল,—আমার একটি কথা দয়া ক'রে রাখুন···

কানাই কহিলেন,—কি কথা, বাবা?

অবু কহিল,—আমার সঙ্গে গৌরীর বিবাহ দিন··· বেচারী একরত্তি মেয়ে···আমি রাজী।

কানাই কোনো কথা বলিলেন না। অবু কহিল,—আমি বিবাহ করবো গৌরীকে। এর জন্য সকলে আমায় যদি ত্যাগ করে, তবুও…

কানাই কহিলেন,—চঞ্চল হয়ো না, বাবা…কি মিথ্যা বিপদ কল্পনা ক'রে সেই বই লিখেছিলুম, তখনও জানতুম না, সংসারের যা সেরা বিপদ, তা আমার জন্য এ ভাবে উদ্যত ছিল!…বাঙালীকে মানুষ হ'তে বলো তুমি—তাই হও বাবা, মানুষই হও। এ বিপদ মানুষের মত সহ্য করা ছাড়া উপায়ও যে নেই। এ বিধাতার দান।

অবু চীৎকার করিয়া ডাকিল,—গৌরী…

দ্বারপ্রান্তে গৌরী দাঁড়াইয়া ছিল। অবু তার পানে চাহিল—সেই হাসি-ভরা চোখ দুটি আজ কি ম্লান!…সহ্য হয় না!…

অবু কানাইয়ের পায়ের উপর পড়িয়া কহিল,—দয়া ক'রে এ অনুমতি দিন। আমি বুঝতে পারিনি,—গৌরীর জীবন এ-ভাবে শেষ হবার নয়। তার সেবা, তার গৃহিণীপণা দুনিয়ার একটি সংসারকেও যে পরিপাটী সুন্দর ক'রে তুলতে পারবে, এক জন সংসারীও গৌরীর সাহচর্য্য পেয়ে বুঝবে, এ-দুনিয়ায় দারিদ্র্যের মধ্যেও শান্তি আছে, আরাম আছে!…গৌরীর সে-দান থেকে সে-সংসারকে, সে-সংসারীকে বঞ্চিত রাখবার আপনার কি সত্যই কোনো অধিকার আছে?…

গৌরী কথা কহিল,—অতি মৃদু স্বর! গৌরী বলিল,—ভুল করচো কেন, অবু-দা! এই যে শিশু—একে নিয়েই এক দিন আমি একটা সংসার গড়বো যে…একে সংসারী করেই আমার সংসারকে আবার আমি এক দিন আয়ত্ত করবো…দু'দিন দেরী,…তা হোক! আমার বাবাও তো আমায় নিয়ে এক দিন আশায় বুক বাঁধতে পেরেছিলেন।…এবার বাবাতে আমাতে দু'জনে বুক বেঁধে আবার চেয়ে থাকবো সুদূর ভবিষ্যতের পানে। মানুষ আশাতেই বাঁচে, অবুদা। এই আশা যদি না থাকতো মানুষের মনে, তা হ'লে দুনিয়ায় কি মানুষ বাঁচতো? না, দুনিয়া বাঁচার মত জায়গাই হতো?…

কথাটা বলিয়া গৌরী শিশুকে বুকে তুলিয়া লইল।

অবু তার পানে চাহিল,—গৌরীর চোখের কোলে জল টল-টল করিতেছে! সেই টলটলে জল-ভরা চোখে হাসির অতি-মৃদু কিরণ…অপূর্ব্ব!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অবু কহিল,—তাই হোক, দিদি। আমাকেও তোমাদের পাশে স্থান দিয়ো…দূর ক'রে দিয়ো না কোনো দিন।…এই বেদনার মধ্যে এসে আমি যে শান্তি পাই, আর কোথাও তেমন পাই না।…এর মধ্যে আমার এই হাত যেটুকু স্নেহ, যেটুকু আরাম রচে তুলতে পারে, তাকে তা তুলতে দিয়ো, এই আমার মিনতি!

কানাই কহিলেন,—সুখ বড় তুচ্ছ, বাবা, মনের উপর কোনো ছাপ রাখে না—মনকে গড়তেও পারে না। কিন্তু দুঃখ, বেদনা…যে মনের দাম জানে, দুঃখ-বেদনার দামও তার কাছে অনেক বেশী, বাবা!…

সে রাত্রে অবু আর গৃহে ফিরিল না। বাড়ীতে একটা চিঠি লিখিয়া দিল মা'র নামে—

আমি বিবাহ করিব না। দুনিয়ায় বিবাহ করিবে কি সকলেই? না। আমায় ক্ষমা করো মা! কিছু দিন নিরুদ্দেশ রহিলাম। ভাবিয়ো না। মাঝে মাঝে খপর দিব এবং এক দিন দেখাও হইবে। দু'দিন বিরলে বসিয়া শুধু ভাবিতে চাই, মানুষ তার মনের শক্তি লইয়া জন্মটাকে কি-ভাবে সফল করিতে পারে এবং কি-ভাবে তা করা উচিত।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আসন্ন-মাতৃকা

ললিত পাণ্ডুর-মুখে কে আসে ও নারী,
মণ্ডিত জননীপদ পূর্ব্ব-মহিমায়!
কৈশোরের যবনিকা ধীরে অপসারি,
ক্ষীণাঙ্গী মন্থরগতি রাজহংসীপ্রায়,
পুঞ্জিত লাবণ্যে সারা দেহটি অলস
হৃদি-মাঝে ক্ষীরনিধি সুধায় সরস।

স্নিগ্ধ পরিমলবদ্ধ ও যে পদ্মকলি,
জলভারে মেঘ যেন পড়িতেছে ঢলি,
বাৎসল্য-বারিতে পূর্ণ ও যে হেমঘট,
শ্যামল পল্লবে ঢাকা যেন নব-বট।
বসন্তের মঞ্জরিত ও যে কুঞ্জবন
ভবিষ্যৎ ফলপ্রদ আশার স্বপন।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

কণাদ ও গৌতম দ্বৈতবাদী

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, কণাদ ও গৌতম দ্বৈতবাদী। তাঁহাদিগের মতে পরব্রহ্ম হইতে জীবাত্মা তত্ত্বতঃই ভিন্ন পদার্থ; কিন্তু এখন কেহ কেহ বলেন যে, কণাদ এবং গৌতমও অদ্বৈতবাদী। ব্যাখ্যাকর্ত্তারা অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিলেও কণাদ ও গৌতমের সূত্র দ্বারা অদ্বৈতমত বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সত্যই কি তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং অদ্বৈতবাদী কোন পূর্ব্বাচার্য্য কি সেরূপ কোন কথা বলিয়াছেন?

গুরু। অদ্বৈতবাদ-প্রচারক ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি এবং তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী বিদ্যারণ্য মুনি প্রভৃতিও ঐরূপ কথা বলেন নাই। তবে পরবর্ত্তী কালে নব্য-নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিরও পরে অদ্বৈতবাদসমর্থক কাশ্মীরক সদানন্দ যতি তাঁহার "অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, (১) দ্বৈতমতের প্রতিপাদক বিভিন্ন দর্শনকার ঋষিগণেরও সকলেরই অদ্বৈতবাদেই চরম তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। কারণ, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং অভ্রান্ত। কিন্তু বাহ্যদৃষ্টি-তৎপর স্থূলদর্শী ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রথমে অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ অসম্ভব বলিয়া তাঁহারা নানা ভাবে দ্বৈতমতপ্রতিপাদক নানা দর্শনশাস্ত্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তদ্দ্বারা স্থূলদর্শী বাহ্যদৃষ্টিতৎপর ব্যক্তিদিগের নাস্তিক্য নিবৃত্তি করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ সমস্ত দর্শনে তাঁহাদিগের উপদিষ্ট দ্বৈতবাদ সিদ্ধান্তরূপে তাঁহাদিগের বিবক্ষিত নহে। তাঁহাদিগেরও অদ্বৈতবাদই সিদ্ধান্ত।

কাশ্মীরক সদানন্দ যতির ন্যায় বঙ্গের গৌরবরবি মধুসূদন সরস্বতীও 'মহিম্নঃ স্তোত্রে'র "ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ—" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় বেদাদিসর্ব্বশাস্ত্র-প্রস্থানভেদ বর্ণন করিয়া সর্ব্বশেষে সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয়প্রদর্শনোদ্দেশ্যে বলিয়াছেন যে, অদ্বৈতসিদ্ধান্তেই সর্ব্বশাস্ত্রের চরম তাৎপর্য্য। কিন্তু প্রথমেই অদ্বৈতমার্গে সকলের প্রবেশ অসম্ভব বলিয়া অধিকারিবিশেষের জন্য নানা শাস্ত্রে নানা মতের উপদেশ হইয়াছে। মহামনীষী মধুসূদন সরস্বতী গৌতমাদি ঋষিগণের কোন সূত্র দ্বারা তাঁহাদিগকে অদ্বৈতবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু সদানন্দ যতি ঐ উদ্দেশ্যে শেষে গৌতমের দুইটি সূত্রও উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং নব্য-বৈয়াকরণ নাগেশভট্টও সেই সূত্র উদ্ধৃত করিয়া কল্পনাবলে গৌতমেরও অদ্বৈতমতেই চরম সম্মতি বলিয়াছেন। সে সব কথা পরে বলিব।

কিন্তু এখানে প্রথমে বলা আবশ্যক যে, পূর্ব্বোক্তভাবে সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয়-ব্যাখ্যার দ্বারা কখনই সকল সম্প্রদায়ের চিরবিবাদ-নিবৃত্তির আশা নাই। কারণ, সকল সম্প্রদায়ই তাঁহাদিগের অভিমত মতকেই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া অন্যান্য আর্ষমতের পূর্ব্বোক্তরূপ একটা উদ্দেশ্য বলিতে পারেন। সদানন্দ যতির পূর্ব্বে নব্যসাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষুও সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্যের প্রারম্ভে তাঁহার নিজ মতকেই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া উহার বিরুদ্ধ ন্যায়-বৈশেষিকাদি শাস্ত্রোক্ত মতের পূর্ব্বোক্তরূপ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ঐরূপ সমন্বয়-ব্যাখ্যা কি অন্য সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন? অথবা কখনও করিবেন? সদানন্দ যতিও ত নিজমত সমর্থনের জন্য বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত কোন বচন উদ্ধৃত করিয়াও তাঁহার অভিমত সমন্বয়-ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। কারণ, বিজ্ঞানভিক্ষু, সদানন্দ যতির অভিমত অদ্বৈতমতকেই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তিনি উক্ত মতের খণ্ডনই করিয়াছেন।

ফল কথা, কোন দার্শনিক সম্প্রদায়ই যখন তাঁহাদিগকে স্থূলদর্শী অতিনিম্নাধিকারী বলিয়া কখনই স্বীকার করেন না এবং তাঁহাদিগের আচার্য্যোক্ত মতকেই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তখন পূর্ব্বোক্তভাবে সমন্বয়-ব্যাখ্যা ব্যর্থ। তাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও ঐভাবে সমন্বয়-ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি সমস্ত ঋষিকেও তাঁহার ন্যায় অদ্বৈতবাদী বলিয়াও নিজ মত সমর্থন করেন নাই। পরন্তু তিনি বেদান্তদর্শনের প্রথমসূত্র-ভাষ্যে আত্মার স্বরূপবিষয়ে নানা মতভেদ প্রকাশ করিতে দ্বৈতবাদী ঋষিদিগের মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরেও উক্ত বিষয়ে কপিল ও কণাদ প্রভৃতির দ্বৈতমত স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া অদ্বৈতমতে প্রতিষ্ঠার জন্য সেই সমস্ত আর্ষমতেরও প্রতিবাদ করিয়াছেন। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও কণাদ ও গৌতমের মত-ব্যাখ্যায় তাঁহাদিগের দ্বৈতমতেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরন্তু তিনি "ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা" গ্রন্থে গৌতমের কোন কোন সূত্র দ্বারা অদ্বৈত মতে

---

(১) সর্ব্বেষাং প্রস্থানকর্ত্তৃণাং মুনীনাং বক্ষ্যমাণবিবর্ত্তবাদ এব পর্য্যবসানেনাদ্বিতীয়ে পরমেশ্বর এব বেদান্তপ্রতিপাদ্যে তাৎপর্য্যম্। ন হি তে মুনয়ো ভ্রান্তাস্তেষাং সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ...কিন্তু বহির্ম্মুখপ্রবণানামাপাততঃ পরমপুরুষার্থেঽদ্বৈতমার্গে প্রবেশো ন সম্ভবতীতি নাস্তিক্যনিবারণায় তৈঃ প্রস্থানভেদা দর্শিতা—ন তু তাৎপর্য্যেণ।—"অদ্বৈত-ব্রহ্মসিদ্ধি" প্রথমমুদ্গর।

খণ্ডনও করিয়াছেন (১)। গৌতম যে অদ্বৈতবাদী নহেন, পরন্ত তিনি অদ্বৈতমতের বিরোধী, ইহা প্রতিপাদন করাই সেখানে বাচস্পতি মিশ্রের উদ্দেশ্য। নচেৎ সেখানে তাঁহার ঐরূপে গৌতমের তাৎপর্য্যব্যাখ্যার কোন প্রয়োজনই বুঝা যায় না।

পরন্ত বেদান্তদর্শনের চতুর্থ সূত্রভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর, যেখানে কোন অংশে নিজমত সমর্থনের জন্য গৌতমের ন্যায়দর্শনের "দুঃখ-জন্ম—" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রটি "আচার্য্য প্রণীত" বলিয়া সসম্মানে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেখানেও "ভামতী" টীকায় শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, (২) গৌতমসম্মত তত্ত্বজ্ঞান কিন্তু উক্ত স্থলে আচার্য্য শঙ্করের অভিমত নহে। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপবিষয়ে আচার্য্য-শঙ্কর গৌতমের মত গ্রহণ করেন নাই। কারণ, গৌতম দ্বৈতবাদী। সুতরাং তাঁহার মতে অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না।

বস্তুতঃ মহর্ষি কণাদ ও গৌতমকে কখনই আমরা অদ্বৈতবাদী বলিয়া বুঝিতে পারি না। কারণ, অদ্বৈতমতে একই ব্রহ্ম প্রত্যেক জীবদেহে জীবভাবে অবস্থিত, জীবাত্মা বস্তুতঃ সেই ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ পদার্থ নহেন। সুতরাং প্রত্যেক জীবদেহে জীবাত্মার বাস্তব কোন ভেদ নাই। তুমি আমি, রাম, শ্যাম, গো, মহিষ, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত জীবই বস্তুতঃ সেই এক ব্রহ্ম। তাহা হইলে তোমার সুখ বা দুঃখের বোধ হইলে তখন আমারও সেই সুখ বা দুঃখের বোধ হয় না কেন? তুমি ও আমি ত বস্তুতঃ একই আত্মা। এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, সুখ-দুঃখাদি আত্মার বাস্তব ধর্ম্ম নহে, ঐ সমস্ত অন্তঃকরণেরই বাস্তব ধর্ম্ম। কিন্তু সেই সমস্ত অন্তঃকরণধর্ম্মই আত্মাতে আরোপিত হয়, এ জন্য উহা আত্মার ঔপাধিক ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ যেমন রক্তজবাপুষ্পের নিকটে স্বচ্ছ স্ফটিক-মণি থাকিলে তাহাতে সেই জবাপুষ্পের ধর্ম্ম রক্তরূপের আরোপ বা ভ্রমাত্মক প্রতীতি হয়, এ জন্য সেখানে সেই রক্ত রূপকে স্ফটিক মণির ঔপাধিক ধর্ম্ম বলে, কিন্তু সেই রক্তরূপ ঐ জবাপুষ্পেরই বাস্তবধর্ম্ম, এইরূপ জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন ও সুখ-দুঃখাদি যে সমস্ত আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাও অন্তঃকরণেরই বাস্তব ধর্ম্ম। ঐ অন্তঃকরণ প্রত্যেক জীবদেহে বিভিন্ন। সুতরাং আমার অন্তঃকরণে উৎপন্ন সুখ-দুঃখাদি তোমার অন্তঃকরণে উৎপন্ন না হওয়ায় তুমি ও আমি একই আত্মা হইলেও তোমার সুখ-দুঃখপ্রতীতিকালে আমার সেই সুখ-দুঃখপ্রতীতি জন্মে না। বিভিন্ন দেহে আত্মাতে ঐরূপ আরোপ হয় না।

কিন্তু কণাদ ও গৌতমের মতে জীবাত্মা প্রত্যেক জীব-দেহে ভিন্ন। তুমি ও আমি বস্তুতঃ একই আত্মা নহি; এবং জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন ও সুখ-দুঃখাদিও সেই বিভিন্ন আত্মারই বাস্তব ধর্ম্ম, ঐ সমস্ত অন্তঃকরণ বা মনের ধর্ম্ম নহে। সুতরাং কণাদ ও গৌতমকে কিরূপে অদ্বৈতবাদী বলা যায়?— জীবাত্মা ও তাহার মুক্তির স্বরূপ বিষয়ে কণাদ-সম্প্রদায়ের মত প্রকাশ করিতে আচার্য্য শঙ্করও ত বলিয়া গিয়াছেন যে, (১) তাঁহাদিগের মতে জীবাত্মা প্রতিশরীরে ভিন্ন, সুতরাং বহু এবং স্বভাবতঃ অচেতন, কিন্তু অতিসূক্ষ্ম মনের সহিত সংযোগবশতঃ সেই সমস্ত জীবাত্মাতে জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রভৃতি নববিধ বিশেষগুণ জন্মে এবং সেই সমস্ত বিশেষগুণের অত্যন্ত উচ্ছেদই তাঁহাদিগের মতে মুক্তি। অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠাতা মহামনীষী মধুসূদন সরস্বতীও "ভগবদ্গীতা"র টীকায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের ন্যায় নৈয়ায়িক ও মীমাংসক প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ের মতেও যে জীবাত্মা—জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং ভাবনা অর্থাৎ জ্ঞানজন্য সংস্কার, এই নববিধ বিশেষগুণবিশিষ্ট এবং প্রতি শরীরে ভিন্ন, নিত্য ও বিশ্বব্যাপী, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন (২)।

কিন্তু অদ্বৈতমতনিষ্ঠ আধুনিক কোন কোন মহা-মনীষীও কণাদ ও গৌতমকে অদ্বৈতবাদী বলিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা—জ্ঞান-সুখাদি আত্মার ধর্ম্ম, ইহা সুস্পষ্ট বলেন নাই এবং আত্মার নানাত্ব বা একত্ব বিষয়ে গৌতম কোন কথা স্পষ্ট বলেন নাই, এইরূপ অনেক কথা লিখিয়াছেন (৩)। তবে কি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও

(১) ন্যায়দর্শন চতুর্থ ১০অঃ ১ম আ০ ১৯শ, ২০শ ও ৪১শ সূত্র ও তাৎপর্য্যটীকা দ্রষ্টব্য।

(২) তত্ত্বজ্ঞানান্মিথ্যাজ্ঞানাপায় ইত্যেতাবন্মাত্রেণ সূত্রোপন্যাসঃ। ন ত্বক্ষপাদসম্মতং তত্ত্বজ্ঞানমিহ সম্মতম্। "ভামতী"—১।১।৪।

(১) "সতি বহুত্বে বিভুত্বে চ ঘটকুড্যাদিসমানাদ্রব্যমাত্রস্বরূপাঃ স্বতোঽচেতনা আত্মানস্তদুপকরণাণি চাণুনি মনাংস্যচেতনানি। তত্রাত্মদ্রব্যাণাং মনোদ্রব্যাণাঞ্চ সংযোগান্নবেচ্ছাদয়ো বৈশেষিকা আত্মগুণা উৎপদ্যন্তে। তেচাব্যতিরেকেণ প্রত্যেকমাত্মসু সমবয়ন্তি স সংসারঃ। তেষাং নবানামাত্মগুণানামত্যন্তানুৎপাদো মোক্ষ ইতি কাণাদাঃ"। বেদান্তদর্শন ২।৩।৫০-সূত্রের শারীরক ভাষ্য।

(২) নন্বাত্মনো নিত্যত্বে বিভুত্বে চ ন বিবদামঃ, প্রতিদেহমেকত্বন্তু ন সহামহে। তথাহি, বুদ্ধি-সুখ-দুঃখেচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-ধর্ম্মাধর্ম্ম-ভাবনাখ্যনববিশেষগুণবন্তঃ প্রতিদেহং ভিন্না এবং নিত্যা বিভবশ্চাত্মান ইতি বৈশেষিকা মন্যন্তে। ইমমেব চ পক্ষং তার্কিক-মীমাংসকাদয়োঽপি প্রতিপন্নাঃ"। ভগবদ্গীতা—দ্বিতীয় অঃ, ১৪শ শ্লোকের টীকা।

(৩) সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছেন—"গৌতম ও কণাদ, জ্ঞান-সুখাদি আত্মার ধর্ম্ম, এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলেন নাই।" "আত্মা নিত্যজ্ঞানস্বরূপ নহে বা নিত্যজ্ঞান নাই, ইহা গৌতম ও কণাদ বলেন নাই। টীকাকারেরা তাহা বলিয়াছেন। যেরূপ বলা

মধুসূদন সরস্বতী, কণাদ ও গৌতমের সূত্র না দেখিয়াই অথবা উহার প্রকৃতার্থ না বুঝিয়াই কেবল ব্যাখ্যাকারদিগের কথানুসারেই পূর্ব্বোক্ত ঐ সমস্ত কথা বলিয়া গিয়াছেন ? ব্যাখ্যাকারদিগের ঐ সমস্ত মতই কি তাঁহাদিগের সেখানে খণ্ডনীয় ? তাহা হইলে শারীরক ভাষ্যে কণাদসম্মত "আরম্ভবাদে"র খণ্ডন করিতে আচার্য্য শঙ্কর কণাদসূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন কেন ? আর কণাদও গৌতমের সূত্রের দ্বারা অদ্বৈত মত বুঝিতে পারিলে তিনি অদ্বৈতমতসমর্থনে তাহাও কি বলিতেন না ?

বস্তুতঃ কণাদ ও গৌতম যে দ্বৈতবাদী, ইহা চিরপ্রসিদ্ধই আছে। তাঁহাদিগের সূত্রের দ্বারাও তাহাই বুঝা যায়। কিন্তু তাহা বুঝাইতে হইলে তাঁহাদিগের অনেক সূত্রের পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। সংক্ষেপে তাহা সুব্যক্ত করা যায় না। তথাপি এখানে আবশ্যকবোধে কিছু বলিতেছি। প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহর্ষি গৌতম জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রভৃতিকে জীবাত্মার নিজেরই বাস্তব গুণ বলিয়াছেন। তিনি যে স্মৃতির আশ্রয় বলিয়া দেহাদি ভিন্ন নিত্য আত্মার অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন, ঐ স্মৃতিরূপ জ্ঞান যে তাঁহার মতে আত্মার গুণ হইলেই উপপন্ন হয়, নচেৎ ঐ স্মৃতির উপপত্তিই হয় না, ইহা তিনি "তদাত্ম-গুণত্বসদ্ভাবাদপ্রতিষেধঃ" (৩।১।১৪) এই সূত্রের দ্বারা স্পষ্ট বলিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি পূর্ব্বে বলিয়াছি। পরন্তু জ্ঞান যে অন্তঃকরণ বা মনের গুণ নহে, ইহাও তিনি পরে স্পষ্ট বলিয়াছেন এবং জ্ঞান আত্মারই ধর্ম্ম, কিন্তু ইচ্ছা প্রভৃতি মনের ধর্ম্ম, এই মত-বিশেষরও খণ্ডন করিয়া জ্ঞান-জন্য ইচ্ছা প্রভৃতিও জ্ঞানের আশ্রয় আত্মারই ধর্ম্ম, ইহাও তিনি সমর্থন করিয়াছেন। (১) পরন্তু স্মরণরূপ জ্ঞান যে, চিরস্থায়ী আত্মারই বাস্তব ধর্ম্ম, ইহা সমর্থন করিতে শেষে তিনি আবারও বলিয়াছেন—

"স্মরণন্ত্বাত্মনোজ্ঞস্বাভাব্যাৎ।" (৩।২।৪০) অর্থাৎ আত্মা জ্ঞাতৃস্বভাব। জ্ঞাতাই পূর্ব্বে জানিয়াছে এবং পরে জানিবে এবং বর্ত্তমান কালেও জানিতেছে। সুতরাং ত্রিকালীন জ্ঞানশক্তি বা জ্ঞানবত্তা চিরস্থায়ী জ্ঞাতা বা আত্মারই স্বভাব। অর্থাৎ জ্ঞান, আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম না হইলেও স্বকীয় ধর্ম্ম—বাস্তব ধর্ম্ম, উহা ঔপাধিক ধর্ম্ম নহে। ফল কথা, মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে বিচার-পূর্ব্বক জ্ঞান যে আত্মারই বাস্তব ধর্ম্ম, উহা মনের ধর্ম্ম নহে, ইহা সুস্পষ্ট সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে তাঁহার উক্তরূপ মত অস্পষ্ট রাখিয়াছেন, খুলিয়া বলেন নাই, এবং তাঁহার মত অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধ নহে, পরন্তু অদ্বৈতমত তাঁহারও অভিমত, এই সমস্ত কথা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না।

পরন্তু মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথমে আত্ম-পরীক্ষায় আত্মা, দেহাদি ভিন্ন ও নিত্য, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে যে সমস্ত যুক্তি বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার মতে জীবাত্মা যে প্রতি শরীরে ভিন্ন, সুতরাং আত্মা এক নহেন—বহু, ইহাও সমর্থিত হইয়াছে। কারণ, গৌতমের মতে তুমি ও আমি একই আত্মা হইলে তোমার দৃষ্ট বিষয় আমি কেন স্মরণ করিতে পারি না ? গৌতমের মতে ইহার উত্তর কি ? তাহা ত তিনি বলেন নাই, পরন্তু জীবের ভিন্ন ভিন্ন মন যে স্মরণ করে না, স্মরণরূপ জ্ঞান যে মনের ধর্ম্ম নহে, কিন্তু আত্মারই বাস্তব ধর্ম্ম, ইহাও গৌতম পরে সুস্পষ্টই বলিয়াছেন। সুতরাং গৌতম যখন একের দৃষ্ট বিষয় অন্যে স্মরণ করিতে পারে না—এই সিদ্ধান্তানুসারে আত্মা দেহাদি ভিন্ন ও নিত্য, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন এবং স্মরণরূপ জ্ঞানকে আত্মারই ধর্ম্ম বলিয়াছেন, তখন তাঁহার মতে—আত্মা এক নহে,—আত্মা প্রতি দেহে ভিন্ন—বহু, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তাহা হইলে তোমার দৃষ্ট বিষয় আমি স্মরণ করিতে পারি না ; কারণ, তুমি ও আমি বস্তুতঃ বিভিন্ন আত্মা। "ন্যায়বার্ত্তিক"-কার উদ্দ্যোতকরও গৌতমের সূত্রানুসারে ইহাই বলিয়া গিয়াছেন। (১)

আপত্তি হয় যে, সমস্ত জীবাত্মাই যখন বিশ্বব্যাপী, তখন সমস্ত জীবদেহেই সমস্ত জীবাত্মার সংযোগ-সম্বন্ধ আছে। সুতরাং তোমার দেহেও আমার সংযোগ আছে। তাহা হইলে তোমার দেহে ও আমার আত্মাতে জ্ঞানাদি জন্মে না কেন? এতদুত্তরে মহর্ষি গৌতম পরে বলিয়াছেন—

শরীরোৎপত্তিনিমিত্তবৎ সংযোগোৎপত্তিনিমিত্তং কর্ম্ম।
৩।২।৬৬।

হইল, তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে সুধীগণ বুঝিতে পারিবেন যে, ন্যায়াদি-দর্শনকর্ত্তাদের মত বেদান্তমতের বিরুদ্ধ, ইহা বলিবার বিশেষ হেতু নাই। বলিতে পারা যায় যে, বেদান্তমত তাঁহাদিগের অভিমত। পরন্তু অন্তঃকরণের সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাস-নিবন্ধন জ্ঞান-সুখাদি আত্মধর্ম্মরূপে প্রতীয়মান হয়, ইহা তাঁহারা খুলিয়া বলেন নাই। তাদৃশ সূক্ষ্ম বিষয় শিষ্যগণ সহসা বুঝিতে পারিবে না, এই বিবেচনাতেই তাঁহারা উহা অস্পষ্ট রাখিয়াছেন।" "গৌতম আত্মার নানাত্ব বা একত্ব বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই।" ফেলোসিপের লেকচর—পঞ্চম বর্ষ, ১৮০ পৃষ্ঠা।

(১) "যুগপজ্জ্ঞেয়ানুপলব্ধেশ্চ ন মনসঃ।
"জ্ঞস্যেচ্ছাদ্বেষনিমিত্তত্বাদারম্ভনিবৃত্ত্যোঃ।"
"যথোক্তহেতুত্বাৎ পারতন্ত্র্যাদকৃতাভ্যাগমাচ্চ ন মনসঃ।"
"পরিশেষাদ্ যথোক্তহেতুপপত্তেশ্চ।"

ন্যায়দর্শন—তৃতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় আহ্নিক, ১৯শ-৩৪শ-৩৮শ ও ৩৯শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

(১) বহুত্বঞ্চ অতএব—"দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাৎ নান্যদৃষ্টমন্যঃ স্মরতীতি। "শরীর-দাহে পাতকাভাবাদিতি, সেয় সর্ব্বাব্যবস্থা শরীরিভেদে সম্ভবতীতি।"—ন্যায়বার্ত্তিক।

তাৎপর্য্য এই যে, বিশ্বব্যাপী প্রত্যেক জীবাত্মারই সমস্ত জীবদেহের সহিত সংযোগ থাকিলেও যে জীবাত্মার অদৃষ্টবিশেষজন্য যে শরীর-বিশেষের সৃষ্টি হয়, সেই শরীরের সহিতই সেই জীবাত্মার বিলক্ষণ সংযোগ এবং তাহার সহিতই তাঁহার সেই মনের বিলক্ষণ সংযোগ জন্মে। তাহাতেও সেই অদৃষ্টবিশেষই নিমিত্ত। সেই অদৃষ্টবিশেষজন্য যে শরীরের সহিত যে আত্মার ও মনের বিলক্ষণ সংযোগ জন্মে, সেই আত্মাকেই সেই শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা বলে। শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাতেই যখন জ্ঞানাদি জন্মে, তখন যে আত্মা, যে শরীরাবচ্ছিন্ন, সেই শরীরেই সেই আত্মাতে জ্ঞানাদি জন্মিবে; অন্য শরীরের সহিত তাহার সংযোগ থাকিলেও সেই সমস্ত শরীর তাহার অদৃষ্টবিশেষজন্য না হওয়ায় সেই আত্মা সেই সমস্ত শরীরাবচ্ছিন্ন নহে। সুতরাং সেই সমস্ত শরীরে তাহাতে জ্ঞানাদি জন্মে না। অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় গৌতমের উক্তরূপ উত্তর স্বীকার না করিলেও উক্ত সূত্রের দ্বারা গৌতমের মতে জীবাত্মা যে বিশ্বব্যাপী এবং প্রতি শরীরে ভিন্ন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; নচেৎ তাঁহার উক্তরূপ উত্তর সঙ্গতই হয় না। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও সেখানে গৌতমের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া তদনুসারেই তাহার ঐ উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু মহর্ষি গোতম উহার পরে শুভাশুভ কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মও যে মনের গুণ নহে, উহাও আত্মারই গুণ, প্রত্যেক আত্মাই নিজকৃতকর্ম্মফল ধর্ম্মাধর্ম্মজন্যই নানাবিধ জন্মলাভ করে, ইহাও বিচারপূর্ব্বক স্পষ্ট সমর্থন করিয়াছেন। এখন বল দেখি, যিনি প্রত্যেক জীবদেহে পৃথক্ পৃথক্ আত্মা স্বীকার করিয়া আত্মার বাস্তবভেদ স্বীকার করিয়াছেন এবং জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম ও তজ্জন্য সুখ ও দুঃখ, জীবাত্মারই বাস্তব গুণ বলিয়াছেন, আত্মার নির্গুণ স্বরূপ স্বীকারই করেন নাই, তাঁহাকে কিরূপে অদ্বৈতবাদী বলা যায়? তাঁহার ঐ সমস্ত মত কি অদ্বৈতমতের একেবারেই বিরুদ্ধ নহে?

এইরূপ মহর্ষি কণাদের সূত্র দ্বারাও জীবাত্মা যে, প্রতি শরীরে ভিন্ন, ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। কিরূপে বুঝা যায়, তাহাও এখানে বলিতেছি। কিন্তু বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝিতে হইবে। বৈশেষিকদর্শনে কণাদ যথাক্রমে নিম্নলিখিত তিনটি সূত্র বলিয়াছেন—

সুখ-দুঃখ-জ্ঞান-নিষ্পত্ত্যবিশেষাদৈকাত্ম্যম্॥ ৩।২।১৯।
নানাত্মানো ব্যবস্থাতঃ॥ * ৩।২।২০।
শাস্ত্র-সামর্থ্যাচ্চ॥ ৩।২।২১।

কণাদ প্রথমে "সুখ-দুঃখ" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যে, শরীর ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সমস্ত শরীরে আত্মা এক। কারণ, সমস্ত শরীরেই নির্ব্বিশেষে সুখ-দুঃখ ও জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যেমন আকাশে সর্ব্বত্রই সমানভাবে শব্দের উৎপত্তি হওয়ায় শব্দের সমবায়িকারণ আকাশ এক বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে, তদ্রূপ, আত্মাতেও সর্ব্বশরীরেই সুখ-দুঃখাদির উৎপত্তি হওয়ায় আকাশের ন্যায় আত্মাও বস্তুতঃ এক। উপাধিভেদে আকাশের ভেদের ন্যায় আত্মারও ভেদ আছে, কিন্তু উহা কাল্পনিক ভেদ। কণাদ প্রথমে উক্ত পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়া পরে তাঁহার সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে দ্বিতীয় সূত্র বলিয়াছেন—"নানাত্মানো ব্যবস্থাতঃ"। অর্থাৎ আত্মা নানা, যেহেতু ব্যবস্থা আছে।

তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা আকাশের ন্যায় এক বলা যায় না। কারণ, আত্মার ভেদসাধক বিশেষ হেতু আছে। আকাশের ভেদসাধক বিশেষ হেতু নাই। তাই কণাদ পূর্ব্বে আকাশের একত্বসাধন করিতে সূত্র বলিয়াছেন—"শব্দলিঙ্গাবিশেষাদ্বিশেষলিঙ্গাভাবাচ্চ" (২।১।৩০।) অর্থাৎ সর্ব্বত্রই আকাশে শব্দ জন্মে। সুতরাং শব্দই আকাশের সাধক লিঙ্গ হওয়ায় আকাশের সাধক লিঙ্গের বিশেষ নাই এবং আকাশের ভেদসাধক কোন বিশেষ লিঙ্গও নাই। অতএব আকাশ এক। কিন্তু আত্মার ভেদসাধক বিশেষ লিঙ্গ থাকায় আত্মা এক, ইহা বলা যায় না, সুতরাং আত্মা নানা অর্থাৎ প্রতি শরীরে ভিন্ন, ইহাই স্বীকার্য্য। আত্মার ভেদসাধক বিশেষ লিঙ্গ কি আছে? তাই কণাদ বলিয়াছেন—"ব্যবস্থাতঃ"। "ব্যবস্থা" শব্দের অর্থ নিয়ম।

তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত জীবাত্মাতেই সুখ-দুঃখাদির উৎপত্তি হইলেও তাহার নিয়ম আছে। একের সুখ বা দুঃখ জন্মিলে তখন সকলেরই সুখ বা দুঃখ জন্মে না। কেহ যখন সুখী বা দুঃখী, তখন সকলেই সুখী বা দুঃখী নহে। এইরূপ কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ মূর্খ, কেহ পণ্ডিত, ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারে জীবাত্মার যে নানারূপ অবস্থার নিয়ম সর্ব্বসম্মত, তাহাও জীবাত্মার ভেদসাধক লিঙ্গ। অর্থাৎ উহার দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, জীবাত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন। কারণ, সমস্ত জীবদেহে একই আত্মা হইলে তাহার উক্তরূপ সুখ-দুঃখাদির ব্যবস্থা বা নিয়মের উৎপত্তি হয় না। এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, মহর্ষি কণাদ উক্ত সূত্রের দ্বারা জীবাত্মার সুখ-দুঃখাদি ব্যবস্থাকে তাহার প্রতিদেহে ভেদসাধক হেতুরূপে উল্লেখ করায় তাঁহার মতে সুখ-দুঃখাদি যে জীবাত্মারই বাস্তব গুণ, উহা অন্তঃকরণ বা মনের গুণ নহে, ইহাও বুঝা যায়।

* প্রচলিত "বৈশেষিকদর্শন" পুস্তকে "ব্যবস্থাতো নানা" রূপ সূত্র পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশস্তপাদভাষ্যের "ন্যায়কন্দলী" টীকায় শ্রীধর ভট্ট এবং "সূক্তি" টীকায় জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি "নানাত্মানো ব্যবস্থাতঃ" এইরূপই সূত্রপাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং উহাই প্রকৃত সূত্রপাঠ বুঝা যায়। শঙ্করমিশ্রের ব্যাখ্যার দ্বারাও উক্তরূপ সূত্রপাঠ বুঝিতে পারা যায়।

অবশ্যই আপত্তি হইবে যে, আত্মার একত্বই শাস্ত্রসিদ্ধ হইলে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কোন যুক্তির দ্বারাই ত আত্মার বাস্তব নানাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। তাই মহর্ষি কণাদ পরে তৃতীয় সূত্র বলিয়াছেন—"শাস্ত্র সামর্থ্যাচ্চ"। অর্থাৎ শাস্ত্রের সামর্থ্যপ্রযুক্তও আত্মা নানা (১)। তাৎপর্য্য এই যে, আত্মার নানাত্ববোধক বহু শাস্ত্রবাক্য আছে; যদ্দ্বারা আত্মা যে নানা অর্থাৎ প্রতি শরীরে ভিন্ন ইহাই বুঝা যায়; এবং সেই সমস্ত শাস্ত্রবাক্য আত্মার বাস্তব নানাত্ব প্রতিপাদনে সমর্থ; কারণ, আত্মার বাস্তব নানাত্বই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু আত্মার একত্ব যুক্তিবাধিত, সুতরাং কোন শাস্ত্রই উহা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ নহে। মহর্ষি কণাদ উক্ত সূত্রে "শাস্ত্র" শব্দের পরে যোগ্যতাবোধক "সামর্থ্য" শব্দের প্রয়োগ করিয়া সূচনা করিয়াছেন যে, অর্থের যথার্থ যোগ্যতা-জ্ঞান, যথার্থ শাব্দবোধের কারণ; সুতরাং যে অর্থ অযোগ্য বা অসম্ভব, তাহা শাস্ত্রার্থ হইতে পারে না। সুতরাং যে সমস্ত শাস্ত্রবাক্য আত্মার একত্বপ্রতিপাদক বলিয়া গৃহীত হয়, তাহার অন্যরূপ তাৎপর্য্যই বুঝিতে হইবে। সে কিরূপ, তাহা পরে বলিব।

বস্তুতঃ কণাদের মতে জীবাত্মা যে প্রতি শরীরে ভিন্ন এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম ও তজ্জন্য সুখ-দুঃখাদি যে জীবাত্মারই গুণ, ইহা কণাদের অন্য সূত্রের দ্বারাও স্পষ্ট বুঝা যায়; কারণ, কণাদ পরে বলিয়াছেন—

আত্মান্তরগুণানামাত্মান্তরগুণেষ্বকারণত্বাৎ।৬।১।৫।*

প্রশস্তপাদভাষ্যের "ন্যায়কন্দলী" টীকাকার শ্রীধর ভট্ট এবং "সূক্তি" টীকাকার নব্যনৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতিও কণাদের মতে ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি যে জীবাত্মারই গুণ, ইহার প্রমাণপ্রদর্শন করিতে কণাদের উক্ত সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীধর ভট্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, দাতার দানজন্য যে ধর্ম্ম, তাহা প্রতিগ্রহীতার ধর্ম্ম উৎপন্ন করে—এই মতের খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যেই মহর্ষি কণাদ উক্ত সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, অন্য আত্মার সুখ-দুঃখাদি গুণ অপর আত্মার সুখ-দুঃখাদি গুণের কারণ না হওয়ায় অন্য আত্মাতে উৎপন্ন ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ গুণ, অন্য আত্মাতে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ গুণের কারণ হয় না। শঙ্কর মিশ্র ও জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি সরলভাবেই উক্ত সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অন্য আত্মার ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি গুণ, অপর আত্মার সুখ-দুঃখাদি গুণের কারণ হয় না। যে ব্যাখ্যাই কর, কণাদের মতে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সুখ-দুঃখাদি যে জীবাত্মারই গুণ এবং জীবাত্মা যে প্রতি শরীরে বস্তুতঃই ভিন্ন, ইহা কণাদের উক্ত সূত্রের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়। উক্ত সূত্রে দুইবার "আত্মান্তর" শব্দের প্রয়োগ দ্বারাও প্রতি শরীরে আত্মার বাস্তব ভেদই প্রকটিত হইয়াছে। তাহা হইলে অদ্বৈত মত যে কণাদের সিদ্ধান্ত নহে, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। সুতরাং আত্মার একত্ব-প্রতিপাদন করিতে কণাদের পূর্ব্বোক্ত "সুখ-দুঃখ" ইত্যাদি সূত্রটি যে তাঁহার পূর্ব্বপক্ষ সূত্র এবং তিনি পরে দুই সূত্রের দ্বারা আত্মার একত্ববাদের খণ্ডন করিয়া নানাত্ববাদ বা দ্বৈতবাদই সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, যে সূত্র দ্বারা কোন পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করা হয়, তাহার নাম পূর্ব্বপক্ষ-সূত্র। সেই পূর্ব্বপক্ষরূপ মত, সূত্রকারের নিজমত নহে, উহা তাঁহার খণ্ডনীয় মতান্তর। পরে তাঁহার সিদ্ধান্ত-সূত্র ও অন্যান্য সূত্রের দ্বারাই তাঁহার নিজমত নির্ণয় করিতে হয়। অবশ্য অনেক স্থলে প্রাচীন ব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যে পূর্ব্বপক্ষসূত্র ও সিদ্ধান্তসূত্র বিষয়ে মতভেদ এবং তদনুসারে সিদ্ধান্ত-ব্যাখ্যাতেও মতভেদ হইয়াছে এবং কোন স্থলে তা[illegible] হইতে পারে; কিন্তু যে সমস্ত সূত্র পূর্ব্বপক্ষসূত্র বলিয়া নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, তাহাও সিদ্ধান্তসূত্র বলিয়া গ্র[illegible] করিলে অন্যান্য সূত্রের সামঞ্জস্য কখনই হইতে পারে না। কারণ, সূত্রকারের খণ্ডিত বা অসম্মত মতকেও তাঁহার ম[illegible]

(১) এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, কণাদের পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় সূত্রের যোগে "ব্যবস্থাতঃ" "শাস্ত্রসামর্থ্যাচ্চ" আত্মানো নানা—এইরূপ ব্যাখ্যাই তাঁহার অভিপ্রেত, বুঝা যায়; কারণ, কোন বাধক না থাকিলে "চ" শব্দের দ্বারা অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত পদার্থই গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং কণাদ তৃতীয় সূত্রে "চ" শব্দের প্রয়োগ করিয়া উক্ত সূত্র যে তিনি দ্বিতীয় সূত্রোক্ত সিদ্ধান্ত-সমর্থনের জন্যই বলিয়াছেন, অর্থাৎ শেষোক্ত ঐ সূত্রের দ্বারা আত্মার নানাত্ব-সিদ্ধান্তেরই উপসংহার করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু কণাদের উক্ত সূত্রের দ্বারা ব্যবহারিক অবস্থায় আত্মা নানা, পরমার্থতঃ আত্মা এক, এইরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। উক্ত সূত্রে ব্যবহারিক অবস্থার বোধক কোন শব্দপ্রয়োগও তিনি করেন নাই। পরন্তু দ্বিতীয় সূত্রে "আত্মানঃ"—এইরূপ বহুবচনান্ত প্রয়োগ করিয়াও আত্মার বাস্তব নানাত্বই যে তাঁহার সিদ্ধান্তরূপে সূচনা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়।

কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় বৈশেষিক-দর্শনের স্বকৃত ভাষ্যাদি পুস্তকে কণাদকে অদ্বৈতবাদী বলিবার উদ্দেশ্যে পূর্ব্বোক্ত স্থলে কণাদের প্রথমোক্ত "সুখ-দুঃখ" ইত্যাদি সূত্রটিকে তাঁহার সিদ্ধান্তসূত্র বলিয়াই দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা ব্যবহারিক অবস্থায় আত্মা নানা, কিন্তু পরমার্থতঃ আত্মা এক, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং কণাদোক্ত আকাশের একত্ব-প্রতিপাদক সূত্রটির উল্লেখ করিয়া তুল্য যুক্তিতে কণাদের মতে আকাশের ন্যায় আত্মাও বস্তুতঃ এক, এইরূপ বলিয়াছেন।

* প্রচলিত 'বৈশেষিকদর্শন' পুস্তকে "আত্মান্তর-গুণানামা[illegible] ন্তরেঽকারণত্বাৎ" এইরূপ সূত্রপাঠ আছে। শঙ্কর মিশ্রের ব্যাখ[illegible] দ্বারাও ঐরূপ সূত্রপাঠ গ্রহণ করা যায়। কিন্তু শ্রীধর [illegible] ও জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি ঐ সূত্রের পরভাগে "আত্মা[illegible] গুণেষ্বকারণত্বাৎ"—এইরূপ পাঠ উদ্ধৃত করায় উহাই প্রাচী[illegible] সম্মত ও প্রকৃত পাঠ বলিয়া বুঝা যায়।

বলিয়া গ্রহণ করিলে কোনরূপেই তাহার সমস্ত সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য হইতে পারে না।—আবশ্যক বোধে এখানে ইহার আর একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি—

মহর্ষি গোতম ন্যায়দর্শনে দুইটি সূত্র বলিয়াছেন—

স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ প্রমাণপ্রমেয়াভিমানঃ॥৪।২।৩১॥

মায়া-গন্ধর্ব্বনগর-মৃগতৃষ্ণিকাবদ্বা ॥৪।২।৩২॥

উদ্ধৃত দুই সূত্র দ্বারা গোতম এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে,—যেমন স্বপ্নে বিষয় না থাকিলেও তাহার অভিমান বা ভ্রম হয়, তদ্রূপ প্রমাণ ও প্রমেয় না থাকিলেও তাহার ভ্রম হয়। অথবা যেমন ঐন্দ্রজালিকের মায়া বশতঃ দৃষ্ট সেই সমস্ত বিষয় না থাকিলেও দর্শকদিগের সেইরূপ ভ্রম হয় এবং আকাশে গন্ধর্ব্বনগর না থাকিলেও গন্ধর্ব্বনগর বলিয়া ভ্রম হয়, এবং মরীচিকা জল না হইলেও জল বলিয়া ভ্রম হয়, তদ্রূপ, প্রমাণ ও প্রমেয় বলিয়া কোন পদার্থ বস্তুতঃ না থাকিলেও ইহা প্রমাণ, ইহা প্রমেয়, এইরূপ ভ্রম হয়। অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থার ন্যায় জাগ্রদবস্থায় অনুভূত সমস্ত বিষয়ও অসৎ, সুতরাং সেই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানও ভ্রম। স্বপ্নাদিস্থলের ন্যায় সর্ব্বত্রই অসতেরই ভ্রম হইতেছে। গোতম উক্ত মত প্রকাশ করিয়া পরে উহার খণ্ডন করিতে সূত্র বলিয়াছেন—"হেত্বভাবাদসিদ্ধিঃ" (৪।২।৩৩)। অর্থাৎ হেতু না থাকায় কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মত সিদ্ধ হইতে পারে না। গোতম পরে আরও কতিপয় সূত্রের দ্বারা নিজ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বোক্ত দুইটি সূত্র যে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র, ইহা নিঃসন্দেহেই বুঝা যায়। সমস্ত ব্যাখ্যাকারও তাহাই বুঝিয়াছেন।

কিন্তু "অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি" গ্রন্থে কাশ্মীরক সদানন্দ যতি গোতমেরও অদ্বৈত মতই চরম সিদ্ধান্ত, ইহা বলিবার উদ্দেশ্যে শেষে গোতমের পূর্ব্বোক্ত দুইটি সূত্রও উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদনুসারে অদ্বৈতমতনিষ্ঠ আধুনিক কোন কোন মহামনীষীও ঐরূপ কথা লিখিয়াছেন (১)। কিন্তু আমরা ইহা একেবারেই বুঝিতে পারি না। কারণ, পূর্ব্বপক্ষ-সূত্রের দ্বারা সূত্রকারের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করা যায় না। গোতম পূর্ব্বপক্ষরূপে যে মতের প্রকাশ করিয়া পরে বিচারপূর্ব্বক উহার খণ্ডন করিয়াছেন, সেই মতই তাঁহার সিদ্ধান্ত মত, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। পরন্তু গোতমের ঐ দুই সূত্রোক্ত মত যে বেদান্তের অদ্বৈত মতই নিশ্চিত, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি না। স্বপ্ন এবং মায়াদি দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিয়াও তাহা বুঝা যায় না। কারণ, যাহারা বিজ্ঞানমাত্রবাদী, যাঁহাদিগের মতে জ্ঞান ভিন্ন জ্ঞেয় বিষয়ের সত্তা নাই, তাঁহারাও স্বপ্নাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহাদিগের উক্ত মত খণ্ডন করিয়া "অনির্ব্বাচ্যবাদ" সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার সমর্থিত অদ্বৈত মতে জগৎ-প্রপঞ্চ, সৎও নহে, অসৎও নহে,—সৎ অসৎ বলিয়া উহার নির্ব্বাচন করা যায় না। তাই তাঁহার উক্ত মত "অনির্ব্বাচ্যবাদ" নামেও কথিত হইয়াছে। কিন্তু—বৌদ্ধ-বিজ্ঞানবাদীর মতে জ্ঞান ভিন্ন জ্ঞেয় অসৎ। জ্ঞান হইতে ভিন্ন জ্ঞেয় বিষয়ের সত্তাই নাই। উক্তরূপ বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদও অতি প্রাচীন মত। বিষ্ণুপুরাণেও (৩।১৮) উক্ত মতের প্রকাশ হইয়াছে। বেদান্তদর্শনেও (২।২।২৮।২৯) উক্ত মতের খণ্ডন হইয়াছে। ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর সেখানে "বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ"—এই সূত্রের দ্বারা উক্ত মতের খণ্ডন করিতে স্বপ্নাদি জ্ঞান এবং জাগ্রদবস্থার সমস্ত জ্ঞান যে তুল্য নহে, ইহা বুঝাইয়া—বিজ্ঞানবাদীর প্রদর্শিত স্বপ্নাদি যে তাঁহার উক্ত মত-সমর্থনে দৃষ্টান্তই হয় না, ইহাও প্রতিপাদন করিয়াছেন।

ফল কথা, পূর্ব্বোক্ত দুইটি পূর্ব্বপক্ষ-সূত্রে গোতম যে সমস্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বপক্ষরূপে যে মতের প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধ-বিজ্ঞানবাদ তাৎপর্য্য টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু মহামনীষী নাগেশ ভট্ট—ইহা স্বীকার করিয়াও গোতমকেও অদ্বৈতবাদী বলিবার উদ্দেশ্যে "বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জুষা" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, (১) গোতম, বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করায় এবং উক্ত স্থলে বাচস্পতি মিশ্রও গোতমের সূত্রের দ্বারা সেইরূপ ব্যাখ্যা করায় অনির্ব্বাচ্যবাদ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতমত যে গোতমের সূত্রসম্মত, ইহা অর্থতঃ উক্ত হইয়াছে। অদ্বৈত মত শ্রুতিমূলক, সুতরাং গোতমের "হেত্বভাবাদসিদ্ধিঃ"—এই সূত্রের দ্বারা তাহার খণ্ডন হইতে পারে না। অর্থাৎ গোতম শ্রুতিমূলক অদ্বৈতমতের খণ্ডন করেন নাই—পরন্তু বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করায় অদ্বৈতমতেই তাঁহার সম্মতি সূচনা করিয়া গিয়াছেন। উক্তস্থলে বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যার দ্বারাও তাহাই বুঝা যায়। কিন্তু মহর্ষি গোতম, পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করাতেই যে কিরূপে তাঁহার অদ্বৈত-মতে সম্মতি বুঝা যায়, ইহা ত আমাদিগের বুদ্ধির অগোচর। দ্বৈতবাদী অন্যান্য আচার্য্যও ত বৌদ্ধ-বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন

(১) মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছেন—"এই সকল সূত্র স্পষ্ট ভাষায় বেদান্ত-মতের অনুবাদ করিতেছে। ব্যাখ্যাকর্ত্তারা অবশ্য সূত্রগুলির তাৎপর্য্য অন্যরূপ বর্ণনা করিয়াছেন"। ফেলোসিপের লেকচর—পঞ্চম বর্ষ, ৪৭ পৃষ্ঠা।

(১) গোতমোঽপি—"স্বপ্নবিষয়াভিমানবদয়ং প্রমাণ-প্রমেয়াভিমানঃ॥" মায়া-গন্ধর্ব্বনগর-মৃগতৃষ্ণিকাবদ্বা॥" "হেত্বভাবাদসিদ্ধিরিত্যাহ"……"এবঞ্চ অনির্ব্বচনীয়তাবাদস্য সূত্রসম্মতত্বমর্থাদুক্তপ্রায়ম্, তস্য শ্রুতিমূলকত্বেন "হেত্বভাবাদসিদ্ধি"রিত্যনেন খণ্ডনাসম্ভবাচ্চ।"—"মঞ্জুষা—তিঙর্থনিরূপণ"—কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত-সিরিজ, ৮৭২-৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

করিয়াছেন। তাই বলিয়া কি তাঁহাদিগকেও অদ্বৈতবাদী বলিতে পারা যায়? আর বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যার দ্বারাই বা তাহা কিরূপে বুঝা যায়? পরন্তু বাচস্পতি মিশ্র যে অন্যত্র গৌতমের মত-ব্যাখ্যায় তাঁহার কোন কোন সূত্র দ্বারা অদ্বৈতমতের খণ্ডনই করিয়াছেন, তাহাও ত দেখা আবশ্যক। সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী নাগেশ ভট্ট যে তাহা দেখেন নাই, ইহা আমি বলিতে পারি না। সুতরাং মুদ্রিত "বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্তমঞ্জুষা" গ্রন্থে যেরূপ কথা পাইয়াছি, তাহা নাগেশ ভট্টের নিজেরই কথা কি না? এবং উহার তাৎপর্য্য কি, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে।

সে যাহা হউক, শেষ কথা, কণাদ ও গৌতমের সূত্রের দ্বারা তাঁহারা যে অদ্বৈতবাদী নহেন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। কারণ, তাঁহারা পরমাণুর নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া "আরম্ভবাদে"রই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিত্য পরমাণুদ্বয়ের সংযোগজন্য প্রথমে "দ্ব্যণুক" নামক দ্রব্য জন্মে, পরে ঐ দ্ব্যণুকত্রয়ের সংযোগ জন্য "ত্রসরেণু" নামে দ্রব্য জন্মে। এই-রূপে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে সমস্ত জন্য দ্রব্যের সৃষ্টি হয়, এই মতের নাম "আরম্ভবাদ"। আচার্য্য শঙ্কর উক্ত মতের খণ্ডন করিতে উহা বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মত বা কাণাদমত বলিয়া উল্লেখ করিলেও তাঁহার মতে উহা যে গৌতম বা নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মত নহে, ইহা কিন্তু প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনে কণাদের অপেক্ষায়ও সুস্পষ্টরূপে পরমাণুর নিত্যত্ব ও "আরম্ভবাদে"র সমর্থন করিয়াছেন। "আরম্ভবাদে"র ব্যাখ্যায় পরে তাহা দেখাইব। তবে বৈশেষিক-দর্শনে প্রথমে মহর্ষি কণাদই "আরম্ভবাদে"র প্রকাশ করায় উক্ত মত প্রথমে বৈশেষিক-মত বা কাণাদ-মত বলিয়াই প্রসিদ্ধিলাভ করে। সেই প্রসিদ্ধি অনুসারেই আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি ঐরূপই উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাই আমরা বুঝি। যাহা হউক, উক্ত "আরম্ভ-বাদ" যে গৌতমেরও সম্মত, এ বিষয়ে কোন সংশয়ই হইতে পারে না। গৌতমের সূত্রানুসারে ভাষ্যকার বাৎ-স্যায়ন প্রভৃতি নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ও উক্ত মতেরই ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। আরম্ভবাদী কণাদ ও গৌত-মের মতে পরব্রহ্মের ন্যায় আকাশ, কাল, দিক্ ও জীবাত্মা—এই সমস্ত দ্রব্যপদার্থও বিশ্বব্যাপী ও নিত্য এবং পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু অতি সূক্ষ্ম ও নিত্য এবং ঐ পরমাণুসমূহই জন্যদ্রব্যের মূল উপাদান-কারণ। কণাদ ও গৌতমের উক্ত মত প্রকাশ করিতে আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্যও "মানসোল্লাস" গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"কালাকাশদিগাত্মানো নিত্যাশ্চ বিভবশ্চ তে।
চতুর্ব্বিধাঃ পরিচ্ছিন্না নিত্যাশ্চ পরমাণবঃ॥" দ্বিতীয় অঃ।

সুরেশ্বরাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত "আরম্ভবাদের" প্রকাশ করিয়া উহা যে বৈশেষিক সম্প্রদায়ের ন্যায় নৈয়ায়িক সম্প্রদায়েরও মত, ইহাও প্রকাশ করিতে সেখানে বলিয়াছেন—

"ইতি বৈশেষিকাঃ প্রাহুস্তথা নৈয়ায়িকা অপি।"

কিন্তু উক্ত "আরম্ভবাদ" অদ্বৈতবাদের অতিবিরুদ্ধ। কারণ, অদ্বৈতবাদে পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নিত্য নহে এবং মায়াসহিত পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বরই জগতের মূল উপাদান-কারণ। কিন্তু "আরম্ভবাদে" কাল ও আকাশ প্রভৃতির ন্যায় পরমাণুসমূহও নিত্য এবং পরমাণুসমূহই জন্যদ্রব্যের মূল উপাদান-কারণ। অদ্বৈতবাদে আত্মা এক, "আরম্ভবাদে" আত্মা বহু। অদ্বৈতবাদে আত্মা চৈতন্য-স্বরূপ, চৈতন্য বা জ্ঞান, তাঁহার গুণ নহে, কিন্তু "আরম্ভ-বাদে" আত্মা চৈতন্যস্বরূপ নহেন, কিন্তু চৈতন্য বা জ্ঞান, তাঁহার গুণ। তন্মধ্যে পরমাত্মার চৈতন্য নিত্য, জীবাত্মার চৈতন্য অনিত্য। সুতরাং সময়বিশেষে—জীবাত্মা জড়। অদ্বৈতবাদে জীবাত্মা বস্তুতঃ নির্গুণ; জ্ঞান, ইচ্ছা ও সুখ-দুঃখাদি অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম, কিন্তু "আরম্ভবাদে" জীবাত্মা সগুণ: জ্ঞান, ইচ্ছা ও সুখ-দুঃখাদি জীবাত্মার বাস্তব-গুণ। অদ্বৈতবাদে অনাদি মিথ্যা বা অনির্ব্বচনীয় "মায়া" স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু "আরম্ভবাদে" ঐরূপ "মায়া" স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং "আরম্ভবাদে" জগৎ সত্য, কিন্তু অদ্বৈতবাদে মায়ামূলক জগৎ মিথ্যা। তাহা হইলে বল দেখি—আরম্ভ-বাদী মহর্ষি কণাদ ও গৌতমকে আমরা কিরূপে অদ্বৈতবাদী বলিয়া বুঝিব?

যদি বল, কণাদ ও গৌতম প্রভৃতি সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ অধি-কারিবিশেষের জন্য নানারূপ দ্বৈতমতের প্রকাশ করিলেও তাঁহারা সকলেই ছিলেন—অদ্বৈতবাদী, যেহেতু অদ্বৈত বাদই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। কিন্তু ঐরূপ অনুমান করিলে যাঁহা-দিগের মতে দ্বৈতবাদই প্রকৃত সিদ্ধান্ত, তাঁহারাও ঐ কথা বলিয়া সমস্ত ঋষিকেই দ্বৈতবাদী বলিয়াই অনুমান করিতে পারেন; এবং তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তৎকালে বৌদ্ধভাবাপন্ন মানবগণের নাস্তিক্যনিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই তাঁহাদিগের সংস্কারানুসারে বৌদ্ধভাবেই অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদের প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ তিনিও ছিলেন—দ্বৈতবাদী।

ফল কথা, ঐভাবে নিজ নিজ মতানুসারে অনুমান করিয়া উক্ত বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা যায় না। যথার্থ অনু-মান করিতে হইলে প্রথমে প্রকৃত হেতু সিদ্ধ করা আবশ্যক। হেতু ও হেত্বাভাসের তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত কোন বিষয়েই যথার্থ অনুমান করা যায় না। কিন্তু তথাপি আমরা নানা বিষয়ে নিজ বুদ্ধি অনুসারে নানারূপ অনুমান করি। অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিও কল্পনার ঘনান্ধকারে সাময়িক বুদ্ধি অনুসারে নানা বিষয়ে কতপ্রকার অনুমান করিতেছেন, ইহা অনিবার্য্য। কারণ, মানবের চিত্তবৃত্তি বা বুদ্ধি বিচিত্র। মহাকবি ভারবি যথার্থই বলিয়াছেন,—"বিচিত্ররূপাঃ খলু চিত্তবৃত্তয়ঃ।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ (মহামহোপাধ্যায়)

নৈতিক উৎকর্ষ-অপকর্ষ

ভারতবর্ষের লোক নৈতিক হিসাবে মানব-সমাজের অতি অধস্তন স্থান অধিকার করে এবং সে জন্য স্বায়ত্ত-শাসন অধিকার পাইবার যোগ্য নহে, প্রতীচ্যের প্রভুত্বপ্রয়াসী সাম্রাজ্যগন্ধীদের তরফ হইতে এই কথাটি প্রায়ই শুনা যায়। কেবল মুখের কথায় নহে, তাঁহারা প্রচারকার্য্যের দ্বারা তাঁহাদের এই তথ্যটি সভ্যজগতের মানব-সমাজে প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। মিস মেয়ো একা নহেন, তাঁহার মত অনেক 'নর্দ্দমা-ঘাঁটা' সমালোচক এই ভাবের প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তাঁহারা জগতের দরবারে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, প্রতীচ্য-বাসীরা নৈতিক চরিত্রে ভারতবাসীদের অপেক্ষা অনেক উন্নত, এই হেতু স্বায়ত্ত-শাসন পাইবার যোগ্য।

কিন্তু আমরা একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব যে, তাঁহাদের এই উক্তির মূলে কোন সত্য নিহিত নাই। এই ঘটনাটি য়ুরোপের অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরীর বুডা-পেষ্ট সহরে সংঘটিত হইয়াছিল। অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরীর সভ্যতা য়ুরোপের সভ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন বলিয়া পূর্ব্বে জানা ছিল। এমন কি, অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরীর পরিচ্ছদের 'ফ্যাসান' সভ্যতার খনি বিলাস-লালসাময়ী প্যারী নগরীরও অনুকরণীয় ছিল। সুতরাং অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরীর নৈতিক উৎকর্ষের বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু গত ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে বুডা পেষ্ট সহর হইতে যে লোমহর্ষণ সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, এই সভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষা হইতে আমাদের দূরে থাকাই মঙ্গল। সংবাদটি এই:—নাগাইরেড ও টিসজ্কার্ট নামক দুইখানি গ্রামে আজ ২০ বৎসর যাবৎ নানা বয়সের ৫০ জনের অধিক পুরুষকে বিষ-প্রয়োগ দ্বারা নিহত করা হইয়াছে। অথচ এই পৈশাচিক নরহত্যাকাণ্ড এমন গোপনে সমাহিত হইয়াছে যে, এ যাবৎ এ সম্বন্ধে কোন কথা সাধারণে প্রকাশ পায় নাই। কিছু দিন হইতে কর্ত্তৃপক্ষের সকাশে কয়খানি বেনামা পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার ফলে কর্ত্তৃপক্ষের মনে সন্দেহ হয়। তাঁহারা কয় জন মৃত ব্যক্তির মৃতদেহ সমাধি হইতে উত্তোলিত করিয়া শবব্যবচ্ছেদ-পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। পরীক্ষার ফলে জানা যায়, দেহগুলির মধ্যে আর্শেনিক বিষ রহিয়াছে!

তখন জোলনোক সহরের ফৌজদারী আদালতে ৩১ জন স্ত্রীলোক ও ৩ জন পুরুষের বিপক্ষে বিষপ্রয়োগে নরহত্যা করার অভিযোগে মামলা দায়ের হয়। প্রকাশ পায়, ইহারা প্রায় সকলেই নিহত ব্যক্তিগণের আত্মীয়-স্বজন। প্রথম দফায় ৪টি নারীর বিচার হয়, তন্মধ্যে মিসেস নিপকার অপরাধ সপ্রমাণ হয় এবং সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। অবশিষ্ট ৩টি নারীর দ্বীপান্তর হয়। আর ৫টি ধৃত আসামী নারী আত্মহত্যা করে।

বিচারে ইহা জানা গিয়াছে যে, অধিকাংশ নারীই পুনরায় বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ স্বামীকে বিষপ্রয়োগ দ্বারা হত্যা করিয়াছে! কেহ কেহ আবার স্বামীর বিষয়-সম্পত্তির লোভে এই পাপানুষ্ঠান করিয়াছে। এখনও দফায় দফায় মামলা চলিতেছে।

যাহারা দণ্ডিত হইয়াছে বা আত্মহত্যা করিয়া কলঙ্কের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, সভ্য উন্নত নামধেয় প্রতীচ্যের এই শ্রেণীর নারীর মনোবৃত্তি অপেক্ষা অসভ্য বর্ব্বর নিগ্রো কাফ্রী নারীদের মনোবৃত্তি শতগুণে শ্রেয়ঃ। প্রতীচ্যের নারীদের সহিত তুলনা করিয়া মিস মেয়োর মত মিথ্যা প্রচারকের দল প্রাচ্যের নারীকে নিম্নাসন দিবার স্পর্দ্ধা রাখেন, ইহা কি আশ্চর্য্য নহে? এক আধটি নহে, ৫০ জনেরও উপর পুরুষ এই ঘৃণিত উপায়ে পত্নী ও অন্যান্য আত্মীয়ার দ্বারা নিহত হইয়াছে—তাহাও বিষয়ের লোভে কিম্বা নূতন স্বামী সংগ্রহের লোভে—এ কথা মনে করিলেও ঘৃণায় সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠে। কাম ও বিলাসলালসা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে অতি আপনার জনকে এমন ভাবে যে শ্রেণীর নারী অসঙ্কোচে হত্যা করিতে পারে, তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা ও ভাবধারার আবহাওয়া কেমন, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। যে দেশে বিবাহ চুক্তিনামায় পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে—ক্যাথলিক বিবাহে ধর্ম্মের বন্ধন যাহা হইতে ক্রমে খসিয়া পড়িতেছে, যে দেশে ইচ্ছা-বিবাহও সমাজে প্রচলিত হইতে চলিয়াছে, যে দেশে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতাকে দিন দিন অধিক মাত্রায় প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে, যে দেশে সাময়িক বিবাহও সমাজে আইনসঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইতেছে,—সেই দেশে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে এমন বিসদৃশ সম্বন্ধ দাঁড়াইবার সম্ভাবনা সমধিক, ইহা ত অস্বীকার করা যায় না।

জার্ম্মাণীর মুক্তি

প্রায় এক যুগ পরে জার্ম্মাণ জাতি বিদেশীর অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইল। মিত্রশক্তিরা জার্ম্মাণীতে তাঁহাদের অধিকৃত স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। জগতের মুক্তিকামী জাতিমাত্রেরই ইহাতে আনন্দিত হইবার কথা।

জগতে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত জাতি যদি অপর কোন জাতির

অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহার চিন্তাশক্তি অনেক ক্ষেত্রে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করে। যেমন কোন একটা বড় গাছের আওতায় ছোট গাছ বাড়িতে পায় না, তেমনই প্রবলতর জাতির অধীনে থাকিলে দুর্ব্বল জাতির স্বাধীন চিন্তাশক্তির স্ফুরণের পক্ষে বাধা পড়ে বলিয়া সেই জাতি জগতের চিন্তাধারায় কোন নূতন সম্পদ্ যোগাইতে পারে না। জার্ম্মাণীর মত গভীর চিন্তাশীল মেধাবী জাতি প্রায় একাদশ বর্ষকাল এই ভাবে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় বিশেষ কোন উন্নতির পরিচয় দিতে পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও জার্ম্মাণরা জন্মগত মেধা-শক্তির প্রভাবে আপনার শিক্ষাদীক্ষাকে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইতে দেয় নাই। তাই জার্ম্মাণরা অধীনতাপাশের পাষাণ-চাপে অবসন্ন হয় নাই, তাই তাহারা অতি অল্পকালের মধ্যে মহাযুদ্ধের সর্ব্বসংহারী প্রচণ্ড আঘাত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে।

জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে জার্ম্মাণদের দান বড় সামান্য নহে। আধুনিক জার্ম্মাণজাতি জগতের শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতার উন্নতিকল্পে অনেক কিছু দান করিয়াছে। সূক্ষ্ম শিল্প, সঙ্গীত, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, আয়ুর্বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে জার্ম্মাণদের দান অসীম। জার্ম্মাণীতে যিনি বর্ত্তমানে মার্কিণ দূতের পদে অধিষ্ঠিত আছেন, সেই ডাক্তার সার্ম্মান স্বীকার করিয়াছেন যে, মার্কিণ জাতি ব্যবহারশাস্ত্র, আয়ুর্বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও স্থাপত্যবিদ্যায় পরম পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতেছে বটে, কিন্তু আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্পনা জার্ম্মাণীর নিজস্ব। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষাপ্রণালী জার্ম্মাণদেরই আবিষ্কার এবং উহারই অনুকরণ করিয়া মার্কিণ ও অন্যান্য আধুনিক জাতি উন্নতির পথ ধরিতে সমর্থ হইয়াছে।

গত এক শত বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, দশ হাজারেরও অধিক মার্কিণ শিক্ষার্থী জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে অনেক রত্ন উপহার দিতে সমর্থ হইয়াছে।

বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে পরলোকগত লর্ড হালডেন তাঁহার দেশের (বৃটেনের) তরুণসঙ্ঘকে জার্ম্মাণ প্রথায় শিক্ষিত করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ আধুনিক বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ জার্ম্মাণ প্রথার অনুকরণে গঠিত হইয়াছে।

জার্ম্মাণদের নিকট এই ঋণের কথা কোন সভ্যজাতি বিস্মৃত হইতে পারেন না। মার্কিণ জাতি বোধ হয় এই কারণে সর্ব্বপ্রথমে জার্ম্মাণদেশ হইতে আপনাদের সৈন্য অপসারণ করিয়াছিলেন। পরন্তু যে বৃটিশ জাতি জার্ম্মাণীর নৌশক্তি ধ্বংস করিয়া তাঁহার বাণিজ্য ও উপনিবেশগুলি অধিকার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং সে জন্য সারা জগতে প্রচারকার্য্য চালাইয়াছিলেন, সেই বৃটিশ জাতিই এখন জার্ম্মাণদের সহিত প্রীতিসম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। যে জার্ম্মাণরা বর্ব্বর রাক্ষস বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল, সে দিন ইংলণ্ডে যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস সেই জার্ম্মাণদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন এবং পুনরায় জার্ম্মাণদিগকে রোডস্ বৃত্তি পাইবার উপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন ও সেইমত ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণ স্কলাররা (শিক্ষার্থীরা) ইংলণ্ডে খুবই সম্মান প্রাপ্ত হইতেছেন।

ইতিমধ্যেই জার্ম্মাণ বিমানবিদ্‌রা জেপেলিন-যোগে আটলান্টিক পার হইয়া এবং জগতের নানাস্থান ব্যোমপথে অতিক্রম করিয়া জগতের সভ্যজাতিদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন। তাঁহাদের রাসায়নিকরা আবার যুদ্ধের পূর্ব্ব অবস্থার জার্ম্মাণ শিক্ষা ও সভ্যতার সম্পদ্ প্রাপ্ত হইতেছেন। স্বাধীন জার্ম্মাণ জাতি এইবার যে জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে আরও অধিক রত্নদান করিতে সমর্থ হইবেন, এমন আশা করা অসঙ্গত নহে।

চীনের ভাগ্য

মহাচীনের ভাগ্যবিপর্য্যয় ক্ষণে বিক্ষণে হইতেছে, ইহার নিবৃত্তি কোথায়, তাহা চীনের ভাগ্য-বিধাতাই জানেন। নানকিং সহরে যখন জাতীয় গবর্ণমেণ্টের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল এবং জেনারেল চিয়াং কাইসেক প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলেন, পরন্তু মাঞ্চুরিয়ার বড় কর্ত্তা পরলোকগত মার্শাল চাং-সোলিনের পুত্র চাং-সুয়েলিয়াংও নানকিং গবর্ণমেণ্টকে 'সার্ব্বভৌম' বলিয়া স্বীকার করিলেন, তখন অনেকেরই মনে আশার সঞ্চার হইয়াছিল, বুঝি এত দিনে চীনের সৌভাগ্যসূর্য্য উদিত হইল, চীনও আর কিছু দিন পরে জাপানের মত প্রাচ্যে প্রধান শক্তিরূপে পরিণত হইবেন। একতা যে শক্তিসঞ্চয়ের মূল, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কাযেই মহাচীনে যখন একতা প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন চীন শক্তিশালী প্রথম শ্রেণীর সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইবেই, এ আশা অনেকের মনে উদিত হইয়াছিল।

কিন্তু চীনের সৌভাগ্যরবি উদিত হইবার এখনও বিলম্ব আছে। যে একতার উপর ইহা নির্ভর করিতেছে, তাহা যে কেবল বাহ্য, দৃঢ়মূল নহে, তাহা কয়েক দিন যাইতে না যাইতেই প্রকাশ পাইল। কেন একতায় বাধা পড়িল, তাহার কারণ এক জন ইংরাজ লেখক প্রদর্শন করিয়াছেন। উহা অতীব কৌতূহলোদ্দীপক ও রহস্যজনক।

আর্কস-অভিযানের পর হইতে, ইংরাজ ও রুসের মধ্যে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার পর হইতে প্রাচ্যদেশে রুস সোভিয়েট যাহাতে প্রতিপত্তি ও প্রভুত্ব বিস্তার করিতে না পারে, বৃটিশ সরকার সে জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এ জন্য তাঁহাদের প্রচারকার্য্য চলিয়াছিল। উহার ফলে চীনদেশে রুসের প্রতিপত্তি ও প্রভাবের অবসান হয়। যে বোরোডিনের সাহায্যে জেনারেল চিয়াং-কাইসেক চীনের জাতীয় সৈন্যদলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়াছিলেন, সেই বোরোডিন তাঁহার অনুচরবর্গ এবং তাঁহাদের ভাবে ভাবুক চীনা কম্যুনিষ্টরা চীন হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন, কেহ কেহ দণ্ডিতও হইলেন। চিয়াং কাইসেক কম্যুনিষ্ট-বিতাড়ন ব্রত অবলম্বন করিলেন। রুসের সহিত চীনের বন্ধুত্ব-সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল। উত্তরে মাঞ্চু প্রদেশেও চাং-সুয়েলিয়াং কম্যুনিষ্ট-বিতাড়নের অছিলায় চ

ইষ্টার্ণ রেলের রুস কর্ম্মচারিগণকে ধরিয়া নির্ব্বাসিত করিলেন এবং রেল দখল করিয়া লইলেন।

এ সকলের মূলে বৃটিশ কূটরাজনীতির খেলা ছিল। চীনে রুস সোভিয়েটের অপমান-লাঞ্ছনার মূলে এই কূট রাজনীতির খেলা ছিল, এ কথা ইংরাজ লেখকই স্বীকার করিতেছেন। নানা স্থানে রুস-দূতাবাস আক্রমণ ইহার মধ্যে অন্যতম। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট চিয়াং-কাইসেকের গভর্ণমেণ্টকে 'হাত করিয়া' ফেলিলেন। চিয়াং-কাইসেক বৃটেনকে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বাণিজ্যে অনেক অধিক সুবিধা (Favoured nation treatment) করিয়া দিলেন; পরন্তু ইংলণ্ডে চীন সমর-শিক্ষার্থীদিগকে পাঠাইতে সম্মত হইলেন। বৃটেন মনে মনে জানিতেন, চিয়াং-কাইসেকের গভর্ণমেণ্ট টলমল করিতেছে, কারণ, রুসের প্রতি এইরূপ ব্যবহার এবং বৃটেনের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেছেন দেখিয়া চীনের জাতীয় দলের একাংশ চিয়াং-কাইসেকের উপরে ঘোর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

কিছু দিন পরেই সেই অসন্তোষ ফুটিয়া বাহির হইল, নানা স্থানে চিয়াং-কাইসেকের গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। তখন আর 'রক্তবর্ণ' কম্যুনিজমের বিপক্ষে অভিযান করা সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। এ দিকে ইংলণ্ডে শ্রমিক-সরকার শাসনদণ্ড প্রাপ্ত হইয়া রুস-সোভিয়েটের সহিত পুনঃ বন্ধুত্ব-সন্ধি প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হইলেন। তাঁহাদের সেই উদ্যোগ সফল হইয়াছে এখন রুসিয়ার সহিত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বন্ধুত্ব-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, রুসের দূত লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছেন।

ইহার পর রুসের আর চাং-স্যুয়েলিয়াং এর মুকডেন গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে রণযাত্রা করিবার বাধা রহিল না। রুস সোভিয়েট সহজে চীন ইষ্টার্ণ রেলটিকে মাঞ্চুরিয়ার সংস্কার-বিরোধীদিগের হস্তে ছাড়িয়া দিতে পারেন না, কেন না, একেই ত তাঁহারা টাকা খরচ করিয়া ঐ রেল নির্ম্মাণের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহার উপরে কোন দিন হয় ত জাপান মাঞ্চুরিয়ায় কর্ত্তৃত্ব অধিকার করিয়া ঐ রেলটিকেও হস্তগত করিতে পারেন। এই সকল কারণে সোভিয়েট সরকার মাঞ্চুরিয়ায় বিমানযোগে বোমা ফেলিয়া গ্রাম-নগর ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এ দিকে নানকিং গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে চীনের জাতীয় দলের কোন কোন অংশের অসন্তোষ বিদ্রোহে আত্মপ্রকাশ করিল। চিয়াং-কাইসেক চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া রুস সোভিয়েটের সহিত সন্ধি করিয়া রেলের বাজেয়াপ্ত অধিকার ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ইহার আরও এক কারণ ছিল। ইঙ্গ-রুস সন্ধির ফলে ইংরাজ মাঞ্চুরিয়ার রুস সোভিয়েট আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোন পন্থা অবলম্বন করিলেন না, কেবল রুসকে লীগ ও প্যাক্টের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। মার্কিণ যুক্তরাজ্যও তাহাই করিলেন। রুস সোভিয়েট তাঁহাদিগকে 'নিজের চরকায় তেল' দিতে বলিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা বুঝিলেন যে, এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষে কোন বাহিরের শক্তি হস্তক্ষেপ করিবেন না, তাই এই রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। চিয়াং-কাইসেকও সে কথা বুঝিলেন। তাই গৃহযুদ্ধে বিব্রত হইয়া তিনি তাহার উপর রুস সোভিয়েটের সহিত বিরোধ বাধাইতে সাহসী হইলেন না। অন্যান্য শক্তিরা যে তাঁহাকে অর্থ বা লোকবল দিয়া সাহায্য করিবেন, এমন আশাও নাই। কাযেই চীনের ইষ্টার্ণ রেলের কর্ত্তৃত্ব রুস সোভিয়েটকে বহুল পরিমাণে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে।

অবস্থা এইরূপ। বিদ্রোহীরা ক্যাণ্টনের দিকে পরাজিত হইয়াছে এবং তাহাদের সেনাপতি মনের দুঃখে আত্মহত্যা করিয়াছেন। কিন্তু হাঙ্কো ও মধ্যচীনে বিদ্রোহীরা এখনও প্রবল। এ যুদ্ধের ফলাফল না দেখিয়া চীনের ভাগ্যে কি আছে, বলা যায় না।

'নেটিবের' জন্য দরদ

পার্লামেণ্টের কমন্স সভার সদস্য মিঃ মার্লি একটি মন্তব্যে অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গে বলেন যে, "নেটিবদিগকে (আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদিগকে) নামমাত্র পারিশ্রমিক দিয়া খাটাইয়া লইয়া যুরোপীয় ঔপনিবেশিকরা যে অন্যায় অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাহা বন্ধ করিতে হইবে। যেখানে নেটিবরা স্বায়ত্ত-শাসনের উপযুক্ত হয় নাই, সেখানে তাহাদিগের শাসন-কর্ত্তৃত্ব বৃটিশ সরকার সরাসরি স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে নির্ব্বাচনাধিকার ও আইনগত অধিকার সকলকে দিতে হইবে।" মিস ইলিনর র‍্যাটবোন জাতি ও বর্ণ কথার সহিত 'নরনারী' কথাটি যোগ করিয়া দিয়া সংশোধন-প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন। সংশোধিত ও মূল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

এই মন্তব্যটির সম্বন্ধে আলোচনাকালে মিঃ ড্রামণ্ড সিয়েল্‌স্ বলিয়াছেন,—"ভূতপূর্ব্ব সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী নীতি অনুসারে আমরা নেটিবদের পূর্ণ অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিয়াছি।"

ইহার স্বরূপ কি? একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। নিগারিয়া প্রদেশ পশ্চিম-আফ্রিকার বৃটিশ উপনিবেশ-রাজ্য। ইহা বৃটিশ ঔপনিবেশিক মন্ত্রীর কর্ত্তৃত্বাধীন, এখানে এখনও দক্ষিণ-আফ্রিকার মত শ্বেতাঙ্গদের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং এই রাজ্যও যে 'নেটিব প্রজার দ্বারা অধ্যুষিত আশ্রিত বৃটিশ রাজ্য এবং উহার অভিভাবক যে বিলাতের ঔপনিবেশিক মন্ত্রী,' তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। এই রাজ্য হইতে গত ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে লণ্ডনে খবর আসে যে, "এই নিগারিয়ার অপোবা ও আবা নামক নগরে দাঙ্গা করা হেতু ৪৫ জন নেটিব নিহত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১২ জন স্ত্রীলোক। নেটিব স্ত্রীলোকরা পুরুষদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিল এবং সরকারী কোষাগার ও অন্যান্য বাড়ী আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে দল বাঁধিয়াছিল। বৃটিশ রাইফল সেনাগণকে এ জন্য তাহাদের মাথার উপর দিয়া গুলী করিতে হুকুম দেওয়া হয়, কিন্তু সৈন্যগণ আদেশের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া দাঙ্গাকারী দলের মধ্যে গুলী বর্ষণ করে। এক সংবাদে প্রকাশ, নারীদের মাথা প্রতি একটা কর ধার্য্য করা হইয়াছিল, অপর সংবাদ,—পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস হইয়াছিল ও আবার নূতন কর ধার্য্য করা হইয়াছিল বলিয়া নেটিবরা দাঙ্গা করিয়াছিল।"

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, "অপোবায় নিহতের সংখ্যা ২০ জন। জনতা গুদামঘর ও রেল-ষ্টেশন লুণ্ঠনের উদ্যোগ

করিতেছিল, এমন সময়ে সৈন্যগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। দাঙ্গাকারীরা উহাদের রাইফল কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করে। দাঙ্গাকারীরা অনেক হতাহত রাখিয়া পলাইয়া যায়। সৈন্যগণের মধ্যে একটিও হতাহত হয় নাই। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত করিয়া দেখিয়াছেন, সেনানীরা গুলীবর্ষণের আদেশ দিয়া ভালই করিয়াছিলেন, উহা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।"

দাঙ্গাকারীরা নিরস্ত্র ছিল, অথবা ইট-পাটকেল লইয়া সরকারী বাড়ী আক্রমণ করিতে গিয়াছিল, ইহা সম্ভব হইতে পারে। অকস্মাৎ খাজনা-বৃদ্ধি অথবা নারীর উপর মাথা প্রতি কর ধার্য্য করার ফলে তাহারা উত্তেজিত হইয়াছিল, ইহাও সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু ইট-পাটকেল যাহাদের অস্ত্র, তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ সশস্ত্র সৈন্যগণের বন্দুক কাড়িয়া লইতে সাহসী হইয়াছিল, ইহা যেন কেমন বলিয়া মনে হয়। আর এই কাড়াকাড়িতে একটি সৈন্যের অঙ্গেও আঁচড় লাগিল না, ইহাও যেন কেমন এক সংবাদ।

আজ যদি ইংলণ্ডে বা স্কটলণ্ডে নিরস্ত্র জনতা কেবল ইট-পাটকেল লইয়া এমন দাঙ্গা করিত, তাহা হইলে সেনানীরা গুলীবর্ষণের আদেশ দিতে সাহসী হইতেন কি? আর এমন ভাবে নরনারী-হত্যা হইলে ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা এক দিনও টিকিয়া থাকিতে পারিত কি? প্রথমে বলা হইয়াছে, সৈন্যরা আদেশের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া এই অনাচার আচরণ করিয়াছে। পরে খবর আসিয়াছে, ইহা অনাচার নহে, সেনানীরা কর্ত্তব্যপালনই করিয়াছে। অথচ এ বিষয়ে কোন নিরপেক্ষ তদন্ত হইয়াছিল কি না, তাহা প্রকাশ নাই।

নাবালকের অভিভাবকত্বের ইহাই কি নমুনা?

দক্ষিণ-আফ্রিকার য়ুনিয়ন গভর্ণমেণ্ট অবশ্য অর্দ্ধ-স্বাধীন। তাহা হইলেও দক্ষিণ-আফ্রিকার 'নেটিবদের' অভিভাবকত্বের দায়িত্ব যে বৃটেনের একবারে নাই, তাহা বলা যায় না। অথচ তথায় বিচার-সচিব মিঃ পাইরো সেখানকার এসেমব্লিতে (পার্লামেণ্টে) একখানি আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিতেছেন। উহার আকৃতি-প্রকৃতি ভারতের Public Safety Billএর অনুরূপ। ইহা দ্বারা দক্ষিণ-আফ্রিকার নেটিবদের হাত, মুখ ইত্যাদি বাঁধিয়া ফেলা হইতেছে। অর্থাৎ ইহার জোরে নেটিবরা আর ইচ্ছামত সাধারণ জনসভার আয়োজন করিতে বা উহাতে বক্তৃতাদি করিতে, কিম্বা ইচ্ছামত রচনা প্রকাশ করিতে পারিবে না।

ইহাও কি 'নেটিবদের' অভিভাবকত্বের নমুনা?

প্রতীচ্যের সাধুতা

ভারতবাসী মিথ্যাবাদী ও জুয়াচোর, প্রতীচ্যবাসীরা ইহা প্রায় বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, কারণে অকারণে ভারতবাসী ব্যবসায়-বাণিজ্যে মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে এবং লোককে ঠকাইয়া থাকে। তাঁহারা আরও একটা অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, ভারতবাসীরা বড়ই কুসংস্কারাপন্ন। এ সকল অভিযোগের উত্তরে আমরা কিছু বলিতে চাহি না, কিন্তু যাঁহারা সাধুতার বড়াই করেন, তাঁহাদের দেশের দুই একটা সাধুতার ও সুসংস্কারের ঘটনার কথা উল্লেখ করিব।

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, তথায় এ বৎসর নরনারীর অন্ধবিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করিয়া জুয়াচোর ব্যবসাদাররা ন্যূনাধিক ২ লক্ষ পাউণ্ড আত্মসাৎ করিয়াছে। কেহ মাদুলী বেচিয়া, কেহ ঔষধ বেচিয়া, কেহ নানারূপ বশীকরণের মন্ত্রতন্ত্র বেচিয়া, এই টাকাটা ঠকাইয়া লইয়াছে। ইহাতে দুইটি কথা সপ্রমাণ হয়। এক, বিলাতে জুয়াচোর ধড়ীবাজ লোকের অভাব নাই, আর এক কথা, অন্ধ কুসংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত হইবার মত নরনারী এই সভ্য জাতির মধ্যে অনেকে আছে।

এই সকল জুয়াচোরের প্রধান অস্ত্র বিজ্ঞাপনের প্রচার। উহারা এমন সব চটকদার বিজ্ঞাপন প্রচার করে যে, তাহার দ্বারা শিক্ষিত ও শিক্ষিতা সম্ভ্রান্ত নরনারীরা প্রভাবিত হয়। ২ লক্ষ পাউণ্ড মুদ্রা সামান্য নহে। এক বৎসরে এত টাকা জুয়াচুরির দ্বারা যে দেশের একটা সহরে উপার্জ্জন করা সম্ভব হয়, সে দেশের নরনারীর অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের মাত্রাও কত অধিক, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ইহা ছাড়া বিলাতের লণ্ডনে ও ফ্রান্সের প্যারী সহরে সম্ভ্রান্ত ঘরের নারীদের বড় বড় দোকানে সামান্য রুমাল চুরি হইতে আরম্ভ করিয়া বহুমূল্য রত্নালঙ্কার চুরির কথাও সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়। অধিক দিনের কথা নহে, গত ৬ই ডিসেম্বর তারিখে লণ্ডন হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, লণ্ডনের ভদ্র সম্ভ্রান্ত ঘরের নারীরা প্যারী হইতে লুকাইয়া লণ্ডনে বহুমূল্য পরিচ্ছদ আনয়ন করিয়া বিক্রয় করিয়াছেন; উদ্দেশ্য, কাষ্টম-শুল্ক ফাঁকি দেওয়া। মিঃ এডোয়ার্ড সিমণ্ডস্ লণ্ডনের এক বিখ্যাত পরিচ্ছদ ওয়ালার দোকানের ম্যানেজার। তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, এই ফাঁকি দেওয়ার কল্যাণে বৃটিশ সরকারের বাৎসরিক ১০ লক্ষ পাউণ্ড প্রাপ্য শুল্ক আদায় হয় না!

আবার এক প্রকার জুয়াচুরির খেলা আছে। জুয়াচুরিতে পরিপক্ব নারীরা প্যারী হইতে একটি পরিচ্ছদ লণ্ডনে আনিয়া এক দোকান হইতে অন্য দোকানে আদর্শরূপে গৃহীত হইবার উদ্দেশ্যে ভাড়া দেয়। এইরূপে একই পোষাক বিশ দোকানে ভাড়া দেওয়া হয়। ভাড়ার হার ৩ গিনি হইতে ৫ গিনি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার ফলে এই ব্যবসায়ী নারী একই পোষাক হইতে ৬০ পাউণ্ড হইতে ১০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করে, অথচ পোষাকটি পরিণামে তাহারই থাকিয়া যায়। অথচ পোষাকটি বিলাতে আনিবার জন্য তাহাকে মাত্র একবার সামান্য কয় শিলিং কাষ্টম-শুল্ক দিতে হয়। কিন্তু আইন অনুসারে ঐ শুল্কের পরিমাণ ৫ পাউণ্ড হইতে ২০ পাউণ্ড পর্যন্ত হওয়া উচিত।

কাষ্টম বিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে জানা যায়, এই ভাবে জুয়াচুরি করিয়া বিলাতের বন্দরসমূহে যে সমস্ত মাল আনয়ন করা হয়, তন্মধ্যে ৮ হাজার ২ শত ১টি মাল ধরা পড়িয়াছে। প্রতি বৎসর এইরূপে কত মাল শুল্ক ফাঁকি দিয়া আনয়ন করা হয়, তাহা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নহে।

ললিত কথা।—

ললিত বাবুর সম্বন্ধে দুই একটা কথা লিখিবার জন্য বসুমতী-সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে আহ্বান পৌঁছিয়াছে। তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত অধ্যাপক, কৃতী সাহিত্যিক, অপূর্ব্ব রসস্রষ্টা ও সর্ব্বজনপ্রিয় সামাজিক সম্বন্ধে, এরূপ আহ্বান অনুসারে কায করা কঠিন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে কাঠিন্য সম্পূর্ণ তিরোহিত—তৎপরিবর্ত্তে অনাবিল, নির্ম্মল এবং উপভোগ্য তারল্যের কমনীয় উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। কারণ, বাস্তবিক এক কথায় তিনি—“ললিত”; দুই কথার আর প্রয়োজন হয় নাই—দুই কথার স্থান নাই। সম্পাদকীয় গুরুনির্দ্দেশ অতি সহজে পালনীয় হইল, বর্ণনীয় বিষয়ের সৌন্দর্য্য, কমনীয়তা ও মাধুর্য্যে, এক অঘটন-ঘটনা, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়ার বিশেষ অনুকম্পায় সুলভ হইল, ইহাতে আমি কৃতার্থম্মন্য।

এক “ললিত” কথায় সকল কথার ভাষা, বার্ত্তিক, মীমাংসা ও টীকা সুসঙ্গত ও সুসম্পন্ন হইল। একটা স্বাদু অতিরিক্ত অক্ষর যোগ করিয়া “সুললিত” কথারও প্রয়োগ প্রয়োজন হইল না।

তিনি সর্ব্বাংশে ললিত ও ললিতচন্দ্র; আমি তাঁহাকে ললিতকুমার বলিতাম না, বলিতাম—ললিতচন্দ্র। শরৎচন্দ্র-মরীচি তাঁহার চারিভিতে প্রতিভাত ও জাজ্বল্যমান, তিনি সর্ব্বাংশে বন্দ্য। তিনি প্রকৃতার্থে উপাধ্যায়।

অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার সাহচর্য্য লাভের সুবিধা ও সৌভাগ্য পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম, তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতাম এবং তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম বিশ্বাসে আমি স্পর্দ্ধান্বিত। স্বর্গীয়, ঋষিকল্প, গুরুস্থানীয়, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আমরা উভয়ে বিশেষ অনুকম্পাভাজন ছিলাম, সেই মহান্ চরিত্র ও আদর্শের আমরা উভয়ে অকৃত্রিম ও গুণমুগ্ধ ভক্ত।

তাই ভাবের আদান-প্রদানের ও কথাবার্ত্তার পথ বড় দুর্গম হইত না। কীর্ত্তনানন্দে তিনি নিমগ্ন হইতেন—ঐ উপলক্ষে মদীয় দীনভবনে তাঁহার পদধূলি পড়িয়াছিল। ভাগবত-কথা-প্রসঙ্গ ও কীর্ত্তনপ্রসঙ্গের আয়োজন হইলে তাঁহাকে সংবাদ না দিলে তিনি অভিমান করিতেন ও দুঃখ করিতেন। সেবার রায় বাহাদুর রসময় মিত্রের অপূর্ব্ব কীর্ত্তন গুরুদাস বাবু ও ললিত বাবু ২০ নং সুরিলেন প্রসাদপুর ভবনে এক

আসরে প্রথম শ্রবণ করেন। উভয়ে একবাক্যে বলিলেন যে, এ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগের অবকাশ না পাইলে জীবন অসম্পূর্ণ থাকিত। কথায় গদগদ হইলাম—ধন্য হইলাম। ভক্ত সাধক রসময় বাবুর কীর্ত্তন তার পর অনেকে শুনিয়াছেন। এমন সহৃদয় শ্রোতার অভাবে অমন কীর্ত্তনও আর তেমন জমে না!

প্রিয়দর্শন ললিতবাবু যেমন স্বভাব-বিনয়ে ভূষিত ছিলেন, লোকপ্রিয় সামাজিক ছিলেন, তিনি তেমনই স্বাধীনচেতা, নির্ভীক-হৃদয় ও স্পষ্টভাষী ছিলেন।

সংযোগ হইয়াছিল। ললিতচন্দ্রের অভাবে শুধু বঙ্গবাসী কলেজ নহে, শুধু বঙ্গীয় সাহিত্য নহে, সমগ্র বঙ্গদেশ ক্ষতি-গ্রস্ত ও হতশ্রী।

নানা সদ্‌গুণে ভূষিত ললিতচন্দ্রের পিতৃমাতৃভক্তি, পত্নীপ্রেম, সন্তান ও ছাত্রবাৎসল্য ও বন্ধুপ্রীতি অতুলনীয় ছিল। দয়া-দাক্ষিণ্যও তদনুরূপ ছিল। ছাত্রপ্রীতির প্রমাণ সে দিন শ্মশানঘাটে প্রকৃষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। শোকে মুহ্যমান সহস্র অনুগত ছাত্র তাঁহার নশ্বর দেহের অনুগমন করিয়াছিল।

বঙ্গবাসী কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকবৃন্দ-পরিবৃত ললিতকুমার

"ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম" এ কথা তাঁহার শাস্ত্রের অন্ত-র্গত ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকের পদ ও অধ্যাপক পদের জন্য অনেকে প্রার্থী হন। কোনও কারণে ললিতবাবু এ সম্মান বর্জ্জন করিয়াছিলেন। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সেবার সময়েও আমি তাঁহাকে অনুমত করাইতে পারি নাই। তাহার বহুদিন পরে সে মত কথঞ্চিৎ ও ক্ষণিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

অধ্যক্ষ শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র বসু ও অধ্যাপক ললিতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংযুক্ত শ্রী ও স্বাধীন বৃত্তিতে মণিকাঞ্চনের

অসাহিত্যিক আমি, সাহিত্যিক ও রসস্রষ্টা ললিতচন্দ্রে অনির্ব্বচনীয় সাহিত্যিক আকর্ষণ-শক্তি ও কৃতিত্বের পরি দিবার স্পর্দ্ধা করিব না, তাঁহার ভাষার ও ভাবের অস অনুকরণে আমাদের কথোপকথন ও পত্র-ব্যবহার হই তাঁহার "ক কারের অহঙ্কারে" অভিভূত হইয়া এক একটা ক্ষুদ্র অগ্ন্যুৎপাতের উপক্রম হইয়াছিল। উদ্গিরণের শেষে ইঙ্গিত ছিল, "পাঠান্তে কুচিকুচিতব্য তাঁহার সুযোগ্য পুত্রের মুখে শুনিয়াছি, তাহা কুচি ক করা হয় নাই।

ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও শ্লেষে সিদ্ধহস্ত হাস্যরসিক ললিতচন্দ্রের বাণে কেহ কখনও মর্ম্মবিদ্ধ হয় নাই। মানুষের ভ্রম ও ত্রুটি দেখাইতে গিয়াও কখনও তিনি মানুষিক দুর্ব্বলতার প্রতি খড়্গহস্ত হন নাই। প্রিয় ও "ললিত" ভাষা এই দুরূহ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিত। গঙ্গার জল গঙ্গায় থাকিত, প্রীতিতর্পণে তৃপ্ত হইয়া পিতৃপুরুষ উদ্ধার পাইতেন।

আঁতে ঘা খাইয়াও কেহ মর্ম্মাহত হইতেন না—রাগ-গোসার অবকাশ থাকিত না। "ভোতারাম ভাটের" পাঠ তিনি কখনও পড়েন নাই এবং "তুষ্টভিশ্চসাৎ" পত্রিকার সম্পাদকের সহিত তাঁহার কখনও নিগূঢ় ঘন সম্বন্ধ ছিল না। তবে অকুশলী "কেশেলের" তাণ্ডবনৃত্য তিনি কখনও সহ্য বা ক্ষমা করিতে পারিতেন না।

ললিতবাবু শুধু লিখিত সাহিত্যেই নিপুণ রসস্রষ্টা ছিলেন, তাহা নহে, সাধারণ কথোপকথন ও সমাজিকতায় তাঁহার রহস্যপ্রিয়তা ও কৌতুক-কথা সর্ব্বদা ফুটিয়া উঠিত। চির-হাস্যময় তাঁহার প্রিয়দর্শন আকৃতি দেখিলে ও তাঁহার মধুময় কথাবার্ত্তা শুনিলে সকলেই পরিতৃপ্ত হইতেন ও আনন্দ বোধ করিতেন। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী মুড়াগাছায় ললিতবাবুর আদিম নিবাস। তাঁহার "মুড়াগাছায়" কেহ কখন অধীর হইত না। মুড়াগাছার স্বাদু সন্দেশ দেশপ্রসিদ্ধ। সে রসে ভিজান "মুড়াগাছা" কখন চেতনা সঞ্চার করিত না। সন্দেশের আধুনিক হোমিওপ্যাথিক গ্লাবিউল সদৃশ এডিশন দেখিয়া ললিতবাবু দুঃখ করিতেন—বলিতেন, "চোখে জল আসে, এ কি সন্দেশ, মা বড়ী?"

আমার স্বগ্রামবাসী স্বভাবকবি শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন ঘোষের নিকট ললিতবাবুর সম্বন্ধে একটি গল্প শুনিয়াছি। এক দিন তাঁহার চশমাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, চশমায় দূর-দর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে কি না? ললিতবাবু উত্তর করিলেন, "দুনিয়ার ব্যাপার যাহা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে কাহারও মুখ দেখিতে না হয়, আর মুখ কাহাকেও দেখাইতে না হয়, চশমার এমন ব্যবস্থা করিতে পারেন ত ভাল হয়।" সামাজিক ও বৈঠকী ভাবে কথোপকথন-শক্তি তাঁহার অদ্বিতীয় ছিল। সে শক্তি এখন সামাজিকদিগের মধ্যে লোপ পাইয়াছে। ডাক্তার ডাক্তারি কথা কহে, উকীল-ব্যারিষ্টার আইনের কথা বলেন, অধ্যাপক অধ্যাপনার কথা কহিয়া থাকেন।

কি শ্রাদ্ধসভা, কি বিবাহ-সভা, কি অধুনা প্রচলিত "পার্টি", "দোকানের কথা" ছাড়া কথা নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় যেরূপ কথোপকথন-শক্তির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, ললিতবাবুও তাই।

চরিত্র-বিশ্লেষণে, বিশেষতঃ স্ত্রী চরিত্র বিশ্লেষণে তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য, তিনি বঙ্কিম-সাহিত্য তন্ন তন্ন বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল, তাহার সাহায্যে সমালোচক বলিয়া তাঁহার স্থান উচ্চে। ইংরাজী বাঙ্গালা লেখায় তিনি সব্যসাচী।

কিন্তু আমার অনধিকারচর্চ্চা হইয়া পড়িতেছে। সাহিত্যিক প্রসঙ্গ উত্থাপন আমার পক্ষে যেমনই অসঙ্গত, তেমনই অশোভন। তাঁহার অমর আত্মা নিত্যধামে বরীয়ান্ স্থান

বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক
শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বসু

অধিকার করুক—তাঁহার পুণ্যস্মৃতি চির-মধুময় হউক—কারণ, তিনি………"ললিত।"………

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
(স্যার স্বরিরত্ন এম্, এ, এন, এল, ডি)

—

অধ্যাপক ললিতকুমার।—

১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২৯শে আশ্বিন, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্—বারাণসী শাখার সাধারণ অধিবেশনে আমি "রত্নাবলী ও বিষবৃক্ষ" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। এই অধিবেশনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত, অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ বিদ্যারত্ন মহাশয় সভাপতি ছিলেন। সেই দিন সর্ব্বপ্রথম আমি ললিতবাবুকে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করি। সেই প্রথম পরিচয়ের পর যতবার তিনি কাশীতে আসিয়াছেন, ততবারই এই অকিঞ্চন প্রবন্ধ-লেখকের সহিত সাগ্রহে সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং সেই অবসরে তাঁহার সহিত নানা আলোচনা করিবার সুযোগ-লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

বঙ্গসাহিত্যে নির্ম্মল শুভ্র হাস্যরসের সৃষ্টি, ললিতকুমারের রচনার বিশিষ্টতা। ইতঃপূর্ব্বে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র, ইতরজনমাত্র-উপভোগ্য হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করেন। বঙ্কিমের প্রকৃত শিষ্য, যথার্থ সমজদার ললিতকুমার, তাঁহার 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা'য় পর্য্যন্ত এই রস পরিবেষণ করিয়া বিভীষিকার পরিবর্ত্তে অনাবিল আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন।

ললিতকুমার, মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। ইংরাজী-সাহিত্যে অত বড় পণ্ডিত হইয়াও তিনি সারা জীবন বঙ্গ-সাহিত্যেরই সেবা করিয়াছেন। তাঁহার বঙ্গ-সাহিত্য-সেবার মধ্যেও বৈশিষ্ট্য ছিল। অনেক ইংরাজী-শিক্ষিত লেখক যে বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করেন, তাহা যেন তাঁহাদের একটা বিশেষ অনুগ্রহ।—তাঁহারা বিশেষ চিন্তালব্ধ মৌলিক গবেষণার ফল, সর্ব্বদেশে যশের প্রত্যাশায় ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করেন, আর কখনও কখনও দয়া করিয়া বাঙ্গালা ভাষাতেও 'কিছু' লিখিয়া মাতৃভাষাকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। ইংরাজী-সাহিত্যের পাণ্ডিত্যে যাঁহারা ললিতকুমারের চরণস্পর্শের যোগ্য নহেন, এরূপ অনেক ব্যক্তি ইংরাজী-সাহিত্যরচনার চেষ্টা করিয়া যশঃকণ্ডূতির নিবৃত্তি করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গবাণীর প্রকৃত বরপুত্র ললিত-কুমার, এরূপ যশকে আকাঙ্ক্ষণীয় বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি "কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব"-প্রমুখ গ্রন্থাবলীতে যেরূপ বিদ্যা-বত্তা, চিন্তাশীলতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, সেক্সপীয়র বা অন্য কোনও বৈদেশিক কবির সমালোচনায় রচনার সে শক্তি অর্পণ করিলে ভিন্ন দেশীয় মনীষিসম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু মাতৃভাষার যথার্থ ভক্ত ললিতকুমার, বাঙ্গালার বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালা উপন্যাসা-বলীর সম্যক্ আলোচনা-কার্য্যেই তাঁহার সমস্ত বৈদগ্ধ্য সাদরে নিয়োগ করিয়াছিলেন। মাতৃভাষার প্রতি এই ভক্তি, যশঃপ্রত্যাশায় এই সংযম, লক্ষ্য করিবার বিষয়।

যথার্থ সাহিত্য-সমালোচনায় ললিতকুমারের ন্যায় শক্তিশালী লোক অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহা তৃপ্তিপ্রদ ছিল না, তাহাকে তৃপ্তিকর করিয়া তোলা, লেখকের অন্তরাত্মার সহিত পাঠকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় করাইয়া দেওয়া সমালোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য। অযথা নিন্দা বা অতিরঞ্জিত প্রশংসা, যথার্থ সমালোচকের কার্য্য নহে। সমালোচনার নৈপুণ্যে কবির রচনা, মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠে, এই জন্য সমালোচনাও এক প্রকার নূতন সৃষ্টি। লেখক অপেক্ষা সমালোচক কম প্রশংসার পাত্র নহেন। যাহা হয় ত লেখকের অজ্ঞাতসারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, নিপুণ সমালোচনার প্রভাবে তাহার সৌন্দর্য্য পরিস্ফুটতা লাভ করে। তাই বলা হয়,—

"কবিতারসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎকবিঃ।
ভবানীভ্রূকুটীভঙ্গীং ভবো বেত্তি ন ভূধরঃ॥"

বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ সমালোচনা-প্রণালী এক অদ্ভুত বস্তু। সহজ রচনাকে জটিল করিয়া তুলিয়া পাঠককে ধন্দি… করাই যেন এই সকল সমালোচনার বৈশিষ্ট্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলী, "দিদি" ও "স্পর্শমণি" প্রভৃতির সমালোচনায় ললিতকুমার যে পাণ্ডিত্য ও ভাবুকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অনন্যসামান্য। সমালোচনা নৈপুণ্যে কাব্যসৌন্দর্য্য যে অপরকেও সম্পূর্ণভাবে বুঝা যাইতে পারে, ললিতকুমারের রচনাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ললিতকুমারের সমালোচনা যেমন সৌন্দর্য্যানুভূতির সহায়, সেইরূপ যেখানে একটু অসৌন্দর্য্যের—অশিবের আভাসমাত্র

অভিব্যক্ত, সেইখানেই তাহা তীক্ষ্ণধার ছুরিকার ন্যায় মমত্ব-শূন্য। তিনি "স্পর্শমণির" সমালোচনাপ্রসঙ্গে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা অশ্লীল গল্প-কবিতা প্রকাশের অপরাধে পুলিস কোর্টে দণ্ডলাভের যুগে শুনাইবার যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,—

"ইংরেজের সাহিত্যে বেকি শার্প রডন ক্রলিকে বিবাহ করিয়াও ঘোর বিপদ্ হইতে আত্মরক্ষার জন্য হাব-ভাব ছলা-কলা বিস্তার করিয়া আপন ভাশুরের মনোহরণের চেষ্টা করে করুক; মেটারলিঙ্কের পিলিয়াস্ ও মেলিস্যাণ্ডার,—দেবর ও বৌদিদির 'পবিত্র প্রণয়ে'র স্রোত ইউরোপীয় সাহিত্যে বহে বহুক; তাহাতে আমাদের সমাজের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; কিন্তু আমাদের সাহিত্যে মুরারির 'মোহ' স্থান না পাইলেই মঙ্গল।"—

[ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২৫]

ললিতকুমারের ভাষা অননুকরণীয়। বর্ত্তমান কালের এক দল লেখক, 'পদ্মবনে মত্ত করিসম' রচনার রীতি-নীতিকে পদদলিত করিয়া স্বেচ্ছাচারকেই অভিনব লিপি-কুশলতা বলিয়া মনে করেন। এমন কি, আজকাল ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞতা না থাকিলে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইলেও অধিকাংশ নিবন্ধের বক্তব্য-বিষয় হৃদয়ঙ্গম হয় না। কারণ, তথাকথিত লেখকরা বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী ভাব ও ভাষার পূর্ণ অনুকরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ললিতকুমার ইংরাজী-সাহিত্যে পরম পণ্ডিত হইয়াও বঙ্গ-সাহিত্য-রচনায় তাহার সকল রকম প্রভাব বর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। লিপিনৈপুণ্য থাকিলে সাধুভাষাও কেমন নিরবদ্য হইয়া উঠে, ললিতকুমারের রচনাই তাহার নিদর্শন। আজকালকার 'সবুজ দল' মুখে সাধুভাষা বর্জ্জনের গর্জ্জন করিলেও কার্য্যতঃ কিন্তু একমাত্র ক্রিয়াপদ ছাড়া তাঁহাদের রচনার প্রায় সমস্ত শব্দই দাঁত-ভাঙ্গা সংস্কৃত। ইহাতে লেখা সহজ হয় না—অদ্ভুত হইতে পারে। ললিত-কুমার, ইংরাজীর ব্যর্থ অনুকরণ ও সাধুভাষার অপপ্রয়োগ—উভয়েরই বিরোধী ছিলেন। তিনি একবার লিখিয়াছিলেন,—

"'মনোযোগ দিতে' 'মনোযোগ আকর্ষণ' ত খুবই চলিত হইয়াছে, প্রতিবাদ বৃথা; 'মনোভাব পাঠ করা' ও 'একটা বৃত্তি তাহার খাদ্য পাইল' ইংরেজীর 'আক্ষরিক অনুবাদ' নহে কি? স্থানে স্থানে অনর্থক সাধুভাষার প্রয়োগে বাগাড়ম্বর হইয়াছে; যথা 'ভস্মনিক্ষেপের ভগ্ন সূর্প' 'মহীলতা-বোধে মৃত্তিকাখননে সুপ্ত অহিধরকে পাছে জাগাইয়া তুলেন'। 'আশীর্ব্বাদের পূতধারা তাহাদের জীবনের মঙ্গলগ্রন্থি বাঁধিয়া দিবার স্বর্ণসূত্র'—এখানে রূপক-বিভ্রাট (confusion of metaphors) ঘটিয়াছে।"—

[ভারতবর্ষ,ষষ্ঠ খণ্ড,২য় সংখ্যা]

ললিতকুমারের পিতা ৺নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ললিতকুমার, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভ হইতে বি-এ পরীক্ষায় বঙ্গভাষার পরীক্ষক ছিলেন। তিনি একবার পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন, আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে চারিখানি পুস্তক পাঠ্য আছে, ["সামাজিক প্রবন্ধ", "সাহিত্য", "কর্ম্মকথা", "কপালকুণ্ডলা"] তাহা পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত। গত দশ বৎসর হইতে 'কপালকুণ্ডলা'র প্রশ্ন করিতেছি, আর নূতন জিজ্ঞাস্য খুঁজিয়া পাই না। তার পর, অবশিষ্ট তিনখানি পুস্তকও বি, এ, পরীক্ষার্থীর পক্ষে কঠিন। রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্য" গ্রন্থের শেষের লেখাগুলি অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও তাহার প্রথমাংশের বক্তব্য বিষয় আমিই যে ভাল বুঝি না।" আমি বলিলাম, "কপালকুণ্ডলার" পরিবর্ত্তে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন্

উপন্যাস পাঠ্য করিলে ভাল হয় ?" তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "'কৃষ্ণকান্তের উইল' পাঠ্য করুন না ।" কিন্তু হায়, তাঁহার প্রস্তাবানুসারে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পাঠ্য হইয়াছে ; তিনি প্রশ্নপত্রই রচনা করিয়া গেলেন, পরীক্ষার্থীরা তাঁহাকে আর উত্তর দেখাইবার সৌভাগ্য লাভ করিল না ! ললিতকুমার হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের রচনা-প্রণালীর প্রশংসা করিতেন। তিনি বলিতেন, "এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমি একবারও খারাপ লেখা দেখিলাম না। শুনিতে পাই, এখানে অনেক মহিলা ছাত্রীও আছেন। কিন্তু হাতের লেখা ও রচনাপ্রণালী দেখিয়া স্ত্রী-পুরুষের ভেদ করা যায় না। খাতার উপরে ত আর নাম থাকে না, রোল নম্বর মাত্র থাকে, এখানকার মেয়েরাও বঙ্গ-সাহিত্যে বেশ উন্নতিলাভ করিয়াছে, বলিতে হইবে।"

কাশীর প্রতি ললিতকুমারের একটা আন্তরিক ভালবাসা ছিল। তিনি যখন-তখন ছুটী পাইলেই কাশীতে ছুটিয়া আসিতেন। কাশীর দারুণ গ্রীষ্মের ভয়ে গ্রীষ্মকালে অনেক কাশীবাসীই অন্যত্র চলিয়া যান। কিন্তু ললিতকুমার অনেকবার গ্রীষ্মাবকাশেও কাশীতে আসিয়া বাস করিয়াছেন। একবার তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি এই অসহ্য গরমে কাশীতে আসিলেন ?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি ত এখানে বেড়াইতে আসি না ; তাহা হইলে দার্জ্জিলিং বা সিমলায় যাইতাম।" ললিতকুমারের বহু রচনা, কাশীর নানাবিধ বর্ণনায় পরিপূর্ণ। তিনি কাশীতে বাসও করিতেন প্রকৃত তীর্থসেবীর ন্যায়। সুস্থশরীরে গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথ-দর্শন করা তাঁহার দৈনিক নিয়ম ছিল। ললিতকুমার বহু তীর্থভ্রমণ করিলেও কাশীর উপর তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণ ছিল।

স্বধর্ম্মে তাঁহার অসাধারণ আস্থা ছিল। ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকায় তীব্র শোকেও তিনি বিচলিত হন নাই। উপযুক্ত দুই পুত্র, কন্যা ও সহধর্ম্মিণীর বিয়োগেও ললিতকুমার, 'নিবাতনিষ্কম্প ইব প্রদীপঃ' ধীর-স্থির ছিলেন। তাঁহার এমনই অসামান্য সহিষ্ণুতা যে, দুইটি পুত্রের যুগপৎ টাইফয়েড হইলে যখন একটি মারা গেল, তখন পাছে শোক প্রকাশ করিলে অপর পুত্রটির পীড়া-বৃদ্ধি হয়, এই আশঙ্কায় সেই প্রচণ্ড পুত্রশোক অপরিম্লান-বদনে সহ্য করিয়াছিলেন।

ললিতকুমারের শেষ রচনা বোধ হয়, '৺কেদারবদরী।' এই ভ্রমণবৃত্তান্ত যেমন মনোমদ, তেমনই জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। ললিতকুমারের কর্ম্মজীবন ও সাহিত্যিক জীবনের বৈশিষ্ট্য, যথাকালে কোনও সৌভাগ্যশালী লেখক জীবন-চরিতাকারে প্রকাশ করিবেন। আমাদের অশ্রুপাতের পাদ্য, এইখানেই সমাপ্তি লাভ করিল।

আজ আমরা কি বলিয়া তাঁহার একমাত্র উপযুক্ত পুত্র শ্রীমান্ সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এলকে সান্ত্বনা দিব, বুঝিতে পারিতেছি না। এই সে দিন,—এখনও ছয় মাসও পূর্ণ হয় নাই, তিনি মাতৃশোক পাইয়াছেন ; ইহার মধ্যেই পিতৃবিয়োগের কষ্টকর অবস্থায় পতিত হইলেন ! আশা করি, তাঁহার পিতৃদেবের পবিত্র আদর্শই তাঁহাকে এই তীব্র শোক সহ্য করিবার শক্তি অর্পণ করিবে।

আশীর্ব্বাদ করি, শ্রীমান্ সলিলকুমার, মাতৃভাষার সেবায়, ধর্ম্মের একনিষ্ঠতায়, কর্ম্মের অনুরাগিতায় পিতার ন্যায় যশস্বী হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করুন।

শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।

(অধ্যাপক, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)

সাহিত্যিক ললিতকুমার।—

ললিতকুমারের সহিত আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের বহুদিন পরিচয় ছিল। আজ প্রায় ২৫ বৎসর আমিও তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলাম। তিনি আমাদের জন্মস্থা[ন] রঙ্গপুর নগরে বিবাহ করেন। রঙ্গপুরের উপর ললিত বাবু[র] প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। আমি কলেজে পড়িবার সময়ে গোপ[নে] বঙ্গবাসী কলেজে তাঁহার লোকপ্রসিদ্ধ অধ্যাপনা শুনি[তে] যাইতাম--আজ আমিও কয়েক বৎসর ধরিয়া অধ্যাপ[না] করিতেছি ও বহু বড় বড় অধ্যাপকের সংস্রবে আসিয়া[ছি] কিন্তু পূজ্যপাদ ললিত বাবুর ন্যায় ইংরাজী সাহিত্যে[র] অধ্যাপনা অতি অল্পই শুনিতে পাইয়াছি। অধ্যাপনাকা[লে] এমন সরসভাবে তিনি পড়াইতেন যে, প্রত্যেক ছা[ত্রের] অন্তঃকরণ পাঠ্যবিষয়ে আকৃষ্ট হইত ; জ্ঞানরাজ্যের বি[বিধ] সম্পদরাশি তাহাদের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইত। পূজ্যপ[াদ] ললিতবাবুর অধ্যাপনার তুলনা নাই, এ কথা বলি[লে] নিশ্চয়ই সত্যের অপলাপ হইবে না।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ৺কাশীধামে প্রায় প্রত্যেক পূজায় তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম। তিনি কাশীতে আসিলে মনে হইত, কাশীর সমাজ যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিত। যে কয় দিন তিনি কাশীতে থাকিতেন, প্রত্যহ তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হইতাম। সাহিত্যচর্চ্চার অবকাশে, তাঁহার সরস উক্তিতে হাস্যসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিত—শ্রোতৃবর্গের আনন্দের সীমা থাকিত না। তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত হাস্য-রসের উৎস বোধ হয় বঙ্গ-সাহিত্য হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। কেন জানি না, তাঁহার সঙ্গলাভে আমি অতিরিক্ত আনন্দ অনুভব করিতাম। তাঁহার 'ফোয়ারা', 'সাহারা', 'পাগলা ঝোরা'—প্রভৃতি পুস্তকগুলি কতবার যে পড়িয়াছি, বলিতে পারি না। বন্ধু-বান্ধবগণকে পড়িয়া শুনাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতাম।

পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন

দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন এখন শুধু নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এখন আর রামেন্দ্রসুন্দর নাই, ব্যোমকেশ নাই, প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয় রোগে শয্যাশায়ী, কলিকাতার বড় বড় সাহিত্যিক, মফঃস্বলের বড় বড় সাহিত্যরথী প্রতিদ্বন্দ্বী না রাখিয়া চিরপ্রস্থান করিয়াছেন। এই সাহিত্য-সম্মিলনে ললিতকুমার ছিলেন হাস্যরসের নির্ঝর। তিনি বক্তৃতা করিতে উঠিলেই সভাশুদ্ধ লোক প্রবলরূপ হাস্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিতেন। তাঁহার প্রবন্ধের প্রত্যেক ছত্রে অফুরন্ত হাস্যরসের সমাবেশ থাকিত। উচ্চ অঙ্গের হাস্যরসের অবতারণা করিতে হইলে যে যে গুণ থাকিবার প্রয়োজন, সমস্তই এককালে ললিতকুমারের রচনায় দেখিতে পাইতাম।—যাঁহারা বঙ্গ-সাহিত্যের সহিত পরিচিত, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহার রচনায় শুধু হাস্যরসই ছিল না। প্রভূত জ্ঞান, সূক্ষ্মদর্শন, প্রকৃষ্ট সমালোচনাশক্তি তাঁহাতে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। মনে পড়ে, 'প্রবাসীতে' তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ, সুচিন্তিত একটি সন্দর্ভ পাঠ করিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবুর সমালোচনায় ও ঔপন্যাসিক চরিত্র আলোচনায় তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছিলেন। পাঠকগণ তাঁহার বিশ্লেষণমূলক সমালোচনা ও অজস্র টীকা-টিপ্পনীর বহু উদাহরণ পাইয়াছেন। 'ব্যাকরণ-বিভীষিকার' সমর্থন করিয়া পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় বিশদ সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কৃতে প্রগাঢ় জ্ঞান দেখিয়া তিনি তাঁহাকে "বিদ্যারত্ন" উপাধিতে ভূষিত করেন ও রংপুরের সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতিত্বের প্রস্তাব করেন। তাঁহার বাঙ্গালা রচনাশক্তি বহু বিষয়কে উপলক্ষ করিয়া অপূর্ব্ব সাহিত্য-সম্পদের সৃষ্টি করিয়াছে; ভাষা-জননীর ভাণ্ডারে সেই মূল্যবান্ গ্রন্থরাজি দ্যুতিমান মণি-মাণিক্যের ন্যায় চিরভাস্বর প্রভায় সঞ্চিত থাকিবে। শিশুপাঠ্য পুস্তকের রচনাতেও তিনি যথেষ্ট যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ভ্রমণ-কাহিনী, গল্প, সর্ব্ববিষয়েই তিনি অশেষ নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার সাহিত্যালোচনার ইতিহাস লিখিবার সময় আসে নাই। তাঁহার রচনার প্রধান গুণ ছিল, মার্জ্জিত ভাষা, সরল প্রকাশ ও ভাবভূয়িষ্ঠতা। তাঁহার রচনায় কোন দিনও আড়ষ্টতা পাই নাই, পড়িতে গেলে এক আসনেই শেষ করিতে হইত। আজকাল এরূপ অনবদ্য ভাষায় রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার প্রত্যেক প্রবন্ধে প্রচুর হাস্যরস দেখিতে পাওয়া যাইবে। সত্যই "যে দেশে বেত্রের চাস হইত, সে দেশে তিনি ইক্ষুর চাষ করিয়াছিলেন।"

তাঁহার জীবনের বহু দিক্ ছিল, সে সকল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। ইংরাজী সাহিত্যজ্ঞ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত

হইলেও তিনি মনে প্রাণে একেবারে খাঁটি হিন্দু ছিলেন। দেখিয়াছি, ৺পূজার সময় খালি পায়ে গরদের কাপড় পরিয়া দুর্গাবাড়ী, ৺অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবালয়ে সস্ত্রীক "যাত্রা" করিতে বাহির হইতেন। তাঁহার চা-পানের বাতিক ছিল না, উপবাস করিয়া সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য সমাধা করিতেন। আজ মনে করিতে চোখে জল আসে, ৺পূজায় আমাদের ক্ষুদ্র কুটীরে মহামায়ার ভোগের প্রসাদ গ্রহণকালে তিনি কতই না আনন্দ প্রকাশ করিতেন। বলিতেন, "তোমাদের বাসায় বিশুদ্ধভাবে মেয়েরা নিজে রাঁধিয়া ভোগ দেয়, তাহার আস্বাদই অন্যরূপ।" আহারেরই কত আলোচনা হইত। তাঁহার অধিকাংশ লেখায় বাহুল্যবর্জ্জিত ধর্ম্মভাবের প্রমাণ সকলেই লক্ষ্য করিবেন। মাসিক 'বসুমতী'তেই তাঁহার অপূর্ব্ব 'কেদার-বদরী' ভ্রমণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

ললিতকুমারের মাতুল ৺হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

তাঁহার আলোকময় জীবনের শেষ ভাগে ছায়াপাত হইয়াছিল। ক্রমান্বয়ে দুইটি বয়স্ক পুত্রের অকালমৃত্যু তাঁহার মনের ও জীবনের বাঁধন ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল। যে কয়েক দিন বাঁচিয়া ছিলেন, তাহা যেন শুধু কর্ত্তব্যানুরোধে। আমাকে দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, "কি করি, বড় সংসার, অল্প বেতন, কিছুই জমাইতে পারি নাই, ইচ্ছা হয়, কাশীতে যাইয়া শান্তিতে বাস করি, কিন্তু অর্থাভাবে শেষ দিন পর্য্যন্তও হয় ত আমাকে ঘানি টানিতে হইবে।" হায়! তাঁহার অবশিষ্ট পুত্র ভজা (এই নামে তিনি ডাকিতেন) ভাল রকম উপার্জ্জন করিয়া তাঁহাকে ছুটী দিবার পূর্ব্বেই তিনি চিরদিনের মত ছুটী লইয়া চলিয়া গেলেন! তাঁহার শেষ আঘাত লাগিল, তাঁর চির-সুখ-দুঃখের সহধর্ম্মিণীর মৃত্যুতে। এমন স্বামি-স্ত্রীর আদর্শ প্রগাঢ় ভালবাসা কদাচ দেখিতে পাই নাই। যে দিকেই যাইতেন, "কপোত-কপোতীর" মত "বাঁধি নীড়" প্রবাসে বাস করিতেন। জীবনে যে ছাড়াছাড়ি হয় নাই, মরণে বোধ হয়, সেই ছাড়াছাড়ি সহিতে পারিলেন না। সহধর্ম্মিণীর সহযাত্রা করিলেন!

আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ জীবনে চিরদিন মনে থাকিবে। তাঁহার অজস্র মুক্তোর ন্যায় অক্ষরে লেখা চিঠি-পত্র কত সুখ-দুঃখের কথায় ভরিয়া আছে। আমি 'ভারতবর্ষে' "চা-তত্ত্ব" "পাণ-তত্ত্ব" "নস্যের নেশায়" প্রভৃতি কয়েকটি Humourous sketches লিখিয়াছিলাম, সেগুলি পড়িয়া তিনি এতই সন্তুষ্ট ছিলেন যে, বলিয়াছিলেন, "তুমি ঠিক আমার মত লিখিতে পার, ঐ সব রচনার নীচে আমার নাম বসাইয়া দিলে কাহারও সাধ্য নাই যে বলে, আমার রচনা কি তোমার রচনা।"
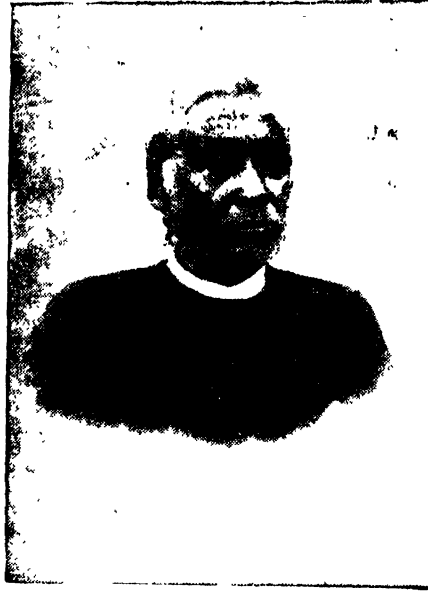
তাঁহার পুত্রবৎ স্নেহের বহু নিদর্শন পাইয়াছিলাম। আমার সামান্য পুস্তক Indian Images-এর 'নাকি বিখ্যাত London Times-এ বড় প্রশংসা বাহির হইয়াছিল, তাহাতে না কি ইংরাজী ভাষায় যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। আমি ইহা দেখি নাই, তিনি হঠাৎ ঐ সমালোচনার "কাটিং" ও সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ প্রকাশ করিয়া সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। সে পত্রখানি পিতৃদেবকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। হায়, জীবনের মত এইরূপ প্রাণ-ভরা উৎসাহ আশীর্ব্বাদ আর পাইব না। বহু বিজয়া আসিবে, বহু পূজা বৎসরে বৎসরে হইবে, কিন্তু তাঁহার আনন্দময় স্পর্শ আর জীবনে লাভ করিতে পারিব না।

শ্রীবৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য
(এম্-এ, অধ্যাপক হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)

শ্রদ্ধাঞ্জলি।—

২০ বৎসর পূর্ব্বে ললিত বাবুকে শিক্ষকরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছিলাম। আজকাল শিক্ষক-ছাত্রের সম্বন্ধ লইয়া অনেক আলোচনা, অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইতেছে; কিন্তু আমি ললিত বাবুকে শিক্ষকরূপে পাইয়া এই সুদীর্ঘ বিংশতি বৎসর ধরিয়া শিক্ষক-ছাত্রের সম্বন্ধের যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য উপভোগ করিয়াছি, তাহা অপেক্ষা মধুরতর সম্বন্ধ কল্পনাতীত।

ললিত বাবু শুধু আমার শিক্ষক ছিলেন না, একাধারে শিক্ষক, অভিভাবক ও বন্ধু ছিলেন। শৈশবে পিতৃহীন হইয়াছিলাম, কিন্তু ললিত বাবুকে পাইয়া পিতার অভাব ভুলিয়া ছিলাম। তাই কেবলই মনে হইতেছে, আজ আবার নূতন করিয়া পিতৃহীন হইলাম।

ললিত বাবুর তিরোধানে যুগপৎ দেশের উচ্চশিক্ষা এবং বাঙ্গালা-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, সে ক্ষতির কখনও পূরণ হইবে, এমন আশা হয় না।

ললিত বাবু ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন, কিন্তু ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা—এই তিনটি সাহিত্যেই তাঁহার সমান অধিকার ছিল, তাঁহার অধ্যাপনায় ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইত। অত্যন্ত জটিল ও নীরস বিষয়কেও সরল ও সরস করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা তাঁহার যেমন ছিল, তেমনটি আর কয় জনের আছে, তাহা বলিতে পারি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া যে আনন্দ, যে তৃপ্তি পাইয়াছি, তাহা অন্যত্র বিরল।

সাহিত্যে ললিত বাবুর দান—অগাধ পাণ্ডিত্যের সহিত অপূর্ব্ব হাস্য ও মধুর রসের সংমিশ্রণ। ব্যাকরণের সাহারার ভিতরেও তিনি রসের ফোয়ারা ছুটাইয়াছেন! দেশের দুর্ভাগ্য, অমৃতলালের অন্তর্দ্ধানের পর ছয়মাস না যাইতে যাইতেই ললিতকুমারও অন্তর্হিত হইলেন!

শিক্ষক ও সাহিত্যসেবী হিসাবে ললিত বাবুর সম্বন্ধে যে দুই একটা কথা বলিলাম, তাহা খুব সাধারণ ভাবেই বলিলাম। কেন না, তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও অনন্যসাধারণ সাহিত্যিক প্রতিভার আনুপূর্ব্বিক বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত সমালোচনা করিবার যোগ্যতা আমার নাই। সে ভার যোগ্যতর হস্তে অর্পণ করিয়া, আমি কেবল ব্যক্তিগতভাবে ললিত বাবুর সহিত মেলামেশা করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যেটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, সেই সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিব।

দেশের স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া উচ্চশিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে লইয়া কলিকাতায় আসিলাম। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহোদয় আমার আর্থিক দুরবস্থার কথা অবগত হইয়া আমার প্রতি করুণাপরবশ হইয়া আমাকে তাঁহার কলেজে অবৈতনিক ছাত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। (যে চারি বৎসর বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, সেই চারি বৎসরই অবৈতনিক ছাত্র ছিলাম; অধিকন্তু এম, এ পড়ার দুই বৎসর ইউনিভার্সিটি কলেজে যে বেতন লাগিয়াছিল, তাহাও সদাশয় গিরিশ বাবুর নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। গিরিশ বাবু আমার প্রতি এই দয়াটুকু না করিলে বোধ হয়, আমার উচ্চ শিক্ষালাভের আশা হৃদয়ে উত্থিত হইয়া হৃদয়েই লীন হইয়া যাইত। ইহা ছাড়া গিরিশ বাবুর নিকট আমি আরও অনেক বিষয়ে ঋণী।) গিরিশ বাবুর নিকটেই ললিত বাবু উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমার বিবরণ সমস্ত শুনিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই বলিলেন, "সংস্কৃত বইগুলি তোমাকে কিনিতে হইবে না, দুই সর্গ রঘুবংশ এবং দুই সর্গ ভট্টিকাব্য আমি তোমাকে দিব। তুমি কা'ল সকালে আমার বাসায় আমার সহিত দেখা করিও।" এই বলিয়া তিনি একখানি কার্ডে স্বহস্তে তাঁহার ঠিকানা লিখিয়া আমাকে দিলেন। (তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া এবং সংস্কৃত পুস্তক দিবার প্রতিশ্রুতি শুনিয়া আমার তখন মনে হইয়াছিল, তিনি সংস্কৃতের অধ্যাপক। কিন্তু যখন দেখিলাম, তিনি ইংরাজীর অধ্যাপক, এবং যেমন তেমন অধ্যাপক নহেন, এক জন দেশবিখ্যাত নামজাদা অধ্যাপক, তখন আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। এক জন খ্যাতনামা ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পোষাক-পরিচ্ছদ ও চালচলন এত সাদাসিদে! তখন হইতে বরাবরই ললিত বাবুর এই আড়ম্বর-শূন্যতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। অনেক দিন তাঁহাকে একটা সাদাসিদে পিরাণ ও একখানা মোটা চাদর গায় দিয়া এবং চটিজুতা পায়ে দিয়া কলেজে যাইতে দেখিয়াছি।)

ললিত বাবুর নির্দ্দেশমত পরদিন প্রভাতে সসঙ্কোচে তাঁহার বাসায় গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, এক মুহূর্ত্তের আলাপেই আমার সমস্ত ভয় ও সঙ্কোচ কাটিয়া গেল, ললিত বাবুর সস্নেহ ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হইলাম। মাদৃশ মাতাপিতৃহীন অনাথ বালক এইরূপ অযাচিত স্নেহ লাভ করিয়া কৃতার্থ না হইয়া পারিল না। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার অন্যতম বন্ধু ও পুস্তক-প্রকাশক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে আমাকে দুই সর্গ রঘুবংশ ও দুই সর্গ ভট্টিকাব্য সংগ্রহ করিয়া দিলেন। তাহার পর যে চারি বৎসর সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার ছাত্র ছিলাম, সেই সময় প্রায়ই তিনি আমার পড়া-শুনার খোঁজ-খবর লইতেন, মধ্যে মধ্যে নিজের বাটী হইতে ২।১ খানি ভাল বই আনিয়া পড়িতে দিতেন, এবং সেগুলি পড়িয়াছি কি না, যথাসময়ে সে সংবাদ লইতে ভুলিতেন না। তাহা ছাড়া নিয়মিতভাবে কতকগুলি করিয়া প্রশ্ন দিতেন, এবং আমি উত্তর লিখিয়া দিলে সেগুলি সযত্নে সংশোধন করিয়া দিতেন। সংশোধনের সঙ্গে সঙ্গে কি চমৎকার মন্তব্যই না লিপিবদ্ধ করিয়া দিতেন! এরূপ একটি মন্তব্যের কথা এখনও আমার বেশ মনে আছে। এক দিন উত্তরপত্রে 'Magnificent' কথাটির বানান ভুল করিয়া 'Magnificient' এইরূপ লিখিয়াছিলাম। সাধারণতঃ শিক্ষকগণ এরূপ স্থলে ভুলটি সংশোধন করিয়া দিয়াই নিরস্ত হয়েন। কিন্তু ললিত বাবু ভুলটি কাটিয়া পাশে লিখিয়া দিয়াছিলেন, "Remember that 'sufficient, proficient and efficient' differ from magnificent." সেই দিন হইতে আর কখনও ও কথাটার বানান ভুল করি নাই। এক জন সাধারণ ছাত্রের জন্য কয় জন শিক্ষক এতটা করিয়া থাকেন?

বি, এ পাশ করার পর এম, এ পড়িবার ইচ্ছা বলবতী হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অধ্যক্ষ গিরিশ বাবু কলেজের বেতনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আহার, বাসস্থান ও অন্যান্য ব্যয়ও ত আছে? সেগুলি সংকুলান হইবে কি করিয়া, এই ভাবনায় অস্থির হইলাম। ললিত বাবুর সহিত দেখা করিলাম। তিনিও আমার একটা সুব্যবস্থা করিয়া দিবার চেষ্টায় রহিলেন।

কলিকাতায় থাকিবার একটা আস্তানা ছিল, হোটেলে খাইতে-ছিলাম। ললিত বাবু বলিলেন, "তোমার যেরূপ শরীর দেখিতেছি, তাহাতে হোটেলে খাওয়া সহ্য হইবে না। এখন দিন কতক আমার বাসাতেই খাওয়া-দাওয়া কর, তাহার পর যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাইবে।" আমি কৃতার্থ হইলাম। সেই দিন হইতে তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলা-মেশা আরম্ভ হইল। ২।১ দিনের মেলামেশাতেই বুঝিতে পারি-লাম, এমন পবিত্র গৃহস্থ আজকাল আমাদের দেশে খুব কমই আছে। উঁহাদের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হইলাম। আমি আত্মীয় নহি, কুটুম্ব নহি, বিশিষ্ট অভ্যাগতও নহি, এক জন দরিদ্র ছাত্র মাত্র। কিন্তু বাটীর কর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে পর্য্যন্ত আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তাহাতে বুঝিবার কোনও উপায় রহিল না যে, আমি এক জন সম্ভ্রান্ত অভ্যাগত নহি।

১০।১৫ দিন এইভাবে কাটিয়া গেল। অথচ আমার কোনও স্থায়ী বন্দোবস্ত হইল না। ইহাতে আমি একটু চিন্তাকুল হই-লাম। আমাকে চিন্তাকুল দেখিয়া ললিত বাবু এক দিন তাঁহার এক আত্মীয়ের * দ্বারা প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার মধ্যম পুত্রটি † দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে, তাহাকে একটু একটু গণিত ও সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য এক জন লোকের প্রয়োজন। যদি আমি ঐ ভার গ্রহণ করি, তাহা হইলে উভয় পক্ষেরই ভাল হয়; তিনিও পুত্রের ঐ দুই বিষয় শিক্ষার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হন, আর আমিও বৃথা চিন্তায় সময় নষ্ট না করিয়া নিশ্চিন্তমনে পড়াশুনা করিতে পারি। আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম; কেন না, ললিত বাবুর মত লোকের ছেলের শিক্ষক হওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নহে। আমি সাগ্রহে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম। অবশ্য তাঁহার ছেলের আর এক জন শিক্ষক ছিলেন—তিনি সকালে তাহাকে পড়াইতেন এবং প্রধানতঃ ইংরাজীই পড়াইতেন। আমার পড়াইবার সময় নির্দ্দিষ্ট হইল সন্ধ্যার পর। আমি ললিত বাবুর বাসাতেই আহার করিতে লাগিলাম এবং অন্যান্য খরচ বাবদ মাসিক ৫৲ টাকা হিসাবে পাইতে লাগি-লাম। ইহাতে আমার সকল দিকেই সুবিধা হইল। এম, এ, পড়িবার সময় আমার যখন যে পুস্তকের প্রয়োজন হইত, ললিত বাবুর নিকট চাহিলেই তাহা পাইতাম—তাঁহার পুস্তকাগারে কোনও পুস্তকেরই অভাব ছিল না। ফলে, এক পয়সার বই না কিনিয়াও আমার এম, এ পরীক্ষা দেওয়া হইল।

* ললিতবাবুর বয়ঃকনিষ্ঠ অথচ সম্বন্ধে খুল্লতাত কাশীপ্রবাসী শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

† অধুনা তাঁহার একমাত্র বংশধর—শ্রীমান্ সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল।

আমার মত এক জন নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়ার জন্যই যে ললিত বাবু ছেলের এক জন শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও আবার আমাকে রাখিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। অবশ্য তিনি ইচ্ছা করিলে আমাকে তাঁহার পুত্রের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত না করিয়া এমনই দয়া করিয়া দুটি ভাত দিতে কাতর হইতেন না। কিন্তু সেরূপ করিলে পাছে আমি তাঁহার গলগ্রহ হইতেছি মনে করিয়া লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হই, সেই জন্যই বোধ হয়, তিনি আমার উপর কর্ত্তব্যের ভার দিয়া আমার আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। যাঁহাদের প্রকৃত আত্মসম্মান-বোধ আছে, তাঁহারা এই রকম করিয়াই পরের সম্মানও বজায় রাখেন।

যে দিন হইতে আমি শ্রীমান্ সলিলকুমারের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলাম, সে দিন আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। কেন না, সেই দিন হইতে আমি প্রকৃতপ্রস্তাবে ললিত বাবুর পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, প্রচলিত প্রথা অনুসারে সলিল আমাকে 'মাষ্টার মশায়' বলিয়াই ডাকিবে। কিন্তু যখন সে এবং তাহার ছোট ছোট ভাই-ভগিনীরা আমাকে 'দাদা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল, তখন আমার ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল, আমি চমৎকৃত হইলাম। আমিও ললিত বাবুর সহধর্ম্মিণীকে প্রাণ ভরিয়া 'মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম। আমি ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে মাতৃহীন হইয়াছিলাম, এখন আবার নূতন মা পাইয়া কৃতার্থ হইলাম—আমার মাতৃস্নেহের ক্ষুধা মিটিল। আহা! এমন স্নেহময়ী মা যে খুব কমই দেখা যায়! তিনি আমায় এত ভালবাসিতেন যে, কোন অচেনা লোক আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "একে চেন না? এটি আমার বড় ছেলে।" (আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র * শিশিরকুমারের চেয়েও কিছু বড় ছিলাম।) শেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর তবে আমার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিতেন। (হায়! গ্রহবৈগুণ্যে আজ ৭ মাস হইল, এ মাকেও হারাইয়াছি।)

দিবাভাগে কলেজের তাড়ায় সকলের একসঙ্গে বসিয়া খাওয়া হইত না; যাঁহার যখন দরকার, তিনি তখন খাইয়া লইতেন। কিন্তু রাত্রিতে নিয়মিতভাবে সকলে একসঙ্গে বসিয়া আহার করা হইত। সে সময়টা যে কিরূপ আনন্দে কাটিত, তাহা বর্ণনা করিতে লেখনী অক্ষম। এই ভোজন-বৈঠকে থাকিতেন ললিত বাবু স্বয়ং, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুমুদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (কখনও কখনও) তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র[illegible] মুখোপাধ্যায় এম, এ (শ্রীরামপুর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক) এবং (মধ্যে মধ্যে) তাঁহার মামাতো ভাই (ভাগলপুর টি, এন্ জুবিলি কলেজের অধ্যক্ষ ৺হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় (অধুনা এম, এ, [illegible] টি)। এই ভোজন-বৈঠকেই ললিত বাবুর পূর্ণ পরিচয় পাইলাম। এতদিন কতকটা দূর হইতেই তাঁহাকে দেখিয়া আসিতে-ছিলাম, এখন তাঁহাকে যতদূর সম্ভব নিকটে পাইলাম। এমন রঙ্গরসপ্রিয় সদালাপী লোক আজকালকার দিনে বড় কমই দেখা যায়। খাইতে খাইতে কত রকমের গল্প ও আলোচনা হইত, তাহার ভিতর ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি

* অধুনা পরলোকগত।

সবই থাকিত, অথচ সেই সব আলোচনা কত সরস ও হৃদয়গ্রাহী। এক এক দিন হাসিতে হাসিতে পেট ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইত। হায়! তে হি নো দিবসা গতাঃ।

এই সময়ে এই দীন লেখকের সাহিত্যসেবারও হাতে খড়ি হয়। ললিত বাবুর লেখা পাঠ করিতে করিতে আমারও হৃদয়ে সাহিত্যসেবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। তিনিও আমাকে নিরুৎসাহ করেন নাই—বরং উৎসাহই দিয়াছিলেন। তিনি যখন 'সাধক' নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন, তখন আমাকে উহার সহকারী সম্পাদকের ভার দিয়া আমার কর্ত্তব্য অতি যত্নসহকারে বুঝাইয়া দিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। তাঁহারই দেওয়া উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মেলনের সাহিত্য-শাখায় তাঁহারই সভাপতিত্বে 'সাহিত্যের পুষ্টি' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম।

দেখিতে দেখিতে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল,—সলিলের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। কিন্তু আমার এম, এ পরীক্ষা হইতে তখনও ৪।৫ মাস বাকী। ললিত বাবু বলিলেন, আমার পরীক্ষা যত দিন না শেষ হয়, তত দিন আমি যেন পূর্ব্বের মত তাঁহার বাসাতেই খাওয়া-দাওয়া করি। আমি কৃতার্থ হইলাম।

অধ্যাপক ললিতকুমারের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া জগত্তারিণী দেবী

পরীক্ষা দিয়া চাকরী করিতে করিতে যে এক বৎসর কলিকাতায় ছিলাম, তখন প্রায়ই ললিত বাবুর বাসায় বেড়াইতে যাইতাম, মধ্যে মধ্যে খাইবার নিমন্ত্রণও হইত। মোট কথা, আমি দূরে যাইলেও তিনি স্নেহের বাঁধনে আমাকে পূর্ব্বের মত নিকটেই রাখিলেন। তাহার পর, আজ ১৩ বৎসরের অধিক হইল কলিকাতা ছাড়িয়াছি, কিন্তু এই ১৩ বৎসরকাল ললিত বাবু নিয়মিতভাবে পত্র লিখিয়া আমার খোঁজ লইয়াছেন, একখানি পত্রের উত্তর পাইতে বিলম্ব হইলে পুনরায় পত্র লিখিয়াছেন, বাসায় কোনও কাযকর্ম্ম হইলেই নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া কার্য্যের একটা না একটা দায়িত্বপূর্ণ অংশের ভার আমার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। আমার বাটীতে কোনও কাযকর্ম্ম হইলে শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ বা অসুখের ভয়ে নিজে পায়ের ধূলা দিতে না পারিলেও পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, জামাতা প্রভৃতিকে পাঠাইয়া দিয়া আমার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া কার্য্যব্যপদেশে যখনই কলিকাতা গিয়াছি, তখনই (কলিকাতায় আমার কয়েক জন আত্মীয়, কুটুম্ব ও বন্ধু থাকা সত্ত্বেও) পাছে তিনি দুঃখিত হন, এই ভয়ে তাঁহার বাসাতেই উঠিতে হইয়াছে, এবং অন্ততঃ এক বেলাও আহার করিতে হইয়াছে।

ললিত বাবু এক জন ধীর, বিবেচক, নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। অন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না এবং তাঁহার বিবেক যাহা বলিত, তাহা করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। এ জন্য অনেক সময় অনেকে তাঁহার উপর বিরক্ত হইত, তাঁহাকে দাম্ভিক ও আত্মম্ভরী বলিয়া নিন্দা করিত। কিন্তু তিনি কখনও সে সব নিন্দায় কর্ণপাত করিতেন না বা তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতেন না। তাঁহার আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান এত অধিক ছিল যে, নিজের ছেলের চাকরীর জন্য তিনি কাহাকেও উপরোধ করিতে পারিতেন না। কাহারও খাতিরে নিজের স্বাধীন মত চাপিয়া রাখিয়া তাহার মতে মত দেওয়া তাঁহার সম্পূর্ণ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁহার

জ্বালাময়ী লেখনীর জ্বালা এড়াইতে পারেন নাই। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া রবীন্দ্রনাথ চিরদিন তাঁহার নিকট শ্রদ্ধার আসন পাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু যখন 'সবুজপত্রে' রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর পত্র প্রকাশিত হইল, তখন উহাতে স্ত্রী-স্বাধীনতার নামে স্ত্রীলোকের স্বেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে দেখিয়া ললিত বাবু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার 'ভর্ত্তার উত্তর' 'শাশ্বতী'তে প্রকাশিত হইল। * এক হিসাবে তাঁহার এই 'ভর্ত্তার উত্তর' লর্ড লিটনের প্রতি প্রদত্ত সুবিখ্যাত উত্তরের সহিত এক কোঠায় স্থান পাইবার যোগ্য।

ললিত বাবু বাহিরে একটু গম্ভীর ও স্বল্পভাষী ছিলেন বলিয়া অনেকে তাঁহাকে অহঙ্কারী মনে করিয়া বিষম ভ্রমে পড়িত। যাঁহারা মানুষটির ভিতরের খবর রাখিতেন, তাঁহারাই জানিতেন, তিনি কিরূপ নিরহঙ্কার ছিলেন। একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, তিনি কি ধাতুতে নির্ম্মিত ছিলেন। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের সময় তাঁহাকে বরযাত্রী হইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। কলিকাতার ভিতরেই বিবাহ হইতেছিল, সুতরাং তিনি সহজেই যাইতে সম্মত হইলেন; শুধু তাহাই নহে, আমার সুবিধার জন্য এ ব্যবস্থাও করিলেন যে, বর ও বরযাত্রী সকলে একত্র হইয়া তাঁহার বাসা হইতেই রওনা হওয়া যাইবে। সেইমতই সব ঠিক হইল। বলা বাহুল্য, যাত্রার পূর্ব্বে তিনি একবার বরযাত্রীদিগকে বেশ করিয়া জলযোগ করাইয়া দিলেন। বরের জন্য একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করা হইয়াছিল। স্থির হইল, বর, গুরুদেব, পুরোহিত মহাশয় এবং এক জন বিশিষ্ট বরযাত্রী ট্যাক্সিতে যাইবেন। বাকী সব বরযাত্রী মোটরবাসে যাইবেন; এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহাও স্থির হইল যে, ললিত বাবুকেই ট্যাক্সিতে তুলিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু তিনি কিছুতেই ট্যাক্সিতে উঠিলেন না; বলিলেন, "তাও কি হয়? এতগুলি বরযাত্রী বাসে যাইবেন, আর আমি ট্যাক্সিতে যাইব?" এই বলিয়া তিনি আমার মধ্যম ভ্রাতাকে বলিলেন, "বাপু, তুমিই বরং ট্যাক্সিতে যাও; কেন না, তুমি কন্যাকর্ত্তার বাটী চেন, শীঘ্র বর লইয়া হাজির হইতে পারিবে।" এই বলিয়া তিনি আমাদের সহিত মোটরবাসেই রওনা হইলেন। তাঁহার এই কার্য্য দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

ললিত বাবু এক জন নিষ্ঠাবান্ খাঁটি হিন্দু ছিলেন; অশনে বসনে সকল সময়েই তিনি আপ্তবাক্য মানিয়া চলিতেন, যতদূর সম্ভব সাত্ত্বিকভাবে জীবন যাপন করিতেন। এমন কি, বৃহস্পতি ও শনিবারে বারবেলা বাছিয়া তবে বেড়াইতে বাহির হইতেন। অথচ তাঁহার মধ্যে গোঁড়ামীর লেশমাত্র ছিল না, বরং যথেষ্ট পরিমাণে উদারতা ছিল। তিনি প্রাচীনপন্থী হইলেও নবীনকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন। কিন্তু এক দিকে যেমন তিনি প্রাচীনের গোঁড়ামী দেখিতে পারিতেন না, অপর দিকে তেমনই আবার নবীনের ন্যাকামীও বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। সাহিত্যে, তথা সমাজে দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিলে তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইতেন। এই সকল বিষয় আলোচনা করিতে করিতে তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিত, চোখ দুইটা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে থাকিত। স্নেহলতার আত্মহত্যার পর যখন আমরা সভাসমিতি করিয়া বরপণপ্রথার এবং বরপণ আদায়কারী বরকর্ত্তাদিগের মস্তক চর্ব্বণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তখন ললিত বাবু বলিয়াছিলেন, "আমি জুলুম করিয়া বরপণ আদায় করার মোটেই পক্ষপাতী নহি; কিন্তু তাহা নিবারণ করিবার উপায় এ নয়। তরলমতি বালিকা স্নেহলতার আত্মহত্যার ফল বড় বিষময় হইবে, ইহাতে সমাজের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী হইবে।" আজ দেখিতেছি, জ্ঞানিপ্রবর ললিত বাবুর ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গিয়াছে। এখন অনেক সময় দেখিতে পাই, নারীগণ সামান্য উত্তেজনাতেই—(যথা, পারিবারিক কলহ, স্বামীর উপর অভিমান ইত্যাদি) কেরোসিনে আত্মহত্যা করিতেছে। নারী-সমাজে দিন দিন সহিষ্ণুতার অভাব অধিকতর প্রকট হইয়া উঠিতেছে। পুরুষদিগকে সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়, পাছে নারী আত্মহত্যা করিয়া ফেলে।

ললিত বাবুর স্বদেশপ্রীতি একটা দেখিবার জিনিষ ছিল। তিনি কখনও স্বদেশ-প্রেমিক সাজিয়া সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করেন নাই বা শোভাযাত্রায় যোগ দেন নাই, কিন্তু তিনি অন্তরে অন্তরে প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন। তাঁহার চাল-চলনে ইহা বেশ বুঝা যাইত। ধুতি-চাদর ও চটি-জুতা লইয়া কলেজে যাওয়ার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার অঙ্গ চা, বিস্কুট প্রভৃতির প্রচলন তাঁহার বাসায় দেখি নাই, ফল-মূল ও সন্দেশেই তাঁহার সমধিক প্রীতি ছিল। (স্যর আশুতোষের সন্দেশপ্রীতি স্মর্ত্তব্য।) তাঁহার পাঠাগারে, ভোজন-মন্দিরে ও শয়নকক্ষে মাটীর প্রদীপ ব্যতীত অন্য আলো কখনও দেখি নাই। * আজকাল অনেকে দুই পাতা ইংরাজী পড়িয়াই আত্মীয়-স্বজনকে (এমন কি, স্ত্রীকে পর্য্যন্ত) ইংরাজীতে পত্র লিখেন। কিন্তু ললিত বাবুকে কখনও এরূপ পত্র ইংরাজীতে লিখিতে দেখি নাই। শুধু তাহাই নহে, প্রত্যেক পত্রের শীর্ষদেশে 'শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়' এবং স্বাক্ষরস্থলে 'শ্রীললিতকুমার শর্ম্মা' লেখা তাঁহার অভ্যাস ছিল। গত ১৩ বৎসরের মধ্যে তিনি আমাকে যতগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সবগুলিই বাঙ্গালায় লেখা।

ললিত বাবুর কাযকর্ম্মে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা একটি দেখিবার ও শিখিবার বিষয় ছিল। তিনি সকল কাযই ধীরে ধীরে যথাবিহিত শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিতেন। ললিত বাবুর হাতের লেখা খুব চমৎকার ছিল; কি ইংরাজী, কি বাঙ্গালা, লেখাগুলি যেন মুক্তাগাঁথা।

বাঙ্গালীরা কায-কর্ম্মে নিয়মানুবর্ত্তী নহে, এ জন্য তিনি দুঃ

'ভর্ত্তার উত্তর' ললিত বাবুর 'পাগলা ঝোরা'য় স্থান পাইয়াছে। যাঁহারা উহা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন, কিরূপ তেজের সহিত উহা লিখিত হইয়াছে।

* সম্প্রতি (বোধ হয় পুত্রের খেয়ালের বশে?) বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা হইয়াছে।

দুঃখ করিতেন। অসময়ে কেহ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলে তিনি একটু বিরক্ত হইতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে দুঃখ করিয়া বলিতেন, "আমরা সাহেবদের দোষগুলা খুব সহজেই অনুকরণ করিয়া বসি, কিন্তু তাহাদের একটা গুণও অনুকরণ করিতে পারি না। সাহেবরা সকল কাযই ঠিক সময়ে করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু আমরা এ বিষয়ে আদৌ যত্নবান নহি।"

ললিত বাবুর আর একটি গুণ ছিল, তিনি বিপদে ধৈর্য্য হারাইতেন না। 'বিপদি ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা, সদসি বাক্‌পটুতা…যশসি চাভিরুচির্ব্যসনং শ্রুতৌ', এই কয়টি গুণেরই সমাবেশ তাঁহাতে ছিল। একাধিক উপযুক্ত পুত্র এবং স্নেহের পুত্তলী কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যুতে তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইয়া যাইলেও তিনি বাহিরে প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় গম্ভীর, অচল, অটল ছিলেন। ভগবানে আত্মনির্ভরশীল না হইলে এরূপ ধৈর্য্যের অধিকারী হওয়া যায় না।

ললিত বাবুর মত একাধারে স্নেহময় পিতা, প্রেমময় স্বামী, দায়িত্বজ্ঞানশীল ও ছাত্রবৎসল শিক্ষক, সুরসিক ও সদালাপী ভদ্রলোক, কর্ত্তব্যপরায়ণ গৃহস্থ, সদ্‌যুক্তিদাতা বন্ধু, দিগগজ পণ্ডিত, সুনিপুণ লেখক ও স্বাধীনচেতা অথচ ধর্ম্মভীরু পুরুষ আজকাল বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। মহাকবি গেটের স্বরে স্বর মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা করে, যদি কেহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে একবার ললিতকুমারের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, তাঁহার আশা পূর্ণ হইবে। এই বাঙ্গালা দেশে ললিত বাবুর যে অগণিত ছাত্র আছেন, তাঁহাদের মধ্যে শতকরা দশ জনও যদি তাঁহার মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার ন্যায় পবিত্র ও বরেণ্যভাবে জীবনযাপন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই তাঁহার স্মৃতির প্রকৃত সম্মান করা হইবে, তাঁহার এই শোকসন্তপ্ত দীন ছাত্রের ইহাই বিশ্বাস। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, (এম্, এ)।
(হেডমাষ্টার গোপালপুর মুক্তকেশী বিদ্যালয়, বর্দ্ধমান)

স্মৃতির পূজা।—

জ্ঞানোন্মেষের পর তাঁহার তদানীন্তন ২৮।১৪।১ নং অখিল মিস্ত্রীর লেনের বাসায় মাতুল মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তখন আমার বয়স ৫।৬ বৎসর হইবে। মাতামহী, মাতাঠাকুরাণী ও অন্যান্য আত্মীয়াদের নিকট শ্রুত মাতুল মহাশয়ের অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও প্রতিভার কাহিনী পূর্ব্ব হইতেই শিশুহৃদয়ে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও সম্ভ্রমের সৃষ্টি করিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার বাসগৃহে সযত্নরক্ষিত বহুসংখ্যক পুস্তক দেখিয়া সেই সম্ভ্রম বিস্ময়ে পরিণত হইয়া উঠিল; এতগুলি গ্রন্থ এক জন কিরূপে আয়ত্ত করিতে পারে, বালকের কাছে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হইত। যে কয় দিন কলিকাতায় ছিলাম, আমার শিশুচিত্তের সন্তোষবিধানের জন্য মাতুল মহাশয় তাঁহার পুস্তকাগার হইতে সচিত্র শিশুপাঠ্য পুস্তক বাহির করিয়া পড়িতে দিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শিশির আমার সমবয়স্ক ছিল; ছবির বই হইতে উভয়ে ছবি দেখিতাম ও তাহার নীচে ইংরাজী ভাষায় অনূদিত বর্ণনার পাঠোদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতাম। এখনও মনে পড়ে, এই সূত্রে ইংরাজী shadow শব্দের অর্থ জানিবার জন্য দুই ভাই মিলিত হইয়া মাতুল মহাশয়ের শরণাপন্ন হই। আমার প্রতি মাতুল মহাশয়ের ও মামীমাতা ঠাকুরাণীর সস্নেহ ব্যবহারে স্বতঃই তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হই এবং কলিকাতায় স্বল্পদিনের বাস সমাপ্ত হইবার পর তাঁহাদের বিচ্ছেদ বহুদিনের জন্য বালকের মনকে ক্লিষ্ট করিয়াছিল, বেশ স্মরণ হয়।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে মাতুল মহাশয়ের অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের কথা সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া পূর্ব্বেকার ভক্তি ও শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়; কলিকাতাপ্রত্যাগত বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রদিগের নিকট তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর, তথা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা শ্রবণ করিয়া গর্ব্বে ও আনন্দে আমার হৃদয় স্ফীত হইত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারের যে যে অংশে কৃতী ও প্রতিষ্ঠাচর্চ্চিত ছাত্রদের তালিকার মধ্যে তাঁহার নাম মুদ্রিত থাকিত, সেই সেই অংশ বন্ধুবান্ধবদিগকে দেখাইতাম ও আত্মশ্লাঘা অনুভব করিতাম।

তখনও তাঁহার রস-রচনার খ্যাতি বিস্তৃতিলাভ না করিলেও পরিচিত মহলে সুরসিক বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। এ সম্বন্ধে আমার পিতামহীর নিকট যে গল্পটি শুনিয়াছি, তাহা এ স্থানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মাতুল মহাশয়ের বাটী কাঁচকুলি আমাদের গ্রাম ধর্ম্মদার সন্নিকট। ছাত্রাবস্থা হইতেই ও অঞ্চলের বহুলোক তাঁহাকে জানিতেন ও দেশের মুখোজ্জ্বলকারী বলিয়া স্নেহ করিতেন। একবার বৈশাখ মাসে আম পাকিবার সময় তিনি আমাদের গ্রামে আসিতেছিলেন; ঠানদিদি-সম্পর্কীয়া পরিচিতা কোন আত্মীয়ার সহিত পথে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ঠানদিদি তাঁহার অসিত বর্ণের উপর ইঙ্গিত করিয়া পরিহাসচ্ছলে তাঁহাকে বলেন, "ললিত, তুমি আসছিলে—আমি দূর থেকে চিনতে পারি নি; মনে করছিলাম, টুকটুকে পাকা আমের মত লোকটি কে"; তদুত্তরে মাতুল মহাশয় উত্তর দেন, "কেন, এ সময়ে আম ছাড়া জামও ত পেকে থাকে।" শৈশবাবস্থায় আমার ভূগোলবিদ্যার পরিচয় গ্রহণ অছিলায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বল দেখি, কোন্ দেশে লুচি পাওয়া যায় না?" উত্তর (বেলুচিস্থান) তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শিশিরের নিকট পাইয়াছিলাম।

২০ বৎসর পূর্ব্বে পাঠোদ্দেশে যখন কলিকাতায় যাই, তখন তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতরভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। রস-সাহিত্যে তাঁহার আসন তখন সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু বাটীতে তাঁহার গাম্ভীর্য্য বরাবর অক্ষুণ্ণ থাকিত, ফলে আমরা সকল ভাইবোনেই তাঁহাকে কতকটা ভয়ের দৃষ্টিতে দেখিতাম ও প্রায়ই দূরে দূরে থাকিতাম। সুতরাং সে সময়ে আমাদের সকল আবদার মাতুলানীকেই সহ্য করিতে হইত।

সাহিত্যের রসবেত্তা ও রসিক হইলেও চটুলতা বা লঘুতা-দোষ কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। অধ্যাপনাকালে সাহিত্যালোচনাপ্রসঙ্গে প্রচুর হাস্যরসের অবতারণা করিলেও তাঁহার গাম্ভীর্য্য বরাবর অটুট থাকিত এবং এই জন্যই ছাত্রদের সশ্রদ্ধ সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা তিনি কখনও হারান নাই!

আমার কলিকাতা যাওয়ার ৬।৭ বৎসর পরেই তাঁহার কৃতী ও কৃতবিদ্য, সদ্যোবিবাহিত জ্যেষ্ঠ পুত্র শিশিরের মৃত্যু হয়। ইতিপূর্ব্বে অনেকগুলি অল্পবয়স্ক সন্তান নষ্ট হইলেও পরিণত বয়সে এই গুরুশোক তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল; কিন্তু স্বভাব-সুলভ গাম্ভীর্য্যের আবরণে এই শোক ঢাকিয়া রাখিয়া সংসারের সকল কার্য্যে পূর্ব্বমত নিজেকে লিপ্ত রাখিয়াছিলেন। বাহিরের লোকচক্ষুতে অন্তরের বিপর্য্যয় ধরা না পড়িলেও এই দুর্ব্বিষহ দুর্ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া যে জ্বালা তাঁহার শরীর ও মনের প্রতি কণায় আপনাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছিল ও যাহা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠা কন্যার ও সর্ব্বশেষে দয়াদাক্ষিণ্যের প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার স্ত্রীর অকালমৃত্যুর মধ্যে নিজের পুষ্টি সংগ্রহ করিয়া উত্তরোত্তর অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, বোধ হয়, এত দিনে তাঁহার মৃত্যুতে তাহা নির্ব্বাপিত হইয়াছে। শোকের উপর্য্যু-পরি আঘাত তাঁহার গাম্ভীর্য্যের বাঁধ কিয়ৎপরিমাণে ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল এবং বাহ্য আচরণেও প্রভূত পরিবর্ত্তন আনিয়াছিল, আত্মীয়দের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়াছেন তাঁহারাই তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। বোধ করি, শোকের কথা ভুলিবার জন্যই শেষ বয়সে, এমন কি, অসুস্থ অবস্থাতেও, তাঁহার দেশভ্রমণ ও তীর্থপর্য্যটনের স্পৃহা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অবিরত রোগ-শোকের আঘাত সহ্য করিয়াও যে, তিনি প্রকৃতিস্থ থাকিয়া সকল বিষয়ে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার অসাধারণ চিত্তসংযম ও মানসিক ক্ষমতার পরিচায়ক; দারুণ চিত্তবিপর্য্যয়ে শেষ বয়সে তাঁহার রসসৃষ্টির উৎস-ধারা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল, ইহা উল্লেখ করিয়া এ জন্য আক্ষেপ করিতে তাঁহাকে একাধিকবার শুনিয়াছি।

তাঁহার নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতার পরিচয় বহুলোক বহু-স্থানে পাইয়াছেন। স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের মনোরঞ্জন ও চাটুবাদকে তিনি আন্তরিক ঘৃণা করিতেন ও বোধ হয়, এই অপরাধের জন্যই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের যথোচিত সমাদর হয় নাই। স্পষ্ট-বাদিতার জন্য আর্থিক ক্ষতি তাঁহাকে বহুবার স্বীকার করিতে হইয়াছে ও এই কারণে শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ণধারদের কাহারও কাহারও বিরাগভাজন হইতে হইয়াছে, ইহা তাঁহার পরিচিতদের মধ্যে অনেকেই জানেন। অন্তরের যে তেজ তাঁহাকে কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট হীন হইতে দেয় নাই, তাহাই অপরপক্ষে, ছাত্রসমাজে লোকপ্রিয় হইবার জন্য কোন কোন অধ্যাপক যে সকল তুচ্ছ বৃত্তি অবলম্বন করেন, তাহার মলিনতা হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। অর্থের প্রলোভন কখনও তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। শেষ পর্য্যন্ত বেসরকারী কলেজের অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন ও অর্থো-পার্জ্জনের বহুবিধ উপায় আত্মনির্ভরতার পরিপন্থী বোধে প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রফুল্লচিত্তে দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন করিয়া প্রকৃত অধ্যাপকের উচ্চ আদর্শসাধনে যত্নবান্ ছিলেন।

অসাধারণ কর্ত্তব্যজ্ঞান তাঁহার সকল আচরণের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিত। কঠিন পীড়া হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইবার পূর্ব্বেও তিনি কলেজের কাযে পুনঃ প্রবৃত্ত হইবার জন্য অস্থির হইতেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিজনিত ক্ষতিপূরণ মানসে কায আরম্ভ করিয়াই পুনরায় গুরু পরিশ্রমে নিজেকে নিযুক্ত করিতেন। পাছে ছাত্রদের পড়াশুনার ক্ষতি হয়, এই জন্য কলেজ হইতে ছুটী লইতে তিনি চিরকালই বিশেষ অনিচ্ছুক ছিলেন।

অদম্য জ্ঞানপিপাসা ও অধ্যয়নপ্রিয়তা তাঁহার চরিত্রগত ছিল। সাহিত্যালোচনার সুযোগের অভাব তাঁহার মনকে ক্লেশ দিত এবং আমার মনে হয় যে, এই জন্যই কলিকাতা ছাড়িয়া (কাশী ব্যতীত) অন্য কোথায়ও বেশী দিনের জন্য স্থিরচিত্তে থাকিতে পারিতেন না। ছুটীতে অন্যত্র যাইবার সময় পুস্তকাদি লেখাপড়ার আবশ্যক দ্রব্যাদির বোঝা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিত ও ভ্রমণের অবকাশে লিখিত তাঁহার বহু প্রবন্ধ বহু বাঙ্গালা পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। দুরূহ কেদারবদরী-পরিক্রমণ হইতে ফিরিবার পথে আমাদের লক্ষ্ণৌর বাড়ীতে বিশ্রাম করিবার কালে দারুণ পথশ্রমজনিত অবসন্ন অবস্থা সত্ত্বেও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সাহিত্যবিষয়ক পুস্তকগুলি সাগ্রহে পুনঃপাঠ করিয়াছিলেন ও Sir A. Conan Doyle প্রণীত Through the Magic Door নামক গ্রন্থে তাঁহার সুন্দর হস্তাক্ষরে প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে সারগর্ভ তুলনামূলক সমালোচনা ও মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। স্মৃতিশক্তির তীক্ষ্ণতা ও জ্ঞানের গভীরতার জন্য উপযুক্ত শব্দনির্ব্বাচনে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যথোপযুক্ত শব্দব্যবহারে ও শব্দযোজনায় তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ ছিল এবং বোধ হয়, এই জন্যই তাঁহার রচনার সহজ অবাধ গতি রসগ্রাহীর চিত্তে অপরূপ আনন্দের সৃষ্টি করে। অধ্যাপনকালে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও অন্যান্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের গ্রন্থ হইতে সম-অর্থবোধক রচনা উদ্ধৃত করিয়া বক্তৃতাবিষয়ক আলোচনাকে সরস ও সহজবোধ্য করিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। ইহা তাঁহার বহু ছাত্রের মুখে শুনিয়াছি।

পুস্তক সংগ্রহের আগ্রহ তাঁহার চিরদিন সমভাবে ছিল, এমন কি, বৃদ্ধাবস্থায়ও তাঁহাকে এ জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিতে দেখিয়াছি। পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সন্ধানে পুরাতন পুস্তকের দোকানগুলিতে তাঁহাকে প্রায়ই দেখা যাইত। বে-সরকারী কলেজের অপেক্ষাকৃত স্বল্প বেতনে তাঁহার মনোমত পুস্তকাগারের সাধ হয় ত মিটে নাই, কিন্তু তাঁহার ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যের গ্রন্থ-সংগ্রহকে কোনমতেই অকিঞ্চিৎকর বলা যায় না।

ভোজন-ব্যাপারে তাঁহার বাল্যাবধি যথেষ্ট অনুরাগ ছিল এবং রন্ধনকার্য্যে মাতুলানী বিশেষ দক্ষ থাকায়, এবং স্বহস্তে রন্ধন করিয়া স্বামী পুত্র আত্মীয়বর্গকে খাওয়ান বিষয়ে তাঁহার অদম্য উৎসাহ থাকায়, এই ভোজনবিলাস ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বাটীতে বিশেষ কোন আহার্য্যের ব্যবস্থা হইলে সকলকে না খাওয়াইলে মাতুল মহাশয়ের পরিতৃপ্তি হইত না। ভোজনানুরাগ বিষয়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শিশির পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিল এবং অনেক সময়েই মাতুল মহাশয়ের ভোজন-বিষয়ক ফরমাস তাহার মুখ হইতে বাহির হইতে শুনিয়াছি।

ভোজনবিলাসী হইলেও বেশভূষা ও অন্যান্য সকল বিষয়ে তিনি অত্যন্ত আড়ম্বরহীন ছিলেন। ধূমপান করিতে তাঁহাকে কখনও দেখি নাই এবং পরিচ্ছদের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে [illegible]

সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। কিন্তু তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য-প্রণালীতে সুশৃঙ্খলা সর্ব্বদা বিরাজিত থাকিত; ফলে সামাজিক, ব্যবহারিক ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার ক্রটি কদাচিৎ ঘটিত। পত্র-লেখকের তাঁহার নিকট হইতে উত্তর পাইতে কখনও অযথা বিলম্ব হইত না।

যে ঘটনা তাঁহার মৃত্যুকে নিকটতর করিয়া দিয়াছিল, তাহার উল্লেখ না করিলে এই বৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। তাঁহার জীবদ্দশায় শত ঝড়-ঝঞ্ঝা, মানসিক অশান্তি ও শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা হইতে মাতুল মহাশয়কে যিনি রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার তিরোধানই মাতুল মহাশয়ের আয়ুঃক্ষয়ের প্রধান কারণ। ইংরাজীতে Guardian Angel বলিয়া একটা কথা আছে। মাতুল মহাশয়ের সংসারে মাতুলানীই ছিলেন Guardian Angel; যিনি তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছিলেন, তিনিই ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবেন। চিত্তের উদারতায়, গৃহকর্ম্মের নিপুণতায়, গৃহস্থালীর সুশৃঙ্খলায়, আত্মীয়স্বজনের প্রতি সমবেদনায়, পরিবারস্থ সকলের সকল প্রকার সুবিধা অসুবিধা বিষয়ে সতর্কতায়—দয়া, দাক্ষিণ্য, সামাজিক কর্ত্তব্য-সাধন—সকল বিষয়ে, মামীমাতা ঠাকুরাণী আদর্শ গৃহিণী ছিলেন। পুত্রশোকে শরীর মন যখন অবসন্ন, তখনও তাঁহার মুখে হাসিটি লাগিয়া থাকিত; পাছে তাঁহার বিষণ্ণ মুখ দেখিলে পরিবারস্থ সকলের মানসিক অশান্তি বর্দ্ধিত হয়, এই জন্য তিনি হৃদয়ের অবর্ণনীয় যাতনা প্রফুল্লতার আবরণে ঢাকিয়া রাখিতেন। ইদানীং নিজস্বাস্থ্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল না; কেবল, এই বিষয়ে আমরা অনুযোগ করিলে তাঁহার মুখখানি বিষণ্ণ হইয়া উঠিত ও অন্তরের সঞ্চিত শোকরাশি দীর্ঘশ্বাসের আকারে বাহির হইয়া আসিত। তিনি শাপভ্রষ্টা দেবী ছিলেন। আত্মীয়-পরিজন সকলেই আপন আপন অন্তরের মধ্যে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হৃদয়ের অকপট ভক্তি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া দিয়াছিল।

উপর্য্যুপরি সন্তানবিয়োগের দুঃসহ শোক-বহনের ক্ষমতার জন্য মাতুল মহাশয় বহুল পরিমাণে মামীমাতা ঠাকুরাণীর নিকট ঋণী বলিয়া আমার মনে হয়। মামীমার মৃত্যুর পর যে বিরাট শূন্যতা তাঁহার জীবন অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, তাহার গ্লানি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছিল। পিতাঠাকুর মহাশয়কে ও আমাকে লিখিত মাতুল মহাশয়ের একাধিক পত্রে ইহার নিদর্শন আছে। তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, তাঁহার জীবনকাল শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং আমরাও ইহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া রহিতাম। কিন্তু তাঁহার এ জীবনের অবসান যে এত নিকট এবং লোকান্তরের আহ্বান যে এত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই।

যাঁহাদের নিকট পিতামাতার আদর ও স্নেহ আজীবন পাইয়াছি, তাঁহাদের অন্তিম সময়ে শ্রীচরণদর্শন দুর্ভাগ্যবশতঃ ঘটিল না, এ দুঃখ জীবনে ঘুচিবে না। লোকচক্ষুর অন্তরালে মাতুল মহাশয় যে মহান্ ব্রতে ব্রতী ছিলেন, তাহার উদ্‌যাপন হইয়াছে; দেশের লোক অবনতমস্তকে, সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁহার সাধনাপূত স্মৃতির উদ্দেশে তাহাদের ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছে। তাহার আত্মীয়-স্বজনের দুঃখের অংশ লইতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছে। আমাদের এই দুর্দ্দিনে ইহাই একমাত্র সান্ত্বনা।

শ্রীকুমারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
(অধ্যাপক, সায়ান্স কলেজ, পাটনা)

—

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।—

ললিত বাবুর ছাত্রজীবন অধুনাতন প্রত্যেক ছাত্রেরই কাম্য ও আদর্শস্থানীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষায় তিনি বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অধ্যাপনাকার্য্যে তাঁহার ন্যায় সুখ্যাতি অতি অল্প অধ্যাপকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। ইংরাজীর অধ্যাপক হইয়া মাতৃভাষায় এরূপ অনুরাগী লোক অত্যন্ত বিরল। তাঁহার রচনায় বিদেশীয় সাহিত্যের প্রতি উপেক্ষার ভাবই অনেক স্থলে পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, প্রগাঢ় জ্ঞান, অসাধারণ ভক্তি, শিশুর ন্যায় সরলতা ও সর্ব্বোপরি তাঁহার অবিশ্রান্ত হাস্যরসে ওতপ্রোত রচনাগুলি তাঁহার স্মৃতিকে চিরকাল অটুট রাখিবে।

হাস্যরসে তাঁহার ন্যায় লেখক এ যুগে আছে কি না সন্দেহ। প্রসিদ্ধ ইংরাজী সাহিত্যিক হাস্যরসের প্রস্রবণ চার্লস ল্যাম্বকে তিনি গুরু বলিয়া মানিতেন। কিন্তু আমরা জানি, হাস্যের অবতারণায় তিনি ল্যাম্ব অপেক্ষাও অধিক দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি একাধারে ইংরাজী, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার রচনাগুলিতে তিন সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত অনর্গল appropriate phrase ব্যবহারে হাস্যরসের যেরূপ পরিপুষ্টি হয়, তাহা সাধারণ humour বা কাতুকুতু দিয়া হাসান নহে। উহা sustained humour, যে হাস্য মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে। তাঁহার রচনার হাস্যরস বালকের বোধ্য নহে। যাঁহারা ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা—এই তিন ভাষায় অন্ততঃ কিছু ব্যুৎপন্ন, তাঁহারাই তাঁহার রচনার প্রকৃত রস গ্রহণ করিতে সমর্থ। তাঁহার হাস্যরস ভাঁড়ামি নহে, vulgar বা গ্রাম্য রসিকতা নহে। উহাতে পঙ্কিলতা বা আবর্জ্জনা নাই। পিতাপুত্রে একসঙ্গে বসিয়া উপভোগ করিতে পারে। ললিত বাবুর humour সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ বিস্তৃত হইয়া যাইবে। যাঁহারাই তাঁহার ফোয়ারা, পাগলা ঝোরা ও সাহারা প্রণিধান করিয়া পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই আমার সহিত একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, বঙ্গভাষায় গদ্যে হাস্যরস বিতরণ করিতে ললিতকুমারের সমকক্ষ এ যুগে কেহ নাই। তাঁহার হাস্যরস, তাঁহারই ভাষায় বলিতে গেলে "অদ্বিতীয়, অনবদ্য, কিমপি দ্রব্যম্।"

সমালোচক হিসাবে ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতির পরেই ললিত বাবুর নাম করা যাইতে পারে। বঙ্কিম বাবুর পুস্তকগুলির সমালোচনায় তিনি ৺গিরিজাপ্রসন্ন অপেক্ষা অধিক দক্ষতা ও বিশ্লেষণ-তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার ভক্তিরসাত্মক রচনাগুলিতে তিনি প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। যেরূপ রচনাতেই তিনি হাত দিয়াছেন, তাহাতেই তিনি অতি উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিরূপ প্রতিভা তাঁহার করায়ত্ত ছিল।

প্রায় দুই বৎসর হইল, ললিত বাবুর সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার পুস্তকাদি পাঠে তাঁহার সহিত পরিচয় করিবার স্পৃহা বলবতী হওয়ায় এক দিবস তাঁহার অখিলমিস্ত্রী লেনস্থ ভবনে উপস্থিত হইলাম। আলাপ-পরিচয়ের পর কথায় কথায় হাস্য-রসিকতায় তিনি কিরূপ পারদর্শী, তাহার পরিচয় পাইলাম। তাঁহার মৌলিক সরস হাস্যপরিহাসে এরূপ বিমুগ্ধ হইলাম যে, প্রায় প্রত্যহই তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতাম। আমাদের বি, এ পরীক্ষার তিনি বাঙ্গালার প্রশ্নকার ও পরীক্ষক ছিলেন। এক দিন বলিলেন যে, "আমাদের বঙ্গদেশের ছাত্রদের অপেক্ষা তোমাদের প্রদেশের ছাত্রেরা বাঙ্গালা ভাল লেখে। কুম্ভকার অপেক্ষা কর্ম্মকার ভাল মৃৎপাত্র তৈয়ারী করে দেখিতেছি। তোমাদের বাঙ্গালা পড়ান কে?" আমি উত্তর কবিলাম, "শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী। কিন্তু আপনি প্রকারান্তরে আমাদিগকে কর্ম্মকারের সহিত সমপর্য্যায়ে ফেলিলেন।" তিনি বলিলেন, "না না, তোমাদিগকে যে কর্ম্মকার বলে, সে চর্ম্মকার, তুমি মর্ম্ম বোঝ নি"। এইরূপে কত কথায় যে তিনি হাসির ফোয়াবা ছুটাইতেন, তাহা বলিয়া শেষ হয় না। শেষ জীবনে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি একে একে কালের কবলে পড়ায় তাঁহার জীবন শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিল। মৃত্যু তাঁহাকে শান্তিদান করিয়াছে। কাশীব প্রতি তাঁহার আন্তরিক টান ছিল। ছুটী পাইলেই তিনি এই আনন্দকাননে আসিয়া শান্তিলাভ করিতেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গসাহিত্যের সেবা কবিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের সহিত তাঁহার নাম চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে। আমরা তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া সান্ত্বনালাভ করিলাম।

শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য (বি, এ)।

বন্ধু-বিয়োগে।—

ঘটনাচক্রে ললিত বাবুর সহিত আমার আলাপ। ছয় বৎসর পূর্ব্বে গরমের ছুটীতে কাশী আসিয়া যখন তিনি পীড়িত হইয়াছিলেন, তখন রোগ-শয্যায় তাঁহাব সহিত আমার প্রথম পরিচয়। বহু রোগীরই ত আমি চিকিৎসা করিয়াছি, কিন্তু এরূপ ঘনিষ্ঠতা খুব কম লোকের সহিতই হইয়াছে। তিনি যে আমাকে বন্ধু বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই মহত্ত্বের পরিচায়ক। রোগশয্যায় তাঁহার সহিত আলাপের সূত্রপাত; পরে বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়। তিনি ভালবাসিতে জানিতেন—পরকে আপনার করিয়া লইবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, তাই সৌভাগ্যক্রমে আমার ন্যায় লোকও তাঁহার মত দেবতুল্য ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ধন্য হইয়াছে। আমাদের মিলন উভয়ের জীবন-সন্ধ্যায়—আলাপও অধিক দিনের নহে, কিন্তু এই অল্প কয় বৎসরে তাঁহার যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহা আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।

'অবিমুক্ত ক্ষেত্র' 'আনন্দকানন' কাশী তাঁহার চির-প্রিয়, চির-শ্রেয়ঃ, চির-আকাঙ্ক্ষিত ও চির-আরাধিত ছিল। পশ্চিম প্রদেশের দারুণ গ্রীষ্মে যখন স্থানীয় লোকরা অনেকে কাশী ত্যাগ করিয়া পলাইত, তখন ললিত বাবু আসিতেন স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যাহারে কাশীতে বেড়াইতে। যাঁহারা তাঁহার অন্তরের পরিচয় জানিতেন না, তাঁহাদের নিকট ব্যাপারটা বড় বিসদৃশ বোধ হইত। জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "এ সময়ে বেশ নিরিবিলি, ভীড় কম, তাই আসি। হৃদয়ে যে অনির্ব্বাণ চিতাগ্নি জ্বলিতেছে, তাহা অপেক্ষা গ্রীষ্মের উত্তাপ অধিকতর অসহ্য হইবে না।" শুনিয়াছি, মৃত্যুর কয় দিন পূর্ব্বেও তিনি কাশী আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। হায়, তখন যদি জানিতাম, এ জীবনে তাঁহার সহিত আর দেখা হইবে না, তাহা হইলে কলিকাতায় যাইয়া জোর করিয়া তাঁহাকে এখানে লইয়া আসিতাম। যতবার কাশীতে আসিয়াছেন, আমার সহিত দেখা করিতে ভুলেন নাই। দুই একবার আমি এখানে না থাকায় তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয় নাই, কিন্তু খোঁজ তিনি বরাবর লইয়াছেন। আমার গল্প শুনিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন, তাঁহার পুস্তক ও প্রবন্ধাদিতে তিনি অকপটে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

'ভোজন-সাধক' ললিতকুমার উৎকৃষ্ট ভোজ্য ভোজন করিতে ভালবাসিতেন ও অপরকে খাওয়াইতে ভালবাসিতেন। তাঁহার রচিত 'সাহারা' উপহার পাঠাইয়া তিনি লিখিলেন, 'ভোজন-সাধন কেমন লাগিল?' আমি বোধ হয় উত্তর দিয়াছিলাম, "সাধনার মধ্যে উহা কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। The way to heart is through the stomach," মন্তব্যটি তাঁহার মনের মত হইয়াছিল। ভোজনবিলাসী ছিলেন বলিয়া একবার তাঁহাকে আহারের জন্য অনুরোধ করি। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার সে আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই। কাশীতে তিনি প্রতিগ্রহ করেন না—জানাইয়াছিলেন।

একটা বিষয় নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি—কপটতা তাঁহার মধ্যে মোটেই ছিল না। তিনি ছিলেন সরল, সত্যবাদী ও স্পষ্টবক্তা। মন ও মুখ এক করিতে তিনি পারিয়াছিলেন। অতবড় পণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু বিদ্যা বা চিত্তের অহঙ্কার তাঁহার একবারেই ছিল না। এক দিন আমার সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে রোগীর সেবার সুচারু ব্যবস্থা দেখিয়া অজস্র প্রশংসা করেন। তাঁহার তখনকার আনন্দোজ্জ্বল মুখ আমার আজও মনে হইতেছে।

বন্ধুবর ললিতকুমার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। আমার অক্ষমতার কথা আমার নিজের কাছে অবিদিত নাই, তথাপি স্নেহভাজনদিগের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। দেবপূজায় এই বিদুরের খুদ দিয়া আমি নিজেকে কৃতা[র্থ] মনে করিতেছি। শুনিয়াছি, মৃত্যুর কয়দিন পূর্ব্বেও তি[নি] আমাকে স্মরণ করিয়াছিলেন। তিনি যে আমাকে বিশে[ষ] শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা কেবল তাঁহার নিজগুণে সম্ভব হইয়াছিল তাঁহার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্যতা আমার নাই। তাঁহার অকাল-বিয়োগে বাঙ্গালা এক জন প্রবীণ সাহিত্যি[ক] হারাইল; বাঙ্গালী ছাত্রবর্গ এক জন সুপণ্ডিত অধ্যাপক হারা[ইল] ও আমরা এক জন প্রকৃত বন্ধু হারাইলাম।

চিরকাল ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়াও ললিত বা[বু] এক জন খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন। নিষ্ঠা ও ধর্ম্মানুরাগ তাঁহার [...] ছিল। জীবনে শোকতাপ অনেক পাইয়াছিলেন। তাপ[...] হৃদয়ের ভার লঘু করিবার আশায় তিনি সস্ত্রীক তীর্থপর্য্য[টন]

করিতে ভালবাসিতেন। দুর্গম তীর্থ কেদারবদরী দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা যখন তিনি জ্ঞাপন করেন, আমি তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিই। আমার অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিবরণ ও আবশ্যক দ্রব্যের একটি প্রকাণ্ড তালিকা পাঠাইয়া দিই। জানি না, তখন উৎসাহ দিয়া ভাল করিয়াছি কি মন্দ করিয়াছি। জীর্ণ শরীরে বদরীনারায়ণ দর্শনে না যাইলে হয় ত আমরা আরও কিছু দিন তাঁহার সঙ্গলাভ করিতে পারিতাম। আবার এক সময়ে ভাবি, তিনি যেরূপ ধর্ম্মপ্রাণ গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, তাহাতে কেদারবদরী দর্শন করিয়া তিনি অশেষ শান্তি পাইয়াছিলেন। সংসারের বন্ধন স্ত্রী ও পুত্রটি তাঁহার সঙ্গে থাকায় তিনি বোধ হয় অনন্যমনে একাগ্রচিত্তে দেবচরণে দীর্ণহৃদয়ের আকুল বেদনা নিবেদন করিতে পারিয়াছিলেন—পাষাণ-দেবতার হৃদয় বুঝি গলাইতে পারিয়াছিলেন। তাই ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান্ এত শীঘ্র তাঁহাকে যন্ত্রণা-মুক্ত করিলেন। ভক্তের বদরীনারায়ণের নির্ব্বাণ মূর্ত্তি দর্শন সার্থক হইয়াছে—অনতিবিলম্বে তিনি নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। তাপদগ্ধ প্রাণে শান্তির শীতল ছায়া লাভের আশায় ছুটী পাইলেই তিনি তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেন—এত দিনে শান্তিময় তাঁহাকে শান্তিধামে স্থান দিয়াছেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন লাহিড়ী, রায় বাহাদুর।
(অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জেন)

ললিত বাবু।—

ললিত বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাত হয়—যখন তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া রিপণ কলেজে কায করিতে আসেন। আমি তখন প্রিন্সিপ্যাল ছিলাম। দু'চার দিন তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হইবার পর তাঁহার সহিত বিবিধ বাক্যালাপ করিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে প্রকার brilliant career দেখাইয়াছেন, তদপেক্ষা অনেক বেশী তাঁহার বিদ্যাবত্তা আছে। অধ্যাপক নিযুক্ত হইবার অল্পদিন পরেই বেশ বুঝা গেল যে, তিনি ঐ কার্য্যে একটি নূতন ধরতা (peculiar style) দেখাইবেন এবং তাহা খুব প্রশংসার যোগ্য। আমাদের দেশে অনেকেই বিলক্ষণ কৃতবিদ্য হইয়াছেন এবং প্রোফেসারের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিতেছেন; কিন্তু আমার বিশ্বাস, ঐ কার্য্য য়ুরোপে যে ভাবে সম্পাদিত হয়, এখনও আমরা এ বিষয়ে তাদৃশ পটুতা লাভ করিতে পারি নাই। আমরা মনে করি যে, ছাত্রগুলিকে অধীয়মান গ্রন্থের বিশদরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইল এবং সেই সঙ্গে কিরূপে পরীক্ষায় পাশ করিবে, তৎসম্বন্ধে কতকগুলি সন্ধান বলিয়া দিলেই আমাদিগের কার্য্য শেষ হইল। কিন্তু য়ুরোপের প্রোফেসারদিগের কার্য্যপ্রণালী কিছু অন্য প্রকার। ছাত্ররা তাঁহাদিগের সংসর্গে আসিয়া যাহাতে বিশেষ জ্ঞানবান্ হয় এবং নানা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহাদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করা হয়। আনুষঙ্গিক এবং প্রাসঙ্গিক যত কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, নানাবিধ শ্লোক সিদ্ধান্ত—উদাহরণ—ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির নিকট উপস্থিত করিয়া উহাকে বিকশিত করা—ইহাই হইতেছে প্রোফেসারের লেক্‌চারের প্রকৃত কার্য্যকারিতা এবং বোধ হয়, তিন চারি শতাব্দী য়ুরোপে প্রোফেসারদিগের দ্বারা এ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

এ সম্বন্ধে এই সকল কথা বলিতে বলিতে বিশ্ববিখ্যাত চিন্তাশীল ব্যক্তি (thinker) ও দার্শনিক Emmanuel Kantএর কথা আমার মনে উপস্থিত হইতেছে। Kantএর সহিত তুলনা করিলে ললিত বাবুকে এক প্রকার বিদ্রূপ করা হয়। কিন্তু তাহা আমার উদ্দেশ্য নহে। কেন যে Kantএর কথা উপস্থিত করিতেছি, তাহা পরে প্রকাশ হইবে। তাঁহার সম্বন্ধে কোন এক বিবরণে আমি পাঠ করিয়াছি যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষরা স্কটলাণ্ডের লোক ছিলেন—পরে কোন সময় জন্মস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া জার্ম্মাণীতে বাস করেন। Kant কোনিসবার্গ (Konigsberg) নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ স্থানেই যাবজ্জীবন বাস করেন; এবং এ প্রকার সুস্থির প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, জীবিতকালের মধ্যে আর কুত্রাপি যান নাই। নগরের মধ্য হইতে দুই তিন ক্রোশ ব্যবধানের অধিক স্থান কখনও দেখেন নাই। দর্শনশাস্ত্র-সংক্রান্ত লেক্‌চার দিয়াই চির-জীবন ক্ষেপণ করিয়াছেন। উহাই তাঁহার উপজীবিকা ছিল। তিনি কোন বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। নিজ বাটীতে বসিয়াই লেক্‌চার দিতেন এবং তদ্দ্বারা সংগৃহীত ফি-এর উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। আপাততঃ আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে যে, দর্শনশাস্ত্রের লেক্‌চারের ফির দ্বারা কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব। দর্শনশাস্ত্র কয় জনই বা পড়িতে চাহে এবং উহার তীব্র দুরূহতা কেই বা নিত্য নিত্য সহ্য করিতে ইচ্ছা করে। Kant যে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম "Critique of pure reason." ইহার মোটামুটি তর্জ্জমা করিতে হইলে বলা যায়, 'অবিমিশ্র

বুদ্ধিবৃত্তির তত্ত্বনির্ণয়'—ইহা হইতে বোধ হয় কেহই বুঝিতে পারিবেন না, ঐ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় কি ? কিন্তু ইদানীন্তন য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে একটি সুগভীর তত্ত্ব উহা দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে, তাহা অনেকেই জানেন। সেই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে গেলে এই স্থলে একটি প্রবন্ধ লিখিতে হয় এবং আমার উপস্থিত বক্তব্য অতিবিস্তার-দোষে দূষিত হয়। এ স্থলে কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে চাহি যে, এই দন্তস্ফুট হইবার বহির্ভূত দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া Kant আপনার দৈনন্দিন লেক্‌চার এত চমৎকার করিয়া তুলিতেন যে, দলে দলে ছাত্র তাহা শুনিতে আকৃষ্ট হইত। সেই লেক্‌চারের মধ্যে কত উদাহরণ, কত ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক বৃত্তান্ত বর্ণনা, কত পরিহাস-রসিকতা প্রকটিত হইত, তাহা বর্ণনাতীত। ইহাই হইতেছে লেক্‌চার সম্বন্ধে Kantএর অত্যাশ্চর্য্য প্রতিপত্তি লাভ হইবার প্রধান রহস্য। ললিত বাবুর সম্বন্ধে এই সকল কথা উপস্থিত করার তাৎপর্য্য এই যে, আমার বোধ হয় যে, তিনি স্বভাবসিদ্ধ সুবিমল বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাবে সেই য়ুরোপীয় লেক্‌চারের (peculiar style) ধরতাটুকু কিছু কিছু উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং তদনুরূপ কার্য্য করিয়া বিশেষরূপে ছাত্রদিগের প্রীতিভাজন হইতে পারিয়াছিলেন। আমি নিজে কখনও তাঁহার লেক্‌চার বসিয়া শুনি নাই। তৎকালে রিপণ কলেজের অধ্যাপনা-কার্য্য যে সকল গৃহমধ্যে সম্পাদিত হইত, তাহার অনেকগুলি খোলার ঘর ছিল এবং বড় বড় ঘরের মধ্যে মধ্যে আবেষ্টন দিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী রচনা করা হইত। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর লেক্‌চার অপর শ্রেণীর অধ্যাপকরা পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে শুনিতে পাইতেন। এইরূপে অন্য দুই এক জন প্রোফেসারের মুখে শুনিয়া আমি ললিত বাবুর লেক্‌চারের ভাবভঙ্গী কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছিলাম। তিনি ত পড়াইতেন ইংরাজী সাহিত্যশাস্ত্র। কিন্তু আমি এক দিন শুনিলাম, তিনি লেক্‌চারের সময় একটি সুপ্রসিদ্ধ উদ্ভট সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া ছাত্রদিগের নিকট ব্যাখ্যা বিশদ করিয়া দিতেছেন। সেই শ্লোকটি অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের তুণ্ডাগ্রে আছে। তাহা এই—

"নাথে কৃতপদঘাতশ্চ লুকিত তাতঃ সপত্নীকাসেবী।
ইতি দোষাদিব রোষান্ মাধববোষা দ্বিজং ত্যজতি॥"

শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে লক্ষ্মীশ্রী হওয়া প্রায়ই বিরল—তাহার কারণ কি ? এই প্রশ্নের উত্তর উক্ত শ্লোকে সরস কাব্যের আকারে দেওয়া হইয়াছে। এই উদাহরণ দ্বারা আমি বলিতে ইচ্ছা করি যে, লেক্‌চার দিবার য়ুরোপীয় ধরতা (peculiar style) ললিত বাবু কিছু কিছু অনুকরণ করিয়া চলিতেন। ইহা তাঁহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই।

তাঁহার আর একটি প্রবণতা ছিল পরিহাস-রসিকতা। আপনার রচনায় তিনি তাহার অনেক পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। অতএব এ স্থলে তাহা বিশেষ বলিবার আবশ্যক নাই। তবে একটি ঘটনা আমার মনে আছে। বলিতে গেলে তৎকালীন অবস্থা কিছু কিছু বলিতে হয়। সে সময় কলেজের আর্থিক অবস্থা খুবই ক্ষুণ্ণ ছিল। অধ্যাপকদিগকে মাসকাবারের পর প্রায় কীস্তিবন্দিতেই বেতন লইতে হইত এবং সমস্ত বেতন পাইতে পরের একটি মাসই অতীত হইত। কোন এক সময়ে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছিল এবং কোন এক মাসে সৌভাগ্যক্রমে মাস কাবারের অল্পদিন পরেই কিছু কিছু বেশী পাওয়া গিয়াছিল। সেই কথা উপলক্ষ করিয়া আমি বলিতেছিলাম যে, অদ্য আমার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি গল্প মনে পড়িতেছে। ললিত বাবু উপস্থিত ছিলেন, আমার কথা শুনিয়াই তিনি অমনি বলিয়া ফেলিলেন—'কি, আজ আমাদের ডাল হইয়াছে, এই গল্প না কি ?' আমি বলিলাম, 'ঠিক তাই, তুমিও জান যে দেখিতেছি।' গল্পটি এই:—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মস্থান হুগলী জেলার প্রান্তভাগে বীরসিংহ নামক গ্রাম; হাওড়া হইতে বিশ ক্রোশ পশ্চিমে। পঠদ্দশায় তিনি কলিকাতা হইতে পদব্রজেই বাড়ী যাইতেন এবং পথ চলিবার ক্ষমতা এত ছিল যে, প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত হাঁটিয়া এক দিনেই বিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতেন। মধ্যাহ্নে পথিমধ্যে কোন এক গৃহস্থের সদরে দাওয়াতে বসিয়া দু'এক দণ্ড বিশ্রাম করিতেন। এক দিন সেইরূপ বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিলেন, বাড়ীর ভিতর হইতে তিন চারিটি বালক নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া আসিতেছে আর মুহুর্মুহু বলিতেছে, 'আজ আমাদের ডাল হয়েছে', অর্থাৎ প্রত্যহই তাহাদিগকে শাকচচ্চড়ি ভাত খাইতে হয়, মাসের মধ্যে দুই এক দিন ডাল খাইতে পায়। সে দিন আর তাহাদের আনন্দের সীমা

থাকে না। মাস-কাবারের মাহিনা পাওয়া সম্বন্ধে সকলেই হাস্য করিয়া উঠিলেন।

ললিত বাবুর লেক্‌চার সম্বন্ধে যেমন আমি দার্শনিক Kantএর কথা উপস্থিত করিয়াছি, সেইরূপ বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থের বিষয়ে তিনি যে সকল উৎকৃষ্ট আলোচনা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমার জার্ম্মাণ দেশীয় কবিবর গয়টার সেক্সপীয়ার-আলোচনার কথা মনে হইতেছে। (এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে আমি বলিতে ইচ্ছা করি যে কৃতবিদ্য বাঙ্গালীগণ যদিও তাহাকে গেটে এই নাম দিয়াছেন, তথাপি আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি যে, তাঁহার স্বদেশীয়রা তাঁহাকে গয়টা এই নামে বিখ্যাত করিয়া থাকেন।) তিনি সেক্সপীয়রের প্রায় সকল নাটকেরই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গভীর সমালোচনা লিখিয়া গিয়াছেন। ললিত বাবুও তেমনই বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকা-বলী সম্বন্ধে এত গবেষণা, এত বিদ্যাবত্তা, এত সূক্ষ্ম বিবেচনাশক্তি প্রকটিত করিয়াছেন যে, পড়িলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। বাঙ্গালা, ইংরাজী, সংস্কৃত—এই তিন সাহিত্যের এমন কোন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থই নাই—যাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল বলিয়া বোধ হয়। এতটা বহুবিস্তার শাস্ত্রজ্ঞান আর কোন বাঙ্গালীর রচনাতে দেখা যায় কি না সন্দেহ। আর ইহাও বুঝিতে পারিতেছি যে, তিনি বঙ্কিম বাবুর বড়ই ভক্ত ছিলেন এবং সাহিত্যরচনায় তাঁহাকে অতি উচ্চ স্থানই দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমি বলিতে ইচ্ছা করি যে, বাঙ্গালা ভাষার এখনও এত দূর উন্নতি হয় নাই যে, এ প্রকার উন্নত সমালোচনা এ ভাষাতে সহজে লেখা যাইতে পারে। পড়িতে পড়িতে অনেক সময় মনে হয় যে, রচনাকালে লেখক ইংরাজীতে মনে মনে চিন্তা করেন, পরে সেই ভাবগুলি কোনমতে বাঙ্গালাতে এক প্রকার তর্জ্জমা করিয়া প্রকাশ করেন, কিন্তু ইহা এক প্রকার বিধিনির্ব্বন্ধ ও অপরিহার্য্য বলিতে হইবে। মেকলে এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে ইংরাজী সাহিত্যের ভাষা আধা ফরাসী হইয়া গিয়াছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীর সময় অর্দ্ধ-শতাব্দী কাল অর্থাৎ মেকলের নিজের সময়ে ইংরাজী ভাষা অনেকটা আধা জার্ম্মাণ হইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিল। যাহা হউক, ইংরাজীর ন্যায় প্রবলপরাক্রান্ত ভাষা চিরকাল এ প্রকার ক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না; কিন্তু আমাদিগের দুর্ব্বল ও অপরিপুষ্ট বাঙ্গালা কত দিনে যে সেই ক্ষুণ্ণ ভাব পরিত্যাগ করিতে পারিবে, তাহা জানি না।

যাহা হউক, ললিত বাবু অপূর্ব্ব শক্তির যে পরিচয় দিয়াছেন, আমাদের দেশে তাহা বিরল। তাঁহার অকাল-বিয়োগে দেশের খুবই ক্ষতি হইল। কত দিনে সে স্থান পূর্ণ হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

(আচার্য্য) শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বিদ্যাম্বুধি।

ললিত-স্মৃতি।—

ললিত বাবু যে এত শীঘ্র পরলোকবাসী হইবেন, তাহা কখনই মনে করি নাই। মধ্যে তাঁহার সহিত বহু বৎসর দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। কয় বৎসর পূর্ব্বে জীবন-সায়াহ্নে যখন চক্ষু-চিকিৎসার্থ কলিকাতায় গিয়াছিলাম, তখন দৃষ্টি-হীনতা বশতঃ আমার গৃহের বাহির হইবার ক্ষমতা ছিল না। খবর পাইয়া ললিত বাবু খোঁজ করিয়া আমার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন। বহু দিন পরে তাঁহাকে পাইয়া রোগশয্যায় প্রাণে বড় শান্তি পাইয়াছিলাম। বহরমপুরে ফিরিয়া আসার পর ইদানীং কয় বৎসর আর তাঁহার সহিত আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু তবুও মনে করিতাম, কোন দিন না কোন দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে এবং তাঁহার সুমধুর ও সরস বাক্যালাপে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব। কিন্তু সে আশা আমার চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে ললিত বাবু আমার স্মৃতি-রাজ্যের অধিবাসী, তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া যতটুকু পারি, আনন্দ উপভোগ করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

বহরমপুর ললিত বাবুর প্রথম বয়সের কর্ম্মভূমি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া এক বৎসরের কিছু উপর বরিশাল ও ভাগলপুর কলেজে অধ্যাপনা করেন। তাহার পরই (বোধ হয় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে) বহরমপুর কলেজে ইংরাজী-সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স বোধ হয় কুড়ি একুশ বৎসর। এই বয়সেই ইংরাজী-সাহিত্যে তাঁহার গভীর জ্ঞান এবং সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। অতি অল্পবয়সে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেও প্রথম দিন হইতেই তিনি আপনার কার্য্যে

পারদর্শিতা দেখাইতে লাগিলেন এবং ছাত্রগণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বহরমপুরে ছাত্র-সমাজে ও সহরবাসীর নিকট বিদ্বান্, সুপণ্ডিত ও সুদক্ষ অধ্যাপক বলিয়া পরিচিত হইলেন।

ললিত বাবু যখন বহরমপুরে আইসেন, তখন কলেজটি পুণ্যস্মৃতি স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর তত্ত্বাবধানে ছিল ও বহরমপুর কলেজ নামে অভিহিত হইত। তাঁহার শুভাগমনের কয় বৎসর পূর্ব্বে কলেজটি গভর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে স্বর্গীয়া মহারাণীর হস্তে অর্পিত হয়। বোধ হয়, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট কয়েকটি কলেজের ভার নিজ হস্তে রাখিতে অনিচ্ছুক হন। সেই কলেজগুলির মধ্যে বহরমপুর কলেজ অন্যতম। বহরমপুর কলেজের এই দুর্দ্দিনে তাহার রক্ষার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া পুণ্যকীর্ত্তি স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী বহরমপুরবাসীদিগকে কৃতজ্ঞতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী ও দানশৌণ্ড স্বর্গীয় মহারাজ সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় কলেজ-রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া এ দেশে বিদ্যা-শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন ও বহরমপুরবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। স্বর্গীয় মহারাজার হস্তে কলেজের ভার ন্যস্ত হইলে মহারাজা তাঁহার মাতুল স্বর্গীয় রাজা কৃষ্ণনাথ নন্দীর নাম চিরস্মরণীয় করিবার মানসে কলেজের সহিত তাঁহার নাম সংযুক্ত করিয়া দেন। সেই হইতে কলেজটি কৃষ্ণনাথ কলেজ নামে প্রসিদ্ধ।

ললিত বাবু যখন এখানে অধ্যাপকের কার্য্যে ব্রতী, তখন সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ দেশমান্য মনীষী শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। শ্রীযুত হীরালাল হালদার মহাশয় দর্শনশাস্ত্রের, রামচন্দ্র মজুমদার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার অঙ্কশাস্ত্রের এবং পণ্ডিত গয়ারাম স্মৃতিকণ্ঠ মহাশয় সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। আমিও অন্যতম অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলাম। ইঁহাদের মধ্যে গয়ারাম স্মৃতিকণ্ঠ, রামচন্দ্র মজুমদার (ইনি উত্তর-কালে কলিকাতা হাইকোর্টে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ও পরে তথাকার জজ হইয়াছিলেন) এবং ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকপ্রবাসী হইয়াছেন। শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় এক্ষণে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, ইনি পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর (Doctor of Philosophy) উপাধি ও রাজসরকার হইতে নাইট (Knight) উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত হীরালাল হালদার মহাশয় এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। তিনিও বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব-জনক ডক্টর (Doctor of Philosophy) উপাধি লাভ করিয়াছেন। সহকর্ম্মিগণের মধ্যে ললিত বাবু বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। আমা অপেক্ষা তিনি অনুমান ১৬ বৎসরের ছোট ছিলেন এবং স্মৃতিকণ্ঠ মহাশয় আমা অপেক্ষা ৩ বৎসরের বড় ছিলেন। আমাদের পরস্পরের বয়োবৈষম্য থাকিলেও প্রীতির ভাব বিদ্যমান ছিল। স্মৃতিকণ্ঠ মহাশয়, ললিত বাবু ও আমি বিশেষভাবে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম।

আমাদের অধ্যাপক-গোষ্ঠীর মধ্যে খুবই সম্প্রীতি ছিল। সহকর্ম্মীদের আমরা খুবই ভালবাসিতাম; সকলের বন্ধুত্বও খুব দৃঢ় ছিল। সুবিধা পাইলেই আমরা একত্র মিলিত হইতাম ও জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শীল মহাশয়ের নেতৃত্বে জ্ঞান-পূর্ণ কথাবার্ত্তার আলোচনায় সময়ক্ষেপ করিতাম। এক দিন আমাদের মধ্যে Thought Reading সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। সে সময়ে ও বিষয়ের চর্চ্চা আমাদের দেশে অল্পদিনমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। আমরা অনেকেই তখন অবিশ্বাসী ছিলাম। আমাদের মধ্যে এক জন বলিলেন, কলেজের এক জন ছাত্র আছেন, যিনি এ বিষয়ের পরিচয় দিতে পারেন। ছাত্রটির নাম যতদূর মনে পড়িতেছে লক্ষ্মীনারায়ণ, তিনি বি, এ, ক্লাশে পড়িতেন। আমরা সকলেই বলিলাম, এ বিষয়ে যখন আমাদের বিশ্বাস নাই, তখন অনর্থক লক্ষ্মীনারায়ণকে পরীক্ষায় ফেলা উচিত নহে এবং আমাদেরও উহা লইয়া বৃথা সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু যুবক অধ্যাপক ললিত বাবু সে মত গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি পরীক্ষা (experiment) প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। নূতন ব্যাপার বলিয়া তিনি কোনরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন না। অগত্যা আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও লক্ষ্মীনারায়ণকে ডাকান হইল, তিনিও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে প্রস্তুত হইলেন। ব্যাপারটি এইরূপ দাঁড়াইল—লক্ষ্মীনারায়ণ বলিলেন, "আমার দ্বারা কোন একটি কার্য্য করাইবা

লইবার জন্য আপনারা আমার অসাক্ষাতে মনস্থ করুন। তাহার পর আমাকে ডাকাইয়া আমার উভয় চক্ষু দৃঢ় বন্ধন করুন। তাহার পর আপনাদের মধ্যে যে কেহ আমার পৃষ্ঠদেশে তাঁহার উভয় হস্তের অঙ্গুলীগুলি সম্প্রসারণ করিয়া পাস (pass) দিতে থাকুন। পাস দিবার সময় তিনি পূর্ণ মনঃসংযোগের সহিত তাঁহার চিন্তাশক্তিকে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা আমার শরীরে সংক্রামিত করিবেন। অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পৃষ্ঠদেশের সহিত সংলগ্ন না করিয়া, উহার যথেষ্ট সন্নিকটে রাখিতে হইবে এবং যিনি এই ভার লইবেন, তাঁহাকে সর্ব্বদাই মনে করিতে হইবে, আমি যেন এই পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিতে পারি।" লক্ষ্মীনারায়ণের কথা শুনিয়া আমরা কেহই pass দেওয়ার কার্য্যভার গ্রহণ করিতে চাহিলাম না। কিন্তু বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও ললিত বাবুর মন অন্য উপাদানে গঠিত ছিল। নূতন ব্যাপারের তথ্যানুসন্ধানে নবীন যুবকের অপরিসীম আগ্রহ ছিল। তিনি একটু চিন্তা করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের কথায় সম্মত হইলেন।

কলেজের পুস্তকালয়টি বৃহদায়তন। তাহার এক পার্শ্বে প্রিন্সিপ্যালের আফিস এবং মধ্যস্থলে একটি বড় টেবিল। টেবিলের চারিপার্শ্বে চেয়ার সাজান থাকিত। অধ্যাপকরা অবসরসময়ে সেখানে বসিতেন এবং অবকাশ পাইলেই প্রিন্সিপ্যাল্ মহাশয় আসিয়া তাঁহাদের কথোপকথনে যোগ দিতেন। ঐ টেবিলখানির পশ্চিমদিকে আর একখানি চেয়ারের উপর কতকগুলি পুস্তক উপরি-উপরি করিয়া সাজান হইল। সেই পুস্তকগুলির মধ্যে একখানি পুস্তক নির্দ্দিষ্ট করিয়া লওয়া হইল এবং টেবিলের উত্তরপশ্চিম দিকে অধ্যাপক হীরালাল হালদার দণ্ডায়মান থাকিবেন স্থির হইল। লক্ষ্মীনারায়ণ দূরবর্ত্তী একটি ঘর হইতে চক্ষু-বাঁধা অবস্থায় পুস্তকাগারের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবেন এবং উত্তরাভিমুখ হইয়া প্রথমে টেবিলের পূর্ব্বদিক্, পরে পশ্চিমদিক্, তৎপরে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া টেবিলের পশ্চিমদিকে কিয়দ্দূর বেষ্টন করিয়া চেয়ার হইতে নির্দ্দিষ্ট পুস্তকখানি গ্রহণ করিয়া উত্তরাভিমুখ হইবেন এবং অবশেষে অধ্যাপক হালদারের হাতে অর্পণ করিবেন, এইরূপ স্থির হইল।

লক্ষ্মীনারায়ণকে এ পরামর্শের কথা বিন্দু-বিসর্গও জানান হইল না। তিন চারিটি ঘরের অন্তরে একটি ঘরে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল; তাঁহার চক্ষু দৃঢ় বদ্ধ হইল এবং ললিত বাবু তাঁহার পৃষ্ঠদেশের সন্নিকটে পাস্ (pass) দিতে লাগিলেন। পরামর্শ যেরূপ হইয়াছিল, ঘটনাটি অবিকল সেইরূপ ঘটিল। লক্ষ্মীনারায়ণ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। যত সহজ কথায় ঘটনাটির বর্ণনা করিলাম, কার্য্যক্ষেত্রে উহা তত সহজে সম্পন্ন হয় নাই। মধ্যে মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণের পদস্খলন হইতে লাগিল এবং তিনি ভুল দিক্ অনুসরণ করিতে লাগিলেন; কখনও কখনও বসিয়া পড়িলেন এবং হস্তপ্রসারণ করিয়া চতুষ্পার্শ্বে খুঁজিতে লাগিলেন; পুনরপি নিজ হইতেই নিজের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইয়া গন্তব্য দিকে যাইতে লাগিলেন। এই ঘটনাটি শেষ হইতে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা লাগিয়াছিল। সমস্তক্ষণই ললিত বাবু ধীরভাবে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যটি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। আমাদের মধ্যে প্রিন্সিপ্যাল ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ও আমরা সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম এবং ললিত বাবুর সত্যের প্রতি অনুরাগ এবং সত্যের অনুসন্ধানের ধৈর্য্য দেখিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলাম; লক্ষ্মীনারায়ণও অবশ্য আমাদের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।

বহুক্ষণ ধরিয়া তর্ক-বিতর্ক করিতে ললিত বাবু ভালবাসিতেন না। দুই এক কথায় উহা সংক্ষেপ করিয়া ফেলিতেন। এক দিন এক উকীল বন্ধুর সহিত বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে ললিত বাবুর বাদানুবাদ হয়। উকীল বাবু বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী আর ললিত বাবু বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী। বাল্যবিবাহের দ্বারা অনেক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে; বাল্যে বিবাহিত লোকদের লেখাপড়া হয় না এবং তাহাদের শরীর ও চিত্ত দুই-ই দুর্ব্বল হয় ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথা উকীল বন্ধুটি বলিলেন। তর্কে ইহার মীমাংসা বড় সহজে হয় না। ললিত বাবু কিন্তু এক কথায় এই আপত্তির খণ্ডন করিয়া ফেলিলেন। তিনি সগর্ব্বে উত্তর দিলেন, "আমি নিজেই আপনার তর্কের প্রতিবাদস্বরূপ, বাল্যাবস্থায় আমার বিবাহ হইয়াছে; আমার স্বাস্থ্যের হানি ঘটে নাই এবং বিদ্যাশিক্ষারও কোনরূপ ব্যাঘাত হয় নাই। বাল্যবিবাহ সত্ত্বেও আমি সম্মানের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগুলি লাভ করিয়াছি।" এই সগর্ব্ব উক্তির পরই তর্ক একবারে থামিয়া গেল।

মৌলিকতা তাঁহার চরিত্রগত ধর্ম্ম ছিল। কথায়-বার্ত্তায়, সাহিত্যিক গবেষণায় ও পাঠনকার্য্যে তাঁহার এই প্রকৃতি প্রকাশ পাইত। তিনি উচিত-বক্তা অথচ মিষ্টভাষী ছিলেন; সত্যের প্রতি তাঁহার অকপট শ্রদ্ধা ছিল; সত্যের অনুরোধে যখন যাহা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছেন, তখন তাহা বলিতে বা করিতে কখনই সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তিনি অন্য দিকে রহস্যপ্রিয়ও ছিলেন। কথায় কথায় লোকজনকে হাসাইতেন। প্রথম বয়স হইতেই তিনি এই সকল গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন। শেষ জীবনে এইগুলি তাঁহার চরিত্রে বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। অধ্যাপকতায় তিনি বহরমপুরে যেরূপ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, উত্তর-জীবনে তাহা বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। কি বহরমপুরে, কি কুচবিহারে, কি কলিকাতায়, যখন যেখানে তিনি কার্য্য করিয়াছেন, সেইখানেই তিনি সকলের প্রশংসা ও যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

নির্ভীকতা ললিত বাবুর প্রকৃতিতে অত অল্পবয়সেও বিদ্যমান ছিল। যখন বহরমপুরে প্রথম তিনি আসেন, তখন তথাকার ভদ্রলোকরা শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী ব্যক্তিদিগকে বিশেষ সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিতেন না। তাঁহাদের ধারণা ছিল, কলেজের অধ্যাপকই হউন আর স্কুলের শিক্ষকই হউন, শিক্ষকমাত্রেই কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। পদস্থ ব্যক্তিগণ ত সরল (simple) শিক্ষকগণকে নির্ব্বোধ (simpleton) মনে করিয়া একটু অবজ্ঞাই করিতেন এবং তাঁহাদের নিকট আত্মশ্লাঘার পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। স্বাধীনচেতা ললিত বাবু ইহাতে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি অবসর পাইলে ইঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষই হউন বা অপর ভদ্রলোকই হউন, সকলেই আবশ্যকমত তাঁহার কঠোর সমালোচনার বিষয়ীভূত হইতেন। একটি ঘটনায় তাঁহার চিত্তে বহরমপুরের উপর চির-বিরক্তি জন্মাইয়া দিয়াছিল। ঘটনাটির সহিত প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না; তথাপি ইহা ভবিষ্যতে তাঁহার বহরমপুর কলেজের কার্য্য পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছাকে বলবতী করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি।

এক সময়ে কলেজ-গৃহের জীর্ণ-সংস্কার হইতেছিল। সে সময়ে এক দিন রাজমিস্ত্রীরা একটি কক্ষ সংস্কার করিতে সময় না পাওয়ায় কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া চলিয়া যায়। পরদিন আসিয়া বাকী কার্য্যটুকু সম্পন্ন করিবে, ইহাই তাহাদের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পরদিন সেই কক্ষে প্রিন্সিপ্যাল ব্রজেন্দ্রনাথের একটি ক্লাস করিবার কথা ছিল। যথানিয়মে তিনি সেই কক্ষে আসিয়া অধ্যাপনা-কার্য্য আরম্ভ করেন। ঘণ্টা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রাজমিস্ত্রীরা আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল এবং ব্রজেন্দ্র বাবুকে উঠিয়া যাইতে অনুরোধ করিল। ব্রজেন্দ্র বাবু কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না, পড়াইতেই লাগিলেন। রাজমিস্ত্রীরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুনরায় ব্রজেন্দ্র বাবুকে উঠিয়া যাইতে বলিল। তিনি তখন অধ্যাপনায় তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। ছাত্রমণ্ডলী তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনিতেছে। তখন অধ্যাপক ও ছাত্রদের উঠায় কাহার সাধ্য! রাজমিস্ত্রীরা বিরক্তিভরে একবারে রাজবাটীতে যাইয়া ব্রজেন্দ্র বাবুর নামে নালিশ করিল। একে রাজসরকারের রাজমিস্ত্রীর কথায় অবজ্ঞা, তাহাতে আবার তাহার কার্য্যের ক্ষতি। সুতরাং রাজবাটীর উপরিস্থ এক জন কর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ কলেজে চলিয়া আসিলেন এবং আমাকে সম্মুখে পাইয়া বলিলেন যে, "ব্রজেন্দ্র বাবু পাণ্ডিত্য ও বিদ্যায় অসাধারণ ব্যক্তি হইলেও সাংসারিক ব্যাপারে তাঁহার জ্ঞান বড় কম। তিনি জানেন না যে, টাকা দিলে তাঁহার মত লোক পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্থপতিরা নিম্নশ্রেণীর হইলেও সকল সময়ে তাহাদিগকে সংগ্রহ করা যায় না।" কথাটি অত্যন্ত অবজ্ঞাসূচক এবং এত শ্লেষপূর্ণ যে, শুনিয়া আমি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়াছিলাম। এ কথার আলোচনা আমি কাহারও সাক্ষাতে করি নাই, তবে ললিত বাবু এখানে আসিলে কেবল তাঁহার নিকটই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছিলাম। শুনিয়া তিনি বড়ই বিরক্ত হইলেন এবং এখানকার বড়লোকদিগের সহিত পরিচিত হইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। পাণ্ডিত্যের উপযুক্ত সমাদর হয় নাই, দেখিয়া সেই দিন হইতেই বহরমপুর ত্যাগের ইচ্ছার প্রথম অঙ্কুর তাঁহার মনে উপ্ত হয়। ললিত বাবুর সহিত কথায় বার্ত্তায় আমোদ-প্রমোদে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল; কিন্তু এ আনন্দ আমাদের ভাগ্যে অধিক দিন স্থায়ী হইল না। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এখানকার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কুচবিহার কলেজে অধ্যাপকের

পদ গ্রহণ করিলেন। অর্থলিপ্সা তাঁহার বহরমপুর-ত্যাগের কারণ নহে। আত্মসম্মানজ্ঞানের উপর আঘাতই তাহার প্রধান কারণ। তিনি মনুষ্য-চরিত্রের, বিশেষতঃ এখানকার বড়লোকদিগের তীব্র সমালোচনা করিতেন। কলেজের কর্তৃপক্ষগণও তাঁহার সমালোচনার বিশেষ লক্ষ্য হইতেন। সে জন্য ললিত বাবু তাঁহাদের প্রিয় ছিলেন না। একদিনকার ঘটনায় তিনি বহরমপুরের পদ পরিত্যাগ করিবার জন্য স্থির-সঙ্কল্প হইলেন। ঘটনাটি যথাযথ আমার মনে নাই, তবে অনেকটা এইরূপ :—মহারাণী স্বর্ণময়ীর কোন ব্রত উপলক্ষ করিয়া স্থানীয় গণ্য-মান্য পণ্ডিত—ব্রাহ্মণদিগকে উপহার বিতরণ করা হয়। ললিত বাবুর নিকটও এই উপহার যথা-সময়ে প্রেরিত হয়। শূদ্রের দান গ্রহণ করিবেন না বলিয়া ললিত বাবু উহা প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে রাজবাটীর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ তাঁহার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া পাঠান যে, তিনি মহারাণীর চাকর হইয়া কেমন করিয়া তাঁহার প্রদত্ত উপহার অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইলেন? ইহাতে ললিত বাবু যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইলেন এবং প্রত্যুত্তরে বলিলেন, আমি রাজবাটীর চাকর নহি, কলেজ বোর্ডের অধ্যাপক। এই ঘট-নার অবসান এইরূপই হইল বটে, কিন্তু সেই দিন হইতেই ললিত বাবু স্থানান্তরে যাইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সে সুযোগ উপস্থিত হইল। কুচবিহার কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ শূন্য হইল, ললিত বাবু বহরমপুর ত্যাগ করিয়া কুচবিহারে চলিয়া গেলেন।

বহরমপুরে ললিত বাবু ৩ বৎসরকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, কুচবিহারে তিনি এক বৎসরের অধিক স্থায়ী হন নাই; সেখানেও কোন ঘটনা উপলক্ষে তাঁহার আত্ম-সম্মানজ্ঞানে আঘাত লাগে, সে জন্য তিনি সেখানকার পদ পরিত্যাগ করেন। সেখানে থাকিলে তিনি সেখান-কার প্রিন্সিপ্যালের পদ গ্রহণ করিতে পারিতেন এবং কার্য্য হইতে অবসর পাইলে ষ্টেট হইতে পেন্সেন্ পাইতে পারিতেন। এখানেও অর্থলিপ্সা, তাঁহার আত্ম-সম্মানজ্ঞানের নিকট পরাস্ত হইয়াছিল। বঙ্গবাসী কলেজ তাঁহার শেষ কর্ম্মভূমি। এইখানে তাঁহার গুণের আদর হইয়াছিল। প্রায় ৩০ বৎসরের উপর সেখানে কার্য্য করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত তিনি ঐ কলেজ পরিত্যাগ করেন নাই।

ললিত বাবুর অমর আত্মা এখন পরলোকে। তাঁহার রচিত পুস্তক এবং প্রবন্ধ-সমূহ মর্ত্তজগতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। যত দিন তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে এক জনও জীবিত থাকিবেন, তত দিন তিনি দেবতার মত তাঁহাদের হৃদয়-মন্দিরে পূজিত হইবেন।

শ্রীশশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

(ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল, কৃষ্ণনাথ কলেজ)

——

স্মরণাঞ্জলি।—

আজ ঠিক এক মাস, সহসা সংবাদ পেলুম, অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মারা গেছেন। সংবাদটা বজ্রাধিক আঘাত করলে। বজ্রের আঘাত যে পায়, সে আঘাতটা অনুভব করবার অবকাশ পায় না; আমি আঘাতও পেলুম, অবকাশও পেলুম। আমাদের উভয়ের ঘনিষ্ঠতার কথা যিনি জানেন, তিনিই কেবল আমার অবস্থাটা অনুমান করতে পারবেন।

বেশী দিন বাঁচাটা যে একটা অপরাধ, সাজাগুলা পদে পদে তার প্রমাণ দেয়। তদ্ভিন্ন বয়স-দোষে ক্রমেই লোককে একঘোরে ক'রে দেয়,—সাথী মেলে না। তাই বোধ হয়, তখন ভগবানের খোঁজ পড়ে—একটু বেশী।

এ বয়সে একটি সহৃদয় বন্ধু খোয়ান যে কতখানি খোয়ানো, ললিত বাবু সেটা আমাকে জানিয়ে গেলেন! তাঁকে আমি অকস্মাৎ পেয়েছিলুম, খোয়ালুমও অকস্মাৎ।

উপর্য্যুপরি দুইটি উপযুক্ত পুত্র-বিয়োগের সুকঠিন আঘাত, কন্যার মৃত্যু, তাঁর বক্ষঃপঞ্জরগুলিকে ইন্ধন ক'রে অন্তরমধ্যে যে আগুন জেলে রেখেছিল, এত দিন অগ্নিহোত্রী তিল তিল ক'রে তা'তে আত্মাহুতি দিচ্ছিলেন। পত্নীরও ছিল সেই অবস্থা। কেবল উভয়ে উভয়ের মুখ চেয়ে মুখ ফুটে 'স্বাহা' মন্ত্র উচ্চারণ করতেন না।

স্বামী অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও সাহিত্য-সেবার দুর্ব্বল আশ্রয় অবলম্বন ক'রে দিন কাটাচ্ছিলেন। পত্নী গৃহকর্ম্মে আর রোগীর সেবায় নিজেকে ব্যাপৃতা রাখতেন। গ্রীষ্মা-বকাশে বা পূজার বন্ধে উভয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতেন। গত বৎসর গরমের ছুটীতে উভয়ে কেদারবদরীনারায়ণের দুর্গম পথ ঘুরে আসেন এবং সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।

একখানি পত্রে আমাকে লিখেছিলেন,—"কেন যে লিখি, তা জানি না—এ লেখা কেউ চায় না, তা জানি,—তবু লিখি। হিউমারিষ্ট ললিত বাঁড়ুয্যে বহুদিন গত হয়েছে, ইত্যাদি। এবং "Touch stone"এর মত বলিতে ইচ্ছা হয়,—'We that have good wits have much to answer for'—রসাপবাদ থাকায় সকলেই রস খোঁজেন।"

ভিতরটা জীর্ণ হয়েই ছিল, তার উপর ৺বদরীনারায়ণ তীর্থের কঠিন পথ-ক্লেশ—পত্নী সামলাতে পারলেন না। ক্রমে রোগ দেখা দিল। বহুদিন পরে তাঁর পিত্রালয় দর্শনের সাধ হ'ল। ললিত বাবু তাঁকে রংপুরে তাঁর পিত্রালয়ে রেখে এসে আমাকে লিখলেন,—"যে অবস্থায় রেখে এলুম, আর যা দেখে এলুম,—রক্ষার আর আশা নাই। তাঁর ইচ্ছা ৺কাশীধামে যাবার। কিন্তু এ অবস্থায় স্থানান্তরিত করার কোন উপায় দেখি না, সাহসও হয় না। একটু যদি ভালো দেখি,"—ইত্যাদি।

কয়েক দিন পরেই তিনি কলকেতায় ফেরবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পথে বিপদাশঙ্কা সত্বেও তাঁকে কলকেতায় আনা হয়। দিন পনেরো ছিলেন। পরে যেখানকার শোক-তাপ, সেইখানেই রেখে সাধ্বী প্রাণ বিনিময়ে শান্তি লাভ করেন।

এইটি হ'ল চরম আঘাত। আর কেউ কারো মুখ চাবার নেই। লিখলেন—"আমার সান্ত্বনার প্রয়োজন আছে কি? মনে হয়,—না।"—"৪৮ বৎসর বিবাহিত জীবন,—শেষ ৪০ বৎসর প্রায় অবিচ্ছেদ। এমন ভাগ্য কয় জনের হয়? তবু কেন যে" ইত্যাদি।—

—"ভরসা—আর বেশী দিন এই নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে হইবে না। জ্যোতিষী গণনায় মিয়াদ ২ বৎসর, মতান্তরে ৪ বৎসর। তবে গণনা যদি ভুল হয়, পিতৃদেবের মত পরমায়ু পাই—I shudder to think of such a terrible contingency!"

হতাশ জীবনের কি গভীর হুতাশ! মানুষ কত আশা নিয়ে সাধের সংসার আরম্ভ করে, শেষ পাথেয়-হৃত জীবন যাপনের কি ভীষণ আতঙ্ক!

তিনি সারা জীবনটা কলেজেই কাটিয়েছিলেন;—বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গ্রেস' দিবার নিয়ম আছে, ভগবান্ তাঁকে গ্রেস্ না দিয়ে পারলেন না। পত্নী-বিয়োগের ছয় মাস মধ্যেই অগ্নিহোত্রী তাঁর অগ্নি-পরীক্ষায়—এত দিনে অসঙ্কোচে স্বাহা মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে আত্মাহুতি দানে পূর্ণাহুতি শেষ করলেন?

কার খাতায় ক্ষতির কি অঙ্ক বসিল, জানি না, জানি কেবল -পথের ধারের old book shopগুলি কিছু দিন প্রতিদিনই তাঁর প্রতীক্ষা কচ্ছে; শেষ খোঁজ নিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলবে। ৪০ বৎসরের এই পরিচিতটিকে তারা সহজে ভুলতে পারবে না।

গত ১৬।১৭ বৎসর তিনি মূর্ত্ত-ব্যথার মত শরীর বহন করেছেন। ভগবান্ তাঁকে শান্তি দিন। এ প্রার্থনা করতে হয় না,—অন্তর থেকে স্বতই আসে।

তবে তাঁর তিরোধানে বঙ্গসাহিত্য একটি সুপণ্ডিত রসগ্রাহী সমালোচক, 'সেক্সপিরীয়ন্ স্কলার' খোয়ালে! ও-শ্রেণীর লেখক বিরল হয়ে এলো।

তাঁর মৃত্যুর ঠিক্ এক মাস পূর্ব্বে (২৯-১০-২৯) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয়, একখানি পত্রে প্রসঙ্গত লিখেছিলেন,—"বঙ্গ-সাহিত্যের সৌভাগ্য—ললিত বাবুর ন্যায় রসগ্রাহী সহৃদয় সমালোচক আছেন। গুণ দেখিলেই আকৃষ্ট হন ও স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আদর করেন। * * * ইহা তাঁহার মহত্ত্বের পরিচায়ক।"

শুধু তাহাই নয়,—কোন লেখা তাঁকে আনন্দ দিলে, লেখকের খোঁজ নিতেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন, উৎসাহ দিতেন, পাঁচ জনের কাছে তাঁর লেখার প্রশংসা করতেন। ছাত্রদের কাছে প'ড়ে শুনিয়ে তৃপ্তি পেতেন। এ সহৃদয়তা বড়ই বিরল।

রবীন্দ্রনাথের কথায়—শিশু-সাহিত্যে বেতের বদলে আকের চাষ তিনিই আরম্ভ করেন। তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার দিন, পরে আসবে।

২

আলাপ-পরিচয়

কৃতবিদ্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায়ই কাশী-ক্ষেত্রে; আর তার মূলে "কাশীর কিঞ্চিৎ!" তাই ব... সঙ্কোচের সহিত লিখতে হয়। উপায়ও নাই।

বোধ হয়, বারো বৎসর পূর্ব্বের কথা,—দশাশ্বমেধ-প... একটি দোকানের সামনে ব'সে, ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলে...

ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তীর (অধুনা সন্ন্যাসী সচ্চিদানন্দ স্বামী) সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলছিল। ললিত বাবুকে সেই পথে যেতে দেখে, হঠাৎ তিনি ব'লে উঠলেন—'আপনার সঙ্গে এক জন বড় সাহিত্যিকের পরিচয় ক'রে দি।' এই ব'লে তিনি ললিত বাবুকে ডাকলেন। তাঁকে আমার নাম ক'রে বললেন,—'ইনি এক জন সুলেখক' ইত্যাদি।

আমি বাধা দিয়ে বললুম,—"লেখা খুঁজে কোথাও পাবেন না। লিখলে হ'তে পারতুম ব'লে মন্মথ বাবুর বোধ হয় অনুমান, এখন 'যাবৎ কিঞ্চিতে'র আশ্রয়ে সুলেখক।"

ললিত বাবু আমার দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে শেষ বললেন—"বন্দ্যোপাধ্যায়? 'কাশীর কিঞ্চিৎ' তা হ'লে আপনারই লেখা,—না?"

বললুম—"আপনি যে মন্মথ বাবুকেও হারিয়ে দিলেন! এ বেদান্তভূতিতে অনুমানসিদ্ধিই বুঝি law!"

"এ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা, আপনি যখন বন্দ্যোপাধ্যায়, এ নিশ্চয়ই আপনার লেখা। কেমন—নয়?"

"প্রমাণটা খুব প্রবল বটে। আপনি জজ হ'লে যে বিভীষিকার কারণ হতেন!"

আমি তাঁর যুক্তির কোন অর্থই পেলুম না, কেবল আশ্চর্য্য হয়ে তাঁর কথাই শুনতে লাগলুম।

তিনি হাসতে হাসতে, পুস্তকের নানা স্থান থেকে আবৃত্তি করতে লাগলেন,—

বই তখন মাত্র দিন দশেক হ'ল বাজারে বেরিয়েছে,—কবে পড়লেন, কখন্ পড়লেন, অথচ যে কোন স্থান থেকে মুখস্থ ব'লে যাচ্ছেন—অসাধারণ মেমরি (স্মৃতিশক্তি) দেখছি! তা ছাড়া, ওঁদের পড়বার মত বইও নয়।

শুনলুম,—তিনখানি কিনেছেন। শেষ বললেন,—"সকলেই পড়ছেন, কিন্তু "কাশীর নিন্দা" ব'লে তাঁদের ধারণা—অথচ কোথাও তা নেই! তাই ভেবে নিয়েছি—বাঁড়ুয্যে ছাড়া এমন অদৃষ্ট কার!"

বাঁচলুম। বললুম, "ভূমিকাটা পড়লেই ত গোল মিটে যায়।"

যাক্—তাঁর সঙ্গে এই ভাবে আমার প্রথম পরিচয়।

দেখি কলকেতায় ফিরে গিয়ে, 'ভারতবর্ষে' 'কাশীর কিঞ্চিতে'র একটি দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই উদারতায় আমি মুগ্ধ হলুম।

বলেছিলেন,—"কাশী সম্বন্ধে আমিও মধ্যে মধ্যে লিখেছি, কিন্তু আপনার মত সাহস দেখাতে পারিনি। আপনার সাহস ও শ্রদ্ধা, কোনটাই কম দেখলুম না।"

*　　*　　*　　*　　*

বোধ হয়, দেড় বৎসর পরে গ্রীষ্মাবকাশে কাশী আসেন এবং আমার সন্ধান করেন। দেখা করায়, প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন,—"আর কি লিখলেন?"

বলি,—"পেনসন্ নিয়ে কাশী এসে ও কায করলে যে রীতিবিরুদ্ধ হয়! এ স্থানে ব'সে মহাত্মা তুলসীদাস রামায়ণ লিখতে পেরেছিলেন বটে,—তিনি নিশ্চয়ই পেনসন্ নেন নি। পেনসন্ লওয়া মানেই ত কর্ম্ম হ'তে অবসর লওয়া।"

"সেটা নিজের কায হ'তে।"

"আপনি যে ভয় দেখান। পেটের জন্যে হলেও, এত দিন ত পরের কাযই করেছি। নিজের কায কা'কে বলে, তাও ভাববার ফুরশৎ ছিল না। তাই না বেলা থাকতে বা বল থাকতে—নমস্কার করেছি।"

"না-না, এইবার দেশের কায একটু করুন—যাতে দশে আনন্দ পাবে। তার চেয়ে নিজের কায আর কি আছে? দশের সেবার মধ্যেই 'তাঁর' সেবা রয়েছে।"

"আপনি ও-পথ ধরলে আমাকে চুপ করতেই হবে। কিন্তু আমি চুপ করলেই প্রাণ যে চুপ করবে, এমন ত মনে হয় না। মাথা নুইতে পারে, প্রাণ যে নোয় না।"

সহাস্যে বললেন,—"তবে দু'টাই চালান।"

"আমার মত দুর্ব্বলের সে শক্তি কোথায়? এক সাহিত্যকে ভালবেসেই ধ্যান-ধারণা ভেসে গেছে, চোখ বুজলেই—অন্ধকারের মধ্যে অক্ষরগুলো তারার মত হাসতে হাসতে পাশাপাশি ফুটে ওঠে! দেখি—"

"কোলাহল ত বারণ হ'ল—এবার কথা কাণে কাণে।"

"অমনি বিমুগ্ধ মন অলক্ষ্যে কখন্ মোড় ফিরে বসে! এই মোহিনীই তাঁকে আড়াল ক'রে দাঁড়ায়! সেই আগুন নিয়ে আবার খেলা করতে বলেন! কাব্যই বলুন আর সাহিত্যই বলুন—বড় সাংঘাতিক জিনিষ মশাই।—ভগবানের আর ভাগ্যদোষে যিনি সাহিত্যিকের ঘরণী, তাঁর—এত বড় শত্রু আর আছে ব'লে আমার ত মনে হয় না।"

তিনি হাসলেন, বললেন—"আপনার কথাগুলি ফেলে দেওয়াও যায় না। কিন্তু আপনি যে একটা সন্দেহে ফেলে

দিলেন ;—যে সাহিত্য-সেবা করে, সে কি পরমার্থ অবহেলা করে ?"

"বাপ্ রে, এত বড় কথা কি আমি বলতে পারি ? তা হ'লে ব্যাস বাল্মীকি কপিলাদি সিদ্ধ মুনি-ঋষিদের হাত-মুখ বন্ধ হয়ে থাকতো, আমি আমার মত ক্ষুদ্র দুর্ব্বলের কথাই কইচি ; শক্তিমানদের কথা স্বতন্ত্র। তথাপি রবীন্দ্রনাথকে আক্ষেপ করতে শুনতে পাই—

"জড়িয়ে গেল সরু মোটা দু'টো তারে,
তাই আমার সাধের বীণা বাজলো না রে'।"

শুনে ললিত বাবু বললেন,—"আচ্ছা, ঐ নিয়েই একটু লিখুন, সুন্দর হবে। বিশেষ—সাহিত্যিক-ঘরণীর ভাগ্যটা।"

আমি অবাক্, কোনমতে ছাড়বেন না,—আমাকে লেখাবেনই !

* * *

এক দিন অহল্যা-ঘাটে ব'সে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস সম্বন্ধে অনেক কথা হ'ল। বললুম—"তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি নিয়ে যখন লিখতে আরম্ভ করেছেন,—কিছু যেন বাদ না যায়,—ক্ষুদ্রটি পর্য্যন্ত। নগণ্য কেউ নয়।"

আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললেন—"ঠিক কথা, নগণ্য কেউ নয়। কিন্তু কে তাদের চায় ? শুনছি, এর মধ্যেই পাঠকদের নাকি ধৈর্য্যের সীমা লঙ্ঘন করা হয়েছে !—আশ্চর্য্য নয়।"

"একটা সত্যিকার কায করতে ব'সে ও কথায় কাণ দেবেন না। ওটা আপনি সব দিক্ দিয়ে সম্পূর্ণ করুন। ওর আদর হবেই।"

শুনে একটু দুঃখের হাসি হাসলেন। বললেন,—"আদরটা কোন্ দিক্ ধ'রে আসবে,—বিশ্ববিদ্যালয় ? সে আশা আমার নাই।"

কারণটা পরে শুনেছিলুম। যা হোক, আমি তাঁকে লেখা বন্ধ করতে দিই নাই। চাই কি ও সম্বন্ধে আরো লিখবেন, কিন্তু আঘাতের পর আঘাত, আর বেশী অগ্রসর হ'তে দিলে না।

তাঁর 'কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব' য়ুনিভার্সিটি নিয়েছে ; 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সম্বন্ধে তাঁর আলোচনাগুলিও ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র ছাপতে হয়েছে।

* * *

এক দিন জিজ্ঞাসা করলেন,—"আচ্ছা কেদার বাবু, আপনি চীন থেকে কি কিছু লিখেছিলেন ?"

শুনে আশ্চর্য্য হই। পরে জেনেছিলুম,—তিনি যেখানে যা একবার দেখতেন—ভুলতেন না।

বললুম,—"বোধ হয়, ১৯০৪এ চীন থেকে 'চীন-প্রবাসীর পত্র' নাম দিয়ে 'ভারতী'তে লিখতে আরম্ভ করি। যে কথা বলবার উদ্দেশ্য ছিল, ভারতে আমাদের সেই সংস্রবের কথা-গুলো আগে ব'লে নিয়ে,—পরে চীনে যা দেখেছি, সেই কথাটা বলবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রবন্ধের নামকরণটা ছিল 'চীন-প্রবাসীর পত্র' ; সুতরাং তার মধ্যে ভারতের কথা থাকে কেন! তাই সমাজপতি মহাশয়—আমাকে কোসে এক চাবুক লাগান। অপরাধ ত বটেই, তিনি ঠিকই করেছিলেন।"

হেসে বললেন,—"তা হ'লে অনুমান আমার ভুল হয়নি, আপনারই লেখা ?"

"এবং চাবুক-প্রাপ্তিটাও আমার।"

বললেন,—"সমাজপতির চাবুক সর্ব্বত্রই পড়েছে, সে জন্য দুঃখ নেই। কিন্তু আপনার সে লেখা 'নব পর্য্যায় বঙ্গদর্শনে' খুব সুখ্যাতি পেয়েছিল,—বোধ করি দীনেশ সেন মহাশয়ের হাতে। মেয়েদের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে একটা কিছু অর্থকরী বিদ্যা শেখানই চাই,—এই সম্বন্ধে আপনি বিশেষ ক'রে আর সবিস্তারে লিখেছিলেন,—না ?"

"হ্যাঁ, আমার প্রস্তাব আর অনুরোধ ছিল তাই !"

কথাটা উত্থাপন করার উদ্দেশ্য,—কবে কে এক অপরিচিত কোথায় কি লিখেছে এবং সে সম্বন্ধে কোন্ কাগজে অন্য এক জন কি বলেছেন, সেটি পর্য্যন্ত তাঁর স্মরণ থাকতো।

তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব যতই ঘনিষ্ঠ হয়ে এল, আমি তাঁর ইচ্ছাটি পালন না করতে পেরে, নিজের কাছে ততই যেন অপরাধী হয়ে পড়তে লাগলুম। দেখা হ'লে আনন্দও যেমন অনুভব করতুম, তেমনি তার পশ্চাতে লজ্জাও আত্মগোপন ক'রে থাকতো। এক দিন ব'লে ফেললুম,—

—"দেখুন, আপনি বোধ হয় এটা মানেন, অকারণ কিছু ঘটে না ?"

"খুব মানি,—এ কথা কেন ?"

"চাকরী থেকে মন আর চেয়ার থেকে দেহ তুলে নিয়ে কাশী আসি। পাঁচ সিন্দুক বই আর এক সিন্দুক বাসন,

প্যাকিং কেসে প্যাক্ ক'রে, টাটমুড়ে সেলাই ক'রে, খিদিরপুরে এক পরিচিতের কাছে রেখে আসি। ৯ মাস পরে পাঠিয়ে দিতে লিখি। এসে পৌঁছিল পাঁচ কেস্ মাটী আর অসংখ্য উই!"

"বলেন কি! সব বইগুলি"···

"হ্যাঁ—সব। তার মধ্যে অভিধানে আর ডিক্সনারিতে ছিল এগারোখানি! সম্প্রতি বেণী গাঙ্গুলী মহাশয়ের একখানি ডিক্সনারী কিনে কায চালাচ্ছি।"

শুনে কিছুক্ষণ তিনি কথা কইতে পারলেন না,—আমার পানে সমবেদনাপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। শেষ বললেন,—"উঃ, এত বড় ক্ষতি ত দূরের কথা, আমার একখানা বই গেলে আমি বোধ হয় ম'রে যেতুম। আপনি সইলেন কি ক'রে?"

"বাড়ীর সকলে সেই ভয়ই করেছিলেন।"

ললিত বাবুর হাতে Stevensonএর একখানি বই ছিল। তিনি বললেন,—"এই বইখানির স্থানে স্থানে পেনসিল দিয়ে দাগ দিয়েছি, মার্জিনে কিছু কিছু লিখেছি। এখন ওইগুলি মুছে দিলে, আমারও অনেকখানি মুছে দেওয়া হবে। সে জিনিষ আর মেলে না,—পুরাতনের মূল্য এতো। তার পর?"

মিনিট পাঁচেক বিমূঢ় থাকবার পর,—হঠাৎ মুখ থেকে বেরুলো,—"বিশ্বনাথ ঠিকই করেছেন,—এর মোহ শেষদিন পর্য্যন্ত ত্যাগ হ'ত না। এ তাঁর কৃপা,—কাশী এসেছি যে!"—

—"সত্যই এ কাযটি তিনি না ক'রে দিলে আর কারো দ্বারাই হ'ত না।"—

—"বাসা-সংলগ্ন একটু বাগানের মত ছিল,—তার ঈশান কোণে স্বহস্তে সেই জ্ঞান-ভাণ্ডার, এই জ্ঞান-চর্চ্চার শীর্ষ ভূমিমধ্যে রক্ষা ক'রে স্বস্তি পেয়েছি।"

"সত্যই স্বস্তি পেয়েছেন কি?"

"তাঁর এতখানি দয়া আর এত বড় সুস্পষ্ট ইঙ্গিতের পর সেটা যে না পেলেও পেতে হয়!"

* * * *

যখনই দেখা হয়, সাহিত্যপ্রসঙ্গই ওঠে। এক দিন 'ওথেলো' নিয়ে কথা চলছিল। তাঁর কাছে শুনবো বলেই কথাটা তুলেছিলুম। কত দিক্ দিয়েই 'ওথেলো' চরিত্র ব'লে চলেছিলেন। হঠাৎ বললেন,—কিন্তু Iago চরিত্র, এক অদ্ভুত সৃষ্টি,—কোথাও পেয়েছেন কি, আমাদের কোনও ব'য়ে?"

বললুম—"কৈ স্মরণ হয় না,—তবে শরৎ বাবুর রাসবিহারীর জ্যেষ্ঠ মাসতুতো ভাই বলা যায় না কি?"

শুনে তিনি একটু আশ্চর্য্য হলেন। বললেন,—"খুব ধরেছেন ত! আমার একটা লাভ হ'ল।"

পরিহাস কি না, বুঝতে পারলুম না। পরে কথাটা নিয়ে আলোচনা চলেছিল।

তার পর জিজ্ঞাসা করলেন—"হিউমারিষ্টদের মধ্যে কার লেখা আপনার সবার চেয়ে উপভোগ্য বোধ হয়?"

"সকলের লেখা দেখবার সুযোগ বা সুবিধা ত ঘটেনি,—কয় জনের লেখাই বা দেখেছি। কিছু কিছু দেখলেও অপর জাতির সব হিউমারের রস গ্রহণের ক্ষমতাও ত নেই। কত দামী জিনিষ এড়িয়ে যায়, উপভোগে বঞ্চিত হই। ওদের সমাজে মেলা-মেশা দরকার করে।"

"ঠিক বলেছেন। তাঁদের সমাজের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে তা ঘটে বৈ কি। কথার মানে ক'রে ও কাযটি যে হয় না।"

বললুম—"আপনাদের যে কায আর যে সংস্রব, তাতে দেখবার শোনবার সুযোগ-সুবিধাও আছে; তার উপর মল্লিনাথদের 'নোট' থাকে। আমাদের স্বপাক—নেড়াযগ্যি।"

হাসলেন, বললেন—"তাতেও আমাদের কাছে সব কি ধরা পড়ে। আবার ও-সুর নিজের ধাতে একটু না থাকলে, সবটুকু রস ভোগে আসে না। সকলের বলবার ভঙ্গিমাও ত এক রকমের নয়। কারুর সখ্ ঘুরিয়ে খেলিয়ে বলার, কারো বা ইসারা-ইঙ্গিত, কারো সহজ ঘরোয়া কথা, সেইগুলাই ধরা কঠিন। Stevenson কিছু গুরুপাক। Jerome K Jeromeর লেখা নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন?"

"না, তাকে দেখা বলে না। তাঁর দু একটা লেখা বোধ হয় Strand Magazineএ দেখেছি। বেশ লেগেছিল।"

"আর কার লেখা ভালো লাগে?"

কি মুস্কিল! অধ্যাপকের হাতে পড়েছি! বললুম—"সকলের স্বাদ পেয়েছি কি? তবে—এডিসন্, চার্লস্, ল্যাম্ব, ডিকেন্স বেশ আনন্দ দিত।"

নিজের বাঁচোয়ার জন্যে আমিই জিজ্ঞাসা করলুম,—"মার্ক টোয়েন আপনার কেমন লাগে ?"

"অনেকটা বৈঠকী বা আসরের জিনিষ; ক্ষমতাশালী উপস্থিত বক্তা। এইবার আসবার সময় সঙ্গে কিছু আনবো, একত্রে উপভোগ করা যাবে।"

বাঁচলুম, অত বড় স্কলারের সঙ্গে বিস্তার আলোচনায় ঘাম দেয়। বটতলার চোতা চটি বই থেকে হোমার, গে(য়)টে, ড্যাণ্টে তাঁর কণ্ঠে!

* * * * *

গরমের ছুটীতে তিনি প্রায়ই কাশী আসতেন। কাশী তাঁর প্রিয় ভূমি ছিল। উচ্চশিক্ষিত হলেও, সেকেলে সাদাসিদে চালের লোক ছিলেন,—ইংরিজির বোট্‌কা গন্ধ ছাড়ত না। দশ দিন সঙ্গ করেও বোঝা যেত না যে, প্যারীচরণ সরকারের হাতে মাথা মুড়িয়েছেন। কাশীর পণ্ডিত-মহলে তাঁর যাতায়াত ছিল, আদরও ছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের খুবই প্রিয় ছিলেন।

আমি ৪।৫ বৎসর কাশীর গরম সহ্য ক'রে বুঝেছিলুম—আত্মহত্যার পাপ সঞ্চয় করছি। মাথায় গঙ্গা বিরাজ করেন বলেই মহাদেব ৺কাশীধামকে তাঁর হেড্‌কোয়াটার করতে সাহস পেয়ে থাকবেন,—বোধ হয়, ঠাণ্ডা পাহাড়গুলি বে-দখল ব'লে।

কিন্তু কেদারনাথের কর্ম্ম নয়। তাই বিশ্বনাথের পারমিসন নিয়ে, জাতীয় খ্যাতিটা বজায় রাখতে, অন্যত্র পালাতুম।

আশ্চর্য্য এই যে, ললিত বাবু বেশির ভাগ গ্রীষ্মকালেই কাশী আসতেন—সপরিবারে। কষ্ট হ'ত নিশ্চয়ই, কিন্তু বড় ছেলেটিকে খোয়াবার পর সে দিকে তাঁদের নজরই ছিল না। বরং গঙ্গাস্নান, দেবদেবী-দর্শন ও ভ্রমণে ভালই থাকতেন।

আমাকে পালাতে দেখে দুঃখ ক'রে বলতেন—"আমি আসবো আর আপনি পালাবেন, এ যে বড় মুস্কিলের কথা হ'ল! আপনাকে শোনাবো ব'লে কয়েক জন ভাল লেখকের (হিউমারিষ্ট) বই ব'য়ে আনলুম যে। আপনাকে না শোনালে যে তৃপ্তি হবে না, ক্ষোভের কথা হবে।"

বললুম—"আমি যে বাঙ্গালী, জাতের নাম ডোবাই কি ক'রে,—পালাব না ?"

"এখন আর সে বাঙ্গালা দেশ নাই।"

"এক জনও দেখাবার মত থাকবে না ? বেশ,—পালাব না; অপরাধ কিন্তু আমার নয়।"

সে বৎসর পালানোটা বাদ দিলুম। কিন্তু বই দেখা হয় কখন্ ? সকালটা সকলের কায সারবার সময়, ১১টা থেকে অগ্নিপরীক্ষা। সন্ধ্যার পর পাখা হাতে ক'রে হিউমার হজম! তবে, পাঠ বেশ জমে উঠতো।

লেখক বা সাহিত্যিকদের সংসারের বাঁধনটা প্রায়ই ঢিলে হয়। কিন্তু তিনি ত কেবল সাহিত্যিকই ছিলেন না,—৪০ বৎসরের অধ্যাপক। সুতরাং কোন দিকে অবহেলা ছিল না। এ দিকে যেমন একটি কমার ভুলও ক্ষমা করতে পারতেন না, ও দিকে নিজে বাজার না করলেও তৃপ্তি ছিল না। সখের মধ্যে ছিল—বিদ্যাচর্চ্চা আর ভোজন-পারিপাট্য। আবার যেমন কর্ত্তব্যপরায়ণ, তেমনি সন্তানবৎসল।

পর বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে তিনি পুরী গেলেন। আমাকে লিখলেন—"এবার গরমের সময় আপনাকে আশ্রমপীড়া দিব না, গ্রীষ্মে আপনি সত্য সত্যই বড় কাতর হন। পুরী চলিলাম;" ইত্যাদি।

লিখলুম—"ছেলেদের নিয়ে গেলেন কেন ? এ সময় বড় ভীড়,—সামনে রথযাত্রা, অর্থাৎ রোগের মাত্রাবৃদ্ধি। তাদের বেশী দিন রাখবেন না;" ইত্যাদি।

পর-পত্রে লিখলেন,—"দুটি ছেলেরই জ্বর, টাইপ ভালো নয় বলেই সন্দেহ হয়। বড়ই চিন্তায় রয়েছি।"

পত্র পেয়েই লিখি—তাদের নিয়ে কলকেতায় ফেরাই ভালো ব'লে মনে হয়।

চিকিৎসার সুবিধার জন্য শেষ তিনি কলকেতায় ফিরতে বাধ্য হন। দুই ঘরে দুই ছেলের টাইফয়েড্!

ছোট ছেলেটির 'আই-এ' পরীক্ষা শেষ হ'লে পুরী যান। তার বিকার অবস্থায় পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়—মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্ব্বে! বিশ্ববিদ্যালয়ে বোধ হয় নবম স্থান অধিকার করেছিল।

সুদীর্ঘ পত্র পেলুম, "* * * চলিয়া গিয়াছে। বুঝিতে পারিয়াছিলাম—রাখিতে পারিব না। তাই ভগবানের কাছে মাত্র এইটুকুই চাহিয়াছিলাম, পরীক্ষার 'রেজল্টটা' শুনিয়া যাইবার মত একটু জ্ঞান দিন, বড় পরিশ্রম

করিয়াছিল। তিনিই জানেন—কেন দেন নাই। সে না শুনিয়াই চলিয়া গিয়াছে! এইটাই আমাকে কষ্ট দিতেছে সমধিক। অবস্থা আর কি জানাইব, তাহার গর্ভধারিণীর ফুকারিয়া কাঁদিবার উপায় পর্য্যন্ত নাই,—অন্য কক্ষে শয্যা-শায়ী মেজ ছেলে (অবশিষ্ট)" ইত্যাদি তিন পৃষ্ঠা।

কি নিদারুণ, কি কঠিন আঘাত! সান্ত্বনার কথা আছে কি? মুখে আসে কি? বোধ হয়, উচ্চারণ করাও অপরাধ।

মানুষকে কিন্তু জগতের বাঁধা সুরে সুর মিলিয়ে থাকতে হয়—চলতে হয়!

আবার কাশীতেই দেখা। মৃদুহাস্যে বললেন—"আপনার জন্যে জেরোমের Three men in a boat এনেছি।" আরো কি একখানি—নাম মনে নাই।

আমি স্তম্ভিত—কথা সরলো না। ভাল কিছু পেলে, আমাকে না দেখিয়ে তাঁর তৃপ্তি ছিল না।

এই সে দিনের কথা, কয়েক মাস মাত্র—Jeromeর 'The idle thoughts of an idle man' আমাকে উপহার পাঠান।

এত বড় সাহিত্য-প্রেমিক কমই দেখতে পাওয়া যায়। অথচ নিজের লেখার কথা কোনো দিন তাঁকে কইতে শুনিনি। যেখানে যা ভাল লেখা বেরুতো, পত্র লিখে জানতে চাইতেন—পড়েছি কি না! নচেৎ পড়তে অনুরোধ করতেন এবং মতামত জানতে চাইতেন।

গত পূজার সময় মাসিক পত্রিকাগুলিতে যে সব লেখা প্রকাশ পেয়েছিল, সে সম্বন্ধে আমার মতামত না জিজ্ঞাসা ক'রে এবং নিজের অভিমত না জানিয়ে থাকতে পারেন নি।—

—'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের 'দিশেহারা; 'বসুমতীতে'—'প্রমত্ত মর্ত্তালোক,' 'মানসী ও মর্ম্মবাণীতে'—'মূল্যদান'; ও 'পঞ্চপুষ্পে'—'নন্দোৎসব' তাঁর খুবই ভালো লেগেছিলো।

গত বিজয়ায় পর নমস্কার জানিয়ে লিখেছিলেন, "* * * আপনি অনুরোধের খোঁচায় যে লিখতে পারেন, এইটাই আশ্চর্য্য মানি। ইহাতে বুঝি, ভিতরে এখনো পদার্থ আছে,—সে উত্তেজনায় response দেয় (যেমন ঔষধে রোগীর দেহযন্ত্র সাড়া দেয়); কিন্তু ঔষধ যখন রোগীর দেহযন্ত্রে সাড়া দেয় না, তখনকার অবস্থা কি আশাশূন্য (hopeless) বুঝিতেই পারেন! আমার ঠিক্ তাই। তবে সে জন্য আর দুঃখ নাই।" * * *

তার পর আর একখানিমাত্র পত্র পাই। তাতে জানান্—"কোষ্ঠীর ফলাফল" হরিদাস বাবু পাঠাইয়াছেন, আপনি আবার না পাঠান, তাই জানাইলাম। আপনি 'বাদ' দিয়া কি দাঁড় করাইলেন, তাহা দেখিবার ইচ্ছা আছে। ধীরে ধীরে সব রসটুকু (তারিয়ে তারিয়ে) উপভোগ করিতে হইবে"; ইত্যাদি। পত্রের তারিখ ১৩ই অক্টোবর ১৯২৯।

'বাদ' দিবার কথাটা একটু খুলে বলতে চাই; কারণ, 'কাট-ছাঁটে' তাঁর ইচ্ছা ছিল না।

'কোষ্ঠীর ফলাফল' ন্যূনাধিক তিন বৎসর ধারাবাহিকভাবে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ পায় (মধ্যে মধ্যে ধারাভঙ্গের অপরাধ যথেষ্টই হয়েছে)। উক্ত তিন বৎসর ম্যালেরিয়ায় আমি প্রায়ই শয্যাশায়ী থাকতুম,—তাঁর ধারা ঠিকই ছিল। তাগাদা তামিল আর লজ্জার খাতিরে লেখাটা চলেছিল। লেখা শেষ হ'ল, কিন্তু পুস্তকাকারে প্রকাশের কথায়, সন্দেহ-শঙ্কা-সঙ্কোচে মন বিচলিত হয়ে ওঠে। কারণ, যে অবস্থায় লেখা, সে অবস্থার ওপর বিশ্বাস রেখে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না;—লেখার সময় পেছন ফিরে দেখাও কোন দিন আমার ঘটেও ওঠেনি। মুস্কিল এই—'ক্রমশঃ' মার্কা রচনা অনেকেই পড়েন না, সুতরাং কারো কাছে অভিমত চাওয়া বা পাওয়া কঠিন। জানা ছিল, ললিত বাবু কিছু বাদ দেন না। তাই তাঁকে লিখে জানতে চাই,—কোন্ কোন্ স্থানে কাট-ছাঁট বা পরিবর্জ্জন আবশ্যক।"

তিনি লিখে পাঠালেন,—"যেমন আছে, তেমনি থাক, কোথাও ছুরি চালাবেন না। 'কোষ্ঠিতে' কেহ Brevity চান না! ও জিনিষ যত বড় হবে, ততই তার মূল্য বেশী।"

আমার সন্দেহ আর অস্বাচ্ছন্দ্য ঘুচল না। প্রুফ্ দেখার সময় কিছু কিছু বাদ দিলুম (সব নিয়ে ৬০।৭০ পৃষ্ঠা হবে) এবং ললিত বাবুকে সে কথা ভয়ে ভয়ে জানালুম। তিনি দুঃখ ক'রে লিখেছিলেন,—"অনেক পাঠককে বঞ্চিত করিলেন;" ইত্যাদি।

তাই পুস্তকাকারে 'কোষ্ঠীর ফলাফল' পেয়ে 'বাদ' কথাটির উপর ঝোঁক দিয়েছিলেন।

তার পর মাত্র দেড় মাস তিনি ছিলেন। জানি না—দেখে গেছেন কি না।

তাঁর ১০ই অক্টোবরের পত্রের উত্তর ২১শে অক্টোবর পাঠাই। তাঁকে তাঁর ইচ্ছামত ধীরে সুস্থিরে পড়বার অবকাশ দেবার জন্য আর পত্র লিখে বাধা দিই নাই। জানিতাম, কোষ্ঠী পড়া শেষ হইলে সুদীর্ঘ পত্র পাইব।

মাস কেটে গেল,—পত্র নাই! এমন ত হয় না!

'বসুমতী'র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পত্র পেলুম। লিখেছেন,—"আপনার 'কোষ্ঠীর ফলাফলের' সমালোচনার জন্য অনুরোধ করিতে ললিত বাবুর কাছে গিয়াছিলাম। রোগে তিনি শয্যাশায়ী। যাহা দেখিয়া আসিলাম,—এ যাত্রা রক্ষা পান ত পুনর্জ্জন্ম। বড়ই মনঃকষ্ট ও চিন্তা লইয়া ফিরিয়াছি;" ইত্যাদি।

প'ড়ে আমার মনটা হু হু ক'রে উঠলো। অন্তর কেবলই মন্দের প্রতিধ্বনি শোনাতে লাগলো। আমাকে ব্যাকুল ও চঞ্চল ক'রে তুললে।

'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনী'র নাগপুর অধিবেশনের জন্য অভিভাষণ লিখিতে হবে—সব ওলট-পালট হয়ে গেল—প'ড়ে রইল।

তাঁর ভালবাসা আমাকে মুগ্ধ ক'রে ক্রমে বন্ধুত্বের অবাধ সহজ অধিকার এনে দিয়েছিল। তাঁর গুরুত্ব ভুলে, পত্রে কি আলাপে—অন্যায় বা অনুচিতের বাধা-সঙ্কোচ মুছে গিয়েছিল। তাই প্রাণ সে দিন অপরাধীর মত কাতরভাবে কেবলই তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে ফিরতে লাগলো।

পত্র লিখলুম। তাঁর কাছে সেই আমার শেষ পত্র!

উভয়ে কেহই কাহারও পত্র নষ্ট করি নাই। কেন যে তা জানি না; বোধ হয়, বন্ধুত্বের সম্মান-রক্ষার্থে। তারা আর কোন্ কাযে লাগবে? আমার লেখার প্রতি তাঁর অন্ধ অনুরাগ ছিল। তাঁর পত্রগুলি (অধিকাংশ) সেই পরিচয়েই পূর্ণ,—ব্যবহারের উপায় নাই।

একবারমাত্র মতানৈক্য ঘটেছিল। 'কোষ্ঠীর ফলাফলে'—মানব ও আজিজের প্রসঙ্গ মধ্যে আছে,—মৃত্যুশয্যায় 'মানবের' প্রাণ তার দোস্ত আজিজকে দেখবার জন্য ব্যাকুল,—ছট্‌ফট্ করছে। বাহিরে আজিজ মানবকে দেখবার তরে উদ্‌গ্রীব। মধ্যে হিন্দুত্বের বাধা,—ঠাকুর-ঘর উত্তীর্ণ হয়ে মানবের ঘরে পৌঁছুতে হয়। বাড়ীর কর্ত্তার ও সমাজের মঞ্জুরী মিললো না,—সুতরাং তাদের শেষ দেখা হ'ল না!—তাতে মানব তার বাল্যবন্ধু লোকেনকে ব'লে গেল,—"দোস্তকে আমার সেলাম্ জানাস্—মাপ করতে বলিস। আর দ্যাখ লোকেন,—হিন্দু হোস্‌নি ভাই,—মানুষ হোস্।"

মানবের এই শেষ কথাটি উল্লেখ ক'রে তিনি আমাকে লিখেছিলেন,—"লেখায় আপনি কোথাও 'কমিট' করেন নি,—মানবের ও কথাটা যেন বাদ দিলেই ভালো করতেন।"

তিনি আমার বয়সের দিকে চেয়েই কথাটা বলেছিলেন। আমাকে নিরঙ্কুশ দেখাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল,—এতই ভালোবাসতেন। এমন সদাশয় সহৃদয় বন্ধু আর পাব না।

আমাদের সাক্ষাৎ, আমাদের আলাপ-পরিচয়,—কাশী-ক্ষেত্রে ও পত্রে কথাবার্ত্তার মধ্যে। তাই তাঁর কথা লিখতে বসলে, নিজের কথাই বেশী বলা হয়ে যায়—যেটা সম্পূর্ণ অবান্তর। পাঠক-পাঠিকারা ওটা নীর ব'লে গণ্য করবেন।

আমি 'ডায়ারি' হ'তে কিছু কিছু উদ্ধৃত ক'রে দিলাম মাত্র।

যাঁরা তাঁর সতীর্থ ও পারিবারিক পরিচয়ে পরিচিত অন্তরঙ্গ, তাঁরাই তাঁর সম্বন্ধে লেখবার যোগ্য ব্যক্তি।

অভাবপূরণের জন্য যুদ্ধ করাটা জীবনের নাকি একটা লক্ষণ। কিন্তু ললিত বাবু আমাকে যে অভাবটা দিয়ে গেলেন, সেটা পূরণ হবার নয়, আমি যেন সেটা স্মরণে পূরণ করতে পারি।

কথা সবই রয়ে গেল। আপাততঃ তাঁর আত্মার শান্তি প্রার্থনা ক'রে ও সেই শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে বার বার নমস্কার-নিবেদন ক'রে এবং তাঁর অবশিষ্ট একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ সলিল-কুমারের দীর্ঘজীবন ও সুখশান্তি কামনা ক'রে এই সামান্য স্মরণাগুলি নিবেদন করলুম।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সতীর্থের স্মৃতি-তর্পণ।—

অসেচনক সতীর্থ-সুহৃৎ রসরাজ ললিতকুমারের [illegible] জীবনের স্মৃতিকথা লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। তিনি ছিলেন রস-মাধুর্য্যের মত্ত মধুকর এবং সুরসাল ও সুমা[illegible] রস-সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক-শিরোমণি। রুচি[illegible] মুকুল-যৌবনে বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় সময় সময় তিনি তাঁহার
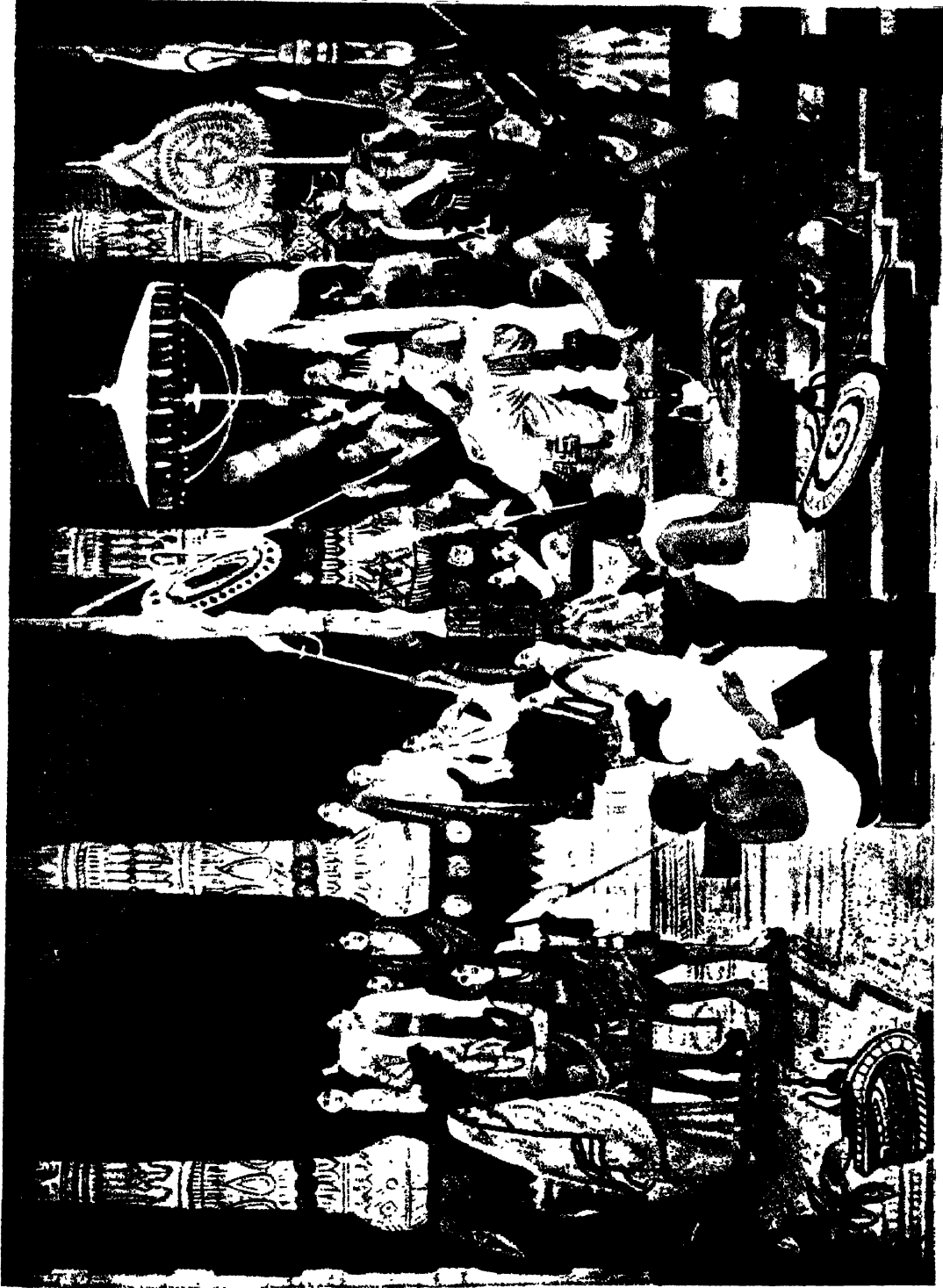
রাজসভায় শকুন্তলা

রসফুল্ল হৃদয়ের সরসতা ও রসলোলুপতার আভাস ও পরিচয় আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। আমি আজ স্মৃতি-বিস্মৃতি-জড়িত সেই সুদূর অতীতের কুক্ষি হইতে উদ্ধার করিয়া তাহারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত মহানিষ্ক্রমণের পূর্ব্বে এই রোগশয্যা হইতে বসুমতীর পাঠকপাঠিকাগণকে উপহার প্রদান করিতেছি।

রসজ্ঞান, রসধ্যান এবং সুনির্ম্মল রসধারা পান ও বিতরণ—এই ছিল যাঁর জীবনের ব্রত, যিনি ইহা দ্বারা আবিষ্ট, ইহাতে বিভোর এবং ইহাতেই মাতোয়ারা ও আত্মহারা হইয়া অপূর্ব্ব রসলীলা সমাপন করিয়া, রসস্বরূপ যিনি, উপনিষদের ঋষি যাহাকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে অন্তিম অভিসারে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন, আমি স্মৃতিকথা লিখিতে যাইয়া কোন নীরস কথার অবতারণা করিয়া সেই রসময় বন্ধুর স্বরূপের ব্যতিক্রম ও অমর্য্যাদা করিব না।

কিঞ্চিদুন ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মাবকাশের পর দিগ্বিজয়ী ললিতকুমার কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে এফ, এ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তদানীন্তন মেট্রোপলিটান্ ইন্‌ষ্টিটিউসনে আসিয়া আমাদের সঙ্গে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। তখনকার দিনে মফস্বলের এইরূপ কৃতী ছাত্র সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ললিতকুমারের সুললিত নামটিও কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাকে আমাদের আকর্ষণের বস্তু করিয়াছিল—সেই সময়ে জয়দেবের "ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়সমীরে মধুকরনিকর-করম্বিত-কোকিলকূজিত-কুঞ্জকুটীরে" প্রভৃতি উন্মাদক কবিতা-কদম্বের আবৃত্তিতে ছাত্রমহল মুখরিত ছিল।

যে দিন ললিতকুমার আসিয়া ভর্ত্তি হইলেন, সেই দিন আমাদের ক্লাশে একটা সাড়া পড়িয়া গেল, সকলেই উদ্‌গ্রীব, উন্নেত্র, উৎকর্ণ ও উৎকণ্ঠিত। সেই দিন হইতেই তিনি সতীর্থ ও শিক্ষক সকলের Cynosure (নয়নমণি) হইয়া দাঁড়াইলেন। ভ্রমরকৃষ্ণ চর্ম্মাবেষ্টনের মধ্যে উজ্জ্বল ভাসা ভাসা, ডাগর ডাগর চক্ষু দুটি—ইহাই বঙ্কিম বাবুর পটলচেরা চোখ কি না, জানি না,—উন্নত, মনীষাদীপ্ত ললাট; সুঠাম, সুগোল দেহ; আর বয়সটি কিনা "কৈশোর যৌবন দুঁহু মিলি গেল;" তরল-নির্ম্মল নবযৌবনের পুষ্পবন্যার প্রথম উন্মেষ ও স্ফুরণে ললিত-লাবণ্যের মৃদুলতরঙ্গে মুখচ্ছবি ভরপূর ও সমগ্র দেহখানি টলমল; এমন কমনীয় শ্রী সন্দর্শন করিয়া (বঙ্কিম বাবুর ভাষায়, অবশ্য পুংপক্ষে) মনে হইয়াছিল, "যেন লাবণ্যের নদীতে ছোট ছোট ঢেউ উঠিয়াছে।" এ হেন সম্পদ লইয়া ললিতকুমার অচিরেই ক্লাশটিকে গুল্‌জার করিয়া তুলিলেন। ললিতকুমারের বাসা ছিল চাঁপাতলায়, আর আমার বাসা ছিল দপ্তরী-পাড়াতে। কলেজের ছুটীর পর আমরা দুই জন প্রায় প্রত্যহ একসঙ্গে একই পথে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ দিয়া বাসায় ফিরিতাম, ইংরাজী ও সংস্কৃতের অনার্স ক্লাশেও দুই জন একত্র পড়িতাম। ক্রমে উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্দ্যের সঞ্চার হয়। কৌতুকপরিহাস আমাদের মধ্যে বেশ চলিত। এক দিন তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ দেহে তেজোব্যঞ্জক উজ্জ্বল চক্ষু দুইটিকে লক্ষ্য করিয়া আমি অবহাসার্থে বলিয়াছিলাম—'নিবিড় নীরদ-কোলে যেন সৌদামিনী', ললিতকুমার ঈষৎ হাস্য করিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—দুর্ব্বাসার বংশধরের চক্ষু,

'কে যানে কখন্ হানে ভীষণ অশনি।'

অনুপ্রাসের অট্টহাসের এই প্রথম নমুনা পাইলাম। আমাদের ক্লাশে সর্ব্বাপেক্ষা হ্রস্বকায় অথচ ফর্‌সা রংএর একটি সহপাঠী ছিলেন। এক দিন তিনি ও ললিতকুমার পাশাপাশি বসিয়া ছিলেন। কালো আর ফরসার একত্র সমাবেশ দেখিয়া আমি কৌতুক করিয়া একখানা কাগজে ললিতকে লিখিলাম—

'এ কি হেরি অপরূপ মিলন-মাধুরী।
পূর্ণিমার পাশে শোভে অমা বিভাবরী॥'

ললিতকুমার ইহার নীচে লিখিয়া দিলেন—

'অস্যার্থঃ—শ্যামের বামে শোভিছে কিশোরী।
অথবা কৃষ্ণের পাশে কুবুজা সুন্দরী॥'

৺ক্ষুদিরাম বসু মহাশয় আমাদের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার উন্নত নীতি এবং মার্জ্জিত রুচির জন্য আমরা তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতাম। তিনি ছাত্রদের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিতেন। অধ্যাপনা-কালে সরল-জটিল-নির্ব্বিশেষে সকল কথাই তিনি অতি বিশদ ও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিতেন। অতটা বিস্তৃত ব্যাখ্যা কেন জানি ললিতকুমার পছন্দ করিতেন না এবং

অধ্যাপক মহাশয়ের প্রদত্ত কোন নোট্‌ও তিনি লিপিবদ্ধ করিতেন না। ইংরাজী শব্দ ব্যবহারে ক্ষুদিরাম বাবুর একটু বৈশিষ্ট্য ছিল।

পড়াইবার সময় কখন কখন তিনি দীর্ঘ শব্দ প্রয়োগ করিতেন। সেকালে গালভরা সুদীর্ঘ শব্দ ('Words of learned length and thund'ring sound') এবং অপেক্ষাকৃত দুরূহ বা স্বল্প-ব্যবহৃত পর্য্যায় শব্দ (synonyms) প্রয়োগ এখনকার তুলনায় একটু বেশী প্রচলিত ছিল এবং Johnson ও Macaulayর styleএর অনুযায়ী বলিয়া অনেকের নিকট সমাদৃতও হইত। Pocket Dictionaryর স্থলে জম্‌কাল Vest Lexicon কথাটি মানাইত ভাল এবং শুনিতেও লাগিত বেশ। এইরূপ গুরু-গম্ভীর ভাষা শুনিলে যৌবনসুলভ আমোদপ্রবণতা-বশতঃ ইংরাজ-কবি Henry Careyর—

"His cogitative faculties immers'd
In cogibundity of cogitation" এবং
"Let the singing singers
With vocal voices, most vociferous,
In sweet vociferation, out-vociferize
Ev'n sound itself."

এই দুইটি ponderous কবিতার কথা মনে পড়িত। যাহা হউক, ইহা অবান্তর কথা। এক দিন ক্লাশে একটি ছাত্রকে ঝিমাইতে দেখিয়া ক্ষুদিরাম বাবু তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "You somnolent philosopher there, are you slumbering or somnambulating?" ইহা শুনিয়া ললিতকুমার অনুরূপ ভাষায়, শিক্ষক মহাশয় শুনিতে না পান এইরূপ সংযত স্বরে, বলিলেন, "Sir, such somniferous syllogisation superinduces somnolence and somnambulation."

এইখানেও ললিতকুমারের রসপ্রিয়তার সহিত (Churchillএর ভাষায়) "Apt alliteration's artful aid" অথবা (তাঁর নিজের ভাষায়) "অনুপ্রাসের অট্টহাস" (alliteration's loud laughter) ব্রীড়াবগুণ্ঠিত।

আমাদের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়। তিনি কাব্য ও ব্যাকরণে সুপণ্ডিত এবং অধ্যাপনাতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। অলঙ্কারশাস্ত্রে তাঁহার নিরতিশয় রসবোধ ছিল। "দৃষ্টিং দেহি পুনর্বালে" প্রভৃতি রসাত্মক শ্লোক যখন তিনি আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতেন, তখন তাঁহার রসের উচ্ছ্বাসে ক্লাশটি প্লাবিত হইয়া যাইত। এইরূপ সময়ে পণ্ডিত মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া ললিতকে বলিতে শুনিয়াছি—

"ঐ উঠলো রস-তরঙ্গ,
রসে ডুবু ডুবু সকল অঙ্গ।"

বি, এ, পাশ করার পর আমরা উভয়েই ইংরেজীতে এম্‌, এ, পড়িবার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হই। প্রথিতনামা অধ্যাপক রো (Rowe) সাহেব আমাদিগকে Shakespeare পড়াইতেন। রো সাহেব খুব আমোদ-প্রিয় লোক ছিলেন এবং আমাদের সঙ্গে বেশ মেশামেশি করিতেন। সময় সময় একটু আধটু ইয়ারকিও চলিত। তাঁহার নিয়ম ছিল— ক্লাশে পড়াইবার সময় প্রত্যেক ছাত্রকে Shakespeareএর নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের এক একটি ভূমিকা দেওয়া। 'Much Ado About Nothing' পড়িবার সময় ঘটনাক্রমে ললিতের ভাগে Benedickএর ভূমিকা এবং আমার ভাগে Beatriceএর ভূমিকা পড়িল। এইরূপ ভূমিকা-বণ্টনে ললিতকুমার আমাকে একটু পাইয়া বসিলেন। একটি অঙ্গুলীর দ্বারা খোঁচা দিয়া বলিলেন, "কেমন, এখন জব্দ!" আমি ললিতের বয়োজ্যেষ্ঠ, আমার তখন শ্মশ্রূদ্গম হইয়াছে। শ্মশ্রুর দৈর্ঘ্য প্রায় এক ইঞ্চি। ললিতের তখনও কচি বয়স, আর

"বদন-মণ্ডল অতি সুকোমল
ঈষৎ গোঁফের রেখা।
বিকচ কমলে যেন গো সহসা
ভ্রমর-পাঁতির দেখা॥"

কিন্তু এ কমল অবশ্য নীলকমল ছিল, তাই কালোয় কা[illegible] মিশিয়া যাওয়াতে সেই রেখাপাত তেমন দেখা যায় না[illegible] আমার পালা আসিলে অধ্যাপক মহাশয় যখন আমা[illegible] লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "Well, Beatrice, what have you got to say?" আমি তখন আমার দীর্ঘশ্মশ্রুর দি[illegible] অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম, "Bearded Beatri[illegible] Sir" এবং ললিতকে ও আমাকে দেখাইয়া বলিলাম, "May

we not exchange our parts?" অধ্যাপক মহাশয় উত্তর করিলেন, "She (Beatrice) must be fair." আমি বলিলাম, "Yes, fair in the sense of beautiful, and the lover sees Helen's beauty (ললিতকে দেখাইয়া) in a brow of Egypt." ললিত তখন এক অপূর্ব্ব ভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "Is it not blasphemy, Sir? Beatrice ought to know I am the *image of God* cut in ebony."

দীর্ঘকায় Percival সাহেব যখন প্রথম দিন ক্লাশে আসিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া কবিবর হেমচন্দ্রের ভাষায় ললিত মৃদুস্বরে বলিয়াছিলেন, "পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।"

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়িল ললিতকুমারের অনন্যসাধারণ স্মৃতিশক্তির কথা। এফ, এ পরীক্ষার জন্য তিনি Taylor's Ancient History এমন ভাবে মুখস্থ করিয়াছিলেন যে, এম, এ পড়িবার সময় এক দিন সেই পুস্তক হইতে অধ্যায়ের পর অধ্যায় অনর্গল আবৃত্তি করিয়া আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন। Macaulayর স্মৃতি-শক্তি সম্বন্ধে পড়িয়াছিলাম, "He could declaim the longest Arabian Nights as fluently as Shaharzadi herself." ললিতকুমারের আবৃত্তি শুনিয়া আমার সেই কথাই মনে পড়িয়াছিল।

আর একটি অবান্তর কথা মনে পড়িল। পূর্ব্বে লিখিয়াছি, ললিতকুমার নিজকে দুর্ব্বাসার বংশধর বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার শান্ত নিরাহ বহিরাবরণের অন্তরালে যে অগ্নিতেজ প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের একটি ঘটনাতে। বরিশালস্থ রাজচন্দ্র কলেজের জনৈক কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার আত্মাভিমান ও আত্মমর্য্যাদায় আঘাত করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমাদের নাম University Calendarএ লণ্ঠন দিয়ে খুঁজ্‌তে হয় না।" কিন্তু "রতনে রতন চিনে,"—উক্ত কলেজের স্বত্বাধিকারী বিহারীলাল রায় মহাশয় উত্তরকালে যখনই ইংরেজীর অধ্যাপকের অভাবে পড়িতেন, তখনই এক জন যোগ্য অধ্যাপক নির্ব্বাচন করিয়া দেওয়ার জন্য ললিত বাবুর উপরে ভারার্পণ করিতেন।

আর একটি অবান্তর কথার উল্লেখ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। ছাত্রজীবনে আমরা একে অন্যকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতাম, কিন্তু যখন কর্ম্মজীবনে প্রায় ২৫ বৎসর পর ললিত বাবুর সহিত আমার পুনরায় সাক্ষাৎ হইল, তখন তিনি আমাকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। সেই হইতে শেষ পর্য্যন্ত পরস্পরকে 'আপনি' বলাই বহাল ছিল, কিন্তু তাঁহার আমাকে 'আপনি' বলা উপলক্ষে আমার একটা কথা মনে হইয়াছিল। আমার কন্যা আমাকে আগেও 'তুমি' বলিত এবং এখনও 'তুমি' বলে, কিন্তু মাঝখানে একবার তাহার ৭ বৎসর বয়সের সময় প্রায় এক বৎসর পর তাহার সঙ্গে আমার দেখা হইলে সে আমাকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করে। পরে এইরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিয়াছিল, আমার দীর্ঘ শ্মশ্রু দেখিয়া ভয়ে (বা সম্ভ্রমে) সে এইরূপ করিয়াছিল। আমার মনে হইয়াছিল, বুঝি বা ললিত বাবুও দীর্ঘকাল পরে আমার সুদীর্ঘ শ্মশ্রু সন্দর্শনে সভয়ে বা সসম্ভ্রমে আমাকে 'আপনি' সম্বোধন করিয়াছিলেন। আমিও তখন কোনরূপ উচ্চবাচ্য না করিয়া মনে মনে তথাস্তু বলিয়া অনুরূপ সম্বোধনই মানিয়া লইলাম। এখন আবার ছাত্রজীবনের একটি পরিহাসের কথা লিখিতেছি।

আমরা সময় সময় একত্র ভ্রমণে বাহির হইতাম। এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ইডেন উদ্যানে বেড়াইতে যাই। উদ্যানের মালীকে দিয়া কতকগুলি বিচিত্র বর্ণের ফুল চয়ন ও সুন্দর পাতা সংগ্রহ করাইয়া তদ্দ্বারা একটি চূড়া রচনা করি এবং একটি কাক পক্ষীর পালক কুড়াইয়া তাহাতে গুঁজিয়া দেই। চূড়াটি ললিতকুমারকে উপহার দিয়া বাল্যে শ্রুত একটি কবিতার ভাষা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া আমি বলিলাম,—

"বন থেকে বনফুল করি আহরণ।
এনেছি সতীর্থগণে শ্যামের কারণ॥
শিখিপাখা দিয়ে তারে বেঁধেছি যতনে।
মনোমত সাজাইব এ নীলরতনে॥"

ললিতকুমার চূড়াটি গ্রহণ করিয়া মৃদুমধুর হাসির সহিত কবিতার ছন্দে উত্তর করিলেন,—

"তোমার এ সাজান যে ব্যর্থ হ'ল ভাই।
শ্যাম-সোহাগিনী রাই—সে ত সঙ্গে নাই॥"

এই দিনই প্রথম জানিলাম, তিনি বাল্যেই বিবাহিত হইয়াছিলেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই—ললিত বাবু তাঁহার শেষ গ্রন্থ 'সাহারার' পরিশিষ্টে পুত্রের (শ্রীমান্ সলিলকুমারের) প্রেরণায় এবং স্বীয় স্নেহ ও প্রীতি বশতঃ আমার আলোক-আলেখ্যসহ "শ্মশ্রুসংহিতা বা দাড়ীর কথা" নামক একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত ও তাঁহার সহিত চিরগ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে আমি তাঁহাকে 'রসরাজ' নামে আখ্যাত করিয়াছি। আশা করি, এই স্মৃতি-তর্পণের সময় হইতে তাঁহার স্বরূপব্যঞ্জক ঐ নামেই তিনি সর্ব্বত্র নন্দিত ও অভিহিত হইবেন। ইহাতে তাঁহার আত্মা নিশ্চয়ই প্রীত ও আনন্দিত হইবে।

মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে আমাকে যে গ্রন্থমধ্যে তাঁহার সহিত চির-সংযুক্ত করিয়া গিয়াছেন, সেই জন্য আমি তাঁহার নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞ। আমার কেবল এই দুঃখ যে, জীবন্ত 'ফোয়ারা'র তিরোধানে আমি 'সাহারা'র এক কোণে পড়িয়া রহিলাম। তবে আশার কথা এই, অচিরেই বৈতরণী পার হইয়া অ-বিচ্ছেদের দেশে আবার সেই অফুরন্ত, অধুনা নবীভূত, ফোয়ারার সহিত মিলিত হইব।

আজ হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ভগবচ্চরণে এই প্রার্থনা উত্থিত হইতেছে, বন্ধুবরের সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ সলিলকুমার আয়ুষ্মান্ হউন এবং জন্মলব্ধ পিতৃগুণে ভূষিত হইয়া ও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিজের গৌরব এবং পিতৃ-আত্মার আনন্দবর্দ্ধন করুন। তাঁহার উপর স্বর্গের পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায় (বি, এ)।
(বেদান্তভূষণ, ভাগবতরত্ন)

অধ্যাপক ললিতকুমার।—

এক জন পাশ্চাত্য দেশের মনীষী বলিয়াছেন,—'Amidst the eternal that envelopes us, one thing is certain—suffering. It is the corner stone of life.' অধ্যাপক ললিতকুমার জীবনে এই সত্যটা তীব্রভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শোকের পর শোকের আঘাতে তাঁহার জীবন-তন্ত্রী ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। মর্ম্মন্তুদ বেদনায় তিনি শেষ জীবনে মুহ্যমান ছিলেন। মৃত্যুর ক্রোড়ে আজ তিনি শান্তি পাইয়াছেন।

তাঁহার সহিত আমার পরিচয় এই অবিমুক্ত বারাণসী-ক্ষেত্রে। হিন্দুর নিকট কাশী চিরদিনই প্রিয়; এমন কি, লর্ড সিংহও আমায় এক দিন বলিয়াছিলেন যে, কয়েক দিন কাশী-বাসে তিনি বড়ই আনন্দ পাইয়াছেন। কিন্তু ললিত বাবুর ন্যায় কাশী-প্রীতি আমি আর কাহারও দেখি নাই। গ্রীষ্ম-কালে যখন ১৮০ ডিগ্রি উত্তাপ, আমরা যখন শৈল-শিখর বা সমুদ্রতটে আশ্রয় লইয়াছি, তখন ললিত বাবু কাশীতে। কাশীর আকাশ, বাতাস, দেবালয়, গহন, এমন কি, ইহার ধূলিকণা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট পবিত্র ছিল। নন্দী শর্ম্মার "কাশীর কিঞ্চিৎ" তাঁহার বড় আদরের গ্রন্থ ছিল। তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল, জীবনের শেষ কয়টা দিন কাশীতে যাপন করিবেন। কিন্তু বিধিলিপি তাঁহার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দিল না।

ছাত্রাবস্থায় ইংরাজী সাহিত্যে তিন জন অধ্যাপকের নাম শুনিতাম, তাহার মধ্যে ললিত বাবুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। বঙ্গবাসী কলেজে ছাত্র সমাগম হইত ললিত বাবুর নামে। ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল প্রচুর ও গভীর, সংস্কৃত সাহিত্যে ও বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল নিবিড়ভাবে, কাযেই তাঁহার অধ্যাপনার ভঙ্গী সুসঙ্গত ও মধুর ছিল। পূজ্যপাদ রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে Physics এর ন্যায় জটিল বিজ্ঞানকে অতি সহজ ও মনোরম করিয়া তুলিতেন। ললিত বাবুও সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে উদাহরণ বা তুলনামূলক অনুরূপ অংশ উদ্ধৃত করিয়া ইংরাজী সাহিত্যের ব্যাখ্যায় নূতন রস-সঞ্চার করিতেন। কথায় বলে, 'কবিতারসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎ কবিঃ।" কবির ধর্ম্ম ফুল ফুটান, সে ফুলের গন্ধ ও সুষমা বিচার করেন সমালোচক ও অধ্যাপক। সেক্সপীয়ারকে নূতন রূপ দিয়েছেন ডাউডেন, ব্রাডলে, কালিদাসকে সহজবোধ্য করিয়া দিয়াছেন মল্লিনাথ।

অধ্যাপকের একটি ছোট কথায় কবির ভাব কি ভাবে পরিস্ফুট করা যায়, তাহার একটি উদাহরণ দিতে চাই। কোলরিজের "এনসিয়েণ্ট ম্যারিন্যার"এ একটি ছত্র আছে। 'The very sea did rot.' অধ্যাপক Percival যোগ দিলেন and it was salt water'—অর্থাৎ যে লবণের ধর্ম্ম অন্যান্য পদার্থকে পচন হইতে রক্ষা করে, সেই লবণ-সমুদ্র পচিয়া গেল। ইহাতে সেই হতভাগ্য নাবিকের

অবস্থাটা যে কি ভয়ানক ও শোচনীয়, তাহা কত সহজে পরিস্ফুট হইল। অধ্যাপক ললিতকুমারের অধ্যাপনা-প্রণালী ছিল এই ভাবের। তিনি অতি শান্ত-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, "dash, push and flash" নামক গুণত্রয় তাঁহার জীবনে বা অধ্যাপনায় ছিল না। গভীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সূক্ষ্ম রসানুভূতিই তাঁহার অধ্যাপনার বৈশিষ্ট্য ছিল।

এক দিন তিনি আমায় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখুন, অধ্যাপকতা আর ভাল লাগে না। কলিকাতার কলেজের ছাত্রদের গুরুভক্তি দিন দিন এমন প্রবল হয়ে উঠ্‌ছে, অধ্যাপকমাত্রেরই নামের পূর্ব্বে যে সব গ্রাম্য বিশেষণ ছাত্ররা প্রয়োগ করে, তাহাতে মনে হয়, অধ্যাপকতা করার চেয়ে চাষ করা ভাল। আনাতোল ফ্রান্সও এক দিন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "It is better to grow cabbages than to write books." গ্রন্থরচনা অপেক্ষা কপির চাষও ভাল। সান্ত্বনার বিষয়, তিনি যুব-সম্মেলনের কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। আমরা পরে গিয়া তাঁহাকে এ সম্বন্ধে সকল কথা বিবৃত করিয়া বলিব। কলিকাতার কলেজের ছাত্রদলের একাংশের আচরণ বড়ই ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের অন্যান্য কলেজেও অল্পাধিক পরিমাণে অনুকৃত হইতেছে। ছাত্ররা G. B. S ও Russellএর বুলি আবৃত্তি করিয়া মনে করিতেছে, দুনিয়ার জ্ঞান হস্তামলকের মত তাহাদের কণ্ঠগত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই অধ্যাপকদের প্রাণ কণ্ঠাগত হইবার পথে চলিয়াছে। সে দিন এক অধ্যাপক বন্ধু বলিতেছিলেন,—"They possess the manners of a tommy." ভদ্রতা ও নম্রতাই শিক্ষাকে সুন্দর ও সার্থক করিয়া তুলে। কবির ভাষায় 'যে গাছে ফুল ফোটে, তাহাতে ফল না ধরলেও চলে।' ক্ষোভের বিষয়, ফুল ত ফুটিতেছেই না, ফল ধরিবার সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। নব্য বাঙ্গালার শিক্ষাক্ষেত্রে যুবসম্মেলনের কৃপায় 'শিব গড়িতে যদি জীববিশেষের সৃষ্টি হইতেছে' বলিয়া কেহ অভিযোগ করেন, তবে তাহাতে প্রতিবাদ করিবার কি আছে? অধ্যাপক ললিতকুমার বাঙ্গালী ছাত্রসমাজের একাংশের এই অশোভন আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও কাতর হইয়াছিলেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি নহে, ভদ্রলোক বা মানুষ গড়িয়া তোলা। সে উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ না হয়, তবে শিক্ষাই বৃথা।

ললিত বাবুর আর একটি আসন আছে—বাঙ্গালা-সাহিত্যে। কাযেই বঙ্গবাণীর মানস-লোকে তাঁহার একটি বিশেষ স্থান আছে। "ফোয়ারা", "পাগলা ঝোরা" মধুর সংযত হাস্যরসে ঝলমল, "ব্যাকরণ বিভীষিকা" ও "অনুপ্রাসের অট্টহাসে" অনাবিল পরিহাসের মধ্যে অধ্যাপকত্ব আছে। "কপালকুণ্ডলা-তত্ত্বে" অধ্যাপক ললিতকুমার সাহিত্যিক ললিতকুমারকে অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার "গরুর গাড়ী" প্রবন্ধ, শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'কর্ম্মযোগের টীকা'র ন্যায় বাঙ্গালা-সাহিত্যে অপূর্ব্ব দানসৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমাদের সাহিত্যে প্রকৃত Humour এবং Wit বা যাহা হাস্যরসের প্রাণবস্তু, তাহা খুব কমই পাওয়া যায়। ইন্দ্রনাথের লেখায় কিছু পরিচয় পাই, দীনবন্ধুর নাটকে, (যদিও তাহাতে কোন কোন স্থানে মার্জ্জিত রুচির অভাব আছে) বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্য ও কমলাকান্তে, রবীন্দ্রনাথের 'হাস্যকৌতুকে' ও 'ব্যঙ্গকৌতুকে' এবং অমৃতলালের রচনায় তাহার স্বরূপের পরিচয় পাই। বর্ত্তমান সাহিত্যে পরশুরাম, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ললিত বাবুই এই হাস্যরসকে সজীব রাখিয়াছেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, উপর্য্যুপরি শোকের আঘাতে তাঁহার 'ফোয়ারা' ও 'পাগলা ঝোরা' অকালে শুকাইয়া গেল; কাযেই লেখনী হইতে পরে বাহির হইল সেই স্বতঃস্ফুট অনাবিল রসিকতার পরিবর্ত্তে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা। শেষ জীবনের লেখায় তাঁহার জীবনের বেদনার করুণ সুর আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং সেই করুণ সুরই পাঠককে ব্যথিত করিয়া তোলে।

তাঁহার লেখার ভঙ্গীটি বড়ই চমৎকার। কোথাও জড়তা নাই, অনাবশ্যক সমাস বা অলঙ্কার-বাহুল্য নাই, অথচ চলিত ভাষাও নহে। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষা যেমন অনবদ্য ও আদর্শ, ললিতকুমারের ভাষাতেও তেমনই একটি সাবলীল গতি ছিল। তাঁহার লেখনী বাষ্পীয় যানের গতিতে চলিত না, সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ'র মত আশে-পাশে দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে চলিত। জীবনের ছোট-খাটো সব ঘটনাই তিনি দেখিতে পাইতেন এবং তিনিও কবি ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের মত বলিয়া গিয়াছেন—

"To me the meanest flower that blooms
Gives thoughts which are too deep for tears."

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

গুরুর স্মৃতি।—

অতীত যুগের গুরু দেখি নাই, তবে গুরুর কথা পড়িয়াছি বা শুনিয়াছি। গুরু-শিষ্যে সে যুগে কি মধুর সম্বন্ধ ছিল, তাহা পাঠ করিলে উপন্যাসের কল্পিত কথা বলিয়াই মনে হয়। আরুণি গুরু আয়োদধৌম্যের আদেশে স্বয়ং আইলরূপে প্রবল জলস্রোতের বিরুদ্ধে শয়ন করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। একলব্য অঙ্গহানি করিয়া গুরুদক্ষিণা দান করিয়াছিল। গুরুর নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে কর্ণ আত্মশরীরে কীটের ভীষণ দংশন সহ্য করিয়াছিল। অর্জ্জুন শরনিক্ষেপ দ্বারা গুরুর চরণ-বন্দনা করিবার পর তাঁহার বিপক্ষে রণক্ষেত্রে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল।

এ সব পুরাণ-কথা। অধিক দিনের কথা নহে, আমাদেরই এই বাঙ্গালা দেশের গুরু সিদ্ধ তিন্তিড়ীপত্র সহযোগে অন্নগ্রহণ ও দান করিয়া চতুষ্পাঠীতে দরিদ্র ছাত্রগণকে বিদ্যাবিতরণ করিয়াছিলেন, শিষ্যগণও গুরু ও গুরুপত্নীকে ইহপরকালের দেবদেবীস্বরূপ পিতামাতার মতই মনে করিত।

সে মধুর সম্বন্ধের যুগ এ দেশে আর নাই। বিজাতীয় অর্থকরী বিদ্যা দান ও গ্রহণের কল্যাণে সেই প্রাচীন প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, সেই ভাবধারারই সহিত আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। এখন যেন বিদ্যাশিক্ষায় বণিকের লেন-দেন কারবারের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অর্থ যোগাইতে পারিলে বিদ্যা আয়ত্ত করা যায়, যিনি সেই বিদ্যা দান করেন এবং যে গ্রহণ করে, তাঁহাদের মধ্যে অর্থের সম্বন্ধই বড়। কারণ, শিক্ষাদাতা জানেন, শিক্ষার্থীর অর্থের উপর তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় নির্ভর করে; শিক্ষার্থীও জানে, সে 'পয়সা দিয়া' বিদ্যা ক্রয় করে। এজন্য গুরু ও শিষ্যের মধ্যে বর্ত্তমানে যে সম্বন্ধ দেখা দিয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বের মধুর সম্বন্ধ না থাকিবারই কথা।

কিন্তু এই বিরুদ্ধ ঘটনাবলীর সমাবেশেও জাতির জন্মগত ভাবধারা কেমন যেন অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রচ্ছন্নভাবে গুরুশিষ্যের অন্তঃকরণে প্রবাহিত হইয়া থাকে। আমরা ভারতীয়, আমরা গুরুকে অতি শৈশব হইতেই কেমন একটা ভক্তিশ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত হই। আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাও আমাদিগকে সে বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকে। এই ধারণা কোমল মনে অঙ্কুরিত হইয়া বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়মূল হইয়া যায়।

বোধ হয়, এইটুকুর অস্তিত্ব আছে বলিয়া আমরা প্রথম যৌবনে অধ্যাপক ললিতকুমারের শিক্ষকতার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার একান্ত অনুরক্ত গুণমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমরা কলেজ-জীবনে একাধিক য়ুরোপীয় ও দেশীয় অধ্যাপকের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। তন্মধ্যে শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু, অধ্যাপক শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ বি, মুখার্জ্জি, অধ্যক্ষ মিঃ রো, মিঃ ম্যান, মিঃ পার্সিভ্যাল, মিঃ হিল, পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ কয়েক জন খ্যাতনামা অধ্যাপকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের সহিত ছাত্রবর্গের কেবল স্কুল-কলেজের সম্পর্ক ছিল না, ইঁহারা ছাত্রগণের অতি আপনার জন ছিলেন। আমাদের বেশ মনে আছে, পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বহুবাজারের বাড়ীতে গিয়া সদলে আবদার করিয়া খাওয়া, অধ্যাপক শ্যামাদাস বাবুর হিন্দু হোষ্টেলের ঘরে গিয়া খাবার আদায় করা ও তাঁহাকে লইয়া ফুটবল ক্লাব গড়া ও খেলা, আমাদের ডিবেটিং ক্লাবে অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র, অধ্যাপক ললিতকুমার প্রভৃতির যোগদান করা এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের থিয়েটারে অধ্যাপক রো, হিল ও উইলসনের উৎসাহ দান করা—তখনকার দিনে ছাত্রবর্গের মনে একটা অভূতপূর্ব্ব সম্প্রীতি ও সহযোগের ভাব আনয়ন করিয়া দিত।

ছেলেদের এ সব আমোদ-প্রমোদে অধ্যাপকরা ত যোগদান করিতেনই, অধিকন্তু তাঁহারা কেবল 'লেক্‌চার' দিয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিতেন না। আমাদের শিক্ষার জন্য তাঁহারা অশেষ পরিশ্রম করিতেন। তাহার পরিচয় আমরা পদে পদে পাইতাম। একবার মিঃ পার্সিভ্যাল, এমার্সনের Representative Men পড়াইতে গিয়া একটা পদ লইয়া মহা বিপদে পড়েন। পদটি এই:— The first men ate the earth and knew it was sweet. তিনি প্রথম দিন পাঠদানকালে বলিলেন, "এই পদটির অর্থ আমি যে ভাবে করিয়াছি, তাহা ঠিক কি না, এখনও আমি নিঃসংশয় হই নাই। তোমরা এখন এই অর্থটাই লিখিয়া লও। তবে আমি মিঃ ইমার্সনকে আমেরিকায় লিখিয়া পাঠাইয়াছি। তাঁহার উত্তর পাইলে পর

এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়া তোমাদিগকে ঐ পাঠটির ব্যাখ্যা লিখিয়া দিব।”

কত যত্ন করিয়া তখনকার কালে অধ্যাপকরা পাঠ দিতেন, তাহা ইহা হইতে বুঝিয়া দেখুন। অধ্যাপক ললিত-কুমারের পাঠ দেওয়াও ঠিক এই প্রকৃতির ছিল। তাঁহার ও অন্যান্য অধ্যাপকের নিকট যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চিতই বলিবেন, তাঁহার ন্যায় parallel passage দিয়া অর্থ বুঝাইতে তখনকার কালে (এখনকার কালে আছেন কি না জানি না) কেহ ছিলেন না। মিঃ ম্যান কতকটা এই প্রকৃতির অধ্যাপক ছিলেন। তবে তিনি ল্যাটিন, গ্রীক ও প্রাচীন ইংরাজী (Anglo saxon) ভাষাবিদ্ ছিলেন; প্রায় তাহা হইতে অনুরূপ পদ উদ্ধার করিতেন। উহা অনেক সময়ে বোধগম্য হইত না। কিন্তু অধ্যাপক ললিত-কুমার কেবল ইংরাজী সাহিত্যে নহে, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। এ জন্য যখনই কোন বিদেশী কবির মনোরম কাব্যের কোন একটা ভাবের ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হইত, তখনই তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে আমাদের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অগাধ সমুদ্র হইতে রত্ন আহরণ করিয়া তাহা বুঝাইয়া দিতেন। কালিদাস ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা যেন তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। সেই উৎস হইতে উদ্গত ভাবধারার সহিত ইংরাজী রচনার যেখানে সামঞ্জস্য ঘটিত, ললিতকুমার তাহা তৎক্ষণাৎ পরম প্রীতি-ভরে প্রফুল্লচিত্তে সুষ্ঠু আবৃত্তি করিয়া বুঝাইয়া দিতেন।

অখিলমিস্ত্রী লেনস্থ বাস ভবনের সম্মুখে ললিতকুমারের অন্তিম-শয্যা

তাঁহার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, যখন তিনি অমর কবি সেক্সপীয়ারের কোন নাটকের পাঠ দিতেন, তখন ছাত্রগণকে এক এক ভূমিকা আবৃত্তি করিবার ভার দিতেন এবং স্বয়ং কোন একটি ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। যেন প্রকৃতই মহাকবির নাটকীয় চরিত্রের অভিনয় হইতেছে, এইরূপই প্রতীয়মান হইত। মিঃ রো-ও এই ভাবে সেক্স-পীয়ার পড়াইতেন। উহাতে শিক্ষার্থীর মনে চরিত্র-চিত্র

যেরূপ স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইয়া যাইত, তাহা কেবল 'লেকচার' ও 'নোট' দানে কখনই হওয়া সম্ভবপর হইত না।

ছাত্রগণের সহিত সুষ্ঠু ও সরস রসালাপে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার মধ্যে হাস্যরসের যে অফুরন্ত উৎস ছিল, তাহা হইতে নানা পীযূষধারা দান করিয়া তিনি নীরস পাঠ্য পুস্তকের বিশ্লেষণে প্রাণসঞ্চার করিতে পারিতেন। শিক্ষকের পক্ষে ইহা সামান্য গুণের কথা নহে।

তাঁহার অন্যান্য অনেক গুণের কথা সুধী সাহিত্যিক-মণ্ডলীর মধ্যে অনেকে বিশদরূপে বর্ণনা করিবেন, আমি কেবলমাত্র তাঁহার শিক্ষক-জীবনের সামান্য পরিচয় প্রদান করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলাম। প্রার্থনা করি, তাঁহার মত অন্য সাহিত্যরস-রসিক শিক্ষকের সহায়তা ও সাহচর্য্য হইতে বাঙ্গালী ছাত্র যেন বঞ্চিত না হয়।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

অর্ঘ্য।—

সহৃদয়, সুরসিক, সাহিত্য-রসগ্রাহী ললিতকুমারের সহিত আমার কখন সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। কিন্তু সে অভাব তিনি তাঁহার অনন্যসাধারণ সহানুভূতিগুণে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। লেখকের রচিত 'বাসিফুল' উপহার পাইয়া আমার পুত্র এবং তাঁহার ছাত্র পার্ব্বতীনাথকে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"বাসিফুলের বিজ্ঞাপন অনেক দিন হইতে দেখিতেছি, কিন্তু গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু যে আমার অপরিচিত হইয়াও পরম পরিচিত, ইহা কোন দিন খেয়াল হয় নাই।"

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, কেউ আম খেয়ে চুপি চুপি কাপড়ে হাত-মুখ মুছে ফেলে, কেউ আর এক জনকে তার রসাস্বাদ করাবার জন্য ব্যগ্র হয়। ললিতকুমার ছিলেন এই শেষোক্ত শ্রেণীর। যাহাতে তাঁহার ছাত্রদিগের অন্তরে সাহিত্যরস পুষ্টিলাভ করে, সে সম্বন্ধে তাঁহার যত্ন ও চেষ্টার সীমা ছিল না। কত দিন শুনিয়াছি, সাহিত্যানুরাগী তাঁহার প্রিয় ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া তিনি পুরাতন পুস্তকের দোকানে গিয়াছেন এবং পঠনোপযোগী পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছেন।

ললিতকুমারের সহৃদয়তার আর একটি উদাহরণ অপর এক পত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। ঐ পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"—'ওথেলো' বহুদিন পূর্ব্বে উপহার পাইয়াছি এবং যে দুই বৎসর সেক্স্পীয়ারের নাটকখানি পাঠনা করিতে হইয়াছিল, সে সময়ে ছাত্র-সমাজে অনুবাদটির প্রচার করিয়াছি।"

অথচ এ সম্বন্ধে কোন দিনই আমি তাঁহাকে কোন অনুরোধ করি নাই।

যে কেহ ললিতকুমারের রস-রচনা পাঠ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন যে, এই নিরভিমান অধ্যাপকের রস-জ্ঞান ছিল যেমন গভীর, পাণ্ডিত্য ছিল তেমনই প্রগাঢ়। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং সাহিত্য-সেবা ভিন্ন এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের অন্য কার্য্য ছিল না। এই রস-রচনাই ছিল ললিতকুমারের বৈচিত্র্যবিহীন, নীরস জীবনের একমাত্র আমোদ। এমন নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, অথচ সহানুভূতিসম্পন্ন সমালোচক অল্পই দেখা যায়।

কিন্তু এই অনাবিল রস-স্রষ্টার শেষ জীবন নিরতিশয় বিষাদময়। নিয়তির পুনঃ পুনঃ আঘাতে তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিলেন। শেষ-শয্যা গ্রহণের তিন চারি মাস পূর্ব্বে তিনি লিখিয়াছিলেন—"জানি না, কত দিন এই বিষম জ্বালা সহিতে হইবে—কেন না, মরণ ভিন্ন শান্তির আর কোন পথ দেখি না।"

যাহারা ছাড়িয়া গিয়াছে, তাহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য এক দিকে একাগ্র কামনা, অন্য দিকে যাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাহাদের সহিত চির-বিচ্ছেদাশঙ্কা! জীবনে শান্তি কোথায়? কিন্তু বিজ্ঞ অধ্যাপকের উপরে উদ্ধৃত উক্তি যেন ভবিষ্যদ্বাণী।

লেখক যখন তাঁহাকে "শকুন্তলায় নাট্যকলা" ও "পরমহংসদেব" উপহার প্রেরণ করিয়াছিল, প্রাপ্তিস্বীকার করিবার সময় তিনি লিখিয়াছিলেন, "অনেক কথা জানাইবার আছে।"

হায়, মনের কথা মনেই রহিয়া গেল।

আমি ললিতকুমারকে "শ্রীচরণেষু" পাঠ লিখিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন—"আপনি ব্রাহ্মণহিসাবে আমাকে "শ্রীচরণেষু" পাঠ লিখিয়াছেন, কিন্তু আমি 'পরম-কল্যাণীয়েষু' গোছের একটা পাঠ লিখিতে পারিলাম না, কেমন যেন বাধে; আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ ও শ্রদ্ধাভাজন বলিয়া তদুপযুক্ত পাঠ না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রাচীন বর্ণাশ্রমের উপযুক্ত প্রথা আর এখন বজায় রাখা কঠিন।"

তিনি পাঠ লিখিয়াছিলেন—"সবিনয়-নিবেদন।"

সহৃদয় সুধীবর, জীবনে তোমাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি নিবেদন করিবার অবসর দাও নাই! তোমার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে আজ তাহাই নিবেদন করিতেছি। তোমার মহদুদার হৃদয় এক দিন অপরিচিতকে "পরম পরিচিত" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। আজ সেই অপরিচিতের ভক্তি ও প্রীতির অর্ঘ্য গ্রহণ কর।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় *
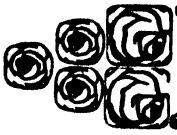
বঙ্গবাসী কলেজের সম্মুখে ললিতকুমারের কুসুমাস্তৃত দেহ

ভাগ্যহত বাঙ্গালীর নিষ্পেষিত জীবনের তলে
নিত্য মৌন হাহাকারে বেদনার তপ্ত অশ্রুজলে
যে কাহিনী হয় লেখা, তুমি তা'রে মুছি' চিরতরে
রসফল্গু বহায়েছ শুষ্কতপ্ত সে মরু-অন্তরে !
বক্ষে বহি চিতানল নির্ম্মম কালের অবিচার,
রুদ্ধ করি' হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত উৎস বেদনার,
বাণীর মন্দিরে তুমি দিয়ে গেছ, হে ভোক্তা ধীমান্
অম্লান অনঘ অর্ঘ্য ! নিজে তুমি নির্ব্বিকার প্রাণ
দুর্ভাগ্যের বিষটুকু কণ্ঠে ধরি' নীলকণ্ঠসম
বিলায়েছ সুধা শুধু ! ধ্যানে জ্ঞানে চির-অনুপম ;
বঙ্গ ভারতীর তুমি প্রিয়পুত্র পবিত্র সুন্দর,
বজ্র চেয়ে দৃঢ়, তবু সুকোমল তোমার অন্তর ।
হে মহান্ অধ্যাপক ! মুক্ত ছিল বৈভবের দ্বার,
সে পথে চল নি তুমি । ইন্দিরার মণি-মঞ্জুষার
দূরে ফেলি' প্রলোভন, হাস্যোজ্জ্বল চিরশান্ত মুখে
অম্লান আসন তব পাতিয়াছ বাঙ্গালার বুকে !

জ্ঞানের সুমেরু তুমি, দীপ্ত ভালে গৌরবের টীকা,
সেথা কভু দেখি নাই কোন দিন তুচ্ছ অহমিকা ।
হে সমালোচক সুধী, মানবের হৃদয়ের তলে
নিত্য যে সঙ্গীত বাজে কভু হাস্য কভু অশ্রুজলে,
সে সঙ্গীত শুনায়েছ দিকে দিকে অমর ভাষায় ;
বঙ্কিমের সৃষ্টি তুমি সার্থক করেছ মহিমায় !
তোমার কুহক-স্পর্শে সেক্সপীর জাগিত আবার,
ছন্দে ছন্দে ক'হে যেত অকথিত মর্ম্মবাণী তার,
আসিত বঙ্কিম ফিরে, তোমারে করিত আশীর্ব্বাদ,
তুমি তার জেনেছিলে হৃদয়ের গোপন-সংবাদ ।
ভারতীর বরপুত্র ! আরতির মন্ত্র গাহি' আজি
কে জ্বালিবে পঞ্চদীপ ? কে ভরিবে নির্ম্মাল্যের সাজি ?
কে বাজাবে শঙ্খ আর ? ঐ হের বিচ্ছেদ-ব্যথায়
কাঁদিছেন বীণাপাণি, বীণা ফেলি লুটায়ে ধূলায় !
হে অমর ! মৃত্যু শুধু উজ্জ্বল করেছে তব ভাল,
বঙ্গের হৃদয়ে তুমি জাগ্রত রহিবে চিরকাল ।

শ্রীকৃষ্ণধন দে ।
(অধ্যাপক, এম্, এ, বিদ্যানিধি)

---

* রজনীকান্ত গুপ্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরীর উদ্যোগে ও রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোকসভায় পঠিত ।

মণীন্দ্র-বিয়োগে

১

মৃত্যু নয়, মৃত্যু নয়—অনন্ত জীবন
লভিয়াছ মহাপ্রাণ বরিয়ে শমন,
মাটীর মমতা মায়া ত্যজি—ছায়াহীন কায়া
লভিয়াছ নরবর—নূতন চেতন,
স্বপ্নভঙ্গে নবলোকে নব জাগরণ।

মৃত্যু নয়, মৃত্যু নয়—এ মহাপ্রয়াণ
মরণের জয়যাত্রা, পুণ্য অভিযান ;
কি জানি কি কর্ম্মফলে
এসেছিলে ধরাতলে,
গলে চ'লে দান-যজ্ঞ করি সমাধান,
চিতানলে দিয়ে শেষ পূর্ণাহুতি প্রাণ!

৩

নিশি দিন শান্তিহীন জীবন-যাপন,
কণ্টকিত পথ 'পরে চির বিচরণ,
সহিয়ে যন্ত্রণা-জ্বালা
জন্মভূমি জপমালা,
মহাদায় ক্লান্তকায় নিদ্রায় মগন,
বিশ্বব্যাপী চিতাধূম চুমিছে গগন!

সত্য বটে মৃত্যু নয়, কিন্তু তবু হায়!
চির-বিরহিত হিয়া করে হায় হায়!
যে গেছে সে আসিবে না, হেসে কাছে বসিবে না,
আসে যদি ফিরে সে কি চিনিবে আমায়,
পূর্ব্ব-প্রীতি, পূর্ব্ব-স্মৃতি ফিরে কি সে পায়?

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

৫

জানি ভালো জ্বলে আলো নিবিলে আবার,
যোড়া যায় পুনরায় ছিন্ন পুষ্পহার ;
অতি অকিঞ্চিত যাহা ফিরে পুন পাই তাহা,
ফিরে না কেবল জীব—শিব নাম যার,
হারায়ে হৃদয়নিধি হাহাকার সার!

৬

ঐ ত ফুটিছে ফুল, লুটিছে পবন,
ছুটিছে তটিনীকূল, উঠিছে তপন ;
ভরিয়ে বিরাট ভূমি
সাধ' আছে, শুধু তুমি
হ'লে চির-অদর্শন, হে চিরস্মরণ!
চিরবঞ্চিতের চিরবাঞ্ছিত রতন!

নাহি আর দোলাহেলা সংশয়দোলায়,
ঘুচে গেছে জন্মশোধ জন্মভূমি-দায় ;
মায়া-মৃগ পিছে ছোটা,
পায় পায় কাঁটা ফোটা ;
অবিশ্রান্ত নামা-ওঠা আশা-নিরাশায়
পরের ভাবনা ভাবা বিনিদ্র নিশায়।

প্রীতি দিয়ে ভুলাইয়ে প্রীতি-পারাবার!
হেনে গেলে চির-শোক-শর তীক্ষ্ণধার,
চ'লে গেলে ফেলে একা, আর নাহি পাব দেখা,
পুণ্যশ্লোক, তব লোক অগম্য আমার,
সম্মুখে নিরখি শুধু স্তব্ধ অন্ধকার!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

রহস্যের খাসমহল

দশম প্রবাহ

আইনের কবলে

ইব্রাহিমের সুদীর্ঘ আঙ্গুলগুলি লোহার সাঁড়াশীর মত আমার গলায় চাপিয়া বসিল, আমার কণ্ঠরোধের উপক্রম হইল; প্রাণ যায় আর কি।—ইব্রাহিম প্রকাণ্ড যোয়ান; তাহার পেশীগুলি লোহার মত শক্ত, দেহেও অসাধারণ শক্তি। সে সবলে আমার গলা চাপিয়া ধরিয়া আনন্দে ও উৎসাহে মুখ দিয়া হিস্ হিস্ শব্দ করিতে লাগিল, যেন তাহা ক্রুদ্ধ সর্পের গর্জ্জনধ্বনি!

আমাকে সেই নরপিশাচের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য যোয়ান যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা! ইব্রাহিম এক ধাক্কায় তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিল। যোয়ান মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া গেল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "ওরে পশু! এই কায তোর? না, আমি উহাকে হত্যা করিতে দিব না।"

পর-মুহূর্ত্তেই একটি সুতীব্র লোহিতালোকের স্ফুলিঙ্গ সেই নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া আমার চক্ষু ধাঁধিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের গম্ভীর গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম। আরবটার সুদৃঢ় আঙ্গুলগুলা তৎক্ষণাৎ আমার কণ্ঠনলী হইতে খসিয়া পড়িল; ইব্রাহিম আরবী ভাষায় কুৎসিত গালি দিয়া আমার দেহের উপর ঢলিয়া পড়িল; তাহার দেহের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া আমিও তাহার সহিত ভূতলশায়ী হইলাম।

আমি ইব্রাহিমকে ঠেলিয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, সভয়ে হাত পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলাম, ইব্রাহিমের তাজা রক্তে আমার হাত ভিজিয়া গিয়াছে! সে পথের ধারে অসাড়ভাবে পড়িয়া রহিল, তাহার কোন অঙ্গ মুহূর্ত্তের জন্য নড়িল না।

আমার মুখে কোন কথা বাহির হইল না, যোয়ানও নির্ব্বাক্! সে তাহার হাতের পিস্তলটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি একটি দীপশলাকা জ্বালিয়া সেই আরবটার বিকটাকার বাদামী রঙ্গের মুখের উপর উঁচু করিয়া ধরিলাম। দারুণ যন্ত্রণায় তাহার মুখ তখন অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল। সে চক্ষু নিমীলিত করিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া ছিল; দীর্ঘ দাঁতগুলি কুকুরের দাঁতের মত সাদা।

যোয়ান ইব্রাহিমের মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! আমি উহাকে হত্যা করিলাম?"—সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

আমি সংযতস্বরে বলিলাম, "হাঁ, আমার প্রাণরক্ষার জন্য উহাকে গুলী করিয়া মারিয়াছ।"

যোয়ান কাতরভাবে বলিল, "নরহত্যা করিলাম! ধরা পড়িলে আমার ফাঁসী হইবে; এই মুহূর্ত্তেই আমাকে পলাইতে হইবে।"

আমি ম্যাচ-বাক্সের আর একটা কাঠী জ্বালিয়া ইব্রাহিমের ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিলাম। গুলী তাহার বাঁ কাঁধের নীচে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার নীলবর্ণ সার্জ্জের জ্যাকেট রক্তে ভিজিয়া গিয়াছিল। ইব্রাহিমের অসাড় দেহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলাম, দেহে প্রাণ নাই; বক্ষের স্পন্দন রহিত হইয়াছিল। এক গুলীতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

যোয়ান জড়িত স্বরে বলিল, "আরবটা কি সত্যই মরিয়াছে ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, সে আর কখন তোমাকে বিরক্ত করিতে পারিবে না।"

যোয়ান দুশ্চিন্তায় ও আতঙ্কে অধীর হইয়া দুই হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল, "আমি এ কি ভয়ানক কায করিলাম, মিঃ কোলফাক্স! এখন আমি কি করিব ? কিরূপে আত্মরক্ষা করিব ? পলায়ন করিয়াও ত আমার নিস্তার নাই! সে যখন এ কথা জানিতে পারিবে, তখন আমাকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত হইতে খুঁজিয়া বাহির করিবে; আমি লুকাইলেও ধরা পড়িব।"

আমি বলিলাম, "কাহার কথা বলিতেছ ? কে তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে ?"

যোয়ান বলিল, "আমার বাবা।—আমি ইব্রাহিমকে হত্যা করিয়াছি, ইহা জানিতে পারিলে সে আমাকে হত্যা করিবে; তাহার প্রতিহিংসা ভয়ানক।"

আমি যোয়ানের কাঁধে হাত রাখিয়া কোমল স্বরে বলিলাম, "তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছ; যদি তুমি উহাকে সে সময় গুলী না করিতে, তাহা হইলে এতক্ষণ আমার মৃতদেহ ঐ স্থানে পড়িয়া থাকিতে দেখিতে।"

যোয়ান দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আকুল স্বরে বলিল, "আমি উহাকে খুন করিয়াছি; এই আরবটা আমার জীবনের সুখশান্তি হরণ করিয়াছিল, এ জন্য আমি উহাকে ঘৃণা করিতাম। আজ না হইলেও এক দিন উহাকে গুলী করিয়া মারিতাম।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আজ তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ। এই উপকার আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। যদি তোমার পিতা তোমার অনিষ্টের চেষ্টা করে, তাহা হইলে আমি উহাকে শাস্তি দিব।"

যোয়ান দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, আপনি তাহা করিতে পারিবেন না। নিজের শক্তি-সামর্থ্যে আপনার বিশ্বাস আছে। কারণ, বাবার কোন কোন গুপ্ত রহস্য আপনি জানিতে পারিয়াছেন, কিন্তু বাবা কিরূপ ধূর্ত্ত, ফন্দীবাজ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সকল রকম কুকর্ম্মে কিরূপ অকুণ্ঠিত—তাহা ধারণা করাও আপনার অসাধ্য।—আপনি এবং আমি—আমরা উভয়েই তাহার নিকট শিশুর ন্যায় দুর্ব্বল। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিব না।"

আমি বলিলাম, "কার্য্যকালে তাহার পরীক্ষা হইবে।"

যোয়ান অস্ফুটস্বরে বলিল, "কিন্তু সে আমাদিগকে দেখিতে না পায়—তাহার উপায় করিতেই হইবে। আজ রাত্রে এই মুহূর্ত্তেই আমি পলায়ন করিব, এ বিষয়ে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আমি আপনার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছি, মিঃ কোলফাক্স! ইব্রাহিম আর কিছুকাল বাসায় না ফিরিলে বাবা তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইবে। তাহার কি ফল হইবে, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না ?"—সে আমার বাহু স্পর্শ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল।

আমি বলিলাম, "তবে কি তোমার বাবাও ঐ হোটেলে আছে ?"

যোয়ান বলিল, "হাঁ, আছে।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু তোমার ত দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। সে ইব্রাহিমের সন্ধানে আসিয়া তাহার মৃতদেহ দেখিতে পাইলে মনে করিবে, সে আমাকে গোপনে আক্রমণ করিতে আসিয়া আমার গুলীতেই নিহত হইয়াছে। সুতরাং তাহার ধারণা হইবে, আমিই ইব্রাহিমকে খুন করিয়াছি।"

যোয়ান বলিল, "আপনার এই অনুমান সত্য হইতেও পারে। কিন্তু এখন এ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিয়া সময় নষ্ট করা উচিত নহে। এখন আমরা কি করিব, তাহাই বলুন; আপনি কি কোন উপায় স্থির করিয়াছেন ?"

আমি বলিলাম, "হেস্কওয়ার্দির কাছে আমার গাড়ী আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সেখানে যাইতে হইলে তোমাকে গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতেই হইবে, সেই পথে তোমার যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা আছে।"

যোয়ান ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আমি এই অঞ্চলে পাঁচ ছয়বার আসিয়াছি। এ জন্য এ দিকের পথঘাট আমার সুপরিচিত। আমার বাবা গ্রীষ্মকালে এখানকার নদীতে মাছ ধরিতে আসে। আপনি এক কায করিলে আমি নির্ব্বিঘ্নে আপনার সঙ্গে পলায়ন করিতে পারিব। আপনি আপনার গাড়ী লইয়া বাঁ ধারের রাস্তা দিয়া কিছু দূর চলিয়া আসিবেন। একটি পথ হোটেলের

পাশ দিয়া গিয়াছে, আর একটি পথ গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। সেই পথে আসিলে বাঁ ধারে আর একটি পথ দেখিতে পাইবেন। একটি সঙ্কীর্ণ গলি দিয়া কিছু দূর যাইলেই আমি আপনার গাড়ীর কাছে উপস্থিত হইতে পারিব। অন্ধকারে আমার চলিবার অসুবিধা হইবে না।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আমি তোমাকে একাকী ছাড়িয়া দিতে পারিব না।"

যোয়ান বলিল, "ইহা ভিন্ন আমার পলায়নের অন্য কোন উপায় নাই। আপনার ম্যাচ-বাক্সটা পাইলে আমি নির্ব্বিঘ্নে সেই স্থানে যাইতে পারিব। আমি সেখানে উপস্থিত হইয়া আলো জ্বালিলেই আপনি আমাকে দেখিতে পাইবেন।"

আমি আমার ম্যাচ-বাক্সটা তাহার হাতে দিলে সে আমার নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল। আমি কয়েক গজ পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিয়া আরবটার মৃতদেহের নিকট ফিরিয়া আসিলাম। তাহার পর তাহার দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার পকেট হাতড়াইতে লাগিলাম। তাহার জ্যাকেটের ভিতরের পকেটে যে কাগজ ছিল—তাহা চিঠি-পত্র বলিয়াই মনে হইল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহা বাহির করিয়া লইয়া পকেটে ফেলিলাম। অতঃপর আমি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া হোটেলের পার্শ্ববর্ত্তী পথ অতিক্রম করিলাম। সেই পথে জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে আমার গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম। শকট-চালক গাড়ীর ভিতর কাত হইয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছিল দেখিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

আমার বিশ্বাস হইল, শকটচালক বা গ্রামের কোন লোক সেই পিস্তলের আওয়াজ শুনিতে পায় নাই। এই অঞ্চলে যে সকল অরণ্য আছে, সেই সকল অরণ্যে শিকারের জন্য অনেক জানোয়ার থাকে, অরণ্য-রক্ষকরা রাত্রিকালে কখন কখন বন্দুকের শব্দ করে। এ জন্য বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইলেও গ্রামবাসীরা কোন বিভ্রাটের আশঙ্কা করে না।

আমি শকট চালকের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাহাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গাড়ী লইয়া যাইতে আদেশ করিলাম। গাড়ী গ্রামের বাহিরের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল ; প্রায় এক মাইল [illegible] গিয়া গাড়ী থামাইলাম এবং সেই স্থানে যোয়ানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

যোয়ানকে সেই রাত্রিকালে নির্জ্জন বনপথ দিয়া সেখানে আসিতে দেখিলে আমার শকট-চালকের মনে কৌতূহলের সঞ্চার হইতে পারে, এই আশঙ্কায় আমি তাহাকে সংক্ষেপে জানাইয়া রাখিলাম—আমার প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাতের জন্যই আমাকে এত দূর আসিতে হইয়াছে, এবং এখানে আমি তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি। তাহাকে আরও বলিলাম, সে কোন দিকে আলো দেখিতে পাইলেই সে কথা আমাকে জানাইবে। আমরা যে দিক্ হইতে আসিয়াছিলাম, সেই দিকে আমি নির্নিমেষ-নেত্রে চাহিয়া রহিলাম।

আমি ভাবিলাম, আমাদের পলায়নের পূর্ব্বেই যদি কেহ আরবটার মৃতদেহ দেখিতে পায়, তাহা হইলে কি আমাদিগকে বিপন্ন হইতে হইবে না? ইব্রাহিমের মৃতদেহ কাহারও না কাহারও দৃষ্টিগোচর হইবেই, তাহার পর পুলিস আমার গাড়ীর সোফেয়ারের সন্ধান পাইলে তাহাকে ধরিয়া জেরা আরম্ভ করিবে। তাহার নিকট তাহারা আমার পরিচয় জানিতে পারিবে ; তাহারা শুনিতে পাইবে, আমি লণ্ডন হইতে টেলিগ্রাম করিয়া ষ্টেশনে আমার জন্য গাড়ী রাখিতে আদেশ করিয়াছিলাম, এবং সেই গাড়ীতে গ্রামে আসিয়া সোফেয়ারকে আমার প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া আমি একাকী স্থানান্তরে গিয়াছিলাম ; অবশেষে একটি রমণী গোপনে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। এই সকল বিবরণ শুনিলে আমার সম্বন্ধে পুলিসের ভাল ধারণা হইবে না। এমন কি, আমি সত্য কথা বলিলেও তাহারা তাহা বিশ্বাস করিবে না। আমার কথাগুলি যে সত্য, ইহা আমি কিরূপে সপ্রমাণ করিব?

আমি আমার সোফেয়ারের হাতে একটি চুরুট দিয়া অধীরভাবে যোয়ানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। শীতের রাত্রিতে ডার্টমুরের আরণ্য পথে তাহার বিপন্ন হইবার আশঙ্কা ছিল ; এই জন্য যোয়ানকে না দেখিয়া আমার ভয় ও দুশ্চিন্তা বর্দ্ধিত হইল। শকট-চালকের নিকট হইতে তাহার ম্যাচ-বাক্সটা চাহিয়া লইয়া দীপশলাকার আলোকে আমি ঘড়ি দেখিলাম। বুঝিলাম, আমরা সেখানে আধঘণ্টা অপেক্ষা করিয়াছি, কিন্তু তখনও যোয়ানের সাক্ষাৎ নাই ; আমি পুনঃ পুনঃ আরণ্য পথের দিকে চাহিতে লাগিলাম, কিন্তু

যোয়ানের সাঙ্কেতিক আলোক দেখিতে পাইলাম না। তখন চতুর্দ্দিক্ এরূপ নিস্তব্ধ যে, আমি নিজের বক্ষের স্পন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। সোফেয়ার গাড়ীর মাথার আলো নিবাইয়া বনপথের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তাহার আশা পূর্ণ হইল না। সে বিরক্তিভরে বলিল, "এই অন্ধকার রাত্রিতে বনের ধারে আর কতক্ষণ বসিয়া থাকিব, মহাশয়! আমার বিশ্বাস, সেই মহিলাটি আপনার প্রতীক্ষায় আরও কিছু দূরে দাঁড়াইয়া আছে।—আর কিছু দূর অগ্রসর হইব কি?"

আমি তাহার প্রশ্নে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে সে সম্মুখে অগ্রসর হইল। গাড়ী সেই পথে চলিতে চলিতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, অবশেষে আমরা একটি পাহাড়ের সানুদেশে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে গাড়ী থামাইবামাত্র আমরা কিছু দূরে মৃদু আলোকরশ্মি দেখিতে পাইলাম।

আমি আগ্রহভরে সোফেয়ারকে বলিলাম, "ঐ দেখ, সে আসিতেছে। চল, আমরা আর একটু আগাইয়া যাই।"

যোয়ান যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, আমরা অল্পক্ষণ পরে সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম।

যোয়ান আমাকে দেখিয়া প্রফুল্লভাবে বলিল, "আপনি কি মনে করিয়াছিলেন, আমি এখানে আসিব না?"

সে আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া শকট-চালককে বলিল, "প্লি মাউথে পৌঁছিতে আমাদের কত সময় লাগিবে, সোফেয়ার?"

শকট-চালক বলিল, "এই রাত্রিকালে সেখানে পৌঁছিতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগিতে পারে, মিস্!"

যোয়ান বলিল, "আমরা এখন সেখানেই যাইব, তুমি যত শীঘ্র পার, আমাদিগকে সেখানে পৌঁছাইয়া দাও, সোফেয়ার!"

আমি যোয়ানকে গাড়ীতে তুলিয়া লইলাম, এবং তাহাকে আমার পাশে বসাইয়া একখানি কম্বল দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিলাম। আমার আদেশে সোফেয়ার সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রান্তরের ভিতর দিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিল। যোয়ান আমার পাশে বসিয়া অত্যন্ত গম্ভীর-ভাবে সম্মুখে চাহিয়া রহিল; আমি অন্ধকারে তাহার মুখ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে না পাইলেও তাহার মানসিক উৎকণ্ঠা বুঝিতে পারিলাম।

দীর্ঘকাল পরে বহুদূরবর্ত্তী দীপালোক আমাদের দৃষ্টি-গোচর হইল; বুঝিলাম, সেগুলি প্লিমাউথের বন্দরের আলোক।

যোয়ান হঠাৎ আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মৃতদেহটা কখন্ লোকের নজরে পড়িবে?"

আমি বলিলাম, "বোধ হয়, কা'ল সকালে।"

যোয়ান বলিল, "স্থানটি নির্জ্জন হইলেও সকালে কেহ না কেহ তাহা দেখিতে পাইবেই। আমি কি করিব? কোথায় যাইব?"

আমি বলিলাম, "লণ্ডনে ফিরিয়া চল। লণ্ডনের মত নিরাপদ স্থান এ দেশে আর কোথাও পাইবে না।"

কথাগুলি এরূপ মৃদুস্বরে বলিলাম যে, শকট-চালক তাহা শুনিতে পাইল না। আমি বুঝিয়াছিলাম—ইব্রাহিমের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইলে আমাকেই সন্দেহভাজন হইতে হইবে, আমি বিপন্ন হইব। সংবাদপত্রে ইব্রাহিমের মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশিত হইলে আমার শকট-চালক তাহা জানিতে পারিবে। সে স্থানীয় লোক, এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ তাহার অগোচর থাকিবে না এবং এ বিষয়ের আন্দোলন আরম্ভ হইলে সে কোন কথা গোপন করিবে না, সে যাহা জানে, তাহা পুলিসের গোচর করিবে। তাহার পর আমাকে খুঁজিয়া বাহির করা পুলিসের অসাধ্য হইবে না। কারণ, আমি এই গাড়ী ভাড়া করিবার সময় আমার নাম প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমাদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ হইবে। কুপ তাহার কন্যাকেই অপ-রাধিনী মনে করিবে, শকট-চালক আমাকেই হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিবে।

কিন্তু ইব্রাহিম যোয়ানের গুলীতে কি সত্যই নিহত হইয়াছে? আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম, আমি তাহার দেহ পরীক্ষা করিয়া প্রাণের কোন চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। যদি যোয়ান গুলী করিয়া তাহাকে হত্যা না করিত, তাহা হইলে ইব্রাহিম আমাকে জীবিত অবস্থায় ত্যাগ করিত না, আমার মৃতদেহ তাহার পরিবর্ত্তে সেই নির্জ্জন পথের ধারে পড়িয়া থাকিত।

কুপ জানে, আমি তাহার গুপ্তকথা জানিতে পারিয়াছি, এ জন্য সে আমাকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল।

আমি য়োয়ানকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে তোমাকে হেক্সওয়ার্দ্দিতে আসিতে বলিয়াছিল ?"

য়োয়ান বলিল, "আমার বাবা।"

আমি বলিলাম, "সে লণ্ডনে থাকিলে ধরা পড়িতে পারে—এই আশঙ্কায় বোধ হয় সে ওখানে পলায়ন করিয়াছিল ? আমি তাহাকে লণ্ডনে যে ভাবে খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম—তাহা জানিতে পারিয়া সে লণ্ডনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল।"

য়োয়ান বলিল, "হইতেও পারে, কিন্তু সে কি কারণে হঠাৎ লণ্ডন ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা আমার অজ্ঞাত।"

য়োয়ান তাহার হাতখানি ধীরে ধীরে আমার হাতের উপর রাখিল; তাহার কোমল করস্পর্শে আমার দেহে শোণিতের বেগ প্রখর হইল। আমি ভাবিলাম, য়োয়ানকে আমি সত্য সত্যই ভালবাসি। তাহার প্রতি আমার এই আকর্ষণ—প্রেম না মোহ ?

আমি বলিলাম, "আমাকে ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতা হইয়াছিল ? তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছ—ইহা তোমার পিতার জানা থাকিলে সে বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিল, আমি তোমাকে দেখিতে যাইব, এই জন্যই সে আমাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে ইব্রাহিমকে আমার অনুসরণ করিতে বলিয়াছিল। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিব, এ সংবাদ তোমার পিতা জানিত কি ?"

য়োয়ান ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আমার বাবার অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই। আপনার কথা শুনিয়া আমার মনে হইতেছে, আমি যখন আপনার বাড়ীতে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম, সেই সময় বাবা বা ইব্রাহিম গোপনে আমার অনুসরণ করিয়াছিল এবং আপনার দেখা না পাওয়ায় হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলাম, ইহাও বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছিল। সুতরাং আমি আপনাকে আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য প্রবাসে আসিতে অনুরোধ করিয়া চিঠি-পত্র লিখিয়াছি, ইহা বাবা সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু আপনাকে এ ভাবে বিপন্ন করিবার জন্য বাবা কোন কৌশল অবলম্বন করিবে, এ সন্দেহ মুহূর্ত্তের জন্য আমার মনে স্থান পায় নাই। মিঃ কোলফাক্স, আমার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই আপনাকে ফাঁদে পড়িতে হইয়াছিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আপনি বাবার কৌশল ব্যর্থ করিয়াছেন। আপনার জীবন বিপন্ন হয় নাই।"

আমি বলিলাম, "সে তোমারই অনুগ্রহে মিস্ য়োয়ান! তোমার কাছে পিস্তলটা না থাকিলে আমার প্রাণ রক্ষা করা তোমার অসাধ্য হইত। আমি এই দ্বিতীয়বার তোমার সাহায্যে শত্রুকবল হইতে উদ্ধারলাভ করিলাম।"

একাদশ প্রবাহ

রহস্য-সূত্রের অনুসরণ

প্লিমাউথে উপস্থিত হইয়া ছদ্মবেশ ধারণের জন্য আমি ব্যাকুল হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে দোকানগুলি সে সময় খোলা ছিল। আমি রয়াল হোটেলে নামিয়া মোটর-চালককে তাহার প্রাপ্য ভাড়া দিয়া বিদায় করিলাম।

মোটর-চালক আমার ব্যবহারে বিস্মিত হইল; তাহার আশা ছিল, আমি সেই স্থানের ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী টট্নেসে ফিরিয়া যাইব। কিন্তু সে আমাকে সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই আমি তাহাকে বলিলাম, আমার সঙ্গিনী দীর্ঘপথ-ভ্রমণে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন, তিনি সেই রাত্রিতে প্লিমাউথে বিশ্রাম করিবেন, এই জন্য আমাকেও সেখানে রাত্রিবাস করিতে হইবে।

আমি পুরস্কারস্বরূপ মোটর-চালকের হাতে দুইটি গিনি দিয়া বলিলাম, "আজ রাত্রে তুমি আমাদিগকে তোমার গাড়ীতে লইয়া কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছ, তাহা ভুলিয়া যাইতে পারিবে ত? ইহার সহিত একটি ভদ্র মহিলার সুনামের সম্বন্ধ আছে। তুমি ভদ্রলোক, আমার সঙ্গিনীকে অপদস্থ হইতে না হয়, সে দিকে নিশ্চিতই তোমার লক্ষ্য থাকিবে।"

মোটর-চালক গিনি দুইটি পকেটে ফেলিয়া উৎসাহ-ভরে বলিল, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, এ জন্য আমাকে অনুরোধ না করিলেও চলিত। গাড়োয়ানী করি বলিয়া কি আমার বুদ্ধি-বিবেচনা নাই? আপনার মত কত ভদ্রলোক মহিলা সঙ্গে লইয়া এই ভাবে রাত্রিকালে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করেন, আমিই তাঁহাদিগকে লইয়া যাই; তাঁহাদের কথা কি কাহারও নিকট প্রকাশ করি? উহা প্রকাশ করিলে কি আমাদের ব্যবসা চলে?"

আমি বলিলাম, "সে কথা সত্য ; আশা করি, তোমার সুবিবেচনার উপর নির্ভর করিতে পারিব।"

এই সকল কথা বলিয়াই আমার মনে হইল, মোটর-ড্রাইভারটাকে এ ভাবে সতর্ক করা ভাল হইল কি ? হয় ত ইহার ফল উল্টা হইতে পারে। কিন্তু ধরা পড়িবার ভয়ে আমি তখন ব্যাকুল হইয়াছিলাম, কাযটি ভাল করিলাম কি না, তাহা বিবেচনা করিবার শক্তি ছিল না।

আমি যোয়ানকে সঙ্গে লইয়া হোটেল ত্যাগ করিলাম, একটা পোষাকের দোকানে গিয়া ভ্রমণোপযোগী পুরু কোট ও টুপী কিনিলাম, এবং সেই পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া আমাদের পরিহিত পরিচ্ছদ একটি ট্রাঙ্কে পুরিয়া ফেলিলাম। যোয়ানও হোটেলে ফিরিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তিত করিল। নূতন বেশে তাহাকে আরও অধিক সুন্দরী বলিয়া মনে হইল। আমি তাহাকে বলিলাম, "নূতন পোষাকে তোমার চেহারার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তোমার পরিচিত কোন লোক দূর হইতে দেখিলে হঠাৎ তোমাকে চিনিতে পারিবে না।"

যোয়ান আয়নায় মুখ দেখিয়া একটু হাসিল, তাহার পর আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনারও চেহারার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আপনার ঐ কোট ও টুপীতে কোন পরিচিত লোক আপনাকেও চিনিতে পারিবে না।"

অতঃপর আমরা উভয়েই রঙ্গ ও তুলির সাহায্যে মুখের স্বাভাবিক ভাবের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিলাম। কয়েক মিনিট পরে আরদালীকে ডাকিয়া আমার ট্রাঙ্কটা হোটেলের গাড়ী-বারান্দায় পাঠাইয়া দিলাম। আমরা যে ট্যাক্সিতে হোটেলে ফিরিয়াছিলাম, তাহা সেখানে আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। ২০ মিনিট পরে সেই গাড়ীতে আমরা লণ্ডনে যাত্রা করিলাম।

সুদীর্ঘ পথ, দীর্ঘকাল গাড়ীতে বসিয়া থাকা কষ্টকর হইল। যোয়ান কিছু কাল পরে ঢুলিতে লাগিল ; কিন্তু আমি নিদ্রাহীন নেত্রে তাহার পাশে বসিয়া রহিলাম। সে ঢুলিতে ঢুলিতে মধ্যে মধ্যে ভয় পাইয়া চমকিয়া উঠিতেছিল। তাহার বিবর্ণ মুখ ও কম্পিত ওষ্ঠের দিকে চাহিয়া আমি তাহার মানসিক উদ্বেগ ও আতঙ্ক বুঝিতে পারিলাম। সেই কদাকার বিশালদেহ আরবটার বিকট মূর্ত্তি মধ্যে মধ্যে আমার মানসনেত্রে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। আমার মনেও বিন্দুমাত্র স্ফূর্ত্তি ছিল না, আমার প্রণয়িনী আমার পার্শ্বে বসিয়া থাকিলেও আমি আনন্দ লাভ করিতে পারিলাম না, কি যেন একটা পাষাণ ভার আমার বুকের উপর চাপিয়া রহিল।

রাত্রি ৩টার কয়েক মিনিট পরে আমরা প্যাডিংটনে উপস্থিত হইলাম। পুলিস হয় ত পূর্ব্বেই আমার বাড়ীতে হানা দিয়াছে, আমাকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিলেই গ্রেপ্তার করিবে—এই ভয়ে আমি আমার বাড়ীর দিকে না গিয়া কিংস ক্রশ ষ্টেশনে আসিলাম এবং প্রত্যূষে পাঁচটার সময় গ্রান্থামগামী এক্সপ্রেস ট্রেণে উঠিয়া বসিলাম। যোয়ানও আমার সঙ্গে ছিল।

গ্রান্থামে উপস্থিত হইয়া আমরা এঞ্জেল এণ্ড ক্রাউন নামক হোটেলে আশ্রয় লইলাম। সেই স্থানেই আমরা প্রাতর্ভোজন শেষ করিলাম। কিন্তু আহারে বসিয়া হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পড়ায় আতঙ্কে অভিভূত হইলাম।

আমি যোয়ানকে আড়ষ্টস্বরে বলিলাম, "পিস্তলটা কোথায় ?"

যোয়ান বলিল, "আমি সেইখানেই ফেলিয়া আসিয়াছি।"

আমি ব্যাকুলভাবে বলিলাম, "কি সর্ব্বনাশ ! তুমি কেন তাহা সেখানে ফেলিয়া আসিলে ?—উহা তোমারই পিস্তল—ইহা সহজেই সপ্রমাণ হইবে। তোমার বিরুদ্ধে ইহা যে সাংঘাতিক প্রমাণ !"

যোয়ান অচঞ্চল স্বরে বলিল, "না, উহা তাহারই নিজের পিস্তল। আমি যখন তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম, সেই সময় তাহার পকেটের পিস্তলের উপর আমার হাত পড়িয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তেই আমি তাহা তাহার পকেট হইতে বাহির করিয়া লইয়া তাহাকে গুলী করিয়াছিলাম।"

যোয়ানের কথা শুনিয়া আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। তখন প্রভাত হইয়াছিল, সুতরাং ইব্রাহিমের মৃতদেহে কাহারও না কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ রহিল না। সেই দিন সায়ংকালে লণ্ডনের সান্ধ্য দৈনিকে এই হত্যাকাণ্ডের বিবরণ প্রকাশিত হইবে, ইহাও বুঝিতে পারিলাম। আরবটার পকেট হইতে যে সকল চিঠিপত্র বাহির করিয়া লইয়াছিলাম, তাহা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু সেই সকল পত্রে কোন

গুপ্তরহস্যের সন্ধান পাইলাম না। পত্রগুলিতে শিরোনামা ছিল না। আমি যে ইব্রাহিমের পকেট হইতে সেই সকল পত্র হস্তগত করিয়াছিলাম, এ কথা যোয়ানকে জানাইলাম না।

অতঃপর আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলাম। স্থির হইল, যোয়ান সেই স্থানেই দুই এক দিন থাকিবে, আমি একাকী লণ্ডনে ফিরিয়া যাইব।

আমরা যে কক্ষে বসিয়া পরামর্শ করিতেছিলাম—সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল। সেখানে অন্য কোন লোক ছিল না।

আমি যোয়ানের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "যোয়ান, আমি তোমার নাম ধরিয়া ডাকিলাম, আমার এই ঘনিষ্ঠ ব্যবহারের জন্য তুমি অসন্তুষ্ট হইও না। আমরা এখন উভয়েই বিপন্ন, এই বিপদের সময় আমাদের পরস্পরের প্রতি বন্ধুবৎ আচরণই কর্ত্তব্য।"

যোয়ান বলিল, "সে কথা সত্য, মিঃ কোল্‌ফাক্স। আমরা বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি, এ বিষয়ে কি সন্দেহের অবকাশ আছে?"

এই কথা বলিবার সময় যোয়ান সলজ্জদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া মাথা নামাইল, তাহার সহিত আমার দৃষ্টিবিনিময় হইল; সেই দৃষ্টি কি মধুর! তেমন সুন্দর চক্ষু আমি আর কাহারও দেখি নাই।

আমি বলিলাম, "এই সঙ্কটকালে আমাদিগকে পরস্পরের উপর নির্ভর করিতে হইবে, এই জন্য আমি তোমার নিকট একটি কথা জানিতে চাই; তাহা জানিতে পারিলে আমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে পারিব।"

যোয়ান বলিল, "আপনি কোন্ কথা জানিতে চাহেন?"

আমি বলিলাম, "তোমার পিতার বাসগৃহের সন্ধান।"

যোয়ান তৎক্ষণাৎ বলিল, "না, আপনাকে তাহার বাড়ীর সন্ধান দিতে পারিব না, সে শক্তি আমার নাই। আমি আমার পিতার গুপ্তরহস্য প্রকাশ করিতে অসমর্থ।"

আমি ক্ষুব্ধভাবে বলিলাম, "তুমি আমার অনুরোধ-রক্ষায় অসম্মত? এখনও তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না?"

যোয়ান বলিল, "আপনি জানেন—আমি আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি; আপনাকে বিশ্বাস করি বলিয়াই আপনার সঙ্গে পলাইয়া আসিয়াছি। কিন্তু আমার পিতার গুপ্তকথা প্রকাশ করি, সে শক্তি, সেরূপ সাহস আমার নাই।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু ও কথা আমার নিকট প্রকাশ না করিলেও তোমার মঙ্গল নাই, তাহা ত তুমি জান। তুমি নিজেই বলিয়াছ, ইব্রাহিম নিহত হওয়ায় তোমার পিতা যে উপায়ে হউক তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে। সে কি উদ্দেশ্যে তোমাকে ধরিবার চেষ্টা করিবে, তাহাও তোমার অজ্ঞাত নহে। এ অবস্থায় তুমি তোমার পিতার বাসস্থানের সন্ধান বলিতে ভয় পাইতেছ কেন? কোন্ আশায় তুমি তাহার গুপ্তরহস্য গোপন করিতেছ?"

যোয়ান বিচলিত স্বরে বলিল, "তাহার কারণ আছে।"

আমি বলিলাম, "পূর্ব্বে যে সকল কারণ বলিয়াছ, তাহার অতিরিক্ত নূতন কোন কারণ আছে না কি?"

যোয়ান বলিল, "হাঁ, আছে। আপনি ত জানেন, আমার পিতার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া আপনি যে সকল উত্তর পাইয়াছেন, তাহাতে আপনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।"

আমি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলাম, "কিন্তু তুমিও বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ, তোমার নিকট আশানুরূপ উত্তর না পাইলেও আমি তাহার বাসগৃহ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিব না। আমার বিশ্বাস, আমার চেষ্টা সফল হইবে, সে কোথায় লুকাইয়া আছে—তাহা আমি জানিতে পারিব। আমার প্রতিজ্ঞা অটল।"

যোয়ান আতঙ্কবিহ্বল স্বরে বলিল, "না, না, ও কায আপনি করিবেন না; আপনি আর তাহার সন্ধান লইবেন না। সে চেষ্টায় ক্ষান্ত হউন; আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা না করিলে বিপন্ন হইবেন, তাহার ফল শোচনীয় হইবে। আপনি যত দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহার অধিক আর পদমাত্র অগ্রসর হইবেন না।"

যোয়ানের কথা শুনিয়া আমি ক্রোধে বিচলিত হইলাম, আমার জিদ্ বাড়িয়া গেল; কৌতূহলও প্রবল হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ যোয়ানের ব্যবহার অস্বাভাবিক, বিস্ময়াবহ ও রহস্যময় বলিয়াই আমার ধারণা হইল। সে তাহার পিতার অপকর্ম্ম ও ঘৃণিত ব্যবহারের জন্য তাহাকে ঘৃণা করিত, অথচ তাহার গুপ্তকথা প্রকাশ করিতেও সে

অসম্মত। তাহার পিতৃভক্তিই যে এই অসম্মতির কারণ, ইহা বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। পিতার প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাভক্তি ছিল না। সে তাহার পিতাকে যমের মত ভয় করিত, এবং পাছে তাহার পিতা তাহাকে কঠোর যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করে বা অন্য কোনরূপে উৎপীড়ত করে, এই ভয়ে সে তাহার গুপ্তরহস্য প্রকাশ করিত না।

আমি এক ঘণ্টা ধরিয়া তাহার সহিত তর্ক-বিতর্ক করিলাম, কিন্তু আমার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। অবশেষে আমি ক্ষুণ্নমনে তাহার নিকট বিদায় লইয়া লণ্ডনে চলিলাম, তাহাকে বলিলাম, দুই দিনের মধ্যেই তাহার নিকট ফিরিয়া আসিব।

আমি লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়া আমার জার্মিন ষ্ট্রীটের বাসায় যাইতে, এমন কি, ডেভিস্‌কে টেলিফোনে কোন কথা বলিতেও সাহস করিলাম না। লণ্ডনের ইউষ্টন রোডে তৃতীয় শ্রেণীর একটি হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

সেই দিন সন্ধ্যার পর আমি একখানি ট্যাক্সি লইয়া ক্রেডেন ষ্ট্রীটের পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, এই অট্টালিকা হইতেই এক দিন কুপকে বাহিরে যাইতে দেখিয়াছিলাম, যদি পুনর্ব্বার সেখানে তাহার সন্ধান পাই—এই আশায় সেই বাড়ীর বহির্দ্বারে গিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিলাম। সেবার যে পরিচারিকা দ্বার খুলিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিল, এবারও সে দ্বার খুলিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল।

আমি তাহাকে বলিলাম, "মিস্ আইভি ফসেট্ বাড়ী আছেন কি?"

পরিচারিকা বিনীতভাবে বলিল, "না মহাশয়, মিস্ ফসেট স্থানান্তরে গিয়াছেন।"

আমি বলিলাম, "বাড়ীতে কে আছে? যে থাক—তাহারই সঙ্গে আমি দেখা করিব। একটা জরুরী কাযের জন্য আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে।"

পরিচারিকা আমাকে চিনিতে পারিল। আমি পূর্ব্বে এক দিন এখানে আসিয়াছিলাম এবং তাহার সহিত অনেক বাদানুবাদ করিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ হওয়ায় সে আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে কি না, তাহাই ভাবিতে লাগিল, সেই সময় আমি পকেট হইতে আমার নামের কার্ডখানি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম। সে কার্ডখানি অনিচ্ছার সহিত লইয়া হলের ভিতর প্রবেশ করিল।

কয়েক মিনিট পরে সে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। আমি তাহার সঙ্গে একটি সুসজ্জিত ক্ষুদ্র উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলাম। সে আমাকে সেই কক্ষে রাখিয়া চলিয়া গেল।

আমি সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম; সেই কক্ষের এক প্রান্তে একটি জিনিষ দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। একখানি টেবলের উপর রূপার ফ্রেমে আঁটা একখানি ছবি, তাহা কোন প্রৌঢ়ের ছবি। আমি বদ্ধদৃষ্টিতে সেই চিত্রপটের দিকে চাহিয়া রহিলাম; মনে হইল, তাহা আমার কোন পরিচিত ব্যক্তির চিত্র। টেবলের নিকটে গিয়া ছবিখানি পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম, তাহা কুপেরই ছবি!

সেই ঘরে কুপের ছবি দেখিয়া আমার ধারণা হইল, কুপ এই বাড়ীর মালিক না হইলেও এই বাড়ীর সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ আছে; ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকিলে বসিবার ঘরে টেবলের উপর কুপের ছবি রূপার ফ্রেমে বাঁধিয়া রাখা হইবে কেন? কোন গৃহস্থ যাহার-তাহার ছবি এভাবে বসিবার ঘরের টেবলে সাজাইয়া রাখে না। আমি ছবিখানি টেবল হইতে তুলিয়া লইয়া দেখিতেছিলাম; তাহা পরীক্ষা করিয়া টেবলের উপর নামাইয়া রাখিবামাত্র সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া একটি খর্ব্বাঙ্গী বৃদ্ধা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধার মস্তকে কালো রেশমী টুপী। সে আমাকে কুণ্ঠিতভাবে অভিবাদন করিল।

আমি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধা বলিল, "মহাশয়, দুঃখের বিষয়, আমার ভাইঝি মিস ফসেট এখন বাড়ী নাই; শুনিলাম, আপনি তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। আপনার কি প্রয়োজন, তাহা কি আমাকে বলিতে পারেন না?"—কাঁসরের শব্দের মত বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর!

আমি কি উত্তর দিব—তাহা হঠাৎ স্থির করিতে পারিলাম না; আমি যে প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে আসিয়াছিলাম, তাহা প্রীতিকর নহে, বরং তাহা শুনিলে বৃদ্ধার মনে দুঃখ হইবারই কথা।

যাহা হউক, আমি বৃদ্ধার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিলাম "আপনার ভাইঝি এখন কোথায় আছেন—তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিতে কি আপনার আপত্তি আছে?"

বৃদ্ধা ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "সেই কথা জানিবার জন্যই ত আমরা গত কয়েক সপ্তাহ হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমাদের চেষ্টা সফল হয় নাই।"

আমি বলিলাম, "তবে কি তাঁহাকে আপনারা খুঁজিয়া পাইতেছেন না?"

বৃদ্ধা বলিল, "হাঁ, আমরা তাহার সন্ধান পাইতেছি না। সে এক দিন প্রভাতে দোকান হইতে কতকগুলি জিনিষ আনিতে গিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর সে আর বাড়ী ফিরিল না! সেই দিন হইতে সে নিরুদ্দেশ!"

আমি বলিলাম, "আমি একটি যুবতীর নিকট আপনার ভাইঝির পরিচয় জানিতে পারিয়াছি, সেই যুবতীর নাম কুপার—মিস্ যোয়ান কুপার।"

বৃদ্ধা কাঁসির মত আওয়াজ করিয়া বলিল, "আপনি তবে মিস্ কুপারকে চেনেন? মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তাহার স্বভাবচরিত্রও সেই রকম ভাল। আমি তাহাকে নিজের মেয়ের মত ভালবাসি। আইভির সঙ্গে তাহার গলায় গলায় ভাব।"

আমি বলিলাম, "মিস্ কুপারের বাড়ীর ঠিকানা আমাকে বলিতে পারিবেন কি? তাহার সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই জানা-শুনা আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি তাহার বাড়ীর নম্বরটা ভুলিয়া গিয়াছি। তবে বেজওয়াটারের কোন রাস্তায় তাহাদের বাড়ী, এ কথা আমার স্মরণ আছে।"

বৃদ্ধার মুখে ঈষৎ হাসি ফুটিল, সেই হাসিতে যেন কোন রহস্যের আভাস ছিল; কিন্তু সে হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "না, আপনার স্মরণ নাই; কেন্সিংটন পল্লীর লেক্সহাম গার্ডেন্সে যোয়ানদের বাড়ী।"

আমি উল্লাস গোপন করিয়া বৃদ্ধাকে যোয়ানের বাড়ীর নম্বরটি বলিতে অনুরোধ করিলাম। বৃদ্ধা বাড়ীর নম্বর বলিলে আমি আমার নোট-বহিতে তাহা লিখিয়া লইলাম।

আমি মিস্ ফসেট সম্বন্ধে যে সকল কথা জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহা বৃদ্ধার নিকট প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় মনে করিলাম না। বিষয়টির আলোচনা কষ্টকর বলিয়াই মনে হইল। যাহা হউক, প্রসঙ্গক্রমে বৃদ্ধার নিকট জানিতে পারিলাম—তাহার ভাইঝি মিস্ ফসেটের গলায় প্রাচীন মিশরের হরফ-ক্ষোদিত একখানি পদক ছিল। সেই পদকখানি সে তাহার কণ্ঠহারের ধুকধুকিস্বরূপ ব্যবহার করিত।

বৃদ্ধা সেই পদকখানির গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে বলিল, "সে কি যে সে পদক! তাহা যেমন প্রাচীন, সেইরূপ দুর্লভ। এ কালে বহু মূল্যেও তেমন জিনিষ পাওয়া যায় না। হাজার হাজার বৎসর আগে যে সময় ফারোয়া রাজবংশ মিশরে রাজত্ব করিতেন, আর এ দেশের লোক উলঙ্গদেহে পাথরের বর্শা দিয়া বনে জঙ্গলে পশু শিকার করিয়া বেড়াইত—সেই যুগে কোন এক জন ফারোয়া-রাজ যে 'শীলমোহর' ব্যবহার করিতেন—সেই শীলমোহর-টিই আমার ভাইঝির গলার মালার ধুক্‌ধুকি। লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের হীরা অপেক্ষা তাহা মূল্যবান্। আমার ভাইএর একটি বড়লোক বন্ধু সেই পদকখানি আমার ভাইঝিকে উপহার দিয়াছিলেন কি না। কাযেই উহা তাহাকে কিনিয়া ব্যবহার করিতে হয় নাই; টাকা দিয়া তাহা কেনা কি আমাদের সাধ্য? প্রাচীন মিশরের ভাষা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অধ্যাপক মার্ভিন প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে সেই পদকখানি দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—ও রকম মূল্যবান্ দুর্লভ পদার্থ য়ুরোপের কোন যাদুঘরে নাই।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, পদকখানি অমূল্য পদার্থই বটে, কিন্তু আপনার ভাইঝি নিরুদ্দিষ্ট হইলে আপনি কি তাহার বন্ধু মিস্ কুপারকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই?"

বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আমার চেষ্টা সফল হয় নাই, আমি মিস্ কুপারের সঙ্গে দেখা করিতে লেক্সহাম গার্ডেন্সে গিয়া শুনিলাম, সে স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে; এই জন্য যোয়ানকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই।"

আমি পর-মুহূর্ত্তেই বলিলাম, "আপনি আমার কৌতূহল মার্জ্জনা করিবেন, আপনার ঐ টেবলের উপর যে ছবিখানি দেখিতেছি—উহা যাঁহার ছবি, তাঁহার মত চেহারার এক জন ভদ্রলোককে আমি চিনি। এই জন্য ছবিখানি কাহার, তাহা জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।"

বৃদ্ধা কহিল, "উহা আইভির একটি হিতৈষী বন্ধুর ছবি। আমি ঠিক না জানিলেও এইরূপই আমার ধারণা। আইভি এক দিন ঐ ছবিখানি লইয়া আসিয়াছিল। সে

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বের কথা। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ছবিখানি কাহার?—সে আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া আমার নিজের চরকায় তেল দিতে বলিয়াছিল! এ কালের মেয়েগুলা যেন কেমনতর! সকল সময় তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারা যায় না। আইভির বয়স অল্প, তাহার ছেলে-মানুষী ধর্ত্তব্য নহে।"

আমি বলিলাম, "উহা কাহার ছবি—তাহা আপনার জানা নাই; উহা আইভির কোন বুড়ো বন্ধুর ছবি—ইহা আপনার অনুমান মাত্র?"

বৃদ্ধা বলিল, "সে কথা সত্য, ঐ লোকটিকে আমি চিনি না।"

আমি বলিলাম, "আপনি কি ঐ ছবিখানি আমাকে ফ্রেম হইতে খুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিতে দিবেন? যে চিত্রকর ঐ ছবি আঁকিয়াছে, চিত্রের নীচে তাহার নাম আছে, সেই নামটি দেখিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে। ছবিখানি আমার একটি বন্ধুর চেহারার মত কি না, এই জন্যই আপনাকে অনুরোধ করিতেছি।"

বৃদ্ধা আমাকে তৎক্ষণাৎ অনুমতি দান করিলে আমি ছবিখানি টেবল হইতে তুলিয়া লইয়া ফ্রেম হইতে খুলিয়া ফেলিলাম। ছবির নীচে চিত্রকরের নাম ছিল, তাহার ঠিকানা—সেফার্ডস্ বুস্। ছবির পিঠে পেন্সিল দিয়া চিত্রখানির সংখ্যাও লিখিত ছিল। বোধ হয়, তাহা 'ফটোর' 'নেগেটিভের' নম্বর। আমি ঠিকানা ও নম্বর উভয়ই লিখিয়া লইলাম।

এই সকল কায শেষ হইলে আমি বৃদ্ধার নিকট বিদায় লইলাম; তাহার দুর্ভাগিনী ভ্রাতুষ্পুত্রীর পরিণাম কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা তাহাকে জানাইতে ইচ্ছা হইল না। আমি কুপের বাড়ীতে যে মৃতদেহটি আবিষ্কার করিয়াছিলাম, তাহা আইভিরই মৃতদেহ, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইলাম। কিন্তু বিষয়টি কিছু কালের জন্য গোপন রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে করিলাম। বৃদ্ধা সত্যই কুপকে চিনিত না এবং আইভি কোন কারণে তাহার পিসীর নিকট কুপের পরিচয় দেওয়া সঙ্গত মনে করে নাই, ইহাও বুঝিতে পারিলাম।

কিন্তু ইহার কারণ কি? ছবিখানি আইভির সখী যোয়ানের পিতার প্রতিকৃতি, এ কথা তাহার পিসীর নিকট প্রকাশ করিতে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে?

যাহা হউক, রহস্যের এই সূত্রটি আবিষ্কার করিয়া আমার মনে আনন্দ হইল। রহস্যভেদের জন্য আমার আগ্রহ প্রবলতর হইল। আমি পথে আসিয়া প্রথমে যে ট্যাক্সি দেখিতে পাইলাম, তাহাই ভাড়া করিয়া লেক্সহাম গার্ডেন্‌সে যোয়ানের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। সেই বাড়ীতে সুবেশধারিণী মধ্যবয়স্কা একটি সুন্দরী নারীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। সেই রমণী আমার নিকট স্বীকার করিল, মিস্ কুপার সেই বাড়ীতে বৎসরাধিককাল বাস করিয়াছিল। কিন্তু তিন মাস পূর্ব্বে সে সেই বাড়ীর সংস্রব ত্যাগ করিয়াছে, তিন মাসের মধ্যে কোন দিন তাহাকে সেখানে আসিতে দেখা যায় নাই।

স্ত্রীলোকটি বলিল, "মেয়েটি বড় শান্তপ্রকৃতির, সে কোন রকম জাঁক-জমক ভালবাসিত না। সে আমার বাড়ী হইতে হঠাৎ চলিয়া যাওয়ায় আমার বড় দুঃখ হইয়াছিল।"

আমি বলিলাম, "তবে কি সে আপনার ভাড়াটে ছিল?"

রমণী বলিল, "হাঁ মহাশয়, আমার বিশ্বাস—সে সহরে কোন কাযে লিপ্ত ছিল। আমার এই বিশ্বাসের কারণ এই যে, সে কোন দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে এখানে ফিরিয়া আসিত না।"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "আমার বোধ হয়, নগরে তাহার কোন নাগর ছিল, কোন যুবকের প্রেমে পড়িয়া সে সকালে বাসায় ফিরিবার অবসর পাইত না।"

ভাবিলাম, আমার প্রণয়ের কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী আছে না কি! ঘটনাগুলি যে উপন্যাসের মত কৌতুকাবহ হইয়া উঠিতেছে!

স্ত্রীলোকটি বলিল, "আপনার অনুমান মিথ্যা নহে। ও রকম অপরূপ সুন্দরীর কোন উপাসক না থাকাই আশ্চর্য্যের বিষয়! শুনিয়াছি—তাহার একটি নাগর জুটিয়াছিল, তাহাদের বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছিল; কিন্তু কথাটা সত্য কি না, ঠিক বলিতে পারি না। মিঃ জিলর প্রায়ই এখানে আসিত, ছোকরা খাসা ভদ্রলোক।"

জিলরয়!—নামটি আমার পরিচিত মনে হইল। এক মিনিট চিন্তার পর স্মরণ হইল—আমি তাহাকে চিনি। স্ত্রীলোকটিকে বলিলাম, "তাহার নাম এডওয়ার্ড জিলরয় নয়? বোধ হয়, সে 'কনার্ড ষ্টীম্‌সিপ লাইনে' কায করে।"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "না, তাহার নাম জর্জ ভিলুরয়। সে লয়েডের চাকরী করে, থাকে 'অটোমোবাইল ক্লাবে।'

আমি বলিলাম, "তবে সে অন্য লোক। আর এক কথা, —আপনি মিস যোয়ানের পিতা মিঃ কুপারকে চেনেন?"

স্ত্রীলোকটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, মনে হইল, তাহার দৃষ্টি অত্যন্ত কঠোর।—সে বলিল, 'হাঁ, তাঁহাকে চিনি বৈ কি, তিনি যে আমার এই বাড়ীতেই বাস করেন।'

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "এই বাড়ীতে বাস করেন!" —তাহার পর বিস্ময় দমন করিয়া বলিলাম, "তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে, এখন তিনি বাড়ীতে আছেন কি?"

বাড়ীওয়ালী বলিল, "না মহাশয়, তিনি স্থানান্তরে গিয়াছেন, কিন্তু আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহার টেলিগ্রাম পাইয়াছি, তিনি আজ রাত্রিতেই এখানে ফিরিয়া আসিবেন; হয় ত আর দুই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসিয়া পড়িবেন।"

আমি ধাঁধায় পড়িলাম; এখন আমার কর্ত্তব্য কি? কুপারের সহিত সাক্ষাতের জন্য এখানেই থাকিব, না পথে গিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিব? সে কি আমাকে দেখিলে ইব্রাহিমের হত্যাকারী বলিয়া অভিযুক্ত করিবে না? ইব্রাহিম ত তাহারই আদেশে আমাকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিল, সুতরাং আমিই ইব্রাহিমকে হত্যা করিয়াছি, ইহাই তাহার ধারণা হইয়াছে। কিন্তু আমি পথে অপেক্ষা করিলে কুপার হয় ত পুনর্ব্বার পলায়ন করিবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি বলিলাম, "আমি তাঁহার জন্য এখানেই অপেক্ষা করিব।"

বাড়ীওয়ালী বলিল, "তাঁহার ফিরিবার সময় হইয়াছে; সন্ধ্যার পরই তাঁহার ফিরিবার কথা। আসুন, আপনি ঐ পাশের কামরায় বসিবেন।"

আমি তাহার সহিত যে কক্ষে প্রবেশ করিলাম, তাহা ভোজন-কক্ষ। আমি একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিলাম, "মিঃ কুপারের পাগলামীর একটু ছিট আছে বলিয়া মনে হয় না কি? তাঁহার আরব ভৃত্য ইব্রাহিমকেও আপনি চেনেন বোধ হয়?"

বাড়ীওয়ালী বলিল, "ইব্রাহিমকে চিনি না? সে-ও যে এখানেই থাকে, তাহার মত প্রভুভক্ত ভৃত্য আমি অল্পই দেখিয়াছি।"

তবে ত আমি তাহাদের গোপনীয় আড্ডায় আসিয়া পড়িয়াছি, কুপার বাড়ী ছাড়িয়া এই স্থানে লুকাইয়া আছে! আমার সকল শ্রম সফল মনে হইল।

আমি পকেটে হাত দিয়া পিস্তলটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম, তাহার পর বাড়ীওয়ালীকে কুপার ও তাহার পরিচারক সম্বন্ধে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

বাড়ীওয়ালী বলিল, "মিঃ কুপার এখানে থাকিতে থাকিতে হঠাৎ কোথায় চলিয়া যান, দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে আর ফিরিয়া আসেন না। তিনি কখন্ কোথায় যান, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করেন না। মিস্ যোয়ান তাঁহার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া হঠাৎ কোথায় চলিয়া গিয়াছে—তাহা আমার অজ্ঞাত। সে বলিয়া গিয়াছে, সে তাহার পিতার সঙ্গে আর এখানে থাকিবে না।"

আমি বলিলাম, "মিস্ যোয়ান কোথায় গিয়াছে?"

বাড়ীওয়ালী বলিল, "সে কথা সে আমাকে বলিয়া যায় নাই; তাহার পিতা তাহা জানিতে পারিবে ভাবিয়াই বোধ হয় আমাকে বলে নাই।"

সেই মুহূর্ত্তেই বহির্দ্বারে কাহার পদশব্দ হইল, পদধ্বনি অত্যন্ত মৃদু হইলেও সেই কক্ষে বসিয়া আমরা তাহা শুনিতে পাইলাম।

বাড়ীওয়ালী বলিল, "কুপার আসিলেন। উনি ঐ রকম নিঃশব্দেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করেন; যেমন সন্দিগ্ধচিত্ত—সেইরূপ সতর্ক।"

আমি এক লম্ফে সেই কক্ষের বাহিরে আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইলাম। বাড়ীওয়ালী বলিল, "আমি তাঁহাকে আপনার কথা বলিব, আপনি ব্যস্ত হইবেন না; কি নাম বলিব?"

আমি বিচলিত স্বরে বলিলাম, "নাম বলিতে হইবে না। কুপার আমাকে 'দেখিবামাত্র চিনিতে পারিবে; আমি তাহার সুপরিচিত।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বঙ্গ-সাহিত্যের সমৃদ্ধি *

বঙ্গভারতীর এই পবিত্র উপাসনাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আজ প্রথমেই বাঙ্গালার ও বঙ্গভাষার অচিরকালের মধ্যে স্বর্লোকপ্রস্থিত কতিপয় বরেণ্য সেবকের কথা স্মৃতিপটে উদিত হওয়ায় আমাকে আকুল করিয়া তুলিতেছে।

বাঙ্গালার রস-সাহিত্যের অন্যতম প্রবীণ স্রষ্টা, চিরনবীন নাট্যাচার্য্য, রসরাজ অমৃতলাল বসু;—গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত ও সহৃদয়ভোগ্য হাস্যরসের অবতারণায় অতুলনীয় প্রবীণ অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়;—লক্ষ্মীর সোহাগের দুলাল হইয়াও সরস্বতীর চিরপ্রিয়, সুকবি দেবকুমার রায় চৌধুরী, এবং বাঙ্গালার সারস্বত-সৌধের নিপুণ স্থপতি, স্বদেশ ও স্বজাতির অকৃত্রিম সেবক, পরম বিদ্যোৎসাহী বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ এবং মধুরহৃদয়, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অকালপ্রয়াণে চির-সমুজ্জ্বল ও কলকাকলীমুখরিত বঙ্গ-সাহিত্যকুঞ্জে যে গভীর বিষাদের ঘনছায়াপাত হইয়াছে, তাহা মনে হয়, আর অপনোদিত হইবার নহে। নিজের নিজের অসাধারণ শক্তি ও মহিমায় প্রাগুক্ত কয় ব্যক্তিই সমগ্র বাঙ্গালী জাতির চিরস্মরণীয় ও চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহাদিগকে হারাইয়া বাঙ্গালার সাহিত্য-সমাজ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার গভীরতা ও মর্ম্মভেদিতা ভাষায় প্রকাশ করিবার সামর্থ্য আমার নাই।

আজ এই সারস্বত-যজ্ঞের পূত মণ্ডপে একই পবিত্র উদার উদ্দেশ্যে ভারতের দূরবর্ত্তী নানাপ্রদেশ হইতে বহুক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক প্রবাসী বাঙ্গালীগণকে সমাগত হইতে দেখিয়া, সত্য বলিতে কি, আমি এক অভূত-পূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতেছি। ছিল এক দিন,—যখন, এই প্রকার এবং অন্যান্য নানা উৎসবাদির ব্যপদেশে নিজ জন্মভূমিতে বাঙ্গালী বৎসরের মধ্যে বহুবার আত্মীয়স্বজন-কুটুম্ব-বান্ধব লইয়া মেলামেশা করিত, আমোদ-আহ্লাদ করিত, দীর্ঘকালীন ও অবিশ্রান্ত কর্ম্মক্লান্ত হৃদয়ে নবীন বলের সঞ্চার করিয়া লইত। সর্ব্ববিধ মতভেদ—সর্ব্বপ্রকার বৈষম্য দূরে সরাইয়া বাঙ্গালী পরস্পরকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া কৃতার্থ হইত। আজ আর সে রামও নাই—সে অযোধ্যাও নাই।

একবার মানস-নয়নে আপনারা স্ব-স্ব জনক-জননী জননী-মাতৃভূমির পল্লীর দিকে চাহিয়া দেখুন, সমস্তই আজ যেন শ্মশানে পরিণত, অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, মাথা গুঁজিবার স্থল নাই, এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, সব থাকিতেও জানি না কোন্ অদৃষ্ট দেবতার কি ঘোর অভিশাপে সুখ-শান্তি ও প্রসন্নতার লীলাক্ষেত্র বাঙ্গালায় যেন সুখ-শান্তি ও প্রসন্নতার সকল উপ-করণই আমাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে। শুধু জলপ্লাবন নহে—কত রকম বিপ্লাবনে যে বঙ্গদেশ আজ হাবুডুবু খাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করাও দুরূহ ব্যাপার। এরূপ দুঃসময়েও প্রবাসী বঙ্গসন্তানগণের এই সুদূর প্রবাসে এরূপ মধুরভাবে মিলিবার আকাঙ্ক্ষা, ঠাঁই ঠাঁই থাকিয়াও ভাই ভাই এক হইবার জন্য এইরূপ সদিচ্ছা যে প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজের পক্ষে কত দূর হিতকর, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার শক্তি আমার নাই। যে জাতির মধ্যে এইরূপ জাতীয় সাহিত্যকে দ্বার করিয়া আন্তরিক ঐক্যবন্ধনের প্রয়াস জাজ্বল্যমান, সে জাতির অভ্যুদয় যে অনিবার্য্য, এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

আমি বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে বিস্ময়াবহ সৃষ্টিশক্তির কথা যখন ভাবি, বাঙ্গালীর নির্ভীক স্বাধীন চিন্তাশীলতার কথা যখন মনে করি, তখন নগণ্য হইলেও আমিও যে সেই বাঙ্গালী জাতির এক পরমাণুকল্প অদৃশ্য অংশ, ইহা ভাবিয়া নিজেকে সৌভাগ্যশালী মনে করি—বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকি।

একবার, ক্ষণকালের জন্য আপনারা অতীতের—বঙ্গ-সাহিত্যের চিরসমুজ্জ্বল বিরাট চিত্রশালার দিকে দৃষ্টিপাত করুন, দেখিবেন, অসাধারণ কোমলতামিশ্রিত স্বাধীন চিন্তার ও মধুর কল্পনার অনাবিল ও নিত্যনূতন কলা-কৌশলে তাহা কত উল্লসিত। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, এবং তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণবপদকর্ত্তারা যে বিশ্ববিস্ময়া-বহ ও অনাস্বাদিতপূর্ব্ব নানাবিধ রসতরঙ্গে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার কি তুলনা আছে! বাঙ্গালার গীতি-কবিতা, যেন বাঙ্গালীর হৃদয়ের মতই কেমন একটা স্বপ্নে জড়িত। যখন স্মরণ করি—তখনই নূতন। বাঙ্গালা[illegible] বাউল—বাঙ্গালার কীর্ত্তন—বাঙ্গালার দাঁড়ী-মাঝীদের সা[illegible] গেয়ে তালে তালে দাঁড় বাওয়া, যখনই মনে পড়ে, ত[illegible] সত্যই কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠি, আকুল হইয়া পড়ি

মধুর ভাবের অমর কবি গোবিন্দদাস কবিরা[illegible] বিচারবিমূঢ় প্রেমের স্বপ্নময় কবিতার মধুরতান য[illegible] মনে জাগিয়া উঠে, যখন পড়িয়া থাকি—

"কোরহি শ্যাম চমকি ধনি বোলত কব মোহে মীলব কান।
হৃদয়ক তাপ তবহি মঝু মীটব, অমিয়া করব সিনান॥
সো মুখ মাধুরি বঙ্ক নেহারহি সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
সো তনু সরস পরশ যব পাওব তবহিঁ মনোরথ পূর॥"

শ্যামের ক্রোড়ে বসিয়া বা শ্যামকে ক্রোড়ে বসাইয়া প্যা[illegible] নিদারুণ বিরহভীতি-বিহ্বল হৃদয়ের শ্যাম-মিলনের অ[illegible] শ্যামদর্শনে বিরহতাপহর আনন্দময় অমৃত-সিন্ধুতে অবগা[illegible]

* নাগপুরে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের ৮ম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

করিবার আকুল আকাঙ্ক্ষা প্রেম-বৈচিত্র্যের ও প্রেমময় বিচারমূঢ়তার যে চিত্র মানস-নয়নে জাগাইয়া দেয়, তাহার তুলনা সম্ভবপর নহে, এ কবিতার রসমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে করিতে মনে হয়, জন্মে জন্মে বাঙ্গালী হইয়া জন্মলাভ করাই যেন এ পৃথিবীতে জন্মলাভের পরম সার্থক্য। নব্যবঙ্গের জাতীয় কবিতার অনন্যসাধারণ স্রষ্টা, বাঙ্গালার অমরকবি হেমচন্দ্রের—

'যাও সিন্ধুতীরে ভূধর-শিখরে—
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে!
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে—
স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও।
তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হ'তে।
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে
যে শিরে এখন পাদুকা বও॥'

এই অমর কবিতা যখন কর্ণকুহর দিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক বাঙ্গালী হৃদয়ে সুপ্ত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা-সমুদ্রকে সমুদ্বেলিত করিয়া তুলে, তখন এই বার্দ্ধক্যের অবসাদ ও নৈরাশ্য-দুর্ব্বহ জীবনের সন্ধ্যায় এই দুর্ব্বল হৃদয় নবজীবনের নবীন উৎসাহরসের দুর্নিবার বন্যায় সর্ব্বতোভাবে আপ্লুত হইয়া উঠে। তখন মনে হয়—যে জাতির মধ্যে হেমচন্দ্রের ন্যায় মহাকবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই জাতির জাতীয় জীবনে আপাততঃ প্রতীয়মান অবসন্নতা কখনই চিরস্থায়িনী হইতে পারে না। তখনই মনে হয়; শতসহস্রবর্ষব্যাপী জীবন লাভ করিয়া আমার বড় সাধের মাতৃভাষার কবিতারসময় অমৃতসাগরে যেন অনন্তকালের জন্য নিমগ্ন হইয়া থাকিতে পারি।

এমন প্রাণমাতান প্রেম, এমন প্রাণভরা উক্তি, এমন দৈন্যহরা উৎসাহ আর কোথায় পাইব? কে আমায় গোধূলির ধূলিধুসর রাখালের মুখে—

"হরি বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল পার কর আমারে।"

গান শুনাইয়া আত্মবিস্মৃত করাইবে? এত মধু, এত রস, এত ভাব ফেলিয়া, বাঙ্গালী আমি কোথায় কোন্ স্বর্গে যাইয়া স্বস্তি পাইব?

গ্রহবৈগুণ্যে বাঙ্গালী আজ পার্থিব সম্পদে ও সুখে বঞ্চিত হইলেও যে অপার্থিব সম্পদ্‌সম্ভারে তাহার ভাবময় হৃদয় ও তাহার সাহিত্য-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ, তাহা কোনও রাজ-রাজেশ্বরের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারেও নাই। বাহ্য দৈন্যে বাঙ্গালী পরিম্লান বলিয়া মনে হইলেও মাতৃভাষার সম্পদে বাঙ্গালী পরমগৌরব ও ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত। তাহার মাতৃবক্ষঃ অফুরন্ত অমৃতের উৎস, তাহার গৃহপ্রাঙ্গণ আনন্দময়ী বঙ্গ-ভারতীর লীলানৃত্যের নিত্য নিকেতন। সুতরাং ভাই বঙ্গভারতীর বাঙ্গালী সেবকগণ! বাঙ্গালার সুসন্তানবৃন্দ! তোমাদের বৈমনস্যের কোনই কারণ নাই।

রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের অভাবে বাহিরের সকল সম্পদ হস্তভ্রষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই স্বাতন্ত্র্যকে আবার ফিরাইয়া আনিবার যাহা একমাত্র প্রধান উপকরণ, সেই জাতীয় সাহিত্য-সম্পদের প্রতিদিন বর্দ্ধনশীল অফুরন্ত প্রস্রবণই অচির-কালের মধ্যেই তোমার জাতিকে আবার বলশালী ও সুগঠিত করিবে, তোমাকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবে, তোমার আত্মকলহ ও পরস্পর বিদ্বেষবহ্নি নির্ব্বাণ করিবে, পৃথিবীর অন্যান্য অভ্যুদয়শালী সভ্যজাতির মধ্যে তোমার জাতির জন্য গৌরবমণ্ডিত বরণীয় আসন সুদৃঢ় স্থাপন করিবে, ইহা ধ্রুব সত্য। এই বিশ্বাস যাহার নাই, সেই বাঙ্গালীর পক্ষে বঙ্গ-সাহিত্যের সাধনা বিড়ম্বনামাত্র। এই কথাই এই প্রাণের মর্ম্মবাণীই আপনাদিগকে কাতরভাবে নিঃসঙ্কোচে বলিবার জন্যই এই অবসাদময়ী অমানিশার নিবিড় অন্ধকারে আপনাদিগের মানস-মন্দিরের রুদ্ধদ্বারে নৈশভিখারীরূপে উপস্থিত হইয়াছি।

আজিকার দিনে আমার একমাত্র ও প্রধান বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালা সাহিত্যই বাঙ্গালীকে কালজয়ী ও অমর করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিবে। বাঙ্গালা সাহিত্যই আমাদিগকে নবজীবন দিবে, চিরনূতন করিবে, বলশালী করিবে ও স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিত করিবে, ইহা উদ্‌ভ্রান্তের কল্পনা নহে, ইহা অখণ্ডনীয় জাজ্বল্যমান ধ্রুব সত্য।

তাই আবার বলি—বৈষ্ণব মহাজনগণ হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বিশ্ববরেণ্য কবিকুলের,—মহাপ্রাণ রাজা রামমোহন হইতে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর পর্য্যন্ত গদ্য সাহিত্যিকগণের, এবং প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্দ্র হইতে বাঙ্গালীর ব্যথার দরদী, শরচ্চন্দ্র পর্য্যন্ত ঔপন্যাসিকবৃন্দের আবির্ভাবে যে জাতি ধন্য ও গৌরবান্বিত হইয়াছে, সে জাতির আর মার নাই। বাঙ্গালীগণের মধ্যে দেখি, মাঝে মাঝে কেমন যেন একটা নৈরাশ্য আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, মধ্যে মধ্যে একটা কেমন যেন ম্রিয়মাণতায় বাঙ্গালী অভিভূত হইয়া পড়েন, অন্য ক্ষেত্র আমার অদ্যকার আলোচ্য নহে, বঙ্গ সাহিত্যের ক্ষেত্রের দিকে চাহিলে যে কোনও সূক্ষ্ম-দর্শীরই ইহা দৃষ্টিতে পড়িবে, হয় ত পড়িয়াছেও।

বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের ভাবধারা ও গতিবিধি দর্শনে বাঙ্গালা ভাষার অনেক অকৃত্রিম বন্ধু, অনেক মনীষী যেন একটু হতাশ হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহাদের মতে বাঙ্গালার আধুনিক সাহিত্যে এমন অনেক বিষয়, এমন অনেক ভাব প্রবেশ করিতেছে, যদ্দ্বারা বঙ্গ-ভারতীর গৌরব বর্দ্ধিত হওয়া দূরের কথা,, প্রত্যুত গৌরব-হানি ঘটিবারই উপক্রম হইয়াছে। যতটা পবিত্র দেহ ও মন লইয়া, পবিত্র পূজাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া জননী জন্মভাষা দেবীর পূজা করিতে হয়, বর্ত্তমানের অনেক সাহিত্যসেবীই নাকি ততটা পবিত্র দেহে ও পবিত্র মনে বঙ্গ-ভারতীর পূজার পুণ্য মণ্ডপে প্রবেশ করিতেছেন না। সাহিত্যের পবিত্র পারিজাত-কাননে

অসংযত, সুতরাং অপবিত্র লেখনীর উদ্বেগকর আঘাত ঘন ঘন প্রদত্ত হইতেছে, ইহাতে সাহিত্য-কাননের শ্রীহানি ঘটিতেছে। অপবিত্রতার অন্ধকারে আবর্জ্জনা ক্রমেই পুঞ্জীভূত হইতেছে।

বন্ধুগণ! আত্মগোপনের কোনও কারণ নাই। আমি অকুণ্ঠভাবে ও উচ্চকণ্ঠে বলিতেছি, আমি কিন্তু ঐ মনস্বীদিগের উক্ত মতে সায় দিতে পারি না। উঁহাদের ঐ উক্তি নির্ব্বিচারে মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি, কেন—তাহাও নিবেদন করিতেছি।

যদি আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে কি দেখিতে পাই? এবং কি বুঝি? দেখি—সর্ব্ববিষয়ে সুপরিপুষ্ট প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এমন কোন আবশ্যক বিষয় নাই—যাহা না ছিল। বাৎস্যায়ন কামসূত্র, কুট্টিনীমত, চৌরশাস্ত্র, নিগমকল্পতরু, রতিসর্ব্বস্ব, রসকৌস্তভ প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদেরই সংস্কৃত সাহিত্যে এখনও প্রচুরভাবে উপলব্ধ হইতেছে। এরূপ আরও বহুগ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে একটা জিনিষ সহজেই উপলব্ধ হয় যে, যখন সাহিত্য গড়িয়া উঠে, একটা পরিপূর্ণ জাতির সাহিত্য সর্ব্বদিক্ দিয়া ক্রমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাতে অগ্রাহ্য বা অবাচ্য বলিয়া কিছুই বাদ পড়ে না। দৈনন্দিন জীবনের ও অভ্যুদয়োন্মুখ জাতীয় জীবনের স্বতঃ-পরতঃ সর্ব্ববিধ স্পন্দনের প্রতিকৃতি তখন স্বতই জাতীয় সাহিত্যে ফুটিয়া উঠে। সাহিত্যই জাতির ইতিহাস, সাহিত্যই জাতির জাজ্বল্যমান প্রতিকৃতি।

আমাদের বঙ্গ-সাহিত্য এই সবে গড়িয়া উঠিতেছে। অনন্তকালের হিসাবে দু'চারশ' বৎসর দু'এক নিমেষের চেয়েও অল্প। এখনও বহুকাল ধরিয়া বঙ্গ-সাহিত্য গঠিত হইবে। ইহার প্রকৃত পরিপুষ্টিসাধনে দীর্ঘ সময় লাগিবে। এই সবে বান আসিয়াছে, আকাশ ভাসাইয়া, উচ্চনীচ সমস্ত প্লাবিত করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের বান ছুটিবে, সব নিজের স্রোতের মুখে টানিয়া লইবে। এ সময়ে বন্যার এই প্রথম মুখে কত কি আসিবে ও ভাসিবে—চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে, এ সময়ে তাহা দেখিয়া বিচলিত হইলে চলিবে কেন? বান সরিয়া গেলে, দেখা যাইবে যে, যে সমুদয় আবর্জ্জনা ও অপ্রীতিকর বস্তু দেখিয়া আমরা শিহরিয়াছিলাম, তাহা আর নাই, কোথায়—কোন্ অকূল সমুদ্রে গিয়া মিশাইয়া পড়িয়াছে। বন্যার পঙ্কিল জল এখন নিথর হইয়া, নদী হ্রদ তড়াগ বাপী কূপ দীর্ঘিকাসমূহকে কানায় কানায় প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। কত অজগর, কত মত্ত ঐরাবত বানের মুখে ভাসিয়া আসিয়াছিল, এখন তাহাদের চিহ্নও নাই। আসিতে পারে বহু অপ্রার্থিত বা বিরক্তিকর—আসিয়া থাকেও। কিন্তু তাই বলিয়া যাহাই বন্যায় ভাসিয়া আসিবে, তাহাই যে চিরদিনের জন্য থাকিয়া যাইবে, এমন কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। যাহা অগ্রাহ্য—তাহা চিরদিনই অগ্রাহ্য। কালের কষ্টিপাথরে—উদীয়মান জাতীয় জীবনের শক্তিশালী পরিষদে কোন্‌টি খাঁটি আর কোন্‌টি মেকি, তাহা ঠিক হইবে। খাঁটি আসিবে ও থাকিবে, মেকি নিশ্চয়ই চলিয়া যাইবে, মেকিকে তাড়াইবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে কাহারও কোনও চেষ্টার কোন প্রয়োজনই নাই, সে আপনার ধর্ম্মে আপনিই বিলুপ্ত বা উপেক্ষিত হইবে। সুতরাং সে জন্য এখন সাহিত্যবন্যার এই সবে উপক্রমকালে আকুল হইয়া কোন লাভ নাই, বরঞ্চ ক্ষতির সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে। অপরাজেয় সৃষ্টিকর্ত্তা কাল স্বহস্তে যাহা গঠন করিতেছেন, তাহাতে বাধা দিয়া বা বাধা দিতে গিয়া বৃথা কোলাহলের সৃষ্টি করা বৈধ বলিয়া মনে হয় না, শুধু সাহিত্যে নহে—ধর্ম্মসমাজ রাজনীতি সমস্ত বিষয়েই একটা নূতন স্বাতন্ত্র্যের ভাব আসিয়া মাথা তুলিয়া দেখা দিয়াছে। প্রথম প্রথম এই নূতন কিছুদিন একটু যাপ্য ছিল, নবীন-সুলভ সলজ্জভাবে উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছিল বটে, কিন্তু এখন সে মাথা সগর্ব্বে উঁচু করিয়া দাঁড়াইতেছে। যতই তাহাকে পিষিয়া ফেলিতে চেষ্টা হইতেছে, ততই তাহার শক্তি উপচিত হইতেছে। সেই নবাগত নূতন—আজ সাহিত্য এবং সাহিত্যেতর সর্ব্ব-বিষয়েই নিজের স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। সেই সবল নূতন আজ সমস্ত জরাগ্রস্ত পুরাতনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতেছে, জগতের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতনের দলবৃদ্ধি ও শক্তিবৃদ্ধি হইতেছে, হইবেও। যাহা সত্য, যাহাতে কৈতবের লেশ নাই, যাহা সমাজের ও দেশের প্রকৃত অনুকূল—আজ তাহা আমাদিগকে সাদরে বাছিয়া বরণ করিয়া লইতেই হইবে, নিজের ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিতে হইবে। ক্ষত আবৃত রাখিয়া বাহিরে অক্ষতভাব দেখাইয়া লোক-মোহনের দিন আর নাই। চারিদিকের এই আলোক-মালার প্রভায় আমাদিগেরও ঘর-দুয়ার দেখিয়া শুনিয়া গুছাইয়া সাজাইয়া লইতেই হইবে, তবেই ত আমরা বাঁচিতে পারিব। শুধু বাঁচিব—তাহা নহে, এই বিংশশতাব্দীর ভয়াবহ জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইব। তবেই আমাদের সাহিত্য, আমাদের সনাতন ধর্ম্ম, আমাদের সমাজ বাঁচিবে ও পরিপুষ্ট হইবে। নতুবা আলোক দর্শনে উলূকের মত ক্রমে অন্ধকারে গিয়া লীন হইলে—আমরা নিশ্চয়ই মারা যাইব, সবে যে আসিতেছে, তাহাকে আসিতে দাও, তোমার মাতৃভাষার [illegible] মঞ্চের প্রান্তে আসিয়া লোহাও সোনা হইয়া যাইবে। যা[illegible] যথার্থই অশ্রদ্ধেয় ও দেশ এবং সমাজের পরিপুষ্টিসা[illegible] অক্ষম, তাদৃশ সাহিত্য কদাচ টিকিয়া থাকিবে না, তা[illegible] বিলোপ নিশ্চিত, অতএব উহা লইয়া অত মাথা ঘামা[illegible] এ সময় গৃহমধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের কোন আবশ্যকতাই নাই।

আমার চিত্ত কিন্তু মদীয় মাতৃভাষার ভবিষ্যৎ ম[illegible] কল্পনায় উৎফুল্ল হইয়াই উঠে। আমি বিশ্বাস করি যে—[illegible] নগ্ন—অনাবৃত এবং শুধু লোক-মোহনের নিমিত্ত অপা[illegible] পরিচ্ছদের চাকচিক্যে আবৃত অথচ অন্তঃসারশূন্য, ত[illegible]

সৌন্দর্য্যনামধারী সৌন্দর্য্যবিরোধী বস্তু কখনও সঙ্কর্ষণকালের সহিত যুদ্ধে বিজয়ী হইতে পারে না। তাদৃশ বস্তু—তাহা সাহিত্যই হউক আর ধর্ম্ম বা সামাজিকতাই হউক, তাহার লোপ অনিবার্য্য।

এক দিন এমন ধারণাও আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল যে, রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণ যদি চলিত ভাষায় পড়া ত দূরের কথা, শোনাও যায়, তবে রৌরব নরকে পতিত হওয়া অনিবার্য্য।

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥"

কৃত্তিবাস-কাশীদাসের—বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের, ভারতচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বঙ্গভাষায় আজ কোথায় সে নিষেধবাণী ও সেই রৌরব-ভীতি? আজ জীবনের এই তিমিরাবৃত সন্ধ্যায় অকপটভাবে তাই বলিতেছি—

"মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান।
মেঘ বরণ তুঝ মেঘ জটাজুট
রক্ত কমল কর রক্ত অধরপুট
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু অমৃত করে দান।
　　তুহুঁ মম শ্যাম সমান॥
মরণ রে শ্যাম তোঁহারই নাম,
চির বিস্মরল যব নিরদয় মাধব
　　তুহিঁ ন ভইবি মোয় বাম॥"

বিশ্বকবির এই সঙ্গীত গান করিতে করিতে যদি নরকেও যাইতে হয়, তবে তাহাতেও আমার সুখ। আমি তেমন স্বর্গ চাহি না—যেখানে আমার মাতৃভাষার এতাদৃশ সঙ্গীতের কল-কাকলী প্রবেশ করে না বা "প্রোসক্রাইবড"। যখন সংসারের খেলা সাঙ্গ হইবে, তখন যেন আমি আমার মাতৃভাষার সেই বসন্ত-কোকিলের সেই মধুর গীতির মধুর তানে আমার কর্কশকণ্ঠ মিশাইয়া গাহিতে পারি—

"বরিষ শ্রবণে তব জল-কলরব
　　বরিষ সুপ্তি মম নয়নে।
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে
　　বরিষ অমৃত মম অঙ্গে।
মা ভাগীরথি! জাহ্নবি সুরধুনি!
　　কল-কল্লোলিনি! গঙ্গে॥"

আর কোন্ ভাষায় আমার বুক এত ভরে! কণ্ঠ এত মধুরসে সিক্ত হয়? এমন ভাষা, এমন কবিতা, এমন [illegible]ল কবি যাহাদের, তাহাদের আবার অভাব কিসের?

আজ বাঙ্গালা ভাষায় যে অফুরন্ত সম্পদ্, অনর্ঘ্য-রত্নরাজি [illegible]কৃত হইয়াছে, এবং ক্রমে আরও হইবে, তাহার [illegible]ভাবে শুধু বঙ্গদেশ নহে, বা শুধু ভারতবর্ষ নহে—সমগ্র জগৎ সম্পন্ন হইবে, চমৎকৃত হইবে। বাঙ্গালী, তুমি দীন নহ, তুমি কাঙ্গাল নহ, তোমারই অমর কবির কথা স্মরণ কর

"ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি।
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি॥"

তোমাদের যাহার যতটা বা যতটুকু সামর্থ্য,—এহেন সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী মাতৃপূজায় সাহায্য কর। ধূপ, দীপ, গন্ধ, মাল্য, দূর্ব্বা, অক্ষত, ত্রিপত্র প্রভৃতি সমস্তই যে পূজার উপকরণ, যে যাহা পার, বঙ্গবাগ্‌দেবতার পূজায় যোগাইয়া দাও, কেবল হেমহারে বা ক্ষৌম বসনেই মা'র পূজা হয় না, নানা উপচার চাই। যদি আমরা স্ব স্ব শক্তি অনুসারে, যে যাহা পারি, তাহাই অকপটচিত্তে বঙ্গভারতীর পূজার জন্য সংগ্রহ করিয়া দেই, তবে আজ যাহা বাঙ্গালার ভাষা—কা'ল তাহা ভারতের, এবং কে বলিতে পারে—কালান্তরে তাহাই জগতের আদরণীয় ও বরণীয় ভাষা হইবে না!

আমার এই মাতৃদেবতার পবিত্র চত্বরে একটি নির্ম্মল শ্যামল তৃণের দ্বারাও যদি শোভাবৃদ্ধি করিতে পারি, আমার জীবন ধন্য হইবে—আমি কৃতার্থ হইব। ভগবানের চরণে প্রার্থনা যে, আমার এই বাগ্‌দেবতার পূজা করিতে যাইয়া যেন আঙ্গিনায় অনাচারের প্রশ্রয় না দেই। মাকে সাজাইবার ব্যপদেশে যেন মাকে শ্রীহীন করিয়া না ফেলি।

বন্ধুগণ! একবার স্মরণ করুন যে কত বড় দেশে আমরা আসিয়াছি, কত বড় জাতিতে আমরা জন্মিয়াছি, এমন দেশে আসিয়া আমাদের মনে, বাক্যে, ভাষায়, সাহিত্যে, নৃত্য-গীতে কালুষ্য জন্মিতে দিব কেন?

ভূমিষ্ঠ হইয়া যে ভাষায় মা বলিয়া ডাকিয়াছি, তাহাকে অনাচারদুষ্ট হইতে দিব কেন? আমার উদ্যানে ত কমল, কুমুদ, বেল, শেফালিকা, যূথী, মালতীর অভাব নাই, সহজ-লভ্য তাহা ফেলিয়া আমি কিংশুকাদির সন্ধানে শক্তিক্ষয় করিব কেন? আমারই না কবি উদাত্ত কণ্ঠে গাহিয়াছেন—

"কবি-রঙ্গভূমি এই না সে দেশ।
ঋষি-বাক্যরূপ লহরী অশেষ।
খেলিছে যেখানে যেখানে দীনেশ
　　অতুল উষাতে উদয় হয়।
যেখানে সরসী কমলে নলিনী
যামিনী ভুলায় যেথা কুমুদিনী
যেখানে শরৎ চাঁদের চাঁদিনী—
　　গগন-ললাট ভাসায়ে বয়।"

এই না সেই দেশ, এমন দেশে জন্মিয়া, এবং এমন অক্ষয় কবচরূপিণী ভাষায় সুরক্ষিত হইয়াও হে বঙ্গ-সাহিত্য-সেবিবৃন্দ! অবসন্ন হইও না, মাতৃভাষার অর্চ্চনায় মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া কৃতকৃতার্থ হও, এবং তোমার স্বজাতি ও

স্বজন্মভূমিকে উল্লসিত এবং অলঙ্কৃত কর। কিসের ভয়? কিসের দৈন্য? কিসের অবসাদ? মৃত্যুশয্যায় শায়িত—তোমাদের কান্ত কবির শেষের কথা ভুলিও না—

"তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল-করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে।
তব পুণ্যকিরণ দিয়ে যাক মোর মোহ-আঁধার ঘুচায়ে॥
লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা—ছুটিছে গভীর আঁধারে।
জানি না কখন্ ডুবে যাবে কোন্ অকূল গরল-পাথারে॥
প্রভু বিশ্ববিপদহন্তা, এসে দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণতলে লয়ে যাও মোরে মত্তবাসনা নিভায়ে।
আছ অনলে অনিলে চির নভোনীলে, ভূধরে সলিলে গহনে,
আছ বিটপিলতায় জলদেরি গায় শশি-তারকায় তপনে॥
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া আঁধারে মরি গো ঘুরিয়া,
আমি দেখি নাই কিছু বুঝি নাই কিছু তুমি দাও গো
দেখায়ে বুঝায়ে॥"

এই মহাগীতিরূপ মহামন্ত্রের সাধনার উপর অকপট ভাবে নির্ভর করিয়া তাঁহাকে—সেই বিশ্ববিপদহন্তাকে স্মরণ করিলে তিনিই দয়া করিয়া আমাদের এই বাঙ্গালী জীবনের সার-সর্ব্বস্ব স্বদেশমাতৃকার চিন্ময় জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে যখন দেখা দিবেন, তখন অকপটহৃদয়ে তাঁহার কাছে প্রাণের এই প্রার্থনা জানাইবে—

"পুণ্য-পাপে দুঃখ-সুখে পতনে উত্থানে,
মানুষ হইতে দাও—তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত্ত বঙ্গভূমি! নিজ গৃহক্রোড়ে
চির-শিশু করে' আর রাখিও না ধরে'।
দেশ-দেশান্তর-মাঝে যার যেথা স্থান,
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে,
বেঁধে বেঁধে রাখিও না ভাল ছেলে কোরে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ স'য়ে আপনার হাতে,
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে
দাও সবে গৃহ-ছাড়া—লক্ষ্মীছাড়া ক'রে
সাত কোটি সন্তানেরে—হে মুগ্ধা জননি!
রেখেছ বাঙ্গালী করি'—মানুষ করনি!"

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রকুমার বসু

বিগত ১লা পৌষ সোমবার প্রভাতে বঙ্গ-জননীর আর একটি সুযোগ্য সন্তান রায় রাজেন্দ্রকুমার বসু বাহাদুর পরিণত বয়সে সাধনোচিত-ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। রাজেন্দ্রকুমার মধ্যবিত্ত কায়স্থবংশে জন্মিয়া স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায়প্রভাবে প্রথমে জিলা জজ পরে দায়রা জজের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সরকার তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। অধ্যয়নানুরাগ, হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস—শাস্ত্রালোচনা—সধর্ম্ম অনুষ্ঠানে ভক্তিনিষ্ঠা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। কর্ম্মজীবন হইতে অবসর লইয়া তিনি শেষ জীবনে দেওঘরে বাস করিতেন। দেওঘরের শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ, সাধারণ পাঠাগার, ব্রাহ্মসমাজ, কুষ্ঠাশ্রম, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

সংস্কৃত-সাহিত্যই অতীত ভারতের ইতিহাস *

বেদ যদি জগতের প্রধান ও প্রাচীনতম সাহিত্য হয়, যাহা অনেক মনীষীই এক প্রকার—বাধ্য হইয়া হউক, আর অবাধ্য হইয়াই হউক, স্বীকার করিয়া থাকেন, তবে, তাহাতে কিন্তু দেখি যে, "ইতিহাস-পুরাণং পঞ্চমো বেদঃ"—ছান্দোগ্যের এই উক্তিতে ইতিহাস বেদেরই মধ্যে পড়িয়া যায়, অর্থাৎ বেদই যদি আমাদের সত্যিকার আদিম গ্রন্থ হয়, তবে সেই সঙ্গে ইতিহাসও আসিয়া যায়। সুতরাং ইতিহাস ছিল না বা প্রাচীন আর্য্যগণের ইতিহাসবিষয়ে তেমন একটা ধারণাই ছিল না, এ কথা আর টেঁকে কৈ? প্রত্যুত ইতিহাসের প্রতি তাঁহাদের গৌরবাধিক্যই দেখিতে পাই। সৌতি জাতিতে অব্রাহ্মণ হইয়াও, এক ইতিহাসের জ্ঞান থাকায়, বরেণ্য ঋষিগণের মধ্যে উচ্চ আসনে, অর্থাৎ ব্যাসের আসনে বসিতে পাইয়াছিলেন। এই ইতিহাস কি? অনন্ত সংস্কৃত-সাহিত্যের মধ্যে এই ইতিহাসকে আমরা কিরূপে দেখিতে পাই? আমাদের প্রাচীন শাব্দিকগণই ইহার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস-শব্দের যৌগিক অর্থ-বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া, তাঁহারা বলিয়াছেন,—ইতি, হ এবং আস এই তিনটির মিলনে ইতিহাস অর্থাৎ—ইতি—অর্থে—ইহা, হ—অর্থে—প্রসিদ্ধ, লোকপরম্পরাগত এবং আস—অর্থে—যাহা ছিল এবং আছে। সুতরাং যাহা সত্য বলিয়া, চিরন্তন বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহাই হইল ইতিহাস। চিরন্তন সত্যের উপর যাহা সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত, তাহাই ইতিহাস। নতুবা, কল্পনার মোহন পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া যাহা লোকনয়নের তৃপ্তিকর ও হৃদয়ের পরম আকর্ষক হইলেও, মর্ম্মের মর্ম্মস্থলে ঢুকিতে পারে না, বা হৃদয়ে একটা স্থায়ী চিহ্ন অঙ্কিত করে না, তাহা আমার ভারতের প্রাচীন সাহিত্যিকগণের দৃষ্টিতে ইতিহাস-পদবাচ্য নহে। জগতের সমস্ত ঘটনা, ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি হইতে অতি ক্ষুদ্রতম বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত, অপরাজেয় কালের অবিনাশী প্রস্তরফলকে অক্ষয় অক্ষরে লিখিয়া যাওয়াই হইল ইতিহাসের ধর্ম্ম ও ইতিহাসের কর্ম্ম। লোকপরম্পরায় প্রসিদ্ধি-লাভ-পূর্ব্বক, সর্ব্ববিধ বিরোধী ভাবের মধ্যেও আত্মসত্তা বজায় রাখিয়া যাহা টিঁকিয়া আছে, তাহাই হইল ইতিহাস। এই হিসাবে ইতিহাসের ক্ষেত্র অতি বিস্তৃত। একটা জাতির সমগ্র জাতীয় সাহিত্যই এই হিসাবে তাহার ইতিহাস। সেই ইতিহাসে দিনক্ষণের তেমন ভ্রমপ্রমাদ-শূন্য নির্দ্দেশ না থাকিলেও বড় বেশী কিছু আসে যায় না। অনন্ত কালের সমক্ষে নির্দ্দিষ্ট দিনক্ষণের উপযোগিতা বা উপকারিতা কতটুকু? কোন্ সময়কেই বা কেন্দ্র করিয়া আমরা বর্ত্তমানকালে দিনক্ষণের নির্দ্ধারণ করিয়া থাকি? ইংরাজীমতে খৃষ্টজন্মের হয় পূর্ব্ব না হয় পর, আর আমাদের মতে সংবৎ বা শকাব্দা লইয়া আমরা মাপজোক করি। কিন্তু উহাই কি ইতিহাসের প্রাণ? অন্য দেশের পক্ষে ঐরূপভাবে কালনির্ণয়ের সার্থকতা থাকিতে পারে, আছেও, কিন্তু অনন্ত কালের সমক্ষে তাহাদের ঐ প্রকার কালনির্ণয়ের কেন্দ্র অতীব সংক্ষিপ্ত, জোর তিন চার হাজার বৎসর। কিন্তু আমাদের পক্ষে, যাহাদের ইতিহাস,—যাহাদের ইতিহাস-প্রতিপাদ্য গ্রন্থরাজির বয়ঃক্রম স্মরণাতীত যুগ-যুগান্তর, তাহাদের পক্ষে কি ঐরূপভাবে কালনির্ণয় খাটে? আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, "এখানে যখন আলোক, তখন সেখানে অন্ধকার।" আমাদের পূর্ব্ব-পিতৃপিতামহগণের সমগ্র সাহিত্যই আমাদের ইতিহাস। দিনক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বা উল্লেখ তাহাতে না থাকুক, কিন্তু তাহাতে আমাদের অতীতের যে বিবরণ জ্বলন্ত ভাষায় ও জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে, তাহা ভাবিলেও কোন্ চক্ষুষ্মান্ বিস্মিত না হন? দুই একটা উদাহরণ ধরা যাউক।

আমাদের সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্রের দায়াধিকারের কোথাও এমন কথা নাই যে, চারি বর্ণের যে কোনও ব্যক্তি যদি পত্নী রাখিয়া মরিয়া যান, তবে ঐ মৃত ব্যক্তির ধনাদি রাজায় অর্শিবে, পত্নী কিছুই পাইবে না। বরঞ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রে উহার বিপরীতই দেখি। পতির অভাবে, তদীয় বিধবা পত্নীই আমরণ পতিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের এই নির্দ্দেশ সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু আমাদের শকুন্তলায় ইহার উল্টা দেখিতেছি। এক জন বৈশ্য মরিয়া গিয়াছে, পুত্রাদি তাহার নাই, আছে শুধু এক পত্নী, কিন্তু ঐ মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি রাজাধিকারে আসিতেছে। অবীরা পত্নী পতির কিছুই পাইতেছেন না। মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা কাব্য, উহা পুরাণ উপপুরাণ নহে, বেদ-বেদাঙ্গও নহে। অথচ উহাতে ঐ সত্যের,—তদানীন্তন দায়াধিকারের একটা সন্ধান মিলিতেছে। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র-নির্ম্মাতৃগণের এবং কালিদাসের আবির্ভাবের নিশ্চিত দিনক্ষণ না পাইলেও উহাদের মধ্য হইতে স্পষ্টতঃ পাইতেছি যে, অবীরার ধনাধিকারপদ্ধতি কালিদাসের এবং ধর্ম্মশাস্ত্র-রচয়িতাদের সময়ে একই প্রকার ছিল না। এই যে ঐতিহাসিক তথ্য,—ইহা পাইতেছি আমরা কালিদাসের কাব্য হইতে। সুতরাং আমাদের ইতিহাস বলিতে, শুধু সন-তারিখ-স্থানের উল্লেখ-সংবলিত কোনও গ্রন্থবিশেষ নহে, সমগ্র সংস্কৃত-সাহিত্যই আমাদের ইতিহাস, অর্থাৎ পরম্পরাগত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘটনার "রেকর্ড" বা দপ্তর। কত যুগযুগান্ত ধরিয়া, কত লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া যে জাতি আপন অস্তিত্বে শ্লাঘা করে, এবং সেই শ্লাঘা অলীক বলিয়া প্রমাণ করিবার কোনও উপকরণই এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, যাহাদের সাহিত্য—পুরাণ-তন্ত্র বেদ-বেদাঙ্গাদির কাল আজিও অসঙ্কোচে এবং নিশ্চিতভাবে কেহই ধরিতে পারেন নাই, তাহাদের সাহিত্যে কালনির্ণয়ের আশা করাও যে একটা বিষম ভুল।

যাহা ঘটে, এবং ঠিক যেমন ভাবে ঘটে, শুধু তাহাই বক্ষে খচিত করিয়া যে সাহিত্য স্মরণাতীত কাল হইতে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার নিকট দুই পাঁচ হাজার বৎসর-ব্যাপী একটা দিন খুঁজিতে যাওয়াও যে বিড়ম্বনা। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ, তাঁহাদের সম-সাময়িক ঘটনারাজির যে চিত্র অকপটভাবে

---

* নাগপুরে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের ৮ম অধিবেশনে ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

আঁকিয়া গিয়াছেন, তদ্দর্শনে, তাঁহাদের অধস্তন সন্তান-সন্ততি-বৃন্দ স্ব স্ব সমাজ ও ধর্ম্ম ঠিক করিয়া লইবে, আপন আপন সংসার গড়িয়া তুলিবে, গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্যত্বের বিচারপূর্ব্বক আপন কর্ত্তব্য বাছিয়া লইবে ও তদনুসারে চলিবে, এই অংশেই হইল আমাদের ইতিহাসের সার্থকতা ও উপযোগিতা। সেই ঘটনা কবে ঘটিয়াছিল, কোন্ শতাব্দে পিতৃসত্যপালনার্থ রাম বনে গিয়াছিলেন বা ভ্রাতৃপ্রাণ ভরত রাজ্য পাইয়াও অসিধারেব্রত গ্রহণপূর্ব্বক ঘরে থাকিয়াও বনবাসীর ন্যায় কাল কাটাইয়াছিলেন, ইহা ততটা জ্ঞাতব্য নহে, যতটা রামের পিতৃভক্তি ও ভরতের ভ্রাতৃপ্রেমের চিত্র জ্ঞাতব্য এবং সেই সম্পর্কে প্রাচীন ভারতের আদর্শপুত্র ও আদর্শ-ভ্রাতার ইতিবৃত্তজ্ঞান। সুতরাং আমাদের ইতিহাসের উপাদান অন্যদেশীয়দিগের উপাদান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

রাহুরূপী চণ্ডাল আসিয়া যে দিন সূর্য্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করে, সেই দিন যথাক্রমে সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ বলিয়া আমরা ধরি এবং হাঁড়ি ফেলি, পুরশ্চরণ করি—দানধ্যান করি, তীর্থ-স্থলে বহুলভাবে সমবেত হইয়া বসন্ত-বিসূচিকায় প্রাণত্যাগ-পূর্ব্বক সহজেই স্বর্গে চলিয়া যাই, ইহা যেমন আমাদের ইতিহাস,—আমাদের শাস্ত্রাদিতে ঐ গ্রহণের বিবরণ লিপিবদ্ধ তেমনই,—পৃথিবীর ছায়া সূর্য্য এবং চন্দ্রের উপর যখন যখন পড়ে, তখন তখনই সূর্য্য ও চন্দ্রকে অবুঝ লোক অপবিত্র মনে করে, বস্তুতঃ ঐ দুই গ্রহ কদাচ অপবিত্র হন না, ইহাও আমাদেরই সাহিত্যের কথা।

"ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলত্বে
নারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ"

ইহা আমাদেরই ইতিহাস।—যখন যে সমাজে বা সম্প্রদায়ে ঠিক যেমন যেমন সংস্কার এবং সেই সংস্কারানুগত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাই নিরপেক্ষভাবে লিপিবদ্ধ করা ইতিহাসের কার্য্য। আমাদের জাতীয় সাহিত্যে সেই কার্য্য যত সুচারু-রূপে সুসম্পন্ন দেখিতে পাই, অন্যত্র তেমনটি দেখি না। সত্যের গোপন এবং যাহা হয় নাই, তাহার অবতারণা-পূর্ব্বক কৃত্রিমতার মনোমোহন আবরণে জাতীয় গৌরববর্দ্ধনের প্রয়াস আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে আদৌ নাই। কোন্ জাতির পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যে দেখাইতে পার যে, তাহার পূর্ব্ব-বর্ত্তী বংশের রমণী অম্লানবদনে পুত্রের নিকট বলিতেছে যে, বৎস, যৌবনে আমি ত মিতাচারিণী ছিলাম না, সুতরাং কে তোমার জন্মদাতা, তাহা কেমন করিয়া বলিব? এই বৃত্তান্তে ঐ ললনা যে জাতির গৌরব, সেই জাতি যে তখন কত বড় সত্যপ্রিয় ছিল, তাহা আমাদের উপনিষদ্রূপী ইতিহাস বলিয়া দিতেছে। কলিতে সমুদ্রযাত্রা, সন্ন্যাসগ্রহণ প্রভৃতি কতকগুলি কায আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত। অথচ আমাদেরই জাতীয় সাহিত্যে দেখিতেছি, আমাদেরই এক জন শ্রেষ্ঠ কবি, জগতের আদিজনকের মুখ দিয়া বলাইতেছেন যে, "বৎসে! এক দিন তোমার এই শিশুপুত্র অপ্রতিরথ বীর হইয়া সমুদ্র পার হইবে এবং সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে জয় করিবে।"

সময়বিশেষে কত ঘটনা ঘটে। দুই দশ বছর হয় ত মনে থাকে, পরে লোক ভুলিয়া যায়, কিন্তু ইতিহাসে ভ্রান্তি নাই। সে ভোলে না, তিল এবং তাল দুই-ই সে সযত্নে কুড়াইয়া অধস্তনদের জন্য রাখিয়া দেয়। তবে ইহাও সত্য যে, সময়ে সময়ে তালের চাপে তিল পিষিয়া উপিয়া যায়। তাই আমাদের ইতিহাসে যেমন সূর্য্য ও চন্দ্রের গ্রহণ সম্বন্ধে দ্বিবিধ সংস্কার পাইতেছি, তেমনই সমুদ্রযাত্রার বিধি ও নিষেধও পাইতেছি। অতীতকালে উহা যখন যেমন ভাবে প্রচলিত ছিল, এবং অপ্রচলিতও হইয়াছিল,—সে সমস্তই আমাদের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে।

বিবাহ মানব-জীবনের একটা প্রধান সংস্কার। আমাদের সাহিত্যে অর্থাৎ বেদ হইতে—পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পর্য্যন্ত নানা গ্রন্থে ঐ বিবাহের যে ইতিবৃত্ত পাই, তাহাতে দেখিতেছি, কত বড় নিষ্ঠুর সত্যপ্রিয়তা সহকারে, আমাদের ইতিহাস-বিদ্গণ গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা তাঁহাদের স্বীকৃত ও লিপিবদ্ধ সত্যের প্রতি উদাসীন থাকিয়া নিজেরা কামড়াকামড়ি করিয়া মরিতেছি। আমাদের শাস্ত্রে যেমন বলিতেছে—

অষ্টমে গৌরী, না হয় নবমে রোহিণী,
না হয় জোর দশমে কন্যাদান কর; সাবধান!

নবমের পর কিন্তু বিবাহের বৈধ কাল আর থাকিবে না। তেমন—আবার আমাদেরই অথর্ব্ববেদে আছে—

"ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্"

কন্যা ব্রহ্মচর্য্যপালনপূর্ব্বক যুবা পতিকে বরণ করিবে। আমাদের ঋষি কাত্যায়ন বলিতেছেন—

"প্রাগ্রজোদর্শনাৎ পত্নীং ন ইয়াৎ"—

রজোদর্শনের পূর্ব্বে পত্নী-সম্বন্ধ করিবে না।—গোপথব্রাহ্মণে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে,—

"আসাং প্রথমে বয়সি রেতঃ সিক্তং ন সম্ভবতি"

ত্রিশ বৎসরের যুবা রূপগুণবতী দ্বাদশবর্ষীয়াকে বিবাহ করিবে, যেমন পাইতেছি, তেমনই, বত্রিশ বছরের যুবা ষোল বছরের যুবতীকে বিবাহ করিবে—ইহাও আমাদেরই শাস্ত্রের আদেশ:

"অথ তদ্ দ্বাদশাহানি ত্রিংশদ্বর্ষেণ সর্ব্বদা।
যদি দ্বাদশ-বর্ষা স্যাৎ কন্যা রূপগুণান্বিতা।
দ্বাত্রিংশদ্বর্ষপূর্ণেন যদি ষোড়শবার্ষিকী।"

সুতরাং এ কথা আমরা দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারি যে, প্রাচীন-কালে যখন যেমন রীতিনীতি, ব্যাপারবৈচিত্র্য পূর্ব্বতন সমাজে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা ঠিক তেমনই ভাবেই আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে বিন্দুমাত্রও অসত্যের লেশ নাই। এই হিসাবে, অতীতের প্রকৃত ইতিহাসের উপাদান প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে যত আছে, অন্য কুত্রাপিও তাহা তত নাই। তবে সেই উপকরণরাজি সঙ্কলন করা এক অতি বিরাট ব্যাপার। ইহা এক জনের বা এক জীবনের কায নহে। তাই ভারতের প্রকৃত ইতিহাস আজও রচিত হয় নাই। সন-তারিখের মাপে ঐ জাতীয় ইতিবৃত্তের মাহাত্ম্যবৃদ্ধি বা তদভাবে মাহাত্ম্য

খর্ব্ব হয় না। যাহা সত্য, সে নিজের মহিমায় সর্ব্বদাই সমুজ্জ্বল। তাহাকে উজ্জ্বলতর করিবার প্রয়াস বৃথা।

যাহাদের অতীত নাই, বর্ত্তমান লইয়া এবং বর্ত্তমানের গৌরবে তাহারা যা হয় একটা অতীত গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করুক, ক্ষতি নাই; কিন্তু যাহাদের অতীতের চিত্র-শালার শতধা ভগ্ন ও শতধা অঙ্গহীন চিত্রাবলীর এখনও যেটুকু আছে, এবং যাহা দর্শনে আজিও জগৎ স্তম্ভিত, তাহাদের ইতিহাসের জন্য ত নিজের আঙিনা ছাড়িয়া পরের দুয়ারে যাইতে হইবে না। সে সমুদয় গ্রন্থের এবং ভারতের নানাস্থানের লুপ্তপ্রায় প্রাচীন নিদর্শনরাজির ভগ্নাবশেষে আমাদিগকে, পরের শত প্রয়াসেও, মানুষের আসন হইতে এক তিলও নামিতে দেয় নাই, যদি ঐ সকল গ্রন্থ এবং নিদর্শনাদি না থাকিত, যদি আমাদের বেদ, উপনিষদ, কাব্য, পুরাণ, জ্যোতিষ—আমাদের ইলোরা, অজন্তা, অস্ত ও উদয়গিরি, আমাদের দ্বারকা, সোমনাথ, ভুবনেশ্বর, কাঞ্চী না থাকিত, তবে এত দিনে ত আমরা একটা আরণ্য জন্তুর বংশধর বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যাইতাম,—ভাগ্যে ঐ সব ছিল, তাই, যত কালোই আমরা হই, সাদার কাছে—যা হোক একটু মর্য্যাদা পাই, সেই আমাদের ইতিহাসের—অতীত ভারতের দিকে, এবং সেই অনুপাতে পশ্চাৎকালের নবীন জগতের নানা নবীন জাতির ইতিহাসের দিকে যখন তাকাই, তখন বুক আমার ভরিয়া উঠে, প্রাণ আমার মাতিয়া উঠে। আশার স্বর্ণচ্ছটায় আমার দশদিক্ উদ্ভাসিত হয়। যাহাদের এমন অতীত, তাহারা ছোট নহে, যাহাদের এমন অতীত, তাহারা মরিবে না, মরিতে পারে না। প্রাতঃসন্ধ্যার ন্যায়, শীত-বসন্তের ন্যায় তুচ্ছ ও অতিক্ষুদ্র সাময়িক পরিবর্ত্তনে অধীর বা বিচলিত না হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। বুকে বল আনিতে হইবে। যখন অবসাদ আসিবে, তখন ইতিহাসের মকরধ্বজে দেহে বলাধান করিয়া লইতে হইবে, তোমার বিশ্ববরেণ্য কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া উদাত্তস্বরে গাহিতে হইবে—

"পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী।
হে চির-সারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিন-রাত্রি।"

বন্ধুবৃন্দ,—হে "নিজ-বাসভূমে পরবাসী"—সাহিত্যসেবিবৃন্দ, আমরা যেন আমাদের ইতিহাসের যে প্রধান বাণী, যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, তাহা ভুলিয়া না যাই। ভুলিয়া না যাই যে, যাহা অল্প, ক্ষুদ্র, তাহাতে সুখ নাই। অল্পতা বা ক্ষুদ্রতায় একটা জাতি কখনও বড় হইতে পারে না। আমাদের ইতিহাস ঐ শোন, জলদগম্ভীরস্বরে কহিতেছে—

"নাল্পে সুখমস্তি, যো বৈ ভূমা, স উপাসিতব্যঃ"

অল্পে সুখ নাই। যাহা বিরাট, তাহার উপাসনা কর।

চল বন্ধুগণ, এই সঞ্জীবন-মন্ত্রে আমাদের জাতীয় শবদেহে নবীন প্রাণ ও নবীন বল সঞ্চার করিয়া লইয়া অগ্রসর হই। আমাদের ভবিষ্যতের জন্য, অতীতের ইতিহাসের দীক্ষায় ইতিহাস গঠন করি। এ জগতে অপূর্ণতায় সুখ নাই। অপূর্ণতায় শান্তি নাই। পরিপূর্ণ হৃদয়ে ও কল্পনার পরিপূর্ণ সম্ভারে মনঃপ্রাণ পূর্ণ করিয়া লইয়া, চল সাহিত্যসেবিগণ, বঙ্গভারতীর পূজার দেউলে উপস্থিত হই গিয়া। আমার ইতিহাসের—

ওঁ

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"

ঝঙ্কার ঐ যে এখনও আমার কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিতেছে, আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছে!

ভাই সাহিত্যের সাধকগণ, সাহিত্যসাধনায়, মাতৃপূজার মহাযজ্ঞে মধুময় হৃদয়ে ও মধুময় কণ্ঠে, চল অগ্রসর হই। আমাদের মনঃপ্রাণ, আমাদের সংস্পর্শে যাহারা আসিবে, তাহাদের মনঃপ্রাণ,—আমাদের ভিতরবাহির, পূর্ব্বপশ্চাৎ—সমস্ত মধুময় করিয়া তুলি। এস,—মধুময় হৃদয়ে ও মধুময় হস্তে আমাদের নবীন জাতীয় ইতিহাস গঠন করি। গরলের ঝাঁঝে যেন প্রত্যূষেই আমরা শুকাইয়া না যাই। একবার মুক্তকণ্ঠে বলুন—

"মধু ক্ষরতু তে চিত্তং মধু ক্ষরতু তে মুখম্।
মধু ক্ষরতু তে বিত্তং লোকো মধুময়োঽস্তু তে।"

একবার সম্মিলিত কণ্ঠে প্রার্থনা করুন—

"বাঙ্গালীর পণ, বাঙ্গালীর আশা, বাঙ্গালীর কাজ বাঙ্গালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক,—হে ভগবান্!
বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন, বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাইবোন্,
এক হউক, এক হউক, এক হউক,—হে ভগবান্।"
ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

কংগ্রেস

লাহোরে কংগ্রেসের চতুশ্চত্বারিংশৎ অধিবেশন হইয়া গেল। এই অধিবেশনের বিশেষত্ব আছে। গত বৎসর কলিকাতা কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিলাতের ও ভারতের সরকার তাহাদের স্কন্ধে সাইমন কমিশন চাপাইয়া দিয়াছিলেন; পরন্তু অধিকাংশ ভারতবাসীর অনুমোদিত নেহরু রিপোর্ট একবার আলোচনা করিতে সম্মত হন নাই। পূর্ব্বে ব্যবস্থাপরিষদের ভারতীয় সদস্যদের একটি সম্মিলিত পরামর্শ সভায় ভারতের স্বরাজের আদর্শ ও স্বরূপ নির্ণয় করিয়া একটি খসড়া প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেড ভারতবাসীকে তাহাদের কামের বিষয় স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে সদম্ভে আহ্বান করিয়াছিলেন। নেহরু রিপোর্ট সেই আহ্বানের উত্তর।

সুতরাং বৃটিশ সরকার যখন উহাও অগ্রাহ্য করিয়া সাইমন রিপোর্টের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন, তখন কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। কিন্তু মহাত্মা গন্ধী প্রমুখ নেতৃবর্গ প্রস্তাব করেন যে, আর একবার বৃটিশ সরকারকে তাঁহাদের মনোভাব ও দৃষ্টির লক্ষ্য পরিবর্ত্তন করিবার অবসর প্রদান করা হউক। মহাত্মা গন্ধী প্রথমে ৩ বৎসর এই অবসর প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে এক বৎসর অবসর প্রদানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাব অনুসারে স্থির হয় যে, যদি ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে নেহরু রিপোর্টের অনুযায়ী ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার ভারতবাসীকে প্রদান করা না হয়, তাহা হইলে ভারতবাসী স্বাধীনতাই ভারতের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিবে এবং সেই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবার উদ্দেশ্যে অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পন্থা অবলম্বন করিবে।

লাহোরে কংগ্রেস প্যাণ্ডেল

লাজপত নগর—প্রধান তোরণ

এবারের কংগ্রেস অধিবেশনের এই হেতু একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। বিশেষতঃ কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ব্বে ৩০শে নভেম্বর তারিখে বড়লাট লর্ড আরউইন (বিলাত হইতে এ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর) যে ঘোষণা করেন, তাহাতে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। ঐ ঘোষণায় তিনি বৃটিশ সরকারের ... হইতে স্বীকার করেন ... দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের ... ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাস... পরন্তু তিনি প্রকাশ করেন ... বিলাতে একটি পরামর্শ স... (Round Table Conference) বসান হইবে এবং ঐ স... বৃটিশ-ভারতের ও রাজন্য-ভারতের প্রতিনিধিদিগের স... বৃটিশ পক্ষের প্রতিনিধিদের স্থান থাকিবে ও সকল পক্ষ তাঁহা...

স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করিতে পারিবেন। বৃটিশ সরকার সকল পক্ষের কথা শুনিয়া পার্লামেণ্টের সকাশে অধিকাংশের যে যে বিষয়ে মত-সামঞ্জস্য হইয়াছে, সেই সকল কথাই নিবেদন করিবেন। পার্লামেণ্ট উহা আলোচনা করিয়া যৎকর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন।

রাভি-সেতুর সম্মুখের দৃশ্য

ডেলিগেটগণের শিবির

এই ঘোষণা প্রচারিত হইবার পর নেতৃবর্গ দেশে এক নূতন অবস্থার অভ্যুদয় হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেন এবং সে অবস্থায় কি করা, কর্ত্তব্য, তাহা অবধারণ করিবার নিমিত্ত এক পরামর্শ সভায় সমবেত হইলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু স্বরাজ্য দলের প্রতিনিধিরূপে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে সরকার পক্ষে স্যার ম্যালকম হেলি বলিয়াছিলেন যে, স্বায়ত্ত-শাসন অর্থে ভারতকে যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হইবে, এমন কথা বুঝায় না। ইহাতে ইংরাজের প্রতিশ্রুতিতে এ দেশবাসীর বিলক্ষণ সন্দেহের উদয় হয়। সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিবার উদ্দেশ্যে বড় লাটের ঘোষণায় স্বায়ত্ত-শাসন অর্থে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন বুঝায়, তাহা স্বীকার করা হইয়াছিল; পরন্তু গোল টেবল বৈঠকের প্রস্তাবেও ইংরাজের অনুসৃত নীতির পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল; কেন না, এ যাবৎ কমিশন কমিটির সাহায্যে ভারতের সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া নেতৃবর্গ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, লাহোর কংগ্রেসে গত কলিকাতা কংগ্রেসের মন্তব্য অনুযায়ী কার্য্য করিবার পরিবর্ত্তে আর একবার বৃটিশ সরকারের সহিত আপোষের কথাবার্ত্তা কহা কর্ত্তব্য। তদনুসারে তাঁহারা বড়লাটের ঘোষণা স্বীকার করিয়া লইলেন, তবে ঐ সঙ্গে কয়েকটা সর্ত্ত দিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজনীতিক বন্দীদিগের মুক্তিদান একটি। অপর একটি হইতেছে,—গোল টেবল বৈঠকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের প্রকৃতি এবং

লাহোরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনোৎসব

সময় সম্বন্ধে একটা খোলাখুলি কথা হইবে। শেষ,—ঐ বৈঠকে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য থাকিবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন আশ্বাস অপর পক্ষ হইতে পাওয়া যায় নাই। ইহার পর দিল্লীতে বড়লাটের সহিত এ বিষয়ে একটা পাকাপাকি কথা কহিবার উদ্দেশ্যে নেতৃবৃন্দের সহিত বড়লাটের পরামর্শ হয়। উহার পূর্ব্বে দিল্লীতে আসিবার পথে মাত্র দশ মাইল দূরে বড়লাটের স্পেশাল ট্রেণে বোমা বিস্ফোরিত হয়। এই দুষ্কার্য্যের তীব্র নিন্দা ভারতের চারিদিক্ হইতে হইয়াছিল। বড় লাটও ইহাতে বিন্দুমাত্র ধৈর্য্য-চ্যুত না হইয়া নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শ সভায় উপস্থিত হন। সে সভা ফলদায়ক হয় নাই। বড় লাট বলেন, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রাজকীয় ঘোষণার মুখবন্ধে নির্দ্দিষ্ট ও ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সংস্কার আইনের নির্দ্ধারিত পন্থা অতিক্রম করিয়া যাইবার সাধ্য কাহারও নাই, এক পার্লামেণ্টই সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের প্রকৃতি ও সময় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিতে পার্লামেণ্টই অধিকারী, অন্য কেহ নহে। সুতরাং গোল টেবল বৈঠকে সে কথার আলোচনা হইতে পারে না। তবে ভারতের প্রতিনিধিদের কথা বৈঠকে নিবেদিত হইলে পরে বৃটিশ সরকার পার্লামেণ্টে উহা পেশ করিতে পারেন, অবশ্য সকল পক্ষের অভিপ্রায় অনুসারে। মূলেই যখন এই মতবিরোধ উপস্থিত হইল, তখন আর রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির অথবা অন্যান্য কথার বিষয়ে কোন আলোচনা হইল না।

গৃহবিচ্ছেদ

পরামর্শ-সভা ভঙ্গের পর নেতৃবর্গ স্থির করিলেন যে, অতঃপর সরকারের সহিত আর আপোষের কথা চলিতে পারে না, গোল টেবল বৈঠকেও কংগ্রেস-কর্ম্মী বসিতে পারে না; কংগ্রেস অতঃপর আপনার কর্ত্তব্য লাহোর অধিবেশনেই স্থির করিয়া লইবে। এই হেতু লাহোর কংগ্রেসের একটা বিশেষত্ব ছিল।

আরও এক কারণে লাহোর কংগ্রেসের সম্বন্ধে জনসাধারণ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। বাঙ্গালায় কংগ্রেস-স্বরাজীদের দল ভাঙ্গাভাঙ্গির মত পঞ্জাবেও কংগ্রেসকর্ম্মীদের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ হইয়াছিল। ডাক্তার সত্যপাল, লালা দুনীচাঁদ, ডাক্তার গোপীচাঁদ এবং ডাক্তার কিচলুর মত নেতৃবর্গের মধ্যেও এই বিরোধ কিরূপ অশোভন ও মর্ম্মপীড়াদায়ক, তাহা সহজেই অনুমেয়। দেশের কায, ইহাতে সকল শ্রেণীর ভাবুকেরই অধিকার আছে। অমুক দল প্রাধান্য লাভ করিল, অতএব আমরা কায করিব না, দেশ উদ্ধার যদি হয়—তবে আমার ও আমার দলের দ্বারাই হউক, এই মনোবৃত্তি লইয়া যাহারা কায করে, তাহাদের মুক্তিসমরে অবতীর্ণ হওয়া বিড়ম্বনামাত্র। যাহা হউক, পঞ্জাব কংগ্রেসকর্ম্মীদের এক দল কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া গেলেন, অপর দল কংগ্রেস অধিবেশনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এরূপ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এত বড় একটা বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করা কিরূপ কষ্টসাধ্য, তাহা সহজেই অনুমেয়। চূড়ার উপর ময়ূরপাখার মত আরও একটা ব্যাপার সংঘটিত হইল।

ব্যারিষ্টারবেশে পণ্ডিত জহরলাল

প্রকাশ পাইল, এবারকার অধিবেশনে নানা দিক্ হইতে বা পড়িতেছে; কংগ্রেসকর্ম্মীদের পশ্চাতে গোয়েন্দা ঘুরিতেছে পঞ্জাবের নানা আফিসে কর্ম্মচারীদিগকে কংগ্রেসে যোগদা করিতে নিষেধ করা হইতেছে, অনেক আফিসের বড়দিনে ছুটী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে;—এই সকল কারণে লে কংগ্রেসে যোগদান করিতে ভয় পাইতেছে।

ফল কথা, এইরূপ নানা কারণে এবার লাহোর কংগ্রে অধিবেশনের সাফল্য সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহের উদয় হইয়াছি কিন্তু লালা লাজপৎ রায়ের স্মৃতিরক্ষা সভায় সকল সন্দে

অবসান হইল। ডাক্তার সত্যপাল সেই সময়ে জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। তিনিও অন্যান্য কংগ্রেসকর্ম্মীর ন্যায় ঐ সভায় যোগ দিলেন এবং তাঁহার অনুচরবর্গকেও লইয়া গেলেন। ডাক্তার গোপীচাঁদ ও ডাক্তার কিচলু প্রমুখ কংগ্রেসকর্ম্মীরা তখন কংগ্রেস কাযে আমায় যে কার্য্যের ভার দিবেন, আমি সানন্দে সগৌরবে সেই কার্য্য সম্পাদন করিব। আমি ও আমার দলের সকল লোক কংগ্রেসের সামান্য সৈনিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

ডাক্তার সত্যপালের এই কথাগুলি জাতির মুক্তির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য; পরন্তু আমাদের বাঙ্গালার স্বরাজী কংগ্রেস-কর্ম্মীদের জন্য উহা নিত্য পাঠ্যরূপে কংগ্রেস হইতে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। ইহারা এবার বাঙ্গালার এবং ততোধিক বাঙ্গালার বাহিরে সুদূর পঞ্জাবে যে কীর্ত্তিধ্বজা উড়াইয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালার মুখে যে চুণ-কালি পড়িয়াছে, বাঙ্গালীর উচ্চ মাথা হেঁট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। লাহোর কংগ্রেসে এই কংগ্রেস স্বরাজীদের প্রভুত্বপ্রয়াসী দলের স্বার্থান্বেষী বিরোধী দল দুইটি বাঙ্গালার ঘরের ঝগড়া পরদেশীয় দরবারে মিটাইয়া লইতে গেলেন। কেহ প্রথমে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিয়া পরে দুঃখ প্রকাশ করিলেন, কেহ সভার মধ্যে অপর দলের 'গুণের' কথা বলিয়া দিতে গিয়া ধমক খাইলেন—সে এক অভিনব দৃশ্য, যেন খেলাঘরে ছেলেদের পুতুল লইয়া চুল ছেঁড়াছিঁড়ি! বাঙ্গালার এতই অধঃপতন হইয়াছে যে, লাহোরের বহুল প্রচারিত উর্দ্দু 'মিলাপ' পত্র 'ষাঁড়ে ষাঁড়ে' লড়াইয়ের ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কিত করিয়া বাঙ্গালী কর্ত্তৃপক্ষকে বিদ্রূপ করিলেন। পথে ঘাটে বাঙ্গালার কথা লইয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপের আলোচনা চলিল। শ্রীমান্ গোবিন্দ মালব্য কংগ্রেসের বাহিরে প্রকাশ্যে বলিলেন, "বাঙ্গালাকে এক বৎসরের জন্য কংগ্রেস হইতে দূরে থাকিবার শাস্তি দেওয়া উচিত।" বহু কংগ্রেস প্রতিনিধি, কংগ্রেসের অধিবেশনকালে উভয় দলকে লক্ষ্য করিয়া "A plague on both the parties" বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও শ্রীমতী স্বরূপকুমারী (পণ্ডিত জহরলালের ভগিনী)

কিন্তু তাহাতেও চৈতন্য হইল না। বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে এক পক্ষ কংগ্রেসের কর্ম্মচারীর কার্য্য ত্যাগ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু অপরের মধ্যস্থতায় এবং আপনাদের ত্রুটি স্বীকার করায় মিটমাট হইয়া গেল। সকলেই আনন্দিত হইলেন। একেই চারিদিকে বিরোধ, তাহার উপরে কংগ্রেসের মধ্যে এই ঘরোয়া বিবাদ। কাযেই বিবাদের অবসান হওয়ায় সকলেই একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

কিন্তু উহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। ইহার পরেই আবার বাঙ্গালার স্বরাজীদের এক পক্ষের নেতা আরও অনেক কংগ্রেসকর্ম্মীর সহিত কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং Congress

অভ্যর্থনা সমিতির কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, ডাক্তার সত্যপালের দল পরাজিত হইয়া কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু সোনা যেমন আগুনে পুড়িয়া খাঁটি হয়, তেমনই ডাক্তার সত্যপাল জেলের কষ্ট উপভোগ করিয়া তখন খাঁটি হইয়াছেন; কাযেই তিনি সেই পরলোকগত জননায়ক পঞ্জাবকেশরীর স্মৃতিসভায় উঠিয়া জলদগম্ভীরনাদে বলিলেন,—আমাদের মধ্যে বিরোধ নাই, কংগ্রেসের কাযে আমরা সবাই এক। ডাক্তার গোপীচাঁদ কংগ্রেসের

মহাত্মা গন্ধী

Democratic party নাম গ্রহণ করিয়া আর একটি নূতন দল সৃষ্টি করিলেন। দলের প্রেসিডেণ্ট হইলেন শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং সেক্রেটারী হইলেন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও ডাঃ আলাম। অথচ এই শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহাশয়ই গৌহাটী কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টরূপে বলিয়াছিলেন,—

"There can be only two parties in India, the party of the Government and its adherents that obstruct Swaraj. and the party that fights unceasingly for Swaraj."

অন্যত্র,—"With the greatest fervour and in a

humility I would appeal to all leaders, all groups of workers and schools of thought in and outside the Congress to put aside all differences for one brief year and stand together as comrades in arms determined to win freedom."

করিলেন, পঞ্জাবের কংগ্রেসকর্ম্মীরা তাহা করিলেন না। তাঁহারা দেশের এই সঙ্কটের দিনে এক হইয়া গেলেন। ইহার ফলে লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন আশানুরূপ সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে।

সভাপতির অভিভাষণ

স্বাধীনতার মন্তব্য।

পণ্ডিত মতিলাল

এবার মহাত্মা গন্ধীরই লাহোর কংগ্রেসে প্রেসিডেণ্ট হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তিনি ঐ পদ গ্রহণ করিতে সম্মত না হওয়ায় পণ্ডিত জহরলাল নেহরু প্রেসিডেণ্ট-পদে নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার ন্যায় উগ্রপন্থী অপরিণতবয়স্ক যুবকের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব করিবার কথা হওয়ায় কাহারও কাহারও মন নানা দুশ্চিন্তায় আন্দোলিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ কলিকাতার টাউনহলের সভায় সরদা বিলের বিপক্ষে হিন্দুসভায় তিনি ও তাঁহার অনুচরবর্গ যে অধৈর্য্য ও অসৌজন্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে সেই চিন্তা আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বিশেষতঃ এবার কংগ্রেসে স্বাধীনতা মন্তব্য ও কাউন্সিলবর্জ্জন নীতি গৃহীত হইবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া—কংগ্রেসের 'জাতীয় দলের' (nationalist) পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও শ্রীযুক্ত কেলকার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ঐ মন্তব্যদ্বয়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন বলিয়া—এবারকার লাহোর কংগ্রেসের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। পণ্ডিত জহরলাল এহেন বিরাট সভায় কি ভাবে নেতৃত্ব করেন, তাহা দেখিবার জন্য সকলে উৎসুক ছিল।

অবশ্য সেই এক বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু তাহা বলিয়া যে অবস্থায় তিনি দেশবাসীকে এই অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেই অবস্থাও কি অতীত হইয়াছে? তবে? তবে তিনি অপর কয় জন কংগ্রেসকর্ম্মীর সঙ্গে স্বতন্ত্র কংগ্রেসদল সৃষ্টি করিয়া দেশের কার্য্যে শক্তির অপচয় করিতে উদ্যত হইলেন কেন? ইহা কি আত্মঘাতী নীতি নহে?

সুখের বিষয়, বাঙ্গালার স্বরাজ্যদল এবং শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রমুখ কয়জন ভিন্নদেশীয় কংগ্রেসকর্ম্মী যে কীর্ত্তি

কিন্তু এবার কংগ্রেসে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিয়া শত্রু-মিত্র একবাক্যে তাঁহার বাক্-সংযম ও গাম্ভীর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার মতের সহিত যেখানে অপরের স্বার্থের সংঘর্ষ হইয়াছে, সেখানে সেই মতকে ভাবপ্রবণ ও ব্যবহারিক জগতে অপাংক্তেয় বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। ইহা হইবারই কথা। এই জন্য 'ইংলিশম্যান' এই অভিভাষণকে 'ডিনামাইটে ভরা' বলিয়াছেন। বিলাতের কয়েকখানা পত্র এই অভিভাষণকে 'অসম্ভব' বলিয়া

দিয়াছে। বিলাতের শ্রমিক সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'নিউ-লিডার'ও ইহাকে আরউইন-বেনের সরল প্রস্তাবের উপযুক্ত উত্তর বলিয়া বিবেচনা করেন নাই, বরং বলিয়াছেন, ইহা ভারতের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর। তাহা হইতে পারে, কিন্তু কেহ এ যাবৎ বলিতে পারেন নাই যে, পণ্ডিত জহরলালের ভাষা ও ভাব অসংযত বা উচ্ছৃঙ্খল। বস্তুতঃ তিনি যথোচিত সংযত ও সরল ভাষায় তাঁহার বক্তব্য নিবেদন করিয়াছেন। তাঁহার বয়সের লোকের পক্ষে এরূপ সংযম ও ধৈর্য্যের পরিচয় দেওয়া নিশ্চিতই গুণের কথা। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, লোকের স্কন্ধে যখন দায়িত্ব নিপতিত হয়, তখন সেও দায়িত্বের গুরুত্ব বুঝিয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হয়।
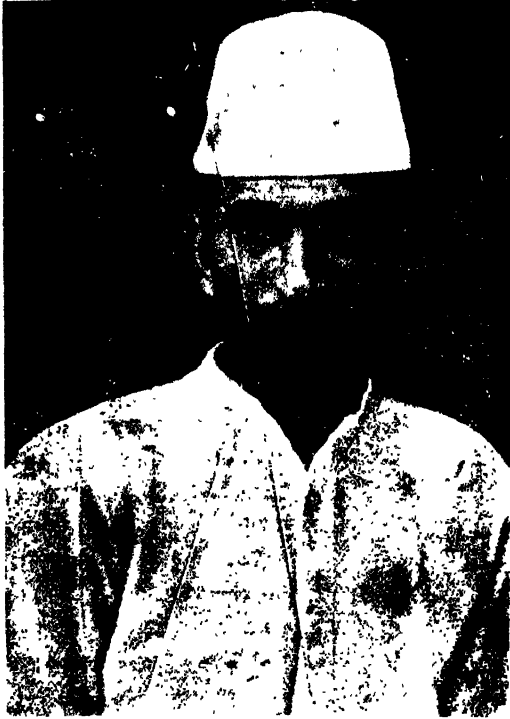
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাক্তার কিচলু

বুয়ার ও আইরিশদের উপর যখন দেশ-শাসনের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল তখন তাহারাও সানন্দে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কার্য্য-সাফল্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ভারতবাসীরাও সেই দায়িত্ব প্রাপ্ত হইলে যে, উহা যথোপযুক্তরূপে পালন করিবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। তবে স্বার্থের খাতিরে সেই অধিকা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখা স্বতন্ত্র কথা।

তাঁহার অভিভাষণে বুঝিবার ও ভাবিবার অনেক কথা আছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা বর্ত্তমান জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের সম্মুখে বর্ত্তমানে এমন কতকগুলি সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, যাহার ফলে ভারতের ইতিহাস আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। বিশ্বাসের যুগ অতীত হইয়াছে, তাহার সহিত সান্ত্বনা ও স্থায়িত্বের কালও চলিয়া গিয়াছে। অবশ্য শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে বিশ্বাসের যুগ অতীত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন আর শাসিত জাতি কেবল স্তোকবাক্যে সান্ত্বনা পায় না, এ কথা সত্য। তাহারা চাহে কঠোর সত্য, প্রকৃত কায। বারবার আশাহত হইয়া বিশ্বাস টলিয়া যাওয়া আশ্চর্য্যের কথা নহে। ইহার জন্য দায়ী শাসকজাতি। তাঁহারা অবিশ্বাসও সন্দেহ আনয়ন করিবার কারণ দিয়াছেন। শেষ মুহূর্ত্তেও যদি তাঁহারা গোলটেবল বৈঠকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের স্বরূপ ও সময় সম্বন্ধে কণামাত্র আভাসও দিতেন, তাহা হইলে হয় ত আজ ভারতে বর্ত্তমান অবস্থার উদয় হইত না।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

ব্যাপকভাবে অবশ্য বিশ্বাসের যুগ অতীত হয় নাই। বিশ্বাস না থাকিলে ব্যবহারিক জগতে ব্যষ্টি বা সমাজগতভাবে কোন কায হইত না। চারি যুগেই বিশ্বাস আছে এবং থাকিবে। বিশ্বাস হারাইয়া কোনরূপ প্রগতি লাভ করা সম্ভবপর হয় না। ধর্ম্মেই কি, সমাজেই কি, আর রাজনীতিতেই কি,—পরস্পর বিশ্বাস, কিংবা কোন একটা ধর্ম্মে, জাতীয়তায় বা অপরের কথায় বিশ্বাস রাখিতেই হয়। এ সকল বিষয়ে বিশ্বাসই সকল প্রকার প্রীতি ও একতার মূল। আর এই একতার প্রীতির উপরে স্বাধীনতাই বলুন, আর মুক্তিই বলুন, সবই বিশেষরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। এই হেতু ফরাসীর ত্রিবর্ণ পতাকার শিরোভূষণ,—সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। সুতরাং পা...

জহরলাল যদিও বলিয়াছেন, বিশ্বাসের দিন অতীত হইয়াছে, তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে যে হয় নাই, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পণ্ডিত জহরলাল বলিয়াছেন, য়ুরোপের প্রভুত্বের দিন অতীত হইয়াছে, আবার এসিয়ার প্রভুত্বের দিন আসিতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে নবীন মার্কিণ জাতিরও প্রভুত্বের দিন আসিতেছে। এসিয়ার প্রভুত্ব নূতন নহে। যুগযুগান্তর পূর্ব্বে শত শত বৎসর এসিয়াবাসীরা য়ুরোপের উপর প্রভুত্ব করিয়াছিল। হান্ বা হুন্ জাতীয় অত্তিলার নাম সকলেই জানেন। এখনও এই হুন জাতির নামানুসারে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর হাঙ্গেরিয়ান নাম হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই এসিয়াবাসী যে কালনেমির আবর্ত্তনে পুনরায় সেই প্রভুত্ব হস্তগত করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? এসিয়ার সর্ব্বত্র যে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। এ চাঞ্চল্য কিসের জন্য? বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তোষ ও অশান্তি ইহার কারণ। ইহার তৃপ্তি না হইলে ভারত ও অন্যান্য এসিয়ার দেশ এইরূপই অশান্ত থাকিবে; ইহাতে জগতের মঙ্গল নাই।

সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল

এই কথার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পণ্ডিত জহরলাল বলিয়াছেন,—সর্ব্বদলসম্মেলন যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, কংগ্রেস তাহা গ্রহণ করিবার জন্য সরকারকে এক বৎসর সময় দিয়াছিলেন। কিন্তু এ যাবৎ সরকার সেই মনোভাব প্রদর্শন করেন নাই। সেই মেয়াদের সময় প্রায় উত্তীর্ণ হইতে বসিয়াছে। এ অবস্থায় কংগ্রেসের পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা ব্যতীত ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পণ্ডিত জহরলাল ইহা ঘোষণা করিবার সময় কিছু রাখিয়া ঢাকিয়া বলেন নাই। তিনি বলেন,—"সময় আসিয়াছে, এখন আমাদিগকে সর্ব্ব-দল-সম্মেলনের রিপোর্ট (নেহরু রিপোর্ট) বাতিল করিয়া দিয়া কোনও কিছু না রাখিয়া আমাদের চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। এই কংগ্রেসের পক্ষে এখন স্বাধীনতার পক্ষে মনোভাবের ঘোষণা করা কর্ত্তব্য, পরন্তু যাহাতে উহা লাভ করা যায়, তাহার কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াও কর্ত্তব্য। বৃটিশ অধীনতা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যিকতা হইতে পূর্ণ মুক্তিলাভ করার নামই স্বাধীনতা। স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার পর ভারত সর্ব্বপ্রকার জাগতিক সহযোগের প্রস্তাব সমর্থন করিবে। জগতের অধিকাংশের মঙ্গলের জন্য আপনার স্বাধীনতার কিছু কিছু অংশ ছাড়িয়া দিবে; তবে সেও তাহাদের সহিত সমানে সমানের আসন ত্যাগ করিবে না। বৃটিশ পার্লামেণ্ট আমাদিগের উপর কোনরূপ হুকুম চালাইবার অধিকারে অধিকারী, ইহা কংগ্রেস স্বীকার করে নাই এবং এখনও করিবে না। আমরা পার্লামেণ্টের দরবারে কোনও রূপ আবেদন-নিবেদন করিতেছি না। কিন্তু আমরা জগতের পার্লামেণ্টের ও বিবেকের নিকট আবেদন করিতেছি। আমরা তাহাদিগকে বলিব, আর ভারত কোনও বৈদেশিক প্রভুত্ব স্বীকার করে না।"

ইহার অপেক্ষা স্পষ্ট কথা কিছুই নাই। ভারতের সর্ব্বদল-সম্মেলনের রিপোর্টই নেহরু রিপোর্ট। উহা এক বৎসরের মধ্যে শাসকজাতি কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই; এই হেতু গত কলিকাতা কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবমত এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করা এবং সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার মত ব্যবস্থা করা কংগ্রেসের কর্ত্তব্য। পণ্ডিত জহরলাল কংগ্রেসে প্রেসিডেণ্টরূপে এই পথ নির্ণয় করিয়া দিলেন। গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে নির্ব্বাচনসমিতিতে গৃহীত এই প্রস্তাব মহাত্মা গন্ধী কংগ্রেসে উপস্থাপিত করেন। মহাত্মা ঐ প্রসঙ্গে বলেন যে, এই প্রস্তাব অনুসারে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইবে। প্রথমেই কাউন্সিল বর্জ্জন সেই কার্য্যপদ্ধতির প্রথম অঙ্গ হইবে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রমুখ কয়েক জন সদস্যের সংশোধন প্রস্তাব উপস্থাপিত ও আলোচনা হইবার পর মহাত্মা গন্ধীর মূল প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কিন্তু স্বাধীনতার প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হইলেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিব, তাহা সম্ভবপর নহে। এ কথা অবস্থাভিজ্ঞ লোকমাত্রেই বুঝেন এবং জানেন। পথে আমাদের দুইটি প্রবল অন্তরায় আছে:—

(১) শাসকজাতির পক্ষ হইতে,

(২) আমাদের আপনাদের মধ্য হইতে।

(১) আমাদের এই মুক্তির সমর অহিংস অসহযোগের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, এ কথা সত্য। কিন্তু তাহা হইলেও শাসক জাতি কখনও স্বেচ্ছায় আমাদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে সম্মত হইবেন না। সে পথ তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না। কেন না, উহাতে তাঁহাদের স্বার্থহানি ঘটিবার আশঙ্কা থাকিবেই। বর্ত্তমানশ্রমিক সরকারের সহকারী ভারত সচিব আরল রাসেল সে দিন এক শ্রমিক সভায় বলিয়াছেন, ভারতকে

পণ্ডিত রলালের পত্নী—ক্রোড়ে কন্যা কুমারী ইন্দিরা

উপনিবেশি স্বায়ত্তশাসন এখনই দেওয়া অসম্ভব, বহুদিন পর্য্যন্ত সে সম্ভবপর হইবে না। শ্রমিকদলের মুখপত্র 'নিউ লিডার' কতকটা এই ভাবের কথা বলিয়াছেন। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনেই যখন এই আপত্তি, তখন পূর্ণ স্বাধীনতায় ত বিষম আপত্তি থাকিবারই কথা। সুতরাং কংগ্রেসের নির্দ্দেশ-মত কার্য্যপদ্ধতি অনুসরণ করিতে গেলেই তাহাতে বৃটিশ সরকার নানারূপে বাধা প্রদান করিবেন, ইহা নিশ্চিত।

(২) অহিংস অসহযোগনীতি পূর্ণমাত্রায় গৃহীত হইলে এবং সেইরূপ কার্য্য আরম্ভ করিলে যে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে পথে আমাদের মধ্য হইতেই অনেক বাধা উপস্থিত হইতে পারে। কংগ্রেসের মধ্যেই কাউন্সিল বর্জ্জন লইয়া প্রথম মুখেই মতবিরোধ উপস্থিত
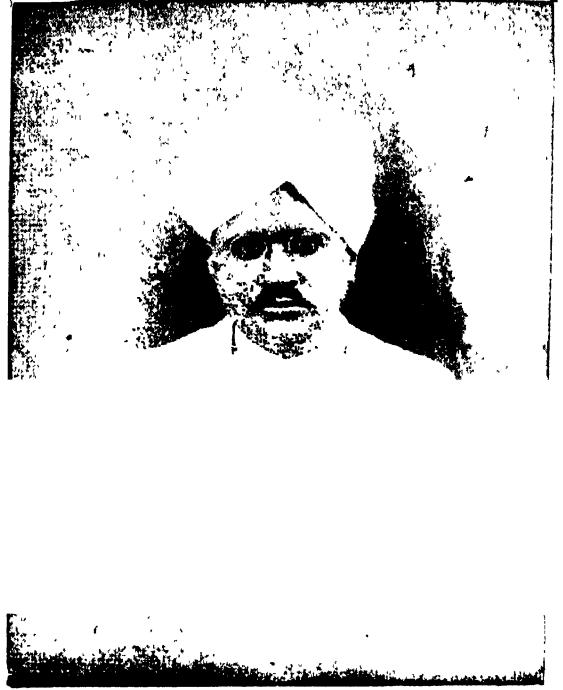
ডাক্তার সত্যপাল

হইয়াছে। এক দল সকল প্রকার বর্জ্জননীতি এখনই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। অপর পক্ষ কেবল কাউন্সিল-বর্জ্জননীতি এখন

ডাক্তার গোপীচাঁদ

গ্রহণ করিতে চাহেন। মহাত্মা গন্ধী এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, দেশের লোক সর্ব্ববিধ বর্জ্জননীতি গ্রহণ করিতে এখনও প্রস্তুত হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রমুখ ইণ্ডেপেণ্ডেণ্ট দল, লিবারল দল, মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক এবং হিন্দু মহাসভার শ্রীযুক্ত কেলকার প্রমুখ নেতা গোল টেবল

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু

[illegible]কে যাইবার পক্ষপাতী। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য আগামী [illegible]চের শেষে অথবা এপ্রেলের প্রথমে দিল্লীতে এক কনভেনশন [illegible]বা সর্ব্বদল-সম্মেলনের অধিবেশনের চেষ্টা করিতেছেন। [illegible]তে গোল টেবল বৈঠকে গিয়া ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-[illegible]নের দাবী পেশ করিবার কথা হইতেছে।

সুতরাং নানাদিক্ দিয়া কংগ্রেসের উদ্দেশ্যসাধনে বিঘ্ন [illegible]স্থিত হইবার সম্ভাবনা। এ ক্ষেত্রে দেশবাসীর কর্ত্তব্য কি? আমাদের মনে হয়, সর্ব্বপ্রথমে আমাদের নিজের [illegible] সামলাইয়া লওয়া প্রধান কর্ত্তব্য। একতার অভাব থাকিলে দেশের স্বার্থের বিপক্ষ দলের বিশেষ সুবিধা হইবে। তাহার পর মহাত্মা গন্ধীর উপদেশমত আমাদের সকলকেই অহিংসা মন্ত্রে অবিচলিত থাকিতে হইবে। মুখে অহিংস অসহযোগী হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে হিংসার পরিচয় দিলে সকল উদ্দেশ্যই
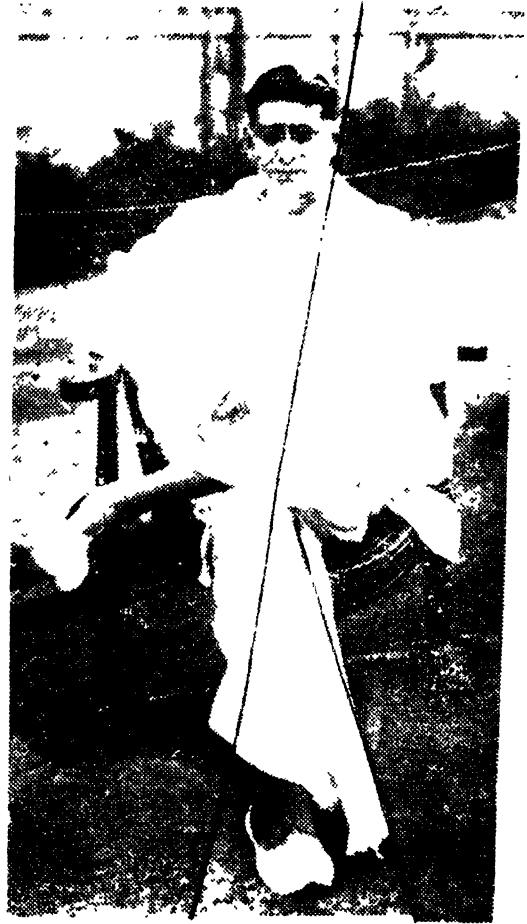
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

পণ্ড হইবে। যাঁহারা মনে প্রাণে অহিংসা মন্ত্র মানেন[illegible], তাঁহাদের এই মুক্তি-সমর হইতে দূরে থাকিয়া উদ্দেশ্যসা[illegible]র জন্য স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করা উচিত এবং প্রকাশ্যে সে ক[illegible] ঘোষণা করা উচিত। যদি সে সাহস তাঁহাদের না থাকে, তা[illegible]হইলে দেশের অধিকাংশ লোকের মতানুবর্ত্তী হইয়া কার্[illegible] করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। বড়লাটের স্পেশাল ট্রেণে বোমা নি[illegible]ের নিন্দাবাদ ও তৎসম্পর্কে বড়লাটের বিপন্মুক্তি হেতু [illegible]ন্দ প্রকাশ করার প্রস্তাবে কংগ্রেসে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়া[illegible]। কংগ্রেসের মূলমন্ত্র অহিংসা। মুখে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া হিংসার ভাব প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। এই কথা বিবেচনা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া কংগ্রেসের কর্[illegible] তাহা হইলে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, অন্যথা নহে

সুশোভনা

(গল্প)

১

শরৎকাল, পূজার ছুটীতে সহরের আফিস আদালত সবে মাত্র বন্ধ হইয়াছে। সেদিন বেলা ৯টার সময় রাইনগর ষ্টেশনে, কলিকাতা হইতে আগত ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর একটি কামরা হইতে থলী, বন্দুক প্রভৃতি শিকারের সরঞ্জাম সহ দুই জন বাঙ্গালী যুবক অবতরণ করিল। এক জনের অঙ্গে ইংরাজি ধরণের শিকারীর বেশ—বয়স আন্দাজ ২৫ হইবে। সুগঠিত বলিষ্ঠদেহ, রঙটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। নাম অমরেন্দ্রনাথ মল্লিক। অপর যুবকটি বয়সে ইহার অপেক্ষা দুই এক বৎসরের ছোট, হাতে বন্দুক থাকিলেও, পরিধানে ধুতি ও শার্ট। ইহার রঙটি অপেক্ষাকৃত ফর্সা, দেহ-গঠনেও পারিপাট্য আছে—বিশেষ করিয়া তাহার চুলগুলিও চোখ দুটি বড় সুন্দর। ইহার নাম সুকুমার মজুমদার। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরা হইতে খানসামার উর্দ্দি পরা এক মুসলমান ভৃত্য নামিল। তাহার সঙ্গে নামিল আমকাঠের এক সিন্দুক এবং একটা বড় বালতী। ঐ বালতীর ভিতর একটা বিলাতী চুলা (ষ্টোভ) ও অন্যান্য জিনিষও ছিল। যুবকদ্বয় ধীরপদে অগ্রসর হইয়া ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমে গিয়া যখন প্রবেশ করিল, তখন গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা হইয়াছে। কুলীর মাথায় আমকাঠের সিন্দুক ও হাতে বালতী দিয়া খানসামাও আসিয়া ওয়েটিং-রুমে প্রবেশ করিল এবং কুলীকে পশ্চাতের বারান্দায় লইয়া গিয়া জিনিষপত্র নামাইয়া, ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিল।

বখশিস লইয়া কুলীটা প্রস্থান করিতেছিল, অমরেন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "কি রে, তোর নাম কি?"

"আজ্ঞে, আমার নাম হরিদাস, আমরা কৈবর্ত্ত।"

"এইখানেই বাড়ী?"

"আজ্ঞে না, এখান থেকে কোশ তিনেক হবে।"

"আচ্ছা, কুমীরদীঘি কোথায় জানিস্?"

"তা আর জানি নে হুজুর! আমাদের গাঁ থেকে কোশখানেক পথ বৈ ত নয়!"

"এখান থেকে কত দূর, সেই দীঘি?"

"এখান থেকে কোশ দুই আড়াই হবে।"

"কুমীরদীঘিতে কি সত্যি সত্যি কুমীর আছে?"

"আজ্ঞে ছিল, খুবই ছিল। কল্‌কাতা থেকে সাহেবরা এসে মেরে মেরে তাদের বংশনাশ ক'রে দিয়েছে। তবে এখনও কুমীর যে একেবারে নেই, তা বল্‌তে পারলাম না, হুজুর!"

অমরেন্দ্র ইংরাজিতে সুকুমারকে বলিল, "আমাদের বন্দুক টন্দুক, টিফিন-বাক্স বইবার জন্যে একটা লোক ত দরকার, একেই নিযুক্ত করা যাক না।"

সুকুমার বলিল, "সেই ভাল। সেই যায়গারই লোক, চেনে শোনে।"

অমরেন্দ্র হরিদাসের মজুরী স্থির করিয়া, সারাদিনের জন্য তাহাকে নিযুক্ত করিল। হরিদাস বলিল, "কখন্ বেরুতে হবে, হুজুর?"

"এই, আধ ঘণ্টা পরেই।"

"আজ্ঞে হুজুর, তবে আমি বাসা থেকে ঘুরে আসি।"

বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

চায়ের জল তৈয়ারি হইলে, খানসামা টেবল "লাগাইয়া" টিফিন-বাক্স হইতে লুচি, আলুভাজা, বেগুনভাজা, ফুল[illegible] ভাজা ইত্যাদি বাহির করিয়া মনিব ও তাঁহার বন্ধুকে "ব্রেকফাষ্ট" খাওয়াইল। জলের পরিবর্ত্তে চা দিল।

ব্রেকফাষ্ট খাইতে খাইতে অমরেন্দ্র দেখিল, কয়েক

রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব।

[শিল্পী—শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

লোক দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া, হাঁ করিয়া তামাসা দেখিতেছে। অমরেন্দ্র খানসামাকে বলিল, "পর্দ্দাটা টেনে দে।" খানসামা ছুটিয়া গিয়া, তাহাদিগকে ধমক দিয়া তাড়াইয়া, দ্বারের পর্দ্দা টানিয়া দিল।

প্রাতরাশ সমাধা করিয়া দুই বন্ধু সিগারেট সেবন করিতেছিল, হরিদাস আসিয়া পৌছিল।

অমরেন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রে, মুর্গী পাওয়া যায় এখানে ?"

হরিদাস অঙ্গুলিনির্দ্দেশে মুক্ত বাতায়ন-পথে দেখাইল, "হুজুর, ঐ যে দেখছেন মাঠের পারে আমগাছগুলো, ঐখানে মোমিনপুর গ্রাম। ওখানে অনেক চাষী মুসলমানের বাস। তাদের কাছে তালাস করলে মুর্গী, এণ্ডা সবই পাওয়া যাবে।"

অমরেন্দ্র নিজ ভৃত্যকে বলিল, "আমরা বেরিয়ে গেলেই ঐ মোমিনপুরে গিয়ে গোটা দু'চ্চার মুর্গী আর ডজন খানেক ডিম কিনে আন্‌বি। রাত্রের জন্যে একটা মুর্গীর রোষ্ট আর একটা মুর্গীর কারি বানিয়ে রাখ্‌বি। আমরা ফিরে এলে, তার পর ভাত বানাবি—বুঝলি ?"

খানসামা বলিল, "জী হুজুর।"

বিধাতাপুরুষ কিন্তু অদৃশ্যে থাকিয়া এই ভোজনের আয়োজন শুনিয়া হাসিলেন,—কারণ, এখন কিছু কাল এই দুই যুবকের অন্ন তিনি স্থানান্তরে "মাপাইয়া" রাখিয়াছিলেন।

খানসামা, প্রভুর আদেশ অনুসারে, তাহার আমকাঠের সিন্দুক হইতে, বরফজল-পরিপূর্ণ দুইটি বড় বড় থার্ম্মোফ্ল্যাস্ক বাহির করিয়া, টিফিন-বাক্স সাজাইতে বসিল। হরিদাস সন্দিগ্ধনেত্রে টিফিন-বাক্সের পানে চাহিয়া বলিল, "হুজুর, এই বাক্সে রান্না মুর্গী-টুর্গীও যাচ্ছে না কি ?" অমরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "না রে না। ঐ দেখ্‌ না, কচুরি, সিঙ্গাড়া, সন্দেশ-টন্দেশ ছাড়া আর কিছু নেই। ও কচুরি-সিঙ্গাড়াও আমার বাড়ীর বামুন ঠাকুরের ভাজা। তোর কোনও ভয় নেই।"

টিফিন-বাক্স, বন্দুকের বাক্স প্রভৃতি হরিদাসের মাথায় চাপাইয়া দুই বন্ধু শিকারে যাত্রা করিল। উভয়েই হিন্দুর ছেলে, "দুর্গা শ্রীহরি" বলিয়া যাত্রা করাই উচিত ছিল, কিন্তু ...লির প্রাবল্যে সে কথা তাহাদের স্মরণ ছিল না।

২

এইখানে এই যুবকদ্বয়ের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয়প্রদান আবশ্যক। কলিকাতা বাদুড়বাগানে উভয়েরই বাস, উভয়েই বৈদ্যবংশসম্ভূত। অমরেন্দ্রনাথ "মুখে রূপার চামচ" লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল—তার পিতা অত্যন্ত ধনী ছিলেন, কলিকাতায় তাঁহার বিস্তৃত কারবার। নিজ বসত-বাটী ছাড়া এখানে ওখানে তাঁহার পাঁচখানি বাড়ী ভাড়া খাটে। তিনি এখন স্বর্গগত, তাঁহার একমাত্র পুত্র অমরেন্দ্র-নাথই তাঁহার পরিত্যক্ত ব্যবসায় ও তাবৎ ভূসম্পত্তির মালিক। ৩ বৎসর পূর্ব্বে অমরেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছিল, গত বৎসর তাহার একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। স্ত্রী সুভাষিণী রূপে গুণে অমরেন্দ্রনাথের মনোমত সহধর্ম্মিণী, তাহার সহিত অমরেন্দ্রনাথের প্রণয় এখনও উদ্দাম। অমরেন্দ্রনাথের জননী সধবা অবস্থাতেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। স্ত্রী ছাড়া, গৃহে তাহার একটি অবিবাহিতা ভগিনী আছে, তার নাম সান্ত্বনা, এবং এক বৃদ্ধা জ্যেঠাইমা আছেন, তিনি বধূর হাতে সংসারের ভার তুলিয়া দিয়া এখন হরিনাম জপ, এবং লোকজনকে তর্জ্জন-গর্জ্জন ও এ কালের সর্ব্ববিষয়ের নিন্দা করিয়া কালযাপন করেন।

অপর যুবক সুকুমার মজুমদার দরিদ্রের সন্তান। তার পিতা অল্পবেতনে কেরাণীগিরি করিতেন, দুইটি কন্যার বিবাহ দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। সুকুমারও কেরাণীগিরি করিয়া জীবন-যাপন করিতেছে। গৃহে বিধবা জননী ছাড়া দুইটি ছোট ভাই, একটি অবিবাহিতা ভগিনীও বর্ত্তমান।

সাংসারিক অবস্থার তারতম্য সত্ত্বেও, অমরেন্দ্র ও সুকুমারের মধ্যে বাল্যকাল হইতে বন্ধুত্ব অত্যন্ত নিবিড়। বিদ্যালয়ে তাহারা একই শ্রেণীতে পড়িত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, অমরেন্দ্র পড়া ছাড়িয়া, পিতার হউসে প্রবেশ করে। সুকুমার বি-এ পাশ করিয়া এম-এ পড়িতেছিল, এমন সময় তাহার পিতৃবিয়োগ ঘটিল, কাযেই উদরান্নের জন্য বাধ্য হইয়া তাহাকে পড়া ছাড়িতে হইল। বাপের আফিসের বড় সাহেব অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে চাকরী দিলেন ;—সেই চাকরীই সে করিতেছে।

আর একটি কথা বলিলেই ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় শেষ হয়। অমেরন্দ্রনাথ স্থির করিয়াছে, তাহার ভগিনী

সান্ত্বনার সহিত সুকুমারের বিবাহ দিয়া নিজেদের বন্ধুত্ব পাকা করিয়া লইবে, এবং তাহার মনের গোপন অভিপ্রায়, বিবাহান্তে সুকুমারকে তার অল্পবেতনের কেরাণীগিরি ছাড়াইয়া নিজ ব্যবসায়ে শূন্য অংশীদার করিয়া লইবে। কিন্তু সান্ত্বনা অগ্রজের মনের এই গোপন অভিপ্রায় অবগত ছিল না। এখন সে আর নিতান্ত ক্ষুদ্র বালিকা নহে, তাহার বয়স হইয়াছে চতুর্দ্দশ বর্ষ। এ বিবাহের প্রস্তাব হওয়া অবধি সে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া আছে। সুকুমারদের বাড়ী সে কতবার গিয়াছে ; সে বাড়ীতে বিদ্যুৎ নাই—সুতরাং ফ্যান নাই, এবং তেলের আলো জ্বলে। আসবাবপত্র কুশ্রী এবং বিরল। দাস-দাসী ও অশন-বসনের ব্যবস্থাও তাহার পিতৃগৃহের তুলনায় অত্যন্ত হীন। তাই এ বিবাহে তার কিছুমাত্র উৎসাহ নাই। ফলে সুকুমারকে দেখিলেই তাহার গা জ্বলিয়া যায়। এ পর্য্যন্ত মুখ ফুটিয়া সে এ কথা কাহাকেও না বলিলেও, তার বৌদিদি তার মনের ভাব বুঝিতে পারেন, কিন্তু ইহা বালিকাসুলভ নির্ব্বুদ্ধিতা বিবেচনা করিয়া, ওটা বড় গ্রাহ্য করেন না।

বিবাহ অগ্রহায়ণ মাসের সুরুতেই হইবে, ইহাই স্থির হইয়া আছে।

৩

চারিদিকে নীচু প্রাচীর-ঘেরা একটি ছোট বাগান, মধ্যস্থলে একটি নবনির্ম্মিত দ্বিতল অট্টালিকা। ফটকের দুই পাশে দুইটি ঘর, একটিতে এক জন দ্বারবান্ থাকে, অপরটিতে মালী বাস করে। গৃহের নিম্নতলের ঘরগুলি প্রায় সবই খালি, মাত্র একটিতে বাড়ীর সরকার থাকে। বাটীর পশ্চাতে কয়েকটি মৃৎকুটীরে কয়েক জন দুলিয়া-জাতীয় লোক বাস করে, তাহারা গৃহস্বামীর পাল্কীবাহক। দ্বিতলে গৃহস্বামী তাঁহার একমাত্র কন্যাকে লইয়া বাস করেন, তাঁহার আর কেহ নাই।

দ্বিতলে পূর্ব্বদিকের বারান্দায় একটি চেয়ারে পড়িয়া, গৃহস্বামী-পেন্সনপ্রাপ্ত সবজজ বৃদ্ধ হরিশঙ্কর বাবু মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন।

একটি ছোট টেবলে রূপার ডিবায় দুই খিলি পাণ। অপর পার্শ্বে মেঝের উপর তাঁহার গুড়গুড়ি রহিয়াছে—সটকা-নলটি চেয়ারের হাতলের উপর পড়িয়া। ভদ্রলোক মাঝে মাঝে কাগজ নামাইয়া নলটি তুলিয়া লইয়া কিঞ্চিৎকাল ধূমপান করিতেছেন, আবার নল রাখিয়া কাগজ উঠাইয়া পাঠে মন দিতেছেন।

চটিজুতা পায়ে ষোল সতেরো বছরের একটি সুন্দরী মেয়ে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। তার কুঞ্চিত কেশরাশি পিঠের উপর পড়িয়াছে—পরিধানে একখানি দেশী ডুরে শাড়ী, গায়ে শিমপাতা রঙের ফ্ল্যানেলের একটি হাপহাতা ব্লাউজ। রঙটি যাহাকে বলে দুধে-আলতা, চক্ষু দুইটি বড় বড়, দেহটি যৌবন-লাবণ্যে টলটল করিতেছে। মেয়েটি বৃদ্ধের চেয়ারের কাছে আসিয়া বলিল, "বাবা, আপনাকে আর দুটো পাণ দিয়ে যাব কি ?"

হরিশঙ্কর বাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন, "দিয়ে কোথা যাবি ? শুতে ?"

"না বাবা, আমি ছাদে যাব চুল শুকুতে।"

"তা যাবি যা, কিন্তু দিনের বেলায় ঘুমুসনে, মা। শীতকালে দিনে ঘুমুলে শরীর খারাপ হয়।"

"না বাবা, ঘুমুবো না আমি। যদি ঘুম পায়, নেমে বাগানে গিয়ে বেড়াব। কিন্তু পাণের কথা ত আপনি বল্লেন না, আর দুটো পাণ দিয়ে যাব কি ?"

হরিশঙ্কর বাবু পাণের ডিবার পানে এক নজর চাহিয়া বলিলেন, "ঐ ত দুটো রয়েছে, আর পাণ কি হবে ?"

মেয়েটির নাম সুশোভনা। সে কলিকাতায় কলেজে পড়ে, বোর্ডিং-এ থাকে, পূজার ছুটীতে বাড়ী আসিয়াছে।

সুশোভনা তখন ধীরপদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল এবং আপন শয়নঘরে গিয়া, টেবলের উপর বিক্ষিপ্ত খান কয়েক বহি হইতে একখানি উপন্যাস বাছিয়া লইয়া ছাদে গিয়া উঠিল। গিয়া দেখিল, বাটীর ঝি কিশোরীর মা, আহারান্তে পাণ ও দোক্তা গালে দিয়া, এক রাশ ডাইল-বাটা লইয়া বড়ী দিতে বসিয়াছে। সুশোভনা কিছুক্ষণ ঝির নিকট দাঁড়াইয়া তাহার বড়ী দেওয়ার কৌশল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ডাল বেঁটেছিস্, কিশোরীর মা ?" ঝি বলিল, "কড়াইয়ের ডাল, দিদিমণি।"

সুশোভনা তখন ঝির নিকট হইতে সরিয়া, ছাদের আলিসার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, কোথাও একটা বৃক্ষের অন্তরাল পর্য্যন্ত নাই

মাঠের মাঝে উচ্চ পাড়যুক্ত কুমীরদীঘি নামক জলাশয়। সুশোভনা লক্ষ্য করিল, দীঘির পাড়ে তিনটি মনুষ্য বিচরণ করিতেছে—এক জনের শাদা শিকার-হ্যাট রৌদ্রে চক্‌চক্ করিতেছে। বলিল, "ঐ দেখ্ কিশোরীর মা, কারা আবার কুমীর মারতে এসেছে!"

কিশোরীর মা বড়া-হাত বাটির কানায় মুছিয়া সুশোভনার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। সেই দিকে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া বলিল, "এক জন সায়েব এসেছে দিদিমণি!"

সুশোভনা বলিল, "সায়েব তোকে কে বল্লে?"

ঝি বলিল, "দেখছনি, টোপা মাথায় দিয়ে বেড়াচ্চে!"

সুশোভনা বলিল, "সায়েব না হাতী! টোপা মাথায় দিলেই বুঝি সায়েব হয়? বাঙ্গালীরাও ত শিকার করতে যাবার সময় ইংরেজি কাপড় পরে, হ্যাট মাথায় দেয়। না না, আমার ঘর থেকে দূরবীণটে নিয়ে আয় না, ভাল ক'রে দেখি ওদের।"

কিশোরীর মা নামিয়া গিয়া, একটা বাইনকুলার দূরবীণ লইয়া আসিল। এটি, তাহার গত জন্মদিনে, তাহার পিতার উপহার। সুশোভনা বাইনকুলার চোখে দিয়া ফোকস্ ঠিক করিয়া দীঘির পাড়ে মনুষ্যদিগকে দেখিল। এক জন ইংরাজি বেশধারী এবং এক জন ধুতি-পরা বাঙ্গালী, উভয়েরই হাতে বন্দুক। অপর ব্যক্তি মুটিয়া-শ্রেণীর বলিয়া বোধ হইল। তখন যন্ত্রটি ঝির হাতে দিয়া বলিল, "বাঙ্গালীই ত। সবাই বাঙ্গালী। দ্যাখ।"

ঝি কিন্তু যন্ত্রটি চোখে লাগাইয়া কিছুই দেখিতে পাইল না। সে কথা সে বলিলে, সুশোভনার স্মরণ হইল, বয়সের আধিক্য হেতু উভয়ের দৃষ্টিশক্তির তারতম্য হওয়াই স্বাভাবিক। তখন সে ঝির চক্ষুলগ্ন যন্ত্রটির পেচ ঘুরাইতে লাগিল; ক্ষণকাল পরে ঝি বলিল, "হ্যা, এইবার বেশ পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সায়েব ত নয়, বাঙ্গালীই ত বটে, দিদিমণি!"

কয়েক মুহূর্ত্ত ইহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া, ঝি বলিল, "ঐ দেখ দিদিমণি, অন্য লোকদুটো স'রে গেল, সায়েবটা শুয়ে পড়লো।"

সুশোভনা বলিল, "বোধ হয়, কোনও কুমীরে গা ভাসান দিয়েছে, গুলী করবে।"—বলিয়া যন্ত্রটি চাহিয়া লইয়া নিজ চক্ষুতে লাগাইল।

তাহার অনুমানই সত্য হইল। ধোঁয়া দেখা গেল, ২।৩ সেকেণ্ড পরেই বন্দুকের আওয়াজও কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল।

সুশোভনা দেখিল, শিকারী উঠিয়া দাঁড়াইল, যে লোক দুই জন পশ্চাতে সরিয়া গিয়াছিল, তাহারাও ছুটিয়া আসিল। তিন জনেই একত্র উচ্চ পাড় হইতে নামিতে লাগিল, এবং হঠাৎ শিকারী পদস্খলিত হইয়া, গড়াইতে গড়াইতে জলের কাছে গিয়া স্থির হইল।

সুশোভনা দূরবীণ নামাইয়া বলিয়া উঠিল, "যাঃ, প'ড়ে গেল"

"কে দিদিমণি?"

"ঐ শিকারী!"

"দূরবীণটে দাও না দিদিমণি, দেখি!"

"দাঁড়া!"—বলিয়া সুশোভনা দেখিতে লাগিল। সে দেখিল, অপর লোক দুই জন সাবধানে পাড় হইতে নামিয়া সেই শিকারীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। শিকারীর নিকট তারা ঝুঁকিয়া বসিল। এক জন দীঘি হইতে জল আনিয়া শিকারীর মুখে-চোখে সেচন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ করিতে করিতে, ভূপতিত ব্যক্তি উঠিয়া বসিল, তার পর আবার সে শুইয়া পড়িল।

সুশোভনা বলিল, "আহা, বড্ড বোধ হয় জখম হয়েছে!" বলিয়াই তাহার মাথায় এক বুদ্ধি আসিল। আহা, এই জনশূন্য তেপান্তর মাঠে, এই বিপদে, উহাদের কি হইবে? বাইনকুলার ঝির হাতে দিয়া, সে ছুটিয়া নীচে নামিয়া গিয়া ডাকিল—"বাবা!"

হরিশঙ্কর বাবুর একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, তিনি চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি মা?"

সুশোভনা বলিল, "বাবা, কুমীরদীঘিতে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক শিকার করতে এসে, পা'ড় থেকে নীচে প'ড়ে ভয়ানক আঘাত পেয়েছেন। এই তেপান্তর মাঠের মধ্যে তাঁর কি উপায় হবে, বাবা?"

হরিশঙ্কর বাবু চেয়ারে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "কে বল্লে তোমায়?"

"আমি ছাদ থেকে বাইনকুলার দিয়ে দেখ্‌ছিলাম বাবা। তাঁকে প'ড়ে যেতে দেখলাম। অজ্ঞান হয়ে গেছেন বোধ হ'ল!"

"কতক্ষণ?"

"এখনও পাঁচ মিনিট হয় নি বোধ হয়। বাবা, পাল্কী-বেয়ারা ছুটিয়ে দিন, তাঁকে নিয়ে আসুক এখানে। নইলে আর ত কোনও উপায় নেই।"

হরিশঙ্কর বাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাড়াইলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, আমি নিজেই তা হ'লে পাল্কী নিয়ে যাই। তুমি ততক্ষণ এক কায কর, মা। তাকে এনে উপরে তোলা বোধ হয় চলবে না। নীচের ঘরে যে লোহার খাটখানা আছে, তারই উপর ততক্ষণ বিছানা ক'রে রাখ। আমার জামাটা জুতোটা দাও।"

সুশোভনা ছুটিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া পিতার জামা ও জুতা লইয়া আসিল। হরিশঙ্কর বাবু উহা পরিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। পাল্কীবাহকগণ বাড়ীতেই থাকিত—তাহারা তখন আহারান্তে দিবানিদ্রার আয়োজন করিতেছিল। পাল্কীতে বিছানা বিছাইয়া হরিশঙ্কর বাবু স্বয়ং উহাতে আরোহণ করিয়া কুমীরদাঘি অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সুশোভনা ছাদে গিয়া ঝির হাত হইতে বাইনকুলার লইয়া, চোখে লাগাইয়া দেখিল, শিকারীর সঙ্গে যে দুই জন লোক ছিল, তাহাদের এক জন কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে,—অপর জন আহতের শুশ্রূষায় নিযুক্ত। তার পর ঝিকে বলিল, "কিশোরীর মা, বাবা রোগীকে আনতে পাল্কী নিয়ে নিজে গেছেন। নীচের ঘরে যে লোহার খাটখানা আছে, তাতে গদি পাতাই আছে, গদিটার ধুলো বেশ ক'রে ঝেড়ে, তার উপর একখানা তোষক আর একটা সাফ চাদর পেতে, বালিস-টালিস দিয়ে বিছানা পেতে রাখ্ গে—বাবা ব'লে গেছেন।"

"ও মা, কি আপদ হ'ল! হে মা মধুসূদন।"—বলিয়া ঝি প্রস্থান করিল।

সুশোভনা দেখিতে লাগিল। ঐ তাহার পিতার পাল্কী ছুটিয়াছে। এক মিনিট, দুই মিনিট, প্রায় মাঝামাঝি গিয়া পৌঁছিল। হঠাৎ একটা কথা তাহার স্মরণ হইল। সে নীচে নামিয়া গেল। কিশোরীর মা তোষক ও বিছানার চাদর অন্বেষণে ব্যাপৃত। সুশোভনা জিজ্ঞাসা করিল, "কিশোরীর মা, তুই চূণে-হলুদ তৈরি করতে জানিস?"

"হ্যাঁ দিদিমণি, তা আর জানি নে!"

"তবে যা, তুই হলুদ বেঁটে একটা এনামেলের বাটিতে চূণ আর হলুদ মিশিয়ে ষ্টোভ জ্বেলে চড়িয়ে দি গে যা, বিছানা-টিছানা আমিই সব ঠিক ক'রে রাখছি।"

কিশোরীর মা চলিয়া গেল। তোষক প্রভৃতি লইয়া সুশোভনা শয্যা প্রস্তুত করিয়া, আবার ছাদে গিয়া উঠিল যন্ত্রে চক্ষু লগ্ন করিয়া দেখিল, পাল্কী ফিরিতেছে—তাহার পিতা ও অপর ভদ্রলোকটি পদব্রজে আসিতেছেন পাল্কী দ্রুত আসিতেছে।

তাই ত, রোগী আসিয়া পড়িবে, পিতা পশ্চাতে রহিলেন যে! সুশোভনা আবার নামিয়া গেল। সরকার বাবুকে ডাকিয়া তাঁহাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিল। সরকার বাবু ফটকের নিকট গিয়া দ্বারবান্ ও মালীকে ডাকিয়া, রোগীকে নামাইয়া বিছানায় লইয়া যাওয়া সম্বন্ধে যথোপযুক্ত উপদেশ দিতে লাগিলেন। বামুন-ঠাকুর ও রামকিষণ ভৃত্য সাহায্য করিবে। সুশোভনা বারান্দায় উঠিয়া পথপানে চাহিয়া দাড়াইয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে পাল্কী আসিয়া পৌঁছিল। পাল্কী বারান্দার উপরে উঠানো হইল। সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া রোগীকে নামাইয়া শয্যায় তাহাকে শয়ন করাইয়া দিল। রোগী যন্ত্রণায় কাৎরাইতে কাৎরাইতে, একবার চক্ষু খুলিয়া সুশোভনার প্রতি চাহিল। বলিল, "টেলিগ্রাম ক'রে কলকাতা থেকে ডাক্তার আনান্—বড় যন্ত্রণা।"

সুশোভনা বলিল, "তাই আনাচ্ছি। বাবা আসছেন। আপনার কোন্‌খানে বেশী লেগেছে, বলুন দেখি!"

রোগী কাৎরাইতে কাৎরাইতে বাম পদে হাটুর নিম্ন দেখাইয়া বলিল, "বোধ হয়, ফ্র্যাকচর হয়েছে।"

অল্পক্ষণমধ্যেই হরিশঙ্কর বাবু রোগীর বন্ধু [illegible] মারের সঙ্গে আসিয়া পৌঁছিলেন। চূণে-হলুদ [illegible] জানিয়া তিনি জখমের স্থানে উহা লাগাইয়া ফ্ল্যা[illegible] জড়াইয়া বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। পাঁচ মিনি[illegible] মধ্যেই রোগীর যন্ত্রণার লাঘব হইল, তাহার কা[illegible] বন্ধ হইল, নিদ্রার আবেশ দেখা দিল।

হরিশঙ্কর বাবু তখন কক্ষান্তরে গিয়া সুকুমা[illegible] সহিত পরামর্শ করিতে বসিলেন। সুকুমার বলিল, "[illegible] যাই, কলিকাতা থেকে ডাক্তার নিয়ে আসি।"

হরিশঙ্কর বাবু বলিলেন, "সন্ধ্যার আগে কলক[illegible] যাবার ট্রেণ ত নেই—তাতে অনেক সময় নষ্ট হবে

বরঞ্চ অমর বাবুর ফার্ম্মের ম্যানেজার—কি নাম বল্লেন যে—তাঁকে টেলিগ্রাম ক'রে দিন, তিনি মেডিকেল কলেজের কোন ভাল সার্জ্জনকে সঙ্গে নিয়ে আসুন। এখন বেলা দেড়টা—সন্ধ্যা নাগাদ তিনি ডাক্তার নিয়ে এসে পড়তে পারবেন।"

তদনুসারে রোগীর অবস্থার সব কথা খুলিয়া একখানি দীর্ঘ টেলিগ্রাম প্রেরিত হইল।

রোগী জাগিলে, মাঝে মাঝে তাহাকে গরম দুধ পান করানো হইল।

বেলা পাঁচটার সময় তার আসিয়া পৌঁছিল, ম্যানেজার বাবু সাহেব ডাক্তারসহ সন্ধ্যা আটটার ট্রেণে আসিয়া পৌঁছিবেন, অমরেন্দ্রনাথের স্ত্রী ও ভগিনীও ঐ সঙ্গে আসিতেছেন, ষ্টেশনে যান-বাহনের যেন ব্যবস্থা থাকে।

হরিশঙ্কর বাবু যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহার সরকারকে ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন। সুকুমার বলিল, "সরকার মশাই, অমরেন্দ্র বাবুর এক জন বাবুর্চ্চি এসেছিল আমাদের সঙ্গে, ওয়েটিং-রুমে বারান্দায় তাকে দেখতে পাবেন, তাকে একখানা টিকিট কিনে দিয়ে কলকাতায় ফিরে যেতে বলবেন, এই টাকা নিন।"

রাত্রি ৯টার মধ্যেই সকলে আসিয়া পৌঁছিলেন।

ডাক্তার সাহেব অমরেন্দ্রনাথের ভাঙ্গা হাড় "সেট" করিয়া মজবুতরূপে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া, এক্স-টেন্সন প্রোসেসে লোহার শিকের ফর্ম্মায় উহা আটকাইয়া, সেই ফর্ম্মা পালঙ্কের ছত্রীতে দড়ি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিলেন। ভাঙ্গা পা বিছানা হইতে ৪।৫ ইঞ্চি উর্দ্ধে, বদ্ধ অবস্থায় দোদুল্যমান। বলিলেন, পূরা তিন সপ্তাহকাল, যত দিন ভাঙ্গা হাড় না জোড়া লাগিবে, তত দিন রোগীকে এই অবস্থাতেই থাকিতে হইবে। সে শুইয়া থাকিবে, যদি বেদনাবোধ না হয়, তবে একটু উঠিয়া বসিতেও পারে। কিন্তু শয্যাত্যাগ করিতে পারিবে না।

ডাক্তার সাহেব সপ্তাহে একবার করিয়া আসিয়া রোগীকে দেখিয়া যাইবেন স্থির হইল।

অমরেন্দ্রনাথের স্ত্রী ও ভগিনী উভয়েই এখানে রহিয়া গেলেন। সুকুমারও রহিল। হরিশঙ্কর বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর যত্ন ও সৌজন্যে সকলেই আপ্যায়িত।

৪

এক মাস কাটিয়া গিয়াছে—এখনও অমরেন্দ্রনাথের বদ্ধাবস্থা। প্রথমে ডাক্তার সাহেব তিন সপ্তাহের কথা বলিলেও, গত সপ্তাহে তিনি রোগীর ভাঙ্গা পায়ের এক্স-রে ফটো তুলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, এ সপ্তাহে সেই ছবি আনিলেন এবং সকলকে উহা দেখাইলেন যে, হাড় বেমালুমভাবে জোড়া লাগিয়া গিয়াছে। বলিলেন, তথাপি নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করিবার জন্য আরও দুই সপ্তাহ রোগীর বাঁধন খুলিবেন না। বাঁধন খুলিলেও রোগী বাড়ী যাইতে পাইবে না, এক সপ্তাহ বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া পায়ে মালিস করাইতে হইবে, কারণ, এই দীর্ঘকালের অসঞ্চালনে পা অসাড় হইয়া গিয়াছে, আরও যাইবে।

অমরেন্দ্রনাথের স্ত্রী সুভাষিণী ও ভগিনী সান্ত্বনা দু'জনেই এখানে। প্রথম চারি পাঁচ দিনের পর যখন দেখা গেল যে, রোগীর কোনও প্রকার দৈহিক যন্ত্রণা আর নাই, অধিক শুশ্রূষারও আবশ্যক হয় না, তখন ইঁহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, সান্ত্বনাকে লইয়া সুভাষিণী ফিরিয়া যাউন, গৃহস্থের যথেষ্ট আশ্রমপীড়া ঘটানো হইতেছে, তাহার যতটুকু লাঘব করা যায়। সুকুমারের আপিস খুলিলে এক দিনমাত্র গিয়া সে এক মাসের ছুটী লইয়া আসিয়া এখানে থাকুক। কিন্তু হরিশঙ্কর বাবু কিছুতেই এ প্রস্তাবে রাজি হন নাই—বিনীতভাবে উত্থাপিত আশ্রমপীড়ার কথা তিনি হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, "আমরা এতগুলি লোক যদি দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাই, তবে তোমাদেরও দু'মুঠো খাওয়াতে আমার কষ্ট হবে না। এই সঙ্কটের দিনে স্ত্রী, ভগিনী কাছে থাকলে, আর কিছু না হোক, রোগীর মনটাও ত ভাল থাকবে, তাই কি কম লাভ? না না, ও সব ছেলেমানুষী খেয়াল তোমরা ছেড়ে দাও।"

ও দিকে আবার এক বিষম বিভ্রাট বাধিয়া গিয়াছে। সুভাষিণী, সান্ত্বনা রোগীর পরিচর্য্যার জন্য রহিয়া গেল, সুকুমারের থাকিবার বিশেষ কিছু আবশ্যকতা ছিল না, কিন্তু সে-ও আছে। আপিস খুলিবার দিন আপিসে গিয়া সে দুই সপ্তাহের ছুটী লইয়া আসিয়াছে—এবং তাহার থাকিবার কারণ যে নিছক বন্ধুপ্রীতি, এ কথাও জোর করিয়া বলা

চলে না। আসল কথা এই যে, এ বাড়ীর মেয়ে সুশোভনাকে তাহার বড়ই ভাল লাগিয়াছে। সান্ত্বনা, সুভাষিণী প্রায় সারাদিনই রোগীর নিকট থাকে, সুকুমার আসিলে সুভাষিণী একটু সঙ্কুচিতা হয়, সান্ত্বনা "মুখ হাঁড়ি" করে,—সুতরাং রোগীর পার্শ্বে বসিয়া থাকার তাহার প্রয়োজনও হয় না এবং উহা প্রীতিকরও নয়। সুতরাং সে প্রায় সারাদিন সুশোভনার আশে-পাশেই থাকে এবং এটাও সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, সুশোভনা তাহাতে বিরক্ত ত নয়ই, বরং তাহার উল্টা। সুশোভনা ও সান্ত্বনাকে যখনই সে একত্র দেখে,তখনই তাহার মনের কম্পাসকাঁটা সান্ত্বনার প্রতি বিমুখ হইয়া, সুশোভনার প্রতি বেগে ধাবিত হয়। মেয়েরা স্নান করিতে গেলে, সুকুমার আসিয়া বন্ধুর শয্যাপার্শ্বে বসে। বন্ধুকে সব কথাই সে বলিয়াছে।

কবে এবং কি অবস্থায় ইহাদের দু'জনের মন জানাজানি হইয়াছিল, তাহা আমরা ঠিক জানি না; কিন্তু সুশোভনার কলেজ খুলিবার দুই দিন পূর্ব্বে, অপরাহ্নে বাগানের আমগাছের ছায়ায় লোহার বেঞ্চে বসিয়া দুই জনে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল।

সুকুমার। পর্শু ত তোমার কলেজ খুলছে, তুমি ত চল্লে।

সুশোভনা। হ্যাঁ, যেতেই ত হবে। ঐ দিন তোমারও ত ছুটী ফুরোবে?

সুকু। হ্যাঁ, আমাকেও যেতে হবে। কিন্তু তার আগে, বাবার কাছে আমি কথাটা পাড়তে চাই, তুমি কি বল?

সুশো। আমি আর কি বলবো? বাবা শুনে যে কি বলবেন, তাই ভেবেই আমার গা কাঁপছে।

সুকু। আমি অবশ্য তাঁকে বলবো যে, আমার সাংসারিক অবস্থার বিষয় সম্পূর্ণ জেনে শুনেই তুমি আমাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছ। তা' হলেও কি তিনি অমত করবেন?

সুশো। কি জানি, হয় ত বলবেন, ও ছেলেমানুষ, ও নিজের ভাল-মন্দের কি বোঝে, ওর কথা ধর্ত্তব্যই নয়!

সুকু। তিনি যদি বোঝেন যে, আমাদের এই মিলনে বাধা দিলে দুটো বুক ভেঙ্গে যাবে,—আমার যাক্ না হয়, তাতে তাঁর কি আসে যায়,—তোমার বুকও ভেঙ্গে যাবে,—তা হ'লে কি তিনি মত না দিয়ে থাক্তে পারবেন? মা যদি বেঁচে থাকতেন এ সময়, তা হ'লে বোধ হয়, আমাদের এত ভাবতে হ'ত না।

সুশো। বাবা যে মা'র চেয়ে আমায় কম ভালবাসেন, তা নয়! কিন্তু তবু ভয় যে ঘোচে না!

উভয়ে কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। তার পর সুকুমার বলিল, "আচ্ছা, কলকাতায় কি তোমাতে আমাতে দেখা-সাক্ষাৎ সম্ভব হবে না?"

সুশোভনা। তা কি রকম ক'রে হবে?

সুকুমার। বোর্ডিং-এ ত মেয়েদের আত্মীয়-বন্ধুরা গিয়ে দেখা করতে পারে, সপ্তাহে এক দিন না মাসে এক দিন, কি একটা নিয়ম আছে, শুনেছি।

সুশো। হ্যাঁ, সে বাপ-মা। অন্য কেউ দেখা করতে চাইলে, বাপের চিঠি চাই।

সুকু। আচ্ছা, বাবা যদি রাজি হন, তা হ'লে তিনি কি আমাকে ঐ রকম চিঠি দেবেন না?

সুশো। কি জানি। কিন্তু বাবা অনুমতি দিলেও, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে গেলে মহা মুস্কিল হবে যে।

সুকু। কেন?

সুশো। অন্য মেয়েরা সবাই আমায় জিজ্ঞাসা করবে, ও তোর কে? তুমি যে আমার কে, এবং কি, তা ত আমি প্রকাশ করতে পারবো না। তা হ'লেই তারা বুঝে নেবে,—ভারি ঝানু মেয়ে সব। তখন ঠাট্টা ক'রে তারা আমায় দেশছাড়া করবে যে। কিন্তু তার দরকারই বা কি? সে শুভযোগ যদি আসে, বাবা যদি সম্মতই হন, তা হ'লে পরীক্ষা পর্য্যন্ত এ ক'টা মাস কি আমরা ধৈর্য্য ধ'রে থাকতে পারবো না?

এই সময় দেখা গেল, রামকিষণ ভৃত্য এই দিকে আসিতেছে, সুতরাং ইহারা কথাবার্ত্তা স্থগিত রাখিল। ভৃত্য আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের চা কি এইখানে পাঠানো হবে, না আপনারা টেবিলে যাবেন?"

সুকুমার সুশোভনার প্রতি চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "এখানেই আসুক না!" কিন্তু সুশোভনা বলিল, "না, আমরা বাড়ীতেই যাই চল। রামকিষণ, বাবাকে বল গে, আমরা আসছি।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে সুশোভনা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার সঙ্গে ও-কথা কখন্ কইবে তুমি?"

"রাত্রে, খাওয়ার পর। তুমি কি বল ?"

"বেশ।"

৫

রাত্রিতে খাওয়ার পর, সুশোভনা সুভাষিণীর সহিত দেখা করিতে রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিল, সুকুমার হরিশঙ্কর বাবুর সহিত উপরে চলিয়া গেল।

হরিশঙ্কর বাবু বারান্দায় ইজি-চেয়ারে উপবেশন করিলেন। রামকিষণ তামাক দিয়া গেল। হরিশঙ্কর বাবু বলিলেন, "সুকুমার, তোমায় কবে আপিসে জয়েন করতে হবে ?"

"পর্শু। কালই আমি কলকাতায় ফিরবো ভাবছি।"

"কোন্ ট্রেণে ?"

"বিকেলের ট্রেণে !"

"আমিও ত ঐ ট্রেণেই শোভনাকে কলেজে রাখতে যাব।"

"ভালই হ'ল, তা হ'লে একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।" বলিয়া সুকুমার নীরব হইল। হরিশঙ্কর বাবুও নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

প্রায় এক মিনিটকাল অপেক্ষা করিবার পর সুকুমার হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "হরিশঙ্কর বাবু, আজ আমি একটা বিশেষ কথা আপনাকে বলবার জন্যেই অপেক্ষা করছি।"

হরিশঙ্কর বাবুর মুখে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল, কিন্তু অন্ধকারে সুকুমার উহা দেখিতে পাইল না। তিনি শান্তস্বরে বলিলেন, "কি বলবে, বল।"

সুকুমার তখন তাহার আবেদন জানাইল। নিজ দারিদ্র্যের কথাও অপকটে প্রকাশ করিল। সুশোভনা যে উহা জানিয়া শুনিয়াই তাহার সহধর্ম্মিণী হইতে সম্মত, সে কথাও বলিতে সে ত্রুটি করিল না।

সুকুমারের কথা শেষ হইলে, হরিশঙ্কর বাবু কিয়ৎকাল মৌন হইয়া রহিলেন। সুকুমারের বুকটি দুরু দুরু করিতে লাগিল,—খুনী আসামী যেন জজ সাহেবের রায় শুনিতে আসিয়াছে।

অবশেষে হরিশঙ্কর বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, সুকুমার, তোমরা ত পাকা হিন্দু ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তোমাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কেউ বিলেত-টিলেত গিয়াছিলেন ?"

"আজ্ঞে না।"

"তোমার মা বেঁচে আছেন বলেছিলে না ?"

"হ্যাঁ।"

হরিশঙ্কর বাবু আবার মৌনভাব ধারণ করিলেন। সুকুমার মনে মনে ভাবিতে লাগিল, তাঁহার এ সব প্রশ্নের অর্থ কি ?

শেষে হরিশঙ্কর বাবু বলিলেন, "দেখ, তুমি তোমার সাংসারিক অবস্থার কথা যা বল্লে, সেটা আমার পক্ষে কোনও বাধা নয়। মেয়ের বিয়ের সময় জামাইকে আমি যে যৌতুক দেবো, তাতে অনেক বছর তাদের জীবন সুখে-স্বচ্ছন্দে কেটে যেতে পারবে। আমার ঐ একমাত্র মেয়ে। আমার অবর্ত্তমানে সমস্তই আমার মেয়ে-জামাইয়ের হবে। তবে আর একটু বাধা আছে—সে বিষয়ে আজ রাতটা আমায় বিবেচনা করতে সময় দাও—আমি কা'ল সকালে তোমার কথার উত্তর দেবো।"

* * * *

পরদিন বেলা ৮টার সময় সুকুমার যখন হরিশঙ্কর বাবুর শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইল, তখন তাহার মুখখানি উল্লসিত।

নীচে নামিবার সিঁড়ির কাছে সুশোভনা দাঁড়াইয়া ছিল, কোন ভৃত্যাদি তখন সেখানে নাই। সুশোভনা অগ্রসর হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কি বল্লেন ?"

সুকুমার সুশোভনাকে বক্ষে জড়াইয়া তাহার মুখ-চুম্বন করিয়া বলিল, "আসছি, এসে বলবো।"—বলিয়া সে ক্ষিপ্রপদে নিম্নে অবতরণ করিল। সুশোভনাও হাসি-মুখে নিজ কার্য্যে গেল।

সুকুমার রোগীর কক্ষে গিয়া দেখিল, অমরেন্দ্র একা। জিজ্ঞাসা করিল, "এঁরা কোথায় ?"

অমরেন্দ্র বলিল, "স্নানের ঘরে।"

"ভালই হ'ল।"—বলিয়া সুকুমার শয্যাপার্শ্বস্থ একখানা চেয়ারে বসিয়া বন্ধুর হাতখানি ধরিয়া বলিল, "ভাই, আমি তোমার বোন্‌কে বিয়ে করতে পারবো না বলেছিলাম, তাতে তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলে, নয় ?"

"সেটা ত খুব স্বাভাবিক।"

"না ভাই, তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না, আমার উপর রাগ কোরো না, তোমার বোন্‌কেই আমি বিয়ে করবো।"

"কেন, কি হ'ল ? হরিশঙ্কর বাবু অমত করলেন ? তবে তোমার মুখ এমন হাসি হাসি কেন ? তুমি যে একটি প্রহেলিকা হয়ে দাঁড়ালে হে !"

"তোমায় বুঝিয়ে বলছি। হরিশঙ্কর বাবু একটা বাধা সম্বন্ধে বিবেচনা ক'রে আজ আমার প্রস্তাবের উত্তর দেবেন বলেছিলেন, জান ত ?"

"কা'ল রাতে তুমি আমায় ব'লে গিয়েছিলে।"

"ওঁর বাধাটা কি শোন। শোভনা ওঁর ঔরস-কন্যা নয়, ওঁর পালিতা কন্যা, একরকম কুড়িয়ে পাওয়া। ও কি জাতের মেয়ে, তা-ও তিনি জানেন না। আমরা পাকা হিন্দু, হয় ত সব কথা জানলে আমাদের আপত্তি হ'তে পারে, তাই ছিল ওঁর বাধা। চৌদ্দ বছর পূর্ব্বে তিন বছর বয়সের সুন্দরী মেয়েটিকে কোথায় কি অবস্থায় তিনি পেয়েছিলেন, সমস্ত আমায় আজ বল্লেন।"

"কোথায় পেয়েছিলেন ?"

"লক্ষ্ণৌয়ে।"

শুনিবামাত্র অমরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিল। বলিল, "লক্ষ্ণৌয়ে ?"

সুকুমার বলিল, "হ্যাঁ, লক্ষ্ণৌয়ে। যে বদমাইসরা লক্ষ্ণৌয়ে তোমার বোন্‌কে চুরি ক'রে নিয়ে যায়, তারা ওকে তিনশো টাকায় এক পতিতা স্ত্রীলোককে বিক্রী করেছিল। হরিশঙ্কর বাবু তার কিছু দিন পরেই সস্ত্রীক লক্ষ্ণৌয়ে গিয়েছিলেন। লক্ষ্ণৌবাসী ওঁর এক মুসলমান বন্ধুর কাছে মেয়েটির কথা শোনেন,—আর শোনেন যে, বদমাইসরা বলেছিল, ওটি বাঙ্গালীর মেয়ে। উনি সেই পতিতা স্ত্রীলোককে পুলিসের ভয় দেখিয়ে, তার উপর পাঁচশো টাকা দিয়ে, মেয়েটি কিনে নেন। তার পর থেকে নিজের মেয়ের মত পালন করছেন। তোমার বোন্ হারানোর সমস্ত ইতিহাসই আমি তোমার কাছে, তোমার বাবার কাছে, তোমার মা'র কাছে শুনেছিলাম ত! স্থান, কাল, সমস্তই দেখ মিলে যাচ্চে। সুশোভনাই যে তোমার সেই হারানো বোন্, তাতে আমার মনে ত কোন সন্দেহই নেই।"

অমরেন্দ্র বলিল, "তুমি এ কথা হরিশঙ্কর বাবুকে বলেছ ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়।"

"ভাই, তুমি একবার গিয়ে তাঁকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এস, আমি নিজে তাঁকে সব কথা জিজ্ঞাসা করি।"

হরিশঙ্কর বাবু আসিলেন। বোন্ হারানোর সময় অমরেন্দ্রনাথ ১২ বৎসরের বালক। সকল কথাই তার স্মরণ ছিল। হরিশঙ্কর বাবুর প্রদত্ত বিবরণ সমস্তই ঠিক ঠিক মিলিয়া গেল।

অমরেন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সুশোভনার বাঁ কনুয়ের উপরটায় একটা জড়ুল আছে কি ? আমার নিজের অবশ্য সেটা ঠিক স্মরণ নেই, কিন্তু মা'র কাছে আমি শুনতাম যে, আমার সে বোনের হাতে ঐ চিহ্ন ছিল।"

হরিশঙ্কর বাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, ঠিক সেইখানে জড়ুল আছে।"

স্থির হইল, এখন শোভনাকে এ সব কথা জানাইবার কোনই প্রয়োজন নাই ; কারণ, হরিশঙ্কর বাবু তাহার জন্মদাতা পিতা নহেন শুনিলে বালিকার হৃদয়ে আঘাত লাগিতে পারে। বিবাহের পর, সময় বুঝিয়া, প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া সুকুমারই তাহাকে আসল কথা জানাইবে।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বৈদ্যুতিক দীপ

কোন কিছু ধরাইবার প্রয়োজন হইলে দীপশলাকার প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে এখন আর দীপ-শলাকা না হইলেও চলিবে। আমেরিকার জনৈক বৈজ্ঞানিক এক প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত করিয়াছেন, উহা বৈদ্যুতিক শক্তি

বৈদ্যুতিক দীপ

সংযোগে জ্বলিয়া উঠিবে; তাহার সাহায্যে যাহা কিছু ধরাইয়া লওয়া চলিবে। প্রাচীর-সংলগ্ন বৈদ্যুতিক শক্তির আধারস্থিত ছিদ্রমধ্যে এই যন্ত্রের সংলগ্ন ধাতুময় জুটি প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেই 'বার্ণার' হইতে রশ্মিশিখা নির্গত হইতে থাকিবে। এই 'বার্ণার'-গুলি 'পোর্সিলেন' অথবা পিত্তল-নির্ম্মিত। পোর্সিলেনের বার্ণার-গুলি নানা বর্ণ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

বিজ্ঞানের বাহাদুরী

মোটর-গাড়ীর অভ্যন্তরভাগ—বসিবার গদী প্রভৃতি উষ্ণ রাখিতে পারিলে প্রচণ্ড শীতের সময় আরাম পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকগণ বস্তুতন্ত্র-জগতের সৌখীন নর-নারীর জন্য সে ব্যবস্থাও করিয়াছেন। বিশেষ এক প্রকার তরল পদার্থ উত্তপ্ত করিয়া বাষ্প প্রস্তুত হইলে, সেই বাষ্পরাশি নলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। নলটি মোটর-গাড়ীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকে। প্রদত্ত চিত্র হইতে

মোটর-গাড়ী উত্তপ্ত রাখিবার কৌশল

উহার সন্নিবেশপ্রণালী বুঝিতে পারা যাইবে। নলের দেহে একটি ছোট বোতাম আছে, উহার সাহায্যে উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়। উত্তপ্ত বাষ্পপূর্ণ আধারটি বসিবার আসনের পশ্চাদ্ভাগে থাকে।

ব্রুসের হাতলে প্রসাধন-দ্রব্য

ক্ষৌরকার্য্যের জন্য সাবান মাখাইবার ব্রুসের হাতলের অভ্যন্তরে 'ক্রিম' বা সর রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই হাতলের অঙ্গে
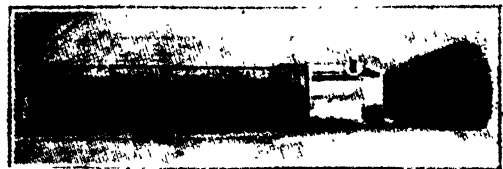
ব্রুসের হাতলে প্রসাধন-দ্রব্য

চাপ দিবার যন্ত্র আছে। উহা চাপিয়া ধরিবামাত্র হাতলের মধ্য হইতে ক্রিম বা সর বাহির হইয়া আইসে। ক্ষৌরকার্য্যের পর এই সর মুখে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এইরূপ একাধারে ব্রুস ও ক্রিমের সন্নিবেশ ভ্রমণকারীদিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক।

বাষ্পস্নান

আমেরিকার ফুটবল খেলোয়াড়রা পূর্ব্বে স্পঞ্জ জলসিক্ত করিয়া মস্তক ও আননের স্বেদধারা মুছিয়া ফেলিত। উহাতে স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে বলিয়া অধুনা বাষ্পস্নানের ব্যবস্থা হইয়াছে। রবারের চক্রযুক্ত একটি গাড়ীর মধ্যে জল সঞ্চিত করিয়া রাখা হয়। উক্ত আধারের সহিত ৮টি নল সংযুক্ত থাকে। জলাধারের মধ্যস্থ সলিলরাশি এই নলগুলির সঙ্কীর্ণ মুখের মধ্য দিয়া সূক্ষ্মতম জল-

ফুটবল খেলোয়াড়ের বাষ্পস্নান

কণার ন্যায় নির্গত হইয়া থাকে। বাষ্পবৎ জলকণা খেলোয়াড়-দের মস্তক, স্কন্ধ ও আননকে সিক্ত ও শীতল করিয়া দেয়। ইহাতে পরিধেয় বস্ত্রাদি আর্দ্র হয় না, অথচ প্রয়োজনীয় উপকার লাভ করা যায়। ৮ জন খেলোয়াড় একসঙ্গে এই বাষ্পস্নানের মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারে।

মেঘলোকের আবহ-সংবাদ

কালিফের অন্তর্গত সান্‌ডায়েগোর জনৈক নৌবিভাগীয় সামরিক কর্ম্মচারী প্রত্যহ বিমান-পোতযোগে ব্যোমপথে উঠিয়া মেঘলোকের আবহসংক্রান্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনেন। বিমান-পথে ভ্রমণকালে আবহাওয়ার কিরূপ অবস্থা অনুকূল বা প্রতিকূল হইতে পারে, তাহার সংবাদ সংগ্রহের জন্যই তাঁহার এই প্রচেষ্টা। আবহ-সংক্রান্ত বিবরণ যে সকল যন্ত্রের দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে, সেই সকল যন্ত্র তিনি নিজের বিমানপোতে রাখিয়াছেন।
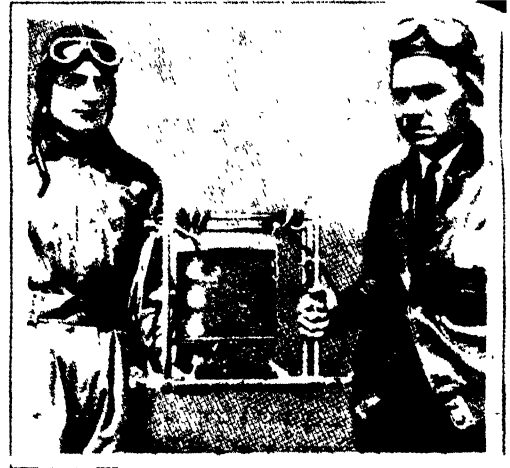
মেঘলোকের আবহ-সংবাদ

তাঁহার উদ্ভাবিত ব্যবস্থার ফলে যন্ত্রের নির্দ্দেশগুলি আপনা হইতেই রেখাপাত করিতে থাকে। এইরূপ আবহ-সংবাদ সংগ্রহ করার ফলে, পরদিবস আবহাওয়ার অবস্থা কিরূপ থাকিবে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

বোমার সাহায্যে সমুদ্রগর্ভের পরিমাপ

গতিশীল অর্ণবযান হইতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া সমুদ্রগর্ভের গভীরতার পরিমাপপ্রণালী অধুনা অবলম্বিত হইয়াছে। বোমা ফেলিবার সময় ঘড়ী দেখিয়া সময় লিখিয়া রাখিতে হয়। তার পর যখন বোমা-বিদারণের শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, সেই সময়ও লিপিবদ্ধ করিয়া লইতে হয়। মাইক্রোফোণ যন্ত্রে এই বোমা

বোমার সাহায্যে সমুদ্রগর্ভের পরিমাপ

বিদারণের প্রতিধ্বনি লিখিত হইয়া যায়। তার পর অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে বোমার গতি-বেগ নির্ণীত হয়; সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রগর্ভের গভীরতারও পরিমাপকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের গণ্ডারের মূর্ত্তি

দক্ষিণ-আফ্রিকার একটি পর্ব্বতে সম্প্রতি প্রাগৈতিহাসিক যুগের গণ্ডারের মূর্ত্তি প্রস্তরগাত্রে ক্ষোদিত অবস্থায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন, এই মূর্ত্তি যাহারা প্রস্তরগাত্রে ক্ষোদিত

প্রাগৈতিহাসিক যুগের গণ্ডার-মূর্ত্তি

করিয়াছিল, তাহারা ২৫ হইতে ৫০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। এই গণ্ডারটি শ্বেতকায়। শিল্পী প্রাচীনতম যুগের যন্ত্রাদির সাহায্যে প্রস্তরগাত্রে এই মূর্ত্তি ক্ষোদিত করিয়াছিল। এখনও পর্য্যন্ত এই মূর্ত্তি অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে।

জলের উপর শিকার

অষ্ট্রীয় সৈনিকগণ ড্যানিয়ুব নদের জলে প্রায় শিকার করিয়া

জলের উপর শিকার

থাকে। উহারা চরণ-সংলগ্ন ভেলার সাহায্যে অনায়াসে জলের যত্র তত্র ভাসিয়া বেড়াইতে পারে। বড় বড় দুইখানি কাঠের তক্তার উপর চরণ রাখিয়া সৈনিক কৌশলে উহা চালিত করে। বসিবার জন্য আসনের ব্যবস্থাও আছে। এই স্কীজাতীয় নৌকাগুলি এমনভাবে নির্ম্মিত যে, পায়ের জুতা জলে ভিজে না। সৈনিকরা এই স্কীনৌকায় চড়িয়া শিকার করিয়া বেড়ায়।

আরণ্য পক্ষীর গ্রাম

মুক্ত পক্ষীদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্য আমেরিকার ভ্রমণকারীরা সেই দেশে গ্রামে প্রান্তরে পক্ষীর গ্রাম নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পাখীদিগের বাসের জন্য মনোরম বহুসংখ্যক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া স্থানটিকে গ্রামের আকার প্রদান করিয়া থাকেন। এই পাখীর গ্রাম অবশ্য আকারে ছোট। তবে ইহাতে বাংলো আছে, বিদ্যালয় আছে, গির্জ্জা এবং বসবাসের বাড়ীও আছে। গাছ ও লতায় স্থানটি মনোরম করিয়া তুলিবার ব্যবস্থাও আছে। স্নান করিবার জন্য একটি ক্ষুদ্রতম

আরণ্য পক্ষীর গ্রাম

জলাশয় এই গ্রামের মধ্যে অবস্থিত। গ্রামের মধ্যস্থলে একটি পতাকা প্রোথিত থাকে। এই মনোরম ক্ষুদ্র গ্রামে পাখীরা আকৃষ্ট হইয়া আসিয়া থাকে।

বিমান-বিহারীর মুখোস

বিমান-বিহারকালে যদি ঝটিকা উপস্থিত হয়, অথবা ভীষণ শীত ঋতুর আবির্ভাব ঘটে, তাহা হইলে বিমান-চালক প্রভৃতির বিশেষ অসুবিধা উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ বিমানপোতে যাঁহারা ক্যামেরা-যোগে দৃশ্য পদার্থের আলোকচিত্র গ্রহণ করেন, নানাপ্রকার অসুবিধায় তাঁহারা বিব্রত হইয়া পড়েন। কারণ, সেই

সময় তাঁহাদিগকে বাতাসের দিকে মুখ করিয়া অবস্থান করিতে হয়। প্রচণ্ড বায়ুর বেগে চাহিয়া থাকাও সম্ভবপর হয় না। জনৈক আলোক-চিত্রকর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য একপ্রকার মুখোস নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই মুখোসে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে আবৃত হয়; অথচ দৃষ্টিশক্তি অব্যাহত থাকে এবং রক্তচলাচলেরও কোনও ব্যাঘাত ঘটে না।

বিমান-বিহারীর মুখোস

বিচিত্র ব্যায়াম-কৌশল

লণ্ডনে মোটর দ্বিচক্র-যান চড়িয়া নিপুণ আরোহীরা অপূর্ব্ব ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করিতেছে। ব্যায়ামক্ষেত্রে একটি কাঠের বৃত্ত নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর দিয়া অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত এই সকল দ্বিচক্রযান-আরোহীরা রোমাঞ্চকর ব্যাপার দেখাইতেছে। ইহাতে জীবননাশের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও দুঃসাহসী আরোহীরা মোটর দ্বিচক্রযান সহযোগে ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রদর্শনে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। দারুনির্ম্মিত এই বৃত্তকে মৃত্যুপ্রাচীর বলিয়া অভিহিত করা হয়।
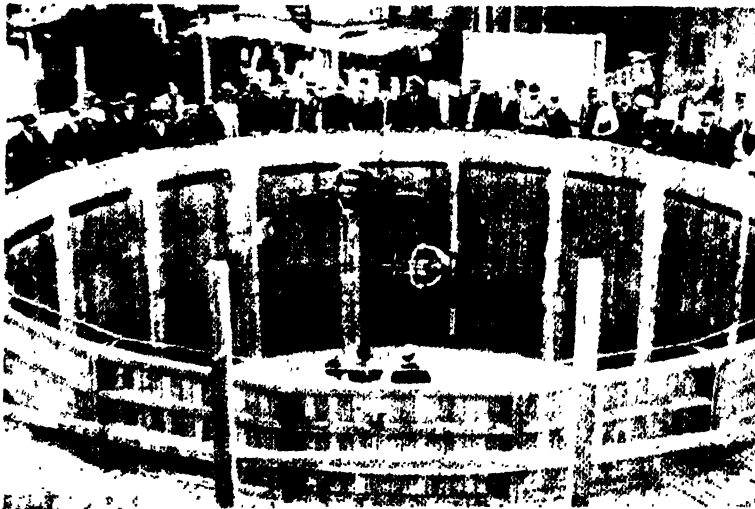
বিচিত্র ব্যায়াম-কৌশল

লতাগুল্মচ্ছেদনের মোটর-গাড়ী

আমেরিকা অঞ্চলে তৃণগুল্মাবৃত ভূমি সহজে ও অল্প সময়ে জঞ্জাল-

লতাগুল্মচ্ছেদনের মোটর-গাড়ী

মুক্ত করিবার জন্য মোটর-চালিত গাড়ী ব্যবহৃত হইতেছে। এই গাড়ীর নিম্নদেশে তীক্ষ্ণধার ও দৃঢ় ছুরী এমনভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে যে, গাড়ী চলিলে ছুরীর সাহায্যে ভূমিস্থিত তৃণগুল্মগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। চাষ-আবাদের পক্ষে এই ব্যবস্থা সুসঙ্গত। এইখানে যে 'ট্রাক্‌টর' গাড়ীর চিত্র প্রদর্শিত হইল, তাহার সাহায্যে ১৮ হাজার একর ভূমির আবাদ হইয়াছে।

ব্যাঘ্রমুখ হাঙ্গর

প্রবাল দ্বীপের সন্নিহিত সমুদ্রে একপ্রকার হাঙ্গর আছে। এই হাঙ্গরগুলির মুখ ব্যাঘ্রের ন্যায় বিভীষণ। ইহারা অতি ভীষণ জন্তু, মুহূর্ত্তমধ্যে মনুষ্যকে গ্রাস করিতে পারে। এই জাতীয় সামুদ্রিক রাক্ষস ২৫ ফুট দীর্ঘ হইয়া থাকে।

ব্যাঘ্রমুখ হাঙ্গর

নিরন্নের অন্নসংস্থান

লাহোরে কংগ্রেস-প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় অভিভাষণে স্বদেশী সম্বন্ধে যে কয়টি সারবান্ কথা বলিয়াছেন, দেশবাসীর পক্ষে উহা প্রণিধান করা বিশেষ কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছেন, দেশে যে অন্নসমস্যা ও বেকার-সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, চরকা ও খদ্দরের সাহায্যে উহার বহুল-পরিমাণে সমাধান হইতে পারে। কথাটা অবশ্য পুরাতন, কিন্তু পুরাতন হইলেও ইহা যতবার বলা যায়, ততবারই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

আশ্চর্য্য এই যে, দেশের কোন কোন মনীষী চরকা ও খদ্দরের উপর বীতশ্রদ্ধ। তাঁহারা চরকায় সূতাকাটার কথা শুনিলে হাসিয়া থাকেন, বিজ্ঞের মত বলিয়া থাকেন যে, ঐ পথে মুক্তির উপায় আছে যাহারা বলে, তাহারা বাতুল! কিন্তু যে দেশে অসংখ্য লোক একমাত্র কৃষির উপর জীবনযাত্রার জন্য নির্ভর করে, এক বৎসর অজন্মা হইলে তাহারা অন্ধকার দেখে। বৎসরের সকল মাসই কৃষির উপযোগী নহে। সুতরাং অবসরকালে তাহারা যদি অন্য পথে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের অন্নসংস্থানের কতকটা উপায় হইতে পারে।

পূর্ব্বে বাঙ্গালার দরিদ্র-জনসাধারণ যে এই জন্য চরকা ও খদ্দরের উপর নির্ভর করিত, তাহা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রাচ্য-ভাষাবিদ্ কোলব্রুকের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়াছেন। মহাত্মা গন্ধীর এই চরকা, খদ্দর প্রচারের বহু পূর্ব্বে—তাঁহার জন্মের ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে কোলব্রুক ১৮০০ খৃঃ লিখিত "বঙ্গে কৃষিকার্য্য" নামধেয় গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন,—"বৃটিশ গভর্ণমেন্টের মত উন্নত সরকারের পক্ষে দরিদ্র শ্রেণীর জন্য কার্য্য নির্দ্দেশ করা কিছুতেই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। কিন্তু এক্ষণে দেশের অসহায় দরিদ্রগণের অভাব-মোচনের জন্য কোনপ্রকার সরকারী ব্যবস্থা নাই। পীড়া বা সামাজিক মর্য্যাদার জন্য যে সকল বিধবা বা অনাথা স্ত্রীলোক মাঠের কাযে অসমর্থ, জীবিকা অর্জ্জনের জন্য হাতে সূতা কাটাই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন। জরা বা অন্য কারণে পরিবারের পুরুষগণ কার্য্যে অশক্ত হইলে পরিবারের নারীরা কেবল হাতে সূতা কাটিয়াই তাহাদের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিতে পারে।"

ইহাতে বৃটিশ-সরকারেরও লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই। সে সম্বন্ধে কোলব্রুক বলিয়াছেন, "বাঙ্গালা হইতে ইংলণ্ডে কার্পাসতূলা চালান দেওয়া অপেক্ষা কার্পাসসূতা চালান দেওয়া অধিকতর লাভজনক। আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে ইংলণ্ডে প্রচুর পরিমাণে রেশম ও পশমজাত সূতা বিনা শুল্কে চালান দেওয়া যদি ইংলণ্ডের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে বঙ্গদেশ হইতে কার্পাসজাত সূতা চালান দেওয়ায় কেনই বা ইংলণ্ডের পক্ষে হানিকর হইবে? কেনই বা বাঙ্গালার কার্পাসসূতার উপর গুরু করভার চাপাইয়া বাঙ্গালার কার্পাসসূতা প্রস্তুতের কার্য্যে বাধা প্রদান করা হয়?"

কোলব্রুক বাঙ্গালার সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া কৃষকদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। অবশ্য তখনকার কালের অবস্থার এখন অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। হয় ত ইংলণ্ডে কলে সূতা ও কাপড় প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া সরকার স্বদেশের বাণিজ্যের রক্ষাকল্পে ভারতের সূতার উপর শুল্ক চাপাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু ইহা ত যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া এ দেশের দরিদ্রের অন্নসমস্যা-সমাধানেও সরকারকে অবহিত হইতে হইবে।

পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও তাঁহার এক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "কৃষির পর হাতে সূতা কাটা এবং তাঁতে কাপড় বোনা ভারতের প্রধান জীবিকা-অর্জ্জনের উপায় ছিল। এক বিহার জেলারই ৩ লক্ষ ৬০ হাজার নারী এই কার্য্যে জীবিকা অর্জ্জন করিত। এই ব্যবসায়ে নারীরাই প্রধানতঃ জীবিকা-অর্জ্জনে সমর্থ হইত। মাত্র দৈনিক সামান্য কয় ঘণ্টা সূতা কাটিয়া এই নারীরা বৎসরে মোট ১০ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা লাভ করিত।"

ইহা সামান্য নহে। এখন এই সূতাকাটার প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তনের ফলও শুভজনক হইয়াছে। যদি শুল্ক হ্রাস বা রদ করার সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে আমরা ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক লাভ করিতে পারি। সুতরাং এ বিষয়ে সরকার ও জনসাধারণের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে কি?

নবদুর্গা

(উপন্যাস)

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

হঠাৎ টেলিগ্রাম

বাঞ্ছারাম দাস অধরকে মোহান্তের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া, মাণিক ঘোষের আদেশে পদব্রজে রামাপুরার বাসায় ফিরিয়া গিয়াছিল, এক্কাখানা অধরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, কারণ, অধর নূতন লোক, একা বাড়ী চিনিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইতে পারে। মোহান্তের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, নোটের পুঁটুলি হস্তে অধর যখন সেই এক্কায় রামাপুরার বাসার সামনে নামিল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বাঞ্ছারাম দেউড়িতে বসিয়া হুঁকা টানিতেছিল, অধরকে দেখিয়া বলিল, "এই যে মুখুয্যে মশাই, খুব সকালে সকালেই এসে পড়েছেন যে দেখছি!"

অধর বলিল, "হ্যাঁ, কায হয়ে গেল, সেখানে ব'সে আর কি করবো বল?"

বাঞ্ছারাম একটু মুখবিকৃতি করিয়া বলিল, "তা হ'লে—তা হ'লে—আচ্ছা যান, বাড়ীর ভিতরেই যান।"

অধর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া উপরে গিয়া দেখিল, নবদুর্গা একা,—বরকে দেখিবামাত্র সে মুখের উপর ঘোমটা টানিয়া দিল।

অধর বধূর নিকটে গিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "এরা সব কোথায়? ছাদে আছে না কি?"

নবদুর্গা মুখের ঘোমটা কমাইয়া চুপি চুপি বলিল, "বামুন ঠাকরুণকে সঙ্গে নিয়ে হরিশের মা বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখতে গেছে।"

অধর বলিল, "অ্যাঁ, বল কি! দেখ, একেই বলে ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। আমি ত ভেবেছিলাম, যাবার আগে তোমার সঙ্গে শেষ পরামর্শ করবার আর সুযোগই পাব না। তারা কখন্ ফিরবে, জান?"

"ব'লে গেছে, বেশী দেরী করবে না, যত শীগ্‌গির পারে, ফিরে আসবে।"

অধর বলিল, "তবে ত বেশী সময়ও নেই। কথাবার্ত্তাগুলো চট্‌পট সেরে ফেলা যাক এস। এস, বিছানায় বস।"—বলিয়া মেঝের উপর পাতা বিছানায় অধর বসিল। নবদুর্গা বিছানায় বসিল না, খালি মেঝের উপরই বসিল।

অধর জিজ্ঞাসা করিল, "বামুন ঠাকরুণকে আমাদের বিপদের সব কথা তুমি খুলে বলেছ?"

"বিপদের কথা আমি ত তাকে আগেই বলেছিলাম; তুমি ছাদে যাবার আগেই আমি তাকে বলেছিলাম। তখন ত তোমাকেও শত্রু ব'লে মনে করেছিলাম কি না! তাকে বলেছিলাম, তুমি আমায় পালিয়ে বাপের বাড়ী নিয়ে চল, আমার নতুন বালা যোড়াটা তোমায় আমি দেবো।"

"এখন বলেছ যে, আমি তোমার শত্রু নই?"

"হ্যাঁ, বলেছি। টাকার কথাও বলেছি। কিন্তু সে দুশো টাকায় রাজি নয়। বলে, ভারি ঝুঁকির কায, মোহান্ত যে রকম দুষ্ট লোক শুনছি, কি ফেঁসাদে ফেলবে, তা বলা যায় না, তোমার বরকে বোলো, পাঁচশো টাকা পেলে আমি এ কাযে হাত দিতে পারি।"

অধর উৎসাহের সহিত বলিল, "আচ্ছা, তাই সই। কি উপায়ে সে তোমায় নিয়ে গিয়ে আমার হাতে দেবে, তা কি বলেছে?"

"তা বলেনি। তবে বলেছে, কা'ল যেন তোমার স্বামী বিন্ধ্যাচল কি চুনার যাবার জন্যে একখানা নৌকো ভাড়া ক'রে সন্ধ্যের পর কেদার-ঘাটে এসে অপেক্ষা করেন, আমি যে উপায়ে পারি, তোমায় পালিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে সঁপে' দেবো।"

অধর বলিল, "বেশ, এ ভাল পরামর্শ। আমি তাই থাকবো। কেদার ঘাটে ত? আচ্ছা।"

নবদুর্গা বলিল, "সে আর একটা কথা বলেছে। বলেছে, এখন কিছু দিন তাকেও আমাদের সঙ্গে পালিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। বাঞ্ছারাম তার বাড়ী চেনে, কি জানি, সেখানে গিয়ে মোহাস্তের লোকরা যদি কিছু উৎপাত করে! প্রভাবতী ব'লে তার একটি মেয়ে আছে, তাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। হ্যাঁ, আর বলেছে, এখানে তার কিছু দেনা আছে, সে সব মিটিয়ে তাকে যেতে হবে, অৰ্দ্ধেক টাকা সে তাই আগাম চায়।"

"তার জন্যে ভাবনা কি?"—বলিয়া অধর তার পুঁটুলি খুলিয়া, ২ শত ৫০ টাকার নোট গণিয়া নবদুর্গার হাতে দিল। নবদুর্গা সে নোটগুলি তাহার বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিতে রাখিতে বলিল,"হ্যাগা, তুমি ত খানিক পরেই চ'লে যাচ্ছ, মোহাস্ত রাত্রে এসে যদি কোনও অত্যাচার করে?"

অধর বলিল, "সে ভয় কোরো না। কাশী হেন সহর, এই বড় রাস্তার উপর বাড়ী, চেঁচামেচি শুনলেই রাস্তায় লোক জমা হবে, পুলিস ছুটে আসবে। আজকে রাত্রে তোমার কোনও ভয় নেই, বরং বামুন ঠাকরুণকে তোমার বিছানায় নিয়ে শুয়ো। হ্যাঁ, ভাল কথা, হরিশের মা এলে আমি প্রকাশ্যভাবে বলবো যে, ডুমরাওন থেকে হঠাৎ তার পেয়ে জরুরী কাযে আমায় সেখানে যেতে হচ্ছে, তিন দিন পরেই আমি ফিরে আসবো, তোমরা নির্ভয়ে থেকো। তুমি যেন সে কথা সত্যি মনে কোরো না,—আমি কা'ল সন্ধ্যা থেকে নৌকো নিয়ে কেদারঘাটে থাকবো, এ তুমি নিশ্চয় জেনো।"

নবদুর্গা বলিল, "আচ্ছা।"

এই সময় বাহিরে একা দাঁড়াইবার শব্দ শুনা গেল। অধর বারান্দায় বাহির হইয়া নিম্নে চাহিয়া দেখিল, বামুন-ঠাকরুণের সহিত হরিশের মা একা হইতে নামিতেছে। নবদুর্গা তাড়াতাড়ি অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

স্ত্রীলোকরা উপরে উঠিয়া আসিল। অধরকে দেখিয়া হরিশের মা যেন চমকিয়া উঠিল; বলিল, "দাদাবাবু, আপনি কতক্ষণ?"

অধর বলিল, "এই ত এসে জামা-জুতা খুলছি। তোমরা গিয়েছিলে কোথা?"

হরিশের মা বলিল, "বলতে নেই যার কপালে থাকে, বাবা বিশ্বনাথের আরতি দেখে এলাম দাদাবাবু। আহা কিবে আরতি, কিবে স্তব, কিবে নাচন, দেখে আমার জন্ম সার্থক হ'ল! আপনি যে ব'লে গিয়েছিলেন, আপনার ফিরতে রাত্তির ৮টা ৯টা হবে!"

"হ্যাঁ, আগে তাই মনে করেছিলাম বটে; কিন্তু কায শেষ হয়ে গেল, তাই চ'লে এলাম। আচ্ছা, হরিশের মা, ওবেলা যে সব খাবার-টাবার আনানো হয়েছিল, তার কিছু আছে কি?"

"না, দাদাবাবু, সে ত সব ওবেলাই উঠে গেছে। কেন, ক্ষিধে পেয়েছে, খাবেন কিছু এখন? ক্ষিধে ত পাবেই, খেতে ব'সে ভাতে হাতে করেছিলেন বৈ ত নয়! বাড়ীওয়ালার দরোয়ানটা দেউড়িতে ব'সে রয়েছে দেখলাম। কিছু খাবার দাবার আনতে দিন না হয়।"

অধর বলিল, "আচ্ছা, তা হ'লে আনতে দিই। অবেলায় ভাত খেয়েছ, রাত্রে তোমরা কি আর ভাত খাবে, খাবার বেশী ক'রেই আনতে দিই, তোমরাও খেও। আমি ত এ দিকে মহা মুস্কিলেই প'ড়ে গেছি।"

"কেন, কি হয়েছে দাদাবাবু?"

"আমাদের জমীদার মশাইয়ের বাড়ীতে ব'সে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইছি, এমন সময় হঠাৎ এক তার এসে হাজির। ডুমরাওন থেকে দেওয়ানজী মশাই তার করেছেন যে, তোমার আর পনেরো দিন ছুটী মঞ্জুর করা গেল, কিন্তু তুমি আজ রাত্রেই চ'লে এস, কালকে আদালতে আমাদের একটা সঙ্গীন মোকর্দ্দমার তারিখ, তোমার সাক্ষী না হ'লে চলবে না, সাক্ষী দিয়ে তুমি আবার ফিরে যেও।"

বলা বাহুল্য, হরিশের মা এ সকল ব্যবস্থার কথা পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিল। বিস্ময় ও দুঃখের ভাণ করিয়া বলিল, "তাই ত, কি হবে দাদাবাবু?"

অধর মুখ ভার করিয়া বলিল, "কি করবো বল,—চাকরী যখন করি, তখন মনিবের হুকুম মেনে চলতেই হবে।"

"কখন্ বেরুতে হবে আপনাকে?"

"এই—রাত দশটার ট্রেণে।"

"কবে ফিরবেন?"

"কা'ল ত আদালতে তারিখ। এখন এক দিনই লাগে

কি দু'দিনই লাগে, তা ত বলা যায় না। আদালতের ব্যাপার ত!"

হরিশের মা ভয় ও উদ্বেগের অভিনয় করিয়া বলিল, "আমরা দুটি মেয়েছেলে, একলা এই নির্ব্বান্ধব পুরীতে কেমন ক'রে থাকবো দাদাবাবু?"

"সে জন্যে কিছু ভয় নেই তোমাদের। কাশী হেন সহর, বড় রাস্তার উপর এই বাড়ী, চারিদিকে লোকজন গিজ্-গিজ্ করছে, ভয় কিছু নেই। বাড়ীওয়ালার দরোয়ানটিকে আমি ব'লে কয়ে দিয়ে যাব, সর্ব্বদা ও উপস্থিত থাকবে, তোমাদের খবরদারী করবে, বাজার-হাট যা কিছু দরকার—সব ক'রে দেবে। ফিরে এসে ওকে ভাল রকম বখশিসের লোভ দেখিয়ে যাব এখন।"

হরিশের মা বলিল, "আমি ত বুড়ো-হাবড়া মানুষ, আমার আর ভয় কিসের? তবে ক'নে-বউ ছেলেমানুষ, কখনও বাড়ীছাড়া হয় নি,—ওর জন্যেই ভাবনা,—কাঁদা-কাটা করে যদি—কি ক'রে থামাবো?"

অধর হাসিয়া বলিল, "না না, ক'নে-বউ হলেও নেহাৎ কচি খুকীটি ত নয়। কাঁদাকাটা করবে কেন? তুমি রয়েছ, বামুন-ঠাকরুণকেও ব'লে যাব, উনিও অষ্টপ্রহর এখানে থাকবেন, বেশ গল্প-গুজবে তোমাদের সময় কেটে যাবে।"

বামনী বাহিরে বসিয়া ইহাদের কথা-বার্ত্তা শুনিতেছিল ও মনে মনে হাসিতেছিল। সে এই সময় বলিয়া উঠিল,—"বাবা-ঠাকুর, আমার যে একটু মুস্কিল আছে। আমি রাতে কি ক'রে এখানে থাকবো! আমার একটি মেয়ে আছে, সোমত্ত মেয়ে, তাকে বাড়ীতে রাতে একলা ফেলে রাখা ত চলবে না বাবা!"

অধর বলিল, "কত বড় মেয়ে তোমার?"

"এই, ক'নে-বউয়ের বয়সীই হবে।"

"তবে এক কায কর না কেন বামুন ঠাকরুণ! আমি বলি কি, তোমার মেয়েকেও এখানে নিয়ে এস না কেন?—দুটিতে সমবয়সী—বেশ কথাবার্ত্তায় ভুলে থাকবে।"

বামনী বলিল, "তা যদি বলেন, তাই না হয় নিয়ে আসি।"

বেশ, সেই ভাল হবে, কেমন হরিশের মা? হ্যাঁ, তোমাদের এ ক'দিনের বাসা-খরচ-টরচের জন্যে কিছু টাকা রেখে দাও।"—বলিয়া অধর পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া হরিশের মা'র হাতে দিল এবং বাঙ্গারামকে ডাকিয়া কচুরি, রাবড়ি, আচার প্রভৃতি আনিতে দিল।

কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে অধর জামাজুতা পরিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। বামনী বলিল, "আর বেশী রাত ক'রে কি হবে, আমি তা হ'লে যাই, মেয়েটাকে এই বেলা নিয়ে আসি।"—বলিয়া সে-ও অধরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিঁড়ি নামিতে লাগিল। একতলে নামিয়া চুপি চুপি বলিল, "বাবা-ঠাকুর, আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন, কা'ল সন্ধ্যার পরে কেদার-ঘাটে আপনার বউকে নিয়ে গিয়ে আপনার হাতে দেবো।"

অধর বলিল, "তোমার জন্যে আড়াই-শো টাকা আমি ক'নে-বউয়ের কাছে রেখে এসেছি।"

বামনী বলিল, "ক'নে-বউ আমাকে তা বলেছে। সব কথাই বলেছে।"

রাস্তায় বাহির হইয়া অধর একখানা এক্কা ভাড়া করিয়া মোহান্ত-ভবনের দিকে চলিল। [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের উনবিংশ অধিবেশন এবার দক্ষিণ কলিকাতাবাসীর উদ্যোগে ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত হইবে। আগামী ১৯শে মাঘ হইতে মাতৃভাষার পূজারীরা জননীর বন্দনাকার্য্যে রত হইবেন। যাহাতে বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগিগণের মধ্যে পরিচয়, মিলন ও ভাববিনিময়ের সুবিধা হয়, এ জন্য সম্মেলনের উদ্যোক্তারা উদ্যান-সম্মেলন, বৈঠকী মজলিস, সঙ্গীত প্রভৃতির আয়োজন করিতেছেন। সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের সহায়তা-কল্পে, একাধিক মনীষীর দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও আলোক-চিত্র-সম্বলিত বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করাও হইতেছে। অভ্যর্থনা সমিতি বিভিন্ন স্থান হইতে চারুশিল্পের নিদর্শন, হস্তলিপি, পুথি, প্রাচীন মুদ্রা ও চিত্র, দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, প্রস্তর ও ধাতুমুদ্রা প্রভৃতি সযত্নে সংগৃহীত করিয়া একটি প্রদর্শনী খুলিবার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। বিশ্ববরেণ্য কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবার মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। সাহিত্য শাখার নেতৃত্বের ভার শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী গ্রহণ করিয়াছেন। দর্শনশাখায় মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, ইতিহাসে কুমার শরৎকুমার রায়, এবং বিজ্ঞান বিভাগে ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র-কুমার সেন সভানেতৃত্ব করিবেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকরূপে কার্য্য করিতেছেন।

দীর্ঘকাল পরে কলিকাতায় বঙ্গ-সাহিত্য-জননীর পূজার স[illegible] নিষ্পন্ন হইতেছে। দেবী ভারতীর বাৎসরিক অর্চ্চনার সময়ে বঙ্গভাষা-জননীর পূজার আয়োজন করিয়া উদ্যোক্তারা ভাল কা[illegible] করিয়াছেন। দক্ষিণ কলিকাতাবাসী প্রাণপণ যত্নে মাতৃপূ[illegible] আয়োজন করিতেছেন। প্রত্যেক বঙ্গভাষাভাষী ভক্ত পূজাপ্রা[illegible] সমবেত হইয়া জননীর চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিবেন, আশা দুরাশা নহে। আত্মনিয়ন্ত্রণের যুগে মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রকাশ করা প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্য করণীয় ধর্ম। আশা করি, মাতৃপূজার আয়োজন সার্থক হইবে।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-রোটারী-মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ] মাঘ, ১৩৩৬ [৪র্থ সংখ্যা

যবদ্বীপ
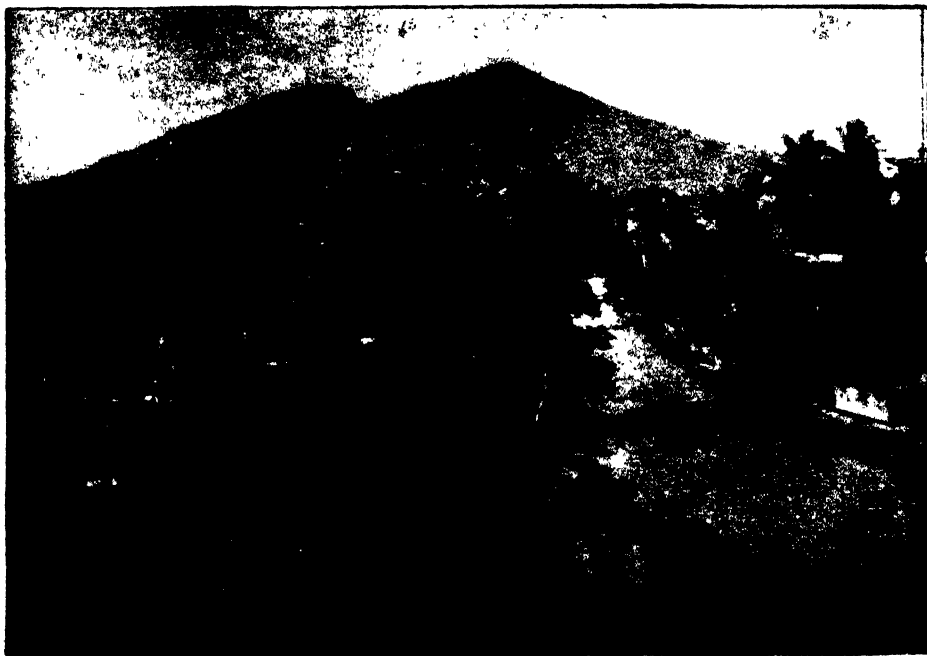
বুইটেন-জর্গ নগরের খর্জ্জুর ও তালকুঞ্জের মধ্যস্থ রাজপথ

ভারত মহাসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে এক দিন ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে ভারতীয়-গণ ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে গমন করিতেন, হিন্দু উপ-নিবেশও তথায় সংস্থাপিত হইয়াছিল। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রতি ভারতবাসীর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। যবদ্বীপ এককালে ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে উন্নত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগে মুসলমানগণ এই সকল ভারতীয় দ্বীপের ঐশ্বর্য্য ও শোভায় আকৃষ্ট হইয়া এতদঞ্চলে রাজ্যবিস্তার করেন। ইতিহাস-পাঠকগণ সে সকল সংবাদ অবগত আছেন। অধুনা যবদ্বীপ হল্যাণ্ডের শাসনাধীন। হিন্দুর কীর্ত্তি যবদ্বীপে বিদ্য-মান। সুতরাং বর্ত্তমান যুগে হিন্দুর অতীত গৌরবের কথা বাঙ্গালী পাঠকের কাছে হৃদ্যই হইবে। তাই যবদ্বীপের বিবরণ সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইল।

যবদ্বীপ নিতান্ত ক্ষুদ্রায়তন নহে। নিউইয়র্ক ষ্টেট যত বড়, যবদ্বীপের আকার তদপেক্ষা কম নহে। কিন্তু এই দ্বীপের অধিবাসীর সংখ্যা নিউইয়র্ক ষ্টেটের অধিবাসিসংখ্যার সাড়ে তিনগুণ অধিক। হল্যাণ্ডের তুলনায় যবদ্বীপ চারিগুণ বড়; ইহার অধিবাসার সংখ্যা শাসকজাতির সংখ্যার অপেক্ষা পাঁচগুণ বেশী। পৃথিবীতে ইদানীং প্রায়ই দেখা যাইতেছে, আয়তনে ছোট হইলেই সেই দেশের শক্তি সামান্ত হয় না; ক্ষুদ্র দেশও বৃহৎ দেশকে গ্রাস করিতে পারে, করিয়াও থাকে। সুতরাং আকারে চারিগুণ কম এবং লোকসংখ্যা একপঞ্চমাংশ হইলেও হল্যাণ্ড যবদ্বীপকে করায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

যবদ্বীপের ট্যাঙ-জোয়েং প্রিয়ক্ বন্দর আধুনিক প্রণালীতে নির্ম্মিত। এই বন্দর হইতে যবদ্বীপের রাজধানী বাটা-ভিয়ায় পৌঁছিতে মোটর-গাড়ীযোগে ২০ মিনিটের অধিক সময় লাগে না। বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ীও যাত্রী বহন করিয়া থাকে। বাটাভিয়ায় মশকের দৌরাত্ম্য ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। বন্দর পর্য্যন্ত তাহার আক্রমণ চলিয়া থাকে বলিয়া অভিজ্ঞ-গণ বর্ণনা করিয়াছেন। এই মশকের উৎপাতের জন্যই নূতন নগর সৃষ্ট হইয়াছে।

ওলন্দাজগণ যখন সর্ব্বপ্রথমে যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তখন বাটাভিয়ার নিম্নভূমিতেই তাহারা বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহারা নিম্নভূমির অধিবাসী বলিয়া তাহার প্রতি জন্মগত প্রেম পরিত্যাগ করিতে পারে নাই; সুতরাং খালের তটভূমির উপর তাহারা যে সকল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহাতে বড় বড় জানালা-দরজা ছিল না। নিম্নজলাভূমির উপর সারি সারি বাসগৃহ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রবল আক্রমণে, অন্যান্য রোগের প্রভাবে দলে দলে, হাজারে হাজারে সৈনিক ও ব্যবসায়ীরা যখন পরপারের যাত্রী হইতে লাগিল, তখন তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, যবদ্বীপ 'নেদারল্যাণ্ড' নহে—এখানে বাষ্পে বিষ আছে, মশকের দংশনে কালব্যাধির বিস্তারলাভ ঘটে।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন কুক দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বাটাভিয়া নগরে তাঁহার 'এন ডেভর' পোতের সংস্কার-কার্য্যের জন্য অবস্থান করিয়াছিলেন। এইখানে তাঁহার প্রিয় টাহেটীয় বন্ধু ও দ্বিভাষী টুপিয়া ম্যালেরিয়া-রোগে আক্রান্ত হয়। কাপ্তেন কুক তাঁহার প্রদত্ত বিবরণে লিখিয়াছিলেন, "এইখানে আমার দীর্ঘ দিনের সঙ্গী টুপিয়াকে চিরদিনের জন্য হারাইয়াছিলাম। এখানকার দূষিত জলবায়ু তাহাকে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল।"

ম্যালেরিয়ার প্রবল আক্রমণে, মশকের প্রচণ্ড উৎপাতে অবশেষে বাটাভিয়াবাসীরা উক্ত নগরের উপকণ্ঠ-স্থিত 'ওয়েলটার ভ্রেডেন্' নামক স্থানে বাস উঠাইয়া লইয়া যায়। নবগঠিত নগরের স্বাস্থ্য অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। বৃক্ষ-বীথিসমন্বিত রাজপথগুলি যেমন রমণীয়, তেমনই প্রশস্ত। নূতন নগরে বহুসংখ্যক প্রমোদোদ্যানও রচিত হইয়াছে। অবশ্য বাটাভিয়া নগরে এখনও অধিকাংশ কার্য্যালয় ও ব্যবসায়ীদিগের গুদাম বিরাজিত আছে; কিন্তু ওয়েল্টার ভ্রেডেনে শাখা-কার্য্যালয়গুলির সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাই-তেছে। বড় বড় অট্টালিকাও নির্ম্মিত হইতেছে।

পুরাতন রাজধানীতে প্রস্তর-নির্ম্মিত সুদীর্ঘ অট্টালিকা-সমূহের পার্শ্বে চীনাদিগের বাসগৃহও দৃষ্টিগোচর হইবে। সৈনিক আবাস-গৃহের সংখ্যাও অল্প নহে। বাটাভিয়ায় মোটর-গাড়ীর যথেষ্ট প্রচলন আছে। সমগ্র পৃথিবীর সহিত বাটা-ভিয়া বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ হইলেও দিবাভাগে প্রখর গ্রীষ্মে অনেকক্ষণ কাযকর্ম্ম বন্ধ থাকে। সকলেই তখন কিছুক্ষণের জন্য নিদ্রাসুখ উপভোগ করিয়া থাকে। শুধু প্রাচ্য দেশের

অধিবাসীদিগের এই দুর্নাম আছে, তাহা নহে, শ্বেতকায়গণও গ্রীষ্মাতিশয্যে প্রাচ্য দেশবাসীর অভ্যস্ত দিবানিদ্রার অনুসরণ না করিয়া পারেন না।

যবদ্বীপের উত্তর সীমায় সোয়েরাবাজা আর একটি প্রসিদ্ধ নগর। বাটাভিয়া হইতে উক্ত উত্তরপ্রান্তবর্তী নগরে গমন করিতে গেলে, মাঝখানে আর একটি নগর পড়ে। এই নগরের নাম সেমারাং। যবদ্বীপের মধ্যে সেমারাং তৃতীয় স্থান অধিকার করিবার গৌরব করিয়া থাকে। কিন্তু বাটাভিয়া ও সোয়েরাবাজা যে প্রকার জনবহুল এবং এই দুই নগরের বন্দরে যত জাহাজ আসিয়া থাকে, সোমারাং সে তুলনায় নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সোয়েরাবাজায় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ আগ্নেয়গিরি—টেংগার পর্ব্বত বিদ্যমান। উহার একটি শিখর হইতে সকল সময় ধূম্রজাল উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এই আগ্নেয়গিরি এখনও সজীব অবস্থায় আছে। পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জে যতগুলি বন্দর আছে, তন্মধ্যে সোয়েরাবাজার বন্দর বৃহৎ। এক সিঙ্গাপুরের পোতাশ্রয় ব্যতীত এত অধিকসংখ্যক পোতের এতদঞ্চলের আর কোনও বন্দরে আশ্রয়লাভ করিবার স্থান নাই।

এই নগর আধুনিকভাবে গঠিত, মোটর-গাড়ী বড় বড় দোকানে বিক্রয়ার্থ শ্রেণীবদ্ধভাবে বিদ্যমান। রেডিও বা বেতার যন্ত্র কিনিতে হইলে তাহারও অভাব নাই। প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা অসংখ্য। নগরটি যেমন মনোরম, তেমনই বৃহৎ।

ব্রমো আগ্নেয়গিরি এই নগর হইতে দর্শন করিবার বিশেষ সুবিধা। ব্রমোর কিছু দূরে ব্যাটক-পর্ব্বত অবস্থিত। পূর্ব্বে এই পর্ব্বত হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গিয়াছে। অধুনা উহা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রহিয়াছে। তবে "ব্রমোর" হৃদয়াভ্যন্তঃপুর হইতে অনলরাশির আবির্ভাব অসম্ভব নহে। কারণ, এখনও উহার মুখ হইতে ধূম্রজাল নির্গত হইয়া থাকে।

ওলন্দাজরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ব্রমোর ভস্মাচ্ছাদিত গাত্রে আড়াই শত সোপান গাঁথিয়া দিয়াছে। সেই সোপান-পথে এই আগ্নেয়গিরির উপরিভাগে আরোহণ করা যায়। উহার মুখবিবর হইতে গন্ধকের গন্ধ অনুক্ষণ নির্গত হইতেছে, মেঘের গুরু গর্জ্জনের ন্যায় শব্দও শ্রুত হইয়া থাকে। উক্ত পর্ব্বতের সন্নিহিত প্রদেশে যে সকল দেশীয় বসবাস করে, তাহারা পর্ব্বত-দেবতার ক্রোধশান্তির জন্য বহু পূর্ব্বে প্রতি বৎসর একটি যুবতী কুমারীকে উৎসর্গ করিত—অর্থাৎ আগ্নেয় গিরির মুখবিবরে নিক্ষেপ করিত। তাহাদের বিশ্বাস, এই বলি পাইলে পার্ব্বত্য দেবতার ক্রোধ আর তাহাদিগের উপর পতিত হইবে না। অধুনা এই প্রথা ওলন্দাজগণ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। যুবতী কুমারীর পরিবর্ত্তে দেশীয়গণ মুরগীশাবক ও নানাপ্রকার শস্য দেবতার মুখগহ্বরের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। বিংশ শতাব্দীর এমনই বিচিত্র প্রভাব যে, আধুনিক দুঃসাহসী যুবকগণ পর্ব্বতারোহণ করিয়া উপহৃত দ্রব্যগুলি অপহরণ করিয়া থাকে। পর্ব্বতস্থ অগ্নিদেবতাকে এই ভাবে ফাঁকি দেওয়া এখনও অবাধে চলিয়া আসিতেছে। তাহারা পর্ব্বতের অধীশ্বরকে বঞ্চিত করিয়া আপনাদের ভোগে মুরগীশাবক প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকে।

যবদ্বীপ ইক্ষু-চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি ইক্ষু মাড়াই করিবার জন্য সমগ্র দ্বীপে ১শত ৮০টি কল ব্যবহৃত হইতেছে। প্রায় ৫ লক্ষ একর ভূমিতে ইক্ষুর চাষ হয়। ইক্ষুরস-জাত চিনির পরিমাণ প্রায় ৭ শত ৬০ কোটি মণ। সমগ্র জগতে কিউবার নিম্নেই যবদ্বীপের স্থান। এত চিনি এক কিউবা ব্যতীত আর কোথাও উৎপাদিত হয় না। প্যাসোরোকান্ নামক স্থানে ইক্ষুদণ্ডের পরিপুষ্টি সম্বন্ধে পরীক্ষার কার্য্য চলিতেছে। অর্থাৎ যাহাতে আরও অধিক পরিমাণে চিনি উৎপাদিত হইতে পারে, সে জন্য যবদ্বীপের ইক্ষু-চাষের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে কর্ত্তৃপক্ষ তৎপর হইয়াছেন।

মদজোকার্টো নামক নগরটি চিনি প্রস্তুতের একটি প্রধান কেন্দ্র। এক কালে এইখানে শক্তিশালী হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। মজপহিৎ নামক রাজবংশ এইখানে রাজধানী স্থাপন করিয়া সমগ্র যবদ্বীপ ও সুমাত্রায় রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু অধুনা কতিপয় ভগ্নস্তূপ মাত্র তাহার অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানে পুরাতন রাজবৈভবের আর কোনও স্মৃতি নাই।

যবদ্বীপের লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ৭ শত ২৭ জন। প্রত্যেক পল্লীবাসীর গৃহে খাঁচাভরা পোষা পাখী দেখিতে পাওয়া যাইবে। যবদ্বীপবাসীরা পক্ষিপ্রিয়। পারাবত

যবদ্বীপের ইক্ষুবাহী গো-শকট

স্বর্ণ-মৎস্য-সমন্বিত দীর্ঘিকা

স্থানীয় সুলতানের অভিনেতৃবৃন্দ
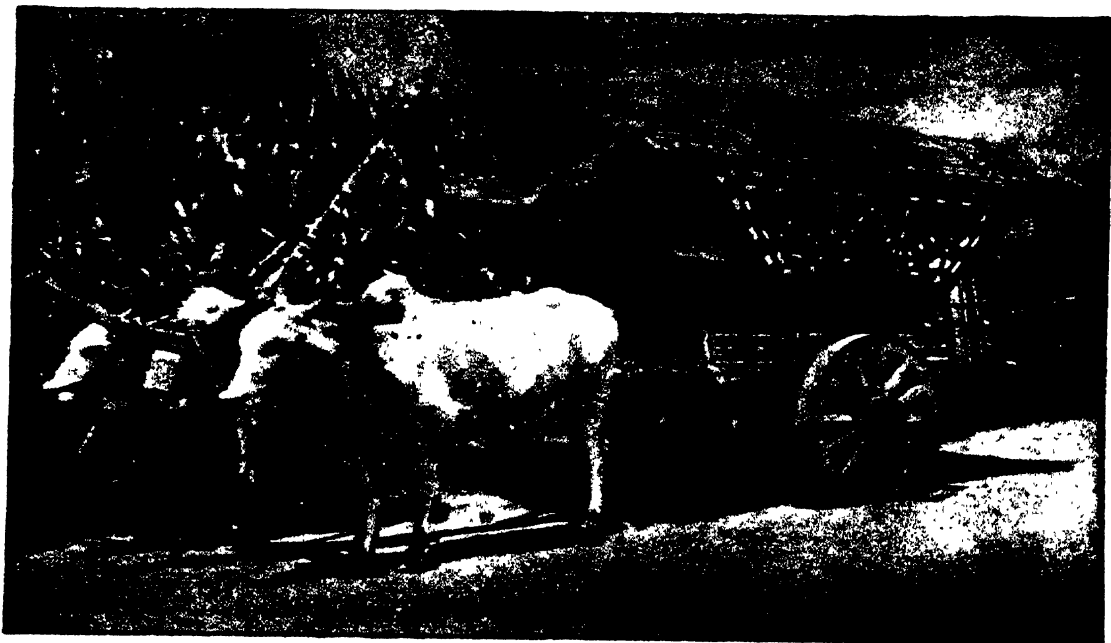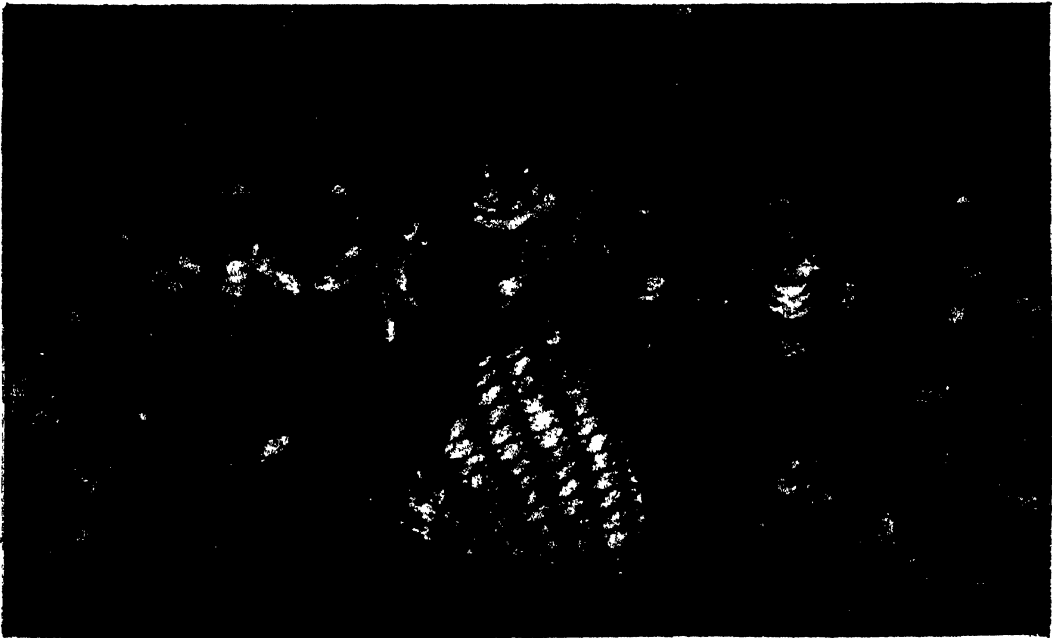
ডোক্‌রা সুলতানের বালক অভিনেতাদের ভঙ্গি-অভিনয়

পাখীর বাজার

প্রভৃতি পক্ষীর সংখ্যাই অধিক। দিবাভাগে বংশদণ্ডের উপর খাঁচাগুলি টানাইয়া রাখা হয়, সন্ধ্যাকালে উহা নামাইয়া গৃহের অভ্যন্তরে রক্ষিত হইয়া থাকে।

যবদ্বীপবাসীরা স্বল্পে সন্তুষ্ট জাতি। ইহাদের কুটীরগুলির প্রাচীর বংশ-নির্ম্মিত। তালপত্রজাতীয় পর্ণের দ্বারা কুটীরের চাল প্রস্তুত হইয়া থাকে। জনৈক অভিজ্ঞ পরিব্রাজক যবদ্বীপবাসীর সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন, "ভগবানের আশীর্ব্বাদে ইহারা যদি সতী সাধ্বী স্ত্রী, যুগল পুত্র-কন্যা, দুই একটি মহিষ এবং কিছু 'সাওয়া' বা ধান্যক্ষেত্র পায়, তাহা হইলে যবদ্বীপের কৃষক আপনাকে সর্ব্বরকমে সুখী বলিয়া মনে করিবে। তখন তাহাদের আর কোনও আকাঙ্ক্ষার বিষয় থাকে না।"

সাধারণতঃ যবদ্বীপবাসীরা মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু দ্বীপের পূর্ব্বভাগে হিন্দুর আচারপদ্ধতি, ধর্ম্ম-বিশ্বাস এখনও দেখিতে পাওয়া যাইবে। বলীদ্বীপে এখনও হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত আছে, উহাকে তথা হইতে কেহই বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয় নাই। যবদ্বীপের মুসলমানগণের মন মালায়-প্রভাববিশিষ্ট। এ জন্য তাহারা মুসলমানধর্ম্মের গোঁড়ামি কখনও করে না। কেহ কেহ মক্কাতীর্থে গমন করিলেও, এই সকল মুসলমান, মানবের হিতকামী ও অনিষ্টকারী উভয় প্রকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

ভঙ্গী অভিনয় যবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ আনন্দ। নানাপ্রকার ভঙ্গীর দ্বারা অভিনয়-কলার বিকাশে এই দেশের অভিনেতৃ-অভিনেত্রীরা বিশেষ পারদর্শী। যে সকল প্রাচীন নাটকের অভিনয় তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া সাধনা করিয়া আসিয়াছে, তাহাতেই যবদ্বীপের অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা অসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ করিয়া থাকে। নূতন কোনও নাটকে সে পারদর্শিতা লক্ষিত হয় না। পুরাতন নাটকগুলির অভিনয়ে তাহারা যে সকল অঙ্গভঙ্গী প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাতে প্রকৃতই মানুষের চিত্ত বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে।

যবদ্বীপে যত প্রকার নৃত্যপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে 'স্রম্পি' ও 'বেদোযো'ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই উভয় প্রকার নৃত্য শুধু রাজকীয় 'ক্রাটন্স' বা উদ্যানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অন্যত্র এই নৃত্য প্রদর্শিত হয় না।

সোয়েরাকার্টা ও ডোক্‌লাকার্টা নামক স্থানে দেশীয় সুলতানগণ প্রাচীন যুগের দ্বীপের শিষ্টাচার ও জাঁক-জমকের সহিত বাস করিতেছেন। সেইখানে উল্লিখিত দুই শ্রেণীর নৃত্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। স্রম্পি নৃত্য কোনও বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুলতান-বংশধরদিগের ৪ জন যুবতী কন্যা এই নৃত্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নৃত্যে নানা কলাকৌশলের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়

—ইহা যেন কলানৈপুণ্যের পূর্ণবিকাশ। সুন্দরী তরুণী-দিগের লীলায়িত নৃত্যভঙ্গীতে প্রাচীন যুগের সঙ্কল্প ও কাহিনীতে বর্ণিত রূপকথা যেন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া নয়ন-সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া থাকে। বেদোযো নৃত্যেও অনুরূপ কলাকৌশলের বিকাশ ঘটিয়া থাকে।

যবদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের অধিবাসীরা "ক্রীশ" বা বড় বড় ছোরা ব্যবহার করিতে পারে। তাহারা পচ্ছন্দ-মত ছোরা নির্ম্মাণ করে। কাহারও কাহারও "ক্রীশ" অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, কেহ বা তরঙ্গায়িতশীর্ষ ছোরা ভালবাসে; কাহারও "ক্রীশ" সোজা। ছোরার বাঁট বা হাতল এবং খাপ কারুকার্য্য-খচিত। এ বিষয়ে সকলেরই পছন্দ একই প্রকার।

যবদ্বীপবাসীর পরিচ্ছদে অধুনা বৈদেশিক প্রভাব অনুভূত হইবে। দেশীয় ও বিদেশীয় উভয়ের মিশ্রণে বর্ত্তমান যুগের যবদ্বীপবাসীর পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু 'সারং' বা দীর্ঘ ঋজু কটিবাস—একভাঁজ করিয়া প্রত্যেকের পরিচ্ছদে দৃষ্ট হইবে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 'সারং'গুলি দেশেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু ম্যাঞ্চেষ্টারে নির্ম্মিত অল্পদামের "সারং"ও অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকে।

গ্যামেলান সঙ্গীত

সোয়েরাকার্টা ও ডোক্জা সহরেই 'বটিক' শ্রমশিল্পের কেন্দ্র। এই উভয় স্থানে অন্যান্য ছোট ছোট কারখানা আছে। কারখানা বলিতে যাহা বুঝায়, 'বটিক' শ্রমশিল্পের কারখানার অর্থ তাহা নহে। এখানে প্রত্যেক কারখানায় কয়েকটি বড় বড় গামলা, তাহাতে বিভিন্ন প্রকার রং, মোম গলাইবার জন্য কতিপয় আধার এবং বাঁশের আলনা আছে। এই আলনায় বস্ত্র ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। উল্লিখিত আসবাব ও সরঞ্জাম ছাড়া, কারখানা-ঘরে কয়েক জন নারী। ইহাই প্রত্যেক বটিক্ শ্রমশিল্পের কারখানার স্বরূপমূর্ত্তি।

বটিকের কায করিবার পূর্ব্বে বস্ত্রের উপর পেন্সিল সহযোগে নক্সা কাটা হয়। তার পর বস্ত্রকে রঙ্গের মধ্যে প্রথমবার নিক্ষেপ করিবার সময় নক্সার যে সকল সূক্ষ্মতম অংশকে বর্ণের প্রভাব হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন, তাহার উপর মোম লাগাইয়া দেওয়া হয়। বস্ত্রের দুই দিকেই মোমের আচ্ছাদন দেওয়া হয়। এ সকল কায হাতেই সম্পন্ন করিতে হয়—অবশ্য ক্ষুদ্র পাত্রের সাহায্যে। তার পর একবার বস্ত্রে রংকরা হইলে উক্ত মোম তুলিয়া ফেলিতে হয়। তার পর আবার অন্য রঙ্গের গামলায় বস্ত্র নিক্ষেপ করিবার সময় পুনরায় পূর্ব্ববৎ উপায়ে মোম লাগাইতে হইবে। সাধারণতঃ পীত, পাঁশুটে ও নীলবর্ণের মধ্যেই বস্ত্র রঞ্জিত করা হইয়া থাকে। এইরূপে 'বটিক' প্রস্তুত হয়।

কার্য্যটি কঠিন নহে। তবে বহু সপ্তাহ বা মাস ধরিয়া ধৈর্য্য সহকারে বটিক বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। যবদ্বীপের নারীরাই প্রধানতঃ এই শিল্প চালাইয়া থাকে।

'ওয়েয়াং' বা ভঙ্গী অভিনয়কালে 'গ্যামেলান' যন্ত্রে সঙ্গীতাদি গীত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে

উপকথার যমরাজ

উপকথার যুবরাজ

যবদ্বীপে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। উক্ত যন্ত্র বাটারা জোরো নামক দেবতার দ্বারা উদ্ভাবিত। স্বর্গে যখন তিনি দীর্ঘকাল একা ছিলেন, সেই সময় তিনি কোন কার্য্য করিতে না পাইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করা যখন কষ্টকর হইয়া উঠিয়া ছিল, সেই সময় তিনি গ্যামেলান যন্ত্র উদ্ভাবিত করেন। এই যন্ত্র সহযোগে যখন তিনি গান আরম্ভ করিলেন, তখন

বোরোবোডোয়ার হিন্দু মন্দির

স্বর্গের দেব-দেবীরা উহার মাধুর্য্যে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন—অমনই নৃত্যচ্ছন্দে তাঁহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আন্দোলিত হইয়া উঠিল। যন্ত্রের উৎপত্তির কারণ যাহাই হউক না কেন, যাঁহারা যবদ্বীপের এই যন্ত্র-সঙ্গীত শুনিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, উহার মাধুর্য্য বিস্ময়কর।

ডোক্জা নগর পরিব্রাজক বা বিদেশী দর্শকদিগের বিশেষ দর্শনীয় স্থান। কারণ, এই নগরের অনতিদূরে 'টামানসারী' ধ্বংস-স্তূপ বিদ্যমান। এইখানে সুলতানের একটি দুর্গ রহিয়াছে। দুর্গটি জলের মধ্যে অবস্থিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে সুলতান ঐ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন, উহা তাঁহারই অন্যতম প্রমোদ-আবাস ছিল। ঘন ঘন ভূমিকম্পের ফলে দুর্গটির অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জলের মধ্যে অবস্থিত এই প্রাসাদের কক্ষগুলির অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। ভূমিকম্পবশতঃ এই দ্বীপের বহুবার বহুপ্রকার ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

উল্লিখিত দুর্গের প্রাচীরগাত্রে নানাপ্রকার গুল্ম জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে। উদ্যানমধ্যে নারিকেল ও দ্রাক্ষাকুঞ্জের বাহুল্য। প্রাসাদ-বেষ্টিত সলিলরাশি অগ্রে স্বচ্ছ ছিল। সুলতান-মহিষী ও রাজকন্যারা এককালে উহার স্নিগ্ধ, শীতল নীরে অবগাহন ও জলক্রীড়া করিয়া আনন্দলাভ করিতেন। অধুনা তাহার জলরাশি বিবর্ণ এবং পল্লীর উচ্ছৃঙ্খল বালকের দল সেই পঙ্ক-সমাকীর্ণ জলে নানা প্রকার ক্রীড়া করিয়া থাকে।

ডোক্জার উপকণ্ঠস্থিত সকল স্থানেই হিন্দু উপনিবেশের ধ্বংসস্তূপ বিদ্যমান। তন্মধ্যে প্রাম্বানান্ ও বোরোবোডোয়ার ধ্বংসস্তূপই বিশেষ প্রসিদ্ধ। বোরোবোডোয়ার মন্দিরে গমন করিতে গেলে ২৬ মাইল পথ মোটর-যোগে গমন করা যায়। ইক্ষু এবং ধান্য-ক্ষেত্রের মধ্যস্থিত বিসর্পিত পথটিও পরম মনোরম।

বোরোবোডোয়ার হিন্দুমন্দিরটি তালীবন-

বোরোবোডোয়ার মন্দির-প্রাচীরের শিল্প-চাতুর্য্য

সমাকীর্ণ স্থানে অবস্থিত। এই মন্দির ৮৫০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরটি একটি শৈলশৃঙ্গের উপর প্রতিষ্ঠিত। ক্ষুদ্র শৈলের চারিপার্শ্বে তালীবন ও ধান্যক্ষেত্র! মেরাপি নামক অধুনা-সুপ্ত আগ্নেয়গিরি মন্দির হইতে বহুদূরে

পুতুল নাচ

রঙ্গমঞ্চের কিশোর অভিনেতা

সোয়েরাকার্টার সরবৎ বিক্রেতা
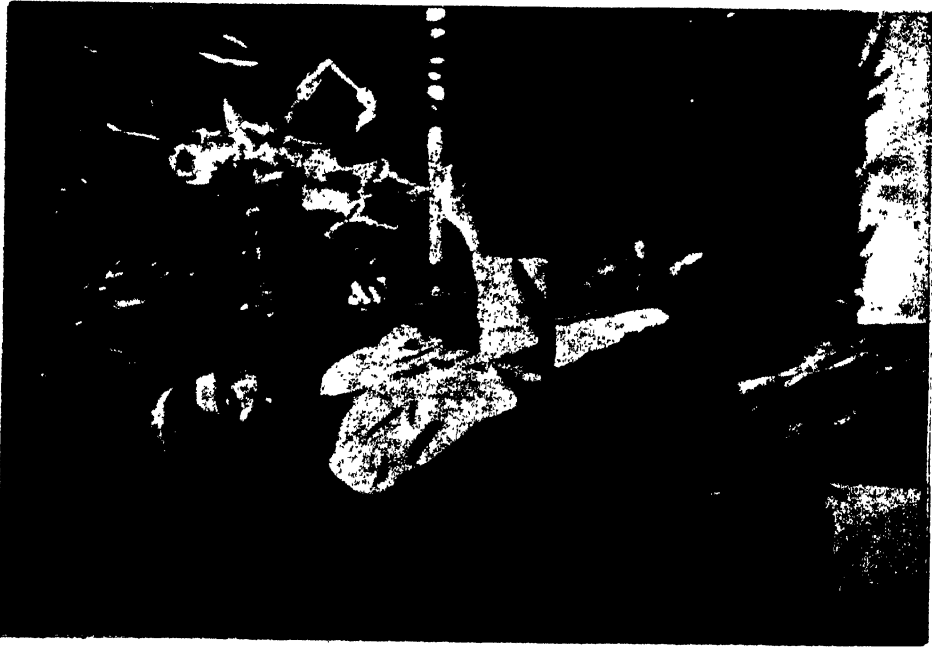
বালীদ্বীপের ভাস্কর-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি

অবস্থিত নহে। এই মন্দিরের স্থপতিশিল্প শুধু প্রশংসনীয় নহে, অপূর্ব্ব বলিয়া বৈদেশিক বিশেষজ্ঞগণ প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গারোয়েট যবদ্বীপের আর একটি নগর। এখানে আগ্নেয়গিরির বাহুল্যও যেমন আছে, ধান্যক্ষেত্রের সংখ্যাও তেমনই অসংখ্য। যবদ্বীপবাসিনী সুন্দরী তরুণীর প্রাচুর্য্যও এখানে অল্প নহে। যবদ্বীপের শস্যসম্পদ প্রচুর, এ জন্য এই দ্বীপকে "Granary of the East" বলিয়া থাকে। কিন্তু বর্ণনায় দেখা যায়, প্রতি বৎসরই যবদ্বীপকে অন্যত্র হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইয়া থাকে।

'বটিক' বস্ত্র যাহারা বিক্রয় করে, সেই সকল নারী গারোয়েট নগরে কেহ নূতন আসিলেই তাহার সন্ধানে বস্ত্রবিক্রয়ার্থ গমন করিয়া থাকে। এখানকার নারীরা সত্যই সুন্দরী এবং লীলায়িত-গতিভঙ্গীবিশিষ্টা। এই স্থলের বাঁশের বাঁশী প্রসিদ্ধ। ছোট ছোট বালকগণ পর্য্যন্ত বাঁশের বাঁশীতে চমৎকার সঙ্গীতালাপ করিতে পারে। বাঁশীগুলি নানা আকারবিশিষ্ট। বাঁশীতে সামান্য ফুৎকার দিয়াই তাহারা চমৎকার সঙ্গীতালাপ করিয়া থাকে। কোনও দর্শক উপস্থিত হইলেই ইহারা দলে দলে সমবেত হইয়া নবাগতকে বাঁশী শুনাইয়া অর্থ আদায় করিয়া থাকে। শ্রোতা খুসী হইয়াই তাহাদিগকে বকশিস প্রদান করিয়া থাকেন।

গারোয়েট ও ব্যান্‌ডোয়েংএর মধ্যবর্ত্তী স্থানে অনেক পুষ্করিণী দেখা যায়। তথায় পর্য্যাপ্ত মৎস্যও বিদ্যমান। টিপানাম্ নামক স্থানটি পরম রমণীয়। দীর্ঘদেহ তাল ও নারিকেলের সারি চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বংশনির্ম্মিত কুটীর। ধীবররা জাল লইয়া শান্ত, স্থির পুষ্করিণীবক্ষে মৎস্য ধরিতেছে।

পুষ্করিণীগুলিতে মৎস্যের চাষ হইয়া থাকে। বাজারে সেই মাছ ধরিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন কোন জলাশয়ে সমুদ্রের লোণা জল প্রবেশ করে। তবে অধিকাংশ পুষ্করিণীর জল মিষ্ট। এ জন্য এখানকার জলাশয়গুলিতে সকল শ্রেণীর মৎস্যই পাওয়া যায়। সোনামাছও (gold fish) এখানে প্রচুর পাওয়া যায়। ইহাদের দৈর্ঘ্য ১২ হইতে ১৮ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

'প্রিয়াঙ্গার রিজেন্সিজ' নামক অঞ্চলে চা ও সিঙ্কোনার চাষ হইয়া থাকে। আমেরিকা হইতে সিঙ্কোনার গাছ কোন সময়ে যবদ্বীপে আনীত হইয়াছিল। এখন ইহার চাষ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, পৃথিবীর জন্য যত কুইনাইন প্রয়োজন, তাহার দশ ভাগের নয় ভাগ এখান হইতেই সরবরাহ করা হইয়া থাকে। 'ব্যান্‌ডোয়েং'এ একটি বড় কারখানা আছে, তথায় একটি স্থান চারিদিকে প্রাচীর দিয়া বেষ্টিত। এই স্থানের মধ্যে ওলন্দাজরা ম্যালেরিয়া-রোগের প্রতিষেধক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকে। সেই প্রতিষেধক কি প্রণালীতে প্রস্তুত হইতেছে, তাহা যাহাতে বিশেষভাবে গুপ্ত থাকে, এ জন্য ওলন্দাজদিগের সতর্কতার সীমা নাই। অনেকগুলি ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক নাকি বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে। পাছে অপর কেহ ঔষধ প্রস্তুত-প্রণালী অবগত হইয়া সেই প্রকার প্রতিষেধক প্রস্তুত করে, এ জন্য কর্তৃপক্ষ এই প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হইলেও স্থানটিকে দুষ্প্রবেশ্য করিবার জন্য প্রাচীরের উপরেও কাঁটা তারের বেড়া এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, অবৈধ উপায়ে প্রাচীর লঙ্ঘনপূর্ব্বক ভিতরে প্রবেশ করিবার কোনও উপায় নাই। প্রতিষেধক ঔষধ প্রস্তুতপ্রণালী গোপন রাখিবার জন্য যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হইবে, হীরক প্রস্তুতের ক্ষেত্রও কেহ এত সতর্কতার সহিত প্রাচীরবেষ্টিত ও দুর্গম করিয়া রাখে না।

যবদ্বীপে অপর্য্যাপ্ত কুইনাইন প্রস্তুত হইতেছে, প্রতিষেধকেরও ব্যবস্থা চূড়ান্ত রহিয়াছে। তথাপি এই দ্বীপের ম্যালেরিয়া এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। বাটাভিয়ার মত ম্যালেরিয়া-বিষদুষ্ট স্থানকে উক্ত কালব্যাধির কবল হইতে মুক্ত করিবার বিশেষ কোনও প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, এমন সংবাদও পাওয়া যায় না। ইহাতে মনে হয় না কি যে, "প্রদীপের নিম্নেই অন্ধকার?" যে দেশে এত কুইনাইন ও প্রতিষেধকের ছড়াছড়ি, সেখানে ম্যালেরিয়ার ভীষণ আক্রমণ কেন?

ব্যানডোয়েং নগরটি অধুনা প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। এখানে রেলপথ, বিমানপোত এবং নানাবিধ সরকারী কার্য্যালয় আছে। শুধু কার্য্যালয় নহে, অনেকগুলি বিভাগের সদর আফিস—এই সহরেই প্র[illegible]। অল্পকাল পরে

ব্যান্‌ডোয়েং যবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ নগর বলিয়া পরিগণিত হইলে তাহাতে বিস্ময়ের কোন অবকাশই থাকিবে না।

বুইটেনজর্গ নগরটিও যবদ্বীপের মধ্যে প্রসিদ্ধ। এখানে একটি 'বোটানিকাল গার্ডেন' আছে। পৃথিবীর মধ্যে এই শ্রেণীর এত বৃহৎ উদ্যান আর কোথাও নাই বলিয়া মার্কিণ পরিব্রাজকগণ বলিয়া থাকেন। এই নগরেই প্রাচ্য দ্বীপসমূহের ওলন্দাজ শাসনকর্ত্তার প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। হল্যাণ্ডের রাণী উইলহেলমিনার প্রতিনিধি হিসাবে যিনি এতদঞ্চলে বাস করেন, তাঁহার অধীনে ৫ কোটি লোকের বাস। এই পাচ কোটি নর-নারীর সুখ-দুঃখের তিনিই নিয়ন্তা। এই ওলন্দাজ শাসকের প্রাসাদটি প্রসিদ্ধ বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্যে অবস্থিত। রাজপ্রাসাদ যেমন মনোরম, তেমনই বিস্তৃত। নানাবিধ ফল-ফুল-সুশোভিত উদ্যান, কুমুদ-কহ্লার-শোভিত তড়াগ শাসকের প্রাসাদের চারিপার্শ্বে স্বর্গ রচনা করিয়া রাখিয়াছে। এই বোটানিকাল গার্ডেনটি এত বৃহৎ যে, অন্ততঃ কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ভ্রমণ না করিলে, ইহার অন্তর্গত যাবতীয় দ্রব্য দর্শন করা যায় না। এখানে কয়েকটি সুদৃশ্য পুষ্পোদ্যান আছে।

রবারবৃক্ষ হইতে রস সংগ্রহ

যবদ্বীপে ধান্য 'মাড়াই' করিবার জন্য বিপুলকায় মহিষের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে। যবদ্বীপে রবারের চাষও হয়। রবার-বৃক্ষের অরণ্য এই দ্বীপে নিতান্ত সামান্য নহে।

বাটাভিয়ার বন্দরের নাম ট্র্যাণ্ডযোয়েং প্রিয়াক—ইহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। বাটাভিয়া হইতে এই বন্দর ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। নগরের সহিত বন্দর, খাল রেললাইন দ্বারা সংযুক্ত। এই বন্দরে বহু মাল রপ্তানী হইয়া থাকে। সম্প্রতি এক বৎসর এই বন্দর হইতে ১২ কোটি ১৫ লক্ষ মণ বিক্রেয় পণ্য জাহাজে রপ্তানী হইয়াছিল।

যবদ্বীপ যে দর্শনীয় স্থান, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ জন্য মার্কিণ পরিব্রাজকগণ প্রায়ই এই দ্বীপ সন্দর্শনে গমন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে, এ দেশের প্রাচীন ধ্বংসস্তূপে হিন্দু উপনিবেশের প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। এই দ্বীপ হল্যাণ্ডের অধীন হইলেও বিদেশীয় শিক্ষা ও সভ্যতা এখনও দ্বীপবাসীর প্রাচীন শিক্ষা ও সভ্যতার উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। দেশীয় পরিচ্ছদ, দেশীয় আচার-ব্যবহার এখনও প্রতীচ্য সভ্যতার আবহাওয়ায় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে নাই। দ্বীপের নর-নারীর মন এখনও প্রাচ্য-প্রভাব ও সংস্কারমুক্ত হইতে পারে নাই।

বায়স্কোপ, সিনেমার প্রচলন বড় বড় সহরে হইলেও দেশের জনসাধারণ এখনও তাহাদের প্রাচীন নৃত্য, গীত প্রভৃতির সমধিক অনুরাগী। হিন্দুদিগের উপনিবেশ স্থাপনেরও পূর্ব্বে এই দ্বীপে "ওয়েয়াং" বা ভঙ্গী অভিনয় প্রচলিত ছিল। সেই অভিনয় এখনও দ্বীপবাসীর চিত্তকে সমধিক আকৃষ্ট করিয়া থাকে। বিদেশীর পক্ষে এই অভিনয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণ করা কিছু কঠিন। দেশীয় উপকথা বা গল্পসমূহের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত না হইলে এই ভঙ্গী অভিনয়ের মাধুর্য্যরস সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করা সম্ভবপর নহে।

এই ভঙ্গী অভিনয় দুই শ্রেণীর। একটির নাম "ওয়েয়াং পুরওয়া।" ইহা পুত্তলিকা-নাচের অনুরূপ। এই পুতুল-নাচটিই অতি প্রাচীনকাল হইতে এই দ্বীপে বিদ্যমান আছে। আর একটির নাম "ওয়েয়াং ওরাং।" এই প্রণালী অপেক্ষাকৃত আধুনিক। শেষোক্ত প্রণালীর

ওলন্দাজ শাসকের প্রাসাদ

ডোক্‌জ্জার সুলতানের সলিল-সৌধ

পুতুল-নাচ

যাত্রার দল যেমন নগর ও গ্রামে গিয়া যাত্রা করিয়া থাকে, যবদ্বীপের "ওয়েয়াং ওরাং" অনেকটা সেই প্রকার। ইহারা কোনও প্রাচীন উপকথা বা কাহিনী অবলম্বন করিয়াই ভঙ্গীসহকারে অভিনয় করিয়া থাকে। এমনও দেখা যায় যে, কোন একটা অভিনয় এক রাত্রিতে শেষ হয় না, তিন চারি রাত্রি ধরিয়া অভিনীত হইয়া থাকে। অভিনয়কালে এক জন লোক অভিনয়ের বিষয়টা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া থাকে।

বৈদেশিক পর্য্যটকগণ দ্বীপবাসীর এই অভিনয়নৈপুণ্য দর্শন করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। তাঁহাদের প্রদত্ত বিবরণ হইতে আর একটি বিষয় অবগত হওয়া যায় যে, 'সারং' পরিহিতা দ্বীপের তরুণীরা শুধু সুবাসিনী নহে, সুভাষিণী ও 'সুমধুরহাসিনী।' বিবিধ বর্ণরাগরঞ্জিত পরিচ্ছদে দেহাবৃত করিয়া অপরাহ্লের
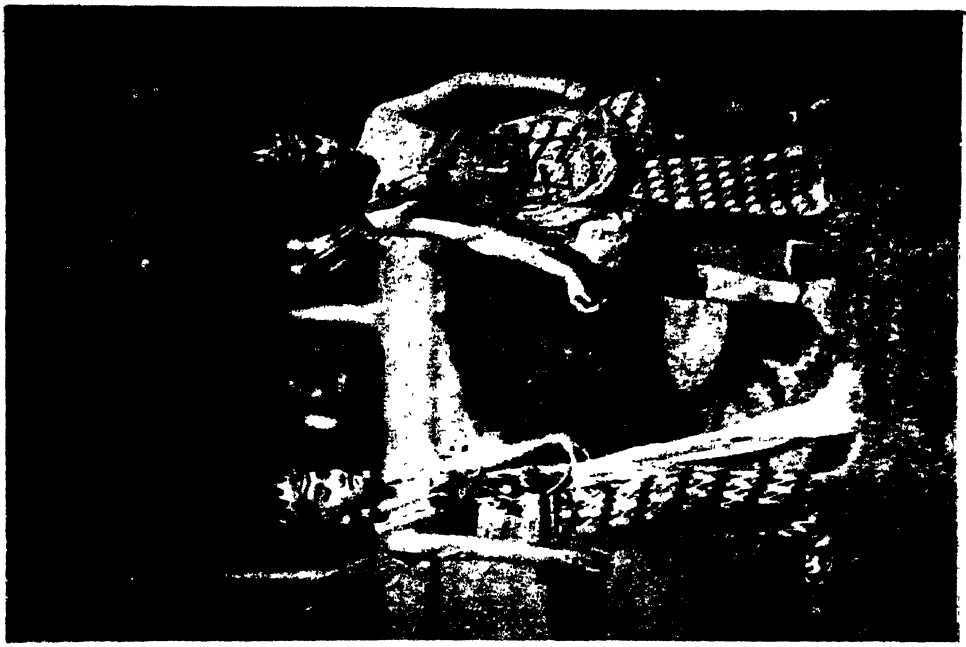
ভঙ্গী অভিনয় মানুষের অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা অভিনীত হইয়া থাকে। পুতুল-নাচের ন্যায় মনুষ্যনৃত্য তেমন জনপ্রিয় না হইলেও, অনেকেই এই অভিনয়কে উৎসাহিত করিয়া থাকে। অভিনেতারা দলবদ্ধ হইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিয়া থাকে। আমাদের বাঙ্গালা দেশে

মৃদু আলোকে, ধান্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যখন তাহার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকে, তখন তাহাদিগকে কলনাদিনী তরঙ্গিণীর ন্যায় উচ্ছলিতদেহা বলিয়াই মনে হইয়া থাকে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

ঊনবিংশ সাহিত্য-সম্মেলন

এবার ভবানীপুর গোখেল মেমোরিয়াল বালিকাবিদ্যালয়ের নবনির্ম্মিত ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের ঊনবিংশ অধিবেশন হইয়াছিল। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভানেতৃত্ব করিবেন বলিয়া কথা ছিল; কিন্তু কার্য্যকালে তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কোন্ অনিবার্য্য কারণে দেবী ভারতীর বাৎসরিক পূজায়, মাতৃভাষার একনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পূজারী উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাহার সংবাদ এ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সুতরাং মাতৃভাষাসেবী দর্শকদল তাঁহার অনুপস্থিতিতে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। তবে কবিবর তাঁহার অভিভাষণ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাহা অধিবেশনস্থলে পরে পঠিত হইয়াছিল। কলিকাতা নগরীর অঙ্কে এবার ভাষাজননীর পূজার বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু বহু সাহিত্যিকই পূজাপ্রাঙ্গণে সমবেত হইতে পারেন নাই, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উদ্যোক্তৃগণের এ বিষয়ে ক্রটি ছিল কি না, অথবা আগ্রহাতিশয়ের অভাব ছিল কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু এ কথা সত্য, এবারের পূজায় প্রয়োজনানুরূপ অনুরাগ ও উৎসাহের অভাব সর্ব্বত্র পরিস্ফুট হইয়াছিল বলিয়া অনেক সাহিত্যসেবীকেই অভিযোগ করিতে শুনা গিয়াছে। উদ্যান-সম্মেলনে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের উক্ত—"এখানে সব ছোট বড় সাহিত্যিক জড়" হইয়া একাসনপ্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ করিতে পান নাই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। কীর্ত্তন-সভায় ৪।৫ জনের অধিক শ্রোতা শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাও সঙ্গত মনে করেন নাই।

পথের স্মৃতি

উপন্যাস

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বিনুদার বিবাহের কথা বলিয়া আমার এই 'পথের স্মৃতি'র শেষ পঙ্‌ক্তি টানিয়া দিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা হয় নাই। হয় নাই যখন, তখন ইহার সূত্র আরও কিছু দূর টানিয়া লইয়া যাইতেই হইবে। টানিয়া লইয়া যাইবার অবশ্য আপত্তি কিছু নাই, তবে একটা কথা ভাবিতেছি। ভাবিতেছি যে, লিখিতে বসিয়া এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত কথা বহু দিনের পর প্রথম-জোয়ারের জলের মত একসঙ্গে হুহু করিয়া মনের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার এক আনা রকম অংশও ত এ পর্য্যন্ত আমার লেখা হইল না, অথচ ইহারই মধ্যে রাশি রাশি কাগজ ত মসীলিপ্ত করিয়া ফেলিলাম। এই হিসাবে বলা চলিলে, কবে যে আমার সব-বলার শেষ হইবে, তাহা ভাবিলে হতাশই হইতে হয়। বিশেষতঃ, বিনুদার বিবাহের পর, বছর পাঁচেকের মধ্যে এত সব বকমারি ঘটনা আমার জীবনের উপর দিয়া ঘটিয়া গিয়াছে যে, কেবল ঐ পাঁচ বৎসরের ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করিতে গেলেই এইরূপ আর একখানি পুস্তকের সৃষ্টি হইয়া পড়ে। সুতরাং স্মৃতির দুয়ার বন্ধ করিয়া রাখা যাউক, কাহিনী আমার পথেতেই পড়িয়া থাকুক, শুধু হাতের সূত্রটুকে আর একটু টানিয়া বাড়াইয়া, যেটুকু না বলিলে নহে, কেবল সেইটুকুমাত্র বলিয়া এ কাহিনীর শেষ করিয়া দিই।

সম্মুখে 'পথের স্মৃতি'র পাণ্ডুলিপিখানি খুলিয়া, কলম লইয়া ইহার নূতন পরিচ্ছেদ লিখিবার চেষ্টায় ওইরূপ কি যে ভাবিতেছিলাম, তাহার আর অন্ত নাই। সন্ধ্যার ও অনেক বিলম্ব ছিল। সে দিন সমস্ত দিনই 'গুমোট' য়া রাখিয়াছিল, অথচ বৃষ্টিরও কামাই ছিল না। মধ্যাহ্নে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া বর্ষণ ক্ষান্ত হইয়া গিয়াছিল এবং মাঝে রৌদ্রও উঠিতেছিল বটে, কিন্তু আকাশে মেঘের ও কম ছিল না। মধ্যে মধ্যে সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিয়া খণ্ডগুলি আকাশের এক দিক্ হইতে আর এক দিকে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। আমার লেক রোডের বাটীর নির্জ্জন গৃহমধ্যে পুঁথিপত্র সম্মুখে লইয়া বসিয়া, মুক্ত জানালার ফাঁকে মেঘ ও রৌদ্রের এই খেলা দেখিতে দেখিতে লেখার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। হঠাৎ চোখের সম্মুখ হইতে দিনের আলো যেন একবারেই পড়িয়া গেল, দেখিতে দেখিতে সেই চলন্ত মেঘের রাশি সারা আকাশে ছড়াইয়া পড়িল, চারিদিক্ অন্ধকারে একবারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, গুরু-গুরু মেঘের গর্জ্জনে আকাশ, প্রান্তর, দিগ্-দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। একটা মহাপ্লাবনের পূর্ব্ব-সূচনা বুঝিয়া প্রকৃতি যেন আড়ষ্ট হইয়া পড়িল। আমি তন্ময় হইয়া বাহিরের দিকে দেখিতে লাগিলাম। আজিকার এই দৃশ্য দেখিয়া বহু কাল পূর্ব্বের একটি দিনের কথা আমার মনে উদয় হইল। সে-ও শ্রাবণের এমনই এক মেঘাবৃত দিন। আমার প্রসাদপুরের পল্লীবাস-গৃহের জানালার ধারে তখন আমি বসিয়া ছিলাম। অদূরবর্ত্তী শিলাই নদীর তীরে তীরে, তাহার দুই পারের দিগন্তব্যাপী শ্যামল প্রান্তরের মাথায় মাথায় সে দিনও এই রকম মেঘের ঘটা ঘটিয়াছিল। এই রকমই, দেখিতে দেখিতে, সারা পৃথিবী সে দিনও অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছিল, বহু দূরে প্রান্তর-সীমায় গ্রামের রেখাগুলি অন্ধকারে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিতেছিল, আর সেই অন্ধকারের মধ্যে আকাশ হইতে দেবরাজ ইন্দ্র যেন অনবরত তাঁহার রোষোদ্দীপ্ত নয়নের বিদ্যুদ্-দৃষ্টিতে চক্ষু ঝল্‌সাইয়া দিয়া বজ্রনির্ঘোষে মুহুর্মুহুঃ ধরিত্রীকে শাসাইয়া ভয় দেখাইতেছিল। সে দিনও এই রকম জানালার ধারে বসিয়া দেখিতে দেখিতে প্রকৃতির এই দৃশ্যের ভিতর নিজেকে এমনই ভাবেই ডুবাইয়া ফেলিয়াছিলাম। আজি দেওয়ালের গায় সন্ধ্যার ঐ ফ্রেমে-আঁটা বড় ছবিখানির চক্ষু দুইটিই অনিমিখে আমার দিকে চাহিয়া আছে, সে দিন সে অবস্থায় স্বয়ং সন্ধ্যাই আমার সেই ধ্যানদৃষ্টি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। সে দিন সন্ধ্যা আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—

"কি ভয়ানক দুর্য্যোগ। যেন পৃথিবী রসাতলে যাবার আয়োজন হচ্ছে!"

আমি বাহিরের সেই দুরন্ত দুর্য্যোগের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই কহিলাম,—"কি সুন্দর, সন্ধ্যা, কি সুন্দর! জীবন আমার সার্থক! ঠাকুর আমার এমনি করেই মাঝে মাঝে দেখা দেন! আজ কোন কায নয়, সন্ধ্যা। সব কায ফেলে রেখে আজ এইখানে আমার কাছে এসে ব'সে প্রাণ ভ'রে ভগবান্‌কে অনুভব ক'রে নাও।"

সন্ধ্যা কহিল,—"তোমার সবই অনাছিষ্টি। এই দুর্য্যোগের ভেতর তুমি ভগবান্ দেখছো?"

"সত্যি সন্ধ্যা, এই রকম সময়েই আমি তাঁর বিরাট মূর্ত্তি আকাশের গায় দেখতে পাই।"

"তা তোমার ভগবান্‌কে দেখিয়ে দেয় এই! যে রকম আকাশ ভেঙ্গে জল নামছে, সব একেবারে ভাসিয়ে দেবে। দেখছ না কি ব্যাপার?"

"তাই ত দেখছি।"

"কিন্তু ব'সে ব'সে শুধু বৃষ্টি দেখলেই ত আর হবে না, কাশী গিয়ে একবার 'বড়কী'কে দেখে আসতে ত হবে। আবার আজ তার চিঠি পেলুম।" এখানে বলিয়া রাখি যে, প্রথম প্রথম, সম্পর্ক হিসাবে সীতাকে সন্ধ্যা দিদি বলিয়াই ডাকিতে গিয়াছিল, ফলে সীতার নিকট হইতে সন্ধ্যা কয়েকটি অন্তরটিপ্পনী খাইয়া নিবৃত্ত হইয়াছিল। এ দিকে সন্ধ্যাও সীতাকে পূর্ব্বের ন্যায় দিদি বলিয়া ডাকিবার অধিকার কিছুতেই আর দেয় নাই। শেষে উভয়ে একটা আপোষ মীমাংসা করিয়া লইয়া, সন্ধ্যা সীতাকে 'বড়কী' এবং সীতা সন্ধ্যাকে 'ছোটকী' বলিয়া ডাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল।

সন্ধ্যা কহিল—"একবার যাও! 'বড়কীর' শরীর যদি খুব খারাপ দেখ, তা হ'লে, দিনকতক এইখেনেই না হয় সে এসে থাকুক। বুকের রোগ হোক, যা হোক, পেসাদপুরের জল-হাওয়া ভাল, নতুন যায়গা, সেরে যাবে এখন।"

"তা ত যাবে এখন, কিন্তু বিনুদার কথা জান ত? সে কাশী ছেড়ে কোথাও আর আসবে না।"

"বড়্‌ঠাকুর না হয় না-ই আসবেন, সেইখানেই থাকবেন।"

"বৌদিকে ছেড়ে? সে সেই আগেকার বিনুদা হ'লে সম্ভব হ'ত বটে।"

"বাস্তবিক, বড়্‌ঠাকুরের এ হ'ল কি? যে লোক এক দণ্ড ঘরের মধ্যে থাকতো না, সে লোক যে সব কাজ কর্ম্ম ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে এই রকম চব্বিশ ঘণ্টা ঘরের কোণে বড়কীকে চোখের সামনে রেখে ব'সে থাকবে, বাস্তবিক এ স্বপ্নেরও অগোচর। আহা, বড়কীর কত সাধ আমাদের কাছে একসঙ্গে সব থাকে। কত দুঃখ করেই যে সে চিঠি লেখে। তার এক একখানা চিঠি পড়লে আমার চোখ ভ'রে কান্না আসে।"

তখন মুষলধারায় বৃষ্টি নামিয়া পড়িয়াছিল। মাতাল বাতাস বৃষ্টির সঙ্গে মিতালী করিয়া তখন 'শিলাই'য়ের পর পারস্থিত আউসধানের শীষগুলিকে লইয়া একবারে নাস্ত-নাবুদ করিয়া দিতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া সন্ধ্যা কহিল—"তা' হ'লে, কবে যাবে বল দেখি?"

"আজকের এ বাদল যদি কা'ল থামে, ত কা'লই যাব, সন্ধ্যা। পদ্মাটাকেও একবার দেখবার জন্যে আমার মনটা অস্থির হয়েছে।"

আকাশে যত জল জমা ছিল, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেবতা সব জল ঢালিয়া দিয়া ক্ষান্ত হইলেন। পরদিন প্রসাদপুরের মাঠ-ঘাট পথ প্রভাত-রৌদ্রে ভরিয়া উঠিল। দ্বিপ্রহরে আহারাদি করিয়া আমিও কাশী আসিবার অভিপ্রায়ে আমার পল্লীগ্রামের সেই ছোট ষ্টেশনটিতে আসিয়া গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

প্রারম্ভেই বলিয়াছি যে, উপন্যাসের নাম দিয়া ইহা লিখিলেও, ঘটনার শৃঙ্খলা বা গল্পের ধারাবাহিকতা কিছুই ইহাতে নাই। সুতরাং বিনুদার বিবাহের পর হইতে এই কয় বৎসরের কথা যখন কিছুই বলা হইল না, তখন বাঙ্গালাদেশের একান্তে এই ক্ষুদ্র প্রসাদপুরে আমাদের থাকিবার ইতিহাস সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু না-ই বা বলিলাম। শুধু এই কথা বলিলেই বোধ হয় হইবে যে, ইদানীং বৎসরের মধ্যে ৪ পাঁচ মাস কাল আমি শিলাইতীরের এই গ্রামখানিতে আসিয়া কাটাইয়া যাই। এই সঙ্গে আরও দুই একটি কথা যাহা আমার বলা আবশ্যক, এই অবসরে তাহাও বলিয়া রাখি।

বিনুদার বিবাহের পর-বৎসরেই জ্যেঠামহাশয়ের গঙ্গা-প্রাপ্তি হয়। পরবৎসর বৌদিও মাতৃহারা হয় এবং সেই

বৎসরই মামাবাবু বেশী মাহিনাতে জব্বলপুর কালেজে চাকুরী পাইয়া কাশী ত্যাগ করিয়া যান।

কাশীর সেই বাড়ীখানি জ্যেঠামহাশয় কিনিয়াই গিয়াছিলেন। সেই বাড়ীতেই বিনুদা বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে। এ কয় বৎসরের মধ্যে কাশী ছাড়িয়া একবারও বিনুদা কালীঘাট আইসে নাই বা কখনও যে আসিবে, তেমন লক্ষণও কিছু দেখি না। এ কয় বৎসরের ভিতর আমি বহুবারই কাশী গিয়াছি; কেন না, পদ্মাকে বেশী দিন না দেখিয়া আমি থাকিতে পারি না। এখন সে তবু একটু বড় হইয়াছে, কিন্তু যখন বড় হয় নাই, তখন সে-ও একটি দিন আমায় না পাইলে বাড়ীশুদ্ধ সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। আজ যে 'ধারা শ্রাবণের' ভরা বর্ষা মাথায় করিয়া সুদূর বাঙ্গালাদেশের একটি গ্রাম হইতে ব্যস্ত হইয়া সেখানে ছুটিতেছি, এ বিনুদা ও বৌদির জন্য যতটা না হউক, তাহার জন্য বটে। তাই খানিক পরে শব্দ করিয়া গাড়ী যখন ষ্টেশনে আসিয়া প্রবেশ করিল, তখন তাহার কথাই ভাবিতে ভাবিতে গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিলাম।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

"ঠাকুরপো, এখন কেমন আছ, ভাই?"

"ভাল আছি বৌদি। তোমার পূজো হয়ে গেল?"

কাশী আসিবার কিছু দিন পরেই জ্বরে পড়িয়াছিলাম। কয় দিনের পর আজ সকালে জ্বরটা বোধ হয় ছাড়িয়া গিয়াছিল। বিনুদার গঙ্গার ধারের ঘরখানিতে জানালার কাছে ইজি-চেয়ারখানি টানিয়া লইয়া একান্তমনে ভাদ্রের ভরাগঙ্গার দিকে চাহিয়াছিলাম। সেই দিকেই চাহিয়া থাকিয়া বৌদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আজ এরি মধ্যে তোমার পূজো হয়ে গেল, বৌদি?"

লালপাড়ের মটকার সাড়ী পড়িয়া একটু দূরে মেজের উপর বসিয়া পড়িয়া বৌদি কহিল—"হ্যাঁ ভাই; আগেকার মত বেশীক্ষণ আর পূজোয় মন দিতে পারি না।"

"অসুখ শরীরে না দেওয়াই ভাল, বৌদি।"

"না ভাই, অমন কথা বোলো না। এই অসুখ শরীরে তাঁকে ডাকতে ডাকতেই যেন এক দিন আমার ডাকার শেষ হয়ে যায়, কিন্তু তা'ও ত হয় না।"

"কেন বৌদি, এমন কথা বল? তোমার মত সকল রকম গুণ নিয়ে এর আগে কোন বউ বোধ হয় আমাদের সংসারে আসে নি। এমন কথা তুমি আর মুখে এনো না, তুমি যে আমাদের ঘরের লক্ষ্মী।"

"তাই হবার ত আশা করেছিলুম, ঠাকুরপো; কিন্তু তা হ'তে পারলুম কৈ! যা চেয়েছিলুম, তা ত পেলুম না, সেই দুঃখই ত আমার দুঃখ। আমি চেয়েছিলুম, সকলের সঙ্গে একসঙ্গে থেকে, ঘরের বৌ হয়ে, সর্ব্বরকম সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে থাকবো, কিন্তু তা ত আর হ'ল না! আজ আমার আপন শাশুড়ী না থাকলেও আর এক শাশুড়ী ত আমার বর্ত্তমান। আজ তিনিই বা কোথায়, আর আমিই বা কোথায়? আজ কোথায়ই বা আমার মা', কোথায়ই বা দেওর আর কোথায়ই বা ঘরের ছেলেমেয়েরা? আজ সকলের কাছ থেকে যে এইভাবে আমায় নির্ব্বাসিত হয়ে থাকতে হবে, এ আমি কিছুতেই আশা করিনি, ঠাকুরপো!"

"এমন ত অনেকেই থাকে, বৌদি।"

"যারা থাকে, তারা থাকে, তারাই জন্ম জন্ম থাকুক, কিন্তু এ আমি কিছুতেই চাই নি। বিয়ের পর থেকে কত সাধই করেছিলুম, এই ক'বছরে তার কোন সাধই ত আমার পূর্ণ হ'ল না। অসুখ ত আমার তাই, ঠাকুরপো। এ কি আমার দেহের অসুখ যে, পেসাদপুর নিয়ে গিয়ে, ছোটকী আমার রোগ সারাবে। এ রোগ আর আমার সারবে না, ভাই! ক'দিন ধ'রে সবই ত তোমায় বলিছি।"

"আচ্ছা, বিনুদা' কুস্তি-টুস্তি সবই একেবারে ছেড়ে দিলে? মিশনেও ত আর যান না?"

বৌদি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আমি কহিলাম—"অত কুস্তির ঝোঁক, জপতপ পূজো-আচ্ছার অত নেশা, পড়ার অত বাই, এ সবই যে বিনুদা ছেড়েছুড়ে দিয়ে একেবারে এমন হয়ে যাবে, এ ত স্বপ্নেও কখনও—"

"বল ভাই—বল বল—এ কখনও ভেবেছিলে কি? ভেবেছিলে কি, দেশ ছেড়ে, বাড়ী ছেড়ে, আপনার জন ছেড়ে, জগতের কাযকর্ম্ম সব ঠেলে রেখে, শুধু আমাকে নিয়ে এই-খানে এইরকম ক'রে থাকবে? আমার অমন স্বামী যে এমন হয়ে গেল, এ আমারই পূর্ব্বজন্মের পাপ, ঠাকুরপো। নইলে, স্বামী আমি যা পেয়েছিলুম, খুব কম স্ত্রীলোকের ভাগ্যেই

তা মেলে। অমন রূপ, অমন স্বাস্থ্য, অমন উদার হৃদয়, প্রশস্ত মন, অমন শিক্ষা, অমন শক্তি, আর সব চেয়ে অমন ঈশ্বরে ভক্তি, এত গুণ একাধারে খুব কম স্বামীতেই থাকে। তাই বিয়ের সময় দেবতা বলেই তাঁকে বরণ করেছিলুম। তখন জানি নি যে, অভাগী আমার ভাগ্যদোষেই সেই দেবতা আমার পুতুল হয়ে এমনিধারা ধূলোমাখা হয়ে যাবে। স্বামীকে আমি স্বামীর মতনই চেয়েছিলুম; আমি চাই নি যে, পৃথিবীর সব কায ছেড়ে দিয়ে, দীন ভিখিরীর মত চব্বিশ ঘণ্টা কেবল আমারই মুখের দিকে তিনি এই রকম চেয়ে ব'সে থাকবেন! অতুল সম্পদের অধিকারী হয়ে তিনি যদি এমনি ক'রে সে সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে, ভিক্ষের ঝুলি হাতে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন, তা হ'লে আমাকে ভিক্ষে দিয়ে আমার দীনতা ঘোচাবে কে বল? কার ওপর আমি তা হ'লে নির্ভর করবো? এমন ক'রে তিনিই যদি নীচে নেমে পড়েন, তা হ'লে আমার হাত ধ'রে কে ওপরে তুলে নেবে, ঠাকুরপো?"

নীরবে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া গঙ্গা দেখিতে লাগিলাম। একটু থামিয়া বৌদি আবার বলিতে লাগিল—"বড় কষ্ট, ঠাকুরপো, বড় কষ্ট! দেবতার মত স্বামী পেয়েও, সব আমার লোকসান হয়ে গেল। এই দুঃখেই আমার এই অসুখ, ঠাকুরপো। এ অসুখ কি আমার চিকিৎসায় সারবে, না অন্য কোথাও গেলে সারবে? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন না-ই আর সারে। আজ আমার জন্যে তাঁর যে শক্তি, যে জ্ঞান, যে মহত্ত্ব হীন হয়ে পড়েছে, যে উঁচু প্রাণ তাঁর আমার জন্যে এমন ভাবে বাঁধা পড়েছে, আমার অবর্ত্তমানে তা যদি আবার উঠতে পারে, আবার মুক্তি পায়! জীবন থাকতে যা হ'ল না, জীবন দিয়েও যদি তা হয়, তা হ'লে মরণই আমার সার্থক।"

হঠাৎ গঙ্গার জলের উপর ছায়া পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতে সুরু করিল। বৌদি নীরবে দেওয়ালের দিকে নির্নিমেষে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল—"ঐ আমার অয়েল পেণ্টিংয়ের চেহারাখানা যেখানে ঝুলছে, ঐখানে জগদ্ধাত্রীর বড় ছবিখানা টাঙানো ছিল, সেখানাকে খুলে তার যায়গায় আমার ঐ ছবি—ছিঃ ছিঃ—যখনি আমার ঐ দিকে নজর পড়ে, তখনি লজ্জায় আমার ম'রে যেতে ইচ্ছা করে। আর তা ছাড়া, দেয়ালের চারিদিকে আমারই রকম রকম এই সব ফটো দিয়ে সাজানো, এর কি দরকার! তোমাকে কি বলবো, ঠাকুর-পো! কি উনি ছিলেন, আর কি হয়েছেন, সে ত তুমি পাঁচ ছ' বছর ধ'রে সবই দেখে আসছ! এ সবের ওপর আর একটি জিনিষ যা নতুন সুরু করেছেন, তাই দেখেই ত আমি ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছি। সে কথা ত তুমি জান না, ঠাকুরপো।"

"কি বৌদি?"

"সে কথা তোমার কাছে আমার বলতেও লজ্জা হয়, ঠাকুরপো।"

"কি বল দেখি? স্বভাব-চরিত্রে কোন—"

"সে সব কিছু নয়" বলিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য নীরব থাকিয়া বৌদি কহিল,—"গোপন রেখেই বা কি করব। মাস তিন থেকে একটু একটু মদ খেতে আরম্ভ করেছেন।"

চাহিয়া দেখিলাম, বৌদির সমস্ত মুখের উপর যেন একটা অসন্তোষ ও বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িল। তাহার সেই বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষুর দীপ্তি ম্লান হইয়া উভয় চক্ষুই জলে ভিজিয়া উঠিল। কথাটি শুনিয়া ভিতরে চমকাইয়া উঠিলাম বটে, কিন্তু বাহিরে সে ভাব গোপন করিয়া কহিলাম—"ও জিনিষটা নিয়মমত একটু একটু খাওয়া যে খুব দোষের—তা নয়, ওতে শরীরটা খুব ভাল থাকে। অনেক লোকেই ও আজকাল—"

কথাটা সব বৌদি আমাকে বলিতেও দিল না, অত্যন্ত বিরক্তির স্বরে কহিল,—"ও কথা আর বোলো না, ঠাকুরপো। ঐ অজুহাত তোমার দাদাও দেন। কিন্তু ঐ একটু একটু হ'তে হতেই যে সর্ব্বনাশ হয়ে যায় কি না! আমি অনেক দেখেছি, ঠাকুরপো। আমারই ছোট মামা ছিলেন, তিনিও প্রথমে ঐ রকম ব'লে, ঐ একটু একটু খেতে সুরু করেছিলেন। তার পর তাইতেই লিবার পাকিয়ে রক্ত বমি ক'রে মারা গেলেন। আমার ভবানীপুরের মেসো মশাইও প্রথমে ঐ একটু একটু ধরেছিলেন। তার এখন রোজ তাঁর একটি ক'রে বোতল না হ'লে আর চলে না। আমি বলি, দরকার কি, ঠাকুরপো? শরীর ভাল শরীর, ও না খেলেও বেশ ভাল থাকে। ও যে কি সর্ব্বনেশে জিনিষ, তা আমি জানি, ঠাকুরপো। তাই ত ভাবনায় আমি সারা হয়ে যাচ্ছি।"

"বিনুদাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ছাড়িয়ে দেওয়ালেই হবে; আমি ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলবো এখন।"

"কি হবে তাতে? বল্‌তে বোঝাতে আমি কি কসুর করিছি? জান ত, কি ধরণের মানুষ! যেটা ধরবে, তা ছাড়ায়, এমন লোক জগতে আছে? বলতে গেলে কোন কথা কাণে নেন্? বলেন—শ্রীকৃষ্ণ খেত, বলরাম খেত, ভীম খেত, অর্জ্জুন খেত, দেবতারা খেত, মুনি-ঋষিরা সকলেই খেত। দেখ দেখি, এই সব কি কথা! এক এক সময় ঠাকুরপো, সত্যি কথা বলতে কি, আমার আত্মহত্যা ক'রে মরতে ইচ্ছা করে," বলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে বৌদি মেজের দিকে চাহিয়া রহিল। অপ্রীতিকর এই কথাটাকে অন্যদিকে ফিরাইয়া দিবার উদ্দেশে কহিলাম—"আচ্ছা বৌদি, আপনার মা কত টাকা দিয়ে গেছেন?"

"বাবা ত বেশী কিছু রেখে যেতে পারেন নি। বড্ডই খরচে ছিলেন তিনি। যা বিশ-বাইশ হাজার রেখে গেছ-লেন, সবই মা ওঁর হাতে দিয়ে গিয়েছেন; তা সে-টাকার বোধ হয় আর কিছুই নেই। সে-সব বোধ হয় নিশ্চিন্দি করেই ব'সে আছেন। তা করুন, তাতে দুঃখু নেই। যদি শান্তির সঙ্গে গাছতলাতেও ভিখিরী হয়ে থাকতে হয়, তাতেও সুখ।—ও মা, আমি ত বেশ! তোমায় কিছু খেতে না দিয়ে ব'সে ব'সে বেশ ত কথা কইচি। ঠাকুরপো, কি খাবে বল দেখি? বেলা হ'ল, কিছু তোমায় এনে দি, ভাই।"

"এখন আর কিছু খাব না বৌদি, শুধু আদা দিয়ে একটু চা যদি——"

মূর্ত্তিমতী বিষাদ-প্রতিমার মত ধীরপদে বৌদি চলিয়া গেল। আমি বিনুদার কথাই ভাবিতে ভাবিতে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিলাম। টেবলের উপর বিনুদার একখান চক্‌চকে ডায়েরীখানি ছিল। সেইখানি তুলিয়া লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে, তাহারই পাতার পর পাতা উল্টাইতে লাগিলাম। হঠাৎ মনে হইল, বিনুদার ডায়েরী, তা ত আমার পড়া উচিত নহে। তবুও 'উচিত'কে ঠেলিয়া দিয়া একটা পাতা তার না পড়িয়াও বন্ধ করিতে পারিলাম না। যেখানটা পড়িলাম, সেখানে এইরূপ লেখা ছিল:—

"বুধবার ২২শে।—

সীতার শরীরের অবস্থা দেখে দিন দিনই আমার বড় ভয় হচ্ছে। ভগবান্ কি শেষে *এই স্বর্গীয় পারিজাত* আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন? জানি না, আমার অদৃষ্টে বিধাতার কি বিধান আছে। সীতাকে স্ত্রীরূপে পেয়ে যে সুখ যে শান্তি পেয়েছিলুম, তা কার ভাগ্যে ঘটে? দুঃখের কালছায়া এসে পড়ে কেন,—এখন শান্তিতেও দুর্ভাবনার বিষ মিশে আমার প্রাণের গভীর আনন্দ এমন করে নষ্ট করে কেন? ছিলাম দরিদ্র ভিখারী, রত্নের মর্ম্ম বুঝিতাম না, ভগবান্ ভিখারীর হাতে জগতের শ্রেষ্ঠ রত্ন তুলে দিলেন, কিন্তু দিয়ে কি তিনি আবার তা কেড়ে নেবেন? তিনি কি এতই নিঠুর হবেন? তাই যদি হয়, তবে দিয়েছিলেন কেন? দেবার জন্যে ত তাঁকে মাথার দিব্য দিই নাই। দীন-দরিদ্রের হাতে রত্ন যেমন তিনি তুলে দিয়েছিলেন, তেমনি করেই তাকে আমি রেখেছি, এক দণ্ড তাকে চোখের আড়াল ক'রে থাকতে পারি না। মুহূর্ত্তের জন্য সীতাকে না দেখতে পেলে প্রাণ আমার অস্থির হয়ে পড়ে, জগৎ আমি শূন্য দেখি। মুহূর্ত্তের বিচ্ছেদ যার সহ্য করতে পারি না, তা'র চিরবিচ্ছেদ যদি ঘটে, কেমন ক'রে তা সহ্য করব? সত্যি তুমি যদি দয়াময় হও, তা হ'লে সীতার জীবন আমায় ভিক্ষা দাও। এ ছাড়া আর আমি কিছু চাই না; ধন-দৌলত, স্বাস্থ্য, কীর্ত্তি, প্রতিপত্তি, জ্ঞান, পুণ্য, কিছু আমি চাই না।—আমি চাই সীতা—আমার প্রাণের সীতা—আমার জীবনে-মরণে চিরসঙ্গিনী সীতা! আমার——"

সিঁড়িতে বিনুদার গলার আওয়াজ পাইয়া, তাড়াতাড়ি ডায়েরীখানি বন্ধ করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম। বিনুদা ঘরে ঢুকিয়া কহিল,—"এ সব এখন আমার যেমন আর মোটেই ভাল লাগে না, ওরাও তেমনি নাছোড়বান্দা।"

"ওরা কারা এসেছিলেন, বিনুদা?"

"ওরা সেই স্কুলের ব্যাপার নিয়ে এসেছেন, এখনও সব ব'সে আছেন,—জ্বালাতন আর কি!" বলিয়া বাক্স হইতে কি খানকতক কাগজ লইয়া বিনুদা তাড়াতাড়ি আবার নীচে নামিয়া গেল।

আমার জন্য চা লইয়া আসিয়া বৌদি কহিল—"এই মেয়ে-স্কুলের জন্যে এক সময় কি খাটুনিই না খেটেছিলেন! নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ ক'রে এক দিন এর জন্যে চাঁদা তুলে বেড়িয়েছিলেন। তা'ও কি সব টাকা উঠেছিল? শেষকালে

দু-তিন হাজার টাকা যা কম পড়ল, উনি ত নিজেই সেই টাকাটা সব তখন দিয়ে দিয়েছিলেন। স্কুলের ঐ বাড়ী উনি না হলে কি আজ আর হত। তখন এই স্কুলের জন্যে কত চাড়, কত চেষ্টা, আর আজ ওঁরা সব এসেছেন ব'লে মনে মনে কত বিরক্ত, দেখছ ত, ঠাকুরপো ?"

চা খাইতে খাইতে কহিলাম—"মেয়ে-স্কুলের বাড়ী ত হয়ে গেছে ?"

"হ্যাঁ। তাই ওঁরা সব আজ সেখানে একটা সভা করবেন।"

বিনুদা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল—"আর সেই সভায় আমাকে আজ যেতেই হবে, তাই ওঁরা বলতে এসেছেন; আমার না গেলে আজ কিছুতেই হবে না, তা হ'লে সব কায পণ্ড হবে, আকাশ ভেঙ্গে পড়বে, পৃথিবীর কাযকর্ম্ম সব একেবারে অচল হয়ে যাবে।"

আমি কহিলাম—"তুমিই ত স্কুলের গোড়া বিনুদা, এ সভায় তোমার যাওয়া চাই বৈ কি।"

"তুই আর বকিস নি। যা কিছু সব ত ক'রে দিয়েছি বাবা, এখন আর আমায় নিয়ে টানাটানি কেন? যাক— তুই আজ ভাল আছিস্ ত? ওবেলা যাওয়া যাবে এখন একবার। যেতে পারবি না? ঘণ্টাখানেক থেকে চ'লে আসা যাবে।"

তিন দিনের অনাহারে শরীরটা খুবই যদিও দুর্ব্বল ছিল, তথাপি বৈকালে স্কুলের সভায় যাইবার ইচ্ছাটাকেও কোনরকমে দমন করিতে পারিলাম না। বড় রাস্তা পর্য্যন্ত আস্তে আস্তে আসিয়া সেইখান হইতে একখানি গাড়ী করিয়া বিনুদার সঙ্গে স্কুল-বাড়ীতে আসিলাম। স্কুলটি দ্বিতল; সদর রাস্তারই উপর। পাথর ও ইঁট মিলাইয়া হাল্-ফ্যাসানানুযায়ীই তৈয়ারী। দোতলায় স্কুল বসিবে, নীচের তলাটি দোকানের জন্য ভাড়া দিয়া কিছু আয় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। নীচেকার হলটিতেই সভার আয়োজন হইয়াছিল।

সভায় বিনুদাকে খুবই সম্মানিত করা হইল। তাহার গলায় রাশীকৃত ফুলের মালা পরাইয়া দিয়া বুক একেবারে ঢাকিয়া দেওয়া হইল। সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় কহিলেন যে, বাঙ্গালাদেশের বাহিরে এই সুদূর হিন্দুস্থানীর দেশে বাঙ্গালী মেয়েদের শিক্ষার জন্য যাঁহার মন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং একমাত্র যাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটি আজ কাশী-প্রবাসী বাঙ্গালীর অন্যতম গৌরবের জিনিষ হইল, তাঁহার উপযুক্ত সম্মান, আজ আমরা কিছুই দেখাইতে পারিলাম না। যত দিন এই স্কুল থাকিবে, তত দিন এই স্কুলের নামের সঙ্গে তাঁহার পুণ্যময় নাম চিরস্মরণীয়—ইত্যাদি ইত্যাদি। বুঝিলাম যে, সভাভঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত এই সম্মান ও ফুলের মালা ঠেলিয়া বিনুদার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিবার কোন উপায়ই নাই। আমি কিন্তু আর বসিয়া থাকিতে পারিতেছিলাম না। ধীরে ধীরে সভা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলাম ও একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে চাপিয়া বসিলাম।

তখনও সন্ধ্যার বিলম্ব ছিল। গাড়ী হইতে নামিয়া দুর্ব্বলপদবিক্ষেপে ধীরে ধীরে গলির মধ্য দিয়া আসিতেছি, পাশের একখানি বাড়ীর বারান্দা হইতে উপরি উপরি দুই তিনবার কে আমার নাম ধরিয়া ডাকিল। উপরের দিকে চাহিয়া দেখি, একটি আধা-বয়সী ফিট-ফাট স্ত্রীলোক,— মাথায় বাঁকা সাঁথা, পাতাকাটা চুল ভুরু পর্য্যন্ত নামান, পরিধানে একখানি চওড়া পাড়ের ধব্‌ধবে সাড়ী, কপালে কাঁচপোকার টিপ,—বারান্দার রেলিং হইতে মুখ বাড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তাহার দিকে চাহিতেই কহিল,— "পঙ্কুবাবু, সামনের দরজা দিয়ে ঢুকেই ডানদিকে সিঁড়ি, একবার আসুন।" নিতান্ত পরিচিতের মত যিনি হাসিতে হাসিতে এমন করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, সেই অভ্যর্থনাকারিণীকে কোথাও কখন দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে করিতে পারিলাম না। তথাপি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া খোলা দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম এবং সম্মুখের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ পার হইয়া সিঁড়ির কাছে আসিতেই দেখি, একটি কালো রংয়ের খর্ব্বাকৃতি হৃষ্টপুষ্ট ব্রাহ্মণ তাঁহার নগ্ন কৃষ্ণবক্ষে পৈতার গোছা ঝুলাইয়া আমার দিকে চাহিতে চাহিতে সেই প্রায়ান্ধকার সিঁড়ি বাহিয়া নামিতেছে। কাছে আসিতেই চিনিতে পারিলাম, কহিলাম, "এ কি নন্দী মশাই এখানে—"

হস্তভঙ্গীর দ্বারা আমার কথায় বাধা দিয়া তিনি তাঁহার বদ্ধ ধরা গলায় সাঁই-সাঁই রবে যাহা বলিলেন, সে কথা তাঁহার মুখের মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া না পৌঁছিলেও বুঝিতে আমার আটকাইল না। তিনি বাধা দি

বলিয়া উঠিলেন,—"চুপ্ চুপ্, ও নাম ধ'রে ডাকবেন না। এখানে সকলেই আমাকে ঘোষাল মশাই ব'লে জানে" বলিয়া চারিপার্শ্বের অন্যান্য ভাড়াটীয়াদের ঘরগুলির দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরাইয়া লইলেন এবং তাহার পর আমার হাত ধরিয়া বরাবর উপরে লইয়া গেলেন।

ঘরের মেজের এক ধারে পরিচ্ছন্ন ধবধবে শয্যা বিস্তৃত ছিল, তাহারই উপরে আমাকে বসাইয়া নন্দী মশাই বলিলেন, "ক'দিন হ'তে গলাটা ভেঙ্গে গিয়েছিল, আজ সকাল থেকে একেবারে আওয়াজই আর বার হচ্ছে না। তাই কামিনীকে ডাকতে ব'লে দিয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে যাচ্ছিলুম। অনেক দিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল দাদা, অনেক কথা বলবার আছে। এই ক'বছরের ভেতর জীবনের ওপর দিয়ে আমার একটা তুফানই চ'লে গেল।"

"তুফানেরই যে সংসার! কি ব্যাপার বলুন দেখি?"

"সবই বলছি দাদা। কামিনী, পঞ্চবাবুকে পাণ দাও।"

শ্রীমতী কামিনী তখন পাণের সরঞ্জাম সম্মুখে করিয়াই বসিয়া ছিল। আমি কহিলাম,—"পাণ ত আমি খাই না, আপনি জানেন।"

"ঠিক ঠিক, ভুলে গিয়েছিলুম। তার পর সংক্ষেপে সব বলি। এর পর এক দিন ভাল ক'রে সব বলবো। বাসাটা করেছেন কোথায়? মাঝে মাঝে যাওয়া যাবে. আর আপনিও পায়ের ধুলো দেবেন, দাদা! বাসাটা চিনে আসতে পারবেন ত? এই হাড়াবাগে এসে ঘোষাল মশাই ব'লে জিজ্ঞাসা করলে সকলেই দেখিয়ে দেবে। গণেশজীর মন্দিরের একেবারে গায়েই আর কি।"

আমি বসিয়া বসিয়া সেই অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘরখানির চারিপার্শ্ব একবার দেখিয়া লইলাম। সেই একখানি ঘরের মধ্যে সকল জিনিষই পরিপাটীভাবে সাজান, কিছুরই ত্রুটি নাই। ঘরের আসবাবগুলি ছাড়া আর একটি সজীব আসবাব বাহিরের বারান্দায় পিত্তলের একটি দাঁড়ে টাঙানো ছিল। টিয়াপাখীটি আমাকে দেখিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণে বা অকারণেই হউক, ভয়ঙ্কর চীৎকার সুরু করিয়া দিল। তাহাকে শান্ত করিতে কামিনী উঠিয়া গেল, নন্দী মশাই বলিল,—"তার পর বলি শোন, ভাই। তুমি ত চাকরী ছেড়েছুড়ে দিয়ে এলে, তার পরই বড় সাহেব চ'লে গেল বিলেত। তার যায়গায় যে এল, সে ব্যাটা মহা হ্যাঁটা, মহা পাজি। এসেই একটা মাস না যেতে যেতেই আমায় বল্লে কি না—'নন্দী, তুমি কাযকর্ম্ম কিছুই বোঝ না, খালি ফাঁকি দিয়ে মাইনে নিচ্ছ, আমি তোমার যায়গায় অন্য লোক রাখবো।' আমি কি ধরণের 'অপার রাইট' লোক, জান ত দাদা, আমায় বলে কি না ফাঁকি দি! মুখের উপর তেমন আমি জবাব দিলুম—'Very good if you not like, I dont more come. I dont care for this 21 rupee post; ব্যাটার এমনি অহঙ্কার পঞ্চুবাবু, ব্যাটা সেই দিনই আমায় ডিস্‌মিস ক'রে দিলে! আরে, আমি কি ডিস্‌মিসের ভয় করি, না তোর মত চিংড়ি-খেকো পিদ্রুকে ভয় করি? বড়সাহেব ছিল আমাদের একেবারে ঋষি, তার খোসামোদ করতুম ব'লে তো-ব্যাটার খোসামোদ করব? তেমন বান্দাই আমি নই।"

"কি করলেন তখন?"

"'রিজাইনিং দিয়ে চ'লে এলুম! আসবার সময় রুখে ব'লে এলুম—'Very good but বিনা দোষে আমার 15 years service, you doing dismiss, but if God is in heaven your punish you must see."

"তার পর?"

"তার পর দিনকতক বড় কষ্টেই কাটলো, ভাই। জান ত, একটি পয়সা বাইরে থেকে আর আসবার উপায় ছিল না। ঐ মাইনেটি যা পেতুম, কোন রকমে তাইতেই ত তিনটি প্রাণীর চলতো।"

"আপনার ত ছেলেপুলে ছিল না,—না?"

"না দাদা, ঐ স্ত্রীটি আর একটি মেয়ে। তা' ছ'মাসের মধ্যেই ভগবান্ সুবিধে ক'রে দিলেন। স্ত্রীটি হঠাৎ গেলেন মারা। তখন মেয়েটাকে তার মামার কাছে গছিয়ে দিয়ে এসে, চ'লে এলাম এই কাশীতে। শুনেছিলুম যে, অন্নপূর্ণার রাজত্বে কা'কেও উপবাসী থাকতে হয় না। কিন্তু এখানে এসে দেখলুম, সেটা ব্রাহ্মণের পক্ষেই বেশী খাটে। অনেক সুখ-সুবিধে এখানে আছে বটে, কিন্তু তা ব্রাহ্মণদেরই একচেটে। সুতরাং এখানে এসেও দিন কতক খুবই কষ্টে কাটালুম। তার পর এক দিন বিশ্বনাথের চরণের উদ্দেশে মাথা ঠেকিয়ে বললুম—'অপরাধ নিও না বাবা, আজ থেকে সাতকড়ি নন্দী তোমার সাতকড়ি ঘোষাল হ'ল'—ব'লে সেই

দিনই গলায় এই পৈতে ঝোলালুম” বলিয়া নন্দী মশাই তাঁহার শুভ্র পৈতা গাছটিতে একবার হাত দিলেন।

আমি কহিলাম—“তা বেশ করেছেন। বামুন হবার পর আর ত আপনার কোন কষ্ট নেই?”

“না দাদা, তোমাদের আশীর্ব্বাদে আর বাবা বিশ্বনাথের দয়ায় বেশ সুখেই আছি এখন। ক’টা দিনই বা আর বাঁচবো! এই ভাবে কাটিয়ে তাঁর চরণে স্থান পেলেই এখন যথেষ্ট।”

“আচ্ছা, নন্দী মশাই——”

“চুপ্ চুপ্, ঐটি ব’লে ডাকা ভুলতে হবে ভায়া, ঘোষাল——”

“ভুলে গিয়েছিলুম। আচ্ছা ঘোষাল মশাই!”

“ভায়া!”

“এ স্ত্রীলোকটি কে?”

“উটি হচ্ছেন” বলিয়া হাসিতে হাসিতে কি ইঙ্গিত করিলেন, তাহার মর্ম্ম ও অর্থ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নন্দী মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। নন্দী মশাই কহিলেন—”ওঁরও কেউ আর নেই। ব্রাহ্মণ-কন্যা আছেন আমার আশ্রয়েই, কিম্বা ওঁর আশ্রয়েই আমি আছি বল্লেও হয়। বড়ই সৎ চরিত্তিরের লোক উনি।”

“তা ত দেখতেই পাচ্ছি; তা ওনাকে তা হ’লে এইখানেই আপনার পাওয়া?”

“সকলই বিশ্বনাথের ইচ্ছা” বলিয়া নন্দী মশাই তাঁহার জোড় হাত মাথায় ঠেকাইলেন। আমিও উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম—“আচ্ছা, শরীরটা আজ ভাল নেই নন্দী—ঘোষাল মশাই, আজ উঠলুম, সন্ধ্যাও হ’ল।”

নন্দী মশাই আমার সঙ্গে সঙ্গে সদর পর্য্যন্ত আসিলেন, কহিলেন—“অনেক কথাই আপনার সঙ্গে আছে ভায়া, থাকা হবে ত কিছু দিন?” আমি ঘাড় নাড়িয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। বাটীতে আসিয়া দেখিলাম, বিনুদা তখনও সভা হইতে বাটী আসে নাই। বৌদির সঙ্গে গল্প করিতে করিতে যখন চোখের পাতা ঘুমে জড়াইয়া আসিল, তখন ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া এগারটা বাজিয়া গেল। তখনও পর্য্যন্ত বিনুদা গৃহে ফিরিল না দেখিয়া বৌদি একটু চিন্তান্বিতা হইয়া পড়িল। তাহার শরীরটাও সে দিন সন্ধ্যা হইতে ভাল ছিল না। কথা কহিবার সময় কয়েকবারই লক্ষ্য করিলাম, বৌদি দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া তাহার বুকের অসহ্য একটা ব্যথাকে যেন প্রাণপণ শক্তিতে ভিতরে ভিতরে চাপিয়া সহ্য করিয়া লইতেছে। বৌদিকে আর বসিয়া না থাকিয়া শুইতে বলিয়া আমি এ ঘরে চলিয়া আসিলাম ও আলো নিভাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ পরে জানি না, বিনুদার ঘরে একটা গোলমালের শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িয়া বিনুদার ঘরে আসিয়া দেখি, মেজের উপর বৌদি অজ্ঞান হইয়া ছিন্ন লতার মত লতাইয়া পড়িয়া আছে, আর বিনুদা এক হাতে মাথায় ও মুখে-চোখে জল দিতেছে, আর এক হাতে পাখা দিয়া বাতাস করিতেছে। [ক্রমশঃ

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

সাধনা

সন্দেহ কেন কর!
সাধনা-দেবীর পাষাণ-বেদীতে জ্ঞানের প্রদীপ ধর,
গোলোকের পথে চলিবে যতই,
মায়ার শিকলি টানিবে ততই,
ময়-দানবের মহা-আহবের দুর্বিপাকে না ডর।

দাঁড়িয়ে কেন যে রও।
মন-দধীচির পাঁজর পোড়ায়ে শুচিতা-শুদ্ধ হও।
ত্রিশঙ্কুরে ঐ ত্রিশূলেতে বিঁধি,—
দাও প্রাণে তার ত্রিদিবের নিধি,
বিশ্বামিত্র-মন্ত্র-শকতি শতগুণ করি লও।

বিত্ত বুকে না রাখ,
কমলের বনে কলুষ-পঙ্ক অঙ্গে নাহি গো মাখ;
বৈরাগী হাসে রিক্ত ঝুলিতে,
বুদ্ধ যে রয় পথের ধূলিতে,
বোধি-পাদপের শিকড় কাটিয়া সত্যেরে কেন ঢাক

অযুত সূর্য্য জ্বলে,
দ্যুলোকের পানে ঝলসিছে আঁখি দৃষ্টি নাহিক চলে
মৃত্যু, জরার মহা উৎসব—
ভূলোকে তুলেছে ভীম কলরব,
হে মহামানব, বাসনা কর কি নামিতে ভূমণ্ডলে?

শ্রীসর্ব্বরঞ্জন বরাট (বি-

আদর্শের মায়ামৃগ

মানুষ স্বভাবতঃই জড়বাদী, কারণ, তার জ্ঞানের সব ইন্দ্রিয়-গুলির মুখ বাহিরে, বাহ্যজ্ঞানই তার কাছে সত্য। আমাদের এই স্থূল পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের এবং একাদশ ইন্দ্রিয় এই মনের দর্শন স্পর্শন স্বাদ আঘ্রাণ শ্রুতি ও মননজাত স্থূল জ্ঞানে আমরা মনে করি, যে, আমরা হচ্ছি এক একটা আলাদা আলাদা বস্তু বা ব্যক্তি। এ জগতের সব কিছুই পরস্পর হতে বিযুক্ত খণ্ড খণ্ড অসংলগ্ন পদার্থ, বড় জোর এক অন্ধ জড় স্রোতের মাঝে ইতস্ততঃ ভাসমান কয়েকগাছি খড়-কুটার মত। এই পরিদৃশ্যমান বস্তুনিচয়ের মাঝে যারা চেতন, তারাই কেবল মাঝে মাঝে মন, প্রাণ ও হৃদয়ের শুঁড় বা দাড়া বাড়িয়ে এ ওকে ছুঁয়ে ফেলছি, তাতেই আমাদের যত কিছু হাসি কান্না সখ্য বাৎসল্য মধুর আদি ভাব ও রসের ট্রাজেডি কমেডি ঘ'টে যাচ্ছে। আমাদের এই আপাতদৃষ্টির পল্লবগ্রাহী ধারণা আদৌ যথার্থ নয়, কারণ, আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনজ স্থূল জ্ঞান নিতান্তই স্থূল, নিতান্তই আপেক্ষিক, নিতান্তই অসম্পূর্ণ। এই চির-চঞ্চল মনপ্রাণকে শান্ত ও উজ্জ্বল ক'রে যে একরস আদি তত্ত্বে পৌঁছতে পারে, সেই ধীর আত্মস্থ মহাজ্ঞানীর কথা না হয় ছেড়েই দিই, যারা জড়কেই আসল বস্তু ভেবে জড় থেকে প্রমাণ বিচার বিশ্লেষণ ক'রে ক'রে, সূক্ষ্মের দিকে চলেন, সেই বিজ্ঞানবিদ্দের কথাই বলি। এক দিন ছিল যখন তাঁরা শুধু জড়কেই মানতেন, তার পর জড় বিশ্লেষণ করতে করতে তাঁরা এসে পড়লেন কতকগুলি মূল উপাদান ও মূল শক্তিতে; অবশেষে আজ তাঁরা অণুপরমাণু বিশ্লেষণ করতে করতে সেই সব উপাদান ও শক্তিকে পরিণত দেখেছেন এক মূল আদি শক্তিতে। আর কিছু কালের গবেষণার ফলে এই বিজ্ঞানবাদীরা হয় ত সেই আদি শক্তির পিছনেও আবিষ্কার ক'রে ফেলবেন চৈতন্যকে, সেই consciousnessকে—"যঃ প্রাণেন ন প্রাণিতি, যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে"।

জড়বিজ্ঞানকে অবলম্বন ক'রে চললেও সহজেই বোঝা যায় যে, জগতে এই আপাতদৃষ্টি, এই ইন্দ্রিয়জ ভাসা ভাসা পল্লবগ্রাহী জ্ঞান কোন জ্ঞানই নয়। আসলে আমরা কতকগুলি অসংলগ্ন উড্ডীয়মান জড় নই, আমরা রয়েছি ওতপ্রোতভাবে একরস, একপ্রাণ, নিরেট, অখণ্ড, একাঙ্গ একটি সত্তায়,—আমরা হচ্ছি সেই মহাসিন্ধুর তরঙ্গলীলা, সেই শক্তিপুঞ্জের তড়িৎস্ফুলিঙ্গ, হয় ত বা সেই মহাচেতনার অসংখ্য মন-পরমাণু। বিজ্ঞানে যা প্রতিপন্ন হয়, যোগেও তা' খুব সহজে প্রত্যক্ষ হ'তে পারে, মনের তরঙ্গকে প্রশান্ত ক'রে যে এই নির্ম্মল স্বচ্ছ মনোদর্পণকে তুলে ধরতে পারে, সেই দেখে, আপাত-দর্শনে এই যে খণ্ড খণ্ড চরাচর, এ হচ্ছে এক—একেবারে একাঙ্গ, একপ্রাণ, একমন, একাত্ম। তার মাঝে মানুষ রয়েছে তার ক্ষুদ্র প্রত্যক্ষ শরীর নিয়ে শুধু এই জড় ধামেই নয়, কিন্তু তার বৃহৎ হ'তে বৃহত্তর সত্তা নিয়ে ঊর্দ্ধে ও নিম্নে বহু ধাম জুড়ে, যেন সেই সব নেপথ্যভূমির রঙ্গমঞ্চ হয়ে, সেই সব নাটচতুর মহাসত্তার সাজঘর হয়ে, সেই সব সিসৃক্ষু শক্তি-ডাইনামোর প্রকাশের বা রূপায়নের ক্ষেত্র হয়ে। দেব যক্ষ রক্ষ কিন্নর পিশাচ পশু ও মানব আদি সকল জগতের গান এই মানবদেহরূপ বেতার যন্ত্রে অহরহঃ ধ্বনিত হচ্ছে, সেই সঙ্গতই আমাদের মানব-জীবন।

একটি মহাদেশের মধ্যে যেমন সমতল ভূমিই শুধু নেই, আকাশস্পর্শী শৈল-শিখরও আছে, আবার পাতালগর্ভ সমুদ্র খাত-পরিখাও আছে, মানুষের মাঝেও দেখি ঠিক তেমনিই। মানুষ তার চেতনার সমতল মানবভূমিতে (human levelএ) সকল সময় থাকে না, কখনও দেবমানবত্বের অপেক্ষাকৃত উচ্চচূড়ে উঠে দেশবন্ধু হয়, আবার কখনও বা যক্ষরাক্ষস-লোকের পাতালগর্ভে নেমে নীরো, হেরড, চেঙ্গিজ খাঁও হয়। মানুষের মধ্য দিয়ে অসুর ও দেবতায় মিলে যেন এই জগৎ ভোগ করছে। এরা দুই দলই অমৃতের পিপাসু, শক্তি আনন্দ ও জ্ঞানের যাচক, অমরত্বের সন্ধানী। মানুষের প্রকৃতিকে দ্বন্দ্বভূমি ক'রে এই দেবাসুর দল হানা দিচ্ছে একবার ঊর্দ্ধের জ্যোতির্লোক থেকে, আবার নিম্নের অন্ধতম পাতালপুরীর ভোগময় প্রাণ ও জড়লোক থেকে। মানুষের দেহের ক্রমপরিণতিতে—চরম সিদ্ধিতে যেন তাদের সকলেরই বড় লোভ। মানুষের সত্তার সম্পুটে যে অমৃত লুকান আছে, যা এক দিন এই সুরাসুর-মন্থনের ফলে উঠবে মানুষকে এক অভিনব মহামানবে পরিণত করতে, সেই

সংবাদ যেন আগেই দেবলোক ও অসুর-দৈত্যনাগলোকে চারিয়ে গেছে, প্রচার হয়েছে। তাই অমৃতকামী দেবচমূ ও দৈত্যচমূ যেন মানুষকে করেছে যন্ত্র, উপলক্ষ্য,—মানুষের ভাবী আকাশস্পর্শী মহত্বের মধ্যে দিয়েই যেন তারা চায় সিদ্ধি, অপবর্গ, তাদের চরম সাফল্য। মানুষেরই জয়ে, পরিণতিতে, পরাগতির মাঝে শুধু তিন কেন, বুঝি সপ্ত বা চতুর্দ্দশ ভুবনের রয়েছে কি এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি ও সিদ্ধি, তাই চতুর্দ্দশ ভুবনেরই অগ্রগতি যেন মুখ চেয়ে রয়েছে এই মাটির মানুষের মাঝে ভগবানের জন্মের ও রূপায়নের জন্য, একান্ত জড়ের এই মূঢ়তার মধ্যে চেতনার কি এক পরম জাগরণের জন্য। হয় ত প্রত্যেক সৌরজগতের যে কোন বিন্দু থেকে—যে কোন গ্রহ উপগ্রহ থেকে দেখলে তাকেই এমনি সৃষ্টির কেন্দ্র ব'লে মনে হয়। কিন্তু মহাকারণ থেকে কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলের মধ্য দিয়ে যত ধাম আছে, তাদের মধ্যে এই মাটির পৃথিবী যদি হয় সব চেয়ে কঠিন ও নিরেট, সব চেয়ে জমাট ও সংহত, সব চেয়ে মূর্ত্ত ও পরিস্ফুট, তা হ'লেই এই গূঢ় রহস্যের একটা সন্ধান মেলে, মানুষের জীবনে দেবতা ও অসুরের এত আনাগোনা, এত হানাহানি, এমন মুহুর্মুহু অভিযানের একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কারণ, তাদের সকলের সিদ্ধি তা হ'লে সত্য সত্যই এইখানেই নিখুঁৎ পরিস্ফুট ও ব্যক্ত হয়ে রূপ নেবে, উর্দ্ধের কারণ ও সূক্ষ্মস্তর-গুলিতে ভাগবত আলো নামতে নামতে রূপ নিতে নিতে এই সর্ব্বাপেক্ষা সংহত concrete স্তরে এসে নিটোল নিঁখুৎ সর্ব্বাবয়ব হয়ে বিগ্রহ ধরবে।

বিজ্ঞান অনেকখানি এগুলেও আজও মানুষ এগোয় নি। তার অবশ্যম্ভাবী দেবত্বের দিকে সে চলেছে তার অন্তরের জ্ঞান-চক্ষু মুদে, বাহিরের চোখ মেলে। জন্মের এপার আর মৃত্যুর ওপার এই দুই রহস্যের কৃষ্ণ যবনিকার মাঝে আমাদের এই ক্ষুদ্র ব্যক্ত জীবন নাটমঞ্চটুকু। এই দুই বিপুল দুরবগাহ অজানার মাঝখানে অস্থির শিশিরবিন্দুবৎ জীবনটুকু নিয়েই আমাদের কত গর্ব্ব, কত পাণ্ডিত্য, কত লাফালাফি, দাপাদাপি। তার ওপর পাশ্চাত্য জ্ঞানের সাড়ে বত্রিশ ভাজা যাঁরা দু'পয়সা খরচ ক'রে লণ্ডন বা বার্লিনের মোড়ের মাথা থেকে কিনে খেয়ে আজ কৃতবিদ্য, তাঁরা সব এক একটি সবজান্তা পুরুষ। পাশ্চাত্যের এই মানস জ্ঞান—intellectual knowledge, এই রঙীন খেলানা, এই দিল্লীকা লাড্ডু এমনই মোহকর; যথার্থ জ্ঞান যত দিক আর না দিক, জ্ঞানের ভান এ খুবই করে, পাণ্ডিত্যের মোহ প্রচুর জন্মায়; এই সাড়ম্বর 'বাগ্বৈখরী শব্দঝরি শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্'—জ্ঞানের এই পিপাসাবৃদ্ধিকরী মৃগতৃষ্ণিকা, এ বস্তু হচ্ছে নিতান্তই ভুক্তয়ে, ন তু মুক্তয়ে। অথচ প্রকৃত জ্ঞান প্রকাশময়, তা' সর্ব্ববন্ধনমোচনকারী, তিমিরনাশী, ভাস্বর বস্তু। পাশ্চাত্যও শুধু অগভীর মানস জ্ঞানের সফরী নয়, আগেই বলেছি, সেখানেও জড় খুঁড়তে খুঁড়তে বিজ্ঞানবিদ্ এক অচিন্ত্য একরসাত্মক শক্তিরাজ্যে এসে পৌঁছেছে এবং সেখান থেকে গলা বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করছে এই "একং সৎ" অথচ বহুধা প্রকাশময়ী শক্তির পিছনে কি আছে। জড়ই যে কুণ্ডলিত আপনাতে আপনি ক্রম-সঙ্কুচিত ঐ আদিশক্তি সে সম্বন্ধে আর বড় সন্দেহ নাই, কিন্তু এই আদিশক্তিই কি আবার এক পরম চেতনা থেকে উত্থিত? পাশ্চাত্যের মনীষীরা জড় ও চেতনার মাঝে এক শক্তির স্তরে দুলছেন, আসলে তাঁরা আর এখন জড়বাদী নন।

এখানে কিন্তু পাশ্চাত্যের মনীষীদের কথা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে পাশ্চাত্য জ্ঞানের অগভীর জলের সফরীদের—চুণাপুঁটিদের কথা। পাশ্চাত্যের জ্ঞানীরা জড়বাদ, জড়ের রাজ্য বহুদিন পার হয়ে গেলেও এখনও সেই পুরাণ জড়বাদের প্রভাব পাশ্চাত্যের জীবনের সর্ব্বত্র রয়েছে, তাই সে সভ্যতা এখনও মূলতঃ বহির্ম্মুখী ও জড়বাদী। তার ওপর বুদ্ধি বস্তুটা মানুষের মাঝে বড় দুর্লভ, দশ হাজার করা এক জন মানুষও গভীরভাবে চিন্তাশীল ও মৌলিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কি না সন্দেহ। এই দশহাজারকে ন'হাজার ন'শ' নিরানব্বই জন নয় পরের বুদ্ধিতে চলে আর নয় নিজের অল্প বুদ্ধিকে ক্ষুরধার বুদ্ধিজ্ঞানে শাণিত হয়ে থাকে। তা ছাড়া কথায় বলে, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়, এই য়ুরোপীয় বাঁশের যে কৃষ্ণাঙ্গ কঞ্চিগুলি আমাদের দেশে অজস্র আমদানী হয়, তাদেরও বুদ্ধির খুব বো[illegible] বালাই নেই, কারণ, তারা ঐ নয় হাজার ন'শ নিরানব্বই এর দল থেকে বাছাই করা চিজ; এদের নিজস্ব কিছু নেই-ই, উপরন্তু জ্ঞানে বুদ্ধিতে সংস্কারে চিন্তায় এ[illegible] ময়ূরপঙ্খীর দল, বাসি য়ুরোপীয় মিঠাইএর এরা অলিগলি

ফিরিওয়ালা। জার্ম্মাণীতে গেলে এরা জার্ম্মাণ সাজে, রুষে গেলে রুষ, মার্কিণে গেলে পুরাদস্তুর মার্কিণ। যাদের নিজের কোন রঙ নেই, তাদের যে রঙের গামলায়ই ডোবাও না কেন, সেই রঙেই তারা ছুপে ওঠে।

য়ুরোপের জড়বাদ যত দিন ইউটোপিয়ার রাজ্যে ছিল, য়ুরোপের ভোগৈকসার নিরীশ্বরবাদ তার নীরস শুষ্ক rationalism যত দিন নিছক মনের রাজ্যে চিন্তা ও কল্পনার ফানুস ওড়াতো, তত দিন বিশেষ কিছু এসে যায় নি। আজ তা জীবনে নেমেছে, জীবনে নেমে য়ুরোপের সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি সবই ভেঙে গড়ছে, নতুন ক'রে ঢেলে সাজছে। য়ুরোপের জাতীয় প্রতিভা এই ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠবেই এক নতুন সিসৃক্ষু প্রেরণা নিয়ে,তার মত ক'রে সে জীবনকে করবে তার মৌলিক রাগিণীর নূতন সুরযন্ত্র, নবীনতর বীণা। য়ুরোপ ব'লে বলছি বটে, কিন্তু য়ুরোপও একটি অখণ্ড সত্তা নয়, তারও মাঝে আছে নানা জাতি, বহু বিভিন্ন সমাজ ও আদর্শ, অনেকগুলি পৃথক্‌ধর্ম্মী মন। রুষের জাতীয় প্রতিভা বা তার মনের গড়ন ঠিক জার্ম্মাণীর নয়, ফরাসীর বা ইতালীর জাতীয় সত্তার ধর্ম্ম এই দুই থেকে স্বতন্ত্র; সুইট্‌জারল্যাণ্ড বা নরওয়ের রূপ ও প্রকাশভঙ্গী এ চারের কারুরই মত নয়। এই জন্য য়ুরোপে যুগপৎ দুই একেবারে বিপরীত মহাপুরুষ লেলিন ও মুসোলিনীর আদর্শ ওঠা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই সব কয়টি পৃথক্ সুর, পৃথক্ বাদ্যযন্ত্র মিলে যে সঙ্গতের সৃষ্টি করছে, তাই-ই হচ্ছে য়ুরোপীয় প্রতিভা। তা কিন্তু আবার এসিয়ার প্রতিভা থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। এই সব বহুবিচিত্র জীবন-বৃক্ষ রয়েছে বলেই মানব-সমাজ এমন বহুমুখী, রূপ সৃষ্টিমুখর, এত চিত্তাকর্ষক। তার ভানুমতীর জীবনঝাঁপীতে হাত দিয়ে যুগে যুগে মানব-সমাজ তুলছে কত বিচিত্র অভিনব অত্যাশ্চর্য্য জিনিষ, যা' দেখে জগতের তাক লেগে যাচ্ছে।

য়ুরোপের চেয়েও বৃহৎ পরিবার হচ্ছে এসিয়া, তার মধ্যে আছে আরও বহুতর জাতি, আরও অসংখ্য বিচিত্রতা, আরও স্বাধীনতা। এসিয়াকে ছেড়ে দিলেও শুধু ভারতেই রয়েছে বাঙালী, মাদ্রাজী, মারাঠা, পাঞ্জাবী, আসামী, উৎকলী, নেপালী, তিব্বতী আদি ক'রে কত না নূতন নূতন জাতি। মানুষ হিসাবে এক, এসিয়াবাসী হিসাবে এক,ভারতের সন্তান হিসাবে এক; কিন্তু জাতি হিসাবে, সত্তার ধর্ম্ম, স্বভাবের গতি হিসাবে খুবই বিভিন্ন। ভারত আসলে একটি মহাদেশ। তার আছে পৃথক্ সত্তা, পৃথক্ ভঙ্গী, পৃথক্ ধর্ম্ম, পৃথক্ বাণী। সে ধর্ম্ম, সে বাণী, সে রূপ ফুটবে জগতের আবহাওয়া থেকে বাতাস ও তাপ আহরণ ক'রে; কিন্তু সে ফুটবে নিজেরই রসে, একান্তই নিজের ভঙ্গীতে। এই সহজ কথাটি অনেকে বুঝতে পারে না; কারণ, খুব বুদ্ধিমান্ মানুষও একদেশদর্শী। এক সময়ে একটা দিককে, একটা aspectকে, একটা ভাবকেই সে একাঙ্গ ক'রে দেখে। মানুষের চোখ যেমন একবারে একটা বস্তুই সমগ্ররূপে ভাল ক'রে দেখতে পারে, মানুষের মনের গঠনও সেই রকম। এই একদেশদর্শিতা মানুষের পূর্ণত্বের দিকে এগুবার প্রকাণ্ড বাধা। মনের গড়া সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম বা নীতি একদেশদর্শী হবেই, সে কিছুতেই সমগ্র অখণ্ড আপনাতে-আপনি-পূর্ণ হ'তে পারে না। তবে সুখের বিষয় এই যে, মানুষ শুধু মন দিয়ে—বাহ্য ইন্দ্রিয় দিয়েই দেখে না, তার আছে আর একটা বৃহত্তর দীপ্ততর ব্যাপকতর বৃত্তি—যা' অখণ্ডকে দেখতে পায়, সমগ্রের ধারণা করতে পারে, সব বিচিত্রতার ঊর্দ্ধে থেকে সব কিছুকে গুটিয়ে গ্রহণ করতে পারে। সেই হচ্ছে জ্ঞানসূর্য্য, মন হচ্ছে তার প্রতিবিম্বিত চন্দ্র; সে রয়েছে অটল আসনে ব'সে সত্তার কাঞ্চনজঙ্ঘায়, আর মন তারই জ্যোতির একটা রশ্মি নিয়ে ঘুরছে সত্তার পাদমূলে, উচ্চ-নীচ শিখরে শিখরে, নানা অধিত্যকা উপত্যকায়। সজ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, এই মহাজ্ঞানেই আমরা ধরা রয়েছি, আমাদের ইন্দ্রিয় মন প্রকাশিত রয়েছে। এই জ্ঞান-সূর্য্যের এই বৃহৎ দৃষ্টির সন্নিহিত হয় জ্ঞানী—যার আছে intuition, আর এর সঙ্গে একাত্মা হয়ে থাকে যোগী—যে এই বস্তুকে খুঁজে পেয়েছে।

সাধারণ মানুষ কিন্তু তার সত্তার সব অচিন্ত্য মহাশক্তির ও জ্ঞানবৃত্তির সন্ধান রাখে না। তারা সত্তার স্বল্প জলের সফরী, মনপ্রাণ ইন্দ্রিয়েরই শাখা-মৃগ, কাযেই পল্লবগ্রাহিতাই তাদের ধর্ম্ম। তারা কোন জিনিষ তলিয়ে ভাবে না, অল্পজ্ঞানের হাঁটুজলে তারা পরমানন্দে চ'লে বেড়ায়, ভাবের নেশায় প্রাণের বা হৃদয়ের মাতাল ঝড়ে কুটাগাছির মত তারা ওড়ে। আহার-নিদ্রা-মৈথুন-রূপ জীবধর্ম্মই তাদের কাছে সাত কাহন, তৈল-তণ্ডুল-বস্ত্রেন্ধন নিয়েই তাদের

হচ্ছে বড় কথা, জ্ঞানের অগভীরতায় তারা স্বভাবতঃই জড়-বাদী। জীবনের এক যায়গায় এগুলি যে খুবই বড় কথা, একান্তই অপরিহার্য্য, সে সম্বন্ধে তখনই কোন সন্দেহ থাকে না, যখন বেলা একটা পেরুলে মেসের ঠাকুরের রাঁধা একটু তরল ডালের সঙ্গে দু'টো কুচোচিংড়ির ঝোল ও ভাত না পেয়ে চোখে অন্ধকার দেখি। যৌবনের তাড়নায় অস্থির হয়ে ষোড়শী অঙ্কলক্ষ্মী না পেলে মুহূর্ত্তের মধ্যে এমন রমণীয় দুনিয়া যখন আমার চোখে হঠাৎ ঘষা ডবল পয়সার মত অচল মনে হয়, তখনই বুঝি, ঐ পৈটিক সত্য এবং এই যৌন সত্য খুবই প্রবল সত্য। কিন্তু এই সত্য নিজের ক্ষেত্রে হাজার প্রবল ও অনিবার্য্য হ'লেও সেইটুকুই মানুষের সারা জীবনের সার সত্য নয়। মানুষের সমাজকে রূপ দিতে হ'লে যত উর্দ্ধ থেকে তা গড়া যাবে, ততই তা সমগ্র হবে, নিখুঁৎ হবে, সম্পূর্ণ হবে। আর তাকে যত নীচে থেকে দেখে গড়া যাবে, সে হবে ততই অসম্পূর্ণ, একাঙ্গ, খণ্ড ও অঙ্গহীন। আপাত স্থূলদৃষ্টিতে যেখানে দেখি, মানুষ খণ্ড, মানুষ ক্ষুৎপিপাসা-তাড়িত জীব, মানুষ যৌন আনন্দের মধুকর, তখন সেখানে স্বতই মনে হয়, এ জগৎ স্বর্গরাজ্যে পরিণত করা যায়, যদি তাদের সকল ক্ষুধা মিটিয়ে পায় এই ক্ষুৎপিপাসার প্রচুর ভোগ্যসামগ্রী। এইখান থেকে সমাজ গড়তে গেলে গড়তে হয় এক পরীহুরী-সমন্বিত সরাবের নদী-ওয়ালা বেহেস্ত বা স্বর্গ, যেখানে হরদম্ 'লেও আর খাও'-এর কারবার চলছে, দীয়তাং আর ভুজ্যতাংএর রব উঠছে। লোভী ভোগ-গৃধ্নু মানুষের কল্পিত স্বর্গও যা, জীবনের পূর্ণতার আদর্শও ঠিক তাই। সেখানে Creature-Comforts ইন্দ্রিয়সুখের প্রাচুর্য্যই আসল কথা।

একদেশদর্শী মন দিয়ে মানুষ যখন সত্য খোঁজে, তখন তার বড়ই বিড়ম্বনা হয়। পূর্ণ সত্যের পথে রয়েছে বহু খণ্ড সত্যের সিঁড়ি, নানা আপেক্ষিক আংশিক aspectএর স্বর্ণ-আরোহণী। মনের দর্পণে এই খণ্ড সত্যের যেটা যখন প্রতিফলিত হয়েছে, সেইটের জন্যই মানুষ হয়ে উঠেছে লুব্ধ ও উন্মত্ত। কারণ, এই সব খণ্ড আংশিক সত্যের মাঝেও আছে পূর্ণ সত্যেরই সেই পরিপূর্ণতার ছায়া, সেই ষোলকলায় পূর্ণ শশধরের দীপ্তি, পূর্ণ সত্যেরই সর্ব্বকামদ ভাব। তাই এক একটি aspect দেখে মানুষের মন ডেকে ব'লে উঠেছে, "এইটি হলেই আর কিছু চাই না, এই চরম সত্য জীবনে ফলালে ধরা স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে।" সত্য এক হিসাবে অমৃত, আবার লোভীর পেটে প'ড়ে তাই হয় মাদক সুরা। দেবতাকে সে অমৃত করে ধীর শান্ত শক্তিবিধৃত অথচ কর্ম্মোন্মুখ, কিন্তু অসুরকে তা' করে উদ্দাম মদমত্ত নিষ্ঠুর। মানুষের—বিশেষতঃ ভোগভূমি য়ুরোপের মানুষের ইতিহাস হচ্ছে, জীবনের পূর্ণ সত্যের এক একটি খণ্ডভাব aspeet নিয়ে এই ভাবে মেতে যাবার ইতিহাস। কোন যুগের আদর্শ হয়েছে ধর্ম্ম বা religion, কোন যুগের আদর্শ হয়েছে শৌর্য্য ও মহিমা, কোন যুগের আদর্শ হয়েছে অর্থ, কোন যুগের আদর্শ হয়েছে মুক্তি, কোন যুগের বা সাম্য; যুগে যুগে এক একটি ভাবকে ধ'রে মানব-কল্যাণের পিপাসায় য়ুরোপের গেছে খুন চেপে। এই ক্ষেপে যাওয়া, খুন চাপা, running amock হচ্ছে ওদের স্বধর্ম্ম, তাই য়ুরোপকে বলে আসুরিক। ভারত তপোভূমি, আর য়ুরোপ ভোগভূমি; ভারত দেবাংশজ, আর য়ুরোপ অসুরাংশজ; এই কথা সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা সত্য। দুই-ই শক্তির বরপুত্র, কিন্তু দুজনে শক্তির দুই মেরু, দুই বিপরীত দিক।

কোন এক যুগের বা দেশের সত্য সেই যুগেরই বা সেই দেশেরই সত্য। সমস্ত মানব-সমাজের জন্য তার মাঝে বাণী থাকলেও সেই ফুলটি ফুটতে এসেছে সেই বিশেষ দেশে, বিশেষ জাতি-বৃক্ষে। সেইখানেই তার মুকুল অবস্থা, তার দলের পর দল-বিকাশ, তার পূর্ণ পরিণতি এবং পরিশেষে ঝ'রে পড়া। আদর্শেরও রয়েছে জন্ম, বৃদ্ধি, জরা এবং মৃত্যু; কারণ, আদর্শমাত্রেই নিতান্তই সাময়িক, চিরন্তন হ'তে গেলে তার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। এ পর্য্যন্ত কত দেশ জগৎকে—মানব-সমাজকে কত বাণী শুনিয়েছে, কত রূপ সৃষ্টি করেছে, কত অপূর্ব্ব রাষ্ট্র ও সমাজচক্র রচনা করেছে, কিন্তু তার কোনটিই চিরস্থায়ী হয়নি। আদর্শলুব্ধ মানুষ তাকে চিরস্থায়ী করতে গিয়ে কেবল কঠিন rigid ক'রে তুলেছে, অসীম দুঃখের দুয়ার খুলে দিয়েছে, এক যুগের মুক্তি থেকে যুগান্তরের বন্ধন ও ভাবের পাষাণকারা সৃষ্টি করেছে। তাই-ই হয়, ফরাসী বিপ্লব তার সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী দিয়েই চ'লে গেল, মার্কিণ মুক্তিসংগ্রাম তার ভাবটুকু তুলে ধরেই ক্ষান্ত, রুষের গণতন্ত্র তার সত্যের বিদ্যুদ্‌বিকাশে পতিত শূন্যে

দুঃখ দেখিয়েই মিলিয়ে যায়; কারণ, আদর্শ হচ্ছে এই বিশ্বনাটমঞ্চের এক রজনীর অভিনয়, এই নিতুই-নবের জগতে তার আনন্দ ও শক্তি দেবার ক্ষমতা শুধু ঐ বারো ঘণ্টারই জন্য। তবু আদর্শ চাই, কারণ, এই আদর্শের মায়ামৃগ না হ'লে সীতাহরণ হয় না, স্বর্ণলঙ্কার দাহ হয় না, শ্রীরামচন্দ্রের দেবদুর্লভ চরিত্র ফোটে না।

আসলে আদর্শ থাকছে না, কিন্তু মানুষ এগিয়ে চলেছে। আদর্শ তার লক্ষ্য নয়, তার পায়ের তলার সিঁড়ি, তার অনন্ত পূর্ণবিকাশের এক একটি দল ফুটিয়ে তোলার উষা, তার পরিণতির আনন্দের ক্ষণিক সুখ-মুহূর্ত্ত। এই দিক দিয়ে History repeats itself—এ কথার মত মিথ্যা আর নাই; ইতিহাসের কোন অধ্যায়ই ঠিক পুনরভিনয় হয় না, মার্কিণ বা রুষের ছাঁদে ভারতকে গড়া যায় না, আসল ভারত এই সব রস আহরণ ক'রে স্বে মহিম্নি অধিষ্ঠিত থেকে আপন ভঙ্গীতে ফুটে ওঠে।

আজ অষ্টাদশ বৎসরের নিভৃত একান্ত সাধনায় সকল শক্তি ও বৈচিত্র্যের মূলে স্বষ্টির ঘরে পৌঁছে শ্রীঅরবিন্দ যে কথা বলছেন, মানুষের, বিশেষতঃ য়ুরোপের ইতিহাস দেখলে তা সত্য বলেই মনে হয়। কারণ, মানুষের দিকে তাকালে স্বাধীন মুক্ত মানুষ বড় একটা দেখা যায় না, সব মানুষই মনে হয় অল্পবিস্তর তাড়িত ও আবিষ্ট, কেউ বা অসুরাবিষ্ট আর কেউ বা দেবাবিষ্ট। মানস-জগতের উচ্চ স্তরের এই সব আদর্শ এক একটি দ্যুতিমান্ স্বর্ণ-গোলকের মত কে যেন জগতে মাঝে মাঝে গড়িয়ে দিচ্ছে আর লুব্ধ ক্ষুব্ধ উন্মত্ত জনসঙ্ঘ নিজেদের দলে পিষে ম'থে তার পেছনে রৈ-রৈ রবে ছুটছে। সেটা ধরতে না ধরতে আর একটা নবোদিত সূর্য্যের মত স্বর্ণপিণ্ড এসে পড়ছে আর সুদূর দিক্‌চক্রবালে কোথায় হারিয়ে যাওয়া পুরাতনটাকে ছেড়ে এই নূতন স্বর্ণমৃগের পেছনে আবার তেমনি নবদৌড় আরম্ভ হচ্ছে। এক একটি আদর্শের কাঞ্চন-গোলক দেখতে যত বেশী দীপ্ত ও ভাস্বর, তার পিছনে তা আয়ত্ত করবার প্রয়াস তেমনি অধিক উদ্দাম ও বীভৎস। এই সব অপেক্ষাকৃত দিব্য আদর্শের লোভে মানুষের যাচ্ছে খুন চেপে, হিউম্যানিটি বা বিশ্বমানবের কল্যাণ-কামনায় মানুষ হয়ে উঠছে লোলুপ ও রক্তপিপাসু। এক দিন নিজের বাহ্য সভ্যতার মদে মত্ত য়ুরোপ প্রাচ্যে এসেছিল নিয়ে এক হাতে অসি আর অন্য হাতে বাইবেল, আজ সেই বণিক য়ুরোপ ভাবুক সেজে আসছে ঠিক সেই ভাবেই এক হাতে অসি ও অন্য হাতে সাম্য গণতন্ত্র নিয়ে—তার বক্তব্য হচ্ছে 'Be my brother or I kill you'।

এই আদর্শের মদিরামোহ বা ভূতাবেশ ভগবানেরই ইঙ্গিতে হচ্ছে বটে, এক এক যুগে পূর্ণ সত্যটির এক একটি দল খুলবার সহায়তা করছে বটে, কিন্তু তাতে কল্যাণ খুব যে বেশী হচ্ছে, তা' নয়। কারণ, মানুষ স্বপ্রতিষ্ঠ না হ'লে, সহস্র ক্ষুধা ও বাসনার নাগপাশ হ'তে মুক্ত না হ'লে কল্যাণ—যথার্থ স্থায়ী কল্যাণ করতে পারে না। মানুষের প্রকৃতিতে লোভ বা অহঙ্কার যখন প্রবল ও দুর্দ্দম হয়ে ওঠে, তখন তার সত্তার পিছনে আসুর লোকের দুয়ার খুলে যায়, সেই ক্ষিপ্ত বাসনার ছিদ্রপথে তার সত্তার উপর অসুর-জগতের প্রভাব এসে পড়ে, দুর্ম্মদ এক অচিন্ত্য শক্তির ঝলক তাকে পাগল ক'রে তোলে,—কারণ, সে গরিমা দেবত্বেরই ছায়া, 'ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী'ই হচ্ছে তার মূলমন্ত্র। পাশ্চাত্যের ভোগবাদ এবং পতিত এসিয়া ত বিশেষতঃ ভারতের আসুরিক উগ্র ত্যাগবাদের দ্বারা জগতে আজ অসুর-লোকের করাল ছায়া সর্ব্বত্রই পড়েছে, চতুর্ব্বর্গ আজ অসুর-করতলগত, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল মানুষ আজ অসুরাশ্রিত। তাই মতের বা আদর্শের সঙ্কীর্ণতায় দীন মানুষ জগতের কল্যাণকামনায়ও আজ রক্তপিপাসু, শক্তির মদ-মত্ততায় সে আজ পরম কল্যাণের দস্যু, লোকহিতের গুণ্ডা। যে পরস্বাপহারী শুধু অর্থ অপহরণ করে, সে তবু বেশি ক্ষতি করে না; কিন্তু যে লগুড়-হস্ত দস্যু বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও অন্তরের স্বাতন্ত্র্য অপহরণ করে, সে বড় ভয়ানক। আদর্শের জগতের এই সব চেঙ্গিজ খাঁরা ভাবে যে, মেরে ঠেঙিয়ে জগৎকে সোজা ক'রে দেওয়া বড় সহজ; জগতে বৈচিত্র্য তারা চায় না, স্বষ্টির নানামুখীন ঐশ্বর্য্য তারা বোঝে না, তারা চায় একরঙা দুনিয়া, আদর্শের এক effective machineএ কাটা-ছাঁটা প্যাটার্ণ মাফিক compressed লেবেল আঁটা মানুষ।

মুক্তির স্বপ্নে বিভোর মানুষ তাই ক্রমাগত মুক্তিকেই খর্ব্ব ক'রে চলেছে, বন্ধনের পর বন্ধনেরই স্বষ্টি করছে, ব্যক্তির কল্যাণে সমাজকে ভাঙছে, আদর্শ সমাজের সৃজনে ব্যক্তিকে পিষছে, সুখের আশায় রাশি রাশি দুঃখের স্তূপ রচনাই হয়ে উঠেছে তার কায, কারণ, তার ধারণা, দুঃখের এই কণ্টকবৃক্ষে এক দিন তার আশার গোলাপ অপরূপ মাধুরী নিয়ে ফুটবে। আসলে মানুষ প্রকৃতিস্থ না হ'লে, বাসনার নাগপাশ থেকে মুক্ত না হ'লে, এই সব কাম-সঙ্কল্পের উত্তাপবর্জ্জিত না হ'লে, শান্ত, স্থিতধী ও বিরাট না হ'লে, "কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ" হ'তে পারবে না, কারণ, স্বষ্টির কমল তার ক্ষুদ্র অহং নয়, সে হচ্ছে তার পিছনের বিরাট সত্তা, কেবল সেইখান থেকেই ভাগবত রাজ্য বা স্বারাজ্য সম্ভব।

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

সত্যের অধিকার

পরিচ্ছেদ—এক

মাধোলাল ফুটবল ম্যাচ্ খেলে বাড়ী ফির্‌ছিল। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে; কিন্তু মিউনিসিপুলের মন্থর ব্যবস্থায় তখনো আলো জ্বালা হয়নি। আকাশে মেঘও ছিল, বৃষ্টিও এক-আধ ফোঁটা দুপুর থেকে পড়ছে; হয় ত বা রাতে চেপে বৃষ্টি নাম্‌বে।

মাধোর সে দিকে বড় একটা লক্ষ্য ছিল না। সে ভাব্‌ছিল তখনো খেলার কথা। গ্রেহাম দৌড়তে পারে না; কিন্তু বলটা পেলেই হ'লো! মাঠের এক দিকে থেকে আর এক দিকে--আকাশে রামধনুক এঁকে যেন বল গিয়ে পড়লো—উঃ কি জোর পায়ের!—কি যে খায়! ধন্যি সাধনা!

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে মাধো একটা পাণের দোকানে দাঁড়াল সিগ্‌রেট কিন্‌তে।

পাণওয়ালা জিজ্ঞেস করে, কো জিতা বাবু? দেশী লোক, না সাহাব লোগ্?

মাধোর লজ্জা করে; কিন্তু সে কাপুরুষ নয়;—উত্তরে বল্লে, সাহাব লোগ জিতা—জলদি দেও জি,—দেরি নেহি করো ম্যান—(একদম সাহেবি ঢং!)

পাণওয়ালা হাসে।

হাসিটা তার কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে!

অন্ধকার আরো ঘনিয়ে এসেছে; বৃষ্টিও ক্রমেই বাড়ে! মাধো মাথায় একটা রুমাল বেঁধে চলেছে লম্বা লম্বা পা ফেলে, তখনো বাড়ীটা মাইল দেড়েক দূরে।

সে চ'লেছে যেন একখানা ইঞ্জিনের মত, হুস্ হুস্ ক'রে ধোঁয়া ফেল্‌তে ফেল্‌তে। মনের মধ্যে সেই একই তর্ক-বিতর্ক; কি করলে, দেশের লজ্জা দূর করা যায়···কি করলে···

এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটা শব্দ তার কাণে গেল!

হায় রে বাপ! জান লিয়া···হায় রে বাপ!

শব্দভেদী বাণের মত মাধো ছুটল সে দিকে—ব্যাপার কি?

ব্যাপারটা কি, জানতে বড় বেশী বিলম্ব হ'লো না।

একটা গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান। দিনের শেষে সে-ও ফিরছিল বাড়ী, গাড়ীখানাকে সেই অন্ধকারের মধ্যে হৈ হৈ শব্দে হাঁকিয়ে। কর্ত্তাদের ব্যবস্থার অনুকরণে তারও ছিল না আলো।

সেই গাড়াখানার উপর এক জন সায়েব স-সাইকল এসে প'ড়ে, নিজের দু'চাকা গাড়ীখানার চুরমার হয়ে যাওয়ার রাগ তুলেছেন ঐ গরীব লোকটার উপর। তার নাক-মুখ দিয়ে ঝুঁজিয়ে রক্ত পড়ছে!

টর্চের আলো ফেলে মাধোর রক্ত দেখে হঠাৎ খুন চেপে গেল। সে টেনে গোটা কয়েক ঘুঁসি সায়েবের নাকে মারতেই—সাহেব যেন কাটা তাল গাছের মত রাস্তার উপর দুম ক'রে প'ড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগলো।

মাধো বুঝলে ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াবে, তাই সে পাশের গলির মধ্যে ঢুকে প'ড়ে সটান নিজের বাড়ী গিয়ে উঠলো।

বাড়ী পৌঁছে সে ম্যাচের পোসাক খুলে ফেলে, ধাঁ ক'রে ষ্টোভটা জ্বেলে দিয়ে একটু চা খেয়ে নিয়ে আবার বেরিয়ে প'ড়ে ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়—জানবার জন্যে মনে মনে যেন ছট-ফট করতে লাগল।

সায়েবকে বেদম ক'রে মারার ইচ্ছাও তার ছিল না, আর মেরে পৃষ্ঠ-প্রদর্শনটা তাকে রীতিমত অসুস্থ ক'রে তুললে। মনের মধ্যেও সত্যি সে ততখানি কাপুরুষ কোন কালেই নয়!

ষ্টোভের পাশে ব'সে সে সেই শব্দের মধ্যে যেন নিজেকে ক্ষণিকের জন্য হারিয়ে ফেলে কত কি ভাবতে লাগল।

একবার মনে হয়, তাই ত, যদি সায়েবটা ম'রে যায়।—তা হ'লে? কি তার করা উচিত? ধরা দেওয়া?

ঝাঁকি দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে, মাধো বল্লে, কখ্খনো না! তাতে দুনিয়ার লাভ? যা' দিনকাল যাচ্চে—যদি বলি, খুন করার এক বিন্দু ইচ্ছেও ছিল না। আদালত তাই বিশ্বাস করবে?

চা খেয়ে কিন্তু তার মেজাজটা অন্য রকম হ'লো। সে বল্লে, হতেই পারে না, অত বড় একটা জোয়ান মর্দ্দ দু-একটা ঘুঁসিতে কিছুতেই ম'রে যায় না—ইম্‌পসিব্‌ল—অ-স-ম্ভ-ব!

এবার নিছক দেশী পোষাকে সে আবার বেরিয়ে গেল—সঠিক খবর জানতে।

পরিচ্ছেদ—দুই

তত দূর পর্য্যন্ত যেতে হলো না; তার আগেই লোকের জমায়েৎ থেকে জান্‌তে পারা গেল যে, মাধো যাকে ঘুঁসি লাগিয়েছে, সে এক জন সি আই ডি;—আর ব্যাপারটা খুব সহজেই নিষ্পত্তি হবে না।

মাধো আর এগুলো না; কারণ, সে শুনলে যে, গোরাটাকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আর সেই সঙ্গে পুলিস সেই গাড়োয়ানটাকেও নিয়ে গেছে; কারণ, খুনীকে চেনার জন্যে এক জন সাক্ষী চাই ত?

মাধোলাল আর সময় নষ্ট না ক'রে বাড়ী এসে মাকে বল্লে, মা, এই রাতের গাড়ীতেই আমি প্রয়াগ যাচ্চি।

মা। কেন রে? কি হয়েছে?

মাধো। কিছু না, ম্যাচ খেলতে যাবে ইস্কুল থেকে ছেলেরা সব,...তারই সঙ্গে...

মা। কবে ফিরবি?

মাধো। দুচার দিনের মধ্যেই...

মা নিজের মনে মনে বকতে লাগলেন; খেলা! খেলা! খেলা! সেকালে ছেলেরা খেললে মার খেতো;—আর একালে? মাষ্টেরগুলো যেমনি আকাট, তেমনি চুলোয় যাক লেখা-পড়া! কেবল শোন, ফুটবল! ফুটবল! না, ওদের মাথা-মুণ্ডু পিণ্ডি!...

মাধোলালের কথাগুলো কাণে আস্‌ছিল। সে বললে, একালে পড়ে-শুনে কি সাড়ে বাইশ হয়? ওই যে ওবাড়ীর খোদন হাকিম হলো—সে কিসের জোরে? খেলায় আজকাল সব হয়, জান; লাটসাহেবের নজরে পড়লে?... ও-সব তুমি কিছু বুঝবে না, মা।

মা কিন্তু ও কথা বোঝেন না। খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বল্লেন, তা যাচ্চিস্ ওদিকে ত, কটা ইষ্টিশান বই ত নয়? মিনিকে একবার দেখে আসিস—পারিস ত।

মাধো উত্তর দিলে, সে আমার মনে-মনে আছে। তুমি তাই ব'লে সবাইকে বলতে যেও না যে, কোথায় গিছি...

মা। কেন বল্ ত?

মাধো। না, কিছু না; তবুও আজকাল সময় খারাপ...কোন কথাই কাউকে বলতে নেই।

মা একটু অবিশ্বাসের সঙ্গে মাধবের মুখের পানে চেয়ে থাকেন।

অত রাত্রে ইষ্টিশানে বড় কেউ ছিল না, অতএব মাধো পার হয়ে গেল নির্ব্বিঘ্নে।

পরের দিন গোটাকয়েক ছেলেকে ধ'রে নিয়ে গেল ইস্কুল থেকে। হেডমাষ্টার কোন আপত্তি করতে পারলেন না। কেন না, দেড় শ' টাকার মাইনের চাকরী সহজে জোগাড় হয় না। তা ছাড়া ছোঁড়াগুলো এমনি বেয়াড়া হয়েছে যে, একটু জব্দ হওয়াই দরকার। কোথায় সায়েব দেখলে সেলাম ক'রে স'রে যাবে, না, ঘুঁসি?

পরিচ্ছেদ—তিন

তিন দিন পরের 'ষ্টেটস্‌ম্যানে' মাধো দেখলে যে, সি আই ডি অফিসার রবিনশন্ মারা পড়েছে। হাঁসপাতালে মরার আগে সে যা ব'লে গেছে, তাতে যে কোন ছোকরাকে ধ'রে ঐ খুনের দায়ী করা চলে।

মাধবের মন যেন বললে যে, এলাহাবাদ যায়গাটা লুকিয়ে থাকার পক্ষে সুবিধার নয়—তাই সে আরও গা-ঢাকা দেওয়ার জন্যে চ'লে গেল বৃন্দাবনে। সেখানে গিয়ে পরম বৈষ্ণব সেজে লেগে গেল—এক সেবাশ্রমের কাযে।

দু'বেলা দু-মুঠো খায়, আর পথঘাট থেকে রুগী কাঁধে ক'রে নিয়ে আসে আশ্রমে। সেখানকার ডাক্তার বাবু

তাদের হেপাজৎ ক'রে বিছানা দেন, ওষুধ দেন, পথ্যের ব্যবস্থা করেন।

মাধব ভাবে, এমনি ক'রে কত দিন চলবে? অবশ্য মা'র জন্য ভাবনা নেই, তাঁর দু'মুঠো খাবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সেবাশ্রমে বেগার দিলে তার জীবনের ভবিষ্যৎটা যে একেবারে অন্ধকার হয়ে যায়।

তাই সে আরো উত্তরে, আরো নিরাপদ যায়গায় গিয়ে এমন কোন একটা কায নিতে চায়, যাতে তার মনের উপর মরচেও না ধরে, অথচ সে একটা মানুষের মত মানুষ তৈরি হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু ডাক্তার বাবুটি এত ভাল লোক যে, তাঁকে কিছু না ব'লে চ'লে যেতেও তার মন চাইলে না। সে গিয়ে তাঁকে নিজের মনের কথা খুলে বললে।

ডাক্তার বাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললেন, তোমাকে একটা কথা বলি বলি করছিলাম, মাধো! তোমার উপরে যেন পুলিসের নজর আছে ব'লে মনে হয়। তোমার সম্বন্ধে কিছু কিছু খোঁজ-খবর নিতে সুরু ক'রে দিয়েছে যেন তারা।

মাধোর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। খানিক পরে সে বল্লে, উপায়?

ডা। উপায় আছে, তুমি মায়াবতী চ'লে যাও, সেখানে তুমি যা চাইচ, তাই পাবে। সেখানে লেখাপড়ার সুবিধে আছে, আর পুলিসের নজর অনেকটা ঢিলে।

মাধো চুপ ক'রে শুন্‌তে লাগলো।

ডা। আমি চিঠি দিচ্চি, তুমি আর দেরি ক'রো না।

মাধব সেই রাত্রেই রওনা হ'য়ে গেল।

মাধো মায়াবতী গেল না। কাউকে জানিয়ে কোন কায করতে যেন তার আর মন চায় না। সাহস হয় না। তাই সে মাঝ-পথের একটা ইষ্টিশানে নেমে গিয়ে, একটা রাস্তা ধ'রে দুচোখ যে দিকে যায়, চলতে লাগ্‌ল।

প্রায় দিন শেষ হয়ে আসচে, পথে বড় লোকজন নেই;—মাধো চলেইছে—সে জানে না, রাত্রে কোথায় থাকবে।

পাহাড়ীদের প্রকৃতি জানা নেই, তাদের ঘরে অতিথি হ'তে মন চায় না। এ দিকে শীত বেশ, বাইরে কাটানও সম্ভব নয়। মাধো ভাবে, কি করা যায়?

সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি, এত পথ চ'লে সে বড় শ্রান্তি বোধ ক'রে একটা পাথরের উপরে ব'সে ভাবতে লাগল।

হঠাৎ মাধো চম্‌কে উঠলো ঘোড়ার পায়ের আওয়াজে যেন এক দল ঘোড়া ছুটে আস্‌চে সেই দিকে। এত ক্লান্ত হয়েছিল যে, উঠে একটু গা-ঢাকাও দিতে ইচ্ছা হয় না। সে চুপটি ক'রে ব'সে রইল—হোগ্‌গে, যা' হবার!

পরিচ্ছেদ—চার

এক দল নয়—মাত্র দুটো ঘোড়া; কিন্তু পাথরের রাস্তার শব্দের প্রতিধ্বনিতে অমন শোনাচ্ছিল। একটি সায়েব, আর একটি মেম।

তারা মাধোকে দেখে একটু অবাক্ হয়ে থম্‌কে দাঁড়াল:—সায়েবটি একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে—কাঁহা যায়েগা? কাঁহাসে আতা?

মাধো বল্লে, নেহি জান্‌তেঁহে;...মালিক যাঁহা লে যায়েগা...যায়েঙ্গে...

মেমসায়েব ইংরাজীতে বল্লেন, ছেড়ে দাও, চল, অন্ধকার হয়ে যাবে।...ও একটা পাগল...চল, চল,...দেরি ক'রো না...

মা। না, মাদাম, পাগল নই,...মুস্কিলে পড়েছি...

মাধোর ইংরাজী শুনে সায়েব ঘোড়া থেকে নেমে প'ড়ে বল্লে, হামলোককো সাথ চ'লো...রাতকে ঠহর কর, যাঁহা খুশী যাও।

মা। থ্যাংকিউ...

সায়েব বল্লে, সে সব পরে হবে,এখন চল,রাত হয়ে যাবে।

মাধো উঠে প'ড়ে ধীরে ধীরে চল্‌তে লাগ্‌ল।

সায়েবদের বাংলো বেশী দূরে নয়। মাইল দুই গিয়ে—একটা বৈক ফিরতেই সুন্দর বাড়ীখানি। সাজান-গোছান ঝক-ঝক করছে।

ক্যায় নাম হ্যায়? সায়েব জিজ্ঞাসা করে।

মাধো আগে থেকেই স্থির ক'রে রেখেছিল যে, ঠিক নাম আর এবার বল্‌বে না। তাই সহজেই বল্লে, রূপলাল।

জাত মান্‌তা? কেয়া খায়েগা?

রূপলাল বল্লে, জাত সব কোই মান্‌তা হৈ, সায়েব যো মিলেগা ওহি খায়েঙ্গে—মাস নেই খাতে হেঁ।

রোটি?

রূপলাল উত্তর করলে, বহুৎ খুশী সে।

মেম সায়েব পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, হেসে বল্লেন, তোমার যেমন সব উদ্ভট প্রশ্ন।

সহিসের সঙ্গে ভাব ক'রে নিতে মাধোর একটুও দেরি হ'লো না। সে জিজ্ঞাসা করলে, ইএ কোন্ সায়েব হ্যায়, ভাইয়া?

সহিস বল্লে, এটি আসল সায়েব নয়। তার সায়েব হচ্চে রবিনশন্—পুলিসে বড় চাকরী করতো—কাশীজিতে এক শয়তান তাকে খুন ক'রেছে। তোবা, তোবা!

মাধোর বুকটা কেমন ক'রে উঠলো। সে চুপ ক'রে বিরিঞ্চির মুখের দিকে চেয়ে রইল।—বিরিঞ্চি ঘোড়া ম'লছিল;—সে বল্লে, আমার সায়েব বুড়ো হ'য়েছিল, কলেজায় অসুখ ছিল, ওর বেটা কত মানা দিয়েছিল;—আর কাম ক'রো না; বাবু, আর কাম ক'রে কাম নেই—বুড়ো কারুর কথা শুন্‌লে না, ভাই;—শেষ মরতে হ'লো,—নসিব, নসিব!—ব'লে বিরিঞ্চি কপালে হাত ঠেকায়!

মাধোর মনে কেমন একটা সন্দেহ জ'মে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। তাই ত! সেই বুড়োটাকে মেরেই এই খুনের দায়েই বুঝিবা সে পড়েছে। সে অনেকক্ষণ চুপটি ক'রে ব'সে ব'সে মনে মনে নানান্ কথা তোলা-পাড়া ক'রে:—

দেখ ত মজা! ধন্য তুমি ভগবান্! যাকে মারলুম, তারি ঘরে ডেকে নিয়ে এসেছ? এ কি অদ্ভুত তোমার বিচার, এ কি কঠিন শিক্ষা দিবার তোমার পদ্ধতি।

খাবার যেন তার মুখে রোচে না। একটু জল খেয়ে সে প'ড়ে রইল,—সহিসটার পাশেই। সকালে উঠে লম্বা দৌড় দিতে হবে। এখানে থাকা হ'তেই পারে না।

একটু তন্দ্রা আস্‌ছে, এমন সময়, বিরিঞ্চি তাকে ডেকে তোলে।

কি?

বি। মিস্ বাবা বোলায়া।

পরিচ্ছেদ পাঁচ

ত বেশী হয়নি, সবে নটা।

মেম সায়েব বল্লেন, রূপলাল, তোমার শোবার যায়গা আস্তাবলে হ'লে তুমি শীতে মারা পড়বে—

রূ। কেন, বিরিঞ্চি ত ওখানেই শোয়?

মেম। সে পাহাড়ী, ছোট লোক···এ শীত তার সহ্য হবে···কিন্তু তুমি তা পারবে না···আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, এত শীত তোমার সহ্য করবার অভ্যাস নেই।

রূ। তা' সত্যি, বিরিঞ্চি গরীব; আমি ততটা নই।

মাধোর এই কথায় হঠাৎ মেম সায়েব যেন ভারি কেমন লজ্জা বোধ করলেন।

মেম। রূপলাল, আমায় ক্ষমা করো; বিরিঞ্চিকে অপমান করার জন্যে তাকে ছোটলোক বলিনি, ওটা আমাদের অভ্যাসের দোষ।···একটা কথা তোমাকে বলি, তা হ'লে তুমি আমার উপর অনেকটা সদয় হবে···

মাধো মেম সায়েবের মুখের দিকে আগ্রহ-ভরে চেয়ে রইল।

মেম। তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে—আমার মা এক জন ভারতবর্ষের মেয়ে···অবশ্য আমার বাবা—ইংরেজ; সম্প্রতি তিনি কাশীতে মারা প'ড়েছেন। শুনছি, এক জন যুবক তাঁকে খুন করেছে; কিন্তু আমার তা' মনে হয় না। তাঁর শরীর জীর্ণ হয়েছিল;···তার পর, সামান্য উত্তেজনাতেই মৃত্যু হ'য়েছে। সেই যুবকটির জন্য আমি পরম ব্যথা অনুভব করি; কেন না—পুলিসের লোক মেরে, তাকে এক দিন না এক দিন, ফাঁসিকাঠে ঝুলতেই হবে।

মাধোর পায়ের তলায় পৃথিবী যেন টলমল করে!

মেম। রূপলাল, তুমি বড় পরিশ্রান্ত, যেন ট'ল্‌চ; ব'সো না এই চেয়ারখানায়?—না হয়, গিয়ে শুয়ে পড়···কিছু খেয়েছ কি?

মাধো চেয়ারে বস্‌লো।

মেম। তোমাকে ইতিপূর্ব্বে ডাকা উচিত ছিল আমার ···কিন্তু ডাকিনি কেন জান?

মা। জানি না।

মেম। ওটি পুলিসের লোক, তোমার উপর ওর সন্দেহ যে, তুমি কোন অন্যায় কায ক'রে; কিম্বা কোন অন্যায় কামের খোঁজে বেড়াচ্ছ,—তোমাকে উনি এনার্কিষ্ট মনে করেন।···এতক্ষণ উনি ছিলেন, তাই তোমাকে ডাকিনি।

মাধো চুপ ক'রে মাথা হেঁট ক'রে ব'সে রইল। তার

মনের মধ্যে কি যেন তোলপাড় করে…মনে হয়, সব কথা বলেই ফেলে।

কিন্তু সে সে রাতের জন্য নিজেকে সম্বরণ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে ব'ল্লে, ধন্যবাদ আপনাকে, কা'ল সকালে কি আপনার সঙ্গে দেখা হবে? কয়েকটা কথা আপনাকে ব'লবো…

মেম। নিশ্চয়, নিশ্চয়; কা'ল সকালে তুমি আমার টেবিলে এসে চা খাবে, চা খাও ত?

মাধো হেসে বল্লে, একটু বেশী রকম।

পরিচ্ছেদ—ছয়

রাতে মাধো ঘুমতে পারেনি।

মানুষের মনের মধ্যে দিয়ে যখন দোটানা বইতে থাকে—তখন মুখে অন্ন রোচে না, চোখে ঘুম আসে না: তাই সকালে মাধোকে দেখে মেরি রবিনশন্ ঠিক ভূত দেখার মত চম্‌কে উঠলো।

মে। এ কি, রূপলাল? তোমার কোন অসুখ হয়নি ত?

মাধো মাথা নেড়ে বল্লে, না, রূপলাল নয়; মাধোলাল; যে নামে আমার মা আমাকে ডাকেন; সেই নামের অধিকার আপনাকে দিলুম।

মেরি একটু বিস্মিত হ'লো; কিন্তু সেটা চাপা দিয়ে বল্লে, ঠিক্ ঠিক্,—আমি শুনেছি,—অনেকের দুটো নাম থাকে…তোমার মা বুঝি, তোমাকে মাধো ব'লে ডাকেন?

মাধো চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

মেরি তাকে খুসী করার জন্যে অনেক আজে-বাজে কথা বলতে লাগলো, যারা চা বেশী খায়, তাদের সকালে চা না হ'লে জুৎ হয় না;—কি বল? তোমার মা বুঝি, খুব ভোরে উঠেন? তিনি বুঝি, সব কাযের আগে, তোমার চা ক'রে দেন?

মাধো বল্লে, নাঃ, চা আমি নিজের হাতে করি, মা সকালে উঠে গঙ্গাস্নান করতে চ'লে যান। তাঁর ফিরতে অনেক বেলা হয়…মা বিধবা কি না।

মেরি হিন্দু বিধবার শুচিময় জীবনের কোন ধারই ধারতো না;—তাই, সে চোখ দুটো ডাগর ক'রে রইল। ও সব কথা সে বুঝতে পারে না।

চা খাওয়ার পর মাধো বল্লে,—আমি একটা কথা আপনাকে বল্‌তে চাই; কিন্তু জানিনে…মাধো হঠাৎ চিন্তা-সমুদ্রে ডুবে গিয়ে চুপ হয়ে গেল।

মেরি খানিক অপেক্ষা ক'রে ব'ল্লে—বল মাধোলাল, তোমার কোন ভয় নেই…

মা। আমাদের শাস্ত্রে একটা কথা আছে, সেটা আমি বড় মানি; আপনি রাগ করবেন না?…

মে। সে কি কথা? আমি হিন্দু শাস্ত্রকে গভীর শ্রদ্ধা করি, মাধোলাল! আমার বাবা যে থিয়োজফিষ্ট ছিলেন।

মা। তবে বলি, সত্যের অধিকার আপনি মানেন?

মে। সত্যের অধিকার বল্‌তে তুমি কি বোঝ?

মা। বুঝি এই যে, কোন কোন কথা কোন কোন লোকের শোনার অধিকার থাকে না…

মে। যেমন?

মা। মনে করুন, এক জন রুগীর জ্ঞান আছে;—কিন্তু তার বাচার কোন আশা নেই; সে যদি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে—তা হ'লে, ডাক্তার কি তাকে বল্‌বে, তোমার মৃত্যু আসন্ন এবং অবধারিত?

মে। কিছুতেই না?

মা। কেন?

মে। বুঝেছি মাধোলাল। ভারি সুন্দর তোমার কথা। ঠিক্! ঠিক্!—অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। তুমি বুঝি কোন কলেজের ফিলসফির প্রফেসর?

মাধো হেসে বল্লে, আমি শিক্ষার্থী মাত্র, ছাত্র!—স্কুলের,—কলেজেও যেতে পারিনি এখনো।

মেরি বল্লে, কিন্তু তোমার কাল্‌চার দেখে তা মনে হয় না…

মা। এই যে দার্শনিক ভাবুকতা, এ এ দেশের সকলের আছে—চাষা-ভূষো ধোপা-নাপিত—এরই আধিক্যে আ… ভারতবর্ষ মরছে!…

মেরি চুপ ক'রে রইল।

মা। কিন্তু ওটা একটা অবান্তর কথা;—আ… আগের কথাই বলি, আমি আপনার কাছে যে কথা বল… তার জন্যে আপনার হাত থেকে আমি সকল শাস্তি নি… প্রস্তুত আছি…কিন্তু আপনি যদি অন্য কারুর সা… নেন—তা হ'লে, কিন্তু আপনি সত্য থেকে চ্যুত হয়…

আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন; কেন না, এই কথা আপনাকে না বল্লেও ত আমি পারি ?···

মেরি অবাক্ হয়ে শুন্‌ছিল; সে বল্লে, মাধোলাল, তুমি নির্ভয়ে আমাকে সব কথা বল্‌তে পার; আমি বিশ্বাস-ঘাতকতা কর্‌বো না···নিশ্চয়···

মা। তবে শুনুন আপনি; আমারই ঘুঁসিতে আপনার পিতার মৃত্যু হয়েছে; কিন্তু আমি তাঁকে হত্যা করবো ব'লে মারিনি; তিনি একটা গরীব গাড়োয়ানকে মেরে নাক দিয়ে রক্ত ছুটিয়ে দিয়েছিলেন; সে অন্ধকারে গাড়া নিয়ে চলেছিল—মাত্র এই তার দোষ!···আমি ঘুঁসি মেরে স'রে প'ড়েছিলুম···কিন্তু তাতে কারুর মৃত্যু হ'তে পারে না; মৃত্যু তাঁর অদৃষ্টবশে, আপনি হয়েছিল···এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস!

মাধোলাল মাথা তুলে দেখে, মেরি সোফার উপর মুর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে আছে। তার মুখ নালবর্ণ হয়ে গেছে!

মাধো তাড়াতাড়ি গিয়ে বিরিঞ্চিকে ডেকে আন্‌লে। দুজনে সোফা শুদ্ধ মেরিকে বাইরের মুক্ত আকাশে বার ক'রে—মুখে জল দিয়ে বাতাস করতে লাগলো।

বিরিঞ্চি বল্লে, বুড়ো সাহেবের ইন্তকালের (মৃত্যু) পর এই রোগে ধরেছে, মিস্ বাবাকে। রূপলাল তুমি থাকো,··· আমি ডেকে আনি···ঐ সাহেবকে।

মাধো বল্লে, দরকার নেই; এখুনি ভাল হয়ে যাবে। তুমি বাবুর্চ্চিকে দুধ গরম ক'রে আন্‌তে বল; জল্‌দি যাও, দেরি নয়, বিরিঞ্চি।

বিরিঞ্চি বাবুর্চ্চিখানার দিকে উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটলো।

মাধো নিশ্বাস বন্ধ ক'রে—প্রতীক্ষা করতে লাগলো, কখন্ মেরির জ্ঞান ফিরে আসে! সে জান্‌তো, শোকাবেগে মেয়েদের এমন মূর্চ্ছা হয়। তার বাবার মৃত্যুর পর—তার মায়ের এই রকম হ'তো। পাঁচ দশ মিনিট পরে আবার সুস্থ হয়ে উঠতো।

পরিচ্ছেদ—সাত

মেরি জ্ঞান হয়ে মাধোর দিকে চেয়ে বল্লে, মাধোলাল, আমার দুর্ব্বলতাকে মার্জ্জনা ক'রো; তোমার উপর আমার একটুমাত্র ক্ষোভ নেই।···

মা। আপনি বেশী কথা কইবেন না—এখনও বড় দুর্ব্বল আছেন···এই দুধটুকু···

মাধোলালের কথার মধ্যে এমন একটি আত্মীয়তার সুর ছিল, যা সহজে মানুষ ভুল করে না। মেরি মনে মনে ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেল, তারও মনটা মাধোর প্রতি একটুও ত বিরূপ হয় নি। যদিও সে জান্‌তে পেরেছে যে, পিতার মৃত্যুর সে অন্ততপক্ষে উপলক্ষ্য।

দুধটুকু খেয়ে— মেরি বল্লে, আমার এই ব্যস্ততার একটা কারণ আছে, মাধোলাল।

মাধোলাল উৎসুকনেত্রে চেয়ে রইল।

মেরি। আমার বিশ্বাস, আমি একটু সুস্থ হ'লেই তুমি অন্যত্র চ'লে যাবে···বোধ করি, তা যাওয়া মোটের ওপর,—অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য দরকার হবে, কিন্তু আমার সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ না ক'রে তুমি কিছুতেই চ'লে যেতে পাবে না।···আমি অনেকটা ভাল বোধ করছি। তুমি এক কায কর, ঐ পশ্চিম দিকের রাস্তা ধ'রে কিছু দূর বেড়িয়ে এস···বারোটার আগে ফিরো না···

মাধো 'আচ্ছা' ব'লে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলো

মে। তোমার কাছে ঘড়ি আছে ?

মা। না।

মে। এইটে নিয়ে যাও।···আমার বিশ্বাস, এগারটার মধ্যে আমি ওই পুলিসের লোকটাকে সরিয়ে দিতে পারবো। তার ঠিক নটার সময় আসার কথা; এসে প'ড়লো ব'লে ···তুমি চট্‌পট্ বেরিয়ে পড়···এক মিনিটও দেরি নয়, আমি চাইনে যে, সে তোমাকে দেখে···

মাধো একটু হেসে চ'লে গেল।

নটা বেজেছে কি না, পিটার এসে উপস্থিত।

মেরি ব'সে কি একটা বুন্‌ছিল।

পিটার, মেরির বাপের নীচে, সি আই ডিতে,—কায করে। এই পরিবারের সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়। পিটারের মনে মনে আরও একটু বাসনা ছিল। সম্প্রতি সেটা একটু উন্মুখ হয়েছে। মেরি সেটা ভাল ক'রেই জানে; এবং তার জন্যে কিছু বিব্রত মনে করতে আরম্ভ করেছে, নিজেকে সে।

পিটার। ইস্! তোমাকে ভারি ফেঁকাসে দেখাচ্ছে!··· রাতে বুঝি ভাল ক'রে ঘুম হয় নি?

মে। ধন্যবাদ, মিষ্টার পিটার, রাতে ঘুম হয়েছিল, কিন্তু সকালে আবার সেই ফিট্ হয়েছিল—

পি। উঃ, কি ইডিয়ট্ তোমার ঐ লোকটা, ওকে আমি ধ'রে ব'লে দিয়েছিলুম···

মে। ওর কোন দোষ নেই—ও যেতে চেয়েছিল; কিন্তু রূপলাল যেতে দেয় নি।

পি। রূপলাল? আবার সে কোন্ জানওয়ার?

মে। তোমার নিমন্ত্রিত অভ্যাগতটি, মশাই···

পি। বটে! বটে! সে কখন্ এত বড় মুরুব্বী হয়ে উঠলো?

মেরি হেসে বল্লে, বিপদের ত ওই মজা! একটা নগণ্য লোকও তখন জাঁদরেল হয়ে উঠে।

পিটারের মুখটা হঠাৎ লাল হয়ে উঠলো।

সে কা'ল রাতে মেরিকে উপদেশ দিয়েছিল যে, আর অবিবাহিত থাকা তার উচিত হয় না।

কেন?

বিপদের সময়·· ইত্যাদি···

মেরির সে কথাটা মনে হয়ে যাওয়াতে সে বল্লে, কিন্তু তাই ব'লে, মিষ্টার পিটার যেন মনে না করেন যে, আমি তাঁর কোন উপদেশের উপর কটাক্ষ করছি!—এটা একটা অত্যন্ত সাধারণ কথা···

পি। থ্যাঙ্ক ইউ···; কিন্তু সেই —মাথা-খারাপ ছোক্‌রা গেল কোথায়?

মে। মাথা তার একটুও খারাপ নয়, সে এক জন ভাল বৈদ্য, আমার ফিটের ওষুধের গাছ চিনে, শিকড় আন্‌তে গেছে!

পি। তুমি সেই ওষুধ খাবে?

মে। না, খেতে হবে না,—গলায় ধারণ করতে হবে—

পি। বল কি? তুমি?

মে। কেন নয়? মিষ্টার পিটার, তুমি ভুলে যেও না যে, আমার মধ্যে এ দেশের অন্ধবিশ্বাসের কিছু ত থাকা একান্ত স্বাভাবিক।

পিটারের মুখটা আবার লাল হয়ে গেল।

মে। কি?—মিষ্টার পিটার? রাগ করলে?

পি। আশ্চর্য্য মানুষ তুমি!—সাদা চামড়ার মানুষের ওটা কি কোন দিন একটা গর্ব্বের হ'তে পারে?

মে। কিন্তু সন্তান হয়ে মাকে বিস্মৃত হওয়া, কি তাঁকে অশ্রদ্ধা করা পাপ নয় কি, মিষ্টার পিটার?

পিটার একদম চুপ।

মে। একবার নৈনী যাব মনে করছি।

পি। কেন?

মে। ডাক্তার দেখাতে।

পি। কত দিন থাকা হবে সেখানে?

মে। কয়েক মাস হয় ত, ঠিক নেই, ডাক্তার যেমন ব'ল্‌বেন।

পি। নৈনী আমার এলাকার মধ্যে পড়ে না·· কবে যাওয়া হবে?

মে। আজই।

পি। কটার ট্রেণে?

মে। তা ঠিক করতে পারি নি—যদি ভাল বোধ করি ত পাঁচটার গাড়ীতেই।

পি। আমি মনে করছি, তা হ'লে তিনটের ট্রেণে···

মে। তাই ত, রূপলাল দেরি করতে লাগলো—তাকেও নৈনী নিয়ে যাব মনে করছি। সে ও-সব দেশ দেখে নি, দেশ দেখাই ওর বাই, মিষ্টার পিটার।

পি। আচ্ছা, তবে এখন চলি। হয় ত কত দিন দেখা হবে না।

মে। এখানে ফিরলে জান্‌তে পারবে।

পি। বেশ, বেশ।

পিটার বিষণ্ণ-মনে চ'লে গেল।

পরিচ্ছেদ—আট

নৈনীতালে।

সে দিন মেরির মনটা ভালই ছিল। একটা প্রক·· সরোবরের ছবি আঁকা শেষ করতে করতে সে মাধো·· ডাক্‌লে।

মাধো, মাধো, মাধোলাল···

মাধো পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্লে, কি·· বল্‌ছেন?

মে। কি করছিলে?

মা। অঙ্ক কষছিলাম?

মে। ওঃ! আমি বুঝতে পারিনি, তোমাকে বিরক্ত করেছি, মিছিমিছি…

মাধো একটু হেসে বল্লে, বলুন, আমার কাজ শেষ হয়েছে…

মে। এই ছবিটা তোমাকে দেখতে ডাকছিলুম, কি রকম হ'লো?

মা। ছবির সম্বন্ধে আমার জ্ঞান কিছুই নেই, তবে এইটুকু বলতে পারি যে, ওটা আসল লেকের চেয়ে সুন্দর হয়েছে…

মে। তাই কি আর হয়?

মা। তাই ত হবার কথা;—একটা মস্ত জিনিষকে ছোটর মধ্যে আনলে তার সম্পূর্ণতাটা আগেই চোখে পড়ে; পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জিনিষই অসুন্দর, যে হেতু তা অসম্পূর্ণ; সম্পূর্ণতাই জিনিষকে সৌন্দর্য্য দান করে।

মেরি অবাক্ হয়ে তার দিকে চেয়ে থেকে থেকে বল্লে, ছবি না এঁকেই দেখছি তুমি পণ্ডিত! ঠিক বলেচ মাধো-লাল! এঞ্জেলোও ঠিক ঐ কথাই বল্‌তেন; তিনি বলতেন, যে রূপদক্ষ ছবিকে শেষ করতে জানে, সেই তাকে সুন্দর করতে জানে।

মাধোলাল ছবির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বল্লে, এ ছবিটা এবারকার একজিবিশনে পাঠিয়ে দেবেন কিন্তু; ফার্ষ্ট প্রাইজ আন্‌বে।

মে। আচ্ছা, দেওয়া যাবে।…কিন্তু আমাদের সে দিনের কথা ত আর শেষ হলো না…

মা। আপনি ছবিটা শেষ ক'রে ফেলুন; সে ত একটা ছোট কথা…

মে। বটে! ছবি আমার ত শেষ হ'লো। এখন আর এখানে আঁকবো না। বাড়ী ফিরে গিয়ে কেবল স্মৃতি থেকে—ওর শেষটা এঁকে তুলবো।…এখন তবে এসো মাধোলাল, কিছু কাযের কথা কওয়া যাক্।

মা। আপনার ইচ্ছা।

মে। আমার ইচ্ছা, তুমি এ বছরের গোড়াতেই চ'লে যাও ইংলণ্ডে; গিয়ে সেখানে য'বছর দরকার থেকে তোমার ইচ্ছামত একটা পাশ ক'রে ফিরে এস, খরচের জন্যে ভাবনা নেই।

মা। আমি কে? যার জন্যে আপনি এত খরচ-পত্র করতে যাবেন?

মে। আমার টাকার কি দরকার? এত টাকা নিয়ে আমিই বা করি কি?

মা। টাকার কত শত দরকার আপনার পরে হ'তে পারে…আপনার টাকা…

মে। ওঃ, বুঝেছি; বেশ, তোমার জন্যে যে টাকা খরচ হবে—তা ত তুমি ধীরে ধীরে শোধ ক'রে দিতে পার পরে। এতে তোমার কি আপত্তি?

মা। আর বিলেত গিয়ে যদি আমি একটা অমানুষ, বাঁদর হয়ে যাই?

মে। তা তুমি হবে না,—আমি মনে মনে বেশ বুঝতে পারি!

মাধোলাল হাসে।

মে। হাসি নয়, মাধোলাল, তোমাকে বিলেতে যেতেই হবে; তোমাকে বড় হতেই হবে। তোমার ভবিষ্যতের সঙ্গে আর এক জনের জীবন যে কতখানি জড়িত রয়েছে, তা তুমি জান না।

মাধো অবাক্ হয়ে বল্লে, কার?

মে। তা এখন তোমাকে বলবো না, পরে জান্‌তে পারবে।…আচ্ছা, এ কথাটা ত মান যে, তোমার ভারত-বর্ষে থাকা—এখনকার জন্যে মোটেই নিরাপদ নয়?

মা। কিন্তু পালিয়ে থাকার মধ্যে যে একটা কত বড় গ্লানি আছে, তা বোধ হয়, আপনি ভেবে দেখেন নি?…

মে। কিন্তু তা ছাড়া—আর গতি কি?

মা। তাই ভাবি…কি যে করি…

মে। আমি যা বলি, তা তোমাকে করতেই হবে। মনে নেই সে দিনের কথা? যে শাস্তির বিধান আমি করবো—তা তুমি স্বীকার ক'রে নেবে? এ ত তোমারই কথা, মাধোলাল!

মা। মনে আছে।

মে। মাধো, লক্ষ্মীটি আমার, আমার কথার অবাধ্য হও না…

মা। আমার বিলেত যাবার মত কোন গুণ নেই;

ঐ টাকা আপনি আরও কোন যোগ্য লোকের পিছনে খরচ করলে, টাকাটা সার্থক হবে···

মে। বেশ থাকা গিয়েছিল কিন্তু নৈনীতালে···কোন হাঙ্গাম ছিল না। অন্ততঃ পিটারের উপদ্রব···

মা। পিটার আপনার ত পিতৃ-বন্ধু?

মে। তাতে আপত্তি নেই; কিন্তু তার লোভ আরও বেশী···সে··

(মেরির মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠলো)

মা। তাতে আপনার যদি আপত্তি থাকে—অনেক ভাল লোকও ত আছেন—কত বড় বড় সায়েব···

মে। সাদা চামড়া আমি গ্রহণ করবো না মাধোলাল··· আমি, আমি, আমি ··তোমাকে বল্‌তে···

মাধোলাল সেখান থেকে দ্রুতপদে বার হয়ে গেল।

পরিচ্ছেদ—নয়

পিটার। উঃ, কত দিন পরে তুমি ফিরে এসেছ, মেরি!

মেরি। মাত্র তিন মাস। আরও কিছু দিন হয় ত থাকৃতুম···

পি। কিন্তু রূপলাল পালিয়ে যাওয়াতে··

মে। ঠিক তাই মিষ্টার পিটার; রূপলালের আশা আমি এখনও ছাড়িনি···তেমন মানুষ পৃথিবীতে খুব অল্প···

[পিটারের ঈর্ষ্যার দৃষ্টি]

তুমি রাগ করো না মিষ্টার পিটার, আমি মনে করে-ছিলুম যে, তাকে সঙ্গে ক'রে—জার্ম্মাণীতে নিয়ে গিয়ে একটা মানুষ তৈরি ক'রে তবে ফিরতুম···

পি। তার পর?

মে। তার মা-বাপের মত হ'লে···আমি মাধোকে··· রূপলালকে···

পি। মাধোলাল? মাধোলাল?···এ যে খুব শোনা নাম!

[নিজের নোটবই দেখে] মেরি, তোমায় অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে—এই মাধোলাল তোমার বাপকে খুন ক'রে পালিয়ে ফেরার হয়ে আছে···

মে। কে মাধোলাল?

পি। যার ছদ্মনাম রূপলাল···যে এত দিন তোমারই আশ্রয়ে লুকিয়ে ছিল।

মে। আমি বিশ্বাস করি নে, মিষ্টার পিটার! তোমা-দের সন্দেহ ভিত্তিহীন।

পি। আমি প্রমাণ ক'রে দিতে পারি·· ছবি আছে আমার কাছে···

মে। কৈ সে ছবি?

পি। দু'দিন পরে দেখতে পাবে।

পিটার দু'খানা ছবি বার ক'রে দিলে। একখানি ছবিতে রয়েছে মাধোলাল—ফুটবল টীমের ক্যাপ্‌টেন।— আর একখানাতে আছে নৈনীতালে লেকের পাশে বেড়াচ্ছে মেরির সঙ্গে।

দ্বিতীয় ছবিটা দেখিয়ে—পিটার বল্লে, এই কি রূপলাল নয়, মিস রবিনশন? এই?

মেরি বজ্রাহতের মত ব'সে রইল।

পরিচ্ছেদ—দশ

পিটার হাতে একতাড়া কাগজ নিয়ে এসে বসলো।

মেরি একমনে বুন্‌চে।

পি। মেরি!

মে। মিষ্টার পিটার, তুমি আমাকে মিস্ রবিনশন বল্লে বেশী সুখী হব।

পি। আমি মিস্ রবিনশনের মার্জ্জনা চাই, তা হ'লে।

মে। কোন কি বিশেষ প্রয়োজন আছে?

পি। বিশেষ না, তবে একটা খবর ছিল···

মে। কি?

পি। মাধোলাল আত্মসমর্পণ করেছে। সে স্বী·· করেছে যে, সেই মিঃ রবিনশনের হত্যাকারক!

মে· কোথায় এই ঘটনা?

পি। কাশীতে।

মে। তার পর?

পি। [বিদ্রূপের হাস্য] ফাঁসিকাঠ! কোন স নেই আর!

মেরি মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে গেল।

* * * *

সে দিন ডাকের সঙ্গে মেরি এই চিঠিটা পেয়েছিল।

শ্রদ্ধাস্পদাসু,

আমি বেনারসে এসেছি। মাকে দেখার জন্য! * * * নিজের অপরাধ গোপন ক'রে বেঁচে থাকার গ্লানি আমার জীবনে অসহ্য হয়ে পড়েছে। এর পর যথা কর্ত্তব্য করবো। আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন।

আমাকে মার্জ্জনা করবেন।

ইতি—

না...

মেরির দু'চোখ জলে ঝাপসা হয়ে গেল। সে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে,—জর্জ্জ রবিনশনের সমস্ত টাকা মাধোলালের পিছনেই খরচ যদি করতে হয় ত মেরি যেন তাতে পশ্চাৎপদ না হয়!—হে ভগবান্, আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।... আমাকে সত্যের অধিকার দান কর। আমি জানি, মাধোলাল উপলক্ষ্য মাত্র! তার আত্মা হত্যার পাপে কলুষিত নয়! তার বজ্রহস্ত—সত্য রক্ষার জন্য উদ্যত হয়েছিল—সত্যকে বিধ্বস্ত করার জন্য নয়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

মণি-মিলন

অমরায়—আজি
একাদশী-দিনে
উত্থান-কোলাহল,
ভক্ত-নৃমণি
লয়ে গেল তাই
ভক্তি-গঙ্গাজল।

রসরাস আসে
রসময়-প্রিয়
সকল ছাড়িয়া তাই—
বৃন্দাবনের
কৃষ্ণ কুঞ্জে
ত্বরিত মিলিল যাই'।
কেঁদো না গোকুল,
কাঁদিও না ব্রজ,
ফেলো না নয়নাসার,
মরমের টানে
পরম মিলন
তা হ'লে হইবে ভার।

ফিরে ফিরে মিছে
পিছে ডাকিও না
তারে ধরে' রাখা দায়,
প্রাণেশের ডাকে
উচাটন মন
যে জন ছুটিয়া যায়।
আরাধনা যার
ঋদ্ধ হইবে
রাধাধারে লীন হয়ে—
কি ফল তুচ্ছ
প্রীতির বেদন
বৃথা তাঁরে জানাইয়ে।

তা'র চেয়ে এস
সবে সাথে মিলি
যত সখা সখী দল,
হরি বোল বলি
হয়ে কুতূহলী
তুলি উলু সুমঙ্গল।

"রঞ্জন"

দেবমন্দিরের পবিত্রতা

এ দেশে যে সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তনা হইয়াছে, সেই সময় হইতে হিন্দুধর্ম্মের সহিত পাশ্চাত্যভাবের একটা প্রবল সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। তাহার কারণ, হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্ব অন্য সকল ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে প্রভিন্ন। হিন্দুধর্ম্ম মানিতে হইলে এই কয়টি বিষয় নিশ্চিতই মানিতে হয় :—(১) বেদের অপৌরুষেয়ত্ব, (২) জন্মান্তরবাদ, (৩) কর্ম্মফলবাদ, (৪) অদৃষ্টবাদ, (৫) অধিকারতত্ত্ব এবং (৬) বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। এই ৬টির কোনটি বাদ দিলে হিন্দু বলিয়া আত্মপরিচয় দেওয়া যায় না। হিন্দুধর্ম্ম কেবলমাত্র যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে অর্থাৎ ইহা ঠিক যৌক্তিক ধর্ম্ম (Rationalism) নহে ; ইহা প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম (Revealed Religion)। হিন্দুর বিশ্বাস, স্বয়ং ভগবান্ই এই ধর্ম্মতত্ত্ব লোকসমাজে প্রচার করিয়াছেন। ইহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য যেমন অনন্ত কাল ব্যক্ত বা অব্যক্ত অবস্থায়, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে বিরাজ করে, হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্বও তেমনই চিরকাল শাশ্বত সত্যের ন্যায় বিরাজ করিতেছে, লোক তাহা বুঝুক আর না-ই বুঝুক, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। ধর্ম্ম ধর্ম্মই থাকিবে এবং সর্ব্বকালে সর্ব্বভাবে জ্ঞাতাজ্ঞাত অবস্থায় মানবের উপর উহা প্রভাব বিস্তৃত করিবেই করিবে। কারণ, ধর্ম্মের উপরই জগতের প্রতিষ্ঠা। বর্ত্তমান সময়ের ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিরা ইহা না মানিতে পারেন, তাঁহারা ইহা কুসংস্কার বলিয়া মনে করিতে পারেন,—কিন্তু হিন্দু হইতে হইলে সকলকে উল্লিখিত ৬ দফা সত্য মানিয়া লইতেই হইবে। যত দিন হিন্দুধর্ম্ম এই পৃথিবীতে বিরাজ করিতেছে, তত দিন হিন্দুজাতি এই ছয়টি দফা মতকে সত্য এবং তর্কের অতীত বলিয়া মানিয়া আসিতেছেন। হিন্দুদিগের কোন কোন দর্শনকার ঈশ্বর অসিদ্ধ বলিতে সাহসী হইয়াছেন, কিন্তু বেদকে অপ্রামাণিক বলিতে সাহসী হন নাই। এই বিশ্বাস লইয়া হিন্দু কত সহস্র বৎসর জীবিত রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় নাই। এখনও বহু লোক এই মত সত্য বলিয়া মানিয়া আসিতেছে ; বর্ত্তমান যুগের ইংরাজী শিক্ষাও তাহাদের মধ্যে অনেকের সে মত টলাইতে পারে নাই।

কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকরা আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে এই বেদেরই নিন্দা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা বৈদিক সাহিত্যগুলিকে প্রকৃতির অনন্ত গৌরবস্তম্ভিত গিরি-গুহাবাসী আদিম মানবের বিস্ময়মুগ্ধ হৃদয় হইতে উত্থিত আনন্দমাখা গান বলিয়াই কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। যে ঋগবেদে এ কথা স্পষ্টই লিখিত রহিয়াছে যে, "এই যে গমনশীল চন্দ্র দেখিতেছ, ইহার কিরণ ইহার স্বকীয় নহে, ভানুর কিরণ ইহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ধরাতলে আসিয়া পতিত হইতেছে,"—সেই ঋগ্বেদ,—অসভ্য বন্যভাবাপন্ন আদিম মানবের অজ্ঞতাবিজৃম্ভিত গীতির সংগ্রহমাত্র-বলিয়া ইংরাজী-শিক্ষিত যুবকগণ বিশ্বাস করিল। চন্দ্রের একটি বৈদিক নাম স্বর্ভানু। ইহার অর্থ—যিনি প্রেরিত স্বর্গীয় দীপ্তি অর্থাৎ সূর্য্যকিরণ পাইয়া থাকেন। স্বঃ অর্থে স্বর্গীয়, ভা অর্থে দীপ্তি, আর নু অর্থে প্রেরিত। এ স্থানে ঋগ্‌বেদের একটি ঋক্ প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করা গেল।

যত্ত্বাসূর্য্য স্বর্ভানুস্তমসা বিধ্যদাসুরঃ।
অক্ষেত্রবিদ্বথা মুগ্ধো ভুবনান্যদীধয়ুঃ ॥ ঋগ্বেদ ৫।৪০।৫

অর্থাৎ "হে সূর্য্য, যখন স্বর্ভানু (চন্দ্র) ভয়ঙ্কর অন্ধকার দ্বারা তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, (তখন) কি হইয়াছে বুঝিতে অসমর্থ ব্যক্তির ন্যায় (অর্থাৎ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধবিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায়) সমস্ত ভুবন বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিল।" ঋগ্বেদের এই ঋকৃটি পাঠ করিলে বৈদিক ঋষিরা জ্যোতিষতত্ত্ব কিরূপ জানিতেন, তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রহণসময়ে চন্দ্রই যে পৃথিবী এবং সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সূর্য্যকে অন্ধকারাচ্ছন্ন বা ম্লান করিয়া ফেলেন, ইহাই এই ঋকে উক্ত হইয়াছে। আবার সূর্য্য যে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করেন, এ কথাও ঋগ্বেদের ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন। যথা :—

স্তোমাসস্ত্বা বিচারিণি প্রতি ষ্টোভন্ত্যক্তুভিঃ।
প্র যাবাজং ন হেষন্তং পেরুমস্যস্যর্জুনি । ৫।৮৪।২

ইহার অর্থ :—হে রাশিসমূহে বিস্তৃতভাবে বিচরণকারিণী পৃথিবী, তুমি শুভ্রবর্ণা। তুমি প্রতিস্তম্ভ (রাশি) ত্যাগ করিতে করিতে সশব্দে অশ্বের ন্যায় গতিতে (দ্রুতগতিতে) সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাক।

ইহাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীই সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। যে ঋগ্বেদকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন,—সেই ঋগ্বেদেই কঠিন জ্যোতিষতত্ত্ব অত্যন্ত বিস্তীর্ণ এবং অভ্রান্তভাবে উক্ত হইয়াছে, ইহা বেশ বুঝা গেল। অন্ততঃ ৭ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সেই ঋগ্বেদ অত্যন্ত বন্যভাবাপন্ন আদি মানবের গীতিমাত্র, এই কথা যখন শ্বেতাঙ্গজাতির আসিয়া এ দেশে প্রচার করিলেন, তখন আমাদের ইংরাজীনবিশ বাবুর দল বিনাবিচারে তাহাই সত্য বলিয়া [illegible] করিয়া বসিলেন ! ইহা অপেক্ষা তাহাদের অধঃপতনের বিষয় আর কি হইতে পারে ? সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া পৃথিবী ঘুরিতেছে, এই তথ্য প্রচার করাতে যাহাদের ধর্ম্মযাজকগণ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও গ্যালিলিওকে ধর্ম্ম[illegible] অভিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আমাদের এই [illegible] অসভ্য বন্য মানুষের গান বলিয়া প্রচার করিলেন [illegible] আমরা তাহা অব্যাজে গ্রহণ করিলাম,—ইহা অপেক্ষা [illegible] কথা,—আপশোষের কথা—আর কি হইতে পারে ? [illegible] এরূপভাবে পরের মুখে ঝাল খায়, তাহাদের শিক্ষা [illegible] যতই থাকুক না কেন,—তাহারা যে নিতান্তই অমানুষ [illegible] পড়িয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। [illegible] বিজাতীয় শিক্ষারই ফল। খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারকগণ [illegible] পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই প্রকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণের [illegible] বেদসম্বন্ধে অলীক ধারণা জন্মাইয়া দিয়া তাহাদিগকে [illegible] হিন্দুধর্ম্মের উপর আস্থাশূন্য করিয়া তুলিয়াছেন। [illegible]

এখন আধ্যাত্মিক কথার আলোচনা করিতে যাওয়াই ঘোর বিড়ম্বনাজনক হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা এখন মনে করেন যে, ধর্ম্মসম্পর্কিত ব্যাপারটাই কুসংস্কার। এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া যদি তাঁহারা স্বয়ং চলেন, তাহা হইলে তাহাতে সমাজে তাদৃশ ক্ষতি হয় না, কিন্তু তাঁহারা যদি সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সমাজে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে তাহার ফল অতি মন্দ হইয়া পড়ে। ইহাদের কার্য্য-ফলে সমাজে ধর্ম্মহীনতা ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আধ্যাত্মিক ব্যাপারটা যে কিছুই নহে,—এই ধারণা আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষারই ফল। য়ুরোপ কস্মিন্‌কালেও আধ্যাত্মিক বিষয়ের চর্চ্চার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাস যে মানুষের প্রগতির প্রায় একমাত্র সহায় হইয়া আসিয়াছে এবং আসিতেছে, ইহা যাঁহারা না বুঝেন, তাঁহাদের মানবজাতির ইতিহাসপাঠে পাঠশ্রমই বৃথা হইয়াছে। * বিবর্ত্তনবাদীদিগের এ কথা যদি সত্য হয় যে, মানুষ অত্যন্ত বন্যভাব হইতে বর্ত্তমান উন্নত-ভাবে উপনীত হইয়াছে, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ধর্ম্মই এবং আধ্যাত্মিকতাই তাহাদের সেই প্রগতির প্রচালক শক্তির কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। যাহা কুসংস্কার, তাহা কখনই মানবজাতির উন্নতির কারণ হয় না। সাধনার দ্বারাই মানুষের আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। ধর্ম্মজ্ঞান হইতেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ হইতে থাকে। মানুষের বাহিরে যেমন একটা বিশাল ও বিস্তীর্ণ জগৎ রহিয়াছে, অন্তরেও তেমনই একটা আন্তর জগৎ আছে। সেই জগৎই আধ্যাত্মিক জগৎ। তাহার বিস্তার বাহ্য জগৎ হইতে অল্প নহে, বরং অনেক অধিক। তাহা দেখিতে হইলে ধর্ম্মসাধনার দ্বারা প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত করিয়া লইতে হয়। বৈজ্ঞানিক সাধনার দ্বারা যেমন বাহ্য জগৎ-সম্পর্কিত জ্ঞান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা তেমনই আন্তর জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যেমন পদার্থাদি-সম্পর্কিত ব্যাপার সম্বন্ধে ক্রমশঃ বিসর্জ্জিত সংস্কার বা ধারণা পরিহার করিয়া নূতন নূতন ধারণা এবং সংস্কার গ্রহণ করিয়া থাকে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেও মানুষ সেইরূপ আধ্যাত্মিক বিষয়ে পুরাতন সংস্কার পরিহার করিয়া নূতন নূতন সংস্কার গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানের এইরূপ ক্রম আছে বলিয়াই অধ্যাত্ম-বিদ্যাবিৎ ঋষিরা অধ্যাত্মব্যাপার সম্বন্ধে অধিকারভেদ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্য কেবলমাত্র হিন্দুধর্ম্মের অনুজ্ঞাতে দেখা যায় যে, "যাহার যেরূপ অধিকার, সে সেইরূপ ভাবে ধর্ম্মসাধনা করিবে।" সেই জন্য হিন্দুধর্ম্মে গুঁড়িকাঠ, মুড়ি, শিলা হইতে আরম্ভ করিয়া অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত ও অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মের অনুধ্যান পর্য্যন্ত নানারূপ উপাস্য দেবতার অর্চ্চনার ও উপাসনার ব্যবস্থা রহিয়াছে। প্রকৃত নির্ব্যূঢ় সত্য (absolute truth) কখনই মানবের চিত্তমুকুরে কোন অবস্থাতেই প্রতিবিম্বিত হয় না। উহার সকল জ্ঞান অন্যোন্যসাপেক্ষ (Relative)। তোমার বুদ্ধির সহিত বিষয়ের যেরূপ সম্বন্ধ হইবে, জ্ঞানও ঠিক সেইরূপ হইবে। কারণ, বুদ্ধির সহিত বিষয়ের সম্বন্ধই জ্ঞান। আমার বুদ্ধি যেরূপ হইবে, আমার জ্ঞানও সেইরূপ হইবে। যে বালক কেবল পাটীগণিতের সঙ্কলন, ব্যবকলন, গুণ এবং ভাগ শিখিয়াছে, সে কখনই রেখাগণিতের কোন দুরূহ সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। অথচ পাটীগণিতের ঐ জ্ঞানই রেখাগণিত-সম্পর্কিত জ্ঞানের ভিত্তিভূমি। কেবল-মাত্র শরীরস্থানবিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করিলে চিকিৎসাবিজ্ঞানে পারদর্শী হওয়া যায় না। অথচ শরীর-স্থানবিদ্যাই (physiclogy) রোগবিজ্ঞান ও আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের বনিয়াদ। সুতরাং, জ্ঞানের আপেক্ষিকতা (Relativity) সর্ব্বত্রই স্বীকৃত। আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্বন্ধেও সেইরূপ আধ্যা-ত্মিক বুদ্ধির বিকাশের সহিত উহার ক্রমিক সম্বন্ধ বিদ্যমান। মানুষের পার্থিব জ্ঞান যখন অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অবস্থায় থাকে, তখন তাহার আধ্যাত্মিক জ্ঞান কখনই অত্যন্ত অধিক হইতে পারে না। বাহ্যজ্ঞান যেরূপ হয়, আন্তর জ্ঞান সাধারণ লোকের পক্ষে প্রায় তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। বরং অনুশীলনের অভাবে বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে পারে। সেই জন্য সাঁওতাল তাহার বড় ভূত, মেজ ভূত, ছোট ভূত প্রভৃতির পূজা করিতে বাধ্য হয়, কারণ, তাহার বুদ্ধি আর তদপেক্ষা বৃহত্তর বা উচ্চতর সৃষ্টিকর্ত্তার বা আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ামকের ধারণা করিতে পারে না। তাহার সঙ্কীর্ণ চিত্তমুকুরে তদপেক্ষা বৃহত্তর বা মহত্তর কিছুই প্রতি-বিম্বিত হয় না। সেই সাঁওতালের চিত্তক্ষেত্রে যে আধ্যাত্মি-কতার বীজ কেবলমাত্র অঙ্কুরাকারে উদ্গত হইয়াছে, তাহার পরিতৃপ্তিসাধন ঐ প্রকার সামান্য কল্পনার দ্বারাই সম্ভব। তাহাকে বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিলে কোন ফলই হইবে না। কিন্তু সাঁওতালের ঐ ধর্ম্ম যদি কোন উচ্চ অঙ্গের বৈদান্তিককে গ্রহণ করিতে বলা হয়, তাহা হইলে তিনি হয় ত হাসিয়াই খুন হইবেন,—কিন্তু তিনি জানেন না যে, সেই সাঁওতালের ভূতরূপী ভগবান্ তাঁহার কাছে আসিয়া বেদান্ত-বেদ্য ভগবানে পরিণত হইয়াছেন।

শিক্ষিত ব্যক্তিরা বলিরাজার যজ্ঞকথা যতই মিথ্যা বলিয়া মনে করুন না কেন,—উহার ভিতর যে হিন্দুর অধিকার-তত্ত্বের একটা মস্ত কথা লুক্কায়িত আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ভগবান্ যখন বসিয়া তপস্যা করিবার জন্য বলির নিকট ত্রিপাদমাত্র ভূমি ভিক্ষা করিয়াছিলেন, তখন তিনি অতি হ্রস্ব বামনাকার। তাঁহার প্রার্থিত ত্রিপাদভূমি অন্য লোকের একপাদও নহে। বলি হাসিলেন। এই

* Religion always has been "one of the strongest forces in the evolution of human mind and the person who asserts that an ancient people did not believe in their religion shows such gross ignorance of humanity as to prove himself unfit for a teacher of youth.—Boxal.

সামান্য ত্রিপাদভূমি ভিক্ষা করিবার জন্য ঠাকুর তুমি এখানে আসিয়াছ? আমি এইক্ষণেই তোমাকে ঐ পরিমাণ ভূমি প্রদান করিব। কিন্তু দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। শুক্রাচার্য্য পার্থিবজ্ঞানের প্রচারক। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইলেও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিরোধী। তাই তিনি বলিকে ঐ ক্ষুদ্র ত্রিপাদভূমি প্রদান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বলি তাহা শুনিলেন না। তিনি দান করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিবার উদ্দেশে কমণ্ডলু হইতে জল গ্রহণ করিবার নিমিত্ত কমণ্ডলু উত্তোলন করিলেন। শুক্রাচার্য্য দেখিলেন, তাঁহার যজমান দৈত্য হইতে দেবতায় পরিণত হইতে বসিয়াছেন। তিনি সেই কমণ্ডলুর ছিদ্রপথ অবরুদ্ধ করিয়া বসিলেন। বামন ব্যাপার বুঝিয়া একটি ইষিকা বা কুশ লইয়া সেই ছিদ্রপথের বাধা অপসারিত করিবার জন্য উহার ভিতর সজোরে চালাইয়া দিলেন। শুক্রাচার্য্য ঐ ছিদ্রপথে একটিমাত্র চক্ষু দিয়া ব্যাপার দেখিতেছিলেন। ঐ ইষিকার আঘাতে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল। তিনি আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কমণ্ডলু হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বলিরাজ বামনকে ত্রিপাদভূমি দান করিলেন। কিন্তু তখন বামন আর বামন রহিলেন না। তখন বামনদেব বিরাট আকার ধারণ করিলেন,—তখন

চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নয়নে দ্যৌ মূর্দ্ধা চরণৌ ক্ষিতিঃ—

অর্থাৎ বলি দেখিলেন, বামনের আকার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া বিরাটরূপ ধরিল। সেই বিরাট পুরুষের নয়ন দুইটি চন্দ্র আর সূর্য্য, স্বর্গ তাঁহার মস্তক আর পৃথিবী তাঁহার চরণদ্বয়। সেই মূর্ত্তি ক্রমশঃ আরও বাড়িতে লাগিল। তখন সেই বিরাট পুরুষ চরাচর বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়া বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা চাহিলেন। তাঁহার একপাদে সমস্ত ঊর্দ্ধলোক পরিব্যাপ্ত হইল; তখন বলি প্রতিশ্রুতিভঙ্গরূপ মহাপাপ হইতে আত্মত্রাণ করিবার জন্য বলিলেন

পাদং তৃতীয়ং কুরু শীর্ষ্ণি মে নিজম্।

অর্থাৎ আমার মস্তকে তোমার তৃতীয় চরণ রক্ষা কর। ইহাতে বুঝা যায় যে, ভগবান্ বা ঈশ্বরসম্বন্ধে ধারণা প্রথমে অতি ক্ষুদ্র বামনাকারে থাকে। ভগবান্ মানুষের মনে প্রথমে সামান্য একটু ভূমি ভিক্ষা করেন। কাযেই জ্ঞানের প্রথম উন্মেষকালে মানুষের ভগবান্ বা আরাধ্যদেবতাসম্বন্ধে জ্ঞান অতি সামান্যই থাকে। সেই ধর্ম্মজ্ঞান হৃদয়ে ধারণা করিবার প্রতিকূলে বিষয়ের দিক হইতে অনেক বাধাও পড়ে। কিন্তু একবার সেই জ্ঞান অন্তরে স্থান পাইলে বা মনে উদিত হইলে জ্ঞানবিস্তারের সহিত সেই আরাধ্যদেবতাসম্বন্ধে ধারণা ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিয়া থাকে। প্রথমে ধর্ম্মবুদ্ধির উন্মেষকালে যে আরাধ্যদেবতা ছোট ভূত, বড় ভূত প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র বামনাকারে কল্পিত ছিল, ধর্ম্মবুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি-বৃদ্ধির সহিত মানব সেই আরাধ্যদেবতাকেই বলিয়া থাকে :—

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।

সেই একই আরাধ্যদেবতা বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র বামনরূপ হইতে বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। যখন মানুষের সেইরূপ ধারণা করিবার সম্ভাবনা জন্মে, তখন সে বুঝে,—

যানি মূর্ত্তান্যমূর্ত্তানি যান্যত্রান্যত্র বা কচিৎ।
সন্তি বৈ বস্তুজাতানি তানি সর্ব্বাণি তদ্বপুঃ।

এই স্থানে বা অন্য স্থানে যে কোন আকার (লোকচক্ষুর গোচর) অথবা নিরাকার (লোকচক্ষুর অগোচর) বস্তু বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই সেই হরির (আরাধ্যদেবতার) রূপান্তর। অর্থাৎ চণ্ডাল,মুচি, মুর্দ্দাফরাস, ম্লেচ্ছই হউক, আর কুকুর, বিড়াল, ছুঁচো, ইন্দুরই হউক, মাছি, মশা, আরশুলা প্রভৃতিই হউক, সমস্তই সেই আরাধ্যদেবতার রূপ।

কিন্তু কেবল বাহ্য-জগৎই তাঁহার রূপ বা তিনি বিশ্বরূপ, ইহা বলিলেও পর্য্যাপ্ত হয় না। মানুষের জ্ঞান যখন বাহ্য জগৎ ছাড়িয়া আন্তর জগতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে, তখন সে দেখিতে পায় যে, সেই অন্তরজগতেও সমস্তই ব্রহ্মময়। সেই জন্য বলি যখন দেখিলেন, এই চরাচর বিশ্ব ভগবানের দুই চরণেই পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল, তখন তিনি তাঁহার মস্তকটিই হরির পদন্যাসের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক জগৎ ধ্যানগম্য। বুদ্ধির দ্বারাই মানুষ আধ্যাত্মিক জগতের সত্তা অনুভব করে। মস্তক সেই বুদ্ধিস্থান। সেই জন্য বলি ভগবানের তৃতীয় চরণ ব্যাপ্তির জন্য তাঁহার মস্তক পাতিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরও যখন সেই ভাবরাজ্য ছাড়িয়া সাধনাপূত মানবের জ্ঞান আরও উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন মানব আর মনে সেইরূপ ধারণা করিতে পারে না, বাক্যে তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় না। সেই হেতু শ্রুত্যুক্ত জ্ঞানকাণ্ডের ঋষি বলিয়াছেন ;—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

তাহার নিকট হইতে বাক্য এবং মন প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আইসে। বুদ্ধিবিকাশের সহিত মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাসের যে প্রগতিলাভ হইয়া থাকে, বর্ত্তমানযুগের পাশ্চাত্য মনীষীরা তাহা কেবলমাত্র উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। *

* What we know is that from the time when man had so far advanced intellectually beyond the animal from which he has evolved as to begin to speculate as to his origin he has always had a religion and this religion has changed as his knowledge increased. Religion, therefore, must be treated as a whole and it is absurd and childish to say that this or that religion is false or childish. It was neither false nor childish to the race which evolved it; for the religion of a race was based on the science of that race, and was as true to the race which evolved it as our religion will be to us when it begins to develop on the basis of our science.—Boxall.

পাশ্চাত্য মনীষীদিগের মধ্যে অনেকেই এখন অধিকার-তত্ত্বের এই প্রাথমিক কথা স্বীকার করিতেছেন। আমি পূর্ব্ববর্ত্তী পাদটীকায় যে কথা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে, আরাধ্যদেবতা সম্বন্ধে সকলের সমান জ্ঞান হয় না, অধিকারিভেদে অর্থাৎ প্রত্যেকের বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে নিজ নিজ ইষ্টদেবতাকে বা আরাধ্যদেবতাকে সে বিভিন্নভাবে কল্পনা করিয়া থাকে। যাহার যেমন জ্ঞান, সে সেইরূপই তাহার পরদেবতার পরিকল্পনা করিয়া থাকে। গ্রীকদিগের জুপিটার তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে পরিকল্পিত, আবার হিব্রু এবং খৃষ্টানদিগের "গড" ঠিক মানুষের মত পরিকল্পিত। হিব্রু ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, God made man in his own image অর্থাৎ ভগবান্ তাঁহার নিজ মূর্ত্তির অনুরূপেই মানুষকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অনেক পাশ্চাত্য মনীষী বলিয়া থাকেন, এই কথাটা উল্টাইয়া বলিলেই কথাটা ঠিক বলা হয় যে, মানুষ নিজমূর্ত্তির অনুসারে তাহার আরাধ্যদেবতার কল্পনা করিয়া থাকে। * ফলে প্রত্যেক জগতেই প্রতিমাপূজক; সেই প্রতিমায় সে নিজ সম্পূর্ণ মানবসম্বন্ধে ধারণাকেই প্রতিবিম্বিত করে। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ভগবান্‌কে ঠিক মানুষের মত কল্পনা করিয়াছেন বলিয়া বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে আর উহা য়ুরোপীয়দিগের মনে ধরিতেছে না। সেই জন্য য়ুরোপে নাস্তিক্যবাদ এত দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে।

হিন্দুর আরাধ্যদেবতার মূর্ত্তির পরিকল্পনা অন্যরূপ। হিন্দু-মাত্রই জানে যে, ভগবানের প্রকৃত রূপ মানুষের বাক্য এবং মনের অতীত। চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত সে রূপ অতি বড় পণ্ডিতের ধারণার মধ্যে আইসে না। সাধারণ লোকের ত কথাই নাই। তবে ভাবরূপ জনার্দ্দন ভাবেই মনুষ্যকে তাহার ধারণার উপযোগী মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া থাকেন। অধিকারভেদে তাঁহার রূপভেদও হইয়া থাকে। শ্রুতি তাঁহাকে অরূপ বলিয়াছেন, যথা:—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বিশ্বং ন হি তস্য বেত্তা
তমাহুরাগ্র্যং পুরুষং প্রধানম্।

যিনি হস্তবিহীন হইলেও গ্রহণে সমর্থ, চরণবিহীন হইলেও চলিতে পারেন; অচক্ষু অর্থাৎ চক্ষুশূন্য হইলেও দেখিতে এবং কর্ণশূন্য হইলেও শ্রবণ করিতে পারিতেছেন; তিনি বিশ্বকে বেশ জানেন, কিন্তু বিশ্বের কেহই তাঁহাকে জানে না, তাঁহাকে আদি এবং প্রধান পুরুষ বলা হইয়া থাকে। এক কথায় তিনি শরীরী নহেন। শরীরধারী জীবের মত তাঁহার কোন অবয়ব বা ইন্দ্রিয় নাই। সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে তাঁহাকে চিন্তার মধ্যে আনাই কঠিন। কিন্তু যাঁহার সম্বন্ধে মানুষের কোন ধারণাই হইতে পারে না, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব তাহাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা-সেবা-পূজা প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিতে পারে না।

সেই জন্য প্রকৃতি দেবী মানুষকে তাঁহার জ্ঞান, বুদ্ধি এবং কল্পনামতে ভগবানের একটা রূপ কল্পনা করিয়া, তাহার আকার দিয়া ভক্তিশ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে পূজা এবং অর্চ্চনা করিবার আদেশ দিয়াছেন। মানুষ সেই আদেশের বশবর্ত্তী হইয়াই তাহার আরাধ্যদেবতার কল্পনা করিয়া থাকে। সেই জন্য মানবজাতির ইতিহাসে প্রাথমিক অবস্থায় মানুষকে মূর্ত্তিপূজকরূপে দেখা যায়। শাস্ত্রকারও সেই জন্য মুক্তি বিচারে বলিয়াছেন:—

যো যো যাদৃশভাবেন নিত্যং ধ্যায়তি ভক্তিতঃ।
তত্তদ্রূপেণ তস্যেষ্টং পূরয়েৎ পরমেশ্বরঃ।

যে যে ব্যক্তি যে যে ভাবে যাদৃশরূপবিশিষ্ট ইষ্টদেবতার ধ্যান করে, পরমেশ্বর তাদৃশরূপবিশিষ্ট হইয়া তাহার অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকেন।

অন্যত্র শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।

যিনি কেবলমাত্র চৈতন্যময়, যাঁহার দ্বিতীয় নাই, যিনি নিষ্কল অর্থাৎ পূর্ণ, সেই পরব্রহ্ম সাধকদিগের বা উপাসকদিগের মঙ্গলের জন্য রূপ স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং এই মূর্ত্তি সাধকদিগের হিতার্থ অথবা উপাসকদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধার্থ পরি-কল্পিত। উহা পরব্রহ্মের স্বরূপ নহে,—উহা সাধকদিগের ইষ্টসিদ্ধির জন্য পরিকল্পিত প্রতীক বা যন্ত্রমাত্র। সাধক এবং ভক্ত কতকগুলি প্রক্রিয়ার দ্বারা সেই প্রতীকে ঐশীশক্তিকে আকর্ষণ করেন। দেবতা অবশ্য ক্ষুদ্রশক্তি মানবের উপর কৃপা করিয়া তথায় আভির্ভূত হইয়া থাকেন,—এই প্রগাঢ় বিশ্বাসেই লোক ঐ মূর্ত্তিকেই যতদূর সাধ্য শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে পূজা করিয়া থাকে। শ্রদ্ধা-ভক্তি ও পবিত্রভাব সেই পূজার সর্ব্বস্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সত্য বটে, মূর্ত্তিপূজা অধমাধম সাধনপদ্ধতি। কিন্তু তাহা হইলেও উহার একটা নির্দ্দিষ্ট প্রক্রোমক্ত প্রণালী আছে। সে প্রণালী লঙ্ঘন করিলে প্রতিমার উপর সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকিবে না,—উহা সামান্য পুতুলখেলায় পরিণত হইবে। সুতরাং এই দেব-আরাধনা সম্পর্কে অপরের ধর্ম্ম কোন-রূপ ক্ষুণ্ণ করা কখনই সঙ্গত হইবে না।

ধর্ম্মকার্য্য বিশ্বাসসম্পর্কিত ব্যাপার। বিশ্বাসের উপরই ধর্ম্ম-কার্য্য নির্ভর করে। যেখানে বিশ্বাস নাই, সেখানে ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। এই বিশ্বাস ভিন্ন ধর্ম্মব্যাপারে আর একটা বিষয় জড়িত আছে, সেটি কল্পনা। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকরা বলেন,—মানুষের বিচারবুদ্ধি অগ্রসর হইবার অগ্রে অগ্রে তাহার কল্পনা

---

* It is said in the Hebrew Scriptures God made man in his own image. Turn the statement up side down, and it becomes true: "Man makes God in his own image." And whether the representation consists of the clay figure made by an African Negro, or the mental image constructed by civilized man, it is equally a vain and foolish idol. The most ignorant savage and the Archbishop of Canterbury are equally unable to form any true conception of the nature of God.—New Light on Old Problems.

ধাবিত হয়। আদিম মানবের বিচারবুদ্ধি অপেক্ষা কল্পনার দৌড় অধিক হইয়াই থাকে। সেই হেতু নিম্নতম অধিকারীর ধর্ম্ম বাহ্যাড়ম্বরবহুল হইয়াই থাকে। ক্রমে যতই মানুষের বিচারবুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই তাহার ধর্ম্মকার্য্য বহির্ম্মুখ হইতে অন্তর্ম্মুখ হয়। উপাস্য দেবতা সম্বন্ধেও তাহাদের জ্ঞানের বিবর্ত্তন ঘটে। সেই জন্য হিন্দুর উপাস্য দেবতা গুঁড়িকাষ্ঠ, নুড়ি, শিলা হইতে বেদান্তবেদ্য ভগবান্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যে যেরূপ অধিকারী, সে সেইরূপ ভাবেই তাঁহার সাধনা করিয়া থাকে। প্রতিমাপূজা বা মূর্ত্তিপূজা সাধনার সর্ব্বনিম্নস্তর, কারণ, উহা বাহ্যপূজা। সেই জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন :—

উত্তমা মানসী পূজা মধ্যমা ধ্যানধারণে।
অধমা জপযজ্ঞস্তু বাহ্যপূজাঽধমাধমা॥

মানসপূজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ভগবানের বিভূতি সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণাই মধ্যমপূজা, মন্ত্রজপ অধম পূজা এবং বাহ্য পূজা অধম পূজা অপেক্ষাও অধম। কিন্তু সকলের মানসপূজা করিবার অধিকার নাই। যাঁহারা সন্ন্যাসী, যোগী এবং যাঁহাদের বিষ্ঠা-চন্দনে সমজ্ঞান জন্মিয়াছে, যাঁহারা এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই ব্রহ্মময়, জগৎ ব্রহ্মময় বলিয়া প্রকৃতপক্ষে উপলব্ধি করিতে সমর্থ, তাঁহারাই মানসী পূজা করিতে সমর্থ। অন্যের পক্ষে তাহা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা এবং অধঃপতনের কারণ। যে হেতু, এই পূজা অতি কঠিন। যথা :—

অর্চ্চয়ন্ বিষয়ৈঃ পুষ্পৈস্তৎক্ষণাৎ তন্ময়ো ভবেৎ।
ন্যাসতন্ময়তাবুদ্ধিঃ সোঽহংভাবেন পুজয়ন্।

বিষয়রূপ পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া তৎক্ষণাৎ তন্ময় হইতে হইবে এবং এই চরাচর বিশ্বে তিনিই একমাত্র সত্ত্ব বলিয়া বিদ্যমান, সাধকের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তিনিই সাধক, এই ভাবে যে পূজা—তাহাই মানসী পূজা। যে মানসী পূজা করে, সে সর্ব্ববিধ ভোগতৃষ্ণা বর্জ্জন না করিলে তাহা পারে না। যাহার সেই ভোগতৃষ্ণা স্বতঃই বর্জ্জিত হইয়া থাকে, সে তাহা পারে। অন্যের পক্ষে তাহা অসাধ্য।

সুতরাং অধম অধিকারীর পক্ষে বাহ্য পূজা হইতেই পূজা আরম্ভ করিতে হয়। লিখিতে শিখিবার পূর্ব্বে শিশুকে যেমন হাঁড়ি-মালসা লিখিতে, রেখা টানিতে শিখাইতে হয়, সেইরূপ অধম সাধককে সর্ব্বপ্রথমে মূর্ত্তিপূজারূপ বাহ্যাড়ম্বর-বহুল পূজা করাইতে হয়। ঐ বাহ্যাড়ম্বরবহুল পূজায় দীক্ষিত করিয়া মানবের মনে ভক্তি, শ্রদ্ধা, শৌচ প্রভৃতির উন্মেষ করাইতে হয়। অধম মানবের পক্ষে চিত্তাকর্ষী বাহ্যাড়ম্বরের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। সে আড়ম্বরের ভিতর দিয়া তাহাদের মনে পবিত্রতার ভাবটুকু ধীরে ধীরে জাগাইয়া তোলাই ধর্ম্মগুরুর সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যদি পূজকের ও যজমানের মনে পবিত্রতার ভাব না জাগে, তাহা হইলে তাহার সেই পূজাই পণ্ড হয়।

দেববিগ্রহের পূজা মূর্ত্তিপূজা। সুতরাং উহা মুখ্যতঃ অধম অধিকারীর পক্ষে বিহিত। এই পূজা-ব্যাপারে নির্ব্যূঢ় সত্য বলিয়া কিছু নাই; সমস্তই আপেক্ষিক সত্য। নির্ব্যূঢ় সত্য মানবজ্ঞানের অগোচর। সুতরাং পূজা-ব্যাপারে যাহাতে সাধকদিগের পবিত্রতাবুদ্ধি ক্ষুন্ন না হইয়া বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়, সর্ব্বতোভাবে তাহাই সকলের কর্ত্তব্য। কারণ, মলিনচিত্তে পবিত্রভাব জাগাইয়া তোলাই এবং পবিত্রতার দিকে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করাই বাহ্যপূজার প্রধান লক্ষ্য। ইহাই সংক্ষেপে হিন্দুর পূজাতত্ত্ব।

ইহাতে বুঝা গেল যে, দেবালয়ে এবং দেবসান্নিধ্যে, দেবতার পূজার এবং দেবতার ভোগরন্ধনে সর্ব্বপ্রকার পবিত্র-ভাব-রক্ষাই একান্ত আবশ্যক। নতুবা পূজকের পূজাই পণ্ড হইবে। পুরোহিত মন্ত্রশক্তিবলে উহাতে যে দেব-সান্নিধ্য বা প্রাণশক্তি জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করেন, তাহা সফল হয় না। কারণ, সাধারণের পবিত্রতাবুদ্ধি এবং ভক্তি-ভাব সেই দেবসান্নিধ্যের মূল কারণ। মন্ত্রশক্তি উহার উত্তেজক কারণ, দেবতা ভক্তির দ্বারাই আকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

সম্প্রতি দেবমন্দিরে সর্ব্বজাতিকে প্রবেশ করিতে, পূজা-দ্রব্য স্পর্শ করিতে এবং দেবার্চ্চনা করিতে অধিকার দিবার জন্য এক সম্প্রদায় যেন একবারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাঁহারা মুখে বলিতেছেন, তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য অস্পৃশ্যতা-নাশ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের উদ্দেশ্য ধর্ম্মনাশ। কারণ, এ কথা খুবই সত্য যে, যদি দেবালয়ে মুচি, মুর্দ্দাফরাস, মেথর প্রভৃতি অশুচি বলিয়া বিবেচিত জাতিদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই অস্পৃশ্যতা-সমস্যার সমাধান হইবে না। উহার দ্বারা কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠিত দেবতার দেবত্ব নষ্ট করা হইবে। কোন উচ্চবর্ণের হিন্দু ঐ দেবমূর্ত্তির আর পূজা করিবে না। অনেক নিম্ন-বর্ণের হিন্দুও উহাকে পূজা করিবে না। কারণ, তাহাদের বিশ্বাস জন্মিবে যে, দেবতা ঐ বিগ্রহ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার ফলে দেবালয়গুলি নষ্ট হইবে এবং অন্য হিন্দুরা দেবালয়ের গতি ঐরূপ হইবে, এই আশঙ্কায় আর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিবে না। ইহার ফলে হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠানের পথ কণ্টকাকীর্ণ করা হইবে। সাধকের বিশ্বাসের উপরই দেবতার দেবভাব পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত থাকিবেই। আমি শৌচাশৌচ বিচারের পক্ষপাতী হইলেও ঘোর অস্পৃশ্যতার পক্ষপাতী নহি। আমার মনে হয়, দেবমন্দিরে প্রবেশ ও দেববিগ্রহ স্পর্শ করিলেই যদি অস্পৃশ্য জাতিকে স্পৃশ্য করা যাইত, তাহা হইলে বনে জঙ্গলে ও লোকালয়েও যে সকল বিগ্রহ-সমেত [illegible] দেবালয় দেখা যায়, উহাতে প্রবেশ করিলেই অস্পৃশ্য জাতি স্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কোন কোন [illegible] তথায় প্রবেশ করিয়াও থাকে, কিন্তু তাহাতেও [illegible] স্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। আসল কথা, ব্যবহারিক জীবনে অস্পৃশ্য জাতিকে শৌচাচারপরায়ণ করিয়া এবং অন্যদিকে তাহাদের উন্নতিসাধন করিয়া তবে তাহাদিগকে দেবালয়-প্রবেশে অধিকার দেওয়া উচিত। আমি বারান্তরে এই অংশের বিস্তৃত আলোচনা করিব।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন, সাহিত্য-বিনোদ)

কন্যাদায়

১

"বলি, মেয়েকে কি থুবড়ো করেই রাখবে?

গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন। কর্ত্তা উত্তর দিলেন, "সেটা কিসে বুঝলে?"

"গতিক ত সেই রকমই দেখছি। কোন চেষ্টাই ত দেখতে পাইনে।"

"আমি যখন বাইরে বেরুব, তখন আমার সঙ্গে যেও, চেষ্টা করছি কি না, দেখতে পাবে।"

"বলতে গেলেই এই রকম বিদ্‌ঘুটে কথাই ত কেবল বল।"

"সাধে কি বলি, দায়ে প'ড়ে বলতে হয়। জেনে শুনে যদি ন্যাকার মত কথা কও ত কি করব বল!"

"ন্যাকার মত কথা কি? মেয়ে বড় হয়েছে, তুমি বাপ—তোমাকে বলব না ত কি গিয়ে রাস্তার লোককে ডেকে বলতে যাব?"

"আহা, আমি কি তোমাকে সে জন্যে ন্যাকা বলছি? আমার মাথায় যে কত রকম বুদ্ধি খেলে, তা ত তুমি জান, সেই জন্যেই ত ন্যাকা বলছি।"

"তোমার বুদ্ধির জোরেই ত আমাদের এই হাড়ীর হাল হয়েছে। আর বুদ্ধির বড়াই করতে হবে না।"

"আরে, বুদ্ধির দোষ কোথায়—তোমাদের বরাতের দোষ। তোমাদের অদেষ্টে কষ্ট আছে, নইলে সেবারের সেই ঘুঁটের কারবারটাতে কখনও লোকসান হয়? মাঘ-মাসে দত্তপুকুরের দিক্ থেকে যত গোয়ালাবাড়ী ঘুরে ঘুরে হাজার টাকার ঘুঁটে এনে গাদা মেরে রাখলুম—বর্ষাকালে কলকাতায় চালান দেব—"

"থাক, বুদ্ধির বড়াই আর করতে হবে না। ভদ্দরলোক ঘুঁটে বেচে লাভ করবে!"

"এই ভদ্দর ভদ্দর করেই ত আমাদের দেশের লোক উচ্ছন্ন যেতে বসেছে। দেশের লোককে শিক্ষাও দেব—নিজেও মোটা রকম লাভ করব, সেই জন্যেই ত ঘুঁটের ব্যবসা আরম্ভ করেছিলুম। লাভ হ'ল না—সেটা তোমার বরাত,—বলে 'স্ত্রীভাগ্যে ধন' তোমার ভাগ্যে ধন নেই, তা নইলে ঘুঁটেগুলো ইঁদুরে কেটে সব গুঁড়ো ক'রে দেয়, না—জল ব'সে অর্দ্ধেকের ওপর গোবর হয়ে যায়!"

"শেষ আমার বালা দু'গাছা বেচে তবে জমীর ভাড়া শোধ করতে হ'ল। নইলে জমীদার মাইনে আটক করে যে! পোড়া কপাল বুদ্ধির!"

"তুমি আমার বুদ্ধির নিন্দে করছ—কিন্তু আমার বুদ্ধি নিয়েই কেষ্ট হালদার আজ বড়লোক—যুগল পরামাণিক গাড়ীঘোড়া চড়ছে। হবে না কেন—তাদের স্ত্রীর বরাতে টাকা আছে—তাই।"

"তোমার কেবলই উল্টো চাপ!—কোন কথা বলবার জো নেই!—বাস্ রে।" বলিয়া গৃহিণী ব্রজরাণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন।

কর্ত্তা কেবলরাম অমনই সুর ফিরাইয়া বলিলেন, "আরে, ঠাট্টা বোঝ না। তুমি রাগলে বড় সুন্দর দেখায়—তাই মাঝে মাঝে তোমাকে রাগাই।"

"আর 'নেকাপনা' করতে হবে না।" কিন্তু গৃহিণীর সুরে সে ঝঙ্কার শোনা গেল না—বরং যেন একটু প্রসন্নতার ভাবই প্রকাশ পাইল।

মনে মনে ঈষৎ হাস্য করিয়া কেবলরাম বলিলেন, "আমি কি খোসামোদ ক'রে এ কথা বলছি,—তা নয়, এ আমার মনের কথা।"

গৃহিণী বলিলেন, "যা খুসী বল গে—কে তোমার মুখে চাবী দিয়ে রাখবে, কিন্তু মেয়ের বিয়ে ত দিতে হবে।"

"দিতে ত হবে নিশ্চয়ই; কিন্তু তা ব'লে যার তার হাতে ত দিতে পারিনে। তাই ভাবছি।"

"এই যে বললে, চেষ্টা করছি।"

"আরে ভাবনাই ত চেষ্টা—ঘুরে বেড়ালেই কি চেষ্টা হয় ?"

"কি ভাবছ, তাই না হয় শুনি।"

"কি যে ভাবব, তাই ত ভেবে পাচ্ছিনি—তবে এটা ঠিক যে, যেখানে সেখানে বা যা-তা পাত্রে বিয়ে দেব না। আমিই না হয় গরীব হইছি, কিন্তু বংশের মর্য্যাদা ত একটা আছে।"

"আচ্ছা, রায় বাহাদুরের ছেলের সঙ্গে চেষ্টা ক'রে দেখলে হয় না ?"

"কোন্ রায় বাহাদুর ?"

"ন্যাকা! আমাদের পাল্টী ঘর, আবার কোন্ রায় বাহাদুরকে আমি জানি ? এই যে জমীদার ত্রিপুরাচরণ—"

"রাম—রাম! সকালবেলা লোকটার নাম করলে! ছুটীর দিনটাই মাটী করলে দেখছি।"

"তোমার এক কথা—একটা ভাগ্যবানের নাম করলে দিন নিশ্চয় ভালই যায়। ভগবানের দয়া না থাকলে কেউ কি কখনও বড়মানুষ হয় ?"

"যা করেছ—তা করেছ; আর ও-নাম কোরো না। দেশশুদ্ধ লোক কি বোকা যে, তার নাম করে না!"

"তবে কি বল্‌তে হবে ?"

"জাম-শাই।"

"সে আবার কি ?"

"জমীদার মশায়ের সংক্ষেপ।"

"তাঁর কাছে একবার গিয়ে দেখ না—কোথায় কি হয়, কেউ বলতে পারে ?"

"আরে, তা কি হয়; সে হ'ল মস্ত জমীদার—তায় তার ঐ একমাত্র ছেলে—ছেলেটি কালেজের একটি রত্ন—আর এ দিকে আমার মত এক জন গরীব—"

"গরীব—কিন্তু বংশমর্য্যাদা ত আছে।"

বংশ-মর্য্যাদার কথায় একটা কথা কেবলরামের মনে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে লাগিল।

গৃহিণীর কণ্ঠস্বর আবার চড়া পর্দ্দায় শোনা গেল,"এ দিকে বুদ্ধির বড়াই করা হয়,—যদি এই ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পার, তবেই বুঝি যে, তোমার বুদ্ধি আছে; নইলে চিরদিন যে জিনিষটাকে তুমি বুদ্ধি ব'লে চালিয়ে আসছ, বুঝব যে, সেটা বুদ্ধি নয়, গোব—"

কেবলরাম সতেজে বলিয়া উঠিলেন, "গোবর যে নয়, তা তোমাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে তবে ছাড়ব।" বলিয়া তিনি চাদর ও ছাতাটা লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন এবং গৃহিণী মুখে অঞ্চল চাপা দিয়া হাস্যবেগ সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

২

জমীদার রায় ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী বাহাদুরের পৈতৃক বাস-ভূমি ভূপালপুর গ্রামে। তাঁহার পিতা করালীচরণের কোন কোন ব্যবহারে গ্রামস্থ দুর্জ্জন ব্যক্তিরা তাঁহাকে একঘরে করে। সেই সময় ত্রিপুরাচরণের বিবাহের জন্য চেষ্টা চলিতেছিল; কিন্তু ত্রিপুরাচরণের নিজের কোনওরূপ দোষ না থাকিলেও যোগ্য ঘরে ভাল পাত্রী জুটিতেছিল না। তখন বাধ্য হইয়াও বটে—আর রক্তের তেজ কমিয়া যাওয়া-তেও বটে—করালীচরণ পূর্ব্ব-ব্যবহারের জন্য নিজের ত্রুটি স্বীকার করেন; কিন্তু তাহাতেও দেশস্থ 'ভবি' যখন ভুলিল না, তখন অগত্যাই তিনি মাইল কতক দূরবর্ত্তী দেবপল্লী বা দেবপাড়া গ্রামে আসিয়া কেবলরামের পিতা হরিরামের শরণাপন্ন হন এবং তাঁহারই পরামর্শে পৈতৃক বাসভূমি ভূপালপুর ত্যাগ করিয়া দেবপাড়ায় প্রকাণ্ড বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে হরিরামের পরামর্শে জমীদার করালীচরণ এক বৃহৎ ভোজের ব্যবস্থা করিলেন এবং পাঁচখানি গ্রামের সর্ব্বশ্রেণীর আবাল-বৃদ্ধবনিতাকে আদরে, আপ্যায়নে ও ভোজনে তৃপ্ত করিলেন; বলা বাহুল্য, মোটা রকম সামাজিক বিতরণেও কার্পণ্য করেন নাই। তাহার পর হরিরাম প্রভৃত চেষ্টায় ঠিক যোগ্য ঘরে না হইলেও ত্রিপুরাচরণের বিবাহ দেওয়াইলেন। সেই অবধি ত্রিপুরাচরণ বংশ-মর্য্যাদা সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন; তাঁহার বরাবর ইচ্ছা, নিজ পুত্রের বিবাহ কো· বনিয়াদি বংশের কন্যার সহিত দেন; কিন্তু সর্ব্বত্র ঠি· মনের মত হয় না—বংশ ত ভাল চাই-ই—মেয়েটিও নিখুঁ· সুন্দরী হওয়া চাই। তিনি নিজে কোন প্রকার প্রার্থী ন হইলেও পুত্র যে শ্বশুরালয় যাইয়া দুই দিন আমোদ করিে পারিবে না—এটা তাঁহার মনঃপূত হইত না; কারণ, তি· নিজে ভুক্তভোগী। এই সব কারণে পুত্র কালীচরণে· বিবাহ আজও ঘটিয়া উঠে নাই।

ব্যাঘ্রাকৃতিপ্রাপ্ত মূষিক যে কারণে তাহার পালক ঋষিকে আক্রমণ করিয়া আত্ম-সম্মান রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, ঠিক সেই কারণেই বোধ হয় ত্রিপুরাচরণ হরিরামের পুত্র কেবলরামকে এড়াইয়া চলিতেন—অবশ্য মনে মনে। বুদ্ধিমান্ ত্রিপুরাচরণ কিন্তু বাহিরে তাহার কিছুই প্রকাশ করিতেন না। পথে-ঘাটে সাক্ষাৎ হইলে পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা বা কিছুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তাও যে না হইত, তাহাও নহে।

ত্রিপুরাচরণের মনোগত অভিপ্রায় কেবলরামের অজ্ঞাত ছিল না, সেই ভরসাতেই নিঃস্ব কেবলরাম জমীদার রায় ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী বাহাদুরের বাটীতে উপস্থিত হইয়া চাকরের দ্বারা নিজের আগমন-বার্ত্তা রায় বাহাদুরের নিকট পাঠাইয়া বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

মিনিট দশেক পরে রায় বাহাদুর আসিয়া কেবলরামকে দেখিয়াই সুদীর্ঘ দাড়ী আন্দোলন করিয়া নীরস কণ্ঠে বলিলেন, "কি দরকার ?"

রাস্তা-ঘাটে যে ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে সাধারণ ভদ্রতার ত্রুটি হয় না, সেই ব্যক্তির বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া কেবলরাম বিস্মিত হইলেন। জড়িত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আমার একটি মেয়ে বিবাহের যোগ্যা হয়েছে।"

"তা কি ?"

"মেয়েটি আমার কর্ম্মিষ্ঠা—সুন্দরী—"

"ভালই ত।"

"লেখা-পড়া জানে—সুশীলা—"

"আনন্দের কথা।"

"যদি আপনি অনুগ্রহ ক'রে আপনার ছেলের সঙ্গে—"

"আমার ছেলের সঙ্গে! আমার ছেলের বিয়ের কথায় আমি থাকব না।"

"যদি আপনি অনুগ্রহ করেন—"

"সে হবে না। আর কিছু দরকার আছে ?"

"না।" বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া চাহিতেই অভিমানাত কেবলরাম দেখিতে পাইলেন, রায় বাহাদুরের লোমশ দেহটি বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণ ছাড়াইয়া অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

৩

সর্ব্বাঙ্গে নিষ্ফলতার ছাপ মাখিয়া কেবলরামকে আসিতে দেখিয়া গৃহিণী ব্রজরাণী বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিলেন, "তা হ'লে গায়ে হলুদের উদ্যুগ করি!"

"গায়ে হলুদের কেন—আমার শ্রাদ্ধের উদ্যুগ কর।"

"কথার 'ছিরি' দেখ।"

"আমার, না—তোমার ?"

"তোমার।"

"আমার কিসে ?"

'নয় ত কি! আমি বললাম গায়ে-হলুদের কথা, আর উনি বল্লেন কি না—"

"দেখতে পাচ্ছ, ছোটলোক বেটার ব্যাভারে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে যাচ্ছে।"

ঈষৎ হাসিয়া গৃহিণী জবাব দিলেন, "তা আমি কি ক'রে জানব ? 'জান্' ত আর নই।"

"'জান্'ই যখন নও, তখন ঠাট্টা করা কেন ?" কর্ত্তার কণ্ঠে অভিমানের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

গৃহিণী সদয় কণ্ঠে বলিলেন, "কি হ'ল বল, শুনি।"

কেবলরাম চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ছোটলোক—নইলে লোকে নাম করে না! বেটা একঘরে, আমাদের দৌলতে সমাজে বাস করছে। তার গ্রামের লোক ত দূর ক'রে দিয়েছিল। আমরা আশ্রয় না দিলে বেটাকে হয় 'কেরেস্থান', না হয় 'বেহ্মজ্ঞানী' হ'তে হ'ত, শা—"

"আহা, ব্রাহ্মণকে গাল দাও কেন ?"

"দেবে না—ছেলের বিয়ে না হয় না-ই দিবি, তা ব'লে এই রকম ব্যাভার কেউ করে—তোর দ্বারস্থ হয়েছি, সেটা ভাগ্যি ব'লে মনে না ক'রে—ইতর—অসভ্য—জানোয়ার—"

"আহা, থাম না গা, আমার কাছে শুধু শুধু চেঁচিয়ে বাহাদুরী ক'রে কি হবে ? তাঁর সামনে ত লেজ মুখে ক'রে চ'লে এসেছ। সেই যে বলে—'কিসের কাছে পেগের বড়াই'।"

"না, তোমার জন্যেই আমাকে সংসারাশ্রম ত্যাগ করতে হবে। আমার দুঃখে তোমার সহানুভূতি নেই—কেবল বিদ্রূপ।" অভিমানে কেবলরামের চোখে জল দেখা দিল।

ব্রজরাণী অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "সহানুভূতি নেই—এ কথা তুমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পার ?"

"পারি।" কিন্তু কণ্ঠস্বরে পরাজয়ের সুরই ধ্বনিত হইয়া উঠিল। কেবলরামের মনের ভিতর অতীতের সমস্ত ঘটনা বায়স্কোপের ছবির মত পর পর চলিয়া গেল—ব্যবসায়ের জন্য গহনা দেওয়া—পিতৃদত্ত সঞ্চিত টাকা হইতে কারবারের দেনা শোধ—আর সে দিনও শেষ সম্বল বালা জোড়াটা বিক্রয় করিয়া ঘুঁটের আড়তের খাজনার টাকা দেওয়া—সর্ব্বপ্রকার কষ্ট-স্বীকার—সময় সময় নিজে স্বল্পাহারে বা অনাহারে থাকিয়া স্বামী ও পুত্র-কন্যাকে পূর্ণরূপে আহার করান—সহানুভূতির অভাব কোথায়? কিন্তু এ কথা স্বীকার করিয়া পুরুষত্বকে ত খর্ব্ব করা চলে না—কাযেই কেবলরাম 'বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "তোমার টাকা ও গয়নাগুলো যদি আমি এই মাসের মধ্যে না ফেলে দিতে পারি ত আমি অব্রাহ্মণ।"

গৃহিণী ইহার ঔষধ জানিতেন, সুতরাং ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "'মুরোদ বড় তেজী, গাঙের কূলে বেড়াতে গিয়ে তাড়িয়ে এল বেজী'।"

কেবলরাম কমণ্ডলুর অনুকল্পস্বরূপ সম্মুখস্থিত একটা ঘটী হাতে লইয়া বলিলেন, "এই আমি আশ্রম ত্যাগ ক'রে চললুম—বানপ্রস্থ অবলম্বন করব।"

"ক্রোধং প্রভো সংহর সংহর" বলিতে বলিতে কেবলরামের পিসতুত ভাই রাঘব আসিয়া উপস্থিত। রাঘব বিপত্নীক, অপুত্রক ও ধনবান্। সে পশ্চিমে ক'ট্রাক্টরের কায করে। অনেক দিনের পর আজই বাঙ্গালায় পা দিয়াছে। ব্রজরাণী ও রাঘব সমবয়সী। কেবলরামকে সে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে। আপনার জন বলিতে এ সংসারে কেবলরাম ছাড়া তাহার আর কেহই ছিল না।

রাঘবকে দেখিয়াই ব্রজরাণী মুখের ক্রোধব্যঞ্জক ভাব গোপন করিয়া ফেলিলেন। কেবলরাম বলিয়া উঠিলেন, "রাঘব যে! কখন্ এলে?"

রাঘব উভয়কে প্রণাম করিয়া বলিল, "এই ত আসছি; কিন্তু প্রবেশ-মুখেই জলধর-জগদম্বার—অপরাধ নিয়ো না বৌদি—অসাবধানে বেরিয়ে পড়েছে।"

"আমি না হয় অপরাধ না-ই নিলুম, কিন্তু বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী তোমার দাদাটি কি ক্ষমা করবেন?" বলিয়া বৌদিদি কর্ত্তার দিকে আড়-চোখে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন।

কেবলরাম বলিয়া উঠিলেন, "কে বানপ্রস্থ অবলম্বন করছে?"

"এই ত কমণ্ডলুর অভাবে ঘটী হাতে ক'রে নিয়ে চলেছিলে—রাঘব দেখে নি মনে করেছ?"

রাঘব বলিল, "যেতে দাও এ কথা। এখন কি নিয়ে দাদার বানপ্রস্থে মনোনিবেশ, সেইটেই শুনি।"

ব্রজরাণী বলিলেন, "সে কথা পরে হবে। এখন তুমি কাপড়-চোপড় ছেড়ে একটু জল খাও—সমস্ত রাত গাড়ীতে জেগে এসেছ।"

রাঘব বলিল, "মোটেই নয়। বাঙ্কের উপর তোফা ঘুমিয়ে এসেছি। রাঘব রাত জাগবার ও কষ্ট পাবার পাত্র নয়। তুমি বল বৌদি, শুনি ব্যাপারটা কি?"

ব্রজরাণী কন্যার বিবাহের সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলিয়া বলিলেন, "এই জন্যে তোমার সদাশিব দাদাটিকে ঠাট্টা করেছিলুম,—এই আমার অপরাধ।"

কেবলরাম বলিলেন, "কে বলছে তোমার অপরাধ—তামাসাও বোঝ না?"

ব্রজরাণী জবাব দিলেন, "বুঝি গো বুঝি; শুধু তোমাকে একটু তাতিয়ে দিচ্ছিলুম।"

রাঘব বলিল, "জাম-শাই নিরুর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবে না?"

কেবল। না।

রাঘব। কিছুতেই না?

কেবল। কি বলিস তার ঠিক নেই—একশ'বার বলছি, সে দেবে না, তবু তোর সেই এক কথা!

রাঘব। আর আমি যদি এ বিয়ে দেওয়াতে পারি?

ব্রজরাণী। ওরে বাবা, এক জন ত মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতে গিয়ে বানপ্রস্থ নিয়ে ফিরলেন, আর এক জন ভাইঝির বিয়ের সম্বন্ধ করতে গিয়ে কি নিয়ে যে ফিরবে, তা ত বুঝতে পাচ্ছিনে।

রাঘব। ঠাট্টা নয় বৌদি। শুধু বিয়ে দেওয়া নয়, রায় বাহাদুর দাদার কাছে এসে যেচে তার ছেলের বিয়ে দেবে।

কেবলরাম বলিয়া উঠিলেন, "তা যদি পার ভাই, তবে আমার মনের ব্যথা ঘোচে।"

রাঘব বলিল, "আচ্ছা দাদা, রায় বাহাদুর কি আমার সকল খবর রাখে?"

কেবল। রাধে ব'লে ত বোধ হয় না।

"তবেই ঠিক হয়েছে।" বলিয়া রাঘব উঠিয়া দাঁড়াইল। ব্রজরাণী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "এখনি কোথা যাচ্ছ, কিছু জল খেয়ে যাও।"

"আচ্ছা।"

জলযোগান্তে রাঘব শিশ্ দিতে দিতে ও ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাহির হইয়া গেল।

৪

"এ কি, রাঘব বাবু যে! কবে এলেন? নমস্কার।"

"নমস্কার। আজই এসেছি।"

পথিমধ্যে রায় বাহাদুরের সহিত রাঘবের সাক্ষাৎ।

রায় বাহাদুর বলিলেন, "কত দূর চলেছেন?"

"আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম।"

"আমার কাছে? কি সৌভাগ্য! কি প্রয়োজন?"

রাঘব কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই বলিল, "আমার একটি মেয়ে আছে, সুন্দরী এবং লেখাপড়াও জানে। যদি আপনার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেন।"

"এ ত খুব আনন্দের কথা; কিন্তু—"

"এর আর কিন্তু কি? মেয়ে পছন্দ না হয় ত এ কথা এইখানেই খতম। আর যদি পছন্দ হয়, তা হ'লে আর কিছুতে আটকাবে না। জানেন ত ভগবানের কৃপায় আমার—"

"বিলক্ষণ, সে কথা আর বলতে! ইউ পির কণ্ট্রাক্টর আর, সি, রায়কে কে না জানে।"

"আর আমার ঐ একমাত্র সন্তান।"

রায় বাহাদুর মহা-উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সোৎসাহে বলিলেন, "টাকাকড়ির লোভ আমার নেই। আপনার যা ইচ্ছে, তাই দেবেন।"

রাঘব বলিল, "বেশ, ভাল কথা। তা হ'লে মেয়ে দেখা হবে কবে?"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "শুভস্য শীঘ্রং, তা হ'লে আজই।"

"কিন্তু আমার একটু নিবেদন আছে।"

"বলুন।"

আমার মেয়েটি বড় লাজুক। বেশী লোক-জন থাকলে ভড়কে যাবে।"

"তার দরকার কি। আমি একলাই মেয়ে দেখে আসব।"

"এর চেয়ে আর কথা কি? আপনি আমার বাড়ী চেনেন ত?"

"সে কি কথা! কেবলরামের পাশের ঐ বড় বাড়ীখানা সে দিন তৈরী হ'ল, আমি আর জানি নে!"

"তা হ'লে কৃপা ক'রে আজ বিকেলবেলা—"

"নিশ্চয়ই।"

পরস্পর নমস্কারান্তে উভয়ে বিদায় লইলেন।

৫

কন্যা দেখা ও আশীর্ব্বাদ হইয়া গিয়াছে। অদ্য বিবাহ। কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ উভয়েই ধনবান্; সুতরাং যেরূপ সমারোহের আয়োজন হইয়াছে—এ প্রদেশের লোক সেরূপ সমারোহের কথা কখন শুনেও নাই—দেখা ত দূরের কথা। উভয় পক্ষের বাটীতেই নহবৎ বসিয়াছে। বরের বাটী হইতে কন্যার বাটী পর্য্যন্ত অর্দ্ধমাইল পথে বাঁধা রোশনাই। গ্রাম্যশানাই হইতে কলিকাতার ব্যাগপাইপ, মাদ্রাজী, শিখ, ইংরাজী প্রভৃতি ১০।১২ রকম বাজনার দল আসিয়াছে। পর্য্যায়ক্রমে তাহাদের বাদ্যের রবে সমস্ত গ্রাম মুখরিত। কারবাইটের গন্ধে সর্ব্বস্থান ভরপুর! এত বড় সমারোহের বিবাহ দেখিবার জন্য গ্রামান্তর হইতেও অনেক নর-নারী আত্মা-কুটুম্বের বাড়ী আসিয়াছে। ছেলে-মেয়েদের যেন মেলা লাগিয়া গিয়াছে। সে এক বিরাট দৃশ্য! অবশ্য এ সমস্তই গোপনে রাঘবের খরচায়; কারণ, অর্থব্যয় সম্বন্ধে রায় বাহাদুরের একটু দুর্নাম আছে, আর ঐ দুর্নামের জন্যই অনেকে তাঁহার নাম সহসা মুখে আনিতে চাহে না।

এইমাত্র আভ্যুদয়িক সারিয়া কেবলরাম উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন; ব্রজরাণী শ্রাদ্ধের স্থান পরিষ্কার করিতেছেন—সেইখানেই সম্প্রদান হইবে। এমন সময় তথায় রাঘব আসিয়া উপস্থিত। রাঘবকে দেখিয়া কেবলরাম বলিলেন, "রাঘব, তোমার কথামত এত দূর ত এগিয়ে পড়েছি। কিন্তু শেষ রক্ষে যদি না হয়?"

রাঘব বলিল, "তুমি ভাবছ কেন দাদা, কোন ভয় নেই।"

ব্রজরাণী উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "তুমি বলছ বটে ভাই, কোন ভয় নেই, কিন্তু যদি গোলমাল ঘটে, তা হ'লে উপায় ?"

রাঘব মৃদু হাসিয়া বলিল, "বৌদি! তুমি আমাকে বিশ্বাস কর ?"

ব্রজরাণী পিতৃমাতৃহারা, বিপত্নীক দেবরটিকে ভালরূপই জানিতেন। তাঁহার স্বামীর পিসতুত ভাই হইলেও রাঘব যে সহোদর অপেক্ষাও আপনার জন এবং ধনবলে শক্তিমান, সে বিশ্বাসও তাঁহার ছিল। তিনি বলিলেন, "জানি, তুমি আমাদের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।"

রাঘব বলিলেন, "সেই বিশ্বাস যদি থাকে, তবে ঠিক জেনো, কোন গোল হবে না। আমি দাদার পাশে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত থাকব। তুমি ত জানো, দাদা ছাড়া আমার সংসারে কেউ নেই।" বলিতে বলিতে রাঘবের কণ্ঠ ধরিয়া আসিল।

কেবলরাম রাঘবের দিকে নির্ব্বাক্‌ভাবে চাহিয়া ছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন, "কিন্তু ভাই, রায় বাহাদুর ত আমার কাছে যেচে মেয়ে নিতে এল না ?"

রাঘব উত্তর করিল, "এইবার আসবে। আমি তারই জন্য যাচ্ছি।"

শিশ দিতে দিতে রাঘব বাহির হইয়া গেল।

৬

রায় বাহাদুর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া জন কয়েক প্রজার সহিত বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন ও শোভাযাত্রার জন্য কর্ম্মচারীদিগকে যথোপযুক্ত উপদেশ দিতেছিলেন। এমন সময় রাঘব আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। রায় বাহাদুর শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি, বেইমশাই যে, এমন অসময়ে ? ওরে, এ দিকে দু'খানা চেয়ার নিয়ে আয়।"

রাঘব সবিনয়ে বলিল, "আপনি ব্যস্ত হবেন না, বেইমশাই! একটা কথামাত্র জানতে এলুম।"

দুইখানি চেয়ার আসিয়া তথায় স্থাপিত হইল। উভয়ে বসিলেন। রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা, বেইমশাই ?"

রাঘব বলিল, "বরের পৈতার গ্রন্থির জন্য পুরুতমশাই আপনাদের প্রবর জানতে চাইলেন। তখন মনে হ'ল, তাই ত, গোত্র ত, জিজ্ঞাসা করা হয় নি। তাই আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করতে এলুম।"

"এই ব্যাপার! তা এর জন্যে আপনার আসবার দরকার ছিল না—অবশ্য আপনি এসেছেন, সে আমার সৌভাগ্য—কারুকে পাঠিয়ে দিলেই হ'ত।"

"তা অবশ্য হ'ত। ভাবলাম, চারি দিক্ তত্ত্বাবধান করা হবে আর এ কথাটা আপনাকে জিজ্ঞাসা করাও হবে।"

"তা বেশ করেছেন। আমার গোত্র বাৎস্য, প্রবর—ঔর্ব্ব্য চ্যবন—"

রাঘব নিপুণ অভিনেতার ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল, "আমি যে সাবর্ণ—আমার প্রবরও ত ওই! সমান প্রবর হ'লে ত বিয়ে হয় না!"

রায় বাহাদুরের চক্ষুর সম্মুখে সমস্ত বিবাহোৎসবটা একটা উপহাসের তীব্র তরঙ্গ তুলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাঘব মনে মনে অত্যন্ত আমোদ উপভোগ করিতে লাগিল।

প্রবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রায় বাহাদুর বলিলেন, "তাই ত!"

কথাটা জানাজানি হইবার পূর্ব্বেই রাঘব রায় বাহাদুরকে একপ্রকার টানিয়া লইয়া নিভৃত স্থানে যাইলেন। রায় বাহাদুর কিছু স্থির হইয়া বলিলেন, "এ কথা আগেই ত জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।"

রাঘব সবিনয়ে বলিল, "সেটা উভয়তঃ। আমরা যদি পৈতৃক ঘোষাল—গাঙ্গুলী উপাধিগুলো ব্যবহার করতুম, তা হ'লে আর এ বিভ্রাট ঘটত না।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "সে ত পরের কথা। কিন্তু আমি যে বড় মুস্কিলে পড়লাম, রাঘববাবু! এখনি কলিকাতা থেকে নিমন্ত্রিতরা এসে পড়বে। চার দিকের আত্মীয়-স্বজন এসেছে। এখন লোকে বলবে কি ; একেই ত—"

রায় বাহাদুরের অসম্পূর্ণ বক্তব্যটি সম্পূর্ণ করিল রাঘব। বলিল, "একটু বদনাম আপনাদের আছে। এই ব্যাপারে সেটা আরও বেড়ে যাবে।"

রায় বাহাদুর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "রাঘব বাবু, আপনার কাছে গোপন করব না, সেই ত আমার প্রধান ভয়। নইলে আমার মেয়ে নয় যে, দুর্ভা[illegible]

হবে। কিন্তু রাঘব বাবু, আপনাকে ত কৈ তেমন বিচলিত দেখিতেছি নে? আপনার মেয়ে—আপনারই ত বিশেষ ভাবনার কথা।”

রাঘব বলিল, “কি জানেন রায় বাহাদুর, আমি পশ্চিমে থাকি, সেখানেই মেয়ের বিয়ে দেব—পাত্রও এক রকম ঠিক করাই আছে। তবে আপনার ছেলেটি নাকি বড় ভাল, তাই শুনে বিয়ে দিচ্ছিলুম। এ সব কথা সেখানে পৌঁছুবে না—আর পৌঁছুলেও টাকায় সব ঢাকা পড়বে।”

রায় বাহাদুর বলিলেন, “কিন্তু আমি যে বড় বিপদে পড়লাম।”

রাঘব বলিল, “আপনি যদি আমার পরামর্শ নেন, তা হ'লে বোধ হয়, সব দিক্ রক্ষা হয়।”

রায় বাহাদুর ব্যগ্রভাবে কহিলেন, “কি—কি?”

রাঘব বলিল, “কেবল দাদার একটি মেয়ে আছে, সে আমার মেয়ের সমবয়সী, আর রূপে গুণে ঠিক তারই মত। বংশ সম্বন্ধে ত সবই জানেন।”

রায় বাহাদুর দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলিলেন, “তা জানি সব, কিন্তু কেবল গরীব—তা ছাড়া, আমি তার সঙ্গে একটু অসদ্‌ব্যবহারও করেছিলাম।”

রাঘব বলিল, “তা জানি, আমি তাঁকে রাজী করব। আমার মেয়েকে যা দিতুম, সে সবই আপনি পাবেন। আর দেখুন, আমার বাড়ী আর কেবল দাদার বাড়ী পাশাপাশি—এক বাড়ী বললেই হয়। কাযেই বিয়ে আমার বাড়ীতেই হবে—উদ্যোগ ত সবই রয়েছে। মাঝখান থেকে কনে বদল হয়ে গিয়েছে, সে খবর আর কে রাখছে বলুন? এ গণ্ডগোলের কথা ত কেউই জানে না—শুধু আপনি আর আমি।”

রায় বাহাদুর উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, “ঠিক বলেছেন—কেউই বিশেষ কিছু জানতে পারবে না। কিন্তু কেবল কি রাজি হবে?”

রাঘব বলিল, “সে আপনাকে ভাবতে হবে না, আমি সব ঠিক ক'রে দেব। এখন চলুন, কেবল দাদার কাছে যাই।”

বিপন্নভাবে রায় বাহাদুর বলিলেন, “সেটা কি ভাল দেখাবে?”

রাঘব বলিল, “আমি এখনই কেবল দাদাকে এখানে আনতে পারি, কিন্তু তাতে হয় ত কথাটা এখনই জানাজানি হয়ে যাবে। আমি যেমন আপনার বাড়ীতে বেড়াতে এইছি, আপনিও যদি সেই ভাবে আমার বাড়ীতে বেড়াতে যান ত লোকে কিছুই সন্দেহ করবার অবকাশ পাবে না। আমার বাড়ীতে বসেই কথাবার্ত্তা হবে এখন।”

এ যুক্তি রায় বাহাদুরের সমীচীন বোধ হইল। তখন মনের আনন্দে শিশ দিতে দিতে রাঘব রায় বাহাদুরকে সঙ্গে লইয়া বাটীর দিকে অগ্রসর হইল।

৭

সম্প্রদান হইয়া গিয়াছে। বর এবং বধূ বাসর-ঘরে, বর-যাত্রী ও কন্যাযাত্রীরা চর্ব্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয়ে পরিতৃপ্ত হইয়া বর-কন্যার কল্যাণ কামনা করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছে। অনাহূত ও রবাহূতরা খাইতে বসিয়াছে। এখন আর সে হট্টগোল নাই—সেই ‘এ দিকে নিয়ে এস’, ‘ওর পাতে দাও’, ‘আরে রমেশ বাবু যে, এখনও দাঁড়িয়ে—ব'সে যান,’ ‘ওহে নেত্যহরি, এখানে পাতা দাও,’ ‘চক্কোত্তি মশাই, চেয়ে-চিন্তে নেবেন,’ প্রভৃতি গ্রাম্যভোজের সে কলরব নাই; চারি দিক্ কতকটা নিস্তব্ধ। রায় বাহাদুর সামিয়ানার নীচে একটা মস্ত গুড়গুড়িতে তামাক খাইতেছেন ও পার্শ্বস্থিত কেবলরামের সহিত কথোপকথন করিতেছেন। এমন সময় রাঘব আসিয়া করযোড়ে রায় বাহাদুরকে বলিল, “বেই মশাই, এইবার একটু মিষ্টি-মুখ—”

রায় বাহাদুর বলিলেন, “এত রাত্রে—”

রাঘব। তা হ'ক, সামান্য কিছু মুখে দিন, নইলে দাদাও যে কিছু খেতে পারছেন না।

রায়। তবে চলুন। আচ্ছা, একটা কথা, বিয়ের কথাবার্ত্তা ত হ'ল বিকেলে, কিন্তু বেই মশাই উপবাস করলেন কি ক'রে?”

রাঘব। আমার মেয়ের সম্প্রদানের ভার দিয়েছিলাম যে ওঁকে।

রায়।, ওঃ, বিধির নির্ব্বন্ধ কি না!

জলযোগান্তে রায় বাহাদুর বধূকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাঘব এ জন্য প্রস্তুত ছিল, অধিকন্তু ইহার প্রয়োজনও ছিল।

বধূ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই ব্রজরাণী কম্পিত

হস্তে মেয়ের অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিলেন। বধূর মুখ দেখিয়া রায় বাহাদুর সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি!"

রাঘব মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, সে বলিল, "কেন, কোন গোল বেধেছে না কি?"

"এ ত আপনারই মেয়ে দেখতে পাচ্ছি।"

"আপনি কি আমাদের দাদা-ভাইয়ে সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই বাধিয়ে দেবেন না কি?"

"কি রকম?"

"এ যে দাদার মেয়ে, তা গাঁ শুদ্ধ সবাই জানে। এখন যদি আপনি আমার মেয়ে বলেন, তা হ'লে—"

কেবলরাম বলিলেন, "কি যে বলিস রাঘব, তার ঠিক নেই—সব সময় তোর রসিকতাগুলো—"

রাঘব বলিল, "তবে শুনুন রায় বাহাদুর, আমার মেয়ে কোনও দিনই ছিল না। দাদার মেয়ের বিয়ের জন্যেই এত কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। দাদা আপনার কাছে যখন গিয়েছিলেন, তখন যদি আপনি রাজি হতেন, তা হ'লে আর এ হাঙ্গামা করতে হ'ত না। কিন্তু আপনি ঠকেন নি একটুও; কারণ, মেয়ে আপনার পছন্দমত, আর আমার যা কিছু আছে, সবই আমি নিরুকে দান করেছি। এই নিন সেই দানপত্র।" বলিয়া রাঘব রেজেষ্টারী-করা দান-পত্রখানি রায় বাহাদুরের হাতে দিল।

বিস্ময়বিমূঢ় রায় বাহাদুর বিহ্বলভাবে রাঘবের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীসতীপতি বিদ্যাভূষণ।

ব্যর্থ

বন্ধু!—

মনের কথা ছড়িয়ে গেলাম
সাময়িকের শুক্‌নো পাতায়,—
চোখের জলের শিশির-ঝরা
ঝরা-আশার শতেক ব্যথায়।
দিন কাটালাম দারিদ্র্যেতে;
স্বচ্ছলতার সূত্রে গেঁথে,
হয়নি সুযোগ—পাইনি সময়
গ্রন্থাকারে মাল্য-গাঁথায়।

কাটবে কীটে;—হয় ত কারো
হঠাৎ চোখে পড়বে আসি';
হেলায় কেহ চোখ ফিরাবে;
চল্‌বে কেহ উপহাসি';
জানি না হায় আমার কথা,
আমার বুকের গোপন ব্যথা
দরদ দিয়ে বুঝবে কি কেউ
সমব্যথার ব্যাকুলতায়?

জাগছে কেশে শুভ্র জরা;—
সুস্থতা নাই আগের মত;
সমুন্নত যৌবন মোর
আসছে ক্রমেই হয়ে নত।
আর বেশী দিন নয়কো থাকা,
শুন্‌ছি যেন পারের ডাকা,
আকাশ-ধরা এম্‌নি রবে—
আমিই শুধু গাইব বিদায়!

সত্যি হবে বিষণ্ণ কেউ
আমার বিয়োগ-ছায়াপাতে?—
সংক্ষেপে শোক প্রকাশ করে'
একটা আলোক-চিত্র সাথে,
হয় ত কেহ চল্‌তি প্রথায়
দেখাবে শেষ-বদান্যতায়।
তুমি দিয়ো মোর কবিতার
সকল খাতা আমার চিতায়!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

চিকিৎসক ও জনসাধারণ

৩

(৫) ডাক্তারদের স্থান কোথায় ?

ডাক্তারী পড়ার কথা এবং স্বাধীনভাবে ডাক্তারী প্র্যাকটিশ করার কথা কতকটা বলিলাম। কিন্তু যে ডাক্তাররা চাকুরী করেন, তাঁহাদের কথা ত কিছু বলা হয় নাই। এ দেশে, বাঙ্গালীর ভাগ্যে ডাক্তারী চাকুরী দুই শ্রেণীর। প্রথম, সাব্-অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনরূপে ও দ্বিতীয়, অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনরূপে। বৃদ্ধবয়সে, কোনও কোনও সাব্-অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন, অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনের শেষধাপে উন্নীত হইতে পারেন এবং অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনরাও বুড়া বয়সে সিবিল সার্জ্জন হইতে পারেন। কোনও কোনও ভাগ্যবান্ অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন মেডিকেল কলেজ বা স্কুলের অধ্যাপক এবং স্কুলের কর্ত্তাও হইতে পারেন। মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক হইতে হইলে, সাগরপারে যাইয়া বিলাতী ডিগ্রি লইয়া আসিতে হয়।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, ভারতবর্ষে তিন রকমের সরকারী চাকুরী দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

(১) "ইণ্ডিয়ান" সার্ভিস—যাঁহাদের বিলাতে অধ্যয়ন করিতে হয়, যাঁহারা খোদ সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট দ্বারা বিলাতে নিযুক্ত হন (কাযেই মন্ত্রীদের কর্ত্তৃত্বাধীন নহেন), এবং তাঁহাদের বেতন শুধু বেতনেই পর্য্যবসিত হয় না, নানা অজুহাতে, নানারূপ ভাতায়, জগতের সকল দেশের চাকুরে ডাক্তারদের চেয়েও অনেক বেশী হইয়া দাঁড়ায়।

(২) "প্রভিন্সিয়াল" সার্ভিস।—এইগুলিই এ দেশীয় মেডিকেল "কলেজের" উচ্চ-শিক্ষিতদের প্রাপ্য। নিম্নে কিছু পরে যে বেতনের তালিকা দেওয়া গিয়াছে, তাহা এই প্রভিন্সিয়াল সার্ভিস-ভুক্তদের পক্ষে প্রযোজ্য। প্রত্যেক প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের মধ্যে তিনটি কথা আছে। প্রথম, কাযে ভর্ত্তি হইবার সময়ে, কয়েক মাস অপেক্ষাকৃত স্বল্প বেতনে প্রবেশন (শিক্ষানবীশী) করিতে হয়। দ্বিতীয়, চাকুরী করিতে করিতে "এফিসিয়েন্সী" (অর্থাৎ কর্ম্মকুশলতা) দেখাইলে, তবে মাহিনা বাড়ে—নতুবা বাড়ে না। ডাক্তারদের পক্ষে প্রত্যেক সাত বৎসর চাকুরী করিবার পরে, রীতিমত পরীক্ষা দিলে তবে মাহিনা বাড়ে। গবর্ণমেণ্টের পোষ্য "মিলিটারী" অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনরা এই বালাইয়ের হাত হইতে মুক্ত। তাহাদের গোড়ার-শিক্ষা, বাঙ্গালী অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনদের চেয়েও কম। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? শুধু পাৎলুনের গুণে, তাহারাই সহজে ও সত্বর সিভিল সার্জ্জন হয়। তৃতীয়তঃ, শতকরা তিন জনকে "স্পেসাল গ্রেড" বা "ইণ্ডিয়ান সার্ভিসের" গ্রেডের কাছাকাছি শ্রেণীতে, বৃদ্ধ-বয়সে (অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর চাকুরীর পরে) উন্নীত করা হয়। এই উন্নতি শুধু নামকা-ওয়াস্তে; কেন না, এ গ্রেডের বেতন পেন্সনের সঙ্গে ধর্ত্তব্য নহে এবং এ গ্রেডে উঠিলে, উঁচা যায়গা ভিন্ন ভাল স্বাস্থ্যকর বা পয়সাওয়ালা ষ্টেশনে যাওয়া কালা আদমীর ভাগ্যে ঘটে না।

(৩) সাবর্ডিনেট্ সার্ভিস।—ইঁহারা নামে ও কাযে প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের চেয়ে নিরেশ হইলেও, ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনদের মত প্রায় একই রকমের পণ্ডিত। কৃতী ব্যক্তিরা প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে প্রবেশ করিতে না পারিলে, এই নিম্নতর সাবর্ডিনেট সার্ভিসে ভর্ত্তি হন। তবে, সাধারণতঃ, ইঁহারা "স্কুলের" পাশ করা।

ডাক্তারী চাকুরীর মধ্যেও—উক্ত ধারা-ক্রমে তিন জাতীয় চাকুরী দেখা যায়। যথা—

(১) আই, এম্, এস্ (I. M. S.) বা ইণ্ডিয়ান্ মেডিকাল সার্ভিস—ইঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের প্র্যাকটিশ করা নিষিদ্ধ, তাঁহাদের বেতনও খুব মোটা। দৃষ্টান্ত—

বাঙ্গালার সার্জ্জন-জেনারল	৩০০০৲
জেলের ইন্‌স্পেক্টার জেনারল	২৩০০—২৫০০৲
ডিরেক্টার অফ পাবলিক্ হেলথ্	২১০০—২৪০০৲
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাঁসপাতাল	২৩৫০৲
" ক্যাম্বেল হাঁসপাতাল	১৯৫০—২৩৫০৲
ডিরেক্টার অফ ট্রপিকাল স্কুল	৩৩৫০৲
এতদ্ব্যতীত যাঁহারা প্র্যাক্‌টিশ পান না, তাঁহাদের ঐ জন্য বিশিষ্ট ভাতা	৩০০৲
লেক্‌চার দিতে হইলে, প্রত্যেক লেক্‌চার পিছু	১০—৩২৲
রেসিডেণ্ট মেডিকাল অফিসারদিগের ডিউটি ভাতা	২০০৲

তাহা ছাড়া,—বিদেশে থাকিবার ভাতা (overseas) এবং সদরে থাকিলে, বাড়ী ভাড়া বাবদ টাকা দেওয়া হয়।

(২) অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন দল।—ইঁহারা নামে প্র্যাকটিশ করিতে পান এবং সেই জন্যই ইঁহাদের বেতন এত অল্প। কিন্তু ইঁহাদিগকে সাত বৎসর অন্তর পরীক্ষা দিতে হয়। পাশ হইলে তবে বেতন বৃদ্ধি হয়। সদরে যেখানে সিভিল সার্জ্জন থাকেন, সেখানে ইঁহাদের পক্ষে প্র্যাকটিশ করা সিভিল সার্জ্জনের দয়া ও মেজাজের উপরে নির্ভর করে। এমন দেখা গিয়াছে যে, যেখানে সিভিল সার্জ্জনের "ডাক" হয় না, অথচ অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনের খুব পসার, সেখানে ঈর্ষ্যাপরবশ সিভিল সার্জ্জন বাহাদুর মুখে প্র্যাকটিশ করিতে নিষেধ না করিয়া, এমন এলোমেলো সময়ে কর্ম্মস্থলে আসিতে আরম্ভ করিলেন—অথবা, দিনের মধ্যে ২৩ বার করিয়া অসময়ে হাঁসপাতালে আসিতে আরম্ভ করিলেন—অথবা আসিয়া এমন অযথাকাল হাঁসপাতালে থাকিতে আরম্ভ করিলেন—কিংবা, এমন খুঁটিনাটি বাজে কায অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেনের স্কন্ধে চাপাইতে আরম্ভ করিলেন যে, বেচারী অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনও প্রাইভেট-রোগী দেখিবার সময় পান না, এবং তাঁহার রোগীরাও যথাসময়ে তাঁহার সঙ্গে খবরাখবর করিতে পারে না, এই বিড়ম্বনায় পড়িয়া, অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনের পসার মাটী হইয়া যায়। অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদের মধ্যে যে দুচারজন স্কুলে শিক্ষকতা করিবার সুযোগ পান, তাঁহাদিগের "ভাতা" এইরূপ :—

৭ বৎসরের কম চাকুরী হইলে	...	৭৫৲
৭-১৪ বৎসরের " "	...	১০০৲
১৪ বৎসরের উপরে " "	...	১৫০৲

এই ভাতা বাঁধা—তাঁহাকে যতগুলিই লেকচার দিতে হউক না কেন! বিড়ালের কপালে শিকা ছিঁড়িলে, ইঁহারা যখন সিভিল সার্জ্জনের কায করিতে পান, তখন ইঁহাদের বেতন,—৯ বৎসরে ৫০০৲ হইতে ৯০০৲ এবং কয়েক জনের মাত্র ১০০০৲!

(৩) সাব্-অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনদের—মধ্যে কয়েক জনকে বিশেষ পারদর্শিতানুসারে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনের পদে উন্নীত করিয়া দেওয়া হয়।

এইবার, কোষ্টকাকারে, গবর্ণমেণ্টের অপর বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগের বেতনের হারের সঙ্গে ডাক্তারদিগের বেতনের হার তুলনা করিয়া দেখাইব। নামে মাত্র, I. Sc. পাশ করিলে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করা যায় বটে কার্য্যতঃ B. Sc. ও M. Scদেরই আদর বেশী। কাযেই, মোটামুটি ২ বৎসর B. Sc+মেডিকেল কলেজে ৬ বৎসর+ট্রপিক্যাল স্কুলে ১ বৎসর—এই ৯ বৎসর পড়িলে, তবে ডাক্তারী চাকরী পাওয়া যায়। অথচ মুন্সেফ, সবজজ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি হইতে হইলে, ২ বৎসর B.A+৩ বৎসর বি-এল্—৫ বৎসরের অধ্যয়নই যথেষ্ট; তাহার উপরে, এম্-এর দুই বৎসর জুড়িলেও, ডাক্তারীর ৯ বৎসরের গর্ভযন্ত্রণার চেয়ে কম। অপর যে কোনও বিভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন,—দেখিবেন, এত হাড়ভাঙ্গা, এত দীর্ঘকাল-ব্যাপী অধ্যয়ন কোনও বিভাগে করিতে হয় না, এত এস্তাজারী ও বেগার কোনও বিভাগে খাটিতে হয় না, অথচ মাহিনার বহর ত দেখিলেন? চূড়ার উপরে ময়ুর-পাখা,—এখন আবার ৬ হইতে ১২ মাসকাল ধরিয়া অবৈতনিক হাউস সার্জ্জনগিরি ও ৬ মাস ৫০৲ বেতনে উমেদারী করিলে অর্থাৎ সর্ব্বসাকল্যে দশ বৎসর ব্যয় করিলে, তবে "যদি" চাকুরীর পথ খোলসা হয়;—তাহারও কোন "দাবা-দাওয়া" নাই—চাকুরী দেওয়া দয়া-সাপেক্ষ। ডাক্তারী-বিভাগের উপর জুলুমের অন্ত নাই—কারণ, সাধারণ লোক-চক্ষুর অন্তরালে এ সব ঘটনা ঘটে; এবং প্রাইভেট প্র্যাক্টিশনারদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আছে বলিয়া, বে-সরকারী ডাক্তাররাও কখনও সরকারী চাকুরীয়াদের প্রতি সহানুভূতি দেখান না! এটি যে বিভীষণের দেশ।

চাকুরীর নাম	কার্য্যারম্ভে বেতন	উর্দ্ধতম বেতনের হার	পেন্সনের হার	[illegible]	[illegible]
অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন (সিভিল)	২০০	৪৫০	২২৫	২৭৫	২৫০
অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন মিলিটারী	২০০	৭০০	৩৫০	—	
সাব্ অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন	৬০	১৭৫	৮৭	১০৫	১৪০
পশু-চিকিৎসক	২০০	৭৫০	৩৭৫	৫৫০	
ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট	২৫০	৮৫০	৪২৫	৫০০	৭০০
সাব্ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট	১৫০	৪০০	২০০	২৫০	
মুন্সেফ	২৭৫	৭০০	৩৭৫	৫০০	
সাবর্ডিনেট জজ	৭০০	৮৫০	৪২৫	৭০০	
বন বিভাগের কর্ম্মচারী	৩২৫	১৩৫০	৫০০	৮০০	
আবগারী কর্ম্মচারী	২৫০	৮৫০	৪২৫	৫০০	৭০০
আয়কর কর্ম্মচারী	৩০০	৯০০	৪৬০	—	—
শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারী	২৫০	৮০০	৪৫০	৪৬০	৫৫০
কৃষি বিভাগের "	২০০	৭৫০	৩৭৫	৫৫	
ইঞ্জিনিয়ার	২৫০	৭৫০	৩৭৫	৫৫০	
পুলিস	২৫০	৭০০	৩৭৫	৫১০	

উপরের বর্ণনার সার মর্ম্ম এই :—

(১) যে সকল এলোপ্যাথিক চিকিৎসক কলেজ হইতে পাশ করিয়া "প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিশে" নিযুক্ত হন, তাঁহাদিগকে এই প্রকার প্রতিযোগিতা ও অসুবিধার মধ্যে দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতে হয় :—

(ক) সরকারী চিকিৎসক ও চিকিৎসালয়।—ক্রমশঃই ইহাদের সংখ্যা বাড়িতেছে ; কাযেই প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিশ-কারী ডাক্তারদের আয়ের ক্ষতির পরিমাণও বাড়িতেছে ও সেই সঙ্গে সরকারী চিকিৎসকগণের হীনতাও বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকারী ডাক্তারকে ডাকিলে, অনেক সময়ে বিনা পয়সায় মূত্রাদি পরীক্ষিত হয়, বিনা পয়সায় ঔষধও মিলে এবং আবশ্যকমত বাড় (স্পিলিণ্ট), ঠেস দিবার যন্ত্র (বেডরেষ্ট) প্রভৃতির সুযোগ লওয়া যায়। প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিশনার তাহা দিতে না পারায়, লোকরা বাধ্য হইয়া শক্ত ব্যারামে তাঁহাদিগের কাছে যাইতে পারে না।

(খ) অবসরপ্রাপ্ত স্থানীয় সিভিল বা অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন।

(গ) সাব্ অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন, হাকিম, বৈদ্য, কম্পাউণ্ডার, হাতুড়ে ইত্যাদি ইত্যাদি, যাহারা যা-তা দর্শনী লইয়া রোগীর বাড়ীতে যায়।

(ঘ) বই কেনা, চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক পত্রিকা কেনা, গাড়ী-ঘোড়া রাখা, ঘর ভাড়া, চাকর কম্পাউণ্ডার প্রভৃতির বেতন ইত্যাদি অনেক বাজে খরচ করিতে হয়—যাহা হয় ত তেমন উশুল হয় না।

(২) যাঁহারা সরকারী চাকুরী করেন, তাঁহারাও অত্যন্ত দুঃখে কষ্টে দিনযাপন করেন। তাঁহাদের উপরে সিবিল সার্জ্জন বলিয়া যে শ্বেতকায় জীবটি থাকেন, সে জীবটিকে "কল" যোগাড় করিয়া দিয়া মাঝে মাঝে পেট খাইয়া না দিলে, তিনি বেচারী অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ও সাব অ্যাসি-ষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনদিগকে এমন অসময়ে, এমন অযথাভাবে খাটাইতে পারেন, যাহা শোভনও নহে, সহনীয়ও হয় না।—তদুপরি প্র্যাক্‌টিশের বাধা ও বদলী হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়। অনেক সময়ে মিলিটারী অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনরাই সিভিল সার্জ্জনরূপে মাথার উপরে আসিয়া জুটেন।

এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালী ডাক্তারদিগের পক্ষে গোরা লাইনে বা দেশীয় পল্টনে কোনও ছিদ্র দিয়া প্রবেশের পথ নাই। চা-বাগানের ডাক্তারী, জাহাজের ডাক্তারী, কয়লার খনির ডাক্তারী —এ সবও বাঙ্গালীদের নাগালের বাইরে।

প্র্যাক্‌টিশে দু পয়সা উপার্জ্জন হয় বলিয়া, অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনদিগের বেতনাদি কি রকম কম করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। অথচ, বি, এ, বি, ই, বি টি বড়জোর এম, এ পাশ করিলেই, ৫০০০৲ টাকায় হাইকোর্টের জজীয়তি পর্য্যন্ত করা চলে। কিন্তু দশ বৎসর ধরিয়া বিশেষ বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া, প্রতি মুহূর্ত্তে নিজ প্রাণকে বিপন্ন করিয়া, ডাক্তাররা আজ কোথায় অতল তলে পড়িয়া আছেন, দেশবাসীরা তাহা ভাবিয়া দেখিবেন কি ?

(৬) W.M.S.

এ পর্য্যন্ত পুরুষ চিকিৎসক ও পুরুষদিগের চিকিৎসার ব্যবস্থার কথাই বলিয়াছি। পুরুষরাই এ যাবৎ মেয়েদিগের শিক্ষকতা ও চিকিৎসা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কয়েক বৎসর ধরিয়া মেয়েদের ডাক্তারী শিক্ষা ও চিকিৎসা যাহাতে মেয়েদের দ্বারাই হয়, তদ্বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত যাহা যাগ করিয়াছেন, প্রবন্ধের কলেবর পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য নিম্নে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম :—

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে—"ডাফরিন্ ফণ্ড" সংগৃহীত হয়। ইহার অধিকাংশ টাকা দেশীয় রাজন্যরাই দেন, এবং কতকাংশ বিলাত হইতেও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "জুবিলি ফণ্ড" হইতে সংগৃহীত হয়। উদ্দেশ্য—

(১) "জেনানা" হাঁসপাতালে "পর্দানসীন" স্ত্রীলোক-দিগের, মেয়ে ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা।

(২) স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা মেয়েদিগকে ডাক্তারী শিক্ষা দেওয়া।

১৯০২ অব্দে—লেডী কার্জ্জন কর্ত্তৃক স্থাপিত "ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল স্কলার্শিপ ফণ্ড"—সাধারণের চাঁদায় গৃহীত। উদ্দেশ্য :—"ধাত্রী"দিগকে উন্নত প্রণালীতে শিক্ষাদান করা।

১৯১৪ অব্দে।—ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের অনু-রূপ "উইমেন্স মেডিক্যাল সার্ভিসের" (W. M. S.) সৃষ্টি। ইহার জন্য অর্থ দেন ভারত গবর্ণমেণ্ট। ইঁহারা কাহারা ? শত-করা ৫০ জন পুরা দস্তুর বিলাতে পাশ-করা মেম-ডাক্তার এবং বাকীরা অন্ততঃ বিলাতী পাশ করা অপর যে কোনও দেশীয় ডাক্তার। এইবারে বিলাতী মেমদের

বেকার সমস্যা ঘুচিল। আপাততঃ ৪৪ জন এ রকমের ডাক্তারণী আছেন।

১৯২০ অব্দে—"লীগ ফর মেটার্নিটি এবং চাইল্ড ওয়েলফেয়ার।"—এই অর্থে ১৯২৬ হইতে দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, কলিকাতা, মান্দ্রাজ, পুণা প্রভৃতিতে হেল্‌থ স্কুল স্থাপিত হইতেছে।

এ দেশে, ধাত্রীদের প্রভূত উন্নতিসাধন করা অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে—ধাত্রীদের অজ্ঞতার ফলে এ দেশে অসংখ্য শিশু ও প্রসূতি মারা পড়ে। এ কার্য্যের জন্য সর্ব্বদাই দেশবাসীর সহানুভূতি আছে। স্ত্রী-ডাক্তারও বহুসংখ্যক হওয়া বাঞ্ছনীয়—কারণ, এ দেশের মেয়েদের "বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না।" কিন্তু তাই বলিয়া, বিলাতের মেমদিগকে এ দেশের অর্থে পুষ্ট করিবার হেতু কি?

শ্রীরমেশচন্দ্র রায় (ডাক্তার, এল্-এম্-এস)।

বিদায় বেলায়

তোমায় এবার ছাড়তে হ'ল
পথের মাঝে বন্ধু মোর!
সাঁঝ না হ'তেই ঘনিয়ে এল
রুদ্ধ ব্যথার আঁধার ঘোর!
যাও চলে' যাও বন্ধু আমার!
এই জগতের আলোর ওপার!
মোদের যদি পড়েই মনে
একটু ফেলো অশ্রু-লোর
পথের দেখা বন্ধু মোর!

হয় ত সেথায় মিলবে তোমার
নূতন সাথী সঙ্গী গো!
নূতন দেশের নূতন খেলার
শিখবে নূতন ভঙ্গী গো!
তা'দের পেয়ে ভুলবে মোদের
বন্ধু হে মোর দূর সুদূরের!
আমরা তোমায় ভুলব নাকো,
স্মরব দিবা-রাত্রি-ভোর!
পথের দেখা বন্ধু মোর!

পড়ছে মনে বৈশাখেরি
আম্রবনের ছায়ার তল
লুকোচুরি খেলার ছলে
ফেলতে মিছে চোখের জল,
বৈঁচি-বনের কাঁটার ফাঁকে
ফলত যে ফল— আন্‌তে তা'কে
মোদের পায়ে ফুটলে কাঁটা
তোমার বুকে বাজতো জোর!
পথের দেখা বন্ধু মোর!

আসবে শরৎ আসবে গো শীত
আসবে সবাই এক্ এক্ ক'রে!
আসবে নাক' তুমিই শুধু
একটু মোদের দেখার তরে!
ক্ষোভ তবু নেই বন্ধু তা'তে—
দুঃখ মিছে বিদায় রাতে,—
হাজার টানেও ছিঁড়বে নাক'
মোদের অটুট মিলন-ডোর—
পথের দেখা বন্ধু মোর!

শ্রীবিমল মিত্র
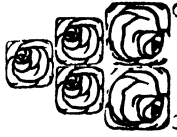
বাণরাজার রাজধানীতে কয়েক দিন

এক

ভবঘুরের মত নানা স্থানে বেড়াইয়া অবশেষে একটি ছোট সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আয়তনে ছোট হইলেও সহরটি বড় সুন্দর। ইহার অধিকাংশ পথই অসমতল— উটের পিঠের মত। কিন্তু অনেক পথের ধারেই শ্যামল শষ্প ও রং-বেরঙের পুষ্প-শোভিত পার্ক বা কৃত্রিম উদ্যান।

এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-শোভিত সহরটির প্রাচীন নাম শোণিতপুর। * পুরাণে এই শোণিতপুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরম শৈব বাণাসুর এখানে রাজত্ব করিতেন, এইরূপ জনপ্রবাদও আছে। বাণের এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিলেন। তাঁহার নাম উষা। উষা অনিরুদ্ধকে গোপনে ভালবাসিয়াছিলেন এবং দূতীর দ্বারা অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া তিনি অনিরুদ্ধকে নিজ প্রাসাদে আনিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল ব্যাপার বেশী দিন গোপন রহিল না। উষার প্রাসাদে অনিরুদ্ধের অভিসারের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তার পর বাণাসুর ও শ্রীকৃষ্ণে ভীষণ যুদ্ধ হইল।

স্থানীয় লোকরা বলে যে, ঐ যুদ্ধও বর্ত্তমান সহরের নিকটবর্ত্তী একটি পাহাড়ের উপর হইয়াছিল। একটি পাহাড়ে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। লোক বলে, উহাই উষা-পাহাড়। ঐ স্থানে উষার প্রাসাদ ছিল। আমরা এক দিন ভোরবেলা উষা-পাহাড় দেখিতে রওনা হইলাম। আমাদের পথি-প্রদর্শক হইল গৌহাটী কলেজের ছাত্র শ্রীমান্ কামাখ্যাপ্রসন্ন ঘোষ। পাহাড়টির দূরত্ব সহর হইতে আড়াই মাইল হইবে। আমরা যখন পাহাড়ের পাদ-দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন বেশ রোদ্র উঠিয়াছে। বর্ষা সমাগতপ্রায়, কাযেই পথ-ঘাট সব তৃণ-গুল্মাচ্ছাদিত। খুব সাবধানে আমরা পথ চলিতে লাগিলাম। অতিকষ্টে পাহাড়ের উপরে উঠিয়া সন্তর্পণে এদিক্-সেদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইলাম। কারুকার্য্যখচিত অনেক সুন্দর সুন্দর পাথর এবং গ্রেনাইট পাথরের অনেকগুলি স্তম্ভ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কোন্ যুগের কোন্ শিল্পীর এই কীর্ত্তি, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

উষা-পাহাড় হইতে যখন নামিয়া আসিলাম, তখন ১১টা বাজিয়া গিয়াছে। প্রখর রৌদ্রতাপে আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; ক্ষুধারও বেশ উদ্রেক হইয়াছিল। পা আর চলিতে নারাজ। এমন সময় অদূরে দেখিতে পাইলাম, এক দল স্ত্রীলোক গান গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইতেছে। ইহারা কে এবং কোথায় যাইতেছে, জিজ্ঞাসা করিতেই শ্রীমান্ কামাখ্যা বলিল, "ইহারা পল্লী-রমণী, 'মাইথানে' ফল উপহার দিতে যাইতেছে। বিপদে আপদে পড়িলে ইহারা 'মাইথানে' ফল, দুধ, পায়রা প্রভৃতি মানত করে এবং বিপদ কাটিয়া গেলে এখানে আসিয়া তাহা দিয়া যায়।" রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণে' 'দেবস্থান' 'ধর্ম্মস্থান' ইত্যাদির কথা পড়িয়াছিলাম, সেই কথা মনে পড়িল এবং সংস্কৃত মাতৃস্থান শব্দটিই যে 'মাইথানে' রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না। এই 'মাইথান' 'মহাভৈরবীর' পাহাড়েরই আর একটি নাম। কথিত আছে, মহারাজ বাণই কন্যা উষার প্রাত্যহিক পূজার জন্য এই ভৈরবী-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। আমরা ঐ মেয়েদের সঙ্গেই 'মাইথান' অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমাদের বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল, কাযেই এইবার পাহাড়ে উঠিতে বেশ ক্লান্তি বোধ করিলাম। পাহাড়ের উপরে মন্দিরের সন্নিকটেই এক প্রকাণ্ড বেল-গাছের নীচে বসিয়া আমরা বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় এক সন্ন্যাসী তাহার জীর্ণ কুটীর হইতে বাহির হইয়া আসিল। মিশ্ মিশে কালো রং, বেশ মোটাসোটা চেহারা, মেয়েদের মত দীর্ঘ কেশ, নেংটি-পরা—যেমনটি সন্ন্যাসীর হওয়া উচিত, সবই তাহার ছিল। দেবী-দর্শন না করিয়াই আমরা বিশ্রাম করিতে বসিয়াছি দেখিয়া সে একটু অসন্তুষ্ট হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল যে, আমরা ঐ ভাবে বসিয়া আছি কেন? "সাধুজী, আমাদের ক্ষিধে পেয়েছে।" কামাখ্যা এই কথা বলিতেই সন্ন্যাসী বলিল, "দর্শন ক'রে এস, আমি খেতে দিচ্ছি এক্ষুনি।" আমরা কথামত কার্য্য করিলে সন্ন্যাসী

---

* শোণিতপুরের বর্ত্তমান নাম তেজপুর। আসামী ভাষায় শোণিতকে (রক্ত) তেজ বলে।

আমাদিগকে দুইটি পেঁপে খাইতে দিল। মেয়েরা তখনও অদূরে মন্দির-প্রাঙ্গণে বসিয়া ঐক্যতানে গান গাহিতে-ছিল। আমাদের খাওয়া শেষ হইলে সন্ন্যাসী ঠাকুর ধরিয়া বসিল, তাহার গাঁজার দাম কিছু দিতেই হইবে। আমি বলিলাম, গাঁজার পয়সা দিতে পারিব না। ইহাতে সন্ন্যাসী ঠাকুর চটিয়া গেল এবং বলিল যে, মাইথান-দর্শনের পুণ্য ত আমার হইবেই না, বরং কিছু পাপ সঞ্চিত হইল।

মহাভৈরবীর পাহাড়ের পাশেই ছোট একটি পাহাড়। ইহার নাম "নর-বলি" পাহাড়। ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে এই অঞ্চলে নর-বলিপ্রথা প্রচলিত ছিল। 'মাইথানে' যে সকল মেয়ে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের এক জন বলিলেন যে, সেকালে দেবীর কাছে নর-বলি দেওয়া হইত। হত-ভাগাকে ব্রহ্মপুত্রে অবগাহন করাইয়া, পরে দেবীর নিকট মন্ত্রপূত করিয়া উৎসৃষ্ট করা হইত। পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড়ে সেই ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করা হইত, এইরূপ জন-প্রবাদ আছে। ইহা সত্য কি না এবং সত্য হইলেও কতদূর সত্য, তাহা প্রমাণ করা সম্ভব নহে।

দুই

বৈকালবেলা আসামের আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবি ও ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত দণ্ডীনাথ কলিতা মহাশয়ের সহিত আলাপ হইল। লোকটি বাস্তবিকই সাহিত্য-রসিক। অনেক কথোপকথনের পরে আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্য তাঁহাকে খুলিয়া বলিতেই তিনি তেজপুরের প্রসিদ্ধ Rock Inscription এবং রুদ্রপদ' দেখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ব্রহ্মপুত্রের গাত্র-সংলগ্ন এক প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডে বহুশত বৎসরের প্রাচীন অনু-শাসন। এত কাল পর্য্যন্ত কেহই তাহার পাঠোদ্ধার করিতে পারে নাই। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস ছিল, এই প্রস্তর-খণ্ডের নীচে অনেক ধনরত্ন আছে এবং এই লেখা যে পড়িতে পারিবে, সেই তাহা পাইবে। কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে জনৈক ইংরাজ ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উহার পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দণ্ডী বাবুর নিকট এই কথা শুনিবার পর শিলা-লিপিটি দেখিবার জন্য বড় কৌতূহল হইল।

পরদিন প্রভাতে তেজপুর গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের ছাত্র ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীকে সঙ্গে লইয়া ক্যামেরা ইত্যাদি সহ Rock Inscription দেখিতে যাত্রা করিলাম। পথে পড়িল "টাইগার হিল"। ব্রহ্মপুত্র হইতে টাইগার হিলের দৃশ্য বড় সুন্দর দেখায়। আমরা নৌকার উপর দাঁড়াইয়া টাইগার হিলের একখানি আলোকচিত্র গ্রহণ করিলাম।

ব্রহ্মপুত্র হইতে 'টাইগার হিলে'র দৃশ্য

"টাইগার হিলের" পরেই "লম্বোদর-পর্ব্বত।" এখানে ভগ্নশুণ্ড এক প্রকাণ্ড গণেশ ঠাকুর এখনও বিদ্যমান আছেন। এই প্রস্তরমূর্ত্তির নাম হইতেই পাহাড়টির নাম হইয়াছে "লম্বোদর-পর্ব্বত।" ইহার পরেই 'রুদ্রপদ' ও 'Rock Inscription।' এক খণ্ড পাথরের উপর একটি পদ-চিহ্ন অঙ্কিত। লোকের বিশ্বাস, এখানে দাঁড়াইয়া মহাদেব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন। মহাদেবের আর এক পা ছিল প্রায় সাত আট মাইল দূরে 'ভোমরাগুড়ি' পর্ব্বতে, কিন্তু যাহার দুই পায়ের মধ্যে এতটা স্থানের ব্যবধান, তাঁহার পা-দুইখানি এত ছোট কি করিয়া হইল, সেই বিষয়ে সন্দেহ করিলেই মুস্কিল। রুদ্র কি সেকালে চীনদেশের মেয়েদের মত লোহার জুতা পরিয়া পা-দুইখানি ছোট করিয়াছিলেন? এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে মহাদেবের ভক্তগণ আমাদিগকে নিশ্চয় নাস্তিক প্রতিপন্ন করিবে সন্দেহ নাই।

এখন শিলা-লিপির কথা বলিব। প্রস্তরখণ্ড [illegible] প্রায় ৭ ফুট এবং উচ্চতায় প্রায় সাড়ে ৩ ফুট। [illegible] গুলির প্রত্যেকটি অক্ষর প্রায় সাড়ে ৩ ইঞ্চি। আ[illegible] ইতিহাস-লেখক এডওয়ার্ড গেইট প্রথমে এই শিলা[illegible] কথা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। (Vide Pa[illegible] 8,

Report on the Progress of Historical Research in Assam) অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে Journal of the Bihar and Orissa Research Societyতে এই শিলা-লিপির পাঠ উদ্ধার করেন। এই শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে "হারুপেশ্বরপুরে" হর্জ্জর বর্ম্মন্ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। শিলালিপির শেষ ছত্রে লেখা আছে—"গুপ্ত ৫১০" অর্থাৎ ৮৩০ খৃষ্টাব্দ। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আসামের এই সুদূর প্রান্তেও গুপ্ত সংবৎ তখন প্রচলিত ছিল। মহাসামন্ত সুচিন্তের শাসনকালে কৈবর্ত্ত ও নৌকাচালকদের মধ্যে ঝগড়া হয়। পরে এই বলিয়া মীমাংসা হয় যে, যদি কেহ নদীর মধ্য দিয়া নৌকা না চালায়, তবে তাহাকে পাঁচ বুড়ি (পঞ্চ বুট্‌টকাং) অর্থদণ্ড দিতে হইবে। দন্ত্য ও মূর্দ্ধন্য উচ্চারণে আসামবাসীরা তৎকালেও গোলমাল করিয়া ফেলিতেন, সেই প্রমাণও প্রস্তরগাত্রে ক্ষোদিত রহিয়াছে। 'প্রবিষ্টঃ' স্থানে "প্রবিস্তঃ" লেখা দেখিয়া আমাদের তাহাই মনে হইল।

তিন

পরদিন প্রভাতে আমরা 'পাৰ্ব্বতীয়া' গ্রামে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত ভগ্ন শিব-মন্দির দেখিতে যাত্রা করিলাম। পাৰ্ব্বতীয়া হইতে সহর প্রায় ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। বসতিবিরল আসামের পল্লীপথে চলিতে চলিতে এক স্থানে একটি প্রকাণ্ড ঘর দেখিতে পাইলাম এবং অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, উহা একটি "নাম-ঘর।" কয়েক মাস পূর্ব্বে সার জর্জ্জ গ্রিয়ারসনের Liguistic Survey of Indiaতে পড়িয়াছিলাম যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারক শঙ্করদেবের আসামী ভাষায় লিখিত নাটক ও কীর্ত্তনঘোষা এই সকল গ্রাম্য "নাম-ঘর"গুলিতে অভিনীত হয়। বাঙ্গালা দেশে যেমন চৈতন্যদেব এক ধর্ম্মান্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, শঙ্করদেবও তেমনই তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে আসামে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার করেন। শঙ্করদেবের নাটকগুলি অসমীয়া সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্-বিশেষ।

পাৰ্ব্বতীয়া শিব-মন্দিরের কারুকার্য্য-খচিত ফটক, সম্মুখভাগে শিবলিঙ্গের অগ্রভাগ

মন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া আমরা ভগ্নাবশেষ সিংহদ্বারটির একখানি আলোকচিত্র গ্রহণ করিলাম। মন্দিরের ভিত্তির চারিদিকে স্তূপীকৃত ইষ্টকরাশি রহিয়াছে। ইটগুলিও বহু প্রাচীন; প্রত্যেকটি দৈর্ঘ্যে ১৩ ইঞ্চি, প্রস্থে ১০ ইঞ্চি, আর প্রায় আড়াই ইঞ্চি পুরু। এই সকল ইট অহোমরাজগণের সময়ে প্রায় ৩ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। প্রাঙ্গণে ৬খানা গ্রেনাইট পাথরের স্তম্ভ পড়িয়া রহিয়াছে। স্তম্ভগুলি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৯ ফুট। মন্দির-তোরণের কারুকার্য্য এত সুন্দর যে, স্থানীয় লোক উহা মানুষের তৈয়ারী বলিয়া বিশ্বাস করিতে রাজী নহে। তাহারা বলে, ইহা এক রাত্রিতে বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। বিংশশতাব্দীর কোন শিক্ষিত লোক তাহাদের কথায় বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক, তজ্জন্য তাহারা মোটেই ভাবে না। শক্ত পাথরের উপর এমন সুন্দর সূক্ষ্ম কায দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। মন্দির-ভিত্তির উপরে এক শিবলিঙ্গ আছে, তাহা ছাড়া আর কোনও দেব-দেবীর বিগ্রহ নাই।

সে দিন বৈকালে মহাভৈরবের মন্দির দর্শনের জন্য

বাহির হইলাম। লোক বলে, এই শিবলিঙ্গ বাণরাজা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মন্দিরটি বহু প্রাচীন হইলেও সময় সময় সংস্কার সাধিত হওয়ায় এখনও বেশ ভালই রহিয়াছে। মন্দিরের ভিতর অন্ধকারময়; চারিদিকে

মহাভৈরব-মন্দির

জঙ্গল। এখানে খুব সাপের ভয়। বাসা হইতে আসিবার সময় আমার আত্মীয় এবং আত্মীয়ারা বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। আসিয়া দেখিলাম, তাঁহাদের কথা সত্য, একটি ঝোপের ধারে প্রকাণ্ড এক নাগ-নন্দন মনের আনন্দে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়াই ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম। আমার সঙ্গী শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ বসু বীরদর্পে বলিয়া উঠিল—"ভয় কি, লাঠি-ই ত আছে হাতে?" আমার কিন্তু সাহস তাহাতে কিছুমাত্র বাড়িল না। মন্দিরের চারিদিক্ ঘুরিয়া দেখিবার সাধ মনেই লয় পাইল। দূরে একটা পরিষ্কার যায়গায় সরিয়া যাইয়া ক্যামেরা বসাইয়া একখানি আলোকচিত্র গ্রহণ করিতেই সন্ধ্যার অন্ধকার আমাদিগকে আবৃত করিয়া ফেলিল। নির্জ্জন ঘোর অরণ্যে বেশ একটু ভয় হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল—"The place is haunted."

চার

তেজপুর গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মিশ্র ভাগবতী মহাশয় এক দিন প্রসঙ্গক্রমে "হাজারী পুখুরী" দেখিয়া যাইতে বলিলেন। ইহা একটি প্রকাণ্ড দীঘিকা। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড় মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ৭ ফার্লং হইবে। কিন্তু যাইয়া দেখিলাম, দীর্ঘিকায় মৎস্যাদি জলচর প্রাণী একটিও নাই; অনেকগুলি গরু, ঘোড়া, মেষ, মহিষ ইত্যাদি মনের আনন্দে ঘাস খাইয়া বেড়াইতেছে; এই দীর্ঘিকা এখন ঘোড়-দৌড়ের মাঠরূপে ব্যবহৃত হয়।

এই দীর্ঘিকা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবাদ প্রচলিত আছে। আমরা এখানে দুইটির উল্লেখ করিব। অনেকে বলে, মহারাজ বাণের আদেশে এক হাজার লোক এক রাত্রির মধ্যে এই পুষ্করিণী খনন করে, এই জন্যই ইহার নাম "হাজারী পুখুরী"। আবার আর একটি প্রবাদ (যাহা সচরাচর অনেক পুরাতন পুষ্করিণী সম্বন্ধেই শোনা যায়) এই যে, কাহারও বাড়ীতে কোন কাযকর্ম্ম উপলক্ষে নানাপ্রকার বাসন-পত্রের আবশ্যক হইলে এই পুষ্করিণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকট তাহা প্রার্থনা করিবামাত্র তাহা তিনি ঠিক কাযের দিনে হাজির করিয়া দিতেন। এই জন্যই এই পুষ্করিণীর নাম "হাজারী পুখুরী"। কিন্তু একবার কোনও এক লোভী গৃহস্থ তাহার কার্য্যাবসানে ঐ সকল জিনিষ প্রত্যর্পণ না করায় এখন আর শত প্রার্থনা করিয়াও কিছু পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয়, এই দীর্ঘিকা মহারাজ হর্জ্জর বর্ম্মনের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং "হর্জ্জর পুষ্করিণী" আসামী ভাষায় এখন "হাজারী পুখুরী"তে রূপান্তরিত হইয়াছে। তেজপুর শিলা-লিপি প্রসঙ্গে আমরা হর্জ্জর বর্ম্মনের নাম উল্লেখ করিয়াছি। হর্জ্জর ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং প্রলম্বের পুত্র। তিনি ছিলেন গোঁড়া শৈব— 'পরম মাহেশ্বর।' লৌহিত্য-তটে হারুপ্পেশ্বরপুর নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। লৌহিত্য ব্রহ্মপুত্রেরই অপর নাম। কালিদাসের রঘুবংশে ইহার উল্লেখ আছে। কাহারও মতে তেজপুরের পাষাণ-লিপি হর্জ্জরের হওয়াতে বোধ হয়, রাজধানী বর্ত্তমান তেজপুরেই ছিল—যদিও তখন ইহা হারু[illegible] (সম্ভবতঃ কোন মহাদেব-মূর্ত্তির নামে)—বলিয়া অভিহিত হইত।

সম্প্রতি হর্জ্জর দেবের একখানি তাম্র-শাসনও [illegible] গিয়াছে। তাহাতেও দেখা যায়, 'পরম মাহেশ্বর' বি[illegible] পরেও লিখিত আছে—'মাতাপিতৃপদানুধ্যাত হর্জ্জর[illegible] দেব'। হর্জ্জর প্রজা-হিতৈষী নৃপতি ছিলেন। [illegible] তিনিই যে এই প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার প্রতিষ্ঠাতা, সে [illegible]

সন্দেহ নাই। হর্জ্জরের পরে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র 'অকলঙ্কা-বিকলেন্দুমগণিতগুণা যুবরাজ শ্রীবনমাল' রাজা হইয়াছিলেন। E. A. Gait লিখিয়াছেন, "The latter (Vanamala) who became king in his turn, is described as having a broad chest, a thick-set neck, and club like arms, a noble disposition and a dignified and serious demeanour. He was an ardent worshipper of Siva."

পাঁচ

আমরা তেজপুর গণেশ-ঘাটের আলোকচিত্র এই সঙ্গে দিলাম। ইহার নীচেই ব্রহ্মপুত্র নদ। বহু ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু প্রাতঃস্নান করিতে এই ঘাটে সমবেত হন। গণেশ ঠাকুরের মূর্ত্তিটি একখানি অতি প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডে ক্ষোদিত। কোন্

তেজপুর গণেশ-ঘাটের গণেশমূর্ত্তি

সময়ে কোন্ ভাস্কর এই মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন বা কে ইহা এখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার কোনও সংবাদ আজ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। শুনিলাম, এই গণেশ জাগ্রত দেবতা এবং তাঁহার কৃপায় মহাবীর তেওয়ারী নামে জনৈক স্থানীয় ঘড়ি-ব্যবসায়ীর বিশেষ কামনা পূর্ণ হওয়ায় উক্ত তেওয়ারী মহাশয় গণেশ ঠাকুরকে একখানি ঘর করিয়া দিয়াছেন। সময় সময় দুই এক জন সন্ন্যাসী ধূনি জ্বালাইয়া এখানে রাত্রিযাপন করেন।

প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও তেজপুরে অসংখ্য প্রস্তরমূর্ত্তি এবং কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যাইত। এককালে যে এখানে রাজধানী ছিল, তাহা অনুমান করা অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। শুনিলাম, ঐ সকল প্রস্তর-খণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া রাজপথে ও তেজপুরের বর্ত্তমান কোর্টের ঘরগুলির ভিত্তিতে দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে আসামের প্রাচীন গৌরবের কত কীর্ত্তিচিহ্ন যে ধূলায় পর্য্য-বসিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সম্প্রতি আসামী ভদ্রলোকদের এই সকল কীর্ত্তি-রক্ষার দিকে নজর পড়িয়াছে। লর্ড কার্জ্জনের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ রক্ষার আইন এখন তাঁহারা কাযে লাগাইতেছেন। মিউনিসিপ্যালিটীর বর্ত্তমান ভাইস্ চেয়ারম্যান ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস মহাশয়ের চেষ্টায় 'কোল-পার্ক' নামক উদ্যানে কতকগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তরমূর্ত্তি ও কারুকার্য্যমণ্ডিত প্রস্তরখণ্ড একত্র করিয়া রাখা হইয়াছে। এই সঙ্গে তাহার একখানি আলোকচিত্র আমরা
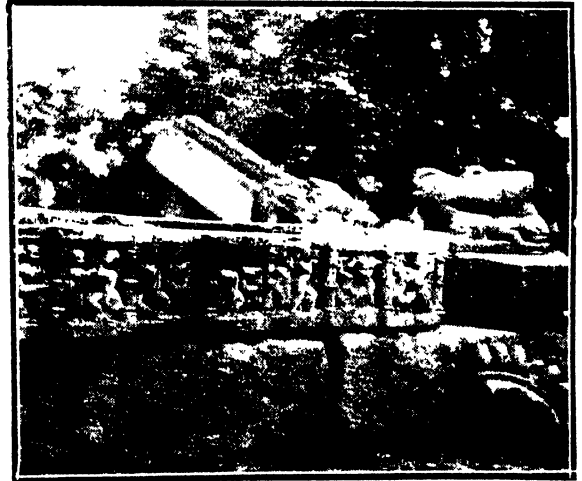
তেজপুর কোলপার্কে সংরক্ষিত প্রাচীন কীর্ত্তির কিয়দংশ, অর্দ্ধশায়িত দশাবতারের মূর্ত্তি, সম্মুখভাগে একটি শিরোহীন ব্যাঘ্র, এবং সুদীর্ঘ শিলাখণ্ডে কোনও সামাজিক উৎসবের চিত্র

দিলাম। অর্দ্ধশায়িত মূর্ত্তিখানি দশাবতারের ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানে ৫ জন মাত্র আছেন, আর এক খণ্ডে বোধ হয় বাকী ৫ জন ছিলেন। তাহা এখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ; বোধ হয়, চূর্ণীকৃত অবস্থায় কোনও রাজপথের ধূলির সহিত মিশিয়া আছে। সম্মুখভাগের মূর্ত্তিগুলি একটি সামাজিক উৎসবের চিত্র বলিয়া মনে হয়। ইহাতে স্ত্রী-পুরুষ দুই-ই আছে। প্রথম মূর্ত্তিটিতে এক জন বীর ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। দ্বিতীয়টিতে পুরুষটি বাঁশী

বাজাইতেছে আর মেয়েটি নাচিতেছে। তৃতীয়টিতে এক জন পুরুষ ঢোল বাজাইতেছে আর এক জন মেয়ে নাচিতেছে। চতুর্থটিতেও ঐরূপ। পঞ্চমটিতে দুই জনই মেয়ে, এক জন নাচিতেছে, ইত্যাদি। এইরূপ আরও অনেক মূর্ত্তি এবং প্রস্তরখণ্ডে (৫ ফুট ১০ ইঃ × ৫ ফুট ১০ ইঃ) পদ্ম ক্ষোদিত আছে। প্রত্যেকটি পদ্মের ৮টি দল। 'কোল পার্কের' নিকটেই একটি বহু প্রাচীন প্রাসাদের প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

তেজপুর হইতে কিছু দূরেই ভালুকপং নামে একটি স্থান আছে। সেখানে এখনও অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন দুর্গ ও রাজধানীর চিহ্ন দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। ভালুকপং আকা-পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত। কথিত আছে, ভালুক নামে এক রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন। ভালুক বাণরাজার পৌত্র। আকাগণ তাহাদিগকে মহারাজ ভালুকের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত অনুভব করে। ঐতিহাসিক Gait ও বলেন "* * * it is, perhaps, not impossible that they are the remains of a people, who once ruled in the plains and were driven into the hills by some more powerful tribe."

আসামের ইতিহাস লিখিবার অনেক উপাদান আছে, কিন্তু তথাপি আসামের একখানিও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। অহোম নৃপতিগণের বংশাবলীর পরিচয় তৎকালের লেখকগণ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। অহোম রাজাদের সময়ে ইতিহাস না জানিলে লোক মূর্খ বলিয়া পরিগণিত হইত। বহু প্রাচীনকাল হইতেই আসামের শিক্ষা-দীক্ষার স্বাতন্ত্র্যের কথা জানা যায়। চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন্‌থ্ সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে দেখা যায়, খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্দ্ধে কুমার ভাস্কর বর্ম্মার রাজসভায় তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া কামরূপে গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, তৎকালেও মধ্য-ভারতের ভাষা হইতে ঐ অঞ্চলের ভাষা পৃথক্ ছিল।

প্রাচীন তেজপুরের অনেক কথাই বলা হইল। এখন আধুনিক তেজপুর সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়াই এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। সহর হিসাবে ছোট হইলেও এমন সুন্দর ও পরিষ্কার সহর বাঙ্গালা দেশে খুব কমই দেখা যায়। আসামের Mental Hospital এই সহরে অবস্থিত। শত শত বিকৃতমস্তিষ্ক, উন্মাদ-রোগগ্রস্ত লোক এখানে চিকিৎসার জন্য আসে।

সহরের এক প্রান্তভাগে অগ্নি-গড় পর্ব্বতের উপরে একটি কৃত্রিম উদ্যান (পার্ক)। মানব ও প্রকৃতি উভয়ে মিলিয়া উহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছে। শুনিলাম, আসামের অন্যতম সাহিত্যিক ও কবি শ্রীযুত পদ্মনাথ বরুয়া স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান হইয়া এই উদ্যানটি সাজাইয়াছিলেন। এই 'অগ্নি-গড়' উদ্যানের নিম্নে ব্রহ্মপুত্র মনের আনন্দে লহরীর পর লহরী তুলিয়া সাগরিকার সহিত মিলিত হইতে ছুটিয়াছে। পরপারে কেবল পাহাড় আর পাহাড়, তাহাতে মেঘের লীলা-খেলা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস (বি, এ)।

"মেঘদূত"-পাঠে

পড়িলাম মেঘদূত মেঘ স্বপ্নময়
ব্যাকুল যক্ষের প্রাণ অলকার তরে,
সম্ভোগ-কাহিনী স্মরি অশ্রু-বিন্দু ঝরে
প্রিয়া-মিলনের লাগি শোকার্ত্ত হৃদয়।
কণ্ঠাশ্লিষ্টা প্রণয়িনী নব মেঘলোকে,
হেন প্রণয়ীর মনে জনমে বিভ্রম
গজ-মূর্ত্তি মেঘে ভাবি বন্ধু প্রিয়তম
প্রিয়ারে জানাতে বার্ত্তা মুহ্যমান শোকে।
রত্নরাগরেখাবতী যক্ষরাজপুরী,
মেঘ-মল্লারের সুরে ছন্দিত স্পন্দিত—
মনে পড়ে প্রেম-লেখ প্রিয়া-করাঙ্কিত
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-মাঝে রতির চাতুরী।
এ কাব্যেও যা' অভাব্য, শ্রবণ বসতি,
কাহারে বিভ্রম দিল নক্তা বসুমতী!

মুনীন্দ্রনাথ দে

উন্মত্তের ভালবাসা

(বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে

মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর সহরে তখন একমাত্র পাগলা-গারদ অবস্থিত ছিল। এই পাগলা-গারদের অধ্যক্ষ ও ডাক্তার আমাদের এক জন আত্মীয়। পাগলা-গারদের হাতার মধ্যেই তাঁহার বাসা। আমি কিছু দিনের জন্য বহরমপুর গিয়াছিলাম ও তাঁহার অতিথি হইয়াছিলাম। এই পাগলা-গারদের অধিবাসী পাগলদিগের ব্যবহার ও কার্য্যকলাপ দেখিতে ও তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে আমার খুব ভাল লাগিত। আহারাদি ও বিশ্রামের সময় ব্যতীত সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমি ডাক্তার বাবুর সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতাম ও এই ভীষণ ব্যাধিগ্রস্ত লোক-দিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিতাম।

পাগলা-গারদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারাকক্ষগুলির চারিদিকের প্রাচীরই উচ্চ, নগ্ন ও চুণকামকরা। মোটা মোটা লোহার গরাদে বসানো একটিমাত্র অপ্রশস্ত জানালা দেওয়ালের এত উচ্চে অবস্থিত যে, তাহা হাত দিয়া নাগাল পাওয়া যায় না! এই গবাক্ষপথে সূর্য্যালোক আসিয়া এই ক্ষুদ্র ও অমঙ্গলা কক্ষগুলিকে আলোকিত করিতেছিল। এই কক্ষশ্রেণীর একটিতে এক জন উন্মাদ-ব্যাধিগ্রস্ত লোক একখানি বেতের মোড়ায় বসিয়া একদৃষ্টে আমাদের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি শূন্য ও আকুলতাপূর্ণ। তাহার দেহ নিতান্ত ক্ষীণ, চক্ষুদ্বয় কোটরপ্রবিষ্ট, গণ্ডদ্বয় হাড়-বেরোনো, তাহার মস্তকের কেশগুলি প্রায় শুভ্র; দেখিয়া বোধ হয় যে, যেন গত দুই চারি মাসের মধ্যেই তাহা পাকিয়া গিয়াছে। তাহার পরিধেয়গুলি সমস্তই মলিন; তাহার ব্যাধি-শীর্ণ দেহে সেগুলি ঝুলঝুল করিয়া ঝুলিতে-ছিল। তাহাকে দেখিবামাত্র বোধ হইল, কীট যেমন সুপক্ক ফলের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া তাহার সারাংশ ভক্ষণ করিয়া ফেলে, কোনও দুশ্চিন্তার খেয়াল সেইরূপ এই লোকটির অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার দেহ ও মনকে ধীরে ধীরে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছিল। তাহার সেই পাগলামীর খেয়ালটি যেন তাহার মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। অনমনীয়ভাবে যেন খেয়ালটি সেখানে বসিয়া তাহাকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়া-ছিল। সেই খেয়ালটি—সেই অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, অধর্ষণীয় ও ... খেয়ালটি তাহার শরীরের মাংসপেশীগুলি ধীরে ধীরে ... করিতেছিল, তাহার হৃদয়ের শোণিতটুকু ঢোকে ঢোকে ... করিতেছিল ও তাহার প্রাণটিকেও নিঃশেষিত করিবার ... ক্রম করিতেছিল।

যে ক্ষুদ্র খেয়ালটি এক জন সুস্থ, সবল ও পূর্ণবয়স্ক মানুষকে মারিয়া ফেলিতে পারে, তাহার রূপ কি, তাহার প্রকৃতি কি, তাহার রহস্যই বা কি, আমি রাত-দিন কেবল তাহাই চিন্তা করিতাম। এই পাগলের দিকে চাহিয়াই আমার মনে বড় কষ্ট হইত, ভয় হইত, একটা মায়াও অনুভব করিতাম। কি অদ্ভুত খেয়ালই লোকটির মাথায় ঢুকিয়াছিল যে, সেই খেয়ালের তাড়নায় তাহার ললাটদেশ কর্ষিত জমীর মত অসমতল ও শিরাবিশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। কি অদ্ভুত খেয়ালই তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে নিরন্তর ঘুরিতেছিল ফিরিতেছিল।

* * * *

ডাক্তার কহিলেন, "এই পাগলের ব্যাধি অত্যন্ত কঠিন ও সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। এরূপ রোগী আমার হাতে ইতঃপূর্ব্বে আর একটিও আসে নাই। ইহার খেয়ালটি একটি বিকট প্রণয়ঘটিত ব্যাপারের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহার প্রণয় কোনও রক্তমাংসে গঠিতা নারীর উপর বিন্যস্ত নহে, তাহার প্রণয়িনী ইহজগতের কোনও শরীরিণী মানবী নহে। এই পাগল তাহার নিজের হাতে যে রোজ-নামচা লিখিয়া রাখিয়াছে, তাহা পড়িলেই আপনি ইহার ব্যাধি সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। আমার সঙ্গে আফিস-ঘরে চলুন। আমি সেই ডায়েরীখানি আপনাকে দিতেছি। যদি আপনার ভাল লাগে, তবে আপনি সেখানি পড়িয়া দেখিতে পাবেন।"

আমি ডাক্তার বাবুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আফিস-ঘরে গেলাম। তিনি সেই পাগলের নিজের হাতে লেখা খাতাখানি আমার হাতে দিয়া কহিলেন, "পড়িয়া দেখুন; পরে আপনার যাহা মতামত, তাহা আমাকে বলিবেন।"

ডায়েরী বইখানিতে এইরূপ লেখা ছিল :—

* * * *

আমার বয়স যখন বত্রিশ বৎসর, তখনও পর্য্যন্ত আমার জীবনে কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশলাভ করে নাই। তখনও পর্য্যন্ত আমি ভালবাসার কোনও ধারই ধারিতাম না। তখনও পর্য্যন্ত জীবন আমার নিকট অত্যন্ত সরল, অত্যন্ত সুন্দর ও অত্যন্ত সহজ বলিয়া মনে হইত। আমি এক জন সম্ভ্রান্ত ধনীর একমাত্র বংশধর ছিলাম। আমার রুচি এত বেশী বিভিন্নমুখী ছিল যে, কোন একটি বিশেষ ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়ের উপর

আমার একান্ত আসক্তি বা ঝোঁক্ ছিল না। কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকাটাই আমার পক্ষে পরম সুখের বিষয় ছিল। প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া আমি যেখানে ইচ্ছা সেইখানে যাইতাম ও স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াইতাম, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতাম। রাত্রিতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া নিশ্চিন্তমনে শুইয়া পড়িতাম। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া আবার সেই নিশ্চিন্ত ও শান্তিপূর্ণ জীবনের পুনরভিনয় চলিত। ইতোমধ্যে আমি দুই চারিটা প্রণয়ব্যাপারেও যে লিপ্ত হই নাই, তাহা নহে। তবে সেগুলির কোনটিতেই আমি আমার প্রণয়িনীকে পাইবার জন্য একেবারে পাগলও হইয়া যাই নাই, অথবা তাহাকে লাভ করিয়া সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতও হই নাই। এরূপভাবে জীবনযাপন করা সুখের বটে, কিন্তু ভালবাসাটা তদপেক্ষা বেশী সুখের। ভালবাসাটা এক দিকে যেমন সুখের, অন্য দিকে আবার তাহা বড় ভয়ঙ্কর। সেই জন্য যাহারা অন্য পাঁচ জনের মত ভালবাসে, তাহাদের দিনও সুখে কাটে বটে, কিন্তু আমার মত এত উৎকট সুখ তাহারা পায় না। এই ভালবাসার ভূত কেমন করিয়া আচম্‌কাভাবে আমার উপর আসিয়া চাপিয়াছিল, তাহা শুনুন।

বরাবরই আমার অর্থের বেশ স্বচ্ছলতা ছিল। পুরাতন আস্‌বাবওয়ালার দোকান হইতে বহুমূল্যে প্রাচীন যুগের আসবাব ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া ঘর-সাজানোটা আমার একটি দুর্দ্দমনীয় ব্যসন ছিল। পুরাতন যুগের কোন জিনিস-পত্র দেখিলেই আমার মনে হইত যে, কোন্ অতীত যুগের কোন্ অজ্ঞানিত হস্ত না জানি তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছিল, কোন্ অজ্ঞানিত চক্ষু না জানি তাহাদিগকে দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, কোন্ অজ্ঞানিত হৃদয় না জানি তাহাদিগকে ভালবাসিয়াছিল! হায়! আমার মতে মানুষ যে কেবল মানুষকেই ভালবাসিতে পারে, তাহা নহে। সে জড়বস্তুকে মানুষের অপেক্ষাও বেশী ভালবাসিতে পারে। আমি বহু প্রাচীন কালের একটি রমণীর ব্যবহার্য্য ছোট ট্যাঁকঘড়িকে এত ভালবাসিতাম যে, এই ঘড়িটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়াছি। আমার মনে হইত যে, এই ঘড়িটি কি সুন্দর, কি সুগঠিত! সুচারু মিনের কায করা ইহার ডালা, তাহার মাঝে খাঁটি সোনা দিয়া কেমন সুন্দর লতাপাতা কাটা। কোন্ অতীত যুগের, কোন্ অপরিচিত সুন্দরী না জানি তাহার উৎকট সৌন্দর্য্য-পিপাসা ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য এই রমণীয় প্রসাধন-সামগ্রীটি সংগ্রহ করিয়াছিল! তখন হইতে এখনও পর্য্যন্ত ইহার যান্ত্রিক জীবন ঠিক একই ভাবে স্পন্দিত হইতেছে। এক শতাব্দীরও অধিককাল ধরিয়া ঠিক একই ভাবে ইহা দিন-রাত টিক্ টিক্ শব্দ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। কে সেই অজ্ঞাতনাম্নী সুন্দরী, যে এই ঘড়িটিকে সযত্নে তাহার পরিপূর্ণ বক্ষঃস্থলের অতি সন্নিকটে স্থান দিয়াছিল। কোন্ অতীত যুগের কে সেই রূপসী, যাহার হৃদয়ের স্পন্দনের তালে তালে এই ঘড়িটিরও জড়হৃদয় স্পন্দিত হইত? কে সেই সুন্দরী, যে তাহার চাঁপার কলির মত অঙ্গুলিতে এই সুন্দর ঘড়িটি ধরিয়া ঘুরাইয়াছে, ফিরাইয়াছে, নাড়িয়াছে-চাড়িয়াছে? কোথায় এখন সেই রমণী? জানি না কেন, অতীত যুগের রমণীগণই আমার হৃদয়ে উৎকট বাসনার বহ্নি উদ্দীপিত করে! আমি দূর হইতে তাহাদিগকে ভালবাসি; কারণ, তাহারা এক দিন জগতে আসিয়াছে, ভালবাসিয়াছে ও চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের অনন্ত ভালবাসার কাহিনী তাহার স্মৃতি ও তাহার কল্পনা আমাকে মাতাইয়া তোলে ও আমার হৃদয়কে প্রমোদিত—বিমুগ্ধ করে। আহা! সেই সৌন্দর্য্য, সেই হাসি, সেই লালসা, সেই ব্যঞ্জনা—কেন এ সকল চিরস্থায়ী হইল না? কত বিনিদ্র রজনী আমি কাঁদিয়া কাটাইয়াছি আর ভাবিয়াছি, অতীত যুগের সেই সুন্দরী-দিগের কথা, যাহারা তাহাদিগের আপন আপন প্রণয়ভাজন-দিগকে আবেগভরে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া বিচিত্র মাধুর্য্য উপভোগ করিয়াছে। কিন্তু হায়! আজ তাহারা নাই। মানুষ মরিয়াছে বটে, কিন্তু ভালবাসা অমর, প্রণয়ের চুম্বনও অমর; এক ওষ্ঠ হইতে ওষ্ঠান্তরে, এক শতাব্দী হইতে শতাব্দ্যন্তরে, এক যুগ হইতে যুগান্তরে ইহা চলিয়া আসিতেছে। প্রেমিক প্রেমিকার ওষ্ঠপুট হইতে ইহা সমাদরে গ্রহণ করিতেছে; আবার প্রতিদানে তাহার ভাবাক্লণিত গণ্ডে [illegible] অঙ্কিত করিয়া দিতেছে। এইরূপ দান-প্রতিগ্রহে তাহারা অনন্ত কাল ধরিয়া রহিয়াছে, অনন্ত কাল ব্যাপিয়া তাহারা থাকিবে।

তাই, অতীত আমাকে প্রলুব্ধ করে, বর্ত্তমান আমার হৃদয়ে ভীতির উদ্রেক করে। কারণ, ভবিষ্যতের দিকে চাহিলেই মৃত্যুর বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি আমি দেখিতে পাই। গত জীবনের ঘটনাবলী আমাকে অনুশোচনায় দগ্ধ করে। যাহারা আমার ভালবাসার পাত্র ছিল, তাহাদের মধ্যে যাহারা চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের জন্য আমার চোখ অশ্রুতে ভরিয়া আসে। সময়ে সময়ে আমার ইচ্ছা হয় যে, অতীতকে আমি আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখি। আমার ইচ্ছা হয় যে, জন্মের মত কালের গতি আমি প্রতিরুদ্ধ করিয়া দিই। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য আমার! আমি তাহা পারি না। কাল চলিতেছে, কাল ছুটিতেছে, কাল মহাকালে মিশিয়া যাইতেছে। এক মুহূর্ত্তের পর আর এক মুহূর্ত্ত আমার জীবনের তিল তিল খসাইয়া লইয়া আমাকে ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গর্ভে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিতেছে। আমি চলিলাম। হে পুরাতন যুগের সুন্দরীগণ! আমি তোমাদিগকে বড় ভালবাসি। আমি মরিতেছি, সে জন্য তোমরা শোক করিও না। আমি তাহাকে পাইয়াছি। যাহার প্রত্যাশায় আমি এত দিন বসিয়াছিলাম, তাহাকে আমি পাইয়াছি। তাহার কৃপায় আজ আমি অতুলনীয় আনন্দের অধিকারী হইয়াছি। কেমন করিয়া হঠাৎ আমি তাহার দেখা পাইলাম, শুন :—

আমি এক দিন সকালবেলা বালসূর্য্যের কিরণে [illegible] কলিকাতার এক রাজপথে একাকী ভ্রমণ করিতে [illegible]। আমার হৃদয় চিন্তাশূন্য ও লঘু, আমার গতি স্বচ্ছন্দ [illegible] চলিতে চলিতে আমি পথিপার্শ্বস্থ প্রত্যেকটি পুরাতন [illegible] বিক্রেতার দোকানে সাজানো জিনিসগুলি দেখিতে [illegible]। হঠাৎ একটি দোকানে একটি আখরোট-কাষ্ঠের কাষ্ঠে প্রস্তুত পুরাতন আলমারী আমার চোখে পড়িল। [illegible] এই আলমারীটি অত্যন্ত সুন্দর, অসাধারণ ও দুষ্প্রাপ্য। আ[illegible] খাঁটি দেখিয়াই আমার খুব পছন্দ হইল। দোকানদার পাছে [illegible] আমার

মনোভাব বুঝিয়া এই দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য হাঁকিয়া বসে, এই ভাবিয়া আমি যেন জিনিষটি দেখিয়াও দেখিলাম না, এইরূপ ভান করিলাম ও ধীরে ধীরে পথ চলিতে লাগিলাম। কেন বলিতে পারি না, এই পুরাতন আলমারীটির স্মৃতি আমাকে পশ্চাৎ হইতে এত জোরে আকৃষ্ট করিতে লাগিল যে, আমি কিছুতেই আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। আমাকে আবার সেই দোকানের অভিমুখে ফিরিয়া আসিতে হইল। আমি ফিরিয়া গিয়া সেই দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইলাম ও সলালস দৃষ্টিতে সেই পুরাতন আসবাবটির দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল যে, জিনিষটি সত্য সত্যই আমাকে প্রলুব্ধ করিয়াছে। এই প্রলোভন কি উৎকট, কি আশ্চর্য্য, কি দুর্দ্দমনীয়! দোকানওয়ালা আমার চোখের মুখের ভাব দেখিয়া আমার মনের ভাব বুঝিয়া লইল। আমিও বুঝিলাম যে, সে আমার দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া অতিরিক্ত মূল্যে সেই আলমারীটি আমার নিকট বিক্রয় করিল।

আমি সেই আলমারীটি ক্রয় করিয়া তখনই বাড়ীতে লইয়া আসিলাম। আমি সেটিকে আমার শয়নকক্ষে সাজাইয়া রাখিলাম। পুরাতন আসবাব সংগ্রহ করা যাহাদের খেয়াল, তাহারা যখন একটি দুষ্প্রাপ্য জিনিষ কিনিয়া ঘরে লইয়া আসে, তখন তাহাদের মনোভাব অনেকটা সদ্যোবিবাহিত বরের অনুরূপ। সে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার বাঞ্ছিতকেই দেখে; তাহার গায় হাত বুলাইয়া সে অতুল সুখ অনুভব করে। সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও জিনিষটিকে চোখের আড়াল করিতে ইচ্ছা করে না। সে যেখানেই কেন যাক্ না, যা-ই কিছু কেন করুক না, অতি অল্পসময়ের জন্যও সে তাহার সেই অতি প্রিয় জিনিষটির চিন্তা ছাড়িতে পারে না। সেই জিনিষটির উপর তাহার ভালবাসার স্মৃতি, প্রেতাবিষ্টের পশ্চাতে প্রেতের মত সর্ব্বদা তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ায়। আমি যখন বাহিরে বেড়াইতে যাইতাম, এই আলমারীটিই তখন আমার চিন্তার বিষয় হইত। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া কাপড়-চোপড় না ছাড়িয়াই সর্ব্বাগ্রে একবার গিয়া আমি এই আলমারীটি দেখিতাম, উহার গায় অতি সন্তর্পণে হাত বুলাইয়া লইতাম। সত্যই এই আলমারীটিকে ক্রয় করিয়া আনিয়া সপ্তাহ হইতে সপ্তাহান্তরে আমি এটিকে দেবী-প্রতিমার মত ভক্তিপূর্ণ ও একনিষ্ঠভাবে পূজা করিতে লাগিলাম। আমি যখন-তখন গিয়া ইহার ডালাটি খুলিতাম অথবা দেরাজগুলি টানিয়া বাহির করিতাম। ইহার স্পর্শজনিত সুখে আমি একবারে আত্মহারা হইয়া যাইতাম। আমিই যে এই অমূল্য রত্নের অধিকারী, এই ধারণাতে আমি নিজেকে অত্যন্ত গর্ব্বিত মনে করিতাম।

এক দিন সন্ধ্যাকালে আমি একাকী বসিয়া এই আলমারীটি খুলিয়া ইহার প্রত্যেকটি দেরাজ, টানা, কোণা-ঘুঁজি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম। আলমারীর এক ধারে একটি ছোট কবাটের মত দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ হইল যে, নিশ্চয় কবাটের অন্তরালে একটা চোরা-দেরাজ আছে। আমার বুকের মাঝে যেন ঢেঁকির পাড় পড়িতে আরম্ভ হইল। আমি সমস্ত রাত্রি ধরিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে এই রহস্যটি উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। পরদিন আমি আবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। একখানি পাতলা কলম-কাটা ছুরি লইয়া আমি তাহার অগ্রভাগ এই কবাটের জোড়ের ফাঁকে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া জোরে চাপ দিলাম। এবার আমার চেষ্টা সফল হইল। জোড়ের মুখে ভিতর দিকে বসানো একটি স্প্রিঙে চাপ লাগিয়া সেই কবাটখানি খুলিয়া গেল। একটি চোরা দেরাজ বাহির হইয়া পড়িল। দেরাজটির চারি ধার ও তলা মহার্ঘ কালো রঙ্গের মখমলমণ্ডিত, তাহার মধ্যে অতি সন্তর্পণে রক্ষিত রমণীর এক গুচ্ছ কেশ—এরূপ সুন্দর, এরূপ প্রচুর চুলের গোছা আমি জন্মেও কখনও দেখি নাই, আর কেহ কখনও দেখিয়াছে কি না, তাহা জানি না। এই ভ্রমরকৃষ্ণ চূর্ণ-কুন্তলগুচ্ছটির গোড়া একগাছি সুবর্ণ-নির্ম্মিত তন্তু দ্বারা এমন শক্তভাবে জড়ানো ও বদ্ধ যে, তাহা হইতে একটি কেশও খুলিয়া পড়িবার সম্ভাবনা নাই। এই কেশগুচ্ছটি দেখিয়া আমি অনেকক্ষণ অবাক্ ও হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কি জানি কি এক অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় আমি ছটফট্ করিতে লাগিলাম। সেই রহস্যময় স্মারকাধার ও তাহার মধ্যস্থিত করাল কালের কবল হইতে সাবধানে সংরক্ষিত সেই অদ্ভুত ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে একটি অতি ক্ষীণ স্নিগ্ধ সৌরভ বাহির হইয়া আমার নাকে আসিতে লাগিল।

আমি আস্তে আস্তে হাত বাড়াইয়া অতি সন্তর্পণে এই চুলের গোছাটি ধরিলাম ও সেটিকে ইহার গুপ্ত আধার হইতে বাহির করিয়া ফেলিলাম। বাহির করিবামাত্র ইহার কুণ্ডলী খুলিয়া গেল। ইহা লম্বিত হইল ও ইহার অগ্রভাগ ভূমিতল চুম্বন করিবার উপক্রম করিল। এই চুলের গোছাটি যেমন প্রচুর, তেমনই লঘুভার; যেমন মোলায়েম গুচ্ছবদ্ধ কালসর্পের মত, তেমনই শীতল ও পিচ্ছিল ইহার স্পর্শ!

সত্যই ইহার স্পর্শ এক অভূতপূর্ব্ব আবেগে ও প্রমোদে আমার হৃদয় বিক্ষুব্ধ করিতে লাগিল। এই কেশগুচ্ছের রহস্যটি কি? কোন্ সময়ে, কি ভাবে, কি জন্য এই কেশগুচ্ছটি এত যত্নে এই গুপ্ত আধারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল? এই অসাধারণ অভিজ্ঞানটির অন্তরালে কি একটি অদ্ভুত ঘটনা, কি একটি লোমহর্ষণ নাটক, কি একটি বিস্ময়জনক প্রহেলিকা লুক্কায়িত রহিয়াছে? কে এই কেশগুচ্ছটি এখানে রাখিয়াছে? প্রেমিক তাহার প্রণয়িনীর নিকট শেষ বিদায় গ্রহণের মুহূর্ত্তে, না—মর্ম্মাহত স্বামী তাহার ব্যভিচারিণী স্ত্রীর উপর মর্ম্মান্তিক প্রতিশোধ লইবার পরে?

আমি যখন এই চুলের গোছাটি হাতে লইলাম, তখনই ইহার রমণীয় স্পর্শে, প্রেমিকার আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইলে প্রেমিকের সমস্ত শরীর যেমন রসাবেশে বিমোহিত হইয়া আসে, আমারও সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেইরূপ বিমোহিত হইয়া আসিল। এই আলিঙ্গন,, এই স্পর্শ কিন্তু জীবিতার প্রণয়দীপ্ত উষ্ণ আলিঙ্গন নহে; ইহা মৃতার হিমশীতল দেহবল্লীর তুষারসিক্ত আলিঙ্গন! আমি সেই চুলের গোছাটা অনেকক্ষণ আমার হাতেই ধরিয়া রহিলাম। তখন আমার মনে হইতে লাগিল যে, সেই জড় কেশরাশির মধ্যে যেন এখনও সেই সুন্দরীর প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে। আমি অতি সন্তর্পণে চুলের গোছাটি আবার সেই

মখমলমণ্ডিত আধারে রাখিয়া দিয়া, আলমারীটি বন্ধ করিয়া দিলাম, এক ছুটে রাস্তায় বাহির হইয়া যেন কাহার অন্বেষণে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

* * * *

এই ভাবে কত দিন কাটিল, আমি জানি না। তবে এই-টুকু জানি যে, আমি এই চুলের গোছাটি সর্ব্বদাই আমার কাছে রাখিতাম, কখনও ইহা কাছছাড়া করিতাম না।

এক দিন রাত্রিকালে হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমার মনে হইতে লাগিল, যেন আমি সেই ঘরে একা নাই। কিন্তু বাস্তবিক সেই ঘরে আমি ভিন্ন অন্য আর কেহই ছিল না। সেই যে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, আর কিছুতেই আমার ঘুম আসিল না। কিন্তু তখন হইতেই সমস্তক্ষণের জন্য সে আমার কাছে কাছে ছিল।

লোকরা তাহা দেখিল। তাহাদের সন্দেহ হইল। তাহাদের হিংসা জন্মিল। তাহারা আমার নিকট হইতে তাহাকে কাড়িয়া লইল। আর অপরাধীকে যেমন সাজা দেয়, আমাকেও সেইরূপ কারাগারে আবদ্ধ করিল। তাহারা তাহাকে আমার কাছ হইতে একবারে সরাইয়া ফেলিল। হায়! হায়!

* * * *

পাণ্ডুলিপিখানির এইখানেই শেষ। আমি ইহার পাঠ সমাপন করিয়া যেমন ডাক্তারের দিকে চোখ ফিরাইলাম, অমনই হাঁসপাতালের দিক্ হইতে একটি বিকট আর্ত্তনাদ আমার কাণে গেল। সেই পাগল চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "দাও, এখনও বল্‌ছি, তাহাকে আমার ফিরিয়ে দাও, নইলে—"

আমি দারুণ দুঃখাভিভূত হইয়া গদ্গদকণ্ঠে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই চুলের গোছাটি! সত্যই কি এটি আছে?"

ডাক্তার একটি আলমারী খুলিলেন। আলমারীর তাকে ঔষধের শিশি, খাতা, কাগজপত্র ও নানারূপ যন্ত্রপাতি সাজানো রহিয়াছে। ডাক্তার বাবু তাহারই মধ্য হইতে রেশমের মত চিক্কণ, ভ্রমরপংক্তির মত কৃষ্ণ ও সুবর্ণতন্তুবদ্ধ, এক গোছা রমণীর কেশ বাহির করিয়া লইয়া আমার হাতে দিলেন। সেই অনুপম কেশগুচ্ছটির স্পর্শ আমাকেও সম্মোহিত করিল।

ডাক্তার বাবু বিজ্ঞভাবে স্কন্ধ নোয়াইয়া কহিলেন, "আমাদের সাইকো প্যাথলজি শাস্ত্রে এই ব্যাধির নাম "স্যাডিজম্" (Sadism), তাহার মধ্যেও ইহা অত্যন্ত উৎকট পর্য্যায়ের। এইরূপ ব্যাধিগ্রস্তগণ নিক্রোফিল (Necrophile) নামে অভিহিত হয়। ইহা দুরারোগ্য।"

শ্রীমনোমোহন রায় (বিএ, বি, এল)।

রাতের পাখী

আমি নিশীথ রাতের পাখী! নিরজনে ভাল থাকি।
উদিত হইলে তরুণ-তপন,
ভাল নাহি লাগে তাহার কিরণ,
মুদিত করিয়া এ দুটি নয়ন
বসন-আঁচলে ঢাকি,—
আমি নিশীথ রাতের পাখী, নিরজনে ভাল থাকি।

যবে নিশাকর গগনে বিকাশে,
জ্যোছনা মাখিয়া এ ধরণী হাসে,
কুমুদিনী-কুল সরোবরে ভাসে
জ্যোছনায় মাখা-মাখি!
দেখিয়া ভুলে না আঁখি—
আমি নিশীথ রাতের পাখী!

অমার রজনী যবে ঘোর কালো—
না থাকে একটু চাঁদিমার আলো,
দেখিতে আমার লাগে তাই ভালো
গগনে নয়ন রাখি;—
আমি নিশীথ রাতের পাখী—নিরজনে ভাল থাকি।

ভাল নাহি লাগে জনকোলাহল,
যবে হয় গৃহ শবদ-বিরল,
একাকী সেথায় আসিয়া কেবল
নীরবে বসিয়া থাকি।
আমি নিশীথ রাতের পাখী, নিরজনে ভাল থাকি।

আপনি আবরি রাখি আপনায়,
হৃদয় সদাই ভরা কুয়াশায়,—
রবির কিরণ না পশে সেথায়
আঁধারে রেখেছে ঢাকি।
আমি নিশীথ রাতের পাখী,
নিরজনে ভাল থাকি।

যদি কেহ ডাকে আয় কাছে আয়,
চলিতে না পারি বাধে পায় পায়!
অজানিত ভয়ে শিহরিত কায়
দূরে দূরে স'রে থাকি।
আমি নিশীথ রাতের পাখী, নিরজনে ভাল থাকি।

মনে হয় শুধু নিয়ে হাসি-খেলা
যাপিলাম দিন কেটে গেল বেলা,
যেতে পরপারে পাইব কি ভেলা—
সুদূরে রাখিয়া আঁখি।
আমি নিশীথ রাতের পাখী, নিরজনে ব'সে থাকি

অকারণে আসে দু'নয়নে জল,
কার দুটি আঁখি স্নেহে অচপল,
দানিয়া অভয় দিবে প্রাণে বল
আদরে লইবে ডাকি
আমি নিশীথ রাতের পাখী,
তারি আশে ব'সে থাকি।

শ্রীমতী সরোজবাসিনী ব

ভোলা ময়রা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)
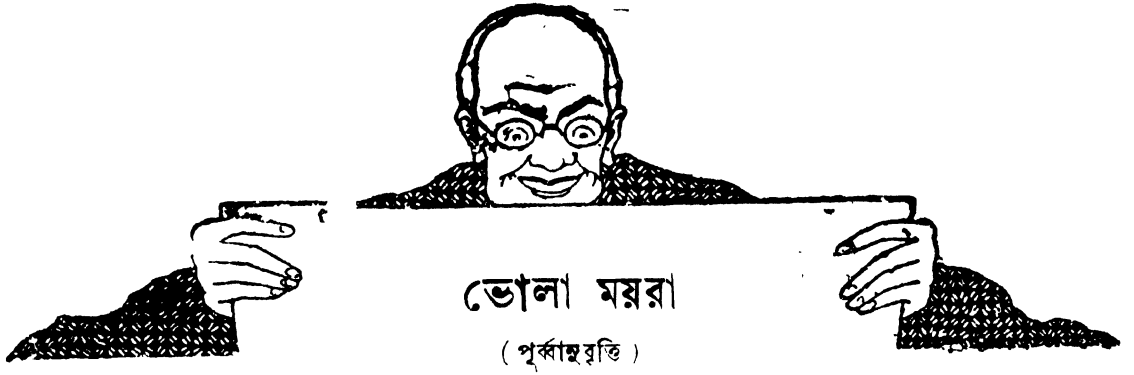
(৯)

ভোলানাথের প্রণীত

ভোলানাথের নিজ দলে গীত।

মহড়া। দুর্য্যোধন কুরুপতি হে,
তোমার মামা শকুনির কথায় বিবাদ ঘটালে।
দেখিল সকলে কপট ছলে, পাশা খেলালে,
পঞ্চ পাণ্ডবের রাজধানী সব জিতে নিলে।
তাদের রাজ্য হ'তে তাড়িয়ে দিলে,
মুখ চাইলে না ভাই ব'লে।

খাদ। পরের কথায় এককালে বুদ্ধি হারালে।

ফুকা। দ্রুপদ-রাজ-কন্যে, তোমার ভাদ্র-বধূ ছিল হস্তিনে,
তুমি উলঙ্গ ক'রেছ তারে সভার মাঝখানে।

মেল্‌তা। সে যে কুলবধূ ভাদ্রবধূ তোমার,
তার আবরু সরম করলে হরণ,
বাম উরুতে বসালে।

১ চিতেন। আমি দ্রোণাচার্য্য নামটি ধরি' হস্তিনাতে রই।

পাড়ন। আমার প্রধান শিষ্য, তুমি রাজা দুর্য্যোধন,
আমি তোমাদের শিক্ষাগুরু হই।

ফুকা। এ কি শুনতে পাই, জানতে এলেম তাই।
যুধিষ্ঠির পাশায় হেরে, রাজ্য ধন ত্যাজ্য ক'রে,
গেল বার বৎসরের তরে বনে পঞ্চ ভাই।

মেল্‌তা। যেমন কেকই দিলে রামকে বনবাস,
তুমি তেম্‌নি ক'রে পাঁচ জনারে বনবাসে পাঠালে।

অন্তরা। ভাল মন্ত্রণা,
শকুনি হইতে তোমার ঘটবে যন্ত্রণা।
শুম্ভ দৈত্যের মন্ত্রী ছিল সে ধূম্র-লোচন,
তেম্‌নি লঙ্কায় ছিল রাবণ-রাজার মন্ত্রী শুক-সারণ,
এখন তোমার মন্ত্রী হ'লো দেখি, শকুনি এক জনা।

চিতেন। ভাল মন্ত্রী নাই যে রাজার, রাজ্যের অমঙ্গল।

ড়ন। যে মন্ত্রণা দিলে তোমার মামা শকুনি,
তোমার সকলি হবে বিফল।

া। নল-রাজা যেমন, এম্‌নি পাশা খেলে গেল বন।
শনির মন্ত্রণায় প'ড়ে, রাজ্য ধন গেল উড়ে,
আবার কতক দিন পরে, হ'লো গৃহে আগমন।

তা। তোমার মাতামহের হাড়ে পাশা হয়;
যখন যেটা ব'লে, পাশা ফেলে, তখনি সেইটে ফলে।

(১০)

ভোলানাথের রচিত

ভোলানাথের নিজ দলে গীত।

মহড়া। কংসের রাজ্যেতে সখা। করিলে মধুর লীলে
এই মথুরায়।
ছিল কুব্জা কুৎসিত, কংসের দাসী,
চন্দন-দান ক'রে হ'লো সুরূপসী,
মধুর প্রেম বৃন্দাবনে, মন বাঁধা রাই শ্রীচরণে,
দিলেন কুব্জার ভক্তির গুণে, চরণ-আশ্রয়।

খাদ। ব্রজাঙ্গনা বিনে আমার মন অন্যেতে কি পায়?

ফুকা। আছে ব্রজেতে রাই রঙ্গিণী, রূপে সৌদামিনী,
প্রেমের অধীন আমি তার, জানে ত্রিসংসার।
হায় হায় গো।
সবাই জানে রাধা কানু, বিভিন্ন নয় একই তনু,
আমার এ মন করে হরণ, এমন সাধ্য কার?

মেল্‌তা। আমি তিলার্দ্ধ শ্রীবৃন্দাবন ছাড়া তো নই,
মনের কথা কই, মনের কথা কই,
বাসুদেব-রূপে আছি কংসের আলয়।

১ চিতেন। শ্রীবৃন্দের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ কয়,
আমার মনের কথা, সকল লীলের কথা,
যথার্থ বলি পরিচয়।

পাড়ন। আমি ছিলেম গোলোক-বিহারী, ক্ষীরোদশায়ী হরি,
লীলাকারী কৃষ্ণধন।
গোপীর মনের ধন, হায় হায় গো।
বৃন্দাবনে গোপের কুলে, ক'রেছিলাম মধুর লীলে,
শ্রীদাম-শাপে সে সব লীলে দিলাম বিসর্জ্জন।

মেল্‌তা। ছিল কুব্জার প্রেম-বাসনা মনে মনে।
মধুর ভুবনে গো, মধুর ভুবনে গো।
ভক্তে সই ভক্তিগুণে বাঁধে আমায়।

অন্তরা। আমি জগতের লীলাকারী হরি,
বৈকুণ্ঠ-ধাম ত্যাজ্য ক'রে মানব-রূপে লীলা করি।
গোকুলে সেই গোপীর কুলে,
আমি ক'রেছিলাম মধুর লীলে,
জানে সকলে, জানে সকলে,
রাধার প্রেমের দায়, থেকে নন্দালয়,
রাধা-নামে বাজাতাম বাঁশরী।

চিতেন। বধেছি কংসাসুরে এই মথুরায়,
আমি শ্রীরাধার দাস, সে সব আছে প্রকাশ,
জানে যত গোপী-সমুদয়।
পাড়ন। তোমরা কুলের ভাবনা ক'রো না,
গোপীর কুল যাবে না, শুন ওহে বৃন্দে কই!
মনের কথা কই গো, মনের কথা কই গো।
কূলে যার কুল রক্ষে করি, অকূলেতে হই কাণ্ডারী,
প্রেমের গুরু রাই কিশোরী, তারে ছাড়া নই।
মেল্‌তা। করি রাধার নাম-সুধা-পান নিশি-দিনে,
শয়নে স্বপনে হে, শয়নে স্বপনে হে।
ভুলিতে কি পারি আমি সেই শ্রীরাধায়!

(১১-১৩)

শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণের বাটীতে ভোলানাথের একবার নীলু ঠাকুরের সহিত কবির লড়াই হইয়াছিল। তাহাতে ভোলানাথ স্বীয় গুরু হরু ঠাকুরের সম্মুখে স্বয়ং গীত রচনা করিয়া নিজ-দলেই গাহিয়াছিলেন। সেবার রাম বসু ও তাঁহার প্রিয়তমা যজ্ঞেশ্বরী, নীলু ঠাকুরের দলে বাঁধনদার ছিলেন। ভোলানাথ রাম বসুকে লক্ষ্য করিয়া এই ধরতা ধরিয়াছিলেন:—

ধরতা।

ভোলানাথের রচিত

ভোলানাথের নিজ দলে গীত হইয়াছিল।

১ চিতান। রাম বোস্! তুই পাজি ছুঁচো, তুই বিষম বদ্‌মাস্।
১ পরচিতান। এই আসরে, ভোলার করে,
আজ তোর হবে সর্ব্বনাশ।
১ ফুকা। তুই কি সেই অযোধ্যার রাম, তুই এক নেমোক-হারাম,
তুই হরু-ঠাকুরের চেলা হয়ে, তাঁর প্রতি হলি বাম।
মেল্‌তা। নীলু যজ্ঞেশ্বরী সনে চ'লে যা গোবিন্দপুর।
মহড়া। আমার হরি এই হরু ঠাকুর।
ইনি টিকি ধ'রে, শোভা-বাজারে,
তোর কর্ব্বেন দর্প চূর।
ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, ইনিই হরি-সনাতন,
এঁর অভয়-চরণ শিরে ধল্লে তুই যাবি রে স্বর্গপুর।

উত্তর।

রাম বসুর প্রণীত

নীলু ঠাকুরের দলে গীত হইয়াছিল।

১ চিতান। সকল ভণ্ড কাণ্ড ভোলা তোর,
তুই পাষণ্ড নচ্ছার।
১ পরচিতান। ভজিস্ ঢেঁকি, বলিস্ কিনা গৌর অবতার।
১ ফুকা। কিসে করিস্ দ্বেষ, নাই ঘটে বুদ্ধিলেশ,
বুঝিস্ না সূক্ষ্ম, ওরে মূর্খ! দিস্ কোন্ ঠাকুরের ঠেস্।
মেল্‌তা। তুই কাঠের ঠাকুর টাটে তুলে মিছে করিস্ পচা ভুর।
মহড়া। সেই হরি কি তোর হরু ঠাকুর।
যিনি বাম করেতে গিরি ধ'রে রক্ষা কল্লেন ব্রজপুর।
যাঁর অভয়-চরণ শিরে ধ'রে জীব তরাচ্ছেন গয়াসুর।
যিনি রজক ছেদন ক'রে করে, ধ্বংস কল্লেন কংসাসুর।

এই উত্তরে ভোলানাথ পরাজিত হওয়ায় পাল্‌টা গীত হয় নাই। কিন্তু রাম বসু পাল্‌টা উত্তর দিয়াছিলেন।

উত্তর।

রাম বসুর প্রণীত

নীলু ঠাকুরের দলে গীত হইয়াছিল।

১ চিতান। এখন বুঝলি ত এই হরু নয় সেই হরি সারাৎসার।
১ পরচিতান: পূর্ণব্রহ্ম সেই হরি, ইনি প্রকাণ্ড অসার।
১ ফুকা। শোন্ রে বলি মূঢ়! এর খুঁজে পাই না কুড়,
তোর ঠাকুরকে বলতে বল্ ভেঙে এর নিগূঢ়।
১ মেল্‌তা। হরির সকল ভক্তে সমান দয়া,
এঁর সে বিষয়ে অনেক খাম।
মহড়া। বুঝব রহিম কি ইনিই রাম।
ইনি তোমার বেলা সিন্নির গোঁসাই,
আমার প্রতি কেন বাম?
ইনি হিন্দুর দেবতা স্থির,
কি মুসলমানের পীর,
তাই বল দেখি জিগীর,
পূজা পঞ্চ উপচারে,
খান্ কি এক পীঁড়িতে পাঁচ মোকাম,
হরু দেবকীর নন্দন,
কি আবার ফৎমা বিবির হন্ এমাম্।

(১৪-১৫)

একবার ভবানীপুরে বাঁড়ুয্যে মহাশয়দিগের বাটীতে ভোলানাথের সহিত ঠাকুরদাস সিংহের কবির লড়াই হইয়াছিল। গদাধর মুখোপাধ্যায় ভোলানাথের দলে এবং রাম বসু ঠাকুরদাস সিংহের দলে বাঁধনদার ছিলেন। বিরহ লইয়াই এই গানটি রচিত হইয়াছিল।

ধরতা।

গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ভোলানাথের দলে গীত।

১ চিতান। একভাবে পূর্ব্বে ছিলে প্রাণ! সে ভাব তোমার নাই।
১ পরচিতান। পেয়েছ যে নূতন নারী, এখন মন তাঁরি ঠাঁই।
১ ফুকা। রাখতে আমার অনুরোধ,
প্রাণ! তোমার প্রেমামোদ হবে,
সে করিবে ক্রোধ।
১ মেল্‌তা। দ্বেষাদ্বেষি দ্বন্দ্ব ক'রে কি দেশান্তরী করিবে।
মহড়া। বল বঁধু হে, কার কথন্ মন রাখিবে।
তোমার এক দিক নয়, দুদিক্ রাখা,
বল ইথে আর কিসে প্রাণ বাঁচিবে?
খাদ। সমভাবে এ প্রণয় কেমনে রবে?

২ ফুকা। সবে তোমার একটি মন,
তায় ক'রেছ প্রেমাধীনী দুটাঁয়ে দুজন।
২ মেল্‌তা। কপট প্রেমে এমন ক'রে প্রাণ!
আমায় কত বার আর কাঁদাবে!

উত্তর।

রাম বসুর প্রণীত

ঠাকুরদাস সিংহের দলে গীত।

১ চিতান। যতনে মন প্রাণ, প্রেয়সি! ক'রেছি তোমায় সমর্পণ।
১ পরচিতান। তোমারি প্রেমে আমি বিক্রীত,
অন্যের নহি কদাচন।
১ ফুকা। কেমন পুরুষের কপাল বুঝিতে নারি,
নিরন্তর তুষি মন, তবু যশ করে না নারী।
১ মেল্‌তা। তোমার নারী-জাতির স্বভাব,
কেবল অভাব করা প্রাণ।
এ ভাব শিখালে বল শুনি কে তোমায়।
মহড়া। অন্য কারো নই, শুন লো রসময়ি,
মিছে দোষ দাও কেন আমায়,
অন্যের যদি হ'তাম, তবে তোমায় নাহি তুষিতাম,
হরি' ল'য়ে মন, যশ কর না, এ কি দায়!
খাদ। নারীর স্বভাব দোষে নাগরকে,
নিবৃত্তি না মানে কথায়।
২ ফুকা। তার প্রমাণ দেখ সীতা সুন্দরী
রামকে বলিলেন, মৃগ দাও আমারে ধরি।
২ মেল্‌তা। গেলেন কুটীর ত্যজে সীতার কথায় রঘুনাথ,
তবু লক্ষ্মণে দুষলেন সীতা পুনরায়।

(১৬-১৭)

একবার কলিকাতার অন্তর্গত হালসীর বাগানে ভোলা-নাথের সহিত ঠাকুরদাস সিংহের কবির লড়াই হইয়াছিল। সেবার ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী ভোলানাথের দলে এবং রাম বসু ঠাকুরদাস সিংহের দলে বাঁধনদার ছিলেন।

ধরতা।

ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তীর প্রণীত

ভোলানাথের দলে গীত।

১ চিতান। আসিয়া কংসধামে বৃন্দে গোবিন্দের পদে ধরি কয়।
পরচিতান। বহুদিনের পর দরশন পেলাম দয়াময়।
১ ফুকা। ভাল ভাল ভাল ওহে কালশশি!
একবার দাসীর পানে ফিরে চাও হে,
কিছু মরমের কথা তোমায় জিজ্ঞাসি।
১ মেল্‌তা। তুমি ব্রজের ধন কৃষ্ণধন, গোপীর সর্ব্বস্ব-ধন,
বিক্রীত হ'য়েছ এই মথুরায়;
মহড়া। ওহে কৃষ্ণধন! দিয়ে কি অমূল্য ধন,
কুবুজা কিনিছে তোমায়?
আমরা ভক্তি-ধন আর প্রেম-ধন
দিয়ে তোমার শ্রীপদে ল'য়েছিলাম হে শরণ;
তবু রাধানাথ! রাখিলে না রাঙ্গা পায়;
খাদ। বল শ্রীপদে কিসে দোষী হ'ল গোপিকায়?
২ ফুকা। ধন মন দেহ যৌবন তোমায় দিয়ে
তোমার রাঙ্গা পায় রাধানাথ হে,
আমরা জনমের মত আছি বিকায়ে।
২ মেলতা। তুমি হ'লে না অনুকূল,
মজালে গোপীর কুল,
অকূল সাগরে বুঝি গোকুল ভেসে যায়।

উত্তর।

রাম বসুর প্রণীত

ঠাকুরদাস সিংহের দলে গীত।

১ চিতান। কি কথা শুনালে গো বৃন্দে!
গোপিকার আমি প্রতিকূল!
১ পরচিতান। জানিলাম সখি! আমি
নিতান্ত হ'য়েছে তোমার মূলে ভুল।
১ ফুকা। তিলেক ছাড়া নই, আমি সখি! বৃন্দাবন,
গোপ-গোপিকা প্রাণ আমার,
আমি সেই গোপিকার প্রেমেতে বাঁধা আছি অনুক্ষণ।
১ মেল্‌তা। কেবল শ্রীদামের শাপেতে, এসেছি মধুপুরীতে,
শত বৎসরের পরে পাবে গোপীগণ।
মহড়া। আমি কাহারো কেনা নই, ভক্তাধীন রসময়ি,
ভক্ত-প্রেম-ডোরে বাঁধা মন;
ছিল রাবণের সহোদরা
এই কুবুজা কল্পান্তরে সই;
করলে বাসনা পেতে আমায়,
দিয়াছিলাম বর তায়,
ধ'রে কৃষ্ণরূপ যুড়াব তার জীবন।
খাদ। শুনিলে সখি ত সকল বিবরণ।
২ ফুকা। প্রতিশ্রুত সই! আমি ছিলাম কুবুজায়,
সেই প্রতিজ্ঞা পূরাতে, সাধের ব্রজ হ'তে
আসিতে হইয়াছে মথুরায়।
২ মেল্‌তা। তুমি তা ব'লে বৃন্দে সখি!
হ'য়ো না অন্তরে দুখী,
আমি রাধার বই কারুর নই ত কখন।

(১৮—১৯)

তেলিনীপাড়া-নিবাসী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ অতি প্রাচীন, প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত জমীদার। তাঁহারা নিরতিশয় সঙ্গীত-প্রিয়। একবার ভোলা ময়রা ও ঠাকুরদাস সিংহকে বাটীতে লইয়া গিয়া তাঁহারা কবির লড়াই বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী ভোলানাথের দলে এবং রাম বসু ঠাকুরদাস সিংহের দলে বাঁধনদার ছিলেন।

ধরতা।

ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তীর প্রণীত

ভোলা ময়রার দলে গীত।

১ চিতান। বৃন্দে শ্রীবৃন্দাবনে বসন্তে হেরে
কাতরা হ'য়ে খেদে কয়,—
১ পরচিতান। একে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রাণ দহিছে,
তাতে আর কি এত জ্বালা সয়।
১ ফুকা। এই ব্রজেতে যখন ছিলেন ব্রজেন্দ্র-তনয়,
হ'ত তাতে হে বসন্তে নিত্য সুখোদয়।
১ মেল্‌তা। এখন সে সুখ হরি, হরি ব্রজধাম পরিহরি,
ব্রজধাম গেছেন যমুনার পার।
মহড়া। দেখ কৃষ্ণ-বিহনে, ওহে ঋতুরাজ! এই দশা গোপিকার,
কেন এ সময় বসন্ত! কর্‌তে গোপীর প্রাণান্ত,
এলে গোকুলে;
তোমার কোকিলের স্বরে প্রাণে বাঁচা ভার।
খাদ। মাধবে মাধব-অভাবে সবে শবাকার।
২ ফুকা। দেখ এই সেই ব্রজেশ্বরী স্বর্ণময়ী রাই,
ধূলায় লুণ্ঠিতা শ্রীমতীর সে স্ব-বর্ণ নাই।
২ মেল্‌তা। কৃষ্ণ-বিরহে অনিবার, নয়নে শতধার,
বহিছে সদা ঐ শ্রীরাধার।

উত্তর।

রাম বসুর প্রণীত

ঠাকুরদাস সিংহের দলে গীত।

১ চিতান। বৃন্দাবন ছাড়া কৃষ্ণ তিলেক নয়,
গোপীগণ তাও কি জান না?
১ পরচিতান। রাধার শ্যাম নহে রাধার বাম,
কেন করিছ বৃথা ভাবনা?
১ ফুকা। মাধবের বিরহ মাধবীর কভু নাই।
রাধা-কৃষ্ণের একাঙ্গ, রাধাই ত্রিভঙ্গ,
তাহে পরমারাধ্যা ব্রজের রাই।
১ মেল্‌তা। কোকিল ভ্রমর কি বসন্ত, বিহনে শ্রীকান্ত,
প্রাণান্ত করিতে নারে শ্রীরাধার।
মহড়া। রাধা নন্‌ সামান্যা, ত্রিভুবন-ধন্যা,
ভয় কি বসন্তে তাহার?
প্যারীর শ্রীপদ-নলিনী, চিন্তে যত মুনি,
আবার বাঁধা তায় চিন্তামণি সারাৎসার।
খাদ। সেই রাধার কৃষ্ণ বই, বসন্ত যাবে কোথা আর?
২ ফুকা। রাধার অভয় পদ করিতে দরশন সখি!
কি ছার বসন্ত, দেবাদি অনন্ত,
সদা বাঞ্ছিত পে'তে শ্রীচরণ।
২ মেল্‌তা। আমি সেই রাধার শ্রীচরণ, করিয়া দরশন,
পবিত্র হব বাসনা আমার! (১)

সম্পূর্ণ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে
(কবিভূষণ, কাব্যরত্ন, উদ্ভটসাগর বি এ)।

---

(১) ভোলানাথের সম্বন্ধে আরও একটু নূতন কথা পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার পৌত্র, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দে মহাশয় তাঁহার স্বর্গতা মাতা ঠাকুরাণীর নিকট হইতে বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহার বংশ-পরিচয় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। বহু অনুসন্ধানের পরে তাহা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে লিখিত আছে, ভোলানাথের পিতার নাম রামগোপাল ও পিতামহের নাম ধর্ম্মদাস। ভোলানাথের একটি কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তাঁহার নাম কৃপানাথ। কৃপানাথের পুত্র শ্যামাচরণ ও শ্যামাচরণের পুত্র রমানাথ। রমানাথ নিঃসন্তান থাকিয়া গতাসু হইয়াছেন।—লেখক

সাহস

রবির কিরণ হরণ করি চন্দ্র জ্যোতিষ্মান্,
তেমনি প্রভু তোমার বলে হয়েছি বলীয়ান্;
রইব না আর ভয়ে ভয়ে—
পেয়েছি যখন মৃত্যুঞ্জয়ে,
মৃত্যু হবে আমার ভয়ে সদাই কম্পমান।

রইব না আর দৈন্য-ভরে লজ্জা-ম্রিয়মাণ,
বিশ্ব-রাজার ছেলে আমি, অমৃত-সন্তান।
দুদিনে এ ধূলার খেলা—
কাটিয়ে দেবো হেলায় বেলা,
স্বপ্ন-শেষে জাগার দেশে করব অভিযান!

আসুক ঝঞ্ঝা, আসুক প্রলয়! "মা ভৈঃ মা ভৈঃ"
শুনেছি মোর মায়ের কণ্ঠে, দৃপ্তা রাজেন্দ্রাণী।
কুজ্‌ঝটিকার অবসানে,
জাগবে অরুণ তরুণ প্রাণে,—
আলোক-শিখা মুছিয়ে দেবে জীবন-ব্যাপী গ্লানি।

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

বাঙ্গালার অন্ন-সমস্যা

আমাদের এই বাঙ্গালা দেশ সুজলা সুফলা শ্যামলা—তাই যেন মা অন্নপূর্ণা হাটে, মাঠে, ঘাটে, বৃক্ষলতায়, পল্লবে—সর্ব্বত্র খাদ্যসম্ভারে পূর্ণ রাখিয়াছেন। "টাকায় আট মণ চাউল" এখন ইহা প্রবাদবাক্যে দাঁড়াইলেও ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে টাকায় ৩০ সের বা এক মণ চাউল বিকাইত, ইহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এখনও অনেকে জীবিত আছেন। বর্ত্তমান কালে ইহাই গল্পের কথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ দুর্দ্দৈববশতঃ বাঙ্গালায় অন্নের হাহাকার উঠিয়াছে।

বাঙ্গালায় কি কৃষির অভাব? তাহা ত বোধ হয় না। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে যাহা চাষ-আবাদ হইত, এখন তাহার চতুর্গুণ হইতেছে। গোচরভূমিও বাদ যাইতেছে না। এ দেশে যত জঙ্গল ও অনাবাদী জমী ছিল, এখন তাহার পরিমাণ বৎসরে বৎসরে হ্রাস পাইতেছে। তবে অন্নের জন্য বাঙ্গালায় হাহাকার কেন?

কেহ কেহ বলেন, পাটের চাষ দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। চাষারা এখন যে সকল জমীতে পাট বুনিয়া থাকে, আগে তাহাতে ধানের চাষ হইত। কিন্তু পাট চাষের পূর্ব্বে যে পরিমাণ ভূমি অনাবাদী ছিল, তাহার হিসাব লইলে দেখা যায়, পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ জমীতে শস্যের চাষ হইতেছে। তবে এই দুর্ম্মূল্যতা ও হাহাকার কেন?—কেহ বাজারে বা হাটে গিয়া ধান বা চাউল কিনিতে পায় না—তাহা ত নহে। মফঃস্বলের হাটে হাটে, বন্দরে বন্দরে ধানের কি অভাব আছে? কেহ কি টাকা লইয়া ধান বা চাউল কিনিতে পারিলেন না বলিয়া বিমুখ হইয়া আসিয়াছেন? বরং ধান-চাউলের ব্যবসায় বাঙ্গালার অনেক পল্লীবাসী জীবনধারণ করিয়া রহিয়াছে; কেহ মহাজন, কেহ আড়তদার, কেহ দালাল, কেহ ফেরিওয়ালা, আবার কেহ কেহ কুলী-মজুর। তবে বাঙ্গালায় ধান্য-চাউলের এত দর কেন?

কেহ কেহ বলিবেন, বহির্বাণিজ্যের জন্য আমাদের এই অবস্থা। বহির্বাণিজ্য ধান্য-চাউলের দর বৃদ্ধি করিয়াছে স্বীকার করিলেও তাহাতে হাহাকার উঠে কেন? প্রত্যেক জাতিই বহির্বাণিজ্যে টিকিয়া আছে। রপ্তানীতে বিদেশ হইতে অর্থের সমাগম হয়, অর্থে জাতির সম্পদ্-বৃদ্ধি হয়, সম্পদ্-বৃদ্ধি হইলে সচ্ছলতা বাড়ে—অভাব কমে। কিন্তু বহির্বাণিজ্যে আমাদের এই দৈন্য আর্ত্তনাদ কেন? আর এই বিংশ শতাব্দীতে বিশেষতঃ রেল-ষ্টীমার, মটর-এরোপ্লেনের যুগে বহির্বাণিজ্য প্রতিরোধ করিতে সামর্থ্য কাহার আছে? যাতায়াতের যত সুগম হইবে, বহির্বাণিজ্যের তত প্রসার হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য। যাঁহারা রপ্তানী বন্ধ করিবার জন্য আন্দোলন করেন, তাঁহারা ঐরাবতের মত গঙ্গার গতিরোধ করিতে বিফলপ্রয়াস করেন। পাশ্চাত্য সভ্যতাই বাণিজ্যকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে এবং এই বাণিজ্যের শক্তিকে দৃঢ়ীভূত করিতে পাশ্চাত্য জাতির বিজ্ঞানের অনুশীলন। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত কি ভাবে পণ্যবীথি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, প্রতিযোগিতায় কি ভাবে বিজয়ী হইতে পারে, প্রত্যেক পাশ্চাত্য জাতির তাহা মূল উদ্দেশ্য। রাজ্যপ্রতিষ্ঠা, নৌবল, সৈন্যবল আর বৈজ্ঞানিক উন্নতি—এই বাণিজ্যকে কেন্দ্র করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং এই পাশ্চাত্য সভ্যতার যুগে যেখানে মহোদধি ও ব্যোমপথ রাজপথে পরিণত হইয়াছে, যেখানে নিমিষে এক প্রান্তের বাণী অপর প্রান্তে বহন করিতেছে, সে যুগে সেখানে যাঁহারা এই বহির্বাণিজ্যকে প্রতিরোধ করিতে চান—তাঁহারা পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের ন্যায় নিষ্ফল প্রয়াস করিতেছেন। বহির্বাণিজ্য থাকিবেই এবং তাহাতে যে জাতির শ্রীবৃদ্ধি না হয়, তাহা নহে। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে শ্রীবৃদ্ধি নাই কেন? কারণ, মূল বাণিজ্য বাঙ্গালীর হাতে নাই। য়ুরোপীয়, মাড়োয়ারী, কচ্ছি, গুজরাটি ও বোম্বাই মুসলমানদের হাতে বাঙ্গালার বাণিজ্য। ভারতবাসী শুধু ফড়িয়ার কায করিতেছে, মূল ব্যাপারী য়ুরোপীয় বণিক্ সম্প্রদায়। তাই বহির্বাণিজ্যের মূল লভ্যের অধিকাংশ ভাগই তাহাদের হাতে। সামান্য ঝড়তি-পড়তি ভারতবাসীর ভাগ্যে পড়িয়া থাকে। এই সামান্য ঝড়তি-পড়তিতেই মাড়োয়াড়ী, ভাটিয়া, কচ্ছি, বোম্বাই মুসলমান অর্থশালী—আজ বাঙ্গালা দেশ তাহাদের অধীন—ক্রমে ক্রমে কলিকাতার জমী ও বাঙ্গালার জমীদারী তাহাদের দখলে আসিতেছে। আমরা কলম পিষিয়া, বক্তৃতা করিয়া, লম্ফ-ঝম্প করিয়া "হা অন্ন" "হা অন্ন" করিতেছি।

বাঙ্গালা কৃষিপ্রধান দেশ, ইহা ভুলিলে চলিবে না। কিন্তু বাঙ্গালার কৃষি কাহাদের হাতে? নিরক্ষর দরিদ্র চাষীদের উপরে ন্যস্ত রহিয়াছে। আর এই নিরক্ষর দরিদ্র চাষীদের রক্ত শোষণ করিতেছে মহাজন, জমীদার, কুসীদজীবী—আর আইন-আদালত। আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায় যদিও তাহাদের শ্রমলব্ধ খাদ্যফসলে পরিপুষ্ট, তবুও তাহাদের দেখিলে নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া, আমাদের শিক্ষিত সমাজের বহির্ভূত করিয়া রাখিয়াছি এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে, শিক্ষা-সংস্কারে কি ভাবে তাহাদিগকে দোহন করিতে পারি, তাহারও চেষ্টা করিয়া থাকি। স্বয়ং সরকার বাহাদুর "কৃষি-কমিশন" বসাইয়াছিলেন, কিন্তু কয় জন কৃষক ইহাতে সাক্ষ্য দিয়াছে? কৃষি-বিভাগ ও কৃষি-কলেজ প্রতি জেলায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু কৃষক কোথায়? শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তি কৃষি-কলেজের ছাত্র

হইবেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের লক্ষ্য থাকিবে কৃষি-বিভাগে চাকুরী। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগার আছে, বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক পণ্ডিতও আছেন, বছরে বছরে প্রায় পাঁচশো হাজার আই-এস্-সি, বি-এস্-সি এবং এম্-এস্-সি হইতেছেন, কিন্তু তাঁহারা কেহ উকীল, কেহ অধ্যাপক, কেহ এঞ্জিনিয়ার আর অনেকেই য়ুরোপীয় মহাজনী আফিসে কেরাণী। বাঙ্গালার নূতন জমীদার মন্ত্রী গজনভী সাহেব বলিয়াছেন, "যদি বাঙ্গালার বেকার শিক্ষিত যুবকরা জমী চাষ করিত, তবে তাহারা মাসে মাসে পাঁচ শত টাকা রোজগার করিতে পারিত।" কিন্তু কে বা জমী দেয়, আর চাষ-আবাদের জন্ম অর্থের সংস্থানই বা কোথায়? আর চাষের অভিজ্ঞতাই বা কোথায়? আনাড়ী বা অনভিজ্ঞ ব্যক্তি চাষ-আবাদ করিলেই বা কি হইবে? অনেকেই জানেন, অনেক বেকার শিক্ষিত যুবক স্বাধীন ব্যবসা করিব বলিয়া—ব্যবসা করিতে গিয়া ফেল হইয়াছেন—কেন না, যে কারবার করিতে তিনি যান—সে কারবারে তাঁর কোন শিক্ষা নাই। স্কুলে কলেজে পড়িলে ব্যবসায়ীর বুদ্ধি-কৌশল, প্রখর দৃষ্টিশক্তি, বিচার-বিবেচনা, কষ্টসহিষ্ণুতা, লোক চিনিবার ক্ষমতা এবং ব্যবসায়ীর হিসাব জন্মে না—ইহার শিক্ষা দরকার। পরিচিত বন্ধুদের মধ্যে কেহ চাষ-আবাদ লইয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন। কারণ, জমী বা কৃষি সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা নাই—নিরক্ষর চাষার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়, আর 'গোদের উপর বিষ-ফোড়া' পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভারতে য়ুরোপীয় প্রথায় চাষ করিবার চেষ্টা। তাঁহারা বুঝেন না, ভারতের জমী, জল-বায়ু ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী কৃষির ব্যবস্থা হওয়া দরকার। বিদেশীয় অনুকরণ এ স্থলে চলিতে পারে না। চাষীরাও বাবুদের আনাড়ী দেখিয়া কাবু করিতে ত্রুটি করে না—ফলে বিরক্ত হইয়া টাকা লোকসান দিয়া—তাঁহারা কৃষি-বাণিজ্যকে ধিক্কার দিয়া বলিয়া থাকেন—"চাষীরাই চাষ করিয়া দু-মুঠা খায়, ভদ্রলোকের উহাতে পোষায় না।"—অথচ বুঝিতে গেলে বাঙ্গালার প্রাণ কৃষির উপর নির্ভর করিতেছে।—হাজার হাজার অনাবাদী পতিত জমী এখনও বাঙ্গালার অধিকাংশ জেলায় পড়িয়া আছে, অনেক স্থলে জঙ্গলে জমী বহিয়াছে, অথচ শিক্ষিত যুবকদের সে দিকে দৃষ্টি নাই। দৃষ্টি থাকিলেই বা কি হইবে, আদৌ শিক্ষা নাই। সহরবাসী এখনও এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা ধানগাছ চিনেন না এবং আম-জামের মত ধানগাছ হইয়া থাকে, এই রকম জ্ঞানও কাহারও কাহারও আছে;—সুতরাং বাঙ্গালার অন্নসমস্যার সমাধান করিতে হইলে, কৃষিকার্য্য ও কৃষি-বাণিজ্যকে অবলম্বন করিতে হইলে কৃষি-শিক্ষার প্রচলন করা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু এই কৃষি-শিক্ষা কি ভাবে প্রবর্ত্তন করিতে হইবে?

প্রতি জনবহুল গ্রামে, প্রতি ইউনিয়নে "কৃষি-পাঠশালা" থাকা দরকার।—এই কৃষি-পাঠশালায় কৃষি-যন্ত্রের ও কৃষি-কার্য্যের মোটামুটি প্রাথমিক জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এই কৃষি-পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিলে তবে উন্নততর কৃষি-বিদ্যালয়—প্রতি প্রধান প্রধান সহরে, এমন কি, প্রত্যেক মহকুমায় প্রতিষ্ঠা করা দরকার। সেই বিদ্যালয়ে "মৃত্তিকা" ও "উদ্ভিদ্-তত্ত্ব" শিক্ষার প্রবর্ত্তন আবশ্যক। আমাদের দেশীয় ও সংস্কৃত ভাষার এই সম্বন্ধে যাহা আছে, তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় অনূদিত করিয়া বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাহা শিক্ষা দিতে হইবে। পরে কৃষি কলেজ প্রতি জেলায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া হাতে-কলমে সমুদায় শিক্ষা প্রদান করা উচিত। এই সমুদায় শিক্ষার মধ্যে বোটানি, জিওলজি, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রীও অন্তর্গত হওয়া প্রয়োজন। এই সব গ্রন্থ সরল প্রাঞ্জলভাবে বিবৃত হওয়া চাই এবং সরস পরিভাষা গঠন অবশ্য কর্ত্তব্য। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত স্বর্গগত রায় রাজেশ্বর দাসগুপ্ত বাহাদুরের প্রণীত "কৃষি-বিজ্ঞান" এইরূপ একখানি আদর্শ গ্রন্থ। ইহার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সহজ, সরল ও সরস।—রাজেশ্বর বাবু সরকারী কৃষি বিভাগের উচ্চ রাজকর্ম্মচারী হইলেও দেশের প্রতি তাঁহার একটা বিশেষ টান ছিল। কৃষি-বিজ্ঞানেও তাঁহার বিশেষ প্রতিভা ছিল। ভাষার উপরও তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি পুরাণসমূহ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, আমাদের দেশেও এক সময়ে কৃষি-বিজ্ঞানের বিশেষ আলোচনা হইত। মহর্ষি মনুও বলিয়া গিয়াছেন যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে, তাহারও সুখ-দুঃখ আছে। রাজেশ্বর বাবু তাঁহার কৃষি-বিজ্ঞানে লিখিয়াছেন যে, "উদ্ভিদের প্রাণবত্তাপ্রসঙ্গে মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—

'অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখ-সমন্বিতাঃ।"

(মনুসংহিতা—১, ৪৯)

অর্থাৎ বৃক্ষাদির অন্তঃসংজ্ঞা আছে এবং ইহারাও অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। সহস্র সহস্র বৎসর পরে আজ ভারতের অন্যতম একনিষ্ঠ বিজ্ঞানসাধক সার জগদীশচন্দ্র বসু জগতের সমক্ষে যন্ত্রাদির সাহায্যে ঐ বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। উদ্ভিদের প্রাণবত্তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া মন্বাদি স্মৃতিকারগণ বিশেষ বিশেষ অবস্থাতে বৃক্ষাদিচ্ছেদনজনিত বিভিন্নরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছেন। হিন্দুগণ তুলসীপত্র চয়ন এবং বিল্ববৃক্ষের পত্রাদির আহরণকালে যে সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন, তাহাতে সম্পূর্ণভাবে উহাদিগকে প্রাণী জ্ঞান করিয়া উহাদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা জ্ঞাপন করা হয়। পরাশরকৃত "কৃষি-সংগ্রহ", শার্ঙ্গধর-প্রণীত "উপবন-বিনোদ", "বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ", "কেদারকল্প", "ক্ষেত্রতত্ত্ব" নামক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়। যাহা হউক, রাজেশ্বর বাবু তাঁহার "কৃষিবিজ্ঞানে" বলিয়াছেন, "সভ্যতাবিকাশের পর হইতে অদ্যাপি এ দেশের কৃষিকার্য্য যাহাদের উপর ন্যস্ত আছে—তাহারা দেশের জীবনরক্ষক হইলেও সামাজিক হিসাবে 'ছোট' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া দেশের শিক্ষিত এবং ভদ্রসমাজের একটু অবনত হইয়া রহিয়াছে। শিক্ষা-দীক্ষা হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকার দরুণ তাহারা চিরকাল অজ্ঞানতার মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করাতে তাহাদের দ্বারা কৃষি-যন্ত্রাদির সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইতে পারে নাই। অথচ দেশের জ্ঞানী সম্প্রদায়ও উদাসীন ছিলেন; কাযেই কৃষি-যন্ত্রাদির উৎকর্ষ-সাধন পক্ষে অন্তরায় ঘটিয়াছিল। যত দিন শিক্ষিত সম্প্রদায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিতেন, তত দিন বিবিধ বিষয়ে কৃষিকার্য্যের উন্নতির পথ মুক্ত ছিল, এবং তাহার ফলে বীজবপন, হলচালনা,

শস্যচ্ছেদন, জলসেচন, বৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ভারতীয় কৃষি-বিজ্ঞান সবিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল।"

আজকাল বিশেষ হুজুগ চলিতেছে Tractor plough মোটর লাঙ্গল এই দেশে কৃষিকার্য্যে চালাইতে। এই বিষয়ে রাজেশ্বর বাবু তাঁহার "কৃষিবিজ্ঞানে" লিখিয়াছেন যে, "মোটর লাঙ্গলের এই সব সুবিধা সত্ত্বেও ইহার বহুল অসুবিধা আছে, যথা—

(১) ইহার মহার্ঘতাই কৃষকদের মধ্যে ইহার প্রচলনের প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। যে প্রকার মোটর লাঙ্গল অধুনা ভারতবর্ষে বিক্রীত হইতেছে, তাহা অতিশয় দুর্ম্মূল্য এবং সাধারণ কৃষকদের পক্ষে অত উচ্চমূল্য দিয়া ইহা ক্রয় করা অসম্ভব।

(২) বাঙ্গালা দেশের সাধারণ ভূমিখণ্ডের গড় পরিমাণ ছয় কাঠার অধিক নহে—সে আয়তনের পক্ষে ইহা অতিশয় বৃহৎ। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এক প্রকার ছোট মোটর-লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়, একজোড়া ঘোড়া ফিরাইতে যতটা স্থান প্রয়োজন হয়, তাহা অপেক্ষাও অল্প স্থানে ইহা ঘুরান যায়। এই প্রকার লাঙ্গল সম্প্রতি ভারতবর্ষে আসিয়াছে, কিন্তু বিশেষ সুফল এখনও পাওয়া যায় নাই।

(৩) ইহার এঞ্জিন এ দেশ হইতে অধিকতর শীতল প্রদেশের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়াই ভারতবর্ষের ন্যায় উষ্ণদেশে ইহার উত্তাপ সহজে শীতল হয় না। তজ্জন্যই ইহা দ্বারা দীর্ঘকাল কার্য্য করা সম্ভব নহে।

(৪) বঙ্গদেশের কৃষকদের ক্ষেত্রের অতি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডগুলি অসমকোণ এবং চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত। এই সব ক্ষেত্রের পক্ষে এই প্রকার কলের লাঙ্গল আদৌ উপযুক্ত নহে। ইহার কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহর ভিন্ন মেরামত করা অসম্ভব, ইহাও লাঙ্গল ব্যবহারের একটি অন্তরায়।

(৫) বঙ্গদেশে কৃষিজাত শস্যের মধ্যে ধান্যই সর্ব্বপ্রধান। ইহার চারা রোপণ করিবার পূর্ব্বে জমীকে কর্দ্দমে পরিণত করিয়া নরম করিয়া লইতে হয়। ঐ কার্য্যের জন্য অধুনা প্রচলিত মোটর-লাঙ্গল এ দেশে বিশেষ কার্য্যকর হয় নাই।"

বাস্তবিকই শিক্ষিত বাঙ্গালী কৃষক হইয়া এই দেশের উপযোগী উন্নততর বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্র আবিষ্কার করিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস, কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত না আমরা শিক্ষিত বাঙ্গালী প্রকৃতভাবে চাষী হইব, তত দিন পর্য্যন্ত আমাদের অন্ন-সমস্যার সমাধান হইবে না—বেকার-সমস্যা ঘুচিবে না। মহাত্মা গন্ধী আত্মনির্ভরশীল হইবার জন্য নিজ হাতে চরকায় সূতা কাটিয়া খদ্দর প্রস্তুত করিতে সমগ্র জাতিকে আহ্বান করিয়াছিলেন, যাহাতে ভারতে ইংরাজের বস্ত্র-বাণিজ্য বিনষ্ট হয় এবং ভারতবাসী আত্মনির্ভরশীল হয়। কিন্তু ভারতবাসী মহাত্মাজীর এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে নাই—তাহার প্রধান কারণ, চরকায় সূতা কাটিয়া এখন পেট ভরে না। তাই আজকালকার এই কলকারখানার যুগে চরকায় সূতা যাহা এক জনে উৎপন্ন করে, তাহার আয়ে এক জনের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে না। যে সময় বাঙ্গালাদেশে প্রবাদ ছিল—"চরকা আমার স্বোয়ামী পুত, চরকা আমার নাতি। চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতী", তখন কল-কারখানার প্রতিযোগিতা ছিল না এবং উঠানে মরাই-ভরা ধানও থাকিত। বাঙ্গালীর খাদ্য-সমূহ এত দুর্ম্মূল্য ছিল না। বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য চাউল। পেট ভরিয়া দুমুঠা ভাত নুণ দিয়া খাইলেও বাঙ্গালীর বাহুতে বল আসিবে। আর বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার—"য়ুরোপ-যাত্রী"তে ফ্রান্সদেশ দেখিয়া লিখিয়াছিলেন, "এই কঠিন পর্ব্বতের মধ্যে মানুষ বহুদিন থেকে বহু যত্নে প্রকৃতিকে বশ ক'রে তার উচ্ছৃঙ্খলতা হরণ করেছে। প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের উপর মানুষের কত প্রয়াস প্রকাশ পাচ্ছে। এ দেশের লোকরা যে আপনার দেশকে ভালবাসবে, তা'তে আর আশ্চর্য্য নেই। এরা আপনার দেশকে আপনার যত্নে আপনার ক'রে নিয়েছে। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বহুকাল থেকে একটা বোঝাপড়া হয়ে আসছে, উভয়ের মধ্যে ক্রমিক আদান-প্রদান চলছে, তারা পরস্পর সুপরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। এক দিকে প্রকাণ্ড প্রকৃতি উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে আর এক দিকে বৈরাগ্য-বৃদ্ধ মানব উদাসীনভাবে শুয়ে—য়ুরোপের সে ভাব নয়। এদের এই সুন্দরী ভূমি একান্ত সাধনার ধন, এ'কে এরা নিয়ত বহু আদর ক'রে রেখেছে।" আর বাঙ্গালা দেশ—?

তাই স্বদেশহিতৈষী বাঙ্গালার যুবকদিগের নিকট বিনীত নিবেদন এই—বাঙ্গালার কৃষি-বাণিজ্যের ও কৃষি-বিজ্ঞানের দিকে তাঁহারা দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। সরকারী অনুগ্রহের প্রতি নির্ভর না করিয়া কৃষিশিক্ষা-মন্দির গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করুন। যাঁহারা বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক, তাঁহারা বিদেশীয় কৃষিগ্রন্থগুলি অনুবাদ করিয়া সরল ভাষায় প্রচার করুন, আমাদের দেশীয় প্রাচীন কৃষি-গ্রন্থগুলি এবং প্রবচনগুলি বর্ত্তমান যুগোপযোগী করিয়া লউন—যাহাতে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়—যাহাতে পতিত ও জঙ্গল জমীতে সোনার ফসল জন্মে, তাহার জন্য যত্ন করুন। বাঙ্গালার মাটী প্রকৃত স্বর্ণপ্রসূ হউক। লোক দেখিলেই যেন বলে "এদের সুন্দরী ভূমি একান্ত সাধনার ধন, একে এরা নিয়ত বহু আদর ক'রে রেখেছে।" বাঙ্গালার জমী দেখে সবাই বলুক—"বাঙ্গালী তার দেশকে ভালবাসে—বাঙ্গালার মাটীই তার পরিচয় এরা বুকের রক্ত দিয়ে দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করেছে।"

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন।

আহার্য্য শ্বেতসার

শ্বেতসার উদ্ভিদ্-দেহের অন্যতম উপাদান। প্রায় সকল উদ্ভিদে শ্বেতসার থাকিলেও কতকগুলি উদ্ভিদের কাণ্ড, মূল, ফল, বীজ প্রভৃতি অঙ্গবিশেষে শ্বেতসারের আধিক্য থাকায় উহাদিগের বিশেষরূপে চাষ হইয়া থাকে। আমাদিগের খাদ্যশস্যসমূহে, যথা—ধান, গম, যব ইত্যাদিতে শ্বেতসার সমধিক মাত্রায় বর্ত্তমান। দেহে উত্তাপ রক্ষা ও কার্য্যকরী শক্তি প্রদান করিতে শ্বেতসার মানবের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। সেই জন্যই সর্ব্বদেশে মানবকে কোন না কোন প্রকার শ্বেতসার-প্রধান শস্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু সাধারণতঃ উদ্ভিদে শ্বেতসারের সহিত অম্লসার, স্নেহপদার্থ, ধাতব লবণ প্রভৃতি অন্যান্য দেহপোষক

উপাদান বিদ্যমান থাকে। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য এই সমস্ত উপাদান বাদ দিয়া যথাসম্ভব বিশুদ্ধ শ্বেতসার প্রস্তুত করা হয়। শ্বেতসার নানাবিধ শিল্পে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এতদ্ভিন্ন সাধারণ খাদ্য হিসাবেও ইহার প্রচলন যথেষ্ট। আবার, উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিয়া লইলে শ্বেতসারের ন্যায় লঘু খাদ্য আর কিছুই নাই। সাগু, বার্লি, আরারুট প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্য রোগী অথবা শিশুগণকে সহজপাচ্য ও বলকারক আহার বলিয়া খাইতে দেওয়া হয়, সেগুলি প্রায়ই বিশুদ্ধ শ্বেতসার। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এইরূপ খাদ্যার্থ ব্যবহৃত শ্বেতসারের আলোচনা করিতেছি।

শ্বেতসার-প্রস্তুতোপযোগী উদ্ভিদ্

চাউল, যব, আলু প্রভৃতি হইতে ব্যবসায়ের জন্য শ্বেতসার সাধারণতঃ প্রস্তুত হইলেও সেরূপ শ্বেতসার প্রায় শিল্পে নিযুক্ত হয়। আহার্য্য শ্বেতসার উৎপাদনের জন্য লাভের হিসাবে এ সমুদয় উদ্ভিদ্ ঠিক উপযোগী নহে; কারণ, খাদ্য শস্য বলিয়া ইহাদিগের দর অধিক। আহার্য্য শ্বেতসার সুলভ মূল্যে প্রস্তুত করিতে হইলে অন্য প্রকার উদ্ভিদ্ আবশ্যক হয়। এ স্থলে সেইরূপ কয়েকটি উদ্ভিদের বিবরণ দেওয়া হইতেছে। যে বিলাতী আরারুট সচরাচর বাজারে পাওয়া যায়, তাহার ব্যবসায়িক নাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান্ অথবা বারমুডা আরারুট এবং তাহা Maranta arundinacea নামক উদ্ভিদ্ হইতে প্রস্তুত। উহা গ্রীষ্ম-মণ্ডলস্থ আমেরিকার আদিম অধিবাসী; ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ডোমিনিকা দ্বীপে ইহা প্রথম পাওয়া যায় এবং তথা হইতে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইহার চাষ বারবাডস্ ও জ্যামেকা-দ্বীপে প্রবর্ত্তিত করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহা সর্ব্বপ্রথমে বিলাতের বাজারে আইসে। এই উদ্ভিদের সমগণীয় গাছ M indica এবং M. ramossisima ভারতে বহুকাল হইতে শ্বেতসারপ্রসূ উদ্ভিদ্ বলিয়া পরিচিত আছে; কিন্তু সমগুণযুক্ত অন্য গাছ আরও প্রচুর আছে বলিয়া এতদ্দেশে উহাদিগের উপর তেমন লক্ষ্য পড়ে নাই। বর্ত্তমান সময়ে বিলাতী আরারুটের চাষ কলিকাতার উপকণ্ঠে আলিপুর, দমদম প্রভৃতি স্থানে ও কোন কোন কারাগারে হইতেছে। জগতের বাজারে আরও কয়েক রকম আরারুট প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখ-যোগ্য:—ব্রেজিল আরারুট; Manihot Utilissima গাছ হইতে ইহা প্রস্তুত। মূলতঃ মার্কিণ দেশীয় উদ্ভিদ্ হইলেও ভারতে ইহা এখন নানাস্থানে পাওয়া যায় এবং বঙ্গদেশে ইহার নাম শিমুল আলু। পোর্টল্যাণ্ড আরারুটের উৎপত্তি আমাদের দেশের ওলের সমগণীয় গাছ, Arum maculatum হইতে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে যে আরারুট প্রস্তুত হয়, তাহা প্রায়ই Tacca pinnatifida নামক উদ্ভিদ্ হইতে তৈয়ারী। ইহা এতদ্দেশে বারাহীকন্দ নামে পরিচিত। ভারতীয় অথবা ইষ্টইণ্ডিয়ান্ আরারুট বিলাতী বাজারে কিয়ৎপরিমাণে চালান যায়। ইহা প্রধানতঃ Curcuma Angustifolia উদ্ভি-দের শ্বেতসার। শঠীর (Curcuma Zedoaria) পালোর ব্যবহার ভারতের বাহিরে খুবই কম। কুইন্সল্যাণ্ডে Canna indica নামক গাছ হইতে প্রচুর পরিমাণে আরারুট তৈয়ারী হয়। এই সমুদয় শ্বেতসারপ্রধান উদ্ভিদের অধিকাংশই ভারতে জন্মিতেছে অথবা অনায়াসে জন্মান যাইতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত গাছ ভারতে স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে, তৎসমুদয় হইতে সমপ্রকার ফল পাওয়া গেলে, বিদেশীয় অপেক্ষা দেশীয় গাছের চাষই যে অনেক প্রকারে সুবিধাজনক, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। আমরা এই শ্রেণীর তিনটি শ্বেতসারপ্রসূ গাছের এ স্থলে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি।

তিক্ষুর

তিক্ষুর হরিদ্রাবর্গীয় উদ্ভিদ্। ভারতের নানাস্থানে, বিশেষতঃ মধ্য হিমালয়ের পাদদেশে, দেরাডুন, রোহিলখণ্ড, অযোধ্যা, বিহার, উত্তর-বঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও ত্রিবাঙ্কুরে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বাজারে যে তিক্ষুরের শ্বেতসার অথবা পালো বিক্রয় হয়, তাহা প্রধানতঃ Curcuma Angustifolia নামক উদ্ভিদ্ হইতে নিষ্কাশিত; কিন্তু এই গণের আরও কয়েকটি গাছের কন্দ শ্বেতসার প্রস্তুতের জন্য নিয়োজিত হইয়া থাকে, এবং অনেক সময় প্রকৃত তিক্ষুরের পালোর সহিত ইহাদের পালো সংমিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়। বঙ্গদেশে C. rubescens, বিহারে C. leucorrhiza, এবং বোম্বাই প্রদেশে C. pseudo-montana উদ্ভিদের কন্দের পালো তিক্ষুরের পালো বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে।

তিক্ষুরের গাছ—আদা-হলুদ গাছের ন্যায় ২।৩ ফুট বড় হয়। বর্ষাকালে নূতন পাতার সহিত ইহাদের পুষ্পদণ্ড বহির্গত হইয়া থাকে। পুষ্পের বর্ণ উজ্জ্বল পীত এবং উহা বেগুনী [illegible] পৌষ্টিক পত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। শীতের শেষে পত্রসমূহ শুকাইয়া যায়। অল্প ছায়াযুক্ত স্থানে ও দোঁয়াস মৃত্তিকায় ইহা [illegible] জন্মে। এই গণের অনেক উদ্ভিদের ন্যায় তিক্ষুরেরও ঈষৎ লম্বা একটি মূল কন্দ থাকে। উহা হইতে [illegible] সূত্রবৎ অংশ বাহির হইয়া অণ্ডাকৃতি, বিলম্বিত [illegible] করতলাকৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ কন্দে পর্য্যবসিত হয়। মূল [illegible] অল্পবিস্তর বর্ণ ও গন্ধ থাকিলেও এই সমুদয় পার্শ্ব [illegible] কন্দ প্রায় গন্ধ ও বর্ণহীন এবং তজ্জন্য শ্বেতসার প্র[illegible] পক্ষে অধিকতর উপযোগী। সাধারণতঃ জঙ্গল ও [illegible] সান্নিধ্যে যে সমস্ত জাতি বাস করে, তাহারাই তিক্ষুরের [illegible] প্রস্তুত করিয়া মহাজনগণের নিকট বিক্রয় করে। [illegible] প্রণালীও যে নিতান্ত অপকৃষ্ট, তাহা সহজে অনুমান কর[illegible]। এরূপ অবস্থায় উৎপাদনের কোন সঠিক হিসাব পাওয়া যা[illegible]। কিন্তু চাষ দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বিঘা প্রতি প্রায় [illegible] মণ কন্দ জন্মায় এবং তাহা হইতে অন্যূন ২ মণ পরিষ্কৃত [illegible] প্রস্তুত হয়। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে যথেষ্ট পরিমাণ বন্য তিক্ষু[illegible] সত্ত্বেও স্থানে স্থানে বিশেষভাবে তিক্ষুরের চাষ হ[illegible]। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, ত্রিবাঙ্কুর ও মালাবারে [illegible] জনসাধারণের দৈনন্দিন খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। [illegible] জমীতেই উক্ত দেশে তিক্ষুরের চাষ হয় এবং ইহার ফসল [illegible] হইতে ৯ মাস সময় দরকার হয়।

শঠী

ঔষধ ও পথ্য উভয় প্রকারেই শঠীর ব্যবহার বহুকাল হইতে এতদ্দেশে চলিয়া আসিতেছে। ইহার কন্দ লম্বা ও গোল, জেডওয়ারী (Zedoary) নামে মধ্যযুগ হইতে পাশ্চাত্যদেশে উহা পরিচিত। ইহার অপর সংস্কৃত নাম—কর্চ্চূর; অনেক স্থলে স্থানীয় লোকই ইহাকে কচুরা বলে। কচুরা পূর্ব্ব-হিমালয়ের পাদদেশ ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। রঙ্গপুর, বরিশাল, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জিলায় অল্পবিস্তর পরিমাণে শঠী সংগৃহীত হয় এবং শেষোক্ত স্থানই শঠী-ব্যবসায়ের অন্যতম কেন্দ্র। শঠীর গাছ তিক্ষুর গাছ অপেক্ষা কিছু বড়; ইহার পাতার মধ্যভাগে বেগুণে আভাযুক্ত দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। শঠীর মূল কন্দ হইতে অন্য যে সমস্ত পার্শ্ববর্ত্তী কন্দ বাহির হয়, সেগুলি প্রায় করতলাকৃতি (Palmate); কন্দগুলিতে সামান্য আদা ও কর্পূরের গন্ধ আছে, পার্শ্ববর্ত্তী কন্দে তাহা কম। উত্তমরূপে কুটিয়া ও ধুইয়া পালো প্রস্তুত করিলে গন্ধ প্রায়ই থাকে না। এতদ্ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্থানভেদে শঠীকন্দের বর্ণ ও গন্ধের অনেক পার্থক্য হয়। চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার কোন কোন স্থানে সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণ ও গন্ধহীন শঠী-ভেদ (Variety) দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ ভেদই শ্বেতসার প্রস্তুতের পক্ষে অধিকতর উপযোগী এবং নির্ব্বাচন করিয়া ইহারই কর্ষণ বিস্তার করা প্রয়োজনীয়। আপাততঃ নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিসমূহই শঠি সংগ্রহ ও পালো প্রস্তুত করে। ব্যবসায়ীবা তাহাদিগের নিকট ক্রয় করিয়া কলিকাতায় চালান দেয়। শঠীকন্দে সাধারণতঃ অন্যূন ৮০ ভাগ শ্বেতসার থাকিলেও দেশীয় প্রথায় নিষ্কাশনে তাহার কতকাংশের অপচয় হয়।

শঠী, বিলাতী আবারুট ও তিক্ষুবের চাষপ্রণালী প্রায় একইরূপ। দোঁয়াশ ডাঙ্গা জমী অথবা স্বল্প ছায়াযুক্ত বাগান-জমী, যাহাতে বর্ষায় জল জমে না, তাহাই এরূপ ফসলের পক্ষে উপযোগী। চৈত্র-বৈশাখে ২।৩ বার লাঙ্গল দিয়া মাটী চূর্ণ করা দরকার। জঙ্গল কাটা অথবা পতিত জমী হইলে আগে কোদাল দ্বারা কোপাইয়া পরে লাঙ্গল দেওয়া ভাল। ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে ১ হাত ব্যবধানে আধ হাত উঁচু করিয়া লম্বালম্বি একগুলি দাঁড়া বাঁধিতে হইবে। দাঁড়ার উপর পৌনে ১ হাত অন্তর চোখযুক্ত কন্দের অংশ বসাইতে হয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে প্রথম পশলা বৃষ্টি হইলেই এই কার্য্য করিতে পারা যায়। চারা একটু বড় না হওয়া পর্য্যন্ত জলসেচন আবশ্যক। বর্ষার সময় চারার গায়ে মাটী ধরাইয়া দেওয়া এবং জলনিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা ভিন্ন অন্য কোন পাইট দরকার হয় না। নূতন জঙ্গল-কাটা জমীতে সার অনাবশ্যক; কিন্তু চাষের জমী নিকৃষ্ট হইলে বিঘাপ্রতি ২০ মণ গোবর-সার ও ১০ মণ অসিক্ত কাঠের ছাই দিলেই যথেষ্ট হয়। দ্বিগুণ চূর্ণ মাটীর সহিত সার মিশ্রিত করিয়া কন্দ পুতিবার সময় প্রত্যেকটির গোড়ায় কিছু কিছু করিয়া দেওয়া প্রশস্ত। কন্দের নিকটস্থ পত্রের নিম্নপ্রান্ত বিবর্ণ হইতে আরম্ভ হইলেই বুঝিতে হইবে যে, কন্দ সুপক্ক হইয়াছে। সেই সময় লাঙ্গল অথবা কোদাল দ্বারা কন্দগুলি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। তুলিবার সময় কন্দ যাহাতে অক্ষত থাকে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা বিশেষ দরকার। কন্দ সুপক্ক হইলেও মাটীতে কিছু দিনের জন্য রাখিতে পারা যায়; কিন্তু মাটী হইতে তুলিয়া লইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব তাহা হইতে শ্বেতসার নিষ্কাশন করা কর্ত্তব্য। রৌদ্র ও বাতাসে অধিক সময় ফেলিয়া রাখিলে উৎপন্ন শ্বেতসারের বর্ণ মলিন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সর্ব্বজয়া

সর্ব্বজয়া যে কোন্ সময়ে ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না। সাধারণ সর্ব্বজয়া, Canna indica অর্দ্ধবন্য অবস্থায় নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সুদৃশ্য পত্র ও নানা বর্ণের ফুলের জন্য এই জাতীয় গাছ সচরাচর আদৃত হয়। কিন্তু কোন জাতীয় সর্ব্বজয়াই এতদ্দেশে এ পর্য্যন্ত শ্বেতসার উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। কুইন্সল্যাণ্ডে C. edulis নামক সর্ব্বজয়ার চাষ সাধারণ। ডাঙ্গা জমীতে অথবা নদী-সংলগ্ন খালের কিনারায় এতদুদ্দেশ্যে বাগিচা প্রস্তুত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে এই জাতীয় সর্ব্বজয়ার যে সহজে চাষ করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সামান্য সারযুক্ত জমীতে উপযুক্তরূপে চাষ দিয়া সমান্তরালভাবে ৪ হাত অন্তর দাঁড়া বাঁধিয়া তাহাতে ৩ হাত ব্যবধানে গেঁড় পুতিতে হইবে। অন্যান্য পাইট তিক্ষুর চাষের ন্যায়। এক একটি গেঁড় হইতে ১০।১২টি চারা বাহির হয় এবং গাছগুলি প্রায় ৫ হাত অথবা পুষ্পদণ্ডসহ ৬ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। প্রত্যেক গাছের মূলে অর্দ্ধসের হইতে ১ সের ওজনের এক একটি কন্দ জন্মিয়া থাকে। ইহার ফলন তিক্ষুর অপেক্ষাও অধিক এবং উৎপন্ন শ্বেতসারও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর।

বিভিন্ন প্রকার শ্বেতসার

আমরা এস্থলে যে চারি প্রকার শ্বেতসারের উল্লেখ করিলাম—বিলাতী আরারুট, তিক্ষুর, শঠী ও সর্ব্বজয়া—সেগুলি সমস্তই হরিদ্রাবর্গীয় (Scitamineae)। ইহাদিগের পরস্পরের গঠন, বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে এবং চাষপ্রণালীও অনেকটা এক প্রকারের। দেশী ও বিলাতী আরারুটের মধ্যে শ্বেতসার কণার (Starch granules) গঠনগত বিভিন্নতা অবশ্য আছে। খাদ্যমূল্য কিন্তু উভয়ের একই রকম। বাজারে বিক্রয়ের মাল হিসাবে বর্ণ, চেহারা ও অন্যান্য গুণ সম্বন্ধে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহার মূল কারণ দুইটি :—(১) কর্ষিত উদ্ভিদ হইতে বিলাতী আরারুট প্রস্তুত হয়; তাহাতে নির্দ্দিষ্ট মোকামে উৎপন্ন শ্বেতসার সমগুণবিশিষ্ট (uniform quality) হইয়া থাকে। বন্য গাছ হইতে দেশী আরারুট প্রস্তুত হয় বলিয়া গুণের লাঘবতা ঘটে ও নানাস্থানের সংগৃহীত আরারুট একত্র সংমিশ্রণের ফলে গুণের সমতা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। (২) দেশীয় শ্বেতসার প্রস্তুতপ্রথা নিতান্তই প্রাচীন; তাহাতে শ্বেতসারের যেমন অপচয় হয়, তেমনই উৎকর্ষতা কমিয়া যায়। বিলাতী আবারুট আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে নিষ্কাশিত হওয়ায় শ্বেতসার অধিক পরিমাণে

পাওয়া যায় এবং তাহা উত্তম গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তিক্ষুর ও শঠীর উপযুক্ত ভেদ নির্ব্বাচন করিয়া চাষ করিলে শ্বেতসারের মাত্রা ও গুণ অবশ্যই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শ্বেতসার নিষ্কাশন করিলে উহা যে সর্ব্বাংশে বিলাতী আরারুটের সমকক্ষ অথচ তদপেক্ষা সুলভ হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। আহার্য্য হিসাবে দেশী আরারুট যে বিলাতী আরারুটের সমতুল্য, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বিভিন্ন আরারুটের রাসায়নিক বিশ্লেষণতালিকা হইতে প্রতীয়মান হইবে :—

	ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান	কুইন্সল্যাণ্ড	তিক্ষুর	শঠী
শ্বেতসার	৮৩'০০	৮১'৮৭	৮২'২০	৮২'২৷
অন্নসার	০'৮০	০'০৬	১'৫০	০'০৫
আর্দ্রতা	১৬'০০	১৭'২৫	১৫'৪৩	১৩'৫
ধাতব লবণ	০'২০	০'২৯	০'৮৭	০'২০

প্রস্তুতপ্রণালী

ভারতবর্ষের নানাস্থানে তিক্ষুর ও শঠী হইতে শ্বেতসার নিষ্কাশনের জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বিত হয়, তৎসমুদয়ের মধ্যে সামান্যই প্রভেদ আছে। দেশীয় প্রথায় পাথরে ঘষিয়া অথবা ঢেঁকিতে কুটিয়া কন্দগুলিকে পিণ্ডবৎ করা হয়; পরে পিণ্ডকে (pulp) উপযুক্ত পরিমাণ জলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া উক্ত জল ছাঁকিয়া এক স্থানে কিছু কাল রাখিয়া দিলে শ্বেতসার নীচে জমিয়া যায়। তখন জল ফেলিয়া দিয়া শ্বেতসার বাহির করিয়া লইয়া শুষ্ক করা হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে শুষ্ক করিবার পূর্ব্বে আবার একবার ছাঁকা হয়। কিন্তু শ্বেতসারকে সাধারণতঃ আর বিশেষ করিয়া চূর্ণ করা হয় না। বাজারে যে পালো আসে, তাহা চূর্ণ ও ঢেলা-মিশ্রিত।

আধুনিক আরারুট-কারখানায় উক্ত প্রাচীন প্রথার উপর অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এরূপ কারখানায় প্রথমতঃ কন্দসমূহ হইতে কাণ্ড ও পত্রের অবশিষ্ট অংশাদি উত্তমরূপে পৃথক্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া কন্দগুলি জলে ২।৩ বার ধুইয়া পরিষ্কৃত করিয়া লওয়া হয়। পরিষ্কৃত কন্দ পরে কারখানার সর্ব্বোচ্চ স্থলে অবস্থিত পিষিবার কলে (Grating mill) বাহক-যন্ত্র দ্বারা চালাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। পিষিবার কল হইতে শ্বেতসার সমেত পিষ্ট-পিণ্ড জলে ধুইয়া একটি বৃহদায়তন লম্বা নলাকার পাত্রের (cylinder) মধ্যে আসিয়া পড়ে। এই পাত্রের গাত্রে উপর নীচে কতকগুলি ছিদ্র আছে; ছিদ্রগুলি আবশ্যকমত বন্ধ করা ও খোলা যায়। পাত্রের নিম্নভাগে শ্বেতসার চাপ বাঁধিয়া বসিয়া গেলে ছিদ্রপথ উন্মুক্ত করিয়া জল ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং বড় বড় হাতলযুক্ত আঁচড়া দ্বারা শ্বেতসারের উপরিস্থিত তন্তুময় পিণ্ডাংশ টানিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়। অতঃপর বারম্বার জল দিয়া শ্বেতসারকে পরিষ্কৃত করা হইয়া থাকে। দেখা দরকার যে, যে জল দিয়া ধোয়া হইবে, তাহাতে যেন লোহা না থাকে। ধোয়া হইলে জল-মিশ্রিত শ্বেতসারকে আবার কাপড়ের মধ্য দিয়া ঘষিয়া ছাঁকিয়া লওয়া নিয়ম; তাহাতে অবশিষ্ট তন্তু প্রভৃতি যাহা কিছু থাকে, তৎসমুদয় পৃথক্ হইয়া গিয়া ছাঁকা জলের মধ্যে শ্বেতসার অধঃস্থ হইয়া যায়। অতঃপর জল বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া কাষ্ঠনির্ম্মিত কোদালির সাহায্যে আর্দ্র শ্বেতসার কাপড়ের টেবলের উপর পাতলা স্তররূপে বিছাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করা হইয়া থাকে। শুষ্কীকৃত শ্বেতসারকে আবার চূর্ণ করিয়া ছাঁকিয়া লওয়া হয়। যথেষ্ট সতর্কতার সহিত প্রস্তুত হইলে শ্বেতসার সম্পূর্ণ শ্বেত ও উজ্জ্বল হওয়া উচিত। প্রত্যহ ৫০ মণ আরারুট প্রস্তুত হইতে পারে, এরূপ একটি মধ্যম শ্রেণী শ্বেতসার কারখানায় যে সকল সাজ-সরঞ্জাম আবশ্যক হয়, তৎসমুদয়ের মূল্য ও স্থাপনের (installation) খরচ সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ২৫ হাজার টাকা হইবে এবং তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্যতম :— One 6-10 H. P. Engine, Root-washer, Carrier, Grinding mill, Cylinder, Rotary shelves. Shaking shelves, Chute, Circuitons trough, Agitators, Sieves, Centrifugals for draining, Calico for drying.

ব্যবসায়-প্রসারের সম্ভাবনা

আহার্য্য শ্বেতসার অথবা আরারুটের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এরূপ স্থান নির্ব্বাচন করা ভাল—যেখানে বন্য তিক্ষুর অথবা শঠী প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, অথচ স্থানটি নৌকাপথ কিম্বা রেলপথের নিকটবর্ত্তী হয়। বন্য উদ্ভিদ হইতে কার্য্য প্রথমতঃ চালাইয়া লইয়া ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট ভেদ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক আরারুটের চাষ করিয়া প্রথম শ্রেণীর আরারুট উৎপাদন করা তাহা হইলে সম্ভবপর হইতে পারে। জগতের বাজারে আরারুট ও অন্য প্রকার শ্বেতসারের চাহিদা নিতান্ত সামান্য নহে। ভারতেই প্রতি বৎসর অন্যূন অর্দ্ধ-কোটি টাকার আরারুট ও তৎশ্রেণীর দ্রব্য আমদানী হয়; এতদ্ভিন্ন দেশ-মধ্যেও নানাপ্রকার পালোর (তিক্ষুর, শঠী, পানিফল ইত্যাদি) চলন যথেষ্ট রহিয়াছে। অথচ সাধারণতঃ বাজারে যে সমুদয় পালো পাওয়া যায়, সেগুলি প্রস্তুতের দোষে এবং ভেজাল মিশ্রিত করায় রোগীর পথ্য হওয়া দূরের কথা, সময়ে সময়ে সুস্থ, সবল লোকেরও আহারের অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। এরূপ অবস্থায় আহার্য্য শ্বেতসার প্রস্তুত কার্য্য যে শুধু ব্যবসায় হিসাবে লাভজনক হইতে পারে, তাহা নহে; উৎকৃষ্ট শ্বেতসার উৎপাদিত হইয়া সুলভ খাদ্যরূপে উহার যথেষ্ট প্রচলন হইলে দেশমধ্যে পর্য্যাপ্ত খাদ্য-সংস্থান-সমস্যারও কিয়ৎপরিমাণে সমাধান হইতে পারে। তিক্ষুরের পালো আপাততঃ কিয়ৎপরিমাণে রপ্তানী হয়; চেষ্টা দ্বারা দেশীয় আরারুটকে বিদেশীয়ের সমকক্ষ করিতে পারা যায়, ত্রিবাঙ্কুরের তিক্ষুরের পালো তাহার সাক্ষ্যস্থল। উক্ত স্থানে উৎকৃষ্ট পালোর দর প্রায় মণ প্রতি ১৫৲ টাকা। রপ্তানীর জন্য উহার যথেষ্ট চাহিদা আছে। আরারুট-শিল্প উত্তমরূপে সংগঠিত হইলে ভারতীয় আরারুট দেশের অভাব মোচন করিয়া কালক্রমে জগতের বাজারে প্রসিদ্ধি ও প্রাধান্য লাভ করা আদৌ বিস্ময়কর নহে

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ·

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রিহার্সেল দেখিয়াই শোভা সে দিন মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা অভিনেত্রী দ্বারা অভিনীত অভিনয় সে একাধিকবার দেখিয়াছে। এক জন মানুষ কতকালকার আগের ভিন্ন জাতি গোত্র আশা ও আশয়সম্পন্ন আর এক জন মানুষের অমন হুবহু অনুকরণ কেমন করিয়াই যে করিতে পারে, সে কথা ভাবিয়াই সে অবাক্ হইত। জিজ্ঞাসায় জানিয়াছিল, ঐ সকল অভিনেত্রী রাজকন্যা—গৃহস্থ-গৃহিণী কিছুই না, অথচ গৌরবান্বিতা রাজমহিষীর—সাধ্বী সতী কুলবধূর অভিনয় উহারা সুচারুরূপেই সম্পন্ন করিল।

যখন উন্মত্ত মাতালের অত্যাচারিতা পত্নী তাহার প্রতিবেশী জমীদারপুত্রের একান্ত ব্যাকুলতা-ভরা প্রেমনিবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়া সগর্ব্ব বচনে প্রত্যুত্তর করিল,—

'দেবতা তেত্রিশ কোটি আছে কি না আছে ভাবিনি কথন।
আমার দেবতা এক অদ্বিতীয় তিনি,—একমাত্র—
পতিপদ কামনা আমার।'

আবার সেই সুরূপ ও প্রেমিক যুবকের হতাশাক্ষিপ্ত অন্তরোৎসারিত তীব্র ব্যঙ্গের প্রতিবাদে—

"পাষাণ-দেবতা পূজা করে না কি কেহ?
প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয় সাধনার বলে" এবং—
"জন্মজন্মান্তর তরে রব প্রতীক্ষিয়া,
যুগযুগান্তরাবধি যাব অনুসরি আমার সে দেবতায়।"

তখন শোভার বিস্ময়ের অবধি থাকে নাই। এ সব কথা অমন প্রাণস্পর্শী করিয়া বলিতে পারা—সে কি সহজ কথা! অবশ্য সতীর প্রভাবে সেই দিনেই তার সন্দেহপরায়ণতার অন্তরালে অবস্থিত স্বামীর জ্ঞানচক্ষু উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় সতীকে আর জন্মজন্মান্তর বা যুগযুগান্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় নাই—ইহাই মঙ্গল।

সেই অভিনয় যখন দীপ্তি, প্রমীলা, হেলেনা, অমিয়া প্রভৃতি চেনাশোনা হাজারবার দেখা মেয়েরা করিল, তখন শোভার বিস্ময় সীমাতিক্রম করিতে উদ্যত হইল। তা হ'লে মানুষে ত সবই পারে? এই যে কলেজে-পড়া মেয়ে রুবি—কেনই বা এ তাদের ঘরের লক্ষ্মী বউটি হইতে পারিবে না? সে দিন প্রতিমাকে বলিতেই সে যে নাক সিঁটকাইয়া বলিয়াছিল, "ও মা গো! ঠাকুরঝি! তোর জ্বালায় আর বাঁচিনি, ভাই! তুই ফর্সা রং দেখে কোন্ দিন হয় ত মেয়ে-স্কুলের ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস মিস্ ফ্রাগসের সঙ্গেই ঠাকুরপোর বিয়ের ঘটকালি ক'রে বস্‌বি দেখছি! ওই কলেজে-পড়া ধেড়ে-ধিঙ্গি মেয়ে কি না, তোমাদের ঘরে এসে ঘোম্‌টা টেনে বউমা হয়ে বস্‌তে পার্‌বে? হয়েছে!"

আসল কথা, প্রতিমার ছোট বোন্ সুরমার সঙ্গে শশাঙ্কের বিবাহ হয়, এ ইচ্ছা প্রতিমা এবং তার পিত্রালয়ের সবাই-কারই মনে খুব বেশী প্রবল। এর জন্য তারা বিন্দু, হরিমোহন কাহারও কাছে কম সুপারিশ করে নাই, কিন্তু বিন্দু জবাব দিয়াছিল, 'এক বাড়ীতে দুই কুটুম্ব করিব না।' প্রতিমা ইহাতে আপনাকে কিছু অবমানিত বোধ করিয়াছিল। সে মনে মনে বুঝিয়াছিল, সুরমার রংটা কিছু ময়লা বলিয়াই মা'র তাকে মনে ধরে নাই, তাই সে শশাঙ্কের ভবিষ্য সুন্দরী বধূর প্রতি মনের মধ্যে আগাম ভাবেই কিছু চটিয়া আছে। এ দিকে সরযূর বিশ্বাস ছিল, প্রতিমার বড়লোক বাপের অন্য মেয়েকে শশাঙ্কর জন্য আনায় বড় গিন্নীর আপত্তির আর কোন কারণ নাই, পাছে শরদিন্দুর শ্বশুর শশাঙ্কেরও শ্বশুর হইলে শরদিন্দুর পক্ষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সেই জন্যই এই ছল-ছুতা, নহিলে তার বাপের বাড়ীর পাড়ায় ক'জনরাই ত এক ঘরে দুই কুটুম্ব করিয়াছে, কি ক্ষতি হইয়াছে তাহাদের?

শোভার এবার বিশ্বাস দৃঢ় হইল যে, রুবি তাহাদের বউ হইলে সে-ও বধূত্ব মানাইয়া লইতে পারিবে। কেনই বা

পারিবে না? যদি সে মানুষ হইয়া,"নিয়তির" ভূমিকায় অমন সুন্দর অভিনয় করিতে পারে, ঘরকন্নার ছুটো কায-কর্ম্ম করা, দরকারমতন এক আধটুকু ঘোমটা টানা—এ আর এমন শক্ত কি? প্রতিমার তীব্র প্রতিবাদে মনের মধ্যে সে অনেকখানিই দমিয়া গেলেও তথাপি মনে মনে একটু-খানি বল সংগ্রহ করিয়া সে প্রত্যুত্তর করিল, "ও যদি রুবি হ'য়ে 'নিয়তি' হ'তে পারে, প্রতিমাই বা কেন হ'তে পারবে না শুনি? নিশ্চয় পারবে, আর এমন কি, আমার মনে হয়, ও যদি 'প্রতিমা' হয় ত, প্রতিমার চেয়ে ভালই হবে।"

প্রতিমা রাগিয়া গেল, ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "প্রতিমার চেয়ে ভাল ত বিশ্বশুদ্ধ সব্বাই। প্রতিমা আবার ভাল কবে? ছোট-মা ত কোন দিনই আমায় ভাল চোখে দেখেন নি, ঠাকুরপো ত আমার মূর্খতার খোঁটা দিতে পেলে আর কিছুই চান না, তুমিই কি আর একলা আমায় ভাল দেখবে? ঠাকুরপোর বউ যেমনই আসুক, সে আমার চাইতে যে ভালই হবে, সে আমার জানাই আছে।"

মুখভাব অন্ধকার করিয়া প্রতিমা একখানা অর্দ্ধ-পঠিত পুস্তকের খোলাপাতা উল্টাইতে লাগিল।

এই যে অভিমান প্রতিমা প্রকাশ করিল, এ বড় তুচ্ছ নহে! গূঢ় ও কঠোর অনুযোগে এ অভিব্যক্তি পরিপূর্ণ! সামান্য এতটুকু ইঙ্গিতও বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের একটা ঝঞ্ঝাময় দুর্য্যোগের তীব্র আভাস ইহার অন্তর্নিহিত।

শোভা অতটা তলাইয়া না বুঝিলেও কিছু অপ্রতিভ হইল। সে প্রতিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া ব্যথিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "ছি ছি, বউদি! আমি তোকে ভাল দেখি নে! ও মা! তুই কি ভাই? আমি বুঝি সত্যিই বল্লুম? বাব্বাঃ, একটা ঠাট্টা করবারও যো নেই!"

"আঁতে যখন ঘা লাগে, তখন ঠাট্টা আর ঠাট্টা থাকে কৈ? তোমাদের বিশ্বাস, আমি বড় তুচ্ছ! আমার বোন্‌কে তাই আর এ বাড়ীতে আনাই যায় না। আচ্ছা, মরচিনে ত এক্ষণি, দেখাই যাবে, কে কত অপরূপ রূপ-গুণবতী বউ আসে। অবিশ্যি থিয়েটারের অ্যাক্‌ট্রেসকে যদি বউ ক'রে আনা হয় ত সে আলাদা কথা! ঘরও করবে, চাই কি নেচে গেয়ে কিছু কিছু রোজগার করেও আনতে পারে। আমাদের দ্বারা ত আর সেটা হবে না!"

এই যে কটু কণ্ঠে তীব্র বিশ্লেষণ সে করিল, এর পর রুবির সম্বন্ধে কাহারও সহিত কোন আলোচনা করিতেই আর শোভার ভরসা হইল না। প্রতিমার প্রজ্বালিত আলোর মধ্য দিয়া দেখিতে দেখিতে রুবিকে ঘরের বউ করার বিষয়েও তার যেন বিশ্বাসের দৃঢ়তা শিথিল হইয়া গেল। সে-ও কিছুক্ষণ তার মনের সহিত তর্ক করিয়া পরাজয়ের ভাবেই মনে মনে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না! সে হয় না, সে কায নেই, সে ভাল হবে না।"

কিন্তু মনটা তার যেন এই অস্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই কেমন একটু শোকাহত হইয়া গেল। বিসর্জ্জিত-প্রতিমা চণ্ডীমণ্ডপের মতই খাঁ খাঁ করিতে লাগিল।

মহা সমারোহে রুবিদের অভিনয় হইয়া গেল। মাসাধিককাল ধরিয়া ঘরে ঘরে "জনগণ-মন-অধিনায়ক জয় হে" রবে ভারতের "ভাগ্য-বিধাতার" যে জয়ধ্বনি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে দিন সমবেত দর্শকগণের উচ্চ প্রশংসিত জয়-রবে তার পরিসমাপ্তি হইয়া গেল। সব চেয়ে খ্যাতি হইল নিয়তির, নিয়তিরূপিণী রুবির সুখ্যাতিতে, নর-নারী নির্ব্বিচারে, সমস্ত দেশ যেন ভরিয়া উঠিল। সংবাদপত্রে তার ফটো এবং প্যারার পর প্যারা ভরিয়া অভিনয়খ্যাতি ছাপা হইয়া গেল। তার বিবাহের সম্বন্ধও কয়েক স্থান হইতে আসিয়া জুটিল। দেখিয়া শুনিয়া এক দিন সুমতি তার স্বামীর অনুমতি লইয়া নর্ম্মদাকে গিয়া তাঁর প্রস্তাব জানাইলেন এবং তাহাদের ইতস্ততঃর মধ্যেই নিজের কাণ হইতে হীরার ফুল খুলিয়া রুবির কাণে পরাইয়া দিয়া তার সম্পূর্ণ বিস্ময় ও হতবুদ্ধির মধ্যেই মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "আজ থেকে তুমি আমার বউমা হ'লে রুবি! হিরণ শীগ্‌গিরই ফিরে আসছে, সে চাকরী পেয়েছে। তাকে আমি লিখেছিলুম, তার সম্পূর্ণ মতও আছে, সে এলেই তোমাদের বিয়ে হবে।"

রুবি স্তম্ভিত হইয়া রহিল, সে তাঁহাকে প্রণাম পর্য্যন্ত করিতে অথবা তাঁর কথার কোন প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিতে ভুলিয়া গেল। নর্ম্মদা তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল, তাহাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া মনে মনে স্থির করিল, বড় লোক [illegible] বাবুর ছেলের চাইতে ম্যাজিষ্ট্রেট হিরণ্ময়ের স্ত্রী হওয়া [illegible] ত রুবির পছন্দ! মনে মনে বলিল, হয় ত সে ভালই, [illegible] ত স্বাধীন নয়, তার মা-বাপ রুবিকে নেবেন কি না, [illegible]

কিছুই ঠিকানা নেই, আর এ—এঁরা নিজেরাই যেচে নিচ্ছেন। এ সুযোগ কেনই বা ছাড়তে যাবো? সিবিলিয়ান জামাই—অমন কুটুম—এমন অনায়াসে পায় কে? কি এমন বসন্ত বাবু আর তার ছেলেই বা এত কি অপরূপ!

সুমতির পায়ের ধূলা লইয়া নর্ম্মদা আহ্লাদে বলিল, "এ আমার বহু কালের সাধ, দিদি! হিরণের মতন অমন ছেলে কত তপস্যা থাকলেই তবে লোক পায়! আমার রুবির অনেক পুণ্যবল ছিল, তাই অমন স্বামী সে পাচ্ছে।"

রুবি এইবার সহসা চটকাভাঙ্গা হইয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু ততক্ষণে এক দল স্কুলের মেয়ে আসিয়া হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে এবং মহা সোরগোল করিয়া ডাকাডাকি বাধাইয়াছে, নিয়তি দিদি! নিয়তি দিদি! পিক্‌নিকে যাবার সময় পার হয়ে যাচ্ছে যে, তার কিছু ঠিক রেখেছেন?"

রুবির মনের দ্বিধাটুকু আর তার প্রকাশ করা ঘটিয়া উঠিল না, সে তখন তাড়াতাড়ি কাপড় বদলাইতে চলিয়া গেল। সুমতির প্রদত্ত হীরার ফুলদুটি তাঁর নির্ম্মল অন্তরের শুভাশীর্ব্বাদের মতই তার ঘন কুঞ্চিত কেশদাম-পরিবেষ্টিত কাণ দুটিতে জল্‌জল্‌ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হঠাৎ হরমোহনের অসুস্থতার সংবাদ বাহিত হইয়া পত্র আসিল, এবং এই সংবাদ পাইবামাত্র বিন্দু বাপের কাছে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। খবরটা শুনিয়া বসন্ত বাবু কিছু উদ্বিগ্ন এবং সরযূ কিছু প্রসন্ন হইয়াছিল। বিন্দুকে শশাঙ্কের বিবাহ-বিষয়ে বিশেষ কোন বাধার সৃষ্টি করিতে না দেখিয়া বসন্ত বাবু মনে বুঝিয়াছিলেন, সে এ বিবাহ-বিষয়ে কোন বিপক্ষতা করিবে না এবং ইহাও তিনি জানিতেন যে, বিন্দুর সাহায্য ব্যতীত এ বাড়ীতে এত বড় ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া উঠা অসম্ভবের চেয়েও অসম্ভব! তিনি একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, ভাবী বৈবাহিক-গৃহ হইতে সেই দিন প্রাতঃকালেই যে পত্র আসিয়াছে, তাহা হাতে লইয়াই প্রথমে সরযূর সন্ধানে আসিলেন। প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়া আসিয়া সরযূ তাহার ঘরে তখন পাণ-জর্দ্দা খাইতে খাইতে একখানা ডিটেক্‌টিভ সিরিজের নভেল পড়িতেছিল। অন্য বইয়ের চাইতে এই ডিটেক্‌টিভের গল্পগুলা তার লাগে ভাল, সহজে বুঝিতেও পারা যায়। অসময়ে কর্ত্তাকে আসিতে দেখিয়া সে বিস্মিত স্মিতমুখ তুলিল, বইখানা ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া বসিল।

বসন্ত বাবু হাতের চিঠিখানা দেখাইয়া মুখে বলিলেন, "ওরা ত এই চিঠি দিয়েছে। লিখেছে, বিয়ের দিন স্থির হ'লে একেবারে পাত্র আশীর্ব্বাদ করতে আসবে। ফর্দ্দ দিয়েছে, তাতে বরাভরণ পাঁচ হাজার, কন্যাভরণ দশ হাজার আর ফার্নিচার,ফুলশয্যা, নমস্কারী বস্ত্রাদি, দানসামগ্রী বাবদ আরও পাঁচ হাজার টাকা—এই রকম একটা মোটামুটি লিখেছে, আর বলেছে, যদি ইহাতে আমাদের আপত্তি থাকে, ইচ্ছামত ফর্দ্দ পাঠাতে পারি, অর্থাৎ আরও দু' পাঁচ হাজার দিতে পিছপা নয়।"

সরযূর মনটা ফর্দ্দের হিসাব শুনিতে শুনিতে আহ্লাদে ডগমগ হইয়া উঠিতেছিল। সে মনে মনে হিসাব জুড়িয়া দেখিল, শরদিন্দুর শ্বশুর শরদিন্দু বা প্রতিমাকে যতই দিক, অত নিশ্চয়ই দেয় নাই। প্রতিমার অলঙ্কার বেশ ভাল বটে, তবে দশ হাজার টাকা—অত কি আর হইবে? আর তা-ও যদি হয়, শরদিন্দুর হীরার বোতাম, আংটী, আর মুক্তার চেন, ঘড়ি ইত্যাদির দাম নিশ্চয়ই পাঁচ হাজার নয়! সে খুসী হইয়া হাসিয়া ফেলিল ও সাগ্রহে বলিল, "তা হ'লে আর পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিতে লিখে দাও না!"

"নগদ!" বসন্ত বাবু মুখটা একটু বিকৃত করিলেন, "নগদটা চাওয়া ভাল দেখাবে না। তারা হয় ত ভাববে, টাকার অনটন পড়েছে, ছেলের বিয়ের খরচা তুলতে চাইছি, তার চাইতে মেয়ের গহনার আর হাজার পাঁচেক দিয়ে দিতেই বলা ভাল। কিন্তু সে ত যা হোক, ওরা যে দিন দিচ্ছে, সে ত মোটে আর মাসখানেক। এ দিকে বড়গিন্নী ত বাপের বাড়ী চল্লেন, তিনি না থাকলে ত আর তোমার আমার সাধ্যে এ সব হয়ে উঠবে না, তার কি করি? ওর বাবার আবার এই সময়ে দিন বুঝে বুঝে অসুখ হলো!"

সরযূও বিন্দুর বাপের বাড়ী যাওয়ার খবর পাইয়াছিল। সে কিন্তু ইহাতে একটু যেন আশ্বস্ত বোধ করিয়াছিল। বিন্দুর উপস্থিতিতে এ বিবাহ সম্বন্ধে তার মন এখনও যথেষ্ট সন্দিগ্ধ, তাই স্বামীর কথায় বিশেষ চিন্তিত না হইয়াই উত্তর করিল,

"তিনি যখন যাবেনই, তখন আর উপায় কি, নিজেরাই যা পারি, করা যাবে।"

বসন্ত বাবু আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়া কহিয়া ফেলিলেন, "বল কি! নিজেরা—? তুমি এবং আমি? আমরা দেব ছেলের বিয়ে? হয়েছে! তা হ'লে সেকেলে গন্ধর্ব্বমতে, না হয় একেলে গির্জ্জেয় পাঠিয়ে ছেলের বিয়ে সারতে হয়! এ ত আর সত্যি ডোম-ডোক্‌লার ঘর নয়।"

সরযূর মনের আনন্দ এই প্রতিবাদে ঈষৎ খর্ব্ব হইয়া আসিল। তার স্বভাবজাত দুর্ব্বলতা তার মনকে দমাইয়া দিল, তথাপি এতখানি প্রশ্রয় পাইয়া মনটা তার আজও একটুখানি খাড়া ছিল, একটুখানি মৃদু প্রতিবাদ সে তুলিল। বলিল, "এর পর শশীর একজামিন এসে যাবে, তার চেয়ে পাকা দেখা হয়ে থাক, এক মাসের মধ্যে দিদি নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন, এখন ওঁকে কিছু না ব'লে পাকা দেখা হয়ে গেলেই লোক পাঠিও আনতে, তাদেরই বরং শীঘ্র পাকা দেখতে আসতে লেখ।"

বসন্ত বাবু এ কথায় ঈষৎ চিন্তিত হইয়া রহিলেন, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিলেন, "পাকা দেখারই না কি সোজা হাঙ্গামা! সেই বা সব খুঁটিয়ে গুছিয়ে করে কে? তার পর শুন্‌ছি, ওঁর অসুখ বেশী, যদিই না সারে, যদিই ভাল-মন্দ কিছু হয়েই যায়, না বাপু! অত ঝঞ্ঝাট পোয়াবে কে? শেষকালে আমাকেই সেই ল্যাঠার মধ্যে ঢুকতে হবে, সে আমার দ্বারা হবে টবে না। তার চেয়ে ওদের লিখে দিই, ওর পরীক্ষার পরেই হবে। বড়গিন্নীও তাতে খুসী হবেন।"

বসন্ত বাবু এই বলিয়া বড়গিন্নীর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন। সরযূর মুখে অমাবস্যার অন্ধকার নামিয়া আসিল। সে গম্ভীরমুখে মনে মনে বলিল, "সে আমি জানি গো জানি, সাতটা প্রাণ তোমার ঐ বড়গিন্নীর পায়েই ঢালা! নেহাৎ ওই তোমায় নেয় না, তাই তোমার আমাকে যেটুকু দরকার। সে তোমার গুণ নয়, বলতে গেলে বলতে হয় ওরই! মরুক গে, যেমন মায়ের পেটে এসে জন্মেছে, ওদের আবার ভাল কি হবে? যা ভাগ্যে আছে, হোক গে, আর আমি কিছু বলবোও না। এমন বিয়ে ওর কপালে থাকলে তবে ত হবে! তেমনি কপাল কি না!"

বিন্দু যাত্রার উদ্যোগে ব্যস্ত রহিয়াছিল, তার ঘরে কাপড়ের ট্রাঙ্ক ও আলমারী খোলা, মধ্যে মধ্যে ঘর-সংসারের কায-কর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া আসিয়া একবার করিয়া বিন্দু সেগুলা নাড়াচাড়া করিতেছে, আবার কোন একটা কাযের কথা মনে হওয়ায় উঠিয়া যাইতেছে। শোভা ম্লান মুখে তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে গুন্ গুন্ করিয়া কিসের একটা আবেদন জানাইতেছিল। বিন্দু কখনও চুপ করিয়া থাকিয়া, কখনও বুঝাইয়া, কখন বা একটু রাগ করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কিছুতেই সে নিজের বায়না ছাড়িতে প্রস্তুত হইতেছিল না।

হঠাৎ মস্ত বড় একটা ভারি সুটকেশ ও তার উপর একটা চাপানো অ্যাটাসী কেস চাকরের মাথায় বোঝাই দিয়া একটা হাত-ব্যাগ হাতে লইয়া, বাহিরে যাওয়ার পোষাকে সাজিয়া শশাঙ্ক টুপী, ছড়ি ও টাইমটেবল বগলে চাপিয়া দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বিন্দু বা শোভা অবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখিতেই তাদের কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই সে তাড়াতাড়ি বলিয়া বসিল, "এইবার, বড়মা! হেরে গেলে যে তুমি! তোমার এখনও কিছু গোছান হ'ল না, আর আমার দেখ—কোয়াইট রেডী।"

বিন্দু তার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই আবার কোথায় চল্লি?"

শশাঙ্ক ভৃত্য-রক্ষিত বোঝাগুলার উপর টুপী, ছড়ি, হাত-ব্যাগ রক্ষা করিয়া চাকরটাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "যা, আমার বেডিংটা নিয়ে আয় গে,—বিছানা রে বিছানা!" তার পর বিন্দুর দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি যেখানে যাচ্ছো।"

বিন্দু বিস্মিত হইয়া কহিয়া উঠিলেন, "সে আবার কি? তোর একজামিন আসছে না?"

শশাঙ্ক উত্তর দিল, "সেই জন্যই ত যাচ্ছি, তুমি চ'লে গেলে ভেবেছ কি যে শুভি পোড়ারমুখী আমায় একটু পড়তে দেবে। যেটুকু পারে না, সেটুকু শুদ্ধ তোমার ভয়েই পারে না। তুমি না থাকলে দিনরাত্তির ভ্যানোর-ভ্যানোর ক'রে ওর সেই যে আজকাল রত্না না রক্ষিণী, না রাক্ষুসী কে এক জন নতুন বন্ধু হয়েছে, তারই অপূর্ব্ব গুণ-পণার কথা সত্যিতে মিথ্যেতে মিলিয়ে জুলিয়ে দুই কাণের কাছে শুনিয়ে বেড়াবে না! পড়বো কি, বাড়ী ছেড়ে তেপান্তরের মাঠে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হবে।"

শোভা তার সম্বন্ধে এত বড় অপবাদ শুনিয়া এবার আর গুন্‌গুনানির আবেদনে নয়, উচ্চকণ্ঠের চীৎকারে আরম্ভ করিয়া দিল,—"শুন্‌লে বড়মা! শুন্‌লে তুমি? না বাপু! আমি কখ্‌খনও থাকতে চাই নে, আমায় তুমি নিয়ে চলো। বাবা! কে থাকবে! উনি যদি থাকেন, আর ফেল হন, সব দোষ পড়বে এসে এই শোভা পোড়ারমুখীর ওপোর! হ্যাঁ, আমিই যেন তোমায় সেধে সেধে রুবিদি'র কথা বলতে যাই কি না! আমার ত ভারি দরকার!"

বিন্দু এদের রকম দেখিয়া একটু ব্যগ্র হইয়াই হাসির মধ্যে বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, এ তোদের কি কাণ্ড বল ত? বাবার অসুখ, আমি যাচ্ছি তাঁর সেবা করতে, তোরা গিয়ে যদি দিনরাত্তির আমায় ঘিরেই থাকবি, তা হ'লে আমার যাবার দরকার?"

শশাঙ্ক বলিয়া উঠিল, "তাই জন্যেই ত যাচ্ছি বড়মা! তোমার বাবার অসুখ, এ সময়ে যদি আমরা তাঁকে গিয়ে ঘিরে না থাকি, তা হ'লে আর আমরা থেকে তাঁর করলুম কি? তোমার বাবাটি ত আর কম লাসটি নন, একলা তুমি ত আর তাঁকে ঘিরতে পারবে না, কাযে কাযেই আমাদের যেতে হচ্ছে!"

শোভা চেঁচাইয়া উঠিল, "আমি কিন্তু তা হ'লে যাবোই যাবো, তা ব'লে দিলুম। নিজের আদুরে ছেলেকে যদি নিয়ে যাও আমায় ফেলে, তা হ'লে আমি এবার রক্ষে রাখবো না। সবতাতেই উনি এগিয়ে আসবেন, বা—রে!"

বিন্দু শশাঙ্কের সহাস্য স্মিত মুখের দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন, "তা হ'লে বাপধনটি! ওই না হয় যাক, তুমি ভাল ক'রে একজামিনের পড়াটা ক'রে ফেল, কেমন?"

শশাঙ্ক হাসিয়া দরজায় আঙুলের টোকা মারিতে মারিতে দুষ্টু দুষ্টু মুখে উত্তর করিল, "সে কেমন ক'রে হবে, বড়মা! শোভা না থাকলে আমার খাবার সময় বাতাস দেবে কে? আমার ধোপার বাড়ীর কাপড় এলে কে আলমারীতে গুছিয়ে তুলবে? কার সঙ্গে আমি এই ভাত হজম হবার জন্যে খুনসুটি করবো? তার চেয়ে আমরা দু'জনেই তোমার সঙ্গে যাই, কি বল?"

বিন্দু বিরক্তি প্রকাশ করিতে গিয়াও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না, "তোদের জ্বালায় আমার এক পা নড়বার যো নেই!" বলিয়াই পুনশ্চ কহিল, "আর তোর মা? সে কি একলা থাকবে না কি? না, না, এক জন তোরা থাক।"

শশাঙ্ক বলিল, "ছোটমা একলা থাক্‌তে ভালই বাসে, ওর কিছু কষ্ট হবে না তাতে, ডেকে বরঞ্চ তুমি জিজ্ঞেসা করো। আমরা থাকলেই বরং ওর ঝঞ্ঝাট বাড়বে।"

শোভা কহিল, "হ্যাঁ, একলা কিসে? বউদি বুঝি নেই? আর বড়দাও ত রইলেন। তোমার খালি ছুতো! না, সে হচ্ছে না, আমি আমার ট্রাঙ্কটা গুছিয়ে এক্ষণি নিয়ে আসছি, আর চুল-টুল বেঁধে নিচ্ছি।" বলিয়াই সে এক ছুট দিল। পিছন হইতে শশাঙ্ক ডাকিয়া বলিল, "এই শুভি! যাচ্ছিস বটে, কিন্তু কা'ল যে প্রবোধের চিঠি-খানা আসবে, সেখানা কিন্তু বৌদির হাতে পড়বে, বৌদিকে ব'লে যাবো, সেখানা আমার নামে পাঠিয়ে দিতে। অবশ্য তার জন্যে বৌদিকে একটা খুব দামী সেণ্ট ঘুষ দিয়ে যেতে হবে।"

শোভার মনোমত আহ্লাদে ভরা, ভবিষ্যতের সমস্যায় তার তখন মাথা খারাপ করিবার অবসর ছিল না, "দাও গে যাও," বলিয়াই সে অদৃশ্য হইয়া গেল। শশাঙ্ক একটু ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "যাঃ, শুভিটা আজ হারিয়ে দিলে! বাবা আসছেন বড়মা!" বলিয়াই সে-ও এক দিকে সরিয়া পড়িল!

"তুমি যাচ্ছো বড়বৌ! কিন্তু একটু অসুবিধে হলো।" বলিয়া বসন্ত বাবু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিন্দুর সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিন্দু তখন মাটীতে হাঁটু গাড়িয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া ট্রাঙ্কে কাপড় ভরিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "অসুবিধে কিসের? সবই ঠিক করা রৈলো, লোকজন সবই পুরনো, অসুবিধে বিশেষ কিছু হবে না।"

বসন্ত বাবু একটুখানি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, "সে জন্যে না, সে যা হয় হতো, এই শশীর সেই বিয়ের ঠিক হলো না? তা' তারা এই মাসের মধ্যেই দিন করতে চায়, ওদের কি সব ও দিকে বাধা আছে, তা ছাড়া ওরও পরীক্ষা আসছে, সে হিসেবে এ মাসে হলেই ত ভালই হ'ত, কিন্তু সে আর কেমন করেই বা হয়?"

বিন্দু যথাকার্য্যে রত থাকিয়া ছাড়া ছাড়া ভাবেই জবাব দিল, "সে আর কি ক'রে হবে!"

বসন্ত বাবু বলিলেন, "না, তাই ত বলছি, সে আর

কি ক'রে হবে ? তবে যদি দেখ, ওঁর অসুখ তেমন কঠিন নয়, তা হ'লে যদি দুচার দিনের মধ্যেই ফিরে আসতে পারো, তা হ'লে এখনও সময় আছে, হয়ে যেতে পারে।"

বিন্দু এবার কাষ ফেলিয়া মুখ তুলিল, বলিল, "আমি ত আগেই বলেছিলুম, ওর পরীক্ষার আগে হয়, সে আমার মত নয়।"

বসন্ত বাবু ঈষৎ অপ্রভিত হইয়া পড়িলেন, কিছু কুণ্ঠিতভাবে জবাব করিলেন, "হাঁ, তা তুমি বলেছিলে বটে ; তবে কি জানো, সম্বন্ধটি ভাল, আর শশীর গর্ভধারিণীরও বড্ড বেশী সাধ, তা তোমার অপছন্দ হবে না, ওরা এই চিঠি দিয়েছে, পড়ে দেখো, সব শুদ্ধ পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকার কম দিচ্ছে না, অবশ্য কিছু হাতে রেখেই বলেছে, বিশ হাজার টাকার ফর্দ্দই দিয়েছে। আর মেয়েরও রং শুনলুম বড়-বৌমার চাইতে ফরসা।"

বিন্দু কথা কহিল না, আবার বাক্স গোছানয় মনোনিবেশ করিল।

বসন্ত বাবু আবারও একটু বিপন্নভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে কি একজামিনের পরে হওয়াই তোমার মত ? তা পাকা দেখাটা করিয়ে না হয় রেখেই দেওয়া যাক্ ? তুমি কবে নাগাৎ ফিরতে পারবে, খবরটা দিও, সেই বুঝে দিন করা যাবে, আমাদের তরফ থেকেও ওটা সেরে তার পর যখন তোমার সুবিধে মনে হবে, বিয়ে দিও।" এই বলিয়া সব কথা বলা হইয়া গিয়াছে বোধে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়া পিছন ফিরিতে গিয়া শুনিতে পাইলেন, বিন্দু বলিতেছে, "আমি ত আগেই বলেছি, ও-বাড়ীতে বিয়ে দেওয়া আমার মত নয়।"

"এ তোমার অন্যায় বড়বৌ! কেন, ও-বাড়ীতে কিসের দোষ হলো বল ত, ছোট বৌএর বাপের দেশে তাদের বাড়ী এই ? না—ছোট বৌএর ভাই সম্বন্ধটা এনেছে তাই ? অমন বনেদী ঘর, যথেষ্ট পয়সা দিচ্ছে, মেয়ে দেখতে ভাল, অপরাধটা কি ?"

বিন্দু তীব্রচোখে স্বামীর উত্তেজিত মুখের পানে চাহিল, কণ্ঠস্বর স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ করিয়া সে তাঁহার কথার জবাব দিল, "তুমি যা যা ওদের গুণ ব'লে বল্লে, আমার চোখে তার সবই দোষ। ছেলে ত আমি বেচবো না, কে কত দাম বেশী দিচ্ছে, সে খবরে আমার দরকার কি ? মেয়ে দেখতে ভাল হলেই মেয়ে নেবার পক্ষে যথেষ্ট হলো মনে করবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে অন্ততঃ নেই, আর বনেদী ঘরের আলসে কুড়ে গণ্ড-মূর্খ মাতামহর নাতিনী আমি অন্ততঃ ইচ্ছা ক'রে আনতে চাইবো না।—তোমাদের একান্ত ইচ্ছা হয়ে থাকে, যা ভাল বোঝ করতে পারো। ও ত আর সত্যি সত্যিই আ—"

বিন্দুর ঠোঁট ও হাত কাঁপিতেছিল, তাহা তাহার বাক্যে ও কার্য্যেই প্রকটিত হইয়া পড়িল, কিন্তু তার দুরুচ্চার্য্য বাক্য তাকে সমাপ্ত করিতেও হইল না। ঠিক সেই সময় এক দিক্ দিয়া শোভা যাত্রার পোষাকে সাজিয়া এবং অপর দিক্ হইতে শশাঙ্ক হাতে বাঁধা হাত-ঘড়িটা খুলিয়া সেটা হাতে করিয়া ত্রস্ত হইয়া আসিয়া দেখা দিল, বিন্দুকে শুনাইয়া বলিল, "বড়মা! ট্রেণের কিন্তু আর দেরি নেই, এ ট্রেণটা মিস্ করলে রাত বারোটার আগে আর যাবার ট্রেণ পাবে না।"

"এই যে হয়ে গেছে।" বলিয়া বিন্দু তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্কের ডালাটা ফেলিয়া দিয়া চাবি বন্ধ করিতে লাগিল। বসন্ত বাবু সাশ্চর্য্যনেত্রে ছেলে-মেয়ের দিকে এক একবার করিয়া চাহিয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "তোমরা আবার কোথায় চল্লে ? শোভা কি শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে না কি ? কৈ, কিছু শুনিনি ত!"

শোভা মুখ নত করিল, শশাঙ্ক ভাল মানুষের মত জবাব দিল, "আমরা দুজনেই বড়মায়ের সঙ্গে যাচ্ছি, বড়মার শরীর বড্ড খারাপ যাচ্ছে কি না, ওখানে গিয়ে রাত-টাত জেগে যদি ওঁর অসুখ বাড়ে, তাই শোভাকে সঙ্গে নিলুম। আর আমি যাচ্ছি ওঁদের পৌঁছে দিয়ে অমনি দাদামশাইকে এক-বার দেখেও আসতে।"

বসন্ত বাবুর মনে হইল যে, জিজ্ঞাসা করেন, "তাতে তোমার একজামিনের পড়ার ক্ষতি হবে না ?—কিন্তু কিছুই না বলিয়া তিনি একটুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া চলিয়া গেলেন। মুখে না বলিলেও তাঁর মন বলিল, এর সঙ্গে তুমি পারিবে না! এ যদি ইচ্ছা করে, তোমায় সর্ব্বস্বান্ত করিয়া নির্ব্বাসনে পাঠাইতে পারে। এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইতে পারা তোমার বা তোমার ছোট গিন্নীর সাধ্য কি!

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

৪
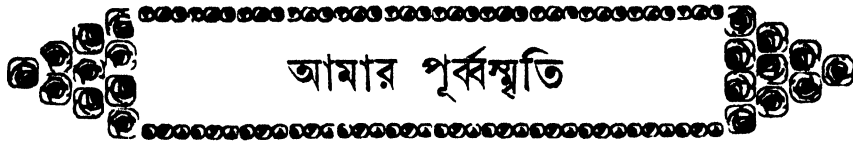
শাস্ত্রে সুবিধাবাদ

অধিকাংশ মানবই সুবিধাবাদী। সুবিধামত মানুষ শাস্ত্রবাক্য গ্রহণ করেন। যাঁহার নিজের মনে যেটি ভাল লাগে, তিনি সেই মতটি গ্রহণ করিতে বিশেষ উৎসুক হইয়া থাকেন এবং নিজের মনের ধারণা অনুযায়ী যে শাস্ত্রবাক্য দেখিতে পান, তাহাকেই অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন; অন্য মতকে মানিয়া লইতে চাহেন না। আবার সময়ে সময়ে যখন নিজের মত শাস্ত্রের মতের বিরোধী হয়, তখন তিনি প্রায়ই বলেন, ইহা বহু পুরাতন শাস্ত্র, বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী নহে। ফলে শাস্ত্রবিষয়ে আমরা বিশেষ সুবিধাবাদী।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যখন আমি পেশার পীড়নে বিশেষভাবে প্রপীড়িত,তখনকার একটি ঘটনার কথা বলিতেছি। যে কোন ভদ্রলোকই যে কোন পেশা গ্রহণ করুন না কেন, তিনি সংসারে অনেক উপকারে লাগিতেও পারেন, না লাগিতেও পারেন। কিন্তু তাঁহার নিজের সুখ-শান্তি অনেক সময় ঘটিয়া উঠে না, তা তিনি ডাক্তারই হউন, উকীলই হউন, এঞ্জিনিয়ারই কিম্বা অন্য পেশাই অবলম্বন করুন। যে কোন পেশার বিষয়ই ধরা যাউক না কেন, প্রতিভাশালী লোকের সংখ্যা সর্ব্বত্রই অতি অল্প, মোটামুটি হাজারে এক জন ধরা যাইতে পারে। পেশায় প্রবেশ করিয়া যিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিন, তাঁহার অপেক্ষা এক জন কেরাণী কিম্বা এক জন শিক্ষকের সাংসারিক অবস্থা অনেক ভাল; কিন্তু যিনি পেশায় বিশেষ পসার জমাইয়াছেন, তাঁহার ভাগ্য বড় একটা সুখ বা শান্তিপ্রদ নহে। তিনি পেশার তাড়নায় পৃথিবীর অনেক সুখেই জলাঞ্জলি দিয়া একনিষ্ঠ পেশার সেবায় জীবনকে একঘেয়ে করিয়া তোলেন। ইহাতে অর্থাগম হইতে পারে বটে, কিন্তু অনেক সময় তিনি নিজে সুখ ও শান্তির ভিখারী।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে আমি প্রাতঃকালে ৬টায় গাত্রোত্থান করিয়া নীচে আসিয়া দেখিতাম, কেবল মক্কেলের ভীড়। মক্কেল লইয়া নাড়াচাড়া করিতেই বেলা সাড়ে ৯টা পর্য্যন্ত কাটিয়া যাইত। তার পর কোনওরূপে কিছু আহার করিয়া তাড়াতাড়ি আদালতে উপস্থিত হইতাম। সারাদিন আদালতে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম। বৈকালে এক ঘণ্টা আন্দাজ বায়ুসেবন। আবার বাড়ীতে ফিরিয়া রাত্রি ১২টা অবধি মক্কেলের সহিত তাহার মামলার ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ। নিজের বলিতে এক মুহূর্ত্ত সময়ও থাকিত না। আমার বেশ মনে আছে, সেই সময়ে আমার সহধর্ম্মিণী কোন দ্রব্য ক্রয়ের জন্য তিন চারি দিন আমাকে অনুরোধ করেন। আমি রোজ আসিয়া একটা না একটা ওজরের বাহানা করি। কোন দিন বলি, মনে ছিল না; কোন দিন বলি, সময় ছিল না; কোন দিন বলি, ঐ যা, ভুলিয়া গিয়াছি। এক দিন যখন আদালতের জন্য বেশ-পরিবর্ত্তন করিতেছি, তিনি আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"উকীল বাবু, আপনাকে ফী না দিলে, আমার কার্য্যটি মনে থাকিবে না, অতএব এই ৫৲ টাকা লউন,—আমার কার্য্য করিবার ফী, আমার কার্য্য আজকে হওয়া চাই।"

অবশ্য কখনও তাঁহাকে বলি নাই যে, আমাদের পেশা এমনই যে, ফী লইয়াও অনেক সময় মক্কেলের কার্য্য করিবার সময় পাই না।

সেই সময়ে তিনি আমাকে এক দিন আরও বলেন—"দেখুন, আপনি ছেলেকে যে পেশাতে দিন, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু ফৌজদারী আদালতে নিজের ওকালতী পেশায় দিবেন না। দিলে আপনার পুত্রবধূ আপনার প্রতি দোষারোপ করিতে পারেন, এমন কি, অসম্মান-সূচক বাক্যও বলিতে পারেন। আমি ভাল মানুষ, আপনি ২৪ ঘণ্টাই নিজের পেশা লইয়া ব্যস্ত আছেন, তাহাতেও আমি কিছু বলি না, কিন্তু ভবিষ্যৎ পুত্রবধূর এত ভাল মানুষ হইবার আশা খুব কম। আপনি প্রাতঃকালে ৬টার সময় উঠিয়া যাইবেন, আর রাত্রি ১২টার সময় ঘরে আসিবেন, এইরূপ করিয়া টাকা পয়সা অলঙ্কারাদি দিয়া স্ত্রীর প্রতি চূড়ান্ত কর্ত্তব্য দেখান হইল মনে করিতে পারেন, কিন্তু আপনার ভাবী পুত্রবধূ এরূপ ভাবের পোষকতা না করিতেও পারে—সম্ভবতঃ করিবে না!"

যখন বাড়ীর লোকের কথা শুনিবার বা তাহাদের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবার সময় নাই, তখন পরের কথা না শুনিতে বা পরের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে না পারিলে তাহা অশোভন হইতে পারে, কিন্তু একবারেই দূষণীয় নহে। সেই সময়ের একটি ঘটনা আমি এই আখ্যায়িকায় বর্ণনা করিতেছি।

সেই সময় এক দিন আমি প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে মামলা করিতেছি, এমন সময় এক ব্যক্তি আমার পশ্চাৎ হইতে "মহাশয়, শুনুন" এইরূপ সম্বোধন করিয়া তিন চারিবার ডাকিলেন। যে মামলাটি করিতেছিলাম, তাহা গুরু দায়িত্বপূর্ণ। আমি আসামীর পক্ষসমর্থন করিতেছিলাম। আমার একটু ভুল হইলে আসামীর জেল হইবার সম্ভাবনা। আসামীটি ভদ্রসন্তান। যদি তাহার জেল হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে তাহা মৃত্যুর সমান হইবে, কাষেই আমার মাথায় বিশেষ দায়িত্বের বোঝা। সেই কারণে লোকটির সম্বোধন প্রথমতঃ আমার কর্ণগোচর হয় নাই, পরে যখন পৌঁছিল, তখন আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম; কিন্তু বিরক্ত হইলেও আমাদের এ পেশায় কোন কারণেই বিরক্তি প্রকাশ একবারেই শোভন নহে। আমাদের এই পেশার প্রধান শিক্ষা আত্মসংযম। কোন অবস্থাতেই বিরক্তি প্রকাশ করা চলিবে না। সকল সময়েই হাসি-মুখে কায করিতে হইবে। এই অবস্থায় অন্তরের ভাব একরূপ, বাহ্য-প্রকাশ অন্যরূপ; সেই হেতু এইরূপ পেশায় ভাবদ্বৈধ মার্জ্জনীয়। কেবল মার্জ্জনীয় কেন—একান্ত বাঞ্ছনীয়। অন্তরে যতই বেদনা অনুভূত হউক না কেন, বাহিরে তাহা প্রকাশ করিবার উপায় নাই। হাকিম নির্ম্মমভাবে অন্যায় বলিতেছেন, মনে ব্যথা অনুভূত হইতেছে; তথাপি তাঁহার অন্যায় ব্যবহারের জবাব দিলে মক্কেলের ক্ষতি হইতে পারে, অতএব অতি সহজভাবে সেই অন্যায় ব্যবহার বেমালুম পরিপাক করিতে হইবে, হাসিয়া কথা কহিতে হইবে। আর যত দিন না পেশায় শীর্ষস্থান অধিকার করা যায়, তত দিন বর্ত্তমান মক্কেলের এবং ভবিষ্যৎ মক্কেলের অত্যাচার ও হাকিমদের অশোভন ব্যবহার সহ্য করিতেই হইবে।

যাহাই হউক, যখন "মশাই, মশাই" শব্দটি আমার কর্ণে গেল, আমি একবার পশ্চাদ্ভাগে ফিরিয়া দেখিলাম, এক জন যুবা পুরুষ, তাঁহার কপাল চন্দনচর্চ্চিত, গলদেশে যজ্ঞোপবীত—আমাকে এইরূপে সম্ভাষণ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিলাম।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'মহাশয়, আমি আপনার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ অমিয়নাথের বিদ্যালয়ের পণ্ডিত। আমি প্রত্যহ গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করি। ব্রাহ্মণ-সন্তান গঙ্গার এত কাছে থাকিয়া গঙ্গাস্নান না করিলে আমার পক্ষে পাপাচার মনে হয়। প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় সরকারী বাগান হইতে গঙ্গাগর্ভে পূজার জন্য কিঞ্চিৎ ফুল সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাই। গতকল্য সরকারী বাগান হইতে কিছু ফুল তুলিয়াছিলাম, তজ্জন্য বাগানের প্রহরী আমাকে ধরিয়া চালান দিয়াছে। আমি কখনও আদালতে আসি নাই এবং আদালতে কোথায় কি করিতে হয়, তাহাও জানি না। মশাই, ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে গিয়া বোধ হয় পূর্ব্বে কেহ এরূপ বিপদে পড়ে নাই। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।'

আমি এক জন উকীল বন্ধুকে তাঁহার বক্তব্য শুনিতে বলিলাম, আর যাহাতে তিনি বিপন্মুক্ত হন, সেই জন্য ঐ উকীল বাবুকে সাহায্য করিতে বলিলাম। আর পণ্ডিত মহাশয়কে বলিয়া দিলাম, "মশাই, আপনার কার্য্য শেষ হইয়া গেলে আপনি আমার সহিত দেখা করিয়া যাইবেন।" ইহার কারণ, তিনি যখন আমাকে মামলার কথা বলিতে-ছিলেন, তখন ইহাও বলেন, "মহাশয়, দেবতার জন্য ফুল নিলে যে দোষ হয়, তাহা আমি একেবারেই জানিতাম না, বরং শাস্ত্রে বলে, দেবপূজার জন্য ফুল চয়ন করিলে কোন পাপই হইতে পারে না।"

আমি তাঁহার সহিত এ বিষয়ে একমত হইতে পারি নাই। তাঁহার মত যে ভ্রান্ত, তাহা বুঝাইবার জন্যই মামলার অবসানে তাঁহাকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম।

আমার বন্ধুটি সেই ব্রাহ্মণ যুবককে লইয়া বেঞ্চ কোর্টে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; "ভবিষ্যতে এইরূপ কার্য্য করি-বেন না" এইরূপ সাবধান করিয়া দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে সে যাত্রা অব্যাহতি দিলেন। অবশ্য ইহা হইল হাকিমের সৌজন্যে আর আমার বন্ধুর গুণে; কিন্তু অনেক সময়ে এরূপ সুফল ফলে না।

বেঞ্চ আদালতের বিচার অনেক সময় দেখিবার সুবিধা।

এখানকার অধিকাংশ হাকিমই "না বিইয়ে কানাইয়ের মা," অর্থাৎ ইঁহাদের অধিকাংশই আইনের ধার ধারেন না, অথচ আইনের বিশ্লেষণ করিয়া আসামীদের ২ বৎসর পর্য্যন্ত জেল দিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাড়ী প্রস্তুত করিবার পরামর্শের জন্য কলেজের ইংরাজী শিক্ষার প্রোফেসার ডাকিবার প্রয়োজন হয় না, মিস্ত্রী বা এঞ্জিনিয়ারকে ডাকিতে হয়। পাককার্য্যের জন্য এঞ্জিনিয়ারকে ডাকিতে হয় না, রোগীর চিকিৎসার জন্য উকীল ডাকিবার দরকার হয় না। কিন্তু বিচার করিবার জন্য আইনে অনভিজ্ঞ লোককে বিচারকের আসনে বসান হয় কেন? এ কার্য্যের সমর্থনে যে কি যুক্তি আছে, তাহা বলা বড়ই কঠিন। সামান্য এক টাকার মামলা করিতে হইলেও এক জন আইনজ্ঞ বিচারকের প্রয়োজন, অর্থাৎ তাঁহার B. L. পাশ করা চাই; তাহার পর তিন বৎসর আইন-ব্যবসায়ে কাটাইয়া মুন্সেফ হওয়া চাই। তার পর কয়েক বৎসর মুন্সেফি করিলে তবে স্মলকজ কোর্টের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। পাঁচ টাকার জমীর মামলা করিতে হইলেও এক জন B. L. পাশ আইনজ্ঞ বিচারকের প্রয়োজন এবং তাহারও তিনটা আপীল আদালত আছে। কিন্তু অনারারী বা অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে যিনি মানুষের স্বাধীনতা লইয়া খেলা করিবেন এবং ইচ্ছা করিলে দুই বৎসর জেল দিতে পারিবেন এবং ছয় মাস পর্য্যন্ত জেলে দিলে আইনের খুঁত না থাকিলে হাইকোর্টও কিছু করিতে পারেন না, ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়! এইরূপ হাকিমের আইনজ্ঞান না থাকিলেও চলিয়া যাইতেছে। তর্কের খাতিরে কেহ বলিতে পারেন, কেন, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটরা সকলে আইন শিক্ষা করেন নাই, তাঁহারা কিরূপে উপযুক্ত বিচারক হন? তাহার জবাবে আমি বলি, যদিও তিনি বিদ্যালয়ে আইন শিক্ষা করেন নাই, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আইন শিক্ষা করিয়াছেন। তিনি বিচারকার্য্য করিয়া ঠেকিয়া শিখিয়াছেন। তিনি "শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ।" আর অনারারী হাকিমদের মধ্যে অনেকেই সে শিক্ষার সুবিধা পান না। তাঁহারা অনেক সময় শিক্ষা পান অর্দ্ধ-শিক্ষিত ধর্ম্মজ্ঞানে অনভিজ্ঞ বেঞ্চ ক্লার্কের নিকট। কাযেই শিক্ষাও তদ্রূপ হয়। এই শ্রেণীর হাকিমরা সব সময় বেপরোয়া—আইন, বিধান, ভাষা কিছুরই ধার ধারেন না, অথচ খুব জোরে দম্ভভরে বিচারকার্য্য পরিচালনা করেন। অবশ্য যতক্ষণ তাঁহাদের উপরওয়ালা বেতনভুক্ হাকিম কর্ম্মক্ষম জবরদস্ত থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার অধীনে অনেক সময় এই শ্রেণীর হাকিম বিষদাঁত-ভাঙ্গা সাপের মত নির্বিষভাবে থাকেন। তবে উপরওয়ালা হাকিম নরম হইলে সাধারণের পক্ষে ইঁহাদের তাড়না অসহ্য হইয়া পড়ে। বিলাতে যে সব শ্রেণীর লোক হইতে অনারারী হাকিম লওয়া হয়, তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী অন্যরূপ। আমি এই ৩৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া বেশ জোরের সহিত বলিতে পারি, এই শ্রেণীর হাকিম না থাকিলে বিচারকার্য্যের কোনরূপ অসুবিধা হইবে না, বরং সুবিধাই হইবে। ইঁহাদের ২৫টিকে সরাইয়া সেই স্থানে একটি শিক্ষিত সাব ডেপুটী দিলেও বিচার-কার্য্যের উৎকর্ষতা বাড়িবে বৈ কমিবে না। এই স্থানে বলিয়া রাখি, পূর্ব্বে অবৈতনিক হাকিমদিগকে আইন-কানুন শিক্ষা দিবার জন্য এক জন উচ্চপদস্থ শিক্ষিত রেজিষ্ট্রার থাকিতেন, তিনি হাতে ধরিয়া এই অনভিজ্ঞদিগকে কার্য্য শিখাইতেন। এখন যদিও উপযুক্ত রেজিষ্ট্রার আছেন, কিন্তু তিনি আদালতের অন্যান্য কাযে এত ব্যস্ত যে, মাষ্টারী করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

মামলা শেষ হইবার পর ব্রাহ্মণকুমার আমার কাছে আসিয়া, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, আমার অবসর হইলে বলিলেন,—"মশাই, আপনি এই বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন, তাহার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ লউন, কিন্তু হাকিমের হুকুম আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। তিনি আমাকে কি ফুল তুলিতে বারণ করিলেন, না—ফুল দিয়া পূজা করিতে নিষেধ করিলেন?"

আমি বলিলাম, "তিনি আপনাকে ফুল চয়ন করিতে বারণ করেন নাই, তবে সরকারী বাগান হইতে ফুল তুলিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মহাশয়, এইরূপ ফুল-চয়ন-নিষেধ অশাস্ত্রীয়; কারণ, শাস্ত্রে আছে—দেবপূজার উদ্দেশ্যে অন্য কাহারও গাছ হইতে পুষ্প-চয়ন দূষণীয় নয়; কারণ, উদ্দেশ্য দেবপূজা। যিনি গাছ পুতিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ফুল ফুটিলে সেই ফুলে দেবতার পূজা হইবে। আমিও দেবপূজার জন্যই গাছ হইতে ফুল তুলিলাম,

তাহাতে দোষ কেন হইবে? উদ্দেশ্য, দুই জনেরই এক।"

আমি বলিলাম, "মহাশয়, দেবপূজার জন্য অন্যের গাছ হইতে পুষ্পচয়ন যেমন অশাস্ত্রীয় নহে, তেমনই আবার শাস্ত্রেই বলে, আপনি যে গাছ নিজে রোপণ করেন নাই, তাহা হইতে পুষ্পচয়ন নিষিদ্ধ, অর্থাৎ অপরের গাছ হইতে ফুল-চয়ন করা পাপজনক।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মহাশয়, মনুর আইনে এইরূপ ব্যবহার অশাস্ত্রীয় নহে। আমরা হিন্দুর ছেলে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশধর, আমরা মনুর আইনই মান্য করি। আমাদের সর্ব্বকাল-বরেণ্য মনুর মতে চুরি হইতেছে,—

নিরন্বয়ং ভবেৎ স্তেয়ং হৃত্বাপহ্নূয়তে চ যৎ। ৩৩২।

অসমক্ষে গোপনভাবে অপহরণের নাম চুরি। কিন্তু তাহার ব্যতিক্রম হইতেছে নিম্নলিখিত স্থলে—

বানস্পত্যং মূলফলং দার্ব্বগ্ন্যর্থং তথৈব চ।
তৃণঞ্চ গোভ্যো গ্রাসার্থমস্তেয়ং মনুরব্রবীৎ॥ ৩৩৯॥
৮ম অধ্যায়—মনুসংহিতা।

অনাবৃত বৃক্ষলতাদির ফল ও মূল, গোজাতিকে খাওয়াইবার জন্য ঘাস—স্বামীর অসাক্ষাতে গ্রহণ করিলেও চুরি হয় না—ইহা মনু বলিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা বলেন—

দ্বিজস্তৃণৈধঃপুষ্পাণি সর্ব্বতঃ স্ববদাহরেৎ।
দেবতার্থন্তু কুসুমমস্তেয়ং মনুরব্রবীৎ॥

দ্বিজগণ তৃণ যজ্ঞকাষ্ঠ ও পুষ্প সমস্ত স্থান হ'তে নিজ দ্রব্যের ন্যায় আহরণ করিবে; পরের বৃক্ষ হইতে দেবতার জন্য কুসুম চয়ন করিলে চুরি করা হয় না, ইহা মনু বলিয়াছেন।

গৌতম-সংহিতায় আছে—

গোগ্ন্যর্থে তৃণমেধাংসি যজ্ঞার্থে বীরুদ্বনস্পতীনাং
পুষ্পাণি সুরভীনি স্ববদাদদীত ফলানি চ পরিবৃংহিতানি।

গোরক্ষার্থে তৃণ ও অগ্নিরক্ষার্থে যজ্ঞকাষ্ঠ এবং যজ্ঞ-সম্পাদনার্থে লতা এবং বৃক্ষের সুরভি পুষ্প নিজ দ্রব্যবৎ গ্রহণ করিবে, আর অন্য কর্ত্তৃক অপরিরক্ষিত বৃক্ষের ফলাদিও ঐ সকল কাযের জন্য নিজ দ্রব্যের ন্যায় গ্রহণ করিতে পারিবে।"

আমি বলিলাম, "মহাশয়, আপনি সব সময়েই কি মনুর নিয়ম পালন করেন? সব সময়েই কি ইহা পছন্দ করেন?"

তিনি বলিলেন, "বলেন কি মহাশয়! আমরা ব্রাহ্মণ-সন্তান, আমরা মনু মানিব না, তাঁহার শাসনতন্ত্রই আমাদিগকে এত দিন ধরিয়া রক্ষা করিতেছে।"

আমি উত্তর করিলাম, "মহাশয়, আপনি জানেন, এক ঋষিকুমার তাঁহার বিমাতার দিকে সাময়িক উত্তেজনায় কুভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহার পর উত্তেজনার অবসানে যখন তিনি বুঝিলেন, তিনি অতি ঘৃণিত গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন, তখন বিশেষ অনুতপ্ত হইলেন এবং সকল কথা প্রকাশ করিয়া এই কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য বিধান চাহিলেন। যাহা চাহিলেন, তাহা পাইলেন—প্রায়শ্চিত্ত তুষানল—তুষের আগুনে অতি ধীরে ধীরে পুড়িয়া মৃত্যু—ভয়ানক শাস্তিবিধান, তথাপি ঋষিকুমার সেই শাস্তি গ্রহণ করিলেন। আজ কয় জন ব্রাহ্মণকুমার আছেন যে, এইরূপ আত্মকৃত পাপের প্রার্থিত দণ্ডে নিজের অস্তিত্ব বিলোপ করিতে প্রস্তুত? এখনকার ব্রাহ্মণগণ তৎকালীন ব্রাহ্মণগণের পরবর্ত্তী পুরুষ বলিয়া গর্ব্ব করেন, কিন্তু কয় জনের সেই সকল গুণাবলী আছে? সুবিধার সময় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে বিশেষ ব্যস্ত, কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করিতে একেবারেই অপারগ।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কিন্তু মহাশয়, যাহাই বলুন, মনুর শাস্ত্র অতি উচ্চ দরের জিনিষ।"

আমি বলিলাম, "আমি সে কথা একেবারেই অস্বীকার করিতেছি না। তবে আমি বলিতে চাই, মনুর নিয়ম পালন করিবার ক্ষমতা আপনাদের কয় জনের আছে? আপনি জানেন, প্রত্যেক কার্য্যের চারিটি করিয়া স্তর আছে [illegible]—মনে ধারণ করা (Intention), দ্বিতীয়—সেই [illegible] কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া (Preparation), তৃতীয়—কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রকাশ্য [illegible] ও কার্য্যারম্ভ (Attempt), চতুর্থ—কার্য্যে পরিণত [illegible] বা কার্য্যকরণ। সোজা কথায় আমি আপনাকে বুঝাইয়া [illegible]। প্রথমে আমি মনে করিলাম, রামকে খুন করিব (Intention),

দ্বিতীয়—সেই ভাব পোষণ করিয়া আমি একটি পিস্তল কিনিলাম (Preparation), তৃতীয়—রামকে লক্ষ্য করিয়া আমি ট্রিগারটি টানিলাম, কিন্তু রামের সৌভাগ্য বশতঃ গুলী লাগিল না (Attempt), চতুর্থ—রামের শরীরে গুলীর আঘাত।

ইংরাজের পেনাল কোডে এবং অপর আধুনিক সমস্ত সভ্য সমাজের আইন পুস্তকে কার্য্যের প্রথম দুই স্তরের জন্য কোন সাজার ব্যবস্থা নাই, তৃতীয়, চতুর্থ স্তরের জন্য সাজার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মনুর আইনে প্রত্যেক স্তরের জন্য সাজার ব্যবস্থা আছে। আপনি কুভাবে কোন যুবতীর দিকে লক্ষ্য করিলে মনুর আইন অনুযায়ী আপনি দোষী, সাজার অধিকারভুক্ত। আপনাকে সাজা পাইতেই হইবে। 'মনসা বাচা,' কোন বাহ্যকার্য্য না করিয়া মনে মনে কুচিন্তা করিলেও মনুর আইনে আপনি দোষী।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বড় কড়া আইন।"

আমি বলিলাম, "নিশ্চয়ই। তবু মনুর আইনে যেটি সুবিধা, সেটি গ্রহণ করিবেন, আর যেটি অসুবিধা, সেটি গ্রহণ করিবেন না, তাহা কিরূপে হয়? সেইটিকেই আমি বলি, শাস্ত্রে সুবিধাবাদ। পণ্ডিত মহাশয়, আপনি বলেন, পরের বাগান হইতে দেবসেবার জন্য ফুল আহরণ দূষণীয় ও দণ্ডনীয় হওয়া উচিত নয়, কিন্তু সেই মনীষী মনুর অপর আইনটি প্রবর্ত্তিত থাকিলে আপনার স্থান কোথায়? আপনি নিজ বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন, কোন সুন্দরী যুবতীর দিকে কখনও কুভাবে লক্ষ্য করেন নাই? আত্মপ্রবঞ্চনা না করিয়া আপনি যদি বলিতে পারেন, হাঁ, তবে আপনি শুধু দেবতা নন, আপনি দেবতার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই প্রসঙ্গে ভবিষ্যপুরাণ বলিতেছেন—

মানস-পাপ ত্রিবিধ।
পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসম্॥

(পরদ্রব্যেতে অভিলাষ ও মনের দ্বারা পরের অনিষ্ট-চিন্তা ও অন্যায় কার্য্যে বাসনা, এই ত্রিবিধ কর্ম্মকে মানস-পাপ বলে) আপনি কি বলিতে চান, এই ত্রিবিধ পাপের একটি পাপও জীবনে করেন নাই? যদি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন, তবে আপনি মানুষ নন, আপনি দেবতা।"

আমার এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি ঢোক গিলিতে লাগিলেন। সেই সময়ে আমার মুহুরি আসিয়া খবর দিল, একটি কেসের ডাক হইয়াছে। আমি পণ্ডিত মহাশয়কে রেহাই দিলাম, নিজেও রেহাই পাইলাম।

শ্রীতারকনাথ সাধু।

ধরার মায়া

আমার তরে আছিস্ তোরা, বাঁচিস্ তোরা আমার তরে—
বর্ণ, সুবাস, মধুর-গীতি, প্রণয়, প্রীতি ধরার 'পরে;
ও নীল গগন, তোমার বুকে আছে আমার আঁধার জমা,
আমার সুখের বিশ্ব,—চাঁদ ওই বক্ষে তোমার মনোরমা।
সুবাস, কুবাস তোদের আবাস, আছে আছে আমার প্রাণে,
আমার সুখে, আমার বুকে, আমার মনে, আমার ঘ্রাণে।
আমার ধ্বনি ধার করেছে—পাপিয়া, পিক, জানি জানি,
শোনায় ভ্রমর ফুলের কাণে আমার প্রেমের মঞ্জুবাণী,
আমি আছি তাই তো আছে, তাই তো বাঁচি ছুটছে ধরা,
তাই জীবনের পায়ের তলে লুণ্ঠিতশির মৃত্যু, জরা;
পাঞ্জা ক'সি ফিরছে হেথা, আমার ব্যথা, আমার হাসি,
ওঙ্কারিছে গভীর ধ্বনি,—উর্দ্ধে নীচে আমার বাঁশী!
সবার আমি আমার সবাই, বেদন দিলেই দুখ পাবি,
তোদের দুখে দুঃখী আমি, তোদের সুখেই সুখ ভাবি;
অলীক তোরা তাহাও জানি,—মায়ার খেলা, কল্পনা।
তোদের হাসি—কান্না তোদের, ছায়ার মেলা—জল্পনা।
ধরার প্রীতি, ভালবাসা, স্নেহ, দয়া, বিত্ত, যশ,
বিষাদ, বেদন, জ্বালার মালা—মিথ্যা মায়ায় চিত্ত বশ!
হায়! সনাতন সত্য শুধু মৃত্যু-বধূর আলিঙ্গন,
অশেষ আশার উষ্ণ-মুখে শীতল-চুমার আলিম্পন!
প্রাণ-সবিতার তীব্র আলোক ধীরে ধীরে হচ্ছে হ্রাস,
গ্রীষ্ম-ধরা পরছে ক্রমে বাদল মেঘের আঁধার বাস।
জানি জানি হৃদ্মে আমার আস্‌বে নেমে মরণ-শীত,
আমার তরে গাইবে হাওয়া করুণ মধুর বরণ-গীত,
হাসিরাশি ফেল্‌বে নাশি' সে দিন মরণ সর্ব্বনাশী,
চূর্ণ করি ফেল্‌বে দূরে আমার সকল গর্ব্বরাশি।
তখন তোরা আমার কাছে হবি রে ভাই, অর্থহীন,
ধরার কাছে—স্বর্গ, নরক কল্পনাতে যেমন লীন।
আমি আছি, ছুটিস্ নাচি, বিশ্ব বাঁচি' আছিস্ তাই,
আমার তিরোধানের সাথে ধরা লো তোর চিহ্ন নাই।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (এম, এ)।

সুন্দরবনে শিকার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)
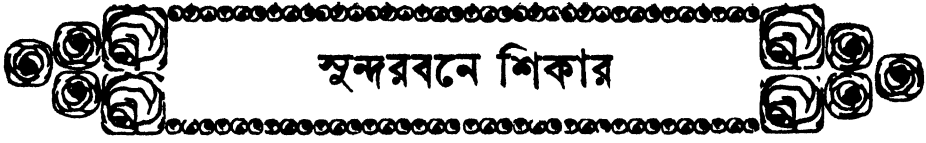
কুম্ভীরের আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইয়াও অনেকে পরে মারা যায়। কুম্ভীরের দাঁতে বিষ আছে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, নদীতে কোনও ব্যক্তিকে কুম্ভীরে আক্রমণ করিলে কোনও উপায়ে যদি সে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়, তথাপি উহার দুই তিন দিবস অন্তে সে ব্যক্তি বিকারগ্রস্ত হইয়া মারা গিয়াছে। তাহাকে চলিত কথায় "মো" চাপা বলে। "মো" চাপা বোধ হয় মোহপ্রাপ্তির অপভ্রংশ। এইরূপ "মো" চাপা অবস্থায় কোনও ব্যক্তির জীবন রক্ষা হইয়াছে, এ সংবাদ কাহারও জানা নাই। কুম্ভীর দ্বারা আক্রান্ত হইবার পর যে লোক দৈবক্রমে উদ্ধার পায়, তাহার দেহের আক্রান্ত ক্ষতস্থানের উপর একটি কালো সরের মত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই বুঝিতে হইবে, ইহার মোহ চাপিবার আর বিশেষ বিলম্ব নাই। কিন্তু সেই ক্ষতস্থান যদি ক্রমে রক্তবর্ণ ধারণ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহার জীবনের আশা আছে। যাহার ক্ষতস্থানে কালো সরবৎ পদার্থ দেখা যায়, তাহার মনে কুম্ভীরাতঙ্ক উপস্থিত হয়। কুকুরদষ্ট জলাতঙ্করোগগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় অন্য ব্যক্তিকে দংশন করিতে উদ্যত হয় এবং উন্মত্তের ন্যায় সর্ব্বত্রই কুম্ভীরের ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে থাকে। এইরূপে কিছুক্ষণ যাপনের পর সে ব্যক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহার পর তাহার মৃত্যু হয়। তবে এইরূপ অবস্থায় চব্বিশ ঘণ্টার বেশী প্রায় কেহই জীবিত থাকে না।

নদীতে যত প্রকার কুম্ভীর আছে, সবই যে মনুষ্যভোজী, তাহা নহে। কয়েক জাতীয় কুম্ভীর আছে, তাহারা মানুষকে ধরে না, কেবল মৎস্য প্রভৃতি ধরিয়া খায়। আর কতকগুলি আছে অত্যন্ত হিংস্র। সুন্দরবন অঞ্চলে দুই প্রকার বর্ণের কুম্ভীর দেখা যায়;—কালো এবং হরিদ্রাভ। উক্ত অঞ্চলের লোক শেষোক্তকে "হাঁসা" বলে। কৃষ্ণবর্ণের কুম্ভীরের মধ্যে এক শ্রেণীর নক্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা মোটেই হিংস্র নহে। ইহারা মানুষকে আক্রমণ করে না। কৃষ্ণবর্ণের কুম্ভীর জাতির মধ্যে অপর শ্রেণী হিংস্র হইলেও ওৎ পাতিয়া অথবা স্নানের ঘাটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মানুষ ধরিবার তেমন চেষ্টা করে না। কিন্তু উল্লিখিত "হাঁসা" কুম্ভীর অতি ভয়ানক। ইহারা যখন নদীতে ভাসিয়া বেড়ায়, তখনই অতি ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করে। মানুষ, গরু ধরিবার জন্য ইহারা নানাপ্রকার বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। নৌকার উপর হইতে নিদ্রিত ব্যক্তিকে ইহারাই উঠাইয়া লয়। ডাঙ্গায় উঠিয়া গরু কিম্বা হরিণ শিকার এই জাতীয় কুম্ভীরের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ইহাদের এমন সাহস যে, নদী হইতে উঠিয়া হাজার কিংবা ১২ শত হস্ত দূরবর্ত্তী ডাঙ্গায় অবস্থিত গরু ধরিয়া জলে টানিয়া আনে। সুন্দরবনের মধ্যে ঝিলেবাদ নামক স্থানে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার রাত্রিকালে ঐরূপ একটি কুম্ভীর জল হইতে উঠিয়া বহুদূরবর্ত্তী স্থানে [illegible] করিয়াছিল। সে যখন হতভাগ্য জীবটিকে টানিয়া আনিতেছিল, তখন অন্যান্য গরু ভয়ে চীৎকার আরম্ভ করে এবং ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে। সুন্দরবন অঞ্চলে সাধারণতঃ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-মাসে লোক মহিষ বাঁধিয়া রাখে না এবং তাহারা মাঠে ঘাটে দল বাঁধিয়া চরিয়া বেড়ায় এবং রাত্রিতে দল বাঁধিয়া এক স্থানে শয়ন করিয়া থাকে। আলোচ্য গরুর দলও নদীতীর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গোঠ বাঁধিয়া শয়ন করিয়াছিল। সেই সময় কুম্ভীরটি নদী হইতে উঠিয়া তাহার মধ্য হইতে একটি বৃহদাকার বলদকে আক্রমণ করে। যেখানে গরুর দল বিশ্রাম করিতেছিল, তাহার অদূরে মনুষ্যের আবাস ছিল। ধাবমান গরুর দলের খুরের শব্দ ও আর্ত্তনাদ শুনিয়া কুটীরে নিদ্রিত মানুষ জাগিয়া উঠে। তাহারা প্রথমতঃ মনে করে যে, হয় ত জঙ্গল হইতে ব্যাঘ্র আসিয়া গরু প্রভৃতিকে আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু কুটীর হইতে বাহির হইয়া তাহারা ব্যাঘ্র দেখিতে পাইল না। অথচ গরু সকল দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। তখন তাহারা তাহার কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইল এবং চারিদিক্ হইতে লোক-ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। সকলে আলো জ্বালিয়া দেখে যে, কুম্ভীর গরু ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তখন সকলে সেই কুম্ভীরকে মারিয়া ফেলিল। জলের ন্যায় ডাঙ্গার উপর কুম্ভীর তেমন বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না।

কুম্ভীরের গাত্রে যদি বিন্দুমাত্র ক্ষত উৎপাদন করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই কুম্ভীর আর বেশী দিন জীবিত থাকে না। তাহার সেই ক্ষতে লবণাক্ত জল লাগিয়া ক্ষত ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং তাহাতে পোকা জন্মে। ক্রমে ক্রমে দেখা যায় যে, সেই কুম্ভীর প্রথমে অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে, একবার জলে ডুবে, আবার ডাঙ্গায় উঠে, শেষে দুই এক দিন নিস্তেজ অবস্থায় থাকিয়া মরিয়া যায়। লেখক নিজে একবার একটি কুম্ভীরকে গুলী করেন। গুলী তাহার পেটে লাগে। আহত কুম্ভীরকে তখন জল হইতে উঠাইতে পারা যায় নাই। সে ভাসিয়া চলিয়া যায়। তাহার পর প্রায় ১৫ দিন পরে সেখান হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। কুম্ভীরটি তখন একটা খালের ভিতর ঐরূপ অস্থির অবস্থায় ছটফট করিতেছিল। তাহার পরদিবস যাইয়া দেখা গেল, সে মরিয়া রহিয়াছে। পরীক্ষায় বুঝা গেল, তাহার উদরের যে অংশে গুলী লাগিয়াছিল, তথায় ক্ষত হইয়াছে এবং তাহাতে পোকা জন্মিয়াছে।

সুন্দরবন প্রদেশের লোক আর এক প্রকার [illegible] কুম্ভীর শিকার করিয়া থাকে। এ প্রণালী কুম্ভীর শিকার করিবার পক্ষে অতি সহজ। অনেক সময় কুম্ভীর নদী হইতে বাঁধা খালের ভিতর প্রবেশ করিয়া মৎস্য খায়। যাহারা সেই খাল মৎস্য ধরিবার জন্য জমা লয়, তাহাতে তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হয় এবং সেই খালে কোন গৃহপালিত পশু জলপান করিতে আসিলে তাহাকেও ধরিয়া মারিয়া ফেলে। [illegible]লেখা

মৎস্য ধরিবার জন্য অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ জলে নামিলে তাহাদের জীবনও বিপন্ন হয়। সুতরাং খালের ভিতর কুম্ভীর আসিলে মারিয়া না ফেলিলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। কুম্ভীরও অত্যন্ত চতুর জীব। চোরের ন্যায় সে রাত্রিকালে খালের ভিতর প্রবেশ করে এবং রাত্রি থাকিতেই প্রস্থান করে। সেই জন্য ইহাকে বন্দুকের দ্বারা শিকার করিবার কোনও সুবিধা হয় না। রাত্রির অন্ধকারে ইহার ভ্রমণস্থান খুঁজিয়া পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

বাঁধা খাল কিরূপ, তাহা একটু বুঝিয়া রাখা আবশ্যক। সুন্দরবনের ভিতর যে স্থান পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ এখন চাষ-আবাদ হয়, তথায় অনেক খাল আছে। সেই সকল খাল কোন একটি নদী হইতে নির্গত হইয়া অন্য নদীতে পড়িয়াছে। এক একটি খাল তিন চারি ক্রোশ অবধি দীর্ঘ। কিন্তু অধুনা চাষের সুবিধার জন্য তাহার দুই মুখ একবারে বাঁধিয়া ফেলা হইয়াছে। সুতরাং জোয়ারের সময় লোণা জল উঠিয়া চাষের কোন ক্ষতি করিতে পারে না, কিন্তু সেই খাল সকল বর্ষার পরে অত্যন্ত মৎস্যপূর্ণ হয়। তখন স্থানীয় জমীদারগণ সেই খালের মৎস্য জেলেদের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলেন। জেলেরা সেই খালের নিকটে আসিয়া অস্থায়ী ঘর বাঁধিয়া বাসা করিয়া থাকে এবং তাহারা মৎস্য ধরিয়া নানা স্থানে চালান দেয়। কিন্তু ঐ খালের সম্মুখবর্ত্তী নদীর কুম্ভীর জানে যে, ঐ খালের ভিতর যথেষ্ট মৎস্য বিদ্যমান। সংস্কারবশে সে ইহাও জানে, দিবাভাগে ঐ খালে প্রবেশ করিলে মৎস্যভোজনের সুবিধা হইবে না; তীরবর্ত্তী লোক সকল অত্যন্ত সতর্ক অবস্থায় অবস্থান করে। তাই কুম্ভীর রাত্রিকালে প্রায় চোরের ন্যায় আসিয়া মৎস্য চুরি করিয়া খায়। এরূপ ঘটনা সুন্দরবন অঞ্চলে প্রায় ঘটে।

মৎস্যচোর কুম্ভীরকে মারিয়া ফেলিতে হইলে আট দশখানি খেজুর-গাছ-কাটা কর্ত্তরিকা প্রস্তুত করিয়া ধীবরদল তদ্দ্বারা কুম্ভীরকে আক্রমণ করে। চোর-কুম্ভীর সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তরিকার আঘাতে প্রাণত্যাগ করে। বাঁধা খালের বহির্ভাগস্থিত নদীতে যখন জোয়ার আসে, সেই সময় মৎস্যচোর কুম্ভীর ঐ খালের ভিতর প্রবেশ করে। বাহির নদীতে যখন ভাটা হয়, তখন তাহারা পলায়ন করে। সেই স্থানের লোক সকল প্রথমে লক্ষ্য করে, কুম্ভীর কোথা দিয়া উঠিয়াছে এবং কোথা দিয়া পলায়ন করিয়াছে। ব্যাঘ্র, হরিণ প্রভৃতি স্থলচর জন্তুগণের স্বভাব, তাহারা যে পথ দিয়া যায়, আবার সেই পথ দিয়াই ফিরিয়া আসে; কদাচ তাহার অন্যথা করিবে না। কিন্তু জলচর হিংস্র জীব কুম্ভীর তাহা কখনও করিবে না। ইহারা এক পথ দিয়া আসিবে এবং অন্য পথ দিয়া ফিরিয়া যাইবে। তবে তাহারা সেই একই পথ নিত্য ব্যবহার করিবে, কদাচ অন্য পথে গমনাগমন করিবে না। সম্ভবতঃ উঠিবার ও নামিবার সুবিধা দেখিয়াই তাহারা আগম-নির্গমের পথ নির্দ্দেশ করিয়া লইয়া থাকে। কুম্ভীর যখন বাঁধা খালে নামিয়া মাছ খায়, তীরের লোক তাহা বুঝিতে পারে। কুম্ভীর খালে প্রবেশ করিলেই মৎস্য সকল লাফাইতে থাকে; তাহাতে শব্দ হয়। তখন জেলের দল কুম্ভীরের আগমন হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বধ করিবার চেষ্টা করে। কর্দ্দমের উপর কুম্ভীরের আগম-নির্গমের যে রেখাপাত হয়, তাহা দেখিয়া লোকরা বুঝিতে পারে, কোন্ পথে কুম্ভীর পলায়ন করিবে। নির্গমনের পথে তীক্ষ্ণধার কর্ত্তরিকাগুলি তাহারা সুকৌশলে প্রোথিত করিয়া রাখে। প্রথম শ্রেণীতে এক হস্ত-পরিমিত দূরে চারিখানি কর্ত্তরিকা সন্নিবিষ্ট করিয়া, তাহার পর তথা হইতে এক হস্ত সম্মুখে প্রথম লাইনের ফাঁকে ফাঁকে আবার তিনখানি দা পুতিয়া দেয়। তাহার পর ঐরূপে সম্মুখে অবশিষ্ট কর্ত্তরিকা পুতিয়া রাখে। আর ইহাতে কিছুই করিবার আবশ্যক হয় না। কুম্ভীর রাত্রিকালে নদী হইতে উঠিয়া যখন খালে নামে এবং মৎস্যভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া ফিরিয়া যায়, তখন উপর হইতে ঢালু স্থান দিয়া জোরে নীচের দিকে পড়িবার সময় ঐ কর্ত্তরিকার দ্বারা তাহার উদরদেশ দুই ভাগ হইয়া যায়। সময় সময় এমনও হয় যে, একবারে তিন স্থান চিরিয়া গিয়াছে। কুম্ভীরের উদরের তলদেশস্থ চর্ম্ম অত্যন্ত নরম। ইহার পৃষ্ঠভাগের চামড়া এরূপ কঠিন যে, বন্দুকের গুলী পর্য্যন্ত প্রবেশ করে না।

রাত্রিতে মৎস্যচোর কুম্ভীরকে মারিবার ইহা অপেক্ষা আর সহজ উপায় কিছুই নাই। লেখকের কোন আত্মীয় সুন্দরবনের ভিতর কোন জমীদারের কাছারীতে চাকরী করিবার সময় এইরূপে প্রত্যেক বৎসর দুইটি তিনটি করিয়া কুম্ভীর বিনাশ করিয়া জমীদারীর অন্তর্গত খালের মৎস্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসন্ন্যাসিচরণ চন্দ্র।

কামন্দকীয় নীতিসার *
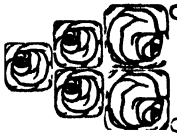
আমাদের মতে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য চার,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এই চারেরই শাস্ত্র আছে। এক এক শাস্ত্রে রাশি রাশি বই আছে। এক এক শাস্ত্রের বইয়েই এক একটা লাইব্রেরী বোঝাই হয়ে যায়। তার মধ্যে অর্থশাস্ত্রের বই কিছু অল্প, কারণ, অর্থ উপার্জ্জনের উপায় কেহ কাহাকেও বলিয়া দিতে রাজী নহেন। সেই জন্য শাস্ত্রে বলে, অর্থশাস্ত্র শিখিতে হইলে অধ্যক্ষদিগের নিকট অনেক দিন নবিশী করিতে হয়। তাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বদাই থাকিতে হয়, তাঁহাদের মন জোগাইতে হয় এবং তাঁহাদিগের কাযকর্ম্ম নিপুণ হইয়া দেখিতে হয়, তবে অর্থশাস্ত্র শেখা যায়। তাহা হইলেও অনেক বড় বড় পণ্ডিত, অনেক মনীষী দু'দশখানা বই লিখিয়া গিয়াছেন। অর্থশাস্ত্র রাজারও যেমন দরকার হয়—চাষারও তেমনি দরকার হয়, পণ্ডিতেরও যেমন দরকার হয়—অপণ্ডিতেরও তেমনি দরকার হয়। বলিতে গেলে অর্থশাস্ত্র মনুষ্যমাত্রেরই শাস্ত্র।

অর্থশাস্ত্রের বই

বহুকাল হইতেই অর্থশাস্ত্রের দুচারখানি বই লেখা হইতেছে। কোন কোন মুনির মতে শিব সর্ব্বপ্রথম অর্থশাস্ত্রের বই লেখেন। সেখানে শিবের নাম বিশালাক্ষ। তার পর ইন্দ্র লেখেন, সেখানে ইন্দ্রের নাম বাহুদণ্ডিপুত্র। শুক্রাচার্য্য যে বই লেখেন, তাহার নাম ঔশন। দেবগুরু বই লেখেন, তাহার নাম বৃহস্পতি। মানবরা বই লেখেন, তাঁহাদের এক সম্প্রদায় ছিল। খৃঃ-পূঃ চতুর্থ শতকে চাণক্য একখানি অর্থশাস্ত্রের বই লেখেন, সেখানে তাহার নাম কৌটিল্য। এইরূপ আরও অনেকে বই লেখেন। তাঁহাদের সবাকার নাম করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। আমাদের যে সকল প্রাচীন স্মৃতির বই আছে, সেগুলিতে ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা যেমন আছে, অর্থশাস্ত্রের কথা তেমনি আছে। ক্রমে খৃঃ একাদশ শতক হইতে যখন স্মৃতি-নিবন্ধ সকল লিখিতে আরম্ভ করা হয়, তখনও তাহাতে অর্থশাস্ত্রের কথা খুবই লেখা থাকিত। অর্থশাস্ত্রের যে ভাগ রাজার দরকার, তাহার নাম রাজনীতি। প্রথম প্রথম সকল নিবন্ধেই অন্ততঃ রাজনীতির উপরও এক একটা ভাগ থাকিত। কিন্তু যখন মুসলমানরা আমাদের দেশগুলি দখল করিয়া আমাদিগকে বন, পাহাড়, জলা, মরুভূমিতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল, তখন সুসভ্য দেশের স্মৃতি-নিবন্ধে অর্থশাস্ত্রের কথাও রহিল না। রাজনীতির কথাও লোপ হইল। আমাদের স্মৃতিনিবন্ধে, রঘুনন্দনের ২৮তত্ত্বের মধ্যে রাজনীতি-তত্ত্বও নাই, অর্থশাস্ত্রতত্ত্বও নাই। কিন্তু যে সকল যায়গায় হিন্দুরা স্বাধীন ছিল, সেখানকার স্মৃতিনিবন্ধে রাজনীতির কথা ২০০, ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত ছিল। মিত্র মিশ্র বুন্দেলখণ্ডে বসিয়া আকবরের সময় যখন নিবন্ধ লেখেন, তখন তাহাতে রাজনীতি ছিল। ঐ অঞ্চলেই বসিয়া যখন নীলকণ্ঠ ভগবন্ত ভাস্কর নামে নিবন্ধ লেখেন, তখনও তাতে রাজনীতি 'ময়ুখ' বলিয়া একটা অংশ ছিল। আরংজীবের সময় যখন অনন্তদেব কুমায়ুনের রাজ-রাজ-বাহাদুর চন্দ্রের আদেশমত একখানি নিবন্ধ লেখেন, তখনও তাহাতে 'রাজনীতি' কৌস্তুভ বলিয়া একটা অংশ ছিল। ক্রমে রাজনীতিতে আমাদের কোন হাত নাই, ভারতবর্ষ হইতে রাজনীতি উঠিয়া গিয়াছে, আর রাজনীতি বইও উঠিয়া গিয়াছে; পণ্ডিতরাও রাজনীতির চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়াছেন ও আমরাও রাজনীতি ভুলিয়া গিয়াছি।

য়ুরোপে অর্থশাস্ত্র

য়ুরোপে অর্থশাস্ত্রের চর্চ্চা বেশী দিন আরম্ভ হয় নাই। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে আদম স্মিথ "ওয়েল্থ অব নেসন্স্" নামে অর্থশাস্ত্রের বই বাহির করেন। বইখানিতে ইউরোপের অর্থশাস্ত্রঘটিত সকল কথাই আছে। রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া চাষা পর্য্যন্ত সকলেরই অর্থাগমের কথা ইহাতে আছে। ঋষিরা যেমন বলিতেন, অধ্যক্ষের কাছে বহুদিন না থাকিলে অর্থশাস্ত্রের গূঢ় কথা বুঝা যায় না, আদাম স্মিথও সেইরূপ বলিয়া গিয়াছেন, যে কোন ব্যবসায়ী, যে ব্যবসা করিয়া সফল হইয়াছে, এমন লোকের নিকট অন্ততঃ ৭ বৎসর "এপ্রেন্টিস্" বা "ব্যাচিলার" না থাকিলে সে লোক সে ব্যবসায়ের কিছু বুঝিতে পারে না। ৭ বৎসরের পর সে "মাষ্টার" হয় এবং তখন ব্যবসা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে শিখে। এই ১ শত ৫০ বৎসরের মধ্যে আদাম স্মিথের অর্থশাস্ত্র ভাঙ্গিয়া কত ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র হইয়াছে। তাহার মধ্যে "পলিটিক্স্" বা রাজনীতি একটি প্রধান।

কামন্দকের নীতিসার

আমরা রাজনীতি ও অর্থশাস্ত্র দুই-ই ভুলিয়া গিয়াছিলাম, জানিতাম না যে, আমাদের দেশে এ সকল শাস্ত্র ছিল। ৫০ বৎসর আগে স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় কামন্দকের নীতিশাস্ত্র নামে একখানি বই খুঁজিয়া বাহির করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কামন্দক কে? কবে বই লিখিয়াছিলেন? বই লেখার উদ্দেশ্য কি, তা কিছুই জানিতাম না। বইখানি অতি কঠিন পারিভাষিক কথায় পরিপূর্ণ। ছাপাও যে শুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা নহে। অনেক সময়ে অর্থ সংলগ্ন হইত না। যে বিষয় লইয়া বই, তাহার আমরা কিছুই জানিতাম না। বইয়ে যুদ্ধের কথা আছে, ব্যূহরচনার কথা আছে, নানা জাতীয় সৈন্য সংগ্রহের কথা আছে, পাহাড়ে কেমন করিয়া লড়াই করিতে হয়, মরুভূমিতে কেমন করিয়া লড়াই করিতে হয়, নদীর ধারে কেমন করিয়া লড়াই করিতে হয়, জঙ্গলে কেমন করিয়া লড়াই করিতে হয়, এ সব কথা আছে। আর এ সব বিষয়ে বাঙ্গালী ত "মা"। সুতরাং বইখানি ছাপাই হইয়াছিল, বড় বেশী কেহ পড়েও নাই, ভাল করিয়া বুঝিতেও পারে নাই।

* শ্রীগণপতি সরকার প্রণীত—মূল্য ১৲ টাকা, বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরে প্রাপ্তব্য।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র

ইংরাজী ২০ শতকের প্রথমে মহীশূর হইতে যখন শ্যাম শাস্ত্রী মহাশয় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বাহির করিলেন, তখন সকলেই চমৎকৃত হইয়া গেল। কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন; নন্দবংশ ধ্বংস করেন, এ কথা তিনি স্বয়ং তাঁহার বইয়ে স্বীকার করেন। সুতরাং তিনি মসীদানের সেকেন্দার সাহের তুল্যকালীন ছিলেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের শিক্ষার জন্যই বই লিখিয়াছিলেন। তাঁহার বই কতক সূত্ররূপে, কতক ভাষ্যরূপে লেখা। সুতরাং লেখার প্রণালীটা খুব প্রাচীন। বইখানা প্রায়ই গদ্যে লেখা, মাঝে মাঝে পদ্যও আছে। বইখানা পুরাই অর্থশাস্ত্র ("ওয়েল্‌থ অব নেসন")। ইহাতে রাজনীতি ও যুদ্ধ ত আছেই, তাহার উপরে চাষ কেমন করিয়া করিতে হয়, গরু কেমন করিয়া পালন করিতে হয়, হাতী কেমন করিয়া ধরিতে হয়, কেমন করিয়া পালন করিতে হয়, কেমন করিয়া মদ চোলাই করিতে হয়, খনি হইতে কেমন করিয়া গন্ধক তুলিতে হয়, সোনা তুলিতে হয়, তামা তুলিতে হয়, কেমন করিয়া উপরের মাটী দেখিয়া ভিতরে খনি আছে জানিতে পারা যায়, কেমন করিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে হয়, মন্ত্রী বাছিয়া লইতে হয়, সেনাপতি বাছিয়া লইতে হয়, পুরোহিত বাছিয়া লইতে হয়, কেমন করিয়া রাজপুত্রকে রক্ষা করিতে হয়, কেমন করিয়া অন্তঃপুর রক্ষা করিতে হয়, কেমন করিয়া "মিউনিসিপ্যালিটী" করিতে হয়, কেমন করিয়া নৌকা তৈয়ারী করিতে হয়, কোন্ নৌকা সমুদ্রে যায় না, কোন্ নৌকায় কি মাল আসে, কোন্ দেশে সূতার কাপড় ভাল হয়, কোন্ দেশে রেশমের কাপড় ভাল হয়, কোন্ দেশে পশমের কাপড় ভাল হয়, কোন্ দেশে ছালটির কাপড় ভাল হয়, এ সব কথাই উহাতে আছে। ২ হাজার ৪ শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এমন বই ছিল দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়া গেলেন। অনেক সাহেবই বলিলেন, উহা ২ হাজার ৪ শত বৎসরেরও পূর্ব্বের হইবে। অনেকে আবার বলিলেন, উহা অত পুরান হইবে না। কেহ বলিলেন, ১ হাজার ৫ শত, কেহ ১ হাজার ৭ শত, কেহ ২ শত বৎসর পূর্ব্বের। কোন রকমে উহাকে অত পুরান হইতে দিবেন না। কিন্তু এ সকল মত টিকেও নাই, টিকিবেও না।

ঐ পুস্তকের প্রচার

বইখানা লইয়া এই ২৫ বৎসরের মধ্যে কত যে ফাঁড়া-ছেঁড়া হইল, তাহা বলা যায় না। শ্যাম শাস্ত্রী মহাশয় উহার দুইবার সংস্কার করিলেন, একবার উহা ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিলেন, একবার উহার পূর্ণ শব্দসূচি করিলেন। গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় উহার এক সংস্কৃত টীকা করিয়া দিলেন। জলি সাহেব উহার আর এক সংস্করণ বাহির করিয়া দিলেন, আর কত লোক যে উহার উপর রিসার্চ্চ করিয়া ডক্টর উপাধি নিলেন, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। বইখানা কিন্তু এখনও ভাল করিয়া বুঝা যায় না। কারণ, সেকালের ভাষাও ভাল বুঝা যায় না, সেকালের মনের ভাবও বুঝা যায় না, আর বইখানাও যে নির্ভুল সংস্করণ হইয়াছে, তাহাও বলিতে পারা যায় না।

যা হোক—বইখানাতে একটা বিশেষ উপকার করিয়াছে, কামন্দকের নীতিসার যে এত কাল ছাপা হইয়াছিল, লোকে পড়ে নাই, তাহার উপর লোকের নজর পড়িয়াছে। একটা উজ্জ্বল হীরার আলোকে যেমন কাছের আর সব হীরা জ্বলিয়া উঠে, তেমনি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আলোয় কামন্দকের নীতিসার জ্বলিয়া উঠিয়াছে। উহার উপর অনেকের নজর পড়িয়াছে, অনেকে উহা পড়িতেছেন। ইউনিভার্সিটীতেও উহা কোর্স হইয়াছে। আর গণপতি সরকার মহাশয় এই কামন্দকের নীতিসার বাঙ্গালায় তর্জ্জমা করিয়া, পূর্ব্বপুরুষরা নীতিশাস্ত্রের প্রতি যে অবহেলা দেখাইয়াছেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতলব খুব ভাল। নীতিশাস্ত্র যাহাতে বাঙ্গালীরা পড়িতে শেখে, তাহার জন্য তিনি খুব পরিশ্রম করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত নীতিশাস্ত্রের যতগুলি সংস্কার হইয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, যতগুলি টীকা-টিপ্পনী হইয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং দুই জন ভাল ভাল পণ্ডিতের সঙ্গে বসিয়া উহার অর্থ করিয়াছেন। যেখানে বুঝা না যায়, সেখানে অন্যান্য বইএর সাহায্যে যতদূর সম্ভব বোঝা যায়, তাহা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষাটি অতি চমৎকার—তর্জ্জমার ভাষা যেমন হওয়া উচিত, তেমনি হইয়াছে। যদিও তিনি অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তবুও তিনি দুরূহ ও পারিভাষিক শব্দ যতদূর সম্ভব পরিহার করিয়াছেন। যুদ্ধ-কৌশল এবং ব্যূহরচনার বিষয় যদিও ইনি অন্যান্য বাঙ্গালীদের ন্যায় কিছুই জানেন না, তবুও অনেক খাটিয়া খুটিয়া তাহার ছক তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন। বইখানা বুঝিবার পক্ষে লোকের অনেক উপকার হইবে।

কামন্দকের নীতিসার কি?

কামন্দকের নীতিসারখানি কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত সারমাত্র। কৌটিল্যের পরিমাণ ৬ হাজার শ্লোক। ইহার পরিমাণ ২ হাজার হইবে কি না সন্দেহ। অথচ অর্থশাস্ত্রে রাজার যা কিছু জানিবার, জিনিষ আছে, সবই ইহাতে আছে। অন্য লোকের যাহা জানিবার, তাহা বড় ইহাতে নাই। অর্থশাস্ত্র হইল "ইকনমিক্‌স্" বা "ওয়েল্‌থ্ অব নেসন্‌স্"। আর নীতিসার হইল "পলিটিকস্" বা রাজনীতি। ইহাতে ধর্ম্মনীতি নাই, সংসারের নীতি নাই, আছে শুধু রাজনীতি।

কামন্দক কে?

আমার মনে হয়, কামন্দক কৌটিল্যের সাক্ষাৎ ছাত্র। ছাত্রের ছাত্র বা আর কিছু নহে। ইনিও বলিয়াছেন, ইন্দ্র যেমন বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, চাণক্যও তেমনি অভিচার-বজ্রের দ্বারা নন্দবংশকে ধ্বংস করিয়াছেন। তিনি চাণক্যকে সুদৃশ অর্থাৎ সুপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কি নিজের চক্ষে না দেখিয়া কাহাকেও সুপুরুষ বা কুপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিতে পারে? ইনি চাণক্যকে আপনার গুরু বলিয়াছেন। সুতরাং ইহাকে আমি চাণক্যের সাক্ষাৎ শিষ্য মনে করি। কোন টীকাকার কিন্তু সুদৃশ শব্দের সুপুরুষ অর্থ করেন নাই। দর্শন-শাস্ত্রে পণ্ডিত, এইরূপ অর্থ করিয়াছেন; অর্থটা কিন্তু টেনেবোনা

হইয়াছে। বুঝিবার একটু কারণও আছে। লোকের সংস্কার, চাণক্য অত্যন্ত কদাকার ছিলেন। তাই নন্দরাজা তাঁহাকে শ্রাদ্ধের আসন হইতে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এটা গল্পমাত্র। ব্রাহ্মণের ছেলে, বিশেষ সেকালে সেইরূপ কুৎসিত হইতেই পারে না।

অর্থশাস্ত্র ও নীতিসার

নীতিসারে বিদ্যাবিভাগ বলিয়া একটি সর্গ আছে। সেটি অর্থশাস্ত্রের বিদ্যাসমুদ্দেশ নামক অধ্যায়ের সঙ্গে ঠিক মিলে। ইহার অনেক সর্গ পড়িতে পড়িতে অর্থশাস্ত্রের অধ্যায়গুলির কথা মনে পড়ে। কিন্তু রাজার যাহাতে দরকার নাই, অর্থশাস্ত্রের এমন অধ্যায়গুলি ইহাতে দেখিতে পাই না। অর্থশাস্ত্রে ধর্ম্মস্থীয় নামে একটি অধিকরণ আছে। উহাতে দেওয়ানি মোকর্দ্দমার কথা আছে। যদিও দেওয়ানি মোকর্দ্দমায় রাজার হাত আছে, কিন্তু উহা ব্রাহ্মণদেরই কর্ত্তব্য। সুতরাং নীতিসারে উহা নাই। অর্থশাস্ত্রে কণ্টকশোধন নামক অধিকরণে ফৌজদারী মোকর্দ্দমার কথা আছে। সঙ্গে সঙ্গে মিউনিসিপ্যাল আইনেরও কথা আছে। কিন্তু নীতিসারের কণ্টকশোধন আর এক রকম। উহাতে শুদ্ধ রাজদ্রোহীদিগকে কিরূপে দমন করিতে হয়, তাহারই কথা আছে এবং সে কথাও খুব সংক্ষেপে। অর্থশাস্ত্রে উপনিষদ্ বলিয়া একটি অধিকরণ আছে, তাহাতে অভিচার করিয়া কেমন করিয়া শত্রুনাশ করিতে হয়, তাহার কথা আছে ও মন্ত্র আছে। সেটা ব্রাহ্মণের কায, নীতিসারে নাই। অর্থশাস্ত্রে তন্ত্রযুক্তি নামে একটা অধিকরণ আছে। সেটাকে শাস্ত্রের পরিভাষা বলিলেও চলে। নীতিসারে তাহা নাই। অর্থশাস্ত্রে দ্বিতীয় অধিকরণে নানা বিভাগের রাজকর্ম্মচারীদের ও তাহাদের কর্ত্তব্যের কথা আছে। যেমন গরুর অধ্যক্ষ, নৌকার অধ্যক্ষ, বেশ্যাদের অধ্যক্ষ, রাজাদের অধ্যক্ষ ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকল ছোট ছোট কথা নীতিসারে নাই। কিন্তু তাহা ছাড়া ইন্দ্রিয়জয়, বিদ্যা-বৃদ্ধসংযোগ, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা, বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর নিয়োগ, তাহাদের বৃত্তির ব্যবস্থা, রাজপুত্রের রক্ষা, নিজের আহারাদির ব্যবস্থা (যাহাতে কেহ বিষ দ্বারা না মারিয়া ফেলে), নিজের রাজত্ব, পরের রাজত্ব, সাম্রাজ্য, সন্ধিবিগ্রহ ইত্যাদি দুইয়ে সমানভাবে আছে।

নীতিসারের রচনা-প্রণালী

কামন্দকীয় নীতিসারের রচনা-প্রণালী অতি সুন্দর। বোধ হয়, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের শেষে অনেক পরিষ্কার। কামন্দক কিন্তু তাহা বলেন না। কামন্দক গুরুর গ্রন্থের বড়ই অনুরাগী। তিনি বলেন, উহা "সকল বিদ্যায় পারদর্শী মহামতি বিষ্ণুশর্ম্মার সুদৃষ্টিতে পড়িয়া রাজনীতিশাস্ত্রের জটিলতা ও অপ্রিয়তা দূরীভূত হইয়া অর্থবিশিষ্ট অথচ একখানি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।" ৭। কিন্তু আমরা বলি, কামন্দকই এইরূপ একখানি অর্থবিশিষ্ট সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ-পুস্তক লিখিয়াছেন এবং সেখানি তিনি চাণক্যের পুথি হইতে লইয়াছেন। তাঁহার লেখা অতি পরিষ্কার। যেখানেই তিনি পারিভাষিক শব্দ দিয়াছেন, সেখানেই তাহার লক্ষণ দিয়াছেন এবং লক্ষণগুলিকে বেশ সমন্বয় করিয়া দিয়াছেন। যেখানে কোথাও শ্রেণীবিভাগ করিতে হইয়াছে, সেখানে শ্রেণীর প্রত্যেক শব্দের পরিষ্কার অর্থ দিয়া দিয়াছেন। পুস্তকে যে জিনিষটির পর যেটি বসিবে, সেটিও বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। এইরূপে রাজার শরীর-রক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে রাজপুত্র রক্ষা, দুর্গনির্ম্মাণ, মন্ত্রিনিয়োগ, প্রজাদের প্রতি ব্যবহার, অনুজীবীদের বৃত্তিবিধান, দ্বাদশ রাজমণ্ডল, সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয় এই ষড়্‌গুণের কথা। তার পর দূত কাহাকে বলে, চর কাহাকে বলে, দূতের কর্ত্তব্য কি, চরের কর্ত্তব্য কি ইত্যাদি এবং শেষে যুদ্ধ ও ব্যূহনির্ম্মাণ পর্য্যন্ত ইহাতে আছে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী (মহামহোপাধ্যায়)।

ফুলের গান

তোমার এই
বিজন্ বনের নিজন্ কোণে একলা আমি
এম্‌নি যেন নিত্য ফুটি, চিত্ত-স্বামি !
এম্‌নি যেন নিত্য মোরে
অর্ঘ্য-ডালার বক্ষে ভ'রে
দেবালয়ের আরতি হয় দিবস্-যামী !

হায় গোলাপের শুক্‌নো পাতার অশ্রু ঝরে
কোন্ নিঠুরের পাষাণ প্রাণের অনাদরে।
হয় ত যূথীর এমনি মালা
হেলায় দলে কুঞ্জ-বালা ;
হয় ত হেনার চক্ষে আসে ধারা নামি'।

রূপ-ভুবনের আলো-পথের ওগো পথিক্ !
মন-ভুলানো রঙের মায়ায় দাঁড়াও ক্ষণিক্ !
দাঁড়াও সুখের বাঁশী নিয়ে,
দাঁড়াও মুখের হাসি নিয়ে ;
গন্ধ-গীতি-পুঞ্জ, তোমার কুঞ্জগামী !

শিউলী-মালা আজ উজালা পাতার ডা
সেই মালাতে কুঁড়ির মাণিক্ আলোয়
জ্বালায়

রং-নিঝরের বন্দনাতে
মোর মুকুলের গন্ধ মাতে ;—
মালাটি তার মণির চেয়ে অনেক দামি

শ্রীভারতকুমার
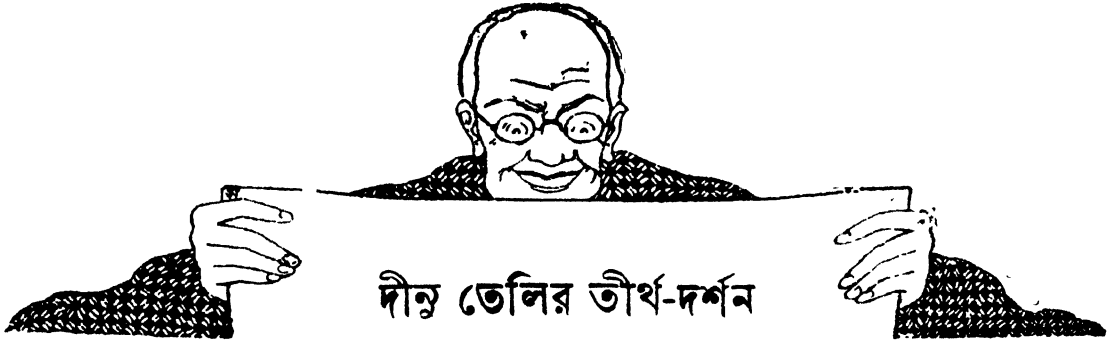
দীনু তেলির তীর্থ-দর্শন

কবে কোন্ স্মরণাতীতকাল পূর্ব্বে কেশববাটী গ্রামের এই পাড়াটির নাম যে লোক তেলিপাড়া রাখিয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করা যেমন সুকঠিন, তেমনি কেমন করিয়া বা কি ভাবেই বা সাবেক কালের সেই সব তেলি-পরিবারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়া আজ পাড়াটির মধ্যে দু'এক ঘর ব্রাহ্মণ, এক ঘর নাপিত, ঘর দুই কুম্ভকার এবং কয়েক ঘর হাড়ি ও সাঁওতাল-বাউরির বাসের পত্তন হইয়াছে, তাহার হিসাব পাওয়াও দুরূহ। কিন্তু তাহা হইলেও, পাড়ার মধ্যে দীনু তেলি ও তাহার ক্ষুদ্র ভদ্রাসনখানি আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিয়া আদি কালের দেওয়া পাড়ার সেই নামটির সার্থকতা জ্ঞাপন করিতেছে।

শীতকাল। অপরাহ্নের নিস্তেজ রৌদ্র প্রাঙ্গণের প্রকাণ্ড জামগাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে আসিয়া দীনু তেলির পশ্চিম-দুয়ারী শয়নঘরের দাওয়াতে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই-খানে কম্বল বিছাইয়া বসিয়া কোলের কাছে একখানি ছোট জলচৌকীর উপর কাশীদাসী মহাভারতের বনপর্ব্ব খুলিয়া দীনু অনুচ্চ কণ্ঠে সুর করিয়া পড়িতেছিল—

"কতক্ষণে দময়ন্তী নিদ্রা অবশেষে।
সজাগ হইয়া দেখে পতি নাহি পাশে॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ভৈমী ভূমিতলে পড়ি।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ যায় গড়াগড়ি॥"

কিছুক্ষণ পড়িবার পর যখন আসন্ন সায়াহ্নের অন্ধকার তাহার চশমার কাচ দুইখানির চারিপাশে অল্পে অল্পে ঘনাইয়া আসিবার উপক্রম করিতে লাগিল, তখন নলরাজের উপা-খ্যান পড়িয়া দময়ন্তীর দুঃখে তাহার সমস্ত অন্তর ভরিয়া বেদনার একটা ঘনান্ধকারও জমিয়া উঠিল। চোখের পাতা বৃদ্ধের ইতিপূর্ব্বেই ভিজিয়া উঠিয়াছিল, এক্ষণে ধীরে ধীরে চশমাখানিকে খুলিয়া বইয়ের খোলা পাতার উপর রাখিয়া দিল এবং দুই হাতে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া স্বামি-পরিত্যক্তা বনচারিণী রাজরাণীর দুঃখে অভিভূত হইয়া মনে মনে বলিল, 'আহা! মা গো আমার! রাজার ঝিয়ারী রাজার ঘরণী হয়ে এত দুঃখ তোর অদৃষ্টে ছিল মা! রাজ্যেশ্বরী রাণী হয়ে বনে বনে কেঁদে বেড়াবার মত এত চোখের জল বিধাতা তোর চোখে জমা ক'রে রেখেছিল!'

বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। চক্রবর্ত্তি-বাড়ীর শাঁখের শব্দ সন্ধ্যা-সমাগম জানাইয়া দিলেও বৃদ্ধ আজ উঠি উঠি করিয়াও উঠিতে পারিল না। এই নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান সে ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকবার পড়িয়াছে, কিন্তু আজিকার মত এমন করুণভাবে কোন দিনই এই কাহিনী তাহার অন্তর-মনকে প্রভাবিত করে নাই। রাজরাণী দময়ন্তীর ব্যথায় গভীর বিষাদের যে মেঘ আজ তাহার অন্তর-প্রদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহা সহসা কাটিতে চাহিল না। দীনু তেমনি ভাবেই খোলা মহাভারতখানি সম্মুখে করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। দময়ন্তীর দুঃখ আজ যেন তাহার অতি আপন হইয়া তাহার অন্তর বাহির একাকার করিয়া দিল। তাই, সন্ধ্যা হইলেও, উঠিয়া আলোটা পর্য্যন্ত জ্বালিবার আজ তাহার আর শক্তি হইল না। মন যেন তাহার আজ এক রাজ্যহারা, স্বামিহারা সতী-সাধ্বীর পিছনে পিছনে গহন বনের চতুর্দ্দিকে তাহারই সঙ্গে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বৃদ্ধের আজ কেবলই মনে হইতে লাগিল যে, জগতে দুঃখই সব, দুঃখ লইয়াই সৃষ্টি, তাহার আশে-পাশে, দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে, নিম্নে সর্ব্বত্রই যেন অনন্ত দুঃখ, অনন্ত বেদনা, অজস্র চোখের জল, অফুরন্ত দীর্ঘশ্বাস!

এই ভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে, সশব্দে সদর-দরজা খোলার শব্দে চমকিত হইয়া দীনু চাহিয়া দেখিল,

প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া ওপাড়ার বাঁড়ুয্যে মশাই আসিতেছে। দাওয়ার পৈঠায় পা দিয়াই বাঁড়ুয্যে মশাই কহিল,—"এখনও সন্ধ্যা জালিস্ নি রে, দীমু? অন্ধকারে ব'সে ব'সে করছিস্ কি বল্ ত?"

বইখানি বন্ধ করিয়া রাখিয়া দীমু উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"দেহটা আজ ভাল নেই খুড়োঠাকুর, তাই আজ আর কিছু ভাল লাগছে না। ব'স, আলোটা জ্বালি,—প্রাতঃপেন্নাম।"

কম্বলের উপর এক পা ধূলাশুদ্ধ উবু হইয়া বসিয়া বাঁড়ুয্যে মশায় কহিল,—"বসবার আর সময় নেই রে, বাবা; রক্ষেকালী পুজোর চাঁদার জন্যে বেরিয়েছি। ধান ঝাড়া হচ্ছে, দিনের বেলা ত আর বেরুবার সময় হয় না। তোর চাঁদাটা দিয়ে দে দেখি।—উঃ! কি ঠাণ্ডাটাই পড়েছে!"

ঘরের মধ্যে আলো জ্বালিতে জ্বালিতে দীমু বলিল,—"কি হবে খুড়োঠাকুর আর ও সব ক'রে? গাঁয়ের সুখ আর কিছুতেই ফেরাতে পারবে না। এই কেশববাটীতে চিরকাল ধরেই ত বছর বছর ঐ সব হয়ে আস্ছে খুড়োঠাকুর, কিন্তু গাঁয়ের ভাল আর কৈ হ'ল? গাঁকে রক্ষে ক'রে গাঁয়ের দুঃখ আর মা কৈ ঘোচালেন বল? তোমরাও ত দেখেছ, গাঁয়ে এক সময়ে লোক ধরত না, আর এখন দেখ, সেই গাঁ ওজোড় হয়ে গিয়ে বনে জঙ্গলে ভ'রে উঠেছে। রক্ষেকালী পূজো ক'রে আর কি করবে, খুড়ো ঠাকুর?"

"বলিস কি রে দীমু, ও কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে আছে? দে, তোর চাঁদাটা চট ক'রে দিয়ে দে; তোদের এই ক'ঘর আদায় ক'রে মাঝের পাড়াটা আজ সেরে ফেলতেই হবে" বলিয়া বাঁড়ুয্যে মশাই উঠিয়া ঘরের চৌকাঠের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, মিনিটখানেক ঘরের মধ্যে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দীমু একবার কি ভাবিল, তাহার পর ছোট আমকাঠের বাক্স হইতে একটি সিকি বাহির করিয়া বাঁড়ুয্যে মশায়ের হাতে দিয়া যোড় হাত মস্তকে ঠেকাইল।

"চার আনা কি রে! তোর যে একটা গোটা টাকা ধরা হয়েছে!"

"মাপ কর খুড়ো ঠাকুর; মায়ের পূজো, নইলে এ-ও আমার এখন দেবার ক্ষমতা নয়। আমার হাল ত তুমি সবই জান।"

"সবই ত জানি। সে দিন ত জমী বেচে এক কাঁড়ি টাকা পেয়েছিস, একটা টাকা তুই দিবি নৈ কি।"

আবার যোড় হাত মাথায় ঠেকাইয়া দীমু কহিল,—"ওই নিয়েই আমায় ক্ষ্যামা দাও, খুড়ো ঠাকুর। এক কাঁড়ি টাকা বলছ,—পেয়েছি বটে। পুঁজির মধ্যে পাঁচটি বিঘে জমী ত ছিল পুঁজি; তাই ছিল আমার ভাত-ভিত্তি, তার ভেতর থেকে তীথ্যি করতে যাব ব'লে একটি বিঘে পঞ্চাশ টাকায় বিক্রী করেছি। তা খুড়ো ঠাকুর, পঞ্চাশ টাকাতেই বা কি তিথ্যি হবে বল? ঐ খালি কাশী গিয়ে একটিবার বিশ্বনাথের চরণ দর্শন ক'রে আসাই হবে। পঁয়ষট্টি বছর বয়স হ'ল, খুড়ো ঠাকুর, এই কেশববাটী ছেড়ে কোথায় ত আর একবার নড়তে পারলুম না, এমনই নরাধম মহাপাপী আমি!"

"তা বেশ ত, যেখানে পঞ্চাশ টাকা ব্যয় ক'রে তীর্থ-ধম্ম করতে যাবি, তা সেখানে তার থেকে না হয় একটা টাকা এ দিকে দিলি। পঞ্চাশ টাকাতে যদি তোর কাশী হয় ত উনপঞ্চাশ টাকাতেও তা হবে। ওর থেকে একটা টাকা দিলে তোর আর এমন কি কম্‌তি—"

"অমন কথা বোলো না, খুড়ো ঠাকুর। তিথ্যি করতে যাবার নাম ক'রে যা রেখেছি, তাতে কি আর আমি হাত দিতে পারি? এখন আশীর্ব্বাদ কর ভাল ক'রে, যাতে ভালয় ভালয় অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর দর্শনটি আমার হয়। মহাপাতকী আমি, চিরজীবনটাই কেবল বাজে কাযে কাটালুম, আমার ভাগ্যে কি আর—"

বাঁড়ুয্যে মশাই বিরক্ত হইয়া মনে মনে কহিল,—'তোমার ভাগ্যে একেবারে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর দর্শন ঘটবে, বেটা চামার কোথাকার!' প্রকাশ্যে কহিল,—"আচ্ছা, চল্লুম তা হ'লে। কবে তা হ'লে কাশী যাচ্ছিস? একলাই যাবি ত?"

প্রশ্ন করিতে করিতে বাঁড়ুয্যে মশাই প্রাঙ্গণের মাঝখানে আসিয়া আর একবার দাঁড়াইল। হেরিকেনটি লইয়া দীমু তাঁহাকে সদর পর্য্যন্ত আগাইয়া দিতে আসিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে কহিল,—"যাবার আগে মুখ দিয়ে বলতে নেই, খুড়ো ঠাকুর! এই একটু শীতটা কমলেই ফাল্গুনের মাঝামাঝি নাগাৎ ইচ্ছেটা একবার আছে আর কি! আর একলা কি ক'রে যাব বল, কিছুই ত জানি না,

চিনি না। ওপাড়ার এককড়ি ঘোষ যাবে, তার সঙ্গেই যাবো।"

দীনুর সব কথা হয় ত বাঁড়ুয্যে মশায়ের কাণেই পৌঁছাইল না। ঝনাৎ করিয়া সদরের দরজা খুলিয়া তিনি রক্ষাকালী পূজার বাকী চাঁদা আদায়ের জন্য ব্যস্ত হইয়া অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

দরজায় হুড়কা লাগাইয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইতেই দীনু দেখিল, খিড়কীর ভাঙ্গা কবাটের ফাঁক দিয়া উঠানের মধ্যে খানিকটা আলোর রেখা আসিয়া পড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গেই শিশুকণ্ঠে সেই দিক্ হইতে কে ডাকিল—"দাদামশাই!"

"কে রে?" বলিয়া দীনু খিড়কী খুলিতেই দেখিল, তাহারই প্রতিবাসী নালু হাড়ির বিধবা স্ত্রী একখানি মলিন ছিন্ন বস্ত্রে আপাদ-মস্তক কোন রকমে আবৃত করিয়া একটি কেরোসিনের ডিবা হাতে এক ধারে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার পাঁচ বৎসরের মেয়ে চাঁপা একখানি ছেঁড়া কাঁথা গায়ে জড়াইয়া শীতে হি হি করিয়া কাঁপিতেছে। দীনু চাঁপার মাতার দিকে চাহিয়া কহিল,—"কি গা বৌমা, কোন দরকার আছে কি? আজ তোমরা শুতে যাওনি যে এখনো?" জিজ্ঞাসা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দীনু দেখিল, একখানি চটে জড়ান ছিন্ন একটি শয্যার পুঁটুলি হাড়ি-বৌয়ের পায়ের কাছে পড়িয়া রহিয়াছে।

দীনুর খিড়কীর বাহিরের দিকেই নালু হাড়ির ঘর। রাত্রিতে গ্রামের চৌকিদারী করিয়া ও দিনে লোকের বাড়ী জন-মজুর খাটিয়া কোন রকমে দুঃখে কষ্টে সে দিনপাত করিত। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল, তাহার মৃত্যু হওয়াতে ইহাদের যে কি দুর্গতির সহিত দিনপাত হইতেছে, তাহার হিসাব আর কেহ রাখুন না রাখুন—দীনু কতকটা রাখে। জাতিতে হাড়ি হইলেও চাঁপার মা দুঃখ-কষ্টকে নীরবে সহ্য করিয়া লইয়া থাকিতে পারিত, তাই এমন দুরবস্থায় পড়িয়াও সে নিজের ভাঙ্গা কুঁড়েখানির মধ্যে মুখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিত; সাহায্যের জন্য কাহাকেও বৃথা বিরক্ত করা তাহার অভ্যাস ছিল না। কিন্তু ভগবান্ শুধু গ্রাসের কাঙ্গাল করিয়া তাহাকে ছাড়িলেন না, বাসের কাঙ্গালও করিলেন। আজ কয় দিন হইল, হঠাৎ এক দিন সামান্য একটু ঝড়-বৃষ্টি হইয়া তাহাদের সবে মাত্র মাথা গুঁজিবার আশ্রয়, বহু কালের জীর্ণ ঘরখানি ভূমিসাৎ হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। পাড়ার চক্রবর্ত্তীদের চণ্ডীমণ্ডপের এক ধারে খানিকটা অংশ ঘেরা ছিল, কয় দিন হইল এইখানেই ইহারা আশ্রয় লইয়াছে। দিনের বেলা ভাঙ্গা ঘরের অনাবৃত দাওয়ার এক ধারেই কোন রকমে দুটি রাঁধিয়া লয়, সমস্ত দিনই সেইখানে থাকে, মেয়েটি উঠানের আমতলায় খেলা-ধূলা করে, তার পর সন্ধ্যার প্রাক্‌কালেই, ভিটাতে সন্ধ্যা দেখাইয়া, মেয়েটিকে বুকে করিয়া চক্রবর্ত্তীদের চণ্ডীমণ্ডপে শুইতে যায়।

দীনুর প্রশ্নের উত্তরে হাড়ি-বৌ মুহূর্ত্তকাল পাঁচীলের দেওয়াল ঠেস দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর ঘোমটাটা আরও একটু টানিয়া দিয়া অত্যন্ত ধীরস্বরে কহিল,—"আজকে আপনার গোয়ালের ভেতর একটু আমাদের শোবার যায়গা হবে?"

দুই একটা প্রশ্নোত্তরের ফলেই জানা গেল যে, আজ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী কে লোক আসিয়াছে বলিয়া সেখানে আজ ইহাদের শুইবার স্থান হইল না, তাই তাহাদের বিছানা লইয়া সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে।

দীনু গোয়াল হইতে তাহার গরুটিকে খুলিয়া আনিয়া তাহার অনাবৃত রাঁধিবার চালায় বাঁধিল এবং তাহার গাত্রে খান দুই চার চটের থলে বেশ করিয়া জড়াইয়া দিল। পরক্ষণেই আবার কি ভাবিয়া সেগুলি তাহার গাত্র হইতে খুলিয়া ফেলিল এবং বরাবর শয়ন-ঘরের মধ্যে আনিয়া তক্তাপোষের পায়ার সঙ্গে তাহাকে বাঁধিল। হাড়ি-বৌকে আসিয়া কহিল, "খড়ের আঁটিগুলো বেশ পুরু ক'রে সাজিয়ে তার ওপর বিছানা পাত্, মা। আহা রে, এত কষ্ট তোর কপালে ছিল, মা-লক্ষ্মি! কি আর করবি বল! তোরা সীতা-দময়ন্তীর জাত মা গো, দুঃখ দিয়ে ভগবান্ তোদের কখনো হারাতে পারবেন না।" তার পর কথায় কথায় হাড়ি-বৌয়ের ঘরখানি মেরামতের কথা উঠিল। হাড়িবৌ অত্যন্ত বিনম্র ও মৃদুকণ্ঠে বলিল,—"খেতে পাই না, ঘর আর কোত্থেকে তুলতে পারব, বাবা! গায়ের ষোল আনাদের মুখ চেয়ে ক'দিন ধ'রে ত ঘুরে ঘুরে বেড়ালুম. তেনারা কেউ ত আর কিছু গা করলে না। ভাইকে তাই তিরপুনিতে পত্তর দিয়েছি, সেইখানেই গিয়ে থাকি গে, বাবা। কালই বোধ হয় ভাই

আমার নিতে আসবে।" স্বামীর ভিটা—যেখানে সে সাত বৎসর বয়সের সময় আসিয়া দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরিয়া নানা-প্রকার সুখ-দুঃখের সহিত কাটাইয়াছে—তাহা ত্যাগ করিয়া যাইবার কথায় বোধ হয় তাহার অন্তর ভিতরে ভিতরে কাঁদিয়া উঠিল, তাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া নীরবে থাকিবার পর ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আবার কহিল,—"মেয়েটা কিন্তু ভিটে ছেড়ে কিছুতেই সেখানে যেতে চায় না। বলে,—'মা, কোথাও আর যাবু নি, ঐ উঠোনের আমতলাতেই মানপাতা দিয়ে, কঞ্চি কুড়িয়ে নিয়ে এসে তাই দিয়ে ঘিরে, ছোট্ট একখানা ঘর ক'রে আমরা থাকব।' মেয়েটার যে কি টান ভিটেটার ওপর—" বলিতে বলিতে হাড়ি-বৌয়ের চোখ দিয়া ফোঁটাকতক জল তাহার শয্যার কাঁথার উপর গড়াইয়া পড়িল। চাঁপার গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল,—"মেয়েটা সারাদিনই ঐ উঠোনের আমতলাটিতে খেলাঘর সাজিয়ে খেলা-ধুলো করবে, এক দণ্ড গিয়ে কোথাও থাকতে চায় না। এখান ছেড়ে সেখানে যাবার নাম শুনেই কা'ল থেকে শুধু কান্‌তে লেগেছে! কি করেই যে ওকে সেখানে—আর আমারও ভিটে ছেড়ে যেতে যে কি হবে, তা বাবা, তুমি গুরুজন, কি আর বোলবো তোমাকে!" আবার হাড়ি-বৌয়ের চোখ ভিজিয়া গলা ভারি হইয়া আসিল। একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ধীরে ধীরে দীনুর অন্তস্তল হইতে বাহির হইল।

* * * *

পরদিন প্রাতে মুখ-হাত ধুইয়া বহু কালের বিবর্ণ বালাপোষখানি গায়ে জড়াইয়া দীনু কিছু একটা কায খুঁজিতে লাগিল। অন্য দিন তাহাকে এই সময়ে কায খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না; কারণ, একাহারী দীনুর রান্না-বান্না ইত্যাদির আয়োজনেই সমস্ত সকালটা কাটিয়া যায়। আজ একাদশী; খাইবার আজ তাহার হাঙ্গামা ছিল না, তাই কর্ম্মশূন্য হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে মনে করিল—যাই, একবার এককড়ির সঙ্গে দেখাটা ক'রে আসি।

বাটী হইতে বাহির হইয়া দীনু হাড়ি-বৌয়ের উঠানে আসিয়া রৌদ্রে দাঁড়াইল। হাড়ি-বৌ গোলাহাঁড়ি লইয়া রান্নার জায়গাটি নিকাইতেছিল, দীনুকে দেখিয়া তাহার পরিহিত বস্ত্রখানিকে টানাটানি করিয়া মাথায় তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতে গেল, ফলে চাঁপার পরনের সেই জীর্ণ পাঁচহাতি বস্ত্রখানি পিঠ হইতে ছিঁড়িয়া আসিয়া তাহার মস্তকের উপর উঠিল, কিন্তু পৃষ্ঠদেশ তাহার একবারেই অনাবৃত হইয়া পড়িল। দীনু পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার উদ্দেশে কহিল,—"আচ্ছা বৌমা, কতগুলি টাকা হ'লে তোমার ঘরখানি ওঠে, বল ত মা! দেখি একবার এককড়ি ঘোষকে ব'লে। ওর ত পয়সার অভাব নেই, আমি একটু ধ'রে বসলে আমার কথাটা কি আর ও ঠেলতে পারবে?" গোলা-হাতেই আড়ষ্ট হইয়া ভাঙ্গা ঘরের দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়াইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া চাঁপার মা কহিল,—"না বাবা, এ নিয়ে আপনি আর কাকেও বলতে যাবেন না, গরীবের দুঃখ কে বুঝবে, বাবা! গাঁয়ের দোর দোর ঘুরতে আমি ত আর বাকী রাখলুম না। আর দু' দশ টাকার কাযও নয়, যেমন করেই হোক্, পনর ষোল গণ্ডা টাকার কমে আর এ ঘর আমার উঠবে না।" দীনু এক পা এক পা করিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার পর এককড়ি ঘোষের বাড়ী অভিমুখে চলিল।

সেখানে প্রায় ঘণ্টা দুই ধরিয়া এককড়ি ঘোষের সহিত নানাবিধ আলাপ-আলোচনা করিবার পর দীনু যখন বেলার দিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন এককড়ি কহিল,—"তা হ'লে ঐ ২রা ফাগুনই ঠিক রইল আর কি, ঐ দিনই খুব ভাল দিন। আর চাঁপীর মা'র ও সব ফ্যাসাদে হাত দিও না, দাদা। জাতে একটা হাড়ি, ছোট লোক; ওদের ছাওয়া মাড়ালে নাইতে হয়, ওদের ঘরের জন্যে টাকা আমিই বা দেবো কেন, আর অন্য কেউই বা দিতে যাবে কেন? দিতেই যদি হয় ত তেমন কোন ব্রাহ্মণকে—"

"তা যা বলেছ, তা ঠিক বটে, তবে কি না—আহা—"

"রেখে দাও তোমার—আহা;—দীনুদা, নিজের কায ক'রে নাও—নিজের কায ক'রে নাও। এই যে দু'জনে কাশী যাচ্ছি, কেউ আমাদের ত আর দু'পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে না, সুতরাং—বুঝলে না? আর ক'টা দিনই বাঁচবে দাদা, এখন ও সব বাজে কাযের দিকে না দেখে, ধর্ম্ম-পুঁজিতে কিছু জমা তুলে নাও।"

দুই বন্ধুতে কথা কহিতে কহিতে সদর রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছিল। দীনু কহিল,—"তা যা বললে এক-কড়ি, খাঁটি কথাই তাই বটে। নাঃ—ও সব কথা ছেড়ে দাও; এখন মা অন্নপূর্ণার দর্শনটি কবে হবে, তাই [illegible]

কথা।" ইহার পর আরও দু'একটি কথা হইল। তাহার পর দীনু যখন গৃহে ফিরিল, তখন বেলা অনেক হইয়াছিল। সদর-দ্বার খুলিয়া প্রাঙ্গণে পা দিতেই হাড়ি-বৌয়ের বাড়ী হইতে কিসের একটা কলরব তাহার কাণে আসিল। সেই কলরবের মধ্যে চাঁপার উচ্চ কান্নার শব্দ দীনু শুনিতে পাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতপদে হাড়ি-বৌয়ের উঠানে আসিয়া দেখিল, চাঁপার মামা তাহাদের লইয়া যাইতে আসিয়াছে এবং দীন-দরিদ্র নিরন্ন হাড়ির ঘরের যৎসামান্য যাহা আসবাব-পত্র, তাহা কয়েকটি পৌটলা-পুঁটুলীতে বাঁধা-ছাঁদা হইয়া উঠানের একাংশে পড়িয়া রহিয়াছে। হাড়ি-বৌয়ের একখানি নয় হাতি গোটা থান কাপড় ছিল। দীনুই এ বৎসর পূজার সময় কাপড়খানি তাহাকে দিয়াছিল। সে সেইখানি পরিয়া নীরবে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে চাঁপাকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, আর চাঁপা জোর করিয়া দাওয়ার খুঁটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে আর হাঁপাইতেছে। তাহার মুখ ও বুক চোখের জলে একেবারে ভাসিয়া যাইতেছে।

দীনু ছুটিয়া আসিয়াই নিমেষের মধ্যে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া লইল এবং কোন কথা না বলিয়াই হাড়ির মেয়ে চাঁপাকে বুকে করিয়া তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার পর মিনিট পনর পরে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া চাঁপার মামার হাতে ছয়খানা নোট ফেলিয়া দিয়া কহিল,—"চাঁপা আমার কোথাও যাবে না। তুমি বাবা, দিনকতক এখানে থেকে ঘরখানি কোন রকমে তুলে দিয়ে তবে যেতে পাবে।"

তাহার পর দীনু গৃহে আসিল এবং দাওয়ার উপর কম্বল বিছাইয়া তাহার মহাভারতখানি খুলিয়া বসিল।

ইহারই কয়েক দিন পরে এক দিন দীনু ও-পাড়ার অন্নদা ঘোষালের কাছে যাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—"ঘোষাল মশাই, আর একবার এই শীতে একটু কষ্ট করতে হবে যে!"

তখন অন্নদা ঘোষাল খামার-বাড়ীতে রৌদ্রে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে বাঁড়ুয্যে মশায়ের সহিত রক্ষাকালী-পূজার আয়-ব্যয়ের হিসাব করিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিল,—"কিসের কষ্ট বল দেখি?"

কহিল,—"আর একটিবার পেঁড়োর রেজেষ্টরী আফিসে যেতে হচ্ছে।"

"কেন বল্ ত?"

দীনু কহিল,—"কাশী যাব ব'লে জমী বিঘেটুকু তোমায় বেচলুম; কিন্তু তা সবই ঘোষাল মশাই, লোকসানের সামিল হয়ে গেল।"

ঘোষাল ও বাঁড়ুয্যে মশাই দু'জনেই সোৎসুকে দীনুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বাঁড়ুয্যে মশাই মনে মনে বলিল,—"হবে না? রক্ষেকালীপুজোয় চারগণ্ডা পয়সা চাঁদা! কাশী হবে, না, তে'-ব্যাটার ছাই হবে, কঞ্জুস কিরেট্ কোথাকার!"

অন্নদা ঘোষাল জিজ্ঞাসা করিল,—"অতগুলো টাকা কি করলি, দীনু?"

"সে কথা আর জিজ্ঞেস করো না, ঘোষাল মশাই! এবার জমীর যা দাম দেবে, নোট আর দিও না, নগদ টাকা দিও, দোহাই তোমার! যাট্ যাটটে টাকা ইঁদুরের দাঁতে গেল, ঘোষাল মশাই!"

"বলিস কি রে! ইঁদুরে কেটে দিয়েছে! তা তার নম্বরগুলো আছে ত?"

"আর ছাই আছে! যাক্, কবে তা হ'লে আবার যাচ্ছ বল? এবার ঐ জলার ওপরকার পাঁচপণখানাই লিখে দেবো, দামের বিষয় একটু বিবেচনা কোরো, দোহাই তোমার, ঘোষাল মশাই!"

"আচ্ছা, সে হবেখ'ন, সন্ধ্যার পর একবার আসিস তা হ'লে।"

দীনু প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল এবং ইহারই চারি পাঁচ দিন পরে এক দিন পাণ্ডুয়ার সব-রেজেষ্টারী অফিসে যাইয়া দলীল লিখাইয়া, ষ্ট্যাম্প লাগাইয়া তাহার বাকী চারি বিঘা জমীর ভিতর হইতে কাশী যাইবার পাথেয়স্বরূপ ৭৫ টাকায় আরও পাঁচপণ জমী অন্নদা ঘোষালকে বিক্রয় করিয়া আসিল।

*　　*　　*　　*

'যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।'

দুই দিন ধরিয়া আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অনবরত টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। শীত ততটা না থাকিলেও,

রাজার ধন্ত হওয়াও কেহ চাহে না, দেশেরও পুণ্যের আর দরকার নাই, টিপ্‌-টিপানি এই বৃষ্টি এখন থামিলেই যেন লোক বাঁচে। দুই দিন পরে ফাল্গুনমাস পড়িবে, কোথায় শীতের আড়ষ্টভাব কাটিয়া গিয়া নব-বসন্তের স্ফূর্ত্তি জাগিয়া উঠিবে, তাহার পরিবর্ত্তে দিবারাত্র আকাশের এই নিরানন্দ ঘন-ঘোর ভাব; পথঘাট জল-কাদায় একাকার, কোন কায করিবার উপায় নাই, বাটী হইতে বাহির হওয়া পর্য্যন্ত কষ্টকর!

আজ একাদশী না হইলেও দীনুর আজ উপবাস। শরীর তাহার ভাল না থাকায় আজ সে আহারাদি করিবে না। তাই সে সবের কোন আয়োজন করিতে হইবে না বলিয়া আজ সকালেই সে দাওয়ায় কম্বল বিছাইয়া মহাভারতখানি খুলিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু শরীর ভাল না থাকায় মনটাও তাহার ভাল ছিল না, তাই খোলা মহাভারতখানি শুধু শুধুই তাহার সামনে পড়িয়া রহিয়াছিল। অন্ত দিনের মত বৃদ্ধ আজ কিছুতেই পড়ায় মন দিতে পারিতেছিল না। হয় ত কোন দিনের কোন কথা আজ তাহার মনে পড়িতেছিল, হয় ত কোন গত দিনের দুঃখ-বেদনার চিত্র আজ তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতেছিল, হয় ত বা অতীতের কোন করুণ সুর গুমরিয়া গুমরিয়া আজ তাহার অন্তর ভরিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। আর সব ছাপাইয়া বহুকাল পূর্ব্বেকার একটি বালকের রোগ-কাতর শীর্ণ মুখ আজ বার বার তাহার মনে পড়িয়া তাহাকে অন্তমনস্ক করিয়া ফেলিতেছিল।

এমনই সময়ে এই দুর্য্যোগের মধ্যে হঠাৎ সদর-দরজা খোলার শব্দ হইল এবং বালককণ্ঠে কে ডাকিল,—"দু'টি ভিক্ষে দাও না গো!"

দীনু চাহিয়া দেখিল, একটি আট নয় বৎসরের ছেলে, পরনে ও গায়ে তাহার যাহা আছে, তাহাকে ঠিক বস্ত্র বলা যায় না,—তাহাও বৃষ্টিতে একবারে ভিজিয়া গিয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া বৃষ্টির জল ঝরিতেছিল। দেখিলেই বোধ হয়, ছেলেটি যেন খুবই কাতর এবং অনেকক্ষণ ধরিয়াই সে এই বৃষ্টিতে ঘুরিতেছে। সে পুনরায় সেইখানে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল,—"দু'টি ভিক্ষে দাও না গো!"

ক্ষণপরে দীনু তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। একটিবার তাহার আপাদমস্তক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল এবং তাহার পর তাহার কাঠির মত সরু ও ঢ্যাঙ্গা হাতখানি ধরিয়া দাওয়ার উপর লইয়া আসিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, —"তুমি কে বাছা, এই বৃষ্টি মাথায় ক'রে ভিক্ষে করতে বেরিয়েছ? এই দুর্য্যোগে তোমার বাপ-মা না বেরিয়ে তোমায় ভিক্ষের জন্ত পাঠিয়েছে!"

ছেলেটি তাহার শুষ্ক নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটি দীনুর মুখের উপর রাখিয়া বলিল,—"বাবা ত আমার নেই, সেই দুগ্‌গো পুজোর পরেই ম'রে গিয়েছে, সেই জন্তেই ত মায়ের আমার অসুখ। মা ত আর উঠতে পারে না, শুয়ে শুয়েই থাকে; সে বলে—সে-ও আর বেশী দিন বাঁচবে না, সে-ও বাবার মত ম'রে যাবে। আমাদের পয়সা-কড়ি যা ছিল, আর কিছু নেই, সব ফুরিয়ে গেছে, সেই জন্তে ডাক্তার বাবু আর ভাল ওষুধ দেয় না।"

দীনু অনিমিষনেত্রে ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথাগুলি শুনিতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমাদের বাড়ী কোন্ গাঁয়ে, বাবা?"

"ফুলপুর। দুদিন মা ওষুধ খেতে পায়নি, পয়সা ছিল না। ডাক্তার বলে—পয়সা না নিয়ে ওষুধ নিতে আসিস্ না, তাই মা আর ওষুধ খেতে চায় না।" তাহার পর খানিক থামিয়া ছেলেটি আবার বলিতে লাগিল,—"আমি সকালে উঠে ভিক্ষেয় বেরিয়ে যা চাল পাই, তাই মুদীর দোকানে দিলে, তারা সাবু মিছরি দেয়। গোলাপীর মা রোজ অনেক ক'রে সাবু রেঁধে দেয়, মাও খায়, আমিও খাই, কোন কোন দিন বামুনদের ছোট গিন্নী আমায় ডেকে দুটি ভাত দেয়। রোজ দেয় না।"

দীনুর চোখে জল ধরিয়া রাখা কঠিন হইতেছিল। ছেলেটিকে কোলের উপর বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার নাম কি, বাবা?"

"আমার নাম ভোঁদা। আজকে ভিক্ষেয় চার আনা পয়সা পেয়েছি, আর চার আনা হ'লে মায়ের ওষুধটা হয়, তুমি দেবে? আজ অনেক ঘুরেছি, পা বড্ড ব্যথা করছে। এই বৃষ্টিতে কখন্ যে——"

আর দীনু শুনিতে চাহিল না, তাহাকেও আর কিছু বলিতে দিল না। উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে আনিল। তাহার ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া একখানি শুকনা

কাপড় পরাইল এবং গায়ে একখানি মোটা চাদর জড়াইয়া তাহাকে কোলে লইয়া বসিল। কিছু পূর্ব্বে যে ব্যাধি-কাতর শীর্ণ মুখখানি আজ তাহার বার বার মনে পড়িতে-ছিল, হয় ত সে মুখখানি এই বালকের মুখের মতই ছিল। অতি ধীরে, রহিয়া রহিয়া বৃদ্ধের অন্তস্তল হইতে একটি বেদনা-জড়িত দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

* * * *

মাঘমাসের সংক্রান্তির দিন প্রাতঃকালে এককড়ি ঘোষ দীনুর সন্ধানে আসিয়া দেখিল, সদরে তালা বন্ধ। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় আসিয়াও এককড়ি দরজায় তালা বন্ধ দেখিয়া গিয়াছিল। এ দিন চাঁপার মাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করাতে, সে কহিল,—"তিনি ত আজ পাঁচ সাত দিন ধ'রে বাড়ী থাকেন না, ফুলপুরে নন্দ চাষার বাড়ী গিয়ে আছেন। মধ্যে এক দিন এসে, কিসের জন্যে টাকা-কড়ির দরকার হয়েছিল, নিয়ে আবার চ'লে গেছেন।"

সেই দিনই দ্বিপ্রহরে ফুলপুর হইতে দীনুর এক পত্র লইয়া এককড়ির কাছে একটি লোক আসিল। দীনু লিখিয়াছে যে, তাহার আর কাশী যাওয়া ঘটিয়া উঠিবে না, সুতরাং তাহার অপেক্ষায় না থাকিয়া এককড়ি যেন নির্দ্ধারিত দিনে কাশীযাত্রা করে। পত্র পড়িয়া খানিকক্ষণ নীরবে থাকিয়া এককড়ি ফুলপুরের সেই লোকটিকে কহিল,—"জানি আমি, দীনুদার ভাগ্যে তীর্থও হবে না, ধর্ম্মও হবে না। ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি ত, সৎ-কাযের দিকে মন ওর কখনই নেই। লোক-দেখানো মহাভারত পড়লে আর কি ছাই হবে? বলি, স্বর্গ আর নরক দুই-ই আছে ত! দু' যায়গায় যাবার লোকও দু'রকমের আছে"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

* * * *

প্রায় দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। এককড়ি তীর্থ করিয়া এখনও ফিরে নাই। চাঁপার মা'র সেই ঘর নূতন হইয়া উঠিয়াছে। ফুলপুরের ভোঁদার মা মৃত্যুমুখ হইতে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা পাইয়া সারিয়া উঠিয়াছে। ভোঁদার কাঠি কাঠি হাতে পায়ে মাংস লাগিয়াছে, নিষ্প্রভ চক্ষুর চাহনীতে তাহার দীপ্তি ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাকে আর আগেকার দিনের মত অস্বাভাবিক লম্বা দেখায় না। এ সমস্ত ছাড়া আর একটি জিনিষ হইয়াছে,—ভোঁদার মায়ের চিকিৎসার জন্য দীনুর দ্বিতীয়বার জমী-বিক্রয়লব্ধ সেই ৭৫ টাকা নিঃশেষে ব্যয় হইয়া গিয়াছে। সে এখন কাশী গিয়া অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর দর্শনের আশা ত্যাগ করিয়া আবার পূর্ব্বকার দাওয়ায় কম্বল পাতিয়া তাহার মহাভারতখানি খুলিয়া বসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

চৈত্রমাস যায় যায়। ১২ মাসের সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, আশা-নিরাশা লইয়া পুরাতন বৎসর পশ্চাতের দিকে মিলাইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল।

আজ বাসন্তী সপ্তমী। প্রতি বৎসরই বাঁড়ুযো মশায়ের বাড়ীতে বাসন্তী-পূজা হয়, এবারেও মায়ের পূজার আয়োজন হইয়াছে।

অন্নপূর্ণা-পূজার দিন প্রাতঃকালে ফুলপুর হইতে ভোঁদার মা প্রতিমা দেখিবার জন্য দীনুর বাটীতে আসিল। দীনুকে সে পিতৃ-সম্বোধন করিয়াছিল। ভোঁদা মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে দীনুকে কহিল,—"দাদামশাই, আমি বড় হ'লে আমাদের বাড়ী অন্নপূর্ণা-পূজো করব, তখন তুমি একেবারে খুব থুড়্থুড়ে বুড়ো হবে, আর ব'সে ব'সে পুজো দেখবে।" উঠানের একাংশে চাঁপা খেলা করিতে-ছিল, সেইখান হইতে সে বলিয়া উঠিল,—"আমি ত তখন শ্বশুরবাড়ী যাব, কি ক'রে তা হ'লে পুজো দেখবো?"

দীনু কহিল,—"এ তোর কি রকম কথা চাঁপা? এত দিন আমার ঘর ক'রে এখন আমায় দ'য়ে মজাবার চেষ্টা! তুই যদি নতুন ক'রে আবার শ্বশুরবাড়ী যাবার ব্যবস্থা করিস, তা হ'লে আমার দশাটা কি হবে?"

হাত-মুখ নাড়িয়া চাঁপা উঠান হইতে উত্তর দিল,—"তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব, কেমন?" চাঁপার মা ও ভোঁদার মা দুজনে মুখ টিপিয়া হাসিল। খানিক পরে ভোঁদার মা দীনুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"শরীরটা এখন কেমন, বাবা?" দীনুর দেহ আজ ভাল ছিল না, তাই উঠিয়া একটিবার বাঁড়ুয্যে-বাড়ী যাইয়া অন্নপূর্ণার প্রতিমা দর্শন পর্য্যন্ত করিয়া আসিতে পারে নাই। দীনু কহিল,—"ভাল নেই মা! এমনি পাপিষ্ঠ আমি যে, মাকে একটি-বার গিয়ে দেখে আসতে কিছুতেই পারলুম না, আমার ভাগ্যে অনন্ত নরক—অনন্ত নরক!" বলিতে বলিতে দীনু আড় হইয়া বালিসটি কাঁধে দিয়া মাদুরের উপর শুইয়া পড়িল।

সে দিন ভোঁদার মার আর বাড়ী ফেরা হইল না।

সন্ধ্যার পর বাঁড়ুয্যে মশাই কি একটা কাযে এ পাড়ায় আসিয়াছিল, দীনুর বাটীর মধ্যে কথা শুনিতে পাইয়া দুয়ার ঠেলিয়া প্রবেশ করিয়া কহিল,—"কি রে দীনু, একটিবার গিয়ে প্রতিমাদর্শন ক'রে এলি না?" দীনু আড় হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল,—"উঠতে পারছি না, খুড়ো ঠাকুর, শরীরটা আজ বড্ডই খারাপ হয়েছে। মা অন্নপূর্ণাকে দেখবার জন্তে কাশী যাব ঠিক করলুম, তা-ও হ'ল না, গাঁয়ে ঘরে আজ তিনি এলেন, তা-ও গিয়ে একটিবার দেখে আসতে—"

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দীনুর দুঃখের কথা শুনিবার অবসর ও ধৈর্য্য বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের ছিল না, তিনি দীনুর সব কথা না শুনিয়াই ব্যস্ততার সহিত চলিয়া গেলেন। মনে মনে কহিলেন,—"অন্নপূর্ণা-দর্শন তোরই হবে বটে, ব্যাটা অধার্ম্মিক! তোর দর্শন হবে, হাড়ি-বাড়ীর শোয়ারের খোঁয়াড় আর চাষা-বাড়ীর বলদের পাল!"

* * * *

সেই রাত্রিতে বাঁড়ুয্যে মহাশয় নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিলেন, যেন জগন্মাতা অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তিতে দীনুর ঘরে তাঁহার রত্নসিংহাসন পাতিয়া বিরাজ করিতেছেন। বাঁড়ুয্যে দূর হইতে তাঁহার দিকে চাহিলে, দেবী তাহার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিলেন,—"তুই মনে করিস যে, বছর বছর তুই আমাকে তোর বাড়ী নিয়ে আসিস আর আমি আসি, কিন্তু তা আমি আসি না, এ গাঁয়েতে আমি দীনুর ঘরেই থালি আসি, এবারেও এসেছি। তবে এবার থেকে আর এখানে আমার আসবার দরকার হবে না। ওর কাশী যাবার ইচ্ছে হয়েছে, ওকে আমি আমার সঙ্গে নিয়ে চললুম। ঐ দেখ, সে আমার কাছে আসছে।" দেবীর ইঙ্গিতে বাঁড়ুয্যে মশাই চাহিয়া দেখিল, যেখানে সমস্ত গাঁয়ের লোক জড় হইয়া ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানে সেই ভীড়ের মধ্য হইতে দীনু বাহির হইয়া মায়ের সিংহাসনের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। তাহার দুই হাত দুই জনে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল। এক জন চাঁপার মা, আর এক জন ভোঁদার মা। চাঁপার মা'র কোলে ছিল চাঁপা, আর ভোঁদার মা'র কোলে ছিল ভোঁদা। দুইজনের মুখ হইতেই একটা স্বর্গীয় হাস্যচ্ছটা বিকীর্ণ হইতেছিল।

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইতেই ধড়মড় করিয়া বাড়ুয্যে মহাশয় শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। তখন প্রায় রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিয়াছিল। শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বাঁড়ুয্যে মহাশয় সেই অবস্থাতেই দীনুর বাটীর উদ্দেশে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। আসিবার সময় একবার তাহার চণ্ডীমণ্ডপস্থ প্রতিমার দিকে চাহিয়া দেখিল, মনে হইল, যেন খড়ের উপর মাটীলেপা বড় একটা পুতুল কট্-মট্ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। বুকের ভিতরটা তাহার গুরু গুরু কাঁপিয়া উঠিল। তাহার পর ছুটিতে ছুটিতে দীনুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিল, উঠানের মধ্যে পাড়ার অনেক লোকই ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহাদেরই সম্মুখে একটু দূরে তুলসীতলায় দীনু যে কম্বলখানিতে বসিয়া তাহার মহাভারত পাঠ করিত, তাহারই উপর তাহার প্রাণহীন দেহ পড়িয়া আছে, আর তাহার মৃত্যু-নিথর উন্মীলিত চক্ষুর্দ্বয় ঊর্দ্ধে স্বর্গের পানে স্থির হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

বাণী-আবাহন

এস সুর-বন্দিতা, নর-নন্দিতা, মুনি-জন-মনোহারিণি!
এস মনো-মৃণালের শ্বেত-শতদল, মানসোজ্জ্বল-কারিণি!
এস ভাবুক-হৃদয়-ভবন-শোভিতা, মঞ্জু-গুঞ্জ-ভাষিণি!
এস মধু-নিকুঞ্জে গুঞ্জন-সারা, কল্প-কুঞ্জ-বাসিনি!
এস ব্যাস-বাল্মীকি-স্মৃতি-বৈভব, মূক-মূর্খের বরদা!
এস রবি-কালিদাস-কণ্ঠ-কাকলি, মধু-ত্রিতন্ত্রি-স্বরদা!
এস ভক্ত-চরণ-রিক্ত-হরণ, রক্ত-চরণ-দানিয়া;
এস সকল শূন্য হর মা তূর্ণ, মিলন পূর্ণ আনিয়া।
এস আগম-নিগম-বালয় ঝুলায়ে, শ্বেতাঞ্চল-ধারিণি!
এস নিখিল কবির হৃদয়-বীণায়, সুর-সংযোগ-কারিণি!
এস নূপুরের তালে ছ'রাগ বাজায়ে, করে ছত্রিশ-রাগিণী।
এস নিয়ে উজ্জ্বল জ্ঞান-বিজ্ঞান, নাশি' অজ্ঞতা-নাগিনী।
এস বর্ষের পরে হর্ষ দানিতে, দিয়ে রূপ-রস-গন্ধ;
এস মিলন-আবেগে হিয়া গদগদ, আঁখি-জলে আঁখি অন্ধ।
এস কি ব'লে ডাকিব, কি দিয়ে পূজিব,
ভাবে ভোর ভুলে গেছি মা!
এস চরণ-পরশে সরস করিবে, সে আশাতে ব'সে আছি মা!
এস সঙ্গীত-গীতা, উজ্জ্বল-সিতা, শুভ্র-তুষার-বরণি!
এস শিরীষ-বকুলে আম্র-মুকুলে, বন্দে মুগ্ধা ধরণী।

শ্রীচারুশীলা দেবী।

বাহুলীনের জন্মকথা

ভারতবর্ষে যতপ্রকার যন্ত্র আছে, তন্মধ্যে বাহুলীন বা বেহালা একটি অতি প্রাচীন যন্ত্র। আমরা ইহাকে ধনুর্যন্ত্র, ততযন্ত্র, বাহুলীন, ভিখারীর ও নীলকমলের বেহালা নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছি। পুরাকালে এ দেশের জনসাধারণে ইহা সারঙ্গী ও সংস্কৃতে সারঙ্গ নামে প্রচলিত ছিল। সারঙ্গ নামে আর একটি যন্ত্র এ দেশে প্রচলিত আছে। ইহা কেবল কোমলকণ্ঠী গায়িকাদের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাহুলীনের সঙ্গে ইহার অনেক সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকেও ততযন্ত্র বলা হয়। ততযন্ত্র দুই প্রকার। ধনুস্তত অর্থাৎ ধনুর যন্ত্র যাহা ছড়ের বা ছড়ির দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর যে সকল যন্ত্র অঙ্গুলাগ্র বা মিরজাপের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, তাহাকে অঙ্গুলীত্র তত বা মিরজাপের যন্ত্র কহে। বাহুলীন তন্ত্রীবিশিষ্ট ততযন্ত্র, ঐক্যতান ও সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য বিকাশিত করিবার একমাত্র যন্ত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

খৃঃ জন্মের প্রায় ৪।৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রবলপরাক্রান্ত লঙ্কেশ্বর রাবণ রাজা কর্ত্তৃক প্রথম ধনুস্তত যন্ত্র বা বাহুলীন ভারতে সৃষ্ট হয় ও তাহাকে রাবণাস্ত্রম্ নামে সাধারণে ব্যবহার করিত। রাবণাস্ত্রমের অনুকরণে রাবণা বলিয়া আর একটি যন্ত্রের অভ্যুদয় হয়। সেই সময়ে জনসাধারণ উহাকে দুইটি তন্ত্রে ব্যবহার করিত। তৎপরে অমৃতি নামে আর একটি ধনুযন্ত্র রাবণাস্ত্রম্ ও রাবণার আদর্শে তৎকালে উদ্ভূত হইয়াছিল। কেমানজে জৌজ (Kemangeh Gouze) নামক আর এক প্রকার ধনুর্যন্ত্র আরবদেশীয়রা সেই সময়ে ব্যবহার করিত। ভারতীয় অমৃতিযন্ত্রের সহিত মিশাইয়া দেখিলে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, "কেমানজে জৌজ" অমৃতির অনুকরণ মাত্র। পারস্য অভিধানে জৌজ শব্দের অর্থ প্রাচীন ধনুর যন্ত্রকে বুঝায়, ভিয়াল বলিয়া লিখিত আছে। অমৃতির ও কেমানজে জৌজের সৌসাদৃশ্যের কারণ, তৎকালীন পারস্য দেশের সহিত এ দেশের বিশেষ সম্ভাব ছিল। ইহার অনুকরণে অনুরূপ দুইটি যন্ত্রই প্রায় একই প্রণালীতে নারিকেল-খোলের দ্বারা প্রস্তুত করা হইত। কেমানজে জৌজএর অনুকরণে ভিয়াল যে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে আর কোন মতভেদ হইতে পারে না। কেবল দেশ ও কালভেদে এই আকৃতি ও নামের পরিবর্ত্তন বা অপলাপ মাত্র। কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কেমানজে জৌজ যে ভিয়ালের পূর্ব্বে সৃষ্ট, তাহার প্রমাণ কি? ব্রসেল মহানগরের সঙ্গীতাধ্যক্ষ এফ. জে. ফিটিস তাঁহার গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে য়ুরোপে কোন ধনুর্যন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না। বিখ্যাত বেহালা-নির্ম্মাতা ষ্ট্রাডিভারীর জীবনবৃত্তান্ত রচনাকালে তিনি এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। ধনুর্যন্ত্রের আদি উৎপত্তি-বিষয়ক গ্রন্থে স্পষ্ট লেখা আছে যে, ধনুর্যন্ত্রের আদি উৎপত্তিস্থান ভারতবর্ষ। এই গ্রন্থখানি জন্ বিনাপ অনূদিত করিয়াছেন। রীজকৃত Encyclopadiaর বর্ণনার সহিত ইহার বিশেষ ঐক্য আছে।

প্রাচীন কাল বলিতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর বহু পূর্ব্বকালকে বুঝায়। তৎকালে অমৃতির অনুকরণে কেমানজে জৌজ সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সময়ে য়ুরোপে ইহার অস্তিত্বই ছিল না। এমতাবস্থায় কেমানজে হইতে ভিয়ালের প্রাচীনত্ব কোনপ্রকারে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। কাইল্ ইলস্ট্রেট ১৮৬০ আগষ্ট মাসের ৩২ খণ্ডের ষষ্ঠ অংশে লিখিত আছে "রিবেক" বলিয়া যে একপ্রকার আরব-দেশীয় ধনুর্যন্ত্র আছে, অষ্টম শতাব্দীতে আরবরা যখন স্পেন দেশ জয় করে, সেই সময় উক্ত যন্ত্র আরবরাই প্রথম য়ুরোপে প্রচার করেন। "ব্রিটানিয়া" গ্রন্থেও এইভাবে বর্ণনা আছে। রীজও তাঁহার Encyclopadiaতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ফরাসীরা রিবেক যন্ত্রকে ভাওলীন বলিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে ও দেশে ঐ প্রকার ছড়ির বা কোন ততযন্ত্র একবারেই ছিল না। রিবেক কেমানজের অনুকরণে নির্ম্মিত, কেমানজে আমাদের এ দেশীয় অমৃতির অনুকরণে নির্ম্মিত।

ভারতীয় সঙ্গীতের বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ আরথার ছইটেক ভারতীয় যন্ত্রের উল্লেখকালে বেহালার নাম করিয়াছেন। বাহুলীনের আদি উৎপত্তিস্থান যে ভারতবর্ষ, তদ্বিষয়ে আর কোন সংশয় আসিতে পারে না। খৃঃ একাদশ শতাব্দীর রিবেক ও রবাবের অনুকরণে ইটালীতে ভিয়ালের প্রথম সৃষ্টি হয়, আর সেই সময় উহাকে তিনটি তন্ত্রের দ্বারা ব্যবহার করা হইত। রবাব আরবদেশীয় আর একপ্রকার আফগানি যন্ত্রবিশেষ। পাঠান রাজসভায় উহা ব্যবহৃত হইত। রাগ-রাগিণীর আলাপ—সেতার ও বীণের ন্যায় ইহাতে সম্পাদিত হইয়া থাকে। আরবদেশে ইহার প্রথম উদ্ভব হয়। দিল্লীর সন্নিহিত রামপুর নগরে ইহার প্রচুর প্রচলন আছে। রীজ তাঁহার Encyclopadiaতে বেহালার প্রথম অভ্যুদয়ের সময় নির্দ্দেশ করেন নাই। ভাওলীন প্রাচীনকালে য়ুরোপে ভিয়াল নামে ব্যবহৃত হইত। এক. জে ফেটিস্ তাঁহার রচিত গ্রন্থে বিশেষরূপে স্বীকার করিয়াছেন,"There is nothing

in the West which has not come from the East" অর্থাৎ য়ুরোপে বা প্রতীচ্যে এমন কিছু নাই,যাহা এসিয়া বা প্রাচ্য হইতে না আসিয়াছে। পূর্ব্বে যে কেমানজে জৌজ শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে ইস্কুবার্থ "Music Hand book" নামক গ্রন্থের ২৬৫ পৃষ্ঠার লেখা আছে, জার্ম্মাণ ভাষায় বেহালাকে "Geize" বলে, ইহার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, যেমন ভিয়ালের পরিবর্ত্তে আমরা বেহালা শব্দ ব্যবহার করি, সেই প্রকার জার্ম্মাণরা কেমানজে জৌজের পরিবর্ত্তে জেজ শব্দ ব্যবহার করেন।

বাহুলীন আর্য্য শৈশব অবস্থায় দুইটি তন্ত্রে বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছিল। তৎপরে ১১০০ খৃঃ হইতে ১৭০০ খৃঃ পর্য্যন্ত এই সাত শত বৎসরের ভিতর শুনা যায়, এমন কি, ২৫।৩০টি তন্ত্রের দ্বারা শোভিত করিয়া বহুরূপে পরীক্ষা করা হইয়াছে। য়ুরোপীয় মনীষিগণ ইহাকে যথার্থ স্বরূপে লইয়া আসিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

বহুবিধ সংস্কারের পর অবশেষে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইটালি দেশের লামবার্ডির অন্তর্ভুক্ত সান নামক নগরে গাসপাত নামক জনৈক শিল্পী নবাকৃতিতে চারিটি তন্ত্রের দ্বারা ইহাকে প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। অদ্যাবধি পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমস্ত সঙ্গীতযন্ত্রের মধ্যে বাহুলীন শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এই যন্ত্র প্রায় সকল দেশেই সমাদৃত এবং এমন অপূর্ব্ব যন্ত্র আর নাই। বিস্ময়ের বিষয়, দুইখানি শুষ্ক নীরসকাঠের ভিতর এত মধুর প্রাণস্পর্শী সুর সমাবেশ থাকিতে পারে, ইহা কল্পনারও অগোচর ছিল। মানবের উর্ব্বর মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা শক্তির পরিমাপ করা যায় না। সামান্ত নারিকেল-খোল হইতে যাহার জন্ম, সেই বাহুলীন আজ সভ্য জগতের ভিতর কত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, ভাবিলে পুলকিত ও চমৎকৃত করিতে হয়।

প্রতীচ্যের বন্ধুরা আমাদের বাহুলীনকে সোহাগ করিয়া সাধারণে কত প্রকার নামে অভিহিত করিয়াছেন, বোধ হয়, তাহা অবগত হইলে অনেকের বিশেষ আনন্দ হইতে পারে, তন্নিমিত্ত সেই সমস্ত নাম কতক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। রোমবাসীরা Vidule Viola, Violin, Violum. ইহা ব্যতীত সাধারণে Fidulli, Fidulu, Fidulle, Veilla, Fidel, Videl Fidad Fiddle. ইংরাজগণ Violin. ও ইটালীবাসীরা ভিয়ালা নামে তাঁহাদের দেশে ইহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ দেশে ঐ শব্দের অপভ্রংশ সভ্য যন্ত্রের ভিতর বেহালা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহাকে পরকীয় করিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়াই এ দেশের জনসাধারণে সকলেই জানেন যে, বাহুলীন বিদেশী যন্ত্র, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বোধ হয়, এত প্রমাণ সত্বে এখন কেহ অস্বীকার করিবেন না যে, বাহুলীনের আদি জন্মস্থান এই ভারতবর্ষ।

নিয়তির চক্র যদি না ইহাকে ঐ সুদূর দেশে লইয়া যাইত, কে আজ উহাকে সভ্যযন্ত্রের ভিতর রাজ-খেতাবে ভূষিত হইয়া সমস্ত যন্ত্রের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া প্রভুত্ব করিতে দেখিত? দশে যাহাকে উচ্চস্থান দিবে ও উচ্চশিখরে লইয়া যাইবে, তাহার গতিরোধ কে করিতে পারে? এমতাবস্থায় উহাকে ভিখারীর যন্ত্র বা অন্ত কোন অপনামে অভিহিত করা আর এখন শোভা পায় না। তাহার মান-সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট সঞ্চিত হইয়াছে, এখন আর এ দেশীয় ভাবে অমর্য্যাদা ও অবহেলা করিলে চলিবে না। সে তাহার স্থান ভগবৎকৃপায় নিজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে। এখন তাহাকে উচ্চস্থান সকলকেই দিতে হইবে, কৃপণতা করিলে চলিবে না।

আমাদের বাহুলীন শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনাবস্থায় উপনীত হইয়াছে, এখন প্রতীচ্যের যে মনীষিগণ ইহার অঙ্গসৌষ্ঠবের ও বর্ত্তমান উন্নতিকল্পে তাঁহাদের শক্তি ও চিন্তা নিয়োজিত করিয়া উহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম যথাসম্ভব নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।—

খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে আরবরা স্পেনদেশ জয় করিয়া ইহাকে ঐ দেশে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পূর্ব্বের ইতিহাস আর কিছু পাওয়া যায় না।

খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে রিবেক ও রবাবের অনুকরণে ইটালীতে ভিয়ালের প্রথম প্রচার হয়, তৎপরে খৃঃ ১৬০০ ঐ দেশস্থ গাস্পতি নামক জনৈক শিল্পী প্রথম অধুনাতন অবয়বে বাহুলীন বা বেহালায় সর্ব্বপ্রথম পরিণত হয় ও তদবধি বেহালা ৪টি তন্ত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। মীজ বলেন, ১৬০০ খৃঃ বিখ্যাত আমেটি-নির্ম্মিত বেহালা নবম চার্লসের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা ফ্রান্সদেশে এখনও পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উন্নতিকল্পে তাঁহারা যথেষ্ট শক্তি, যত্ন ও স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট কাষ্ঠের জন্য সময়ে সময়ে এড্রিয়াটিক সমুদ্র পর্য্যন্ত দৌড়াইতে হইয়াছে আর তজ্জন্ত বহু কষ্ট ও প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া এই যন্ত্রকে লোকসমাজে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নে যখন বেহালা ক্রমে ক্রমে সকলের আদরের যন্ত্র হইতে আরম্ভ হইল শুনা যায়, তখন বাহুতন্ত্রীবিশিষ্ট যে সমস্ত ক্ষীণ শব্দের ভাওলীন ছিল, তৎসমুদয়ের লোপ ক্রমশঃ বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে দেখা গিয়াছিল।

আন্দ্রিনো আমেটি বেহালার সংস্কার সম্বন্ধে কিছু উন্নতি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র এণ্টোনিও এবং তাহার ব্যবসায়ের অংশীদার জিরোনিমোর নিকট বেহালা ও জনসাধারণ বিশেষরূপে ঋণী। তাঁহারা আধুনিক যন্ত্র বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংস্কার করিয়াছিলেন। ১৫৯৬-১৬৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জিরোনিমোর পুত্র নিকোলাস আমেটি পিতার আদর্শে যৎসামান্ত উন্নতি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ছাত্র আণ্টোনিয়াষ্ট্রাডিভিয়ারি Cremonaর আদর্শভুক্ত করিয়া শেষ নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন। উচ্চ ও নিম্ন অঙ্গের বেহালা নির্ম্মাণকারকগণ এই Cremonaর আদর্শে বহুসংখ্যক বেহালা নির্ম্মাণ করিয়া জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ ও উপকার করিয়াছেন। ১৭০০ খৃঃ ষ্ট্রাডিভিয়ারি মূল্যবান উৎকৃষ্ট বেহালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত বেহালা নির্ম্মাণকারকগণ আমেটির আদর্শে বেহালা গঠন করিয়াছিলেন। আলেসানড্রো গ্যাগলিয়ানো, গোয়াডগুই ফ্যানিনি পুরাতন সভ্যগণ, আনড্রিয়াস গোঁফইরি এবং তাঁহার ... জিলোপি, কোপা, গ্যাবেটী গোসিনো ক্যামিলি প্যানো... ভিনীসের সিবাকিন্ ম্যাগগেরী ক্যামিলী,ইহারা হয় ত ষ্ট্রাডিভিয়া

ছাত্র বা অনুকারক ছিলেন। টিরোলীর নিকট আবাসাম্বানে বিখ্যাত জেকব এণ্টেনার আদর্শে ইংলণ্ড, টাইরল, ও জার্ম্মাণীর বেহালা-নির্ম্মাণকারকগণ খৃঃ ১৮০০ মধ্যবর্ত্তী সময়ে সকলেই ইহার অনুকরণ করিয়াছিলেন। এণ্টেনার সম্প্রদায় প্রতিনিধি-রূপে হরণ এণ্টেনার, ব্রোটজফেমিলি বহুসংখ্যক উত্তম বেহালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ডালজব্রগের Schorm ও মুরেনব্রাগের Wilhalem ও অন্যান্য, ইহাদেরও নাম উল্লেখ-যোগ্য। ইংরাজী বেহালা-নির্ম্মাণকারকগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) প্রাচীন ইংরাজসম্প্রদায়, রেমান্ আইকুইষ্ট প্যামফিলাম, ব্যারক্ নিউমান অকস্‌ফোর্ডের ডিউক—ইহারা আপনাদের রুচি অনুযায়ী ইহাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। (২) এণ্টেনার পিটার, ওয়ামসলে, ইম্মিত, ব্যারেট, ক্রশ, হিল, এয়ারটন পোরিশ, ও অন্যান্য অনুকরণকারী। (৩) ক্রিমেনসন, ব্যাক্স, হলবরণের ডিউক, ফষ্টার বেটস, গিলার্কিস, কারটার, ফেণ্ডট, পারকার হ্যারিস মাথু, এডিনব্রগে হারডু ও অন্যান্য। পুরাতন ফরাসী নির্ম্মাতা ব্যাক্‌বেয়ে, গ্যাভিণী, প্যায়ে, গোয়েরসেন। Cremona আদর্শে লুপট আলড্রি, চ্যানেট অক দি এলডার নিকোলাস, পীইক্‌, সিলভেসটি, ভ্যাললুইম, ইহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রিমোনার আদর্শে বহুল সুন্দর সুন্দর বেহালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

বাহুলীনের জন্মকথার উপসংহারের পূর্ব্বে ইহার ছড় বা ছড়ির জন্মকথা কিছু না বলিয়াও শেষ করা বিশেষ অন্যায় মনে হয়। কারণ, বেহালার উন্নতির মেরুদণ্ড বা প্রাণরূপে সঙ্গে সঙ্গে ইহা এত সংশ্লিষ্ট যে, কোনক্রমেই উহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিতে পারা যায় না। ১৭০০ খৃঃ বেহালা যখন অতি নিম্নস্তরে অর্থাৎ বংকালে ইহার প্রচলন ও ইহার অস্তিত্ব অতি ঘনান্ধকারে আবৃত ছিল, সে অবস্থায় ছড়ির আদি নির্ম্মাণকর্ত্তা বিখ্যাত Francois Tourti of Paris ইহার অসমসাহসিক সংস্কার-ভার লইয়া ইহাকে ১৭৮০ খৃঃ ভিতর অতি উচ্চস্থানে লইয়া গিয়াছিলেন। ইহার সংস্কার এত উচ্চ অঙ্গের হইয়াছিল যে, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আর কাহারও সাহায্য আবশ্যক হয় নাই। ইহাও অতি সত্য যে, বাহুলীন এত উচ্চস্থান অধিকার করিত না, যদি এই ছড়ির অতি সূক্ষ্ম সুর ও তন্ত্রের অপূর্ব্ব মধুর কম্পন বেহালাকে মুখর করিতে না পারিত। ইহার মূলে আর একটি মহাসত্য রহিয়াছে—যাহা এ স্থলে উল্লেখ না করিলে বিশেষ অপরাধের ভাগী হইতে হয়। সেটি ঐ দেশীয় মনীষি-গণের দৈবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বৈজ্ঞানিক নিয়মসঙ্গত সঙ্গীত বিরচন। ঐ দেশবাসিগণ সকলেই উহার মধুর গুণে মুগ্ধ হইয়া উহাকে বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিখ্যাত স্বরসংযোগ-রচয়িতা মনীষিগণ যথা Tartinia, Corelli, Spohr, Veotti ইত্যাদি বেহালার কথা ও আলাপের দ্বারা বিশ্বকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, অসাধারণ নাদপদ্ধতি হৃদয়ের মর্ম্মোচ্ছ্বাসশক্তির বিকাশের সহায়ক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

দিনাজপুর বৌদ্ধ-চিহ্ন-ভগ্নাবশেষ

দিনাজপুর ডিষ্ট্রিক্টের পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশে বগুড়ার নিকটবর্ত্তী বৌদ্ধ-চিহ্নের কতকাংশ এবং পালরাজবংশীয় রাজন্যবৃন্দের অতীতকীর্ত্তি-কাহিনীর অনেক প্রমাণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। চীন পরি-ব্রাজক হুয়েনসাঙ্গ যে সময়ে ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি পৌণ্ড্রদেশ নামে একটি সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। করতোয়া-নদীতীরে গোবিন্দগঞ্জের নিকট-বর্ত্তী 'বর্দ্ধনকুটি' বা বর্দ্ধনকুট নামে যে স্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের মতে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, সেই স্থানেই পৌণ্ড্রদেশের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পৌণ্ড্রদেশ এক সময়ে অতি বিস্তৃত ও বহুজনাকীর্ণ জনপদ ছিল। মিঃ সণ্ডার্সন ওরিয়েণ্টাল কোয়ার্টারলি ম্যাগেজিনের ৪র্থ খণ্ডে হুয়েনসাঙ্গের সম্বন্ধে অনেক বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বর্দ্ধনকোট নিবৃত্তি-রাজ্যের একটি প্রধান নগর। ইহার অধিকাংশ অধীশ্বর এক জন যবন, তিনি নিবৃত্তি-রাজ্যের বিস্তার করিয়াছিলেন। কোচবিহার হইতে রংপুর, দিনাজপুর এবং আরও পরবর্ত্তী দেশসমূহ পর্য্যন্ত উহা বিস্তৃত ছিল।

সেন-রাজগণ ঢাকা বিক্রমপুর যাইয়া বসতি করিবার সময়েও এতদ্দেশ পালরাজাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। বর্দ্ধনকুটের ৮০ মাইল উত্তরে একটি ভগ্নাবশেষ দুর্গ দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ দুর্গকে মহাত্মা ধর্ম্মপালের দুর্গ বলিয়া থাকে। বঙ্গদেশে যখন সেন-বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন, সে সময়ে পাল-রাজ-গণ করতোয়ার পূর্ব্বাংশ দেশসমূহে রাজত্ব করিতেছিলেন। পাল-রাজগণও দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়েও ঐ সমস্ত প্রদেশে তাঁহাদের অতীত কীর্ত্তির অনেক নিদর্শন বিদ্যমান।

গোবিন্দগঞ্জের ৪০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে "পাহাড়পুর" নামে একটি গ্রাম আছে, এ স্থানে একটি উচ্চ ইষ্টকস্তূপ পরিদৃশ্যমান হয়। ঐ স্থানটি এক সময়ে একটি বৌদ্ধস্তূপ ছিল বলিয়া অনেকেই ধারণা করেন। ডাঃ বুকানন তাঁহার লিখিত দিনাজ-পুর-বিবরণীর মধ্যে ঐ স্তূপটির বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত ইষ্টকস্তূপটির উচ্চতা ১ শত হইতে ১ শত ৫০ ফুট হইবে। ইহার চতুর্দ্দিকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল। ডাঃ বুকানন যখন ইহার উপর অধিরোহণ করিয়াছিলেন, তখনও তিনি অর্দ্ধপথে ৩খানি বৃহৎ প্রস্তর দেখিয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ ওয়েষ্টমেকট যখন ইহা পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি সেগুলি অনুসন্ধান করিয়া পান নাই, প্রস্তর তিনখানিতে কোনও ক্ষোদিত লিপি ছিল না। ডাঃ বুকানন বলেন, ঐ স্তূপের নিকটবর্ত্তী বৃক্ষের পার্শ্বে একটি ইষ্টক-গৃহ ছিল, তাহার পূর্ব্ব-পশ্চিমদিকে একটি কুলুঙ্গি তিনি দেখিয়াছিলেন। ডাঃ বুকানন শুনিয়াছিলেন যে, বহুকাল পূর্ব্বে এই গৃহে এক জন মুসলমান ফকির থাকিতেন। এই ইষ্টক-স্তূপের চতুর্দ্দিক্ চতুষ্কোণ প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল, ভগ্নাবশিষ্ট প্রাচীরের ইষ্টকস্তূপ অদ্যাপি পড়িয়া আছে। উল্লিখিত প্রাচীরের প্রত্যেক অংশ ৪ শত গজ দীর্ঘ ছিল। প্রাচীর-বেষ্টিত ইষ্টক-স্তূপের উপরেও এখন বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি জন্মিয়াছে। কিন্তু প্রধান স্তূপ ও প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী যে প্রাঙ্গণ ছিল, তাহা

পরিষ্কার। এই প্রাঙ্গণের মধ্যে পুষ্করিণী আছে। প্রাঙ্গণের মধ্যে যে গৃহাদিও ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাঙ্গণটির দৈর্ঘ্য ও বিস্তার দেখিয়া অনেকেরই ধারণা হয়, এখানে একটি দুর্গ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ডাঃ বুকানন বলেন যে, তিনি কোনরূপ খাল বা পরিখার চিহ্ন পান নাই। প্রধান স্তূপটির গঠনপ্রণালীও সেরূপ নহে। ডাঃ বুকানন অনুমান করেন যে, এই স্তূপটি একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। ইহার শিখরদেশে যে গৃহটি তিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার অনুমান, সেইটিই এই মন্দিরের দেহায়তন ছিল এবং ইহার তলভাগের গঠন ও উচ্চতা দৃষ্টে অনুমান করিয়াছেন যে, ইহা নেপালের বুদ্ধ-মন্দিরের ন্যায় নিরেট বা পূর্ণগর্ভ ছিল। যদি ইহা শূন্যগর্ভ হইত, তাহা হইলে ইহার গঠন অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত হওয়াই সম্ভব ছিল।

মিঃ ওয়েষ্টমেকট অনুমান করেন যে, দিনাজপুর যেরূপ নাবাল-ভূমি, তাহাতে এই প্রাচীরের ভগ্নাবশেষগুলি মঠ-গৃহের ভিত্তিভাগ হওয়াই বেশী সম্ভব, এই স্থান হইতে ঈষৎ উত্তর-পশ্চিমে ৫ মাইল দূরে যোগি-গুহানামক ভূগর্ভস্থ গহ্বর-গৃহ বিদ্যমান। ইহাও বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, পর্ব্বতগাত্র ক্ষোদিত করিয়া বা পর্ব্বত-গুহায় যে সকল মন্দির-মঠ-চৈত্য-বিহারাদি নির্ম্মিত হইত, তাহা গুহামন্দির নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। ভূগর্ভে ঐরূপ উপাসনা-স্থান নির্ম্মিত হইলে "যোপা" এই আখ্যা প্রাপ্ত হইত। অনেক স্থলে পার্ব্বতীয় গুহাকে যোপা নামে উল্লেখ করিতে শুনা যায়। যোপা শব্দের সাধারণতঃ অর্থ "গহ্বর।" এই যোগি-যোপার মধ্যে একখানি ২১ ইঞ্চি দীর্ঘ প্রস্তরফলকে একটি বুদ্ধ চিত্র আছে। মায়া দেবী (বুদ্ধ-জননী) অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় অবস্থিতা, কোলের নিকটে শিশু বুদ্ধ শায়িত, চতুর্দ্দিকে সখীগণ উপস্থিত। আর একখানি ৪০ ইঞ্চি দীর্ঘ প্রস্তরফলকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি। এই সকল ক্ষোদিত মূর্ত্তির কিছুই বিকৃতি ঘটে নাই।

খোতলাল থানার অন্তর্গত স্থানে এই যোগি যোপের প্রতিমাগুলির ন্যায় প্রতিমা আছে। সে প্রতিমাগুলি সংখ্যায় চারিটি, গ্রাম্য দেবতারূপে ইহারা পূজিত ও প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে একটি বৌদ্ধ ও অন্য তিনটি শৈবমূর্ত্তি। মিঃ ওয়েষ্টমেকট এগুলির সহিত যোগি-যোপার প্রতিমা ও শিবলিপির সৌসাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। খোতলাল থানায় ঐ চারিটি প্রতিমার মধ্যে একখানি ৩২ ইঞ্চি প্রস্তরে মায়া দেবী বাম পদে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ পদের হাঁটু বাঁকাইয়া বাম হস্তে মস্তক রাখিয়া শুইয়া আছেন। শিশু বুদ্ধ নিকটে বালিস মাথায় দিয়া শুইয়া আছেন। উপরে ক্ষোদিত কারুকার্য্যের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ১০টি উপবিষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি বিদ্যমান। ইহা সম্ভবতঃ ৯।১০ম খৃষ্টীয় শতাব্দীতে ক্ষোদিত হইয়া থাকিবে। দ্বিতীয় একখানি ১২ ইঞ্চি ফলকে একটি পদ্মোপরি উপবিষ্ট মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটির মুখভাগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটি দ্বিভুজ। উহার নিম্নদেশে দুইটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি। একের মুখে বংশীবৎ যন্ত্র, অপরের হস্তে কমালবৎ বস্ত্র আছে। যেন বাদক ও নর্ত্তক। মিঃ ওয়েষ্টমেকট অনুমান করেন যে, ইহা বুদ্ধ-প্রতিমার ভগ্নাবশেষ। তৃতীয় ফলকে দুইটি স্ত্রী-পুরুষ-মূর্ত্তি, উভয়ে প্রেমসম্ভাষণে মগ্ন। পুরুষটি চতুর্ভুজ, তন্নিম্নে একটি বৃষ; স্ত্রীটি দ্বিভুজ। তন্নিম্নে একটি সিংহ। মিঃ ওয়েষ্টমেকটের মতে ইহা শিব-পার্ব্বতীর প্রতিমা। এই ফলকখানি ২৩ ইঞ্চি দীর্ঘ ও প্রস্থ ১৪ ইঞ্চি, ৪র্থ একখানি দীর্ঘ ৩৮ ইঞ্চি ও প্রস্থ ২০ ইঞ্চি ফলকে একটি পদ্মারূঢ়া দেবতামূর্ত্তি, এই মূর্ত্তির অনেকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার ভগ্নাংশ দৃষ্টে অনুমান হয় যে, ইহা সম্ভবতঃ চতুর্ভুজা ছিল। প্রতিমার উভয় পার্শ্বে একটি সিংহ ও একটি হস্তী। কুম্ভের উপর সম্মুখের দুই পদে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হস্তী দুইটি শুঁড়ি মারিয়া বসিয়া আছে। যোগিযোপার নারায়ণ-প্রতিমাতেও ঐরূপ সিংহ-হস্তিমূর্ত্তি আছে। এই প্রতিমাগুলি বৌদ্ধগণের নির্ম্মিত নহে।

পাল-বংশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক এই সকল মূর্ত্তি ক্ষোদিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। এই প্রতিমার নিকটেই শিবলিঙ্গ অদ্ধ এবং একটি গ্রানেট পাথরের থাম ছিল। মিঃ ওয়েষ্টমেকট এই থামটি আনিয়া খোতলাল থানার এক পার্শ্বে স্থাপন করেন।

পাহাড়পুর স্তূপের ১১ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ও পানছিবি থানার পূর্ব্বে তুলসীগঙ্গা নদীতীরে নিমাই সা নামক এক মুসলমান ফকিরের আস্তানা। এই স্থানে নদীগর্ভে বহু-সংখ্যক প্রস্তরখণ্ড থাকায় এই স্থানকে পাথরঘাটা বলে। জেনারল কানিংহাম বলিয়াছেন যে, মুসলমানের অধিকাংশ মঠ, মস্‌জিদ হিন্দুদিগের। হিন্দুদিগের মঠ-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর উহা নির্ম্মিত, ইহা অতি সত্য কথা। এই সামান্য মঠও তাহাই; কারণ, ইহার নিকট একটি নাতিবৃহৎ বৌদ্ধস্তূপের ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টকস্তূপ আছে। মিঃ ওয়েষ্টমেকট দেখিয়াছিলেন যে, এই ভগ্নাবশেষ হইতেই যে এই মুসলমান দরগার উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহারও চিহ্ন বর্ত্তমান। এই বৌদ্ধস্তূপটি হয় পাহাড়পুর স্তূপ অপেক্ষা ক্ষুদ্রকায় ছিল, নয় ত ইহার প্রধানাংশ তুলসীগঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। তুলসীগঙ্গার গর্ভে প্রস্তরবহুলতার কারণ, সম্ভবতঃ ইহাই হইতে পারে। ঐ সকল প্রস্তরের মধ্যে মিঃ ওয়েষ্টমেকট একটি বৃহৎ বুদ্ধ-প্রতিমার মুণ্ড ও স্কন্ধভাগের ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে উত্তর-পশ্চিমে এক মাইল দূরে মহীপুর নামে একটি স্থান আছে। ডাঃ বুকানন বলেন, ইহা পাল-রাজবংশীয় রাজা মহীপালের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। ইহারই নিকটে আতাপুর নামক স্থানেও ঐরূপ বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। তাহা উষাপালের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বলিয়া খ্যাত। ঠিক এই সকল স্থানে লোকাবাস নাই। মহীপাল হইতে মহীপুর ও মহীপাল দীঘির নামকরণ হইয়াছে। মহীপাল রংপুরের অন্তর্গত মহীগঞ্জ সহরের ৪৫ মাইল উত্তর-[illegible] অবস্থিত। আত্রেয়ী নদীর তীরে একটি মুসলমান [illegible] অবস্থিতিস্থানকে মহীসন্তোষ বলে। ইহা সন্তোষ [illegible] পরগণায় অবস্থিত বলিয়া বোধ হয় এই নাম পাইয়াছে। [illegible] সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে ঐ স্থান মহীসন্তোষ নামে বৌদ্ধ [illegible] ছিল। পাহাড়পুরস্তূপের ৯ মাইল দক্ষিণে যে স্থান দিয়া [illegible] বঙ্গ রেলপথ চলিয়া গিয়াছে, সেই স্থানে পূর্ব্বে একটি বৃহৎ [illegible] ছিল। কারণ, এই স্থানে জঙ্গলের মধ্যে বহুতর ইষ্টক [illegible] ভগ্নাবশেষ আছে। ঐ সকল ইষ্টকের পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ১০ [illegible]

প্রস্থে ১০ ইঞ্চি এবং মোটা দেড় ইঞ্চি হইবে। এত বড় ইষ্টক-স্তূপ বোধ হয় পালরাজগণই প্রস্তুত করাইতেন।

পাহাড়পুর স্তূপের ২০ মাইল উত্তরে করতোয়া-তীরে রাজবাড়ী নামে একটি প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আছে। বাগজনা নামক স্থানে মিঃ ওয়েষ্টমেকট এই ভগ্ন প্রাসাদের এক খণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত একখানা গোবরাট দেখিয়াছিলেন। এই গোবরাটের কারুকার্য্য অতি সুন্দর।

যোগিঘোপার নিকটে যে বহু বিস্তৃত ইষ্টকালয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, তাহা দেবপালের প্রাসাদের অবশিষ্টাংশ। যোগিঘোপার যে প্রতিমাগুলি আছে, তন্মধ্যে একটি স্ত্রী-মূর্ত্তি দেখাইয়া এখানকার পূজারীরা বলে যে, এই দেবপালের কন্যা বিমলা দেবীর প্রতিমা। এই স্থানে একটি বিল আছে, বিল পার হইয়া উত্তরপূর্ব্বে দুই মাইল যাইলে চণ্ডীর নামক স্থানে আবার ঐরূপ আরও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়, উহা চন্দ্রপালের প্রাসাদ ছিল। ফটক ও ধোজেনা নামক স্থানেও ঐরূপ আরও ইষ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষ আছে। প্রধান স্তূপের ৭ মাইল উত্তরে বিখ্যাত বুদালস্তম্ভ। নারায়ণপালের মন্ত্রী ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ইহার গাত্রে ক্ষোদিত লিপিতে দেবপাল ও সুরপাল, নারায়ণপালের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বুদাল স্তম্ভের ৪২ মাইল উত্তরে বিখ্যাত আমগাছি ফলক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল স্থান খনন ও অনুসন্ধান করিলে বাঙ্গালার পালরাজত্বের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক বিষয় জ্ঞাত হওয়া যাইবে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

এক্ষণে স্বতঃই মনে উদিত হয় যে, পালবংশীয় রাজারা কোন্ জাতি?

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে রামচরিত কাব্য সংগ্রহ করিয়া ঐতিহাসিকগণের গবেষণার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। পালবংশীয়গণ কোন্ জাতি ছিলেন, তাহার আলোচনা চলিতেছে। খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, "সর্ব্ববিদ্যাবদাত" দয়িত বিষ্ণু এক জন সামন্ত রাজা ছিলেন। দয়িত বিষ্ণুর পুত্র বপ্যট, এই বপ্যটের পুত্র গোপালদেবকেই প্রকৃতিপুঞ্জ "মাৎস্যন্যায়" (অরাজকতা) দূর করিবার জন্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। গোপাল হইতেই প্রকৃতপ্রস্তাবে পালবংশীয়গণ গৌড়ের সম্রাট হয়েন।

শ্রীছুটবিহারী চক্রবর্ত্তী (ডাক্তার)।

বাদশাহ আলমগীর ও ইংরাজ বণিক

(ঐতিহাসিক চিত্র)

মোগল শাসনকালের শেষভাগে বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার বিরুদ্ধে ইংরাজ বণিক অস্ত্রধারণ করিয়া রাজমুকুট এক প্রকার করায়ত্ত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বাণিজ্যব্যপদেশে ইংরাজ বণিকের বঙ্গদেশে ইহাই প্রথম অস্ত্রধারণ নহে। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী বাদশাহ আলমগীরের শাসনকালেও ইংরাজ বণিকগণ বাদশাহের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে ইংরাজের সাহসের পরিচয় পাইলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তবে প্রাচ্যাকাশে তখন ইংরাজের ভাগ্যোদয়ের সূচনা প্রকাশ পাইতেছিল, তাই বাদশাহ আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াও ইংরাজ তাঁহার রোষানলে ভস্মীভূত না হইয়া পুনরায় সহানুভূতিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। আলমগীর বাদশাহের শাসনকালে তাঁহার জবরদস্ত সুবেদার নবাব সায়েস্তা খাঁর সহিত তাৎকালীন ইংরাজ বণিকগণের সংঘর্ষকাহিনী আমরা এই আখ্যায়িকায় বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইব।

ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণ অবগত আছেন যে, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের শাসনকালেই স্যর টমাস রো ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধিরূপে বাদশাহ-দরবারে উপস্থিত হইয়া বিবিধ সৌখীন সামগ্রী উপহার প্রদানে বাদশাহের প্রসাদলাভে সমর্থ হন এবং তাঁহারই প্রদত্ত সনন্দের বলে বঙ্গদেশ ও বিহারে বাণিজ্য চালাইবার ও বাণিজ্যকুঠী নির্ম্মাণ করিবার অধিকার লাভ করেন। পরবর্ত্তী কালে বাদশাহ শাহজাহানের সময় সুবিখ্যাত ইংরাজ ডাক্তার গেব্রিয়েল ব্রাউটন অগ্নিদগ্ধা বাদশাহ-নন্দিনীকে সুচিকিৎসায় আরোগ্য করিয়া তাহার পুরস্কারস্বরূপ বঙ্গদেশ ও বিহারে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। শাহজাদা সুজা তখন বঙ্গের সুবেদার। ডাক্তার ব্রাউটন রাজমহলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সম্রাটের সনন্দ প্রদর্শন করেন। উদারমতি সুজা ডাক্তারকে সাদরে গ্রহণ করিয়া পিপলী, বালেশ্বর ও হুগলীতে ইংরাজ বণিকগণকে বাণিজ্য-কুঠী নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি প্রদান করেন।

সুজার পতনের পর নূতন বাদশাহ আওরঙ্গজেবের আদেশে মীরজুমলা বাঙ্গালার সুবেদার হইয়া আসেন। ইহার শাসনকালে হুগলীর মোগল ফৌজদার ইংরাজ বণিকগণের বাণিজ্যের উপর বার্ষিক তিন সহস্র মুদ্রা 'পেশকুস' বা শুল্ক ধার্য্য করেন এবং নবাব মীরজুমলা তাহা মঞ্জুর করিয়া যথারীতি উক্ত শুল্ক আদায়ের আদেশ দেন। ভূতপূর্ব্ব বাদশাহ শাজাহানের সনন্দের অধিকারে ইংরাজ বণিকগণ শুল্ক প্রদানে অসম্মতি প্রকাশ করিলে মীরজুমলা ইংরাজের সোরা-বোঝাই কয়েকখানি নৌকা আটক করেন। তাহাতে ইংরাজদের পাটনার ব্যবসায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ইংরাজগণ উত্তেজনাবশে পরিণাম চিন্তা না করিয়াই নবাব মীরজুমলার একখানি নৌকা অবরোধ করিয়া বসিলেন। ইহাতে মীরজুমলার ক্রোধানল বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তিনি বঙ্গদেশ হইতে ইংরাজ বণিকগণের উচ্ছেদসাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। তখন ইংরাজগণ প্রমাদ গণিয়া তাঁহার পোত প্রত্যার্পণ পূর্ব্বক এই অত্যাচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মীরজুমলা তখন কুচবিহারের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছিলেন, সম্ভবতঃ এই জন্যই ইংরাজ বণিকগণ তাঁহার নিকট মার্জ্জনালাভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মীরজুমলা ইংরাজগণকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিয়া মার্জ্জনা করিলেন বটে, কিন্তু হুগলীর ফৌজদার তাঁহাদের বাণিজ্যের উপর যে শুল্ক নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, তাহা বাহাল রাখিলেন এবং উপরন্তু ইহাও আদেশ

করিলেন যে, অতঃপর ইংরাজের কোনও বাণিজ্যপোত গঙ্গাবক্ষে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

মীরজুমলার পর বাদশাহ আলমগীরের অন্যতম প্রিয়পাত্র ও কার্য্যদক্ষ বিচক্ষণ সেনাপতি সায়েস্তা খাঁ বঙ্গের সুবেদার নিযুক্ত হন। ইঁহার শাসনকালে ইংরাজের বাণিজ্য বিশেষভাবে উন্নতিলাভ করে। সায়েস্তা খাঁ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে গঙ্গাবক্ষে পুনরায় পোত চালনা করিবার অনুমতি প্রদান করেন। নবাবের এই অনুমতির সুযোগ গ্রহণ পূর্ব্বক চতুর ইংরাজ কোম্পানী এই সময় হইতে রীতিমত পোতবহর প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হন। সায়েস্তা খাঁর শাসনকালেই ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ও দিনেমাররা বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নবাব সায়েস্তা খাঁ ইংরাজগণকে বাণিজ্য সম্বন্ধে সুবিধা প্রদান করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু শুল্ক হইতে অব্যাহতি দেন নাই।

সায়েস্তা খাঁর পর আজিম খাঁ বাঙ্গালার ভাগ্যবিধাতা হইয়া ইংরাজগণকে আবার বিব্রত করিয়া তুলিলেন। এই সময় দিনেমারগণ বঙ্গদেশে উপদ্রব আরম্ভ করায় বাদশাহ আলমগীর তাহাদিগের বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ প্রদান করেন। ইংরাজ বণিকগণ প্রথম হইতেই নবাব আজিম খাঁর কোপে পড়িয়াছিলেন। দিনেমারদিগের উচ্ছেদসূত্রে নবাব আজিম খাঁ ইংরাজ বণিকের গঙ্গাবক্ষে স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলেন এবং প্রতিপদক্ষেপেই তাঁহাদিগকে বাঙ্গালার নবাবের প্রভুশক্তি স্বীকার করাইতে বাধ্য করিলেন। এক বৎসরমাত্র এই ভাবে নবাবী করিয়া আজিম খাঁ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুকে ইংরাজ বণিকগণ বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলিয়াই মনে করিলেন। কিন্তু আজিম খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার দেওয়ান সুফি খাঁ বাদশাহের আদেশে বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ইনিও ইংরাজের পরম শত্রু ছিলেন। ইনি বঙ্গের মসনদে বসিয়াই হুকুম জারি করিলেন যে, সুরাটে ইংরাজ-বণিকগণের নিকট হইতে শতকরা সাড়ে তিন টাকা হারে শুল্ক আদায় করা হইয়াছিল, সুতরাং বঙ্গদেশেও তাহারা সেই হারে শুল্ক প্রদান করিতে অতঃপর বাধ্য হইবে। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যসংশ্রবে এই সকল অসুবিধার নিরাকরণকল্পে ইংরাজ বণিকগণ এবার সরাসরি বাদশাহের দরবারে তাঁহাদের সমূহ অভিযোগ জ্ঞাপন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

এই সময় ওয়ালটার ক্ল্যাডেল নামক জনৈক ইংরাজ বাদশাহ আলমগীরের দরবারে ভূতপূর্ব্ব বাদশাহ শাজাহানের সনন্দ পেশ করিয়া শুল্ক-প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইবার আবেদন উপস্থাপিত করেন। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বাদশাহ উক্ত আবেদন সম্বন্ধে এই মর্ম্মে এক আদেশপত্র প্রচার করিলেন,—প্রবলপরাক্রান্ত বাদশাহ শাজাহান ও শাহজাদা সুলতান সাসুজা প্রদত্ত আদেশপত্র অনুসারে ইংরাজ কোম্পানীর আমদানী-ক্রীত-বিক্রীত কোনও পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক গৃহীত হইত না। সুতরাং এতদ্বারা আমিও উক্ত হুকুমনামা দুইটি বলবৎ রাখিয়া আমার আদেশ প্রচার করিতেছি যে, আমার সাম্রাজ্যের মধ্যে ইহারা যে সকল পণ্য আমদানী করিবেন অথবা আমার সাম্রাজ্য হইতে ইহারা সোরা বা অন্যান্য যে সকল সামগ্রী সমুদ্রপথে রপ্তানী করিবেন, সে সকল দ্রব্যের শুল্ক গৃহীত হইবে না। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা এ সম্বন্ধে কোনওরূপ বাধা বা উদ্বেগের সৃষ্টি না করিয়া অবাধে ইহাদের পণ্য-সামগ্রী ছাড়িয়া দিবেন। যদ্যপি আমার রাজ্যের কোনও প্রজা প্রকৃতপক্ষে এই ইংরাজ কোম্পানীর নিকট ঋণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই ঋণ যাহাতে আদায় হইতে পারে, সে বিষয়ে শাসনকর্ত্তারা অবহিত হইবেন। সম্প্রতি দিনেমারগণ আমার রাজ্যে গর্হিত আচরণ করায়, আমি তাহাদের বাণিজ্য বন্ধ করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছি এবং আমার উক্ত আদেশের সুযোগ গ্রহণ করিয়া এই সূত্রে প্রাদেশিক কর্ম্মচারিগণ ইংরাজ কোম্পানীর বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদের সমূহ ক্ষতিসাধন করিয়াছেন। কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, দিনেমারদের ব্যবসায়ের সহিত ইংরাজের ব্যবসায়ও আমি বন্ধ করিবার আদেশ দিই নাই এবং তাহার প্রয়োজনও হয় নাই। কেন না, ইংরাজরা আমার সাম্রাজ্যের মধ্যে কোনও গর্হিত আচরণ করে নাই। অতএব, এখন হইতে তাহাদের বাণিজ্য-বিষয়ে কেহ যেন কোনওরূপ বাধা প্রদান না করেন ও তাহাদের কর্ম্মচারিগণের খরিদ-বিক্রয়ে কোনওরূপ অসুবিধা বা ব্যাঘাত উপস্থিত করা না হয়। অতঃপর আমার কর্ম্মচারিগণের বিরুদ্ধে এই ইংরাজ বণিকগণ কোনওরূপ অভিযোগ উপস্থাপিত না করিলেই আমি সুখী হইব। আমার এই আদেশ যেন বর্ণে বর্ণে পালিত হয়।

বাদশাহের স্বাক্ষরিত এই সনন্দ লইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেণ্ট ওয়ালটার ক্ল্যাডেল ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই হুগলী বন্দরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ঐ দিন ইংরাজ বণিকগণের আনন্দের অবধি ছিল না। তাঁহারা তাঁহাদের বাণিজ্যপোত-সমূহ হইতে তোপধ্বনি সহকারে মহাসমারোহে বাদশাহের এই ফারমান গ্রহণ করিলেন। এই সময় বাদশাহ আলমগীর সায়েস্তা খাঁকে পুনরায় বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে নবাব সায়েস্তা খাঁর দ্বিতীয় শাসনকাল।

এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ মাদ্রাজে স্থিত কোম্পানীর অধীনভাবেই বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতেছিলেন। কিন্তু এক্ষণে বাদশাহের নিকট হইতে স্বাধীন ভাবে বাণিজ্য করিবার চিরস্থায়ী অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশীয় কোম্পানী মাদ্রাজ কোম্পানীর অধীনতা-পাশ ছেদন পূর্ব্বক বাণিজ্য সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ হেজেস্ বঙ্গদেশীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি বা গবর্ণর নিযুক্ত হন। ইনিই বঙ্গদেশে ইংরাজ কোম্পানীর প্রথম গবর্ণর। বঙ্গোপসাগরের উপকূল হইতে বঙ্গদেশস্থিত তাবৎ ইংরাজ কুঠীই তাঁহার শাসনাধীন বলিয়া সাব্যস্ত হয়। গবর্ণর হেজেস্ হুগলীতেই তাঁহার আবাসস্থান নির্দ্ধারিত করেন। তদনুসারে তাঁহার পদমর্য্যাদা-রক্ষাকল্পে তাঁহার অধীনে কয়েক জন শরীররক্ষক ইংরাজ কর্ম্মচারী এবং ২০ জন সৈনিক রক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। হুগলীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেনা-সংস্থাপনের ইহাই প্রথম সোপান এবং বঙ্গে ইংরাজের শক্তি-প্রতিষ্ঠার ইহাই প্রাথমিক সূচনা।

ফলতঃ বাদশাহের অনুগ্রহে বঙ্গের সুযোগ্য নবাব সায়েস্তা খাঁর আনুকূল্যে ইংরাজ কোম্পানীর বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রতিপত্তিও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। আশার উৎসাহে ইংরাজ কোম্পানী ক্রমশঃই বেশ গুছাইয়া উঠিতেছিলেন। ক্রমশঃ অধিকতর অধিকার ও গঙ্গাবক্ষে আপনাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্ম ইংরাজ কোম্পানী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং এই সূত্রে পুনরায় নবাবের সহিত তাঁহাদের মনোমালিন্ত উপস্থিত হইল। ঠিক এই সময় 'কাকতালীয়বৎ' এমন কতকগুলি ঘটনা উপস্থিত হইল, যাহার আবর্ত্তে পড়িয়া ইংরাজ কোম্পানীর সৌভাগ্য-তপন আবার কিছু কালের জন্ম তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

বঙ্গদেশ হইতে যে সকল সামগ্রী ইংরাজ কোম্পানী ইংলণ্ডে রপ্তানী করিতেন, তাহাদের মধ্যে সোরাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। প্রতি বৎসর গড়ে ২৮ হাজার মণ সোরা এই ভাবে রপ্তানী হইত। এই ভাবে প্রাচ্যদেশ হইতে প্রতীচ্যে প্রচুর সোরা রপ্তানীর কাহিনী তৎকালে সমগ্র প্রতীচ্য-জগতে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় বিহারের জমীদার গঙ্গারাম সিংহ বিদ্রোহ উপস্থিত করেন, বিদ্রোহীরা পাটনা অধিকার করিবার প্রয়াস পায়। নবাব সায়েস্তা খাঁ তখন পাটনায় ছিলেন। বিদ্রোহীদের সংখ্যাধিক্য দর্শনে ভীত হইয়া তিনি পাটনার সিংহদ্বার বন্ধ করিয়া রাখিতে বাধ্য হন। অনতিবিলম্বে বারাণসী ও ঢাকা হইতে সৈন্ত আনাইয়া নবাব বিদ্রোহ দমন করেন। এই বিদ্রোহের সময় পাটনা ও তাহার সন্নিহিত স্থান-সমূহের সম্পন্ন অধিবাসী ও ব্যবসায়িগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পাটনা হইতে কয়েক ক্রোশমাত্র দূরে অবস্থিত সিঙ্গী নামক স্থানে ইংরাজ কোম্পানীর সোরার আড়তটিকে বিদ্রোহের আবর্ত্ত হইতে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ দেখিয়া নবাব বিস্মিত হন। এই সময় বিশ্বস্ত সূত্রে নবাব অবগত হন যে ইংরাজ কোম্পানী গোপনে গোপনে বিদ্রোহী পক্ষের সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহাতে নবাব ইংরাজ কোম্পানীর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন ও দৃঢ় আদেশ করিলেন যে, অতঃপর ইংরাজরা এ দেশ হইতে এক রতি-পরিমাণ সোরাও বিদেশে রপ্তানী করিতে পারিবে না। শুধু এই আদেশ দিয়াই নবাব নিরস্ত হইলেন না, পাটনার ইংরাজ কোম্পানীর অধ্যক্ষ পিকক্ সাহেবকে অবিলম্বে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। ইহাকে উদ্ধার করিতে ইংরাজ কোম্পানীকে বহুল আয়াস ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল।

ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের সিদ্ধান্ত এই যে, নবাব সায়েস্তা খাঁর সোরা রপ্তানী সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞার মূলে বাদশাহ আলমগীরের আদেশ প্রচ্ছন্ন ছিল। এই সময় মক্কার প্রধান মোল্লা বাদশাহ আলমগীরকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন যে, বিদেশীয়গণ তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার রাজ্য হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর সোরা তাহাদের দেশে পাঠাইতেছে এবং সেই সোরায় বারুদ প্রস্তুত হইয়া হজরৎ মহম্মদের ভক্তগণকে হত্যা করিবার উপাদানস্বরূপ ব্যবহৃত হয়, সুতরাং অবিলম্বে উহার রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।—মক্কার মালিকের এই আদেশ-পত্র পাইয়াই নাকি ধর্ম্মান্ধ বাদশাহের বিবেকবুদ্ধি বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে এবং সোরা রপ্তানী বন্ধ করিবার জন্ম নবাবের উপর পরোয়ানা আসে। সে যাহা হউক, নবাব সায়েস্তা খাঁ ইংরাজ কোম্পানীকে বিহারের বিদ্রোহিগণের পরিপোষক সাব্যস্ত করিয়াই তাহাদিগকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন এবং এই সময় হইতে ইংরাজগণ তাঁহার বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন।

মিঃ হোজেসের পর মিঃ গিফোর্ড হুগলীতে ইংরাজ কোম্পানীর গভর্ণর হইয়া আসেন। ইনি ইংরাজ বণিকের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়ে নবাব সায়েস্তা খাঁর দরবারে এই মর্ম্মে এক আবেদন করিলেন যে, কোম্পানীর ধনসম্পত্তি ও কর্ম্মচারিগণকে নিরাপদে রাখিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা গঙ্গার মোহনায় অথবা গঙ্গাতীরবর্ত্তী কোনও সুবিধাজনক স্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন।—কিন্তু বিচক্ষণ বহুদর্শী নবাব সায়েস্তা খাঁ ইংরাজ কোম্পানীর এই আবেদন উপেক্ষার সহিত অগ্রাহ্য করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের উপর নূতন আদেশ জ্ঞাপন করিলেন যে, যদিও ইংরাজ বণিকগণ বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার সনন্দ বাদশাহের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাপি অতঃপর তাঁহাদিগকে আমদানী মালের উপর শতকরা সাড়ে তিন টাকা হিসাবে শুল্ক প্রদান করিতে হইবে।—বাদশাহ আলমগীর ইংরাজ বণিকগণকে বাণিজ্য-শুল্ক হইতে মুক্তি প্রদান করিলেও, বাঙ্গালার সুবেদার তাঁহাদিগের নিকট হইতে প্রতি বৎসর করস্বরূপ ৩ হাজার টাকা আদায় করিতেন, এক্ষণে নবাব সায়েস্তা খাঁ, উক্ত করের উপর এই আমদানী-শুল্ক নূতন সংযোগ করিয়া দিলেন। ইংরাজ কোম্পানী নবাবের এই আদেশের বিরুদ্ধে বাদশাহের দরবারে এবার অভিযোগ উপস্থিত করিয়াও কোন ফল পাইলেন না। কারণ, নবাব পূর্ব্ব হইতেই ইংরাজদের আচরণ সম্বন্ধে সম্রাটকে এমন অনেক বিরুদ্ধ কথাই জানাইয়াছিলেন, যাহার ফলে বাদশাহ ইংরাজ বণিকগণের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণ বিলাতে বসিয়া যথাসময় এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশীয় প্রতিনিধিকে বঙ্গের নবাবের ইচ্ছার অনুকূলেই কার্য্য করিবার পরামর্শ প্রদান করিলেন। কিন্তু এই পরামর্শ প্রদান করিয়াই তাঁহারা নিরস্ত হইলেন না, সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় জেমসের নিকট ভারতের অস্থিরমতি বাদশাহ ও বঙ্গের স্বেচ্ছাচারী নবাবের কঠোরতায় ইংরাজ কোম্পানীর বাণিজ্য যে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া ভারতেশ্বরের অনিষ্টসাধনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আলমগীর বাদশাহের অসীম প্রভাবের বিষয় জানিয়াও ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় জেমস্ সমস্ত কাহিনী শ্রবণ করিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণের প্রার্থনায় সম্মতি প্রদান করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই!

অতঃপর ইংলণ্ডে মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে অভিযানের উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইল। ইংলণ্ডের ভাইস এডমিরাল নিকলসন্ দশখানি রণপোত লইয়া ভারতবর্ষে অভিযান করিলেন। এই নৌ-বহরের প্রত্যেক রণপোতে দশটি হইতে সত্তরটি কামান এবং সর্ব্বসমেত ছয় শত ইংরাজ সেনা ছিল। মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়া নিকলসন্ সৈন্তসংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিলেন এবং এক সহস্র সৈন্ত লইয়া তিনি জলপথে মোগল-বিজয়ে যাত্রা করিলেন।

বিলাতের পরামর্শ সভাতেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, নিকলসন্ প্রথমে মাদ্রাজে উপনীত হইবেন। মাদ্রাজ হইতে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া বালেশ্বর যাইবেন এবং সেখানকার কোম্পানীর কর্ম্মচারী ও সৈনিকগণকে সঙ্গে লইয়া বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্ব উপকূল ধরিয়া অতর্কিতভাবে চট্টগ্রাম আক্রমণ পূর্ব্বক উহা অধিকার করিয়া লইবেন। চট্টগ্রামকেই ইংরাজের স্থায়ী আস্তানারূপে পরিণত করিয়া এবং চট্টগ্রামকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া, মোগলের পরম শত্রু আরাকানের মগরাজ ও বিদ্রোহোন্মুখ জমীদার ও জায়গীরদারগণের সহিত মৈত্রীবন্ধন করিয়া নিকলসন্ বাঙ্গালার নবাবের বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন। রাজধানী ঢাকা এই ভাবে সহসা আক্রান্ত হইলেই নবাব ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিবেন। আর সেই ভবিষ্যৎ সন্ধির সর্ত্ত পর্য্যন্ত বিলাতের পরামর্শ সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছিল। তাহা এই যে, নবাব চট্টগ্রাম নগর ও তাহার এলাকাধীন সমস্ত প্রদেশ ইংরাজ কোম্পানীকে ছাড়িয়া দিবেন এবং নবাবের প্রজাগণ কোম্পানীর নিকট যে সমস্ত টাকা ঋণ লইয়াছে, নবাব সরকার তাহা পরিশোধ করিবেন। ইংরাজ কোম্পানী চট্টগ্রাম সহরে টাকশাল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যে টাকা প্রস্তুত করিবেন, নবাব তাঁহার অধিকার মধ্যে সেই সমস্ত টাকা প্রচলিত করিবার আদেশ দিবেন এবং এই সন্ধিসর্ত্ত বাদশাহ আলমগীর ও সুরাটের ইংরাজ প্রতিনিধি কর্ত্তৃক সুদৃঢ় করিয়া লওয়া হইবে।

পূর্ব্ব হইতেই এই ভাবে 'লঙ্কা ভাগ' করিয়া, আকাশ-কুসুম চয়ন করিতে করিতে এডমিরাল নিকলসন্ চট্টগ্রাম অভিমুখে অভিযান করিলেন। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে ইংরাজ নৌ-বহর প্রতিকূল বায়ুর তাড়নায় ভ্রমক্রমে ভিন্ন পথে চালিত হইয়া চট্টগ্রামের পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গার পশ্চিম শাখা বাহিয়া হুগলী বন্দরে আসিয়া পড়িল। ঠিক এই সময় মাদ্রাজের ইংরাজ অধিনায়ক আরও ৪ শত নূতন সৈন্য ও মিঃ চার্ণকের তত্ত্বাবধানে এক দল পোর্ত্তুগীজ পদাতিক সৈন্য হুগলীতে প্রেরণ করিলেন। সহসা একসঙ্গে গঙ্গাবক্ষে এতগুলি রণতরীর সমাগম-সংবাদ পাইয়া নবাব সায়েস্তা খাঁ চমৎকৃত হইলেন। ভিতরে ভিতরে ইংরাজদের এই উদ্যোগ আয়োজন সম্বন্ধে তিনি ইতিপূর্ব্বে কিছুই অবগত হন নাই এবং তিনি কল্পনা করিতেও পারেন নাই যে, ইংরাজ সৈনিকগণ এত দূর অগ্রসর হইতে সাহস পাইবে।

এই সময় বাদশাহ আলমগীর দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রশক্তি চূর্ণ করিবার জন্য এক বিরাট অভিযানে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। সাম্রাজ্যের সকল স্থান হইতেই সৈন্যদল আহূত হইতেছিল। কথিত আছে, প্রায় ১২ লক্ষ সৈন্য লইয়া বাদশাহ আলমগীর দাক্ষিণাত্যে এই অভিযান করিয়াছিলেন। সুতরাং এই সময় বঙ্গদেশেও সৈন্যের অভাব ঘটিয়াছিল এবং নবাবকেও বাদশাহের বিরাট অভিযান-পর্ব্বে যথাযোগ্য উপাদান যোগাইতে হইতেছিল। কাজেই এই সময় ইংরাজ বণিক্‌গণের এই অভিযান সমর-পণ্ডিত অসমসাহসী সায়েস্তা খাঁকেও চমকিত করিয়া তুলিয়াছিল।

এডমিরাল নিকলসন্ যখন দেখিলেন, ভ্রমবশতঃ চট্টগ্রামের পরিবর্ত্তে তাঁহার নৌ-বহর হুগলী বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন তিনি তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া এই স্থানেই ভাগ্যপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। চতুর নবাব ইংরাজ বণিকের উদ্দেশ্য অবগত হইয়াই হুগলীর ফৌজদারকে আদেশ করিলেন যে, তিনি যেন ইংরাজ কোম্পানীকে জানাইয়া দেন, উভয় পক্ষের মধ্যস্থগণের মীমাংসা অনুসারে মিটমাট করিতে নবাব প্রস্তুত আছেন। এই প্রস্তাব পাঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে নবাব সায়েস্তা খাঁ দ্রুতগামী এক দল অশ্বারোহী সৈন্য হুগলীর অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। ইংরাজ কোম্পানী নবাবের প্রস্তাব শুনিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়িলেন। বিনা যুদ্ধেই যে নবাব সহসা সন্ধির প্রস্তাব করিবেন, মিটমাটে সম্মত হইবেন, ইহা তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কিন্তু কূটবুদ্ধি মিঃ চার্ণক নবাবের কূট অভিপ্রায় অবগত হইয়া যখন তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন, তখন ইংরাজ বণিক্‌গণ নবাবের শঠতার শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর হুগলী বন্দরে ইংরাজ-মোগলে প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিন্তু যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ নৌ-বহরে কতিপয় আকস্মিক দুর্ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় জলযুদ্ধে ইংরাজগণ জয়ী হইতে পারিলেন না। রণপোত হইতে কামান দাগার ফলে হুগলীর ৫ শত গৃহ ভস্মীভূত হইল এবং সেই সঙ্গে হুগলীর কোম্পানীর পণ্যরাশিপূর্ণ কুঠীও বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ইহার ফলে কোম্পানীর ক্ষতি হইল ৪৫ লক্ষ টাকা।

এ দিকে ঢাকা হইতে মোগল সৈন্যদল হুগলীতে উপস্থিত হইবামাত্র ইংরাজ সৈন্যদলের অধিনায়কগণ তাহাদের সংখ্যা দৃষ্টেই বুঝিলেন যে, এই প্রচণ্ড সৈন্যদলের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তখন সমুদয় নৌ-বহর পাল তুলিয়া সুতানুটির পথে পলায়ন করিল।

নবাব সায়েস্তা খাঁ ইংরাজ বণিকের যাবতীয় কুঠী অধিকার করিবার আদেশ দিলেন। ফলে পাটনা, ঢাকা, কাশীমবাজারের কুঠীসমূহ নবাবের কর্ম্মচারিগণ কাড়িয়া লইলেন, সুতানুটির ইংরাজ কোম্পানীর প্রতিনিধিকে নবাব আদেশ করিলেন যে, অবিলম্বে তিনি যেন সদলবলে হুগলীতে আসিয়া উপস্থিত হন, নতুবা তিনি সৈন্য পাঠাইয়া তাঁহাদের উচ্ছেদ করিবেন। নবাব মিঃ চার্ণককে আরও আদেশ করিলেন যে, হুগলীতে উৎপাতের ফলে প্রজাসাধারণের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহাও ইংরাজ বণিকগণকে পূরণ করিতে হইবে। অধিকন্তু নবাব তাঁহার সৈন্যদলকে ইংরাজ বণিকের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। ইংরাজগণ তখন প্রমাদ গণিলেন। অবশেষে পরামর্শ করিয়া তাঁহারা দুই জন সদস্যকে প্রতিনিধিস্বরূপ মীমাংসার জন্য নবাব-দরবারে প্রেরণ করিলেন। এ দিকে বাদশাহ আলমগীর ইংরাজদের উপদ্রব-কাহিনী শ্রবণ করিয়া ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন। অবিলম্বে বাদশাহ আদেশ করিলেন,—অবিলম্বে ইংরাজদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করা হউক; তাহাদের যেখানে যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, সমস্তই অধিকার করা হউক। আদেশের সঙ্গে সঙ্গে মসলিপত্তনের মোগল শাসনকর্তা সেখানকার ইংরাজ কুঠী অধিকার করিলেন; ভিজেগাপত্তনের ইংরাজ কোম্পানীর বাণিজ্যালয় লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইল,—সমুদয় ইংরাজ পুরুষ নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইল। বিহার ও বঙ্গদেশের যাবতীয় ইংরাজ-কুঠী অধিকৃত ও কর্ম্মচারী বন্দী হইলেন।

এইবার ইংরাজ বণিকগণের চৈতন্যসঞ্চার হইল। তখন তাঁহারা আত্মকৃত অপরাধ স্বীকার করিয়া বঙ্গের নবাব ও ভারতের বাদশাহের বরাবর ক্ষমা প্রার্থনা ও জরিমানা দণ্ড দিবার প্রস্তাবসহ দরখাস্ত পেশ করিলেন। ইংরাজের সৌভাগ্য-ক্রমে তাঁহাদের প্রার্থনা উভয় স্থানেই মঞ্জুর হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে বাদশাহ আলমগীর এই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন,—

ইংরাজগণ অতি বিনীতভাবে অবনত-মস্তকে বাদশাহ-সমীপে দরখাস্ত করিয়া প্রার্থনা জানাইতেছে যে, তাহাদের সকল অপরাধ মার্জ্জনাপূর্ব্বক ফারমান বা আদেশ প্রদানে তাহাদিগকে এই মার্জ্জনার কথা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করা হয়। এ জন্য তাঁহারা জগন্মান্য বাদশাহের দরবারে তাঁহাদের উকীলকে প্রেরণ করিয়াছেন। বাদশাহের অনুগ্রহলাভ করাই উকীলের উদ্দেশ্য। অধিকন্তু সুরাটের শাসনকর্ত্তা এতিমাত খাঁ দরখাস্তে জানাইয়াছেন যে, ইংরাজগণ বাদশাহের সমীপে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিতে প্রস্তুত আছেন। উপরন্তু তাঁহারা অন্যান্য বণিকগণের নিকট হইতে হাঙ্গামার সময় যে সকল পণ্যদ্রব্য বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছেন, তাহা তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবেন এবং ভবিষ্যতে আর কখনও তাঁহারা এরূপ গর্হিত কার্য্যে লিপ্ত হইবেন না এবং বন্দর-সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থা সম্যক্‌রূপে মানিয়া চলিবেন। বাদশাহও তাঁহার স্বাভাবিক উদারতা-বশে ইংরাজদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। ইংরাজগণ পুনরায় বন্দরের উন্নতিবিধানের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববৎ নিয়মাধীনে বাণিজ্য করিতে পারিবেন। এই গর্হিত কার্য্যের নায়কগণ দেশ হইতে বিতাড়িত হইবে।

বাদশাহ আলমগীরের রাজত্বের ত্রয়স্ত্রিংশৎ বৎসরে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে এই আদেশপত্র প্রচারিত হয়।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাতি-বৈষম্য

ভারত-শাসনের নানা অঙ্গে জাতি-বৈষম্যের চিহ্ন পরিস্ফুট, এ কথা বোধ হয় অবস্থাভিজ্ঞ কেহ অস্বীকার করিবেন না। সরকার পক্ষ অবশ্য নানা ছুতা তুলিয়া ব্যবস্থার সাধুতা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার কোনটাই যুক্তির আক্রমণ সহ্য করিতে পারে না। আমরা দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া জনসাধারণের এই অভিযোগের মূলে সত্য নিহিত আছে কি না, দেখাইবার প্রয়াস পাইতেছি। প্রথমেই ভারতীয় জেলে জাতি-বৈষম্যের কথা উল্লেখযোগ্য। জেলে য়ুরোপীয় ও ভারতীয় উভয় শ্রেণীর কয়েদীর প্রতি সমান ব্যবহার করা হয় না। বিশেষতঃ ভারতীয় রাজনীতিক হাজত-আসামী বা কয়েদীদের প্রতি যে ব্যবহার করা হয়, তাহা কি কোনও য়ুরোপীয় জেল-কয়েদীর প্রতি করা হয়?

জেল-সংস্কার সম্পর্কে ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকার-সমূহকে যে বিজ্ঞপ্তিপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, উহা পাঠ করিলে কি মনে হয়? সকলেই জানেন, ইতিপূর্ব্বে শিমলা শৈলে স্বরাষ্ট্র-সচিব সার জেমস ক্রেরার এক পরামর্শ বৈঠক বসাইয়াছিলেন। জেল-সংস্কার সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য তিনি ঐ বৈঠকে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভিন্ন ভিন্ন রাজনীতিক দলের নেতৃবর্গকে আহ্বান করিয়াছিলেন। সরকারের বিজ্ঞপ্তি-পত্র প্রচার যে তাহারই সিদ্ধান্তের ফল, তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যায়। ভারতীয় নেতৃবর্গ পরামর্শ বৈঠকে জেল-কয়েদীদের প্রতি ব্যবহারে জাতিগত বা বর্ণগত বৈষম্য-দোষের কথা উল্লেখ করিয়া উহা সংশোধনের চেষ্টা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। বিজ্ঞপ্তিপত্রে তদনুসারে লেখা হইয়াছিল :—

"নেতৃবর্গ সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রথমতঃ ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকার সমূহকে অতি অবশ্য জানাইবেন যে, ভারতীয় নেতৃবর্গ বিশেষ বিবেচনার পর স্থির করিয়াছেন,—অতঃপর যেন জেলের আইনের এমনভাবে পরিবর্ত্তন করা হয়, যাহাতে কয়েদীদের প্রতি ব্যবহারে জাতিগত বৈষম্যের বিষয়ে কোন অভিযোগের কথা শুনিতে না পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারসমূহ কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, তাহা যেন অনতিকালবিলম্বে ভারত সরকারকে জ্ঞাপন করেন।" এই ভাবের কথা লিখিবার পরেও সরকার অন্যত্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, জেলে কয়েদীদের প্রতি ব্যবহারে কোনরূপ জাতিগত বৈষম্য প্রদর্শন করা হয়, এ কথা সরকার স্বীকারই করেন না। তাঁহারা পত্রে বলিয়াছেন,—"য়ুরোপীয় কয়েদীদের প্রতি জেলে যে ব্যবহার করা হয়, তৎসম্পর্কে যে নিয়মাবলী আছে, তাহা জাতিগত বৈষম্যের ভিত্তির উপর ন্যস্ত নহে, তাহা জেলের প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থা অনুসারেই গঠিত। জেল-শাসনের নিয়মে আছে, কয়েদী জেল-বাসের পূর্ব্বে যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত (অর্থাৎ খাইত পরিত ইত্যাদি), কোনওরূপ বিলাস-বাবুয়ানার প্রশ্রয় না দিয়া অথবা সুবিধা করিয়া না দিয়া মাত্র সেই কথাটুকু মনে রাখিয়া তাহার প্রতি জেলে সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। এই হেতু য়ুরোপীয় কয়েদীদের প্রতি বিশেষ ব্যবহারের নিয়ম আছে।"

এই উক্তিতেই কি জেলে জাতি-বৈষম্য রক্ষা করার পরিচয় পাওয়া যায় না? য়ুরোপীয় চোর-ছেঁচড়, জুয়াচোর, জালিয়াত, বা খুনী ডাকাত যাহাই হউক না কেন, সে য়ুরোপীয় বলিয়া জেল-বাসকালে তাহার পূর্ব্ব-জীবনের অনুযায়ী সুখ-আরাম উপ-ভোগ করিবার সুবিধা পাইবে। এমনও শুনা গিয়াছে যে, য়ুরোপীয় কয়েদীদের জন্য দারুণ গ্রীষ্মে টানাপাখা ও বরফ-পানির ব্যবস্থা ছিল। এমন কি,—দেশীয় কয়েদীকে য়ুরোপীয় কয়েদীর পাখা টানিবার কুলীতে পরিণত করা হইয়াছিল,—এই ভাবের একটা কথাও নাকি রটিয়াছিল। অবশ্য য়ুরোপীয় কয়েদীর জন্য গোস-রুটী বা উত্তম শয্যার ব্যবস্থা ততটা আপত্তিজনক না হইতে পারে, কিন্তু টানা-পাখা বা বরফপানি কি বিলাসিতা বাবুয়ানার অন্তর্ভুক্ত নহে? একবার সিন্ধুদেশের এক ট্রেনে কয়েকজন বৃটিশ টমির জন্য বরফের ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়া কি হুলস্থুলই না পড়িয়া গিয়াছিল! অথচ টমিরা সচরাচর কোন্ স্তর হইতে গৃহীত, তাহা সকলেরই বিদিত। অথচ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার শিক্ষিত ভদ্র সম্ভ্রান্ত রাজনীতিক হাজত-আসামীরা

মীরাটের গরমে মৃতকল্প হইলেও য়ুরোপীয় মহলে টুঁ শব্দটি শুনা যায় নাই।

এই ভাবের ব্যবস্থা যে, যুক্তি অনুসারে সমর্থনযোগ্য নহে, তাহা সরকারও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন,—"সাধারণভাবে এই ভাবের ব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য বটে, কিন্তু তথাপি ভারত সরকারের বিশ্বাস, কার্য্যক্ষেত্রে এইরূপ ব্যবস্থা যত অনর্থ ও গোলযোগের সৃষ্টি করে এবং উহা হইতেই ব্যবহারে জাতিগত বৈষম্যের কথা উঠিয়া থাকে।" যদি তাহাই হয়, তবে সেই ব্যবস্থা কিরূপে সমর্থনযোগ্য হইতে পারে? য়ুরোপীয় কয়েদীরা শাসকজাতির অন্তর্গত; সুতরাং তাহাদের প্রতি এইরূপ বিশেষ ব্যবস্থা করা হইলে জেলে জাতিগত বৈষম্য রক্ষা করা হয় বলিয়া লোকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় কি? ভারতবাসী যখন দেখে, ভারতীয় কয়েদীর জেলের পূর্ব্ব-জীবনের সামাজিক অবস্থা, বিদ্যাবুদ্ধি, মান-সম্ভ্রম, প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা বিবেচনা করিয়া জেলে তাহার প্রতি বিশেষ ব্যবহার করা হয় না, অথচ য়ুরোপীয় ইদক পিদক জাল জুয়াচুরী অপরাধে জেল-কয়েদী হইলেও তাহার প্রতি বিশেষ ব্যবহারের নিয়ম আছে, তখনই তাহার মন বিষাক্ত হইয়া উঠে। কেবল জেল কেন, বিচারকালেও ভদ্র শিক্ষিত অভিযুক্ত ভারতীয় আসামীর প্রতি হাজতে অনেক সময়ে যে ব্যবহার করা হয়, তাহা কোন সাধারণ চোর গুণ্ডা শ্রেণীর য়ুরোপীয় আসামীর প্রতিও করা হয় না। বিশেষতঃ ভারতীয় রাজনীতিক কয়েদীদিগের ও বিচারাধীন আসামীদের প্রতি অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার এমন কঠোর হয় যে, তাহা কোন সভ্যতাভিমানী জাতি সমর্থন করিতে পারে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস কমিটীর কর্ম্মী দাণ্ডেকারের কাহিনী উল্লেখ করা যায়। এই শিক্ষিত ভদ্রলোকটি রাজদ্রোহ অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। যখন তাঁহাকে কাশী হইতে মৈনপুরীতে স্থানান্তরিত করা হইতেছিল, তখন তাঁহাকে হাতকড়া লাগান হইয়াছিল। সরকার পক্ষ ব্যবস্থাপক সভায় ইহার কৈফিয়তে বলিয়াছেন, "ইহার বিপক্ষে জামীন-হীন অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে; সুতরাং পাছে সে পলাইয়া যায়, এই হেতু তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইয়াছে! কয়েদীদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা না করার সম্বন্ধে বিবেচনার ভার পুলিসের হস্তে না দিলে চলে না।"

অতি সুন্দর কৈফিয়ৎ নহে কি? রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত শিক্ষিত ভদ্র আসামী কয় জন এ যাবৎ পলায়ন করিয়াছে? পাছে তাহারা পলায়ন করে, এই আশঙ্কায় তাহাদিগের হস্তে শৃঙ্খল পরাইয়া অপমান করিতে যে সরকার লজ্জানুভব করেন না, তাঁহাদের মুখে এই যুক্তি অতি শোভনই হইয়াছে। একের অপরাধে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার শিক্ষিত ভদ্র আসামীর প্রতি কি ব্যবহার করা হইয়াছিল? সংবাদপত্রে প্রকাশিত সেই অনাচারের কাহিনী শতাংশের একাংশও সত্য হইলে কি বলিতে ইচ্ছা করে? এমন ব্যবহার কি কখনও য়ুরোপীয় কয়েদীদের প্রতি করা হইয়াছে?

কেবল জেলে কেন, রেলেও জাতিবৈষম্যের অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। লাহোরে হুইট্‌লে কমিশন বা শ্রম-তদন্ত কমিটীর অধিবেশনকালে রেল-য়ুনিয়নসমূহের প্রতিনিধিরা যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহাতে রেলের অনেক রহস্যই উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

নর্থ ওয়েষ্ট বা পঞ্জাব রেলের প্রতিনিধিদের সাক্ষ্যে প্রকাশ পায় যে, তাহাদের রেল কর্তৃপক্ষ য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীদের পুত্র-কন্যার শিক্ষাব্যপদেশে বৎসরে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন, আর ভারতীয় কর্ম্মচারীদের পুত্র-কন্যার জন্য মাত্র ২ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়া থাকেন! যখন দেওয়ান চমনলাল এই বৈষম্যের কথা ধরিয়া দেন, তখন রেল-কর্তৃপক্ষের সাক্ষীরা বলেন যে, "ভারতীয়দের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হস্তান্তরিত বিভাগের মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত, আর য়ুরোপীয়দের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা সংরক্ষিত বিভাগের অর্থাৎ সরকারের শাসন-পরিষদের সদস্যের হস্তে ন্যস্ত; এই জন্য ব্যবস্থার এইরূপ তারতম্য হইয়াছে।" কেবল ইহাই নহে, ইহা ছাড়া তাঁহারা আরও একটি যুক্তি দেখাইয়াছেন,—"য়ুরোপীয় স্কুলগুলি পাহাড়ের উপর অবস্থিত, এই হেতু উহাদের খরচও বেশী।" চমৎকার! ইহার উপর মন্তব্যের প্রয়োজন আছে কি? আইনে ভারতীয়ের শিক্ষার ব্যবস্থার ভার প্রাদেশিক সরকারের, আর য়ুরোপীয়ের শিক্ষার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের। যদি ভারতীয়রা এ বিষয়ে অভিযোগ করে, তাহা হইলে তাহাদের নাকের উপর আইনখানা ধরিয়া দিলেই হইল। যদি ভারতীয়রা বলে, "য়ুরোপীয়দের স্কুল পাহাড়ের উপর হইবে কেন? উহাও আমাদের মত স্বর্গে না হইয়া মর্ত্ত্যে হউক না কেন?" তাহা হইলেই জবাব পাইবে, "দেবতার বেলাও যে লীলাখেলা, মানুষের বেলাও তাহা হইবে না কি?" মজা এই, ভারতীয় কর্ম্মচারীদের শিক্ষার্থী সন্তানের তুলনায় য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীদের শিক্ষার্থী সন্তানের সংখ্যা নগণ্য। অথচ তাহাদের বেলা দেড় লক্ষ, আর ভারতীয়দের বেলা ২ হাজার! ইহা যদি জাতি-বৈষম্য না হয়, তাহা হইলে উহা কি হইবে?

রেল বোর্ড এখন প্রচার বিভাগ দ্বারা বিদেশী 'শীতের পর্য্যটকদের' সুবিধার জন্য পুস্তিকাদি প্রণয়নে মহাব্যস্ত, তাঁহাদের কর্ণে এ সকল ছোট-খাটো কথা পৌঁছিবে কি? কোথায় কোন্ রেলের খেলোয়াড়দল ফুটবলের সেমি-ফাইনালে উঠিল বা কোন্ রেলের বক্সার বক্সিং টুর্ণামেণ্টে প্রথম প্রাইজ পাইল, [illegible] যাঁহাদের সমস্ত আগ্রহ উৎসাহ আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাঁহাদের কাছে কি প্রত্যাশা করা যায়?

এমন জাতি-বৈষম্য সরকারী চাকুরীতে ও অন্যান্য [illegible] অনেক আছে। সে সকল দেখাইতে গেলে সাত কাণ্ড [illegible] লিখিতে হয়। সরকার রাউণ্ড টেবল বসাইয়া ডমিনিয়ান [illegible] ঘোষণা করিয়া শান্তি ও সন্তোষ প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্ব্বে [illegible] জাতি-বৈষম্য-দোষ সংশোধন করিবার চেষ্টা করি[illegible] করিতেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার [illegible]

"প্রেমের কথা আর বলো না..."

(গল্প)

আদি পর্ব্ব

কোথা দিয়া যে কি ঘটে, ভাবিলে অনেক সময় তাক্ লাগিয়া যায়! ধরুন, এই পাড়ার সনাতন বাবুর ব্যাপার... তাঁর হাত ফস্কাইয়া একটা কাচের গ্লাস এক দিন ভাঙ্গিয়া যায়—কাচের কুচিগুলা সাফ করা হয়, কিন্তু তারি এক টুকরা কোথায় পড়িয়া ছিল, সেই কুচি পায়ে ফুটিয়া সনাতন বাবুর স্ত্রীর পা কাটে এবং সেই কাটা ঘা ক্রমে বিষম হইয়া কি কাণ্ডই না ঘটিল! ফলে তাঁর স্ত্রীর জীবনে যবনিকা-পাত এবং সনাতন বাবুকে বুড়া বয়সে আবার বিবাহ করিয়া নব-বধূ গৃহে আনিতে হয়; গৃহে বিপ্লব বাধে... সে বিপ্লবের ফলে সম্পত্তি-হস্তান্তর, নব-বধূর গ্রহবৈগুণ্য, উকীল-পেয়াদার জয়োল্লাস প্রভৃতি যে-সব ঘটনা ঘটিল, তা শুধু পাড়া-প্রতিবেশী নয়, খবরের কাগজওয়ালাদের অবধি মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই দীর্ঘ ঘটনাবলীর মূলে কিন্তু ঐ ভাঙ্গা কাচের কুচিটুকু। তাই বলিতেছিলাম, কোথা দিয়া যে কি...

কিন্তু সনাতন বাবুর কথা আজ বলিতে বসি নাই; দৃষ্টান্তস্বরূপ সংক্ষেপে একটু উল্লেখ করিলাম।

তখন আমাদের কলেজে ফোর্থ ইয়ার। প্রিয়নাথ তার বন্ধুদের মনোযোগ আকর্ষণ করিল বিশেষভাবে চার কারণে। প্রথম, সে স্কলার; দ্বিতীয়, তার চেহারা সুশ্রী; তৃতীয়, সে স্পোর্টস্‌ম্যান; এবং চতুর্থতঃ, সে কবিতা লেখে। কাজেই কলেজে লেক্‌চারের অন্তরালে তার পাশে যে মধুচক্র রচিয়া উঠিত, গুঞ্জনের আর তাহাতে অন্ত থাকিত না! তার কথাবার্ত্তার অন্তরালে এটুকু আমাদের বুঝিতে বাকি ছিল না যে, তার জীবনের কোথায় একটা বেদনার কাঁটা ফুটিয়া আছে! তার কবিতার এই বয়সেই দুঃখ-বিরহের অমন সজল করুণতা...আমাদের কেমন বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিল। এ-বয়সে কবিতায় বিদ্রোহের সুর জাগানোই প্রতিভার লক্ষণ...অন্ততঃ, যেমন দেখা যায়! পাঁচিল ভাঙ্গো তরুণী, ছুটিয়া এসো কনক-বরণী,—তোমার হাতে গাঁথা মালা আমার গলায় পরাও বালা,—চূর্ণ করো পদাঘাতে, প্রাচীন সমাজ আইন-সাথে,—মাসিকপত্রে তরুণ কবিদের এমনি বজ্র-হুঙ্কারই তো শুনা যায়! কাজেই...

বেণী একদিন একান্তে আমায় ডাকিয়া বলিল,—যা ভেবেছিলুম হে পাঁচু...

আমি কহিলাম,—কি?

বেণী কহিল,—ঐ আমাদের প্রিয়নাথ...

আমি কহিলাম,—কি করেচে প্রিয়নাথ?

বেণী কহিল,—আমাদের বাড়ী রবিবারে ও গেছলো ...আমরা টেনিশ খেলছিলুম, ও চুপ ক'রে ব'সে খেলা দেখছিল...তার পর সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকার একটু গাঢ় হয়ে আসতে ও কেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার কাছে ব'লে ফেললে...

আমি কহিলাম—কি বললে?

বেণী কহিল,—ওর মনের গোপন বেদনার করুণ কাহিনী।

প্রিয়নাথের সঙ্গে বেণীর ঘনিষ্ঠতা ছিল একটু বেশী। সেই কারণেই বেণীর কথাবার্ত্তায় এ-কালের মাসিক সাহিত্যের সুর কেমন আপনি ধ্বনিয়া ওঠে!...

আমি কহিলাম,—কি কাহিনী হে?

বেণী কহিল,—কাকেও বলো না যেন। আমায় ও নিষেধ করেচে...

বাধা দিয়া আমি কহিলাম,—তবে বলচো কেন?

বেণী কহিল,—না ব'লেও থাকতে পারচি না। সে-কাহিনী শুনে ওর প্রতি আমার এমন শ্রদ্ধা জেগে উঠেচে···

মানুষের মনে কৌতূহল বস্তুটা আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করে। আমি কহিলাম—বলো তবে···ভয় নেই হে, এ কথা প্রকাশ হবে না।

বেণী কহিল,—হঠাৎ সে নিশ্বাস ফেলে আমায় বল্লে, আমার কবিতায় বিষাদের সুর কেন বাজে, সে প্রশ্নের উত্তর শুনবে? আমি বললুম, শুনবো।···প্রিয়নাথ কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বল্লে, তার স্বর গাঢ় হয়ে এলো···সে বল্লে, তার হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে···একদম যাকে বলে, চূর্ণ-বিচূর্ণ! অর্থাৎ বছর-খানেক পূর্ব্বে ও তখন থাকতো জামালপুরে—সেখানকার গার্ল স্কুলের মিষ্ট্রেস মিস্ মায়া চক্রবর্ত্তী···তাঁর সঙ্গে দৈবাৎ একদিন আলাপ হয়···সে আলাপ ক্রমে গভীর প্রেমে—মানে, দু'জনের মনের মিল ঘটে ভারী গাঢ়। তার পর মায়া চক্রবর্ত্তী বিবাহের প্রস্তাব করেন; প্রিয়নাথের বাড়ী থেকে গভীর নিষেধ ওঠে··· প্রিয়নাথ তবু অটল। কিন্তু মায়া চক্রবর্ত্তী সে খবর জানতে পারেন। জেনে তিনি বলেন,—না···এত বাধা-বিপত্তি নিষেধ যখন, তখন কাজ নেই এ তরঙ্গাকুল সাগর-বক্ষে জীবন-তরী ভাসানো!···প্রিয়নাথের মিনতি আর অশ্রুর সীমা রইলো না। মায়ার চোখেও জল এলো। মায়া বললেন,—অভিশাপের তীব্র দাহ বয়ে? তাছাড়া আমার জন্ত সকলকে ত্যাগ করবে?···না!···প্রিয়নাথের তবু কি সাধ্য-সাধনা! সজল চক্ষে মায়া দেবী আর কোনো কথা বললেন না; মৌনতার বর্ম্ম-আঁটা বুকে সব সইলেন! পরের দিন সকালে কিন্তু তাঁর আর দেখা মিললো না। প্রিয়নাথ পেলে ছোট্ট এক-টুকরো চিঠি, তাতে দুটি মাত্র ছত্র—'প্রিয়তম, বিদায়।' নীচে নাম সহি,—মায়া।···

বেণী স্তব্ধ হইল। বুক আমার বেদনায় দুলিয়া উঠিল। এমন রোমান্স—আহা! আমি কহিলাম,—তাঁর সন্ধান করলে না প্রিয়নাথ?

বেণী কহিল,—না। প্রিয়নাথ ম্লান হাসি হেসে বললে,—আমি তাঁর সন্ধান করিনি কোনো দিন। বৈরাগ্য নেবার বা মরার কথাও আমার মনে হয়নি! আমি শুধু আশায় বুক বেঁধে ব'সে আছি। আমি জানি, তাঁকে আমি পাবোই। আমাদের এ ভালোবাসা হারাবার নয়, ফুরোবার নয়!—তাই প্রিয়নাথ কর্ত্তব্যের বোঝা মাথায় নিয়ে জীবনের পথে চলেছে! কারো কোনো দাবী সে অপূরণ রাখবে না···আর সে এ আশাও রাখে, একদিন···জীবন অপরাহ্ন-বেলায় ঢলে পড়লেও, এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগে মায়া দেবীর সঙ্গে দেখা তার হবেই!···

অদূরে এক কামারের দোকানে কে লোহা পিটিতে-ছিল। তারি কর্কশ শব্দে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়া উঠিতে-ছিল। সেই কম্প্র বায়ুরাশি ভেদ করিয়া আমার মন সুদূর ভবিষ্যতের পথে সবেগে ছুটিয়া চলিল···হিমালয়ের তুষার-শুভ্র দীর্ঘ দেহ···তারি ঠিক নীচে গৈরিক-বসনা দিব্য-জ্যোতিঃ তরুণী ধ্যানস্তিমিত নেত্রে কোন্ ইষ্টমন্ত্র-সাধনায় চেতনহীনা···আর তাঁর দিকে ধীর-পায়ে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে শীর্ণ ক্ষীণ দেহে আমাদের এই প্রিয়নাথ—বিরহ-তাপে-ক্লিষ্ট-তনু! তা হোক, তবু মুখে-চোখে পুলক-হাস্তের কি স্নিগ্ধ বিমল দিব্য বিভা!···অর্থাৎ হ্যাভেলের বইয়ে ছাপা ধ্যানী বুদ্ধের ছবিখানা আমার চোখের সুমুখে জল্‌জল্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল!···

প্রিয়নাথের উপর শ্রদ্ধা এমন বাড়িয়া উঠিল যে,সে কাছে থাকিলে আবেগের উচ্ছ্বাসে কি যে করিতাম, জানি না!

পরের দিন বন্ধুর দলে দেখি, এ করুণ কাহিনী বেশ প্রচার হইয়া গিয়াছে। আমার সঙ্গে ইতিমধ্যে কাহারো দেখা-শুনা হয় নাই। কাজেই বুঝিলাম, এ প্রচার ঘটিয়াছে শুধু বেণীর অনুগ্রহে! মন্ত্রগুপ্তির শক্তি তার অসাধারণ, সন্দেহ নাই!

বন্ধুদের প্রাণে গভীর সমবেদনা, এবং আরো গভীর শ্রদ্ধা! প্রিয়নাথ ক্লাশে আসিল। সকলেই দরদের ভরে তাকে কাছে পাইতে চায়! বেচারী প্রিয়নাথ!

প্রিয়নাথ কিন্তু খাসা আছে! হাসিয়া কথা কহিতেছে, রসিকতা করিতেছে! আমাদের বুকে ব্যথা-বেদনা ছ্যাৎ করিয়া ওঠে···কি বেদনা ওই মুখের হাসি দিয়া চাপিয়া রাখিয়াছ, বন্ধু!··

আমার বার-বার বাসনা জাগিতেছিল, এই ব্যাপারটায় রং কলাইয়া তোফা গল্প লিখিয়া এ-কালের 'তরুণ' পত্রিকায় পাঠাইয়া দি, সত্য ঘটনার একটু লেবেল আঁটিয়া। তরুণদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে পাইলে যাঁরা নাচিয়া ওঠেন, তাঁদের

মুখে বেশ করিয়া চুণকালি লেপা হোক্! কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির বাছা বাছা লাইন চুরি করিয়াও কিছুতেই আর কাহিনীটুকু গুছাইয়া তুলিতে পারিলাম না! বুঝিলাম, না, সাহিত্য রচা আমার কাজ নয়! হয় তো আমার জীবনের উদ্দেশ্য বৃহত্তর গভীরতর।

বিরাট পর্ব্ব

বেণীর সঙ্গে প্রিয়নাথের ঘনিষ্ঠতা একটু বেশী মাত্রায় বাড়িয়া উঠিল। বেণীর একটু সুযোগ ছিল – সে সুযোগ বিধি-দত্ত। অর্থাৎ বেণীর বাপ বড় উকিল; তাঁর মস্ত বাড়ী, ভালো গাড়ী; এবং বন্ধুত্বের বনিয়াদ পাকা করিয়া গড়িয়া তুলিবার নানা কশরৎ যেমন তার জানা ছিল, তার মশলার প্রাচুর্য্যও ছিল তেমনি তার আয়ত্তে। বন্ধুদের ভোজে আপ্যায়িত করা ছিল তার প্রধান কশরৎ। প্রিয়নাথকে প্রায়ই সে তাহাদের গৃহে লইয়া যাইত। কিসের লোভে, সে কথাটা আমাদের কাছে বেণী গোপন রাখিয়াছিল আশ্চর্য্য নিপুণ কৌশলে।

প্রিয়নাথের মনের মধ্যে কোনো পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল কি না, সে খবর আমাদের অবিদিত ছিল। তবে আমাদের দলে কোথা হইতে এপিডেমিক লাগিল! অনেকের চিত্তেই পুষ্পশরের দুই-একটা আঘাত আসিয়া বাজিল।

সত্যব্রত সৌখীন লোক; হোষ্টেলে থাকিত। মাসিক পত্র পড়িতে পড়িতে সহসা একদিন সে কবিতা লিখিয়া ফেলিল। এবং তার সে কবিতা ছাপা হইল 'তরুণ আলো' মাসিক-পত্রে। 'তরুণ আলোর' ফণ্ডে সত্যব্রত মাসে মাসে দক্ষিণা দিতে সুরু করিল এবং সম্পাদকের গৃহে তার সন্ধ্যার অবসরটুকু নিত্য চায়ের কাপ্ উপচাইয়া অপরূপ মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিল; এবং ইহার কিছু কাল পরে সে আসিয়া একদিন হৃদয়-বেদনার এক করুণ কাহিনী আমার কাছে বিবৃত করিল।

অর্থাৎ সম্পাদকের বাহিরের ঘরে গীত-বাদ্য চলিত; এবং এই গীত-বাদ্যের অন্তরাল দিয়া সত্যব্রত দেখিত, সামনের বাড়ীর বাতায়নে দাঁড়াইয়া এক তরুণী একান্ত মনোযোগে গানের সুরে তাঁর প্রাণের নিবিড় সুর ঢালিয়া দিয়াছেন! তাঁর নয়নের দৃষ্টি, মুক্ত বেণী, শাড়ীর আঁচল আর প্রসন্ন মুখ...সত্যব্রতর হৃদয়-সমুদ্রে কি তরঙ্গই উথলিয়া সমস্ত নয়ন-মন দিয়া তরুণীর রূপ-মাধুরী পান করিয়া সত্যব্রত বিহ্বল...তার জীবনে সুখ নাই, স্বস্তি নাই, শান্তি নাই! কবিতা লিখিয়া প্রাণের কত কামনাই তাঁর উদ্দেশ্যে সে নিবেদন করিয়াছে—কিন্তু এ ব্যাকুল নিবেদন তাঁর প্রাণের দ্বারে পৌছাইয়া দিতে না পারিলে যে তার জীবন...

হতাশভাবে আমি কহিলাম,—বিপদের কথা তো! কিন্তু কি ক'রে এ নিবেদন পৌছে দেওয়া যায়?...

সত্যব্রত কহিল—'তরুণ আলোয়' ছাপিয়ে? কিন্তু কত কবিতা এক সঙ্গে ছাপবে?

আমি কহিলাম,—তাও বটে!...

সত্যব্রত কহিল,—তুমি এক কাজ করো যদি, ভাই...

আমি কহিলাম,—কি কাজ?

সত্যব্রত কহিল—তোমরা এখানকার লোক...যদি কাকেও ধ'রে ওঁদের পরিচয় প্রভৃতি নিতে পারো...

আমি কহিলাম,—'তরুণ আলোর' সম্পাদকই তো এ-কাজের যোগ্য পাত্র। যখন তাঁরি প্রতিবেশিনী...

সত্যব্রত কহিল,—সম্পাদক যদি পরিহাস-বিদ্রূপ করে?...

আমি কহিলাম,—খুব গোপনে তাঁকে এ বার্ত্তা জানাও—তোমার এ বিহ্বলতা, প্রাণের এ নীরব পূজার সমাচার...

সত্যব্রত একটা নিশ্বাস ফেলিল, তার পর কহিল,—চেষ্টা করেচি বলতে; কিন্তু পারিনি...

আমি কহিলাম—এ সঙ্কোচ কাটাতে হবে। উদ্যোগিনং পুরুষসিংহং...জানো তো—

ফোঁস করিয়া সত্যব্রত আর-একটা নিশ্বাস ফেলিল!...

ওদিক হইতে তারক আসিয়া ডাকিল,—পাঁচু...

আমি কহিলাম,—কি?...

তারক আমায় এক ধারে টানিয়া আনিয়া অতি সতর্ক ভঙ্গীতে কহিল,—বায়োস্কোপের সেই লাল শাড়ী...মনে আছে?

শূন্য পথে দুই চোখের দৃষ্টি সঞ্চালিত করিয়া আমি কহিলাম—কোন্ লাল শাড়ী?

তারক কহিল,—সেই যে পিকচার প্যালেসে...দু'টাকার সীটে...

মনে পড়িল। কহিলাম,—হাঁ, মনে পড়েচে...

তারক কহিল,—তিনি লক্ষ্য করেচেন, তাঁর পানে আমার শূন্য নয়নের দৃষ্টি...

কহিলাম,—তার পর?

তারক কহিল,—কাল চোখে-চোখে মিলন হ'তে এমন জালাময়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন···কি অসহ্য বিরক্তি সে দৃষ্টিতে···

কহিলাম,—পাষাণী···

তারক কহিল,—কেন তবে ওঁরা আমাদের নয়ন-পথের পথিক হন! এই জীবনের বসন্ত, এই আকুল হাওয়া—চোখের এ-চাওয়াকে যে নিবৃত্ত করতে পারি না!···

কহিলাম,—কবি ঠিক বলেচেন,—হায় রে রাজধানী পাষাণ-কায়া···

তারক কহিল,—Star to star vibrates light. May not soul to soul···মনের এ ব্যাকুল পূজা—এর কোনো দাম নেই? টাকা-পয়সার অর্ঘ্যটাই সব-চেয়ে বড় অর্ঘ্য···?

কহিলাম,—বলশেভিশ্‌ম্‌···?

তারক উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল,—None but the brave···

বাধা দিয়া কহিলাম,—কিন্তু braveryর কি পরিচয় দিয়েচো?

তারক কহিল,—দিই নি। দেবো! আধুনিক সাহিত্যকে বলশালী ক'রে তুলবো, নিরাশ প্রাণের বহ্নি-তরঙ্গে···সে বহ্নিস্পর্শে সমাজ, শাসন, নিষেধ···সব পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেবো···

তারক চলিয়া গেল।

আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আকাশে-বাতাসে এ কি ফাগুন-হাওয়ার ঘূর্ণি! পুষ্পশর একসঙ্গে তাগ্‌ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের ফোর্থ ইয়ারের এই কটিকে বাছিয়া একসঙ্গে শরক্ষেপ করিলেন, কি উদ্দেশ্যে···? চিন্তাকুল নয়নের সম্মুখে স্পষ্ট দেখিলাম, কাগজের ফুল হাউইয়ের বেগে আকাশের গায়ে উঠিয়া চলিয়াছে—তাহাতে আগুনের অক্ষরে লেখা,—পোড়াও সমাজ, জালাও পুঁথির পাতা-ভরা শাসন-নিষেধ···টানিয়া আনো বিপুল বিক্রমে হে বিক্রমশালী তরুণ বীর, তোমার প্রাণের আকুলতার অসহ্য শক্তিতে ঐ বন্দিনী পাষাণী তরুণীর দলে···

শিহরিয়া চক্ষু মুদিলাম। অমনি পিঠে মৃদু চাপড় দিয়া প্রিয়নাথ ডাকিল,—পাঁচু···

আমি কহিলাম,—খবর কি?

প্রিয়নাথ কহিল—শোনো···

আর-একটু দূরে আমায় টানিয়া আনিয়া প্রিয়নাথ কহিল,—বিপদ হয়েচে। বেণীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা জানো?

কহিলাম,—জানি।

প্রিয়নাথ কহিল,—নন্দা বেণীর তরুণী ভগ্নী···সহোদরা নয়···অপরূপ রূপসী, সঙ্গীতে কুশলা···তার কণ্ঠস্বরে বিশ্বের সাতটি সুরের সাবলীল ভঙ্গী। আমায় সে মুগ্ধ করেচে, হৃদয় বিদ্ধ করেচে···

আমি দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া চাহিলাম। আজ এ বসন্তে দুনিয়ায় কি আর কোনো সুর নাই?···বিমূঢ়ের মত প্রিয়নাথের পানে চাহিয়া রহিলাম···

প্রিয়নাথ কহিল,—আমি বুঝচি, নন্দাকে না পেলে আমার জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে। তুমি বেণীর কাছে কৌশলে ইঙ্গিতে এ কথা তুলতে পারো···যাতে বুঝতে পারি, আমার এ আশা দুরাশা কি না···?

আমি কহিলাম,—কিন্তু তাঁর দিক্ থেকে কোনো সাড়া···?

প্রিয়নাথ কহিল,—দু'জনে আলাপ হয়েচে···নানা বিষয়ে আলোচনাও। সে সব ব্যাপারে তাঁর সলজ্জ ভঙ্গীই আমায় আরো উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলেচে···

আমি কহিলাম,—কিন্তু তোমার মায়া দেবী···?

প্রিয়নাথ মৃদু হাসিল, কহিল,—সে স্মৃতি···এ সত্য···

আমার প্রাণে আঘাত বাজিল। তরুণ বয়সে এ আঘাত সহজে বাজে। মানুষের প্রাণের দামটাই সব-চেয়ে বড় মনে হয়। আজ জীবনে অপরাহ্ণ গড়াইয়া আসিয়াছে···আজ তা বুঝিয়াছি। আজ বুঝিয়াছি, মানুষের মন···পাথর! তাহাতে কোনো দাগ পড়ে না···আঘাত বাজে, আবার তা মুছিয়া যায়! নব নব আঘাতে নিমেষে স্পন্দিত হয় মাত্র···সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বেদনা···অলক্ষিতে চকিতে প্রাণে দোল দিয়া যায়, সেখানে বসিতে পায় না, থিতাইতে পারে না···

প্রিয়নাথের কথা শুনিয়া রাগ ধরিল, তার পর করুণা জাগিল। আহা, জীর্ণ দীর্ণ মন··আবার যদি শ্যামল রঙে রাঙিয়া ওঠে···

কহিলাম,—বলবো বেণীকে···?

প্রিয়নাথ কহিল,—ভারী সতর্ক হয়ে কিন্তু…

কহিলাম—তাই হবে।…

বেণীকে কথাটা বলিলাম। শুনিয়া বেণী প্রথমে চুপ করিয়া রহিল, তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিল, তার পর কহিল,—কিন্তু নন্দা শিক্ষিতা, নন্দার মন জাগ্রত…

আমি কহিলাম—প্রিয়নাথের মনও জাগ্রত…

বেণী কহিল,—আর মায়া চক্রবর্ত্তী ? প্রিয়নাথের হৃদয়-বেদনার কথা যে তাকেও আমি বলেচি। শুনে দরদে তার চোখ ছলছলিয়ে এসেছিল। প্রিয়নাথের কথা উঠলে সে বলে, একজন মানুষ বটে ! দ্যাখো তো, এই বয়সেই মায়া দেবীর স্মৃতির প্রতি এমন শ্রদ্ধা ! প্রিয়নাথের উপর নন্দার শ্রদ্ধাও অগাধ…

কহিলাম,—সে কথা ঠিক ! মেয়েরা পুরুষকে জানে, অত্যন্ত হাল্‌কা তার মন, এই…না ? কাজেই…

বেণী কহিল,—অথচ, বেণীর শূন্য মন…আমি তো মুস্কিলে পড়লুম। আচ্ছা, দেখি, কি হয়…প্রিয়নাথ আমার বন্ধু…তার সুখের জন্য আমি…

দু'দিন পরে বেণী আসিয়া ডাকিল,—পাঁচু…

আমি কহিলাম,—কেন ?

বেণী কহিল—নন্দা শুনে বিরক্ত হলো…

আমি কহিলাম,—বিরক্ত ?

বেণী কহিল,—হাঁ। ঐ মায়া দেবী…দু'জনের মনের মাঝখানে মস্ত ব্যবধান তুলে থাকবেন চিরকাল ! নন্দার প্রাণে করুণার ভাবটা খুব বেশী।…অর্থাৎ তার ধারণা যা বুঝলুম, মায়ার স্মৃতিতে প্রিয়নাথের চিত্ত ভরপুর…নন্দার প্রতি এই যে গভীর অনুরাগ প্রিয়নাথ অনুভব করুচে, এটা মোহ…বিভ্রম ! যদি বিবাহ হয়, নন্দা কোনো দিন প্রিয়নাথকে সমগ্রভাবে হৃদয়ে-মনে গ্রহণ করতে পারবে না… দুজনের মাঝখানে আড়াল তুলে থাক্‌বে ঐ মায়াদেবীর স্মৃতি…

আমি কহিলাম,—বিপত্নীকরা তো হামেশা বিবাহ করচে…

বেণী কহিল,—নন্দা কোনো বিপত্নীককে কোনো দিন যেমন স্বামী ব'লে গ্রহণ করতে পারবে না, প্রিয়নাথকেও তেমনি…

আকাশে ক'টা পাখী উড়িতেছিল। আমার মনে হইল, ও-গুলা রৌদ্র-কিরণ-স্নাত শুভ্র উজ্জ্বল আকাশের পটে স্মৃতির কালো আঁচড় ! বেদাগ বস্তু জগতে দুর্লভ। অমন যে আকাশ…তাহাতেও ঐ কালো ফুট্‌কিগুলা ! মানুষের মনে তেমনি স্মৃতির বিন্দু…কালির রেখা !

আমি কহিলাম,—এ কিন্তু নিছক সাহিত্য…

বেণী হতাশভাবে কহিল,—এই সাহিত্যই তো জাতির মনের আয়না…

—উপায় ?…

বেণী কহিল,—বুঝচি না।…

বৈকালে প্রিয়নাথ আসিয়া ম্লান মুখে পাশে দাঁড়াইল। তাকে রিপোর্ট দিলাম।

প্রিয়নাথ হাসিল, ম্লান হাসি। তার পর কহিল,—কিন্তু ঐ মায়া দেবী স্রেফ কাল্পনিক জীব।

বিস্ময়ে তার পানে চাহিলাম।

প্রিয়নাথ কহিল,—আমার সে প্রেমের গল্পটি স্রেফ বানানো। মায়া দেবী ব'লে কোনো তরুণীকে কখনও জানতুম না—জানবার সুযোগও ঘটেনি। জামালপুরে হয় তো মেয়ে-স্কুল আছে, আমি জানি না। কারণ, জামালপুরে আমি কখনো বাস করিনি। ট্রেণে আসতে ষ্টেশনটা একবার ছেলেবেলায় দেখেছিলুম। টানেল্ আছে জামালপুরে,—শুধু এই জানি, ভাই ! কাজেই মেয়ে-স্কুল থাকলেও তার কোনো শিক্ষয়িত্রীকে দেখবার সৌভাগ্য আমার কখনো ঘটে নি !

চমকিয়া উঠিলাম। কহিলাম,—এ মিথ্যা কথা বলবার উদ্দেশ্য ?

প্রিয়নাথ কহিল,—নিছক কৌতুক…তোমাদের তারিফ পাবার জন্যও। তা ছাড়া কল্পনায় অমনি চিন্তা ক'রে আনন্দ পেতুম। সে আনন্দ বন্ধুদের মধ্যে বণ্টন করেচি…

রাস্কেল ! আমার শ্রদ্ধা ফাঁসিয়া চূর্ণ হইয়া গেল ! কহিলাম,—অমন গভীর প্রেম…

প্রিয়নাথ কহিল,—প্রেমের কথা আর বলো না, আর বলো না—ক্ষম হে সখা ! ঐ কবি আর লেখকের দল জীবনের বাস্তবতার উপর কেন যে এই বিভ্রমের সুর লাগান ! বোঝেন না, তাতে কি ভুল পথের দিকে ছুটতে চায় আমাদের এ তরুণ মন…কেবলি মনে হয়, কোনো বাতায়নে কোনো তরুণী যদি…

কহিলাম,—থামো। তা'হলে নন্দার প্রতি এই প্রেমও…?

প্রিয়নাথ কহিল,—এ খাঁটি। কারণ, নন্দা দেবী প্রত্যক্ষ…আর মায়া দেবী কল্পনা…

কহিলাম,—বেণীকে বলো ..

প্রিয়নাথ কহিল,—তুমি বলো, ভাই। আমার সঙ্কোচ হচ্ছে। তাকে ডেকেই প্রথমে এ বানানো গল্প বলি…শুনে সে গদ্‌গদ হয়ে ওঠে। যদি আজ সে ভাবে, তাকে বেকুব বানানোর জন্তই…

কহিলাম,—তা ভাবলে বিচিত্র হবে না।…

প্রিয়নাথ আমার ছুই হাত ধরিয়া কহিল,—সেদিন বুঝিনি, কল্পনার এ প্রেম সত্য হয়ে একদিন দেখা দেবে! তুমি তাকে বুঝিয়ে বলো। আমার বন্ধু তুমি—

অগত্যা বেণীর সঙ্গে আবার আমার আলোচনা…এবং পরের দিন বেণী আসিয়া ডাকিল—ওহে পাঁচু…

কহিলাম,—কি?

বেণী বলিল,—নন্দা একেবারে ছুই চোখে বিদ্যুৎ বর্ষে বজ্রস্বরে ব'লে উঠলো, তোমার বন্ধুর ছুটো কথাই সমান সত্য…যেমন মায়া দেবীর স্মৃতি, তেমনি আমার প্রতি এই নবানুরাগ…

আমি কহিলাম,—এমন সুস্পষ্ট ভাষায়…? বলো কি?

বেণী কহিল,—নিশ্চয়। ও যে আধুনিকী…এবং আধুনিক সাহিত্যেও নন্দার ব্যুৎপত্তি প্রবল।

বাধা দিয়া কহিলাম,—প্রিয়নাথকে কি বলবো…?

বেণী কহিল,—তার মনে বেদনা দিতে চাই না। তবে ধৈর্য্য ধরুক…সামনে এগ্‌জামিন, অনার্সে যদি ফার্ষ্ট হয়, তা'হলে উপরওয়ালাদের তরফ থেকে বিবাহ ঘটিয়ে দিতে পারবো, বোধ হয়, তার পর…

আমি কহিলাম,—তার বরাত আর তোমার হাত-যশ!…কিন্তু ছ'ছুটো জীবন…বিশেষ নন্দা দেবী…তোমার ভগ্নী শিক্ষিতা এবং আধুনিক সাহিত্যেও যখন তাঁর…

বেণী সঙ্কারে কহিল,—আরে, সাহিত্য সাহিত্য; জীবন জীবন…আমরাও তো সাহিত্যচর্চ্চা করি, সত্যব্রতর পাঁচিল ভাঙ্গা কবিতার তারিফও করি, তা ব'লে কারো পাঁচিল ভাঙ্গার সাধ কখনো মনে পুষেছি…?

আমি কহিলাম,—পুষিনি, কারণ, পাঁচিল ভাঙ্গার প্রেরণা জাগেনি কোনো দিন…

বেণী কহিল,—সত্যব্রতর প্রেরণা জেগেচে, কিন্তু পাঁচিল ভাঙ্গার কোনো উদ্যোগ করেচে আজ অবধি?

আমি কহিলাম,—না। শুধু আবেগ-ভরা কবিতার ছন্দ কখনো অশ্রুমণ্ডিত করচে, কখনো বা দীর্ঘশ্বাসে ফাঁপিয়ে তুলচে…

বেণী কহিল,—Lost head. Sense ঠিক থাকলে· অর্থাৎ আমি এমন অবস্থায় পড়লে…

হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম—কি করতে?

বেণী কহিল,—দুর্লভের পিছনে অশ্রু ত্যাগ না ক'রে যা সুলভ, তাই আয়ত্ত করতুম। অর্থাৎ ক্ষেত্রান্তর থেকে তরুণী নববধূ সংগ্রহ ক'রে এই রুদ্ধপ্রেম উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলতুম।

আমি কহিলাম,—Most practical love, or love with a sense. প্রেমে তা হ'লে তোমার আস্থা নাই? প্রেম অমূলক?

বেণী কহিল—তাও ঠিক বলতে পারি না। ছাপার অক্ষরে প্রেমের অত উল্লেখ যখন দেখি—তখন অমূলক বলি কি ক'রে?…

কহিলাম,—তা বটে!

অন্ত্য পর্ব্ব

প্রিয়নাথ ম্লান মূর্ত্তি…প্রেমার্ত্ত মন শেষে ঢালিয়া দিল কলেজের কেতাবে। পরীক্ষার বিভীষিকা আমাদের মধুচক্রে যেন লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিল! কলেজ ছাড়িয়া সকলে দিবারাত্র কেতাবের পাতা উল্টাইতে ব্যস্ত। কাজেই…

এগ্‌জামিনের পর সহসা আমার একটা চাকরি জুটিয়া গেল কলিকাতার বাহিরে। হাতের লক্ষ্মী…হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিলাম। ওকালতিতে ভবিষ্যতের বিরাট আশা… ছাড়িলাম। কারণ, সেদিকে লোলুপতা রাখিতে গেলে আরো ক'টা এগজামিনের আবর্ত্ত পার হইতে হয়। অতএব…

তার পর আসিল ঐ গল্পে প্রবন্ধে যে-কথাটা প্রায় দেখি,—সুধীজনের নিত্য-ব্যবহার্য্য…সেই কালস্রোত! এ স্রোতে ভাসিয়া পাঁচ-ছ বছর পরে একদিন পাশাপাশি সহসা মিলিলাম, বেণী আর আমি।…

মাহিন

বসুমতী চিত্র-বিভাগ]

[শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন।

আমি তখন জার্ডিনের পাটের কাজে ঘুরিতে ঘুরিতে নদীয়ার ওদিকে গিয়া পড়িয়াছি; বেণী আসিয়া জুটিল তার শ্বশুর-বাড়ীতে এক শ্যালীর বিবাহে নিমন্ত্রণে। পথে দৈবাৎ দেখা—বেণী বিলের সন্ধানে চলিয়াছিল, হাঁস মারিতে; আর আমি জার্ডিন কোম্পানীর তরফ হইতে একটা জমীর দখল লইতে পেয়াদা-সমেত চলিয়াছিলাম বাঁশ গাড়িতে। বেণী কহিল,—আরে, পাঁচু যে…

আমি কহিলাম,—তাই তো, বেণী!…

বেণী বন্দুক রাখিয়া মাঠের ধারে বসিয়া পড়িল; আমি পেয়াদাকে ডাকিয়া কহিলাম,—একটু জিরিয়ে নাও তোমরা।

কথায় কথায় প্রিয়নাথের কথা উঠিল। বেণী কহিল,—নন্দার সঙ্গেই তার বিবাহ হয়েচে…

কহিলাম,—সে ব্যবধান?…

বেণী কহিল,—মস্ত কাহিনী…

কহিলাম,—বলো…

বেণী কহিল,—প্রিয়নাথ ধৈর্য্য ধ'রে রইলো এবং প্রেমে বিমূঢ়ায় হলো না ঐ এগ্‌জামিনের কল্যাণে। এগ্‌জামিন আসন্ন. অনার্সে পাশ করার জন্য সে কেতাবে অস্বাভাবিক মনঃসংযোগ করলে…আমাদের গৃহেও দুর্লভ হয়ে উঠলো। একদিন নন্দাকে বল্লুম,—তোমার বে-দরদ তাকে এখান থেকে বিতাড়িত করলে।

প্রশ্ন করিলাম,—তিনি কি বল্লেন?

বেণী কহিল,—নন্দা গর্জ্জে উঠলো—মিথ্যা কথা! আমি তোমার বন্ধুকে আসতেও বলিনি এবং আসতে বারণও করিনি। আমি বল্লুম,—বারণ করা যায় দু'ভাবে—এক, মুখের সুস্পষ্ট বচনে; আর-এক অস্পষ্ট ইঙ্গিতে। সে যে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করেচে এবং যে-দুর্ব্বলতার জন্য কুণ্ঠিত হয়ে আছে, তাতে তোমার ব্যবহার তার প্রতি কঠিন অবিচার হয়ে বেজেচে। একটা কৌতুক মাত্র সে করেছিল—মায়া দেবীর কোনো অস্তিত্ব নেই, তবু…তাতে নন্দা বললে,—বানানো নারী-চিত্ত নিয়ে যে এ কৌতুক করতে পারে, আসল নারী-চিত্তও হয় তো তার কাছে একদিন কৌতুকের উৎস হবে…! সন্দেহের উপর চিত্ত-বিনিময় চলে না…

আমি কহিলাম,—কথা ঠিক। তবু…?

বেণী কহিল—আমি স্তব্ধ রইলুম। এ সম্বন্ধে আর কোনো উচ্চ-বাচ্য না। তার পর এগ্‌জামিনের রেজাল্ট বার হলো…প্রিয়নাথ ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট…আমি বিবাহের প্রস্তাব তুললুম। বাড়ীতে সকলের মত হলো। নন্দা গুরুজনদের কাছে এ সম্বন্ধে একটি কথাও তুলতে পারলে না…

আমি কহিলাম—Ah, এইখানেই বাঙ্গালীর মেয়ে আজও বাঙ্গালীর মেয়ে…এবং এইখানেই তফাৎ কেতাবের নায়িকায় আর জীবন্ত নায়িকায়…

বেণী কহিল,—শোনো…তার পর বিবাহ হলো। কিন্তু দু'মাস পরে প্রিয়নাথ এসে মলিন মুখে আমায় জানালে, মনের কোনো সম্পর্ক নেই দু'জনে। বাহিরে অর্থাৎ জীবনযাত্রায় কোথাও বাধচে না; যে-ব্যবধান দুজনের মাঝে, বাহিরের লোক তার কোনো পরিচয় জানে না। সে-পরিচয় পাবার কোনো ফাঁকও কোথাও ছিল না!…প্রিয়নাথ বললে, কিন্তু এ কি জীবন?…আমি তাকে বললুম, ধৈর্য্য ধরো…তা ছাড়া উপায়ও তো নেই, বন্ধু! প্রিয়নাথ বললে, তা জানি। কিন্তু সময়ে সময়ে কি দুঃসহ বাজে এ বেদনা!…

তার পর প্রিয়নাথ ডেপুটিগিরি পেয়ে দূরে চ'লে গেল; আমি বাবার মক্কেলগুলির পৃষ্ঠে চ'ড়ে জীবনযাত্রা সুরু করলুম।

আমি কহিলাম,—প্রিয়নাথের খবর বলো…

বেণী কহিল,—Latest bulletin ভালো…তবে কি ক'রে এ হলো, সে সম্বন্ধে কিম্বদন্তী মানতে হবে। অর্থাৎ কতক নন্দার মুখে শোনা, কতক শোনা প্রিয়নাথের কাছে এবং কতক আমার স্ত্রীর মুখ থেকে। রবীন্দ্রনাথের আদি যুগের গল্প 'মধ্যবর্ত্তিনী' মনে আছে? প্রিয়নাথ আর নন্দার মধ্যে ব্যবধান মায়ার বানানো প্রেমের স্মৃতি! তার পর ঘটলো এক কাহিনী—তা ঠিক 'এক রাত্রি' গল্পের পুনরাবৃত্তি…

আমি কহিলাম,—অর্থাৎ?

বেণী কহিল,—প্রিয়নাথের কাছে আমার শোনা—গত বছর। সে তখন দুবরাজপুরে। অজয়ে খুব বন্যা এলো না? সেই বন্যায় চারিধার তখন যেতে বসেচে…প্রিয়নাথ মফঃস্বলে গেছলো। ফেরবার মুখে জলের ঐ দুরন্ত লীলা দেখে সে শিউরে [illegible]

নন্দা···তার কি হলো? সে কি আছে? একটা মস্ত উঁচু টিলা···সেটায় সে আশ্রয় নিলে—তার চাপরাশি ছুটলো জল ভেঙ্গে নৌকো কিম্বা ভেলা সংগ্রহ করতে। তার আর দেখা নেই। অজয় ফুঁশে ফুলে ক্রমে সেই টিলা আক্রমণে ছুটে এলো···কি তার উচ্ছ্বসিত গর্জ্জন···সংহারের মূর্ত্তি! মুখে বিদ্রূপের তীব্র ফেনিলোচ্ছল অট্টহাস্য! প্রিয়নাথ প্রমাদ গণলে···সে টিলার একদম্ উপরে চড়লো···এ জলে বেরুবার চেষ্টা আত্মহত্যার প্রয়াস। সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক ম্লান। উপরে উঠতেই প্রিয়নাথ দেখে, সেখানে আরো দু'জন আগে থেকে আশ্রয় নেছে···তারা নন্দা আর নন্দার দাই-ঝী পার্ব্বতী···প্রিয়নাথ আনন্দে ডাকলে,—নন্দা···

শুনে নন্দা বললে, এসেচো? আমি লোক পাঠিয়েচি, তোমার সন্ধানে। বাড়ী ডুবে গেছে···তুমি আসবে এই পথে, তাই এখানে এসে দাঁড়িয়েচি···গুপী চাকর তোমার সন্ধানে গেছে। প্রিয়নাথ পার্ব্বতীকে বললে—তুই এ টিলার নাম জানিস? সে বললে, জানে। তখন তাকে পাঠানো হলো চাপরাশির খোঁজে···পার্ব্বতী সেই অঞ্চলের লোক—সব জানে-শোনে, তাই···

তার পর···

আমি কহিলাম,—বুঝেচি,—উপন্যাসে যেমন হয়··· কেমন···? রাস্কেলের কল্পনা-শক্তি খুব। ভগবান্ যেন মস্ত উদ্দেশ্য নিয়ে অজয়ে বন্যা পাঠিয়েছিলেন, আর নভেলিষ্টের মত সব ডুবিয়ে ওদের দু'টি প্রাণীকে ঐ উঁচু টিলার উপর ঠেলে তুলেছিলেন, উপসংহার-অংশ লিখবেন ব'লে···না?

বেণী কহিল,—শোনো। শেষটুকু খাশা···

কহিলাম,—বলো···

বেণী কহিল,—প্রিয়নাথ ডাকলে, নন্দা···নন্দা বললে, —কেন? প্রিয়নাথ বললে,—ঐ প্রলয়ের জল এগিয়ে আসচে—এই চরম মুহূর্ত্তে অকপটে স্বীকার করচি, তোমায় আমি ভালোবাসি। একমাত্র তোমাকেই ভালোবেসেচি। মায়া সত্যই মরীচিকা, মায়া নিছক কল্পনার সৃষ্টি··· বিশ্বাস করো···

নন্দার সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো···ম্লান দৃষ্টি আরো ম্লান হলো! প্রিয়নাথ তার হাত ধ'রে বললে—তুমিও আমায় ভালোবাসো—এ কথা সত্য। নন্দা তাতে কেঁদে ফেললে। নন্দা বললে, কেন এ কথা বলচো? তার উত্তরে প্রিয়নাথ বললে,—না হ'লে এই জলস্রোতে তুমি প্রাণের মায়া ছেড়ে আমায় বাঁচাতে এখানে আসবে কেন? আমার খোঁজে চারিধারে লোকই বা পাঠাবে কেন?···

এ কথায় নন্দা উচ্ছ্বসিত হয়ে তার বুকে মাথা রেখে ব'লে উঠলো,—আমি অহঙ্কারে তোমায় উপেক্ষা করেচি। আজ এই প্রলয়ের মুহূর্ত্তে আমিও বুঝেচি, তোমায় আমি ভালোবাসি। এই প্রলয়ের মুহূর্ত্তে এ-ও বুঝেচি, মায়ার সে কাহিনী কল্পিত···আমায় ক্ষমা করো। পুরুষের বুক ঐ আকাশের মত অসীম। আমি ভুল বুঝেছিলুম। ক্ষমা করো। এবং এই ঘটনার পর থেকে তারা মনের আরামে আছে। প্রিয়নাথ এখন আছে চাঁদপুরে।

আমি কহিলাম,—বন্যা থামলো কি না, সে কথা শোনোনি?

বেণী কহিল,—রাত বারোটা অবধি তারা ঐ টিলার উপর ছিল। তার পর জ্যোৎস্না ফুটলো। পার্ব্বতী ফিরে এলো, সঙ্গে চাপরাশি—ভেলাও মিললো। সেই ভেলায় চড়ে তারা বাসায় ফেরে—তখন বাসার ধার থেকে বন্যার জল নেমে গেছে···

আমি কহিলাম,—এবং গৃহজাত সম্পত্তিও নিশ্চয় রক্ষা পেয়েছিল!

বেণী কহিল,—সে কথা জিজ্ঞাসা করিনি···

আমি কহিলাম,—নিশ্চয় তাই। অর্থাৎ বুঝলে না, এটাও বানানো গল্প···মোদ্দা, বিস্মিত হচ্ছি—প্রিয়নাথ এখনো নভেল লেখা সুরু করেনি কেন?

বেণী কহিল,—মাসিক পত্রের উৎসাহের অভাবে, নিশ্চয়! মফঃস্বলে থাকে, কাজেই প্রাচীন মাসিক পত্রের নাগাল পাওয়া তার পক্ষে শক্ত এবং আধুনিক সাহিত্য-রীতিতে অভ্যস্ত না হ'লে তরুণ-পত্রের দল আমোল দেবে না।

আমার মনে কিন্তু সমস্যা রহিয়া গেল! ঐ [illegible]র ব্যাপার···ওটা সত্য, না···?

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
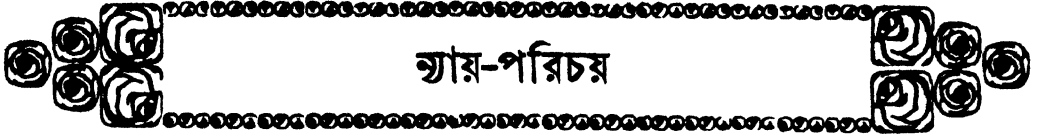
কণাদ ও গৌতমের মত তাঁহাদিগের বুদ্ধি-কল্পিত নহে

চতুর্থ অধ্যায়

শিষ্য। কণাদ ও গৌতমের মতে জীবাত্মা যে, প্রত্যেক জীবদেহে বস্তুতঃই ভিন্ন, সুতরাং পরব্রহ্ম হইতেও বস্তুতঃ ভিন্ন এবং জ্ঞান, ইচ্ছা, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সুখদুঃখাদি যে জীবাত্মারই বাস্তব গুণ, ইহা আমি বুঝিয়াছি; এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণ যে কণাদ ও গৌতমের সমস্ত সূত্রের পর্য্যালোচনা ও সামঞ্জস্য বিচার করিয়াই তাঁহাদিগের ঐরূপই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া গিয়াছেন, এ বিষয়েও আমার সংশয় নাই। কিন্তু কণাদ ও গৌতম তর্ক দ্বারা কেন যে ঐ সমস্ত শ্রুতিবিরুদ্ধ মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ত আমি বুঝিতেছি না। তর্ক দ্বারা কখনও আত্মতত্ত্ব-নির্ণয় হইতে পারে না। কারণ, তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। শারীরক ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, প্রথমে এক তার্কিক তর্ক দ্বারা যাহা নির্ণয় করেন, পরে তদপেক্ষায় বুদ্ধিমান্ অপর তার্কিক অন্যরূপ তর্ক দ্বারা তাহা খণ্ডন করিয়া অন্যমত সমর্থন করেন, পরে আবার অন্য তার্কিক তর্ক দ্বারা তাহাও খণ্ডন করিয়া অন্যরূপ মত সমর্থন করেন, ইহা সর্ব্বত্রই দেখা যায়। সুতরাং তর্কের কুত্রাপি প্রতিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তি নাই। একই সময়ে একই স্থানে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সমস্ত তার্কিক উপস্থিত করিয়া তর্ক দ্বারা সকলের ঐকমত্যে কোন তত্ত্ব নির্ণয় করাও একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং অলৌকিক অচিন্ত্য তত্ত্বের নির্ণয় করিতে হইলে একমাত্র শ্রুতিকেই আশ্রয় করিতে হইবে। যে তত্ত্ব শ্রুতিসিদ্ধ, তাহাই প্রকৃত তত্ত্ব, প্রকৃত সত্য। তাই শাস্ত্রও বলিয়াছেন—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।" যে সমস্ত পদার্থ অচিন্ত্য, যাহা লৌকিক বুদ্ধিগম্যই নহে, তাহা তর্কের বিষয়ই নহে। সুতরাং তর্কের দ্বারা তাহার নির্ণয় হইতে পারে না। সুতরাং কণাদ ও গৌতম তর্কের দ্বারা যে সমস্ত শ্রুতিবিরুদ্ধ মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কিরূপে গ্রহণ করা যায়? আর অক্ষপাদ গৌতম প্রণীত ন্যায়-দর্শন এবং কণাদ প্রণীত বৈশেষিক দর্শনে যে কোন কোন অংশ শ্রুতিবিরুদ্ধ আছে, তাহা পরিত্যাজ্য, ইহা ত শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে।

গুরু। কোন্ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে? আর শাস্ত্রে উহা কথিত হইলে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাহা বলেন নাই কেন? তাঁহারা কি সে শাস্ত্রবচন জানিতেন না? আর যদি পরবর্ত্তী বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত পরাশরোপপুরাণের বচনকে (১) শাস্ত্র বলিয়া তুমি গ্রহণ কর, তাহা হইলে তাঁহার উদ্ধৃত পদ্মপুরাণ-বচনের অপরাধ কি? সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যের প্রারম্ভে বিজ্ঞানভিক্ষু "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ" ইত্যাদি যে সমস্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা মুদ্রিত কোন পদ্মপুরাণ পুস্তকেও দেখা যায়। ঐ সমস্ত বচনে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত "মায়াবাদ"কে অবৈদিক ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলা হইয়াছে। কোন কোন বৈষ্ণবাচার্য্যও ঐ সমস্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু "অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি" গ্রন্থে কাশ্মীরক সদানন্দ যতি "সাংখ্যভাষ্যকৃদ্ভিশ্চোদাহৃতং"—এই কথা বলিয়া সাংখ্যভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত "অক্ষপাদপ্রণীতে চ" ইত্যাদি বচনদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া নিজ মত সমর্থন করিলেও বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং"—ইত্যাদি বচনের কোনই আলোচনা বা উল্লেখই করেন নাই।

যদি বল, বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত অদ্বৈতবাদের নিন্দা-বোধক ঐ সমস্ত বচন অসঙ্গত ও বিরুদ্ধার্থ বলিয়া উহা প্রমাণ হইতেই পারে না। পরবর্ত্তী কালে ঐ সমস্ত বচন রচিত হইয়া পদ্মপুরাণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। আমিও বলি, তথাস্তু। কিন্তু তাহা হইলে অদ্বৈতবাদী সদানন্দ যতি বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত পরাশরোপপুরাণের বচনকে কিরূপে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবেন, ইহাও ত বুঝা আবশ্যক। উক্ত বচনে কথিত হইয়াছে যে ন্যায়, বৈশেষিক এবং সাংখ্য ও যোগদর্শনে শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ আছে। জৈমিনির পূর্ব্ব-মীমাংসাদর্শন ও ব্যাসের বেদান্তদর্শনে শ্রুতিবিরুদ্ধ কোন অংশ নাই। কারণ, তাঁহারা উভয়েই শ্রুতির পারগামী। কিন্তু অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের মতেও কি জৈমিনির পূর্ব্ব-মীমাংসাদর্শনে শ্রুতিবিরুদ্ধ কোন অংশই নাই? তাহা হইলে অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্কর জৈমিনির কোন কোন মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন কেন? বেদান্তদর্শনের "দেবতা-ধিকরণের"র ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর দেবতাদিগেরও বিগ্রহ বা দেহ আছে এবং তাঁহাদিগেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে জৈমিনির যে বিরুদ্ধ

(১) অক্ষপাদপ্রণীতে চ কাণাদে সাংখ্যযোগয়োঃ।
ত্যাজ্যঃ শ্রুতিবিরুদ্ধোঽংশঃ শ্রুত্যেকশরণৈর্নৃভিঃ।
জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধাংশো ন কশ্চন।
শ্রুত্যা বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতৌ হি তৌ॥
(সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্‌ধৃত বচন।)

মতের খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা কি শঙ্করের মতে শ্রুতি-বিরুদ্ধ নহে? তাহা হইলে অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ও যে, বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত উক্ত বচনের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে পারেন না, ইহা তুমি প্রণিধান পূর্ব্বক চিন্তা কর। আর আচার্য্য শঙ্কর ও বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ উক্ত বচন কেন উদ্ধৃত করেন নাই, ইহাও তুমি চিন্তা কর।

পরন্তু ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক যে, ন্যায়াদি দর্শনের মতকে বেদান্তমতের অবিরুদ্ধ বলিয়া নিজের অভিমত সমর্থন করিতে গেলে বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত উক্ত বচনকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করাই যায় না। আর উহা প্রমাণরূপে গ্রহণ করিলে জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের কোন মতও যে পরিত্যাজ্য নহে, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, উক্ত বচনে জৈমিনির দর্শনেও বেদবিরুদ্ধ কোন অংশ নাই, ইহা কথিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে অন্যান্য দর্শনের মত পরিত্যাগ করিয়া কেবল বেদান্ত-দর্শনের মতেরই অনুসরণ কর্ত্তব্য বলা যায় না (১)। আর বেদান্তদর্শনের যে প্রকৃত মত কি, সে বিষয়েও ত বহু প্রাচীন মত আছে। পরে বিজ্ঞানভিক্ষুও তাঁহার নিজমতানুসারে বেদান্তদর্শনের ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত বচনানুসারে নিঃশঙ্কচিত্তে বেদান্তদর্শনের কোন্ মতের অনুসরণ কর্ত্তব্য, ইহাও ত আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারি না। সুতরাং বিজ্ঞান-ভিক্ষুর উদ্ধৃত উক্ত বচনকে আশ্রয় করিলেই বা সকল বিবাদ-নিবৃত্তির আশা কোথায়?

অবশ্য তোমার কথিত "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ"—ইত্যাদি বচন, আস্তিকমাত্রেরই গ্রাহ্য। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে কথিত হইয়াছে—

> অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাস্তান্ন তর্কেণ যোজয়েৎ।
> প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥ ৫।১২

অন্যত্র উক্ত বচনের পরার্দ্ধে "নাপ্রতিষ্ঠিততর্কেণ গম্ভীরার্থস্য নিশ্চয়ঃ"—এইরূপ পাঠ আছে, ইহা উক্ত শ্লোকের টীকায় নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, অপ্রতি-ষ্ঠিত তর্কের দ্বারা গম্ভীর তত্ত্ব অর্থাৎ অতি দুর্জ্ঞেয় অচিন্ত্য অলৌকিক তত্ত্বের নির্ণয় হইতে পারে না। "তর্ক" শব্দের অর্থ এখানে অনুমান। শ্রুতিনিরপেক্ষ নিজ বুদ্ধিমাত্র-কল্পিত তর্ক এবং শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্কই অপ্রতিষ্ঠিত তর্ক, উহাকেই বলে কুতর্ক। বেদান্তদর্শনের "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ইত্যাদি সূত্রেও ঐ কুতর্কেরই অপ্রতিষ্ঠা বলা হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করও কঠোপনিষদের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"ন হি কুতর্কস্য প্রতিষ্ঠা কচিৎ বিদ্যতে।" পূর্ব্বে তাঁহার কথা বলিয়াছি। কূর্ম্মপুরাণেও কথিত হইয়াছে—"শ্রুতিসাহায্য-রহিতমনুমানং ন কুত্রচিৎ।" অর্থাৎ অলৌকিক আত্মাদি তত্ত্বে শ্রুতির সাহায্যশূন্য বা শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমান প্রমাণই নহে।

কিন্তু মহর্ষি কণাদ ও গৌতম যে, শ্রুতি জানিতেন না, অথবা জানিয়াও তাহার কোন অপেক্ষা না করিয়া কেবল তর্কের দ্বারাই ঐ সমস্ত মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, অথবা তাঁহারা শাস্ত্র অপেক্ষাও অনুমান প্রমাণরূপ তর্ককে প্রবল বলিয়াছেন, ইহা ত আমরা বলিতে পারি না। কারণ, তাঁহারাও শাস্ত্রবিরুদ্ধ অনুমানের প্রামাণ্যই স্বীকার করেন নাই। তাই গৌতম কোন বিষয়ে অপরের শ্রুতিবিরুদ্ধ কোন অনুমানের আশঙ্কা করিয়া "শ্রুতিপ্রামাণ্যাচ্চ"—(৩।১।৩১) এই সূত্রের দ্বারা সেই অনুমানের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। তদ্দ্বারা শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমানের যে প্রামাণ্যই নাই, ইহা তিনিও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ মহর্ষি কণাদও আত্মার নানাত্ব-সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া পরে সূত্র বলিয়াছেন—"শাস্ত্র সামর্থ্যাচ্চ"। পূর্ব্বে ইহা বলিয়াছি। কিন্তু তিনি শাস্ত্রের কোন অপেক্ষা না করিলে অথবা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ অনুমানেরও প্রামাণ্য স্বীকার করিলে সেখানে পরে আবার ঐ সূত্রটি বলিবেন কেন? তিনি বৈশেষিকদর্শনে আরও অনেক স্থলে অনেক সূত্রের দ্বারা কোন কোন বিষয়ে বেদকেই প্রমাণরূপে স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং কণাদ ও গৌতমের ঐ সমস্ত মত যে, তাঁহাদিগের বুদ্ধিমাত্র-কল্পিত, ইহা কিরূপে বলা যায়?

তবে কণাদ ও গৌতমের দর্শন মননশাস্ত্র ব[illegible] তাহাতে প্রধানতঃ মননের উপকরণ তর্কই প্রদর্শিত [illegible]য়াছে। তাই তাহাতে বেদার্থব্যাখ্যার দ্বারা আ[illegible] পদার্থের তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের ব্যা[illegible] ঐ সমস্ত মতও বেদমূলক, ইহাই আমরা বিশ্বাস ক[illegible] কারণ, সমস্ত আর্যমতেরই মূল বেদ। ঋষিগণ ভিন্ন [illegible] বেদবাক্যানুসারেই নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কালে অনেক বেদবাক্য বিলুপ্ত হইয়াছে, অনেক বেদবাক্য অন্যরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং অনেক বাক্য

---

(১) অদ্বৈতবাদী মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় ন্যায়াদি দর্শনের মতকে বেদান্তমতের অবিরুদ্ধ বলিয়াও পূর্ব্বে বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত পরাশরোপপুরাণের "অক্ষপাদপ্রণীতে চ" ইত্যাদি বচনদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া এবং তদনুসারে জৈমিনির দর্শনে বেদবিরুদ্ধ কোন অংশ নাই, ইহা বলিয়াও লিখিয়াছেন—

"পরাশর বলিতেছেন—অন্যান্য দর্শনে কোন কোন অংশ শ্রুতিবিরুদ্ধও আছে। এ অবস্থায় মহাজনদিগের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অপরাপর দর্শনের মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে আমরা বেদান্তদর্শনের মতের অনুসরণ করিতে পারি। তাহাতে কিছুমাত্র অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা নাই। বরং বেদান্তদর্শনের মতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া—অন্যান্য দর্শনের মতের অনুসরণ করিলে অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা আছে, ইহা সাহসসহকারে বলিতে পারা যায়।" "ফেলোসিপের লেক্‌চর" পঞ্চমবর্ষ ৭১ পৃষ্ঠা ও ১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অন্ত সম্প্রদায় প্রকৃত বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু সেই সমস্ত বাক্যও যে প্রকৃত বেদবাক্যই নহে, ইহাও ত আমরা বলিতে পারি না। কারণ, সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক বেদবিশ্বাসী ঋষিকল্প কোন আচার্য্য যে নিজ মতের প্রতিপাদক কোন বাক্য রচনা করিয়া উহাও শ্রুতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা ত আমরা মনে করিতে পারি না। এই যে, দ্বৈতবাদের প্রচারক পরমবৈষ্ণব আনন্দতীর্থ বা মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদের স্পষ্ট প্রতিপাদক অনেক শ্রুতিবাক্য প্রদর্শন করিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, সেই সমস্ত বাক্য কি তিনি নিজেই রচনা করিয়াছিলেন? তিনি কি প্রতারক? আর তাহা হইলে কি ব্যাস যতি প্রভৃতি বহু মহামনীষী তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া উহা সমর্থন করিতেন? এবং ভারতের লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি তাঁহার সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইতেন? আমরা ইহা কখনই সম্ভব মনে করি না। মধ্বাচার্য্যের উল্লিখিত সেই সমস্ত শ্রুতিবাক্য অন্ত সম্প্রদায় গ্রহণ না করিলেও উহা তাঁহার গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত এবং সুপ্রাচীনকালেও উহা দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে শ্রুতি বলিয়াই প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহাই আমরা বুঝি। এইরূপ কণাদ ও গৌতমের প্রকাশিত মতও তাঁহাদিগের বুদ্ধিমাত্র-কল্পিত নহে। সুচিরকাল হইতেই বেদমূলক ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্র আছে, কণাদ ও গৌতম উহা লাভ করিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা উহার কর্ত্তা নহেন, কিন্তু প্রকাশক। ন্যায়শাস্ত্র যে, অক্ষপাদ গৌতমের সম্বন্ধে প্রতিভাত হইয়াছিল, তিনি উহার স্রষ্টা নহেন—ইহা ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও সর্ব্বশেষে বলিয়া গিয়াছেন। আর অদ্বৈতবাদী যে সদানন্দ যতি বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত বচনানুসারে ন্যায় বৈশেষিকদর্শনের কোন কোন অংশকে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন, তিনিও ত পরে বলিয়াছেন যে, (১) গৌতম প্রভৃতি মুনিগণ ন্যায়াদি শাস্ত্রের স্মারক, কিন্তু তাঁহারা নিজ বুদ্ধির দ্বারা ঐ সমস্ত শাস্ত্রের কর্ত্তা নহেন। সুতরাং সদানন্দ যতিও ত কণাদ ও গৌতমের কোন মতকেই তাঁহাদিগের বুদ্ধিমাত্র-কল্পিত বলিতে পারেন না।

পরন্তু সুপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতে বেদের নানা অর্থবাদবাক্য আশ্রয় করিয়া তাহার নানারূপ ব্যাখ্যার দ্বারাও অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ নানা মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সেই সমস্ত মত ও তাহার প্রতিপাদক সাংখ্যাদি দর্শন প্রাচীনকালে "প্রবাদ" নামেও কথিত হইয়াছে। "বাক্যপদীয়" গ্রন্থে মহামনীষী ভর্তৃহরিও ঐরূপ বলিয়াছেন (২)। যোগদর্শন-ভাষ্যে (৪।২১) ব্যাসদেবও বলিয়াছেন—"সাংখ্যযোগাদয়স্তু প্রবাদাঃ" (১) সুতরাং বেদার্থের ব্যাখ্যাভেদেও যে অনেক মতভেদের প্রকাশ হইয়াছে, ইহাও স্বীকার্য্য। তাহা হইলে কোন্ মত যে শ্রুতিবিরুদ্ধ এবং কোন্ মত শ্রুতিসম্মত, ইহাই বা আমরা কিরূপে বলিতে পারি? শ্রুতিপ্রামাণ্যবাদী কোন আচার্য্যই ত শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমানরূপ তর্কের প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই।

সত্য বটে, একই সময়ে একই স্থানে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত তার্কিককে উপস্থিত করিয়া তর্ক দ্বারা সকলের ঐকমত্যে কোন সিদ্ধান্ত-নির্ণয় একেবারেই অসম্ভব, কিন্তু ঐরূপ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত বেদব্যাখ্যাসমর্থ পণ্ডিতগণকে একত্র উপস্থিত করিয়া সকলের ঐকমত্যে প্রকৃত বেদার্থ নির্ণয় করাও ত একেবারেই অসম্ভব। তর্ক দ্বারা সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিতে গেলে যেমন তার্কিকের বুদ্ধিভেদমূলক তর্কের ভেদপ্রযুক্ত নানা মতভেদ অবশ্যম্ভাবী, তদ্রূপ বেদের ব্যাখ্যা দ্বারা সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিতে গেলেও ত ব্যাখ্যাভেদে নানা মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। কারণ, বিচার ব্যতীত অতি দুর্ব্বোধ বেদার্থ নির্ণয় হইতে পারে না। তর্ক ব্যতীতও বেদার্থ-বিচার হইতে পারে না। বেদার্থে বিবাদ হইলে সেখানে যে তর্ক-বিশেষের দ্বারাই প্রকৃতার্থ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, ইহা ত আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন এবং পরে তিনি মনু-বচনের দ্বারাও উহা সমর্থন করিয়াছেন (২)। সুতরাং বেদার্থ-নির্ণয়ে তর্ক যখন সকলেরই অপরিহার্য্য, তখন তর্কের ভেদে বেদার্থবিষয়েও মতভেদ অবশ্যই হইবে। নির্ব্বিবাদে কোন বেদার্থ-নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্তও কেহ কাহারও তর্ককে বেদবিরুদ্ধ বলিয়াও প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। সুতরাং অলৌকিক অচিন্ত্য তত্ত্ব-নির্ণয়ের জন্য শ্রুতিদেবীকে আশ্রয় করিয়াই বা সকল বিবাদ নিবৃত্তির আশা কোথায়?

শিষ্য। আপনি কণাদ ও গৌতমের পূর্ব্বোক্ত মতকেও শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিবেন না, ইহা আমি বুঝিয়াছি। কিন্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত হইয়াছে—"অসঙ্গো হ্যয়ং

(১) গৌতমাদিমুনীনাং তত্তচ্ছাস্ত্র-স্মারকত্বমেব শ্রূয়তে, ন তু বুদ্ধিপূর্ব্বককর্ত্তৃত্বং। তদুক্তং—"ব্রহ্মাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মারকা ন তু কারকা" ইতি। "অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি" ১ম মুদ্গর।

(২) "তত্ত্বার্থবাদরূপাণি নিশ্চিত্য স্ববিকল্পজাঃ।
একত্বিনাং দ্বৈতিনাঞ্চ প্রবাদা বহুধা মতাঃ"। ৭।

(১) সাংখ্যাশ্চ যোগাশ্চ ত এবাদয়ো যেষাং বৈশেষিকাদি-প্রবাদানাং, তে সাংখ্যযোগাদয়ঃ প্রবাদাঃ। (বাচস্পতি মিশ্র-কৃত টীকা)।

(২) শ্রুত্যর্থ-বিপ্রতিপত্তৌ চার্থাভাস-নিরাকরণেন সম্যগর্থ-নির্দ্ধারণং তর্কেণৈব বাক্যবৃত্তিরূপেণ ক্রিয়তে। মনুরপি চৈবং মন্যতে—

"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা" ইতি
"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদ-শাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।"
(১২শ অঃ ১০৫—১০৬)

ইতি চ ব্রুবন্। শারীরক ভাষ্য—২।১।১১।

পুরুষঃ” (৪।৩।১৫)। এবং পূর্ব্বে কাম ও সঙ্কল্পাদির উল্লেখ করিয়া কথিত হইয়াছে—“এতৎ সর্ব্বং মন এব।” পরেও স্পষ্ট কথিত হইয়াছে—“যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিস্থিতাঃ।” সুতরাং ঐ সমস্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জীবাত্মা যে অসঙ্গ অর্থাৎ নিগুর্ণ নির্লেপ এবং ইচ্ছা-বিশেষরূপ কাম এবং তাহার কারণ জ্ঞান ও তাহার ফল সুখ-দুঃখাদি যে মনেরই ধর্ম্ম, ইহা ত স্পষ্টই বুঝা যায়। আর জীবাত্মা যে পরব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃ অভিন্ন, ইহা ত শ্রুতির “তত্ত্বমসি” “অহং ব্রহ্মাস্মি” ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ মহাবাক্যের দ্বারা সুস্পষ্টই বুঝা যায়। সুতরাং কণাদ ও গৌতমের পূর্ব্বোক্ত মত যে, শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে, ইহা ত আমি বুঝিতেছি না।

গুরু। কথা অনেক। সমস্ত শ্রুতিবাক্যের উদ্ধার ও ব্যাখ্যা করিয়া তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং সংক্ষেপে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের বক্তব্য যথামতি তোমাকে বলিতেছি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে জীবের স্বপ্নাবস্থার বর্ণন করিতেই জীবকে অসঙ্গ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় জীবের কোন পুণ্য-পাপ জন্মে না, স্বপ্নাবস্থায় জীব যাহা কিছু দেখে বা করে, সেই সমস্ত বিষয়ের সহিত তখন জীবের বাস্তব সম্বন্ধ হয় না, কিন্তু তখনও জীবের জ্ঞাতৃত্ব থাকে। তখনও জীবের নানারূপ ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হওয়ায় তখনও তাহাতে মনের বিলক্ষণ সংযোগ থাকে। ফল কথা, স্বপ্নকালে জীবের অবস্থার বর্ণনই সেই স্থলে উদ্দেশ্য, ইহা সেখানে পূর্ব্বাপর সমস্ত শ্রুতিবাক্যের পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়। সেখানে “অসঙ্গ” শব্দের দ্বারা জীবাত্মা যে বস্তুতঃ নিগুর্ণ, ইহা প্রতিপন্ন হয় না।

আর যে বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত হইয়াছে, “এতৎ সর্ব্বং মন এব”,—ইহার দ্বারাও কামাদি যে মনেরই ধর্ম্ম, ইহা প্রতিপন্ন হয় না! কারণ, সেখানে মন, বাক্য ও প্রাণকে জীবাত্মার জ্ঞানাদির প্রধান সাধন বলিবার জন্য প্রথমে মনের সহিত জীবাত্মার বিলক্ষণ সংযোগ ব্যতীত জীবাত্মার যে জ্ঞানাদি জন্মে না, ইহাই কথিত হইয়াছে এবং “মনসা হ্যেব পশ্যতি, মনসা শৃণোতি”—ইহা বাক্যের দ্বারা মন যে জীবাত্মার দর্শনাদি জ্ঞানের প্রধান সাধন, ইহাই কথিত হইয়াছে। পরে কামাদির উল্লেখ করিয়া কথিত হইয়াছে —“এতৎ সর্ব্বং মন এব।” (১) উক্ত বাক্যের দ্বারা কামাদিকে মনই বলা হইয়াছে, মনের ধর্ম্ম বলা হয় নাই। কারণ ও কার্য্যের অভেদ প্রকাশের দ্বারা কামাদির উৎপাদক কারণসমূহের মধ্যে মনের প্রাধান্যখ্যাপনই ঐরূপ প্রয়োগের উদ্দেশ্য। উহাকে বলে ঔপচারিক প্রয়োগ। ফল কথা, উক্ত বাক্যের দ্বারা জ্ঞানাদি যে মনেরই ধর্ম্ম, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। পরন্ত উক্ত বাক্যের পূর্ব্বে “মনসা হ্যেব পশ্যতি, মনসা শৃণোতি” এই বাক্যের দ্বারা জ্ঞান যে আত্মারই ধর্ম্ম, ইহাই বুঝা যায়। কারণ, জীবাত্মাই মনের দ্বারা দর্শন ও শ্রবণ করিলে সেই জ্ঞান তাহাতেই জন্মে, জীবাত্মাই সেই জ্ঞানের আশ্রয়, ইহাই বুঝা যায়।

পরন্ত জীবাত্মার স্বরূপ বর্ণনায় প্রশ্ন উপনিষদে কথিত হইয়াছে—“এষ হি দ্রষ্টা, স্পষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ।” ৪।৯।

উক্ত শ্রুতিবাক্যে “দ্রষ্টা” ইত্যাদি পদের দ্বারা জীবাত্মাই যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়জন্য সমস্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কর্ত্তা এবং অন্যান্য সমস্ত জ্ঞানেরও কর্ত্তা, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়, কিন্তু জীবাত্মা ঐ সমস্ত জ্ঞানের আশ্রয় না হইলে তাহাকে উহার কর্ত্তা বলা যায় না। জ্ঞানের আশ্রয়ত্বই জ্ঞানের কর্ত্তৃত্ব। উক্ত শ্রুতিবাক্যে পরে “কর্ত্তা” এই পদের দ্বারা জীবাত্মার কর্ত্তৃত্বও কথিত হইয়াছে। পরে কথিত হইয়াছে, “বিজ্ঞানাত্মা।” ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে উক্ত বাক্যে “বিজ্ঞান” শব্দের অর্থ বিবিধ জ্ঞানের আশ্রয়। বিজ্ঞানাত্মা বলিতে বিজ্ঞাতৃস্বভাব। জীবাত্মা স্বভাবতঃ অচেতন হইলেও মনঃসংযোগাদি কারণ জন্য তাহাতেই দর্শনাদি জ্ঞান জন্মে। সেই জ্ঞানই তাহার চৈতন্য। তাই জীবাত্মাই দ্রষ্টা ইত্যাদি বলিয়া কথিত হইয়াছে।

এইরূপ জীবাত্মাই সময়ে তাহার শুভাশুভ কর্ম্মের কর্ত্তা। কর্ম্মের অনুকূল প্রযত্নরূপ গুণই তাহার কর্ত্তৃত্ব। সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জ্ঞানও প্রযত্ন যে, আত্মার গুণ, ইহা বুঝা যায়।

অবশ্য শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে জ্ঞান আত্মার গুণ নহে এবং আত্মা কর্ত্তা নহে, ইহাও কথিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য এই যে, মুমুক্ষু সাধক নিজের আত্মাকে নিগুর্ণ ও অকর্ত্তা বলিয়া ধ্যান করিবেন। তাঁহার ঐরূপ ধ্যানের ফলে নিজের গুণবত্তা ও কর্ত্তৃত্বের অভিমান ক্ষয় হওয়ায় চিত্তশুদ্ধি বা আত্মশুদ্ধি হইবে, কিন্তু জ্ঞানাদি যে, বস্তুতঃই আত্মার গুণ নহে এবং আত্মা বস্তুতঃই কর্ত্তা নহে, ইহা বলা যায় না। কারণ, সর্ব্বশাস্ত্রে আত্মার সম্বন্ধেই শুভাশুভ কর্ম্মের বিধি ও নিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে। আত্মাই তাহার শুভাশুভ কর্ম্মফলের ভোক্তা। সুতরাং আত্মাই তাহার শুভাশুভকর্ম্মের কর্ত্তা, ইহাই শাস্ত্র দ্বারা বুঝা যায়। শাস্ত্র যখন জীবাত্মাকেই সাধুকর্ম্ম করিতে উপদেশ করিয়াছেন এবং শ্রীভগবানও অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—“নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং,—” তখন জীবাত্মা কর্ত্তাই নহে, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

---

(১) ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুতেতি মনো বাচং প্রাণং তান্যাত্মনেঽকুরুতান্যত্র মনা অভূবং নাদর্শমন্যত্র মনা অভূবং নাশ্রৌষমিতি, মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি। কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব।

বৃহদারণ্যক ১।৫।৩।

প্রশ্নোপনিষদের পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যেও জীবাত্মাকে কর্ত্তা বলা হইয়াছে। তদনুসারে বেদান্তদর্শনেও "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্বাৎ" (২।৩।৩১) ইত্যাদি কতিপয় সূত্রের দ্বারা জীবাত্মার কর্তৃত্ব সমর্থিত হইয়াছে। শ্রীভাষ্যকার রামানুজ সেখানে ঐ সমস্ত সূত্রের দ্বারা আত্মার বাস্তব কর্তৃত্বেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রামানুজের ঐ সূত্রার্থ—ব্যাখ্যাও তাঁহার নিজের কল্পিত নহে। বেদান্তদর্শনের সুপ্রাচীন বৃত্তিকার ভগবান্ বোধায়ন মুনির মতানুসারেই তিনি বেদান্তসূত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রামানুজ উক্ত স্থলে ভগবদ্গীতাতেও যে আত্মার বাস্তব কর্তৃত্বের নিষেধ হয় নাই, ইহাও বলিয়া নিজমত সমর্থন করিয়াছেন। (১) ফল কথা, রামানুজের মতেও আত্মা চৈতন্যস্বরূপ হইলেও জ্ঞানাদি তাহার বাস্তব গুণ। রামানুজও প্রশ্ন উপনিষদের পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যানুসারে আত্মার সগুণত্বই সমর্থন করিয়াছেন। উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জ্ঞান ও প্রযত্ন আত্মার গুণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে জ্ঞানজন্য এবং প্রযত্নের জনক ইচ্ছাও যে, আত্মার গুণ, ইহাও প্রতিপন্ন হয়।

অবশ্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত হইয়াছে—"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিস্থিতাঃ" (৪।৪।৭)। কিন্তু তৎপূর্ব্বে "আত্মনস্তু কামায়"—এইরূপ বাক্যও ত বহুবার কথিত হইয়াছে। সুতরাং তদ্দ্বারা ইচ্ছাবিশেষরূপ কাম ও কাম্যসুখ যে, আত্মার ধর্ম্ম, ইহাও ত সরলভাবেই বুঝা যায়। ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় তাহাই বুঝিয়া বলিয়াছেন যে, ইচ্ছা-বিশেষরূপ কাম সাক্ষাৎসম্বন্ধে জীবাত্মারই ধর্ম্ম এবং জ্ঞান, প্রযত্ন ও সুখ-দুঃখাদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে জীবাত্মারই ধর্ম্ম। কিন্তু মনের সহিত বিলক্ষণ সংযোগ ব্যতীত জীবাত্মাতে ঐ সমস্ত জন্মে না। সুতরাং আত্মসংযুক্ত মনেও ঐ সমস্ত আত্মধর্ম্ম পরম্পরাসম্বন্ধে থাকে। তাই সেই পরম্পরা-সম্বন্ধ তাৎপর্য্যেই শ্রুতি বলিয়াছেন—"কামা যেঽস্য হৃদি-স্থিতাঃ"। এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধ তাৎপর্য্যেই শ্রুতি বলিয়া-ছেন—"আত্মনস্তু কামায়।" এইরূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধ তাৎ-পর্য্যেই লোকে আমার জ্ঞান, আমার ইচ্ছা, আমার সুখ, আমার দুঃখ, এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে এবং পরম্পরা-সম্বন্ধবিশেষ তাৎপর্য্যে আমার মনের জ্ঞান, মনের ইচ্ছা, মনের সুখ, মনের দুঃখ,—এইরূপও প্রয়োগ হইয়া থাকে। আত্মাতে উৎপন্ন সুখ সাক্ষাৎসম্বন্ধে মনে না থাকিলেও মনে উহার পরম্পরাসম্বন্ধবিশেষ গ্রহণ করিয়া নৈয়ায়িক গ্রন্থকার বিশ্বনাথ পঞ্চাননও "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী"র প্রারম্ভে প্রয়োগ করিয়াছেন—"মনসো মুদং বিতনুতাং।"

মূল কথা, জীবাত্মা যে নির্গুণ, জ্ঞানাদি যে তাহার গুণ নহে, ইহা কণাদ ও গৌতম স্বীকার করেন নাই। আমি জানিতেছি, আমি ইচ্ছা করিতেছি, আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি প্রকার সার্ব্বজনীন বোধকে তাঁহারা ভ্রম বলেন নাই। মীমাংসক প্রভৃতি আরও কোন কোন সম্প্রদায়ও জ্ঞানাদিকে আত্মারই বাস্তব গুণ বলিয়াছেন। রামানুজ প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবাচার্য্যও সাংখ্য-মত বা অদ্বৈতমতানুসারে আত্মার নির্গুণত্ব স্বীকার করেন নাই।

আর যে তুমি "তত্ত্বমসি" এবং "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস্তব অভেদ বুঝা যায় বলিয়াছ, ইহা অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের প্রধান কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক শ্রুতিবাক্যের দ্বারা যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ বুঝা যায়, তাহারও ত বিচার করা আবশ্যক। দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় সেই সমস্ত শ্রুতিবাক্যানুসারে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদই বাস্তবতত্ত্ব বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কথা এই যে, শ্বেতাশ্বতর উপ-নিষদে প্রথমে "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনা-মৃতত্বমেতি" (১।৬) এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মুমুক্ষু নিজের আত্মা ও তাহার প্রেরক অন্তর্য্যামী পরমাত্মাকে পৃথক্ অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া জানিয়া মুক্তিলাভ করেন, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। নিজের আত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য বা ভেদ কিরূপে বুঝিতে হইবে, ইহা প্রকাশ করিতে পরে কথিত হইয়াছে—"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ (১।৯) অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয় আত্মাই অজ অর্থাৎ নিত্য। তন্মধ্যে পরমাত্মা জ্ঞ, জীবাত্মা অজ্ঞ, অর্থাৎ পরমাত্মা ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ অভ্রান্ত, জীবাত্মা অসর্ব্বজ্ঞ ভ্রান্ত এবং পরমাত্মা ঈশ, জীবাত্মা অনীশ। উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জ্ঞৌ"

---

(১) শ্রীভাষ্যকার রামানুজ ভগবদ্গীতার "প্রকৃতেঃ ক্রিয়-মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" (৩।২৭)—এই শ্লোকের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, জীবাত্মার বাস্তব কর্তৃত্বই নাই, সর্ব্বজীবেরই আমি কর্ত্তা, এইরূপ জ্ঞান, ভ্রম, ইহা উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য নহে। কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির সম্বন্ধ-প্রযুক্তই জীবাত্মার সাংসারিক কর্ম্মে কর্তৃত্ব। অর্থাৎ কর্ম্মের অন্যান্য কারণকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল জীবাত্মা কোন কর্ম্মের কর্ত্তা হইতে পারে না, ইহাই তাৎপর্য্য। ভগবদ্গীতায় পরে "তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ" (১৮।১৬) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা ঐ তাৎপর্য্যই ব্যক্ত করা হইয়াছে। রামানুজ ভগবদ্গীতার অন্যান্য শ্লোকের উল্লেখ করিয়াও তাঁহার ব্যাখ্যাত তাৎপর্য্যের সমর্থন করিয়াছেন। ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণও ভগবদ্গীতার উক্ত শ্লোকের উক্তরূপ তাৎপর্য্যই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে তাঁহাদিগের মতে উক্ত শ্লোকে "প্রকৃতি" শব্দের অর্থ জীবের অদৃষ্ট। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ইহা জীবের অদৃষ্টবিশেষেরই নাম। সেই অদৃষ্ট জন্য জীবের জ্ঞান ও ইচ্ছা-বিশেষরূপ গুণ উৎপন্ন হওয়ায় জীব নানা কর্ম্ম করে। আমি কর্ত্তা, এইরূপ জ্ঞান জীবের ভ্রম নহে। কিন্তু আমিই স্বতন্ত্র, আমার কর্তৃত্ব স্বাধীন, এইরূপ জ্ঞানই ভ্রম। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহ-মিতি মন্যতে।"

এই পদের দ্বারাও আত্মা যে বস্তুতঃ এক নহেন, ইহাও প্রকটিত হইয়াছে। পরে "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" (৬।১৩) এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারাও একই পরমাত্মা যে অসংখ্য জীবাত্মার অভীষ্ট বিধাতা, ইহা কথিত হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিবাক্যে "বহূনাং" এই বহুবচনান্ত "বহু" শব্দের প্রয়োগের দ্বারা জীবাত্মা যে প্রত্যেক জীবদেহে বস্তুতঃই ভিন্ন, সুতরাং বস্তুতঃই অসংখ্য, ইহা বুঝা যায়। তাহা হইলে উহার দ্বারা জীবাত্মা যে পরমাত্মা হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন পদার্থ, ইহাও অবশ্যই বুঝা যায়। কারণ, যাহা বস্তুতঃই বহু বা অসংখ্য, তাহা এক হইতে অভিন্ন হইতে পারে না। পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম যে, বস্তুতঃ, এক অদ্বিতীয়, ইহা সর্ব্ব সম্মত। এইরূপ আরও অনেক শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস্তব ভেদ বুঝা যায়। দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবাচার্য্য নিম্বার্ক প্রভৃতি ইহা স্বীকার করিয়াই এবং "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস্তব অভেদও স্বীকার করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ ও অভেদ এই উভয়ই সত্য এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। উক্ত দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদবাদও অতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত মত। কিন্তু দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস্তব অভেদ অস্বীকার করিয়া "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের নানারূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তন্মধ্যে প্রাচীন মীমাংসক সম্প্রদায়ের মত এই যে, কোন বেদবাক্যেরই কোন ক্রিয়াবিধির সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত প্রামাণ্য হইতে পারে না। কারণ, সমস্ত বেদবাক্যই ক্রিয়ার্থক, সুতরাং উপনিষদে যে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি অর্থবাদ বাক্য আছে, তাহারও কোন বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে যে সমস্ত বিধিবাক্য আছে, তাহার সহিত উহার একবাক্যতা-গ্রহণ সম্ভব না হইলেও জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদেও বিধিবাক্য আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" (৩।১৪) সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যে "উপাসীত" এই ক্রিয়াবোধক পদের সহিত "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যের যোগ করিয়া বুঝিতে হইবে যে, মুমুক্ষু সাধক "আমি ব্রহ্ম" এইরূপে ভাবনারূপ উপাসনা করিবেন। সুতরাং "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মুমুক্ষুর পূর্ব্বোক্তরূপে আত্মোপাসনার প্রকারবিশেষই কথিত হওয়ায় উহার দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদরূপ তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয় না। ঐ সমস্ত বাক্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদরূপ তত্ত্বের প্রতিপাদকই নহে। কারণ, তাহা হইলে উহার প্রামাণ্য এবং প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। মীমাংসাচার্য্য গুরু প্রভাকর এই মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। শারীরক ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও প্রথমে পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রাচীন মীমাংসক সম্প্রদায়ের উক্ত প্রসিদ্ধ মতের প্রকাশ করিয়াছেন। "ভামতী"কার শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্র সেখানে পূর্ব্বোক্তরূপেই উক্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (১)

কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা ব্যতীতও অর্থবাদ বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বিশেষ বিচারপূর্ব্বক মীমাংসাচার্য্য প্রভাকরের যুক্তি খণ্ডন করিয়া বিধিবাক্য বা কোন ক্রিয়ার বোধক কোন পদ না থাকিলেও কেবল বস্তুতত্ত্ববিষয়ক যথার্থ শাব্দবোধও জন্মে, ইহা সমর্থন করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহাদিগের মতেও উপনিষদে "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা মুমুক্ষুর আত্মোপাসনার প্রকারবিশেষই কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ "উপাসীত" এই ক্রিয়াপদের সহিত যোগ করিয়া উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, মুমুক্ষু "আমি ব্রহ্ম" এইরূপে নিজের আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনারূপ উপাসনা করিবেন। উক্তরূপ উপাসনার ফলে মুমুক্ষু সাধকের রাগদ্বেষাদি দোষের ক্ষয় হওয়ায় তাহার সম্পূর্ণরূপে চিত্তশুদ্ধি হয়। তাই উপনিষদে মুমুক্ষুর পক্ষে উক্তরূপ উপাসনাও বিহিত হইয়াছে। যে পদার্থ বস্তুতঃ ব্রহ্ম নহে, তাহাকেও ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনারূপ উপাসনার বিধান উপনিষদে দেখা যায়। যেমন ঐ ছান্দোগ্য উপনিষদেই কথিত হইয়াছে—"মনোব্রহ্মেত্যুপাসীত" (৩।১৮) অর্থাৎ মনকে ব্রহ্ম এইরূপে ভাবনারূপ উপাসনা করিবে।

শিষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠপ্রপাঠকে শ্বেতকেতু ও তাঁহার পিতা আরুণির সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে যে, আরুণি প্রথমে পরব্রহ্মের কথা বলিয়া উপসংহারে পুনঃ পুনঃ পুত্রকে বলিয়াছেন—"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।" অর্থাৎ "হে শ্বেতকেতো! ত্বং তৎ ব্রহ্ম অসি" অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রহ্ম আছ। সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জীব যে বস্তুতঃই ব্রহ্ম, ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায়। পরন্তু "তত্ত্বমসি" এই বাক্যে "অসি" এই ক্রিয়াপদের প্রযোগ থাকায় উক্ত মহাবাক্যের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদ যে, বাস্তব তত্ত্ব বলিয়াই উপদিষ্ট হইয়াছে এ বিষয়ে সংশয় নাই। নচেৎ উক্ত বাক্যে "অসি" এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সরলভাবে যে অর্থ বুঝা যায়, তাহাই শাস্ত্রার্থ বলিয়া গ্রাহ্য। আর যে সমস্ত শাস্ত্রবাক্যে উপাসনার নাম-গন্ধ নাই, তাহারও ভাবনারূপ উপাসনা-বিধানে তাৎপর্য্য কল্পনা কিরূপে করা যায়? ইহা ত আমি বুঝিতে পারি না।

---

(১) যদি স্বসন্নিধানাত্তৎপরত্বং ন রোচয়তে, তৎ [illegible]হিতোপাসনাদিক্রিয়াপরত্বং বেদান্তানাং। এবং হি প্র[illegible]নধিগতগোচরত্বেনানপেক্ষতয়া প্রামাণ্যঞ্চ প্রয়োজনঞ্চ সি[illegible]তি তাৎপর্য্যার্থঃ। বেদান্তদর্শন চতুর্থ সূত্রের অবতারণাভা[illegible] ভামতী দ্রষ্টব্য।

শুক্র। জীবাত্মা যে, পরমাত্মা হইতে ভিন্ন, ইহাও ত বহু শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা সরলভাবেই বুঝা যায়। আর বল দেখি, শাস্ত্রবাক্য আছে—"সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা"। উক্ত বাক্য দ্বারা সমস্ত বাদ্যই ঘণ্টা হইতে অভিন্ন, ইহাই কি তুমি বুঝিবে? এবং শাস্ত্রবাক্য আছে—"শালগ্রামঃ স্বয়ং হরিঃ" কিন্তু শালগ্রাম শিলা—যাহা হরিপূজার প্রতীক, তাহা কি বস্তুতঃই স্বয়ং হরি? উক্ত বাক্যের দ্বারা সরলভাবে তাহাই ত বুঝা যায়। আবার বৃষোৎসর্গ-কার্য্যে সেই বৃষকে প্রদক্ষিণ করিয়া যজমান যে মন্ত্র পাঠ করিবেন, তাহার প্রথমে আছে —"ধর্ম্মোঽসি ত্বং চতুষ্পাদঃ" (১) উক্ত বাক্যে "অসি", এই ক্রিয়াপদেরও প্রয়োগ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি কি বুঝিবে, সেই বৃষ বস্তুতঃই চতুষ্পাদ ধর্ম্ম? বস্তুতঃ সেই বৃষ চতুষ্পাদ ধর্ম্ম নহে। কিন্তু বৃষোৎসর্গকর্ত্তা সেই যজমান তখন সেই বৃষকে চতুষ্পাদ ধর্ম্মরূপে ভাবনা করিবেন, ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। এইরূপ যিনি শালগ্রাম-শিলায় ৺হরিপূজাদি করিবেন, তিনি সেই শালগ্রাম-শিলাকে স্বয়ং হরি বলিয়া ভাবনা করিবেন, ইহাই "শালগ্রামঃ স্বয়ং হরিঃ" এই শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য। এইরূপ যিনি পূজক, তিনি ঘণ্টাকে সমস্ত বাদ্যরূপে ভাবনা করিবেন, এবং অন্য বাদ্য না থাকিলেও কেবল ঘণ্টাবাদ্য দ্বারাও তাঁহার পূজা সিদ্ধ হইবে, ইহাই "সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা" এই শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যেই শাস্ত্রে ঐ সমস্ত বাক্য কথিত হইয়াছে। ঐরূপ বাক্যকে বলে "অর্থবাদ।" শাস্ত্রে বিধিবাক্য কথিত না হইলে "অর্থবাদ" বাক্যের দ্বারা বিধিবাক্য বুঝিতে হয়, ইহা মীমাংসাশাস্ত্রেও প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এইরূপ "সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা" এই অর্থবাদবাক্যের ন্যায় "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" ইত্যাদি অর্থবাদবাক্যের দ্বারাও ঐরূপে ভাবনারূপ উপাসনার বিধিও বুঝিতে পারি। এবং "শালগ্রামঃ স্বয়ং হরিঃ", "ধর্ম্মোঽসি ত্বং চতুষ্পাদঃ"—ইত্যাদি অর্থবাদবাক্যের ন্যায় "তত্ত্বমসি", "অহং ব্রহ্মাস্মি", "সোঽহং" ইত্যাদি অর্থবাদ-বাক্যের দ্বারা ঐরূপে ভাবনারূপ উপাসনার বিধিও বুঝিতে পারি। অর্থাৎ মুমুক্ষু সাধক সমগ্র জগৎকে এবং নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করিবেন। তিনি বস্তুতঃ ব্রহ্ম না হইলেও "সোঽহং" অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম, এইরূপ ভাবনা করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন। মৈত্রী উপনিষদে "সোঽহং ভাবেন পূজয়েৎ" (২।১) এইরূপ বিধিবাক্যও কথিত হইয়াছে। তোমার কথিত ছান্দোগ্য উপনিষদেও পূর্ব্বে "সর্ব্বং খল্বিদং" "ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত"—এই বাক্যে "উপাসীত" এই ক্রিয়াপদের দ্বারা উক্তরূপে উপাসনার বিধানই হইয়াছে, নচেৎ উক্ত শ্রুতিবাক্যে "উপাসীত" এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ অনাবশ্যক। আর ছান্দোগ্য উপনিষদে পরে "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বিশেষরূপে মনঃ প্রভৃতি অনেক পদার্থে যে ব্রহ্ম-ভাবনারূপ উপাসনা বিহিত হইয়াছে, ইহা আচার্য্য শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনিও উহাকে ব্রহ্মদৃষ্টির অধ্যাস বলিয়াছেন। যাহা বস্তুতঃ ব্রহ্ম নহে, তাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধিই ব্রহ্মদৃষ্টির অধ্যাস। বেদান্তদর্শনেও "ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ" (৪।১।৫) এই সূত্রের দ্বারা উক্তরূপ ব্রহ্মদৃষ্টি সমর্থিত হইয়াছে। ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্করও সেখানে উপনিষদের অনেক শ্রুতিবাক্যের দ্বারা উহা সমর্থন করিয়াছেন এবং তিনি সেখানে বিষ্ণুপ্রতিমায় বিষ্ণুবুদ্ধিকে উহার দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। নির্গুণ ব্রহ্মবাদী আচার্য্য শঙ্করও শাস্ত্রানুসারে শালগ্রাম-শিলায় হরিপূজার কর্ত্তব্যতা সমর্থন করায় অন্য প্রসঙ্গে পূর্ব্বেও বলিয়াছেন—"যথা শালগ্রামে হরিঃ"। শারীরক ভাষ্য (১।২।৭)।

মূল কথা, ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে সমস্ত জীব ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন পদার্থ হইলেও তাহাতে ব্রহ্মদৃষ্টি কর্ত্তব্য। সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাবনাও সাধকের প্রধান উপাসনা। তাহার ফলে সময়ে সর্ব্বভূতে আত্ম-দর্শন ও সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়। সমস্ত জীবকে এক ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করিলে সমস্ত জীবে অভেদবুদ্ধি জন্মে। উহা ভ্রমবুদ্ধি হইলেও উহার ফলে সাধকের ভেদবুদ্ধিমূলক রাগ-দ্বেষাদি দোষের ক্ষয় হওয়ায় চিত্তশুদ্ধি বা আত্মশুদ্ধি হয়। তাই শাস্ত্রে সর্ব্বজীবে ব্রহ্ম-ভাবনারূপ উপাসনার উপদেশ হইয়াছে। উক্তরূপ উপাসনার প্রভাবে ভারতের শুদ্ধচিত্ত সাধকগণ ভেদ-বুদ্ধি সত্ত্বেও সমানভাবে সর্ব্বজীবের মঙ্গলকামনায় তারস্বরে গাহিয়াছেন—

"সর্ব্বেঽপি সুখিনঃ সন্তু সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥"

[ক্রমশঃ।

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ (মহামহোপাধ্যায়)।

---

(১) ধর্ম্মোঽসি ত্বং চতুষ্পাদশ্চতস্রস্তে প্রিয়াস্ত্বিমাঃ। চতুর্ণাং পোষণার্থায় ময়োৎসৃষ্টাস্ত্বয়া সহ। ইত্যাদি মৎস্যপুরাণোক্ত মন্ত্র স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত—"ছন্দোগ্য-বৃষোৎসর্গতত্ত্বে" দ্রষ্টব্য।

মুক্তি

১

ত্যাগকে আশ্রয় করিয়া তখন সবে মাত্র অসহযোগের মন্ত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। দেশময় নব-জাগরণের সাড়া।

আজন্ম বিলাসপুষ্ট ধনীর সন্তান—বিধবা মায়ের এক-মাত্র স্নেহ-দুলাল বিংশবর্ষীয় শক্তিও সে আহ্বানে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিল না।

এক দিন কলেজ হইতে ফিরিবার মুখে দোকান হইতে খদ্দর কিনিয়া—বহুমূল্য বস্ত্রাদি হেলাভরে পরিত্যাগ করিয়া যখন সে বাড়ী আসিয়া হাসিমুখে ডাকিল, "মা!" তখন কর্ম্মে ব্যস্ত জননী সে দিকে নিমেষের তরে চাহিতে গিয়া দারুণ বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে কোন ভাষা বাহির হইল না, শুধুই চাহিয়া রহিলেন।

শক্তি মৃদু হাসিয়া বলিল, "কি দেখছো অবাক্ হয়ে! তোমার ছেলে যে আজ থেকে গন্ধী মহারাজের মন্ত্র-শিষ্য। দেখ দেখি,—খদ্দর প'রে কেমন মানিয়েছে?"

মা গন্ধী মহারাজের নাম শুনিয়াছিলেন—তাঁহার সহ-যোগিগণের অপূর্ব্ব ত্যাগ, মহান্ কর্ম্মপ্রচেষ্টা—সমস্তই জানিতেন। কিন্তু পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মনে মনে ভাবী অকল্যাণ আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিলেন; মুখে কঠিন নীরস স্বরে বলিলেন, "ও-সব কুবুদ্ধি তোর কেন হ'ল শক্তি? তুই কলেজের ছেলে, এখন পড়া-শুনো কর্‌বি—উন্নতি কর্‌বি। তোর ও-সব নিয়ে মেতে থাকা ত ভাল নয়।":

শক্তি হাসিয়া বলিল, "মা মা,—যদি জাগবার আমাদের সময় হয়ে থাকে ত—এই উপযুক্ত অবসর। এই ত কাযের সময়। এই খদ্দরই এক সময় আমাদের দোরে লক্ষ্মীকে বেঁধে রেখেছিল, একে হারিয়েই না—আমাদের আজ এই দুরবস্থা! আবার সেই অতীত গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে হ'লে, এর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। আর তুমি ত জান মা,—পড়ার কোন নির্দ্দিষ্ট কালাকাল নেই। তোতার মত ইংরিজী গৎ আউড়ে কতকগুলো বিদেশী ডিগ্রী নাই বা নিলুম।" শক্তি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

মা প্রবল আপত্তি তুলিয়া মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তা হয় না—পড়া তোকে ছাড়তে দেব না আমি। ও-সব খেয়াল ত্যাগ কর। তোর কিসে ভাল—কিসে মন্দ, সে আমি যেমন বুঝবো, তেমন কেউ নয়—।"

শক্তি বলিল, "কিন্তু মা, স্নেহান্ধ হয়ে তুমি ভুল বুঝছো। ভাবছ 'স্বদেশীর' দলে মিশলে তোমার ছেলেকে জেলে নিয়ে যাবে। না মা, সত্যি বলছি, সে ভয় তোমার নেই। শুধু যা আমাদের দেশের জিনিষ—তা কেন পরতে বারণ করছো? তাতে ত অগৌরবের কিছু নেই।"

মা বলিলেন, "কিন্তু শক্তি—শক্তি, তোমার পড়া ছাড়া হবে না।"

শক্তি অনুনয় করিয়া কহিল,—"মা, ও অনুরোধ ক'রো না, প্রতিজ্ঞা করেছি, আর কলেজে যাব না। বিদ্যা ত শুধু অর্থ উপার্জ্জনের জন্য নয় মা, ঘরে ব'সে পড়বো। তোমার পায়ে পড়ি—আমায় পীড়াপীড়ি ক'রো না।" বলিতে বলিতে নতজানু হইয়া সে মাতার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল।

পুত্র-স্নেহাতুর মায়ের মন পুত্রের এই অনুনয়ে গলিয়া গেল। তিনি সনিশ্বাসে বলিলেন, "তোর যা ইচ্ছে হয়—কর বাবা, আমি আর বাধা দেব না।"

আনন্দে শক্তি মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বালকের মত বলিয়া উঠিল, "এই জন্যেই মা—তোমায় এত ভালবাসি। মা, তোমাকেও একটা চরকা এনে দেব, তুমি বেশ সুতো কাটবে। আমিও একটা কিনবো,—তার পর দেখবো, কে কত ভাল সুতো তৈরী করতে পারে।"

মা স্নেহ-সকোপদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হাঁ, খেয়ে-দেয়ে ত আমার কায নেই, তাই ঘ্যানর ঘ্যানর ক'রে চরকা কাটবো?"

শক্তি আদর করিয়া কহিল, "না মা, কাটবে। বল, বল—কাটবে?" বলিয়া সে নিবিড়ভাবে মাকে বেষ্টন করিয়া উত্তরপ্রতীক্ষায় মুখের পানে চাহিল।

মা হাসিয়া ফেলিলেন বলিলেন, "বুড়ো খোকার আব্দার দেখ! আচ্ছা—আচ্ছা, সে যা হয় হবে, ছাড় এখন। ঠাকুরকে ভাঁড়ার থেকে জিনিষ-পত্তর বার ক'রে না দিলে রান্না চাপাতে পারবে না।"

শক্তি মা'কে ছাড়িয়া দিয়া উৎফুল্ল স্বরে কহিল, "আচ্ছা, মনে থাকে যেন। ওকে জিনিষ-পত্তর বার ক'রে দিয়ে এ দিকে এসো। গোটাকতক টাকা দিতে হবে, এখনি চরকা কিনে আনব।"

শক্তির আর বিলম্ব সহিতেছিল না, খদ্দরের বস্ত্রে দেহ ঢাকিয়া তাহার মনে হইতেছিল, এত দিনের অনাচার হইতে সে যেন সবেমাত্র শুদ্ধ—নিষ্পাপ হইয়াছে। এইবার চরকার কায আরম্ভ করিতে পারিলেই, মহাত্মার উপদেশানুসারে, স্বরাজের পথে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিতে পারিবে। দেশের মুক্তিকার্য্যে—তাই—তরুণ-হৃদয় তিলমাত্র বিলম্ব সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

উপর হইতে একটি তরুণী বহুক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই মাতা-পুত্রের আদর-অভিনয় দেখিতেছিল, আর মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল। মাতা ভাঁড়ার ঘরে চলিয়া যাইতেই সে উপর হইতে বিদ্রূপভরা কণ্ঠে কহিল, "কি শক্তিদা, এক দিনেই স্বরাজ না এনে ছাড়বে না দেখছি!"

শক্তি উপরের দিকে চাহিয়া জবাব দিল, "এক দিনে না হোক,—এক বছরে ত বটেই।"

"বল কি, এতটা স্থির-নিশ্চয় ক'রে ফেলেছ! বেশ—বেশ, তা হ'লে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।"

তরুণীর কণ্ঠে তখনও শ্লেষ-তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছিল।

শক্তি তাহার শ্লেষ বুঝিতে পারিয়া জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, "অত ঠাট্টার কায কি? যখন হবে দেখতেই পাবে। তখন আর ম্যানচেষ্টারের মিহি সাড়ী, বিলিতী রোজ ক্রীম সাবান—ও-সব চলবে না।"

মেয়েটি পূর্ব্ববৎ হাসিয়া কহিল, "স্বরাজ আসবে তোমাদের—তাতে আমার কি?—ও-সব কুশ্রী কাপড়-চোপড় কোনকালে পরবো না—তার কথাও নয়।" পরে নিজের সাড়ীর প্রান্ত তুলিয়া দোলাইতে দোলাইতে বলিল, "ম্যানচেষ্টার মন্দ জিনিষ দেয় না—কেমন ফ্যান্সী। তোমার খদ্দর কিন্তু এর পানে চাইলেই—মাথা নীচু করবে।"

তরুণীর কণ্ঠে হাসির তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

শক্তি আরও রাগিয়া গেল। দুম-দাম শব্দে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া একবারে মেয়েটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া চড়া গলায় কহিল, "ও নিয়ে বড়াই করতে লজ্জা করে না? পরের দেওয়া উচ্ছিষ্ট জিনিষ!"

মেয়েটি হাসি-মুখে শান্তস্বরে বলিল, "উচ্ছিষ্ট কেন হবে! এ যে কা'ল আনকোরা কিনে এনেছি—আর পরের দেওয়াও নয়। তবে লজ্জা কিসের? তোমার খদ্দর যখন এর তুল্য উৎকৃষ্ট হবে, তখন না হয় একটু একটু লজ্জা করবো!"

শক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া জবাব দিল, "মেয়েমানুষের সঙ্গে তর্ক করাই ঝকমারী। নিরেট মাথা—বোঝালেও কিছু বোঝে না।"

মেয়েটি বলিল, "কিন্তু পুরুষের সরেস মাথার চেয়ে অঙ্কশাস্ত্রটা হয় ত কিছু বেশীই আয়ত্ত করেছে। তার প্রমাণ চাও ত—"

শক্তি বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, "প্রমাণে কায নেই—ও সব জঞ্জাল একেবারে দূর ক'রে দিয়েছি। তোমার বাইনোমিয়েল ইকুয়েশন প্যারাবোলা তুমিই চর্চ্চা ক'রো, আমার তাতে বিন্দুমাত্রও উৎসাহ নেই।"

তরুণী বিন্দুমাত্র বিচলিতভাব প্রকাশ না করিয়াই বলিল, "তা না থাকতে পারে, তাতে কিন্তু এমন প্রমাণ হয় না যে, তোমার অঙ্কশাস্ত্র-অপটু মাথাটির দাম এ বিষয়ে বিশেষ মূল্যবান্ হয়ে উঠলো। শক্ত জিনিষকে ত্যাগ করলেই তার অসারত্ব প্রতিপন্ন করা যায় না।"

শক্তি উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিল, "তা তুমি যা-ই বল, এই মোটা কাপড়ের চেয়ে মহত্তর আমার কাছে আর কিছু নয়—এ যে আমার মায়ের দেওয়া—"

কৌতুকভরা দৃষ্টিতে সে দিকে চাহিয়া বিস্মিত কণ্ঠে তরুণী কহিল, "বল কি! জ্যেঠাইমা নিজে তোমাকে এই ক্যাট-কেঁটে কাপড় পরতে দিয়েছেন!"

শক্তি কোনও উত্তর করিল না। তরুণীর দিকে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে আপনার ঘরে

দ্বার রুদ্ধ করিল। তরুণী রেলিঙের উপর লুটাইয়া পড়িয়া হাসিতে লাগিল।

২

তরুণীর নাম নমিতা—পাশের বাড়ীর চারু বাবুর কন্যা। চারু বাবু ও শক্তির পিতা উভয়েই আবাল্য বন্ধু। পাশাপাশি দুইখানি বাড়ী—বাহিরের লোক মনে করিত, ইঁহারা অভিন্ন-হৃদয় দুই ভ্রাতা।

প্রগাঢ় বন্ধুত্বের ফলে উভয়ে এই সত্যবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পুত্র-কন্যা জন্মিলে আর একচোট আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহারা নূতনতর সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন। বিধাতা তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে এক জনকে দিলেন পুত্র—অপরকে কন্যা। ক্রমে তাহারা বড় হইল, স্কুলে পড়িতে লাগিল। স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন উভয়েই,—কাযেই নমিতা যেবার সসম্মানে ম্যাট্রিক পাশ করিল,—সেবার দুইখানি বাড়ীতে আনন্দের উৎসব বহিয়া গেল। সে বেথুনে আই, এ পড়িতে গেল,—শক্তি তখন বি, এ পড়িতেছে।

তাহাদের বিবাহের সম্বন্ধ সমস্তই ঠিক—আগামী অগ্রহায়ণে সুসম্পন্ন হইবে, এমন সময় অকস্মাৎ কলেরা রোগে শক্তির পিতা অপূর্ণ আশা বুকে বহিয়া পরলোকে প্রয়াণ করিলেন। আনন্দালোকদীপ্ত জীবন-রঙ্গমঞ্চের উপর একটা শোকের যবনিকা পড়িল। নমিতা আগেকার মত কলেজে যাইতে লাগিল, শক্তিও পড়া ছাড়িল না।

দুই জনেই তাহাদের মধুর সম্বন্ধের কথা জানিত। সে কথা তাহারা বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছে, তাই তাহাতে নূতনত্ব বা মধুরত্ব কিছু উপভোগ করিতে পারিত না; সঙ্কোচও তাহাতে বিন্দুমাত্র ছিল না।

আজ শক্তি যখন সহসা মোটা খদ্দরে দেহ ঢাকিয়া কলেজের পড়া-শুনা ছাড়িয়া বাড়ী আসিয়া বসিল, তখন নমিতা ইহাও তাহার অন্যান্য ক্ষণস্থায়ী খেয়ালের অঙ্গ ভাবিয়া বিদ্রূপ করিতে ছাড়ে নাই।

কতবার সে এই তরলমতি যুবকের বালকত্ব দেখিয়া হাসিয়াছে। মায়ের কাছে তাহার যত উদ্ভট কল্পনা আদর পাইয়া গজাইয়া উঠিত, আবার প্রভাতের রবিকরস্পর্শে কুজ্ঝটিকার মত কোথায় মিলাইয়া যাইত! এক একটা খেয়াল বড় জোর তিন দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইত—তার পর অন্যান্য খেয়ালের স্রোতের মুখে তাহাও ভাসিয়া যাইত।

নমিতা দেখিল, চরকা আসিল, কত রং-বে-রংয়ের খদ্দরের মোটা মোটা কাপড়-জামা আসিল, শক্তির উৎসাহও যেন চতুর্গুণ হইয়া দিবস-নিশীথের সব অবসরটুকু কর্ম্মে ভরাইয়া ফেলিতে লাগিল।

সে মনে মনে হাসিল। ক'দিনের জন্যই বা? হয় ত কা'ল আসিয়া দেখিবে, পম্পসু পায়ে, মিহি বিলাতী ধুতি পরনে, পাতলা আদ্দির জামা গায়ে বাবু শক্তি প্রাতভ্রমণে বাহির হইতেছেন!

কিন্তু এক দুই করিয়া সাতটি দিন গেল, নমিতা পরিবর্ত্তন কিছু দেখিতে না পাইয়া একটু অধীর হইয়া পড়িল। শক্তি বেশী কথা কহে না—কায করে। নমিতাও তাহাকে এ বিষয়ে একটু জিজ্ঞাসা করে না, নীরবে আসিয়া—দেখিয়া শুনিয়া—নীরবে চলিয়া যায়।

সে দিন দ্বিপ্রহরে সে দেখিল—শক্তি ঘরে নাই, তাহার মা একটা মাদুরের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া, এক পাশে খানিকটা তূলা ও ছোট বাটিতে একটু জল লইয়া—ঘ্যানর ঘ্যানর শব্দ করিয়া চরকা চালাইতেছেন, আর গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছেন। জ্যেঠাইমা পর্য্যন্ত যে এত দূর করিবেন—তাহা সে আশা করে নাই।

সে ঘরে প্রবেশ করিয়াই কাণে আঙ্গুল দিয়া বিরক্তি-ভরা কণ্ঠে কহিল, "থামাও জ্যেঠাইমা, থামাও। তোমায়ও যে এমন ভূতে পেয়েছে, তা কে জানে বল!"

জ্যেঠাইমা চরকা থামাইয়া নমিতার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন, পরে মাদুরের এক প্রান্ত দেখাইয়া বলিলেন, "বোস মা, বোস। কদিন আসিসনি কেন?"

নমিতা সেখানে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "যে তোমাদের পাগলামী—আসবার যো কি? খালি ঘ্যানর ঘ্যানর, দিন-রাত—ভালও লাগে?"

জ্যেঠাইমা হাসিয়া বলিলেন, "পাগলামী কে বল্লে মা, এই ত আমাদের ছিল আগে!"

নমিতা বলিল, "আমি তর্ক করিতে চাই না, মানি, ও সব ছিল, তাতে আমাদের সুখ-সমৃদ্ধি সবই ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ উন্নতির সঙ্গে ও-সব বালাই আর নাই। তাতে ত

দুঃখের বদলে সুখটাও কিছু কমে নি, বরং বেড়েই চলেছে।"

জ্যেঠাইমা বলিলেন, "কিন্তু—"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বাধা দিয়া নমিতা বলিল, "জানি। সে দিন তোমার ছেলের মুখে এর ব্যাখ্যানা শুনেছি। অনেক মহাত্মা—বড় লোক এর পিছনে আছেন, ওকে সাদরে বরণ ক'রে নিয়েছেন। আর এ—আমাদের আগেকার কালে দোরে হাতী, সিন্দুকে দৌলত—বোঝাই ক'রে দিত—কিন্তু এ কথা ভুললে ত চলবে না, জ্যেঠাইমা—যে, কালের গতি সামনে—পেছোনে নয়।"

জ্যেঠাইমা কোন উত্তর না দিয়া বিস্মিত মুখে নমিতার পানে চাহিয়া রহিলেন।

নমিতা বলিতে লাগিল, "এ অতীত যুগের আন্দোলন বর্ত্তমানে কিছুতেই বাঁচতে পারে না, ওর মূলে যতই কেন মহাত্মা থাকুন না? তাঁদের মহৎ কার্য্যের দৃষ্টান্তে, হয় ত লোক ভাবের উচ্ছ্বাসে দু'দিনের তরে ঘরে ঘরে একে বরণ ক'রে তুলবে, কিন্তু প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারবে না।"

জ্যেঠাইমা বলিলেন, "তা যদি না পারে ত দেশের দুর্ভাগ্য!"

নমিতা দীপ্তকণ্ঠে কহিল, "ও-কথা শতবার। দেশেরও দুর্ভাগ্য—জাতিরও। এই ঘুম-ভাঙ্গানো সোনার কাঠি যে মহাত্মা আবিষ্কার করেছেন, তাঁর পায়ে আমার কোটি কোটি প্রণাম, কিন্তু দেশের রুচি আবহাওয়া অনুযায়ী এ কাঠির মূল্য কেউ বুঝবে না। সুতরাং এ নিষ্ফল। তাই বল্‌ছিলাম—মিছে ও-সব জঞ্জাল বাড়িয়ে লাভ কি? কেবল শক্তির অপব্যবহার বৈ ত না?"

জ্যেঠাইমা কহিলেন, "মনে-প্রাণে যাকে সত্য ব'লে জানছি, তাকে গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করা ঠিক নয় ত, মা! কায করবার লোক জোটে না, আপত্তি তোলে অনেকেই। তুমি তুলবে,—অন্যে তুলবে, হাজার হাজার লোক তুলবে। যুগ যুগ ধ'রে তারা আপত্তি আর যুক্তি তুলে আসল কায থেকে তফাতে চ'লে যাবে,—সেটাও ত ঠিক নয়। নিশ্চিত হোক—অনিশ্চিত হোক—একটা সম্পূর্ণ পথে এগিয়ে যাওয়া ঢের বেশী বাঞ্ছনীয়। তাতে যদি সুফল লাভ না হয় ত, শক্তির পরিমাপ বুঝতে পারবে।"

একটু থামিয়া তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "আর দেখ মা, প্রথম প্রথম আমারই কি এতে কম আপত্তি ছিল। কিন্তু একবার এতে হাত দিয়ে সব মত যেন বদলে গেছে, একটা উৎসাহ এসেছে। এই ঘ্যানর ঘ্যানর আওয়াজ শুনে তুই কাণে আঙ্গুল দিলি, আমার কাছে ওই আওয়াজই মুক্তির গান ব'লে বোধ হচ্ছিল।"

নমিতা হাসিয়া বলিল, "শুধু শক্তি নয়—ওতে ভাবও বেশ একটু আছে।"

জ্যেঠাইমা স্নিগ্ধ শান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "আছে বৈ কি, মা! এই সামান্য কাঠ ক'খানার মধ্যে যে ভাব আছে, তার খোরাক যোগাতে কত মনীষীর মূল্যবান্ সময় নষ্ট হচ্ছে, কত ভোগের সমল নদী বানের স্রোতে নির্ম্মল হয়ে উঠছে। তাই ত সারা ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা একে মনে প্রাণে বরণ ক'রে নিয়েছেন।"

নমিতা প্রতিবাদ করিল, "না, জ্যেঠাইমা, আগেও বলেছি, এখনও বলছি, প্রাণ এতে নেই। আছে শুধু উচ্ছ্বাস, আর ভাবে ভরা মন। তাই ত আমার সন্দেহ হয়—"

"কি সন্দেহ হয় তোমার?" বলিতে বলিতে শক্তি আসিয়া মেঝের উপর বসিল।

নমিতা শক্তির আকস্মিক আগমন আশা করে নাই। কাযেই তাহার আচম্বিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না—মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল।

শক্তি হাসিয়া কহিল, "কি তোমার সন্দেহ হয়, বল্‌লে না?"

নমিতা একবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "সন্দেহ হয়—অনেক বিষয়েই। যে কায তোমরা সব কায ফেলে নিয়েছ, তা কতক্ষণ স্থায়ী হবে, সেই সন্দেহই হয়।"

শক্তি স্বরে জোর দিয়া কহিল, "মিথ্যে সন্দেহ! এর সাফল্যটুকু করায়ত্ত না ক'রে আমরা ছাড়ছি নি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, স্বরাজ আমরা পাবই।"

নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল, গমনোদ্যত হইয়া কহিল, "জ্যেঠাইমা, তোমার ছেলের দৃঢ়বিশ্বাসে আমার একটুও আস্থা নেই। স্বরাজ কিছু গাছের ফল নয় যে, চরকা ঘুরোলেই টপ্ ক'রে খ'সে হাতে এসে পড়বে।"

জ্যেঠাইমা হাসিলেন। শক্তি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া-মুখ

কালো করিয়া কহিল, "মেয়েমানুষে লেখাপড়া শিখলে প্রায়ই জ্যেঠা হয়,—অসার অপদার্থ!"

এই খোঁচা নমিতার বুকে আসিয়া বিঁধিল। সে-ও রক্তরাগদীপ্ত মুখ ফিরাইয়া কি একটা কঠিন উত্তর দিতে যাইতেছিল; জ্যেঠাইমা সহসা উঠিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন ও তাহার একখানি হাত ধরিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "আয় দেখি মা এ দিকে, আজ কিন্তু মাছের কচুরী তৈরী করব মনে করছি।"

শক্তির জননী তাহার হাত ধরিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। শক্তি অকারণে খালি চরকাটা লইয়া সজোরে ঘুরাইতে লাগিল।

৩

শক্তি যদিও জননীকে অভয় দিয়াছিল, চরকা খদ্দর লইয়া ঘরেই কায করিবে—বাহিরে যাইবে না, তবু কার্য্যকালে সে সত্য রক্ষা করিতে পারিল না। উত্তেজিত স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর সঙ্গে মিশিয়া পিকেটিং করিতে গিয়া ধরা পড়িল। যখন তাহাকে ঘন ঘন 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির সঙ্গে মোটরে তুলিল,—তখন তাহার মনে হইল, —এত মহৎ সম্মান বুঝি সম্রাট্ হইলেও পাইত না। আনন্দে গর্ব্বে তাহার সর্ব্ব-দেহে রোমাঞ্চ জাগিল।—

কিন্তু যখন বন্ধ ঘরের মধ্যে বায়ু এবং মুক্তি দুইটাই দুর্ল্লভ বস্তু হইয়া উঠিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে সে উদ্দাম উল্লাস উৎসাহ একটু একটু করিয়া স্তিমিত হইয়া অবশেষে দারুণ অবসাদে হৃদয়-মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল! ভাবী স্বরাজের মুক্ত আলোকচ্ছটা কারাগারের অন্ধকারে মায়া-মরীচিকার মতই অদৃশ্য হইয়া গেল!

হতাশার্ত্ত মন ভাবিল,—এই কারাগারের দুঃখ-কষ্ট কত দিন স্থায়ী হইবে কে জানে? তার পর মুক্তি! তার মধ্যে কাম্য বস্তুর প্রতিষ্ঠা কি করিয়া ঘটিবে? না,—এও একটা নৈরাশ্যময় ব্যর্থ অভিযান।

সংবাদ বাতাসে ভাসিয়া আসে। তাহার ১৫ দিন কারাবাসের মধ্যে সে শুনিল,—এই অসহযোগ আন্দোলনের ছোট-বড় সকল নেতাই প্রায় এই পথের পথিক হইয়াছেন। অমন যে বিরাট ব্যক্তি দেশবন্ধু, তিনিও বাদ পড়েন নাই। মনটা উৎফুল্ল হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা জাগিল, তবে আন্দোলন চালাইবে কে? কোন্ শক্তির অঙ্গুলিচালনে বিরাট জনসঙ্ঘ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া মুক্তি-সংগ্রামের পতাকা তুলিয়া—অভীষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হইবে?

নমিতা এ সংবাদ শুনিয়া বিমর্ষ জ্যেঠাইমাকে সান্ত্বনা দিল, ইহা ত এমন গুরু অপরাধ নহে, দুই দিন বাদেই শক্তি ফিরিয়া আসিবে। জ্যেঠাইমা ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিলেন, "আমি তাকে বাইরে যোগ দিতে পই পই ক'রে বারণ করেছিলুম, মা।"

নমিতা একটু হাসিয়া বলিল, "তুমি আদর্শ মা হ'তে পারলে না, জ্যেঠাইমা। সেকালে ক্ষত্রিয় মেয়েরা যুদ্ধকামী বীরের বর্ম্ম আপনার হাতে বেঁধে দিত, হাতে তলোয়ার তুলে দিত।"

জ্যেঠাইমা বলিলেন, "আর এক হাতে চোখের জল মুছতো। তা যাক্—অতটা মনের জোর আমার নেই, আমি তার কষ্ট ভেবে আকুল হয়ে উঠছি।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিলেন,—"দেখলি ত তার উচ্ছ্বাস বাইরের নয়, ক্ষণিকের খেয়ালও নয়। এ কাযটা সে প্রাণের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিল।"

পুত্রগর্ব্বে তাঁহার মুখখানি দীপ্ত হইয়া উঠিল।

নমিতা কহিল, "কিন্তু জ্যেঠাইমা—আমার আগেকার মত এতে একটুও বদলায় নি। জেলখানা চিরদিনই একটা বিভীষিকার মত—আমাদের মনে জেগে রয়েছে; যারা মান-মর্য্যাদা খুইয়ে—হাসতে হাসতে সেখানে ঢুকতে পারে—তাদের প্রাণকে ছাপিয়ে কত বড় উচ্ছ্বাস জেগেছে, তা ত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। প্রাণের যোগ এতে খুবই কম।"

জ্যেঠাইমা মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কিন্তু এই উচ্ছ্বাসেই সৈন্যরা প্রাণ তুচ্ছ ক'রে শত্রুর বুকে আঘাত করে।"

নমিতা বলিল, "তা সত্য। তবু উচ্ছ্বাসের আরও একটা দিক্ আছে। আঘাত সইবার আগে সে যেমন নির্ভীক উল্লসিত, আঘাত পাবার পরেও যদি সে তেমন থাকে—তবেই তার সার্থকতা। নৈলে—"

জ্যেঠাইমা বিরক্তি গোপন করিতে না পারিয়া কহিলেন, "এর চেয়ে ঢের সার্থকতা আমি ত আর কিছুতেই দেখি না।"

নমিতা তাঁহাকে সাদরে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া বলিল,

"বড্ড রেগেছ, জ্যেঠাইমা। আমিও তাই প্রার্থনা করছি, যেন তাঁরা সব দুঃখ-কষ্ট হাসি-মুখে জয় ক'রে—মনের অটুট উৎসাহ নিয়ে আসুন। এসো—আমায় তোমার চরকা-কাটা একটু শিখিয়ে দেবে।"

নমিতা বিস্মিতা জ্যেঠাইমাকে টানিতে টানিতে একবারে চরকার সম্মুখে আসিয়া বসিল।

১৫ দিন পরে, কারামুক্ত শক্তি ও তাহার সঙ্গীরা বাহিরে আসিতেই শত শত প্রতীক্ষমাণ নর-নারী বিজয়-উল্লাসে তাহাদিগকে পুষ্পমাল্য দিয়া বরণ করিল। ঘন ঘন জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কম্পিত হইতে লাগিল। মুক্তিপ্রাপ্ত যুবকদিগের মনে যেটুকু গ্লানি, অবসাদ জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই সাদর অভ্যর্থনার অমৃত-মদিরা পান করিয়া কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। প্রয়োজন হইলে তাহারা আবার এই জয়োল্লাসের মধ্য দিয়া সগৌরবে পশ্চাতের অন্ধতমসাবৃত কারা-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিত।

সর্ব্বশুদ্ধ মুক্ত হইয়াছিল আট জন। এক জন তরুণী সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া তাহার মোটরে উঠিতে অনুরোধ করিল। তাহার ইচ্ছা, এই সব দুঃখজয়ী বিজয়ী বীরের আতিথ্য-সেবা, সে আপনার গৃহে বসিয়া করে। সকলেই তাহাকে সশ্রদ্ধ সম্মতি জানাইয়া মোটরে উঠিয়া বসিল, তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে মোটর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট বাড়ী পৌঁছিয়া সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, সর্ব্ব বিষয়ে সুব্যবস্থা রহিয়াছে। যেন আজ তাহাদের মুক্তি নিশ্চয় জানিয়া মেয়েটি আয়োজনের কোন ত্রুটি রাখে নাই।

বৃহৎ এক বৈঠকখানা-ঘর স্বদেশ-শিল্পজাত দামী আসবাবে পরিপূর্ণ। খদ্দরের রঙ্গীন কাপড়ে দেওয়াল টেবল সমাচ্ছন্ন—তাহাতে সুরুচির ও সৌন্দর্য্যনিষ্ঠার পরিচয় বিদ্যমান। গোটা ২০ চরকা, একরাশ তূলা ও কতকগুলা খদ্দরের কাপড় গৃহের এক কোণে সাজান রহিয়াছে।

গৃহস্বামী এক নবীন যুবক—তরুণীর ভ্রাতা। তিনি আসিয়া একে একে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিতে লাগিলেন।

শক্তি তখন অন্যমনে গৃহের অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়া মনে মনে মেয়েটির রুচিজ্ঞানের প্রশংসায় শতমুখ হইতেছিল। ভাবিতেছিল, এই ত নবজাগরণের আলোয় ভরা বাঙ্গালার নির্ভীক মেয়ে! ইহাদেরই উৎসাহ-বারি হইতে আবার এক দিন ভারতের সুখসমৃদ্ধির গৌরবময় যুগ ফিরিয়া আসিবে।

সহসা পশ্চাৎ হইতে কে সম্ভ্রমসূচক কণ্ঠে বলিল, "নমস্কার।"

শক্তি মুখ ফিরাইয়া প্রতিনমস্কার করিতে গিয়া দেখিল, এ যে তাহারই সতীর্থ তপন।

বিস্ময়াপ্লুত কণ্ঠে সে কহিল, "তুই যে হঠাৎ?"

তপন হাসিতে হাসিতে বলিল, "একেই বলে ভাগ্য। তুই যে পিকেটিং কর্ত্তে গিয়ে কারাবরণ করেছিলি—তা কে জানতো বল্? আমি ত জানতুম, তোর মা কিছুতেই তোকে এ কাযে অগ্রসর হ'তে দেবেন না।"

শক্তি খুসী হইয়া কহিল, "তা হ'লে তোমারই মাননীয় অতিথি আজ?—আর উনি?" বলিয়া অদূরে দণ্ডায়মানা তরুণীর পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল।

তপন কহিল, "তুই ত কখনও আমাদের বাড়ী আসিস নি, তা চিনবি কি ক'রে। উনি হচ্ছেন আমার গুরু—মাননীয়া ভগ্নী শ্রীমতী অলকা দেবী—বরাবরেষু—" বলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শক্তি সকৌতুকে প্রশ্ন করিল, "গুরু কিসে?"

তপন মুহূর্ত্তে গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল—"গুরু নয়? এই স্বদেশী যজ্ঞের গুরু-পুরোহিত উনিই আমার সব। এই যে ঘর বা বাড়ীটার চারিদিকে গন্ধী মহারাজের সুপবিত্র ছাপ জ্বল্-জ্বল্ করছে—ও ওঁর নিজের হাতে আঁকা। আমার মত পাষণ্ডকেও উনি খদ্দর পরিয়ে, চরকা কাটিয়ে—তবে ছেড়েছেন। শুধু তাই নয়, বেশ একটু উৎসাহ-সঞ্চারও করেছেন।"

শক্তির কাণে কে যেন স্বর্গের সুধা ঢালিয়া দিতেছিল। বাঃ! এমন নহিলে নারী! পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গশোভিনী—এই ত চাই। দুর্ব্বল বাঙ্গালীর অন্তরে শক্তি সঞ্চার করিতে হইলে—ঘরে ঘরে এমনই শক্তিময়ীর প্রতিষ্ঠা আবশ্যক।

তাহার মুগ্ধ-কণ্ঠ হইতে ধ্বনিয়া উঠিল—"বাঃ! সুন্দর!"

তপন তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "আয়, ওর সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দিই।"

শক্তি মৃদু হাসিয়া বলিল, "সে জন্য তোর চিন্তা নেই। উনি যখন সাদরে আমাদের পথ থেকে তুলে এনেছেন, তখন

আলাপের কাযটা তৃতীয় ব্যক্তির উপর দেবেন না নিশ্চয়।"

তপন হাসিতে লাগিল।

এমন সময় তরুণী সেখানে আসিয়া একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া কহিল, "আপনাদের আলাপ হয়ে গেছে দেখছি?" তপন সকৌতুকে তাহার পানে চাহিয়া কহিল, "ইনি কিন্তু তোমার সঙ্গে নিজেই আলাপ করতে চান। কোন তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতা পছন্দ করবেন না, যদিও আমরা এক সময়ে একই কলেজে পড়তুম!"

সকলে হাসিয়া উঠিল।

অলকা বলিল, "তা হ'লে সবে কলেজ ছেড়ে এ কাযে নেমেছেন? এখানে যে ক'টি অতিথি আছেন, সকলেই তাই। এই ত চাই। দেশের তরুণরা যে দিন অর্থকরী বিদ্যার মায়া কাটিয়ে উঠে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে পা দেবেন, সে দিন ভারতের মুক্তিকে ডেকে আনতে হবে না—আপনিই আসবে।" তরুণীর কমনীয় মুখশ্রী উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রভাত অরুণের এক ঝলক আলোক সারা মুখখানিতে ছড়াইয়া পড়িল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল, "কবে আসবে সে শুভদিন? জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে, যে দিন ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই মহামন্ত্রে দীক্ষা নেবে, এই পবিত্র অহিংস অসহযোগে যোগ দেবে?"

শক্তি মুগ্ধনয়নে অলকার ভাবোদ্বেল শান্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কি সুন্দর—সরল প্রাণস্পর্শী—আশা!

পরিধানে খদ্দরের সরু পাড় সাড়ী, হাতে দুই গাছি রুলি, আর গৌরবর্ণ উজ্জ্বল দেহের কোথাও অলঙ্কার বা সজ্জার পারিপাট্য নাই। মধ্যাহ্নের দীপ্তশ্রীর মত ভাস্বর সে তনুলতা কি যেন এক মহিমার জ্যোতি-রেখায় সীমাবদ্ধ। মুগ্ধ নয়নে ভক্তি-প্রীতি আপনা হইতে ওই দুইখানি শুভ্র চরণের 'পরে লুটিয়া পড়িতে চাহে, মাথা শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমে আপনি নত হইয়া পড়ে।

সে সশ্রদ্ধ পুলকভরা কণ্ঠে কহিল, "আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে সত্যই আজ নবজীবন লাভ করলুম। সত্যিই আপনি অসহযোগের পবিত্র মানসী মূর্ত্তি।"

তরুণী লজ্জিত হইয়া মাথা নীচু করিল; কহিল, "এ সামান্য সাধনা মাত্র।"

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর সহসা সে সচকিত হইয়া কহিল, "দেখ, কি ভুলো মন আমার। দিব্যি গল্পে মেতে আছি! জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন এতগুলি অভুক্ত অতিথি—সে কথা ভুলে গেছি—।" বলিতে বলিতে চঞ্চল-চরণে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ক্ষণ পরে তিন চার জন দাসীর সঙ্গে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী লইয়া সে ঘরের এক ধারে আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া সকলকে বিনীতভাবে আহ্বান করিল। সকলে কলরব করিতে করিতে আসনে আসিয়া বসিল। গৃহকর্ত্রীর সুমিষ্ট অনুরোধের সঙ্গে সেগুলির সদ্ব্যবহারে তাহারা গভীরভাবে মনঃসংযোগ করিল।

আহার শেষে—সকলের অনুরোধে তরুণী গাহিল—

"বাংলার মাটী—বাংলার জল
বাংলার বায়ু—বাংলার ফল
পুণ্য হউক—পুণ্য হউক—পুণ্য হউক—হে ভগবান্।
বাঙ্গালীর পণ—বাঙ্গালীর আশা
বাঙ্গালীর কাজ—বাঙ্গালীর ভাষা
সত্য হউক—সত্য হউক—সত্য হউক—হে ভগবান্॥"

গান থামিল—কিন্তু সকলের স্তব্ধ অন্তরের মাঝে তাহার বিচিত্র রেশ বাজিতে লাগিল।—সকলের মর্ম্মবীণা যেন সকরুণ সুরে কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল,—"বাংলার মাটী—বাংলার জল।"

তরুণী হাসিমুখে উঠিয়া সকলকে নমস্কার করিয়া বলিল, "আজ আপনারা শ্রান্ত-ক্লান্ত, বাড়ীতে সকলে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন—বেশীক্ষণ আর আটকে রাখবো না। মাঝে মাঝে আসবেন—দেশের কাযে জীবন-পণের এই মহামন্ত্র কখনও ভুলবেন না। দাঁড়ান,—আজ একটি জিনিষ আপনাদের হাতে দেব,আশা করি, ছোট বোনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সকলেই সে জিনিষের মর্য্যাদা রাখবেন।" বলিয়া দাসীদের ইঙ্গিত করিতেই তাহারা গোটাকতক চরকা তুলিয়া আনিল। তরুণী সকলকেই এক একটি করিয়া উপহার দিল, আর দিল একখানি করিয়া খদ্দরের ধুতি ও তাহাতে বাঁধা খানিকটা তুলা।

অলকা বলিল, "মা-বোন্‌দের আমার নমস্কার জানাবেন, তাঁদের হাতেই এর ভার দেবেন, আপনাদের আশা যেন সফল হয়। ভারতের ভাই-বোন্ সব, কোন দিন [illegible]বেন

না যে, এই মন্ত্র আমাদের মুক্তির বাণী।" যুক্ত-করে তরুণী সকলকে নমস্কার করিল।

৪

বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া শক্তি ডাকিল,—"মা!"

মা পূজাগৃহে তখন ইষ্টদেবতার ধ্যান করিতেছিলেন। পুত্রের চিরপরিচিত কণ্ঠে 'মা' ডাক শুনিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া আসিলেন ও তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

মায়ের স্নেহাশ্রুর মন্দাকিনী-ধারায় স্নাত হইয়া শক্তির মন অসহায় শিশুর মত নির্ভরপরায়ণ হইয়া উঠিল, সে-ও মুক্তির আনন্দবারতা জানাইতে গিয়া মা'র বুকে মুখ লুকাইল।

মাতা-পুত্রের এই অনির্ব্বচনীয় সুখাস্বাদ- পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আর একটি প্রাণীও পরম পরিতৃপ্তিতে উপভোগ করিতেছিল। সে কহিল, "ঘরে চল, জ্যেঠাইমা, অনেক দূর থেকে আসছেন!"

শক্তির মা সহসা পুত্রের দুঃখ-কষ্ট সম্বন্ধে সচেতন হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আয়, পাখার হাওয়ায় একটু বসবি আয়। নমি, যা ত মা ভাঁড়ার ঘরে, একটু ঘি-ময়দা বার ক'রে খান-দুই লুচি ভেজে—"

পুত্র হাসিয়া বলিল, "ব্যস্ত হয়ো না মা, এইমাত্র এক যায়গা থেকে পেট ভ'রে খেয়ে এসেছি, আর তিলমাত্র যায়গা নেই।"

মা আশ্বস্তা হইয়া শক্তির চরকা ও কাপড়ের পানে চাহিয়া কহিলেন, "ও সব আবার কি? না—না, আর নয়।"

শক্তি হাসিয়া বলিল, "মা, এ এক স্বদেশভক্ত গরীয়সী মহিলার দান। এতে ভয় পাবার কিছু নেই, মা।"

মা ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে কহিলেন, "আবার এই সব হাঙ্গামা!"

শক্তি বলিল, "তাই যদি হয়—তাতেই বা ভয় কি? এ আমার পরম শ্রদ্ধার জিনিষ, মনের মৃত্যু থেকে জাতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে! দেহের মরণই কি তোমার কাছে এত বড় হ'ল, মা!" বলিতে বলিতে শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া চরকাটিকে তুলিয়া লইয়া কহিল, "এক তরুণী, দেশের প্রকৃত মেয়ে আমায় এটি দিয়ে বলেছেন,জীবনে যেন এইটিই মূলমন্ত্র হয়। মা, সত্য বলতে কি, মেয়েটির এই প্রাণের পরিচয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি, তাঁর দৃঢ়তা আমার বদ্ধমূল সংস্কারকে আঘাত করেছে। হায়! যদি সব মেয়েই আজ এ কাযে জীবন-পণ করতো!" বলিয়া করুণভাবে সে একবার নমিতার পানে চাহিল।

নমিতার মুখের উপর 'সপাং' করিয়া কে যেন এক ঘা চাবুক বসাইয়া দিল। বিবর্ণ মুখভাব গোপন করিতে তাড়াতাড়ি সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

পুরুষ বা প্রকৃতি আপন আপন অধিকার-সীমায় কোন অনাহূত উপদ্রব সহ্য করিতে পারে না। প্রবল অভিমান যৌবনের ধর্ম্ম। বিচার-বিবেচনা—এ সবের সূক্ষ্মতত্ত্ব তাহারা তলাইয়া বুঝে না। বেগবান্ স্রোত বাধা পাইলে যেমন ফুলিয়া ফুঁসিয়া ভিন্নমুখে গতি নিয়ন্ত্রিত করে, ভালবাসার অধিকার ব্যাহত হইলেও তেমনই রুদ্ধ আবেগকে অভিমানে ভরাইয়া উপেক্ষার স্রোতে বিপরীতগামী হয়।

কোন অজ্ঞাত তরুণীর শ্রদ্ধাময় দান,– নমিতার বুকে এমনই আলোড়ন তুলিল যে, সে আপনার মার্জ্জিত শিক্ষিত শত যুক্তির বাঁধ বাঁধিয়াও তাহা অবরুদ্ধ করিতে পারিল না। সে ত জানিত, মুখে রূঢ় ব্যবহার করিলেও অন্তরে অন্তরে শুধু শুভ কামনার মধুই ক্ষরিয়া পড়িত! সে ত বুঝিত, ভারতের এই জাগরণ প্রত্যেক নারীর অন্তরে কতখানি চেতনা জাগাইয়াছে! তাই ত চরকা কাটিয়া,—কাপড় বুনিয়া শক্তির কারাবরণকে গোপনে গোপনে সফলতার হর্ষে ভরিয়া দিতে কতখানি উৎসাহ লইয়া কাযে নামিয়াছিল! আর আজ এক অজ্ঞাত তরুণীর বাহ্য প্রচেষ্টা, তাহার তরুণ মনকে এমনই মোহমুগ্ধ করিয়া ফেলিল যে, করুণাবিগলিত দৃষ্টিতে নমিতার সর্ব্বাঙ্গ লজ্জার আবরণে ঢাকিয়া দিতে সে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিল না! এমনই পুরুষ! না,—তাহার গোপন সাধনা গুপ্তই থাকুক—সাধিয়া সে ও সবের কুহক পাতিয়া শক্তিকে বাঁধিবে না। যদি কোন দিন মোহমুক্ত অন্তর ভালবাসার আসল পথটি চিনিতে পারে,—তবে সেইখানেই তাহার সার্থকতা।—যাচিয়া মান করিবার কোন আবশ্যক নাই।

তিন দিন নমিতা এ বাড়ীতে আসিল না। পরে ভাবিল, ইহাও ত অভিমানের নামান্তর। কিসের জন্ত সে এ কণ্টক বুকের মাঝে পুষিয়া রাখিবে? না, সে

যাইবে—জ্যেঠাইমার সঙ্গে কথা কহিবে, হাসিবে, কিন্তু শক্তিকে উপেক্ষাটুকু দিয়া বুঝাইয়া দিবে, তোমার নিন্দা প্রশংসা আমার নিকট সমতুল্য, তাহার জন্য বিন্দুমাত্র লালায়িত নহি।

সে আসিত—শক্তির সম্মুখ দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইত, কিন্তু শক্তি চরকা বুনন লইয়া এমনই ব্যস্ত থাকিত যে, সে দিকে চাহিবার অবসরও পাইত না। এমনই প্রত্যহ নীরব অভিমান—মনকে আঘাত করিতে না পারিয়া দ্বিগুণ ক্রোধে ফুলিয়া উঠিত, পদশব্দ দ্রুত ও মুখর হইয়া শক্তির মগ্ন চৈতন্যকে বৃথাই উদ্‌বুদ্ধ করিবার প্রয়াস করিত। কখনও বা সশব্দে দুয়ার বন্ধ করিয়া আপন তাচ্ছীল্য জানাইয়া যাইত। শক্তি সচকিত হইয়া মুখ তুলিত ও সম্মুখে গমনোদ্যত নমিতাকে দেখিয়া অন্যমনস্কে বলিয়া উঠিত—'ও:'। সঙ্গে সঙ্গে চরকার উপর গভীর নিবিষ্ট মনে ঝুঁকিয়া পড়িত!

এক দিন দ্বিপ্রহরে সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় নমিতা শুনিল—পাশের ঘরে মাতাপুত্রে কিসের তর্ক হইতেছে। অমনই তাহার দ্রুত পদক্ষেপ লঘু হইয়া স্ত্রীস্বভাবসুলভ কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করিল, সে ধীরে ধীরে দ্বারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

তখন মা বলিতেছিলেন, কথার ভাবে বোধ হইল, স্বর অশ্রু-বিকম্পিত,—"ওসব কোন কথা আমি শুনবো না।"

শক্তি মিনতির স্বরে কহিল, "না মা, এখন নয়। এই সবে দেশের কাযে হাত দিয়েছি।"

মা বাধা দিয়া বলিলেন, "দেশের কাযে হাত দিলে কি সব সাধ আহ্লাদ ধুয়ে মুছে ফেলতে হয়? এই যে এত লোক রয়েছেন।"

শক্তি শান্তস্বরে উত্তর দিল, "তাঁদের সঙ্গে আমার তুলনা ক'রো না, মা।"

মা দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করিলেন, "না, না—ও-সব কথা ঢের শুনেছি। আমি বুড়ো হয়েছি, আমার কি সাধ-আহ্লাদ নেই! যে মা হ'তে দেশ-মাকে চিনেছিস, সে কি তোর কেউ নয়, শক্তি!" বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।—

কিছুক্ষণ কক্ষ নিস্তব্ধ। বোধ হয়, মায়ের অশ্রু-[illegible] মাসিমা-[illegible] আসিয়া গেল।

মা পুনরায় কহিলেন, "আর নমিরও বয়স হয়েছে, সত্যবদ্ধ আছি।"

শক্তি আর্তস্বরে সহসা বলিয়া উঠিল, "মা, মা, দোহাই তোমার, এখন নয়।"

মা আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "ও কি? অমন ক'রে উঠলি কেন?"

শক্তি কিছুক্ষণ কোন কথা কহিল না; পরে রুদ্ধ নিশ্বাস মুক্ত করিয়া বলিতে লাগিল, "তুমি ত জান না, আমার এ কাযের মাঝে নমিতাকে এনে ফেলা মানে—একে নষ্ট করা!"

নমিতা আর শুনিতে পারিল না, তেমনই লঘু দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া একবারে ছাদ পার হইয়া ঘরে আসিয়া বিছানায় আপনাকে একান্তভাবে সঁপিয়া দিল।—

তাহার বিক্ষুব্ধ অন্তরে আজ এই আলোড়নই উঠিল যে, জন্মগত সংস্কারকে মানুষ বাহিরের মিথ্যা মোহ আবরণে ঢাকিয়া কি করিয়া এক মুহূর্তে এমন অপরিচিত হইয়া যায়। সত্য প্রতিজ্ঞা, বাপ-মার স্নেহ-ভালবাসা, বুভুক্ষু কামনার মুখে হয় ত মূল্যহীন, কিন্তু প্রাণসূত্রের যে সুনিবিড় যোগ—উদ্দাম আবেগহীন যে কৃত্রিমময় প্রেম—তাহাও কি ভ্রান্ত পথের মরীচিকামাত্র? উদ্দামেই কি প্রাণের প্রতিষ্ঠা? নিস্তরঙ্গ নদীর গর্ভে স্বচ্ছ সলিল লীলাবিভঙ্গে তরঙ্গ না তুলিলে কি নদীর সমলত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ সুনিশ্চিত? না, হয় ত এ প্রাণের স্পর্শ তাহার মনে অন্য অনুভবে গঠিত? হয় ত সেখানে ইহার মূল্য কাঞ্চন-কাচের সমতুল্যই। তবু?

নমিতার দৃঢ়চিত্ত শক্তির প্রত্যাখ্যানজনিত আঘাতে কি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল? তাই কি তাহার নয়নে ধারার উপর ধারা নামিয়া আসিতেছে? সে নারী, এই অদৃষ্টই কি তাহাকে তীব্র অভিমানে আহত করিয়াছে?

কখন্ যে মধ্যাহ্নের দীপ্ত মিহির অপরাহ্নের চিতা[illegible] পা চালিয়াছেন, নমিতা তাহা জানিতেও পারে নাই। [illegible] মোটরের শঙ্খধ্বনি শুনিয়া সে বিছানা হইতে উঠিয়া জা[illegible] ঝুঁকিয়া পড়িয়া অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু চিন্তাসূত্রের মাঝেই যে বাহিরের দৃশ্য ধরা পড়িয়াছে, তাহা ত সে জানিত না!

সে দেখিল,—এক সুস্মিত-হাস্যময়ী তরুণী, [illegible] দেহ

রূপের অদম্য আলোকে সমুজ্জ্বল, শক্তির হাত ধরিয়া মোটর হইতে নামিতেছেন। তাঁহার অঙ্গে খদ্দরের শাড়ী—অত্যন্ত মোটা; কিন্তু শুচি-শুভ্রতার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। সৌন্দর্য্যের তীব্রচ্ছটা মনকে বিভ্রান্ত করে না, রূপহীনতার কুশ্রীতায় চোখের পীড়াও জন্মায় না।

শক্তির মুখে কি আগ্রহ, যেন হাত বাড়াইয়া সে বাঞ্ছিত স্বর্গ স্পর্শ করিয়াছে। চোখ বুঝি আবেগে কাঁপিতেছে! নমিতা আর চাহিতে পারিল না, শয্যায় আসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

৫

দাসী কখন্ আলো জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে। নমিতার শয্যা-প্রান্তে আসিয়া কে যেন মৃদু কোমলস্বরে ডাকিল, "নমিতা!"

নমিতা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই সে দিকে চাহিয়া আর পলক ফেলিতে পারিল না। এ কি! তাহার শয্যা-প্রান্তে শক্তির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই অপরিচিতা, মৃদুহাস্যময়ী তরুণী! তাহাকে যে অভ্যর্থনা করা প্রয়োজন, সে কথা তাহার মনেই জাগিল না, শুধু অবাক্-বিস্ময়ে সে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

আগন্তুকার কিন্তু কোন সঙ্কোচ ছিল না, সে দিব্য সপ্রতিভের মত নমিতার শয্যাপ্রান্তে আসিয়া বসিল ও তাহার একখানি হাত তুলিয়া মৃদু দোলা দিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম, ভাই। বোধ হয়, খুব আশ্চর্য্য লাগছে তোমার, না? জানা নেই, শোনা নেই, একেবারে 'তুমি'!" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

নমিতা অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "না, না, এতে আমি—"

মেয়েটি হাসির মাঝেই বলিল, "তা আমি জানি। তুমি যদি কিছু মনেই করতে ত এমন ভাবে ডাকতে আমার সাহস হবে কেন?" পরে শক্তির পানে ফিরিয়া বলিল, "কেমন, দেখলেন ত শক্তি বাবু, আপনার সন্দেহ অমূলক!"

শক্তি মাথা নাড়িয়া অস্পষ্ট স্বরে কি বলিল, বুঝা গেল না।

নমিতার মনে ক্রোধের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিল। শক্তির এ বড় স্পর্দ্ধা যে, তাহার কথা লইয়া এই সুন্দরী তরুণীর কাছে পরিহাস করে?

তরুণী নমিতার দিকে ফিরিয়া কহিল, "কিন্তু ভাই, তোমার কাছে আমার নালিশ আছে বিস্তর, অবশ্য সবগুলিই আজ করছি না। আজ শুধু আলাপটা ক'রে—"

নমিতা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "সে কি! আপনি এক দণ্ডের পরিচয়ে আমাকে যে অধিকার দিয়েছেন, তার মাঝে আর বৃথা সঙ্কোচের সৃষ্টি করবেন না। বলুন—" বলিয়া তাহাকে দৃঢ়ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিল।

অলকা কহিল, "সঙ্কোচের বালাই আমার বড় একটা নেই, তার জন্য ভাবিনে। ভাল কথা, শক্তি বাবু—" বলিয়া সে দিকে চাহিতেই দেখিল—শক্তি কখন্ নিঃশব্দে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

সে হাসিয়া কহিল, "দেখলে আমার বন্ধুর ভীরু স্বভাব, তর্কের পূর্ব্বেই স'রে পড়েছেন।" পরে একটু থামিয়া বলিল, "শুনলুম, তুমি না কি খদ্দরকে ঘৃণা কর?"

এক মুহূর্ত্তে দৃঢ় হইয়া নমিতা উত্তর দিল, "হাঁ।"—

আগ্রহে অলকা কহিল, "কেন? ওর অপরাধ?"

নমিতা হাসিয়া ফেলিল, "অপরাধ ওর কিছু নয়—আমারই মনের। সখ ত সকলের সমান নয়!"

দুই চক্ষু বিস্ময়ে কপালে তুলিয়া অলকা কহিল, "সখ?"

নমিতা তেমনই নিস্পৃহভাবে বলিতে লাগিল, "তা ভিন্ন আর কি বলবো?"

অলকা তাড়াতাড়ি কহিল, "কিন্তু এ বেয়াড়া সখটি তোমায় ছাড়তে হবে, বোন্।"

"কেন?"

"কেন আবার! আমরা ঘরের ভেতর থেকে যদি এ সম্বন্ধে প্রবল আপত্তি না তুলি ত বাইরে ওর প্রতিষ্ঠা হবে না। তুমি কি বোঝ না ভাই যে, ভারতের প্রত্যেক মুক্তিকামী নরনারী শততীর্থ-রেণুর চেয়েও একে পবিত্র জ্ঞান করেন? হয় ত পরাধীন আমরা থাকবো,—সে জন্যই বা দুঃখ কি? যদি বাইরের শৃঙ্খল না ভেঙ্গে মনের বাঁধন ওর দ্বারা আলগা হয়ে যায়, সেইটাই বা মন্দ কি? শক্তির বিকাশ করতে হ'লে আগে প্রয়োজন শক্তিমান্ হওয়া, আর সে শক্তি বাইরে থেকে আসে না, আসে অন্তর থেকে। এ কথা তুমি কি বোঝ না—এত বড় বুদ্ধিহীনতার অপবাদ আমি তোমায় দিতে পারি না।"

নমিতা কোন কথা কহিল না। বলিবারই বা কি আছে? ইহা ত তাহারই অন্তরের কথার প্রতিধ্বনি।

শ্রদ্ধায় এই সমবয়সী বুদ্ধিমতী নারীর কাছে তাহার মাথা আপনি নত হইয়া পড়িল ; কিন্তু মনের গোপন কোণে কোথায় একটু অভিমানের কণা লুকাইয়া ছিল।

নমিতা কহিল, "যা-ই বলুন না কেন—এতে আমার মোটেই বিশ্বাস নেই।" কিন্তু কথায় তেমন জোর ফুটিয়া উঠিল না।

অলকা তাহার এ দুর্ব্বলতাটুকু লক্ষ্য করিল,—হাসিয়া কহিল, "না ভাই, ও তোমার অন্তরের কথা নয়, এ আমি জোর গলাতেই বলছি। কেন জানি না, তুমি আমায়ও যেন কি লুকোচ্ছ! যাই হোক, আজ উঠি।" অলকা উঠিয়া দাঁড়াইল।

নমিতা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "সে কি? একটু মিষ্টিমুখ ক'রে—"

হাসিয়া অলকা কহিল, "তার জন্যে ভাবনা কি? কা'ল না হয় আবার আসবো ; তবে ভাই, তোমার অন্তর আমি চিনে নিয়েছি—কোন ফাঁকি আর চলবে না। আসল সত্যকে কেউ কি কখনও আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখতে পারে?" বলিয়া একটা প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া উঠিল।

অলকা চলিয়া গেলে নমিতা ভাবিতে লাগিল, আশ্চর্য্য মেয়ে। এক মুহূর্ত্তে মনের মধ্যে আসন পাতিয়া চিরন্তন অধিকারটুকু সাব্যস্ত করিয়া লয়—এতটুকু দ্বিধা-সঙ্কোচ মান-অভিমান নাই। বোধ হয়, কুহকিনীর ঐ সুমিষ্ট হাসিটুকুই মধু সম্পর্কের মূল উৎস!

কা'ল আসিবে বলিয়া তরুণী গিয়াছে। এক সপ্তাহের মধ্যে তাহার দেখা নাই। নমিতার ইচ্ছা হইল, শক্তিকে সে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে ; কিন্তু তাহার সম্মুখে আসিলেই সেদিনকার সেই কথাগুলা তাহাকে এমন আঘাত দিয়া বিমুখ করিয়া দেয় যে, উৎকণ্ঠার স্থানে অভিমান আসিয়া জুড়িয়া বসে, সে ফিরিয়া চলে।

৬

দিন যায়। একে একে সকল নেতাই কারাবরণে গৌরবখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের কারাবরণে দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়—দীপ্ত হয়, কিন্তু কর্ম্মের ক্ষেত্রে আঁধার ঘনাইয়া আসে। হয় ত পাষাণ-প্রাচীরের অভ্যন্তরে মুক্তির আলোক জ্যোতিষ্মান্ হইয়া প্রতি দণ্ডে—প্রতি পলে মুক্তিকামীদের মনে আশার দেউটি জ্বালিয়া দেয় ; কিন্তু বাহিরের বিরাট বিশ্ব সে আলোর কণামাত্র লাভ করিতে না পারিয়া দিনে দিনে ম্লান হইতে ম্লানতর হইতে থাকে। এমনই নিয়ম। যে জগতে সূর্য্য জ্বলে, তাহার বিপরীত জগতে আঁধারের শোভা।

শক্তির উৎসাহও নির্ব্বাণোন্মুখ বহ্নির মত স্তিমিতপ্রায়, শুধু অলকার উৎসাহ ইন্ধনে এখনও একবারে নিভিয়া যায় নাই। তবে দেখিলে বুঝা যায়—অনেকটা জোয়ার শেষে কর্দ্দমকঙ্করপঙ্কিল ক্ষীণ নদীটির মত।

শুক্লাষ্টমীর সন্ধ্যায় অলকার বাড়ীর ছাদের উপর বসিয়া তিনটি প্রাণী মিলিয়া ভারতের ভবিষ্যৎসম্বন্ধে তর্ক করিতেছিল। ক্ষীণ চাঁদের পাণ্ডুর আলোয় তর্কটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে একটা বড় বাড়ীর অন্তরালে চাঁদের জ্যোতির্ম্ময় দেহ লুকাইয়া পড়িতেই তরল অন্ধকারে সবটা ঢাকিয়া দিল—তর্কের সমাপ্তি করিয়া তপন নীচে নামিয়া গেল। রহিল শক্তি আর অলকা।

তর্কের শেষ হইয়া গিয়াছিল, কাযেই দুই জনে চুপ করিয়া বসিয়া, বোধ করি বা অন্ধকারের রহস্যানুসন্ধানে নূতন তত্ত্বের খানিকটা আবিষ্কার করিতেছিল।

খানিকক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শক্তি কহিল, "দেখুন, ক'দিন থেকে মা বড় কান্নাকাটি করছেন।"

অলকা কহিল,—"কেন?"

শক্তি একটু ইতস্ততঃ করিয়া সসঙ্কোচে বলিল, "আমার বিয়ের জন্য, আমি অমত করাতেই তাঁর কান্নাকাটি। আপনি বলুন ত, এত শীঘ্র বিয়ে করা উচিত কি?"

অলকা মৃদু হাসিয়া কহিল, "উচিত বৈ কি।"

শক্তি বিস্ময়ে মিনিট দুই চুপ করিয়া কি ভ[illegible] পরে যেন সব সন্দেহ মিটাইয়া কহিল, "পরিহাস ক[illegible]

অলকা কহিল, "পরিহাস! ভাইয়ের সঙ্গে [illegible] হাসের সম্পর্ক! দেখুন, সংসারে কর্ত্তব্য ব'লে একট[illegible] আছে, তার উপর আছে ভালোবাসার দাবী [illegible] কর্ত্তব্যে হয় ত খুব একটা গর্ব্ব অনুভব করা যে[illegible] কিন্তু মন তাতে সন্তুষ্ট হয় না। আপনিই বলুন [illegible] মনে কষ্ট দিয়ে, সে কষ্ট কি আপনার মনে বা[illegible] বেজেছে বলেই ত ও কথা আজ তুলেছেন।"

শক্তি অলকার এই অদ্ভুত অনুভবশক্তিতে সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় মাথা নত করিল; কহিল, "ঠিক বলেছেন। তবে আমার ইতস্ততঃ এই জন্যে যে, দেশের কাযে সবে হাত দিয়েছি।"

অলকা হাসিয়া বলিল, "ও সব মিথ্যে আপত্তি। আসল হচ্ছে মনটিকে চেনা। বিয়ে করার সঙ্গে কায বা উৎসাহের কোন যোগ নেই। কাযের অছিলায় ও কাযটা ঠেলে ফেলে রাখলে হয় ত কোন দিনই সুযোগ আর আসবে না। কাযও চিরকাল থাকবে, সংসারও ত্যাগ করা চলে না, তার মাঝে ওগুলোর প্রয়োজনও কম নয়।"

শক্তি বলিল, "তা মানি, কিন্তু উপযুক্ত পাত্রী না হ'লে—"

অলকা কহিল, "অন্ততঃ কর্ম্মে সঙ্গিনী, মন্ত্রণায় সচিব, প্রেমে পত্নী, স্নেহে ভগ্নী—"

শক্তি হাসিতে হাসিতে একটু জোর দিয়া কহিল, "ঠিক ঠিক। তা না হ'লে জীবনের সর্ব্ব-সাধকেই জলাঞ্জলি দিতে হয়। সংসার করা মানে—পুত্র-কন্যার বোঝা নিয়ে বন্ধুর জীবনপথে কষ্টে সৃষ্টে পাড়ি দেওয়া—নিতান্তই অসহ্য, অন্ততঃ আমার পক্ষে।"

অলকা সকৌতুকে কহিল, "তা হ'লে মনোমত পাত্রী আপনার ঠিক হয়ে আছে। শক্তির শ্রী—।"

শক্তি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল, "আছে বৈ কি। তবে তাঁর মতামতটা জানতে পারলেই মাকে সম্মতি দিই।"

শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বর পুলকের আতিশয্যে কাঁপিয়া উঠিয়া মৃদুল রাগিণীর মত ঝঙ্কার তুলিল।

অলকা কোন কথা কহিল না, নীরবে শক্তির উজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

শক্তি একটু অগ্রসর হইয়া আবেগবিহ্বল স্বরে বলিল, "এ কি আমার পক্ষে দুরাশা মাত্র!"

অলকা তেমনই নীরবে শক্তির পানে চাহিয়া একটি মৃদু নিশ্বাস মুক্ত করিল।

ধীরে ধীরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

শক্তির মোহ টুটিয়া গেল, অপরাধীর মত মাথা নীচু করিয়া কুণ্ঠিত স্বরে কহিল, "আপনার অপমান করলুম কি?" স্বরে যেন বেদনা ও গ্লানি ফাটিয়া পড়িতেছিল।

অলকা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল. "না, আপনি কা'ল আসবেন, এর উত্তর দেব।"

পর-মুহূর্ত্তে গম্ভীর হইয়া কহিল, "ঠাণ্ডা পড়ছে, এখন বাড়ী যান।" বলিয়া সে ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

এই দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময়ী নারীর নির্ব্বাক্ আচরণ কুণ্ঠিত শক্তিকে অভয় দিয়া পর-মুহূর্ত্তে গম্ভীর হইয়া বাড়ী যাওয়ার অনুরোধ—সব কটি মিলিয়া দুশ্চিন্তার ভারে তাহার অপরাধী মনকে লজ্জায় সঙ্কোচে একবারে সঙ্কুচিত করিয়া দিয়াছিল। সারা রাত্রি সে বিনিদ্র থাকিয়া এই সব অদ্ভুত আচরণের মর্ম্মভেদ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কোন খুঁতই পায় নাই। একটু আশার বাণী—অনুকম্পা, দৃষ্টির ঔজ্জ্বল্য? কিছু না। একবারে ভাবসংস্পর্শহীন পাষাণ-প্রতিমা! তবে কি বৃথা আশা? না—এ কল্পনাতেও যে তরুণ মন ভাঙ্গিয়া পড়ে।

যৌবনের আশা, রঙ্গীন বাসন্তী স্বপ্ন, চিরদিন মলয়ের মাথায় সফলতার গৌরব-তৃপ্তিতে ঝলমল করে। আশপাশ বা সুদূর সম্মুখ—কিছুই সে দেখে না। দেখিতে পাইলে হয় ত যৌবনের উদ্দীপনা, তেজ ও আকাঙ্ক্ষা—ধরণীর বুকে নব নব উন্মাদনা জাগাইয়া তাহাকে বৈচিত্র্যসম্ভারে সমৃদ্ধ করিতে পারিত না।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা শক্তি স্থির করিল, কায নাই ওখানে গিয়া। কিন্তু উৎকণ্ঠিত মন সে কথা শুনিল না। চঞ্চল পুলকে মাতিয়া মৃদু গুঞ্জনে কুহকিনী আশা তাহার কাণে কাণে কহিল, আশা পাও নাই বটে, কিন্তু নিরাশ হইবারও ত কোন হেতু নাই। হয় জীবন, না হয় মরণ—একটা কিছু লাভ-লোকসান হইবেই, তাহার জন্য ইতস্ততঃ কেন?

* * * *

তপন তাহার রুক্ষ কেশ ও শুষ্ক মুখ দেখিয়া বলিল, "এ কি! তোর কি কোন অসুখ করেছে?"

শক্তি সংক্ষেপে উত্তর দিল, "না। সারারাত্রি ঘুম হয় নি।"

তপন রহস্য করিয়া কহিল, "কেন? স্বরাজ—চরকা এ সব স্বপ্নে দেখিস না কি? কিন্তু তার চেয়ে আরও মিষ্টি স্বপ্ন—"

কথাটা শেষ হইল না। তপন মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল।

শক্তি সে কথায় কাণ না দিয়া বলিল, "অলকা কোথায়?"

তখন অঙ্গুলী প্রসারণ করিয়া কোণের একটা ঘর দেখাইয়া কহিল, "ঐ ঘরে।"

সান্ধ্য বায়ুতরঙ্গে ধূপ-ধুনার মধুর গন্ধ সে দিক হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল। শক্তির আকুল নাসারন্ধ্রে সে সৌরভ স্নিগ্ধতর হইয়া সারা মনটাকে যেন নিমেষে তৃপ্ত করিয়া দিল। সে আসিয়া কক্ষদ্বারে দাঁড়াইল।

৭

কক্ষমধ্যে গাঢ় ধূম তখন তরল হইয়া আসিলেও অস্পষ্ট মায়ারাজ্যের মত আবছায়ায় ঘেরা।

সে দেখিল, অলকা গললগ্নীকৃতবাসে কি একটা মূর্ত্তির সম্মুখে মাথা নীচু করিয়া প্রণাম করিতেছে। ধুনুচি হইতে কুণ্ডলীকৃত ধূম উঠিয়া তাহার এলায়িত কেশপাশ বহিয়া ও সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে, সে নৃত্য শ্রদ্ধা ও মহিমার দ্যোতক।

দারুণ বিস্ময়ে শক্তি বহুক্ষণ বিমূঢ়ের মত সে দিকে চাহিয়া রহিল। এ কি! কোন্ দেবতার পূজায় অলকার এ আত্মসমাধি? এমন প্রগাঢ় ভক্তি ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য তৃপ্তি সে ত জীবনে দেখে নাই। এই কি ধ্যান?

অলকার সুমিষ্ট স্বরে শক্তির চমক ভাঙ্গিয়া গেল। সে চাহিয়া দেখিল, সম্মুখের প্রতিমূর্ত্তি কোন দেবতার নহে, এক সুকুমারকান্তি তরুণের। সে কি বলিতে যাইতেছিল, অলকা ছবির দিকে অঙ্গুলী প্রসারণ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "উনি আমার ইষ্টদেবতা—স্বামী।"

গভীর বিস্ময়ে একটা অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করিয়া শক্তি দ্বারের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার মাথা বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরিতেছিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল না যে, ইহা স্বপ্ন—না, রহস্যময়ীর লীলা। ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া চাহিল, না, দৃষ্টির বিভ্রম নহে, দিনের আলোর মত সুস্পষ্ট সত্য। পরে ব্যথাভরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অলকার পানে চাহিতেই তাহার যেটুকু সন্দেহ ছিল, একবারে মুছিয়া গেল। কি অন্ধ সে! শুভ্র কাষায়বাসপরিহিতা নিরাভরণা তরুণীর সর্ব্ব অঙ্গে যে বৈধব্যের চিহ্ন সুপরিস্ফুট! এতটুকু অসত্য ত উহার মধ্যে নাই!

অলকা বলিল, "ছেলেবেলায় আমাদের বিয়ে হয়, ১৩ বৎসর বয়সের সময় ওঁকে হারাই। কিন্তু দেবতার স্মৃতি নিষ্করুণ আঘাতে আমার মনকে বিপর্য্যস্ত করতে পারেনি। তাই পটের দেবতা হয়ে বাইরে—ও মনের দেবতা হয়ে অন্তরে উনিই প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। বড্ড কুসংস্কার, নয়?"

শক্তি কোন কথা কহিল না, তেমনই নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

অলকা কহিল, "দেখুন, এ নিয়ে অনেকে তর্ক করেন যে, আমার এ উচ্ছ্বাস দুদিনের বা চিরদিনের হলেও এর মূলে কোন সত্য নেই। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য না কি শব্দসমষ্টির মোহমাত্র। তরুণ মনের মাঝে যে বাসনার অঙ্কুর যৌবন-সমাগমে পত্রে পুষ্পে মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে, তাকে অকালে ঝরিয়ে ফেলবার জন্যই—এই সব বড় বড় কথার সৃষ্টি! এর মোহ নাকি যুগ যুগ ধ'রে এমনি মহিমার সমারোহ জেলে আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ অন্তরকে মনুষ্যত্বের পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।" বলিয়া সে শক্তির পানে চাহিল।

শক্তি নির্ব্বাক্।

অলকার মৃদুকণ্ঠ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, স্বরে দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিল—সে বলিতে লাগিল, "কিন্তু তাঁরা বোঝেন না যে, যুক্তিটাই মনের যথাসর্ব্বস্ব নয়, পথও বিভিন্ন। ব্রহ্মচর্য্য কথাটি মোহকর হ'তে পারে, কিন্তু সে মোহ উদ্দাম যৌবনের পঙ্কিল লালসাময় মোহের চেয়ে কতখানি ঊর্দ্ধে, সে শুধু জানে অনুগতা। তৃপ্তি বা নির্ম্মল আনন্দ যাতে আছে, তাই মহৎ জীবনের কাম্য। প্রবৃত্তি-পরিতৃপ্তির যে আনন্দ, তাতেও মাঝে মাঝে অবসাদ আসে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যকার অসীম উল্লাস অবসাদের ছায়াও স্পর্শ করে না; দিনে দিনে ঊর্দ্ধগামী সে।"

শক্তি এতক্ষণে কথা কহিল, "আপনার যুক্তিটাও ত ঠিক বলতে পারি না। মনের ইচ্ছাকে যখন গলা টিপে ঊর্দ্ধগামী করবেন, তখনই ত দুঃখ-কষ্ট অনিবার্য্য।"

অলকা মৃদু হাসিয়া কহিল, "কে বললে দুঃখ-কষ্ট! বালক যখন পাঠাভ্যাস করে, সে কি তখন বড়ই দুঃখ-কষ্ট অনুভব করে? কর্ম্মী যখন কর্ম্মে মাতে, তখন সে কি পা-- পার্থিব বাধা-বিপত্তিতে ভেঙ্গে পড়ে? জানবেন শক্তি বাবু, বাধা যেখানে বলবতী, জয়ের চেষ্টা সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত। সেখানকার পরাজয়েই দুঃখ, জয়ে নয়। আমাদের মুনি-ঋষিরা মূর্খ ছিলেন না, অবশ্য মুনি-ঋষি নামে কোন অতিমানব

নন; যিনি সত্য, শিব, সুন্দরের উপাসক, তিনিই মুনি। তাঁরা জানতেন যে, বাসনার সীমা নির্দ্দেশ না হ'লে, পূর্ণ তৃপ্তি মানুষ লাভ করতে পারে না। কেন না, রুগ্ন ব্যক্তির সংযম না থাকলে তাকে চির-রোগীই থাকতে হয়।"

শক্তি বলিল, "কিন্তু এই মুনি-ঋষিদের নিষ্কাম নিস্পৃহতাই আজ ভারতের অধঃপতনের মূল। শক্তিকে বাদ দিয়ে শুধু অলস সাধনা, ধর্ম্মের নামে জাতটাকে ক্ষমাময় তৈরী করাতে তারা বলবীর্য্যহীন ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়েছে।"

অলকা দৃঢ়স্বরে কহিল, "না, ঠিক তা নয়। সংযমের মধ্যে যে শক্তি, তারই অভাবে আজ আমাদের এমন দশা। শুধু বিলাস, যথেচ্ছাচার আমাদের এমন অবস্থায় এনে ফেলেছে। যে পাশ্চাত্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আমরা শাস্ত্র-কর্ত্তাদের মূর্খ ব'লে উপহাস করি, তাঁদের আর একটু ভাল ক'রে দেখলে বুঝবেন, তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে কি গভীর একাগ্রতা, কতখানি ত্যাগ, প্রবল সাধনা। জীবনকে তুচ্ছ ক'রে, তাঁরা সমুদ্রে নামছেন, আকাশে উঠছেন, বিদ্যুৎ নিয়ে লোফালুফি করছেন, কিন্তু যাক্ সে কথা। ঘর না চিনে পরের দৃষ্টান্ত দেওয়া আমি ভাল মনে করি না।" বলিয়া হাসিল।

পরে কহিল, "জানেন শক্তি বাবু, ভারতের যদি কোন দিন মুক্তি হয় ত এই অসহযোগের মধ্য দিয়েই হবে। ব্যাধি তার সর্ব্বাঙ্গে, নিরাময় করতে হ'লে সব ভেঙ্গে চুরে এক করতে হবে। এই ত্যাগ ও অহিংসার উত্তাপে তার শতাব্দী-সঞ্চিত আলস্য, জড়তা, মোহ গলিয়ে তৈরী করতে হবে—সংযমী মন। সেই অমোঘ অস্ত্রই হবে জগতের পশুশক্তির সংহারবজ্র।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া সে যেন ঐ কথাটাই ভাবিতে লাগিল।

পরে সনিশ্বাসে কহিল, "কিন্তু তা কি হবে! ত্যাগ বলতে যেখানে অসার শব্দসমষ্টিমাত্র বোঝায়, যৌবন সাড়া দেয় না, সেখানে এ আশা—?"

শক্তি কোন কথা কহিল না। কোন অদৃশ্যশক্তি তাহার সব তর্কেচ্ছাকে নিরুদ্যম করিয়া দিয়াছিল।

কিছুক্ষণ এইরূপ নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটিবার পর অলকা সহসা এক সময়ে হাসিয়া উঠিল; কহিল, "কি ভাবছেন? আর কোথায় ভারতের মুক্তি! কিন্তু ছুটো জিনিষ আলাদা হ'লেও ওর মূলে আছে এক বস্তু,—সে হচ্ছে সাধনা। থাক ও সব কথা—অনেক তর্ক করলুম। এখন উঠুন—আপনার চা খাবার সময় হয়েছে, দাদাটিও বোধ হয় এতক্ষণ ছটফট করছেন।"

মহিমময়ী মূর্ত্তিতে সে আসন ত্যাগ করিল।

৮

পুঞ্জীভূত অন্ধকারে যে ক্ষুদ্র অনুজ্জ্বল তারকার ভাতি পিপাসার্ত্ত চকোরের তনু-মনকে মোহলুব্ধ করিয়া মায়া-সরসীর সৃষ্টি করে,—পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার আলোকে তাহার কোন চিহ্নই খুঁজিয়া মিলে না। জ্যোৎস্নাম্লান ছলছল তারাটির দিকে তখন পিপাসী চকোর বারেকের তরে ফিরিয়াও চাহে না। এমনই নিয়ম।

শক্তির মন ছুর্নিবার গতিবেগে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া স্বর্গলোকের উন্নত সোপানে পদক্ষেপ করিবামাত্র সেখানকার আলো তরল হইয়া অবলম্বনবিচ্যুত তাহাকে একবারে মর্ত্ত্যের নিরালা অন্ধকারে নামাইয়া দিয়া গেল। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুখচ্ছবি বর্ত্তমানের নিষ্ঠুর আঘাতে এমনই অতর্কিতে অন্তর্দ্ধান করিল! সে স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখিল, যে সিংহাসনের প্রথম সোপানে উন্নমিত চরণ তুলিয়া সে অধিরোহণের প্রয়াস করিতেছিল—তাহা একান্তই অনধিগম্য; সেখানে বিরাট ব্যবধান প্রাচীর তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে ব্যবধান মানুষ ও দেবতার।

যে ছুর্জ্ঞেয় নারী এত দিন রহস্যের নিগূঢ় অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া তাহার লুব্ধ মনকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণে বিকর্ষণে উত্যক্ত করিতেছিল, আজ সে আবরণ সরাইয়া তাহার সম্মুখে ভাস্বর মূর্ত্তিতে এমনই জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল যে, সে অলোকসামান্য দীপ্তিতে অবগাহন করা চলে না, মানুষের অন্তরে আবদ্ধ করিবারও নহে,—শুধু শ্রদ্ধানতভাবে মাথায় রাখিবার মতই তাহা পবিত্র ও অনবদ্য।

বাড়ী আসিয়া বিছানায় পড়িয়া শক্তি আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে সে দেখিল, পাণ্ডুর আকাশের এক কোণে একটি তারা জল-জল করিয়া

সে লক্ষ্য করে নাই! প্রতিনিয়ত দৃষ্টির সম্মুখে রহিয়াছে বলিয়াই বুঝি সে দিকে তাহার সাগ্রহ নেত্রপাত হয় নাই! সহসা উজ্জ্বল আলোকমালা বিকীর্ণ করিতে করিতে যে চাঁদ গগনপথে উঠিয়াছিল, তাহারই তীব্র রশ্মিসম্পাতে এই তারার অস্তিত্ব সে ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ ম্লান চাঁদের আলোয় তাহা শুধুই নয়নের সম্মুখে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল না, তাহার অন্তরে এই স্নিগ্ধ দীপ্তি অভূতপূর্ব্ব ভাবরাশিকে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিল। এই তারকা অনুজ্জ্বল, কিন্তু স্নিগ্ধ বটে। আজীবন অভ্যস্ত নয়ন এ দিকে চাহিয়াই আসিয়াছে, কিন্তু হৃদয় কথনও হর্ষ-উচ্ছ্বাস অনুভব করে নাই।

একটু কম্পন? সামান্য বৈচিত্র্য? কিন্তু না। জীবনের সায়াহ্নে শান্তিকামী অন্তর হয় ত ইহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারে; মধ্যাহ্ন-দীপ্ত প্রখর যৌবন কি তাহাতে সান্ত্বনা লাভ করিবে? সে চাহে—বিচ্ছুরিত কিরণ, প্রখর তেজ, দুর্দ্দম গতি, অনলস উদ্যম, প্রজ্বলিত কর্ম্ম! কিন্তু ও? না—না—না।

সপ্তমী অষ্টমী, নবমী চলিয়া গেল। তিন দিনের অহরহ সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত শক্তি স্থির করিল, আর নহে। স্বদেশ, স্বরাজ এ সব ছাড়িতে হইবে। অদৃশ্য ইঙ্গিত তাহার লক্ষ্যকে ভিন্নমুখী করিয়াছে, জয়ী এখানে অদৃষ্ট।

বিবাহ না করিলেও চলিত, কিন্তু মায়ের মন অশান্তিতে ভরাইতে ইচ্ছা নাই, পিতৃ-সত্যও পূর্ণ হউক। অসহযোগ, স্বরাজ হইতে বহু দূরে অবস্থিত নমিতাই তাহার ভগ্ন হৃদয়ে অধিষ্ঠাত্রী হউক। লক্ষ লোকের মৃত আত্মার মাঝে তাহারও বিক্ষুব্ধ আত্মা এমনই সংসারী সাজিয়া পাতান শান্তি লইয়া অনন্ত কালের জন্য চিতা-শয্যার আয়োজন করুক।

দশমীর রাত্রিতে দূরাগত বিজয়ার করুণ বাদ্যধ্বনি তাহার চিন্তা-জগতের সূত্রজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে সহসা সচেতন করিয়া দিল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। ঘর হইতে বাহির হইবে, এমন সময় ধীরে ধীরে এক তরুণী আসিয়া তাহার পদপ্রান্তে মাথা রাখিল।

বিস্মিত নয়নের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া প্রণতা তরুণীর মূর্ত্তিখানি সে অনিমেষে দেখিতে লাগিল।

নমিতা!

কিন্তু এ কে? চির-বৈরতাকে সহসা মিত্রতার আলিঙ্গনে বাঁধিয়া সে কি ছলনার নব মোহে মুগ্ধ করিতে আসিয়াছে? তাহার অঙ্গে খদ্দরের সাড়ী!

দুই হাতে চক্ষু মুছিয়া ভাল করিয়া সে অপস্রিয়মাণ নমিতার মূর্ত্তির পানে চাহিয়া শুধুই অবাক্ হইল না, একটা পুলকবিমিশ্র স্বর তাহার কণ্ঠ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল, সে ডাকিল, "নমি!"

নমিতা ফিরিল।

শক্তি তাহার নিকটে আসিয়া আনন্দোজ্জ্বল কণ্ঠে কহিল, "তুমি খদ্দর পরেছ?"

নমিতা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "কেন, এ অধিকারটুকুও আমার নাই কি?"

শক্তি কহিল, "কিন্তু এক দিন—"

নমিতা বাধা দিয়া হাসি-মুখে শান্ত কণ্ঠে কহিল, "এর ঘোর বিদ্বেষী ছিলুম! এই ত? তা, সময়ে মত বদলানো কিছু বিচিত্র নয়! অন্তরটাকে আমি চিরদিনই শ্রদ্ধা ক'রে এসেছি;—ভাব, উচ্ছ্বাস এ সব চক্ষুঃশূল। তাই শান্ত অসহযোগের মাঝে, শান্ত অন্তরে শান্তির উপাসনা করেছিলুম।"

শক্তি আবেগে কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। তাহার মুখমণ্ডলে বিষাদ রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিল। সে ভগ্ন-কণ্ঠে কহিল, "কিন্তু নমিতা,—তোমার অনুমানই সত্য। এ আন্দোলন নিষ্ফল। প্রাণ এর মোটেই নেই, শুধুই উচ্ছ্বাস।"

নমিতা কি এ কথায় সুখী হইল? মৃদু কণ্ঠে সে বলিল, "মত বদলেছে?"

তাহার কণ্ঠস্বর এত শুষ্ক, এমন প্রাণহীন কেন?

শক্তি বলিল, "হাঁ। শুধু আমার নয়, চার দিকে চেয়ে দেখ, সবাই লক্ষ্মী ছেলের মত যে যার কাযে নেমে পড়েছে। সংসারে তারা পোষাকী স্বদেশভক্তির আড়ম্বরটুকু রেখে নামটাকে গৌরবের মালায় গাঁথতে চায়। বুঝেছি, [illegible] ভুয়ো। শুধু নাম—আর কিছু নয়।"

নমিতা তথাপি কোন কথা কহিল না।

শক্তি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তাই বলছি, [illegible] আন্দোলন মিছে। মনে করেছি, আবার কলেজে ঢুকবো।"

নমিতা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া যেন কি ভাবিল, [illegible] শান্ত দৃঢ়স্বরে কহিল, "না, তা হয় না। যে ব্রত একবার গ্রহণ করেছ, তার সাফল্য বা অসাফল্যের পানে চেয়ো না,

তোমার প্রাণ-মন দিয়ে তুমি তা সাধনা কর। স্বরাজ মানে আমি বুঝি—আত্মপ্রতিষ্ঠা। তাই আমাদের শত-বর্ষাধিক দাসত্বের মুক্তি এনে দেবে। এ বিশ্বাস আমার আছে।" তাহার উজ্জ্বল নয়নে প্রভাতের অরুণ-রাগ ফুটিয়া উঠিল।

সে বলিতে লাগিল, "উৎসাহের মুখে সবাই গা ঢেলে দেয়, কিন্তু অবসাদের মাঝে যে তার সাধনাকে ধীরে ধীরে উর্দ্ধগামী করে—তারই ব্রত সার্থক। অমৃতের পুত্র আমরা, কেন ভারত-মাকে সুখে দুঃখে ভালোবাসবো না? আমার দৃঢ় পণ—আরও বহু জন্ম যদি এমনই ব্যর্থতার মাঝে কেটে যায়, তবু যেন উদ্যম না হারাই, তবু যেন নিরাশার আশা বিমল মুক্তিই আমাদের লক্ষ্য হয়।"

কক্ষ নিস্তব্ধ। তাহার মাঝে নমিতার গাঢ় অশ্রু কম্পিত সশ্রদ্ধ কণ্ঠ অপূর্ব্ব সাধনার ভাষায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। উহাই যেন নিখিলের শাশ্বত বাণী—এই যেন মুক্তির মন্ত্র।

শক্তি সসম্ভ্রমে অগ্রসর হইয়া নমিতার সম্মুখে দাঁড়াইল। শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে তাহার সমগ্র অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে পুলকিত কণ্ঠে বলিল, "আমায়ও আজ মোহ থেকে মুক্তি দিলে, নমি। কি ভুলই বুঝেছিলুম! আমার এই অসহযোগ ব্রতের পাশটিতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তটি পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে, এমনি আশার বাণী শোনাবে ত, নমি!"

নমিতা কোন উত্তর দিল না। তরল অন্ধকারের ছায়া তাহার আরক্ত আননের মাধুর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। নত-মস্তকে সে কি তখন বিশ্বস্রষ্টার চরণে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছিল?

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়।

ভাবের অভিব্যক্তি

আতঙ্ক

বিভীষিকা

রোদন

বিরক্তি

তীক্ষ্ণদৃষ্টি

চক্রান্ত

[অভিনেতা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ
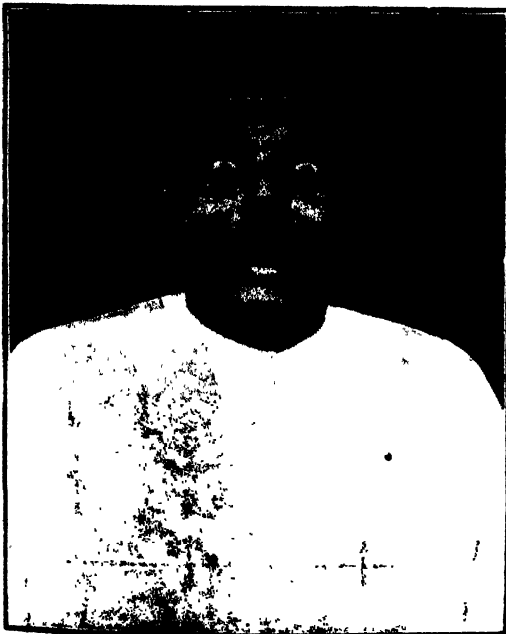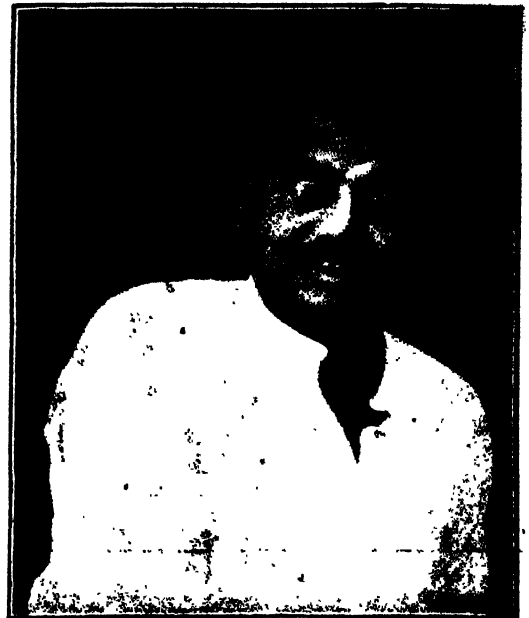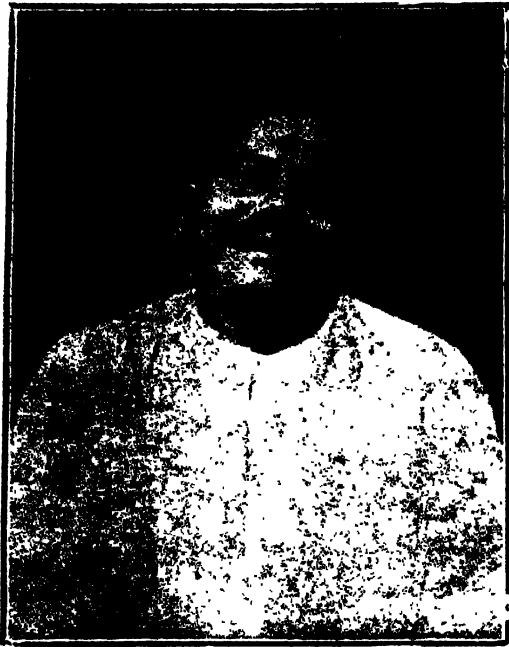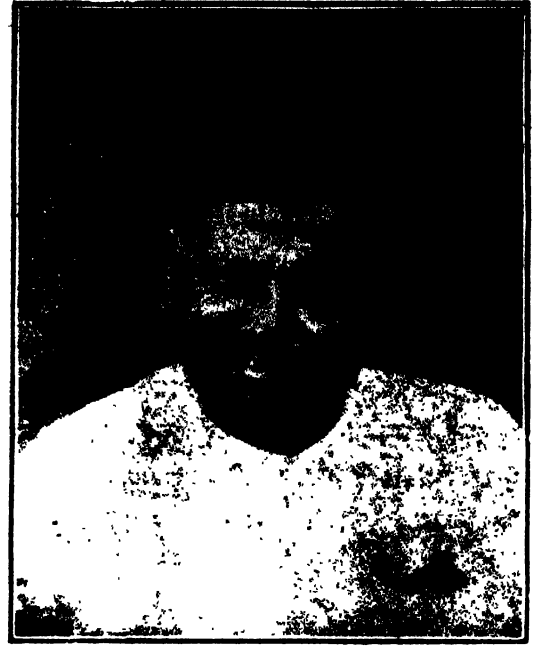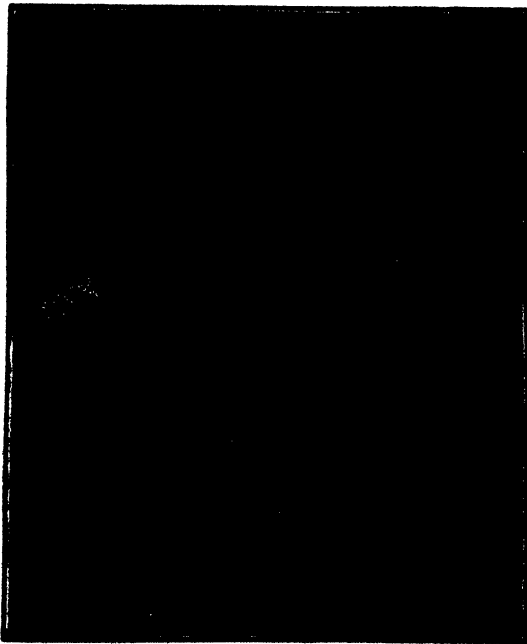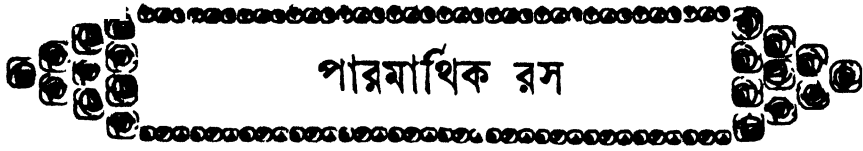
পারমার্থিক রস

লৌকিক রসের মূলীভূত বস্তুকে আলঙ্কারিকগণ ভাব শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শৃঙ্গার বা আদিরসের মূলীভূত ভাবকে বা স্থায়ী ভাবকে তাঁহারা রতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সেই রতি কাহাকে বলে, তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক্ষণে তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক হইয়াছে।

সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন, "রতির্মনোঽনুকূলেঽর্থে মনসঃ প্রবণায়িতম্॥" অর্থাৎ মন যাহাকে চাহে, তাহার প্রতি মনের যে আনুকূল্য, তাহারই নাম রতি। এই আনুকূল্য বা প্রবণীভাব কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। মনে মনে যে বস্তুকে আমি সুখের সাধনা বলিয়া বুঝি—যাহা আমার আয়ত্ত হইলে আমি বড়ই সুখী হইব বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেই বস্তুটি মনে পড়িবামাত্র আমার মন যখন অন্য সকল বস্তু ছাড়িয়া একান্তভাবে তন্ময়তা পায় এবং তাহার দিকে নিরন্তরভাবে ঝুঁকিয়া পড়ে,শুধু তাহাই নহে—তাহার প্রতি ঔদাসীন্যশূন্য হয়, বিদ্বেষ, ঘৃণা বা কঠোর ভাব হইতে বিমুক্ত হইয়া কোমলতার অনুভূতির সঙ্গে যেন তাহাতেই মিশিয়া যায়, প্রিয় বস্তুর প্রতি এইরূপ যে মানসিক অবস্থা, ইহাকেই আলঙ্কারিকগণ রতি বা আনুকূল্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই আনুকূল্য বা রতি দ্বিবিধ;—সংস্কাররূপা রতি এবং অনুভূতিরূপা রতি। অর্থাৎ মানব-হৃদয়ে জন্মজন্মান্তরের অনুভবের পরিণামস্বরূপ যে সংস্কার বা সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত রতি-বাসনা, তাহারই নাম সংস্কাররূপা রতি; আর বর্ত্তমান জন্মে কোন প্রিয়বস্তু দর্শনের পর তাহাকে অবলম্বন করিয়া সেই জন্মান্তরীণ সংস্কাররূপা রতির যে অনুভূতিরূপে পরিণতি,তাহারই নাম প্রীতি, ভালবাসা বা অনুভবরূপা রতি। এই উভয়বিধ রতির পরিচয় মহাকবি কালিদাসের একটি শ্লোকে বড়ই সুন্দরভাবে পরিস্ফুটিত হইয়াছে—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥"

(অভিজ্ঞান-শকুন্তল)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয়ের আনুকূল্য বশতঃ সময়বিশেষে আপনাকে যখন মনে করে, আমি বেশ সুখে আছি, বেশ স্বচ্ছন্দভাবে আরামে আমার দিন কাটিতেছে, সেই সময় হঠাৎ কোন প্রকার চিত্তাকর্ষক সুন্দর বস্তুকে দেখিয়া বা কোন মধুর ধ্বনি অকস্মাৎ শ্রবণ করিয়া সে যেন কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠে,যেন আত্মহারা হইয়া উঠে, যেন চিরবিস্মৃত একটি কোন প্রিয় বস্তুর অস্পষ্ট স্বপ্নময় অনুভূতির আকস্মিক উদয়ে তাহার অন্তরাত্মার অন্তস্তল পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠে, চিরবিস্মৃতের—চিরপ্রিয়ের আকস্মিক কল্পিত অনুভূতিতে হৃদয়ে নূতন ভাবের উন্মাদনা উদিত হয়, এই যে জন্মান্তরীণ ও ইদানীন্তন সংস্কার, ইহা হইতে সমুদ্ভূত যে কোমলতাময় অনুভূতি, ইহাই অলঙ্কার-শাস্ত্রে অনুরাগ বা রতি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রের আচার্য্যগণ কিন্তু এই রতিকে পরমার্থ-রস বা মধুর রসের স্থায়ীভাব বলিয়া অঙ্গীকার করেন না; তাঁহাদের মতে রতি বা অনুরাগ বা প্রেম প্রাপঞ্চিক মনোবৃত্তির বহির্ভূত বস্তু; কারণ, প্রাপঞ্চিক স্থায়ীভাব লৌকিক রসের উপাদান হইতে পারে, কিন্তু তাহা পারমার্থিক রসের স্থায়ী ভাব হইতে পারে না। কবিরাজ গোস্বামী—'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে' এই কথাই স্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন—

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে' শ্রীরূপ গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন—

"নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই—রতিনামে প্রসিদ্ধ যে স্থায়ী ভাব, তাহা নিত্যসিদ্ধ অর্থাৎ তাহার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি মনোদর্পণের মলিনতাব অপনীত হইলে সেই নিত্যসিদ্ধ রতিভাবের যে প্রকটতা বা প্রতিবিম্বের প্রতিফলন, তাহাই সাধ্য বা উৎপন্ন হয় বলিয়া রতিকেই সাধ্য বা উৎপাদ্য অথবা অনিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় এইমাত্র।

সেই নিত্যসিদ্ধ বা জন্মবিনাশরহিত রতির প্রাকট্য কখ...

কি, তাহাই বিশদভাবে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ আরও বলিয়াছেন—

"শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্ ।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥"
ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু ।

ইহার অক্ষরার্থ এইরূপ—

নিত্যোদিত প্রেম সূর্য্যসদৃশ, সূর্য্যের সহিত সূর্য্যরশ্মির যেরূপ সম্বন্ধ, প্রেমের সহিত রতির সম্বন্ধ ঠিক সেই প্রকার। সেই রতির প্রকৃত স্বরূপ হইতেছে, তাহা শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ—তাহার অভিব্যক্তি হইলে হৃদয় পরমার্থ সত্ত্বস্তর আস্বাদন-বিষয়ে অলৌকিক অভিলাষনিকরের আবির্ভাবে গলিয়া যায়, অননুভূতপূর্ব্ব কোমলতাসম্পন্ন হয়। ইহাই হইল রতিনামক স্থায়ী ভাবের যথার্থ স্বরূপ।

লৌকিক দৃশ্যকাব্যের অভিনয়দর্শনে বা সুকবি-প্রণীত সৎকাব্যের অনুশীলনে সহৃদয়গণের রসাস্বাদের উপাদানস্বরূপ যে রতির উদয় হইয়া থাকে, তাহার সহিত পারমার্থিক রসের উপাদানস্বরূপ এই রতির একরূপতা সম্ভবপর নহে; কারণ, নাটক দেখিয়া বা কাব্য পড়িয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া আমরা যে রতি বা অনুরাগের আস্বাদন করিয়া থাকি, তাহাতে আমাদের চিত্তে মসৃণভাব বা কোমলতা আসে না। যতক্ষণ নাটক দেখি বা কাব্যের অনুশীলন করি, সেই সময় বোধ হয়, আমাদের মন যেন গলিয়া গিয়াছে; রঙ্গশালার বা কাব্যানুশীলন-গৃহের বাহিরে যে কঠোর সংসার, তাহাকে লইয়া ব্যবহার করিতে হইলে আমাদের অন্তঃকরণে যে কঠোরতা—যে অহমিকা—যে পরিচ্ছিন্ন আত্মভাব বা সঙ্কীর্ণতা—যাহাকে ছাড়িলে আমার আমিত্বই ঘুচিয়া যায়, তাহা আমাদিগকে কিয়ৎকালের জন্য ছাড়িয়া সরিয়া যাইলেও, রসাস্বাদনের নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আবার আসিয়া তাহাই জগদ্দল পাথরের ন্যায় আমাকে চাপিয়া ধরে, কাব্যরসানুভূতি আনন্দময় হইলেও তাহা প্রাপঞ্চিক বিষয়ের অনুভব হইতে উৎপন্ন আনন্দের ন্যায় বিনশ্বর, ক্ষণস্থায়ী এবং পরিণতিবিরস, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, যেহেতু তাহার উপাদান নিত্যসিদ্ধ বস্তু নহে অর্থাৎ নিত্যোদিত প্রেমসূর্য্যের সতত ভাস্বর রশ্মিস্বরূপ পরমার্থ রতি নহে, এই কারণেই তাহা হইতে সমুদ্ভূত যে রস, তাহাও বৈষয়িক রসেরই ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও পরিণামবিরস। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

"ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্‌ক্ষয়াঃ ॥"

যাহাতে মনোরঞ্জন বিচিত্র পদসমূহ বিন্যস্ত হইয়া থাকে, কিন্তু কখনও ভুবনপাবন শ্রীহরির কীর্ত্তি বর্ণিত হয় না, এরূপ সাহিত্য কাকসেবিত তীর্থের সদৃশ। কারণ, মানসহংস সে তীর্থে বাস করে না, কারণ, অনাবিল পরমানন্দসেবী মানসহংসগণ সে তীর্থে যাহা প্রকৃত আনন্দ, তাহার সন্ধান পায় না বলিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইতে পারে না।

পারমার্থিক রসের উপাদানস্বরূপ এই রতি নিত্যোদিত ভগবৎপ্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণসদৃশ, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই প্রেম কি? তাহারই আলোচনা এইক্ষণে করা যাইতেছে।

চরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

"হ্লাদিনীর সার প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা হয় মহাভাব ॥"

চরিতামৃতকারের এই প্রেমলক্ষণ বুঝিতে হইলে হ্লাদিনী কাহাকে বলে এবং তাহার সারই বা কি, তাহা অগ্রে বুঝা আবশ্যক, এই কারণে প্রথমে হ্লাদিনীর পরিচয় সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণে শ্রীভগবান্‌কে বিষ্ণুনামে অভিহিত করা হইয়াছে। বিষ্ণু শব্দের যৌগিক অর্থ হইতেছে—যাহা সকল জগৎকে ব্যাপিয়া বিরাজমান থাকে, তাহাই বিষ্ণু অর্থাৎ যাহা কার্য্যে ও কারণে, সতে অসতে, ভাল মন্দে, সুন্দরে অসুন্দরে, অণুতে বিভুতে, সূক্ষ্মে ও স্থূলে, সকল বস্তুতেই অনুস্যূত আছে-সকল প্রকার বিকারের আশ্রয় বা অধিষ্ঠান হইয়াও যাহা নিজে সর্ব্বদা অবিকৃত এবং একরূপ শাশ্বত, তাহাই হইল বিষ্ণু। নিজে যাহা অবিকৃত, তাহাই আবার কি প্রকারে সকল বিকারের উপাদান বা অধিষ্ঠান হইয়া থাকে, এই প্রকার শঙ্কার নিরাকরণ করিতে যাইয়া ভগবান্ বেদব্যাস বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"নিগুর্ণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যতে ॥"
(বিষ্ণুপুরাণ—মৈত্রেয়-প্রশ্ন)।

যাহাতে কোন গুণ নাই, যাহা কোনপ্রকার প্রমার বিষয়ীভূত নহে, সর্ব্বপ্রকার দোষ হইতে যাহা বিনির্মুক্ত, সেই ব্রহ্ম কি প্রকারে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন?

এই প্রশ্নের উত্তর মহর্ষি পরাশর এইরূপ দিয়াছিলেন—

"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ॥
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা।"

এ সংসারে যতপ্রকার বস্তু কারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কার্য্য করিতে শক্তি ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের সেই শক্তি হইতে তাহারা ভিন্ন কি অভিন্ন অথবা সেই শক্তির সহিত তাহাদের সম্বন্ধই বা কিরূপ? তাহা চিন্তা করিয়া কেহই বুঝিতে পারে না বা বিচার করিয়া অপরকে বুঝাইতেও পারে না। অথচ তাহাদের সেই শক্তির অস্তিত্ব-বিষয়ে আমাদের কাহারও অসম্মতি নাই অর্থাৎ তাহাদের সেই শক্তির অস্তিত্ব আমরা সকলেই অঙ্গীকার করিয়া থাকি, ব্রহ্ম হইতেই সমুদ্ভূত এই সকল প্রাপঞ্চিক বস্তুনিবহে যখন এইরূপ চিন্তার অবিষয় শক্তি আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি, তখন সেই সকল প্রকার অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন বস্তুনিচয় যাহা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে, সেই সর্ব্বকারণ-কারণ পরব্রহ্মে যে সকল জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অনুকূল অনন্ত শক্তি বিদ্যমান আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং তিনি স্বয়ং নির্ব্বিকার হইলেও অসংখ্যাত বিকারের অনুকূল শক্তিনিচয় তাঁহাতে বিদ্যমান আছে, অথচ ঐ সকল শক্তি তাঁহা হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন, তাহা চিন্তা বা বিচার দ্বারা নির্ণীত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই; এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত অগ্নি হইয়া থাকে, অর্থাৎ অগ্নি দাহ, পাক ও তাপ প্রভৃতি কার্য্যের কারণ, সুতরাং তাহাতে দাহিকা, পাচিকা ও তাপিকা শক্তি বিদ্যমান আছে, ইহা স্থির। সেই দাহিকা, পাচিকা ও তাপিকা শক্তি পরস্পর বিভিন্ন হইলেও দাহ, পাক ও তাপরূপ কার্য্য যখন না থাকে, তখন ঐ শক্তিত্রয় অগ্নি হইতে পৃথক্ বলিয়া কাহারও প্রতীতিগোচর হয় না, অথচ যখন পাকাদি কার্য্য দৃষ্ট হয়, তখন এই শক্তিত্রয়কে আমরা পৃথক্ বলিয়া বিবেচনা করি এবং সেইরূপ নির্দ্দেশও করিয়া থাকি। প্রকৃত স্থলে ব্রহ্মকেও সেই অনন্ত বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে, অথচ ঐ সকল শক্তি তাঁহা হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন, তাহা তর্কের দ্বারা ব্যবস্থাপিত হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। শ্রুতিই এইরূপ ব্রহ্মশক্তির সাধক, প্রমাণ। কারণ, শ্রুতি বলিতেছে—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাপ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥"

তাঁহার কোন কার্য্য নাই, কোন কার্য্য-নিষ্পাদনের অনুকূল সাধনও নাই—এ সংসারে তাঁহার সদৃশ কোন পদার্থই নাই—তাঁহা অপেক্ষা অধিক বা বৃহৎ কোন বস্তুই নাই, অথচ সকল কার্য্যের অনুকূল অসংখ্য পরম শক্তিসমূহ তাঁহার আছে—ইহা শ্রুত হইয়া থাকে। তাঁহার শক্তি, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার বল ও ক্রিয়া তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

সংসারে যে সকল ধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ, সেই সর্ব্বাত্মভূত পরমাত্মা বিষ্ণুতে কিন্তু সেই সকল বিরুদ্ধ ধর্ম্মই পরস্পর বিরোধ পরিহারপূর্ব্বক একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া অবস্থান করে, ইহাই হইল সেই বিষ্ণুর অচিন্ত্য স্বভাব। তাই শ্রুতি বলিতেছে—

"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥"

যাহা কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর বর্ত্তমান বস্তু, যাহা কিছু অতীত এবং যাহা কিছু ভবিষ্যৎ, তাহা সকলই এই পুরুষ। তিনি অমৃতত্বের ঈশ্বর অথচ যাহা অন্নের দ্বারা পুষ্টিলাভ করে, তাহাও তিনি।

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোঁকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥"

সেই পুরুষের কর ও চরণ সকল দিকেই ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তাঁহার নয়ন, মুখ ও মস্তক সকল দিকেই রহিয়াছে, তাঁহার কর্ণ সকল দিকেই আছে, তিনি সকল বস্তুকেই আবৃত করিয়া রহিয়াছেন।

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বিশ্বং ন হি তস্য বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥"

তাঁহার হাতও নাই, পাও নাই, অথচ তিনি বেগে ধাবনও করেন, হাতে ধারণও করেন; তাঁহার চক্ষু নাই, অথচ তিনি দেখিয়া থাকেন; তাঁহার কাণ নাই, অথচ তিনি শুনিয়াও থাকেন; এই বিশ্ব-সংসারের সবই তিনি দেখিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহই দেখিতে পায় না, এইরূপ বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন যে মহান্ পুরুষ, তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ এবং সকল বস্তুর আদিভূত।

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥"

তিনি পরমাণু হইতেও অণুতর, অথচ তিনি মহৎ আকাশাদি হইতেও মহত্তর, এই জীবনিবহের তিনিই আত্মা, অথচ তিনি সঙ্কীর্ণ গুহার মধ্যে নিহিত, যে আত্মভোগ-লালসা-পূরণের অনুকূল সকল কর্ম্মই পরিত্যাগ করিয়াছে, সে-ই তাঁহাকে দেখিতে পায় এবং তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই জীবের সকলপ্রকার শোক নিবৃত্ত হয়, তখন বিধাতার অনুগ্রহে সে দেখিয়া থাকে যে, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই ভূমা।

এইরূপ অসংখ্য শ্রুতি বিদ্যমান আছে, যাহার দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে যে, সেই বিষ্ণু বা সর্ব্বব্যাপী প্রকাশশীল দেব, সকল প্রকার বিরোধের একমাত্র সমন্বয়ক্ষেত্র, সুতরাং আশ্চর্য্য স্বরূপ ও অচিন্ত্য-শক্তি-নিচয়ের একমাত্র আধার, লৌকিক প্রমাণের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ বুঝিবার কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও যাহার প্রতি তাঁহার অহৈতুকী করুণার অভিব্যক্তি হয়, সে-ই তাঁহাকে দেখিতে পায় ও কৃতার্থ হইয়া থাকে।

এই প্রকারে সর্ব্বাত্মভূত সেই বিষ্ণুর স্বরূপ প্রতিপাদন পূর্ব্বক আরও বিশদভাবে সেই বিষ্ণুতত্ত্বকে বুঝাইবার জন্য বিষ্ণুপুরাণ তাঁহার অচিন্ত্য ও বিচিত্র শক্তি সম্বন্ধে কি বলিতেছে, এইবার তাহার অবতারণা করিয়া সেই শক্তি-নিচয়ের মধ্যে পরমা শক্তি যে হ্লাদিনী, তাহার আলোচনা করিব; কারণ, এই হ্লাদিনী শক্তির জ্ঞান ব্যতিরেকে পরমার্থ-রসের উপাদানস্বরূপ যে রতি বা ভগবৎপ্রেম, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

উদ্যান-উৎসব

পরলোকগত স্বনামধন্য বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বিরাট কার্য্যালয়ের বর্ত্তমান কার্য্যাধ্যক্ষ সার হরিশঙ্কর পাল মহাশয়ের নাইট উপাধি-লাভ উপলক্ষে তাঁহার কর্ম্মচারিবৃন্দ তাঁহার দমদমা-স্থিত উদ্যানে উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে কর্ম্ম-কর্ত্তাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর ব্যবসায়-বুদ্ধির অল্পতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনেকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা ও তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র পরলোকগত ভূতনাথ পাল মহাশয় তাঁহাদের জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালীর কর্ম্মশক্তি ও প্রতিভা ব্যবসাবাণিজ্য-ক্ষেত্রে কাহারও নিকট হীনতা স্বীকার করে না। তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সার হরিশঙ্কর এই প্রতিষ্ঠান-টিকে উত্তরোত্তর প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতেছেন। বাঙ্গালার ব্যবসায়ক্ষেত্রে এরূপ উন্নতিসাধন নিশ্চিতই প্রশংসার্হ। সরকার তাঁহাকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মতে সরকারের প্রদত্ত এই সম্মান অপেক্ষা বিরাট প্রতিষ্ঠানের অগণিত কর্ম্মচারীর আন্তরিক শ্রদ্ধা-প্রীতির এই সম্মানপ্রদর্শন বহুগুণে বাঞ্ছনীয়। সার হরিশঙ্কর এই সম্মান লাভ করিয়া নিজেই আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছেন। উৎসবে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট জনগণ কর্ম্মচারিবৃন্দের আদর-আপ্যায়নে এবং নানারূপ আ[illegible]নে পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর এই সম্মানে বাঙ্গালার ব্যবসা-ক্ষেত্র উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াছে, ইহা অকুণ্ঠ-চিত্তে স্বীকার করা যায়। সার হরিশঙ্কর এই সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাইতে সমর্থ হউন, ইহাই কামনা।

সার হরিশঙ্কর পাল

রহস্যের খাসমহল

দ্বাদশ প্রবাহ

মুখোমুখী

দ্বার খুলিবার মুহূর্ত্ত পরেই তাহা রুদ্ধ হইল। কুপ হল-ঘরে প্রবেশ করিয়া ওভারকোট খুলিয়া রাখিল; তাহার পর আমি যে দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেই দ্বারের সম্মুখে পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। কুপ সেই দ্বার খুলিতেই আমার সম্মুখে পড়িল। সে আমাকে দেখিবামাত্র চমকিয়া দাঁড়াইল, এবং আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার মুখ হইতে বিস্ময়সূচক অস্ফুট ধ্বনি নির্গত হইল। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, সে আমাকে সেখানে দেখিবার প্রত্যাশা করে নাই।

আমাকে দেখিয়া তাহার মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গেল, তাহার পর তাহা অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিল; কিন্তু আমি তাহাতে ভীত না হইয়া বলিলাম, "মিঃ কুপার, তুমি আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছ, কেমন, এ কথা সত্য কি না?"

বাড়ীওয়ালী বুঝিয়াছিল—আমাদের সাক্ষাতের ফল প্রীতিকর হইবে না। এ জন্য সে আমাদের সম্মুখে না আসিয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িল, সুতরাং আমরা দুই জন ব্যতীত সেই কক্ষে আর কেহই রহিল না। আমি তাড়া-তাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া রুদ্ধ দ্বারে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, মনে মনে বলিলাম—"আর তুমি পলাইতে পারিতেছ না।"

কুপ মুহূর্ত্তমধ্যে বিস্ময় দমন করিয়া সামলাইয়া লইল, তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "দুঃখের বিষয়, আপনার কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না। আপনাকে দেখিয়া আমার বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে, মহাশয়? আমি কি আপনাকে চিনি?"

তাহার নির্লজ্জ মিথ্যাকথা শুনিয়া আমি রাগ করিব কি, হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলাম; আমার মনে একটু বিস্ময়েরও সঞ্চার হইল। মানুষ এত দূর বেহায়া হইতে পারে?

আমি বলিলাম, "এখন কি ছলনা দ্বারা আমাকে প্রতারিত করিবার আশা করিয়াছ, বৃদ্ধ? তুমি আমাকে চেন না—এই কথা বলিতে চাও? কিন্তু আমি তোমাকে সহজে ছাড়িব না; তুমি ও তোমার আরব ভৃত্য তোমার বেজওয়াটারের বাড়ীতে আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে; আমি কোন দিন তোমার কোন ক্ষতি করি নাই, তথাপি আমার প্রতি সেইরূপ পৈশাচিক আচরণ কেন করিয়াছিলে, আমি তাহা জানিতে চাই। ইহার কি কৈফিয়ৎ আছে, বল।"

কুপ অবিচলিত স্বরে বলিল, "মহাশয়, আপনার মাথায় কি কিছু গোল আছে? নতুবা এ রকম অসঙ্গত কথা কেন বলিবেন? বেজওয়াটারে আমার বাড়ী কোথায়? আমি ত এই বাড়ীতেই বাস করি।"

কুপের ন্যাকামী দেখিয়া আমার বড় রাগ হইল; আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "শোন, তুমি চালাকী করিয়া আর আমার চোখে ধুলা দিতে পারিতেছ না; আমি তোমার অনেক গুপ্ত কথাই জানিতে পারিয়াছি। আইভি ক্রসে-টের পরিণাম কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে, তাহাও আমার অজ্ঞাত নহে। তুমি আমাকে যেরূপ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা

করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে, তাহাকেও সেই ভাবে হত্যা করিয়াছ।"

কুপ গভীর বিস্ময়ের অভিনয় করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "বাঃ, তুমি পাগল না কি? কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত উন্মাদ! কে তুমি?"

আমি সক্রোধে বলিলাম, "আমি সিড্‌নে কোলফাক্স, তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই, এইরূপ ভান করিতেছ; কিন্তু তোমার চালাকী খাটিবে না। আমি এখন কি করিব, তাহা কি বুঝিতে পার নাই? আমি তোমাকে পুলিসের হস্তে অর্পণ করিব, নরহত্যার অপরাধে তুমি অভিযুক্ত হইবে।"

আমার কথা শুনিয়া কুপ তৎক্ষণাৎ একখানি আরাম-কেদারায় বসিয়া পড়িয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, যেন সে এমন হাসির কথা জীবনে আর কখন শুনে নাই!

আমি গম্ভীরস্বরে বলিলাম, "এ হাসির কথা নয়। পুলিস তোমার অপরাধের কথা জানিতে পারায় তোমার ও তোমার পৈশাচিক কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছে। তুমি সুকৌশলে দুই জনকে তোমার নির্জ্জন গৃহে আবদ্ধ করিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিয়াছ, ইহার কোন কোন প্রমাণ পুলিসের হস্তগত হইয়াছে। রাত্রিকালে বালিকা বেসি মনক্রিফকে পথে পাঠাইয়া তাহার সাহায্যে তোমার শিকার সংগ্রহ করিবার সুযোগ নষ্ট হইয়াছে, আর তোমার সে কৌশল খাটিবে না। পুলিস তোমার সম্বন্ধে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে।"

কুপ স্পর্দ্ধাভরে বলিল, "পুলিস! তুমি কি মনে কর, পুলিসকে আমি ভয় করি? তোমার মত পাগল আমার বিরুদ্ধে পুলিসের নিকট কোন কথা প্রকাশ করিলে তাহারা সেই কথা বিশ্বাস করিয়া আমাকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবে? না, এ দেশের পুলিস ততদূর নির্ব্বোধ নহে। তাহারা তোমার মত পাগলও নহে।"

আমি বলিলাম, "তুমি কি আমার কথা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাও?"

কুপ সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তোমাকে আমি তৃণতুল্য নগণ্য মনে করি। তুমি কে, তাহা জানি না, জীবনে আর কখন তোমাকে দেখি নাই, আর তুমি আজ হঠাৎ এখানে আসিয়া অকারণ আমাকে নরহন্তা বলিয়া সম্বোধন করিতেছ, নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করিবার ভয় দেখাইতেছ! তুমি আরও কি বলিবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়াছি।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু তুমি জান, তোমার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ মিথ্যা নহে। তুমি আমাকে তোমার দোতলার ঘরে চালাকী করিয়া লইয়া গিয়া আবদ্ধ করিয়া ছিলে, তাহা কি তোমার স্মরণ নাই? সেই কক্ষের দেওয়ালে যে সকল চিত্র দেখিয়াছিলাম, তাহা তোমারই অঙ্কিত; নর-নারীগণকে মৃত্যুযন্ত্রণা দিয়া তাহাদের অন্তিম দৃশ্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলে।"

কুপ বলিল, "তুমি এ সকল কি প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিলে? আমি তোমার মত পাগলের কথা শুনিতে চাহি না; তুমি এখন তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়, আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে, খাবারও ঠাণ্ডা হইতেছে; আমি এখন খাইতে যাইব। যদি তুমি পুলিস ডাকিতে চাও, তাহাতে আমার আপত্তি নাই, তাহারা এখানে আসিলে আমি তোমাকে বদ্ধ পাগল বলিয়া তাহাদের হাতে সঁপিয়া দিব।"

বৃদ্ধের ধৃষ্টতায় আমার ক্রোধ সংবরণ করা কঠিন হইল, আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম, "তুমি অজ্ঞতার ভান করিয়া আমার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না, আমি তোমার অপরাধের বিচারের জন্য তোমাকে বিচারালয়ে পাঠাইব। তাহার পর তোমার যাহা বলিবার থাকে, বলিও।"

সেই কক্ষের এক কোণে একটি ছোট টেবল ছিল; সেই টেবলের পাশে টেলিফোনের কল ছিল, তাহা আমি পূর্ব্বে দেখিতে পাই নাই; আমি সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই কুপ তাড়াতাড়ি সরিয়া গিয়া তাহা আড়াল করিয়া দাঁড়াইল। আমার তখন মনে হইল, যদি তাহাকে সরাইয়া দিয়া টেলিফোনে অদূরবর্ত্তী থানায় সংবাদ দিতে পারিতাম, তাহা হইলে সেই সংবাদ পাইয়া থানা হইতে কোন কনষ্টেবল শীঘ্রই সেখানে উপস্থিত হইত; কনষ্টেবলের প্রতীক্ষায় কুপকে সেই কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতাম।

কিন্তু সুচতুর বৃদ্ধ বদমায়েসটা আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সেই স্থানে এভাবে দাঁড়াইয়া রহিল যে, তাহাকে

সরাইয়া দিয়া টেলিফোন স্পর্শ করিবার সুযোগ পাইলাম না।

কুপ আমার মুখের দিকে চাহিয়া তীব্রস্বরে বলিল, "আমার ঘরে এই ভাবে অনধিকারপ্রবেশের কারণ কি, তাহাই আগে জানিতে চাই।"

আমি বলিলাম, "তুমি যে কায করিয়াছ, তোমাকে তাহার উপযুক্ত পুরস্কার দিতে আসিয়াছি। তুমি আর তোমার আরব গুণ্ডাটা—তোমরা দুজনেই বিশ্বাস করিয়াছিলে, আমাকে হত্যা করিয়াছ; কিন্তু এখন তুমি দেখিতে পাইতেছ, আমি মরি নাই, আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তোমাদের দুষ্কর্ম্মের সজীব সাক্ষিস্বরূপ আমি সমাধি-গহ্বর ভেদ করিয়া উঠিয়াছি।"

আমার কথা শুনিয়া কুপ কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না; তাহার নির্ব্বিকার ভাব দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সেই নরপিশাচ মৃদু হাসিয়া বলিল, "তুমি ত খাসা মজার কথা বলিতেছ! কিন্তু কথাগুলি যতই আমোদজনক হউক, তোমার ঐ হেঁয়ালির ভাষা বুঝিয়া উঠা আমার অসাধ্য। যে সকল ভয়ঙ্কর অপরাধ তুমি আমার ঘাড়ে চাপাইতেছ, সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নাই। তোমার কি বলিবার আছে বল, আশা করি, তোমার কাহিনী বিলক্ষণ কৌতূহলোদ্দীপক হইবে।"

আমি তাহার ভোজন-টেবল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, টেবলটি নানা জাতীয় প্রস্ফুটিত পুষ্পে সজ্জিত ছিল। আমি সেই স্থানেই সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, তোমাকে ফৌজদারী আদালতে আসামীর কাঠরায় তুলিয়া যখন তোমার কীর্ত্তিকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিব, তখন তাহা শুনিয়া সকলেই বিলক্ষণ কৌতূহল বোধ করিবে।"

কুপ দুই হাত পশ্চাতে রাখিয়া অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলিল, "আঃ, তুমি যে আমাকে জ্বালাতন করিয়া মারিলে! আমাকে এখন নিশ্চিন্তমনে খাইতে দিবে কি? আমি বহু দূর হইতে আসিয়াছি, ক্ষুধায় আমার পেট জ্বলিতেছে; তোমার ঐ সকল অসার বাচালতা শুনিব—আমার সেরূপ অবসর নাই।"

আমি বলিলাম, "আমি কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছি, তাহা ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কিন্তু তুমি আমার সকল কথা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাও; আমি—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তাহাকে একটু অসতর্ক দেখিয়া তাহার পাশ দিয়া টেলিফোনের কলের কাছে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলাম; কুপ আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া এক লম্ফে সরিয়া গিয়া আমার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং উত্তেজিত স্বরে বলিল, "না, ঐ কাযটি করিতে পাইবে না, আমার ঘরে আসিয়া আমারই বুকে বসিয়া দাড়ি ছিঁড়িবে—এ আবদার ত্যাগ কর। এখানে তোমার পাগলামী খাটিবে না।"

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম, "কিন্তু আমি এ কায করিবই। তুমি মনে করিয়াছ, তুমি এতই চালাক যে, যে বাড়ীতে আবদ্ধ করিয়া আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে, নানা কৌশলে সেই বাড়ীর অস্তিত্ব আমাকে জানিতে দিবে না; কিন্তু তোমার সকল কৌশলে নিষ্ফল হইয়াছে, আমি সেই বাড়ী আবিষ্কার করিতে না পারিলেও তোমার গুপ্ত আড্ডার সন্ধান পাইয়াছি; আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা এখন করিব।"

কুপ আরক্ত-নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, "দেখিতেছি, তুমি সত্যই ক্ষেপিয়া গিয়াছ; তুমি কোন্ বাড়ীর কথা বলিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

আমি বলিলাম, "জানিয়া শুনিয়া ন্যাকা সাজিতেছ, আবার আমাকে পাগল বলিয়া আমার কথা উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছ! এ ধৃষ্টতা তোমার মত শয়তানেরই শোভা পায়। যে বাড়ীতে তুমি নিরপরাধ নর-নারীগণকে কৌশলে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিতে বা হত্যা করিবার চেষ্টা করিতে এবং সেই অবস্থায় তাহাদের যন্ত্রণা-বিকৃত মুখচ্ছবি তুলি ও রঙ্গের সাহায্যে ক্যাম্বিসের উপর আঁকিয়া ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখিতে, সেই বাড়ীর কথা বলিতেছি। তোমার পৈশাচিক উৎপীড়নে যে বাড়ীতে আইভি ফসেটের প্রাণ গিয়াছে এবং তাহার মত আরও অনেকে শোচনীয়ভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং আমাকেও যেখানে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, আমি সেই বাড়ীর কথাই বলিতেছি।"

নিহতা আইভি ফসেটের নাম শুনিবামাত্র কুপ হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে সে প্রকৃতিস্থ হইয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল। বুঝিলাম, লোকটার

স্নায়ু লৌহবৎ সুদৃঢ়, তাহার সহ্য করিবার শক্তি অসাধারণ। সে স্বাভাবিক স্বরে বলিল, "তুমি অসম্ভব কথা বলিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়াছ। আমি চিত্রকর নহি, কোন দিন ও বিদ্যা শিক্ষা করি নাই, এখন মনে হইতেছে, অন্য লোকের পরিবর্ত্তে তুমি ভুল করিয়া অপরের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপাইতেছ। দাঁত মাজিবার বুরুষ ভিন্ন অন্য কোন বুরুষ আমি জীবনে কখন স্পর্শ করি নাই।"

আমি বলিলাম, "তোমার নাম কুপার, তোমার কন্যার নাম যোয়ান, ইহা কি তুমি অস্বীকার করিতে পার ?"

কুপ বলিল, "না, আমি ইহা অস্বীকার করি না, অস্বীকার করিবারও কোন কারণ নাই।"

আমি অধীরভাবে বলিলাম, "এবং অস্বীকার করিয়াও কোন লাভ নাই। তোমার কন্যা যোয়ানের সংবাদ কি ? সে কোথায় ?"

কুপ বলিল, "আমি তাহা জানি না; আমার কন্যার সহিত এখন আমার সদ্ভাব নাই।"

আমি শ্লেষের সহিত বলিলাম, "ও কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম না। তুমি অধিকাংশ কথাই অস্বীকার করিতেছ, অজ্ঞতার ভান করিতেছ; কিন্তু স্মরণ রাখিও, তোমার সম্বন্ধে আমি যে সকল কথা জানিতে পারিয়াছি, তোমাকে নরহন্তা বলিয়া আসামীর কাঠরায় পুরিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।"

আমার এই কঠোর উক্তিতেও কুপের মুখভাবের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না; সে প্রশান্তভাবে হাসিয়া বলিল, "তোমার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে, যোয়ান আমার বিরুদ্ধে তোমাকে কতকগুলা নির্জ্জলা মিথ্যা কথা বলিয়াছে। সে চারিদিকেই আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক রটাইতেছে, এ সংবাদ আমার অজ্ঞাত নহে।"

আমি বলিলাম, "আর তোমার বিশ্বাসী অনুচর ইব্রাহিমের সংবাদ কি ? সেই ত যোয়ানকে মাদকমিশ্রিত কাফি পান করিতে বাধ্য করিয়াছিল। যত অপরাধ যোয়ানের, আর তোমরা সাধু, অপাপবিদ্ধ পুরুষ !"

কথাগুলি হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াই ভাবিলাম—এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া ভাল করিলাম কি ? আমি হেক্কাওয়ার্দ্দিতে গিয়াছিলাম, এ সংবাদ সম্ভবতঃ তাহার অজ্ঞাত নহে এবং তাহার আরব ভৃত্য ইব্রাহিম নিহত হইয়াছে, ইহাও সে জানিতে পারিয়াছে, এ অবস্থায় সে আমাকে হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করে নাই ত ?

কিন্তু সে আমার কথা শুনিয়া কোন কথা বলিল না, স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া আমার জিদ বাড়িয়া গেল, আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "কথা কহিতেছ না যে ? ইব্রাহিম তোমার ভৃত্য, ইহা কি অস্বীকার করিবে ? যদি অস্বীকার কর, তাহা হইলে বাড়ীওয়ালীকে ডাকিয়া তোমার সম্মুখে তাহাকে সেই আরবটার সম্বন্ধে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

আমার কথা শুনিয়া সে তাহার আরব ভৃত্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে সাহস করিল না। কিন্তু ইব্রাহিম জীবিত আছে কি নিহত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিল না। কুপ ইব্রাহিমের মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারিয়াছে কি না, তাহা তাহার নিকট শুনিবার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ হইল; কিন্তু সে আরবটার প্রসঙ্গে আর কোন কথা বলিল না। আমি তাহার পর তাহাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই সকল প্রশ্নের এ রকম ঘোরাল উত্তর দিতে লাগিল যে, তাহার উত্তর শুনিয়া আমাকে স্তম্ভিত হইতে হইল। তাহার চক্ষুর দিকে চাহিয়া আমার ধারণা হইল, সাধ্য হইলে সেই মুহূর্ত্তেই সে আমাকে হত্যা করিত; মনে হইল, তাহার মাথায় খুন চাপিয়াছে! কিন্তু আমিও তাহার আক্রমণে আত্মরক্ষার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম; ব্রাউনিং পিস্তলটা আমার বুকের পকেটেই ছিল এবং তাহার ঘোড়ার উপর আমার আঙ্গুল ছিল। আমি স্থির করিলাম, সে যদি আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে পিস্তলটা বাহির না করিয়া পকেটের ভিতর হইতেই তাহার বক্ষঃস্থলে গুলী চালাইব।

বস্তুতঃ তখন আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়াছিলাম, আমার ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছিল; আমি তাহাকে যে সকল কথা বলিয়া তিরস্কার করিলাম, তাহা বিবেচনাসঙ্গত হয় নাই; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমার কথাগুলি শুনিয়াও সে স্থির, ধীর, নির্ব্বিকারভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। যেন সে আমার কোন কথা গ্রাহ্য করিল না, বোধ হয়, আমাকে অবজ্ঞার পাত্র মনে করিয়া উপেক্ষা করিল; কিন্তু এক

বিষয়ে সে সতর্ক রহিল, আমাকে মুহূর্ত্তের জন্যও টেলিফোন স্পর্শ করিতে দিল না।

যদি আমি পিস্তল উদ্যত করিয়া তাহাকে ভয় দেখাইয়া সরিয়া যাইতে বাধ্য করিতাম, তাহা হইলে আমি বোধ হয় টেলিফোন ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইতাম, কিন্তু সে সেই অবসরে সেই কক্ষ হইতে অন্তর্দ্ধান করিত। আমাকে মুহূর্ত্তের জন্য অসতর্ক দেখিলেই সে সেই কক্ষ হইতে পলায়ন করিবে বুঝিয়া আমি রুদ্ধ দ্বারে পিঠ দিয়া পিস্তলটা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম; সে টেলিফোন আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া কোণ-ঠেসা বাঘের মত কটমট করিয়া আমার দিকে চাহিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "তোমার বিশ্বাস, তোমাকে কোন দিন ধরা পড়িতে হইবে না। কিন্তু তুমি পথের লোক ধরিয়া ফাঁদে ফেলিবার জন্য বালিকা জেসিকে অসহায়ভাবে পথে পাঠাইবার যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলে, তাহা পুলিস জানিতে পারিয়াছে। তাহারা তোমার অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছে। আমি তোমাকে তাহাদের হস্তে অর্পণ করিবামাত্র তাহারা পরম সমাদরে তোমার অভ্যর্থনা করিবে—আমার এ কথা তুমি বিশ্বাস করিতে পার।"

কুপ আমার কথা শুনিয়া অধীরভাবে বলিল, "কেন বেশী কথা খরচ করিতেছ? থাম। আমি এখানে দাঁড়াইয়া তোমার বাজে কথা শুনিতে চাহি না, এখন সরিয়া পড়।"

আমি বলিলাম, "আর কোন নূতন ফিকির খাটাইবার মতলব করিয়াছ না কি? কিছুকাল পূর্ব্বে তুমি আমাকে পাগল বলিয়াছিলে, আমাকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলে।"

কুপ বলিল, "হ্যাঁ, এখনও আমি তোমাকে অগ্রাহ্য করিতেছি; তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি পুলিস ডাকিতে পার।"

আমি বলিলাম, "বেশ কথা বলিলে। আমি পুলিস লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিব, তুমি চম্পট দিয়াছ! আমি কি তোমার মতলব বুঝিতে পারি নাই? আমি এখান হইতে নড়িতেছি না।"

কুপ বলিল, "তুমি যে সকল অসংলগ্ন বাজে কথা বলিলে, তাহা সমস্তই যোয়ানের কাছে শুনিয়াছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। সে বলিয়াছিল, চতুর্দ্দিকে আমার কলঙ্ক প্রচার করিয়া বেড়াইবে। তাহার—"

আমি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম, "তোমার কলঙ্ক প্রচার ত সামান্য কথা, পুলিস জানিতে পারিয়াছে, নরহত্যাই তোমার পেশা।"

কুপ বলিল, "বোধ হয়, তোমারই অনুগ্রহে। তুমি তাহাদের নিকট আমার কুৎসা প্রচারের জন্য কতকগুলা অসম্ভব গল্প বলিয়া আসিয়াছ, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা প্রচারের প্রয়োজন হয় নাই; তোমার অপরাধ সম্বন্ধে যে সকল সত্য কথা জানি, আমি যে শোচনীয় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাই কি যথেষ্ট নহে? তুমি কার্ল কুপ, আমার প্রতি তোমার ক্রোধ ও বিদ্বেষের কোন কারণ না থাকিলেও কৌশলক্রমে আমাকে তোমার বাড়ীতে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া দোতলার একটা কুঠুরীতে আটক করিয়া রাখিয়াছিলে, আমার দেহে বিষ প্রয়োগ করাইয়া অসহ্য যন্ত্রণা দিয়া আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে, আর তুমি ছবির পাশে দাঁড়াইয়া নির্ব্বিকারভাবে আমার যন্ত্রণা দেখিতেছিলে! তুমি এরূপ কৌশলে সেই বিষ লুকাইয়া রাখিয়াছিলে যে, আমি অজ্ঞাতসারে স্বয়ং তাহা দেহে প্রবেশ করাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। মানুষ কি তোমার অপেক্ষা অধিকতর নিষ্ঠুর বা খল হইতে পারে? এরূপ পৈশাচিকতা কি অন্য কাহারও কল্পনাতে স্থান পায়?"

কুপ আমার কথা শুনিয়া প্রশান্তভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িল, এবং ধীরে ধীরে বলিল, "দুঃস্বপ্ন! তুমি কবে কখন্ উৎকট দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছ, আর তাহাই সত্য মনে করিয়া সে জন্য আমাকে দায়ী করিতেছ।"

হঠাৎ যোয়ানের কথা আমার মনে পড়িল। যোয়ান আমাকে সতর্ক করিবার জন্য বলিয়াছিল, যদি আমি তাহার পিতার গুপ্ত রহস্য ভেদের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করি, তাহা হইলে সে পুনর্ব্বার আমাকে নূতন ফাঁদে ফেলিয়া আমার জীবন বিপন্ন করিতে পারে। আমি কুপের অনুসন্ধানে বিরত হই, এ জন্য কেন সে আমাকে পুনঃ পুনঃ আগ্রহভরে অনুরোধ করিয়াছিল?

কিন্তু সেই চিন্তা ত্যাগ করিয়া আমি কুপকে বলিলাম, "না, দুঃস্বপ্ন নহে, আমি তোমার উৎপীড়নে যে মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। তুমি ও ইব্রাহিম উভয়েই মনে করিয়াছিলে—আমি মরিয়া গিয়াছি! আমার দেহ

পরীক্ষা করিয়া তোমাদের ঐরূপ ধারণা হইয়া থাকিবে; কারণ, যে বিষ আমার দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার ফলে মৃত্যুর সকল লক্ষণই প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বে তোমার আর এক শিকারের মৃতদেহ আমি আবিষ্কার করিয়াছিলাম। হাঁ, আইভি ফসেদের মৃতদেহ দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

আমার কথা শুনিয়া কুপ সক্রোধে আমার সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল, এবং আমার মুখের কাছে দুই হাত প্রসারিত করিয়া বিকৃতস্বরে বলিল, "তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ। এই মিথ্যা কথা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করিলে আমি গলা টিপিয়া ধরিয়া তোমাকে মারিয়া ফেলিব।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ইব্রাহিম ডার্টমুরে যে ভাবে আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই ভাবে না কি?"

কুপ দুই হাতের আঙ্গুল মট্‌কাইতে মট্‌কাইতে যেন আমার টুঁটি চাপিয়া ধরিবে, এইরূপ ভঙ্গী করিয়া বলিল, "তবে ত আমি যাহা সন্দেহ করিয়াছি, তাহা সত্য। তুমিই ইব্রাহিমকে গুলী করিয়া মারিয়াছ। নরহন্তা তুমি—আমি তোমাকে পুলিসে দিব।"

মুহূর্ত্তের জন্য আমি হতবুদ্ধি হইলাম; অতঃপর আমার কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। কিন্তু তখন ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। কুপের স্পর্দ্ধা আমার অসহ্য হইল। আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "যে কথা একবার বলিয়াছি, তাহা হাজারবার বলিব, আমি সত্য কথাই বলিয়াছি—তোমার উপদেশে বা আদেশে তোমার অনুচর ইব্রাহিম গলা টিপিয়া আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তোমারও অভিসন্ধি সেইরূপ। কিন্তু তুমি আমাকে স্পর্শ করিবামাত্র তোমাকে আমি কুকুরের মত গুলী করিয়া মারিব। দেখি তোমার কত সাহস।"

আমি পশ্চাতের দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দরজার কলে চাবি দেখিতে পাইলাম না। আমি সেই স্থান হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেই কুপ দ্বার খুলিয়া পলায়ন করিবে, তাহা বুঝিতে পারিলাম। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইল, সে পলায়নের জন্য উৎসুক হইয়াছে। বৃদ্ধ হইলেও সে যৌবনের সামর্থ্য ও তৎপরতায় বঞ্চিত হয় নাই।

কুপ আমার কথা শুনিয়া আমার সম্মুখ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি জানি, যোয়ান তোমার সঙ্গে পলায়ন করিয়াছিল। সে এখন আমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমিও তাহাকে এখন শত্রু মনে করি। আমি তাহাকে কিরূপ শাস্তি দিব, তাহা পরে জানিতে পারিবে। ইচ্ছা হয়, তুমি পুলিস ডাকিয়া নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে পার। কিন্তু তুমি জানিয়া রাখ, যোয়ানকেও তাহার কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হইবে; সে শাস্তি পাইবে, আমি পাইব না। লয়েড কোম্পানীর কর্ম্মচারী জিলরয়কে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিও, সে তোমার নিকট সকল কথাই প্রকাশ করিবে। সত্য ভিন্ন সে মিথ্যা কথা বলিবে না।"

জিলরয়!—নামটি আমার পরিচিত বলিয়াই মনে হইল। আমি বলিলাম, "জিলরয়? সে কি জানে?"

কুপ বলিল, "যোয়ান যে সকল কথা তোমার নিকট প্রকাশ করিবে না, তাহাই তাহার নিকট শুনিতে পাইবে। তুমি আমার প্রতি অধিকতর অপমানজনক ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা শুনিয়া লও। 'অটোমোবাইল ক্লাবে' তাহার সাক্ষাৎ পাইবে। যোয়ান সম্বন্ধে সে কি জানে, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে এবং সত্য কথা বলিতে অনুরোধ করিবে।"

ত্রয়োদশ প্রবাহ

যোয়ানের গুপ্তকথা কি?

আমি বিরক্তিভরে তীব্রস্বরে বলিলাম, "তুমি কি আত্মরক্ষার জন্য শেষে নিজের মেয়েটির দুর্নাম রটাইবার সঙ্কল্প করিয়াছ?"

আমার তিরস্কারে কুপ বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হইয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "কন্যা হইয়া সে আমার দুর্নাম রটাইয়া বেড়াইতেছে, আমার সম্বন্ধে লজ্জাজনক মিথ্যাকথা প্রচার করিতে তাহার কুণ্ঠা নাই! আমি তাহাকে অনেকবার সতর্ক করিয়াছি, তাহাকে ভয়প্রদর্শনও করিয়াছি। পূর্ব্বে যাহা মুখে বলিয়াছি, এবার তাহা কাযে করিব।"

আমি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিরক্তিভরে বলিলাম, "কি কায করিবে? কাযটা কি শুনি।"

কুপ বলিল, "যাহা সত্য কথা, কেবল তাহাই বলিব। তাহা শুনিতে পাইলে পুলিস তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া গ্রেপ্তার করিবে। যদি তুমি তাহাকে আশ্রয়দান কর, তথাপি পুলিসের কবল হইতে সে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না। জিলরয় সাক্ষীর কাঠরায় দাঁড়াইয়া তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। হাঁ, সমন ধরাইলে জিলরয়কে সাক্ষ্য দিতেই হইবে।"

যোয়ানের কথা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া আমি কি তবে ভুল করিয়াছি?—তাহা বুঝিতে পারিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলাম, "এই জিলরয়টি কে?"

কুপ ঈষৎ শ্লেষের সহিত বলিল, "জর্জ্জ জিলরয় লয়েড কোম্পানীর কর্ম্মচারী এবং—এবং যোয়ানের ভূতপূর্ব্ব প্রণয়ী।"

ভূতপূর্ব্ব প্রণয়ী!—কথাটা যেন বিষদিগ্ধ তীরের মত আমার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইল। হৃদয়ে ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইল। আমি যাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছি, সে অন্যের প্রণয়িনী! অন্য পুরুষকে ভালবাসিয়াছিল?

আমি কুপের কথা শুনিয়া প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। হয় ত আরও কি কঠোর উত্তর পাইব—এই আশঙ্কায় ও সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে কুণ্ঠাবোধ করিলাম।

নরপ্রেত কুপ আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিল; বলিল, "হাঁ, জিলরয় তাহার প্রণয়ী ছিল, কিন্তু আর সে পূর্ব্বের মাখামাখি নাই, পীরিত চটিয়া গিয়াছে! অত কাণ্ডের পর কি পীরিত বজায় থাকে? যুবক-যুবতীর প্রেম—নিতান্ত ঠুন্‌কো জিনিষ, তাহার উপর ঐ সকল কাণ্ড! নিঃস্বার্থ প্রণয় ত নয়।"

কি সর্ব্বনাশ! কেবল প্রণয় নয়, কাণ্ডও হইয়া গিয়াছে, বুড়া বেটা বলে কি? যন্ত্রণায় আমার বুকের ভিতরটা টন্‌টন করিয়া উঠিল; আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না; বলিলাম, "কাণ্ডটা কি?"

কুপ বলিল, "সে প্রকাণ্ড কুকাণ্ড; কিন্তু সে কথা আমার মুখে তোমায় না শুনাই ভাল; আমি বলিব না। যথাসময়ে পুলিস কোর্টে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া সেই কাহিনী শুনিও। তাহার সেই অপরাধের কাহিনী কেবল অদ্ভুত ও অসাধারণ নহে; এরূপ ভয়ঙ্কর যে, সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু সত্য।"

আমি বিস্ময়ভরে মুখব্যাদান করিয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিলাম, বিহ্বল স্বরে বলিলাম, "অপরাধের কাহিনী? তবে কি সে কোন অপরাধ করিয়াছিল?"

কুপ বলিল, "বলিব না বলিলাম—তথাপি জেরা আরম্ভ করিলে, অপরাধ ত বটেই। আর সে কি যেমন তেমন অপরাধ, গুরু অপরাধ। তাহার উপর জানিয়া শুনিয়া পূর্ব্ব হইতে মতলব ভাঁজিয়া সেই অপরাধ করা হইয়াছিল। সে কথা শুনিলে তোমার মূর্চ্ছা না হয়! দুর্ভাগ্যক্রমে আমি আর জিলরয় সেই লজ্জাজনক কদর্য্য কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি; আর কেহ তাহা জানে না। তবে ইব্রাহিম সন্দেহ করিয়াছিল বটে, কিন্তু আমাদের মত সে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারে নাই।"

যোয়ানের কাতরতা, আমার নিকট তাহার অনুনয়, মিনতি, তাহার ব্যাকুলতাপূর্ণ কথাগুলি আমার মনে পড়িল। আমি যাহাতে তাহার পিতার গুপ্তরহস্যভেদের চেষ্টা না করি, সে জন্য তাহার কি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ! আমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিবার জন্য তাহার কি বিপুল আগ্রহ! সকল কথাই স্মরণ হইল। সে বলিয়াছিল, তাহার অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া যদি আমি আমার সঙ্কল্প-সিদ্ধির চেষ্টা করি, তাহা হইলে তাহাকেই বিপন্ন হইতে হইবে, সকল যন্ত্রণা তাহাকেই সহ্য করিতে হইবে, ইহার কারণ তখন বুঝিতে পারি নাই। তবে কি তাহার পিতার কথা সত্য? আমার প্রতিজ্ঞাপালনের ফল এইরূপ শোচনীয় হইবে—ইহা কি সে বুঝিতে পারিয়াছিল?

কিন্তু তাহার অপরাধ কি প্রকৃতির? তাহার বিরুদ্ধে কিরূপ অভিযোগ উত্থাপিত হইবে? আমি তাহা শুনিবার জন্য অধীর হইলাম; কুপকে তাহা বলিবার জন্য পুনর্ব্বার আগ্রহভরে অনুরোধ করিলে সে বলিল, "তুমি ভদ্রলোক হইলে সে সকল কথা আমার নিকট শুনিবার জন্য ওরকম জিদ করিতে না; আমি আমার কন্যার গুপ্ত কলঙ্ককাহিনী কোন অপরিচিত লোকের নিকট প্রকাশ করিব—কোন ভদ্রলোক এরূপ আশা করিতে পারে না। জিলরয় বোধ হয় সকল কথাই তোমাকে বলিবে, কিন্তু আমি তাহা বলিতে পারিব না।"

কুপের ভণ্ডামী আমার অসহ্য হইল। সে য কন্যাকে শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিল, তাহার

করিতে চাহিল, কন্যার কলঙ্কপ্রচারের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল, আর আমার নিকট সে কথা প্রকাশ করিবার সময় তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রখর হইয়া উঠিল !

আমি তাহাকে বিচলিত স্বরে বলিলাম, "তোমার নাম কুপই হউক, আর কুপারই হউক, আমার একটা কথার উত্তর দাও। তুমি তোমার কন্যার বিরুদ্ধে এত বড় একটা অভিযোগ করিতে পারিলে, কিন্তু সেই অভিযোগের প্রকৃতি কি, তাহা প্রকাশ করিতে সম্মত নহ ! ইহার কারণ কি ? তাহার কলঙ্ক প্রচার করিতেছ, কিন্তু কলঙ্কটি কি, তাহা বলিতেছ না, ইহা কি অসঙ্গত নহে ?"

কুপ প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করিল ; বলিল, "তুমিও আমার বিরুদ্ধে অত্যন্ত কুৎসিত অভিযোগ করিয়াছ, আমাকে নরহন্তা, নারীহন্তা বলিয়াছ, আরও অনেক অপরাধ আমার ঘাড়ে চাপাইয়াছ,—কিন্তু ঐ সকল অভিযোগ সত্য, ইহা সপ্রমাণ করিয়াছ কি ? অবস্থাটা এই, তুমি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, তুমি আমার বিনানুমতিতে অসঙ্কোচে আমার ঘরে আসিয়া এক অদ্ভুত গল্প বলিতে আরম্ভ করিলে—কাহার মেয়ে তোমাকে ভুলাইয়া বেজওয়াটারের এক বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল, সেখানে কোন্ চিত্রকর তোমাকে তাহার চিত্রশালায় পুরিয়া যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিবার উপক্রম করিয়াছিল ইত্যাদি কত অসংলগ্ন অদ্ভুত কথা বলিলে এবং সেই অপরাধের বোঝা ভ্রমক্রমে আমার ঘাড়ে চাপাইলে ! ইহা কি তোমার পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে ? রাত্রে পেট ভরিয়া মদ-মাংস খাইয়া তাহা হজম করিতে পার নাই, কাযেই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছ, আর তাহাই সত্য মনে করিয়া আমার কাছে আসিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছ—যেন আমিই তোমাকে খুন করিবার ষড়্যন্ত্র করিয়াছিলাম !"

আমি বলিলাম, "অপরাধ করিয়া তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করিয়া ফল নাই। তুমি অপরাধী, এই জন্য বহু চেষ্টায় তোমাকে ধরিয়াছি ; আমার একটি কথাও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নহে। তুমিও জান, আমার কথা সত্য, কিন্তু অপরাধ করিয়া তাহা স্বীকার করিবার সাহস অনেকেরই থাকে না, তোমারও নাই। তুমি আমাকে চেন না বলিতেছ ; তুমি আমাকে তোমার বসিবার ঘরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলে, তোমার চাকর ইব্রাহিমকে কাফি দিতে বলিলে সে আমাকে কাফি পান করিতে দিয়াছিল ; তোমার কন্যা সেই কক্ষে আসিলে ইব্রাহিম তাহাকে মাদকদ্রব্য-মিশ্রিত কাফি আনিয়া দিয়াছিল, সে তাহা পান করিতে আপত্তি করিলে তুমি তাহাকে ভয় দেখাইয়া তাহা পান করিতে বাধ্য করিয়াছিলে ! এ সকল কথা মিথ্যা, অজীর্ণবশতঃ আমার দুঃস্বপ্নমাত্র, এ কথা বলিতে তোমার লজ্জা হইতেছে না ? তুমি কি এ সকল অস্বীকার কর ?"

কুপ বলিল, "আর কেন বাজে কথা বলিতেছ, থামিয়া যাও।—আমি আমার কন্যাকে মাদকদ্রব্য-মিশ্রিত গরলতুল্য অনিষ্টকর কাফি পান করিবার জন্য জিদ করিব, এ কি একটা কথা ? না—কোন ভদ্রলোক এ কথা বিশ্বাস করিতে পারে ? এ সকল কথা যিনি শুনিবেন—তিনিই বলিবেন, তোমার মাথা খারাপ হইয়াছে।"

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম, "কিন্তু সেই রাত্রে তুমি আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে, ইহা পুলিসের নিকট সপ্রমাণ করিলে পুলিস আমার কথা বিশ্বাস করিবে।"

কুপ বলিল, "তুমি আমার অপরাধ সপ্রমাণ করিবে ? প্রমাণ পাইবে কোথায় ?"

আমি বলিলাম, "এক জন সাক্ষী আছে—সে যোয়ান।"

কুপ বলিল, "শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল ! কে তাহার কথা বিশ্বাস করিবে ? তাহার ঘৃণিত কুকর্ম্মগুলির কথা আমার মুখ হইতে বাহির হইতে পারে, এই ভয়ে সে আমার মুখ বন্ধ করিবার জন্য আমার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার কলঙ্ক প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে ; তাহার কথার কি কোন মূল্য আছে ?"

আমি বলিলাম, "আমিও তোমার কথা বিশ্বাস করি না, কিন্তু আর অধিক তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন নাই ; তুমি আমাকে পুলিস ডাকিতে বলিয়াছ, আমি তাহাই করিব।"

আমি দৃঢ়পদে টেলিফোনের দিকে অগ্রসর হইলাম ; তাহা দেখিয়া সে দুই হাতে আমাকে ঠেলিয়া ফেলিল ; বলিল, "মূর্খ তুমি ! তুমি কি আশা করিয়াছ, একটা তরলমতি একগুঁয়ে মেয়ের খেয়াল পূর্ণ করিবার জন্য আমি পুলিসের সঙ্গে ভাজন হইতে যাইব ? তুমি আমার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে আমি তাহার সকল অপরাধের কথা পুলিসের নিকট প্রকাশ করিব ; তখন পুলিসের কবল হইতে কে

তাহাকে রক্ষা করিবে ? তুমি বলিতেছ—তুমি তাহার বন্ধু, বন্ধু হইয়া তাহার শত্রুতাসাধন করিবে ?"

আমি বলিলাম, "তুমি আমার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করিয়াছ, সেই জন্য তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিব।"

কুপ বলিল, "কিরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছি ?"

আমি।—তুমি আমাকে তোমার ঘরে পুরিয়া নানা-ভাবে আমাকে উৎপীড়িত করিয়াছ, তাহার ফলে আমার প্রাণবিয়োগের উপক্রম হইয়াছিল ; আমাকে হত্যা করাই তোমার উদ্দেশ্য ছিল।

কুপ।—আমি এই অভিযোগ অস্বীকার করি, তুমি পূর্ব্বে কোন দিন আমার বাড়ীতে প্রবেশ কর নাই।

আমি।—এখানে নহে ; আমি তোমার বেজওয়াটারের বাড়ীর কথা বলিতেছি।

কুপ।—কোথায় ? কোন্ বাড়ীর কথা বলিতেছ ? আমার অন্য কোথাও বাড়ী আছে না কি ? বেশ, তুমি পুলিসকে সেই বাড়ী দেখাইয়া দিও, তাহা হইলে তাহারা হয় ত তোমার কথা বিশ্বাস করিবে।

আমি।—তাহারা সেই বাড়ী খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিলেই দোতলার কুঠুরীর দেওয়ালে তোমার অপকার্য্যের নিদর্শন—সেই সকল লোম-হর্ষণ চিত্র দেখিতে পাইবে। তবে তুমি ধরা পড়িবার ভয়ে সেই ছবিগুলি সরাইয়া ফেলিয়াছ কি না, বলিতে পারি না।

কুপ।—পুলিস তোমার অসম্ভব গল্প বিশ্বাস করিবে না ; তোমার অভিযোগ কেবল অসঙ্গত নহে, নিতান্ত অসার। পুলিসের ধারণা হইবে, ইহা তোমার কল্পনার বিকারমাত্র। এরূপ অভিযোগের মূলে সত্য নাই।

আমি।—সে বিচার পরে হইবে, আগে ত তোমাকে পুলিসের হাতে সঁপিয়া দিই।

সেই সময়ে ঘরের বাহিরে স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদের খস্-খস্ শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, বাড়ীওয়ালী ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল না ; আমা-দের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে অন্য দিকে প্রস্থান করিল।

কুপ ধীরে ধীরে টেবলের দিকে সরিয়া আসিয়া বলিল, "তুমি [illegible] সকল কথা ভাবিয়া দেখ। যোয়ান পলায়ন করিয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তুমি নির্ব্বোধের মত যে কায করিতে উদ্যত হইয়াছ—তাহার ফল কি তাহার পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইবে ? বিশেষতঃ পুলিস তোমার কথা কখন বিশ্বাস করিবে না।"

আমি।—যোয়ান আমার সাক্ষী হইলেও পুলিস আমার কথা অবিশ্বাস করিবে ?

কুপ।—সে কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তদ্ভিন্ন সে তাহার পিতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে ?

আমি।—আমার অনুকূলে সাক্ষ্য দিতে সে আপত্তি করিবে না।

কুপ ভোজন-টেবলের অন্য ধারে দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দুই এক মিনিট পরে কঠোর স্বরে বলিল, "তুমি আমাকে ভয় দেখাইতেছ, তুমি আশা করিয়াছ, আমার কন্যাকে পুলিসের সম্মুখে টানিয়া আনিয়া তাহাকে দিয়া তোমার নির্লজ্জ মিথ্যা অভিযোগ সপ্রমাণ করাইবে। বেশ, চেষ্টা করিয়া দেখিও ; কিন্তু আপাততঃ তোমার ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিফল গ্রহণ কর।"

সে হঠাৎ হাত তুলিল, আমি তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিয়া সতর্ক হইবার পূর্ব্বেই আমার মুখের উপর এক মুঠা গুঁড়া নিক্ষেপ করিল ; সেই গুঁড়াগুলির কিয়দংশ আমার চক্ষুর ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র আমার দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইল। যেন চক্ষুর ভিতর শত শত সূচী একসঙ্গে বিদ্ধ হইতে লাগিল !

কুপ সদর্পে বলিয়া উঠিল, "মূর্খ, তুমি ভাবিয়াছিলে, আমাকে তুমি কায়দায় পাইয়াছ, কিন্তু তোমার অপেক্ষা অনেক অধিক চতুর লোকও কার্ল কুপের সঙ্গে চালাকী করিতে আসিয়া জব্দ হইয়া গিয়াছে। এখনও যদি তুমি মুখ বুজিয়া চলিয়া না যাও, তাহা হইলে তোমার লাঞ্ছনা ও বিপদের সীমা থাকিবে না ; আমার কথা বুঝিয়াছ ?"

আমি দুই হাতে চোখ ডলিতে ডলিতে সাহায্যলাভের আশায় চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলাম। সে হঠাৎ পলায়ন করিতে পারে, এই আশঙ্কায় আমি চক্ষু হইতে দুই হাত সরাইয়া লইয়া, কিছু দেখিতে না পাইলেও তাহাকে জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেই স্থানে হাত বাড়াইয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিলাম না। অগত্যা আমি অন্ধের ন্যায় চারিদিকে হাতড়াইতে লাগিলাম।

আমার চেষ্টা বিফল হইয়াছে দেখিয়া সে দূরে দাঁড়াইয়া

নীরস হাস্যে সেই কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিল, "কেমন বন্ধ! এখন আমি তোমার নিকট বিদায় লইলাম, বন্ধু! তোমাকে ও যোয়ানকে পুলিসের হাতে পড়িতে না হয়, এ জন্য তোমরা উভয়েই সতর্ক থাকিও। ভবিষ্যতে যখন আমার সঙ্গে তোমার দেখা হইবে, তখন যেন তোমাকে বন্ধু-ভাবে অভিনন্দিত করিতে পারি; অতঃপর তুমি আমার প্রতি শত্রুভাব ত্যাগ করিও, ইহাই আমার অনুরোধ।"

দুর্দান্ত খুনীটা সেই বাড়ী হইতে পলায়ন করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে আমি বাড়ীওয়ালীকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া সদর-দরজা তাড়াতাড়ি বন্ধ করিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু বাড়ীওয়ালী আমার অনুরোধে কর্ণপাত করিল না, অথবা আমার আহ্বানধ্বনি শুনিতে পাইল না। কুপ টুপীটা তুলিয়া লইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সেই কক্ষ হইতে পলায়ন করিল। আমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না, তাহার পদশব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, সে সেই অট্টালিকার বাহিরে প্রস্থান করিল।

আমি তাহার অনুসরণের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমি তখন দৃষ্টিশক্তিহীন; দৌড়াইতে গিয়া চৌকাঠে পা বাধিয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইলাম। কুপ আমার চক্ষুতে কোন্ সামগ্রী নিক্ষেপ করিয়া আমার দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইল না। ভোজন-টেবলের উপর একটি বেলোয়ারী কাচের পাত্রে কিছু মরিচের গুঁড়া ছিল; সে আমার অজ্ঞাতসারে সেই গুঁড়া হাতে ঢালিয়া মুঠায় পুরিয়া রাখিয়াছিল, এবং সুযোগ বুঝিয়া তাহাই আমার চোখে মুখে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এক মুঠা মরিচের গুঁড়া চক্ষুর ভিতর নিক্ষিপ্ত হইলে চক্ষুর অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

কুপকে ধরিয়াও ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না; সেই ধূর্ত্ত আমার চক্ষুতে ধূলার পরিবর্ত্তে মরিচের গুঁড়া নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিল! ধূলা ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল।

কুপ পলায়ন করিলে বাড়ীওয়ালী হাঁপাইতে হাঁপাইতে ব্যগ্রভাবে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং ব্যাপার কি জানিতে চাহিল। আমি তাহাকে সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিয়া, কুপের অনুসরণ করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু সে আমার অনুরোধ রক্ষা করিল না, স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, বোধ হয়, সে আমাকে পাগল মনে করিল!

আমি রাগ করিয়া তাহাকে দুই চারিটি কড়া কথা শুনাইয়া দিলাম। বাড়ীওয়ালী মরিচগুঁড়ার পাত্রটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার ভিতর মরিচের গুঁড়া দেখিতে পাইল না; তখন তাহার বিশ্বাস হইল, কুপ আমার চক্ষুতে মরিচের গুঁড়াগুলি নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

আমি বাড়ীওয়ালীকে উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "লোকটা খুনে, নরহত্যাই উহার পেশা। উহাকে ধরিয়া পুলিসের হাতে দেওয়া উচিত। তুমি তাহাকে ধরিবার চেষ্টা না করিয়া এখনও দাঁড়াইয়া আছ?"

বাড়ীওয়ালী কোন কথা না বলিয়া সদর-দরজা দিয়া পথের দিকে চলিয়া গেল, কিন্তু দুই তিন মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "পথে তাহাকে দেখিতে পাইলাম না, সে সরিয়া পড়িয়াছে।"

কুপ আমার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার কেন করিল, আমার সহিত তাহার বিরোধের কারণ কি প্রভৃতি প্রশ্নে বাড়ীওয়ালী আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিল; কিন্তু তাহার কৌতূহল প্রবল হইলেও আমি তাহাকে অধিক কথা বলিলাম না, তাহার নিকট গুপ্তরহস্য ভেদ করা সঙ্গত মনে করিলাম না। আমার চক্ষু ডলিতে ডলিতে কয়লার মত লাল হইল, তখনও যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয় নাই শুনিয়া বাড়ীওয়ালী এক বাল্তি জল আনিয়া আমার চক্ষুতে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল; কয়েক মিনিট পরে জ্বালা-নিবৃত্তি হইল, দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইলাম। কিন্তু তখনও মধ্যে মধ্যে চক্ষু টাটাইতে লাগিল, এবং মধ্যে মধ্যে রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিতে হইল।

কুপ পলায়নের পূর্ব্বে বলিয়াছিল, যোয়ানের ভাগ্যে বিস্তর যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা আছে, সে কঠোর শাস্তি পাইবে। যোয়ানও সে কথা আমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিল। আমি হতাশভাবে দাঁড়াইয়া আদ্যোপান্ত সকল কথা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল, কুপকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার সঙ্গে এই ভাবে তর্ক-বিতর্ক করা অত্যন্ত অবিবেচনার কায হইয়াছে। কুপ এই বাড়ীতে প্রবেশ করিবার পর, তাহাকে দেখিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করাই আমার উচিত ছিল। আমি সেই পল্লীর থানায় উপস্থিত হইয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে সকল কথা

জানাইলে তিনি আমাকে সাহায্য করিতেন, কুপকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আমার সঙ্গে দুই এক জন কনষ্টেবলও পাঠাইতেন। তাহারা আমার সঙ্গে আসিয়া কুপকে এখানে গ্রেপ্তার করিত। তাহাকে অতি সহজে ধরা পড়িতে হইত।

কুপ আমাকে মূর্খ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল; সত্যই আমি মূর্খের মত কায করিয়াছি। সে পলায়ন করিয়াছে, এবার কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে, জানি না; অনেক চেষ্টায় তাহার সন্ধান পাইয়াছিলাম; আমার বুদ্ধির দোষে সে আমার মুঠার ভিতর হইতে পলায়ন করিল, পুনর্ব্বার কি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব? সে আর এখানে ফিরিয়া আসিবে না।

আমার চক্ষু তখনও সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হয় নাই, মধ্যে মধ্যে জ্বালা করিতেছিল, বেদনাও ছিল। আমি সেই অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া আর্লস্ কোর্ট রোডের দিকে চলিলাম। পথিমধ্যে একখানি ট্যাক্সি পাইলাম, সেই ট্যাক্সি লইয়া প্রথমে 'জুনিয়ার এথেনিয়ম' ক্লাবে উপস্থিত হইলাম, এবং সেখানে শীতল জলে পুনর্ব্বার চক্ষু ধুইলাম। এবার পূর্ব্বাপেক্ষা স্বস্তি বোধ করিলাম। অর্দ্ধ-ঘণ্টা পরে আমি 'রয়াল অটোমোবাইল ক্লাবে' প্রবেশ করিয়া এক জন আরদালীকে জর্জ্জ জিলরয়ের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। আরদালী আমাকে সঙ্গে লইয়া একটি কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইল, আমি সেই কক্ষেই মিঃ জর্জ্জ জিলরয়ের সাক্ষাৎ পাইলাম।

জর্জ্জ জিলরয় দীর্ঘকায় সুপুরুষ, ব্যায়াম-কুশল যুবকের ন্যায় দেহের গঠন, পেশীগুলি পরিপুষ্ট, দাড়ি-গোঁফবর্জ্জিত মুখ কোমলতাপূর্ণ। তিনি সেই কক্ষে সাদরে আমার অভ্যর্থনা করিলেন। কক্ষটি সুসজ্জিত, কিন্তু সিগারেটের ধূমে আচ্ছন্ন। আমাকে দেখিয়া তাঁহার চক্ষুতে কৌতূহল পরিস্ফুট হইল। বুঝিলাম, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কারণ জানিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইয়াছে।

আমি বলিলাম, "মিঃ জিলরয়, আমি কি উদ্দেশ্যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি, তাহা আপনি এখনই জানিতে পারিবেন। তাহা বলিবার জন্য অধিক ভূমিকা করিবার প্রয়োজন নাই। আমার বিশ্বাস, আমার একটি নবীনা বান্ধবীর সহিত আপনার পরিচয় আছে। তাঁহার নাম যোয়ান কুপার।"

আমার কথায় মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার ভাবান্তর লক্ষিত হইল; তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া যেন কিঞ্চিৎ বিরক্তভরেই বলিলেন, "যদি তাহার সহিত আমার পরিচয় থাকেই, তাহা হইলে সে কথা জানিয়া আপনার কি লাভ হইবে, মহাশয়! আপনার এ প্রকার কৌতূহলের কারণ কি?"

আমি ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে বলিলাম, "লাভ? না, লাভ কিছুই নাই, আর আমরা কি কেবল লাভের আশাতেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করি, বা কাহাকেও তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের কথা জিজ্ঞাসা করি? কথা এই যে, আমি যোয়ান কুপার ও তাঁহার পিতার সম্বন্ধে গোপনে দুই একটি বিষয়ের সন্ধান লইবার জন্য উৎসুক হইয়াছি, অন্য কোন কারণ নাই।"

জিলরয় ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "ওঃ, বুঝিয়াছি, আপনি ডিটেক্‌টিভ! আপনি আমার গার্হস্থ্য ব্যাপার সম্বন্ধে অনধিকারচর্চ্চা করিতে আসিয়াছেন? এরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ ডিটেক্‌টিভদের চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব।"

আমি নরম সুরে বলিলাম, "না মিঃ জিলরয়! আমার সম্বন্ধে আপনি ভুল ধারণা করিয়াছেন। আমি ডিটেক্‌টিভ নহি, এবং আপনার গার্হস্থ্য ব্যাপার সম্বন্ধে অনধিকারচর্চ্চা করিবার দুরভিসন্ধিও আমার নাই। আমি যে কথা জানিবার জন্য আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, তাহা বলায় এবং শোনায় আমাদের উভয়েরই সমান স্বার্থ। মিস্ কুপারের জীবন রহস্যাবৃত, আপনি কি সেই রহস্যভেদ করিতে পারিয়াছেন?"

জিলরয় আমার কথা শুনিয়া যেন একটু নরম হইলেন, কিন্তু তাঁহার সন্দেহ দূর হইল না। তিনি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার ও কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না।"

আমি বলিলাম, "মিস্ যোয়ান কুপারের জীবন রহস্যজাল-সমাচ্ছন্ন; আমি সেই রহস্যের জটিল সূত্র আবিষ্কার করিবার চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনাকেও হয় ত প্রথমে আমার মত ধাঁধায় পড়িতে হইয়াছিল; কিন্তু পরে বোধ হয়, আপনি রহস্যভেদে সমর্থ হইয়াছিলেন। আপনি তাঁহার সম্বন্ধে কি জানেন, তাহাই শুনিবার আশায় আপনার কাছে আসিয়াছি। আমার মনের কথা স্পষ্টভাবেই আপনার নিকট প্রকাশ করিলাম।"

জিলরয় দুই এক মিনিট চিন্তা করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর মৃদুস্বরে বলিলেন, "তাহার সম্বন্ধে আমি কি জানি, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন? কিন্তু আমি যাহা জানি, তাহা শুনিলে আপনি কি বিশ্বাস করিতে পারিবেন? আপনি কেন, পৃথিবীর কোন লোক সে কথা বিশ্বাস করিবে না। এই জন্য সে সকল কথা আপনার নিকট প্রকাশ করিব না। তবে আপনাকে এইমাত্র বলি, যদি আপনি সেই মহিলার সহিত বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই বন্ধন অটুট রাখিতে পারেন, আপনার ইচ্ছার উপর তাহা নির্ভর করিতেছে, তবে আমি সে বন্ধন ছিন্ন করিয়াছি, এবং তাহার সহিত পরিচয় রাখাও আমি বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিতে পারি নাই।"

জিলরয়ের কথা শুনিয়া আমার বুকের উপর হইতে যেন দুর্ব্বহ পাষাণ-ভার অপসারিত হইল; কিন্তু আমি মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলাম, "আপনি সে বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন! তাহা হইলে আর সে সকল কথা আমার নিকট প্রকাশ করিতে আপনার বাধা কি? আপনি যাহা জানেন, তাহা কি আমাকে বলিবেন না? আমি স্বীকার করিতেছি, তিনি আমার বান্ধবী এবং আমি তাঁহার হিতৈষী।"

জিলরয় গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সে আপনার বান্ধবী, এই জন্যই তাহার সম্বন্ধে যাহা জানি, তাহা আপনার নিকট প্রকাশ করিব না। কাহারও বন্ধুর নিকট তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা শিষ্টাচারসঙ্গত নহে। আমি যাহা জানি, তাহা কুপারের পক্ষে অনুকূল নহে, প্রতিকূল। বিশেষতঃ রমণীর বিরুদ্ধে কোন কথা প্রকাশ করা পুরুষোচিত কার্য্য নহে।"

আমি আগ্রহভরে বলিলাম, "কিন্তু মিস্ কুপার বিপন্না; তাঁহাকে দারুণ সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছে। সে কিরূপ সঙ্কট, তাহা আপনি জানেন না।"

মিঃ জিলরয় প্রশান্তভাবে বলিলেন, "আমি সকলই জানি, তাহার সঙ্কটের সংবাদ আমার অজ্ঞাত নহে। আপনি বলিতেছেন, আপনি তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী, সম্ভবতঃ আপনি তাহার সঙ্কটমোচনেরই চেষ্টা করিবেন, কিন্তু যদি তাহার সম্বন্ধে আমি কোন কথা প্রকাশ করি, তাহা শুনিয়া আপনি তাহার কোন উপকার করিতে পারিবেন না, অধিকন্তু তাহার অবস্থা অধিকতর সঙ্কটাপন্ন হইবে। এ অবস্থায় তাহার সম্বন্ধে আমার কোন কথা না বলাই কি সঙ্গত নহে?"

আমি বলিলাম, "আপনি দয়া করিয়া বলুন; যাহা জানেন, সকল কথাই শুনিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে। সকল কথা শুনিলে হয় ত তাঁহাকে সঙ্কট হইতে উদ্ধারের কোন পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিব।"

মিঃ জিলরয় আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তবে সেই অপ্রীতিকর কাহিনী সত্যই শুনিবেন? আমার মনে হয়, তাহা না শুনিলেই ভাল করিতেন। কিন্তু আপনি পীড়াপীড়ি করিলে আমি নিরুপায়। আপনি একটা সিগারেট ধরাইয়া লউন, মিঃ কোলফাক্স। আমি ধীরে ধীরে সকল কথাই বলিতেছি, আপনি শুনুন। যদি আপনার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার থাকে, আমার কথা শেষ হইলে তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন; কিন্তু এই শোচনীয় বিচিত্র রহস্যজালসমাচ্ছন্ন কাহিনী যেরূপ অদ্ভুত, সেইরূপ লোমহর্ষণ এবং বিশ্বাসের অযোগ্য; তথাপি তাহা সম্পূর্ণ সত্য, বাস্তব জীবনের অনতিরঞ্জিত ঘটনা।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।
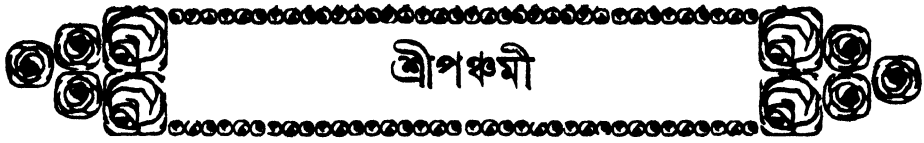
শ্রীপঞ্চমী

সে এক সময়ে এমন একটি দিন ছিল—যে দিন কোথাও কিছু ছিল না। কেবল শূন্য অবকাশ—একটির উপর আর একটি মণ্ডল, তাহার উপর আর একটি মণ্ডল, এইরূপে মণ্ডলের উপর মণ্ডল অনন্তের দিকে ছুটিয়াছে! তাহারই মধ্যস্থলে ওঁ-কার আশ্রয় করিয়া সচ্চিদানন্দ আপনাকে প্রকাশ করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ অন্তরের অন্তস্তম স্থলে বাসনার উদয় হইল। এই বাসনার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত মণ্ডলে স্পন্দন জাগিয়া উঠিল। তাহার প্রকাশ সর্ব্বব্যাপী এবং ওতপ্রোত। তাহার সমতায় আকর্ষণ ও বিকর্ষণ প্রতি অণু-পরমাণুতে প্রকাশ পাইল। ইহার ফলে জল, অগ্নি, বায়ু মৃত্তিকার সৃষ্টি হইল। ইহাদিগের আবার সংঘটন ও বিঘট্টনে মিলন ও দূরীকরণে নানা সৃষ্টির বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিল। ফুলে ফলে বৃক্ষে লতায় পর্ব্বতে নদীতে তড়াগে পল্বলে দিগ্ দিগন্ত অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। বৈদ্যুতিক শক্তির সম ও বিষম প্রকারের পরস্পর আকর্ষণ ও বিকর্ষণে এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চের বহুতে এক ও একে বহু পদার্থের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব হইতে থাকিল। এই সর্জ্জন-ব্যাপারে এক ক্রমিক ধারা নিয়মানুসারে প্রবাহিত। তাহা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং ইহার প্রবাহে অনাদিকাল হইতে সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য হইয়া আসিতেছে। পদার্থ হইতে পদার্থান্তর মূর্ত্তি পরিগ্রহে যে শূন্য অবকাশে স্পন্দন যে যে অনুপাতে প্রয়োজন হইয়া থাকে, যথারীতি সেই সেই অনুপাতে শূন্যাবকাশের সেই স্পন্দন সৃষ্টিপ্রকরণে মৌলিক উপাদানসমূহ—ক্ষিতি জল বায়ু অগ্নি ও ব্যোম অর্থাৎ শূন্যে প্রথমেই প্রয়োজন হইয়াছিল। সে কবে, কোথায়, তাহা আজ কে জানে—কে বলিতে পারে? কালের কোন্ অতীতে প্রথমে এই সুন্দর ভাস্বর ছবিখানি অরুণ-রাগে রঞ্জিত হইয়া—ভবিষ্যের অন্ধকার দূর করিয়া আলো করিয়া-ছিল, তাহার নির্ণয় করিতে কে পারে? তবে হঠাৎ এক দিন শুভক্ষণে পত্রগুচ্ছে ফুলে-ফলে নদ-নদী-তড়াগ-পল্বলে মহীধর-মহীরুহে জীবজন্তু বৈশিষ্ট্যে সচলে অচলে প্রত্যক্ষ ও অনুমেয়ে কোথাও কোন বৈষম্য রহিল না। সকল জাগিয়া উঠিল। তখনও যে প্রথম দেখিল, সে ভাবিল, এমন মনোহর কবে, কোথা হইতে, কি করিয়া, কোথায় কে করিল! যে প্রথম দেখিল, ভাবিল, সে অনাদি অনন্তে আসিল। আজও যে দেখিয়াছে, ভাবিতেছে, সে-ও ঐ অনাদি অনন্তে আসিতেছে!

শব্দকে আলিঙ্গন করিয়া এই চিরন্তন স্পন্দন অনন্ত শূন্য অবকাশের মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ষড়ৈশ্বর্য্যময়ের কেবল ইচ্ছানুসারেই তাহার উদয় এবং উদয় হইতেই স্পন্দনের প্রবাহ চলিতে থাকিল। কালের কোন ক্ষণেই তাহার আর বিরতি হইল না—আজিও প্রতিমুহূর্ত্তে সেই ইচ্ছার উদয় ও শূন্য অবকাশের ভিতর স্পন্দন জাগিয়া উঠিতেছে—ভবিষ্যতের যবনি-কার অন্তরালে ঠিক এমনই ধারা প্রবাহিত হইতে থাকিবে। শব্দ-গুণে পরিপূর্ণ এই ষড়ৈশ্বর্য্যময়ের জ্যোতির্ম্ময়ী শক্তির বিরাট ভাব-কল্পনা সৃষ্টিপ্রপঞ্চে আশ্রয় লাভ করিল। লোক বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মুখ আনত করিল, এবং ষড়ৈশ্বর্য্যময়ের গঠনে যে দুই উপাদান শব্দ ও জ্যোতিঃ, তাহার পূজা করিতে আরম্ভ করিল। শব্দের শক্তিতে সৃষ্টিপ্রপঞ্চের অণু ও পরমাণুর মিলন ও ধ্বংসে লোক ভগবৎপ্রীতির মূর্ত্তিমতী করুণাস্বরূপিণী বাণীর মন্দিরে পূজক হইয়া ভক্ত আপনাকে বুঝিতে সমর্থ হইল। তখন সে আপনার ভিতরে অনুভব করিল যে, এই বাণীর সাধনায় নিজের শক্তি সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিলে ষড়ৈশ্বর্য্যময়ের অন্যতর গঠনোপাদান পরম জ্যোতিরও পরিস্ফুরণ হইতে পারে। প্রথমে যে সাধকশ্রেষ্ঠ মানস-চক্ষুর গোচর করিয়া এই নূতন তত্ত্ব আপনার অস্তিত্বের সহিত মিলাইয়া লইতে পারিল, সে শব্দ ও জ্যোতিরূপা শক্তির সকল সৃষ্ট পদার্থে ধারাবাহিক ভাবে বর্ত্তমান থাকার কথা প্রকাশ করিয়া কি সাধনা করা উচিত এবং সাধনা করিলেই বা তাহার ফল আত্মপ্রতীতি কি না, তাহা সরল-ভাবে মানব-সমাজে ভগবদ্‌বুদ্ধির উন্মেষ করিয়া দিবার চেষ্টা করিল, কেহ সে কথা বিশ্বাস করিল, কেহ বাতুলের প্রলাপবাক্য বলিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিল, আর কেহ কেহ বা অবিশ্বাসের গুরুভার বিশ্বাসে কতকটা লঘু করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমশঃ এক দুই তিন করিয়া বাণীর উপাসক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্রোতঃ যে দিকে যায়, সেই দিকেই সকলকে টানিয়া লইয়া যায়। যখন স্রোতঃ আসিয়া পড়িল—বাণীর সাধনায় কি এক অপার্থিব বস্তু লাভ হইবে, তখন যে যেখানে ছিল, সে সেই-খানে নূতনের স্রোতে গা-ভাসান দিল। সর্ব্বত্র বাণীর সাধনার সাড়া পড়িয়া গেল। মানবদৃষ্টির প্রথম উন্মেষে বৈদিকযুগের প্রথম সাধনার দিনে এই শব্দই লক্ষ্যস্থল হইয়া উঠিল। সুতরাং হোমাদি বিবিধ অনুষ্ঠানে কর্ম্মমার্গে। ভগবদারাধনা শব্দ-সাধনায় পর্য্যবসিত হইয়া জপমার্গের সৃষ্টি করিয়া দিল। কর্ম্মযজ্ঞ ও তাহার পরিণতি জপযজ্ঞ এবং তাহাতেই ষড়ৈশ্বর্য্যময়লাভ, ইহাই সাধক বুঝিল। সাধক তখন বেশ বুঝিতে পারিল যে, ষড়ৈশ্বর্য্যময় এই নাম ভগবত্তাকে গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ করিয়া ফেলে। তাঁহার কোন নাম থাকিতে পারে না। অথচ নাম না থাকিলেই বা তাঁহাকে কেমন করিয়া ডাকা যায়? তখন ঘোর সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইল; এই সমস্যা সমাধান করিতে যাইয়া সাধক বহু সাধনা আরম্ভ করিল। তখন সে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিল যে, শব্দকে যথারীতি প্রমাণ ও প্রয়োগে ঝঙ্কার ও মূর্চ্ছনার ভিতর দিয়া এমন মহান্ করিয়া তুলিতে পারা যায় যে, তাহারই আকর্ষণে জ্যোতিরও স্ফুরণ এবং সম্যক্ প্রতীতি হইয়া থাকে। সুতরাং শব্দের সাধনাতেই ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান এবং জ্ঞানলাভ হইবার পর ব্রহ্মপ্রকৃতিলাভ হইয়া থাকে। অতএব শব্দের সাধনা বা বাণীর পূজা ব্রহ্মত্বে পরিণতি, ইহা ভক্ত সাধকমাত্রেই বুঝিতে পারিল।

সাকার ও নিরাকারভেদে পূজা দুই প্রকার। ব্রহ্মের কোন আকার নাই, কোন উপাধি নাই, সুতরাং তিনি নিরাকার এবং নিরুপাধি। বাণীর পূজা যদি ব্রহ্মত্বে পরিণতি, তাহা হইলে তাহা নিরাকারের পূজা। কিন্তু কর্ম্মপথে নিরাকার—ধারণা আদৌ সম্ভব হয় না। কেন সম্ভব হয় না, তাহা তর্কের বিষয়। তর্কের বহু অবতারণা না করিয়া এখানে মোটামুটি ইহাই বলিলে যথেষ্ট

হইবে যে, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিকের সূক্ষ্মভাগ ছাড়িয়া স্থূলভাগ পর্য্যন্ত মানবপ্রকৃতি নিরাকারের ধারণার অযোগ্য। সে প্রকৃতি সাকারের সাধনা করিতে পারে এবং চায়। তাহার কল্পনাশক্তি সাকার সাধনা ছাড়িয়া আর অগ্রসর হইতে পারে না। ইহাই কর্ম্মমার্গ। কর্ম্মমার্গের পরিণতি জপমার্গ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময়ত্বের অন্তরাত্মায় উপলব্ধি করা। এই অবস্থায় মানব-প্রকৃতির আধ্যাত্মিক ভাগের সূক্ষ্মাংশ ও আধিদৈবিক অংশ কার্য্য করিয়া থাকে। সুতরাং সাকারকে ধরিয়া নিরাকারকে ধরিতে হয়। সাকারের রূপ-কল্পনা ভক্ত সাধকের হৃদয়ে স্বতঃই প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ কল্পনায় ভক্ত সাধকের বহিঃপ্রকৃতির পরিণতি অন্তঃপ্রকৃতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। অন্তঃপ্রকৃতি পবিত্রতা চায়। পবিত্রতা এমন জিনিষ যে, পাপের অণুমেয়-স্পর্শে কলুষিত হয়। সুতরাং তাহার বর্ণ এমন হইতে হইবে যে, সামান্যমাত্র অঙ্কপাতে তাহার শুভ্রত্ব নষ্ট হইয়া যাইবে। শুভ্রবর্ণ ভিন্ন অন্য যে সকল বর্ণ আছে, তাহাতে তদ্ব্যতীত অন্য বর্ণের রেখাপাত হইলেও তত পরিস্ফুট হয় না। কিন্তু শ্বেতবর্ণ সম্বন্ধে সে আশঙ্কা অনুক্ষণ বর্ত্তমান। সুতরাং সাকারের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া শ্বেত তাহার বর্ণ, তাহা কল্পিত হইল। সামান্য সংস্পর্শে যাহার একাধিকারিত্ব রক্ষা হয় না, যাহা মলিন হইয়া যায়, তাহাই পবিত্রতার দ্যোতক। বর্ণান্তরে শ্বেতবর্ণের বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করে বলিয়াই পবিত্রতা জানাইতে শ্বেতবর্ণই একমাত্র আশ্রয়ণীয়। জ্ঞানদায়িনী বাগধিষ্ঠাত্রী দেবী অধিকার-বৈচিত্র্যে অপূর্ব্ব—ভক্তের হৃদয় সম্পূর্ণ পবিত্র না হইলে এই বিচিত্র অধিকার রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। এই অনন্য-সাধারণ পবিত্রতা দেবীর প্রাণ ও দেহ, তাহা সম্পূর্ণ শুভ্র—উজ্জ্বল। ভক্তের হৃদয় এইরূপ শুভ্র উজ্জ্বল না হইলে সম্পূর্ণ এই সর্ব্বশুক্লা দেবী সেখানে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন না। পরস্পর পরস্পরকে না আকর্ষণ করিলে দুই বস্তুর কখন একত্র মিলন হইতে পারে না। দেবীর ও মানবের পরস্পর আকর্ষণে এই মিলন দেখা দিল, এবং সর্ব্বশুক্লত্ব এই আকর্ষণের প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। সকলই কল্পনার নন্দন-কানন; এবং প্রত্যক্ষদৃষ্ট জল অগ্নি বায়ু প্রভৃতির অধিদেবতা মানব কল্পনা করিয়া তাহার পূজার ব্রতী হইয়া যেমন আত্মোন্নতিবিধানের চেষ্টা করিতে লাগিল, তেমনই ভক্ত আর এক দেবতার কল্পনার মানস-নয়নে তাহার রূপ দেখিতে পাইয়া দেবী সর্ব্বশুক্লা ধারণা করিয়া লইল। মেধাবীর সুচিন্তারক্তে পবিত্রতাময়ী বাগ্দেবী মানব-হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন। ষড়ৈশ্বর্য্যময়ের আংশিকত্বে অধিকার থাকা সত্ত্বেও শব্দময়ী ব্রহ্মপ্রকৃতি সর্ব্বশুক্ল নব-কলেবর ধারণ করিয়া নূতন অস্তিত্বে অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়া বাগ্বিভাদায়িনী অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সর্ব্বশুক্লা প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া দিল। তখন এই দেবীপ্রতিমার শুভ্র আননে অধরস্ফুরণে শব্দের প্রাণ জাগিয়া উঠিল, তাঁহার শ্বেত হস্তে স-কল-গুণ-ময় আনন্দময় শ্বেতবীণা ঝঙ্কার তুলিল, শ্বেতপদ্মে শুক্লবসনার শুভ্রচরণপাতে মৃদুমন্দ মলয়-হিল্লোলে আনন্দ-ঝঙ্কার ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কল্পনা তখন বাস্তব সত্যে পরিণত হইয়া শ্বেত-সরোবর রচনা করিয়াছে, তাহাতে শ্বেত শতদল হাসিরাশি ছড়াইয়া আমোদ বিলাইতেছে, সেই শ্বেতসরোজে বসিয়া বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্বেত করপল্লবে শ্বেতবীণায় শব্দের ঝঙ্কার তুলিয়া করুণানয়নে তাঁহার উপাসকের দিকে একটু স্মিতহাস্যে হাসিয়া হৃদয়ের পবিত্রতা-বিধান করিতেছেন। যাহা সুনির্ম্মল তৃপ্তিপ্রদ ষড়ৈশ্বর্য্যদাতা, তাহার মোহন আবেশে ভরপুর হইয়া, শব্দের গণ্ডী সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে না পারিয়া, অনন্তের শুভ্র গরিমার মহিমায় মানব আত্মাহুতি দান করিল। বাণীর অর্চ্চনা হইল—তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পরিকল্পনা সার্থক হইল।

বৈদিক যুগের ইতিহাস পাঠ করিলে আর্য্য তাপসগণের শক্তি অর্জ্জন করিতে প্রাণপণ চেষ্টার বহুল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যখন আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ দেখিলেন যে, পার্থিব প্রতিপত্তি লাভ করিতে হইলে পাশবিক ও আসুরিক শক্তির প্রয়োজন অনপনোদনীয়, তদ্ব্যতীত শক্তিসম্পন্ন বর্ব্বরজাতির উচ্ছেদ করিয়া শান্তিস্থাপন করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তখন তাঁহারা শক্তির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সাধনার পথে উজ্জ্বল জ্যোতির বিকাশ দেখিয়া সেই অপৌরুষেয় শক্তির সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অহমিকাপ্রাণ পুরুষকারের অতীত শক্তির সন্ধান পাইয়া অপরাজেয় দৈবী শক্তির উপাসক সাধক মহাত্মা আর্য্য ঋষিগণ দৈববলে বলীয়ান্ হইতে চাহিয়া নির্জ্জন নির্ব্বিঘ্ন স্থান সন্ধান করিতে লাগিলেন। এই অনুকূল অবসরে যে যে অভিব্যক্ত শক্তির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল, অপ্রতিহত দুর্দ্দম বেগ দর্শন করিয়া তাহাদিগকে দৈবশক্তির প্রকাশমাত্র স্থির করিয়া দেবতাভাবে ঋষিগণ পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অগ্নি, পর্জ্জন্যদেব, ইন্দ্র, মরুৎ প্রভৃতি দেবসম্বন্ধীয় ঋক্ উচ্চারণ করিয়া তাঁহাদিগের দেবত্বের শ্লাঘা করিতে থাকিলেন। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত স্বরভেদে বৈচিত্র্যময় সরভ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ ভেদে সপ্ত স্বরে সম্যক্ ব্যাহৃতি স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল শূন্য অবকাশের ভিতর দিয়া স্পন্দিত করিয়া ব্রহ্মত্ব-পরিকল্পনার শেষ হইল। স্বচ্ছ সুশীতল স্রোতস্বিনীর সরস করিয়া জীবনপ্রবাহ অব্যাহত এবং ওতপ্রোত রাখে দেখিয়া তাঁহারা ব্রহ্মত্ব আরোপিত করিয়া জলের দেবত্ব ফুটাইয়া তুলিলেন। যে স্রোতস্বিনী এই জলের আধারস্বরূপ হইয়া সকল দিকে সকলের তৃষ্ণা দূর করিতে থাকিল, যাহার জল পান করিয়া পৃথিবী শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিতে থাকিল, যাহার সুশীতল জলে অবগাহন করিয়া ক্লান্তি একবারে অপনোদিত হইতে থাকিল, সেই পবিত্রতাময়ী স্রোতস্বিনীকে প্রাণদাত্রী দেবী পরিকল্পনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ঋগ্বেদের ক্রমিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, আর্য্য তাপসগণ সর্ব্বপ্রথমে ভারতের যে অংশে বসবাস করিতেছিলেন, তাহা পাঁচটি নদীর দ্বারা বিধৌত হইতেছিল। এই জন্য এই প্রদেশ পঞ্চনদ নামে অভিহিত ছিল। এই প্রদেশকে বিধৌত করিয়া কিরণা, ধূতপাপা, সরস্বতী, গঙ্গা ও যমুনা এই পঞ্চনদের অন্যতমা যে সরস্বতী নদী আনন্দোচ্ছ্বাসে কুলুকুলু নাদে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহার তীরভূমি নির্জ্জন ও নির্ব্বিঘ্ন পাইয়া আর্য্যতাপসগণ দৈববলের সন্ধানে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। স্বচ্ছতোয়া সরস্বতীর তীরে সুর, লয় ও তালের ভিতর দিয়া শব্দের মূর্চ্ছনা আত্মপ্রকাশ করিয়া অনন্তে

মিশিবার সুযোগ পাইল। তাঁহারা দেখিলেন, শব্দের অন্ত নাই, শব্দের শক্তি অনন্ত। যতই সাধনা করিতে লাগিলেন, ততই শব্দের শক্তি স্ফুরিত হইতে লাগিল। ঐ শব্দের সাধনাই তখন একমাত্র লক্ষ্য হইল। ক্রমে এই সরস্বতীর কলকলনাদের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া আপনি স্ফুরিত ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারিত হইতে থাকিল। তখন ঋক্‌মন্ত্র আর সরস্বতীর কলকলধ্বনির ভিতর কোন পার্থক্য রহিল না। সুতরাং সরস্বতী-নদীকে দেবী কল্পনা করা সহজ হইয়া পড়িল। তাহা হইতে উদ্ভূত ধ্বনি শব্দময় ব্রহ্মের কল্পনার উপচার শব্দতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিল এবং তাহাই তাহার পরিণতিরূপে সরস্বতী ব্রহ্মের আত্মা হইতে নিঃসৃতা ভক্তের মনে বিশ্বাস স্থাপন করাইয়া দিল। শব্দের সাধনাস্থল সরস্বতী নামান্তরে বাণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে গৃহীত হইল। তখন যাঁহারা বাণীর উপাসনা করিতেছিলেন, তাঁহারা সরস্বতীর উপাসনা করিতে লাগিলেন। সুতরাং বাগ্দেবী আর সরস্বতী এক হইয়া উঠিলেন। অগ্রে শব্দশক্তির যে অধিষ্ঠাত্রী দেবী কল্পনা করিয়া বাগ্দেবীর সর্ব্বশুক্লত্ব প্রচার হইতেছিল, এই সরস্বতীর তীরে ধ্বনিতে ও প্রতিধ্বনিতে সাধনার বাণীতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়া এক নূতন শক্তিতে নূতন পূজা নূতন নামে প্রচার হইতে লাগিল। এই বাগ্দেবীর পূজার সময় নির্ণয় করিতে কোনই কষ্ট পাইতে হইল না। যখন শব্দ আপনা আপনি স্পন্দনের ভিতর দিয়া ফুটিয়া ওঠে, এক অভিনব আভ্যন্তরীণ প্রেরণার অভিতাড়নে প্রকৃতির স্বতঃ আবির্ভাবে, তখনই এই বাণীর ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার আরাধনার অবসরকাল আসিয়া উদয় হইয়া থাকে। যখন ফুল প্রথম ফুটিয়া প্রাণের ভাষা টানিয়া বাহির করে, কোকিল আম্র-মুকুলের স্তবকে লুকাইয়া মধুর কূজনে, পরাণে অব্যক্তভাবের প্রেরণার অব্যক্ত অথচ ব্যক্তভাষার সৃষ্টি করিয়া দেয়, সৌন্দর্য্যের রাশি উপহার দিয়া যখন উদ্ভিন্ন যৌবনে প্রকৃতি সাজিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন এই বাগধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী কণ্ঠলগ্না হইয়াও প্রাণের অব্যক্ত পুলক ভাষায় প্রকাশ করিয়া আপনার পূজার সময় করিয়া লন। তাই বসন্তের এই প্রকৃতিগত উন্মেষণার ভিতর বাণীর আরাধনার শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। শক্তির আরাধনায় সরস্বতী-নদীর কুলুকুলুনাদী উর্ম্মি-মালা প্রাচীন আর্য্য-ঋষিগণের হৃদয়ের গোপনভাবের সন্ধান পাইয়া সাধনার সিদ্ধিলাভ করাইয়া দিল শব্দের সাধনায় ঐশী শক্তির পরিস্ফুরণে। তাই সরস্বতীর নাম চিরস্মরণীয় করিতে কৃতজ্ঞ ভক্ত-হৃদয় বাগ্দেবীর পূজার নামান্তর শব্দের সাধনাস্থল সরস্বতী—তাহার পূজায় পর্য্যবসিত করিল।

যত দিন বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, গৃহ্যসূত্র, কল্পসূত্র ও প্রাচীন স্মৃতির যুগ চলিয়া আসিতেছিল, তত দিন এই বেদোক্ত শব্দ-ব্রহ্মের অন্যতম ষড়ৈশ্বর্য্যময় ব্রহ্মত্বের অংশোপাদান বাণীর উপাসনা বৃহন্মন্দবীচিমালা-সংক্ষোভিতা কলনাদিনী স্বচ্ছতোয়া সরস্বতী-নদীর নির্জ্জনতা ও নির্ব্বিঘ্নতার ভিতরে সাধনার সিদ্ধিলাভের সংস্কারের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া সরস্বতী দেবীর নামান্তর বাগধিষ্ঠাত্রী দেবীর আরাধনা হইয়া আসিতেছিল। পুরাণাদি-যুগে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত সংস্কারের পরিবর্ত্তন ঘটিল। সময়ের পরিবর্ত্তনে যখন মানব দীর্ঘজীবনলাভে বঞ্চিত এবং শক্তিহীন হইয়া আসিল, তখন তাহার কল্পনা ও ধারণাশক্তিরও হ্রাস হইল। সুতরাং বেদোক্ত ব্রহ্মের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ে স্পন্দনধৃত শব্দময়ী শক্তির কষ্টসাধ্য কল্পনা ও ধারণা করিতে জীব অক্ষম হইয়া পড়িল। এই সময়ে দেবতা আর কল্পনা ও মানস-চক্ষুর গোচরীভূত স্বর্গে জীব হইতে পৃথক্ হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার মাতা, পিতা, স্বামী ভ্রাতা, মাতুল বা অন্য কোন অতি নিকট-আত্মীয় হইয়া তাহারই নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কাহারও স্বামী, কাহারও ভ্রাতা কাহারও বন্ধু, কাহারও বা পিতারূপে এই মর্ত্ত্যলোকে মর্ত্ত্যদেহে বিচরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক ভাব সকলেই দেখিয়া বিস্মিত হইল। এত দিন মর্ত্ত্যবাসী দেবতা সম্বন্ধে যে সর্ব্বব্যাপকতা কল্পনানয়নে দেখিয়া আসিতেছিল, আজ শ্রীকৃষ্ণের বদনবিবরে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র মহীরুহ মহীধর সাগর নদী তড়াগ বাপী পল্বল পৃথিবী সৃষ্টজীব সকলই দেখিয়া চরাচরে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বব্যাপকতায় ব্রহ্মের সহিত তাঁহার অভিন্নত্ব স্থির করিয়া তাঁহার বাস্তব প্রত্যক্ষ আবির্ভাবে শব্দশক্তির পরিস্ফুরণ দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া গ্রহণ করিয়া অতীতের সে শব্দ-সংস্কারে বাণীর আরাধনা মিশাইয়া দিল। তখন জ্যোতীরূপা ও স্পন্দনময়ী শক্তিদ্বয়ের নূতন নামকরণ হইয়া গেল।—প্রাণাধিষ্ঠাত্রী জ্যোতীরূপিণী শক্তি শ্রীরাধার নামে পরিচিত হইয়া উঠিল।—আর অপরা জ্ঞান-ময়ী বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী শক্তি সরস্বতীর নামে সাধারণের নিকট সমাদৃত হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন আর শ্রীকৃষ্ণের সহিত কোন সংস্কারই অসংশ্লিষ্ট রহিল না। সৃষ্টির সংস্কারও তাঁহার সহিত জড়িত হইয়া উঠিল। ঈশ্বর অর্থে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে তাঁহার শক্তি রাধা ও সরস্বতী নামে দুই এবং এই শক্তিদ্বয় আবার রাধা, পদ্মা, সাবিত্রী, দুর্গা ও সরস্বতী নামে পঞ্চপ্রকার ভেদে সাধারণের গোচরীভূত হইল। এই সংস্কার পুরাণাদিতে চিরদিনের জন্য স্থানলাভ করিল ও সরস্বতীর জন্মাদিবৃত্তান্ত লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মের মুখনিঃসৃত সৃষ্টি করিবার স্বতঃ প্রেরণার বাণী শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বলিয়া প্রচারিত হইল। সেই বাণী মোহিনী সর্ব্বশুক্লা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অংশোৎপন্না, সুতরাং তদভিসারিকারূপে আবির্ভূতা হইল। শ্রীকৃষ্ণকে কামভাবে সেবা করিতে প্রার্থনা জানাইল। শ্রীকৃষ্ণ এই মোহিনীকে বৈকুণ্ঠবাসী নারায়ণের কণ্ঠলগ্না হইয়া থাকিতে উপদেশ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য চিন্তা যখন তিরোহিত হইল, তখন সৃষ্টিপ্রকরণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অধিকারপ্রাপ্ত তিন প্রতীক চরাচরের প্রভু প্রকাশ করিয়া আপনারই আত্মার প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছুরই প্রকাশ করিলেন না। সুতরাং বৈকুণ্ঠবাসী নারায়ণ বা বিষ্ণু যে তিনিই, তাহা অপরিস্ফুট রহিল না। সুতরাং বাণী মোহিনী মূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে কামভাবে প্রার্থনা করিয়া তাঁহার উপদেশমত বৈকুণ্ঠবাসী নারায়ণ বা বিষ্ণুর কণ্ঠলগ্না হইয়া থাকিবার অধিকারে প্রকারান্তরে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণেরই কণ্ঠলগ্না হইয়া রহিলেন। বাণী যে তন্ময়ী, তাহার আর সন্দেহ রহিল না। শব্দময় যে শ্রীকৃষ্ণ—তাহা গঠিত হইয়া উঠিল। এই বাণীর প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন

য, যে ব্যক্তি মূলমন্ত্রে এই দেবীর পূজা করিবে এবং দেবীর নাম ও মূলমন্ত্রসঞ্জীবিত কবচ ধারণ করিয়া প্রত্যহ তাঁহার নাম জপ করিবে, তাহার সকল আপদ দূর হইয়া যাইবে এবং দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, মর্ত্ত্য ও নাগলোকে তাহার বিদ্যার প্রতিষ্ঠা হইবে। এমন কি, এই শক্তিপরিস্ফুরণের জন্য তিনি স্বয়ং দেবীর আরাধনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই শব্দশক্তিময়ী দেবী সরস্বতী যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের আত্মায় আত্ম-সমর্পণ করিলেন, তাহা নহে; লক্ষ্মী ও গঙ্গাও তাঁহার স্ত্রীরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সাগর মন্থন করিয়া লক্ষ্মীর উদ্ভব হইয়াছিল। তাঁহাকে বিষ্ণু গ্রহণ করিলেন, ইহাই লোকপ্রসিদ্ধি। ভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্টা বরারোহা মুক্তিদায়িনী মন্দাকিনী ধূর্জ্জটির জটাভারে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহারই হৃৎস্থিতা দেবীরূপে পরিচিতা। বিষ্ণু বা নারায়ণের দুই ভার্য্যা, অংশরূপিণী সরস্বতী ও লক্ষ্মী এবং শিব-সোহাগিনী গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণের ভার্য্যারূপে কথিত থাকায় শ্রীকৃষ্ণে, বিষ্ণু ও শিবের পরিণতি এবং শ্রীকৃষ্ণের মনোময়ী ইচ্ছার বিকাশেই চরাচরের আবির্ভাবের কথার সহিত ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য্যে একাধিকারিত্বের শ্রীকৃষ্ণেই পরিণতি অসন্দিগ্ধরূপে শ্রীকৃষ্ণকেই ব্রহ্মস্বরূপে গ্রহণ করিল, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইতে দিল না। যখন এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রহ্ম অভিন্ন প্রচারিত হইল, তখন তাঁহার সরস্বতী ও লক্ষ্মী শক্তিদ্বয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও আশ্রয়গ্রহণ-বিচারে শক্তির আরাধনায় ভক্ত সাধক ভীষণ সমস্যায় আসিয়া পড়িল। অমনি ভক্তাধীন শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে বাসনার বিকাশ হইল। তিনি ভক্তের সাধনার পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ভক্ত সাধক ধন্য হইল!

ব্রহ্মার মানস-পুত্র ভৃগু প্রজাপতিগণের অন্যতম। প্রজাপতি নিদ্রিত বৈকুণ্ঠবাসী নারায়ণের বক্ষে পদাঘাত করেন। ভক্তাধীন নারায়ণ নিদ্রাভঙ্গে স্মিতহাস্যে প্রজাপতি ভৃগুর শ্রীচরণে আঘাত লাগিয়াছে কি না, তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারই পদসেবা করিতে তৎপর। প্রজাপতি নারায়ণের আপনার-করা ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত—কি করিবেন, কি বলিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার কন্যা লক্ষ্মীদেবী নিদ্রিত নারায়ণের পদসেবার রত ছিলেন। পিতার এইরূপ অবিচারে মর্ম্মাহতা হইয়া আর পিতৃকুলে যাইবেন না বলিয়া অভিমান করিলেন। ভৃগু অবসর পাইলেন। সৌভাগ্যের সাধনায় আত্মজ্ঞান হয় না, এই জ্ঞানে প্রজাপতি তাঁহার কন্যার অভিমান দূর না করিয়াই তাঁহার নিকট চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং বলিয়া আসিলেন যে, তিনি কেন, সমগ্র ব্রাহ্মণ আর তাঁহার কখন সেবা করিবেন না। ইহা অভিমানের পরিণতি। তখন ভক্ত সাধক সরস্বতী শক্তিরই আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই ঘটনা আশ্রয় করিয়া অনেক গল্প রচিত হইল। এক হইতে জনান্তরে আখ্যাত হইয়া ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীর পরস্পর প্রতিযোগিতার কথায় তাহার পরিণতি হইল। বহুবার লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লক্ষ্মীর পরাভব ও সরস্বতীর বিজয়বার্ত্তা বিঘোষিত হইতে লাগিল। উন্নতি অর্থে জনসমাজ ধনসম্পত্তির জন্য সৌভাগ্য বুঝিল না—কেবল বুঝিল আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানই উন্নতির চরমোৎকর্ষ। সুতরাং ব্রহ্মের সাধনায় অর্থাৎ শব্দের সাধনা করিতে উৎসুক ভক্ত-হৃদয় শব্দশক্তিময়ী শ্রীসরস্বতী দেবীর আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিল। শ্রীসরস্বতী দেবীর প্রতিষ্ঠা হইল।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পাঠ করিয়া জানিতে পারা যায় যে, ভারতের আর্য্যাবর্ত্ত ভূমিভাগে বসন্তের আগমে নূতন ফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী এক নূতন আমোদের প্রেরণায় পুলকিত হইয়া উঠিত। সেই আনন্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্বরূপে সকল আনন্দের আবাসভূমি মদনদেবের পূজা হইত। তদুপলক্ষে নর-নারী আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই কালোচিত বসন-ভূষণে সুশোভিত হইয়া সেই আনন্দে যোগদান করিত। এমন সুন্দরভাবে এই মহামহোৎসবের আয়োজন হইত যে, যে যেমন ব্যক্তি হউক না কেন, এই উৎসবে যোগদান করিতে কাহারও কোন অসুবিধা হইত না। বসন্ত-রঙ্গে নূতন কাপড়, উড়ানি, পিরাণ, কাঁচলি, ওড়না প্রভৃতি বসন ছোপাইয়া, ফুলের পরাগে অঙ্গরাগ করিয়া, ফুলের মালা মস্তক, কবরী ও গলদেশে ধারণ করিয়া, ফুলের কুণ্ডল, বাউটি প্রভৃতি অলঙ্কারে দেহের সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া এই মহামহোৎসবে যোগদান করিত, এবং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া গিয়া ধনী দরিদ্র আপামর সাধারণে এই মহোৎসবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিত। পূজার উপচারেও ধনী বা দরিদ্র বলিয়া কাহারও কোন পার্থক্য করিবার কারণ ছিল না। বসন্তোদ্গমে আম্রমুকুলে সূর্য্যকিরণ দশদিকে সোনার বর্ণ ছড়াইয়া দেয়। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, যত দূর দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ একই সৌন্দর্য্য কেবল নয়নে ফুটিয়া উঠে। এই বসন্তের চিরসহচর আম্রমুকুলে মদনদেবের অধিবাস, আমন্ত্রণ ও পূজা সম্পন্ন হইত। আর এই মহামহোৎসবের প্রাণ ছিল পরস্পরের সহিত সখ্যতায় ও বিশ্বাসে। সুতরাং কাহারও সে মহামহোৎসবে যোগদানে কোন বাধা ছিল না। আম্রমুকুলে অঞ্জলি ভরিয়া মদনদেবের শ্রীচরণে উপহার দিত, নির্ম্মল আনন্দে, প্রাণখোলা মিলনের সুখে নৃত্যগীতে সকলে যোগ দিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিত। ভাবে ও রসে হৃদয় ভরপূর হইয়া উঠিত। বহুকাল যাবৎ এই প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই মহামহোৎসবে একটা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইত। কল্পনার মনোমোহন সৌন্দর্য্যের রূপ লোক দেখিতে পাইত না। তাই যাহা হইবার তাহাই হইল। অত্যাধিক আনন্দে অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। আরও যখন ভিতরকার শক্তি কমিতে থাকিল, তখন এই মহানন্দের ধারা ধরিয়া রাখা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। নদীর এক কূল ভাঙ্গিলে যেমন অপর কূল গজাইয়া উঠে, তেমনই এ আনন্দে অবসাদ আসিলে মন তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে তাহা অধিক শক্তিসম্পন্ন আনন্দের আস্বাদন সন্ধান করিয়া থাকে। এই মহামহোৎসবের প্রাণ নষ্ট হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিক্ হইতে আর এক আনন্দের প্রেরণা আসিয়া উপস্থিত হইল। যে সাধক-সম্প্রদায় শব্দশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া বাণীর তথা তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী দেবীর পূজা আপামর সাধারণের আদরের বস্তু করিয়া তুলিতে প্রাণপাত করিতেছিল, সে এই সুবর্ণ সুযোগ হারাইল না। ... দেখিল যে, মদন-পূজার উপলক্ষে মহামহোৎসবের অত্যাধিক পার্থিব সুখ-লালসার পরিপূর্ণতায় যে অবসাদ আসিয়া পড়িয়াছে, নূতন নূতন ভাব ও রসের সৃষ্টি করিয়া যে আনন্দধারা এক প্র...

হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আর প্রবাহিত হইতেছে না, সেই আনন্দের প্রকৃত অনুভূতির অভাবে সাধারণ নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে, সেই অবসাদে কালের সম্মুখস্রোতে পতিত হইয়া নব-জীবনলাভ—নব নব উৎসাহে দৈনন্দিন কর্ম্মের পথে জটিলতা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। তখন সেই সম্প্রদায় নূতন জীবন লাভ করিবার এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া সকলের নিকট এক নূতন প্রেরণা আনিয়া দিল। মদন-পূজার উপচার আম্রমুকুল রহিল, মদন-পূজার পদ্ধতি রহিল, সকলই সেই রহিল, সেই বেশভূষা রহিল, সেই আনন্দ রহিল, সেই আচণ্ডাল অধিকার রহিল, সেই কাল রহিল, সেই সম্মিলনী রহিল, কেবল পরিবর্ত্তন হইল উপাস্য দেবতার মূর্ত্তিতে ও আনন্দের ভিতরে চিরন্তন কল্পনার উৎসপ্রস্রবণে! সেই আম্রমুকুলেই দেবীর আরাধনা হইতে লাগিল, সেই ফুলহারে দেবীকে সাজান হইল, সেই ভক্তি, প্রেম ও বিশ্বাসে অঞ্জলি ভরিয়া দেবতার চরণে উপ-হার দেওয়া হইতে থাকিল, সেই দৈনিক কর্ম্মের অবসান করাইয়া নিরবচ্ছিন্ন নৃত্যে ও গীতে আনন্দ উপভোগ করিতে মন আবার নূতন ছন্দে, নূতন গন্ধে, নূতন পুলকে নূতন হইয়া মাতিয়া উঠিল। সে দিন ছাত্র চিরাভ্যস্ত বিদ্যাভ্যাস হইতে বিরত হইল, বৈদিক যত সংস্কার আছে, তাহার নিষেধ হইল। ব্যবসায়ী ব্যবসায় ছাড়িয়া বাণীর উপাসনায় মন দিল, দিবা-রাত্র নৃত্য-গীতাদিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল, আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এই বাণীর পূজায় তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী দেবীর চরণে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ধন্য হইল। আবার নূতন বৎসরের নূতন উৎসাহ হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। মন সতেজ সোৎ-সুক হইয়া প্রস্তুত হইল, সম্মুখে যাহা আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহা অবশ্য পালনীয় করিয়া লইবার উপযুক্ত অবসর করিয়া লইবে। কার্য্যতৎপরতা তাহার চিরাভ্যস্তের মত হইয়া উঠিবে।

এইরূপে প্রাচীন প্রথার পরিবর্ত্তে যে নূতন প্রেরণা জাগিয়া-ছিল, তাহার দ্বারা প্রচলিত নূতন প্রথায় নূতন প্রেম জাগিয়া উঠিল। মদন-পূজায় চিত্তের উম্মাদনায় যে দেবভাবের অভাব ছিল, তাহা এই বাগ্দেবীর কৃপায় পূর্ণ হইয়া গেল। মদন-পূজার বিশেষত্ব ছিল এই যে, তাহাতে পরিকল্পিত পার্থিব লালসারই তৃপ্তিসাধনের যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহারই আয়োজন করা হইত। এই বাগ্দেবীর আরাধনায় পার্থিব কামনার সহিত অনানুষিক আধিদৈবিক শক্তির প্রার্থনা সংযোজিত হইয়া মোহময় আনন্দের ভিতরে জ্ঞানের লিপ্সা জাগিয়া উঠিল—"হে বাগ্দেবি, আমাদিগকে প্রকৃত জ্ঞান দিন, যাহাতে আমরা সদসৎ বিচার করিতে সমর্থ হইয়া মনের প্রকৃত উন্নতিসাধন করিতে পারি।" এই সভক্তি প্রার্থনা আনন্দানুভবের সঙ্গে সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। যখন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল, তখন সাধক সম্প্রদায় যাহা চাহিতেছিল, তাহা সুসম্পন্ন হইয়া গেল। ক্রমশঃ শ্রীসরস্বতী দেবী সর্ব্বজ্ঞানদায়িনী মহেশ্বরী হইয়া সাধারণের আরাধ্য উপাসনার দেবতা হইয়া উঠিলেন। জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলের হৃদয়ে এমন দুরপনেয় স্থান অধিকার করিলেন যে, সকলেই একই মতের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণে প্রাণে বুঝিল ও বিশ্বাস করিল যে, শ্রীসরস্বতী দেবী বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁহার পূজা, সন্তুষ্টি ও করুণার প্রসাদ ব্যতীত চিন্তা করা ত দূরের কথা, কেহই কথা পর্য্যন্ত কহিতে পারে না। যে ব্যক্তি এই বাগ্দেবীর আরাধনা না করিবে, তাহার বাক্‌রোধ হইয়া যাইবে। ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে যেমন কলির সৃষ্টি করিয়া সত্যের আলোকে মুক্তি ও মিথ্যার প্ররোচনায় ধ্বংস—অন্ধকার মনীষা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছে, তেমনই বাগ্দেবীর আশ্রয়ে জ্ঞানের উন্মেষ, ব্রহ্ম-প্রাপ্তির অবসর, আর ভ্রষ্টা সরস্বতী—অর্থাৎ কর্ত্তব্যে অবহেলার আপাতরম্য কুরুচির সম্মোহন-প্ররোচনায় নরক—চির-অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। এই নরকের কল্পনা করিয়া কুপথের বিভীষিকা দেখাইয়া কর্ত্তব্যহীন পথ হইতে আত্মধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার দিকে টানিয়া আনিতে মনীষী শাস্ত্রকারগণ এক অপূর্ব্ব সংযোজনা করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধিবৃত্তি সাধুদিগকে পরিচালিত করিতেই নরকের কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে এই বাগ্দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, ইহাই মানবমাত্রেরই দৃঢ় ধারণা হইয়া আসিল। তখন শব্দসাধনার কথা মানব-হৃদয় হইতে তিরোহিত হইল—সে কথা ভুলিয়া সরস্বতী দেবীর আরাধনাতে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া দিল। ইহাতে সে পাইল আত্মজ্ঞান—সে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির মূল সূত্রের সন্ধান পাইল। সকল দিক্ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সরস্বতী-পূজায় ব্রহ্মেরই পূজা হইয়া থাকে। কষ্ট-সাধ্য নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা অল্পায়াসসাধ্য সাকার সরস্বতী দেবীর উপাসনাতে পর্য্যবসিত হইল। তখন তাঁহার করুণার কথা এবং তাঁহার করুণা পাইয়া বিদ্যার সম্যক্ পরিস্ফূর্ত্তি সাধারণের গোচরীভূত হইয়া এক বিরাট বিশ্বব্যাপিনী ক্রমপ্রসারিণী কল্পনার সৃষ্টি হইল। শ্রীসরস্বতী দেবীর কৃপায় মহাকবি কালিদাস প্রভৃ-তির অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়া জ্ঞানোন্মেষের কথা সাধারণে প্রচার হওয়ায় শ্রীসরস্বতী দেবীর করুণা, তথা ষড়ৈশ্বর্য্যময়ের শক্তিত্বের কথা ভারতের প্রতিগৃহে প্রতি জনে চিরদিনের জন্য স্থান পাইল।

মাঘের এই শুক্লা পঞ্চমী তিথি মদনদেবের পূজা ও শ্রীসরস্বতী দেবীর সংস্কারের সহিত জড়িত থাকিয়া চিরদিনের জন্য অমরতা লাভ করিয়াছে। এই বসন্তে মদনপূজার সহিত জড়িত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের হিন্দোল-যাত্রা পর্য্যন্ত এক বিপুল উৎসবের সমাবেশ ছিল। এখনও পশ্চিমদেশ অঞ্চলে এই পঞ্চমীতিথি হইতে ভজন-গান প্রচলিত আছে। তাই এই মাঘের শুক্লা পঞ্চমী বাসন্তী-পঞ্চমী বা শ্রীপঞ্চমী নামে প্রতি হৃদয়ে বৈদিক যুগ হইতে ইদানীন্তন কাল পর্য্যন্ত ভক্তি ও প্রেমে অপূর্ব্ব সংস্কার জড়াইয়া রাখিয়াছে।

মা'র আরাধনা করিতে সন্তান ভালবাসে, ফলের দিকে লক্ষ্য রাখে না। আমি তাঁহার অকৃতী সন্তান। আজ সুধীজন-সমাজে যদি তাঁহার করুণার শতাংশের একাংশও কথায় ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমার মনুষ্যজন্ম সার্থক হই-য়াছে। যিনি সকলের আনন্দময়ী মা, তিনি আমারও মা। তিনি ভাষা দিউন, ভাব দিউন, শক্তি দিউন, আমি তাঁহার কৃপা-করুণা পাইয়া ধন্য হই! এস আজ দীন-দরিদ্র ধনবান্, এস আজ সকলে সেই দেবীর ভাষায়, সেই দেবীর শ্রীচরণে অর্ঘ্য দান করি—প্রার্থনা করি, যেন সেই দেবীর পূজায় সেই দেবীরই ভাষার প্রেরণা পাই!

শ্রীমন্মথনাথ বিদ্যাভূষণ (এম এ, অধ্যাপক)।

নারীর অধিকার

গ্রেটবৃটেনের পার্লামেন্টের লর্ড সভায় নর-নারীর প্রবেশাধিকার কিরূপ, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য একটি কমিটী বসিয়াছিল। তদন্তে সাক্ষীর মুখে প্রকাশ পায়, প্রাচীনকালে বিলাতের অভিজাতবংশীয়া নারীদের লর্ড সভায় আহ্বান করা হইত। কিন্তু ঐতিহাসিকরা এ কথা স্বীকার করেন না।

এ সম্বন্ধে রাটল্যাণ্ডের কাউণ্টেসের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হয়। তাঁহার বিপক্ষে আদালতের পরওয়ানা বাহির হয়। কথা উঠে, তাঁহাকে ঐ পরোয়ানার জোরে ধরা যায় কি না। তখন আদালত যে সিদ্ধান্ত স্থির করেন, তাহা লর্ড কোক তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৫৫২ খৃঃ হইতে ১৬৩৪ খৃঃ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের প্রধান ব্যবহারাজীব ছিলেন। আদালতের মন্তব্য এইরূপ :—

"বিবাহ ও উত্তরাধিকার সূত্রে যিনি আইনের দৃষ্টিতে কাউণ্টেস বলিয়া পরিগণিত, তাঁহাকে ঋণ অথবা অনধিকারপ্রবেশ অপরাধে ধৃত করা যায় না। কারণ, যদিও তিনি তাঁহার নারীত্ব হেতু পারলামেণ্টে প্রবেশ করিতে পারেন না, তথাপি বৃটিশ রাজ্যের অভিজাতবংশীয়া বলিয়া তাঁহাকে এই অপরাধে পুলিস ধৃত করিতে পারে না।" ইহার পরেও আইনজ্ঞরা অন্যান্য মামলায় এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সুতরাং নারী যে পারলামেণ্টের সদস্যরূপে প্রবেশ করিতে পারেন না, তাহাই এ যাবৎ আইনে স্থির হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে Sex disqualification removal Act. বিধিবদ্ধ হয়। ইহাতে স্থির হয় যে, "কোন ব্যক্তি আইনে যৌন অযোগ্যতা হেতু (অর্থাৎ নারীত্ব হেতু) অথবা বিবাহ হেতু সাধারণের কার্য্যসম্পাদনে অনধিকারী হইবে না, অথবা কোন সরকারী বা বে-সরকারী আফিসে কার্য্য গ্রহণ করিতে অনধিকারী হইবে না।" তৎকালীন এটর্ণী জেনারল সার গর্ডন হিউয়ার্ট অভিমত প্রকাশ করেন যে, পারলামেণ্টের নির্ব্বাচনকালে ভোট দেওয়া বা পারলামেণ্টে সদস্যরূপে প্রবেশ করার ব্যাপারও সাধারণের কার্য্য করার অন্তর্ভুক্ত।

এই আইনের জোরে নারী লর্ড চ্যান্সেলার এবং প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত হইতে পারেন। রাজা ইচ্ছা করিলে নারীকে সৈন্যদলেও গ্রহণ করিতে পারেন। আইনে তাহার বাধা নাই। আইন অনুসারে নারী প্রধান সেনাপতির পদও প্রাপ্ত হইতে পারেন।

কিন্তু সম্প্রতি ইংলণ্ডে নারীকে পুলিসপ্রহরীরূপে অপরাধী পুরুষকে গ্রেপ্তার করিবার অধিকার দেওয়া উচিত কি না, এই সম্বন্ধে এক মামলায় কথা উঠিয়াছিল। বিরুদ্ধবাদীরা আইনে কোন বাধার সন্ধান দিতে পারেন নাই, কেবল বলিয়াছিলেন, নারীর হস্তে পুরুষ ধৃত হইলে পুরুষের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জা ও অপমানের কথা!

যাহা হউক, বর্ত্তমানে নারীর অধিকার আইনে পুরুষের সমান বলিয়া প্রতীচ্যে স্বীকৃত হইতেছে। আমাদের দেশেও নারী এখন ব্যারিষ্টার হইতেছেন; মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, ব্যবস্থাপক সভার কাউন্সিলার, কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক হওয়াতেও তাঁহাদের বাধা নাই। ইহা ছাড়া, নারী ডাক্তার, নারী নার্শ, নারী কম্পাউণ্ডার, নারী সভানেত্রী এখন ত সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। নারী-প্রগতির সমর্থকরা বলেন, এ দেশে নারী যখন প্রাচীন কালেও রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, সৈন্যদলে নেতৃত্ব করিয়াছেন, তখন এখনকার কালে তাঁহাদের অন্যান্য কার্য্যে পুরুষের সমকক্ষতা করায় আপত্তি কি?

অদ্ভুত বিবাহ

প্রতীচ্যে সভ্যতার 'উৎকর্ষের' সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ-ব্যাপারে নানাপ্রকার অদ্ভুত ব্যবস্থার কথা শুনা যাইতেছে। মার্কিণ দেশই এ সকল ব্যাপারে সকলের অগ্রণী। এই দেশে গত ৮ই জানুয়ারী তারিখে এক অদ্ভুত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের নাম উইলিয়াম মোয়ের। সে ও তাহার তরুণী পত্নী বিবাহজগতে যে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে, সে জন্য তাহাদের নাম বিবাহ-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকা কর্ত্তব্য।

আধুনিক বিবাহের চুক্তিতে সন্তান-জন্ম-নিরোধ এবং বন্ধুত্বমূলক সাহচর্য্য ইত্যাদি নানা অভূতপূর্ব্ব কথা শুনা যায়। কিন্তু মোয়ের ও তাহার পত্নী জন্ম-নিরোধের বিপক্ষেই চুক্তি করিয়া উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। তাহারা কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে চুক্তি করিয়াছে যে, তাহারা উভয়ে স্বেচ্ছায় সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতেছে। চুক্তিটি এইরূপ :—

"যদি দুই বৎসরের মধ্যে আমরা আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে না পারি, অর্থাৎ সন্তান উৎপাদনে সমর্থ না হই, তাহা হইলে দুই বৎসর পূর্ণ হইলে পর আমাদের মধ্যে যে কেহ অপরের সম্মতি গ্রহণ না করিয়াও বিবাহের বন্ধন পূর্ণরূপে ছেদন করিবার জন্য বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবে।"

এই চুক্তিপত্রটি সরকারী দলীলরূপে গৃহীত হইয়াছে। কে বলে মার্কিণ মুল্লুকেও অদ্ভুত জিনিষের অসদ্ভাব হইয়াছে?

এই ব্যাপারকে পৃথিবীর নবম আশ্চর্য্য পদার্থরূপে ধরিলে ক্ষতি কি ?

চীনদেশে নূতন সমস্যা

সম্প্রতি চীনের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের রাজধানী নানকিং সহর হইতে চীন সরকারের এক ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে। ঘোষণার মর্ম্ম এইরূপ :—

"চীনদেশের প্রত্যেক বিভাগে চীনের জাতীয় প্রজা এবং বিদেশী প্রজা—সকল প্রজাই অতঃপর চীন সরকারের প্রবর্ত্তিত একই আইনের আমলে আসিবে এবং চীনের জাতীয় আদালতে সকলেরই অপরাধের বিচার হইবে।" চীন সরকার ইহার উপর টিপ্পনী করিয়া বলিয়াছেন, চীন সরকারের জাতীয় প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল, এই ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক আইনের অনুমোদিত।

চীন সরকার এ কথা বলিতে পারেন, তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত আইন অনুসারে সে কথা বলিবার অধিকার আছে। কেন না, চীন স্বাধীন। অন্যান্য স্বাধীন জাতিরা যখন এই অধিকার উপভোগ করে, তখন চীনই বা করিবেন না কেন ?

কিন্তু একটা কথা আছে। চীন স্বাধীন বটে, কিন্তু এখনও দুর্ব্বল এবং গৃহবিবাদে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। ইহা নিশ্চিত যে, বক্সার বিদ্রোহের কাল হইতে বহুদিন যাবৎ চীন নামে স্বাধীন থাকিলেও অন্ততঃ সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী রাজ্যাংশে প্রকারান্তরে বিদেশী শক্তি-সমূহের অধীন ছিলেন। তবে এই অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন শক্তিপুঞ্জ তাঁহাকে উচ্চাসন দিতে বাধ্য হইয়াছেন, কেন না, চীনের জাতীয় দল বাহুবলে প্রায় সমগ্র চীনকে একই শাসনাধীনে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং রাজ্যরক্ষার্থ সুশিক্ষিত, অনলস, সাহসী সৈন্যশ্রেণী গঠন করিয়াছেন। এ জন্য চীন এখন ক্রমশঃ নিজের জন্মগত অধিকারের দাবী করিতে সাহসী হইতেছেন এবং একে একে জগতের শক্তিপুঞ্জের দ্বারা তাহা স্বীকার করাইয়া লইতেছেন।

কিন্তু এই ব্যাপারটায় একটু গোলযোগ বা সমস্যার কথা উঠিয়াছে। আজ ন্যূনাধিক ৮০ বৎসরের অধিক কাল প্রবল বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ চীনদেশে যে বিশেষ অধিকার উপভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহা চীন সরকারের এক ঘোষণায় পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইবে, এ আশা করা যায় কি ? এই বিশেষ অধিকারের নাম—Extra-territorial privileges. এই অধিকারের বলে বিদেশীরা যদি কোন অপরাধ করে, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধের বিচার হয় তাহাদেরই স্বজাতীয়দের গঠিত বিচারালয়ে। এখন হঠাৎ চীন সরকারের ঘোষণায় বলা হইতেছে, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে বিদেশীয়দিগের অপরাধের বিচার চীনের স্বজাতীয় আদালতে চীনা অপরাধীদেরই মত হইবে। বিদেশীয়দিগকে চীনের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের আইন ও নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। এক কথায় বিদেশীরা কোন বিশেষ অধিকার বা সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে না, তাহাদিগকে খাস চীনাদের সহিত সর্ব্বতোভাবে সমান বলিয়া গণ্য করা হইবে।

বাহুবল-দর্পিত, সাম্রাজ্যগর্ব্বে গর্ব্বিত প্রবল শক্তিপুঞ্জ সহজে বিনা আপত্তিতে চীন সরকারের এই ঘোষণা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে, ইহা আশা করা বাতুলতা মাত্র। চীন সরকারও এ কথা বুঝেন। তাই ঘোষণার একাংশে তাঁহারা আদেশ করিয়াছেন যে, সরকারের সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিচার ও শাসন বিভাগের কর্ম্মচারীরা যেন একটা কার্য্যপদ্ধতি গঠন করেন। ইহাতেই বুঝা যায়, চীন সরকার এখনই তাঁহাদের আদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে সাহস পাইতেছেন না। পরন্তু বিদেশীরাও সহসা এই ব্যবস্থায় সম্মত হইবেন না। তাঁহারাও সাধ্যমত ইহাতে বাধা দিবেন। ইতিমধ্যেই তাঁহারা ধুয়া তুলিয়াছেন যে, "চীনের অবস্থা অস্বাভাবিক। সেখানে বিদেশীর ধনপ্রাণ ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সহজেই বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে, উহা নিরাপদ রাখিবার জন্যই বিদেশীয়দের এই অতিরিক্ত বিশেষ অধিকারের প্রয়োজন।"

এ বড় বিষম কথা। ইহার উপরে চীন সরকারের আর কথা চলে না। চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এখনও সম্পূর্ণ নিরাপদ হয় নাই। এ অবস্থায় বিদেশীরা বলিতে পারে, তাহাদের বিশেষ অধিকারের অবসান করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু চীন সরকার যদি ইহার উপরও আপনাদের দাবী মানাইয়া লইতে নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করেন, তবেই চীনদেশে আবার এক নূতন সমস্যা উপস্থিত হইবে।

রাজা নাদীর শাহ

আফগানিস্থান হইতে এখন যে ভাবের সংবাদ আসিতেছে, তাহাতে মনে হয়, সামান্য দুই এক স্থান ব্যতীত সমগ্র আফগানিস্থান রাজা নাদীর শাহের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে এবং আফগানিস্থানে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোহিদামান ও অন্য এক স্থানের অশান্তি-দমনেও যথেষ্ট শক্তি নিয়োজিত করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ অতি অল্পকালের মধ্যেই এই দুই স্থানও রাজা নাদীরের বশ্যতা স্বীকার করিবে।

নাদীর শাহ যে এক্ষণে বহুল পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার কার্য্যেই বুঝা যাইতেছে। প্রকাশ, দেশের উন্নতিকল্পে তিনি নানারূপ সংস্কারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ ও অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেশের পণ্য অধিকতররূপে ব্যবসায়ের অনুকূল করিয়া উৎপন্ন করিবার জন্য তাঁহার সাহায্যে একটি ব্যবসায়-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহার নাম 'সারকাৎ ইসনাহ'। কাবুল ও হিরাটের কয়েক জন ধনী ব্যবসায়ী ইহার ডিরেক্টর বা নিয়ামক হইয়াছেন। ইহার মূলধন দেড় কোটি টাকা। এই মূলধন ১০ হাজার করিয়া এক একটি শেয়ারে বিভক্ত হইবে এবং আফগানী প্রজা ব্যতীত কেহ অংশীদার হইতে পারিবে না।

কিন্তু তাহা হইলেও রাজা নাদীর শাহ অন্যান্য সংস্কার-সাধনের জন্য বিদেশীর অর্থ গ্রহণ করিবেন না, এমন কোন কথা নাই। আফগানরাজ্যে মূল্যবান্ প্রস্তর, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কেরোসিন তৈল, পেট্রোল প্রভৃতির খনি আছে। খনির কায চালাইবার জন্য বিদেশ হইতে ঋণ গৃহীত হইবে।

ইহা ছাড়া আফগান রাজ্যে রেল, খাল, সেতু, পথ, সরকারী কার্য্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠারও কল্পনা করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে রাজা নাদীর বিশেষ তৎপর হইয়া উদ্যোগ-আয়োজনও করিতেছেন।

নিশ্চিন্ত হইয়া সিংহাসনে বসিতে না পারিলে এ সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে রাজ্যেশ্বরের মন লাগে না। আরও এক কারণে বুঝা যায় যে, রাজা নাদীর এখন অনেকটা ভয় ও চিন্তাশূন্য হইয়াছেন। তিনি রাজা আমানুল্লার অসমাপ্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য উহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি রাজ্যের সর্ব্বত্র আবার শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রায় সর্ব্বত্রই প্রাথমিক শিক্ষালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। এতদ্ভিন্ন তিনি রাজপ্রাসাদের বাহিরে মোটরযোগে রাজবংশীয়া সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগকে মাঝে মাঝে সহর-ভ্রমণে যাইতে দিতেছেন। অবশ্য একবারে অবগুণ্ঠনশূন্য অবস্থায় নহে, তবে মুসলমান নারীদিগের অবরোধ-ত্যাগের ফলেই আমানুল্লার বিপক্ষে মোল্লারা ষড়যন্ত্র করিবার সুযোগ পাইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, রাজা নাদীর এখন বুঝিয়াছেন যে, এরূপ করিলে বিদ্রোহ ষড়যন্ত্রের আর ভয় নাই, তাই এইরূপ করিয়াছেন।

আরও এক কারণে বুঝা যায় যে, রাজা নাদীর জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছেন। পরলোকগত আলি আমেদ জানের বিধবা পত্নী সিরাজুল বানাৎ কিছু দিন পূর্ব্বে আফগানিস্থান ত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়াছেন। তাঁহার প্রথমে পারস্যে ও পরে ইটালী দেশে ভ্রাতার নিকট যাইয়া বসবাস করা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তিনি এখন পীড়িতা কন্যার চিকিৎসার জন্য বোম্বাই সহরে অবস্থান করিতেছেন। রটিয়াছিল, রাজা নাদীর শাহের সহিত তাঁহার মতান্তর হইয়াছিল বলিয়া তিনি কাবুল ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু সিরাজুল বানাৎ স্বয়ং বলিয়াছেন, তাঁহার কন্যার চিকিৎসার জন্য তিনি স্বেচ্ছায় আফগানিস্থান ত্যাগ করিয়াছেন, রাজা নাদীর এ জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিয়াছেন, তিনি এযাবৎ তাঁহার সহিত সদয় ব্যবহারই করিয়া আসিয়াছেন, তিনি ইটালী যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন; কারণ, তিনি দেখিতেছেন যে, বোম্বাই সহরের স্বাস্থ্য খুবই ভাল, তাঁহার কন্যার উহাতে অনেক উপকার হইয়াছে। তাঁহার কন্যা একটু সুস্থ হইলেই এবং শীত কাটিয়া গেলেই তিনি কাবুলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

ইহাতেও বুঝা যায়, রাজা নাদীর প্রজার সহিত সদয় ব্যবহারই করিতেছেন। এই হেতু তিনি অল্পকালমধ্যে জনপ্রিয়ও হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাই হউক, তাহা হইলে আফগান্‌খণ্ডে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত ইহারই সম্ভাবনা।

পাপের খতিয়ান

'সভ্যতা'-বৃদ্ধির সঙ্গে পাপের পরিমাণও যে বৃদ্ধি হইতেছে, মার্কিণ দেশই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। মার্কিণ-জাতি আধুনিক জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য বলিয়া পরিগণিত। তাহাদের পাপের মাত্রা কিরূপ শুনুন। আমাদের মন-গড়া কথা নহে, চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধতত্ত্ব গবেষণার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক কিছু দিন পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছেন যে, মার্কিণ-দেশে বৎসরে ১২ হাজার খুন, ১ লক্ষ রাহাজানি, ৫ লক্ষ ডাকাতী, মোটর-দুর্ঘটনায় ২৫ হাজার খুন এবং ৫ লক্ষ লোক অন্যান্য দুর্ঘটনায় হাঁসপাতালে আনীত হইয়া থাকে।

বিবরণ শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ইহার উপর ঠকামী, জুয়াচুরি, চুরি, জাল, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও অন্যান্য অপরাধের কথা না-ই ধরিলাম!

স্মৃতি-চিহ্ন

জীবনের-পথে, ভাই, মোরা সকলি
কোথায় কে নাহি ঠিক যা'ব যে চলি';
কালের প্রবাহমাঝে দাঁড়াইতে পারি না যে,
সময়ও নাহি যে আর দু'কথা বলি;
জীবনের পথ ধরি চলি সকলি।

যে পথে চলেছি এটা নহে ত সোজা;
কাতর পথিক চলে, বাড়িছে বোঝা;
আছে এতে কত গলি, তাতে সবে চায় চলি';
যে যায় চলিয়ে তারে নাহি যায় খোঁজা;
কেমনে যাইবে? ইহা নহে ত সোজা।

জানি না 'সে দিন' এবে আসিবে কবে,
বাঁধন-ছেঁড়ার গান গাহিব যবে।
চলে পিপীলিকা-সারি, আলাপ জমেছে ভারি,
বুঝি বা এখনি তারে ছাড়িতে হবে;
এখনি সে দিন বুঝি আসিবে ভবে।

কিছু দূর যাব ভাই একই সাথে,
সুখ-আলাপনে হাত ধরিয়ে হাতে।
আসিয়া 'সে দিন' তবে, বাঁধন কাটিয়া লবে;
ছাড়াছাড়ি হবে যবে তোমা-আমাতে,
জানি না আবার কবে মিলিব সাথে।

'সে দিনের' পরে বুঝি যাবে ভুলিয়া?
স্মারক-লিপিটি দিনু তাই বলিয়া।
মরমের কথা দুটি, উঠিল সামনে ফুটি'
তাই লিখে দিনু হৃদে লহ তুলিয়া,
নাহি যেও বন্ধুবর পরে ভুলিয়া।

শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য

চয়ন

দাঁড়বিহীন নৌকা

জনৈক ইংরাজ সামরিক কর্ম্মচারী বাচ খেলিবার একখানি নৌকা বিনা দাঁড়ে চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নৌকার পার্শ্বদেশে

দাঁড়বিহীন নৌকা

কফোণির আকৃতিবিশিষ্ট দুইটি যন্ত্র তিনি সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। হাতল ঘুরাইলেই পার্শ্বস্থ জলের অভ্যন্তরস্থিত চক্র-যুগল আবর্ত্তিত হইবে এবং তখনই নৌকা চলিতে থাকিবে। উল্লিখিত সামরিক কর্ম্মচারী তাঁহার পত্নীর জল-বিহারের জন্য এই নৌকাখানি নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

বিরাট করাতী-মৎস্য

সামুদ্রিক মৎস্যজাতির মধ্যে করাতী-মাছ দেখিতে পাওয়া যায়।

বৃহদাকার করাতী-মৎস্য

উহার মুখের সম্মুখভাগে করাতের আকারবিশিষ্ট তীক্ষ্ণধার খড়্গ বিদ্যমান। মিয়ামির সন্নিহিত সমুদ্রে একটি বিরাটদেহ করাতী-মৎস্য ধৃত হইয়াছিল। উহার ওজন প্রায় ৫ মণ। অধুনা এই মৎস্যদেহ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যাদুঘরে রক্ষিত আছে। করাতী-মৎস্য সমুদ্র-রাক্ষস বলিয়া কথিত।

শিশু-ব্যায়ামাগার

জার্ম্মাণীতে বয়স্কদিগের জন্য যেমন ব্যায়াম-শিক্ষাগার বিদ্যমান,

শিশু-ব্যায়ামাগার

সেইরূপ অসংখ্য শিশু-ব্যায়ামাগারও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বালক-বালিকাদিগকে শৈশবকাল হইতেই ব্যায়ামে দক্ষ করিয়া তুলিবার দিকে জার্ম্মাণীর বিশেষ দৃষ্টি আছে। বার্লিনে শিশু-ব্যায়ামাগারে যথাযথভাবে হাঁটিবার জন্য শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। কাষ্ঠনির্ম্মিত চলন-সিঁড়ি ভূমিতলে অবস্থিত। ইহার উপর দিয়া শিশুদিগকে নগ্ন-পদে হাঁটিতে হয়। এইরূপভাবে হাঁটার ফলে শিশুর চরণের মাংসপেশী সুদৃঢ় হয়, বাহুও বলসম্পন্ন হইয়া উঠে; চরণতলের যে সকল সামান্য ত্রুটি থাকে, তাহাও অন্তর্হিত হইয়া যায়।

মোটর-গাড়ীর অভিনব 'গ্যারেজ'

অনেকগুলি মোটর-গাড়ীকে অল্পস্থানে রাখিবার ব্যবস্থা সম্প্রতি আমেরিকায় অবলম্বিত হইয়াছে। দুইখানি মোটর-গাড়ী পাশাপাশি থাকিতে পারে, এমন স্থানের উপর অত্যুচ্চ সৌধ নির্ম্মিত

মোটর-গাড়ীর বিচিত্র 'গ্যারেজ'

হইয়াছে। একটি সৌধে ৬০ খানি মোটর-গাড়ী থাকিতে পারে, এমন গৃহও ফাঁকা যায়গায় নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সকল অট্টালিকা 'কংক্রিট' ব্যবস্থা অনুসারে নির্ম্মিত। এক একটি মোটর-গাড়ী যতটুকু স্থানে থাকিতে পারে, প্রত্যেক তল সেইভাবে রচিত। সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খল বৈদ্যুতিক রশ্মির সাহায্যে এই সকল সৌধে আবর্ত্তিত হয় এবং একখানি গাড়ী সৌধমধ্যে উপস্থিত হইবামাত্র উহার সাহায্যে ঊর্দ্ধদেশে নীত হইয়া থাকে। প্রদত্ত চিত্রে সৌধের বহির্ভাগ ও অভ্যন্তরভাগের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইবে।

বায়ুপূর্ণ বালিস

সম্প্রতি এক প্রকার বালিস নির্ম্মিত হইয়াছে, উহা আপনা আপনি বায়ুপূর্ণ হইয়া থাকে। এই বালিস মোটর-গাড়ী চালনা, সন্তরণ ও নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুকে বিশেষ আরাম প্রদান করিয়া থাকে। যখন বায়ুপূর্ণ না থাকে, তখন ইহা ভাঁজ করিয়া পকেটে লওয়া চলে। এই বালিস বায়ুপূর্ণ থাকিলে দৈর্ঘ্যে ১৭ ইঞ্চ ও প্রস্থে ১২ ইঞ্চি। রবার ও খাকি কাপড়ের সমবায়ে উহা নির্ম্মিত। [illegible] মধ্যে রবার এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট যে, উহা বন্ধ করিলে

বায়ুপূর্ণ বালিস

বায়ু নির্গত হইতে পারে না, জলও প্রবেশ করিতে অসমর্থ। প্রদত্ত চিত্র হইতে দেখা যাইবে যে, জলে সন্তরণকালে উহার উপর মাথা রাখিয়া সন্তরণকারী পরম আরাম উপভোগ করিতেছে। বালিসের বহির্ভাগ বিভিন্ন বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়াও থাকে।

বিনামার টব

বিনামার ফুলের টব

জনৈক ইংরাজ উদ্যানপাল পরিত্যক্ত সামরিক বিনামা সংগ্রহ করিয়া তাহাতে মাটী ভরিয়া ফুলের টব প্রস্তুত করিয়াছেন। বিনামার টবগুলি দীর্ঘকালস্থায়ী। চর্ম্ম-নির্ম্মিত বলিয়া উহার আর্দ্রতা সহসা দূরীভূত হয় না। উদ্যানপাল তাঁহার উদ্যানটিকে এইরূপ বহুসংখ্যক বিনামা-টবে ফুল ফুটাইয়া সুশোভিত করিয়াছেন।

ক্ষুদ্রকায় মোটর-গাড়ী
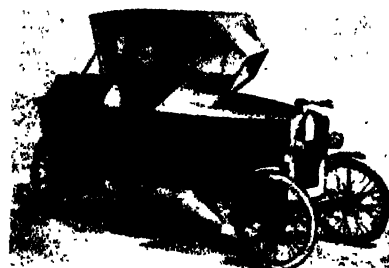
ক্ষুদ্রকায় মোটর-গাড়ী

প্যারী নগরীতে এক প্রকার ছোট মোটর-গাড়ী দেখা দিয়াছে। এই গাড়ী [illegible] কে বালকের [illegible] খেলানা বলিলেও চলে। ক্ষুদ্রাকার হইলেও এই গাড়ীতে

কাষ কম হয় না। এই মোটরগাড়ীতে আড়াই ঘোড়ার শক্তিবিশিষ্ট মোটর-যন্ত্র সন্নিবিষ্ট আছে। ঘণ্টায় এই গাড়ী ২০ মাইল পথ অনায়াসে অতিক্রম করিয়া থাকে। এই মোটর-গাড়ীর দাম মাত্র ৩ শত টাকা।

স্বয়ং-চালিত যানে রন্ধনাগার

ইংরাজ ভ্রমণকারীরা ভ্রমণপথের কোথাও বিশ্রাম ও ভোজনের প্রয়োজন হইলে সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রাবাস লইয়া থাকেন। অধুনা

স্বয়ং-চালিত যানে রন্ধনাগার

তাহারও আর প্রয়োজন হয় না। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে স্বয়ং-চালিত যানে এমন ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন যে, বস্ত্রাবাস সন্নিবিষ্ট করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় না। এই যানের উপরেই স্বল্প চেষ্টায়, স্বল্পসময়ে রন্ধন ও ভোজনের স্থান হইয়া থাকে। প্রদত্ত চিত্রে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। যখন প্রয়োজন না হয়, আচ্ছাদনের উপযোগী দ্রব্যগুলিকে গুটাইয়া যানের এক পার্শ্বে রাখিয়া দেওয়া হয়।

কুকুরের আকারবিশিষ্ট ঘর

কুকুরের আকারবিশিষ্ট গৃহ

[ক্যালি]ফোর্ণিয়ায় এক ব্যক্তি কুকুরের আকারবিশিষ্ট একটি ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। লস্ এঞ্জেলেসের সন্নিকটেই এই বিচিত্র-দর্শন গৃহটি অবস্থিত। পরিব্রাজকগণ এই গৃহ দর্শনের জন্য এই অঞ্চলে আসিয়া থাকেন। ইহাতে বিজ্ঞাপনের বিশেষ সুবিধা হয়।

যন্ত্রযোগে টেনিস্‌বলক্রীড়া

কলের কামানের সাহায্যে টেনিস্‌বল নিক্ষিপ্ত হইলে খেলোয়াড়

যন্ত্রযোগে টেনিস্‌বল নিক্ষেপ

সেই বল সবলে ফিরাইয়া দিয়া ক্রীড়ায় দক্ষতা লাভ করিতে পারেন। এই কামানে একযোগে ৩৬টি বল ধরে। এই যন্ত্রটি এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত যে, দ্বাদশটি বিভিন্ন প্রণালীতে বল নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

আলোকরশ্মির বিচিত্র প্রভাব

স্পেনদেশে বার্সিলোনা সহরে জাতীয় প্রাসাদটিকে আটটি শক্তি-সম্পন্ন আলোকরশ্মির দ্বারা আলোকিত করা হইয়াছিল। এই
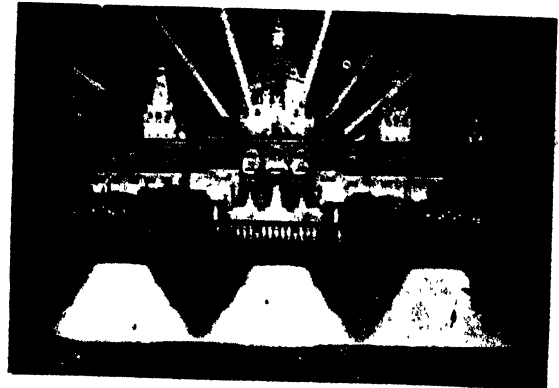
আলোকরশ্মির বিচিত্র প্রভাব

তীব্র দীপ্তিশালী আটটি আলোকরশ্মি গগনপথকে আলোকিত করিয়া প্রাসাদটিকে যেন বিরাট হীরকমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল।

বহুক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান হইতে এই আলোকপ্রবাহ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

ছায়াহীন আলোক

ছায়াহীন আলোক

অস্ত্রোপচারের সময় গৃহমধ্যে কিছুমাত্র অন্ধকার বা ছায়া বাঞ্ছনীয় নহে। এ জন্য হাঁসপাতালের অস্ত্রোপচার-কক্ষে এমনভাবে বিদ্যুতের আলোক সন্নিবিষ্ট করা হয় যে, ছায়ার সংস্পর্শ পর্য্যন্ত থাকে না। যে টেবলের উপর রোগীকে রাখিয়া অস্ত্রোপচার করা হয়, তাহার উপরে আটটি আলোক এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে যে, নির্দ্দিষ্ট স্থলে আলোক-পাত হইলে বিন্দুমাত্র ছায়াপাত হয় না। এই আলোক হইতে সামান্য উত্তাপ নির্গত হয়।

চলমান ভেলায় মোটর-গাড়ী

দারুনির্ম্মিত ভেলার উপর মোটর-গাড়ী রাখিয়া উইনিপেগের
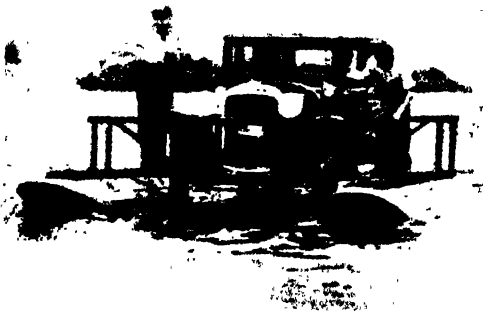
চলমান ভেলায় মোটর-গাড়ী

এক জন লোক জলপথে ১ শত ২০ মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন। গন্তব্য পথে তাঁহাকে কোন প্রকার বিপদে পড়িতে হয় নাই। মোটর-গাড়ীর চালক-চক্রকে বিশ্লিষ্ট করিয়া জাহাজের চালক-চক্র উক্ত ভেলার পার্শ্বে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই উপায়ে ঘণ্টায় ১৫ মাইল গতিতে ভদ্রলোক দীর্ঘ জলপথ অতিক্রম করিয়াছিলেন।

দ্বিচক্রযানে কাগজের আধার

প্রত্যেক সৈনিক দ্বিচক্রযানে যাহাতে বিবিধ প্রকার সমরোপকরণ বহন করিতে পারে, এ জন্য বিলাতের সামরিক বিভাগে কার্ড

দ্বিচক্রযানে কাগজের আধার

বোর্ডনির্ম্মিত আধার নির্ম্মিত হইয়াছে। উক্ত আধারগুলি দ্বিচক্রযানে সন্নিবিষ্ট করিয়া সম্প্রতি সহস্র সহস্র সৈনিক সমরাভিনয়ে যোগ দিয়াছিল। কার্ড বোর্ড-নির্ম্মিত আধারগুলি সে সময়ে বিশেষ কাযে লাগিয়াছিল।

বৃক্ষ ... নূতন প্রণালী

বৃক্ষ ছাঁটিবার নূতন প্রণালী

ইংলণ্ডের কে... অঞ্চলের কোনও উদ্যানে বৃক্ষ ছাঁটিবার অভি... প্রণালী অবল... হইয়াছে। ... যুগ্ম দণ্ডের ... দাঁড়াইয়া ... উদ্যানপাল উ... বৃক্ষের শাখা ... ছাঁটিয়া ... ইহাতে অধিক ... প্রয়োজন হ... প্রদত্ত চিত্র ... ব্যাপারটির ... ধারণা করা যাই...

দণ্ডিত আসামীর মুখোস

প্যারীর সন্নিহিত ফ্রেস্‌নেঁর ফরাসী কারাগারে গুরু অপরাধে দণ্ডিত আসামীর মুখে মুখোস দিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। যে সকল অপরাধী নির্জ্জন কারাবাসে অবরুদ্ধ হইবার যোগ্য, তাহাদিগকে তৎপরিবর্ত্তে মুখোস দ্বারা শোভিত করা হয়। ইহাতে তাহাদের মুখমণ্ডলের কোনও অংশ অন্যের দৃষ্টিগোচর হয় না, অথচ বন্দীর শ্বাস-প্রশ্বাস এবং সাধারণ দৃষ্টির ব্যাঘাতও ঘটে না। বন্দীরা যাহাতে পরস্পরের আকৃতি দেখিয়া গোপনে ষড়যন্ত্র করিতে না পারে, এই জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা। মুখোসে আবৃত বন্দী অনুরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত অন্য বন্দীর মুখ এই আবরণ বশতঃ দেখিতে পায় না।

মুখোসে আবৃতমুখ বন্দী

শুষ্ক অষ্টভুজ রাক্ষস

নিউইয়র্কের পূর্ব্বাঞ্চলের কোন কোন অধিবাসী শিশু অষ্টভুজ জাতীয় সামুদ্রিক জীবের মাংস ভালবাসে। এ জন্য দুই সের ওজনের শিশু অষ্টভুজকে ধৃত করিয়া স্থানীয় অধিবাসীরা উহার পচনশীল অংশ বাহির করিয়া ফেলে। তার পর রৌদ্রে শিশু-দেহকে শুকাইয়া জমা করিয়া রাখে। যখন মৎস্য-মাংস দুষ্প্রাপ্য হয়, সেই সময় উহারা উক্ত মাংস ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ করে।

শুষ্ক অষ্টভুজ রাক্ষস

গোলাকার তাস

গোলাকার তাস

অনেক ইংরাজ ব্যবসায়ী সম্প্রতি গোলাকার তাস বাহির করিয়াছেন। এই তাস খেলার পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক। তাসের চারিটি স্থানে সংখ্যা লিখিত থাকে। সুতরাং যে কোন অবস্থায় সংখ্যাটি বুঝিতে পারা যায়।

বিজ্ঞানের বাহাদুরী

বার্লিনের বৈজ্ঞানিকগণ সম্প্রতি একটি বিচিত্র ব্যবস্থা করিয়াছেন। বার্লিন সহরে একটি নারী-মূর্ত্তি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ম্মিত হইয়াছে। বহু দূরবর্ত্তী কোনও ব্যক্তি যাহা লিখিবেন, এই নারীমূর্ত্তি একখানি বোর্ডে অথবা কাগজে ঠিক তাহাই লিখিয়া দিবে। এমন কি, লেখকের হস্তাক্ষর পর্য্যন্ত এই মূর্ত্তির মারফতে লিখিত হইবে। লেখক যেখানে বসিয়া লিখিবেন, তথায় এমন বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা আছে, যাহার সাহায্যে এই মূর্ত্তিও প্রত্যেক শব্দ কাগজে বোর্ডে লিখিয়া দিবে। বিজ্ঞানের বাহাদুরী অসামান্য।

মূর্ত্তি দূরবর্ত্তী লেখকের রচনা লিখিতেছে
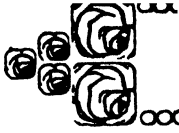
দুইটি আদর্শ

লাহোরে কংগ্রেস স্থির করিয়া দিয়াছেন যে, কংগ্রেস স্বরাজ অর্থে অতঃপর পূর্ণ স্বাধীনতা বুঝিতে থাকিবেন। আবার মান্দ্রাজে লিবারাল ফেডারেশন বা উদারনীতিক সঙ্ঘ এবং মুস্লিম লীগ প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, আমরা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন চাই। ফলে কংগ্রেস ভিন্ন পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী এমন পাকাপাকিভাবে আর কেহই করেন নাই। কিন্তু কংগ্রেসই এই দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান জৈন বৌদ্ধ শিখ সকল ধর্ম্মাবলম্বী, সকল সম্প্রদায়ের লোকই যোগদান করিতে পারেন, সকল সম্প্রদায়ের লোকই ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। কেবল ভারতের সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায় ইহাতে যোগদান করেন নাই। যাহা হউক, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এই রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানে যত লোক উপস্থিত হইয়া থাকেন, এত লোক আর কোন রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়েন না। এই কংগ্রেসের রাজনীতিক মত ভারতের যত লোক অবিচারিত ভাবে মানিয়া লইয়া থাকেন, ভারতের অন্য কোন রাজনীতিক মতের অনুবর্ত্তন এ দেশের তত লোক করেন না। আজ যে ভারতের সর্ব্বত্রই জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং অহিংসভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল, তাহার কারণ, কংগ্রেস ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং এ দেশে কংগ্রেসের প্রভাব অত্যন্ত অধিক। আমরা সুদূর মফঃস্বলের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে, তাহারা "কংগ্রেসের মালিক" দিগের মতকেই বিশেষ মান্য করে। ইহাদের মধ্যে কয়েক জন ভোট-দাতাকে কিছু দিন পূর্ব্বে আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনারা বিগত নির্ব্বাচনে কাহাকে ভোট দিয়াছেন? উত্তরে সকলেই বলিয়াছিলেন, "কেন, কংগ্রেসের মালিকদিগকে।" ইহারা কংগ্রেস কি, ইহার মতামত কি, তাহা না বুঝিলে এবং না জানিলেও কংগ্রেস যে তাহাদের হইয়া সরকারের সহিত ঝগড়া করে, এইটুকু বুঝে। কংগ্রেস সম্বন্ধে ইহাদের সুস্পষ্ট না হইলেও একটা অস্পষ্ট ধারণা যে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং দেশের লোকের উপর কংগ্রেসের প্রভাব অত্যন্ত অধিক।

কিন্তু তাহা হইলেও লিবারাল ফেডারেশন, মুস্লিম লীগ, খেলাফৎ সঙ্ঘ, খৃষ্টান সঙ্ঘ প্রভৃতি সকলেই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের দাবীই করিতেছেন। এমন কি, কংগ্রেসের মদনমোহন মালব্য প্রভৃতির দল, হিন্দু সভার দল ঠিক পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী মানিয়া লইতেছেন না। তাঁহারা যখন কাউন্সিল-বর্জ্জনের বিরোধী এবং বিলাতী পরামর্শ-বৈঠকে যাইবার পক্ষপাতী, তখন তাঁহারা যে ঠিক পূর্ণ স্বাধীনতালাভই তাঁহাদের লক্ষ্য, এ কথা বলিতে পারেন না। ইহারা যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকারপ্রাপ্তির দাবী করিতেছেন, তাহাও নিতান্ত সামান্য নহে। বোধ হয়, অনেকেরই মনে থাকিতে পারে যে, লর্ড মর্লি কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই ভারতবাসীর পক্ষে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন-প্রাপ্তির দাবীকে ছেলেদের চাঁদ ধরিবার আব্দারের (Crying for the moon) মত হাস্যজনক বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এ দাবী নিশ্চিতই নিতান্ত সামান্য নহে। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী যদি পূর্ণ হয়, তাহা হইলে স্বদেশ-শাসনকার্য্যে ভারতবাসীর অধিকার অপ্রতিহত হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও পূর্ণ স্বাধীনতা, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন অপেক্ষা বড় বলিয়া অনেকে মনে করেন। তাহা মনে করাও অসঙ্গত নহে।

তবে এ কথা সত্য যে, ইংরাজ আমাদিগকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দিতে চাহিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যাহা একটু কথার 'মা'র-প্যাঁচ' ছিল, তাহা গত ৩১শে অক্টোবরের ঘোষণায় লর্ড আরউইন পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং ঐ দাবী আমাদের পক্ষে অন্যায়, এমন কথা বৃটিশরাজ আর বলিতে পারেন না। আমরা তারস্বরে ঐ দাবী করিতে পারি, এবং আমাদিগকে ঐ অধিকার অবিলম্বে দেওয়া হউক, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। উহাতে কাহারও বাধা দিবার ন্যায়সঙ্গত হেতু নাই—বৃটিশের আইনও উহাকে বে-আইনী বলিতে পারেন না। সুতরাং এ আদর্শ নিরাপদ।

কিন্তু এই দুই আদর্শের মধ্যে কোন্ আদর্শ বড়, তাহা লইয়া বিচার করিবার কোন প্রয়োজনই হইতে পারে না। কারণ, পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ যে বড়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দশ আনা, বড় জোর বারো আনা স্বাধীনতার নাম। দশ বা বারো আনা কখনই পূর্ণ এক টাকার সমকক্ষ হইতে পারে না। অংশ যতই বড় হউক, পূর্ণের নিকট তাহাকে নিশ্চিতই মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইতেই হইবে। সে কিছুতেই পূর্ণের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং আদর্শ হিসাবে পূর্ণ স্বাধীনতাই বড় এবং অধিক বাঞ্ছনীয়। আমাদের শাসক বৃটিশ জাতি যে তাহা বেশ বুঝেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ভারতবাসীরা যদি এখন পূর্ণ স্বাধীনতা চাহেন, তাহা হইলে তাঁহারা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, কিন্তু যদি তাঁহারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন চাহেন, তাহা হইলে তাঁহারা বলেন, উহা ভারতবাসীর ন্যায্য দাবী বটে, সু[illegible] ভবিষ্যতে তাহাদিগকে উহা পাইবার যোগ্যতা প্রদান [illegible] তাহাদিগকে উহা দেওয়া হইবে। ইহাতে বুঝা যা[illegible] পূর্ণ স্বাধীনতা যে বড়, তাহা আমাদের শাসকগণ ব্যব[illegible] স্বীকার করিয়া থাকেন। আর এক কথা, দৃষ্টান্ত দে[illegible] পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী বড় বলিয়া স্বীকার করিতেই হ[illegible]বে। মার্কিণ এবং কানাডা দুইটিই য়ুরোপীয়দিগেরই উপ[illegible]শ। মার্কিণ এখন স্বাধীন, কানাডা এখন পূর্ণ ঔপনিবেশিক [illegible] শাসনে স্বত্ববান্। উভয়ের পার্থক্য দেখিলেই বুঝা [illegible] কোন্‌টি বড়, কোন্‌টি ছোট। মার্কিণে যেরূপ প্রতি[illegible] এবং মনীষার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, কানাডায় তা[illegible] যায় না। কানাডার ভূমি-পরিমাণ ৩৫ লক্ষ ৪৭ হাজা[illegible] ৩০ মাইল, কিন্তু উহার অধিবাসি-সংখ্যা সাড়ে ৯৭ [illegible] পক্ষান্তরে, মার্কিণের ভূমি-পরিমাণ ৩০ লক্ষ ২৭ [illegible]জার

বর্গ-মাইল। তন্মধ্যে স্থলভাগ ২৯ লক্ষ ৭৪ হাজার বর্গ-মাইলেরও কিছু অল্প। কিন্তু জনসংখ্যা হিসাবে উহার পার্থক্য কত অধিক, তাহাও চিন্তনীয়। কানাডার বিস্তার অধিক হইলেও উহার জনসংখ্যা মার্কিণের জনসংখ্যা অপেক্ষা অনেক অল্প। কানাডার জনসংখ্যা সাড়ে ৯৭ লক্ষ, আর মার্কিণের জনসংখ্যা ১২ কোটিরও কিছু অধিক। কানাডার উত্তর অংশে শীত কিছু অধিক সত্য, কিন্তু তাহা ত্যাগ করিয়া ধরিলে মার্কিণ ও কানাডার মধ্যে পার্থক্য হইবার কোন কারণ নাই। প্রাকৃতিক সম্পদেও কানাডা মার্কিণ অপেক্ষা বিশেষ পশ্চাৎপদ নহে। এরূপ অবস্থায় মার্কিণের অপেক্ষা কানাডার অধিক ধনাঢ্য হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কেন এমন হয়? অনেকের অনুমান, কানাডার রাজনৈতিক অবস্থা-দৈন্যই তাহার কারণ। কিন্তু কেবল সমৃদ্ধিতে নহে, প্রতিভা, মনীষা প্রভৃতিতেও কানাডা মার্কিণ অপেক্ষা বহু পশ্চাতে অবস্থিত। কেবল একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেখিয়াই এ বিষয়ের কোন সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। অন্য দৃষ্টান্তও দেখিতে হয়। আমাদের মনে হয়, নিউজিল্যাণ্ড এবং জাপানের দৃষ্টান্ত এ স্থলে অশোভন হইবে না। নিউজিল্যাণ্ডের ভূমি-পরিমাণ ১ লক্ষ সাড়ে ৪০ হাজার বর্গ-মাইল, লোকসংখ্যা সাড়ে ১৩ লক্ষ। জাপানের ভূমি-পরিমাণ আসল দেড় লক্ষ বর্গ-মাইল, উপনিবেশাদি লইয়া আড়াই লক্ষ বর্গ-মাইলেরও উপর (২ লক্ষ ৬০ হাজার ৭ শত ৮ বর্গ-মাইল); লোকসংখ্যা অন্তত: ৮ কোটি। নিউজিল্যাণ্ডের ভূমি জাপানের ভূমি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। নিউজিল্যাণ্ডের আয়তন অপেক্ষা জাপানের আয়তন প্রায় আড়াই গুণ। প্রকৃত জাপানের আয়তন দেড় গুণেরও কম। কিন্তু লোকসংখ্যা প্রায় ৬০ গুণ; কোরিয়া প্রভৃতি বাদ দিলে প্রায় ৪০ গুণ ত বটেই। ধনাঢ্য হইবার কথা নিউজিল্যাণ্ডওয়ালাদিগের, কিন্তু ধনাঢ্য অধিক জাপানী। উন্নতিতে এবং ক্ষমতাতে জাপানীরা নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক অগ্রসর। কেন এরূপ হয়? গ্রেটবৃটেন হইতে নিউজিল্যাণ্ড অনেক দূরে অবস্থিত। গ্রেটবৃটেন নিউজিল্যাণ্ডের রাজনীতিক ব্যাপারে প্রায় হস্তক্ষেপ করেন না। কাযেই নিউজিল্যাণ্ড প্রায় স্বাধীন। কিন্তু তাহা হইলেও পূর্ণ স্বাধীন জাপান উন্নতিপথে যেরূপ অগ্রসর, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারসম্পন্ন নিউজিল্যাণ্ড ততটা অগ্রসর নহেন। প্রতিভা, মনীষা প্রভৃতি সকল দিক দেখিয়া বিচার করিলে তাহা বুঝা যাইবে। কেবল নিউজিল্যাণ্ড কেন? অষ্ট্রেলিয়া গ্রেটবৃটেনের একটা বড় উপনিবেশ। ইহার ভূমি-পরিমাণ পৌনে ৩০ লক্ষ বর্গ-মাইল, লোকসংখ্যা ৫৯ লক্ষেরও কম। অধিকাংশ স্থান জঙ্গলে এবং পর্ব্বতে আকীর্ণ,কিন্তু ভৌম সম্পদে অষ্ট্রেলিয়া জাপান অপেক্ষা অনেক সম্পন্ন। তাহা হইলেও উন্নতিপথে জাপানই অধিক অগ্রসর, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। অথচ গ্রেটবৃটেন অষ্ট্রেলিয়ার আভ্যন্তরীণ শাসন-সম্পর্কিত ব্যাপারে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করেন না। অষ্ট্রেলিয়া কার্য্যতঃ স্বাধীন। তথাপি উহা পূর্ণ স্বাধীন জাপানের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই। সকল দিক বিবেচনা করিলে জাপানই উন্নতিপথে অধিক অগ্রসর, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সেই জন্য অনেকের ধারণা যে, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন অপেক্ষা পূর্ণ স্বাধীনতা অধিক বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু উপনিবেশগুলি পূর্ণমাত্রায় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অতি অল্পদিন পূর্ব্বে পাইয়াছে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতে যে সাম্রাজ্য পরিষদের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতেই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকে পূর্ণাঙ্গ করা হইয়াছে। এখনই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রায় পূর্ণ স্বাধীনতার তুল্যমূল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বনার ল বলিয়াছিলেন যে,—

What is the essential of Dominion Home Rule? The essential is that they have the control of their whole destinies, of their fighting forces, and of the amounts which they will contribute to the general security of the Empire. All these things are vital, and there is not a man in the House who would not admit that the connection of the Dominions with the Empire depends upon themselves. If the self-governing Dominions of Australia and Canada choose to-morrow to say "we will no longer make a part of the British Empire" we would not try to force them. Dominion Home rule means the right to decide for themselves.

ইহার মর্ম্মার্থ:—"ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের সার পদার্থ কি? উহার সার পদার্থ এইগুলি:—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারসম্পন্ন জাতিরা তাহাদের সমস্ত ভাগ্যই আপনাদের আয়ত্তমধ্যে রাখিতে পারে, তাহাদের সৈন্যাদির নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে এবং সমগ্র সাম্রাজ্যের নির্বিঘ্নতা রক্ষার জন্য তাহারা কিরূপ অর্থসাহায্য করিবে, তাহা তাহারাই নির্দ্ধারিত করিতে পারে। এই সমস্ত ব্যাপারই জাতীয় জীবনের পরিপোষক এবং আমার বিশ্বাস এই যে, এই সভায় এমন কোন সদস্য নাই, যিনি এ কথা অস্বীকার করিতে পারেন যে, সাম্রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করা আর না করা ঔপনিবেশগুলির সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। কালই যদি স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারসম্পন্ন অষ্ট্রেলিয়া বা কানাডা বলেন যে, আমরা আর বৃটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত থাকিব না, তাহা হইলে তাঁহারা তাহা করিতে পারেন। আমরা তাঁহাদিগকে জোর করিয়া সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত রাখিতে চেষ্টা করিব না। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্থে আপনাদের ইচ্ছাধীনভাবে কার্য্য করিবার অধিকার।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এখন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনে আর পূর্ণ স্বাধীনতায় পার্থক্য অধিক নহে। কেবল কতকগুলি পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত ব্যাপারে, নৌ-বাহিনীর গঠন প্রভৃতি ব্যাপারে স্বায়ত্তশাসনাধিকারী উপনিবেশগুলিকে বৃটিশ জাতির মারফতে কার্য্য করিতে হয়। ইহাতে যে তাহাদের আভ্যন্তরীণ উন্নতিসাধনে প্রবল বাধা ঘটে, তাহা কোনমতেই বলা যায় না। এখন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন চৌদ্দ আনা স্বাধীনতা বলা যাইতে পারে।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য, পূর্ণ স্বাধীন দেশ হইতে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার-সম্পন্ন রাজ্যগুলি এত পশ্চাৎপদ রহিয়াছে কেন? কেন কানাডা মার্কিণের সমকক্ষ হইতে পারে না? কেন নিউজিল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়া জাপানের ন্যায় হইতেছে না? তাহার কারণ, বিগত

মহাযুদ্ধের পর হইতেই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারের প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে, কাযেই তাহার ফল এখনও উপলব্ধ হইবার সময় হয় নাই। আর অর্দ্ধ-শতাব্দী অতিবাহিত না হইলে সে ফল স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে না।

এখন জিজ্ঞাস্য, যদি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনে এবং পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশেষ পার্থক্যই না থাকিবে, তাহা হইলে কংগ্রেস ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ত্যাগ করিয়া পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনই তাঁহাদের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন কেন? উভয় আদর্শে কোন পার্থক্য নাই, এ কথা বাতুলেও বলে না। তবে আপাততঃ সে পার্থক্য উপেক্ষা করা যায়। আমাদের বিশ্বাস, কংগ্রেস অনেকটা বাধ্য এবং কতকটা হতাশ হইয়াই ঐরূপ ঘোষণা করিয়াছেন। গত কলিকাতা কংগ্রেসে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে যদি বৃটিশ সরকার ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান না করেন, তাহা হইলে কংগ্রেস তাহাদের লক্ষ্য যে পূর্ণ স্বরাজ, এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন। সরকার ঐ সময়ের মধ্যে ভারতবাসীকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দিবার কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। এমন কি, কত দিন পরে তাঁহারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দিবেন, তাহাও বলেন নাই। অগত্যা কংগ্রেস বাধ্য হইয়া স্বরাজ অর্থে পূর্ণ স্বাধীনতা, এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছেন। ইহা ভিন্ন তাঁহাদের অন্য কোন উপায় ছিল না। ভারতের শাসকবর্গ যদি বলিতেন যে, তাঁহারা দশ, বিশ বা পঁচিশ বৎসর পরে ভারতবাসীকে পূর্ণাঙ্গ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দিবেন, তাহা হইলেও একটা আপোষ-নিষ্পত্তির পথ ছিল; কিন্তু বৃটিশ সরকার তাহা কিছুই করেন নাই। কাযেই কংগ্রেসকে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া লইতে হইয়াছে। ইহার জন্য যদি কোন কুফল ফলে, তাহা হইলে সে দায়িত্ব হইবে বৃটিশ সরকারের। তাঁহারা যদি একটু সহানুভূতির সহিত কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে এই ব্যাপার ঘটিত না। এই ব্যাপারে লর্ড আরউইনের কোন দোষ নাই। দোষ সম্পূর্ণ বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীদিগের।

যাহা হউক, এখনও এই বিষয়ের আপোষ-মীমাংসা বা এই সমস্যার সমাধান কঠিন নহে। কংগ্রেস সম্পূর্ণ অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত। তাঁহারা হিংসার পথে স্বাধীনতা লাভ করিতে চাহেন না। তাঁহারা শক্রতার দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করিতে চাহেন না। মিত্রতার দ্বারা, অন্ততঃ হিংসাশূন্য আত্মবশ কর্ম্ম দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতা পাইতে চাহেন। তাঁহারা স্বাধীন হইলেও কতকগুলি স্বায়ত্তশাসনাধিকারসম্পন্ন রাজ্যসমবায়ের মধ্যে থাকিতে ইচ্ছা করিলে থাকিতে পারিবেন। সুতরাং এই আদর্শ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন অপেক্ষা বিশেষ পৃথক্ নহে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। কংগ্রেস চাহেন, ধর্ম্মের বলে, সত্যের বলে, ন্যায়ের বলে, যোগ্যতার বলে, আধ্যাত্মিকতার বলে ইংরাজের নিকট হইতে স্বাধীনতা লইতে। সুতরাং ইহাতে বৃটিশ জাতির বিরোধ করিবার কিছুই নাই।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

বাঙ্গালার বাহিরে যে কয় জন খ্যাতনামা বাঙ্গালী বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, স্বর্গীয় অবসরপ্রাপ্ত জনপ্রিয় পোষ্ট-মাষ্টার-জেনারেল রায় বাহাদুর পি, এন, বসু এম, এ, মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। গত ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে তিনি ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি নৈহাটীনিবাসী স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার বসুর পুত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষা-সমুদ্র পার হইয়া তিনি প্রথমে পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরূপে প্রথম কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন। পরে প্রতিভা ও কর্ম্মকুশলতাবলে তিনি যথাক্রমে পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, বোম্বাই, বাঙ্গালা ও আসাম এবং যুক্ত-প্রদেশের প্রথম বাঙ্গালী পোষ্ট-মাষ্টার-জেনারেলের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের তিনিই প্রথম ভারতীয় পোষ্ট-মাষ্টার-জেনারল। সকল প্রদেশেই তিনি যোগ্যতা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালী নামের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সরকারী উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অমায়িকতা, সরলতা, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, ন্যায়পরায়ণতা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। কর্ম্মজীবনে তাঁহার নির্ভীকতা ও স্বাধীন মতের অভিব্যক্তি তাঁহাকে কর্ত্তৃপক্ষের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সহায়তা করিয়াছিল। আমরা তাঁহার বিধবা পত্নী, পুত্র-কন্যার এই বিয়োগ-ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

রায় বাহাদুর পি, এন, বসু

জাতীয় পতাকা-দিবস

লর্ড আরউইনের সহিত নেতৃবর্গের আপোষের কথা ভাঙ্গিয়া যাইবার পর যখন লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতা-মন্তব্য গৃহীত হয়, তখন কংগ্রেসের মন্তব্য অনুসারে যে কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইবে, তাহা সকলেই জানিত। কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ মহাত্মা গন্ধীর নেতৃত্বে গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখ স্বাধীনতা-দিবস বলিয়া ধার্য্য করেন এবং ঐ দিন কেন্দ্রে কেন্দ্রে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আলোক-সজ্জা এবং কংগ্রেসের গৃহীত নূতন নীতি-পাঠ প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য দেশের কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগকে অনুজ্ঞা প্রদান করেন। এতদুপলক্ষে ঐ দিন ভারতের সর্ব্বত্র উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছিল, কোথাও শান্তিভঙ্গ হয় নাই, কেবল ঢাকা ও বোম্বাই সহরে জনগণের মধ্যে সংঘর্ষ হইয়াছিল। কি কারণে এই সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল, তাহা এখনও বিচার-সাপেক্ষ। তবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ যতদূর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায়, ঢাকায় হিন্দুগণের বন্দে মাতরম্ জয়গানে মুসলমানদের আপত্তি ছিল বলিয়া এবং বোম্বাই সহরে শ্রমিকগণের রক্ত-পতাকা, জাতীয় পতাকার পার্শ্বে উত্তোলন করা সম্পর্কে শ্রমিক ও কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। 'বন্দে মাতরমে' মুসলমানদের আপত্তির কারণ বুঝা যায় না। কেন না, উহা দেশ-জননীর বন্দনা-গীতি-মাত্র, উহাতে মুসলমান কেন, জগতের কোন দেশপ্রেমিক জাতির আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না। ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে খিলাফৎ আন্দোলনকালে মুসলমানদের মুখে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি উত্থিত হইতে শুনা গিয়াছিল। যে সন্ন্যাসী শ্রদ্ধানন্দ মুসলমান আততায়ীর কাপুরুষোচিত আক্রমণে নিহত হইয়াছিলেন, সে সময়ে তিনিও দিল্লীর প্রধান মুসলমান উপাসনালয় জুম্মা মসজিদে বক্তৃতা করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই অনুমতিও পাইয়াছিলেন। আজ হঠাৎ মুসলমানের এই মনোবৃত্তি-পরিবর্ত্তনের কারণ কি, বুঝিয়া উঠা বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। নিরক্ষর অজ্ঞ মুসলমান জনসাধারণকে চতুর স্বার্থসর্ব্বস্ব তথাকথিত কয় জন নেতা যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তাহাদের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নহে। বোম্বাইএর দুর্ঘটনা একটা ভ্রান্ত ধারণা হেতু ঘটিয়াছে, ইহা শ্রমিকপক্ষ বলিয়াছেন; তাঁহারা বলিয়াছেন, জাতীয় পতাকার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা তাহাদের ইচ্ছা ছিল না।

যাহা হউক, দুই একটি অশুভ সংবাদ ব্যতীত এত বড় সার্ব্বজনীন বিরাট উৎসবে আর কোথাও কোন মন্দ সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ইহা দেশের ও জাতির ধৈর্য্য ও ত্যাগের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। তাহারা যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সুশৃঙ্খলার সহিত বিরাট যজ্ঞ-সম্পাদনে অধিকারী হইয়াছে, ইহা অতীব আনন্দের কথা। মুক্তিপথযাত্রী জাতির পক্ষে ইহা নিশ্চিতই গৌরবের কথা। পুলিসেরও এ বিষয়ে বিশেষ প্রশংসার কথা আছে। ঐ দিন পুলিস কোথাও কোনরূপ বাধা প্রদান করে নাই, বরং শান্তিরক্ষায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষের সে দিন এই নীতি অবলম্বন বিশেষ প্রশংসার্হ।

মহাত্মা গন্ধী এই স্মরণীয় দিবসে জাতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক দেশকর্ম্মীর হৃদয়ে ধারণ করা বিশেষ কর্ত্তব্য। মহাত্মার কথা এই :—

"স্মরণ রাখিবেন, ২৬শে জানুয়ারী তারিখে আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করি নাই। ইহা স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার দিন নহে। ঐ দিন আমরা ঘোষণা করিব যে, তথাকথিত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের পরিবর্ত্তে আমরা পূর্ণ স্বরাজের অধিকার না পাইলে সন্তুষ্ট হইব না। এই হেতু কংগ্রেসের নীতিতে স্বরাজ অর্থে এখন হইতে পূর্ণ স্বরাজ বুঝিতে হইবে।

"স্মরণ রাখিবেন, আমাদিগকে সত্যপথে থাকিয়া, অহিংসায় অবিচলিত রহিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। যত দিন আমরা চিত্তশুদ্ধি করিতে সমর্থ না হই, তত দিন সাধনায় সিদ্ধিলাভ আমাদের অদৃষ্টে নাই। অতএব জাতীয় পতাকা উত্তোলনের দিবসে আমাদিগকে গঠনমূলক কোন না কোন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে।"

এমন ভাবে জাতির ভবিষ্যৎ কার্য্যপন্থার নির্দ্দেশ করিবার পর মাহাত্মা যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এইরূপ,—"এইরূপে চিত্তশুদ্ধি হইবার পর জাতি যখন কষ্ট-বিপৎসহনে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইবে, তখন কোন একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া সেখানে সার্ব্বজনীন আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্ত্তন করা হইবে। কবে কোথায় উহা সম্পন্ন করিতে হইবে, কংগ্রেস তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। ইহাতে কাহাকেও বেদনা দেওয়ার সঙ্কল্প নাই, স্বয়ং বেদনা সহ্য করার কথা আছে। ইহাতে যাহারা সমর্থ হইবে, এমন লোককে লইয়া সার্ব্বজনীন আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্ত্তন করা হইবে।"

কি ভাবে এই সমস্ত কার্য্য আরম্ভ করা হইবে, সে সম্বন্ধেও মহাত্মা গন্ধী রীতিমত চিন্তা করিতেছেন। সুতরাং উহা যে নিতান্ত ছেলে-খেলার বিষয় হইবে না, ইহা নিশ্চিত। এই হেতু মহাত্মা স্বাধীনতা-দিবসে কোথাও বক্তৃতা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। বক্তৃতার দিন অপগত হইয়াছে, এখন জাতির জীবন-মরণের খেলায় দিন আসিয়াছে, এ কথাটা সকলকেই স্মরণ রাখিতে হইবে।

শাসকের জবাব

এ কথা, বোধ হয়, কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, শাসক জাতি কংগ্রেসের ঘোষণায় ও স্বাধীনতা-দিবসের অনুষ্ঠানে সন্তোষ অনুভব করিতে পারেন না। তাঁহারা আমাদের অভিভাবক, আমাদিগকে হাঁটি হাঁটি পা পা করিয়া ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন, অতএব এখন নিজে দৌড়াইতে গেলে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গিয়া হাত-পা ভাঙ্গিব,—এই ভাবের কথা বলিয়া তাঁহারা আমাদিগকে ও তথা জগতের লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও এবং আমরা ঐ কথার মূল্য কতটুকু বুঝিলেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁহারা কেবল আমাদের মুখের ঘোষণায় এত বড় একটা সাম্রাজ্যের জমীদারী ছাড়িয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া গুটি গুটি বত্রিনারায়ণের পথে অগ্রসর হইবেন না। এ জগতে এ যাবৎ কোন সাম্রাজ্যবাদী শাসক জাতিই তাহা করে নাই। সুতরাং বিলাতের প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া এ দেশের লাট-বেলাট এবং বিলাতের পার্লামেণ্টের লিবারল, কনজার-ভেটিব, লেবার মেম্বার হইতে আরম্ভ করিয়া বিলাতী ও এ-দেশী ইংরাজ কাগজওয়ালারা যে কংগ্রেসের ঘোষণায় তিড়বিড় করিয়া জ্বলিয়া উঠিবেন ও নানারূপে ভারতবাসীকে ভয়প্রদর্শন করিবেন, ইহা স্বাভাবিক।

বিলাতে ইহার পূর্ব্ব হইতেই অর্থাৎ বড়লাটের ঘোষণার পর হইতেই 'মর্ণিং পোষ্ট' ও 'ডেলি মেল'-প্রমুখ সংবাদপত্র শাসন-সংস্কারের পরিবর্ত্তে কড়া শাসনের ব্যবস্থাপত্র দিয়া আসিতেছেন। 'ডেলি মেল' পত্র সার মাইকেল ওডয়ার হইতে লর্ড লয়েড পর্য্যন্ত অবসরপ্রাপ্ত জবরদস্ত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শাসককুলের দ্বারা এ সম্বন্ধে বড় বড় প্রবন্ধে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিয়া আসিতেছেন। এ সকল রচনায় বৃটিশ বেয়নেট ও ডেডনটের সাহায্যে ভারত-শাসন করার উপদেশ-দান ব্যতীত অন্য কোন যুক্তি নাই।

এখন কংগ্রেসের ঘোষণার পর হইতে লাট-বেলাটের মুখেও কড়া শাসনের আভাস পাওয়া যাইতেছে। সার চার্লস ইনেস ব্রহ্মের গভর্ণর; তিনি সে দিন স্থানীয় বৃটিশ বণিকসভার সম্মেলনে স্বাধীনতার দাবীর বিরুদ্ধে—সার্ব্বজনীন আইন অমান্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে খাঁটী চণ্ডনীতি চালাইবার কথা পাড়িয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর সার ম্যালকম্ হেইলি সে দিন কংগ্রেসের ঘোষণার প্রতি বিদ্রূপের কশাঘাত প্রয়োগ করিয়াছেন।

বিলাতে কনজারভেটিব দলে মিঃ বলডুইনের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র চলিয়াছে, তাঁহার অপরাধ—তিনি বড়লাটের ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করেন নাই, বরং প্রকারান্তরে বড়লাটকে সমর্থন করিয়াছেন। খুনা কনজারভেটিব মিঃ চার্চ্চহিল এই সুযোগে লিবারল দলের নামজাদা লয়েড জর্জ্জকে লইয়া মিঃ বলডুইনের বিপক্ষে একটা মিশ্র দল (coalition) গঠনে মনোযোগ দিয়াছেন, উদ্দেশ্য,—বলডুইনকে সরাইয়া নূতন দলপতি ঠিক করিয়া লওয়া।

চার্চ্চহিল, লয়েড জর্জ্জ, লর্ড রেডিং, লর্ড রাসেল, লর্ড লয়েড, সার মাইকেল ওডয়ার, লর্ড সিডেনহাম, সার রেজিনাল্ড ক্রাডক, লর্ড মেষ্টন, আরল উইণ্টার্টন, লর্ড বার্কেণহেড, কত নাম করিব? একে একে আসরে নামিয়াছেন অনেকে, একই বুলি—কড়া শাসন চালাও, ভারতবাসীরা উহাই বুঝে ভাল। এ দিকে টাইমস, ডেলি মেল, ডেলি টেলিগ্রাফ, ডেলি এক্সপ্রেস, ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেন, সাণ্ডে টাইমস, নেশান এণ্ড এথিনিয়াম,—নানা শ্রেণীর বিলাতী সংবাদপত্র ঠিক যেন ফেরুপালের মত ভারতবাসীকে একযোগে আক্রমণ করিয়াছে। 'মর্ণিং পোষ্ট' স্পষ্টই বলিল, "পালের গোদা-দিগকে (Ringleaders) ধর।" ঠিক ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড সল্‌সবেরি এইভাবে আইরিশ জাতিকে 'হটেণ্টট' (অসভ্য কাফ্রি জাতির একটা উপজাতি) আখ্যা দিয়া বলিয়াছিলেন, এই বর্ব্বর জাতি স্বায়ত্তশাসন অধিকার পাইবার উপযুক্ত নহে। তাঁহারই নিকট-সম্পর্কের মিঃ এ, জে, ব্যালফোর আয়ার্ল্যাণ্ডের সেক্রেটারীরূপে আয়ার্ল্যাণ্ডে বে-পরোয়া চণ্ডনীতি চালাইয়া-ছিলেন। অথচ সেই আইরিশ জাতিই আজ স্বায়ত্ত-শাসনের উপযুক্ত, সাম্রাজ্যের সমান অংশীদার বলিয়া স্বীকৃত!

আর একখানা পত্র বলিল, "লোক আয়ার্ল্যাণ্ডের সহিত ভারতের অবস্থার তুলনা করিতে যায়। আয়ার্ল্যাণ্ডের একটা আলষ্টার আছে, ভারতের একশতটা। আয়ার্ল্যাণ্ডের লোক বিদেশীর উপর বিজাতীয় ঘৃণা পোষণ করিত, তাহাদের বিপক্ষে একপ্রাণ হইয়া বিপ্লবের ধ্বজা উত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়া-ছিল।" অর্থাৎ বিলাতী পত্রগুলা রাগে এত অন্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, ভারতকে আয়ার্ল্যাণ্ডের সহিত তুলনা করিতে গিয়া প্রকারান্তরে অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতবাসীকে হিংসাত্মক বিদ্রোহধ্বজা তুলিতে উত্তেজিত করিয়াছিল!

এতটা অধঃপতন এই সাম্রাজ্যবাদীদের হইয়াছে! সেক্স-পিয়ারের ইংলণ্ড আজ রুডিয়ার্ড কিপলিংএর ইংলণ্ডে পরিণত,—পিট, বার্ক, সেরিডেন, পিম, হ্যামডেনের ইংলণ্ড আজ সিডেন-হাম ওডয়ারের ইংলণ্ডে পরিণত, ইহা কি কম দুঃখের কথা।

চারিদিকের এই আক্রমণ, বড়লাট নীরব থাকেন কিরূপে? তিনি ব্যবস্থা-পরিষদে তাঁহার সরকারের পক্ষের মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছেন। কথায় তাঁহার নূতনত্ব একটুকু আছে। প্রথমতঃ তিনি মামুলি বিলাতী প্রতিশ্রুতির (ভারতের ঔপনিবে-শিক স্বায়ত্ত-শাসনদানের) পুনরুল্লেখ করিয়াছেন এবং কংগ্রেসের ঘোষণামত সার্ব্বজনীন আইন অমান্যাদি আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইলেই সরকার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবেন, এই ভয় দেখাইয়াছেন। তবে নূতন এইটুকু যে, তিনি অম্লানবদনে বলিয়াছেন, "মূল কথা লইয়া (main issue) ভারতের সহিত বিলাতের কোন গোলযোগ নাই।" ইহার অর্থ? মূল কথা লইয়াই ত মতবিরোধ। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ভবিষ্যৎ ভারত-শাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ইহা লইয়া ত মারামারি নাই, বিবাদ সেইখানে—যেখানে সময়ের কথা উঠে। ভারতবাসীরা চাহে, অবিলম্বে অধিকার, ইংরাজ শাসক জাতি চাহে, কবে, কি বৃত্তান্ত, তাহা এখন বলা হইবে না, সে সম্বন্ধে পার্লামেণ্টই হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা। বড়লাট

বলিয়াছেন, "যাঁহারা বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের সমানে সমানের আসন চাহেন, তাঁহারা জানিয়া রাখুন, বৃটেনও তাহাই চাহেন এবং এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে সাহায্যদানে প্রস্তুত আছেন।" এ কথা ত সকলেই জানে। কিন্তু কথা হইতেছে,—কবে? এইখানেই ত গোল। বৃটেন বলিতেছেন, 'কোন না কোন সময়ে তোমাদিগকে পূর্ণ স্বরাজ দিব'; ভারত বলিতেছে, 'সে কবে? আমরা যে এখনই চাই।' এখানে উভয় পক্ষের মত-সামঞ্জস্য রহিল কোথায়? বৃটেনের যদি মতলব তাহাই থাকিত, তাহা হইলে বড়লাটের ঘোষণার পরেই তাঁহারা গোল-টেবল বৈঠক বসাইয়া কি ভাবে ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দেওয়া যায়, সে সম্বন্ধে ভারতীয় নেতৃবর্গকে লইয়া পরামর্শ করিতেন। তাহা হয় নাই। সুতরাং উভয় পক্ষে আপোষও হয় নাই। এখন অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, এক পক্ষ ভয় দেখাইতেছেন, অপর পক্ষ সহিতে প্রস্তুত হইতেছেন। সুতরাং শান্তির আশা ক্রমে যেন দূরে অপসারিত হইয়া যাইতেছে। মহাত্মা গন্ধী এখনও বলিতেছেন, "আমাকে কংগ্রেসের আন্দোলন থামাইয়া গোল-টেবল বৈঠকটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কথা বলা হইতেছে। আমি বলি, যাঁহারা বৈঠকে যাইতে চাহেন এবং মনে করেন, উহাতে কায হইবে, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে যাইতে পারেন। যদি তাঁহারা উহা হইতে প্রকৃত কায কিছু আদায় করিয়া লইয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলে কংগ্রেস আত্মসমর্পণ করিবে।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি বড়লাটকে ১১টি সর্ত্ত দিয়াছেন, যদি সেই সর্ত্তমত কায করিতে বৃটিশ সরকার সম্মত হন, তাহা হইলে কংগ্রেস সার্ব্বজনীন আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিবেন না।

এখন এই পর্য্যন্ত। ইহার পর যখন মহাত্মা গন্ধী কোন এক স্থানে কংগ্রেসের আন্দোলনকে কার্য্যে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইবেন, তখনই প্রকৃত সমস্যার উদয় হইবে। মহাত্মা বলিয়াছেন, কিরূপে এই আন্দোলনকে রূপ দেওয়া যায়—মূর্ত্তি দেওয়া যায়—তিনি তাহা এখন বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন। যে দিন তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া যাইবে, সে দিনই তিনি কংগ্রেসকে সেই সিদ্ধান্তের কথা নিবেদন করিবেন এবং কংগ্রেস সেই নির্দ্ধারণমত কার্য্য করিতে দেশবাসীকে আহ্বান করিবে।

তবেই বুঝা যাইতেছে, সমস্যার সময় আসিতেছে। তাহার পূর্ব্বেই যদি সরকারের সুমতি হয়, তাহা হইলে হয় ত বিরোধ মিটিয়া যাইতে পারে। এটা ঠিক যে, অবিমিশ্র দমননীতি কখনও কোথাও কার্য্যকর হয় নাই। বরং তৎপরিবর্ত্তে প্রজার সন্তোষের উপরই রাজত্বের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ কথাটা কর্ত্তৃপক্ষকে অনুক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে।

স্বর্গীয়া রাধারাণী দেবী

গত ২২শে অগ্রহায়ণ 'প্রবর্ত্তক-নারী-মন্দিরের' প্রাণস্বরূপা রাধারাণী দেবী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ১৮৯ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় এক ক্ষেত্রী-পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তিনি স্নেহপ্রবণা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। স্থানীয় ফ্রি চার্চ্চ মিশনারী বালিকা-বিদ্যালয়ে তাঁহার প্রথম শিক্ষারম্ভ। কিন্তু তিনি কর্ম্মজীবনে ভারতীয় ভাবধারায় সিদ্ধ সাধিকা হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনে সামান্যমাত্রও বিদেশী ভাব-বিলাসের স্থান হয় নাই। একমাত্র কন্যার অকালমৃত্যুর পর তরুণ

স্বর্গীয়া রাধারাণী দেবী

জীবনে তিনি স্বামীর যথার্থ সহধর্ম্মিণীরূপে ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং হিন্দুনারীর মত আদর্শ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন। সংযম ও বৈরাগ্যব্রতধারিণী এই নারী স্বামীর সকল দেশহিতকর কার্য্যে অন্তরালে থাকিয়া আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনিই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে 'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের' ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং 'প্রবর্ত্তক নারী-মন্দিরে' হিন্দু আদর্শে হিন্দুনারীর শিক্ষাবিধানে বদ্ধব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় আদর্শ হিন্দু নারীকর্ম্মীর তিরোধানে প্রবর্ত্তক-নারী-শিক্ষামন্দির যে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরিষদ ও প্রেসিডেণ্ট

শীতের মরশুমে ব্যবস্থাপরিষদের অধিবেশনের উদ্বোধনের দিনে প্রেসিডেণ্ট পেটেল যে বিবৃতি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা অতীব প্রয়োজনীয়।

অধিবেশনের দিনে পরিষদে অতিরিক্ত পুলিস-প্রহরার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট পেটেল ইহাতে আপত্তি করেন। কিন্তু সরকার পক্ষ হইতে জবাব দেওয়া হয় যে, পরিষদে যখন একবার সার বেসিল ব্ল্যাকেটের মাথার চামড়ার বাক্স ছুড়িয়া মারা হইয়াছিল এবং আর একবার বোমা ফাটিয়াছিল, তখন পরিষদের শান্তিরক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা করার ভার সরকারের হস্তে থাকা কর্ত্তব্য। দিল্লীর চিফ-কমিশনার এ বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন। প্রেসিডেণ্ট পেটেল ইহাতে আপত্তি তুলিয়া বলেন, পরিষদের ভিতরে শান্তিরক্ষা বা আর কিছু ব্যবস্থা করিবার অধিকার প্রেসিডেণ্টের আছে, সুতরাং তিনি যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন, সরকারকে তাহা মানিয়া চলিতে হইবে। যদি নিয়মানুগ পথে চলিতে হয়, তাহা হইলে পরিষদকে পার্লামেণ্ট এবং প্রেসিডেণ্টকে স্পীকারের সহিত তুলনা করিয়া সমান আসন দিতে হইবে। সুতরাং পার্লামেণ্টের স্পীকারের পার্লামেণ্টের ভিতরে যে অধিকার ও ক্ষমতা আছে, পরিষদের মধ্যে প্রেসিডেণ্টের সেই অধিকার ও ক্ষমতা থাকিবে। তাঁহার আদেশ পরিষদের মধ্যে শেষ আদেশ, absolute and final.

মিঃ ভি, জে, পেটেল

এই নীতি অনুসরণ করিয়া প্রেসিডেণ্ট পেটেল পরিষদের ভিতর হইতে পুলিস বাহির করিয়া দিয়াছিলেন; অধিকন্তু দর্শকাদির গ্যালারী হইতেও বহিষ্কারের আদেশ দিয়াছেন। এ যাবৎ গ্যালারী দর্শকহীন রহিয়াছে, সরকারের সহিত প্রেসিডেণ্টের মনোমালিন্য ও মতভেদ সমানই রহিয়া গিয়াছে। সরকার-পক্ষ এবং তাঁহাদের মতানুবর্ত্তীরা বলিতেছেন, প্রেসিডেণ্ট তাঁহার অধিকারের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার পদত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

কিন্তু প্রেসিডেণ্ট পেটেল সেই ধাতুতে গঠিত নহেন—তিনি বিনা যুদ্ধে কখনও সূচ্যগ্র ভূমি দান করেন নাই। এ ক্ষেত্রেই বা দিবেন কেন? তিনি বরং নজীর ও যুক্তি-তর্কের বোঝা বিরুদ্ধবাদীদের স্কন্ধে বেশী করিয়া চাপাইয়া দিয়াছেন।

ধরিতে গেলে ঝগড়াটা এখন দাঁড়াইয়াছে উভয়পক্ষে শক্তি-পরীক্ষা লইয়া—বস্তুতঃ সমস্যাটার মীমাংসার চেষ্টা ততটা নাই। এক দিকে সরকারপক্ষে স্বরাষ্ট্র-সচিব সার জেমস ক্রেরার ও দিল্লীর চিফ-কমিশনার, অন্য দিকে প্রেসিডেণ্ট পেটেল—যুদ্ধ উপভোগ করিবার বটে!

পরিষদে বোমা পড়ার পর একটি "ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড" কমিটী বসিয়াছিল। পরিষদে কি ভাবে শান্তিরক্ষা করা হইবে, সে সম্বন্ধে তাঁহারা কয়েকটি পরামর্শ দিয়াছিলেন। প্রেসিডেণ্ট পেটেল সেই পরামর্শ-অনুসারে তাঁহার আদেশ দিয়াছিলেন। দিল্লীর চিফ-কমিশনার সরকারের সহিত যোগাযোগে অর্থাৎ সরকারের অনুমতি লইয়া তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট পেটেল এই অবাধ্যতা সহ্য করিবেন, এমন ধাতুর লোক নহেন।

অন্যান্য দেশে কি হয়? সেখানে পার্লামেণ্ট বা অন্যরূপ জনসভার প্রচলিত আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি প্রভৃতি দেখিয়া কার্য্য করা হয়, আইনে কি বলিতেছে, তাহা চুল চিরিয়া গ্রহণ করা হয় না।

রাজা প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে যখন পার্লামেণ্টের ৫ জন সদস্য তাঁহার ক্রোধের কারণ হইয়াছিলেন এবং রাজা চার্লস যখন ঐ ৫ জনকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে বলেন, তখন স্পীকার লেন্থল রাজার আদেশও অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তিনি তখন পার্লামেণ্টে প্রাচীন আচার-ব্যবহার রীতি-নীতির দোহাই দিয়াছিলেন। ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড কমিটী যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহা পার্লামেণ্টের রীতি-নীতির নজীর দেখাইয়া দিয়াছিলেন, সে পরামর্শ তাঁহাদের নিজের মনগড়া নহে। এ বিষয়ে পার্লামেণ্টের কমন্স সভার ক্লার্ক এইরূপ পত্র লিখিয়াছেন:—

"লণ্ডনের মেট্রোপলিটান পুলিস (সহর পুলিস) পার্লামেণ্টের সাধারণ দর্শকদের গ্যালারীর প্রবেশ-পথে পাহারা দেয়। কিন্তু খাস গ্যালারীগুলি পাহারা দেয় পার্লামেণ্টের স্পীকারের অধীন সার্জ্জেণ্টের লোকজন। ইহার বাহিরের যায়গায় পুলিস পাহারা দেয়। সদস্যদের গ্যালারীতে মুফতি-পরা এক জন পুলিস উপস্থিত থাকে। এইটি ছাড়া পুলিস পার্লামেণ্টের 'গ্যালারী'-গুলিতে, 'লবিতে' অথবা 'হাউসের ফ্লোরে'—অর্থাৎ পার্লামেণ্টের মধ্যের কোন স্থানে প্রবেশ করিতে পায় না (অবশ্য যে সময়ে পার্লামেণ্টের অধিবেশন হয়)। কমন্স সভার গৃহের আশে-পাশে ও হলদার মধ্যে যে সকল পুলিস উপস্থিত থাকে, তাহাদিগকে পার্লামেণ্টের স্পীকারের অধীনে থাকিতে হয়। স্পীকার সার্জ্জেণ্টকে হুকুম করেন, সার্জ্জেণ্ট পুলিসের ইনস্পেক্টরকে হুকুম করেন এবং পুলিস ইনস্পেক্টর যাহাতে আদেশ পালিত হয়, তাহা দেখেন।"

প্রেসিডেণ্ট পেটেল পরিষদেও এই নীতি চালাইতে চাহিতেছেন। ইহাতে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। ইংরাজ পরিষদকে Indian Parliament বলিয়া থাকেন। যদি তাহাই হয়, তবে প্রেসিডেণ্টও স্পীকার। সে ক্ষেত্রে পরিষদের মধ্যে তাঁহার আদেশ final and absolute.

কিন্তু যদি শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে প্রেসিডেণ্টের এই ন্যায্য অধিকারের উপর বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করা হয়, তাহা হইলে দেশের লোক এই 'ভাণ পার্লামেণ্টের' ও 'মণ্টেগু-মাকালের' মর্ম্ম সহজেই বুঝিতে পারিবে, সে জন্ম সরকার প্রস্তুত হইয়া থাকুন। যাঁহারা কাউন্সিল বর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা বহু দিন হইতে এ কথা বুঝিয়াছেন। বাকী যাঁহারা আছেন, এই সব ব্যাপারে তাঁহাদের চৈতন্মের উদয় হইলে দেশের পক্ষে মঙ্গল।

—

কাউন্সিল-বর্জ্জন

কংগ্রেসের আহ্বানে বহু কংগ্রেস-সদস্য পরিষদ ও প্রাদেশিক কাউন্সিল ত্যাগ করিয়াছেন, অনেকে করেন নাই। এ বিষয় লইয়া দলাদলিও হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার ও অন্য প্রদেশের কয় জন কংগ্রেস-সদস্য "কংগ্রেস কাউন্সিল পার্টি" নামে স্বতন্ত্র একটি দল গঠন করিয়াছেন। দেশবন্ধু দাশ যেমন স্বরাজ্য দল গঠন করিয়াছিলেন, বোধ হয়, এ দলও তাহার অনুকরণে গঠিত হইয়াছে। তবে এ দলের প্রভাব যে বহু দূরবিসারী হইবে, এমন ত মনে হয় না। এক শ্রেণীর কংগ্রেসের সদস্য স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা পদত্যাগ করিয়া পুনর্নির্ব্বাচনের জন্য দাঁড়াইবেন। ন্যাশনালিষ্ট, ইণ্ডেপেণ্ডেণ্ট, মুসলমান, য়ুরোপীয়—ইঁহারা কাউন্সিল ত্যাগ করিবেন না, (তবে দুই চারি জন মুসলমান কংগ্রেস-সদস্য কাউন্সিল ত্যাগ করিয়াছেন), ইহা সকলেই জানিত।

এ দিকে কংগ্রেস-সদস্যরা পদত্যাগ করার ফলে অনেক মডারেট (লিবারল) ও অন্য দলের লোক তাঁহাদের শূন্য পদ অধিকার করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইয়াছেন। ফল কথা, কাউন্সিল-বর্জ্জনের জন্য সরকার যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, এমন মনে হয় না। তবে ইহার নৈতিক মূল্য কম নহে। অতঃপর জগতের লোক জানিবে, সরকারের খয়ের-খাঁদের দলের দ্বারাই প্রধানতঃ কাউন্সিল ও এসেমব্লি পূর্ণ হইয়াছে। ইহাও কংগ্রেসের পক্ষে একটা লাভ ও জয়ের নিদর্শন।

প্রেসিডেণ্ট পেটেল পদত্যাগ করিবেন কি না, ইহা লইয়া ঘোর তর্ক-বিতর্ক উঠিয়াছিল। দেশের কংগ্রেস-কর্ম্মীরা বলিয়াছিলেন, তিনি যখন কংগ্রেস দলীয় লোক এবং কংগ্রেসের ছাড় লইয়া কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন কংগ্রেসের অনুজ্ঞা তাঁহার পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রেসিডেণ্ট পেটেল পরিষদে ইহার এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছেন :—

(১) আমি কংগ্রেসের ছাড় লইয়া কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমি সকলের সম্মতিক্রমে পরিষদের প্রেসিডেণ্টরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছি, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আমি সকল দলের অতীত; আমি নিরপেক্ষ না থাকিলে প্রেসিডেণ্টের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য পালন করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে।

(২) আমি একবার কংগ্রেস-সদস্যের পদত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র দলের ছাড় লইয়া কাউন্সিলে প্রবেশ করি। সে ক্ষেত্রে আমি কংগ্রেসের নির্দ্দেশ বা অনুজ্ঞা মানিতে বাধ্য নহি।

(৩) কাউন্সিলের দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে কংগ্রেস অপেক্ষা কায অধিক পাওয়া যায়। দেশের এই সঙ্কটসঙ্কুল সময়ে সেই কার্য্যের আশা থাকিতে প্রেসিডেণ্টের পদে অধিষ্ঠিত থাকা আমি আমার পক্ষে আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি। যদি দেখি যে, আমার পদের মর্য্যাদাহানি হইয়াছে, অথবা আমার দেশের প্রয়োজনে আমার পদত্যাগ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই আমি পদত্যাগ করিব।

প্রেসিডেণ্ট যে যুক্তি দিয়াছেন, তাহা সহজে খণ্ডন করা যায় না। তবে তিনি যে বলিয়াছেন, কাউন্সিলে কায হয়, এ কথা আমরা মানি না। দুই একটা বিল পাশ হইলেই যে দেশের মস্ত কায হয়, এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না। আসল ব্যথা কোথায়, তাহা প্রেসিডেণ্ট পেটেলের ন্যায় কূটবুদ্ধি তার্কিক নিশ্চয়ই জানেন। 'গলার বগলসের' দাগ যত দিন থাকিবে, তত দিন কাউন্সিল এসেমব্লি মাকাল-ফল ভিন্ন কিছুই হইবে না। অন্ততঃ তিনি যদি কংগ্রেসের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কাউন্সিল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার শক্তির সাহায্য পাইয়া কংগ্রেসে বিশেষ শক্তিসঞ্চয় হইতে পারিত।

—

কর্ম্মীর কারাদণ্ড

ভারত ও বিলাতের শাসকজাতি কি ভাবে এ দেশে দমন-নীতি চালাইবার জন্য সরকারকে উত্তেজিত করিতেছেন, তাহার পরিচয় সকলেই পাইয়াছেন, কিন্তু দমননীতি যে এখনই চলিতেছে না, তাহার প্রমাণ কি? দেশে ধরপাকড়, খানাতল্লাসী ত চলিতেছেই, তাহার উপর রাজনীতিক মামলাও একাধিক চলিতেছে। সে দিন রাজনীতিক বন্দি-দিবসে কংগ্রেসকর্ম্মীরা কলিকাতায় শোভাযাত্রা করিয়াছিলেন, এই অপরাধে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মীরা কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। জামীনের জন্য আপীল করিলেও বিনা সর্ত্তে তাঁহাদিকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই। এইরূপ কঠোর দণ্ড কি দমন-নীতির অঙ্গ নহে? সুভাষচন্দ্র তাঁহার ত্যাগে ও দেশসেবায় দেশবাসীর শ্রদ্ধাপ্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং উচ্চশিক্ষিত; সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। ইচ্ছা করিলে তিনি আরামে বিলাসে বাস করিয়া আর পাঁচ জনের মত সরকারের সুনজরে থাকিয়া সরকারী খেতাবে ভূষিত হইয়া সুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি পরাধীন দেশের বিপৎসঙ্কুল পথে চলিয়া দেশ-জননীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এ পথে চলিলে দুঃখ-বিপদের কণ্টকমুকুট শিরে ধারণ করিতে হয়, এ কথা সকলেই জানে। সুতরাং সে জন্য সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য কংগ্রেসকর্ম্মীদের গুরু দণ্ডে দুঃখের কোন কারণ নাই, বরং উহা দেশবাসীর পক্ষে গৌরবেরই বিষয়। তবে সরকারও যদি এই পথে চলিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সময় থাকিতে তাঁহাদিগকে সতর্ক করা আমরা কর্ত্তব্য

বলিয়া মনে করি। দমন-নীতি সকল দেশেই বিফল হইয়াছে। এ দেশেও একাধিকবার উহা প্রয়োগ করিয়া দেখা হইয়াছে, তাহাতেও ফল হয় নাই, বরং অসন্তোষ বাহিরে ফুটিতে না পাইয়া ভিতরে গুমরিয়া উঠিয়াছে, আর তাহার ফলে এক শ্রেণীর অবিবেচক লোক হিংসা ও অনাচারের পথ গ্রহণ করিয়াছে। কংগ্রেসকর্ম্মীরা অহিংসমন্ত্রে দীক্ষিত, তাহারা বেদনা দেয় না, বেদনা গ্রহণ করে। আর যাহারা বেদনা দেয়—হিংসা করে,—কংগ্রেসকর্ম্মীরা তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিরুদ্ধবাদী। সুতরাং সরকার কংগ্রেসকর্ম্মীর প্রতি দমননীতি প্রয়োগ করিলে তাঁহাদের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে, হয় ত উহাতে হিংসানীতি-সমর্থকদের দল বৃদ্ধি হইয়া যাইবে। হিংসাবাদীরা দেশে দমন-নীতিই প্রার্থনা করে, কেন না, তাহারা জানে, যতই লোকের অসন্তোষ-বৃদ্ধি হইবে, ততই তাহাদের সুযোগ হইবে, দলপুষ্টির সম্ভাবনা হইবে। সরকারের এ কথাটা ভাবিয়া দেখা উচিত।

নূতন তথ্য

গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার বৌদ্ধধর্ম্ম-মন্দিরে বৌদ্ধ সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। তদুপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রেভারেণ্ড ডি, এ, ধর্ম্মাচার্য্য যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি কথা বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। তিনি অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গে বলেন, "বৌদ্ধ-সাহিত্যে জগতের যে অনেক কিছু শিখিবার ও জানিবার আছে, তাহা অনেকেই জানেন না। সম্প্রতি নেপালে গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বৌদ্ধ-ত্রিপিটক ৯৬টি বিভিন্ন দেশে ৯৬টি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। এখন জানা গিয়াছে যে, বুদ্ধ ভারতবর্ষে যে ৮৪ হাজার ধর্ম্মকাণ্ডসমূহ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইটালীয় প্রভৃতি নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। আরও জানা গিয়াছে যে, কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করিবার এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে কাবুল হইতে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনদেশে ধর্ম্মপ্রচারে গিয়াছিলেন এবং পরে তথা হইতে আমেরিকার মেক্সিকো দেশে গিয়া বৌদ্ধ-সভ্যতা ও শিক্ষাদীক্ষা বিস্তার করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি একটি মন্দিরও নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখন প্রতীচ্যের প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতরা মার্কিণ দেশের মায়া সভ্যতাকে বৌদ্ধ সভ্যতার রূপান্তর বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।"

আমরা মায়া সভ্যতার পরিচয় সবিশেষ জানি বা না জানি, তবে কিম্বদন্তী শুনিয়া আসিতেছি যে, মার্কিণ মুলুক মহীরাবণের দেশ ছিল। একবার আমরা 'মাসিক বসুমতী'তে সে সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দিয়াছি। ইতিহাস-পাঠে জানা যায় যে, স্পেনীয় বিজেতারা (সেনাপতি কর্টেজ) যখন মধ্য-আমেরিকা জয় করেন, তখন সেখানে এক অতি সভ্যজাতি ও সভ্য রাজার রাজ্য দেখিয়াছিলেন। তাহাদের নাম 'ইন্‌কা'। তাহাদের দেউল, প্রাচীর, মন্দির, প্রাসাদ, অলঙ্কার, ভাষা ইত্যাদি সমস্তই ছিল। আর এক জাতির নাম ছিল 'আজটেক'। তাহারাও সুসভ্য ছিল।

ইহারা কাহারা? ইহারা কি এই বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রচারিত শিক্ষা-দীক্ষায় অভ্যস্ত আমেরিকার আদিম জাতির বংশধর, না বৌদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে যাহারা নূতন দেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদের বংশধর? এ সমস্যার সমাধান জগতের প্রত্নতাত্ত্বিকরা করিতে পারেন।

গো-রক্ষা

রাজা রঘুনন্দন প্রসাদ ব্যবস্থা-পরিষদে দুগ্ধবতী গাভী এবং বৎসতরহত্যা নিবারণকল্পে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। প্রস্তাবে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন, এতদ্দ্বারা ধর্ম্ম-সম্পর্কিত ব্যাপারে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে না।

তাঁহার প্রস্তাবের একটা সংশোধনমূলক প্রস্তাবও উপস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু কোনটিই ভোটে টিকে নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে হারে গো-দুগ্ধ এ দেশে দিন দিন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে এবং উহার ফলে শিশুমৃত্যু বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে গো-রক্ষা করা কি কেবল হিন্দুদেরই দায়, আর কাহারও নহে? অর্থনীতির দিক্ দিয়া দেখিলে গো-রক্ষা করা যে বর্ত্তমানে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? কৃষিই যে দেশের প্রধান অবলম্বন, সে দেশে গো-জাতির বংশবৃদ্ধি ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান করা কি দেশবাসীর কর্ত্তব্য নহে? দেশহিতকর এত বড় একটা ব্যাপারেও সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্ম্মান্ধতা-রাক্ষস বিকট মুখব্যাদান করিয়াছিল। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া স্বচ্ছন্দে বলা যায়,—দেশে এমন অবস্থা বিদ্যমান থাকিতে ব্যবস্থা-পরিষদ বা ব্যবস্থাপক সভা থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল! কংগ্রেস, কাউন্সিল বর্জ্জন করিয়া ভালই করিয়াছেন। ইহা হইতে উপকারের পরিবর্ত্তে সারদা-বিলের মত অপকারই বেশী পাওয়া যায়।

ভারতীয় নিয়োগ

পার্লামেণ্টের প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে, ভারতীয়দিগকে সামরিক বিভাগে কি ভাবে সেনানীর পদ (Kings Commissions) দেওয়া হইয়াছে। গত ১লা এপ্রেল তারিখে ভারতীয় সে[না]র ৩ হাজার ৩ শত ৬৫ জন সেনানীর মধ্যে মাত্র ৯১ জন ভার[তী]য় সেনানী ছিলেন? অর্থাৎ ভারতীয় সেনানীর সংখ্যা শ[তক]রা ৩ জনেরও কম! গত ৫ বৎসরে ২ শত ৬৩ জন য়ুরো[পী]য় সেনানীর পদ পাইয়াছেন, আর ভারতীয়রা ঐ পদ পাইয়া[ছে]ন মাত্র ৪৯ জন। মাত্র ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয়দের একটু ক[পা]ল ফিরিয়াছিল,—ঐ বৎসরে ২৫ জন বৃটন ও ১১ জন ভার[তী]য় সেনানীর পদ পাইয়াছিলেন। তবুও ভাল, প্রায় এক[তৃতীয়াংশ]! নিম্নে একটা হিসাব দিতেছি,—

	বৃটিশ সেনানী	ভারতীয় সেনানী
১৯২৬	৪৮	৭
১৯২৭	৪২	৬
১৯২৮	৬৭	১৪
১৯২৯	৮১	১১

কেমন, আর কি চাই, চিনিবাস কি ইহাতেও সন্তুষ্ট নহে ?

——

দেশের তরুণ

লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনকালে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু কোন সূত্রে বলিয়াছিলেন, "কয়েক দিন আমি দেখিয়া লজ্জা পাইতেছি যে, এই সভায় শৃঙ্খলার অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। সেনাপতির অধীনে শৃঙ্খলার সহিত কার্য্য করিবার ও থাকিবার বিদ্যায় অভ্যস্ত না হইলে আপনারা কখনই স্বাধীনতা পাইবেন না, পাইলেও উহা রক্ষা করিতে পারিবেন না।"

কথাটা যে দেশের এক শ্রেণীর অসহিষ্ণু তরুণদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না। কংগ্রেসে স্বাধীনতা মন্তব্য উপস্থাপিত হইলে যখন মত-বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন এক দল অপর দলকে 'শেম' 'শেম,' ইত্যাদি মামুলী গালিবর্ষণে আপ্যায়িত করেন। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জ্জন করা দূরে থাকুক, স্বাধীন হইবার উদ্যম করিতে গেলে যে অদম্য সাহস ও সহিষ্ণুতা, অমিত তেজ ও আত্মত্যাগ প্রয়োজন হয়, তাহা এই 'শেম, শেম' চীৎকারকারীরা দেখাইতে পারিতেছেন কি ? বিপ্লববাদের মামুলী বুলি আওড়াইয়া অথবা 'শেম, শেম' বলিয়া বিরুদ্ধবাদীকে গালি পাড়িয়া চীৎকার করিলেই সেই তেজ, সাহস বা ধৈর্য্য প্রদর্শন করা হয় না, এ কথাটা দেশের এই শ্রেণীর তরুণরা যত দিন না বুঝিবেন, তত দিন তাঁহাদের মুক্তি-যুদ্ধে সাফল্যের কোন আশা নাই। তাঁহারা নিজে যেমন ব্যক্তিগত মতের স্বাধীনতার জন্য আমলাতন্ত্র সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন, তেমনই অপরকেও তাঁহাদের পক্ষে ব্যক্তিগত মতের স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে কি ?

কিছু দিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই মহাশয় 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে দেশের এই শ্রেণীর তরুণদের এক দলের কীর্ত্তির কথা প্রকাশ করিয়াছেন। মহাত্মা গন্ধী যখন লাহোর কংগ্রেসের পর দিল্লীর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন কতকগুলি তরুণ তাঁহার সেই তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় প্রবেশ করে ও 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির পর "Down with Gandhism" অর্থাৎ 'গন্ধীবাদ নিপাত যাও' বলিয়া চীৎকার করে। শ্রীযুক্ত দেশাই বলেন, মহাত্মা গন্ধী কংগ্রেসে বড় লাটের গাড়ীতে বোমা-বিস্ফোরণের প্রতিবাদ করিয়া ও বড় লাটকে এই বিপদ হইতে মুক্ত হওয়ার দরুণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া মন্তব্য পেশ করিয়াছিলেন,—ইহাই তাঁহার অপরাধ। দেশপূজ্য নেতার প্রতি এই শ্রেণীর তরুণগণের ব্যবহার দেখিয়া ঘৃণায় লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। তাঁহার ত্যাগ, তাঁহার দেশপ্রেম,—এ সব কোন কাযেরই হইল না, কেবল তিনি তাহাদের মনের মত করিয়া একটি মন্তব্য গঠন করেন নাই বলিয়াই তাঁহার মতবাদ নিপাত যাইবে এবং সেই কথা তাঁহারই সম্মুখে চীৎকার করিয়া শুনাইয়া বলিতে হইবে! এই মনোবৃত্তি লইয়া ইহারা দেশ স্বাধীন করিতে চাহেন ? অধুনা এক শ্রেণীর যুবজনের মধ্যে এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিতেছে। দেশের নেতৃস্থানীয়রা ইহাতে প্রশ্রয় না দিয়া তাহাদিগকে এ বিষয়ে সদুপদেশ দান করিলে তাহাদের মতিগতি ফিরিতে পারে। ভবিষ্যতে যাহারা দেশের আশা-ভরসা, তাহাদিগকে কোমল বয়স হইতেই সংযম, ত্যাগ ও ধৈর্য্যে অভ্যস্ত হইতে হইবে।

——

মডারেটদের পুরস্কার

বিলাতের 'মর্ণিং পোষ্ট' পত্র ভারতীয় মডারেটদের সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "আরল রাসেলের বক্তৃতার পর ভারতীয় মডারেটরা এমন ঘেউ ঘেউ রব তুলিয়াছে যে, উহা আরল রাসেলের পীড়িত কুকুরের 'কেঁউ কেঁউ' রব অপেক্ষাও হৃদয়ে করুণার উদ্রেক করে।" যে মডারেটরা এখনও গোলটেবল বৈঠকে যোগ দিয়া বৃটিশ সরকারের সহিত 'সহযোগ' করিতে যাইতে পশ্চাৎপদ নহেন, তাঁহাদিগকে বৃটিশ পত্রের এই পুরস্কার-দান কেমন শোভন ও সময়োচিত হইয়াছে, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন।

——

পরিষদে সাম্প্রদায়িকতা

দুই চারি জন দেশপ্রেমিক মুসলমান ব্যতীত অধিকাংশ মুসলমানই কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন এবং গোল টেবলে যোগদান করিয়া সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগ করিতেছেন। সার মহম্মদ সফি অথবা তাঁহার বর্ত্তমান অনুচর আলিভ্রাতারা আপন কোলে ঝোল টানিবার জন্য নানা সময়ে নানা মূর্ত্তি ধরিতেছেন। মিঃ মহম্মদ আলি ইহার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত; পরন্তু কংগ্রেস নেহরু রিপোর্ট গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই তাঁহার কংগ্রেসের সহিত বিরোধ। কিন্তু কংগ্রেস যে মুহূর্ত্তে নেহরু রিপোর্ট বাতিল করিয়া স্বাধীনতা নীতি গ্রহণ করিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে মিঃ মহম্মদ আলি বা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আর কোন সাড়া-শব্দ নাই। এ দিকে ব্যবস্থা পরিষদেও সকল দলের (মায় কংগ্রেসী মুসলমান দলেরও) মুসলমানদিগকে লইয়া একটি স্বতন্ত্র মুসলমান দল গঠনের চেষ্টা চলিতেছে। এই ভাবে অগ্রসর হইলে আমাদের স্বরাজ পাইবার আর অধিক বিলম্ব হইবে না!

——

নারী-ধর্ষণ

বাঙ্গালায় নারীধর্ষণ কাণ্ড অবাধেই চলিতেছে। ইহার প্রতীকারের কোন উপায় হইতেছে না। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, আসামী উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত ভদ্রলোক হইয়া থাকেন।

নিরক্ষর গুণ্ডাপ্রকৃতির নিম্নশ্রেণীর লোক পাশবিক উত্তেজনাবশে যে পাপাচরণ করে, তাহার কৈফিয়ৎ থাকে যে, সে যে আবহাওয়া ও শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট, তাহাতে তাহার দ্বারা এই ভাবের পাপাচরণ হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু তাহারা এমন পাপাচরণ করিলে পর যদি তাহাদের সামাজিক শাসন হয়, তাহা হইলে এই পাপাচরণের প্রবৃত্তি কথঞ্চিৎ উপশমিত হইতে পারে। আদালতের বিচারে দণ্ডই এ সব ব্যাপারে যথেষ্ট নহে। সমাজের উচ্চশ্রেণীর প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী নায়কগণ যদি সমস্বরে এই জঘন্ত আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং সমাজে পাপাচারীর দণ্ডের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে এই শ্রেণীর পশু-প্রকৃতি লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার হইতে পারে।

পরন্তু যখন শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের লোকও এই নীচ লাম্পট্য ও পশুবৃত্তির পরিচয় প্রদান করে, তখন তাহাদের সামাজিক দণ্ড আরও কঠোর হওয়া কর্ত্তব্য। এই শ্রেণীর লোককে ভদ্রসমাজে স্থান দেওয়া উচিত নহে। যেখানে এই শ্রেণীর লোক সমাজে সাধারণভাবে মিলিতে আসিবে, সেখানেই তাহাদিগকে পাপের মত বর্জ্জন করিতে হইবে। কথায়, ইঙ্গিতে, ব্যবহারে তাহা তাহাদিগকে দেখাইতে হইবে। তবেই যদি এই ব্যাপারের কিছু কূলকিনারা হয়!

কিছু দিন পূর্ব্বে হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ কষ্টেলোর দায়রায় তিন জন লোক একটি অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাকে হরণ করিয়াছিল, এই অভিযোগে বিচার হইয়া গিয়াছে। আসামীদের নাম মহম্মদ আমিন, তাহার স্ত্রী সাকিনা বিবি এবং পুত্র মহম্মদ সাহিদ। পিতা-মাতা পরিণতবয়স্ক, পুত্রের বয়স ৩৫ বৎসর। ইহারা অপহৃতা বালিকাকে রতি সরকারের লেনের এক বাটীতে লইয়া যায় এবং সেখানে মহম্মদ সাহিদ ও তাহার ভ্রাতা গুল মহম্মদ বালিকার উপর অনাচার আচরণ করে। গুল মহম্মদ পলাতক। জুরীরা একবাক্যে আসামীদিগকে অপরাধী বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। বিচারপতি কষ্টেলো বৃদ্ধ আসামীকে ৪ বৎসর, বৃদ্ধাকে ৩ বৎসর এবং পুত্রকে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন।

রায়ে বিচারপতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালার ঘরে ঘরে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করা উচিত এবং সরকারকেও উহা উপহার দেওয়া প্রয়োজন। রায় এইরূপ:—কোন সভ্য দেশের সভ্য সমাজে এই ভাবে নারী ধর্ষিতা হয়, ইহা কিছুতেই সহ্য করা যায় না। যদি মানুষ তাহাদের কামবৃত্তি দমন করিতে না পারে, তাহা হইলে এই আদালত এমন উপায় অবলম্বন করিবেন, যাহাতে মানুষ কামবৃত্তি দমন করিতে বাধ্য হয়। লোক জানিয়া রাখুক, যদি এই অপরাধের উপশম না হয়, তাহা হইলে এই অপরাধ দমন করিতে অতি কঠোর উপায় অবলম্বন করা হইবে; এমন কি, অপরাধীর এই অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিতে হইবে।

সভ্য সমাজের মানবমাত্রেই বিচারপতি কষ্টেলোর এই অভিমতের পূর্ণ সমর্থন করিবে এবং তাঁহার জয়গান করিবে। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতেছেন? সে দিন কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় নারীধর্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিবার নোটিশ দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট রাজা মন্মথনাথ উহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই। ইহাই কি বাঙ্গালায় নারীধর্ষণ সম্বন্ধে সরকারের মনের ভাব? অন্ততঃ চক্ষুলজ্জার খাতিরেও ত সরকারের বিচারপতি কষ্টেলোর রায় অনুসারে কায করা উচিত। আদালত হইতে এ বিষয়ে যেমন কঠোর ব্যবস্থা হইবে, সরকারের শাসন বিভাগ হইতেও উহার অনুরূপ ব্যবস্থা করা উচিত।

—

এ দেশের শিক্ষা

বাঙ্গালার শিক্ষা-নিয়ামক মিঃ ষ্টেপলটন, সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের বাৎসরিক-পারিতোষিক বিতরণকালে বলিয়াছেন,—"বাঙ্গালার শিক্ষাপদ্ধতি কি এমন ভাবে গড়িয়া তুলা যায় না, যাহাতে বাঙ্গালীদের মধ্যে এখনও 'মুখার্জ্জি, বোস, সাহা, ঠাকুর'-এর মত বাঙ্গালী দেখা দিতে পারে?" বাঙ্গালীর মধ্যে এই প্রতিভার অভাবের মূলে তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক অবস্থাকে দায়ী করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কেবল মুখস্থ বিদ্যা, শিক্ষাদান এবং অধ্যাপকদের লেকচার-দান দ্বারা প্রকৃত শিক্ষাদান করা হয় না, এই হেতু প্রতিভাবান্ ব্যক্তি আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহার মতে আমরা মত দিতে পারিলাম না।

প্রথমতঃ এখনকার বাঙ্গালার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক অবস্থা যেরূপ—মুখার্জ্জি, বোস, সাহা, ঠাকুর প্রভৃতি বাঙ্গালী ছাত্রগণ যে সময়ে প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, সে সময় বাঙ্গালার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক অবস্থা তদপেক্ষা উন্নত ত ছিলই না, বরং অবনতই ছিল বলিতে হইবে। বহু প্রাচীনকালেও এ দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ ছাত্রগণের পক্ষে ব্যয়-সাপেক্ষ ছিল না। সামান্ত অন্ন সিদ্ধ করিয়া টোলের ছাত্রগণকে খাওয়াইয়া শিক্ষিত করিয়া গিয়াছেন, এমন শিক্ষকের দৃষ্টান্তও বিরল নহে, এবং অতীত অন্ধকার যুগেরও নহে। এখনও অনেক চতুষ্পাঠীতে বিনা বেতনে শিক্ষাদান করা হয়। অথচ অতীত কালে এ দেশে বহু প্রতিভাবান্ পুরুষ সেই সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কেবল চতুষ্পাঠীতে নহে, নালন্দা তক্ষশীলার মত বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়েও দেশ-দেশান্তর হইতে যাঁহারা শিক্ষালাভ করিতে আসিতেন, তাঁহাদের উপর ব্যয়ের গুরুভার চাপাইয়া দেওয়া হইত বলিয়া শুনা যায় না। সুতরাং আধুনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-গুলির আর্থিক অবস্থার জন্ত প্রতিভা-বিকাশের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, এমন কথা বলা যায় না।

মুখস্থ বিদ্যা ও লেকচারদান দ্বারা যথার্থ শিক্ষার [illegible] হয় না, এ কথা সত্য। কিন্তু 'মুখার্জ্জি, বোস' প্র[illegible]তির সময়েও উহা অল্প-বিস্তর ছিল। অথচ 'মুখার্জ্জি, [illegible]দের' উদ্ভব হওয়ার পথে অন্তরায় উপস্থিত হয় নাই। [illegible] রাং শিক্ষাদানের পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিলেই অথবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলির আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিলেই যে একটা সার আশুতোষ, একটা সার জগদীশ, একটা রবীন্দ্রনাথ ব[illegible] একটা

মেঘনাদ সাহা গড়িয়া তুলা যায়, তাহা বলিতে পারা যায় না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে যে ইংলণ্ডে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক অবস্থা বহুগুণ উন্নত, তাহা হইতে একটা সেক্সপিয়ার, একটা মিল্টন বা একটা নিউটন গড়িয়া তুলা সম্ভবপর হইত। অনুশীলন দ্বারা কোথাও কোথাও প্রতিভার কথঞ্চিৎ স্ফুরণ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রতিভা মানুষের সহজাত গুণ, উহা গড়িয়া তুলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রতিভাবান্ পুরুষ দরিদ্রের সন্তান—দরিদ্র। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সার গুরুদাস, বুনো রামনাথ দরিদ্র ছিলেন। তাঁহারা যে স্কুল-কলেজ বা চতুষ্পাঠীতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, সেগুলির আর্থিক অবস্থা এখনকার স্কুল-কালেজ বা চতুষ্পাঠীর আর্থিক অবস্থা হইতে অনেকাংশে হীন ছিল।

প্রতিভার অভাবের কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। কারণ একটি নহে, অনেক। অবশ্য এখনকার বিদ্যাশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন, সেই হেতু অর্থকরী বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক অবস্থা উন্নত হইলে শিক্ষার্থীদের অনেক উপকার হয়, এ কথা সত্য। এখনকার কালে ব্যবসায়িক বা কারিগরী শিক্ষাদান করা বাবদে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে আধুনিক প্রথায় জ্ঞানবিজ্ঞানের উপযোগী যন্ত্রতন্ত্র সংগ্রহে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। উহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে দরিদ্র দেশের ছাত্রদের উপর শিক্ষা-ব্যয়ের গুরুভার চাপাইয়া দিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। এ বিষয়ে সরকারকে এবং দেশের সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে অবহিত হইতে হয়। যে দেশের ছাত্ররা অর্থাভাবে পুষ্টিকর খাদ্যে বঞ্চিত, সে দেশে শিক্ষার ব্যয়বৃদ্ধি কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। এখনকার কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস দেখিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তাহার উপর কেতাবের বোঝা আর পরীক্ষার চাপে ত সর্ব্বনাশ! ইহার ফলে মুখস্থ বিদ্যা ও লেকচারের হস্ত হইতে নিস্তারলাভ করিবার উপায় কি? যে কারণেই হউক, প্রতি বৎসরই পাঠ্য কেতাব বদলাইতেছে, আর তাহার স্তূপ বর্দ্ধিতায়ন হইতেছে। তাই ছাত্রের লক্ষ্য, কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, বিদ্যা শিক্ষা করা নহে। প্রতিভা কি অকারণে অন্তর্হিত হইতেছে?

সে দিন পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেশনে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার সার সুলতান আমেদ ভারতীয় শিক্ষার্থীর জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হইবার দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—(১) তাহাদের শিক্ষালাভের নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাব, (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের একদেশদর্শিতা। কিন্তু ইহার জন্য অপরাধী কে? ছাত্ররা ত নহেই। বিশ্ববিদ্যালয় যদি সাধারণ শিক্ষাদান করা যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন, কেবল সেই দিকেই ঝোঁক দিয়া কারিগরী বা ব্যবসায়িক শিক্ষাদান উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে কেরাণী উকীল ছাড়া এ দেশে আর কি সম্ভব হইতে পারে?

স্বাধীন সভ্য দেশে শিক্ষার নানা পথ উন্মুক্ত আছে। কেবল স্কুল নহে, নৌ ও বিমান-বিভাগেও যথেষ্ট শিক্ষার সুযোগ আছে। সে শিক্ষার সুবিধা থাকিলে এ দেশেও সে দিকে প্রতিভা-স্ফুরণের অবকাশ থাকিত।

সরকারী বিবরণ

অনেক সময়ে সরকার তাঁহাদের রিপোর্ট প্রস্তুত করেন—গ্রাম্য চৌকীদারের অথবা পুলিসের কথার উপর নির্ভর করিয়া। সেই হেতু অনেক সময়ে সরকারী বিবরণ সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করা যায় না। এ বিষয়ে সরকারের পক্ষে বিশেষ বিবেচনা করিয়া সুদক্ষ শিক্ষিত লোকের উপর গ্রাম্য তথ্য সংগ্রহের ভার দেওয়া কর্ত্তব্য। যে বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া দেশের ইতিহাস পরে রচিত হইবার সম্ভাবনা, তাহা যতদূর সম্ভব ভ্রমপ্রমাদশূন্য হওয়া উচিত। সরকারী বিবরণ কিরূপ ভ্রমাত্মক হয়, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

সকলেই জানেন যে, ত্রিপুরা জেলার ত্রিপুরা মহকুমায় এই বৎসর অন্নাভাবে লোকের দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। সংবাদপত্রের বিবরণে জানা যায় যে, কোন কোন স্থানে লোকের অনাহারে মৃত্যুও ঘটিয়াছিল। বাঙ্গালা-সরকার এ সকল কথা ভিত্তিহীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এক ইস্তাহারে বলা হয় যে, "অনাহারে লোকের মৃত্যু হয় নাই, রোগে হইয়াছে।" কিন্তু অভয়-আশ্রমের সম্পাদক ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এই সরকারী ঘোষণার প্রতিবাদ করিয়া সেই সময়ে বলিয়াছিলেন, "সারাইল পুলিস থানার অন্তর্গত তেলিকাজী গ্রামের অধিবাসী আবু মুসার অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে, এ কথা সত্য। সরকারের ঘোষণায় প্রকাশ, বিটের চৌকীদার এবং মৃত ব্যক্তির পুত্রের কথায় জানা যায় যে, আবু মুসা বহু দিন হইতে রক্তামাশয় ও অন্যান্য রোগে ভুগিতেছিল, তাহারই ফলে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, অনশন-কষ্টের ফলে নহে। ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাঁহার পত্রে এ কথা পূর্ব্বেই অস্বীকার করিয়াছেন। "আমি আবু মুসার গ্রামবাসীদের মধ্যে বহু লোকের নাম-স্বাক্ষরিত দুইটি স্বতন্ত্র বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি। উহাতে আবু মুসার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ বিবৃত হইয়াছে। এই বিবরণ বিট চৌকীদার ও আবু মুসার পুত্র দিয়াছে। যে আবু মুসার পুত্র ও বিট চৌকীদারের কথাকে ভিত্তি করিয়া সরকারী ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইয়াছে, সেই কথা হইতেই জানা যায় যে, আবু মুসা একাদিক্রমে কয় দিন খাইতে না পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।" ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ গ্রামের বহু অধিবাসীর নাম-স্বাক্ষরিত এই বিবরণ-পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ পত্রে স্বাক্ষরকারীরা বলিতেছেন যে, "তাঁহাদের নিকট বিট চৌকীদার মহেশ্বর নাসা বলিয়াছে যে, অনাহারে আবু মুসার মৃত্যু হইয়াছে। চৌকীদারের টিপসহিও গৃহীত হইয়াছে। আবু মুসার পুত্র ছান্দা এবং ভ্রাতা করিম হোসেন গ্রামবাসীদের সম্মুখে বলিয়াছে যে, আবুর অনশনে মৃত্যু হইয়াছে।"

হইতে পারে, খাদ্যাভাবে অখাদ্য খাইয়া শেষ মুহূর্ত্তে আবুর রক্তামাশয় ও অন্যান্য রোগ দেখা দিয়াছিল, কিন্তু উপবাসের কষ্টই যে তাহার মৃত্যুর মুখ্য কারণ, তাহা এই নাম-স্বাক্ষরিত বিবরণেই জানা যায়। ইহা ত সরকার অস্বীকার করিতে পারেন না। এই বিবরণের [illegible]

এই ভাবে তথ্য সংগৃহীত হইলে সরকারী বিবরণে গোলযোগ থাকিবার সম্ভাবনা সমধিক। কথাটা সরকারের ভাবিয়া দেখা উচিত।

বিমান-বিভাগে ভারতীয়

পাঞ্জাব রাওলপিণ্ডির সর্দ্দার মোহন সিং বিলাতে শিক্ষালাভ করিতেছেন। এই তরুণ ভারতীয় বিমান-বিভায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন এবং আগা খাঁর প্রাইজ-লাভের আশায় বিলাতের ক্রয়ডন হইতে স্বয়ং বিমানযোগে ভারতে আসিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রথম চেষ্টা প্রকৃতির দুর্য্যোগের জন্য বিফল হয়। দ্বিতীয় চেষ্টায় তিনি বিলাত হইতে ফ্রান্স হইয়া ইটালী আসিয়া পৌছিয়াছিলেন, কিন্তু এ চেষ্টাও বিফল হইয়াছে।

সর্দ্দার মোহন সিং

তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার বিমানও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তিনি সুস্থ হইয়া পুনরায় চেষ্টা করুন, ইহাই প্রত্যেক ভারতবাসীর আন্তরিক কামনা।

এ দিকে ভারতেও বিমান বিভাগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই বিভাগে যে ব্যবসায় হিসাবে লাভের সম্ভাবনা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই হেতু এ দিকে এখন ভারতীয় ব্যবসায়ী ধনকুবেরগণের দৃষ্টি নিপতিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এ পথে বাধা-বিঘ্নও যথেষ্ট। য়ুরোপীয় ও মার্কিণ ব্যবসাদাররা ইতিমধ্যেই এ দিকে বদনব্যাদান করিতেছে।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সরকার পক্ষে সার ভূপেন মিত্র আশা দিয়াছিলেন যে, ভারতের মধ্যে বিমান-যাত্রার ব্যবসায়ে অধিকার ভারতীয়দিগকে দেওয়া হইবে। ভারতীয় কোম্পানীরা এ জন্য উৎসাহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু হাজীর উপকূল বাণিজ্য বিলের বিপক্ষে যেমন বিদেশী ব্যবসায়ীরা তাহাদের একচেটিয়া অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, এই ভারতের অভ্যন্তরস্থ বিমান ব্যবসায়েও তাহারা সেইরূপ চেষ্টা করিতেছে।

কিছু দিন পূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, বোম্বাই হইতে করাচী পর্য্যন্ত বিমান-ডাক বহিবার ভার 'ইষ্টারণ এয়ারওয়েস কোম্পানীকে' দেওয়া হইবে। কিন্তু বিদেশী বণিক্‌দের লালসার বিপক্ষে দেশীয় কোম্পানীর দণ্ডায়মান হওয়া সহজ কথা নহে। শুনা যাইতেছে, সার ভূপেন তাঁহার পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি রক্ষা না

সার ভূপেন মিত্র

করিয়া বোম্বাইএর য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীদিগের মনস্তুষ্টিসাধন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রকাশ, 'ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েস' হইতে বিমান ও তাহার যন্ত্রপাতি গ্রহণ করা হইবে; কেন না, ভারতের অভ্যন্তরে বিমান-ডাক যাতায়াতের ব্যবস্থা 'রাজকার্য্য', (State service) বলিয়া গণ্য হইবে। গত ৩০শে ডিসেম্বর লণ্ডন হইতে তার আসিয়াছে যে,ক্রয়ডন হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত বিমানডাক

বহন করিবার ভার 'ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েস, লিমিটেডের' হস্তে দেওয়া হইবে। তাহা হইলে বোম্বাই হইতে করাচী পর্য্যন্ত বিমান ডাক বহনের ভারও যে ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েসকে দেওয়া হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ভারতীয় "ইষ্টারণ এয়ার-ওয়েস কোম্পানীর" আর কোন আশা নাই। এ বিষয়ে ব্যবস্থা-পরিষদের ভারতীয় সদস্যরা কি করেন, তাহা দেখিবার বিষয়।

ভারতের প্রতিনিধি

সার অতুল চ্যাটার্জ্জি ভারতের 'প্রতিনিধি'রূপে নৌ-বৈঠকে স্থান পাইয়াছিলেন। ইহাতে আমাদের ভারত-সচিব মিঃ বেন বলিয়াছিলেন,—"এই জগৎ-জোড়া বৈঠকে সার অতুলের স্থান পাওয়ার অর্থই হইতেছে যে, ভারতবর্ষ কার্য্যক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে।" অতি সুন্দর!—যেন মথি-লিখিত সুসমাচার! সার অতুলও ৩২ কোটি ভারতবাসীর যেমন প্রতিনিধি, ভারতও তেমনই বৃটিশ উপনিবেশ-সমূহের দশটির মধ্যে একটি! কথাটা শুনিয়া ভারতবাসী হাসে আর বলে,—"লীলাময়-লীলা, নাথ! সকলি তোমারি!" ইহাও সহ্য করা যায়, কিন্তু যখন সার অতুল সেই বৈঠকে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া গম্ভীর স্বরে বলেন,—

সার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"আজ এই বৈঠক, জগতে নূতন ইতিহাস রচনা করিতেছে। এমন যে বৈঠক—সেই বৈঠকে স্থানলাভ করিয়া 'ভারত' আজ আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছে।"—তখন বলিতে ইচ্ছা হয়, চমৎকার! পুতুলনাচওয়ালা রাজারাণীর টিকি ধরিয়া নাচাইতেছে, হাত-পা নাড়াইতেছে, আর নেপথ্য হইতে তাহাদিগকে কথা কহাইতেছে, এ দৃশ্য যেমন সুন্দর, তেমনই উপভোগ্য। এ দৃশ্য দেখিয়া মার্কিণ, ফরাসী, জাপান ও ইটালী যে নিশ্চিতই অন্তরালে হাসিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নবদুর্গা

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রভাবতী

অধর চলিয়া যাইবার ঘণ্টাখানেক পরে বামুন ঠাকরুণ তাহার কন্যাকে লইয়া আসিল। মেয়েটির নাম প্রভাবতী। সে নবদুর্গার বয়সী না হইলেও, তাহার অপেক্ষা বেশী বড় নয়। অঙ্গে সধবার সমস্ত চিহ্নই বর্ত্তমান। হরিশের মা তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়ের কোথায় বিয়ে দিয়েছ, বামুন ঠাকরুণ?"

বামুন ঠাকরুণ বলিল, "বিয়ে ত এইখানেই দিয়েছিলাম, কিন্তু মেয়ের বরাত মন্দ, জামাই মেয়েকে নেয় না।"

হরিশের মা বলিল, "কেন নেয় না? মেয়ে ত তোমার দেখতেও মন্দটি নয়,—আর এই সোমত্ত বয়স, নেয় না কেন?"

"সে দুঃখের কথা আর কি বল্‌বো দিদি,—জামাইটি মানুষ নয়। আগে কি তা জানতাম ছাই! আমার সাতটা নয় পাঁচটা নয়, ঐ একটি মেয়ে, আট কুড়ি টাকা খরচ ক'রে বিয়ে দিলাম, কিন্তু বরাতগুণে মেয়ের সুখ হ'ল না। জামাই গাঁজাগুলী খেয়ে বেড়ায়। বাড়ীতে তার মা-বাপ আছে, কিন্তু বাড়ীতে প্রায় আসে না। কোথায় থাকে, কোথায় খায়, তা কেউ জানতে পারে না। মিছামিছি দাসীবিত্তি করবার জন্যে শ্বশুরবাড়ীতে ওকে ফেলে রাখার চেয়ে, মেয়েকে আমি নিজের কাছে এনে রেখেছি।"

প্রভাবতীর দুর্ভাগ্যের কথা শুনিয়া, নবদুর্গার হৃদয়ে তাহার জন্য সমবেদনা জাগিল। সে তাহার সঙ্গে ভাব করিবার চেষ্টা করিল, সফলও হইল।

জলখাবার যাহা আসিয়াছিল, তাহাই সকলে ভাগ করিয়া আহার করিল, এবং রাত্রি ১০টার মধ্যেই আলো [illegible]

নিজের বিছানা নবদুর্গার ঘরেই করিতে যাইতেছিল, নবদুর্গা বলিল, "তুমি বামুন ঠাকরুণের সঙ্গে ও ঘরেই শোও গে না, হরিশের মা। প্রভাবতী এই ঘরে থাকুক, আমরা দু'জনে গল্প-সল্প করবো, শেষকালে তোমার ঘুম হবে না।"

বামুন ঠাকরুণ বলিল, "তা বেশ ত, ওরা দুটি সমবয়সী, সুখ-দুঃখের কথা কইবে,—আর সেই জন্যেই ত পেরভাকে নিয়ে আসা! চল, আমরা দুই বুড়ী ও-ঘরেই শুই গে।"

ঘরে খিল বন্ধ হইলে, প্রভাবতী নিজের বিছানায় না শুইয়া, নবদুর্গার নিকট গিয়া চুপি চুপি বলিল, "ক'নে দিদি, তোমার বিছানায় আমি একটু বসবো? তোমার সঙ্গে কথা আছে, মা কতকগুলি কথা তোমায় বলতে বলেছেন।"

নবদুর্গা চুপি চুপি বলিল, "বোস না ভাই—আর বসবারই বা দরকার কি? তোমার বালিসটা এনে এই বিছানাতে শুলেই হয়, যায়গা ত যথেষ্টই রয়েছে।"

প্রভাবতী বলিল, "না না, সেটা কি ঠিক হয়? তোমরা হ'লে মনিব, আমরা হলাম চাকর।"

নবদুর্গা বলিল, "তোমার ভাই যেমন কথা! মনিব চাকর আবার কিসের? আমিও বামুনের মেয়ে, তুমিও বামুনের মেয়ে।"

প্রভাবতী জানিত, তাহার পিতা গোয়ালা। তাই সে আপন মনে হাসিয়া বলিল, "সে যাই হোক হবে এখন, তোমার সমস্ত কথা ভাই, আমি মা'র কাছে শুনেছি। তুমি কোনও ভাবনা কোর না, যেমন ক'রে হোক, মা তোমাকে উদ্ধার করবেই। মা আমার ভারি বুদ্ধিমতী। মা যে উপায় ঠাউরেছে, সেইটে নিরিবিলি পেলেই, তোমায় [illegible] বলেছে। বাসায় ব'সে মাতে আমাতে এতক্ষণ এই সব কথাই হচ্ছিল কি না! তাই ত আসতে দেরী হ'ল, [illegible] আমাদের বাসা ত খুব কাছেই।"

নবদুর্গা আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি উপায় ঠাউরেছেন, ভাই ?"

প্রভাবতী বলিতে লাগিল, "বাড়ীর ভিতর হরিশের মা, বাইরে বাঞ্ছারাম তোমায় পাহারা দিচ্ছে ত! মা আমাকে বলেছে, হরিশের মা'র চক্ষে ধূলো সেই দেবে, বাঞ্ছারামকে ভোলাবার ভার আমার উপর দিয়েছে।"

"কি ক'রে ভোলাবে তুমি ওকে ?"

এ কথা শুনিয়া প্রভাবতী নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল। শেষে বলিল, "একটি যুবতী মেয়ের পক্ষে, এক জন পুরুষকে ভোলানো কি কিছু শক্ত ? তুমি ভাই একে ছেলেমানুষ, তায় গেরস্থ ঘরের মেয়ে, তুমি এ সব জানবেই বা কি ক'রে বল!"

এ কথাগুলির ইঙ্গিত নবদুর্গা যে একেবারে না বুঝিল, তা নয়। বলিল, "তুমি কি করবে ?"

প্রভাবতী বলিল, "আমি কা'ল কাযকর্ম্ম উপলক্ষে নীচেই বেশী সময় থাকবো। ঐ বাঞ্ছারাম হতভাগাকে বাঁদর নাচাবো। ওর সঙ্গে হাসবো, গল্প করবো, ফষ্টিনষ্টি করবো, সারাদিনে ওর মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবো আমি।"

"তাতে কি ফল হবে ?"

"ফল কি হবে, তাও বলি শোন। মা'র মৎলব, কা'ল সন্ধ্যেবেলা, তোমায় বিশ্বনাথের আরতি দেখাবার ছল ক'রে বাইরে নিয়ে যাবে, তার পর কেদারঘাটে তোমার স্বামীর হাতে দিয়ে আসবে। কিন্তু ভয়, পাছে বাঞ্ছারাম তোমায় বেরুতে না দেয়—সেই পোড়ারমুখো মোহান্তের চাকর ত ও—তারই হুকুমের চাকর। তাই, ওর মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেওয়ার ভার, মা আমার উপর দিয়েছে। মা কা'ল সন্ধ্যেবেলা বলবে, 'চল আমরা আজ সন্ধ্যে লাগতেই বেরিয়ে পড়ি, বাবা বিশ্বনাথের আরতি, মা অন্নপূর্ণার আরতি দেখে তার পর ফিরবো।' খুব সম্ভব, হরিশের মা'র মনে খুব লোভ হবে। তখন তুমি বায়না নিও—'আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব!' হরিশের মা নিশ্চয়ই মনে ভাববে—'আমি যখন সঙ্গে রয়েছি, তখন আর ভয় কি ?'—তার পর, আমাদের নিয়ে ঠাকুরদের আরতি দেখাতে দেখাতে, সুযোগ বুঝে এক দমে হরিশের মাকে ফেলে, তোমায় নিয়ে সোজা মা কেদারঘাটে।"

নবদুর্গা বলিল, "কিন্তু ভাই, বাঞ্ছারাম পোড়ারমুখো যদি আমাকে বেরুতে না দেয় ?"

প্রভা বলিল, "সেই জন্যেই ত আমাকে দরকার। দিনের বেলাতেই, বাঞ্ছারামের পিণ্ডি আমি চটকে রাখবো। তার পর সন্ধ্যের একটু আগেই, বাঞ্ছারামকে গিয়ে আমি চুপি চুপি বলবো, 'বাঞ্ছা বাবু, আমার মা'র সঙ্গে, হরিশের মা, কনে বউ সবাই আরতি দেখতে যাবে পরামর্শ করছে, আমায় বাড়ী আগলাবার জন্যে রেখে যাবে। ওরা বলছিল, ফিরবে সেই রাত্তির দশটায়। আমি একলাটি কি ক'রে থাকবো ? ওরা বেরিয়ে গেলে, তুমি যদি সদর বন্ধ ক'রে উপরে এস, তা হ'লে দু'জনে গল্পগুজবে বেশ সময় কাটানো যাবে। নইলে একলাটি আমার বড় ভয় করবে, বাঞ্ছা বাবু।' তা হ'লেই বাঞ্ছারাম আর তোমায় বেরুতে দিতে আপত্তি করবে না।—মা ত ভাই, এই মৎলব করেছে।"

নবদুর্গা কথাগুলি বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিল। এ উপায়ে কার্য্য উদ্ধারের সম্ভাবনা আছে বটে। কিন্তু বামুন ঠাকরুণের প্রতি মনটি তাহার বিমুখ হইয়া উঠিল। যে মা আপন গর্ভের মেয়েকে এমন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারে,—সে মা, না রাক্ষসী ? আর প্রভা, সেই বা এমন হীন-কার্য্যে সম্মত হইয়া, হাসি হাসি মুখে সে কথা বলিতেছে কেমন করিয়া ? নবদুর্গা মনে মনে বলিল, "তবে ত এরা ভাল লোক নয়!"

নবদুর্গাকে নীরব দেখিয়া প্রভা বলিল, "তুমি কি ভাবছ, ভাই ?"

নবদুর্গা তাহার মনের কথা গোপন রাখিল। ভাবিল, "পৃথিবীতে কত রকম প্রবৃত্তির মানুষ আছে,—তা নিয়ে বিবাদ ক'রে ফল কি ? এখন আমি নিজের বিপদটা কাটিয়ে উঠতে পারিলেই বাঁচি।" প্রকাশ্যে বলিল, "কিন্তু বাঞ্ছারাম যদি তোমার উপর কোনও অত্যাচার করে ?"—এতক্ষণ প্রভাকে "ভাই" বলিয়া কথা কহিতেছিল, এবার আর ভাই বলিল না।

প্রভা বলিল, "হ্যাঁঃ—অত্যাচার অমনি করলেই হ'ল! মগের মুল্লুক কি না!"

নবদুর্গা নীরব রহিল। যে স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় নিজেকে এ রকম অবস্থায় ফেলিতে ভয় করে না, সে কি রকম স্ত্রীলোক ? নবদুর্গা স্থির করিল, "ইহারা অন্য রকম।"

প্রভা বলিল, "এই ত সব কথা [illegible]

ভাই, এখন তোমার কপাল আর আমাদের হাতযশ। রাত্তির হ'ল, তা হ'লে এবার আমি শুই গে যাই—কেমন ?"

নবদুর্গা শুধু বলিল, "আচ্ছা"—শয্যাসঙ্গিনী হইতে তাহাকে আমন্ত্রণ করিল না।

দীপ নিবাইয়া, প্রভা গিয়া নিজ শয্যায় শয়ন করিল।

পাঁচ মিনিট পরে, বহির্দ্বারে বিষম ধাক্কা। নবদুর্গা জাগিয়াই ছিল, সে প্রভাকে ডাকিল—"ও প্রভা, দুয়োরে কে ধাক্কা মারছে যে !"

প্রভা উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া বলিল, "বারান্দায় গিয়ে দেখ্‌বো ?"—বলিয়া সে বারান্দায় বাহির হইল। রেলিংয়ে বুক দিয়া মাথা ঝুঁকাইয়া দেখিল, মস্তকে বৃহৎ পাগড়ী, দ্বারবান্‌বেশী এক খোট্টা তখনও দুয়ার ঠেলিতেছে ও ডাকাডাকি করিতেছে—"এ জী বাঞ্ছারাম !—উঠো উঠো, কেঁওয়াড়ি খোলো।"

বাঞ্ছারাম দ্বার খুলিয়া বলিল, "তোম কোন্ হায় জী, ক্যা খবর ?"

দ্বারবান্ অনাবশ্যকভাবে উচ্চস্বরে বলিল, "তুমারা বাবু তো ভুলাও গিয়া না—জিমিন্দার বাবুকো পাশ বাকে বাবু বোলা কি মেহেরবাণী করকে, খবরদারীকে লিয়ে আপ একঠো দ্বারবান্ হামারা রাসামে ভেজ দিজিয়ে ; জেনানা-লোগ একেলা হায়, ডরেঙ্গি। ওহি ওয়াস্তে আয়া।"

বাঞ্ছারাম বলিল,"না ভাইয়া, হামারা বাবু নেহি, হামারা বাবুকো ভাড়াটিয়া। তা তুম আয়া, আচ্ছাই হুয়া। দুনো আদমি রহেঙ্গে।"—বাঞ্ছারামও এমন স্বরে কথা কহিল, যাহাতে দোতলায় সে স্বর স্পষ্টভাবেই পৌঁছে।

প্রভা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বারান্দার দ্বার বন্ধ করিয়া নবদুর্গার বিছানার কাছে বসিয়া বলিল, "শুন্‌লে ভাই ?"

নবদুর্গা বলিল, "শুনলাম ত !"

প্রভা বলিল, "এক পোড়ারমুখো ছিল, দু' পোড়ারমুখো হ'ল। দুটোকে এখন সামলাই কি ক'রে ?"

নবদুর্গা এ কথার কোনও উত্তর দিল না।

প্রভা বলিল, "মাও বোধ হয় শুনেছে ওদের কথাবার্ত্তা। ফন্দি বোধ হয় বদলাতে হবে। দেখি, মা ভেবে-চিন্তে কি ফন্দি ঠিক করে। রাতের মধ্যেই একটা যা হোক ফন্দি ঠিক করবেই—ও ভারি ধড়িবাজ মেয়ে ! এখন তা হ'লে শুই গে ভাই—রাত হ'ল। তুমিও নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোও, ভাই। কোনও ভাবনা কোরো না। মা যখন এ কাযের ভার নিয়েছে, তখন কোনও চিন্তে নেই তোমার।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

পরলোকে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

বঙ্গ-সাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র, সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কর্ম্মজীবনের অবসানে পরপারের যাত্রী হইয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গ-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা পূর্ণ হইবার নহে। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যখন শিক্ষিত বাঙ্গালী জাতিকে মাতৃভাষার সেবায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সাহিত্যের নানা বিভাগে আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন অক্ষয়কুমার বাঙ্গালার ইতিহাস রচনায় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার নিয়োগ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী যে কাপুরুষ নহে, বাঙ্গালীর শারীরিক ও মানসিক শক্তি যে এক দিন বাঙ্গালী জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল, অক্ষয়কুমার তাহা দেশবাসীর সম্মুখে অনবদ্য ভাষায় ঝঙ্কারে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম প্রমাণিত করেন, অন্ধকূপ-হত্যা অতিরঞ্জিত—অনৈতিহাসিক ঘটনা। নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে বৈদেশিক অনেক ঐতিহাসিক যে সকল মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই অতিরঞ্জনের বর্ণলেপে সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, ইহা তিনি ইতিহাসসম্ভূত প্রমাণবলে সিদ্ধান্ত করিয়া দেখাইয়াছিলেন। গৌড়রাজমালা, গৌড়-লেখমালা সম্পাদনে অক্ষয়কুমার পর্য্যাপ্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ইতিহাস বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পত্তি। ব্যবহারাজীবের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও তিনি বঙ্গবাণীর সেবায় কোনও দিন ক্লান্তি অনুভব করেন নাই। তাঁহার অবলম্বিত পথ গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী ঐতিহাসিক বাঙ্গালার অতীত কাহিনীকে লোকলোচনের গোচরীভূত করিতেছেন। আমরা তাঁহার বিয়োগে মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেছি। ভগবান্ তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনাদান করুন, ইহাই প্রার্থনা।

মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-রোটারী-মেশিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
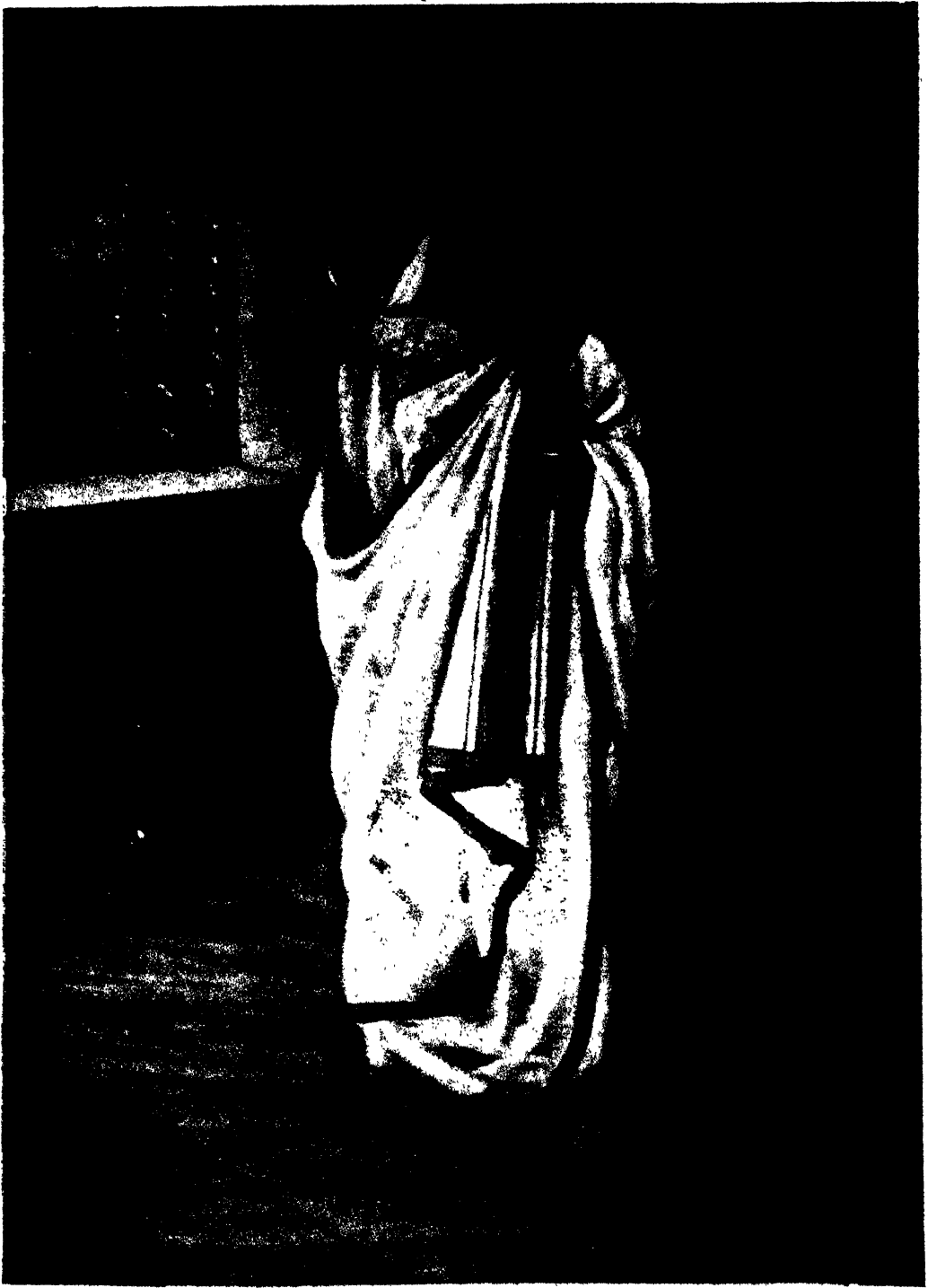
"লাজ-বিজড়িত চকিত চাহনি—"

বসুমতী-চিত্রবিভাগ] [শিল্পী—শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা

৮ম বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৩৬ [৫ম সংখ্যা
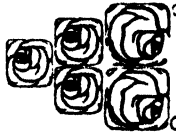
শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

উদ্দাম অনুরাগ, অহেতুকী প্রেম-ভক্তি ও তীব্র ব্যাকুলতা-বলে শ্রীজগন্মাতার দর্শন-লাভ করিয়াও শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলেন না। সেই যে বরাভয়-করা, হাসিতা-ধরা, অসি-মুণ্ড-ধারিণী, নর-শিরো-হারিণী, হর-হৃদি-বিহারিণী, চিদ্‌ঘন, জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহা কি মনের প্রতারণা, অবস্থা-বিশেষের ধারণা, না, তাহা নিত্য-সত্য, এই স্থূল জগতের অন্তরালে মহাকালে নিয়ত প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছে ?

আত্ম-প্রত্যক্ষে দৃঢ়প্রত্যয় স্থাপন করিতে না পারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ চঞ্চলচরণে দক্ষিণেশ্বর দেবোদ্যানে বিচরণ করিতেছেন। চারিদিকে এ কি আনন্দের মেলা! তরু-লতার অঙ্কে সুকুমার কুসুম-শিশু আনন্দে দুলিতেছে! নীড়স্থ শাবককে আহার প্রদান করিয়া বিহঙ্গ আনন্দ-কল-গানে উর্দ্ধমুখে উধাও হইয়া যাইতেছে! উদার অম্বর-বিম্বিত জাহ্নবী-বক্ষে তরঙ্গচঞ্চল শিশুর দল উল্লাসে কলহাস্যে নাচিতেছে! শ্রীরামকৃষ্ণ নিবিষ্ট চিত্তে দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, একখানি তরী তীরবেগে আসিয়া বকুলতলার ঘাটে উপস্থিত হইল এবং অনতিপরেই এক সন্ন্যাসিনী তাহা হইতে নামিয়া শান্ত পদক্ষেপে দ্বাদশ শিব-মন্দির-মধ্যস্থ চাঁদনীর দিকে আসিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সে সময় ফুল তুলিতেছিলেন, সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া নিজ কক্ষে গিয়া হৃদয়কে বলিলেন, চাঁদনীর ঘাটে যে ভৈরবী এসেছে, তাকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়।

ভৈরবীই বটে! চোখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতেছে! কিন্তু কেবল চোখে কেন? ইহার সর্ব্বশরীর যেন একটি প্রদীপ্ত হোম-শিখা—গৈরিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে! তাপসী রূপসী, বিদুষী, মধ্যবয়সী। কিন্তু দেখিলে মনে হয়, এই অমেঘ-বাহিনী দামিনীর তপঃপূতা তনুলতা আশ্রয় করিয়া অভুক্ত যৌবন যেন নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে।

ভাগিনেয় হৃদয় নিষ্পলক নেত্রে দেখিতে লাগিল। সন্ন্যাসিনী তখন অধ্যয়ন-নিমগ্না। তাঁহার গভীর অভিনিবেশ দেখিয়া হৃদয়ের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সসঙ্কোচে

অগ্রসর হইয়া কহিল, আমার মামা এখানে থাকেন, ঈশ্বরীয় কথায় তাঁর ভাব হয়, আপনাকে একবার ডাকছেন।

যেন কোন প্রত্যাশিত শুভ-সংবাদে সন্ন্যাসিনী পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ হৃদয়ের অনুসরণ করিলেন।

হবে। দু'জনকে পূর্ব্ববঙ্গে পেয়েছি। আজ হেথায় তোমাকে খুঁজে পেলাম।

অপার আনন্দে ভৈরবী শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে বসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, মা, আমার এ কি হ'ল?' দিন-রাত্রি ঘুম নাই। এই দেখ, চোখে পলক পড়ে না। অহরহ গাত্রদাহ। গঙ্গার জলে তিন-চার ঘণ্টা গা ডুবিয়ে ব'সে থাকি, তবু সে জ্বালা-নিবৃত্তি হয় না। আর কত কি যে রূপ দেখি! লোকে বলছে, আমি পাগল হয়েছি। হ্যাঁ মা, মনে-প্রাণে মাকে ডেকে কি আমি পাগল হলুম!
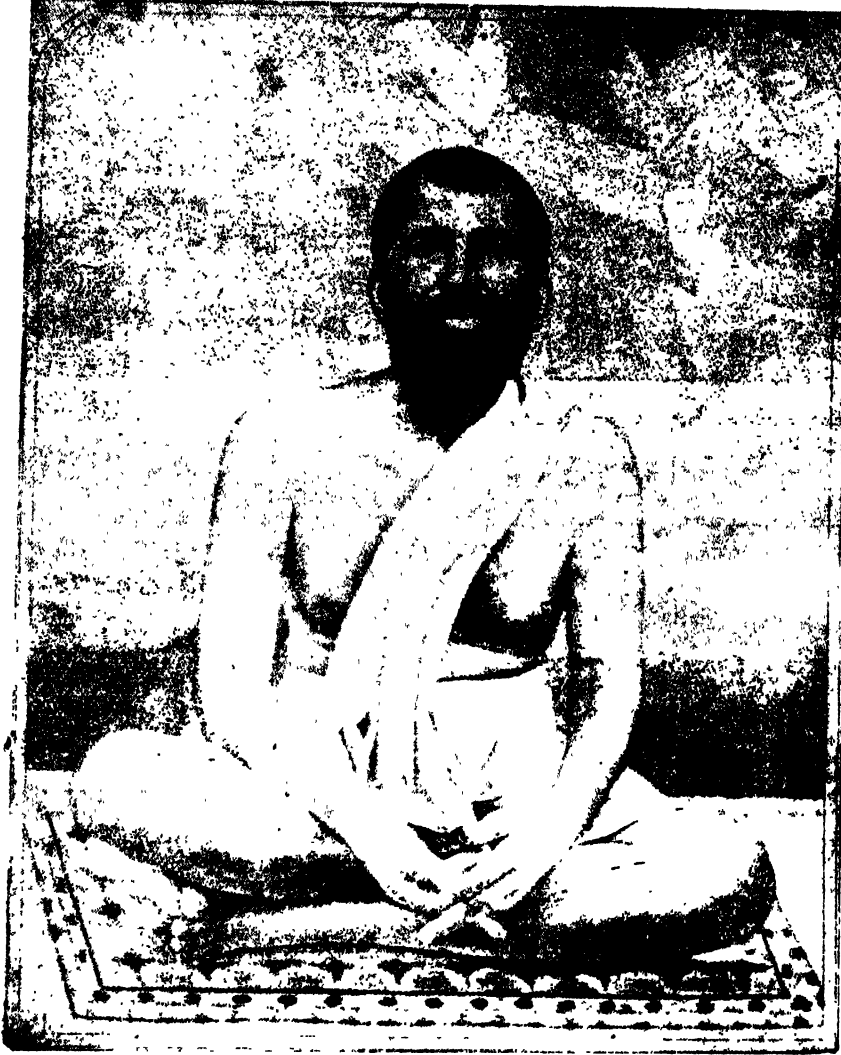
ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, হ্যাঁ বাবা, তুমি পাগল হয়েছ! কিন্তু এমনি পাগল হয়েছিলেন, শ্রীবৃন্দাবনে রাধারাণী, আর নদীয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ! বাবা, ঈশ্বরের জন্য যে পাগল হয়, তারই তোমার মত গা জ্বলে। ও-জ্বালা কি গঙ্গায় গা ডুবিয়ে জুড়ায়! ওর নাম মহাভাব। আমার কাছে ভক্তি-শাস্ত্রের পুঁথি আছে। তা'তে ওর ঔষধও লেখা আছে। আমি সেই ব্যবস্থা ক'রে দেব।

হৃদয় নির্ব্বাক্! কে ইনি!

কক্ষে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন, বাবা, তুমি এখানে রয়েছ! আমি এ-দেশ সে-দেশ কত খুঁজে বেড়াচ্ছি।

মা, তুমি আমাকে জানলে কেমন ক'রে?

মা-ই আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। মায়ের দয়ায় জেনেছি, তিন জনকে আমায় সাধনের সহায়তা করতে

কথায় কথায় প্রকাশ পাইল, সন্ন্যাসিনী ব্রাহ্মণী। জন্ম যশোহর জেলায়। নাম যোগেশ্বরী। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত সম্ভ্রান্তবংশজা। কিন্তু পরিণীতা কি অপরিণীতা, কেনই বা কঠোর ব্রতধারিণী হইয়া পথচারিণী হইয়াছেন সে ইতিহাস নিবিড় রহস্যে ঢাকা।

কথায় কথায় ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। হৃদয় সিধা আনিয়া দিলে যোগেশ্বরী পঞ্চবটীমূলে রন্ধন করিয়া নিজ

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে মথুরমোহন সে কথা শুনি বলিলেন, সে যা-ই কেন বলুক না, অবতার ত দশটি।

এই সময় ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণকে খাওয়াইবা নিমিত্ত এক থালা মিষ্টান্ন লইয়া পঞ্চবটীতে উপস্থিত অনতিপূর্ব্বেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিতে কালীবাটী অনতিদূরে দেবমণ্ডলের ঘাটে স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া ছেন। কে জানে, নিন্দুকের রসনা কত অযথা কথার সৃষ্টি করিবে! ভৈরবী সেথান হইতে নিত্য আসিয়া শ্রীরাম কৃষ্ণের সহিত শাস্ত্রালাপ করিতেন। আজ তাঁর ইচ্ছা ছিল, মা যশোদার ভাবে মিষ্টান্নগুলি তিনি স্বহস্তে শ্রীরামকৃষ্ণকে খাওয়াইবেন। কিন্তু অপরিচিত মথুরকে দেখিয়া ভাব সম্বরণ করিয়া ভৈরবী মিষ্টান্নের থালাটি হৃদয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়াই মথুর জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনিই কি তিনি? হাঁ, বলিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, ওগো, তুমি যা-সব বল, এঁকে বলছিলুম। ইনি বলেন, অবতার ত দশটি ছাড়া নাই।

ভৈরবী বলিলেন, কেন? শ্রীমদ্ভাগবতে ত চব্বিশটি

কণ্ঠলগ্ন শালগ্রাম-শিলাকে ভোগ নিবেদন করিতে বসিলেন এবং চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিবেদিত ভোগ্যবস্তু সকল ভক্ষণ করিতেছেন। যোগেশ্বরী বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। ন্যূনাধিক চারি শত বৎসর পূর্ব্বের আর একটি বিবৃত কাহিনী সন্ন্যাসিনীর স্মৃতিপটে ভাসমান হইল। মিশ্রভবনে অতিথির নিবেদিত অন্ন শ্রীচৈতন্য এই ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন! এ কি! ইনিই কি তিনি? ভক্তি-শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরগত লক্ষণ-সকল সন্ন্যাসিনী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিঃসংশয় হইয়া যোগেশ্বরীর যুগল নয়নে জলধারা বহিল।

এ দিকে ভাবভঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ অতিশয় অপ্রতিভ এবং ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন, এ কি করিলাম! ভৈরবী বলিলেন, বেশ করেছ, বাবা! আজ বুঝলাম, আর আমার বাহ্যপূজার প্রয়োজন নাই। বলিয়া সন্ন্যাসিনী তাঁহার যত্নরক্ষিত শালগ্রাম-শিলা ভাগীরথী-গর্ভে বিসর্জ্জন দিলেন এবং উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতে লাগিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার।

মথুরমোহন

প্রধান অবতারের কথা আছে। তা ছাড়া বলেছেন, অবতার অসংখ্য। বেশ ত, বাবা! দেশ-বিদেশ থেকে পণ্ডিত আনিয়ে সভা করা হ'ক। আমি আমার কথা প্রমাণ করব।

কথা মন্দ নয়। মথুর ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসিনীকে তিনি শ্রদ্ধার চক্ষুতে দেখিতে পারিলেন না। একে এই রূপ! তার উপর স্বেচ্ছাচারিণী! কে জানে, ঐ গৈরিক বস্ত্র অসংশয়ি-বধের অস্ত্র নয়! শ্রীভবতারিণীর মন্দিরে এক দিন তাঁহাকে একাকিনী পাইয়া মথুর প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গভরে প্রশ্ন করিলেন, ভৈরবি, তোমার ভৈরব কৈ?

অবিচলিত স্থৈর্য্য ও দৃঢ় গাম্ভীর্য্যের সহিত শ্যামাপদ-শায়িত শিবমূর্ত্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সন্ন্যাসিনী উত্তর দিলেন, ঐ।

মথুর পুনরায় বলিলেন, ও ভৈরব ত অচল।

ভৈরবী এবার অসম্ভব গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, অচলকে যদি সচল করতে না পারব, তবে ভৈরবী হয়েছি কেন?

মথুর নিরুত্তর। তার পর নানা কথা তাঁহার মনে তোলাপাড়া হইতে লাগিল। ইনি যে-ই হ'ন, যা-ই হ'ন, একটা বিষয় অস্বীকার করবার উপায় নাই। শাস্ত্রজ্ঞানে ইনি যেমন সুপরিপক্ব, শাস্ত্রীয় বিধান-দানেও তেমনি সুদক্ষ। এই ত সে দিনের কথা। বাবার অসম্ভব গাত্র-দাহ আরাম করতে কলিকাতার বড় বড় কবিরাজ লাল-কালো কত রকমের বড়ী খাওয়ালে, কত রকম তেল মাখালে! এক-একটার গন্ধে ভূত পালায়! কিন্তু কি হ'ল? সে জ্বালা ত পালাল না!

ভৈরবী সর্ব্বাঙ্গে চন্দন মাখিয়ে, রাশি রাশি ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিতেই তিন দিনে সব জ্বালা-নিবৃত্তি! তার পর সেই অসম্ভব ক্ষুধা, দিনরাত খাই-খাই! ভৈরবী নানাবিধ খাবার তৈরি করিয়ে একটা ঘরে রাখিয়ে দিলে আর তিন দিন সেই ঘরে বাস করতে বল্লে। বাবা এটা-সেটা নাড়েন-চাড়েন, কখন একটু-আধটু মুখে দেন। ব্যস, একেবারে সে ক্ষুধাশান্তি! কিন্তু অবতার বলছে কেন? বল্ছে, পণ্ডিত-সভায় আমি প্রমাণ ক'রে দেব। দেখাই যাক না। কিন্তু বৈষ্ণবরা একটা ছুত পেলেই নেচে উঠ্‌বে। এক জন বিশিষ্ট শাক্ত পণ্ডিতকেও আনাতে হবে। সভায় বিচার হ'লে অন্ততঃ একটা উপকার হ'তে পারে। বায়ুরোগ ঠিক হ'লে বাবার শরীরের দিকে মন আস্‌তে পারে।

পণ্ডিত-সভার আয়োজন হইতে লাগিল এবং একে একে পণ্ডিতগণও উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তন্মধ্যে বৈষ্ণবচরণের ও গৌরী পণ্ডিতের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা উভয়েই প্রভূত পণ্ডিত এবং ভক্ত সাধক। তবে বৈষ্ণবচরণ বৈষ্ণব ও গৌরী শাক্ত।

বৈষ্ণবচরণ শান্ত-ভাবাপন্ন। কিন্তু গৌরী কালীবাটীর তোরণে উপস্থিত হইয়াই উচ্চৈঃস্বরে হাঁক ছাড়িলেন—হারে-রে-রে 'নিরালম্বো লম্বোদর-জননি কং যামি শরণম্!'

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন নিজ কক্ষে বসিয়াছিলেন। ঐ হারে-রে-রে রব তাঁহার কাছে পৌঁছিতেই কে যেন তাঁহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল। দ্রুতপদে কক্ষের বাহিরে আসিয়া তিনিও গৌরী হইতে উচ্চতর স্বরে হাঁকিলেন, হারে-রে-রে।

গৌরী তদপেক্ষা সমুচ্চস্বরে আবার ঐ ডাক্ ছাড়িলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, তার উপর আর এক গ্রাম চড়াইয়া।

কয়েকবার এই বজ্রনাদে শান্ত দেবোত্থান সচকিত হইয়া উঠিল। পূজারী পূজার আসন ছাড়িয়া, ভাণ্ডারী তৌল-দাড়ি ফেলিয়া, দ্বারবানরা দালরুটির আয়োজন ত্যাগ করিয়া এবং কর্ম্মচারিবর্গ আলস্যের আসন হইতে উঠিয়া পড়িয়া ছুটিয়া আসিল। কিন্তু কাছে যাইতে কাহারও সাহসে কুলাইতেছে না, পাছে কামড়ায়! এ ত উন্মত্ততার চরম বিকাশ। কিন্তু ওটা আবার জুটল কোথা থেকে! কালীবাড়ীকে এ-যে বাতুলাশ্রম ক'রে তুললে দেখছি! রাণী রাসমণি বেঁচে থাক্‌লে কি এমনটা হ'তে পারত! এখন থেকে ত দিন-রাত এমনি হারে-রে-রে চল্‌তে থাকবে। মা কালীর প্রসাদ খেয়ে স্বচ্ছন্দে যে দুপুর-বেলা একটু আলস্য রাখব, তারও উপায় রইল না। ঠেলা সামলাও। এখন রাণীর আদরের জামাতা মথুরমোহন! সর্ব্বময় ক'রে দিয়ে গেছেন! এ দিকে আমাদের খাতা-পত্রের উপর ত খুব খর চক্ষু! সিকিটি পয়সার ফাঁক পাবার যো নাই। আর এ-দিকে একেবারে অন্ধ, বাবা বল্‌তে অজ্ঞান।

কিছু দিন পূর্ব্বেই রাণী রাসমণি স্বর্গগতা হইয়াছেন। সহসা এক দিন পদস্খলনে পড়িয়া গিয়া রাণীর জ্বর ও অতিসার রোগের সঞ্চার হয়। কিছু দিন চিকিৎসা

করাইয়া রাসমণি বুঝিলেন, তাঁহার মুক্তির দিন সন্নিকট। শ্রীশ্রীভবতারিণী তাঁহাকে কোলে লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন। তবে আর কেন? মায়ার দুর্ভেদ্য দুর্গ—সংসারের সুখ-স্মৃতির এই সুসজ্জিত মন্দির—যেখানে প্রত্যেক বস্তু ভোগ-বিলাসের উদ্দীপন করিতেছে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি বন্ধনের পর বন্ধন পরাইতেছে, কায়-মন যেখানে রিপুর অধীন, বাসনা বিরাম-বিহীন, লোভ সতত সজাগ, কাম-কাঞ্চনে উন্মত্ত অনুরাগ, আর কেন সেখানে? রাণী কালীঘাটে আদি-গঙ্গাতটে যাত্রিভবনে শেষ যাত্রা করিলেন। তার পর শিবাশত-নিনাদিনী এক পুণ্যময়ী মহানিশায় অশেষ পুণ্যবতী রাণী মহাসমাধিতে লীন হইলেন। ইঁহার শেষ উচ্চারিত বাণী—মা এলে!

ক্রমে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর প্ররোচনায় দক্ষিণেশ্বরে এক দিন বিচার-সভা বসিল। গৌরী ও বৈষ্ণবচরণ প্রমুখ সাধকগণ একবাক্যে বলিলেন, যে মহাভাব জীবে অসম্ভব, শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর-মনে তাহা পূর্ণভাবে প্রকটিত।

সাধারণ মানবের প্রকৃতি নরত্ব ও পশুত্বে গঠিত, কিন্তু যুগ-প্রয়োজনে যে-সকল আধিকারিক পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের পবিত্র চরিত্র দেব ও মানব-ভাবের বিচিত্র সম্মিলন-ভূমি। সাধারণ মানবের ন্যায় ইঁহারাও ক্ষুৎ-পিপাসাতুর এবং সময় সময় মানবীয় দুর্ব্বলতার অধীন। যে যীশু ক্রস (cross)-দণ্ডে শলাকাবিদ্ধ হইয়া তাঁহার নির্য্যাতনকারীদের জন্য শ্রীভগবচ্চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার ক্ষুধার সময় ফলশূন্য দেখিয়া কালাকাল নির্ব্বিচারে ডুমুর-বৃক্ষকে তিনি অভিসম্পাত দিলেন। তার পর, জানকী-বিরহ বিধুর শ্রীরামচন্দ্রের বালীবধও ঐ শ্রেণীভুক্ত। ইঁহারা এক ভাবে জীব, এক ভাবে শিব। এক ভাবে ভক্ত, এক ভাবে ভগবান্। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে রোমা রোলা যেমন বলিয়াছেন—He is the Mother and adorer in one, তিনি একাধারে জগজ্জননী ও ভক্তশিরোমণি।

কিন্তু জন্মাবধি যাঁহার অন্তরে ঐশী শক্তি স্বতঃ আত্মপ্রকাশ করে, তাঁহার আবার সাধনার প্রয়োজন কি?

প্রথম প্রয়োজন—ঐ শক্তির সহিত ঘনিষ্ঠতর পরিচয়।

দ্বিতীয়তঃ—নিজ উপলব্ধিতে পূর্ণ-প্রত্যয়। ঐ উপলব্ধি যতক্ষণ না গুরুবাক্য, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ পূর্ব্ববর্ত্তী সাধকগণের অনুভূতির সহিত ঐক্য হয়, ততক্ষণ সংশয়-মুক্তি হয় না।

তৃতীয়তঃ—যিনি লোকাচার্য্যরূপে উদ্‌ভ্রান্ত মানবকে পথ-প্রদর্শনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকল মতের সাধনায় স্বয়ং সিদ্ধ না হইলে তিনি আচার্য্য-পদগ্রহণের উপযোগী হ'ন না।

শ্রীশ্রীভবতারিণী

যে সময় শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময় ভারতের সর্ব্বত্র নানা মতের প্রচলনে প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসুগণ সংশয়াপন্ন, ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। এক দিকে খ্রীষ্টোপাসকগণ পৌত্তলিকদিগের জন্য অনন্ত নরকব্যবস্থা করিতেছেন; অন্যদিকে 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্' গভীর সিংহনাদ তুলিয়া
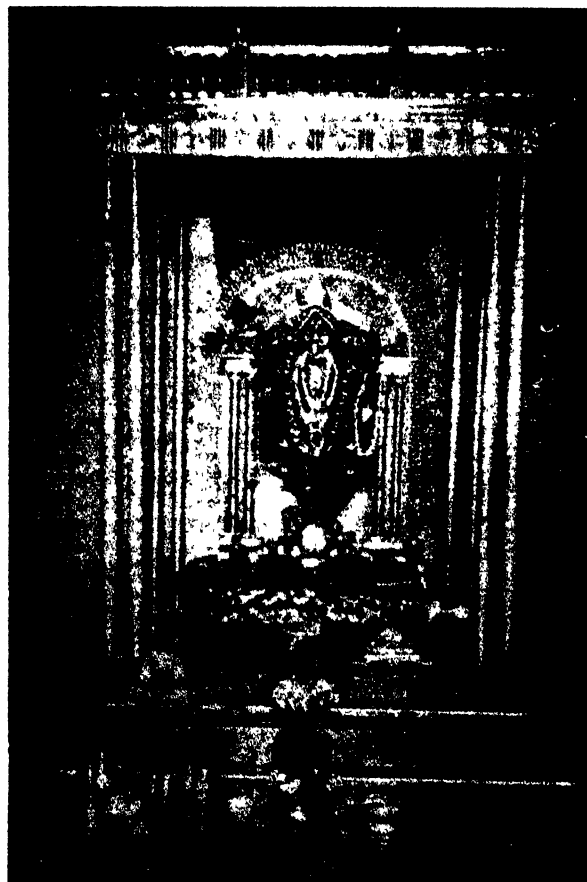
নিরীহ দেব-দেবীদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। শ্রীশঙ্কর ও রামানুজ আবার বাক্-বিতণ্ডায় মাতিয়া উঠিয়াছেন। কোথাও শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব, কোথাও কালী করালবদনীর প্রচণ্ড তাণ্ডব! হেথা নরনারী-সম্মিলনে কর্ত্তাভজনের অনুষ্ঠান, হোথা ভৈরবীচক্রে অপরিমিত কারণ-পান। ধর্ম্ম কর্ণধারবিহীন তরণীর ন্যায় রঙ্গে-ভঙ্গে তরঙ্গে টলটলায়মান। এইরূপ নানা মতের জটিল অরণ্যে মানব যখন পথহারা, সেই সময় সকল মতের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, মত—পথ। প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা সহকারে যে কোন মত অবলম্বন করিলে সাফল্যলাভ অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু সে মত-প্রচারের দিন এখনও বহুদূরে। আপাততঃ শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসিনীর উপদেশে ও প্ররোচনায় তন্ত্রসাধনায় ব্রতী হইলেন।

ভৈরবী উত্তরসাধিকা। নানা স্থান হইতে সাধনোপযোগী উপকরণ সকল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। গোকল ব্রত হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে চতুঃষষ্টি সংখ্যক তন্ত্রের সাধন অনুষ্ঠিত হইল। আজ সাধনার শেষ দিন।

ভৈরবী মহানিশায় মহাপুরুষ আজ আনন্দাসনে মহা-ধ্যানে মগ্ন। ঘোরা যামিনী যেন আপন ওষ্ঠাধরের উপর তর্জ্জনী-অর্পণে স্তব্ধতার ইঙ্গিত করিয়া নিথরভাবে বসিয়া আছেন। চির-চঞ্চল পবনও আজ নিশ্চল! বৃক্ষবল্লী নিস্পন্দ। বিহঙ্গকুল নীরব। অবিরল কলনাদিনী জাহ্নবীও যেন আজ মহাপুরুষের ধ্যান-ভঙ্গভয়ে নিস্তব্ধ। ফুলও আজ ফুটিতে সাহস করিতেছে না, পত্রান্তরালে মুখ ঢাকিয়াছে। দক্ষিণেশ্বর দেবোদ্যান যেন চিত্রার্পিতের ন্যায় প্রতীয়মান। প্রকৃতি কি এক মহাভাবে আচ্ছন্ন। গগন সহস্র লোচন মেলিয়া নিঃশব্দে সে নিবাত-নিষ্কম্প শিখা সদৃশ ধ্যানস্তিমিত মূর্ত্তি দেখিতেছে!

কিছুক্ষণ পরে সে মূর্ত্তি ঈষৎ নড়িয়া উঠিল। শ্বাস-বায়ু বহিল। মুখে দিব্য হাসি ফুটিয়া উঠিল। সন্ন্যাসিনী বলিলেন, বাবা, তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধকাম হয়ে আজ দিব্য-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'লে। বীরভাবের এই শেষ সাধনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃভাব-সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তন্ত্রের লুপ্ত-গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহাকে দিব্য বিভূতি-সকল আশ্রয় করিল।

তান্ত্রিক বীরভাবের-সাধককুল কারণ-পান ও শক্তিগ্রহণ সাধনার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিতেন। সময় সময় উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতায় এই পিচ্ছিল পথে বহু সাধকেরই পদস্খলন ও অধঃপতন হইত। এ জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায় তন্ত্রকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সে সঙ্কট-সঙ্কুল পথ পরিহার করিয়া প্রতিপন্ন করিলেন যে, ত্যাগ, বৈরাগ্য, সত্যনিষ্ঠা, প্রেম-ভক্তি ও সংযমবলে অতি দুরূহ সাধনাতেও সিদ্ধিলাভ করা যায়। বলিতেন, মাতৃভাব অতি শুদ্ধভাব।

সাধনার শেষে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে দিব্যকান্তি ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার তপস্তেজে কি এক পবিত্র প্রভায় সমগ্র দেবোদ্যান যেন ঝলমল্ করিতে লাগিল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

বাসন্তী

তুমি যথা সেথা নিত্য বসন্ত প্রকাশ,
তোমার চরণ বেড়ি অলি-গুঞ্জরণ,
মুকুল-কুসুম-দামে পূর্ণ উপবন
মলয়-পবন-লীলা, কি মহা উল্লাস!

অশোক কিংশুক চাঁপা মল্লিকার বাসে
মদালসা অপ্সরীরা খেলে লীলাভরে
দুলে বিনোদিনী লতা তরুবাথি পরে
শিখী ইন্দু ইন্দ্রধনু আনন্দে প্রকাশে।

মুগ্ধা হরিণী একা সরসীর কূলে
বিমল মুকুরে দেখে আপনার ছায়া
আলো-ছায়া ইন্দ্রজাল মাধুরীর মায়া
দিবা-নিশি ছবি আঁকে মঞ্জুলে-বঞ্জুলে।

মুখে শুভস্মিত শোভা লীলা-পদ্ম হাতে
ফুটাও লাবণ্যরাশি রূপ পারিজাতে।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

পারমার্থিক রস

৬

বিষ্ণুপুরাণে ভগবানের শক্তিসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাঽপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ স্যাৎ বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বদা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যনুসন্ততান্॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই—সকল জীবের ও সকল প্রপঞ্চের আত্মস্বরূপ সেই যে বিষ্ণু, তাঁহার শক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; প্রথম—স্বরূপশক্তি; দ্বিতীয়—তটস্থা শক্তি; তৃতীয়—বহিরঙ্গশক্তি। তাঁহার স্বরূপভূত যে শক্তি, তাহাই পরাশক্তি; তাঁহার দ্বিতীয় যে শক্তি—যাহাকে তটস্থশক্তি বলা হইয়াছে,—সংসারের সকল জীবই সেই তটস্থশক্তি। তৃতীয় যে শক্তি, যাহা বহিরঙ্গশক্তি বলিয়া কথিত হয়, তাহাকেই অবিদ্যা বা মায়াশক্তি বলা যায়, এই অবিদ্যাশক্তির দ্বারা আক্রান্ত বা অভিভূত হইয়া জীবনিবহ এই সংসারে ধারাবাহিক দুঃখসমূহকে অনুভব করিয়া থাকে, ইহাই হইল—এই শ্লোক কয়টির সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য।

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, বিষ্ণুপুরাণের এই দুইটি শ্লোকের দ্বারা অদ্বয়, অখণ্ড পরমাত্মতত্ত্বকে অনন্ত বিচিত্র শক্তিসমূহের দ্বারা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ঈশ্বরতত্ত্ব কি, তাহা বুঝিতে হইলে ঈশ্বরেরই কৃপা ব্যতিরেকে তাহা বুঝিতে পারা যায় না, ইহাই হইল হিন্দুশাস্ত্রসমূহের অভিপ্রায়। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, লৌকিক এমন কোন প্রমাণই নাই, যাহার সাহায্যে নিজ বিবেকের উপর নির্ভর করিয়া আমরা শ্রীভগবানের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে পারি না। তাই শ্রীমদ্‌ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে—

"অথাপি তে দেবপদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্ মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥"

হে দেব! হে ভগবন্! তুমিই লৌকিক সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের অগোচর হইলেও তোমার চরণারবিন্দের প্রসাদ যে পাইয়াছে, সেই তোমার মহিমা-স্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ হয়। নিজের কর্তৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্বের উপর যাহার দৃঢ়বিশ্বাস, এরূপ ব্যক্তি চিরকাল যুক্তি-তর্ক প্রভৃতি দ্বারা অনুসন্ধান করিয়াও তোমার মহিমা অবগত হইতে সমর্থ হয় না।

সুতরাং ইহাই স্থির হইতেছে যে, যে সকল দার্শনিক অনুমান-প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরেরই বাক্যস্বরূপ শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের শ্রম নিষ্ফলই হইয়া থাকে, তাই বলিয়া অনুমান প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণের ঈশ্বরতত্ত্ব-নিরূপণবিষয়ে কোনপ্রকার সাহায্য করিবার শক্তি নাই, এ কথাও হিন্দুশাস্ত্রকারগণের অভিমত নহে। শ্রুতির দ্বারা প্রথমতঃ ঈশ্বরতত্ত্বের স্বরূপ কথঞ্চিৎ অধিগত হওয়ার পর তাহাই অনুকূলভাবে যদি অনুমানাদি প্রমাণের প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে শ্রুতির দ্বারা অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত ঈশ্বরতত্ত্ব অনুকূল অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা আরও অধিকভাবে হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। অর্থাৎ বিস্পষ্টভাবে—নিঃসন্দিগ্ধভাবে বুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকে।

তাই শ্রুতিই নির্দ্দেশ করিতেছেন—"আত্মা বাঽরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ।" অর্থাৎ এ সংসার-তাপ হইতে ঐকান্তিক নিষ্কৃতিলাভ করিতে হইলে আমাকে দেখিতে হইবে, দেখিবার উপায় কি—দেখিবার উপায় হইতেছে শ্রবণ, মনন ও ধ্যান। শ্রুতির এই উক্তির তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে যাইয়া পুরাণ বলিতেছে—

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ॥"

অর্থাৎ "ভগবানের স্বরূপ কি, তাহা প্রথমতঃ শ্রুতিবাক্যের সাহায্যে বুঝিতে হইবে, তাহার পর সেই শ্রুতিবাক্যের অনুকূল যুক্তিসমূহের দ্বারা আত্মার মনন করিতে হইবে। মননের পর একাগ্রচিত্তে তাহার ধ্যান করিতে হইবে। সুতরাং এইরূপ শ্রবণ, মনন ও ধ্যানই হইতেছে আত্মদর্শন করিবার উপায়।"

এই আত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া উপনিষৎ বলিতেছেন, "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম তৎ সত্যং স আত্মা।"

অর্থাৎ বিজ্ঞান ও আনন্দই ব্রহ্ম, তাহাই সত্য এবং সেই ব্রহ্মই সকলের আত্মা, অদ্বৈতবাদিগণ এই উপনিষৎকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আমরা যাহাকে সংসারী বা জীব বলিয়া বুঝি, সেই জীব বস্তুতঃ ব্রহ্মই, তাহাতে যে আনন্দরূপতা ও বিজ্ঞানরূপতা সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে, তাহা অবিদ্যাবশতঃ আমরা ব্যবহার-দশাতে অনুভব করিতে না পারিলেও তাহা সত্যই সেই অবিনাশী অখণ্ড, নির্ব্বিশেষ, সর্ব্বদা একরূপ সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। ব্রহ্মই অবিদ্যাবশতঃ সংসার-দশাতে জীব বলিয়া ব্যবহৃত হইলেও তাহা প্রকৃতপক্ষে নিজরূপ কখনই পরিত্যাগ করিতে পারে না। এ অবিদ্যা দ্বারা আরোপিত যে সংসার, তাহা তাহার বাস্তবিক রূপ নহে; তাহার বাস্তবরূপ হইল সৎ, চিৎ ও আনন্দ। সৎ, চিৎ ও আনন্দ একই বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ ব্যপদেশ মাত্র, অর্থাৎ যাহা সৎ, তাহাই চিৎ ও তাহাই আনন্দ। দুঃখ হইতে তাহা সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, ইহাই বুঝাইবার জন্য তাহাকে আনন্দ-শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায়; জড় হইতে তাহা অত্যন্ত ভিন্ন—ইহা বুঝাইবার জন্য তাহাকে চিৎ—চৈতন্য ও জ্ঞান প্রভৃতি শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়, এবং অসৎ অর্থাৎ মায়িক বা কল্পিত সকল বস্তু হইতে তাহা অত্যন্ত বিলক্ষণ, ইহাই বুঝাইবার জন্য তাহাকে 'সৎ' এই শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়।

সুতরাং তাঁহাদিগের মতে একই বস্তু এই ত্রিবিধ শব্দের দ্বারা নিষেধমুখে প্রতিপাদিত হয়, এই মাত্র বুঝিতে হইবে। এইরূপ নিষেধমুখে সেই অদ্বয় বস্তুকে বুঝান কেন হইয়াছে, ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, এইভাবে নিষেধমুখে তাহার নির্দ্দেশ করা ছাড়া অন্য কোন প্রকারে তাহার নির্দ্দেশ বা প্রতিপাদন হইতে পারে না বলিয়াই শ্রুতি এইরূপ করিয়া থাকে। তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, শব্দ দ্বারা সাক্ষাদ্‌ভাবে যে বস্তু প্রতিপাদিত হয়, তাহা বিশেষণযুক্ত বস্তুই হইয়া থাকে। যাহার কোন বিশেষণ নাই, যাহার সদৃশ বা বিসদৃশ কোন বস্তুই নাই, যাহাতে স্বগতঃ স্বজাতীয় বা বিজাতীয় কোন প্রকার ভেদ থাকিতে পারে না, এরূপ বস্তুকে সাক্ষাদ্‌ভাবে বুঝাইবার সামর্থ্য কোন শব্দেই নাই বলিয়া শ্রুতি অগত্যা এইরূপ নিষেধমুখে সেই অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপ বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

এই অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্মের জীবত্ব যে প্রকার কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা আরোপ মাত্র, সেইরূপই ঈশ্বরত্ব তাহাতে কল্পিত বা আরোপ মাত্র। তিনি জীবও নন, তিনি ঈশ্বরও নন, জীবাত্মা তাঁহার উপর অজ্ঞান বশতঃ আরোপিত হয়, সেইরূপ ঈশ্বরত্ব তাঁহাতে অজ্ঞান বশতঃ আরোপিত হয় মাত্র। ঈশ্বরত্ব তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নহে, শুক্তিতে রজতের ন্যায় বা রজ্জুতে সর্পের ন্যায় সেই এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে জীবেশ্বরভাব কল্পিত অর্থাৎ বাস্তব নহে।

এইরূপ অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তকে কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্যগণ অর্থাৎ পরমার্থ-রসের আস্বাদনকারী ভক্তগণ অঙ্গীকার করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে অদ্বৈতবাদীর এইরূপ যে সিদ্ধান্ত, তাহা উপনিষৎ-সমূহের একাদশ-দর্শনের ফল হইতে পারে। কিন্তু সমগ্র উপনিষৎশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে এ প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বিবেকিগণের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। উপনিষদের ব্যাখ্যাতা পরমর্ষিগণ কর্ত্তৃকও এইরূপ সিদ্ধান্ত যে আদৃত হয় নাই, তাহা বেদান্তসূত্রের রচয়িতা মহর্ষি-প্রবর বেদব্যাসেরই উক্তির দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মহর্ষি বেদব্যাস ভাগবতে স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যদ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

"তত্ত্ববিদ্‌গণ যাঁহাকে অদ্বয় তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই অদ্বয় তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিনটি শব্দের দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।"

ভাগবতের এইপ্রকার উক্তির দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, অদ্বয় তত্ত্ব যেমন ব্রহ্ম এই শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়, তেমনই তাহা পরমাত্মা ও ভগবান্ এই দুইটি শব্দের দ্বারাও শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রুতিতে যাহাকে এক অদ্বিতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং অদ্বৈতবাদিগণের মতে যে বস্তুকে বিধিমুখে কোন শব্দই প্রতিপাদন করিতে পারে না, সেই বস্তুই 'ব্রহ্ম' 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' এই তিন শব্দের দ্বারাই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, এইরূপ যে ভাগবতের উক্তি, তাহা দ্বারা ব্রহ্মে ভগবত্তা যে কল্পিত, তাহা বুঝিতে পারা যায় না, অথচ অদ্বৈতবাদিগণ সকলেই একবাক্যে ব্রহ্মের ভগবত্তা যে কল্পিত,

ইহা অঙ্গীকার করিতে কোন প্রকার কুণ্ঠা বোধ করেন না। আরও এক কথা এই যে, একমাত্র অদ্বয় তত্ত্বই যদি সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য বিষয় হয়, তাহা হইলে অনেকগুলি শ্রুতিকে উপনিষদের মধ্য হইতে ছাঁটিয়া বাহির করিতে হয়। অদ্বৈতবাদীর মতানুসারে ঐ সকল শ্রুতির অর্থকে অসত্য বা গৌণ বলিয়া মানিতে হয়। সেই সকল শ্রুতি কিরূপ, তাহারও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। শ্রুতিতে দেখিতে পাই —"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দীভবতি। ক এবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদ্যেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।"

"তাহাই (অর্থাৎ ব্রহ্মই) রসস্বরূপ। এ সংসারে কে স্পন্দিত হইতে পারিত, কে বাঁচিয়া থাকিতে পারিত, যদি সেই রসরূপ প্রকাশমান আনন্দ না থাকিত ?"

এই শ্রুতিতে পূর্ব্বকথিত সেই অদ্বয়তত্ত্বকে রস বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, 'রস' শব্দের অর্থ—যাহা রসিত হয়, অর্থাৎ আস্বাদিত হয়, তাহাই, সুতরাং রস শব্দের অর্থ আস্বাদ্য, সেই আস্বাদ্যকেই আবার ঐ শ্রুতি আনন্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। আনন্দই যে ব্রহ্মের স্বরূপ, তাহা ত সকল অদ্বৈতবাদী স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের মতে আনন্দরূপ যে ব্রহ্ম, তাহা আস্বাদ্য নহে। আস্বাদন করিতে হইলে আস্বাদ্য এবং আস্বাদয়িতা এই উভয়েরই সত্তা অপেক্ষিত হইয়া থাকে। আস্বাদয়িতা এবং আস্বাদ্য যদি পরস্পর ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে আস্বাদ্য-আস্বাদক-ভাব বা ভোগ্য-ভোক্তৃভাব কখনই বাস্তব হইতে পারে না। ইহা কে অস্বীকার করিবে ? শ্রুতি কিন্তু স্পষ্টভাবে সেই আনন্দরূপ বস্তুকে রসশব্দ প্রয়োগ দ্বারা আস্বাদ্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতেছে। এরূপ অবস্থায় অদ্বৈতবাদিগণকে বলিতে হইবে যে, ব্রহ্ম আস্বাদস্বরূপ হইতে পারেন, কিন্তু কিছুতেই আস্বাদ্য হইতে পারেন না। যেহেতু, আস্বাদ ও আস্বাদ্য কখনও এক হয় না। ইহাই যদি তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে যে, উপনিষদের যে অংশে ব্রহ্মকে 'রস' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সে অংশটি গৌণ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত, আর উপনিষদে যেখানে তাহাকে আস্বাদ অর্থাৎ জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই অংশটি বাস্তব প্রামাণ্যযুক্ত।

তাহার পর উপনিষদ্ আরও বলিতেছে—

"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।
স বিশ্ববিৎ বিশ্বকৃদ্ আত্মযোনির্জ্ঞঃ
কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥"

তাঁহাকেই জানিয়া লোক মৃত্যুকে অতিক্রমণ করিতে পারে। মৃত্যু অতিক্রমণের অন্য পন্থা নাই। তিনি বিশ্ব নির্ম্মাণ করেন, তিনি বিশ্বকে জানেন। তিনি আত্মযোনি, তিনি কালেরও কাল, তিনিই জ্ঞাতা, তিনি গুণী, তিনি সর্ব্ববিৎ, তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের পতি, তিনি গুণেশ, সংসার হইতে মোক্ষ বা সংসারে স্থিতি বন্ধন, তাহার তিনিই কারণ। এই শ্রুতি আবার বলিতেছে—

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যে বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং, মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥"

"যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে সকলবেদের উপদেশ করিয়াছেন, সেই আত্মবুদ্ধিতে প্রকাশ দেবকে আমি মুমুক্ষু হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।" এই কয়টি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জগদীশ্বরের যে স্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা অদ্বৈতবাদীর মতানুসারে সগুণব্রহ্ম অর্থাৎ কল্পিত, ইহা বলিতে হইবে। কারণ, তাঁহাদিগের মতে নির্গুণ ব্রহ্মের যে জ্ঞান, তাহাই মোক্ষের হেতু। এই শ্রুতিতে কিন্তু স্পষ্টই বলিতেছে যে, মুমুক্ষু জীব যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, তিনি সগুণ, সুতরাং সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা যে মোক্ষলাভের কারণ, তাহা এই শ্রুতির বিস্পষ্ট অর্থ, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্মের যে সগুণ ভাব, তাহা অনিত্য বা কল্পিত, কিন্তু শ্রুতি তাহা বলে না। শ্রুতি স্পষ্টই বলিতেছে—

"স ঈশে অস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতুর্বিদ্যত ঈশনায়।"

অর্থাৎ যিনি এই জগতের নিত্য ঈশ্বর, তাঁহার সেই যে ঈশভাব, তাহা অন্য কোন হেতুর দ্বারা জনিত নহে, অর্থাৎ তাঁহার তাহা স্বতঃসিদ্ধ ; সুতরাং শ্রুতিতে ব্রহ্মের যে ঈশভাব, তাহা মায়া হইতে বা অবিদ্যা হইতে প্রসূত নহে, ইহা নিজ মুখেই শ্রুতি বলিয়া দিতেছে। এতাদৃশ দৃঢ়তর প্রমাণ

সত্ত্বেও অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মের ঈশভাব বা ঈশ্বরত্ব ব্রহ্মভিন্ন যে মায়া বা অবিদ্যা, তাহার দ্বারাই কল্পিত হইয়া থাকে। জ্ঞানের দ্বারা সেই মায়া বা অবিদ্যা অপনীত হইলে ব্রহ্মের ঈশত্বও বিলুপ্ত হয়। শ্রুতি কিন্তু স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে—ব্রহ্মের যে ঈশভাব, তাহা নিত্য এবং সেই ঈশভাব অন্য কোন কারণ হইতে প্রসূত হয় না। তাহা তাহার নিত্যসিদ্ধ স্বভাব, এই প্রকার পরস্পর শ্রুতি-বিরোধের সমন্বয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অদ্বৈতবাদিগণ কতকগুলি শ্রুতিকে পারমার্থিক প্রমাণ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন, এবং কতকগুলি শ্রুতিকে গৌণপ্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করেন, অর্থাৎ যে সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মকে নিরাকার, নির্গুণ, অদ্বিতীয় ও জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে, সেই সকল শ্রুতিরই পারমার্থিক প্রামাণ্য অদ্বৈতবাদিগণ মানিয়া থাকেন, আর যে সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মকে সগুণ, সাকার ও জীব হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে, সেই সকল শ্রুতির পারমার্থিক প্রামাণ্য নাই, কিন্তু গৌণ প্রামাণ্য বা ব্যবহারিক প্রামাণ্য বিদ্যমান আছে।

অদ্বৈতবাদিগণের এই প্রকার যে ব্যবস্থা, তাহা ভক্তি-বাদিগণের নিকট প্রমাণসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয় না। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিবার মূল প্রমাণ হইতেছে যখন শ্রুতি, তখন সেই শ্রুতি যাহা বলিতেছে অর্থাৎ যে ভাবে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, অবিকৃতভাবে তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এ স্থলে "অর্দ্ধকুক্কুটীয়" ন্যায় অবলম্বন করা কিছুতেই যুক্তিসহ হইতে পারে না। সেই অর্দ্ধকুক্কুটীয় ন্যায়টি এই প্রকার—

কোন ব্যক্তির নিকটে একটি কুক্কুটী ছিল, সে নিত্য একটি অণ্ড প্রসব করিত। কুক্কুটীর স্বামী সেই কুক্কুটীপ্রসূত অণ্ড প্রতিদিনই একটি করিয়া ভক্ষণ করিতেন, ইহাই তাঁহার অভ্যাস ছিল। কোন সময় তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, কুক্কুটীর অণ্ড ত খাইয়াই থাকি, কিন্তু কুক্কুটীর মাংসও শুনিয়াছি বড় আস্বাদযুক্ত, সুতরাং তাহারই যোগাড় করিতে হইবে। তাঁহার একটি সুবুদ্ধি ভৃত্য ছিল, তাহার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা কর্ত্তা নিজেও যে না করিতেন, তাহা নহে, অন্য অনেকেও করিত। তিনি সেই ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন যে, বাজার হইতে কুক্কুটের মাংস ক্রয় করিয়া আন; কারণ, কুক্কুটের মাংস অন্য আহার করিতে হইবে। প্রভুর আদেশ পাইয়া সুবুদ্ধি ভৃত্য হাসিতে হাসিতে বলিল যে, কুক্কুটের মাংসের জন্য বাজারে যাইতে হইবে কেন, বাড়ীতে যে কুক্কুটী আছে, তাহাকে মারিলেই ত মাংস পাওয়া যাইবে। কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন যে, তাহা হইলে আমি যে প্রত্যহ কুক্কুটের অণ্ড ভক্ষণ করিয়া থাকি, তাহার কি গতি হইবে? প্রত্যুৎ-পন্নমতি ভৃত্য তখনই উত্তর করিল যে, আপনার প্রত্যহ কুক্কুটীর অণ্ড ভক্ষণও যাহাতে হয় অথচ বাজারে গিয়া কুক্কুট-মাংস খরিদ করিতেও না হয়, তাহার ব্যবস্থা আমি করি-তেছি। কর্ত্তা বলিলেন, তাহা কিরূপে হইবে? প্রত্যুৎপন্ন-মতি ভৃত্য উত্তর করিল যে—আমাদের এই কুক্কুটী যে অংশের দ্বারা অণ্ড প্রসব করে, সেই অংশটি রাখিয়া দিব, তার তাহার শরীরের বাকি অংশ আপনাকে রাঁধিয়া খাওয়াইব।"

কুক্কুটীর অর্দ্ধেক ভাগ নিত্য অণ্ড প্রসব করিবে, আর অর্দ্ধভাগ রন্ধনার্থ কল্পিত হইবে, ইহা যেরূপ সম্ভবপর নহে, সেইরূপ কোন যুক্তিবিরুদ্ধ বস্তু যদি কেহ মানিয়া তর্ক করিতে উদ্যত হয়, তবে সেই তর্ককে পণ্ডিতগণ "অর্দ্ধ-কুক্কুটীন্যায়" বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

অদ্বৈতবাদিগণ পরমাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রুতিকে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইতেছেন, অথচ সেই শ্রুতিরই বড় অংশ ব্যবহারিক প্রমাণ বা গৌণ প্রমাণ বলিয়া নিজ শিষ্যগণকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, ইহা কিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে? তাঁহাদিগেরই ন্যায় দ্বৈতবাদিগণ বলিবেন যে, শ্রুতির মধ্যে দ্বৈতপ্রতিপাদক যে অংশ, তাহাই পারমার্থিক প্রমাণ, এবং অদ্বৈততত্ত্বপ্রকাশক যে সকল অংশ, তাহা ব্যবহারিক বা গৌণ প্রামাণ্যই হউক। যে পর্য্যন্ত শ্রুতি হইতে স্পষ্টভাবে ইহা অর্থাৎ দ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রুতি অপ্রমাণ এবং অদ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রুতিগুলি প্রমাণ স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা অদ্বৈতবাদিগণ যে পর্য্যন্ত দেখাইতে না পারিবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের এই যে শ্রুতির ভাগাভাগি করিয়া মুখ্য ও গৌণ প্রামাণ্যের ব্যবস্থা সিদ্ধান্ত, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট "অর্দ্ধকুক্কুটী" ন্যায় সদৃশ বলিয়া উপেক্ষিতই হইবে। [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)

ফুলের ইতিহাস

(১)

সে যে এক বসন্তের পূর্ণিমার নিশি,
জ্যোছনা-জোয়ার-স্রোতে স্নাত দশদিশি,
স্বর্গের নন্দন-বনে মলয়-পবন
বার বার বৃক্ষশিরে করিয়া ভ্রমণ,
কিসের অভাবে যেন ফিরে ফিরে আসে,
মর্ম্মব্যথা ব্যক্ত করি সুদীর্ঘ নিশ্বাসে।

সে নিশীথে মন্দাকিনী-কূলে
মন্দারের মূলে,
ব'সে আছে রতিদেবী শিলাবেদী'পরে,
গণ্ড রাখি করে—
চিত্রার্পিত-প্রায়,—
দিব্যদেহে জ্যোছনার জ্যোতি মিশে যায়;
মন্দ মন্দ বায়,
কুঞ্চিত কুন্তলগুচ্ছ লুন্ঠিছে শিলায়।

সম্মুখেতে মন্দাকিনীজলে
হংস দলে দলে
করিতেছে কেলি
অভ্র-শুভ্র পক্ষগুলি মেলি—
দূরে যায় দেখা
দিগন্ত ললাটে ক্ষীণ পর্ব্বতের রেখা।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে একা কন্দর্প সেথায়,
দাঁড়াল বিমুগ্ধ আঁখি হেরি ললনায়,

সহসা তখন
তুলি দুটি নলিন-নয়ন—
চাহিলেন রতি
কন্দর্পের প্রতি
চারি চক্ষে হইল মিলন
বক্ষে তুলি মৃদুল কম্পন,
নিমেষে উঠিল জাগি যুগল-হৃদয়—
প্রথম প্রণয়
মাদকতাময়।

এক হয়ে দুটি প্রাণ সেই শুভক্ষণে
নিবেদিল ধাতার চরণে,
'দাও স্রষ্টা বস্তু অভিনব,
এ প্রেম উৎসর্গ করি মোরা ধন্য হব,
সে অপূর্ব্ব দান
মিলনের হয়ে থাক চির-অভিজ্ঞান।'

অন্তর্য্যামী শুনিলেন অন্তরের একান্ত প্রার্থনা
বর্ষিলেন কৃপা এক কণা—
অকস্মাৎ কুহরিল পিক,
বিকচ কুসুমগুচ্ছে ভরিল চৌ'দিক্,
কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে মধুপের দল
মধুর ঝঙ্কারে ভরি দিল বনস্থল।

ঝ'রে প'ল দুইটি মন্দার
দিব্য প্রণয়ের পূজার সম্ভার,

পরস্পর করি পুষ্প-বিনিময়
দুঁহু দোঁহে বাঁধিল হৃদয়।

মিলন-মাধুরী হেরি মলয়-পবন
পুলকে প্রথম পুষ্প করিল চুম্বন,
উঠিল আনন্দধ্বনি তারায় তারায়
নভো নীলিমায়।

সে সময় দূরে,—
ইন্দ্রপুরে
রজনীর উৎসব-প্রহরে
কিন্নরীর কমকণ্ঠ-পরে,
সুধার নির্ঝর সম ঝরিল ঝর্‌ঝর্‌
সঙ্গীতের সুললিত স্বর ;
মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীর গুঞ্জরি'
লাস্যের সুষমা দিল স্বরগে সঞ্চরি।

(২)

সে দিন উর্ব্বশী,
ত্রিদিব-রূপসী
ফুলে ফুলে সাজি ফুলরাণী
দোলাইয়া নীলাঞ্চলখানি
যায় ইন্দ্রসভার মাঝারে,
নৃত্য করিবারে।

মদালস চিত্ত তার পুষ্পের সৌরভে
শিথিল চরণে চলে গরবে গৌরবে,
সুবঙ্কিম নয়ন-যুগল
নেশার আবেশে যেন করে ঢল ঢল।

নৃত্যকালে তার
তালভঙ্গ হ'ল তিনবার,
অভিশাপ দিল তারে রুষ্ট দেবগণ
'দেবকার্য্যে অবহেলা—লভ গিয়া মানব-জীবন
মনস্তাপে প্রায়শ্চিত্ত হ'লে সমাপন,
পুনঃ স্বর্গে আসিও তখন।'

কঠোর সে অভিশাপ অশনি সমান
ভেঙ্গে দিল যেন আহা অভাগিনী-প্রাণ,
উচ্ছ্বসি উচ্ছ্বসি
কাঁদিল উর্ব্বশী
অগ্নিতাপে পরিম্লান পদ্মের মতন—
বিবর্ণ বিশুষ্ক তার সুন্দর বদন।

দেবগণ-পদ ধ'রে
কহিল করুণ-স্বরে
হে অমরগণ,—
দুঃখময় ধরার জীবন
করিতেছে মোরে আকর্ষণ,
মুহূর্ত্তকে চ'লে যেতে হবে—
এক ভিক্ষা দাও মোরে তবে,
সঙ্গে মোর দাও সেই ফুল
নৃত্যকালে যে আমারে করাইল ভুল—
হেরি তারে স্বর্গ-স্মৃতি জাগিবে পরাণে,
স্মরিব দেবতা-মুখ চাহি তার পানে।

বিগলিত হ'ল দেবপ্রাণ
প্রার্থিত ভিক্ষা তারে করিলেন দান।

• • • •

ফুলপদ উর্ব্বশীর পদস্পর্শ পেয়ে
সে অবধি ফুলে ফুলে ধরা গেছে ছেয়ে।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

পথের স্মৃতি

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শশব্যস্ত হইয়া এ-ঘরে ছুটিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বিনুদাকে জিজ্ঞাসা করিবারও অবসর পাইলাম না। ঘরের মধ্যে পদার্পণ করিতেই বিনুদা কহিল,—"পঙ্কু, আমাদের এই লাইনেই থানচুচ্চার বাড়ীর পরেই সুশীল চৌধুরী ডাক্তারের বাড়ী, আমার নাম ক'রে ডেকে আনতে পারিস্ ? বাড়ীর দরজায় সাইনবোর্ড আছে, দেখে নিস্। খুব শীগ্‌গির। আমার নাম ক'রে ডাকলেই এক্ষুনি—।" অর্দ্ধেক কথা বিনুদার না শুনিয়াই আমি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলাম।

মিনিট পনরর মধ্যেই আমি ডাক্তার চৌধুরীকে সঙ্গে লইয়া ফিরিলাম। বিনুদার নাম শুনিয়াই তিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই ব্যস্ত হইয়া আমার সহিত চলিয়া আসিলেন। বিনুদা তাঁহাকে বলিল,—"মাঝে মাঝে বুকে একটা ব্যথা আটকাত, তার জন্যে ঘরে সর্ব্বদাই একটা ওষুধ থাকে। আধঘণ্টাটাক আগে সেই ওষুধ এক দাগ খেতে গিয়ে ভুলে পাশের একটা ব্রাণ্ডির শিশি থেকে আউন্সটাক ব্রাণ্ডি ঢেলে খেয়ে ফেলেচে। খাবার সঙ্গে সঙ্গেই Senseless হয়ে এই অবস্থা।" ডাক্তার চৌধুরী কহিলেন—"এক আউন্স ব্রাণ্ডি খেলে ত Senseless হয় না, ওঁর কি ফিট-টিট্ হ'ত আগে ?" বিনুদা কহিল—"খুব কম, কালে-ভদ্রে। মনে খুব কষ্ট বা রাগ হ'লে কচিৎ কখন হয়।"

"যাই হোক, ভাই হয়েচে আর কি" বলিয়া ডাক্তার চৌধুরী বৌদির বুক ও নাড়ী পরীক্ষা করিয়া কহিলেন,—"ভয় কিছু নেই, নাড়ী খুব ভালই আছে। কিন্তু এঁর heart ভয়ানক weak—ভয়ানক—ভয়ানক। Heartএর সম্বন্ধে খুব ভাল ক'রে care নেবেন বিনু বাবু।"

তখনই ডাক্তার চৌধুরীর সঙ্গে আবার তাঁহার গৃহে গেলাম। তিনি 'ডিস্‌পেন্‌সারি'-ঘর খুলিয়া দুইটি মোড়ক তৈয়ারী করিয়া দিলেন। তখনই ফিরিয়া আসিয়া সেই একটি মোড়ক বৌদিকে খাওয়ান হইল। ঔষধটি খাইবার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বৌদি অল্প অল্প চেতনালাভ করিতে লাগিল। আরও মিনিট পাঁচেক পরে পূর্ণসংজ্ঞা ফিরিয়া পাইয়া বৌদি পাশ ফিরিয়া শুইল এবং তাহার খানিক পরেই সেই মেজের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন দুপুরবেলা গঙ্গার দিকের টানা বারান্দায় বসিয়া বৌদির সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম। পূর্ব্বরাত্রির অনিদ্রার জন্য বিনুদা তেতলার ঘরে ঘুমাইতেছিল। আমি কহিলাম, "সত্যি বৌদিদি, ওষুধ মনে ক'রে ভুলে ব্রাণ্ডি খেয়ে ফেলেছিলে ?"

"হ্যাঁ।"

"সত্যি বলচো ?"

মুখ নীচু করিয়া, একটু মৃদুস্বরে বৌদি কহিল,—"সত্যি।"

"কিন্তু আমার তা মনে হয় না, আমার মনে হয় মিথ্যা।" একটুখানি চুপ করিয়া পুনরায় কহিলাম—"কাশীতে মিথ্যা কথা বল্‌লে কি হয়, জান ত ?"

"জানি। যা হয়, তা কাশীতে বল্‌লেও হয়, কোল্‌কাতাতে বল্লেও হয়" বলিয়া একটু দ্রুততার সহিতই উঠিয়া বৌদি ও-ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

মিনিট দুই পরেই বৌদি আবার ফিরিয়া আসিল। মুখে তাহার বেদনা ও বিরক্তির ভাব। বড় বড় টানা চক্ষু দুইটির ভিতরে ভিতরে বোধ হয় যেন কিছু জলও জমা হইয়াছিল। সেই চোখে আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া চাপা উত্তেজনার স্বরে কহিল,—"সত্যি নয়।"

"কি বৌদি ?"

"ভুলে খাওয়া।"

"তবে ?"

"তবে ?" বলিয়া আমার সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া বৌদি কহিল,—"বল, এ কথা কারও কাছে কখনই বলবে না ?"

"কারুর কাছেই বলব না বৌদি।"

"বললে, আমার মাথা খাবে, আমার মরামুখ দেখবে।"

"আচ্ছা।"

"কা'ল সব কথার ভেতর এই কথাটাকেই শুধু তোমার কাছে গোপন ক'রে গিয়েছিলুম ঠাকুরপো, আজ তা আর পারলুম না।" তার পর মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বৌদি কহিল—"নিজে একটু একটু খেতে অভ্যেস ক'রে ইস্তক আমাকেও ওই ছাই খাওয়াবার জন্তে যে কত লোভই দেখিয়েছেন, তা আর কি বলবো! বলেন—'তোমার এই বুকের রোগ-টোগ সব সেরে যাবে, ক্ষিদে হবে, হজম হবে, চেহারা আরও সুন্দর হবে।'—কত চেষ্টাই যে আমাকে খাওয়াবার জন্তে করেছেন, কোন দিনই কিন্তু আমাকে খাওয়াতে পারেন নি। কা'ল যে আমার কি মতি হ'ল!"

"কা'ল নিজেই ইচ্ছে ক'রে খেলে বৌদি ?"

"ইচ্ছে ক'রে ? ওই জিনিষ ইচ্ছে ক'রে খাব ?"

"তবে ?"

"সেই কথাই ত বলছি ভাই তোমায়। কা'ল যখন উনি এলেন, রাত তখন প্রায় বারোটা। হাতের কব্‌জিতে, পাঞ্জাবীর আস্তিনের ওপরেই যুঁইফুলের ছড়াকতক মালা জড়ানো, চোখদুটো খুবই চকচকে, বুঝলুম—বাইরে কোথাও থেকে আজ একটু খেয়ে এসেছেন। আমার বুকের ব্যথাটা তখন এত বেড়ে উঠেছিল যে, আমি কথা কইতেই পাচ্ছিলুম না। উনি বল্লেন—'তোমার বুকের অসুখের একটা ওষুধ আনিয়ে রেখেছি, এক দাগ দি, খাও দেখি, এখ্‌খুনি ব্যথা সেরে যাবে এখন।' কা'ল কেনই যে ওঁর সে কথা বিশ্বাস করলুম! মেজের ওপর শুয়ে ছিলুম, হাঁ করতেই মুখের ভেতর যেমন ঢেলে দিলেন, অমনি বিশ্রী একটা ঝাঁজে সমস্ত গলার ভেতরটা যেন আমার পুড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গেই রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠলো। তার পরেই বোধ হয় 'ফিট' হয়ে পড়েছিলুম, সে ত তোমরা সব জান।"

মিনিট দুই তিন আমিও চুপ করিয়া রহিলাম, বৌদিও নীরবে বসিয়া রহিল। শেষে আমি কহিলাম—"বৌদি, তুমি দিনকতক প্রসাদপুরে চল।"

"চল ভাই, চল। বড় কুক্ষণেই এ বাড়ীতে আমি এসেছিলুম! এ বাড়ীর যাত্রা আমার বদলে আসতে হবে। ভাদ্রমাসের এই কটা দিন কেটে যাক্, এর মধ্যে তুমিও একটু সেরে নাও, তার পর একটা ভাল দিন দেখে, চল ত ভাই যাই।"

বৌদিকে লইয়া প্রসাদপুর আসিবার কথা সেই দিনই বিনুদার কাছে বলিলাম। বিনুদা প্রথমে রাজী না হইলেও বৌদির ও আমার আগ্রহাতিশয্যে শেষে তাহাকে আমাদের মতেই মত দিতে হইল; কিন্তু নিজের সম্পর্কে বিনুদা কহিল—"কাশী ছেড়ে আমি কোথাও পাদমেকং ন গচ্ছামি।" যাহা হউক, ২রা আশ্বিন আমাদের যাওয়ার দিন স্থির হইল, এবং সেই দিন সন্ধ্যার পর বিনুদার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া, ঠাকুর-ঘরের সমস্ত দেবদেবীর ছবিগুলিকে বার বার প্রণাম করিয়া, বৌদি আমার সহিত আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

এক দিন শ্রাবণের শেষে প্রসাদপুরের যে মূর্ত্তি দেখিয়া গিয়াছিলাম, আজি আশ্বিনে তথায় ফিরিয়া আসিয়া তাহার সে মূর্ত্তি আর দেখিতে পাইলাম না। এই কয় দিনের ভিতরেই তাহার এক ভিন্ন রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর তাহার আকাশে মেঘের সে বিচিত্র ক্রীড়া নাই। তাহার আজিকার আকাশ একেবারেই মেঘশূন্য। শুভ্র সূর্য্যোকরোজ্জ্বলতায় তাহা আজ সুনীল, প্রফুল্ল, হাস্যময়। শরতের এই শুভ্র হাস্যচ্ছটা প্রসাদপুরের দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কাশ-শেফালী-কুমুদ-কহ্লারকে ফুটিবার ভার দিয়া তাহার কদম্ব-কেতকী-চম্পক আজ আত্মগোপন করিয়াছে। খাল বিল ডোবা পুষ্করিণী সকল কানায়-কানায় পরিপূর্ণ। শিলাইয়ে আর জল ধরিতেছে না। জল-সম্পদে গর্ব্বিতা হইয়া, আনন্দে তর্ তর্ করিয়া শিলাই বহিয়া চলিয়াছে। তাহার পরপারের সেই আউস-ধানগুলি এই অল্পদিনের ভিতরেই পাকিয়া উঠিয়া হরিৎবর্ণ ধারণ করিয়াছে। মাঠ-ঘাটের পথের জল শুকাইয়া গিয়াছে। গাড়ীর চাকার দাগ ও পথিকের পায়ের চিহ্ন বুকে লইয়া পথের কর্দ্দমরাশি আজ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বর্ষার স্নান সমাপন করিয়া

প্রসাদপুরের বৃক্ষলতা কানন-প্রান্তর এক শুদ্ধ শ্যামল রূপ অঙ্গে ধারণ করিয়া বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে।

এখানে আসিবার কয়েক দিন পরে প্রসাদপুরের এই শরৎকালীন শোভা দেখিতে দেখিতে সে দিন শিলাইয়ের তীরের পায়ে-চলা পথ ধরিয়া যাইতেছিলাম। অপরাহ্নকাল; পরপারে বহুদূরে কাঁইপাড়ার প্রান্তস্থিত ঝাউবনের অন্তরালে সূর্য্যদেব তখন অস্ত যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন। নদী-তীরের এই পথটি যেখানে আসিয়া ষ্টেশনের বাঁধের রাস্তায় মিশিয়াছে এবং যেখান হইতে পূর্ব্বদিকে মাঠের উপর দিয়া আর একটি পথ সুন্দরদীঘির জলেশ্বরের মন্দিরের দিকে গিয়াছে, সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলাম এবং নদীর ঠিক উপরেই যে প্রাচীন বটগাছটি ছিল, তাহার তলায় বসিয়া সম্মুখে মাঠের সেই পথের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখিতে লাগিলাম।

সে দিন সন্ধ্যা ও বৌদি উপবাস করিয়া জলেশ্বরের মন্দিরে শিবের মাথায় গঙ্গাজল দিতে গিয়াছিল।

এখনও পুরা এক মাসও হয় নাই আমরা কাশী হইতে আসিয়াছি, কিন্তু ইহারই মধ্যে বৌদির স্বাস্থ্যের আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছে। এখানে আসিয়া বৌদি তাহার বুকের অসুখ এক দিনও আর জানিতে পারে নাই, অথচ শরীরের উপর দিয়া অনিয়ম, অত্যাচার, পরিশ্রমও তাহার কম যাইতেছে না। এখানে আসিয়া অবধি সংসারের কায-কর্ম্ম বৌদি সন্ধ্যাকে বড় একটা করিতে দেয় না। প্রত্যূষে শয্যাত্যাগের পর পূজার ফুল তোলা হইতে সুরু করিয়া সংসারের কায-কর্ম্ম করিবার পর ঘণ্টা দুই তিন পূজার ঘরে কাটাইয়া খাইতে তাঁহার প্রত্যহই অপরাহ্ণ গড়াইয়া যায়। ইহার মধ্যে আবার কোন কিছু উপলক্ষ করিয়া মাঝে মাঝে উপবাস করাও আছে। অথচ ইহাতে তাঁহার কি অসীম উৎসাহ, কি গভীর তৃপ্তি, চিত্তের কি প্রফুল্লতা! সন্ধ্যা কখনও উপবাস করিতে পারিত না, কিন্তু বৌদি এই অল্প কয়েক দিনের মধ্যে তাহাকেও বেশ শিক্ষা করিয়া তুলিয়াছিল।

এবার কার্ত্তিকমাসে পূজা পড়িয়াছে। মহামায়ার আগমনের আর অল্প কয়েক দিনমাত্র বাকী। প্রকৃতির চারিদিকে, আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে, কাননে-প্রান্তরে, বৃক্ষে-লতায়, নর-নারীর অন্তরে অন্তরে মায়ের এই আসন্ন শুভাগমনের একটা সাড়া তখন পূর্ণমাত্রায় পড়িয়া গিয়াছিল।

আজ মহালয়া—অমাবস্যা। সকালে উঠিয়াই বৌদি দুইখানা পাল্কীর জন্য বলিয়া কহিল,—"আজ আমরা উপোস ক'রে জলেশ্বরে জল দিতে যাব।" আমি কহিলাম, "এ তুমি কি আরম্ভ করেছ বৌদি? এই এত উপোস আর পুজা-আচ্চা নিয়ে শরীরের ওপর এই রকম অত্যাচার ক'রে শেষে কি একটা তুমি—"

"কাণ্ড বাধিয়ে বসবো বলছ? কোন ভয় নেই ঠাকুরপো। কাশীতে তাঁর পায়ের তলা ছেড়ে কি কাণ্ড বাধাতে পারি? আর তা' ছাড়া পুজো-আচ্চা, উপোস করলে কি কখনো কাণ্ড বাধে? সে বাঁধে ঠাকুরপো, বিবি বৌ-ঝিদের, যারা সকালে উঠে চা না খেলে মাঠে-ঘাটে হাওয়া খেতে বেরুতেই পারে না, দেহ তাদের এলিয়ে পড়ে। আমরা হিঁদুর ঘরের মেয়ে, হিঁদুর ঘরের বৌ, এ আমাদের অভ্যেস আছে ঠাকুরপো! এই ক'রে দেহ আমার দিন দিন খারাপ হচ্চে কি ভাল হচ্চে, তা ত দেখতেই পাচ্ছ। আমি ত আবার সেই আগেকার মত হয়ে উঠেছি। দেখছ না, গায়ে কি রকম মাংস লাগতে আরম্ভ করেছে?" এ কথার পর কি-ই বা আর বলিব! দুইখানি পাল্কীর ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। দ্বিপ্রহরে আমাদের আহারাদি হইয়া গেলে দরোয়ান ও শৈলীর মা ঝিকে সঙ্গে লইয়া ইহারা জলেশ্বরের মন্দিরে যাত্রা করিয়াছে।

যে সময় তাহারা গিয়াছে, এতক্ষণে ফিরিয়া আসিবার কথা। যদিও সঙ্গে লোকজন আছে বটে, কিন্তু তবুও তাহাদের ফিরিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন, তাহাই সেই বটবৃক্ষতলে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে দেখিতে পাইলাম যে, অনেক দূরে মাঠের পথে একখানি পাল্কী এই দিকে আসিতেছে। একটু কাছে আসিতে ভাল করিয়া দেখিলাম যে, আমাদের পাল্কীই বটে। কিন্তু একখানি কেন, আর একখানি কি হইল? ভাবিলাম, বোধ হয় পিছনে পড়িয়াছে, আর তাহারই সঙ্গেই বোধ হয়, দরোয়ান ও ঝি আসিতেছে। এ পাল্কীখানির মধ্যে সন্ধ্যা নিশ্চয়ই নাই, কারণ, সন্ধ্যা তাহার পাল্কীখানিকে মাঠের মধ্যে এমনভাবে যে আগাইয়া আসিতে দিবে, বিশেষ পাল্কীর সঙ্গে দরোয়ান বা ঝি কেহই নাই—তেমন সাহস তাহার কিছুতেই হইবে না।

এ নিশ্চয়ই বৌদির পাল্কী। গ্রামের জানা-চেনা বেহারা হইলেও বৌদির এই সাহস যে অন্যায়, পাল্কী সামনে আসিলে এই কথাটাই বলিতে গিয়া দেখি যে, পাল্কীর দুই দিকের দরজাই খোলা আর তাহার মধ্যে আড় হইয়া শুইয়া বিনুদা গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতেছে। আমি চমকিত হইয়া কিছু একটা বলিতে যাইতেছিলাম, তৎপূর্ব্বেই বিনুদা বেহারাদের পাল্কী থামাইতে বলিল ও সঙ্গে সঙ্গেই পাল্কীর ভিতর হইতে নামিয়া পড়িয়া কহিল,—"তোকে আগে চিঠি না দিয়ে আসার এই শাস্তি পঞ্চু। ষ্টেশনে নেমে বাঁধের রাস্তা ধ'রে ঠিক এইখানেই এসেছিলুম, কিন্তু সোজা না গিয়ে বরাবর এই মাঠটা ভেঙ্গে চ'লে গিয়েছি।"

আমি কহিলাম—"কোন চিঠি-পত্তর খবর-টবর না দিয়ে হঠাৎ এমনি ক'রে—। আড়াইটের গাড়ীতে নেমেছিলে বোধ হয়?"

"হ্যাঁ রে। নাকালের একশেষ আর কি। এ দিকে কি দীঘি ব'লে একটা গাঁ আছে?"

"সুন্দরদীঘি।"

"হ্যাঁ, সেই সুন্দরদীঘিতে একেবারে গিয়ে পড়েছি। দুপুরবেলা, মাঠে একটা লোকও দেখা পাই না যে জিজ্ঞাসা করব। সমস্ত দুপুরের রোদ্দুরটাই আজ মাথার ওপর দিয়ে গিয়েছে। এখান থেকে সেই শিবের মন্দির কি কম দূর, বোধ হয়—"

"পাকা তিন মাইল পথ বিনুদা। ওদের সঙ্গে সেখানে দেখা হ'ল ত?"

"তা না হ'লে আর পাল্কী পেলুম কোথায়?"

কথা কহিতে কহিতে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। খালি পাল্কী তুলিয়া লইয়া বেহারারা বৌদি ও সন্ধ্যাকে আনিবার জন্ত আবার সুন্দরদীঘির মাঠের পথে ফিরিয়া গেল।

বাটীতে আসিয়া মুখ-হাত ধুইয়া কিছু জলযোগান্তে চা খাইতে খাইতে বিনুদা কহিল—"দেখ পঞ্চু, ভাবলুম, অত ক'রে এখানে একবার আসবার জন্তে বললি, না এলে দুঃখু করবি, তাই একবার এসে পড়লুম। ও ত দেখলুম বেশ সেরেসুরে গিয়েছে রে! তোর পেসাদপুর দেখছি ওর পক্ষে শিমলের পাহাড় হয়ে গেছে! কাশীর মত যায়গায় থেকে যে শরীর সারলো না, এখানে এই ক'দিন এসেই—আচ্ছা, পদ্মাটা ত তেমন গায়ে সারতে পারে নি।"

"এখানে এসে পর্য্যন্ত বৌদি ভারি আনন্দেই আছে বিনুদা।"

"সে ত দেখতেই পাচ্ছি। দু'কোশ মাঠ ভেঙ্গে গিয়ে শিবের মাথায় জল দেওয়া, স্কুলে মাষ্টারী করা—?"

"স্কুলে মাষ্টারী করা?"

"হ্যাঁ রে! গিয়ে দেখি কি, মন্দিরের চাতালের ওপর বৌমা ব'সে রয়েছে, নইলে ত আমি বরাবর আরও চ'লে যেতুম। বৌমা ত হঠাৎ আমাকে দেখেই একেবারে চমকে উঠল। মনে মনে ভাবলুম, ঠিকই তা হ'লে পেসাদপুরে এসে পড়েছি। স'রে এসে এ ধারে মন্দিরের ছায়ায় এসে দাঁড়াতেই দরোয়ান এসে বল্লে—'আপনি পাল্কীতে গিয়ে বসুন, বেহারা লোক আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিবে। বড় মাইজী ওহি স্কুলমে গিয়া।' স্কুল? স্কুলমে গিয়া? সামনে চেয়ে দেখি, সত্যিই বটে, খানিকটা দূরে একটা টীনের প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে একপাল মেয়ে—"

"হ্যাঁ বিনুদা, ও গাঁয়ের মিত্তিররা মেয়ে-স্কুলটা নতুন বসিয়েছে।"

"তা হবে। এক-পা এক-পা ক'রে কাছে গিয়ে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখি যে, তোর বৌদিদি চেয়ারে ব'সে সেখানে মহা মাষ্টারী আরম্ভ ক'রে দিয়েছে" বলিয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিয়া বিনুদা কহিল—"মেয়েদের জিজ্ঞাসা করাতে বড় বড় দু-চারটে মেয়ে বলেছিল যে, পৃথিবীর ভেতর গরম হয়ে উঠলে ভূমিকম্প হয়, তোর বৌদি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে, হাত-মুখ নেড়ে কি বক্তৃতে—'না—না—না, কিছুতেই তোমরা এ কথা বলবে না। বইয়ে তোমাদের যা লেখা থাকে থাকুক, ও খালি প'ড়ে যাবে, মনে নেবে না। তোমাদের ঠাকুরমা-দিদিমারা, তোমাদের ঘরের মা-খুড়ী জ্যেঠাইরা যা বলেন, যা আমরা চিরকাল ধ'রে আমাদের ঘরে শুনে আসছি, তাই বলবে। বলবে যে, বাসুকি পৃথিবীর ভার সহ্য করতে যখন আর পারেন না, তখন একবার ক'রে ফণা বদলান, তাই তখন পৃথিবী নড়ে ওঠে। শুধু কাশী মহাদেবের ত্রিশূলের ওপর আছে ব'লে সেখানে ভূমিকম্প হয় না।' ওরে বাস রে, সে হাত-মুখ নাড়বারই বা ধরণ কি, আর সে বলবারই বা ভঙ্গী কি!"

নীচে কথার গোলমালে বুঝিলাম, ইহারা সব ফিরিয়াছে। বিমুদার দিকে চাহিয়া কহিলাম—"মহাদেবের ত্রিশূলও কিন্তু এবার নড়ে উঠেছে বিমুদা, নইলে তুমি যে কাশী থেকে ছিট্‌কে এখানে এসে পড়বে, এ স্বপ্নেরও—"

দরজার পায়ের শব্দ হইল। বৌদি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিমুদার উদ্দেশ্যে কহিল—"রাত্রে ভাত খাবে না লুচি খাবে? সমস্ত দিন ত আর পেটে ভাত পড়ে নি।"

"তা ত পড়ে নি, সুতরাং ভাতই খাওয়া যাবে, কিন্তু বাসুকির ফণার কি সাংঘাতিক জোর রে পণ্টু, এত বড় পৃথিবীটাকে ফণার ওপর অবলীলাক্রমে ধ'রে রয়েছে, আর সে ফণা না জানি বড়ই বা কত! তার পর, শুধু একটাই ফণা নয়, এই রকম এক হাজার—।" পরক্ষণে বৌদির মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"আচ্ছা হ্যাঁ গা, বাসুকি থাকেন কোথায়, ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে না ফিলাডেলফিয়ায়? কিন্তু ষ্টেশন থেকে নেমে বাড়ী পর্য্যন্ত আসতে পথে যে রকম তাঁর ছোট-বড় প্রজাপুঞ্জের দর্শন পেলুম, তাতে মনে হয়, কাছাকাছিই কোথাও যেন তাঁর রাজসিংহাসন পাতা আছে।"

"বেশ বেশ, তোমার আর ফাজলামী করতে হবে না। ঠাকুরপো, কা'ল ভাই একটু ভোর ভোর আমায় তুলে দিও ত, ওদের সব নেমন্তন্ন ক'রে এলুম।"

"কাদের বৌদি?"

"মিত্তির-বাড়ীর বৌদের। বৌ তিনটি যেমন শিক্ষিত—তেমনই অমায়িক। শিবের মাথায় আমাদের জল দেওয়া হয়ে গেলে পরে, কিছু না খাইয়ে আর আমাদের ছাড়লে না। সে যে কি যত্ন, তা আর তোমায় কি বলবো ঠাকুরপো! ঘরে গোপীনাথ ঠাকুর, তিন যায়ে মিলে কি সেবাই যে ঠাকুরের করে! ঐ বৌদের ঝোঁকেই ত স্কুল। তিন জনে সঙ্গে ক'রে আমায় স্কুল দেখালে। কালই ত স্কুল হয়ে পুজোর ছুটী হয়ে যেত। সে দিন আমি ব'লে দিয়েছিলুম কি না যে, মহালয়ার দিন যাব, তাই কা'ল আর স্কুলে ছুটী দেয় নি, আজ স্কুল ক'রে তবে ছুটী দিলে।" মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বৌদি বলিল,—"একটা কায ক'রে এসেছি ঠাকুরপো।"

"কি বৌদি?"

"স্কুলের জন্তে একশটা টাকা দেবো ব'লে এসেছি। কা'ল ওদের হাতে টাকাটা দিয়ে দিলেই ভাল হয়। তুমি ভাই, এই একশ টাকা কা'ল আমাকে দিও, তার পর আমি তোমায় দিয়ে দেবো এখন,—কেমন?"

"আচ্ছা, বৌদি।"

এই অল্প সময়ের মধ্যে এ দিকে তখন বিমুদার নাক ডাকিতে আরম্ভ করিয়া দিল। বৌদি কহিল—"পথের কষ্ট কি কম কষ্ট! গোটা একটা রাত একটা দিন ত গাড়ীতে কেটেছে! যাই আমি, রাঙ্গাদিকে আগে চারটি ভাত চড়িয়ে দেবার কথা ব'লে আসি" বলিয়া নীচে নামিয়া গেল। খানিক পরে ওদিককার ঘর হইতে অনেক দিন পরে আজ হার্ম্মো-নিয়মের সঙ্গে বৌদির গলা পাইলাম। বৌদি গাহিতে লাগিল—

"(তোমার) ডাকের সাড়া কর্ণে লেগেছে।
তাই গো আমার শেষ নিশাতে তন্দ্রা ভেঙ্গেছে॥
পথে আমার পায়ের চিহ্ন, কার গো এমন ছিন্নভিন্ন?
কার সে গায়ের গন্ধে আমার বাতাস ভরেছে?
চারিদিকে ঐ কে ডেকে যায়—
'আয় রে ওরে আয় না রে আয়'?
কার সে গীতি, কার সে প্রীতি, আকুল করে যে!
যাই গো আমি, জীবনস্বামী, তন্দ্রা ভেঙ্গেছে॥"

সেইখানেই কাত হইয়া শুইয়া বৌদির গানখানি শুনিতে শুনিতে আমারও চোখের পাতা ঘুমে জড়াইয়া আসিল। সুমিষ্ট কণ্ঠের উচ্চতম পর্দ্দা হইতে তরঙ্গায়িত সুরটি যখন গান-শেষের সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন পর্দ্দায় নামিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতে লাগিল, তখন সত্যই মনে হইল, যেন কোন সুদূর স্বপ্নলোক হইতে কোনও অগ্রদূতের আহ্বানে গায়িকা ব্যাকুল অন্তরে যাই যাই বলিয়া তাহার অনুসরণ করিতেছে। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিশীথের সেই নীরবতার মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া আমি অর্দ্ধ-সচেতন অর্দ্ধ-অচেতন অবস্থায় শুনিতে লাগিলাম, কে যেন সূক্ষ্মদেহে পক্ষবিস্তার করিয়া অতি দূর-দূরান্তরে সীমাহীন শূন্যপথে ভাসিতে ভাসিতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাইতেছে, আর ব্যাকুলকণ্ঠে গাহিতেছে—

'যাই গো আমি, জীবনস্বামী, তন্দ্রা ভেঙ্গেছে।'

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

কাশীতে বাঙ্গালী *

আজ অদৃষ্টের পরিহাসে বাঙ্গালীর ললাটে ভীরুতার কলঙ্ক-কালিমা অবলিপ্ত হইয়াছে। কালচক্রের আবর্ত্তনের ফলে আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী তাহার পূর্ব্ব-সৌভাগ্যের সমস্ত কথাই ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এমন এক দিন ছিল, যে দিন ভারতের নানা প্রদেশের সহিত বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির একটা গৌরবময় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

যাঁহারা ভারতবর্ষে আর্য্যোপনিবেশ স্থাপনের ঘটনাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে "যে সময়ে শতপথ-ব্রাহ্মণ রচিত হইয়াছিল, সে সময়ে মিথিলায় আর্য্যোপনিবেশ স্থাপিত হইলেও, মগধ ও বঙ্গ আর্য্যজাতির নিকট মস্তক অবনত করে নাই।" (১) "আর্য্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদ পর্য্যন্ত উপস্থিত হন, তখন বাঙ্গালার সভ্যতায় ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাঁহারা বাঙ্গালীকে ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য এবং ভাষাশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।" (২)

পাঞ্চাল-রাজকন্যার স্বয়ম্বর-সভায়, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে ও কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভারতের বিভিন্ন শক্তিশালী রাজন্যবর্গের সহিত পৌণ্ড্রক বাসুদেব, প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি ভগদত্ত প্রমুখ বাঙ্গালী বীরগণও সমবেত হইয়াছিলেন। বীরত্ব-গৌরব-পরীক্ষার সেই সকল সুবর্ণক্ষণে বাঙ্গালী তাহার বিলাসশয্যায় শয়ন করিয়া স্বপ্নরাজ্যের বিভ্রমে তন্ময় ছিল না!

তাহার পর রাঢ়াধিপতি সিংহবাহুর ত্যাজ্য-পুত্র বিজয়-সিংহ বাঙ্গালার রণপোতে সার্দ্ধসহস্র সৈন্য লইয়া যে দিন লঙ্কাদ্বীপ আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন, তাহাও বাঙ্গালীর সেই পুরাতন গৌরবময় বীরত্ব-কীর্ত্তির স্মরণীয় মুহূর্ত্ত! বিজেতা বীরের নামানুসারে লঙ্কা সেই দিন হইতে 'সিংহল' নামে বিখ্যাত হইল। কাহারও কাহারও মতে ইহা বুদ্ধ-জন্মেরও পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। (৩)

আবার যখন কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য, 'পরিহাস-কেশব' নামক বিষ্ণুমূর্ত্তির সমীপে শপথ করিয়াও ত্রিগ্রাম নামক স্থানে গুপ্তঘাতকের দ্বারা গৌড়পতির বধসাধন করেন, তখন সেই সংবাদ গৌড়ে পৌঁছিলে গৌড়পতির স্বল্পসংখ্যক ভৃত্য প্রভুহত্যার প্রতিশোধ-আকাঙ্ক্ষায় কাশ্মীরের দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া শ্রীনগরের বিপুল সৈন্য-বাহিনীর সহিত যেরূপ অকুতোভয়ে সংগ্রাম করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছিল, কাশ্মীর-কবি কহ্লন সেই অমানুষিক বীরত্ব-গাথা "রাজতরঙ্গিণী"তে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন,—

"ক দীর্ঘকাললভ্যোঽধ্বা শাস্তে ভক্তিঃ ক চ প্রভৌ।
বিধাতুরপ্যসাধ্যং তদ্ যদ্ গৌড়ৈর্বিহিতং তদা॥"

"গৌড় হইতে কাশ্মীরের দীর্ঘপথ লঙ্ঘন করিয়া নিহত প্রভুর প্রতি ভক্তির আবেগে সে সময়ে গৌড়গণ যাহা সম্পাদন করিয়াছিল, তাহা বিধাতার পক্ষেও অসাধ্য!"

কহ্লন ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, শেষে লিখিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ডং গৌড়বীরাণাং সনাথং যশসা পুনঃ॥"
"গৌড়বীরগণের যশে ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ।"

গৌড়ের ইতিহাসকার লিখিয়াছেন,—"মুসলমান অধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতের পূর্ব্বাংশের সমস্ত বাণিজ্য বাঙ্গালীর হস্তগত ছিল। গ্রীস, আরব, মিসর, পারস্য প্রভৃতির লোক বাণিজ্য-পোতযোগে পশ্চিম-ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিতেন; ঐ সকল বাণিজ্যপোত তাঁহাদের নির্ম্মিত ছিল না, কিন্তু বাঙ্গালীরা আপনাদের নির্ম্মিত বাণিজ্যপোতযোগে মার্ত্তাবান, জাভা, চীন, জাপান প্রভৃতি বহুতর দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। আসিয়ার পূর্ব্ব অঞ্চলে ধর্ম্মমন্দিরের প্রাচীরগাত্রে বাঙ্গালায় লিখিত "ওঁ নমঃ" মন্ত্রটি দেখিলে জানিতে পারা যায়, বাঙ্গালীরা শুধু বাণিজ্যের জন্য নয়—ধর্ম্মপ্রচারার্থ সুদূর প্রাচ্যদেশে গমন করিতেন।"

["গৌড়ের ইতিহাস", ১ম খণ্ড, ২২৬-২৭ পৃঃ]।

কাশী সুপ্রাচীন সমৃদ্ধিশালী মহানগরী। সেই স্মরণাতীত কাল হইতে এই পবিত্র ক্ষেত্রের সহিত সর্ব্বদেশের, সর্ব্বজাতির ও সর্ব্বধর্ম্মের একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধের

---

* প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের নাগপুর অধিবেশনে পঠিত।

(১) "বাঙ্গালার ইতিহাস", ১ম ভাগ, ২৩ পৃঃ।
(২) "মানসী", বৈশাখ, ১৩২১, ৩৫৬ পৃঃ।
(৩) "মানসী", বৈশাখ, ১৩২১। সভাপতির অভিভাষণ। "বাঙ্গালার ইতিহাস" ১ম ভাগ, ২৪ পৃঃ।

পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মশাসন কালে অর্দ্ধ-ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেই শাক্যসিংহ বুদ্ধত্বলাভের অনতিকাল পরেই কাশীর ধর্ম্মকেন্দ্রতা অনুভব করিয়া তাহারই সান্নিধ্যে ই-সি-পতন-মি-গ-দা-য়ে সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন-সূত্র কীর্ত্তন করেন। আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদের বিজয়-দুন্দুভি এই স্থানেই নিনাদিত হইয়াছিল। আবার এক দিন চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তির বংশীধ্বনিও এই কাশীর অদ্বৈতবাদী কঠোর সন্ন্যাসীর (প্রকাশানন্দ সরস্বতীর) কর্ণে নূতন সুরের অনুরণন জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

কাশী বঙ্গের বাহিরে অবস্থিত হইলেও সেই পুরাতন যুগ হইতেই এই পূতভূমি বাঙ্গালীর কীর্ত্তি-গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন সগৌরবে বক্ষে ধারণ করিয়া আছে! কাশীর ইতিহাস হইতে বাঙ্গালীর শৌর্য্য-বীর্য্যের কাহিনী বাদ দেওয়া চলে না। জানি না, কোন্ মাহেন্দ্রক্ষণে কাশীতে বাঙ্গালীর প্রথম শুভ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল! ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে 'শুভদিনের নির্ঘণ্ট' দেখিতে পাই না।

শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত

মহাকবি বাণভট্টের 'হর্ষচরিতের' ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'গৌড়াধিপ' বলিয়া শশাঙ্কের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান্-চোয়াং শশাঙ্ককে কর্ণসুবর্ণের অধিপতি বলিয়াছেন। কর্ণসুবর্ণের স্থান-নির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কাপ্তেন লেয়ার্ড সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন যে, কর্ণসুবর্ণ মুর্শিদাবাদ নগরের ১২ মাইল দক্ষিণে গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল (১)। "গৌড়-রাজমালা" প্রভৃতি গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তই অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু "সাহিত্য" পত্রে প্রকাশিত 'কর্ণসুবর্ণ' নামক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, "হিয়োনসাঙের লিখিত দূরত্ব স্থির রাখিয়া বাঙ্গালার মানচিত্রে দৃষ্টি করিলে নির্ণীত হয় যে, পরিব্রাজক-বর্ণিত কর্ণসুবর্ণ নগরী সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্ত্তী ও আধুনিক সিংভূম জেলার অন্তর্গত (২)। চাঁইবাসার ২০ মাইল উত্তরে 'সঙ্করান' নামে একটি গ্রাম আছে। বেগলার সাহেবের মতে ইহাই

(১) J. A. S. B. Vol xxii, p 281-2.
(২) "সাহিত্য", বৈশাখ, ১৩১৯, ৩৬ পৃঃ।

ইউয়ান্-চোয়াং বর্ণিত শশাঙ্কের রাজধানী 'কিরণসুবর্ণ' (১)। আমাদের মনে হয়, শশাঙ্কের গৌড়রাজ্য দক্ষিণে যেরূপ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, তখন রাঢ় ও উৎকল উভয়ত্রই তাঁহার রাজধানী থাকা অসম্ভব নহে।

দক্ষিণ মগধে সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত রোহিতাশ্ব দুর্গের অভ্যন্তরে পর্ব্বতগাত্রে যে শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা শশাঙ্কের একটি মুদ্রার ছাঁচ। এই মুদ্রার ছাঁচে উপরে উপবিষ্ট বৃষের মূর্ত্তি ও নিম্নে 'শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্কদেবস্য' এই অক্ষরগুলি উৎকীর্ণ আছে (২)। এই শিলালেখ অনুসারে অনেকে অনুমান করেন, শশাঙ্ক প্রথমে কোনও সার্ব্বভৌম নৃপতির সামন্ত ছিলেন, পরে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে "লৌহিত্য-নদের উপকণ্ঠ হইতে গহনতালবনাচ্ছাদিত মহেন্দ্রগিরির উপত্যকা" পর্য্যন্ত ভূভাগ বশীভূত করিয়া তিনি গৌড়রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন (৩)।

"বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস"-লেখক প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, গৌড়াধিপ নরেন্দ্রগুপ্ত ও কর্ণসুবর্ণপতি শশাঙ্ক ভিন্ন ব্যক্তি (৪)। কিন্তু তাঁহার প্রমাণসমূহ বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না।

'হর্ষচরিতে'র লেখা ও ইউয়ান্-চোয়াংএর বর্ণনায় একবাক্যতা করিলে অনুভব হয় যে, শশাঙ্ক সমগ্র উত্তরবঙ্গ (গৌড়) ও রাঢ়দেশের অধিনায়ক ছিলেন। পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন যে, মগধ ও মিথিলাও শশাঙ্কের অধিকারভুক্ত ছিল (৫)।

প্রথম জীবিতগুপ্তের বংশোদ্ভব মহাসেনগুপ্ত, শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের পিতা। মহাসেন, দামোদরগুপ্তের পুত্র। দামোদরের কন্যা মহাসেনগুপ্তার সহিত স্থাণ্বীশ্বর আদিত্য বর্দ্ধার বিবাহ হইয়াছিল। ইঁহারই পুত্র প্রভাকরবর্দ্ধন 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। মহাসেনগুপ্ত ব্রহ্মপুত্র

(১) Archæological Survey Report, Vol-VIII, p. 191.
(২) বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১০০ পৃঃ।
(৩) গৌড়রাজমালা, ৭-৮ পৃঃ।
(৪) রাজন্যকাণ্ড, ৬৩ পৃঃ।
(৫) গৌড় রাজমালা, ৭ পৃঃ; বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১০৪ পৃঃ।

নদের তীরে কামরূপরাজ সুস্থিত বর্ম্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

গুপ্তবংশীয় গৌড়পতি শশাঙ্কের চিত্তে হৃত ঐশ্বর্য্য পুনরুদ্ধারপূর্ব্বক সমগ্র উত্তরাপথে ঐকাধিপত্য করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগরূক হইয়াছিল। "বাঙ্গালার ইতিহাসে" লিখিত হইয়াছে, "গুপ্ত-সাম্রাজ্যের শেষ দশায় গুপ্তবংশের কোনও ব্যক্তি মালব অধিকার করিয়া একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। মালবের গুপ্তরাজগণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত মালবে স্বীয় অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তবে তাঁহারা যশোধর্ম্মদেব অথবা প্রভাকরবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতি প্রবল রাজগণের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রভাকরবর্দ্ধন মালবরাজের কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত নামক পুত্রদ্বয়কে মালব হইতে স্থাণ্বীশ্বরে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গ্রহবর্ম্মানিহন্তা মালবরাজ দেবগুপ্তের নাম ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। একবংশসম্ভূত বলিয়াই বোধ হয়, শশাঙ্ক দেবগুপ্তের সাহায্যার্থ বঙ্গ হইতে সুদূর কান্যকুব্জে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন।......তাঁহার (প্রভাকরবর্দ্ধনের) মৃত্যুর পরে উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া দক্ষিণে দেবগুপ্ত ও পূর্ব্বে শশাঙ্ক প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের অতীত গৌরব উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের স্থাণ্বীশ্বররাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার অপর কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। শশাঙ্ক সসৈন্যে দেবগুপ্তের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বেই মালবরাজ বোধ হয়, রাজ্যবর্দ্ধনের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, অথবা নিহত হইয়াছিলেন।"—(১ম ভাগ, ১০৫-৬ পৃঃ)।

মালবপতি দেবগুপ্তের পরাজয় বা নিধনের পর রাজ্যবর্দ্ধন যখন নিশ্চিন্তপ্রায় চিত্তে দেবগুপ্তের দ্বারা কারারুদ্ধ ভগিনী রাজ্যশ্রীর উদ্ধারার্থ কান্যকুব্জে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময়ে সহসা তাঁহাকে শশাঙ্ক সসৈন্যে আক্রমণ করেন। গৌড়াধিপের সহিত এই যুদ্ধে রাজ্যবর্দ্ধন নিহত হন। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর কান্যকুব্জ অনায়াসেই গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের অধিকৃত হইয়াছিল। "৬০৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যু হইয়াছিল। এই সময়ে শশাঙ্ক কামরূপ ব্যতীত সমগ্র উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের অধীশ্বর ছিলেন।" (১) ৩০০ গৌপ্তাব্দে (৬১৯ খৃঃ) মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক, "চতুরুদধি-সলিলবীচিমেখলানিলীন সদ্বীপ-গিরিপত্তনবতী বসুন্ধরা"র অধীশ্বর বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। (২) কাযেই অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও যে বারাণসী শশাঙ্কের অধীন ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হর্ষবর্দ্ধন ৬ বৎসর পর্য্যন্ত অবিরত মহাযুদ্ধ করিয়াও গৌড়াধিপের বিশেষ কোনও হানি করিতে পারেন নাই।

গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের পরে গৌড়মণ্ডলের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মা, কামরূপপতি হর্ষদেব, গুর্জ্জরাধিপতি বৎসরাজ প্রভৃতি বহিঃশত্রুর আক্রমণে এবং আভ্যন্তরিক রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়-মগধ-বঙ্গে অরাজকতা প্রাবল্য লাভ করে। কৌটিল্যপ্রমুখ ভারতীয় রাজনীতিবিশারদগণ এই অরাজক অবস্থাকে 'মাৎস্যন্যায়' বলিয়াছেন। গৌড়ের প্রকৃতিপুঞ্জ এই 'মাৎস্যন্যায়' অপোহিত করিবার জন্য দয়িত-বিষ্ণুর পৌত্র, বপ্যট-তনয় গোপালদেবকে বঙ্গের রাজলক্ষ্মীর করগ্রহণ করাইয়াছিলেন। এই গোপালদেব হইতেই বঙ্গে পাল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। ইঁহারা ভিন্নদেশীয় নহেন,—বঙ্গদেশই ইঁহাদের আদি বাসভূমি। (৩) এই পালবংশের সহিত বহুকাল পর্য্যন্ত কাশীর বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। এই বংশের একাধিক নরপতি কাশীতে হিন্দু ও বৌদ্ধ মঠ-চৈত্যাদির নির্ম্মাণ ও সংস্কারকার্য্য করিয়া কীর্ত্তিভাজন হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মপাল

গোপালদেব স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল ৭৯০—৭৯৫ খৃষ্টাব্দমধ্যে রাজসিংহাসন লাভ করেন। (৪) কাহারও মতে ৮১৫ খৃষ্টাব্দ, ধর্ম্মপালের রাজ্যাভিষেকের কাল। (৫) ধর্ম্মপাল সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াই সর্ব্বপ্রথমে

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১০৮ পৃঃ।

(২) Epigraphia Indica, Vol, VI. p. 143.

(৩) গৌড়রাজমালা, ২১ পৃষ্ঠা। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা।

(৪) বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১৬৫ পৃষ্ঠা।

(৫) গৌড়রাজমালা, ২৪ পৃষ্ঠা।

ইন্দ্রায়ুধ বা ইন্দ্ররাজকে পরাজিত করিয়া কান্যকুব্জ-রাজ্য অধিকার করেন ও চক্রায়ুধের প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে উক্ত রাজ্যের সামন্ত-রাজারূপে প্রতিষ্ঠা করেন। (১) কেবল কান্যকুব্জেই গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের প্রভাব বিশ্রাম লাভ করে নাই; খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্ম্মপালের তাম্র-শাসনে কীর্ত্তিত হইয়াছে যে, ধর্ম্মপাল ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গন্ধার, কীর প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের অধিপতি-গণকে প্রণতিপরায়ণ করিয়াছিলেন। (২) তিব্বতদেশীয় ইতিহাস-লেখক লামা তারানাথও লিখিয়াছেন, ধর্ম্মপাল, কামরূপ, তীরভুক্তি, গৌড় প্রভৃতি দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব পূর্ব্বদিকে সমুদ্র হইতে পশ্চিমে তিলি (দিল্লী?) পর্য্যন্ত এবং উত্তরে জলন্ধর হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার সময়ে চক্রায়ুধ পশ্চিম দিকে রাজ্য করিতেন। (৩) কাযেই ধর্ম্মপালের সময়ে বারাণসী যে গৌড়রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই ধর্ম্মপালই বিখ্যাত বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাপয়িতা। গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের হৃদয়ে যে মনোরথ উত্থিত হইয়াছিল, ধর্ম্মপাল সমগ্র উত্তরাপথের সার্ব্বভৌমত্ব অর্জ্জন করিয়া সেই মনোরথ চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। "বাঙ্গালার ইতিহাস"-লেখক স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—"ধর্ম্মপাল আজীবন সমগ্র উত্তরাপথের মণ্ডলেশ্বরপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।" (৪) "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে"ও কথিত হইয়াছে,—"এ সময় কিছুদিনের জন্যও হয় ত গৌড়পতি ভারত-সম্রাট্ বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন।" (৫)

দেবপাল

ধর্ম্মপালের পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র দেবপাল পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত দেবপালের তাম্রশাসনে ও দিনাজপুরের মঙ্গলবাড়ী হাটের সন্নিহিত [দেবপালের মন্ত্রিকুল-পরিচায়ক] ভট্টগুরব মিশ্রের স্তম্ভলিপিতে দেবপালের বীরত্ব ও ঐশ্বর্য্যাদির যে কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, দেবপাল ধর্ম্মপালের অনুরূপ পুত্রই ছিলেন। মুঙ্গেরের তাম্রশাসনে প্রশস্তিকার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, দেবপাল—হিমালয় হইতে সেতু-বন্ধ পর্য্যন্ত ও পশ্চিম-সমুদ্র হইতে পূর্ব্ব-সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূভাগ নিঃসপত্নভাবে উপভোগ করিয়াছিলেন (১)। গুরবমিশ্রের লিপিতেও কথিত হইয়াছে, (২)—মন্ত্রী দর্ভপাণির নীতি-কৌশলে শ্রীদেবপালনৃপতি মতঙ্গজ-মদজলসিক্তশিলাসংহতি-বহুল রেবা-জনক বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে মহেশ্বরের ললাটস্থ ইন্দুকিরণে প্রবর্দ্ধমান-শ্বেতিমা হিমাচল পর্য্যন্ত মার্ত্তণ্ডের উদয়াস্তকালে অরুণবর্ণ জলের আধার পূর্ব্ব এবং পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূখণ্ড করপ্রদ করিয়াছিলেন। দর্ভপাণির পর তাঁহার উপযুক্ত পৌত্র কেদারমিশ্র দেবপালের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন। দিনাজপুরের স্তম্ভলিপিতে উদ্ঘোষিত হইয়াছে, এই কেদারমিশ্রের বুদ্ধির প্রসাদে গৌড়েশ্বর দেব-পাল উৎকলকুল উৎকীলিত করিয়া, হূণগর্ব্ব হরণ করিয়া, দ্রবিড় ও গুর্জ্জরের অধিপতির দর্প খর্ব্ব করিয়া সাগর-মেখলাভরণা বসুন্ধরা দীর্ঘকাল ভোগ করিয়াছিলেন (৩)। সুতরাং বারাণসীও যে এ সময়ে গৌড়েশ্বরের শাসনাধীন ছিল, ইহা বলাই বাহুল্য।

জয়পাল

দেবপালদেবের দেহাবসানে তাঁহার নিজ বংশধারা না থাকায় বিগ্রহপালদেব গৌড়ের সিংহাসন উত্তরাধিকারসূত্রে

(১) জিত্বেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনরাতী-
নুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।
দত্তা পুনঃ সা বলিনার্থয়িত্রে
চক্রায়ুধায়ানতিবামনায় ।—গৌড়লেখমালা, ৫৭ পৃঃ।

(২) গৌড়লেখমালা, ১৪ পৃষ্ঠা।

(৩) Indian Antiquary, Vol. iv, pp. 366.

(৪) প্রথম ভাগ, ১৭০ পৃষ্ঠা।

(৫) রাজন্যকাণ্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা।

(১) গৌড়রাজমালা, ৩২ পৃষ্ঠা ও বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্য-কাণ্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা।

(২) আরেবাজনকান্মত্তমতঙ্গজমদস্তিম্যচ্ছিলাসংহতে-
রাগৌরীপিতুরীশ্বরেন্দুকিরণৈঃ পুষ্যৎসিতিম্নো গিরেঃ।
মার্ত্তণ্ডাস্তময়োদয়ারুণ-জলাদ বারিরাশিদ্বয়াৎ
নীত্যা যস্য ভুবং চকার করদাং শ্রীদেবপালো নৃপঃ ॥
গৌড়লেখমালা, ৭২ পৃঃ।

(৩) উৎকীলিতোৎকলকুলং হৃতহূণগর্ব্বং
খর্ব্বীকৃতদ্রবিড়গুর্জ্জরনাথদর্পম্।
ভূপীঠমব্ধিরশনাভরণং বুভোজ
গৌড়েশ্বরশ্চিরমুপাস্য ধিয়ং যদীয়াম্ ।
গৌড়লেখমালা, ৭৪ পৃষ্ঠা।

লাভ করেন। ইঁহার পিতার নাম জয়পাল। জয়পাল ধর্ম্মপালের কনিষ্ঠ সহোদর বাক্‌পালের পুত্র (১)। জয়পালও পিতৃপুরুষাগত বীরত্বাদিগুণে বঞ্চিত ছিলেন না। উপেন্দ্রের ন্যায় চরিত্র-গৌরবে জগৎ-পাবন, বিজয়ী ধর্ম্মদ্বেষিগণের শাসক জয়পাল, যুদ্ধাবসরে অগ্রজ দেবপালকে,

(১) অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় "গৌড়লেখমালা"র নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসনের অনুবাদপ্রসঙ্গে জয়পালকে ধর্ম্মপালের পুত্র এবং বিগ্রহপালকে দেবপালের পুত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন [—লেখমালা, ৬৫ পৃঃ ও ৬৭ পৃঃ]। আমরা কিন্তু প্রবীণ ঐতিহাসিক মৈত্রেয় মহাশয়ের সিদ্ধান্ত অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমরা পাঠকবর্গের বুঝিবার সুবিধার জন্য তাম্রশাসনের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিলাম—

"………স শ্রীমান্………হশ্চ গোপালদেবঃ ॥ ১ ॥
………স্মাদভূদ্
দুগ্ধাম্ভোধিবিলাসহাসিমহিমা শ্রীধর্ম্মপালো নৃপঃ ॥ ২ ॥
জিত্বেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনরাতী-
নুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।
দত্তা পুনঃ সা বলিনার্থয়িত্রে
চক্রায়ুধায়ানতিবামনায় ॥ ৩ ॥
রামস্যেব গৃহীতসত্যতপসস্তস্যানুরূপো গুণৈঃ
সৌমিত্রেরুদপাদি তুল্যমহিমা বাক্‌পালনামানুজঃ।
যঃ শ্রীমান্ নয়বিক্রমৈকবসতির্ভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাসনে
শূন্যাঃ শত্রুপতাকিনীভিরকরোদেকাতপত্রা দিশঃ ॥ ৪ ॥
তস্মাদুপেন্দ্রচরিতৈর্জ্জগতীং পুনানঃ
পুত্রো বভূব বিজয়ী জয়পালনামা।
ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা যুধি দেবপালে
যঃ পূর্ব্বজে ভুবনরাজ্যসুখান্যনৈষীৎ ॥ ৫ ॥
যস্মিন্ ভ্রাতুর্নিদেশাদ্ বলবতি পরিতঃ প্রস্থিতে জেতুমাশাঃ
সীদন্নাম্নৈব দূরান্নিজপুরমজহাদুৎকলানামধীশঃ।
আসাঞ্চক্রে চিরায় প্রণয়িপরিবৃতো বিভ্রদুচ্চেন মূর্দ্ধ্না
রাজা প্রাগ্‌জ্যোতিষাণামুপশমিতসমিৎসংকথাং
যস্য চাজ্ঞাম্ ॥ ৬ ॥
শ্রীমান্ বিগ্রহপালস্তৎসূনুরজাতশত্রুরিব জাতঃ।
শত্রুবনিতাপ্রসাধনবিলোপিবিমলাসিজলধারঃ ॥ ৭ ॥

এখন পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন, পঞ্চম শ্লোকের—"সেই [ধর্ম্মপাল] হইতে বিজয়ী জয়পাল নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"—এই অনুবাদ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? 'যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধঃ' এই নিয়মানুসারে চতুর্থ শ্লোকে 'যঃ শ্রীমান্' বলিয়া যখন বাক্‌পালকেই উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন পঞ্চম শ্লোকস্থ 'তস্মাৎ' এই পদে বাক্‌পালেরই পরামর্শ হইবে—ব্যবহিত ধর্ম্মপালের পরামর্শ হইবে না। 'তৎ' শব্দে ব্যবহিত পদার্থের পরামর্শ স্বীকার করিলে 'তস্যানুরূপো গুণৈঃ'—এই 'তৎ' শব্দে গোপালদেবকে ধরিয়া বাক্‌পালকে ধর্ম্মপালের অনুজ না বলিয়া গোপালদেবেরই অনুজ বলিতে হয়। সুতরাং পঞ্চম শ্লোকে "দেবপাল জয়পালের "পূর্ব্বজ" বলিয়া উল্লিখিত থাকায় জয়পালকেও ধর্ম্মপালের পুত্র বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে"—মৈত্রেয় মহাশয়ের এই উক্তির সমর্থন করা চলে না।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতেই বিগ্রহপালকেও জয়পালের পুত্রই বলিতে হইবে—দেবপালের পুত্র বলা যায় না। কাযেই মৈত্রেয় মহাশয়ের নির্দ্দেশানুসারে "পালবংশীয় নরপালগণের প্রচলিত বংশাবলীর ভ্রম সংশোধন" (?) করার আবশ্যক হইবে না।

ঐতিহাসিক সংস্কৃত শ্লোকগুলির অনুবাদে মৈত্রেয় মহাশয় নিজেই এইরূপ আরও অনেক ভ্রম করিয়া ফেলিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা গরুড়স্তম্ভলিপির দ্বাদশ শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

"সকৃদ্দর্শনসম্পীতান্ চতুর্ব্বিদ্যাপয়োনিধীন্।
জহাসাগস্ত্যসম্পত্তিমুদ্গিরন্ বাল এব যঃ।"

"তিনি বাল্যকালে একবারমাত্র দর্শন করিয়াই চতুর্ব্বিদ্যা-পয়োনিধি পান করিয়া তাহা আবার উদ্গীর্ণ করিতে পারিতেন বলিয়া অগস্ত্য-প্রভাবকে উপহাস করিতে পারিয়াছিলেন।"

পাদটীকা।—"চতুর্থ শ্লোকের ন্যায় এই শ্লোকেও "বেদ"—অর্থে "বিদ্যা"—শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বিদ্যার সংখ্যা চতুর্দ্দশ, মতান্তরে অষ্টাদশ। এখানে সে অর্থ সূচিত হয় নাই। সুতরাং কেদারমিশ্র বেদজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই বুঝিতে হইবে।"

[গৌড়লেখমালা, ৮১ পৃষ্ঠা।]

মৈত্রেয় মহাশয় এ স্থলে বিষম ভ্রম করিয়াছেন। লোকযাত্রা-নির্ব্বাহের হেতুরূপে শাস্ত্রে চতুর্ব্বিধ বিদ্যারও উল্লেখ আছে। "কামন্দকীয় নীতিসারে" কথিত হইয়াছে,—

"আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চ শাশ্বতী।
বিদ্যাশ্চতস্র এবৈতা লোকসংস্থিতিহেতবঃ।"—

[২য় সর্গ, ২য় শ্লোক।]

চাণক্যও স্বরচিত "অর্থশাস্ত্রে"র দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে—"আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বিদ্যাঃ।"—এইভাবে চারি প্রকারের বিদ্যার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাযেই বিদ্যা চারি প্রকার হয় না, অতএব 'বিদ্যা' শব্দ 'বেদ' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত মৈত্রেয় মহাশয়ের অভিজ্ঞতাসূচক নহে। রাজা বা রাজমন্ত্রীর পক্ষে কেবল বেদশাস্ত্রজ্ঞতাই পর্য্যাপ্ত নহে। এই জন্যই মহাকবি ভারবি বৃকোদরের মুখ দিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলাইয়াছেন,—

"চতসৃষ্বপি তে বিবেকিনী
নৃপ বিদ্যাসু নিরূঢ়িমাগতা।"

[কিরাতার্জ্জুনীয়, ২।৬]

মন্ত্রীরও যে আন্বীক্ষিকী প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ বিদ্যায় অভিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন, তাহা "অলঙ্কার-চিন্তামণি"র—

"মন্ত্রী শুচিঃ ক্ষমী শূরোঽনুরক্তো বুদ্ধিভক্তিমান্।
আন্বীক্ষিক্যাদিবিদ্ দক্ষঃ স্বদেশজহিতোত্তমী।"

[১ম পরিচ্ছেদ, ৩৪ শ্লোক]

এই শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে।

ভুবনরাজ্য-সুখের অধিকারী করিয়াছিলেন (১)। ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রলেখে লিখিত হইয়াছে যে, পরাক্রমশালী জয়পাল দিগ্‌বিজয়ার্থ প্রস্থান করিলে উৎকলাধীশ্বর দূর হইতে নাম শুনিয়াই অবসন্নভাবে নিজ নগর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার যুদ্ধোত্তম-নিবৃত্তির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বন্ধুপরিবৃত প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা দীর্ঘকাল নিরুদ্বেগে অবস্থান করিয়াছিলেন (২)। এই বীরশ্রেষ্ঠ গৌড়ের গৌরব জয়পাল কাশীর সারনাথ-বিহারে দশটি চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন (১)। সারনাথে এ সম্বন্ধে যে লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"বিশ্বপালঃ। দশ চৈত্যাংস্তু যৎ পুণ্যং
কারয়িত্বার্জ্জিতং ময়া [।] সর্ব্বলোকে ভবে
[স্তেন] সর্ব্বজ্ঞঃ কারুণ্য [করুণা ?] ময়ং ॥
শ্রীজয়পাল
......এতামুদ্দিশ্য কারিতমমৃতপালে [ন]।"

অনুবাদ। বিশ্বপাল ॥ দশটি চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়া আমার যে পুণ্য অর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা সর্ব্বলোক সর্ব্বজ্ঞ ও কারুণ্যপূর্ণ হইবে। শ্রীজয়পাল.........অমৃতপাল দ্বারা এই উদ্দেশ্যে (এই চৈত্যসমূহ) করাইয়াছেন। "সারনাথের ইতিহাসে" এই লিপি বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে (২)। [ক্রমশঃ।

শ্রীহরিহর শাস্ত্রী (অধ্যাপক)।

(১) তস্মাদুপেন্দ্রচরিতৈর্জ্জগতীং পুনানঃ
পুত্রো বভূব বিজয়ী জয়পালনামা।
ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা যুধি দেবপালে
যঃ পূর্ব্বজে ভুবনরাজ্যসুখান্যনৈষীৎ।
গৌড়লেখমালা, ৫৭ পৃষ্ঠা।

(২) যস্মিন্ ভ্রাতুর্নিদেশাদ্ বলবতি পরিতঃ প্রস্থিতে জেতুমাশাঃ
সীদন্নাম্নৈব দূরান্নিজপুরমজহাদুৎকলানামধীশঃ।
আসাঞ্চক্রে চিরায় প্রণয়িপরিবৃতো বিভ্রদুচ্চেন মূর্দ্ধা
রাজা প্রাগ্‌জ্যোতিষাণামুপশমিত সমিৎ সংকথাং যস্য চাজ্ঞাম্।
গৌড়লেখমালা, ৫৮ পৃঃ।

(১) সারনাথের ইতিহাস, ৩৬ পৃঃ।
(২) সারনাথের ইতিহাস, ১-৯ পৃঃ।

মাটীর মায়া

শ্রান্ত ব্যাধিশয্যাশায়ীর
মন হ'ল উদাসী,—
এম্‌নি কবে হঠাৎ যাব
মরণ-স্রোতে ভাসি'!
মাটীর মা, তোর সকল বাঁধন,
সব মমতা, মায়ার কাঁদন,
পারবে না ত এ দেহ মোর
রাখ্‌তে অবিনাশী।

জননি, তাই জানিয়ে রাখি—
তোমায় ভালোবাসি;
আবার যেন আসি, মা গো,
আবার যেন আসি।
মা গো, তোমার মাটীর গৃহ
স্বর্গ হ'তে আমায় প্রিয়,
স্বর্গ কোথায় পাবে এমন
মর্ত্ত্য-স্নেহের রাশি ?

আবার যেন আসি, মা গো,
আবার যেন আসি,—
যাওয়া-আসার পথে বসে'
আবার কাঁদি, হাসি।
তোমার আঁধার তোমার আলোয়,
তোমার মন্দ তোমার ভালোয়
আবার আমি সাধিব মা
আমার জীবন-বাঁশী!

আসি,—আসি,—আসি,—মা গো,
আবার যেন আসি;
তোমায় ছেড়ে' চিত্ত আমার
রবেই যে পিপাসী।
সেই পিপাসা আবার মোরে
ফিরায় যেন তোমার দোরে,—
আমায় যেন ফিরিয়ে আনে
আমার অভিলাষই।

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

অপহৃতা

১

বেলা বারোটা। প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ বিজয়কুমার বোস তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ীর নীচের তলায় বসবার ঘরে তাঁর আরাম-কেদারায় ব'সে একখানা মোটা বই 'The part which Cigarette Ashes play in the detection of Crimes' পড়ছিলেন। এক ধারে টেবলে তাঁর সহকারী সুধীর কতকগুলো কাগজপত্র গোছাচ্ছিল।

এই তীক্ষ্ণধী গোয়েন্দাটি মোটে আজ ৬ বৎসর কাজ সুরু করেছেন, কিন্তু তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, বিশ্লেষণ-ক্ষমতা, ধীরতা, সময়োপযোগী জ্ঞান এবং কর্ম্মকুশলতা তাঁকে এরি মধ্যে যে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি দিয়েছে, তা অসাধারণ। যেখানে ২৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা নিয়েও সরকারী গোয়েন্দারা হাবুডুবু খাচ্ছেন, সেখানে বিজয়কুমার তাঁর আশ্চর্য্য কার্য্যপদ্ধতিতে অবিলম্বেই কিনারা ক'রে দিয়েছেন। এই জন্যে তাঁর সম্মান দেশের লোকের কাছে যেমন, সরকারী মহলেও তার চেয়ে কম নয়।

তাঁর কাজের সুবিধা হয়েছিল সুধীরকে পেয়ে। এর যেমনি সাহস, তেমনি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। মেডিকাল কলেজ থেকে সে ডাক্তারী পাশ ক'রে বিজয়কুমারের সহকারী হ'ল। কারণ, বিজয়কুমারের কার্য্যপ্রণালী, পরোপকার-প্রবৃত্তি এবং উদ্ভাবনী শক্তি তাকে মুগ্ধ করেছিল। সে ডাক্তারীও করত বটে, কিন্তু তার সব চেয়ে আনন্দ হ'ত বিজয়কুমারকে সাহায্য করবার সুযোগ পেলে।

বিজয়কুমার বইখানা বন্ধ ক'রে বল্লেন, এর প্রয়োজন এখনও আমাদের দেশে বড় কম। আমাদের চোর ডাকাত খুনেদের ভেতর সিগারেটের প্রচলন এখনও তেমন হয়নি। তারা বাড়ী থেকে তামাক খেয়েই আসে, না হয় ত বড় জোর বিড়ি খায়। বিড়িতে তামাকের অংশ থাকে কমই। তাতে যে ছাই পাওয়া যায়, তা অধিকাংশ ওপরের পাতাটারই, সুতরাং ও-দিক্‌ দিয়ে বিশেষ সুবিধা কিছু হয় না। তবে দোকান হিসাবে বিড়ি তৈরীর বিভিন্নতা আছে, সেটা কখনও কখনও সামান্য সাহায্য করে;—ছাইএ বিশেষ সাহায্য পাওয়া কঠিন।

সুধীর বল্লে, বইখানা কবার পড়া হ'ল আপনার?

বিজয় হাসলেন, বল্লেন, বার চারেক।

সুধীর প্রত্যুত্তরে হেসে বল্লে, তবে এ ব্যর্থ পরিশ্রম কেন?

বিজয় বল্লেন, না, ব্যর্থ নয় সুধীর। আমাদের এই সব কাজে সব চেয়ে দামী জিনিষ হচ্ছে মন। তাকে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে তৈরী ক'রে নিতে হবে। একটা জায়গায় কোনও অনুসন্ধানে গিয়ে পড়লে, সেখানে হয় ত একশোটা বস্তু তোমার চোখে পড়বে, অথচ তার মধ্যে তোমার উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে হয় ত নিরানব্বইটা জিনিষ অকেজো, মোটে একটি জিনিষ কাজের। সেই অকেজো নিরানব্বইটা পদার্থের মধ্যে যদি তোমার মন হারিয়ে গেল, তা হ'লে বেকার হয়ে গেলে। মনের এমনি একটা সহজ ক্ষমতা থাকা চাই, যাতে সে চটপট বুঝে নিতে পারে, কোন্ কোন্ বস্তু কোন্ কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রে তার কাজে লাগতে পারে। এই ক্ষমতাটাই এই সব কাজে হচ্ছে আসল জিনিষ। এ সকল বইএর উপকারিতা এই যে, এরা মনকে ঠিক সেই ভাবে তৈরী করতে ভারী সাহায্য করে। সেই জন্যেই সুধীর, আমার পরিশ্রম এতটুকুও ব্যর্থ হয়নি।

এমন সময় বেয়ারা এসে খবর দিলে যে, এক জন ভদ্রলোক দেখা করতে চান।

বিজয় বল্লেন, ডাকো।

যে লোকটি ঘরে ঢুকল, সে দেখতে সুশ্রী, বয়স বোধ করি ত্রিশ, বত্রিশ, কিন্তু তার মুখের চেহারা দেখলে বোঝা যায় যে, তার ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে।

আগন্তুককে একটা চেয়ার দেখিয়ে বিজয় বসতে বল্লেন।

তার পর বল্লেন, এত বেলা অবধি আপনার স্নান আহার হয়নি দেখছি।

লোকটি বল্লে, না, হয়নি।

কা'ল সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আপনার একটা বিপদ হয়েছে দেখছি, এবং সেই নিয়ে সমস্ত সন্ধ্যাটা আপনাকে দৌড়া-দৌড়ি করতে হয়েছে,—বোধ করি আজ সকালেও।

আজ্ঞে হাঁ, ঠিক কথা।

আপনার স্ত্রী বুঝি বাড়ীতে নেই?

লোকটি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বল্লে, ঠিক কথা—ঠিক কথা। স্ত্রী নেই—বড় বিপদ যাচ্ছে আমার। কিন্তু কি ক'রে আপনি মাত্র আমাকে দেখেই এ সব কথা বলছেন?

সুধীর হাঁ ক'রে তাকিয়ে ছিল। বিজয় বল্লেন, শক্ত কিছুই নয় সুধীর! ওঁর চুল আর মুখের ভাব দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, নাওয়া খাওয়া হয়নি। কা'ল সন্ধ্যার আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল মনে আছে বোধ হয়। এঁর জুতো দেখে বুঝবে যে, তার পরই এঁকে রাস্তায় বেরোতে হয়েছিল, এবং যে রকম ভাবে আগাগোড়া কাদা লেগেছে, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, উনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটেছিলেন, মানুষের মনের সহজ অবস্থায় কাদা বাঁচিয়ে চলবার যে একটা চেষ্টা থাকে, সে চেষ্টা করবার মত ওঁর মনের গতি এবং অবসর ছিল না। লক্ষ্য ক'রে দেখো, ওঁর কাপড়-চোপড়ে, এমন কি, গায়ের কাপড়েও কাদার দাগ। এ থেকে বোঝা যায়, বিপদ গুরুতর এবং ঠিক তার আগেই সেটা ঘটায় সে সময় ওঁকে সম্পূর্ণ উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল। আপনাকে বোধ হয় থানায় দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছিল—না?

আজ্ঞে হাঁ।

সুধীর বল্লে, তা যেন হ'ল, কিন্তু স্ত্রী না থাকা?

বিজয় বল্লেন, এও সহজ। এঁর ব্যবহারের জিনিষ-গুলো মূল্যবান্, অথচ এদের কাদায় এমন অবস্থা হয়েছে—এ হয় ত এঁর চোখে না পড়তে পারত, কিন্তু এঁর স্ত্রী বাড়ীতে থাকলে কিছুতেই তাঁর চোখ এড়াত না। তিনি নিশ্চয়ই স্বামীর পায়ে এ রকম কাদা-মাখা' জুতো বরদাস্ত করতেন না, অথবা এই রকম কাদা মাখা ধুতি আর গায়ের কাপড় নিয়ে এঁকে বেরোতে দিতেন না। যাক্, আপনার সময় আর নষ্ট করব না, আপনার বক্তব্য বলুন।

আগন্তুক বল্লে, আমি হাওড়ায় রয়ডন ষ্ট্রীটে থাকি ১১৫ নম্বর। কলকাতায় মার্চ্চেণ্ট আপিসে কাজ করি। কা'ল সন্ধ্যার আগে আপিস থেকে বাড়ী ফিরে গিয়ে দেখলাম, বাড়ীতে স্ত্রী নেই।

বিজয় বল্লেন, আপনার বাড়ীতে আর কেউ থাকে না বুঝি?

আগন্তুক বল্লে, না, ঠিকে ঝি এসে দুবেলা কাষ ক'রে দিয়ে যায়। ছেলে-পুলেও নেই। তার পর থানায় খবর দি। সেই থেকে থানায় ছুটোছুটি সুরু। তারা এখন পর্য্যন্ত কোনও সন্ধানই দিতে পারেনি। সমস্ত রাত্রি ঘুমোতে পারিনি, আজ সকালেও থানায় ব্যর্থ ছুটোছুটি করেছি।

আপনার শ্বশুরবাড়ী কোথায়?

কলকাতায়।

কোন্ জায়গায়?

একটু ইতস্ততঃ ক'রে আগন্তুক বল্লে, সোনাগাছি।

সেখানে খবর নিয়েছিলেন নিশ্চয়ই।

প্রথমেই সেখানে যাই—তাঁরা কিছুই জানেন না।

বিজয় তার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, শ্বশুরবাড়ীতে আছে কে?

এক মাস-খাশুড়ী।

শ্বশুর-খাশুড়ী?

খাশুড়ীর সম্প্রতি মৃত্যু হয়েছে, শ্বশুরও নেই।

আপনার আর কেউ আত্মীয় আছেন?

কেউ না। তবে এক শালী থাকেন বিডন রো-এ।

সেখানেও খবর নিয়ে থাকবেন নিশ্চয়ই।

আজ্ঞে হাঁ, তিনিও কিছু জানেন না।

একবার তীক্ষ্নদৃষ্টিতে আগন্তুকের মুখ ও আপাদ-মস্তক দেখে নিয়ে বিজয় বল্লেন, আরও কিছু বলবার থাকে ত বলুন।

আগন্তুক বল্লে, আজ্ঞে, আরও আছে বৈ কি। আজ সকালে খাবার কিছুই ছিল না, কিছু তৈরী করবার প্রবৃত্তিও ছিল না। গয়লা ভোরে যথারীতি দুধ দিয়ে যায়, ভেবেছিলাম, মাত্র ঐ দুধটুকুই খাব। কিন্তু বোধ করি, কা'ল সমস্ত রাত ঘুম হয় নি ব'লে আর এই ভীষণ চিন্তাতেও সকালে পেট খারাপ হ'ল। ভাবলাম, তা হ'লে

খাব না। কিছুই খাওয়া হয়নি এ পর্য্যন্ত। ঝি দুধ চড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল। ওটা নষ্ট না ক'রে আমার কুকুরকে খেতে দিই। তার পর—ব'লে আগন্তুক যেন একটা অবরুদ্ধ কান্নাকে দমন করতে চেষ্টা করতে লাগল।

বিজয় বল্লেন, হাঁ, বলুন, তার পর কি হ'ল?

তার খানিক পরেই কুকুরটা মাটীতে প'ড়ে লুটোপুটি খেতে লাগল, আর যেন অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করতে লাগল। ডাক্তার ডাকতে যাবো—কিন্তু তার আগেই সেটা ম'রে গেল।

ব'লে লোকটি দুই হাতের ওপর মুখ রেখে চুপ ক'রে ব'সে রইল। তার চোখ দিয়ে টপ টপ ক'রে জল পড়তে লাগল।

তার পর হঠাৎ বিজয়ের দিকে চোখ তুলে দুই হাত যোড় ক'রে বল্লে, বাঁচান ডিটেক্‌টিভ বাবু! আপনার বহু খ্যাতি, বহু ক্ষমতা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কি যে কাণ্ড হয়ে গেল আমার। স্ত্রী নিরুদ্দেশ এবং আজকে সকালের এই ব্যাপার, এ যেন একটা ভীষণতর বিপদের সূচনা করছে। রক্ষা করুন আমাকে, দোহাই আপনার, যা চান আপনি—

বিজয় স্থিরদৃষ্টিতে দেখছিলেন তাঁর ঘড়ির দিকে, চোখ ছিল ঘড়িতে, কিন্তু-মন যে কোথায়, তার ঠিকানা নেই। যারা তাঁকে জানে, তারা বুঝতে পারবে, এর অর্থ কি।

আগন্তুকের দিকে চেয়ে বল্লেন, আমার যা সাধ্য, তা হবে, কি নাম আপনার?

হরেন্দ্রনাথ দাস।

হ্যাঁ, আমার যেটুকু ক্ষমতা, তা সমস্তই আপনার কাজে লাগাতে হবে এবং অবিলম্বেই হরেন বাবু! খুব ক্ষিপ্রকারিতার দরকার। আমার ফি-এর কথা সুধীর বলবে। কুকুরটা আছে কি?

আছে, সেইখানেই প'ড়ে আছে।

সুধীরের দিকে চেয়ে বিজয় বল্লেন, কুকুরটার পাকস্থলীর দরকার। তোমার যন্ত্রপাতি নাও। আমাদের এখনই বেরোতে হবে সুধীর! বিপক্ষ-পক্ষ নিষ্ঠুর এবং ক্ষিপ্র, বিষপ্রয়োগেও পশ্চাৎপদ নয়। চলুন আমাদের সঙ্গে হরেন বাবু।

তার পর বাঙ্গালা দৈনিকের ফাইল খুলে ৭।৮ দিন আগেকার একখানা কাগজ পকেটে নিয়ে বল্লেন, আর দেরী নয়।

২

মোটরে উঠে বিজয় হরেনকে বল্লেন, আপনার বাড়ীর সামনে আমার গাড়ী নিয়ে যেতে চাইনে। দশটা বারোটা বাড়ীর আগেই বলবেন। সেইখানেই গাড়ী রেখে যেতে চাই।

রয়ডন ষ্ট্রীটে ঢোকবার খানিক পরেই হরেন্দ্রের কথামত গাড়ী সেইখানে রেখে তিন জনে হরেন্দ্রের বাড়ীতে গেলেন। কুকুরটা তখনও অপ্রশস্ত উঠানের মাঝখানে প'ড়ে ছিল। তার দেহের অবস্থা দেখলে বোঝা যায় যে, কি রকম যন্ত্রণা পেয়ে সেটা মরেছে।

বিজয় কুকুরটাকে দেখে বল্লেন, সেঁকো বিষ ব'লে মনে হয়। যা হ'ক, সে ভার তোমার ওপর রৈল সুধীর। আমি একবার এঁর রান্নাঘরটা দেখে আসি। আসুন, হরেন বাবু।

অপ্রশস্ত রান্নাঘর; পেছন-দিকটা পড়েছে একটা সঙ্কীর্ণ গলির ওপর। গলির দিকে জানালা, তাতে অর্দ্ধ-ভগ্ন চিক্। জানালার নীচেই উনান।

বিজয় বল্লেন, এই উনানেই আপনার দুধ চড়ান ছিল—না?

আজ্ঞে হাঁ।

আপনার গয়লা কত দিন দুধ দিচ্ছে আপনাকে? বোধ হয় পশ্চিমী—কেমন লোক?

হরেন বল্লে, সে ৪।৫ বৎসর আমাকে দুধ দিচ্ছে—হাঁ, পশ্চিমীই বটে, বুড়ো-সুড়ো মানুষ, লোক ত ভাল বলেই মনে হয়।

আপনার ঝি কত দিন আছে? কি জাত, কত বয়স, লোক কি রকম?

ঝি দু বৎসর যাবৎ কাজ করছে, বাঙ্গালী, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে, বেশ স্নেহশীলা বলেই ত মনে হ'ত।

খানিকটা ভেবে নিয়ে বিজয় বল্লেন, একবার গলির ভেতরটা দেখতে চাই। চলুন দিকি।

গলির মধ্যে রান্নাঘরের পেছনের জানলাটার কাছে

দাঁড়িয়ে বিজয় গলিটা ভাল ক'রে দেখে নিলেন। গলিটা রাইও, লোক-চলাচল নেই বল্লেও হয়। জানলাটা গলি থেকে প্রায় বুক পর্য্যন্ত উঁচু।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বিজয় রাস্তা এবং রান্নাঘরের দেওয়ালের মাঝের অপ্রশস্ত নালাটা পরীক্ষা করতে লাগলেন। ছেঁড়া ন্যাকড়া, ময়লা, ভাঙ্গা চিকের খানিকটা অংশ সেই নালাটাকে আরও কদর্য্য করেছে। কা'ল রাত্রি থেকে রান্না হয়নি, সে জন্য শুষ্ক। পরীক্ষা করতে করতে এক টুকরো কাগজ পাওয়া গেল, সামান্য টুকরো মাত্র, বহু ভাঁজে দোমড়ান।

স-ব্যগ্রে কাগজখানা তুলে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে বিজয় তাঁর পকেট থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন। পরীক্ষা ক'রে তাঁর মুখ হর্ষ-প্রফুল্ল হয়ে উঠল। কাগজটাকে সযত্নে রেখে দিলেন।

বল্লেন, চলুন এইবার।

বাড়ীর ভেতর গিয়ে দেখলেন, সুধীর তখনও কাজ করছে। বল্লেন, সুধীর, আর কত দেরী?

সুধীর বল্লে, আর বড় বেশী দেরী নেই।

বিজয় বল্লেন, তাড়া নেই। আমার কাজ এখনও একটু বাকী, সেটা সেরে নি ততক্ষণ।

হরেন বাবুকে বল্লেন, চলুন, আপনার ঘরটা দেখে নি। ঘরে গিয়ে দেওয়ালে টাঙ্গান ছবিগুলো দেখলেন, বল্লেন, একেবারে up-to-date, অনেক বই যে—থিয়েটারের বইও ঢের। আপনার স্ত্রীর এক জোড়া জুতোও রয়েছে দেখছি—তিনি কি বাড়ীতেও জুতো পরেন হরেন বাবু? এই যে এক জোড়া স্লিপারও আছে।

বাড়ীতে কখনও কখনও পরেন—কচিৎ।

বাইরে যাবার জন্যে ক'জোড়া জুতো তাঁর?

দু জোড়া।

তা হ'লে এক জোড়া পরেই গেছেন।

তাই ত মনে হচ্ছে।

তিনি কোন্ শাড়ী প'রে গেছেন, বলতে পারেন কি?

আমার অনুমান হয়, পার্শি-শাড়ী, সেটা দেখতে পাচ্ছি না।

তিনি কি আপনার অবর্ত্তমানে বাইরে কোথাও যান? তিনি কি রাস্তায় বেরোন হরেন বাবু?

না, রাস্তায় হেঁটে বেরোন না। তবে আমি বাড়ী না থাকলে মাঝে মাঝে এই হাওড়াতেই দু-এক জন বন্ধুর বাড়ীতে তাঁদের সঙ্গে যান, আর কখন কখন তাঁর বোন্ তাঁকে নিয়ে যান এবং তাঁর মা'র জীবদ্দশায় তাঁর ওখানেও যেতেন। কিন্তু পূর্ব্বে আমার অনুমতি না নেওয়া থাকলে আমি আপিস থেকে আসবার আগেই তিনি ফেরেন।

অনুমতি নিয়ে তিনি কোথাও রাত্রি-যাপন করেন?

হ্যাঁ, তাঁর মা'র কাছে আর ভগ্নীর কাছে। তাও কচিৎ। সম্প্রতি তাঁর মা'র মৃত্যুর পর দিনকতক মাসীর কাছে গিয়েছিলেন।

তিনি যখন বাইরে যেতেন, ধরুন, মা'র বা মাসীর কাছে, তখন কার সঙ্গে যেতেন?

কখন তাঁরা নিজেই আসতেন, কখন বা তাঁদের এক আত্মীয়কে পাঠাতেন।

কে সে আত্মীয়?

প্রসাদ বাবু—আমার শাশুড়ীর এক দূরসম্পর্কীয় ভাই।

আর অন্যত্র?

তাঁরা নিজেরাই এসে নিয়েও যেতেন এবং দিয়েও যেতেন।

তিনি বাইরে গেলে বাড়ী বন্ধ ক'রে যেতেন?

হাঁ। একটা তালার ডুপ্লিকেট চাবি আছে, একটা থাকে আমার কাছে, আর একটা তাঁর কাছে। বাইরে যাবার সময় তিনি সেই তালা বন্ধ ক'রে যেতেন।

কা'ল আপিস থেকে ফিরে এসে আপনি তালা বন্ধ দেখেন কি?

হাঁ।

বিজয় খানিকটা চুপ ক'রে ভাবলেন। তার পর সোজা হরেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, হরেন বাবু, আমাকে মাপ করবেন, আপনার মঙ্গলের জন্যে এবং আমার কর্ত্তব্যের খাতিরে আমার আপনাকে কতকগুলো প্রশ্ন করতে হচ্ছে, তার যথাযথ উত্তর চাই।

হরেন্দ্র বল্লে, বলুন।

বিজয় বল্লেন, স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আপনার স্ত্রী আধুনিক মতাবলম্বী এবং নিশ্চয়ই তাঁর চাল-চলনও নব্য-তন্ত্রের, সুতরাং ব্যয়সাপেক্ষ। আপনি যে কায করেন, তার মাইনে বোধ করি, বেশী নয়, ৭০ কি ৮০ কি—

হরেন্দ্র বল্লে, ৮০-ই—

এই ৮০ টাকায় সাধারণ হিন্দু-গৃহস্থের হয় ত কোনও রকমে টেনে-টুনে চলতে পারে, কিন্তু যে সংসারে ব্যয়-বাহুল্য, যেমন আপনাদের হওয়া সম্ভাবনা—সেখানে এতে কুলান কঠিন। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, গার্হস্থ্য অস্বচ্ছলতা দাম্পত্য-সুখের একটা মস্ত অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, সেই জন্যে আমার প্রশ্ন এই যে, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার বেশ মনের মিল ছিল কি না, অর্থাৎ এটা সম্ভব কি না যে, তিনি কোনও বিশেষ কারণে, নিজের ইচ্ছাতেই গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে গিয়ে থাকতে পারেন। এ আপনার ও আমার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রশ্ন ; কারণ, এর যথাযথ উত্তরের ওপর আমার ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী এবং বোধ করি বা আপনার জীবনও অনেক পরিমাণে নির্ভর করছে। সুতরাং সঙ্কোচ না ক'রে এর ঠিক উত্তর দেবেন।

হরেন্দ্র খানিকক্ষণ ভাবলে, তার মুখখানা করুণ হয়ে উঠল, তার পর বল্লে, না মশায়, সে-দিক্ থেকে আমার অনুযোগ করবার কিছুই ছিল না ; আমার ধারণা, আমার স্ত্রী আমাকে যথেষ্ট ভালবাসতেন।

এ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত ?

নিশ্চিত বৈ কি।

বিজয় বল্লেন, বেশ। আচ্ছা, আপনার শাশুড়ীর নাম কি মানদা দাসী ছিল ?

আজ্ঞা হাঁ।

তিনি ব্যবসায়ে নর্ত্তকী ছিলেন এবং তাঁর পসার ও প্রতিপত্তিও ভাল ছিল—না ? মাপ করবেন, এ সকল প্রশ্নের জন্যে।

হরেন্দ্র বল্লে ঠিক কথাই। কিন্তু আপনি এ সব—?

বিজয় বাঙ্গালা খবরের কাগজখানা বার ক'রে দিয়ে বল্লেন, এ সব খবর আমি এই কাগজখানা থেকে পেয়েছি। এই পড়ুন না।

হরেন্দ্র কাগজখানা নিয়ে পড়লে। এইরূপ লেখা ছিল, সোনাগাছির বিখ্যাত নর্ত্তকী শ্রীমতী মানদা বাঈএর আজ কয়দিন হইল আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে আমরা দুঃখিত হইয়াছি। বাঙ্গালীর মধ্যে কীর্ত্তন-গানে তাঁহার সমতুল্য আর কোনও বাঈ-ই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সদ্ব্যয়ও ছিল। প্রথম জীবন যাহাই হউক, শেষ জীবন তিনি নিষ্ঠাবতী হিন্দুরমণীর ন্যায়ই যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দুই কন্যা ও ভগ্নীকে আমরা আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।"

বিজয় বল্লেন, এর বোধ করি সব কথাই সত্য ?

সত্য।

বিজয় একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বল্লেন, আমার আরও জিজ্ঞাস্য আছে। ইনি নিশ্চয়ই সমাজের বাইরে ছিলেন। সে ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে এঁর কন্যার বিবাহ ঠিক বুঝতে পারলাম না। হিন্দু শাস্ত্রমতে বিবাহ হয়েছিল কি ?

হরেন একটা ঢোক গিলে খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বল্লে, হয়েছিল। আমার স্ত্রী শৈলর অন্তর থেকে নর্ত্তকী-জীবনের ওপর একটা দুঃসহ ঘৃণা ছিল, জীবনের শেষ দিক্‌টায় আমার শাশুড়ীরও একটা অনুশোচনার ভাব দাঁড়িয়েছিল। তারই ফলে আমাদের বিবাহ হিন্দুমতেই। শৈল স্বেচ্ছায় উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পরিবর্ত্তে দরিদ্র গৃহস্থ জীবন বরণ ক'রে নিয়েছিল, এবং সে জন্য সে কোনও দিনই দুঃখ করেনি। আমাদের বিবাহ ভালবাসার বিবাহ, সেই জন্যেই আমি আপনাকে সুনিশ্চিত বলতে পেরেছি যে, শৈল স্বেচ্ছায় যায় নি। আমরা গৃহস্থের মতই দুঃখে কষ্টে, কিন্তু আনন্দের সঙ্গে জীবন যাপন করেছি, বিলাসিতার যা কিছু উপকরণ দেখছেন, এ আমার শাশুড়ীর দেওয়া, এবং তা আজকাল হিন্দুসমাজে চল হয়েছে ব'লে তাতে আপত্তি করবার কিছু পাইনি।

কিন্তু সমাজে আপনার স্থান ?

উঁচে নয়। কোনও দিনই ছিল না। জন্মের জন্যে আমি দায়ী নই নিশ্চয়ই।

বিজয় বল্লেন, বুঝেছি। আপনার এক শালী ...ডন রোএ থাকেন বল্লেন না ? তাঁর জীবনের ইতিহাস ?

হরেন বল্লে, কতকটা শৈলরই মত। তবে বিয়ে করেনি, থিয়েটারে অভিনেত্রী, ওই করেই নিজের জীবিকা অর্জ্জন করে। পাপপথ থেকে দূরে থাকাই তার ইচ্ছা, সেই জন্য শাশুড়ীর কাছ থেকে পৃথক্ থাকত।

আপনার শাশুড়ী কি একাই থাকতেন ?

না, তাঁর বোন্ মোক্ষদা তাঁর সঙ্গে থাকত, এবং তা

ছাড়া অনেক সময় ওঁদের দূর-সম্পর্কের এক ভাই প্রসাদ ওঁদের সঙ্গে থাকত।

আপনার খাশুড়ী কি পরিমাণ অর্থ রেখে গেছেন, আপনার জানা আছে কি, এবং কোথায় রেখে গেছেন?

তাঁর সমস্ত টাকাই ব্যাঙ্কে আছে, বোধ করি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে হবে। সঙ্গে কিছু রাখতেন, কিন্তু ইদানীং তাঁর বোন্ আর প্রসাদের ওপর তেমন সন্তুষ্ট ছিলেন না, এমন কি, মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্ব থেকে পৃথক বাসাতেও উঠে যাবার কল্পনা করেছিলেন, সেই জন্যে শেষাশেষি সমস্ত টাকাই ব্যাঙ্ক ও সেভিংস্ ব্যাঙ্কে রেখে-ছিলেন শুনি।

মোক্ষদা কি করেন?

তাঁরও নর্ত্তকীর ব্যবসার, কিন্তু কোনও দিনই তাতে বিশেষ সুবিধা হয়নি, সেই জন্যে আমার খাশুড়ীই তাঁকে এক রকম প্রতিপালন করতেন এবং স্নেহও করতেন।

শেষের দিকে আপনার খাশুড়ী মোক্ষদার ওপর কেন অসন্তুষ্ট হন, বলতে পারেন?

হরেন খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বল্লে, প্রসাদ কি রকম ভাই হ'ত, জানি না, হয় ত গ্রামসম্পর্কও হ'তে পারে, তার সঙ্গে মোক্ষদার শেষাশেষি বেশী রকম ঘনিষ্ঠতা বোধ করি তিনি পছন্দ করতেন না।

বিজয় বল্লেন, ধন্যবাদ, আমার আর জানবার বিশেষ কিছু আপাততঃ নেই। আপনি যে অকপটে—

এমন সময় সুধীর এসে বল্লে, আমার কাজ হয়েছে। প্যাক-ট্যাক ক'রে তৈরী। বাড়ীতে গিয়ে এগজামিন করলেই হয়।

বিজয় বল্লেন, সাবাস। চলো যাওয়া যাক্। আমিও তৈরী।

হরেন জিজ্ঞাসা করলে, আমাকেও কি যেতে হবে, না এইখানেই থাকব?

বিজয় হাসলেন, বল্লেন, জীবনের ওপর যদি বিন্দুমাত্র মায়া থাকে ত ভাল ছেলের মত বাড়ীতে তালা লাগিয়ে আমাদের সঙ্গে চলুন। অন্ততঃ আজকের দিন-রাত্রি ত আমাদের হেপাজতে থাকতে হবে। আর ত কুকুরও নেই যে, সে আপনার পরিবর্ত্তে মহাপ্রস্থানের পথে প্রয়াণ করবে।

৩

বাড়ী ফিরে এসে বিজয় হরেনকে বল্লেন, ঐ ঘরে আপনি থাকুন, আমাদের আপাততঃ কিছু কাজ আছে। আপনার সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি, অল্প কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি, কারণ, আপনার অসুস্থ মন ও শরীরে গুরুতর কিছু বরদাস্ত হওয়া কঠিন। সে বরং কাল হবে। আপনাকে আজ কিছুক্ষণের জন্য আমার দরকার হবে। সুধীর, চলো আমাদের ঘরে, ওঁর খাবারের বন্দোবস্ত ক'রে আমি আসছি, খানিক পরেই বেরোতে হবে আবার।

খানিক পরে ফিরে এসে বল্লেন, সুধীর, দিন-রাত্রি আমাদের কাজ প'ড়ে রয়েছে, যদি তাতেও বিপক্ষ-পক্ষের নাগাল পেতে পারি!

সুধীর বল্লে, আমি ত যে আঁধারে সেই আঁধারেই, বড় জোর ঐ কুকুরের পাকস্থলীটা পর্য্যন্ত পৌঁছেছি। আপনি কিছু সূত্র পেলেন?

বিজয় হাসলেন, বল্লেন, বলা যায় কি! সূত্র অথবা মূল, এ ত বলা কঠিন। কিন্তু সে কথা যাক্। তোমার আরও একটা প্রয়োজনীয় কাজ আছে সুধীর, বোধ হয়, ঐ কুকুরের পাকস্থলীর চেয়েও বেশী প্রয়োজনীয়।

সুধীর আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, কি?

পকেট থেকে সেই দোমড়ান কাগজখানা বার ক'রে বল্লেন, এই কেসের পক্ষে হয় ত এই তুচ্ছ কাগজখানা অমূল্য, সুধীর। দেখতে পাচ্ছ, এই আঙুলের টিপ। খুব অস্পষ্ট সন্দেহ নেই, কিন্তু দাগ কাজের পক্ষে যথেষ্ট পরিষ্কার। তোমাকে একে এনলার্জ ক'রে ফটো নিতে হবে। খুব তাড়া নেই, কা'ল সকালের মধ্যে হ'লেই হবে। কাগজটা যেন নষ্ট না হয়, কারণ, ওর উল্টোদিকে যে লেখাটা আছে, তারও দাম কম নয়। পড় ত, কি লেখা আছে।

হরেন সেটা পড়লে—ছেঁড়া টুকরায় মাত্র কয়েকটি কথা, "স্নেহপর—সন্তানে—শ্রীমতী মো—।" হরেন বল্লে, কিছুই ত বোঝা গেল না।

বিজয় হাসলেন, বল্লেন, যথাসময়ে হয় ত বোঝা যেতে পারে। যাক্, তুমি কুকুরের পাকযন্ত্রটা পরীক্ষা কর গে। ফটোর কথাও ভুলো না। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে আমার বেরোতে হবে। এখন আমাকে একটু একলা থাকতে হবে, সুধীর।

সুধীর চ'লে গেলে বিজয় গোটা-দুই আইনের বই উল্টে-পাল্টে দেখে নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলেন। তার পর এক কোণ থেকে সেতারটা নামিয়ে নিয়ে চল্লো বাজান।

শিক্ষার্থীর বাজ নয়, একেবারে পরিপক্ক হস্তের ঝঙ্কার। যার হাতে এত বড় একটা কঠিন মামলা, সে যে কেমন ক'রে নিশ্চিন্তে ব'সে এমন নিবিষ্ট-মনে সেতার আলাপ করতে পারে, তা বোঝা কঠিন। অথচ বোধ করি, এইখানেই এদের সফলতার বীজ নিহিত আছে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করলে মনকে সকল রকম জটিল বন্ধন থেকে অনায়াসে মুক্ত করতে পারে, প্রয়োজন হলে সে-ই তেমনি অনায়াসে তাকে জটিলতার সহস্র সঙ্কীর্ণ আবর্ত্তের মধ্যে নিয়োগ করতে পারে।

এমনি ক'রে ঘণ্টাখানেক কেটে গেল, সুরের সেই আশ্চর্য্য লহরী সমস্ত ঘর, সমস্ত বাড়ী আর তার আকাশ-বাতাসকে আচ্ছন্ন ক'রে যেন একটা স্বপ্ন-পুরীতে পরিণত ক'রে ফেলেছিল। শুনলে মনে হয় না যে, চুরি, ডাকাতি, খুন এবং অপহরণের পঙ্কিল প্রগাঢ় রহস্য এর ত্রিসীমায় আসতে পারে। অথচ কে না জানে যে, সুরের এই ইন্দ্র-জাল-স্রষ্টাটি ঠিক এই সকল রহস্যোদ্ভেদের পক্ষেও বাঙ্গালার এক জন অদ্বিতীয় ঐন্দ্রজালিক।

সুধীর দরজার বাইরে থেকে বল্লে, আসতে পারি কি?

এসো।

সুধীর ঘরে ঢুকে বল্লে, আর্সেনিকই বটে, খুব বড় ডোজ্।

বিজয় বল্লেন, অনুমানই করেছিলাম। রিপোর্টটা রেখো। আঙ্গুলের টিপের কথা ভোলোনি ত?

সুধীর বল্লে, ভুলিনি, কিন্তু এখনই বেরোতে হবে বল-ছেন, তা হ'লে কা'ল সকালে পাওয়া শক্ত হবে।

বিজয় বল্লেন, আচ্ছা, কুছ পরওয়া নেই, তোমাকে এখন ছুটী দিলাম। আমি একবার ঘুরে আসি। হরেন বাবুকে দরকার হবে। কি কচ্ছেন তিনি?

ব'সে আছেন আর আপনার সেতারের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে অবিরত অশ্রু বিসর্জ্জন করছেন।

বিজয় হেসে বল্লেন, তা করুন। যে শোচনীয় নিয়তির হাত থেকে বেঁচে গেছেন, তার কাছে ত এ একটা রীতিমত বিলাস।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই বিজয় ও হরেন বেরোলেন।

সোফারকে বল্লেন, বিডন রো চলো। হরেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার শালীর বাড়ীর নম্বর কত?

নম্বর শুনে বল্লেন, তাঁর নামটি কি শুনতে পাই?

উষারাণী।

গান করেন চমৎকার—না? একটিংও ভাল। 'সফল-গৌরব' নাটকে ওঁরই বোধ হয় ছিল নায়িকার পার্ট।

আজ্ঞে হাঁ।

কত দিন থিয়েটারে ঢুকেছেন?

আজ বছর চারেক হবে।

ছোট বাড়ী পরিষ্কার-ঝরিকার। হরেন বাড়ীর ভেতর গেল এবং অবিলম্বে ফিরে এল, সঙ্গে উষাকে নিয়ে।

দেখতে সুন্দরী না হ'লেও সুশ্রী। মুখে স্নেহকরুণ-ভাব, বোধ করি, ভগিনীর এই আকস্মিক বিপৎপাতে আরও করুণ। দুইটি সুকুমার হাত যোড় ক'রে, বিজয়কে অভি-বাদন ক'রে বল্লেন, আসুন:

ছোট ঘর, আধুনিক ধরণে সাজান। তারই ভেতর গিয়ে সবাই বসলেন।

হরেন বল্লে, ইনিই সেই বিখ্যাত বিজয় বাবু, উষা। দয়া ক'রে শৈলর অনুসন্ধানের ভার নিয়েছেন।

দুই হাতে আপনার মুখ ঢেকে উষা চুপ ক'রে রৈল। তার পর তার দুটি সজল চোখ বিজয়ের মুখের দিকে তুলে বল্লে, আমার দিদিকে বার ক'রে দিন দয়া ক'রে, আপনার কাছে চিরদিন কেনা হয়ে থাকব আমরা, এমন স্নেহ-পরায়ণ, মধুর-স্বভাব দিদি আর কারও হয় না।

বিজয় বল্লেন, মানুষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, জোর ক'রে কিছুই বলা চলে না। তার হাতে আছে শুধু চেষ্টা করা। তার যথাসাধ্য হচ্ছে, এবং হয় ত এই চেষ্টার ভেতরে আপ-নাকেও দরকার হ'তে পারে।

উষা সোৎসাহে বল্লে, আমার দিদির জন্যে আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি, বিজয় বাবু।

বিজয় হাসলেন, বল্লেন, অতটা হয় ত দরকার হবে না। কিন্তু কঠিন কিছুর প্রয়োজন হ'লেও হ'তে পারে। যদি হয় ত ধৈর্য্য হারাবেন না, মনে এই সাহস রাখবেন যে, একেবারে অসহায় নন্।

উষার মুখে ভীতির চিহ্ন দেখা দিল। বল্লে, আমি ত আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছিনে বিজয় বাবু, আবার কি কোনও বিপদ হ'তে পারে ?

বিজয় হাসলেন, বল্লেন, এইতেই প্রায় ভয় পেয়েছেন যে! বিপদের কথা দেবাঃ ন জানন্তি। যে রকম বিস্তৃত জাল ফেলেছে শত্রুরা, তাতে সাবধান থাকা দরকার বৈ কি! কিন্তু ভয় পেয়ে লাভ নেই। যাক্, আজ শনিবার। বোধ হয়, আপনাকে থিয়েটারে যেতে হবে। ফিরবেন কখন্?

রাত ১টায়।

আমি আপনাকে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, থিয়েটার যাবার বা ফেরবার পথে আর কোথাও যাবেন না। বাড়ী থেকেই যাবেন এবং বাড়ীতেই ফিরবেন। আর আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা কাউকে বলবেন না। এ একটা নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর বা ভীতিজনক গোছের কাজ নয়—কি বলুন ?

উষার মুখে হাসি দেখা দিল, বল্লে, আজ্ঞে না।

বিজয় নমস্কার ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। বল্লেন, এখন আসি তা হ'লে।

উষা প্রতিনমস্কার ক'রে দাঁড়াল। তার পর একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্লে, দিদিকে তা হ'লে পাওয়া যাবে? আপনি কি রকম বুঝছেন ?

বিজয় হাসলেন, বল্লেন, এ আপনাদের নাটকের কল্পনা নয়, একেবারে কঠিন, রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। কিছুই ত বলা যায় না। এমনও হ'তে পারে যে, কা'ল সকালের আগেই আপনার দিদির সঙ্গে আপনার দেখা হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সবই ত আপাততঃ অনুমান।

ব'লে আবার একটু হেসে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।

বাড়ীতে গিয়ে টেলিফোনে ইনস্পেক্টর রায়কে ডাকলেন।

ইনস্পেক্টর রায় জবাব দিলেন, হ্যালো, কে আপনি ?

প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ বিজয় বোস।

বিজয় বাবু?—কি খবর ?

আজ রাত্রে দু'জন কনস্টেবল চাই, সঙ্গে দারোগা আসতে পারলে ভাল হয়।

বেশ, আমিই না হয় যাব। কি কেস, বোস ?

হাওড়ার একটি স্ত্রীলোক হারান কেস—১১৫ রয়ডন ষ্ট্রীট থেকে হরেন দাসের স্ত্রী শ্রীমতী শৈল দাসী অপহৃতা। আপনাদের কোন খবর আছে কি ?

আছে বৈ কি। কা'ল সন্ধ্যা থেকে খোঁজ ক'রে ক'রে হয়রান।

কোনও 'ক্লু' পেয়েছেন কি ?

কিছু না। বোধ করি, গুণ্ডার কাজ। ওদের ডেন্-গুলো আজ দেখা হবে। আপনি কিছু পেলেন ?

বিজয় হাসলেন। বল্লেন, হাতী ঘোড়া গেল তল। দেখা যাক কি হয়। কিন্তু পুলিস পাঠাতে ভুলবেন না যেন।

কোথায় পাঠাব ?

ওকুস্থলের ঠিক নেই, তবে রাত ১২টার সময় আমার এখানেই পাঠিয়ে দেবেন, তার পর যেখানে দরকার, নিয়ে যাব। ঠিক ১২টায়, বুঝেছেন ত ?

বেশ। নিশ্চয়ই যাবে। 'ক্লু'এর মত লাগছে যে, বিজয় বাবু।

বিজয় বল্লেন, ফলেন পরিচীয়তে। নমস্কার।

নমস্কার।

সুধীর বল্লে, আমার কাজ অনেকটা এগিয়েছে। কা'ল সকালে আপনাকে টিপ্-এর এনলার্জড ফটো দিতে পারব ব'লে বোধ হয়।

বিজয় বল্লেন, থ্যাঙ্ক ইউ, সুধীর, কিন্তু রাত্রে যে তোমাকে চাই।

সুধীর বল্লে, সর্ব্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু কটা রাত ?

রাত ১২টার পর।

সাংঘাতিক কিছু একটা হবে বোধ হয়।

বিজয় বল্লেন, বলা যায় না। কিন্তু তোমার পিস্তলটা পকেটে ফেলে নিও। আর রাত ১২টায় বোধ করি ইন্‌স্পেক্টর রায়ের সঙ্গে জন-দুই কনষ্টেবল আসবে। খবর দিও তখন।

আচ্ছা। হরেন বাবুকেও দরকার ?

তাঁকে একবার ডাকো।

হরেন এসে বল্লে, কি অনুমতি ?

বিজয় বল্লেন, আজ রাত্রে আপনার ছুটী হরেন বাবু, আপনার ঘরে গিয়ে যদি পারেন ত বেশ ক'রে নিদ্রা দিন কা'ল সকালের দিকে দরকার হ'তে পারে।

এইবার আমি একটু বিশ্রাম চাই, সুধীর।

৪

রাত ১২টায় সময় সুধীর খবর দিলে, দু'জন কনষ্টেবল নিয়ে ইনস্পেক্টর রায় এসেছেন। রায়কে ডেকে এনে নিজের ঘরে ইজি-চেয়ার দিয়ে বিজয় বল্লেন, এখন আপনাদের কষ্ট করতে হবে না। আমি আর সুধীর সাড়ে ১২টায় বেরোবো।

রায় হাসলেন, বল্লেন, আমাদের কি তবে নিমন্ত্রণ খেতে ডেকেছেন, বিজয় বাবু?

বিজয়ও হাসলেন, বল্লেন, নিমন্ত্রণের ত আর সবই প্রস্তুত, কেবল খাবারেরই যা অভাব, মিঃ রায়। কিন্তু একেবারে নিছক উপবাসও যাবে ব'লে বোধ হয় না। আপাততঃ আমাদের আসল গন্তব্য স্থানের ঠিক নেই। ঠিক হলেই যে আর বিলম্ব করব না, এটা জানবেন। তখন নিকটবর্ত্তী থানা থেকে টেলিফোন ক'রব—সম্ভবতঃ সুধীরই করবে, সেইমত আপনারা যাবেন।

রায় বল্লেন, মস্ত একটা "রেডে"র মত মনে হচ্ছে—ক্লু পাওয়া গেছে নিশ্চয়ই।

বিজয় হাসলেন, বল্লেন, আপনাদের ডেনের খবর কি?

রায় বল্লেন, চারটে ডেন খানাতল্লাসের খবর পেয়ে এসেছি—ব্যর্থ-কাম।

বিজয় বল্লেন, সুধীর, আমাদের বেরোবার সময় হ'ল। ছোট অষ্টিন কারটা নিতে হবে।

সুধীর বল্লে, আমিও তৈরী।

রিডন রোডে ঢুকে একটা সরু গলির মধ্যে কারটা ঢুকিয়ে, বিজয় বল্লেন, আমাদের এইখানে গলির মোড়ে লুকিয়ে দেখতে হবে, সুধীর।

সুধীর বল্লে, কার প্রতীক্ষায়?

একটা মোটর আসবে, তারই প্রতীক্ষায়।

দুই জনে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর একখানা ট্যাক্সি এসে অনতিদূরে একটা বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। সুধীর বিজয়ের হাত ধীরে ধীরে স্পর্শ করলে।

গাড়ী থেকে উষা নেমে বাড়ীর ভেতর ঢুকল। বিজয় বল্লেন, না, ওটা নয়, আরও একটা আসবে।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। মিনিট দশেকের ভেতরেই আর একখানা 'কার' এসে সেই বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। তার ভেতর থেকে এক জন সবল বলিষ্ঠ পুরুষ নেমে সেই বাড়ীতে ঢুকল।

পুরুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তার পর দরজা-খোলার শব্দ। তার পর স্ত্রী-পুরুষের কথাবার্ত্তার আওয়াজ, স্ত্রীলোকটির কণ্ঠস্বর যেন কম্পিত। তার পর কথাবার্ত্তা মৃদু হ'তে লাগল—তার পর চুপ্।

তার পর দেখা গেল, তার সবল বাহু-পাশে মূর্চ্ছিত স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে পুরুষটি মোটরে উঠ্ল। মোটর ছেড়ে দিলে।

সুধীর উত্তেজিত হয়ে বল্লে, আরও একটা ক্রাইম, বিজয় বাবু। চলুন, উদ্ধার করুন।

বিজয় তার কাঁধের উপর চাপ দিয়ে আস্তে বল্লেন, চুপ্। ওকে ক্লোরোফর্ম করেছে। রেডি, আস্তে আস্তে পেছনে যেতে হবে ওদের।

দুজনে গাড়ীতে উঠে ধীরে ধীরে গাড়ী ছেড়ে দিলেন। সুধীর চুপি চুপি বল্লে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিনে। ঘরের ভেতর পুলিসকে বন্ধ ক'রে রেখে এত বড় একটা ক্রাইম যে কেন করতে দিলেন, তা একেবারেই বোঝা যায় না। আমাদের কাছেও ত দুটো পিস্তল রয়েছে, আমরাও ত কিছু করতে পারতাম, অন্ততঃ বাধাও ত দিতে পারতাম। যে দুর্ব্বৃত্ত রাত দেড়টার সময় ক্লোরোফর্ম ক'রে এক জন অসহায় অচৈতন্য স্ত্রীলোককে নিয়ে পালায়, তার যে নিশ্চয়ই সদুদ্দেশ্য নেই, এ ত বোঝা শক্ত নয়। নাঃ—

বিজয় আস্তে আস্তে বল্লেন, আর আমায় বোকামীর সঙ্গে পেরে ওঠ না—এই ত? দেখ, ওদের গাড়ী চলছে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল ত নিশ্চয়ই, এ সময় বেশী কথাবার্ত্তা কয়ে ওদের হারিয়ে ফেল্লে চলবে না। অবস্থা এমনি যে, এই ক্রাইম ওকে করতে না দিলে হয় ত সবই ব্যর্থ হ'ত, চুপ্।

সামনের গাড়ী দ্রুতগতিতে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ধ'রে চলতে লাগলো, তার পর ধর্ম্মতলা দিয়ে বেঁকে চৌরঙ্গী পার হয়ে সোজা কালীঘাটের দিকে চল্লো। বিজয়ের গাড়ীও কিছু পশ্চাতে নিঃশব্দে তার পেছনে পেছনে চলতে লাগলো।

বিজয় আস্তে আস্তে বল্লেন, ওকে যেতে দেওয়া আমাদের পক্ষে প্রয়োজন সুধীর। ওদের যদি এইখানেই বাধা দিতাম ত আমাদের সব উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যেত। ধৈর্য্য

হচ্ছে এ কাজের বড় সম্বল, বড় লাভের জন্যে ছোট অন্যায় বরদাস্ত করতে হয়।

কিন্তু যদি ঐ স্ত্রীলোকটিকে মেরে ফেলে?

বিজয় বল্লেন, না, কিছুতেই মারতে পারে না। তা হ'লে ত ওর নিজের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। শুনে আশ্চর্য্য হবে সুধীর, স্ত্রীলোকটিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা ওর তোমার চেয়ে বেশী।

তবে ক্লোরোফর্ম কল্লে কেন?

বিজয় হাসলেন, বল্লেন, তা নইলে স্ত্রীলোকটি চেঁচামেচি ক'রে গোলযোগ বাধিয়ে তুলত, ওর উদ্দেশ্য হচ্ছে হরণ করা এবং নিঃশব্দে, সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'ত। এইবার রাস্তা খারাপ হ'তে সুরু হ'ল, আর কথা কইলে আমরা লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হব, সুধীর।

কালীঘাটের রাস্তা পেরিয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী মোটর টালিগঞ্জের রাস্তা ধরলে। সেই রাস্তায় খানিকটা গিয়ে একটা বস্তির ভেতর ঢুকল। গোড়ার দিকটায় বস্তি ঘন, তার পর ক্রমশঃ বাড়ী ছাড়া ছাড়া। তারই একটা বাড়ীর সামনে গিয়ে গাড়ী দাঁড়াল।

প্রায় দু-শ' গজ দূরে ছিল বিজয়ের মোটর। সামনের মোটরটা থামতেই তিনি পাশেই একটা সরু গলির ভেতর নিজের মোটরটা চালিয়ে দিয়ে একটা অন্ধকার জায়গায় তাকে দাঁড় করালেন। বল্লেন, সুধীর, গাড়ী এইখানেই থাক, তুমি এস আমার সঙ্গে।

সুধীর কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বিজয়ের ইঙ্গিতে থেমে গেল।

বিজয় গলির মোড় থেকে উঁকি মেরে দেখে নিয়ে সুধীরকে তাঁর পেছনে আসতে ইঙ্গিত করলেন।

দু'জনেরই পায়ে রবারসোল জুতা ছিল, সহজেই কম শব্দ হয়, কিন্তু তারা তার ওপর যে রকম সাবধানে চলছিল, তাতে এক হাত দূর থেকেও বোঝা যায় না যে, লোক আসছে। যে বাড়ীর সামনে মোটরটা দাঁড়িয়েছিল, সে একটা খোলার-চালের বাড়ী। সেই বাড়ী আর তার পাশের বাড়ীর মাঝখানে যে ব্যবধানটুকু ছিল, তারই ভেতরে দুজনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করলে।

পাশাপাশি তিনটা ঘর, গলির দিকে জানালা। প্রথম দুটা ঘর অন্ধকার। তৃতীয় ঘরে আলো জ্বলছে, জানালার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য হয়। আস্তে আস্তে সেই জানালার কাছে গিয়ে বিজয় দাঁড়ালেন। পুরানো জানালা, তারই একটা ফাটা দিয়ে ভেতর সামান্য লক্ষ্য হয়। সেই ফাটা দিয়ে দেখতে পেলেন, ঘরে দুইটা চৌকী, একটাতে হাত-পা বাঁধা এবং মুখ বন্ধ করা একটি স্ত্রীলোক শুয়ে রয়েছে এবং দ্বিতীয়টিতেও নূতন অপহৃতা উষাকে শোয়ান হয়েছে। উষার তখনও ভাল ক'রে জ্ঞান হয়নি, কিন্তু দেখে বোঝা যায় যে, ধীরে ধীরে তার চৈতন্য ফিরে আসছে।

তাদের সামনে দাঁড়িয়ে সেই ভীষণ-মূর্ত্তি পুরুষ, এবং পাশে একটি স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটি যৌবনের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছে।

পুরুষের হাতে মদের গ্লাস। এক ঢোক খেয়ে বল্লে, বাঁচা গেল, পরিশ্রম কি সোজা হয়েছে, সদু! মেয়ে নয় ত যেন এক একটা হাতী! কিন্তু খুব সাবধান সদুমণি! ভাগ্যিস্ তুমি ছিলে, নইলে কি হ'ত! আর ঘণ্টা-তিনেকের মধ্যে কাজ হতে হবে। এই সময়টা তুমি এদের কড়া পাহারা দেবে। বরং এক চুমুক খেয়ে নাও, সদুমণি—ব'লে গ্লাসটা সদুর মুখের কাছে এগিয়ে ধরলে।

গ্লাসটা হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সদু বল্লে, আক্কেল দেখ না! সমস্ত রাত কড়া পাহারা দিতে হবে কবুল হ'ল, আবার সোহাগ ক'রে গেলাস এগিয়ে ধরা হচ্ছে! ও খেলে লোক এক্তিয়ারে থাকতে পারে—তোমার পাহারা দেবে কে?

পুরুষের মুখে হাসি দেখা দিল, সে বল্লে, মেয়ে-মানুষের জান্ কি না। আমরা পুরুষরা যতক্ষণ না দু-চার চুমুক খাচ্ছি, ততক্ষণ কাজে আটাই লাগে না, আর তোমরা এক চুমুকেই বে-এক্তিয়ার! অনেক তফাৎ, সদুমণি!

সদু বল্লে, ভারি বিক্রম তোমাদের। এখন কোথায় আমার টাকা?

পুরুষটি একটা দশ টাকার নোট বার ক'রে দিতে গেল।

সদু চোখ পাকিয়ে বল্লে, কি, কা'ল থেকে একটা মেয়ে-মানুষকে আগলে ব'সে আছি, আজ দুপুর রাত্তিরে আমদানী হ'ল আবার একটা, আর উনি দিতে আসছেন দশটি টাকা! ভারী পীরিত আর কি! চালাকি কর ত এখনই লোক-জানাজানি ক'রে হাতে দড়ি পরাব, তা জান!

পুরুষের দুই চোখ জ্ব'লে উঠল, কিন্তু সে

পরক্ষণেই ঠাণ্ডা হয়ে হেসে বল্লে, রাগ কর কেন, সদুমণি। এইটেই ত সব নয়। আচ্ছা, আরও নাও এই দশ টাকা, তুমি রাগ করলে যে আমার দুনিয়াই আঁধার! কাজ কত্তে হ'লে আরও কত পাবে, সদু! তখন সোনায় তোমার গা মুড়ে দোবো, সদুমণি!

সদু নোট দু'খানা আঁচলে বেঁধে চোখ বাঁকিয়ে একটু হেসে বল্লে, কতবারই যে সোনাদানায় আমার গা মুড়ে দিলে, সে ত আর জানতে বাকী নেই!

পুরুষটি হেসে বল্লে, আচ্ছা, এবার দেখো অখন, সদুমণি, আমার কথা সত্যি হয় কি না!

ততক্ষণে উষার জ্ঞান হয়েছিল। সে চারিদিকে চেয়ে বল্লে—আমাকে কোথায় নিয়ে এলে তুমি?

পুরুষটি তার কাছে এসে তর্জ্জনীর ইঙ্গিত ক'রে বল্লে, চুপ্, চেঁচামেচি করিসনে বলছি।

তুমি আমাকে এখানে আন্‌লে কেন?

শুধু তোকে নয়, তোর দিদিকেও এনেছি, ঐ দেখ। তোদের কোনও ক্ষতি করব না—যদি ভাল মানুষের মত যা বলব, তাই করিস। খুব সহজ কাজ, একটা কাগজে সই করা মাত্র। আমার কথামত কাজ করলে কিছু বলব না, বরং গাড়ী ক'রে তোদের নিজের নিজের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসব। আর যদি না করিস ত তোদের আর ফিরে যেতে হবে না ব'লে দিচ্ছি।

কেন তুমি এমন কাজ করলে, কেন এত ভয় দেখাচ্ছ? কোন কিছুতেই তোমার ভয়ে সই করব না—

একটা প্যাড দিয়ে তার মুখ বন্ধ করতে করতে পুরুষটি বল্লে, বেশী কথা কবার এ জায়গা নয়, সময়ও নয়। দু ঘণ্টা সময় দিলাম। ভেবে দেখ্। এই কথা মনে রাখিস যে, প্রাণের চেয়ে দামী কিছুই নয়।

সদুর দিকে ফিরে বল্লে, আমি চল্লাম। ঘণ্টা দুইএর মধ্যে ফিরে আসব। ততক্ষণ খুব সাবধান!

সদু বল্লে, তা আর বলতে?

বিজয় সুধীরকে চুপি চুপি বল্লেন, এ চ'লে গেলে নিকটস্থ থানায় গিয়ে রায়কে খবর দেও। তাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যত শীঘ্র পার নিঃশব্দে এই গলির ভেতর আসবে। তার পর আমি যা করবার করব। আমি চল্লাম।

সদু দরজা বন্ধ করতে এসে মোটর পর্য্যন্ত পুরুষটিকে এগিয়ে দিয়ে গেল। মোটর ছেড়ে গেলেও যতক্ষণ তাকে দেখা যায়, ততক্ষণ সদু তার দিকে চেয়ে রৈল, বোধ করি, সে অচিরেই তার দেহ আগাগোড়া সোনায় মুড়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছিল।

কিন্তু সে দেখতে পেলে না যে, এই অবসরে তারই পেছন দিয়ে বিদ্যুতের মত চকিতে কে এক জন তার বাড়ী ঢুকল! বিজয় এসে বারান্দার পাশে একটা দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সদু দরজা বন্ধ ক'রে বাড়ী এল। তার পর যে ঘরে শৈলরা ছিল, সেই ঘরে গিয়ে দেখলে, সব ঠিক আছে। তখন বাইরে থেকে সেই ঘরে শিকল লাগিয়ে, পাশের ঘরে নিজের বিছানায় একটু হাত-পা ছড়িয়ে জেগে শুয়ে থাকবে মনে ক'রে শোবামাত্রই ঘুমিয়ে পড়ল।

৫

ঘণ্টা-খানেক পরে বিজয় আস্তে আস্তে লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে দরজা খুলে গলিতে এসে দেখলেন, ইন্‌স্পেক্টর রায় ও কনেষ্টেবলরা এসেছে। রায়কে কাণে কাণে বল্লেন, এইবার নিমন্ত্রণের যোগাড় হয়েছে। আস্তে আস্তে আসুন আমার সঙ্গে।

রায় বল্লেন, বুঝছি না ত কিছুই। চলুন।

তাদের বাড়ীর ভেতর নিয়ে এসে বল্লেন, এইখানে লুকোন আপনারা। একটুমাত্র শব্দ না হয়,—সে আপনারা পুলিসের লোক, ভালই পারবেন। আমি আর সুধীর থাকব ঐ ঘরে। আমার হুইশল শুনলে আপনারা গ্রেপ্তার করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাবেন। বোধ হয়, ঘণ্টাখানেকও আর অপেক্ষা করতে হবে না। তবে আপাততঃ একটু কাজ করতে হবে, মিষ্টার রায়। আমরা ঐ ঘরে ঢুকলে শিকলটা চড়িয়ে দিয়ে তার পর এইখানে এসে অপেক্ষা করবেন।

ঘরের ভেতর গিয়ে বিজয় একটা আলমারির কোণে লুকোলেন। সুধীর একটা চৌকির তলায় ঢুকল। সুধীরকে বল্লেন, আমি বেরুলে তুমিও অবিলম্বে বেরিয়ে—ঐ দরজাটা সম্ভব বন্ধ থাকবে, সেটা খুলে দিও।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সেই পুরুষ আর সদু এসে সেই ঘরে ঢুকল। সদু দরজা বন্ধ ক'রে দিলে।

পুরুষটি আলো বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে, শৈল, তুমি বড় বোন্, তোমার দস্তখতটা আগে হওয়া চাই। ওজর আপত্তি চলবে না। তুমিও শোন, উষা, আপত্তি করলে জেনো, নিশ্চয় মৃত্যু। এ হচ্ছে তোমাদের মায়ের দান-পত্র, তাঁর পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে তাঁর বোন্ মোক্ষদাকে দিয়েছেন ৩৫ হাজার, মোক্ষদাকে তিনি কত ভালবাসতেন তা জান, আর মোক্ষদাই চিরদিন তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর সেবা করেছেন, এই জন্তে। তোমরা সমর্থ, তবুও তিনি তোমাদের ভোলেন নি, তোমাদের দুই বোনের ব্যবস্থাও আছে ১৫ হাজার। মন্দ নয়। এতে আপত্তি করবার কিছুই নেই। তোমাদের দস্তখত হ'লে এটা একেবারে পাকা হয়ে যায়, তোমরাও স্বচ্ছন্দে ঐ টাকাটা পাও। আপত্তি যদি কর ত এই দেখ ছোরা, চক্‌চকে ধারাল ছোরা, আর ফিরতে হবে না প্রাণ নিয়ে। শুধু আজ নয়, মনে রেখো, যে দিন কোথাও কোনও ক্ষেত্রে আপত্তি করবে, সেই দিন কিংবা বড় জোর তার পরদিন এই ছোরা তোমাদের বুকে বসবে। প্রস্তুত হও, এই দোয়াত-কলম আর এই আমার হাতে ছোরা।

ব'লে শৈলর বাঁধন খুলে কাগজখানা এগিয়ে দিলে।

শৈল বল্লে, এ ত মিথ্যে, টাকা ত সব আমাদের।

পুরুষটি কঠিন কণ্ঠে বল্লে, কলম নাও, এই দেখ ছোরা, টাকার চেয়ে প্রাণ বড়।

তাই যদি হয় ত ছোরা ফেলে দিয়ে দুই হাত বুকের ওপর রেখে সোজা নিশ্চল হয়ে দাঁড়াও—অন্যথায় মাথার খুলি উড়ে যাবে, বলতে বলতে বিজয় তার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

পুরুষটি দেখলে, তার কপালের সামনে পিস্তলের এক জোড়া নল তার মাথা লক্ষ্য ক'রে রয়েছে। সে খানিকটা স্তম্ভিতের মত চেয়ে রৈল, তার পর ছোরা ফেলে দিয়ে বল্লে, কে তুমি অনধিকারপ্রবেশ করেছ এখানে?

বিজয় বাঁশী বাজিয়ে বল্লেন, সে কথা বুঝিয়ে দেবার লোক এলো ব'লে।

কনষ্টেবল সহ ইন্‌স্পেক্টর রায় ঘরে ঢুকতে বিজয় পুরুষটিকে দেখিয়ে বল্লেন, নারীহরণকারী ও খুনোদ্যত প্রসাদ দাস—গ্রেপ্তার করুন।

প্রসাদ চুপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে রৈল; কারণ, আর চেষ্টা করা বৃথা।

বিজয় সদুর দিকে দেখিয়ে বল্লেন, এই দুর্বৃত্তের সাহায্যকারিণী সৌদামিনী, একেও গ্রেপ্তার করুন।

তাদের গ্রেপ্তার ক'রে রায় বল্লেন, পুলিস ত এখনও ঘোল খাচ্ছে। এই কেসটার জন্তে কখন্ আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে?

বিজয় বল্লেন, বেলা ১০টায় একবার অনুগ্রহ ক'রে আমার বাড়ীতে আসবেন, মিষ্টার রায়। একবারে আপনাদের সমস্ত প্রমাণ তৈরী থাকবে। কিন্তু ইতিমধ্যে আরও একটা কাজ করতে হবে। এই লোকটার দু বুড়ো আঙুলের টিপ-সই সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবেন, আর এদের প্ররোচক ও সহকারী হিসাবে বোধ করি সোনাগাছির মোক্ষদা দাসীকেও গ্রেপ্তার করা দরকার হবে। ওই দলিলখানাও নিতে হবে।

রায় বল্লেন, যেমন আপনি বলবেন।

উষারও বাঁধন খুলে দিয়ে বিজয় বল্লেন, এঁদের দুজনকে আপাততঃ আমি নিয়ে যাচ্ছি। সুস্থ হ'লে বাড়ী পাঠিয়ে দেবো।

সমস্ত রাত্রিই হরেনের কঠিন দুশ্চিন্তায় কেটেছে, এক দিনে তার গৃহের সমস্ত শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে, তার জীবন-হরণের চেষ্টা পর্য্যন্ত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে ভাগ্যে যে কি আছে, তাও বলা যায় না। অতি কঠিন চক্রান্তের জালে তাকে চারিদিক্ থেকে ঘিরে ধরেছে, অথচ তা থেকে মুক্তির ত কোনও আশাই এখন পর্য্যন্ত দেখা যায় না। ওই যে ছন্নের লোকটি অনুসন্ধানের ভার নিয়েছেন, তাঁর কথা-বার্ত্তায় ত কিছুই বোঝা যায় না। রহস্য-উদ্ভেদের নিকট তিনি পৌঁছেছেন অথবা অন্ধকারেই হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, তাও বোঝবার উপায় নেই। উষার সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হ'ল, সাধু-ভাষায় তাকে সদালাপ ছাড়া ত কিছুই বলা যায় না, অথচ এ ত ঠিক সদালাপের সময় নয়! একটা কথা বলেছিলেন বটে, যে রাত্রি-প্রভাতের আগেই উষার তার দিদির সঙ্গে দেখা হওয়া অসম্ভব নয়। রাত্রি ত প্রায় শেষ হয়ে এল, অথচ সে নিশ্চিন্ত এবং বোধ করি বিজয় বাবুও নিশ্চিন্তই হবেন। কি উপায় হয় তার! কাণের পাশটা গরম হয়ে উঠল, হরেন বিছানায় উঠে বসলো। অবশেষে পাগল হয়ে যাবে না কি সে?

দুয়ারে বার-কতক টোকা, তার পর প্রশ্ন, হরেন বাবু জেগে আছেন না কি?

আছি ব'লে লাফিয়ে প'ড়ে, দরজা খুলে হরেন সামনে বিজয়কে দেখে তার দু'হাত চেপে ধরলে, বিজয় বাবু, আমি পাগল হয়ে যাব।

বিজয় হেসে বল্লেন, অন্ততঃ এবার হওয়া আশ্চর্য্য নয়, তার পর সুইচটা টিপে বল্লেন, এঁদের চিনতে পারেন হরেন বাবু?

উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো শৈল ও উষার মুখে পড়েছিল। শৈল আর উষা বিস্মিত হয়ে হরেনের দিকে তাকিয়ে রৈল, আর হরেন তাদের দেখে স্তম্ভিতের মত খানিকটা দাঁড়িয়ে রৈল। তার পর বিজয়ের দুই পা জড়িয়ে বল্লে, আপনি মানুষ নয়, দেবতা, বিজয় বাবু!

বিজয় পা ছাড়িয়ে নিয়ে হরেনকে বল্লেন, অত উত্তেজিত হবেন না। তার পর উষাকে বল্লেন, দেখুন, কথা আমার মিথ্যে হয় নি, আপনার দিদির সঙ্গে আপনার রাত্রেই দেখা হয়েছিল, কিন্তু আপনার যে একটু কষ্ট হ'ল, তা অনিবার্য্য, কারণ, তাকে নিবারণ করতে গেলে আপনার দিদির বোধ করি সন্ধানই পাওয়া কঠিন হ'ত।

উষা হাত যোড় ক'রে বল্লে, কি ক'রে যে আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করব, তা ত জানি না।

শৈলর দিকে ফিরে বিজয় বল্লেন, আপনার সঙ্গে প্রথম পরিচয় যে দুঃখের মধ্য দিয়ে হ'লো, তার জন্যে নিশ্চয়ই আমাকে অপরাধী করবেন না।

শৈল দুই হাতে চোখের জল মুছে বল্লে, আপনার এত বড় দয়ার কথা কোনও দিনই ভুলতে পারবো না, আপনি অনুগ্রহ না করলে কে আমাদের এই প্রচণ্ড বিপদ থেকে উদ্ধার করত?

৬

হাতের টিপ-সই মিল ক'রে বিজয় বল্লেন, মিষ্টার রায়, আমার অনুমানই ঠিক। এ একই লোকের ইম্প্রেসন, এবং সে লোকটি ত জানেনই কে—এই নাটের নায়ক প্রসাদ।

রায় বল্লেন, ব্যাপারটা ত আগাগোড়া এখনও আমাদের বিশেষ বোধগম্য হয়নি, অথচ এও ত চোখের সামনে দেখলাম যে, একটা দুর্ব্বৃত্তকে হাতে হাতে ধরলেন, এবং অপহৃতা স্ত্রীলোক দুজনকে উদ্ধার করলেন। অথচ কা'ল রাত্রের মধ্যে আমরা গোটাকতক 'ডেন' রেড করেছি। কি রকম হ'ল ব্যাপারটা, জানতে পাই কি?

বিজয় হাসলেন, বল্লেন, একটা জিনিষ গোড়া থেকে আমার কাছে খুব প্রয়োজনীয় ব'লে বোধ হয়েছিল, এবং সেইটাই আমার অনুসন্ধানের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। কুকুরের জন্যে যে সেঁকোবিষ অপব্যয়িত হয় নি, ওটার লক্ষ্য ছিল যে হরেন বাবু, এ অতি সহজ কথা, সবাই বুঝবে। কিন্তু আমার কাছে যেটা দরকারী ব'লে ঠেকেছিল—সেটা এই যে, হরেন বাবুকে যে লোকটা প্রাণে মারতে চেয়েছিল, সে তাঁর স্ত্রীকে মারতে চায় নি, তাঁকে জীবন্তই হরণ করেছিল। অর্থাৎ হরেন বাবুকে তার কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে একটা মস্ত বাধাস্বরূপ ব'লে তাঁকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেবার দরকার খুবই হয়েছিল, এবং তার সহজ উপায় ওঁকে মেরে ফেলে,—কারণ, এ রকম দুর্ব্বৃত্তদের কাছে উপায় যতই নৃশংস হক না কেন, তার জন্যে তারা মাথা ঘামায় না, উদ্দেশ্যসাধনই হচ্ছে এদের কাছে একমাত্র কাম্য। মনে রাখবেন যে, এ পক্ষে একমাত্র সমর্থ ও বুদ্ধিমান্ পুরুষ হরেন বাবু, যিনি বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে পদে পদে বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁকে সরাতে পারলে বাকী রৈল দুজন স্ত্রীলোক মাত্র, যাদের মুঠোর ভেতর আনা শক্ত নয়; এবং সে কাজ সুরুও হ'য়ে গিয়েছিল। সেই জন্যে হরেন বাবুর সম্বন্ধে সে সোজা পন্থাই নিয়েছিল, চিরকালের জন্যে তার রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া। ওঁর এবং সকলেরই সৌভাগ্য যে, ওঁর প্রভুভক্ত কুকুর তার নিজের প্রাণ দিয়ে ওঁর প্রাণ রক্ষা করেছে।

ওঁর স্ত্রী শৈলকে সে কিন্তু প্রাণে মারতে চায়নি, এটা ঠিক, নইলে আগের দিনই বিষ দিতে পারত। জীবন্ত শৈলকে দরকার ছিল ব'লে ওঁকে হরণ করে। এই কথাটা আমার মনে ভারি লাগে। তখনই আমার মনে সন্দেহ হয় যে, এর ভেতর এমন গূঢ় কোনও উদ্দেশ্য আছে, যার সিদ্ধি শৈল বেঁচে থাকলেই হয়, এবং যাতে শৈলর সম্বন্ধ, বস্তু হরেনের নেই।

শৈলর চ'লে যাওয়া দু'রকমে হ'তে পারত;—এক স্বেচ্ছায়, অন্য অনিচ্ছায়। লক্ষণ সব ছিল স্বেচ্ছায় চ'লে যাওয়ার মতনই, অকস্মাৎ স্বস্থ হ'লে উনি সখরে জুতো প'রে অথবা পার্শী শাড়ী প'রে যেতেন না, কিংবা ড্রয়িং-রুম চাবি দিয়ে দোরে তালা লাগিয়েও যেতেন না। তা'ছাড়া জনবহুল পাড়া থেকে দিন-দুপুরে কাউকে অনিচ্ছায় হরণ করাও

কঠিন। সেই জন্তে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাকে হরেন বাবুর কাছ থেকে খবর নিতে হয় যে, স্বেচ্ছায় গৃহ ত্যাগ করবার মত ওঁর মনোভাব ছিল কি না। হরেন বাবুর কথায় আমার প্রতীতি জন্মায় যে, সে রকম মনোভাব ওঁর ছিল না। অথচ লক্ষণ ত সব স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগেরই মত। এমনভাবে তিনি গেছেন, যাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, রীতিমত সাজগোজ করেই বেরিয়েছেন। সবগুলো একসঙ্গে ক'রে আমি এই অনুমানে উপনীত হলাম যে, গোড়াটায় বেরোবার সময় উনি কোন বন্ধু ব্যক্তির সঙ্গেই বেড়াবার জন্ত বেরোন, এবং এও শুনলাম যে, উনি এমন বেরোতেন। সে বন্ধুর ওপর যে ওঁর বিশ্বাস ছিল, তাও স্পষ্ট—এবং এও নিশ্চয় যে, তাঁর সঙ্গে উনি ইতিপূর্ব্বেও বেরোতেন। গৃহ থেকে ওঁকে স্বেচ্ছায় বার করিয়ে তার পর গাড়ীতে সে ব্যক্তি ওঁকে অচৈতন্ত ক'রে হরণ করে—এমনটি না হ'লে ঘটনাগুলির পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য থাকে না। আমার কল্পনা যে মিথ্যা নয়, তা আপনারা শৈলর নিজের মুখ থেকে শোনা তাঁর কাহিনী থেকেই জানতে পেরেছেন।

এইটে যখন স্থির করলাম, তখন বাকীটা সহজ হয়ে গেল। পৃথিবীতে সকল দুষ্কর্ম্মেরই মূলে প্রধানতঃ দুইটি কারণ থাকে, নারী এবং অর্থ। এ ক্ষেত্রে প্রথমটির অবসর ছিল না, সুতরাং সম্ভবতঃ দ্বিতীয়টি। সে অর্থের সঙ্গে শৈলর সম্বন্ধ। হরেনের কাছে যা শুনলাম, তাতে বোঝা গেল যে, মানদা বহু অর্থ রেখে গেছেন, এবং তৃতীয় ব্যক্তির সে অর্থ পাওয়ার পক্ষে বাধা শৈল, উষা এবং পরোক্ষে হরেন। এক জনকে হরণ করা হয়েছে, আর এক জনকে চিরদিনের জন্ত সরাবার ব্যবস্থা হয়েছিল, বাকী রৈল তৃতীয় ব্যক্তি উষা। আমি নিশ্চিত জানতাম যে, উষারও হরণ অবশ্যম্ভাবী, এবং নিশ্চয়ই সে অবিলম্বে, এবং থিয়েটার থেকে ফিরে আসার পর ; কারণ, তার পূর্ব্বে সুবিধামত সময়ও ছিল না, এবং থিয়েটারে না গেলে তখনই লোক-জানাজানি হয়ে যাবার সম্ভাবনা। থিয়েটার থেকে ফেরার পর নিশীথ রাত্রে হরণের প্রকৃষ্ট সময়। সেই জন্তেই আমি তাঁর থিয়েটার থেকে ফিরে আসার পরই এই ঘটনাটির প্রতীক্ষা তাঁর বাড়ীর কাছে থেকেই করছিলাম।

আমাদের চোখের সামনে থেকে এই হরণ-ব্যাপার সম্বন্ধে সুধীর একটু বেশী রকম আপত্তি করেছিল। আমি কিন্তু নিশ্চিত জানতাম যে, উষার জীবনের কোন শঙ্কা ছিল না, এবং এও জানতাম যে, এ সুযোগ যদি হারাই ত শৈলকে পাওয়া কঠিন হবে। কোথায় যে তাঁকে রাখা হয়েছে, তা জানা আমাদের অসম্ভব হ'ত,—যদি দুর্বৃত্ত নিজেই না দেখিয়ে দিত।

এখন বাকী রৈল কে ও কাজ করেছে, তার সম্বন্ধে একটা অনুমান করা। পূর্ব্বাপর ঘটনা এবং অনুমানগুলো এক-সঙ্গে ক'রে ভাবলে এও তেমন কঠিন কাজ নয়। শৈল এবং উষার পর মোক্ষদার ঐ টাকায় দাবী। ওদের দু'জনকে উপর্য্যুপরি হত্যা করা হয় ত সম্ভব হ'তে পারত, কিন্তু মোটেই নিরাপদ নয়। মানদার টাকার ওরাই উত্তরাধিকারী এবং ওদের যুগপৎ হত্যা সুনিশ্চিত দেখিয়ে দিত হত্যাকারী কে এবং তার উদ্দেশ্য কি। পাকা খেলোয়াড়রা এমন কাঁচা চা'ল দেয় না। তার চেয়ে জীবন্ত ওদের দ্বারা কাজ হাসিল ক'রে নিয়ে, ওদের এমন ভয় পাইয়ে দেওয়া যে, ওরা প্রাণ থাকতে আর আপত্তি করতে পারবে না, এই হচ্ছে পাকা চা'ল। মোক্ষদাই যে এ সমস্ত ব্যাপারের কেন্দ্র, তা বোঝা সহজ, এবং নিশ্চয়ই সে পরম বন্ধু প্রসাদের প্রলোভনে এবং প্ররোচনায় প'ড়ে অত বড় ভবিষ্যৎ লাভের মোহে অন্ধ হয়ে পড়েছিল। প্রসাদ পরের অন্নে প্রতিপালিত, এবং যে আবেষ্টনের মধ্যে সে থাকত, তা কদর্য্য। এতে মানুষ সহজেই দুর্ব্বৃত্ত হয়ে ওঠে, বিশেষ সে যে সব সঙ্গে থাকত। সুতরাং আমি নিশ্চিত অনুমান করলাম যে, এ কাজ মোক্ষদা ও প্রসাদের। তার পর হরেনের বাড়ীর কাছে নালায় কুড়িয়ে পাওয়া এই যে ছোট দোমড়ান কাগজটি, এ বহু সাহায্য করবে আপনাদের এই কেসে। ওইতে ক'রে সেঁকো বিষ এনেছিল প্রসাদ, আর জানালা দিয়ে দুধের কড়ায় ফেলেছিল। হরেনের সৌভাগ্য যে, তার সে দিন পেট খারাপ হওয়ায় ও-দুধ খায়নি, খেলে ব্যাপার অন্যরূপ ওর পক্ষে দাঁড়াত একেবারে অন্যরূপ। ওই কাগজখানায় প্রসাদের আঙুলের টিপ প'ড়ে যায়। সুধীর ওই টিপের এনলার্জড ফটো নিয়েছে, আপনাদের নেওয়া টিপের সঙ্গে মেলালে দেখবেন, দুটোই প্রসাদের। এই কাগজখানা প্রথমতঃ প্রসাদের সঙ্গে এই কেসের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধের কথা প্রমাণ করবে। দ্বিতীয়তঃ এ একটা দলীলের খসড়া—যা দু'চার কথা কয়টি পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যাবে।

এখন পেয়েছেন,—যাতে শৈল আর উষার স্বাক্ষর নেওয়াই ছিল দুর্ব্বৃত্তের উদ্দেশ্য। ওতে মানদার যে দস্তখত—সেটা হয় জাল, না হয় ত তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রসাদ আর মানদা জোর ক'রে তাঁকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে। মানদার আকস্মিক মৃত্যু স্বাভাবিক কি না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ, মিষ্টার রায়, কিন্তু সে বোধ করি, এখন অনুসন্ধানের বাইরে। যাক্, ওই দলীলটা হচ্ছে একটা কৃত্রিম দানপত্র—যাতে মানদা ৩৫ হাজার দিয়েছেন মোক্ষদাকে, এবং পাছে আদালতের সন্দেহ হয় ব'লে বাকী ১৫ হাজার যে শৈল আর উষার রৈল, তারও উল্লেখ আছে। মোক্ষদা মানদার স্নেহের পাত্রী এবং কন্যারা পৃথক্ হ'লেও মোক্ষদা যে মানদার সঙ্গে থেকে তাকে অহরহ সেবা করেছে, এই হ'ল অতবড় দানের অজুহাত। একেবারে যুক্তিহীন নয়, এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ বাহ্য অবস্থার সঙ্গে মেলেও বটে। এই দলীলে যদি শৈল আর উষার দস্তখত করিয়ে নেওয়া যায়, তা হ'লে ওটা হবে পাকা আর ওদের দুজনেরই মুখ বন্ধ হয়। এ সব কথাই আমার স্পষ্ট অনুমান হয়েছিল, এবং দেখেছেন যে, সে অনুমান এবং তদনুযায়ী আমার কার্য্যপদ্ধতি নিষ্ফল হয়নি।

ইন্‌স্পেক্টর রায় বল্লেন, অদ্ভুত, অদ্ভুত। I take off my hat, বিজয় বাবু। কিন্তু এখন উঠতে হয় আমাকে, আপনার কাজ ত সব শেষ করলেন, কিন্তু বাকী বহু উঞ্ছ পড়ল যে আমাদের ঘাড়ে!

বিজয় বল্লেন, উঠবেন ত, কিন্তু দুটি নবীন বন্ধু বোধ করি আপনাকে কিছু বলতে চান।

রায় ফিরে দেখলেন, শৈল আর উষা। তারা হাত যোড় ক'রে বল্লে, আজ দয়া ক'রে এইখানেই আপনাকে খেয়ে যেতে হবে, কারণ, এঁর কৃপায় আমাদের সকলের পুনর্জীবনলাভের উৎসব আজ এইখানেই হবে,—এঁর সদয় অনুমতিতে!

রায় মুখে হাসলেন, কিন্তু চোখ দুটো ছলছল ক'রে উঠল, বল্লেন, সত্যি মা, এঁর এই দুটি হাত আশ্চর্য্য ভেল্কী খেলে, ওরা নিরানন্দ গৃহে আনন্দ ফিরিয়ে আনে—অশ্রুপ্রবাহের পরিবর্ত্তে হাসির ঢেউ তোলে।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ফুলের ডাক

আয় রে ভোমর তুই আয় রে ত্বরা,
মৌমদে মোর হৃদিপেয়ালা ভরা!

সুকোমল দলগুলি
সহসা গিয়েছে খুলি,
রেণু পড়ে ঝরি-ঝরি
হরদম—'হরঘড়ি',
'বদ্ধ বুকের মোর গন্ধ লুটি,'
মন্দমধুর বায় যায় সে ছুটি।
আজি বনের উৎসব এসেছে ফাগুন,
মধুকর মধু তরে গাও গুন্-গুন্।

সেই মধু পলে-পলে মরমতলে
জমিল গো এত দিন আজি উথলে।
আয় বঁধু আয়,
লয়ে যা রে হৃদি-মধু বেলা বয়ে যায়!
এখনি ত যাব ঝরে
ধূলি-ভরা ধরাপরে,
এস সখা ত্বরা ক'রে
ক্ষণিক তরে।

লও হৃদি-সম্পদ্ উজাড় ক'রে,
বিশ্ব হইতে যাই নিঃস্ব—ঝরি'
বিকচ এ যৌবন সফল করি।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গ-সাহিত্যে সুরেন্দ্রনাথের স্থান

সহস্র অনুমান, কল্পনা, তর্ক ও বিচারের ব্যর্থ প্রয়াস সত্ত্বেও সৃষ্টির রহস্য মানুষের কাছে চিরদিন রহস্যই রহিয়া গিয়াছে। তাহাকে ব্যাখ্যা করিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া তাহার গোপন কথাটি প্রকাশ করিতে হয় ত বা স্রষ্টা নিজেও অপারগ; কেন না, সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি করাই ধর্ম্ম এবং তাঁহার সৃষ্টির কলকাঠী, মন্ত্র-তন্ত্র সমস্ত গুপ্ত কক্ষে বদ্ধ রাখিয়া কেবল-মাত্র সৃষ্ট সামগ্রী দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে আনিয়া তাহাদিগকে মুগ্ধ—স্তম্ভিত করিয়া দেওয়াতেই তাঁহার আনন্দ। সমধর্ম্মী ব্যতীত সেই গুপ্তগৃহে আর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই—থাকা সমীচীনও নহে। ইহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে, তাহাই আমাদের এখন দ্রষ্টব্য।

মানুষ তাহার সাধ্যের মধ্যে যতটুকু আছে, তাহা না করিয়া পারে না, সাধ্যাতীত প্রয়াসেও সে বিমুখ নহে, তাহা ব্যর্থই হউক আর সার্থকই হউক। উল্লিখিত সনাতন রহস্য-গৃহের দ্বার উদ্ঘাটনের বিপুল প্রয়াসের সাক্ষ্য দিতেছে জগতের দর্শনশাস্ত্র। মানুষ তাহার বিশ্ববিজয়িনী বুদ্ধি প্রভাবে সৃষ্ট যাহা কিছু সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের নামকরণ, শ্রেণী-বিভাগ, সংযোগ-বিয়োগ প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া কতিপয় সিদ্ধ সত্য বিধিতে উপনীত হইয়াছে, এই সার্থক প্রয়াসই বিজ্ঞানের জয়ডঙ্কা বাজাইয়া জগৎকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে।

সকল দেশের সকল কালের ন্যায় বাঙ্গালার আধুনিক সাহিত্য-জগতেও ঐ সনাতন নীতির ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এখানে রসসৃষ্টির অব্যাহত ধারা পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার মত নব নব ভগীরথের শঙ্খধ্বনির অনুসরণ করিয়া কখনও সংস্কৃত হিমাদ্রি-শেখরাগত বিগলিত তুষারসম্পাতে স্বীয় কলেবর পুষ্ট করিয়া, কখনও সাগর-বিরহকাতরা ক্ষীণা তন্বীর ন্যায়, কখনও বা বিদেশিনী পথসঙ্গিনীর প্রেমালিঙ্গনে উদ্বেলিতা হইয়া আপনার দুই কূল প্লাবিত করিয়া বিচিত্র বীচিভঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে। ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্র বন্ধনের শত শত সূত্রে জাল রচনা করিয়া সৃষ্টির সেই লীলায়িত গতিটিকে বাঁধিয়া নিয়মানুগ করিয়া দিতে চাহিতেছে; কিন্তু সে তাহার নবনৃত্যমাধুরী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, গিরিচরণ চুম্বন করিয়া পাদপমূল ধৌত করিয়া দিয়া শ্যামল তটভূমিতে নানা রঙ্গের, নানা রসের তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে আপন তালে আপন মনে চলিয়া যাইতেছে। এই বন্ধনের মধ্যে মুক্তি, এই নিয়মের মাঝে অনিয়ম, এই মৃত্যুর কোলে জন্ম, এই পুরাতনের দেহে নূতন, এই সমাপ্তির সহিত আরম্ভই সৃষ্টির সনাতন রহস্য।

আমরা সেই রসধারার নিত্য নূতন ভঙ্গী প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিয়া লইতে লইতে যদি একটি ধারাবাহিক নিয়ম কিংবা তাহার অনুকূল সঙ্গীতের সুরটিকে অথবা ঐ জীবন্ত নৃত্যের তালটিকে আয়ত্ত করিবার প্রয়াস পাই, তাহা হইলে আমরা অনধিকারচর্চ্চার গুরু অপরাধ হইতে নিঃসন্দেহে রক্ষা পাইতে পারি।

চক্ষু-কর্ণ উন্মুখ করিয়া উক্ত রসসৃষ্টি-লীলাসম্ভোগে আপনাকে ছাড়িয়া দিলে প্রথম প্রথম আমাদের দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় তন্ময় হইয়া যায়। তাহারা শীতের শান্ত স্রোতকে শিশিরসিক্ত উত্তর-সমীরণস্পর্শে মধ্যে মধ্যে শিহরিতে দেখিয়া আপনারা কাঁপিয়া উঠে—বসন্তের দক্ষিণ-বাতাস যখন নবোদ্গত পত্র-পুষ্প দোলাইয়া আসিয়া তটিনীকে বীচিমালিনী করে, তখন তাহারা আকুল হয়—বর্ষার বারি-ধারা পূর্ণযৌবনা স্রোতস্বিনীবক্ষে অসংখ্য বুদ্‌বুদ তুলিয়া নিমেষে মিলাইয়া দিলে তাহারা ক্ষুব্ধ হয়—প্রস্ফুটিত কুমুদ-কমলশোভিত শরতের পরিপূর্ণ নদীবক্ষে হংসমিথুনের জল-খেলা দেখিয়া তাহারা পরিতৃপ্ত হয়, আবার প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার দিনে ধারাটিকে ব্যর্থ আক্রোশে আস্ফালন করিতে দেখিয়া তাহারা ভীত হয়—অথবা নিশীথ জ্যোৎস্না-কিরণে শুভ্র দেবশিশুটিকে লইয়া যখন তাহার মত তরঙ্গমালায় মধ্যে খেলার কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায় এবং সেই খেলা আশ্রয় করিয়া শিশুটি যখন কলহাস্যে চঞ্চল হইয়া উঠে, তখন তাহারা মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত নিস্তব্ধ—মোহিত হইয়া যায়, কিংবা যখন রজনীর অন্ধকারে অনুকূল বায়ুভরে তাহার নৃত্যানুগামী মধুর দেবসঙ্গীত দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে থাকে, তখন তাহারা সেই সুরলহরীশ্রবণে একাগ্র মুগ্ধ হইয়া থাকে।

করিতে করিতে ঐ বিচিত্র লীলাভঙ্গীর মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা লক্ষ্য হয়, তখন ইন্দ্রিয়গ্রামের উপর আর একটি মহাশক্তি কার্য্য করিতে থাকে এবং সে শক্তিকে এক কথায় আমরা ধীশক্তি বলিতে পারি। আমরা দেখিতে পাই যে, বাঙ্গালার রস-সাহিত্যের নিয়মানুগ ধারাবাহিকতার একটি নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য আছে এবং সেই লক্ষ্যে পৌছিবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা স্রষ্টার পর স্রষ্টাকে অবলম্বন করিয়া একটি বিশিষ্ট পথে আপন স্বভাবানুযায়ী বিশেষ গতিভঙ্গীতে দিনের পর দিন অগ্রসর হইতেছে। একটি গান যেমন নিখাদে বা পঞ্চমে উঠিয়া আবার রেখাবে বা খাদে নামিতেছে, মধ্যে হয় ত গান্ধারে উঠিয়া নামিয়া আবার পঞ্চমে উঠিল—কখনও ধৈপদ পর্য্যন্ত গিয়া নামিয়া যাইতেছে—এই অসংখ্য অনিয়মের মধ্যে একটি বিশেষ সুর বা তালের নিয়ম রক্ষা করিয়া থাকে এবং গানের পদগুলি অবলম্বনে সুরের হিন্দোলায় তাল-লয়ের সমন্বয় করিয়া গান তাহার আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চলে—বাঙ্গালার রস সাহিত্যের ধারাও সেইরূপ সৃষ্টিপটু রসিক কবিগণকে অবলম্বন করিয়া নব নব তরঙ্গ সৃষ্টি করিতে করিতে উপন্যাস, নাটক, কাব্য, গল্প, কবিতা প্রভৃতির পর্দ্দায় পর্দ্দায় সুর-লয়ের অবিশ্রাম খেলা খেলাইয়া জাতির কণ্ঠে আবহমানকাল হইতে যে অচিন্তনীয় সঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলিতেছে, তাহা কোন গুণী শ্রোতার শ্রবণে বেতালা বাজিতেছে না।

বঙ্কিম-যুগের পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যের যে যুগ গিয়াছে, তাহাকে প্রাচীন সাহিত্যের জরাগ্রস্ত জীর্ণ বার্দ্ধক্য বলিতে পারা যায় এবং সেই বার্দ্ধক্যের করুণ কাতর অবসান ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমকার গানের যুগে। প্রাচীন সাহিত্যের স্থিরযৌবনের পদাবলী সাহিত্যরূপ একমাত্র উপযুক্ত সন্তানের মুখ চাহিয়া চির-কল্যাণময়ী জননীকে তাঁহার শেষ বয়সের দাশরথি, গোবিন্দদাস, নিধুবাবু প্রভৃতির গানে আপনার নিষ্প্রভ সকরুণ মুখখানি মাতৃগৌরবে উন্নত করিয়াই রাখিয়াছিলেন।

তার পরে বঙ্কিমযুগ—বাঙ্গালার আধুনিক সাহিত্যের স্বর্ণ-ঊষা। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ বলিতে আমরা রাজা রাম-মোহনের সাহিত্য-রচনা হইতেই বুঝিয়া থাকি। তখন সমুখে অন্ধকার "রজনী একাকী পোহায় ধীরে ধীরে, রঙীন মেঘমালা উষারে বাঁধে ঘিরে।" অন্ধের যষ্টি মাতৃদুঃখাতুরা মেয়েটির মত শুকতারা যখন 'মায়ের মুখে চেয়ে' মরণপথের যাত্রী জ্যোতিঃহারা রক্তহীন চন্দ্রদেবের সহিত গগনে অদৃশ্য হইল, তখন রক্তিমরাগরঞ্জিত অধরে সুধা-হাস্যের লহরী তুলিয়া সুকুমার শিশু তরুণ অরুণ পূর্ব্বদিগন্ত-কোলে প্রকাশ পাইয়া সমগ্র আকাশ আপনার কলহাস্যের বিমল আভায় উদ্ভাসিত করিয়া দিল। দেবশিশু অনঙ্গ-সখা চিরনবীন বসন্ত যেন তাহার নবীন কুসুমপল্লবের সহস্র সুকোমল অঙ্গুলি নাড়িয়া নবীন বিমল প্রভাতকে "চাঁদ আয়, চাঁদ আয়" বলিয়া আবাহন করিল—সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের কুসুমগন্ধ দখিণ-হাওয়ার রথে চড়িয়া দিকে দিকে ব্যাপ্ত হইয়া জগৎকে আমোদিত এবং মানব-মনকে একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। বাঙ্গালার পাঠক-সমাজ অতৃপ্ত বাসনা ও স্মৃতির তাড়না লইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে ভরা বসন্তের নিবিড় স্পর্শে শ্যামলা পুষ্পিতা ধরিত্রী যেমন ধন্য হন—বঙ্গকাব্য-সাহিত্যক্ষেত্রেও তদ্রূপ ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রভৃতি সুপটু শিল্পীর তুলিকাঘাতে নব নব ভাব, রস ও বর্ণের বিচিত্র সমাবেশে অতি মনোহর সুন্দর শ্রীঃ ধারণ করিল।

বঙ্কিম-যুগের সাহিত্য-সাধনা ছিল সকাম, শান্ত এবং সংস্কারপরায়ণ। ভাবিয়া চিন্তিয়া, প্লট স্থির করিয়া, পরি-চ্ছেদ বা সর্গ ভাগ করিয়া লইয়া কবি ও লেখক রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তাই তাঁহাদের সৃষ্টিকে সকাম বলা হইয়াছে। তাঁহারা ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের এবং সামাজিকতার বিধি নিয়মের শাসন মানিয়া চলিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন এবং 'স্বর্ণমৃগের' জন্য উতলা না হইয়া বরং মৃগলাভের আশা ত্যাগ করিতেন, তথাপি "গণ্ডী" ছাড়াইতেন না—এই জন্যই তাঁহাদিগের কার্য্য ছিল সংযত, শান্ত। তাঁহারা হয় বিদেশী সাহিত্যের সাহায্যে অথবা সংস্কৃতের আদর্শে বঙ্গসাহিত্যের সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের সাধনা ছিল সংস্কারপরায়ণ। এই যুগ-সাহিত্যের উল্লিখিত তিনটি চরিত্রগত লক্ষণের সহিত তাহার শৈশবসুলভ প্রকাশ্য অনুকরণপ্রবৃত্তির উল্লেখ করিতে আমরা ন্যায়তঃ বাধ্য। পরবর্ত্তী যুগের ন্যায় তখনও উক্ত প্রবৃত্তি বেশ স্বভাবগত হয় নাই, ভাসা-ভাসা রহিয়াছে, তাই সহজেই ধরা যায়।

এখনকার রবীন্দ্র-যুগের বঙ্গসাহিত্য ভরা যৌবনে টলমল করিতেছে। তাহার 'যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে?' তাহার ঢলঢলে রূপ আজ জগৎকে মুগ্ধ চকিত করিয়া তুলিয়াছে। যৌবনশ্রী আজ তাহার প্রত্যেক অঙ্গকে আপন আপন পরিপূর্ণতা দান করিয়া নয়নের চঞ্চল কটাক্ষে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তাহার গর্ব্বোন্নত মুখখানি আজ অন্তরের অমলিন মাধুর্য্য, উদ্দাম লালসা, প্রমত্ত বিদ্রোহ, গভীর প্রেম ও সুমহান্ ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত। আলুলায়িতকুন্তলা পূর্ণযৌবনা বর্ষারাণীর মত সে আজ শৈশবের অকারণ শুভ্র হাস্যের পরিবর্ত্তে সস্মিত সুন্দর গাম্ভীর্য্যে পক্ষশেষের পূর্ণ জোয়ারের নদীর মত কূলে কূলে ভরা তাহার সে স্বভাবসুলভ কুলকুলগীতি আজ শিক্ষালব্ধ বিজ্ঞানসম্মত সঙ্গীতের দ্যোতনায় ছলছল করিতেছে। তখনকার লঘু ক্রন্দন আর তাহার নাই—এখন তাহার বিগলিত মর্ম্মবেদনা যখন অশ্রু হইয়া কপোলদেশ বাহিয়া ঝরিয়া পড়ে, তখন দর্শকের হৃদয়ও সেই নিদারুণ ব্যথায় ব্যথিত হইয়া উঠে। ললাটে সিন্দূরবিন্দু পরিয়া সুন্দর মেয়েটি ঊষা প্রভাতে আমাদের আছে আসিয়া ছোট বোন্‌টির মত খেলা করিতেছিল—বেলা বাড়িতে সে যেন সুধাশান্তির চেষ্টায় তাহার কমনীয় কান্তির সহিত 'মমতায় বিগলিত' হৃদয়টি লইয়া মায়ের সন্ধানে অন্তঃপুরমধ্যে চলিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে এখন প্রখর মধ্যাহ্নের তপ্তসূর্য্য আমাদের মাথার উপর উঠিয়া সমগ্র আকাশমণ্ডলের সহিত পৃথিবীকে ঝলসিয়া দিতেছে। সে তাহার দীপ্ত চক্ষুতে ভুবন জয় করিয়া বিশ্বসভায় আপনার বরণীয় আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

রবীন্দ্র-যুগের সাহিত্যের সাধন-বেদিকায় আজ নিষ্কাম ধর্ম্ম তাহার উদ্দাম বিদ্রোহলীলা প্রকট করিতেছে। এ যুগে রসসৃষ্টির অনুপ্রেরণা জাগিলেই কবি রচনা করিয়া ফেলেন—তাঁহার সুচিন্তিত প্লট বা পূর্ব্বসংকল্প কিছুই থাকে না; এই সংকল্পশূন্য যজ্ঞকেই আমরা 'নিষ্কাম' বিশেষণে বিশেষিত করিতেছি। এখন স্রষ্টা বা শিল্পী ছন্দ ও যতি, সূত্র ও ব্যাখ্যা সংকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া যথেচ্ছ ছন্দে এবং অনিয়মানুগ গতিভঙ্গীতে পটের গায় আপন আপন তুলিকা বুলাইয়া চলিয়াছেন। সৃষ্টির আনন্দে তাঁহারা রচনা করিয়াই চলিয়াছেন—ফলাফলে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই, সৃষ্টির এই উদ্দামতা নিজের উচ্ছ্বাসে সংস্কার ও শান্তির বাঁধ প্লাবিত করিয়া চলিয়াছে। এই "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" নীতির বাস্তব দৃষ্টান্তের মধ্যে অনুকরণস্পৃহা প্রবলভাবে সকল ক্ষেত্রে বর্ত্তমান না থাকিলেও পরকে আপন করিয়া লইবার শক্তি বা বিশ্বমানবতা লক্ষিত হয়।

উল্লিখিত যুগদ্বয়ের মধ্যে একটি অপূর্ণ ব্যবধান, একটি সুনিশ্চিত অভাব যে বঙ্গীয় পাঠক-সমাজ উপলব্ধি করিতেছে, তাহা সুরেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণেই সপ্রমাণ হইতেছে। এই যুগান্তরকাল ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই যেন বিধাতা সুরেন্দ্রনাথের জীবনকাল কিঞ্চিদধিক ৪০ বৎসর মাত্র নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন এবং ফলে তাঁহার সৃষ্টিলীলা আরও সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথেই যেন বঙ্কিম-যুগের শেষ এবং রবীন্দ্র-যুগের আরম্ভ। তাঁহার পরেই কবীন্দ্রগুরু বিহারীলাল নবযুগের উদ্বোধন করিলেন তাঁহার "সারদা-মঙ্গলে"। কবির "সবিতা সুদর্শন" ও "ফুলরা" কাব্য বিগত যুগের বিসর্জ্জনমন্ত্র পাঠ করিল—"বর্ষবর্জন" ও "মাদক-মঙ্গলে" আমরা নূতন ও পুরাতনের অভিনব সংমিশ্রণ দেখিতে পাই, কিম্বা ভূমিকা ও সমাপ্তির মিশ্র সুরের মূর্চ্ছনায় মোহিত হই—তার পরে তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক 'হামির' যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান', 'মেবার-পতন' প্রভৃতি নাটকের মঙ্গলাচরণ করে, তাঁহার 'মহিলা' কাব্যও সেইরূপ রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র বোধনে আগমনী গান করে। মজুমদার কবির সাহিত্য-সাধনাই সকাম হইতে নিষ্কামে আসিবার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দেয় এবং সেই নির্দ্দিষ্ট যাত্রার পথেই শান্ত সংযত পাঠক-পথিক উদ্দাম চঞ্চল হইয়া উঠে এবং গন্তব্য স্থানের ভরসায় পূর্ব্বাশ্রয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া চলে, দেখিতে পাই। তাঁহার রস-সৃষ্টির বিশিষ্টতা আমরা কবির নিজের কণ্ঠেই প্রচার করি :—

"বর্ণিতে না চাই হ্রদ, নদ, সরোবর,
সিন্ধু, শৈল, বন, উপবন
নির্ম্মল নির্ঝর মরু—বালুর সাগর
শীত-গ্রীষ্ম-বসন্ত-বর্ণন ;
হৃদয়ে জেগেছে তান,
পুলকে আকুল প্রাণ,
গাবো গীত খুলি হৃদিদ্বার,—
মহীয়সী মহিমা মোহিনী-মহিলার।

কোন বরবর্ণিনী বিশেষ নায়িকার
চাটু-স্তুতি না চাই রচিতে,
সমুদয় নারীজাতি নায়িকা আমার,
বাঞ্ছা চিতে বিশেষ বর্ণিতে ;
স্মরি চির-উপকার
দিব গীত উপহার
শুধিবারে ধার মমতার
মায়া কায়া মাতা, ভগ্নী, নন্দিনী জায়ার।"

সুরেন্দ্রনাথের শিল্প-কৌশলে 'শিশির-ভেজা' সেফালিকার মত। রক্তাম্বরা বালিকা উষার অন্তর্ধানে শূন্য রঙ্গমঞ্চে সরলা কিশোরী সকালবেলা তাহার মল্লিকার ন্যায় স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যসুষমা লইয়া অবতীর্ণা হইল—কিশোরী সকলের স্নেহাকর্ষণ করিল, তাহাদের লঘু জীবনক্রীড়া সাঙ্গ করিয়া সকলকে চিন্তা করিতে শিখাইল, কিন্তু কাহাকেও ব্যাকুল করিল না। কিশোরীর সহজ সুন্দর রূপ চঞ্চল মানব-মনকে চকিত করিয়া তুলিল, কিন্তু তাহাকে আকুল হইতে দিল না। বিশ্বামিত্রের ন্যায় স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে ত্রিশঙ্কুর আবাসস্থলের মত কবি শৈশব ও যৌবনের মধ্যে কৈশোরের সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালার আধুনিক রস-সাহিত্যের পূর্ব্বাপর দুইটি যুগকে যে সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত করিলেন, তাহাতেই রসধারার স্রোতোগতি অব্যাহত রহিল। সাহিত্য-তরীখানি মধুমাসের মলয়-কম্পিত স্বচ্ছতটিনী অতিক্রম করিলে পর নিজে কর্ণধার হইয়া তাহাকে কালবৈশাখীর বাত্যাবিক্ষোভ হইতে রক্ষা করিয়া সংকীর্ণ-সলিলা শৈবালাচ্ছাদিতা নদীবক্ষে অতি নিপুণতার সহিত বাহিয়া লইয়া গিয়া উদ্বেলহৃদয়া বর্ষার প্রসারিত বাহুমধ্যস্থ নিবিড় আলিঙ্গনে তাহাকে সমর্পণ করিয়া কবি নিজে তীরে উঠিলেন। তাঁহার রসসৃষ্টির সার্থকতা এইখানে এবং এই গুরু কর্ত্তব্যপালনেই তিনি যথার্থ স্রষ্টার আসনলাভের অধিকারী হইয়াছেন।

অতি সামান্য সামান্য ঘটনা বা ভাব এই যুগসন্ধিক্ষণের রসস্রষ্টার অন্তরে নব নব প্রেরণা জাগাইয়াছে, আর সেই "অহং বহু স্যাম"—মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বতন্ত্র কাব্যজগতের সৃষ্টি হইয়াছে। এই মানবসংসারের চিরাভ্যস্ত দৈনন্দিন যে নরনারীর প্রেমকে বাণভট্ট তাঁহার "কাদম্বরী"তে জন্মান্তর-রহস্যের পরপারে লইয়া গিয়া স্বপ্নলোকী করিয়া ছাড়িয়াছেন, সেই প্রেমকে স্মরণ করিয়া আমাদের কীর্ত্তন-পরায়ণ কবি খঞ্জনি বাজাইয়া গাহিলেন—

"এ জীবনে শত শত সুখ-দুখ ঘটে কত
কালে সব হই বিস্মরণ ;
জিজ্ঞাসহ জনে জনে কার না যে আছে মনে
প্রণয়ের প্রথম চুম্বন।"—(ফুলরা)

আবার ফুলরাকে ডাকিয়া আশ্বাস দিতেছেন—

"ভিন্ন জাতি যদি হয় তবু হ'লে পরিণয়
ধর্ম্মলোপ কখন না হয় ;
জাতি গড়া মানুষের প্রেম সৃষ্টি ঈশ্বরের
কেন তবে কর ধনি ভয়?"—(ফুলরা)

এই মধুর শান্ত কীর্ত্তন সমজদার পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে যে ছবিখানি ফুটাইয়া তুলিল, তাহা বর্ণনার যোগ্য নহে, অনুভূতির সামগ্রী।

আবার বিশ্বনিয়মের অভ্রান্তপথে মহাকাল যে তাঁহার সময়ের রথখানি অনাদিকাল হইতে চালাইয়া আসিতেছেন, তাহারই একটি চলমান দৃশ্যদর্শনে কবি করুণ সুরে গাহিয়া উঠিলেন—

"ধীরে ধীরে যামিনীর আঁধার যেমন
অপরাহ্ণে করে আসি গ্রাস ;
বৃদ্ধকাল দুর্ব্বলতা, আসিছে তেমন,
প্রৌঢ়মতি গতি-বলনাশ।"—(বর্ষবর্ত্তন)

একতারার সাহায্যে আমাদের উদাসীন দরবেশ কবি বাউলের-সুরে এই গান গাহিয়া শ্রোতার নয়ন অশ্রুসিক্ত করিলেন। পরক্ষণেই জড়িতকণ্ঠে শক্তি-সাধক কবি নারীর স্নেহ-ঋণ স্মরণ করিয়া, স্বহস্তস্থিত বীণার তারে তারে ঝঙ্কার তুলিয়া, সেই সুরের মূর্চ্ছনার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিয়া উঠিলেন :—

"ধরা হীরা হয় হায় !
সিংহাসন রচি' তায়,
বসাইতে পারি যদি জননি, তোমায় !—
ফুল হয় তারাদল,
চন্দন সাগরজল,
শত কল্প বসি' যদি পূজি' তব পায় !"—
(মহিলা—মাতা)

কখনও হয় ত ভক্ত কবি ভক্তিভাজনের পীড়ন ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে না পারিয়া, লেখনীরূপ খড়্গ উদ্যত করিয়া ভৈরব হুঙ্কারে অকৃতজ্ঞকে আক্রমণ করিতেছেন :—

"প্রহার করিলে শিশু হবে সুশিক্ষিত
সতী রবে রমণী রাখিলে আবরিত,
অজ্ঞ-চিত, এ সকল ভ্রমের ভাণ্ডার।
* * * *"

(মহিলা—জায়া)

অথবা বিজিতের দৈন্য দর্শনে আক্ষেপ করিতেছেন :—

"বিদ্যা হ'লে ললনার বাধ্য না থাকিবে আর,
পুরুষ না মানিবে, হইবে অভিমানী !
* * * *
হ'লে নারী বিদ্যাবতী
কখন না থাকে সতী
কামিনী কামাগ্নি, বিদ্যা হবি হেন তার,
হেন ভ্রম হৃদে যার,
যুক্তি কি করিব তার,
হে বাণি, গণিকাদলে গণে সে তোমায়।"

(মহিলা—মাতা)

আবার যখন কবির এই রুদ্রমূর্ত্তি মুমুক্ষুর প্রশান্তি ধারণ করিল, তখন সেই—

"প্রবীণ, প্রাচীন, অতি সম্ভ্রমভাজন
বিগলিত হেয় কায় নয়,
ফুল্ল, পুষ্ট দেহ গর্ব্ব জানায় আপন
যৌবনের পুণ্য পরিচয়" (সবিতা-সুদর্শন)

কবি তানপুরা লইয়া তান ধরিলেন :—

"দেশ হ'তে গমন করিতে দেশান্তর
পাথেয়ের হয় প্রয়োজন
লোক হ'তে গমন করিতে লোকান্তর
পাথেয় বিষয়-বিসর্জ্জন।"

(সবিতা-সুদর্শন)

সেই সঙ্গীতের দ্যোতনায় বাঙ্গালায় কবি-হৃদয় মথিত হইয়া যে অপূর্ব্ব রসজগৎ সৃষ্ট হইল, তাহারই মধ্যস্থলে আজ নবযুগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী "ডান হাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড ল'য়ে বাম করে" অবতীর্ণা হইলেন।

ভৈরব-তটবর্ত্তী যশোহরস্থ জগন্নাথপুরের কবির পুস্তকাকারে প্রকাশিত (উল্লিখিত) কাব্যনাটক কয়খানির পৃথক্ পৃথক্ সমালোচনা করার স্থান এ নহে—আমাদের সংকল্পও তাহা ছিল না। বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার স্থান নির্ণয় করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য ; সে উদ্দেশ্য কতদূর চরিতার্থ হইয়াছে, তাহা পাঠক-পাঠিকাগণই বিচার করিবেন। তাঁহার দেহাবসানের পর তাঁহার মানস-কন্যার রূপগুণের খ্যাতি প্রচার লাভ করে। রসগ্রাহী মানবমন যখন পূর্ব্বযুগের বালিকা সাহিত্য-বালাকে কোলে লইয়া আদর করিয়া বুকের উপর দুলাইয়া সবেমাত্র নামাইয়াছে, এমন সময়ে কবির কিশোরী কবিতারাণী আসিয়া তাহাকে আপনার খেলাঘর, সঙ্গিনীর দল দেখাইয়া লইয়া নিজের সহজ সরল স্বভাবসুন্দর হাস্যালাপে পরিতৃপ্ত করিয়া দিল এবং ভাবপ্রবণ মানবহৃদয়ও তাহার সেই অতি মনোহর মুখখানিতে বৈশাখের সকালবেলাকার স্নিগ্ধ কমনীয়তা লক্ষ্য করিয়া শান্তিলাভ করিল। পরবর্ত্তী যুগের যৌবনচঞ্চলা কাব্য-লতিকার ন্যায় তাহার নয়নে কটাক্ষ ছিল না। বাগ্‌দেবীর শুভ্রচরণোদ্দেশে নির্ম্মল-সুন্দর মাঙ্গল্য রচনার জন্য যত কিছু উপকরণ প্রয়োজন হয়, সে সমস্তই তাহাতে বর্ত্তমান ছিল, কেবলমাত্র তাহাতে এই যুগসুলভ জীবন্ত সঙ্গীতের সরসতার কিছু অভাব অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুভূত হয়, সে যেন ছন্দের বন্ধনে সময় সময় বিরসবদনে বসিয়া থাকিত। তাহাকে অকুরন্ত স্নেহ-উপহার দান করিয়া আমরা স্বর্গীয় কবির চরণোদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণামের অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। কবিবর সুরেন্দ্রনাথের কাব্য ও কবিতাসংগ্রহনিচয় প্রচার অভাবে বিলুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছিল। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির কবিবরের অমূল্য কাব্যরত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া, নামমাত্র মূল্যে গ্রন্থাবলীর আকারে প্রচার করিয়া সাহিত্যের সম্পদবৃদ্ধি করিয়াছেন।

শ্রীত্রিদিব মুখোপাধ্যায় (এম্-এ)।

ভারতের রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা *

২
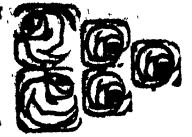
ভারতীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইলে, এটিকে স্বতন্ত্রভাবে, জাতির চিন্তাধারা ও জীবনের অন্যান্য অংশ হইতে পৃথক্‌ভাবে দেখিলে চলিবে না, সমগ্র সমাজ-জীবনের একটি অঙ্গরূপেই রাষ্ট্রকে দেখিতে হইবে।

একটি জাতি, একটি মহান্ মানবসমষ্টি বস্তুতঃ একটি জীবন্ত সত্তার ন্যায় (An organic living being), তাহার এক সমষ্টিগত বা সাধারণ আত্মা আছে, মন আছে, শরীর আছে। ব্যক্তির দৈহিক জীবনের ন্যায় সমাজ-জীবনকেও জন্ম, বিকাশ, পরিণতাবস্থা, অবনতি, এই সব অবস্থান্তরের ভিতর দিয়াই যাইতে হয়। যদি এই শেষ অবস্থা অধিক দূর অগ্রসর হয়, অবনতি ও ক্ষয়ের গতিকে রুদ্ধ করা না যায়, তাহা হইলে যেমন মানুষ বার্দ্ধক্যের পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তেমনই জাতিকেও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। এই ভাবেই ভারত ও চীন ব্যতীত জগতের আর সব পুরাতন জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সমষ্টিগত সত্তার এমন শক্তিও আছে যে, সে নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারে। ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা পাইয়া আবার নূতন জীবন আরম্ভ করিতে পারে। কারণ, প্রত্যেক জাতির মধ্যেই একটি মূলভাব ও আদর্শ ক্রিয়া করিতেছে, জাতির দেহের ন্যায় সেটি সহজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না; এই আদর্শ যদি যথেষ্ট শক্তিশালী, উদার ও প্রেরণাময় হয় এবং লোকের মনে ও প্রকৃতিতে যদি তেজ থাকে, প্রাণ থাকে, নমনীয়তা থাকে, যাহার দ্বারা তাহারা রক্ষণশীলতার সহিত সর্ব্বদা বিকাশ ও বৃদ্ধির সামঞ্জস্য করিতে পারে, জাতীয় আদর্শকে নূতন অবস্থার মধ্যে নূতনভাবে জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারে, তাহা হইলে সে জাতি চরম ধ্বংসে পৌঁছিবার পূর্ব্বে বহুবার পতন অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়া যাইতে পারে; তাহা ছাড়া ঐ যে জাতীয় ভাব ও আদর্শ, উহা জাতির সমষ্টিগত সত্তারই আত্মপ্রকাশের ধারা; আবার প্রত্যেক সমষ্টিগত আত্মাই এক মহত্তর নিত্য, সনাতন আত্মার অভিব্যক্তি ও প্রকাশের কেন্দ্র, সেই সনাতন আত্মা যুগে যুগে নিজেকে প্রকাশ করিতেছে এবং মানবজাতির পতন ও অভ্যুদয়ের ভিতর দিয়া মানব-সমাজের মধ্যে নিজেকে পূর্ণভাবে প্রকট করিতে চাহিতেছে। অতএব যে জাতি কেবল বাহিরের স্থূল জীবনের মধ্যেই বাস করে না, এমন কি, যে মূল জাতীয় ভাব তাহার বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং জাতিকে বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ব, বিশিষ্ট প্রকৃতি প্রদান করে, কেবল সেই মূল ভাবটিকেই ধরিয়া থাকে না; কিন্তু, ইহাদের পশ্চাতে যে আত্মা রহিয়াছে, অধ্যাত্মসত্তা রহিয়াছে—তাহার সন্ধান পায় এবং সেই নিগূঢ় আত্মসত্তার মধ্যে সজ্ঞানে বাস করিতে শিখে, সে জাতিকে ধ্বংস পাইতে হয় না, অপরের সহিত মিশিয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিতে অথবা এক নূতন জাতির জন্য স্থান ছাড়িয়া দিয়া সম্পূর্ণভাবে লয় পাইতে হয় না, পরন্তু নিজেই বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকসমাজকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া নিজের উচ্চতম স্বাভাবিক বিকাশসাধন করিতে পারে এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া পুনঃ পুনঃ নবজীবন লাভ করিতে পারে। যদিই বা কোনও সময়ে মনে হয়, এইবার বুঝি তাহার পূর্ণ ধ্বংস আসন্ন, এখনও সে আত্মার শক্তিতে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিতে পারে এবং হয় ত আরও এক অধিকতর গৌরবের যুগ আরম্ভ করিতে পারে। ভারতের ইতিহাস এইরূপই একটি জাতির ইতিহাস।

যে মূল ভাব ভারতবাসীর জীবন, শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক আদর্শসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তাহা হইতেছে—মানুষের প্রকৃত সত্তার, আত্মার সন্ধান করা এবং জীবনকে এমনভাবে কাযে লাগান, যেন জীবনের ভিতর দিয়াই মানুষ আত্মাকে লাভ করিতে পারে, অজ্ঞান প্রাকৃত জীবন হইতে উঠিয়া দিব্য অধ্যাত্ম-জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে; অবশ্য দেহ, প্রাণ, মনের যে নীচের প্রাকৃত জীবন, তাহার স্ফূর্ত্তি ও বিকাশসাধন করিয়াই মানুষের অধ্যাত্মজীবন লাভ করা সম্ভব। সকলের উপর এই যে অধ্যাত্ম আদর্শ, ভারত ইহা কখনও বিস্মৃত হয় নাই, যদিও রাষ্ট্র ও সমাজের গঠনে অনেক সময়েই বহু বাহ্য পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু সমাজ-জীবনকে মানুষের প্রকৃত আত্মার অভিব্যক্তি করিয়া তোলা মানুষের মধ্যে যে অধ্যাত্মসত্তা রহিয়াছে, সমাজের বাহ্যজীবনে তাহার কোন শ্রেষ্ঠ বিকাশসাধন করা সাতিশয় কঠিন; ধর্ম্ম, চিন্তাসম্পদ, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতি মনের ব্যাপারে আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ করা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী সহজ এবং যদিও এই সকল বিষয়ে ভারত অতি উচ্চ স্তরে উঠিতে পারিয়াছিল, বাহ্য সামাজিক জীবনে আত্মার নিতান্ত আংশিক প্রকাশ করা এবং নিতান্ত অসম্পূর্ণ পরীক্ষা করা ছাড়া আর বেশী কিছু করা সম্ভব হয় নাই। নানা রূপকের (Symbolism) ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিকতার সাধারণ প্রভাব, জীবনের সকল স্তরে অধ্যাত্ম লক্ষ্যের স্পর্শ, সমাজ-জীবনের একটি বিশিষ্ট ছাঁচ, অধ্যাত্ম আদর্শের অনুকূল অনুষ্ঠানসমূহের সৃষ্টি—কেবলমাত্র এইগুলিই কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইয়াছিল। ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষায় অর্থ ও কাম মানব-জীবন ও কর্ম্মের দুইটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল এবং রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি হইতেছে ঐ দুইটি উদ্দেশ্যসাধনের স্বাভাবিক ক্ষেত্র। জীবনের এই বাহ্য দিকে উচ্চতর নীতি বা ধর্ম্মকে কেবল আংশিকভাবে আনা ছাড়া আর বেশী কিছু কোথাও সম্ভব হয় নাই এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্ম্মের স্থান খুবই অল্প ছিল। কারণ, নীতিধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া রাজনীতিক কার্য্যপরিচালনের চেষ্টা সাধারণতঃ একটা ছল ভিন্ন আর বেশী কিছু নহে। মানবজাতির অতীত ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত সমষ্টিগত বাহ্য জীবনের সহিত মোক্ষ বা মুক্ত অধ্যাত্ম-জীবনের প্রকৃত সংযোগ বা সমন্বয় সাধন করা—আদর্শ হিসাবেও

---

* শ্রীঅরবিন্দের, "A Defence of Indian culture"

কোথাও গৃহীত বা অনুসৃত হইয়াছে কি না সন্দেহ, এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া ত দূরের কথা। মানুষ এখনও তদুপযোগী পরিণত অবস্থায় উপনীত হয় নাই। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতে মোক্ষলাভের সাধনা ব্যক্তিগত জীবনেরই উচ্চতম সাধনা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, কিন্তু সামাজিক, অর্থনীতিক, রাজনীতিক * জীবন-ধারাকে ধর্ম্মের † দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে, আধ্যাত্মিক সার্থকতাকে কেবল ছায়ার মত পশ্চাতে রাখা হইয়াছে; ভারতের প্রাচীন সমাজ ইহার অধিক আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তবে এই চেষ্টাটুকু সে ছাড়ে নাই, ধৈর্য্যের সহিত ইহাতে লাগিয়াছিল এবং ইহা হইতেই ভারতের সমাজব্যবস্থা এক নিজের বিশিষ্ট ধরণ লাভ করিয়াছে। ভারতের যে পুরাতন আদর্শ, আধ্যাত্মিকতার সহিত জীবনের সমন্বয় করা, গভীরতর অধ্যাত্ম সত্যের উপরে মানুষের সমষ্টিগত সত্তার জীবন ও কর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করা, আমাদের জীবনের যে সকল অধ্যাত্ম সম্ভাবনা এখনও প্রকট হয় নাই, তাহাদের উপরে সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এই ভাবে জাতির জীবনকে অধ্যাত্মভাবে গড়িয়া তোলা, যেন সমগ্র মানব জাতির মহত্তর আত্মার লীলা, বিরাট বিশ্বপুরুষের একটি সচেতন সমষ্টিগত সত্তা ও শরীর—এই আদর্শ ও লক্ষ্য হয় ত ভবিষ্যৎ ভারতকেই সফল করিয়া তুলিতে হইবে, লক্ষ্যকে আরও পূর্ণ ও প্রসারিত করিয়া, পূর্ণতর অভিজ্ঞতা, আরও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করিয়া ভবিষ্যৎ ভারতই এই ভাবে অধ্যাত্ম সত্যের উপর সমষ্টিগত সমাজ-জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে, যাহাতে ভারতের প্রাচীন রাষ্ট্রব্যবস্থার সহিত য়ুরোপের পার্থক্য হইয়াছে এবং যাহার জন্ম ভারতের আভ্যন্তরীণ শিক্ষা-দীক্ষার ন্যায় রাষ্ট্রজীবনকেও পাশ্চাত্য নিরিখ (Standards) অনুসারে বিচার করা চলে না। মানব-সমাজকে পূর্ণতম বিকাশের অবস্থায় পৌঁছিতে হইলে ক্রমবিকাশের তিনটি স্তরের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। প্রথমটি হইতেছে সেই অবস্থা, যখন সমাজের অবস্থা ও কর্ম্মসমূহ তাহার স্বাভাবিক জীবনলীলা হইতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইতেছে। তখন সমাজের সকল বিকাশ, সকল গঠন, রীতিনীতি, অনুষ্ঠান জীবনের স্বাভাবিক বিস্তাসে সংবৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, সে সকলের প্রেরণা আসিতেছে প্রধানতঃ সমাজ-জীবনের মগ্নচৈতন্তের স্তর হইতে; সজ্ঞানে ইচ্ছা করিয়া করা না হইলেও আপনা হইতেই সে সকলের ভিতর দিয়া জাতির সমষ্টিগত মনস্তত্ব, প্রকৃতি, শরীর ও প্রাণের প্রয়োজন প্রকাশিত হইতেছে, সে সব টিকিয়া থাকিতেছে বা পরিবর্ত্তিত হইতেছে কতকটা ভিতরের প্রেরণার চাপে, কতক সমষ্টিগত মন ও প্রকৃতির উপরে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে। এই স্তরে এখনও সজ্ঞান বিচার-বুদ্ধি পরিচালনা করিবার মত সচেতন (Self-Conscious) হইয়া উঠে নাই, সমষ্টিগতভাবে চিন্তা করিতে শিখে নাই এবং সমাজ-সমষ্টি জীবনকে বিচার-বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করে না, পরন্তু প্রাণের সহজোপলব্ধি অনুসারে জীবন যাপন করে। অন্যান্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের জনসঙ্ঘের (communities) ন্যায় ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রথম কাঠামো এইরূপ অবস্থাতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল; পরে যখন সামাজিক আত্মচেতনা জাগিয়া উঠিতে থাকে, তখনও সেই প্রাথমিক কাঠামো বর্জ্জিত হয় নাই, কেবল আরও সুগঠিত, পরিবর্দ্ধিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, অতএব তাহা রাজনীতিক আইনকর্ত্তা বা সমাজনেতৃগণের দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই। সকল সময়েই তাহা ছিল, দৃঢ়ভাবে স্থিতিশীল প্রাণবান্ সমাজতন্ত্র, ভারতবাসীর মন, সহজাত সংস্কার ও প্রাণের সহজোপলব্ধির পক্ষে স্বাভাবিক।

সমাজবিকাশের দ্বিতীয় স্তর আসে তখন, যখন জাতির সমষ্টিগত মন ক্রমশঃ অধিকতর বুদ্ধিতে সচেতন হয়, প্রথমতঃ অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে, পরে আরও সাধারণভাবে। প্রথমতঃ স্থূলভাবে, ক্রমশঃ অধিকতর সূক্ষ্মভাবে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই। তখন জাতি সমষ্টিগতভাবে নিজের জীবন, সামাজিক ধ্যানধারণা, অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিকশিত চিন্তাশক্তির আলোকে পর্য্যালোচনা করে এবং শেষে বিশ্লেষণমূলক ও গঠনমূলক বুদ্ধির দ্বারা সকল বিষয়কে বিচার করিয়া দেখে ও নিয়ন্ত্রিত করে।—এই অবস্থায় অনেক কিছু মহান্ হইবার সম্ভাবনা, আবার এই অবস্থার বিশিষ্ট বিপদগুলিও কম নহে। স্বচ্ছ বোধশক্তি এবং অবশেষে সঠিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বৃদ্ধিতে যে সব সুবিধা সকল সময়েই আসে, সমাজের এই অবস্থায় প্রথমতঃ সেই সুবিধাগুলি লাভ করা যায়; ইহার চরম পরিণতি হইতেছে নিয়মনিষ্ঠ, শৈথিল্যহীন ও সুরক্ষিত দক্ষতা (efficiency); সমালোচনামূলক ও গঠনমূলক বুদ্ধির, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির, পূর্ণ প্রয়োগের পুরস্কার ও ফলস্বরূপ এই দক্ষতা লাভ করা যায়। সমাজ-বিকাশের এই স্তরে আরও একটি মহত্তর পরিণাম হইতেছে মহান্ ও উজ্জ্বল ভাব ও আদর্শসমূহের আবির্ভাব। এই সব আদর্শ মানুষকে প্রাণের খেলার গণ্ডী হইতে, তাহার আদিম সামাজিক, অর্থনীতিক, রাজনীতিক প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা সমুদয় হইতে উপরে তুলিতে চাহে, গতানুগতিক আচার অনুষ্ঠানের উপরে তুলিতে চাহে, সমষ্টির জীবন লইয়া কল্পনার তেজোব্যঞ্জক নানা নির্ভীক পরীক্ষায় প্রেরণা আনিয়া দেয় এবং এইভাবে আরও উচ্চতর সমাজ-জীবনের সম্ভাবনার ক্ষেত্র খুলিয়া দেয়। জীবনের উপর এইরূপ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রয়োগ এবং ইহার উচ্চতম ফলস্বরূপ নিয়মনিষ্ঠ, সুসম্পন্ন, সুরক্ষিত দক্ষতা, এইরূপ সজ্ঞানে মহান্ সামাজিক ও অর্থনীতিক আদর্শসমূহের অনুসরণ, এবং এই চেষ্টায় সাফল্যের পরিমাণস্বরূপ ক্ষেত্রবিশেষে সমাজের প্রগতি—এই সবই হইয়াছে য়ুরোপের সামাজিক ও রাজনীতিক প্রচেষ্টার বিশিষ্ট সুবিধা, তাহাতে অন্য যতই অসুবিধা বা অপূর্ণতা থাকুক।

অন্যপক্ষে, বুদ্ধি যখন এইভাবে জীবনের উপাদানের উপরে একমাত্র নিয়ন্তা হইবার দাবী করে, তখন সে দেখিতে চাহে না যে, সমাজ একটা জীবন্ত জিনিষ, জীবন্তভাবে ইহার বিকাশ হইতেছে। পরন্তু দেখে, উহা যেন একটা য

---

* জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্র অপেক্ষা রাজনীতিকে ধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা শীঘ্রই ভাঙিয়া পড়িয়াছিল।

† ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা (মোক্ষ) এক জিনিষ নহে, যদিও সাধারণতঃ এই দুইটিকে গোলমাল করিয়া একই মনে করা হয়।

ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে পারা যায়, ইট, কাঠ বা লোহার ন্যায় প্রাণহীন জড়পদার্থের মত বুদ্ধির খেয়াল অনুসারে গড়িয়া তোলা যায়। বুদ্ধি বেশী কূটতর্ক ও কল্পনাজাল রচনা করিতে গিয়া, যন্ত্রবৎ দক্ষতা খুঁজিতে গিয়া, জাতির জীবনের সহজ সূত্রগুলি হারাইয়া ফেলে; জাতির জীবনীশক্তির যে নিগূঢ় উৎস, তাহার সহিত যোগসূত্র ছিন্ন করিয়া ফেলে। ইহার ফলে হয় এই যে, বাহ্য অনুষ্ঠান ও পদ্ধতির উপরে, আইনকানুন ও শাসন-প্রণালীর উপরেই অত্যধিকভাবে নির্ভর করা হয় এবং জীবন্ত জাতির পরিবর্ত্তে এক যন্ত্রবৎ রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার দিকেই মারাত্মক ঝোঁক আসে।—যাহা সমাজ-জীবনের একটি সহায় বা যন্ত্রমাত্র, তাহাই ঐ জীবনের স্থান গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে এবং এইভাবে একটি শক্তিশালী কিন্তু যন্ত্রবৎ ও কৃত্রিম সংবিধান (organisation) সৃষ্ট হয়; কিন্তু বাহিরের দিকে এই যে লাভ হয়, তাহার মূল্যস্বরূপ মুক্ত ও সজীব জাতির শরীরে নিগূঢ়ভাবে আত্মবিকাশশীল সমষ্টি আত্মার যে জীবন, তাহা বিনষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির এই যে ভুল, যান্ত্রিক পদ্ধতির গুরু চাপে প্রাণের ও আত্মার সহজোপলব্ধির ক্রিয়াকে নিগ্রহ করা, এইটিই য়ুরোপের দুর্ব্বলতা. ইহাই য়ুরোপের আশাকে প্রতারিত করিয়াছে এবং য়ুরোপকে তাহার নিজেরই উচ্চতর আদর্শসমূহের প্রকৃত সিদ্ধিতে উপনীত হইতে দেয় নাই।

যেমন ব্যষ্টিগত মানবজীবনে, তেমনই সমষ্টিগত সামাজিক জীবনে তৃতীয়স্তরে উপনীত হইয়াই, মানুষের চিন্তা যে সব আদর্শকে প্রথমে ধরিয়াছে ও পোষণ করিয়াছে, তাহাদের প্রকৃত মূল কোথায় এবং সত্যস্বরূপ কি, তাহা জানিতে পারা যায় এবং সেগুলিকে বস্তুতঃ কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, তাহারও উপায় ও সর্ত্তসকল জানিতে পারা যায়, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সিদ্ধ সমাজ কেবল সুদূর কল্পনা বা স্বপ্নমাত্র থাকে না। যত দিন না সেই তৃতীয় স্তরে পৌঁছান যাইতেছে, তত দিন আদর্শ সমাজ ভাস্বর মেঘের ন্যায় কেবল দূর হইতে দূরেই সরিয়া যাইবে, মানুষ তাহার দিকে ধাবিত হইয়া সর্ব্বদা বৃত্তাকারে ঘুরিবে; সর্ব্বদা তাহা মানুষের আশাকে বঞ্চিত করিবে, মানুষ ধরি ধরি করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারিবে না। সেই তৃতীয় অবস্থা আসিবে তখনই, যখন মানুষ সমষ্টিগত সত্তায় আরও গভীরভাবে জীবনযাপন করিতে আরম্ভ করিবে এবং সমষ্টিগত জীবনকে মূলতঃ প্রাণের প্রয়োজন, প্রেরণা, সহজোপলব্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবে না, আবার তর্কবুদ্ধির রচনা অনুসারেও নিয়ন্ত্রিত করিবে না। পরন্তু তাহার মহত্তর সত্তা ও আত্মার সন্ধান পাইবে এবং প্রথমতঃ, প্রধানতঃ ও সর্ব্বদা সেই আত্মার ঐক্য, সহানুভূতি, স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাধীনতা, সাবলীল ও সজীব নিয়ম অনুসারে সমষ্টির জীবনকে পরিচালিত করিতে আরম্ভ করিবে; ঐ আত্মার মধ্যেই ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনের স্বাধীনতা, পূর্ণতা ও ঐক্যের সূত্র নিহিত আছে। কিন্তু এইরূপ চেষ্টা আরম্ভ করিবার মত উপযোগী অবস্থাও এ পর্য্যন্ত কোথাও মিলে নাই। কারণ, এই অবস্থা তখনই আসিতে পারে, যখন অধ্যাত্মজীবনে পৌঁছান ও প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা কেবল কতকগুলি অসাধারণ ব্যক্তিরই সাধনা থাকিবে না, কিম্বা সাধারণের মধ্যে লৌকিক গতানুগতিক ধর্ম্মাচরণেই পর্য্যবসিত হইবে না। কিন্তু এইটিই যে মানব-জীবনের অবশ্য পালনীয় প্রয়োজন এবং এইটিকে ঠিকভাবে, যথার্থভাবে লাভ করিয়াই মানবজাতি ক্রমবিকাশের পর্য্যায়ে আর এক পদ অগ্রসর হইতে পারে, লোক তাহা উপলব্ধি করিবে এবং সেই অনুসারে জীবনকে চালিত করিবে।

তেজীয়ান্ স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণশক্তির যে প্রথম স্তর—তাহার ভিতর দিয়াই অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেরও প্রথম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনসমষ্টি (Communities) গড়িয়া উঠিয়াছিল, প্রাণশক্তি সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে নিজের বিকাশের পথ ও আদর্শ ঠিক করিয়া লইয়াছিল, সমষ্টিগত প্রাণের, সহজোপলব্ধি ও প্রকৃতি হইতেই জীবনের কাঠামো, সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক অনুষ্ঠান বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ জনসমষ্টিগুলি পরস্পরের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া শিক্ষা-দীক্ষাগত ও সামাজিক ঐক্যে যেমন বাড়িয়া উঠিল এবং বৃহৎ হইতে বৃহত্তর রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিল, তেমনই তাহাদের মধ্যে বিকশিত হইল এক সাধারণ আত্মা এবং এক সাধারণ ভিত্তি ও সাধারণ গঠন। তাহার মধ্যে ছোট ছোট ব্যাপারে স্বাধীন বৈচিত্র্যের যথেষ্ট স্থান ছিল। কঠোর একরূপতার (a rigid unifomity) কোনও প্রয়োজন ছিল না; সাধারণ আত্মা ও সাধারণ প্রাণের গতি ঐ বৈচিত্র্য-বিকাশের স্বাধীনতার উপরে এক সাধারণ ঐক্যের সূত্র স্থাপন করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এমন কি, যখন বিশাল রাজ্য ও সাম্রাজ্য সকল গড়িয়া উঠিতেছিল, তখনও ঐ সব স্বভাবসিদ্ধ ছোট ছোট রাজ্য, গণতন্ত্র, জাতিগুলিকে যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হইয়াছিল, নূতন সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে সেগুলিকে একবারে ধ্বংস বা বর্জ্জন করা হয় নাই। জাতির স্বাভাবিক ক্রমবিকাশে যাহা টিকিয়া থাকিতে পারে নাই বা যাহার আর কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই, তাহা আপনা হইতেই খসিয়া পড়িয়াছিল এবং অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছিল; যাহা নূতন অবস্থা ও পরিবেষ্টনের অনুযায়ী আপনাকে স্বতঃই পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়া টিকিতে পারিয়াছিল, তাহাকে টিকিতে দেওয়া হইয়াছিল। ভারতবাসীর বিশিষ্ট প্রকৃতি ও জীবন-বিকাশের ধারার সহিত যাহার নিগূঢ় সামঞ্জস্য ছিল, সে সবই ভারতের স্থায়ী সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল।

পরে যখন চিন্তাশীলতা ও বুদ্ধির উৎকর্ষসাধনের যুগ আসে, তখনও এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত জীবনের নীতি সম্মানিত হইয়াছিল। সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে, ধর্ম্মশাস্ত্রে ও অর্থশাস্ত্রে, ভারতের মনীষিগণ অব্যবহারিক তর্কবুদ্ধির (abstract intelligence) সহায়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিভিন্ন আদর্শ তন্ত্র রচনা করাকেই নিজেদের কায বলিয়া মনে করিতেন না, সমষ্টিগত মন ও প্রাণের দ্বারা সমাজ-জীবনের যে সব অনুষ্ঠান ও ধারা পূর্ব্বেই গঠিত হইয়াছে, সেই সবকেই তাঁহারা ব্যবহারিক যুক্তির (Practical reason) সহায়ে বুঝিতে ও সুপরিচালিত করিতে চাহিতেন, আদিম অবয়বগুলিকে ধ্বংস না করিয়া, তাহাদের বিকাশ, দৃঢ়তা ও সামঞ্জস্যসাধন করিতে চাহিতেন, যাহা কিছু নূতন অবয়ব, নূতন ভাব গ্রহণ করা প্রয়োজন হইত, তাহা অবয়ব-বৃদ্ধি বা আবশ্যক পরিবর্ত্তন হিসাবেই গ্রহণ করা হইত, প্রাচীনের ধ্বংস বা বিপ্লবসাধন করিয়া নহে। এই ভাবেই পূর্ব্ব

প্রচলিত রাষ্ট্রতন্ত্রগুলিকে পূর্ণ বিকসিত রাজতন্ত্রে পরিণত করা হইয়াছিল ; রাজা বা সম্রাটের একাধিপত্যে বিদ্যমান অনুষ্ঠানগুলিকে অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াই এই পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল। উপরে রাজতন্ত্র বা সাম্রাজ্যতন্ত্র চাপিয়া বসায় তাহাদের অনেকেরই পদমর্য্যাদা ও স্বরূপের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল বটে, কিন্তু যতদূর সম্ভব, সেগুলি লুপ্ত হইয়া যায় নাই। ইহার ফলে আমরা ভারতে য়ুরোপের ন্যায় বুদ্ধি কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত আদর্শের অনুসরণে রাজনীতিক প্রগতি (Progress) অথবা বিপ্লবমূলক পরীক্ষা দেখিতে পাই না ; এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা আদর্শ বা থিওরি রচনা করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রে বিপ্লবের ভিতর দিয়া প্রগতি ও পরীক্ষা প্রাচীন ও আধুনিক য়ুরোপের বিশিষ্ট লক্ষণ। অপর পক্ষে, প্রাচীন সৃষ্টিগুলির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ভারতীয় মনোভাবে সমধিক শক্তিশালী ; কারণ, ঐ সৃষ্টিগুলি ভারতীয় মন ও প্রাণের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, ভারতের স্বধর্ম্মের সুষ্ঠু প্রকাশ ; এই যে রক্ষণশীল প্রবৃত্তি, পরবর্ত্তী মহান্ বুদ্ধিবিকাশের যুগেও ইহা ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বরং আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলাকে নষ্ট না করিয়া, সমাজে ও রাষ্ট্রে অতীত দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, ধীরে ধীরে আচার-ব্যবহার ও অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশ—ইহাই ছিল প্রগতির একমাত্র পথ, অন্য কোন পন্থা সম্ভব ছিল না, স্বীকৃতও হইত না। পক্ষান্তরে, জাতির জীবনের স্বাভাবিক বিন্যাসের পরিবর্ত্তে যান্ত্রিক বিন্যাস যে য়ুরোপীয় সভ্যতার দুষ্ট ব্যাধিস্বরূপ হইয়াছে, ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি কখনও সেই দুরবস্থায় পৌঁছায় নাই, য়ুরোপের যান্ত্রিক বিন্যাসের (mechanical order) এখন চরম পরিণতি হইতেছে, বিকটাকার কৃত্রিম আমলাতন্ত্র ও শিল্পতন্ত্র ষ্টেট (the Bureaucratic and Industrial State)। আদর্শরচনাকারী বুদ্ধির যে সব সুবিধা, ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতে সে সব ছিল না, কিন্তু তেমনই বুদ্ধি যান্ত্রিকতার সৃষ্টি করায় যে সব অসুবিধা হয়, সে সব অসুবিধাও ছিল না।

সহজোপলব্ধির (Intuition) অনুসরণ করাই ভারতীয় মনের চিরন্তন সুগভীর অভ্যাস, এমন কি, যখন ভারতবাসী যৌক্তিক বুদ্ধির (reasoning intelligence) অনুশীলন করিতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত, তখনও সেই অভ্যাস অক্ষুণ্ণ ছিল। অতএব ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা সকল সময়েই চেষ্টা করিয়াছে আত্মার সহজোপলব্ধিগুলির সহিত প্রাণের সহজোপলব্ধিগুলিকে মিলাইয়া লইতে, বুদ্ধির আলোককে আনিয়াছে কেবল ইহাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করিতে, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যস্থাপন করিতে। জীবনের নিশ্চিত ও স্থায়ী বাস্তব তথ্যের উপরেই তাহা নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে, আদর্শবাদের জন্য বুদ্ধির উপরে নির্ভর না করিয়া আত্মার আলোক, প্রেরণা ও উচ্চতর অনুভূতি উপলব্ধির উপরে নির্ভর করিয়াছে, এবং বুদ্ধিকে কেবল বিচারশক্তিরূপে ব্যবহার করিয়াছে, কোনও পদক্ষেপ ঠিক হইতেছে কি না, বুদ্ধির বিচারের দ্বারা পরীক্ষা ও নিশ্চয় করিয়া লইয়াছে, বুদ্ধি প্রাণ ও আত্মার স্থান গ্রহণ না করিয়া তাহাদিগকে কেবল সাহায্য করিয়াছে ;—কেবল সমগ্রে প্রাণ ও আত্মাই সত্য ও নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করিতে পারে। ভারতের অধ্যাত্মভাবাপন্ন মন জীবনকে আত্মা অভিব্যক্তি বলিয়াই ধারণা করিয়াছে ; সমাজ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার শরীর, জনগণ সমষ্টিগত ব্রহ্মার প্রাণ-শরীর, সমষ্টি-নারায়ণ সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যষ্টিগত ব্রহ্ম, স্বতন্ত্র জীব, ব্যষ্টি নারায়ণ ; রাজা ভগবানের জীবন্ত প্রতিনিধি এবং সমাজের অন্যান্য অংশ ও শ্রেণী সমষ্টিগত আত্মার বিভিন্ন স্বাভাবিক শক্তি, প্রকৃতয়ঃ। অতএব, স্বীকৃত রীতিনীতি, অনুষ্ঠান, আচার-ব্যবহার, সকল অংশ সমেত সমাজ ও রাষ্ট্র-শরীরের গঠন, এ সবের আধিপত্য স্বীকার করিতে সকলেই যে বাধ্য ছিল, শুধু তাহাই নহে, এ সব কতকটা পবিত্র ও পূজার্হ বলিয়াই পরিগণিত হইত।

প্রাচীন ভারতীয়গণ বুঝিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি যথাযথভাবে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, নিজের প্রকৃতির এবং নিজের শ্রেণীর বা জাতির প্রকৃতির সত্যধারা ও আদর্শ অনুসরণ করে এবং সেইরূপ প্রত্যেক শ্রেণী, প্রত্যেক সঙ্ঘবদ্ধ সমষ্টি-জীবনও যদি স্বধর্ম্মের, স্বীয় প্রকৃতির অনুসরণ করে, তাহা হইলেই বিশ্বজগতের যেমন সুশৃঙ্খলা রক্ষিত হয়, মানব-জীবনেও সেইরূপ শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়। পরিবার, কুল, জাতি (caste), শ্রেণী, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, শ্রমিক বা অন্যবিধ সঙ্ঘ, নেশন (nation) জনসমূহ (people) এই সবই হইতেছে জীবন্ত সমষ্টিসত্তা, ইহারা নিজ নিজ ধর্ম্মের বিকাশ করে এবং সেই ধর্ম্মের অনুসরণ করিলেই তাহারা রক্ষা পায়, সুস্থভাবে টিকিয়া থাকিতে এবং সুচারুভাবে কর্ম্ম করিতে পারে। আবার পদমর্য্যাদাজনিত ও অন্যের সহিত সম্বন্ধজনিত কর্ত্তব্যধর্ম্ম আছে, দেশকালের অবস্থা অনুযায়ী যুগধর্ম্ম আছে, সার্ব্বলৌকিক রিলিজন্ * ও নৈতিক ধর্ম্ম আছে—এই সকল প্রকারের ধর্ম্ম স্বধর্ম্মের (স্বভাব অনুসারে কর্ম্মই স্বধর্ম্ম) উপরে ক্রিয়া করিয়া শাস্ত্রবিধান সমূহ সৃষ্টি করে।—প্রাচীন ধারণা এই ছিল যে, ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে মানুষের অবস্থা যখন সম্পূর্ণ অবিকৃত ও নির্দ্দোষ (ইহাই কাল্পনিক সত্য-যুগ বা স্বর্ণ-যুগ), তখন আর কোন রাজনীতিক শাসনতন্ত্রের, ষ্টেটের বা সমাজের কৃত্রিম অনুষ্ঠান প্রয়োজন হয় না। কারণ, তখন সকলে আপন আপন প্রবুদ্ধ আত্মা ও ভাগবত-অধিষ্ঠিত সত্তার সত্য অনুসারে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করে এবং সেই জন্য আপনা হইতেই আভ্যন্তরীণ দিব্যধর্ম্মের অনুসরণ করে। অতএব আত্মনিয়ন্ত্রণশীল ব্যক্তি এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণশীল সমাজ আপন আপন সত্তার যথার্থ ও স্বচ্ছন্দ ধর্ম্ম অনুসারে জীবন যাপন করিবে, ইহাই আদর্শ। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে মানুষের যে অবস্থা, তাহার প্রকৃতি ব্যক্তিগত ও সামাজিক ধর্ম্মের বিকৃতি ও বিচ্যুতির অধীন, অজ্ঞান ও ব্যভিচারী। এরূপ অবস্থায় সমাজের স্বাভাবিক জীবনের উপরে ষ্টেট, রাজশক্তি, রাজা বা শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দেওয়া প্রয়োজন ; এই রাজশক্তি অযথাভাবে সমাজের জীবনে

---

* ইংরাজীতে রিলিজন্ (religion) বলিতে যাহা বুঝায়, ভারতে "ধর্ম্ম" তাহা অপেক্ষা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।—রিলিজন্ ধর্ম্মের একটা দিক বা অঙ্গমাত্র। সামাজিক, নৈতিক,

হস্তক্ষেপ করিবে না, সমাজ-জীবনকে প্রধানতঃ স্বাভাবিক নিয়ম ও রীতিনীতি অনুসারে সচ্ছন্দভাবে বিকশিত হইতে দিতে হইবে; রাজশক্তি শুধু দেখিবে, সমাজ ঠিক পথে চলিতেছে কি না, ধর্ম সতেজ আছে কি না, পালিত হইতেছে কি না। ধর্মের বিরুদ্ধাচরণকে শাস্তি দিবে, দমন করিবে, যথাসম্ভব অধর্মাচরণ নিবারণ করিবে এবং এইভাবে সমাজকে আপনার পথেই ঠিকমত চলিতে সাহায্য করিবে। ধর্ম যখন আরও অধিক বিকৃত অবস্থায় উপস্থিত হয়, তখন সমগ্র সমাজ-জীবনকে বাহ্য বা লিখিত বিধিনিষেধের শাস্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন হয়, শাস্ত্রকর্ত্তা, আইনকর্ত্তার প্রয়োজন হয়; কিন্তু আইন বা শাস্ত্র প্রণয়ন করা রাজা বা রাজশক্তির কার্য্য ছিল না, রাজশক্তি ছিল কেবল প্রয়োগকর্ত্তার (administrator); সমাজ ও ধর্মসম্বন্ধীয় বিধিবিধান নির্দ্ধারণ করিতেন ঋষি এবং সে সবের রক্ষা ও ব্যাখ্যা করিতেন ব্রাহ্মণ। আবার ঐ বিধি-বিধান (লিখিতই হউক বা অলিখিতই হউক) রাজশক্তি বা ব্যবস্থাপক কর্ত্তৃক স্পষ্ট বা উদ্ভাবিত হইবার জিনিষ ছিল না, উহা পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে, কেবল উহার স্বরূপ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হইত অথবা সমাজের জীবন ও চেতনায় প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি হইতেই উহা কেমন স্বাভাবিকভাবে উঠিয়াছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া হইত। এইভাবে কৃত্রিমতা ও গতানুগতিকতা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে অবশেষে এমন অধম অবস্থা আসিবেই, যখন সমাজ বদ্ধ, অনাচার ও বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ হইয়া উঠিবে, ধর্ম লয়প্রাপ্ত হইবে (ইহাই কলিযুগ)। এইরূপ চরম গ্লানির অবস্থা উপস্থিত হইলেই তখন বিপ্লবের রক্তরেখার ভিতর দিয়া মানবাত্মা আবার নিজেকে ফিরিয়া পায়, আবার অভিনবভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে অগ্রসর হয়।

অতএব রাজশক্তির, রাজা ও রাজ-পরিষদ ও রাষ্ট্রের অন্যান্য শাসক বিভাগের প্রধান কায ছিল সমাজ-জীবনের স্বাভাবিক বিকাশকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করা; রাজশক্তি ছিল ধর্ম্মের পালক ও প্রয়োগকর্ত্তা। সমাজেরই কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল মানুষের জীবনধারণ ও বিকাশের প্রয়োজনগুলি সিদ্ধ করা, ভোগসুখে মানুষের যে স্বাভাবিক দাবী আছে, সেই দাবী যথাযথ-ভাবে পূর্ণ করা। তবে এই সকল প্রয়োজন ও ভোগের নিয়মিত মাত্রা ছিল এবং সে সব নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী ছিল। সমাজ-রাষ্ট্র শরীরের (Socio-political body) সকল অবয়ব ও সকল সঙ্ঘের আপন আপন ধর্ম ছিল, সে ধর্ম তাহাদের স্বভাব, তাহাদের স্থান, এবং সমগ্র সমাজ-শরীরের সহিত তাহাদের সম্বন্ধের দ্বারা নির্ণীত হইত। প্রত্যেকে যাহাতে স্বাধীন ও যথাযথভাবে আপন আপন ধর্ম অনুসরণ করিতে পারে, সে সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিতে হইত, নিজেদের সীমার মধ্যে আপন আপন স্বভাব অনুসারে কর্ম করিতে সকলকে স্বাধীনতা দিতে হইত; কিন্তু আবার সেই সঙ্গে ইহাও দেখিতে হইত, যেন তাহারা নিজেদের গণ্ডী অতিক্রম না করে, অপরের সীমানায় অনধিকারপ্রবেশ না করে, নিজেদের সত্য পন্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া না পড়ে, যথোচিত মাত্রা ছাড়িয়া না যায়। ইহাই ছিল সর্ব্বোচ্চ রাজ-ধর্মসম্প্রদায়, শ্রমিকসঙ্ঘ, গ্রাম, নগর প্রভৃতির স্বাধীন ক্রিয়ার উপর হস্তক্ষেপ করা বা দেশের জীবনের সহিত নিগূঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট আচার-ব্যবহারের ব্যতিক্রম করা বা তাহাদের স্বীয় অধিকার সকল নষ্ট করা রাজশক্তির কার্য্য ছিল না। কারণ, যথা-যথভাবে সমাজ ধর্মপালন করিবার নিমিত্ত এইগুলি অপরিহার্য্য বলিয়া এ সবের উপরে সকলের জন্মগত অধিকার স্বীকৃত হইত। রাজশক্তিকে যাহা করিতে হইত, তাহা কেবল এই—সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে হইত, সকলের উপরে সাধারণ-ভাবে শাসন রাখিতে হইত, বাহিরের আক্রমণ বা ভিতরের বিপ্লব হইতে সমাজ-জীবনকে রক্ষা করিতে হইত, দুষ্কর্ম ও অশান্তি দমন করিতে হইত, সমাজের অর্থনৈতিক ও শিল্পবিষয়ক কল্যাণের পথ পরিষ্কার করিতে সাধারণভাবে সাহায্য ও দেখা-শুনা করিতে হইত, সকল বিষয়ে সুবিধা আছে কি না দেখিতে হইত এবং এই সকল করিবার জন্য অপরের যে শক্তি নাই, রাজাকে সেই সকল শক্তি ব্যবহার করিতে হইত।

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল, সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাবিষয়ক এক জটিল অনুষ্ঠান। সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক সঙ্ঘ বা সম্প্রদায়ের ছিল নিজস্ব স্বাভাবিক জীবন, প্রত্যেকে নিজের জীবন ও কর্ম নিজে পরিচালনা করিত, আপন আপন ক্ষেত্রের স্বাভাবিক গণ্ডীর দ্বারা প্রত্যেকে অপর হইতে পৃথক্ ছিল, কিন্তু সমগ্রের সহিত সকলে সুপরিজ্ঞাত সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল। সাধারণ সমাজ-জীবনের কর্ত্তব্য ও অধিকার সমূহে প্রত্যেকে ছিল—আর সকলের সঙ্গে অংশীদার। প্রত্যেকে নিজের নিয়মকানুন প্রয়োগ করিত, নিজের ক্ষেত্রে নিজের কার্য্য নিজে পরিচালিত করিত, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের স্বার্থের ব্যাপার অপরের সহিত মিলিত হইয়া আলোচনা করিত, পরিচালনা করিত এবং রাজা বা সম্রাটের সাধারণ সভায় সকলেরই আপন আপন যোগ্যতা ও প্রয়োজনী-য়তা অনুযায়ী প্রতিনিধি থাকিত। ষ্টেট, রাজা বা সর্ব্বোচ্চ রাজশক্তি ছিল সামঞ্জস্যসাধনের, সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ও দক্ষতা-সাধনের যন্ত্র। তাহার প্রভুত্ব ছিল সকলের উপরে, কিন্তু তাহাই একমাত্র সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা ছিল না; কারণ, তাহার সকল অধি-কার ও ক্ষমতায় সে ছিল ধর্ম বা আইনের দ্বারা বাধ্য এবং জনগণের ইচ্ছার অধীন; এবং ভিতরের সমস্ত ব্যাপার পরি-চালনায় সে ছিল সমাজ-রাষ্ট্র-শরীরের অন্যান্য অংশের সহিত একটি অংশীদার মাত্র।

ভারতীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ইহাই ছিল থিওরি এবং মূলনীতি এবং বাস্তবিক গঠনভঙ্গি,—সাম্প্রদায়িক (Communial) স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের জটিল অনুষ্ঠান, সকলের উপরে সামঞ্জস্য-সাধনের এক কর্ত্তা, রাজপুরুষ ও রাজশক্তি, তাহার যথেষ্ট কার্য্যকরী ক্ষমতা, পদমর্য্যাদা, কিন্তু সে সব যথাযোগ্য ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহা একই সঙ্গে অপরকে শাসন করিতেছে, আবার অপরের দ্বারা শাসিত হইতেছে, সকল বিভাগেই তাহাদিগকে সক্রিয় অংশীদাররূপে স্বীকার করিতেছে, সমাজ-জীবনের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা কার্য্য তাহাদিগকেও ভাগ দিতেছে, এবং রাজা, জনসাধারণ এবং ইহার অন্তর্গত সমুদয় সম্প্রদায় ও সঙ্ঘ সকলেই

নিয়ন্ত্রিত। এতদ্ব্যতীত সমাজ-জীবনের অর্থনীতির ও রাষ্ট্র-নীতিক দিক ছিল ধর্ম্মের কেবল একটা অংশমাত্র, এবং সে অংশ ছিল অন্যান্য অংশের সহিত, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সমাজের উচ্চতর শিক্ষা-দীক্ষার পরিচায়ক লক্ষ্যের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। রাজনীতি ও অর্থনীতি নৈতিক আদর্শের (ethical law) দ্বারা প্রভাবিত ছিল, রাজা এবং তাঁহার মন্ত্রিগণ, মন্ত্রণা পরিষদ ও সাধারণ রাজসভা, প্রত্যেক ব্যক্তি, সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক স্বতন্ত্র সঙ্ঘ, সকলকেই প্রত্যেক কর্ম্মে নীতির বিধান মানিয়া চলিতে হইত। প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনে কাহাকে ভোট দেওয়া হইবে, কোন্ ব্যক্তি মন্ত্রী বা রাজকর্ম্মচারী হইবার যোগ্য, এই সব নির্দ্ধারণ করিতে নৈতিক চরিত্র ও উচ্চ শিক্ষা-দীক্ষার হিসাব লওয়া হইত; আর্য্যজাতির কার্য্যপরিচালনায় যাহারা প্রভুত্ব করিবে, তাহাদিগকে চরিত্রে ও শিক্ষা-দীক্ষায় খুব উচ্চ হইতে হইত। রাজা ও জনসাধারণের সমগ্র জীবনের পশ্চাতেও সহায় ছিল ধর্ম্মভাব (religious spirit) ও ধর্ম্মপ্রচারকগণ। যদিও সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ ও অংশের বিশিষ্ট বিকাশের উপর প্রয়োজনীয় ঝোঁক দেওয়া হইত, তথাপি সমাজ-জীবনটাই চরম লক্ষ্য বলিয়া ততটা পরিগণিত হইত না; পরন্তু সকল অংশ-সমেত সমগ্র সমাজ-প্রতিষ্ঠানটিকেই দেখা হইত যেন মানুষের মন ও আত্মার শিক্ষা ও বিকাশের মহান্ ক্ষেত্র—এই ক্ষেত্রে প্রকৃত জীবনের বিকাশ করিয়া মানুষ ক্রমশঃ অধ্যাত্ম জীবনলাভ করিবে।

শ্রীঅনিলবরণ রায়

বরণ

তোমারে যখন চিনিতে গেলাম তখন জীবন হয়েছে শেষ—
তরণী ভিড়েছে নদী-কিনারায় সূর্য্য-কিরণ নাহিক লেশ।
বাতাস থামিয়া গেছে বহুক্ষণ গগনে তারকা উঠেছে ফুটি
ত্রস্ত খেচর ফিরিছে কুলায় মেলিয়া ক্লান্ত পক্ষ দুটি।
যে প্রেরণা ছিল হৃদয় জুড়িয়া—যে সুধা-উৎস যাইত বহে
সকলি তখন নষ্ট হয়েছে কোন্ সে দারুণ দুরাশা-মোহে।
যে বীণায় তান আপনি উঠিত—সুরের ঝর্ণা খেলিত হাসি
সে বীণা ভাঙিয়া গিয়াছে কখন্ সুরের আবাস দুপায়ে নাশি'।
ক্লান্ত পরাণ সারা দিনমান মায়া-মরীচিকা পিছনে ঘুরি,
কে তুমি বারিদ নামালে বাদল আমার সকল হৃদয় জুড়ি'!

যবে যৌবন শতধা হইয়া বিকাত আপনা ধরণীতলে,
অহির সমান ফুলিয়া উঠিত জানি না কিসের মন্ত্রবলে,
যাহা কিছু আছে ভরিয়া ভুবন ছুটিত সকলি ভোগের লাগি',—
প্রিয়া-মুখ চাহি অর্দ্ধরাত্রে অনিমেষ আঁখি রহিত জাগি,
কহিত তাহারে মধুর বচনে কত যে সোহাগ-আদর-বাণী
বক্ষে চাপিয়া কাণে রেখে কাণ, দয়িতা আমার হৃদয়-রাণী।
তখন কেন গো দূরে স'রে গেলে, সে দিন বৃথায় যাইতে দিলে,
সে ভাব-বন্যা তব দিক পানে কেন নাহি প্রভু ছুটায়ে নিলে।
আজিকে যখন বাসনা মিটেছে মনে হয় ভোগ সকলি নহে—
অসময়ে ঘুম ভেঙে দিলে দেখি অনুকূল বায়ু গিয়াছে বহে।

আজি উত্তর-বাতাস প্রবল উড়ে যায় বালু তীরের বেগে,
ক্রুদ্ধ সলিল উঠিছে গরজি সহসা তন্দ্রা হইতে জেগে।
ক্ষীণ কলেবর কাঁপে থর থর হাতের যষ্টি নড়িয়া উঠে,
শুষ্ক রসনা হয় ভাষাহীন ভয়ের চিহ্ন মুখেতে ফুটে।
ঝাপসা দিঠিতে তাকাই যখন ও-পারের শ্যাম ছায়ার দিকে,
দেখিতে কিছুই পাই না, কেবলি মনে হয় সব শূন্য ফিকে।
যদিও জানি গো রয়েছে হোথায় পিয়াসীর লাগি তৃষিত বারি—
হাতটি বাড়ালে দুই করপুট পূরে যাবে মোর দয়াতে তাঁরি।
তবু মনে হয় গেছে সুসময় মত্ত থাকিয়া খেলার ভুলে,
আজ যদি তিনি ক'রে অভিমান না লন আমারে কোলেতে তুলে।

ওগো নিরদয় কেন তুমি মোরে সে দিন নিকটে টানি না নিলে।
যায়নি যখনো যৌবন মোর নয়নে রহিত স্বপন মিলে।
ফুলমালা শুধু গাঁথিতাম নাক, ফুলের সুবাস নিতাম সুখে—
মদির জ্যোছনা-কিরণে পাগল পড়িতাম প্রিয়া-পদেতে লুটে
কোমল তৃণেতে পাতিয়া আসন বাজাতাম বাঁশী নদীর ধারে,
ঢেউগুলি সব হইত নীরব নামিত তন্দ্রা আঁখির পারে।
পূজা করিবার ক্ষমতা তখনো মুছে যায় নাই নিঃশেষ হয়ে,
অর্ঘ্য সাজাতে পারিতাম ভাল মন্দিরে পূত বেদিটি লয়ে।
আজি গান সব হয়ে গেছে শেষ ফুলগুলি মীচে
হারানো সে গান ঝ'রে পড়া ফুল তাই নিয়ে পুনঃ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময় দেশে ফিরিয়া অল্প কয়েক দিন পরেই তার কর্ম্মস্থলে —চলিয়া গেল। সুমতি মলয়াকে সঙ্গে লইয়া ছেলের নূতন বাসায় গোছগাছ করিয়া দিতে সঙ্গে আসিলেন, অবশ্য আসল উদ্দেশ্য, কিছু দিন তার কাছে থাকা। ফিরিয়া আসিয়া হিরণ্ময় তাঁহাকে বলিয়াছিল, "থাক্ গে চাকরী, কে আবার এক্ষুনি চাকরী করতে ছোটে! তার চাইতে আমি তোমার কাছেই থেকে যাই মা, দুট ছুটি প্রসাদ দিও, তা হ'লেই আমার চ'লে যাবে।"

মা হাসিয়া অশ্রুভরা করুণ চোখে ছেলের মুখখানা বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়াছিলেন। ফলে স্বামি-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া এই ব্যবস্থা দাঁড়াইয়াছিল।

সাহেবী ধরণেরই বাংলো-বাড়ী। সাহেবী আদর্শেই সাজান হইল। সুমতির হাতের তৈরী কুসন, টেবল-ক্লথ, পোর্ট-ফলিও, ছবিতে ড্রইংরুম সুন্দর হইয়া উঠিল। এ-ঘর ও-ঘর করিয়া গোছগাছ করিতে করিতে সুমতি এক সময় ছেলেকে শুনাইয়া বলিলেন, "এ ঘরদোর সাজান আমার সার্থক হবে, যখন আমার টুকটুকে বউমাটি এর মধ্যে ঘুরে বেড়াবেন।"

মলয়া গম্ভীরমুখে খানকতক সদ্যক্রীত নাটক, নভেল ও দেশী বিলাতী মাসিক ম্যাগাজিন লইয়া নাড়াচাড়া করিতে-ছিল, হিরণ্ময় আসিয়া তাহাকে পাকড়াও করিল; —

"আচ্ছা খুকি! তুমি তো কিছুই বলো না? অথচ শুনতে পাই, তোমারই বিশেষ বন্ধু! বোর্ডিংয়ে না কি দু'জনে একঘরের বোর্ডার ছিলে!"

মলয়া ঈষৎ বিব্রত হইয়া পড়িল। দাদার অভিযোগ সত্যই তো মিথ্যা নয়! বাস্তবিকই সে কোন দিনই দাদার ভাবী বধূর সম্বন্ধে তার সঙ্গে কোন আলোচনাই করে নাই। করে নাই অথবা করিতে পারে নাই, তা' ঠিক বলা যায় না। রুবির নামটা কাণে আসিলেই তার মনটা যেন কেমন করিয়া হঠাৎ একটু বাঁকিয়া দাঁড়ায়, ভরা প্রাণ ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া আসে, কিছুতেই এই সঙ্কীর্ণতার হাত হইতে সে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতে সমর্থ হয় না। সেই যে কবে সেই কথাটা রুবি এক দিন তার সাক্ষাতে বলিয়াছিল, "বিধবা হইলে নিশ্চয়ই সে আবার বিবাহ করিবে," রুবিকে হিরণ্ময়ের বধূরূপে কল্পনা করিতে গেলেই তার মুখের সেই অলক্ষণা বাণী তাকে অত্যন্ত বিসদৃশরূপেই একটা বেদনার আঘাত না করিয়া ছাড়িত না। সে মনে মনে বলিত, এই যার আদর্শ, সে কি আমার দাদার কল্যাণী গৃহিণী হ'তে পারবে? যে পাতিব্রত্যের জোরে সাবিত্রী মৃত পতিকে প্রাণ ফিরিয়ে এনে দিয়েছিলেন, আরও কত সতী-সাবিত্রীতে আজও হয় তো দিচ্ছেন, আমার দাদার বউএর মধ্যে সে একনিষ্ঠা থাকবে না, এ আমার ভাল লাগছে না! অথচ এত বড় কথাটাকেও শুধু নিজের কল্পনার দিক হইতে প্রকাশ বা প্রচার করিতে গেলেও সে যেন এ যুগের লোকের কাছে নিতান্ত ছেলে-মানুষী প্রকাশ পায়! মলয়া নির্ব্বিরোধ শান্ত মেয়ে, সে অনুভব বড় বেশী করে, কিন্তু আঘাত করা তার স্বভাব নয়।

দাদার কথায় ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া জবাব করিল, "কৈ, তুমি তো কিচ্ছু জিজ্ঞেস করো না? কি শুনতে চাইছো বল, উত্তর দিচ্ছি।"

হিরণ্ময় একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল, মৃদু মৃদু স্বরে কহিল, "শুনতে আর এমন কি চাইবো? মা'র পছন্দ, তোমার পছন্দ—"

মলয়া হঠাৎ ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া ভাইয়ের মুখের দিকে চাহিল, হঠাৎ তার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িতে গেল, "আমার পছন্দ? কে বল্লে তোমাকে যে আমার পছন্দ?" কিন্তু সহসা সে সচকিত হইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল, পাছে তার দাদা তার চোখের দৃষ্টি হইতে তার মনের লেখা পাঠ করিয়া লয়, তাই সে তার চোখের তারা

ভূমিলগ্ন করিয়া ফেলিল। না, না,—এ যে অন্যায় অসঙ্গত! তার মা যাকে পছন্দ করিয়া পুত্রবধূ নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তার দাদা বিশ্বস্তচিত্তে মায়ের মনোনয়নকে স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিয়া লইয়া যাহাকে নিজের চির-জীবনের সুখ-দুঃখের নিত্যসঙ্গিনী করিতে চলিয়াছে, সে তার নিজের একটা খেয়ালের বশে তার সম্বন্ধে অমন একটা মিথ্যা সংশয় তার ভাইএর মনের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে যায় কেন? সত্যই ত সে কোন অপরাধ করে নাই! মুখেই এ সব আবোল-তাবোল বলিয়াছে, হয় ত ভিতর অবধি তলাইয়া দেখিয়া কোন কথা সে বলে নাই—

মলয়ার মন আবার বাঁকিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু যে মেয়ে এমন কথা মুখে আনিতে পারে, তার কাযে করাই বা আশ্চর্য্য কি? আর যার মধ্যে এই আদর্শ, সে তার স্বামীর মঙ্গলামঙ্গলের প্রতিই বা কতখানি আগ্রহশীলা হ'তে পারে? তার দাদা বিলাত হইতে মেম বিয়ে করে নাই, কিন্তু দেশে বসিয়াই তাঁর ভাগ্যে কি তাই জুটিবে?

হিরণ্ময় বলিতে লাগিল, "সে দিন আমার একটি বন্ধু বল্‌ছিল, কলকাতায় আস্‌ছে হপ্তায় একটা কিসের জন্য এম্পায়ারে 'ওথেলো' অভিনয় হবে, তা'তে তোমার বন্ধু নাকি জুলিয়েট সাজবেন, এখন থেকেই টিকিটের জন্য মারামারি চলেছে। তুমি দেখতে যাবে না?

শুনিয়া মলয়ার খুব বেশী উৎসাহ জাগিল না, শুধু একটুখানি টানিয়া আনা হাসির সহিত প্রশ্ন করিল, "তুমি যাবে?"

হিরণ্ময় মৃদু হাসিল, "গেলে হয়, কি বল? মা আর তুমি যাবে?"

মলয়া বলিল, "আমরা? আমরা আর কি করবো গিয়ে? মাও দেখেছেন, আমি ত ওর অভিনয় অনেক-বারই দেখেছি, তুমিই বরং একলা গিয়ে দেখে এস।"

হিরণ্ময় একটু ইতস্ততঃ করিল, তার পর বলিল, "কিন্তু আমি একলা গেলে দেখা করতে বা আলাপ করতে পারবো না, তা তোমায় ব'লে রাখছি। সে আমার দ্বারা হবে না।"

মলয়া এবার হাসিয়া ফেলিল, "এইটুকু আর তুমি পারবে না? বিলাত ঘুরে এলে কি ক'রে?"

হিরণ্ময় বলিল, "ঐ জন্যেই ত বিলেতে খুব নিরুপদ্রবে কাটাতে পেরেছি, আমার দিকেও কোন মেম ঘেঁষতেন না, আমায় দেখেই তাঁরা আমায় চিনে নিয়েছিলেন। আচ্ছা, মাকে জিজ্ঞেস করো, মা যা স্থির করবেন, তাই হবে।"

"কি হবে রে, হিরু?" বলিয়া সুমতি প্রবেশ করিলেন। তাঁর হাতে একটা আধবোনা পুঁতির ব্যাগ, ভাবী বধূর আইবুড় ভাতের তত্ত্বের জন্য বোনা চলিতেছিল।

হিরণ্ময় ঈষৎ লজ্জিত হইয়া নীরব রহিল, তার পর মা পুনঃ প্রশ্ন করিলে মলয়াকে বলিল, "তুমি ব'লে দাও না, খুকি!"

মলয়াকে ছোটবেলা হইতে খুকি বলিত, আজও তার সে অভ্যাসের বদল হয় নাই।

মলয়া ব্যাপারটা মাকে জানাইল। সুমতিও শুনিয়া খুব খুসী হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ভালই হলো, হিরু! আমারও ইচ্ছে ছিল, তোমাদের মধ্যে একবার দেখাশুনা হয়। এ বেশ সুযোগ হয়েছে, আমরা আর না-ই গেলুম, তুমিই বরং এক দিনের জন্যে চ'লে যাও, অভিনয় দেখাও হবে, আর দেখা করেও আসবে। তুমি যখন ফিরলে, রবি তখন একজামিনের জন্যে আসতে পারলে না, আর গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্ব্বে বিয়েও যখন হচ্ছে না, তখন একবার দেখা হয়, সে মন্দ কি?"

হিরণ্ময় নীরবেই রহিল। মলয়া বলিল, "দাদা বল-ছিলেন, একলা গেলে উনি দেখা করতে পারবেন না।"

সুমতি স্নেহের সহিত ঈষৎ হাসিলেন, নিজের মুখচোরা লাজুক ছেলের স্বভাব তাঁর জানাই ছিল, তবে এত বড় হইয়া বিলাত ঘুরিয়া আসিয়া প্রকৃতির যে কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই, ইহাতে তাঁর মাতৃগর্ব্ব বর্দ্ধিতই হইল, করুণ দৃষ্টিতে বারেক তার লজ্জাবিনম্র মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া মেয়েকে বলিলেন, "মলু! তুমি তা হ'লে ওর সঙ্গে যেও। আমি আর তোমাদের সঙ্গে যাবো না, বাড়ীতেই থাকবো; তোমরা ফিরে এলে এইবার আমায় আবার যেতে হবে, ওঁর শরীরটা তত ভাল থাকছে না লিখেছেন।"

হিরণ্ময় উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, "তা হ'লে মা, তোমরা আগেই না হয় যাবে? বাবার যদি কষ্ট হয়?"

সুমতি কহিলেন, "না, তেমন কিছু হয় নি, লিখেছেন, ব্যস্ত হয়ে যেন ছুটে এসো না। তোমার পিসীমা রয়েছেন, কষ্ট হ'লে কি আমি থাকতুম!"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মলয়ার ইচ্ছা না থাকিলেও সে হিরণ্ময়ের সহিত কলিকাতায় আসিল, পূর্ব্ব হইতেই টাকা পাঠাইয়া হিরণ্ময় টিকিট কিনিয়া রাখিয়াছিল, তা' না রাখিলে হয় ত টিকিট তাহারা পাইত না, এত বেশী ভিড় যে কোন অভিনয়ে হয়, এ ধারণা হয় তো কোন লোকেরই ছিল না। বিস্তর লোক টিকিট না পাইয়া, অনেক লোক টিকিট কেনা সত্ত্বেও সিট না পাইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল। হিরণ্ময়ের অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, ভাগ্যে সঙ্গে ছিল তার মলয়া, তাই তাকে চিনিতে পারিয়া তারই একটি স্কুলের বন্ধু তাদের দুজনের সিট কোনগতিকে উদ্ধার করিয়া দিল।

বন্ধুটি হিরণ্ময়ের দিকে চাহিয়া মলয়াকে প্রশ্ন করিল, "দিস্ জেণ্টলম্যান? আর ইউ হিজ ফিয়ানসে?"

মলয়া অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "ওহ, নো, নো, হি ইজ মাই ব্রাদার।"

মেয়েটি হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "ওহ মাই গড্! বট ইজ হি ব্যাচিলর, মলু?"

মলয়া তার বেহায়াপনায় বিরক্ত ও হিরণ্ময়ের সামনে বিব্রত হইয়া মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "না, দাদার এখনও বিয়ে হয় নি!"

"দেন হি উইল ফল ইন্ লাভ উইথ দেস্‌দেম্‌না টো-নাইট।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে মলয়ার বন্ধু মলয়াদের পথ দেখাইবার জন্য ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইল, মলয়া ও হিরণ্ময় তাহার পিছনে পিছনে চলিল। হিরণ্ময় সব কথাই শুনিতে পাইয়াছিল, মেয়েদের নির্লজ্জতা এক সময় সেও মলয়ার মতই অপছন্দ করিত, তবে এখন অনেকটা সহ্য হইয়া গিয়াছে। বিলাতে থাকিতে ততটা তার দেখাশোনার সুযোগ ছিল না, সে কোথাও মিশিত না, তবু কতকটা দেখিয়াছেই হয়; বিশেষতঃ আসা যাওয়ার সময় জাহাজে। তবু দেশী মেয়েদের মধ্যে সলজ্জ নম্রতার অভাব দেখিলে আজও তার চক্ষু ঈষৎ পীড়িত না হইয়া পারে না।

অভিনয় যেমন হইতে হয়, ভালই হইল। এমিলিয়া প্রভৃতি যারা যারা সাজিয়াছিল, তাদের অনেকেই দেশী ব্যারিষ্টারের য়ুরোপীয়ান স্ত্রীর সন্তান, চেহারা তাদের সাহেবের মতই। ওথেলোর ছদ্মবেশ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় সকলেরই নিকট উচ্চ প্রশংসা লাভ করিল। অন্যান্য পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে অনেকেই মিশ্রিত ক্লাশের বলিয়া থিয়েটারকে ঠিক দেশীয়ের অভিনয় বলা যায় না, অথচ এ সমাজের মধ্যে কি আশ্চর্য্যভাবেই মিশিয়া গিয়াছিল করবী! তার গায়ের রঙ্গে ও গলার স্বরে সে যে য়ুরোপীয়া নয়, এ কথা বলা কঠিন হইয়াছিল।

হিরণ্ময় মলয়াকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বন্ধু কি য়ুরোপীয় না কি?"

মলয়া মৃদু হাসিল, কহিল, "চেহারায় বটে, জাতে নয়।"

হিরণ্ময় ঈষৎ আশ্বস্ত হইল।

অভিনয়-শেষে দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া বসিয়াছিল, উঠার জন্য, ছোটার জন্য কাহারও যেন কোন ত্বরাই ছিল না। তখনও শেষ গানের রেশ কাণের তারের মধ্যে ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছিল—

"Thesthemona! where are you gone?
Re-appear light the morning sun."

মলয়া হিরণ্ময়ের কোটের প্রান্ত ধরিয়া ঈষৎ টানিয়া ডাকিল, "দাদা!"

"কি রে খুকি?" বলিয়া আত্মবিস্মৃত হিরণ্ময় হঠাৎ সচেতন হইয়া উঠিয়া মলয়ার দিকে চাহিল।

"এস, ওরা আবার হয় তো দেরী হ'লে চ'লে যাবে। কিন্তু দেখা করাই মুস্কিল, দেশী বিলেতী বিস্তর লোক দেখছি দেখা করতে ছুটেছে।"

দুই জনে অগ্রসর হইল। হিরণ্ময় তন্ময় হইয়া দেস্‌দেমনা-রূপিণীর কথাই ভাবিতেছিল, মনটা তার একটা নূতন আনন্দে নবীন অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। খানিক দূর আসিয়াই হঠাৎ সে একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল! ড্রপসিন উঠিয়া পুনশ্চ রঙ্গভূমি প্রকাশ পাইতেছে, একরাশি উপহার বস্তু ও অজস্র পুষ্পমাল্য ও ফুলের তোড়ার মাঝখানে দাঁড়াইয়া ওথেলো ও দেস্‌দেমনা।

চারিদিক হইতে তুমুল শব্দে প্রশংসাধ্বনি শ্রুত হইল। বড় বড় নামজাদা লোক অগ্রসর হইয়া অভিনেতা ও অভি-নেত্রীকে ধন্যবাদ প্রদান করিল। সকল জাতীয় এবং সকল-শ্রেণীর যুবকদল রুবির চারিদিকে ঘন করিয়া ভিড় জমাইল। মলয়া ও হিরণ্ময় সে ভিড় ঠেলিয়া রুবির কাছে পৌঁছিতে পারিল না, খানিকটা দূরেই তাহারা দাঁড়াইয়া পড়িল। রুবি হাসি হাসিমুখে সকলের সহিতই ভদ্রতার আদান-প্রদান

করিতেছিল, অসঙ্কুচিতচিত্তে উপহার গ্রহণ করিতেছিল, মালা লইয়া গলায় হাতে জড়াইতেছিল, তোড়া লইয়া পায়ের তলায় জমা করিতেছিল, প্রজাপতির মত লঘু, শিশুর মতই যেন সে চঞ্চল।

মলয়ারা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তার ঠিক পাশেই দু'জনে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাদের কাণে গেল। এক জন অপরকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, সবারই তো পরিচয় পাওয়া গেল, কিন্তু ঐ অজ্ঞাতকুলশীল মূরটি কে বল তো? ওর তো কোন হদিস্ পাওয়া গেল না?"

জিজ্ঞাসিত উত্তর দিল, "আমিও তা জানি না, যা'কে প্রশ্ন করি, দেখি কেউই জানে না, তবে একটুখানি খবর আমি বার করেছি, ও নাকি কোন বড় লোকের ছেলে, 'দেসদেমনা' নাকি ওরই বিট্রোথ্‌ড—"

প্রথম লোকটি বলিয়া উঠিল, "ওঃ, ঐ রবি গুপ্তা? ও তো একটি আস্ত কোকেট! ওর কথা ছেড়ে দাও না।"

হিরণ্ময় মলয়ার দিকে চাহিয়া দেখিল, মলয়া ত্রস্ত হইয়া দৃষ্টি নত করিয়া লইল, কেহ কাহারও দিকে চাহিয়া দেখিতে ভরসা করিল না।

এমনি ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় যখন এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ধাক্কায় হিরণ্ময় ও মলয়া দু'জনেই একসঙ্গে বাড়ী ফিরিবার কথা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, হঠাৎ রবি তাহাদের দেখিতে পাইল। হিরণ্ময়কে সে চেনে না, মলয়াকে দেখিয়াই তার সমস্ত মুখখানা আনন্দে যেন উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। সমবেত সম্মানিত প্রশংসাকারীদের সমস্ত সম্মান বিস্মৃত হইয়া গিয়া সে উচ্ছ্বসিত চিত্তে ছুটিয়া আসিয়া একেবারে মলয়াকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল। "মলি, ভাই! তুই যে আস্‌বি, আমি সত্যি বলছি, স্বপ্নেও ভাবিনি? সত্যি ভাই, তোকে দেখে এত আহ্লাদ হচ্ছে, স্বয়ং ইন্দ্র যদি ঐরাবতে চ'ড়ে এসে হাজির হতেন, তাতেও হয় তো অত আহ্লাদ আমার হতো না, মাসীমা! মাসীমা এসেছেন?"

মলয়ার মনটা এই অভ্যর্থনা-লাভে অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল। সে মনে মনে বলিল, 'ও সবার সঙ্গেই এই রকম করে, তাই লোকে সেটা হয় তো অন্যভাবে নেয়!' প্রকাশ্যে তার প্রশ্নের উত্তর দিয়া শেষে বলিল, "আমি একলা আসিনি, রবি! ইনি আমার দাদা, নাম এবং পরিচয় সে সব বোধ হয় তোমার বেশ জানাই আছে, আর নূতন ক'রে জানাতে হয় তো হবে না?"

রবি মলয়াকে ছাড়িয়া দিয়া হাত তুলিয়া হিরণ্ময়কে প্রতি-নমস্কার করিল, তার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, তার পর তার চোখের পাতা ঈষৎ লজ্জাভারনত হইয়া আসিল এবং তার মুখের চিরচঞ্চল আনন্দভাব যেন কেমন একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে মণ্ডিত হইয়া পড়িল। সে হিরণ্ময়ের ঔৎসুক্যস্মিত মুখের দিকে না চাহিয়াই ঈষৎ মৃদুকণ্ঠে কহিয়া গেল, "খুব খুসী হলেম।"

হিরণ্ময়ের সমস্ত বুকটা দুলিয়া উঠিল, ক্ষণ-পূর্ব্বের নিন্দাবাদ সে তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া গেল। রবির এই সহসা পরিবর্ত্তিত সলজ্জ শান্ত ভাবটুকু তার অত্যন্ত মিষ্ট-মধুর ঠেকিল; তার মনে হইল, মনে মনে সে-ও তাহা হইলে তাদের ভবিষ্য সম্বন্ধকে গ্রহণ করিয়া লইয়া তার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে! সে গভীর সুখে তন্ময় হইয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিল। কোন একটা ছোট-খাট কথা বলিয়া সে যেন তার অন্তরের এই নীরব প্রকাশকে খর্ব্ব করিয়া ফেলিতে পারিতেছিল না। তার পর নিতান্ত অসঙ্গত দেখায় বুঝিয়া সে কোনমতে আস্তে আস্তে বলিল, "আমিও।"

এক দল লোক এক গাদা দামী দামী প্রেজেন্ট লইয়া দেসদেমনার অভিমুখে আসিতেছে দেখিয়া হিরণ্ময় ও মলয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। হিরণ্ময়ের তখন মনে পড়িল, এত লোক এত উপহার দিতেছে, এর মাঝখানে দাঁড়াইয়া তার খালি হাতে ফিরিয়া যাওয়া ভাল দেখায় না। সে একটু বিপন্ন বোধ করিল, এখন বাজারে গিয়া জিনিষ কিনিয়া আনিয়া উপহার দেওয়া তার কেমন যেন অসঙ্গত ঠেকিতে লাগিল।

রবি মলয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা আজ থাকবে তো, তোমার সঙ্গে কা'ল সকালেই দেখা হচ্ছে বোধ হয়?"

মলয়া মৃদু হাসিল, "না ভাই! আমাদের এখনই ছুটে ছুটে গিয়ে ট্রেণ ধরতে হবে, কা'ল দাদার কোর্ট খোলা আছে যে।"

রবি মলয়ার হাত সাগ্রহে চাপিয়া ধরিল, "তুই দু'দিন থাক না, মলু! একটিও কথাবার্ত্তা হলো না যে, ভাই?"

মলয়ার থাকার ইচ্ছাই করিতেছিল, কিন্তু সে প্রস্তুত

জামা ইত্যাদি যাহার
হইতে নূতন লোক
করিতেছে, আর বেশী
ন্যায় চাহিল, তার পর হঠাৎ
আসিয়া প্রশ্ন করিল, "কে ঐ

রবির মুখ হঠাৎ আবার একটু যেন গম্ভীর হইয়া উঠিল, সে একবার চকিত-কটাক্ষে হিরণ্ময়ের দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, সে-ও স্থিরনেত্রে তাহার দিকেই চাহিয়া আছে, তাহাকে চাহিতে দেখিয়া সে সসম্ভ্রমে দৃষ্টি নত করিল। তার পর সহসা তার কাছে একটুখানি অগ্রসর হইয়া আসিয়া কোমল প্রীতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "অনেকেই আপনাকে অনেক জিনিষ দিচ্ছেন, আমি আর বেশী কি দেব, আপনার আঙুলের অনুপযুক্ত হলেও অনুগ্রহ ক'রে এই আংটীটি আঙুলে রাখলে বাধিত হবো।" এই বলিয়া সে তার নিজের আঙুল হইতে একটি হীরার আংটী খুলিয়া লইয়া রবির উদ্দেশ্যে মলয়ার হাতে দিতে গেল।

মলয়া আংটী নিজের হাতে লইল না, সে রবির বাম হস্ত টানিয়া লইয়া তাহার দাদার সামনে ধরিয়া বেশ একটু দৃঢ়তার সহিতই বলিয়া উঠিল, "না দাদা! আমি কেন দেব, তুমি নিজে ওর আঙুলে পরিয়ে দাও।"

এই বলিয়া হিরণ্ময়কে দিয়া এক রকম জোর করিয়াই আংটী পরাইয়া লইল।

রবি একবারমাত্র মৃদুকণ্ঠে কি বলিতে গিয়াছিল, কিন্তু চারি পাশের জনতার কথা ভাবিয়া সে কোন কথাই বলিতে পারিল না; হিরণ্ময়ের নিজ হাতে পরাইয়া দেওয়া আংটী সে নিঃশব্দেই পরিল এবং পরা হইয়া গেলে তার দিকে একটিবার চোখ তুলিয়া না চাহিয়াই দুই হাত যোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া তাহাকে নমস্কার জানাইল, তার পর সে অন্য লোকদের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। তার মুখে গম্ভীর বিষণ্ণতা তখন স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, মনের ভিতর একটা অস্বস্তি যে জাগিয়া উঠিয়া তাহার চিরচপল চিত্তকে কিছু পীড়িত করিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রবি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইতেই হিরণ্ময় ও মলয়া ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল, তাদের সম্বন্ধে তখন যে মৃদু ও সুস্পষ্ট আলোচনা চলিতেছিল, তাহারও কিছু কিছু তাদের কাণে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। এক জন আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, এটা কি রকম হলো? অঙ্গুরীয়-বিনিময়?"

প্রথম ব্যক্তি কহিল, "না, দান ত ঠিক বোধ হলো না! এ যেন আরও কিছু বেশী! আচ্ছা, ও লোকটা কে, যে ঐ আংটী পরিয়ে দিলে?"

দ্বিতীয় জন উত্তর করিল, "হবেন কেষ্ট কেষ্ট-বিষ্ণুর মধ্যে, না হ'লে আর ভরসা ক'রে রবি গুপ্তর আঙুলে আংটী পরাতে যায়! আচ্ছা, তবে যে শুনছিলাম, ঐ 'ওথোলো'র সঙ্গে এর আগেই রবি গুপ্তর অঙ্গুরীয়-বিনিময়াদি হয়ে গেছে!"

জিজ্ঞাসিত হাসিয়া কহিল, "সে হয় তো হৃদয়-বিনিময়, বিনিময়ের আংটীটা হয় তো ওর কমলহীরের না থেকে, ইমিটেশন রবির থাকায় ও কাযটা যার হাতে জলজলে কমল হীরের আংটী ছিল, তার জন্যেই বাকি রাখা হয়েছিল। ওহে, সাত-সকালে সেকেলে পচা-মতে বিয়ে ক'রে ব'সে আছ, আধুনিক কোর্টশিপের তুমি এখন বুঝতে পারবে কিছু? এ সব তো হতভাগা মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের শাস্ত্র নয়, খাঁটি য়ুরোপের আমদানী। বাপ-মা দেখে শুনে যার সঙ্গে মন্তর পড়িয়ে দিলে, পরস্পর তাকে নিয়েই আপনার করতে বাধ্য হবে, এত বড় অত্যাচার এর মধ্যে নেই। নাচো, গাও, আজ একটা কা'ল একটা পরপুরুষকে নিয়ে ষ্টেজে দাঁড়িয়ে প্রিয়তম! Dear! Dearest! ব'লে প্রেমাভিনয় দেখাও, দেখে দেখে আর দশ-বিশ জনের মাথা ঘুরে যাক্, তার পর যাকে খুসী বেছে নাও, চিত্ত-বিনিময় কর, সুবিধা হলো বিয়ে করলে, না হলো বাধা পড়লো, আবার সুযোগ দেখা দেবে! এই রকম মজাটা মন্দ কি?"

"মন্দ কি!" বলিয়া শ্রোতা সদর-দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

চলন্ত মোটরে বসিয়া মলয়া অনেকক্ষণের চেষ্টার পর কথা কহিয়া ডাকিল, "দাদা!"

হিরণ্ময় প্রথম ডাক শুনিতে পায় নাই, চিন্তা-তন্ময়তা হইতে জাগ্রত হইয়া উঠিয়া দ্বিতীয়বারের আহ্বানে সে জবাব দিল, "কি খুকি?"

মলয়া একটু ইতস্ততঃ করিল, "তোমার রবিকে কেমন লাগলো?"

বিধার পর মোরিয়া হইয়া কহিল, "কিন্তু দাদা! লোকে কি সব বলাবলি করছিল, তাও তো শুনতে পেলে? কত কি অযথা কথা!"

হিরণ্ময় ক্ষমার সহিত একটু হাসিল, উত্তর করিল, "মলু! চাঁদকে কলঙ্কী বল্লেই তো সত্যিকারের চাঁদে কলঙ্ক লাগে না?"

মলয়া কহিল, "এ এখনকার নব্যতন্ত্রতার কথা, দাদা! সকল দেশের সভ্যতা এক নয়, আমাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতা শুধু আমাদের দেশেরই নয়, সকল দেশেরই প্রাচীন সভ্যতায় 'জনের' চেয়ে 'গণের' প্রাধান্যই শুধু রাজনীতি-ক্ষেত্রেই নয়, সকল ক্ষেত্রেই বড় ছিল, লোকাপবাদকে এখন লোকে তুচ্ছ করতে শিখেছে, কিন্তু এ আগে ছিল না এবং কোন ভদ্রসমাজে থাকাও সঙ্গত মনে করি না। সমাজে বাস করবো অথচ তাকে মানবো না, স্বেচ্ছাতন্ত্রতা চালাবো. এ কি ভাল? আমার মনে হয়, আমাদের ঘরের বৌএর পিছনে একটা মস্ত-বড় নিন্দা অপবাদের সুযোগ থাকতে দেওয়া না হওয়াই সঙ্গত। সেটা থাকা উচিতই নয়।

মলয়ার আসল উদ্দেশ্য না বুঝিয়াই হিরণ্ময় একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি মাকে কি এ সব কথা বলবে?"

মলয়া কহিল, "না, আমি তোমাকেই বলছি।"

হিরণ্ময় কহিল, "আমার তো কোন হাতই নেই, যা দিয়ে লোকের মুখ বন্ধ করতে পারি? নিন্দুক সেই রামচন্দ্রের যুগ থেকেই তার নিন্দাকার্য্য সজোরে চালিয়ে যাচ্ছে, কোন রকম জমকালো একটা রিফর্ম্ম স্কিম ক'রে তাদের শোধরাতে না পারলে আর তারা এ স্বভাব বদলাবে ব'লে আমার ভরসা হয় না।"

মলয়া এ কথায় আর কোন জবাব দিল না। যা দিয়া সবাই ভোলে, রুবির সেই অত্যন্ত তীব্র রূপে যে তার শিষ্টশান্ত দাদাটিও আজ মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছে, তাহা সে স্পষ্টই অনুভব করিল এবং ইহার বিরুদ্ধে বলিতে গেলে হয় তো তার প্রতি অন্যায় করা হইয়া যাইবে, এই কথা ভাবিয়া সে এইখানেই চুপ করিয়া গেল। শুধু মনে

চলিয়া গেলে

পৌঁছে দিয়ে আসি।

রুবি সাগ্রহে সম্মতি দিয়াই

বোর্ডিংএ এত রাত্রিতে শুধু এক জন পুরুষ মানুষের সঙ্গে যাওয়া তো নিয়ম নয়! মৃদুস্বরে কহিল, "আমাদের মেট্রন যে সঙ্গে আছেন।"—

"বেশ তো, তিনি পরেই যাবেন" এই বলিয়া মুগ্ধ রুবির হাত ধরিয়া টানিল, "চল চল, এখনই হয় ত তিনি এসে পড়বেন, তার চাইতে আগেই আমরা বেরিয়ে পড়ি। তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা কইবার আছে।"

ট্যাক্সিতে উঠিয়া রুবি বলিল, "ঐ যা, আপনি মুখটাও যে ধুলেন না!"

"ও একেবারেই হবে তখন" বলিয়া ওথেলো গায়ে জড়ানো ওভার-কোটের কলারটা গলা পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়া মাথায় নাইট ক্যাপটা পরিল।

"রুবি!"

"কি?" বলিয়া রুবি জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিল।

"তুমি কিন্তু আমায় এক দিন আশা দিয়েছিলে। দাওনি রুবি?" ওথেলোবেশী শশাঙ্ক রুবির হাত ধরিল।

"বলো দাওনি? সেই প্রথম দেখার দিন? দাওনি?" করবী কথা কহিল না, তার বুকখানা অত্যন্ত ভারি হইয়া উঠিতে লাগিল। শশাঙ্ক তার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, "আজ তোমার কাছে অনেকগুলি আবেদন পড়লো বুঝতে পারলুম। এক জনকে তুমি তো তোমার হাতে আংটী পরিয়ে দিতেই দিলে। ও কে? বল রুবি, ও লোকটা কে? ওকে কি তুমি চেনো? চিনতে? আমায় ছেড়ে ওরই বুঝি হ'তে চাও? ও কি খুব বড়লোক? ওর সঙ্গে কোথায় কবে তোমার পরিচয় হলো? তুমি কি ওকে কোন আশা দিয়েছিলে? ও হঠাৎ কেন তোমায় নিজের আঙুল থেকে খুলে আংটী পরিয়ে দিলে? বল?"

রুবির দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, সে নিজের মধ্যে একটা অপরিসীম দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে লাগিল। কি বলিবে, কি করিবে, কিছুই সে যেন ভাবিয়া উঠিতে পারিল

না। সত্য কথা বলিতে তার সাহসে কুলাইল না, হিরণ্ময়ের সে যে একরকম বাগ্‌দত্তা, সে কথা সে শশাঙ্ককে জানাইতে পারিল না। এক তো সে কথা বলিতে তার লজ্জা করিল, দ্বিতীয় হইল ভয়। এই নির্জ্জন রাত্রিতে, একা এক গাড়ীতে এই কথা শোনার পর শশাঙ্ক যে কি করিবে, তার ঠিকানাই বা কি? তা' ছাড়া আরও হয় তো একটু কিছু ছিল। শশাঙ্কের অপূর্ব্ব সুঠাম মূর্ত্তি, তার স্বাভাবিক প্রফুল্ল চঞ্চলতা প্রথমাবধিই তার প্রতি তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। হিরণ্ময়কে সে কোন দিনই প্রত্যাশা করে নাই, আজই তাহাকে সে প্রথম দেখিল। দেখিয়া অবশ্য তার মানুষের মত শান্ত গম্ভীর ভাব, সহজ ভদ্রতা তাকে ভালই লাগিয়াছিল, কিন্তু শশাঙ্কের কথা অন্যরূপ! শশাঙ্ক তার জীবনে দিন দিনই জড়িত হইয়া পড়িতেছিল। আজই—'ওথেলোর পার্ট' যায় লওয়ার কথা, সে অসুস্থ হইয়া পড়ায় কি বিষম বিপদই না ঘটিতেছিল, এমন সময় কোথা হইতে শশাঙ্ক আসিয়া উপস্থিত! সে একবার কলেজে ওথেলোর পার্ট লইয়া প্রশংসিত হইয়াছিল, সবাই সে কথা জানিত, চাহিবামাত্র তাই তাহাকে 'ওথেলো' করিয়া লইয়া মুখরক্ষা এবং মানরক্ষা দুই-ই হইয়া গেল!

রুবি শুধু রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"আমি তো এর আগে কক্ষনোই ওঁকে দেখিনি, শশাঙ্ক বাবু! এই প্রথমবার ওঁকে আজই আমি দেখলুম।"

"সত্যি!" বলিয়া শশাঙ্ক রুবির হাতখানা আর একবার চাপিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে শিথিল করিয়া দিল।

"রুবি?"

"বলুন?"

"ও আংটীটা কি অনেক দামী? ওটা কি ফেলে দিতে পার না?"

করবী ক্ষণকাল নীরব রহিল, একবার মনে হইল বলে যে, তাহা হয় না, তাহা করিবার অধিকার তার হয় ত নাই, কিন্তু সে এবারও এই সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে শশাঙ্কর হাতের মধ্য হইতে নিজের হাত সরাইয়া লইয়া বাম হাতের মধ্যমাঙ্গুলী হইতে হিরণ্ময়ের প্রদত্ত তার নিজের হাতে পরাইয়া দেওয়া হীরার আংটীটা খুলিয়া লইল।

শশাঙ্ক বলিল, "আংটীটা তুমি আমায় দিতে পার, রুবি?"

করবী এ কথা শুনিয়া একটু খুসী হইল। সত্য সত্যই একটা দামী জিনিষ খামোখা রাস্তায় ফেলিয়া দিতে পাগলে ভিন্ন আর কে মনের সঙ্গে রাজী হইতে পারে! সে সাগ্রহেই উত্তর দিল, "বেশ ত, নিন না।" আংটীটা তার হাতে দিতে গেল, শশাঙ্ক হাত সরাইয়া লইয়া আঙ্গুল বাড়াইয়া দিল, জোর দিয়া বলিল, "অমন বেগারি দিলে আমি নিই না, দাও যদি, তবে নিজে হাতে পরিয়ে দাও।"

রুবি তাহাকে আংটী পরাইয়া দিলে নিজের আঙ্গুল হইতে সে-ও সেই রকমই, বরং আরও একটু বড় হীরা ও নীলা দেওয়া একটা খুব দামী আংটী খুলিয়া লইয়া রুবির হাত টানিয়া লইয়া তাহার আঙ্গুলে সেটি পরাইয়া দিতে দিতে হাসিয়া কহিল, "বাঃ, এইটেই ঠিক তোমার জন্যে তৈরী হয়েছিল! দেখছ না, আঙ্গুলে কেমন ঠিক হয়েছে!"

গাড়ী বোর্ডিংএর দরজার সামনে পৌঁছিয়া থামিয়াছিল, দোরের সামনে একখানি বাস দাঁড়াইয়া, মেয়ের দল কল-কল করিতে করিতে তাহার মধ্য হইতে বাহির হইতেছে। সকলকার মুখেই অভিনয়-সম্বন্ধীয় আলোচনা। 'রুবিদি'র রাশি রাশি উপহার পাওয়ার গল্প!

রুবি গাড়ী থামিবামাত্র তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িতে গেল, এতক্ষণ সে শশাঙ্কর সঙ্গে থাকিয়া এক দিকে সুখী হইলেও আজিকার এ সব আলোচনা ও ব্যাপারে মনে মনে একটা অজ্ঞাত অশান্তিও অনুভব করিতেছিল। তা[র] ব্যবহার যে, না হিরণ্ময়, না শশাঙ্ক কাহারও সম্বন্ধেই ঠি[ক] সঙ্গতমত হইল না, তাহা বুঝিতে পারিয়া সে নিজে[র] পরেও অত্যন্ত বিরক্তিবোধও করিতেছিল, অথচ কি করি[য়া] যে কি করিবে, তাহাও ঠিক করিয়া বুঝিয়া উঠিতে সম[র্থ] হইতেছিল না। শশাঙ্ক তার পক্ষে লোভনীয়, আবার তা[র] মা-বাপ হিরণ্ময়কে কথা দিয়াছেন, শশাঙ্কর পক্ষ হই[তে] সত্যকার কোন পাকা কথা এ পর্য্যন্ত উঠে নাই!

শশাঙ্ক রুবির হাত চাপিয়া ধরিয়া তার কাণের কা[ছে] নত হইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "মনে থাকে যেন রু[বি] তুমি আর কারু হ'তে পারো না, তুমি আমায় অ[ঙ্গুরী] দিয়েছ, তুমি শুধু আমারই! তোমার জন্যে আমি পৃথি[বী]

শুদ্ধ সবার সঙ্গেই যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছি, শুধু তুমি আমার পক্ষে থেকো।"

নিঃশব্দে নত-মস্তকে করবী যখন নামিয়া আসিয়া সেই আনন্দ-কলরবশীলা সহাধ্যায়িনীদের মধ্যে দাঁড়াইল, তখন তাহারা নিজেদের ভাবে ভোর না থাকিলে তাহার মুখ দেখিয়া বিস্মিত—এমন কি, শুম্ভিত হইত। তার সেই সদা-চঞ্চলতা ও হাসি-খুসী আজ এই এত বড় বিজয়ের মুহূর্ত্তে কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। মুখ তার শুভ্র—বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল দুই চোখ বর্ষাকাশের মতই জল-ভারাবনত।

কাহারও সহিত কোন আলোচনা না করিয়াই সে তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকিয়া এক রকম ছুটিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

মেয়েরা বলিল, "করবীদির নিশ্চয়ই খুব বেশি মাথা ধরেছে।"

এক জন বলিল, "আমি কিন্তু সেই 'সুর'টার পরিচয় না জেনে ওর মাথা-ধরাকেও ক্ষমা করতে প্রস্তুত নই, এক্ষণি ওর কাছে যাচ্ছি, দাঁড়া না।"

আর এক জন বলিল, "আহা, আজকে ওকে আর ডিষ্টার্ব করিস্ নে, বেচারী রাতটা ঘুমিয়ে কাটাক, সকাল-বেলা ঘুম থেকে উঠলেই যার যত জেরা করবার আছে, করিস্।"

শেষকালে ভোটে এই মতই গ্রাহ্য হইল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

ব্যায়ামবীর বাঙ্গালী যুবক

শ্যামাকান্ত, রামমূর্ত্তি, অমু গুহ, ভীম ভবানী, মহেন্দ্রনাথ, গোবর প্রভৃতির দৈহিক বল ও তাঁহাদের অনুষ্ঠিত বিবিধ কৌশলক্রীড়া দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়া থাকি। কিন্তু কত সহজ সাধনায় পেশী-সংযমন অভ্যাস করিয়া বিবিধ কৌশলে কি অদ্ভুত দৈহিক ক্রিয়া সকল দেখান যাইতে পারে, তাহার সংবাদ আমরা খুব কমই রাখিয়া থাকি। এই প্রবন্ধে আজ দুই জন বাঙ্গালী যুবকের ব্যায়ামের কীর্ত্তিকথা লিখিত হইল।

বাঙ্গালী ব্যায়ামবীর ও পেশী-নিয়ামক বিষ্ণুচরণ ঘোষ, সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেশচন্দ্র কর্ম্মকার, কেশবচন্দ্র সেন, হৃষীকেশ ঘোষ প্রভৃতির কথা হয় ত ইতিমধ্যে অনেকে জানিয়া থাকিবেন। আজ যাঁহাদের কথা বলিতেছি, তাঁহারা চন্দননগরবাসী গৃহস্থ ব্রাহ্মণ-সন্তান। এক জনের নাম শ্রীযুত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় এবং অপরের নাম শ্রীযুত লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়। প্রথমটি বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, বয়ঃক্রম পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর, দ্বিতীয়টি স্থানীয় ডুপ্লে কলেজের ছাত্র, সম্প্রতি পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়াছেন, বয়ঃক্রম একুশ বৎসর। এই যুবকদ্বয় তাঁহার নিয়ন্ত্রিত পেশী-সঞ্চালন দ্বারা এরূপ অদ্ভুত ক্রিয়া সকল দেখাইতে পারেন, যাহা দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না।

তাঁহারা চন্দননগরে বহুবার তাঁহাদের কৌশল ও দৈহিক বলের পরিচয় দিয়া দর্শকদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন এবং তৎকালীন বিশিষ্ট দর্শকগণের নিকটও প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাদের কথা অনেকের কাছে অজ্ঞাত ছিল। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে যে দিন চন্দননগরের প্রধান রাজপুরুষ এডমিনিষ্ট্রেটর মহোদয়ের সভাপতিত্বে নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে বহুজন সমক্ষে সাধারণ সভায় অন্যান্য কতিপয় যুবকের সহিত তাঁহাদের দৈহিক ক্ষমতা ও পেশী-সঞ্চালনক্রিয়া-সাধনার পরিচয় প্রদান করেন, তখন হইতেই তাঁহাদের শক্তি ও কৌশল-প্রদর্শনের কথা ঘরে-বাহিরে প্রচার হইতে থাকে। তাহা হইলেও তাঁহাদের কথা এখনও অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। আজ তাঁহাদের পরিচয়ে এই স্বল্পায়াসসিদ্ধ প্রয়োজনীয় ব্যায়ামে আমাদের ছেলেরা যদি একটু আকৃষ্ট হয়, এই উদ্দেশ্যে আমার এই প্রয়াস।

এই যুবকদ্বয়ের কথায় ও এই সকল কার্য্যে বেশ বুঝা যায়, কিছুদিনের সংযতভাবের চেষ্টায় যে কেহ অনায়াসে

ইহা আরম্ভ করিতে পারেন। ইহা হইতে মনে হয়, বুকের উপর ভারি পাথর ভাঙ্গা, হস্তি-পদতলে বা মোটর গাড়ীর তলায় নিজ দেহ রক্ষিত করা একটা অলৌকিক কার্য্য নহে। এ সকল ক্রীড়ায় তাঁহারা এখনও পারদর্শী না হইলেও, তাঁহাদের নিজের ইচ্ছামত দেহের সর্ব্বাঙ্গে পেশী-সঞ্চালন, গুরুভার উত্তোলন, দুইখানি চেয়ারে মস্তক ও পদদ্বয় রক্ষিত করিয়া পেটের উপর গুরুভার গ্রহণ, গতিশীল শক্তিসম্পন্ন মোটর গাড়ীর গতিরোধ করা, চওড়া ও মোটা ষ্টীলের পাটীকে হাতের উপর তারের ন্যায় জড়ান প্রভৃতি প্রক্রিয়া দেখানও ইঁহাদের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।
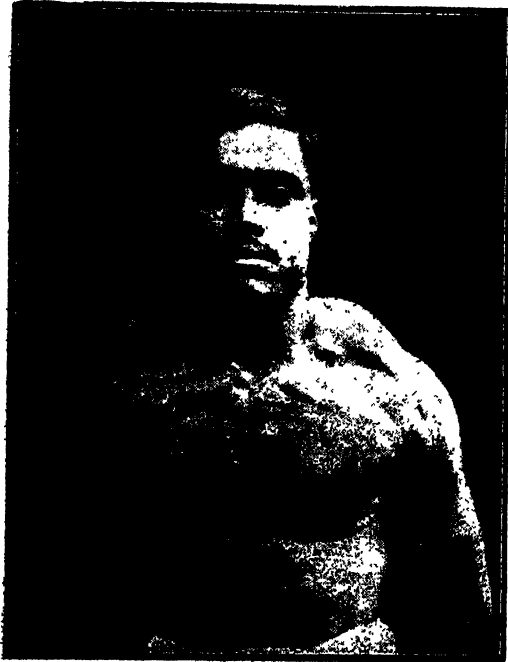
পেশীসঞ্চালনরত শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়

এই দুই যুবকের দৈহিক শক্তিলাভের বিশেষ ইতিহাস কিছুই নাই। পুরুষানুক্রমে যে ইঁহারা বলশালী অথবা শৈশব বা কৈশোরে ইঁহাদের এই বলসঞ্চয়ের জন্য যে এমন কিছু বিশেষ ব্যবস্থা ছিল, এমন কথাও জানা যায় না। বেণীমাধব কলিকাতায় সিটি কলেজে অধ্যয়নকালে তাঁহাদের ব্যায়াম-শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাজেন ঠাকুর গুহ মহাশয়ের নিকট হইতে উৎসাহিত হইয়া তাঁহার কাছেই প্রথম শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীকান্ত বেণীমাধবেরই শিষ্য। ইঁহাদের চেষ্টায় এখন চন্দননগরে আরও কতিপয় যুবক এই সকল কৌশল শিখিতেছে। বেণীমাধবকেই চন্দননগরে এই ব্যায়ামাদি শিক্ষায় প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে।

মধ্যে মধ্যে স্বাস্থ্যবিষয়ক বৈদেশিক পত্রে বা অন্যত্র বৈদেশিক যুবকদের দৈহিক বল ও কৌশলাদির কথা পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত হই। একটা মোটা লোহার পাত জড়ানোর কথা-প্রসঙ্গে হ্যারি লাফট্ নামক একটি তরুণ যুবকের প্রশংসা সর্ব্বত্র ঘোষিত হইয়াছিল। কালে সেই যুবক পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান পুরুষ হইবে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণীও শুনা গিয়াছিল। * কিন্তু আমাদের সাধারণ গৃহস্থ সন্তান বাঙ্গালী যুবক লক্ষ্মীকান্তকে প্রায় আড়াই

বেণীমাধব পৃষ্ঠদেশের পেশী সঞ্চালন করিতেছেন

ইঞ্চি চওড়া ও সিকি ইঞ্চি মোটা ষ্টীল-বারকে অবলীলাক্রমে পাকাইয়া ফেলিতে দেখিয়াছি। উনিশ ঘোড়ার শক্তি বিশিষ্ট মোটরকে ধরিয়া রাখিতে দেখিয়াছি এবং ২ শত ২৫ পাউণ্ড ওজনের ভার উত্তোলন করিতে দেখিয়াছি। অথচ তাঁহাদের কথা দেশ-বিদেশে ঘোষিত হওয়া দূরে থাকুক, প্রতিবেশীদিগের মধ্যেও অনেকে হয় ত সে সংবাদ রাখেন না।

তাঁহাদের কথায় বুঝা যায়, এ সব শিক্ষা বিশেষ কিছু

* প্রবাসী—ফাল্গুন, ১৩৩৪।

লক্ষ্মীকান্ত ২২৫ পাউণ্ড ওজনের ভার এক হস্তে রাখিয়াছেন

লক্ষ্মীকান্ত ষ্টীলের পাটী হাতে জড়াইতেছেন

কঠিন নহে, সাধনা করিলে সকলেই শিখিতে পারেন। কয়েক বৎসর গত হইল, তারাপদ নামক একটি ষোড়শবর্ষ-বয়স্ক বালক—তাহার আর্থিক অবস্থা ভাল নহে—হঠাৎ এক দিন উপস্থিত হইয়া অন্যান্য কতিপয় পেশী-নিয়ন্ত্রণ-বিষয়ক কৌশলের সহিত বক্ষোপরি মোটরগাড়ী চালনা-কৌশল দেখাইয়াছিল। তখন বেণীমাধব ও লক্ষ্মীকান্তের নাম অজ্ঞাত ছিল। আগন্তুক বালকের কাছেও শুনিয়াছিলাম, এ সব শিক্ষা আদৌ কঠিন নহে, চেষ্টা করিলে সকলের পক্ষেই শিক্ষা করা

লক্ষ্মীকান্তের পেটের উপর এক জন দাঁড়াইয়া আছেন

সম্ভব। এ সকল ব্যায়ামের দ্বারা শরীরের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে এবং পাকস্থলী-সংক্রান্ত অনেক ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে।

ব্যায়ামের দ্বারা যুবক ও বালকদের দৈহিক উন্নতির যাহাতে সুযোগ হয়, বেণীমাধব ও লক্ষ্মীকান্ত প্রভৃতির চেষ্টায় প্রায় দুই বৎসর হইল 'সেণ্ট্রাল জিমনাশিয়ম্' নামে চন্দননগরে ম্যারের সভাপতিত্বে একটি উচ্চাঙ্গের ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে তিনকড়িনাথ সিংহ, সতীশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি কতিপয় স্থানীয় যুবক ভারোত্তোলন, লোহার
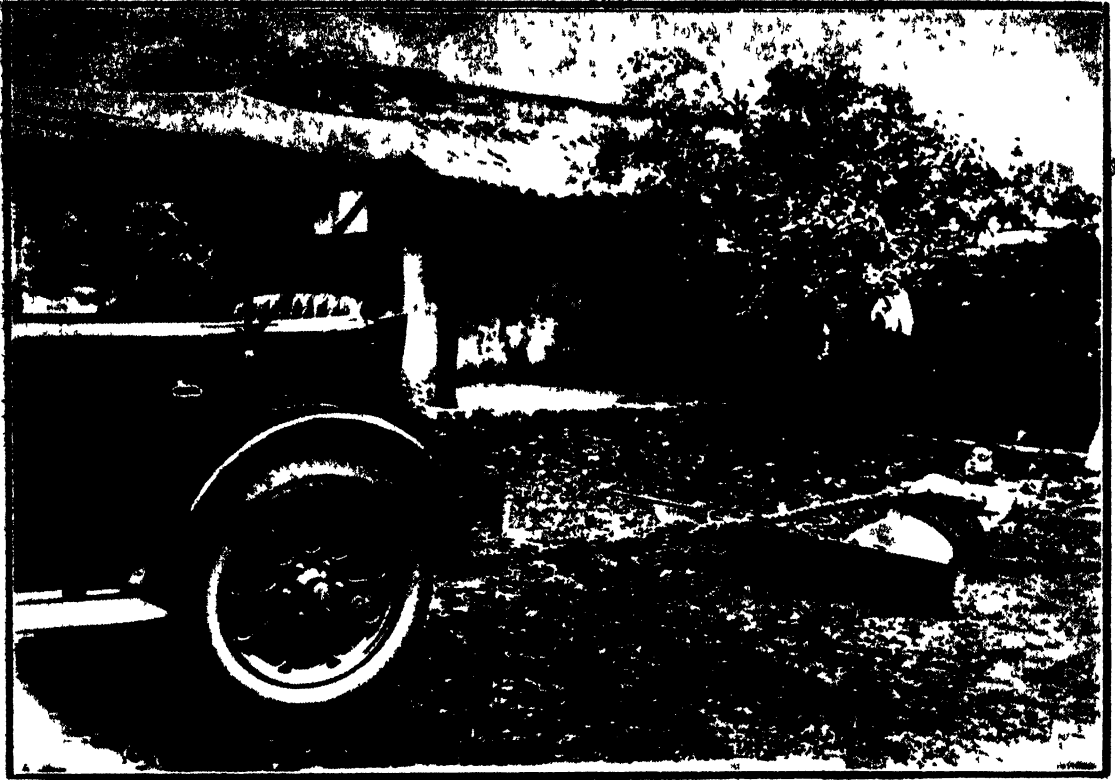
লক্ষ্মীকান্ত একখানি ১৯ ঘোড়ার শক্তিসম্পন্ন সুবৃহৎ মোটর গাড়ীর গতিরোধ করিতেছে

পাটী পাকান প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছেন।

বাঙ্গালী শক্তিচর্চ্চায় দিন দিন অবহিত হইতেছে, ইহা আশা ও আনন্দের কথা। দুর্ব্বল ও ভীরু অপবাদ বাঙ্গালীর কলঙ্কস্বরূপ। আত্মনিয়ন্ত্রণের যুগে বাঙ্গালী জাতিকে প্রমাণ করিতে হইবে, শারীরিক শক্তিতে পৃথিবীর কোনও জাতির পশ্চাতে তাহারা পড়িয়া থাকিবে না। ব্যায়ামচর্চ্চায়—বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শক্তি অর্জ্জনের চেষ্টার প্রসার শিক্ষাবিভাগে বাধ্যতামূলক হইলেই সহজে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

শ্রীহরিহর শেঠ।

অর্ঘ্য

দীনের বুকে তোমার পূজা তাও কি কভু হয়?
দুখীর প্রাণে সুখের আশা ভাগ্যে কি তা সয়?

ভাগ্য যে তার ব্যথায় ভরা, শুধু চোখের জল,
দুঃখ যে তার চির-সাথী, সুখটি শুধু ছল।
ভাগ্য-ভরা নিঠুর-খেলা দুখীর সারা ভালে,
জন্ম তার যায় যে কেটে শুধু চোখের জলে।

কেমন ক'রে তোমার পূজা করব ওগো বল,
সম্বল মোর নেইকো কিছু, শুধু চোখের জল।
আজকে এই বিদায়-বেলা তোমায় দিনু তাই,
এমনি ক'রে চোখের জলে তোমায় যেন পাই।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ রায়।

আসল ভালবাসা

(বিদেশী গল্পের ভাবালম্বনে)

এইমাত্র একখানি সাময়িক-পত্রে একটি ভালবাসার গল্প পড়িলাম। গল্পটির সারাংশ এই যে, এক জন পুরুষ একটি স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়া নিজে আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে; কাযে কাযেই পুরুষটি যে স্ত্রীলোকটিকে ভালবাসিত, ইহা নিশ্চিত। সেই স্ত্রীলোকটি কে, অথবা সেই পুরুষটি কে, তাহাদের ভালবাসা প্রকৃত ভালবাসা না সাময়িক মোহ, ইহা ক্ষণিক উন্মাদ ব্যাধি না বিকারগ্রস্ত স্নায়বিক আক্ষেপ, সে সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা অনাবশ্যক। তাহাদের ভালবাসায় অথবা জীবন-মরণে অবশ্য আমাদের লাভ বা ক্ষতি কিছুই নাই। তাহাদের ভালবাসার এই লোমহর্ষণ পরিণাম আমাকে এতটুকুও আশ্চর্য্যান্বিত করে নাই। তাহাদের প্রেমের এই বিসদৃশ অভিব্যক্তি মুহূর্ত্তকালের জন্যও আমার চিন্তার বিষয় হয় নাই। গল্পটি আমার প্রাণে এতটা লাগিয়াছিল, তাহার কারণ এই যে, ইহা আমার যৌবনে সংঘটিত একটি ঘটনার স্বপ্নের মত ছায়াময় স্মৃতিকে জাগ্রত ও বাস্তবের ন্যায় প্রকট ও পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিল। অনেক দিন পূর্ব্বে আমি এক দিন পক্ষী শিকার করিতে গিয়া একটি ভালবাসার ব্যাপার দেখিয়াছিলাম। এই স্মৃতিটি হইতেছে, সেই ভালবাসার ব্যাপারটির স্মৃতি। নাস্তিকের নিকট ভগবৎ-কৃপা যখন প্রথম আবির্ভূত হয়, তখন যেমন তাহা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া আসে, ভালবাসাও সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে সর্ব্বপ্রথম আমার নিকট এক দিব্যমূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল।

আদিম মানবের হৃদয়ে নিষ্ঠুরতা, হিংসা ও শোণিতলিপ্সা যেমন সহজাত সংস্কার—জন্মগত প্রবৃত্তি; আধুনিক সভ্যতার আলোকে আলোকিত মানবের হৃদয়ে যেমন সেই আদিম সংস্কার ও প্রবৃত্তিগুলি পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান থাকে, কেবলমাত্র তাহাদের উপর বিবেকের একটা পাতলা প্রলেপমাত্র অবলিপ্ত থাকে, আমারও হৃদয়ের গঠনটি ঠিক সেইরূপ ছিল। পরকীয়ার প্রতি শঠ নায়কের ভালবাসা যেমন উৎকট, আমারও মৃগয়ালিপ্সা সেইরূপ উৎকট ছিল। বন্দুকের গুলীতে হত পক্ষীর বুক হইতে যখন তীরের মত রক্তধারা ছুটিত, আমার হৃদয় তখন সেই শোণিতোৎসব দেখিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া যাইত। আহত পক্ষীর বক্ষের শুভ্র পালকে অথবা ডানায় ছিট ছিট, তাজা রক্তের দাগ দেখিয়া আমি আনন্দে মুহ্যমান হইয়া পড়িতাম। মৃগয়াহত মৃগের শোণিতে আমি আমার শুভ্র হস্তদ্বয় রঞ্জিত করিতে বড়ই ভালবাসিতাম।

সে বৎসর পৌষের প্রারম্ভ হইতেই খুব জাঁকাইয়া শীত পড়িয়া গেল। বড়দিনের ছুটীতে আমার মাসতুতো ভাই রাজসাহী জেলায় তাঁহার জমীদারীর মধ্যে যে প্রকাণ্ড বিল আছে, সেই বিলে পক্ষী শিকার করিবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। এই বিলের নাম বিল-চলন বা চলন-বিল। এই চলন-বিলের ধারে ধারে বহু সম্ভ্রান্ত অধিবাসীর দ্বারা অধ্যুষিত গ্রাম, গণ্ডগ্রাম ও জনপদ আছে। কলমগ্রামটি ইহাদেরই অন্যতম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উক্ত প্রদেশে বহুকাল হইতে কোনও গ্রাম্য কবিরচিত একটি পয়ার প্রচলিত আছে। পয়ারটি এই—"বিলের মধ্যে চলন, আর গাঁয়ের মধ্যে কলম।" আমার মাসতুতো ভাই এই কলমগ্রামের জমীদার; বিল-চলনও তাঁহার জমীদারীর অন্তর্গত। তিনি এক জন বলিষ্ঠ পুরুষ ও নামজাদা শিকারী। তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর। তাঁহার কেশগুলি কুঞ্চিত ও কাঁচায়-পাকায় মিশ্রিত। তাঁহার মুখে খুব জাঁকালো গোঁফ ও গালপাট্টা দাড়ী। তিনি এক জন বিখ্যাত হুঁদে গেঁয়ো জমীদার—আধা-মানুষ আধা-জানোয়ার, সদালাপী, সরল ও সদাই প্রফুল্ল। তাঁহার স্বভাবে এমন একটা মধুরতা ছিল, যাহা থাকিলে মানুষের অন্য বিষয়ে বিশেষ কিছু বিশেষত্ব না থাকিলেও সে সমাজে আদর পায়। তাঁহার বেশভূষাও খাঁটি শিকারীর মতই ছিল। তিনি রাত-দিন কর্ডরয়-ভেলভেটের যোধপুরী ব্রিচেস্ আঁটিয়া, পায়ে হবনেল্ বুট পরিয়া, হাঁটু পর্য্যন্ত মোটা পটি-লেগিং জড়াইয়া, হাতকাটা খাকী-সার্ট গায়ে দিয়া ও মাথায় শিকারী সোলা-হাট চড়াইয়া থাকিতেন। তিনি সহর বা সহুরে লোককে আদৌ পছন্দ করিতেন না এবং কলমে তাহার নিজের পৈতৃক আবাসস্থান প্রকাণ্ড একটি খামারবাড়ীতেই বাস করিতেন। তাঁহার আবাসের পাশ দিয়া একটি ক্ষুদ্র পদ্মার খাড়ীও ছিল। এই নাতিপ্রশস্ত স্রোতস্বতীটি নগর, প্রান্তর ও শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া গিয়া সেই প্রকাণ্ড চলন-বিলে গিয়া মিশিয়া গিয়াছিল। তাহার বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বেই প্রান্তর, শস্যক্ষেত্র ও মাঝে মাঝে আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, জাম প্রভৃতি ফলের বৃক্ষ ও নানা জাতীয় আগাছা ও লতা-গুল্মাদিপরিপূর্ণ জঙ্গল। সেই জঙ্গলে গাছের ঝোপে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ছোট ও বড় পক্ষী বাস করিত। এত বিভিন্ন জাতীয় পক্ষী বাঙ্গালার অন্য কোনও স্থানে একসঙ্গে দেখা যাইত না। সেখানে মাঝে মাঝে দুই চারিটা চখাচখী পক্ষীও শিকার মিলিত। ইহা ভিন্ন যে সকল পক্ষী এক প্রদেশে স্থির হইয়া বাস করে না, যাহারা এ দেশ ও দেশ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, এরূপ ভবঘুরে জাতীয় পক্ষীর দলও এই সকল জঙ্গলের নিকটে আসিলে তথায় এক রাত্রি বাস করিয়া যাইবার প্রলোভন এড়াইয়া যাইতে পারিত না। তবে এই প্রদেশে, সকলের চেয়ে চলন-বিলই ছিল একটি সুন্দর পক্ষি-মৃগয়ার স্থান। আমার ভ্রাতা এই জলাটিকে অতিশয় যত্নের সহিত ও পরিপাটীভাবে,

রক্ষা করিতেন। এই জলাটি বড় বড় নলবন, কল্মী, পদ্ম, কুমুদ ও থানিকল প্রভৃতি জলজ লতাগুল্ম ও শরের জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। আমার ভ্রাতা সেই নলবন, লতাগুল্ম ও ঘাসের জঙ্গলের ভিতর দিয়া নৌকা চলাচলের জন্ত বহু সরু সরু পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন—সে পথে ছোট ছোট নৌকা লগীর সাহায্যে বাহিয়া লওয়া যাইত। জলার অল্প জলে ঘাস ও শরবনের মধ্যস্থ সঙ্কীর্ণ পথে যখন নৌকা বাহিয়া যাওয়া যাইত, তখন চারিধার হইতে নলগাছ নৌকায় ও নৌকার আরোহীদিগের গায়ে লাগিয়া শর-শর করিয়া শব্দ হইত। সেই শব্দে ছোট মাছগুলি জলের ভিতর হইতে লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিয়া পলাইয়া গিয়া সন্ত্রস্তভাবে ঘাসবনের মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইত। আশে-পাশে যে সকল জলচর পক্ষী থাকিত, তাহারা সেই শব্দ পাইয়া ভয়ে জলের ভিতর ডুব দিয়া পলাইত।

আমি বদ্ধ জলাভূমি জিনিষটাকে আন্তরিক ভালবাসি। সমুদ্র বড় বিশাল, বড় উচ্ছৃঙ্খল। তাহাকে কিছুতেই বাগ মানানো যায় না। স্রোতস্বিনী ক্ষুদ্র হইলেও বড় চঞ্চলা—বড় উতলা। সে সর্ব্বদাই গতিশীলা, তাহাকেও ধরিয়া রাখা দায়। জলাভূমিকে আমি বড়ই ভালবাসি; কারণ, জলার মধ্যে একটা প্রাণের স্পন্দন আমি অনুভব করিতে পাই। জলা একটি ক্ষুদ্র জড়জগৎ—যেখানকার জীব পৃথক্—জীবন পৃথক্—বাসিন্দা পৃথক্, আগন্তুক পৃথক্, সেখানকার রূপ পৃথক্, রস পৃথক্, স্পর্শ পৃথক্, শব্দ ও গন্ধ পৃথক্। এমন কি, এখানকার রহস্যও জড়জগতের রহস্য হইতে বিভিন্ন ও পৃথক্। জলার মত এমন নির্জ্জন—এমন পীড়াদায়ক ও এমন ভীতিসঙ্কুল স্থান আর দ্বিতীয় নাই। কেন? এই বদ্ধ জলময় প্রদেশ কেন আমাদিগের মনের মধ্যে এতটা ভীতির উদ্রেক করে? এই ভীতির কারণ কি বায়ুতাড়িত শরবনের অব্যক্ত অস্পষ্ট মর-মর শব্দ, না জলের উপর ভ্রাম্যমাণ ক্ষিপ্রগতি আলেয়ার আলো? এই ভীতির কারণ কি জলার নৈশ নির্জ্জনতা,না ঘন কুজ্ঝটিকার আবরণ—যাহা ফেনশুভ্র শবাবরণ বস্ত্রের মত জলার মরণপাণ্ডুর মুখখানিকে ঢাকিয়া রাখিয়া দেয়? অথবা ইহার কারণ কি জলার জলের সেই লপ-লপ শব্দ, যাহা সময়ে সময়ে কামানগর্জ্জন অথবা বজ্রপতনের শব্দ অপেক্ষাও অধিকতর ভীতির সঞ্চার করে? অথবা ইহার কারণ কি এই যে, এই জলসঙ্কুল প্রদেশ অনেকটা সেই স্বপ্নরাজ্যের অনুরূপ, যাহার অভ্যন্তর-নিহিত রহস্যগুলি দুর্ভেদ্য, দুর্জ্ঞেয় ও বিপজ্জনক? না; কেবল তাহাই নহে। আর একটি গুরু ও গভীরতর রহস্য, ঘন কুজ্ঝটিকার মত, জলের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে। এই রহস্যটি—সৃষ্টিরহস্য। এইরূপ স্রোতোবিহীন কর্দ্দমাক্ত বদ্ধ-জলাভূমি ও আর্দ্র সিক্ত পিচ্ছিল প্রদেশেই সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া প্রথম সৃষ্টির বীজ উপ্ত হইয়াছিল। এইরূপ প্রদেশেই আদিজীবনের বীজ অঙ্কুরিত, স্পন্দিত ও প্রকটিত হইয়াছিল।

* * *

সন্ধ্যাকালে আমি আমার ভ্রাতার আবাসে পৌঁছিলাম। সেই রাত্রিতে ভয়ানক শীত পড়িয়াছিল। রাত্রিতে আমরা একখানি বড় ঘরের মধ্যে আহার করিতে বসিলাম। আমার ভায়া আহার-বিহার শয়নাদি সমস্তই ইংরাজের অনুকরণে করিতেন। আমি দেখিলাম যে, তাঁহার হলঘরের দেয়ালে ও ছাতের গায়ে পেরেক ঠুকিয়া নানাজাতীয় মৃত পক্ষীর পেটের ভিতর খড় পূরিয়া জীবিত পক্ষীর ভঙ্গীতে সাজাইয়া টাঙাইয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল মৃত পক্ষীর মধ্যে বাজপাখী আছে, বক আছে, হুতোমপ্যাঁচা আছে, চখাচখী আছে, আরও কত কত রকমের পাখী আছে। আমার ভায়া একটি ধূসরবর্ণের পশমী ড্রেসিংগাউন্ পরিয়া আহার করিতে বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মেরুপ্রদেশজাত একটি আজগুবি ও আশ্চর্য্য জানোয়ার বলিয়া মনে হইতেছিল। সেই দিনই শেষ রাত্রিতে শিকারের জন্ত কিরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তিনি আমাকে বারবার সেই কথাই বলিতেছিল।

তিনি কহিলেন যে, "রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় উঠিয়া আমাদিগকে মৃগয়ার জন্ত যাত্রা করিতে হইবে। কারণ, তখন উঠিয়া না গেলে ঠিক সময়ে মৃগয়ার স্থলে পৌঁছিতে পারা যাইবে না।"

তিনি হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে কহিলেন, "আজ রাত্রের মত ঠাণ্ডা আমি আর কখনও দেখি নাই। আগে হইতে বুঝিয়া সুঝিয়াই আমি সেখানে একটি কুটীর প্রস্তুত করিয়া রাখিতে আদেশ দিয়াছি।"

নৈশ ভোজন শেষ করিয়া, আমি বিছনায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম। ঘরের দরজা-জানালা সন্ধ্যার পরেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঘরটিও বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছিল। আমি আরামে ঘুমাইতে লাগিলাম।

রাত্রি ৩টার সময় আমার ভায়া নিজে আসিয়া আমাকে ঘুম হইতে জাগাইলেন। তাঁহার পরিধানে সেই শিকারীর পোষাক, তাহার উপর আজানুলম্বিত একটি ধূসরবর্ণের লোমের ওভার-কোট। আমিও উঠিয়া আমার শিকারের সজ্জায় সাজিয়া লইলাম ও লোমের ওভার-কোট গায়ে দিলাম। সেই বেশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমরা দুই জনে দুই পেয়ালা গরম গরম কাফি ও ছাপাছাপি দুই গ্লাস উৎকৃষ্ট স্তাম্পিন্ পান করিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলাম। আমাদিগের সঙ্গে মাত্র এক জন পরিচারক ও দুইটি সন্তরণপটু স্প্যানিয়েল জাতীয় শিকারী কুকুর। কুকুর দুইটির একটির নাম 'বিলিফ' ও অপরটির নাম 'টাইগার'।

বাহিরে প্রথম পা বাড়াইতেই যেন আমার শরীরের অস্থির মধ্যে মজ্জা পর্য্যন্ত ঠাণ্ডায় জমিয়া গেল। আজিকার রাত্রি সেইরূপ একটি অতিরিক্ত ঠাণ্ডা রাত্রি ছিল—যে রাত্রিতে নৈশ প্রকৃতি যেন শীতে গতপ্রাণ হইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। জমাট বাঁধা হাওয়া ঠেলিয়া লোকের চলাফেরা দুঃসাধ্য বোধ হয়, নিশ্বাস-প্রশ্বাসেও যেন এই ঠাণ্ডা বাতাস তিলমাত্র সঞ্চালিত হইতেছে না বলিয়া অনুমান হয়। বাতাস যেন বদ্ধ জড়। বাতাস যেন দাঁত দিয়া কামড়াইতে আসে, যেন সূচী দিয়া বিদ্ধ করে, যেন তাপ দিয়া শুকাইয়া দেয়। এই বাতাস এত ঠাণ্ডা যে, ইহা লাগিয়া গাছগুলি মরিয়া যায়, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত জড়তা প্রাপ্ত হয় ও নিঃশব্দে জমাট-বাঁধা পৃথিবীর বক্ষে পড়িয়া হিমাচ্ছন্ন ও লুপ্তচিহ্ন হইয়া যায়।

ত্রয়োদশীর খণ্ড-চাঁদ বাঁকা হইয়া আকাশে উদিয়াছে। চাঁদ বড়ই ম্লান, যেন ঠাণ্ডায় জমিয়া মরমর হইয়াছে, যেন সে এত

ক্ষীণ যে, তাহার চলিবারও শক্তি নাই, তাই একস্থানেই রহিয়াছে। চাঁদের মুখে আজ হাসির লেশ পর্য্যন্ত নাই। আজ চাঁদ তাহার বিষাদময় ও শুষ্ক আলোক ঢালিয়া জগৎ আলোকিত করিতেছিল যে, ম্লান আলোক পূর্ণত্ব পাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে পক্ষে পক্ষে একবারমাত্র করিয়া সে পৃথিবীতে বর্ষণ করে।

ভায়া ও আমি পাশাপাশি হইয়া তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতেছিলাম। আমাদের উভয়ের ঘাড়ে বন্দুক, উভয়েরই ডান হাতে মুষ্টিতে বন্দুকের কুঁদো, উভয়েরই বামহস্ত পকেটের মধ্যে। ঘাসের উপর অথবা পিচ্ছিল স্থানে পা পিছলাইয়া যাইবার ভয়ে আমাদের দুই জনেরই জুতার তলায় হবনেল্ লাগানো ছিল। চলিবার সময় আমাদের জুতার হবনেল্‌গুলি নরম মাটীর মধ্যে গাড়িয়া যাইতেছিল। আমাদের কুকুর দুইটির শ্বাস-প্রশ্বাসে শুভ্র ধূম নির্গত হইতেছিল।

আমরা শীঘ্রই চলন বিলের ধারে গিয়া পৌঁছিলাম এবং শরবনের মধ্যের একটি সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া জলার তীরবর্ত্তী জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। দুই ধার হইতে সবুজবর্ণের ফিতার মত আকারের নল-খাগড়ার পাতা আমাদের গায় ঠেকিতে লাগিল। আমার মনে একটি অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইতে লাগিল। জলার জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় সকল লোকেরই মনে যেরূপ ভাব হয়, আমারও মনে সেইরূপ ভাব হইল। আমরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মরা ঘাস, অর্দ্ধশুষ্ক কলমীর লতা ও শুষ্ক খড়ের রাশি দুই পদে দলিতে দলিতে চলিতে লাগিলাম।

সহসা একটি সঙ্কীর্ণ পথের বাঁক ফিরিয়াই আমি আমাদের আশ্রয়ের জন্ম নির্ম্মিত নল-খাগড়া ও শরের বেড়া দিয়া ঘেরা ও উলু-খড়ের চালের ক্ষুদ্র কুটীরটি দেখিতে পাইলাম। আমি সেই কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তখনও আমাদের শিকার আরম্ভ হওয়ার এক ঘণ্টারও অধিক বিলম্ব আছে দেখিয়া, আমি একখানি কম্বল মুড়ি দিয়া সেই কুটীরের মধ্যে শুষ্ক ঘাসপালার উপরে আর একখানি কম্বল বিছাইয়া তাহার উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলাম। আমি শুইয়া শুইয়া ঘরের চালের ছিদ্র ও ফাঁক দিয়া কুয়াসার আবরণের মধ্য দিয়া বিকৃত-শ্রী চন্দ্রমার পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম।

শরের বেড়া ও খড়ের চালের আবরণ সত্ত্বেও কিন্তু এই বিরাট জলাভূমি হইতে উত্থিত জমাটবাঁধা কুহেলিকার শৈত্য, হিমময় বাতাসের শৈত্য ও হিমাচ্ছন্ন আকাশের শৈত্য আমার হাড় পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল। আমি খক্-খক্ করিয়া কাসিতে লাগিলাম।

আমার ভ্রাতা আমার কাসি শুনিয়া একটু উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন, "আমরা শিকার কিছু পাই আর না পাই, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু তোমার সর্দ্দি লাগিয়া একটা অসুখ না হয়।" তিনি তখনই পরিচারককে জঙ্গল হইতে কতকগুলি খড়কুটা সংগ্রহ করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন।

কুটীরের মধ্যস্থলে রাশীকৃত শুষ্ক তৃণ ও কাষ্ঠ জ্বালাইয়া আমরা বহ্নি-সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। আমাদের শুইয়া আরাম করিতে লাগিল। এইরূপে প্রায় ঘণ্টাখানে কাটিয়া গেল।

সহসা একটি অস্বাভাবিক চীৎকারধ্বনি, একটি উচ্চ কল একটি চলনশীল বিরাব আমাদের মাথার উপর শুনা গে আমাদের কুটীরমধ্যে প্রজ্বালিত আলোক দেখিয়া পক্ষি জাগিয়া উঠিয়াছিল। ইহা তাহাদেরই কাকলী। অন্য কিছু আমাকে তত মুগ্ধ করিতে পারে না, যত পারে শীতের উষ যখন পূর্ব্বদিগ্ ভাগ বালারুণের রক্তিম রশ্মিপাতে উজ্জ্বল হই উঠে। জগতে নবজীবন-সঞ্চারের এই প্রথম আভাস আম স্পষ্ট দেখিতে পাই না। ইহা আমাদের মাথার উপর দি হাওয়ায় ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়া যায়, বাতাসে ভাসিতে ভাসি কত দ্রুত কত দূরে চলিয়া যায়!

আমার তখন মনে হয় যে, এই চীৎকার বন্য পক্ষিগণে উদ্‌ভ্রান্ত কলকলধ্বনি নহে, ইহা জননী বসুন্ধরার বক্ষঃ হইতে নিঃসৃত একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস।

আমার ভায়া কহিলেন, "ভোর হইয়াছে, শিকার বাহির হইয়াছে।"

সত্যই প্রভাত হইয়াছিল। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাদুকরী প্রকৃতিদেবী তাঁহার মুখ হইতে রহস্যময় কুজ্ঝটিকার অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া লইলেন। আকাশপথে অসংখ্য বালিহাঁস ও অন্যান্য জলচর পক্ষী যূথবদ্ধ হইয়া উড়িয়া যাইতেছিল।

সহসা শরের জঙ্গলের মধ্যে একটি আলোকের দীপ্তি দেখা গেল, সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ শুনা গেল। ভায়া গুলী করিয়াছিলেন। শিক্ষিত কুকুরদ্বয় তীরের মত ছুটিয়া শিকার ধরিতে গেল।

তার পর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হয় ভায়া, নয় আমি যখনই আকাশপথে পক্ষীর ছায়া দেখিতে লাগিলাম, তখনই গুলী করিতে লাগিলাম। বিলিফ ও টাইগার স্ফূর্ত্তিভরে ছুটিয়া ছুটিয়া গিয়া হতাহত রক্তাক্তকলেবর পক্ষীগুলি আনিয়া আমাদের হাতে দিতে লাগিল। আহত পক্ষীদিগের মধ্যে কোন কোনটি আমাদের দিকে কাতরদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া পৃথিবী হইতে শেষ বিদায় লইল।

দেখিতে দেখিতে বেলা হইয়া গেল; রৌদ্র চড়িয়া উঠিল। আকাশ নির্ম্মল ও নীল। সূর্য্যদেব আকাশে অনেক দূর উঠে উঠিয়া পড়িয়াছেন। আমাদেরও প্রাতঃকালের শিকার সারিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইবার সময় হইয়া আসিয়াছে। সহসা দুইটি পাখী সোজা আমার মাথার উপর আকাশপথে উড়িয়া যাইতেছে দেখিতে পাইলাম। ইহা একটি সুন্দর চক্রবাক-মিথুন। এই জাতীয় শিকার এ প্রদেশে খুব কমই মিলে। ইহারা প্রায়শঃ পদ্মার মধ্যস্থিত নির্জ্জন চড়ায় যুগবদ্ধভাবে বিচরণ করে। অনেক দিন হইতেই আমার এই দুর্ল্লভ পক্ষিশিকারের উপর ঝোঁক ছিল। আমি পরম আহ্লাদের সহিত এই পক্ষিযুগলের একটিকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করিলাম। পাখীটি আহত হইয়া ঠিক আমার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল। ইহা একটি সুন্দর পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীজাতীয় চক্রবাক-পক্ষী। ইহার বুকের পালক অতিশয় চিক্কণ, ধবধবে সাদা ও মাঝে মাঝে কাল ছিট-ছিট দাগযুক্ত। ইহার

আকাশে একটি পক্ষি-কণ্ঠের কাতর চীৎকারধ্বনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই চীৎকার অসহ্য, সেই চীৎকার মর্ম্মভেদী! আমার নির্দ্দয়হস্তে নিহত এই পক্ষিমিথুনের অপরটি আকাশে আমাদের মাথার উপর আকুলভাবে আমার হাতে তাহার জীবনসঙ্গিনীটিকে দেখিতেছে, আর এই হৃদয়-বিদারক বিকট চীৎকার করিতেছে!

আমার ভায়া শরের জঙ্গলের মধ্যে লুকায়িত হইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বন্দুক উত্তোলিত করিয়া আকাশে বিচরমান সেই পক্ষীটির দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এবং কখন্ সেটি নামিয়া তাহার বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসে, তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

তিনি কহিলেন, "স্ত্রী-পক্ষীটি হত হইয়াছে; পুং-পক্ষীটি যতক্ষণ উটিকে দেখিতে পাইবে, ততক্ষণ কখনই পলাইবে না।"

সত্যই পক্ষীটি পলাইল না। সে আকাশপথে পাগলের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে লাগিল ও কাতরভাবে চীৎকার করিতে লাগিল। পক্ষীর কাতর চীৎকার ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও আমাকে এতটা মর্ম্মবেদনা দিতে পারে নাই। সে যেন আকাশপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অব্যক্ত ভাষায় আমারই উপর অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিল। কখনও কখনও সে আমাদের মাথার উপর অনেকটা নীচে নামিয়া বন্দুকের নল দেখিয়া আবার অনেক দূর উর্দ্ধে উঠিয়া যাইতে লাগিল। তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল যে, সে আকাশপথে উড়িতে উড়িতে বরাবর আমাদের সঙ্গে যাইবে—যতক্ষণ সে তাহার জীবন-সঙ্গিনীকে না পাইবে, অথবা তাহার সহযাত্রী না হইবে, ততক্ষণ সে কিছুতেই প্রত্যাবৃত্ত হইবে না। সে কি করিবে, কেমন করিয়া সে তাহার প্রাণ হইতেও প্রিয়তর বস্তুটিকে ফিরিয়া পাইবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, আবার শূন্যপথে নীচে নামিতে লাগিল।

ভায়া কহিলেন, "এক কায কর দেখি, ঐ মৃত পক্ষীটাকে ভূমিতে ফেলিয়া রাখ। তাহা হইলেই জোড়াটি নীচে নামিয়া আসিবে।"

আমি তাহাই করিলাম। সত্যই পুংপক্ষীটি নীচে নামিয়া আসিল। কোন বিপদকেই সে গ্রাহ্য করিল না। ভালবাসার উন্মত্ততায় সে প্রত্যক্ষ বিপদকেও সাদরে বরণ করিয়া লইল। সে একবারে আমাদের বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসিয়া পড়িল।

সুবিধা পাইয়া ভায়া পক্ষীটিকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করিলেন। পক্ষীটি হত হইয়া এমন ভাবে নীচে পড়িল যে, বোধ হইল যেন, একটি রজ্জুতে আবদ্ধ থাকিয়া সেটি আকাশে ঝুলিতেছিল। কে যেন সেই রজ্জুটি ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। আমি স্তম্ভিতের ন্যায় দেখিতে লাগিলাম। আমি দেখিলাম যে, কি যেন একটি কালো জিনিষ আকাশ হইতে ভূতলে আসিয়া পড়িল। শুষ্ক শরবনের উপর একটি গুরুবস্তু-পতনের শব্দও আমার কাণে গেল। আর টাইগার গিয়া মুখে করিয়া শিকারটি আমারই হাতে আনিয়া দিল।

গতপ্রাণ পক্ষিদম্পতির জড়দেহ দুইটি তখনও পর্য্যন্ত আমার হাতে বেশ উষ্ণ রহিয়াছে বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। আমি দুইটি পক্ষীকেই এক থলের মধ্যে পূরিলাম।

সেই দিনই আমি প্রথম বুঝিলাম যে, আসল ভালবাসা কি, এবং সেই দিনই আমি কলিকাতায় ফিরিয়া গেলাম।

কলিকাতায় ফিরিয়া প্রথমেই আমি আমার বন্দুক, গুলী, বারুদ ও শিকারের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম বিক্রয় করিয়া দিলাম ও জন্মের মত মৃগয়ার ব্যসন পরিত্যাগ করিলাম।

শ্রীমনোমোহন রায় (বি, এল)।

শেষের দান

তোমার রুচি কোমল করে
আমার এই কবিতাখানি
শেষের দিনে সঁপিয়া যাব
আদরে নিয়ো বক্ষে টানি'।

তুমি তো জানো করিনি হেলা
বসিয়া সারা সন্ধ্যা-বেলা,—
আপন মনে লিখেছি শুধু
শুনি নি কাণে কাহারো বাণী!

তোমার আশা অসীম ছেয়ে
কেবলি ঘুরে কাহারে চেয়ে—
তোমার কাছে আমার এ'টি
দিবার মত হবে না জানি।

তবু তো সখি সে দিন রাতে
একলা ঘরে বসিয়া সাথে
অবাক্ হয়ে শুনেছ হায়
মুখের 'পরে দৃষ্টি হানি'।

রেখেছি তাই যতন ক'রে
নিভৃতে কত বরষ ধ'রে
পূর্ণ হবে সাধনা মম
তোমার হাতে মানস-রাণী!

শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার

তিব্বত

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রায় অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়া লিংথামথু বাজারে পৌছিলাম। লিংথামথুর বাজারে প্রবেশ করিতে গেলে প্রথমেই একটা রাস্তা পড়ে। উহা উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে ক্রমোচ্চভাবে প্রস্তুত। এই পথের উভয় পার্শ্বে অশ্বতর রাখিবার স্থান— দুই চারিখানি ঘরও এখানে বিদ্যমান। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে বিস্তৃত একটি স্থানের উপর আসল বাজার অবস্থিত; বাজারের মধ্য দিয়া পথ চলিয়া গিয়াছে। উহার দুই ধারে দোকান-ঘর ও অশ্বতরগুলিকে রাখিবার ঘর আছে। অশ্বতর-রক্ষকগণ দোকান-ঘরে কিংবা চা রুটী ইত্যাদি বিক্রেতাদের ঘরে অবস্থান করে। বিক্রেয় পশম রাখিবার জন্য স্বতন্ত্র ঘরের ব্যবস্থা আছে। ঘরের মধ্যে স্থান সঙ্কুলান না হইলে ঘরের বারান্দায় পশম সাজাইয়া রাখিয়া তাহা উত্তমরূপে আবৃত করিয়া দেওয়া হয়। সিকিমের প্রত্যেক বাজারে 'পাকাগদি' সাইনবোর্ড দেওয়া একটি মদের দোকান দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই 'পাকাগদি'তে মহুয়ার বা অন্য যে কোন প্রকার মদ বিক্রয় করার জন্য সিকিম রাজষ্টেট হইতে বন্দোবস্ত লওয়া হয়। ইহা ছাড়া দেশী মদ (চোং) বিক্রয় করার জন্য যে দোকান আছে, তজ্জন্য সিকিম রাজষ্টেট হইতে কোন অনুমতি লইতে হয় না। এই দেশীয় মদ চোংএর দোকান বাজারে, গ্রামে, রাস্তার পার্শ্বে সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

বাজারটি নিতান্ত অপরিষ্কার, চারিদিক্ অশ্বতরসমূহের বিষ্ঠায় পূর্ণ। তাহা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে। যে সকল বাজারে অশ্বতর চলাচল করে, তাহার অবস্থা নিতান্ত কদর্য্য। তিব্বত হইতে এই রাস্তা দিয়া পশম চালান হয়, সুতরাং এখানেও রঙ্গলীর মত অশ্বতরের আড্ডা আছে। প্রত্যহ শত শত অশ্বতর পশম লইয়া এই রাস্তা দিয়া গমনাগমন করিয়া থাকে। এখানে আমাদের ডাণ্ডীওয়ালারা ও কুলীগণ কিছু আহার্য্য গ্রহণ করিল।

বৈকালে প্রায়ই বৃষ্টি হয় বলিয়া প্রভাতে পশমবাহী অশ্বতরযূথ এক আড্ডা হইতে অন্য আড্ডায় যায়। সঙ্গে মাত্র ২।৩ জন লোক এবং তিব্বতদেশীয় একটি কুকুর থাকে। ইহারা প্রায় বেলা ১২টা পর্য্যন্ত চলিয়া যে আড্ডা পায়, সেখানে বোঝা নামাইয়া অশ্বতরদিগকে আহার্য্য দান করে এবং সেই দিনের মত তথায় বিশ্রাম করে; কুকুরটি ঐ স্থানে পাহারা দেয়। এই কুকুর এরূপ শিক্ষিত যে, কাহাকেও তাহার গচ্ছিত মালের নিকট আসিতে দেয় না, কেহ অগ্রসর হইয়া মালে হাত দিতে গেলে তাহাকে কামড়াইতে যায়। পথ চলিতে চলিতে অশ্বতর বিপথে গেলে কুকুর তাড়া দিয়া তাহাকে ঠিক পথে আনিয়া দেয়।

লিংথামথুর বাজার ছাড়াইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে আমরা একটি কাঠের সেতুর উপর দিয়া একটি ঝরণা-নদী পার হইলাম। এই স্থানে রেণক কাজির কার্য্যকারক শ্রীযুক্ত গেমটুমু সেরিং নামক একটি ভুটিয়া ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনিও সেডোম্‌চাং পর্য্যন্ত যাইবেন। আমরা গল্প করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলাম। তখন আমি ডাণ্ডী হইতে নামিয়া পদব্রজে চলিতেছিলাম। আমার সমভিব্যাহারীরাও বাহন ত্যাগ করিয়া হাঁটিতেছিলেন। এখান হইতে রাস্তা পাহাড়ের গা দিয়া খুব 'খাড়াই' উঠিয়াছে। রাস্তায় পাথর সাজান, কিন্তু অশ্বতর চলাচলের জন্য বহু যায়গায় গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। তদুপরি বৃষ্টি হওয়ায় পথ পিচ্ছিল। রাস্তার উভয় পার্শ্বেই জঙ্গল এবং বড় বড় গাছ। কোন কোন গাছ পুষ্পিত অর্কিড এবং লতায় মণ্ডিত। একরূপ কণ্টকী লতা

দেখিলাম। তাহার বর্ণ হরিদ্রাভ, ছোট ছোট ফলের ভারে লতা অবনতদেহা। এই ফল আস্বাদ করিয়া দেখিলাম, মিষ্টরসের সহিত টকরসের স্বাদ পাইলাম। রাস্তায় অন্য কোন ফল পাই নাই, কাযেই ঐ জঙ্গলী ফলই খুব উপাদেয় বোধ হইল। ভুটিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন যে, ঐ ফল খাইলে জ্বর হইতে পারে। কিন্তু তথাপি আমরা লোভ সংবরণ করিয়া ফল খাইতে বিরত হইলাম না।

রাস্তার বাম পার্শ্বেই উচ্চ পাহাড় এবং দক্ষিণে উপত্যকা, অরণ্য-পরিবৃত আঁকাবাঁকা ক্রমোচ্চ পার্ব্বত্যপথে প্রায় ৩ মাইল অতিক্রম করার পর আমরা পাহাড়ের উপরে এক উন্মুক্ত স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে বৃক্ষাদি বেশী নাই। স্থানটি তৃণের দ্বারা সমাচ্ছন্ন। এতখানি দীর্ঘ 'খাড়াই' পথ অতিক্রম করিতে আমরা বড় ক্লান্ত হইয়াছিলাম। সুতরাং উন্মুক্ত স্থানটিতে কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করিলাম।

আবার আঁকাবাঁকা পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে কর্ষিত ক্ষেত্র অথবা তৃণগুল্মাবৃত অরণ্য আমাদের গন্তব্য পথে দেখা দিতে লাগিল। ক্রমেই আমরা ঊর্দ্ধ-দিকে উঠিতেছি। কিছুকাল পরে এক সমতল ভূমিতে সেডোম্‌চাং বাজার নয়নগোচর হইল। বাজারটি পূর্ব্ব-পশ্চিম দিকে অবস্থিত, বেশ বড় বাজার বলিয়াই মনে হইল। উহার সংলগ্ন বসতিও আছে। বাজারে বহু দোকান-ঘর, অশ্বতরের আড্ডা, চা-রুটী ও মদের দোকান, 'পাকাগদি' প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হইল। বাজারের পশ্চিম দিকে একটি গোম্ফা আছে। বাজারটি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন, অশ্বতর-বিষ্ঠার দুর্গন্ধে বায়ুমণ্ডল পূর্ণ। আমরা এই বাজারের ভিতর দিয়া আরও কিছু দূর উপরে উঠিয়া স্থানীয় বাংলোয় উপস্থিত হইলাম। ভুটিয়া ভদ্রলোকটি সেডোম্‌চাং গোম্ফায় রাত্রিযাপনের বন্দোবস্ত করিয়া আমাদের জন্য কিছু দুগ্ধ লইয়া ডাক-বাংলোয় সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। পরদিন প্রভাতেও কিছু দুগ্ধ আনিয়া দিয়াছিলেন। আমি মূল্য দিতে চাহিলাম, তিনি গ্রহণ করিলেন না।

এই বাংলোটি দেখিতে সুন্দর। দুইখানি শয়ন-ঘর, সম্মুখে একটি খোলা বারান্দা। বারান্দা হইতে পশ্চাদ্দিকে চাহিলে অভ্রভেদী পাহাড় দৃষ্টিগোচর হইবে। উহার বামদিকে একটি উপত্যকা, তাহার পর একটি অরণ্যাবৃত পাহাড়। ঐ পাহাড়ে বিস্তর বন্য জন্তু আছে বলিয়া শুনিলাম। সম্মুখে দক্ষিণ-কোণে নেত্রপাত করিলে সিকিমের উপত্যকার সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুদূর উপত্যকা হইতে কেবল কুজ্ঝটিকা এবং মেঘতরঙ্গ

পর্ব্বতের উপর মেঘ-তরঙ্গ

সেডোম্‌চাংএর দিকে বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। বৈকালে উপরে উঠিয়া আলোক-চিত্র গ্রহণের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু বৃষ্টির জন্য ফিরিয়া আসিতে হইল। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না।

এখানেও অশ্বতরদিগের জন্য আড্ডা আছে। বাজার ও গ্রাম বড়। এখানে আলুর চাষ হয় এবং উহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। মাথই (ভুট্টা) চাষও হইয়া থাকে; কিন্তু ধান্যের চাষ নাই। এখানে এত অশ্বতরের যাতায়াত আছে যে, চতুর্দ্দিক জঙ্গলাবৃত হইলেও ঘাস খুব চড়া দামে বিক্রীত হয়। পণ্যদ্রব্যাদির উপর সিকিম সরকার এখানে কোনরূপ শুল্ক আদায় করেন না। কিন্তু ঘাস বিক্রয়ের স্বত্ব ঠিকাদার সরকার হইতে প্রতি বৎসর বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া থাকে। নাথুলা ও জালাপালার উপর দিয়া বিস্তর পশম সিকিমের মধ্য দিয়া নানা দেশে যায়; কিন্তু এই সকল পশমের উপর সিকিম সরকার কোন প্রকার কর ধার্য্য করেন না। শুধু ঘাস কেন, বাজারে অশ্বতরের জন্য দানা বিক্রয় করিবার স্বত্বও ঠিকাদার-গণকে সিকিম সরকার হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয়। তাহাতে সরকারের কিছু লাভ হয়।

২৭শে মে। অদ্য আমাদের মাত্র ৯ মাইল দূরে নেটঙ্গ বাংলোয় যাইতে হইবে। সারা পথই খাড়াই। কদর্য্য রাস্তা এবং কোন কোন স্থানে অতলস্পর্শী উপত্যকার উপরিভাগে পাহাড়ের গায় তুষারের উপর দিয়া চলিতে হয়। এই পথ বিঘ্নবর্জ্জিত নহে। অদ্য প্রায় ৬ হাজার ফুট উপরে অবস্থিত নেটঙ্গ বাংলোয় পৌছিতে হইবে। চলা আরম্ভ হইল। বৃষ্টিরও বিরাম নাই, অবশ্য ধারাবর্ষণ নহে। তবে সমগ্র পথেই বৃষ্টির অসুবিধা ভোগ করিতে হইল। একে খাড়াই পথ, তাহার উপর বর্ষণ, কাযেই কষ্টের সীমা রহিল না। ডাক বাংলো হইতে বাহির হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। বর্ষাতি মুড়ি দিয়া এবং টুপী ও ছাতা মাথায় দিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে সুরু করিলাম। ডাণ্ডী পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে আরম্ভ করিল। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, দ্বারবান ও চাকর ঘোড়ায় চড়িয়া আমার অনুগামী হইল। পথ পূর্ব্ববৎ আঁকাবাঁকা এবং ক্রমেই ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়াছে। অশ্বতর চলাচলের ফলে স্থানে স্থানে গর্ত্ত বিদ্যমান—কর্দ্দম দুরতিক্রমণীয়! পথের উভয় পার্শ্বেই অরণ্য—বড় বড় গাছ অরণ্যের ভীমকান্তিকে বাদল-ধারায় ভীষণতর রূপ দান করিয়াছিল। বৃহৎ অজগর সর্পের ন্যায় আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড়ের গাত্র বেষ্টনপূর্ব্বক বন্ধুর পথ উর্দ্ধে উঠিয়াছে। আমরা কখন পাহাড়ের এক ধারের রাস্তা দিয়া বরাবর উপর দিকে যাইয়া ঘুরিয়া আবার উপরের রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কখনও বা পাহাড় বেষ্টন করিয়া উপর দিকে উঠিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে জঙ্গলের মধ্য দিয়া গমন-কালে উপত্যকা দেখা যায়; কিন্তু অদ্য মেঘ ও কুয়াসার জন্য অধিক দূরবর্ত্তী স্থান নয়নগোচর হইল না। এইরূপে দেড় মাইল চলার পর আমরা পাহাড়ের উপর পৌছিলাম। তথাপি পাহাড়ের শৃঙ্গ আমাদের অনেক উপরে রহিয়া গেল। এখান হইতে আমরা সামান্য নীচে নামিয়া আবার অন্য এক পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। এই স্থানটিতে ফাঁকা বৃক্ষের সংখ্যা কম।

সেডোম্‌চাং হইতে প্রায় আড়াই মাইল পথ অতিক্রম করার পর আমরা জুলুপ নামক ছোট একটি বাজারে পৌছিলাম। এখানে মদের ও চা প্রভৃতির কয়েকখানা দোকান আছে। আমাদের ডাণ্ডীওয়ালারা ও কুলীগণ বাজারে কিছু কিনিয়া খাইল। তৎপর আমরা আবার উপরের দিকে উঠিতে লাগিলাম। জুলুপের বাজারের পর হইতে 'রোডেডেনড্রন্' ফুলের গাছ দেখিতে পাইলাম। এখানে তুষার বিগলিত হওয়ায় রোডেডেনড্রন্ ফুল ফুটিয়াছে। আমাদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের প্রাচুর্য্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। লিংটু বাজারের পাহাড়গুলিতে এত রোডেডেনড্রন্ ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে যে, বৃক্ষ কি পাহাড় কিছুই দেখা যায় না। পাহাড়টি কেবল নানা বর্ণের রোডেডেনড্রন্ ফুলের পাহাড় বলিয়া মনে হয়।

বিচিত্র বর্ণের পুষ্পসম্ভারে অলঙ্কৃত পাহাড়ের শীর্ষদেশে তুষারধবল কিরীট দর্শকের চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দেয়। উহার বাম ও দক্ষিণভাগে অতলস্পর্শী উপত্যকা! দূর হইতে মনে হয়, নীলবসনা উপত্যকা-ভূমি যেন পর্ব্বতরাজের চরণতলে প্রণতি জানাইতেছে। প্রায় দেড় মাইল রাস্তা চলিয়া বাজারে পৌছিলাম। এই বাজারেও জুলুপের মত চা ও মদের দোকান আছে। লিংটু প্রায় ১২ হাজার ৬ শত ফুট উচ্চ। বাজার ছাড়াইয়া আমরা শৃঙ্গের কিছু নিম্নে আরও উপর দিকে যাইয়া তুষারাবৃত পাহাড়ের গা দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা নিতান্ত কদর্য্য এবং বিপজ্জনক। এক দিকে তুষারাবৃত পাহাড়—চলিবার রাস্তাও তুষারাবৃত; অপর দিকে খাড়া উপত্যকা। কোন প্রকারে পদস্খলন ঘটিলেই ২।৩ হাজার ফুট নীচে সমাধিলাভ অনিবার্য্য, সেখানে অস্থি-মজ্জার অংশ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অশ্বতর চলাচল করাতে সেখানে তুষারস্তূপের মধ্যে একটি নালার মত হইয়া গিয়াছে। গলিত তুষার এবং বৃষ্টির জল সেই স্থানে পতিত হওয়ায় কর্দ্দমে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

পাহাড় বেষ্টন করিয়া অন্য পাহাড়ের উপর দিয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলাম। এই রাস্তাটি অপেক্ষাকৃত ভাল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তুষার গলিয়া গেলেই গাছে পাতা এবং ফুলের ডগা বাহির হয়। উপর হইতে নীচের দৃশ্য আমরা কুয়াসার জন্য দেখিতে পাইলাম না। রাস্তার মাঝে মাঝে ছায়াবৃত স্থানে বিস্তর তুষার রহিয়াছে। রৌদ্রতপ্ত স্থানে তুষার প্রায়ই গলিয়া গিয়াছে। এই বিপজ্জনক রাস্তা দিয়া পাহাড় বেষ্টন করিয়া আমরা অপর পাহাড়ে পৌছিলাম। এখানে উপরের দিকে রোডেডেনড্রন্ পুষ্প অধিক নাই

দেখিলাম। আরও খানিক খাড়াই উঠিয়া, পরে নীচে নামিয়া আমরা বেলা সাড়ে ৩টার সময় নেটঙ্গ পৌছিলাম।

তিব্বত অভিযানের সময় নেটঙ্গ ইংরাজ সৈনিকদের একটি প্রধান আড্ডা ছিল। ঐ স্থানে একটি দুর্গ ছিল বলিয়া শুনা যায়, কিন্তু এখন তাহার চিহ্নমাত্র নাই। কেবল ঘর-বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ কোন কোন স্থানে নয়নগোচর হয়। তন্মধ্যে কাঠের ঘরের ধ্বংসাবশেষই দেখিতে পাওয়া যায়। চারিদিকে এখন তুষার রহিয়াছে। গলিত তুষার নিম্নাভিমুখে একটি উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। উপত্যকাতেও কিছু কিছু তুষার বিদ্যমান। উহার নালা পার হওয়ার জন্য একটি কাঠের সেতু দেখিলাম। রাস্তার দুই দিকে নেটঙ্গের বাজার। পশমবাহী অশ্বতর-রক্ষকদিগের বিশ্রামের জন্য নেটঙ্গ একটি প্রধান আড্ডা। স্থানীয় বাজারে অশ্বতরদিগের জন্য ঘাস ও দানা পাওয়া যায়। এখান হইতে জেলাপেলা মাত্র ৭ মাইল। তিব্বত হইতে জেলাপেলা পার হইয়া অশ্বতররক্ষকগণ এখানে বিশ্রাম করে। নেটঙ্গ হইতে ৬ মাইল দূরে জেলাপেলার পাদদেশে কুপুপ নামক আর একটি বাংলো আছে। এখানে চা-পানের দোকান প্রভৃতির অভাব নাই, কিন্তু অশ্বতরদিগের বিশ্রামের তেমন বন্দোবস্ত নাই। নেটঙ্গে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস আছে। এখানে আসিয়া বাড়ীতে আমাদের পৌছার সংবাদ তারে পাঠাইলাম।

বাজার ছাড়াইয়া আমরা নেটঙ্গের ডাক-বাংলো পাইলাম। তথায় আমরা রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিলাম। বাংলোয় দুইটি শয়নগৃহ ও একটি বসিবার ঘর আছে। দুই ঘরে চারি জনের শয়ন করিবার খাট আছে দেখিলাম। বাংলোর সম্মুখে এখনও বিস্তর তুষার জমিয়া আছে। বাংলোর প্রত্যেক দরজায় ডবল শার্শি এবং শার্শির সম্মুখে পশমের পর্দ্দা। শীতাধিক্যবশতঃ এখানে রাত্রিকালে আগুন জ্বালাইতে হইল। তাপমান যন্ত্রযোগে দেখিলাম, টেম্পারেচার ৩৬ ডিগ্রি।

২৮শে মে। প্রভাতে সাড়ে ৪ ঘটিকায় শয্যাত্যাগ করিলাম। আজ আমাদিগকে জেলাপেলা পার হইতে হইবে। সুতরাং যত শীঘ্র রওনা হইতে পারি, ততই আমাদের পক্ষে সুবিধা। জেলাপেলা পার হওয়া সকালবেলাই সুবিধাজনক। কারণ, দ্বিপ্রহরের পর বৃষ্টি হইবার বিশেষতঃ তুষারপাতের আশঙ্কা আছে। তবে মে মাসের শেষভাগে প্রায়ই তুষারপাত হয় না। ডাল, তরকারী, ভাত পূর্ব্বরাত্রিতে রন্ধন করিয়া আগুনের উত্তাপে রাখা হইয়াছিল। প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া ৭ ঘটিকায় খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া গেল। ১০ মিনিটের মধ্যে দুর্জ্জয় শীতকে জয় করিবার জন্য উপযুক্ত বেশভূষা করিয়া পাহাড়ীয়া লাঠি হাতে লইয়া বাংলো হইতে নির্গত হইলাম। দুই হাতে দস্তানা পরিয়াছিলাম। জেলাপেলার তুষাররাশির উপর দিয়া যাইতে হইবে বলিয়া যত দূর সম্ভব গরম পোষাক পরিয়া লইয়াছিলাম। অতি ঠাণ্ডা বাতাসে আমার মাথা ধরে বলিয়া ডবল টুপী মাথায় দিয়া লইলাম। জেলাপেলা ও পাথুলা যাইতে প্রায় প্রত্যেক যাত্রীরই পার্ব্বত্য পীড়া হইয়া থাকে। কাযেই আমাদের ঔষধের বাক্সটি অন্য কুলীর মাথায় দিয়া কুলীকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিলাম। এই স্থান হইতে জেলাপেলা ৭ মাইল। কিন্তু ইয়াটুং পৌছিতে হইলে আমাদিগকে ২২ মাইল যাইতে হইবে।

কুপুপের সন্নিহিত হ্রদের দৃশ্য

বাংলো ছাড়াইয়া কর্দ্দমাক্ত কদর্য্য রাস্তা দিয়া উপরদিকে উঠিতে লাগিলাম। কিছু দূর উপরদিকে উঠিয়া, সামান্য কিছু নীচে নামিয়া, পুনরায় উপরদিকে উঠিতে হইল। গলিত তুষারের জলে রাস্তায় অত্যন্ত কাদা হইয়াছে। মাঝে মাঝে তুষারস্তূপ মথিত করিয়া, কখনও বা উভয় পার্শ্বে তুষার-প্রাচীর রাখিয়া চলিতে হইল। এই-রূপে সাড়ে ৪ মাইল পথ অতিক্রম করার পর পাহাড়ের উপর হইতে নীচের দিকে কুপুপ বাংলো দেখা গেল। এইখান হইতে পুনরায় দেড় মাইল আন্দাজ নীচের দিকে

গেলাম। পাহাড় হইতে গলিত তুষারের জলধারা কুপুপের পূর্ব্বদিকে একটি ছোট হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে। রাস্তার পার্শ্বে এবং নীচে বরফ গলিয়া যাওয়ামাত্র গাছের যে অংশ বাহির হইতেছে, অমনই তাহাতে নূতন পল্লব ও ফুল দেখা দিয়াছে। উত্তরদিকে চাহিলে তুষারাবৃত জেলাপেলা ও অন্যান্য পাহাড় দেখা যায়। এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে কুপুপ পৌঁছিলাম। কুপুপ ১৩ হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত একটি উপত্যকা। এই স্থানটি সিকিমের সীমান্তপ্রদেশ। এখানে সিকিম সামরিক পুলিসের একটি থানা আছে। কুপুপে যাত্রীদিগের অবস্থানের জন্য একটি ডাক-বাংলো আছে। চা, মদ ও রুটী বিক্রয়ের জন্য ২।৪খানা দোকানও আছে। জেলাপেলার উপরে তিব্বত ও সিকিমের সীমানা। কুপুপের বাংলোর পাশ দিয়া বাজারের মধ্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। এখানে কুলীগণ ও ডাণ্ডিবাহকগণ কিছু চা-রুটী খাইয়া লইল, আমরাও কিছু বিশ্রাম করিলাম। এখান হইতে পুনরায় ডাণ্ডিতে উঠিয়া রওনা হইলাম। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, দ্বারবান্ ও চাকর ঘোড়ায় চড়িয়া চলিল।

একটি কাঠের পুলের উপর দিয়া নদী পার হইলাম। এখানে এক জন পথিকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ডাণ্ডি হইতে নামিয়া তাহার সহিত পদব্রজে চলিলাম। সেও ঘোড়া হইতে অবতরণ করিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সে কলিকাতা হইতে জিনিষপত্র লইয়া তিব্বতে বিক্রয় করে। অর্দ্ধ-মাইল চলার পর উপর দিকে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। কিছু দূর উঠিয়া দুই পার্শ্বেই তুষারস্তূপ দেখিতে পাইলাম। আমাদিগকে কখনও কখনও তুষারের উপর দিয়া যাইতে হইল। রাস্তা নিতান্ত কদর্য্য। ইহাকে রাস্তা বলা চলে না। কারণ, কিছু দূর উঠিয়া আর কোন রাস্তা দেখিতে পাইলাম না। কখনও তুষার মথিত করিয়া, কখনও বা দুই পার্শ্বে তুষারস্তূপ রাখিয়া উপর দিকে উঠিতে লাগিলাম। এখন আমাদের চতুর্দ্দিকে কেবল শুভ্র তুষারস্তূপ।

জেলাপেলায় কোন বৃক্ষাদি নাই। জেলাপেলা পার হওয়ার সময় হঠাৎ তুষারপাত আরম্ভ হইলে যাত্রীদের ভয়ানক বিপদ্ উপস্থিত হয়। তুষারপাতের সময় কুয়াসায় আর পথ দেখা যায় না। কাযেই সাহস করিয়া অগ্রসর হইলে বিপথগামী হইয়া পাহাড় হইতে পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আবার তুষারস্তূপের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকাও অসম্ভব। সময় সময় এত তাড়াতাড়ি তুষারপাত হয় যে, আস্তে আস্তে চলিতে গেলেও তুষার-সমাধি লাভ করিবার আশঙ্কা থাকে। বেশী তুষারপাতের সময় কোন কোন পথিকের হস্ত, পদ এবং সমস্ত শরীর প্রচণ্ড শীতে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। এমনও শুনা গিয়াছে যে, কোন কোন পথিক চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া শেষে জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছে। আমরা বরফের উপর দিয়া যাইবার সময় দুইটি মৃত অশ্বতরের শব দেখিতে পাইলাম। এই হতভাগ্য জীব তুষারপাতের সময় জীবন হারাইয়া এত দিন বরফের নীচে পড়িয়া ছিল, এখন গরমের প্রারম্ভে বরফ গলিয়া যাওয়ায় মৃতদেহ বাহির হইয়াছে। মৃতদেহ কোনরূপ বিকৃত হয় নাই, বা তাহা হইতে কোন গন্ধ বাহির হইতেছে না। উহা এখনও সদ্যোমৃতের ন্যায় দেখায়। একটি তিব্বত-দেশীয় কুকুর এবং হিমালয়ের বড় দাঁড়কাক এই মৃতদেহ ভক্ষণ করিতেছে দেখিলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রিয়নাথ রায়।

১
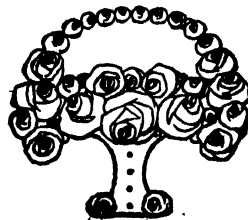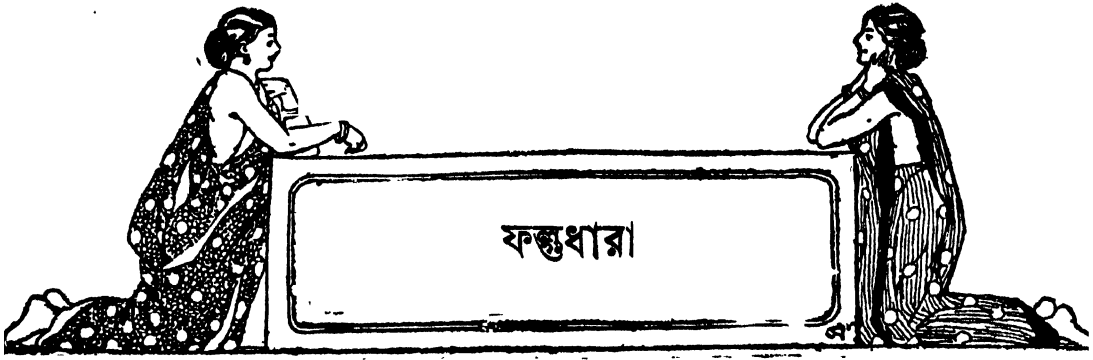
তাহারা ছিল আমার সতীর্থ, প্রায় সমবয়স্ক, খেলার সাথী, একই গ্রামবাসী। তিন জনে একসঙ্গে পাততাড়ি বগলে পাঠশালে যাইতাম। দুপুরবেলা স্কুল পলাইয়া নেতোর মা'র বাতাবী-লেবুর গাছে চড়িতাম, লেবু পাড়িয়া কলা-পাতায় ছাড়াইয়া জারাইতাম আর ধানিলঙ্কার ঝালে নাকের জলে চোখের জলে হইতাম। বাগানের আম-কাঁঠাল, মাঠের খেজুর-রস, ক্ষেতের আক-মূলো-কলাইশুঁটি আমাদের দৌরাত্ম্যে ঘরে তোলা গৃহস্থের কষ্টকর হইত। তিনটি যেন ত্রিমূর্ত্তি! আমাদের ভয়ে সশঙ্ক থাকিত না, এমন গৃহস্থ খুবই কম ছিল। ছেলেবেলাটা এইভাবে বেশ সুখেই কাটিয়াছিল। সে কি আনন্দ! এই পরিণত বয়সে সে সব কথা মনে পড়িলে চোখে জল আসে।

আমরা গাছে চড়িলে যাহারা তলায় থাকিয়া ফল কুড়াইত বা কলাপাতাটা, লঙ্কাটা, নুণটা যোগাড় করিয়া আনিত, আর ধরা পড়িয়া প্রায়ই মার খাইত, তাহাদের মধ্যে এক জনের সঙ্গে বেশী বয়স পর্য্যন্ত আমাদের সম্পর্ক ঘুচে নাই, সে বোসেদের সরমা। সরমার ডাক-নাম ছিল সরো। সরমার বিবাহ হইয়া যাইবার পরেও আমরা তাহাকে সরো বলিয়াই ডাকিতাম। আমাদেরই ত্রিমূর্ত্তির এক মূর্ত্তি হইয়াছিল তার বর।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছিল। কি জানি, কি কারণে বিবাহের পর হইতেই নরেশটা একবারে নিপাট ভালমানুষ হইয়া গেল। আমাকেও অনেকে বলিত, প্রসাদটা শুধরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিশ্বনাথের সম্বন্ধে এমন কথা বলিতে তাহার অতি বড় আত্মীয়কেও শুনি নাই। সে যেমন দুর্দ্দান্ত, তেমনই রহিয়া গেল, তাহার 'বিশে ডাকাত' নামকরণের সার্থকতা কেহ অস্বীকার করিত না।

আর এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। ত্রিমূর্ত্তির দুই মূর্ত্তির মধ্যে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হইয়া গেল! নরেশ ও বিশু একই 'মিত্তির' বাড়ীর ছেলে হইলেও এবং উভয়ে অতি নিকট-জ্ঞাতি হইলেও তাহাদের দুই অংশের ভাঙ্গা বাড়ীর মধ্যেও পাঁচীল উঠিল!

নরেশের অসুখ শুনিয়া এক দিন প্রভাতে মিত্তির-বাড়ী যাইতে তাহাদের বাহিরের অঙ্গন হইতে বিষম কোলাহল শুনিলাম,—যেন কে কাহাকে শাসাইয়া তাড়াইয়া দিতেছে! পা বাড়াইতেই শুনিলাম, বিশে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "ইস, যেন বাবাকেলে সাপ! বেরো বেটা হাঁড়ী রেখে!"

মানে? অঙ্গনে গিয়া দেখি, হুলস্থূল ব্যাপার! লোকে লোকারণ্য, গ্রামের ছেলেবুড়ায় অঙ্গন ভরিয়া গিয়াছে। নিম্নশ্রেণীর একটা লোক—মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল, চোখ দুটো জবার মত লাল, কোমরে গামছা জড়ান—হাত-যোড় করিয়া কাকুতি-মিনতি করিতেছে, আর বিশে চোখ লাল করিয়া বলিতেছে,—"ও সব নেকামি চলবে না বলছি! ভাল চাস্ ত যেখান থেকে সাপ বার করেছিস, সেইখেনে ছেড়ে দিয়ে যা। এটা সাজার বাড়ী, কারুর বাবাকেলে নয়!"

মিস কালো জোয়ান লোকটা তখনও মিনতির সুরে বলিল,—"দোহাই, বাবু মশায়! তেনারা না কইলি কি মুই ছুঁতি পারি? ও নোংরাতে হাত—"

বিশ্বনাথের বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ রাগে যেন ফুলিয়া দ্বিগুণ হইল, ক্রোধে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া সে বলিল, "তোর তেনারার নিকুচি করেছে! বেরো বলছি, হারামজাদা! ও সাপ ত সাপ, একটা সলুইতে হাত দে দিকি, কেমন তোর তেনারা!"

ব্যাপার কি ? বিশ্বনাথের সে মূর্ত্তি দেখিলে ভয় হয়। বাপ! অসুরের মত দেহ, তাহাতে চোখ দুটা ধক্‌ধক্ জ্বলিতেছে! মাথায় আসিল না, সাপ লইয়া হাঙ্গামাটা কি।

ভিতর হইতে ডাক পড়িল—নরেশের ছোট ছেলে নন্ত আমায় ডাকিয়া লইয়া গেল। নরেশ শুইয়া ছিল, সরমা একখানা কলাপাতায় কতকগুলি পানিফল ছাড়াইয়া রাখিতেছিল। আমায় দেখিয়া সে মাথার ঘোমটা একটু টানিয়া দিল। এত দুঃখ-দৈন্য, তবুও যেন সে সেই ঘরখানা আলো করিয়া রহিয়াছে!

নরেশ আমায় দেখিয়া বলিল, "বাইরে কাণ্ডখানা দেখে এলি ত? গোঁয়ারটার ঘটে যদি একটু বুদ্ধি থাকে!"

আমি বলিলাম, "কেন, হ'ল কি?"

সে বলিল, "হবে আর কি ছাই—চুল চিরে ভাগ হচ্ছে। গাঁয়ে মালবদ্যি সাপ খেলাতে এসেছিল, নন্ত ওকে ডেকে এনেছিল। খেলা হয়ে গেলে মনে পড়লো, ছেলেরা পূজোর দালানে সে দিন চোর চোর খেলতে গিয়ে বিচিলির গাদার ভেতর থেকে মস্ত একটা গোখরো সাপকে বেরুতে দেখে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তাই সাপুড়েটাকে কিছু পয়সা কোবলে সাপটাকে ধরতে বলেছিলুম,—এই আর যায় কোথা!"

আমি স্তম্ভিত হইলাম, বলিলাম, "বলিস কি—ওটার মাথা খারাপ হয় নি ত?"

নরেশ বলিল, "বারুইপাড়ার কেত্তোনে মেতে গাঁজায় দম মেরে খোল পেট্‌বার সময় ত মাথা বেশ থাকে। মাথা-খারাপ, না পিণ্ডি-খারাপ! এটা যে সাজার দালান, সাজার সাপ!"

এতক্ষণ সরমা ঘাড় হেঁট করিয়া আমাদের কথা শুনিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ মৃদুস্বরে বলিল, "আমরাও ত ভাগের বেলা কম করিনি।"

নরেশ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "বেশ করেছি ভাগ করেছি। ওর সঙ্গে আমাদের কিসের সম্বন্ধ?"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "সরো মিথ্যে বলেনি, তোদের ব্যাভারটাই বা কি রকম? ধানের গোলা খুলে দিলে, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাছ পাঠিয়ে দিলে, তোরা দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিস্! মন বিগড়োয় না ওতে?"

নরেশ বল্লে, "তা ব'লে সাপ ধরতে দিলে না?"

আমি হো হো হাসিয়া উঠিলাম। সাজার সাপ! চমৎকার! একেই ব'লে দেইজীর ঝগড়া!

নরেশ বলিল, "যাক্ গে, মরুক্ গে। এখন কি করা যায়, বল দিকি। এখনও গর্জ্জন শুন্‌ছিস ত। শরীর ভাল না, এ সব হেঁচড়ামিও ভাল লাগে না।"

মহা ফাঁপরে পড়িলাম। দুই জনেই বন্ধু—কাহাকে কি বলি? কেন এই দেইজী ঝগড়ায় থাকি? বলিলাম, "এক কায কর, লোকটাকে কিছু দিয়ে বিদেয় ক'রে দে, দিক গে সাপ ছেড়ে, তাতে তোর আমার কি?"

নরেশ বলিল, "তাই ভাল। দাও গো, গণ্ডা চেরেক পয়সা—ওঃ, তাও বটে, তোমাদের কাছে কিছু নেই। মা, ও মা, দাও ত তোমার প্যাঁটরা থেকে চার গণ্ডা পয়সা পেসাদকে, আমি দিয়ে দোব'খন।"

মা আসিলেন, সরমা ঘোমটা টানিয়া বাহিরে গেল। মা এতক্ষণ অঙ্গনের কাণ্ড দেখিতেছিলেন। তিনি আমায় দেখিয়া বলিলেন, "ও মা, পেসাদ এইছিস্? দেখ একবার, বিশের কাণ্ডটা দেখ! হাড়-মাস কালি করলে একেবারে! সাপ না কি আবার ভাগের জিনিষ! অবাক্ কল্লে মা, অবাক্ কল্লে!"

পয়সা কয়টা হাতে লইয়া আমি বলিলাম, "অবাক্ কিছু নেই এ কালে মেজ-খুড়ী! সবই সম্ভব। জান খুড়ী! কলকাতায় যে মেসে থাকি আমরা, তারই পাশের বাড়ীর একটা মদ্দ-মিন্‌সে—তিন চার ছেলের বাপ—ক্ষিদে পেলে হোটেলে গিয়ে চা, চপ খেয়ে আসে, পাছে বাড়ীতে খেলে ছেলেদের ভাগ দিতে হয়! নোরোকেই জিজ্ঞেসা কর না, আমাদের আফিসের নারাণ দত্ত আফিসের ফেরতা চাটের দোকানে কাঁকড়াচচ্চড়ি আর ইলিশ-মাছের ডিম-ভাজা খেয়ে যায় কি না। বলে, বাড়ীতে ত মবলক চার আনার মাছ বরাদ্দ, খেতে শত্রুর মুখে চিনি দিয়ে দুবেলা তেরো দুগুণে ছাব্বিশ জন, খাব কি?"

গৃহিণী অবাক্ হইয়া বলিলেন, "ও মা, বলিস কি? কি ঘেন্নার কথা গো! শূয়োর পেটে গিলবে ব'লে বাচ্ছা-কাচ্ছাকে খেতে দেয় না! কর্ত্তারা যে হাটে গেলে রুই-কাতলা কিনতো আর তাই বাড়ীতে ছেলে-পুলে ভাগ্না-ভাগ্নি সবাই মিলে ভাগ ক'রে খেতো রে! সে কত আমোদ!

নিজেরা হয় ত ভাগে একখানাও পেতো না। ও মা, অধম্মের কথা দেখ একবার!"

যখন সাপুড়েকে বাহিরে ডাকিয়া পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দিলাম, তখনও বিশের গলার কামাই নাই। বাহির হইতে স্পষ্ট শুনিলাম, সে চীৎকার করিতেছে, "ধান ছালা গণ্ডা গণ্ডা! আজ সাপ, কাল দালান-বাড়ী, শেষ ভদ্রাসন ভিটেটা—এটাও আর বাকী থাকবে কেন? মগের মুল্লুক কি না!"

উঃ! এই মানুষ!

২

তিন জনেই এক গ্রামবাসী, সহরে এক আফিসেই চাকুরী করি, একই মেসে বাস করি। প্রতি শনিবার বাড়ী যাই, সোমবারে আফিস করি। উহারা কায়স্থ, আমি ব্রাহ্মণ, এইটুকুই প্রভেদ। কিন্তু ব্রাহ্মণ হইলেও উহাদের সহিত আমার বামুন-কায়েতের সম্বন্ধ ছিল না। একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, দাঁড়া-বসা, সবই চলিত। আমি নরেশের মা'কে খুড়ী বলিতাম, নরেশও আমার মা'কে বামুন-জ্যেঠাই বলিয়া ডাকিত। বিশের মা-বাপ ছিল না, এক পিসীই তাহাকে মানুষ করিয়াছিল, আমিও তাঁহাকে পিসী বলিতাম।

এখন আমরা তিন জনেই সংসারে স্বয়ং কর্ত্তা, কারণ, তিন জনেই পিতৃহীন, আর আমরা জ্যেষ্ঠ সন্তান, বিশের ত কথাই নাই, তাহার ভাই-বোন্ কিছুই নাই। অল্পবয়সে সংসারের ভার ঘাড়ে পড়িয়াছিল, তাই তিন জনকেই কলিকাতায় চাকুরী গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

মিত্তিরদের প্রকাণ্ড ভিটা, কিন্তু জরাজীর্ণ, অর্থাভাবে মেরামত হয় না, যেন গলিয়া খসিয়া পড়িতেছে। সরিক অনেক, অথচ পরস্পর বনিবনাও নাই, কাযেই একতার অভাবেও ভিটার এই দুরবস্থা হইয়াছিল।

নরেশ ও বিশ্বনাথের মধ্যে ঝগড়াটা সকলের অপেক্ষা পাকাপাকি রকমেই হইয়াছিল। পাশাপাশি ঘরে দালানে বাস, সামান্ত চলাফিরা করিলেই পরস্পর চোখোচোখি হওয়া অনিবার্য্য, তথাপি বাক্যালাপ ত দূরের কথা, মুখ-দেখাদেখিই ছিল না। শুনিয়াছি, বিশ্বনাথ এই ভাঙ্গা বাড়ীর মধ্যে পাঁচীল তুলিয়া দিয়াছিল।

কেন এমন হইয়াছিল, ঠিক কেহ বলিতে পারে না। আমি অন্তরঙ্গ বন্ধু হইলেও সঠিক সংবাদ জানিতাম না। যে সময়ে বিবাদের সূত্রপাত, সে সময়ে আমি মাতুলালয়ে ছিলাম। তবে কাণাঘুষায় শুনিয়াছিলাম, বিবাহ উপলক্ষেই মনোমালিন্ত ঘটিয়াছিল। কনে সরমা উহাদেরই প্রতিবেশী ৺নীলরতন বাবুর একমাত্র কন্যা। অমন সুন্দরী মেয়ে এ অঞ্চলে কেহ ছিল না। প্রথমে বিশ্বনাথের সহিত সরমার সম্বন্ধ হয়। কিন্তু উহা পরে ভাঙ্গিয়া যায় এবং নীলরতন বাবু নরেশের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করেন। আরও একটা কথা শুনিয়াছিলাম যে, নরেশের পক্ষ হইতে ভাংচি দেওয়ার ফলে পূর্ব্ব-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। অবশ্য এই বিবাহভঙ্গ সম্বন্ধে বিশের মুখে এক দিনও কেহ কোন কথা শুনে নাই। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে গেলে সে এমন মূর্ত্তি ধরিত, যাহার ঝাঁঝের কাছে কেহ অগ্রসর হইতে সাহস করিত না। নরেশকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিত, সে কিছুই জানে না।

এক আফিসে, একই ডিপার্টমেণ্টে আমরা তিন জনে কায করিতাম, একই মেসে তিন জনে থাকিতাম,—এ কথা সত্য; কিন্তু বিশ্বনাথ এমন ভাবে তাহার 'সিট' ঠিক করিয়া লইয়াছিল, যাহাতে নরেশের সহিত তাহার মুখ দেখাদেখি না হয়। সাপ লইয়া যে দিন বিশে মারামারি করিল, সে দিন হইতে আমারও অন্তরটা কেমন বিগড়াইয়া গেল। ছিঃ ছিঃ, এত হীন, এত ক্ষুদ্র! আমিও আফিসে তাহার দিকে পিছন করিয়া বসিতে লাগিলাম।

কেবল আমি নহি, আফিসের অনেক বাবুই উহাকে ভয় করিত এবং পারতপক্ষে উহার সঙ্গ ত্যাগ করিত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এই দুর্দ্দান্ত ডাকাবুকো কড়া মেজাজের লোকটাকে আর সকলে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিলেও কি জানি কেন, এই লোকটাকে অন্তরে ভাল-বাসিত না, এমন লোক অল্পই ছিল; বিশেষতঃ সে যে কি গুণে বড় সাহেবকে বশ করিয়াছিল, তাহা কেহই জানিত না। তাহার বিদ্যা ত একবারে মা-গঙ্গা! অথচ আশ্চর্য্য, সে যেমন সহজ ভাষায় বড় সাহেবের সহিত কথা কহিতে পারিত বা 'কেস' বুঝাইতে পারিত, স্বয়ং বড় বাবুও তেমন পারিতেন কি না সন্দেহ।

সাপের কাণ্ড ঘটিবার পর সোমবারে আফিসে যোগ

উৎকট প্রসাধন

বসুমতী-চিত্রবিভাগ]

[শিল্পী—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু

দিয়াছি। এক দিন টিফিনের ঘরে গল্প-গুজব ও পাণ-তামাক চলিতেছে, এমন সময়ে বিষ্ণু বাবু বলিলেন, "শুনেছ হে, নরেশ আবার একশো এডভান্স চেয়েছে? সাহেব নাকি তাতে কড়া রিমার্ক ক'রে দিয়েছে?"

নেত্য বলিল, "এ্যাঁ? আবার? বারবার এই ত তিনবারে দাঁড়াল—বছরে কোন্ আফিসে তিনবার এডভান্স দেয়, বল ত? সত্যি হ'লে সাহেবকে দোষ দেবার কিছু নেই।"

শঙ্কর বাবু বড় বাবুরই এসিষ্টাণ্ট—তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি, ওর হ'ল কি? তুমিই বল না পেসাদ, একগাঁয়ে ত বাড়ী।

আমি বলিলাম, "আহা, বেচারীর জ্বর, তার উপর আমাশা—

শঙ্কর বাবু বলিলেন, "আহা, সে ত সে দিন হে—তার আগে এমন কি হ'ল যে, বছরে তিন তিনবার ধার করতে হয়?"

আমি জবাব দিতে যাইতেছি, এমন সময় ঘণ্টা বাজিল, যে যাহার কাযে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল। দরজার কাছে পৌছিতে দেখিলাম, কোণে দাঁড়াইয়া বিশেটা তামাক টানিতেছে। আমায় দেখিয়া মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, "এ দিকে ত টানাটানি—আফিসে ধার, কিন্তু মাগের গয়না গড়াবার সময় ত হাত দরাজ হয়—তার কামাই যে কোনও মাসে নেই হে!"

রাগে আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল—বলিলাম, "তুই আসল ছোটলোক! বলে—খেতে পায় না, গহনা গড়ায়! খবর রাখিস, কি কষ্টে ওদের দিন চলছে?"

মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া গরগর করিয়া চলিয়া গেলাম। একবার পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, রাস্কেলটা তখনও ফিক্-ফিক্ করিয়া হাসিতেছে!

গুডফ্রাইডের ছুটী। আমি আর বিশে বাড়ী গেলাম। গেল না নরেশ—সে তখন 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগলে'র মত হইয়া কলিকাতায় পাঁচ যায়গায় টাকার সন্ধানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার ভাগের দুইখানা ঘর গলিয়া খসিয়া পড়িতেছে, কোনরূপে কয় মাস বাঁশের চাড়া দিয়া খাড়া করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু স্ত্রী-পুত্র লইয়া সে ঘরে বাস করা নিরাপদ নহে। কিন্তু উপায় কি? প্রাণে ব্যথা পাইলাম খুবই, কিন্তু আমারও 'অন্ত ভক্ষো ধনুর্গুণঃ'—আজ চাকুরী গেলে কা'ল কি খাইব, তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। নরেশ বেচারী একে অভাবগ্রস্ত, তাহার উপর ছেলে-পুলে লইয়া সংসারে পাত পড়ে দুই বেলা অনেকগুলি। বৌটারও কি কপাল! রাজরাণীর মত রূপ, কিন্তু সংসারের অনাটনে ভাজা-ভাজা হইয়া হাড় কালি হইয়াছে!

কিন্তু বিশে? তাহার অবস্থা ত মন্দ নহে। চাকুরী ছাড়া সে দেশেও যে তরি-তরকারী ও আম-কাঁঠালের বাগান করিয়াছে, তাহা হইতেও দুই পয়সা রোজগার করে, পাটের চাষেও কিছু পায়, তেজারতিও কিছু আছে। বিবাহ করে নাই, সংসারে তাহার খাইতে দুইটি প্রাণী, সে আর তাহার পিসী। এই যে শনিবারে শনিবারে বাড়ী আসে, সেই একটা দিনেই জন-মজুরের সঙ্গে খাটিয়া দশ দিনের কায করিয়া যায়। গায়ে অসুরের মত শক্তি, অটুট স্বাস্থ্য। সে ত অনায়াসে বাল্যবন্ধুর দুর্দ্দিনে সাহায্য করিতে পারে। মনে ভাবিলাম, তাহাকে একবার বলিয়া দেখি।

সে তখন ক্ষেতে কায করিতেছিল। ভয়ে ভয়ে কথাটা পাড়িলাম। ভয়ে ভয়ে—কেন না, সে নরেশের নাম শুনিলেই জ্বলিয়া উঠে! যেমন কথা পাড়া, অমনই পাষণ্ডটা চোখ-মুখ গরম করিয়া বলিয়া উঠিল, "নিজের চরকায় তেল দাও গে ঠাকুর—যে মাগ-ছেলেকে পুষতে পারে না, তার বিয়ে করা কেন?"

আমি মরমে মরিয়া গেলাম—বড়-মুখ করিয়া বলিতে আসিয়াছিলাম! রাগে, ঘৃণায় শরীরটা রি-রি করিয়া উঠিল, বলিলাম, "মানুষের চামড়া যদি তোর গায়ে থাকত"—রাগে কথাটা শেষ করিতে পারিলাম না, দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করিলাম। একবার পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম, লক্ষ্মীছাড়া ফিক্‌ফিক্ হাসিতেছে। ছিঃ ছিঃ! হাড়ি-ডোমের ঘরেও যে এমন হয় না!

অপরাহ্ণে একবার নরেশদের ওখানে খবরটা আনিতে গেলাম, কেমন আছে, হাঁড়ী চড়িয়াছে কি না। হাটবার, পুরুষরা প্রায় কেহই ঘরে নাই, সবাই হাটে গিয়াছে। বাড়ীটা যেন নিঝুম, নিস্তব্ধ।

সেকালের পল্লীগ্রামের জমীদার-বাড়ী—ভাঙ্গা দালান—ভাঙ্গা জানালা—ছাদে অশ্বত্থ বট গজাইতেছে। কিন্তু তথাপি কেতা-দোরস্ত পূজা-বাড়ী, বার-বাড়ী, সামনে মস্ত পুকুর আর বাগান। পুকুরের শানের ঘাটে ফাট ধরিয়াছে,

তাহাতে তৃণ-গুল্ম জন্মিয়াছে, পুকুর দামে ভরা। এক কালে মিত্তিরদের কি বোল-বোলাওই না ছিল!

অঙ্গনের মধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া ঘাটের দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। এ কি দেখিলাম! নস্তর টোপরের মত কুঞ্চিত কেশমণ্ডিত মাথাটা বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া, তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া নিমীলিত-নেত্রে বসিয়া রহিয়াছে বিশ্বনাথ। নস্ত নরেশের ছোট ছেলে। একবার মনে করিলাম দৃষ্টিভ্রম! কিন্তু না, শুনিলাম, বিশ্বনাথ তাহার ফুলের মত কচি মুখখানি চুম্বনে ভরাইয়া দিয়া ভাব-গদগদ স্বরে বলিতেছে, "মাণিক আমার! যাদু আমার! কিছু খাস্ নি ও-বেলা? আমায় বলিস নি কেন?" দরদরধারে বিশ্বনাথের গণ্ড বহিয়া অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।

আমি স্তম্ভিত হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া পড়িলাম। পথে চলিতে চলিতে সম্মুখে সর্প দেখিলে মানুষ যেমন চমকিত হয়, হঠাৎ আমার দিকে দৃষ্টি নিপতিত হইবামাত্র বিশ্বনাথ তেমনই চমকিত হইল, পর-মুহূর্ত্তেই সে ছেলেটাকে দূরে ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং কোন কিছু না বলিয়া ঝড়ের মত চলিয়া গেল।

এ কি প্রহেলিকা!

৩

আফিসের ছুটীর পর মেসে গিয়া দেখি, আমার নামের একখানা পোষ্টকার্ড। হাতের লেখা দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলাম—এ ত নরেশের পত্র। আঁতি-পাঁতি করিয়া যাহাকে আজ সাত দিন ধরিয়া সকালে-সন্ধ্যায় খুঁজিতেছি, কি আশ্চর্য্য—অসম্ভাবিতরূপে আসিল আজ তাহারই পত্র! দয়াময়, সব তোমারই খেলা!

নরেশের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতেছিল। আফিসের চাকুরী যায় যায়—কেবল কামাই। একবার জবাব হইয়াই গিয়াছিল। কি জানি কেন, দুই দিন পরে বড় সাহেব তাহাকে ডাকিয়া সতর্ক করিয়া দিয়া আবার চাকুরীতে বহাল করিয়াছিলেন। তাহার শরীর-মন—সব যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। জমী-জমা বাঁধা পড়িয়াছে, বাড়ী-ঘরের অবস্থা শোচনীয়। শুনিয়াছি, নরেশের বাপের তেজারতি কারবারে অনেক টাকা মারা যায়, তাহার উপর পর পর কয় বৎসর অজন্মা—মনের দুঃখেই তিনি মারা যান। নরেশ চাকুরী করিয়া কোনরূপে জোড়াতাড়া দিয়া সংসার চালাইতেছিল, কিন্তু আর চলে না। মহাজনদের জোর তাগিদ, মান বাঁচাইয়া আর দেশে থাকা চলে না। ইদানীং তাই সে বড় একটা দেশে—ঘরে যাইত না। আমাদের অনুযোগের ভয়ে সে মেসও ছাড়িয়াছিল। আরও অন্য কারণ যে তাহার ছিল না, তাহা নহে। কয় মাস সে নিয়মিত মেসের প্রাপ্য আদায় দিতে পারে নাই। সে যে কোথায় থাকিত, তাহা কেহ জানিতে পারিত না। ইদানীং সে আমাদের যথাসাধ্য এড়াইয়া চলিত। মাঝে মাঝে দেশে যাইত শুনিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ধরিতে পারিতাম না।

আজ এই চিঠি—এত দিন পরে—কাযেই চমকিত হইবারই কথা। তাড়াতাড়ি পড়িয়া ফেলিলাম। সে কি নিদারুণ করুণ পত্র! নরেশ রোগশয্যায়—বিদেশে রাণীগঞ্জে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া আছে, হাতে একটি পয়সাও নাই, চিকিৎসা-পথ্য ত দূরের কথা, খাইবার সঙ্গতিও নাই!

মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। এখন উপায়? হতভাগা ডাক্তারী সার্টিফিকেট যোগাড় করিয়া আফিস হইতে সাত দিনের ছুটী লইয়া রাণীগঞ্জে গিয়াছে কাযের চেষ্টায়! সাহেব শুনিলে এবার আর রক্ষা নাই। ইচ্ছা হইল, তখনই রাণীগঞ্জে চলিয়া যাই। কিন্তু হস্ত যে কপর্দ্দক-শূন্য, কি লইয়া যাইব? কোনরূপে রাতটুকু কাটাইয়া পর-দিন আফিসে বড় বাবুকে ধরিয়া গুটি দশেক টাকা ধার করিয়া, তিন দিনের ছুটী লইয়া রাত্রির গাড়ীতে রাণীগঞ্জ যাত্রা করিলাম। কিছু বেদানা ও কমলা-লেবু সঙ্গে লইলাম। গভীর রাত্রিতে সহরে পৌঁছিয়া তাহার ঠিকানা কিছুতেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলাম না। আফিসের দৌলতে পরিচিত এক মাড়োয়ারী বেনিয়ানের এইখানে একটা গদী ছিল। গদীতে রাতটা কাটাইলাম, প্রত্যুষে উঠিয়াই তাহার খোঁজে বাহির হইলাম। ভিজে সেঁৎসেঁতে খোলার বাড়ী, চারিদিকে পচা পাঁক আর গোবরের গাদা। দেখিলাম, খোট্টার বস্তি, গোয়াল-পাড়া। জিজ্ঞাসাবাদে জানিলাম, এক মাড়োয়ারী মহাজনের বাঙ্গালী বাবু তাহাকে অন্যত্র লইয়া গিয়াছে।

হতভাগা এখানে মরিতে আসিয়াছিল কেন? অদৃষ্ট! কোথায় পাই তাঁহাকে? শ্রান্ত-দেহে, বিষণ্ণ-মনে গদীতে ফিরিলাম। সরকার মহাশয় আমায় দেখিয়া বলিলেন,—"আপনি কা'ল রাতে এসেছেন না? আপনাদেরই আফিসের এক বাবুকে নিয়ে কা'ল দিন-রাত ঘা নাকাল! কত কষ্টে যে তাঁকে হাঁসপাতালে যায়গা ক'রে দিয়েছি, সে আর কি বোলবো! রাতভোর হাঁসপাতালেই কাটাতে হয়েছে।"

আমি তীরের মত উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তখন আমার সমস্ত আগ্রহ চোখে মুখে ফুটিয়া বাহির হইতেছে—অবসাদ ক্লান্তি কোথায় চলিয়া গিয়াছে, উদ্বেগ ও আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ হাঁসপাতাল?"

তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "মাড়োয়ারী হাঁসপাতাল। কেন?"

আমি ততক্ষণ পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছি—কিরূপে তিনি নরেশের খবর পাইলেন বা কোথা দিয়া কি হইয়া গেল, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার মত জ্ঞান-গোচর ছিল না। তিনি অত্যন্ত বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া আমার দিকে যে বহুক্ষণ চাহিয়া ছিলেন, ইহা আমি নিশ্চিতই অনুমান করিয়া বলিতে পারি।

এক গা ঘাম ও এক হাঁটু ধুলা লইয়া যখন হাঁসপাতালে পৌছিলাম, তখন আর রোগীর সহিত দেখা হইবার উপায় নাই। তবে রূপচাঁদের মহিমা অনন্ত, শুনিয়াছি, উহার কল্যাণে কাঠের পুতুলও নাকি কথা কয়! নরেশের সহিত দেখা হইল, সে একখানা খাটিয়ায় শুইয়া ছিল।

আমাকে দেখিয়াই সে শয্যায় উঠিয়া বসিল, নার্সের নিষেধ শুনিল না। অস্থিচর্ম্মসার, চক্ষু কোটরগত। আমার দিকে দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া গদ্‌গদ স্বরে বলিল, "এতক্ষণে দেখা দিলি? ভাল কায করলে কি লজ্জায় দেখা দিতে নেই? সরকার মশাইকে পাঠিয়েই নিশ্চিন্তি! বেশ যা হ'ক!"

তাহার দুই নয়নে ধারা বহিতেছিল। আমি তাহার শয্যাপার্শ্বে টুলের উপর বসিয়া তাহাকে জোর করিয়া শোয়াইয়া দিলাম, সে তখন হাঁপাইতেছিল। বলিলাম, "চুপ, কথা কসনে, নইলে নার্স আমায় তাড়িয়ে দেবে।" কিছুক্ষণ তাহার বুকে পিঠে হাত বুলাইয়া দিলাম, নার্স একটু বেদানার রস খাওয়াইয়া দিল। সে আরাম ও তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলে নার্স বাহিরে গেল।

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম,—"ব্যাপারখানা কি বল দিকি আস্তে আস্তে।"

সে আমার হাতখানা ধরিয়া রহিল, পাছে আমি পলাইয়া যাই।

ধীরে ধীরে বলিল, "তা হ'লে চিঠি পেইছিলি? আমি ভাবলুম, লক্ষীছাড়া দেখে ভুলে গেছিস সবাই। তা না, চিঠি পেয়েই ছুটে এসেছিস, সরকার মশাইকে পাঠিয়ে এই ব্যবস্থা করেছিস,—আর জন্মে আমার কি ছিলি ভাই?"

আমি ধমক দিয়া বলিলাম, "আবার? আবার কাঁদ্‌ছিস? তা হ'লে চ'লে যাব বলছি। সরকার মশায়ের কথা কি বলছিলি?"

সে বলিল, "বলছি সব। আগে বল, ওরা সব কেমন আছে?"

আমি বলিলাম, "ওদের জন্যে ভাবতে হবে না তোকে—ওরা সবাই বেশ আছে। সতী লক্ষ্মী সরমা, সে কি কখন দুঃখু পায়!"

ধরা গলায় নরেশ বলিল, "একশোবার। কি বলবো ভাই, এত কষ্টে রয়েছে, কিন্তু মুখে হাসি কখনও মিলিয়ে যায় নি।"

আমি বলিলাম, "যাক্, রাণীগঞ্জে এলি কেন?"

সে বলিল, "সে ঢের কথা, সেরে উঠে বোলবো। সারি যদি ত, তোরই কল্যাণে। যখনই সরকার মশাই ডুলি নিয়ে এল, তখনই বুঝেছিলুম, তুই রাণীগঞ্জে এইছিস।"

আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না,—এ বলে কি? কে এ লোক যে নরেশকে যমের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে? কে দূরে থাকিয়াও অতি নিকট আপনার জনের মত তাহাকে বাহুপুটে আশ্রয় দান করিয়া রক্ষা করিতেছে? কে এ?

এ প্রশ্নের জবাব কলিকাতায় ফিরিয়া পাইয়াছিলাম। আফিসে গিয়া শুনিলাম, আমি যে দিন রাণীগঞ্জে যাত্রা করি, তাহার পূর্ব্বদিন হইতে বিশ্বনাথ আফিস কামাই করিতেছে, এখনও যোগদান করে নাই। ইহার অর্থ কি? বাসায় ঝির কাছে শুনিয়াছিলাম, নরেশের পোষ্টকার্ডখানা সে প্রথমে বিশ্বনাথের হাতেই দিয়াছিল, তখন আমি বাসায় ছিলাম না।

সেই সপ্তাহের শনিবার দেশে গিয়া যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার বিস্ময় আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল—বিশে তাহার পিসীকে লইয়া কাশী যাত্রা করিয়াছে, আর দেশে ফিরিবে না। কেবল আমায় একখানা চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

চিঠি পড়িয়া স্তম্ভিত হইলাম। দেবতা চোখে দেখি নাই, এই কি দেবতা? বিশে দানপত্র করিয়া তাহার দেশের সম্পত্তি মায় ভদ্রাসনের অংশ সমস্তই নরেশের দুই পুত্রের নামে লিখিয়া দিয়াছে এবং আমাকে তাহার সমস্ত সম্পত্তির একজিকিউটার নিযুক্ত করিয়াছে, সেই দানপত্র রেজিষ্ট্রীও করা হইয়াছে। দলীলখানা সে আমার জিম্মায় রাখিয়া গিয়াছে। আর আমাকে বলিয়াছে, রাণীগঞ্জে গিয়া নরেশকে লইয়া আসিয়া ভাল করিয়া চিকিৎসা করাইতে। সে নরেশের পুত্রদের জন্য দুই হাজার টাকার নোট পত্রের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছে!

শেষ দুই ছত্রে মাত্র এইটুকু লেখা আছে:—"জীবনে এত দিন শান্তি পাই নাই, এইবার বাবা বিশ্বনাথ বুঝি পায়ে রাখিলেন।"

আমার দুনয়নে ধারা নামিয়া আসিল। বুঝিতে বাকী রহিল না, রাণীগঞ্জে কে নরেশকে যমের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিতে গিয়াছিল!

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

আঁধারে আলো

আঁধার আমার ধন্য হ'ল আলোর ছায়া মেখে,
জীবন-বীণা উঠল বেজে পূর্ণ মিলন সুখে।
পাপড়ি-ঝরা ফুলের বনে
গান গেয়ে যাই আপন মনে,—
অন্ধকারের আভরণে
বেড়াও তুমি সুখে।
আঁধার আমার ধন্য হ'ল আলোর ছায়া মেখে।

অষ্টপ্রহর তোমায় খুঁজে ফুরিয়ে এল বেলা—
ভাঙ্গা-ঘরেই বুঝি তোমার লুকোচুরি খেলা?
হিয়ার গোপন সিংহাসনে,
এমন মধুর সন্ধিক্ষণে,
এমনি সাজে ওগো নবীন
বুঝি তোমার মেলা?
অষ্টপ্রহর তোমায় খুঁজে ফুরিয়ে এল বেলা।

আলোর ছায়ে নূতন সাজে
তোমার নূপুর সকল কাজে
হৃদয়-মাঝে কেবল বাজে
সন্ধ্যা সকাল-বেলা।
আবার কেন হে বিদেশী করছ আমায় হেলা?

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী।

পুরাণ-প্রসঙ্গ
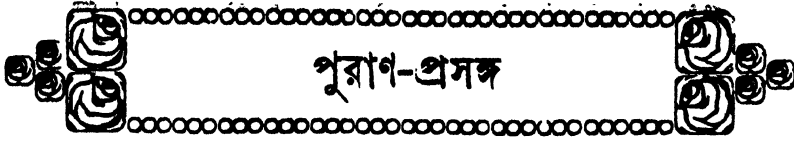
(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পুরাণে জ্যোতিষ

পুরাণ-সকলের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে পুরাণের কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিব, তন্মধ্যে পুরাণের জ্যোতিষ সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করিতেছি। কটক কলেজের অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় এম এ প্রণীত "আমাদের জ্যোতিষ" নামক গ্রন্থে এই বিষয়ের আলোচনা আছে। তিনি বলেন, খৃষ্টপূর্ব্ব ৮ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মেরুসন্নিহিত প্রদেশে ঋষিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ বাস করিতেন, এবং বেদবর্ণিত 'উষা' আর্য্যগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ঐ উষার স্থিতিকাল ৩০ দিন। ঐ উষার যে রমণীয় মূর্ত্তি বর্ণিত আছে, উহা প্রত্যক্ষ না করিলে কল্পনায় আনা যায় না।

প্রাচীন পঞ্জিকায় বর্ষ, মাস, সংক্রান্তি প্রভৃতির স্মৃতি পরবর্ত্তী সময়ের ব্রত-পূজাদি দ্বারা রক্ষিত হইয়াছে। আর্য্যগণ মেরু-সন্নিহিত প্রদেশে অবস্থান করিবার কালে ৭ মাস সূর্য্য দেখিতে পাইতেন বলিয়া উহার নাম সপ্তাশ্ব, সপ্তরশ্মি প্রভৃতি হইয়াছে। ক্রমশঃ দ্বাদশ মাসে দেখিতে পাওয়ায় সূর্য্যের নাম দ্বাদশাদিত্য হইয়াছে।

যুগ-নির্ণয়ও পুরাণের একটি প্রসিদ্ধ কথা। এই যুগের পরিমাণ ১২ হাজার বৎসর। ঐ মান দেব-পরিমাণে বুঝিতে হইবে, ঐ পরিমাণ ক্রমশঃ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়াছে।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১০ হাজার হইতে ৮ হাজার বৎসর মধ্যে হিম-প্রলয়ের জন্য মেরুপ্রদেশ বাসের অযোগ্য হওয়ায় আর্য্যগণ পূর্ব্ব-স্থান ত্যাগ করিয়া নূতন বাসের যোগ্য স্থান নির্ণয়ার্থ পর্য্যটন করেন, ঐ সময়ের নাম কৃতযুগ। তৎকালে কৃত্তিকাতে বিষুবায় থাকিত। ৫—৩ হাজার বর্ষ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মৃগশিরা কাল, ঐ সময়ে প্রাচীন পঞ্চাঙ্গ সংস্কৃত হয়। ৩—১। হাজার খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ রচনা হয়। এই বিষয়সকল সম্বন্ধে পৌরাণিকগণের অভিপ্রায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পুরাণ-প্রসঙ্গ) প্রাচীনগণ যে সকল কারণে ঐ দীর্ঘ সময়াদিতে বিশ্বাসবান্, তাহা অগ্রহায়ণ সংখ্যায় মন্বন্তর-বিচার প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। এই স্থানে পুনরায় উহার বিচার করিব না।

উৎপল ভট্ট বলিয়াছেন, জ্যোতিষ্কমণ্ডলকে অবলম্বন করিয়া যে শাস্ত্র রচিত, তাহার নাম জ্যোতিষ। ইহা ত্রিবিধ;—গণিত, হোরা ও সংহিতা। কিন্তু জ্যোতিষে ভূগোল, খগোল, গণিত, মানবের জীবন-সম্বন্ধীয় কথা (ফলিত), উৎপাত, শকুন, দৈববাণী প্রভৃতি অনেক কথাই বর্ণিত হইয়াছে, উহার নাম গণিত বা তন্ত্র। যাহাতে জন্ম, যাত্রা, বিবাহাদি কার্য্যে লগ্ন ও গ্রহাধীন উৎপন্ন শুভাশুভ বিবেচিত হয়, উহার নাম হোরা বা অঙ্গবিনিশ্চয়। উহারও অনেক ভেদ, যথা—জাতক, প্রশ্ন, চেষ্টা প্রভৃতি।

যে শাস্ত্রে যাবতীয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, উহার নাম সংহিতা।' গ্রহ, নক্ষত্র, অদ্ভুত, দিব্য, অন্তরীক্ষ, ভৌম, উৎপাত তাহার অন্তর্গত। তন্ত্র বা গণিত সিদ্ধান্তও করণভেদে দ্বিবিধ। বেদ মধ্যস্থ জ্যোতিষই বেদের ছয়টি অঙ্গান্তর্ভূত জ্যোতিষ। পুরাণে যে জ্যোতিষ বর্ণিত হইয়াছে, উহা সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ। বেদে ৩ শত ৬০ দিনে বৎসর বর্ণিত হইয়াছে। বেদে দক্ষিণায়নান্ত হইতে বর্ষ গণনা আরম্ভ হইত, ইহা শত হেমন্ত আয়ুঃ প্রার্থনা দ্বারা বুঝা যায়, পৈতামহ সিদ্ধান্ত ও বেদাঙ্গ-জ্যোতিষও ইহাই বলে। ৫০৫ খৃষ্টাব্দে বরাহমিহির বলিয়াছেন, তাঁহার সময়ে কর্কটের আদিতে উত্তরায়ণ হইত। পুরাণে বসন্তকাল হইতে গণনা (বসন্তায় নমস্তভ্যং ইত্যাদি দ্বারা) দেখা যায়। বৃহৎ-সংহিতার টীকায় ভট্টোৎপল পরাশরের গণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, হস্তায় সূর্য্য প্রবেশ করিলে অগস্ত্যের উদয় এবং রোহিণীতে প্রবেশ করিলে অগস্ত্যের অস্ত হয়। কোলব্রুক সাহেব ইহা দ্বারা বলেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এইরূপ হইত। পরন্তু তৎকালে পরাশরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু বিচার দ্বারা ইহারও বহুবর্ষ পূর্ব্বে পরাশরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। ভট্টোৎপল-কৃত বৃহৎ-সংহিতার টীকায় পরাশরবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে যে, "হস্তস্থে সবিতর্য্যুদেতি রোহিণীসংস্থে প্রবিশতি।" অগস্ত্য তারার এইভাবে উদয়াস্ত কথিত হইয়াছে এবং বৃহৎ-সংহিতায় আছে,—

> অশ্লেষার্দ্ধাদ্দক্ষিণায়ণমুত্তরময়নং রবের্ধনিষ্ঠায়াম্।
> নূনং কদাচিদাসীদ্ যেনোক্তং পূর্ব্বশাস্ত্রেষু।

উৎপল ভট্ট ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, পূর্ব্বশাস্ত্রপদে পরাশরতন্ত্র; তাহার প্রমাণ—'সৌম্যাদ্যাৎ সার্পার্দ্ধং গ্রীষ্মঃ।' সৌম্য পদে মৃগশিরা। অতএব অদ্য হইতে প্রায় ৩৬ শত বর্ষ পূর্ব্বে অশ্লেষার অর্দ্ধাংশে রবির উত্তরায়ণ শেষ হইত। এই অনুসারে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৭শ শতাব্দীতে পরাশর জীবিত ছিলেন বুঝা যায়। অথচ ঐ পরাশরোক্ত বিষ্ণুপুরাণে আছে, 'অয়নস্যোত্তরস্যাদৌ মকরং যাতি ভাস্করঃ।" বরাহের সময়ে ৪২৭ শকে বা ৫০৫ খৃষ্টাব্দেও উত্তরায়ণে প্রথমে মকর রাশিতে সূর্য্য গমন করিতেন এবং সূর্য্য যখন বিশাখার তৃতীয়াংশে অবস্থান করেন, চন্দ্র সেই সময়ে কৃত্তিকার মস্তকে থাকেন, তাহাকে বিষুব বলে। এই সম্বন্ধে বায়ু ও বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকগুলি প্রায় অভিন্ন। বিষ্ণুপুরাণে সংক্ষিপ্ত, বায়ুপুরাণে বিস্তৃতভাবে আছে। বায়ুপুরাণের ২০টি অধ্যায়ে বর্ণিত ভূগোল, খগোল, বৃষ্টির কারণাদি সম্বন্ধেও দুই পুরাণের শ্লোকগুলি প্রায়ই অভিন্ন। পুরাণে ত্রিকালের কথা থাকার বিষয়ে আমরা বিশ্বাস করি। সুতরাং খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক পরাশর, এ কথা মানি না।

আর্য্যগণ জ্যোতিষিক শুভাশুভ ফল বিশ্বাস করিতেন। ঋগ্বেদে শাকুন শাস্ত্রের সূচনা আছে। গোভিলগৃহ্য পরিশিষ্টে নবগ্রহ-শান্তির কথা আছে, অথর্ব্ববেদে গ্রহযুদ্ধ, রাহুচার, কেতুচার, নক্ষত্র-গ্রহোৎপাত প্রভৃতি জ্যোতিষ-সংহিতার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

পৌরাণিক জ্যোতিষ আলোচনা করিলে দেখা যায়, উহা সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষের [illegible]

সিদ্ধান্তীর ন্যায় স্পষ্টতঃ বর্ণনা করিয়াছেন। উহার মধ্যে উপাখ্যান-গুলিই অধিক, আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় উহাকে রূপকাখ্যান বলেন, উহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না।

স্বপ্নফল অগ্নিপুরাণের ২২৯শাধ্যায়ে ও মৎস্যপুরাণের ২৪২শ অধ্যায়ে অভিন্ন শ্লোকে বর্ণিত আছে, স্থানে স্থানে একটু পৌর্ব্বাপর্য্যের ভেদ আছে, যথা—অগ্নি ৩১শ, মৎস্য ৩৫শ শ্লোক, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ৭৭ অধ্যায়েও স্বপ্নফল বলা হইয়াছে, উহা পূর্ব্বোক্ত পুরাণদ্বয়াপেক্ষায় কিঞ্চিদধিক ও স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডে কিঞ্চিৎ কম আছে। শ্লোকগুলি যে অনেক পুরাণেরই এক হয়, ইহার কারণ প্রথমেই বলিয়াছি ও প্রমাণ করিয়াছি যে, পূর্ব্বে বেদের ন্যায় পুরাণও একখানিই ছিল, পরে বেদব্যাস পুরাণকে ১৮শ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। রামায়ণে দশরথের মৃত্যুর পর ভরতের স্বপ্নদর্শন বর্ণিত আছে। মহাভারতে মুষলপর্ব্বে ও অন্যান্য স্থানে দুঃস্বপ্নের কথা আছে। মৎস্যপুরাণে ২৪১শ অধ্যায়ে শুভাশুভসূচক অঙ্গস্পন্দনাদির কথা আছে।

জম্বুদ্বীপ ভারতবর্ষাদি ভুবনবিন্যাস সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, মৎস্য, বায়ু, দেবীভাগবত, ভাগবত, ব্রহ্ম, বিষ্ণু প্রভৃতি সকল পুরাণেই প্রায় এক জাতীয় কথা, গরুড়পুরাণে উহা অতি সংক্ষিপ্ত হইলেও তন্মধ্যে দুই একটি বেশ পরিষ্কার বর্ণনা আছে, যাহা অন্য পুরাণে না থাকায় অপূর্ণ বোধ হয়। যথা—ভারতের সীমা-নির্দ্দেশ করিতে গিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিম ও মধ্যমাত্র বর্ণনা ব্রহ্ম, বিষ্ণু, বায়ু, মার্কণ্ডেয়, অগ্নিপুরাণে আছে, যাহার পূর্ব্বদিকে কিরাত জাতি, পশ্চিমে যবনগণ ও মধ্যে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ বাস করে। গরুড়পুরাণে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বলিয়া যাহার দক্ষিণে অন্ধ্র ও উত্তরে তুরুস্ক জাতি বাস করে, এই অধিক বর্ণন পাওয়া যায়। ব্রহ্ম ও বিষ্ণুপুরাণে সমুদ্রের উত্তর, হিমালয়ের দক্ষিণ নবদ্বীপযুক্ত ভূখণ্ডকে ভারত বলে, এইরূপ ভারতবর্ষের লক্ষণ আছে। মার্কণ্ডেয় ও অগ্নির, ব্রহ্ম ও বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক সকল অভিন্ন, এমন কি, বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশের ২য়াধ্যায়ের ৩য় শ্লোক হইতে ৯মাধ্যায় পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুরাণের ১৮শাধ্যায়ের ১০ম শ্লোক হইতে ২২শাধ্যায় পর্য্যন্ত অভিন্ন, মধ্যে বিষ্ণুপুরাণের ১টি অধ্যায় বাদ দেওয়া ও ২টি, অধ্যায় ব্রহ্মপুরাণে ধরা হইয়াছে। এই ভারতবর্ষকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া কোন্ দিকে কোন্ দেশ, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণ ভারতকে কূর্ম্মাকারে বর্ণন করিয়াছেন, ঐ কূর্ম্মের কোন্ অঙ্গে কোন্ দেশ, তাহা বর্ণিত হইয়াছে এবং প্রায় সকল পুরাণেই নদ-নদীর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের ন্যায় আরও ৮টি বর্ষেরও বিবরণ ঐ পুরাণসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সকল নাম এখন অন্য-রূপান্তরিত হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণ-কথিত কূর্ম্মাকৃতি ভারতের মুখ পূর্ব্বদিকে, উহার নয়টি অঙ্গ উক্ত হইয়াছে, প্রত্যেকাঙ্গের তিনটি করিয়া নক্ষত্র অধিপতি, উহারাই ঐ সকল দেশের শুভাশুভনিয়ন্তা, এই বিষয়টি উক্ত পুরাণের ৫৮শাধ্যায়ে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কোন্ অঙ্গে কোন্ দেশ, কোন্ কোন্ নক্ষত্র তাহার নিয়ন্তা ইত্যাদি বর্ণিত বিষয়গুলি, বরাহ-প্রণীত বৃহৎ-সংহিতায় বিস্তৃত-ভাবে আছে। তন্ত্রেও কূর্ম্মচক্র শোধনাদির দ্বারা ভারতকে কূর্ম্মাকৃতিই বলিয়াছেন। পুরাণ-প্রোক্ত ভারতের প্রদেশগুলি নাম বর্ত্তমান নাম-সকলের সঙ্গে মিলে না। যাঁহারা প্রাচীন নাম বাহির করিয়া প্রাচীন মানচিত্র লিখিয়াছেন, তাহাতেও অনেক প্রাচীন দেশের নাম নাই। কালক্রমে উহা এত পরিবর্ত্তিত—বিকৃত হইয়াছে, যাহা অনুমান করাও কঠিন। একচক্রা—আরা, বিদিশা—ভিল্‌সা, চর্ম্মণ্বতী—চম্বলা, কপিলাবস্তু—বস্তি,মৃগদাব বা ঋষিপত্তন—সারনাথ ইত্যাদি। কলিঙ্গ, চেদী, কৌশাম্বী প্রভৃতির সুবিখ্যাত রাজধানী অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

মৎস্য, বায়ু, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, অগ্নি, মার্কণ্ডেয়, গরুড় ও স্কন্দপুরাণে গ্রহসংস্থানানুসারে জীবনের শুভাশুভ ফল, ত্রিবিধ উৎপাত, শাকুন, নরপতি-জয়চর্য্যা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গলক্ষণ, কর ও ললাট-রেখা, তিল, মশকাদিচিহ্ন-ফল, সামুদ্রিক লক্ষণ-বিচার, স্ত্রীলক্ষণাদি-বিচার প্রভৃতি অল্পবিস্তরভাবে আছে, তন্মধ্যে গরুড়পুরাণে কিছু বিস্তৃত আছে। এই সকল পুরাণের জ্যোতিষাংশ দেখিলে পৌরাণিক জ্যোতিষও যে পূর্ণাঙ্গ ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কালক্রমে উহা বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে, ইহারও বহু শ্লোকই অভিন্ন। যাঁহারা পুরাণের সকল বিষয়ই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহারা একটু মনোযোগ সহকারে বিভিন্ন পুরাণে অভিন্ন শ্লোকাবলীর প্রতি দৃষ্টি দিলে বুঝিতে পারিবেন যে, উহা প্রক্ষিপ্ত নহে, উহা প্রাচীন পুরাণের অঙ্গ।

মৎস্য, অগ্নি ও গরুড়পুরাণে অদ্ভুত, ত্রিবিধ উৎপাত, বৃক্ষোৎপাত, প্রসব, বিকৃতাদি বর্ণিত হইয়াছে। গরুড়পুরাণে ফলিত জ্যোতিষ, সামুদ্রিক, স্বরোদয়, প্রশ্নগণনা প্রভৃতিও বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল জ্যোতিষ-বিষয়ের নাম 'জ্যোতিঃসার' দেওয়া হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতে সপ্তর্ষিগণের অবস্থান দ্বারা একটি স্থূল সময়ের নির্দ্দেশের সূচনা দেখা যায়, উহা বায়ু ও মৎস্যপুরাণে একটু বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এক একটি নক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণ ১ শত বৎসর করিয়া অবস্থান করেন। উঁহারা পরীক্ষিতের রাজত্বকালে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। ২৭শ শত বর্ষে একটি সপ্তর্ষি যুগ হইয়া থাকে। পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে যখন সপ্তর্ষিগণ অবস্থিত, তখন মগধে মহানন্দ রাজা ছিলেন। অন্ধ্রগণের রাজ্যশেষকালে রেবতী নক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণ এবং ঐ সময়েই সপ্তর্ষিযুগ সমাপ্ত হয়। এই স্থূল গণনায় বিষ্ণু ও ভাগবতাদি পুরাণের প্রদত্ত রাজগণের সময়ের সহিত বিরোধ হয় এবং তাহার পরিহারার্থ পৌরাণিকগণের সিদ্ধান্ত একবার 'মাসিক বসুমতী'তে ১৩৩৪ শ্রাবণ সংখ্যায় কাশ্মীর ইতিহাস প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। সপ্তর্ষিগণ কখন্ কোন্ নক্ষত্রে অবস্থান করেন, ইহা জানিবার একটি সহজ সঙ্কেতমূলক শ্লোক আছে, উহা এইরূপ—

> ষড়গ্নিলোচনৈর্হীনে শকে খাভ্রেন্দুভাজিতে।
> যল্লব্ধং তদ্‌গতর্ক্ষং স্যাৎ শেষে সপ্তর্ষিসংস্থিতিঃ।

ইহার অর্থ এই যে, ২৩৬ শকাব্দ হইতে বাদ দিয়া যে শকাব্দ থাকে, উহাকে এক শত দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল যৎ সংখ্যা থাকিবে, তত্ সংখ্যক নক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণের অবস্থান বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে ১৮৫১ শকাব্দ, উহা হইতে ২৩৬ বাদ দিলে ১৬১৫ থাকে এবং এক শত দ্বারা ঐ সংখ্যাকে ভাগ করিলে

ভাগফল ১৬ হয় এবং তাহা দ্বারা ১৬ নক্ষত্র বিশাখায় বর্ত্তমান সময়ে সপ্তর্ষিগণ আছেন এবং আরও ৮৫ বৎসর থাকিবেন। শকাব্দের ২৩৬ বৎসর গত হইলে অশ্বিনীনক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণ অবস্থান করেন, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, ইহা দ্বারা প্রকৃত নির্ণয় হয় কি না? পৌরাণিক সিদ্ধান্তানুসারে জানা যায়, পরীক্ষিতের রাজত্বকালে কলির ১২ শত বৎসর অতীত হইয়াছিল। বর্ত্তমান কল্যব্দ ৫০৩১। সুতরাং পরীক্ষিৎ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ৩৮৩১ বৎসর হইল। পরীক্ষিতের সময় সপ্তর্ষিগণ মঘায় ছিলেন। মঘা ১০ নক্ষত্র, বর্ত্তমানে সপ্তর্ষিগণ ১৬ নক্ষত্রে, এই গণনা দ্বারা ৩৩ বর্ষ মাত্র পাওয়া যায়, ৫ শত বৎসরের অমিল হয়। অথচ বিষ্ণুপুরাণের প্রদত্ত সময়ানুসারে কল্যব্দ মিলিয়া যায়। যথা— অতীত কল্যব্দ ১২ শত বৎসর, পরীক্ষিৎ-সমকালীন বার্হদ্রথাদি রিপুঞ্জয়ান্ত ২২ জন রাজার রাজ্যকাল সহস্র বৎসর। পঞ্চপ্রদ্যোত-বংশীয় রাজগণের রাজ্যকাল ১শত ৩৮ বর্ষ, শিশুনাগবংশীয় ১০জনের রাজ্যকাল ৩শত ৬২ বৎসর, নন্দরাজগণ ৯ জনের ১ শত বর্ষ, সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত ২৮ শত বর্ষ হয়। তৎপরে ২২ শত ৩০ বর্ষ অতীত হইয়াছে, চন্দ্রগুপ্তের সময় প্রতীচীর মনীষিগণও খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩২২।২৩ এইরূপ স্বীকার করেন। সুতরাং বর্ত্তমান কল্যব্দ ৫০৩১ মিল হয়। পরীক্ষিতের সময়ে যে কলির ১২ শত বৎসর অতীত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ শ্লোক আছে—

> সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
> তয়োস্তু মঘানক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎসমং নিশি।
> তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।
> তে তু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ মহর্ষয়ঃ।
> তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্দশাব্দশতাত্মকঃ॥

৪র্থাংশ, ২৪ অধ্যায়।

এবং ইহারই পরে বলা হইয়াছে—

> যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
> এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥

পঞ্চাশদুত্তরম্ মাৎস্যে।

অর্থাৎ আকাশে সপ্তর্ষিগণের মধ্যে প্রথমোদিত যে নক্ষত্রদ্বয় দেখা যায়, তাহাদের মধ্যবর্ত্তী যে নক্ষত্রটি তাহাদের সমকালীন রজনীকালে দেখা যায়, ঐ নক্ষত্রে যুক্ত হইয়া সপ্তর্ষিগণ এক শত বর্ষকাল অবস্থান করেন, সপ্তর্ষিগণ পরীক্ষিতের রাজত্বকালে মঘানক্ষত্রে ছিলেন।

পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত এক হাজার পনের বৎসর জানিবে।

শেষোক্ত শ্লোকটির পাঠ যদি 'জ্ঞেয়ং পঞ্চশতোত্তরং' হয়, (১৫ শত) তাহা হইলে সকল গোল মিটিয়া যায়। পরন্তু সপ্তর্ষিযুগ গণনায় মিল হইবে না। শ্রীধর স্বামীও এই সংখ্যায় অর্থ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, এই সংখ্যানির্দ্দেশ কোন অবান্তর অভিপ্রায়ে (সে অভিপ্রায় স্বামীর অজ্ঞাত) বাস্তবিক দুই বৎসর কম ১৫ শত বৎসর বুঝিতে হইবে।

বিষ্ণুপুরাণ হইতে মৎস্য ও বায়ুপুরাণে সপ্তর্ষি-যুগের কথা একটু বিস্তৃতভাবে আছে, নিম্নে প্রদত্ত হইল—

> মহাপদ্মাভিষেকান্তু যাবজ্জন্ম পরীক্ষিতঃ।
> এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চাশদুত্তরম্॥
> পুলোমান্তাস্তথান্ধ্রা্স্তু মহাপদ্মান্তরে পুনঃ।
> অনন্তরং শতান্যষ্টৌ ষট্ত্রিংশত্তু সমাস্তথা।
> তাবৎকালান্তরং ভাব্যমান্ধ্রান্তাপরীক্ষিতঃ।
> ভবিষ্যে তে প্রসংখ্যাতাঃ পুরাণজ্ঞৈঃ শ্রুতর্ষিভিঃ॥
> সপ্তর্ষয়স্তদা প্রাংশু প্রদীপ্তেনাগ্নিনা সমাঃ।
> সপ্তবিংশতি ভাব্যানামান্ধ্রানান্তু যদা পুনঃ॥
> সপ্তর্ষয়স্তু বর্ত্তন্তে যত্র নক্ষত্রমণ্ডলে।
> সপ্তর্ষয়স্তু তিষ্ঠন্তি পর্য্যায়েণ শতং শতম্॥

(মৎস্যপুরাণ—১৭৩ অধ্যায়)

> মহাপদ্মাভিষেকাত্তু জন্ম যাবৎ পরীক্ষিতঃ।
> এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চাশদুত্তরম্॥
> প্রমাণং বৈ তথা চোক্তং মহাপদ্মান্তরঞ্চ যৎ।
> অন্তরং তচ্ছতান্যষ্টৌ ষট্ত্রিংশচ্চ সমাঃ স্মৃতাঃ।
> এতৎকালান্তরং ভাব্যা আন্ধ্রান্তা যে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
> ভবিষ্যৈস্তত্র সংখ্যাতাঃ পুরাণজ্ঞৈঃ শ্রুতর্ষিভিঃ।
> সপ্তর্ষয়স্তদা প্রাহুঃ প্রতীপে রাজ্ঞি বৈ শতম্।
> সপ্তবিংশশতৈর্ভাব্যা অন্ধ্রাণ্তে তু ত্বয়া পুনঃ।
> সপ্তবিংশতিপর্য্যন্তে কৃৎস্নে নক্ষত্রমণ্ডলে।
> সপ্তর্ষয়স্তু তিষ্ঠন্তি পর্য্যায়েণ শতম্ শতম্।
> সপ্তর্ষীণাং যুগং হ্যেতৎ। ইত্যাদি।

(বায়ুপুরাণ—৯৯ অধ্যায়)

এই পুরাণদ্বয়ের সপ্তর্ষিযুগসম্বন্ধীয় শ্লোকগুলি প্রায় অভিন্নার্থ ও অভিন্নাক্ষর, কিন্তু এই স্থূল গণনায় যে সকল বিরোধ হয়, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। প্রতীপ শান্তনুর পিতা যে সময়ে রাজা, তৎকালে অশ্বিনীনক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণ—অন্ধ্র রাজ পুলোমায় সময়ে রেবতী নক্ষত্রে ছিলেন, বর্ত্তমানে বিশাখায় সপ্তর্ষিগণ আছেন। গণনা দ্বারা প্রতীপ হইতে পরীক্ষিৎ পর্য্যন্ত ৭ জনের রাজত্বকাল সহস্র বৎসর এবং ৮৬ জন রাজার রাজ্যকাল ১৭ শত বৎসর পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠির হইতে পরীক্ষিৎ ৩ জন মধ্যে (অভিমন্যুকে ধরিয়া) ৬০ বৎসর—প্রতীপ, শান্তনু, বিচিত্রবীর্য্য, পাণ্ডু—এই ৪ জনের ৯শত ৪০ বৎসর রাজত্বকাল বুঝা যায়।

পুরাণে বাস্তুবিদ্যা

মৎস্যপুরাণের ২৫২ অধ্যায় হইতে ২৫৭ অধ্যায় পর্য্যন্ত বাস্তুবিদ্যা বর্ণিত আছে। এই বাস্তুশাস্ত্রের উপদেশক ১৮ জন ছিলেন;— ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বকর্ম্মা, যম, নারদ, নগ্নজিৎ, বিশালাক্ষ, পুরন্দর, ব্রহ্মা, কুমার, নন্দিকেশ্বর, শৌনক, গর্গ, বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, শুক্র, বৃহস্পতি। ইঁহাদের মধ্যে কাহারও প্রণীত কোন পুস্তক পাই নাই। মৎস্যপুরাণে মনুর নিকট মৎস্যরূপী নারায়ণ যে বাস্তুবিদ্যার কথা সংক্ষেপে বলিয়াছেন, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। ঐ পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, অন্ধকাসুরের সহিত যুদ্ধকালে রুদ্রদেবের ললাট হইতে যে ঘর্ম্মবিন্দু পতিত হয়, উহা হইতে এক ক্ষুধার্ত্ত জীব উৎপন্ন হয় এবং সে অতি বৃহত্তমদেহ হইলে সকল দেব তাহার দেহ আক্রমণ করিয়া বসিলে সে দেবগণের শরণাগত হয়। তখন দেবগণ উঁহাকে বাস্তুদেব নামে খ্যাত

সিদ্ধান্তীর স্তায় স্পষ্টতঃ বর্ণনা করিয়াছেন। উহার মধ্যে উপাখ্যান-গুলিই অধিক, আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় উহাকে রূপকাখ্যান বলেন, উহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না।

স্বপ্নফল অগ্নিপুরাণের ২২৯শাধ্যায়ে ও মৎস্তপুরাণের ২৪২শ অধ্যায়ে অভিন্ন শ্লোকে বর্ণিত আছে, স্থানে স্থানে একটু পৌর্ব্বা-পর্য্যের ভেদ আছে, যথা—অগ্নি ৩১শ, মৎস্ত ৩৫শে শ্লোক, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ৭৭ অধ্যায়েও স্বপ্নফল বলা হইয়াছে, উহা পূর্ব্বোক্ত পুরাণদ্বয়াপেক্ষায় কিঞ্চিদধিক ও স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডে কিঞ্চিৎ কম আছে। শ্লোকগুলি যে অনেক পুরাণেরই এক হয়, ইহার কারণ প্রথমেই বলিয়াছি ও প্রমাণ করিয়াছি যে, পূর্ব্বে বেদের স্তায় পুরাণও একখানিই ছিল, পরে বেদব্যাস পুরাণকে ১৮শ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। রামায়ণে দশরথের মৃত্যুর পর ভরতের স্বপ্নদর্শন বর্ণিত আছে। মহাভারতে মুষলপর্ব্বে ও অন্তান্ত স্থানে দুঃস্বপ্নের কথা আছে। মৎস্তপুরাণে ২৪১শ অধ্যায়ে শুভাশুভসূচক অঙ্গস্পন্দনাদির কথা আছে।

জম্বুদ্বীপ ভারতবর্ষাদি ভুবনবিন্তাস সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, মৎস্ত, বায়ু, দেবীভাগবত, ভাগবত, ব্রহ্ম, বিষ্ণু প্রভৃতি সকল পুরাণেই প্রায় এক জাতীয় কথা, গরুড়পুরাণে উহা অতি সংক্ষিপ্ত হইলেও তন্মধ্যে দুই একটি বেশ পরিষ্কার বর্ণনা আছে, যাহা অন্ত পুরাণে না থাকায় অপূর্ণ বোধ হয়। যথা—ভারতের সীমা-নির্দ্দেশ করিতে গিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিম ও মধ্যমাত্র বর্ণনা ব্রহ্ম, বিষ্ণু, বায়ু, মার্কণ্ডেয়, অগ্নিপুরাণে আছে, যাহার পূর্ব্বদিকে কিরাত জাতি, পশ্চিমে যবনগণ ও মধ্যে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ বাস করে। গরুড়-পুরাণে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বলিয়া যাহার দক্ষিণে অন্ধ্র ও উত্তরে তুরুষ্ক জাতি বাস করে, এই অধিক বর্ণন পাওয়া যায়। ব্রহ্ম ও বিষ্ণুপুরাণে সমুদ্রের উত্তর, হিমালয়ের দক্ষিণ নবদ্বীপযুক্ত ভূখণ্ডকে ভারত বলে, এইরূপ ভারতবর্ষের লক্ষণ আছে। মার্কণ্ডেয় ও অগ্নির, ব্রহ্ম ও বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক সকল অভিন্ন, এমন কি, বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশের ২য়াধ্যায়ের ৩য় শ্লোক হইতে ৯মাধ্যায় পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুরাণের ১৮শাধ্যায়ের ১০ম শ্লোক হইতে ২২শাধ্যায় পর্য্যন্ত অভিন্ন, মধ্যে বিষ্ণুপুরাণের ১টি অধ্যায় বাদ দেওয়া ও ২টি, অধ্যায় ব্রহ্মপুরাণে ধরা হইয়াছে। এই ভারতবর্ষকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া কোন্ দিকে কোন্ দেশ, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণ ভারতকে কূর্ম্মাকারে বর্ণন করিয়াছেন, ঐ কূর্ম্মের কোন্ অঙ্গে কোন্ দেশ, তাহা বর্ণিত হইয়াছে এবং প্রায় সকল পুরাণেই নদ-নদীর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের ন্যায় আরও ৮টি বর্ষেরও বিবরণ ঐ পুরাণসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সকল নাম এখন অন্য-রূপান্তরিত হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণ-কথিত কূর্ম্মাকৃতি ভারতের মুখ পূর্ব্বদিকে, উহার নয়টি অঙ্গ উক্ত হইয়াছে, প্রত্যেকাঙ্গের তিনটি করিয়া নক্ষত্র অধিপতি, উহারাই ঐ সকল দেশের শুভাশুভনিয়ন্তা, এই বিষয়টি উক্ত পুরাণের ৫৮শাধ্যায়ে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কোন্ অঙ্গে কোন্ দেশ, কোন্ কোন্ নক্ষত্র তাহার নিয়ন্তা ইত্যাদি বর্ণিত বিষয়গুলি, বরাহ-প্রণীত বৃহৎ-সংহিতায় বিস্তৃত-ভাবে আছে। অন্তেও কূর্ম্মচক্র শোধনাদির দ্বারা ভারতকে

নাম বর্ত্তমান নাম-সকলের সঙ্গে মিলে না। যাঁহারা প্রাচীন নাম বাহির করিয়া প্রাচীন মানচিত্র লিখিয়াছেন, তাহাতেও অনেক প্রাচীন দেশের নাম নাই। কালক্রমে উহা এত পরিবর্ত্তিত —বিকৃত হইয়াছে, যাহা অনুমান করাও কঠিন। একচক্রা—আরা, বিদিশা—ভিল্সা, চর্ম্মণ্বতী—চম্বলা, কপিলাবস্তু—বস্তি, মৃগ-দাব বা ঋষিপত্তন—সারনাথ ইত্যাদি। কলিঙ্গ, চেদী, কৌশাম্বী প্রভৃতির সুবিখ্যাত রাজধানী অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

মৎস্ত, বায়ু, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, অগ্নি, মার্কণ্ডেয়, গরুড় ও স্কন্দপুরাণে গ্রহসংস্থানানুসারে জীবনের শুভাশুভ ফল, ত্রিবিধ উৎপাত, শাকুন, নরপতি-জয়চর্য্যা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গলক্ষণ, কর ও ললাট-রেখা, তিল, মশকাদিচিহ্ন-ফল, সামুদ্রিক লক্ষণ-বিচার, স্ত্রীলক্ষণাদি বিচার প্রভৃতি অল্পবিস্তরভাবে আছে, তন্মধ্যে গরুড়পুরাণে কিছু বিস্তৃত আছে। এই সকল পুরাণের জ্যোতিষাংশ দেখিলে পৌরাণিক জ্যোতিষও যে পূর্ণাঙ্গ ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কালক্রমে উহা বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে, ইহারও বহু শ্লোকই অভিন্ন। যাঁহারা পুরাণের সকল বিষয়ই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহারা একটু মনোযোগ সহকারে বিভিন্ন পুরাণে অভিন্ন শ্লোকাবলীর প্রতি দৃষ্টি দিলে বুঝিতে পারিবেন যে, উহা প্রক্ষিপ্ত নহে, উহা প্রাচীন পুরাণের অঙ্গ।

মৎস্ত, অগ্নি ও গরুড়পুরাণে অদ্ভুত, ত্রিবিধ উৎপাত, বৃক্ষোৎপাত, প্রসব, বিকৃতাদি বর্ণিত হইয়াছে। গরুড়পুরাণে ফলিত জ্যোতিষ, সামুদ্রিক, স্বরোদয়, প্রশ্নগণনা প্রভৃতিও বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল জ্যোতিষ-বিষয়ের নাম 'জ্যোতিঃসার' দেওয়া হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতে সপ্তর্ষিগণের অবস্থান দ্বারা একটা স্থূল সময়ের নির্দ্দেশের সূচনা দেখা যায়, উহা বায়ু ও মৎস্য পুরাণে একটু বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এক একটি নক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণ ১ শত বৎসর করিয়া অবস্থান করেন। উঁহারা পরীক্ষিতের রাজত্বকালে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। ২৭শ শত বর্ষে একটি সপ্তর্ষি যুগ হইয়া থাকে। পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে যখন সপ্তর্ষি-গণ অবস্থিত, তখন মগধে মহানন্দ রাজা ছিলেন। অন্ধ্র গণের রাজ্যশেষকালে রেবতী নক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণ এবং ঐ সময়েই সপ্তর্ষি যুগ সমাপ্ত হয়। এই স্থূল গণনায় বিষ্ণু ও ভাগবতাদি পুরাণে প্রদত্ত রাজগণের সময়ের সহিত বিরোধ হয় এবং তাহা পরিহারার্থ পৌরাণিকগণের সিদ্ধান্ত একবার 'মাসিক বসুমতী'তে ১৩৩৪ শ্রাবণ সংখ্যায় কাশ্মীর ইতিহাস প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। সপ্তর্ষিগণ কখন্ কোন্ নক্ষত্রে অবস্থান করে, ইহা জানিবার একটি সহজ সঙ্কেতমূলক শ্লোক আছে, উহা এইরূপ—

> বড়গ্নিলোচনৈর্হীনে শকে খাভ্রেন্দুভাজিতে।
> বলব্ধং তদ্গতক্ষ`ং স্তাৎ শেষে সপ্তর্ষিসংস্থিতিঃ

ইহার অর্থ এই যে, ২৩৬ শকাব্দ হইতে বাদ দিয়া যে শক থাকে, উহাকে এক শত দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল যত সংখ্যা থাকিবে, তত সংখ্যক নক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণের অবস্থান বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে ১৮৫১ শকাব্দ, উহা হইতে ২৩৬ [illegible] এবং শত দ্বারা ঐ সংখ্যাকে ভাগ করি

ভাগফল ১৬ হয় এবং তাহা দ্বারা ১৬ নক্ষত্র বিশাখায় বর্ত্তমান সময়ে সপ্তর্ষিগণ আছেন এবং আরও ৮৫ বৎসর থাকিবেন। শকাব্দের ২৩৬ বৎসর গত হইলে অশ্বিনীনক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণ অবস্থান করেন, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, ইহা দ্বারা প্রকৃত নির্ণয় হয় কি না? পৌরাণিক সিদ্ধান্তানুসারে জানা যায়, পরীক্ষিতের রাজত্বকালে কলির ১২ শত বৎসর অতীত হইয়াছিল। বর্ত্তমান কল্যব্দ ৫০৩১। সুতরাং পরীক্ষিৎ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ৩৮৩১ বৎসর হইল। পরীক্ষিতের সময় সপ্তর্ষিগণ মঘায় ছিলেন। মঘা ১০ নক্ষত্র, বর্ত্তমানে সপ্তর্ষিগণ ১৬ নক্ষত্রে, এই গণনা দ্বারা ৩৩ বর্ষ মাত্র পাওয়া যায়, ৫ শত বৎসরের অমিল হয়। অথচ বিষ্ণুপুরাণের প্রদত্ত সময়ানুসারে কল্যব্দ মিলিয়া যায়। যথা— অতীত কল্যব্দ ১২ শত বৎসর, পরীক্ষিৎ-সমকালীন বার্হদ্রথাদি রিপুঞ্জয়ান্ত ২২ জন রাজার রাজ্যকাল সহস্র বৎসর। পঞ্চপ্রদ্যোত-বংশীয় রাজগণের রাজ্যকাল ১শত ৩৮ বর্ষ, শিশুনাগবংশীয় ১০জনের রাজ্যকাল ৩শত ৬২ বৎসর, নন্দরাজগণ ৯ জনের ১ শত বর্ষ, সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত ২৮ শত বর্ষ হয়। তৎপরে ২২ শত ৩০ বর্ষ অতীত হইয়াছে, চন্দ্রগুপ্তের সময় প্রতীচীর মনীষিগণও খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩২২।২৩ এইরূপ স্বীকার করেন। সুতরাং বর্ত্তমান কল্যব্দ ৫০৩১ মিল হয়। পরীক্ষিতের সময়ে যে কলির ১২ শত বৎসর অতীত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ শ্লোক আছে—

> সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
> তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎসমং নিশি।
> তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।
> তে তু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ মহর্ষয়ঃ।
> তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ।

৪র্থাংশ, ২৪ অধ্যায়।

এবং ইহারই পরে বলা হইয়াছে—

> যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
> এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥

পঞ্চাশদুত্তরম্ মাৎস্যে।

অর্থাৎ আকাশে সপ্তর্ষিগণের মধ্যে প্রথমোদিত যে নক্ষত্রদ্বয় দেখা যায়, তাহাদের মধ্যবর্ত্তী যে নক্ষত্রটি তাহাদের সমকালীন রজনীকালে দেখা যায়, ঐ নক্ষত্রে যুক্ত হইয়া সপ্তর্ষিগণ এক শত বর্ষকাল অবস্থান করেন, সপ্তর্ষিগণ পরীক্ষিতের রাজত্বকালে মঘানক্ষত্রে ছিলেন।

পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত এক হাজার পনের বৎসর জানিবে।

শেষোক্ত শ্লোকটির পাঠ যদি 'জ্ঞেয়ং পঞ্চশতোত্তরং' হয়, (১৫ শত) তাহা হইলে সকল গোল মিটিয়া যায়। পরন্তু সপ্তর্ষিযুগ গণনায় মিল হইবে না। শ্রীধর স্বামীও এই সংখ্যার অর্থ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, এই সংখ্যানির্দ্দেশ কোন অবান্তর অভিপ্রায়ে (সে অভিপ্রায় স্বামীর অজ্ঞাত) বাস্তবিক দুই বৎসর কম ১৫ শত বৎসর বুঝিতে হইবে।

বিষ্ণুপুরাণ হইতে মৎস্য ও বায়ুপুরাণে সপ্তর্ষি-যুগের কথা একটু বিস্তৃতভাবে আছে, নিম্নে প্রদত্ত হইল—

> মহাপদ্মাভিষেকাত্তু যাবজ্জন্ম পরীক্ষিতঃ।
> এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চাশদুত্তরম্।
> পুলোমাস্তাস্তথান্ধ্রাস্তু মহাপদ্মান্তরে পুনঃ।
> অনন্তরং শতান্যষ্টৌ ষট্ত্রিংশত্তু সমাস্তথা।
> তাবৎকালান্তরং ভাব্যমান্ধ্রান্তাপরীক্ষিতঃ।
> ভবিষ্যে তে প্রসংখ্যাতাঃ পুরাণজ্ঞৈঃ শ্রুতর্ষিভিঃ।
> সপ্তর্ষয়স্তদা প্রাংশু প্রদীপ্তেনাগ্নিনা সমাঃ।
> সপ্তবিংশতি ভাব্যানামান্ধ্রানান্ত যদা পুনঃ।
> সপ্তর্ষয়স্তু বর্ত্তন্তে যত্র নক্ষত্রমণ্ডলে।
> সপ্তর্ষয়স্তু তিষ্ঠন্তি পর্য্যায়েণ শতং শতম্।

(মৎস্যপুরাণ—১৭৩ অধ্যায়)

> মহাপদ্মাভিষেকাত্তু জন্ম যাবৎ পরীক্ষিতঃ।
> এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চাশদুত্তরম্।
> প্রমাণং বৈ তথা চোক্তং মহাপদ্মান্তরঞ্চ যৎ।
> অন্তরং তচ্ছতান্যষ্টৌ ষট্ত্রিংশচ্চ সমাঃ স্মৃতাঃ।
> এতৎকালান্তরং ভাব্যা আন্ধ্রান্তা যে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
> ভবিষ্যৈস্তত্র সংখ্যাতাঃ পুরাণজ্ঞৈঃ শ্রুতর্ষিভিঃ।
> সপ্তর্ষয়স্তদা প্রাহুঃ প্রতীপে রাজ্ঞি বৈ শতম্।
> সপ্তবিংশৈশতৈর্ভাব্যা অন্ধ্রাণান্তে তু ত্বয়া পুনঃ।
> সপ্তবিংশতিপর্য্যন্তে কৃৎস্নে নক্ষত্রমণ্ডলে।
> সপ্তর্ষয়স্তু তিষ্ঠন্তি পর্য্যায়েণ শতম্ শতম্।
> সপ্তর্ষীণাং যুগং হ্যেতৎ। ইত্যাদি।

(বায়ুপুরাণ—৯৯ অধ্যায়)

এই পুরাণদ্বয়ের সপ্তর্ষিযুগসম্বন্ধীয় শ্লোকগুলি প্রায় অভিন্নার্থ ও অভিন্নাক্ষর, কিন্তু এই স্থূল গণনায় যে সকল বিরোধ হয়, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। প্রতীপ শান্তনুর পিতা যে সময়ে রাজা, তৎকালে অশ্বিনীনক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণ—অন্ধ্র রাজ পুলোমার সময়ে রেবতী নক্ষত্রে ছিলেন, বর্ত্তমানে বিশাখায় সপ্তর্ষিগণ আছেন। গণনা দ্বারা প্রতীপ হইতে পরীক্ষিৎ পর্য্যন্ত ৭ জনের রাজত্বকাল সহস্র বৎসর এবং ৮৬ জন রাজার রাজ্যকাল ১৭ শত বৎসর পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠির হইতে পরীক্ষিৎ ৩ জন মধ্যে (অভিমন্যুকে ধরিয়া) ৬০ বৎসর—প্রতীপ, শান্তনু, বিচিত্রবীর্য্য, পাণ্ডু—এই ৪ জনের ৯শত ৪০ বৎসর রাজত্বকাল বুঝা যায়।

পুরাণে বাস্তুবিদ্যা

মৎস্যপুরাণের ২৫২ অধ্যায় হইতে ২৫৭ অধ্যায় পর্য্যন্ত বাস্তুবিদ্যা বর্ণিত আছে। এই বাস্তুশাস্ত্রের উপদেশক ১৮ জন ছিলেন;— ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বকর্ম্মা, ময়, নারদ, নগ্নজিৎ, বিশালাক্ষ, পুরন্দর, ব্রহ্মা, কুমার, নন্দিকেশ্বর, শৌনক, গর্গ, বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, শুক্র, বৃহস্পতি। ইঁহাদের মধ্যে কাহারও প্রণীত কোন পুস্তক পাই নাই। মৎস্যপুরাণে মনুর নিকট মৎস্যরূপী নারায়ণ যে বাস্তুবিদ্যার কথা সংক্ষেপে বলিয়াছেন, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। ঐ পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, অন্ধকাসুরের সহিত যুদ্ধকালে রুদ্রদেবের ললাট হইতে যে ঘর্ম্মবিন্দু পতিত হয়, উহা হইতে এক ক্ষুধার্ত্ত জীব উৎপন্ন হয় এবং সে অতি বৃহত্তমদেহ হইলে সকল দেব তাহার দেহ আক্রমণ করিয়া বসিলে সে দেবগণের শরণাগত হয়। তখন দেবগণ উঁহাকে বাস্তুদেব নামে খ্যাত

করিয়া প্রতি গৃহস্থের প্রদত্ত বৈশ্বদেবান্তে বাস্তমধ্যে প্রদেয় বলিই আহার্য্য নির্দ্দেশ করেন। ইহার পর গৃহারম্ভের উপযোগী মাস নক্ষত্র তিথি প্রভৃতি সময় নির্দ্দেশ হইয়াছে। তৎপরে—ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের উপযোগী মৃত্তিকার বর্ণ এবং ভূমি-পরীক্ষার কথা আছে, যেমন অরত্নিপরিমিত একটি গর্ত্ত খনন করিয়া লেপন করিবে এবং ঐ গর্ত্তমধ্যে একটি আম-মৃন্ময় আধারে চতুর্দ্দিকে চারিটি বর্ত্তিকা ঘৃতাক্ত করিয়া জ্বালিয়া দিবে, পূর্ব্বাদি-ক্রমে উজ্জ্বল হইলে ব্রাহ্মণাদিক্রমে বর্ণচতুষ্টয়ের জন্য প্রশস্ত জানিবে। সকল দিকের দীপ উজ্জ্বল হইলে সর্ব্ববর্ণেরই প্রশস্ত বুঝিতে হইবে, এবং ঐ খাত পূরণ করিবার সময়ে যদি পূর্ব্বো-খাপিত মৃত্তিকা গর্ত্ত পূরণ করিয়াও অধিক হয়, তবে সর্ব্বোত্তম, সমান হইলে ভাল মন্দ কিছুই নহে, কম হইলে হানি জানিবে। অথবা গৃহারম্ভের জন্য কল্পিত ভূমি হল দ্বারা কর্ষণ পূর্ব্বক সর্ব্ব-জাতীয় বীজ বপন করিবে, ৩ দিনে অঙ্কুর হইলে উত্তম, ৫ দিনে মধ্যম, ৭ দিনে অঙ্কুর হইলে ঐ ভূমি বর্জ্জনীয়। এইরূপ সূত্র-পাত দ্বারাও শুভাশুভ জানা যায়। রাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের প্রারম্ভে যে শিল্পী যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করে, সে প্রথমে সূত্রপাত করিয়াই বলিয়াছিল, মহারাজ ! আপনার এই যজ্ঞ পূর্ণ হইবে না। কোন ব্রাহ্মণকে নিমিত্ত করিয়া এই যজ্ঞ অসম্পূর্ণ রহিবে। শিল্পীর বাক্যে সন্দিগ্ধ রাজা উহাকে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, পরে ব্রাহ্মণকে নিমিত্ত করিয়া যজ্ঞ বন্ধ হইলে উহাকে পুরস্কৃতও করিয়াছিলেন। এই কথা মহাভারতের আদিপর্ব্বে বর্ণিত আছে।

ইহার পরে একাশীতিপদ বাস্তনির্ণয় আছে এবং ঐ অধ্যায়ের শেষে কথিত হইয়াছে যে, যদি গৃহারম্ভ করিলে গৃহস্বামীর অঙ্গে কণ্ডূতি (চুলকানি) জন্মে, তবে ঐ বাস্তভূমিমধ্যে শল্য আছে বুঝিতে হইবে এবং ঐ শল্য অপনোদন করিতে হইবে। শল্যযুক্ত প্রাসাদ বা গৃহ ভয়প্রদ হয়, সুতরাং উহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। নগরে কিম্বা গ্রামে হীনাঙ্গ অথবা অধিকাঙ্গ বাস্ত বর্জ্জনীয়। ইহার পর চতুঃশাল। সর্ব্বদিকে দ্বারযুক্ত বাড়ীর নাম সর্ব্বতোভদ্র, দেবতা ও রাজার জন্য প্রশস্ত পশ্চিম-দ্বারহীনকে 'নন্দ্যাবর্ত্ত' ও দক্ষিণ-দ্বারহীন 'বর্দ্ধমান'; পূর্ব্বদ্বারহীনকে 'স্বস্তিক', উত্তর-দ্বারহীনকে 'রুচক' বলে। এইরূপ ত্রিশাল দ্বিশাল একশাল গৃহ ও কোন দিকে গৃহ না থাকিলে কি উৎপাত হয়, উহা বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ কোন্ দিকের গৃহে চুল্লী নির্ম্মাণ করিলে কি হয়, উহা বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে রাজার বাড়ী এবং তাহার মন্ত্রী প্রভৃতির বাড়ী কত দূরে কি পরিমাণে কতগুলি গৃহযুক্ত করিয়া নির্ম্মাণ করিবে, তাহা এবং স্তম্ভাদির পরিমাণ, কাষ্ঠাহরণকাল, স্তম্ভের আকার, গৃহদ্বার কিরূপ করিতে হয় এবং তাঁহার ফল বলা হইয়াছে এবং গৃহসংলগ্ন উদ্যান ও উহাতে যে সব বৃক্ষ বর্জ্জনীয় ও বাঞ্ছনীয়, সেই সকল বর্ণিত হইয়াছে। গৃহের জন্য বৃক্ষ-নির্ব্বাচন ও তাহার ফল-বিচারাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে সামান্য গৃহস্থ হইতে নরপতির গৃহনির্ম্মাণ, নগর স্থাপন, উদ্যান নির্ম্মাণ প্রভৃতি ৬টি অধ্যায়ে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণ-পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, এই বাস্তশাস্ত্রের পারিভাষিক অনেক শব্দ পুরাণমধ্যে পাওয়া যায়। মহাভারতে 'বর্দ্ধমানপুরদ্বারি' বলিয়া হস্তিনার বর্ণনে দেখা যায়, বাস্তশাস্ত্রে 'দক্ষিণদ্বারহীনন্তু বর্দ্ধমানমুদাহৃতং' বলা হইয়াছে। এইরূপ গোপুরস্তম্ভ প্রভৃতিরও পারিভাষিক নাম পাওয়া যায়।

পুরাণে আয়ুর্ব্বেদ

পুরাণে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে যাহা আছে, উহা অসম্পূর্ণ। অষ্টাঙ্গের মধ্যে মাত্র নিদান ও চিকিৎসা এই দুইটি অঙ্গ পাওয়া যায়, উহাও অসম্পূর্ণ। গরুড়, মৎস্য, অগ্নি ও দেবীপুরাণে আয়ু-র্ব্বেদের কথা আছে। সর্ব্বাপেক্ষা গরুড়পুরাণেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বাগ্ভটকৃত অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ের সম্পূর্ণ নিদান ও গরুড়পুরাণের নিদানস্থান অভিন্ন, কোন কোন স্থানে দুইটি অধ্যায় একাধ্যায়ে আছে মাত্র; চিকিৎসাস্থানের কথা যাহা আছে, উহা নিদানস্থানের ন্যায় একটি তন্ত্রের শ্লোকের সহিত অভিন্নভাবে পাওয়া যায় না, তবে সারসঙ্কলন বলিয়া বোধ হয়। ইহা ব্যতীত কিঞ্চিৎ দ্রব্যগুণ, পথ্যাপথ্য, অনুপান-বিধির কথাও সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। তৈল, ঘৃত, অরিষ্ট, আসব নির্ম্মাণপ্রণালী, সর্ব্বরোগহর, সিদ্ধযোগসার এবং কিঞ্চিৎ তান্ত্রিক চিকিৎসা ও সিদ্ধমুষ্টিযোগ উল্লিখিত হইয়াছে।

মৎস্যপুরাণে রাজাদের আত্মরক্ষার নিমিত্ত বিষাম জানিবার ব্যপদেশে কিঞ্চিৎ বিষ-চিকিৎসা আছে, উহা কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রেও আছে এবং সুশ্রুতের সমানার্থ—তাহারই কিয়দংশমাত্র।

অগ্নিপুরাণে চিকিৎসাস্থানের কয়েকটি কথামাত্র আছে, সর্ব্বরোগহর ঔষধ, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ, হস্তী ও অশ্বচিকিৎসা সংক্ষিপ্ত-ভাবে আছে, ইহা কোন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের শ্লোকের সহিত অভিন্ন না হইলেও এই ঔষধগুলি প্রায় সকল তন্ত্রেই আছে।

বৃক্ষায়ুর্ব্বেদের কথা

অগ্নি ও ভবিষ্যপুরাণের মধ্যমতন্ত্রে বৃক্ষায়ুর্ব্বেদের কথা আছে। দেবীপুরাণে দ্রব্যগুণ ও সামান্য চিকিৎসার কথা আছে। এই সকল পুরাণে রোগসামান্যের সাধারণ চিকিৎসার কথা আছে, সর্ব্বরোগহর ঔষধ ও রসায়ন বলা হইয়াছে, উহাও অন্যত্র দেখিতে পাই নাই। চিকিৎসা-প্রণালী ও ঔষধ অন্যান্য তন্ত্রে আছে, এই সকল পুরাণে অনেক সিদ্ধ মুষ্টিযোগের উল্লেখ আছে। অগ্নিপুরাণে বাণচিকিৎসা ও প্রায়শঃ রোগের সম্বন্ধে বিশিষ্ট মুষ্টিযোগ ও সর্পদষ্টের চিকিৎসা আছে। মৎস্যপুরাণে বৃক্ষোৎপাত দর্শনে কিরূপ অশুভ হইবে, তাহার কথা ও তৎপ্রতীকার বর্ণিত হইয়াছে। বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ ভবিষ্যপুরাণে অতি বিস্তৃত এবং অগ্নিপুরাণে সংক্ষিপ্তভাবে আছে। উদ্যান-নির্ম্মাণ-প্রণালী সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, ফলপ্রদ বৃক্ষ সকল ২০ হাত অন্তর রোপণ করিলে উহা উত্তম শ্রেণীর বাগান হয়, ১৬ হাত অন্তর রোপণে মধ্যম ইত্যাদি। ক্ষেত্রে মূষিকের উপদ্রব হইলে কিরূপে তাহার প্রতীকার করিতে হয় এবং কিরূপে বৃক্ষের ও তৎপত্র-পুষ্পের ও ফলের অভাবনীয় উৎকর্ষ হইতে পারে, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। সকালে ও সন্ধ্যায় গ্রীষ্মকালে, অপরাহ্নে শীতকালে, বর্ষায় মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে বৃক্ষের মূলদেশে জলসেক করিতে হয়। ছাগল ও মেষের বিষ্ঠাচূর্ণ ও যবচূর্ণ সপ্তাহকাল জলমধ্যে রাখিয়া সেই জল বৃক্ষমূলে দিলে সকল বৃক্ষেরই ফলপুষ্প বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মৎস্যের জলে বৃক্ষসেক করিলে সকল বৃক্ষই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উষ্ণ জল শীতল করিয়া সেক করিলে বিষবৃক্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শৃগাল-মাংস ও

মত্স্যাবসেকে চম্পকবৃক্ষের হিত সাধিত হয়। উষ্ট্রবিষ্ঠা ক্ষেত্রমধ্যে নিক্ষেপ করিলে ক্ষেত্রের মূষিক নষ্ট হয়, এইরূপ শত শত কথা ভবিষ্যপুরাণে মধ্যমতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বৃহৎ শার্ঙ্গধর-পদ্ধতিতে উদ্যান-বিনোদাধ্যায়ে এই সকল কথা অতি বিস্তৃতভাবে আছে। এই জাতীয় বহির্বিজ্ঞানের কথা বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি দার্শনিকগণও দৃষ্টান্তপ্রসঙ্গে স্বীয় টীকামধ্যে বহু স্থানে বলিয়াছেন। রক্তাবসেকে দাড়িম্ববৃক্ষে তালের ন্যায় বড় দাড়িম্ব হয়, বেতের মূল দগ্ধ করিয়া দিলে সেই স্থানে ঐ ভস্ম হইতে কদলীবৃক্ষের উৎপত্তি হয় ইত্যাদি। কোন্ কোন্ বৃক্ষের বিষাক্ত বায়ু নষ্ট করিবার শক্তি আছে, তাহাও বলা হইয়াছে। সুশ্রুতে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে রাত্রিকালে বৃক্ষমূল পরিহার করার কথা আছে। বিশেষভাবে তেঁতুল ও বংশবৃক্ষ হইতে রাত্রিকালে দূষিত বায়ু নিঃসৃত হয়। ঐ বায়ুসেবনে প্রাণহানি ঘটিয়া থাকে। শেফালিকা প্রভৃতি কয়েকটি বৃক্ষের ঐ বিষ নাশ করিবার শক্তি থাকায় বৃক্ষ-দোষনিবারণার্থ উহাদিগকে উদ্যানমধ্যে রাখিবার বিধি আছে।

সার্ব্বজনীন মঙ্গলকামী, মনীষী, ঋষিগণ সকল বিষয়ই জানিতেন এবং বলিয়া গিয়াছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহাদের বংশধরগণ আত্মগৃহের খবর না রাখিয়া পরোচ্ছিষ্ট ভোজনের জন্য লালায়িত। আজ যে উদ্ভিদের প্রাণ ও শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-বিজ্ঞান থাকার কথা প্রমাণ করিয়া বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহোদয় পৃথিবীর সর্ব্বপ্রান্তে যশস্বী হইয়াছেন, এই কথা প্রায় ৪ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বেদব্যাস মহাভারতে লিখিয়া গিয়াছেন। দিগম্বর-দর্শনে "চেতনাবন্তঃ সর্ব্বে পদার্থাঃ" এই সূত্র দ্বারা বৃক্ষাদির ও পর্ব্বতাদির চেতনা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রশস্তপাদ ভাষ্যের টীকায় ৯০৬ শক ৯৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক উদয়নাচার্য্য বৃক্ষাদির প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব যুক্তি ও তর্ক দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ে ভৃগুভরদ্বাজ-সংবাদে ১৮৩ অধ্যায়ে বৃক্ষের সম্বন্ধে ভরদ্বাজের প্রশ্ন ও ভৃগুর উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ভরদ্বাজ উবাচ।

পঞ্চভির্যদি ভূতৈস্তু যুক্তাঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ।
স্থাবরাণাং ন দৃশ্যন্তে শরীরে পঞ্চধাতবঃ।
অনূষ্মণামচেষ্টানাং ঘনানাং চৈব তত্ত্বতঃ।
বৃক্ষাণাং নোপলভ্যন্তে শরীরে পঞ্চধাতবঃ।
ন শৃণ্বন্তি ন পশ্যন্তি ন গন্ধরসবেদিনঃ।
ন চ স্পর্শং বিজানন্তি তে কথং পাঞ্চভৌতিকাঃ।
অদ্রব্যত্বাদনগ্নিত্বাদভূমিত্বাদবায়ুতঃ।
আকাশস্যাপ্রমেয়ত্বাদ্ বৃক্ষাণাং নাস্তি ভৌতিকম্।

ভৃগুরুবাচ।

ঘনানামপি বৃক্ষাণামাকাশোঽস্তি ন সংশয়ঃ।
তেষাং পুষ্পফলব্যক্তির্নিত্যং সমুপপদ্যতে।
উষ্মতো ম্লায়তে পর্ণং ত্বক্ ফলং পুষ্পমেব চ।
ম্লায়তে শীর্য্যতে চাপি স্পর্শস্তেনাত্র বিদ্যতে।
বাযুগ্ন্যশনিনির্ঘোষৈঃ ফলং পুষ্পং বিশীর্য্যতে।
শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দস্তস্মাচ্ছৃণ্বন্তি পাদপাঃ।
বল্লী বেষ্টয়তে বৃক্ষং সর্ব্বতশ্চৈব গচ্ছতি।
ন হ্যদৃষ্টেশ্চ মার্গোঽস্তি তস্মাৎ পশ্যন্তি পাদপাঃ।
পুণ্যাপুণ্যৈস্তথা গন্ধৈর্ধূপৈশ্চ বিবিধৈরপি।
অরোগাঃ পুষ্পিতাঃ সন্তি তস্মাজ্জিঘ্রন্তি পাদপাঃ।
পাদৈঃ সলিলপানাচ্চ ব্যাধীনাঞ্চাপি দর্শনাৎ।
ব্যাধিপ্রতিক্রিয়ত্বাচ্চ বিদ্যতে রসনং দ্রুমে।
বক্ত্রেণোৎপলনালেন যথোর্দ্ধ্বং জলমাদদেৎ।
তথা পবনসংযুক্তঃ পাদৈঃ পিবতি পাদপঃ।
সুখদুঃখয়োশ্চ গ্রহণাচ্ছিন্নস্য চ বিরোহণাৎ।
জীবং পশ্যামি বৃক্ষাণামচৈতন্যং ন বিদ্যতে।
তেন তজ্জলমাদত্তং জরয়ত্যগ্নিমারুতৌ।
আহারপরিণামাচ্চ স্নেহবৃদ্ধিশ্চ জায়তে। ইত্যাদি।

শান্তি—মোক্ষধর্ম্ম, ১৮৩ অধ্যায়।

অর্থাৎ ভরদ্বাজ বলিলেন, স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থই যদি পঞ্চভূতসংযুক্ত, তবে বৃক্ষাদির স্থাবর শরীরে পঞ্চভূত দৃষ্ট হয় না কেন? অনূষ্মত্বনিবন্ধন নিরগ্নি, গমনাদিবিহীন বলিয়া নিশ্চেষ্ট। প্রকৃতরূপে নিবিড় সংযোগবিশিষ্ট বৃক্ষগণের শরীরে পঞ্চভূত দৃষ্টিগোচর হয় না। যাহাদের দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন এবং স্পর্শ করিবার শক্তি নাই, তাহারা কি প্রকারে পাঞ্চভৌতিক হইবে? যাহা দ্রব্য পদার্থ নহে, যাহাতে অগ্নি, ভূমি ও বায়ু নাই এবং যাহাতে আকাশ প্রতীয়মান হয় না, সেই বৃক্ষগণের ভৌতিকত্ব সম্ভব হইতে পারে না।

ভৃগু বলিলেন,—"বৃক্ষগণ নিবিড় সংযোগবিশিষ্ট হইলেও তাহাতে আকাশ আছে, সংশয় নাই। যেহেতু, নিরতই তাহাদের ফল ও পুষ্প প্রকাশিত হইতেছে, উষ্মবশতঃ তাহাদিগের ত্বক্ পত্র ফল ও পুষ্প ম্লান হইতেছে, অতএব অগ্নি থাকিবার অসম্ভাবনা নাই, তরুগণ গ্লানিযুক্ত ও শীর্ণ হইতেছে। অতএব তাহাতে স্পর্শাত্মক বায়ু অবশ্যই আছে। বায়ু, বহ্নি ও বজ্র-নির্ঘোষ দ্বারা বৃক্ষদিগের ফল-পুষ্প বিশীর্ণ হয়। অতএব যখন শ্রোত্র দ্বারা শব্দজ্ঞান জন্মে, তখন অবশ্যই তাহারা শ্রবণ করে, বল্লী সকল যখন বৃক্ষ সকলকে বেষ্টন করে এবং সর্ব্বদিকেই গমন করে, তখন অবশ্যই পাদপগণ দর্শনশক্তিসম্পন্ন, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। কেন না, দর্শনশক্তিবিহীনের পথ চিনিয়া যাইবার শক্তি নাই। পবিত্র ও অপবিত্র গন্ধ এবং বিবিধ ধূপ দ্বারা পাদপ সকল অরোগ ও পুষ্পিত হইয়া থাকে। অতএব তাহারা অবশ্যই আঘ্রাণ করে। মূল দ্বারা জল আকর্ষণ, ব্যাধি ও তৎপ্রতিক্রিয়াদর্শন নিবন্ধন বৃক্ষের রসনশক্তি আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ঊর্দ্ধ্বগত নালমুখে যেমন ঊর্দ্ধ্বদিকে জল লোকে উত্তোলন করে, সেইরূপ বৃক্ষগণ বায়ুসংযুক্ত হইয়া মূল সন্ততি দ্বারা জলপান করে, বৃক্ষগণের সুখ-দুঃখ জন্মে এবং ছিন্ন হইলে পুনরায় উৎপত্তি হয়, অতএব তরুগণের চৈতন্য নাই, এমন নহে। পরন্তু জীবনই দেখিতে পাই। পাদপগণ যে জল আকর্ষণ করে, অগ্নি ও বায়ু তাহা জীর্ণ করিয়া থাকে, উহাদের আহারের পরিমাণানুসারে স্নিগ্ধতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি। দীর্ঘ দিন হইতে এ দেশে মনোবিজ্ঞানের বিশেষ চর্চ্চা হওয়ায় বহির্বিজ্ঞান উপেক্ষিত ছিল, সেই জন্য এবং বৌদ্ধ ও যবন-বিপ্লবেও এই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান বিপর্য্যস্ত হইয়াছে।

শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন (কাশীরাজ-সভাপণ্ডিত)।

বসন্ত-আবাহন

বসন্ত-বাহার-মিশ্র—দাদ্‌রা।

এস হে এস হে নব বসন্ত !
মধুর নয়নে চাহি, সুরে সুরে তরী বাহি
দক্ষিণ সমীরণে।

এস হে এস হে মধুছন্দ,
মাতাইয়া তুলি দিগ্‌দিগন্ত
পুলক শিহরণে।

আমরা কুসুমরাশি, ফুটে উঠি হাসি হাসি,
কামিনী, চম্পা, বকুল, বেলা গন্ধে বরণে !
হে বসন্ত নমি চরণে।

এস হে বসন্ত গায়নরাজ !
এই গোপন বনের মনের মাঝ
পাতায় লুকায়ে থাকি,
(মোরা) দোয়েল কোয়েল পাখী
সুরে সুরে শিস্‌-গানে,
বাঁশরী বীণার তানে,
বরণ করিব তোমায় সবে কূজনে,
নমি নমি তব চরণে ॥

কথা—শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী]　　[সুর ও স্বরলিপি —শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত।

	{ +	২			[নর্সা । ।	। । ।] }	
	{ সা সমা মা	মা মপধপা মগা	মা ধা ধা	না র্সা র্ঋা	না র্সা না	ধা না ধা }	
	{ এ স হে	এ স - - - হে -	ন - ব	ব স ন্	ত - -	- - - - }	

না র্সা র্গা | র্ঋা র্সা না | ধনা ধনা র্সনা | ধা । । | মা মা মা | মা মা মা |
ম ধু র | ন য় নে | চা হি - - | - - - | সু রে সু | রে ত রী |

মজ্ঞা গা । | । । । | গা মা ধা | না র্সা র্ঋা | না র্সা না | ধা মা ধা |
বা - হি - | - - - | দ - ক্ষি | ন স মী | র - - | ণে - - - |

+ ২
|| { ধা না র্সা | া া া | ধা না র্সা | া া া | র্সা র্সর্গা র্গা | র্গা র্মা র্রা
এ স হে | - - - | এ স হে | - - - | এ স - হে | ম - ধু

র্রা র্জ্ঞা র্রা | র্সনা র্সা া } | সা নর্সা র্রা | র্সা ধণা পা | মপা ধা পা | মা পা মগা
ছ - ন্ | দ - - - } | মা তা ই | য়া তু - লি | দি - গ্ দি | গ ন্ ত

গা মা পা | মা গা মা | রা া সন্া | সা া া || { সা মা মা | মা গা পা
পু ল ক | - শি হ | র - ণে | - - - || { আ ম রা | কু সু ম

জ্ঞা পা া | া া া | জ্ঞা পা ধা | র্সা ধা ণা | ধা পজ্ঞা পা | া া া }
রা শি - | - - - | ফু টে উ | ঠি হা সি | হা সি - - | - - - }

জ্ঞা পা ধা | পা মা গা | গা মা ধা | নর্সা র্ঋা র্সা | না র্সা না ধা ণা ধা
কা মি নী | চ ম্ পা | ব কু ল | বে - লা | গ ন্ ধে ব র ণে

পা ধা পা মা পা মা গা মা ণা ধা না র্সর্ঋা র্সা া া া া
হে - ব ন - মি - চ র - ণে - -

|| { ন্া সা মা | মা মা া | গমজ্ঞা মগমা া | া া া | গা মা গা | ঋা সা ঋা }
|| { এ স হে | ব স ন্ | ত - - - - - - | - - - | গা - য় | ন রা জ }

সা ঋা মা | মা া মা | মা জ্ঞা গা মা ধা ধা ধা া া া া
এ ই গো | প - ন | ব নে র ম নে র মা - ঝ্

{ ধা মধা নর্সা | র্সা র্সা র্সা র্সানর্সার্ঋর্সা | নর্সা র্সা র্সা | না র্সা না | ধা না ধা
{ পা তা - - য় | লু কা য়ে থা কি - - - | - - মো রা | দো য়ে ল্ | কো য়ে ল

মা মা া | া া া } | র্সা র্সর্গা র্গা র্গা র্গা র্মা র্রা র্সনা র্সা
পা খী - | - - - } | সু রে - সু রে শী স্ গা নে - -

না র্সা র্রা | র্সা ধণা পা | মপা ধপা মপা মগা া া সা মা মা মা জ্ঞা গা
বাঁ শ রী | বী ণা র | তা নে - - - ব র ণ ক রি ব

গা মা ধা | না র্সা র্ঋা | না র্সা না | ধা ণা ধা | পা ধা পা | মা পা মা
তো - মা | র স বে | কু - জ | নে - - | ন - মি | ন - মি

গা মা ণা | ধা না র্সর্ঋা | র্সা া া া া
ত - ব | - চ র - | ণে - -

জীবন-স্বপ্ন

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অজানা পথ

পরের দিন সকালে সারদা আসিয়া ডাকিল,—বলাই···

বলাই বাহিরে আসিল। সারদা কহিল,—এখনো যে বেরুস নি···?

বলাই কহিল,—বাবার সঙ্গে কথা কইছিলুম। বাবার কি কাজ আছে,—স্কুলের ছুটির পর বাবার সঙ্গে কোথায় যেতে হবে আমায়···তার উপর ভাবছিলুম, তুই তো এই পথ দিয়েই ষ্টেশনে যাবি,···ডাকলেই বেরিয়ে আসবো।

দুজনে একসঙ্গেই স্কুলে যায়, এক ট্রেণে। ফিরিবার সময় সব দিন অবশ্য এক-সঙ্গে ফেরা হয় না। বলাইয়ের মত সারদা ভয়লেশহীন নয়। তার বাড়ীতে গোটা-কতক আই-নের বাঁধনে এখনো কড়াক্কড় আছে। সারদার গার্জ্জেন তার মামা। মামা যেমন হিসাবী, তেমনি রাশ-ভারি লোক। সার-দার বাপ নাই, বাপের কিছু সম্পত্তি আছে। কাজেই আরো পাঁচটা সংসারে যেমন হয়, তেমনি,—অর্থাৎ সারদার মামা বিধবা ভগিনীকে একটু মানিয়া চলে, এবং সারদার উপর বিবিধ আইন জারী করিয়া তাকে মানুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে খানিকটা যত্ন, মায়া, স্নেহ-দরদও মামাকে দেখাইতে হয়।

খানিকটা পথ আসিয়া বলাই কহিল—তুই ষ্টেশনে গিয়ে দাঁড়া, ভাই। আমি এক দৌড়ে গিয়ে বিন্দীকে একটা কথা ব'লে আসি···বুঝলি? বলিয়াই এ-কথার জবাবের প্রত্যাশা না করিয়া সে এক দৌড়ে ডান দিকের সরু গলির পথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বিন্দু তখন ওদিক হইতে আসিয়া বাড়ী ঢুকিতেছিল। বলাইকে দেখিয়া কহিল—ইস্কুল যাওনি, বলাই-দা?

বলাই কহিল,—এই তো যাচ্ছি।···একটা কথা বলতে এলুম···তোর হাতে ও কি রে?

বিন্দুর হাতে কাগজের ছোট একটা ঠোঙা। বিন্দু কহিল—পরাণের দোকান থেকে দু'পয়সার চা কিনে আনচি।

দুই চক্ষু গোলাকার করিয়া বলাই কহিল—ওঃ···সহুরে বাবুটির সকালে চা না হলে বুঝি আলিস্যি ভাঙবে না! কত চালই মাণিক চালছেন···

হাসিয়া বিন্দু কহিল—তুমি যে কি, বলাইদা···! ছি! কেউ যদি চা খায়? যদি তার অভ্যাস থাকে? এই যে তুমি সারা দুপুর হৈ-হৈ ক'রে বেড়াও···যার যা সখ, বাবু···

বলাই কহিল—থাক্ ও কথা···তুমি এখন চা দিয়ে তাঁর অভ্যর্থনা করো গে···যা বলতে এসেছিলুম···হ্যাঁ, পিসিমা আজই না কলকাতায় যাচ্ছে?

বিন্দু কহিল—হ্যাঁ।

বলাই কহিল—ওঁদের বাড়ীটা কোথায়?

বিন্দু কহিল—চাঁপাতলায়।

বলাই কহিল—কত দিন সেখানে থাকা হবে?

বিন্দু কহিল—তা তো জানি না ভাই। তবে পিসিমা বলছিল, কাল পৈতে, তিন দিন দণ্ডীঘর···তার পর দণ্ডীঘর থেকে বেরুলে লোক খাওয়ানো সেই শনিবারে। বোধ হয়, আমরা রবিবারে আসবো।

বলাই কহিল—ওরে বাবা—আজ সোমবার···ফিরবে সেই রবিবারে? এমন নেমন্তন্ন খাওয়া তো শুনিনি কখনো!

বিন্দু কোনো কথা না বলিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। বলাই কহিল,—আমি বলতে এসেছিলুম, কুঁচো যা রেখেছিলে, সেটা দয়া ক'রে আমাদের বাড়ী না হয় রেখে যেয়ো···কমলির কাছে। আমাদের তো আর নেমন্তন্ন নেই কোথাও। ঐ মাছ ধরেই সময় কাটাতে হবে! বুঝলে? ভুলো না যেন সহুরে বাবুর অভ্যর্থনার ঘটায়···

কথাটা বলিয়া ক্ষিপ্র পায়ে বলাই আবার ষ্টেশনের পথে চলিল।

বিন্দু কিছুক্ষণ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর একটা নিশ্বাস ফেলিল, তার পর ধীরে ধীরে বেড়া টানিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। পিসিমা তখন পুকুরে স্নান করিতে গিয়াছেন এবং শম্ভুচরণ নিজের টুথ-ব্রশ্ ও দাঁতের মাজন লইয়া জল-চৌকির উপর মহা-সমারোহে মুখ ধুইতে বসিয়াছে।

বলাইয়ের ছুটী হইল বেলা দশটায়। ছুটীর পর স্কুল হইতে বাহির হইয়া সে দেখে, ফটকের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া জীবন চক্রবর্ত্তী। বলাইকে দেখিয়া জীবন কহিল—আয় আমার সঙ্গে···

বলাই বাপের সঙ্গে চলিল। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের উপর একটা বাঙালী হোটেল। বলাইকে সেই হোটেলে লইয়া গিয়া সে খাওয়াইল। তার পর কহিল,—একটু হেঁটে ঐ বৌবাজারের মোড়ে চ'···ওখান থেকে ট্রামে চড়বো···

ট্রামে চড়িয়া বলাই বাপের সঙ্গে আসিয়া খিদিরপুর ট্রাম-ডিপোর কাছে নামিল। তার পর বাঁ দিকে একটা নোংরা গলি। সেই গলি ধরিয়া অনেকখানি আসিয়া একটা পোড়ো জায়গা। পাশে খোলার ঘরের বস্তী; যত মুসলমানের বাস। জীবন কহিল,—তুই এখানে দাঁড়া রে, আমি আসচি।

জীবন গিয়া বস্তীর মধ্যে ঢুকিল এবং বলাই পথে দাঁড়াইয়া রহিল। পথের ওধারে কতকগুলা খোলার ঘর। তার মধ্যে এই ঠিক দুপুর বেলায় কলহের প্রচণ্ড কলরব চলিয়াছে। চারিদিকে একটা বিশ্রী আব-হাওয়া। বলাইয়ের কেমন অসহ্য বোধ হইতেছিল। সে ভাবিল, এই লক্ষ্মীছাড়া পাড়ায় বাপের এমন কি কাজ পড়িয়াছে, যার জন্য তাকে লইয়া আসার জরুরি প্রয়োজন ছিল!···

দশ মিনিট পরে জীবন বাহিরে আসিল, তার সঙ্গে এক জুয়ান মুসলমান। জীবন কহিল,—আমার সঙ্গে আয়···

জীবন ও সেই মুসলমান আগে আগে চলিল, পিছনে বলাই।

জীবনের সঙ্গে মুসলমানের যে কথা হইতেছিল, তার দুই-চারিটা যা বলাইয়ের কাণে আসিয়া বাজিল, তাহা হইতে সঠিক কিছু সে নির্ণয় করিতে পারিল না।

জীবন মুসলমানকে বুঝাইতেছিল, তারাও অল্প ঝুঁকি মাথায় লইয়া কাজে নামে নাই। নগদ টাকা তাদের পক্ষই বাহির করিয়া দেয়, এবং তাদের রিপদও কতখানি··· ইত্যাদি।

ব্যাপারটা সব ঠিক না বুঝিলেও বলাই এটুকু বুঝিল যে, মস্ত ঝুঁকির কাজে সে আসিয়াছে। এ ঝুঁকি কিসের, তা সে জানে না। তার বিরক্তি ধরিতেছিল শুধু···এই সব অভদ্র ইতর লোকগুলার সঙ্গে বাপের এমন মাখামাখিতে।

একটা কৌতূহল! তরুণ প্রাণে কৌতূহলের বেগ দুর্দ্দমনীয়; নহিলে সে চলিয়া যাইত। এই কৌতূহল-তৃপ্তির বাসনায় মনের বিরক্তি মনে চাপিয়া সে নিঃশব্দে জীবনের অনুগমন করিয়া চলিল, সমস্ত রহস্যটুকু যদি আবিষ্কার হয়, এই লোভে!···

দশ-বারো মিনিট চলিয়া আসিবার পর গোলার মত বেড়া-ঘেরা একটা জায়গা মিলিল। মুসলমানটা ভিতরে গেল, এবং একটু পরেই সে যখন বাহিরে আসিল, তখন গোলার ভিতর হইতে তার সঙ্গে আসিয়া উদয় হইল, সেই মাড়োয়ারী, এক জন বাঙালী এবং একটা গাড়োয়ান। মাড়োয়ারী মুসলমানের হাতে এক তাড়া নোট গুঁজিয়া দিল। গাড়োয়ান ও মাড়োয়ারীকে লইয়া মুসলমান আবার গোলায় গিয়া ঢুকিল। জীবন তখন বাঙালী দু'জনকে কহিল,—এটি আমার ছেলে···একে ঠিকানা ব'লে দেবো। ও গাড়ীর সঙ্গে মাল নিয়ে যাবে। চেতলায় তো···? খুব পারবে।

অপর বাঙালীটি কহিল,—কিন্তু আপনি একটু হুঁশিয়ার থাকবেন। ছেলেমানুষ···যদি কোনো···

লোকটার কথায় পূর্ব্ব-বঙ্গীয় টান। জীবন কহিল,—না, না, ও খুব চালাক আছে!···বলিয়া গর্ব্বিত দৃষ্টিতে জীবন বলাইয়ের পানে চাহিল।

বলাই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাথার উপর রৌদ্র তখন বেশ প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। রায়-পুকুরের শীতল কালো জলের কথা তার মনে পড়িতেছিল! কতক্ষণে যে এখানকার কাজ চুকিবে!···হঠাৎ অমনি মনে পড়িল, ফিরিয়া বিন্দুর সঙ্গে আর দেখা হইবে না। তার মাছ ধরার, ফল পাড়ার, সাঁতার কাটার ব্যাপারে বিন্দু যে কতখানি উৎসাহ জোগায়···বলাইয়ের মনে হইল, তার খেলা-ধুলার মধ্যে যে আনন্দটুকু ছিল, কলহের মধ্যেও যে-আরাম, তা এখন কিছু কালের জন্য বন্ধ হইয়া গেল! চাঁপাতলা!···সে তো

তার স্কুল হইতে বেশী দূরে নয়···একটা কোনো অছিলায় সেখানে যদি··· ?

কিন্তু সেই শম্ভুচরণ! ওঃ, জাঁক করিয়া বলিয়াছিল না, তাদের আস্তানায় বলাইকে পাইলে দেখাইয়া দেয়! একবার গিয়া দেখিবে···কি রাজত্বই করিতেছে সেখানে সিংহাসনে বসিয়া!···তার হাসি পাইল···একটু মজা···মন্দ কি!

গফুর ফিরিল,—এবং পাঁচ-সাত মিনিট পরে মাল-বোঝাই একখানা মোষের গাড়ী আসিয়া পথে দাঁড়াইল। জীবনের হাতে মাড়োয়ারী এক তাড়া নোট দিল, দিয়া কহিল,—পৌঁছোবার বন্দোবস্ত করুন, জীবন বাবু···রাতমে ফিন্ দেখা হোবে···

জীবন কহিল,—ঠিকানা ?

মাড়োয়ারী কহিল,—যম্‌নাদাস নোপানি···গোপালনগর রোড, চেতলা···

জীবন একখানা কাগজে নাম-ঠিকানা লিখিয়া বলাইয়ের হাতে দিল, দিয়া বলিল,—চেতলা জানিস তো? কালী-ঘাটের কাছে।

বলাই কহিল,—জানি।

জীবন কহিল,—এই মাল ঐ ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে বাড়ী যাবি।

বলাই কহিল,—আমার টাকা কৈ ?

জীবন কহিল,—বাড়ী গিয়ে নিস্ না···

বলাই কহিল,—না···তোমার মাল পৌঁছে দিয়ে আমি কিছু কেনা-কাটা করবো···কালীঘাটে একটা ভালো বুলবুলি পাখী দেখেচি···ছ'টাকা দিলেই সেটা পাবো।

জীবন কহিল,—এই নে···ছ'টাকা কেন, তুই এই তিন টাকাই নে···জল-টল খাবি ?

বলাই কহিল,—না।

জীবন কহিল,—তুই ঐ গাড়ীতেই নয় চেপে বোস, এতখানি পথ এই রোদে হেঁটে নাই গেলি!···

বলাই কহিল,—আচ্ছা, সে দেখবো'খন···

জীবন কহিল,—বেশ!···তার পর গাড়োয়ানকে বলিয়া দিল—এই বাবু তোর সঙ্গে যাচ্ছে···যা। বেশ হাঁকিয়ে যাবি।

বলাই কহিল,—মাল পৌঁছে রসিদ নিতে হবে ?···

জীবন কহিল,—রসিদ একটা নিবি বৈ কি···

মোষের গাড়ী চলিল, বলাই সেই গাড়ীর সঙ্গে; এবং জীবন ও তার সহচরবৃন্দ গিয়া গোলার মধ্যে ঢুকিল।···

এ-পথে বলাই কখনো আসে নাই। কদর্য্য, মলিন বস্তী। কোলাহলের কি প্রাচুর্য্য···এ সবের বৈচিত্র্য তার প্রাণকে স্পর্শ করিল। ক্রমে গলি পার হইয়া সে আসিল একবালপুরের পথে। দুধারে অনিবিড় জঙ্গল, ডোবা, পুকুর, মাঝে-মাঝে দু'একখানা একতলা বাড়ী···সাহেব-মেমের বাস। তাদের ছেলে-মেয়েরা মনের আনন্দে খেলা করিতেছে। জীবনের কি বিচিত্র লীলা!···তার মনে হইল, সে এই কাজের পাকে বন্দী হইয়া আছে···তার এ বাঁধন কাটিলে সেও জলে ঝাঁপাইয়া, গাছে চড়িয়া জীবনটাকে মনের আনন্দে উপভোগ করিয়া লয়!

আলিপুরের পথে একটা মোড়ে আসিয়া যখন সে পৌঁছিয়াছে, তখন বাইসিক্লে চড়িয়া খাকী-পোষাক-পরা এক সাহেব আসিয়া গাড়ী থামাইল, গাড়োয়ানকে কহিল,—এতে কি আছে? প্রশ্ন হইল হিন্দীতে।

গাড়োয়ান কহিল,—সুতি কাপড়া···

সাহেব কহিল,—লে চলো হামারা সাথ···

বলাই গাড়ীর সামনে আসিয়া বাধা দিল, কহিল,—My goods সাহেব···

সাহেব কহিল,—Yes boy, you manage it so cleverly, I see···

বলাই কহিল,—তোমার সঙ্গে কেন যাবো সাহেব? আমার মাল···

বাধা দিয়া সাহেব কহিল,—You must, boy! আজ এক সপ্তাহ ধরিয়া এই মালের সন্ধান করিতেছি···

এ কি রহস্য!···বলাইয়ের মনে একরাশ অন্ধকার কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিল। সে মুহূর্ত্তের জন্য কি ভাবিল, তার পর কহিল,—কোথায় নিয়ে যাবে তুমি?···

হাসিয়া সাহেব কহিল—থানায়।···

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কর্ম্ম-সূত্র

আধ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত রহস্য বলাইয়ের কাছে রৌদ্রের মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

গাড়ীর মাল চোরাই! সেই চোরাই মালের সঙ্গে সে

চলিয়াছিল, চোরাই মাল নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য। নিজেকে বাঁচাইবার জন্য জীবন সঙ্গে আসে নাই ; তার উপর দিয়াই···

প্রথম মুহূর্ত্তে সে রাগে জ্বলিয়া উঠিল, ভাবিল, পুলিশের কাছে সব কথা প্রকাশ করিয়া দেয়···কোথা হইতে মাল আসিয়াছে···সেই গুণ্ডা মুসলমানটার আস্তানা, তারি মোকাবেলায় এই মাল,—তা ছাড়া সেই মাড়োয়ারী···

কিন্তু পর-মুহূর্ত্তে মনে হইল, না···ইহাতে কত বড় সর্ব্বনাশ ঘটাইবে সে! বাপ···তাদের সংসারের একমাত্র নির্ভর !···মার কথা মনে পড়িল। এমনিতেই তো মাকে কি যাতনা সহিতে হয়···সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বদিক হইতে কি অভিযোগের, কি ঝড়-ঝাপ্‌টার বেগ আসিতেছে, হাসি-মুখে প্রশান্ত মনে মা সব সহ্য করিতেছেন !···

সে নিজেও মাকে জ্বালায় কম ! তা ছাড়া মার আরো দুটি ছেলে আছে···ভালো ছেলে, সংসারে এক দিন লক্ষ্মীকে তারা ধরিয়া আনিবে। বাড়ীতে সে-ই যা লক্ষ্মীছাড়া···যদি তার উপর দিয়াই এ বিপদ কাটিয়া যায়, যাক্ ! সে এ বিপদ মাথায় বহিয়া বাপকে যদি রক্ষা করিতে পারে !···শুধু কলঙ্ক নয়, অত বড় সংসারটাও বাঁচিয়া যায় !···

ইন্‌স্পেক্টর কহিলেন,—দলে বড় বড় মাথাওয়ালা লোক আছে। এ তো একটা শিখণ্ডী মাত্র !···বলাইয়ের পানে চাহিয়া তিনি গর্জ্জন করিলেন,—বেঁচে যাবে হে ছোকরা··· কোথা থেকে মাল পেলে, কারা পাঠিয়েচে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, সব বলে ফ্যালো···ন্যাকামি করো না···

বলাই নিস্পন্দ, নির্ব্বাক্ ! সহস্র প্রশ্ন উঠিল, সে তার কোনটার জবাব দিল না। পুলিশ গাড়োয়ানকে ধমক দিল, ঘুঁষা প্রহারও সেই সঙ্গে। সে কাঁদিয়া কহিল—হামি কুছু জানি না···এ গরীব পরওয়ার···ইন্‌স্পেক্টর তার কাণে পাক ও পিঠে লাঠির গোঁজা দিলেন। গাড়োয়ানের প্রতি জুলুম দেখিয়া বলাই কহিল,—ওকে কেন মিছিমিছি মারচেন ! ও কিছু জানে না···ভাড়া পেয়ে মাল নিয়ে চলেছিল !

মুখখানা বিকৃত করিয়া ইনস্পেক্টর কহিল,—থামো ডেঁপো ছোকরা···এই বয়সে খুব ধড়িবাজ হয়ে উঠেচো। তোমার দাওয়াই আমি জানি, প্রয়োগ করচি এখনি··· যাতাবদল্···

উর্দ্দি-পরা এক জোয়ান জমাদার আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। ইনস্পেক্টর কহিলেন—তালাসী লেও···চালানী কাগজ-পত্র থেকে সব বার করচি···

বলাই সদর্পে কহিল,—দেখুন, দেখুন সব···বলিয়া ক্ষিপ্র হস্তে পকেট হইতে নোপানির ঠিকানা-লেখা কাগজের টুক্‌রাটা মুখে পুরিয়া চিবাইয়া মুহূর্ত্তে গিলিয়া ফেলিল।···

ইনস্পেক্টর কহিলেন,—কি কাগজ মুখে পুরলে, ছাখো···

জমাদার বীর-বিক্রমে বলাইয়ের হাত ধরিল। বলাই হাসিয়া হাঁ করিল, কহিল,—এই হাঁ করচি, দেখুন, সে কাগজ কোথায়···

ইনস্পেক্টর তার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া সবলে একটা হ্যাঁচকা টান দিলেন, কহিলেন,—তবে রে ছোঁড়া···মজা দেখাচ্ছি···

কিন্তু কিছুই হইল না। যে মোরিয়া হয়, তাকে কে আঁটিবে ! বলাই সাফ বলিয়া দিল—আমায় মেরে ছেঁচে ফেললেও একটি কথা বলবো না···

ইনস্পেক্টর কহিলেন,—গাড়ীর নম্বর দেখে তলাস্ নাও বিধু বাবু···কে এর মালিক···তার পর খবর বেরোয় কি না, দেখি।

বলাই হাসিয়া কহিল,—তাই দেখুন···

ইনস্পেক্টর কহিলেন,—থাম্ হতভাগা !···এই, একে হাজতে পোরো···ও কি বেরুলো তালাশীতে ?···

কাগজে মোড়া খানিকটা আচার আর লজেন্সেস, একটা পেন্সিল, রেলের আধখানি টিকিট, তিনটা টাকা আর ক'আনা পয়সা, একটা খড়ির টুক্‌রা, কাগজে আঁটা একটা বঁড়শী···এই এষ্টেট ছিল বলাইয়ের পকেটে।···

ইনস্পেক্টর কহিলেন,—এই যে টিকিট···বালিগঞ্জ-বেলিয়াঘাটা···ছোঁড়া থাকে বালিগঞ্জে···নিয়ে যান সেখানে আজই সন্ধ্যা বেলায়···ষ্টেশনে গেলেই পাত্তা মিলবে।···

বলাই শিহরিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ ! যদি···

সে কহিল,—আমার বাড়ী নিয়ে গিয়ে কোনো ফল হবে না···বাড়ী থেকে আমায় তাড়িয়ে দেছে লেখাপড়া করি না ব'লে—

হুঁ···তা বুঝেচি। বলিয়া ইনস্পেক্টর সামনে উপবিষ্ট এক মাড়োয়ারীকে প্রশ্ন করিলেন,—মাল চিনতে পারলেন ?

মাড়োয়ারী বাবুটি কহিল,—এই যে আমার ইনভয়েস্ কাগজ দেখে পেটির নম্বর মিলিয়ে নিন্। মাল ঠিকঠাক মিলে যাচ্ছে···বারো পেটী···গুদাম থেকে গাড়ী বেরিয়েচে···সে

গাড়ী আমার ফার্ম্মে পৌঁছোয় নি···তবেই না কেশ লিখিয়েচি।···এই সাত দিন এ মাল সরে গেছে গাড়ী-শুদ্ধ···

ইনস্পেক্টর কহিল,—এ গাড়ীতে পাঁচ পেটী মাল তো মিলচে। বাকী?···

পুলিশের বিধু বাবু কহিলেন—সে মাল পাচার হয়ে গেছে। গাড়োয়ানদের সঙ্গে ষড় থাকে মশাই···ফশ্ করে মাল-সমেত গাড়ী সরে যায়। এ ছোকরা বলবে না কিছুতে···

ইনস্পেক্টর কহিলেন,—জেলে যাবে।···ভেবেচে, একটা ছোকরা···ধরেচি···কেঁদে-কেটে জামিন-মুচলেকায় বার করে নেবে···

বিধু বাবু কহিলেন,—এই গাড়োয়ানের সঙ্গে গেঁথে কেশ চালান দিন···411 I. P. C···পাকা কেশ···

ইনস্পেক্টর কহিলেন—ছুটো চার্জ্জই দিন, চুরি বা দখলে চোরাই মাল রাখা···379 বা 411 I. P. C. attempt at 414টাও লাগাতে পারেন···

রাত প্রায় এগারোটার সময় বলাইকে লইয়া পুলিশ বালিগঞ্জ ষ্টেশনে হাজির হইল। ষ্টেশনের সকলে কহিলেন, ছোকরার মুখ চেনা, তবে কার বাড়ীর ছেলে, তা তাঁরা জানেন না!

বলাই আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, আঃ!

কিন্তু বিধু বাবু পাকা অফিসার, সহজে ছাড়িবার পাত্র নন্। তিনি বলাইকে লইয়া ষ্টেশনের কাছে খাবারের দোকানে গিয়া দোকানীকে ডাকাইলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ ছোকরাকে চেনো?

বলাইয়ের মুখ পাংশু হইয়া গেল। দোকানী কহিল,—চিনি বৈ কি···চক্কোত্তি মশায়ের ছেলে।···

বিধু বাবু কহিলেন,—তাঁর বাড়ী দেখাবি, চ'···

বিধু বাবুর সঙ্গে লাল-পাগড়ী কনষ্টেবল ছিল। অগত্যা দোকানীকে বিনা-বাক্য-ব্যয়ে আসিতে হইল।

জীবনের গৃহে তখনো সংসারের কাজ চোকে নাই। বলাই ফিরিল না এখনো···চিন্তিত মনে জীবন গৃহের বাহিরে খোলা জায়গায় বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিল। জ্যোৎস্না রাত্রি···সহসা এই রাত্রিতে হারিকেন হাতে পাঁচ-সাত জন লোক গৃহের দিকে আসিতেছে দেখিয়া সে কম্পিত বুকে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং গৃহের পানে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল।···

আসিয়া যা দেখিল, তাহাতে বুক ছাঁৎ করিয়া উঠিল, এবং মুখের কথা বুকের কোন্ অতল কোণে সরিয়া লুকাইল।

দোকানী কহিল,—ঐ যে চক্কোত্তি মশাই···

বিধু বাবু কহিলেন,—এটি আপনার ছেলে?

জীবনের জিভটাকে কে যেন সাঁড়াশি দিয়া চাপিয়া বুকের মধ্যে টানিতেছিল! কোনো মতে সে কহিল,—হ্যাঁ, কেন, বলুন তো···?

বলাই একেবারে বিধু বাবুর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কহিল,—আমায় নিয়ে চলুন ছোট ইনস্পেক্টর বাবু···আমি চোর, আমি মাড়োয়ারীর কাপড় চুরি করেচি···বদ ব'লে আমায় বাড়ী থেকে বাবা তাড়িয়ে দেছে। বাড়ীর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই···চলুন আমায় নিয়ে···

পাথরের মূর্ত্তির মত জীবন নিশ্চল, নিস্পন্দ···অপলক নেত্রে বলাইয়ের পানে চাহিয়া! তার বুকের উপর দুম-দুম করিয়া সজোরে কে মুগুর মারিতেছিল···কি প্রচণ্ড তার শব্দ!···

বিধু বাবু কহিলেন—এ ছেলে চোরাই-মাল-সমেত ধরা পড়েচে···আমি আপনার বাড়ী তলাশ করতে চাই···আরো মাল যদি থাকে! আমার কর্ত্তব্য। কি করবো, বলুন···

বলাই ছুই চোখে অন্ধকার দেখিল। এত করিয়াও কিছু হইল না! মার সামনে এ বেশে···সে আর্ত্ত স্বরে কহিল,—বাড়ীতে আমার মার খুব অসুখ···আমি দশ দিন বাড়ী-ছাড়া···বাড়ীতে কোনো মাল নেই, ইনস্পেক্টর বাবু···মিছি মিছি এ লাঞ্ছনা বাড়ীর লোকের উপর আর করবেন না···দোহাই আপনাকে।

বিধু বাবু কহিলেন,—তবে বলো, কোথা থেকে মাল পেয়েচো?···

বিস্ফারিত নেত্রে জীবন বলাইয়ের পানে চাহিল। তার চোখের সামনে কতকগুলা হরিদ্রা বর্ণের গোলা বায়ু-তরঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিল···চোখের সামনে হইতে আর সব বিলুপ্ত হইয়া গেল!···

বলাই কহিল,—গাড়োয়ানের সঙ্গে ষড় ক'রে মাল নিয়ে যাচ্ছিলুম। এক জন···এক জন···বলাই ঢোক গিলিল, তার পর কহিল—কালীঘাটের পুলে টাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে বলেছিল, সেখানে গেলে সে টাকা দেবে, কথা ছিল। তার বাড়ী আমি চিনি না···পথে দেখা···আমায়

চাকরি দেবে বলেছিল···বাঙালী···একজন বাঙালী বাবু···

জীবন তেমনি নিস্পন্দ···তার মনে হইতেছিল, সত্যই বুঝি বলাই কোনো বাঙালী বাবুর পরামর্শে···আসল ব্যাপার কোন্ ধূমাচ্ছন্ন কুহেলিকায় উবিয়া মিলিয়া গিয়াছিল··· বলাই এমনি আশ্চর্য্য কৌশলে বানাইয়া চুরির কাহিনী বলিতেছিল······

বিধু বাবু ধমক দিলেন, কহিলেন—ও-সব কথা চলবে না। বাড়ী আমায় তল্লাশ করতেই হবে। আনোয়ার সেখ, আর-এক-জন কাকেও ডাকো···সাক্ষী এই দোকানী আছে, আর এক জন···

সে যেন এক প্রলয়ের অভিনয়! বাড়ীর লোকের আর্ত্ত ক্রন্দন, কোলাহল,···পুলিশের তল্লাসী···জীবন ও বলাই পুতুলের মত নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া! এ রুদ্র অভিনয়ে তারাই শুধু দুটি মূক দর্শক!···

মাল আর মিলিল না। তালাসী সারিয়া পুলিশ বলাইকে লইয়া বিদায় গ্রহণের আয়োজন করিল।···জীবন ভাবিল, ভাগ্যে সে গাড়োয়ানটাকে সঙ্গে আনে নাই। জীবনকে সে চেনে না, তবুও···কি জানি···

মা ছুটিয়া আসিয়া বলাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, আর্ত্ত উচ্ছ্বসিত আবেগে ডাকিলেন,—বলাই···

বলাইয়ের চোখে জল। মার চোখের জল মুছাইয়া বলাই কহিল—কেঁদো না মা। আমি তোমার লক্ষ্মীছাড়া ছেলে। তোমার আরো ছেলে আছে, মা, তারা ভালো··· তাদের পানে চাও···

মা কহিলেন—বাবা রে···

বলাই কহিল,—কেঁদো না, মা···তোমার বাড়ীর কলঙ্ক আমি। ভেবো, আমি ম'রে গেছি···

বিধু বাবু তালাসীর কাজ কায়েমি করিয়া লইতেছিলেন; সে কাজ সারা হইলে তিনি কহিলেন,—আমায় মাপ করুন, এবার আমায় আসামী নিয়ে যেতে হবে···

বলাই কহিল—ছাড়ো মা···

মা কহিলেন,—ওরে, তুই যে আমার বড় আদরের রে···তুই-ই যে শুধু আমায় দরদ করিস, মুখের পানে তুই-ই যে শুধু চাস্, বাবা···

বলাই কহিল—ছি মা, কেঁদো না। আমি চোর, চুরি করেচি···এ বাড়ীর বাতাস যে বিষিয়ে উঠবে আমি এখানে থাকলে ··

জোর করিয়া মার বাহুপাশ কাটিয়া বলাই বাহিরে আসিল। জীবন সদরে দাঁড়াইয়া ছিল শুম্ হইয়া···তার প্রাণ যেন কবে বাহির হইয়া গিয়াছে! প্রাণহীন দেহখানা শুধু কোনো রকমে খাড়া আছে!

বলাই মৃদু স্বরে কহিল,—চললুম বাবা···

আসামী লইয়া বিধু বাবু চলিয়া যাইতেছিলেন···পথে জীবন আসিয়া তাঁর পায়ের উপর পড়িল, কহিল—আমি ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ হয়েচি ··ও বালক···কোন উপায় যদি···?

বিধু বাবু কহিলেন—পিঁপুল-পাকা ছেলে···সহজ চীজ নয়!···কোনো উপায় দেখচি না···কেশ খুব শক্ত মাসাবধি এমনি গাড়ী-শুদ্ধ মাল চুরি হচ্ছে। সহজে নিষ্কৃতি পাবে ব'লে মনে হয় না। তবে চেষ্টা করবেন বৈ কি ভালো ভালো উকিল-কৌশুলী দেবেন···

জীবনের বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে হারিকেন লণ্ঠনের আলো মুছিয়া গেল। পৃথিবী প্রবল বেগে দুলিয়া উঠিল·· সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপরকার ঐ চাঁদ, নক্ষত্র-ভরা নীল নির্ম্মল আকাশ···জীবনের চেতনাও যেন বিলুপ্ত হইয়া আসিল! জীবন বসিয়া পড়িল।···

যখন তার চেতনা ফিরিল, তখন জ্যোৎস্না আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! একটা পাখীর ডাক জীবনের কাণে গেল···দূরে একটা কুকুরও থাকিয়া থাকিয়া ডাকিতেছিল···বড় কর্কশ, কঠিন তার ডাক···

টলিতে টলিতে জীবন আসিয়া গৃহে ঢুকিল। নিস্তব্ধ গৃহ·· সামনের রোয়াকে কাপড়-ঢাকা কি ওটা পড়িয়া আছে?···

জীবন দাঁড়াইল···এবং বহু কষ্টে চোখ দুটাকে সঙ্কুচিত ও পরক্ষণে বিস্ফারিত করিয়া লইয়া বুঝিল, গৃহিণী·· নিশ্চল পাথরের মত পড়িয়া আছে···

জীবন ধীরে ধীরে গৃহিণীর কাছে বসিল, তার মাথায় হাত রাখিল,···কোথা হইতে রাজ্যের কান্না একেবারে বুকটাকে তোলপাড় করিয়া সাগরের বন্যার মত তার দুই চোখে ছাপিয়া আসিল···অশ্রু-ঝরা নিষ্পলক দৃষ্টিতে গৃহিণীর পানে সে চাহিয়া···পৃথিবী তখন জ্যোৎস্নার অজস্র ধারায় একেবারে ভরিয়া গিয়াছে! [ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
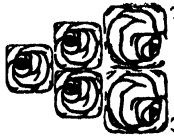
মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স দ্বারকানাথ

(১) দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রথমবার বিলাত-যাত্রা

দ্বারকানাথ ঠাকুর দুইবার ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। প্রথমবার, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে, ৯ জানুয়ারি, রবিবার তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যান এবং যাইবার সময় ইটালীর রাজধানী রোম-নগরে গিয়া পোপের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১০ই জুন শুক্রবার তিনি লণ্ডন-নগরে উপস্থিত হন। ১৬ই জুন তারিখে তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার স্বামী প্রিন্স এলবার্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভারতবাসীর পক্ষে এইরূপ গৌরব-লাভ এই প্রথম দেখা যায়। মহারাণী ও প্রিন্স এলবার্টের অনুরোধে ইনি তাঁহাদিগের সহিত একত্র ভোজন এবং ইংলণ্ডের সৈন্য-সম্মেলন (Review) ও রাজ-প্রাসাদের শিশুগৃহ পরিদর্শন করেন। তিনি প্রায় ৪ মাস ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি সংকল্প করেন যে, ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্স দেখিয়া দেশে যাইবেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১৫ই অক্টোবর তিনি ইংলণ্ড ত্যাগ করেন। ইহার ৩।৪ দিন পূর্ব্বে তিনি পুনরায় মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স এলবার্টের নিকটে বিদায় লইবার জন্য "উইণ্ডসর ক্যাসেলে" তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহারা দ্বারকানাথকে এবারেও যথেষ্ট আদর ও অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের অনুরোধে তাঁহারা তাঁহাদের দুইখানি তৈলচিত্র (১) কলিকাতাবাসিগণকে উপহার দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। শুধু তাহাই নহে। তাঁহারা লর্ড ফিটজ্‌জেরাল্ড দ্বারা দ্বারকানাথকে একখানি স্বর্ণপদক উপহার পাঠাইয়া তাঁহার গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

---

(১) এই দুইখানি তৈলচিত্র বহু বিলম্বে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ, যতক্ষণ না ইহারা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইয়াছিল, ততক্ষণ মহারাণী ইহা গ্রহণ করেন নাই। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে মাননীয় মিঃ মারে কলিকাতায় দ্বারকানাথকে এই বিলম্বের কারণ জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। উইণ্টার্-হোথাম্ নামক এক জন ইংলণ্ডদেশীয় প্রসিদ্ধ চিত্রকর এই দুইখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে টাউনহলে ইহাদিগকে স্থাপিত করা হয়। মনোমত-ভাবে চিত্র স্থাপিত না হওয়ায় ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখের Calcutta Star নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক চিত্রস্থাপন-সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ১লা মার্চ্চ তারিখের Eastern Star নামক সংবাদপত্রে জানিতে পারা যায়, মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স এলবার্টকে ধন্যবাদ দিবার জন্য ১লা মার্চ্চ তারিখে টাউনহলে বাঙ্গালী ও য়ুরোপীয়গণ এক বিরাট সভা আহ্বান করেন। ইহাতে স্থির হয় যে, যখন দ্বারকানাথ শীঘ্রই দ্বিতীয়বার বিলাত-যাত্রা করিতেছেন, তখন আমাদের এই ধন্যবাদ-পত্রখানি তিনিই মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স এলবার্টকে স্বহস্তে প্রদান করিবেন। Friend of India, 5 January, 1843, p. 10 ; 4 April, 1844, p. 215 ; Eastern Star, 2 March, 1845.

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ২১ অক্টোবর তারিখে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্বদেশ-হিতৈষিতার জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র সহ একটি স্বর্ণ-পদক উপহার প্রদান করেন। দ্বারকানাথও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ বক্তৃতা করিয়া তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

(২) দ্বারকানাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক রামমোহন রায়ের সমাধি-মন্দির-নির্ম্মাণ

দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন প্রথমবার বিলাত যান, তখন তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার দিবসে টাউনহলে এক বিরাট সভা হইয়াছিল। (১) এই সভায় গণ্যমান্য য়ুরোপীয় ও বাঙ্গালীগণ উপস্থিত ছিলেন। হিন্দু-কলেজের ছাত্রগণও দলে দলে আসিয়া এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রত্যেক রবিবার দ্বারকানাথের টিফিনের অংশভাগী হইয়া সেরি-স্যামপেন চালাইতেন, এবং অভাব জানাইলেই দ্বারকানাথ যাঁহাদিগকে মুক্তহস্তে দান করিতেন, তাঁহাদের অধিকাংশ লোকই এই সভায় উপস্থিত হন নাই, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। এই সময় সভায় একটি প্রস্তাব উঠিল যে, মহাত্মা রামমোহন রায়ের সমাধি-স্থানের অত্যন্ত দুর্গতি হওয়ায় তাহার সংস্কার করা উচিত। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ৮ জানুয়ারী তারিখে John Mack, ৩ই জানুয়ারী তারিখের Friend of India পত্রে লিখিয়াছেন, "প্রসিদ্ধ রচনা-লেখক John Fosterএর সহিত আমি যখন তখন দেখা করিতে যাইতাম। তিনি Stapleton Groveএ বাস করিতেন। তাঁহার বাটীর ঠিক পার্শ্বেই রামমোহন রায়ের কবর ছিল। তিনি রামমোহন রায়ের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, এবং তাঁহার অশেষ গুণকীর্ত্তন করিতেন। তিনি বলিতেন, যেখানে রামমোহনের কবর ছিল, তাহা অন্য এক জন আসিয়া কিনিয়া লইয়াছে। কবরের চিহ্নমাত্র নাই।" (২) যাহা হউক, মুক্তহস্ত মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় বিলাতে-গমন করিয়া উক্ত স্থান হইতে রামমোহন রায় মহাশয়ের মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া যান এবং "আর্ণোস-ভেল" (Arno's Vale) নামক স্থানে তাহার উপরি একটি মনোহর সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। (৩)

(৩) ফ্রান্সে লুই ফিলিপ ও দ্বারকানাথ ঠাকুর

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১৫ই অক্টোবর তারিখে দ্বারকানাথ ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া যান, এবং কয়েক দিন ফ্রান্স-দেশে থাকিয়া কলিকাতায় আসিবার সংকল্প করেন। তৎকালে লুই ফিলিপ ফ্রান্সের রাজা ছিলেন। ফ্রান্সেও দ্বারকানাথের আদর ও অভ্যর্থনার সীমা

---

(১) Hurkaru, 10 January, 1842.
(২) Friend of India, 13 January, 1842.
(৩) "রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত", ৩৮৪ পৃষ্ঠা।

ছিল না। ২৮শে অক্টোবর তারিখে তিনি রাজা ও রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ফরাসী-দেশীয় রাজগণের প্রথানুসারে আগন্তুক ব্যক্তি কখনই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। কিন্তু লুই ফিলিপ সে প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া দ্বারকানাথকে নিজ অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া স্বীয় মহিষীর সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় করিয়া দেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি বেলজিয়মের রাজা ও রাণী, নিমুর্শের ডিউক ও ডাচেস্ এবং রাজকুমারী ক্লেমেন্টাইনের সহিত দ্বারকানাথের পরিচয়-দান ও গুণ-কীর্ত্তন করিতে ক্রটি করেন নাই। দ্বারকানাথের সম্মানের জন্য সমগ্র রাজভবন আলোকিত করা হইয়াছিল। রাজা স্বয়ং তাঁহাকে বাটীর ভিতরে লইয়া গিয়া তাঁহার যাবতীয় ঘর ও আসবাব-সামগ্রী দেখাইয়াছিলেন। (১)

এইখানে বহুদিনের একটি গল্প না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আঁব-পোস্তায় একটি সুপণ্ডিত, সুধার্ম্মিক ও সম্ভ্রান্ত লোক বাস করিতেন। তাঁহার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইঁহার পিতা শিবচরণ ঠাকুরই হিন্দু-কলেজের প্রথম দিনের প্রথম ছাত্র। দেবেন্দ্রনাথ রাঢ়ী-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের অন্তর্গত ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত তাঁহার নামের ও বয়সের ঐক্য এবং মনের মিল থাকায় উভয়ের মধ্যে পরম সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল, এবং উভয়েই পরস্পর "সখা" বলিয়া ডাকিতেন। আমি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ি, তখন পোস্তার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে থাকিতাম ও তাঁহার পুত্রকে পড়াইতাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। উভয়ে একত্র বসিয়া "অমরকোষ অভিধান" পড়িতাম। এক দিন তিনি বলিলেন, "আমার সখা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত এক দিন তোমার আলাপ করিয়া দিব।" আমি ইহা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। এক দিন তাঁহার সঙ্গে মহর্ষির সহিত দেখা করিতে গেলাম। পোস্তার দেবেন্দ্রনাথ, মহর্ষির সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। দেখিলাম, মহর্ষি বাস্তবিকই মহর্ষি। তাঁহার যেমন গুণ, তেমন রূপ। কথাগুলি মধুমাখা। তাঁহার মনোহর মূর্ত্তি এখনও আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। কথায় কথায় মহর্ষি দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথা তুলিলেন। তিনি বিলাতে গিয়া কিরূপ ভাবে থাকিতেন ও কি কি করিয়াছিলেন, তাহা আমি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। এই কথা বলিবামাত্র তিনি স্বয়ং উঠিয়া গিয়া একখানি বই আনিয়া ও তাহাতে আমার নামটি লিখিয়া আমাকে উপহার দিলেন। যতদূর মনে হয়, বইখানির নাম Stockler's Life of Prince Dwarkanath Tagore. এই বইখানি ছোট নহে, বেশ মোটাসোটা। এই বইখানি সুদীর্ঘকাল পরে আর খুঁজিয়া পাইতেছি না। ইহা এখন অতি দুর্লভ। মহর্ষি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাবা যখন ফ্রান্সে গিয়া লুই ফিলিপের সহিত দেখা করেন, তখন ফিলিপ বাটীর ভিতরে একটি মনোহর ফোয়ারা তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, ইহা কেমন সুন্দর দেখুন। ফোয়ারা হইতে সুন্দর-ভাবে জল পড়িতেছে দেখিয়া বাবা আহ্লাদে ও মনের আবেগে বলিয়া ফেলিলেন, It is exactly like that of my Belgachia villa" দ্বারকানাথের কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য। আমি বাল্যকালে বেলগাছিয়া-বাগানের যে অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়াছি, তাহা আর এখন নাই আমি এখানে যাহা যাহা লিখিলাম, তাহা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের কথা। অগ্রজ-প্রতিম বহুদর্শী এটর্ণী শ্রীযুক্ত কালিদাস ভঞ্জ মহাশয়ের মুখেও সম্প্রতি ফোয়ারার গল্পটি শুনিয়াছি।

(৪) দ্বারকানাথ ঠাকুরের মল্লযুদ্ধার্থ আহ্বান

দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন ফ্রান্সে গিয়াছিলেন, তখন একটি হাস্যজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। এক দিন একটি ভোজে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সেখানে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে এক জন দ্বারকানাথের এইরূপ আদর ও অভ্যর্থনা দেখিয়া ঈর্ষ্যা-পরবশ হইয়া তাঁহাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন। দ্বারকানাথ পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি অন্য এক প্রকোষ্ঠে গমন করিয়া ও ভারতীয় পালোয়ানের বেশে সুসজ্জিত হইয়া মল্লযুদ্ধ-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহাকে এই প্রকারে সজ্জিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন, "আমাদের দেশের পালোয়ানরা এইরূপ মালকোচা মারিয়া কুস্তি করে।" তখন সেই প্রতিদ্বন্দ্বী মল্লযুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইল। (১)

(৫) দ্বারকানাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়বার য়ুরোপ-যাত্রা

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ৮ই মার্চ্চ শনিবার দ্বারকানাথ ঠাকুর "বেন্টিঙ্ক"-নামক জাহাজে চড়িয়া য়ুরোপ-যাত্রা করেন। তাঁহার এই কয়েক জন সঙ্গী এক জাহাজেই তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন:—দ্বারকানাথের কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ, তাঁহার ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার র‍্যালে, দিল্লী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বৌট্রস, ডাক্তার গুডিভ্ ও তাঁহার চারি জন ছাত্র ভোলানাথ বসু, গোপাললাল শীল, দ্বারকানাথ বসু ও সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী। যাইবার সময় কেইরো-নগরে ইজিপ্টের রাজ-প্রতিনিধি ও নেপল্‌স্ নগরে ইটালীর রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ বৎসরে ২৪শে জুন তারিখে লণ্ডনে উপস্থিত হন। এবারেও তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স এলবার্টের নিকটে মহা সম্মান ও সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। প্রাসাদে তাঁহার অভ্যর্থনা-উপলক্ষে দ্বারকানাথ মহারাণীর সিংহাসনের পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইবার দুর্লভ সম্মান প্রাপ্ত হন। যখন তিনি বকিংহাম-প্রাসাদে গমন করেন, তখন মহারাণী ও প্রিন্স এলবার্ট আপনাদের একখানি ছবি তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। ছবিখানির নিম্নভাগে মহারাণী স্বহস্তে এই কথাগুলি লিখিয়া দিয়াছিলেন,—To Dwarkanath Tagore with best

(১) Friend of India. 5 January, 1843.

(১) "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন-চরিত", ১২ পৃষ্ঠা

regards from Victoria R, Albert, Buckingham Palace, July 8, 1845. এই বৎসর স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডে গিয়াও তিনি বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ৩০ জুন তারিখে Duchess of Inverness তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। আহার করিবার সময়ে তিনি কম্প অনুভব করিয়া তৎক্ষণাৎ লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন।

প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মার্টিনের পরামর্শে দ্বারকানাথ, Sussex সায়ারের অন্তর্গত সমুদ্রকূলে Worthing নামক বন্দরে গিয়া বাস করেন। তখন কি ভাবে তিনি দিন-যাপন করিতেন, তৎসম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন—"রোগের যন্ত্রণায় বড়ই অশান্তি ও ছটফটানি হয়েছিল। ৬টার সময় উঠে গাড়ী ক'রে বেড়িয়ে ফিরে এসে অল্প নিদ্রা যেতেন। তার পর আহার। তাঁর ভৃত্য হুলির তৈয়ারি কারি ও ভাত, আর একটু কমলা লেবুর জেলি, এইমাত্র আহার। পরিচ্ছদের মধ্যে একখানি সুন্দর কাশ্মীরি শাল তাঁর গায়ে থাকত। তাঁকে দেখবার জন্য মহিলারা দলে দলে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। Duchess of Cleveland প্রত্যহ তাঁকে দেখতে আসতেন। Duchess of Inverness রোজ পত্র দ্বারা তাঁর সংবাদ নিতেন। তিনি তাঁর অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এত পীড়ার প্রকোপেও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়নি। কখনও কোন বিষয়ে ত্রুটি জানিয়ে কারও প্রতি দোষারোপ করতেন না। সর্ব্বদাই সন্তুষ্টচিত্তে হাসিমুখে থাকতেন। অতি অকর্ম্মা ভৃত্যও তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতা হ'তে বঞ্চিত ছিল না। স্বদেশী আচার-ব্যবহারে তিনি অনুরক্ত ছিলেন। দেশীয় পরিচ্ছদ তিনি পরিধান কত্তেন। আলবোলার নল সর্ব্বদাই তাঁর হাতে থাকত; ভৃত্য হুলি তামাক সেজে দিত। তাঁর একটি কাঁচ-কড়ার তৈয়ারী মসলার ডিপে ছিল। গরম তাঁর আদপে সহ্য হ'ত না। জানালা খুলে শুতেন। প্রত্যহ সকালে স্নান করতেন, আর বরফ-জল ভালবাসতেন। তাঁর শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হয়ে পড়ল। তিনি আপনার আসন্ন মৃত্যু আপনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। কেমন আছেন, কেহ জিজ্ঞাসা করলে মধুর গম্ভীরস্বরে বলতেন, I am content অর্থাৎ আমি শান্তিতে আছি। ক্রমে তাঁর শরীর আরো অবসন্ন হ'তে লাগল। তাঁকে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক হয়ে পড়ল। অবসর বুঝে সেই স্থান হতে জুলাই মাসের ২৭শে তারিখে Dr. Martin তাঁকে সঙ্গে ক'রে লণ্ডনে নিয়ে যান। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্ট তারিখে তিনি পরলোক-গমন করেন।" এই দিনই তিনি Kensal Green নামক স্থানে মহাসমারোহে সমাহিত হন। গোরস্থানের উপরিভাগে একখানি রৌপ্যফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি বঙ্গানুবাদ সহ লিখিত হইয়াছিল। Babu Dwarkanath Tagore, Zemindar, died 1st August, 1846, aged 52 years.

(৬) য়ুরোপে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সম্মান

ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে অবস্থান-কালে দ্বারকানাথ ঠাকুর অপরিমিত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, এক দিন ফ্রান্সে একটি ভোজে যত সম্ভ্রান্ত মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে তিনি এক একখানি উৎকৃষ্ট কাশ্মীরি শাল উপহার দিয়াছিলেন। যে কেহ প্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকটে আসিতেন, তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া মুক্তহস্তে তাঁহাকে দান করিতেন। তিনি স্বভাবতঃ সুপুরুষ, সুরসিক ও সদালাপী ছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সকলেই নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিতেন। (১)

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে (উদ্ভটসাগর, কবিভূষণ, কাব্যরত্ন, বি-এ)।

---

(১) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বসন্ত-বেণু

উদাসীর সুর বাজে,
অমরার গীতি হইল নীরব, ইন্দ্র রহিল লাজে;
অপ্সরা বুঝি সেই অবসরে, ললিত লাস্যে এল ধরা'পরে,
তনু-শিহরণ, চল-নর্ত্তন ইন্দু-আলোক মাঝে;
মঞ্জু কুঞ্জে কাঁপিছে চেতন, তরুণী তুলেছে বিজয়-কেতন,
ধরিতে রাতুল চটুল চরণ কমলে সুষমা রাজে।

নাহি অবসর আর,
উছলে নিচোল, শিথিল আঁচল দুলিছে চন্দ্রহার;
লেগেছে লতায় লুলিত অলক, কুসুম-কপোলে গোলাপী ঝলক,
হয়েছে সরিৎ বিনোদ মেখলা প্রকৃতির শ্রোণিভার!
সঙ্গীত জাগে কুহু-আলাপনে, শিঞ্জিনী শুনি' অলি-গুঞ্জনে,
বিলাসী পবনে মাধবিকা নাচে বিলায়ে সুরভি-সার!

বিরহীর বেশে হায়!
ছুটেছে অতনু ফেলি' ফুলশর রতিরে যে নাহি পায়;
প্রজাপতি-রথে ঘুরে ফুলে ফুলে, পথিক বধূরে চুমে ভুলে ভুলে,
বাসনা-সীধুতে বিভোল পাগল আগল ঠেলিয়া যায়।
আলো ঢালে সুর—করুণ মধুর! এত কাছে বঁধু তবু বহু দূর,
কুহেলি-স্বপনে জাগরণ-জ্বালা, এসে বুঝি ফিরে যায়!

শ্রীসর্ব্বরঞ্জন বরাট (বি-এ।)

চিংড়ি মাছের ব্যবসায়

চিংড়ি মাছ অনেকের নিকট অতি তুচ্ছ জিনিষ, এতদ্দেশের দুই একটি চলিত কথা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। যে সময়ে বাঙ্গালা দেশে মাছ অপর্য্যাপ্ত ছিল, তখন হয় ত চিংড়ি দীনদরিদ্রের আহার বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। বর্ত্তমান সময়ে মাছের বাজারে চিংড়ির প্রাধান্য কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কলিকাতার কথা বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, আমিষ আহার্য্যের মধ্যে চিংড়ি মাছই অনেক কলিকাতা-বাসীর দৈনিক খাদ্য। মফঃস্বলের বাজারেও চিংড়ি মাছের কাটতি কম নহে। এই সমুদয় বিবেচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, চিংড়ি মাছের কারবার বঙ্গদেশীয় সাধারণ মৎস্য-ব্যবসায়ের একটি প্রধান অঙ্গ এবং স্বতন্ত্ররূপে আলোচনার যোগ্য।

বঙ্গদেশের গল্‌দা-চিংড়ি

চিংড়ি-বর্গ

চিংড়িকে সাধারণতঃ মাছ বলা হইলেও জীবতত্ত্বের হিসাবে ইহা মৎস্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; বরং কীটপতঙ্গাদির সহিত ইহার কতকটা সম্বন্ধ আছে। ইহা crustacea বর্গের অন্তর্ভুক্ত ; ছোট ও বড় চিংড়ি ব্যতীত গেঁটে চিংড়ি (lobster) ও কাঁকড়াও এই বর্গে রহিয়াছে। ব্যবসায়ের দিক্ হইতে এগুলির তেমন প্রাধান্য নাই। লব্‌ষ্টার সামুদ্রিক জীব ; বাজারে অধিক পরিমাণ আইসে না এবং যে সকল স্থানে ইহা সুলভ, অত্যন্ত গুরুপাক বলিয়া সেরূপ স্থানেও দেশীয় লোক ইহা পছন্দ করে না। কাঁকড়ার ব্যবসায় কেবলমাত্র শীতকালে চলে এবং তাহার পরিসর ক্ষুদ্র। স্বাদু, লবণাক্ত ও ঈষৎ লবণাক্ত জলে নানা জাতীয় চিংড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। বড় চিংড়িকে সাধারণতঃ গলদা চিংড়ি বলা হয় ; ইংরাজীতে ইহার নাম prawn এবং ছোট চিংড়ির সাধারণ নাম shrimp। শেষোক্ত শ্রেণীর (cragnon) চিংড়ির বহুবিধ স্থানীয় নাম আছে। বঙ্গদেশে সচরাচর যে গলদা চিংড়ি (palaemon carcinus) পাওয়া যায়, তাহার শরীর পীত, হরিত ও নীলের আভাবিশিষ্ট এবং পদসমূহ উজ্জ্বল নীল। সুপুষ্ট গলদা চিংড়ির দেহ (দাড়া প্রভৃতি বাদে) গড়ে ১২ ইঞ্চ দীর্ঘ এবং তিনটি চিংড়িতে ১ সের ওজন হয়। Prawn ও shrimp এই দুই শ্রেণীর চিংড়ির দেহের আয়তনে, পদসমূহের গঠনে ও শল্কবিন্যাসে প্রভেদ আছে। উভয় শ্রেণীর বিভিন্ন জাতির বাসস্থানও পৃথক্—কতকগুলি একবারেই সামুদ্রিক ; কতকগুলি সমুদ্রে, সমুদ্রের খাঁড়িতে ও নদী-মোহানায় পাওয়া যায় ও ইহাদের জীবনধারণের জন্য অল্প-বিস্তর লোণা জল আবশ্যক হয় ; অন্য কতকগুলি স্বাদু জলেরই অধিবাসী। গঠন হিসাবে চিংড়ির কিছু বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ ইহাদের মেরুদণ্ড নাই ; তৎপরে ইহাদের মস্তক ও বক্ষোদেশ একত্র সংযোজিত (cephalsthorax); ইহাই দেহের প্রথমাংশ এবং ইহাতে রক্তাভ পীতবর্ণ যকৃৎ, বক্ষ, স্নায়ুমণ্ডল, পাকস্থলী প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। সাধারণ ভাষায় ইহাকে মাথা এবং যকৃৎ-নিঃসৃত রসকে 'ঘি' বলে। অগ্ন্যুত্তাপে যকৃৎরস গাঢ় রক্ত-বর্ণ হইয়া উঠে। শরীরের দ্বিতীয়াংশে উদর ; ইহার পেশীসমূহ বিশেষরূপ পুষ্ট এবং ইহাদের মধ্যে স্বল্পাকার, ঋজুনাড়ী (Intestine) সন্নিবিষ্ট। দেহের প্রথমাংশে শুঙ্ক,
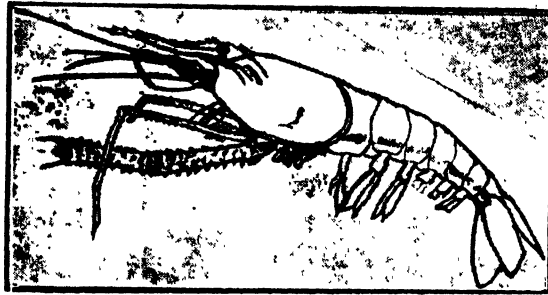
স্পর্শনী ও পদসমূহ আছে। চিংড়ির চক্ষু সবৃন্তক; তিন জোড়া পায়ের মধ্যে একজোড়া পদ বড় ও উহার প্রান্ত শাঁড়াসিসদৃশ; ইহাই প্রকৃত দাড়া, যদিও পদসমূহের সাধারণ নাম দাড়া। দ্বিতীয়াংশের নিম্নদেশে জলে সাঁতার দেওয়ার উপযুক্ত বিশেষ প্রত্যঙ্গাদি অবস্থিত।

জীবন-বৃত্তান্ত

কলিকাতার বাজারে কাদা-চিংড়ি অনেকেই দেখিয়াছেন। কর্দ্দম ও অন্যান্য আবর্জ্জনা সমেত ইহা শিশু চিংড়ির সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। চিংড়ি বর্ষার সময় বংশবিস্তার করিয়া থাকে। নদীর জলে এই সময়ে চিংড়ি ও কাঁকড়া-পোনা এত অধিক সংখ্যায় থাকে যে, জলে অবগাহন করিলে কাপড়ের সহিত কতকগুলি উঠিয়া আসে। বর্ষাকালে নদীর জল স্বভাবতঃ খাল, বিল প্রভৃতি জলাশয়ে প্রবেশ করে এবং সেই সঙ্গে চিংড়ি-পোনাও চতুর্দ্দিকে প্রসারলাভ করে। জীব-জগতে চিংড়ির অবস্থা কতকটা গৃহহীন ভবঘুরের ন্যায় হইলেও, ইহাদের মধ্যে কতিপয় শ্রেণী, বিশেষতঃ গলদা চিংড়ি অনেক সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকে। পায়ের সাহায্যে জলাশয়ের তীরে গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া বাস করে; গর্ত্ত অপেক্ষা শরীর যখন বৃহত্তর হইয়া উঠে, তখন ছোট গর্ত্ত পরিত্যাগ করিয়া আবার বড় গর্ত্ত তৈয়ার করে এবং পূর্ব্বোক্তগুলি অন্য কৃশকায় চিংড়ি দ্বারা অধিকৃত হয়। যে সকল চিংড়ি গৃহ নির্ম্মাণ করে না, তাহারা প্রায়ই ঝাঁক বাঁধিয়া নানা স্থানে বিচরণ করিয়া বেড়ায়।

চক্ষু সবৃন্তক হওয়ায় ইহা চারিদিকে প্রসারিত করিয়া শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে। প্রথম স্পর্শনী-যুগলের পাদদেশে চিংড়ির কর্ণও আছে, কিন্তু উহার দ্বারা শ্রবণের কার্য্য হয় না; বরং ক্ষুদ্র স্থলীবৎ কর্ণযুগল জলের মধ্যে দেহের ভার সমতা (equilibrium) রক্ষা করিবার সহায়তা করে। দ্বিতীয় পদযুগলের প্রান্তাংশ শাঁড়াসি আকারে গঠিত, ইহার দ্বারা চিংড়ি শিকার ধরিয়া থাকে। মস্তকোপরি শৃঙ্গ বা খড়্গ জাতিবিশেষে ৪।৫ ইঞ্চ বড় ও দেখিতে ভয়াবহ হইলেও ইহা কচিৎ ব্যবহৃত হয়। কারণ, চিংড়ি স্বভাবতঃ ভীরু জীব; 'যঃ পলায়তি স জীবতি' মন্ত্রেই ইহা প্রায় পরিচালিত হয়। পিছু হটিয়া যাইবারও ইহার বিশেষ সুবিধা আছে; উদরপ্রদেশের কয়েকটি নৌকার দাঁড়বৎ ও অন্য অর্দ্ধচন্দ্রাকার কতিপয় প্রত্যঙ্গ দ্বারা এইরূপ পশ্চাদ্‌গতি সহজেই সাধিত হইয়া থাকে।

উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণিজ সকল প্রকার দ্রব্যই চিংড়ির আহার্য্য। অর্দ্ধগলিত ভাসমান শব এক এক সময় চিংড়ি দ্বারা প্রায় সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ অপেক্ষা জলজ কীট ও কৃমির উপরই কিন্তু চিংড়ির আসক্তি অধিক। যদি ধীরে ধীরে কোন বিপদ ইহাদিগের সম্মুখীন হয়, তাহা হইলে অন্যান্য জীবের ন্যায় চিংড়িও সহজে তাহা বুঝিতে পারে না। সেই জন্য সামান্য একগাছি সূতা অথবা দড়ি দিয়া চিংড়ি ধরিতে পারা যায়। কোন দ্রব্যের সংস্পর্শে আসিলে ইহারা তাহাকে সজোরে ধরিয়া রাখে এবং সেই অভ্যাসের নিমিত্ত সূতা যদি আস্তে আস্তে টানা যায়, তাহা হইলে উহার সহিত চিংড়িও উঠিয়া আইসে। বর্ষার পর হইতে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ পর্য্যন্ত চিংড়ির পরিপুষ্টির সময়, কিন্তু সকল শ্রেণীর বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির কাল সমান নহে; জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে কোন কোন স্থলে পরিপুষ্ট চিংড়ি দেখা যায়। যুক্তপ্রদেশে এই সময়ে যমুনার তীরে শুষ্ক বালুকার উপর বহু পরিমাণে ঝিঙ্গা অর্থাৎ চিংড়ি ধরা হইয়া থাকে। এগুলি ক্ষুদ্র জাতীয়, সাধারণতঃ ৪ ইঞ্চের বড় হয় না।

ব্যবহার

চিংড়ির প্রায় কোন অংশই অব্যবহার্য্য নয়। বিকানীর লঙ্কা সহযোগে গলদা চিংড়ির মাথার যে সুস্বাদু, গাঢ় রক্তবর্ণ ঝোল অথবা ডালনা প্রস্তুত হয়, তাহার সহিত অনেকেই পরিচিত আছেন। ছোলার ডালের সহিতও চিংড়ির মাথা পাক করা হয়। নিম্ন অর্থাৎ উদরাংশ কাটলেট্ প্রস্তুতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। শ্বেতাঙ্গগণ এরূপ কাটলেটের ভক্ত। বড় বড় পা অথবা দাড়াগুলি ভাজা হয় এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রাংশ দ্বারা লাউ-কুমড়া সংযোগে ব্যঞ্জন তৈয়ারী হয়। কোন কোন স্থলের গলদা চিংড়ি স্থির জন্য বিখ্যাত, তন্মধ্যে নারায়ণগঞ্জের চিংড়ি অন্যতম। মাদ্রাজে পিষ্ট চিংড়িও (Prawnpaste) প্রস্তুত হয়; ঝোলে উৎকৃষ্ট স্বাদ ও গন্ধ প্রদানের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দেশীয় লোকের নিকট প্রিয় না হইলেও শুষ্ক চিংড়িরও

সামান্য পরিমাণে খাদ্যার্থ কাটতি আছে; কিন্তু ইহার অধিকাংশই বাহিরে চালান যায়। চিংড়ির খোলা প্রভৃতি পরিত্যক্ত অংশ উৎকৃষ্ট সার। রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে শতকরা ৯ ভাগ সোরাজন এবং ৫ ভাগ ফস্‌ফরাস আছে। আপাততঃ চিংড়ি-সারের অপচয় হইতেছে; কিন্তু সংরক্ষণ ও সংগ্রহের উপযুক্ত ব্যবস্থা হইলে ইহা হইতে যথেষ্ট আয় হইতে পারে।

উৎপাদন-কেন্দ্র

ছোট, বড় সকল প্রকার জলাশয়েই কোন না কোন জাতীয় চিংড়ি পাওয়া যায় এবং নিম্নবঙ্গের সর্ব্বত্রই চিংড়ি সুলভ। তথাপি চিংড়ি ধরার ও ব্যবসায়ের কয়েকটি বিশেষ কেন্দ্র আছে। পশ্চিমবঙ্গে খুলনা, যশোহর, মেদিনীপুর, হাওড়া ও ২৪-পরগণা জিলায় এবং পূর্ব্ববঙ্গে নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ, ফরিদপুর এবং বরিশালে এই প্রকার কেন্দ্র দেখা যায়। বঙ্গদেশে কিন্তু চিংড়ি উৎপাদনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র সুন্দরবন। আমরা যে সমুদয় জিলার উল্লেখ করিলাম, সেগুলিতে তিন প্রকার স্থান হইতে চিংড়ি ধৃত হয়।

১। পুষ্করিণী ও ঝিল, ২। খাল ও বিল এবং ৩। নদী। পুষ্করিণীর চিংড়ি ছোট শ্রেণীর; সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে পুষ্করিণীতে গলদা চিংড়ি হইলেও সেগুলি তেমন বড় অথবা সুস্বাদু হয় না।

ধরার কৌশল ও যন্ত্রাদি

শরৎকালের প্রায় প্রথম হইতেই গলদা চিংড়ি ধরা আরম্ভ হয়। অগ্রহায়ণ পৌষ ইহার পুরা মরসুম। চিংড়ি ধরা অপেক্ষাকৃত সহজ। খাল, বিল, জলা, ফাঁড়ি প্রভৃতিতে বর্ষাকালে যে চিংড়ি প্রবেশ করে, অধিকাংশ সময় উক্ত স্থানসমূহে সেগুলি আবদ্ধ থাকিয়া যায় ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে। এরূপ স্থলে এক একবারে বহুসংখ্যক চিংড়ি ধৃত হয়।

চিংড়ি ধরিবার জন্য যে সমুদয় জাল ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে ঝামতি, রেঁইতি, দোদ্, সারিঙ্গে ও খেয়ো অন্যতম। ঝামতি জাল বাঁশ দিয়া খাটান হয়। স্থানবিশেষে বিভিন্ন প্রকার জালের চলন আছে। পদ্মা, শীতলাক্ষী, বুড়ীগঙ্গা ও অন্যান্য নদীতে খেয়ো জালের চলনই অধিক। খেয়ো জাল মাথার উপর ঘুরাইয়া সাধারণতঃ নিক্ষেপ করা হয়। নদীতে জাল ফেলিবার সময় এক একটি নৌকাতে তিন জন করিয়া লোক থাকে। তীরের সন্নিকট দিয়া নৌকা বাহিয়া যাইবার সময় খুব ধীরে ধীরে জাল ফেলিয়া দেওয়া হয়। মাছ জালের সংস্পর্শে আসিলে ছুটিয়া পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু চিংড়ির স্বভাব ঠিক বিপরীত, উহা জাল কামড়াইয়া ধরে এবং সেই জন্য সহজে ধরা পড়ে।

কলিকাতার দক্ষিণস্থ সোনাগাঙ্গে, খুলনা, যশোহর, নারায়ণগঞ্জ ও গোয়ালন্দে সন্ধ্যার সময় চিংড়ি ধরা হয়, কিন্তু অনেক বড় বড় বিল অথবা জলাতে চিংড়ি ধরিবার সময় রাত্রিকাল। রাত্রি প্রায় ১০টার সময় কার্য্য আরম্ভ হয় এবং উহা শেষ হইতে প্রায় তিনটা বাজিয়া যায়। শীতকালে এরূপ সময় নৌকায় যে খুব ঠাণ্ডা বোধ হয়, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য করিয়া পাইকারগণ জলার তীরে উপস্থিত থাকিতে ত্রুটি করে না এবং নৌকা তীরে লাগা মাত্র চিংড়ি ঝুড়ি-বোঝাই করা হয় এবং তৎসমুদয় লইয়া বাহনগণ অবিলম্বে ধাবিত হয়। নৈশ অন্ধকারের মধ্যে চিংড়ির বোঝা সহ পাইকারগণ যখন ছুটিয়া ছুটিয়া যায়, তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়।

কোন কোন জলাতে চিংড়ি ধরিবার জন্য জাল ব্যতীত অন্য উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ফরিদপুরের উল্লেখ করিতে পারা যায়। এই প্রকাণ্ড জলা ফরিদপুর সহরের প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার মধ্যে অনেক খাল ও নালা আছে এবং সেগুলি গলদা চিংড়িতে পরিপূর্ণ। অন্যান্য স্থানের চিংড়ির সহিত এ স্থানের চিংড়ির প্রভেদ এই যে, ইহারা জলের উপর ভাসে এবং স্রোতের সহিত চলিতে থাকে। বর্ষায় জল প্লাবিত হওয়ার পর শীতকালে যখন জল কমিয়া আসে, তখন জলার জল আবার নিম্নাভিমুখে নদীর দিকে প্রবাহিত হয়। ঠিক যে স্থান হইতে এইরূপ স্রোত আরম্ভ হয়, তাহাকে দাঁড়া বলে। দাঁড়া হইতে জল যে স্থানে নদীর শাখা উপশাখায় প্রবেশ করে, সেইরূপ স্থানে চিংড়ি ধরিবার জন্য 'চুই' অথবা 'দোলার' যন্ত্র পাতা হইয়া থাকে। চুই-যন্ত্র বাঁশ অথবা বেত দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ইহা লম্বা ও গোলাকার। দৈর্ঘ্যে সাধারণতঃ ৫।৬ হাত এবং ব্যাস প্রায় ৩ হাত; স্থানবিশেষে এতদপেক্ষা বৃহত্তর চুইও ব্যবহৃত হয়। চুই উপযুক্ত স্থানে ঠিক করিয়া এরূপ ভাবে পাতা হয়, যেন উহা স্থানভ্রষ্ট হইতে না পারে। উহার উপর পাতা প্রভৃতির দ্বারা আবরণ দেওয়া হয়। এবং

ভিতরে স্থানে স্থানে গুগ্‌লি কুচি করিয়া টোপ হিসাবে রাখা হইয়া থাকে। জলস্রোতের সহিত গলদা চিংড়ি ছুইয়ের বহির্ভাগে আসিয়া লাগিলে উহাদের স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস অনুযায়ী ছুই-প্রাচীর কামড়াইয়া ধরে এবং উহার গাত্র বাহিয়া ছুই-মুখ দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে; গুগলি-কুচি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া এই প্রকারে যথেষ্টসংখ্যক চিংড়ি ভিতরে ঢুকিলে ছুই-মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এতদুপায়ে বন্দী-কৃত চিংড়ি ব্যাপারীগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত রাখিয়া দেয় এবং বাজারে দর খুব চড়া হইলে বিক্রয় করে। মাঘ ফাল্গুন মাসে এরূপ চিংড়ি কলিকাতার বাজারে বিবাহ উপলক্ষে সের প্রতি দুই টাকা দরেও বিক্রয় হইতে দেখা গিয়াছে।

মেদিনীপুর জিলার শিলাই ও কাঁসাই নদী এবং উপনদীতে উৎকৃষ্ট গলদা চিংড়ি পাওয়া যায়। এই সকল স্থানে, বিশেষতঃ শিলাই নদীতে এক প্রকার অদ্ভুত কৌশলে চিংড়ি ধরা ও সঞ্চয় হইয়া থাকে। নদীর বাঁক অথবা কোন উপযুক্ত স্থানে বাঁশের চেটাই ও দড়ির জাল দিয়া কতকটা স্থান ঘিরিয়া লওয়া হয়। বাঁশের খুঁটি পুতিয়া প্রাচীর দৃঢ়তর করিয়া চিংড়ি প্রবেশ করিবার জন্য একটি দ্বার উন্মুক্ত রাখা হয়। অনেক চিংড়ি এরূপ স্থানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ধীবরগণও পুরুষানুক্রমে এই ঘেরা স্থানের মধ্যে চিংড়িসমূহকে প্রলুব্ধ করিয়া আনিয়া প্রবেশদ্বার বন্ধ করিয়া দেয়। ইহাকে হাতী ধরার খেদ্দার সহিত তুলনা করিতে পারা যায়। যাহা হউক, এইরূপ ভাণ্ডারে তিন মাস পর্য্যন্ত চিংড়ি রাখিয়া দেওয়া হয়; বিবাহ অথবা অন্য কোন কাজকর্ম্ম উপলক্ষে দর খুব চড়া হইলে এই ভাণ্ডার হইতে আবশ্যকমত চিংড়ি বাহির করিয়া বাজারে চালান দেওয়া হইয়া থাকে।

ব্যবসায়

বাজারে চিংড়ি মৎস্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই পরিগণিত হয়; ইহার উৎপাদন অথবা কাটতি সম্বন্ধীয় কোন স্বতন্ত্র অঙ্ক পাইবার উপায় নাই। ছোট অথবা কুচো চিংড়ি অল্প-বিস্তর পরিমাণে সকল বাজারেই বিক্রয় হয় এবং বৎসরের সকল সময়েই পাওয়া যায়। গলদা চিংড়ির সময় কেবল-মাত্র শীতকাল এবং উৎপাদনের কেন্দ্র হিসাবে কোন কোন বাজারে ইহা অধিক সংখ্যায় আমদানী হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের বাজারসমূহে অন্ততঃ ১৫ লক্ষ মণ মাছ আমদানী হয় বলিয়া সাধারণতঃ অনুমান করা হইয়া থাকে; ন্যূন-কল্পে তাহার শতকরা ১০ ভাগ যে চিংড়ি (অর্থাৎ দেড় লক্ষ মণ), তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কলিকাতার বাজারে চিংড়ির অনুপাত আরও অধিক হইবে। টাটকা চিংড়ি বাঙ্গালার বাহিরে প্রায় চালান যায় না,—যদিও বরফ দ্বারা প্যাক্ করিয়া উৎপাদনস্থল হইতে এক হাজার মাইল দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত চিংড়ি চালান দেওয়া সম্ভবপর।

যে চিংড়ি বঙ্গদেশ হইতে রপ্তানী হয়, তাহা শুষ্কীকৃত। সুন্দরবনই শুষ্ক চিংড়ি প্রস্তুতের প্রধান কেন্দ্র। শুষ্ক চিংড়ি-ব্যবসায় প্রধানতঃ কতিপয় বোম্বাই প্রদেশীয় মুসলমান বণিক্ দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। খুলনা জেলায় লোক পাঠাইয়া ও দাদন দিয়া ইঁহারা প্রতি বৎসর অনেক পরিমাণ মাছ ক্রয় করেন। সুন্দরবনের মধ্যে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ২০ হাজার মণ শুটকি মাছ প্রস্তুত হয়; ইহার অর্দ্ধাংশেরও অধিক চিংড়ি। ধরার পর চিংড়ি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া কাঠের মুগুর দ্বারা অথবা অন্য উপায়ে পিটিয়া খোলা ছাড়াইয়া লওয়া হয়। আবর্জ্জনার সহিত খোলা ব্যতীত কিয়ৎপরিমাণ মাথা যে না থাকে, তাহা নহে; শুষ্ক ও খোলারহিত করার বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিলে অপচয়ের পরিমাণ অনেক কম হইতে পারে। সুন্দরবন ব্যতীত অন্য দুই এক স্থানেও শীতকালে শুটকি চিংড়ি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে গঙ্গার মোহানার সন্নিকটে নদীর পশ্চিম তীরস্থিত খেজরি ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান অন্যতম। ইহা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত এবং সুন্দর-বনের আড়পার। অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত এ স্থানে শুষ্ক চিংড়ির কার্য্য চলে এবং পাচড়া নামক একটি গ্রাম ইহার কেন্দ্র। ধীবরগণ এখানে গিয়া 'খটি' প্রস্তুত করিয়া কয়েক মাস থাকে এবং চিংড়ি ও মৎস্য শুষ্ক করে। প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় এই স্থানে পাইকারগণ আসিয়া শুষ্কমাছ ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। 'হলদা' মোড়কা, ঝোন্‌কা ও রঙ্গী নামক কয়েক জাতীয় চিংড়িং এখানে ধৃত হয়, কিন্তু শুটকি চিংড়ির মধ্যে শেষোক্তেরই প্রাধান্য অধিক। দর যখন সুবিধা থাকে, তখন টাকায় প্রায় ১২ সের শুটকি চিংড়ি পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, গলদা চিংড়ি কোন স্থানেই শুটকি করা হয় না।

চিংড়ি মাছের ব্যবসায়ে উন্নতি ও প্রসারের অনেক অবসর আছে। মাদ্রাজে মালাবার উপকূলের সরকারী মৎস্য-কারখানায় টিনে বন্ধ করা ২।৩ রকমের তৈয়ারী চিংড়ি মন্দ বিক্রয় হয় না। বঙ্গদেশেও সেইরূপ টিনে প্যাক করার কার্য্য (canning) অনায়াসে চলিতে পারে। ব্রহ্ম, মালয়, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে শুষ্ক চিংড়ির চাহিদা খুবই অধিক। সুন্দরবনে আধুনিক প্রথায় শুটকি চিংড়ির কারখানা স্থাপনে লাভের সম্ভাবনা যথেষ্ট। উত্তম প্যাকিং ও চালান দেওয়ার সুবন্দোবস্ত করিয়া অন্যান্য প্রদেশে বাঙ্গালার চিংড়ি চালান দেওয়া যাইতে পারে। সর্ব্বশেষে চিংড়ি-সার যথেষ্ট মাত্রায় প্রস্তুত করিলে উহা আদৌ পড়িয়া থাকিবে না; উপযুক্ত প্রথায় বাজারে চালান দিলে ইহার ত্বরিত বিক্রয় অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

অম্ল-মধুর

হাওড়া ষ্টেশনে, এক দিন, দুইটি পুণ্যকামী নারী এবং তাঁহাদের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বিস্তর জিনিষপত্র লইয়া পুরী এক্সপ্রেসে চাপিয়া বসিলাম। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করিলে অকৃতজ্ঞতা হইবে যে, তাঁহাদেরই দেব-দর্শনের আগ্রহাতিশয্যে—এই যাত্রা। বহু দিন হইতে এই দুইটি পুণ্যসঞ্চয়াভিলাষিণী নারী অনবরত তাগাদা দিয়া এমনই প্রতিজ্ঞার বেড়াজালে ঘিরিয়াছিলেন যে, কোন দিক দিয়া 'না' বলিবার বিন্দুমাত্র উপায় ছিল না। আইনের ফাঁকি অনেক থাকিলেও, এ-হেন তীক্ষ্ণদর্শিনীদের কাছে—অফিস্, স্কুল, কলেজ কিংবা কাষ, কিছুরই দোহাই টিঁকিতে পারে না।

জানি না, অশ্লেষা কি মঘা, গুরুবার না দিক্‌শূল, তবে যাত্রা-পথে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আভাস যেটুকু উপলব্ধি করিয়াছিলাম, তাহাতে মনে হইয়াছিল,—ইহাই যথেষ্ট। ভুবনেশ্বর, সাক্ষি-গোপাল,—পুরীর শ্রীমন্দির, সমুদ্রোপকূল—সমস্তই বুঝি ঐ অখণ্ড সৌন্দর্য্যের মাঝে বাঁধা পড়িয়াছে। সূক্ষ্ম মানস-নয়নের অদৃশ্য অন্তরাল ঘুচাইয়া তাঁহারা যে কথনও স্থূল-দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইবেন, তাহা ত স্বপ্নেরও অগোচর!

আমি ত তাঁহাদিগকে জেনানা-কামরায় তুলিয়া নিজের একটু যায়গা দখল করিতে ছুটিলাম। ফিরিয়া দেখি,—এক দিকে অনেকটা স্থান খালি থাকা সত্বেও উভয়ে একই বেঞ্চির কোণে গুঁতাগুঁতি করিতেছেন ও বেশ একটু গরম গরম বাক্যবাণ বর্ষণও চলিতেছে! যথা—

১মা। আর একটু স'রে বসতে পার না?

২য়া। না। তোমার ঐ হাতীর মত গতর—

১মা। দেখ, খুঁড়িস্ না বলছি—

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম,—"কেন, ওদিকে ত অনেক যায়গা প'ড়ে রয়েছে, এক জন আসুন না?"

এক জন ছিলেন একটু অতিরিক্ত স্থূলাঙ্গী—গজেন্দ্রগামিনী। তিনি চলিতেন মেদিনী কাঁপাইয়া, কথা বলিতেন কাঁসর বাজাইয়া, আর রসনার চক্র চালাইতেন ইলেক্‌ট্রিক মেসিনের মত। যায়গার প্রয়োজন তাঁহারই কিছু বেশী।

অপরা ক্ষীণা, কণ্ঠস্বর অনেকটা পিক্‌লু বাঁশীর মত। শব্দ-ঝঙ্কার নাই বটে, কিন্তু তীব্রতা বেশী। যায়গার দরকার তাঁহারও কিছু কম নহে। কেন না, তাঁহার যুক্তি, রেল-কোম্পানী ত লঘুগুরু বিচার করিয়া টিকিটের ন্যায্য ভাড়া কিছু কম লন নাই, সুতরাং স্থানের সম-অধিকার তাঁহারও অবশ্যপ্রাপ্য। ক্ষীণার সব চেয়ে বেশী অসুবিধা হইয়াছিল এই যে, সকল কথার উত্তর-প্রত্যুত্তর ঠিকমত দিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

কিন্তু সে জন্য তাঁহার 'মহাবিদ্যার' কিছুমাত্র অপটুত্ব প্রমাণিত হয় না; কেন না, তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় এ বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিত—খুবই কম!

যাহা হউক, খালি যায়গা দেখাইয়া সেই দিকটায় বসিতে বলিলাম।

উভয়ে একসঙ্গে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ম্যা-গো! ওই যে একটা ধাঙ্গড়—রাম!"

বলিলাম, "ও ধাঙ্গড় নয়,—মাদ্রাজী। আর ও ত এক পাশে ব'সে আছে।"

বলিলেন, "তা হোক, এক বেঞ্চিতে ছোঁয়া-নেপা! এ আমরা বেশ আছি।"

মনে মনে ভাবিলাম—বেশই বটে! ঘুমের বদলে সারারাত কুস্তি-কসরৎ চলিবে ভাল। প্রকাশ্যে বলিলাম, "সব বেঞ্চিই ত এক। একই কাঠের গাড়ী ত।"

বলিলেন, "তা হোক, বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নেই। তুমি যাও—আমরা বেশ আছি।"

তাই থাক। তোমাদের যুক্তিতর্ক, ছুৎমার্গ শাস্ত্র যে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে। এ দেশে শাস্ত্রের বিধান অসংখ্য। জাত্যা

সে সবের উপবিধান অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে বাহির হইয়াছে ঝুড়ি ঝুড়ি! গোময়, গঙ্গাজল, মটকার কাপড়—শুদ্ধাচারের অমোঘ অস্ত্র।

গাড়ী ছাড়িল—রাত্রির মত নিশ্চিন্ত হইলাম।

ভোরবেলা ভুবনেশ্বর নামিয়া দেখি, দুই সখী পূর্ব্ববৎ শুচিত্ব বজায় রাখিয়া তন্দ্রামগ্ন, নিশীথ-রণে বোধ হয় কিছু ক্লান্ত।

ভুবনেশ্বর শুনিয়া নামিলেন।

তার পর, একখানি গো-যানে মালপত্র চাপাইয়া রওনা হওয়া গেল। পূর্ব্বদিক্ সবে লাল হইয়া উঠিতেছে; ভোরের মৃদুশীতল ফুরফুরে হাওয়াও বেশ বহিতেছে। দুই ধারে স্বল্প অরণ্য—মাঝখানে আঁকাবাঁকা লাল পথ। দূরে দুই একটি মন্দিরের চূড়া দেখা যাইতেছে। এমন মনোহর পথের মাঝে সুখালু নিদ্রার আবেশ না হইলে যে সব মিথ্যা! দুই সখীর নাসিকা-ধ্বনিতে—অমন যে স্নিগ্ধ শান্ত তরুণী উষার অপরূপ মূর্ত্তি—কোন্ অরণ্যের অন্তরালে সভয়ে আত্মগোপন করিল। রৌদ্র উঠিল এবং বেশ একটু তীব্রতা লইয়াই উভয় সখীর মুখের উপর সোহাগস্পর্শ বুলাইয়া দিল।

উভয়েই ধড়মড়িয়া উঠিয়া সাধা কণ্ঠে বলিলেন, "কি আপদ! এমন ক্যাটকেটে রোদ ত কখনো দেখিনি!"

রৌদ্র বোধ হয় আরও একটু বেশী হাসিয়া উত্তর দিল, ঘরে বাইরের তফাৎ এইটুকু।

বিন্দু সরোবরের সম্মুখে প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা। পাণ্ডা জুটল দশ-বিশটা; ঝাড়াই-বাছাই করিয়া একটি অতি বৃদ্ধ বাকারী প্যাটার্নের চেহারা—অনেকটা পুরাণবর্ণিত দুর্ব্বাসা আর কি—সার্দ্ধ দুই ঘণ্টা পরে তাঁহার নথিপত্র দাখিল করিয়া আমাদের উপর পূর্ণ অধিকারের দাবী করিলেন। বেলাও অধিক হইতেছে, সুতরাং অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাঁহার শ্রীকরে কায়মনপ্রাণ সঁপিয়া একখানা ঘর দখল করিয়া একবারে স্নানের উদ্যোগ।

স্নানশেষে দর্শন। মন্দির সংস্কার হইতেছে—চারিদিকে বিশৃঙ্খলা।

কষ্টে-সৃষ্টে উহারই মধ্যে ঢুকিয়া পড়া গেল। ভিতরে দারুণ দুর্গন্ধ; চামচিকা ও আরও কোন কোন জীব মন্দির-মধ্যে আদিকাল হইতে বাসা বাঁধিয়া আছে, তাহা বলিতে পারেন—এই ঘন-দুর্ভেদ্য অন্ধকারের একমাত্র অধীশ্বর দেবাদিদেব ভুবনেশ্বর।

উঁচু, নীচু, অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে—দুই সখী টাল সামলাইতে সামলাইতে সে কালের পুরাঙ্গনাদের নৃত্য-ভঙ্গীতে অগ্রসর হইতেছিলেন। দেবস্থান না হইলে রসনার অশ্রান্ত আলাপে হয় ত কলধ্বনি বাজিয়া উঠিত। পুণ্যের পথ চিরকালই কষ্টকর; কাযেই অতি ধৈর্য্য তাঁহাদের সামান্য দুই-একটি 'উঃ', 'গেলুম', 'জয় বাবা ভুবনেশ্বর', ইত্যাদি—কয়েকটি বাক্যের মধ্য দিয়াই পাপার্জ্জনের পথ হইতে তাঁহাদিগকে সাবধানে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল।

দেবতার চারি পাশে মাত্র দুইটি দীপ; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিছু ঠাহর হয় না। কাংস্য-কণ্ঠ এইবার মৃদু বাজিল, "কৈ গো ঠাকুর, বাবাকে যে দেখতে পাই না?"

পিকলুও পোঁ ধরিল, "ও মা, কৈ?"

পাণ্ডা তাড়াতাড়ি একটা বাতি জ্বালাইয়া সম্মুখে ধরিল, "এই যে মা, এই ধারে। পরশো বয়, বল, চৈত্রে মাসি—"

দুই জনেই মূর্ত্তির উপর সেই স্বল্পালোকে হুমড়ি খাইয়া দুই হাতে সেটির উপর দেহের গুরু-লঘুতায়ের সমতা রক্ষা করিয়া মন্ত্রের আগুশ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন।

উড়িয়া পাণ্ডার খচুড়ি-সংস্কৃত, কাঁসরের বিড়-বিড়, পিকলুর ফিস্-ফিস্ (কেন না, শ্রবণেন্দ্রিয়ের খর্ব্বতাপ্রযুক্ত মন্ত্রের এক বর্ণও তাঁহার শ্রুতিগোচর হয় নাই) ঝপাঝপ ফুল-বিল্বপত্রের অঞ্জলি-দান, জলধারা, নারিকেল-দান প্রভৃতি ষোড়শোপচারে পূজা—মাত্র দুই মিনিটের মধ্যে শেষ।

বাবাকে প্রণাম করিয়া দক্ষিণান্ত করিবার সময় একটু গোল বাধিল। পাণ্ডা ভিন্ন- সেই মন্দিরে আরও দশ বারো জন প্রত্যাশী ক্ষুধিত দৃষ্টি মেলিয়া এই দুইটি নারীর ভক্তি-একাগ্রতা তন্ময়চিত্তে দেখিতেছিল। তাহারা সকলেই 'জয় রাণীমায়' বলিয়া প্রথমেই কাঁসরের নিকট হাত পাতিল। তিনি দুই-একটি পয়সা ঠাকুরের মাথায় ফেলিয়া দিলেন, কিন্তু তাহারা ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া দাবী করিল, এই কয়টি সুব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া তাঁহারা অক্ষয়-পুণ্যের অধিকারিণী হউন!

দেবতার মন্দির—অতি ভয়ে খর রসনা শুদ্ধ ছিল।

এইবার খন্ খন্ শব্দে কাঁসর বাজিয়া উঠিল, "আ—

মলো, আবার হুলুম! যা—যা, নেক্ করিস নি।" সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের মত জনতা সরিয়া গেল।

হতভম্ব পাণ্ডা—তখন অগ্রসর হইয়া কাঁচু মাঁচু মুখে বলিল, "আসুন,—মা,—আসুন।"

মা তখন রুদ্রাণী। ঠাকুরকে এক কড়া ধমক দিয়া বলিলেন, "তুমিও ত আচ্ছা। দুটো মেয়েমানুষ—এক পাল মেয়ো ভাট লেলিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছো?" ঠাকুর বাক্যব্যয় না করিয়া তাঁহাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিলেন।

নমুনা যেটুকু পাওয়া গেল, তাহাতে পথে পাণ্ডার উপদ্রব হইতে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাইবে,—ভরসা আসিল।

পিকলু-কাঁসরের ঐক্যতান আরম্ভ হইলে পাণ্ডা ত পাণ্ডা, পাণ্ডার ঠাকুর পর্য্যন্ত ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িবেন!

পথে কাঙ্গালীর ভীড়, কিন্তু সম্মুখে গজগামিনী, পশ্চাতে ক্ষীণা। সাহস করিয়া কেহ হাত বাড়ায় ত মুখ ফোটে না।

ক্ষীণা অঞ্চলাগ্র হইতে কয়েকটি পাই বাহির করিতে না করিতে চারিদিকে কাড়াকাড়ি ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। সভয়ে ক্ষীণা গজগামিনীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন

গজগামিনী সে দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া নিজেও কতকগুলি পাই ছুড়িয়া দিলেন। তার পর দ্রুতপদে বাসায় আসিয়া একবারে দ্বার বন্ধ করা গেল।

বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে। পাণ্ডা বলিয়াছিল, ১২টায় ভোগ মিলিবে। কিন্তু দেড়টার সময়ও শুনিলাম, আরও এক ঘণ্টা বিলম্ব। ২টায় যাত্রা না করিলে ট্রেণের আশা নিষ্ফল। কিছু মিষ্ট, ফলমূল কিনিতে বাজারে আসিয়া পাইলাম খানিকটা গুড়। তাহাই মুখে দিয়া এক এক গ্লাস শীতল জল পান করিয়া গো-যানে চাপা গেল।

গো-যান চলিল, পাণ্ডার দেখা নাই।

মাঝ-পথে, শিকার হাত-ছাড়া হয় দেখিয়া, সে ছুটিতেছে দেখা গেল। তাহার হাতে কিছু পুণী মালপো।

তাহাই লইয়া কিছু দর্শনী দেওয়া গেল। সে মুখ ভার করিয়া সে টাকা ফেলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে কাঁসর-পিকলু বাজিয়া উঠিল। পাণ্ডাও তখন সন্তুষ্ট-মনে যথালাভ ভাবিয়া টাকা তুলিয়া আশীর্ব্বাদ (?) করিতে করিতে ঘরে ফিরিল।

মনে করিলাম, ইঁহাদেরই দৃঢ় বর্ম্মে দেহ ঢাকিয়া অনায়াসে পাণ্ডা-অসুর রণে জয়ী হইয়া মনের সুখে পুরীর সমুদ্র উপভোগ করা যাইবে! কিন্তু হিসাবে ভুল হইয়াছিল এইটুকু যে, যে খর রসনা বাছিয়ের বস্তু অবস্তু বিচার না করিয়া সমান তেজে আপন কার্য্য চালাইতে পারে, তাহার বিশ্রামস্থল ঘরে নহে। স্থান, কাল, পাত্রের ভেদ তাহারা হিসাব করে না; একবার কণ্ডুয়িত হইয়া উঠিলেই হইল!

পুরী নামা গেল, চেনা ছড়িদারও জুটিল। নির্ব্বাবনায় যানে চাপিয়া ২।৩ মাইল দূরে পাণ্ডার বাসা অভিমুখে রওনা হওয়া গেল।

ধুলা-পায়ে দর্শন—প্রত্যেক যাত্রীর অবশ্য-কর্ত্তব্য। ইঁহারাও চলিলেন।

তখন সবে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, নাটমন্দির জনপূর্ণ। মন্দির-চত্বরে প্রসাদের স্তূপ—পাশের আনন্দ-বাজারে ভারে ভারে নীত হইতেছে; ক্রেতা-বিক্রেতাও মন্দ নহে। দূর হইতে দর্শন—বলে ঝাকি দর্শন।

মণি কোঠায় ঘৃতের স্নিগ্ধ অনুজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলিতেছে। বাতাসে পুষ্প-চন্দন-ধূপ-দীপের অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সৌরভ ভাসিয়া আসিতেছে। এ হেন মিলনের প্রাণারাম স্বর্গ আর কোথাও আছে কি না জানি না! সত্যই মনে হয়, সংসারের অনন্ত কোলাহল পশ্চাতে ফেলিয়া সম্মুখের শ্রীবৈকুণ্ঠে আমাদের মনোভৃঙ্গ ক্ষীরোদশয্যা-শায়িত যোগি-মুনি-জন-বাঞ্ছিত ও সে রূপহীনের সরস রক্ত রাগ দুইটি চরণপদ্মের ভক্তি মুক্তি-দলের উপর গুঞ্জন করিয়া বেড়াইতেছে। হায় রে স্বপ্ন!

পশ্চাতে গুনগুনের পরিবর্ত্তে ভ্যানভ্যানানি উঠিল।

কাঁসর পিকলুকে বলিলেন, "কি লো, দেখতে পাচ্ছিস?"

পিকলু এ কথায় রাগিয়া গেলেন। প্রবাদ আছে, যাহারা পাপী, তাহারা না কি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখের পরিবর্ত্তে আপনাদের মাথার বস্তুগুলিকে প্রত্যক্ষ করে; কেহ কেহ বা পুঁই-মাচাও দেখে। আরও একটা কারণ, শ্রবণশক্তি-হীনাদের দর্শন-শক্তি বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তাহারা মনে করে, বিদ্রূপ করিবার জন্যই বুঝি ঐ কথা বলা হইল।

তিনি মুখ বাঁকাইয়া উত্তর দিলেন, "কাণাও নই—খোঁড়াও নই, কাণেই যা একটু কম শুনি। কেন দেখতে পাব না?"

কাঁসরও শ্লেষটুকু গায়ে মাখিয়া আতিয়া উত্তর দিলেন, "তোর বড় মুখ।"

পিকলু সে-কথা কাণে না তুলিয়া বলিলেন, "লোকের কেবল মজা দেখা বৈ ত না! কোথায় ছুটো বুঝিয়ে বল্—"

কাঁসর জোর-গলায় কহিলেন, "বড় অশুদ্ধ মন তোর, তেমনি গেছেও কাণ—" থামাইতে গেলে থামে না,—এ এক মহা বিপদ! ক্ষণপূর্ব্বের সুখ-কল্পনা পরম বিভীষিকায় দৃষ্টির সম্মুখে মূর্ত্তি ধরিয়া অট্টহাসি হাসিতে লাগিল।

ঝন্‌ঝন্ শব্দে শ্রীমন্দিরের দরজা বন্ধ হইয়া গেল। যাত্রীরা কোলাহল করিয়া উঠিল,—'জয় প্রভু জগন্নাথ!'

ভীড়ের খরস্রোত কলহনিপুণা দুইটিকে একবারে ঠেলিয়া নাটমন্দিরের বাহিরে আনিয়া তৎনকার মত ক্ষণ-স্থায়ী শান্তি আনিয়া দিল। কিন্তু বাসায় আসিয়া সেই পুরাতন কাহিনী প্রধূমিত হইয়া আবার যে দাবানলের সৃষ্টি করিবে এবং সে দাবানল দিনের পর দিন, অসংখ্য মন্দির, মঠ দর্শনের পরও বাড়িয়া যাইবে, তাহা কোন্ পুণ্যার্থীই বা ভাবিতে পারেন?

এক একবার মনে হইত, ইঁহারা কি সত্যই পুণ্যার্জ্জনের জন্য আসিয়াছেন, না গৃহের অপূর্ণ কলহ-লালসার ইচ্ছামত সম্পূরণ করিতে বিদেশ-যাত্রার এই সুন্দর আয়োজন? তা যদি হয় ত সার্থক ইঁহারা!

অমন যে সমুদ্র, তাহাও কি বিন্দুমাত্র রেখাপাত করিতে পারে নাই,ও-দুইটি কোমল প্রাণে? অথচ পুণ্যার্জ্জনের আগ্রহে আমার স্বাধীন বিচরণের এক তিলও অবসর মিলিত না।

ঠাকুর দর্শন করিয়া সকলে গা ঢালিয়াছে,—যাই একটু উঠিয়াছি—অমনি কাঁসর বলিতেন, "কোথায় যাচ্ছ?" যদি বলিতাম, "ঠাকুর দর্শনে।" অমনি তিনি বলিতেন, "আমিও যাব।" যদি বলিতাম, "একটু বাজারটা ঘুরে আসি।" তিনি বলিতেন, "বেশ ত, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল।"

কাঁসর উঠিতেন—ত পিক্‌লুও উঠিতেন। কারণ, উঁহাকে দুই একবার বেশী ঠাকুর দর্শন করিয়া, বেশী পুণ্য অর্জ্জনের অবসর দিবেন কেন? টিকিট ত আর কম ভাড়ায় কিনেন নাই। বাজারের কথায়ও উঠিতেন; কাণে খাটো হইলেও—চোখে—ত—

অথচ যে দিন জিজ্ঞাসা করিতাম, "বেড়াতে যাবেন?" সে দিন উত্তর আসিত, "আর পারি না—পা দুটো ভেঙ্গে গেছে। একটু গড়িয়ে নিই।"

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে আমি উঠিলেই তাঁহাদের সব শ্রান্তি-ক্লান্তি নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া যাইত।

আটকে-বাঁধা, পাণ্ডায় পা-পূজা, ধ্বজা বাঁধা, মাসীর বাড়ী, পিসীর বাড়ী, বাকী আর কিছু রহিল না; অভাব রহিল শুধু দুই জনের ভাবের। আর বাকী রহিল প্রসাদ মুখে দেওয়া।

সকালেই আহারে বসিয়াছি, আর মাত্র এক দিন,—তার পর পুরী ছাড়িয়া দেশে যাইব। প্রাণের ভিতর কেমন যেন হু-হু করিতেছে—কিসের অজানা সূক্ষ্ম বেদনার বন্ধন-সূত্র—অন্তরে অন্তরে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। দূর-প্রবাসের স্মৃতি কি? কে জানে!

অকস্মাৎ আমার বিস্মিত নয়নের সম্মুখে সে দিনের হারাণো বৈকুণ্ঠের অপরূপ ছবি ফুটিয়া উঠিল। দুই সখীতে প্রসাদ লইয়া পরস্পরের মুখে দিতেছেন—আর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। কলহ, বিবাদ যেন এই মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্যে কোথায় ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। ধন্য প্রভু, ধন্য তোমার লীলা!

মেঘ কাটিল—সুনির্ম্মল আকাশে চন্দ্র হাসিল।

পরদিন সমুদ্র-স্নান—দুই সখীর জলকেলির (অবশ্য বালুকেলি বলিলেই ভাল হয়) আর অন্ত ছিল না। অব-শেষে এক বৃহৎ ঢেউ আসিয়া সেই বালির গাদাতেই দুইটিকে তাল পাকাইয়া নাস্তা-নাবুদ করিয়া দিয়া গেল!

জীণার উপরে বিপুলা লুটা-পুটি খাইতেছেন, মুখে উভয়ের ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার,—খুব খানিকটা লোণাজলও বোধ হয় উদরস্থ হইয়াছে!

যাহা হউক, তীরে উঠিয়া তাঁহাদের হাসি ফুটিল।

সে দিনের দর্শন-স্পর্শন এত সুন্দররূপে প্রাণে প্রাণে অনুভব করা গিয়াছিল যে, জীবনের পক্ষে সে এক চির স্মরণীয় দিন। বহিঃসুন্দর ত অন্তরেরই প্রতীক।

তার পর বিদায়। বলা বাহুল্য, পুরী থাকিতেই এই অনন্ত পুণ্যের সাক্ষী সংগ্রহের জন্য এক দিন সাক্ষি-গোপাল দর্শনে যাওয়া গিয়াছিল।

ট্রেণ যখন হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া শেষ ক্লান্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল, তখন দেখিলাম, দুইটি আসন্ন বিচ্ছেদকাতরা নারী চোখের জলে ভাসিয়া পরস্পরকে বিদায় দিতেছেন ও ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছেন।

অথচ কয় দিন প্রবাসে তাঁহাদের স্মৃতির যে নীড় বাঁধিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে কতখানি মধু—আর কতখানি হলাহল যে সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা ত আমার অজানা ছিল না!

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়।

ফুঙ্গী বিজয়

ভারতের যতীন দাস ও আয়ার্ল্যাণ্ডের ম্যাক্‌সুইনীর মত ফুঙ্গী বিজয়ের অদ্ভুত আত্মত্যাগের কথা ব্রহ্মবাসীর নাম চিরদিন অমর করিয়া রাখিবে। এই বৌদ্ধ ভিক্ষু রাজদ্বারে রাজনীতিক অপরাধে দণ্ডিত হইয়া কারাদণ্ড-ভোগকালে জেলের আইনের অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন এবং উহারই ফলে অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহা কয়মাস পূর্ব্বের কথা। সম্প্রতি রেঙ্গুন সহরে মহা সমারোহে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে যে বিরাট শোভাযাত্রা হইয়াছিল, তাহা রেঙ্গুনের মত সহরে অপূর্ব্ব বটে। সহস্র সহস্র ব্রহ্মবাসী দেশের এই বিরাট পুরুষের শবদেহের অনুগমন করিয়াছিল। শত শত নারী তাঁহার শববাহী শকট টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাঁহার চিতা-চুল্লীর চটচটা রবের সহিত তাঁহার জয়গান শতকণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল।

এ কিসের শ্মশান? মানুষ আসে যায়, শয়ন, ভোজন, নিদ্রা, ভ্রমণ,—দেহের আরাম, ভোগ-বিলাস, কিছুরই তাহার অভাব হয় না। দৈহিক ইন্দ্রিয়ভোগই তাহার চরম আশ্রয়রূপে পরিগণিত হয়। তাহার চিতা-ভস্ম গগনে পবনে সঞ্চারিত হয়, নতুবা ধূলার সহিত মিলাইয়া যায়। কে তাহার তত্ত্ব লয়? কিন্তু ভিক্ষু-বিজয় ব্রহ্মবাসী মানুষের মত মানুষ দেখিতে পাইয়াছিল বলিয়াই তাহারা সেই মানুষের মধ্যস্থিত দেবতার পূজা করিয়াছিল। যে মানুষ একটা মূলনীতির সম্মানরক্ষার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম প্রাণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে, তাহার ভিতরে দেবত্ব আপনিই ফুটিয়া উঠে—যে দেবত্বের নিকটে মানুষের মাথা আপনিই অবনত হয়! ফুঙ্গী বিজয়ের মত আরও দুই জন সন্ন্যাসী (ফুঙ্গী) প্রায়োপবেশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক জন ১২ই অক্টোবর হইতে, অপর জন ১৫ই নভেম্বর হইতে এ যাবৎ অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া আছেন। এ কি আশ্চর্য্য মনোবল? আমরা ভারতবাসীরা পরলোকগত মহাপ্রাণ ভিক্ষুর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। ভারতের ও ব্রহ্মের শিক্ষা-দীক্ষা ভাবধারার মধ্যে প্রভেদ ত সামান্য,—ভারতের বুদ্ধের ত্যাগের মহিমাই ত ব্রহ্মে প্রচারিত হইয়াছিল। ফুঙ্গী বিজয়ের আত্মত্যাগ ভারত ও ব্রহ্মের প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় করুক, ইহাই কামনা।

ফুঙ্গী বিজয়

আফগানিস্থান

রাজা নাদীর শাহের শাসনাধীনে আফগান-রাজ্য শান্তি, সুখ, সম্পদের মুখ ক্রমেই দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, পরলোকগত আমির আমেদ জানের বিধবা তাঁহার কন্যার চিকিৎসার্থ বোম্বাই সহরে আসিয়াছিলেন, কন্যা সুস্থ হইলেই পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তিনি কোন সাংবাদিককে বলিয়াছিলেন যে, তিনি রাজা নাদীরের শাসনাধীনে পরম সুখেই আফগানিস্থানে বাস করিতেছিলেন।

সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সিংহাসনচ্যুত রাজা আমানুল্লাও শীঘ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত না হইলে তিনি কখনও এরূপ সঙ্কল্প করিতে পারিতেন না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, রাজা নাদীর কেবল রণকুশলী সেনাপতি নহেন, বিচক্ষণ দূরদর্শী রাজনীতিকও বটেন। তিনি প্রজাবৎসল না হইলে এত শীঘ্র আফগানিস্থানের মত অশান্ত রাজ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন না।

সিংহাসনচ্যুত রাজা আমানুল্লা অকালে সমাজ-সংস্কার করিতে গিয়া সিংহাসন হারাইয়াছেন, এ কথা সত্য ; কিন্তু এখন প্রকাশ পাইতেছে যে, তাঁহার বিপক্ষে তাঁহার রাজ্যে পূর্ব্ব হইতেই ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। সম্প্রতি রাজা নাদীর শাহের আদেশে কাবুলে এক বিশেষ বিচারালয়ে দুই জন ষড়যন্ত্রকারীর বিচার হইয়া গিয়াছে। ইহাদের নাম মহম্মদ ওয়ালী খাঁ ও মামুদ সোয়ামী। ওয়ালী খাঁ রাজা আমানুল্লার বিদেশ-ভ্রমণকালে তাঁহার নামে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, আর জেনারল মামুদ সোয়ামী রাজা আমানুল্লার তুর্ক সেনাপতি ছিলেন। বিচারে তাঁহাদের ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা উভয়ে রাজা আমানুল্লার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার বিপক্ষে গোপনে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন এবং বিদ্রোহ-ধ্বজা উড্ডীন করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। উত্তর-আফগানিস্থানের কোহিদামান উপজাতির প্রায় এক শত জন বিশিষ্ট প্রতিনিধি কাবুলের দিলখুসা প্রাসাদের দরবারে রাজা নাদীর শাহের সকাশে এক দরখাস্ত পেশ করিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, "রাজা আমানুল্লার উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদিগের সহায়তায় বাচ্চা-সাকাও বিদ্রোহী হইতে সাহসী হইয়াছিল। মহম্মদ ওয়ালী খাঁ বাচ্চাকে বন্দুক সরবরাহ করিয়াছিলেন, সে জন্য বাচ্চা তাঁহাকে প্রকাশ্যেই ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিল। ইহা ছাড়া ওয়ালী খাঁ বাচ্চাকে অস্ত্র-শস্ত্র, গুলী, বারুদ ও অনেক গুপ্ত সামরিক নক্সা সরবরাহ করিয়াছিল। মামুদ সোয়ামী বাচ্চাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তাঁহার অধীনস্থ সেনারা বাচ্চার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে না। আলী আমেদজানও বাচ্চাকে অনেক সাহায্যদান করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর রাজপুরুষরা যদি বাচ্চাকে সাহায্যদান না করিতেন, তাহা হইলে আফগানিস্থানে কখনও বিদ্রোহ উপস্থিত হইত না।"

আলী আমেদজান পরলোকগত। অবশিষ্ট দুই জন রাজপুরুষের বিশেষ বিচারালয়ের আদেশে দণ্ড হইয়াছে। কি দণ্ড হইয়াছে, তাহা এখনও জানা যায় নাই। এখন রাজা নাদীর এই দণ্ডাদেশ মানিয়া লইলে অপরাধীদের দণ্ড হইবে। কাবুলের মন্ত্রিবর্গ, কাউন্সিলের সদস্যগণ, কাবুলের শিক্ষিত উলেমাগণ, প্রদেশসমূহের উকীলগণ এবং সর্দারগণের প্রতিনিধিরা এই বিশেষ বিচারালয়ে বসিয়া ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার করিয়াছিলেন। সুতরাং বুঝা যায়, রাজা নাদীর শাহ স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনের পক্ষপাতী নহেন, তিনি জনমতের মর্য্যাদা পদে পদে রক্ষা করিয়া থাকেন। শাসকের সুনাম ইহাতে যত ব্যক্ত হয়, এত আর কিছুতেই নহে। রাজা নাদীরের শাসনাধীনে আফগানরাজ্য উন্নতির চরমশিখরে আরোহণ করুক, প্রাচ্যের একটি স্বাধীন রাজ্য শক্তিশালী হইয়া আপনার ভাগ্য আপনিই নিয়ন্ত্রণ করুক, ইহাই কামনা।

নেপালের নূতন শাসনকর্ত্তা

নেপাল স্বাধীন হিন্দুরাজ্য। জার্ম্মাণ যুদ্ধের পর হইতে বৃটিশ সরকার আফগানিস্থান ও নেপাল রাজ্যকে স্বাধীন বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। তদবধি নেপালের মহারাণাকে His Majesty, প্রধান মন্ত্রীকে His Highness এবং সেনাপতিকে His Excellency বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে।

চিরাচরিত প্রথানুসারে নেপালের রাজা (মহারাণা) নাম মাত্র রাজা, তিনি দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত, প্রজা-সাধারণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোনও সম্পর্ক নাই বলিলেও চলে। প্রকৃত শাসক হইতেছেন প্রধান মন্ত্রী। এই প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজবংশের ইতিহাস অতীব কৌতূহলপ্রদ। এই রাজবংশ উদয়পুরের ঘিলোট-শিশোদিয়া মহারাণাগণের বংশধর বলিয়া গৌরবানুভব করিয়া থাকেন। তাহা হইলে তাঁহারা সূর্য্যবংশোদ্ভব ; কেন না, উদয়পুরের মহারাণারা শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লব হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া দাবী করেন। যেমন জয়পুরের রাজবংশ আপনাদিগকে 'কুশোয়া' 'কাছোয়া' বা কুশ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া থাকেন।

এই প্রাচীন বংশের হিজ হাইনেস মহারাজা সার চন্দ্রসমসের জঙ্গ বাহাদুরের দেহাবসানের পর তাঁহারই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিজ হাইনেস মহারাজা ভীম সমসের জঙ্গ বাহাদুর রাণা প্রধান মন্ত্রীর আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। তিনিই বর্ত্তমানে নেপালের সর্ব্বেসর্ব্বময় কর্ত্তা। তাঁহার শাসনের প্রারম্ভকালই যেরূপ শুভ ফল প্রদর্শন করিতেছে, তাহাতে মনে আশার সঞ্চার হয় যে, মহারাজার শাসনাধীনে নেপালরাজ্য সাফল্য-গৌরবে মণ্ডিত হইবে। মহারাজা সেনাপতি ছিলেন, সুতরাং তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যে কাহারও সন্দেহ থাকিবার কথা ছিল না ; কিন্তু তিনি যে বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ও সুশাসক, তাহা জানা ছিল না।

তাঁহার সংস্কারকার্য্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। তিনি ভারত হইতে আমদানী লবণ ও তুলার উপর শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার প্রজাপ্রীতি প্রস্ফুট হইয়াছে। তিনি সেনাদলের সেনানী ও গুর্খা সেনার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি গোচারণের মাঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া এবং গোচারণের শুল্ক উঠাইয়া দিয়া প্রজার যে সন্তোষবৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। ইহা দ্বারা তাঁহার বন-বিভাগেরও কোন ক্ষতি না হয়, এমনই ভাবে গো-চারণের মাঠ সমূহ তৈয়ার করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

৩৮ বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত মহারাজা বীর সমসের জঙ্গ নেপালে প্রথমে জল সংশোধন করিয়া নলের সাহায্যে সরবরাহ করিবার প্রথার প্রবর্ত্তন করেন, কিন্তু উহা সামান্যমাত্র লোকের অভাব পূর্ণ করিতে পারিত। এখন বর্ত্তমান মহারাজা বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে কাঠমাড়ো (কাঠমুণ্ডু) সহরে কলের জল সরবরাহের ব্যবস্থায় অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। নেপালীদের ধর্ম্মের দিক হইতে কলের জল খাইতে আপত্তি নাই। তাহারা এখন বলিতেছে, যত বেশী সহরে কলের জল হয়, ততই মঙ্গল।

সালিস মোকর্দ্দমার বিচারে বিলম্ব ঘটিত বলিয়া নূতন মহারাজা কয়েক জন বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারীকে প্রত্যেক প্রদেশে ঘুরিয়া বকেয়া কায সারিয়া লইতে আদেশ করিয়াছেন। ইহাতে প্রজাদের যে কত সুবিধা হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রজারা এই হেতু ইতিমধ্যেই তাঁহার জয়গান করিতেছে।

অনেকে বিস্মিত হইতেছেন যে, কোনরূপ অশান্তি উপদ্রব না ঘটিয়াও নেপালে কিরূপে এত বড় একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া

গেল, অর্থাৎ চন্দ্র সমসের জঙ্গ রাণার পরলোকপ্রাপ্তির সময়ে কোনরূপ অরাজকতা দেখা দিল না কেন? নেপালে পূর্ব্বে রাজা বা মন্ত্রী পরিবর্ত্তনের সময়ে এইভাবের গোলযোগ ও অশান্তি দেখা দিত। তাহা ছাড়া শাসননীতিরও পরিবর্ত্তন হইত, রাজপুরুষগণেরও দলে দলে চাকুরিচ্যুতি ঘটিত। এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে নূতন মন্ত্রী নিজে নিরাপদ হইবার জন্ত তাঁহার শত্রুপক্ষের অনেককে নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিতেন এবং কাহাকেও কাহাকেও দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতেন।

কিন্তু এবার গত নবেম্বর মাসে নেপালে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা অভাবনীয়—এই দৃশ্য দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, গত ২৯ বৎসর যাবৎ ভীম সমসের জঙ্গ তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মহারাজা চন্দ্র সমসেরের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। তিনি এত দীর্ঘকাল রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন যে, প্রজারা তাঁহাকে বিলক্ষণরূপই জানে ও শ্রদ্ধাপ্রীতির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে। তখন তিনি ডেপুটী প্রাইম মিনিষ্টার অথবা সহকারী প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার শাসনের ক্ষমতার পরিচয় সেই সময়েই পাওয়া গিয়াছিল। একবার যখন সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ভারত-ভ্রমণে আসিয়া তেরাইএর জঙ্গলে শিকার করিতে যান, সেই সময়ে পরলোকগত চন্দ্র সমসের জঙ্গ রাণা সম্রাটের সহিত জঙ্গলে ছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে ভীম সমসের জঙ্গ রাজধানী কাঠমণ্ডো সহরে সেনাপতিরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। ঠিক সেই সময়ে নেপালের রাজার মৃত্যু হয়। তখন ভীম সমসেরই বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সহিত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন বলিয়া চন্দ্র সমসেরকে শিকার হইতে ফিরিয়া আসিয়া কোন বেগ পাইতে হয় নাই। ভীম সমসেরই সেই সময়ে বর্ত্তমান রাজাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

ভীম সমসেরের বয়ঃক্রম এখন প্রায় ৬৫ বৎসর। কিন্তু এখনও তাঁহাতে যৌবনের পূর্ণ উৎসাহ ও উদ্যম বিদ্যমান। তাঁহার ভ্রাতা His Excelleney সার যোধ সমসের জঙ্গ তাঁহাকে রাজ্যশাসনে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন। তিনি এখন নেপালের সেনাপতি হইয়াছেন।

শান্তি

প্রতীচ্যের শক্তিপুঞ্জের মধ্যে নৌবল সংযত করিয়া পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করিবার স্বপ্ন দেখা হইতেছে। পোপ হইতে আরম্ভ করিয়া একাধিক ধর্ম্মযাজক খৃষ্টান পাদরী এবং রাজা-রাজড়া হইতে প্রেসিডেণ্ট প্রাইম মিনিষ্টার পর্য্যন্ত প্রতীচ্য জগতের বহু শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি এই প্রচেষ্টার প্রতি তাঁহাদের আশীর্ব্বচন ও স্বস্তিবচন উচ্চারণ করিয়াছেন। লোক মনে করিতেছে, না জানি এইবার বুঝি জগৎ হইতে যুদ্ধ-বিগ্রহ উঠিয়াই গেল বা!

কিন্তু প্রতীচ্যেরই দুই এক জন চিন্তাশীল মনীষী এ বিষয়ে সন্দিহান। তাঁহারা কাগজে-কলমে এমন অনেক সন্ধিসর্ত্ত লিখিত হইতে দেখিয়াছেন, উহাদের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে মূল্য কি, তাহাও বুঝেন। এই শ্রেণীর এক জন লেখক বলিয়াছেন,—

"গত ৪০ বৎসরের মধ্যে—অর্থাৎ বর্ত্তমানের লোকের মধ্যে অনেকের জীবিতকালের মধ্যে—মার্কিণ যুক্তরাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষ স্থল ও নৌসেনার জন্ত প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ২০ লক্ষ ডলার মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন! মার্কিণ সংবাদপত্রসমূহ যুদ্ধকে মানুষের প্রধান 'ব্যবসায়' (Man's greatest Industry) বলিয়া অভিহিত করেন। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকাই জগতের মধ্যে যত ব্যবসায়-বাণিজ্যের সৃষ্টি করিয়াছে, এত আর কিছুতে নহে। এই ব্যবসায়ের যন্ত্রতন্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করিবার জন্ত কত কল-কারখানার উদ্ভব হইতেছে, কত বৈজ্ঞানিকের রসায়নাগারে বা বিজ্ঞানাগারে কত শত রকমের যুদ্ধ-সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতেছে, কত রকমের মালপত্র রেলে, ষ্টীমারে বা উড়োকলে বাহিত হইতেছে, কত কুলীমজুর ইহার জন্ত ডকে, রেলে কায করিতেছে। পূর্ব্বে যাহাদের মধ্যে যুদ্ধ হইত, তাহাদের দুই পক্ষের বেতনভুক সৈন্তরা সংঘর্ষে নিযুক্ত হইত। তাহারা জাতির সংখ্যার অনুপাতে মুষ্টিমেয়। তাহারা একটা মাঠ বা একটা নদী বা সাগর ঠিক করিয়া লইত, সেখানে ঢাল-তলোয়ার তীর-ধনু লইয়া উপস্থিত হইত এবং তালঠোকাঠুকি করিয়া যুদ্ধে লাগিয়া যাইত। যে জয়লাভ করিত, সে পরাজিতের জমীজমা কাড়িয়া লইত ও ভোগ করিত। ইহাতে গ্রামস্থ সহরবাসীর বিশেষ ক্ষতি হইত না। তাহাদের বাড়ীঘর বা শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি রক্ষা পাইত, আর সৈনিক-বৃত্তিধারী ব্যতীত অপরের যুদ্ধের সহিত সম্পর্ক থাকিত না। এখনকার কালে একটা গোটা জাতিকেই যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে হয়,—ছেলেবুড়ো নরনারী কেহ দায়িত্ব এড়াইতে পারে না। কোন না কোন কাযে যুদ্ধে সকলকেই সহায়তা করিতে হয়। বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা, সামরিক বিদ্যালয়, স্কুল-কালেজের ছাত্রগণকে বাধ্য করিয়া সমরশিক্ষাদান, ডাকবিভাগ, তারবিভাগ, রেডিও, সিনেমা, থিয়েটার, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক, নার্শ—সকলপ্রকার উপকরণকে যুদ্ধের জন্ত নিযুক্ত করা হয়। সমস্ত জাতিকে এইভাবে সমরসাজে সর্ব্বদা প্রস্তুত করিয়া রাখিতে কত লোক ও কত অর্থব্যয় করিতে হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

"কিন্তু এই ব্যয়ের অনুপাতে নিরাপত্তা বা শান্তির বিষয়েও নিঃসন্দেহ হইবার উপায় নাই। ইহাতে দুশ্চিন্তার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই, অথচ সঙ্গে সঙ্গে বেকার-সমস্যা, জাতীয় ঋণবৃদ্ধি, ক্রমাগত করবৃদ্ধি প্রভৃতি আপদের উদ্ভব হইতেছে। ইহাতে সরকারের সহিত নাগরিকগণের মনোমালিন্য ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ইহাতে দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় লোকের আয়ু কমিয়া যাইতেছে।"

সুতরাং কেবল অস্ত্রসংহরণের বৈঠক বা নৌ-শান্তিবৈঠক বসাইয়া ফল কি? আসলে দেখিতে হইবে, মানুষের লোভ বা দুরাকাঙ্ক্ষা দমনের জন্য কি ব্যবস্থা করা হইতেছে। এক জাতি অন্য জাতির উপর প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিলে শান্তির সম্ভাবনা কোন কালে হইবে না। দুর্দমনীয় সাম্রাজ্য-মদগর্ব্বকে খর্ব্ব না করিলে শত নৌ-বৈঠকে বা অস্ত্রসংবরণ-বৈঠকে কোন ফল হইবে না। যত দিন তাহা না হয়, তত দিন এই অবস্থাই বলবৎ থাকিবে।

নদীয়া-যশোহরের গাজন-গীতি

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

এবারে "বালির পিণ্ডি", "রাবণ-বধ", "গোষ্ঠে গমন", "নিমাই-সন্ন্যাস" ও "নারী লোকের বাহার" এই কয়টি গান এবং "দেহশুদ্ধি" ও "কূলশুদ্ধি" শীর্ষক দুইটি ছড়া প্রদত্ত হইল। ছড়া দুইটি নদীয়া পোড়াদহ গ্রামনিবাসী শ্রীপঞ্চানন দাসের নিকট হইতে সংগৃহীত। ইঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত অন্যান্য গাজন-গাথা পরে যথাস্থানে সন্নিবেশ করা যাইবে।

"বালির পিণ্ডি" ও "গোষ্ঠে গমন" গান দুইটি পোড়াদহের নিকটবর্ত্তী কামারডাঙ্গা গ্রামের শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিশ্বাসের রচিত। ইঁহার পিতার নাম ভোলানাথ বিশ্বাস, জাতিতে নমঃশূদ্র, প্রধান পেশা কৃষিকার্য্য। ইনি কুষ্টিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। গাজনের সময় ইনি দল লইয়া নৃত্যগীত করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন লাঠীখেলা প্রভৃতিতেও ইঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। ইঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত খাতায় অতি অস্পষ্ট লেখা নিম্নলিখিত বন্দনাটি পাইয়াছি—

"নমো নমো নমো বন্দি নারায়ণ।
বন্দি আমি সব দেবের চরণ।
তার পরে বন্দি পিতা-মাতার চরণ।
যাঁহার প্রসাদে পাই সভা দরশন।
মাতার দুইটা স্তন বন্দি অক্ষয় ভাণ্ডার।*

• • • •

সেই মাতা ছেড়ে যেবা অন্য দেশে যায়।
হারের পঞ্চ মাণিক হায় রে দিবসে হারায়।
বৃদ্ধকালে পিতামাতা যে করে সেবন।
নিশ্চয় জানিবে ভাই সাধু সেই জন।
শোন সবে বিষ্ণুসভায় দিগবন্দনার কথা।
সবে মিলে প্রণাম হই হরগৌরী যথা।"

"রাবণবধ", নারীলোকের বাহার" ও "নিমাই-সন্ন্যাস" শীর্ষক গান কয়টি পূর্ণচন্দ্রের জ্ঞাতিভ্রাতা শ্রীভাবকৃষ্ণ বিশ্বাসের নিকট হইতে সংগৃহীত। "নারীলোকের বাহার" শীর্ষক গানে "ইহাই বলে পাগলা শশী" এইরূপ ভণিতা আছে; পাগলা শশী সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া বন্ধুবর শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ হাজরা ও স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ কান্তিভূষণ মুখোপাধ্যায় জানাইয়াছেন যে, উক্ত পাগলা শশীর নিবাস কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী জিয়ারখি কমলাপুর গ্রামে। ইনি বৈরাগী সম্প্রদায়ভুক্ত, বয়স অনুমান ৫৫ বৎসর হইবে। ইনি নিঃসন্তান, কায-কর্ম্ম বিশেষ কিছু করেন না—শিষ্যবর্গের উপর নির্ভর করিয়াই দিন চলে।

"বালির পিণ্ডি" গানটির প্রসঙ্গ রামায়ণের পালাগান-রচয়িতাদিগের সৃষ্ট। বনবাসে অবস্থানকালে রামচন্দ্র এক দিন লক্ষ্মণের সহিত বন-ফল আহরণে গিয়াছেন, এমন সময় পিণ্ড-লাভ প্রত্যাশায় গণ্ডী দ্বারা রক্ষিত কুটীরে জানকীর নিকট স্বর্গগত রাজা দশরথ আসিয়া উপস্থিত। রামের প্রত্যাগমনের বিলম্ব দেখিয়া তিনি সীতাকেই পিণ্ডদান করিতে বলিলেন। সীতা পিণ্ড দিবার মত কিছুই নাই, এই কথা জানাইলে দশরথ তাঁহাকে ফল্গুনদীর বালি দ্বারা পিণ্ড দিতে আদেশ দিলেন। সীতা তদনুসারে তুলসী, বটবৃক্ষ, ফল্গুনদী ও পুরোহিত ব্রাহ্মণকে সাক্ষী রাখিয়া পিণ্ডদান করিলেন। পিণ্ডদানের পর সীতা আর্দ্রবসনে কুটীরে ফিরিতেছেন, এমন সময় লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সীতা-প্রমুখাৎ পিণ্ডদানের কথা অবগত হইয়া রাম মনে করিলেন যে, সীতা তাঁহার স্বর্গগত পিতার নামে মিথ্যা অপবাদ দিতেছে। এই বিষয়ে উপযুক্ত প্রমাণ দেখাইতে না পারিলে, সীতাকে বর্জ্জন করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সীতা সাক্ষিস্বরূপ তুলসী, বটবৃক্ষ, পুরোহিত ব্রাহ্মণ ও ফল্গুনদীকে খাড়া করিলেন। এক বটবৃক্ষ ভিন্ন আর সকলেই মিথ্যা সাক্ষ্য দিল। বটবৃক্ষ সীতার নিকট বর পাইল যে, তাহার তলদেশ পুণ্যময় মহাতীর্থস্বরূপ হইবে। ফল্গুনদীকে সীতার অভিশাপে অন্তঃসলিলা হইতে হইবে, তুলসীগাছের মাথায় কুকুরে মূত্রত্যাগ করিবে। আর দক্ষিণা না পাওয়ায় ব্রাহ্মণ মিথ্যা কথা বলিয়াছে, এ জন্য তাহার প্রতি অভিশাপ হইল যে, সে যতই অর্জ্জন করুক না কেন, কিছুতেই তাহার অভাব যাইবে না। বলা বাহুল্য যে, প্রসঙ্গটিতে রামায়ণের কোনই ভিত্তি নাই। গোপীচন্দ্রের গানেও আমরা ময়নামতী কর্ত্তৃক বালির পিণ্ডদানের উল্লেখ পাইয়া থাকি।

"চাউলের পিণ্ড না পাইয়া ময়না বালুর পিণ্ড দিল।
আপনায় গোঁসাইর নামে প্রণাম করিল।"

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণের ১ম খণ্ডের ৪৭ পৃষ্ঠায় পাদটিকায় প্রদত্ত পাঠ)।

---

* মায়ের দুটি স্তন বন্দ অক্ষয়-ভাণ্ডার।
গয়া-কাশী গিয়া যায় শোধিতে নারি ধার।
—মৈমনসিংহ গীতিকা পৃঃ—দস্যু কেনারামের পালা।

"বালির পিণ্ড" প্রসঙ্গ লইয়া রচিত একটি পালা ইতঃপূর্ব্বে বটতলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার ভণিতাতে দ্বিজ-লক্ষ্মণের নাম উল্লেখ আছে। আমাদের সংগৃহীত গানটি অনেক সংক্ষিপ্তাকার হইলেও অপেক্ষাকৃত সুন্দর। নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটি অংশের সহিত আমাদের সংগৃহীত গানটির তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে।

উহার প্রারম্ভে আছে,—

"প্রাতঃকালে গা তুলিলেন কমল-লোচন।
লক্ষ্মণে ডাকিয়া কিছু বলেন বচন।
অভাগিয়া রাম আমি বৃথা জন্মেছিনু।
পুত্র হইয়া পিতার কার্য্য করিতে নারিনু।
ভরত পিতার কার্য্য করিতে লাগিল।
আমি না পারিলাম জন্ম অকারণে গেল।
লক্ষ্মণ বলেন গোসাই করি নিবেদন।
যত কিছু দেখ প্রভু কপালে লিখন।"

তুলসীর প্রতি অভিশাপ,—

"সীতা বলে তুলসীর বড় অহঙ্কার।
সাক্ষী দিলে কিবা ক্ষতি হইত তোমার।
স্ত্রী হইয়া থাক তুমি মাথার স্বামীর।
এই অহঙ্কারে সাক্ষী না দিলে আমার।"
* * *
সাক্ষী নাহি দিলে তুমি ঘটালে বিপাক।
আজি হ'তে হও তুমি চাঁপানটে শাক।
* * *
শ্মশানে মশানে জন্ম হইবে প্রচুর।
আজি হ'তে তোমার মাথায় মুতিবে কুকুর।"

ব্রাহ্মণের প্রতি অভিশাপ,—

"সীতা বলে শুন তবে ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
সাক্ষী নাহি দিলে তুমি হইয়া নিষ্ঠুর।
দানেতে আকুল হবে কহিলাম তবে।
সদা ভিক্ষাজীবী হয়ে বিদেশে বেড়াবে।"

গান দুইটির মধ্যে ঘটনাগত পার্থক্যও বেশী কিছু আছে।

"নিমাই সন্ন্যাস" গানটিতে চৈতন্য মহাপ্রভুর গৃহত্যাগের সময় শচী দেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সেই মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রকটিত করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। এইটির মধ্যে "কেঁদে বলে বিষ্ণুপ্রিয়ে, কোথা গেল প্রাণপ্রিয়ে, প্রেয়সীরে রেখে শূন্য ঘরে, ত্বরিতে জ্বালিয়ে বাতি, খোঁজে রাণী ইতিউতি, গৌরাঙ্গের উদ্দেশ না পায়" প্রভৃতি অংশগুলি বেশ হৃদয়গ্রাহী। আলোচ্য গানটির (১) "শয়ন-মন্দিরে ছিল, নিশাভাগে কোথা গেল, মোর মুণ্ডে বজ্র পড়িল" এবং (২) "ত্বরিতে জ্বালিয়ে বাতি, খোঁজে রাণী ইতি উতি" এই পংক্তি দুইটি বৈষ্ণব পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষের পদে পাওয়া যায়। (শ্রীশ্রীপদকল্পতরু—সাহিত্য-পরিষদ সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা)।

রাবণবধ গানটিতে কৃত্তিবাসের বর্ণনাকেই অল্প লেখাপড়া জানেন, এমন কোনও কৃষক-কবি গানের সুবিধার জন্য এইরূপ রূপান্তরিত করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে প্রদত্ত গান কয়টি শ্রীমান্ বলরাম হাজরার ঐকান্তিক চেষ্টায় পোড়াদহের নিকটবর্ত্তী কামারডাঙ্গা হইতে সংগৃহীত। এগুলি সংগ্রহের মূলেও পূর্ব্বোক্ত শ্রীমান্ কান্তিভূষণের অনেকখানি আগ্রহ নিহিত আছে।

বালির পিণ্ড

পিতৃসত্য করতে পালন, শ্রীরাম করেন বনে গমন,
সঙ্গে লক্ষ্মণ আর সীতা সতী।
যেয়ে পঞ্চবটী-বনে, কুটীর বেঁধে তিন জনে,
হয়ে আছেন বনের বসতী।
শ্রীরাম বলেন ভাই লক্ষ্মণ, কি করি উপায় এখন,
আজি পিতার সপিণ্ডকরণ।
ভরত করিছে রাজ্য, আমি হলাম পিতৃত্যাজ্য,
বৃথা জন্ম সংসারেতে স্নেহ।
কেন আমি জন্মেছিলাম, পুত্র হয়ে কি করিলাম,
মোর মত অভাগা নাহি কেহ।
এত বলি রঘুমণি, কাঁদিয়ে ব্যাকুল তিনি,
লক্ষ্মণ বলে প্রবোধ-বচন।
বিধি যাহা লেখেন ললাটে, কালে দাদা তাই ঘটে,
সকলই হয় কপালে লিখন।
রাজা হয়ে সিংহাসনে, বসিবেন সীতা সনে,
আমি দাদা হব ছত্রধারী।
কত আশা মনে ছিল, বিধি তাহা না ঘটাল,
বনে এলাম গাছের বাকল পরি।
খেদ করি দুই ভায়ে, কুটীরেতে গণ্ডী দিয়ে,
বনফল আনিবারে গেল।
হেথা দশরথ রাজন, ব্রহ্মলোক হ'তে তখন,
বনমাঝে সীতার কাছে এল।
ডাকে দশরথ রাজন, কোথা বাপ রাজীবলোচন,
আয় বাপ দেখিব নয়নে।
দশরথের ডাক শুনে, সীতাদেবী ভাবে মনে,
লুকাইল কুটীরের কোণে।
রাজা বলে আপন মনে, তোমাদের মা দিয়ে বনে,
ব্রহ্মলোকে আছি গো মা আমি।
আমার ব্রহ্মলোক লাগে না ভাল, দেখতে এলাম নীলকমল,
সে নীলকমল কোথা শুনি।
সীতা বলে কাতরেতে, কোন্ দেব এলে ছলিতে,
ছলনা বুঝিতে নারি আমি।
পার হয়ে গণ্ডীরেখা, এসে যদি কর দেখা,
তবে জানি শ্বশুর বটে তুমি।
পার হয়ে গণ্ডীরেখা, আসিয়ে দিলেন দেখা,
প্রণাম করিল উঠে সীতা।
রাজা বলে মা জানকী, কোথা আমার কমল-আঁখি,
রাম-লক্ষ্মণ গেছে মা গো কোথা।
সীতা বলে ভাই দুজনে, প্রভাতেতে গেছে বনে,
বনফল আনিবার তরে।
শুনিয়ে জানকীর কথা, মরমে লাগিয়ে ব্যথা,
ভেসে যায় নয়নের নীরে।

যে থাকিবে সিংহাসনে, সে রাম আমার থাকে বনে,
বাকল প'রে হল জটাধারী।
বাপ হয়ে কাল হলাম, মায়ীর কথায় বনে দিলাম,
কলঙ্ক রাখিলাম জগত ভরি।
এক বৎসর পিণ্ডি বিনে, আছি গো মা অনশনে,
সীতা বলে দেবর ভরত আছে।
রাজা তখন বলে বাণী, থাকিতে মোর রঘুমণি,
পিণ্ড অধিকারী ভরত পাছে।
বল ওগো মা জানকী, কখন্ আসবে কমল-আঁখি,
সময় অতীত হয়ে যায় গো মা।
বলি আমি তব ঠাঁই, রাম দেখা দিবে নাই,
তুমি আমার পিণ্ড দাও মা খায়।
সীতা বলে কেমন হয়, পুত্র থাকৃতে বধূ নয়,
রাজা বলে রামের অঙ্গ তুমি।
তুমি ক'রে পিণ্ডদান, শীতল কর আমার প্রাণ,
পিণ্ডদানের আজ্ঞা দিলাম আমি।
সীতা বলে কই তোমারে, কিছু আমার নাই্ক ঘরে,
কিসের পিণ্ডি দিব দেহ বলি।
দশরথ বলে তখন, শুন গো মা আমার বচন,
পিণ্ড দেহ ফল্গুনদীর বালি।
সীতাদেবী বলে রাজন, ক্রোধ কেন কর রাজন,
ক্ষণেক বিলম্ব কর তুমি।
রামচন্দ্র আসি ঘরে, পিণ্ড সে দিবে তোমারে,
পিণ্ড খেয়ে হও স্বর্গবাসী।
বধূ হয়ে শ্বশুরের হাতে, বালির পিণ্ডি দিই কি মতে,
পিণ্ডিদানে অধোগতি হব।
রাজা বলে কাতরেতে, রাগ নাহি অন্তরেতে,
হস্ত পাতি লয়ে আমি যাব।
দেখি রাজার কাতরতা, সাত পাঁচ ভাবে সীতা,
উপনীত ফল্গুনদীর তীরে।
স্মরণ করে ভাবে জানকী, কি বলিবে কমল-আঁখি,
পিণ্ডদান করিব শ্বশুরে।
এত বলি বিধুমুখী সম্মুখে তুলসী দেখি,
বলে তুলসী সাক্ষী থাক তুমি।
ফল্গুনদী সাক্ষী দিও, বটবৃক্ষ সাক্ষী হয়ো,
শ্বশুর-হস্তে পিণ্ড দিব আমি।
নামিয়া ফল্গুর জলে, সীতাদেবী বালি তুলে,
হেনকালে মিলল ব্রাহ্মণ।
সীতা বলে ঠাকুর দাঁড়াও, এখন তুমি মন্ত্র বলাও,
শ্বশুরকুলে পিণ্ড করি দান।
ব্রাহ্মণ তখন মন্ত্র বলে, সীতাদেবী পিণ্ড তুলে,
দশরথ রাজার হাতে দিল।
হস্ত পাতি লয়ে রাজন, বালির পিণ্ডি করেন ভক্ষণ,
বাবার পুরুষ হস্ত পাতি নিল।
পিণ্ড লয়ে বলে রাজন, কৃতার্থ মা করলে যেমন,
জন্মে জন্মে রামকে সেবা কর।

খুসী হয়ে রাজা তখন, বৈকুণ্ঠে করিল গমন,
সীতাদেবী কুটীরেতে এল।
ফল হাতে দুভাই এসে, কুটীরের দ্বারে ব'সে,
ভোজ্যবস্তু সীতারে দেখাল।
ধীরে ধীরে রঘুমণি বলে গো জনক-নন্দিনী,
বসন ভিজা দেখি কি কারণ।
যোড় করে সীতা বলে, ফল জন্যে তোমরা গেলে,
এসেছিল দশরথ রাজন।
বালির পিণ্ডি দিছি তারে, গিয়েছেন বৈকুণ্ঠপুরে,
শ্রীরাম বলে শুন ভাই লক্ষ্মণ।
ভুবনবিখ্যাত পিতা, তার অপমানে কথা,
সীতাদেবী বলে কি কারণ।
কথা যদি মিথ্যা হয়, সীতাকে বর্জ্জন নিশ্চয়,
করিব যে কহিলাম আমি।
লক্ষ্মণ বলে কেন মাতা, কহিলে গো মিথ্যাকথা,
রাম-নিধিহারা থাক তুমি।
কেঁদে বলে সীতা তখন, বলি না গো মিথ্যা বচন,
পিণ্ডি দিছি সাক্ষী আছে তার।
এমন সময় কালে, সেই বিপ্র আসি মিলে,
সীতা বলে ইনি সাক্ষী মোর।
দান নাহি পায় ব'লে, দ্বিজ সাক্ষী নাহি দিলে,
সীতাদেবী কেঁদে কয় তখন।
তুলসী আমার সাক্ষী আছে, শুন দেওর তার কাছে,
দেখি তুলসী কি বলেন বচন।
রাম বলে তুলসী কহ, দেখে থাক সাক্ষী দেহ,
অহংকারে সাক্ষী নাহি দিল।
কাতর হয়ে বলে সীতা, কও তুলসী সত্যি কথা,
কোন উত্তর তুলসীর না পেল।
সীতা বলে রামের কাছে, ফল্গুনদী সাক্ষী আছে,
এত শুনে ফল্গুকে সুধায়।
তুলসী আর ফল্গু তখন, মন্ত্রণা করয়ে দুজন,
রামের কাছে সাক্ষী নাহি দেয়।
রামচন্দ্র বলে তখন, মিথ্যা হ'ল সীতার বচন,
ভাল করে সুধাও রে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ বলে মা জানকী, হেলা করি কমল-আঁখি,
বল হারাইলে কি কারণ।
কাঁদিয়ে জানকী তখন, ফল্গুকে করেন স্তবন,
ফল্গু তখন না চাহিল ফিরে।
বটবৃক্ষ পানে চেয়ে, বলে মা কাতর হয়ে,
বটবৃক্ষ সাক্ষী দেহ মোরে।
কেঁদে কয় জনক-নন্দিনী, এই সাক্ষী রঘুমণি,
রাম কহে বুঝিব এবার।
মিথ্যা হ'লে এইবারে, বর্জ্জন নিশ্চয় তোমারে,
শুনে সীতা কাঁপে থর থর।
সীতার চক্ষে দেখে ধারা, বটবৃক্ষ বলে তারে,
কেঁদ না মা জনক-নন্দিনী।

এসেছিল নৃপমণি, পিণ্ড খেয়ে গেলেন তিনি,
শুন প্রভু রাম রঘুমণি।
বৃক্ষমুখে শুনে বাণী, অজ্ঞান হলো রঘুমণি,
কাঁদিয়ে অস্থির হয়ে বলে।
আমি রাম অভাগিয়া, কি করিলাম পুত্র হয়্যা,
বধূ হয়ে তুমি পিণ্ড দিলে।
তুমি সতী ভাগ্যবতী, বারায় পুরুষের গতি,
বধূ হয়ে তোমা হতে হ'ল।
কেঁদে যেয়ে রাম তখন, বৃক্ষে করে আলিঙ্গন,
বৃক্ষ তখন চরণে পড়িল।
সীতা বলে বৃক্ষ তুমি, তোমার কাছে ঋণী আমি,
তোমার ঋণ শুধিব কেমনে।
তোমায় আমি দিলাম বর, আজ হ'তে হও অমর,
মহাতীর্থ হলো তোমার স্থানে।
বালির পিণ্ড যারে দিবে, তার বাস স্বর্গে হবে,
বর দিয়া তুলসী দেখিল।
তুলসী তুমি অহংকারে, সাক্ষী নাহি দিলে মোরে,
সাক্ষী দিলে কিবা ক্ষতি ছিল।
থাক স্বামীর মাথার পরে, অহংকারে চাও না ফিরে, *
সাপ দিব কে রক্ষা করিবে।
যেমন ঘটালে বিপাক, তেমনি হও নটের শাক, †
শ্মশানে-মশানে প্রচুর জন্মিবে।
তোমার মস্তক'পরে, কুকুর দিবে প্রস্রাব ক'রে,
সীতার শাপে তুলসীর দায়।
কাঁদিয়া তুলসী তখন, ধরিল সীতার চরণ,
বলে লক্ষ্মী রাখ গো আমায়।
সীতা বলে আমার বচন, মিথ্যা না হইবে কখন,
তবু বিষ্ণু করিবে গ্রহণ।
ফল্গুকে বলেন তখন, দুরাচার তুমি যেমন,
রসাতলে করহ গমন।
ফল্গু কেঁদে তখন কয়, রক্ষা কর মা আমায়,
সীতাদেবী বলেন তখন।
অন্তঃশীলা তুমি হবে, বালি খুঁড়লে জল পাবে,
সে জলেতে হবে পিণ্ডদান।
ব্রাহ্মণকে বলেন তখন, তুমি ঠাকুর নিদয় যেমন,
তোমার উদর কভু না পূরিবে।
যত আনবে তত নাই, না মিটিবে খাই খাই,
দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিবে।

শ্রীরাম কুটীরে আসি, বনফল রাশি রাশি,
পিতার উদ্দেশে করেন দান।
পূর্ণচন্দ্রের এই নিবেদন, পদে যেন থাকে এ মন,
অন্তিমকালে দিও প্রভু স্থান।

রাবণ-বধ

রামজয় শব্দ করি, ডাকে বানর সারি সারি,
মার মার বলে কেহ ধর।
শ্রীরাম বলেন রাবণ, কি ভাবিছ ব'সে এখন,
মরণ নিকটে এল তোর।
এত বলি ধনু নিল, ধনুকেতে গুণ দিল,
শ্রীরাম-রাবণে যুদ্ধ হয়।
হইল যুদ্ধ বিষম, নাহি যায় উহা গণন,
মহাসুখে বাণবৃষ্টি হয়।
শূন্যপথে অমরগণ, করে যুদ্ধ নিরীক্ষণ,
মৃত্যুবাণ রাম ধনুকে জুড়িল।
হংসগতি বাণের মুখে, দেবগণ বাণ দেখে,
বাণ দেখে চমৎকার লাগিল।
কনক-রচিত বাণ, ভুবন প্রকাশে জন,
বাণের মুখে গুপ্ত অগ্নি রহে।
পশুপতি বসেন তাই, পবনেতে বাণ চালাই,
উনপঞ্চাশ পবনেতে বহে।
কৃষ্ণবর্ণ বাণ গোটা, সকল অঙ্গ জটাপটা,
বসুমতী বিনাশ হয় আজি।
সোনা ফুলের মালা দিয়ে, বাণগোটা সাজাইয়ে,
মন্ত্র পড়ি ব্রহ্মবাণ পূজি।
মহাদম্ভ করে বাণ, সঘনে গরজে জান
রাবণের উড়িল পরাণ।
রাবণ রাজা বাণ চিনিল, মৃত্যুবাণ সে জানিল,
এই বাণে বাহির হবে প্রাণ।
বিশ্বামিত্র ঋষি বাণ, রঘুনাথ ছাড়ি দেন,
রাবণ রাজা ভূমে পড়ি যান।
রাজা ছট ফট্ করে, পড়ে এই ভূমির পরে,
ব্রহ্মাদি দেবতা দেখে তায়।
ইন্দ্র চন্দ্র আর বরুণ, দেখিছে দেবতাগণ,
তেত্রিশ কোটি একত্রিত হয়ে।
যতেক দেবতাগণ, কাণাকাণি করে এখন,
এবারেতে মরিল রাবণ।
হস্ত পদ নাড়ে নাই, মরিল এবার নিশ্চয়,
কেহ বলে নাহিক মরণ।
কতবার মরে বেটা, আরবার বাঁচে এটা,
কপট ভাবেতে প'ড়ে আছে।
যদি রাবণ বাঁচে পুন, না রবে জীবন-প্রাণ,
মোদের ভাগ্যে কি জানি কি আছে।
অরি ভাবে নাহি যাব, অন্তরে বসিয়া রব,
চিন্তার ধমা [illegible]

---

* তুলসীপত্র বিষ্ণুর শিরোভূষণ এবং রাম স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার (কৃত্তিবাসী এবং অন্যান্য বাঙ্গালা রামায়ণে বাঙ্গালী রামকে স্বয়ং বিষ্ণু—অবতার হিসাবেই পাইয়াছে), তাই সীতা রামের মস্তকে তুলসীর অবস্থানের বিষয় উল্লেখ করিতেছেন।

† নটিয়া এক প্রকার গুল্মবিশেষ। ইহাকে যশোহর ও নদীয়া অঞ্চলে কাঁটানটে বলা হইয়া থাকে। ছেলেমেয়ে ভুলান ছড়া আছে,—"মা গো মা, তোমার জামাই এয়েছে। কাঁটানটে গাছের তলায় ব'সে রয়েছে।"

শিবদূত যমদূত কয়, মরেছে এবার নিশ্চয়,
রাবণ এবার মরিবে নিশ্চয়।
বাল্মীকি লেখেন রামায়ণে, মহাপরাণ করিবেন,
রাবণের নাহিক মরণ।
রাবণ মরিবে হেন, লেখা নাই রামায়ণে,
মরিবে না হেন লয় মন।
জানিল বাল্মীকি মুনি, পুরাণ অনুসারে তিনি,
রাবণ দুর্জ্জয় বীর হবে।
প্রকাশিয়া মৃত্যু তার, না লিখিল মুনিবর,
লিখিল সংক্ষেপে মরিবে।
রাম বলে ভক্তবর, রাজা দশানন মোর,
শাপে রাক্ষস হয়েছে এখন।
বাণাঘাতে অস্থির প'ড়ে আছে মহাবীর,
এইখানে দিব দরশন।
লক্ষ্মণ আইল রাবণ-পাশ, রাবণ কন সবিশেষ,
প্রভুরে দেখিতে ইচ্ছা আছে।
লক্ষ্মণ যাইয়া কয়, তোমারে দেখিতে চায়,
প্রভু গেল রাবণের কাছে।
রামে দেখে রাবণ কন, এস প্রভু নারায়ণ,
আমার এখন অস্থির পরাণ।
দয়া ক'রে নারায়ণ, মাথায় দেহ শ্রীচরণ,
পাপ দেহ করহ মোচন।
এতেক শুনিয়া রাম, মস্তকে দেন শ্রীচরণ,
পাপদেহ মুক্ত হইল।
সকলে তরিয়া গেল, মোরে দয়া না হইল,
রাবণ-বধ কৃত্তিবাসে রচিল।

নিমাই-সন্ন্যাস

জগত ব্যাপিত হরি, নবদ্বীপে অবতরি,
তেজে হরি মধুর বৃন্দাবন।
সন্ন্যাস ধরম করব বলে, জন্ম নিলে শচীর ঘরে,
ধন্য শচীর মানব-জীবন।
শয়নেতে বিষ্ণুপ্রিয়ে, পরমসুখে গৌর লয়ে
গৌরাঙ্গেতে অঙ্গ মিশাইয়ে।
গৌরাঙ্গ জাগিছে মনে, নিদ্রা না হয় দুনয়নে,
প্রভাতকালে উঠিল কাঁদিয়ে।
কেঁদে বলে বিষ্ণুপ্রিয়ে, কোথা গেল প্রাণপ্রিয়ে,
প্রেয়সীরে রেখে শূন্য ঘরে।
আমি হই তোমার দাসী, শ্রীচরণে অভিলাষী,
প্রাণ-প্রেয়সী ব'লে ডেক মোরে।
আগে না জানিয়ে মনে, এ দাসী ত্যজি এখনে,
মনোবাঞ্ছা পূরইব কারে।
চোখের জলে বুক ভাসে, শচীর আঙিনায় আসে,
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়ে।
শয়ন-মন্দিরে ছিল, নিশিভাগে কোথা গেল,
মোর বুকে বজ্র পড়িল।
হাহা কার শব্দ শুনি, নিদ্রা ভাঙ্গি শচীরাণী,
শচীমাতা কাঁদিয়া উঠিল।
ত্বরিতে জ্বালায়ে বাতি, খোঁজে রাণী ইতিউতি,
গৌরাঙ্গের উদ্দেশ না পায়।
এ খাট অঙ্গুরী বালা, গোরাচাঁদের কণ্ঠমালা,
খাট পালঙ্গ সোণার দোলায়।
কেঁদে বলে শচীরাণী, কোথা নিমাই গুণমণি,
তার শোকে মোর জীবন জ'লে যায়।
অমূল্য রতন ছিল, কোন্ বিধি হরে নিল
পরম পুতুলী গোরা রায়।
নিমাই আমি তোর জননী, শোকে প্রাণ অনাথিনী,
শোকাকুলে ভাসালি আমায়।
মায়ের বুকে দিয়ে ছুরি, সন্ন্যাসে যায় গৌরহরি,
এড়াইয়ে সংসারের দায়।
কাঞ্চননগর-মাঝে, মনোহর বৃক্ষ আছে,
তার ছায়ায় বসে গোরা রায়। *
যে দেখেছে দুনয়নে, সে পড়েছে ধরাসনে,
প্রেমে পুলকিত অতিশয়।
নগরের নরনারী, গৃহকর্ম্ম পরিহরি,
গৌরাঙ্গ দেখিতে সবে যায়।
জলে স্থলে কোন নারী, কক্ষেতে কলসী করি,
সুরধুনী-তীরেতে দাঁড়াল।
কেহ বলে সহচরী, হেন রূপ নাহি হেরি,
নদেপুরে উদয় হইল।

নারী লোকের বাহার

শুন শুন সর্ব্বজন, করি এক নিবেদন,
নারী-লোকের কত যে বাহার।
সবে জল আনতে যায়, বাঁকপাতা মল দিয়ে পায়,
গুজরি পঞ্চম তেউরি তার আর।
মাজার উপর চন্দ্রহার, হাতেতে বসন্তবাহার, †
আলগা ছোড়ান ‡ অঞ্চলেতে বাঁধা।
অলঙ্কার কত গায়, মনে করে রাখা না যায়,
দেখতে যেন ঠিক যেন সেই রাধা।
তাদের কথা মনে হলে, আন কার্য্য যাই ভুলে,
নাম শুনিলে মন প্রাণ হরে।

---

* "কাঞ্চন নগরে এক বৃক্ষ মনোহর।
সুরধুনীতীরে ছায়া শীতল সুন্দর।
তার তলে বসিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর।
কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্ত কলেবর।"
—পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ।

† এক প্রকার চুড়ীর নাম।

‡ চাবি। চাবির দ্বারা কুলুপ (তালা) ছাড়ান যায়, এই জন্ত চাবিকে "ছুড়ান" বা "ছোড়ান" বলা হয়। যশোহর জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই এবং নদীয়া জেলার অনেক স্থানে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে উক্ত শব্দটির বহুল প্রচলন আছে।

কারো নাম বিনোদিনী, রাজ বিরজা রাধামণি,
কথা বলে অতি ছোট করে।
সারদা বরদা দিদি, নীরদা ক্ষীরদা খুদি,
জ্ঞানদা প্রাণদা সুকুমারী।
কামিনী দামিনী ধুমা, পুষ্প আর অন্নদা বালা,
রাজমোহিনী কৃপা রাজেশ্বরী।
চিকণ কালা চিকণ মালা, মুণ্ডমালা কিরণবালা,
ষোল কলা পূর্ণ মধুমালা।
সোণা ভোলা গিরিবালা, কণ্ঠমালা ব্রজবালা
প্রাণ উতলা কমলা বিমলা।
বিধুমতি সুবদনী, মনোমোহিনী বিনোদিনী,
দুর্গা লক্ষ্মী কালী মহামায়া।
ইহাই বলে পাগলা শশী, মনে করে অভিলাষী
কবে তারা দিবেন পদছায়া।

গোষ্ঠে গমন

শুন শুন সর্ব্বজন, করি এক নিবেদন,
গোষ্ঠলীলা শুন দিয়া মন।
রজনী-প্রভাতকালে, ডাকে কৃষ্ণ মা মা ব'লে,
ধেয়ে যায় যশোদা তখন।
কোলে লয়ে কৃষ্ণধনে, চুমো দেন চাঁদবদনে,
অঞ্চলেতে মুছায় বদন।
কৃষ্ণমুখে স্তন দিয়ে, ক্ষীর সর নবনী নিয়ে,
থরে থরে করিল সাজন।
স্তনদুগ্ধ পান হলে, মুখে দিচ্ছে ননী তুলে
দে মা দে মা বলে কৃষ্ণরায়।
ননী দিয়ে চাঁদমুখে, কৃষ্ণমুখ নেহারে সুখে,
কৃষ্ণমুখ পানে চেয়ে রয়।
যশোদার গলা ধরি, বলে কৃষ্ণ ছলা করি,
আজি আমি গোষ্ঠে যাব না মা।
রাণী বলে ওরে কানু, কেন চরাবে না ধেনু,
কি অসুখ হয়েছে বল না।
কৃষ্ণ বলে গোষ্ঠের কথা, কইতে মা গো লাগে ব্যথা,
যে কষ্টেতে গোচারণ করি।
বলাই দাদা গোঠে লয়ে, দুষ্ট গাভী মোরে দিয়ে,
ভাল গাভী লয় ভাগ করি।
দুষ্ট গাভী ধেয়ে বেড়ায়, পরের ক্ষেতে শস্য খায়,
ফিরাইতে কাঁটা ফোটে পায়।
ক্ষেতওয়ালা আসি পরে, গালি দেয় মা কত মোরে,
দাদারা সব হাসিয়ে পলায়।
কাঁধে চড়া পণ করে, খেলা করে লয়ে মোরে,
হেরে যাই মা একদিন পারি না।
হেরে গেলে কাঁধে উঠে, আমার বক্ষ যাই মা ফেটে,
ছোট বলে কেউ দয়া করে না।
যদি বলি খেলব নারে, বলাই দাদা ধরে মারে,
এখনো মা আছে সে বেদনা।

কৃষ্ণ-মুখে শুনে বাণী, নয়নজলে ভাসে রাণী,
বলে তোরে আর গোঠে দেব না।
খেলনা বানায়ে দিব, আমরা সবে খেলা দেখব,
ঘরে বসে খেল রে বাপধনে।
ইচ্ছামত বাজাও বেণু, শুনব মোরা ওরে কানু,
যে রবেতে ধেনু ফিরাও বনে।
এত বলি নন্দরাণী, কোলে লয়ে নীলমণি,
আছেন কৃষ্ণ-মুখপানে চাহিয়ে।
হেনকালে বলাই এল, সঙ্গে লয়ে রাখালদল,
দাঁড়াইল চৌদিকে ঘেরিয়ে।
বলাই বলে ওরে কানু, পূর্ব্বদিকে উদয় ভানু,
হাম্বারবে ডাকে ধেনুগণে।
গোষ্ঠে যাবার বেলা হল, কখন্ গোষ্ঠে যাবি বল,
ধেনু ব'সে চেয়ে তোর পানে।
শুনে বলে নন্দরাণী, গোষ্ঠে দিব না নীলমণি,
আজকার মত যা রে গোপাল।
আমি গত নিশি ভোরে, দুঃস্বপ্ন দেখিছি ওরে,
ভেঙ্গেছে যেন দুখিনীর কপাল।
কালীদহের বিষ-জলে, হারায়েছি প্রাণগোপালে,
গোপাল কত কেঁদেছে মা ব'লে।
তাই বলি ওরে বলাই, আজকের মত যা রে সবাই,
মোর দুখিনীর ধন থাক্ কোলে।
রাণীমুখে শুনে কথা, বলাই পেয়ে মনোব্যথা,
বলে ও মা এ কি কথা শুনি।
তোর গোপালে লয়ে গোঠে, তরি মা কত সঙ্কটে,
বিপদেতে রাখে নীলমণি।
এক দিন মা সব রাখালে, কালীদহের বিষ-জলে,
খেয়ে মরেছিল গো জীবনে।
ও মা গোপাল কত গুণ ধরে, মরিলে বাঁচাতে পারে,
বাঁচাইল সব রাখালগণে।
আর দিন মা সব রাখালে, মরেছিল ক্ষুধানলে,
অন্ন ভিক্ষা করে বাঁচায় প্রাণে।
ও মা কৃষ্ণ এত গুণের ভাই, কৃষ্ণ ছেড়ে গোঠে কিবায়,
কৃষ্ণ ছেড়ে যাব না আর বনে।
আর এক কথা বলি শুন, হাঁসে চ'ড়ে আসে এক জন,
চারি মুখ তার অদ্ভুত গঠন।
গলে বাস জোড় হাতে, নীলে করে কত যত্নে,
গোপাল ফিরেও না দেখে বদন।
একটি বুড়ো ষাঁড়ে চড়ি, সে যেন মা রজতগিরি,
পাঁচ মুখ তার কপালে আগুন।
পরণে তার বাঘের ছালা, সাপে করে গায়ে খেলা,
ফণা ধরে থাকে সাপগণ।
পড়ে বুড়ো পদতলে, ভেসে যায় নয়নজলে,
গোপালে লয়ে কত নৃত্য করে।
তার সঙ্গে আসে এক নারী, সে যেন মা পূর্ণগিরি,
সে আবার মা দশ হস্ত ধরে।

কোলে লয়ে তোর গোপালে, চুম্বন দেয় বদন-কমলে,
দশ হাতে ননী দেয় মুখে।
আমি সব রাখাল লয়ে, দূর থেকে দেখি চেয়ে,
তোর গোপাল ননী খায় সুখে।
গোপালের বাঁশীর সুরে, ধেনু বৎস আপনি ফিরে,
বড় সুখে খেলি মোরা বনে।
রাণী বলে বলাইরে, কৃষ্ণ ছেড়ে যাবি না রে,
তবে দাঁড়া সাজাই কৃষ্ণধনে।
রাণী তখন ব্যস্ত হয়ে, অলকা-তিলক নিয়ে,
কৃষ্ণ-অঙ্গ করেন সাজন।
পরাইয়া পীতধড়া, মাথায় দিল মোহন চূড়া,
গলে দিল বনফুলের মালা।
করে দিয়ে মোহনবাঁশী, কেঁদে বলে ব্রজবাসী,
আশীর্ব্বাদ কর এই বেলা।
কাত্যায়নী রেখো চরণে, গোপাল চল্লো গোচারণে,
ষষ্ঠী শুভচুন্নী শুভকর। *
যত আছে দেবগণে, সবাই রেখ চরণে,
গোপালের বিঘ্ন সবে হর।
হর পূজি বিল্বদলে, গোপাল পেয়েছি কোলে,
সে ধন বলাই দিলাম রে তোর কোলে।
আপন ছোট ভাই ব'লে, আগে ক'রে নিস্ গোপালে,
রোদ হলে ছায়া দিস্ রে শিরে।
গোপালের চাঁদবদন, ঘামে না যেন দেখিস্ কখনো,
ঘর্ম্ম হলে বাতাস করিস্ গায়।
ক্ষুধার সময় হলে, বনফল দিস রে তুলে,
জল দিস্ রে তৃষ্ণার সময়।
দূর-বনে চরাসনে ধেনু, কাছে বসে শুন্‌বো বেণু,
সকাল ক'রে এনে দিস গোপালে।
জীবনধন তোর সঙ্গে গেল, খালি দেহ প'ড়ে রল.
প্রাণধন এনে দিস্ রে কোলে।
এত বলি নন্দরাণী, গোষ্ঠে দিল নীলমণি,
বলাই সনে কৃষ্ণ গোঠে যায়।
ধেনুগণ লয়ে সঙ্গে, চলে কৃষ্ণ মহারঙ্গে,
পূর্ণচন্দ্রের আনন্দ হৃদয়।
ধেনুগণ বৎস লয়ে, গোষ্ঠ পানে চলে ধেয়ে,
তার পাছে কৃষ্ণ যান ধীরে।
নবীন সূর্য্যের কিরণ, লাগবে ব'লে কৃষ্ণ-বদনে,
ডাল ভেঙ্গে বলাই ধরে শিরে।
ঘোর বনে প্রবেশিয়ে, ধেনু বৎস ছেড়ে দিয়ে,
বলাই ডাকে আয় রে সুবল তোরা।
আজকে খেলা করব সবাই, বাদ থাকবি কেবল কানাই,
কানু সনে খেলবো না আজ মোরা।
ও বড় আদরের ছেলে, আমরা মারি ধরি ব'লে,
গালি খাওয়ায় মার কাছেতে কয়ে।

তাই তো বলি ওরে সুবল, কৃষ্ণ থাকলে বাধিবে গোল,
কৃষ্ণকে দাও দল হ'তে তাড়িয়ে।
বলাই-মুখে শুনে বাণী, যোড় হস্তে নীলমণি,
বলে দাদা কি করিলাম আমি।
আর যদি বলি মারে, তখন দাদা মের মোরে,
আজকে দাদা ক্ষমা কর তুমি।
কেঁদে যেয়ে কৃষ্ণ তখন, ধরে বলরামের চরণ,
বলে দাদা যাব কোথাকারে।
দেখে কৃষ্ণ পদতলে, বলাই ভাসে নয়ন-জলে,
কৃষ্ণে তুলে তখন বুকে ধরে।
বলে ও ভাই নীলরতন, তুই রে জীবনের জীবন,
জীবন-ধন রাখি হৃদে ধরি।
মোরা সব রাখালগণ, চিনিনে ভাই তুই কি ধন,
রাখাল-স্বভাবে তোরে মারি।
কোলে লয়ে কৃষ্ণধনে, বলাই বলে রাখালগণে,
বনফুল আন রে তুলে।
মনসাধে বনফুলে, মালা গেঁথে দিব বলে,
রাখাল রাজা হইবে গোপালে।
রাখালগণ দলে দলে, বন-ফল বনফুলে,
চেয়ে চেয়ে বন-ফল আনে।
যে ফল মুখে লাগে মিষ্ট, আর খাব না খাবে কৃষ্ট,
অমনি দেয় শ্রীকৃষ্ণের বদনে।
নানা জাতি নানা ফুলে, মালা গেঁথে দিল গলে,
রাজ-গোষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র ভণে।

ছড়া (ফুলশুদ্ধি)

ফুল ফুল কর বালা ফুলের কর নাম।
কোন্ ফুলেতে তুই তোমার কেষ্ট বলরাম।
কোন্ ফুলে তুই তোমার অমিয় সাগর।
কোন্ ফুলে তুই তোমার সন্ন্যাসী নাগর।
ফুল ফুল করি ভক্ত ফুলের শোন নাম।
কদম-ফুলে তুই আমার কেষ্ট বলরাম।
পদ্মের ফুলে তুই আমার অমিয় সাগর।
ধুতরার ফুলে তুই আমার সন্ন্যাসী নাগর।
কালীদহে তুল্লাম ফুল জাহ্নবীতে ধুলাম।
গঙ্গাজলে শুদ্ধ ফুল গাজনে আনিলাম।

দেহশুদ্ধি

স্বর্গ হ'তে এলাম আমি মর্ত্ত্যে আমার স্থিত।
মায়ের গর্ভেতে পেলাম এ সব শরীর।
দক্ষিণ-শিয়রী মায়ের গর্ভে ছিলাম হয়ে ঊর্দ্ধবাসী।
যোগী কুলে জন্ম নিয়ে হলাম সন্ন্যাসী।
মহাদেবের শিষ্য হই হই তার চেলা।
বৈষ্ণব ঋষি গুরু আমার গলে দিল মালা।
নিদ্রা ঋষি গুরু আমার মাজে আর চাড়ে।
জিহ্বা ঋষি গুরু আমার আছড়িয়ে মারে।

---

* "সুবচনী" শব্দের অপভ্রংশ! বাঙ্গালিনীদিগের নিকট এই দেবী খুবই সুপরিচিতা।

গোস্বামী কবি গুরু আমার ফুকারিল কাণ।
শোন রে অবোধ নর ইহার সন্ধান। [ক্রমশঃ।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পারস্য কাব্য-সাহিত্য

পৃথিবীর সাহিত্য ইতিহাসে এক পরমাশ্চর্য্য ঘটনা এই যে, প্রায় প্রত্যেক দেশেই কাব্য-সাহিত্য গদ্য-সাহিত্যের অগ্রে স্ফুরণ লাভ করিয়াছে। কোন কোন সাহিত্যে এমনও দেখা যায় যে, পদ্য-সাহিত্যের বহুদিন পরে গদ্য-সাহিত্যের শৈশব আরম্ভ হইয়াছে। পারস্য সাহিত্যের বেলাও উহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

সর্ব্বপ্রথমে কোন্ সময় পারস্য সাহিত্যে কাব্যলক্ষ্মী ভূমিষ্ঠা হন, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। প্রাচীন ঐতিহাসিকরা নানারূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন, উহার মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয়, কোন্‌টি অগ্রহণীয়, তাহার বিচার করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে।

দৌলতশাহ তাঁহার "তাজ কেরাতুস্ শোয়ারা" গ্রন্থে বলিয়াছেন, বাহারাম গোর (৪২০—৪৩০ খৃঃ) ও তাহার স্ত্রীর যুক্ত-প্রচেষ্টায় প্রথম পারস্য-কবিতার সৃষ্টি হয়। দৌলতশাহ আরও বলেন যে, ইয়াকুব লাইসের ক্রীড়ারত পুত্রের আনন্দপূর্ণ বাক্য হইতে পারস্য ছন্দ জন্মলাভ করিয়াছে এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকরা নানাবিধ মত ও প্রমাণ উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং পারস্য কাব্যের প্রথম জন্মদাতার নাম আমাদের কল্পনার বিষয় ব্যতীত স্থির-জ্ঞান-লব্ধ হইতে পারে না।

যাহা হউক, পারস্য কাব্যের জন্মকুলজি পরিত্যাগ করিয়া আমরা যে প্রথম কাব্যসাহিত্য পাই, তাহার রচয়িতা চারণ বারবাদ। সাসানীয় যুগে তিনি সম্রাট খসরু পরভিজের [৫৯০—৬২৭ খৃঃ] দরবারের গৌরব ছিলেন। এই বারবাদ ও দশম শতকের কবি রুদকীর মধ্যে যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। আদি যুগের অন্যতম কবি শরিক ই মুহাল্লাদি বারবাদ ও রুদকীর সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"From all the treasures hoarded by the Houses
Of Sasan and Saman, in our days
Nothing survives except the song of Barbad,
Nothing is left sare Rudogi's sweet lays."

প্রকৃতপক্ষে রুদকী হইতে পারস্য কাব্যসাহিত্যের আরম্ভ হয়। রুদকী জন্মান্ধ ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ কবিত্বশক্তির কথা শ্রবণ করিয়া সামানীয় বংশের বাদশা আমির নসরবিন আহমদ তাঁহাকে তাঁহার রাজ-কবির পদে বরণ করিয়াছিলেন, রুদকীর কবি-প্রতিভা ব্যতীত সঙ্গীতশক্তি অসাধারণ ছিল। রুদকীর কবিতার মধ্যে যে মতবাদের ছাপ পাওয়া যায়, উত্তরকালে সেই ধারার সহিত ওমর খাইয়ামের রুবাইয়াতে আমরা বহুল পরিমাণে সাদৃশ্য দেখিতে পাই। রুদকী পারস্য কাব্যকে আরবীর প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং তাঁহার সে চেষ্টা উত্তরকালে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। চাহার মাকালার রচয়িতা কবি নিজামী উরুজী কবি রুদকী সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সত্যই আশ্চর্য্যজনক। কবি রুদকী কবিত্বের মোহিনী শক্তিপ্রভাবে প্রবাসপ্রিয় সম্রাট নসরবিন আহমদকে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। উহার ইংরাজী তর্জ্জমা এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"The Juyi-Muliyan we call to mind,
We long for those dear friends long left behind.
The lands of Oxus toilsome though they be
Beneath my feet were soft as silk to me.
Glad at the friends return, the Oxus deep
Up to our girths in laughing waves shall leap.
Long live Bukhara! Be thou of good cheer!
Joyous towards thee hosteth our Amir!
The Moon's the prince, Bukhara is the sky;
O sky the moon light thee by and by!
Bukhara is the mead, the Cypress he;
Receive at last, O Mead, the Cypress tree."

রুদকীর স্বভাব-সুলভ সুকণ্ঠে পারস্যগজল যখন গীত হইয়াছিল, তৎশ্রবণে বাদশাহ মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

রুদকীর পরে আমরা কবি দকিকীর সাক্ষাৎ পাই। দকিকীর জীবন-মৃত্যু বড়ই শোচনীয়। দকিকী প্রতিভাশালী কবি ছিলেন, শাহনামার তিনিই আদি রচয়িতা। এক কথায় দকিকী যে কাব্যসূত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার অকাল-মৃত্যুর জন্য কবি ফেরদৌসি এই শাহনামা সমাপ্ত করেন। দকিকীর কবিত্ব-নিদর্শন আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহা সত্যই অপ্রচুর। রুদকী ও দকিকীর কাব্যমাত্র Quotation-এর ছলে অন্যান্য গ্রন্থকার যাহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহার বেশী আমাদের জানিবার সুবিধা নাই। তাঁহাদের কবিতার মুদ্রিত সংস্করণ সুদুর্ল্লভ।

দকিকীকে অনেক প্রাচ্যবিদ জরথু্ষ্ট্র ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ সপক্ষে তাঁহারা দকিকীর নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করেন—

"Of all that's good or evil in the world
Four things suffice to meet Daqiqi's need;
The ruby coloured lip, the harp's lament,
The blood-red wine, and Zorouster's creed."

কিন্তু সুধী ব্রাউন এইমতে সায় দেন নাই। অধ্যাপক নেক্তি বলিয়াছেন যে, এই কয়েক ছত্র হইতে দকিকীকে জরথু্ষ্ট্র ধর্ম্মাবলম্বী বিবেচনা করা সঙ্গত নহে।

তারিখুল উতবি গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, দকিকী নুহবিন মনসুরের রাজত্বকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। সমসাময়িকগণের মধ্যে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। আসাদ যখন কবি ফররোকীকে আমির মাহমুদের নিকট পরিচয় করাইয়া দেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "হে রাজন্! কবি দকিকীর মৃত্যুর পর কালের আঁখি ঈদৃশ কবি আর দর্শন করেন নাই।" সুতরাং দেখা যাইতেছে, কবি দকিকীর প্রতি শ্রদ্ধা কত দূর বেশী।

সামানীয় বংশের পতনের পরে গজনী বংশের অভ্যুত্থান হয়। গজনী বংশের শাসনকালে পারস্য কাব্য-সাহিত্যের যথেষ্ট পরিপুষ্টি সাধিত হয়।　　মৌলভী মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (এম, এ)।

কুম্ভ-মেলায়

আসন্ন 'কুম্ভ'-মেলার জন্ম দেশদেশান্তরের অধিবাসিগণ যেরূপ আগ্রহের সহিত প্রয়াগের ত্রিবেণী-সঙ্গমের দিকে ধাবিত হইতেছিল, ঠিক সেইরূপ আগ্রহ না থাকিলেও হিন্দুর পবিত্র তীর্থে জনসমাগমের বিচিত্র দৃশ্য দর্শনে অভিলাষী হইয়া যাত্রার জন্য কৌতূহল জন্মিল। কলেজ হইতে চারি দিন ছুটী পাওয়া গিয়াছিল এবং কাশী হইতে এলাহাবাদ ৮০ মাইলের বেশী নহে; সুতরাং দ্বাদশ বৎসর পরে আগত এই কুম্ভমেলা দর্শনের লোভ ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

সহপাঠী বন্ধু যোগেশের সহিত স্থির হইল যে, ১২ই মাঘ রবিবার প্রভাতে ৬টার সময় উভয়ে দ্বিচক্রযানে এলাহাবাদ যাত্রা করিব। কুম্ভের স্নান ১৫ই মাঘ বুধবার। যাহাতে এলাহাবাদে পৌঁছিয়া বিশ্রামলাভের পর বিস্তারিতভাবে সমগ্র মেলাটা উপভোগ করিতে পারি, সেই জন্য তিন দিন আগে রওনা হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বন্ধুর নিকট পূর্ব্বেই পত্র দিয়াছিলাম যে, আমরা শীঘ্রই তাঁহাদের 'অতিথি' হইব।

চাদর গায়ে লেখক ও তৎপার্শ্বে যোগেশ

যোগেশ রাত্রি থাকিতে থাকিতেই আসিয়া ডাক দিয়াছিল। প্রস্তুত হইতে যেটুকু বাকী ছিল, তাহা শেষ করিয়া লইলাম। ঠিক ৬টার সময় ১২ই মাঘ রবিবার প্রাতঃকালে স্ব স্ব দ্বিচক্রযানে আরোহণ পূর্ব্বক বাড়ী হইতে রওনা হইয়া পড়িলাম।

মাঘের আতঙ্কজনক বায়ু তখন বেশ জোরের সহিতই বহিতেছিল, সহরের বৈদ্যুতিক আলোগুলি তখনও নিবে নাই এবং রাস্তায় ক্বচিৎ দুই এক জন বাহির হইয়াছিল। সহর তখনও সুখ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন। পূর্ব্বদিকে ঈষৎ লোহিত আভাস। সুষুপ্ত পুরীর মধ্য দিয়া আমাদের দ্বিচক্রযান চলিতে লাগিল। সহর অতিক্রম করিয়া ২ মাইল যাইবার পর গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পাইলাম।

প্রথম ১০।১২ মাইল বেশ নির্ব্বিবাদেই যাওয়া গেল; কিন্তু বেলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনটি শত্রু আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহা বেশ স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিল। প্রথম শত্রু—প্রবল বিপরীত বায়ু। অনভিজ্ঞ লোকেরা দ্বিচক্রযানের যথেষ্ট প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, ইহা যেরূপ দ্রুতগামী, সেইরূপ সুখদায়ক। আমি তাঁহাদের এ কথার সম্পূর্ণ সমর্থন করি,—যদি না বিপরীত প্রবল বায়ুতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হয়। অভিজ্ঞ ভ্রমণকারীরা জানেন যে, সে সময় 'সাইকেল' চালান অপেক্ষা হাতে ধরিয়া হাঁটিয়া যাওয়া অধিক সুখকর। যাহা হউক, আমাদের দ্বিতীয় শত্রু দেখা দিলেন অজস্র এবং অগণিত পদাতিক যাত্রিদল। আমরা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং ইহাদের বিশেষত্ব এই যে, ইহারা ঠিক রাস্তার মধ্যস্থান অধিকার করিয়া যাইবে এবং ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়াও স্থান ত্যাগ করিবে না। ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ ইহাদের মধ্যে অনেকেই সাইকেল কখনও দেখে নাই এবং দ্বিতীয়তঃ যাহারা দেখিয়াছে, তাহারা ইহাকে ততটা ভীতিকর বস্তু মনে করে না। সুতরাং যত দায় আমাদেরই।

যাহা হউক, যাত্রীর ভিড়ে কষ্ট হইলেও এ সময়ের দৃশ্য যেরূপ সুন্দর বোধ হইয়াছিল, পূর্ব্বে তেমন মাধুর্য্য কখনও উপভোগ করি নাই। অন্য সময়ে যে রাস্তাকে জনশূন্য মরুভূমির ন্যায় দেখায়, তাহা সে সময়ে নানা বেশধারী, নানা প্রকৃতির এবং নানা আকারের লোকের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল। স্কন্ধে পুঁটলি ঝুলাইয়া, হস্তে এ দেশীয় লোটা এবং কম্বল লইয়া বিভিন্ন গ্রাম এবং সহরের অধিবাসীরা 'কুম্ভের' উদ্দেশ্যে উন্মুখ হইয়া চলিতেছিল। আর কোন দিকে ইহাদের দৃষ্টি ছিল না, কেবল একমাত্র লক্ষ্য—কুম্ভ ও প্রয়াগ-সঙ্গম। অনেকের চরণতল ক্রোশের পর ক্রোশ চলিবার ফলে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, অনেকে পায়ে কাপড় জড়াইয়া চলিতেছে, তবুও পৌঁছান চাই-ই—এ যে 'কুম্ভযোগ'—একবারে পূর্ণকুম্ভ। জানি না, কোন্ দৃঢ় বিশ্বাসে মনকে অনুপ্রাণিত করিয়া ইহারা এই কষ্টে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, হয় ত দার্শনিক তাহা বলিতে পারিবেন অথবা হয় ত তিনিও পারিবেন না। মাঝে মাঝে জটাধারী এবং ভস্মাচ্ছাদিত সাধুদলের সহিতও দেখা হইতে লাগিল। ইহারা হাতে চিমটার আওয়াজ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। খুব কম করিয়া ধরিলেও প্রতি মাইলে ২ শত যাত্রীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, ইহারা সকলেই পশ্চিমদেশীয় নর-নারী। এতদ্দেশীয়া স্ত্রীলোকেরা যে কিরূপ কষ্টসহিষ্ণু, তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ এইখানে দেখিতে পাইয়াছিলাম।

এইবার আমাদের তৃতীয় শত্রুর কথা বলিব। তৃতীয় শত্রু দেখা দিলেন দুই বিভিন্ন মূর্ত্তিতে—প্রথম মন্দগামী গোযানরূপে এবং দ্বিতীয় দ্রুতগামী 'বাসের' আকারে। পশ্চিমদেশের বিখ্যাত গরুর গাড়ী—যাহা বঙ্গদেশীয় গোযান অপেক্ষাও মন্দগামী, তাহা একসঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া প্রায় সমস্ত পথ ব্যাপিয়া যাত্রী

সঙ্গমের পথে জনতা

সহ অগ্রসর হইতেছিল—ইহাদেরও মুখ্য লক্ষ্য প্রয়াগ-সঙ্গম। গোশকটারোহীদের নিকট হইতে আমরা একটা জিনিষ উপভোগ করিতেছিলাম। সেটা স্ত্রীলোকদিগের কণ্ঠ-নিঃসৃত একতান হিন্দুস্থানী সঙ্গীত। ইহারা যে-হেতু পদাতিক যাত্রী অপেক্ষা একটু আরামে যাইতেছিল, সে-হেতু গানের চর্চ্চাটা করা অসঙ্গত মনে করে নাই। এক দিকে যেমন গরুর গাড়ীর উৎপাত, অপর দিকে তেমনই 'বাস'এর ভোঁ ভোঁ আওয়াজ। ইহাদের শ্রুতিকটু শব্দে কর্ণ বধির এবং চলিয়া যাওয়ার পর রাস্তার উত্থিত ধূলি-প্রবাহে মুখ এবং নাসিকার ছিদ্র বন্ধ হইবার যোগাড় হইয়াছিল। এই সময় বেণারস এবং এলাহাবাদের মধ্যে রীতিমত বাস গতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুদূর পঞ্জাব এবং মধ্যপ্রদেশ হইতে বহু 'বাস্' উভয় স্থানেই যাত্রী লইয়া যাইবার জন্ম আসিয়াছিল। যাঁহারা একটু বেশী পয়সা ব্যয় করিতে সমর্থ, তাঁহারা প্রায়ই রেলের ভিড়ের ভয়ে বাসএ বেণারস হইতে এলাহাবাদ গিয়াছিলেন। চালকরা কখনও জন প্রতি ৩ টাকা এবং কখনও ২।০ টাকা লইতেছিল। এই মেলা উপলক্ষে শিখ বাস-চালকরা যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করিয়া লইয়াছে।

এইরূপে পথের ক্ষণিক জীবন অতিবাহিত করিতে করিতে আমরা উভয়ে ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। বেলা প্রায় ১১টার সময়—২ ঘণ্টায় ৪০ মাইল আসার পর—আমরা 'গোপীগঞ্জ' নামক এক বড় গ্রামে বিশ্রামের জন্ম নামিলাম। এখানে এক জন পূর্ব্ব-পরিচিত ডাক্তারের বাসায় উঠিলাম এবং কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বেশ পরিতৃপ্তির সহিত স্নানাহার সমাপন করিলাম। এই সময় গোপীগঞ্জ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল; অসংখ্য যাত্রী এবং শকট বিশ্রামের জন্য এখানে আশ্রয় লইয়াছিল এবং গ্রামটিকে কলরোলে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল।

বেলা ১টার সময় আবার আমাদের যাত্রা সুরু হইল। যতই এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই লোকের ভিড়ও বাড়িতে লাগিল। রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী কোন ক্ষুদ্র গ্রামই আজ আর খালি ছিল না। প্রত্যেক স্থানেই অসংখ্য যাত্রী তাহাদের শ্রান্ত ও অবসন্ন দেহ স্থাপিত করিয়াছিল। মাঝে দুই একবার অল্প বিশ্রামের পর আমরা ঠিক সন্ধ্যার সময় এলাহাবাদের অপর তীর 'ঝুসিতে' পৌছিলাম। ঝুসি আজ বহু যাত্রীতে পরিপূর্ণ, বহু তাঁবুতে আচ্ছন্ন। যাহারা কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে আসিয়া স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহারা তাঁবু নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছিল। ভিড়ের মধ্য দিয়া অতি কষ্টে অনবরত 'বেল্' দিতে দিতে আমরা ধীরে ধীরে বালির চরে উপস্থিত হইলাম। প্রায় মাইল দুই অতি সন্তর্পণে অন্ধকারে বালির চরের উপর দিয়া সাইকেল চালাইবার পর আমরা গঙ্গার উপর ভাসমান সেতু পাইলাম। উহার প্রবেশমুখে ৪।৫টি পুলিস-প্রহরী পাহারা দিতেছিল। তাহারা আমাদিগকে সাইকেল হইতে নামিয়া পুল পার হইতে বলিল। আমরা বলিলাম—"ইহার কি প্রয়োজন?" তাহাতে তাহারা বলিল যে, পুলের উপর দিয়া বহু লোক যাতায়াত করিতেছে, তাহাদের সহিত ধাক্কা লাগিতে পারে, এই জন্য এই নিয়ম করা হইয়াছে। আমরা ক্ষুণ্ণ-মনে চলিতে লাগিলাম; কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, নামিয়া ভালই করিয়াছি। কারণ, ক্রমশঃ এত ভিড় বেশী হইতে লাগিল যে, সাইকেল হাতে করিয়া চলাই বিপদ, চড়া ত সুদূরপরাহত। এইরূপে ভিড়ের সঙ্গে মিশিয়া ভিড়েরই একটা অংশ হইয়া আমরা চতুর্দ্দিকের শোভা দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

পুল পার হইয়া সাইকেলে চড়িয়া কিছু দূর যাওয়ার পর আমরা 'দারাগঞ্জে' পৌছিলাম। দারাগঞ্জে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে পুনরায় সাইকেল হইতে নামিতে হইল। ইহার কারণ—সম্মুখে বিপুল জনতা। দারাগঞ্জের নিকটেই একটি রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। সে সময়ে সহস্র সহস্র যাত্রী রেল হইতে নামিয়া দারাগঞ্জকে "ন স্থানং তিলধারণং" করিয়া তুলিয়াছিল। ষ্টেশনে ত সহস্র সহস্র লোক নিজ নিজ সঙ্গী ও জিনিষ লইয়া বসিয়াই ছিল, উপরন্তু রাস্তা, দোকান, মাঠ এবং সর্ব্বোপরি গাড়ীর উপর যে যেখানে বিন্দুমাত্রও স্থান পাইয়াছে, সেই স্থানেই বসিয়া পড়িয়াছে। অনেকে যে গাড়ীতে ষ্টেশন

যমুনার তটদেশ

হইতে আসিয়াছে, তাহাতেই রহিয়া গিয়াছে; কোথায় যে স্থান পাইবে বা যাইবে, তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না। অনেক ভদ্র গৃহস্থ—যাঁহারা হয় ত কখনও বাড়ীর বাহির হন নাই, তাঁহাদিগকেও শঙ্কাকুল-নেত্রে ইতস্ততঃ চাহিতে দেখিলাম। অনেকে রাস্তায় টহল [illegible]

প্রাণ ধারণ করিয়া অগণিত যাত্রিদল নিদ্রাহীন-নয়নে রাত্রি-জাগরণ করিতেছিল, উন্মুক্ত গগনতলই তাহাদের আশ্রয়স্থান। চতুর্দ্দিকের পেষণে ও কোলাহলে তাহারা মাঘের প্রচণ্ড শীতকেও ভুলিয়া গিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, রাত্রিকাল বলিয়া স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই নাই যে, কেহ স্থানাভাবে নিকটস্থ অথবা দূরস্থ বৃক্ষের উপর আশ্রয় লইয়াছিল কি না। ভিড় ঠেলিয়া, হাতে

বালির চরে অদূরে জনতা ও বিপণিশ্রেণী

করিয়া সাইকেল লইয়া যাইতে আমাদের আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগিয়াছিল। অতঃপর অপেক্ষাকৃত অল্প ভিড় পাইয়া আমরা আবার সাইকেলে আরোহণ পূর্ব্বক এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের New hostel অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। তথায় যাইবার রাস্তা ঠিক ভালরূপে না জানা থাকায় লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে করিতে প্রায় আধ ঘণ্টা পরে রাত্রি ৮টার সময় New hostelএ পৌঁছিলাম। পৌঁছিয়াই তথাকার অধিবাসী পরিচিত বন্ধুদিগের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলাম। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিয়া অতি সমাদরের সহিত আমাদিগকে উপরের তলায় তাঁহাদের নিজেদের ঘরে লইয়া গেলেন। তাঁহারা সকলেই খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং চারিদিকে একটা বেশ সাড়া পড়িয়া গেল। এই Hostelএ আমাদের পরিচিত ১০।১২টি বন্ধু থাকেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর উত্তমরূপে রাস্তার ময়লা পরিষ্কার পূর্ব্বক পরিতোষের সহিত বন্ধু-প্রদত্ত আহারে উদরপূর্ত্তি করা গেল। তার পর শ্রান্তিবশতঃ আর বেশী রাত্রি অবধি না জাগিয়া শীঘ্রই সুকোমল শয্যায় অঙ্গ-স্থাপনা করিলাম। মোট ১৪ ঘণ্টায় ৮০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলাম, তন্মধ্যে শেষ ছয় মাইল ভিড় ঠেলিয়া আসিতে ২ ঘণ্টা লাগিয়াছিল।

পরদিন প্রভাতে অর্থাৎ ১৩ই মাঘ সোমবার শয্যাত্যাগের পর গরম জিলাপী ভক্ষণ করিতে করিতে বন্ধুদিগের সহিত আলাপে কিছুক্ষণ বেশ আমোদেই কাটান গেল। তার পর বেলা ১০টার সময় স্নান আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক বন্ধুরা কলেজে গেলেন এবং আমি ও যোগেশ সহর পরিদর্শনে বাহির হইলাম। আমরা হাঁটিয়া রওনা হইলাম। কারণ, সঙ্গমে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল এবং তথায় সাইকেল লইয়া যাইবার আদেশ নাই। আমাদের Hostel হইতে সঙ্গম প্রায় ৮ মাইল। সুতরাং সমস্ত দিনের মত বিদায় লইয়া আমরা দুই জনে ভারতবাসী হিন্দুর চির-আকাঙ্ক্ষিত, চিরপূজ্য, দ্বাদশ বর্ষ পরে আগত পূর্ণ কুম্ভের অকূস্থলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সঙ্গে থাকিল ক্যামেরা। মনে মনে ভাবিলাম, ফটো উঠাইয়া কুম্ভের ছবি আঁকিয়া রাখিব। কিন্তু বিধাতাও মনে মনে হাসিলেন, বলিলেন, —মূর্খ মানব, সাধ্য কি তোমার যে, তুমি তোমার ঐ ক্ষুদ্র যন্ত্রে বিরাটকে, বিপুলকে গ্রহণ করিতে পার। অকৃত্রিমকে কৃত্রিমে প্রকাশ করার চেষ্টা সুদূরপরাহত। ফটো উঠাইলাম বটে, কিন্তু যখন ফটোর দিকে তাকাই এবং কুম্ভের ছবি মনে পড়ে, তখন আমার নিজেরই হাসি পায়। একমাত্র চলচ্চিত্রে কুম্ভের দৃশ্যের কিছু ধারণা দেওয়া যাইতে পারে—কিন্তু সত্য বলিতে গেলে 'তাজ যেমন তাজেরই তুলনা', তেমনই 'কুম্ভ কুম্ভেরই তুলনা'।

আমরা হোটেল হইতে বাহির হইয়া বড় রাস্তা ধরিয়া সঙ্গমের অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। যে দিকে তাকাই, কেবল অগণিত মনুষ্য। ইহাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সংখ্যাই সমান এবং ১ মাসের শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া ৮০ বৎসরের বৃদ্ধও আছে। যাত্রিদল অবিশ্রান্তভাবে অনন্যচিত্ত হইয়া সেই এক সঙ্গমস্থানের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে, সকলেরই চেষ্টা—আগে গিয়া স্থান অধিকার করা। চির-পুরাতন ত্রিবেণীসঙ্গমে সে দিন যেন আর এক নূতন সঙ্গমের সৃষ্টি হইয়াছিল—সে সঙ্গমে বিশালকায় মানব-স্রোত কোন্ এক অজ্ঞাত, অভূতপূর্ব্ব আহ্বানে মিলিত হইয়াছিল।

আমরা ক্রমশঃ সঙ্গমের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম; লোক-সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। বামে লোক, দক্ষিণে লোক, সম্মুখে লোক, পশ্চাতে লোক এবং উপরেও লোক। বিমানপোত-চালকরা এই সময় বিমান লইয়া এলাহাবাদে আসিয়াছিল। টাকা লইয়া যাত্রীদের সমস্ত সহর দেখাইতে-ছিল। সমস্ত দিন ধরিয়া মাথার উপর বোঁ বোঁ শব্দ বিমান-পোতের উপর অরুচি আনিয়া দিয়াছিল। সঙ্গম হইতে প্রায়

যমুনার তীরে জনতা

৪ মাইল দূরে রাস্তার ধারে মাঠে একটি কৃষি ও শ্রমশিল্প-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। আমরা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক-ক্ষণ ধরিয়া সব দেখিয়া বেড়াইলাম। দেখা শেষ হইলে ১ মাইল পুনরায় চলার পর আমরা বাঁধের নিকট উপস্থিত হইলাম। এই বাঁধের বিষয় কিছু বলা দরকার। যেখান হইতে গঙ্গা এবং যমুনার বিস্তৃত চর আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থানটিকে বাঁধ বলে।

ইহা বালির চর হইতে প্রায় ১০ ফুট উচ্চ। ঢালু পথ ইহার উপর হইতে চরের উপর নামিয়া গিয়াছে। এই বাঁধ হইতে সঙ্গম-স্থান অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনার মিলনস্থান পর্য্যন্ত ১২ বর্গ-মাইলব্যাপী এক বিস্তৃত বালির চর। কুম্ভের মেলার সম্পূর্ণ দৃশ্য দেখিতে হইলে এই বাঁধই উৎকৃষ্ট স্থান। এখান হইতে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া যতদূর চক্ষু যায়, কেবল লোক, তাঁবু, খড়ের ঘর, পতাকা ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। যাহারা অমাবস্যার যোগে সঙ্গমে স্নান করিবে, তাহারা সকলেই এই বালির চরে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে। দেখিলে মনে হয়, ভগবান্ যেন কুম্ভের জন্যই এই চরটিকে এত বিস্তৃত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বাঁধ হইতে আমরা বালির চরে নামিলাম। বালির চরের মধ্যস্থলে সঙ্গম পর্য্যন্ত গাড়ী যাইবার জন্য প্রশস্ত পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল, অসংখ্য বৈদ্যুতিক আলো ও জলের কল বসান হইয়াছিল। সংখ্যাতীত পায়খানা নির্ম্মিত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য অসংখ্য লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অন্য সময়ে যে স্থান বহুদূরব্যাপী জলশূন্য মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করে, তাহা এই সময়ে জনসংখ্যায় কলিকাতাকেও অতিক্রম করিয়াছিল। বালির উপরে সহস্র সহস্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া লোকেরা তাহাতে ১ মাস পূর্ব্ব হইতে বাস করিতেছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুরা নানা আখড়া তৈয়ারি করিয়া তথায় মৌরসি-পাট্টা লইয়া বসিয়াছিল। লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির দানে ভূরি-ভোজনের অভাব তাহারা কোন দিনই অনুভব করে নাই। এইরূপ একটি ভোজন-ব্যাপারে যোগ দিতে গিয়াই এক বৈরাগীর দলের সহিত সেবা-সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণের এবং পুলিসের

সাধুর আখড়া

মারামারি আরম্ভ হইয়া যায়। আমরা তখন বেড়াইয়া ফিরিতে-ছিলাম। সংবাদপত্রপাঠকারীরা ইহা অবগত হইয়াছেন। তার পর এই লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য রাস্তার উভয় পার্শ্বের স্থান-গুলি ভোজন-সামগ্রীর দোকানে, বাসনের দোকানে, কাপড়ের দোকানে এবং আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্তে পূর্ণ হইয়া পূর্ণকুম্ভ নামের সার্থকতা প্রকাশ করিতেছিল। একটি বড় সহরে যত রকমের জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে, তাহার সব রকম জিনিষই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। ম্যাজিক, সার্কাস, থিয়েটার কিছুরই অভাব ছিল না। চারিদিকের এই সমস্ত বিপুল আয়োজন দেখিতে দেখিতে আমরা গঙ্গার ধারে উপস্থিত হইলাম। সেখানে পুণ্যানুষ্ঠানের আর এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম, অসংখ্য পাণ্ডা এক একটি নারিকেল হস্তে এবং কিছু কুশ লইয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহারা যে কোন যাত্রীকে দেখিতেছে, তাহাকেই বলিতেছে, "নারিকেল দান কর, পাপ ক্ষয় কর।" দেখিতে দেখিতে একই নারিকেলের উপর দিয়া সহস্র সহস্র লোকের নারিকেল-দান ও পাপক্ষয় হইয়া গেল। যাত্রীদের কেবল কষ্ট করিয়া

বালির চরের আর একটি দৃশ্য

প্রত্যেককে ২।০ টাকা করিয়া দক্ষিণা দিতে হইল; নতুবা মন্ত্রপাঠেরও হাঙ্গামা বা যোগাড়-যন্ত্রেরও চিন্তা নাই। এইরূপে পাণ্ডারা প্রত্যেকে যে কত টাকা এই কুম্ভ-মেলায় উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। গঙ্গার তীর অব-লম্বন করিয়া আমরা সঙ্গমে পৌঁছিলাম। সেখানে সব সময়েই লোক স্নান করিতেছিল। সঙ্গম হইতে একখানি নৌকায় করিয়া আমরা যমুনাতীরস্থ দুর্গের নিকট ফিরিয়া আসিলাম। এই দুর্গের ভিতর 'অক্ষয়বট' নামক একটি তীর্থস্থান আছে। যাত্রিগণ তথায় যাইবে জানিয়া পুলিস এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ বেড়া বাঁধিয়া তাহাদিগকে এক এক দল করিয়া ছাড়িতেছিল; সেখানেও লক্ষ লোক প্রবেশের নিমিত্ত দণ্ডায়মান ছিল। সমস্ত দিনের পর কুম্ভমেলার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ৫।০টার সময় ক্লান্ত-দেহে হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিলাম। রাস্তায়, বিশেষতঃ বালির চরে লক্ষপদোত্থিত ধূলিজালে দেহ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেই জন্য সেই শীতের দিনেও সন্ধ্যাবেলা মাথা ধুইতে হইল। রাত্রির আহারাদির পর পূর্ব্বদিনের ন্যায় শীঘ্র শীঘ্রই শয্যাগ্রহণ করিলাম এবং অচিরাৎ নিদ্রামগ্ন হইলাম।

দ্বিতীয় দিন সকালবেলা বন্ধুবর্গের সহিত গল্প চলিতেছে, এমন সময় 'ভারত সেবাশ্রমসঙ্ঘ' হইতে এক জন স্বামীজী আসিলেন। তিনি বলিলেন—'আগামী কল্য অর্থাৎ ১৫ই মাঘ বুধবার কত জন ভলাণ্টিয়ার হইতেছেন?' এ স্থলে বলা দরকার যে, গত পৌষ-সংক্রান্তিতে যে একটি স্নানের যোগ ছিল, তাহাতে এই হোষ্টেল হইতে প্রায় ৪০ জন ছাত্র ভলাণ্টিয়ার হইয়াছিল। সুতরাং এবারও প্রায় ৩৫ জন যাইতে রাজি হইল। আমরা কাশী হইতে আসিয়াছি শুনিয়া স্বামীজী আমাদিগকে ভলাণ্টিয়ার হইতে বলিলেন। আমরা উভয়ে তৎক্ষণাৎ রাজি হইলাম। অতঃপর ঠিক হইল যে, সে দিন সন্ধ্যাবেলা আমরা সকলে

উপস্থিত হইব। কারণ, আমাদের কায সেই দিন রাত্রি ২টা হইতে আরম্ভ হইবে। বর্ত্তমান কুম্ভমেলায় তিনটি দল নিজের খরচে যথেষ্ট কার্য্যদক্ষতার সহিত স্বেচ্ছাসেবকের কায করিয়াছিলেন। এ জন্য ইঁহারা সকলেরই কৃতজ্ঞতার অধিকারী। এই তিনটি দলের নাম যথাক্রমে 'ভারত সেবাশ্রমসঙ্ঘ', 'ভারত সেবা-সমিতি', এবং 'আগরওয়াল সমিতি'। শেষোক্তটি স্থানীয় সমিতি এবং প্রথম দুই দল বাহির হইতে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে 'ভারত সেবাশ্রমসঙ্ঘ' সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর কায করিয়াছেন। তাহার প্রধান কারণ, ইঁহারা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে গিয়া বহু শিক্ষিত ভলান্টিয়ার যোগাড় করিয়াছিলেন। শিক্ষিত ছাত্র-সম্প্রদায়ের দ্বারা যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি ?

আহার শেষ হইলে একটু বিশ্রামের পর সাইকেল লইয়া দুই জনে সহরভ্রমণে বাহির হইলাম। সহর বেড়াইতে গিয়া আমরা ঘুরিতে ঘুরিতে পূর্ব্বদিনের বাঁধের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং অল্প কিছুক্ষণ মেলার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিলাম। সে দিন দেখিলাম যে, লোকসংখ্যা পূর্ব্বদিন অপেক্ষা আরও বাড়িয়াছে। বেশী দেরী না করিয়া আমরা শীঘ্রই হোটেল অভিমুখে ফিরিলাম। কারণ, সন্ধ্যার সময় আহারাদির পর 'সেবাশ্রমে' যাইতে হইবে। হোটেলে ফিরিবার পথে আমরা এলাহাবাদের সাধারণ পুস্তকাগারে প্রবেশ করিলাম। আমি একাধিকবার এলাহাবাদে গিয়াছি, কিন্তু ইহা দেখা হইয়া উঠে নাই ; সুতরাং এবার ঠিক করিয়াছিলাম যে, দেখিতে হইবেই। লাইব্রেরীটি Gothic styleএ নির্ম্মিত এবং সহরের প্রান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে এক বিশাল পার্কের মধ্যে অবস্থিত। কাশীর 'কারমাইকেল লাইব্রেরী'র সহিত তুলনা করিয়া ইহাকে স্বর্গ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যে কোন পাঠকের ইহার ভিতর অবারিত-দ্বার। উচ্চ তাকের উপর সহস্র সহস্র পুস্তক সজ্জিত এবং পাঠক যে কোন স্থান হইতে যে কোন পুস্তক টানিয়া লইয়া দেখিতে বা পড়িতে পারেন। কক্ষের চতুর্দ্দিকে যে শান্তি ও নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল, তাহা সত্য সত্যই মনোমুগ্ধকর। দেখিয়া মনে হইল, ইহা কলিকাতা Imperial Libraryর অনুকরণে চলিতে চেষ্টা করে। আশা করি, কাশীর সাধারণ পুস্তকাগারটিও শীঘ্রই নিজের উন্নতিসাধনে ইঁহাদিগকে আদর্শ করিবে। লাইব্রেরী দেখা শেষ হইলে হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে সন্ধ্যার সময়েই আহার সমাপ্ত হইল। তার পর সঙ্ঘে যাওয়ার আয়োজন হইতে লাগিল। রাত্রিতে ঘুমাইতে হইবে বলিয়া সকলে নিজের নিজের কম্বল লইল এবং প্রায় রাত্রি সাড়ে ৮টার সময় সর্ব্বসমেত ৩০ জন ছাত্র মিলিয়া রওনা হওয়া গেল। ৩০ জনের মধ্যে আমরা ৮ জন বাঙ্গালী ছিলাম এবং বাকী অন্য জাতীয়—যথা হিন্দুস্থানী, পাহাড়ী, গুজরাটী ও মারাঠী। প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করিয়া আমরা প্রথমে প্রয়াগ নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এখানে প্রত্যেকে ১ আনার টিকিট কাটিয়া যাত্রীদের জন্য একখানি Mela Special Trainএ উঠিলাম। গাড়ীর মধ্যে অসম্ভব রকম ভিড়। অন্য লোকের প্রবেশ অসাধ্য, আমরা ভলান্টিয়ার বলিয়া ঢুকিতে পাইলাম। গাড়ী প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ছাড়িল এবং ১০ মিনিট হইতে না হইতেই 'প্রয়াগ-ঘাট' ষ্টেশনে পৌঁছিল। এই ষ্টেশন হইতে বাঁধ দেড় মাইল, সেবাশ্রমের ক্যাম্প ৩ মাইল এবং সঙ্গম ৫ মাইল। গাড়ী থামিলে আমরা সকলে নামিয়া পড়িলাম এবং দলবদ্ধ হইয়া বাঁধের দিকে চলিতে লাগিলাম। এই রাত্রির দৃশ্য আমি বোধ হয় জীবনে কখনও ভুলিব না। রাত্রি ২টার সময় হইতে স্নানের যোগ আরম্ভ, সুতরাং যে যেখানে আছে, সকলেই সঙ্গমের নিকট চলিয়াছে। তাহাদের এত কষ্টের এবং আকাঙ্ক্ষার বস্তু সমাগত জানিয়া তাহারা অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। অপর দিকে রাস্তা এবং দোকানের দৃশ্য অচিন্তনীয়—লক্ষ লক্ষ বৈদ্যুতিক ও গ্যাসের আলো অমাবস্যার রাত্রির সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যে দিকে তাকাও, কেবল দেখিবে—আলো ও মনুষ্য। এই আলোর মেলার মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে আমি তখনও জানিতে পারি নাই, ইহা অপেক্ষা সুন্দরতর, বিস্ময়জনক দৃশ্য আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এই দৃশ্যের কিয়দংশ আমরা প্রথম ঝুসির পুল হইতে সন্ধ্যাবেলা দেখিতে পাই।

রাত্রি তখন ১০টা বা আরও কিছু বেশী হইবে। ভলান্টিয়ার হইয়া আমরা সহর অতিক্রম পূর্ব্বক বাঁধের নিকট উপস্থিত হইলাম। অমনই নয়নের উপর হইতে পর্দ্দা সরাইয়া কে যেন এক অপূর্ব্ব অচিন্তনীয় মহিমায় মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। দেখিলাম, ঊর্দ্ধে ঘন ঘোরকৃষ্ণ গগনপটে লক্ষ লক্ষ তারকা আর নিম্নে বালির চরে লক্ষ লক্ষ প্রদীপ।

মধ্যাহ্নের যমুনা

যতদূর দৃষ্টি চলে, শুধু অসংখ্য প্রদীপের দীপ্তি। সসীম পৃথিবী আজ যেন অসীম হইয়া গিয়াছে, উপরের নভোমণ্ডল আজ যেন মর্ত্ত্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। আকাশ-পাতাল জুড়িয়া কে যেন আজ 'দেওয়ালী' করিয়াছে। সেই 'দেওয়ালীতে' লক্ষ লক্ষ নরনারী যেন কাহার আগমনে উন্মুখ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। লক্ষ লক্ষ মনুষ্যকণ্ঠের যে কলরোল উত্থিত হইতেছিল, তাহাকে একমাত্র বিরাট সমুদ্র-গর্জ্জনের সহিতই তুলনা করা যাইতে পারে। যাহা দেখিলাম, তাহা বর্ণনা করা যায় না। লেখনী এখানে অচল, চিত্রকরের তুলি এখানে স্তম্ভিত ; যে না দেখিয়াছে, তাহাকে বুঝান যাইবে না—কেবল নবকুমারের মত বলিতে ইচ্ছা হইল, "আহা, কি দেখিলাম! জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না।"

প্রায় ১১টার সময় 'সেবাশ্রমের' ক্যাম্পে পৌছিলাম। সেখানে পৌছিবামাত্র সেখানকার স্বামীজীরা আমাদিগকে ঘর দেখাইতে লাগিলেন। এই ঘরগুলি খড়ের চাল এবং দেয়াল দিয়া নির্ম্মিত। মাটিতেও অনেক খড় বিছান ছিল। ইহাতে ঘরগুলি সেই শীতের সময়ও বেশ আরামপ্রদ হইয়াছিল। যাহা হউক, আমরা একটা বড় ঘর বাছিয়া লইয়া কম্বল সম্বল করিয়া নিদ্রা গেলাম। বলা বাহুল্য, আমাদের প্রয়োজনের জন্ম 'সেবাশ্রম' অনেকগুলি কম্বল দিয়াছিলেন ও পরে ঘাটে যাইবার সময় কম্বলের জামাও দিয়াছিলেন। ভলান্টিয়ারদের যাহাতে কোন অসুবিধা না হয়, এ বিষয়ে সেবাসঙ্ঘ যথেষ্ট টাকা খরচ এবং চেষ্টা করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি আমাদের সহিত অতি মধুর এবং সুন্দর ব্যবহার করিয়াছেন। ভলান্টিয়ার হইতে গেলে সচরাচর যে সব কড়া কথা শুনিতে হয়, সে সব ইহাদের নিকট হইতে কিছু শুনি নাই।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম, ঠিক বলিতে পারি না, তবে যে গভীর নিদ্রা হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হঠাৎ বাঁশীর আওয়াজে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং শুনিলাম যে, আমাদের এখন যাইতে হইবে। রাত্রি তখন বোধ হয় ২টা কি ২৷টা। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা প্রস্তুত হইয়া দলবদ্ধভাবে শৃঙ্খলার সহিত সঙ্গমের দিকে রওনা হইলাম, সেবাসঙ্ঘের উপর সঙ্গমস্থান-পরিদর্শনের ভার পড়িয়াছিল। সুতরাং আমাদিগকে সেই দিকেই চলিতে হইল। কার্য্যের উত্তেজনায় তখন আর শীত অনুভূত হইতেছিল না। তবে খালি পায়ে থাকায় পায়ের নীচে বেশ ঠাণ্ডা লাগিতেছিল। প্রায় ৩ মাইল যাওয়ার পর আমরা সঙ্গমের জলের ধারে পৌছিলাম। এইখান হইতে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া এক এক যায়গায় কায লইলাম। আমাদের প্রথম কায হইল—যাহাতে কেহ না ডুবিয়া মরে, তাহা দেখা, দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত লোক সঙ্গচ্যুত হইয়া পড়িবে, তাহাদিগকে সেবাশ্রমের Enquiry officeএ পাঠাইয়া দেওয়া এবং ইহা ব্যতীত আর যে কোন কাযের প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা করা। Enquiry officeটি নদীর ধারেই স্থাপিত হইয়াছিল।

এইবার সঙ্গমের বর্ণনা সম্বন্ধে কিছু বলিব। সঙ্গমের অর্থ গঙ্গা ও যমুনার মিলনস্থান এবং এই স্থানে স্নানের জন্যই যাত্রীরা আসিয়াছে। সুতরাং এই স্থানটিকে নিরাপদ করিবার জন্ম এক কোমর পর্য্যন্ত জল খালি রাখিয়া চারিদিকে নৌকা দ্বারা বেষ্টন করা হইয়াছিল,—যাহাতে কেহ না বেশী জলে চলিয়া যায় বা ডুবিয়া মরে। রাত্রির অন্ধকারের জন্য জলের মধ্যে খুঁটি গাড়িয়া বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। সমগ্র সঙ্গমের স্থানটিকে স্নানের উপযোগী করা হইয়াছিল। উহা প্রায় দেড় মাইল-ব্যাপী। আমরা প্রায় এক হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া যাত্রীদিগকে দেখিতে লাগিলাম, রাত্রি সাড়ে ৩টা না বাজিতেই অসংখ্য যাত্রী স্নান করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। এই সমস্ত যাত্রীর মধ্যে পুণ্যার্থীর সংখ্যাই অধিক ;—হিন্দুস্থানী তার পর বাঙ্গালী এবং সর্ব্বাপেক্ষা কম পঞ্জাবী ছিল। আলো ও অন্ধকারের মধ্যে অগণিত ধর্ম্মপ্রাণ মনুষ্য, স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই স্নান করিয়া সিক্তবসনেই শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। সহস্র "বাবুজী, এহি ত সঙ্গম হ্যায়"। তাহারা যেন সঙ্গমে আসিয়াছে ইহা স্থির নিশ্চয় না জানিয়া কিছুতেই ডুব দিবে না। আবার সহস্র সহস্র লোক স্নানের পর অন্ধকার বশতঃ রাস্তা ভুলিয়া বালির চরে ফিরিয়া যাইবার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। এইরূপে জলের মধ্যে মনুষ্য এবং মনুষ্যের গায়ের জল এই উভয় মিলিয়া অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি হইয়াছিল। খালি যে লোক স্নান করিতেছিল, তাহা নহে। তাহাদের পুণ্যের জন্য আরও অন্য জিনিষের বন্দোবস্ত ছিল। যথা—'গো-দান', 'ফুল-দান', 'দুগ্ধ-দান' ইত্যাদি। ইহার মধ্যে গো-দানটি বড়ই চমৎকার, পূর্ব্বের

নৌকা হইতে যমুনার ঘাটের দৃশ্য

সেই নারিকেল-দানের মত। সহস্র সহস্র ধূর্ত্ত একটি করিয়া 'বাছুরের' গলায় দড়ি বাঁধিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং যাহাকে দেখিতেছে, তাহাকেই বলিতেছে, "গোদান কর, গোদান কর।" এইরূপ একই গরু শত সহস্রবার দান করা হইয়া গেল। দানের প্রথার নিয়ম গরু-স্পর্শ এবং দক্ষিণা-দান। দক্ষিণাটাই হইল আসল, গরু স্পর্শ কর আর না-ই কর।

ঘণ্টা দুই জলে দাঁড়াইয়া থাকার পর শীতে কাঁপিতেছি, এমন সময় দেখি, এক ভদ্রলোক সেই অগণিত লোকরাশির মধ্যে "জৈনের মা, জৈনের মা" শব্দে চীৎকার করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। বুঝিলাম যে তাঁহার কেহ হারাইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার ঠিকানা জানিয়া লইলাম এবং বলিয়া দিলাম,"যদি আপনি খুঁজিয়া না পান, তাহা হইলে কা'ল একবার Enquiry officeএ খোঁজ করিবেন।" ইহার পর আমি পরদিন দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ছিলাম, কিন্তু "জৈনের মায়ের" আর খোঁজ পাই নাই। কেবল ইহাই নহে, কিছুক্ষণ পরেই আবার এক স্থলে এক সিন্ধী দম্পতির সহিত দেখা হইল। তাহারা ক্রন্দনোন্মত্তভাবে বলিল যে, তাহারা তাহাদের একটি ছোট মেয়ে ও ছেলেকে হারাইয়াছে। আমি যথাসাধ্য খোঁজ করিয়াও ইহার কোন উপায় করিতে পারিলাম না এবং ইহাদেরও Enquiry officeএর কথা বলিয়া দিলাম। কুম্ভের মহামেলায় এ এক করুণ দৃশ্য। কত মাতা সন্তানের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, কত স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে পৃথক্ হইয়াছে, কত লোক সন্তান হারাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে ? যাহারা হারাইয়া আকুলভাবে অসহায় অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদের কথা মনে হইলে এখনও দুঃখ হয়। পরদিন দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত

লইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহাদের কেহ সেখানে খোঁজ লইতে আসিতেছে না, আবার যাহারা খোঁজ লইতে আসিতেছে, তাহাদের কাহাকেও সেখানে পাওয়া যাইতেছে না। জানি না, নিরুদ্দিষ্টগণের কি হইয়াছে। এইরূপে শেষ রাত্রিটা আমাদের জলের মধ্যেই অতিবাহিত হইল। অবশেষে অরুণদেব পূর্ব্বদিকে দেখা দিলেন।

১৫ই মাঘ বুধবার সকাল হইতে না হইতেই বেশীর ভাগ ভলান্টিয়ারদিগকে জল হইতে উপরে একটি 'পথ' রক্ষার জন্ত আসিতে হইল। আমিও এই দলে ছিলাম। উল্লিখিত দীর্ঘ পথটি সাধুদিগের স্নানের জন্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রবল জনস্রোত রোধ করিবার জন্ত দুই ধারে বাঁশে দড়ি বাঁধা হইয়াছিল। এই পথ রক্ষা করা সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ ব্যাপার। লক্ষ লক্ষ নরনারী সাধু-দর্শনের বাসনায় দড়ি ছিঁড়িয়া রাস্তার উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। তখন অশ্বারোহী পুলিসের দ্বারা ইহাদের উপর অশ্বচালনা করিয়া তবে ইহাদিগকে রোধ করা যায়। সাধুদিগের স্নান কুম্ভমেলার আর একটি প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্য জিনিষ। ভারতবর্ষে যে কত রকমের এবং কত অধিকসংখ্যক সাধু এবং 'সাধুনী' আছে, তাহার বিষয় জানিতে হইলে আমার মনে হয়, একমাত্র কুম্ভ ছাড়া অন্য উপায় নাই। কারণ, কেবল কুম্ভ ব্যতীত আর কোথাও সমগ্র সাধুর দল এক সময়ে সমবেত হয় না।

৭টা বাজিতে না বাজিতেই প্রথম সাধুর দল দেখা দিলেন। প্রত্যেক দলই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য সমেত বিরাট মিছিল লইয়া স্নানে আসিয়াছিল। প্রত্যেক দলেই ৪।৫টি করিয়া হস্তী, ৮।১০টি অশ্ব, ২০।২৫টি মোহান্ত অধিষ্ঠিত শিবিকা এবং চামর, ঝালর, আসা-সোটা, বল্লম হস্তে অগণিত পদাতিক সন্ন্যাসী। প্রথমে কয়েকটি দল কেবল নাগা সন্ন্যাসীর দ্বারা গঠিত হইয়া আসিয়াছিল। এই সকল বিভিন্ন সন্ন্যাসীর দলের আখড়ার বিভিন্ন নাম, যথা—নির্ব্বাণী আখড়া, নিরঞ্জনী আখড়া ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কোনও দল শঙ্করাচার্য্যের উপাসক, কোনও দল নানকপন্থী, কোনও দল বৈষ্ণব, কোনও দল বা সীতারামের উপাসক ইত্যাদি। এই সমস্ত সাধু অতি নির্দ্দয় প্রকৃতির; ইহারা যখন স্নান করিতে আসিতেছিল, তখন আর কোন দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অতি বেগে ধাবিত হইতেছিল এবং এ সময়ে যদি কোন দর্শক ইহাদের সম্মুখে পড়ে, তাহা হইলে তাহার প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসা দুষ্কর। এই জন্যই পুলিসের দ্বারা এবং ভলান্টিয়ারের দ্বারা ইহাদের জন্য একটি পৃথক্ পথ রাখা হইয়াছিল। এই পথে আর কাহাকেও আসিতে দেওয়া হয় নাই। প্রাতঃকাল হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত সাধুর দলের আর শেষ ছিল না; একের পর এক আসিতেই ছিল এবং স্নান করিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। ইহাদের স্নানের জন্যও অনেকখানি স্থান বেষ্টন করিয়া ভলান্টিয়ারদের দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল এবং অন্য কাহাকেও তাহার মধ্যে স্নান করিতে আসিতে দেওয়া হইতেছিল না। যেহেতু, সন্ন্যাসিগণের স্নানও অতি অদ্ভুত ব্যাপার। সহস্র সহস্র সাধু মত্ত হস্তীর ন্যায় উল্লম্ফন পূর্ব্বক এবং বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া 'হর হর শঙ্কর' অথবা 'জয় জয় সীতারাম' বলিতে বলিতে স্নান সমাপন করিতেছিল। তখন যে কেহ ইহাদের সম্মুখে পড়িলে ডুবিয়া মরিত। সাধুদের এই অত্যাচার হইতে জনতাকে রক্ষা করিবার জন্য ভলান্টিয়ারদিগকে এবং পুলিসকে যে কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ নর-নারীর জন্য তাহারা তাহার একাংশও ব্যয় করে নাই।

যখন ১০টা বাজিল, তখন আমাদের খাওয়ার ডাক পড়িল। আমরা একে একে গিয়া পুরী এবং হালুয়া খাইয়া আসিলাম। ইহার পর আমরা বেলা ২টা পর্য্যন্ত কায করিবার পর স্নান করিয়া ক্যাম্পে ফিরিলাম। তথায় আশ্রমের প্রদত্ত ভাত, ডাল, রুটী এবং তরকারির দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া কিছু বিশ্রামের পর শ্রান্ত-ক্লান্ত-পদে আমাদের হোষ্টেলের ভলান্টিয়াররা হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিলাম।

পূর্ব্ব-রাত্রিজাগরণের ফলে এবং অবিশ্রান্তভাবে ১২ ঘণ্টা কায করার ফলে আমরা সন্ধ্যার পরেই নিদ্রা গেলাম। পরদিন ভোরে ১৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার আবার পূর্ণোদ্যমে সাইকেল দুইখানিকে সম্বল করিয়া বন্ধুদের নিকট অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদায় লইয়া কাশী অভিমুখে রওনা হইলাম। আসিবার সময় বাতাস অনুকূল থাকায় এবং রাস্তায় পূর্ব্বাপেক্ষা ভিড় কম থাকায় আমরা নিরাপদে ১০ ঘণ্টায় স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

শ্রীসুধাংশুচরণ ভট্টাচার্য্য।

চিঠি

আবর্জ্জনার স্তূপের মাঝে কুড়িয়ে পেলাম ছেঁড়া চিঠি,
মলিন আখর-গুলায় যেন হান্‌লো বেদন-ভরা দিঠি!
আঁকা-বাঁকা লাইনগুলি অনল-দাগে বক্ষে জ্বলে,
যার লেখা সে হারিয়ে গেছে কাল-সাগরের অতল-তলে।

সোনার জলের লেখার চেয়ে এ লেখা যে অনেক দামী,
চখের জলের সিক্ত পরশ সকল দেহে পেলাম আমি!
স্মৃতির তরে নাইক' কিছু সম্বল তো শূন্য ঘরে,
'তুল্‌বো ছবি' বলেছিলাম আশার ঘোরে সমাদরে!

হয় নি তোলা, 'হবে-হবে'র প্রবঞ্চনায় কাট্‌লো কাল,
হঠাৎ সে যে মিলিয়ে গেল রৌদ্র-তাপে নীহার-জাল।
আল্‌তা-শিশি সিঁদুর-দানি তাকের পরে আছে তোলা,
এরাই আমার বুকের ভাবে দেয় দুলিয়ে ব্যথার দোলা!

আজকে হঠাৎ চিঠির মাঝে সেই হারানো মুখটি জাগে,
শুক্‌নো ক্ষতে রক্ত ঝরে কতই তবু মিষ্টি লাগে;
সযতনে কুড়িয়ে নিলাম প্রিয়ার আমার লিপিখানি,
চোখের ভিতর দিয়ে শুনি তার সে গলার মধুর বাণী!

শ্রীসন্তোষকুমার সরকার।
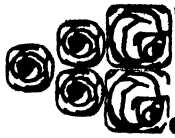
শিষ্য। ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের কথা ত বুঝিলাম। মীমাংসক সম্প্রদায়ের ঐ ভাবের কথাও পূর্ব্বে শুনিয়াছি। কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদের "তত্ত্বমসি"—এই মহাবাক্যের উক্তরূপ তাৎপর্য্য ত আমি কিছুতেই বুঝিতে পারি না। কারণ, ছান্দোগ্য উপনিষদে কোন কোন স্থলে যাহা বস্তুতঃ ব্রহ্ম নহে, তাহাতেও ব্রহ্মভাবনারূপ উপাসনার বিধান থাকিলেও ষষ্ঠ প্রপাঠকে আরুণি ও তৎপুত্র শ্বেতকেতুর সংবাদে ব্রহ্মতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বই বর্ণিত হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই পরব্রহ্ম ঈক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া তেজঃ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং বিবিধ জীবদেহ সৃষ্টি করিয়া সেই সমস্ত জীবদেহে তিনি নিজেই জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইহা সেখানে বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে পরে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে—"অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ" (৬।৩।৩)। শ্রীমদ্ভাগবতেও স্পষ্ট কথিত হইয়াছে—"ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি" (৩।২৯।৩৮)। সুতরাং সেই এক পরমেশ্বরই যখন প্রত্যেক জীবদেহে জীবরূপে প্রবিষ্ট বা অবস্থিত, তখন বস্তুতঃ তিনিই জীব, তাঁহা হইতে জীব বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে, ইহাই সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। তাহা হইলে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্য দ্বারাও উহাই বুঝা যায়। সুতরাং ঐ সমস্ত মহাবাক্যের অন্য কোনরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা যায় না।

গুরু। অদ্বৈতবাদ সমর্থনে আচার্য্য শঙ্করের চরম কথাই তুমি বলিয়াছ। তাঁহার শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্যও "মানসোল্লাস" গ্রন্থে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অন্যরূপ তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যার খণ্ডন করিতে ঐ কথাই বলিয়াছেন।* কিন্তু পরমেশ্বর যে সমস্ত জীবদেহের সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক জীবদেহে জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইহা দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ শাস্ত্রার্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে তোমার কথিত ছান্দোগ্য উপনিষদের "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "জীব"শব্দের অর্থ জীবের অন্তর্যামী। শাস্ত্রে "জীব" শব্দের নানা অর্থে প্রয়োগ আছে। দ্বৈতবাদী মাধ্ব সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য ব্যাসতীর্থ "ন্যায়ামৃত" গ্রন্থে "জীব" শব্দের উক্তরূপ অর্থেও প্রমাণ ও প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ পরমেশ্বর যেমন অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অন্তর্যামিরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, তদ্রূপ, তিনি সমস্ত জীবদেহের সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক জীবদেহে অন্তর্যামিরূপেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, তিনি জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হন নাই। তিনিই সর্ব্বজীবের হৃদয়দেশে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত হইয়া সমস্ত জীবকে কর্ম্মে প্রেরিত করিতেছেন। তিনি প্রেরক, জীব তাঁহার প্রের্য্য। তাই তিনি নিজেও বলিয়াছেন—"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ" (গীতা ১০।২০) অর্থাৎ সর্ব্বভূতের হৃদয়দেশে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আত্মা আমি। পরে তাঁহার ঐ অন্তর্যামিত্বই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" গীতা ১৮।৬১

"সর্ব্বভূত" শব্দের অর্থ এখানে সমস্ত জীবাত্মা। একই পরমেশ্বর সেই অসংখ্য জীবাত্মার হৃদয়দেশে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত। তিনিই সমস্ত জীবাত্মা নহেন, কিন্তু তিনি সমস্ত জীবাত্মার আত্মা। তাই তাঁহার স্বরূপবর্ণনায় শ্রুতিও বলিয়াছেন—"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" (শ্বেতাশ্বতর—৬।১১) সেই অন্তর্যামী পরমাত্মা সর্ব্বভূতের আত্মা, এই অর্থে তিনিই শাস্ত্রে "ভূতাত্মা" বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তাই শ্রুতি তাঁহার সম্বন্ধেই বলিয়াছেন,—"এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ" (ব্রহ্মবিন্দু উপ)। সেই অন্তর্যামী পরমাত্মা সর্ব্বজীবেরই হৃদয়দেশে নিজ নিজ আত্মাতে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত থাকিলেও জীব তাঁহাকে জানে না এবং তিনি জীবের দোষে দূষিতও হন না। যাঁহারা নিজের আত্মস্থ সেই নির্দ্দোষ পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তাঁহারাই মুক্তিলাভ করেন। তাই শ্রুতি পরেই বলিয়াছেন—

"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং"—(শ্বেতাশ্বতর ৬।১৩)

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধেও ভগবদ্বাক্য কথিত হইয়াছে,—"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা" (২৯।২১)। পরে কথিত হইয়াছে—

"অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্ দানমানাভ্যাং মৈত্র্যা ভিন্নেন চক্ষুষা॥" (২৯।২৭)

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী ...

---

* "নোপাসনাপরং বাক্যং প্রতিমাস্বীশবুদ্ধিবৎ।
ন চৌপচারিকং বাক্যং রাজবদ্ রাজপুরুষে।
জীবাত্মনা প্রবিষ্টোঽসাবীশ্বরঃ শ্রূয়তে যতঃ॥"
মানসোল্লাস (৩।২৪।২৫)

"অথ অতঃ সর্ব্বভূতেষু কৃতালয়ং কৃতবাসম্। তত্র হেতুঃ,—ভূতানামাত্মানং অন্তর্যামিণম্।"

পরে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বভূতের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা বা তারতম্য বর্ণন পূর্ব্বক কথিত হইয়াছে—

"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহু মানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥" ২৯।৩৪

টীকাকার শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"জীবানাং কলয়া পরিকলনেন অন্তর্যামিতয়া প্রবিষ্ট ইতি দৃষ্ট্যা ইত্যর্থঃ।" অর্থাৎ ভগবান্ ঈশ্বর সর্ব্বজীবের দেহে অন্তর্যামিরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছেন—এইরূপ দৃষ্টিবশতঃ ভক্তিযোগী পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ববিধ সমস্ত জীবকেই বহু সম্মান করত মনের দ্বারা প্রণাম করিবেন। উক্ত স্থলে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত শ্লোকের তাৎপর্য্যানুসারেই শ্রীধর স্বামিপাদ শেষোক্ত শ্লোকের উক্তরূপ তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনিও উক্ত শ্লোকের দ্বারা পরমেশ্বর যে সমস্ত জীবদেহে জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এইরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। ফল কথা, পূর্ব্বোক্ত মতে পরমেশ্বর সমস্ত জীবদেহে অন্তর্যামিরূপেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন এবং তিনি জীবাত্মা হইতে বিভিন্ন। কারণ, শ্রুতি যাঁহাকে সর্ব্বজীবের আত্মস্থ আত্মা বলিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও পূর্ব্বোক্ত স্থলে তাহাই কথিত হইয়াছে, সেই পরমাত্মা সমস্ত জীব হইতে ভিন্ন, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ অন্যভাবে ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, সমস্ত জগৎ ও সমস্ত জীব, সেই অন্তর্যামী পরমেশ্বরের শরীর, ইহা উপনিষদে কথিত হইয়াছে। * সুতরাং যেমন জীবের শরীর হইতে শরীরী জীব ভিন্ন, তদ্রূপ সেই অন্তর্যামী পরমেশ্বরের শরীরভূত সমস্ত জগৎ ও সমস্ত জীব হইতে তিনি ভিন্ন। সেই জীবরূপ শরীরবিশিষ্ট পরমেশ্বরই সর্ব্বজীবের হৃদয়দেশে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত। তিনিই সমস্ত জীবদেহের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অন্তর্যামিরূপেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের—"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সেই জীবরূপ শরীরবিশিষ্ট পরব্রহ্মই "জীব" শব্দের অর্থ এবং পরে "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" এই শ্রুতিবাক্যেও "ত্বং" শব্দের অর্থ সেই জীবরূপ শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্ম এবং "তৎ" শব্দের অর্থ সর্ব্বদোষশূন্য সকল-কল্যাণগুণাধার সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী ব্রহ্ম। তাহা হইলে "তত্ত্বমসি"—এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, "ত্বং"—অর্থাৎ জীবরূপ-শরীরবিশিষ্ট বা জীবান্তর্যামী যে ব্রহ্ম, তিনিই "তৎ"—অর্থাৎ সর্ব্বদোষশূন্য সকল-কল্যাণগুণাধার সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী ব্রহ্ম। তাহা হইলে "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের দ্বারা জীব ও পরব্রহ্মের অভেদ বুঝা যায় না।

ফল কথা, বেদাদি শাস্ত্রে জীব ও জগৎ পরব্রহ্মের শরীর বলিয়া কথিত হওয়ায় তদনুসারে রামানুজ জীব ও জগৎকে পরব্রহ্মের বিশেষণ বলিয়া নিগুর্ণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বীকার করেন নাই। অর্থাৎ তাঁহার মতে চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ জীব ও জড়জগৎ সেই পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরের বিশেষণ, পরব্রহ্ম বিশেষ্য। বিশেষ্য পদার্থ হইতে তাহার উক্তরূপ বিশেষণ পদার্থ বস্তুতঃ ভিন্নই হইয়া থাকে। কিন্তু জীব ও জগৎ পরব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন পদার্থ হইলেও প্রলয়কালে সেই ভেদ অব্যক্ত হইয়া যায়। কারণ, তখন অতি সূক্ষ্ম জীব ও জগৎ সমস্তই সেই পরব্রহ্মে একীভূত হয়, ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন। সুতরাং পরব্রহ্মের অদ্বৈতবোধক শ্রুতিসমূহের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ঐ একীভাবরূপ অদ্বৈতই বুঝা যায়। অর্থাৎ প্রলয়কালে একীভূত জীব ও জগৎবিশিষ্ট পরব্রহ্মের উক্তরূপ অদ্বৈতই উপনিষদের প্রতিপাদ্য। রামানুজ উপনিষদের দ্বারা প্রলয়কালীন জীব ও জগৎবিশিষ্ট পরব্রহ্মের উক্তরূপ অদ্বৈতই গ্রহণ করিয়া "বিশিষ্টাদ্বৈত" মতের সমর্থন করিয়াছেন। তাই তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। কিন্তু রামানুজের উক্তরূপ ব্যাখ্যাও তাঁহার নিজের কল্পিত নহে। উক্ত বিশিষ্টাদ্বৈতমতও অতি প্রাচীন ও দৃঢ় মত। ভগবান্ বোধায়ন মুনি উক্ত মতানুসারে, বেদান্তদর্শনের সুবিস্তৃত বৃত্তি রচনা করেন। পরে পূর্ব্বাচার্য্যগণ উক্ত বৃত্তির সংক্ষেপ করেন। রামানুজ উক্ত মতানুসারেই বেদান্তসূত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা তিনি নিজেই শ্রীভাষ্যের প্রারম্ভে বলিয়াছেন।

রামানুজের পরে প্রাচীন দ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা পরমবৈষ্ণব আনন্দতীর্থ বা মধ্বাচার্য্য প্রচার করেন যে, জীবাত্মা ও পরব্রহ্ম যে তত্ত্বতঃ ভিন্ন পদার্থ, ইহাই শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ এবং যুক্তিসিদ্ধ। কারণ, কোন জীব তাহার প্রভু পরমেশ্বরকে নিজ হইতে অভিন্ন মনে করিলে তিনি কখনই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন না। কারণ, জীবের ঐরূপ বুদ্ধি পাপজনক। প্রজা যদি আমিই রাজা বলিয়া অভিমান করে—এবং সেইরূপ বলে, তাহা হইলে রাজা তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ করেন না, পরন্তু তাহাকে দণ্ড প্রদানই করেন। সুতরাং জীব ও পরমেশ্বর অভিন্ন, ইহা কখনই শাস্ত্রার্থ হইতে পারে না। পরন্তু জীবাত্মা অণু অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম, সুতরাং প্রত্যেক জীবদেহে ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য। কিন্তু পরব্রহ্ম বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী ও এক। সুতরাং জীব ও পরব্রহ্মের অভেদ সম্ভবই হইতে পারে না। কিন্তু পরব্রহ্মের ন্যায় সমস্ত জীবাত্মাও চেতন ও নিত্য পদার্থ। পরব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার ঐরূপ অনেক সাদৃশ্য আছে। উপনিষদে "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ও "সোঽহং" ইত্যাদি

---

* যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং, যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ। বৃহদারণ্যক। ৩।৭।১৫।

শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জীব ও পরব্রহ্মের সেই সাদৃশ্য বিশেষই প্রকটিত হইয়াছে। সেই সাদৃশ্য প্রকাশের দ্বারা পরব্রহ্মের ন্যায় জীবাত্মারও দেহাদিভিন্নত্ব ও নিত্যত্বাদি তত্ত্ব সমর্থন করাই ঐ সমস্ত বাক্যের উদ্দেশ্য। বেদে ঐরূপ সাদৃশ্য-বোধক গৌণ প্রয়োগও বহু আছে। যেমন বেদে আছে, "আদিত্যো যূপঃ"। কিন্তু যজ্ঞীয় যূপ ত বস্তুতঃই সূর্য্য নহে, সুতরাং উহা সূর্য্যসদৃশ, ইহাই উক্ত বেদবাক্যের তাৎপর্য্য। উক্ত বাক্যে আদিত্য সদৃশ, এই অর্থে "আদিত্য" শব্দটি গৌণ। এইরূপ "তত্ত্বমসি" এই বাক্যেও তৎসদৃশ অর্থে তৎশব্দটি গৌণ শব্দ। মধ্বাচার্য্য নানা প্রমাণের দ্বারা তাঁহার উক্তরূপ দ্বৈত মতই সমর্থন করিয়াছেন। তাই তিনি দ্বৈতবাদী।

অপর বৈষ্ণবাচার্য্য নিম্বার্ক জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতঃ ভেদ ও অভেদ উভয়কেই সত্য বলিয়া সমর্থন করায় তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী অর্থাৎ ভেদাভেদবাদী। উক্ত ভেদাভেদবাদও অতি প্রাচীন মত। কিন্তু অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী উভয় সম্প্রদায়ই উক্তমতের খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতঃ ভেদ ও অভেদ শাস্ত্র ও যুক্তি-বিরুদ্ধ। এ বিষয়ে তাঁহাদিগের অনেক সূক্ষ্ম বিচার আছে। সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করা যায় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী এবং শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও উক্ত ভেদাভেদবাদের খণ্ডন করিয়া মাধ্বমতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদবাদই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদী নহেন। তবে "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামী ভাস্করাচার্য্যের মতানুসারে ঈশ্বর ও জগতের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থেও তিনি বিশেষ বিচার করিয়া জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদই তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন। *

সে যাহা হউক, মূল কথা, পরমেশ্বরই সমস্ত জীবদেহে জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, তিনিই অবিদ্যাবশতঃ কল্পিত জীবভাবাপন্ন হইয়া নানাজন্ম গ্রহণ ও শুভাশুভ কর্ম্মজন্য স্বর্গ-নরকাদি ভোগ করিতেছেন, তাঁহার ঐ জীবভাব এবং শুভাশুভ কর্ম্ম, জন্মগ্রহণ ও স্বর্গ-নরকাদি সমস্তই অবিদ্যাকল্পিত, তাঁহার বিশ্ব-সৃষ্টিই মিথ্যা, এই সমস্ত সিদ্ধান্ত দ্বৈতবাদী ন্যায় বৈশেষিকাদি সমস্ত সম্প্রদায় স্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগের মতে পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রথমে জীবরূপে বহু হইতে ইচ্ছা করেন নাই। তাঁহার কল্পিত জীবভাব সম্ভবই নহে। কারণ, যেরূপ অবিদ্যাবশতঃ তাঁহার জীবভাব কল্পিত হইবে, সেইরূপ মিথ্যা বা অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যাবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। পরন্তু সর্ব্বজ্ঞ অভ্রান্ত পরমেশ্বর বা পরব্রহ্মে ঐ অবিদ্যা থাকিতেই পারে না। ঐ অবিদ্যা জীবগত, ইহাও বলা যায় না। কারণ, উক্ত-মতে অবিদ্যাবশতঃই পরব্রহ্মের জীবভাব কল্পিত হয়। কিন্তু ঐ জীবভাব ব্যতীত জীবের পৃথক্ সত্তাই না থাকায় ঐ জীব-ভাবের অভাবে প্রলয়কালে ঐ অবিদ্যা কোথায় থাকিবে? পরব্রহ্মের জীবভাব যেমন অবিদ্যাকে অপেক্ষা করে, তদ্রূপ ঐ অবিদ্যাও নিজের আশ্রয়লাভের জন্য ঐ জীবভাবকে অপেক্ষা করায় উক্তমতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। এইরূপ আরও অনেক সূক্ষ্ম বিচার করিয়া ন্যায়-বৈশেষিকাদি সম্প্রদায় উক্ত মত স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে পরমেশ্বর প্রলয়ান্তে পুনঃ সৃষ্টির প্রথমে সমস্ত জীবের অন্তর্যামিরূপে এবং অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র অন্তর্যামিরূপে এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে এবং আরও বহুরূপে বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া সেই সেইরূপে বহু হইয়াছেন। তাই তাঁহার সেই ইচ্ছাশক্তিরূপ মায়াকল্পিত বহুত্ব প্রকাশ করিতেই ঋগ্‌বেদ বলিয়াছেন—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" (২।৩।২২) তাঁহার সেই ইচ্ছা-শক্তিরূপ মায়াই শাস্ত্রে "আত্ম-মায়া" বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং উপনিষদে তাঁহার উক্তরূপ ইচ্ছা প্রকাশের দ্বারা তাঁহার উক্তরূপ "মায়া"ই প্রকটিত হইয়াছে। "মায়া" শব্দের আরও অনেক অর্থ আছে। কিন্তু আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যাত মিথ্যা বা অনির্ব্বচনীয় "মায়া" অন্য কোন সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে উক্তরূপ মায়া বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই।

দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের মতে বেদাদিশাস্ত্রে যে যে স্থলে "আত্মন্" শব্দের প্রয়োগ করিয়া আত্মার একত্ব কথিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও সেখানে পরমাত্মা পরমেশ্বরের একত্বই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শাস্ত্রে নানাস্থানে নানাদৃষ্টান্ত দ্বারা সেই পরমাত্মার বহু উপাধিকৃত কল্পিত ভেদ ও বাস্তব একত্বই সমর্থিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব বা অভেদ বিবক্ষিত নহে। শাস্ত্রে অনেক স্থলে পরমাত্মরূপ বিশেষ অর্থেও "আত্মন্" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে এবং কোন কোন স্থলে জীবের অন্তর্যামী অর্থে পরমাত্মাতেও "জীব" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে এবং কোন কোন স্থলে পরমাত্মার ন্যায় অর্থবিশেষ গ্রহণ করিয়া জীবাত্মাতেও "ব্রহ্মন্" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু তদ্দ্বারা জীবাত্মা যে পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, ব্রহ্ম বলিলেই সর্ব্বত্র পরমাত্মাই বুঝা যায় না। তাই শাস্ত্রে অনেক স্থলে পরমাত্মা বুঝাইতে "পরব্রহ্ম", এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। শ্রীভাষ্যকার রামানুজও এই কথাটি বলিয়াছেন।

---

* গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদাভেদবাদী নহেন, এই বিষয়ে তাঁহাদিগের গ্রন্থসংবাদ ও

অদ্বৈতবাদিগণও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু উহা লোক-সিদ্ধ বা ব্যবহারিক ভেদ, উহা বাস্তব ভেদ নহে। যেমন আকাশ এক হইলেও ঘটের মধ্যগত আকাশ এবং গৃহাদির মধ্যগত আকাশকে আমরা ভিন্ন বলিয়া বুঝি। কিন্তু ঘট ও গৃহাদি আকাশের উপাধি। সেই উপাধিভেদে আকাশের যে ভেদ কল্পিত হয়, তাহা আকাশের ঔপাধিক ভেদ, উহা বাস্তব ভেদ নহে। কারণ, আকাশের ঐ সমস্ত উপাধির বিনাশ হইলে তখন আর ঐ ভেদ থাকে না। তখন ঐ সমস্ত কল্পিত আকাশ যে,সেই এক মহাকাশ হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন, ইহা বুঝা যায়। এইরূপ পরব্রহ্মেরও নানা উপাধিভেদে নানা ভেদ কল্পিত হইয়াছে এবং শাস্ত্রেও আবশ্যকবশতঃ সেই কল্পিত ভেদই কথিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ যে বাস্তব সত্য, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ যে সত্য, ইহা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন না হইলেও "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যের অনুরূপ তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায় না।

গুরু। তত্ত্ববাদের গুরু মধ্বাচার্য্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদের সত্যতাবোধক শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। * তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণও সেই সমস্ত প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য সম্প্রদায় সেই সমস্ত প্রমাণ গ্রহণ না করিলেও জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস্তব ভেদবাদী সকল সম্প্রদায়ই সর্ব্বসম্মত শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণের দ্বারাও ঐ ভেদের সত্যতা সমর্থন করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" (১।৬) এই শ্রুতিবাক্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উক্ত শ্রুতিবাক্যের পূর্ব্বার্দ্ধে আছে—"সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে"। অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় উক্ত পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত পরার্দ্ধগত "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" এই অংশের যোগ করিয়া ব্যাখ্যা করেন যে, হংস অর্থাৎ জীব নিজের আত্মা ও প্রেরক পরমাত্মাকে ভিন্ন বলিয়া জানিয়া অর্থাৎ ঐ উভয়ের ভেদজ্ঞানরূপ মিথ্যাজ্ঞান প্রযুক্ত সংসারচক্রে ভ্রমণ করে। কিন্তু দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির পূর্ব্বার্দ্ধেই পূর্ব্ববাক্যের সমাপ্তি বুঝিয়া পরার্দ্ধবাক্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করেন যে, জীব নিজের আত্মস্থ সেই অন্তর্যামী পরমাত্মাকে এবং তাঁহা হইতে পৃথক্ নিজের আত্মাকে দর্শন করিয়া অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের অন্যান্য শ্রুতিবাক্যের দ্বারা উক্ত শ্রুতিবাক্যের ঐরূপ তাৎপর্য্যই বুঝা যায়। পরন্তু ঈশ্বর বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান না থাকিলেও পশ্বাদি জীবের সংসারচক্রে ভ্রমণ হইতেছে। সুতরাং জীব ও ঈশ্বরের ভেদজ্ঞান সংসারের কারণ বলা যায় না। কারণ, ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান ব্যতীত ঐ ভেদজ্ঞান সম্ভবই হয় না। অতএব শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উক্ত শ্রুতির পরার্দ্ধ-বাক্যের দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভিন্নরূপে তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ বলিয়াই বুঝা যায়। তাহা হইলে ঐ ভেদকে সত্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, ঐ ভেদ অসত্য বা কল্পিত হইলে উহা তত্ত্ব হইতে পারে না। সুতরাং ঐ ভেদজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান না হওয়ায় উহাকে মুক্তির কারণ বলা যায় না।

পরন্তু মুণ্ডক উপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকের প্রারম্ভেও জীবাত্মা ও পরমাত্মা ঈশ্বরের ভেদ কথিত হইয়াছে। সেখানে তৃতীয় শ্রুতিবাক্যের পরার্দ্ধে কথিত হইয়াছে—"তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি"। অর্থাৎ মুমুক্ষু সাধক যে সময়ে সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করেন, তখন তিনি বিদ্বান্ হইয়া অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া পুণ্য ও পাপ ত্যাগ করিয়া চিরকালের জন্য সর্ব্বদা দুঃখশূন্য হইয়া সেই পরমেশ্বরের পরম সাম্য লাভ করেন। সেই মুক্তপুরুষ তখন পরমেশ্বরের সাম্য লাভ করিলে তখনও পরমেশ্বর হইতে তাঁহার বাস্তব ভেদ থাকে, ইহা বুঝা যায়। কারণ, ভিন্ন পদার্থদ্বয়ের সাদৃশ্যই "সাম্য" শব্দের মুখ্য অর্থ। সুতরাং পরম সাম্যলাভ হইলেও তখনও সেই মুক্ত আত্মা ও পরমেশ্বরের বাস্তবভেদ অবশ্যই থাকিবে। পরন্তু কঠোপনিষদেও কথিত হইয়াছে—

"যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম।" (১।১৫)

অর্থাৎ নির্ম্মল জলে কোন নির্ম্মল জল নিক্ষিপ্ত হইলে উহা যেমন তাদৃশই হয়, তদ্রূপ, ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্তপুরুষের আত্মা, ব্রহ্মের সদৃশ হন। উক্ত শ্রুতিবাক্যের পূর্ব্বার্দ্ধে কথিত হইয়াছে—"তাদৃগেব ভবতি", ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। "তাদৃক্"—বলিলে বুঝা যায় তৎসদৃশ। কিন্তু তাহা হইতে অভিন্ন, এইরূপ অর্থ বুঝা যায় না। আর সেই অর্থই বিবক্ষিত হইলে উক্ত স্থলে "তদেব ভবতি" এইরূপ কেন বলা হয় নাই? ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক।

ফল কথা,—দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় পূর্ব্বোক্ত ঐ সমস্ত শ্রুতিবাক্য এবং আরও অনেক প্রমাণের দ্বারা মুক্ত আত্মা যে পরব্রহ্মের সদৃশই হন, সুতরাং তাঁহার সহিত তখনও পরব্রহ্মের বাস্তব ভেদ থাকে, ঐ নিত্য ভেদের কখনই বিনাশ হইতে পারে না—এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। তাই দ্বৈতবাদী ন্যায়-বৈশেষিকাদি সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, মুণ্ডক উপনিষদের পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারাও যখন ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্ত পুরুষেরও পরব্রহ্মের সহিত বাস্তব ভেদই বুঝা যায়, তখন মুণ্ডক উপনিষদের শেষোক্ত

---

* "সত্য আত্মা সত্যো জীবঃ সত্যং ভিদা" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "যথেশ্বরস্য জীবস্য ভেদঃ সত্যো বিনিশ্চয়াৎ"—ইত্যাদি স্মৃতিবচন বেদান্তদর্শনের মাধ্বভাষ্য ও গোবিন্দভাষ্য এবং "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে দ্রষ্টব্য।

"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই শ্রুতিবাক্যকে গৌণ বা ঔপচারিক প্রয়োগই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যেমন রাজার সহিত পরম সাদৃশ্যবশতঃ প্রধান রাজপুরুষকে রাজাই বলা হয়, তদ্রূপ, ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্তপুরুষের ব্রহ্মের সহিত পরমসাদৃশ্যলাভ প্রকাশ করিতেই শ্রুতি বলিয়াছেন—"ব্রহ্মৈব ভবতি।" উহাকে বলে ঔপচারিক প্রয়োগ। তাই কথিত হইয়াছে—"রাজবদ্ রাজপুরুষে"।

মধ্বাচার্য্যের মতানুসারে দ্বৈতবাদের সমর্থক গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "সিদ্ধান্ত-রত্ন" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, মুণ্ডকোপনিষদের শেষে "ব্রহ্মৈব ভবতি" এই বাক্য পূর্ব্বোক্ত দ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। কারণ, উক্ত বাক্যে "ব্রহ্মৈব" এই স্থলে "এব" শব্দ সাদৃশ্য অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কোষকার অমর সিংহ অব্যয়-বর্গে "বদ্ বা যথা তথৈবৈবং সাম্যে"—এই বাক্য দ্বারা "এব" শব্দেরও সাদৃশ্য অর্থও প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইলে "ব্রহ্মৈব ভবতি" এই বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের সদৃশ হন, এই অর্থই বুঝা যায়।

এইরূপ শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে যে মুক্ত আত্মার পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি কথিত হইয়াছে, তাহার অর্থও ঐ পরম সাদৃশ্যপ্রাপ্তি। সদৃশ পদার্থেই সদৃশ পদার্থের লয় হইয়া থাকে। তাই পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি বলিয়া পূর্ব্বোক্ত সাদৃশ্যপ্রাপ্তিই প্রকটিত হইয়াছে। কারণ, নির্ব্বিকার বিশ্বব্যাপী আত্মার সবিকার পদার্থের ন্যায় কুত্রাপি লয় হইতেই পারে না। অদ্বৈতমতেও উহা সম্ভব না হওয়ায় এবং মুক্ত আত্মার ব্রহ্মভাব স্বতঃসিদ্ধই থাকায় তাহার পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি বা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি তাহার অজ্ঞান-নিবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং অদ্বৈতমতেও ঐ সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের যথাশ্রুতার্থ গৃহীত হয় নাই। এইরূপ দ্বৈতবাদী নানা সম্প্রদায় নানা প্রকারে বেদাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়া দ্বৈতমতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহাদিগের মধ্যে পরব্রহ্মের সহিত মুক্ত পুরুষের কিরূপ সাদৃশ্যপ্রাপ্তি হয়, সে বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে।

শিষ্য। সুপ্রাচীনকাল হইতেই উপনিষদের নানারূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে, ইহা সত্য। বেদান্তসূত্রকার বাদরায়ণও অনেক পূর্ব্বাচার্য্যের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সেই সমস্ত পূর্ব্বাচার্য্য-গণেরও সম্প্রদায় ছিল, তাঁহারাও উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। পরে বাদরায়ণ নিজেও বেদান্তসূত্রের দ্বারা উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনকাল হইতে সেই বেদান্তসূত্রেরও নানারূপ ব্যাখ্যা দ্বারা নানা মতের প্রচার হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তসূত্রের দ্বারা অদ্বৈত মতের ব্যাখ্যা করিলেও অন্যান্য সম্প্রদায় অন্যান্য মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং বেদান্তসূত্রের সাহায্যেও উপনিষদের প্রকৃতার্থ নির্ব্বিবাদে নির্ণীত হয় নাই, ইহাও সত্য। কিন্তু ভগবদ্গীতায় ভগবদ্বাক্যের দ্বারা আমরা ত জীব ও ব্রহ্মের অভেদরূপ অদ্বৈতবাদই সরলভাবে স্পষ্ট বুঝি। কারণ, ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবান্ জীবকেই "ক্ষেত্রজ্ঞ" বলিয়া পরে বলিয়াছেন,—"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত" (১৩।৩)। সুতরাং পরমেশ্বর নিজেই সমস্ত জীব-দেহে জীবরূপে অবস্থিত, বস্তুতঃ তিনিই জীব, ইহাই ত স্পষ্ট বুঝা যায়। পরে পঞ্চদশ অধ্যায়েও শ্রীভগবান্ স্পষ্ট বলিয়াছেন—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (১৫।৭)। অর্থাৎ জীবলোকে সমস্ত জীব আমারই অংশ। তাহা হইলে জীব যে তাঁহা হইতে অভিন্ন, ইহা ত আরও স্পষ্ট বুঝা যায়, ভগবদ্গীতায় ভগবদ্বাক্যের দ্বারা যে সিদ্ধান্ত বুঝা যায়, তাহাই কি উপনিষদের প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রাহ্য নহে?

গুরু। অবশ্যই গ্রাহ্য, শিরোধার্য্য। কিন্তু ভগবদ্গীতার ঐ সমস্ত ভগবদ্বাক্যের দ্বারা যে, জীব ও ঈশ্বরের বাস্তব অভেদই বুঝা যায়, ইহা আমরা কিরূপে বলিতে পারি? ঐ সমস্ত ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্য-নির্ণয়ও ত আমাদিগের পক্ষে সম্ভব নহে। সত্য বটে, শ্রীভগবান্ জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া পরেই বলিয়াছেন—"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি।" কিন্তু দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের মতে ঐ "ক্ষেত্রজ্ঞ" শব্দের অর্থ জীব নহে। সমস্ত জীবই নিজ নিজ শরীররূপ ক্ষেত্রকে আত্মা বলিয়া জানে, এই অর্থে জীবমাত্রকেই পূর্ব্বে "ক্ষেত্রজ্ঞ" বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীভগবান্ অসংখ্য জীবের অসংখ্য শরীররূপ ক্ষেত্রসমূহে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত হইয়া সেই সমস্ত শরীরকেই জানেন, এই অর্থে তিনিও ক্ষেত্রজ্ঞ। তাই বলিয়াছেন—"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।" গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় উক্ত শ্লোকের টীকায় তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেমন প্রজাগণ তাহাদিগের নিজ নিজ ক্ষেত্রকেই জানে, কিন্তু রাজা সেই সমস্ত ক্ষেত্রকেই জানেন, তদ্রূপ, প্রত্যেক জীব, তাহার নিজ নিজ শরীররূপ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ, কিন্তু সেই সমস্ত জীবের স্বামী ভগবান্ সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই ক্ষেত্রজ্ঞ। তাই উক্ত শ্লোকে "সর্ব্বক্ষেত্রেষু" এই পদের প্রয়োগ হইয়াছে। ফল কথা, "ক্ষেত্রজ্ঞ" শব্দের যেমন জীব অর্থ কথিত হইয়াছে, তদ্রূপ সর্ব্বজীবের অন্তর্যামী ও সাক্ষী পরমাত্মাও শাস্ত্রে "ক্ষেত্রজ্ঞ" বলিয়া কথিত হইয়াছেন।*

---

* বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ।
একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরচারী যথাসুখম্‌।
ক্ষেত্রাণি হি শরীরাণি বীজঞ্চাপি শুভাশুভম্‌।
তানি বেত্তি স যোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে।
শান্তিপর্ব্ব ৩৫১ অঃ—৫।৬।

সেই সর্ব্বসাক্ষী অন্তর্যামী পরমাত্মা সমস্ত জীবের সমস্ত শরীররূপ ক্ষেত্র এবং তাহার শুভাশুভ কর্ম্মরূপ বীজ সমস্তই জানেন. এই অর্থে তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে পরমাত্মার বোধক "ক্ষেত্রজ্ঞ" শব্দের উক্তরূপ অর্থ কথিত হইয়াছে। সেই সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ এক পরমাত্মাই সর্ব্ব-জীবের হৃদয়দেশে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আছেন। তাই শ্রীভগবান্ ঐ তাৎপর্য্যেই পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ" (গীতা—১০।২০)।

অবশ্য শ্রীভগবান্ পরে বলিয়াছেন—"মমৈবাংশো জীব-লোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" কিন্তু এখানে প্রথমে বুঝা আবশ্যক যে, নির্ব্বিকার অখণ্ড পরমেশ্বরের খণ্ডরূপ অংশ বা অবয়ব সম্ভবই নহে। সুতরাং উক্ত শ্লোকে "অংশ" শব্দ মুখ্য নহে, উহা গৌণশব্দ। অর্থাৎ ঐ "অংশ" শব্দের অর্থ অংশ-তুল্য। "অংশো নানা ব্যপদেশাৎ" (২।৩।৪৩) ইত্যাদি বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অংশ ইবাংশো নহি নিরবয়বস্য মুখ্যোহংশঃ সম্ভবতি।" অর্থাৎ নিরবয়ব পরব্রহ্মের অবয়ব বা খণ্ডরূপ মুখ্য অংশ সম্ভব না হওয়ায় ঐ সূত্রোক্ত "অংশ" শব্দের অর্থ অংশ-তুল্য। তাহা হইলে ভগবদ্গীতার উক্ত শ্লোকে গৌণ "অংশ" শব্দের দ্বারা সমস্ত জীব যে পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কিন্তু সমস্ত জীব পরমেশ্বরের অংশ-তুল্য, এই কথার দ্বারা সমস্ত জীবের সহিত পরমেশ্বরের প্রভু-ভৃত্যাবৎ সম্বন্ধই প্রকটিত হইয়াছে। অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রভু, সমস্ত জীব তাঁহার উপকার্য্য ভৃত্য, অর্থাৎ তাঁহার কার্য্যসম্পাদক। যেমন রাজা তাঁহার কার্য্যসম্পাদক অমাত্যাদি ভৃত্যগণকে নিজের অংশ বলেন, তদ্রূপ, জগৎস্বামী ভগবান্‌ও সমস্ত জীবকে তাঁহার কার্য্যসম্পাদক বলিয়া তাঁহার অংশ বলিয়াছেন, এবং যেমন আমাদিগের শরীরের অংশগুলি শরীর-সাধ্য কার্য্যের সম্পাদক, তদ্রূপ সমস্ত জীবই পরমে-শ্বরের কার্য্যসম্পাদক বলিয়া তাঁহার অংশতুল্য। কিন্তু শরীরের অবয়বরূপ অংশের ন্যায় মুখ্য অংশ নহে। কারণ, নিরবয়ব পরমেশ্বরের মুখ্য অংশ সম্ভবই নহে। মীমাংসাচার্য্য পার্থসারথি মিশ্রও "শাস্ত্রদীপিকা'র তর্কপাদে ভগবদ্গীতার উক্ত শ্লোকের উক্তরূপ তাৎপর্য্যই সমর্থন করিয়াছেন এবং উহা যে প্রাচীন ব্যাখ্যা, ইহা শারীরক ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করের কথা দ্বারাও বুঝা যায়। ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ও উক্তরূপ তাৎপর্য্যই গ্রহণ করিয়াছেন।

পার্থসারথি মিশ্র পরে ইহাও বলিয়াছেন যে, ভগবদ্-গীতার উক্তশ্লোকে "জীবভূতঃ সনাতনঃ"—এই বাক্যে শেষে "সনাতন" শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় জীবভাব যে নিত্য, ইহাও বুঝা যায়। সুতরাং উহা অদ্বৈত মতের সাধক না হইয়া বাধকই হয়। কারণ, অদ্বৈত মতে পরব্রহ্মের জীবভাব অজ্ঞানকল্পিত। আমি ব্রহ্মই আছি, কিন্তু আমি তাহা জানি না। অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মেই জীবভাব কল্পিত হইয়াছে। ঐ অজ্ঞানের বিনাশ হইলে ঐ জীবভাবেরও বিনাশ হয়। সুতরাং তখন সেই কল্পিত জীবেরও বিনাশ হয়। কিন্তু তাহা হইলে "জীবভূতঃ সনাতনঃ" এইরূপ উক্তি সঙ্গত হয় না। পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও উক্ত শ্লোকের টীকায় ঐ কথা বলিয়াছেন। তাঁহা-দিগের তাৎপর্য্য এই যে, পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মাও সনাতন, ইহা শ্রীভগবান্ পূর্ব্বেই বহু প্রকারে বলিয়াছেন। জীবাত্মাতে পরমাত্মার অনেক সাধর্ম্ম্য প্রকাশ করিয়াও তিনি উহাই সমর্থন করিয়াছেন। তথাপি পরে আবার উক্ত শ্লোকে "জীব-ভূতঃ সনাতনঃ"—এইরূপ বলায় জীবভাবও যে সনাতন, ইহাই তাঁহার বিবক্ষিত বুঝা যায়। অর্থাৎ উক্ত শ্লোকে সনাতনত্ব বা নিত্যত্ব, বিশেষণরূপেই বিবক্ষিত। সুতরাং জীবভাবেও উহার অন্বয়বশতঃ জীবভাবও যে নিত্য, ইহাই প্রকটিত হইয়াছে। তাহা হইলে ঐ জীবভাব যে, অজ্ঞান-কল্পিত নহে, ইহাও ঐ কথার দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। কারণ, জীবভাব অবিদ্যা-কল্পিত হইলে জীব নিত্য হইতে পারে না। বস্তুতঃ আমরাও দেখিতে পাই, শ্রুতিও "জীব" শব্দের প্রয়োগ করিয়াও বলিয়াছেন—"ন জীবো ম্রিয়তে" (ছান্দোগ্য ৬।১১।২)।

দ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন যে, জীব পরমেশ্বরের অংশ, ইহা কথিত হইলেও তদ্দ্বারা জীব যে পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন, ইহা বুঝা যায় না। কারণ, বরাহ-পুরাণে কথিত হইয়াছে—"স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে"। অর্থাৎ পরমেশ্বরের অংশ দ্বিবিধ;—স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। তন্মধ্যে মৎস্য কূর্ম্ম-বরাহাদি অবতারগণ তাঁহার স্বাংশ বা স্বরূপাংশ। কিন্তু জীবগণ তাঁহার বিভিন্নাংশ। যাহা বিভিন্নাংশ, তাহা অংশী হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন পদার্থ। কিন্তু পরমেশ্বরের ন্যায় জীবগণও চৈতন্য-স্বরূপ ও নিত্য, সুতরাং সজাতীয় বা তুল্য এবং পরমেশ্বর বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু জীবসমূহ অণু। তাই সজাতীয় সূক্ষ্ম পদার্থ অংশতুল্য বলিয়া ঐ তাৎপর্য্যেই তাহাকে পরমেশ্বরের অংশ বলা হইয়াছে। কিন্তু জীব পরমেশ্বরের বিভিন্ন অংশ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণও মাধ্বমতানুসারে পরমেশ্বরের পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। * শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও তাঁহার "সিদ্ধান্তরত্ন" গ্রন্থের অষ্টম পাদে লিখিয়াছেন—"স চ তদ্ ভিন্নোঽপি তচ্ছক্তিরূপত্বাৎ তদংশো নিগদ্যতে"। অর্থাৎ জীব ঈশ্বর হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন হইলেও ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ, এ জন্য তাঁহার অংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

---

* স্বাংশবিস্তার চতুর্ব্যূহ অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন।
চৈতন্য-চরিতামৃত—মধ্য, ২২ পঃ।

বস্তুতঃ বিষ্ণুপুরাণে জীবের কর্ম্মের ন্যায় জীবকে পরমেশ্বরের শক্তিবিশেষ বলা হইয়াছে। * এবং ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান্‌ও জীবকে তাঁহার পরাপ্রকৃতি বলিয়াছেন। † পরমেশ্বরের জগদ্ধারণে জীব তাঁহার প্রধান সাধন, এই অর্থে জীব তাঁহার পরাপ্রকৃতি। তাই তিনি বলিয়াছেন—"যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।" ঐ জীবরূপ শক্তি তাঁহার পরাপ্রকৃতি এবং উহা যে তাঁহা হইতে ভিন্ন, ইহাই তাঁহার ঐ কথার দ্বারা বুঝা যায়। শ্রীচৈতন্যদেবও পুরীধামে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকটে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বর সহ করহ অভেদ?
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীবে অভেদ কহ ঈশ্বরের সনে?॥

—চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য, ষষ্ঠ পঃ।

ফল কথা, দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ ভগবদ্‌গীতার দ্বারাও জীব ও ঈশ্বরের বাস্তব ভেদই বুঝিয়াছেন। কারণ, তাঁহারা দেখিয়াছেন—ভগবদ্‌গীতায় প্রথমে অর্জ্জুনকে আত্মার নিত্যত্ব বুঝাইতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, ‡ আমি, তুমি ও এই সমস্ত নৃপতিবর্গ—"সর্ব্বে বয়ং"—অর্থাৎ সকলেই আমরা চিরকালই আছি ও চিরকালই থাকিব। আমাদিগের কাহারও উৎপত্তিও নাই—বিনাশও নাই। উক্ত স্থলে শ্রীভগবান্ প্রথমে নিজের আত্মার পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়া এবং "সর্ব্বে বয়ং"—এইরূপ বলিয়া তাঁহা হইতে জীব যে তত্ত্বতঃ ভিন্ন, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। আরও তিনি বলিয়াছেন—"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।" উপক্রমে ঐরূপ ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া পরেও স্পষ্ট বলিয়াছেন—

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ গীতা ১৫।৭।

উক্ত শ্লোকে যিনি ত্রিলোকধারক অব্যয় ঈশ্বর, সেই উত্তম পুরুষ পরমাত্মা পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে ভিন্ন, ইহা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। এবং "তু" শব্দ ও "অন্য" শব্দের দ্বারা তাঁহার বাস্তব ভেদই প্রকটিত হইয়াছে। পরন্তু শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন—

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ"॥

গীতা ১৪।২

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তপুরুষগণ আমার সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ সৃষ্টিতেও পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন না এবং প্রলয়কালেও ব্যথিত হন না। দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ সকলেই ভগবদ্‌গীতার উক্ত শ্লোকে "সাধর্ম্ম্য" শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া জীবাত্মা ও পরমেশ্বরের বাস্তবভেদ সমর্থন করিয়াছেন। কারণ, বিভিন্ন পদার্থদ্বয়ের সাদৃশ্যই "সাধর্ম্ম্য" শব্দের মুখ্য অর্থ। আচার্য্য শঙ্কর উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, * "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" এই বাক্যের দ্বারা মৎস্বরূপতা প্রাপ্ত, এই অর্থই বুঝিতে হইবে, কিন্তু আমার সমানধর্ম্মতা প্রাপ্ত, এই অর্থ বুঝা যায় না। কারণ, গীতাশাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ স্বীকৃত হয় নাই। আচার্য্য শঙ্করের ঐ কথার দ্বারা ভিন্ন পদার্থদ্বয়ের সমান ধর্ম্মবত্তা বা সাদৃশ্যই যে "সাধর্ম্ম্য" শব্দের মুখ্য অর্থ, ইহা তাঁহারও সম্মত, ইহা স্বীকার্য্য। টীকাকার আনন্দগিরিও উহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন।

কিন্তু উক্ত শ্লোকে "সাধর্ম্ম্য" শব্দের সাদৃশ্যরূপ মুখ্য অর্থ গ্রাহ্য নহে, এ বিষয়ে আচার্য্য শঙ্কর যে হেতু বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসম্মত নহে। কারণ, দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মতে ভগবদ্‌গীতায় জীব ও ঈশ্বরের বাস্তব ভেদই উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং যে হেতু, অসিদ্ধ বা বিবাদগ্রস্ত, তদ্দ্বারা উক্ত "সাধর্ম্ম্য" শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রাহ্য নহে—ইহা নির্ণয় করা যায় না। তাই দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ উক্ত "সাধর্ম্ম্য" শব্দের মুখ্য অর্থই গ্রাহ্য বলিয়া উহার দ্বারা জীবাত্মা ও ঈশ্বরের বাস্তবভেদই সমর্থন করিয়াছেন। কারণ, তত্ত্বজ্ঞানী মুক্তপুরুষগণ পরমেশ্বরস্বরূপ না হইয়া পরমেশ্বরের সদৃশ হইলে তখনও পরমেশ্বরের সহিত তাঁহার ভেদ থাকায় ঐ ভেদ যে কল্পিত নহে, উহা নিত্য, ইহা স্বীকার্য্য। পরন্তু তত্ত্বজ্ঞানী মুক্তপুরুষ পরব্রহ্মস্বরূপত্বই লাভ করেন, ইহাই উক্ত শ্লোকের দ্বারা বিবক্ষিত হইলে—"মৎস্বরূপত্বমাগতাঃ"—এইরূপ বাক্য প্রয়োগ না করিয়া "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ"—এই বাক্য প্রয়োগ কেন হইয়াছে? সাদৃশ্যবোধক "সাধর্ম্ম্য" শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য কি? ইহাও ত চিন্তা করা আবশ্যক। আর ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক যে, মুক্তপুরুষগণ সকলেই পরব্রহ্মস্বরূপই হইলে তখন তাঁহাদিগের ব্যবহারিক ব্যক্তি-ভেদও থাকে না। সুতরাং উক্ত

---

* বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।
বিষ্ণুপুরাণ—৬।৭।৬১।

† অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।
গীতা—৭।৫।

‡ ন ত্বেবাহং জাতু নাসং, ন ত্বং, নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্।
।—২।১২।

* মম পরমেশ্বরস্য সাধর্ম্ম্যং মৎস্বরূপতামাগতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থো ন তু সমানধর্ম্মতাং সাধর্ম্ম্যং। ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভেদানভ্যুপগমাদ্ গীতাশাস্ত্রে। শাঙ্করভাষ্য। 'সাধর্ম্ম্যে গোগবয়য়োরিব বিদ্বদীশ্বরয়োরপি ভেদঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—"মৎস্বরূপতা"মিতি। সাধর্ম্ম্যস্য মুখ্যত্বে ভেদপ্রৌব্যাদ্ গীতাশাস্ত্রবিরোধঃ স্যাদিত্যাহ—"ন তি"তি।' আনন্দগিরিকৃত টীকা।

মতে "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ"—এই বাক্যে বহুবচন প্রয়োগও উপপন্ন হয় না।

পূর্ব্বোক্তরূপে আরও বহু বিচার করিয়া দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ সেই পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন আর কোন পদার্থের বাস্তব সত্তা নাই, ইহাও শাস্ত্রার্থ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে যে এই জগৎ মায়াময় অসত্য, এইভাবে অনেক বর্ণন আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, এই জগৎ অস্থায়ী অনিত্য। মানবের মুক্তিলাভে অধিকার-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক ও জাগতিক সমস্ত অনিত্যপদার্থে বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্যই শাস্ত্রে ঐরূপ বর্ণন হইয়াছে। জগতের বাস্তব সত্তাই নাই, জগৎ অসত্য বা মিথ্যা কল্পিত এবং ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বও কল্পিত, ইহা ঐ সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য নহে। তাই শ্রীভগবান্‌ও জগৎ অসত্য, এই মতের নিন্দা সূচনা করিতে বলিয়াছেন—

"অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরং" (গীতা ১৬।৮)

আর বেদাদিশাস্ত্রে যে অনেক স্থলে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বাশ্রয় পরমেশ্বরের নানারূপে বহু বিভূতির বর্ণন ও নানারূপ স্তুতি আছে এবং ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ নিজেও তাঁহার নানা বিভূতির বর্ণন করিয়াছেন এবং ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে "দেবীসূক্তে" দেবীর যে বিভূতির বর্ণন হইয়াছে, তদ্দ্বারাও সেই পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন পদার্থের পৃথক্ বাস্তব সত্তা নাই, ইহাই বিবক্ষিত নহে। কিন্তু তিনিই সর্ব্বেশ্বর, তিনিই সর্ব্বকর্ত্তা ও তিনিই সর্ব্বাশ্রয় ও সর্ব্বান্তর্যামী; সুতরাং সমস্তই তাঁহার অধীন, তাঁহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, ইহাই ঐ সমস্ত বর্ণনার তাৎপর্য্য। তাই শ্রীভগবান্ নিজেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥" গীতা ৭।৭

উক্ত শ্লোকে "পরতরং" এই পদে উৎকর্ষবোধক "তরপ্" প্রত্যয়ের প্রয়োগ বশতঃ ঐ "পর" শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ আমা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কিছুই নাই, ইহাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন। আমা হইতে ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহা তাঁহার তাৎপর্য্য নহে। তিনিই সমস্ত জীব ও জগতের আশ্রয়, তাই তাঁহা হইতে অন্য কিছু শ্রেষ্ঠ হইতেই পারে না। তাই ঐ সর্ব্বাশ্রয়ত্ব ও সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্ত করিতে পরে তিনিই বলিয়াছেন যে, সূত্রে মণি-সমূহের ন্যায় আমাতেই এই সমস্ত জীব ও জগৎ গ্রথিত আছে। সুতরাং সূত্রে গ্রথিত মণিসমূহ এবং তাহার আশ্রয়সূত্র যেমন তত্ত্বতঃ ভিন্ন পদার্থ, তদ্রূপ, সমস্ত জীব ও জগৎ এবং তাহার আশ্রয় পরমেশ্বরও তত্ত্বতঃ ভিন্ন পদার্থ, ইহাই উক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝা যায়। মূল কথা, দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ ভগবদ্গীতার দ্বারাও দ্বৈতবাদই বুঝিয়াছেন। তাঁহারা আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই।

আচার্য্য শঙ্কর শারীরক ভাষ্যে (২।১।১) মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের কোন কোন শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াও বলিয়াছেন যে, মহাভারতেও ঐ স্থলে দ্বৈতমতের খণ্ডন পূর্ব্বক অদ্বৈতমতই প্রকৃত সিদ্ধান্তরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ তাহাও বুঝেন নাই।

আমরা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ঐ স্থলে দেখিতে পাই, বৈশম্পায়নের নিকটে জনমেজয় প্রশ্ন করিলেন যে, পুরুষ অর্থাৎ আত্মা কি বহু অথবা এক? এবং কোন্ পুরুষ শ্রেষ্ঠ এবং পুরুষের যোনি অর্থাৎ উৎপাদক কি? তদুত্তরে বৈশম্পায়ন বলিলেন যে, * সাংখ্যাদি সম্প্রদায়ের মতে পুরুষ বহু, ইঁহারা পুরুষের একত্ব স্বীকার করেন না। কপিলাদি মহর্ষিগণ অধ্যাত্মচিন্তাকে আশ্রয় করিয়া সামান্যতঃ ও বিশেষতঃ নানা শাস্ত্র বলিয়াছেন। বেদব্যাস সংক্ষেপে যে পুরুষের একত্ব বলিয়াছেন, তাহা আমি তোমাকে বলিব। পরে সেখানে বহু পুরুষের কথা বলিয়া সেই সমস্ত পুরুষের যোনি এক পুরুষ আছেন, এবং তিনি সমস্ত পুরুষের সাক্ষিভূত মহাপুরুষ, ইহা কথিত হইয়াছে। সমস্ত পুরুষ বা জীবের দেহাদির সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়াই তিনি সমস্ত পুরুষের যোনি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ফল কথা, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ঐ স্থলে যে, বহু পুরুষবাদ বা দ্বৈতবাদের খণ্ডন পূর্ব্বক অদ্বৈতবাদই সিদ্ধান্তরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা আমরাও বুঝিতে পারি নাই। পরন্তু ঐ স্থলে পূর্ব্বোক্ত উভয় মতের স্বীকার পূর্ব্বক সমন্বয়ই প্রদর্শিত হইয়াছে—ইহাই আমাদিগের মনে হয়। তুমি শান্তিপর্ব্বের ৩৫০ ও ৩৫১ অধ্যায়টি প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিয়া যেরূপ বুঝিতে পার, তাহা আমাকে বলিবে। বস্তুতঃ মহাভারতে সমস্ত মতেরই বর্ণন হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ৮৭ম অধ্যায়ে শ্রুতি-দেবতাগণের যে পরমেশ্বরস্তুতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যেও সমস্ত

---

* বৈশম্পায়ন উবাচ—
বহবঃ পুরুষা লোকে সাংখ্যযোগবিচারিণাং।
নৈতদিচ্ছন্তি পুরুষমেকং কুরুকুলোদ্বহ॥
বহূনাং পুরুষাণাং হি যথৈকা যোনিরুচ্যতে।
তথা তং পুরুষং বিশ্বং ব্যাখ্যাস্যামি গুণাধিকং॥
উৎসর্গেণাপবাদেন ঋষিভিঃ কপিলাদিভিঃ।
অধ্যাত্ম-চিন্তামাশ্রিত্য শাস্ত্রাণ্যুক্তানি ভারত॥
সমাসতস্তু যদ্ব্যাসঃ পুরুষৈকত্বমুক্তবান্।
তত্তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি প্রসাদাদমিতৌজসঃ॥
মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহিসংজ্ঞিতাঃ।
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ কচিৎ॥
তস্যৈকত্বং মহত্ত্বঞ্চ স চৈকঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
মহাপুরুষশব্দং স বিভর্ত্ত্যেকঃ সনাতনঃ॥
শান্তিপর্ব্ব ৩৫০—৩৫১ অঃ।

মতেরই প্রকাশ হইয়াছে। সুচিরকাল হইতেই সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছায় নানা শাস্ত্রে নানা মতের প্রকাশ হইয়াছে। সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই সকল শাস্ত্রের যোনি। বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রই তাঁহার নিঃশ্বসিত, অর্থাৎ তাঁহা হইতেই অনায়াসে উদ্ভূত, ইহা শ্রুতিদেবী নিজেই বলিয়াছেন। তিনিই যুগে যুগে অনেক মহর্ষি ও তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত অনেক আচার্য্যের শরীরে আবিষ্ট হইয়াও নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা তাঁহারই মায়া। আবার তাঁহারই ইচ্ছাশক্তিরূপ মায়ার দ্বারা মোহিত হইয়া সুচিরকাল হইতেই কত কত মানব প্রকৃতির বৈচিত্র্যবশতঃ নিজের কর্ম্ম ও রুচি অনুসারে নানা বিরুদ্ধ মতের সমর্থন পূর্ব্বক নানাবিধ শ্রেয়ঃ উপদেশ করিতেছেন। তাঁহার পরমভক্ত উদ্ধবের প্রশ্নোত্তরে তিনি নিজেই ইহা বলিয়াছেন—

> "এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্।
> পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে॥
> মন্মায়া-মোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
> শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম্ম যথারুচি॥"
>
> শ্রীমদ্‌ভাগবত—১১।১৪।৮।৯॥

শিষ্য। শাস্ত্রে নানা মতের প্রকাশ হইয়াছে, ইহা ত বুঝিতেছি এবং একই শাস্ত্রের নানারূপ ব্যাখ্যার দ্বারাও নানা মতভেদ হইয়াছে। সুতরাং আমরা ত শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারি না, তাই আমরা সতত সংশয়াত্মা। কিন্তু আমাদিগের শ্রেয়ঃ কি?

গুরু। বুঝিবার জন্য সংশয় প্রকাশ করিও, কিন্তু সংশয়াত্মা হইও না। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" শাস্ত্রোক্ত নানা মতের মধ্যে নিজের অধিকার ও রুচি অনুসারে যে মতে শ্রদ্ধা জন্মে, সেই মতানুসারেই উপযুক্ত গুরুর সাহায্যে সাধনা কর। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া গুরু এবং জ্ঞানী বৃদ্ধগণের সর্ব্বতোভাবে উপাসনা কর এবং সতত নানা শাস্ত্র শ্রবণ কর। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তরে পিতামহ ভীষ্মদেব ঐ কথাই বলিয়াছিলেন, ইহা মহাভারতে শ্রবণ কর—

যুধিষ্ঠির উবাচ—

> অতত্ত্বজ্ঞস্য শাস্ত্রাণাং সততং সংশয়াত্মনঃ।
> অকৃতব্যবসায়স্য শ্রেয়ো ব্রূহি পিতামহ॥

ভীষ্ম উবাচ—

> গুরুপূজা চ সততং বৃদ্ধানাং পর্য্যুপাসনম্।
> শ্রবণঞ্চৈব শাস্ত্রাণাং কূটস্থং শ্রেয় উচ্যতে॥
>
> —শান্তিপর্ব্ব—মোক্ষধর্ম্ম ২৮৭ অঃ॥

বস্তুতঃ প্রথমে শাস্ত্রানুসারে যথাবিধি নানা কর্ম্ম কর্ত্তব্য। কারণ, কর্ম্ম ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি জন্মে না। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীতও সেই পরমেশ্বরে পরাভক্তি জন্মে না। তাঁহাতে পরাভক্তি ব্যতীতও তাঁহার তত্ত্ব প্রকাশ হয় না। তাই শ্রুতিও তাঁহার সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া শেষে বলিয়াছেন—

> "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
> তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"
>
> —শ্বেতাশ্বতর (৬।২৩)।

অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর ও গুরুতে তুল্যভাবে যাঁহার পরাভক্তি জন্মিয়াছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই কথিত সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য্য এই যে, সেই করুণাময় পরমেশ্বরে পরাভক্তি না জন্মিলে কেহ তাঁহাতে প্রপন্ন হইতে পারে না। প্রপন্ন না হইলেও তাঁহার মায়াকে জয় করিতে পারে না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" (গীতা—৭।১৪)। যাঁহারা তাঁহাতে প্রপন্ন হইয়া সতত প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার ভজন করেন, তিনি তাঁহাদিগকেই সেই "বুদ্ধিযোগ" প্রদান করেন, তিনি তাঁহাদিগেরই কৃপা করিয়া সমুজ্জ্বল জ্ঞানপ্রদীপের দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করেন। তাই তিনি নিজেই কৃপা করিয়া প্রাণস্পর্শিনী স্পষ্ট ভাষায় ঐ চরম কথাই পরে বলিয়াছেন—

> "মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
> কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
> তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
> দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
> তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
> নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।"
>
> গীতা—১০।৯।১০।১১।

তাই ভক্তগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহাকেই উক্তরূপে প্রপন্ন হইয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া অজ্ঞানান্ধকার নিরাসের জন্য তাঁহার নিকটেই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান প্রার্থনা করিয়াছেন। যাঁহার মায়ায় এই বিশ্ব বিমূঢ়, তিনি দেবীমূর্ত্তিতেও ভক্তবিশেষকে দর্শন দিয়া তাহার প্রার্থনানুসারে আত্মজ্ঞান প্রদান করেন। তাই ঋষি বলিয়াছেন—

> "তয়ৈব মোহ্যতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।
> সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি॥"
>
> —মার্কণ্ডেপুরাণ দেবীমাহাত্ম্য (চণ্ডীর শেষ)

তাই মাতৃভক্ত সাধক রামপ্রসাদ সেই বিশ্বমোহিনী মহামায়ার নিকটেই প্রপন্ন হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"খুলে দে মা চোখের ঠুসী দেখি তোরে অবিরত"

[ক্রমশঃ।

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ (মহামহোপাধ্যায়)।

ধ্বংসাবশেষ 'মায়া'নগরী

মেক্সিকোর মালভূমিতে চারিটি 'মায়া'নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিমানপথে যাত্রাকালে সস্ত্রীক কর্ণেল চার্লস্ লিণ্ডেনবার্গ চারিটি স্থানে মায়ানগরী আবিষ্কার করেন। তাঁহাদের সহিত কর্ণেজী ইনষ্টিটিউশনের প্রত্নতাত্ত্বিক ছিলেন। অধুনা আবিষ্কৃত নগরীগুলি, গোয়াটিমালা সাধারণ-তন্ত্র যে প্রদেশে অবস্থিত, তাহার কিছু দূরেই এই ধ্বংসাবশেষ নগরীগুলি বিদ্যমান

মায়ানগরীর দৃশ্য—বিমানপোত হইতে

বলিয়াই অনুমিত হয়। বিমানপথে যাত্রাকালে তাঁহারা ভীষণ অরণ্যের উপর দিয়া গমন করিতেছিলেন। এই অরণ্যের বিবরণ এখনও পর্য্যন্ত ভূগোলে বর্ণিত হয় নাই—মানচিত্রে অঙ্কিত হয় নাই। বিমানপোত হইতে তাঁহারা প্রথমতঃ তিনটি নগরী দেখিতে পান। চতুর্থ নগরীটিও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয়। সম্ভবতঃ শেষোক্তটি সম্বন্ধে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার টমাস্ গ্যাস উল্লেখ করিয়াছিলেন। উহা বাকালার হ্রদের সন্নিহিত প্রদেশে অবস্থিত। বিমানপোত হইতে লিণ্ডেনবার্গ-দল উল্লিখিত যে সকল নগরী দর্শন করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করিতে এখনও বহু মাস, বহু বর্ষ অতিবাহিত হইবে বলিয়া অভিজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আবিষ্কারকার্য্য সম্পন্ন হইলে মায়া-সভ্যতার বিকাশ ও পরিপুষ্টি সম্বন্ধে অনেক তথ্য সভ্য জগতে প্রচারিত হইবে।

গ্যাসনির্ণয়ে মূষিক

খনির মধ্যে বিষাক্ত বাষ্প সঞ্চিত বা উদ্ভূত হইলে কেনারী পাখীর দ্বারা তাহার অস্তিত্ব নিরূপিত হইত। অধুনা বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়াছেন যে, জাপানী মূষিক কেনারী পাখী অপেক্ষাও বিষাক্ত বাষ্পনির্ণয়ে অধিক উপযোগী। মার্কিণ যুক্তরাজ্যে এ বিষয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, জাপানী মূষিক অত্যন্ত চঞ্চল এবং সর্ব্বদা নৃত্যশীল। বিষাক্ত বায়ু অত্যন্ত
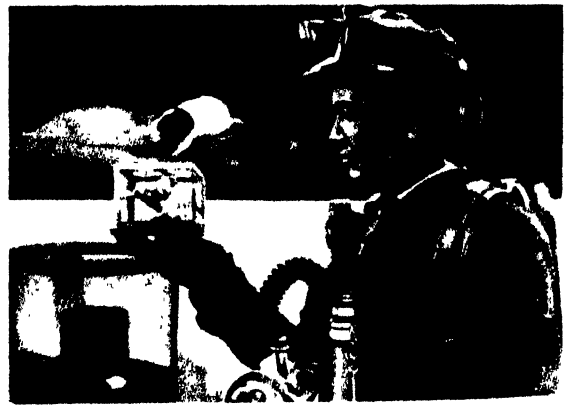
বিষাক্ত বাষ্পনির্ণয়ে জাপানী মূষিক

সহজে ইহাদের দেহে ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহারা অত্যধিক চঞ্চল এবং ৪ শত বার ঘুরপাক না দিয়া বিশ্রাম করে না। এই অত্যধিক চাঞ্চল্যবশতঃ তাহাদের শ্বাস-প্রশ্বাস ও রক্ত-সঞ্চালনের কার্য্য অত্যন্ত দ্রুত হইয়া থাকে। বিষাক্ত বাষ্প মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাদের দেহে স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করে। তাহার ফলে উহাদের গতি ও চঞ্চলতা হ্রাস পায়। ভূগর্ভে যাহারা কায করে, তাহারা দুই ঘণ্টাকালের উপযোগী অক্সিজেন সঙ্গে লইয়া যায়। কিন্তু উহা সহজে ব্যবহৃত হয় না। কেনারী পাখী বা জাপানী ইন্দুর সঙ্গে থাকিলে তাহারা বাষ্পের অবস্থা মানবদেহের পক্ষে অনিষ্টকর হইবার পূর্ব্বেই, উহা জানাইয়া দেয়। এখন হইতে জাপানী মূষিক ভূগর্ভের কার্য্যে ব্যবহৃত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

বিচিত্র মধুচক্র

জনৈক ইংরাজ মধু-ব্যবসায়ী বিচিত্র উপায়ে মধুমক্ষিকা প্রতিপালন করিয়া মধুচক্র নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উদ্যানমধ্যে ৮ ফুট উচ্চ মধুমক্ষিকা-ভবন নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে মধুমক্ষিকাগুলিকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। মৌমাছিরা সেই ভবনে চাক নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। প্রত্যেক ভবনে দ্বাদশটি তাক। প্রতি তাকের মধ্যে শত শত মধুমক্ষিকা ইচ্ছানুক্রমে চক্র নির্ম্মাণ করিয়া তথায় পুষ্পমধু বহন করিয়া আনে।

মধুমক্ষিকার বিচিত্র আবাস

এই উপায়ে তিনি মধুর ব্যবসায়ে অন্যান্য ব্যবসায়ীকে পরাস্ত করিয়াছেন।

দারুনির্ম্মিত গো-পদ

ডেন্‌মার্কের একটি গাভীর একটি পদ এমন ভাবে আহত হইয়াছিল যে, সেই পদটিকে অস্ত্রোপচারের দ্বারা দেহ হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া লওয়া হয়। দিনেমার কৃষি-বিজ্ঞান কলেজের জনৈক অধ্যাপক গাভীটির জন্য একটি দারুময় পদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই পদ গাভীর ছিন্ন চরণের সহিত

গাভীর দারুনির্ম্মিত পদ

সংশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়ার ফলে সে এখন সহজভাবে চলাফেরা করিতে পারিতেছে। গাভীটির স্বাস্থ্য এ জন্য বাহ্যতঃ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ওক্‌লাহামার জনৈক কৃষকের একটি ছাগের কোন একটি চরণও অস্ত্রোপচারের দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হইয়াছিল। সেই অজনন্দনও কাষ্ঠ-চরণের সাহায্যে অধুনা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে সমর্থ।

প্রসাধনাধারে মুদ্রারক্ষা

প্রসাধনদ্রব্যাদি সঙ্গে রাখা বিলাসিনীদিগের নিত্যকার্য্য। সেই আধারে বিভিন্ন মূল্যের মুদ্রা রক্ষা করিবার ব্যবস্থাও আছে। মুদ্রাগুলি উক্ত আধারে এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে যে, অনুসন্ধান করিতে হয় না। আধারটি খুলিবামাত্র অনায়াসে প্রয়োজনীয়

প্রসাধনাধারে মুদ্রারক্ষার ব্যবস্থা

মূল্যের মুদ্রা বাহির করা যায়। ইহাতে সময়ব্যয়ও হয় না; ক্ষতির সম্ভাবনাও থাকে না।

ভীষণাকার গরিলা

ডাক্তার ডেভেন্‌পোর্ট এক জন প্রসিদ্ধ শিকারী এবং পর্য্যটক। আফ্রিকার নিবিড়তম অরণ্যে পরিভ্রমণকালে তিনি একটি

বিভীষণ গরিলা

বিরাটাকার পার্ব্বত্য গরিলার সাক্ষাৎ পান। এত বড় গরিলা তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। অনেক কৌশলে তিনি এই বিভীষণ গরিলাটিকে নিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জনৈক বিশ্বাসী দেশীয় অনুচরকে নিহত গরিলার পার্শ্বে রাখিয়া তিনি গরিলাটির একটি আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। চিত্রখানি দেখিলেই বুঝা যাইবে, এই ভীষণাকার জীবের বক্ষঃস্থল কিরূপ প্রশস্ত এবং তাহার দেহে কি অসাধারণ শক্তিই না ছিল।

বর্ম্মাবৃত চলমান ব্যাঙ্ক

লস্ এঞ্জেলেসের ন্যাসনাল ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ সহরের উপকণ্ঠস্থিত মক্কেলদিগের সুবিধার জন্য গ্রামে গ্রামে চলমান ব্যাঙ্ক পাঠাইবার

চলমান বর্ম্মাবৃত মোটর ব্যাঙ্ক

ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ম্মাবৃত মোটর গাড়ীর মধ্যে অর্থ থাকে। যাহারা ব্যাঙ্কের মক্কেল, তাহারা গৃহে বসিয়া টাকার আদান-প্রদান করিতে পারে। এ জন্য তাহাদিগকে ব্যাঙ্কে দৌড়াইতে হয় না। এই চলমান ব্যাঙ্ক বর্ম্মাবৃত এবং উহাকে রক্ষার জন্য অস্ত্রধারী প্রহরীও থাকে। গাড়ীর মধ্যে কলের কামান আছে। দস্যুদল এই চলমান ব্যাঙ্ক লুণ্ঠন করিতে সাহসী হয় না। পল্লী-বাসীরা এই ব্যবস্থায় সহজে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে পারে এবং প্রয়োজনানুসারে টাকা উঠাইয়া লইতেও বেগ পায় না।

অগ্নি নির্ব্বাণের বিচিত্র ব্যবস্থা

জার্ম্মাণীতে জলের পরিবর্ত্তে অগ্নিনির্ব্বাণ-কার্য্যে পাউডার-জাতীয় পদার্থ ব্যবহৃত হইতেছে। নির্দ্দোষ কার্ব্বলিক এসিডচূর্ণ নলের

কার্ব্বলিক এসিড-চূর্ণ প্রয়োগে অগ্নিনির্ব্বাণ

সাহায্যে প্রজ্বলিত স্থানে নিক্ষেপ করিবামাত্র অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। কার্ব্বলিক এসিডচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় দ্রব্যাদি নষ্ট হয় না; কিন্তু জলের স্রোতে নষ্ট হইয়া থাকে।

বাজারের থলে বিকল্পে আসন

বাজারে সম্প্রতি একপ্রকার সৌখীন থলে বাহির হইয়াছে, তদ্দ্বারা জিনিষ বহন ও উপবেশন উভয় কার্য্যই সমাধা করা যায়। নারীরা বাজার করিবার পূর্ব্বে বায়স্কোপ বা অন্য কোনও প্রকার আমোদ-প্রমোদে যোগ দিবার সময় থলেটিকে সুখ-সেব্য আসনে পরিণত করেন। তার পর গৃহে ফিরিবার সময় দ্রব্যাদি কিনিয়া তন্মধ্যে রক্ষা করেন। প্রতীচ্য-দেশীয়া নারীরা এই যুগল কার্য্য সম্পাদনের উপযোগী বস্তুটির অত্যন্ত অনুরাগিণী।

বিচিত্র বাজারের থলে

পৃষ্ঠদেশে শঙ্কাজ্ঞাপক আলোক

লণ্ডনের রাজপথ-গুলি যেমন জন-বহুল, তেমনই যানবাহন-কণ্টকিত। এ জন্য পথে নিরাপদে চলাফেরা করা অনেক সময় নিরাপদ নহে। রাজপথ অতিক্রমকালে পাছে কোনও মোটরের তলদেশে নিপতিত হইতে হয়, এ জন্য পথবাহী নারী বা পুরুষগণ পৃষ্ঠদেশে একপ্রকার বৈদ্যুতিক আলোক জালিয়া যাতায়াত করেন। পাঠকগণ চিত্র হইতে আলোক-ব্যবস্থার স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন।

পৃষ্ঠদেশে শঙ্কাজ্ঞাপক বৈদ্যুতিক আলোক

জল-পাদুকা

বর্ণিত চিত্র হইতে দেখা যাইবে, ভাসমান জল-পাদুকা পরিধান করিয়া এক ব্যক্তি জলের উপর দিয়া যাইতেছে। উহার সম্মুখভাগে একটি পাইল উড়িতেছে। পশ্চাতে হাল, এই পাইল বিশিষ্ট পাদুকা-নৌকা যদৃচ্ছ পরিচালনা করা যায়। যে ব্যক্তি পাইলের দণ্ডধারণ করিয়া আছে, সে শরীরকে যে দিকে চালনা করিবে, নৌকা সেই দিকে চলিবে।

জল-পাদুকার নৌকা

সকাগজ পেন্সিল

সকাগজ পেন্সিল

অনেক সময় পকেটে পেন্সিল বা ফাউন্টেন পেন থাকিলেও কাগজ হয় ত থাকে না। সে জন্য বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। এ জন্য বাজারে একপ্রকার পেন্সিল বাহির হইয়াছে, তাহার সঙ্গে কাগজ রাখিবার চমৎকার ব্যবস্থা আছে। পেন্সিলের আধারমধ্যে চিঠির কাগজ গোল করিয়া জড়ান থাকে। পশ্চাতের রবার যেখানে অবস্থিত, সেখানে একটি বোতামের ব্যবস্থা আছে। উহা দক্ষিণে ও বামে ঘুরাইলেই কাগজ বাহির হইয়া আসে বা ভিতরে গুটাইয়া রাখা যায়।

আহত কুকুরের নিরাময়-প্রণালী

জনৈক মার্কিণ ভদ্রলোকের একটি কুকুরের পশ্চাতের পদযুগলের উপর দিয়া মোটর গাড়ী চলিয়া যাওয়ায়, হতভাগ্য পশুটি আহত হয়। উহার প্রভু চক্র-বিশিষ্ট একটি আধার নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সহিত কুকুরের দেহ সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে কুকুরটি পরম আরামে যত্রতত্র গমন করিতে পারিত। কুকুরের আঘাত তেমন সাংঘাতিক হয় নাই। কিছু কাল পরে তাহার চরণের আঘাত নিরাময় হইয়াছিল।
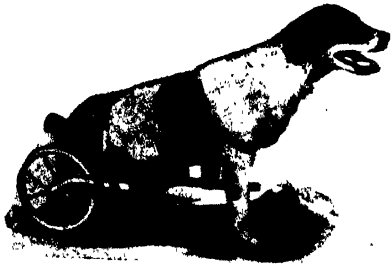
আহত কুকুরের নিরাময়ের ব্যবস্থা

পারাবত-সাহায্যে চুরী

হাম্বার্গের এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট হইতে একটি শিক্ষিত পারাবত ও চিঠি পায়। পত্রে লেখা ছিল যে, পারাবতের গলদেশে ৫ হাজার মার্ক মুদ্রার নোট বাঁধিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলে অপর ব্যক্তি সেই টাকা পাইবে! উভয় ব্যক্তি তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ভয় দেখাইয়া কিছু টাকা আদায় করিয়া লইয়াছিল। পুলিস এই ঘটনার সন্ধান পাইয়া উড্ডীয়মান পারাবতের পশ্চাতে দুইখানি বিমানপোত ছাড়িয়া দিয়াছিল। পারাবতটি নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে উপস্থিত হইলে বিমানপোত হইতে পুলিস সেই বাড়ীর ফটোগ্রাফ লইয়াছিল। পরে সেই চিত্রের সাহায্যে লোকটিকে গ্রেপ্তার করায়, অপরাধী সমস্ত কথা স্বীকার করে।

পারাবতের সাহায্যে চুরী

বিচিত্র মডেল

জীবন্ত "মডেলের" পরিবর্ত্তে কলকব্জাবিশিষ্ট দারুময় মনুষ্য-মূর্ত্তির সাহায্যে কোন কোন চিত্র-শিল্পী—চিত্রাঙ্কন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই দারুমূর্ত্তির হস্ত-পদাদি যে কোন অবস্থায় রাখিয়া চিত্রকার্য্য সম্পন্ন করা বিশেষ সুবিধাজনক। অনেক সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির যথাযথ মাপ কল্পনার দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। এই দারুময় মডেলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দেহের অনুরূপ পরিমাপবিশিষ্ট। সুতরাং চিত্র-শিল্পী যত বড় দেহ অঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করেন, এই মডেলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির মাপ হইতে

বিচিত্র মডেল

তাহা নির্ণয় করিয়া লন। যখন ইহার প্রয়োজন থাকে না, তখন অন্যত্র দারুমূর্ত্তিটিকে খুলিয়া রাখা হয়।

মোটর গাড়ীতে ভাঁজ-করা টেবল

মোটরে ভাঁজ-করা টেবল

ভ্রমণকারীরা মোটরে আহারাদি সম্পন্ন করিবার জন্য গাড়ীর সঙ্গে ভাঁজ-করা টেবল রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সম্মুখের আসনের পশ্চাতে এই ভাঁজ-করা টেবল সন্নিবিষ্ট থাকে। ইহার প্রস্থ ও দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১৬ ও ২৮ ইঞ্চ হইবে। গাড়ীতে বসিয়া লিখিবার জন্যও এই টেবল ব্যবহৃত হয়। চারি জন আরোহী এই টেবলে বসিয়া জলযোগ সম্পন্ন করিতে পারেন।

বিচিত্র মৎস্য

বিচিত্র মৎস্য

দুই জন বৈজ্ঞানিক কুইন্স্ল্যাণ্ডের "গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ" দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহারা ঘটনাক্রমে একটি মৎস্য ধরিয়াছিলেন। এই বিচিত্র মৎস্যটি প্রবালপুঞ্জের সহিত এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছিল যে, তাহাকে ঐ জাতীয় বস্তু বলিয়া প্রথমতঃ তাঁহাদের ভ্রম হইয়াছিল। এই জাতীয় মৎস্য অত্যন্ত বিষাক্ত বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ মত প্রকাশ করেন। মৎস্যের অঙ্গের আঘাতে মানব-দেহের কোথাও যদি আঁচড় লাগে, তাহা হইলে শরীরে তীব্র যন্ত্রণা হয়। কখনও কখনও মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে। এই মৎস্যকে পাথর মাছ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ধৃত হইবার কয়েক দণ্ড পরে মৎস্যটির প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়ার যাদুঘরে মৎস্যদেহ রক্ষিত হইয়াছে।

পরলোকে সিদ্ধেশ্বর ঘোষ

পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী স্বনামধন্য জমীদার স্বর্গীয় খেলাৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র ও স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষের পুত্র সিদ্ধেশ্বর বাবু মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে গত ১লা ফাল্গুন তাঁহার রাণীগঞ্জের বাটীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সিদ্ধেশ্বর বাবু দেশের নানা হিতকর কার্য্যে মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতৃপিতামহের অনেক গুণের অধিকারী হইয়া অল্প-বয়সেই যশস্বী হইয়াছিলেন। এই সদাপ্রফুল্ল, অমায়িক, মিষ্টভাষী, বন্ধুবৎসল ও পরোপকারী যুবাপুরুষ বহু অনাথ, বিধবা, স্কুল কলেজ ও টোলের ছাত্রদিগকে মাসিক সাহায্য করিতেন। কন্যাদায় এবং পিতৃমাতৃদায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার সাহায্যলাভে কখনও বঞ্চিত হন নাই। আজ তাঁহার অকাল-বিয়োগে চারিদিকে বিয়োগব্যথা অনুভূত হইতেছে। তিনি গত আশ্বিনমাসে তাঁহার পিতামহীর দানসাগর শ্রাদ্ধে লক্ষাধিক টাকা খরচ করিয়াছিলেন। তিনি খেলাৎচন্দ্র ইনষ্টিটিউসনে এককালীন এক লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন। তিনি দেশবন্ধু স্মৃতিমন্দিরের সাহায্যার্থ কয়েক সহস্র মুদ্রা মহাত্মা গন্ধীর হস্তে দান করিয়াছিলেন। খাদি-প্রতিষ্ঠানের উন্নতির চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। তিনি একটি বিধবা-শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। সৎকার্য্যে তাঁহার অনেক গুপ্ত দান ছিল। সিদ্ধেশ্বর বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অক্ষয় বাবু, একটি কন্যা, স্ত্রী ও জননী বর্ত্তমান। তাঁহার বিয়োগে একণে দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবান্ তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ করুন।

সিদ্ধেশ্বর ঘোষ

জন্ম—৯ই শ্রাবণ, ১৩০৭। স্বর্গারোহণ—১লা ফাল্গুন, ১৩৩৬।

৮

"স্বার্থের সংঘর্ষ"

ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় এক জন উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ-সন্তান। তাহার পিতা সংযমচন্দ্র এক জন অবস্থাপন্ন জমীদার ছিলেন। তাঁহার পূজা, পার্ব্বণ, দান-ধ্যান যথেষ্ট ছিল। সমস্তই পৈতৃক সম্পত্তির আয়ের উপর নির্ভর করিত। অর্থাগমের নূতন উপায় অবলম্বন করা জমীদার-বংশের আদর্শ নহে মনে করিয়া সংযমচন্দ্র অন্য কোনও পেশা অবলম্বন করেন নাই।

ননীগোপালের এক বিধবা পিসীমাতা ছিলেন। তিনি অল্পবয়সেই বিধবা হইয়া বরাবরই পিতার আলয়ে লালিতা-পালিতা ও বর্দ্ধিতা হইয়াছিলেন। পিতৃভবনে তাঁহার প্রভূত আধিপত্য ছিল এবং সাংসারিক যাবতীয় ব্যাপার তাঁহারই মতানুসারে সম্পাদিত হইত।

ননীগোপাল বাপের একমাত্র সন্তান। আলালের ঘরের দুলাল বলিয়া তাহার আদরের সীমা ছিল না।

গ্রামে একটি পাঠশালা ছিল। সেই পাঠশালায় জটাধারী গাঙ্গুলী নামে এক গুরুমহাশয় ছিলেন। জটাধারী সার্থক-নামা ছিলেন অর্থাৎ তাঁহার জটা না থাকিলেও তাঁহার লম্বিত কেশগুচ্ছ ছিল। ছেলেদের মহলে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল।

ননীগোপালের বয়স যখন ১০ বৎসর, তখন সে প্রথম জটাধারী-অধ্যুষিত গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি হয়। তাহার পিতা-মাতার ইচ্ছা ছিল, ৭ বৎসর বয়সেই তাহাকে পাঠ-শালায় ভর্ত্তি করিয়া দেন। কিন্তু ননীগোপালের পিসীমাতা তাঁহার আদরের দুলালকে কোনমতেই পাঠশালায় পাঠাইতে সম্মত ছিলেন না। তাঁহার যুক্তি এই ছিল যে, মুখোপাধ্যায়-বংশের কুলপ্রদীপ, জমীদার-সন্তান, সাধারণ লোকের সন্তানদের মত বিদ্যার্জ্জন করিতে গেলে জমীদার-বংশের অপমান হইবে। তাহার পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি চিরকাল জমীদারী চালাইয়া আসিতেছেন। ননীগোপালও সেইভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। কিন্তু পরিশেষে ননীগোপালকে পাঠশালায় যাইতে হইল। কয়দিন হাজিরা দিবার পর জমীদার-বংশের দুলাল "পাঠশালা-পলায়ন" বিদ্যা আরম্ভ করিল। উপর্য্যুপরি তিন দিন অনুপস্থিতির পর গুরুমহাশয় জটাধারী স্বয়ং জমীদার-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ননীগোপাল ভয়ে তাহার পিসীমাতার অঞ্চল-চ্ছায়ায় আশ্রয় লইল।

জটাধারী বলিলেন, "পিসীমা, ননীগোপাল আজ তিন দিন পাঠশালায় যায় নাই।"

পিসীমা। হ্যা রে, ননী, তুই পাঠশালায় যাসনি কেন?

ননী। আমার বড় শীত করে। যেতে ভাল লাগে না।

জটাধারী। তবে লেখাপড়া শিখ্‌বি কি ক'রে?

পিসীমা। আচ্ছা, গ্রীষ্মকালে শিখ্‌বে, শীতকালে এত সকালে সে উঠ্‌তে পারে না।

জটাধারী। তবে লেখাপড়া শিখ্‌বে কি ক'রে ও কবে? আর লেখাপড়া না শিখ্‌লে ত চল্‌বে না, চল্ ননী, আমার সঙ্গে পাঠশালায় চল্।

ননীগোপাল পিসীমাতাকে জড়াইয়া ধরিল।

পিসীমা বলিলেন, "তা বাপু, যখন সুবিধা হবে, তখন যাবে, তুমি অত ত্যক্ত করছ কেন?"

জটাধারী দমিবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন, "ত্যক্ত করা কি পিসীমা, লেখাপড়া না শিখ্‌লে চল্‌বে কি ক'রে?"

পিসীমাতা এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়া ছিলেন, কিন্তু এখন আর রাগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "তবে রে বিট্‌লে বামুন, তোর বাপ-জ্যাঠা ছেলে চরিয়ে খেয়েছেন, সকলেই পণ্ডিত ছিলেন অথচ চিরকাল ছেলে ধ'রে ও ছেলে চরিয়ে পেট চালিয়েছেন, আর আমার বাপ-দাদা

চিরকালই জমীদারী চালিয়ে সংসার করেছেন। তোরা যা কচ্ছিস্, তাই কর্, আর আমার ননীগোপাল তার বাপ-দাদা যা ক'রে গেছে, তাই কর্‌বে। তোদের মত প্রজাকে ঠেঙ্গিয়ে খাবে। যা, বিট্‌লে বামুন, সে আর পাঠশালায় যাবে না। এবার যদি ছেলে ধর্‌তে আমার বাড়ীর কাছে আসবি, তোর ঐ লম্বা কাণকে ছোট ক'রে ছেড়ে দেব।"

পিসীমাতার মূর্ত্তি দেখিয়া ও তাঁহার বচনসুধা পান করিয়া গুরুমহাশয় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আসিবার সময় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, পিসীমা যাহা বলিয়াছেন, তাহা কটু হইলেও সত্য।

যাহা হউক, সংযম মুখোপাধ্যায় ক্রমান্বয়ে বিষয়-সম্পত্তি বন্ধক দিয়া, বিক্রয় করিয়া পূর্ব্বাচরিত প্রথা বজায় রাখিয়া চলিতে লাগিলেন। বার্দ্ধক্যকালে অর্থের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইল। কিন্তু খরচ কমাইতে পারিলেন না, অথচ আয়ের নূতন উপায়ও উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না, কাযেই সাংসারিক অনেক অসুবিধা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিম্বদন্তী আছে, এক সময়ে এক পুরাতন জমীদারবংশের অগ্রসন্তানের সম্মুখে লক্ষ্মী আবির্ভূত হইয়া বলিয়াছিলেন, "এখন তোমার যা অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে হয় আমাকে ছাড়, নয় তোমার পুরাতন বনিয়াদি চাল ছাড়। এই দুই ব্যবস্থা একসঙ্গে চলিতে পারে না।" তাহাতে সে লোকটি উত্তর দিয়াছিলেন, "মা, আমি তোমায় ছাড়িতে পারি, কিন্তু পুরান চাল ছাড়িতে পারিব না।" সংযম মুখুয্যে মহাশয়ের তাহাই হইল। তাঁহার পুরাতন বনিয়াদি চাল, গাড়ী, ঘোড়া, পাল্কী, বাহক, নায়েব, তহশীলদার, পাইক, নিত্য পূজা, দান, বার মাসে তের পার্ব্বণ সবই চলিতে লাগিল, কিন্তু খরচের আধিক্যহেতু দেনা হইতে লাগিল। ক্রমে দেনা না দিতে পারায়, সম্পত্তির কোন কোন অংশ বিক্রীত হইতে লাগিল। তিনি কোন কর্ম্মই শিখেন নাই, অতএব অর্থাগমের অন্য কোন পন্থা উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। তাঁহার পুরাতন বনিয়াদি চাল রহিয়া গেল, কিন্তু লক্ষ্মী ছাড়িয়া গেলেন।

এক দিন সংযমচন্দ্র প্রতিবাসী আত্মীয়স্বজন ও পোষ্য-পরিবারবর্গকে কাঁদাইয়া লোকান্তরে চলিয়া গেলেন। মহাযাত্রার পূর্ব্বে অধিকাংশ সম্পত্তি শেষ করিয়া গেলেন। রাখিয়া গেলেন তাঁহার একমাত্র পুত্র ননীগোপাল, বিধবা বনিতা হৈমবতী, ভগিনী জটিলাসুন্দরী এবং অপর্য্যাপ্ত ঋণ।

সংযম বাবুর মৃত্যুর চারি বৎসর পরেই আত্মীয়স্বজনগণও ননীগোপাল প্রভৃতির সংবাদ লওয়া পরিত্যাগ করিলেন। ননীগোপালের বয়স তখন ১৬ বৎসর। সে কোনরূপ লেখা-পড়া শিখে নাই, কোনরূপ কার্য্যক্ষমও হয় নাই। ঋণগ্রস্ত জমীদারীকে চালাইবার শক্তি ও বুদ্ধি তাহার ছিল না। ক্রমেই তাহাদের দুর্দ্দশা চরমে উঠিবার উপক্রম করিল।

ননীগোপালের ১৮ বৎসর বয়সে তাহার পিসীমাতা এবং মাতাও শোকে, দুঃখে, অভাবে, আত্মীয়গণের ব্যবহারে ক্ষুব্ধা ও দুঃস্থা হইয়া ভবলীলা সংবরণ করিলেন।

ইতিমধ্যে দেনার দায়ে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেল। নিকট-আত্মীয়রাই সেই সব সম্পত্তি জলের দরে কিনিয়া রাখিলেন! সম্পত্তিগুলির নীলামের সময় অন্যান্য লোক উপযুক্ত মূল্যে খরিদ করিতে আসিয়াছিলেন। ননীগোপালের আত্মীয়রা তাঁহাদিগকে বলিলেন—"মহাশয়, আপনারা এই সম্পত্তিগুলি ডাকিবেন না, আমরা তাঁহার নিকট-আত্মীয়, আমরা চেষ্টা-বেষ্টা করিয়া এই সম্পত্তি কম দামে কিনিয়া ননীগোপালকেই স্থিতু করিব এবং এইভাবেই সংযম মুখুয্যের বংশধরের যাহাতে কষ্ট না হয়, তাহা দেখিব।" এই বলিয়া ঐ সম্পত্তিগুলি খুব কম দামে কিনিয়া লইলেন। পরে তাঁহারাই বলিতে লাগিলেন, "আরে রাধামাধব! ওই হাবাতে ছোঁড়াটাকে সম্পত্তি দিয়া কি লাভ হইবে? যদি ছোঁড়াটা কখনও শোধরায়, তখন দেখা যাবে এবং কর্ত্তব্য বিবেচনা করা যাবে।"

এইরূপে ননীগোপাল সর্ব্বস্বান্ত হইল।

শুধু মাতার খানকয়েক অলঙ্কার ও মূল্যবান্ বস্ত্র সমেত দুইটি ট্রাঙ্ক ও কিছু নগদ মুদ্রা ননীগোপালের অবলম্বন হইল। আত্মীয়-স্বজনের কেহই তাহাকে আশ্রয় দিল না। স্বার্থের জন্য সকলেই তাহাকে তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করিল, সকলেই তাহাকে তাড়াইয়া দিল। আর সেই স্বার্থসাধনের জন্যই তাহার গহনা, নগদ টাকা ও বাক্সের দিকে নজর রাখিয়া এক গণিকা তাহাকে আশ্রয় দিল।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় অনেক গণ্যমান্য নামজাদা এটর্ণি ও উকীল অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট-রূপে কলিকাতা পুলিস আদালতে কার্য্য করিতেন এই

শ্রেণীর হাকিমের সংখ্যা এ সময় বড় কম ছিল না। বাবু কালীনাথ মিত্র, C.I.E, বাবু গণেশচন্দ্র চন্দ্র, বাবু অর্দ্ধেন্দু-কুমার গাঙ্গুলী, বাবু নবীনচাঁদ বড়াল, বাবু অমরেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি এবং আরও অনেক গণ্যমান্য আইনজীবী অবৈতনিক হাকিম ছিলেন। তাঁহারা সকলেই বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোক ছিলেন। আজকালকার হাল আইনের মতে তাঁহাদের একটি দুইটি কিম্বা ততোধিক পোঁ-ধরা উকীল তাঁহাদের কাছে ওকালতি করিত না। আজকাল প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক হাকিমের একটি বা ততোধিক পেয়ারের উকীল আছে। সেই উকীলগুলি হাকিমদের ঘরে উকীলশ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের অপেক্ষা বড় উকীল এ এজলাসের জন্য আর পাওয়া যায় না। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত যে আইন-ব্যবসায়ী অবৈতনিক হাকিম হইতেন, তিনি যে আদালতের বিচারভার পাইতেন, সেই আদালতেই আবার ব্যবহারাজীবের পেশা চালাইতে পারিতেন। কিন্তু Act v of 1898এ এই নিয়মের পরিবর্ত্তন হয়। অর্থাৎ সেই সময় হইতে তিনি একবার বেঞ্চে বসিবেন আর একবার ওকালতী করিবেন, এই প্রথা রহিত হইয়া যায়।

আমি দেখিয়াছি, পূর্ব্বকথিত ভদ্রমহোদয়গণ কয় ঘণ্টা হাকিম হইয়া বসিলেন এবং তৎপরেই হাকিমের তক্ত হইতে অবতরণ করিয়া উকীলভাবে মক্কেলের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। অমরেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। এক দিন তিনি লালবাজারে ম্যাজিষ্ট্রেট-রূপে শোভা পাইতেছেন, তাঁহার ঘরে একটি নূতন ধরণের চুরির মামলা চলিতেছিল। পূর্ব্বেই বলিয়া রাখা উচিত, ১৮৯৩-৯৪ খৃষ্টাব্দে আমি অমরেন্দ্র বাবুর কাছে হাইকোর্টের Appellate sideএ Articled clerk ছিলাম। তাঁহার সম্বন্ধে আমি লিখিলাম, তিনি আদালতে শোভা সম্পাদন ও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিতেছিলেন। বাস্তবিক তাহা সত্য কথা। তিনি দৈর্ঘ্যে ৬ ফুট কয় ইঞ্চি, প্রস্থেও প্রায় ৩ ফুট। বর্ণ খুব সুন্দর, এক কথায় বলিতে গেলে তিনি সুপুরুষ ছিলেন। তিনি দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে যেমন বড় ছিলেন, অন্তঃকরণেও তদপেক্ষা বড় ছিলেন। তাঁহার মত উদার ও উচ্চ অন্তঃকরণবিশিষ্ট লোক খুবই বিরল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি হাকিম হইয়া বসিয়াছেন, তাঁহার এজলাসে একটি মোকদ্দমা পেশ হইল। ইহা পুলিস-চালানি মোকর্দ্দমা নহে, দরখাস্ত করিয়া মোকর্দ্দমা রুজু হইয়াছে। ফরিয়াদীর নাম সৌরভী দেবী, আসামীর নাম রূপচাঁদ মুখুয্যে। এই রূপচাঁদ মুখুয্যে আর কেহই নহে, আমাদের পূর্ব্বকথিত ননীগোপাল মুখুয্যে। ফরিয়াদীর উকীল মিঃ ডট্ (তিনি এখন জীবিত নাই)। তিনি তখন বিলাত হইতে নূতন ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিলেন, কাযেই তখন ঝাঁজ খুব বেশী। আসামীর পক্ষের উকীল মিঃ ম্যানুয়েল ও আমি।

মিঃ ডট্ নূতন কৌন্সুলী, বিলাত হইতে পাশ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, মোকর্দ্দমার ঘটনাবলী ও প্রমাণ-প্রয়োগ যতই কম থাকুক্ না কেন, তিনি তাঁহার বক্তৃতার চোটে সামান্য ঘটনা হইতেও ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া একটা মস্ত জিনিষ করিয়া তুলিতে পারিবেন।

হাকিম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ ডট্, আপনার মোকর্দ্দমাটি কি?"

তিনি একটি আকাশ-পাতালব্যাপী ঘটনাবলীর স্রোতস্বতীর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন। তাঁহার মুখ হইতে ঘটনা-স্রোত কল-কল রবে বহিয়া যাইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "হুজুর, কলিকাতা সহরে দিন-দুপুরে এমন অরাজকতার বিষয় কখন শুনা যায় নাই। আমার মক্কেল নিঃসহায়া, পিতৃমাতৃহীনা এক জন স্ত্রীলোক। এ জগতে তাহার অন্য কোন আশ্রয় নাই। ইংরাজ রাজত্বে এরূপ অরাজকতা হইতে পারে, তাহা আপনি শুনিলেও বিশ্বাস করিবেন না। এই আসামী ভদ্রসন্তান হইলেও অতি নীচ ও জঘন্য প্রকৃতির লোক ও অতি দুশ্চরিত্র। অবশ্য আমার মক্কেল তাহা পূর্ব্বে জানিত না—"

আঃ উকীল।—আমি মিঃ ডটের এই কথায় বিশেষরূপে আপত্তি করি। মামলায় প্রমাণ হইবার পূর্ব্বে ভদ্রসন্তান আসামীকে দুশ্চরিত্র, নীচ ও জঘন্য প্রকৃতির লোক বলিবার আপনার অধিকার নাই।

ফঃ কৌঃ।—যে ব্যক্তি বেশ্যালয়ে যায়, সে ব্যক্তি দুশ্চরিত্র নয় কি চরিত্রবান্? নীচ নয় কি উচ্চ? জঘন্য নয় কি ভাল?

আঃ উঃ।—যদি বেশ্যালয়ে যাইলেই লোক দুশ্চরিত্র, নীচ ও জঘন্য প্রকৃতির হয়, তাহা হইলে কলিকাতার ১ শত জনের ভিতর ৯৫ জন লোক ঐ শ্রেণীভুক্ত।

মিঃ ডট বলিতে লাগিলেন—"জানিলে তাহাকে কখনই আশ্রয় দিত না। যখন তাহাকে তাহার জাতি, কুটুম্ব, আত্মীয়-স্বজন সকলেই পরিত্যাগ করে, তখন আমার মক্কেল দয়াবশে তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহাকে আশ্রয় দেন। যখন পৃথিবীর সকল লোকই নীচ-প্রকৃতি ও কূটবুদ্ধির জন্য তাহাকে ত্যাগ করে, একমাত্র আমার মক্কেলই তাহাকে আশ্রয়দানে বঞ্চিত করেন নাই। চারি বৎসর ধরিয়া তাহাকে আশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন, ভাত, কাপড়, পোষাক, পরিচ্ছদ, শীতে বস্ত্র, গ্রীষ্মে পাখার হাওয়া, মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখিবার পয়সা সবই জোগাইয়াছেন। সেই উপকারের প্রত্যুত্তরে সে যে কি নির্ম্মম অকৃতজ্ঞ ব্যবহার করিয়াছে, তাহা শুনিলে আপনি আশ্চর্য্য হইয়া যাইবেন। অনেক সময়ে সত্য ঘটনা গল্পের অপেক্ষাও আশ্চর্য্যজনক। এই চারি বৎসর প্রভূত সেবা করিয়া এক দিন আমার মক্কেল তাঁহার ধর্ম্ম-ভায়ের বাড়ী চলিয়া যান, সেখানে ফোঁটা দিবার জন্য। হুজুর, আপনি ফোঁটা কাকে বলে, তা বোধ হয় জানেন, 'A drop of kindness to brother.'"

হাকিম।—মিঃ ডট, আমি ফোঁটা খুব ভালই জানি, এখনও নাতনীদের কাছ থেকে ফোঁটা লইয়া থাকি।

মিঃ ডট্ বলিতে লাগিলেন—"আসিয়া কি দেখিলেন, তাহা শুনিবেন? আসিয়া দেখিলেন, আসামী বাদিনীর আদরের প্রিয় একটি টিয়াপাখী পিতলের দাঁড়সমেত লইয়া পলাইতেছে। সেই দাঁড়ের এক দিকে ছোলা ও অপর দিকে জল ছিল। আমার মক্কেলের বাড়ীওয়ালী—যে অনেক অধমকেই আশ্রয় দেয়,—আসামী দাঁড়সহ টিয়াপাখী লইয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহার পিছু-পিছু দৌড়ায় ও চোর চোর বলিয়া চীৎকার করে। সেই চেঁচামেচি শুনিয়া অনেক লোক জড় হয় এবং আমার মক্কেলও আসিয়া পড়েন। *তিনি মানুষের অকৃতজ্ঞতা দেখিয়া একবারে হতভম্ব* হইয়া পড়েন। শোকে, দুঃখে, ঘৃণায়, অভিমানে একেবারে বসিয়া পড়েন, তাঁহার হৃৎপিণ্ড জোরে জোরে তাঁহার বুকে ধাক্কা মারিতে থাকে, এমন কি, heart-fail হইবার জোগাড় হয়। ভগবানের অসীম করুণা ও সিধাপথে ধর্ম্মের সাহায্যহেতু তিনি সে যাত্রা বাঁচিয়া যান।"

আঃ উঃ।—মিঃ ডট্, আপনার ঘটনাবলীর স্রোতটা একটু কমাইয়া দিন না। আপনার বর্ণনাটি মোটের উপর কিছু সংক্ষেপ করিলে, আদালতের সময়ের সাশ্রয় হয়, আর আমাদেরও অনেক সুবিধা হয়।

কঃ কৌঃ।—Both you and the Court are paid for their work.

আঃ উঃ।—আপনি ভুলে যাচ্ছেন, উনি এক জন অবৈতনিক হাকিম।

কঃ কৌঃ।—Don't interrupt me please, আমি আমার বক্তৃতার খেই হারিয়ে যাচ্ছি।

হাকিম।—মিঃ ডট্, যদি পারেন ত আপনার বক্তৃতা একটু সংক্ষেপ করিয়া লউন।

কঃ কৌঃ।—হুজুর, আজ্ঞে, তাই করিতেছি। অকৃতজ্ঞ আসামী এই সময় পাখীটি ছাড়িয়া দেয়। সে অনেক যত্নের এবং অনেক দিনের পোষা পাখী। মানুষ অকৃতজ্ঞ হয়, কিন্তু পাখী হয় না। তাই যখন সে আসামীর হাত হইতে ছাড়ান পাইল, তখন সে উড়িয়া গিয়া আমার মক্কেলের বারান্দার রেলিঙের কাঠের উপর গিয়া বসিল। আর পিতলের দাঁড়টি—আহা, সে অতি সুন্দর দাঁড়,—তাহার *ভিতর অকৃতজ্ঞ মানুষের নীচ প্রাণ নাই, তাই সেটা* যেখানে পড়িল, সেইখানেই রহিল, পলাইবার চেষ্টাও করিল না। কিন্তু অকৃতজ্ঞ আসামী পলাইয়া তাহার নীচ মনের পরিচয় দিল। তাহার কৃতঘ্নতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেও এক দিন আসামীর বাড়ীতে আসিল না। বলিয়াও গেল না যে, আমার ভুল হইয়াছে, আমাকে মাপ কর। কাযেই অনন্যোপায় হইয়া আইনের মর্য্যাদা-রক্ষাকারিণী আমার মক্কেল, আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কথায় বলে, যাহার কেহ নাই, তাহার ভগবান্ আছে। ভগবান্‌কে সব সময় ডাকিয়া পাওয়া যায় না, সেই কারণে ভগবানের প্রতিনিধি রাজার আশ্রয় লইতে হয় এবং রাজার প্রতিনিধি *আদালতের হাকিমের আশ্রয় লইতে হয়। রাজাকেও সব* সময়ে সশরীরে পাওয়া যায় না, সেই জন্য রাজার প্রতিনিধি আদালতে অধিষ্ঠিত হাকিমের আশ্রয় লইতে হয়। যাহার কেহ নাই, তাহার আইন আছে, আইনই তাহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করে। সেই জন্যই আমার মক্কেল আপনার আশ্রয় লইয়াছেন, অতএব প্রমাণ-প্রয়োগাদি লইয়া, সাক্ষিগণের জবানবন্দী শুনিয়া এই মোকর্দ্দমার সুবিচার করুন। এক দিকে অবলা, নিরাশ্রয়া, অভিভাবকহীনা স্ত্রীলোক ও

অপর দিকে দুর্ব্বুদ্ধিতাড়িত, কৃতঘ্ন-চূড়ামণি এই আসামী। ইহাকে উপযুক্ত সাজা দিয়া আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

হাকিম।—মিঃ ডট্, মোটের উপর কথা এই, ফরিয়াদী এক জন বারবনিতা। আসামী তাহাকে কিছুদিন রাখিয়াছিল অথবা সে আসামীকে রাখিয়াছিল। আপনার মক্কেল বলে যে, আসামী তাহার পাখী ও দাঁড় চুরি করিয়াছে। পাখী ফিরিয়া পাইয়াছেন, দাঁড়ও ফিরিয়া পাইয়াছেন। কেবল কিছু ছোলা ও একটু জল মাটীতে পড়িয়া গিয়াছে। সে অতি তুচ্ছ কথা। তাহার জন্য মোকর্দ্দমার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না।

ফঃ কৌঃ।—বলেন কি হুজুর, চোরাই মাল পাওয়া গেলেই আর মোকর্দ্দমা চালান উচিত নয়? আমার মক্কেল 'শান্তি-প্রিয়া অনাথিনী রমণী'; যদিও সাধারণে তাহাদের নিজস্ব ভাষায় তাঁহাকে বারবনিতা বলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি উচ্চকুলসম্ভবা ব্রাহ্মণের কন্যা।

আঃ উঃ।—সোনাগাছির সমস্ত স্ত্রীলোকই দেবী, ওখানে দাসী মিলে না।

ফঃ কৌঃ।—তিনি পুরুষের কুহকে পড়িয়া স্বামিগৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসেন। তিনি কিছুকাল পরে পরপুরুষের অকৃতজ্ঞতা বুঝিতে পারিয়া স্বামিগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু আধুনিক সমাজের যে দুরবস্থা ও ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন ভাব, এ দীনবৎসল পরদোষদর্শী অবস্থায় তাঁহার স্বামী তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে বিশেষভাবে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কাযেই স্বামিগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ঘটিল না। তাহার জন্য তিনি সদাই অনুতপ্তা। আত্মহত্যা মহাপাপ, তাহা না হইলে সেই ধর্ম্মপ্রাণা বালিকা অনেক পূর্ব্বেই আত্মহত্যা করিতেন, তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। আজ চারি বৎসর পূর্ব্বে কুক্ষণে এই আসামী যুবক ফরিয়াদীর গৃহে পদার্পণ করে। আমার মক্কেলের গুণে সে তাহার আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ফরিয়াদীর আশ্রয় লয় ও তাঁহার গৃহেই বাস করিতে থাকে। বিশুদ্ধ আমোদ, আহ্লাদ ও স্ফূর্ত্তিতে চারি বৎসর কাটিয়া গেল। মনে রাখিবেন, এই যুবাপুরুষ উপায়ক্ষম নয়, তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল, তাহার জীবন-মরুভূমির একমাত্র মরুদ্বীপ, আমার মক্কেলের আবাস-স্থানে আশ্রয়-ভিক্ষা করিল। আমার মক্কেলও সরল বিশ্বাসে ও নিজ উদারতাগুণে দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে আশ্রয় দিলেন। তাহার পর আজ প্রায় ছয় মাস হইতে তাহার উড়ু-উড়ু ভাব দেখা দিল।

হাকিম আসামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কি হে বাপু, তুমি দেখছি ব্রাহ্মণ-সন্তান, বয়স অল্প, তোমার এ কি দুষ্প্রবৃত্তি, তোমার কি বলিবার আছে? দেখতে, শুন্‌তে, চেহারাও বড় মন্দ নয়, ভদ্র-সন্তান বলিয়াই বিশ্বাস।"

ফঃ কৌঃ।—হুজুর, এ Warrant case, সাক্ষ্য না শুনিয়া, charge না করিয়া, আসামীর কৈফিয়ত চাহিতেছেন? এ কি আইনসঙ্গত? বিশেষ সে এক জন চরিত্রহীন যুবক। যে বেশ্যালয়ে যায়, সে নিশ্চয় চরিত্রহীন।

আঃ উঃ।—আপনার "চরিত্রহীন" যুবকের মাপকাঠি ধরিতে হইলে শতকরা ৯৯ জন চরিত্রহীন।

হাকিম।—মিঃ ডট, আমি ত সাক্ষী না শুনিয়াই মামলার ফয়সালা করিতেছি না, আমি মোটামুটি জিনিষটা কি, তাই বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। আসামী দোষী সাব্যস্ত হইলে সাজা দিব।

ফঃ কৌঃ।—আমার মক্কেল তাহাই চান, অন্ততঃ এক বৎসর জেল। নূতন হাল আইনে চোরকে ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা নাই, এরূপ আইন থাকিলে আমার মক্কেল তাহাই প্রার্থনা করিতেন।

হাকিম।—(আসামীর প্রতি) তোমার নামে চুরির নালিস, তা জান?

আসামী কাঁদিয়া ফেলিল। কহিল, "হুজুর, আমি চোর নই। আমি পিতৃমাতৃহীন ও সহায়হীন ব্রাহ্মণ-বালক। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম বটে, কিন্তু লেখাপড়াও শিখি নাই, কাযকর্ম্মও শিখি নাই। অল্পবয়সে পিতৃমাতৃবিয়োগ হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে অর্থকৃচ্ছ্রতা আসিয়া আমাকে অধিকার করে। আমার জ্ঞাতি ও নিকট-আত্মীয়রা পিতৃমাতৃ ও অর্থের অবসানে কেহই আমার খোঁজ লইলেন না, এমন কি, আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিলেন না, সেই সময় আমার নিজের জন সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। আমি মূর্খতা হেতু কুসঙ্গে পড়িয়া বামা বাড়ী-ওয়ালীর বাটীতে আসিয়া জুটি এবং (সৌরভীকে দেখাইয়া) এর কুহকে পড়ি। চারি বৎসরকাল বিকারের রোগীর মত অজ্ঞানে, অর্দ্ধজ্ঞানে, বেঘোরে কাটিয়া গেল। শেষে আমার এক দরিদ্রা দূর-আত্মীয়া আমাকে আশ্রয় দিলেন

এবং আমাকে সৎপরামর্শ দিয়া অনেক বুঝাইয়া পড়াইয়া এর সঙ্গ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন। শ্রীযুক্ত রামশরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যাদায়ে পীড়িত, তিনি আমাকে কন্যা দিতে রাজী, আমিও আত্মীয়ের পরামর্শে এ কাযে রাজী হই। ২৪শে ফাল্গুন আমার বিবাহের দিনস্থির হয়। ১০।১২ দিন এর বাটীতে যাই নাই, লোকের উপর লোক পাঠায়, তার পর বাড়ীওয়ালী আমাকে অনেকবার রাস্তায় ধরে ও জোর করিয়া তাহার বাটী লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। এইরূপ অবস্থায় এক দিন আমি চেঁচামেচি করি, তখন সে 'পাখী-চোর' 'পাখী-চোর' বলিয়া চেঁচায় ও অনেক লোক জড় করে। শেষে লোকদিগকে আমার প্রকৃত অবস্থা বলায়, বাড়ীওয়ালী আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। আমি তখনকার মত তাহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলাম। কিন্তু বিবাহের দিন বেলা ২টার সময় এ আর ঐ বাড়ীওয়ালী (সৌরভী ও বাড়ীওয়ালী আদালতে উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে দেখাইয়া দিল) পুলিস লইয়া আমাদের বাটীতে আসে, হাতে সুতা-বাঁধা অবস্থায় আমাকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারি warrantএ জামিনের ব্যবস্থা ছিল না, কাযেই হাজতে লইয়া যায়। শেষে হাকিমের বাটীতে গিয়া আমার ভাবী শ্বশুর জামিন করিয়া লইয়া আসেন। সেই রাত্রেই আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। হুজুর, আমাকে মারুন, কাটুন, জেল দিন, ফাঁসী পর্য্যন্ত দিন, আমি আর ওর কাছে যাইব না।" এই বলিয়া আসামী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

হাকিম।—দেখুন মিঃ ডট, আসামী যাহা বলিতেছে, তাহা সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে। বিচার শেষ হইলে তখন বলিব, আমার মতে কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা। কিন্তু আপনার মুখ হইতেই যাহা শুনিলাম, তাহাতে ফরিয়াদীর যে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, তাহা বেশ বুঝা গেল। সে পাখীটি ফিরিয়া পাইয়াছে। ক্ষতির মধ্যে ছোলা আর জল, সে ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। বিশেষ যখন দুই পক্ষই স্বীকার করিতেছে, আসামী ও ফরিয়াদী চারি বৎসর কাল একত্রে কাটাইয়াছে। আসামী বলিতেছে, সে এখন বিবাহ করিয়াছে, অতএব এ অবস্থায় কাহারও ইচ্ছা হইতে পারে না যে, আসামী ফরিয়াদী আর একত্রে থাকে। এ অবস্থায় এ মামলা চালাইয়া লাভ কি ?

ফঃ কৌঃ।—হুজুর, সত্যের খাতিরে নীতি-বুদ্ধির মর্য্যাদা হেতু নীতিজ্ঞানের সম্মানার্থে আমার মক্কেল এ মামলা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না। প্রত্যেক ধর্ম্মেই বলে, চোরের সাজা হওয়া উচিত। আমার মক্কেল লাভালাভ বোঝেন না, লাভের আশায় তিনি আদালতে আসেন নাই, দুষ্টের দমনের জন্য এখানে আসিয়াছেন। আপনি বিচার করুন, আমার সাক্ষী-সাবুদ আছে।

হাকিম।—তবে তাহাই হউক্।

এই বলিয়া তিনি মামলা শুনিতে ও জবানবন্দী লিখিতে সুরু করিলেন।

বিচার-গৃহে লোকারণ্য। আজকাল বাঙ্গালায় এত বেকার লোক আছে যে, সর্ব্বস্থানে এবং সর্ব্বসময়ে বেকার লোকের অভাব হয় না। সভা হইলেই সেখানে হাজার হাজার লোক উপস্থিত হয়। যতগুলি পার্ক—কোন স্থানেই লোকের অভাব নাই। চমকপ্রদ, কৌতুকজনক মোকর্দ্দমা থাকিলে বিচারগৃহ অতিশয় অসহনীয় হইয়া উঠে।

জবানবন্দীর সঙ্গে সঙ্গে আসামীর উকীল ফরিয়াদীর ও সাক্ষিগণের জেরা করিলেন। ফরিয়াদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিল, ফরিয়াদী নিজে, বামা বাড়ীওয়ালী, তাহার দুই জন ভাড়াটিয়া আর ভাড়াটিয়াদের তিন জন বাবু, আর সেই বাটীর পাশের চাটের দোকানের এক জন দোকানদার।

এজাহার শেষ হইবার পর হাকিম মিঃ ডটকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "Charge frame সম্বন্ধে আপনার কি বলিবার আছে ?" এই কথা শুনিয়া ফরিয়াদীর কৌন্সুলী লম্বা-চওড়া এক প্রকাণ্ড বক্তৃতা করিলেন। মোটের উপর শব্দালঙ্কারের আড়ম্বর বাদ দিলে এই বুঝা যায়, তাঁহার মক্কেল অবলা, সরলা, দুষ্টজনপ্রপীড়িতা, বিচারপ্রার্থিনী। আসামীকে সাজা দিয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

আঃ উঃ।—হুজুর, চার্জ্জ কেন হইবে না, এই সম্বন্ধে আমি দুই এক কথা বলিতে চাই।

হাকিম।—বলুন।

আঃ উঃ।—মোটের উপর সংক্ষেপে বলিতে গেলে মামলাটি এই—অবলা, সরলা, অকুলবালা ফরিয়াদীর পাখী চুরি গিয়াছে, দাঁড় চুরি গিয়াছে, দানাপানি গিয়াছে। দাঁড় ফিরিয়া পাইয়াছে, পাখী ফিরিয়া আসিয়াছে। আর দানাপানির যে কথা, তাহা বিবাহিতা স্ত্রীলোকের অভাব হইতে পারে, অন্নরমণীর কম হইতে

পারে, কিন্তু কলিকাতার ন্যায় আজগুবি সহরে ফরিয়াদী শ্রেণীর স্ত্রীলোকের দানাপানির কখন অভাব হইবে না। তবে কথা হইতেছে, আমার মক্কেলরূপ পাখীটি শিকল কাটিয়াছে, নূতন দাঁড়ে বসিয়াছে, সে পাখীটি আর ফিরিয়া আসিবে না। ফরিয়াদী যতই চেষ্টা করুক না কেন, আর তাহার দাঁড়ে বসিবে না। তিনি আরও বলিলেন, বাদী ও তাহার সাক্ষীরা ফরিয়াদীর নিজের দলের লোক, তাহাদের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নহে। জেরাতে স্পষ্ট বুঝা গেল, তাহারা মিথ্যা বলিতেছে।

কঃ কৌঃ।—আমি এ কথায় বিশেষ আপত্তি করি, এ কথার প্রতিবাদ করি। ফরিয়াদী ও তাহার সাক্ষীরা হলপান জবানবন্দীতে এজাহার দিয়াছে। তাহারা মিথ্যা বলিতে পারে না। মিথ্যা বলিলে তাহাদের সাজা হইতে পারে। আসামী শুধু মুখের কথা বলিয়া গিয়াছে। সে ন্যায়সঙ্গত ধর্ম্মসঙ্গত হলপ নেয় নাই—তাহার কথার আবার দাম কি ?

আঃ উঃ।—আপনি বলিতে চান, যদি চারি জন অন্ধ আসিয়া হাকিমকে বলেন যে, সূর্য্যদেব নাই, হাকিম কি তাহাদের কথা বিশ্বাস করিবেন ?

কঃ কৌঃ।—আমার সাক্ষীরা ত অন্ধ নয় ?

আঃ উঃ।—তাহারা স্বার্থান্ধ। সাক্ষীদের জবানবন্দী হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, তাহাদের এজাহারে আভ্যন্তরীণ মিথ্যাবাদের চিহ্ন রহিয়াছে।

এই সুরে তিনি একটি বক্তৃতা করিলেন। তবে তাহাতে শব্দাড়ম্বর কম, অলঙ্কারের আধিক্য নাই। সারগর্ভ যুক্তি আছে। যাহা হউক, দুই পক্ষের বক্তৃতা শেষ হইলে হাকিম ছোট একটি রায় লিখিয়া আসামীকে অব্যাহতি দিলেন। অব্যাহতি দিবার পর ফরিয়াদীকে বলিলেন, আসামীকে হায়রাণ করিবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা মোকর্দ্দমা আনার অপ-রাধে তাহার কেন সাজা হইবে না, তাহার কারণ দর্শাইতে হইবে।

বামা বাড়ীওয়ালী একটি অদ্ভুত জীব, ওজনে প্রায় সাড়ে ৩ মণ, খুব বেঁটেও নহে, খুব লম্বাও নহে। বেঁটে না হইলেও সে এত অধিক মোটা যে, দেখিলে তাহাকে খুব বেঁটে বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বসময়ে পয়সায় দুইটি করিয়া যে মাটীর আহলাদী পুতুল বিক্রয় হইত, সে তাহারই একটী। গায়ে খুব মোটা মোটা গহনা, পায়ে চারগাছা মল, নাকে খুব ফাঁদাল নথ, তাহাতে খুব বড় নোলক ও বড় জুড়ি মুক্তা, গালে একগাল পাণ, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীতে চুণের দাগ, হাতে পাণের আর সুর্ত্তির ডিবে। পরনে চওড়া পেড়ে দেশী সাড়ী, পাছায় চন্দ্রহার খুব মোটা রকম, কপালে সিন্দুরের টিপ। দেখিলে মনে হাস্যরসের উদয় হয়। সে লোককে হাসায়, কিন্তু নিজে কখনও হাসে না। কর্কশতাই তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে। সে সৌরভীর কাণে কাণে বলিয়া দিল, "খুব সাবধান, যেন রূপোর মুখ দেখে ভুলে যাস্ নি। এক রূপো যাবে, একশ' রূপো আসবে। কলিকাতার সহরে অভাব কিসের ? ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব ? ভদ্রঘরের সুপুরুষ কুলাঙ্গার এক যায়গায় কলিকাতায় ছাড়া এতগুলি কোথাও নাই।"

কৌন্সূলীর ইচ্ছা, আর এক দিন তারিখ পড়ে, তিনি বলিলেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহার জবাব দিবেন। কিন্তু বাড়ীওয়ালী মস্ত ঘুঘু। সে স্ত্রী ও পুরুষ চরাইয়া খায়। কৌন্সূলীর সহিত যে ছোট উকীল ছিল, তাহাকে সে জিজ্ঞাসা করিল, এ দোষের জন্য খালি জরিমানাই হয় ? যখন উকীল বলিল যে, তাহাই। তখন সে বলিল—মামলা মুলতুবি করিবার প্রয়োজন নাই, আজকেই শেষ করিয়া দিন। তার পর ফৌজদারীর কৌন্সূলীর আর একটি লম্বা-চওড়া বক্তৃতা হইল।

হাকিম বক্তৃতা শুনিয়া রায় দিলেন—ফরিয়াদীর ৫০৲ টাকা জরিমানা, না দিলে, দুই মাস বিনা পরিশ্রমে হাজত। টাকা আদায় হইলে আসামীর ক্ষতিপূরণস্বরূপ সে সমস্ত টাকাই পাইবে। তার পর আসামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ওহে, মুখুয্যে, খবরদার, এমন কোন কায করিও না, যাহাতে আবার এইরূপ বিপদে পড়।"

শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)।
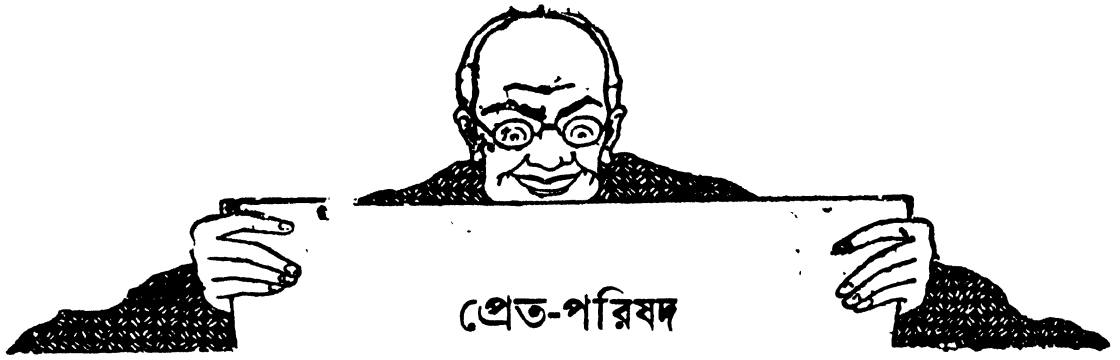
প্রেত-পরিষদ

আপনারা ভূত মানেন না? আমি মানি। যেহেতু আমি এমন সব প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি ··

সেই কথাই বলি।

দার্শনিক বলেন, আমি আছি, তাই আমি আমি। ভূতও তেমনি আছে, তাই ভূত ভূত।

কথাটা ঠিক বুঝিলেন না? আপনাদের দুর্ভাগ্য, সন্দেহ নাই। বুদ্ধি যাঁদের অতি-কাঁচা, তাঁরা এ সহজ কথা বুঝিতে পারিবেন না। বুদ্ধি যাঁদের পাকিয়াছে, তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের এ দার্শনিক তথ্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। কাঁচা-বুদ্ধিদের পরামর্শ দিই, তাঁরা কিছুকাল মাসিকপত্রগুলিতে গল্প-উপন্যাস পড়া বন্ধ রাখিয়া দার্শনিক তত্ত্বালোচনা-গুলি দু'বার দশবার পড়িয়া পরিপাক করুন, তবে যদি আমার কথা বুঝিতে পারেন। কারণ, অতি-কাঁচা বুদ্ধিবৃত্তিশালিগণের জন্য আমি কখনও লেখনী ধরি না।

অতএব, আমার যাঁরা পাঠক, তাঁরা অতিবুদ্ধিশালী। অল্পবুদ্ধি পাঠক আমার লেখা পড়িবেন না—কারণ, তাঁরা রস-গ্রহণে অক্ষম হইবেন। যে-ছেলে সবে ধারাপাত ধরিয়াছে, সে যেমন ট্রিগনমেট্রি বুঝিবার দুরাশা মনে পোষণ করিতে পারে না, আমার রচনাও তেমনি অল্প-বুদ্ধিশালী পাঠকের পক্ষে দুঃসহ, কঠিন বস্তু!

হাঁ, যে কথা বলিতেছিলাম। ভূতে আমার তেমন বিশ্বাস ছিল না। তবে ভয় ছিল না, এমন কথা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে; এবং ছেলেবেলায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগে পড়িয়াছি, কদাপি মিথ্যা বলিও না। মিথ্যা কথা বলা পাপ ইত্যাদি।

অবশ্য এ-উপদেশ যে আজীবন পালন করিয়াছি, তা নয়। তবে···কিন্তু বুদ্ধিমান্ পাঠক এ সম্বন্ধে জেরা করিবেন না; কারণ, মিথ্যা কথা প্রয়োজন হইলেই বলিতে হয়। যে না বলে, সে······।

ভূত মানিতাম না, তবে ভূতকে ভয় করিতাম। মানিবার প্রথম চেষ্টা করিলাম, যে দিন জানিলাম, বিলাতে ভূতের অস্তিত্বই শুধু নয়, তার সঙ্গে মানুষের আলাপ-আলোচনাও চলিয়াছে বিষম রেটে (rate-এ)। বিলাতীরা মিথ্যা কথা বলেন না—যেহেতু তাঁরা তো বহু বর্ষের অধীনতায় মনুষ্যত্ব খোয়ান নাই,—কাজেই তাঁদের কথা না মানিয়া চলা সম্ভব নয়। সর্ব্ব-বিষয়েই তো এমনি ঘটিতেছে। আমরা এক দিন জানিলাম, আমরা অতি ভীরু পাপিষ্ঠ জাতি,—যেহেতু মেকলে সাহেব এমনি মত ব্যক্ত করিলেন। আবার ঐ বিলাত হইতেই খবর আসিল—না হে, তোমাদের অতীত ছিল গৌরবময়। অমনি বুক আমাদের দশ হাত হইল। অতীতের গৌরব-গাথায় আমরা মশ্গুল হইলাম। রেল-অফিসের সাহেব সে দিন বুকিং ক্লার্ক হারাধনকে ধমক দিয়া কহিলেন, তুমি মূর্খ—চারপায়ার ইংরাজী করিয়াছ Quadruped? হারাধন গর্জ্জিয়া উঠিল,—আমি মূর্খ হইতে পারি সাহেব, কিন্তু আমার long-long-past forefathers ভারী পণ্ডিত ছিলেন, তোমাদের স্বজাত স্যর উইলিয়াম জোন্স তাঁর লেখা নাটকের ইংরাজী তর্জ্জমা করিয়াছেন। তার উপর সম্প্রতি ঐ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! কবিতা লিখিয়া কয়েকটি ছোকরার কাছেই যা বাহবা লইতেছিলেন, দেশের লোক বলিত, বড়-লোকের ছেলে, দু'ছত্র নয় লেখে···তাঁকে মানিতে চাহিত না! তার পর যেই তিনি নোবেল প্রাইজ পাইলেন·

থাক, সে কথা আর সবিস্তারে বলিয়া কায নাই। আমারই দুটি নিকট-প্রতিবেশীর সমালোচনা তো আজো ভুলি নাই···শেষে কি মানহানির দায়ে পড়িব!···

বিলাতী লেখকেরা ভূতকে লইয়া রীতিমত আলাপ-আলোচনা করিতেছেন দেখিয়া আমার মন সংশয়-দোলায় দুলিতেছিল, এমন সময় এক দিন বন্ধুবর যোগেশচন্দ্র আসিয়া হাজির।…তিনি 'প্রেত-পরিষদে'র নূতন সদস্য হইয়াছেন, বলিলেন। প্রেতলোকের দু'চারিটা বিচিত্র কাহিনীও বিবৃত করিলেন। তখন তাঁকে ধরিলাম, কহিলাম—তুমি আমার কাছে প্রমাণ করিয়া দাও তো।…

যোগেশচন্দ্র কহিল,—বেশ।…আসতে পারো আমার সঙ্গে শ্যামবাজারের মোড়ে? সেখানে এক বঙ্গীয় প্রেত-পরিষদ খোলা হয়েচে…চমৎকার ব্যবস্থা। প্রসিদ্ধ প্রেত-তত্ত্বজ্ঞ ঘনদাস বাবাজী মস্ত তান্ত্রিক, রক্তাম্বর-পরা, গলায় রুদ্রাক্ষ ও জবার মালা, কপালে লাল সিঁদুরের ইয়া টিপ, মাথায় দীর্ঘ জটা, কামাখ্যা থেকে শব-সাধনা ক'রেও এসেচেন… তাঁর অসাধারণ শক্তি দেখবে, চলো। যে পরলোকগত প্রেতাত্মার সঙ্গে আলাপ করতে চাও, করতে পারবে। পাঁচ মিনিট আলাপের জন্য দর্শনী দিতে হয় দু'টাকা।

আমি কহিলাম,—দর্শনী?

যোগেশ কহিল,—হাঁ। না হ'লে যে ভিড় হয়, সামলানো দায়। তা ছাড়া বাবাজী বলেন, এই দর্শনীর টাকায় 'নিখিল-ভারত প্রেত-পরিষদ' স্থাপিত হবে—নিখিল বিশ্বের প্রেতদের সঙ্গে তার দ্বারা ঘনিষ্ঠতা ঘটবে। জগতের আধি-ব্যাধি সব তাঁদের সাহায্যে বিদূরিত হবে।

বিস্ময়ে কিছুক্ষণ আমার বাক্যস্ফূর্তি হইল না।…ভৃত্য চা দিয়া গেল। পানান্তে কহিলাম—চলো…

যাত্রা করিলাম।…

শ্যামবাজারের মোড়ে মস্ত বাড়ী। ছাদে মন্দিরের চূড়ার মত একটা ঢিপি; তাহাতে ত্রিশূল-আঁটা রক্ত-পতাকা উড়িতেছে।…গৃহদ্বারে দু'টি মাটীর রুদ্রভৈরব-মূর্ত্তি! কারিগরের বাহাদুরী আছে—কি পালোয়ানের মূর্ত্তিই গড়িয়া তুলিয়াছে!

ভিতরে ঢুকিলাম। ধূপ-ধুনার গন্ধে চারিধার পরিপূর্ণ।… উঠানের পর মস্ত দালান—দালানে মহাকালিকার মূর্ত্তি! সামনে রক্তাম্বর-পরিহিত বাবাজী আসনে বসিয়া আছেন। তাঁর দুই চক্ষু জবা-ফুলের মত লাল টকটকে।

যোগেশ কহিল—তুমি দাঁড়াও…আমি ওঁকে ব'লে আসি।…

পাঁচ মিনিট পরে যোগেশ আসিয়া কহিল—উপরে চলো…

দোতলায় উঠিলাম। মস্ত ঘর। ঘরের দেওয়াল লাল শালুতে ঢাকা। এক জায়গায় মস্ত একটি ফোকর; সেই ফোকরের মুখে গ্রামোফোনের হর্নের মত বা হালের রেডিয়ো-সেটের লাউড-স্পীকারের মত একটা পদার্থ।

যোগেশ কহিল,—ঐ যন্ত্র-মারফৎ প্রেতাত্মার কথা শোনা যায়। অর্থাৎ আমাদের ঐহিক জগতে বায়ু ও বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা বহু দীর্ঘ যোজন পথ অতিক্রম ক'রে মানুষের কণ্ঠের স্বর গানে-আলাপে রেডিওর সাহায্যে আমরা শুনচি তো…ঠিক সেই বৈজ্ঞানিক প্রণালী আর সাধনার শক্তির দ্বারা এঁরা প্রেতলোকের বার্ত্তা প্রেত-মুখে শোনাবার ব্যবস্থা করেচেন…যাঁকে চাও…

আমার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না!

বাবাজী আসিলেন। মৃগচর্ম্মের আসনে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া প্রায় দশ মিনিট কি সব মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, তার পর আমার পানে চাহিয়া কহিলেন—দর্শনী?…

যোগেশ কহিল—ওটা অগ্রিম দেয় হে।

বেশ! চারিটি টাকা দিলাম। বাবাজী টাকা কয়টি একটি তাম্রটাটে রাখিলেন, কহিলেন,—দশ মিনিট আলাপ চাও? এক জনকে পাঁচ মিনিটের বেশী ধরে রাখলে তাঁর কষ্ট হয়। অর্থাৎ এখানকার বায়ুর চাপ অত্যন্ত বেশী। তাঁদের শরীর অতি সূক্ষ্ম…কাজেই…

অপ্রতিভ হইলাম। কহিলাম—দু'জনকে পাওয়া যাবে?…

আমার কথা লুফিয়া যোগেশ কহিল,—তা যাবে।…

কাহাকে ডাকি? বুকটা একবার ছাঁৎ করিয়া উঠিল। বাল্যের সংস্কার! একেবারে প্রাচীন যুগ আসিয়া মাথায় চাপিল। কহিলাম—শঙ্করাচার্য্য প্রভু?…

বাবাজী কহিলেন—তাই হবে। চক্ষু মুদিয়া আবার তিনি একটা বাঁশীর মুখে কি সব মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, তার পর সেই গ্রামোফোনের চোঙে পরিষ্কার স্বর ফুটিল—

কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব-বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত-
স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥

যোগেশ মৃদু স্বরে কহিল—প্রভু এসেচেন…ঐ তাঁর কণ্ঠস্বর…

শিহরিয়া উঠিলাম।

যোগেশ কহিল—কোনো প্রশ্ন থাকে তো বলো…পাঁচ মিনিট মাত্র সময়…

তাই তো! মুস্কিল বাধিল। এত বড় মহাত্মাকে কষ্ট দিয়া আনা হইয়াছে, কি প্রশ্ন করা যায়? নিজের আর্থিক উন্নতি ঘটিবে কি না?…ঐ প্রশ্নই বুকে বাজে সারাক্ষণ!…কিন্তু, না। প্রথম আলাপেই এ লোলুপতা…যদি রাগ করেন?…

তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিলাম—প্রভু বেশ আনন্দেই আছেন, বোধ হয়?…

সেই চোঙার মুখে বজ্রস্বরে জবাব পাইলাম,—হাঁ বৎস …ভূমানন্দ, ঘনানন্দ, নিবিড়ানন্দ…এ ত্রিবিধ আনন্দ তুলনা-রহিত।…হর হর শঙ্কর!…

প্রশ্ন করিলাম—ঈশা মুশা—ইঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়?

তেমনি বজ্রস্বরে উত্তর পাইলাম—হাঁ বৎস। সকলেই সাধনানন্দে পরিপ্লুত আছি। রে মোহান্ধ জীব, এ আনন্দ-রস যে কি সঘন, তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে না!…

অগত্যা আনন্দের বিশ্লেষণ করাইতে পারিলাম না; কিন্তু আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, কহিলাম,—প্রভু, এ জগতে আধি-ব্যাধির উপদ্রব কি ঘোচে না? তার কোনো উপায় যদি দয়া করিয়া…

প্রকাণ্ড এক অট্টহাস্য! মনে হইল, গ্রামোফোনের ঐ চোঙ বুঝি ফাটিয়া যাইবে! তার পর উত্তর শুনিলাম,—এ আধি-ব্যাধি মানুষের পাপের ফলে। পাপকার্য্য হইতে বিরত থাকো, সকল আধিব্যাধি দূর হইবে। ত্যজ দুর্জ্জনসংসর্গং। ভজ সাধু-সমাগমং…

বাঃ! এমন উত্তর শুনিব, তা ভাবি নাই! সাধু-পুরুষের সঙ্গ এমনি! উত্তর শুনিয়া প্রাণ-মন নিমেষে জুড়াইয়া গেল।…

আবার প্রশ্ন করিলাম,—আপনি কোথায় আছেন, জানিতে পারি?

উত্তর হইল,—কৈলাসে।

প্রশ্ন—হিমালয়ের উত্তরে?

উত্তর হইল—মূঢ়! তোমাদের স্বল্পবিদ্যায় কৈলাসকে হিমালয়ের ধারে বসাইয়া আত্মম্ভরিতায় মত্ত হইয়াছ! কৈলাস হিমালয়ের ধারে নয়। উত্তর-মেরু জানো? চিরতুষারে সমাচ্ছন্ন উত্তর-মেরু মানবগণের দুরধিগম্য স্থান। তাহা হইতে আরও উত্তরে, বহুদূর-উত্তরে বহু যোজন দূর উত্তরে হিমতুষারাচ্ছন্ন রক্ত গোলকের মত গ্রহ…গৈরিকবর্ণে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন—সেই কৈলাসে বাস করি।

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলাম,—তবে যে এই মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ দেখি, কৈলাস হিমালয়েরই…?

উত্তর হইল,—মূঢ়তা! মাসিক পত্রে কি না ছাপা হয়? তাহা হইতে সত্য-বস্তু সংগ্রহ করিতে চাও, মূঢ়?

মনে হইল, কি ভুল শিক্ষাই আমরা পাইতেছি! প্রশ্ন করিলাম,—পুনর্জ্জন্ম আছে কি?…

উত্তর হইল—কাহারো কাহারো পক্ষে আছে, কাহারো কাহারো পক্ষে নাই।

প্রশ্ন করিলাম,—আপনার পুনর্জ্জন্ম-গ্রহণের বাসনা আছে?

উত্তর হইল,—আছে। তবে সে আরো লক্ষ বৎসর পরে। গীতা পড়ো নাই? যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত…তবে, এবার মাঞ্চুরিয়ায় জন্ম লইব। ঐখান হইতে ভক্তিস্রোত বহাইয়া ভারতকে প্লাবিত করিয়া দিব। বহুদূর হইতে ধাক্কা দিলে ভক্তির বেগ প্রচণ্ড হইবে।

খট্ খট্ শব্দ হইল। বাবাজী কহিল,—প্রভু চলিয়া গেলেন।

যোগেশ কহিল, পাঁচ মিনিট হয়েচে। যোগেশ ঘড়ি দেখাইল। আমার তাক্ লাগিয়া গেল!…

বাবাজী কহিলেন,—আর কাকে চাও?…তোমার কোনো আত্মীয়?…

কহিলাম,—বেশ। আমার প্রপিতামহ…

বাবাজী কহিলেন,—তাঁর নাম? কি কাজ করিতেন? এখানে মর্ত্ত্যলোকে কোথায় বাস করিতেন, কোথায় মৃত্যু ঘটে…কি রোগে…এ সব সংবাদ আগে লিখিয়া দিতে হয়…তার সঙ্গে তালাসীর দর্শনী। কেন না, কত প্রেত যে প্রেতলোকে আছেন, তার ইয়ত্তা নাই। প্রেতলোকে দপ্তর-মত জমা-খরচের খতিয়ান আছে। ভূতপ্রেতের মারফৎ এই সব সংবাদের দ্বারা অখ্যাত প্রেতগণের

পাত্তা লইবার পর তবে তাঁহাদের আনানো সম্ভব হয়। নহিলে কোথায় খুঁজিয়া মরিবে?…

কথা শুনিয়া আমি অবাক্! কি শৃঙ্খলা চারিদিকে… পাশ কাটিয়া কোনো দিক দিয়া প্রেতলোকে কাহারো পলাইবার উপায় নাই!…আশ্চর্য্য!…

আমি কহিলাম,—বেশ, তবে একবার ছত্রপতি শিবাজী —ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে…

বাবাজী হাসিলেন, কহিলেন,—ঐটুকু হবে না। আমরা নির্বিরোধী। নিখিল-প্রেত নিয়ে এ পরিষদ স্থাপনা করেচি। কোনো রকম জাতীয়-বিদ্বেষ বা বিরোধ যে-সব প্রশ্নোত্তরে বাধিবার সম্ভাবনা, তা আমরা পরিহার ক'রে চলি!…

বটে! প্রশ্ন করিলাম,—বুদ্ধদেবকে পাওয়া যাবে?

বাবাজী কহিলেন,—নিশ্চয়।

কহিলাম—তবে তিনি যদি সদয় হয়ে একবার…

বাবাজী আবার ফুঁ-যন্ত্রে মন্ত্র পড়িলেন। চোঙায় উত্তর ফুটিল,—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি…সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি…

আমি বুঝি উন্মত্ত হইব!…এ কোন্ পুণ্যে আমি এই লাঞ্ছিত যুগে এই কলিকাতা সহরে বসিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের কণ্ঠের মহাবাণী-শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিলাম!

যোগেশ কহিল—শীঘ্র প্রশ্ন করো…ওঁদের মর্য্যাদাহানি করো না…

প্রশ্ন কহিলাম—প্রভু, আপনার অমন অহিংসা-মন্ত্র জীব গ্রহণ করতে পারলো না কি জন্য?

উত্তর হইল—জীব মোহে অন্ধ, অহঙ্কারে বিমূঢ়াত্ম, তাই। কুপথ্যেই রোগীর বাসনা! তা যদি না হইত, এ বিশ্বে মৃত্যুর প্রবেশ ঘটিত না।

কি অমৃত-বাণী! দুটি ছত্রে বিশ্বের যত দর্শন একেবারে condensed হইয়া আছে!

কহিলাম—প্রভু, আপনার সে অহিংসা-মন্ত্র জীব কি গ্রহণ করিবে না?

উত্তর হইল—করিবে। সময় আসিলে।

কহিলাম—সে শুভ সময় কবে আসিবে?

উত্তর হইল—বহু যুগ পরে। জীব যখন হিংসার বিষে জর্জ্জর হইবে, শান্তি হারাইবে, স্বাস্থ্য ও শক্তি হারাইয়া জীর্ণ-গলিত হইবে, তখন…

ঠিক বুঝিলাম না। কথায় যেন হেঁয়ালি রহিয়া গেল! কিন্তু এ সম্বন্ধে আবার প্রশ্ন তুলিতেও ভরসা হইল না। নেহাৎ মূর্খ ভাবিয়া যদি রাগ করেন!…

প্রশ্ন করিলাম—প্রভু, একটা প্রশ্ন…বিমূঢ় মনের নিগূঢ় সংশয়…অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া…

উত্তর। বলো, অভয় দিতেছি।

আঃ! প্রশ্ন করিলাম—বহু তীর্থ-স্থানে প্রস্তর-গাত্রে দেড় হাত, দু'হাত পদ-চিহ্ন দেখাইয়া পাণ্ডার দল বলে, সে সব প্রভুর পদ-চিহ্ন—সে কথা কি সত্য?

উত্তর। মূর্খ! যখন মনুষ্য-দেহে বর্ত্তমান ছিলাম, তখন মনুষ্যের আকার-বিশিষ্টই ছিলাম। হস্ত-পদও সাধারণ মনুষ্যের মত ছিল। অত বড় পা মানুষের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। সেগুলা শুধু দর্শনী-আদায়ের ফন্দী।…

প্রশ্ন করিলাম—প্রভু, আপনার অহিংসা মন্ত্র-প্রচারের সহায় কোনো মতে হইতে পারি না?

উত্তর। পারো। নাটক লেখো; আর তোমাদের নাট্যশালা হইতে ঐতিহাসিক নাটকগুলার অভিনয় তুলিয়া দিয়া শুধু বৌদ্ধ গল্প হইতে নাট্য রচনা করো… তাহা হইলেই…বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি,… খট্ খট্ খট্…

যোগেশ কহিল—প্রভু চলিয়া গেলেন।…

নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম—আশ্চর্য্য!

ঘনদাস বাবাজী হাসিয়া কহিলেন—একটা অনুরোধ…

কহিলাম—বলুন…

বাবাজী কহিলেন—এখানকার কোন কথা বন্ধু-সমাজে প্রচার করো না।

সে কি! বিস্ময়ে তাঁর পানে চাহিলাম।

বাবাজী কহিলেন—অহেতুক নানা লোক এসে ওঁদের নানা প্রশ্নে বিব্রত করবে…প্রেতলোকে অবসর যাপন করচেন, পরম শান্তিতে…

আমি কহিলাম—কিন্তু প্রভু, পরলোকের সঙ্গে এ পরিচয়, এ হিতকর আলোচনা…বহু জীব-প্রচুর শান্তি পাবে যে…

বাবাজী কি ভাবিলেন, ভাবিয়া কহিলেন—বেশ, তবে এ বিষয়ে যাদের আস্থা আছে, এমনি জীবগণ ছাড়া আর কারো কাছে এ কথা প্রকাশ করো না…

— তাই হবে, বাবাজী।…

পাঁচ-সাত দিন পরে গজেনের গৃহে গিয়াছিলাম। বাতে বেচারা ভারী কষ্ট পাইতেছে। কহিল, নানা চিকিৎসা করাইয়াছে, কোনো ফল পায় নাই।

কহিলাম—একটু কষ্ট ক'রে প্রেত-পরিষদে যেতে পারো? অদ্ভুত ব্যাপার…তোমার রোগ যাতে সারে, তার উপায় করা যায়।

গজেন কহিল—পাল্কী ক'রে যেতে পারি।…

দর্শনী প্রভৃতির আমূল পরিচয় বিবৃত করিলাম; এবং এক দিন মধ্যাহ্ন-কালে গজেনকে পাল্কীতে চড়াইয়া ঘনদাস বাবাজীর পরিষদে আনিয়া উপস্থিত করিলাম।…

দর্শনী প্রভৃতির পালা সারিয়া দোতলার সেই ঘরে আসিলাম।…সেই চোঙ…সেই সব।…

বাবাজী কহিলেন—ধন্বন্তরিকে ডাকি। রোগী নিজে তাঁকে রোগের কথা বলুন।…

মন্ত্রাদি উচ্চারণের পর ধন্বন্তরি আসিলেন। গজেন তাঁকে রোগের কথা বলিল, বলিয়া নিবেদন জানাইল,—ঔষধ চাই, প্রভু…

ধন্বন্তরি কহিলেন—আমার পক্ষে ঔষধ দেওয়া কঠিন। কারণ, আমার বায়ুর শরীর…হাত নাই। অতএব, আমারি করুণাশ্রিত ভিষক আছেন, মর্ত্ত্যলোকে, পোড়গঞ্জ গ্রামে… ভারী নৈষ্টিক, শাস্ত্রজ্ঞ…তার নাম অশ্বিনীকুমার সেনগুপ্ত। তাঁকে সাধ্যসাধনায় তৃপ্ত করিয়া বলিয়ো 'দধীচি তৈল' প্রস্তুত করিয়া দিতে…বাতের পক্ষে অমোঘ ঔষধ!…

গজেন হতাশ নেত্রে বাবাজীর পানে চাহিল। বাবাজী কহিলেন—পোড়গঞ্জ কোথায়, প্রশ্ন করুন।

গজেন প্রশ্ন করিল—পোড়গঞ্জ কোথায় প্রভু?

উত্তর হইল—মাদারিপুর হইতে সাত ক্রোশ উত্তরে। অশ্বিনীকুমার শাস্ত্রজ্ঞ…এখন সংসারে নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী… তাঁর পায়ে গিয়া পড়ো…

গজেন আবার হতাশ নেত্রে বাবাজীর পানে চাহিল; কহিল,—কিন্তু আমার পক্ষে সেখানে যাওয়া তো সম্ভব নয়।

বাবাজী কহিলেন—প্রশ্ন করুন—

গজেন কহিল—কিন্তু এ যে অসম্ভব, প্রভু। আমার পক্ষে এ অবস্থায়…

বাবাজী কহিলেন—উপায় সম্বন্ধে প্রশ্ন করুন…

গজেন কহিল,—কি উপায়ে তাঁর কাছে যাই?…

উত্তর হইল,—ঘনদাস বাবাজীকে ধরো। অশ্বিনীকে আমি সংবাদ দেবো…ঘনদাসের পত্র পেলে সে ব্যবস্থা করবে…ঐ সঙ্গে তুমি ঘনদাসকে যথাযথ অনুগ্রহ পাবার ক্ষমতা দিয়ে পত্র লেখো…

সমস্যার সমাধান হইল।…ওদিকেও খট্ খট্ শব্দ…

আমি কহিলাম—ধন্বন্তরি প্রভু চলিয়া গেলেন।

আর একটি ভদ্রলোক আসিয়া বসিয়াছিলেন।…বাবাজী কহিলেন—কাকে চান্?…

ভদ্রলোক কহিলেন—সেদিন নাম আর পরিচয় লিখিয়ে দিয়ে গেছলুম। আমার মাতামহ ৺হলধর চক্রবর্ত্তী…সেই যে। তাঁর লিখিত উইল-পত্র কিছু রেখে গেছেন কি না…

বাবাজী কহিলেন—হাঁ, মনে পড়েচে…

আবার মন্ত্র এবং চোঙায় কথা ফুটিল বাসুদেব এসেচো?

ভদ্রলোক চমকিয়া উঠিলেন, তার পর প্রসন্ন মুখে কহিলেন,—হাঁ, দাদামশায়—

—কি চাও?

ভদ্রলোক কহিলেন,—সেই উইল-পত্র…

—আঃ! সে উইল-পত্র…আমার বন্ধু বঁড়িশা গ্রামের বংশীবদন মিত্রের কাছে আছে। মোটরের ঘা খাইয়া বংশীর পা ভাঙ্গিয়াছে—সে শয্যাগত। তার সঙ্গে বেলা নটার সময় দেখা করিয়া উইল-পত্র চাহিয়ো—তোমার অর্থকষ্ট ঘুচিবে।

ভদ্রলোকটির নাম বাসুদেব। বাসুদেব প্রশ্ন করিলেন, —আপনি বেশ আনন্দে আছেন?

উত্তর হইল,—আনন্দে আছি। তোমার দিদিমার আমার জন্য বড় মন কেমন করিত, আমি আসায় তিনি আরাম পাইয়াছেন। আমরা এখন সুখেই আছি।

বাসুদেব প্রশ্ন করিলেন,—আমার অর্থকষ্ট ঘুচাবার উপায় তো করিলেন, কিন্তু নদেরপাড়ার শচীকান্ত যে নালিশ করবেন ব'লে শাসাচ্ছেন, তার বিহিত হয় কি ক'রে?

খট্ খট্ শব্দ হইল। বাবাজী কহিলেন,—উনি চ'লে গেলেন।

বাসুদেব কহিলেন,—আর একবার পাই না ?

বাবাজী কহিলেন,—আজ আর নয়। কাল যদি ওঁকে চান, আজ দর্শনী জমা দিয়ে যান—আমরা ব্যবস্থা ক'রে রাখবো।...

বাসুদেব তাই করিলেন,—টাকা দিয়া বিদায় লইলেন। আমি কহিলাম,—গজেনের ওষুধের কি হবে ?

হাসিয়া বাবাজী কহিলেন,—আমাকেও বিপদে ফেল্‌লেন। দেখুন তো, ধন্বন্তরি প্রভু আমার উপর ভার দিতে বললেন—সেখানে লোক পাঠাতে খরচ আছে, কাকেই বা পাঠাই! আমার এই সাধন-ভজন......

গজেন অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে কহিল,—আপনাকে উপায় করতেই হবে, বাবাজী। আমার চাকরী যেতে বসেছে... নড়ার ক্ষমতা নেই। এ কি জীবন! টাকাই তো সব নয়! পয়সা যা লাগে, দেবো।

বাবাজী কহিলেন,—তা হ'লে এক কাজ করবেন। সেখানে থার্ড ক্লাশে যাতায়াতের ট্রেণ ভাড়া কত লাগে, ঘরে গিয়ে হিসেব ক'রে সেই খরচ আর একটা লোকের চারদিনের খোরাকী-বাবদ দৈনিক পাঁচ সিকে হিসাবে আমার কাছে রেখে যাবেন। আমি যেমন ক'রে পারি, বন্দোবস্ত করবো।

আমি কহিলাম,—এটুকু করা চাই-ই। তার উপর ঐ তেলের দাম যা লাগে...

বাবাজী কহিলেন,—এই সব ঝঞ্ঝাটের জন্তই আপনাকে নিষেধ করেছিলুম, আর কারো কাছে এখানকার রহস্য প্রকাশ করবেন না।...

আমি কহিলাম,—কিন্তু মানুষের কতখানি উপকার হবে এর দ্বারা, ভাবুন। এই এক জন পঙ্গু প্রাণহীনকে প্রাণ দেবেন...

বাবাজী হাসিলেন,—অতি সুনির্ম্মল হাস্য! হাসিয়া তিনি কহিলেন,—বড় ভয় করে এ সব ভার নিতে, মশায়...বুঝলেন কি না।

আমি কহিলাম,—আপনারা এ ব্যাপারের ভার না নিলে সংসারী আমাদের গতি কি হবে, বলুন ?

মাথায় জটা, পরনে রক্তাম্বর, কপালে লাল ফোঁটা, জবার মত লাল চক্ষু হইলে কি হয়, বাবাজীর কি শান্ত মেজাজ! মুখে হাসিটুকু লাগিয়াই আছে! বুঝিলাম, সাধু-সন্ন্যাসীর পায়ে ভারতবর্ষ কেন মাথা লুটাইয়া আছে!...

আমি গজেনকে আশ্বাস দিলাম, কহিলাম,—পোড়-গঞ্জর খপর আমি সংগ্রহ ক'রে দেবো। আমার এক বন্ধুর ভগ্নীর বিবাহ হয়েছে মাদারিপুরে—সে বন্ধুটি থাকেন তালতলায়।

গজেন বলিল,—এ উপকারটি ক'রে আমায় বাঁচাও, দাদা।...

প্রেত-পরিষদে আমি ক্রমে নিত্য অতিথি হইয়া উঠিলাম। চাকরি নাই, ঘরে বসিয়া কাঁহাতক দুশ্চিন্তায় পীড়িত জর্জ্জরিত হই! তা ছাড়া ইহলোকের জীবগুলা মুখের পানে চাহিতে জানে না...ভাবিলাম, পরলোকের প্রেতাত্মাদিগের সঙ্গেই আলাপ-আলোচনায় সময় কাটিবে ভালো!...

আমার মারফৎ আরো চার-পাঁচটি বন্ধু পরিষদে আসিলেন।... নানা ভাবের ভাবুক তাঁরা। কেহ খেয়ালী, কেহ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু, কেহ বা জীবন-সংগ্রামে বিপর্য্যস্ত...

পনেরো দিন পরে গজেনের 'দধীচি তৈল' আসিল, মূল্য পড়িল বারো টাকা। বাবাজী অশ্বিনীকুমারের পত্র বাহির করিলেন—বাবাজীকে তিনি খরচা পাঠাইতে বলিয়াছেন এবং সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন, সমাজে-সংসারে যাঁদের জীবনের বিশিষ্ট মূল্য আছে, তাঁদের ব্যাধি-নিরাকরণার্থ তাঁদের ভার ছাড়া যার-তার জন্ত যেন তাঁকে ঔষধির উদ্দেশ্যে বিরক্ত করা না হয়! যেহেতু তিনি সংসারাশ্রম হইতে অবসর-গ্রহণপূর্ব্বক ভগবচ্চিন্তায় আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, ইত্যাদি...

সে-দিন আমাদের পরিচিত বন্ধু সান্যাল বাবাজীকে বিস্তর অনুরোধে রাজী করাইয়া দর্শনী দিয়া ডাকিল, হানিম্যান সাহেবকে। বন্ধু হোমিওপ্যাথির ভক্ত।

হানিম্যান সাহেব আসিলে বন্ধু কহিল—আমার মাথা ধরে প্রত্যহ এবং মাথা ধরা ছাড়িলেই জ্বর হয়। জ্বর যেই ছাড়ে, অমনি মাথা ধরে...এ রোগের ঔষধ কি ?

চোঙার মুখে জবাব আসিল—হোমিওপ্যাথিকে আমি যে দশায় রাখিয়া গিয়াছিলাম, তার আর উন্নতি ঘটিল না। তোমার এ রোগে নূতন আবিষ্কৃত...প্যাগলিয়াম, ২০০ ডাইলিউশন ব্যবহার করো।

বন্ধু সান্ন্যাল প্রশ্ন করিল—কোথায় পাবো ?

হানিম্যান সাহেব জবাব দিলেন,—চোরবাগানে অতসী বাবু নামে এক ভদ্রলোক থাকেন, তিনি হোমিওপ্যাথির সাধনা করেন। তাঁর কাছে পাইবে।…

কেমন কৌতূহল হইল। বন্ধুকে কহিলাম—চলো এখনি…

বন্ধুর মোটর ছিল। মোটরে চড়িয়া চোরবাগানে আসিলাম। অতসী বাবুর পাত্তা মিলিল। একটা বাড়ীর নীচেকার এক কামরা ভাড়া করিয়া থাকেন—একখানা তক্তাপোষের উপর রাজ্যের খালি শিশি, লেবেল, কাঠের গুঁড়া প্রভৃতি। অতসীর চেহারা ঠিক ভদ্রোচিত লাগিল না, একটু গুলির ছাপ দেওয়া যেন! কপালে একটা মস্ত আব্।

তাঁকে ঔষধের নাম বলিলে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, কহিলেন,—এ ঔষধের সন্ধান কে দিল ? এ ঔষধ আজ এক সপ্তাহ মাত্র আমেরিকা হইতে আনাইয়াছি… নবাবিষ্কৃত।…ভারী চড়া দাম …ভারতবর্ষের কোথাও আর মিলিবে না…

আমরা বিস্মিত! কহিলাম,—মহাপুরুষের মহাবাণী আমাদের এখানে আনিয়াছে…

দশ টাকা মূল্যে ছোট একটি শিশি লওয়া হইল। বন্ধু কহিল,—একশো টাকা চাইলে আমি তাও দিতাম।

অতসী কহিল,—আমি তা নেবো কেন ?…

আর এক দিনের কথা—

হংসেশ্বর মিত্র মারা গেলে তাঁর ছেলে বংশেশ্বর বড় শোকার্ত্ত হইয়া পড়িল। হংসেশ্বরের অগাধ সম্পত্তি… বংশেশ্বরের ইয়ার-বন্ধু জুটিল বিস্তর—আমোদের নানা লোভনীয় ছবি আঁকিয়া তার সামনে ধরিতে লাগিল। বংশেশ্বর তাহাতে টলিতে চায় না। শেষে এক দিন এক ইয়ার কহিল,—তোমার মন এমন শোকার্ত্ত…তোমার বাবার প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা কহিবে চলো,—তবু মনে কিছু স্বস্তি মিলিবে।

বংশেশ্বর আসিল তখন প্রেত-পরিষদে। দর্শনী প্রভৃতি দিয়া যথাসময়ে পিতার প্রেতাত্মাকে আনাইল। হংসেশ্বর কহিলেন,—কি চাও ?

বংশেশ্বর কহিল,—মনে সুখ নাই, শান্তি নাই বাবা…

প্রেতাত্মা কহিল,—কেন, সব বিষয়-সম্পত্তি তো তোমায় দিয়া আসিয়াছি।

বংশেশ্বর কহিল—তবু মন কেমন সদাই শূন্য, উদাস…

চোঙায় দীর্ঘ নিশ্বাসের সুস্পষ্ট শব্দ শুনিলাম। প্রেতাত্মা জবাব দিল—বুঝিয়াছি। গত জন্মে তোমার পত্নীকে বড় কষ্ট দিয়াছ…সে বেচারী সেই দুঃখে এ-জন্মে ভদ্র ঘরে জন্মও লয় নাই। সে জন্মিয়াছে পাপের হ্রদে…পঙ্কের কমল সে …তাকে পাইলে,…

একটা বিশ্রী পাড়ার নাম শুনিলাম। হংসেশ্বরের প্রেতাত্মা কহিল—তার এ জন্মের নাম ডালিম। তার কাছে ক্ষমা চাহিয়ো…তাকেই তোমার গত জন্মের পত্নী জানিয়া এ জন্মে গত জন্মের সকল অবহেলার প্রায়শ্চিত্ত করো…

বংশেশ্বর কহিল—আর এ জন্মের স্ত্রী ?…

প্রেতাত্মা কহিল—গত জন্মে সে ছিল তোমার প্রণয়-ভাগিনী বিলাসিনী গণিকা। তুমি তাকে না দেখিলে পাগল হইতে, তাই এ জন্মে তোমার মনের সেই প্রীতির বলে সে তোমার স্ত্রী হইয়া জন্মিয়াছে !…

বংশেশ্বর ভাবিল, তাই হইবে, নহিলে এ-জন্মের পত্নী গোপিকাবালার গহনার উপর এত লালচ কেন ? ভালো বেশ-ভূষার দিকে তার বিলক্ষণ দৃষ্টি…ঠিক ! গত জন্মের সংস্কার ইহাকেই বলে !…

বংশেশ্বর তার ইয়ারকে ডাকিয়া বলিল, ঐ ঠিকানায় সন্ধান নাও…আমার গত জন্মের উপেক্ষিতা পত্নী ডালিম যথার্থই আছে কি না ! যদি থাকে…

ইয়ার কহিল—খবর নেবো, তুমি যথাবিহিত ব্যবস্থা করো।…

খুশী-মনে ইয়ার ছুটিল ডালিমের সন্ধানে। বংশেশ্বর ডাকিল—বাবা…

খট্ খট্…বাবাজী কহিলেন—তিনি চলে গেছেন…

বংশেশ্বর কহিল—আবার একবার ডাকাতে চাই…

বাবাজী কহিলেন—আজ আর হবে না। এক দিনে কোনো প্রেতাত্মা দুবার আসে না। আসবার উপায় নেই। এলে এখানকার বায়ুর অতি-চাপে বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়বার আশঙ্কা আছে।…

বংশেশ্বর বিদায় লইল।…

কার্য্য-গতিকে হপ্তাখানেকের জন্য জয়নগর গিয়াছিলাম

ফিরিয়া শুনিলাম, গজেনের বাড়ী হইতে লোক আসিয়াছিল, আমার সন্ধানে।···সন্ধ্যার পর গেলাম। গজেনের বাতের ব্যথা আরো বাড়িয়াছে; কিছুমাত্র কমে নাই।··· পালকী করিয়া গজেন আবার ধন্বন্তরি ঠাকুরকে খবর দিতে যাইবে, সে শক্তি তার নাই। দুটি টাকা আমার হাতে দিয়া গজেন কহিল—কাল একবার গিয়ে ঠাকুরকে যদি আমার হয়ে জানাও···

আমি কহিলাম—বেশ।

পরের দিন পরিষদে গেলাম। বাবাজীকে বার্ত্তা বলিলাম। বাবাজী কহিলেন—আশ্চর্য্য তো! তাঁকে জানাই, যন্ত্র-সাহায্যে।

ধন্বন্তরি ঠাকুরকে আবার চোঙার মুখে আনানো হইল। বিবরণ জানাইলে উত্তর পাইলাম—অবিশ্বাসী জীব, মনে সংশয় জাগিয়াছিল···কাজেই সব পণ্ড হইয়াছে। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারো তো আমায় কষ্ট দিতে দ্বিধা করিয়ো না। চিত্তে যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগে তো আমায় এ মর্ত্ত্যলোকের বদ্ধ বায়ুর মধ্যে টানিয়া আনিয়ো না। অনর্থপাত ঘটিবে।

প্রশ্ন করিলাম—মনের বিশ্বাসেই নিবেদন জানাইতেছি, দ্বিতীয় ঔষধ সেবনের কি ব্যবস্থা···অনুমতি করে···

উত্তর হইল—সেই রোগীকে বুঝাইয়া বলো। তাদের সকলের মন যদি সংশয়লেশহীন থাকে তো আবার আসিও। ব্যবস্থা মিলিবে। নচেৎ আমায় বিরক্ত করিয়ো না। মহা বিপদ ঘটিবে।

তখনই খট্ খট্ শব্দ। বুঝিলাম, ধন্বন্তরি ঠাকুর চলিয়া গিয়াছেন।

ঘনদাস বাবাজী কহিলেন,—প্রেতদের সঙ্গে কোনো-রূপ চাতুরী বা প্রবঞ্চনায় সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে—এ কথাটুকু তাঁদের বুঝাইয়া বলিয়ো···

গজেনের বাড়ী ছুটিলাম। তাকে যথাযথ খপর জানাই-লাম। গজেন কহিল,—ঐ আমার ছোট কাকা খাপ্পা হয়ে বললেন, তোমার আক্কেল গেছে! রোগে ডাক্তার ডাকো, কবিরাজ ডাকো, যারা বেঁচে আছে, জ্যান্ত ডাক্তার কবি-রাজ···তা না করে মরে গেছে কোন্ যুগে, সেই বৈদ্য দিয়ে চিকিৎসা করাতে বসেচো! যত বুজরুকি···ছি! এ কথায় মনে সন্দেহ একবার জেগেছিল!···তার উপর ও-পাড়ার কেষ্ট এসে বললে, ওদের ব্যবসাদারীটুকু খাশা···প্রেশক্রপসন দেবে মরা কবিরাজ আর সে প্রেশক্রপশন্ সার্ভ করবে কোন্ ধাপধাড়ার জ্যান্ত সন্ন্যাসী কবিরাজ! আশ্চর্য্য!···তবু আমার বিশ্বাস নষ্ট হয়নি ভাই, কারণ, নানারকম চিকিৎসা তো করিয়েছি।···

আমি কহিলাম,—উপায়?

গজেন কহিল,—এরা দুটো ইঞ্জেকশন দেছে···কিন্তু আমি বলি, চুপি চুপি তুমি আর একবার ধন্বন্তরি ঠাকুরকে আমার ভক্তিপূর্ণ নিবেদন জানাও, তাঁর ব্যবস্থাই আমার শিরোধার্য্য।

গজেন আবার দুটো টাকা দিল, দর্শনীর। আমি কহিলাম,—ও-বেলায় যাবো ···

গেলাম। বাবাজীকে সকল কথা বলিলাম, শুধু ইঞ্জেকশনের কথা গোপন রাখিলাম।

দর্শনী লইয়া বাবাজী কহিলেন,—দোতলায় চলো। হালিমপুরের কুমার বাহাদুর এখনি আসবেন, কথা আছে।

ফুঁক-যন্ত্রে আবার ধন্বন্তরি ঠাকুরের আবির্ভাব। তিনি গজেনের ভক্তি-নিবেদনে দয়ার্দ্র হইলেন, জবাব দিলেন,—সপ্তাহান্তে এইখানে ঔষধ মিলিবে মালিশের। কাল সকালে তুমি এই গৃহে দেবীপ্রতিমার চরণে পাঁচটি মুদ্রা পূজা পাঠাইয়ো।···

হালিমপুরের কুমার বাহাদুর আসিলেন। বাবাজীকে কহিলাম,—আমি থাকতে পারি?

বাবাজী কহিলেন,—নিশ্চয়। এখানে যিনি আসবেন, তিনি স্বেচ্ছায় চ'লে না গেলে তাঁকে বিদায় দেবার অধি-কার আমার নাই। তা ছাড়া এখানে কোনো প্রশ্নোত্তরে গোপনতা নাই। কারণ, সকলের সকল প্রশ্নোত্তরে জীব-লোকের উপকার ভিন্ন ক্ষতি নাই! প্রেতগণ জীবের মঙ্গল ভিন্ন কখনো অমঙ্গল কামনা করেন না!···

আমি কহিলাম,—বলেন কি বাবাজী! তবে যে ঐ ভূতের ভয়, দৌরাত্ম্য প্রভৃতির গল্পগুলা···

বাবাজী কহিলেন,—অজ্ঞান জীবের মনের সে মহা-ভ্রান্তি! তারা নিজেদের মানসিক দুর্ব্বলতায় বিভীষিকা দেখে। রজ্জুতে তাদের সর্পভ্রম হয়।···

বহু দিনের ভুল ধারণা ঘুচিল। আরাম পাইলা

কুমার বাহাদুর দর্শনী দিয়া ডাকাইলেন তাঁ

পিতা রাজা বাহাদুরকে। তিনি আসিলেন। কুমার বাহাদুর প্রশ্ন করিলেন,—কোথায় আছেন ?…

উত্তর। পৃথিবীর বাহিরে—মেরু সীমায় শেষপ্রান্তের পারে।

প্রশ্ন। সেখানে এখন শীত, না গ্রীষ্ম ?

উত্তর। এখানে শীতও নাই, গ্রীষ্মও নাই। পুরী গিয়াছ তো…? সেখানে যেমন শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, এখানেও তেমনি। উপরন্তু সোম-রস-পানে বিভোর আমরা এখানে সর্ব্বক্ষণ !

প্রশ্ন—ওখানে আলো, না, অন্ধকার ? রৌদ্র, না, জ্যোৎস্না ?

উত্তর—আলো নয়, অন্ধকার নয়; রৌদ্র নয়, জ্যোৎস্নাও নয়। দিব্য জ্যোতিঃ, উর্দ্ধে অধে দক্ষিণে বামে চতুর্দ্দিকে রাশি রাশি শুধু দিব্য জ্যোতিঃ। ভাগ্যে প্রেতের চক্ষু নাই, থাকিলে ঝলসিয়া যাইত !

প্রশ্ন—চক্ষু নাই ?

উত্তর—চক্ষু নাই, নাসিকা নাই, কর্ণ নাই, শুধু আছে সূক্ষ্ম বায়ুর বেগ…অপূর্ব্ব সে বায়ু…সে বায়ুর প্রকোপে কিন্তু বাতিক চাগে না।

প্রশ্ন। শুধু বায়ু! তা হ'লে আপনি সুখে আছেন, না দুঃখে ?

উত্তর। সুখ, সুখ, বড় সুখে আছি। আত্মীয় বন্ধুবান্ধব দাস-দাসী সকলকে জানাইয়ো, আমি পরম সুখে আছি।…

প্রশ্ন। আমার কি রাজা হইবার আশা আছে ?

উত্তর। আছে। নিজ কার্য্যের উপর ফলাফল নির্ভর করিতেছে। কলিকাতায় বাড়ী কিনিয়া ফ্যালো। বড় মোটর কেনো, সাহেব-মেমদের পার্টি দাও, বল্‌নাচ দাও, হালিমপুরে একটা বল্‌নাচের আথড়া করিয়া দাও। এষ্টেটের উচ্চ পদে কদাপি দেশীয় ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবে না ; এবং একবার বধূ-মাতাকে লইয়া বিলাত ঘুরিয়া এসো…তদুপরি……

খট্ খট্—রাজা বাহাদুর চলিয়া গেলেন।…

* * * * *

সম্পাদক মহাশয়, এই প্রেত-পরিষদের কয়েকটি সাঁচ্চা রিপোর্ট পাঠাইলাম। এখনো অনেকে এই পরিষদের সংবাদ জানেন না, কারণ, বাবাজী প্রচারের বিরোধী। কিন্তু আমাদের দেশে চারিদিকে যেরূপ বিরাট বিপত্তি, দলাদলি, মত-ভেদের মারামারি…এবং যেহেতু সমস্যা অতি জটিল হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আপনার উচিত, এই পরিষদের অস্তিত্ব ও কার্য্য-বিধির প্রচারে সহায়তা করা। এই উদ্দেশ্যে আমি রাত্রি জাগিয়া পুরাতন ডায়েরি ঘাঁটিয়া রিপোর্ট সঙ্কলন করিয়া দিলাম। চাই কি, বিলাতী মাসিকে প্রেত-লোকের বিবিধ তথ্য (সত্য ঘটনা সংবলিত) ছাপা হইয়া হুলস্থূল বাধাইয়া দিয়াছে, এ রিপোর্ট ছাপাইয়া আপনি এ দেশেও তেমনি হুলস্থূল বাধাইয়া দিন। ইহাই আমার উদ্দেশ্য। অতঃপর পরিষদের আরো রিপোর্ট পাঠাইব। পড়িয়া আপনি রোমাঞ্চিত হইবেন, প্রেতলোক সম্বন্ধে আপনার দিব্যজ্ঞান লাভ ঘটিবে। চাই কি তথায় ক্যানভাসার পাঠাইয়া গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনাদি সংগ্রহ করিয়া বেশ কিঞ্চিৎ আয় বাড়াইতেও পারিবেন। আয় বাড়িলে আমাদের এ আয়াসটুকু সে শুভদিনে শুধু স্মরণ করিবেন, ইহাই নিবেদন। শ্রীহুজুগদাস হাজরা।

[সম্পাদকীয় বক্তব্য :—হুজুগদাস বাবুর প্রবন্ধটিতে প্রেতলোকের রহস্যময় বহু তথ্য সন্নিবিষ্ট দেখিয়া আমরা মহা-উৎসাহে তাহা পত্রস্থ করিয়া ফেলি। ছাপা হইয়া গেলে সংবাদ পাই, পরিষদের কার্য্যবিধি যথাযথ বিবৃত হইয়াছে। হুজুগদাস বাবু মিথ্যাবাদী নন। এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু পরিষদের পিছনে পুলিশ লাগিয়াছে। যেহেতু পুলিশ সন্দেহ করে যে, ঐ বাবাজী যে-সব ঔষধাদির ব্যবস্থা করেন, সে-সব ঔষধ তাঁরই লোক সরবরাহ করে। তিনি তজ্জন্য কমিশন পান। হোমিওপ্যাথি ঔষধের যে নব নব নাম প্রেতলোক হইতে তাঁরা দেন, সে সব নাম বাবাজীর কৃত। তা ছাড়া প্রেতাত্মা আসিয়া চোঙার কথা কন্ না, আসলে, পিছনের ঘরে বাবাজীর চেলারা প্রেত সাজিয়া কথা কন্। ঐতিহাসিক প্রেতাত্মা চট্ করিয়া আসেন, কিন্তু দর্শনার্থীদের মৃত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে আলাপ করিতে চাহিলে তাদের ফী বাবদ টাকা আদায় করিয়া যে সময় লওয়া হয়, সেই সময়ের মধ্যে লোকমুখে যথাসম্ভব বিবরণ বাবাজীর লোক সংগ্রহ করে। বহু ব্যবসায়ীর সহিত বাবাজী কন্ট্রাক্ট করিয়াছেন, প্রেতাত্মার মারফৎ ঔষধ, তৈল, এমন কি, কোন্ মাসিকপত্রের গ্রাহক হইলে ভূমানন্দ বা পত্নীর ভালোবাসা বা প্রতিবেশিনীর অপাঙ্গ-দৃষ্টি ও প্রেম লাভ করা যাইবে, এ সব সম্বন্ধেও বাবাজী উচ্চ কমিশনে বন্দোবস্ত

করিতেছেন। আমাদের কাছেও লোক আসিয়াছিল,—আমরা যদি উচ্চ হারে কমিশন দি, তাহা হইলে মুক্তিকামী জীব প্রেতমুখে এমন উপদেশ পাইবেন যে, আমাদের মাসিক-পত্রের গ্রাহক হওয়াতেই একমাত্র জীবের মুক্তি বা শান্তির উপায় নিহিত আছে; এবং যাঁহারা ঐহিক আরাম চান্, আমাদের কাগজের গ্রাহক হইলে, তাঁরাও সে আরামের অধিকারী হইবেন। এ কথায় সন্দিগ্ধ হইয়া আমরা মহামান্ত পুলিশ কমিশনারের কাছে গোপনে সংবাদ পাঠাইয়াছি। তদন্ত চলিতেছে; ফলাফল যথাসময়ে জানাইব। ইতি]

সম্পাদক।

হুজুগদাসের পত্র

সম্পাদক মহাশয়,

আমার সে রিপোর্ট ছাপাইবেন না। পুলিশের হানায় বাবাজী পলাতক। পরিষদের বাড়ী-তালাশীতে দেখা গিয়াছে, পাশের ঘরে বহু বেঞ্চ এবং বহু কাগজপত্র। সেই সব কাগজপত্রে দর্শনীদারদের মৃত আত্মীয়স্বজন-সম্বন্ধে বহু কথা লিপিবদ্ধ দেখা গিয়াছে। এমন কি, পোড়গঞ্জের অশ্বিনীকুমার কবিরাজের চিঠির মুশাবিদাও সেখানে পাওয়া গিয়াছে। তা ছাড়া হোমিওপ্যাথি ঔষধের একটা নির্ঘণ্ট—তাহাতে 'নাক্স ভোমিকার' পাশে লেখা আছে "ভাটালিটি"; "পাল্সেটিলার" পাশে লেখা 'প্যাগলিয়াম্' (এই প্যাগলিয়াম ও অতসী বাবুর কথা রিপোর্টে পাইবেন) টোকা আছে। ব্যাপার দেখিয়া আমি হতভম্ব। রিপোর্ট ছাপিলে আমার পক্ষে পাড়ায় বাস করা সম্ভব হইবে না। কি জানি, পুলিশ আসিয়া আমাকেও ধরিয়া হয় তো উহাদের সঙ্গে conspiracyর চার্জ্জে sec. 120 (B)তে চালান দিবে। 120 (B)র যে মহোৎসব দেশে…প্রাণে আতঙ্ক হয়। ইতি

বিনীত— শ্রীহুজুগদাস হাজরা।

সম্পাদকীয় মন্তব্য ঃ—

হুজুগদাস বাবু ক্ষমা করিবেন। তাঁর রিপোর্ট আমাদের কাগজে ছাপা হইয়া গিয়াছে। এখন বাদ দিতে গেলে ঠিক সময়ে কাগজ বাহির করা সম্ভব হইবে না। তা ছাড়া কাগজের দাম ও ছাপার খরচ…সে টাকাটা যদি হুজুগদাস বাবু পাঠাইতেন, তাহা হইলেও তাঁর কথা রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইতাম। আমাদের এ ব্যয়ের জন্ত তিনি দায়ী। এ সম্বন্ধে তাঁকে আইনের খর্পরে ফেলা যায় কি না, সে-সম্বন্ধে সত্বর আমাদের উকিলের কাছে পরামর্শ লইব। ইতি—সম্পাদক। শ্রীবৈকুণ্ঠ শর্ম্মা।

মন চুরি

সে যে খুলিয়া ব'সেছিল ভুলিয়া এলোমেলো
মঞ্জু সুষমার মঞ্জুষা
যেন ঊষা অকুণ্ঠিতা অনবগুণ্ঠিতা
বিথারি নন্দন-বনভূষা।
মোর দৃষ্টি এনেছে সে সৃষ্টি-মধুরিমা
হরণ করি মনোমূর্ত্তিটি
আমি আঁকিয়া নি'ছি বুকে আলোকছায়াপাতে
অলোক সুষমার স্ফুর্ত্তিটি।
কিবা বীণাটি লয়ে করে পরমাদর-ভরে
যক্ষ-কামিনীর ভঙ্গিতে
ছিল আত্মহারা সে যে কোকিল-কণ্ঠের
যক্ষ-রাগিণীর সঙ্গীতে।
আহা দূরেও র'য়ে মোর যুগল শ্রুতি চোর
হয়নি সম্ভোগে বঞ্চিত.
সবি এনেছে হরি তারা কণ্ঠমধুধারা,
স্মৃতিতে শ্রুতিসুখ সঞ্চিত।

তার পরশ উপাদেয় নয়নে অজ্ঞেয়,
ও দেহ ছুঁয়ে বায়ু সঞ্চরি,'
মৃদু আভাসখানি তার হরিয়া আনি' দিল
পুলকে তনু উঠে মঞ্জরি'।
সে যে অলক নিয়ে তার খেলিতে অনিবার
সে চোরে দিল মৃদু বিশ্বাসে,
তার সঙ্গ মধুরিমা অঙ্গ-পরিমল
লভিনু তাই মোর নিশ্বাসে।
হায় এমনি করি সব হরিয়া বৈভব
ফিরিতে গৃহপানে উল্লাসে,
পথে দেখি যে মোর পানে ব্যঙ্গ শর হানে
দু'পাশে লতিকার ফুল হাসে।
থেমে সহসা খুঁজে দেখি— ঠকেছি—হায় এ কি
কখন্ গেছে মোর মন চুরি,
শেষে সে হারা মন লাগি চোরের সন্ধানে
আজিকে সারা ত্রিভুবন ঘুরি।

শ্রীকালিদাস রায়

দেবমন্দিরে স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের বিচার

আজকাল অনেকে অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিদিগকে দেবমন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার দানের জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। যাঁহারা এই আন্দোলনের জন্য নেতৃত্ব করিতেছেন,—তাঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য যে অসাধু, হিন্দুধর্ম্মের উচ্ছেদসাধন—ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে না। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই রাজনীতিক অধিকার লাভের জন্য এইরূপ করিতেছেন। তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, দেশের জনসাধারণের মধ্যে যদি নানা জাতি ও নানা ভাগ এবং সেই নানা ভাগের মধ্যে কেহ ছোট কেহ বড় বলিয়া লোকের ধারণা থাকে—তাহা হইলে সেই দেশবাসীর মধ্যে কখনই একতা সংস্থাপিত হইতে পারে না। একতা না হইলেই আমরা রাজনীতিক অধিকারলাভে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিব না। কারণ, ছোট বড় জ্ঞানই একতালাভের পরিপন্থী। বিশেষতঃ সেই ছোট বড় হিসাবে শ্রেণী-বিভাগ যদি স্বার্থপরতামূলক ও স্বৈরিতাপূর্ণ বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে যাহাদিগকে অন্যায় করিয়া বা কুবুদ্ধিবশে ছোট করা হইয়াছে,—তাহারা স্বার্থপর উচ্চ শ্রেণীর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিবেই করিবে। নিম্ন শ্রেণী উচ্চ শ্রেণীর প্রগতির পথে বাধা দিবেই দিবে। কারণ, কোন শ্রেণীই চিরদিনই একটা স্বৈরিতাপূর্ণ ব্যবস্থা সহ্য করিবে, ইহা আশা করা যায় না। ইহাই হইল অস্পৃশ্যতাবর্জ্জনকামীদিগের মনের কথা।

কিন্তু কথাটা আরও একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। বাস্তবিক হিন্দু কি কাহাকেও ছোট—কাহাকেও বড় বলিয়া মনে করে? কখনই না। তাহারা সকলকেই সমান দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। হিন্দুর শ্রুতি তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, যেখানে জীব, সেইখানেই শিব। মানব ত দূরের কথা, সামান্য কৃমিকীট পর্য্যন্ত অতি ক্ষুদ্র যে সমস্ত জীব আছে, তাহাতেই শিব বিদ্যমান রহিয়াছেন। জীবত্ব শিবত্ব হইতে পৃথক্ নহে। তাই হিন্দুর বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদ্ বলিয়াছেন:—

> এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
> একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥

ইহার অর্থ এই যে, একই চন্দ্র যেমন বিভিন্ন জলাধারে পতিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ একই পরমেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন ভূতে অবস্থিতি করেন বলিয়া এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। কিন্তু জ্ঞানীরা তাঁহাকে সর্ব্বত্র একরূপে দেখেন। এই উপমাটি আরও একটু ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। বিভিন্ন জলাধারে একই চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পতিত হয় সত্য, কিন্তু সর্ব্বত্রই সেই চন্দ্রবিম্ব সমানভাবে ব্যক্ত বা লক্ষিত হয় না। একটা বড় জলাধারে হয় ত সেই চন্দ্রবিম্ব পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়, কিন্তু একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জলকণায় উহা তেমন ভাবে প্রকাশ পায় না,—উহাতে পতিত চন্দ্রবিম্ব অতিক্ষুদ্রই দেখায়। বৃহৎ জলাশয়ের জল যদি নির্ম্মল ও নিথর হয়, তাহা হইলেই তাহাতে চন্দ্রবিম্ব সুন্দরভাবে পতিত হয়, কিন্তু উহা যদি আবিল ও চঞ্চল হয়, তাহা হইলে উহার উপর পতিত প্রতিবিম্ব তত স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয় না। অতি ক্ষুদ্র জলকণাও যদি নির্ম্মল হয়, তাহা হইলে তাহাতেও যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চন্দ্রবিম্ব পতিত হয়, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু উহা যদি আবিল হয়, তাহা হইলে উহাতে যে চন্দ্রবিম্ব আছে,—তাহা বুঝাই যায় না। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারেন যে, ঐ সকল জলাধারে প্রকৃত চন্দ্রবিম্বই প্রতিবিম্বিত হইতেছে। কিন্তু সাধারণ স্থূলবুদ্ধি লোক তাহা বুঝিতে পারে না। তাই সাধারণ মানবের মধ্যে—জীবমাত্রের মধ্যেই ভেদাভেদ করা হয়। স্থূলবুদ্ধি লোক সকল জীবেই শিব বিদ্যমান আছেন—ইহা শুনিলেও তাহা হৃদয়ঙ্গম ও বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে না। আজকাল অনেক সুশিক্ষিত বলিয়া অভিমানী ব্যক্তিও ঐ সত্যে বিশ্বাস করা ত দূরের কথা, উহা ধারণার মধ্যেও আনিতে পারেন না। কারণ, উহা উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন। সেই জন্য গীতা বলিয়াছেন—

> সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
> বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

যিনি সকল ভূতেই বা প্রাণীতেই পরমেশ্বরকে অবস্থিত দেখিতে পান এবং সর্ব্বভূতের বিনাশ আছে, ইহা দেখিয়াও সেই পরমেশ্বর যে অবিনাশী, তাহা ঠিক বুঝিতে পারেন,—তিনি যথার্থ ব্যাপার দেখিতে সমর্থ। কিন্তু আমরা কি তাহা দেখিতে পাই? কিছুতেই নহে। আমরা যদি তাহা দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে আমরা জীবহিংসা করিতাম না, পরস্পর পরস্পরের উপর বিদ্বেষ বা পরস্পরকে ঘৃণা করিতাম না। রজোগুণবহুল রাজগণের ন্যায় শিকার করিয়া বেড়াইতাম না। আসল কথা, ঐ উক্তি সত্য হইলেও উহা উপলব্ধি করিবার শক্তি আমাদের নাই। কারণ, আমাদের মন অবিদ্যায় আবিল হইয়া গিয়াছে। আমরা তোতাপাখীর মত ঐ কথা আবৃত্তি করিতে পারি, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ঐ উক্তিকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি না,—বিশ্বাস করা ত দূরের কথা। বলা বাহুল্য, এই সাম্যবাদের মত উচ্চ অঙ্গের সাম্যবাদ আর আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু উহাকে বিশ্বাস করিতে হইলে যে শিক্ষার ও সাধনার প্রয়োজন, আমাদের সে শিক্ষা ও সাধনা একবারেই নাই। আমাদের এই সাম্যবাদে ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই সমান, সমস্তই ব্রহ্মের রূপ। এই সাম্যবাদ য়ুরোপীয় সাম্যবাদ অপেক্ষা অনেক উচ্চ। কিন্তু হইলে হইবে কি,—ইহা উপলব্ধি করাই কঠিন। ইহা অপেক্ষা য়ুরোপীয় সাম্যবাদ অনেক হীন হইলেও তাহাই বা কয় জন য়ুরোপীয় উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন? য়ুরোপীয়দিগের কার্য্য দেখিয়া কেহই যে তাহা পারিতেছেন, তাহা মনে হইতেছে না। তাঁহারা কেবল অন্যের মধ্যে ভেদনীতি চালাইবার সময় তাঁহাদের সাম্যবাদ প্রচারিত করেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারা উহাতে আস্থাবান্ নহেন। সেই জন্য তাঁহাদের সমাজে নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সকলে সমান হইলেও ব্যবহারিক জগতে সকলে সমান নহেন। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিনিয়তই দেখিতেছি। আবিল জলে যে চন্দ্রবিম্ব পতিত হয়, সে চন্দ্রবিম্ব নির্ম্মল ও নিথর জলে পতিত চন্দ্রবিম্বের ঠিক সমান হইতে পারে না। বৃহৎ জলাধারে পতিত চন্দ্রবিম্ব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জলকণার প্রতিবিম্বিত চন্দ্রমূর্ত্তির সমান হয় না, বাহ্যদৃষ্টিতে উহার তারতম্য হইবেই হইবে। উহা ভ্রান্তি বা মায়া হইতে পারে, কিন্তু মায়ায় উপহত জীব আমরা মায়াকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারি না। যাহা অপরিহার্য্য, তাহা অতিক্রম করিবার প্রয়াস নিষ্ফল এবং অজ্ঞতা-সূচক। যে ব্যক্তি সমুদ্রমধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে, তাহার পক্ষে জল ছাড়িয়া স্থলে উঠিবার আশা একবারে নিরর্থক। তাহার জল ছাড়িয়া স্থলে উঠিবার চেষ্টা স্বাভাবিক এবং অবশ্য করণীয়। নতুবা তাহার প্রাণবিয়োগ হইবে। তাহাকে স্থলে আসিতে হইলে জলের উপর দিয়াই স্থলে আসিতে হইবে। সেইরূপ এই মায়ার দ্বারা উপহত জীবকে এই মায়া-সমুদ্র অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিকতার সুদৃঢ় ভূমিতে উপনীত হইতে হইবে সত্য, সে জন্য—তাহার নিরন্তর চেষ্টা করাও অবশ্য কর্ত্তব্য সত্য,—কিন্তু তাই বলিয়া সে একবারে মায়ার সম্পর্ক ছাড়িয়া দিয়া আধ্যাত্মিকতার সুদৃঢ় ভূমিতে পদার্পণ করিতে পারিবে না। তাহাকে এই মায়া-সমুদ্রের ভিতর দিয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে সাঁতার দিয়া আধ্যাত্মিক ভূমির দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। এক কথায় ভ্রান্তিকে মানিয়া লইয়া তাহাকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। সাধারণভাবে অগ্রসর হইতে হইলে এই মায়া-সাগরের জল মাখিয়াই তাহাকে হস্ত-পদ সঞ্চালনপূর্ব্বক তীরে যাইয়া উঠিতে হইবে। সদ্‌গুরুই এই সাগরের তরণী এবং শাস্ত্রই ইহার সামুদ্রিক আলোকস্তম্ভ (Light house)। যে ব্যক্তি এই মায়া-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে খাইতে ভাগ্যবশে সদ্‌গুরু পায়, সে সহজেই আধ্যাত্মিকতার তীরে উপনীত হইতে পারে। তাহাকে তত পরিশ্রম করিতে হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও তাহাকে এই মায়াময় সমুদ্রের উপর দিয়াই যাইতে হইবে। সমুদ্রের অধিকার ছাড়িয়া সে মুহূর্ত্তমধ্যে তীরে উঠিতে পারিবে না। আর যদি তাহার ভাগ্যে সদ্‌গুরুরূপ তরী না মিলে, তাহা হইলে তাহাকে ঐ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আলোকরশ্মি দেখিয়া তীর কোন্ দিকে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে এবং ধীরে ধীরে সুকৌশলে হস্ত-পদসঞ্চালন পূর্ব্বক মায়াতরঙ্গ প্রতিহত করিয়া তীরে উপনীত হইতে হইবে। প্রকৃত গুরু না পাইলে সে তোমাকে বিপথে লইয়া যাইবে এবং অতি ভীষণ তিমিরাচ্ছন্ন উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল সাগরে তরী বানচাল করিয়া সেই সাগরে ডুবাইয়া দিবে। সুতরাং ভণ্ড গুরুর আপাতমনোহর বাক্যে প্রলুব্ধ হইলে সর্ব্বনাশ ঘটিবে। অতএব গুরুনির্ব্বাচনে সাবধানতার প্রয়োজন। অসদ্‌গুরু অপেক্ষা গুরুহীনতাও ভাল।

অন্যান্য ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অন্যান্য ধর্ম্মের শিক্ষা এই যে, ভগবানকে স্তবে তুষ্ট করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও কৃপা লাভান্তে মুক্তি পাইতে হয়। হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষা ঠিক তাহা নহে। হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষা এই যে, ভগবান্ কাহারও স্তবে তুষ্ট বা নিন্দায় রুষ্ট হয়েন না। তিনি নিন্দা-স্তুতির অতীত। তবে শ্রদ্ধাবুদ্ধিসহকারে তাঁহার পূজা অর্চনা স্তব-স্তুতি করিলে চিত্তের উৎকর্ষ সাধিত হয়,—চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলেই মানুষ মায়াপাশ অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সেই জন্য শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন, চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম। চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিতে হয়। ভগবানের প্রীতির জন্য কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই। তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধকের ভেদবুদ্ধি থাকিবে অর্থাৎ ভগবান্ হইতে সাধক পৃথক্, এরূপ ধারণা থাকিবে, ততক্ষণ সাধককে কর্ম্ম করিয়া যাইতেই হইবে। অর্থাৎ মানুষ যতক্ষণ দ্বৈতবাদী থাকিবে, ততক্ষণ সে কর্ম্মসন্ন্যাস করিতে পারে না। সে প্রথমে ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম্ম করিবে, পরে অধিকার জন্মিলে ফললাভের আশা ছাড়িয়া কর্ম্ম করিতে থাকিবে।

কিন্তু শেষে যখন তাহার তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইবে, তখন সে বুঝিবে যে, এই বিশ্ব সমস্তই ব্রহ্মময়, তখন স্রষ্টা ও সৃষ্ট, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুইয়ের কোন পার্থক্য থাকিবে না। তখন সে বুঝিবে,—

যস্মিন্ সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্ব্বময়ো নিত্যং তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥

যাহাতে এই সব, যাহা হইতে এই সব, যিনি এই সব, আর অগ্রে পশ্চাতে অধে ঊর্দ্ধে বামে দক্ষিণে সর্ব্বদিকে যিনি বিদ্যমান, যিনি সর্ব্বময়, যিনি নিত্য, সেই সর্ব্বাত্মাকে নমস্কার। ইহাই "একমেবাদ্বিতীয়ং" জ্ঞান,—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" জ্ঞান। এ জ্ঞান জন্মিলে আর বিষ্ঠা-চন্দনে, গুণবানে গুণহীনে,—পাপীতে পুণ্যাত্মায়, জীবে ও শিবে ভেদজ্ঞান থাকে না। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান বা প্রকৃত জ্ঞান। কিন্তু কেবল তোতাপাখীর মত এই কথাগুলি আবৃত্তি করিলেই যে ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া যায়, তাহা নহে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ঐ তথ্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে হয়। মুখে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম বলিতে এক মিনিট সময়ও লাগে না, কিন্তু মর্ম্মে মর্ম্মে ঐ সত্য উপলব্ধি করিতে সাধকের পক্ষে জীবনের পর জীবন এরূপ কত শত জীবন কাটিয়া যায়, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞানলাভের ক্রম আছে। সোপান-পরম্পরার ন্যায় ইহার আরোহণীতে উঠিতে হয়। এই ভ্রান্তির দিগন্তবিসারী হিমবৎ শীর্ষেই শিবের বা সত্যজ্ঞানের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। সাধক যতক্ষণ ভ্রান্তির পর ভ্রান্তির প্রস্তরময় গৌরীশঙ্কর শিখরের শীর্ষদেশে উঠিতে না পারিতেছেন,—ততক্ষণ তাঁহাকে ধাপে ধাপে ভ্রান্তির উপরেই পদন্যাস করিতে হইবে। ইহাই মহামায়ার মায়া—লীলাময়ীর লীলা। ভ্রান্তিতে পদন্যাস না করিয়া কোন্ বিজ্ঞান, কোন্ দর্শন, কোন্ তত্ত্ব অভ্রান্ত সত্যকে ধরিতে পারিয়াছে? কেহই তাহা পারে নাই। কারণ, মহামায়া জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যে ভ্রান্তিরূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থিতা। সুতরাং ভ্রান্তি তুচ্ছ-তাচ্ছীল্যের বিষয় নহে। সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করা সকলের সাধ্য নহে। বিশেষ আধ্যাত্মিক সত্য বাক্য ও মনের অগোচর। তাই ভ্রান্তির উপর অবস্থিত সত্য জ্ঞানের সন্নিহিত সাধক সেই পরমাত্মাকে উদ্দেশ করিয়া স্তব করেন,—

যত্র বেদা বিজানন্তি, মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্।
ন যত্র বাক্ প্রসরতি তস্মৈ চিদাত্মনে নমঃ॥

বেদগণ যাহাকে জানেন না, যাহাকে ধারণা করিতে যাইয়া মন কুণ্ঠিত হইয়া ফিরিয়া আইসে, বাক্য যেখানে বিস্তার লাভ

করিতে পারে না,—সেই চিদাত্মাকে নমস্কার। সাধনায় যাঁহারা প্রায় শেষসীমায় উপনীত, তাঁহাদেরই যখন এই কথা,—তখন আমরা সাধন-ভজনবিহীন হইয়া একবারে সার সত্যকে আঁকড়াইয়া ধরিব, এ আশা যে বাতুলতা। সেই জন্য বাঙ্গালী সাধক গাহিয়াছেন :—

"ভ্রান্তিতে শান্তি আমার—"

ভ্রান্তিতেই মনে শান্তি আনিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। তাই আড়ম্বরবহুল উৎসব মূর্ত্তিপূজা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে আত্মচিন্তায় সমাহিত হইতে হইবে। যে যেরূপ অধিকারী, তাহার পক্ষে তাহাই সত্য,—উহা ভ্রান্তি নহে। পরে উহা ভ্রান্তি হইতে পারে, কিন্তু তখন উহা সত্য। কারণ, জ্ঞানের যে ধাপে মানুষ উপস্থিত হয়, তখন সেই ধাপের জ্ঞানই তাহাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। এ কথা আমি বহুবারই বলিয়াছি।

এখন আমি আমাদের মূর্ত্তিপূজার কথা বলিব। আমাদের পূজাপদ্ধতি অন্য সকল ধর্ম্মাবলম্বীর পূজাপদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হইলে মূর্ত্তিপূজা ভ্রান্তিজনিত অথবা অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের যে সকল স্থান জলে প্লাবিত হইয়া যায়, সেই সকল স্থানে যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে, ঐ সকল স্থানের মাঠের মধ্যে অনেক জলাশয় খনিত থাকে। ফাল্গুন চৈত্র বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন কোথায়ও জল থাকে না,—দারুণ উত্তাপে মাঠ খাঁ খাঁ করিতে থাকে, তখন লোক ঐ সকল জলাশয় হইতে তৃষ্ণার উপশান্তি করিবার জন্ত জল লইয়া আইসে। তখন উহাই তাহাদের জলের প্রয়োজন নিবারণের একমাত্র উপায়। উহা তাহাদিগের পক্ষে পরিহার করিবার উপায় নাই। কিন্তু শ্রাবণ ভাদ্র মাসে যখন সমস্ত মাঠ বন্যার জলে ভরিয়া যায়, লোকের অঙ্গনে আসিয়া লোক জল পায়, তখন আর তাহাদিগকে সেই জলাশয়ে জল আনিতে যাইতে হয় না। জল তাহার গৃহদ্বারেই আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইরূপ মানুষ যখন ব্রহ্মজ্ঞানহীন থাকে, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এ জ্ঞান তাহার না থাকে, অবিদ্যার প্রখর তাপে তাহার চিত্ত তখন মরুতুল্য শুষ্ক হইয়া প্রতপ্ত মাঠের মত হইয়া পড়ে। তখন তাহার চিত্তে ভগবদ্ভাব জাগাইয়া তুলিবার জন্ত এই চিত্তরূপ শুষ্ক প্রান্তরমধ্যে কৃত্রিম জলাশয় খননের মত আড়ম্বরবহুল মূর্ত্তিপূজা, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। সেই জন্ত সাধকের হিতের উদ্দেশে মূর্ত্তিপূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তখন সেই বহির্ম্মুখ চিত্তে ভক্তিশ্রদ্ধা ও পবিত্র ভাব ধরিয়া রাখিবার জন্ত দেবায়তন, দেববিগ্রহ প্রভৃতি সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়া থাকে। উহাতে যাহাতে অপবিত্র ভাব প্রবেশ করিতে না পারে, তাহারও ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আবার শৌচের এবং পবিত্রতার মাপকাঠি যত দূর হইতে পারে, তত দূরই উহাকে শুদ্ধ, পবিত্র এবং শুচি রাখিতে হইবে। সেইরূপ ভাবে উহা না রাখিলে উহা তোমার হৃদয়ে প্রকৃত শ্রদ্ধাভাব ও পবিত্র ভাব জাগাইয়া তুলিতে পারিবে না। প্রান্তরস্থ পম্বলে বা পুষ্করিণীতে যদি মলমূত্র ও আবর্জ্জনা নিক্ষেপ না কর, যদি উহা নির্ম্মল রাখ, তাহা হইলেই উহা তোমার উপকারে আসিবে; অন্যথা উহা তোমার প্রাণ-হানিকর ও পীড়ার কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং, উহার নির্ম্মলতা-রক্ষাই উহার প্রথম প্রয়োজন। সে নির্ম্মলতাও আবার বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মাপকাঠির বা Standardএর অনুরূপ হওয়া চাই। সেই জন্ত দেবমন্দির এবং দেববিগ্রহের শৌচ, পবিত্রতা এবং বিশুদ্ধিরক্ষা একান্ত আবশ্যক। সেই শৌচ, পবিত্রতা ও নির্ম্মলতা আবার বিজ্ঞানের অর্থাৎ আন্তরিক বিশ্বাসের অনুরূপ হওয়া চাই। নতুবা উহা আমাকে আমার আধ্যাত্মিক পথে প্রগতি দিতে পারিবে না,—অর্থাৎ সোজা কথায় উহাতে দেবসান্নিধি ঘটিবে না, দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে না। এই প্রাণ-প্রতিষ্ঠাই মূর্ত্তিপূজার সর্ব্বস্ব।

সেই জন্ত যিনি দেবার্চ্চনা করেন, তাঁহার যত দূর সম্ভব, শুচি, পবিত্র এবং ভক্তিমান হইয়া তবে দেবতার পূজা করিতে হয়। সেই জন্ত শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

"না দেবো পূজয়েদ্দেবং দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ।"

অর্থাৎ দেবতা না হইয়া দেবতার পূজা করিতে নাই। পূজক বা পূজারি আপনাকে দেবময় করিয়া তবে দেবপূজায় কৃতী হইবেন। এ কথার আধ্যাত্মিক সার্থকতা আছে। এ কথা অনধিকারীকে অর্থাৎ যাঁহাদের সে জ্ঞান নাই, সেইরূপ ব্যক্তিকে বুঝান যায় না। আসল কথা, ভূতশুদ্ধির ব্যাপারটা বুঝা অত্যন্ত কঠিন। উপযুক্ত গুরু ব্যতীত অন্তে উহা শিষ্যকে বুঝাইয়া দিতে পারে না। গুরুর যেমন বুঝাইবার মত বিদ্যা থাকা চাই, শিষ্যের তেমনই বুঝিবার মত শক্তি থাকা আবশ্যক। যে ব্যক্তি যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি জানে না, তাহাকে Inferential calculus বুঝাইবার চেষ্টা করিতে গেলে সে কি তাহা বুঝিবে? আর আমার যদি সামান্ত Binomial theoremএর অঙ্ক কষিলে মূর্চ্ছা যাইতে হয়, তাহা হইলে আমি কি Inferential calculus শিখাইতে সমর্থ হইব? কখনই না। ভূতশুদ্ধি ব্যাপারে আধ্যাত্মিক দেহতত্ত্বের অনেক কথা আছে। উহা বুঝান কঠিন। তবে সহজবুদ্ধিতে অন্য দিক দিয়া উহা যে একবারে বুঝা যায় না, তাহা নহে। একটু চিন্তা করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলে তাহা অনেকটা বুঝা যায়।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চিত্তশুদ্ধিই কর্ম্মের লক্ষ্য। অর্থাৎ চিত্তকে শুদ্ধ ও নির্ম্মল করিবার উদ্দেশ্যেই কর্ম্ম করিতে হয়;—পূজা, যাগ-যজ্ঞ, দান, নাম-সঙ্কীর্ত্তন, শ্রাদ্ধাদি পৈতৃক কার্য্য অর্থাৎ আধ্যাত্মিক কর্ম্ম। আমরা যে পূজার্চ্চনা প্রভৃতি করি, তাহার প্রধান লক্ষ্যই চিত্তশুদ্ধি; দেবতার ও ভগবানের প্রীতিসাধন নহে। তবে দৃঢ় ভক্তি, ঐকান্তিক শ্রদ্ধা এবং অকপট বিশ্বাস সহকারে দেবতার পূজা এবং অর্চ্চনা করিলে চিত্ত শুদ্ধ হইলেই আমরা মনে করি, দেবতা আমার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন। সেই হেতু সাধুগণ বলিয়া থাকেন যে, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি প্রভৃতি দ্বারা দেবতা প্রসন্ন হইয়া থাকেন। এক হিসাবে এ কথা মিথ্যা বলা যায় না। এই অচলা ভক্তি এবং অকপট বিশ্বাসের প্রভাব এতই অধিক যে, উহার ফলে মনের বল অতিশয় বৃদ্ধি পায় এবং তাহার প্রভাব দেহের এবং জীবনীশক্তির উপর আসিয়া পড়ে। উহার ফলে অনেক উৎকট এবং দুশ্চিকিৎস্য রোগ আরোগ্য হইয়াছে, দেখা গিয়াছে। তারকেশ্বরে হত্যা দিয়া অনেক লোক দুশ্চিকিৎস্য রোগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াছেন, এ কথা বোধ হয়

অনেকেই শুনিয়াছেন, কেহ কেহ প্রত্যক্ষও করিয়াছেন। ইহা বিশ্বাসজনিত দৃঢ় মনের বলের ফল, সুতরাং সেই হিসাবে দেবতার অনুগ্রহ ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এখানে বলা আবশ্যক যে,মানুষ যত কিছু শুভ ফল ভোগ করিয়া থাকে,তাহাই দেবতার অনুগ্রহ বা কৃপা বলিয়াই বিবেচিত। দৃঢ়বিশ্বাসের ফলে যে রোগ আরোগ্য হয়, তাহা জড়বাদী য়ুরোপীয়রাও স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা উহাকে Faith cure বলিয়া থাকেন। য়ুরোপীয়রাও তাহার অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন। এ স্থলে তাঁহাদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমি এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না।

আমাদের প্রধান কথা এই যে, দেবতার অচলা ভক্তি, পূজা, অর্চনা প্রভৃতি পদ্ধতি, অকপট বিশ্বাস যখন মানুষের মানসিক উন্নতিসাধনে বিশেষ সহায়তা করে, তখন উহা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, তাহা করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বিশেষ দেবপূজা প্রভৃতিতে পবিত্র বুদ্ধি যাহাতে লোপ না পায়, দেবপ্রসাদ লাভ করিতে হইলে মনের পবিত্রভাব যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার দিকে মানব-সমাজের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সেই জন্য পুরোহিত ভূতশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, আচমন প্রভৃতি করিয়া আপনাকে দেবতা জ্ঞান করিয়া তবে পূজায় বসিয়া থাকেন। আপনাকে এইভাবে দেবতাজ্ঞান সকলে করিতে পারে না। অনেকে মনে করেন, ব্রাহ্মণমাত্রই দেবতাস্পর্শ করিতে পারেন। এ ধারণা ভুল। যিনি পূজক, তিনিও পূজায় বসিয়া আসনশুদ্ধি, অঙ্গশুদ্ধি, অঙ্গন্যাস, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি না করিয়া দেববিগ্রহ স্পর্শ করেন না। অন্য সময়ে, অশুচি অবস্থায় তিনিও দেব-মূর্ত্তি স্পর্শ করিতে পারেন না। যদি বিশেষ প্রয়োজনে দেববিগ্রহের অঙ্গ-স্পর্শ করিতে হয়, তাহা হইলে বিগ্রহের অভিষেকাদি কর্ত্তব্য। কারণ, শৌচের দিকে লক্ষ্য রাখাই এই বিষয়ে একান্ত আবশ্যক। তাহা না করিলে চিরন্তন সংস্কারবশেই দেবতা সম্বন্ধে জনসাধারণের যে পবিত্র ভাব আছে, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবেই যাইবে। ফলে দেবপূজা পুতুল-পূজায় পরিণত হইবে।

অশুচি অবস্থায় কোন উচ্চজাতি অথবা শুচি অবস্থাতেও যদি কোন অশুচি বলিয়া বিবেচিত জাতি দেবতার অঙ্গস্পর্শ করেন, দেবমন্দিরে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে বহুকাল হইতে পোষিত লোকের শৌচের উপর বিশেষ শ্রদ্ধাবুদ্ধি থাকিবে না। তাহার মন হইতে পবিত্র ভাব চলিয়া যাইবে। আজ যদি কোন দেব-বিগ্রহ মেথর, মুদ্দাফরাস বা মুচি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নমঃশূদ্র, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতিরও সেই দেববিগ্রহের উপর ভক্তি ও পবিত্র ভাব থাকিতে পারে কি? তাহা কখনই থাকিবে না। আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেই এই কথা বলিতেছি। মানুষের বহুকাল ধরিয়া অর্জ্জিত সংস্কার সহজে লোপ পায় না। এরূপ অবস্থায় দেবমন্দিরে অস্পৃশ্য জাতি প্রবিষ্ট করাইয়া উহার পবিত্রতানাশ করিলে লাভ কি হইবে? পবিত্র ভাব উদ্রিক্ত করিবার জন্য যে পূজার্চ্চনার ব্যবস্থা মনীষিগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে যদি পবিত্র ভাবই চলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতে থাকে কি? দেবতার আসন যে ঐ পবিত্র ভাবের উপর। অতএব ঐ ভাবে দেবমন্দির নষ্ট করা বিধেয় নহে উহা অত্যন্ত গর্হিত। আমরা অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে শুনিতে পাইয়াছি যে, তাঁহাদের অজ্ঞাতে পূজায় অশুচির ঘটাতে তাহার ফল অত্যন্ত মন্দ হইয়াছে। সংস্কারপন্থীরা বলিবেন যে উহা গোঁড়ামির কথা; কিন্তু কোন্ পক্ষের গোঁড়ামী অধিক, তাহা অনেক সময় বুঝা কঠিন। বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আমরা জ্ঞানহীন বলিয়া আমাদের অনেক ব্যাপার গোঁড়ামি বলিয়াই মনে হইতে পারে। কিন্তু যদি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইলে আর তাহা গোঁড়ামি বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ শৌচ, সদাচার, সাত্ত্বিক আহার প্রভৃতির দ্বারা যদি চিত্তের সংশোধন করা যায়, তাহা হইলে সেই চিত্ত অন্তর্ম্মুখীন করা যায়। অন্তর্ম্মুখীন চিত্তেই আধ্যাত্মিক ভাব প্রতিবিম্বিত হয়। সেই হেতু বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—

"আত্মভাবনয়া সাধো নিত্যমন্তর্ম্মুখং স্থিতম্।
বজ্রধারাপি তে রাম পতিতা যাতি কুণ্ঠতাম্॥"

হে সাধুবুদ্ধিসম্পন্ন রামচন্দ্র! যদি তুমি আত্মভাবনাতে রত হইয়া সর্ব্বদা অন্তর্ম্মুখচিত্তে অবস্থান কর, তাহা হইলে তোমার উপর যদি বজ্রাঘাত হয়, তাহা হইলে সেই বজ্রও ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ইহার অর্থ—চিত্ত যখন অন্তর্ম্মুখ হয়, আত্মভাবনায় বা অধিক চিন্তায় রত হয়, তখন তাহাকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারে না। সেই ব্যক্তিই আপনার ভিতর দিয়া দেবতার সন্ধান করিতে পারে।

উহা করিতে হইলে যে যে পদ্ধতির ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, তাহাতে ব্যাঘাত ঘটান কোনমতেই সঙ্গত নহে। অতএব চিত্তের নির্ম্মলতা-সাধনের জন্য সাধনার প্রাথমিক অবস্থায় শৌচাশৌচ স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার করা আবশ্যক। যাহাদের চিত্ত নিতান্ত বহির্ম্মুখ, যাহারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষসাধনের প্রতিকূল আচারপরায়ণ, তাহাদিগকে দেবমন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া সঙ্গত নহে। তাহাতে তাহাদের ক্ষতি, সমাজের ক্ষতি। কারণ, তাহাদেরও দেবমন্দির এবং দেববিগ্রহের উপর শ্রদ্ধা-বুদ্ধি হ্রাস পাইবে, অন্যেরও সদাচার প্রভৃতির উপর শ্রদ্ধাহানি ঘটিবে। সেই জন্য আমাদের মনে হয় যে, অগ্রে অস্পৃশ্য জাতিদিগকে সদাচারসম্পন্ন, শৌচাচারবিশিষ্ট এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্মে আস্থাবান্ করিয়া পরে তাহাদিগকে দেবমন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রদান করাই সঙ্গত। সদাচার এবং আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব অত্যন্ত অধিক। যে জাতি বা সম্প্রদায় সদাচারী, ভক্তিমান এবং ধার্ম্মিক, দেবমন্দিরে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিতে কোন অসুবিধাই ঘটিতে পারে না। অনেক জাতি এই ভাবে উন্নীত হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সেই জন্য আমাদের মনে হয়, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত কল্যাণকামী, তাঁহাদের দেবমন্দিরে অস্পৃশ্য জাতি প্রবিষ্ট করাইয়া তাহাদিগের উন্নতিসাধন করিতে যাইয়া ধর্ম্মনাশ না করিয়া ঐ সকল অস্পৃশ্য জাতিকে ধার্ম্মিক, সত্যবাদী সদাচারী করিয়া উন্নত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন সাহিত্যবিনোদ)

রহস্যের খাসমহল

চতুর্দ্দশ প্রবাহ
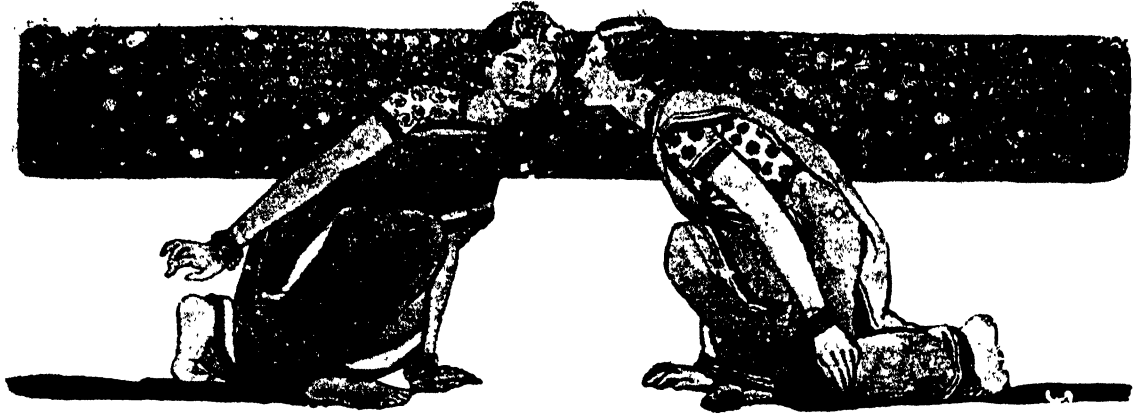
কলম না বোমা ?

জর্জ্জ জিলরয় চর্ম্মমণ্ডিত প্রকাণ্ড আরাম-কেদারায় বসিয়া স্তব্ধভাবে ধূমপান করিতে লাগিল, তাহার পর ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত কুণ্ডলীভূত ধূমরাশির দিকে চিন্তাকুল চিত্তে চাহিয়া আমাকে বলিল, "শুনিলাম, আপনি তাহার বন্ধু; সুতরাং আমার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছে। সে স্ত্রীলোক, কিন্তু স্ত্রীলোকের কলঙ্ক প্রচার করা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে, এবং কোন ভদ্রলোক এরূপ কার্য্যের সমর্থন করিবেন না।"

আমি আগ্রহভরে বলিলাম, "আমি আপনার অসুবিধা বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে আপনার কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই। আমি একটি জটিল রহস্যভেদের চেষ্টা করিতেছি, তাহা যেরূপ বিচিত্র, সেইরূপ লোমহর্ষণ ঘটনাজালে সমাচ্ছন্ন।"

জিলরয় বলিল, "কাহার সম্বন্ধে ও-কথা বলিতেছেন ?"

আমি বলিলাম, "আমাদের উভয়ের বান্ধবীর পিতা কার্ল কুপের সম্বন্ধে।"

জিলরয় একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "তাহার সম্বন্ধে কোন কোন কথা জানিবার চেষ্টা করিতেছেন ?"

আমি।—হাঁ।

জিলরয় গম্ভীর স্বরে বলিল, "ইহাই যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমি আপনাকে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, আপনি অনর্থক সময় নষ্ট করিতেছেন।"

আমি সহজস্বরে বলিলাম, "আপনার এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ কি ?"

জিলরয় বলিল, "আমি স্বয়ং এক বৎসর ধরিয়া এই চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু আমার সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে; রহস্যের কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারি নাই।"

আমি বলিলাম, "কুপ একটি জটিল প্রহেলিকা !"

জিলরয়।—হাঁ, অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য; লোকটি রহস্যের সজীব মূর্ত্তি !

আমি বলিলাম, "তাহার কার্য্যে ও ব্যবহারে সন্দেহের কি কোন কারণ নাই মনে করেন ?"

জিলরয়।—হাঁ, সন্দেহের কারণ যথেষ্ট আছে; কিন্তু পিতা ও পুত্রী উভয়েই সেই সকল কথা এরূপ গোপনে রাখিয়াছে যে, সহস্র চেষ্টাতেও তাহাদের মুখ হইতে তাহা বাহির করিবার উপায় নাই !

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে এ সম্বন্ধে আমাদের উভয়েরই অভিজ্ঞতা সমান। আমার ধারণা, কুপ অতি ভীষণ অপকর্ম্মে অভ্যস্ত উন্মত্ত; কোন কুকর্ম্মেই তাহার কুণ্ঠা নাই, এবং অপরাধ করিয়া তাহা গোপন করিবার শক্তিও তাহার অসাধারণ।"

জিলরয় আমার কথা শুনিয়া কয়েক মিনিট নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। আমার সন্দেহ হইল, সে হয় ত সকল কথা আমার নিকট সরলভাবে প্রকাশ করিতে অসম্মত। আমি কুপ সম্বন্ধে যাহা জানি, সে হয় ত তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক জানে, কিন্তু আমি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম না; আমিও স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলাম।

অবশেষে সে বলিল, "তাহার সম্বন্ধে কি আপনার এইরূপ ধারণা ? কিন্তু আপনার ধারণা যাহাই হউক, তাহার সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত শোচনীয়, এতই ভয়াবহ

যে, সে সকল কথা শুনিলে সহজে কাহারও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।"

আমার নিকট সেই সকল কথা প্রকাশ করিবার জন্য আমি তাহাকে অনুরোধ করিলাম; কিন্তু আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে তাহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ লক্ষিত হইল না। আমি যোয়ানের বন্ধু, এ কথা শুনিয়া যোয়ানের বিরুদ্ধে কোন কথা প্রকাশ করা সে বোধ হয় সঙ্গত মনে করিল না।

আমি তাহাকে নীরব দেখিয়া বলিলাম, "আমি জানি, ইহা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার, কিন্তু আপনি যদি আমার ন্যায় উৎপীড়ন সহ্য করিয়া থাকেন, আপনি যদি আমার মত মৃত্যু-কবল হইতে অতি কষ্টে উদ্ধারলাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার ন্যায় ভুক্তভোগীর নিকট সকল কথা প্রকাশ করিলে কি আপনার কর্ত্তব্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে?"

জিলরয় আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া গম্ভীরভাবে কি চিন্তা করিতে লাগিল, তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার কৌতূহল বর্দ্ধিত হইল। আমি পুনর্ব্বার বলিলাম, "আপনি আর যোয়ানকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করেন না, তাহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছেন, ইহার কারণ জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে, আপনি দয়া করিয়া সকল কথা বলুন।"

জিলরয়ের মুখে বিষাদের হাসি ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু সে কোন কথা বলিল না।

আমি বলিলাম, "আপনি ঐ সকল কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন বটে, কিন্তু লেক্সহাম গার্ডেন্সের বাড়ীওয়ালী আমাকে বলিয়াছিল—"

আমার কথা শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল, এবং আমার কথায় বাধা দিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "আপনি কি সত্যই লেক্সহাম গার্ডন্সে গিয়াছিলেন? সেই বাড়ীতে—"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আমি গিয়াছিলাম।"

জিলরয় বলিল, "তাহা হইলে আপনি কুপের বাসস্থান খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন! আপনি এখন কি করিবেন মনে করিয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "এখন পর্য্যন্ত কিছুই স্থির করি নাই; আপনার উপদেশ লইতে আসিয়াছি।"

জিলরয় বলিল, "উপদেশ আর আপনাকে কি দিব? আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা ত আপনাকে বলিয়াছি। আপনি অতঃপর এই রহস্যভেদের চেষ্টা করিবেন না, ইহাই আমার অনুরোধ। আপনার মঙ্গলের জন্যই এ কথা বলিতেছি। কুপ ভয়ঙ্কর ধূর্ত্ত, আপনি কোন উপায়েই তাহার গুপ্তরহস্য ভেদ করিতে পারিবেন না। সকল পথ সে সুকৌশলে রুদ্ধ করিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু যোয়ান সকল কথাই জানে।"

জিলরয়।—যোয়ানের মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইবে না।

তাহার কথা শুনিয়া আমার সন্দেহ হইল, যোয়ানের মত সে কুপের পক্ষাবলম্বন করিতেছে। আমার দ্বারা কুপের কোন অনিষ্ট না হয়, ইহাই তাহার ইচ্ছা।

আমি তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলাম, "কিন্তু কুপের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল, কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল। তাহার বাড়ীতে গিয়াই তাহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম।"

জিলরয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "তাহার বেজ-ওয়াটারের বাড়ীতে?"

আমি বলিলাম, "না, লেক্সহাম গার্ডেনসে। কিন্তু বেজ-ওয়াটারে তাহার বাড়ী আছে, এ সংবাদ আপনি কিরূপে জানিলেন?"

জিলরয়ের মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম—আমাকে সে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ভুল করিয়াছে এবং তাহা গোপন করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে; এই জন্য সে তাড়াতাড়ি বলিল, "শুনিয়াছিলাম—বেজওয়াটারে তাহার একখান বাড়ী ছিল, কিন্তু সে চারি বৎসর পূর্ব্বের কথা, কথাটা সত্য কি না, তাহা এখন জানিবার উপায় নাই।"

আমি পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "আপনি কি কোন দিন তাহার সেই বাড়ীতে প্রবেশ করেন নাই?"

জিলরয় আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল, আমি পুনর্ব্বার তাহাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম,—তথাপি তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, কুপের গুপ্তরহস্য ভেদ করিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিই, ইহা তাহার ইচ্ছা নহে। কুপকে সাহায্য করাই যেন তাহার অভিপ্রেত।

কিন্তু আমি নিরাশ না হইয়া বলিলাম, "আপনি কিছু-কাল পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিলেন—আপনাকেও ঐ

ব্যাপারের সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল, এবং আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আমার নিকট প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু আপনার কথা শুনিয়া এখন মনে হইতেছে—আপনার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সে সকল কথা আপনি গোপন করিতে উৎসুক!"

জিলরয় আমার কথায় যেন একটু লজ্জিত হইল। সে ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া বলিল, "সকল কথা শুনিবার জন্য যদি সত্যই আপনার আগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনাকে তাহা বলিতে বাধা নাই, কিন্তু আপনার মঙ্গলের জন্যই আমি ঐ সকল কথা গোপন করিতেছিলাম। যাহা হউক, আপনি যখন এতই জিদ্ করিতেছেন, তখন বলিতেছি, শুনুন; কিন্তু আপনি সেই সকল কথা বিশ্বাস করিতে পারিবেন কি না, জানি না; আমিই এ সকল কথা অন্য লোকের নিকট শুনিলে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। মাসের পর মাস ধরিয়া আমি কঠোর পরিশ্রম, এমন কি, কুপের অনুসরণে অর্দ্ধ-য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া যে সকল গুপ্ত-কথা জানিতে পারিয়াছি, তাহা অতীব ভয়াবহ! সত্য কথা বলিতে কি, সেই সকল কথা জানিতে পারায় আমি যোয়ানের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছি; তাহার সহিত কথাও বন্ধ করিয়াছি।"

আমি কুণ্ঠিতভাবে বলিলাম, "তবে কি আপনি যোয়ানের অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ?"

জিলরয় বলিল, "সকল কথা শুনিলেই আপনি তাহা বুঝিতে পারিবেন। আমি যাহা করিয়াছি, তাহা সঙ্গত হইয়াছে কি না, তাহাও নির্ণয় করা আপনার পক্ষে কঠিন হইবে না।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আপনার কথা শুনিবার পূর্ব্বে একটা কথা জানিতে চাই, কার্ল কুপ কি আপনার বন্ধু? আপনার কথা শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছে—আপনি তাহাকে বন্ধু মনে করেন।"

জিলরয় অসঙ্কোচে বলিল, "হাঁ, কুপ আমার বন্ধু।"

আমি ক্ষুব্ধভাবে বলিলাম, "আপনি এ কথা স্বীকার করিতেছেন?"

জিলরয় বলিল, "কেন স্বীকার করিব না? এ কথা অস্বীকার করিবার কারণ আছে কি? কুপ কোন দিন আমার প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হয় নাই, আমি তাহার নিকট সদ্ব্যবহারই পাইয়াছি। তবে তাহার জীবন রহস্যাবৃত, ইহা আমার অজ্ঞাত নহে, তাহাতে আমাদের বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আমার বিশ্বাস, লোকটি কিঞ্চিৎ বাতিকগ্রস্ত বলিয়াই তাহার কার্য্যপ্রণালী রহস্যপূর্ণ।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আপনি বলিতেছিলেন—সে এরূপ চতুর যে, তাহাকে ফাঁদে ফেলিবার উপায় নাই।"

জিলরয় বলিল, "তাহার কার্য্যপ্রণালী এরূপ অদ্ভুত যে, তাহার সম্বন্ধে যতই আলোচনা করিয়াছি, আমার মনের ধাঁধা ততই বাড়িয়া উঠিয়াছে। আমি তাহার সম্বন্ধে কিছুই মীমাংসা করিতে পারি নাই। তাহার সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিরূপ, তাহাই এখন বলি, শুনুন।"

সে দুই তিন মিনিট অবনতমস্তকে কি চিন্তা করিল, তাহার পর মাথা তুলিয়া বলিল, "আমার সেই অভিযান যেমন বিস্ময়াবহ, সেইরূপ রহস্যপূর্ণ। এক বৎসর পূর্ব্বে এক দিন রবিবার সন্ধ্যার পর—তখন রাত্রি প্রায় ৯টা—আমি নদীতীরবর্ত্তী পথ দিয়া যাইতেছিলাম। হাঁ,আমি একটি বন্ধুর সহিত স্যাভয় হোটেলে নৈশ আহার শেষ করিয়া সেই পথে একাকী ফিরিতেছিলাম, বোধ হয়, পলমলের দিকেই যাইতেছিলাম, সেই সময় সেই পথে বিস্তর নর-নারী ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আমি সেই জনতার ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে পথের মধ্যস্থলে একটি সুন্দরী মেয়েকে দাঁড়াইয়া বিহ্বলভাবে কাঁদিতে দেখিলাম।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "সে বেসী মনিক্রিফ্! হাঁ, বেসী।"

জিলরয় প্রশান্তভাবে বলিল, "হাঁ, তাহার নাম উহাই বটে; আপনি তাহাকে জানেন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাকে চিনি; কিন্তু সে কথা থাক, আপনি কি বলিতেছিলেন, বলুন।"

জিলরয় বলিল, "তাহাকে হতাশভাবে কাঁদিতে দেখিয়া আমি সহানুভূতিভরে তাহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, হারাইয়া গিয়াছে, পথ চিনিয়া বাড়ী যাওয়া তাহার অসাধ্য। সে তাহার দিদির সঙ্গে হ্যামষ্টেড্ টিউব' রেলে চেয়ারিং ক্রসে আসিয়াছিল; কিন্তু ভীড়ের মধ্যে পড়িয়া সে তাহার দিদিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। একাকী তাহার বাড়ী ফিরিবার উপায় নাই! সে জানিত, গোল্ডার্‌স্ গ্রীণে তাহাদের বাড়ী, কিন্তু যে পথে তাহাদের

বাড়ী, সেই পথের নাম সে ভুলিয়া গিয়াছিল। কারণ, সেই বাড়ীতে তাহারা অন্য পল্লী হইতে অল্পদিন পূর্ব্বে উঠিয়া আসিয়াছিল। মেয়েটির অবস্থা দেখিয়া আমার দয়া হইল, আমি তাহাকে লইয়া 'টিউব' রেলে গোল্‌ডার্স গ্রীণ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। সে কয়েকটি গলি পার হইয়া একটা নূতন পথের শেষ সীমায় আসিল এবং একখানি বাড়ী দেখাইয়া বলিল, উহা তাহাদেরই বাড়ী।"

আমি বলিলাম, "তাহার পরিচ্ছদ দেখিয়া আপনার ধারণা হইয়াছিল, সে কোথাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল ?"

জিলরয় বলিল, "'না, তাহার পরিচ্ছদের আড়ম্বর ছিল না।—যাহা হউক, আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের সদর-দরজায় সাড়া দিলাম। মুহূর্ত্ত পরে একটি তরুণী দ্বার খুলিয়া দিল। পরে জানিতে পারি, তাহার নাম যোয়ান। মেয়েটিকে ফিরিতে দেখিয়া সে যেন আনন্দে আত্মহারা হইল; আমি তাহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছি শুনিয়া যোয়ান আমাকে বিস্তর ধন্যবাদ করিল; তাহার পর আমাকে ঘরের ভিতর আহ্বান করিল। ও রকম সুন্দরী যুবতীর সহিত আলাপ করিতে কাহার অনিচ্ছা হয় ? আমি সেই লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া তাহাদের সুসজ্জিত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলাম। যোয়ান আমাকে একখানি চেয়ারে বসিতে অনুরোধ করিয়া, মেয়েটি কিরূপে হারাইয়াছিল, তাহাই বলিতে লাগিল; তাহাকে হারাইয়া তাহার মনে কিরূপ দুশ্চিন্তা ও ভয় হইয়াছিল, তাহাও আমাকে বুঝাইয়া দিল। তাহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, আধঘণ্টা পূর্ব্বে সে একাকী বাড়ী ফিরিয়া যেসীর জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল।

"তখন রাত্রি প্রায় দশটা। কিন্তু যোয়ানের সহিত নানা কথায় আলোচনা করিতে করিতে রাত্রি ক্রমশঃ অধিক হইতেছিল, তাহা স্মরণ হইল না। যেসী টুপি ও কোট খুলিয়া রাখিয়া অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিয়া রহিল। যোয়ানের গল্প শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম; আমার আর উঠিতে ইচ্ছা হইল না। সে বলিল, বাড়ীতে তাহাকে একা থাকিতে হইয়াছে, সে দিন রবিবার বলিয়া তাহাদের দুই জন পরিচারিকা ছুটী পাইয়াছিল। যোয়ান নিশ্চিন্ত-মনে গান করিতে লাগিল, তাহা শুনিতে শুনিতে রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিল; তখনও সেখান হইতে আমার উঠিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু আর অধিক বিলম্ব করা অনুচিত মনে হওয়ায় আমি উঠিলাম। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কে এক জন লোক বাহিরের দরজা খুলিল, সেই শব্দ শুনিয়া যোয়ান লাফাইয়া উঠিল, তাহার মুখ শুকাইল, সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল! সে আমাকে সেই কক্ষে স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে অনুরোধ করিয়া তাড়াতাড়ি সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। তাহার পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ হইল।

আমি সেই কক্ষে একাকী বসিয়া রহিলাম; যেসী প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্ব্বেই শয়ন করিতে গিয়াছিল। আমার মন অশান্তিপূর্ণ হইল, ভাবিলাম, আমি এই পরিবারের সম্পূর্ণ অপরিচিত যুবক, রাত্রি ১১টার সময় সেখানে বসিয়া একটি সুন্দরী যুবতীর সহিত গল্প করিতেছিলাম, এ কথা প্রকাশ হইলে আমাকে বিষম লজ্জায় পড়িতে হইবে; কোন অপ্রীতিকর ব্যাপারও ঘটিতে পারে। বিশেষতঃ যোয়ান আমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিল, তাহার পিতা সন্দিগ্ধ-চিত্ত বদ্‌রাগী লোক!—আমি উদ্বেগভরে কাণ পাতিয়া শুনিতে পাইলাম—কিছু দূরে মৃদুস্বরে যে সকল কথা হইতেছিল, তাহাতে কি যেন ষড়্‌যন্ত্রের আভাস ছিল; কিন্তু কোন কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না। আমার মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য দুঃসহ হইয়া উঠিল। মনে হইল, অবিলম্বে কি একটা বিভ্রাট ঘটিবে।

স্মরণ হইল, আমাকে অবিলম্বে চেয়ারিং ক্রশে গিয়া ট্রেণ ধরিতে হইবে। আমি নিঃশব্দে সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া ধীরে ধীরে বারান্দায় প্রবেশ করিলাম; সেই বারান্দার অন্য প্রান্তে দৃষ্টিপাত করিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, আগন্তুক যোয়ানের পিতা নহে—যোয়ান সেখানে দাঁড়াইয়া যাহার সহিত আলাপ করিতেছিল, সে কুড়ি একুশ বৎসর বয়সের যুবক; দীর্ঘকায়, কৃশ, সুবেশ-ধারী! কে এই যুবক ?—আমি তাহাদের পরামর্শ শুনিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তাহারা এরূপ মৃদুস্বরে আলাপ করিতেছিল যে, তাহাদের কোন কথা বুঝিতে পারিলাম না। আমার মন নানা সন্দেহে পূর্ণ হইল। আমি যোয়ানের পিতাকে দেখিবার আশা করিয়াছিলাম, তাহার পরিবর্ত্তে যাহাকে দেখিলাম, সে কি যোয়ানের প্রণয়ী ?—সে আমাকে সেখানে দেখিতে পাইলে কি অনর্থ

ভাবিয়াই যোয়ান আতঙ্কে অধীর হইয়াছিল। মনে হইল, সে সেই যুবককে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছিল। যোয়ান অত্যন্ত উত্তেজিত হইলেও তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদু। কিন্তু সে যে ভাষায় আলাপ করিতেছিল, তাহা বিজাতীয় ভাষা বলিয়াই আমার ধারণা হইল। মনে হইল, তাহা জার্ম্মাণ ভাষা!"

আমি বলিলাম, "আপনার অনুমান অসঙ্গত নহে, যোয়ান জার্ম্মাণ ভাষায় অনর্গল কথা বলিতে পারে।"

জিলরয় বলিল, "যোয়ানের ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল, সে তাহার প্রণয়ীকে মিনতির সহিত কি অনুরোধ করিতেছিল, কিন্তু সেই যুবক তাহাকে ধাক্কা দিয়া দূরে সরাইয়া দিল। যোয়ান তাহাতে অপমান বোধ না করিয়া সরিয়া আসিয়া ব্যগ্রভাবে তাহার হাত ধরিল, যেন কোনও নিষ্ঠুর কার্য্যে তাহাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিল। সেই সময় যুবক হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে দেখিতে পাইল। সে তৎক্ষণাৎ সবেগে আমার সম্মুখে আসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে আমার সেখানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি ধীরভাবে সত্য কথা বলিলে সে আমাকে মিথ্যাবাদী বলিল, এবং কদর্য্য ভাষায় আমাকে গালি দিতে লাগিল। সে আমার সত্যকথা বিশ্বাস করিল না!

"যোয়ান আমার উক্তির সমর্থন করিয়া তাহাকে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু যুবক তখন ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায়, তাহার মনে ঈর্ষ্যানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সে আমাকে গালি দিতে দিতে ভোজনের কক্ষে প্রবেশ করিল। যোয়ানও তাহার অনুসরণ করিল। তাহারা সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিলে আমি বৈঠকখানায় পুনঃপ্রবেশ করিলাম। তখন হঠাৎ চলিয়া যাওয়া সঙ্গত মনে না হওয়ায় আমি সেই কক্ষের দ্রব্যসামগ্রীগুলি দেখিতে লাগিলাম। অবশেষে ভোজন-কক্ষের রুদ্ধদ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রণয়ি-যুগলের প্রেমালাপ (?) শুনিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সেই কক্ষে কাহারও সাড়া পাইলাম না। একবার মনে হইল, সেই যুবক যন্ত্রণাসূচক আর্ত্তনাদ করিল; তাহার পর সেই কক্ষে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল!

"সেই কক্ষের আকস্মিক নিস্তব্ধতায় আমি বিস্মিত হইলাম। সেই কক্ষে যদি যোয়ান ও তাহার সঙ্গী তখন পর্য্যন্ত মৃদুস্বরে পরামর্শ করিত, তাহা হইলে আমি তাহা বুঝিতে না পারিলেও শুনিতে পাইতাম; কিন্তু কক্ষটি তখন সম্পূর্ণ নির্জ্জন বলিয়াই আমার মনে হইল। আমি রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া 'মিস্ যোয়ান' 'মিস্ যেসী'কে দশবারো বার ডাকিলাম; কিন্তু তাহাদের সাড়া পাইলাম না।

"আমি সেই কক্ষের পাশ দিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলাম, সেই দিকে পাকশালা। পাকশালা অন্ধকারাচ্ছন্ন। সে দিকেও জন-মানবের সাড়া না পাইয়া আমি ভোজনকক্ষে প্রবেশের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দ্বার খুলিতে পারিলাম না, তাহা ভিতর হইতে রুদ্ধ; দ্বারে ধাক্কা দিয়াও কোন ফল হইল না, তখন সেই দ্বারে কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল—কেহ সেই কক্ষে পড়িয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিতেছিল। কিন্তু পরে তাহা বাতায়নের ছিদ্রপথে নৈশবায়ু-প্রবেশের শব্দ বলিয়াই আমার ধারণা হইল। গৃহবাসীরা সকলেই তখন অদৃশ্য হইয়াছিল; কিন্তু আমাকে এ ভাবে একা ফেলিয়া তাহাদের পলায়নের কারণ বুঝিতে পারিলাম না। সেই অপরিচিত পল্লীর অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জ্জন গৃহের বায়ুস্তর আমার অসহ্য মনে হইল। সেই প্রণয়ি-যুগলের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের রহস্য ভেদ করা আমার অসাধ্য হইল। আমি যোয়ানের অনুরোধেই সেই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলাম; আমি তাহাদের উপকার ভিন্ন অপকার করি নাই, তবে আমার প্রতি ঐরূপ অশিষ্ট ব্যবহারের কারণ কি?"

জিলরয় এই পর্য্যন্ত বলিয়া দুই তিন মিনিট স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল; তাহার পর সে পুনর্ব্বার তাহার আত্মকাহিনী বলিতে লাগিল।

"হঠাৎ আমার মনে একটি নূতন সন্দেহের উদয় হইল। যখন সেই যুবকটি সেই বাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন আমার সন্দেহ হইয়াছিল, অন্য কোন লোক তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু আমি অন্য কাহাকেও সেখানে দেখিতে পাই নাই। আমি সেই কক্ষে প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলাম; সেই সময় সেই কক্ষের এক কোণে একটি ক্ষুদ্র টেবলের উপর কতকগুলি চিঠির কাগজ ও লেফাপা দেখিতে পাইলাম। তাহা দেখিয়া যোয়ানকে একখানি পত্র লিখিয়া গোপনে রাখিয়া যাইবার জন্য আমার আগ্রহ হইল। তাহাকে কি লিখিব, মনে মনে তাহা চিন্তা করিয়া সেই টেবলের কাছে বসিয়া পড়িলাম। সেখানে দোয়াত-কলমের পরিবর্ত্তে 'ট্রের' উপর একটি

'ফাউণ্টেন পেন্' দেখিতে পাইলাম। আমি সেই কলমটি হাতে লইয়া কি ভাবে পত্রখানি লিখিতে আরম্ভ করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

"দুই এক মিনিট পরে একখানি চিঠির কাগজ টানিয়া লইয়া পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলাম। আমি সেই কাগজে 'ফাউণ্টেন পেনের' নিব্‌টি স্পর্শ করিবামাত্র কলমটির ডগা হইতে লালবর্ণ একটা আলোক-শিখা বিদ্যুদ্বেগে বাহির হইয়া আমার ওষ্ঠ স্পর্শ করিল! সঙ্গে সঙ্গে বোমা ফাটিবার মত এমন একটা গম্ভীর শব্দ হইল যে, মনে হইল, সেই ঘরের ছাদ যেন আমার মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল! সেই শব্দে বাড়ীর বনিয়াদ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। আমিও মুহূর্ত্তমধ্যে চেতনা হারাইয়া সেই টেবলের পাশে লুটাইয়া পড়িলাম; বোমা ফাটায় আসবাব-পত্র প্রভৃতি চূর্ণ হইয়া সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; আমার অচেতন দেহ সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে পড়িয়া রহিল!"

পঞ্চদশ প্রবাহ

বার্লোর কাহিনী

জিলরয়ের কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিতভাবে ক্ষণকাল বসিয়া রহিলাম। কলমের ভিতর বোমা? সেই বোমা ফাটিয়া বাড়ী-ঘর পর্য্যন্ত ভূমিসাৎ হইবার উপক্রম! রহস্যটা যে ক্রমশঃ অত্যন্ত উৎকট ও সাংঘাতিক হইয়া উঠিতেছে! এ সকল কি ব্যাপার, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। জিলরয়ের মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিলাম, "অদ্ভুত বটে! আপনি কলমের বোমা ফাটিয়া অজ্ঞান হইলেন, কিন্তু সেই কলমটি সেখানে কি উদ্দেশ্যে রাখা হইয়াছিল, তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছিলেন; আপনার জীবন বিপন্ন করা ভিন্ন উহা সেখানে রাখিবার অন্য কি কারণ থাকিতে পারে?"

জিলরয় বলিল, "আমার বিশ্বাস, আমার জীবন বিপন্ন করিবার জন্যই সেই কলমটি সেই স্থানে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কলমটির ভিতর কোন্ দ্রব্য ছিল, তাহা আমার অজ্ঞাত; কিন্তু সেই দ্রব্য যে অতি ভীষণ বিস্ফোরক, এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। সেই বোমা ফাটিয়া আমার কি অনিষ্ট করিয়াছিল, তাহা আমার হাতের দিকে চাহিলেই আপনি জানিতে পারিবেন।"

জিলরয় তাহার ডান হাতখানি আমার সম্মুখে তুলিয়া ধরিলে দেখিলাম, তাহার হাতের মধ্যম অঙ্গুলীর চিহ্নমাত্র নাই, বোমার আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া উড়িয়া গিয়াছিল।

আমি সভয়ে বলিলাম, "কি সর্ব্বনাশ! আপনার একটি আঙ্গুলের উপর দিয়া গিয়াছে, ইহাই আপনার সৌভাগ্যের বিষয়। আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত যাইতে পারিত! যাহা হউক, আপনি অজ্ঞান হইবার পর কি ঘটিয়াছিল, বলুন।"

আমার ধারণা ছিল, কুপের ষড়্‌যন্ত্রেই জিলরয় এই ভাবে বিপন্ন হইয়াছিল।

জিলরয় বলিল, "আমার চেতনা বিলুপ্ত হইবার পর কি হইয়াছিল, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। আমার এই-মাত্র স্মরণ আছে, রবিবার রাত্রিতে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। বুধবার অপরাহ্নে আমার মস্তিষ্কের অবস্থা প্রকৃতিস্থ হইলে সকল কথা একে একে আমার স্মরণ হইল। আমি সেই সুদীর্ঘকাল পরে চেতনা লাভ করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, এবং জানিতে পারিলাম, আমি সেণ্ট অ্যালবান্‌সের দুই মাইল দূরবর্ত্তী একটি খোলা মাঠে চিৎ হইয়া পড়িয়া ছিলাম; ভিজা জমীর জল উঠিয়া আমার সর্ব্বশরীর ভিজিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কে আমাকে সেখানে ফেলিয়া গিয়াছিল, তাহা জানিতে পারিলাম না। আমার অনুমান হইল, আমাকে মৃত মনে করিয়া কেহ ট্যাক্সিতে বা মোটর-কারে তুলিয়া আনিয়া সেই স্থানে ফেলিয়া গিয়াছিল। হাঁ, আমি একটি বেড়ার আড়ালে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম; এই জন্যই বোধ হয় কেহ আমাকে দেখিতে পায় নাই। কেহ আমার চেতনা-সম্পাদনের চেষ্টা না করিলেও অবশেষে মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছিল।"

আমি বলিলাম, "আমার অবস্থাও ঠিক ঐরূপ হইয়াছিল। তবে আমাকে মাঠে না ফেলিয়া নদীর বাঁধের উপর ফেলিয়া গিয়াছিল। সে সকল কথা থাক, তাহার পর কি হইল, বলুন।"

জিলরয় বলিল, "আমি অতি কষ্টে উঠিয়া কোন প্রকারে সেণ্ট অ্যালবান্‌সে উপস্থিত হইলাম। সেখানে এক জন ডাক্তার আমার ক্ষত ধুইয়া হাতে পটি বাঁধিয়া দিলেন। আহারের পর আমার শরীর একটু সবল হইলে গোল্ডার্স গ্রীণের সেই বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলাম। ইচ্ছা হইল—আমার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিবার কারণ

কি—এ কথা যোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিব। আমি যখন গোল্ডার্স গ্রীণে উপস্থিত হইলাম—তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল, কিন্তু সেই বাড়ীখানি খুঁজিয়া বাহির করিতে আমার তেমন কষ্ট বা অসুবিধা হইল না। আমি সেই অট্টালিকার দ্বারে উপস্থিত হইয়াই বুঝিতে পারিলাম, বাড়ীতে জনপ্রাণীও নাই, গৃহবাসীরা বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে! তথাপি আমি রুদ্ধদ্বারে পুনঃ পুনঃ ধাক্কা দিতে লাগিলাম। কাহারও সাড়াশব্দ না পাইয়া পথের দিকে চাহিলাম, পথটি তেমন প্রশস্ত নহে, তাহার উপর সেই পথে আলোকেরও সুব্যবস্থা ছিল না। দূরে দূরে দুই একটি আলো জ্বলিতেছিল, তাহাতে পথের অন্ধকার অপসারিত হয় নাই। সেই বাড়ীর ঠিক সম্মুখে পথের অন্যধারে বাড়ী ছিল না। সেই বাড়ীর পাশে একখানি বাড়ী ছিল বটে, কিন্তু তাহাও কিছু দূরে, একটি বাগানের ভিতর অবস্থিত। পরিত্যক্ত অট্টালিকা রহস্যান্ধকারে সমাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইল; চতুর্দ্দিক্ নির্জ্জন, অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া আমার গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। অতঃপর কি করিব, হঠাৎ তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।"

আমি বলিলাম, "আপনি যে অল্প চেষ্টাতেই সেই অট্টালিকা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা মন্দের ভাল বলিতে হইবে।"

জিলরয় বলিল, "হাঁ, আমার সেই চেষ্টা সফল হইয়াছিল। যাহা হউক, আমি সেখানে দীর্ঘকাল দাঁড়াইয়া থাকা সঙ্গত মনে করিলাম না। আমি সেই অট্টালিকার পশ্চাতে উপস্থিত হইয়া একটি বাতায়ন পরীক্ষা করিলাম! দেখিলাম, বাতায়নটি অর্গলরুদ্ধ নহে, কিন্তু অন্ধকারে সেই পথে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে আমার সাহস হইল না। আমি পথে আসিয়া দোকানের সন্ধান করিতে করিতে কিছু দূরে পথের ধারেই একখানি দোকান দেখিতে পাইলাম। সেই দোকান হইতে একটি আঁধারে লণ্ঠন অল্পদামে কিনিয়া লইলাম। লণ্ঠনটা জ্বালিয়া লইয়া সেই অট্টালিকায় প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হইলাম। মনে করিলাম—লণ্ঠনটা আমার হাতে থাকিলে কেহ কোন দিক্ হইতে হঠাৎ আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে সাহস করিবে না।"

আমি তাহার কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিলাম, "কি আশ্চর্য্য, আপনি অসুস্থ দেহে সেই রাত্রিতেই একাকী ঐ রকম বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস করিলেন?—অত্যন্ত দুঃসাহসের কায করিয়াছিলেন!"

জিলরয় বলিল, "হাঁ, দুঃসাহসের কায হইলেও আমি সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। আমার হাতে পটি বাঁধা থাকায় ডান হাতখানি কাযে লাগাইবার উপায় ছিল না; কিন্তু এই অসুবিধাতেও আমি দমিলাম না। জানালা খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জানালাটি ভিতর হইতে বন্ধ করিলাম। তাহার পর জানালার পর্দা ঠেলিয়া ঘরের ভিতর কিছু দূর অগ্রসর হইয়া লণ্ঠন জ্বালিলাম। লণ্ঠনের আলোকে দেখিতে পাইলাম, যে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা ভোজনাগার। যোয়ান তাহার প্রণয়ীর সহিত এই কক্ষেই প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল। তাহা কয়েক দিন পূর্ব্বের—রবিবার রাত্রির ঘটনা হইলেও দেখিলাম, টেবলের উপর হইতে আচ্ছাদন বস্ত্রখানি অপসারিত হয় নাই, এমন কি, তাহার উপর যে সকল খাদ্যসামগ্রী রাখা হইয়াছিল—তাহাও অভুক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম; এই কয়েক দিনের মধ্যেও কেহ তাহা স্পর্শ করে নাই! আমি লণ্ঠনের আলোকে সেই কক্ষের সকল অংশ পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। টেবলের অদূরে মেঝের উপর লণ্ঠনের আলো পড়িবামাত্র এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম, ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইল। কি দেখিলাম, তাহা কি আপনি অনুমান করিতে পারেন?"

জিলরয় আমার মুখের দিকে চাহিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহার বিস্ফারিত নেত্রে আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট দেখিলাম। বুঝিলাম—সে সেই রাত্রির কথা স্মরণ করিয়া বিহ্বল হইয়াছে।

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "না, আপনি সেখানে কি দেখিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য!"

জিলরয় বলিল, "তাহা একটি যুবকের মৃতদেহ! লণ্ঠনের আলোকে মৃত যুবকের মুখের দিকে চাহিয়াই তাহাকে চিনিতে পারিলাম;—সে যোয়ানের সেই প্রণয়ী, যোয়ান যাহার সহিত কলহ করিতে করিতে রবিবার রাত্রিতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।"

আমি তাহার কথায় চমকিয়া উঠিয়া অধীর স্বরে বলিলাম, "আপনি কি তবে বলিতে চাহেন, যোয়ানই সেই যুবককে—"

"এক দফা মদ বেচে লাভ,
আবার মাতালের জরিমানায় লাভ!"—অমৃতলাল।

জিলরয় আমার কথায় বাধা দিয়া সংযতভাবে বলিল, "আমি কিছুই বলিতে চাহি না। তবে আমি এই শোচনীয় দুর্ঘটনা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ত্রুটি করি নাই। যথাসাধ্য অনুসন্ধানের পর প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করিয়াছি। হাঁ, প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা জানিতে পারিয়াছি।"

আমি অধীরভাবে বলিলাম, "প্রকৃত সত্য? আপনি কি জানিতে পারিয়াছেন, বলুন। যোয়ানের বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ কি, তাহা আমি এই মুহূর্তে জানিতে চাহি।"

জিলরয় মানসিক চাঞ্চল্য গোপন করিয়া ধীরভাবে বলিল, "আপনি অত ব্যস্ত হইবেন না মহাশয়, আপনাকে সকল কথাই খুলিয়া বলিতেছি, আপনি স্থিরভাবে শুনুন। সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া আমি কিরূপ আতঙ্কে অভিভূত হইলাম, তাহা প্রকাশ করা আমার অসাধ্য। আমি কয়েক মিনিট স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম, প্রথমে আমার ইচ্ছা হইল, নিঃশব্দে পলায়ন করি; কিন্তু অবশেষে সেই ইচ্ছা দমন করিয়া মৃতদেহটি পরীক্ষা করিলাম। তাহার পিঠে ছোরার গভীর ক্ষত দেখিতে পাইলাম। ক্ষত পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলাম, ছোরাখানি সবেগে তাহার পিঠে আমূল বিদ্ধ করা হইয়াছিল। ছোরাখানি তীক্ষ্ণধার, এবং তাহার ফলার উভয় দিকেই ধার ছিল; সেই ধার বর্শার ফলার ধারের অনুরূপ বলিয়াই আমার ধারণা হইল। ছোরাখানি তখনও তাহার পিঠে বিঁধিয়া ছিল, সুতরাং আমার অনুমান সত্য, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সেই ছোরার আঘাতেই আপনার বান্ধবীর প্রণয়ী ধরাশায়ী হইয়াছিল, এবং সেই অবস্থাতেই তাহার মৃত্যু হয়। ছোরা খাইয়া সে যে আর্ত্তনাদ করিয়াছিল, তাহাও আমি শুনিতে পাইয়াছিলাম, সে কথা পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি। যুবকটি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও অকম্পিত হস্তের ছুরিকাঘাতে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

"সেই মৃতদেহের অদূরে গালিচার উপর একটা দাগ দেখিয়া লণ্ঠনের আলোকে তাহা পরীক্ষা করিলাম; বুঝিলাম, তাহা এক দলা রক্ত, জমিয়া কালো হইয়া গিয়াছিল! মৃতদেহটি কয়েক দিন সেখানে পড়িয়া থাকায় তাহা অত্যন্ত শীতল ও শক্ত হইয়া গিয়াছিল। আমার মনে হইল, দুর্ঘটনার রাত্রিতে আমি সেই কক্ষের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলাম। সেই সময় আমার অদূরে এরূপ হৃদয়বিদারক শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল; অথচ আমি ইহাতে বাধা দিতে পারি নাই! এমন কি, এরূপ পৈশাচিক ব্যাপার ঘটিল, তাহা আমি জানিতেও পারিলাম না। ক্ষোভে, দুঃখে, ভয়ে আমি অভিভূত হইয়া মৃতদেহের অদূরে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কয়েক মিনিট পরে আমি আত্মসংবরণ করিয়া মৃত যুবকের পকেট হাতড়াইতে আরম্ভ করিলাম। তাহার একটি পকেটে কার্ডের রৌপ্য-নির্ম্মিত আধার দেখিতে পাইলাম। তাহা হইতে একখানি কার্ড বাহির করিয়া পরীক্ষা করিলাম; জানিতে পারিলাম—আপনার বান্ধবীর সেই প্রণয়ীর নাম এড়ুইন বার্লো। এই ব্যক্তি—"

আমি বাধা দিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "বার্লো?—এই নামটি যে আমার পরিচিত! যেসী আমাকে বলিয়াছিল—তাহার পরিচারিকার নাম মিস্ বার্লো। নিহত যুবক এই মিস্ বার্লোর সহোদর ভ্রাতা—ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।"

জিলরয় বলিল, "আপনার অনুমান সত্য হইলে রহস্যটা যে ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিতেছে—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, কিন্তু এই মিস্ বার্লোটি কে? তাহার বাড়ী কোথায়?"

আমি বলিলাম, "এ সকল সংবাদ আমার অজ্ঞাত, আমি তাহা জানিতে পারি নাই; আপনি এই নিহত যুবক সম্বন্ধে কি জানিতে পারিয়াছেন, বলুন।"

জিলরয় বলিল, "উল্লেখযোগ্য কোন বিষয় জানিতে পারি নাই। আমি আর অধিককাল সেই কক্ষে থাকিতে সাহস করিলাম না। কারণ, আমার মনে হইল, যদি পুলিস জানিতে পারে, আমি তিন দিন পূর্ব্বে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম, এবং হত্যাকাণ্ডের পরও পুনর্ব্বার এই কক্ষে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা হইলে এই হত্যাকাণ্ডের সহিত আমার সংস্রব আছে বলিয়াই তাহাদের ধারণা হইবে। সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল, অথচ জানালার অর্গল মুক্ত, ইহার কারণ তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলাম। হত্যাকারী সেই বাতায়ন-পথে পলায়ন করিয়াছিল। আমি সেই স্থান হইতে পলায়ন করিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। হত্যাকাণ্ডের কারণ সম্বন্ধে মনে মনে তর্ক-বিতর্ক করিবার জন্য আমার তখন আগ্রহ হইল না; কেবলই মনে হইতে

আমাকে দেখিতে না পায়—এরূপ কৌশলে পলায়ন করিতে হইবে, নতুবা আমার বিপদ ও বিড়ম্বনার সীমা থাকিবে না। মৃতদেহ সনাক্ত করিবার উপযোগী কোন সামগ্রী তাহার পকেটে নাই বুঝিয়া আমি সেই বাতায়ন-পথেই সেই অট্টালিকা ত্যাগ করিলাম। লণ্ঠনটা তৎপূর্ব্বেই নিবাইয়া দিয়াছিলাম।

"আমি সেই বাতায়ন হইতে লাফাইয়া বাগানে পড়িলাম, এবং জানালার নীচে দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া জানালাটি বন্ধ করিলাম। বাগানের ভিতর দিয়া চলিবার সময় ইচ্ছা হইল—লণ্ঠনটা দূরে নিক্ষেপ করি, কিন্তু তখনই মনে হইল, পুলিস লণ্ঠনটি হাতে পাইলেই যে দোকান হইতে তাহা কিনিয়াছিলাম, সেই দোকানের সন্ধান পাইতেও পারে, তাহার পর লণ্ঠনের ক্রেতাকে খুঁজিয়া বাহির করা হয় ত তাহাদের অসাধ্য হইবে না। মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া আমি লণ্ঠনটি আমার কোটের পকেটে লুকাইয়া রাখিলাম; তাহার পর 'টিউব' ট্রেণের সাহায্যে চেয়ারিং ক্রশে উপস্থিত হইলাম। আমি তিন দিন ক্লাবে অনুপস্থিত; তিন দিন পরে সেই রাত্রিতে যখন ক্লাবে ফিরিলাম, তখন আমার অবস্থা কিরূপ, তাহা না বলিলেও চলে। ক্লাবের সর্দ্দার খানসামা বিস্মিতভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি তাহাকে একটা মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিয়া খুসী করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমার চেষ্টা সফল হইল কি না, বুঝিতে পারিলাম না। সেই রাত্রিতে আমার সুনিদ্রা হইল না; সেই যুবকের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের কথা পুনঃ পুনঃ আমার মনে পড়িতে লাগিল।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে কুপের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয় নাই?"

জিলরয় বলিল, "না। সমস্ত ব্যাপার এরূপ জটিল রহস্যে আচ্ছন্ন যে, আমি সেই রহস্যভেদের চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। তাহার পর কয়েক দিন অতীত হইল, আমি প্রত্যহই আগ্রহের সহিত দৈনিক পত্রিকাগুলি দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু সেই হত্যাকাণ্ড বা মৃতদেহের আবিষ্কার প্রসঙ্গে কোন সংবাদ কোন কাগজে দেখিতে পাইলাম না। ইহাও একটি দুর্ব্বোধ্য রহস্য। অবশেষে এক দিন অপরাহ্ণ ৫টার সময় একখানি সান্ধ্য দৈনিকে এই সংবাদটি পাঠ করিলাম—'গোল্ডার্স গ্রীণ-রহস্য,—বিস্ময়কর আবিষ্কার!'

"কাগজের একটি স্তম্ভে এই শিরোনামাটি দেখিয়া আমি ওয়াটারলু প্লেসের এক জন কাগজ-বিক্রেতার নিকট হইতে একখানি কাগজ ক্রয় করিলাম, এবং তাহা পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম যে, যে গোয়ালা সেই বাড়ীতে দুধের যোগান দিত, তাহার দুধের দাম কয়েক দিন বাকি পড়ায় সে গৃহস্বামীর নিকট তাহা আদায় করিবার জন্য তাহাকে ডাকা-ডাকি করিয়াছিল, কিন্তু তাহার সাড়া না পাওয়ায় পুলিসে সংবাদ দিয়াছিল। পুলিস প্রথমে তাহার অভিযোগে কর্ণপাত করে নাই, কিন্তু গোয়ালার পীড়াপীড়িতে পুলিস সেই বাড়ীতে প্রবেশ করে, এবং ভোজন-কক্ষে উপস্থিত হইয়া হতভাগ্য যুবকের মৃতদেহ দেখিতে পায়। প্রত্যেক দৈনিকেই সেই দুর্ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং যথেষ্ট আন্দোলন আলোচনাও আরম্ভ হইয়াছিল; সুতরাং তাহা আপনারও স্মরণ থাকিতে পারে। যথাসময়ে করোনারের আদালতে এই হত্যাকাণ্ডের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছিল। করোনার জুরীদের সহিত একমত হইয়া রায় দিয়াছিলেন, 'ইচ্ছাকৃত নরহত্যা, কিন্তু হত্যাকারী অজ্ঞাত ব্যক্তি।' অতঃপর এই ব্যাপার লইয়া আর উচ্চ-বাচ্য হয় নাই; লণ্ডনের জনসাধারণ এ কথা বিস্মৃত হইয়াছে। এরূপ হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্ত লণ্ডনে বিরল নহে, দুই এক দিনের আন্দোলন-আলোচনার পর সকলেই তাহা ভুলিয়া যায়। ইহাতে নূতনত্ব নাই।"

আমি বলিলাম, "যোয়ানের সঙ্গে পুনর্ব্বার আপনার কোথায় কি ভাবে দেখা হইয়াছিল?"

জিলরয় বলিল, "দৈবক্রমে হঠাৎ দেখা হইয়াছিল। উক্ত ঘটনার প্রায় তিন মাস পরে এক দিন আমি বণ্ড্ ষ্ট্রীটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, সে সেই সময় সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ আমার সম্মুখে পড়িল! সে আমাকে দেখিয়া যেন চিনিতে পারে নাই, এই ভাবে আমার পাশ দিয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল; কিন্তু আমি তাহার পথরোধ করিয়া তাহাকে জেরা করিতে লাগিলাম; অবশেষে তাহাকে স্বীকার করিতে হইল, আমি তাহার অপরিচিত নহি। তাহার অভিনয়-চাতুর্য্যে আমি বিস্মিত হইলাম! সে যখন তাহাদের ঘরে আমার অভ্যর্থনা

করিয়াছিল, তখন আমি তাহার কপটতা বুঝিতে পারি নাই; তাহার কোনও দুরভিসন্ধি ছিল—ইহা কেহই বোধ হয়, ধারণা করিতে পারিত না। কিন্তু এখন—"

জিলরয় হঠাৎ নীরব হইল। তাহাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া আমি আগ্রহভরে বলিলাম, "এখন কি? তাহার সম্বন্ধে এখন আপনার কিরূপ ধারণা হইয়াছে? কি জন্যই বা আপনি তাহার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় বন্ধ করিলেন?"

জিলরয় বলিল, "তাহার সম্বন্ধে ত অনেক কথাই আমার কাছে শুনিলেন, তাহা শুনিয়াও ঐ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন?—সকল কথা কি আরও খুলিয়া বলিতে হইবে?"

আমি আগ্রহভরে বলিলাম, "হাঁ, বলুন।"

জিলরয় কিঞ্চিৎ শ্লেষের সহিত বলিল, "কিন্তু যোয়ান যে আপনার বান্ধবী; সম্বন্ধটা বোধ হয় আরও একটু বেশী ঘনিষ্ঠ। আপনি তাহার প্রণয়ী, এ কথা আমার অজ্ঞাত নহে।"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম, মিঃ জিলরয়, আপনিও এক সময় তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু এখন আপনার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, মোহ কাটিয়া গিয়াছে, ইহা আমার জানিতে বাকি নাই। এখন কি আপনি বলিবেন, এড্‌উইন বার্লো তাহার প্রণয়ী ছিল? এ কথা আপনি একটু আগেই বলিয়াছিলেন ত?"

জিলরয় বলিল, "উহা আমার অনুমানমাত্র, আমি কোন প্রমাণ পাই নাই। হাঁ, অনুমানে নির্ভর করিয়াই ঐরূপ বলিয়াছিলাম।"

আমি ঈষৎ উত্তেজিত-স্বরে বলিলাম, "তথাপি কথাটা বলিতে আপনার এক বিন্দু সঙ্কোচ হইল না! যাহা হউক, আপনি স্বীকার করিলেন—ইহা আপনার অনুমানমাত্র, আপনার অভিযোগের অনুকূলে কোন প্রমাণ নাই; আপনার এই উক্তি সরলতারই কতকটা পরিচয়।"

জিলরয় বলিল, "আমি ত কোন কথা গোপন করি নাই। সেই ভীষণ হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছিলাম, সমস্তই আপনাকে বলিলাম, আপনি যদি তাহা বিশ্বাস না করেন—তাহা হইলে কি আমাকে আপনার বিদ্রূপভাজন হইতে হইবে?"

আমি বলিলাম, "আপনার অভিজ্ঞতা শোচনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু কতটুকু সত্য আপনি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন?"

জিলরয় বলিল, "অর্থাৎ?"

আমি বলিলাম, "অর্থাৎ কাহাকে আপনি এড্‌উইন বার্লোর হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন?"

জিলরয় গম্ভীরস্বরে বলিল, "সন্দেহ?—বার্লো কাহার হস্তে নিহত হইয়াছে, তাহা আমার সুবিদিত, এ অবস্থায় বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ আছে কি?—হাঁ, আমি জানি, যোয়ান কুপার সহস্তে এড্‌উইন বার্লোকে হত্যা করিয়াছে। বার্লো তাহার পিতার কোন গুপ্ত কথা জানিতে পারিয়াছিল, তাহার মুখ বন্ধ করিবার জন্যই যোয়ান এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিল।"

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম, "মিথ্যা কথা। যোয়ান নরহন্ত্রী নহে।"

জিলরয় অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বলিল, "আমি জানিতাম, আমার সত্য কথা আপনি অবিশ্বাস করিবেন। আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করিয়া আপনি আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন কি?"

আমি সক্রোধে বলিলাম, "আপনার অভিযোগ—যোয়ানই বার্লোকে হত্যা করিয়াছে। আপনার অভিযোগ সত্য, ইহা আপনাকে সপ্রমাণ করিতে হইবে।"

জিলরয় হঠাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া হাসিয়া বলিল, "মিঃ কোলফাক্স, আপনি অনর্থক উত্তেজিত হইবেন না; যোয়ানের অপরাধ সপ্রমাণ করিবার জন্য আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ঐ দ্বারের পশ্চাতে আপনি তাহার প্রমাণ পাইবেন।"—সে অদূরবর্ত্তী দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

জিলরয় মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "উহা আমার পরিচ্ছদাগার, ঐ কক্ষে যোয়ানের অপরাধের প্রমাণ বর্ত্তমান। আপনি কি এখনই প্রমাণ লইবেন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, প্রকৃত সত্য আমি জানিতে চাই।"

জিলরয় সেই দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া এক ধাক্কায় দ্বার খুলিয়া বলিল, "নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে আপনি অন্ধ।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বিমান বিভাগ ও ভারতীয়

পার্লামেণ্টে কমাণ্ডার কেনওয়ার্দির প্রশ্নের উত্তরে ভারত-সচিব মিঃ ওয়েজউড বেন স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতের বিমান বিভাগে একটিও ভারতীয় নাই। ইহা ছাড়া তিনি জানাইয়াছেন যে, ক্রানওয়েলের বিমান শিক্ষালয়ে যে দুইটি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে একটি ভারতীয় শিক্ষার্থীও উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

মিঃ বেন যে ভারতবাসীর কৃতিত্বের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভাষায় এমন কথা বলিয়াছেন, তাহা আমরা বলিতেছি না। যাহা সত্য ঘটনা, তাহাই তিনি বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, কেন এমন হয়? ভারতীয়রা স্থলসৈন্য বিভাগে যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারে, নৌবিদ্যায়ও তাহারা অনভ্যস্ত নহে,—যদিও নৌ-সামরিক বিভাগে তাহাদিগকে এ যাবৎ কৃতিত্ব অর্জ্জনের সুযোগ প্রদান করা হয় নাই। কিন্তু সুযোগ দিলে যে তাহারা এই বিদ্যাতেও যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ইংরাজ আমলের পূর্ব্বে ভারতীয়রা—বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা জলযুদ্ধে অনভ্যস্ত ছিল না, এ কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। বিমান-বিদ্যাতেও যদি তাহাদিগকে পারদর্শিতা অর্জ্জনের সুযোগ ও সুবিধা ভাল করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা উহাতেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে। ভারতীয়রা আপনা হইতে সেই শিক্ষা লাভ করিয়া বিমান-যোগে ব্যোমপথে পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ, এ দৃষ্টান্তেরও অসদ্ভাব নাই। পঞ্জাবের মনোমোহন সিং যদিও লণ্ডন হইতে ভারতে নিজে চালকরূপে বিমানযোগে যাত্রা সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি যে বিলাত হইতে ইটালী ও গ্রাস পর্য্যন্ত বিমানযোগে একাকী যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। সম্প্রতি করাচী হইতে দুইটি ভারতীয় যুবক বিমানযোগে বিলাতযাত্রা করিয়াছে। যতই এ বিষয়ে ভারতীয়কে সুবিধা ও সুযোগ করিয়া দেওয়া হইবে, ততই তাহাদের আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। এ দিকে যদি অর্থার্জ্জনের একটা উপায় করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভারতের বেকার-সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান হইতেও পারে ত।

মনোমোহন সিং

বিমানবিদ্যা প্রতীচ্য জাতিদেরই যে একচেটিয়া, তাহাও নহে। তুর্কী দেশের সরকার বিমান বিভাগ চালাইতেছেন। বহু তুর্ক বিমানবিদ্‌ সেই হেতু প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহারা সে বিদ্যায় কাহারও পশ্চাৎপদ নহেন। পারস্য, আফগানিস্থান, চীন, জাপান প্রভৃতি স্বাধীন দেশমাত্রেরই বিমান বিভাগ আছে। মিশর এখনও পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় নাই, তথাপি তাহার বিমান বিভাগে সুদক্ষ বিমানবিদ্‌ প্রস্তুত হইতেছেন। মহম্মদ সিদ্দিকি এফেণ্ডি মিশরের বিমান বিভাগের সুদক্ষ কর্ম্মচারী। তিনি সম্প্রতি তাঁহার বিমান-চালনার বিদ্যা দেখাইয়া দেশবাসীর প্রশংসা ও গৌরবভাজন হইয়াছেন। সে দিন তিনি অত্যন্ত ঝড়-বৃষ্টি ও কুয়াসার মধ্যেও জার্ম্মাণীর বার্লিন সহর হইতে কাইরো সহরে বিমানযোগে উড়িয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে মিশরবাসীরা একরূপ পূজা করিতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য জগতে এখন ইহা নূতন দৃশ্য নহে। কিন্তু তাহা হইলেও উহা মিশরের পক্ষে নূতন। তিনি দেশবাসীকে এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিতেছেন বলিয়াই তাঁহার এত নাম! যখন হেলিপোলিস বিমানাগারের উপরে তাঁহার বিমানপোত উড়িয়া বেড়াইয়া ভূমিতে অবতীর্ণ হইল, তখন শত সহস্র কণ্ঠে তাঁহার জয়ধ্বনি উত্থিত হইল, শত সহস্র মিশরবাসী একবার তাঁহাকে দেখিবার জন্য—একবার তাঁহার সহিত দুইটা কথা কহিবার জন্য, অথবা একবার তাঁহাকে স্পর্শ করিবার জন্য আকুলতা প্রদর্শন করিল। ইহা কি কম সৌভাগ্যের কথা? মিশর সরকার তাঁহাকে ১ হাজার পাউণ্ড (মিশরীয় মুদ্রা) দান করিয়াছেন এবং তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে ১ হাজার ৫ শত পাউণ্ড মিশরীয় মুদ্রা চাঁদা করিয়া তুলিয়া দিতেছে।

আমেদ হামালিন যে আর এক জন মিশরীয় বিমানবিদ্। তিনি সামান্য শিক্ষার পরেই ইংলণ্ড হইতে মিশরে উড়িয়া আসিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য ইটালীর পাইজা সহরে আসিয়া তাঁহার কল বিগড়াইয়া যায় বলিয়া তিনি প্রথম উদ্যমে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি নিরাশ হন নাই। তিনি এই বিমান-যাত্রা ভবিষ্যতে সফল করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প, এ কথা তিনি প্রিন্স ওমর তৈমুনকে জানাইয়াছেন।

মিশরের দৃষ্টান্তে কি ভারতীয়রা অনুপ্রাণিত হইতে পারে না? চীন ও জাপানের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, এ দেশ দুইটি বহুকাল স্বাধীনতা ও সভ্যতা উপভোগ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু মিশরের সম্বন্ধে ত এ কথা বলা চলে না। তবে ভারতীয়রা বিমানবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে না কেন? এ দেশের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা যেমন বলেন, নৌবিদ্যা ভারতীয়দের ধাতুসহ নহে, উহাতে তাহাদের জন্মগত আসক্তি নাই, তেমনই হয় ত বিমান-বিদ্যার সম্পর্কে ভারতবাসীকে এই কথা বলিয়া তাহাদের মুখ চাপা দিয়া রাখিবার চেষ্টা হইবে। কিন্তু ভারতবাসীরা এ সব স্তোকবাক্যে এখন আর ভুলে না, তাহারা তাহাদের জন্মগত ন্যায্য অধিকার আদায় করিয়া লইবেই।

গ্রাম্য শিক্ষা

বাঙ্গালার জেলা-বোর্ড-সমূহের ১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, গত বৎসরে বঙ্গের জেলা-বোর্ডসমূহের অধীনে ৪৭ হাজার ৯ শত উচ্চ ও নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষালয় ছিল। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে ১২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৫ শত বালক এবং ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬ শত বালিকা শিক্ষা-লাভ করিয়াছিল।

বাঙ্গালার মত এত বড় একটা দেশে এই শিক্ষাব্যবস্থাই কি যথেষ্ট? বিশেষতঃ ছাত্রীর সংখ্যা যে আদৌ সন্তোষজনক নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বাঙ্গালার লোক-সংখ্যার অনুপাতে এই ব্যবস্থা সমীচীন হইতেই পারে না। জেলা বোর্ড শিক্ষার জন্য মোট ৩৬·৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সরকার দিয়াছিলেন ২১·৩ লক্ষ টাকা। ইহা কি সরকারের পক্ষে উপযুক্ত? সে দিন বাঙ্গালার লাট সার ষ্ট্যানলি জ্যাকসন শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সহিত এই ব্যবস্থা মিলাইয়া দেখিলে কি মনে হয়?

জেলা-বোর্ডগুলি একটি বিষয়ে প্রশংসার্হ। তাঁহারা অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষালয়সমূহ ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। এ বিষয়ে ২৪ পরগণাকে অন্যান্য বোর্ডের আদর্শ করা উচিত। তাঁহারা প্রত্যেক থানায় একটি করিয়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী ও পাবনার জেলা-বোর্ডগুলি অনুন্নত শ্রেণীর ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহা নিশ্চিতই প্রশংসার যোগ্য।

পুলিসের বিবেক-বুদ্ধি

এ দেশের জনসাধারণ পারতপক্ষে পুলিসের ত্রিসীমায় যাইতে চাহে না। তাই লাট-বেলাট পুলিস-পদক দিবার উৎসবকালে পুলিসের প্রশংসাবাদ করিয়া দেশবাসীর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়া থাকেন, ভারতীয় প্রজারা পুলিসের সহিত সহযোগ করে না, পুলিসকে কোন বিষয়ে সাহায্য দান করে না। কিন্তু কেন করে না, তাহা তাঁহারা বলেন না, অথবা বলিবার প্রয়োজন দেখেন না। পূর্ব্বেকার কয়েকটা বোমামামলা, রেল-নাশের মামলা এবং আরও কয়েক প্রকার স্বদেশী মামলায় পুলিসের যে কীর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পরও জনসাধারণ কেন পুলিসের সহিত সহযোগিতা করে না, জিজ্ঞাসা করা অথবা সে সম্বন্ধে নীরব থাকা—সত্য গোপন করা ব্যতীত আর কিছু বলা যাইতে পারে না।

এ দেশের কোন কোন পুলিস কিরূপ দায়িত্বহীন ও বিবেকবুদ্ধি-বিবর্জ্জিত, তাহার একটা টাট্‌কা দৃষ্টান্ত দিতেছি। গত ১৪ই জানুয়ারী তারিখে কোন ভদ্রলোকের গৃহ হইতে একটি রিভলবার হারাইয়া যায়। পুলিস এই সম্পর্কে গত ১৭ই জানুয়ারী তারিখে শিশিরকুমার ও নরেশচন্দ্র নামক দুইটি যুবককে গ্রেপ্তার করে। অথচ শিয়ালদহের পুলিস-ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বিচারকালে পুলিস আসামীদের বিপক্ষে কোন অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। কাযেই বিচারক তাহাদিগকে বে-কসুর মুক্তি দিয়াছেন। ভদ্রসন্তানদের এই অনর্থক হয়রাণির কৈফিয়ৎ কি? কর্ত্তৃপক্ষ পুলিসকে যখন পদক পুরস্কার দেন বা তাহাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন, তখন সাধে কি জনসাধারণ মনে মনে হাসে?

সুতরাং পুলিসের নিন্দা করাই যে এ দেশের জনসাধারণের স্বভাব, তাহা বলা যায় না। পুলিস ভাল কায করিলে বা পুলিসের লোক বিবেকবুদ্ধির পরিচয় দিলে জনসাধারণ পুলিসের সুখ্যাতি করিতে পশ্চাৎপদ হয় না, সে দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। প্রকাশ,—ঢাকার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সম্পর্কে উত্তর-মৈশুণ্ডী পল্লীতে যে খানাতল্লাস হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ৭টি বাড়ীতে পুলিস কয়েক জন মুসলমানকে সঙ্গে লইয়া সেই সকল গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক নানা অনাচার আচরণ করিয়াছিল। হিন্দু গৃহস্থের অন্তঃপুরচারিকারা অভিযোগ করেন যে, তাহারা তাঁহাদিগকে অপমান করিয়াছিল, কুবাক্য বলিয়াছিল এবং দেবস্থান অপবিত্র করিয়াছিল। ঢাকা শান্তি-সমিতির শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী প্রমুখ কয় জন স্থানীয় ভদ্রলোক এ সকল

কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ঘটনা।

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হাডসন ঘটনাস্থলে তদন্ত করিতে যান। তাঁহার সহিত তিন জন পুলিস-কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহাদিগের নাম—আফসরউদ্দীন, বনমালী গোপ এবং বীরেন চাটার্য্যি। ইঁহাদের নামেই গুরু অভিযোগ হইয়াছিল। সেই সময়ে অভিযোগের বিবরণে স্বাক্ষরকারী কয় জন ভদ্রলোকের সহিত শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্রও তথায় উপস্থিত ছিলেন। মিঃ হাডসন স্বয়ং লাঞ্ছিতাগণের নিকট তদন্ত করেন। মোট ৭টি গৃহে তদন্ত হয়। লাঞ্ছিতারা বিবরণের ঘটনা সত্য বলিয়া এজাহার দেন। সকল কথা শুনিয়া মিঃ হাডসন অত্যন্ত বিচলিত হন এবং পুলিসের এই অনাচারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। অভিযুক্ত পুলিস-কর্ম্মচারীরাও যোড়-হস্তে নারীদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মিঃ হাডসন ইহাতেও তৃপ্তি পান নাই। তিনি উক্ত পুলিস-কর্ম্মচারী-দিগকে পুনরায় লাঞ্ছিতাদের সকাশে গমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আদেশ করিয়াছেন।

এমন পুলিস-কর্ম্মচারীর নামে যে দেশে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বস্তুতঃ ঢাকায় মিঃ হাডসনের যশোরব মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। পুলিসের লোক বলিয়াই যে দেশের লোক তাঁহার গুণের মর্য্যাদা করে নাই, এমন নহে। পুলিসের লোকের উপর দেশবাসীর বিন্দুমাত্র ক্রোধ বা হিংসা নাই, আমলাতন্ত্র সরকারের পুলিসের আকৃতি-প্রকৃতিরই উপর—শাসন-ব্যবস্থার উপর তাহাদের অসন্তোষ ও পুলিসাতঙ্কের ভিত্তি স্থাপিত।

বস্তুতঃ পুলিসের কায করিতে হইলেই যে, সকল কর্ম্ম-চারীকে হৃদয়হীন হইতে হইবে, এমন কথা নাই। সে দিন কৃষ্ণনগর রাজদ্রোহ মামলায় সাক্ষ্যদানকালে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ প্রায়র বলিয়াছিলেন,—"এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। যতীন দাস যে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। স্বাধীনতার চিন্তার সহিত যদি হিংসার সংস্রব না থাকে, তাহা হইলে উহা যে জাতির উন্নতির অনুকূল হয়, তাহা আমি স্বীকার করি।"

মিঃ প্রায়র পুলিসের লোক হইলেও যে উদার মনের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে দেশের লোক তাঁহার গুণের পূজা করিতে অবশ্যই বাধ্য, সে বিষয়ে তাহারা কার্পণ্যও প্রদর্শন করে নাই।

স্বীকারোক্তি

শাসক জাতির কথাই নাই, এ দেশেরও এক শ্রেণীর লোকের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে,—এ দেশের লোক অনুপযুক্ত, এজন্য তাহারা অচির-ভবিষ্যতে অথবা সুদূর-ভবিষ্যতেও স্বায়ত্তশাসনাধিকার পাইতে পারে না। কথাটা শাসকজাতির মুখে অশোভন হয় না, কেন না, তাঁহাদের স্বার্থের সহিত আমাদের স্বার্থের এ বিষয়ে সংঘর্ষ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু দেশের লোকের মধ্যে যাঁহারা এই অভিমত পোষণ করেন, তাঁহাদের কি কৈফিয়ৎ আছে?

আমরা শাসকজাতির মধ্য হইতেই এমন দুই একটি মনীষী ব্যক্তির সন্ধান দিতে পারি, যাঁহাদের কথায় প্রতি-পন্ন হইবে যে, উপরের উক্তি ছল মাত্র, উহার কোন ভিত্তি নাই। মিঃ আর্ণল্ড ওয়ার্ড আয়ার্ল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টের জাতীয় দলের সদস্য। তিনি কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতে আসিয়া এখানকার ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক ও বিচার আলোচনা শুনিয়া গিয়াছেন। দেশে ফিরিয়া স্বদেশের পার্লামেণ্টের তর্কবিতর্কের সহিত উহার তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, "ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের জাতীয় দলের সদস্যরা জ্ঞানে, বিদ্যায়, অধ্যবসায়ে ও রাজনীতিক দক্ষতায় আমার দেশের আইরিশ ন্যাশালিষ্ট সদস্যদের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। পরন্তু তাঁহারা আগ্রহে, উৎসাহে ও স্বদেশপ্রেমে আইরিশ সদস্য অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহেন।"

আইরিশ পার্লামেণ্ট সত্যই স্বাধীন, আর ভারতের পার্লামেণ্ট (?) পরিষদ নকল পার্লামেণ্ট ও ভারতীয় সদস্য পরের অধীন ও আজ্ঞাবাহী। এই নকল পার্লামেণ্টেই যদি তাঁহারা বিজাতীয়ের দৃষ্টিতে কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বাধীন পার্লামেণ্টের স্বাধীন সদস্য হইলে কত কি না-ই করিতে করিতে পারিতেন? স্বাধীনতার সংস্পর্শে মানুষের কত সুপ্ত গুণ জাগিয়া উঠে, তাহা সকলেই বিদিত আছেন।

আমাদের ভাবধারা

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নিখিল বঙ্গ ছাত্র-সমিতির উদ্যোগে ছাত্রদিবসের অনুষ্ঠান উপলক্ষে সার চন্দ্রশেখর বেঙ্কটেশ্বর রমণ ছাত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে জানিবার শিখিবার অনেক কথাই ছিল। তিনি বলেন,—"আমরা ভারতবাসী। শাসন করিব, এমন রাজ্য আমাদের নাই। আমাদের আছে—আমাদের দেশ। আমরা এই প্রদেশেরই মানুষের মত বসবাস করিয়া আমাদের জাতীয় সমস্যার সমাধান করিতে চাহি। আমরা আমাদের জাতিগত প্রতিভার বিকাশসাধন করিতে চাহি।"

বর্ত্তমানের জাগরণের দিনে আমাদের দেশের তরুণগণের মধ্যেও অন্যান্য দেশের মত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। অতীতকে মুছিয়া ফেলিয়া সমাজ ও দেশকে নূতন করিয়া

অধ্যাপক রমণ

গড়িবার প্রবৃত্তি প্রায় সকলেরই মধ্যে দেখা দিয়াছে। প্রতীচ্যের অধৈর্য্য ও নিত্য নূতনের প্রয়াস অনেককেই অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। পরের অনুচিকীর্ষা ও অনুকরণপ্রিয়তা মৌলিকতাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। দেশের প্রাচীন যাহা কিছু, তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন কিছু গড়িবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিতেছে। নবীন বা 'সবুজ' সাহিত্যের মধ্য দিয়া সেই ভাবের অভিব্যক্তি হইতেছে। এই হেতু এই সময়ে অধ্যাপক রমণের মত গভীর চিন্তাশীল মনীষীর কথাগুলি অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছে। এগুলি আমাদের তরুণদের মনে-প্রাণে গাঁথিয়া দিতে পারিলে দেশের উপকার হইবে। বিজাতীয়ের আদর্শের অনুকরণে দেশের সব কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন ভারত গড়িবার স্বপ্নে যাহারা বিভোর, অধ্যাপক রমণের এই উক্তি তাঁহাদের পক্ষে ঔষধের কার্য্য করিতে পারে।

অধ্যাপক রমণ ছাত্রগণকে আত্মবিশ্বাসী হইতে বলিয়াছেন। তাঁহার কথা,—"আমরা পরাজিত জাতি—এই মনোভাব থাকা, এবং আমরা নিকৃষ্ট জাতি, ইহা মনে করা—জাতির মৃত্যুকে ডাকিয়া আনারই অনুরূপ। যে মুহূর্ত্তে আমাদের মনে ধারণা বদ্ধমূল হইবে যে, বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করা আমাদের পক্ষে দুষ্কর, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের অধঃপতনের সূত্রপাত হইবে।" এ কথার মূল্য নাই। আমাদের জাতীয় কবি তাই গাহিয়াছেন, "আত্ম অবিশ্বাস নাশি কঠিন ঘাতে।" আপনার শক্তিতে আপনি অনাস্থা প্রদর্শন করিলে জাতি কখনও বড় হইতে পারে না। আমরা কিসে ছোট?—অন্যে যাহা করে, আমরা তাহা করিতে পারিব না কেন?—এ কথা তরুণগণের মনে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক থাকা কর্ত্তব্য।

প্রেসিডেণ্টের মর্য্যাদা

ব্যবস্থা-পরিষদের প্রেসিডেণ্ট পেটেলের সহিত ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ ক্রেরারের যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল, তাহার সুমীমাংসা হইয়া গিয়াছে। ইহাতে বড়লাট লর্ড আরউইনের স্থিরবুদ্ধিতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে। কেন না, তাঁহারই মধ্যস্থতায় এই বিরোধের অবসান হইয়াছে।

ধরিতে গেলে বিরোধ বাধিয়াছিল সরকার-পক্ষের সহিত পরিষদের প্রেসিডেণ্টের। সুতরাং বড়লাট যে বিবদমান পক্ষদ্বয়ের অন্যতম ছিলেন না, তাহা বলা যায় না। সুতরাং তাঁহার স্বপক্ষের পক্ষপাতিতা করাই স্বাভাবিক হইত। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া বহুদিন গভীর চিন্তার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহা তাঁহার পক্ষে প্রশংসার কথা। বিশেষতঃ য়ুরোপীয় প্রভাব অতিক্রম করিয়া এমন ব্যবস্থা করা বড়লাটের পক্ষে পরম নিরপেক্ষতা ও নির্ভীকতারই পরিচায়ক।

বিরোধ,—প্রেসিডেণ্টের অধিকার সম্পর্কে। পরিষদে বোমা পড়িবার পর হইতে সরকার তন্মধ্যে প্রহরা দিবার ও শান্তিরক্ষা করিবার নূতন ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। দিল্লীর শাসনকর্ত্তার উপর এই ভার দেওয়া হইয়াছিল। মিঃ ক্রেরার এই হুকুম দিয়াছিলেন। ইহা হইতে বিরোধের উৎপত্তি। এ সব কথা পুরাতন।

এখন যাহা মীমাংসা হইল, তাহাতে প্রেসিডেণ্ট পেটেলের অধিকারের দাবী পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হয় নাই বটে, তথাপি পরিষদ-কক্ষে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার অধিকার প্রেসিডেণ্টের আছে, ইহা সরকার-পক্ষ স্বীকার করিয়াছেন। পরন্তু শাসনবিভাগের কর্ম্মচারীরা প্রেসিডেণ্টকে অতিক্রম করিয়া কোন কার্য্য করিতে পারেন না, ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা বড় কম লাভ নহে। পরিষদ-কক্ষের

নির্ব্বিঘ্নতা-রক্ষাকল্পে প্রেসিডেণ্টের অধীনে এক জন পুলিস বিভাগের পদস্থ কর্ম্মচারীকে দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট তাঁহাকে ও অন্য যাহাদিগকে লইয়া পরিষদ-কক্ষের শান্তিরক্ষা করিবেন, তাঁহারা যে সাধারণ পুলিস-কর্ম্মচারী হইতে স্বতন্ত্র, তাহা পরিষদের বিশেষ চিহ্ন ধারণ করিয়া তাঁহারা সকলকে বুঝাইবেন।

কিন্তু এই সঙ্গে আর একটি সর্ত্ত আছে। পরিষদ-কক্ষে শান্তিরক্ষা-কল্পে যদি এই পুলিস-কর্ম্মচারী বুঝিতে পারেন যে, শান্তিরক্ষা-বিষয়ে তাঁহার সহিত প্রেসিডেণ্টের মতের অমিল হইয়াছে, অর্থাৎ যদি তিনি আপনার অভিজ্ঞতাফলে বুঝিতে পারেন যে, প্রেসিডেণ্ট যে ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে ব্যবস্থা-পরিষদে উপস্থিত জনগণের নির্ব্বিঘ্নতা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে তিনি সেই কথা পুলিস বিভাগের উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারীর গোচর করিতে পারেন। যদি সেই কর্ম্মচারী এই শান্তিরক্ষক কর্ম্মচারীর অভিমত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তিনি প্রেসিডেণ্টের নিকট সেই সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পেশ করিবেন। প্রেসিডেণ্ট যদি উচ্চপদস্থ পুলিস-কর্ম্মচারীর সহিত একমত না হইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি সেই রিপোর্টের উপর আপনার মন্তব্য লিখিয়া সপারিষদ বড়লাটের নিকট প্রেরণ করিবেন।

প্রেসিডেণ্ট পেটেল

আপৎকালে (Emergency) পুলিস-কর্ম্মচারী নিজের বিবেচনামত শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। অবশ্য এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রেসিডেণ্টের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে। মতদ্বৈধ হইলে পরে এ বিষয়ে বড়লাটের সকাশে নিবেদন করা যাইতে পারে।

ইহা যেন কতকটা দ্বৈত-শাসনেরই মত। প্রেসিডেণ্টের কতকটা ক্ষমতা রহিল বটে, কিন্তু সরকার-পক্ষেরও বিশেষ ক্ষমতা রহিল। এ ব্যবস্থা কি ভাবে কত দিন চলিবে, তাহা এখন বলা যায় না। ভবিষ্যতে প্রেসিডেণ্টের সহিত পরিষদে নিযুক্ত পুলিস-কর্ম্মচারীর সহিত শান্তিরক্ষা সম্বন্ধে মতভেদ হইলে যে অবস্থার উদ্ভব হইবে, সেই অবস্থায় কি হয়, তাহাই দেখিবার বিষয়।

বাঙ্গালার জেলা-বোর্ড

ইদানীং দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালার জেলা-বোর্ডগুলি গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে কতকটা মনোযোগ দিয়াছেন। গত ২ বৎসর হইতে প্রত্যেক থানার এলাকার মধ্যে জেলা-বোর্ডের অধীনে এক জন করিয়া স্বাস্থ্যপরিদর্শক নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইনি চিকিৎসা-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ না হইতে পারেন, কিন্তু স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইয়া থাকেন। এই হেতু মহা-মারী ও সংক্রামক রোগ যাহাতে গ্রামে প্রবেশ ও বিস্তারলাভ করিতে না পারে, সে বিষয়ে তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নে সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারেন। ১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে জেলা-বোর্ড-সমূহ প্রায় ২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন, এই ব্যয়ের কিয়দংশ ভারত গভর্ণমেণ্টও বহন করিয়াছেন। স্বাস্থ্য-পরিদর্শকদিগের চেষ্টায় গ্রামবাসীদের মধ্যে ওলাউঠা-প্রতি-ষেধক টীকা দিবার প্রথা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বসন্ত "রোগ"-প্রতিষেধক গো-বীজ-টীকা দেওয়ার প্রথা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। পানীয় জল সরবরাহকল্পে জেলা-বোর্ড-সমূহ এই বৎসর ৮ লক্ষ টাকার উপর ব্যয় করিয়াছেন। নলকূপ দ্বারা বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের চেষ্টাও চলিতেছে। অনেক সময়ে নলকূপের কল বিগড়াইয়া যায় বলিয়া কোন কোন জেলা-বোর্ড গ্রামে কূপ খননের ব্যবস্থা করিতেছেন।

কোন কোন জেলায় স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট উদ্যোগী হইয়া গ্রামবাসীদিগের সাহচর্য্যে জঙ্গল পরিষ্কার এবং পুষ্করিণী, খাল ও নদীর পঙ্কোদ্ধার ও কচুরি পানা ইত্যাদির উচ্ছেদে যত্নবান্ হইয়াছেন। এ সকল শুভ লক্ষণ। ইহা ছাড়া কোন কোন গ্রামে গ্রাম্য যুবকদের চেষ্টায় পল্লী-[illegible] সমিতি-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ইঁহারাও গ্রামের [illegible] উন্নতিসাধনে মনোযোগী হইয়াছেন। গ্রামের [illegible] পরিষ্কার রাখা, নিম্নশ্রেণীর বালক-বালিকাদের জন্য প্র[illegible] শিক্ষার ব্যবস্থা করা, গ্রামের রোগ নিবারণ করা [illegible] ব্যাপারে ইঁহারা বিশেষ মনোযোগ দিতেছেন। এই [illegible] যদি জেলায় জেলায় প্রকৃত কায হয়, তাহা [illegible] অত্যন্ত সুখের বিষয়।

বেতার-বার্ত্তা

বেতারবার্ত্তা-সরবরাহকারী ইণ্ডিয়ান ব্রড্‌কাষ্টিং কোম্পানীর ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়ায় ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ হইতে কোম্পানী তুলিয়া দিবার কথা হইয়াছিল। অনেকের অনুরোধে ভারত সরকার এই ব্যবসায় স্বহস্তে গ্রহণ করিতেছেন। এ বিষয়ে তাঁহারা ব্যবস্থাপরিষদে ব্যয় মঞ্জুরী করাইয়া লইবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই ব্যবসায়-সংক্রান্ত মাল-মশলা ও যন্ত্রপাতির অনেক দোকান হইয়াছিল। উহাতে অনেকে অন্নসংস্থান করিতেছিলেন। কেহ কেহ উহাতে গান, কনসার্ট, অভিনয় ইত্যাদি সরবরাহ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছিলেন। তাঁহাদের সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল। এক্ষণে তাঁহারা কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন।

জেলের নিয়মের পরিবর্ত্তন

সরকার যে সকল জেল কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রিপোর্ট অনুসারে জেল-নিয়মের কি সংস্কার সাধিত হয়, তাহা জানিবার জন্য সকলে উৎসুক হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা একপক্ষে সন্তোষজনক হইয়াছে, কিন্তু অন্যপক্ষে আশাজনক হয় নাই।

দেশবাসী রাজনীতিক বন্দীদিগের প্রতি জেলে সদ্ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিতে সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিল। সরকার সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই, অর্থাৎ রাজনীতিক বন্দী হিসাবে কোন বন্দীর প্রতি সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন নাই। তবে তাঁহারা বন্দীদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতি বিশেষ ব্যবহারের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতঃপর (A) বা (ক) শ্রেণীর, (B) অথবা (খ) শ্রেণীর এবং (C) অথবা (গ) শ্রেণীর বন্দী থাকিবে। বন্দীদিগের সামাজিক অবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা ও জীবনযাত্রার গতি-প্রকৃতি দেখিয়া অথবা তাহাদের অপরাধের প্রকৃতি দেখিয়া এইরূপ শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে।

বিশেষ বা (ক) শ্রেণীর বন্দী।—যাহারা স্বভাবতঃ অপরাধী নহে; যাহাদের নৈতিক চরিত্র ভাল; যাহারা সামাজিক অবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হেতু সাধারণ অপরাধী অপেক্ষা উচ্চ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছে; যে অপরাধে নিষ্ঠুরতা, নৈতিক অবনতি, ব্যক্তিগত লোভ, পূর্ব্বাহ্ণে ভাবিয়া চিন্তিয়া গুরু অপরাধ করিবার অভিপ্রায়, সম্পত্তির বিরুদ্ধে গুরু অপরাধ, বিস্ফোরক পদার্থ, আগ্নেয়াস্ত্র বা প্রাণঘাতী অস্ত্র অস্ত্র দখলে রাখার অপরাধ এবং এই সকল অপরাধে উত্তেজনা বা সহায়তা করিবার অপরাধ প্রভৃতি অপরাধের সংস্রব না থাকে, সেই অপরাধে অপরাধীদিগকে প্রথম শ্রেণীর বিশেষ (ক) অপরাধী বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(খ) শ্রেণীর অপরাধী।—যাহারা সামাজিক অবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা অথবা স্বাভাবিক জীবনযাত্রার হিসাবে উচ্চ-শ্রেণীর লোকের মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের অপরাধের প্রকৃতি বিচার না করিয়াও—এমন কি, তাহারা স্বভাবতঃই অপরাধী, ইহা জানিয়াও যদি শ্রেণীবিভাগ বিচার করিবার অধিকারে অধিকারী বিচারক তাহাদিগকে (খ) শ্রেণীর অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করেন, তাহা হইলে তাহারা (খ) শ্রেণীভুক্ত হইবে।

(গ) শ্রেণীর অপরাধী।—এই দুই শ্রেণী ছাড়া অন্যান্য সাধারণ অপরাধী।

এ ব্যবস্থা মন্দের ভাল। ইহার ফলে রাজনীতিক বন্দীদের মধ্যে যাহাদের সামাজিক অবস্থা ভাল, যাহারা শিক্ষিত এবং বরাবর ভাল ও ভদ্রভাবে সংসারে বসবাস করিয়া আসিয়াছে, যদি তাহাদের বিপক্ষে নিষ্ঠুরতা, লোভ প্রভৃতি দোষের অভিযোগ না থাকে, তাহা হইলে তাহারা বিশেষ বন্দিরূপে ব্যবহার পাইতে পারিবে। যাহারা কেবল রাজনীতিক মতামত প্রকাশের জন্য অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হয় এবং ভদ্র ও ভালভাবে বরাবর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছে, তাহারাই এই নূতন নিয়ম অনুসারে (ক) শ্রেণীর বন্দীর মধ্যে পরিগণিত হইবে। কিন্তু ইঁহারা সংখ্যায় কয় জন? অধিকাংশ রাজনীতিক বন্দী এই নূতন নিয়ম অনুসারে হয়, (খ) শ্রেণীর, না হয়, (গ) শ্রেণীর বন্দিরূপে পরিগণিত হইবে, ইহা নিশ্চিত। কেন না, তাহাদের মধ্যে অনেকেই 'সাধারণ জীবনযাত্রার স্বরূপ বুঝিয়া ব্যবহারের বন্দোবস্ত করা হইবে। তাহাদের সামাজিক অবস্থা এবং অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করা হইবে, কিন্তু তাহারা যে কেবল রাজনীতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অপরাধ করিয়াছে, তাহা দেখা হইবে না। অথচ এইটির জন্যই দেশে আন্দোলন চলিতেছিল। রাজনীতিক মতামতের জন্য অপরাধী হইলে তাহাদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করা উচিত, দেশের লোক এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিল। সে কথায় ত কর্ণপাত করা হইল না।

তাহার পর ব্যবহারে জাতিগত পার্থক্য জেলকয়েদীদের মধ্যে রক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন হইয়াছিল। এ বিষয়েও নূতন আইনের দ্বারা কিছু সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু একবারে জাতিগত পার্থক্য জেল হইতে উঠিয়া গেল না। যতই কর্ত্তৃপক্ষ বলুন যে, 'কোন শ্রেণীর কয়েদীই তাহার জাতি হিসাবে অধিক অধিকার উপভোগ করিতে পারিবে না', তথাপি যুরোপীয় কয়েদীদের পূর্ব্বাবস্থা ও সাধারণ জীবন-যাপনের কথা স্মরণ করিয়া তাহাদের প্রতি বিশেষ ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হইল কেন? যদি কর্ত্তৃপক্ষ এমন কথা

বলিতেন যে, "কোন কয়েদীই কেবল জাতি হিসাবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী বলিয়া বিবেচিত হইবে না, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইত, তাঁহারা যথার্থই জেলে জাতি-বৈষম্য তুলিয়া দিতে অভিলাষী, তাহা ত হইল না। সুতরাং নূতন আইন যে খুব সন্তোষজনক হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য।

শাসক ও বিচারক

কংগ্রেসের সৃষ্টিকাল হইতে এ দেশবাসী শাসন ও বিচার বিভাগকে পৃথক্ করিবার উদ্দেশ্যে ঘোর আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। শাসক ও শাসিতের মধ্যে নিরপেক্ষ বিচার করিবার জন্য বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। যদি তাহা না হইয়া বিচারক শাসন বিভাগের দ্বারা প্রভাবিত হন, তাহা হইলে বিচারের মূল্য থাকে না।

লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনকালে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দাস আরও কয়জন স্বেচ্ছাসেবকের সহিত 'সন্দেহক্রমে' পুলিসের হস্তে ধৃত হন। মিঃ মির্জ্জা মেহেদি হোসেনের আদালতে তাঁহাদের বিচার হইতেছিল। তাঁহারা মামলা স্থানান্তরিত করিবার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করেন। কেন এই আবেদন হইয়াছিল, তাহার কারণগুলি কৌতূহলোদ্দীপক। তন্মধ্যে এইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য:—"যখন জামিনের জন্য বিচার আলোচনা চলিতেছিল, অথবা জামিনের সম্বন্ধে যখন কোনরূপ আদেশ দেওয়া হয় নাই, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট টেলিফোঁযোগে গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের সহিত কথা কহিয়াছিলেন।"

হাইকোর্টের বিচারপতি ফোর্ড আবেদন মঞ্জুর করিয়া মামলা স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিয়াছেন। ইহাতে বিচার বিভাগের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। নিম্ন আদালতের বিচারক মিঃ মির্জ্জা মেহেদি হোসেন সাহেব বিচারকালে টেলিফোঁযোগে গোয়েন্দা পুলিসের সহিত আলাপ করিবার কথা হাইকোর্টে কৈফিয়ৎ দিবার কালে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। টেলিফোঁ নম্বর ছিল ২১৭৬, উহা গোয়েন্দা পুলিসের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের ফোন। আসামী পক্ষ ঘটনাক্রমে ফোন নম্বরের ইতিহাস জানিতে পারিয়াছিল বলিয়া কাণ্ড এতদূর গড়াইল, না হইলে কি হইত? এই হেতু শাসন ও বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া ফেলাই কি যুক্তিসঙ্গত নহে?

নারী-ধর্ষণ

বাঙ্গালায় নারী-ধর্ষণের বিরাম নাই। এ সম্বন্ধে সমাজ-পতিগণের কঠোর ব্যবস্থা করা ভিন্ন কেবল আদালতের দণ্ডে কোন ফল হইবে বলিয়া আমরা বিবেচনা করি না। প্রায় এ সকল মামলার আসামীরা সমাজে কোন দণ্ড পায় না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে উৎসাহই পাইয়া থাকে। এজন্য এই সকল ধর্ষণকাণ্ডের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। আমরা শুনিয়াছি, যে সকল ক্ষেত্রে আসামী মুসলমান, সে সকল ক্ষেত্রে তাহারা তাহাদের স্থানীয় স্বধর্ম্মীদের সহানুভূতি লাভ করিয়াছে। এই সহানুভূতি প্রায়ই অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত অন্তরে প্রবাহিত হইয়া থাকে। হিন্দু যুবতীর উপর অত্যাচার আচরিত হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে নাকি গর্ব্বও প্রকাশ করা হইয়া থাকে। এইরূপ হীন পাশব প্রবৃত্তি যে নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ, তাহা নহে, শিক্ষিত সমাজেও এইভাবে এই শ্রেণীর পশুপ্রকৃতি কাপুরুষের প্রশংসা করা হইয়া থাকে। আমরা একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। বরিশালের শোভনা হরণের মামলার কথা বোধ হয় সকলেরই মনে আছে। মহিউদ্দীন নামক যে শিক্ষিত মুসলমান যুবক শোভনাকে হরণ করে এবং তাহার ফলে দণ্ডিত হয়, বরিশালের এক শ্রেণীর শিক্ষিত তরুণ তাহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিল, এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এ সংবাদ সত্য হইলে ঘৃণায় লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে হয়। ইহাই কি এই মুসলমান তরুণদের বিদ্যাশিক্ষার ফল? নারী যে জাতিরই হউক, যে ধর্ম্মেরই হউক, মাতৃজাতির অংশ, তাঁহাকে জননীসমা জ্ঞান করিতে হয়। অবশ্য এ বিষয়ে বিবাহিতা পত্নীর সম্বন্ধে নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। সেই নারী যাহার দ্বারা ধর্ষিত হইয়াছে, তাহাকে এইভাবে প্রকাশ্য সম্বর্দ্ধনা করা কি মুসলমান শিক্ষিত তরুণদের পক্ষে শোভন হইয়াছিল? স্থানীয় মুসলমান সমাজপতিরাই বা কি হিসাবে বিনা প্রতিবাদে এই বিসদৃশ কাণ্ডের সমর্থন করিলেন? মহিউদ্দীনের মত সমাজকলঙ্ককে সামাজিক শাসন করার পরিবর্ত্তে এইরূপ পূজা করা কি পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের অনুমোদিত?

সুখের বিষয়, সকল মুসলমানই এই প্রকৃতির নহেন। আমরা শুনিয়াছি, সিরাজগঞ্জের মুসলমান তরুণসঙ্ঘ এই ঘৃণিত কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। যাঁহারা বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ নাগরিকরূপে দেশের মুখোজ্জ্বল করিবেন, তাঁহাদের নিকট এইরূপ ব্যবহারেরই প্রত্যাশা করা যায়। প্রার্থনা করি, সিরাজগঞ্জের মুসলমান তরুণসঙ্ঘের মত বাঙ্গালার সর্ব্বত্র মুসলমান তরুণসঙ্ঘ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে নারীধর্ষণকারীর বিপক্ষে এইভাবে সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা করিবেন।

ইঁহাদের সংখ্যা বিরল বলিয়াই ক্ষোভ হয়। 'মতি বা শোভনার প্রেমপত্র' নাম দিয়া একখানি গ্রন্থের বাজারে কাটতি হইয়াছে। এই জঘন্য গ্রন্থ প্রকাশ্যে বিক্রীত হইতেছে। অথচ সরকার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছেন। এই প্রকৃতির আর একখানি রুচিহীন গ্রন্থ বাজারে অবাধে কাটিয়াছিল। এ সকল বিষয়ে সরকারের আদৌ দৃষ্টি থাকে

না। যাহাতে সাধারণের নৈতিক অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়ে না, কিন্তু সামান্য একটু রাজনীতিক গন্ধ থাকিলে ৩০ হাজার গোয়েন্দা পুলিস ঝাঁপাইয়া পড়ে! এই মহি-শোভনা গ্রন্থে মুসলমান যুবক কর্তৃক হিন্দু বালিকা হরণে যেন গৌরব ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা কি অন্যান্য দুষ্ট-প্রকৃতির মুসলমান যুবককে হিন্দু যুবতী হরণে প্রলুব্ধ ও উত্তেজিত করা হয় নাই? পরন্তু ইহাতে কি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করা হয় নাই?

উচ্চশিক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশান উপলক্ষে চ্যান্সেলার সার ষ্ট্যানলি জ্যাকসন বাঙ্গালার উচ্চ-শিক্ষা সম্বন্ধে এমন কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, যাহা এদেশবাসীর বিশিষ্ট-ভাবে প্রণিধানযোগ্য।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি যে দেশের পক্ষে সুফল উৎপাদন করিতেছে না, তাহা এখন সকলেই বুঝিয়াছেন। অনেকে এ বিষয়ে অনেক পরামর্শ ও উপদেশও দিয়াছেন। কেন এরূপ হইতেছে, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। শিক্ষা মানুষকে যদি চরিত্রবান্ ও স্বাবলম্বী, দেশপ্রেমিক ও স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ সমাজসেবী করিতে না পারে, তাহা হইলে সে শিক্ষার কোন সার্থকতা থাকে না! অবশ্য দেশের দুই চারি জন লোক যে শিক্ষার ফলে চরিত্রবান্ বা স্বাবলম্বী হইতেছে না, এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু এই যে হাজার হাজার শিক্ষার্থী প্রতিবৎসরই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ লইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, উহাদের মধ্যে কয় জন স্বাবলম্বী চরিত্রবান্ সমাজসেবী দেশপ্রেমিক হইতে সমর্থ হইয়াছে? সুতরাং আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির আশু পরিবর্ত্তন ও সংস্কার সংশোধন যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই।

সার ষ্ট্যানলি জ্যাকসন্

চ্যান্সেলার এ বিষয়ে কোনরূপ পরামর্শ দেন নাই, অথবা সরকার কোন কার্য্য আরম্ভ করিবেন বলিয়া আভাস দেন নাই। তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালাদেশে জনসাধারণের শিক্ষাবাবদ অত্যন্ত অল্প অর্থব্যয় হইয়া থাকে, উচ্চশিক্ষা বাবদই অধিক অর্থব্যয় হয়; কিন্তু বোম্বাইপ্রদেশে ইহার বিপরীত ব্যবস্থা করা হইয়াছে; সেখানে উচ্চশিক্ষা-বাবদ অল্প অর্থব্যয় করিয়া অধিক অর্থ সাধারণের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়। তাহাতে কি ক্ষতি হয়, বুঝিতে পারা যায় না। বাঙ্গালা দেশে চিরদিনই উচ্চশিক্ষার সমাদর ছিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড ওয়ার্ড বলিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালার নদীয়া জেলায় সর্ব্বত্র বিদ্যালয় ছিল। তখন এতদঞ্চলে প্রত্যেক ৩১ জন লোকের জন্য একটি বিদ্যালয় ছিল। বিদ্যালয় বলিতে এখানে টোল, চতুষ্পাঠী, মোক্তব ইত্যাদি বুঝাইতেছে। ইহা ছাড়া পাঠশালাও ছিল। বৃটিশ অধিকারের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ৮০ হাজার বিদ্যালয় ছিল। ইহার মধ্যে জনসাধারণের জন্য পাঠশালার সংখ্যা টোল মোক্তব অপেক্ষা কম ছিল না। বর্ত্তমানে বাঙ্গালায় পাঠশালার সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। তাহার মূল কারণ কি, তাহা চ্যান্সেলার যে জানেন না, তাহা নহে। সেই কারণ দূর করিতে পারিলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের সুবিধা হইবে। এ বিষয়ে সরকারের ঔদাসীন্যই যে মূল কারণ, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। বৃটিশ আমলের পূর্ব্বে রাজা ও জমীদাররা এ বিষয়ে অর্থসাহায্য করিয়া উৎসাহ দিতেন। এখনকার কালে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন জমীদাররা সরকারের রায় বাহাদুরী খেতাবকে সদনুষ্ঠান অপেক্ষা অধিকাংশে ভাল বলিয়া মনে করেন। দেশের দেশীয় রাজা
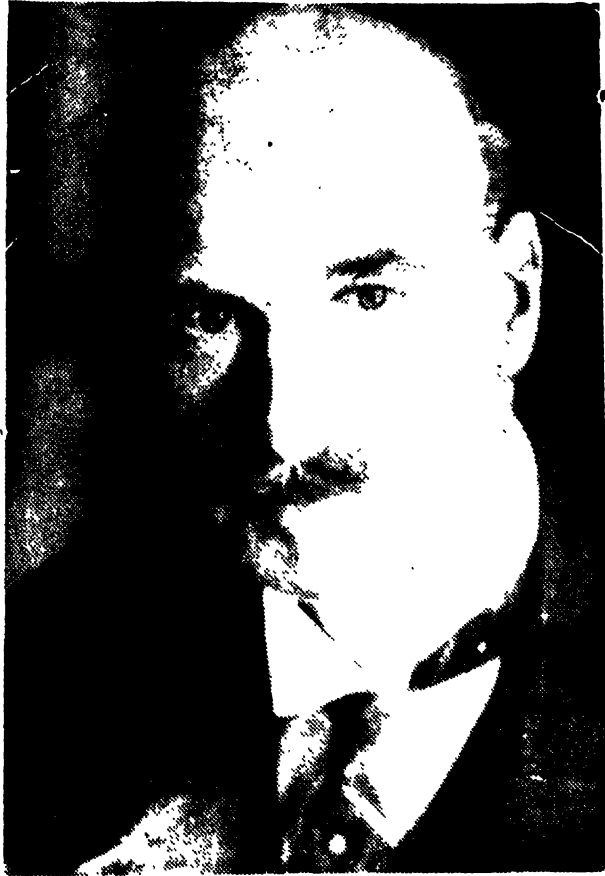
হিন্দু অথবা মুসলমান যাহাই হউন, বিদ্যায় উৎসাহ দান করিতেন। এখনকার কালে সরকারী অন্যান্য বরাদ্দ মিটাইয়া যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইতে এ দিকে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া হয়।

তখনকার কালে নিম্ন বা উচ্চশিক্ষা ব্যয়বহুল ছিল না। টোল মোক্তবে মাদুর পাতিয়া বসিয়া ও বসাইয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। গুরু বা মৌলভী কোথাও রাজসাহায্য, নিষ্কর ভূমি বা অর্থ পাইতেন, ছাত্রগণকে প্রায়ই বিশেষ অর্থব্যয় করিতে হইত না। এখনকার কালে সরকারী সাহায্যদান ওজন করিয়া হইয়া থাকে। বিশেষতঃ আধুনিক শিক্ষাদানের অনুরূপ সাজসরঞ্জাম যোগান দেওয়া বহুব্যয়সাপেক্ষ। সরকার অন্যান্য বিভাগে যথেষ্ট ব্যয় করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিভাগে দান করেন। ইহাতে উচ্চশিক্ষা বা নিম্নশিক্ষা—কোন কিছুরই সুবিধা হয় না।

বর্ত্তমান অবস্থায় যখন উচ্চশিক্ষা ব্যয়বহুল করিয়া তোলা হইয়াছে, তখন সেই ব্যয়-ভারের অধিকাংশ সরকারেরই বহন করা উচিত। কেন না,এ দেশ দরিদ্র, এ দেশের শতকরা ৭৭ জন লোক কৃষিজীবী। ইহার উপর উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার আরও অধিক পরিমাণে শিক্ষার্থীদের উপর চাপাইবার কথা উঠিয়াছে। চ্যান্সেলার বলিয়াছেন, যে সকল শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা লাভ করিবে, তাহাদেরই এই অধিক ব্যয়ভার বহন করা কর্ত্তব্য। ইহা কি সঙ্গত কথা হইল? একেই শিক্ষার্থীদের উপর যে শিক্ষাব্যয়ের ভার চাপান হইয়াছে, তাহাতেই তাহাদের অভিভাবকরা অবসন্ন। ইহার উপর আরও ভার চাপাইলে অনেক বিদ্যার্থীকে দায়ে পড়িয়া উচ্চশিক্ষা ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইহা দেশের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে না। তাহা হইতে যদি বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তন করা যায় এবং সরকার জাতিগঠনমূলক কার্য্যের জন্য পুলিস ও শান্তিরক্ষা বাবদে ব্যয়ের সঙ্কোচসাধন করেন, তাহা হইলে সাপও মরে, লাঠিও ভাঙ্গে না। সে শুভদিন কখনও আসিবে কি?

যোগোদ্যান

কলিকাতা কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে জন্মাষ্টমীর দিন যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পবিত্র দেহাস্থি সমাহিত হইয়াছিল। তদবধি তাঁহার অসংখ্য ভক্ত ও শিষ্য এই পীঠস্থানে তাঁহার নিত্য পূজা করিয়া থাকেন। বিশেষ নির্দ্দিষ্ট দিনে এবং প্রতি বৎসর জন্মাষ্টমীর দিনে এখানে উৎসব হয়। তখনকার কালে এই উদ্যানে ও পীঠস্থানেই রামকৃষ্ণ-ভক্তগণের পবিত্র সম্মেলন-স্থান ছিল, বেলুড়মঠ ইহার দ্বাদশ বৎসর পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরলোকগত স্বামী যোগবিনোদ মহারাজের চেষ্টায় ১৩২২ সালে এই যোগোদ্যানের সমাধিস্থানের উপর একটি পাষাণ-মন্দির নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার পরেই স্বামীজী দেহরক্ষা করেন। এজন্য তাঁহার কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। যোগোদ্যানের বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীমদ্ যোগবিমল এই অসমাপ্ত কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ প্রয়াস পাইতেছেন। এ জন্য তিনি জনসাধারণের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন। প্রাচীন মন্দিরের জীর্ণস্থান সংস্কার করা এবং অসম্পূর্ণ মন্দির সম্পূর্ণ করা প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। আমরা আশা করি, রামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলী এই ন্যায়সঙ্গত আবেদনে কর্ণপাত করিবেন।

আয়ব্যয়

এ বৎসর ভারত সরকারের আয়ব্যয়ের যে সালতামামি হিসাব রাজস্ব-সচিব সার জর্জ্জ শুষ্টার ব্যবস্থাপরিষদে পেশ করিয়াছেন, তাহা আদৌ সন্তোষজনক হয় নাই। বাজেটে যদি দেশের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল দেখাইতে পারা যায়, যদি সে জন্য প্রজার গুরু করভারের লাঘব হইবার সম্ভাবনা হয়, আর যদি স্বচ্ছলতা-হেতু দেশ ও জাতিগঠনমূলক কার্য্যে অধিক পরিমাণে সরকারী তহবিল হইতে খরচ করিতে পারা যায়, তবেই বাজেট সন্তোষজনক হয়। অন্যথা জনগণ এই আয়ব্যয়ের হিসাবে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। বরং উহাকে নৈরাশ্যজনকই বলা যায়।

ভারত সরকারের বাজেটকে 'সামরিক বাজেটই' বলা উচিত, কেন না,এই সরকারের তহবিলে নানা বিভাগ হইতে যে আয় হয়, তাহার প্রায় মূল অংশই সামরিক খাতে ব্যয় হয়। যাহারা কর দান করে, তাহাদের যদি অর্থব্যয়ের উপর কোন কর্তৃত্ব না থাকে, তাহা হইলে এইরূপই হইয়া থাকে। কর্তৃপক্ষ যদি করবৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে তাহাদের আপত্তি করিয়া কোন ফল নাই। সরকারের শাসন-বিভাগীয় কর্ত্তারা ইচ্ছামত ব্যয় করেন, ব্যয় সঙ্কোচ করিবার প্রয়োজন তাঁহাদের অনুভব করিবারই আবশ্যক হয় না। তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন যে, প্রজা পছন্দ করুক বা না-ই করুক, প্রজা দিতে সমর্থ হউক বা না হউক, প্রজার উপর যে করই ধার্য্য করা হউক না কেন, প্রজাকে তাহা দিতেই হইবে।

এই সুন্দর, উন্নত, সভ্য ব্যবস্থার ফলে দেশের লোক মরিয়া 'উড়কুড়' হইয়া গেলেও পুলিসের গৃহনির্ম্মাণের বা অর্থ মঞ্জুরী করা আটক থাকে না। মফঃস্বলে একটা হাসপাতালের ঔষধ যোগান দেওয়ায় টাকা না জুটিলেও সামরিক সাজসরঞ্জাম রীতিমত যোগান দেওয়া চাই। প্রাথমিক শিক্ষালয়ের শিক্ষকরা মাসিক ১০৲ টাকা ১৫৲

টাকা বেতনে আধ-পেটা খাইয়া মরিলেও রাজপুরুষদের মোটা মাহিনা মাসে মাসে ঠিকমত যোগান দিতেই হইবে।

এরূপ আয়-ব্যয়ের প্রথার কোন সংশোধন না হইলে যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছে। সার জর্জ্জ সুষ্টারের সালতামামি হিসাবে আলোচ্য বৎসরে সাড়ে ৫ কোটি টাকারও উপরে ঘাঁটতি হইয়াছে। এই অভাব পূর্ণ করা চাই। কাযেই নূতন কর ধার্য্য করিতে হইবে।

সার জর্জ্জ যেন কতকটা গর্ব্বভরে বলিয়াছেন,—সামরিক বাবদে ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় সঙ্কোচ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে গর্ব্ব করিবার ত কিছুই নাই! ইঞ্চকেপ কমিটী পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, সামরিক ব্যয় ৫০ ক্রোরের উপরে যেন কখন না উঠে। কিন্তু এবারও সামরিক বাবদে ৫৫ ক্রোর ব্যয় হইয়াছে। ইহার উপর 'সামরিক' (strategic) রেল লাইনে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এই ভাবের রেল লাইন ত সাধারণ যাত্রীর সুবিধার জন্য করা হয় না। সুতরাং ইহাকে সামরিক বাবদে ব্যয়ও বলা যায়। তবেই বুঝিয়া দেখুন, রাজকোষের অর্থ কি ভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হয়!

রেল বোর্ড মুখে অনেক সংস্কারের প্রতিশ্রুতিই দিয়া থাকেন। রেলের রাজস্ব সাধারণ রাজস্ব হইতে পৃথক্ করাও হইল। কিন্তু ফল তাহার কি হইয়াছে? রাজস্ব-সচিব সার জর্জ্জই স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, রেলের আয় হইতে সাধারণ তহবিলে এবার যাহা দেওয়া হইবে, অন্যান্য বৎসরে তাহা হইতে অনেক অধিক দেওয়া হইয়াছে। ইহার উপর রেলের চাকুরীতে এবং যাত্রীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের ব্যাপারে যে ভাবে এখনও জাতিবৈষম্য রাখা হয়, তাহাতে মনে হয়, রেল বোর্ডের অস্তিত্ব না থাকিলেও ক্ষতি ছিল না। বিদেশী বস্ত্র-শিল্পের উপর অতিরিক্ত শুল্ক বসাইবার সময়েও সার জর্জ্জ ল্যাঙ্কাশায়ারের বৃটিশ তাঁতি-দিগের প্রতি জাপানীদের অপেক্ষা ভাল এবং বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার কৈফিয়ৎ তিনি ভারতের মঙ্গলের দোহাই দিয়াছেন। কিন্তু ভারতবাসীর ল্যাঙ্কা-শায়ারের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার কোন কারণ নাই। এতকাল ল্যাঙ্কাশায়ার ভারতের বস্ত্রশিল্পের সর্ব্বনাশ করিয়া ভারতের অর্থ শোষণ করিয়া আসিয়াছে, এখন যদি তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাহা হইলে সে জন্য হাহুতাশ করিলে চলিবে কেন?

মহাত্মা গন্ধী ও আইন অমান্য

লাহোর কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের পর স্বাধীনতাদিবসের উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার পরই সার্ব্বজনীন আইন অমান্য আন্দোলন কার্য্যে পরিণত করিবার কথা। এই আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিবার জন্য মহাত্মা গন্ধী কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অনুমতি গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের মধ্যে সকল শ্রেণীর লোকই কথায় কাযে কায়মনে অহিংসায় অবিচলিত নহে, হয় ত অনেকে নীতি হিসাবে অহিংসা গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু কার্য্যে পারিবেন না। এই আশঙ্কায় মহাত্মা গন্ধী স্বয়ং এই আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিতে চাহেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহারই সবরমতী আশ্রমের অহিংসায় অভ্যস্ত শিষ্য ও অনুচর-বর্গকে লইয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইবেন বলিয়া কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি প্রার্থনা করেন। এই ব্যবস্থা হইবার পর সরকার পক্ষ হইতে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দেওয়া হয় যে, সার্ব্বজনীন আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইলে পর আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করা হইবে।

ইহার পর মহাত্মা গন্ধী পণ্ডিত মতিলাল ও জহরলালের এবং অন্যান্য কয়জন শিষ্য ও অনুচরের সহিত পরামর্শ করিয়া একখানি চরমপত্র রচনা করেন। মহাত্মা গন্ধী উহাকে চরমপত্র বলেন নাই, উহার 'বড়লাটের প্রতি পত্র' বলিয়া নামকরণ করিয়াছিলেন। ৭ঠা মার্চ্চ তারিখে মহাত্মা গন্ধীর সবরমতী আশ্রম হইতে মিঃ রেজিনাল্ড রেণল্ডস্ নামক এক ইংরাজ যুবক এই পত্র লইয়া মহাত্মা গন্ধীর দূতরূপে দিল্লীযাত্রা করিয়া বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীকে প্রদান করেন। এই যুবকটি কয়মাস পূর্ব্বে মহাত্মা গন্ধীর আশ্রমে আসিয়া তাঁহার মন্ত্রশিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, তাই এ দেশে মহাত্মার অধীনে ভারতের সেবা করিতে আসিয়াছেন।

মহাত্মা গন্ধী বলিয়াছেন, তিনি কোন জীবের প্রতি হিংসা করেন না, সুতরাং মানুষমাত্রকেই করেন না। ইংরাজকে তিনি বন্ধু বলিয়াই মনে করেন। তাই এক্ষণে ইংরাজের মারফতে এই পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি পত্রে কয়টি সর্ত্ত দিয়াছেন। যদি ৮ দিনের মধ্যে বড়লাট পত্রের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করিয়া উত্তর দেন, এবং তাঁহার সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিতে চাহেন ও সেই মর্ম্মে তার করেন, তাহা হইলে তিনি ৮ দিনের মধ্যে পত্র প্রকাশ করিবেন না। তাঁহার সেই প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই, তাই মহাত্মা গন্ধী ৭ই মার্চ্চ তারিখে পত্র প্রকাশ করেন।

জগতের ইতিহাসে এই পত্রের তুলনা নাই। শান্ত, সংযত, ধীর, স্থির, গম্ভীর ভাষায় পত্রের রচনা সন্নিবিষ্ট। ইহাতে হুঙ্কার-টঙ্কার নাই, রক্তচক্ষু-প্রদর্শন নাই, স্বশক্তিতে স্পর্দ্ধা-প্রকাশ নাই। ইহাতে আছে কেবল সরল সহজ আন্তরিক অকপট ভাষায় আত্মপক্ষের অভাব-অভিযোগের, যাতনা-বেদনার বিবৃতি এবং ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার

স্বরূপ বর্ণন। ইহাতে রাজনীতিকের চাতুরী নাই, আছে—সাধুজনোচিত সরলতা ও অকপটতা আর ভারতের মঙ্গলের জন্য, বৃটেনের মঙ্গলের জন্য, জগতের মঙ্গলের জন্য শান্তি-প্রতিষ্ঠার অকৃত্রিম প্রচেষ্টা। এমন পত্র কেবল যুগমানবেই সম্ভবে!

মহাত্মা গন্ধীর পত্রের মর্ম্ম

বৃটিশ শাসনকে আমি অভিসম্পাত বলিয়া মনে করি। কারণ, এই শাসনে ক্রমবর্দ্ধমান শোষণপ্রথা এবং সামরিক ও বে-সামরিক ধ্বংসকর ব্যয়-বাহুল্যের ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ মূক জনসাধারণ দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। ইহা আমাদিগকে রাজনীতিক্ষেত্রে ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছে। নিরস্ত্রীকরণ নীতির ফলে আমরা মানসিক ও দৈহিক বলেও অবনত হইয়া পড়িয়াছি।

মহাত্মা গন্ধী

গোল টেবল বৈঠকে এই সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া আশা হইয়াছিল। কিন্তু আপনারা আমাদের পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের আশ্বাস দিতে পারেন নাই। বৃটিশ পার্লামেণ্ট কি করিবেন, সে কথা পূর্ব্বে উঠে নাই। কাযেই কংগ্রেসে স্বাধীনতা-নীতি অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই স্বাধীনতা কামনার পশ্চাতে মহান্ উদ্দেশ্য আছে। যাহারা জীবিকার্জ্জনের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে, সেই মূক জনসাধারণের জন্যই মূলতঃ স্বাধীনতার দাবী করা হইতেছে। ভূমির খাজনাই রাজস্বের প্রধান অংশ। এই সম্পর্কে প্রজার উপর ভীষণ চাপ পড়িতেছে। স্বাধীন ভারতে এই অবস্থায় পরিবর্ত্তন করা সম্ভবপর হইবে। সমগ্র রাজস্ব-প্রথা এমনভাবে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, যাহাতে প্রজার মঙ্গল সাধিত হয়।

কয়েকটি ব্যবস্থা প্রজাবর্গকে পিষিয়া মারিতেছে। একে একে সেগুলির পরিচয় দিতেছি:—(১) লবণকর; জীবন-ধারণের জন্য লবণ অবশ্য ব্যবহার্য্য, অথচ ইহার উপর এমন কর ধার্য্য হইয়াছে, যাহা প্রজার উপর গুরু হইয়া নিপতিত হইয়াছে। (২) আবগারী বিভাগের আয়ও দরিদ্রের উপর চাপিয়া বসিয়াছে, ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য ও নৈতিক চরিত্রও অবনত হইতেছে। ইহার ভার ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সংস্কার আইন অনুসারে মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত। তাঁহারা এই বিভাগের আয় কমাইলে শিক্ষাদি ব্যাপারে খরচ করিতে পারেন না। (৩) চরকায় সূতা কাটার ব্যবস্থা ঘুচিয়া যাওয়ায় দরিদ্র প্রজাদের একটি প্রধান সাহায্যকারী আয় কমিয়া গিয়াছে। (৪) ভারতের ঋণের ভারও অসম্ভব গুরু হইয়াছে। (৫) বৈদেশিক শাসন চালাইবার জন্য অসম্ভব ব্যয়বাহুল্য করিতে হইয়াছে। আপনার বেতনের কথাই ধরুন। উহার হার দৈনিক ৭ শত টাকারও অধিক। ইহা ভারতবাসীর গড়পড়তা আয়ের ৫ হাজার গুণ অধিক। অথচ বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী বৃটিশ প্রজার গড়পড়তা আয়ের মাত্র ৯০ গুণ অধিক পাইয়া থাকেন। এই শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন বিশেষ আবশ্যক। এই পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। লক্ষ লক্ষ প্রজার নিকট স্বাধীনতা অর্থে প্রাণান্তকর গুরু করভার হইতে অব্যাহতি লাভ করা। এই শোষণনীতি রুদ্ধ করার নাম স্বাধীনতা।

অহিংসাই পথ

এইভাবে নানা কারণে আমাদিগকে স্বাধীনতা-লাভের জন্য বৃটেনের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিতে হইবে। মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইবার উদ্দেশ্যে এই শক্তি-পরীক্ষার প্রয়োজন। আরও এক কারণে আমাদিগকে শক্তিসঞ্চয় করিতে হইবে। এক দল লোক হিংসার পথে শক্তি সংগ্রহ করিতেছে। আমার ও তাহাদের উদ্দেশ্য এক। কিন্তু উভয়ের পথ বিভিন্ন। হিংসার দ্বারা মূক জনসাধারণের ঈপ্সিত ফল লব্ধ হইবে না। একমাত্র অহিংসা দ্বারা বৃটিশ সরকারের সঙ্ঘবদ্ধ হিংসামূলক কার্য্য সংযত করা সম্ভবপর। অনেকে মনে করেন, অহিংসা সক্রিয় শক্তি নহে। আমার মতে অহিংসাকে

সক্রিয় শক্তিতে পরিণত করা যায়। বৃটিশ শাসনের সঙ্ঘবদ্ধ হিংসামূলক শক্তি এবং হিংসাপন্থী মুক্তিকামীর বিশৃঙ্খল শক্তির বিরুদ্ধে জনগণকে অহিংসার শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া থাকিলে উহা সম্ভবপর হইবে না।

সার্ব্বজনীন আইন অমান্য

এই হেতু এই অহিংসাকে আমি সার্ব্বজনীন আইন অমান্য-রূপ কার্য্যপদ্ধতির মধ্য দিয়া প্রকাশ করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি। বর্ত্তমানে ইহা কেবলমাত্র সবরমতী আশ্রমে সীমাবদ্ধ রাখিব, পরিশেষে ইচ্ছানুসারে সকলেই ইহাতে যোগদান করিতে পারিবেন। ইহাতে কষ্ট ও বিপদ বরণ করিতে হইবে, তাহা জানি। আমার বিশ্বাস, আমি

অহিংসা দ্বারা বৃটিশ জাতির পরিবর্ত্তন-সাধন করিব। এত দিন (১৯১৯ খৃঃ পর্য্যন্ত) আমি বৃটিশ জাতির সহযোগিতা করিয়াছি। তাহার পর আমার চোখ ফুটিয়াছে। আমি তাহাদের সেবা করিতে চাই। আমি আপনার ঘরের লোকের যেমন অহিংসা দ্বারা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছি, সেই ভাবে বৃটিশ জাতিরও পরিবর্ত্তন করাইতে চাই। অন্যায়ের প্রতীকারের জন্য আমি বৃটিশ জাতির সহিত সম্পর্ক বর্জ্জন করিতে চাই। অন্যায় অপসারিত হইলে পর বন্ধুভাবে আপোষের কথা হইবে। আপনারা যদি ভারতের সহিত লালসা-বর্জ্জিত বাণিজ্য করেন, তাহা হইলে আমাদের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে আপনাদের পক্ষে শক্ত হইবে না।

লবণ আইন ভঙ্গ

প্রথমেই দরিদ্র দেশবাসীর দিক হইতে দেখিলে লবণ আইন ভঙ্গ করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। আমি প্রথমে সেই দিকে আত্মনিয়োগ করিব। আপনি আমাকে ধরিয়া ও দণ্ড দিয়া আমার সংকল্প ব্যর্থ করিতে পারেন ; কিন্তু আমি আশা করি, আমার পর সহস্র সহস্র ভারতবাসী এই কার্য্যে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আত্মনিয়োগ করিবে।

* * * * *

এই পত্রপ্রাপ্তির পর বড়লাট লর্ড আরউইনের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ কানিংহাম গত ৫ই মার্চ্চ তারিখে বড়লাটের তরফ হইতে ইহার এইরূপ উত্তর দেন :—

প্রিয় মিষ্টার গন্ধী, আপনার ২রা মার্চ্চ তারিখের পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিবার জন্য মহামান্য রাজপ্রতিনিধি আমাকে আদেশ করিয়াছেন।

আপনি যে কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন, তাহার ফলে স্পষ্টরূপেই আইনভঙ্গ ও সাধারণের শান্তি বিপন্ন হইবে জানিয়া তিনি দুঃখিত।

মহাত্মাজীর সঙ্কল্প

ইহার পর মহাত্মা গন্ধীর পক্ষে গত্যন্তর রহিল না। তিনি স্থির করিলেন যে, ১২ই মার্চ্চ তারিখে সবরমতী আশ্রমের পুরুষ শিষ্য ও অনুচরবর্গকে এবং ১ শত জন নানা প্রদেশীয় স্বেচ্ছাসেবককে লইয়া সবরমতী আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া প্রত্যহ প্রভাতে ও অপরাহ্ণে ১০ মাইল পদব্রজে পথাতিক্রম করিয়া জালালপুর গ্রামে উপস্থিত হইয়া লবণ প্রস্তুত করিয়া আইন ভঙ্গ করিবেন। পথে গ্রামে গ্রামে জনগণের নিকট হইতে গ্রামের জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহ অবগত হইবেন। গ্রামে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা কত, কে কত খাজানা দেয়, কে কত চরকা কাটে, খদ্দর পরে ও প্রচার করে, কে কত লবণ ব্যবহার করে, ইত্যাদি নানা বিষয়ে একটা রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া রাখিতে প্রত্যেক গ্রামের প্রতিনিধিদিগকে পূর্ব্বাহ্ণে অবগত করান হইয়াছে।

সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেলের দণ্ড

এই সময়ে আর এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। ৭ই মার্চ্চ তারিখে বর্দোলি সত্যাগ্রহের নেতা স্বনামধন্য সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল বোরসাদ তালুকের রাস নামক গ্রামে এক সভায় বক্তৃতা করিতে যান। সেই সময়ে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে আদেশ দেন যে, তিনি ঐ সভায় বক্তৃতা করিতে পারিবেন না। সর্দ্দার তাঁহার আদেশ পালন করিতে সম্মত হইলেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট এজন্য তাঁহাকে ৩ মাস বিনা শ্রমে কারাদণ্ড প্রদান করেন এবং ৫ শত টাকা জরিমানা করেন, অনাদায়ে আরও ৩ সপ্তাহ তাঁহাকে কারাবাস করিতে হইবে, এরূপ আদেশ করেন।

ইহাতে আরও হুলস্থূল পড়িয়া যায়। মহাত্মা এই দণ্ডের কথা শুনিয়া ১২ই মার্চ্চের পূর্ব্বেই সত্যাগ্রহ করিবেন কি না, বিবেচনা করিতে থাকেন। কিন্তু শেষে ১২ই মার্চ্চই সত্যাগ্রহের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়।

১২ই মার্চ্চ তারিখ ভারতের মুক্তির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় দিন। ঐ দিন মহাত্মা গন্ধী তাঁহার সত্যাগ্রহী অনুচরবর্গকে লইয়া অহিংস-সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছেন। ভারতের দিকে দিকে উৎসাহ ও আগ্রহের স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার পরিণাম কি, তাহা ভারতের ভাগ্যবিধাতাই বলিতে পারেন।

এরোপ্লেনে চড়ার প্রথম সুযোগ পাওয়া গেল ১৯২০ খৃষ্টাব্দে। এক এরোপ্লেন আসিল কলিকাতায়। মাথা-পিছু একশো টাকায় আকাশে ওড়ার ব্যবস্থা ঘটিল। আমি চট্‌পট্ শীট্ বুক্ করিয়া ফেলিলাম। কলিকাতার গড়ের মাঠ হইতে এরোপ্লেন উঠিবে। এরোপ্লেনে কয়েকটি টাইট্-কা-রা; ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকিবার আশঙ্কা যেমন নাই, গলিয়া ঝুপ্ করিয়া পড়িয়া যাইবার কথাও তেমনি মনে উদয় হয় না। শীতকাল। দুপুর বেলায় আহারাদি সারিয়া মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সঙ্গে আমার ন'দশ বছরের কন্যা রেণু—তারো ওড়ার ভারী সখ। তার জন্যও কামরায় শীট্ বুক্ করিলাম। এরোপ্লেনের ভিতরে ১৪ কামরা; তার সাম্‌নে পাইলটের (চালকের) আসন এবং মাথার উপর আরো দুটা শীট্। কামরায় আকাশ-পথের যাত্রীরা উঠিলেন, সাহেব-মেম, মাড়োয়ারি দু'চারজনও। আমার বন্ধু মিষ্টার গ্রাউ ও আমি উঠিয়া বসিলাম পাইলটের সম্মুখে এরোপ্লেনের মাথায় যে-দুটি শীট্ ছিল, সেই শীটে।

মাঠের উপর এরোপ্লেন

পাইলট সতর্ক করিয়া দিল, ভারী ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিবে—চোখ-কাণ সাবধান! চোখে বড় গগ্‌ল্ আঁটিলাম; গায়ে গরম জামা ছিল, মাথা খোলা রহিল; যেহেতু আমি সাহেবী বেশ কোনদিন গ্রহণ করিতে পারি নাই। বহু ব্যাপারে সে-বেশে সুবিধা আছে মানি, তবুও। এইখানেই আমার কেমন দুর্ব্বলতা। আত্মীয়-বন্ধু দুই চারি জন মাঠে আসিয়াছিলেন কৌতুক দেখিতে। তাঁদের কাছে বিদায় লইয়া প্রোপেলারের প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে আমরা আকাশ-পথে যাত্রা করিলাম।

প্রথমটা ভীষণ বেগে মাঠের উপর দিয়া ছুটিয়া উড়ো জাহাজ ভূমি ছাড়িয়া বায়ু-পথে ভাসিয়া উঠিল...সে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি...লিফ্‌টে দাঁড়াইয়া উপরতলায় উঠিবার সময় প্রথম মুখে বুকে যেমন ধ্বক্ করিয়া একটা দোলা লাগে, ঠিক তেমনি! তার পর ক্রমেই ধরণীর সান্নিধ্য ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে, আরো ঊর্দ্ধে ভাসিয়া চলিলাম বাধাহীন, বন্ধহীন গতিতে।... আশে-পাশে নীচে ঘর-বাড়ী মাঠ-ঘাট যেন ছবিতে আঁকা অপরূপ প্যানোরামায় রূপান্তরিত হইয়া গেল।

আমরা প্রথমেই চলিলাম, উত্তরে নৈহাটীর দিকে।...ঐ কলিকাতা সহর, ঐ গঙ্গা—শীর্ণ জলরেখা! ক্রমে মনে হইল একগাছি মোটা সাদা সুতা আঁকা-বাঁকা পড়িয়া আছে! পাটের কলগুলা যেন ছোট ছোট আলপিন পোঁতা! মানুষ লক্ষ্য হয় না! বোটগুলা যেন ছোট মাছি! আর [illegible]-পালা? এমন পরিপাটী সাজানো...যেন ছবিখানি!

মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মনে হইল, পৃথিবী যে এমন সুশ্রী, তা তো নীচে থাকিয়া মনে হয় না! এই জন্যই সেকালে বুঝি দেবতারা হরঘড়ি পুষ্পক-রথে চড়িয়া মর্ত্ত্যধামে বেড়াইতে আসিতেন। নামিবার সময় মহাকবির রচিত সেই অমর ছত্রগুলি মনে পড়িতে লাগিল,...

বেগাবতরাচাদাশ্চর্য্যদর্শনঃ মনুষ্যলোকঃ।

যদাহি—শৈলানামরহোতীব শিখরাদুন্মজ্জতাং মেদিনী

পর্ণাভ্যন্তরলীনতাং বিজহতিস্কন্ধোদয়াৎ পাদপাঃ।

সন্তানৈস্তনুভাবনষ্টসলিলা ব্যক্তিং ভবন্ত্যাপগাঃ

কেনাপ্যুৎক্ষিপ্যতেব পশ্য ভুবনং মৎপার্শ্বমানীয়তে॥

প্রায় পনেরো মিনিটে আমরা হুগ্‌লীর জুবিলি ব্রিজের উপর আসিয়া পৌঁছিলাম। জুবিলি ব্রিজ একটা সরু সুতার মত পড়িয়া আছে! মানুষের হাতের তৈয়ারী কল-পুল জাহাজ এত তুচ্ছ মনে হইতেছিল!—তার পর ফেরা পাড়ি—কলিকাতা পার হইয়া দক্ষিণে ডায়মণ্ডহার্বার অবধি...দৃশ্য-বৈচিত্র্যের আর সীমা-পরিসীমা নাই!

এ ক ঘ ণ্টা য় উত্তর-দক্ষিণের পাড়ি সারিয়া আবার মাঠে নামিলাম। প্র কা ণ্ড ভিড়... আমরা নামিলাম। সকলের সস্মিত ভঙ্গী, বিস্মিত প্রশ্ন,—কেমন? কেমন? ভয় হচ্ছিল? কেমন দেখলেন সব? কষ্ট হয়েচে কোনো রকম? কাণ ভোঁ-ভোঁ করিতেছিল... প্রোপেলারের সেই শব্দ...আর ঠাণ্ডা হাওয়ায় গাল চড়চড় করিতেছিল। পাইলটকে প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, আমরা প্রায় ৬ হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠিয়াছিলাম।...বন্ধু-বান্ধবকে কহিলাম,—চমৎকার, চমৎকার! যাঁরা স্বর্গ কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁরা নিশ্চয় ওড়া-পথে কোনো দিন পাড়ি দিয়াছিলেন!

সেবার এই পর্য্যন্ত।
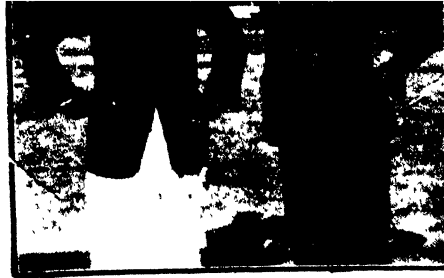
শিক্ষাচার্য্য মিঃ ডব্লু, এফ, ওয়ার্ণার—পার্শ্বে মিঃ লোহিয়া
[ফটোগ্রাফার—রোমী।

কিন্তু মনে বাসনা জাগিয়া রহিল, ভূ-পথে : পাড়ি দেওয়া হইয়াছে, আকাশ-পথে এমনি ভ্রমণ আ[illegible] হয় কি করিয়া!...

সে সুযোগ মিলিল শেষে গত বছর।

অনেকেই জানেন, দমদমায় বেঙ্গল ফ্লাইইং ক্ল (Bengal Flying Club) খোলা হইয়াছে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এই ক্লাবে জীবন সঞ্চারিত হইয়াছে ১৯২৯ খৃষ্টা[illegible] ফেব্রুয়ারী মাসে। এই ক্লাবে এরোপ্লেন চালানো শিক্ষ[illegible] চমৎকার ব্যবস্থা হইয়াছে। ক্লাবে তিনখানি এরোপ্লে[illegible] আছে। এখানে এখন প্রধান শিক্ষাচার্য্য মিষ্টার ডব্লু, এ[illegible] ওয়ার্ণার। ১৬ বৎসর-যাবৎ ই[illegible] এরোপ্লেন চালাইতেছেন।

এরোপ্লেন চালানো শিখি[illegible] হইলে এই ক্লাবের সভ্য হই[illegible] হয়। সভ্য-পদ-গ্রহণে জাতি[illegible] ভেদের সম্পর্কমাত্র নাই। মে[illegible] হইতে গেলে প্রবেশিকা [illegible] দিতে হয় ৫০৲ টাকা, তার উ[illegible] মাসিক চাঁদা ৭৲ টাকা। কা[illegible] নির্ব্বাহক সমিতির দু'জন সভে[illegible] পরিচয়-লিপি না দিতে পারি[illegible] কাহাকেও সভ্যশ্রেণীভুক্ত ক[illegible] হয় না। এই টাকায় উ[illegible] শিক্ষার জন্য ঘণ্টায় ২৪৲ টা[illegible] হিসাবে খরচ দিতে হয়। [illegible] মিনিট করিয়া সময়-বিভাগ ক[illegible] আছে। প্রত্যেকের শিক্ষা-ক[illegible] সাধারণতঃ ২০ মিনিট; ত[illegible] পূর্ব্ব হইতে 'বুক্' করিয়া রাখিলে ৪০ মিনিট বা এক ঘ[illegible] কাল একটানে উড়িবার সময় পাওয়া যায়। এ ছা[illegible] 'joy ride'এর জন্য এরোপ্লেনে ওঠার ব্যবস্থা আছে সভ্যের মারফৎ অবশ্য সে ব্যবস্থা হয়। তার দর ঘণ্টা ১২৲ টাকা হিসাবে। সভ্যের বন্ধু বা বান্ধবী বা আত্মী[illegible] ছাড়া আর কাহাকেও 'ওড়ানো'র নিয়ম নাই।

ক্লাব সৃষ্টির কাল হইতেই সভ্য-তালিকাভুক্ত হইলা[illegible] কিন্তু নানা কার্য্যগতিকে ওড়ার ব্যবস্থা করিতে পারি নাই।

গত বৎসর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এক সাহেব এক এরোপ্লেন নামাইলেন দমদমার এরোড্রোমে। এরোপ্লেনের সাম্নে পাইলটের শীট্—এবং তাঁর শীটের পিছনে তিন শীট্-ওয়ালা ঢাকা কামরা। দশ-বারো মিনিট করিয়া তিনি short circuit-এর ব্যবস্থা করিলেন; ভাড়া যাত্রী-পিছু ১০৲ টাকা।

আমরা সবান্ধবে ও সপরিবারে রঙ্গস্থলে হাজির হইলাম এবং দু বছরের ছোট শিশু অবধি কেহই আকাশ-পথের যাত্রী হইয়া উর্দ্ধ লোকের একটু পরিচয় লইবার সুযোগ ত্যাগ করিলাম না।···তিন জনে একসঙ্গে কামরায় বসিয়া যাওয়ায় লাভ এই, গল্পে-স্বল্পে দৃশ্যমাধুর্য্য উপভোগের মাত্রা বেশী হইবে। আমোদও প্রচুর মিলিল। কাণের কাছে প্রোপেলারের ঐ শব্দ! কথা কহিতে গেলে রীতিমত চীৎকার করিতে হয়। তবুও আরামের অন্ত নাই!

আকাশ-পথে সেই অনুভূতি! হেলিয়া বাঁকিয়া এরোপ্লেন উর্দ্ধে—আরো উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। নীচে ঘর-বাড়ী ঘাট-মাঠ ক্রমেই যেন তার সজীবতা ছাড়িয়া পটে-আঁকা বলিয়া বোধ হইতেছিল। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে লাইন দেখিলাম। একটা ট্রেণ চলিয়াছে—ঠিক যেন ছেলেদের খেলা-ঘরের গাড়ী। মিউনিসিপাল মার্কেটে পাঁচসিকা দামে যে-গাড়ী কিনিতে পাওয়া যায়, অবিকল সেইরূপ। গাড়ীর গতি বুঝা গেল—ধীরে ধীরে চলিয়াছে, যেন কেন্নুই পোকা! গঙ্গা সেই সূতার হারের মত! আর গাছপালা ··অপরূপ শ্যামল, কেয়ারি করিয়া সাজানো! এবার ঐ দমদমার চারিধারে ঘুরিয়াই বেড়ানো শেষ! তবু বহুদূরে ঐ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল—সাদা মর্ম্মরে তৈয়ারী জয়পুরের খেলনার মত রৌদ্রকিরণে চিক্-চিক্ করিতেছে। মনুমেণ্ট প্রভৃতি দেখিবার প্রয়াস পাইলাম; দেখা গেল না।···কামরার বাহিরে হাত বাড়াইলাম—প্রচণ্ড শীত, আর বাতাসের বেগও তেমনি প্রচণ্ড! মনে হইল, হাতে যেন ধারালো অস্ত্রের পরশ লাগিল! মাটীর পানে চাহিয়া কেবলি মনে হইতেছিল, লাফাইয়া নীচে পড়ি। নামিবার সময়ও অপরূপ শ্যামশোভার মধ্যে এ বাসনা দুর্জ্জয় হইয়া উঠিতেছিল!

এরোপ্লেন বাঁকিয়া হেলিয়া নামিতেছিল, আর নীচেকার জমী-ঘর গাছ-পালা যেন পাহাড়ের গড়ানে গায়ের মত চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল।···

এই যাত্রার পর ফ্লাইইং ক্লাবে গিয়া এরোপ্লেন চালানো শেখার বাসনা অত্যন্ত প্রবল হইল; এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতে প্রত্যহ রীতিমত শেখার কসরৎ সুরু করিয়াছি!···

সেই কথাই এবার বলিব।

মোটর চালানো শিখিয়া পরীক্ষা দিয়া যেমন গাড়ী চালাইবার লাইসেন্স লইতে হয়, এরোপ্লেন চালানো সম্বন্ধেও তেমনি আইন-কানুন আছে। তবে এরোপ্লেনের লাইসেন্স আছে দু'রকম। 'A' লাইসেন্স ও 'B' লাইসেন্স। এরোপ্লেনে প্যাসেঞ্জার বা মালপত্র বহিবার অধিকার শুধু B লাইসেন্সে পাওয়া যায়। 'B' লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা ভারতবর্ষে নাই। যাঁরা B লাইসেন্স পাইতে চান্, তাঁদের এখান হইতে A লাইসেন্স লইয়া বিলাতে গিয়া বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতে হয়। B-লাইসেন্স শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আজো এখানে হয় নাই।

'A' লাইসেন্সে যোগ্যতা লাভের অধিকার মেলে যাঁরা এখানকার ক্লাবের সভ্য হইয়া চালনা শিক্ষা করেন। লাইসেন্সের জন্য পরীক্ষা দিতে হয়। সাড়ে ৬ হাজার ফুট উর্দ্ধে নিজে এরোপ্লেন চালাইয়া ওঠা চাই এবং নামিবার সময় ৪ হাজার ৫ শত ফুট উর্দ্ধ হইতে এঞ্জিন থামাইয়া নামিবার পারদর্শিতা চাই; তা ছাড়া এঞ্জিন চালনা সম্বন্ধে আরো খুঁটি-নাটি অনেক ব্যাপার আছে। তার উপর 'আলো', সিগন্যাল' (lights and signals) ও Air-traffic-এর সাধারণ বিধি, সাধারণের চলা পথের নিকটবর্ত্তী এরোড্রোমের কাছে নামিতে গেলে সাধারণের যাহাতে কোনো অসুবিধা না ঘটে, সে সম্বন্ধে যে-সব আইন-কানুন আছে, তার পুরা জ্ঞান প্রয়োজন। তদুপরি International Air-legislation-এও জ্ঞান থাকা চাই। যিনি শিখিবেন, তাঁর সাহস ও শক্তি এবং তাঁর অবসরের উপর A লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্যতা নির্ভর করে। A লাইসেন্সে শিক্ষার ব্যয় মোটামুটি প্রায় ২ হাজার টাকা লাগে এবং A লাইসেন্সের অধিকারী পাইলটরা যাত্রী লইয়া আকাশ-পথে যাত্রা করিতে পারেন; কিন্তু সেজন্য অর্থ লইতে পারিবেন না। এই বিশেষ বিধির দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। তা ছাড়া পাইলটের সঙ্গে অন্ততঃ ১০ ঘণ্টাকাল তাঁর নিজের solo flying course (শিক্ষক-pilot

ব্যক্তিয়েকে একা এরোপ্লেন চালানো) পাকা রকমে হওয়া চাই।

এরোপ্লেন চালানো শিখিয়া B লাইসেন্স লইতে পারিলে রোজগার হয় বিলক্ষণ। মাহিনা হাজার, দেড় হাজার টাকা মিলিবেই। এ দেশের ভাগ্যাকাঙ্ক্ষী শক্তিমান্ যুবকরা এ দিকে মনোযোগী হইলে লাভ সুনিশ্চিত।

এখন যে কথা বলিতেছিলাম :—

১লা জানুয়ারী শুভ ইংরাজী নববর্ষারম্ভে আমি ওড়াবিদ্যা শিখিতে জুটিলাম। বেলা ৩৷৪০ মিনিটে 'টাইম্' নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রথম দিনে এক বাঙালী বন্ধু ডক্টর রয় ও এক জন মাড়োয়ারি বন্ধু কম্বল বাবুকে সঙ্গী পাইলাম। বৈকালে তাঁদেরও ওড়ার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। দমদমা এরোড্রোমে দেখাশুনা। মাথা ও কাণ ঢাকিবার জন্য চামড়ার টুপি টেলিফোন নল-সমেত কিনিয়া লইয়াছিলাম। নলটার চেহারা ডাক্তারদের ষ্টেথেস্কোপের মত। ড্রিলের টুপিও চলে, তাহাতে দাম সস্তা হয়। টুপি মাথায় দিতেই হইবে, নহিলে হাওয়ার চাপে কর্ণপটহ ছিন্ন হইবার আশঙ্কা আছে, শুনিলাম। টুপির ভিতর দিয়া দুটা নল ও মুখের কাছে মাউথপীশ আঁটা। নল দুটা কাণে লাগানো থাকে। পাইলট্-শিক্ষকের উপদেশ কাণে শুনিতে হইবে, ঐ নল দিয়া; আর কথা চলিবে মাউথপীশ্ মারফৎ। পাইলট-শিক্ষকের টুপির সঙ্গেও এমনি যন্ত্র সংলগ্ন থাকে; দুটা যন্ত্রের সংযোগ ঘটে এরোপ্লেনে উঠিবার পর। এই দ্রব্যটির নাম তারহীন টেলিফোন্। চোখে ট্রিপ্লেক্স গগ্ল্ আঁটিতে হইল। নহিলে হাওয়ায় চোখ জলে ভরিয়া যাইবে। ঝাপ্সা চোখে কিছুই লক্ষ্য হইবে না, তা ছাড়া ঠাণ্ডা লাগার ফলে চক্ষুরোগ হওয়াও বিচিত্র নয়।

দমদমায় তিনখানি এরোপ্লেন আছে; সবগুলিই জিপ্সি মথ। এই এরোপ্লেনে দুটি শীট—পিছনের শীটে ছাত্র বসে, সামনের শীটে পাইলট-শিক্ষক। এই পিছনের শীটে Instrument Board থাকে; কল্‌কজার যা-কিছু তা এই শীটেই। কোন্‌টা কি-ভাবে চালাইলে কি হয়, শিক্ষক তা বুঝাইয়া দিলেন। আমি পিছনের শীটে উঠিয়া বসিলাম, সামনের শীটে শিক্ষক চড়িয়া বসিলেন। এরোপ্লেনে Dual control থাকে; অর্থাৎ ছাত্র চালাইবে, কিন্তু আনাড়ি যথেচ্ছভাবে চালাইলে বিপদের আশঙ্কা; তাই শিক্ষক প্রতিপদে ছাত্রের চালনাকে সামনের শীটে বসিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপদেশ চলিতে থাকে ঐ তারহীন টেলিফোন্ যন্ত্রযোগে। শিক্ষার কার্য্য এমনি ভাবে চলে।
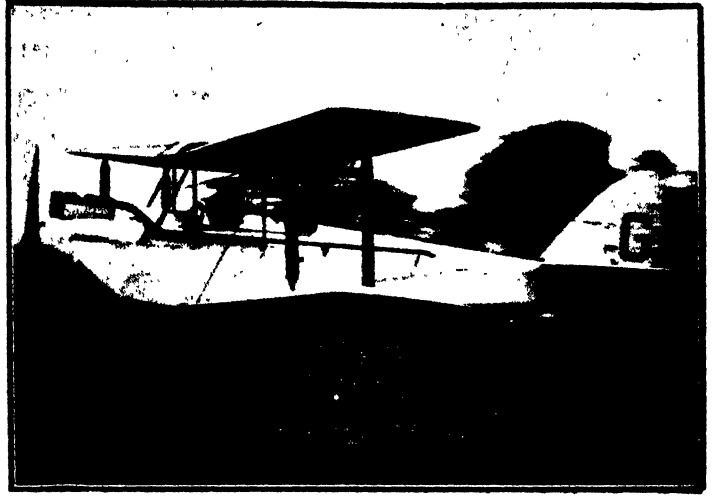
জিপসি মথ এরোপ্লেন

প্রথম-দিন পনেরো মিনিটমাত্র চালনা প্রাক্‌টিশ্ করিলাম; তার পর প্রতিদিন ২০ মিনিট, ৪০ মিনিট করিয়া

এরোপ্লেনের এঞ্জিনের কল-কব্জা
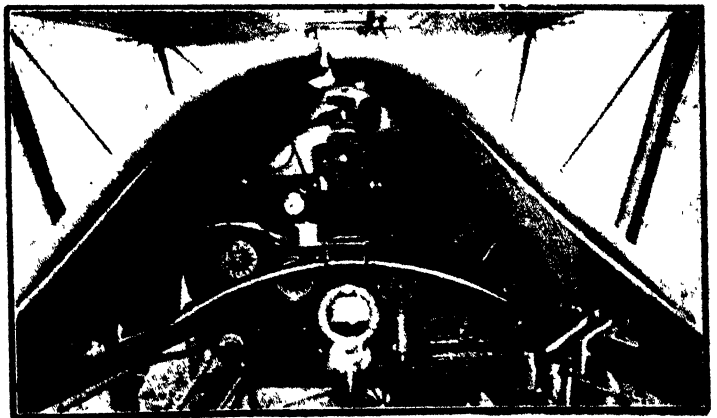
শিক্ষার সময় নির্দ্ধারিত করিয়া আসিলাম। অর্থাৎ শীট বুক্ করিলাম।

আমার শিক্ষকের নাম মিষ্টার ডব্লু, এফ্ ওয়ার্ণার। চমৎকার ভদ্রলোক। শিক্ষা-ব্যাপারে ছাত্রের প্রতি তাঁর দরদ-যত্নের সীমা নাই। আমি তাঁর দরদ ভালো করিয়াই অনুভব করিতেছি।

দু-চারদিন ওড়া পথ ঘুরিয়া নামিবামাত্র আত্মীয়-বন্ধুরা বলিলেন,—কত দূর গেছলে হে? আমি কহিলাম, নীচেকার পৃথিবীর দিকে চাহিবার অবসর পাই নাই। শুধু কল চালাইতেছিলাম, লক্ষ্য ছিল কল-কব্জার উপর। আর উৎকর্ণ ছিলাম শিক্ষকের কথা শুনিবার জন্য প্রতিমুহূর্ত্ত!...

তার পর শিক্ষক বলিয়া দিলেন, নীচের দিকে চাহিবেন মাঝে মাঝে, স্থান নির্ণয়ের জন্য। আমিও ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, তথাস্তু।

শিক্ষকের নির্দ্দেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ওড়া সুরু হইল। হু-হু হাওয়ার বেগ, খুব ঠাণ্ডা হাওয়া! চারিদিকে চাহিলাম, সে কি অপরূপ দৃশ্য! যেমন মাধুরী, তেমনি বৈচিত্র্য! সামনে ঐ গঙ্গা, ঘোলা জল। ঠিক যেন ঘোর বর্ষায় বৃষ্টিপাতের পর দীর্ঘ খানিকটা চালু নালির মধ্য দিয়া ঘোলা জলের স্রোত চলিয়াছে। এরোপ্লেন তখন ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে ছুটিয়াছে—নিজে সে-বেগ বুঝিতে পারিতেছি না। মনে হইতেছে, এক জায়গায় স্থির হইয়া আটকাইয়া আছি, আর প্রোপেলারের ভীষণ ঘড়ঘড় শব্দ চলিয়াছে! বালির পুল মনে হইতেছিল, যেন গেরুয়া রঙের কয়েকটা নুড়ি পড়িয়া আছে। নীচে পাটের প্রেস-হাউশগুলা যেন ছেলেদের ছোট ছোট খেলাঘর!.. গঙ্গা পার হইয়া হাবড়ার দিকে ফিরিলাম। নীচে রেলওয়ে ইয়ার্ড...রেল লাইন যেন সরু কালো সূতা সাজানো আছে...গাড়ী লক্ষ্য হয় না। অনুমানে বুঝিয়া লইলাম, ঐখানটায় হাবড়া! হাবড়ার পুল নজরে পড়িল। উপর হইতে পুলের চেহারাখানা শণের কাছির মত দেখাইতেছিল। তার পর ঐ হাইকোর্ট লাল গেরুয়া মাটীর রং ছেলেদের খেলার Building blockএ রচা খেলার ঘর...ঐ গড়ের মাঠ! চমৎকার সবুজ রংএর ছোট একটু গালিচা পড়িয়া আছে। মনুমেণ্ট? ছোট একটা পেন্সিল যেন কে মাটীতে পুঁতিয়া রাখিয়াছে। আর কলিকাতা সহর? চার-পাঁচতলা সাত-আটতলা বাড়ী...যেন শ্রেণীবদ্ধভাবে কতকগুলা পাথরের নুড়ি পড়িয়া আছে—ছ'লাইনে; মাঝখানে পথ যেন দীর্ঘ ছোট গহ্বর! ককপিটের altitude মিটারের পানে চাহিয়া দেখি, ৫ হাজার ফুট উপরে উঠিয়াছি।

দূরে দক্ষিণে দৃষ্টি পড়িতে দেখি, গঙ্গা পাঁচ-সাত বাঁকে বাঁকিয়া গিয়াছে। বহুদূরে শেষ বাঁকের কাছে আকাশে জলে একাকার মিশিয়া গিয়াছে! পাইলটকে প্রশ্ন করিলাম,—শেষপ্রান্ত যা দেখিতেছি, কত মাইল দূর হইবে?

পাইলট কহিলেন—রূপনারায়ণের মোহানা। প্রায় ৩০ মাইল হইবে। মানুষের দৃষ্টিশক্তি কম। উহার বেশী আর কিছু দেখা সম্ভবও নয়।...

এই Instrument-Boardএর কথা একটু বলা প্রয়োজন। সমস্ত যন্ত্রগুলির হদিশ এই বোর্ডে আছে। Tachometre আছে, কতদূর পাড়ি হইল, তা লক্ষ্য হয় এই ট্যাশোমিটারে; Altimetreএ বুঝা যায় ভূতল হইতে কত ফুট ঊর্দ্ধে উঠিয়াছি, oil-pressure gaugeএ এঞ্জিনে তেলের চাপ ও চলাচল এবং compassএ কোন্ দিকে চলিয়াছি, তা নিরূপিত হয়।...

জানুয়ারি মাসে সর্ব্বসমেত আমি ৯ ঘণ্টা ২৫ মিনিটকাল ধরিয়া শিক্ষকের সহিত উড়িয়াছি। উপরে ওঠা ও চালানো সম্বন্ধে শিক্ষকের কাছে তারিফও পাইয়াছি; এবং ফেব্রুয়ারির গোড়ায় solo flying আমায় দেওয়া হইয়াছিল এক দিন; প্রথম দিনেই নামিবার সময় গাছে ধাক্কা লাগে।

এই landing ব্যাপারটিই সবচেয়ে কঠিন। বিপদের ভয় যা কিছু, তা এই নামিবার সময়। গাছের উপর না পড়ি, মাটীতে ধাক্কা খাইয়া উল্টাইয়া না যাই!...খুব সন্তর্পণে নামা চাই, তবেই যাত্রী ও এরোপ্লেন দুই নিরাপদ। নহিলে যাত্রীরও যেমন হাত-পা ভাঙ্গার ভয়, এরোপ্লেনেরও তেমনি জখম হইবার আশঙ্কা।...

আমার শিখিবার উৎসাহ এতটুকু কমে নাই। প্রত্যহ প্রায় ২০ মিনিট, ৪০ মিনিট ধরিয়া কশরৎ চলিয়াছে এবং প্রতিদিনই মনে নব নব সমস্যার যেমন উদয় হইতেছে, শিক্ষকের শিক্ষায় ও উপদেশে তেমনি সে সমস্যার সমাধানও মিলিতেছে। সোমবারে ছুটী। এরোপ্লেন চলে

না। কল-কব্জার পরীক্ষা ও মেরামত প্রভৃতি সেই দিন হয়।

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। আমার এ বিশ্বাস অটুট যে, এক দিন 'A' লাইসেন্স আয়ত্ত করিবই।

আর একটি কথা বলিয়া আজিকার মত বিদায় লই।

গত ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে দমদমায় বেঙ্গল ফ্লাইইং ক্লাবের প্রথম বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। দর্শনী দিয়া সে অপরূপ উৎসব-আনন্দ অনেকেই উপভোগ করিয়াছেন। সেই উৎসবে looping the loop, exhibition flying, fomation flyingএ যে অসাধারণ ব্যাপার দেখা গিয়াছে, তাহাতে মনে হইয়াছে, মানু শক্তি ও সাহসের বলে কি অসাধ্যসাধনই না করিতে পারে! দুর্ভাগ্যক্রমে উপযুক্ত ক্যামেরা তখন কাছে ছিল না। থাকিলে সে-সব ব্যাপারের বহু চিত্র আজ সকলকে উপহার দিতে পারিতাম।

এই ক্লাবের সভ্য-সংখ্যা এখন তিনশোর বেশী। তিন জন বাঙালী ভদ্রলোক A লাইসেন্স পাইয়াছেন,—শ্রীযুক্ত জে, পি, গাঙ্গুলি, শ্রীযুক্ত এন, এন, সরকার ও শ্রীযুক্ত বি, কে, দাস। ইঁহাদের মধ্যে মিষ্টার গাঙ্গুলি B লাইসেন্সের জন্ম বিলাত গিয়াছেন।

শ্রীভবদেব মুখোপাধ্যায়।

পরলোকে রায় বাহাদুর যশোদা ঘোষ

নোয়াখালির খ্যাতনামা উকীল রায় বাহাদুর যশোদা ঘোষ মহাশয়ের পরলোক-প্রাপ্তিতে পূর্ব্ববঙ্গের এক জন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ জনসেবকের বিশেষ অভাব অনুভূত হইল। এই ধর্ম্মসংহারের এবং বিকৃত শিক্ষা ও মতবাদ-প্রচারের যুগে তাঁহার ন্যায় হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠাবান্ ইংরাজীনবিশ বিরল ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার মৃত্যুতে সনাতন হিন্দু-সমাজের সমূহ ক্ষতি হইল বলিতে হইবে। উচ্চশিক্ষা-লাভকালে তিনি বিশেষ সংস্কৃতানুরাগী এবং শাস্ত্রবিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় নোয়াখালির একাধিক টোল ও চতুষ্পাঠী উপকৃত ও সমৃদ্ধ হইয়াছিল। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে তিনি উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজনীতি জনসাধারণের প্রীতিকর ছিল না, এ কথা সত্য, কিন্তু তিনি তাহা বলিয়া আপনার দিক হইতে দেশসেবায় বিরত ছিলেন না। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট বীরেন্দ্রনাথ সেনের সহায়তায় নোয়াখালির কোন এক দূষিত বাষ্পবিকৃত জলাভূমিকে সমৃদ্ধ ও জনবহুল আবাদ-ভূমিতে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন লোকের অভাবে যে কোন পল্লী ক্ষতিগ্রস্ত হয় সন্দেহ নাই। পরলোকে তাঁহার আত্মা শান্তি লাভ করুক।

রায় বাহাদুর যশোদা ঘোষ

নবদুর্গা

(উপন্যাস)

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন ষড়্‌যন্ত্র

অধর প্রস্থান করিলে পর যে দ্বারবান্ রাত্রি ১০টার সময় রামপুরার বাসায় নবদুর্গাকে পাহারা দিতে আসিল, তাহার নাম রামসিং। সে মোহান্তের এক জন পুরাতন ভৃত্য। তাহার প্রতি মোহান্তের এই হুকুম ছিল যে, হয় সে, নচেৎ বাঞ্ছারাম, দুই জনের এক জন সর্ব্বদাই সদর-দরজায় পাহারায় থাকিবে, যাহাতে বাড়ীতে কেহ ঢুকিতে না পায়, অথবা বউটি না বাহির হইতে পারে, সে বিষয়ে খুব সতর্ক থাকিবে।

পরদিন বেলা ৯টার সময় মোহান্ত চা পান করিতে করিতে বলিলেন, "ওহে, উপায় কিছু ঠাওরালে? আগে যা পরামর্শ ছিল, 'তোমার স্বামী হঠাৎ কলেরায় মারা গেছেন, তোমায় বাপের বাড়ী পৌঁছে দিই চল,' এই ধাপ্পায় তাকে কোনও নির্জ্জন পাড়াগাঁয়ে নিয়ে যাওয়া—এটা তেমন সুবিধে মনে হচ্ছে না। সে মহা ভজকট, আর দেরীও হবে বিস্তর। তার চেয়ে কোনও কৌশলে আজ রাত্রেই তাকে এখানে এনে ফেলা যাক্—ও শুভস্য শীঘ্রং—বুঝলে? দেরী ক'রে কায নেই।"

মাণিক কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "তা হ'লে এক কায করতে হয়, হুজুর। সিদ্ধির সঙ্গে ধুতরোর রস-টস মিশিয়ে, তাকে তাই খাইয়ে, বেহুঁস ক'রে, পাল্কীতে তুলে এখানে আনতে হয়।"

"সিদ্ধি কে তাকে খাওয়াবে?"

"কেন, হরিশের মা।"

"পাবে কোথা?"

"সে বন্দোবস্ত কি আর করা যায় না? অনায়াসে করা যায়। ঐ ত রামসিং রয়েছে, ও ত একটি একের নম্বরের সিদ্ধিখোর।"

"বাড়ীতে ঐ যে আবার ভেজাল জুটেছে। সেই বামনী, আবার তার মেয়ে।"

"হরিশের মাকে বলতে হয়, তুই নবদুর্গাকে সিদ্ধিটুকু খাইয়ে দিয়ে, বামনী আর তার মেয়েকে নিয়ে ঠাকুরদের আরতি দেখতে বেরিয়ে যাবি। তার পর, আমি নিজে উপস্থিত থেকে, রামসিং আর বাঞ্ছারামের সাহায্যে, পাল্কীতে তুলে তাকে এখানে এনে ফেলি।"

"এত সব কাণ্ড, আজ দিনের মধ্যে হয়ে উঠবে কি?'

"কেন হবে না, হুজুর? আমাকে একবার গিয়ে, রাম-সিংএর সঙ্গে আর হরিশের মার সঙ্গে দেখা ক'রে, সব ব্যবস্থা পাকা ক'রে ফেলতে হয়।"

"তুমি সেখানে যাবে কি ক'রে? নবদুর্গা তোমায় চিনবে যে।"

মাণিক বলিল, "হ্যাঁ, তাও ত বটে, ওটা আমার খেয়াল ছিল না।"

মোহান্ত বলিলেন, "দীনে গিয়ে রামসিংকে এখানে ডেকে আনুক। তার সঙ্গে তুমি সকল বন্দোবস্ত কর।"—বলিয়া মোহান্ত দীনু খানসামাকে ডাকিয়া, যথোচিত আদেশ দিলেন। দীনু চলিয়া গেল।

মোহান্ত বলিলেন, "হ্যাঁ, ধুতরোর রস-টস খাওয়ালে ছুঁড়ী ম'রে টরে যাবে না ত?"

সেটা অবিশ্যি মাত্রার উপর নির্ভর করছে। কতখানি সিদ্ধিতে কতখানি রস মেশালে কি রকম নেশা হয়, তাও রামসিং বোধ হয় জানে। ওকেই পূর্ব্বে আমি বলতে শুনেছি, সিদ্ধিতে নেশা না ধরলে, তাতে একটু ধুতরোর রস মেশাতে হয়। শুধু সিদ্ধির নেশা ধরতে দু'ঘণ্টা লাগে, এ বোধ

হয়, দশ পনেরো মিনিটের বেশী লাগবে না। সে আমি ওর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সব ঠিক ক'রে নেবো। যাতে সারা রাত অঘোরে ঘুমোয়, সেই রকম ডোজ তৈরি ক'রে দিতে বলবো।"

মোহান্ত হাসিয়া বলিলেন, "জেগে উঠে কি দেখবে?"

মাণিক বলিল, "দেখবে, সে হুজুরের রাজশয্যায় রাজরাণীর মত শুয়ে আছে।"

"চেঁচামেচি করে যদি?"

"ক্ষেপেছেন? কি জন্যে চেঁচামেচি করবে? সে ত নিতান্ত কচি খুকীটি নয়? সে জানে, ভাঙ্গা কাচ আর জোড়া লাগে না,—মাথা কুটে রক্ত বের ক'রে ফেল্লেও না—তার যা গেছে, তা এ জীবনে আর ফিরে পাবার উপায় নেই। চেঁচামেচি ক'রে লাভ? আর যদিই বা বোকার মত চেঁচামেচি করে, এই এত বড় বাগান-ঘেরা বাড়ী—তার চেঁচামেচি কে-ই বা শুনতে পাবে?"

মোহান্ত বলিলেন, "চেঁচামেচি না-ও যদি করে, কান্নাকাটি করতে পারে ত!"

মাণিক বলিল, "হ্যাঁ, তা পারে বৈ কি! আপনি তাকে গহনা দেখিয়ে, কাপড় দেখিয়ে, মিষ্টি কথা ব'লে শান্ত করবেন। সব কথা খুলেই তাকে বলবেন। বলবেন যে, যে লোক তাকে বিয়ে করেছিল, সে আপনারই চাকর, আপনারই হুকুমে, আপনারই টাকা খেয়ে, আপনাকে এনে দেবার জন্তেই সে বিয়ে করেছিল। এখন আপনার হাতে তাকে সমর্পণ ক'রে, চিরদিনের জন্তে সে চ'লে গেছে।"

মোহান্ত বলিলেন, "দেখা যাক্, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!"

ঘণ্টাখানেক পরে, রামসিং দ্বারবান্ আসিয়া দাঁড়াইল। মোহান্ত তাহাকে বলিলেন, "রামসিং, আমার নিমক তুমি কত দিন খেয়েছ?"

রামসিং সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুর, জিন্দগি ভোর। আমার বাপ আমার আগে রাজসরকারে দ্বারওয়ানি ক'রে গেছে।"

"সে নিমকের কদর তুমি রাখতে পারবে?"

রামসিং পুনরায় সেলাম করিয়া বলিল, "আলবৎ পারবো, হুজুর। আমি জান্ কবুল ক'রেও হুজুরের নিমকের কদর রাখবো।"

"আচ্ছা যাও। এই মাণিক বাবু তোমায় যা যা করতে বলবে, তাই তুমি কোরো। কাম ফতে হলে, কা'ল সকালে শও রূপিয়া তোমার বখশিস। মাণিক, ওকে নিয়ে যাও।"

মাণিক রামসিংকে নিম্নতলে লইয়া গিয়া তাহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিল।

রামসিংহ বলিল, "যে রকম ভাঙ্গের কথা বলছেন, আমি নিজেই তা তৈরি ক'রে দেবো, হুজুর।—যাতে শরীরের কোনও অনিষ্ট না হয়, অথচ সারা রাত বেহুঁস হয়ে ঘুমোয়। কিন্তু পাল্কী-বেহারার কি হবে? আমি এ সহরে নূতন, পাল্কী-বেহারা কোথায় পাওয়া যায়, তা ত জানিনে।"

"আচ্ছা, এ বাড়ীর মালীটাকে জিজ্ঞাসা করা যাক্।"—বলিয়া মাণিক মালীকে ডাকিয়া পাঠাইল। মালী শুনিয়া বলিল, "কাশীধামে পাল্কী-বেহারার দুঃখ?" কোথায় কোথায় পাল্কী-বেহারা পাওয়া যাইতে পারে, তাহা সে বলিয়া দিল।

মাণিক বলিল, "চল রামসিং, আগে পাল্কী-বেহারা ঠিক ক'রে ফেলা যাক।"

গোধুলিয়ায় পাল্কী-বেহারাদের একটা আড্ডা ছিল। অন্বেষণ করিতে করিতে, মাণিক ও রামসিংহ তথায় উপনীত হইল। সর্দার বেহারার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিল, সন্ধ্যার পর বেহারাগণ সকলেই যেন আড্ডায় উপস্থিত থাকে, যে মুহূর্ত্তে দ্বারবান্ ডাকিতে আসিবে, সেই মুহূর্ত্তে উহার সঙ্গে যাইতে হইবে। মাণিক বলিল, একটি স্ত্রীলোক, তার ভারি ব্যারাম। যে বাড়ীতে থাকে, সে বাড়ী অতি জঘন্য। ডাক্তার বলিয়াছে, ও বাড়ীতে থাকিলে রোগিণী বেশী দিন বাঁচিবে না। তাই ভাল বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছে, সেই বাড়ীতে রোগিণীকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

বেহারারা বলিল, "তবে দেরী কেন বাবু? এই বেলা দিনে দিনে লইয়া গেলেই ত হয়!"

মাণিক বলিল, "দেরী কি আর সাধে হচ্ছে, বাপু! সে বাড়ী এখনও খালি হয় নি। সে বাড়ীতে যারা আছে, সন্ধ্যার ট্রেণে তারা কলকাতা যাবে। তাই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেরী করতে হবে।"

সুযোগ বুঝিয়া বেহারা দ্বিগুণ ভাড়ার দাবী করিল। মাণিক তাহাতেই সম্মত হইয়া, অগ্রিম কিছু বায়না দিয়া রামসিংকে লইয়া প্রস্থান করিল।

তার পর হরিশের মাকে কি কি শিখাইতে হইবে, মাণিক রামসিংকে তাহা সবিস্তারে বুঝাইয়া দিল। শেষে বলিল, "না, তুমি যদি কোনও গোলমাল ক'রে ফেল! তার চেয়ে যাও, হরিশের মাকে তুমি সঙ্গে ক'রে নিয়েই এস। মহারাজের বাসাতেই নিয়ে আসবে। বেলা হ'ল, আমি ততক্ষণ গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিই গে। নীচের ঘরেই আমি শুয়ে থাক্‌বো,—যদি ঘুমিয়ে পড়ি ত আমায় উঠিও।"

বেলা যখন ২টা, বাঙ্গারাম তখন হরিশের মাকে আনিয়া হাজির করিল। একটা দড়ির খাটিয়ায় মাণিক আহারান্তে নিদ্রা যাইতেছিল, বাঙ্গারাম তাহাকে জাগাইয়া দিল। মাণিক খাটিয়ায় উঠিয়া বসিয়া, হরিশের মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "রামসিংএর কাছে সমস্ত ব্যাপার শুনেছ ত, হরিশের মা?"

হরিশের মা বলিল, "কতক কতক শুনেছি বৈ কি।"

"কি শুনেছ, আগে বল দেখি?"

সে বলিল, "বন্দোবস্ত হয়েছে, সন্ধ্যার পর বামনী আর তার মেয়েকে কোনও ছুতোয় কোথাও পাঠিয়ে দিতে হবে, তার পর কনে বউকে সিদ্ধি খাইয়ে বেহুঁস ক'রে পাল্কীতে তুলে এ বাড়ীতে এনে ফেলতে হবে।"

মাণিক বলিল, "রামসিং ধুতরোর রস মিশিয়ে সিদ্ধি বানিয়ে দেবে, সেই সিদ্ধি কনে বউকে খাইয়ে দেওয়া তোমারই ভার।"

যদি সিদ্ধি সে খেতে না চায়।"

"তুমি বলবে, এ বাবা বিশ্বনাথের প্রসাদী সিদ্ধি, এ না খেলে পাপ হয়। এই রকম কথা ব'লে তাকে ভুজং দেবে। পারবে না?"

"চেষ্টা করবো।"

মাণিক বলিল, "চেষ্টা নয়, তোমায় করতেই হবে। আচ্ছা, তুমি কি ছুতোয় বামনী আর তার মেয়েটাকে সরাবে বল দেখি?"

হরিশের মা বলিল, "সে জন্যে আমায় বেশী কষ্ট পেতে হবে না। আজ সকালেই বামনী আমায় বলছিল, আজ বিশ্বনাথের মন্দিরে কি একটা কাণ্ড আছে, আজ ভারি ধুমধামে আরতি-টারতি হবে। আমায় বল্লে, হরিশের মা, যাবে তুমি দেখতে? ও বেলায় রান্না-বাড়া সকালে সকালে সেরে নেবো এখন, রাত ৮টার সময় আরতি দেখতে যাওয়া যাবে। কনে বউ বল্লে, আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। আমি তাকে বল্লাম, ভয়ঙ্কর ভীড় হবে, তুমি বউ মানুষ, ভীড়ে যদি হারিয়ে-টারিয়ে যাও, তোমার গিয়ে কায নেই। এ কথা শুনে সে মুখখানি চুণ ক'রে রইল। আমার অবিশ্যি কনে বউকে একলা ফেলে এক মুহূর্ত্ত কোথাও যাবার হুকুম নেই, তখনি আমি মনে মনে মতলব করেছিলাম যে, যাবার সময় আমি বলবো, আমার শরীরটে কেমন ভাল ঠেকছে না, তোমরা মা-বেটীতে যাও, আরতি দেখে এস! তাদের আরতি দেখতে পাঠিয়ে দিয়ে আমি থাকবো। সিদ্ধিটে কখন্‌ খাওয়াব?"

"বামনী আর মেয়ে চ'লে গেলেই।"

"পাল্কী কখন্‌ আসবে?"

"রামসিংকে ব'লে দিও, সন্ধ্যার পরই পাল্কী-বেহারাদের ডেকে এনে, বাড়ীর সামনে রাস্তার অপর ধারে হাজির রাখে। তার পর যখন দেখবে, কনে বৌ বেহুঁস হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন তোমাতে বাঙ্গারামেতে রামসিংএতে ধরাধরি ক'রে ওকে নামিয়ে এনে পাল্কীতে তুলবে। আমিও না হয় সে সময় ওখানে যাব।"

হরিশের মা বলিল, "তাই যাবেন বাবু। আপনি থাকলে আমাদের ভরসা কত বাড়বে। কি বল বাঙ্গারাম?"

বাঙ্গারাম বলিল, "সে ত ঠিক কথা। হাজার হলেও আমরা হলাম ছোটলোক। বাবু, আপনি নিশ্চয়ই সন্ধ্যের পর আসবেন তা হলে।"

মাণিক বলিল, "আমাকে ছুঁড়ী যে আবার চেনে, এই ত হয়েছে মুস্কিল। আচ্ছা, আমি যাব, একটু তফাতে থাকবো—পাল্কীটার কাছে থাকবো। তার পর ছুঁড়ী বেহুঁস হয়ে গেলে তোমরা যখন ডাকবে, সেই সময়ে বাড়ীর ভিতর যাব।"

সমস্ত পরামর্শ স্থির হইলে, হরিশের মা দন্ত বাহির করিয়া বলিল, "কিন্তু বাবু, মহারাজকে ব'লে—আমরা গরীবরা—"

মাণিক বলিল, "সে হবে হবে—তার জন্যে ভেব না। রামসিংকে কাল সকালে একশো টাকা বখশিসের হুকুম হয়ে গেছে। স্বয়ং মহারাজ নিজ মুখে বলেছেন।"

হরিশের মা বলিল, "রামসিং ত মোটে কাল রাত থেকে এ কাযে লেগেছে। আমি যে সেই কালীঘাট থেকে—"

মাণিক বলিল, "কার্য্যসিদ্ধি হোক ত আগে,—তার পর মহারাজ সুবিচার করবেনই, এটা নিশ্চয় জেনে রেখ। এখন যাও তোমরা।"

হরিশের মাকে লইয়া বাঙ্গারাম প্রস্থান করিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রভার সাহস

সে দিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর হরিশের মা একটা স্বাভাবিক কার্য্যে নিম্নতলে গেলে, নিরিবিলি পাইয়া বামুন ঠাকরুণ প্রভা ও নবদুর্গাকে বলিল, "তাই ত, ভারি মুস্কিল যে! উপায় কি করা যায় বল দেখি?"

প্রভাবতী বলিল, "কেন, কি মুস্কিল, মা?"

"আমি ভেবেছিলাম, আজ সন্ধ্যার পর তোকে, কনে বউকে, হরিশের মাকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বনাথের মন্দিরে আরতি দেখতে যাব, তুই কোনও ছুতোয় হরিশের মাকে কোথাও নিয়ে গিয়ে একটু আটকে রাখবি, আমি কনে বউকে সটান কেদারঘাটে নিয়ে গিয়ে ওকে ওর বরের হাতে দিয়ে আসবো। কিন্তু হরিশের মা নিজেও যেতে তেমন রাজি নয়, আর কনে বউকে সে ত যেতে দেবেই না।"

প্রভাবতী বলিল, "এ কথা কখন্ হ'ল?"

"তোরা ভাত খেয়ে দোতলায় নেমে এলি, আমি আর হরিশের মা ভাত খাচ্ছিলাম, তখন এই কথা হ'ল।"

প্রভাবতী বলিল, "তাই ত, বড় ভাবনার কথা যে!"

বামুন ঠাকরুণ বলিল, "এক কায করলে হয়। কিন্তু পেরভা, তুই কি তা পারবি?"

"কি কায মা?"

"তুই আমি সন্ধ্যার পর আরতি দেখতে বেরুব, এটা ত ঠিকই আছে। হরিশের মা বল্লে, তা তুমি সকালে সকালে রান্না-বাড়া সেরে, তোমার মেয়েকে নিয়ে আরতি দেখে এস, আমার শরীরটে ভাল নয়, আমি যাব না, আর কনে বউ ছেলেমানুষ, সেই ভিড়ের মধ্যে পাছে হারিয়ে যায়, ওকে যেতে দিতে আমার সাহস হয় না।"

প্রভা বলিল, "কিন্তু আমাকে কি করতে হবে, তাই বল না মা।"

বামুন ঠাকরুণ বলিল, "আমি ভাবছিলাম কি জানিস। সন্ধ্যের পর, কনে বউয়ের যেন ভয়ানক মাথা ধরলো। আলো নিবিয়ে বিছানায় ও শুয়ে রইলো, তুই রইলি তার কাছে সেবা করতে। তার পর সেই আঁধার ঘরে, তোর কাপড়-চোপড় কনে বউকে পরিয়ে দিলি, কনে বউয়ের কাপড়-চোপড় তুই পোরে বিছানায় শুয়ে রইলি। আমি এসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কনে বউ ঘুমুলো, প্রভা?' তুই বল্লি, 'হ্যাঁ মা, ঘুমিয়ে পড়েছে।' আমি বল্লাম, 'হরিশের মা ত রইল, চল্ তা হ'লে আমরা আরতিটে দেখে আসি।' কনে বউ তোর কাপড় পোরে তুই সেজে বেরুল, আমি কনে বউকে নিয়ে চ'লে গেলাম। কেমন, কনে বউ সেজে এখানে শুয়ে থাকতে তোর সাহস হয়?"

এ প্রস্তাব শুনিয়া প্রভা খানিকক্ষণ খুব হাসিল। শেষে বলিল, "মা, খুব বুদ্ধিই ত করেছ তুমি! আচ্ছা, ২।৩ বছর আগে এখানে কি একটা থিয়েটার হয়েছিল না! সেই থিয়েটারে ঐ রকম কি একটা দেখেছিলাম।"

বামুন ঠাকরুণ বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, চন্দ্রকিশোর না কি পালা হয়েছিল। এক জনের বউকে সায়েবে নৌকো ক'রে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিল, আর এক জন মেয়েলোক নাপতিনী সেজে তাকে ঐ কৌশলে উদ্ধার করতে এসেছিল বটে।"

প্রভা ক্ষণকাল কি ভাবিল, তার পর বলিল, "আচ্ছা মা, তা যেন হ'ল। কিন্তু যখন হরিশের মা দেখবে, কনে বউ নয়, আমি ঘরে শুয়ে আছি, তখন ও ত হাঙ্গামা বাধাতে পারে। আমি তখন কি বলবো?"

"তুই বলবি, কনে বউয়ের আরতি দেখতে যাবার ভারি ইচ্ছা হয়েছিল, তাই তোরা দুজনে পরামর্শ ক'রে ঐ রকম করেছিস। তবে ভয় এই যে, দরোয়ানগুলোকে ডেকে তোকে মারে ধরে যদি!"

প্রভা ঠোঁট উল্টাইয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, "ঈস্—মার-ধোর অমনি প'ড়ে রয়েছে আর কি! আমি আগে থাকতে বঁটিখানা এনে ঘরে রেখে দেবো, যে মারতে আসবে, বঁটি দিয়ে তার নাক কেটে দেবো না! চেঁচামেচি করবো,—ওগো রাস্তার লোক সবাই ছুটে এস গো, আমায় খুন করলে। মার-ধোরের ভয় আমি করিনে।"

বামুন ঠাকরুণ বলিল, "মার-ধোর করতে সাহস করবে না বোধ হয়। তা, তুই যদি সাহস করিস, ঐ রকম উপায়ে

কনে বউকে নিয়ে আমি চম্পট দিই। এ ছাড়া আর ত কোনও উপায় দেখছিনে।"

নবদুর্গা বলিল, "কিন্তু আমি যে প্রভাবতী সেজে বেরুব, হরিশের মা আমায় দেখে চিনতে পারবে না?"

বামুন ঠাকরুণ বলিল, "সে একটু সুযোগ বুঝে বেরুতে হবে। হরিশের মা যখন ঠিক কাছাকাছি না থাকবে, তখন। ধর, যদি সে ও ঘরে থাকে, কি ছাদে কোনও কাযে গিয়ে থাকে, তখন।"

নবদুর্গা বলিল, "তবে সেই ভাল, বামুন ঠাকরুণ। প্রভা ভাই, এই উপকারটি আমার তুমি কর।"

প্রভা হাসিয়া বলিল, "আমি তুমি সাজলে, তোমার ঐ সব নূতন গহনাগুলিও আমায় পরতে হবে ত?"

"তা হবে বৈ কি!"

"তার পর গহনাগুলি আবার তুমি কোন সময় আমার কাছে ফিরে চাইবে ত?"

নবদুর্গা প্রভার হাতখানি ধরিয়া বলিল, "না ভাই, গহনা আমি আর ফিরে চাইব না। ওগুলি সবই তোমার হবে। আমায় বাঁচাও।"

প্রভাবতী বলিল, "আচ্ছা, তবে এই পরামর্শই ঠিক রইল।"

হরিশের মা উপরে আসিয়া বলিল, "আমায় একবার এখুনি বেরুতে হ'ল।"

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "এই ঠিক দুপুরে, কোথায় আবার যাবে তুমি?"

হরিশের মা বলিল, "বাঞ্ছারামের কাছে শুনলাম, আমাদের দেশের কয়েক জন লোক এসেছে, গণেশ মহল্লায় তারা বাসা ক'রে আছে। ওর সঙ্গে গিয়ে তাদের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি।"

বামুন ঠাকরুণ বলিল, "আচ্ছা যাও, বেশী দেরী কোরো না, ভাই।"

"না, দেরী করবো কেন? ঘণ্টাখানেকের ভিতরেই ফিরে আসবো।"—বলিয়া হরিশের মা চলিয়া গেল।

নিরিবিলি পাইয়া ইহাদের পরামর্শের বেশ সুবিধা হইল। তিন জনে বসিয়া সন্ধ্যাবেলার কার্য্য-তালিকা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল।

* * * *

হরিশের মা যখন ফিরিয়া আসিল, তখন বেলা প্রায় চারিটা বাজে। বারান্দা হইতে তাহাকে আসিতে দেখিয়াই, বামুন ঠাক্‌রুণ ছাদে গিয়া, রান্নাঘরে উনানে কয়লা ধরাইতে বসিল। হরিশের মা আসিয়া দেখিল, ক'নে বউ ঘুমাইতেছে, প্রভাবতী বসিয়া সুপারি কুচাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, "ক'নে বউ কতক্ষণ ঘুমুচ্ছে?"

"এই ঘণ্টাখানেক হবে। তুমি চ'লে যাবার পরেই শুলো। তোমার দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল, হরিশের মা?"

"হ্যাঁ, হ'ল বৈ কি। তাদেরই সঙ্গে কথাবার্ত্তাতেই ত ফিরতে দেরী হ'ল। তোমার মা কোথা?"

"উপরে, রান্নাঘরে।"

হরিশের মা ছাদে গিয়া বলিল, "এ বেলা কি রান্না হবে গো, বামুন ঠাক্‌রুণ?"

বামুন ঠাক্‌রুণ বলিল, "ক'নে বউকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি খাবে এ বেলা, সে বল্লে, এ বেলা ভাত খেতে ইচ্ছে নেই, দু'খানা পরোটা ভেজে দিও বামুন ঠাক্‌রুণ, ও-বেলাকার ডাল-তরকারী যা আছে, তাই দিয়ে খাব এখন। তাই শুনে পেরভা বল্লে, আমিও তা হ'লে দু'খানা পরোটাই খাব। তুমি কি খাবে, হরিশের মা?"

"আমি একমুঠো ভাতই খাব। ভাত-ভুকো বাঙ্গালী আমরা, ও পরোটা-ফরোটা খেলে আমাদের পেটই ভরে না। ও-বেলার ভাত চারটি আছে, না?"

বামুন ঠাক্‌রুণ বলিল, "হ্যাঁ, ভাত যথেষ্ট রয়েছে। জল দিয়ে রেখেছি।"—বলিয়া ভাতের হাঁড়ির সরা খুলিয়া দেখাইল।

হরিশের মা বলিল, "ঐ ভাতেই আমার হবে এখন। পরোটা যখন হচ্ছেই, তখন তুমি আর রাত্রে মুড়ি-গুড় কেন খাবে ভাই, তুমিও নিজের জন্যে দু'খানা পরোটাই ভেজে নিও এখন।"

বামুন ঠাক্‌রুণ বলিল, "তা হ'লে চারটি ময়দা আনতে দাও। আর, ঘি-ও পোয়াটেক! ঘি বাড়ন্ত।"

হরিশের মা নীচে গিয়া, বাঞ্ছারামকে ডাকিয়া জিনিষপত্র আনিতে দিল।

প্রদীপ জ্বালিবার সময় পরোটা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া গেল। বামুন ঠাক্‌রুণ সে সব ঢাকা দিয়া, দোতলায় গিয়া

বলিল, "পরোটা গরম গরম দু'খানা খেয়ে নাও না ক'নে বউ।"

নবদুর্গা বলিল, "এখনও আমার ক্ষিদে পায়নি বামুন মা। তোমরা আরতি দেখতে কখন্ বেরুবে?"

বামুন ঠাকরুণ বলিল, "সে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরী আছে। এর মধ্যে যদি তোমার ক্ষিদে পায় ত তোমায় বেড়ে দিয়েই যাব। নয় ত তুমি নিজেই বেড়ে-গুড়ে খেও।"

হরিশের মা বলিল, "তোমার চুলটা বেঁধে দিই, এস না ক'নে বউ।"

নবদুর্গা বলিল, "আজ আর চুল বেঁধে কি হবে হরিশের মা। বিশেষ শরীরটেও তেমন ভাল লাগছে না। মাথাটা ধরেছে।"

"মাথাটা ধরেছে বুঝি? এত ক'রে বলি যে ভিজে মাথায় শুয়ো না, তা ত তুমি শুনবে না। তুমি চুপটি ক'রে ব'সে থাক না, আমি তোমার চুলগুলো বেঁধে দিই।"—ক'নে বউকে ভাল করিয়া সাজাইয়া গুজাইয়াই মোহান্ত-সকাশে প্রেরণ করা হরিশের মার ইচ্ছা। তাই সে একটু পীড়াপীড়িই করিতে লাগিল।

নবদুর্গা ভাবিল, আজ সে স্বামি-সন্দর্শনে যাইতেছে। একে ত প্রভাবতীর বস্ত্রাদি পরিয়া, অলঙ্কারশূন্য হইয়া যাইতে হইবে, তার উপর চুলের এই অবস্থায় সে যে নেহাৎ পেত্নীর মত দেখাইবে। তাই সে আর আপত্তি করিল না, বলিল, "আচ্ছা, দাও তবে চুলগুলো বেঁধে।"

চুল বাঁধা শেষ হইলে হরিশের মা বলিল, "নাও, কাপড়-খানা ছেড়ে ফেল, এই বেলা কেচে দিই। কলে আবার জল চ'লে যাবে।"

নবদুর্গা কাপড় ছাড়িয়া আসিল। সে জানিত, তাহার লাল শান্তিপুরী শাড়ীখানির উপর প্রভার লোভ আছে। তাই কাপড়খানি তাহাকে দান করিবার অভিপ্রায়ে সেই শাড়ীখানিই বাহির করিয়া পরিল। দেখিয়া হরিশের মা মনে মনে খুসী হইল।

খানিক পরে নবদুর্গা বলিল, "উহুহু, মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে, হরিশের মা। আমি একটু শুই। হারিকেনটা নিবিয়ে দাও, বা বাইরে নিয়ে গিয়ে রাখ, চোখে আলো সহ্য হচ্ছে না। আর প্রভাকে ডেকে দাও, মাথাটা একটু টিপে দিক।"

হরিশের মা আলো বাহিরে রাখিয়া, প্রভাকে ডাকিয়া দিল। প্রভা নবদুর্গার শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষার অভিনয় করিতে লাগিল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে বামুন ঠাকরুণ বলিল, "আমাদের বেরুবার ত সময় হ'ল। দেখ ত, ক'নে বউ ঘুমুলো কি না, পেরভাও যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে।"

হরিশের মা অন্ধকার ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ প্রভা, ক'নে বউ কি ঘুমুলো?"

প্রভা ও নবদুর্গার তখন বস্ত্রালঙ্কার পরিবর্ত্তন শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রভা বলিল, "হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়েছে।"

"তবে তোমার মার সঙ্গে যাও, আরতি দেখে এস।"

এই সময়ে বামুন ঠাকরুণও সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলিল, "পেরভা, আয় বাছা। হরিশের মা, একটা পাণ দাও না ভাই, খেতে খেতে যাই।"

হরিশের মা ও ঘরে পাণ আনিতে গেল। প্রভা-বেশিনী নবদুর্গা বাহির হইতেই বামুন ঠাকরুণ তাহাকে ঠেলিয়া সিঁড়ির কাছে পাঠাইয়া দিল, নবদুর্গা সেখানে গিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

হরিশের মা পাণ আনিয়া দিল। তাহা মুখে দিয়া, বামুন ঠাক্রুণ অগ্রসর হইয়া বলিল, "আসি তা হ'লে ভাই।"—বলিবামাত্র নবদুর্গা দুরু দুরু বক্ষে সিঁড়ি নামিতে আরম্ভ করিল, বামুন ঠাক্রুণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

হরিশের মা বাহির-বারান্দায় গিয়া দেখিল, বামুন ঠাকরুণ ও তথা-কথিত প্রভা ক্ষিপ্রপদে চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে তাহারা মোড়ের বাঁকে অদৃশ্য হইল। রাত্রি তখন ৮টা।

হরিশের মা পা টিপিয়া টিপিয়া নবদুর্গার ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিল, শয়নকারিণীর নিশ্বাস গভীরভাবে পড়িতেছে।

হরিশের মা তখন নামিয়া দ্বারবান্‌কে চুপি চুপি বলিল, "ও রামসিং, পাল্কী এখনও এল না।"

রামসিং বলিল, "এই যে সিদ্ধি ঘুঁটছি। এটা শেষ হলে, সিদ্ধি খাইয়ে পাল্কী ডাকতে যাব।"

হরিশের মা বলিল, "ওঃ, এতখানি সিদ্ধি কি হবে ?"

"আমরাও যে খাব কি না, আমি একটু খাব, বাঙ্গারাম একটু খাবে।"

"ধুতরোর রস মিশিয়েছ না কি ?"

"রাম রাম, তা কেন ? যে গেলাসে কনে বউয়ের সিদ্ধি ঢালবো, সেই গেলাসে ধুতরোর রস মেশাব। এই দেখ না, ধুতরো এনে রেখেছি, এখনো এ পেষাও হয় নি।"

হরিশের মা বলিল, "তবে রামসিং, আমাকেও এক গ্লাস দিও। তোমাদের ঐ ভাল সিদ্ধি।"

রামসিং বলিল, "বহুৎ আচ্ছা। ঘরে চিনি আছে ? বাজার থেকে চিনি আমি এক পয়সার এনেছি, কিন্তু বোধ হচ্ছে কম পড়বে।"

হরিশের মা বলিল, "আচ্ছা, চিনি আমি এনে দিচ্ছি, দাঁড়াও।"

রামসিং বলিল, "যে গেলাসে তুমি খাবে, সে গেলাসটাও নিয়ে এস ঐ সঙ্গে।"

"আচ্ছা"—বলিয়া হরিশের মা উপরে গেল। দোতলায় নবদুর্গার ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিল, শয়নকারিণীর নিশ্বাস তেমনি গভীরভাবেই পড়িতেছে।

চিনি ও গেলাস লইয়া হরিশের মা আবার নীচে নামিয়া গেল। সিদ্ধি তখন গোঁটা হইয়া গিয়াছে। রামসিং উহাতে জল মিশাইয়া, নিজেদের লোটায় বেশ করিয়া ঢাল-উপর করিতেছে। উহা শেষ হইলে হরিশের মার গ্লাসে খানিকটা ঢালিয়া দিয়া বলিল, "খেয়ে ফেল, আমি ততক্ষণ ধুতরোটা থেঁতো করি।"

গেলাস হাতে লইয়া হরিশের মা বলিল, "বেশী নেশা হবে না ত, রামসিং ?"

"না, পাতলা আছে।"

হরিশের মা গেলাসটি শেষ করিয়া উহা নামাইয়া রাখিল।

রামসিং ধুতুরা থেঁতো করিয়া, একটি ন্যাকড়ায় উহা বাঁধিয়া, খানিকটা রস হরিশের মার শূন্য গ্লাসে ঢালিয়া দিল। তার পর লোটা হইতে সিদ্ধি ঢালিয়া, একটা মাটীর ভাঁড়ের সাহায্যে বেশ করিয়া ঢাল-উপর করিয়া লইল। গ্লাস হরিশের মার হাতে দিয়া বলিল, "যাও, তাকে খাইয়ে এস।"

"তুমি তা হ'লে পাল্কী আনতে যাও।"

"এই যে, সিদ্ধিটুকু খেয়ে নিই, নিয়েই যাচ্ছি।"

হরিশের মা গ্লাস লইয়া দ্বিতলে নবদুর্গার ঘরে গিয়া দেখিল, নিশ্বাস সেইরূপ গভীরভাবেই পড়িতেছে। বিছানার পাশে বসিয়া শয়নকারিণীর গা ঠেলিয়া বলিল, "কনে বউ, ও কনে বউ।"

উত্তর হইল—"উঁ।"

"মাথা ধরাটা একটু সারলো ?"

"উঁহু।"

"এক কায কর দেখিন। রামসিং বাবা বিশ্বনাথের মন্দির থেকে এই প্রসাদী সিদ্ধি এনেছে। তোমার মাথা ধরেছে শুনে ও বল্লে, এই সিদ্ধি একটু খাইয়ে দাও গে, এখনি মাথা ধরা ছেড়ে যাবে।"

আজ যে নবদুর্গাকে অচেতন করিয়া মোহান্তের ভবনে লইয়া যাইবার ষড়্‌যন্ত্র হইয়াছে, ইহা অবশ্যই প্রভা কিছুই জানিত না। সিদ্ধি পান করিতে সে খুবই ভালবাসিত, এবং সিদ্ধি হজম করিতে পারিতও ভাল। সে হরিশের মার হাত হইতে গ্লাস লইয়া চোঁ চোঁ করিয়া উহা পান করিয়া ফেলিল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে পাল্কী আসিয়া পৌছিল। রাত্রি ১০টার সময়, প্রভার অচেতন দেহ রামসিং পাঁজা-কোলা করিয়া তুলিয়া নীচে নামিয়া পাল্কীর মধ্যে শোয়াইয়া দিল।

তখন কাশীর সীমানা হইতে কয়েক মাইল দূরে, অধরের ভাড়া-করা বজরা (গ্রীণবোট) অনুকূল পবনে গঙ্গাবক্ষে তর তর করিয়া ছুটিতেছে। কি ফন্দি করিয়া নবদুর্গাকে লইয়া আসিল, রুদ্ধ কামরার ভিতরে বসিয়া বামুন ঠাকরুণ হাতমুখ নাড়িয়া তাহাই অধরের নিকট সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-রোটারী-মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

—"কলসী লয়ে কাঁখে
পথ সে বাঁকা—" রবীন্দ্রনাথ।

বসুমতী-চিত্রবিভাগ]

[শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেন গুপ্ত।

৮ম বর্ষ] চৈত্র, ১৩৩৬ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

পারমার্থিক রস

৬

শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি ত্রিবিধ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই শক্তিত্রয়ের মধ্যে হ্লাদিনীশক্তির সহিত পরমার্থ-রসের সম্বন্ধ বড়ই ঘনিষ্ঠ, সুতরাং তাহারই আলোচনা এক্ষণে করা যাইতেছে। অধ্যাত্মতত্ত্বদর্শিগণ শ্রীভগবান্‌কেই সুখ বা আনন্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের মতে সংসারের সকল জীবই তাঁহাকে যে চাহে, তাঁহাকে যে ভালবাসে, তাঁহাকে পাইতেছি না বা পাইব না, এই ভাবনায় ব্যাকুল হয়, তাহা মানিতেই হইবে।

মানবমাত্রই এ সংসারে জানিয়া শুনিয়া যাহা কিছু করে, তাহা সকলেরই উদ্দেশ্য যে সুখভোগ, তাহা ত আমরা সকলেই বুঝি। শ্রীভগবান্‌ই যদি সুখ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে পাইবার জন্য বা নিত্যপ্রাপ্ত তাঁহাকে পাইয়াছি বলিয়া অনুভব করিবার জন্য, আমরা যে সকলেই সকলপ্রকার জ্ঞানপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকি, তাহাও স্থির; কিন্তু, তাই বলিয়া আমরা যে সকলেই ভগবৎপ্রেমিক বা শুদ্ধ ভক্ত, তাহা বলিতে পারা যায় না। কেন যে এমন হয়, ইহারই উত্তর দিতে যাইয়া পারমার্থিক রসতত্ত্ববিদ্ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, হ্লাদিনী-শক্তির প্রেমময়ী বৃত্তির অনাস্বাদনই হইতেছে ইহার কারণ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের এই উক্তির মধ্যে যে গভীর দার্শনিকতা এবং অখণ্ডনীয় সত্য নিহিত রহিয়াছে, এক্ষণে তাহারই অনুশীলন করা যাইতেছে।

বল দেখি—এ সংসারে সুন্দর কে? মানুষ অনাদিকাল হইতে সুন্দরের উপাসনা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া চলিতেছে, কবি সুন্দরকে অনুভূতির গোচর করিয়া তাহারই সৌন্দর্য্য অপরকে অনুভব করাইবার জন্য ভাষার সাহায্য গ্রহণ করে, যাহার ভাষা নিজের অনুভূত সৌন্দর্য্যকে অনায়াসে অপরের হৃদয়রাজ্যে ভাবের সিংহাসনে বসাইয়া একচ্ছত্রী সাম্রাজ্য করাইতে সমর্থ হয়, এ সংসারে সেই ত মহাকবি বলিয়া প্রসিদ্ধি

লাভ করিয়া থাকে। শিল্পী নিজের কল্পনা ও প্রতিভাবলে সৌন্দর্য্যের প্রতিমা মনের মধ্যে গড়িয়া অপরকে তাহাই বুঝাইবার জন্য—হয় প্রস্তর, না হয় মাটী, কিম্বা কাষ্ঠ, অথবা পটের সাহায্য গ্রহণ করিয়া সেই প্রতিমাকে ফলাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। শিক্ষার বলে, সাধনার প্রভাবে জড়-প্রস্তর, মাটী, কাষ্ঠ বা পটে সেই তাহার মানসী প্রতিমা যদি সজীব হইয়া উঠে, তাহা হইলেই সেই শিল্পী মহাভাস্কর—মহামার্ত্তিক—মহাসূত্রধর বা মহাচিত্রকর বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়, তাহার শিল্পকলা-কৌশল এ সংসারে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই প্রশংসাভাজন হইয়া থাকে। এই সকল শিল্পী যখন দল বাঁধিয়া একত্র সমবেত হইয়া নিজ নিজ কল্পিত ব্যষ্টি সৌন্দর্য্যনিবহের সম্মিলনে একীভূত সমষ্টি মানস-সৌন্দর্য্যপ্রতিমাকে গঠিত করিয়া সহস্র সহস্র—লক্ষ লক্ষ মানবের অনুভূতির যোগ্য করিয়া সেই বিরাট মানসী প্রতিমার জীবন দান করিতে সমর্থ হয়, তখনই পৃথিবীতে পিরামিড, তাজমহল, আমখাস, দেওয়ানখাস, ভুবনেশ্বর-মন্দির, রামেশ্বর-তোরণ প্রভৃতি ভুবনবিখ্যাত বিস্ময়াবহ বিরাট বস্তনিচয় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

কাব্য, নাটক ও শিল্পকলা-কৌশল প্রভৃতি Fine art,—এ সংসারে যাহাকে লইয়া, সেই সুন্দর বস্তু যে কিরূপ—তাহার নিরূপণ করিতে যাইয়া আমরা কিন্তু, বিষম সমস্যার মধ্যে পড়িয়া যাই, পৃথিবীর সৌন্দর্য্যতত্ত্ববিদ্ মহা মহাপণ্ডিতগণ এই সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইতে যাইয়া এত বিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া বসিয়াছেন যে, তাহাদের মধ্যে সার বাছিয়া লইয়া সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব নিরূপণ করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার না হইলেও তাহা যে নিতান্ত কৃচ্ছ্রসাধ্য, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কিরূপ মতভেদ হইয়াছে, তাহাই অগ্রে দেখাইয়া পরে আমাদের বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মত কি, তাহা দেখান যাইতেছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত Baumgarten (বম্‌গার্টেন) বলেন—

"The aim of beauty itself is to please and excite a desire,

আনন্দকে আস্বাদিত করাইয়া কামনার উৎপাদন-সৌন্দর্য্যের উদ্দেশ্য বা কার্য্য হইয়া থাকে।

তিনি আরও বলিয়াছেন—

"That highest embodiment of beauty is seen by us in nature"—"That the highest aim of art is to copy nature."

আমরা সৌন্দর্য্যের সমুন্নততম মূর্ত্তিকে স্বভাবের মধ্যেই দেখিয়া থাকি; সুতরাং স্বভাবের প্রতিকৃতি-নির্ম্মাণই সমুন্নততম কলা-কুশলতার পরিণতি।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে জর্ম্মণীর কলাতত্ত্ববিদ্ বম্‌গার্টেন সৌন্দর্য্যের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারে আমরা ইহাই বুঝিয়া থাকি যে, যাহা হইতে আমরা আনন্দ পাই এবং যাহা আনন্দ উৎপাদন করিয়া আমাদের হৃদয়ে আনন্দের উত্তরোত্তর অনুভূতির জন্য তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেয়, তাহারই নাম সৌন্দর্য্য। কবি, ভাস্কর ও চিত্রকর প্রভৃতি স্বভাবে বা প্রাকৃতরাজ্যে এই সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া, অসাধারণ কলাকুশলতা দ্বারা তাহাই অপরের আনন্দের জন্য অঙ্কিত করিয়া থাকেন মাত্র—সৌন্দর্য্য স্বভাবের ধর্ম্ম, তাহাকে দেখিতে হইলে—বুঝিতে হইলে, অনুভূতির বিষয় করিয়া আস্বাদন করিতে হইলে, স্বভাবেরই শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। সৌন্দর্য্য স্বভাবসিদ্ধ বস্তু, তাহার সৃষ্টি করা যায় না। তাহার প্রতিকৃতি সৃষ্টি করিবার জন্যই কবি প্রভৃতির সাধনা হইয়া থাকে। বম্‌গার্টেনের এইরূপ সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের সিদ্ধান্ত মিলে কি না, এ বিচার করিতেছি না, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে যাইয়া তিনি যে অবতরণিকা করিয়াছেন, তাহার একটু আলোচনা অগ্রে করিতে চাহি।

তিনি বলিয়াছেন,—

"The object of Logical knowledge is truth, the object of aesthetic (sensuous) knowledge is beauty."

নৈয়ায়িক বা যথার্থ প্রমাণ হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানের বিষয় সত্য হইয়া থাকে, আর ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান যাহাকে প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহারই নাম সৌন্দর্য্য হইয়া থাকে।

বম্‌গার্টেনের এইরূপ সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করিতে হইলে বলিতে হয়, সৌন্দর্য্য এবং সত্য এক বস্তু নহে; পারমার্থিক প্রমা সৌন্দর্য্যকে বুঝাইতে পারে না, কিন্তু কামনারঞ্জিত ইন্দ্রিয়জনিত ভ্রান্তিস্থলাভিষিক্ত জ্ঞানই সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করে বলিয়া সৌন্দর্য্য—সত্য বা অবাধিত বস্তু নহে। ফলে দাঁড়াইল যাহা সত্য, তাহা সুন্দর নহে এবং যাহা সুন্দর, তাহা সত্য নহে। এইরূপ সিদ্ধান্তের প্রতি যাঁহার আস্থা আছে, তাঁহার নিকট হ্লাদিনী শক্তির পরিচয়প্রদান-চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র; কারণ,

হ্লাদিনীর স্বভাব হইতেছে এই যে, তাহা যে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি করাইবার জন্য, সংসারে প্রতি জীবের হৃদয়ে বৃত্তি-রূপে পরিণত হইবার জন্য অনাদিকাল হইতে ব্যাপৃত রহিয়াছে, সেই সৌন্দর্য্যই ধ্রুব সত্য এবং সেই সত্যের উপরই বিশ্বসংসার প্রতিষ্ঠিত। যথাসময়ে এই বিষয়ের আলোচনা বিস্তৃতভাবে অগ্রে করা যাইবে।

বম্‌গার্টেন আরও কি বলিতেছেন, দেখা যাক, তিনি বলিতেছেন—

"Beauty is the Perfect (the Absolute) recognised through the senses; Truth is the Perfect perceived through reason; Goodness is the Perfect reached by moral will."

নিরতিশয় যে সৌন্দর্য্য, তাহা ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানের সাহায্যে অনুভূত হইয়া থাকে; নিরতিশয় যে সত্য, তাহা যুক্তির সাহায্যে প্রত্যক্ষীকৃত হয়, আর নিরতিশয় যে মঙ্গল, তাহা নৈতিক জ্ঞানের দ্বারা লব্ধ হয়।

এই উক্তির সহিতও হ্লাদিনীর উপাসক ভক্ত দার্শনিকগণের ঐকমত্য হওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ, ভক্ত দার্শনিকগণের সিদ্ধান্তই হইতেছে যে, যাহা নিরতিশয় সত্য, যাহা নিরতিশয় সুন্দর ও যাহা নিরতিশয় মঙ্গল, তাহা একই বস্তু, নিরতিশয় সত্য, নিরতিশয় সুন্দর ও নিরতিশয় মঙ্গলস্বরূপ এক অদ্বিতীয় শ্রীভগবানকে আস্বাদিত করাইবার অনুকূল যে শক্তি শ্রীভগবানে নিত্য ব্যাপৃত রহিয়াছে, তাহারই নাম হ্লাদিনী শক্তি। হ্লাদিনীর আবির্ভাব যে পর্য্যন্ত মানব-হৃদয়ে না হয়, সে পর্য্যন্ত মানব নিরতিশয় সত্য, নিরতিশয় সুন্দর ও নিরতিশয় মঙ্গলের অনুভব করিতে সমর্থ হয় না।

সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল যে এক বস্তু নহে, উহা তিনটি বিভিন্ন বস্তু, বম্‌গার্টেনের এইরূপ সিদ্ধান্ত য়ুরোপে কিন্তু, বেশী দিন সমাদর পায় নাই। তাঁহারই সম-সাময়িক এবং অপেক্ষাকৃত নব্য কলাতত্ত্ববিদ্‌ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সলজর (Sulzer) বম্‌গার্টেনের সহিত একমত হইতে না পারিয়া স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন—

"Only that can be considered beautiful which contains goodness, the aim of the whole life of humanity is welfare in social life. This is attained by the education of the moral feelings, to which end art should be subservient. Beauty is that which evokes and educates this feeling."

যাহা মঙ্গলকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকে, তাহাই কেবল সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। সামাজিক যাহা হিতকর, তাহ সমগ্র মানব-জীবনের লক্ষ্য, নৈতিক মনোবৃত্তির শিক্ষার দ্বার সেই সমাজহিতকর বস্তু লব্ধ হইয়া থাকে, সমগ্র কলাশাস্ত্রে প্রসারও ইহারই অধীন হওয়া উচিত। তাহাই প্রকৃ সৌন্দর্য্য—যাহা এইরূপ নৈতিক মনোবৃত্তিকে জাগাইয়া দে এবং শিক্ষিত করে।

সলজর সুন্দর ও মঙ্গলকে বিভিন্ন বলিয়া মানিতে পারে নাই—প্রত্যুত মঙ্গল যাহার মধ্যে প্রবিষ্ট নহে, তাহা সুন্দর হইতে পারে না, এইরূপ মত প্রকাশ দ্বারা বম্‌গার্টেনে মত খণ্ডন করিয়াছেন। সলজর সাহেবের পর মেণ্ডেলস (Mendelssohn) আরও এক পদ অগ্রসর হইয়াছেন—

তিনি বলিয়াছেন—

"Art is the carrying forward of the beautiful, obscurely recognised by feeling till it becomes the true and good. The aim of art is moral perfection."

তাহারই নাম কলা-কৌশল, যাহা সুন্দরকে এগিয়ে নিয়ে চলে, ঐন্দ্রিয়িক বৃত্তি কিন্তু, তাহাকে অস্পষ্টভাবেই চিনিতে পারে—পরে তাহা যথার্থ সত্য ও মঙ্গলরূপে পরিণত হয়, সুতরাং নৈতিক পরিপূর্ণতাই হইতেছে কলা-কৌশলের (আর্টের) চরম লক্ষ্য।

এখানে দেখা যাইতেছে—সুন্দর, সত্য ও মঙ্গল একই হইয়া উঠিয়াছে। সুন্দর, সত্য ও মঙ্গলের মধ্যে যে কোন পার্থক্য আছে, তাহা মেণ্ডেল্‌সন মানিতেছেন না।

সৌন্দর্য্য যদি ঐন্দ্রিয়িক বৃত্তিবেদ্য হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত মঙ্গল ও সত্যের সহিত কোন প্রকার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হইতেই পারে না। এই প্রকার মত কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে য়ুরোপে বেশ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়—

উইনকেলম্যান (Winekelmann) নামে সুপ্রসিদ্ধ কলাতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিত বলিয়াছেন—

"The Law and aim of all art is beauty only, beauty quite separated from and indipendent of goodness."

নিখিল কলার একমাত্র নিয়তি ও লক্ষ্য হইতেছে সৌন্দর্য্য, কিন্তু, এই সৌন্দর্য্য-মঙ্গল হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্‌ এবং ইহা মঙ্গল দ্বারা নিয়ন্ত্রিতও নহে।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী ও হলাণ্ডে

যে সকল সৌন্দর্য্যতত্ত্বানুসন্ধিৎসু দার্শনিক এই বিষয়ে বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এইরূপ ধারণা করিতেন যে, সৌন্দর্য্য বহির্জ্জগতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিয়া থাকে এবং তাহা কোন কোন স্থলে মঙ্গলের সহিত অল্প বা বিস্তৃতভাবে মিশ্রিতও হইতে পারে অথবা এই সৌন্দর্য্য ও মঙ্গল একই উপাদান হইতে সমুদ্ভূতও হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিষয়ে যে গবেষণা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত আলোচনা এ ক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে। ঐ সময়ে মহামতি বর্ক—(Burke)

'Philosophical Inquiry in to the origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful'

নামে একখানি সুন্দর গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি স্পষ্টভাবেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"The sublime and beautiful, which are the aim of art, have their origin in the promptings of self-preservation and of society. These feelings examined in their source are means for the maintenance of the race through individual. The first (self-preservation) is attained by nourishment defence and war; the second (society) by intercourse and propagation. Therefore self-defence and war, which is bound up with it, is the source of the sublime; sociability and the sex-instinct which bound up with it is the source of beauty."

কলা-সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইয়া থাকে উদার ও সুন্দর। সেই উদার ও সুন্দর বস্তুর মূলীভূত উপাদান কি, তাহার অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, আত্মরক্ষা ও সমাজসংরক্ষণপ্রবৃত্তির উদ্দীপনাই ইহার মূলীভূত কারণ। এই সকল মানসী বৃত্তির মূলকারণ বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, ব্যক্তির মধ্য দিয়া সমষ্টি বা জাতির রক্ষা ও পালন করিবার হেতু ইহারাই হইয়া থাকে। প্রথম অর্থাৎ ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার হেতু হইয়া থাকে অন্নপানাদি, বিপদ্‌বিনিবারণ ও যুদ্ধ। (এই কয়টি বস্তুর সহিত ইহার সম্বন্ধ অনিবার্য্যই হইয়া থাকে) দ্বিতীয় অর্থাৎ জাতি বা সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে পরস্পর সংমিলন ও উৎপাদন একান্তভাবে অপেক্ষিত হইয়া থাকে। সেই কারণে আত্মরক্ষা ও যুদ্ধ ইহার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ থাকে। সুতরাং ইহা উদারভাবের উদ্ভাবয়িতা হইয়া থাকে। অপর পক্ষে সামাজিকতা ও স্ত্রী বা পুরুষপ্রকৃতিগত ভোগলিপ্সা—যাহা ইহার সহিত নিত্যসম্বদ্ধ, তাহাই সৌন্দর্য্যসৃষ্টির উপাদান হইয়া থাকে।

সৌন্দর্য্যতত্ত্বের এই প্রকার অনুশীলনের দ্বারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত যে সমুন্নতি সাধিত হইয়াছিল, এই প্রসঙ্গে সে বিচারের আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমি মনে করি না, কিন্তু, পারমার্থিক রসের সহিত এইরূপ সৌন্দর্য্যের কোন অপেক্ষণীয় সম্বন্ধ যে থাকিতে পারে না, তাহাই দেখাইবার জন্য এইখানে আমি ইহার সংক্ষিপ্তভাবে অবতারণ করিলাম। যে সৌন্দর্য্যের উপর হ্লাদিনীবৃত্তির বিকাশ নির্ভর করিয়া থাকে, তাহা বাহ্য সৌন্দর্য্য হইতে সম্পূর্ণরূপে বিলক্ষণ, বাহ্যজগতে সেই সৌন্দর্য্যের এক কণাও সম্যক্‌ভাবে সমুপলব্ধ হইতে পারে না—ইহাই অগ্রে প্রতিপাদিত হইবে তাহার পূর্ব্বে বাহ্য-সৌন্দর্য্যবাদী পাশ্চাত্য মনীষিগণের সৌন্দর্য্যতত্ত্ব এই প্রবন্ধে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইতেছে মাত্র। [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

চৈত্র-চিত্র

রসস্পর্শ সুখময় সুন্দর পবন
পিক-পাপিয়ার গানে স্পন্দিত ছন্দিত,
ললিত কোমল পর্ণ-মুকুলে গ্রন্থিত—
মোর বিশ্বকুঞ্জ আজি আনন্দ-ভবন।

প্রভাতের স্বর্ণরৌদ্রে পড়িছে ঝরিয়া
কনক-ধুতুরা হতে ইন্দ্রনীল-ভাতি!
স্বপ্নে প্রাণে জাগে কার দিব্য অনুভূতি—
কে আসে হৃদয়ে মোর মূরতি ধরিয়া।

নহে ছায়া নহে মায়া স্বপনের ছবি
বিশীর্ণ রসাল-শাখে সম্মোহন বাণ,—
বিশ্ব-পুষ্প-রেণুব্যাপ্ত বেদিকা পাষাণ—
আমি যারে খুঁজি পূজি সে নহে মানবী।

বাড়ে বেলা বহে বায়ু ক্লান্ত ফুলগুলি,
মদন-ভস্মের স্মৃতি জাগাইছে ধূলি।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।
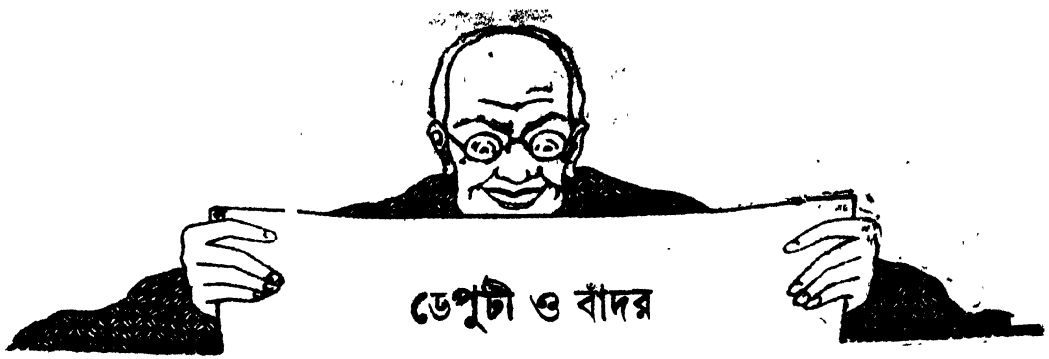
ডেপুটী ও বাঁদর

রাধানগর জেলার সিনিয়ার ডেপুটী সত্যকিঙ্কর বাবু এক দিন বেলা আটটার সময় তাঁহার বাসার বৈঠকখানায় বসিয়া গীতা-পাঠ করিতেছিলেন। তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে পড়িতেছিলেন,—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥"

এবং পড়িতে পড়িতে ইহার অর্থ চিন্তা করিয়া ভাবিতেছিলেন, কর্ম্ম করিতেই তোমার অধিকার আছে. কর্ম্মফলে তোমার কোন অধিকার নাই। কর্ম্মের ফলাফল চিন্তা না করিয়া, কর্ম্মে আসক্তিশূন্য হইয়া, নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে। ইহাই ভগবানের উপদেশ। বড় শক্ত কথা।

এই সময়ে 'সত্যকিঙ্কর বাবু বাড়ী আছেন' বলিতে বলিতে একটি যুবক সেখানে প্রবেশ করিল। তাহার পরিধানে হাফ প্যান্ট—কোট—কলার—নেকটাই—হ্যাট্, গোঁফের দুই দিকের অগ্রভাগ কামানো, মাথার সম্মুখভাগের চুল খুব লম্বা, পশ্চাদ্-ভাগে কামানো—যেন সেই দিক্ দিয়া কিছু দিন পূর্ব্বে তাহার গুরুদশা হইয়া গিয়াছে।

সত্যকিঙ্কর বাবু গীতা বন্ধ করিয়া বলিলেন—"এস, এস, তরুণ এস। প্রভাতে তরুণতপনের উদয় কি মনে ক'রে?"

তরুণতপনও এক জন ডেপুটী। সে পার্শ্ববর্ত্তী চৌকীতে বসিয়া বলিল,—"একটা সু-খবর দিতে এলুম। গবর্ণমেণ্ট আমার সেই পিটিসন্ মঞ্জুর করেছেন।"

সত্য বাবু বলিলেন, "কোন্ পিটিসন্? ওঃ—সেই 'মিষ্টার' হওয়ার দরখাস্ত? বেশ বেশ। শুনে খুব খুসী হলেম। তোমার মত মিষ্টার হওয়াই উচিত।"

তরুণ বলিল—"আমার মামা বিলাত-ফেরত, আমি তাঁরই বাড়ীতে মানুষ হয়েছি, আমার মামার ছেলে বিলাত গিয়াছে, আমার এক সম্বন্ধীও বিলাত গিয়াছে।"

সত্য বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তবে ত তোমার মিষ্টার হওয়ার বার্থ রাইট-ই (birth right) রয়েছে। বেশ, আজ থেকে তোমাকে আমরা মিষ্টার ব'লেই সম্বোধন করব। আর তরুণতপন বানার্জ্জী না লিখিয়া Mr. T. T. Banerjee লিখব, কেমন?"

তরুণ বলিল—"ভাল কথা, আজ ৪টার সময় আমাদের ফুটবল খেলার একটা ম্যাচ আছে। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব খেলা দেখতে যাবেন. আমি তাঁহাকে invite (নিমন্ত্রণ) ক'রে আস্ছি। আমাকে আজ কোন বড় মোকদ্দমা দেবেন না।"

সত্য বাবু বলিলেন—"আচ্ছা, যদি দিই, তবে খুব ছোট একটা দেব। তুমি প্রায়ই বুঝি ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কাছে যাও?"

তরুণ বলিল—"দরকার পড়লেই যেতে হয়। আচ্ছা, তবে এখন আসি।"

এই বলিয়া তরুণতপন উঠিল। সত্যকিঙ্কর বাবু তাহার ফ্যাসনদুরস্ত ভাব দেখিয়া একটু হাসিলেন।

তিনি আহারাদি করিয়া বেলা ১১টার সময় তাঁহার এজলাসে গিয়া বসিয়াছেন, এই সময়ে এক জন আর্দ্দালী আসিয়া সেলাম দিয়া বলিল—"হুজুর, সাহেব সেলাম দিয়াছেন।"

সত্যকিঙ্কর বাবু তখন উঠিলেন এবং মাথায় টুপী পরিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে যাইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জাড্-কেল (Mr. Zadkiel) সাহেব তাঁহার আফিস-ঘরে বসিয়া ফাইল (file) দেখিতেছিলেন। এক জন চাপরাশী পাশে দাঁড়াইয়া ঝুড়ি (basket) হইতে এক একটা [illegible]

বাঁধা কাগজের বাণ্ডিল খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিতেছিল, আর সাহেব সেই কাগজে আমলা ও ডেপুটীর লেখা নোট (note)-এর উপর ক্রতবেগে চক্ষু বুলাইয়া তাহার পাশে Yes, No, Very good, I agree, ইত্যাদি হুকুম লিখিতেছিলেন। ইহার নাম file clear করা। কোন জটিল বিষয়ে মাথা ঘামাইবার ফুরসৎ তাঁহার নাই, তিনি জানেন, উপরে উপরে নোটটা বুলাইতে পারিলেই "সরকারী কাম্ আপসে চল্ যায়েগা।" সত্যকিঙ্কর বাবুর কার্ড পাইয়া তিনি আর্দালীকে বলিলেন—"বাবুকো সেলাম দেও।"

সত্যকিঙ্কর বাবু আসিয়া গুড মর্ণিং বলিয়া সেলাম করিলে সাহেব একটা ফাইল হইতে চোখ তুলিয়া Good morning Satya Babu, sit down please" বলিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন এবং আবার সেই ফাইল দেখিতে লাগিলেন। পরে সত্য বাবুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—

"You see, Satya Babu, here is a note submitted by the Land Registration Deputy Collector. He says that his file is too heavy, and he wants somebody else to assist him. But I don't understand why should the Land Registration work be so heavy when there are so many Sub-Registrars in this district." (সত্য বাবু, আপনি দেখুন, নামজারির ডেপুটী কালেক্টার বলেন, তাঁহার ফাইলে অনেক বেশী কায, তিনি আর এক জন সাহায্যকারী চান; কিন্তু এ জেলায় এতগুলি সব-রেজেষ্ট্রার থাকিতে, নামজারির ফাইলে বেশী কায হইবে কেন, আমি বুঝি না।)

সত্যকিঙ্কর বাবু কালেক্টার সাহেবের বিদ্যার দৌড় দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন—

"Sir, the Sub-Registrars only register deeds, they have nothing to do with Land Registration cases, which are dealt with by a Deputy Collector at sadar." (সবরেজিষ্ট্রারেরা কেবল দলিল রেজেষ্ট্রী করেন, নামজারি মোকদ্দমার সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই; সে সব মোকদ্দমা সদরে এক জন ডেপুটী কালেক্টার নিষ্পত্তি করেন।)

সাহেব এবার নিজের মূর্খতা বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"Oh, I See. Who can assist him? (আমি এবার বুঝিলাম। তাঁহাকে কে সাহায্য করিতে পারে?)

Sub-Deputy Collector may dispose of a good many uncontested cases." (এক তরফা মোকদ্দমার অনেকগুলি এক জন সব-ডেপুটী করিতে পারেন।)

সাহেব বলিলেন,—All right. I order Debendra Babu, Sub-Deputy Collector to assist him." (ঠিক কথা, আমি দেবেন্দ্র বাবু সব-ডেপুটী কালেক্টরকে সাহায্য করিবার জন্য হুকুম দিলাম।)

এই বলিয়া সাহেব হুকুম লিখিয়া ফাইলটা চাপরাশীর হাতে দিয়া তাহাকে যাইতে বলিলেন। চাপরাশী চলিয়া গেলে তিনি সত্যকিঙ্কর বাবুর দিকে ঘুরিয়া বসিয়া ইংরাজীতে যাহা বলিলেন, তাহার ভাবার্থ এই—

"এখন যে জন্য আপনাকে ডাকিয়াছি, সেই কথা বলি। আমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, আমার খানসামা আবদুলকে থানার দারোগা গত রাত্রে মদ খাইয়া রাস্তায় মাতলামি করার অভিযোগে চালান দিয়াছে। এটা অত্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার (simply preposterous)। আমি তাহাকে কখনও মাতাল দেখি নাই। এখন এই মোকদ্দমাটা আপনিই বিচার করিবেন, এই আমার অভিপ্রায়। আপনি এখন যাইতে পারেন।"

এই বলিয়া সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সত্য বাবু কোন কথা বলিবার আগেই গোছলখানায় চলিয়া গেলেন। সত্য বাবু নিতান্ত বিমর্ষচিত্তে কাছারীতে আসিলেন। গীতার সেই বাক্য তাঁহার মনে হইল, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" অমনই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন।

তিনি এজলাসে আসিয়া বসিতে কোর্ট সব-ইন্‌স্পেক্টার তাঁহার খাতা-পত্র ও মোকদ্দমার নথি লইয়া আসিলেন। দুইটা চার্জ্জসিট আসিয়াছে, একটা হাজামা মোকদ্দমা, আর একটা সেই খানসামার বিরুদ্ধে পাঁচ আইনের মোকদ্দমা। সত্যকিঙ্কর বাবু প্রথমটি নিজের ফাইলে রাখিয়া দ্বিতীয়টির উপর হুকুম লিখিলেন—"To Mr. T. T. Banerjee for disposal" (মিঃ টি, টি, ব্যানার্জ্জিকে নিষ্পত্তির জন্য দেওয়া হইল)। লিখিবার সময় একবার হাত কাঁপিল, অমনি আর একবার ভগবদ্‌বাক্য স্মরণ করিলেন, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" আবার ডেপুটী তরুণতপনকে মিঃ টি টি মনে একটু হাসিও আসিল।

তরুণতপনের এজলাসে সেই পাঁচ আইনের মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইলে তিনি দেখিলেন, দুই জন কনেষ্টবল চাপরাশী আসামীর পাশে [illegible] তিনি

প্রথমে একটু ভড়কাইয়া গেলেন, পরে কোর্ট সাব-ইন্‌স্পেক্টা-রের নিকট আসামীর পরিচয় পাইয়া বুঝিলেন, আসামী আর কেহ নহে, সাহেবের পেয়ারের খানসামা আবদুল। তখন কর্ত্তব্য স্থির করিতে তাঁহারও বেশী সময় লাগিল না। মোক-দ্দমার মাত্র এক জন সাক্ষী ছিল অর্থাৎ যে কনষ্টেবল আসা-মীকে মাতাল অবস্থায় ধরিয়াছিল, সেই কনষ্টেবল। পুলিস এই সকল মোকদ্দমায় বেশী সাক্ষী পাঠায়ও না; কারণ, প্রায়ই আসামীরা অপরাধ স্বীকার করিয়া ।৹, ৷৷৹ আনা জরিমানা দিয়া চলিয়া যায়। এ ক্ষেত্রে আসামী খোদ কালেক্টার সাহে-বের খানসামা, সে অপরাধ স্বীকার করিবে কেন? সুতরাং সে বলিল, "হুজুর, আমি নির্দ্দোষ, ঐ কনষ্টেবল আমার কাছে ঘুস চাহিয়াছিল, তাহা না দেওয়ায় আমাকে মিথ্যা করিয়া চালান দিয়াছে।" কনষ্টেবল প্রমাণ দিল যে, সে আসামীকে রাস্তায় মাতাল অবস্থায় ধরিয়াছিল, তখন অন্য লোকও উপ-স্থিত ছিল, থানায় লইয়া গেলে সেখানেও তাহার মুখে মদের গন্ধ ছিল ও সে মাতলামী করিয়াছিল, তাহা থানার জমাদার বাবু জানেন ইত্যাদি। কিন্তু তাহার কথার পোষকতা করিবার জন্য অন্য সাক্ষী উপস্থিত না থাকায়, হাকিম তাহার কথা অবিশ্বাস করিয়া আসামীকে খালাস দিলেন।

ফুটবল খেলার মাঠে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে তরুণের দেখা হইলে সাহেব তাঁহাকে congratulate করিলেন। সত্যকিঙ্কর বাবুর উপর অবশ্য রুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু মোক-দ্দমার ফল সন্তোষজনক দেখিয়া সে রাগ প্রকাশ না করিয়া চাপিয়া রাখিলেন। যে দারোগা আবদুল খানসামাকে চালান দিয়াছিল, সে মফঃস্বলের এক থানায় বদলী হইল।

২

ইহার ছয় মাসের পরের কথা। Mr. T. T. Banerjee অর্থাৎ তরুণতপন যথার্থই "rising sun" (উদীয়মান রবি)। করিমপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী ছুটীর দরখাস্ত দেওয়ায়, মিঃ জাডকেল সাহেব তরুণতপনকে নিযুক্ত করিবার জন্য recommend (সুপারিশ) করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার [illegible]লে মিঃ টি. টি. ব্যানার্জ্জী করিমপুর মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible]য়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

করিমপুর মহকুমার অন্তর্গত কয়লাপুরের বিখ্যাত জমীদার অমরেন্দ্র বাবু এক দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি-লেন। [illegible] প্রকাণ্ড রোহিত-মৎস্য ও অন্যান্য অনেক আহার্য্য জিনিষ ভেট লইয়া আসিয়াছেন। মাছ দেখিয়া মিঃ ব্যানার্জ্জী মহা খুসী হইলেন; কারণ, এত বড় মাছ তিনি কখনও দেখেন নাই। তিনি জমীদার বাবুকে ড্রইং-রুমে খুব আপ্যায়িত করিয়া বসাইলেন। কুশল-প্রশ্নাদির পরে জমীদার বাবু বলিলেন—

"হুজুর, আমার একটা বিশেষ নিবেদন আছে। রথযাত্রার সময় আমাদের বাড়ীতে কিছু আমোদ-উৎসব হয়, গ্রামে একটা মেলা বসে, তাহা ৭ দিন পর্য্যন্ত থাকে। আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবরা সেই সময়ে অনুগ্রহ করিয়া পদধূলি দিতেন, ঐ ৭ দিন তাঁহারা সেখানে ক্যাম্প করিতেন। সেখানে থাকার কোন অসুবিধা নাই, একটা ডাক-বাংলো আছে। আমার বিশেষ অনুরোধ, হুজুরও সেখানে সেই সময় যাইয়া মেলায় [illegible] দিন ক্যাম্প করিবেন এবং আমার বাড়ীতে পদধূলি দিবেন।"

মিঃ ব্যানার্জ্জী হাসিয়া বলিলেন, "তা' যেতে পারি। আপনারা কিরূপ আমোদ-উৎসব করেন?"

জমীদার বাবু বলিলেন—"কলিকাতা থেকে একটা [illegible] চপ আনা হবে, আর আমাদের একটা থিয়েটারের পার্টি আছে, তারা প্লে করবে।"

মিঃ, ব্যানার্জ্জী বলিলেন—"আচ্ছা, চপ কাকে বলে? চপ মানে বোধ হয় মোটা মানুষ অর্থাৎ যাদের বয়স বেশী ও শরীর মোটা ব'লে নাচতে পারে না, কেবল ব'সে ব'সে গান করে, তাই না?"

জমীদার বাবু হাসিয়া বলিলেন—"কতকটা তাই বটে, অর্থাৎ যারা চপ গায়, তারা সাধারণতঃ একটু প্রবীণ, তবে সকলে মোটা হয় না, আর তারা নাচে না, কেবল কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কীর্ত্তন গান করে।"

মিঃ ব্যানার্জ্জী বলিলেন, "অমরেন্দ্র বাবু, কৃষ্ণলীলা শোন-বার মতন বয়স আমার এখনও হয় নাই, তা' অবশ্য দেখতেই পাচ্ছেন।"

অমরেন্দ্র বাবু বলিলেন—"হুজুর যদি ইচ্ছা করেন [illegible] খেমটা-নাচেরও ব্যবস্থা করতে পারি।"

মিঃ ব্যানার্জ্জী বলিলেন—"আচ্ছা, তবে তাই করবে, আমি আপনাদের গ্রামে যাইয়া তিন দিন ক্যাম্প করব, আমার পকেট-ডায়রিতে তারিখ নোট ক'রে নিচ্ছি।"

অমরেন্দ্র বাবু বলিলেন—"রথযাত্রার দিন হচ্ছে ২। আষাঢ়, ৮ই জুলাই।"

মিঃ ব্যানার্জ্জী তারিখ নোট করিয়া লইলেন, জমীদার বাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই জমীদার বাবুর মহকুমার হাকিমকে পরিতুষ্ট করার বিশেষ কারণ ছিল। তাঁহার সরিক হরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে তাঁহার মামলা-মোকদ্দমা প্রায় লাগিয়াই আছে।

যাহা হউক, ক্রমে সেই ৮ই জুলাই আসিল। মিঃ ব্যানার্জ্জী তাহার পূর্ব্বদিন সদল-বলে ডাক-বাংলোয় আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে তিনি থানার দারোগাকে সঙ্গে করিয়া মেলার স্থান দেখিতে বাহির হইলেন। এই মেলাতে অনেক দূরের দোকানদার আসিয়া ঘর বাঁধিয়া বেচাকেনা করে, ৭ দিন পর্য্যন্ত বহু লোকের সমাগম হয়। মেলাভূমির খাজনা জমীদারদের একটা মস্ত লাভের উপায়। সে খাজনা আদায়ের ভার হাজারি বিশ্বাস নামক এক জন ইজারাদারের উপর। হাকিম সাহেব মেলার স্থান দেখিয়া দারোগাকে বলিলেন— "Why no sanitary arrangements? Call the Ijaradar." (স্বাস্থ্যরক্ষার বন্দোবস্ত হয় নাই কেন? ইজারাদারকে তলব করুন)। আধঘণ্টা পরে ইজারাদার কাঁপিতে কাঁপিতে হাজির হইল, কিন্তু হাকিম সাহেব তাহার সহিত দেখা করিলেন না। পরে দারোগা তাহাকে কাণে কাণে কি বলিলেন, এবং সে ১৫ মিনিটের মধ্যে ১ মণ চাউল, আধ-মণ ময়দা, দশ সের ঘি ইত্যাদি জিনিষের এক মস্ত ডালি সাজাইয়া আনিয়া দেখা করিতে আসিল। তখন হাকিম সাহেব ডাক-বাংলো হইতে বাহির হইয়া আসিয়া হাসিমুখে তাহাকে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে এক লেক্চার দিয়া বিদায় দিলেন।

সে দিন সন্ধ্যার পর জমীদার বাবুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে গানের আসর বসিল। প্রকাণ্ড সামিয়ানার তলে প্রায় হাজার লোক সমবেত হইয়াছে। সন্ধ্যা ৮টার সময় কলিকাতা হইতে সমাগত কুসুমকুমারী নাম্নী নাচওয়ালীর নাচগান আরম্ভ হওয়ার কথা। মিঃ ব্যানার্জ্জী সাহেব নাচ দেখিতে আসিবেন বলিয়াছেন। জমীদার বাবু স্বগণ-সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু রাত্রি ৯টা বাজিল, তবু নাচওয়ালীর দেখা নাই। তাহার সঙ্গীয় বাদ্যকরগণ আসিয়া আসরে বসিয়া তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। জমীদার বাবু তাহার বাসায় পুনঃ পুনঃ লোক পাঠাইতেছেন, কিন্তু সে কোথায়, কেহ বলিতে পারে না। অবশেষে রাত্রি সাড়ে ৯টার সময় সে আসরে আসিল, তাহার সঙ্গে হাকিম সাহেবের আর্দ্দালী আলো ধরিয়া আসিয়াছে। সে আসরে আসিয়া একটু পরেই গান ধরিল।

কুসুমকুমারী দেখিতে সুন্দরী, বয়স অনুমান ২০ বৎসর। তাহার গলার স্বরও সুমিষ্ট। অল্পক্ষণের মধ্যেই গান জমিয়া গেল। ইতিমধ্যে ব্যানার্জ্জী সাহেব কোন্ সময়ে আসিয়া আসরের এক পার্শ্বে একটা চেয়ারে বসিয়াছেন, তাহা জমীদার বাবু ভিন্ন বড় কেহ লক্ষ্য করে নাই। কুসুমকুমারী দাঁড়াইয়া গাহিতেছিল,—

সখি, যমুনাপুলিনে বাঁশী বাজাইছে শ্যাম.
বাঁশীর রবে আকুল হ'লো আমার এ পরাণ,
(ও সখি, আমার এ পরাণ)—

"আমার এ পরাণ"—"আমার এ পরাণ" বলিতে বলিতে যখন সে নৃত্য আরম্ভ করিল—অমনই—ঐ দেখ, কে এক জন ফিরিঙ্গী-বেশধারী লোক উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে নাচা সুরু করিতেই,—জমীদার বাবু ধাঁ করিয়া উঠিয়া তাহাকে যেন ছোঁ মারিয়া লইয়া গেলেন। দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই ইহা লক্ষ্য করিবার অবসর পাইল না। নাচওয়ালী একটু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া লইল। জমীদার বাবু হাকিম সাহেবকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় শোয়াইয়া দিলেন।

পরদিন বেলা ৫টার সময় টপগান আরম্ভ হইল, রাত্রি ৯টার পর নাচ হইবে। সন্ধ্যার পর কুসুমকুমারী ডাকবাংলোয় যাইয়া ব্যানার্জ্জী সাহেবকে গান শুনাইবে। সন্ধ্যা ৭টা বাজিল, মিঃ ব্যানার্জ্জী তাহার অপেক্ষায় একাকী বসিয়া আছেন। কতকক্ষণ পরে একটি লোক একটা হার্ম্মোনিয়াম রাখিয়া গেল। আজ কুসুমকুমারী নিজেই হার্ম্মোনিয়াম বাজাইয়া গান গাহিবে। পরক্ষণেই সুরম্য বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া এসেন্সের গন্ধ ছড়াইতে ছড়াইতে কুসুমকুমারী আসিল। মিঃ ব্যানার্জ্জী তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার পাশে এক-খানা চেয়ারে বসিতে দিলেন। কুসুমকুমারী বলিল—

"কাল আপনি একটু বেচাল হইয়া পড়িয়াছিলেন ; [illegible] খাওয়া বুঝি আপনার অভ্যাস নাই ?"

মিঃ ব্যানার্জ্জী একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"[illegible] খাওয়া সহিয়া উঠে না, বাটীতে স্ত্রীর বড় কড়া শাসন।"

কুসুম হাসিয়া বলিল,—"তাই নাকি? হুজুরের উপর হুজুর আছেন দেখছি! তা' হ'লে এখন আরম্ভ করা যা'ক।"

এই কথা শুনিয়া মিঃ ব্যানার্জ্জী টেবলের তলায় যে বোতল ছিল, তাহা উপরে তুলিয়া, তাহা হইতে একটু গেলাসে ঢালিয়া ও সোডা মিশাইয়া কুসুমকুমারীর হাতে দিলেন। কুসুম অল্প এক চুমুক খাইয়া তাঁহার হাতে গেলাস দিল, তিনি সবটুকু এক নিশ্বাসে খাইয়া ফেলিলেন। কুসুম তখন হার্ম্মোনিয়ামে সুর দিয়া এই গান ধরিল :—

বঁধু মম চিত্ত-চকোর তব বদন-সুধাকর,
অমিয় পিয়াসী হে,—

গানের মাত্র এই দুইটি পদ গাওয়া হইয়াছে, এই সময়ে বাহিরে পাল্কী-বেহারাদের কোলাহল শুনা গেল, এবং সেই পাল্কী ডাক-বাংলোর হাতার মধ্যে প্রবেশ করিল। মিঃ ব্যানার্জ্জী তাঁহার সঙ্গিনীর গানে এতদূর তন্ময় হইয়াছিলেন যে, তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। পরমুহূর্ত্তেই একটি স্ত্রীলোক পাল্কী হইতে অবতরণ করিয়া তাড়াতাড়ি বারান্দায় উঠিলেন। ব্যানার্জ্জী সাহেবের আর্দ্দালী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া দৌড়াইয়া আসিল এবং সাহেব কোথায় জিজ্ঞাসা করায় সেই কক্ষ দেখাইয়া দিল। তখন তিনি খুব জোরে ধাক্কা মারিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিলেন। মিঃ বানার্জ্জী "কে—কে" বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখে সেই উগ্রচণ্ডা-মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার চক্ষুস্থির হইল। "অ্যাঁ—অ্যাঁ, তুমি যে হঠাৎ এলে"—বলিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীকে সম্ভাষণ করিলেন। কুসুমকুমারী গান বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিল, নড়িল না। মিসেস্ ব্যানার্জ্জী ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"তুমি মফঃস্বলে এসে বুঝি এইরূপ চলাচলি করছ? তোমার লজ্জাসরম একেবারেই নাই?"

ব্যানার্জ্জী সাহেব কি বলিবেন, কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না। কুসুমকুমারী সপ্রতিভভাবে বলিল,—"আপনি বোধ হচ্ছে সাহেবের স্ত্রী—তা' এতে দোষ কি? আপনি শিক্ষিতা রমণী, নির্দ্দোষ সঙ্গীতচর্চ্চা হচ্ছে—"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জী ক্রোধভরে বলিলেন,—

"আমি তোমাকে কিছু বলছি না—তুমি এখনই বেরিয়ে যাও। গানের আসরে বেশ্যার হাত ধ'রে নাচা কেমন নির্দ্দোষ সঙ্গীতচর্চ্চা, তা' আমি বিলক্ষণ জানি! ছিঃ ছিঃ! আমার গলায় দড়ি দিয়া মরতে ইচ্ছা হচ্ছে!"

তাঁহার মার-মূর্ত্তি দেখিয়া কুসুমকুমারী আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল। ব্যানার্জ্জী সাহেব টলিতে টলিতে

৩

এই ঘটনার ১৫ দিন পরে মিঃ ব্যানার্জ্জী কালেক্টার মিঃ জ্যাডকেলের এক ডেমি-অফিসিয়াল চিঠি পাইলেন, কালেক্টার ৩ দিন পরে মহকুমা পরিদর্শন করিতে আসিবেন, মিঃ ব্যানার্জ্জী যেন তাঁহার নিজের বাংলোতে তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত করেন। তিনি মিঃ জ্যাডকেলের ভাবগতিক বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি কয়েক জন জমীদারের মোক্তারকে বলিয়া দিলেন, সাহেব যে কয় দিন মহকুমায় থাকিবেন, তাহার প্রত্যেক দিন যেন এক একটি ডালি দেওয়া হয়।

নির্দ্দিষ্ট দিন বেলা ১০টার সময় মিঃ জ্যাডকেল আসিয়া পৌছিলেন। মিঃ ব্যানার্জ্জী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিজের কুঠীতে লইয়া গেলেন। সেখানে মিসেস্ ব্যানার্জ্জীও তাঁহার যথোচিত সমাদর করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা বিলাত গিয়াছেন, সুতরাং তিনিও সাহেবী আদব-কায়দা অনেকটা শিখিয়াছিলেন। মিঃ ব্যানার্জ্জীও তাঁহাকে ইংরেজী কথাবার্ত্তা কিছু কিছু শিক্ষা দিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া "ব্রেক্‌ফাষ্ট" করিলেন। পরে মিঃ ব্যানার্জ্জী তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ডাক-বাংলোয় লইয়া গেলেন। সেখানে এক জন জমীদারের কর্ম্মচারী ৫।৬ জন লোকের দ্বারা আনীত বহুবিধ ফল, শাকসব্জী, কেক্-বিস্কুট, পাঁউরুটী, সোডা-ব্রাণ্ডী, মুর্গী, আণ্ডা প্রভৃতি জিনিষ লইয়া উপস্থিত ছিল। সাহেব সেগুলি দেখিয়া উৎফুল্লনেত্রে একবার সেই আমলার দিকে ও একবার মিঃ ব্যানার্জ্জীর দিকে তাকাইলেন। ইহাতে তাঁহারা নিজদিগকে কৃতার্থবোধ করিলেন। সাহেব সেই জমীদারের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহাকে মোলাকাত করিবার জন্য অনুমতি দিলেন। বলা বাহুল্য, মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্যানার্জ্জীর কুঠীতেও আর একটা ডালি দেওয়া হইয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ৩ দিন সেখানে থাকিয়া আফিসের কায-কর্ম্ম দেখিয়া খুব সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। মিঃ ব্যানার্জ্জী সদরে থাকিতে তাঁহার মন বুঝিয়া কার্য্য করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। সাহেব মিঃ ব্যানার্জ্জীকে বলিলেন,—

"I am glad to see that the cross examination of the witnesses examined by you is very brief. How do you manage to shut up the Muktears? (আমি দেখিতেছি, সাক্ষীদের জেরা খুব সংক্ষিপ্ত; আপনি মোক্তারদের মুখ বন্ধ করেন কিরূপে?)

Muktears try to drag on cases mainly in their own interest. When they find that I don't take down replies to unnecessary and irrelevent questions they sit down of their own accord." (আমি জানি, মোক্তাররা তাহাদের আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্যই প্রধানতঃ মোকদ্দমা বাড়ায়। জেরা করিবার সময় যখন তারা দেখে যে, আমি অনর্থক প্রশ্নের জবাব লিখিতেছি না, তখন তাহারা অমনি বসিয়া পড়ে।)

সাহেব বলিলেন—"Quite right. How do you manage to show almost 99 p.c. conviction in Police cases)" (ঠিক কথা। পুলিসের মোকদ্দমায় আপনি শতকরা ৯৯টিতে সাজা দেন কিরূপে ?)

মিঃ ব্যানার্জ্জী বলিলেন—"Sir, when the Thana-officer has once sifted the evidence on the spot and shut up the accused for trial, I generally do not find any reason to differ from him." (থানার দারোগারা যখন সরেজমিনে সাক্ষীদিগের জবানবন্দী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া আসামী চালান দেয়, তখন সাধারণতঃ আমি তাহাদের মত অগ্রাহ্য করিবার কোন কারণ দেখি না।)

এই কথা শুনিয়া সাহেব একটু হাসিলেন।

এইরূপে পরিদর্শন শেষ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব যাইবার পূর্ব্বে ডাক-বাংলোয় বসিয়া মিঃ ব্যানার্জ্জীর হাতে একখানা কাগজ দিয়া পড়িতে বলিলেন। ইহা একখানি বেনামী চিঠি, ইহাতে এইরূপ লেখা ছিল :—

"The new S. D. O. eats *ghoose*. He took a *substitude* in his camp and his wife came and driven her out with a *Jhata*. Please enquire." (নূতন হাকিম ঘুস খান। তিনি ক্যাম্পে এক জন বেশ্যা আনিয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রী আসিয়া তাহাকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইয়াছিল। আপনি তদন্ত করুন) যেরূপ অশুদ্ধ ইংরেজীতে ইহা লেখা, অনুবাদে তাহার রস বুঝা যাইবে না।

ইহা পড়িয়া মিঃ ব্যানার্জ্জীর মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল। সাহেব তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—

"You must know that I hate all such anonymous letters. They are written by cowards who have not the courage to come out in public with their grievances. So I throw them into the waste paper basket. (তুমি জানিয়া রাখিবে, আমি এই সকল বেনামী চিঠি অত্যন্ত ঘৃণা করি। যে সকল কাপুরুষ তাহাদের নালিশ প্রকাশ্যে জানাইতে সাহস করে না, তাহারাই এ সব চিঠি লেখে। আমি এ সব চিঠি ফেলিয়া দিই।)

এই বলিয়া সাহেব সেই চিঠিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। অবশেষে তিনি হাসিয়া বলিলেন—

"I know young men sometimes show signs of exuberance of youth. We don't take notice of them unless they create scandals." (আমি জানি, যুবকগণ বয়সের ধর্ম্ম অনুসারে স্ফূর্ত্তি করে। যতক্ষণ তাহাতে কেলেঙ্কারী না হয়, ততক্ষণ আমরা তাহা গ্রাহ্য করি না।)

এই বলিয়া সাহেব মিঃ ব্যানার্জ্জীর করমর্দ্দন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। মিঃ ব্যানার্জ্জী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

৪

সত্যকিঙ্কর বাবু এক দিন ৫টার পরে কোর্ট হইতে আসিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া বেড়াইতে বাহির হইতেছেন, এই সময়ে কোর্ট সব-ইন্‌স্পেক্টার এক জন ডাকাতি মোকদ্দমার আসামীকে দুইখানা সোনার গহনা সহ আনিয়া হাজির করিয়া বলিলেন,—

"হুজুর, এই আসামী confession (অপরাধ স্বীকার) করিয়া এই মাল বাহির করিয়া দিয়াছে, confession (স্বীকারোক্তি) record করিতে হইবে। ভবেশ বাবু কি অন্য কোন ডেপুটীর উপর ভার দিন।"

সত্যকিঙ্কর বাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন,—"তাঁরাও ত সব খেটে খুটে এসেছেন, এখন হয় ত খেলার মাঠে গিয়েছেন। আচ্ছা, আমি নিজেই confession record করিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি বৈঠকখানায় ঢুকিলেন এবং টেবলের সম্মুখে দোয়াত-কলম লইয়া বসিলেন। কোর্ট-বাবু কাগজ-পত্র সম্মুখে রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আসামীর স্বীকারোক্তি লিখিবার সময় কোন পুলিস থাকিতে পারে না। দুই জন কনষ্টেবল আসামীকে আনিয়া হাকিমের নিকট রাখি[illegible] বাহিরে গিয়া দূরে দাঁড়াইল। একগাছা সোনার বালা ও এ[illegible] ছড়া হার কোর্ট-বাবু পূর্ব্বেই টেবলের উপর রাখিয়াছিলেন।

সত্যকিঙ্কর বাবু যথারীতি আসামীকে এইরূপ warnir[illegible] দিলেন,—"তুমি ভাল করিয়া দেখ, এখানে কোন পুলিস ন[illegible] তুমি কাহারও ভয়ে কোন কথা বলিও না, তোমাকে [illegible] কোন কথা শিখাইয়া দিয়া থাকিলে তাহা বলিও না, [illegible] তোমার আপন খুসীতে যাহা ইচ্ছা আমার নিকট বলিতে পা[illegible]

আমি এক জন হাকিম, আমার নিকট তুমি কোন অপরাধ স্বীকার করিলে, তাহাতে তোমার সাজা হইতে পারে। এই সব কথা ভালরূপ বিবেচনা করিয়া তুমি যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমার নিকট কোন কথা বলিতে পার। তুমি কিছু বলিতে চাও?"

আসামী বলিল—"আজ্ঞে হুজুর, আমি যাহা করিয়াছি, সব বলিব। আপনি লিখুন।"

এই কথার পরে সত্যকিঙ্কর বাবু ছাপা ফরম লইয়া লিখিতে বসিলেন। তিনি আসামীর নাম-ধাম ইত্যাদি লিখিয়া পরে তাহার উক্তি লিখিলেন। আসামী বলিল, সে আর ৬ জন লোক (তাহাদের নাম বলিল) ইহারা মিলিয়া লতিফপুর গ্রামের বংশীধর সাহার বাড়ীতে ডাকাতি করিতে গিয়াছিল। তাহারা ঘরে ঢুকিয়া লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া অনেক নগদ টাকা ও সোনার গহনা আনিয়াছিল। তাহার ভাগে তিন শ টাকা ও এই দুইখানা সোনার গহনা পড়িয়াছিল, সে এই গহনা মাটীর তলে পুতিয়া রাখিয়াছিল, পুলিসের নিকট বাহির করিয়া দিয়াছে।

সত্যকিঙ্কর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, তুমি দারোগা যাওয়া মাত্রই আপন খুসিতে অপরাধ স্বীকার করিয়া এইগুলি বাহির করিয়া দিয়াছিলে?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া আসামী সচকিতে চারিদিক তাকাইয়া এবং একবার দরজার কাছে গিয়া বাহিরের দিকে ভাল করিয়া দেখিয়া আসিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল,—

"হুজুর, আপন ইচ্ছায় কি দিয়াছিলাম? দুই জন কনষ্টেবল আমার মাথায় একখান পাথর চাপাইয়া রৌদ্রে অনেকক্ষণ বসাইয়া রাখিয়াছিল, দারোগা আমার বাড়ীর মেয়েলোক-দিগকে বে-ইজ্জত করিবার ভয় দেখাইয়াছিলেন। তখন আমি ভয়ে এই সকল কথা স্বীকার করিয়া মাল বাহির করিয়া দিয়াছিলাম। সেই অত্যাচারের কথা মনে হইলে এখনও আমার ভয় হয়।"

আসামীর এই জবাব শুনিয়া সত্যকিঙ্কর বাবু অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। অবশেষে তিনি রেকর্ড শেষ করিয়া তাহার নীচে এইরূপ সার্টিফিকেট (certificate) দিলেন—"The confession does not appear to be voluntary." (আসামী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অপরাধ স্বীকার করে নাই।)

কোর্টবাবু আসিয়া আসামীকে লইয়া গেলেন। সে দিন এই [illegible] পরদিন সত্যকিঙ্কর বাবু কোর্টে যাওয়ামাত্র ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব [illegible] পাঠাইলেন।

তিনি যাইয়া সাহেবকে সেলাম দিলে—সাহেব "Good morning, Satya Babu" বলিয়া তাঁহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। পরে অতি রুক্ষস্বরে বলিলেন,—

"Satya Babu, I am surprised to see that being a senior officer you have managed to spoil this dacoity case of which you recorded the confession of an accused yesterday." (সত্য বাবু, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, আপনি এক জন সিনিয়ার অফিসার, অথচ আপনি কাল সেই ডাকাতি মোকদ্দমাটার আসামীর স্বীকারোক্তি লিখিতে গিয়া মোকদ্দমা-টাকে মাটী করিয়া দিয়াছেন।)

সত্য বাবু বিমর্ষ হইয়া বলিলেন—"How have I spoilt this case, Sir? I merely recorded what the accused stated before me." (আমি কিরূপে মোকদ্দমা নষ্ট করলাম? আসামী আমার কাছে যাহা বলিয়াছে, আমি ত কেবল তাহাই লিখিয়াছি।)

পরে উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইল, নিম্নে তাহার অনুবাদ দিতেছি।

ম্যাজি। সেই স্বীকারোক্তির কাগজ এই দেখুন। আসামীকে আপনার শেষ প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করিবার কোন প্রয়োজন ছিল? এই শেষ প্রশ্নের উত্তরে আসামী যাহা বলিল, তাহাতে প্রথমকার অপরাধ স্বীকারটা সব নষ্ট হইয়া গেল।

সত্য। কিন্তু আসামীর দোষ-স্বীকার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কি না, আমাকে ত তাহা ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া তবে সার্টিফিকেট দিতে হইবে? নচেৎ আমি সে সার্টিফিকেট কি প্রকারে দিতে পারি?

ম্যাজি। সত্য বাবু, আপনার ত যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, আপনি অনেক স্বীকারোক্তি লিখিয়াছেন, আপনি বলিতে পারেন, কোনো আসামী সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কখনও অপরাধ স্বীকার করিয়াছে কি?

সত্য। হাঁ, করিয়াছে বৈ কি? যেখানে আমার সে বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে, আমি সেখানে ঐ সার্টিফিকেট দিই নাই।

ম্যাজি। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আসামী নিজে চোরা-মাল বাহির করিয়া দিয়াছিল। ইহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

সত্য। আসামী যে চুরি করিয়াছিল, সে বিষয়ে আমার

কি না, তাহাই বিবেচনার বিষয়। মাল বাহির করিয়া দেওয়াতেও সময় সময় সন্দেহের কারণ হয়।

ম্যাজি। সে কেমন ?

সত্য। আমি জানি, কোন কোন পুলিস-দারোগা নাম নেওয়ার জন্য চোরাই মালের ফর্দ্দ দেখিয়া ঠিক সেই রকম নূতন গহনা সেকরা দিয়া তৈয়ার করাইয়া আসামীর সঙ্গে চালান দেয়।

ম্যাজি।—This is simply preposterous (এটা নিতান্ত আজগুবি কথা), You must know, the Magistrates are not merely judicial officers like Munsiffs. They are Magistrates who help the criminal administration of the district. They are expected to make up small lapses and short commings of the Police. (আপনি জানিয়া রাখুন, ম্যাজিষ্ট্রেটরা মুনসেফদিগের ন্যায় কেবল বিচারক নহেন। তাঁহারা জেলার শাসন বিষয়ে সাহায্য করিবেন এবং পুলিসের সামান্য ত্রুটি তাঁহারা ঢাকিয়া লইবেন।)

সত্য।—But, sir, it must be your personal opinion, It can't be the policy of the benign British Government which is expected to administer even handed justice in the country. (এটা আপনার নিজের মত হইতে পারে। কিন্তু যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এ দেশে ন্যায়বিচার করিতে আসিয়াছেন, ইহা সেই গবর্ণমেণ্টের পলিসি কিছুতেই হইতে পারে না।)

এই কথা শুনিয়া সাহেব রাগিয়া বলিলেন—"I don't wish to argue with you Satya Babu. I see you are unfit to do criminal work. Good morning." (আমি আপনার সঙ্গে বাদানুবাদ করিতে ইচ্ছা করি না—আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনি ফৌজদারী কাযের অনুপযুক্ত। গুডমর্ণিং অর্থাৎ এখন উঠুন।)

সত্য বাবু সাহেবকে সেলাম দিয়া চলিয়া আসিলেন। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন—" এই বাক্য বারংবার তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল।

তাহার পরদিন সাহেব হুকুম দিলেন, সত্যকিঙ্কর বাবু ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার না করিয়া এখন হইতে ট্রেজারির কার্য্য করিবেন। ইহার তিন মাস পরে অফিসারদের চরিত্র সম্বন্ধে কালেক্টার যে গোপনীয় রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে পাঠান, তাহাতে সাহেব সত্য বাবুর সম্বন্ধে লিখিলেন—"He is lacking in enthusiasm in the performance of his duty, has got a too refined sense of criminal justice, altogether not a success." (ইঁহার কাযে উৎসাহ নাই, ফৌজদারী মোকদ্দমার বেশী সূক্ষ্ম বিচার করিতে ইচ্ছা করেন, মোটের উপর সফলতা দেখাইতে পারেন নাই।) আর মিঃ টি, টি, ব্যানার্জ্জী সম্বন্ধে সাহেব লিখিলেন—"An excellent officer, very keen, quick and energetic" (—এক জন উৎকৃষ্ট অফিসার, খুব বুদ্ধিমান, উৎসাহী ও কর্ম্মঠ) এই রিপোর্ট যাওয়ার এক মাস পরে সত্যকিঙ্কর বাবু আমিনগঞ্জ মহকুমার সেকেণ্ড অফিসার হইয়া বদলী হইলেন। মিঃ ব্যানার্জ্জী পুরা ৩ বৎসর করিমগঞ্জে কাটাইয়া দাসেরহাট মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হইলেন।

৫

দাসেরহাট মহকুমায় যাওয়ার পরে মিঃ ব্যানার্জ্জীর নানা প্রকার কীর্ত্তি বাহির হইতে লাগিল।

বসন্তপুর গ্রামে তিনি পশুপতি বাবু জমীদারের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন, পশুপতি বাবু তাঁহাকে বৈঠকখানায় বসাইয়া চা খাওয়াইতেছেন। তিনি তাঁহার একটি ১২ বৎসর বয়সের মেয়েকে ডাকিয়া চা তৈয়ারি করিয়া দিতে বলিলেন। মেয়েটির নাম রমনা দেখিতে খুব সুন্দরী। তাহার গায় নানাপ্রকার গহনা ঝলমল করিতেছিল। মিঃ ব্যানার্জ্জী তাহাকে আদর করিয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদায় লওয়ার সময় তিনি পশুপতি বাবুকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন,—

"মশায়, আপনি ত আমাকে খুব চা খাওয়াইলেন। এখন আমার বাড়ীতে কবে একবার যাবেন, তাই বলুন।"

পশুপতি বাবু বলিলেন, "আপনি আমাদের হাকিম, রাজ-প্রতিনিধি, আপনি আমার কুটীরে পদার্পণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। যে দিন হুকুম করেন, সেই দিনই আপনার কুঠীতে যাইয়া দেখা করিব।"

এবার গলার স্বর নীচু করিয়া মিঃ ব্যানার্জ্জী বলিলেন—"মশায়, সম্প্রতি এক বিপদে পড়েছি। আমার একটি বি[illegible] যোগ্য মেয়ে আছে, সে আপনার এই রমনার সমান হ[illegible] — বরং কিছু বড়। তার বিয়ের সম্বন্ধ আসিয়াছে, শীঘ্রই [illegible] বরের পিতা দেখতে আসবেন। আমরা চাকুরে মানুষ, [illegible] আনি, রোজ খাই, তার গহনা-পত্র সেরূপ কিছু [illegible] পরাইয়া তাকে ভদ্রলোকের সামনে বাহির করতে [illegible]। আপনি যদি মেয়ে-দেখানোর দিন আপনার মেয়ের [illegible] গহনা পরাইয়া তাকে বাহির করতে দেন, তবে বড়ই [illegible] হইব। আমি পরের দিনই আবার সে গহনা ফেরত পা[illegible]।"

পশুপতি বাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"সে আর কি কথা, মশায়! আপনি যে দিন অনুমতি করবেন, সেই দিনই একটি বাক্সে ক'রে রমনার সব গহনা আপনার কুঠীতে পাঠাইয়া দিব। আপনি যে আমাকে আত্মীয় মনে ক'রে এরূপ অনুরোধ করলেন, ইহাতে আমি কৃতার্থ হইলাম। আপনার মেয়ে কি আমার মেয়ে নয়? আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

মিঃ ব্যানার্জ্জী খুব জোরের সহিত তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া তাঁহার মোটর গাড়ীতে উঠিলেন। তিনি এই নূতন মহকুমায় আসিবার সময় একখানা মোটর গাড়ী কিনিয়া আনিয়াছেন।

যথাসময়ে সংবাদ পাইয়া পশুপতি বাবু এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর হস্তে তাঁহার মেয়ের গহনার বাক্স মিঃ ব্যানার্জ্জীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মিঃ ব্যানার্জ্জী সেই কর্ম্মচারীর নিকট যথেষ্ট মৌখিক ধন্যবাদ জানাইলেন, কিন্তু কোন চিঠি দিলেন না। তাঁহার মেয়ে দেখা হইয়া গেল। তাহার পরেও ১ মাস অতীত হইল, কিন্তু তিনি গহনাগুলি ফেরত দেওয়ার নামও করিলেন না। পশুপতি বাবু এ বিষয়ে তাগাদা করিতে নিতান্ত লজ্জাবোধ করিলেন। আর ১ মাস পরে তিনি একখানা চিঠি লিখিলেন, কিন্তু তাহার কোন উত্তর পাইলেন না। অবশেষে গৃহিণীর তাড়নায় নিতান্ত অতিষ্ঠ হইয়া তিনি এক দিন মিঃ ব্যানার্জ্জীর বাংলোতে উপস্থিত হইলেন। মিঃ ব্যানার্জ্জী তাঁহাকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করিয়া চা খাওয়াইলেন। পরে বলিলেন—

"পশুপতি বাবু, আপনার নিকট আমার লজ্জায় মুখ-দেখান কষ্টকর হইয়াছে। আমি আপনার চিঠি পাইয়াছি, কিন্তু সব কথা ত চিঠিতে লেখা যায় না, সে জন্য উত্তর দিই নাই। আমার মেয়েটা নিতান্ত নির্ব্বোধ। তার আপন-পর জ্ঞান নাই। আপনার মেয়ের গহনাগুলি তার গায় চমৎকার মানাইয়াছিল, সে জন্য সে আর কিছুতেই সেগুলি খুলিতে চায় না। আমার স্ত্রী তাহাকে অনেক রকমে বুঝাইতে সে গহনাগুলি খুলিয়া দিয়াছে, কেবল একছড়া নেকলেস্ কিছুতেই খুলছে না। এখন আমি তাহাকে ঐ রকম আর একছড়া নেকলেস্ না দিলে তার গলা থেকে সেটা কিছুতেই নেওয়া যাবে না। আমি সে জন্য কোন গহনাই আপনাকে পাঠাইতে পারিতেছি না, অথচ লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।"

এই কথা শুনিয়া পশুপতি বাবু হাসিয়া বলিলেন—"সে জন্য ভাবনা কি, মিঃ ব্যানার্জ্জী? আপনি কি মনে করেন, আমি আপনার মেয়েকে সেই নেকলেস্টা উপহার দিতে পারি না?"

মিঃ ব্যানার্জ্জী বলিলেন—"তা' কি ক'রে হয়—তা' কি ক'রে হয়—সে জিনিষটার দাম ত কম নয়, ৪।৫শ টাকা হবে। আপনি এত টাকা দামের জিনিষ দেবেন কেন?"

পশুপতি বাবু বলিলেন—"তা'তে কি? আমি খুব সন্তুষ্ট-চিত্তে আপনার মেয়েকে সেই নেকলেস্টা উপহার দিচ্ছি। তার বিয়ের সময় আপনি আমাকে অবশ্য নিমন্ত্রণ করবেন, সে সময় আমার ত কিছু দিতে হবে, সেটা আমি আগেই দিচ্ছি।"

এই কথার পরে মিঃ ব্যানার্জ্জী তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে সেই গহনার বাক্স আনিয়া দিলেন। পশুপতি বাবু তাহা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু মানুষের সব দিন সমান যায় না। মিঃ ব্যানার্জ্জীর ভাগ্যগগনে যেন কিঞ্চিৎ মেঘের সঞ্চার হইল।

৬

Dear Tarun Tapan Babu,

I find that in the case Emp. *vrs.* Arshad Ali under S. 110 C. P. C. your jndgment betrays complete ignorance of law and procedure. The Sessions Judge says that the deposition of witness recorded by you is too meagre and he has reasons to suspect that you omit to record statements which go in favour of the accused. I hope you will be good enough to mend your ways and study High Court Rulings carefully.

Your's faithfully,
R. Soberly.

এক দিন তাঁহার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে এই ডেমি অফিসিয়াল চিঠি পাইয়া তরুণতপনের চক্ষুঃস্থির হইল। তাঁহার এত সাধের "মিষ্টার" কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। সাহেব লিখিয়াছেন, তিনি আইন জানেন না। জজ সাহেব বলিয়াছেন, তিনি সাক্ষীর জবানবন্দীতে অনেক কথা লেখেন না, বিশেষতঃ যে সব কথা আসামীর পক্ষে যাইতে পারে। এ যে বড় সাংঘাতিক কথা। তাঁহার উদীয়মান সৌভাগ্য-রবি কি তবে আকাশের মধ্যপথে উঠিবার পূর্ব্বেই অস্ত যাইবে? এ সাহেবকে কিরূপে বশ করিতে পারা যায়, তিনি তাহা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয়, সাহেব তাঁহাকে কোন সংবাদ পাঠান নাই। তিনি একটা ডালি সাজাইয়া লইয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে যাইলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সোবারলি (Soberly) একটা ডাক-বাংলোয় অবস্থিতি করিতেছিলেন। মিঃ ব্যানার্জ্জী তাঁহার মোটর গাড়ীতে সেখানে আসিলেন। সাহেব গাড়ীর শব্দ শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইলেন; পরে মিঃ ব্যানার্জ্জী আসিয়া কার্ড দিলে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলে সাহেব হাসিমুখে তাঁহাকে যথেষ্ট ভদ্রতার সহিত গ্রহণ করিয়া বলিলেন—

"Tarun Tapan Babu, I see in your card you prefer to call yourself 'Mr'. But I don't mean any offence when I address you as 'Babu'. I consider it as respectable as 'Mr'." (আপনার কার্ডে আপনি নিজের নামের পূর্ব্বে মিষ্টার লিখিতে ভালবাসেন দেখিতেছি, কিন্তু আমি আপনাকে বাবু বলিতেছি বলিয়া মনে করিবেন না, আপনাকে অপমান করিবার জন্য এরূপ সম্বোধন করিতেছি। আমি 'বাবু'কে মিষ্টারের চেয়ে কম সম্মানজনক মনে করি না।)

এই সময়ে মিঃ ব্যানার্জ্জী-প্রদত্ত ফলের ডালির প্রতি সাহেবের নজর পড়িল। সাহেব বলিলেন—

"What are all these things? Oh, you wish to present them to me? I am sorry Tarun Tapan Babu, I can't accept them. Have you forgotten the Government circular on the subject, or knowing it you prefer not to obey it?" (এ সব কি? আপনি বুঝি এগুলি আমাকে দিতে চান? কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি এ সব নিতে পারি না। আপনি কি এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের সার্কুলার ভুলিয়াছেন, অথবা তাহা জানিয়াও সে অনুসারে কায করিতে পছন্দ করেন না?)

এই কথা শুনিয়া তরুণতপনের মুখ সাদা হইয়া গেল। তিনি কি বলিবেন, খুঁজিয়া পাইলেন না। সাহেব তাঁহার এই ভাব দেখিয়া বলিলেন,—

"However, I don't mean to wound your feelings. I accept one fruit, a plantain. চাপরাশী—একঠো কেলা লও।" (যা হউক, আমি আপনার মনে কষ্ট দিতে চাই না, আমি একটা কলা নিতেছি।)

চাপরাশী একটা কলা আনিয়া দিল। সাহেব তাহা টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন—

"Have you any thing particular to say to me? (আপনার আমাকে কি কোন কথা বলিবার আছে?)

তরুণতপন বলিলেন—"No sir, I have only come to pay my respects to you." (না—আমি আপনাকে কেবল সেলাম দিতে আসিয়াছি।)

সাহেব বলিলেন—"Very well, Tarun Tapan Babu, I don't wish to detain you. I don't like people coming to dance attendance on me neglecting their own business. Please take away your things. Your necessity is greater than mine as I enjoy a higher salary. I hope you are not living beyond your means. Good bye." (বেশ, আপনি এখন যেতে পারেন। লোকে তাদের নিজের কায-কর্ম্ম ফেলিয়া আমার পিছনে ছুটিবে, আমি তাহা আদৌ পছন্দ করি না। আপনার এ সব জিনিষ নিয়া যান। আমার চেয়ে আপনার অভাব বেশী; কারণ, আমি আপনার চেয়ে বেশী মাহিনা পাই। আপনি ত আপনার আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করেন না? বিদায়।)

মিঃ ব্যানার্জ্জী বুঝিলেন, সাহেবের শেষের মন্তব্যটি তাঁহার মোটর গাড়ীর জন্য। তিনি আজ কুক্ষণে যাত্রা করিয়াছিলেন। এ যে বড় কঠিন ঠাঁই, এখানে তাঁহার কোন ছলাকলা খাটিবে না। তিনি এখন হইতে ফৌজদারী মোকদ্দমায় অনেক আসামী খালাস দেওয়া আরম্ভ করিলেন। তবে লোক বলে, সে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে নহে।

যাহা হউক, মিঃ ব্যানার্জ্জীর ভাগ্য ভাল। সোবারলী সাহেব বেশী দিন এ জেলায় থাকিলেন না, তিনি কমিশনার হইয়া অন্যত্র বদলী হইলেন। তাঁহার স্থানে যিনি আসিলেন, তিনি আবার সম্পূর্ণ অন্য ধরণের লোক। তাঁহার নাম মিঃ পম্পাই (Mr. Pompy), তিনি মোকদ্দমার সাজা-খালাস লইয়া মাথাঘামানো পছন্দ করিতেন না। তিনি এক জন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী (Imperialist), তিনি খুব ধুমধাম জাঁকজমক ভালবাসেন, যাহাতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে লোক খুব ভয় করে, যাহাতে তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হয়—এই সব বিষয় লইয়া তিনি মহা ব্যস্ত। তিনি জানেন, চৌকীদার ও দফাদারগণই মফঃস্বলে গবর্ণমেণ্টের অঙ্গুলি; যদি লোক তাহাদিগকে ভয় করে ও মান্য করে, তবেই বৃটিশ জাতির

প্রতাপ ভারতবর্ষে অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এ জন্য চৌকীদারদের বেতন-বিলির সময় থানায় তিনি নিজে উপস্থিত থাকিতেন, চৌকীদারদের পোষাক খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইবে, তাহাদের হাতের লাঠি কতখানি লম্বা হইবে ও কতটা মোটা হইবে, দফাদারদের মাথার পাগড়ী খুব টুকটুকে লাল হইবে, তাহারা সমানভাবে পা ফেলিয়া ড্রিল করিবে—তিনি নিজে এই সকল বিষয়ে উপদেশ দেন। দফাদারদের লোকের দৃষ্টিতে সম্মানবৃদ্ধির জন্য তিনি তাহাদিগকে "ডফাদার মহাশয়, আপনি" বলিয়া সম্বোধন করেন। তিনি যখন ঘোড়ায় চড়িয়া মফস্বলে ভ্রমণ করেন, তখন রাস্তার মোড়ে মোড়ে চৌকীদারগণকে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সেলাম করিতে হয়। ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার, স্কুলের ডেপুটী ইনস্‌পেক্‌টার, হেলথ অফিসার, ভ্যাক্সিনেসন ইনস্‌পেক্‌টার, পুলিস ইনস্‌পেক্‌টার, দারোগা, জমাদার ইত্যাদি অনেক কর্ম্মচারীকে তাঁহার সঙ্গে ঘুরিতে হয়।

মিঃ ব্যানার্জ্জী খুব অল্পদিনের মধ্যে পম্পাই সাহেবের মেজাজ চিনিয়া লইলেন, এবং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। দাসেরহাট মহকুমায় স্কুলের বোর্ডিং ছিল না, মিঃ ব্যানার্জ্জী পম্পাই সাহেবের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি লইয়া একটা বোর্ডিং-ঘর নির্ম্মাণের জন্য চাঁদা সংগ্রহ আরম্ভ করিলেন। ছয় মাসের মধ্যে ১০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইল এবং এক বৎসরের মধ্যে বোর্ডিং নির্ম্মিত হইল। তাহার দ্বার উদ্‌ঘাটন (opening ceremony) করিবার জন্য তিনি কালেক্‌টার পম্পাই সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তখন তিনি খুব ধূমধাম করিলেন। টাউনের রাস্তার দুই পার্শ্বে কলাগাছ ও রঙ্গীন কাগজের মালায় সুশোভিত হইল। স্থানে স্থানে পত্র-পুষ্প-পতাকা-শোভিত কয়েকটি গেট নির্ম্মিত হইল। সাহেব আসিবার সময় রাস্তার দুই ধারে চৌকীদারগণ তাহাদের চক্‌চকে তকমা আঁটিয়া ও ফিট্‌ফাট পোষাক পরিয়া লম্বা লাঠি হাতে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। এই সকল দেখিয়া সাহেব মহাখুসী হইয়া "Pompy Boarding"এর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন, এবং সেই সভায় মিঃ ব্যানার্জ্জীর অনেক প্রশংসা করিয়া এক বক্তৃতা দিলেন। পরে মিঃ ব্যানার্জ্জী সাহেবকে খুব পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন এবং নিজেও সেই সঙ্গে খাইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সদরে ফিরিয়া গিয়া যথাসময়ে মিঃ ব্যানার্জ্জীকে রায় সাহেব খেতাব দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন। আবার এ দিকে বোর্ডিংএর সমস্ত খরচ-পত্র বাদে প্রায় ২ হাজার টাকা বাঁচিল, সে টাকাটা মিঃ ব্যানার্জ্জী গ্রহণ করিয়া তাঁহার মোটর খরচ পোষাইয়া লইলেন। এইরূপে মেঘ কাটিয়া গেলে তরুণতপন মধ্যাহ্ন-ভাস্করের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন। ইহার পরে যখন প্রমোশনের সময় আসিল, তখন তরুণতপন ৪ শত টাকার গ্রেডে প্রমোশন পাইলেন, আর সত্যকিঙ্কর বাবুকে ডিঙ্গাইয়া তাঁহার নীচেকার এক জন অফিসার ৫ শত টাকার গ্রেডে প্রমোশন পাইলেন। সে বেচারীর প্রমোশন বন্ধ হইল।

৭

আমিনগঞ্জ মহকুমায় যাইয়া সত্যকিঙ্কর বাবু মিঃ টমাস্ (Thomas) নামক এক জন জুনিয়ার সিভিলিয়ানের অধীনে কায করিতে লাগিলেন। টমাস সাহেব নেহাৎ ছোকরা হইলেও খুব বুদ্ধিমান্ এবং কার্য্যদক্ষ। সত্য বাবু ইঁহার অধীনে ৬ মাস কায করিলে, সাহেব তাঁহাকে এক জন বিচক্ষণ, ন্যায়-পরায়ণ ও ধর্ম্মভীরু লোক বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং অনেক জটিল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে এই সাহেব Appointment Departmentএর Under Secretary নিযুক্ত হইয়া বদলী হইলেন। যাইবার সময় সাহেব বলিলেন—"সত্য বাবু, আপনার প্রতি ঘোর অবিচার হইয়াছে, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি প্রমোশনের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট একটা representation (আবেদন) পাঠান; আর চীফ সেক্রেটারীর সঙ্গে একবার দেখা করিবেন।" সাহেব চলিয়া যাওয়ার সময় সত্য বাবু একটা representation দিলেন এবং সাহেব তাহাতে সত্য বাবুর প্রশংসা করিয়া অবশেষে লিখিলেন, আমি ইঁহার নিকট অনেক কায শিখিয়াছি। সাহেব যাইয়া কিছু দিন পরে সত্য বাবুকে প্রতাপপুর জেলায় সদরে বদলী করিলেন। ইতিমধ্যে সেই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ৩ মাসের ছুটী লইলেন, এবং সেই জেলার অন্তর্গত দাসেরহাট মহকুমা হইতে মিঃ টি টি ব্যানার্জ্জী সহরে একটিং-ম্যাজিষ্ট্রেট্ কালেক্‌টার হইয়া আসিলেন। সত্যকিঙ্কর বাবু তাঁহার সিনিয়ার ছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার প্রমোশন বন্ধ, সে জন্য তিনি একটিং কায পাইলেন না। ইহার অল্পদিন পরেই তরুণতপন "রায় সাহেব" উপাধি লাভ করিয়া তাঁহার বড় সাধের "মিঃ" খেতাবকে বিসর্জ্জন দিতে

করিয়া চাকুরীর প্রতি নিতান্ত বীতস্পৃহ হইয়া পড়িলেন। এই সময় টমাস সাহেব তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার শীঘ্র আসিয়া Chief Secretaryর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত।

Chief Secretary Mr. Whit (হুইট্) এক জন ন্যায়বান্ ও ধীরপ্রকৃতির লোক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সত্য বাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া বলিলেন—

"Sir, my promotion to the Rs. 500 grade has been stopped. May I enquire for what fault of mine. I have been superseded? (আমার প্রমোশন কেন বন্ধ হইয়াছে, আমি জানিতে পারি কি?)

চীফ সেক্রেটারী বলিলেন—"Satya Babu, promotion to the senior grade is not given according to seniority alone but according to merit." (উপরের গ্রেডের প্রমোশন গুণানুসারে দেওয়া হয়, কেবল সিনিয়ার হইলে হয় না।)

সত্য।—But sir, how do you judge our merits? (আমাদের গুণ কিরূপে আপনারা বিচার করেন?)

চিফ।—From the confidential character reports of your Superior Officer. (আপনাদের উপরিস্থ কর্ম্মচারীদিগের গোপনীয় রিপোর্ট অনুসারে।)

সত্য।—But sir, I hope yow will kindly excuse me when I say that a mere unreliable machinery for judging our merits could not have been set up by Govt. Under the present system rogues thieves, and cheats are prospering and honest officers have no chance. (আমাদের গুণের বিচার করিবার পক্ষে এরূপ অবিশ্বাস-যন্ত্র আর হইতে পারে না—এই যন্ত্রের অধীনে থাকিয়া যত বাঁদর, ছুঁচো, চোর দিব্য উন্নতিলাভ করিতেছে, কিন্তু খাঁটি লোকের কোন আশা নাই।)

এই কথা শুনিয়া হুইট্ সাহেবের মুখ লাল হইয়া গেল, তিনি বলিলেন—"Satya Babu, please don't be excited, I know the Collectors are not infallible." (আমি জানি, কালেক্টাররা ভুল করিতে পারেন।)

সত্য।—But they are guided by their own predilections. They fall easy prey into the hands of self-seeking, designing men; some times they are incapable of judging the merits of officers on account of their incompetence and inexperience. For these reasons it is quite unsafe to place absolute reliance on their reports which are submitted behind our backs." (কালেক্টার আপন খেয়াল অনুসারে চলেন, তাঁহারা সহজেই স্বার্থান্বেষী চতুর লোকের ফাঁদে পড়েন, কখন কখন তাঁহাদের অনভিজ্ঞতা ও অক্ষমতার জন্য অনেক অফিসারের দোষ-গুণ বুঝিতে পারেন না, সে জন্য তাঁহারা আমাদের সম্বন্ধে যে সকল এক-তরফা রিপোর্ট পাঠান, তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা উচিত নহে।)

চীফ সেক্রেটারী সত্য বাবুর কথাগুলি শুনিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। তিনি নিতান্ত ধীরপ্রকৃতি ও বিচক্ষণ লোক, সহসা ক্রোধ প্রকাশ করেন না। তিনি সত্য বাবুর যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া সব শেষে বলিলেন—

"I have seen your representation, Satya Babu, Thomas speaks highly of you. I shall consider your case. Good bye." (আমি আপনার দরখাস্ত পড়িয়া দেখিয়াছি, ও মিঃ টমাস আপনার খুব প্রশংসা করিয়াছেন। আমি আপনার সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিব। আচ্ছা, এখন আসুন।)

সত্য বাবু টমাস সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আসিলেন। ইহার ৩ মাস পরে তাঁহার প্রমোশন হইল, কিন্তু মিঃ টি, টি, ব্যানার্জ্জী (এখন রায় সাহেব) যথাসময়ে পাকা কলেক্টার হইবার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

সাবান-শিল্প

প্রকৃত সাবান আধুনিক কালের দ্রব্য। সম উদ্দেশ্যসাধনার্থ অর্থাৎ বস্ত্রাদি ধৌত ও গাত্র পরিষ্কার করার জন্য কয়েক প্রকার পদার্থ প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। ভারতে এরূপ পদার্থের অভাব নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, রিঠার ব্যবহার খুব প্রাচীন। ইহার অন্য নাম ফেনিল। আর একটি গাছের ফলকে বনরিঠা (Acacia concinna) বলা হয়। উভয় প্রকার ফলেরই বস্ত্রাদি ও মূল্যবান্ ধাতব অলঙ্কার ও তৈজসপত্র ভিন্ন কেশ ধৌত করণের জন্য চলন রহিয়াছে। ভারতের নানাস্থানে বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকাও এতদভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে অবশ্য সাজিমাটীই সমধিক পরিচিত। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্তও কদলীপত্রভস্ম গ্রাম্য রজকের প্রধান অবলম্বন ছিল। এই সমুদয় দ্রব্য কতক পরিমাণে সাবানের কার্য্য করিলেও এগুলি ঠিক সাবানের সমান নহে, বিশেষতঃ এগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে বহুমূল্য সূক্ষ্ম বস্ত্র অথবা গাত্র পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে না। বর্ত্তমান জগতে সর্ব্বত্রই সাবানের ব্যবহার ক্ষিপ্রগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে; ভারত সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে পারা যায়। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার সাবান আমদানী হইত; এখন তাহা কিঞ্চিৎ ন্যূন ২ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বিদেশ হইতে যত টাকা মূল্যের সাবান আমদানী হয়, ভারতেও প্রায় সেই পরিমাণ সাবান উৎপাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভারতে সাবানের কাটতির পরিমাণ প্রায় ৪ কোটি টাকা। অপর দেশের তুলনায় ইহা অতি সামান্য। ভারতে সাবান-শিল্পের পরিসর-বৃদ্ধির যথেষ্ট অবসর আছে। বিদেশের বড় বড় সাবান-প্রস্তুতকারিগণ ভারতের ন্যায় বাণিজ্য-ক্ষেত্রের উপর প্রতিনিয়ত লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। ভারতে সাবান-শিল্প বিস্তৃতভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাঁহাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশ্যম্ভাবী। এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে হইলে একসঙ্গে ভূরি পরিমাণে সাবান প্রস্তুত হওয়া যেমন প্রয়োজনীয়, প্রস্তুতের কল-কব্জা ইত্যাদিও সেইরূপ সম্পূর্ণ আধুনিক হওয়া আবশ্যক।

দেশীয় সাবান প্রস্তুত-প্রচেষ্টা

সাবান আধুনিক যুগের দ্রব্য হইলেও কেহ মনে করিবেন না যে, ইহা মোটে ৫০।৬০ বৎসর দেখা দিয়াছে। বস্তুতঃ ভারতে এক প্রকার মোটা সাবান (crude soap) বহু দিবস হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিতেছিল। মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে ও ইংরাজ আমলের প্রথমাংশে গুজরাট্, অমৃতসহর, ফতেপুর, দিল্লী, আজমীর, মীরাট প্রভৃতি স্থানে এরূপ সাবান প্রস্তুতের বিবরণ পাওয়া যায় এবং এখনও পর্য্যন্ত উহার অস্তিত্বের নিদর্শন আছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ভারতে সাবান-শিল্পে বাঙ্গালীই অগ্রণী; ঢাকা ও চট্টগ্রামের সাবান এক শতাব্দী পূর্ব্বেও দেশীয় ব্যবসায়ে উচ্চস্থান পাইত, ঢাকার উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম শ্বেতবস্ত্র প্রস্তুতের সহিত ঢাকাই সাবানেরও কিছু সম্পর্ক ছিল। বর্ত্তমান সময়ে অন্যান্য লোকের প্রতিযোগিতায় ঢাকা ও চট্টগ্রামের সাবানপ্রস্তুতকারিগণের বংশধরেরা নিজে সাবান প্রস্তুত কার্য্যে বিশেষ লাভ করিতে পারে না, কিন্তু অনেক সাবানের কারখানায় উহারা সুদক্ষ মিস্ত্রীরূপে স্থান পাইয়াছে। এই শ্রেণীর জনৈক উদ্যোগী ব্যক্তি জাহাজের খালাসীরূপে বিশ্ব-বিশ্রুত সাবানের অন্যতম কেন্দ্র মারসেঁ (Marseilles) নগরে গিয়া আধুনিক সাবান-প্রস্তুতপ্রণালী শিখিয়া আইসে। ইহার নাম হামিদ মিস্ত্রী; হামিদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ২।১টি প্রথা ও যন্ত্রপাতি এখনও পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র সাবান-কারখানাসমূহে চলিয়া আসিতেছে। ফলতঃ বঙ্গদেশে সাবান প্রস্তুত শতাধিক বৎসরের পূর্ব্ব হইতে এ পর্য্যন্ত জাগ্রত রহিয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বঙ্গের সাবান-শিল্পে নব প্রাণ সঞ্চারিত হয়। নর্থওয়েষ্ট, বেঙ্গল, ওরিয়েণ্টাল্, বুল্-বুল্ প্রভৃতি সাবান কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দেশীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিলাতী সাবানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আরম্ভ করেন। নানাবিধ কারণে, বিশেষতঃ উপযুক্ত অভিজ্ঞতা, মূলধন ও কলকব্জাদির অভাবে উক্ত প্রকার কারখানাসমূহের মধ্যে

অনেকগুলি উঠিয়া যায়; কিন্তু তৎসমুদয়ের দ্বারা যে কোন কার্য্য হয় নাই, তাহা বলা যায় না। আর্থিক হিসাবে লোকসান হইলেও এই সমুদয় কারবার বাঙ্গালায় সাবান-শিল্পের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং বাঙ্গালীকে ভারতের মধ্যে সাবান-শিল্পিরূপে অগ্রণী করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের অন্যত্র যে সমুদয় সাবান-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—যথা মাদ্রাজ, মহীশূর, বরোদা, হাইদরাবাদ প্রভৃতি স্থানে—সে সকল স্থলেই বাঙ্গালী বিশেষজ্ঞ ও বাঙ্গালী শিল্পের সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়াছে ও হইতেছে। স্বদেশী আন্দোলনজাত পূর্ব্বোক্ত কারখানাগুলির মধ্যে কয়েকটি লাভজনক না হওয়ায় কিছু দিনের জন্য বঙ্গের সাবান-শিল্পের অগ্রগতি মন্দীভূত হয়। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের সময় যখন বিলাতী সাবান আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়া যায়, তখন আবার নূতন উদ্যমে বাঙ্গালী সাবান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। এক দিকে বাগমারী কারখানাসমূহের প্রধানতঃ কাপড় ধোয়া ও অন্য দিকে ক্যালকাটা সোপ ওয়ার্কের নানাবিধ উৎকৃষ্ট সাবানের এই সময়ে বাজারে প্রচুর কাট্‌তি হইতে আরম্ভ হয়। শেষোক্ত কোম্পানীর 'নির্ম্মলীন' সাবান সুবিখ্যাত 'সন্‌লাইট' সাবানের সমকক্ষ হইয়া উঠে। য়ুরোপীয় যুদ্ধ অবসানের পর আবার বাজার একটু মন্দা হয়, কিন্তু এখন সাবান কোম্পানীসমূহের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়।

সাবানের মশলা

সাবানকে মোটামুটিভাবে ক্ষার সহ তৈল অথবা চর্ব্বির যৌগিক বলিতে পারা যায়। সাবান প্রস্তুতের তৈলের ভারতে অভাব নাই। নারিকেল, মহুয়া, তিল, চীনার বাদাম, তুলাবীজ, রেড়ী, পোস্তদানা ও সর্ষপ—এ সমস্তই সাবান তৈয়ারীর উপযোগী; কিন্তু ইহাদের গুণাগুণের প্রভেদ আছে। সাধারণতঃ সকল তৈলেরই উপকরণ—গ্লিসেরিণ ও কতিপয় স্নেহাম্ল (fatty acids)। স্নেহাম্লসমূহের, বিশেষতঃ Stearic acidএর পরিমাণের তারতম্য অনুসারে কোন নির্দ্দিষ্ট তৈলের সাবান উৎপাদনোপযোগিতা নির্ভর করে। মহুয়া ও নারিকেল তৈলে কঠিন এবং চীনার বাদাম ও তিলতৈলে নরম সাবান প্রস্তুত হয়; নারিকেল তৈলের সাবানে যথেষ্ট ফেনা হইয়া থাকে। মহুয়া তৈল কতক পরিমাণে চর্ব্বির পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা চলে। বস্তুতঃ তৈল কঠিন হইয়া যাওয়ার উপর সাবান প্রস্তুতের সফলতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। Hydrogenation প্রণালী দ্বারা আজকাল অনেক অপকৃষ্ট তৈলকেও সাবান প্রস্তুতে প্রয়োগ করা হইতেছে। বিদেশীয় তৈলসমূহের মধ্যে য়ুরোপীয় অলিভ এবং আফ্রিকা-দেশীয় পাম্ তৈল উৎকৃষ্ট উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়। পূর্ব্বোক্ত তৈল খাদ্যার্থে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হওয়ায় উহার স্থান ক্রমশঃ তিলতৈল দ্বারা অধিকৃত হইতেছে। প্রাণিজ স্নেহ অর্থাৎ চর্ব্বি বহু পরিমাণে সাবান প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু উহা অত্যাবশ্যক নহে; কেবলমাত্র উদ্ভিজ্জ তৈল হইতেও অত্যুৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত করা যায়। এতদ্দেশে সাবানের জন্য সাধারণতঃ যে চর্ব্বি ব্যবহৃত হয়, তাহা কসাইএর দোকান হইতে প্রাপ্ত। ভারতে মৃত গো-মহিষাদি হইতে সচরাচর চর্ব্বি নিষ্কাশিত হয় না। উহা একটি প্রকাণ্ড অপচয়। সাবান-শিল্পের পরিসর-বৃদ্ধির সহিত সম্ভবতঃ এইরূপ চর্ব্বির সদ্ব্যবহার হইবে। মৎস্য-তৈলও সাবান প্রস্তুতের একটি উপাদান। পশ্চিম উপকূলে যথেষ্ট পরিমাণে মৎস্যতৈল প্রস্তুত হয় এবং মাদ্রাজের দুই একটি সাবান-কারখানায় উহা এখন ব্যবহৃত হইতেছে। সামুদ্রিক মৎস্যে অধিকতর সদ্ব্যবহারের সহিত মৎস্যতৈল আরও সুলভ হইবে।

তৈল অথবা চর্ব্বি ব্যতীত সাবানের অন্য প্রধান উপাদান ক্ষার। সার্জ্জিকা ক্ষার ও চূণ পূর্ব্বে অনেক পরিমাণে দেশী সাবান প্রস্তুতে প্রযুক্ত হইত। এখন কষ্টিক সোডাই সাবানপ্রস্তুতের অন্যতম ক্ষার-উপাদান। আগে ইহা বিলাত হইতে আমদানী হইত। বর্ত্তমান সময় এইরূপ বিলাতী কষ্টিক সোডা কলিকাতার বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় এবং কতক পরিমাণে একটি দেশীয় কারখানাতেও প্রস্তুত হইতেছে। ইহাতে সাবান-প্রস্তুতকারকগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। সাবানের কলেবর বৃদ্ধি করার জন্য উপরি-উক্ত দুই শ্রেণীর মূল উপাদান ব্যতীত অন্য কয়েকটি দ্রব্য আবশ্যক হইয়া থাকে। তন্মধ্যে Sodium silicate, Soda-ash, Paper-pulp, Kaolin ও soapstone অন্যতম। ইহাদিগকে filling material বলে এবং সাবানের প্রকার অনুসারে ইহাদের মধ্যে এক বা অন্য দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। সাবান সুরভিত ও রঞ্জিত করিবার নিমিত্ত নানাবিধ স্বভাবজ ও কৃত্রিম গন্ধ ও বর্ণ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ইহা একটি চারু-শিল্পবিশেষ; সাবানে কিরূপ রং ও সুবাস ঠিক জনপ্রিয় হইবে, তাহা বাছিয়া বাহির করিতে বিশেষ দক্ষতা প্রয়োজনীয়।

বিভিন্ন শ্রেণীর সাবান

গুণানুসারে নানাশ্রেণীর সাবান বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়। মোটামুটি হিসাবে ধরিতে গেলে সেগুলি দুই প্রকারের ;—বস্ত্রাদি ধুইবার ও গাত্র পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সাবান। কাপড়-ধোয়া সাবানের যে অনেক উপশ্রেণী আছে, তাহা সকলেই জানেন। গুঁড়া সাজিমাটী অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের উষর মৃত্তিকা হইতে আরম্ভ করিয়া ঢেলা, বল, বার প্রভৃতি বিভিন্নরূপ সাবানের গুণের তারতম্য আছে, কিন্তু সকলগুলিই বস্ত্রাদি ধৌত করিতে ব্যবহৃত হয়। সুবিখ্যাত সন্‌লাইট সাবান এই শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ আদর্শ; বাঙ্গালার নির্ম্মলীন সাবান ইহার সমকক্ষ হইয়াছে। ফরাসী-দেশে বহু-প্রচলিত শুভ্র মারসেঁ সাবানেরও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আছে। ক্ষারাধিক্যবিহীনতা, কোমলতা, সামান্য সুগন্ধ ইত্যাদি গুণাবলী উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাপড়-ধোয়া সাবানে পরিলক্ষিত হয়। গৃহস্থালীর কার্য্যে ব্যবহৃত ও গায়ে-মাখা সাবানের কতিপয় গুণ থাকা দরকার—শীঘ্র শীঘ্র যথেষ্ট ফেনা উৎপাদন ও ফেনা বেশ মোলায়েম হওয়া তন্মধ্যে অন্যতম। গায়ে-মাখা সাবানের ফেনা যাহাতে চর্ম্ম মসৃণ ও স্নিগ্ধ রাখে, তাহার উপরও বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। প্রসাধনের সাবানের মধ্যে এক শ্রেণীর সাবান কেহ কেহ অধিক পছন্দ করেন; উহার নাম Transparent Glycerine Soap। নাম উক্তরূপ হইলেও ইহাতে বিশেষ পরিমাণ গ্লিসেরিন নাই এবং ইহা একেবারে স্বচ্ছও নহে। তথাপি ইহা ব্যবহারে চর্ম্মের কর্কশতা দূরীভূত হয়। প্রস্তুতের সময় সাবানের শুষ্ক চোকলা-(chips) সমূহকে সুরাতে দ্রব করিয়া সুরা অপসারণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার শুষ্ক করিয়া এই প্রকার সাবানের স্বচ্ছতা-সাধন করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে ব্যয়বাহুল্য আছে। পিয়ার্শ প্রভৃতি দুই একটি কোম্পানী ব্যতীত অন্য কেহই বোধ হয় এ প্রথা অবলম্বন করেন না। তাঁহারা কেবলমাত্র ঠাণ্ডা প্রণালীতে সাবান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শর্করা-দ্রব ও সুরাসার কিয়ৎ-পরিমাণে যোগ করেন। প্রকৃত Transparent Glycerine Soap অবশ্য এই প্রথায় হয় না, কিন্তু বাহ্যতঃ উহা দেখিতে একইরূপ হইয়া থাকে। তৈজসপত্র, গৃহের মেজ, আসবাব প্রভৃতি ধৌতকরণ ও বস্ত্রাদি রঞ্জন করার বিবিধ প্রকার সাবান আছে। [illegible] সমস্তের বিবরণ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া অসম্ভব।

বস্ত্রাদি ধৌত করার সাবান

আজকালকার উচ্চশ্রেণীর সাবান প্রস্তুত করিতে নানা প্রকারের মাল-মসলা ও জটিল কলকব্জাদি আবশ্যক হয়। আধুনিকতম সাবানের কারখানায় হাতের কায খুবই কম। উপাদানসমূহ ফুটাইবার পাত্রে চড়ান হইতে আরম্ভ করিয়া সাবান একেবারে প্যাক হইয়া বাহির হইয়া আসা পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই প্রায় কল দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। সাবান প্রস্তুতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে এক দিকে যেমন রসায়ন-বিজ্ঞানের কতিপয় বিভাগে ব্যুৎপত্তি দরকার, প্রকৃত প্রস্তুত-কার্য্যের কলা-কৌশলেও তেমনই সুদক্ষ হওয়া প্রয়োজনীয়। এ স্থলে সাবান প্রস্তুতের একটি স্থূল ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

কলিকাতার পূর্ব্বাংশে, ঢাকা ও নানা ক্ষুদ্র সহরে কাপড়-ধোয়া অথবা বাঙ্গালা সাবানের কারখানা আজকাল বেশ চলিতেছে। সর্ব্বপ্রকার সস্তা তৈল ও চর্ব্বি এবং অপরিশুদ্ধ কষ্টিক সোডা ইহার প্রধান উপাদান। তৈল অথবা তৈল ও চর্ব্বি-মিশ্রণ বড় বড় লৌহ কটাহে উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে ক্ষার-দ্রাবণ সংযোগপূর্ব্বক ৭।৮ ঘটা ধরিয়া ফুটান হয়; এক শ্রেণীর উপাদানের আধিক্য হইলে আর এক শ্রেণীর উপাদান যোগ করিয়া তাহা সমীকরণ (neutralise) করা সাধারণ নিয়ম। অগ্নি হইতে অপসারিত হইয়া সাবান ঠাণ্ডা হইলে আবার তাহাকে গরম করিয়া চীনামাটী, খড়ি, সাজি-ক্ষার অথবা অন্য কোন কলেবরবৃদ্ধির মসলা সংযোগ করিয়া, নমনীয় অবস্থায় থাকিতে থাকিতে মাটীর ছাঁচে ঢালিয়া কিম্বা হস্ত দ্বারা ইচ্ছামত আকার প্রদান করা হয়। এই প্রথা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত না হইলেও এই উপায়ে প্রস্তুত প্রভূত পরিমাণ কাপড়-কাচা সাবান বাজারেও চলিতেছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কটাহ ও সাক্ষাৎ অগ্নু-তাপের পরিবর্ত্তে যথাক্রমে বড় বড় নলাকার পাত্র (kettle) ও উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাত্রে তৈল ও চর্ব্বি-মিশ্রণ দেওয়ার পর ক্রমশঃ ক্রমশঃ ক্ষারদ্রাবণ যোগ করিয়া ফুটান হয়। পূর্ব্বপ্রস্তুত সাবানের যে সমস্ত ছাঁট থাকে, তাহার কিয়দংশ এই সময়ে ফুটন্ত মিশ্রণে নিক্ষেপ করিলে প্রথমতঃ মিশ্রণ ঘোলাটে ও পরে মণ্ডবৎ হইয়া সাবান-গঠনক্রিয়ার প্রথম স্তর আরম্ভ হয়। তৈল অথবা চর্ব্বির উপর ক্ষারদ্রাবণের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে গ্লিসেরিন ও মেদোম্ল পৃথগ্‌ভূত হইয়া শেষোক্ত পদার্থ সোডার সহিত যুক্ত হইয়া

সাবান উৎপাদন করে ও গ্লিসেরিন জলের সহিত মিশ্রিত থাকিয়া যায়। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, সাক্ষাৎ অগ্নিতাপে উক্ত মিশ্রণ ফুটাইলে গ্লিসেরিন কতক পরিমাণে নষ্ট হয় এবং তৈল অথবা বসার প্রকৃতিও অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হইয়া যায়। গ্লিসেরিন স্বতন্ত্রভাবে (free state) অধিক পরিমাণে থাকিলে সাবান জমিবার ব্যাঘাত হয়; সেই জন্য সামান্য পরিমাণে সাধারণ লবণ-সংযোগ দ্বারা সাবানের দানা বাঁধিয়া গেলে গ্লিসেরিন সংযুক্ত অবশিষ্ট জল (spent lye) পৃথক্ করিয়া লওয়া হয়; পরে উহা হইতে গ্লিসেরিন বাহির করা হইয়া থাকে। এমন দানা-বাঁধা সাবানকে আবার গলাইয়া এরূপ তরল অবস্থায় আনা হয় যে, উহার মধ্যে যাহা কিছু ময়লা থাকে, সমস্তই অধঃপাতিত হইয়া যায়। পরিষ্কৃত মিশ্রণের সহিত অতঃপর বাঁধিবার মশলা (চীনামাটী ইত্যাদি) সংযোগ করিলে সাবান জমিবার সুবিধা হয়। এই অবস্থায় সাবানকে বড় বড় লৌহনির্ম্মিত বাক্সে ঢালিয়া দেওয়া হয়; তাহাতে সাবান ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া যায়। বাক্স এরূপ কৌশলে তৈয়ারী যে, উহাকে নাড়া-চাড়া না করিয়া ধারগুলি খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। বাক্স এইরূপে খুলিয়া ও অনাবৃত করিয়া উহা কলের ছুরি দ্বারা কাটিয়া ইচ্ছামত আকারে পরিণত করা হয়। অতঃপর খণ্ডগুলিকে বিশেষ উপায়ে শুষ্ক করিয়া ছাপ মারিয়া দিলেই প্রস্তুতের কার্য্য শেষ হইল। অবশিষ্ট কায—খণ্ডগুলিকে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় বাক্সবন্দী করিয়া বাজারে চালান দেওয়া। বলা বাহুল্য যে, মিষ্টান্ন পাকের ন্যায় সাবানের পাক ঠিক হইয়াছে কি না, তাহা কেবল অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী শিল্পীই বুঝিতে পারে। পাকের সামান্য ইতর-বিশেষ হইলে প্রস্তুতীকৃত সাবানের গুণা-গুণের অনেক তফাৎ হইয়া যায়।

অঙ্গ-প্রসাধনের সাবান

গায়ে-মাখা সাবান-প্রস্তুত-প্রণালীর প্রথম স্তর অর্থাৎ উপাদানসমূহ ফুটাইয়া পরিষ্কৃত মিশ্রণ প্রস্তুত করা পর্য্যন্ত, কাপড়-কাচা সাবানের সমতুল্য। অবশ্য গায়ে-মাখা সাবানের মাল মশলা উৎকৃষ্টতর হওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ আহার্য্য তৈল হইতেই এইরূপ সাবান প্রস্তুত হয় এবং পশ্চাতে তৈল, বর্ণ ও গন্ধহীন করা হইয়া থাকে। অধিকন্তু প্রসাধন সাবানে জলীয়াংশ খুব কম থাকা দরকার। কাপড়-কাচা সাবানে উহার মাত্রা শতকরা ২৫ হইতে ৫০ ভাগ হইতে পারে; কিন্তু গায়ে-মাখা সাবানে উহা ৮ হইতে ১০ ভাগের অধিক হওয়া উচিত নহে। নতুবা সাবানের গন্ধ ও স্থায়িত্বগুণ নষ্ট হইতে পারে। কাপড়-ধোয়া সাবান-প্রস্তুত-প্রণালীতে সাবান জমানর পর উহাকে পাতলা পাতলা ক্ষুদ্র পর্দ্দায় কাটিয়া, তারের জাল-নির্ম্মিত পাত্রে রাখিয়া উত্তপ্ত বায়ু-প্রবাহ সাহায্যে ভিতরে বাহিরে সমরূপে শুষ্ক করা আবশ্যক। পরে এই পর্দ্দাগুলি প্রস্তরময় রুলের মধ্যে পেষণ করিয়া চূর্ণ করা হয়; চূর্ণে বর্ণ ও গন্ধ সংযোগ করিয়া পুনর্ব্বার চূর্ণ করাই নিয়ম; তাহাতে মশলাসমূহ চূর্ণের সহিত সর্ব্বত্র সমভাবে মিশ্রিত হইয়া যায়। তৎপরে চাপ দেওয়ার যন্ত্রে চূর্ণগুলি দিয়া যথেষ্ট চাপ প্রয়োগ করিলে সাবানের মূল পর্দ্দা উষ্ণ অবস্থায় এক দিক্ দিয়া বাহির হইয়া আসে। পর্দ্দা তখন ইচ্ছামত আকারে কাটিয়া খণ্ড করিয়া ছাপ দেওয়া হইয়া থাকে। আধুনিকতম কারখানা-সমূহে নূতন রকমের কল-কব্জাদি ব্যবহৃত হইতেছে এবং প্রস্তর-নির্ম্মিত রুলের পরিবর্ত্তে অন্তঃসলিল-প্রবাহযুক্ত দৃঢ় ইস্পাতের রুলের প্রচলন হইয়াছে।

এ স্থলে বলা দরকার যে, "খুব সস্তা দরের যে সমস্ত গায়ে-মাখা সাবান বিক্রয় হয়, সেগুলি বর্ণ ও গন্ধযুক্ত কাপড়-ধোয়া সাবান ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এক প্রকার ঠাণ্ডা প্রণালীতে উত্তম সাবান প্রস্তুত করা যায়। ইহা অনেকটা আমাদের দেশের কুটীরশিল্পের উপযুক্ত; কারণ, কল-কব্জার বাহুল্য নাই। শুদ্ধ নারিকেল-তৈল কিম্বা উপযুক্ত মাত্রায় নারিকেল-তৈল ও চর্ব্বি সংমিশ্রণ করিয়া, সামান্য উত্তাপে গলাইয়া লইয়া তাহাতে ক্ষার-দ্রাবণ যথোপযুক্ত অনুপাতে সংযোগ করিতে হয়। যতক্ষণ না মিশ্রণ ঘোলবৎ (emulsion) হইয়া উঠে, ততক্ষণ উহা নাড়া দরকার। পরে উহাকে ২।১ দিন রাখিয়া দিলে সাবান স্বতঃই জমিয়া যায় ও জমিবার পূর্ব্বে মিশ্রণ উত্তপ্ত হইয়া উঠে। সাবান ভাল হইয়া জমিয়া গেলে উহাকে কাটিয়া ছাপ মারিয়া লইতে পারা যায়। গন্ধ ও বর্ণ ক্ষার-সংযোগ করিবার পূর্ব্বেই দেওয়া ভাল। এইরূপ ঠাণ্ডা-প্রণালীতে প্রস্তুত সাবানকে কলে কাটা-ছাঁটা (milling) চলে না। কিন্তু ইহার উপাদানের মধ্যে সামান্য পরিমাণে পশম-বসা (wool-fat) কিম্বা তজ্জাতীয় দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত করিলে সাবান দেখিতে উৎকৃষ্ট কলের সাবানের সমতুল্য হয়। কেহ কেহ এরূপ সাবান আজকাল প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট লাভ করিতেছেন। শিক্ষিত ব্যক্তি-বর্গের পক্ষে ইহা অর্থাগমের একটি প্রকৃষ্ট উপায় হইতে পারে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

অনাবিষ্কৃত হিমগিরি

পৃথিবীর মানচিত্রে অনাবিষ্কৃত স্থান—গিরি, দরী, নদী, দেশ, কিছুই নাই—অনুসন্ধিৎসু মানুষ, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-গর্ব্বিত য়ুরোপীয় বা আমেরিকাবাসী পৃথিবীর সমগ্র রহস্য মানচিত্রে অঙ্কিত করিয়া লোকলোচনের গোচরীভূত করিয়াছে, এমন স্পর্দ্ধিত কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কিন্তু সে কথা সত্য নহে। বিপুলা ধরণীর অনেক বৃহৎ ও বিচিত্র স্থান এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে—সমগ্র রহস্যের উদ্ভেদ ঘটে নাই। ডাক্তার জোসেফ রক্ আমেরিকার এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, পর্য্যটক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক। তিনি আমেরিকা হইতে বিগত ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে চীন-তিব্বত সীমান্ত-প্রদেশের অনাবিষ্কৃত স্থানসমূহ আবিষ্কার করিবার জন্য আমেরিকা হইতে যাত্রা করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে অর্থাৎ তিন বৎসরব্যাপী কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার ফলে তিনি আম্‌নাই ম্যাচেন্ গিরিমালার আবিষ্কার করিয়াছেন। এই গিরিমালার একটি তুষারকিরীটী শৃঙ্গ হিমালয়ের গৌরীশৃঙ্গের প্রায় সমতুল্য বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

দুরধিগম্য এবং বিপৎসঙ্কুল চীন-তিব্বত সীমান্তপ্রদেশে ডাক্তার রকের পূর্ব্বে কোনও য়ুরোপীয় এ পর্য্যন্ত পদার্পণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার লিখিত বিবরণ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। সম্প্রতি পত্রান্তরে উহা প্রকাশিত হইয়াছে। 'মাসিক বসুমতীর' পাঠকবর্গের কৌতূহল-পরিতৃপ্তির জন্য তাহার সার সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইল। ডাক্তার রক্ এক স্থানে লিখিয়াছেন, "বিপৎপূর্ণ এবং উদ্বেগাকুল মাসগুলি কেমন করিয়া আমার জীবনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহা চিন্তা করিয়া এখনও আমি বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়ি। ২ হাজার মাইল দীর্ঘ পীত-নদের উৎপত্তি-মুখে উপনীত হইতে আমাকে কিরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, কেমন করিয়া অনাবিষ্কৃত হিমগিরিমালা আম্‌নাই ম্যাচেনএ উপনীত হইয়াছিলাম, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। এই গিরিমালার একটি শৃঙ্গ এভারেষ্টের মতই অত্যুচ্চ—২৮ হাজার ফুট উন্নত তুষারকিরীটী শৃঙ্গ যেন আকাশ-প্রান্ত চুম্বন করিতেছে। এখানে আমি যে সকল জীব-জন্তু দেখিয়াছি, তাহাদের সংখ্যা গণনা করা যায় না এবং অনেকের

ডাক্তার রকের সহযাত্রী অভিযানকারীগণ

নাম সভ্যসমাজে অবিদিত। এমন কি, সে সকল আরণ্য জীব কখনও মানুষের সংস্রবে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অনেক উপত্যকাভূমি দুর্লঙ্ঘ্য। স্বর্গোদ্যান মানুষ কখনও দেখে নাই, কিন্তু এই গিরিমালার অভ্যন্তরে এমন স্থান আছে, যাহা সুরোদ্যানের মতই রমণীয় এবং মনোমুগ্ধকর। পীত-নদ সমুদ্রবক্ষ হইতে ১০ হাজার ফুট উচ্চস্থান হইতে নিঃসৃত হইয়া, বৃক্ষবীথির মধ্য দিয়া, গিরি-কন্দরের বক্ষোভেদ করিয়া সগর্জ্জনে প্রবাহিত হইতেছে।"

ডাক্তার রক্ যে সকল প্রদেশ অতিক্রম করিয়া এই দুর্গম স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা দারিদ্র্য এবং আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক সভ্যজগতের সহিত এই সকল স্থানের কোন সংস্রবই ঘটে নাই। এ সকল দেশের অধিবাসীদিগের শাসন-পদ্ধতি বিচিত্র, জীবন-যাত্রা-প্রণালী স্বতন্ত্র, সামাজিক রীতি-নীতিও বিভিন্ন। রেল-পথ, মোটর গাড়ী, বিমানপোত, বেতার-বার্ত্তাবহ প্রভৃতি এতদঞ্চলে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। মার্কোপোলোর সময় হইতে সভ্যজগতে বিজ্ঞানের যে প্রকাশ ও উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা আলোচ্য চীন-তিব্বতসীমান্তে অভিনব ব্যাপার।

জনৈক তিব্বতীয় ধার্ম্মিক

চোনির যাযাবর সম্প্রদায়ের নারীগণ

এতদঞ্চলে কোনও চৈনিকও ভ্রমণ করিতে সাহসী নহে। এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে ৯০ হাজার নোলোক জাতি বাস করিয়া থাকে। ইহারা যেমন সমরপ্রিয়, তেমনই দুর্দ্ধর্ষ। অন্যান্য তিব্বতীয় জাতি বা সম্প্রদায়ও এই অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরিয়া বাস করিতেছে। এক উপজাতি অপর উপজাতির সহিত সর্ব্বদাই সংঘর্ষে রত। কিন্তু সভ্যসমাজ তাহার কোনও সংবাদই পান না, পাইবার উপায়ও নাই। ডাক্তার রক্ এখানকার মানুষকে ৩০ ফুট দীর্ঘ বর্শা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছিলেন। একটি লামা-নিবাসে তিনি বিদেশ হইতে আমদানী করা ৫০টা ঘটিকা যন্ত্র দেখিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে চলিতেছিল।

ডাক্তার রক্ যে পর্ব্বতমালার কথা বলিয়াছেন, এসিয়ার বর্ত্তমান মানচিত্রে তাহার উল্লেখ দেখা যায় বটে; কিন্তু উহার নামকরণে বানান-ভুল রহিয়া গিয়াছে। এসিয়ার মানচিত্রে "আম্নি ম্যাচিন্" বলিয়া যাহা লিখিত হয়, তাহার প্রকৃত বানান "আম্ নাই ম্যাচেন্।" পীত-নদের পশ্চিম ভাগে কোকো-নর প্রদেশের মধ্যে এই অদ্রিমালা তাহার বিরাট দেহ প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান।

ধর্ম্মপ্রচার-ব্যপদেশে যে সকল মিশনারী নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন, তাঁহাদের কোন কোন ব্যক্তি ব্যতীত শ্বেত-জাতীয় কোনও পরিব্রাজক অথবা অপর কেহ চীন-তিব্বত সীমান্তপ্রদেশে কখনও পদার্পণ করেন নাই।

রুশীয় পর্য্যটক রোকেরোভস্কি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের শীতকালে আম্‌নাই ম্যাচেনএ উপনীত হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু মান্‌গন্‌ গিরিসঙ্কটে তিনি এক দল "টানগটের" দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। মঙ্গোলীয়গণ তিব্বতীয়দিগকে উল্লিখিত নামে অভিহিত করিয়া থাকে। রোকেরোভস্কি উহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন।

ডাক্তার রক্‌ নানাপ্রকার বিপদ্‌কে অগ্রাহ্য করিয়া অনাবিষ্কৃত অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় তিনিও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল বিষয় লক্ষ্য করিবার সুযোগ পান নাই। তাড়াতাড়ি যতদূর পারিয়াছিলেন, তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। সুতরাং সভ্যজগতের লোক শুধু কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়াই এই রহস্যময় অঞ্চলের যৎসামান্য সংবাদ রোমন্থন করিয়া থাকে।

টাউ চাউয়ের জনৈক ধার্ম্মিক মুসলমান

ডাক্তার রক্‌ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ হইতে দক্ষিণ-তিব্বতাভিমুখে অনুসন্ধান ব্যপদেশে গমন করেন। সেই সময় তিনি পথিমধ্যে জনৈক ইংরাজ পরিব্রাজকের দেখা পান। ইঁহার নাম জেনারেল জর্জ্জ প্যারিয়া। ইনি সে সময়ে পিকিং হইতে লাসা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। ডাক্তার রক্‌ তাঁহার নিকট জানিতে পারেন যে, চীন-তিব্বত সীমান্তে তুষারমণ্ডিত আম্‌নাই ম্যাচেন্‌ গিরিমালা বিদ্যমান আছে। ইংরাজ পরিব্রাজক ১৫ মাইল দূর হইতে উক্ত হিমগিরির দর্শন পাইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট এই পর্ব্বতমালা সম্বন্ধে আভাস পাইয়া ডাক্তার রকের হৃদয়ে এই সঙ্কল্প জন্মে যে, তিনি এক দিন উক্ত গিরিমালার অবস্থান-স্থান আবিষ্কার করিবেনই। জেনারেল জর্জ্জ প্যারিয়া তাঁহাকে এমন কথা বলিয়াছিলেন যে, গৌরীশৃঙ্গ (এভারেষ্ট) অপেক্ষাও আম্‌নাই ম্যাচেনের শৃঙ্গ উচ্চতর বলিয়া তিনি অনুমান করেন। তত্রত্য নোলোক জাতিও যে ভীষণ দুর্দ্ধর্ষ, তাহাও তিনি এই ইংরাজ পরিব্রাজকের নিকট অবগত হন। এই জাতির শাসন-ভার এক জন নারীর উপর অর্পিত, ইহাও তিনি তাঁহার নিকট জানিতে পারিয়াছিলেন। জেনারেল প্যারিয়া স্বয়ং এতদঞ্চলে গমন করিবেন বলিয়া ডাক্তার রকের নিকট অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই। জেনারেল প্যারিয়া উক্ত ঘটনার কিছুকাল পরেই প্রাণত্যাগ করেন।

অস্ত্রধারী তিব্বতীয় যাযাবর সম্প্রদায়

ডাক্তার রক্‌, জেনারেল প্যারিয়ার বাক্যে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। তাই তিনি কয় বৎসর পরে এই শঙ্কাজনক সঙ্কটসঙ্কুল কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তিনি সংকল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উনানফু হইতে দ্বাদশ জন বিশ্বস্ত "নাশী" সহকারীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাত্রা করেন। ইহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ববারে তাঁহার দীর্ঘ পর্য্যটনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

কান্সুর উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থিত সাইনিংএ ডাক্তার রক্ তাঁহার এই অভিযানের মূল কেন্দ্রস্থান মনোনীত করেন। কিন্তু ১৫ সপ্তাহব্যাপী কষ্টকর পর্য্যটনের পর তিনি স্থানে স্থানে দলবদ্ধ দস্যুর নিদর্শন পাইয়া সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া চোনি সহরেই অভিযান-কেন্দ্র স্থাপন করেন। চোনির অধিবাসীরা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যদি রাদ্‌জাগম্বায় গমন করিতে পারেন, তাহা হইলে আম্‌নাই ম্যাচেন্ গিরিমালার কাছে অপেক্ষাকৃত সহজে উপনীত হইতে পারিবেন। রাদ্‌জাগম্বা পীত-নদের পূর্ব্বপারে অবস্থিত।

চোনির প্রিন্স ইয়াং চিচিংএর সহিত ডাক্তার রক্ পরিচয় করিয়া লইয়াছিলেন। ডাক্তার তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। সেই সময়ে লাব্রাং মঠের জীয়ন্ত বুদ্ধ—বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অংশরূপে তিনি পূজিত ছিলেন—আঙ্কর গম্বা নামক ক্ষুদ্র মঠে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রিন্স ইয়াং চিচিংএর নিকট হইতে অনেক কষ্টে একখানি পরিচয়-পত্র সংগ্রহ করিয়া ডাক্তার জীয়ন্ত বুদ্ধের সহিত দেখা করিতে গেলেন।

লাব্রাংএর বুদ্ধের বিশ্রাম-কক্ষ

দ্বাদশ বৎসর-বয়স্ক জীয়ন্ত বুদ্ধ আঙ্কর গম্বায় তখন কেন অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা ডাক্তার রক্ অনুসন্ধানফলে জানিতে পারিয়াছিলেন। সেই সময়ে লাব্রাংএর অধিবাসীদিগের সহিত সাইনিংএর মুসলমানদিগের ঘোর সংঘর্ষ চলিতেছিল। এই মুসলমানদিগকে কোকোনর দেশের শাসক জেনারেল মাচি পরিচালিত করিতেছিলেন। এই জন্যই জীয়ন্ত বুদ্ধ আঙ্কর গম্বায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই মঠটি ক্ষুদ্র হইলেও জীয়ন্ত বুদ্ধের জন্য সে সময় এখানে বহু জনসমাগম হইয়াছিল। অসংখ্য যাযাবর সম্প্রদায়ের নর-নারী, বালক বালিকা প্রত্যহ জীয়ন্ত বুদ্ধের পূজার জন্য এখানে সমাগত হইত। "ওম্ মণিপদ্মে হুঁম্" ধ্বনিতে অনুক্ষণ সেই মঠ অনুরণিত হইত। ডাক্তার রক্ এই ব্যাপারের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হৃদয়গ্রাহী।

"আমাদিগকে জীয়ন্ত বুদ্ধ যেখানে থাকিবার স্থান দিয়াছিলেন, তাহার অনতিদূরে একটি ছায়াশীতল স্থানে বহু যাক্ ও ভেড়ার স্কন্ধদেশের অস্থি দোদুল্যমান ছিল। দর্শনার্থীরা জীয়ন্ত বুদ্ধকে উপঢৌকনাদি দান করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে লাগিল। তার পর তাহারা অস্থিগুলি বাজাইতে আরম্ভ করিল। সেই শব্দ বায়ুমণ্ডলকে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। এমন অবস্থায় আমরা বুদ্ধসকাশে নীত হইলাম। দেখিলাম, বালক বুদ্ধ পীতবর্ণের সাটীনের পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া উচ্চ আসনে বসিয়া আছেন। আমি তাঁহাকে কতকগুলি দ্রব্য উপহার দিলাম। যে লামা তাঁহার পরিচর্য্যায় রত ছিলেন, তিনি সেই সকল উপহার গ্রহণ করিলেন। আমার পাচক তিব্বতীয় ভাষা অবগত ছিল। সে দ্বিভাষীর কার্য্য করিতে লাগিল। তাহার সাহায্যে আমি বালক বুদ্ধকে, অর্থাৎ তাঁহার পিতাকে
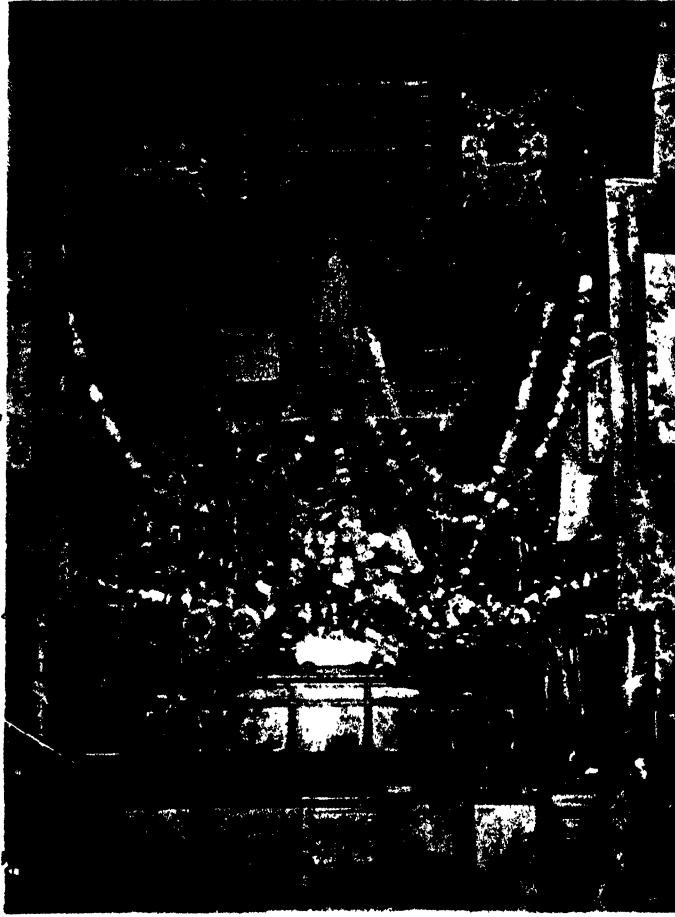
(ইনিই বুদ্ধের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন) আমার উদ্দেশ্যের কথা বিবৃত করিলাম। রাদ্‌জাগম্বার বুদ্ধ এবং নোলোক সর্দ্দার-দিগের কাহারও নামে পরিচয়-পত্র প্রদানের জন্য অনুরোধও করিলাম।

"রাদ্‌জাগম্বার বুদ্ধের নামে পরিচয়পত্র তখনই পাইলাম। কিন্তু সে সময়ে যাযাবর তিব্বতীয় এবং সাইনিংএর মুসলমান-দিগের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল বলিয়া নোলোক সর্দ্দার-দিগের কাহারও নামে তখনই পরিচয়পত্র পাইলাম না। কয়েক সপ্তাহ পরে উহা পাইবার কথা রহিল।"

এই সংঘর্ষব্যপদেশে অবস্থা এমন সঙ্কটসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছিল যে, ডাক্তার রক্ অনেক দিন পর্য্যন্ত আমনাই ম্যাচেন অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

আলোচ্য যুদ্ধে তিব্বতীয়রাই মুসলমান-দিগকে আক্রমণ করিয়া লাব্রাং হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। কিন্তু মুসলমানগণ পরাজিত হইয়াও নিরুৎসাহ হয় নাই। তাহারা নব-বলে বলীয়ান্ হইয়া তিব্বতীয়দিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। তাহার ফলে গাঙ্গা বালভূমি ও সংচু উপত্যকা-ভূমিতে তিব্বতীয়রা পরাজিত হয়। মুসলমানগণ নির্দ্দয়ভাবে আক্রান্তদিগকে হত্যা করিতে থাকে। কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ নুরা নামক যাযাবর তিব্বতীয় উপজাতি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মুসলমানদিগকে এমন তীব্রভাবে বাধা দিয়াছিল যে, সে আক্রমণ প্রতিহত করিবার শক্তি তাহাদের ছিল না। ৩০ ফুট দীর্ঘ বর্শার অব্যর্থ আঘাতে শত শত মুসলমানকে নিহত করিয়া ফেলিয়াছিল। ডাক্তার রক্ বলিয়াছেন, বন্দুকের গুলীতেও এত লোক মারিয়া ফেলা সম্ভবপর নহে।

রাদ্‌জার সন্নিহিত শীত-নদ

তিব্বতীয়দিগের উপর নেতৃত্ব করিবার তেমন সুযোগ্য ও কৌশলী সেনাপতি বিদ্যমান থাকিলে সেই যুদ্ধে মুসলমান-দিগের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকিত না। কিন্তু এই সকল দুর্দ্ধর্ষ তিব্বতীয় উপজাতির মধ্যে সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ় নহে। উল্লিখিত যুদ্ধ সম্বন্ধে ডাক্তার রক্ যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে, আমচক উপজাতি তিব্বতীয়দিগের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিলেও, অবকাশকালে তাহার স্বপক্ষীয়গণের শিবির লুণ্ঠন করিয়াছিল।

যে সকল তিব্বতীয় মুসলমানদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিল, তাহা-দিগের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে রজ্জু বন্ধন করিয়া বৃক্ষ-শাখায় ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কাহারও কাহারও উদরদেশ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলা হইয়াছিল। কোন কোন বন্দীর উদর-মধ্যে তপ্ত লোষ্ট্র ভরিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

বিবরণে দেখা যায়, কাংসু সরকার সেনাদল সহ তিব্বতীয়-দিগকে সাহায্যদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু কার্য্য-কালে তাহা ঘটে নাই। মুসলমানগণ তিব্বতীয়দিগের অপেক্ষা রণকৌশলে পারদর্শী। সুতরাং পরিণামে এই সকল তিব্বতীয়

উপজাতি তাহাদিগের নিকট পরাজিত হইয়াছিল। লাব্রাং মুসলমানগণের হস্তগত হয়। হেটশো মঠ লুণ্ঠন করিয়া মুসলমানগণ তত্রত্য জীবিত বুদ্ধকে তাঁহার পঞ্চদশ জন সন্ন্যাসীর সহিত শমনসদনে প্রেরণ করে। এই বিগ্রহের ফলে নারী ও বালক-বালিকাগণও অব্যাহতি লাভ করিতে পায় নাই বলিয়া ডাক্তার রক্ প্রমাণ পাইয়াছিলেন।

যুদ্ধের পর লাব্রাং এর অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়াছিল। মুসলমান সেনা-শিবিরের সম্মুখে প্রায় দেড় শত তিব্বতীয়ের মুণ্ড মালার ন্যায় ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। যুবতী নারী ও শিশুর মস্তক সেনা-শিবিরের চারিদিকে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। অশ্বারোহী মুসলমান সৈনিক ১০ হইতে ১৫টি নরমুণ্ড আসনের উভয় পার্শ্বে বিলম্বিত করিয়া সহরের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

লাব্দি উপজাতির তিন জন নারী

তিব্বতীয় যাযাবর জাতির মৃতদেহ মুসলমানগণ পদদলিত করিয়া ফিরিতেছিল। ডাক্তার রক্ স্বয়ং এই ভাবে যুদ্ধের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

উল্লিখিত বীভৎস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইতেছিল বলিয়া ডাক্তার রক্ গন্তব্য স্থান অভিমুখে যাত্রা করিতে পারেন নাই, কিছু কাল বিলম্ব করিতে হইয়াছিল। এই অবকাশে তিনি নোলোক জাতি সম্বন্ধে যথাসাধ্য বিবরণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বালক বুদ্ধও তাঁহাকে কোন কোন নোলোক সর্দ্দারের নামে পরিচয়-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

অবশেষে যাত্রার দিন স্থির হইল। চোনি ত্যাগের পূর্ব্বে তিনি পাঁচ মাসের রসদ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন। যে প্রদেশের অভিমুখে তাঁহারা চলিয়াছিলেন, তথায় মুদ্রার ব্যবহার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। সুতরাং তাঁহারা কয়েক তাল রৌপ্য,

লাব্রাং মঠের সন্নিহিত বাজার

কয়েক পেটি সূতা, সাটিন এবং অন্যান্য বস্ত্র সঙ্গে লইয়াছিলেন।

তাঁহাদের সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র এবং এক দল অশ্বারোহী রক্ষিসৈন্য ছিল। যাক্-বাহিত গাড়ীর মধ্যে দ্রব্যসম্ভার রাখিয়া যখন তাঁহারা যাত্রা করিলেন, তখন তাঁহাদের বাহিনীটি দর্শনীয় হইয়াছিল। ৩৪টি অশ্বতর তাঁহাদের সঙ্গে ছিল।

মঙ্গোল জাতীয় সোকো আরিক সম্প্রদায়ের ২০ জন সশস্ত্র অশ্বারোহী তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছিল। ইহারা যাযাবর জাতি। লাব্রাং মঠে ৫ হাজার লামা সন্ন্যাসী বাস করে। কথিত আছে, এই স্থানটি পূর্ব্বে জলা-ভূমি ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের কোনও বুদ্ধের প্রার্থনাফলে জলাভূমি, শুষ্ক ভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

লাব্রাং মঠের বিপরীত দিকে একটি 'ফার' গাছের অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার রক্ বলিয়াছেন যে, জনশ্রুতি আছে, জনৈক ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মুণ্ডিত মস্তকের কেশ-রাজি সন্নিহিত পাহাড়ে বায়ু-প্রবাহে নীত হয়। তার পর তথায় এই অরণ্যের উদ্ভব হইয়াছে।

ডাঙ্গার মঠের অশীতিপর বৃদ্ধ

লাব্রাংএ ৩০টি বড় বড় অট্টালিকা আছে। বুদ্ধদেবের স্তোত্র গান এই সকল গৃহে প্রত্যহ ধ্বনিত হয়। জীয়ন্ত বুদ্ধরা এই সকল অট্টালিকায় বসবাস করিয়া থাকেন। বহির্ভাগ হইতে দেখিলে এই অট্টালিকাগুলিকে কারাগার বলিয়া অনুমিত হয়। অট্টালিকা-গুলির কোন কোনটি চারিতল বা পাঁচতল উচ্চ। কাহারও বর্ণ লোহিত, কোন কোনটি বা পীত-বর্ণবিশিষ্ট। এই সকল অট্টালিকার মধ্যে জীয়ন্ত বুদ্ধের মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। উহার ছাদ স্বর্ণ ও ব্রোঞ্জমণ্ডিত।
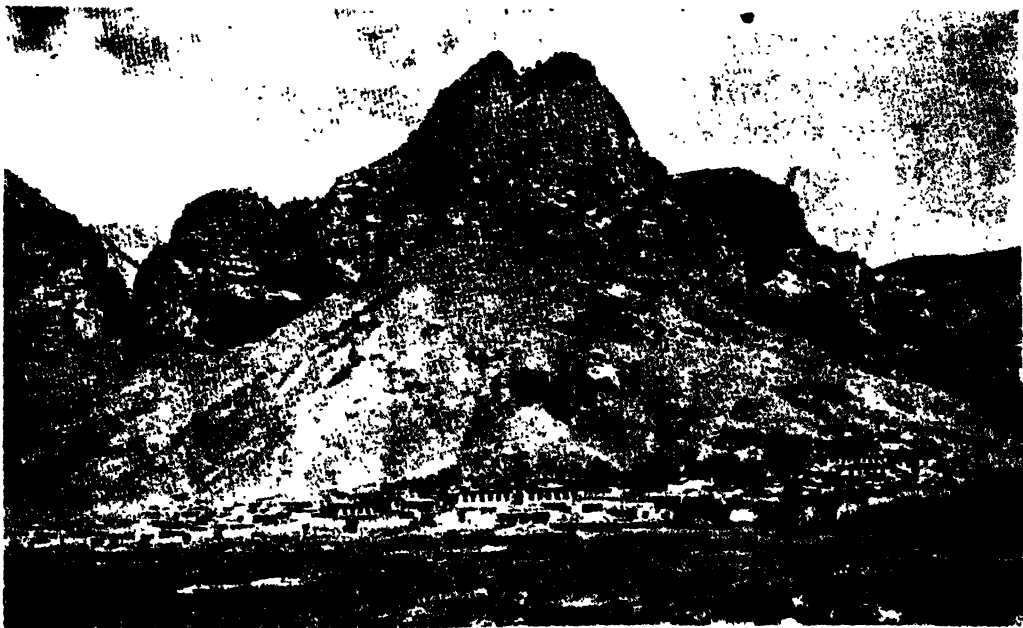
রাদ্জার লামা-নিবাস

রন্ধনাগারে প্রকাণ্ড আকার ৫টি কেৎলীতে জল গরম করা হইতেছে। ৪ হাজার সন্ন্যাসীর উপযুক্ত খাদ্য একই সময়ে উহাতে প্রস্তুত হইতে পারে। সাধারণতঃ চা, মাখম ও ভাত সন্ন্যাসীদিগের আহার্য্য।

উপাসনা-গৃহে একসঙ্গে ৪ হাজার লোক বসিতে পারে। ডাক্তার রক্ লিখিয়াছেন, লামাদিগের ভোজনাগার অতি অপরিষ্কৃত। লাব্রাংএ আসিয়া তিনি প্রধান মঠাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যে কক্ষে তিনি নীত হইলেন, তাহা সুসজ্জিত এবং প্রাচীরগাত্রে অতি চমৎকার বর্ণলেপ রহিয়াছে। একটি তাকে নানাপ্রকার সুদৃশ্য পানপাত্র—কায়েন লাংএর সময়ে ঐ সকল পানপাত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। ডাক্তার রক্ এই মঠে প্রচুর ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন।

যাযাবর সম্প্রদায়ের নেতার পুত্র

এই মঠাধ্যক্ষের পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে জ্ঞান প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের ন্যায়। তাঁহার ধারণা, পৃথিবী চতুষ্কোণ। পৃথিবীতে কুকুর ও মেষের মস্তকবিশিষ্ট মানুষ আছে বলিয়া তাঁহার ধারণা। বিমান-পোতে মানুষ দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতেছে, এ কথা এই মঠাধীশের কাছে বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার নহে। কিন্তু সন্ন্যাসীর মনে খলতা-কপটতার পরিচয় ডাক্তার রক্ পান নাই।

মঠের অনতিদূরবর্ত্তী একটি গ্রাম আছে। তথায় মুসলমানের বাস অধিক। তাহারা সৈনিকবৃত্তিধারী। এই গ্রাম অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন—চারিদিকে যাক্ ও মেষ-অস্থি পড়িয়া আছে। পথে মাঠে মৃত কুকুর অথবা পক্ষীর দেহ অসংখ্য।

লাব্রাং হইতে যাত্রা করিয়া ডাক্তার রক্ সদলবলে সংচু নদী অভিমুখে অগ্রসর হন। সংচুর উপত্যকা-ভূমি তুষারাচ্ছাদিত। রাত্রিকালে একটি ফাঁকা যায়গায় শিবির সন্নিবেশ করিয়া ডাক্তার রক্ বিশ্রামের আয়োজন করিলেন। ফনোগ্রাফ যন্ত্র সে অঞ্চলের লোক শ্রবণও করে নাই—দেখা ত দূরের কথা। ফনোগ্রাফের গান শুনিবার জন্য অনেক লোক রাত্রিকালে শিবিরে সমবেত হইয়াছিল। এই স্থানের অধিবাসীরা যাযাবর জাতি। ডাক্তার রকের শিবিরের সন্নিকটে এই সকল যাযাবর সম্প্রদায়ও শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল।

তিব্বতীয় যাযাবর সম্প্রদায় যেমন দীর্ঘকায়, তেমনই বলিষ্ঠ। তাহাদের দেহ মেষচর্ম্মের পরিচ্ছদে আবৃত। বৈদেশিকগণকে তাহারা "উরুসু" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

যে ভূমির উপর দিয়া অভিযানকারীরা গমন করিতেছিলেন, গ্রীষ্মকালে সেই স্থান জলে পূর্ণ হয়। এই পথে অত্যন্ত দস্যুভয় আছে।

অশ্বতরবাহিত দোলায় ডাঙ্গারের জীয়ন্ত বুদ্ধ

তুষারাচ্ছন্ন পথে ডাক্তার রক্ কয়েক দিন চলিবার পর তুষার-ঝটিকার দ্বারা আক্রা[illegible] হইয়াছিলেন। [illegible] মাইল পর্য্যন্ত ঝ[illegible] তাঁহাদিগকে [illegible] করিয়া তুলিয়াছিল

পীতন দের [illegible] ডাঙ্গার নামক [illegible] মঠ আছে। [illegible] ঝটিকা হইতে অ[illegible]

অব্যাহতি লাভ করিয়া ডাক্তার রক্ উক্ত মঠের অভিমুখে যাত্রা করেন। জনৈক জার্ম্মাণ পরিব্রাজক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই স্থান পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। তিনিই হাট্‌সিচু নামক নদীর উল্লেখ করায় উহা অধুনা মানচিত্রে লিখিত হইতেছে। এই নদীর তীরে জার্ম্মাণ পরিব্রাজক ফটারার্ যাযাবর জাতির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাহারা তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া তাঁহাকে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় তাড়াইয়া দিয়াছিল।

হাট্‌সু চু নদীর একটি শাখা-নদীর নাম চোনাস্। এই শাখা-নদীর ধারে একটি ক্ষুদ্র মঠে ৮১ বৎসর-বয়স্ক এক জন বৃদ্ধ বাস করেন বলিয়া ডাক্তার রক্ অবগত হয়েন। পরিব্রাজকের পক্ষে সকল ক্ষেত্রেই যথাসম্ভব বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি করা সঙ্গত। ডাক্তার রক্ এই নীতি অনুসারে বৃদ্ধ বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দালাই লামার কয়েকখানি চিত্র তাঁহাকে উপঢৌকন প্রদান করেন। বৃদ্ধ বুদ্ধ তাঁহাকে চা-পানে আপ্যায়িত করেন।

রাদ্জা মঠের প্রধান বুদ্ধ

সেই মঠে অবস্থানের দুই দিন পরে অভিযানকারীরা গান্‌মার নামক উপত্যকা অভিমুখে যাত্রা করেন। এইখানে অসংখ্য নেকড়ে বাঘ তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তবে তাহারা অস্ত্রধারী বহুসংখ্যক মানুষ দেখিয়া দূরে দূরেই অবস্থান করিতেছিল। শৃঙ্গধারী মৃগযূথের অভাবও এখানে ছিল না।

এই উপত্যকা-ভূমিব্যাপী অসংখ্য তিব্বতীয় শিবির তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন। এখানকার লোকদিগকে টোকর বলে। এই উপত্যকাভূমির আবহাওয়ার অবস্থা দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল। হয় ত রৌদ্রালোকে পৃথিবী ঝলমল করিতেছে, মুহূর্ত্তমধ্যে আকাশব্যাপী মেঘমালা দেখা দিল। অথবা মুহূর্ত্তমধ্যে ঝটিকা সমুত্থিত হইয়া তুষারপাত হইতে লাগিল। আবার ঘণ্টাখানেকের পরে হয় ত প্রকৃতির এই সংহার-লীলার অবসান হইয়া রৌদ্রে পাহাড় ও অরণ্য হাসিয়া উঠিল।

ডাঙ্গার মঠে পৌঁছিবামাত্র ডাক্তার রকের যাযাবর পথিপ্রদর্শকগণ মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া চলিয়া গেল। এমন কি, বিদায়-সম্ভাষণ করাও তাহারা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে নাই। এক দিন ডাঙ্গার মঠে বিশ্রামের পর নূতন যাক্ ও পথিপ্রদর্শক এবং ভারবাহীর দল সংগ্রহ করিয়া ডাক্তার রক্ পীত-নদ দেখিতে যাত্রা করেন। এই স্থান হইতে পীত-নদ ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। উপত্যকা ও পাহাড় অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে হইয়াছিল।

রাদ্জার জনৈক লামা নদ-সলিলে বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিতেছে

পীত-নদের তীরভূমিতে উপনীত হইয়া ডাক্তার রক্ যে বিস্ময় অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভাষাতেই বিবৃত হইল। তিনি লিখিয়াছেন, "পূর্ব্বে পৃথিবীর কোনও শ্বেতকায় মনুষ্য এই স্থানে উপনীত হইতে পারেন নাই। আমি যে পাহাড়ের উপর

দাঁড়াইয়া ছিলাম, তাহার ৫ শত ফুট নিম্ন দিয়া পীত-নদে জলধারা প্রবাহিত হইতেছিল। সমুদ্রবক্ষ হইতে এই স্থানে উচ্চতা ১২ হাজার ২ শত ফুট। গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া জল স্রোত চলিয়াছে—গিরিগাত্রে উইলো প্রভৃতি জাতীয় বৃ অসংখ্য। যে গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া পীত-নদ বহিতেছিল তথায় উপনীত হইবার একটিমাত্র পথ দেখিলাম একটি সঙ্কী উপত্যকার মধ্য দিয়া নদীর কাছে যাইতে হয়। আম তদভিমুখে অগ্রসর হইলাম। নদীর উৎপত্তিস্থলে ভীষ গর্জ্জনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। তথায় জলরাশি ভীষণভাবে আবর্ত্তিত হইতেছে।

চামড়ার ভেলায় পীত-নদ অতিক্রম

"আমি পথিপ্রদর্শককে বলিলাম, একটি গাছের ডালপালা ছাঁটিয়া দাও। আলোকচিত্র গ্রহণের পক্ষে সেই শাখা-প্রশাখা-গুলি বাধা দিতেছিল। গাইড তাহাতে আপত্তি জানাইল। সে বলিল যে, এরূপ করিলে পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ক্রুদ্ধ হইবেন। পূর্ব্বে কোন কোন লোক বৃক্ষশাখাচ্ছেদন করায় দুই জন তিব্বতীয় বৃক্ষশাখার আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।"

জাজার মঠে ৫ শত লামা ও ১৫ জন জীবন্ত বুদ্ধ বাস করিয়া থাকেন। এই জীর্ণপ্রায় মঠে আম্‌নাই ম্যাচেন পর্ব্বতের

জাজা উপজাতির সর্দার

দেবতার একখানি ছবি আছে। ডাক্তার রক্ এখানে অন্য কোন চিত্তাকর্ষক বস্তু দেখিতে পান নাই। রাদজা মঠে বুদ্ধের নিকট তিনি লোক পাঠাইয়া তাঁহার আগমন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন।

নার্দ্ধি-জাতীয়া যুবতী

জাজা উপজাতির অন্যতম নেতা

কয়দিন ডাঙ্গার মঠে বিশ্রামের পর ডাক্তার রক্ রাদ্‌জোর মঠের দিকে যাত্রা করেন। মঠে উপস্থিত হইয়া তিনি স্থানীয় বুদ্ধের কক্ষে উপনীত হইলেন। এই ঘরে অসংখ্য ঘটিকাযন্ত্র ছিল; কিন্তু সময় সম্বন্ধে প্রত্যেকটি স্বাধীনভাবে চলিতেছিল। ডাক্তার রক্ জীয়ন্ত বুদ্ধকে একটি পকেট ঘড়ী, কিছু মার্কিণী স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকন প্রদান করেন।

রাদ্‌জোর নোলোক বালক

পথিমধ্যে ডাক্তার রক্ এক জন মার্কিণ ধর্ম্মপ্রচারককে সংগ্রহ করেন। এই ভদ্রলোক তিব্বতীয় ভাষা উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। তিনিই দ্বিভাষীর কার্য্য করিতে লাগিলেন। জীয়ন্ত বুদ্ধ তাঁহার সহকারীকে যথাযথ উত্তর দিবার ভার দিলেন, স্বয়ং কিছু বলিলেন না।

সহকারী ডাক্তার রক্‌কে বুঝাইয়া দিলেন যে, নোলোকদিগের শ্রেষ্ঠ সর্দ্দার সম্ভবতঃ তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন

কোকোনর সম্প্রদায়ের নারী

করিয়া লইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন জীয়ন্ত বুদ্ধের সর্ব্বস্ব তাহারা অপহরণ করিয়াছে। ৪০টি ঘোড়া ও ৪ শত মেষ লইয়া উক্ত বুদ্ধ সদলবলে যাইতেছিলেন। নোলোকরা তাঁহাদের প্রতি কোন সম্মানই প্রদর্শন করে নাই। সুতরাং তিন জন নোলোক সর্দ্দারের নামে ডাক্তার রক্ যে পরিচয়-পত্র আনিয়াছিলেন, তদ্দারা কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। স্থানীয় বুদ্ধের সহকারী এ কথাটা তাঁহাকে ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, যদি আম্‌নাই ম্যাচেন পর্ব্বত দেখিবার সাধ থাকে, তবে নোলোকসর্দ্দারদিগকে কোনও সংবাদ না দিয়া, দ্রুতগামী অশ্বারোহণে পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করাই

সঙ্গত। তাড়াতাড়ি পর্ব্বতটি দেখিয়া অবিলম্বে প্রত্যাবর্ত্তন করাই একমাত্র সুপরামর্শ।

ডাক্তার রক্ ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। তাড়াতাড়ি পর্ব্বত দর্শনে গেলে তিনি আলোকচিত্র গ্রহণ অথবা সকল স্থান খুঁটিনাটি করিয়া আবিষ্কার করা সম্ভবপর হইবে না। অবশেষে অনেক আলোচনার পর বৃদ্ধ নোলোক সর্দ্দারদিগকে সংবাদ পাঠাইতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু কোনও ব্যক্তিই দূতের কার্য্য করিতে সম্মত হইল না। অবশেষে এক জন লামা এ কার্য্যগ্রহণের ভার লইলেন। লোকটি দুঃসাহসী বলিতে হইবে, অথবা নির্ব্বোধ।

রাদ্‌জার নোলোক-যুগল

ডাক্তার রক্ দূতের মারফতে নানাবিধ উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। উত্তর আসিতে সপ্তাহকাল লাগিতে পারে দেখিয়া ডাক্তার রক্ রাদ্‌জা মঠের সন্নিহিত স্থানগুলি পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

রাদজাগম্বা নামক একটি মঠ আছে, এ সংবাদ বাহিরের কোন লোকই জানিত না। নোলোক জাতীয় অনেক লোকও এই মঠে বাস করিয়া থাকে। এখানকার কুটীরগুলি যেমন সঙ্কীর্ণ তেমনই অস্বচ্ছ। পাহাড়ের ধারে ধারে গৃহগুলি নির্ম্মিত।

নদী হইতে বড় বড় কাঠের পাত্র ভরিয়া পানীয় জল এখানে আহৃত হইয়া থাকে। স্থানীয় বৃদ্ধ অত্যন্ত ধনী। তাঁহার সহকারীরও ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। রাদ্‌জা মঠে কারাগার নাই। যে সকল লামা পরস্বাপহরণ করে, অথবা কোনও বিশিষ্ট বিধান লঙ্ঘন করে, তাহাদিগকে হস্তপদ-বদ্ধাবস্থায় প্রহার করা হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, তাহাদের মাথায় গাধার টুপী পরাইয়া দেওয়া হয়। অধিকন্তু গলদেশে

আম্‌নাই চেঙন পর্ব্বত-দেবতার উৎসব

সম্মার্জনী ঝুলাইয়া দিয়া অপরাধীকে মঠ হইতে নির্ব্বাসিত করা হয়।

ডাক্তার রক্ এখানে নদীর জলে এক জন লামাকে একখানি দুই ফুট দীর্ঘ তক্তা ভাসাইয়া দিয়া বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে দেখিয়াছিলেন। পিত্তলের ছাঁচ সাহায্যে এই লামা নিজের উদ্ভাবিত কৌশলে বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন।

রাদ্‌জার বৃদ্ধ পর্ব্বত-দেবতা আম্‌নাই চংগনের পূজার উৎসব উপলক্ষে ডাক্তার রক্‌কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ৫ শত লামাসহ সন্নিহিত পর্ব্বতের পাদদেশে এই উৎসবক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল। রাদজায় এতদুপলক্ষে একটি মেলা বসিয়াছিল। বহুসংখ্যক নোলোক এই মেলায় যোগ দিয়াছিল। ডাক্তার রক্ নোলোকদিগের শিবিরে তাহাদিগকে পর্যাবেক্ষণ করিতে

গিরিবত্ম-প্রবাহিত পীত নদ

গিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কখন তিনি এই জাতীয় লোকে সংস্রবে আসেন নাই। তাঁহাকে দেখিয়া নোলোকগণ অবশ্য সতর্ক হইয়াছিল—তাহাদের মনে সন্দেহও জাগ্রত হইয়াছিল, কিন্তু বিস্ময়বোধও তাহাদের সামান্য পরিমাণে হয় নাই। এমন বেশধারী লোক জীবনে তাহাদের নেত্রগোচর হয় নাই। সকলে তাঁহার কোটের বোতাম, পকেট প্রভৃতি দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। তাহারা দ্বিভাষীর সাহায্যে তাঁহাকে বলিয়াছিল, "এমন লোক আমরা আগে দেখি নাই। তোমরা এখানে কি করিতে আসিয়াছ ?"

ডাক্তার রকের জুতা দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। চামড়াতে যে এমনভাবে সীবনকার্য্য চলে, ইহা তাহাদের ধারণার অতীত। ডাক্তারের ক্যামেরা দেখিয়া

তুষারকিরীটী আমনাই ম্যাচেং
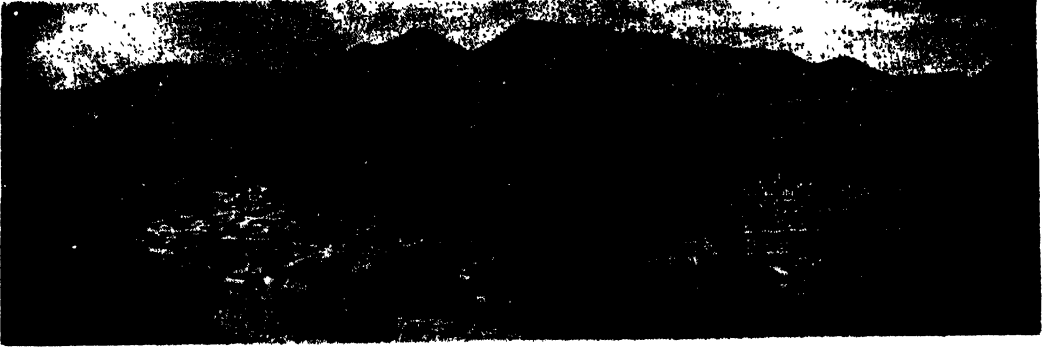
লাব্রাং মঠ

তাহারা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আলোকচিত্র তুলাইতে প্রথমতঃ সম্মত হয় নাই। পরিশেষে ডাক্তার তাহাদের কয়েক জনের চিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। নোলোকদিগের উদরে অনেক ক্ষতচিহ্ন দেখিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মণিবন্ধেও ক্ষতচিহ্ন ছিল। উদর-পীড়া ও বাত আরোগ্যের জন্য এই সকল ক্ষত তাহাদের দেহে তাহারা করিয়া থাকে।

নোলোকরা এমনই দুর্দান্ত জাতি যে, রাদ-জার বুদ্ধ তাহাদিগকে ভয় করিয়া চলেন। উহারা ইচ্ছামত লুণ্ঠনাদি করিয়া থাকে। তাহাদের কার্য্যে বাধা দিবার কাহারও শক্তি নাই। কোনও মানুষকেই তাহারা গ্রাহ্য করে না।

চামড়ার ভেলায় পীত-নদ অতিক্রম

ডাক্তার রক্ নোলোক-শিবির হইতে উত্তরের প্রত্যাশা করিতেছিলেন। সহসা এক দিন জীবন্ত বুদ্ধ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিলেন যে, এখনই যদি তাঁহারা অশ্বারোহণে যাত্রা করেন, তাহা হইলে আম্নাই ম্যাচেন গিরি-মালা দেখিয়া আসিতে পারেন। কারণ, নোলোকরা মঠের এক জন সন্ন্যাসীকে হত্যা করিয়া তাঁহার যথা-সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে। উহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য তিনি একদল অস্ত্রধারী সন্ন্যাসীকে পাঠাইতেছেন। উহাদের সহিত গমন করিলে ডাক্তারের পর্ব্বত দর্শন ঘটিতে পারে। সন্ন্যাসীরা নোলোকদিগকে অভিসম্পাত দিয়া আসিবেন; মঠ হইতে এই ব্যবস্থাই হইয়াছে।

সাড়ে ১১ হাজার ফুট উচ্চ স্থানে শিবিরসন্নিবেশ

যথাসময়ে যাক্‌গুলিকে যাত্রার উপযোগী করিতে না পারায় ডাক্তার রক্ এই সন্ন্যাসীদিগের সহিত যাত্রা করিতে পারেন নাই। পরে তিনি শুনিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসীরা নোলোকদিগকে অভিসম্পাত করায় তাহারা ভয় পাইয়া অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। ভয়লেশহীন দুর্দ্ধর্ষ জাতি হইলেও নোলোকরা অত্যন্ত কুসংস্কারসম্পন্ন।

নোলোক-শিবির হইতে কোনও সংবাদ আসিল না। ডাক্তার রক্ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পথ দেখাইবার জন্য কোনও লোকও তাঁহাদিগের সহযাত্রী হইতে সম্মত হইল না। তিনি সংবাদ পাইলেন যে, নোলোকরা রাদ্‌জায় সংবাদ উপস্থিত হইলে, তথা হইতে এক দিনে আম্‌নাই ম্যাচে[নে] পৌঁছিতে পারা যাইবে। যদি কেহ আক্রমণ করে, তাহা হই[লে] অশ্বারোহণে পলায়নের সুবিধা হইবে। কিন্তু লামারা ডাক্তা[র] রকের নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধে কোনও দায়িত্ব গ্রহ[ণ] করিতে সম্মত হইলেন না। ডাক্তার রক্ সেই প্রস্তাবেই সম্ম[ত] হইলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, আম্‌নাই ম্যাচেনে কিছু দি[ন] অবস্থান করিয়া নানাপ্রকার বিবরণ সংগ্রহ করা অসম্ভব। শু[ধু] দেখিয়া আসা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু অচিরে তি[নি] জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার সংকল্পের কথা নোলোক-শিবি[রে] কেহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। এক জন আসিয়া সংবাদ দি[ল]

কোকোনরএর তিব্বতীয় যাযাবর সম্প্রদায়

পাঠাইয়াছে যে, বিদেশীদিগকে কেহ যেন সাহায্য না করে। ডাক্তার রক্‌কে লামারাও নিরুৎসাহিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে ডাক্তার তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, যদি কেহ তাঁহাকে সাহায্য না করে, তাহা হইলে তিনি সাইনিংএর মুসলমানদিগকে সাহায্যার্থ নিযুক্ত করিবেন। ইহাতে লামাগণ ও জীয়ন্ত বুদ্ধ শঙ্কিত হইলেন। তাঁহারা তখনই পরামর্শ-সভা আহ্বান করিলেন।

তাঁহারা ডাক্তার রক্‌কে জানাইলেন যে, রাদ্‌জার সন্নিহিত পীত-নদের জলরাশি পার হইয়া চৌ-সম্প্রদায়ের শিবিরে যে, তাহারা নদী পার হইবামাত্র নোলোকগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে। একটি উপদলের এক ব্যক্তি সরাসরিভাবে তাঁহাদের শিবিরে আসিয়া স্পষ্টই জানাইয়া দিল যে, নোলোকগণ প্রস্তুত হইয়া আছে। এমন অবস্থায় ডাক্তার যেন কখনই গমন না করেন।

কিন্তু মার্কিণ জাতি ভীত হইবার নহেন। ডাক্তার রক্ তাঁহার সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না। নোলোকদিগের নয়নে ধূলিনিক্ষেপের জন্য নূতন কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। তিনি প্রচার করিয়া দিলেন যে, আম্‌নাই ম্যাচেন দেখিবার প্রয়োজন

যাযাবর হাডজাঙ্গুর নোলোক

দিয়াছিলেন। তাহারা জীয়ন্ত বুদ্ধের অনুগত। অভিযানকারীরা তাহাদের অধিকৃত প্রদেশে উপস্থিত হইবামাত্র তাহারা শিবির সন্নিবেশে ডাক্তার রক্কে সাহায্য করিল।

পীত-নদ পার হইয়া কোনও শ্বেতকায় মনুষ্য এ যাবৎ এ অঞ্চলে পদার্পণ করেন নাই। এ প্রদেশ ডাক্তার রক্ ও তাঁহার সহযাত্রীদিগের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। রাত্রিকালে বিশ্রামের পর অভিযানকারীরা যাত্রারম্ভ করিলেন। প্রথমেই তাঁহারা আম্‌নাই ড্রুগ্‌ও নামক গিরিশৃঙ্গের সন্নিহিত হইলেন। তথা হইতে তাঁহারা দেখিলেন, দক্ষিণভাগে গিরিমালা বিস্তৃত। তৃণাস্তৃত পাহাড়ের উপর দিয়া তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। উচ্চাবচ পর্ব্বতে আরোহণ ও অবতরণ অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল হইলেও অভিযানকারীরা নিরস্ত হইলেন না।

ডাক্তার বলিয়াছেন, এমন চমৎকার দৃশ্য তিনি অতি অল্পস্থানেই দেখিয়াছেন। যতই তাঁহারা নিম্নে অবতরণ করিতেছিলেন, ততই পর্ব্বতদেহের শোভা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নানাবিধ পশুপক্ষীও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। জোন্‌জী

নাই। তাঁহারা ফিরিয়া যাইতেছেন। এই বলিয়া তাঁহার শিবিরের কতিপয় ব্যক্তিকে দ্রব্যসামগ্রীসহ এক দিন প্রত্যাবর্ত্তনের পথে পাঠাইয়া দিলেন।

যে ব্যক্তিকে রৌপ্যাস্তু প্রদানে পথিপ্রদর্শকের পদে বরণ করিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে তাহার লাভের পথে বিঘ্ন ঘটার জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাকে আরও কিছু রৌপ্য প্রদান করিয়া ডাক্তার তাহাকে নির্জ্জনে বলিলেন, তাহার লাভের অংশ তিনি পূর্ণ করিয়া দিবেন। তবে সেই রাত্রি তাহাকে তাঁহার শিবিরে বাস করিতে হইবে। লোকটি হৃষ্টান্তঃকরণে স্বীকার করিল।

ডাক্তার রক্ অতঃপর কয়েকটি অশ্ব সংগ্রহ করিলেন। দ্রুতগমনের পক্ষে অশ্বগুলি প্রয়োজনীয়। লামাগণ তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। মঠ হইতে কিছুদূর গিয়া ডাক্তার সদলবলে নদীতীরে উপনীত হইলেন। আকাশে তখন ঘনকৃষ্ণ মেঘমালা দেখা দিয়াছিল। পথিপ্রদর্শক ঝটিকার পরিণতি দেখিয়া নদী অতিক্রম করিতে নিষেধ করিল। অবিলম্বে ভীষণ ঝটিকা, বৃষ্টি ও অশনিগর্জ্জন আরম্ভ হইল। বৃষ্টিপাতে পথ দুরবগাহ হইলেও অভিযানকারীরা নিরস্ত হইলেন না। ঝড়বৃষ্টির অবসানে তাঁহারা নদী পার হইলেন। জাজা নামক সম্প্রদায়কে লামারা পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ

পর্ব্বত-দেবতা আম্‌মাই ম্যাচেনের চিত্র

সম্প্রদায়ের সহিত অভিযানকারীদিগের সাক্ষাৎ হইল। তাহারা এমন অভূতপূর্ব্ব অভিযানকারী কখনও দেখে নাই। এত অস্ত্র-শস্ত্র সহ লোক কেন যে তাহাদের দেশে আসিয়াছে, তাহা তাহারা বুঝিতেই পারে নাই।

ডাক্তার রক্ আম্‌নাই ড্রগগু পর্ব্বতের পাদদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই পর্ব্বতের দেবতা জোন্‌জী সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা। সাড়ে ১২ হাজার ফুট উচ্চস্থানে অভিযানকারীরা শিবির সন্নিবেশ করিলেন। আম্‌নাই ম্যাচেন গিরিশৃঙ্গের দৃশ্য এখান হইতে মেঘান্তরালে আচ্ছন্ন দেখাইতেছিল। ডাক্তার রক্ এই স্থান হইতে সূর্য্যাস্ত-শোভা দেখিয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন।

পরদিন প্রভাতে আম্‌নাই ড্রগগুর শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়া আম্‌নাই ম্যাচেন শৃঙ্গের শোভা সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমাদের সম্মুখে তুষারধবল আম্‌নাই ম্যাচেন উন্নতশীর্ষে দণ্ডায়মান। আকাশ মেঘলেশশূন্য। আমরা মনের সাধে আলোকচিত্র গ্রহণ করিলাম। আমাদের নিম্নভাগস্থ উপত্যকা-ভূমিতে নোলোক জাতির শিবির। সম্ভবতঃ তাহারা আমাদের আগমন-সংবাদ অবগত নহে।

"আমরা দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় দেখিলাম, যাযাবর সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি আম্‌নাই ড্রগ্‌গুর শীর্ষদেশে পশ্চিমদিক্ দিয়া আরোহণ করিতেছে। আমাদিগকে দেখিয়া সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। সে দেবতার পূজার জন্য আসিয়াছে। সে জানু পাতিয়া বসিয়া দেবতার উদ্দেশে তিনবার প্রণাম করিল।

"পরদিবস প্রভাতে আমরা সাচু ইম্‌কার নামক আর একটি শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া আম্‌নাই ম্যাচেন্ পর্য্যবেক্ষণের সংকল্প করিলাম। এ দিনও দেবতারা আমাদিগের প্রতি বিরূপ হন নাই। গত রাত্রির তুষার-ঝটিকার বিন্দুমাত্র চিহ্ন তখন আকাশে ছিল না। আমরা ১৬ হাজার ফুট উচ্চস্থানে উঠিয়াছি। এখনও ১২ হাজার ফুট তুষারস্তূপ ভাঙ্গিয়া উর্দ্ধে উঠিলে তবে আম্‌নাই ম্যাচেনএ উঠিতে পারা যাইবে। তিব্বতীয়রা বলে, এই তুষার-কিরীটী শৃঙ্গের উপর আম্‌নাই ম্যাচেন দেবতা অবস্থান করেন। আমাদের সঙ্গে থিওডোলাইট না থাকায় শৃঙ্গের উচ্চতা মাপিতে পারিলাম না। কিন্তু অন্যান্য বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমার স্থির ধারণা জন্মিল, এই শৃঙ্গের উচ্চতা ২৮ হাজার ফুটেরও অধিক।

"যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলাম, তাহা জীবনে বিস্মৃত হইব না। বহুক্ষণ একাকী এই বিরাট দৃশ্যের সম্মুখে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তার পর অতি কষ্টে তথা হইতে নয়ন ফিরাইয়া অবতরণ করিতে লাগিলাম।"

প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে দস্যুদল দ্বারা ডাক্তার রক্ ও তাঁহার সঙ্গী দল আক্রান্ত হইয়াছিলেন। অতিকষ্টে আত্মরক্ষা করিয়া তাঁহারা সদলবলে পরিশেষে লিফিয়াংএ উপনীত হন।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

বসন্ত-প্রভাতে

আমার চোখে ক্ষেতখানি ওই মায়ার কাঠি বুলায়;
কচি পাতার ডালপালা সব আনন্দে প্রাণ দুলায়!

তৃণ হরিৎ শিশুরা আজ সবুজ আসন মেলি,
আনন্দেরি বার্ত্তা পাঠায় হৃদয়-দুয়ার ঠেলি!
আকাশ থেকে নীহারকণা, স্বর্গ হতে আলো,
সাগর থেকে ঊর্ম্মি, মলয়, বনের ছায়া কালো,—

সবাই এলো একে একে; দল হলো যে ভারী;
পাতার ফাঁকে চড়াই ডাকে—"আয় রে তাড়াতাড়ি!"
গন্ধমদির ফুলেল হাওয়া ওই দিল রে দোল্।—
উদাসী মন, এই জোয়ারে ভাবের তরী খোল্।

শ্রীঅমূল্যকুমার রায়-চৌধুরী।

ধন্বন্তরি

একটি ক্ষুদ্র পল্লীর এক ছোট বাড়ীর প্রাঙ্গণে একটি ছয়-সাত বছরের ছেলে সমবয়সী আর একটি ছেলেকে পিঠে রাখিয়া ঘোড়া ঘোড়া খেলিতেছিল। তখন বাড়ীটি সবেমাত্র সন্ধ্যার কালোচুলে ঢাকা পড়িয়াছে।

এমনই সময়ে হঠাৎ জুতার শব্দ ও এক পরিচিত মূর্ত্তির আবির্ভাবে 'ঘোড়া'-ছেলেটি উঠিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিল "বাবা এয়েছে রে!" বলিয়াই ছুটিয়া আসিয়া গোপী বাবুকে আঁকড়িয়া ধরিয়া দাবী করিল, "বাবা, 'বল্' ?"

গোপী বাবু একটিবার এ-ছেলেটি আর একটিবার ও-ছেলেটি—উভয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিলেন, যেন এক ত্রিকালদর্শী ঋষি কলিযুগের শাস্ত্র রচিতে গিয়া চমকিয়া উঠিয়াছেন। অতঃপর যে বস্তু মানবের হৃৎপিণ্ড বলিয়া লোকালয়ে নাম ধরিয়াছে, তাহাকে যেন একটু অনাদরেই ছাড়াইয়া পকেট হইতে খেলিবার একটি 'বল' বাহির করিয়া দিয়া দ্বিতলে উঠিয়া গেলেন ছেলেটিরও কাম মিটিয়াছে, সেও আর ও'দিকে ভ্রূক্ষেপ করিল না—সঙ্গীর কাছে ছুট দিল।

গোপী বাবু কলিকাতায় একটি কলেজে প্রফেসরী করেন। বেতন কম নহে, তত্রাপি তিনি এ যাবৎ কলিকাতায় সংসার পাতেন নাই। মাসের প্রথম শনিবারে একটিবার বাড়ী আসেন, সোমবারে ফিরিয়া যান—মাঝের ওই মাত্র একটি দিনের সংসার নির্ব্বাহ পূর্ণতায় বুঝি বা সারামাসের শূন্যতাকেই খর্ব্ব করিয়া দেয়। এক দিন স্ত্রী আবদার ধরিয়াছিল—"আমায় নিয়ে চল না, যাবে ?"

প্রত্যুত্তরে গোপী বাবু বলিয়াছিলেন, "তোমায় ?"

অপ্রতিভ হইয়া স্ত্রী ইস্তফা দিয়াছিল—"ঘাট হয়েছে!"

সেই দিন হইতে প্রসঙ্গটা চাপাই পড়িয়া আছে,—পুরাতন অসংলগ্ন ইতিহাসের মত। কিন্তু, ও-কথা এখন থাক্।

অতিথি আসিয়াছে। স্ত্রী নীচে রান্নাঘরে ছিল, খবর পাইয়াই তাড়াতাড়ি উপরে গিয়া পাখা হাতে করিয়া বসিল। প্রশ্ন করিল, "সন্ধ্যে হলো যে ?"

গোপী বাবু জামা খুলিয়া মেঝের এক পাশে রাখিয়া গম্ভীর ভাবে জবাব দিলেন, "বল কেন! ট্রেণ থেকে নেমেই দেখি—কুলীদের একটা ছেলের কলেরা হয়েছে, প্লাটফরমে প'ড়—কেউ ছুঁচ্ছে না! ওকে নিয়ে তাই হাঁসপাতালে দি' আসি। বীণা—"

"আর, তুমি ছুঁলে ?"

"আমার কথাটা—"

"ঐ বোলে ডাক আমায় ?"

গোপী বাবুর মুখে একটু ম্লান হাসি দেখা দিল। ভ্রম-সংশোধন করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, বীণি—"

বীণা জেদ ধরিল, "বলি, তুমি ছুঁয়েছ ত ?"

"কোলে কোরে—"

"মা গো মা! কাপড় ছাড়া—" বীণা ধমক দি' উঠিল।

গোপী বাবুর মুখে পুনশ্চ একটু হাসির আভা দেখা দিল। বলিলেন, "ধুয়ে ফেলেছি!"

"বাহাদুর!"—বীণা আল্‌না হইতে একখানা কাপড় পাড়িয়া মেঝেয় রাখিয়া হুকুম করিল, "পরো—আমি গঙ্গাজল নিয়ে আসি—" বলিয়াই নীচে নামিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার হুকুম তামিল হইয়াছে। অ... মাথায় ও গায়ে গঙ্গাজল ছিটাইয়া দিয়া কহিল, "... আছে গা ?"

"কে ?"

"সেই ছেলেটি ?—আচ্ছা, ওর মত হবে না—এই ... কমলার—"

"বীণি—" এক জোর ডাক দিয়া কমলা আসিয়া প... খেলা ভাঙ্গিয়াছে।

বীণার রাগের যেন অবধি নাই, স্বামীর প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া বলিল, "তোমার ছেলে শাসন কর!" প... খোকার দিকে ফিরিয়া যথারীতি স্বর্গমর্ত্ত্য এক করিয়া ...

লাগিল, "তুমি আমার আঁতুড়ে ব'সে নাম রেখেছ, না? যাব তার সামনে—'বীণি' 'বীণি!' দেখবি—"

মায়ের দৌড় বিলক্ষণ জানা আছে। গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কমলা আব্দার ধরিল, "কোলে"—বীণা যেন কঠিন অশ্রদ্ধায় ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইল। লইয়া স্বামীকে অভিযোগ করিল, "তুমিই গোড়া! নাম ধ'রে ডাক কেন? ওগো-হ্যাঁগো বল্‌তে পার না?" বকিতে বকিতে সে ঘরের এক কোণ হইতে ঢাকা খুলিয়া এক গ্লাস জল ও এক রেকাবী খাবার আনিয়া সম্মুখে ধরিয়া দিল—

"দে না—" কমলা মায়ের চুল ধরিয়া সজোরে এক টান মারিল। আচম্‌কায় টান মারিয়াছিল বলিয়া, বীণাকে বেশ একটু লাগিয়াছিল। সে চুলের গোছ শুদ্ধ মাথায় হাত চাপিয়া ছেলেটাকে নামাইয়া দিল ও তাহার দিকে গুম্ হইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, "লাগে না? এর বেলায় কেউ দেখতে পায় না '—দেবো কি?"

গোপী বাবু একটি পুঁটুলি আনিয়া মেঝেয় রাখিয়াছিলেন। সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কমলা বলিল, "ওতে কি আছে—"

"দেখ্ গে যা! আছে ত সবাই—বলতে পার না দিতে?" বীণা মুখখানা ভারি করিয়া অন্য দিকে ফিরাইল।

গোপী বাবু ঈষৎ হাসিয়া পুঁটলি খুলিয়া গোটাকয়েক লীচু ও খানকতক বিস্কুট কমলার হাতে দিলেন, দিয়াই স্ত্রীকে খোঁচা মারিলেন—"তুমিই মাটী করলে ত ছেলেটাকে!"

"আমি?"

"নয়? প্রতিবার সতর্ক ক'রে গেছি—মিশতে দিয়ো না ঘেঁটুর সঙ্গে! ছোটোলোকের ছেলে—ডুলেবাগদী! দেখ, ভদ্রলোকের ছেলের স্বভাব-সভ্যতাই আসল পুঁজি. লেখাপড়া—তার পর!"

যথেষ্ট অপরাধ! বীণা সহসা কোনও জবাব দিতে পারিল না। সত্যই ত, প্রতিবার আসিয়া স্বামী নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কথার মর্য্যাদা রাখিবার কোনও ব্যবস্থাই সে করে নাই ত! কেন? যদি জন্ম-গোত্র, সমাজ-শ্রেণী ...বালয়ে পা ফেলিবার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, তবে সে বগুকে ঠেকাইয়া রাখিবে সে কোন্ হিসাবে? কেমন করিয়াই বা সে অস্বীকার করিবে, যে মানুষ গড়িবার প্রথা—নিয়ম রুচি অবস্থা হইতেই মানবকে আরোপ করিবার প্রয়োজন? আজ স্বামীর নিশ্চিন্ত বাক্যে সে স্পষ্ট করিয়াই টের পাইল যে, ভূমিষ্ঠ হইলেই সে পৃথিবীর সম্পত্তি—পুরুষ তাহার। নারী কেহই নহে—ইহাই কল্যাণ!'

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ঈষৎ কুণ্ঠায় বীণা কৈফিয়ৎ দিল, "আমি কি করবো, বলো? বাড়ীতে ওর মা কায করে—ছেলেটাও থাকে। কাযেই ছেলের জাত—ছেলের কাছেই যায়!"

"পাড়ায় আর ছেলে নেই?"

"আছে। কিন্তু, ওরা এ-ওর গলার হার!"

"অর্থাৎ, ওরা ছেলের জাত—তুমিও মায়ের জাত!"

বীণার মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল, "কি বললে? ঘেঁটুকে আমি মানুষ করেছি কোলে-পিঠে ক'রে? বাড়ী ত এসেছ—কর না বিচার?" বলিয়া উল্কার ন্যায় সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াইবে, তাহা গোপী বাবু প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই, যখন বুঝিলেন, তখন বীণা নীচে নামিয়া গিয়াছে। বুঝিলেন, সর্ব্বংসহা ধরিত্রীও মাতৃত্বের খোঁটা সহ্য করেন না। বসিয়া-বসিয়া আকাশ-পাতাল, ছাইভস্ম কি ভাবিতে লাগিলেন, এবং ক্রমশঃ তাঁহার সমগ্র অন্তরই এক তীব্র অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল! ঘরে তিষ্ঠিতে পারিলেন না, বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দূরে নেত্রপাত করিতেই অবলোকন করিলেন—দৃষ্টির অস্তিত্ব কিনারায় এক পরমাশ্চর্য্য নারীমূর্ত্তি ইতর-ভদ্র অসংখ্য ছেলের মেলায় মাতিয়া রহিয়াছে, তাহার ঘৃণা নাই, দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই!

কাহার পায়ের শব্দে গোপী বাবুর চমক ভাঙ্গিল। দেখিলেন বীণা, হাতে চায়ের 'কাপ', পশ্চাতে কমলা। একটু অপ্রস্তুত হইয়া কি বলিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি চায়ের 'কাপটা' হাত বাড়াইয়া লইলেন, তার পর কমলাকেই অবলম্বন করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাঁ রে, লীচু খেয়েছিস্?"

স্বচ্ছন্দে কমলা জবাব দিল—"না।"

"না কি রে?—কি করলি?"

"কেন—ঘেঁটুকে দিয়েছি—"

গোপী বাবু কষ্ট-বিস্ময়ে কমলার পানে তাকাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সমগ্র অন্তর কটু হইয়া উঠিল! তিক্তকণ্ঠে কহিলেন, "ঘেঁটুর জন্যে তোকে দিলাম?"

কমলা তৎক্ষণাৎ পুঁটুলিটির দিকে আঙুল বলিল, "আমার ত ঐ রয়েছে—"

সরল জবাব—জেরা চলে না ! গোপী বাবু হটিয়া গেলেন। পরন্তু, বিশেষ একটু দুশ্চিন্তায় পড়িলেন—এ সমস্যার সমাধান হইবে কিসে, কোন্ অস্ত্রে ? চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়া অন্য কথা পাড়িলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলকাতায় যাবি ?"

কম্‌লা যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল, তৎক্ষণাৎ জানিতে চাহিল, "ঘেঁটু যাবে ?"

প্রশ্নটা গোপী বাবুর কাছে এক স্বচ্ছ অর্থ করিয়া দিল। নিঃসংশয়েই বুঝিলেন, কম্‌লা ঐ ইতরটার উপর এতদূর আসক্ত হইয়াছে যে, তাহাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না ! বাস্তবিকই, একটা বিহিত করা এই মুহূর্ত্তেই উচিত। এর পর এই রুচি-প্রকৃতি ঐ ছোঁড়াটার নোংরা প্রভাবে যখন পাকিয়া উঠিবে, তখন সহস্র শাসন, শত কৌশলেও তাহাকে আর সংশোধন করা যাইবে না ! স্ত্রী হয় ত ভবিষ্যতের ধার ধারে না, অপিচ তাহার মুখ—বর্ত্তমানের মুখ চাহিয়া তিনি নিশ্চিন্ত রহিবেন কেমন করিয়া ? চায়ের 'কাপটা' নিঃশেষ করিয়া বীণাকে কহিলেন, "একবার কলকাতায় যেতে চেয়েছিলে—এখন চাও ?" কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

বীণা স্তব্ধ হইয়া স্বামীর দিকে তাকাইল।

গোপী বাবু পুনরাবৃত্তি করিলেন, "চাও ?"

মুখ নামাইয়া বীণা অবিচলিতকণ্ঠে বলিল—"না।"

"হবে যেতে।"

"আচ্ছা !"

"কালই—"

"বেশ !"

পরদিন ঘুম ভাঙ্গিয়া যখন বীণা বাড়ীটার এদিক্-ওদিক্ চাহিল, তখন তাহার মনে হইল—এ যেন একটা পড়ো বাড়ী ! স্বামীর সহিত বসবাস করিতে চলিবে, ইহা তাহার পক্ষে অতুল আনন্দেরই কথা ! তবু যেন এক অহেতুক নিরানন্দ, রূপহীন বিষাদ তাহার নারী-অন্তরকে ছাইয়া ফেলিল ! বারো বৎসর বয়সে সে এই বাড়ীতে আসিয়াছে, আজ এই বত্রিশ বৎসর বয়সের ভিতর সে কোথাও কোন দিন নড়ে নাই। বাড়ীতে আর কেহ ছিল না, পল্লীবধূ হইলেও পাড়ায় আর কাহারও বাড়ী বড় একটা সে যাইত না। প্রথমে একান্ত অবলম্বন ছিল—ঘেঁটুর মা, তার পর—ঘেঁটু, সর্ব্বশেষে খোকা আসিয়া তাহার এই ক্ষুদ্র সংসারটিকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে ! ঘরকন্না যেন তাহার সঙ্গে কথা কহে ! আজ এই সব ছাড়িয়া কোথায় চলিবে, এ কথা ভাবিতে গিয়া চোখে জল আসিল ! ঘেঁটুর মা কায করিতে আসিয়াছে, তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "ঘেঁটুর মা ! আজ আমরা কল্‌কাতা চল্‌লাম—বাড়ীঘর দেখিস্ !"

ঘেঁটুর মা বিস্ময়ে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যা বউদিদি, সত্যি ?"

"হ্যাঁ রে হ্যাঁ ! কম্‌লার পড়াশোনা হচ্ছে না—পড়াতে হবে ত !"

অদূরে ঘেঁটু কতকগুলা ভাঙ্গা বাঁশ, ইট-পাটকেল, ঢিল-ঢেলা আনিয়া জড় করিতেছিল—খেলাঘর পাতিবে ! ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "বড়মা, আমি ?"

পুনশ্চ বীণার চোখ দুইটি সজল হইয়া উঠিল. চোখ মুছিয়া বলিল, "তুমিও যাবে বৈ কি, বাবা ! এর পরে যেয়ো, কেমন ?"

কথাটা ঘেঁটুর মনঃপূত হইল না। মুখখানা কাঁদ-কাঁদ করিয়া মায়ের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

ইত্যবসরে নীচে নামিবার সিঁড়িতে কম্‌লার ডাক শোনা গেল—"ঘেঁটু !" যেন সারা রাত্রি সে ঘুমায় নাই ! অতঃপর চোখের পলক পড়িতে-না-পড়িতেই 'বল্' লুফিতে-লুফিতে আসিয়া হাজির হইল। বীণাও অন্যত্র সরিয়া গেল।

প্রবাস-যাত্রার বাজনা উঠিয়াছে ! যথাসময়ে বাড়ীঘরের ব্যবস্থা করিয়া পাঁজির এক শুভক্ষণে যাত্রা করিয়া উহারা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। গো-যান সজ্জিত ছিল, যখন কম্‌লার হাত ধরিয়া বীণা গাড়ীতে উঠিবে, কম্‌লা ধরিয়া বসিল, "ঘেঁটু ?" যেন কি হারাইয়াছে !

বীণা মুখ ফিরাইল, গোপী বাবু কহিলেন, "সেখানে কত ছেলে ! ওঠ—"

"না—" কম্‌লা কাঁদিয়া উঠিল।

গোপী বাবু ধমক দিলেন। কিন্তু থামাইতে পারিলেন না ! তার পর ভুলাইবার অন্য কৌশল আবিষ্কার করিলেন। খেলনার পুঁটুলি খুলিয়া পূর্ব্বোক্ত 'বলটা' আনিয়া আদর করিয়া বলিলেন, "এই নে ! আরও ক-ত দেবো—"

কিন্তু, কে চাহে ? কম্‌লা আরও জ্বলিয়া উঠিল এবং 'বলটা' হাতে পাইয়াই টান মারিয়া ফেলিয়া দিল। এইবার গোপী বাবু কঠিন হইয়া উঠিলেন, এবং সময়োচিত বিধানমত ছেলেটাকে সাপটিয়া ধরিয়া তুলিয়া গাড়ীতে শোয়াইয়া দিলেন।

* * * * *

গোপী বাবু থাকিতেন কলিকাতার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। তাঁহাদের বড় সংসার, বাড়ীখানাও বড়। সেই বাড়ীরই এক অংশে, তিনি আসিয়া উঠিলেন। প্রথম প্রথম দুই এক দিন এক সংসারেই আহারাদি চলিল, তার পর স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া লইলেন।

অভাব ছিল না কিছুরই—বাড়ীময় ছেলেপিলে, বাড়ীময় বউ-ঝি। যেন এক বিপুল লোকালয়! মেয়েদের পরিচয় বীণার কতক-কিছু জানাই ছিল, বিশেষ যা-কিছু গোপী বাবু প্রথম রাত্রিতেই দিয়া দিলেন।

উৎপাত ঘটিল কেবল কম্‌লাকে লইয়া! ওরা আসে, কম্‌লা যায় না। ওরা ভাব করিতে কম্‌লাকে দেখাইয়া দেখাইয়া নিজেদের ভিতর পিস্তল ছোড়াছুড়ি করে, লাটিম ঘুরায়, ঘুড়ি উড়ায়, কম্‌লা কিন্তু মুখ ফিরাইয়া ঘরে ঢোকে! হয় ত বা দেখে—এদের কেহই ত ঘেঁটু নহে!

এক দিন মায়ের চোখ পড়িল। রাত্রিকালে স্বামীকে সে বলিল, "কম্‌লা বড় মন-মরা হয়ে পড়েছে, দেখেছ তুমি?"

অনাসক্তভাবেই গোপী বাবু জবাব দিলেন, "নতুন-নতুন অমন হয়। কা'ল একখানা খেল্‌বার গাড়ী এনে দেব।"

পরদিন গাড়ী আসিল। গোপী বাবু চালাইবার কল-কৌশল কম্‌লাকে দেখাইয়া দিলেন কিন্তু সে ও-দিকে ঘেঁষিল না, যেন সে উহা চাহে না! তাহার স্ফূর্ত্তিও নাই, উৎসাহও নাই! * * * অতঃপর সে যেন নিজেকে লইয়াই নিজে রহিল—হাসেও না, কাঁদেও না! ক্রমশঃ এক বিরাট অনাসক্তি তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল!

এমনই ভাবেই দিন কাটিতে লাগিল। মাসখানেক পরে, এক দিন রাত্রিতে কম্‌লা ঘুমের ঘোরে বিশ্রী চেঁচাইয়া উঠিল—"ঘেঁটু—উ—"

বীণার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তাড়াতাড়ি স্বামীকে ঠেলা মারিয়া উঠাইয়া সভয়ে কহিল, "ওগো! খোকা চেঁচিয়ে উঠলো কেন, 'ঘেঁটু' বোলে—"

গোপী বাবু অর্থ করিয়া বলিয়া দিলেন—"পেট গরম হয়েছে—মিছরির সরবৎ দিয়ো!"

কিন্তু, মায়ের প্রাণ বুঝিল না, বীণা আলো জ্বালিল এবং নির্নিমেষনেত্রে কিয়ৎক্ষণ ছেলের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ আঁৎকিয়া উঠিল! ভীতি-বিহ্বলকণ্ঠে বলিল, "শুকিয়ে যাচ্ছে যে দিন দিন!" মুখখানা শাকমূর্ত্তি করিয়া সে স্বামীর দিকে ফিরাইল।

বাস্তবিকই কম্‌লার চেহারাটা এমনই হইয়াছে, যে রক্তগোলাপে আচম্‌কায় কখন্ রৌদ্র লাগিয়াছে।

গোপী বাবু হেতু নির্দ্দেশ করিলেন—"প্রথম প্রথম লো[illegible] লাগে, তাই! দু'দিন যাক্, দেখো—কেমনটি হয়!"

বীণা নিরস্ত হইল খানিক পরে আলো নিবাইয়া শুই[illegible] পড়িল,—ছেলেকে বুকে করিয়া।

কিন্তু গোপী বাবুর মনের গতিটা আজ সহসা বাঁকের মু[illegible] আসিয়া ঠেকিল! টের পাইলেন—স্তোকবাক্যে স্ত্রীকে ব[illegible] করিলেন সত্য, কিন্তু নিজেকে ত বশ করিতে পারিলেন না এক বিশ্বব্যাপী আকাঙ্ক্ষা লইয়া ঘর বাঁধিতে আসিয়াছেন কিন্তু এ কি হইতে চলিয়াছে? খুঁৎ লইয়া মানুষ জন্মে এ[illegible] এই ত্রুটি পূরিয়া উঠে সন্তানের সৃষ্টি-মহিমায়! অতএ[illegible] তাঁহার এই পরিপূর্ণ জন্মে দাগ ধরিল কেন? এক প্রশ্নে উত্তর দিতে আসিয়াছেন বলিয়া আর একটি বিদ্রোহ তুলি[illegible] কেন? তটিনীর যে উচ্ছ্বাস লোক লোকালয়ে অমৃত চালি[illegible] বলিয়া আশ্বাস দেয়, তাহাই কি আবার উজান ঠেলিয়া বি[illegible] ছড়াইবে? * * * তাঁহার বুকে এক আঘাত পড়িল—তাই ত!

এইরূপে যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই কম্‌লাকে ঘিরিয়া দুর্ভাবনার এক কালো-মেঘ স্বামিস্ত্রী উভয়কেই ছাই[illegible] ফেলিতে লাগিল! সে যেন কেমন হইয়া পড়িয়াছে—কে[illegible] অনড়, অচেতন পদার্থ; অথবা দেবদূত—নরলোকে ছায়[illegible] ফেলিয়াছে!

এক দিন কলেজ হইতে ফিরিয়া গোপী বাবু বসিয়া পড়িলেন! দেখিলেন, কম্‌লার জ্বর আসিয়াছে, বীণা চাপিয়া ধরিয়া আছে।

স্বামীকে দেখিয়াই বীণা কাঁদিয়া ফেলিল, প্রবলোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, "ওগো, তোমার ছেলে নাও—আমি রাক্ষুসী!"

বাড়ীরই একটি অল্পবয়সী বিধবা মেয়ে ঘরে বসিয়া ছিল, সে পট্ করিয়া বলিল, "হোক্ গে বাছা! অসৈরণ সহ্য হয় না! ছেলের যেন কারুর অসুখ হয় না! আমার দাদার ফুটফুটে ছেলে যে মরেই গেল, তা ব'লে কি বউদি কাপড় ফেলেছে? আর ছেলের মতন ছেলে—সাহেবের ছেলে!" বলিয়াই মুখ বাঁকাইয়া ঘর হইতে ঠিকরিয়া বাহির হইয়া গেল।

[illegible] আসছি !" একটু ইতস্ততঃ করিয়া বাহিরের দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "খোকা ভাল হোক, হলেই এ বাড়ী ছেড়ে দেব—ফাজিল মেয়ে !" আর দাঁড়াইলেন না।

অবিলম্বেই ডাক্তার আসিলেন এবং রোগী পরীক্ষা করিতে গিয়া যেন একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,"মাথায় কিছুর আঘাত লেগেছিল ?"

গোপী বাবু জবাব দিলেন,—"না।"

"আচ্ছা। মাথায় বরফ চাপান—'আইস-ব্যাগ'! খুব সাবধানে রাখবেন—যেন উঠে না পড়ে !" এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া দিয়া ডাক্তারবাবু চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—দুই ঘণ্টা অন্তর যেন তিনি রিপোর্ট পান।

রাত্রি যখন গভীর, কমলা কি বকিয়া উঠিল !

জনক-জননী উভয়েই শিয়রে বসিয়াছিলেন, মুখের উপর পড়িয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি বাবা, খোকা—কমল ? ও বাপি—"

আর সাড়া নাই ! উভয়েই ব্যগ্র-ব্যাকুল চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন—খোকার মুখ-চোখ তেমনই স্থির হইয়া রহিয়াছে ! বীণা ফোঁপাইয়া উঠিয়া হাঁটুর ভিতর মুখ গুঁজিল। গোপী বাবু তাড়াতাড়ি ডাক্তার আনিতে গেলেন।

বাহির-দরজার খিল খুলিতেই, এক কর্কশ নারীকণ্ঠের সাড়া উঠিল—"কে রে ?"

"আমি পিসীমা—একবার ডাক্তারের বাড়ী যাচ্ছি !"

"বৌকে খিল দিয়ে যেতে ব'লে যাও! তোমাদের না-হয় ফাঁকার ঘরকন্না, কিন্তু, আমাদের ত গেরস্তের বাড়ী ! বৌকে বল, খিল দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুক, তুমি এলে আবার খুলে দেবে !"

ক্রোধে গোপী বাবুর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। ও-কথায় কর্ণপাত না করিয়াই রাস্তায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। যাইতে যাইতে ভাবিলেন—এরাও মানুষ !

পুনশ্চ ডাক্তার আসিলেন, আবার তেমনই করিয়া বুদ্ধি হারাইলেন, আবার তেমনই সংশয়ের ভার গৃহস্থকে চাপাইয়া চলিয়া গেলেন।

গোপী বাবু পর্য্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন, স্ত্রীকে বলিয়া ফেলিলেন, "আর পারলাম না, বীণা !" কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু বীণার মুখটি আজ সহসা দীপ্ত হইয়া উঠিল ! কণ্ঠ দৃঢ় করিয়া কহিল, "কাঁদছ কেন ? এখনো আমার প্রাণ শক্ত আছে !" অতঃপর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "দোয়োর-ধরা ছেলে ! ঘেঁটুর মাকে একটা টাকা পাঠিয়ে দাও না, দেবে ? সে খোকার ঠাকুর-দোয়ারে দিয়ে আসবে ! লিখে দিয়ো—খুব অসুখ !"

গোপী বাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া কি ভাবিলেন। অতঃপর প্রতিশ্রুতি দিলেন,—"সকালেই টেলিগ্রাম পাঠাবো।"

মাঝে আরও একটা দিন কাটিল। তৃতীয় দিবসের অপরাহ্নে রোগীর কক্ষের ভিতরে-বাহিরে যেন এক প্রেতমূর্ত্তি নৃত্য সুরু করিল ! খোকার এক পাশে ডাক্তার বসিয়া, অপর পার্শ্বে বীণা— তাহার মাথায় কাপড় নাই, যেন সে প্রতিমা, পুরোহিত বিসর্জ্জনের মন্ত্রপাঠ করিয়া এইমাত্র উঠিয়া গিয়াছে ! কক্ষের এক প্রান্তে বাড়ীর দুই চারিটি প্রবীণা দাঁড়াইয়া তাহারা মাঝে মাঝে বলিতেছে,—'বৌ, মাথায় কাপড়টা দাও ! কি করবে বল—সোয়ামী পুত্তুর কি সকলের সয় ?" গোপী বাবু সে দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া বাহিরের দিকে মুখ করিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছেন। ঠিক এমনই সময়ে এক অতিবড় দীন মূর্ত্তি আসিয়া দেখা দিল—সে ঘেঁটুর মা, সঙ্গে ঘেঁটু ! গোপী বাবুকে দেখিয়াই ঘেঁটুর মা প্রবল আতঙ্কে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু কমলা—" দাদাবাবুর কথা সরিল না, ইঙ্গিতে ঘর দেখাইয়া দিলেন। দিদা ঘরের এক পাশে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। ঘেঁটুর মা ঘেঁটুকে সম্মুখে রাখিয়া আড়ষ্টপদে ঘরে ঢুকি.. এবং মেঝের কমলার দিকে নজর পড়িতেই, ঘেঁটু আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া ডাকিল—"কমলা—" পলকে কক্ষের সমগ্র প্রকৃতি যেন আলোড়িত হইয়া উঠিল। তার পর, তাব [illegible] সকলকে স্তম্ভিত করিয়া কমলা সহসা চোখ মেলিয়া তাকাইল, সে দৃষ্টি চঞ্চল অথচ সহজ, স্বাভাবিক। সম্মুখে ঘেঁটুকে দেখিতে পাইয়াই এ-দিক্ ও-দিক্ তাকাইয়া কাহাকে যেন

লুফিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া খোকার কাছে বসাইয়া
দিলেন। অতঃপর খেল্‌নার পুঁটুলিটি ছেলে দুইটির কাছে
খুলিয়া দিয়া ডাক্তারবাবুর দিকে ফিরিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিতে

কম্‌লা তখন ঘেঁটুর একখানি হাত তাহার
চাপিয়া ধরিয়াছিল। তাহার মুখে তখন
আনন্দরেখা প্রদীপ্ত!

হাসি

তোমার মুখের হাসিখানি যদি অমলিন থাকে প্রিয়া,—
সকল দুঃখ-দৈন্য-গ্লানিমা মুছাব সে হাসি দিয়া।
সরোজাসীনার দীন সন্তান— লক্ষ্মী ভিন্নমুখী—
হীন দাসত্বে দিন কাটে, হায়! শতেক দুঃখে দুখী।
সাহিত্য-কারখানার শ্রমিক—চিত্তের শ্রম ঢালি'
মুষ্টিভিক্ষা মুদ্রার সাথে ছল-ধরা মিছা গালি।
সব গুণরাশি ম্লান করে এক ধন-বিহীনতা আসি';—
অযশ-আঁধারে অমলিন থাক্ শুধু প্রিয়া তব হাসি!

অলঙ্কারের রাঙা পারিজাতে ভূষিতে পারিনি কভু,—
কাঙালের কালো অপরাজিতায় তুষ্ট তুমি যে তবু।
সারাটি দিনের শ্রান্তি বহিয়া দিনশেষে ফিরি ঘরে,—
তোমার মুখের হাসিটি নিমেষে আমার শ্রান্তি হরে।
পরের দিনের সকল ভাবনা ভুলাও মুহূর্ত্তেকে—
কাণ থেকে দুল, হাতের আংটী খুলে দিয়ে একে-একে।
স্বল্পাভরণা, ধরিলে হাসিয়া নিরাভরণার রূপ—
তোমার অমৃত-হাসিটি তোমারে করিল যে অপরূপ!

ধনীর ঘরের রাণীরে দেখেছি—স্বভাব-অহঙ্কৃতা;
প্রেম নাই—শুধু হেম-সম্ভারে আপাদ-অলঙ্কৃতা।
দাসের, দাসীর হাত দিয়ে লভে সহস্র সেবা ধনী,—
রাণীর হাতের কঙ্কণ বাজে প্রসাধনে ঝনঝনি।
সহ-পারিষদ মজলিস-মোহে ধনীর রাত্রি বাড়ে;
গোপন বুকের বেদনা—রাণীর নিদ্রা ত নাহি কাড়ে!
দেখেছি—দেখেছি ধনীর রাণীর মুখের বিলাস-হাসি,—
ঊষার অমল কমল নহে সে, তোড়া-খসা ফুল বাসি!

তোমার মুখের হাসিখানি যদি অমলিন থাকে প্রিয়া,—
সকল দুঃখ-দৈন্য-গ্লানিমা মুছাব সে হাসি দিয়া।
বিজলী-দীপ্ত সৌধ-স্বরগে দেবতারা থাক্ সুখে,—
তোমার মাটীর দীপটি জ্বলুক—আমার আঁধার বুকে।
বাহিরের যত আঘাত—ঈর্ষ্যা অপবাদ—অন্যায়
ঘরের দুয়ারে আসি' যেন মোর লজ্জায় ম'রে যায়।
মম দীনতার কাঁটায় ফুটায়ে প্রেমের কমলরাশি,
কাঙাল কবির প্রিয়া,—তুমি হাসো তব মহিমার হাসি!

১৪
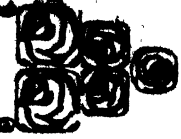
সমাজ ও শাসন

নির্জ্জনে মালিনী-তটের লতামণ্ডপে দুষ্যন্ত শকুন্তলার মিলন হইয়া গিয়াছে। আশ্রমে, কণ্বের অনুপস্থিতিতে রাক্ষসরা নানারূপ উৎপাত করিতেছিল, সংবাদ পাইয়া, মিলন-মন্দির হইতে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া, দুষ্যন্ত সকল আপদ্‌-বিপদ্‌ নিবারণ করিয়াছেন। নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ-সমাপ্তি হইয়াছে। ঋষিরা বিদায় দিয়াছেন, সুতরাং আর কোন্‌ ছলেই বা আশ্রমে থাকেন,—তাই বাধ্য হইয়া রাজা স্বীয় রাজধানীতে চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এখনকার মত, আশ্রম-ঘটিত তাঁহার 'সময়োচিত নিবেদন'—একপ্রকার শেষ হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু তার পর—?

শকুন্তলা কি করিতেছে, সখীরা কি করিতেছে, আর সর্ব্বোপরি, রাজা দুষ্যন্তই বা রাজধানীতে ফিরিয়া কি করিতেছেন, কি ভাবিতেছেন, কেমন আছেন—ইত্যাদি চিন্তা শকুন্তলার সমবেদনায় ব্যথিত সামাজিকগণের মনে স্বতই উদিত হইবার কথা।

আশ্রম-পতি কণ্বের অনুপস্থিতিতে, শকুন্তলাকে বহু প্রমাণ-প্রয়োগের বলে রাজি করিয়া দুষ্যন্ত গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু কণ্ব আসিয়া যখন শুনিবেন, তখন কি ভাবে এই পরিণয়ব্যাপার গ্রহণ করিবেন, কি বলিবেন, ফলাফলই বা ইহার কি দাঁড়াইবে, ইত্যাদি চিন্তাও দর্শক-বৃন্দের হৃদয়ে উদিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

আশ্রমের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসদৃশী, যাঁহার উপর ভার দিয়া কুলপতি কণ্ব নিশ্চিন্ত-হৃদয়ে চলিয়া গিয়াছেন, সেই কন্যা শকুন্তলাই বা কি ভাবে পিতার ন্যস্ত ভার বহন করিতেছেন, আশ্রমের প্রধান কর্ত্তব্য অবশ্য-পালনীয় অতিথি-সৎকার প্রভৃতি করিতেছেন,—যত দিন শকুন্তলা প্রকৃত আশ্রমবাসিনী ছিলেন, তত দিন ত কোন কথাই ছিল না, কিন্তু এখন নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচর্য্যপূর্ণ আশ্রমে রহঃপরিণীতা শকুন্তলার আতিথ্য-সৎকারে,—আশ্রমধর্ম্ম-পর্য্যবেক্ষণে যোগ্যতা এবং অধিকারই বা কতটা, এবং সেই সঙ্গে কন্যা শকুন্তলা পিতার পরোক্ষে অপরিচিতকে যে আত্মদান করিয়াছেন, সেই দানের পরিণতিই বা কি—ইত্যাদি নানা বিষয় জানিবার বাসনা রসজ্ঞ দর্শক-হৃদয়ে না জাগিয়াই পারে না।

তাই কবি চতুর্থ অঙ্কের প্রারম্ভেই একটা বিষ্কম্ভকের,—অতীত ঘটনার অবতারণা পূর্ব্বক পরবর্ত্তী ব্যাপার-পরম্পরার একটা ছায়ার আভাস প্রদান করিলেন। সংস্কৃতব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা কথা চলিত আছে যে,—

> কালিদাসস্য সর্ব্বস্বং অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।
> তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কো যত্র যাতি শকুন্তলা ॥

কালিদাসের যথাসর্ব্বস্ব হইল অভিজ্ঞান-শকুন্তল, তাহার মধ্যে আবার চতুর্থ অঙ্কের তুলনা নাই, যে চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলা আশ্রম ছাড়িয়া গৃহস্থ হইতে যাইতেছে। সেই চতুর্থের চিত্রাবলী দর্শনের উপযুক্ততা জন্মাইবার জন্য কবি দর্শকগণের হৃদয় মনের মত ছাঁচে ঢালাই করিয়া লইলেন।

অনসূয়া-প্রিয়ংবদার কথোপকথনকালে সুলভক্রোধ দুর্ব্বাসার সর্ব্বনাশকর অভিশাপের বিষয় অবগত হইয়া দর্শকবৃন্দ শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। অভাগিনী শকুন্তলা যে ক্ষণে 'আশ্রম-বিরোধি'ভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়াছে, তদবধিই সখীরা তাহার জন্য চিন্তিত ছিল। তাহাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও সরলা অপ্সরার দুহিতা আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই, আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং তাহাকে পুড়িতে হইবেই। এত দিন আশ্রমে ছিল, আশ্রমের চির-শীতল বক্ষে সেই মদনাগ্নির বিশ্ব-গ্রাসিনী জিহ্বা তাহাকে তত স্পর্শ করিতে পারে নাই,—মনে মনে বিরহানলে শকুন্তলা পুড়িতেছিল বটে, কিন্তু সে পোড়ায় দুঃখের অনুপাতে সুখও কম নহে। সে পোড়ায় মেকি খাঁটী হয়, খাদ মরিয়া সোনা সাচ্চা হয়। কিন্তু আজ দুর্ব্বাসা যে আগুন জ্বালাইলেন, ইহার ধর্ম্ম অন্যরূপ। ইহাতে শকুন্তলাকে হয় ত ভস্মই করিয়া ফেলিবে। তবে ভরসার মধ্যে এইটুকু যে, একটা কোনরূপ অভিজ্ঞান দেখাইতে পারিলে, রাজার তাঁহাকে মনে পড়িবে, এবং সে চিহ্নও শকুন্তলার নিজেরই হাতে আছে—রাজার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক। তবুও মন্দের ভাল। কিন্তু সকলেরই মনটা যেন কেমন খুঁত-খুঁত করিতে লাগিল। কোথায় আত্মহারা সরলা শকুন্তলাকে দেখিয়া মমতা জন্মিবে,

সমবেদনার উচ্ছল উৎসে তাহাকে প্লাবিত করিবে, তাহার জীবনের পথ যাহাতে কুসুমাস্তৃত হয়, সেইরূপ আশীর্ব্বাদামৃত দুঃখিনীর মস্তকে সহস্র-ধারায় বর্ষিত হইবে, আর তাহা না হইয়া তাহার মাথায় পড়িল কি না বজ্র! তাহাও আবার এক জন সংসারবিরক্ত মহর্ষির হাত হইতে! এইরূপ কত কি দুর্ভাবনায় দর্শকদিগের চিত্ত ব্যথিত। তাহার উপর আবার,—

দুষ্মন্ত অনেক দিন চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কোনই সংবাদ নাই। আর তিনিও কোন সংবাদ লন না। সখীদ্বয়ের প্রাণ অস্থির হইয়াছে। নিজের ভাবনা তাহারা জানে না, করিতে শেখে নাই। দিনযামিনী শকুন্তলার কথাই তাহারা ভাবে। কেন রাজা কোন সংবাদ দেন না, কি হইল? তিনি কি ভুলিয়া গেলেন? ইত্যাদি ভাবনায় সখীদ্বয়ের আহারনিদ্রা পর্য্যন্ত বন্ধ। কি করিলে শকুন্তলার এই দুরদৃষ্টের খণ্ডন হয়, এই ঘোর বিপদ্ কাটে, তাহাদের নিরন্তর এই চিন্তা। অনসূয়া আজ প্রিয়ংবদাকে লইয়া আশ্রমোপান্তে কুসুম-চয়ন করিতেছে, বাসনা—ডালা ভরিয়া ফুল তুলিবে ও অঞ্জলি অঞ্জলি ফুলের দ্বারা শকুন্তলার সৌভাগ্য-দেবতার অর্চ্চনা করিবে। ইহাতে যদি ঠাকুর প্রসন্ন হন, রাজার শকুন্তলাকে মনে পড়ে। হিন্দুর সংসারে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য, যখনই কোন আপদ্ ঘটে, দেখিতে পাই। সংসারের যাঁহারা প্রাণ, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, তাঁহারা অনন্যহৃদয়ে আপৎপ্রশমনের জন্য দেবতার অর্চ্চনা করেন, কত ব্রত-নিয়ম পালন করেন। নারী-জাতির মজ্জায় মজ্জায় যদি এইরূপ ধর্ম্মভাব নিহিত না থাকিত, তবে এত দিনে হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসংসারের, না জানি, আরও কত অধঃপতন ঘটিত। কবি কেমন নিপুণভাবে, ধর্ম্মপ্রভাবপূর্ণ হিন্দু-সমাজের, তথা হিন্দু রমণী-হৃদয়ের একখানি নিরবদ্য চিত্র অঙ্কিত করিলেন। অথবা শুধু হিন্দু কেন, বিপদ্ যখন ঘনীভূত হইয়া আসে, তখন হিন্দু অহিন্দু—সকলের মধ্যেই আত্মত্রাণের অক্ষমতা-জনিত এইরূপ আকুলতা পরিলক্ষিত হয়। এই সে দিন সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ পীড়িত হইয়াছিলেন, জীবন-সংশয় ঘটিয়াছিল, ঐহিক চেষ্টাযত্নের কোনই ত্রুটি হয় নাই, তবুও কিন্তু রাজাধিরাজের মঙ্গলকামনায় দেশবিদেশের ধর্ম্মমন্দিরে ... উপাসনা করিয়া, অদৃষ্টদেবতার চরণে প্রাণের উৎকণ্ঠা নিবেদন করিয়া সাধারণে স্বস্তিবোধ করিয়াছিল।

অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যখন এইরূপে কুসুমচয়নে ব্যস্ত, তখন অন্যদিকে আশ্রমের কুটীরদ্বারে শকুন্তলাও একাকিনী তাহার আরাধ্য মূর্ত্তির ধ্যানে নিমগ্না। এক দিকে অনিমেষ নয়নে যদিও সে চাহিয়া আছে, কিন্তু সে দৃষ্টির দৃষ্টি-শক্তি নাই। সে দৃষ্টি বহিস্থ হইয়াও বাহ্যবস্তুর স্বরূপ-গ্রহণে অসমর্থ। সে দৃষ্টি শকুন্তলার মর্ম্ম-মর্ম্মরে অঙ্কিত দুষ্মন্তের প্রতিকৃতি দর্শনে লীন। পুত্তলিকার নয়নের ন্যায় সে নয়ন চিত্রিত, নিস্পন্দ—বস্তুর স্বরূপ-সংগ্রহে বিমূঢ়।

আজ কত কথা শকুন্তলার মনে পড়িতেছে। সামান্য কয়টি মাস মাত্র, কিন্তু মনে হইতেছে যেন কত যুগ—কত যুগান্তর! পার নাই, অন্ত নাই।—সম্মুখে যেন কত বড় মরুভূমি, কি ভয়ঙ্কর রৌদ্র-মূর্ত্তি, চোখ ঝলসিয়া যায়! সেই গ্রীষ্মের দিবাবসানে তিন সখীতে মিলিয়া আশ্রমতরুর 'আলবাল-পূরণে' আসা,—বনতোষিণীর মূলে শকুন্তলার জলসেচন করা, ভ্রমরের সম্পাত এবং অত্যাচার,—সেই নবীন অতিথির সহসা আবির্ভাব, প্রিয়ংবদার রহস্যোক্তি, সপ্তপর্ণ-বেদিকায় সকলের উপবেশন, শকুন্তলার আত্মগোপনের প্রয়াস;—সেই শিলাতলের কুসুম-শয্যা, গীতিরচনা ও পদ্মপত্রে তাহার লিখন এবং সহসা রাজার অভ্যুপপতন;—আর তার পর সেই,—সেই হরিণ ধরিবার ছলে সখীদ্বয়ের অন্তর্ধান, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পরস্পরে আত্মসমর্পণ, নির্জ্জনে শকুন্তলার কাতরতা, রাজার অনুনয়, শকুন্তলার পরাজয়, আরও কত কি;—শেষে হঠাৎ সুখের আকাশে ধূমকেতু-রূপিণী পিসী গৌতমীর আগমন প্রভৃতি আজ একে একে শকুন্তলার চিত্তমুকুরে প্রতিবিম্বিত! আজ আর শকুন্তলা বহির্জ্জগতের নহে, অন্তর্জ্জগতে একবারে বিলুপ্ত, মিশ্রিত। জীবের স্থূলদেহ পড়িয়া থাকে, সূক্ষ্মদেহ চলিয়া যায়। আজ শকুন্তলারও স্থূল-দেহ শবদেহবৎ ঐ মালিনী-তটের কুটীরদ্বারে নিপতিত, আর তাহার চৈতন্যময় সূক্ষ্মদেহ কোথায় চলিয়া গিয়াছে! অনশ্বর প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, প্রীতি প্রভৃতি এই মরজগতের সামগ্রী নহে, উহারা লোকান্তরের পবিত্র বস্তু। তাই প্রেমময়ী,—স্নেহময়ী, প্রীতিময়ী শকুন্তলার প্রাণও যেন আজ লোকান্তরে—দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে, আর তাহার মাংস-পিণ্ডময় শবদেহ ঐ নশ্বর লোকের ধূলায় পড়িয়া আছে।

করুণাময়; দুহিতৃ-সর্ব্বস্ব পিতা কণ্ব, দ্বিতীয় হৃদয়-সদৃশী সরলা অনসূয়া, প্রাণতুল্যা তড়িন্ময়ী প্রিয়ংবদা, স্নেহময়ী আর্য্যা গৌতমী,—এ সমস্তকেই আজ শকুন্তলা ভুলিয়াছে। বড়ের বড় আদরের আশ্রম, আশ্রম-তরু-লতা, বড় আগ্রহের আশ্রম

ধর্ম্ম-পালন, অতিথির অর্চনা প্রভৃতি, তিনি তীর্থযাত্রাকালে শকুন্তলার হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে, শকুন্তলা যেরূপ ভুলো মেয়ে, অপ্সরার গর্ভ-সম্ভবা বিস্মৃতিময়ী বালিকা, তাহাতে আশ্রমের কায-কর্ম্মের ভার পড়িলে হয় ত কতকটা আনমনা হইবে। অন্য কোন চিন্তার আর তত অবসর থাকিবে না। কিন্তু শকুন্তলা আর এখন আশ্রম-বাসিনী নাই। পার্থিব আশ্রমের অনেক দূরে, অনেক উর্দ্ধে যে আশ্রম, সেই আশ্রমের যে সঞ্জীবন-তরু, সেই তরুর সর্ব্বপ্রধান সম্মোহন ফলের আস্বাদে শকুন্তলা এখন উন্মাদিনী। কণ্ব তাপস, চিরদিন তপস্যা করেন। বনে থাকেন, ফল-মূল আহরণ করেন, ব্রহ্মচর্য্যের অক্ষয় কবচে তাঁহার দেহ-মন আজন্ম সুরক্ষিত, হৃদয়ের বেগ, প্রেমের প্রতাপ যে কত প্রবল, কি অদম্য, জীবের উপর তাঁহার যে কি অপ্রতি-বিধেয় আধিপত্য, তাহা বোধ হয় সংসার-রস-বোধ-বিধুর বনবাসী ঋষি বিদিত ছিলেন না। তাই তিনি বিস্মৃতিময়ী মুগ্ধা শকুন্তলাকে একটু কর্ম্মঠ ও আত্মধারণসমর্থ করিবার মানসে, তাহার উপর আশ্রমের ভার, আতিথ্য-ক্রিয়ার ভার ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। নতুবা প্রেমের প্রভাব যদি তিনি বিদিত থাকিতেন, নারীহৃদয়ের প্রকৃত পরিমাণজ্ঞান যদি তাঁহার কিয়ৎপরিমাণেও থাকিত, তাহা হইলে ক্রান্তদর্শী মহর্ষি কদাচ মুগ্ধা, কোমলপ্রকৃতি মেনকাত্মজার উপর এই গুরুভার অর্পণ করিতেন না। তিনি স্নেহময় পিতার দৃষ্টিতে আশ্রমকন্যা শকুন্তলাকে দেখিতেন, পিতৃত্ব-নিরপেক্ষ হইয়া কদাচ তিনি শকুন্তলাকে দেখেন নাই। তাই শকুন্তলা-হৃদয়ের সকল ভাব তাঁহার চোখে পড়ে নাই।

কোমলপ্রাণা শকুন্তলার সৌভাগ্য-দেবতার মস্তকে যখন অভিসম্পাতরূপ বজ্র নিক্ষেপ করিয়া দুর্ব্বাসা ত্বরিতচরণে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তখন হতভাগ্যা ঘুণাক্ষরেও জানিল না যে, তাহার শুভ্র ললাটপট্টকে একটি কালো রেখার পাত হইল।

জীবনে এমন একটা সময় আসে, যখন মানুষ লোক-লজ্জা, ভয়, সমাজ, সদাচার সব ভুলিয়া যায়। আপনাকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়। সে বিস্মৃতির ফল ভালো কি মন্দ, অক্ষয় কি ভঙ্গুর, অমৃত কি গরল, তাহা মানুষ তখন বুঝিতে পারে না। বুঝিবার সামর্থ্যও তখন তাহার থাকে না। তরণী যতক্ষণ নিমগ্ন না হয়, ততক্ষণই তাহার বহনযোগ্যতা, ততক্ষণই সে পারাপার করিতে সমর্থ, একবার নিমগ্ন হইলে, কোথায় কত দূরে যে তাহার মৃত্তিকাস্পর্শ-সম্ভাবনা, তাহা কে বলিবে? শকুন্তলাতরণী নিমগ্ন হইয়াছে, কত দূরে যে আশ্রয় মিলিবে, কে জানে?

সংসারের প্রত্যেক ব্যক্তিই সমাজের এক একটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। পত্র, পল্লব, শাখা, প্রশাখা, ফুল, ফল প্রভৃতি লইয়া যেমন একটি তরু, প্রত্যেক মানব—ছোট বড় সকলকে লইয়া তেমনই এই সমাজ। এই বিশাল সমাজ-মহীরুহের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া মানব ক্লান্তহৃদয়ে স্বস্তি প্রাপ্ত হয়, সংসারের তাপ-যাতনা ভুলিয়া যায়। সমাজ অনাথের নাথ, অপুত্রকের পুত্র, পিতৃহীনের পিতা, মাতৃহীনের স্নেহময়ী মাতার স্থানীয়। সমাজ নির্ব্বান্ধবের বন্ধু, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দুঃসাধ্য রোগীর ধন্বন্তরি। ইষ্টকের উপর ইষ্টক, তাহার উপর ইষ্টক, তাহার উপর ইষ্টক রাখিয়া যেমন অভ্রভেদী সৌধ গ্রথিত হয়, এবং সেই পরস্পর সংযুক্ত সকল ইষ্টকের সমবেত দৃঢ়তায় যেমন সেই আকাশচুম্বী সৌধ দাঁড়াইয়া থাকে, সেইরূপ পরস্পরাপেক্ষিণী মানব-বাহিনীর সমবায়ে সমাজ দাঁড়ায়। এখানে ব্যষ্টিভাবে প্রতিমানবের ন্যূনাধিক স্বাধীনতা থাকিলেও কিন্তু সমষ্টিভাবে সকলেই সমাজের অধীন। ঐ প্রকার পরস্পরাপেক্ষিত্ব বা পরাধীনত্ব আছে বলিয়াই সমাজ সুখের সদন, জীবনের বিশ্রান্তিগৃহ। যে সমাজে এই পরস্পরাপেক্ষিত্ব নাই, প্রত্যেকে নিজের জন্যই ব্যস্ত, পরের কথা যে সমাজে ভাবিতে জানে না বা ভাবিতে চাহেও না, সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান, সে সমাজে সুখ নাই। সহানুভূতির অমৃত-নির্ঝরে যে সমাজ অভিষিক্ত নহে, তাহা আগ্নেয়গিরির বক্ষের ন্যায় দুঃসহ, অগম্য, অভোগ্য। তাহা মানব-সমাজ নহে, দানব-সমাজ। কেবল আত্মসুখের অন্বেষণেই তাদৃশ সমাজে নিয়ত সুন্দ-উপসুন্দের কলহ বাধে, তারক-বৃত্র প্রভৃতি অসুরের উৎপত্তি হয়।

সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে,—সকল অবস্থাতেই তুমি সমাজের অধীন। কোনও সময়ে কোনও অবস্থাতেই তুমি সমাজ হইতে স্বতন্ত্র নহ; স্বতন্ত্র হইতে পার না; হইলে তোমার মঙ্গল নাই। সমাজের নিকট তোমার অশেষ কর্ত্তব্য মনে রাখিও—সমাজের মঙ্গলামঙ্গল, সুতরাং বিপুল জনসমষ্টির মঙ্গলামঙ্গল তোমার উপর ন্যস্ত। সমাজের সহিত তুমি অঙ্গাঙ্গিভাবে গ্রথিত। তুমি শোকেই অধীর হও, আর সুখেই উন্মত্ত হও, সমাজকে ভুলিও না। ভুলিলে চলিবে না। তাহাতে তোমার ও সমাজের—উভয়েরই অকল্যাণ। তোমার

সুখসম্পদ্ সমাজের সুখ-সম্পদ্ হইতে স্বতন্ত্র নহে। যখন তোমার আত্মসুখকে তুমি সমাজ হইতে পৃথক্ করিয়া লইবে, কেবল নিজের সুখেরই স্বপ্ন দেখিবে, জানিও, তখনই তোমার পতন নিকটবর্ত্তী, তোমার সুখযামিনী অবসিতপ্রায়।

শকুন্তলা আপনার সুখের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জগৎকে একবারে বিস্মৃত হইয়াছিল। কণ্ব, কণ্বাশ্রম, আশ্রমতরু, আশ্রম-মৃগ—প্রভৃতি সমস্ত ভুলিয়াছিল। সে নিজের সুখ-দুঃখ, নিজের ভাবনা—সমাজের অঙ্ক হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছিল। সমাজের চিরসংযুক্ত গ্রন্থি শিথিল করিয়াছিল। সমাজের অঙ্ক-শায়িনী থাকিয়াও, যে কোন কারণেই হউক, সমাজকে অবজ্ঞা করিয়াছিল। শকুন্তলা বহুজন-মধ্য-বর্ত্তিনী থাকা সত্ত্বেও তাহার ক্ষুদ্র নিজত্বকে একাকী, অসহায়, অন্যনিরপেক্ষ করিয়া তুলিয়াছিল। তাই সমাজের কঠোর শাসন—দুর্ব্বাসার অভি-শাপ তাহার মস্তকে পতিত হইল এবং তাহাকে একাকিনীই সেই গুরু দণ্ড মাথা পাতিয়া লইতে হইল। সুখের মোহে অন্ধ হইয়া সে সমাজের সুখের দিকে তাকায় নাই। আজ দুঃখের সময়ে, সমাজের কোন প্রাণী ত তাহার ছায়াস্পর্শ করিল না। যে অবস্থাতেই সে থাকুক, যতই আত্মবিস্মৃত হউক, সমাজের নিকট তাহার যে কর্ত্তব্য, তাহা তাহাকে পালন করিতে হইবেই হইবে; যদি তাহা সে না করে, সমাজের সে ক্ষমার অযোগ্য; প্রত্যক্ষে হউক, পরোক্ষে হউক, তাহার উপর সমাজের দণ্ডপতন অনিবার্য্য। শাসনের উদ্দেশ্য সংশোধন, ধ্বংস নহে। তাই দুর্ব্বাসার শাসনে আতিথ্য-বিমুখী, কর্ত্তব্য-ভ্রষ্টা শকুন্তলা ভস্মীভূত হইল না। সে শাসন অঙ্গুরীয়ক-দর্শনান্ত হইল। একটা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সমাজরূপী শক্তিমান্ নৃপতির দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল। যে মোহে শকুন্তলার এই আত্মবিস্মৃতি, সেই মোহ সমূলে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল।

মহাকবি এই অভিশাপের সৃষ্টিপূর্ব্বক, এক দিকে মহা-ভারতের কামাধীন দুষ্যন্তের কামুকত্বের নিরাস করিলেন; পার্থিব দুষ্যন্তকে অপার্থিব করিলেন; প্রাচীন কীটদষ্ট দারুময়ী প্রতিমার পরিবর্ত্তে স্বর্ণপ্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং নির্ম্মল শারদ-কৌমুদীর দ্বারা সেই প্রতিমার অঙ্গরাগ করিয়া দিলেন;—অন্য দিকে এই শাপের সৃষ্টিতে কবি সমাজ এবং সমাজ-বাসীর সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা, সমাজে এবং সামাজিক—পরস্পরের—পরস্পরাপেক্ষিতা, তথা অন্যোহন্য-কর্ত্তব্যতার জলন্তী মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। নির্ম্মাণ-দক্ষতার প্রভাবে কবি একই চিত্র-পটে এমন একখানি মূর্ত্তি অঙ্কিত করিলেন যে, দুই দিক্ হইতে দেখ, সেই একই মূর্ত্তিতে দুইখানি সুন্দর ছবি দেখিতে পাইবে। সেই দুইখানি ছবিরই ভঙ্গি, ঠাম, প্রকার সম্পূর্ণ পৃথক্, অথচ তাহা একই মূর্ত্তিতে প্রতিফলিত। সৃষ্টি-নৈপুণ্যের ইহা পরাকাষ্ঠা, কবিত্বের ইহা চরম উৎকর্ষ।

শকুন্তলা-নাটকের চতুর্থ অঙ্ক যেমনই গম্ভীর অথচ আবেগোচ্ছল,—তাহার বিষ্কম্ভকও তদ্রূপ সুগভীর ভাবপূর্ণ ও রসভাব-সমুজ্জ্বল। সহৃদয়-হৃদয় এতদ্দর্শনে বিমোহিত না হইয়া যায় না। "তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কঃ"—এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। শত শত বাগ্মী শত সহস্র উচ্চমঞ্চে দাঁড়াইয়া তারকণ্ঠে বক্তৃতাদান পূর্ব্বক যাহা না পারিতেন,—কবির কবি কালিদাস আলেক্ষ্যাগাত্রে একটি রেখাপাতের দ্বারা তাহার অনেক অধিক করিয়া গেলেন; একটা আ-কল্পস্থায়ী সংস্কার জন্মাইয়া দিলেন; কর্ত্তব্যের অপালনজনিত প্রত্যবায়ের একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

গরলে অমৃত

দগ্ধ করি' বিশ্ব যায় গ্রীষ্ম চলি' যবে,
অমৃতের বন্যা লয়ে বর্ষা আসে ভবে;
পীড়ি' নিখিলের মর্ম্ম নিরমম শীত—
ফিরে যবে, বসন্ত সে হাসি উপনীত।
রাত্রি যায় দিন আসে, মৃত্যু শেষে প্রাণ,
দুঃখ পরে সুখ, ইহা বিধির বিধান।

শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার।

দীপনা

১

আজ কয় দিন তাহার জ্বর, কিন্তু কাযে না গেলে ছেলে-মেয়ে উপবাস করিয়া মরিবে। জ্বরের জন্য দীপনা এ মাসে বারো দিন খাটিতে পারে নাই। সন্তান হওয়ায় তাহার স্ত্রীও মাসাবধি ঘরে আবদ্ধ আছে। পাঁচটা গৃহস্থবাড়ী ঝাঁট দিয়া সেও মাসে বারো তেরো টাকা রোজগার করে। মাসান্তে ঘরভাড়া দিতে হয়, তার পর কাবুলী আছে, মুদী আছে। তাড়াতাড়ি সারিয়া উঠিবার জন্য ডাক্তারবাবুকে দীপনা কিছু টাকা কবুল করিয়াছে। কিন্তু তাহাও এ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। ধাঙড়-মেথরদের চিকিৎসার জন্য কর্পোরেশনের ডাক্তার আছেন; কিন্তু তাহাদের ধারণা এই যে, সাধারণতঃ তিনি যে ঔষধ দেন, তাহাতে অসুখ সারে না। তাই অসুখ হইলেই তাহারা 'আচ্ছা দাওয়াইর' জন্য তাঁহাকে কিছু কিছু টাকা দেয়।

মাস-কাবারের আর সাত দিন বাকী। বেশী খাটিয়া এই কয় দিন কিছু উপরী রোজগার করা দরকার। তাহা না হইলে মাসকাবারে কাবুলীর সুদ ও মুদীর টাকা দেওয়া অসম্ভব। ডাক্তারকে আরও কিছু দিন অপেক্ষা করিতে বলা বরং সম্ভবপর; কিন্তু মুদী ত শুনিবে না। তাহাকে টাকা না দিলে সে চাল দেওয়া বন্ধ করিয়া দিবে, কাবুলীর উৎপাতে রাস্তায় বাহির হইতে পারিবে না। তেলওয়ালাও কা'ল তেল দেয় নাই। যে সব বাবুর কাছে কিছু কিছু পাওনা ছিল, বলিয়া কহিয়া আজ তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু আদায় করা দরকার।

শেষরাত্রিতে পাড়ার সহকর্ম্মীদের সঙ্গে দীপনাও বাহির হইয়া পড়িল। লছমী যাইতে নিষেধ করিল, বলিল—'চাল-ডাল সিদ্ধ ক'রে খাব, তেল নয় নাই হ'ল। নুণ ত আছে।"

দীপনা বলিল—"কাযে যেতে আমি পারব। ডাক্তার বাবু কা'ল বলেছে, জ্বর এক দাগেরও কম, এক কম একশ।"

লছমী বলিল—"কিন্তু ক'দিন যে কিছু খাসনি।"

দীপনা হাসিয়া বলিল—"তোর সবতাতেই বাড়াবাড়ি। এ ত' বাবুর শরীর নয় যে, এক দিন ভাত না খেলেই কায বন্ধ ক'রে দিতে হবে। খালি পেটে ত' আর নেই।"

লছমী জানিত, কথা বাড়াইয়া লাভ নাই, তাই সে চুপ করিল। দীপনা বালতী ও ঝাড়ু হাতে বাহির হইয়া গেল। গায় তার একটি ছেঁড়া গেঞ্জি।

কিছু আগে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছিল। কোন কোন রাস্তায় তখনও হাঁটু জল, তার উপর কনকনে বাতাস। সমস্ত কলিকাতা তখন সুষুপ্ত। মাঝে মাঝে দুই একখানা ট্যাক্সিতে নিশাবিহারী বাবুরা বাড়ী ফিরিতেছেন। পথের ধারে একটা ইটের পাঁজার পশ্চাৎ হইতে একটা কুকুরছানা আর্ত্তনাদ করিতেছিল। দীপনা তাহাকে তুলিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। মানুষের বুকের গরম পাইয়া কুকুর-ছানাটা চুপ করিল।

ধাঙড়দিগকে দেখিলে যাহারা ছুঁস নে ছুঁস নে বলিয়া দূরে সরিয়া যায়, তাহাদের রাস্তা ও ঘরবাড়ীর আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া ১৪ টাকা মাসমাহিনার এই মানুষগুলি যখন ঘরে ফিরিল, তখন বেলা ১১টা। দীপনাও তাহাদের সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়াছে, তাহার বালতীর মধ্যে সেই কুকুরছানাটি। দীপনার চোখে একটা হলুদ আভা, মাথার চুলে একরাশ ধূলা। সে লছমীকে বলিল—"দে ত' দুটো ডাল চড়িয়ে। ডাল জলই খাব'খন।"

লছমী ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"ডাল ত' নেই।" দীপনা কি যেন বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু আপনাকে সামলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"লছমীর ঘরে চাল আছে?" লছমী বলিল—"চাল আছে বটে, কিন্তু ভাতটা আজ খেলি।" দীপনা উত্তর করিল—"না, না, ভাতই খাব। খিদে পেয়েছে।"

ভাত খাইয়া বৈকালে দীপনা একটু সুস্থ বোধ করিল

লছমীকে বলিল—"ডাক্তাররা ছোট লোকের ধাত বোঝে না। ভাত দিলে আমি কবে সেরে উঠতুম।"

লছমী এ বেলা আর তাহাকে কাযে যাইতে বাধা দিল না। সন্ধ্যার সময় কায করিয়া দীপনা যখন বাড়ী ফিরিল, তখন তাহার শরীর অত্যন্ত অবশ। চোখের নীচে কালো একটা দাগ। কেরোসিনের ডিবার অস্পষ্ট আলোকেও তাহার ক্লান্ত মুখচ্ছবি দেখিয়া লছমী শিহরিয়া উঠিল; বলিল—"একেবারে যে কালো হয়ে গেছিস।" দীপনা হাসিয়া উত্তর করিল—"ঘরের মানুষ তোর ময়ূর-চড়া কার্ত্তিক! তাই কালো বলে দুঃখ কচ্ছিস।" তাহাদের দুঃখ-দৈন্যের কথা অনেক সময় এই রকম হাসি-ঠাট্টার মধ্যে চাপা পড়িয়া যাইত।

সীতা-মাইকো লুঠকে ভাগল
রাবণ করকি ছল।
(ওরে) রাবণ করকি ছল।
পবন্‌কি লেড়কা হনুমানজী
দরিয়া বাঁধনেবালা,
রামচন্দরকি সাথ উনকা
ভৈলা রে মিতালা।
(ভেইয়া) বান্দরকি সাথ দেউতাকি
ভৈলা রে মিতালা।

দীপনাও সঙ্গে সঙ্গে ধরিল—

বান্দরকি সাথ দেউতাকি
ভৈলা রে মিতালা।

২

ধীরেশ বাবু উত্তরাধিকারসূত্রে কর্পোরেশনের কাউন্সিলার। একাদিক্রমে তাঁহার পিতামহ ২১ বৎসর ও তাঁহার পিতা ১৭ বৎসর এই পদে অভিষিক্ত ছিলেন। ধীরেশ বাবুও আজ ৪ বৎসর এই কায করিতেছেন। ইহাতে ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের কোন সুবিধা না হইলেও দিন দিন তাঁহাদের ধন, মান ও প্রতিপত্তি বাড়িতেছে।

গত রাত্রির বৃষ্টির জন্য তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে বড় পাইপে ময়লা জমিয়া গিয়াছিল সন্ধ্যার পর বৃষ্টি হওয়ায় ড্রেণের ভিতর হইতে একটু একটু জল উঠিতেছিল। সকলকে ডাক-হাঁক করিয়া, চাকর-বাকরকে ধমকাইয়া তিনি কর্পোরেশনে টেলিফোন করিলেন। রাত তখন প্রায় ৯টা। ওভারসিয়ার যদুনাথ কর্পোরেশন আফিসে উপস্থিত ছিল। খবর শুনিয়া সে ধীরেশ বাবুকে ফোনে বলিল—"হুজুর, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে লোক নিয়ে হাজির হব।" প্রশংসাপ্রাপ্তি ও মাহিনা-বৃদ্ধির এমন শুভ সুযোগ শীঘ্র উপস্থিত হয় নাই। কিছু দিন যাবৎ যদুনাথের বিরুদ্ধে আফিসে খালি অভিযোগই আসিতেছিল।

লছমী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দীপনা ফুটপাথে একটা খাটিয়ার উপর বসিয়া, তাহার কোলে সেই ছোট কুকুর-ছানাটি। দীপনার এক জন সহকর্ম্মী ডুগডুগী বাজাইয়া গাহিতেছিল—

অবুঝিয়া ছোড়কি রাম গেইলা—
গেইলা রে জঙ্গল,

রাত্রিতে ম্যানহোলের কায হয়। আজ কোন কাযের খবর দীপনা জানিত না। শরীরও খারাপ, কায থাকিলেও তাহা করিবার শক্তি তাহার নাই।

সহকর্ম্মীর গান থামিলে সে আবার তাহাকে গাহিতে বলিল। এমন সময় যদুনাথ আসিয়া ডাকিল—"দীপনা, একটা বীন্ হুলের (Manhole) কায আছে, যেতে হবে যে!" ড্রেণ পরিষ্কারের কাযে দীপনার বেশ সুখ্যাতি ছিল।

দীপনা উত্তর করিল—"আজ শরীর খারাপ ভাসিয়ার (Overseer) বাবু।"

যদুনাথ বলিল, "এক টাকা ক'রে বকসিস পাবি। বড়মানষের কায।"

নগদ এক টাকা বক্‌সিসের কথা শুনিয়া দীপনা ভাবিল, ঘরে ত তেল নাই, ডাল নাই। ছোট মেয়ে ও ছেলেটা বৈকালে ক্ষুধায় কাঁদিয়াছে। তাহাদিগকে এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া দিতে না পারায় লছমী কত দুঃখ করিয়াছে। এক টাকায় দুই সের ডাল ও আধসের তেল কিনিয়াও কিছু হাতে থাকিবে। সে বলিল—"ক'টা আদমী চাই তোমার, বাবু?"

যদু বলিল—"জন দশেক লোক দরকার।"

দীপনা জিজ্ঞাসা করিল—"কায কোন্ রাস্তায়?"

যদু বলিল—"শ্যামপণ্ডিত ষ্ট্রীট।"

যে গান গাহিতেছিল, তাহাকে সঙ্গে করিয়া দীপনা বস্তির ভিতর গেল। মিনিট পনেরো পরে কয়েক জন লোক লইয়া সে ফিরিয়া আসিল। লছমী তখন

তাহাকে আর জাগাইল না। দীপনার আশঙ্কা—সে জানিতে পারিলে কিছুতেই তাহাকে যাইতে দিবে না।

রাত তখন প্রায় ১০টা। বৈঠকখানায় বসিয়া ধীরেশ বাবু পাঁচ জন পেটোয়া লোকের সম্মুখে উঁচু গলায় খুব বাহাদুরী করিতেছিলেন। মেয়র তাঁহার ভয়ে কাঁপেন, ডেপুটী মেয়র তাঁর ভাড়াটিয়া, তিনিই ভোট সংগ্রহ করিয়া বড় বড় চাকুরীয়াদের কায যোগাড় করিয়া দিয়াছেন। আর তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে কি না ময়লা জমিয়া আছে। এত বড় Negligence একবারেই অসহ্য।

আত্মমর্য্যাদার কথা বলিতে বলিতে তিনি এক একবার চাকরকে তামাক আনিতে হুকুম করিতেছিলেন। তাঁহার শ্রোতাদের মধ্যে কেহ চাহিলেই দুই দশ টাকা ধার পান, কেহ ধার পাওয়ার আশা রাখেন। এই অপ্রীতিকর কথাগুলি তাই তাঁহাদের কাণ-সহা হইয়া গিয়াছিল। এমন সময় শোনা গেল, বাঙ্গালা-মিশ্রিত অপূর্ব্ব হিন্দিতে কে এক জন রাস্তায় চীৎকার করিতেছে—"ইধার আও—উধার যাও—এই বীন হলমে দো আদমী—দখিণ বগলমে তিন—আর ওর নাম কি মাঝখানটায় দো।"

ধীরেশ বাবু যদুনাথকে চিনিতেন। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"যা হ'ক, বেটারা লোক পাঠিয়েছে দেখছি। তা না হ'লে আর রক্ষে ছিল?"

এক জন বৈঠকী বন্ধু বলিল—"ক'টা মাথা বেটাদের ঘাড়ে যে ধীরেশ চকোত্তির কথা অমান্যি করে?"

এমন সময় যদুনাথ আসিয়া সেলাম ঠুকিল—"হুজুর, ডিরিণ এখুনি সাফ ক'রে দিচ্ছি।"

ধীরেশ বাবু হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন। কর্পোরেশন পাইক-পেয়াদার সম্মুখে হাসিলেও হয় ত বা তাঁহার পদমর্য্যাদা নষ্ট হইবে। তাই সন্নিহিত একখানা স্যানাটোজেনের বিজ্ঞাপনের বই খুলিয়া তাহাতেই গভীরভাবে মনোনিবেশ করিলেন।

* * * *

ধীরেশ বাবুর বাড়ীর সম্মুখস্থ ম্যানহোলের মুখ খোলা হইল। ভিতরে ময়লা জমিয়া জল প্রায় রাস্তা পর্য্যন্ত ছাপাইয়া উঠিয়াছে। তার উপর কতকগুলি ময়লা, ছোট ছোট কাঠের টুকরা, পোড়া কয়লা, দেশলাইয়ের বাক্স, আমের আঁটি আরও কত কি ভাসিতেছিল, ভিতর হইতে একটা পূতিগন্ধমিশ্রিত হাওয়া উপরের বাতাসকে কলুষিত করিয়া দিল। এমন কি, যদুনাথও মুখে কাপড় দিয়া সরিয়া গেল।

ম্যানহোলটা প্রায় ১০ ফুট গভীর। দড়ি বাঁধিয়া নীচে নামিয়াই ময়লা পরিষ্কার করিতে হয়। কিন্তু এখানে নীচে নামা অসম্ভব। বড় রাস্তার মোড় পর্য্যন্ত আরও তিনটা ম্যানহোল খুলিয়া দেখা গেল, সেগুলিরও কানায় কানায় জল।

বড় রাস্তার ম্যানহোলের মুখে দড়ি বাঁধিয়া একটা আলো লইয়া দীপনা ড্রেণে নামিয়া গেল। উপর হইতে তাহাকে একটা বাখারী দেওয়া হইল।

ড্রেণের ভিতর হইতে কেমন একটা উৎকট গন্ধ আসিতেছিল, অন্য সময় হইলে ভয়ে দীপনা পিছাইয়া যাইত। কিন্তু আজ সে কাযের নেশায় মত্ত, তাই মনে করিল, উহা জমাট ময়লার গন্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সে একটু অগ্রসর হইল।

পাশের গ্যাসের পাইপ ছেঁদা হইয়া গিয়াছে, গ্যাসের ধাকায় ড্রেণের সংযোগস্থলে খানিকটা ফাটিয়া ভিতরে গ্যাস ঢুকিতেছে।

দীপনার নাকে আসিতেছিল বিষাক্ত বাষ্পের সঙ্গে মিশ্রিত গ্যাসের গন্ধ, আর উপর হইতে যদুনাথ চীৎকার করিতেছিল—"আচ্ছা কাম কর, দীপনা, আচ্ছাসে কাম কর।"

সেখানে যেন একটা দৈত্য ঘুমাইতেছিল, দীপনার অনধিকার প্রবেশে মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—তাহার হিংসাবৃত্তি জ্বলিয়া উঠিল। হতভাগ্য দীপনাকে গ্রাস করিতে সে ছুটিয়া আসিল। হারিকেনের চিম্নী ফাটিয়া দপ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

উপর হইতে সকলে শুনিল, একটা অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ ভিতরে চাহিয়া দেখিল, আগুনের ঘূর্ণী। হতভাগা দীপনা আর্ত্তনাদ করিয়া প্রাণবায়ুটুকু বাহির করিবারও সময় পাইল না। কে যেন তাহার গলা চাপিয়া দম আটকাইয়া দিল। দিনের ডবল কায করিয়া দীপনা লাভ করিল দরিদ্রের উপযুক্ত বিশ্রাম—জল, কাদা, ময়লা ও গ্যাসের রচিত শয্যা।

* * * *

ভিতরে আগুন দেখিয়া ধাঙ্গড়রা "আগ লাগ গিয়া—গ্যাস কাট গিয়া" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ডাক-হাঁক ও কলরবে চারিদিক গুলজার। ধীরেশ বাবু টেলিফোনে

এম্বুলেন্স, ফায়ার ব্রিগেড, গ্যাস কোম্পানী বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে রাস্তায় ভিড় জমিয়া গেল। বিপন্নের জন্ত সহানুভূতি-সূচক "আহা" "উহুরে" মধ্যেও মানুষ তাহার কৌতূহলপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা যেন দেখিতে চাহে, মানুষটি কতখানি পুড়িয়াছে। এ যেন মস্ত বড় একটা মজার জিনিষ !

* * * *

ফায়ার ব্রিগেড আসিয়া চলিয়া গিয়াছে, গ্যাস কোম্পানীর লোকরা তখনও পাইপ ঠিক করিতেছিল। এম্বুলেন্সের গাড়ী রাস্তায় দাঁড়াইয়া। পাঁচ ছয়টা লাল পাগড়ী সমবেত জনতাকে পিছু হঠাইয়া শান্তিরক্ষায় ব্যস্ত, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উত্তেজিত হইয়াছিল যদুনাথ। চীৎকার করিয়া লাঠি ঘুরাইয়া সে দেখাইতে চাহে যে, সেও কর্ত্তৃপক্ষের এক জন।

গ্যাসের পাইপ ঠিক হইলে রাত প্রায় ১টার সময় দুই জন ধাঙ্গড় ম্যানহোলের মধ্যে নামিয়া গেল। একটু পরে তাহারা ডাকিয়া বলিল—'দড়ি টান।' পাঁচ জন লোক অনেক কষ্টে দড়িটা টানিয়া তুলিল—তাহাতে বাঁধা ছিল দীপনার মৃতদেহ। শরীরের স্থানে স্থানে পুড়িয়া চামড়া উঠিয়া গিয়াছে, মাংস বাহির হইয়া পড়িয়াছে, মুখখানা বিকৃত, চোখ ঝলসান।

কৌতূহলীর দল ঝুঁকিয়া পড়িল। কনষ্টেবলরা 'হট যাও' 'পিছু যাও' বলিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন আরম্ভ করিল। ধীরেশ বাবুর বাড়ীর মহিলারা ছাদ হইতে রাস্তার দিকে চাহিয়াছিলেন। ধীরেশ বাবু একটা গরদের চাদর ফেলিয়া দিলেন মৃতদেহ ঢাকিবার জন্য।

এমন সময় "ভেইয়া রে ভেইয়া" বলিয়া চীৎকার করিয়া একটি ক্ষীণকায়া স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিল। সেই আর্ত্তনাদে সকলের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। রুক্ষ আলুলায়িত কেশ-রাশি তাহার পিঠে মুখে বুকে ছড়ানো। বসন বিস্রস্ত, চোখ দুইটি পাগলের মত।

লছমী "ভেইয়া রে ভেইয়া" বলিয়া দীপনার মৃতদেহের উপর পড়িয়া গেল। তাহার চোখের জলে চাদরখানি ভিজিয়া উঠিল।

* * * *

তার পরদিন খবরের কাগজে দীপনার মৃত্যুসংবাদ বাহির হইল। সঙ্গে ছিল ধীরেশ বাবুর প্রশংসার কথা, তাঁহার টেলিফোনের কথা, বক্শিশের কথা, গরদের কথা।

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন (বি, এ)।

ধীবর

ভোরের আলো গেছে দেখা রাত পোহাতে পহর দেরী,
ওই শোনা যায় দূর-বাতাসে প্রধান তাঁহার বাজায় ভেরী।
তাড়াতাড়ি সাজ ক'রে নে ছুটতে হবে নদীর তটে—
দেবতা আছেন আজ অনুকূল দেখি কেমন ভাগ্যে ঘটে।

পানসী ঘাটে আছেই বাঁধা, দুলছে ঢেউয়ের তালে তালে,—
হাত যেন তোর না কাঁপে, ভাই! ফেলবি সঠিক ক্ষেপের জালে।
বিফল হলে চলবে নাক, অন্ততঃ চাই অল্প কিছু—
সন্ধ্যা নাগাদ বাইবি তরী, তাকাসনি আর ঘরের পিছু।

রাজার ছেলের বিয়ের খবর পৌঁছেছে কা'ল গভীর রাতে,
আজ আমাদের আনন্দদিন জল ঝরে যে চোখের পাতে।
বিদেশ হতে লোক এসেছে রাজপ্রাসাদে অতিথ হয়ে
তাঁদের সেবার মাছ জোগাতে নায়েব মশাই গেছেন কয়ে।

নিজের পেটের চিন্তা ক'বে কাটছে ত কাল নিত্য মোদের—
অন্ন লাগি যুদ্ধ করি সঙ্গে সদাই বাদল-রোদের।
একটা দিনের তরে ও-সব দূর ক'রে দে মনের থেকে
দিগন্তে আজ লাগুক তরাস মোদের অট্টহাস্য দেখে।

টানাটানি না হয় হবে অসুবিধা একটা দিনে—
বাজার হতে আনতে হবে ধার ক'রে সব জিনিষ কিনে।
সময়মত দুধ পাবে না হয় ত কোলের ছেলে-মেয়ে
কেঁদে কেঁদে পড়বে শুয়ে নুণ দিয়ে ভাত চারটি খেয়ে।

তাই ব'লে ত রাজার ছেলের আসবে না বে' বছর বছর,
এমনি ক'রে বাজবে বাঁশী রাতদিনেতে পহর পহর ?
একটু না হয় কষ্ট হবে আনন্দ তার অনেক বেশী
দ্বিগুণ ক'রে দাম পাব আর এ মাসের ওই শেষা-শেষি।

শ্রীশিতিকণ্ঠ দা।

নামের মূল্য

১

অবকাশের ক্ষুদ্র বৃহৎ দিনগুলিতে মানবের পরিবর্ত্তনশীল মন স্বতঃই বৈচিত্র্য কামনা করিয়া থাকে। তাই ক্যালেণ্ডারের লাল দাগ দেওয়া ঘরগুলি দেখিয়া সকলেই অবসর-যাপনের আনন্দটুকু কোথায় গিয়া উপভোগ করিবে—পূর্ব্বাহ্ণ হইতে তাহারই একটা খসড়া মনে মনে ঠিক করিয়া লয়।

সহরবাসী সহর ছাড়িয়া পল্লীপ্রান্তে ছুটে, পল্লীবাসী ঘন জনারণ্যে বৈচিত্র্য খুঁজিতে আসে।

সামনে মহরমের ছুটী। বন্ধুরা ধরিয়া বসিল—চল, কোন দূরদেশে বেড়িয়ে আসা যাক। রেল কোম্পানী নাকি আজকাল সস্তায় যাওয়া-আসার টিকিট দিতেছে—ইচ্ছা করিলে অনায়াসে একবার দিল্লী পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসা চলে।

কিন্তু তিন দিন ছুটীতে অত দূরে পৌঁছিয়া ফিরিয়া আসা অসম্ভব, তাই নৃপেন বলিল, "চল না কেন—কাশীতে। খাসা প্লেজাণ্ট ট্রিপ।"

সুরেশ বলিল, "তার চেয়ে শিমুলতলা ঢের ভাল।

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, ও সব তীর্থদর্শন বা স্বাস্থ্য-সঞ্চয়ের ইচ্ছা তাহার আদৌ নাই—এবং মাত্র তিনটি দিনে তাহা সম্ভবও নহে—। বরং কাছাকাছি বর্দ্ধমান—

সুধাংশু দেখিল,—ভ্রমণের দূরবর্ত্তিতা যেরূপ দ্রুতবেগে নামিতেছে,—তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত হাওড়া প্ল্যাটফরমে আসিয়া না পৌঁছায়।

তাড়াতাড়ি সে কহিল,—"ছত্তোর ছাই—ও লাইনই ছেড়ে দাও—। তার চেয়ে চল না কেন টিটাগড়—আমার এক বন্ধু থাকে। কতবার সে লিখেছে—একবার সেখানে যেতে।"

সকলে সোৎসাহে কহিল, "সেই ভাল। অমনি ব্যারাকপুরটাও দেখে আসা যাবে।"

সেই দিনই সুধাংশু বন্ধুবরকে পত্র লিখিয়া জানাইল,—শনিবার সন্ধ্যার ট্রেণে তাহারা কয়েক জন বন্ধু মিলিয়া টিটাগড়ে তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিবে।

যাত্রা-দিনে কিন্তু ৪ জনের বেশী ষ্টেশনে দেখা গেল না। কেহ বলিয়া পাঠাইয়াছে, তাহার শরীর অসুস্থ; কেহ বা বাড়ীতে কোন জরুরী কর্ম্মের অজুহাত দেখাইয়াছে—কেহ বা কিছুই বলে নাই। প্রতিবারই এমন হয়। বেড়াইবার সখও ইহাদের প্রচুর—কল্পনা-জল্পনাও চলে দিনের পর দিন ধরিয়া, কিন্তু অবসর-মুহূর্ত্তে, কর্ম্ম—বা অসুখ বা অন্য কোন না কোন প্রতিবন্ধকও আসিয়া জুটে তেমনই অসম্ভাবিতরূপে।

কতটুকুই বা পথ? দুই চারটা ষ্টেশন পার হইয়াই টিটাগড়,—কলিকাতা হইতে মাত্র ১৩ মাইল। পল্লীর শ্যামলশ্রী কোথাও চোখে পড়ে না। সারি সারি খোলার চালা—ময়লা আবর্জ্জনাভরা অঙ্গন। পথে ঘাটে সেই সব পশ্চিমা অশিক্ষিত ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত কুলীর দল।

মাঝে মাঝে ঊর্দ্ধমুখ চিমনী হইতে ঘন ধূম্র উদ্গারিত হইয়া আকাশের নীলিমাটুকুকে পর্য্যন্ত অস্বচ্ছ করিয়া তুলিয়াছে। এই যন্ত্র-দানবের বুকে যাহারা শ্রম-শক্তি সর্ব্বস্ব দিয়া স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহারা জানে না যে, কি মহার্ঘ্য মূল্যই না ইহার জন্য প্রতি দণ্ডে—প্রতি পলে তাহারা গণিয়া দিতেছে। অথবা জানিলেও এক মুষ্টি অন্নের জন্য জীবনকে এমনই তিলে তিলে ক্ষয় করিতে দ্বিধাবোধ করে না। শুধু তাহাদের নিজের জীবনের নহে, আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে যে সংসারকে তাহারা ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিয়া বৃদ্ধির পথে লইয়া আসিয়াছে —তাহাদের ক্ষুধার কোলাহল থামাইবার জন্য—সেই সব প্রা[illegible] মুখে সময়মত দুইটি কদর্য্য অন্ন বা এক মুষ্টি চানা তুলিয়া দি[illegible] জন্য শ্রমের সঙ্গে প্রাণকেও ওই যন্ত্র-দানবের চরণতলে উ[illegible] করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু গঙ্গার কূলে আসিলে মনে হয়, সত্যকার পল্লী[illegible] স্নিগ্ধ শ্যামলতায় বুঝি ফিরিয়া আসিলাম। সারি সারি [illegible] শ্রী-সম্বন্ধে অনুপম। কেয়ারী করা বাগান, সুবিন্যস্ত [illegible] বিতান, কৃত্রিম উৎস, শ্যামল শষ্প দেখিয়া মনে হয়, কত[illegible]

সুখী উহার অধিবাসীরা। জীবনকে উহারাই প্রকৃত ভোগ করিতে জানে।

কিন্তু সে ভোগের মূল্য যোগাইতে যাহারা সহরের অপর প্রান্তে ম্লান শুষ্ক মুখে ঘুরিয়া মরিতেছে—সে সময় ভ্রমেও কি তাহাদের কথা মনে হয়? সর্ব্বকালে—সর্ব্বদেশে এই ভোগের মূল্য যাহারা যোগাইয়া থাকে, ইতিহাস তাহাদের কোন পরিচয়ই লিখিয়া রাখে না। তাহারা যেন চারি পার্শ্বের ঘন দুর্ভেদ্য তিমিররাশি—ঐ উজ্জ্বল আলোকটির বিস্ফুরিত শিখা বুকে ধরিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। উহাকে প্রকাশ করাই যেন তাহাদের ধর্ম্ম।

ইহারা কুশ্রী কদর্য্য ও বিলাস-সৌন্দর্য্যের মাঝামাঝি একটা মেসে আসিয়া উঠিল। এখানে যাহারা বাস করে—তাহাদেরও অবস্থা মাঝামাঝি। গঙ্গার দিকে মুখ হইলেও বাড়ীটির গঠন-গুণে গঙ্গার শোভা সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয় না। আলো, হাওয়া অপ্রচুর নহে—এবং লন টেনিসের পরিসর শ্যামল ক্ষেত্র না থাকিলেও অযত্নবর্দ্ধিত তৃণরাশির শ্রী পল্লীর শ্যামাঞ্চলের এক টুকরা বলিয়াই মনে হয়। বন্ধুবর সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন।

ছুটীর বাজার বলিয়া মেসের জনসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছিল। যাহারা ছিল, তাহারা হয় ত অদূরে গঙ্গার তীরে কর্ম্মক্লান্ত দেহভার বিছাইয়া মুক্তির আনন্দ উপভোগ করিতেছিল।

সতীশের ছোট তক্তপোষের উপর বসিয়া—সুরেশ বলিল,—"বেশ—তার পর?—"

সতীশ হাসিয়া বলিল, "অতঃপর চায়ের আয়োজন করা যাক। বহু দূর হ'তে এসেছ, ক্লান্ত ত?"

নৃপেন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "হাঁ,—ক্লান্ত আবার নয়,—আজকাল ক্লান্তি অপনোদনের এমন চমৎকার দাওয়াই কোথায় বা নেই—আর কোন অরসিকই বা পান না করেন? অভাব ছিল দুধের;—তা টিন-ভর্ত্তি জমানো বিলিতী জিনিষের দৌলতে—ওটাও মিটে গেছে। এইবার ষ্টোভে অগ্নিসৎকার কর।"

অবিলম্বে ষ্টোভ গর্জ্জন করিয়া উঠিল ও কয়েক মিনিটের মধ্যে অতিথি-সৎকারের প্রথম পর্য্যায়টা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গেল।

গঙ্গার হাওয়া খাইয়া ক্লান্ত কেরাণীর দল মেসে ফিরিয়া আসিলেন—আর একচোট গান-বাজনার আসর বসিল।

২

প্রকৃত ঘটনার আরম্ভ কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে। পূর্ব্ব রাত্রির আমোদ-প্রমোদে মাত্রার আধিক্য হওয়ায় সকলে অনেক বেলায় শয্যা ত্যাগ করিল। সুধাংশুর সকাল সকাল স্নান করা অভ্যাস। বেলা ৯টায় চক্ষুরুন্মীলন করিয়াই সে তড়াক করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। কহিল, "ইস্—বড্ড বেলা হয়ে গেছে! স্নানটা এই বেলা সেরে নেওয়া যাক।"

সুরেশ বিছানায় পাশ মোড়া ভাঙ্গিয়া হাই তুলিতে তুলিতে জবাব দিল, "এত সকালে স্নান! আগে চা খেয়ে গায়ের আলিস্যিটা ভেঙ্গে নেই, বাবা।"

সুধাংশু সে কথায় কাণ না দিয়া সতীশকে বলিল, "একটু তেল দে দিকি,—আর কলতলাটা দেখিয়ে দে একবার।"

সতীশ ষ্টোভ লইয়া চায়ের আয়োজনে বসিয়াছিল; বলিল, "চা-টা খেয়ে যা।"

"না; এসেই খাব" বলিয়া সুধাংশু কক্ষের বাহির হইয়া গেল।

চা-পান করিয়া বারান্দায় আসিয়া সকলে দেখিল, কলতলায় সাবান, গন্ধ-তৈল প্রভৃতি লইয়া সুধাংশু রীতিমত স্নানের কসরৎ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে এবং বারান্দার অপর প্রান্ত হইতে এক জোড়া কৌতূহলী চক্ষু সে দিকে অনিমেষে চাহিয়া আছে। ইহাদের বারান্দায় আসিতে দেখিয়া লোকটি চক্ষুর ইঙ্গিতে সতীশকে ডাকিল। সতীশ নিকটে গেলে—সে ব্যক্তি বিস্ফারিত চক্ষু স্নানরত সুধাংশুর পানে ন্যস্ত করিয়া কৌতূহলপূর্ণ স্বরে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল,"—উনি?"

সতীশের মাথায় অকস্মাৎ একটা দুষ্ট বুদ্ধি খেলিয়া—লোকটির অজ্ঞতা দেখিয়া মনে মনে অদম্য কৌতুক জাগিয়া উঠিল।

যে চাপা গলায় কহিল—"সে কি, ওকে জানিস না? ভা-ল ক'রে চেয়ে দেখ দিকি।"

লোকটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে দিকে চাহিয়া অবশেষে হতাশাভরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "নাঃ, ঠিক মনে হচ্ছে না, অথচ কোথায় যেন দেখেছি দেখেছি ব'লে—"

সতীশ মৃদু হাসিয়া বলিল, "কলকাতার—"

সে সোল্লাসে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

সতীশ বলিল, "আচ্ছা, মনে কর দিকি—পিকচার থিয়েটারে—"

লোকটি সহসা লাফাইয়া উঠিয়া সতীশের পিঠে একটা চাপড় মারিয়া কহিল, "ঠিক—ঠিক ! এইবার মনে হয়েছে।" পরে অকস্মাৎ কণ্ঠস্বর নামাইয়া পূর্ব্ববৎ চাপা গলায় কহিল, "উনিই বুঝি অনিল বাবু—আজকালকার নামজাদা অ্যাক্টর ?"

সতীশ গম্ভীরভাবে শুধু বলিল, "হুঁ।"

লোকটির আনন্দ আর ধরিতেছিল না। এই রকম বিস্ময়কর আবিষ্কারের কথা বন্ধুমহলে না জানাইয়া কিছুতেই তাহার চিত্ত স্থির হইতেছিল না। ইহাতে শুধুই আনন্দ নহে, গর্ব্বও যে অনেকখানি রহিয়াছে। যাহার অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়া তাহারা মুগ্ধচিত্তে শতমুখে সুখ্যাতি করিতে করিতে কত রাত্রি মেসের নৈশ আসর সরগরম করিয়া তুলিয়াছে, এমন অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার দর্শনলাভ কি কম সৌভাগ্যের কথা ?

দ্রুতপদে সে বারান্দা হইতে অপসৃত হইতেই সতীশ বন্ধুবর্গকে ডাকিয়া বলিল, "ওহে, আজ একটু মজা হবে মন্দ নয়। ওই যে লোকটা চ'লে গেল, ও সুধাংশুকে মনে করেছে পিকচার থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেতা—অনিল বাবু। খুব হুঁসিয়ার, আসল কথা কেউ সহজে ভেঙ্গো না। সুধাংশু এলে—তাকেও ব'লো।"

কিন্তু সুধাংশুকে বলিবার অবসর আর হইল না। সে স্নান সারিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল,—সেখানে রীতিমত ভীড় জমিয়া গিয়াছে এবং নানা প্রকার তর্ক-বিতর্ক হইতেছে।

তাহাকে দেখিয়া সেই এক-ঘর অপরিচিত ভদ্রলোক—কেহ দাঁড়াইয়া,—কেহ বসিয়া,—যিনি যে অবস্থায় ছিলেন—একসঙ্গে অভিবাদন জানাইলেন এবং কক্ষের মৃদু গোলযোগ যেন কোন সম্রান্ত অতিথির আগমনে মুহূর্ত্তে নিঃশব্দ হইয়া গেল। ব্যতিব্যস্ত হইয়া সুধাংশু তাঁহাদের প্রত্যভিবাদন জানাইয়া কাপড় ছাড়িবার জন্য গৃহের চারিধারে ব্যাকুল দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র কক্ষে কোথাও তিলধারণের স্থান ছিল না। সতীশের ক্ষুদ্র তক্তপোষ, ভাঙ্গা চেয়ার, টেবল ও জানালা—সমস্তই ভদ্রলোকরা দখল করিয়া ক্ষান্ত হন নাই—ঘরের মেঝেতেও অনেকে দাঁড়াইয়া আছেন।

তাঁহারা বোধ হয় গামছা-পরিহিত সুধাংশুর বিপন্ন অবস্থা অনুভব করিয়া পুনরায় একসঙ্গে অভিবাদনানন্তর কক্ষের বাহির হইবার সময় জানাইয়া গেলেন,—জলযোগাদির পর—আর একবার আসিবেন, সেই সময় আলাপ-পরিচয়াদি হইবে।

নিশ্বাস ফেলিয়া সুধাংশু ক্ষিপ্রকরে আলনা হইতে একখানা লুঙ্গি টানিয়া লইল ও সেইখানা কোমরে জড়াইয়া মনে মনে বলিল, "মাথায় থাক আমার ছুটীর আমোদ। এমনি খাতির আলাপ জমালেই—এক দিনে হাড়মাস ভাজা ভাজা ! সাবাস ! এমন জান্‌লে কোন্ শালা ওখানে আসতো ?—এঁরা অতিমাত্রায় বিনয়ী এবং নবাগত ভদ্রলোকের উপর সে বিনয়টুকু দেখাতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন না দেখছি ! সতীশটা গেল কোথায় ?—"

সন্তর্পণে আর এক ব্যক্তি প্রবেশ করিতেছে দেখা গেল। সুধাংশু সহসা গম্ভীর হইয়া চশমাটি নাকের ডগায় তুলিয়া গুরু-গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিল, "কাকে চান ?"

সে ব্যক্তি থতমত খাইয়া হাত দুইখানি কপালে ঠেকাইয়া অভিবাদন জানাইল,—মুখে কিছুই বলিল না।—সুধাংশুও প্রতি-নমস্কার করিয়া সতীশের দৈনিক হিসাবের খাতাখানা তুলিয়া গভীর মনোযোগের সহিত কি দেখিতে লাগিল।—এইভাবে বহুক্ষণ কাটিবার পর সে ব্যক্তি ক্ষীণ কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আজ্ঞে, আমার নাম রাইচরণ। এখানকার সখের থিয়েটারে কমিক পার্ট করি।"

এ কথা জানাইবার কি উদ্দেশ্য—তাহা বিস্মিত সুধাংশু বুঝিতে পারিল না। সে গম্ভীরস্বরে শুধু 'হুঁ' বলিয়া খাতাটায় গভীর মনোনিবেশ করিল।

সাহস পাইয়া সে ব্যক্তি কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ উচ্চে তুলিয়া বলিল, "সকলের মুখে শুনলুম, আপনি এসেছেন, তাই একবার দেখতে এলুম।"

সুধাংশু জানাইল—তাহার পরম সৌভাগ্য।

এইবার লোকটির মুখে বাক্যস্রোত বহিয়া গেল,—"সে কি কথা ! আপনারা মশাই লোক—ক্ষণজন্মা পুরুষ।—এখানে যে দয়া ক'রে পদার্পণ করেছেন, এই না আমাদের মহৎ সৌভাগ্য, টিটাগড়ের সৌভাগ্য, মিলের সায়েবদের—"

অতিকষ্টে হাসি থামাইয়া সুধাংশু প্রশ্ন করিল, "মশায়ের কি করা হয় ?—"

সে ব্যক্তি কৃতকৃতার্থের হাসি হাসিয়া বলিল, "সেই জন্যই

ত আসা—মহতের আশ্রয়ে। চাকরী করি ঐ মিলে,—মাইনে মাত্র ২০টি টাকা! তাতে কি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার চলে স্যর?—আবার সায়েব ব্যাটা এমনি পাজী—যে, কামাই করলেই মাইনে কাটে। মাসকাবারে কেটে কুটে কতই বা আর পাই? দাঁড়ান—" বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে একখানা কাগজের চিরকুট হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এই দেখুন—গেল মাসে পেয়েছিলুম ১৫৵১০ তা ওটা পুরোপূরি চোদ্দ আনাই ক'রে দিয়েছিল। বাবুরা যাই দয়া করেন—হেঁ—হেঁ—" বলিয়া খুব একচোট আপন মনে হাসিয়া লইল। পরে একটু অগ্রসর হইয়া পরম বিনীত-ভাবে বলিল, "তাই বলছিলুম কি, দয়া ক'রে পাবলিক থিয়েটারে একটা ৫০।৬০ টাকা মাইনের চাকরী ক'রে দেন ত"—বলিয়া অর্দ্ধসমাপ্ত কথার মুখে আগ্রহভরে সুধাংশুর মুখপানে চাহিল।

সুধাংশু বুঝিল—বিপদ মন্দ নহে। এ ধারণা উহার কোথা হইতে হইল যে, আমি পাবলিক থিয়েটারে চাকুরী দিবার মালিক!

যাহা হউক, মুখে কোন কথা না ভাঙ্গিয়া শুধু বলিল, "আচ্ছা, কাল বলবো।"

সে ব্যক্তি উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "আছেন ত দুই এক দিন?"

"—হাঁ, পরশু বিকেলের ট্রেণে যাব।"

"আচ্ছা, তবে উঠি। খাওয়া-দাওয়া ক'রে আবার আসবো।" বলিয়া—নমস্কার করিয়া একটু দ্রুতপদেই বাহির হইয়া গেল।

সিঁড়িতে পুনরায় পদশব্দ হইল।

সুধাংশু বুঝিল, আবার এক দল অতিথি-সম্বর্দ্ধনার বিপুল বিনয় লইয়া জ্বালাইতে আসিতেছেন! সে খাতাখানা টেবলের উপর রাখিয়া সতীশের ময়লা বালিসটা টানিয়া লইয়া সেই সঙ্কীর্ণ তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিল এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যতক্ষণ না আহারের ডাক পড়ে, ততক্ষণ শত আহ্বানেও সে আর চক্ষু মেলিবে না।

৩

কক্ষমধ্যে তিন চার জন প্রবেশ করিলেন, সতীশও সেই সঙ্গে মৃদু স্বরে সন্তর্পণে এক ব্যক্তি বলিল, "ঘুমুচ্ছেন দেখছি।"

সতীশ চাপা গলায় কহিল, "হুঁ।"

একটি যুবক বলিল, "তাই ত!—আলাপটা ক'রে যাওয়া হ'লো না। আচ্ছা সতীশ-দা, আমরা না হয় খাওয়া-দাওয়া ক'রেই আসবো।

—"হাঁ, ভাল কথা—কাগজে দেখলুম, কাল রাতে উনি প্লেতে নামবেন, কিন্তু সন্ধ্যে-বেলায় কি ক'রে এলেন?"

সতীশ বিস্মিত হইয়া কহিল, "উনি ত কাল আসেন নি। উনি এসেছেন—আজ সকালে। দেখছেন না সারারাত প্লে ক'রে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই ঘুমুচ্ছেন।"

যুবক বলিল, "তবে যে কাল খুব গান-বাজনা হচ্ছিল, শুনলুম কলকেতা থেকে—"

হাসিয়া সতীশ বলিল, "ওঃ—সে ওঁর বন্ধুরা। তাঁরা কাল রাতে এসেছেন। নলিনী বাবুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছেন তাঁরা।"

এক জন প্রৌঢ় কহিলেন, "কিন্তু ভদ্রলোককে বড্ড রোগা রোগা দেখাচ্ছে।"

সতীশ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "রাত জাগার পরিশ্রম ত কম নয়, রোগা না হওয়াই আশ্চর্য্য।"

প্রৌঢ় বলিলেন, "কিন্তু ষ্টেজে যেন এর চেয়ে ঢের বেশী মোটা ব'লে মনে হয়।"

সতীশ বলিল, "তা আর হবে না বিনোদ-দা, তবে আর মেক্-আপটা কি হ'লো? ওই শশী বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন—যখন উনি কলতলায় চান করছিলেন, তখন কি রকম রোগা দেখাচ্ছিল। আবার ঐ লুঙ্গি প'রে শুয়ে আছেন—আর এক চেহারা। তার পর রাত্রিকালে আলোর মধ্যে ড্রেস, পেণ্ট, মেক্-আপ ক'রে যখন নামেন, তখন সাধ্য কি আমাদের চিনতে পারি।"

শশী বাবু—(কলতলায় যিনি সর্ব্বপ্রথম ইহাকে আবিষ্কার করেন ও মুহূর্ত্তে টিটাগড়ের সমস্ত প্রবাসী বাঙ্গালীদের দ্বারে দ্বারে গিয়া এই সুসংবাদটা প্রচার করিয়া দেন)-বলিলেন, "তা বৈ কি! বড় অ্যাক্টররা এক একটি যাদুকর। ওঁদের স্বরূপ চেহারা কেউ কি জানে?"

অতঃপর সকলে ওবেলা আসিবার প্রতিশ্রুতি মুখে অগ্রসর হইলেন।

সুধাংশু চক্ষু মুদিয়া মনে মনে সতীশের মুণ্ডপাত করিতে লাগিল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক সহসা ফিরিয়া সতীশকে বলিলেন, "শুনলুম, উনি নাকি রাইচরণের চাকরী ক'রে দেবেন বলেছেন। তা, আমার পঞ্চুর জন্তে একটা—। ছেলেটা না ক'রলে পড়া-শুনো—না শিখলে কোন কায-কর্ম্ম, কি যে হবে আখেরে—"

সতীশ আশ্বাস দিয়া বলিল—"সে জন্ম কোন চিন্তা নাই। যাহার যাহা অভাব-অভিযোগ জানালেই উঁহার হাতে যতটুকু ক্ষমতা আছে, ততটুকুই সদ্ব্যবহার করিবেন।"

প্রৌঢ় বলিলেন, "মহৎ হ'লেই এ সব সাধুপ্রবৃত্তি হয়—শুনে সুখী হলুম। হাঁ সতীশ,—ও'র মাইনে কত?"

সতীশ বলিল, "পাঁচশো। তা ছাড়া শেয়ার আছে।" তাঁহারা সকলেই নিদ্রিত অতিথির উপর আর একবার সসম্ভ্রম দৃষ্টিপাত করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

তাঁহাদের পদশব্দ নিঃশেষে মিলাইয়া গেলে সুধাংশু সবেগে শয্যা হইতে উঠিয়া সতীশের পানে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "কি এ সব?"

সতীশ হাসিয়া বলিল, "ও হরি—কপট নিদ্রা! দেখ দেখি, দু'দিনের জন্ম কেমন হঠাৎ বাদশাহী জুটিয়ে দিচ্ছি। কোথায় নাম-না-জানা সুধাংশু— আর কোথায়—"

তক্তপোষের উপর চাপড় মারিয়া সুধাংশু কহিল, "থাক তোমার হঠাৎ বাদশাহী নিয়ে, আমি চলুম। শেষে ভদ্র-লোকদের সামনে অপদস্থ না ক'রে ছাড়বে না। ঝকমারী ক'রেছিলুম—এখানে বেড়াতে এসেছিলুম।"

সতীশ তাহার হাত ধরিয়া অনেক বুঝাইল। অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া কহিল, "এ একটু মজা বৈ ত না, নিজেরা ঠিক থাকলে কার সাধ্য অপ্রস্তুত করে। তুই ত জানিস না, জ্যাক নামটাই চেনে,—আসল লোকটিকে ক'জনে জানে? আর জানলেও নামের ইন্দ্রজালে তাদের চোখে ধাঁধা লাগানো কিছু বিচিত্র নয়।"

সুধাংশু বলিল, "না, এ খেলার শেষ এইখানেই। আমি ওঁদের ডেকে এখনি সব খুলে বলব।"

সতীশ কহিল, "বলবে! তাতে নিজের মুখখানাই কাল ক'রে ফেলবে। আমার যা অবস্থা হবে, তাতে কিমার্ডিও তার থেকে [illegible] হবে না!" সুধাংশু কি বলিতে যাইতে-ছিল,—এমন সময় এক ব্যক্তি কক্ষমধ্যে ঢুকিয়া উভয়কে নমস্কার করিয়া জানাইল, গিন্নি-পিসী তাঁহাদের কয়েক জনকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। মেসের বন্দোবস্ত যেন এ বেলার মত মুলতুবী রাখেন।

সতীশ বলিল, "পিসীমাকে বল গে, আমরা ও বেলাই যাব। এ বেলা মেসের রান্না প্রায় হয়ে এলো, বুঝেছ?"

সে ব্যক্তি নমস্কারান্তে প্রস্থান করিল।

সুধাংশু বলিল, "গিন্নি-পিসী কে? মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ হয় না কি?"

সতীশ কহিল, "নেমন্তন্ন হবে না। এ হেন অসাধারণ—মহামান্ত অতিথির আগমন!"

এমন সময় কোলাহল করিতে করিতে অপর বন্ধুরা কয়েক জন লোকের সঙ্গে ফিরিয়া আসিল। অপরিচিতরা যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়া সুধাংশুকে প্রণতি জানাইল, সুধাংশু ভদ্রতা রক্ষা করিয়া মনে মনে বলিল, "হাতের দফা গয়া দেখছি। কলকাতায় ফিরে খানিকটা সরষের তেল আর কর্পূর দিয়ে মালিশ না করলে—টাটানি কমবে না। বাবা, এত বিনয় আর নমস্কারও এদের টকে জমা আছে!"

নৃপেন বলিল, "দেখুন অনিল বাবু, এঁরা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন। আমাদের সঙ্গেও খুব তর্ক হচ্ছিল এই নিয়ে।"

মনের ভাব মনে চাপিয়া—মুখখানাকে অসম্ভব গম্ভীর করিয়া ও কণ্ঠস্বর খাদে নামাইয়া সুধাংশু সংক্ষেপে বলিল, "বলুন।"

নৃপেন বলিল, "বলুন না রঞ্জন বাবু, আপনিই বলুন না।"

সে ব্যক্তি মৃদু বিনীতস্বরে বলিল, "সে দিন গেছলুম আপনাদের 'খুনের নেশা' প্লে দেখতে। চমৎকার বই—পার্ট হয়েছে সব সুন্দর। কিন্তু একটা যায়গায় আপনি যে ট্যাক্স দিলেন,—তা যেন সময় উপযোগী হ'লো না। অবশ্য আমার মত নয়, দর্শকরা তাই বললেন।"

গম্ভীরকণ্ঠে সুধাংশু বলিল, "কোন্‌খানটা?" মনে মনে ভাবিল, এইবার বুঝি সব বিদ্যা ফাঁক হইয়া যায়। সতীশের পানে একটা জোরা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ হানিয়া অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটা জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিল ও আর একটা মোটা বর্ম্মা ধরাইয়া মৃদু মৃদু টান দিতে দিতে গম্ভীরভাবে বক্তার মুখপানে চাহিল। রঞ্জন বাবু বলিলেন, "সেই জায়গাকে খুনের পর

অঞ্জলি

বসুমতী-চিত্রবিভাগ]　　　　[শিল্পী—শ্রীযতীশ

আত্মবিভীষিকা দেখার সিনটা। সেটা ও রকম না ক'রে,—কি অন্য রকম করা যেত না ?"

সুধাংশু চক্ষু মুদিয়া সহসা অসম্ভব গম্ভীর হইয়া গেল। বন্ধুরা মনে মনে প্রমাদ গণিল।

বক্তা একদৃষ্টে সুধাংশুর মুদিত নয়নের পানে চাহিয়া উত্তর-প্রত্যাশায় বসিয়া আছেন, সমবেত জনমণ্ডলী স্তব্ধ। সুধাংশু নির্ব্বাক্।

বর্ম্মা অর্দ্ধদগ্ধ হইল; সেটি জানালা দিয়া পথে ছুড়িয়া ফেলিয়া সুধাংশু পুনরায় একটি সিগারেট ধরাইল ও তাহাও প্রায় অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া চক্ষু মেলিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "আপনিই ভেবে দেখুন দিকি, ওখানে ও রকম না ক'রে কি অন্য রকম করা যায়? দেশকাল-পাত্রোপযোগী ওই অভিব্যক্তিই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। দানী বাবু পর্য্যন্ত ওর জন্য প্রশংসা ক'রে চিঠি লিখেছেন আমায়।"

রঞ্জন বাবু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "আমিও ত বলছিলুম যে,ওর থেকে অন্য টাইপ কিছুই হ'তে পারে না, কিন্তু—দর্শকরা,—যাক। আমাদের এখানে 'শাজাহান' ধরা হয়েছে। যে দুদিন আছেন—একটু দেখিয়ে শুনিয়ে যদি দেন।—"

সতীশ তাড়াতাড়ি কহিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনি সব লোককে খবর দিন, আজ রাত থেকেই—"

সুধাংশু বলিল, "আজ নয়, কাল থেকে হবে। ওহে সতীশ, চা এক কাপ—"

তিন চারি জন ব্যস্তভাবে উঠিয়া গেল এবং ৫ মিনিটের মধ্যে চা ইত্যাদি লইয়া ফিরিয়া আসিতেই সতীশ কহিল, "আরে—এ সব করেছ কি? এ যে এক বেলার খোরাক। যা হোক, সকলে মিলে এর সদ্ব্যবহার করা যাক।"

মুহূর্ত্তে থালা-ভরা গরম বেগুনি, কচুরি, সিঙ্গেড়া, অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম ও টোষ্টের সঙ্গে চায়ের পেয়ালাগুলি শূন্য হইয়া গেল।

কেবল সুধাংশু পেয়ালায় একটামাত্র চুমুক দিয়া সেটা ঠেলিয়া রাখিল—একখানা কচুরির আধখানা, বেগুনির সিকি ভাগ ও অর্দ্ধসিদ্ধ ডিমের কয়েকটি আস্বাদ করিয়া পকেট হইতে পুনরায় একটা বর্ম্মা বাহির করিয়া মৃদু-মন্দ টান দিতে লাগিল।

৪

রাত্রির আহারের আয়োজন-পর্ব্ব দেখিয়া সুধাংশুর চক্ষুস্থির হইয়া গেল। বৃহৎ থালায় গরম ফুলকো লুচি, পটোল ভাজা, মাছ ভাজা এবং থালার চারি পাশ ঘিরিয়া ছোট বড় বাবাটি ১৩।১৪টি বাটিতে নানা প্রকারের মৎস্য-মাংসের ব্যঞ্জন থরে থরে সজ্জিত রহিয়াছে। গুরু মধ্যাহ্ন-ভোজনের ফলে উদরের অবস্থা আশাপ্রদ নহে এবং এতগুলি সুপের রসনাতৃপ্তিকর ভোজ্যের আস্বাদ হয় ত ঘ্রাণেন্দ্রিয় ছাড়া অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের ভাগ্যে ঘটিবে না ভাবিয়া, দর্শনেন্দ্রিয় অলক্ষ্যে দুই এক ফোঁটা ক্ষোভের অশ্রুও মোচন করিল।

ভোজনকার্য্য ধীরে ধীরেই চলিতে লাগিল। অন্তরাল-বর্ত্তিনী গিন্নি-পিসী কিন্তু ডবকা ছেলেদের এই ক্ষুধা-মান্দ্যের ব্যাপারটা অচিরেই লক্ষ্য করিলেন এবং ঈষদ্দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "কিছুই যে খাচ্ছ না, বাবা। বৌমা এত ক'রে সকাল থেকে রাঁধলেন। ঐ যে চিংড়ী-মাছের কালিয়াটা ঐ ধারে প'ড়ে রইলো, না, না, ওটা মুড়ির ঘণ্ট। তা হোক, খেতে পারবে। ও মা! তুমি যে বাছা কিছুই মুখে তুলছো না—" বলিয়া সুধাংশুর দিকে সরিয়া বসিলেন।

সুধাংশু ঘাড় হেঁট করিয়া উত্তর দিল, "খাচ্ছি বৈ কি, পিসীমা। তবে ও বেলা খেতে অনেক দেরী হয়েছিল কি না, তাই।"

পিসীমা চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "ও আমার কপাল! তাই বল!—ও বেলা যে তোমরা এলে না, সকাল সকাল উয্যুগই করেছিলাম। কি যে কলকাতার কলের জল আর বালাম চাল খেয়ে খেয়ে নাড়ী সব মজে গেছে, কিছু খেতে পারে না।—হাঁ রে সতীশ, এইটি বুঝি আমাদের কলকাতার থিয়েটারের লোক?"

পিসীমার ভ্রাতুষ্পুত্র মণি বাবু অদূরে বসিয়া ছিলেন, তিনি পিসীমার কথার ধরণে মনে মনে বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "পিসীমা, তুমি ভেতরে গিয়ে বোস গে, আমরা সব দেখছি শুনছি।"

পিসীমা বলিলেন, "তবেই খেয়েছে বাছারা। কাছে ব'সে না খাওয়ালে কি পেট ভরে?"

তাঁহার বিশ্বাস, ক্ষুধা যত প্রচণ্ডই হউক না কেন, মেয়েদের অনুযোগ না করিলে কেহই পেট ভরিয়া খাইতে চাহে না, ইহা যেন এ কালের দস্তুর।

সতীশ বলিল, "হাঁ পিসীমা, ইনিই অনিল বাবু।"

সুধাংশু সতীশের পানে কোপদৃষ্টিতে চাহিল।

পিসীমা পুলকিত হইয়া কহিলেন, "তা বেঁচে থাক বাবা, রেতের প্রাতঃবাক্যে শ্রীজীবী হয়ে। আহা, এই ছেলে-মানুষ, কাঁচা বয়েস, কিন্তু কি থায়েটারই ক'ল্লে সে দিন! রামের কান্না দেখে—আমি ত কেঁদেই মরি!"

এমন সময় নেপথ্যে দ্বারের শিকল নড়িয়া উঠিল। পিসীমা দ্বারপ্রান্তে গিয়া কাহার সহিত ফিসফিস্ করিয়া কি কথা কহিলেন ও ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মেজ বোয়ের এক কথা। বলে কি, আমাদের এক দিন পাশ দিন না, থিয়েটার দেখে আসি। সেই 'সীতাহরণের' পালা। আমার বাপু ও সব কান্নাকাটি ভাল লাগে না। তার চেয়ে যে দিন 'রাম-রাজার' পালা গাইবে বাবা, সে দিন একখানা পাশ বরঞ্চ—"

ক্রুদ্ধ মণি বাবুর পানে চাহিয়া সতীশ বলিল, "তার ভাবনা কি পিসীমা, যে দিন ইচ্ছে হবে, আমায় জানিয়ো—থিয়েটার দেখিয়ে আনব। বৌদিদিদেরও নিয়ে যাব। কি বল, মণি —যাবে ত?"

ক্রুদ্ধ মুখে কষ্টকল্পিত হাসি ফুটাইয়া মণি শিরশ্চালনে সম্মতি জানাইল ও পিসীমাকে বলিল, "আর কি আছে, নিয়ে এসো না।"

পিসীমা যাইতে যাইতে বলিলেন, "আর কি-ই বা আনবো; কিছুই ত কেউ মুখে তুলছে না।"

সতীশ হাসিয়া বলিল,"পিসীমার বিশ্বাস, এ কালের ছেলেরা মোটে খেতে পারে না।"

পিসীমা রসগোল্লার থালা হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন ও প্রত্যেক পাতে পরিবেষণ করিতে করিতে বলিলেন, "এ দোকানের জিনিষ নয় বাবা—বোয়েরা ঘরে তৈরী করেছে। কেমন হয়েছে—খেয়ে বল?"

সকলে একবাক্যে বলিল,—"চমৎকার।"

তৎপরে অন্যান্য মিষ্টান্নও পরিবেষণ করা হইল। পিসীমা বলিতে লাগিলেন, "আজকালই গলিতে গলিতে দোকান হয়েছে; হঠাৎ কেউ এলো ত কিনে আনে খাবার। কিন্তু আমাদের কালে গোয়াল-ভর্ত্তি গরু, পুকুর-ভর্ত্তি মাছ, আর বাগান-ভর্ত্তি আনাজ-পাতি ছিল। রাত-বিরেতে যে কেউ আসুক না কেন, পাতে কি দিয়ে ভাত দেব—এ ভাবনা ভাবতে হোত না। আর ছাই মেয়ের বিয়ের হাঙ্গামাই কি ছিল? এখন যেন হয়েছে নীলেমের দর। যে যত পয়সা ঢালবে, তার তত ভাল সম্বন্ধ জুটবে। দেখ না বাবা, আমাদের ঘরেই রয়েছে ১৩।১৪ বছরের আইবুড়ো মেয়ে।—দেখতে শুনতে দুগ্‌গো-প্রতিমে, কিন্তু হ'লে হবে কি—ভাল সম্বন্ধ একটিও জোটাতে পারছি না। মণি ত কায করে ঐ কলে, মাইনে সামান্য ১শটি টাকা। তাতে কি—"

মণিমোহন তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিল, "কি সব বাজে বোকছো পিসী, কে কি নেবেন, একবার জিজ্ঞেস কর।"

পিসী ঈষৎ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "তুই থাম্।—যে যত খাইয়ে—তা আমি এক আঁচড়েই বুঝে নিয়েছি।"—পরে সহসা সুধাংশুকে বলিলেন, "তোমার সন্ধানে অনেক পাত্তর-টাত্তর আছে ত বাবা,—একটু চেষ্টা-চরিত্তির যদি কর ত গরীব ব্রাহ্মণের অনেক উপকার হয়।"

সুধাংশু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—সে চেষ্টা করিবে। পিসী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ঘেটের ক'টি ছেলে-মেয়ে বাবা?"

সতীশ হাসিয়া বলিল, "তা অনেক পিসীমা। আজ অবধি ও বিয়েই করে নি!"

পিসীমা বিস্ময়বিহ্বল-দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, "পাঁচ ছ'শো টাকা মাইনেওলা ছেলের আজও বিয়ে হয় নি? বলিস কি সতীশ! এমন রূপে গুণে পাত্র পাওয়া যে আজকালকার দিনে অনেক তপিস্তের ফল!"

সুধাংশু বুঝিল, বাক্যের স্রোত অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছে এবং বিপদ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। সে তাড়াতাড়ি আচমন সারিয়া সতীশকে বলিল, "তোর হ'লো! না, আজ আর উঠবি নে?" সতীশ ও অন্যান্য বন্ধুরা মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল, সে কথার উত্তর দিল না।

নেপথ্যে দুই একবার বস্ত্রের খস্‌খস্ শব্দ হইল, মৃদু আলাপের ফিসফিসানিও শুনা গেল এবং অলঙ্কারও টুন্‌টুন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল।

সুধাংশুর চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে আসনের উপর দাঁড়াইয়া কহিল, "মণি বাবু, চলুন।"

আচমন শেষ হইলে অন্য কক্ষ হইতে পিসীমার ডাক আসিল। সুধাংশু তাঁহার পায়ের উপর নত হইয়া প্রণাম করিতেই—তিনি সস্নেহে তাহার চিবুক ধরিয়া চুমা খাইয়া আর এক প্রস্থ আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিলেন এবং অনতিবিলম্বে পাণের ডিবা হাতে এক অবগুণ্ঠনহীনা কিশোরী উষার অপরূপ

মাধুরী লইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল। পিসীমা তাহাকে বলিলেন, "প্রণাম কর, রেণু।" সুধাংশুর পানে চাহিয়া বলিলেন, "এরই কথা বলছিলাম, বাবা। রূপে গুণে এমন মেয়ে আজকাল মেলে না। কিন্তু এমন পোড়াকপাল—ভাল পাত্তর —"

কিশোরীর আর প্রণাম করা হইল না,—ঝন্ ঝন্ শব্দে পানের ডিবা হাত হইতে খসিয়া পড়িল—লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া সে ছুটিয়া পলাইল।

সুধাংশুর মুখও পলকে রাঙ্গা হইয়া উঠিল ও অপসৃতা কিশোরীর গতিশীল মনোরম মূর্ত্তির পানে চাহিয়া একটি মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

তখন বাহিরে বন্ধুবর্গের উচ্চহাস্যরোল উঠিয়াছে ও অন্তঃপুরকক্ষে পুরবাসিনীদের লঘু চঞ্চল পদবিক্ষেপ শুনা যাইতেছে।

বাহিরে আসিয়া সে সতীশকে বলিল, "চলুন কলকাতায়, আর মেসে ফিরবো না। তোমরা মানুষ খুন করতে পার।"

সতীশ হাসিয়া বলিল, "মানুষ আমরা খুন করি বটে, আবার বাঁচাবার পন্থাও জানি।—যাচ্ছ, যাও। কিন্তু আবার আসতে হবে। পল্লীর যে অপরূপ শ্রীটুকু আজ হঠাৎই চোখে প'ড়ে গেছে,—তা ভোলবার মত দাওয়াই সহজে মিলবে না, বুঝেছ?"

বন্ধুরা হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ইহার পর পল্লীগ্রামের আকর্ষণটা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মতই তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল।

পিসীমারা সপরিবারে কলিকাতায় থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন। তবে পাশের পরিবর্ত্তে যে কয়খানি টিকিট কেনা হইয়াছিল, তাহার মূল্য সুধাংশুর পকেট হইতে বাহির হইয়াছিল এবং সুপাত্রের অভাবে এত দিন পিসীমার দুর্ভর চিন্তাগুলি জট পাকাইয়া যে ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া আসিতেছিল, তাহা সহসা রহস্যের লঘু বাতাসে এক নিমেষেই উড়িয়া গিয়াছিল।

তার পর ফাল্গুনের এক জ্যোৎস্নাপ্লাবিত যামিনী, তাহার ধার করা নামের উপর বিজয়-ভেরী বাজাইয়া—দুইটি হৃদয়ের পবিত্র বন্ধনের সাক্ষিস্বরূপ জীবনের খাতায় সুবর্ণ অক্ষরে চিরদিনের তরে মুদ্রিত হইয়া রহিল।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়।

তুলসী-মূলে

তুলসী-মূলে ঢাল বধূ, জল
　　তোমার প্রাণের অমৃত-নিষেক;
ওরই ধারে হয় যে ধরার 'পর
　　স্বগরাজের অমর অভিষেক।
মাটীর ঘটের শূন্য কর নীর
　　সিক্ত কর শুষ্ক বেদীর বুক;
লেপন কর বুলিয়ে পূত কর
　　দূর কর ওর পঙ্ক-কলুষটুক।

সোনা হ'ল মাটীর বেদী আজ—
　　তোমার ও কর পরশমণির তুল;
মন্দাকিনী মাটীর ঘটের জল
　　মর্ত্ত্য হ'ল স্বরগ ব'লে ভুল।
তুলসী-তলে নত করি শির
　　ছোট্ট প্রণাম রাখলে তলে ওর,
ছোট বুকের জানাও ভাষাটুক
　　আঁচল-গলে করি' কর-যোড়।

কল্যাণি, ও কোমল বুকের হার
　　কামনা হয় ফুটে প্রণিপাত;
আশিস্ নামে তব মাথার 'পর
　　স্বর্গ হ'তে নীরব দানের সাথ।
তুলসী-বেদী কর নরের বুক
　　প্রাণের কর অমৃত-সিঞ্চন,
বুলাও বুকে তোমার পূত কর
　　মুক্ত-কলুষ হবে অকিঞ্চন।

প্রাচীন কাহিনী

(১) কালীঘাট, মহারাজ নন্দকুমার ও গোবিন্দরাম মিত্র

ইংরাজ-গণ চন্দননগর অধিকার করিলে তাঁহাদিগের কলিকাতার "ব্ল্যাক জমীদার" (সহর-কোতোয়াল) কুমারটুলী-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দরাম মিত্র মহাশয় (১) হুগলীর তাৎকালিক ফৌজদার মহারাজ নন্দকুমারকে (২) রামধন ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বারা (৩) এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, "কালীঘাট কলিকাতার অন্তর্গত। সুতরাং এই স্থানটি ইংরাজদিগের দখলে থাকা উচিত।" ইহার পরেই গোবিন্দরাম ইংরাজদিগের স্বত্ববৃদ্ধি করিবার জন্ত ফৌজদার নন্দকুমারের অগোচরে কালীঘাট অধিকার করিয়া লন। এই বিষয় লইয়া গোবিন্দরামের সহিত নন্দকুমারের অনেক পত্র লেখালেখি হইয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দরাম সহজে কালীঘাট পরিত্যাগ না করায় অগত্যা নন্দকুমার সিরাজের নিকটে এই সংবাদ প্রেরণ করেন। সিরাজ এই সংবাদ অবগত হইয়া মিষ্ট কথায় গোবিন্দরামের অত্যাচারের কথা এডমির্‌য়াল ওয়াটসন্‌কে পত্র লিখিয়া জ্ঞাপন করেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারে গোবিন্দরাম এই সকল কার্য্য করিয়াছেন, পুনরায় যাহাতে তিনি এইরূপ কার্য্য না করেন, তাহার চেষ্টা করা হইবে এবং উপস্থিত কার্য্যের জন্ত তাঁহাকে ভৎর্সনা করা হইবে, ওয়াটসন্ এই মর্ম্মে সিরাজের পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন।—মহারাজ নন্দকুমার-চরিত, ১০০—১০১ পৃষ্ঠা।

(২) "ছিয়াত্তরে মন্বন্তরে"

মহারাজ নন্দকুমার ও শ্রীমতী চারু বেওয়া

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ভেরিলষ্ট সাহেব বিলাত গমন করিলে কাটিয়ার কাউন্সিলের সভাপতি ও গভর্ণর নিযুক্ত হন। ইহারই শাসনকালে বাঙ্গালা দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ১১৭৬ বঙ্গাব্দে এই নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, এই হেতু, এই দুর্ভিক্ষকেই লোক "ছিয়াত্তরে মন্বন্তর" বলে। অন্নাভাবে লক্ষ লক্ষ মনুষ্য মরিতে লাগিল। রাস্তা-ঘাট মৃতদেহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কোন স্থানে শীর্ণদেহা জননী অন্নক্লিষ্টা পুত্র-কন্তাকে লইয়া পথের ধারে পড়িয়া আছে, এবং শৃগাল, কুক্কুর ও শকুনিগণ ইহাদিগকে লইয়া টানাটানি করিতেছে। য়ুরোপীয়দিগের আশ্রয়ে গিয়া যদি অন্ন পায়, এই আশায় সহস্র সহস্র স্ত্রী-পুরুষ কলিকাতা, বরাহনগর, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিল। পতিত-পাবনী ভাগীরথী স্বীয় সন্তান-গণকে নিজ ক্রোড়ে স্থান দিতে লাগিলেন। দুর্ভিক্ষ-রাক্ষস নির্দ্দয়-ভাবে সমগ্র বাঙ্গালা-দেশ গ্রাস করিয়া ফেলিল। একে এই সর্ব্বনাশ, তাহার উপর আবার এক সর্ব্বনাশ দেখা দিল। দুর্ভিক্ষ হইবার পূর্ব্ব-লক্ষণ দেখিয়া মহম্মদ রেজা খাঁ দেশের প্রায় সমস্ত চাউল ক্রয় করিয়া অত্যধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। জমীদারগণও সুযোগ

---

(১) গোবিন্দরাম মিত্রের পূর্ব্ব-পুরুষগণ প্রথমতঃ গোবিন্দপুরে বাস করিতেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী-যুদ্ধের ঠিক পরেই যখন বর্ত্তমান "ফোর্ট উইলিয়ম" দুর্গ নির্ম্মিত হয়, তখন ইহারা গোবিন্দপুর ত্যাগ করিয়া কুমারটুলীতে আসিয়া বাস করেন। গোবিন্দরামের পুত্রের নাম রঘুনাথ মিত্র। এই রঘুনাথের নামে বাগবাজারে গঙ্গাতীরে একটি ঘাট ছিল। ইহার নাম "রঘু মিত্রের ঘাট।" আমরা বাল্যকালে এই ঘাটে স্নান করিয়াছি। গোবিন্দরাম ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনতায় কার্য্য করিয়া "ডেপুটী গভর্ণর," "ব্ল্যাক-জমীদার" বা "সহর-কোতোয়াল" নামে অভিহিত হইতেন। প্রথমতঃ তাঁহার মাসিক বেতন ৩০৲ টাকা ছিল ও পরিণামে তাহা ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তৎকালে তাঁহার এরূপ প্রবল প্রতাপ ছিল যে, হলওয়েল সাহেবও তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। তিনি কোম্পানীর যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে, ১৬ জুন, বুধবার, বেলা ১২টার সময় যখন মীরজাফরের সেনাপতিত্বে সিরাজ-সৈন্ত ইংরাজদিগের সহিত বাগবাজারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন গোবিন্দরাম সিরাজ-সৈন্তের গতিরোধের জন্ত বড় বড় গাছ কাটাইয়া চিৎপুর-রোডের উপর ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৭২০ হইতে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী করিয়াছিলেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।—লেখক

(২) মহারাজ নন্দকুমার ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে ভদ্রপুর-নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ভদ্রপুর, পূর্ব্বে মুরশিদাবাদ-জেলার অন্তর্গত ছিল, এক্ষণে ইহা বীরভূম-জেলার অন্তর্গত। তাঁহার পিতার নাম পদ্মনাভ রায় ও স্ত্রীর নাম ক্ষেমঙ্করী। ইনি নবাব-সরকারে বহুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে, ৫ই আগষ্ট, শনিবার (১১৮২ বঙ্গাব্দে, ২২শে শ্রাবণ) দিবসে কুলীবাজারে ইহার ফাঁসী হইয়াছিল। নন্দকুমারের পুত্রের নাম গুরুদাস। ইনি পরিশেষে "রাজা গুরুদাস" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। মিনার্ভা থিয়েটার হইতে রামবাগানে যাইতে হইলে যে রাস্তা দেখা যায়, তাহার নাম "রাজা গুরুদাসের ষ্ট্রীট।" এখন যেখানে বিডন্-পার্কস রহিয়াছে, সেইখানেই পূর্ব্বে মহারাজ নন্দকুমারের বৃহৎ অট্টালিকা ছিল।—লেখক

(৩) এখন যেখানে বাগবাজার ষ্ট্রীট ও নন্দলাল বসুর লেন মিলিত হইয়াছে, তাহার উত্তর-পূর্ব্ব-দিকে শ্রীচন্দ্রনাথ বসুর বাটী করিয়া পুলিসকে ভাড়া দিয়াছিলেন। এই পুলিস-বাটী রামধন ঘোষের ভিটার উপর অবস্থিত। রামধন ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রসিদ্ধ গোবিন্দরাম মিত্রের সহকারী ছিলেন। এই জ্যেষ্ঠ পুত্রের কন্তার সহিত প্রসিদ্ধ রামদুলাল সরকারের বিবাহ হওয়ায় সরকার মহাশয়ের দুই পুত্র ছাতু বাবু ও লাটু বাবু রামধন ঘোষের অর্দ্ধেক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন।—লেখক

পাইয়া বলপূর্ব্বক খাজনা আদায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১১৭৭ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত এই দুর্ভিক্ষ চলিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ মহামারী আসিয়াও দেখা দিল।

এই সময়ে মহারাজ নন্দকুমার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় জন্মভূমি ভদ্রপুর ও গুরুগৃহ মালিয়াড়ী গ্রামের গৃহস্থ ভদ্রলোকদিগকে প্রচুর-পরিমাণে চাউল বিতরণ করিয়াছিলেন। নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের জীবন-রক্ষার জন্য তিনি অনেকগুলি পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে যে কেহ আসিত, সে নিরাশ হইয়া ফিরিত না।

এই সময়ে স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। স্ত্রীলোকগণ অন্নাভাবে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভিক্ষা পাওয়াও সুকঠিন হইল। তখন নিরুপায় হইয়া স্ত্রী-পুরুষ-গণ "আত্মবিক্রয়" করিতে আরম্ভ করিল। "চারু বেওয়া"-নামক একটি স্ত্রীলোক এই সময়ে মহারাজ নন্দকুমারের নিকটে আপনাকে বিক্রয় করিয়া ফেলিল। এই "আত্ম-বিক্রয়ের" দলিলখানির অবিকল নকল নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"ইয়াদিকীর্দ্দ সকল মঙ্গলালয়।—

শ্রীলালা গুরুদাস রায় অওলাদে শ্রীযুক্ত মহারাজ নন্দকুমার রায় ইবনে পদ্মনাভ রায় সচ্চরিত্রেযু লিখিতং শ্রীচারু বেওয়া অওলাদে ভীতুগোপ ইবনে গঙ্গারাম গোপ বন্দা আটাবি পত্র-মিদং সন ১১৭৭ এগার শত সাতাত্তরি অব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চ আগে অকালে অন্নাভাবে মরি মহাশয়ের নিকট আত্মবিক্রয় হইলাম ভরণপোষণ করিয়া দাস্তে দাখিল করিবেন একরার বিকাইলাম, ইহাতে পলাইয়া যাই ধরিয়া আনিয়া শাস্তি করিবেন এতদর্থে বন্দা আটাবি পত্র দিলাম। ইতি সন ১৭৭ বতারিখ ৫ জমাদিলৌন মোতাবেক ১৪ ভাদ্র।

শ্রীচারু বেওয়া—সাং ঘরুতা।"
মহারাজ নন্দকুমার-চরিত,
২২৩—২৩২ পৃষ্ঠ।

(৩) টেনিসন্, ডারউইন্, লালবিহারী দে ও কানাইলাল মুখোপাধ্যায়

হুগলী-কলেজের সুবিখ্যাত ও সুপণ্ডিত অধ্যাপক রেভারেণ্ড লালবিহারী দে মহাশয় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে একখানি ইংরাজি মাসিক-পত্র বাহির করিয়াছিলেন। ইহার নাম "বেঙ্গল ম্যাগাজিন" (Bengal Magazine)। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে আমি যখন উত্তর-পাড়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমি এই কাগজখানির গ্রাহক হইয়াছিলাম। তখন "Folk Tales of Bengal" নামক একটি প্রবন্ধ দে-সাহেব মহাশয় ধারাবাহিক-রূপে এই কাগজে লিখিতেন। তাঁহার এই গল্পগুলি অত্যন্ত মধুর লাগিত। মধুর লাগিত বলিয়া আমি উক্ত মাসিক কাগজখানির গ্রাহক হইয়াছিলাম। হুগলী-ষ্টেসনের নিকটে জীবন পালের বাগানে তিনি একখানি সুন্দর বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতেন। হুগলীতে একটি আত্মীয় লোকের বাটীতে মধ্যে মধ্যে আমাকে যাইতে হইত। সেই সূত্রে আমি দে-সাহেবের সহিত দেখা করিতে যাইতাম। তিনি ক্রিশ্চান হইলেও হিন্দু ছাত্রদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আমি বিশেষ ভাগ্যবান্ যে, তাঁহার মত বিখ্যাত বিদ্বান্ লোকের আমি অত্যন্ত প্রীতিপাত্র হইয়াছিলাম। এক দিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। কিয়ৎক্ষণ কথা কহিবার পরে তিনি আমাকে বলিলেন, "Master De, do you wish to see my staircase ?" তুমি কি আমার সিঁড়ি দেখিতে চাও ? তাঁহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া আমি একটু অবাক্ হইয়া রহিলাম। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "Make a staircase." মেম-সাহেব তাঁহার অনেক-গুলি পুত্র ও কন্যাকে মাথার উচ্চতা-অনুসারে একটির পরে আর একটিকে দাঁড় করাইয়া দিলেন। দেখিতে ঠিক সিঁড়ির মত হইল। তখন দে-সাহেব আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "See my staircase, আমার সিঁড়ি দেখ।" আমি এই দৃশ্য দেখিয়া আনন্দিত হইয়া হাসিতে লাগিলাম।

কয়েক বৎসর চলিয়া গেল। ১০ বৎসর বাহির হইবার পরে বোধ হয় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এই কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়। যখন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রথম শ্রেণীতে পড়ি, তখন এক দিন হরীতকী-বাগান-নিবাসী ৺কানাইলাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ ; বি, এল্ মহাশয়ের সহিত কোন কার্য্যোপলক্ষে দেখা করিতে যাই। ইনি তৎকালে লালবাজার পুলিসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন। তিনি বহুদিন ধরিয়া দে-সাহেবের "বেঙ্গল ম্যাগাজিনে" "Hindu Family" নামক একটি ইংরাজী প্রবন্ধ ধারাবাহিক-রূপে লিখিতেন। এতদ্ভিন্ন "ডারউইন্ সাহেবের মতের" বিরুদ্ধে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখিয়া "বেঙ্গল ম্যাগাজিনে" বাহির করিয়া এই কাগজখানি তিনি বিলাতে ডারউইন-সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তৎকালে মহাত্মা মহারাণী ভিক্টোরিয়া Isle of Wight নামক স্থানে বাস করিতেন। কবিবর টেনিসন ও ডারউইন সাহেবও তাঁহার সহিত বেড়াইতে গিয়াছিলেন।

কথায় কথায় কানাইলাল বাবু, লালবিহারী দের কথা তুলিয়া বলিলেন, "তাঁহার মত ইংরাজী লেখক বাঙ্গালায় নাই।" তখন আমি বলিলাম, "আপনিও ত সুন্দর ইংরাজী লেখেন।" তখন তিনি বলিলেন, "লালবিহারী দে কে, আর আমি কে !" চাঙ্গা বিছানায় বসিয়া ও সম্মুখে একটি বাক্স রাখিয়া তিনি ইহার উপর লেখাপড়া করিতেন। বাক্সটি খুলিয়া হাসিতে হাসিতে একখানি পত্র বাহির করিয়া তিনি আমাকে ইহা পড়িতে দিলেন। দেখিলাম, ডারউইন এই পত্রখানি Isle of Wight হইতে কানাইলাল বাবুকে লিখিয়াছেন। যতদূর আমার মনে আছে, তাহাতে বলিতে পারি যে, পত্রখানির ভাবার্থ এইরূপ :—"মিষ্টার মুখার্জ্জি, আপনার পত্রখানি পাইলাম ; ইহার আদ্যন্ত মনো-যোগ সহকারে পাঠ করিয়া দেখিলাম, আপনার প্রবন্ধে আপনি অনেক সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। কথা এই, প্রবন্ধটি আপনার বুদ্ধিমত্তার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। তবে প্রাণ্ বলিতেছি যে, ইহা পাঠ করিয়াও আমার মত ও বিশ্বাস রূপ অটল রহিল। ইহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল

(It has not shaken my belief in the least degree) যে একখণ্ড 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' পাঠাইয়াছেন, তাহার আদ্যন্ত পড়িলাম। ইহার সম্পাদক মিষ্টার লালবিহারী দে অতি সুন্দর ইংরাজী লিখিতে পারেন। ম্যাগাজিনখানি বন্ধুবর টেনিসনকে দেখিতে দিলাম। তিনিও ইহা পড়িয়া মিষ্টার দে-র ইংরাজী ভাষার অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিলেন।"

এই ঘটনার ২।৩ বৎসর পরে একবার হুগলীতে দে-সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়া ডারউইন সাহেবের পত্রের কথা বলিলাম। তিনি শুনিয়া হাসিতে হাসিতে একখানি পত্র বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। পত্রখানি টেনিসন সাহেব, *ম্যাকমিল্যান কোম্পানীকে মন্তব্য সহ পাঠাইয়াছিলেন। ম্যাকমিল্যান ইহা হুগলীতে লালবিহারী দের নিকটে পাঠাইয়া* দিয়াছিলেন। পত্রখানির ভাবার্থ মোটামুটি আমার এইরূপ মনে আছে :—"ম্যাক্‌মিল্যান কোম্পানী আপনার Gobinda Samanta ও Folk-Tales of Bengal আমাকে opinion দিবার জন্ত পাঠাইয়াছেন। পুস্তক পড়িয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। ইহা পড়িয়া বাঙ্গালী কৃষক-গণের সামাজিক জীবন ও আচার-ব্যবহারের কথা অনেক জানিতে পারিলাম। আমাদের দেশে আজকাল যত বড় বড় উপন্যাস-লেখক আছেন, আপনি তাঁহাদের অনেকের অপেক্ষা সুন্দর প্রাঞ্জল ইংরাজী লিখিতে পারেন (You write English far better than not a few great novelists of the day in our country)," লালবিহারী দে কিরূপ সুন্দর ইংরাজী লিখিতে পারিতেন, তাহা পাঠকগণ একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।—লেখক

(৪) বারাসতে "ক্যাডেট্ কলেজ"

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বারাসতে একটি "ক্যাডেট কলেজ" বা "সমর-শিক্ষা বিদ্যালয়" ছিল। হিন্দু-কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডি, এল রিচার্ডসনের পিতা লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল ডি, টি রিচার্ডসন, এই কলেজে বিলাত হইতে সমাগত তরুণবয়স্ক য়ুরোপীয়-সন্তানদিগকে সমর-শিক্ষা দিতেন। বিলাতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর-গণই এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ১৬ হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের ছাত্রগণকে বিলাত হইতে কলিকাতায় আসিয়া বারাসতে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত। তাঁহারা বাঙ্গালা অথবা হিন্দুস্থানী ভাষা এবং সমর-কৌশল শিক্ষা করিতেন। তাঁহাদের সংখ্যাও বড় অল্প ছিল না। দুই হইতে তিন শত পর্য্যন্ত ছাত্র এই স্থানে শিক্ষালাভ করিতেন। গভর্ণর জেনারল মার্কুইস অফ ওয়েলেসলি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ৫ই মার্চ্চ তারিখে বারাসতে "ক্যাডেট কলেজের" ছাত্রগণকে পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। রিচার্ডসন, ছাত্রগণের অগ্রণী হইয়া ও এডজুট্যাণ্ট লেফটেন্যাণ্ট ব্রাউন্যামকে সঙ্গে লইয়া সেনা-নিবাসের অনতিদূরে গভর্ণর জেনারলের সংবর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। এরসাইন অলিভার সাহেব ছাত্রগণকে সুসজ্জিত রাখিয়া গভর্ণর জেনারলকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। রিচার্ডসন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ছাত্রগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন, অধিকাংশ ছাত্র হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা করিতেন। সদর দেওয়ানী আদালতের সুপ্রসিদ্ধ বিচারপতি, বহুভাষাবিৎ কোলব্রুক ও হ্যারিংটন এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দুস্থানী ভাষার অধ্যাপক গিলক্রাইষ্ট ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্ত লাট সাহেবের সহিত আসিয়াছিলেন। লাট সাহেব এবং বার্লো প্রভৃতি তদীয় পারিষদ-গণ পরীক্ষা-গৃহে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোপ, রবার্টস্, মিভার প্রভৃতি প্রত্যেক ছাত্রের পরীক্ষার ফল অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যাকালে কয়েকটি ছাত্রের সমর-কৌশল পরীক্ষা করা হইল। তাঁহাদিগের অদ্ভুত রণ-কৌশল দেখিয়া লাট সাহেব, তাঁহাদিগের গুরু ডি, টি, *রিচার্ডসনের সহস্র-মুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি কয়েকটি উপযুক্ত ছাত্রের প্রত্যেককে একখানি করিয়া* যুদ্ধের তরবারি ও ৫ শত টাকা পুরস্কার প্রদান করিলেন।

প্রথম দুই চারি বৎসর উক্ত কলেজের অবস্থা মন্দ হয় নাই। কিন্তু ক্রমশঃ ইহা নানাবিধ রঙ্গভঙ্গের লীলাভূমি হইতে লাগিল। সমর-শিক্ষার্থি-গণ ভিন্ন ভিন্ন জাহাজে আরোহণ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন। আসিবামাত্র তাঁহাদিগকে বারাসতে পাঠান হইত। কেহ কেহ কলিকাতায় নানাবিধ প্রলোভন ত্যাগ করিতে না পারিয়া এইখানেই কিছু দিন পড়িয়া থাকিতেন। তৎকালে কলিকাতায় "ক্যাডিট ফ্লোরেড" নামে একটি শুঁড়িখানা ছিল। তাঁহারা এই স্থানে থাকিয়া আমোদ-আহ্লাদের চূড়ান্ত করিতেন। বারাসতে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাদিগকে কলেজে ভর্ত্তি করা হইল। কলেজের হেড মাষ্টার ও অন্যান্য মিলিটারী শিক্ষকগণ তাঁহাদিগকে যত্ন করিয়া শিক্ষাদান করিলেও তাঁহারা সমর-বিদ্যা-শিক্ষায় কিছুমাত্র মনোযোগ করিতেন না। তাঁহারা তরুণবয়স্ক ও কোমলমতি। ১৬ হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের বয়ঃক্রম ছিল। তাঁহাদের বিবিধ বিলাস-লীলা অপ্রতিহত-প্রভাবে চলিতে লাগিল। বিলাসিতার অনুরোধে তাঁহারা নিতান্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। প্রচুর-পরিমাণে মদ্যপান, অশ্রাব্য অশ্লীল বাক্যপ্রয়োগ ও অতি কুৎসিত আমোদ-প্রমোদ লইয়াই তাঁহারা দিবানিশি আসক্ত থাকিতেন। একটা শৃগালকে খুঁটিতে বাঁধিয়া তাঁহারা তিন চারিটা কুকুর ছাড়িয়া দিতেন। কুকুরগুলা তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিত। ইহা দেখিয়া গুণধর-গণ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। কোন অফিস হইতে কোন বিল-সরকার প্রাপ্য টাকার তাগাদা করিতে আসিলে তাহার দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন বুঝিলেন যে, এই সকল তরুণ-বয়স্ক ছাত্র স্বদেশের কলঙ্ক-জনক, তখন তাঁহারা বিরক্ত হইয়া ১৮১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে এই "ক্যাডেট কলেজ" তুলিয়া দিলেন।—W. H. Carey's "The Good Old Days of Honourable John Company, vol I United Service Magazine and Despatch to the Court of Directors 1808.

(৫) আহিরীটোলায় শঙ্কর হালদার

কলিকাতার অন্তর্গত আহিরীটোলায় "শঙ্কর হালদারের লেন" নামক একটি রাস্তা অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই শঙ্কর হালদারের সম্পূর্ণ নাম "রামশঙ্কর হালদার।" ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে

১৬ জুন, বুধবার যখন সিরাজ-উদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করেন, এবং জেফানিয়া হলওয়েল অন্ধকূপ-হত্যার রাত্রিতে যখন কলিকাতার গভর্ণর হইয়াছিলেন, তখন শঙ্কর হালদার মহাশয় তাঁহার দেওয়ান ছিলেন। তিনি তিনটি পুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। প্রথমের নাম কালীচরণ হালদার ও দ্বিতীয়ের নাম ভবানীচরণ হালদার। তৃতীয়ের নাম জানা যায় না।

তখন শঙ্কর হালদারের মত বলবান্ পুরুষ কলিকাতায় আর কেহই ছিলেন না। ভীমের মত তিনি আহার করিতে পারিতেন। তিনি এরূপ হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিলেন যে, তাল ঠুকিয়া তিনি স্থূলাকার স্তম্ভ অনায়াসে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিতেন। তিনি কখনও লাঠী লইয়া পথে যাইতেন না। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, "মহাশয়! শুধু হাতে পথে বাহির হইয়াছেন। যদি কেহ আপনাকে আক্রমণ করে, তবে কিরূপে আপনি আত্মরক্ষা করিবেন?" তদুত্তরে তিনি বলিতেন, "পথে অনেক গরুর গাড়ী যাতায়াত করে। তাহা হইতে এক গাছা বাঁশ বাহির করিয়া লাঠীর কাজ করিব। তাহা না পাইলে দাঙ্গাকারীদিগের এক জনকে ঘুরাইয়া লাঠীর কাজ সারিব।"—আনন্দকৃষ্ণ বসু; নব্যভারত, ১৩০৯

(৬) শ্রীরামপুরে দিনেমার-জজের বিচার-পদ্ধতি

দিনেমার-গণ (Danes) বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত ডেন্‌মার্ক হইতে ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা-দেশে আগমন করিয়াছিলেন। তিনখানি গ্রাম লইয়া বর্ত্তমান শ্রীরামপুর গঠিত হইয়াছিল। ইহাদের নাম,—শ্রীপুর, গোপীনাথপুর ও মোহনপুর। এই তিনখানি গ্রাম মিলিত করিয়া ডেনিস-কোম্পানী এই স্থানের রাশিনাম ফ্রেডরিক-নগর ও ডাকনাম শ্রীরামপুর রাখিয়াছিলেন। তৎকালে সাধারণ বাঙ্গালীরা ইহাকে দিনেমার-ডাঙ্গা বলিয়া ডাকিত। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে দিনেমারেরা উক্ত শ্রীপুর নামক স্থানে ৬০ বিঘা জমী ক্রয় করিয়া সেই স্থানে বাণিজ্য করিবার জন্য একটি কুঠী নির্ম্মাণ করেন। তখন উক্ত তিনখানি গ্রাম সুপ্রসিদ্ধ দশ আনি ও ছয় আনি জমীদার মহাশয়-গণের অধিকার-ভুক্ত ছিল। পরে দিনেমার কোম্পানী বার্ষিক ১ হাজার ৬ শত টাকা কর ধার্য্য করিয়া উক্ত জমীদার মহাশয়দিগের নিকট হইতে শ্রীপুর, গোপীনাথপুর, মোহনপুর, আকনা ও পেয়ারাপুর নামক এই কয়েকখানি গ্রাম বন্দোবস্ত করিয়া লন, এবং আরও একটি বৃহৎ কুঠী নির্ম্মাণ করেন। এক্ষণে এই কুঠী সুবিখ্যাত গোস্বামী মহাশয়দিগের অধিকার-ভুক্ত।

দিনেমারদিগের রাজত্বের প্রথমাবস্থায় তাহাদের বিচার-পদ্ধতি অতি অপরূপ ছিল। তখন কোর্ট-ফীর প্রয়োজন হইত না। বাদী ও প্রতিবাদীর আরজী বা জবানবন্দী লওয়া হইত না। বিচার-পতিকে মুখে গিয়া বলিলেই তিনি বিচার-নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে:—কোন সময়ে প্রসিদ্ধ গোস্বামী মহাশয়দিগের সহিত একটি লোকের বিবাদ হইয়াছিল। সেই লোকটি বিচারকের নিকটে গিয়া নালিশ করিলেন। নালিশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিলক্ষণ উপহার-সামগ্রীও দিলেন। তৎকালে তাঁহার গাত্রে একখানি লাল-রঙের শাল ছিল। জজ-সাহেব উপহার পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "মিস্তে, তুমি ঘরে জেতে কর।" গোস্বামী মহাশ[য়] এই সন্ধান পাইয়া জজ-সাহেবকে অধিকতর উপহার-সামগ্রী দেওয়ায় তিনি কহিলেন, "বাবা, তোর ডর নাই। তোর ডিক্রী তোর নাকে ঝুঝিতেছে।" পরদিন বাদী গঙ্গাজলী সাদা শাল এবং প্রতিবাদী লাল শাল গায়ে দিয়া জজ-সাহেবের নিকট গিয়া হাজির হইল। জজ-সাহেব দেখিলেন, বাদীর গায়ে শাদা শাল ও প্রতিবাদীর গায়ে লাল শাল; বিশেষতঃ প্রতিবাদী তাঁহাকে অধিকতর উপহার-সামগ্রী দিয়াছেন। ইহা চিন্তা করিয়া তিনি মাটীর দিকে চাহিয়া রায় দিলেন যে, "রাঙ্গা শাল ডিক্রী।" তখন বাদী হাকিম সাহেবের নিকটে গিয়া দুঃখ জানাইয়া কহিলেন, "হুজুর কি হইল?" তাহাতে হাকিম সাহেব কহিলেন, "বাবা, আমি কি করিতে পারি। তুমি পূর্ব্বদিন লাল শাল গায়ে দিয়া আসিয়াছিলে, তাহাতে তোমাকে বাদী মনে করিয়া 'লাল শাল ডিক্রী' দিয়াছি। এখন হাকিম নড়ে ত হুকুম নড়ে না। আমি কি করিব, তুমি নিজের দোষে লজ্জা পাইলা।"—"বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে" (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত) ৮৮ পৃষ্ঠ।

(৭) সাহেবী থিয়েটারে 'বিদ্যাসুন্দর'-অভিনয়

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার অন্তর্গত চীনাবাজারের নিকটে "ডোমটুলী" নামক একটি স্থান ছিল। এখানে সাহেবরা একটি থিয়েটার খুলিয়াছিলেন। ইহার নাম "ডোমটুলী থিয়েটার" (Doomtulla Theatre)। কলিকাতার প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায়, সাহেবরা কবিবর ভারতচন্দ্র রায়-কৃত "বিদ্যাসুন্দর" ইংরাজীতে নাটকাকারে পরিণত করিয়া ইহার অভিনয় করিয়াছিলেন। সাহেবরা এই অভিনয় সম্বন্ধে এইরূপ বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন:—"By permission of the Honourable the Governor General (Sir John Shore) Mr. Lebedeff's New Theatre in the Doomtulla (ডোমটুলী চীনেবাজার) decorated in the Bengali style will be opened very shortly with a play called "The Disguise" * * * The words of the much admired poet Shree Bharat Chandra Ray sre set to Music." অর্থাৎ "গভর্ণর-জেনারল বাহাদুরের আদেশানুসারে মিষ্টার লেবেডেফএর ডোমটুলীস্থ নূতন নাট্যশালায় "ছদ্মবেশী" এই নামে একখানি নূতন ইংরাজী নাটক অতি শীঘ্রই অভিনীত হইবে। * * * সমাদৃত কবি ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতা সুরে বাধা হইয়াছে।" যখন "ছদ্মবেশী" এই নাম দেওয়া হইয়াছে, তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, ইহা বিদ্যাসুন্দর। ইহা সম্ভবতঃ Ballad হিসাবে গীত হইয়াছিল। ইহা ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের কথা। (১)—Calcutta Gazette; Cotton's Calcutta Old and New.

[ক্রমশঃ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, (কবিভূষণ, কাব্যরত্ন, উদ্ভটসাগর, বি, এ)।

(১) এখন যেখানে Ezra Street আছে, পূর্ব্বে সেইখানেই "ডোমটুলী" ছিল।

অতীন্দ্রিয় লোক

"মানুষের মধ্যেও তেমনি একটি পরম শক্তি গোপন রয়েচে। কত বড় যে সেই শক্তি—তা দেখাই যাচ্ছে না। তার প্রভাত, তার রাত্রির আবরণে ঢাকা আছে।"—"বীজধর্ম্ম"—রবীন্দ্রনাথ।

জীবনের মধ্যে এমন এক একটা ক্ষণ আসিয়া পড়ে—যখন এ জগৎ আমাদের চিত্ত পূর্ণ করিতে পারে না। দৃশ্যজগৎ তখন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। আমাদের ভিতরের সত্তা তখন আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে থাকে। যত দিন তাহাকে ভুলিয়া থাকি, তত দিন "বাহিরের"ই জয়। দৃশ্যজগৎ কত ভাবে আমাদের চিত্ত চঞ্চল করে, আমরা লক্ষ্যহারা হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত হই। মন বলিতে থাকে, পিপিসা মিটিল কৈ? ঘোরার ত অন্ত নাই! আমরা প্রতিনিয়ত আসক্তিবশে ঘুরিতেছি। আমাদের সত্য অভাব যে কি, তাহা আমরা জানি না। অনাদি কাল আমাদের যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। জীবনের বিচিত্র অভিনয়ের মধ্যে আমরা জ্ঞানে অজ্ঞানে আত্মাকেই খুঁজিয়া আসিতেছি, তাহাই আমাদের প্রকৃত অভাব।

আত্মার জগৎ, এ জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। আমাদের সে জগতে প্রবেশলাভ হয় নাই, তাই আমরা আপনাকে ধরিতে পারিতেছি না। তাই আমাদের এত দীনতা, হীনতা, এত পঙ্গুতা। অতীত ও বর্ত্তমানে কত মহাপুরুষ আত্মবিস্মৃত বদ্ধ জীবগুলীকে প্রেমের সহিত আহ্বান করিয়া উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন, তুমি তোমাকে প্রকাশ কর। অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া বদ্ধাবস্থাই স্বভাবগত হইয়াছে, তাই আলোর জন্য প্রাণ আকুল হইতেছে না। "অহম্"-অন্ধকারে তোমার বৃত্তিসকল সুষুপ্ত রহিয়াছে। তুমি তোমার সম্মুখে সমস্তই সীমাবদ্ধ দেখিতেছ। যতক্ষণ এই ভাবে মগ্ন থাকিবে, ততক্ষণ অন্ধকারেরই জয়। আলোর জন্য আকুল হও, অন্ধকার অপসৃত হইবে, তুমিও প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। এই প্রকাশানন্দই তোমাকে যে জগৎ দেখাইবে, তাহাই আত্মার জগৎ।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"মানুষ আপনার ক্ষুদ্র জীবনের শক্তিকে অতিক্রম করবে, আপনারই বড় জীবনের শক্তিলাভ করবার জন্যে।" মহত্তর জীবন লাভ করিবার পথে প্রবৃত্তির সহিত মহা সংগ্রাম। বহু যুগের কর্ম্মসংস্কার আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কর্ম্মগুণে পশুভাব যাঁহাদের যে পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে, প্রবৃত্তির সংগ্রাম কাটাইয়া উঠা তাঁহাদের পক্ষে সেই পরিমাণে সহজ। মন প্রতিনিয়ত নানা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দৃশ্যজগৎ হইতে তৃপ্তিকর বস্তু আহরণ করিতেছে। ভোগলালসা ত্যাগ করা সহজ নহে। কিন্তু পশু-জীবন ত মানব-জীবন নহে। পশুভাবের উপরে যে দেবভাব রহিয়াছে, যাহা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে ও ক্রমশঃ চিত্তকে স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত করিয়া তুলে, সেই দেবত্বই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। পশুত্ব দেহজগতেই কেন্দ্রীভূত। দেহধর্ম্মসাধনই তাহার লক্ষ্য, দেহ-ক্ষুধা-পূরণেই তাহার ব্রত পরিসমাপ্ত। যত দিন আমরা তাহাতে আবদ্ধ থাকি, তত দিন দেহের সুখ-দুঃখ আমাদের মন বিচলিত করে, তাহাকে কত ছোট করিয়া রাখে; আর দেবত্ব মনকে আত্মার জগতে লইয়া যাইতে চাহে।

দেহ-জগতে চিরসুখের নিদানভূত কিছুই নাই। যত দিন দেহাত্মবোধ লইয়া দৃশ্য জগতে সুখের সন্ধানে ফিরিব, তত দিন আপনার পরিচয় পাইব না, তত দিন আপাত সুখের বস্তু আমাদের চিত্ত মোহযুক্ত ও চঞ্চল করিবে। যত দিন চিত্তচাঞ্চল্য, তত দিন দুঃখভোগ, আপনা হইতে দূরে থাকা।

তপোবনের যুগে মানুষের লক্ষ্য ছিল এই আত্মা। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা চিত্ত স্থির হইলে সংসারধর্ম্মপালন বিহিত ছিল। তৎ-সাধনানন্তর মহত্তর জীবনের ব্রতগ্রহণ। সংসার তাঁহাদের চিত্ত অধিকার করিতে পারিত না। বিষয় ভোগ করিতে করিতে আমরা তাহার মোহেই আত্মহারা হইয়া যাই। উহা একান্ত করিয়া দেখার ফলে তাহার পারে যাইবার ক্ষমতা হারাই। বিষয়ের অতীত বস্তু অনেকে আবার ধারণা করিতেও পারেন না। আমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তির বীজ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অনুকূল অবস্থার মাঝে আসিয়া যাহাতে আমাদের সেই সত্তা বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে, তদ্বিষয়ে দেবভাবই আমাদের সহায়তা করে। মনের মালিন্যে সেই "বীজ" আবৃত রহিয়াছে। এই জন্য চিত্তশুদ্ধি আবশ্যক। ষড়রিপুর অস্তিত্ব মনে,—মনকে রিপুগত হইতে না দিয়া আত্মগত করিতে পারিলেই মন বিশুদ্ধ হইয়া যায়। শুদ্ধ বুদ্ধ পরমরমণীয় আত্ম-বিষয়ে যতই মুক্ত হওয়া যায়, ততই মনের উপর প্রেমের 'রং' ধরে। প্রেমের স্বাদ একবার পাইলে আর কিছুই ভাল লাগে না। সেই রসে সমস্ত চিত্ত সিক্ত হইয়া উঠিলে—সাধকের সিদ্ধিলাভ সম্যক্ ঘটিয়া থাকে। তিনি তখন জগতের সহিত তাঁহার একটা সম্বন্ধ আবিষ্কার করেন। বিধাতার সৃষ্ট সমস্ত বস্তুই তাঁহার আত্মীয়, সকলের সহিতই তাঁহার প্রাণের অকৃত্রিম যোগ আছে। সকলের সুখ-দুঃখ তাহার সহিত জড়িত। সকলের শেষ লক্ষ্য এক। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মহাশিল্পীর বিভিন্ন চিত্র

বৈচিত্র্যে একত্বের যে সূত্র সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিয়া তিনি তন্ময় হইয়া পড়েন।

মনকে আত্মগত করিবার যতরূপ উপায় আছে, যোগশাস্ত্র তাহার আলোচনা করিয়াছেন। যোগশাস্ত্র বলেন, মন স্থির কর। মন একাগ্র হইলেই সব লাভ হইবে। মনকে সংযত করিবার জন্যই নানাবিধ সাধন আছে। গুরু বিনা তাহা আয়ত্ত হয় না। কিন্তু ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা মনঃসংযম ও বীর্য্যধারণ সম্ভবপর হইতে পারে। যিনি যে পরিমাণে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে বীর্য্যধারণ করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহার চিত্ত তদনুরূপ শান্ত ও ধ্যানশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। মনই নানা সাধুভাবের দ্বারা পাক হইয়া আত্মায় রূপান্তরিত হয়। শিখগুরু নানক "সুখমণী" ও "জপজী" গ্রন্থে বলিতেছেন, অহরহঃ ভগবানের নাম করা ও তাঁহাকে স্মরণ করাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। তাঁহার নামে এমনই শক্তি নিহিত আছে যে, অহরহঃ তাহার স্রোত মনের মধ্যে চলিতে থাকিলে সাধকের সকল মালিন্য, সকল গ্লানি দূরীভূত হয়। তাহার আর অন্য সাধনার আবশ্যক হয় না। নাম-সাধনাই—তাহাকে আত্যন্তিক সুখ প্রদান করিতে পারে। যত দিন মন চঞ্চল থাকে, তত দিন অবিচ্ছেদে নাম-সাধন চলে না। কিন্তু নাম করিতে করিতে প্রকৃত আকুলতা আসিলেই ভগবদনুগ্রহ লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার কৃপাদৃষ্টি-লাভ হইলেই সাধকের সকল অভাব তিনি পূর্ণ করিয়া দেন। কিন্তু আমাদের আকুলতা কৈ? শ্রীচৈতন্য দেবের যে আকুলতা আসিয়াছিল—তাহার তুলনা বিরল। ভগবানের সান্নিধ্যলাভ করিবার জন্য পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সম্মুখে তাঁহার কি ব্যাকুল ক্রন্দন। মহাত্মা তুলসীদাসেরও এইরূপ আকুলতা আসিয়াছিল। ভক্ত "কবীরের" আকুলতা তাঁহার অনুপম প্রেম-সঙ্গীতে পরিব্যক্ত। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন, আকুলতায় সব হয়। আকুল হইয়া তাঁহার জন্য কাঁদ, অভীষ্ট-লাভ হইবে। তিনি জগন্মাতার সমীপে সরল শিশুর ন্যায় অজস্রধারে অশ্রুবর্ষণ করিতেন। মাতার সহিত তাঁহার কথোপকথন হইত। এ সকল অনেকের কাছে অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মানব-মনের যে অলৌকিক শক্তি আছে ও ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সেই মন সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া যখন ভগবৎ-সাধনায় কেন্দ্রীভূত হয়, তখন তাহার দ্বারা অসম্ভবও যে সম্ভব হইয়া উঠে। ধর্ম্ম-সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যখন আমাদের এমন "মূলধন" রহিয়াছে—তখন তাহাকে অযথা বসাইয়া রাখা মনুষ্যত্বেরই ক্ষতিসাধন করা। ইন্দ্রিয়-জগতে তাহাকে তুচ্ছ ঐহিক সুখা-ন্বেষণে ব্যাপৃত না রাখিয়া অতীন্দ্রিয়লোকে পরমার্থতত্ত্বানু-সন্ধানে তাহাকে নিয়োজিত করা উচিত।

ইন্দ্রিয়জগতে মনকে নিয়োজিত করিয়া আমরা মনের আসল শক্তির পরিচয় পাই না। ধ্যানের দ্বারা আমাদের চিত্ত যখন একাগ্র হইতে থাকে ও ভাবজগতে বিচরণ করে, তখনই তাহার প্রকৃত স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। দৃশ্যজগতের অতীত যে এক অদৃশ্য বিশাল জগৎ রহিয়াছে, ইথারময় সেই সূক্ষ্মলোকের তত্ত্ব যখন আমরা চিত্তে ধারণা করিতে পারি, তখন হইতে আপনার রহস্যতত্ত্ব আভাসে জ্ঞাত হইতে থাকি।

অনন্ত ইথারে আমাদের অনন্ত জীবনের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। জন্মে জন্মে আমাদের মনোজগতের যতরূপ চিত্র সবই ইথারের মধ্যে রহিয়াছে। নব নব জন্মে তাহারাই আমাদের চিত্তকে প্রভাবান্বিত করিতেছে। মনঃশক্তিবলে তাহাদের উপর যত দিন না আমরা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিব, তত দিন আত্যন্তিক সুখলাভ হইবে না। "নামই" আমাদের পরমবন্ধু নামের দ্বারাই প্রারব্ধ ক্ষয় হইতে থাকে। সর্ব্বদা নামে মন থাকিলে পূর্ব্বজন্মের কৃত কর্ম্মের দ্বারা আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। নিভৃতে নিবিষ্ট হইয়া যখন পরমার্থ বিষয় চিন্তা করা যায়, নামের সহিত "নামী" যখন ধ্যানময় জগতে প্রকট হইয়া উঠেন, তখন আমরা আনন্দলোকের সন্ধান পাই। ধ্যানের দ্বারাই আমাদের অন্তর্লোক ও ইথার-ময় জগতের সহিত পূর্ণ যোগ হয়। এই যোগ যখন স্থায়ী হয় তখন আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের চিত্রাবলী দর্শন করিতে সমর্থ হই। আপনাকে বুঝিয়া লইতে পারি ও ভবিষ্যতের মহত্তর জীবন লাভ করিবার পথে অন্তরায় সকল আপনা-আপনি অন্তর্হিত হইয়া যায়। এ জগতের কোন জিনিষের জন্যই তখন আসক্তি থাকে না। সমস্তই তখন মন হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। আত্মাই তখন প্রিয়তম বস্তু হইয়া পড়েন ও সমগ্র মন তখন অতীন্দ্রিয় লোক-রহস্য আবিষ্কার করিতে ব্যগ্র হয়।

এই দৃশ্যজগৎ সেই অদৃশ্য লোকের মধ্যেই পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতেছে। সেই অতীন্দ্রিয় লোকই ইন্দ্রিয়লোককে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এতদুভয়ের মধ্যে মধুর সামঞ্জস্য যিনি উপলব্ধি করিতে পারেন, মানবজন্ম তাঁহারই সার্থক।

শ্রীশিবকৃষ্ণ দত্ত (বি, এ)।

আর্ট সম্বন্ধে বার্গশোঁর মত

ফরাসী দার্শনিক বার্গশোঁ আর্ট বলিতে কি বুঝেন, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, হাস্যরসাত্মক কবিতা ও কমেডি আর্ট এবং বাস্তবের মধ্যবর্ত্তী। বিষয়-ব্যাপকতায় ইহারা অন্য ধরণের আর্ট হইতে ভিন্ন। আর্টের উদ্দেশ্য কি? যদি বস্তু ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানের গোচরীভূত হইতে পারিত, যদি আমরা বস্তু ও নিজস্বরূপের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আর্টের প্রয়োজন থাকিত না, কিম্বা মনুষ্যমাত্রেই আর্টিষ্ট বা শিল্পী হইয়া উঠিত। যেহেতু তখন আমাদের হৃদয় সর্ব্বদা প্রকৃতির অনন্ত অফুরন্ত ছন্দের সহিত তালে তালে নাচিয়া উঠিত, তাহা হইলে আমাদের চর্ম্মচক্ষু স্মৃতির সাহায্যে অসীম ব্যোমে অননুকরণীয় ছবি অঙ্কন করিয়া অনন্ত কালে স্থাপন করিত, তাহা হইলে প্রাচীন ভাস্কর্য্যের মনোহর নিদর্শনস্বরূপ মূর্ত্তির ভগ্ন অংশসমূহ মনুষ্যদেহের জীবন্ত প্রস্তরে ক্ষোদিত হইয়া দর্শকের নয়নে আনন্দ বিতরণ করিত, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ের অন্তর-প্রকোষ্ঠে অন্তর্মুখ জীবনের অফুরন্ত সঙ্গীতের আনন্দলহরী এবং বিশেষতঃ অভিনব করুণ মূর্চ্ছনা শ্রুত হইত। এই সমস্ত আমরা ওতপ্রোত রহিয়াছি, কিন্তু তাহার কণামাত্র করিতে পারিতেছি না। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে

তাহার জ্ঞানের মধ্যে একটা আবরণ রহিয়াছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই আবরণ অস্বচ্ছ ও ঘন, কিন্তু কবি ও শিল্পীর পক্ষে তাহা স্বচ্ছ। কোন্ অপ্সরীর হস্ত এই আবরণ রচনা করিয়াছে? আমাদিগকে জীবন ধারণ করিতে হয়। কর্ম্মানুষ্ঠান জ্ঞানের হেতু। কর্ম্মই জীবন। প্রয়োজন অনুসারে আমরা বস্তুসমূহ গ্রহণ করিতে সমর্থ হই। ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য জগৎকে প্রতিভাত করে এবং আমাদের কর্ম্মের পরিপোষক হয়। কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞান বাস্তবের সরলতা সম্পাদন করে। জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বস্তুর যতটুকু প্রয়োজন, আমরা ততটুকু লক্ষ্য করি, উহার বাকী অংশকে আমরা অবজ্ঞা করি। পূর্ব্ব-গামী মানব যে রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাতেই আমাদের কর্ম্মের প্রবাহ পরিচালিত হয়, প্রয়োজন অনুসারে বস্তুসমূহ যে ভাবে পূর্ব্ব হইতে বিভক্ত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে, মাত্র তাহার উপরেই আমাদের চক্ষু পতিত হয়, বস্তুর গুণ এবং আকার বা যথার্থ স্বরূপ আমাদের উপলব্ধি হয় না। বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি বিষয়ে ইতর শ্রেণীর প্রাণী অপেক্ষা মানুষ শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নাই। খুব সম্ভব ব্যাঘ্রের নিকট অজা ও মেষের তারতম্য নাই। দুই প্রকারের জন্তু তাহার পক্ষে একই ধরণের। তাহাদের শ্রেণীগত পার্থক্য বিচার না করিয়া সে তাহাদের উপর লাফাইয়া পড়ে এবং উহাদের মাংস ভক্ষণ করে। আমরা উহাদের জাতিগত পার্থক্য বুঝিতে পারি, কিন্তু উহাদের ব্যক্তিগত পার্থক্য আমাদের দৃষ্টিতে হঠাৎ ধরা পড়ে না। অতএব প্রয়োজন না থাকিলে আমরা বস্তু বা প্রাণীর ব্যক্তিগত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহি। এমন কি, সমশ্রেণীর বস্তু বা জন্তুর পার্থক্য পরিস্ফুট হইলেও আমরা তাহাদের যথার্থ স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে পারি না, তাহাদের একটি বা দুইটি অংশবিশেষের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

এক কথায় বলিতে গেলে, আমরা বস্তুর স্বরূপগত যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারি না, আমরা তাহার উপরের ছাপ বা 'লেবেল' দেখিয়া সন্তুষ্ট হই। শুধু বাহ্য বস্তু নহে, এমন কি, প্রণয় ও ঘৃণা, আনন্দ ও বিষাদের হিল্লোলে আমাদের হৃদয় যখন উদ্বেল হয়, তখন আমাদের মানস-পটে যে অগণিত পরিবর্ত্তনশীল তত্ত্বের আবছায়া আসিয়া পড়ে এবং নিগূঢ় সুর-ঝঙ্কার বাজিয়া উঠে, তাহা আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় না, নতুবা আমরা সকলেই কবি, গায়ক বা কথা-সাহিত্যিক হইয়া পড়িতাম। এইরূপে আমাদের নিজত্ব আমাদের দৃষ্টি অতিক্রম করে। আমরা নাম ও রূপের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াই এবং কর্ম্ম দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বস্তু ও নিজস্বরূপের বহির্দ্বারে বাস করি। কিন্তু মাঝে মাঝে প্রকৃতি আমাদের আত্মাকে জীবনের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উদ্বুদ্ধ করে। আত্মার এই বিচ্ছিন্নতা বা তন্ময়তা দার্শনিক চিন্তা-প্রসূত স্বেচ্ছানুষ্ঠিত কোন নিয়মের আনুগত্য স্বীকার করে না। ইহা স্বাভাবিক। ইহা চিত্তের সংযত পরিশুদ্ধ অবস্থা। ইহা যেন বায়ুপ্রবাহশূন্য স্থলে জলন্ত প্রদীপের অচঞ্চল অবস্থা। মানব তখন যোগীর ন্যায় শুদ্ধচিত্ত দ্বারা আত্মাকেই অবলোকন করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয়। সেই অবস্থায় যোগী বুদ্ধিগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়াতীত সুখ অনুভব করেন, তখন দর্শন, শ্রবণ ও মননের নিষ্কলঙ্ক অনুভূতি সাধিত হয়। মনের স্বাভাবিক চাঞ্চল্য বশতঃ ইহা দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না। কিন্তু বিষয় হইতে চিত্ত প্রত্যাহৃত হইয়া এই আনন্দধারা তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন হইলে যে আর্টিষ্টের জন্মলাভ হয়, তাহার তুলনা পৃথিবীতে নাই। তখন আর্টের ক্ষেত্রে ভেদ দৃষ্ট হয় না; কারণ, তখন 'একস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি'—একটি বস্তু জানিলে সকল বস্তু জানা হয়। তৎকালে জাগতিক সকল বস্তুর স্বাভাবিক পবিত্রতা পরি-দৃষ্ট হয়; নাম, রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ এবং অন্তর্জীবনের সূক্ষ্মতম গতি অজ্ঞাত থাকে না। কিন্তু শাশ্বত নিত্য আত্মানন্দস্বরূপ সুখলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। আমাদের মধ্যে যাঁহারা আর্টিষ্ট বলিয়া অভিহিত হন, তাঁহাদের পক্ষে উক্ত সুখ মাত্র একবার, কি দুইবার উৎপন্ন হয়, মাত্র দুই একবার অবিদ্যা-আবরণ অপসারিত হয়।

কোন একটি ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া বস্তুবিশেষের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়। ইহাই আর্ট ও মনের বিভিন্নতার কারণ। মন নাম ও রূপ লইয়া কারবার করে। আর্টিষ্টের মন নামকে নামের জন্য, রূপকে রূপের জন্য ভালবাসেন, নিজের সুখের জন্য তিনি তাহাদিগকে ভালবাসেন না। নাম ও রূপের ভিতর দিয়া বস্তুর যে গূঢ় প্রাণশক্তি প্রকাশ পায়, তিনি তাহারই উপাসক, তিনি ধীরে ধীরে ইহাকে আমাদের বোধশক্তির মধ্যে অনুস্যূত করিয়া দেন। সত্য ও আমাদের মধ্যে নাম-রূপের যে ভ্রান্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইতে তিনি আমাদিগকে অন্ততঃ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সরাইয়া দেন এবং প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রূপ উদ্ঘাটন করিয়া আর্টের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বা উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কোন কোন আর্টিষ্ট প্রচলিত বাক্যের পশ্চাতে যে অমলিন ভাবজগৎ লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করেন। তিনি তাহাকে ছন্দ-তানলয় সহযোগে প্রাণময় করিয়া তুলেন এবং তাহা দর্শন করিতে আমাদিগকে সাহায্য করেন। আবার কোন কোন আর্টিষ্ট সুখদুঃখের অতলজলে ডুব দিয়া এমন এক অপার্থিব বস্তুর সন্ধান পান, যাহা বাক্য-মনের অতীত, যাহার স্পর্শে আমাদের সূক্ষ্ম হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে। সুতরাং আর্ট যে কোন আকার গ্রহণ করুক না কেন, তাহা চিত্রই হউক, ভাস্কর্য্যই হউক, কাব্য বা সঙ্গীত হউক না কেন, তাহা ব্যবহারিক বস্তু সংজ্ঞা ও সামাজিক বিধিব্যবস্থা, এক কথায় সত্যের আবরণ-স্বরূপ অজ্ঞানের যবনিকা উত্তোলন করিয়া কূটস্থ নিত্যের স্বরূপাব-গতি জন্মাইয়া থাকে। একমাত্র সত্যের স্বরূপবোধই আর্টের মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব বস্তুতন্ত্রবাদ এবং আদর্শবাদের প্রভেদ কাল্-নিক। বস্তুতন্ত্রতা কর্ম্মে, আদর্শবাদিতা আত্মায় প্রকট। আদর্শ-বাদিতার ভিতর দিয়া বস্তুজ্ঞান বা সত্যের স্বরূপবোধ জন্মে।

আর্টিষ্ট যে চিত্র অঙ্কন করেন, যে বর্ণে তাঁহারা পট রঞ্জিত করেন, তাহা অতুলনীয়। তাঁহার সেই শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ আর ফিরিয়া আসে না। যে ভাবে বিভোর হইয়া, যে প্রেরণার অনুবর্ত্তী হইয়া কবি তাঁহার বীণার তারে ঝঙ্কার দেন, তাহা তাঁহার স্বকীয় বস্তু। সেই ভাব, সেই প্রেরণা, সেই ঝঙ্কার কখনও ফিরিয়া আসে না, তাহার আর পুনরাবর্ত্তন নাই। অন্য কোন ব্যক্তির হৃদয়ে তাহা ঠিক তেমন ভাবে আবির্ভূত হয় না। এই স্বাতন্ত্র্যই যথার্থ আর্ট।

শ্রীহরিপদ ঘোষাল (বিদ্যাবিনোদ, এম্, এ)।

আমাদের শিক্ষার কথা *

শিক্ষার প্রবর্ত্তন পৃথিবীর কোন্ দেশে কবে প্রথম হইয়াছিল, জানি না, সে আলোচনার এখানে আবশ্যক নাই। ভারতে যে বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন বহু প্রাচীন কাল হইতে হইয়াছে, বেদ উপনিষদ প্রভৃতি মহাগ্রন্থগুলিই তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ। ইংরাজ আসিবার পর আমাদের শিক্ষা মাত্র নবভাবে নবসাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, আর সেই সময় হইতেই আমাদের জাতীয় শিক্ষা বিসর্জ্জনের পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। অবশ্য ইংরাজই এ নবভাবের প্রবর্ত্তক। বিদ্যাশিক্ষার যাহা চিরন্তন উদ্দেশ্য, তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেই জ্ঞানার্জ্জনই এ দেশের শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য ছিল। তখন আধ্যাত্মিক ও আভ্যন্তরীণ উৎকর্ষতাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক ছিল। এখনকার মত প্রাচীনকালে অর্থ-সম্পদের জন্য ভারতের মানুষের এমন প্রবল আকুলতা ছিল কি না বা কতটা ছিল, সে অনুসন্ধান করি নাই, কিন্তু অর্থের জন্য—অন্নের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার দিকেই তখন এমন করিয়া চাহিয়া থাকিতে হইত না। কথাটা হয় ত ঠিক-মত করিয়া বলা হইল না। আমার বলার উদ্দেশ্য—অর্থোপার্জ্জন ও শিক্ষা তখন একই মূলোদ্ভব ছিল না। অর্থোপার্জ্জনের পথে অগ্রসর হইতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মত কোন প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত প্রশংসাপত্ররূপ সদর-দরজা পারের ছাড়পত্রের প্রয়োজন হইত না। শিক্ষার আদর ও প্রয়োজন যথেষ্টই ছিল, কিন্তু তাহা কেবল শিক্ষার্থ। অতি পূর্ব্বকালে ধর্ম্মার্থই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

বৈদেশিক শাসক সম্প্রদায় যে দিন আমাদের শিক্ষার কথা ভাবিলেন, যে দিন তাঁহারা সে ভার তাঁহাদের নিজের হাতে লইলেন, সে দিন আমাদের আবশ্যক অনাবশ্যকের কথা মনে করিবার তাঁহাদের অবসর কোথা? সে দিন তাঁহাদের আবশ্যক অন্যরূপ ছিল। তখন আমাদিগকে জ্ঞানবিদ্যায় গরীয়ান্ করিয়া তোলা অপেক্ষা তাঁহাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য ভিন্ন প্রকার শিক্ষার আবশ্যক হইয়াছিল। আর তখন হইতেই তাঁহাদের প্রয়োজনের অনুরূপ করিয়া আমাদিগকে গড়িয়া তুলিবার আয়োজন চলিতে লাগিল। আজ এই দেড়, কি পৌনে দুই শত বৎসরে তাহারই পরিসমাপ্তিও বলা যায়। তাঁহাদের তখন আবশ্যক ছিল, প্রধানতঃ শাসিতকে শাসকের অনুরাগী করিয়া তুলা, এ দেশে বিলাতী দ্রব্যের প্রচলন, রাজ্য-শাসনের সুবিধা ও খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার ও বিস্তার। এক কথায় আমাদিগকে পুরাদস্তুর মনে ও কার্য্যে য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন করিয়া তুলা, এ কথা শুধু চিন্তাশীল ভারতবাসীর কথা নহে, মেকলের ন্যায় রাজনৈতিক তখন স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন—"We must do our best to form a class of persons Indian in blood and colour but English in taste, in opinions and intellect" তাঁহারা চাহিয়াছিলেন "more English than Hindu" করিয়া তুলিতে। তাঁহারা যা চাহিয়াছিলেন, তাহা বর্ণে বর্ণে মিলাইয়া পান নাই কি? শুধু তাহাই নহে, যাহা চাহিয়াছিলেন—তদপেক্ষা অনেক অধিক লাভই সঞ্চিত হয় নাই কি? ধর্ম্মজ্ঞান ও শৃঙ্খলাহীন কেরাণী সৃষ্টির জন্যই যে এই শিক্ষার প্রবর্ত্তন, এ কথা অনেক দিন হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার স্যার্ উইলিয়ম হাণ্টারও বলিয়া গিয়াছেন।

আমাদের পরাধীনতা ইংরাজ-শাসনের সঙ্গেই আরম্ভ হয় নাই। বহু শতাব্দী হইতেই আমাদের হাতে পায়ে এ শৃঙ্খল পড়িয়াছে। মুসলমান-শাসনে আমাদের সামাজিক জীবনে আমাদের ব্যবহারে, ভাষায়, বেশ-ভূষার মধ্যে কিছু-না-কিছু বিপর্য্যয় যে না ঘটিয়াছিল, তাহা নহে। হিন্দু-ভারতের দেহ ও মনে তাহার রেখা এখনও বিদ্যমান, এখনও পর্য্যন্ত তাহা হইতে তাহারা সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই, কিন্তু তাঁহারা কি এমন করিয়া সর্ব্ববিষয়ে আমাদিগকে পরাজিত করিতে পারিয়াছিলেন? না, তাহা কখনই নহে। আমাদের ভাবরাজ্যে এমন করিয়া বিস্তারলাভ করিতে পাঠান-মোগল কেহই কখনও পারে নাই। অন্য কোন পরাধীন জাতি এমন করিয়া ভাবনীতিতে বিজিত হইয়াছে, তাহাও জানি না।

এ পরাভবের জন্য বিদেশীয় শাসক জাতিকে শুধু দোষ দিই কেন? সাত সমুদ্র পারের এই তুলনাহীন ভারত-সাম্রাজ্য গঠন ও উহার রক্ষণের পাকা ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হওয়ায় তাঁহাদের অসীম ব্যক্তিত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা রাষ্ট্রগত সকল ক্ষমতা করতলগত করিয়া আমাদের অর্থনৈতিক ও ভাব-নৈতিক স্বাধীনতাগুলি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগ করেন। তখন আমাদেরও তাহা মন্দ লাগিয়াছিল, এমন কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না কি? ইংরাজের বেশ, ইংরাজের বুলি, ইংরাজের খানা, ইংরাজের আদব-কায়দা আর সর্ব্বোপরি ইংরাজের দাসত্বের মোহ তখন আমাদিগকেও প্রলুব্ধ করিয়া উহার সাধনায় আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। সে সাধনায় আমরা সিদ্ধিলাভই করিয়াছি। তাই তখন কেরাণী-উৎপাদনকারী তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত বিদ্যাকে অর্থকরী বিদ্যা মনে হইয়াছিল। এই অর্থের খাতিরেই বিজাতীয় ভাবের এই শিক্ষার অন্ধকার দিক্‌টার প্রতি তেমন দৃষ্টি পড়ে নাই, দুগ্ধবতী গাভীর পদাঘাতেরই মত তাহা ত্যাজ্য না হইয়া তখন বরণীয়ই ছিল। কিন্তু আজ সে মোহ ক্রমে অপগত হইবার পথে দাঁড়াইয়াছে। দুই একটা পাশ করিলেই এখন আর চাকুরী জুটে না, পেটের জ্বালা ঘুচে না, তাই এই পাশ্চাত্য শিক্ষার নগ্নমূর্ত্তি ক্রমে আমাদের কাছে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য বিবিধ সমস্যার ন্যায় শিক্ষাও একটা সমস্যার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

মেয়েদের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। ছেলেদিগকে লেখাপড়া না শিখাইয়া মূর্খ করিয়া রাখিবার কথা ভদ্রলোক-নামে পরিচিত এমন এক জনও বোধ হয় এখন মনে করিতে পারেন না। শাসক সম্প্রদায়ের আবশ্যক যাহাই থাক, 'লেখাপড়া শেখে যে গাড়ী-ঘোড়া চড়ে সে' ইহা একটা সেকালের প্রবচন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গাড়ী-ঘোড়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও ইংরাজী শিখিলে পেটের ভাবনা হইতে যে মুক্ত হওয়া

* পুইনান এম, ই স্কুলে বিগত বাৎসরিক উৎসব ও পারিতোষিক বিতরণ সভায় সভাপতির অভিভাষণ। ৪ঠা ফাল্গুন ১৩৩৬।

যায়, এ ধারণাটা সকলের মনে দৃঢ় ছিল এবং সেই বিশ্বাসের বলে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যে অমনোযোগী হইয়া প্রধান উদ্দেশ্য দাঁড়াইয়াছিল অর্থোপার্জ্জন। তাই স্কুলে পড়িলে অফিসে চাকুরী হইবে, এই ধারণায় ছেলেদের একটা ইংরাজী স্কুলে দিয়া চাকুরীর মত শিক্ষা হওয়া পর্য্যন্তই সাধারণের শিক্ষার দৌড় ছিল। এখনই শিক্ষিতের সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেরাণীদের কদর যেমনই কমিতে লাগিল, অমনই শিক্ষার মাত্রা বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে এন্‌ট্রান্স, এল, এ পাশেরও আধিক্য দেখা দিতে লাগিল। তার পর যখন দেখা গেল, কেরাণীগিরি চাকুরীর বাজার আর সুলভ নাই, তখন ডাক্তারী, ওকালতী, এঞ্জিনিয়ারীংএর দিকে দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ছেলে যেমনই একটা পাশ করিল, তাহার শিক্ষার বিষয় সম্বন্ধে স্বাভাবিক প্রবণতার কথা কিছুমাত্র না ভাবিয়া সাধারণ ছেলেদের অমনই ঐ তিনটি পথের মধ্যে যে দিকে যাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ, সেই দিকেই দেওয়া হইল। এখন ক্রমে এমন একটা সময় আসিয়াছে যে, আর চাকুরী মিলিতে চায় না, ডাক্তারী-ওকালতীতেও পয়সা নাই, তাই ছেলেদের ম্যাট্রিক্ পাশের পর তাহাকে কি শিক্ষা দেওয়া হইবে, এইটা এখন একটা সমস্যা। তার পর যে কোন একটা দিকে দেওয়ার পর যখন সে দিকের শিক্ষা শেষ হইল, তখন দ্বিতীয় সমস্যা অর্থোপার্জ্জনের জন্য সে কোথায় যাইবে? বর্ত্তমান শিক্ষা যথার্থ অর্থোপার্জ্জনের সহায়ক কোন দিনই হয় নাই। অর্থনীতির দিক্ দিয়া বিচার করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ দিকে অসাফল্যের কথাই প্রমাণিত হয়, বরং এ শিক্ষা অর্থসম্পদ অর্জ্জনের পরিপন্থী, ইহাই বলা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া নিজ চেষ্টায় বিত্তশালী হইয়াছেন, এ উদাহরণ এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য। স্বনামখ্যাত মতিলাল শীল, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, নলিনবিহারী সরকার, বটকৃষ্ণ পাল, সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী হইলে কি হইতেন, বলা যায় না। কিন্তু তাহা হইলেও এত দিন এই শিক্ষা হইতে সাধারণ গৃহস্থের মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান হইয়াছিল, এ কথা বলিতে হইবে। আজ চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার, সাধারণ শিক্ষিতদের পক্ষে যেন চতুর্দ্বার বন্ধ। তাই আজ পাশ-করা যুবকদের মধ্যে রিক্‌শটানা, বিড়িপাকান বা মেথরের কাষ করার কথাও শুনা যাইতেছে।

এক পক্ষে এই পাশ্চাত্য শিক্ষার আপাতমধুর দিক্‌টা যেমন স্লানতর হইতে চলিয়াছে, অন্যদিকে ইহার তীব্রতাও ক্রমশঃ অনুভূত হইতেছে। অথচ এই বহু অর্থ ও আয়াসসাধ্য শিক্ষা ভিন্ন আমাদের অন্য গতি নাই। যে শিক্ষায় বৈশিষ্ট্য স্ফুরিত হয়, দেশাত্মবোধ উদ্ভূত হইতে পারে, বর্ত্তমান শিক্ষার সংস্কার দ্বারা সেই জাতীয় ভাবের শিক্ষার যে ব্যবস্থা, তাহা অনেক মহাপুরুষ নির্দ্দেশ করিতে পারেন। কিন্তু এই scheme ভিন্ন দেশের প্রয়োজনের অনুরূপ করিয়া আমরা কি প্রতিষ্ঠান গড়িতে পারি?

জ্ঞানার্জ্জনের জন্যই শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্বন্ধ নাই। আমার এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য ইহা নহে যে—এমন কোন কিছু শিখিবার বিষয় নাই, যাহা লাভ করিয়া অর্থাগম হইতে পারে। শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, এজেন্সি, এমন কি, দালালি যা কিছু সবই শিক্ষাসাপেক্ষ। এ শিক্ষার স্থান ভিন্ন। এক জন ব্যবসাদারের ছেলে সহজে ব্যবসায়কার্য্যে যে পারদর্শিতা লাভ করে, অপরের পক্ষে তেমন সম্ভব হয় না কেন? ব্যবসায়ীর পুত্র সে জন্য বিশেষ কোন শিক্ষালয়ে না গিয়াও অলক্ষ্যে তাঁহাদের কর্ম্মস্থানে যে শিক্ষা পান, শেষোক্ত যুবকের পক্ষে সে সুযোগ নাই। লেখাপড়া শিখিয়া যদি কেহ ব্যবসা বা অন্য কোন অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগ দেয়, তাহাতে সুফল লাভেরই সম্ভাবনা।

ইংরাজী শিক্ষার নিন্দা করাই আমার উদ্দেশ্য নহে, বা এই শিক্ষা হইতে অলক্ষ্যে যে আমরা কিছুই লাভবান্ হই নাই, এমন কথা আমি কেন, কেহই বলিবেন না। অথবা প্রকৃত মনুষ্যত্বগুণসম্পন্ন মানুষ গড়িয়া তুলিতে হইলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ত্রিসীমা পরিত্যাগ করা ভিন্ন উপায় নাই, ইহাও কথা নহে। এখান হইতেই উদ্ভূত এমন অনেক জ্ঞানমণ্ডিত মনুষ্যত্বসম্পন্ন মনীষী দেখা যায়, যাঁহাদের মানবতার কাছে আপনা হইতেই মস্তক অবনত হইয়া পড়ে।

আমাদের দেশের শিক্ষার আদর্শ হইতে আমরা ক্রমেই দূরে চলিয়া যাইতেছি। অর্থের জন্য শিক্ষা বা শিক্ষা ও অর্থের সমন্বয় চেষ্টা, এ ঠিক এ দেশের নহে। শিক্ষা জাতীয় ভাবের না হইলে শুধু যে উন্নতির পথ রুদ্ধ থাকে, তাহা নহে, জাতিকে অবনত করে। জ্ঞানার্জ্জনের জন্য ধর্ম্মালোচনার দ্বারা আভ্যন্তরীণ উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় বিদ্যালোচনা, ইহাই এ দেশের আদর্শ, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বিদ্যাই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ, বিদ্বান্‌ই এ দেশের সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য ও পূজ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। আড়ম্বরহীন পোষাক বা চাল-চলনের দীনতায় সে সভ্যতা কোন দিন কোন সমাজে স্লান হয় নাই বা তাহাদিগকে পূজ্য আসন হইতে সরাইতে পারে নাই। বিদ্যার মন্দিরে আভিজাত্যের পূজা এ দেশে কোন দিনই স্থান পায় নাই। সেখানে রাজপুত্র ও কৃষক-সন্তানের স্থান পৃথক্ নহে। সেও গুরুপদপ্রান্তে বসিয়া চিরদিন শিক্ষালাভ করিয়াছে। শিক্ষাই এ দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঐশ্বর্য্য ছিল। শিক্ষিত জন ছিল জ্ঞানের আধার, অর্জ্জিত বিদ্যা ছিল জীবন-পথের শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক। দাসমনোবৃত্তি, আত্মবিস্মৃতি ও শ্রম-বিমুখতা তখন শিক্ষিতের লক্ষণ ছিল না। কর্ম্মশক্তির অসাড়তা তখন এমন করিয়া এ জাতিটাকে পঙ্গু করিয়া ফেলে নাই। তখন বিদ্যাটা একটা উৎসব-দিনের অলঙ্করণ, পোষাকী পরিচ্ছদের মত ছিল না। তাহাই ছিল প্রকৃত বিদ্বানের জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। আড়ম্বরশূন্য সরল জীবনযাপন কোন দিন অসভ্যতা—বর্ব্বরতা বলিয়াও বিবেচিত হয় নাই। যাহা লাভ করিয়া দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক বৃত্তি সকলের পূর্ণ পরিণতি হইত, তাহাকেই সেকালে প্রকৃত শিক্ষা বলিত। সে শিক্ষায় মার্জ্জিত রুচি, অম্লেষিত জ্ঞান, বিকশিত বুদ্ধি ও কর্ম্মে আসক্তি অর্জ্জন করা যাইত। এখনকার উচ্চ শিক্ষিতদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে তখনকার সে শিক্ষায় মানুষকে বর্ব্বরতার বেশী উচ্চস্তরে লইয়া যাইতে পারিত না। কিন্তু সে শিক্ষা পাইয়াও তখন পেট ভরিয়া দুই বেলা খাইতে পাইতাম, পরনের কাপড়ের জন্য পরের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইত না, বরং নিজেদের উপচিত অংশ হইতে পরকে আমরা তাহা সরবরাহ করিতাম। তখন পল্লীতে ছিল

গোলা-ভরা ধান, ক্ষেতে ফসল, উদ্যানে ফল, পুষ্করিণীতে মৎস্য ; তখন ছিল হৃদয়ে আনন্দ, উৎসাহ, দেহে অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য, পল্লীজনের মধ্যে উল্লাসভরা হাসিমুখ, অকপট সৌহার্দ্দ, আনন্দমুখরিত গ্রাম। এমন শতবাহুবিস্তৃত বিলাসে দিব্যচ্ছটা তখন প্রকটিত না থাকিলেও আমরা আপনার গৌরবে গৌরবান্বিত ছিলাম। কিন্তু এখনও দুই শত বৎসর যায় নাই, ইহারই মধ্যে যাদুকরের ফুৎকারে কোথা গেল সে সুখ-শান্তি, আনন্দ, উল্লাস, আমাদের সে মহিমা-গরিমা! আমাদের সেই সোনার দেশ আজ অন্নের কাঙ্গাল, উৎসবমুখরিত পল্লী নিত্য শ্মশান!

বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইলে, দেশকে রক্ষা করিতে হইলে, চাই সৃষ্টি-সামর্থ্য, দিকে দিকে সংগঠনের যজ্ঞানুষ্ঠান। বাঙ্গালার শ্মশান-পল্লীগুলিই সংগঠন-যজ্ঞের পীঠস্থান। বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, আপনাদের এই পল্লীর মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন আছেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানুন দেখি, বেশী দিন নহে, পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে এই স্নিগ্ধ শ্যামল পল্লী কেমন শোভাময় ছিল। আর আজ একবার চাহিয়া দেখুন, চারিদিকে শ্মশানের ছবি প্রকটিত। কোথা গেল সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সেই শোভাময়ী পল্লী-শ্রী! সেই অক্ষুণ্ণ-দেহ কৃষককুল, সেই সন্ধ্যাগমে গৃহাভিমুখী পুষ্টাঙ্গী সুরভীর পাল, সেই ক্রীড়ারত ছেলের দল! কোথায় গেল সেই পৌষ-সংক্রান্তির পিঠা-পার্ব্বণের সরল উৎসব, সেই অগ্রহায়ণে নূতন চালের নবান্ন বা চৈত্র-সংক্রান্তির চড়কের উৎসব। আর কোথায় গেল সেই পল্লীর প্রাণ কৃষক-কৃষাণ, কুম্ভকার, তন্তুবায়, মালাকর, কর্ম্মকারের কর্ম্মময় কর্ম্মশালা। আজ সব গিয়াছে, পল্লীর সম্পদ সেকালের সব কুটীরশিল্পও আজ ধ্বংস হইয়াছে ; তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে—বাহিরে বিরোধ-বিতণ্ডা, মামলা-মোকর্দ্দমা, আর ভিতরে দ্বেষ-হিংসা ম্যালেরিয়া কালাজ্বর বিসূচিকা। আশ্বিন-কার্ত্তিকে ঢাকের বাজনার স্থানে মড়াকান্না আর সাঁঝের বেলায় মঙ্গলশঙ্খনিনাদের স্থানে শিয়ালের ডাক।

আজ স্বাধীনতার স্বপ্নে নাগরিক অধিবাসিগণ বিভোর হইয়াছেন। স্বরাজ পাইলে হয় ত অনেক দৈন্যই ঘুচিবে, কিন্তু তাহার আগে আমাদের মধ্যে পৌরুষ ও প্রাণের দীপ্তি পুনরায় ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। যুবকদিগকে কুসংস্কারমুক্ত উদার আত্মনির্ভরশীল বুদ্ধিমান নাগরিক করিয়া তুলিতে হইবে। পল্লীর সংস্কারে পল্লীর শ্রী ফিরাইয়া আনিবার জন্য অবহিত হইতে হইবে। কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা পল্লীর নষ্ট শিল্প পুনর্জ্জীবিত করিতে হইবে। সহরের সমৃদ্ধি সভ্যতা তাহাদেরই থাক। দরকার হয়, তাহাদের বিলাসিতা,তাহাদের সামাজিকতা,তাহাদের লৌকিকতাকে 'বয়কট' করিয়া নিজেদের অন্ন, নিজেদের পরিধেয় নিজেরা উৎপন্ন করিয়া গৌরব অনুভব করিতে হইবে। রাষ্ট্রগত স্বাধীনতা পাইবার অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া নিজের নিজের মধ্যে যে স্বাধীনতা আনিবার পথে বাহিরের বাধা নাই, সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা উপলব্ধি করিতে হইবে। স্বর্গগত দেশ-বন্ধুর কথায় বাঙ্গালীর যে একটা নিজস্ব সাধনা, ধর্ম্মকর্ম্ম, নিজস্ব ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ আছে, এ কথা অনুক্ষণ মনে রাখিতে হইবে। যে শিক্ষায় এই সব পাওয়া যায়, সেই শিক্ষা কিসে দিতে পারা যায়, আগে সেই ব্যবস্থা করুন। ইহার জন্য যদি বিজ্ঞান, ইতিহাস,ভূগোলাদি শিক্ষা একটু কমও হয়,তাহাতে ক্ষতি নাই। যখন পাশ করার প্রধান মোহ চাকরী আর মিলে না, তখন সে শিক্ষার দিকটায় আর না হয় ততটা দৃষ্টি নাই রহিল। আমাদের স্বত্বাক আমাদেরই থাক। কে বিদেশী অসভ্য বলিবে, সে ভাবনার দরকার নাই,আর যখন তাহাদের সংস্পর্শ সাধারণের পক্ষে দুর্লভ, তখন ত সুবিধাই হইয়াছে। শুধু বসনে-ভূষণে নহে, আহারে-বিহারে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, ভাবে-চিন্তায় একবারে পূর্ণ স্বদেশী হউন। শার্ট কোট টেরি ছড়ির অভাবে লজ্জা বোধ না করিয়া নিজ দেশ-জাত চটি-চাদরের সভ্যতার গৌরবে অবহিত হইতে অভ্যস্ত হউন। পশ্চিমের কাছ হইতে যাহা গ্রহণ-যোগ্য, তাল করিয়া অর্জ্জন করুন, তাহাতে দোষের কিছু নাই। পরের কাছ হইতে বিচার করিয়া ভাল জিনিষ লইয়া নিজেদের জাতি ও দেশকে সমৃদ্ধ করায় দোষের কিছু দেখি না।

বাঙ্গালী যুবক আজ জীবন-সংগ্রামে বিপর্য্যস্ত, তাহাদিগকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। আত্মচেষ্টায় আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহার জন্য যাহা কিছু সংস্কার, তাহা আমাদের স্বভাবধর্ম্ম, আমাদের নিজস্ব ভাবধারার সঙ্গে মিলাইয়া করিতে হইবে। এক জাতির সংস্কার অপর জাতির আদর্শে কখন সুফলপ্রসূ হইতে পারে না। আজ দেশমধ্যে একটা নবযুগের অভ্যুদয়, নব-জাগরণের সূচনা হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে নব আলোকে আজ হৃদয় উদ্ভাসিত, ইহা স্বদেশপ্রীতি। এ শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তিটুকুর উন্মেষলাভ দেশের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। বৈষ্ণব গীতাবলীর মধ্যে যেমন কানু ছাড়া গীত নাই, তেমনই এ যুগে আমাদের এমন চিন্তা থাকা উচিত নহে—যাহার মধ্যে স্বদেশপ্রীতির কথা না আছে ; এমন শিক্ষা হওয়া উচিত নহে—যাহাতে দেশাত্ম-বোধ না জাগে ; এমন বেশ, এমন আহার এমন উৎসব, এমন খেলা থাকা উচিত নহে—যাহাতে জন্মভূমির প্রতি একটুও প্রীতি-মমতা না বাড়ে। জন্মভূমিকে ভালবাসা পাপ নহে, এ পুণ্য কায। স্বদেশপ্রীতির পথে বাধা আসিতে পারে, এমন শিক্ষা পরিত্যাজ্য। স্বাধীন মন লইয়া নিজের জন্মভূমিকে স্বাধীন দেখিবার আকাঙ্ক্ষা অনুরাগ মানুষেরই ধর্ম্ম ; কিন্তু সে জন্য পাশ্চাত্যের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।

সবই মনের কথা। ইংলণ্ড স্বাধীন দেশ, সে দেশের যুবকগণ যে সব বই পড়িয়া শিক্ষা পায়, আমাদের ছেলেরাও ত তাহা ছাড়া আলাদা বিশেষ কিছু পড়ে না, কিন্তু তাহাদের মন যে ভাবে গড়িয়া উঠে, আমাদের তাহা হয় না কেন ? যে সব কারণ হইতে মনোবৃত্তির এই ভাব ঘটে, তাহা হইতে মুক্ত হইতে হইবে। এই সব শিক্ষা দিবার জন্য প্রথম ও প্রধান আবশ্যক যোগ্য শিক্ষকের। মনুষ্যত্বের বিকাশ না হইয়া যে শিক্ষাই লাভ করা যাক্, তাহা অপূর্ণ। মনুষ্যত্বের বীজ অন্নবিস্তর প্রায় সকল বালকের হৃদয়মধ্যেই লুকায়িত থাকে। শিক্ষক যিনি হইবেন, মুখের উপদেশ নহে, নিজ জীবনের কার্য্যাবলীর উদাহরণে, আপনার স্নেহের ছায়ায়—সুশিক্ষার আলোক-বাতাসে [illegible] সেই ক্ষুদ্র বীজকে অঙ্কুরিত করিয়া শাখা-পল্লবময় [illegible] করিতে হইবে। ইহার জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিবিড় সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন। সে সম্বন্ধ এখন [illegible]

দেখা যায়। আজ তাহা নাই বলিয়াই শিক্ষার মধ্যে শুধু পুস্তকগত কতকগুলি পাঠ অভ্যাস ভিন্ন অপর বিশেষ আবশ্যক শিক্ষার কোন সম্বন্ধই থাকে না। এ শিক্ষা পাইয়া এক জন সাধারণ করিৎ-কর্ম্মা লোকও হওয়া যায় না।

অধুনা দেখা যায়, অনেক পিতামাতাই ছেলের শিক্ষার ভার বিদ্যালয় ও বড়জোর এক জন গৃহ-শিক্ষকের উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, সময়ের অভাবেই হউক, আর উদাসীনতা বশতই হউক, নিজেরা প্রায়ই কিছু দেখেন না বা দেখিতে পারেন না। অনেকে হয় ত উপলব্ধি করিতেও পারেন না যে, নিজের ছেলেকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিলে কি তৃপ্তি পাওয়া যায়। দেশের অবস্থার কথা মনে করিলে মর্ম্মবেদনায় হৃদয় ভরিয়া যায়। আমি এখানে একটু অপ্রিয় কথার আলোচনা করিব। আজকাল সহর অঞ্চলে বি, এ, এম, এ ছড়াছড়ি বলিলেই হয়, কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন কি? তাঁহাদের মধ্যে কয় জনকে নিতান্ত আবশ্যক দুই একটা কথা বলা ভিন্ন পিতামাতার সঙ্গে দুই দণ্ড বসিয়া স্বচ্ছন্দভাবে কথা কহিতে দেখা যায়! যেন সে পবিত্র সম্বন্ধের মধ্যে ক্রমে একটা যবনিকা বিস্তৃত হইতেছে। সভ্যসমাজে আজকালের শিক্ষিত যুবকদের অনেকের মধ্যে দেখা যায়, তাঁহাদের শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে সদ্ভাব নাই। তাঁহারা অপরের কাছে অযথা অপমানিত হইয়া বা পথের এক জন নগণ্য আগন্তুকের কাছে অযথা একটা চপেটাঘাত লাভ করিয়া তাহা অনায়াসে পরিপাক করিতে পারেন, কিন্তু পিতৃমাতৃসম তাঁহার পরম পূজ্যপাদ শ্বশুর-শাশুড়ীর অতি হিত কথাও তাঁহাদের অসহ্য। মনে করিলে লজ্জা হয়—এমনও কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেন শ্বশুর-শাশুড়ীকে মনঃকষ্ট দেওয়া, তাঁহাদিগকে অপদস্থ অপমানিত করাই তাঁহাদের বাহাদুরী। এই কি শিক্ষার পরিণাম? শিক্ষিত হইয়াও যে এমন সব অন্যায় কায করিতে পারে বা যে শিক্ষার সে কায করিতে নিবৃত্ত করিতে পারে না, এমন শিক্ষার অভিমানেই যুবকরা আত্মহারা হইয়া থাকেন। শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের দ্বারা যদি এমন সব অপকর্ম্ম অশান্তি সৃষ্ট হয়, তবে অশিক্ষিতদের কাছে কি আশা করা যাইতে পারে? যদি অন্যদিকে কোন সংস্কার না-ও সম্ভবে, তবে শুধু এই সব শিষ্টাচারাদি শিক্ষার দিকে কি মনোযোগী হওয়া একান্ত দরকার নহে?

আমি এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না। অভিভাবকগণ আমার কোন কোন কথা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিবেন এবং তাঁহারাই ইহার প্রতীকার-উপায় চিন্তা করিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমি এতক্ষণ শিক্ষার ত্রুটি ও শিক্ষা যে ভাবে হওয়া প্রার্থনীয়, সে সম্বন্ধে সকল স্থানেই যাহা বলিয়া থাকি—তাহারই পুনরুল্লেখ করিলাম মাত্র। আমি ছাত্রদিগকে বলি, তাহাদের সম্মুখে একটা বিরাট কর্ত্তব্য উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের কাছে দেশ অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। ভবিষ্যৎ আশা বলিতে ছাত্ররাই, এ কথা সত্য; কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সকল কার্য্যেই চাই সংযম, চাই আন্তরিকতা। ঔদ্ধত্য উচ্ছৃঙ্খলতায় কখন কোথাও কোন বড় কায সাধিত হয় নাই—হইতে পারে না। এখন দেশে একটা বড় গোলযোগের সময় আসিয়াছে, কোন্‌টা করণীয় আর কোন্‌টা পরিত্যাজ্য, তাহা নির্ণয় করা অনেক সময় কঠিন। বর্ত্তমানে উচ্ছৃঙ্খলারূপ বহ্নিমুখে ইন্ধনসংযোগে দেশের কাযের নামে আপন আপন কার্য্যসিদ্ধি করিবার জন্য অনেক লোক আছেন। তাঁহাদের কবল হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে সর্ব্বদা যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। দেশের কাযে—জন্মভূমির বিরাট যজ্ঞে যোগ দিতে হয়—দেওয়া সঙ্গত, কিন্তু সেটা গড্ডলিকাবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া নহে। জানিয়া বুঝিয়া কর্ত্তব্যানুরোধে যদি মন চায়, তবেই। অথবা পিতামাতা প্রভৃতি পরিজনবর্গের সুখশান্তি ভঙ্গ করিয়া, তাঁহাদের প্রতি, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যপথ-বিচ্যুত, দুর্বিনীত ও যথেচ্ছাচারী হইয়া নহে। এ জন্য দরকার চরিত্রবলের। নিজেকে বিশ্বাস করিতে না পারিলে, আত্মপ্রতিষ্ঠ না হইতে পারিলে কোন মহৎ কাযই সম্ভব হইবে না। পরের মিষ্ট কথায় আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বার্থান্ধ ব্যক্তির হাতের ক্রীড়নক হইয়া থাকা সঙ্গত নহে। ইহার জন্য চাই স্বাবলম্বী স্বাধীন দৃঢ় মন, চাই পরিপূর্ণ অটুট স্বাস্থ্য, উদার শিক্ষা আর আপনার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস।

শ্রীহরিহর শে ।

কুঞ্জকুটীর

ঐ যে আমার কুঞ্জকুটীর নদীর তীরে!
পল্লী-পথের ঐ কিনারে শান্তি-সমীর বইছে ধীরে!

লতায় ঘেরা সবুজ মায়া
তপ্তপ্রাণে দেয় গো ছায়া;
সুরের সুধা দেয় গো ঢেলে
পরাণ ভ'রে নদীর নীরে!

প্রেয়সী মোর সহজ সাজে
ঐ ঘাটে যায় সকাল সাঁঝে
ঐ ঘাটেতে নিত্য নূতন
দূর-প্রবাসীর তরী ভিড়ে!

মুক্ত আকাশ চিত্ত জাগায়—
পাখীর গীতি জাগায় ঊষায়,
ভোমরা বঁধু মধুর গানে
কুসুম কোটায় গন্ধে ঘিরে।

ঐ কুটীরের শাকান্নেতে
কে দিল গো প্রণয় গেঁথে,
দূর-প্রবাসের বিলাস-সুখে
ভুলতে সে সুখ পারবো কি রে

শ্রীনগেন্দ্র দেওয়

সমস্যা

১

প্রভাত-সূর্য্যের হিরণ্ময় রশ্মিতরঙ্গের আনন্দ-দোলায় চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়িল। কালি ও কলম লইয়া বর্ণনাটা কাগজের পৃষ্ঠে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার দুর্দ্দমনীয় লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। বহু দিন হইতে এই অপূর্ব্ব মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া বেড়াইতেছি। কথায় বলে, 'বোবার শত্রু নেই'। কিন্তু আমি দেখিতেছি, চলমান বিশ্বে এ সিদ্ধান্ত নিতান্তই ভ্রমাত্মক। বৈষয়িক ব্যাপারে দেখা যায়, সরিকের মধ্যে যে নির্ব্বাক্‌ভাবে থাকে, নির্য্যাতন তাহাকেই সহ্য করিতে হয়। তাহার ভদ্রতাকে অপরে দুর্ব্বলতার চিহ্ন বলিয়া মনে করে। তাহাকে নানা ভাবে বঞ্চিত করিবার জন্য বিরাট চক্রব্যূহ রচিত হয়। সে ব্যূহের অভ্যন্তর হইতে শরজাল নির্গত হইয়া—নিরীহ, বিবাদে বিগতস্পৃহ সরিকের অঙ্গে পতিত হইতে থাকে। তাহার ভদ্রতার উপর সরিকান বাণিজ্যের অপ্রতিহত গতিবেগ প্রবাহিত হইতে থাকে। জ্ঞানসঞ্চারের পর হইতে তরুণ যৌবনের প্রখর দিবালোকে অনেকের সহিতই ঘটনাক্রমে আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল, পণ্ডিতের নীতিবাক্য অবলম্বন করিয়া, এত দিন বোবা সাজিয়াই রহিয়াছি ; কিন্তু নিঃশত্রু হইতে পারিয়াছি কি ?

প্রকাশ্য আক্রমণ সকল ক্ষেত্রে না হউক, অলক্ষ্যে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন যে ভাবে আমার নির্ব্বাক্‌ সহিষ্ণুতাকে মথিত ও দলিত করিতেন, তাহাতে বড় দুঃখেও হাসি আসিত। 'অর্ব্বাচীন' 'কল্পনাশ্রয়ী,' প্রভৃতি নানাবিধ বিশেষণ, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর পশ্চাতে নহে, নামের অগ্রে সুশোভিত হইত। এক এক করিয়া প্রবেশিকা হইতে সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ফলে বন্ধুর দল আমাকে "উপাধিব্যাধিমণ্ডিতং"-এর বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিল। সুতরাং কেমন করিয়া নীতিকারের কথা মানিয়া লইব—"বোবার শত্রু নাই !" কথাটা নিরর্থক ! অন্ততঃ বিংশ শতাব্দীর এই বিচিত্র যুগে।

আজ এই সুন্দর প্রভাতকে, দ্যুতিমান দিবসের এই সুন্দর মনোরম অধ্যায়টিকে লেখনীর সাহায্যে ধরিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা করিতে গিয়া এই সকল কথাই মনের মধ্যে জটলা করিতে লাগিল। ভাবিলাম, এতগুলি ডিগ্রী লইয়াই বা কি ফললাভ করিলাম ? অর্থের অভাব ছিল না। পিতৃ-পিতামহের অর্জ্জিত বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারত্ব ভাগ্যগুণে ঘটিয়াছিল। সংসারে এখন নিজেই নিজের ও সম্পত্তির নিয়ন্তা। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগুলির প্রয়োজন ত আমার ছিল না। উপাধির মূল্যও ত দেখিতে পাইতেছি না। উহাদিগকে 'ডেডলেটার' আপিসের ছাপমারা ব্যর্থ চিঠির মতই মূল্যহীন মনে করিলে ক্ষতি কি ?

উপাধি পাইবার পূর্ব্বে ভাবিতাম, এই ঐন্দ্রজালিক অভিজ্ঞানের বলে সাহিত্য-দরবারের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত হইবে ; আমি চির-অভিলষিত রাজ্যে প্রবেশ করিয়া দেবী ভারতীর চরণপদ্মে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিতে পারিব। কিন্তু এত দিন চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, আমার ডিগ্রীর প্রতাপ এবং ঐশ্বর্য্যের মহিমা আমাকে সাহিত্যের তপোবনে প্রবেশাধিকারদানে সমর্থ হয় নাই। হায় ! আমার উপাধিরাশি যদি আমার সাধনাকে সিদ্ধির সন্নিহিত করিয়া দিতে পারিত ! সাহিত্য—কথাটা ক্ষুদ্র, কিন্তু কি বিরাট, কি মহৎ, কি সুন্দর জগৎ এই কয়টি শব্দের অন্তরালে বিরাজিত ! 'সাহিত্য' কথাটার অর্থ হইতেছে, একটা কিছু অবলম্বন। কোন একটা বিষয়কে অবলম্বন করিয়া যাহা কিছু রচনা করা যায়, তাহাই সাহিত্য। কিন্তু কি অবলম্বন করিয়া লিখি, যাহার ফলে সাহিত্যিক হইবার আশা সফল হইতে পারে ?

আজ প্রভাত-সূর্য্য প্রকৃতির দেহে মাধুর্য্যধারা ঢালিয়া দিবার অবকাশে আমাকে কি সেই তপোবনে প্রবেশলাভ করিবার পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছে ?

"বলি, আজ আর নাইতে খেতে হবে না বুঝি ?"

চমকিয়া উঠিলাম। অঙ্গুলিধৃত অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটিকা খুলিয়া

পড়িল। অর্দ্ধলিখিত কাগজগুলি অন্তরালে রাখিতে রাখিতে বলিলাম, "বেলা কত?—তা তোমরা খেয়ে নিতে পার। আমার একটু কায আছে, সরমা।"

মৃদু হাসিয়া 'সরমা' আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। অর্দ্ধলিখিত কাগজগুলি তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে প্রতারিত করিতে পারিল না। সে সহাস্যে বলিল, "তোমার কায ত এই? ও সব এখন থাক্, আজ আর কিছু হবে না।"

পত্নীর কাছে ধরা পড়িয়া যাওয়াতে মনে ক্ষোভ জন্মিল কি? আত্মবিশ্লেষণের মত মনের অবস্থা তখন ছিল না। তাড়াতাড়ি বলিলাম, "লক্ষ্মীটি, আর একটু পরে আমি খাব। এই ত সবে ১১টা বেজেছে।"

হাস্যময়ী সরমা বলিয়া উঠিল, "তুমি সকল সময়ই ত সাহিত্য নিয়ে ব'সে আছ, লিখছ ত সারাদিনই। তা কোন কাগজে ত তোমার লেখা ছাপলে না!"

ইহা কি বিদ্রূপ, না সরল হৃদয়ের সহজ অভিব্যক্তি? আমার রচনা যেমনই হউক না কেন, অর্থব্যয় করিয়া আমি অসংখ্য বই মনের মত করিয়া ছাপাইতে পারি। সে সামর্থ্য আমার আছে। কিন্তু তেমন সাহিত্য-রচনার জন্য আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই। আমি চাই প্রকৃত সাহিত্য-সাধনা, যথার্থ সাহিত্য-রচনা, যাহা গুণগ্রাহী সম্পাদক স্বয়ং মুদ্রিত করিবেন, রসিক পাঠক তাহা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিবে। আমার সহধর্ম্মিণী, জীবনসঙ্গিনী সরমা আমার মনের এই গোপন অভিপ্রায় ভাল করিয়াই জানিত, তাহার কাছে আমার গোপন করিবার কিছুই ছিল না, তবে আজ কেন সে এমন ভাবে এই মন্তব্য প্রকাশ করিল?

সমগ্র অন্তর বিষাদভারে অবসন্ন হইয়া উঠিল। অভিমানের আতিশয্যে চোখের কোণে উদ্গত অশ্রুবিন্দুকে গোপন করিবার চেষ্টা করিলাম, তার পর মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, সরমা আমার দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। সেই দীর্ঘায়ত কৃষ্ণতার নয়নযুগলে কোন্ রহস্যের সমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা বুঝিলাম না।

বলিলাম, "নতুন লেখকের লেখা হঠাৎ কেউ ছাপতে চায় না, সরো!" নিজের কথায় নিজেই চমকিয়া উঠিলাম। কথায় কি অশ্রুসাগর উদ্বেল হইয়া উঠে? বাহিরে রৌদ্র তখন অনল বর্ষণ করিতেছিল। সরমা বাতায়নপথে তাহাই কি দেখিতেছিল? সে মৃদু কণ্ঠে বলিল, "ভাল লেখা হ'লেও কি তাঁরা ছাপেন না? তুমি ভাল ক'রে লিখেই দেখ না। যা তা লিখলে ভাল কাগজে স্থান হবে কেন?"

সরমারও কি বিশ্বাস, আমি যা তা লিখি? বুকে কথার আঘাতে বেদনা লাগে, লাঠির আঘাতের অপেক্ষাও উহা তীব্র ও ভীষণ। কিন্তু সে ব্যথার প্রকাশ—নারায়ণ! শক্তি দাও, এ ব্যথা শুধু তোমার চরণেই নিবেদন করিব।

সরমা জানে না, নূতন লেখকের অর্থবল, জনবল, সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তির গৌরব, দেবী ভারতীর পূজাপ্রাঙ্গণে কত তুচ্ছ! সরমা বোঝে না, যেখানে কষ্টিপাথরে সোনার দর কষিয়া মূল্য নিরূপিত হয়, সেখানে নকল সোনার কোন স্থান নাই।

সরমা আমার কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ লইয়া পশ্চাতে দাঁড়াইয়া খেলা করিতেছিল। আমি বলিলাম, "তুমি জান না, সরো! ভালমন্দ লেখার মাপকাঠী আমাদের হাতে নেই। আমার এক বন্ধু 'সুনীতি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে কোন প্রসিদ্ধ সম্পাদকের কাছে গিয়েছিলেন। তিনি শুধু নাম দেখেই চ'টে লাল। তিনি বল্লেন, 'আমার কাগজে কি কুরুচির প্রবন্ধ বেরোয় যে, আপনি দেড়গজি সুনীতির বক্তৃতা নিয়ে এসেছেন?' আর এক নবীন লেখক মাদকদ্রব্য-বর্জ্জন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে-ছিলেন; সম্পাদক তাঁকে জানিয়েছিলেন, তাঁর এমন পাঠক আছেন, যাঁরা এ প্রবন্ধ প'ড়ে চ'টে যাবেন। ডাক্তাররা বলবেন, 'মাদক দ্রব্য না হ'লে ঔষধ হবে কি ক'রে?' যাঁরা ও জিনিষের ব্যবসা করেন, তাঁরা বলবেন, 'এখন লোটা-কম্বল নিয়ে বদরীনাথে যাওয়া যাক্'।"

সরমার উচ্চ হাস্যলহরী কক্ষমধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে আমার সম্মুখভাগে আসিয়া বলিল, "আচ্ছা, ও সব লেখ-চারের বিষয় নাই বা তুমি লিখলে। আজকাল যে ধুয়ো উঠেছে, নারীর অধিকার-সমস্যা। ঐ বিষয় নিয়েই একটা প্রবন্ধ বা গল্প লেখ না?"

সর্ব্বনাশ! সরমা বলে কি? "নারীর অধিকার" জটিল সমস্যা-সমাধানের চেষ্টায় রক্ষণশীল ও প্রগতি দুই তরফই আমার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিবেন, তাহা শাস্ত্রের' কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। সম্পাদক বলিবেন, এ প্রবন্ধ ছাপিবার অযোগ্য। পরাশররা বলিবেন, বর্ত্তমান সময়ের সহিত ভাল করিয়া চলিতে পারি নাই, সুতরাং তাঁহাদের তরুণ পাঠক

এ প্রবন্ধ ত পড়িবেই না, বরং অত্যন্ত আধুনিকদিগের তরফ হইতে শতমুখী আস্ফালিত হইতে থাকিবে।

হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া সরমা বলিল, "ঐ রকম একটা কিছু নিয়ে লেখ।"

হাসি আসিতেছিল। বলিলাম, "কলেজের ছেলেদের কাছে তোমার স্বামীর নির্য্যাতন তা হ'লে সুনিশ্চিত। নারীর অধিকার নিয়ে বল্‌তে গেলেই সতীত্ব ও সংযমের কথা উঠবে। বাপ, দাদা বা শ্বশুরের অর্থে যাঁরা থিয়েটার, সিনেমা দেখার সঙ্গে সঙ্গে কলেজের পড়া পড়েন—"

"কি হে, প্রিন্স! আবার কলেজের ঘাড়ে কেন?—" সঙ্গে সঙ্গে আমার বাল্যবন্ধু রমেশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সরমা সীমন্তের প্রান্তে অঞ্চলটা একটু টানিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। মধুরভাবে হাসিয়া সে বলিল, "এই দেখ রমুদা, উনি কাগজে প্রবন্ধ লিখলেই কলেজের ছেলেরা নাকি ওঁকে গিলে ফেলবে।"

পল্লী-সুবাদে রমেশ সরমার ভ্রাতৃস্থানীয়—পিতৃস্বসার পুত্র। তাহারই প্রস্তাবে ও চেষ্টায় সরমা আমার কুললক্ষ্মীর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিল। ডাক্তারী পাশ করিয়া সে এখন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। যত কাযই থাকুক না কেন, প্রত্যহ সে কোন-না-কোন সময়ে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। আমার গৃহের চিকিৎসার ভারও তাহারই উপর অর্পিত ছিল।

সে হাসিয়া বলিল, "প্রিন্স বাহাদুর সাহিত্যিক হ'তে চান, তা জানি। হিজি-বিজি যা তা খাতা লিখে পাঠালেই ত ছাপা হ'তে পারে।"

"মাসিকপত্র—নামকরা কাগজগুলো ত আর জমীদারী সেরেস্তা নয় যে, যো হুকুম ব'লে আমলারা মনিবের বাজে কথায় তালিম দিতে থাকবে!"

রমেশ সহসা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর বলিল, "আচ্ছা, ও সব সাহিত্যিক আলোচনা এখন থাক্। যে জন্য এসেছি, সেটা চাপা প'ড়ে যাচ্ছে। আজ কপালকুণ্ডলা দেখতে যাবি?—তা হ'লে ঐ সঙ্গে—"

"তা মন্দ কি? গেলেই হয়। কি বল তুমি?"

পত্নীর দিকে চাহিলাম। সে সলজ্জ কণ্ঠে বলিল, "আমি আর কি বলব—যা ঠিক করবে—"

ডাক্তার রমেশ বাধা দিয়া বলিল, "তা হ'লে এ কথাই ঠিক রইল। আমি এখানে এসেই একসঙ্গে যাব।"

হঠাৎ সাহিত্য-মঙ্গল সভার অধিবেশনের কথা মনে পড়ায় আমি বলিলাম, "না, ভাই, আজ আর যাওয়া হ'তে পারে না। রতন বাবুর ওখানে সাহিত্য-সভা হবে। সেখানে যাব ব'লে কথা দিয়েছি।"

রমেশ আমার পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিল, "ও সব ছুতো চল্‌বে না। কত দিন ধ'রে কথা হচ্ছে, এখন বাজে ওজর—"

"না না, ভাই, তুই বুঝিসনি। যে কথা নিয়ে আমাদের তর্ক হচ্ছিল, সভায় তাই নিয়েই আলোচনা হবে, আমাকে যেতেই হবে।"

"তবে আগে আমায় কথা দিলি কেন?"

"কথা দিয়েছি যাব, আজই যেতে হবে, এমন কি কথা?"

"আচ্ছা, তুই না যাস্, সরো যাবে। সন্ধ্যাবেলা আমি এসে নিয়ে যাব।"

রমেশ চলিয়া যাইতেছিল। সরমা বলিল, "এত বেলায় না খেয়ে যাচ্ছ, রমুদা? সে হবে না; খেয়ে যাও।"

গৃহিণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সরমার সজাগ দৃষ্টি প্রশংসনীয়। গৃহীর কর্ত্তব্যে আমার এ ঔদাসীন্য উপেক্ষার যোগ্য কি?

রমেশ ঘাড় ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, "ডাক্তার মানুষের খাবার সময়ের ঠিক নেই। ঘড়ী ধ'রে কি আমাদের খাওয়া চলে? আচ্ছা, আর এক দিন এসে খাব। আজ সময় নেই। নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াস—উড়ে বামুনের হাতের রান্না নয়।"

উভয়ের চোখে চোখে বিদ্যুৎ-দীপ্তির বিকাশ দেখিলাম না? রমেশ চলিয়া গেল, কিন্তু কল্পনাপ্রবণ মনে সমস্যার সন্দেহ দুলিয়া উঠিল কেন? মেজাজটা ঠিক ছিল না। সহসা বলিয়া ফেলিলাম, "দেখ, তোমার যাওয়া হবে না।"

আমার আহারের যোগাড় করিতেই বোধ হয় সরমা রান্না-ঘরের দিকে পা বাড়াইয়াছিল। আমার কথার আঘাতে সে বিস্মিত ভাবে ফিরিয়া চাহিল, মুহূর্ত্ত স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আজ তোমার কি হয়েছে?—এখন নাবে খাবে চল।"

লজ্জা ও কুণ্ঠায় মনটা নত হইয়া পড়িল।

বালিকা সরমা আমাদের গৃহে সীমন্তে

আসিয়াছিল। বিংশতিবর্ষীয়া যুবতীর নয়নে আজ বিদ্যুৎদীপ্তি দর্শনে মনের এ বিকার আসিল কেন? ১০ বৎসর ধরিয়া যে লতিকা সমগ্র বৃক্ষটাকে বেষ্টন করিয়া পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছে, যাহার শত বাহুবন্ধনে বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, পত্র ও পল্লব সমাচ্ছন্ন, আজ তাহার অবলম্বনবিচ্যুতির অসম্ভব শঙ্কা লজ্জাজনক নহে কি?

না, মানুষের মনের সূক্ষ্মতম তত্ত্ব বিশ্লেষণের অতীত।

২

তাহাকে—শুধু তাহাকে কেন, সমগ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া, সকলকে গোপন করিয়া একটা গল্প লিখিয়াছিলাম। কেমন হইয়াছে, জানি না, তবে বুকের রক্ত দিয়া বিনিদ্র রজনীতে, দেবী ভারতীর প্রসাদলাভের জন্য পূজা করিয়াছিলাম। শুধু গল্পের নামটি দেওয়া হয় নাই। আর একবার ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিয়া তবে গল্পের নামকরণ করিব।

প্রবন্ধ-রচনার আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম। কারণ, যে বিষয়েই প্রবন্ধ লিখি না কেন, নূতন লেখক বলিয়া কোন মাসিকের স্নেহক্রোড়ে স্থান পাইব না। ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি সম্বন্ধে এত বিভিন্ন মতবাদ যে, আমার মত তরুণ সাহিত্যিক মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের দোহাই দিয়া প্রবীণ দলের কাছে নিস্তার পাইবে না—পাশ্চাত্য পাণ্ডিত্যের কথা লইয়া কোন কথা বলিতে গেলেও তরুণ-দল আমার রচনার মধ্যে কোনও ফাঁক পাইয়া এই তরুণ বয়সেই আমাকে নির্ব্বোধ বৃদ্ধের সংজ্ঞা দিয়া তাহাদের মধ্যে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিবে। বর্ত্তমান নাস্তিক্য যুগে ধর্ম্মনীতির কথা অরণ্যে রোদনে পর্য্যবসিত অবশ্যই হইবে। বিংশ শতাব্দীর তরুণ প্রতীচ্য-জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারের সন্ধান না পাইলেও বড় বড় নাম অনেকেরই কণ্ঠস্থ আছে। সুতরাং তাঁহারা নির্ব্বিচারে আমার প্রতি নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারেন।

অর্থনীতিকে আমার আলোচনার বাহিরে রাখিয়া দিয়াছি। উহা শুধু জটিল বলিয়া নহে, উহার আবর্ত্তে পড়িয়া মানুষ হাবুডুবু খাইয়া থাকে। অর্থ জড়পদার্থ হইলেও উহার এমন ক্ষমতা যে, অচেতনকে সচেতন করিয়া তুলে। ধনী বা জমীদার যদি এই জড়পদার্থটিকে আয়ত্তের মধ্যে রাখিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহার আমলাবর্গ জনাস্তিকে তাঁহার সম্বন্ধে এমন গল্প রচনা করিবে যে, অবশেষে তাঁহাকে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগের জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইবে। এমন শক্তিশালী যে অর্থ, তাহার নীতি সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে যাওয়া নিরাপদ নহে। বিশেষতঃ ঐ প্রকার প্রবন্ধ পাঠকবর্গের নিকট অত্যন্ত গুরুপাক—সুতরাং সম্পাদক মহাশয়রা নির্ব্বিচারে নূতন লেখকের দুষ্পাচ্য প্রবন্ধ ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতেই নিক্ষেপ করিবেন।

রাজনীতিকেও সভয়ে পরিহার করিয়াছি। তরুণ যৌবনে যৌবনের অভিমান প্রবল। স্বাবলম্বনের মন্ত্র আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতেছে, এমন সময়ে এ বিষয়ে প্রবন্ধ অনেক পাঠকের কাছে মুখরোচক হইতে পারে; কিন্তু স্বাবলম্বনের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই সর্ব্বনাশ। প্রভুরা অমনই রোষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জীবনকে দুর্ব্বহ করিয়া তুলিবেনই। পৈতৃক সম্পত্তির সম্বন্ধেও সজাগ দৃষ্টি থাকিবে না কি? সুতরাং বুদ্ধিমানের পক্ষে উহা বাঞ্ছনীয় পথ নহে।

ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, প্রেততত্ত্ব—সর্ব্বত্রই ভীষণ গোলযোগ ও মতদ্বৈধ। ও সকল তত্ত্ব এখন কদাচিৎ কোন নবীন লেখকের যশের কারণ হয়। সুতরাং উহাদিগকে দূরে পরিহার করিয়া চলাই বিবেচনাসঙ্গত। তাই তাত্ত্বিক হইবার দুরাশা নাই।

নাটক-রচনাও চলিতে পারিত। কিন্তু মাসিক পত্রিকায় নাটকের—নূতন লেখকের নাটকের কোন সমাদর নাই। বিশেষতঃ যে নাটক রঙ্গমঞ্চের পরিচালকদিগকে তুষ্ট করিবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত, তাহার স্থান পাঠকের কাছে ত নহেই, প্রকাশকদিগের পুস্তকালয়েও স্থানাভাব ঘটে। আর একটা ভয় আছে, মৌলিকতার আভাস থাকিলে, রঙ্গালয়-কর্ত্তৃ[illegible] তাহার রূপ-পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। সুতরাং প্রকৃত অধিকা[illegible]কে, তাহা আবিষ্কার করা আদৌ সহজসাধ্য হয় না। সুত[illegible] ও দুরাশা ছাড়িয়া দিয়া ভালই করিয়াছি।

গল্প আছে, পিতা কদম্বগাছ দেখিয়া পুত্রকে বৃক্ষের না[illegible] বলেন নাই। কারণ, কদম্বের সঙ্গে অনেক স্মৃতি বিজ[illegible] মায় বস্ত্রহরণ পর্য্যন্ত। সুতরাং নীতিবাগীশ পিতা স[illegible] পুত্রকে বৃক্ষটির পরিচয় দেন নাই। এই কাহিনী মনে প[illegible] রুচিসংক্রান্ত কোন প্রকার প্রবন্ধরচনার ধৃষ্টতা বহু পূ[illegible] ত্যাগ করিয়াছিলাম।

সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার চেষ্টা

পরিহার করিলাম ; কারণ, দিলীপীয় কণ্ঠে, সুমিষ্ট ছন্দে গান গাহিবার ক্ষমতা না থাকিলে সঙ্গীত সম্বন্ধে কোন কিছু রচনা করা নিরর্থক। চিত্রবিদ্যাও ঐ অজুহাতে বাদ দিয়াছি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিল্পকলার বিবাদে প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায়।

কবিতা সম্বন্ধে আমার বরাবরই আতঙ্ক ছিল। কারণ, অতি কষ্টে মিল করিতে পারিলেও, বর্ত্তমান ছন্দোময় যুগে নূতন ছন্দের সাহায্যে আসর গরম করিয়া তোলা সহজসাধ্য নহে। তরুণ কবি-বন্ধুদিগের দৈনিক ব্যর্থতা সম্বন্ধে এত কাহিনী জানিতাম যে, এ বিষয়ে উৎসাহই ছিল না। না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণের অপরাধ করিতে পারিব না। বিশেষতঃ ভাবের ঘরে চুরী' 'মৌলিকতাশূন্য', 'অচল' প্রভৃতি মন্তব্য-কণ্টকিত কবিতাগুলি ফেরত পাইবার আদৌ আগ্রহ ছিল না।

তাই ছোট গল্পের আসরে সংগোপনে নামিয়াছিলাম, নিজের জীবনের কাহিনীকে বুকের শোণিতে অনুরঞ্জিত করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়া ভাগ্যপরীক্ষার জন্য এবার শেষ চেষ্টা করিব। ছোট গল্প রচনায় আর্টের পরিচয় দিতে পারা যায়। কিন্তু—কিন্তু—স্রষ্টার বিচিত্র আনন্দানুভূতিলাভের যোগ্যতা অর্জ্জনের সুযোগ কি কখনও মিলিবে না ?

মাজ্ সাহিত্য-সম্মিলন হইতে মোটরে ফিরিতেছিলাম। সাহিত্যিক হিসাবে সেখানে আমার স্থান ছিল না। দর্শক হিসাবে তথায় গিয়াছিলাম। কয়েকখানি মাসিকপত্রের সম্পাদকদিগের সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য আজ হইয়াছিল। যে গল্পটি লিখিয়াছি, এক জনের কাছে পাঠাইয়া দিব।

মোটরের গতিবেগ অপেক্ষাও আমার মনের রথ দ্রুততর বেগে ধাবিত হইতেছিল। কতক্ষণে বাড়ী পৌছিব ?

গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিতেছিল, সন্ধ্যার আকাশে জ্যোৎস্না তখনও ভাল করিয়া ফুটে নাই। চৌরঙ্গীর প্রশস্ত পথে গাড়ী দ্রুত চলিতেছিল। মণিবন্ধের ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, ৬টা বাজিয়া গিয়াছে। বাতাস বড় মধুর লাগিতেছিল।

সহসা চমকিয়া উঠিলাম। পাশ দিয়া একখানি মোটর দ্রুতবেগে বিপরীত দিকে চলিয়া গেল। কিন্তু আমার দৃষ্টি-বিভ্রম হয় নাই। আমার কৈশোর-সঙ্গিনী, জীবনের আরাধ্যা দেবী, আমার সকল সুখ-দুঃখের সমভাগিনী সরমার মুখ কি কখনও ভুলিবার ! নিশ্চয়ই ঐ গাড়ীতে তাহাকে দেখিয়াছি। তাহার সঙ্গে সে কোথায় চলিয়াছে ? গাড়ীর মধ্যে আর কে আছে, তাহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। আমার অনুপস্থিতিতে আমার বিনা অনুমতিতে সে ত কোথাও কখনও যায় না। তবে ?

চকিতে তখনই মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম। মোটর তখন দূরে চলিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি মনে হইল, উহা রমেশের 'অষ্টান্ কার'। নিশ্চয়ই, তাহাতে কোন ভুল নাই।

সহসা মাথার মধ্যে একটা তীব্র বেদনা অনুভব করিলাম—রক্তস্রোত মুহূর্ত্তে মস্তিষ্কে প্রতিহত হইয়াছিল। কেন ?—কেন ?

রমেশের সহিত তাহার ভ্রাতৃসম্বন্ধ আছে। মাঝে মাঝে তাহাদের গৃহে সরমা বেড়াইতে যায়, থিয়েটার-বায়স্কোপেও রমেশ বহুবার তাহার সঙ্গী হইয়াছে। অবশ্য একা নহে। কখনও আমি সঙ্গে গিয়াছি, কখনও রমেশের স্ত্রী এবং ভগিনী প্রভৃতিও সঙ্গিনী হইয়াছে, তাহা জানিতাম। কিন্তু আমার অনুপস্থিতিতে, রমেশের গাড়ীতে—

যে শয়তান আমাকে প্রলুব্ধ করিতেছিল, অতিকষ্টে তাহাকে যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝাইয়া নিরস্ত করিলাম। সে দিনের চকিত দৃষ্টি-বিনিময়ের সঙ্গে মুহূর্ত্ত-স্থায়ী হাসি, অথবা আজিকার সান্ধ্য মোটর-বিহারের মধ্যে সন্দেহের ইতর সঙ্কেতের ছায়াপাত হইবে কেন ? রমেশকে বাল্যকাল হইতে ত চিনি। সরমার প্রকৃতির কোন্ তত্ত্বই বা আমার অবিদিত ? সেই সরলা স্বামিগতপ্রাণা সাধ্বীর সম্বন্ধে সামান্য সন্দেহও অত্যন্ত গ্লানিকর।

সহস্র ধিক্কার দিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম। সত্য বটে, আমার সাহিত্যসেবাসম্বন্ধে সরমার পরিহাস-রসিকতা অনেক সময় সীমা অতিক্রম করিয়া থাকে ; সত্য বটে, গভীর রজনীতে বিনিদ্র অবস্থায় আমি যখন দেবী ভারতীর আরাধনায় তন্ময়, তখন অকস্মাৎ আমার খাতাপত্র কাড়িয়া লইয়া বলপূর্ব্বক আমাকে সে শয্যায় শয়ন করাইয়া দেয় ; কিন্তু এ কথাও সত্য যে, আমার প্রতি তাহার স্নেহ, প্রেম যে অফুরন্ত, তাহার লক্ষ নিদর্শন কি আমি পাই নাই ? সে স্বয়ং বিদুষী, তাহাকে মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি, মানবাত্মার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছি ; কিন্তু তথাপি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনও তাহাকে কোন কার্য্য করিতে দেখি নাই। অথচ তাহার কোন কার্য্যে আমি কখনও বাধাস্বরূপ কোন প্রকার মন্তব্য পর্য্যন্ত প্রকাশ করি নাই।

৩

লেক রোডের ভবনে যখন মোটর আসিয়া থামিল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে। রাজপথের আলোর সহিত আকাশে ত্রয়োদশীর আলোকধারা মিশিয়া যেন স্বপ্নের আভাসের ইঙ্গিত করিতেছিল।

অনুসন্ধিৎসু মন কক্ষে কক্ষে সরমার সন্ধানে আমার দেহকে পরিচালিত করিল। না, সে এখনও ফিরিয়া আসে নাই। আমার সাহিত্যচর্চ্চার খেয়াল এই তরুণীর মনের সকল কামনাকে সার্থকতা দিবে, এমন দুরাশা থাকাই সঙ্গত নহে। সে তাহা হইলে আজ সর্ব্বপ্রথম আমার অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই সিনেমা অথবা থিয়েটারে গিয়াছে। আজ দুই দিন সাহিত্য-সম্মিলনের আনন্দে আমি কলিকাতায় অনুপস্থিত, সুতরাং আমার দেখা পাইয়া অনুমতি লইবার অবকাশই বা সে কেমন করিয়া পাইবে? তাহা ছাড়া আমার অনুমতি দিবার প্রয়োজনও যে আছে, তাহা আমি কোনও দিন তাহাকে বুঝিবার অবকাশও দেই নাই। সে ত আমার সকল খেয়ালেই পূর্ণ উৎসাহ দিয়া অনুক্ষণ আমার পাশে পাশেই অবস্থান করিয়া থাকে। কোন দিন তাহাকে এ বিষয়ে ক্লান্ত হইতে দেখি নাই। এক দিন যদি সে না বলিয়াই—

ঠিক! ঠিক! কিন্তু সন্দেহরূপ শয়তান আমাকে কাবু করিবার জন্য কি ভীষণ চেষ্টাই না করিতেছে!

ছোট গল্পটিকে টানিয়া বাহির করিবার জন্য উঠিলাম। পরিচারক ও পরিচারিকা আমার পরিচর্য্যার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছিল। প্রয়োজন ছিল না। মাস্তু হইতে জলযোগ সারিয়াই আসিয়াছিলাম।

একবার প্রশ্নটা ওষ্ঠাগ্রে আসিয়াছিল—ইনি কোথায় গেলেন? কিন্তু এমন প্রশ্ন নিতান্তই অশোভন হইবে মনে করিয়াই রসনাকে সংযত করিলাম।

গল্পটা কোথায় রাখিলাম? আলমারী, টেবলের ড্রয়ার তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিলাম, সকল রচনাই যথাযথভাবে সজ্জিত আছে। নাই শুধু আমার বুকের রক্ত দিয়া রচিত নূতন ছোট গল্পটি!

মনটা অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইল।

আরাম-কেদারার শয়ন করিয়া আলবোলার শ্রান্তিহরণকারী নলটি মুখে তুলিয়া লইলাম। অপ্রসন্ন মনটাকে কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশির মধ্যে নিমগ্ন করিয়া দিলাম।

"এই যে, কখন্ এলে তুমি?"

চমকিতভাবে সোজা হইয়া বসিয়া তরুণী পত্নীর রহস্যপূর্ণ নয়নের দিকে চাহিলাম। সে আননে শুধু নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতা এবং পবিত্র আনন্দদীপ্তির স্নিগ্ধ আলোক-রেখা সমুজ্জ্বল। কি সন্দিগ্ধ মন আমার!

"তোমার মুখ এত শুক্‌নো কেন?"

তাহার কোমল, পেলব করপল্লব আমার ললাট স্নিগ্ধ প্রলেপে শীতল করিয়া দিল।

আমি তাহার অনুপস্থিতি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করিয়াই বলিলাম, "আমার গল্পটা কোথায় রেখেছ?"

"গল্প, কোন্‌টা?"

সরমা তখন লঘুচরণে কক্ষের অপর প্রান্তে কি একটা কাযে যাইতেছিল। চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সমুজ্জ্বল দৃষ্টিতে আমার মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

সরল, স্নিগ্ধ—অকলুষ দৃষ্টি। সরমা হাসিয়া বলিল, "তোমার সব লেখাই ত তোমার ড্রয়ারে আছে।"

"সেটা কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি না।"

"তবে বোধ হয়, ঘর ঝাঁট দেবার সময় ঝি-চাকর কোথায় ফেলে দিয়ে থাকবে। সে দিন অনেকগুলা জঞ্জাল পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।"

আমি সলম্ফে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমার এত যত্নের, এত সাধনার রচনা অগ্নিদেবের গহ্বরে সমাধিলাভ করিয়াছে!

তখন যদি আমার নায়েব, ম্যানেজার আমার সম্পত্তি-নীলামের সংবাদ দিতেন, সম্ভবতঃ তাহাতে আমি এত বিচলিত হইতাম না।

"তবে কি হবে!—আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল!"

সরমা আমার নৈরাশ্যে বিচলিতা হইয়াছে বুঝিলাম। কিন্তু তাহার ধৈর্য্য অসাধারণ। সে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "[illegible] এলোমেলো স্বভাব গেল না। যদি বুঝেছিলে যে, [illegible] বড় যত্নের, তবে ভাল ক'রে গুছিয়ে রাখতে হয়। [illegible] আর উপায় কি? আবার মনে ক'রে, নতুন [illegible] লেখ।"

সরলা সরমা—সে বেচারা কেমন করিয়া বুঝি[illegible] একবার লেখা যায়, তাহা নষ্ট হইয়া গেলে আর তেমন [illegible] রচনা করা যায় না!

৪

সরমার আজ রমেশের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। তাহার স্ত্রী লীলাবতী সরমাকে লইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের "নষ্টনীড়" পড়িবার জন্য গল্প-গ্রন্থাবলী টানিয়া বাহির করিলাম। আগে একবার পড়িয়াছিলাম, এখন আবার উহা পড়িবার জন্য একটা ব্যগ্রতা অনুভব করিলাম। সরমার শয়ন-ঘরের আলমারীতে বইখানি ছিল।

বইখানি খুলিবামাত্র একখানা ভাঁজকরা কাগজ সহসা পড়িয়া গেল। কৌতূহলবশে উহা তুলিয়া লইলাম। এ কি? সরমাকে এ পত্র কে লিখিল? এ যে রমেশের হস্তাক্ষর। উভয়ের মধ্যে গোপনে পত্রব্যবহার চলে? তবে—তবে—

অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া পত্রখানি পড়িলাম।

"সরো,

আজ বহুকালের ঈপ্সিত সুযোগ আসিয়াছে। এইমাত্র সে সুযোগ ঘটিল। পাগলটা কাল হইতে মাজুতে গিয়াছে। আজও সে আসিবে না। এমন সুযোগ ছাড়া যায় না। আমার গাড়ী তোমাকে আনিতে যাইবে। কৈফিয়ৎ তোমাকে কাহারও কাছে দিতে হয় না। সুতরাং কোথায় যাইতেছ, সে প্রশ্ন অনায়াসে গোপন থাকিবে। যদি সার্থকতা চাও, এ সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত নহে। তোমার আগমন-প্রতীক্ষায় থাকা গেল। ইতি—

তোমার রমুদা।"

আকাশের বজ্র! চূর্ণ কর, এ মস্তিষ্ককে অণু-পরমাণুতে মিশাইয়া দাও! আমার সাধ্বী পত্নী—যাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসি, বিশ্বাস করি—সংসার-মরুর একমাত্র ওয়েসিশ বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকি, সেই সরমা অভিসারিকা, কলঙ্কিনী!

উঃ, পৃথিবীতে বিশ্বাসের যোগ্য পুরস্কার এমন ভাবেই ঘটিয়া থাকে!

একে একে সব কথা বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালার ন্যায় হৃদয়কে তীব্রদাহে অস্থির করিয়া তুলিল। তারিখ মিলাইয়া দেখিলাম, মাজু হইতে যে দিন আমি ফিরিয়াছি, এ সেই তারিখের পত্র। পথে রমেশের মোটরে সরমার অভিসার-যাত্রা দেখিয়াছি। চোখে চোখে বিদ্যুতের স্ফুরণ লক্ষ্য করিয়াছি!

বড় জ্বালা, বড় ব্যথা! পৃথিবীর সমস্ত আলোক যেন নিভিয়া আসিতেছে। নির্জ্জীবের ন্যায় আরাম-কেদারায় পড়িয়া রহিলাম।

"অমন ক'রে শুয়ে আছ কেন? অসুখ করেছে?"

সহানুভূতি, স্নেহ, প্রেম যেন সহস্র ধারায় উদ্বেল হইয়া উঠিল। সরমার দেহে রূপের জ্যোৎস্না তরঙ্গায়িত হইতেছিল, তাহার আননে প্রসন্নতা, আনন্দের মধুর দীপ্তি।

পার্শ্বে বসিয়া সে আমার কেশরাজির মধ্যে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিতে করিতে বলিল, "মাথা তোমার এত গরম কেন?"

উদ্বেগে, শঙ্কায় মুহূর্ত্তে তাহার আনন ম্লান হইয়া গেল।

ক্রোধে অভিমানে আমার কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়াছিল। আমি সজোরে আমার ললাট হইতে তাহার হাতখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলাম।

সরমা চিন্তিত হইয়া বলিল, "কি হয়েছে? রমুদাকে আসতে ব'লে পাঠাব?"

আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পতিত হইল; তীরের মত উঠিয়া বসিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিলাম, "ব'লে পাঠাবার ত দরকার নেই—কাছ-ছাড়া ত বেশীক্ষণ হওনি।"

সরমার চোখে মুখে গভীর বিস্ময়ের রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "কি বলছ? তুমি অমন কচ্ছ কেন?"

আমি তাহার অভিনয় আর সহ্য করিতে পারিলাম না, চিঠিখানা তাহার মুখের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। কঠোর নির্ম্মম স্বরে বলিলাম, "পড়! অভিনয়ে যে তুমি দক্ষ হয়ে উঠেছ, তা এবার ভাল ক'রে বুঝলাম।"

সরমা পত্রখানা কুড়াইয়া একবার তাহার উপর দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্ত মাত্র। পরক্ষণেই আমার আঁধারের মত কালো মুখখানার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই আপনাকে সামলাইয়া লইল, মনে হইল, দারুণ ঘৃণায় লজ্জায় তাহার মুখখানা একবারে রাঙ্গা ও পরমুহূর্ত্তে পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নীলোৎপল তুল্য আয়ত নয়ন আমার উপর স্থাপন করিয়া গম্ভীরভাবে একবারমাত্র বলিল,"ছি!" তাহার পর নিমেষে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল।

৫

দিন আর কাটে না। স্বামি-স্ত্রী অথচ পরস্পর কত বিচ্ছিন্ন—যেন কত অপরিচিত! একই গৃহে অবস্থিতি, অথচ যে যাহার মহলে স্বতন্ত্রভাবে দিনযাপন করি।

আজ প্রায় পক্ষাধিককাল সরমাতে আমাতে বাক্যালাপ নাই, দেখা-সাক্ষাৎ বড় কম। দৈবাৎ আমার অন্দরের শয়ন-কক্ষে প্রয়োজন হইলে কচিৎ কখনও উভয়ের চোখোচো হইয়া যায়। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। তখনই উভয়েই ফিরাইয়া লইয়া যে যাহার কাযে চলিয়া যাই। প্রাণে কেমন করে। নির্জ্জনে থাকিলেই মনে হয়, পত্রে

সরমা নির্দ্দোষ। কিন্তু অভিমান ও সন্দেহ রাক্ষসের মত বদন ব্যাদান করিয়া পরমুহূর্ত্তেই গ্রাস করিতে আসে।

আর রমেশ? বাল্যবন্ধু রমেশ? সে যে আমার এখন প্রধান শত্রু। পথে দেখা হইলে সে আমার সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু আমি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া আসিয়াছি। আমার বাড়ীতে আসিবার তাহার উপায় ছিল না, কেন না, আমি পত্র দ্বারা তাহাকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলাম, আসিলে সে অপমানিত হইবে। একবার মনে হইয়াছিল, উহাকে খুন করিব। সে জন্য প্রস্তুত হইয়া বাড়ীর বাহির হইয়াছিলাম। কিন্তু উহার বড় সৌভাগ্য, ঠিক সেই সময়েই সে একটা ডাক লইয়া মফঃস্বলে গিয়াছিল। তাহা বলিয়া তাহার উপর বিজাতীয় ক্রোধ ও ঘৃণার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

আশ্চর্য্য এই সমাজ! এই লোকটা সমাজে গণ্যমান্য হইয়া ডাক্তারী করিয়া লোকের শ্রদ্ধাপ্রীতি অর্জ্জন করিতেছে —সমাজ তাহাকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছে,—অথচ এই লোকটার চরিত্র কি জঘন্য! পরস্ত্রীর উপর ইহার লোভ—আসক্তি। পরের সংসার এই প্রকৃতির দানবরা ছারখার করিয়া দেয়, কিন্তু উহাদের বিপক্ষে সমাজ একটি কথাও বলে না, বরং উহাদিগকে সমাদরই করিয়া থাকে। আর নারী!—যাক্, সে কথা না বলাই ভাল। কাগজেই পড়ি, পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান গুণ্ডা হিন্দুনারী হরণ করিয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে বলপূর্ব্বক নারী অপহৃতা, লাঞ্ছিতা ও হৃতসর্ব্বস্বা হয়। অমনই সমাজে তাহার আর স্থান হয় না! কেন, নারী বলিয়া! আর পুরুষ দুশ্চরিত্র লম্পট হইলেও সমাজে তাহার সমাদর কেন?

তবে একটা কথা, রমেশটা মিটমিটে শয়তান, ভিজে বেড়ালটি সাজিয়া সমাজে চরিয়া বেড়ায়। আমার সোনার সংসারে এই লোকটাই যে আগুন জালিয়া ছারখার করিতেছে, তাহা আমরা তিন জন ভিন্ন সংসারে আর কে জানে? আমাদের মত সমাজে এমন গুপ্তলীলা অন্য ঘরেও চলিয়া থাকে। বিশেষতঃ আধুনিক সবুজ সাহিত্যের প্রভাবে রক্তসম্বন্ধও সে সংযমের বাধা মানে না, তাহা জানিতে বাকী কাহার আছে?

নাঃ!—আর পারা যায় না। এ ভাবে জীবন যাপন করা অসহ্য বলিয়াই বোধ হইতেছে। দিন কয়েক কোথাও বেড়াইয়া আসিব? কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই। বাহিরের লোককে ত কিছু জানিতে দেওয়া হইবে না। অন্তর পুড়িয়া খাক্ হইয়া গেলেও মুখের একটি পেশীকেও নড়িতে দেওয়া হইবে না। আমি বিদেশে বেড়াইতে যাইব—আর আমার পত্নী, গৃহিণী, সাধ্বী! তিনি কোথায় থাকিবেন?

না, বাড়ী ছাড়িয়া নরকে গেলেও এ বন্ধন হইতে মুক্তি নাই। হিন্দুশাস্ত্রে না কি বলে, ইহকালেও নাই, পরকালেও নাই। তাই হউক, বাড়ীতেই মুখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিব, ঠাট বজায় রাখিব। কিন্তু এমন করিয়া চলিবে কত দিন!

সুখ কিছুতেই পাইলাম না। সংসারে ত ঐ জিনিসটা নাই। ইহার উপর বাণীর সেবায়ও কোন সুখ পাইলাম না, উহা ত্যাগ করিয়াছি। গল্পটা অকস্মাৎ অগ্নিগর্ভে ভস্মীভূত হওয়ায় আমার সমস্ত সাহিত্য-প্রচেষ্টা যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

বাণীও চরণে ঠেলিলেন, সংসার-মরুর মধ্যে একমাত্র মরুদ্বীপ যিনি—তিনিও আমায় ত্যাগ করিলেন। এ জীবনে তবে কি প্রয়োজন? কিন্তু এক একবার মনের মধ্যে কে যেন একটা আলোক-রশ্মিপাত করে—চপলা-চমকের মত উহা যেন মনের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া মুহূর্ত্তে মিলাইয়া যায়। আমি ত অন্ধ নহি? সর্পভ্রমে রজ্জুকে ত দূরে পরিহার করি নাই? সরমা—আমাগতপ্রাণা, না, না, সে কি কখনও এমন নরকের জ্বালাময় হ্রদে পতিত হইতে পারে? তবে ঐখানা কিসের পত্র? আবার শতবৃশ্চিক বুকের মাঝে দংশন করিতে থাকে। এ সমস্যা কে সমাধান করিয়া দিবে?

"এই যে, ঘরে আছিস?"—নির্লজ্জ রমেশটা কোন্ মুখে আবার আমার কক্ষে পদার্পণ করিল! আমার মুখ-চক্ষু লাল হইয়া উঠিল। সে সেই ভাবটা লক্ষ্য করিয়াই তাড়াতাড়ি বলিল, "দরোয়ান দিয়ে মেরে তাড়িয়ে ত দিবিই, কিন্তু তার আগে তোর সঙ্গে আমার একটু বোঝাপড়া আছে।"

আমি কোনও কথার জবাব না দিয়া তাহার দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসিলাম। কিন্তু একবার অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিলাম, শয়তানটা মুচকিয়া মুচকিয়া হাসিতেছে। আপাদমস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু কোন কথা বলিলাম না। বেহায়াটা হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা যদিও আমাদের সমাজে ঠিক ডাইভোর্সটা চলে নি, তা হ'লেও নিজেরা চালিয়ে নিলেই ত আইন হ'ল। কি বলিস? এ রকম মনঃকষ্টে থাকার চেয়ে—"

কথাটা তাহাকে শেষ করিতে না দিয়া এক লাফে তাহার সান্নিধ্যে গিয়া তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিলাম। ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গেলাম।

অতি সহজে, অনায়াসে আমার কবল হইতে রমেশ আপনাকে মুক্ত করিয়া লইল, তাহার জিজিৎসু জানা ছিল, আমি তখন তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম—আমি তাহার হাতের কৌশলে নিজেই ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলাম! সে হো হো হাসিয়া উঠিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "ভাগ্যে কুস্তীর প্যাঁচটা জানা ছিল, না হ'লে সাবাড় করেছিলি একেবারে! ভাগ্যে দেশটা জুলুদের না; না হ'লে তোর পরিবারের উপর আমার যখন নজর পড়েছে, আর তোর চেয়ে আমার গায়ে জোর বেশী আছে, তখন তার চুলের ঝুঁটিটা ধরতাম আর এখান থেকে নিয়ে গিয়ে নিজের গুহার মধ্যে নিয়ে যেতাম। কিন্তু তা ত হবার যো নেই; এ যে সভ্যতার রাজ্য—এখানে আইন-কানুন বাধা-বিঘ্ন মেনে না চললে পেনাল কোডে ধরবে।"

আমি কাঠ হইয়া শুনিয়া যাইতেছিলাম, প্রতিবাদ করিবার শক্তিও ছিল না। হঠাৎ রমেশটা গম্ভীর হইয়া বলিল, "ভেবেছিলুম, তোর মত নীরেট গাধার ভুল ভেঙ্গে দেবো না, কিন্তু বাড়াবাড়ি কিছুরই সহ্য করতে পারিনি, তাই একবার ছুটে এলাম। নইলে ভেবেছিস কি, তোর মত অকাল-কুষ্মাণ্ডের মুখদর্শন করতাম? এই কেতাবখানা রইলো, চোখ যদি থাকে—সব দেখতে পারবি, সব বুঝতে পারবি। বহু জন্ম তপস্যা করেছিলি ব'লে সরমার মত স্ত্রী পেয়েছিস, জানিস গাধা?"

রমেশ দাঁড়াইল না, তখনই ধুপ-ধাপ করিয়া তিন চারিটা সোপান একসঙ্গে অবতরণ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম।

বলে কি? সত্যই কি তাই? সত্যই কি আমি নীরেট গাধা? এ কয় দিন কেবল বাতাসের সঙ্গেই যুদ্ধ করিয়াছি?

টেবলের উপরে কেতাবখানা পড়িয়া ছিল। হাতে তুলিয়া লইতেই দেখিলাম, একখানি প্রথম শ্রেণীর সচিত্র মাসিক পত্রিকা, প্রচ্ছদপটে একটা নীল পেন্সিলের ক্রশ-মার্কা করা। কি আছে ইহাতে? সূচিপত্রের পাতাখানা খুলিবামাত্র আমার বিস্মিত পুলকিত নেত্রের সম্মুখে এ কি প্রতিফলিত হইতে দেখিলাম! এ যে আমারই নাম! গল্পটির নাম দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না, খানিকটা পড়িয়া বুঝিলাম, ইহা আমারই সেই হারানো গল্প!

কিন্তু—কিন্তু—কি করিয়া এই রচনা এই পত্রে স্থান পাইল? আমি ত জানি, তাহা আবর্জ্জনাস্তূপের সহিত অগ্নির ক্ষুধা মিটাইয়াছে!

মনের জমাট অন্ধকারের সম্মুখ হইতে একখানা পর্দা সরিয়া গেল। হস্তলিখিত রচনার সন্ধান ত সরমা ছাড়া জগতে কেহ জানে না। সে-ই-কি—সে-ই-কি?—

"খাবার দেবে কি এখন?"

আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম। বলিতে ভুলিয়াছি, প্রতি দিন আহারের পূর্ব্বে একবার সরমা আমায় আহ্বান করিত। কিন্তু মাত্র একটি কথা। তাহার পর সে চলিয়া যাইত। আহারকালে নিকটেই থাকিত, বুঝিতে পারিতাম; কিন্তু দেখা পাইতাম না।

আমি ব্যগ্র উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, "সরমা, কোথা থেকে কি হয়ে গেল, বল, আমার বড় জানতে ইচ্ছে কচ্ছে।"

"কি বলবো? বলবার ত অবসর দাওনি।"

"অপরাধ স্বীকার করছি। জান ত রাগ চণ্ডাল।"

"তা হ'তে পারে, কিন্তু, বিয়ের কনেটি হ'তে এত দিনের ব্যবহারেও যখন আমায় বুঝতে পারনি, তখন আমার বলবার কি মুখ রেখেছিলে?"

"বলেইছি ত, অপরাধ স্বীকার করছি, কিন্তু তুমিই বা কোন্ ভুল ভেঙ্গে দিলে?"

সরমার মুখে স্নিগ্ধ দীপ্তি। সে বলিল, "নারীত্বের কি এতটুকুও আত্মসম্মান নেই? তুমি—"

"নিশ্চয়ই আছে, পাঁচশোবার আছে। আমি নীরেট গাধা না হ'লে—" আমি আগ্রহভরে সরমার হাতখানি চাপিয়া ধরিলাম, বলিলাম, "বল, বল, আমার সমস্যার সমাধান ক'রে দাও। তুমি কি—তুমি কি রমেশের সঙ্গে মোটরে একলা বেড়াতে যাওনি?"

"যদিই গিয়ে থাকি, কি ক্ষতি হয়েছে? এতটুকু বিশ্বাসও কি নেই? অমন ভালবাসার মূল্য কি? আমি ত তোমারই লেখা নিয়ে লীলার সঙ্গে তার বন্ধুর কাছে গিয়েছিলাম। তুমি জান না, লীলা 'প্রসূনে' ছদ্মনামে কবিতা লেখে। সে কাগজের যুগ্ম সম্পাদক লীলার বান্ধবী ও তার স্বামী"—

আমি লাফাইয়া উঠিয়া বলিলাম, "এ্যাঁ, বল কি? সত্যই আমি গাধা—"

সরমা হাসিয়া বলিল, "চল, সব বলছি গিয়ে। রমুদা কি ষড়যন্ত্র করেছিলো, শুনলে অবাক্ হয়ে যাবে।"

আনন্দের আতিশয্যে আমার বাক্শক্তি রহিত হইয়া গেল, আমি যন্ত্রচালিতবৎ সরমার অনুসরণ করিলাম।

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়।

পথের স্মৃতি

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিন কি অসীম উৎসাহ আর অবিরাম পরিশ্রমের মধ্য দিয়া যে বৌদির কাটিয়া গেল, তাহা আর বলিবার নহে। কিন্তু ফলও ইহার ফলিল। শুনিলাম, সারারাত্রি গায়ের বেদনায় বৌদি কেবলই ছট্‌ফট্ করিয়াছে এবং নিদ্রাহীন রাত্রি কাটাইয়া পরদিন অনেক বেলায় যখন বৌদি উঠিল, তখন তাহার বেশ একটু জ্বর হইয়াছে। বৈকালে এই অল্প জ্বরের উপরেই বেশী করিয়া আবার জ্বর আসিল এবং দুই দিনের মধ্যে সে জ্বরের আর বিরামই হইল না। তৃতীয় দিনে বৌদির জ্বর অন্য দিন অপেক্ষা আরও বেশী হইল।

এক দাগ ঔষধ খাওয়াইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আজ কি মাথার যন্ত্রণা বড্ড বেশী হচ্ছে, বৌদি?" আরক্ত চক্ষু দুইটি আমার দিকে ফিরাইয়া, দুই হাতে মাথাটাকে খুব জোরে টিপিয়া ধরিয়া বৌদি বলিল—"মাথার যন্ত্রণা? উঃ! কে—ঠাকুরপো?—এখন দিন না রাত বলতে পার?" পার্শ্বে বিনুদা বসিয়া ছিল, জিজ্ঞাসা করিল—"মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?"

"মাথার? কোথায় মাথা? আমার ত মাথা নেই। মাথা নেই—মাথা নেই—মাথা নেই—মাথা নেই—মাথা ম'রে গেছে—ম'রে গেছে গো! জান না? সেই—সেই—উঃ! দেখ ঠাকুরপো, একটা শিয়াল—না না—একটা হাড়্‌গিলে—ছুট্ ছুট্! উঃ! কি ছুটতেই পারে বাবা!" বলিয়া খানিকক্ষণ নিঝুম হইয়া বৌদি চোখ বুজাইয়া রহিল। তাহার পর তেমনি চোখ বুজাইয়াই অত্যন্ত মৃদুস্বরে কহিল—"কি জিজ্ঞাসা করছিলে? হ্যাঁ, মাথার যন্ত্রণাটা আজ বড্ড বেশী।"

"আর কোন যন্ত্রণা হচ্ছে, বৌদি?"

"কিছুই বুঝতে পারছি না, অনেক রকমই হচ্ছে।—ঐ প'ড়ে গেল! ধর্ ধর্—যাঃ!" বলিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল—"যাই গো আমি জীবন-স্বামী—।"

ঘণ্টাখানেক পর ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গেল, কহিল—"জ্বরটা এইবার রেমিশান হচ্ছে। তিন দিনের পর জ্বরটা ছাড়ছে ব'লে একটু restless হয়েছেন—যা হোক ওঁকে বেশী বকতে দেবেন না। একটু ঘুমুতে পারলেই ভাল হয়, যদিও ঘুমুতে উনি এখন বোধ হয় পারবেন না।"

ডাক্তার চলিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে বিনুদাও উঠিয়া গেল। বৌদিকে বলিলাম—"একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর বৌদি, আমি যাই।"

"আমিও যাই।"

"কোথায় বৌদি?"

"ওই যে ডাকছে।"

"একটু চুপ ক'রে ঘুমাও দেখি।"

"ঘুমুচ্ছিলুম ত, ঘুম যে ভেঙ্গে গেল ভাই। (সুর করিয়া) 'তাই গো আমার শেষ নিশাতে তন্দ্রা ভেঙ্গেছে'। উঃ! ঠাকুরপো, ভাই, মাথাটা আমার আছে কি না দেখ ত, কেউ কেটে নিয়ে যাচ্ছে না কি?" মিনিট খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বৌদি পাশ ফিরিয়া শুইল। সেই অবস্থায় চোখ বুজাইয়া অতি মৃদু মৃদু কহিল—"সত্যি ঠাকুরপো, আমায় চারিদিক থেকে কেবলই ডাকছে,—কাছে এসে ডাকতে ডাকতে আবার দূরে চ'লে যাচ্ছে! কেমন জান? যেমন জানকীর দুঃখে মা বসুন্ধরা তাঁকে কোল বাড়িয়ে ডেকেছিল—আয়, আয়, আয়, ঠিক তেমনি।" বলিয়াই বৌদি আবার গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিল—"যাই গো আমি জীবনস্বামী তন্দ্রা ভেঙ্গেছে।"

আমি দেখিলাম, কাছে কেহ থাকিলেই বৌদি এই রকম অনর্গল বকিতে থাকিবে, তাই উঠিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

ডাক্তারের অনুমানই সত্য হইল। সেই রাত্রিতেই বৌদির জ্বর রেমিসন্ হইল। তাহার পর দুই দিন ধরিয়া আর একবারেই জ্বর আসিল না। পরের দিন সপ্তমীপূজা, সেদিন বৈকালের দিকে একটু যেন বৌদির গা গরম হইল, কিন্তু ডাক্তার কহিল যে, উহা কিছুই নহে।

এই গ্রামটিতে কয় বৎসর হইতে বারোয়ারীতে দুর্গোৎসব

হইয়া আসিতেছে। এই কার্য্যের মূলও ছিলাম যেমন আমি, তেমনই অনেকটা পরিমাণে আমারই অর্থ ও পরিশ্রমের উপরই ইহা নির্ভর করিত। এ বৎসরও মাকে আনা হইয়াছে, কিন্তু বৌদির অসুখের জন্য এবার আমি অন্যান্য বৎসরের মত ইহাতে তেমন ভাবে যোগ দিতে পারি নাই। কয় দিনের পর সে দিন বাড়ী হইতে বাহির হইবার অবকাশ পাইয়া ঠাকুরতলাতে আসিলাম। মহামায়াকে দর্শন করিয়া, সমস্ত বিকালটা সেখানে কাটাইয়া সন্ধ্যার পর বাটী ফিরিয়া আসিলে, বৌদি জিজ্ঞাসা করিল,—"আজ মহাষ্টমী, ঠাকুরপো?" তাহার শিয়রের ধারের চেয়ারখানার উপর বসিয়া বলিলাম—"হাঁ বৌদি।"

"আমি আরতি দেখতে যাব।"

"কোথায়?"

"ঠাকুরতলায়।"

"তুমি পাগল হয়েছ, বৌদি? এই শরীর নিয়ে তুমি যাবে ঠাকুরতলায়?"

"হ্যাঁ ঠাকুরপো, যাবো। মা এত কাছে এলেন, একবার দেখবো না, চোখ বুজিয়ে থাকবো? চোখ বুজিয়েও যে তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। একটিবার আমি যাব, ঠাকুরপো।"

বিনুদা আসিয়া কহিল,—"হ্যাঁ, ঠাকুরতলায় ঠাকুর দেখে অমনি একবার শিবের মাথায় জলটাও দিয়ে এস, তার পর মিত্তির-বাটীর সকলকে নেমন্তন্ন ক'রে এসে, কালকে উদয়াস্ত খেটে তাদের ভাল ক'রে খাইয়ে দাইয়ে দাও। দিয়ে—"

"আচ্ছা গো আচ্ছা, বলেছি, আমার ঘাট হয়েছে, আর বোলব না।"

"না—না—তা কি হয়। ঠাকুরতলায় আজ একবার যেতে হবে বৈ কি।" আমি পাল্কী ডেকে আনি।" বলিয়া বিনুদা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আমিও বাহিরে আসিয়া বারান্দায় আরামকেদারাখানার উপর বসিয়া পড়িলাম। সেইখান হইতে শুনিতে পাইলাম, সন্ধ্যা কহিল—"বড় কী, তুমি এ যা-তা বলতে আরম্ভ করেছ। সাত দিনের এই অসুখের পর এই দুর্ব্বল শরীর নিয়ে আজ তুমি যাবে ঠাকুরতলাতে?"

জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলাম, দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরিয়া শুইতে শুইতে বৌদি কহিল—"ওরে যাব না—যাব না—যাব না। বাবা রে বাবা, একবার বলেছি ব'লে সকলে একেবারে হাঁ-হাঁ ক'রে এসেছে!"

অষ্টমী কাটিয়া গেল, নবমীও কাটিল। মহামায়ার সাম্বৎসরিক উৎসবের শেষ হইল। কয় দিন ধরিয়া ক্ষুদ্র গ্রামখানির উপর যে একটা উৎসাহ ও পুলকের সাড়া পড়িয়াছিল, নবমীর নিশান্তের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অবসান হইল। ঠাকুরতলায় ঢুলীদের ঢোল-কাঁসর হইতে আজ বিজয়ার প্রভাত হইতে বিদায়ের বাদ্য বাজিতে সুরু করিল।

এ দিক্‌কার ঘরে বসিয়া কি-একখানা ইংরাজী নভেল লইয়া আমি পড়িতেছিলাম। আজ বৌদি অন্নপথ্য করিবে। সম্মুখে মেজেয় বসিয়া বৌদির জন্য মাছের ঝোলের তরকারী কুটিতে কুটিতে সন্ধ্যা আবোল-তাবোল কত কি বলিয়া আমায় বিরক্ত করিতেছিল। শেষে তাহার কথার জবাব দেওয়া বন্ধ করাতে, বঁটী ও তরকারীর থালা লইয়া সন্ধ্যা নীচে নামিয়া গেল। খানিক পরে আবার পায়ের শব্দে বহি হইতে মুখ ফিরাইয়া দেখি, বৌদি একখানি পাটের সাড়ী পরিয়া আমার সামনে দাঁড়াইয়া। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ কি বৌদি?"

"যাবো।"

"কোথায়?"

"যেতেই হবে একবার,—ঠাকুরতলায়। আজ আর তোমাদের কারো কথা আমি শুনবো না।"

"আট ন'দিন পরে আজ দুটি ভাত খাবে, আজ তুমি কখনো ঠাকুরতলায় যেতে পার? আর পূজো ত শেষ হয়ে গেছে বৌদি, আজ ত বিসর্জ্জন।"

"সেই জন্যেই ত আজ একবার যেতেই হবে। আর আজ যদি একটিবার তোমরা আমায় যেতে না দাও, তা হ'লে আবার কিন্তু আমার অসুখ করবে। সমস্ত রাত স্বপ্ন দেখিছি, মা আমায় খালি ডাকছেন।"

"আচ্ছা বৌদি, মাকে তোমায় দেখাব। বিসর্জ্জনের সময় এই পথ দিয়েই ঠাকুর নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব এখন। এই দুর্ব্বল দেহ নিয়ে তুমি কি কখনো এতটা পথ যেতে পার?"

অসম্ভব ধীর গলায় বৌদি কহিল—"মাকে দেখবার জন্যে হিড় হিড় ক'রে তাঁকে আমার বাড়ীর দরজার সামনে টেনে আনাবো? এমন কথা আর বোলো না, ঠাকুরপো, ওতে পাপ হয়। আর তা ছাড়া, দেহ ত আমার দুর্ব্বল নয়। তোমাদের চেয়ে আমার দেহে পায়ে বল আছে। আমি এখনি এক কোশ, দু'কোশ, চার কোশ

পারি। আমার সঙ্গে তুমি হাঁটতে পারবে? চল ঠাকুরপো, ওঠ ভাই, লক্ষীটি।" দেখিলাম, আজ বৌদি না-ছোড়বান্দা। প্রকৃতপক্ষে, কাহারও মানাই আজ বৌদি মানিল না। বিনুদা আসিয়া বলিল, সন্ধ্যা অনেক করিয়া বুঝাইল, কিন্তু কাহারও কথাই আজ আর বৌদি শুনিতে চাহিল না, উপরন্তু সকলের এই বাধাপ্রদান ও পীড়াপীড়িতে তাহার নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া আসিল। তখন অগত্যা একখানি পাল্কীর বন্দোবস্ত করিয়া তাহাকে ঠাকুরতলায় লইয়া আসা হইল। বিনুদা ও আমি সঙ্গে আসিলাম।

তখন সকাল-বেলায় ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের দলই ঠাকুরতলায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বৌদির সেই রোগশীর্ণ পাণ্ডুর মুখে একটা গভীর তৃপ্তি ও প্রফুল্লতার ভাব ফুটিয়া উঠিল। মিনিট দুই তিন ধরিয়া অপলকনেত্রে প্রতিমা দর্শন করিবার পর, আমার মুখের দিকে চাহিয়া বৌদি কহিল—"এইখানে একটু বসি, আমার বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেমন ক'রে উঠছে।" বিনুদা কহিল—"তা হ'লে আর ব'সে দরকার নেই, প্রণাম ক'রে বাড়ী চল!"

বুকের উপর হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বৌদি সেইখানে মাটীর উপর বসিয়া পড়িল। একটা গভীর বেদনার ভাব নিমেষে তাহার রক্তহীন মুখের উপর ছাইয়া পড়িল। স্পষ্টই বোধ হইল, যেন একটা তীব্র বেদনা প্রাণপণ-শক্তিতে বৌদি বুকের মধ্যে চাপিয়া সহ্য করিয়া লইতেছে। ভিতর-ভিতর এই যন্ত্রণা চাপিতে চাপিতে, গলায় আঁচল জড়াইয়া দেবীকে প্রণাম করিবার জন্য বৌদি সেইখানে মাটীর উপর মাথা নত করিতে গিয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মান বিনুদার পায়ের উপরই তাহার মাথা একবারে লুটাইয়া পড়িল। সেই মুহূর্ত্তেই 'কি হ'ল' বলিয়া বিনুদা চীৎকার করিয়া উঠিল! কিন্তু যাহা হইল, তাহা বুঝিতে বিনুদারও বাকী রহিল না, আমারও বাকী রহিল না। একটু দেখিতেও অবসর পাইলাম না, একটু ভাবিতেও অবসর পাইলাম না। কোথা হইতে নিমেষে যেন কি হইয়া গেল। কি যে বলিব, কি যে করিব, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, শুধু হতভম্বের মত দেবদারু-পাতা-জড়ান সেই বাঁশের খুঁটি ধরিয়া নির্জ্জীবের মত সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

বিনুদার চীৎকারে তখনই অনেকে প্রতিমার সম্মুখে ছুটিয়া আসিয়া জমা হইল। কে এক জন ছুটিয়া ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিতে গেল, আর এক জন একখানি পাখা লইয়া জোরে জোরে বৌদিকে বাতাস করিতে লাগিল। আমি বজ্রাহতের মত শুধু দাঁড়াইয়াই রহিলাম আর ভাবিতে লাগিলাম, ইহারা করিতেছে কি? কাহার জন্যই বা ডাক্তার আনিতে ছুটিল আর কাহার মাথাতেই বা বাতাস করিতে লাগিল! কিন্তু মুখ দিয়া আমার কোন কথাই বাহির হইল না। কে যেন হাত দিয়া আমার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিল, কে যেন মন্ত্রশক্তিতে আমাকে পাষাণে পরিণত করিয়া ফেলিল।

ডাক্তার হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া বৌদিকে দেখিয়াই যখন বলিল—"কি জন্যে আর আমায় নিয়ে এলেন, পঙ্কু বাবু?" তখন মনে মনেই বলিলাম যে, আমি তোমায় ডাকি নি ডাক্তার, আমি তোমায় ডাকি নি!

একবার প্রতিমার দিকে চাহিয়া দেখিলাম। আজ বিদায়ের দিনে জগন্মাতার মুখে যেন আর হাসি ধরিতেছে না। এ রকম হাসি এ কয় দিনের মধ্যে মায়ের মুখে আর দেখি নাই। মা গো, জগতে অতুলনীয় তোমার এই কন্যা-রত্নটিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবার জন্যে তোমার এত ছল, এত আয়োজন, মা?—এত তোমার আনন্দ, এত হাসি?

বিনুদা সেইখানে বসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পদতলে বৌদির রুক্ষ চুলগুলি তখনও লুটাইতেছিল। আমি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, খুটি ধরিয়া সেইখানের ধূলার উপর বসিয়া পড়িলাম।

ডাক্তার বলিল—'হার্টফেল', গ্রামের লোকরা বলিল—পুণ্যবতী, সতীলক্ষ্মী,—মেয়েরা বলাবলি করিল—মানুষ নয়, শাপভ্রষ্টা স্বর্গের দেবী।—কেবল মুখ দিয়া বাহির হইল না কিছু সন্ধ্যার ও বিনুদার। সন্ধ্যা তবুও প্রথম একদফা খানিক কান্নাকাটি করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু বিনুদার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। চোখও তাহার একটিবারের জন্য ছল-ছল করিল না!

* * * * *

শিলাই-তীরের শ্মশান। একরত্তি গ্রাম, তার শ্মশানও তেমনই একরত্তি। কদাচিৎ কালে-ভদ্রে দুই একটি চুলী হয় ত বা এ শ্মশানে জ্বলে। কারণ, গ্রামের অধিকাংশ লোকই প্রায় নিঃস্ব। জীবিতকালে রোগের চিকিৎসাই যাহারা করিতে পারে না, রোগ হইলে পথ্যের সংস্থানটুকু পর্য্যন্ত করা যাহাদের অসাধ্য হইয়া পড়ে, মরিয়া গেলে পোড়াইবার ব্যয়-ব্যবস্থা তাহারা কেমন করিয়া করিবে? তাই অধিকাংশ

মৃতদেহ গ্রামের বাহিরে নদীতীরে ফেলিয়া দেওয়ার পর, শৃগাল-কুকুর শকুনিতেই তাহার গতি করিয়া দেয়।

বেলা তখন অপরাহ্ণ গড়াইয়া পড়িয়াছে। ক্ষুদ্র শ্মশানের বুকে এক ধারে বৌদির চিতা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। অদূরে কতকগুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট বাবলা-গাছের ছায়ায় বসিয়া শ্মশান-বন্ধুরা পরস্পর কথা কহিতেছিল। বিনুদা নাই। মুখাগ্নি শেষ করিয়া বিনুদা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। মুখে আগুন দিতে প্রথমে বিনুদা কিছুতেই রাজী হয় নাই, খুব গণ্ডগোল বাধাইয়াছিল, বলিয়াছিল—'ওর মুখে আমি কিছুতেই আগুন দিতে পারব না, জগতে অনেক লোক আছে, যে-কেউ এসে দিয়ে যাক্'। অনেক ব্যাপারের পর তবে তাহাকে রাজী করাইতে পারা গিয়াছিল। কিন্তু সেই আগুন দিবার পরই বিনুদা কোথায় যে ওই দিকে চলিয়া গিয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত ফিরিয়া আইসে নাই। অনেকক্ষণ পূর্ব্বে একবার তাহাকে দেখিয়াছিলাম—নদীর বাঁকের উপরকার ঐ কলাই-ক্ষেতখানার আলের উপর। যে বুড়া লোকটি এখন ক্ষেতের ঢেলা ভাঙ্গিতেছে, উহারই হাত হইতে উহার হুঁকাটি লইয়া আলের উপর উহার পাশে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, আর হাসিয়া হাসিয়া উহার সহিত কি-সব কথা কহিতেছিল। তার পর বিনুদা যে কোথায় গেল—জানি না।

সম্মুখে প্রজ্জলিত চিতাগ্নি বৌদির দেহকে ভস্মীভূত করিতে লাগিল, আর আমি একাকী তাহারই দশ পনর হাত দূরে ঘাসের উপর বসিয়া কত রকম কত কথাই যে একান্তমনে ভাবিতে লাগিলাম, তাহার আর শেষ নাই। সহসা একটা তীব্র গন্ধে ও শব্দে পিছন ফিরিয়া দেখি, বিনুদা একেবারে আমার গা ঘেঁসিয়া পিছনে আসিয়া বসিয়া রহিয়াছে ফিরিয়া বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতেই, মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিল, —"কি রে, এখনো দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে? এতক্ষণ ধ'রে পোড়বার তার কি-ই বা ছিল!" দেখিলাম, দর্ দর্ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া তাহার ঘাম ঝরিতেছে, দুই চক্ষু ভয়ানক আরক্ত, পরনের কাপড়খানা এলোমেলোভাবে কোমরে পাক দিয়া জড়ান। মুখের দিকে চাহিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিলাম, ত্রস্তে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিনুদা কহিল,—"পোড়া—পোড়া—যত পারিস্ পোড়া! একটু মদ খাবি? তা' হলে গায়ে আরও জোর পাবি এখন",—বলিতে বলিতে হন্ হন্ করিয়া বিনুদা মাঠের পথে গ্রামের দিকেই চলিয়া গেল।

তখনও সন্ধ্যা হয় নাই, হইবারও বেশী বিলম্ব ছিল না। সূর্য্য তখন আরক্ত হইয়া আকাশের প্রান্তদেশে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। মনে হইল, সেখানেও তখন এক বিরাট শ্মশানের চুলী জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দিনের শেষে না জানি কাহার সে চিতা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া সেখানের সমস্ত আকাশকে একেবারে রাঙ্গা করিয়া তুলিয়াছে। সম্মুখে পৃথিবীর চিতা—পশ্চাতে আকাশের চিতা। দেখিতে দেখিতে দুই চিতাই এক-সঙ্গে নিভিয়া গেল! ইহার পর জানি না, কতক্ষণের জন্য একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। সঙ্গীদের ডাকে যখন চমক ভাঙ্গিল, তখন দেখিলাম, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, আর সেই অন্ধকারের মধ্যে শ্মশানপ্রান্তের সেই বাবলা-গাছগুলি প্রেতমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জোনাকীর ন্যায় অসংখ্য চক্ষুর দৃষ্টিতে আমাদের দিকে মিটমিট করিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। তখনও নির্ব্বাপিত চিতার সেই ভস্মস্তূপের মধ্য হইতে দু'-একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রহিয়া রহিয়া ঝিক্-ঝিক্ করিয়া উঠিতেছিল। কিছু পরেই গ্রামের দিক্ হইতে বিসর্জ্জনের বাজনার শব্দ যখন বাতাসে শ্মশান পর্য্যন্ত ভাসিয়া আসিয়া আমাদের কাণে আসিয়া পৌঁছিল, তখন বুঝিলাম, গ্রামের ঘাটে ঠাকুর-বিসর্জ্জন হইয়া গেল। সেই সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন পল্লী-শ্মশানের সেই গভীর নীরবতা ভেদ করিয়া, সকলের মিলিত কণ্ঠ হইতে উচ্চ-রবে ধ্বনিত হইল—বল হরি-হরি বোল্!

—

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বাড়ী ফিরিয়া সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বিনুদা?" সন্ধ্যা কহিল, "জানি না।" বাড়ীর নীচের ও উপরের ঘরগুলি খুঁজিয়া আসিলাম, বিনুদাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। এই রাত্রিতে, হয় ত কোথাও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, নয় ত বা কোথায় মাঠের ধারে বা গাছের তলায় বা নদীর ধারে একলাটি চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ইহাই ভাবিতে ভাবিতে আমার ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। বেশীক্ষণ শুইয়া থাকিতেও পারিলাম না, বিনুদার জন্য চঞ্চল হইয়া পড়িলাম। নীচে যাইয়া, দরোয়ানকে ডাকিয়া ঠাকুরতলায় পাঠাইয়া দিলাম, কি জানি, যদি সেইখানে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু দরোয়ান ঘুরিয়া আসিয়া যাহা খবর দিল, তাহাতে জানিলাম যে, ঠাকুরতলায় এবং তাহার আশে-পাশে কোন স্থানেই বিনুদা

যাই। নিদ্রাহীন চক্ষু বুজাইয়া সমস্ত রাত্রিই শয্যায় পড়িয়া রহিলাম।

পরদিনও বিনুদা আসিল না বা তাহার কোন খোঁজ-খবর পাইলাম না। প্রভাতেই তাহার অনুসন্ধানের জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইয়াছিলাম, সকলেই দ্বিপ্রহরের মধ্যে একে একে ফিরিয়া আসিল, বিনুদার কোন সন্ধান কেহ আনিতে পারিল না। অপরাহ্নে জনশূন্য বাঁধের উপরকার একটা গাছ-তলায় একাকী বসিয়াছিলাম, পার্শ্বের গ্রামের এক জন মুসলমান হাট করিয়া ফিরিতেছিল। তাহার মুখে শুনিলাম, বারুইহাটির কাছে নদীতে এক জন লোক ডুবিয়া মারা গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল—"কাল রাতেই বোধ হয় ডুবেছে, এখনো বেশী ফুলে ওঠে নি, পচা গন্ধও বেরোয় নি। বোরো-হাটির নদীর বাঁকে ঠেকে মড়াটা আটকে ছিল, গ্রামের চৌকিদার তাকে ড্যাঙ্গায় তুলেছে।" মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া লোকটি কহিল—"এদিক্‌কার কোন লোক নয় বাবু, কেউ চেনে না। বেশ বাবুর মত চেহারা, মোটা-সোটা যোয়ান গোছের—"

"গায়ের রং খুব ফরসা ?"

"হ্যা বাবু।"

"মাথায় বড় বড় ঝাঁকড়া চুল ?"

"হ্যা।"

ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম। বারুই-হাটি প্রায় দুই ক্রোশ পথ। প্রসাদপুরের রেলের ষ্টেশন ছাড়াইয়া বাঁধের উপর আরও ক্রোশ-খানেক যাইলে তবে বারুই-হাটির হাট-তলা। নদীর বাঁধ ধরিয়া ক্রমাগত ছুটিতে লাগিলাম। খানিকটা আসিয়াই হাঁপাইয়া পড়িলাম। আর দৌড়াইতে পারিলাম না। তখন সবেমাত্র পোয়া-তিনেক পথ আসিয়াছি। বাকী পাঁচ পোয়া পথ ছুটিয়া যাইতেই ইচ্ছা হইল ; কিন্তু শক্তিতে কুলাইল না ; হাঁপাইতে হাঁপাইতে চলিতে লাগিলাম। প্রায় ষ্টেশনের কাছে আসিয়া পড়িলাম, আরও ক্রোশখানেক যাইতে হইবে। এ স্থানটায় দুই পার্শ্বের কাশ-বন বর্ষায় বাড়িয়া উঠিয়া বাঁধের অপ্রশস্ত পথকে ঢাকিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল ; তাহাই দুই হাতে সরাইতে সরাইতে দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম। সহসা এক স্থানে ঘন কাশ-বনের অন্তরাল হইতে কে সুর করিয়া বলিয়া উঠিল—"খুঁজে খুঁজে নারি—যে পায় তারি।" চমকিত হইয়া সেই দিকে চাহিয়া যেন আমি পুনর্জীবন পাইলাম, দেখিলাম, একটা দেশী মদের বোতল হাতে করিয়া, বাঁধের নীচে একটা গাছে পিঠ দিয়া বিনুদা বসিয়া আছে। সেই-খান হইতেই চীৎকার করিয়া ডাকিলাম—"বিনুদা !"

জড়িত কণ্ঠে একটা ধমক দিয়া বিনুদা বলিয়া উঠিল—"ড্যাম্ ষ্টুপিড্ ব্রুট্,—খুঁজে খুঁজে নারি—যে পায় তারি।"

দুই হাতে দীর্ঘ কাশের গুচ্ছগুলিকে সরাইতে সরাইতে পথ করিয়া, বাঁধের নীচে সেই গাছতলাতে বিনুদা'র সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম, কহিলাম—"কাল থেকে তুমি—"

বোতল হইতে এক গেলাস মদ ঢালিয়া পান করিয়া সুরা বিকৃত কণ্ঠে বিনুদা কহিল—"Dont' speak silly words, পঙ্কু। 'কাল থেকে তুমি', মানে কি ? কাল মানে—গেছে কাল, না আসছে কাল ? কাল means—not today, yesterday, day before yesterday, month before yester month, year before yester year and 12 months make one year, বুঝতে পারলি ? 30 days have September, Apirl June and November, February has 28 alone and all the rest have 31."

দেখিলাম, এ অবস্থায় বিনুদার সহিত কোন কথা বলিতে যাওয়াই বৃথা। তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম—"ওঠ এখন, বাড়ী চল।" কিন্তু টানাটানিই সার হইল, আমি কি বিনুদাকে টানিয়া তুলিতে পারি ?—পারিলাম না। আমি যত টানি বিনুদাকে, বিনুদা তত টানে আমাকে। খানিকক্ষণ টানাটানির পর আমি যখন কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া ধমক দিয়া উঠিলাম, তখন দাঁড়াইয়া উঠিয়া টলিতে টলিতে বিনুদা কহিল,—"রাগ কচ্ছিস্—আচ্ছা, চল, কিন্তু—কিন্তু কি বল্ দেখি ? অর্থাৎ, খুঁজে খুঁজে নারি—যে পায় তারি, বুঝলি পঙ্কু ?"

চলিতে চলিতে বাঁধের এক স্থানে আসিয়া বিনুদা থমকিয়া দাঁড়াইল ; কহিল—"এইখান থেকেই ব্যাটাকে ঝপ-ঝপাং ! কিন্তু আসল কথাটাই খালি ভুল হয়ে যাচ্ছে রে" বলিয়া আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া মৃদুস্বরে কহিল—"সে আর নেই, ম'রে গেছে, না ? তোর বৌদি রে !—তাই ত, খুঁজে খুঁজে নারি—যে পায় তারি।"

কোন রকমে বিনুদাকে বাড়ীতে আনিয়া ফেলিলাম। এইটুকু পথ আসিতেই কিন্তু সন্ধ্যা উৎরাইয়া গেল। সেই সন্ধ্যার পরই তাহাকে স্নান করাইয়া দিয়া, জোর করিয়া দুটি খাওয়াইয়া তাহার শয্যায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া বিনুদা আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ রে, কেউ কাল নদীতে ডুবে মরেছে কি না, কোন খবর শুনিছিস্?" চমকিত হইয়া সোৎসুকে কহিলাম,—"শুনিছি। কেন বিনুদা? কিন্তু সে ত এদিক্‌কার কোন লোক নয়। শুনলুম, আড়-শিমলের মণ্ডলদের বাড়ী জনকতক বাবু কোলকাতা থেকে পাখী শিকার করতে এসেছিল, তাদেরই এক জন। হয় ত কোন রকমে বে-কায়দায় নদীতে প'ড়ে গিয়েছিল, সঙ্গে আর কেউ ছিল না, জামাজুতো শুদ্ধ আর হয় ত উঠতে পারে নি। বারুইহাটির বাঁকে গিয়ে ভেসে উঠেছিল।—কেন বল দেখি?"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বিনুদা এই সূত্রে যে ব্যাপারটির বর্ণনা করিতে লাগিল, কাঠের মূর্ত্তির মত আড়ষ্ট হইয়া আমি তাহা শুনিয়া যাইতে লাগিলাম। শঙ্কায় ও চমকে সমস্ত শরীর আমার বার বার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। কথা সমাপ্ত করিয়া বিনুদা কহিল,—"বাবুরা কোলকাতা থেকে আসেন পাখী শিকারের ছল ক'রে, কিন্তু যে শিকারের সন্ধানে তাঁরা ঘোরেন—কি পাষণ্ড বল্ দেখি! আহা, চাষাদের বৌটা একলা সন্ধ্যাবেলা নদীর ঘাটে, না পারে চীৎকার করতে, না পারে তার হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালাতে!" নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া আমি বিনুদার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। খানিক থামিয়া বিনুদা আবার বলিতে লাগিল,—"লোকটা যে আবার আমার সঙ্গে জোর দেখাতে এল, আমারও তাই মাথার ভেতরটা কেমন যেন ক'রে উঠলো। বউটাকে পালিয়ে যেতে বললুম আর তার পর পাঁজাকোলা ক'রে তাকে জাপটে ধ'রে ঝপাং ক'রে দিলুম নদীর জলে ফেলে। নেশাটা তখন বড্ডই ধরেছিল, অন্ধকারে আর তাকে দেখতেই পেলুম না। কে জানে যে, লোকটা সাঁতার টাঁতার একেবারেই জানতো না! বন্দুক নিয়ে শিকার করতে আসে, সাঁতার জানে না!—কোথাকার বাঁকে গিয়ে আটকেছিল বললি?"

আমি স্তম্ভিতের ন্যায় কিছুক্ষণের জন্য বিনুদার মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলাম, তাহার পর কহিলাম,—"বিনুদা, খুব সাবধান! ঘুণাক্ষরেও এ সব কথা তুমি কারও কাছে বোলো না। এই ক'টা দিন পরে, চল তোমায় কাশী রেখে আসি, তোমার আর এখানে থেকে কায নেই।"

বিনুদা কহিল—"ক'টা দিন পরে কি? কাশী আমি আজই চ'লে যাব। এখানে আর আমি এক তিল থাকতে পারব না, কিছুতেই পারব না। পেসাদপুরে তুই আর আমাকে থাকতে বলিস নি, পঞ্চু। আমি আজই যাব।"

কয়টা দিন কোন রকমে বিনুদাকে প্রসাদপুরে জোর করিয়া রাখিলাম। কিন্তু কয় দিনই চব্বিশ ঘণ্টা তাহার মদের উপর কাটিল। নানাপ্রকারে বুঝাইয়া, উপদেশ দিয়া, রাগ করিয়া কোন রকমেই তাহাকে মদ খাওয়া ছাড়াইতে পারিলাম না। বিনুদার সেই একই কথা—"ওরে, তাকে ভুলে থাকতে দে—তাকে ভুলে থাক্‌তে দে। এ ত মদ ব'লে খাচ্চি না, এ যে তাকে ভোলবার ওষুধ, পঞ্চু!"

কয় দিন এমনই করিয়াই কাটিয়া গেল। দশ দিনের দিন বৌদির শ্রাদ্ধ কোন রকমে শেষ হইয়া গেলে বিনুদাকে কহিলাম,—"কাশী না হয় আর নাই বা গেলে বিনুদা। কাশীর বাড়ী বিক্রী ক'রে দাও, এখান থেকে চল, কালীঘাটে থাকবে চল।"

বিনুদা কহিল—"সে আমি কিছুতেই পারব না—কিছুতেই পারব না, কাশী ছেড়ে আর আমি কোথাও থাকতে পারব না।" অনেক করিয়াই বিনুদাকে বুঝাইলাম, কিন্তু বিনুদা কিছুতেই রাজী হইল না, কাশী যাইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িল। তখন এক দিন পদ্মাকে লইয়া বিনুদা ও আমি কাশীযাত্রা করিলাম। দিন পনর কাশীতে থাকিয়া আমি আবার প্রসাদপুরে ফিরিয়া আসিলাম। আসিবার সময় বিনুদাকে মাঝে মাঝে চিঠি দেবার জন্য অনেক করিয়া বলিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু কাশী হইতে কোন পত্রই আর বিনুদার পাইলাম না।

তিন মাস ধরিয়া চিঠির পর চিঠি দিয়াও যখন বিনুদার কোন সংবাদই পাইলাম না, তখন ফাল্গুন মাসে আমি সন্ধ্যাকে সঙ্গে করিয়া কালীঘাট হইতে কাশী চলিয়া আসিলাম। আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে দুশ্চিন্তায় আমার মন ভরিয়া উঠিল। এই তিন মাসের মধ্যেই তাহার সেই চেহারা একেবারে বিশ্রী হইয়া গিয়াছে, সংসারের কিছুই আর বিনুদা দেখে না, সবই চাকর-বাকরদের উপর নির্ভর, তাহারা যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতেছে আর বিনুদা নিজে চব্বিশ ঘণ্টাই কেবল মদের উপরই আছে। এ কাযে আরও দু'একটি বন্ধুও তাহার জুটিয়াছে।

সন্ধ্যা কহিল,—"বড়ঠাকুরকে যেমন ক'রে হোক কাশী ছাড়াতেই হবে। এখানে থাকলে উনিও বাঁচবেন না, ম'রে যাবে। তুমি ভাল ক'রে বুঝিয়ে সুজিয়ে খ থেকে সরিয়ে নিয়ে চল।" কিন্তু যাহাকে কিছুতেই বুঝিবার পাত্র নহে, এ কথা হয়

পারে না। তবুও বিনুদাকে বুঝাইতে আমি আর বাকী রাখিলাম না, কিন্তু বিনুদার সেই একই কথা—"কাশী ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।"

—

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই ৫ বৎসরের মধ্যে প্রথম বৎসর দুই আমি মধ্যে মধ্যে কাশী গিয়া বিনুদা ও পদ্মার সংবাদাদি লইয়া আসিতাম, কিন্তু তৃতীয় বৎসরে হঠাৎ একবার গিয়া দেখিলাম, বিনুদা নাই, বাড়ীটি এক জন হিন্দুস্থানীর কাছে বিক্রয় করিয়া দিয়া বিনুদা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। বাড়ীতে এক ঘর বাঙ্গালী গৃহস্থ ভাড়াটীয়া ছিল, তাহাদের নিকট হইতে নূতন গৃহস্বামীর ঠিকানা জানিয়া লইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটি কহিল, বাড়ীটি কেনা তাঁহার ঠকা হইয়াছে. কিনিবার কোন দরকারও ছিল না, স্রেফ্ দোস্তির খাতিরেই তিনি ৫ হাজার টাকা দিয়াছেন। বিনুদা কোথায়, জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে, কাশীতেই ছিলেন, তার পরে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন. তিনি জানেন না। যাহা হউক. আরও কিছু দিন কাশীতে থাকিয়া বিনুদার খোঁজ করিলাম, কিন্তু তাহার কোন সন্ধান করিতে পারিলাম না। অগত্যা হতাশ হইয়া সেবার কাশী হইতে ফিরিয়া আসিলাম। তাহার পর এই ৩ বৎসর ধরিয়া কোথাও আর বিনুদাকে খুঁজিতে বাকী রাখি নাই। কাশী. চুনার, এলাহাবাদ, মথুরা, বৃন্দাবন হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্ণৌ. কানপুর. দিল্লী, আগরা, হরিদ্বার,—এ দিকে আরা, বাঁকিপুর, ছাপরা. পাটনা. মুঙ্গের. ভাগলপুর প্রভৃতি একে একে পশ্চিমের ও উত্তর-পশ্চিমের সমস্ত বড় বড় সহর খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি. কোথাও বিনুদার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই। হঠাৎ সে দিন শয্যায় শুইয়া বিনুদার কথা ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল. এত যে খুঁজিতেছি, কিন্তু বিনুদা বাঁচিয়া আছে ত? বাঁচিয়া থাকিলে এই ৩ বৎসরের মধ্যে কোথাও না কোথাও তাহার সন্ধান পাইতাম। কিন্তু যে বাঁচিয়াই নাই, তাহার সন্ধান কি করিয়া মিলিবে? এই ৩ বৎসরের মধ্যে এ কথাটা ত একবারও ভাবি নাই। যদি তাহাই ঘটিয়া থাকে. তাহা হইলে, পদ্মা—আর ভাবিতে পারিলাম না। সমস্ত শরীরটা আমার ভয়ে ও ভাবনায় শিথিল হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া সন্ধ্যার কাছে এই কথা বলিতেই সন্ধ্যা কহিল,—"অমন অলুক্ষণে কথা মুখে এনো না. বড়ঠাকুর কোথাও না কোথাও ঠিকই আছেন।"

আজ সকালে চা খাইবার সময় সন্ধ্যা কহিল,—"দেখ. আমার খুব বিশ্বাস, বড়ঠাকুর হয় ত ঐ কাশীতেই আছেন. তুমি ভাল ক'রে খুঁজতে পারনি। আমার বড্ড ইচ্ছে. তুমি আর একবার গিয়ে ভাল ক'রে খুঁজে এস।" সন্ধ্যার আগ্রহ দেখিয়া কহিলাম,—"বেশ, কালই আমি যাব, সন্ধ্যা!"

সন্ধ্যা কহিল,—"তাই যাও। যদি কোন রকমে সন্ধান করতে পার. যেমন করেই হোক. এবার বড়ঠাকুরকে ধ'রে আনতেই চাও. কিছুতেই আর যেন ছেড়ে এস না।" আরও কি সন্ধ্যা বলিতে যাইতেছিল, বলিতে পারিল না। মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম. দুই চক্ষু তাহার জলে ভরিয়া আসিয়াছে।

দুই দিন পরেই আমি কাশী আসিলাম ও যথাসাধ্য চারি দিকে বিনুদার খোঁজ করিতে লাগিলাম। পরিচিত অপরিচিত যাহাকে পাই. তাহাকেই বিনুদার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি. কেহই কোন খবর দিতে পারে না। এক ছত্রের ম্যানেজার এক দিন বলিল,—"একটা মাতাল গোছের লোক একটা বড় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রোজ এখানে খেতে আসতো বটে। মাতাল ব'লে প্রথম দিন তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল. কিন্তু ঐ মেয়েটির শুকনো মুখ দেখলে বড় কষ্ট হতো. তাই আর তাদের ফেরাতুম না. রোজই এইখান থেকে তারা খেয়ে যেতো।" ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তারা কোথায় থাকে. বলতে পারেন? আজও কি তারা এসেছিল?" বাবুটি কহিল,—"মাস দুই তিন দিন আর তাদের দেখিনি। আপনাকে যা বলছি. এ মাস দুই তিন আগেকার কথা।"

এমনি সময় এক দিন নন্দী মশাই আসিয়া খবর দিলেন যে, তিনি সেই দিনই প্রভাতে বিনুদারই মত এক জনকে দেখিয়াছেন, ষ্টেশনের ঐ দিকে একটা দেশী সরাবের দোকানে বসিয়া মদ খাইতেছিল। নন্দী মশাই কাছে যাইয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করাতে, লোকটি না কি ঘুসি পাকাইয়া তাঁহাকে মারিতে আসিয়াছিল। নন্দী মশাই কহিলেন,—"আমার খুবই বিশ্বাস পঞ্চু বাবু, এ বিনু বাবু না হয়ে আর যায় না। কিন্তু চিনতে পারা বড়ই মুস্কিল। কাণের নীচেই সেই দাগটা দেখেই আমার সন্দেহ হয়। এই তিন চার বছরের ভেতর তাঁর যে চেহারা কি হয়ে গেছে, তা' আর বলবার নয়। বিনু বাবু ব'লে কি আর তাঁকে চেনবারই জো আছে!"

সেই বৈকাল হইতে সুরু করিয়া রাত্রি ৯টা সাড়ে ৯টা পর্য্যন্ত কাশীর যেখানে যতগুলি দেশী বিলাতী মদের দোকান ছিল, কোনটিই আর খুঁজিতে বাকী রাখিলাম না, কিন্তু কোন স্থানেই বিমুদার কোন সন্ধানই পাইলাম না। ক্লান্তদেহে বাসায় ফিরিতেছিলাম; গোধোলিয়ার কাছে এক স্থানে রাস্তার উপর লোকের ভীড় ও গোলমাল শুনিয়া দাঁড়াইলাম। একটি লোককে জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল—"চুরি ক'রে ধরা পড়েছে, তাই লোকটাকে ধ'রে মারছে।" কাশীতে চোর-জুয়াচোরের ত অভাব নাই, সুতরাং কিছুমাত্র আশ্চর্য্য না হইয়া বাসার পথেই আবার চলিতে লাগিলাম। লোকটি আমারই সঙ্গে আসিতে আসিতে বলিল—"দু'খানা পাউরুটী চুরি করেছে ব'লে অত ক'রে মারাটাও ওদের ঠিক নয়।" জিজ্ঞাসা করিলাম—কা'দের দোকান?"

"ওই যে মেয়ে-স্কুলটার নাচে, মস্ত একটা হিঁদুর তৈরী পাঁউরুটীর দোকান হয়েছে, এক দিকে পাউরুটী, এক দিকে চা-সরবৎ, এক দিকে পান সিগারেট ষ্টেসনারী।"

এ বিমুদার সেই মেয়ে-স্কুল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"লোকটা হিন্দুস্থানী না মুসলমান?"

"কে? যে রুটী চুরি করেছে?"

"হ্যাঁ।"

"বাঙ্গালী। আরে মশাই, একটা মাতাল। তাকে কি অত ক'রে—

"বাঙ্গালী? মাতাল?" পিছন ফিরিয়াই ছুটিতে লাগিলাম। ছুটিতে ছুটিতে সেই মেয়ে-স্কুলের সম্মুখে আসিয়া ভিড় ঠেলিয়া দোকানের ভিতর ঢুকিলাম। তখনও দু'এক ঘা ঘুসি-ঘাসা লোকটির উপর পড়িতেছিল। একবারে তার সামনে যাইয়া দেখিলাম—হা ভগবান্, যা ভেবেছি, তাই—এ ত বিমুদাই বটে! হায়, এ-ও আমায় দেখতে হ'ল! এক দিন যে স্কুলের নীচেকার এই হলের মধ্যে ফুলের মালা দিয়া বিমুদাকে সম্মানিত করা হইয়াছিল, আজ ঠিক সেইখানেই কি না—! আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"দু'খানা রুটীর তোমার দাম কত ভাই?" সে কহিল—"পাঁচ সাত দিন ধ'রে রোজই দু'খানা ক'রে বড় রুটী ব্যাটা চুরি করেছে। ওই কোণে এসে দাঁড়ায় আর দু'খানা ক'রে রুটী পকেটের ভেতর সরায়। রোজই হিসেবে আমাদের দু'খানা ক'রে রুটী কম হয়, আজ সকলে তক্কে তক্কে ছিলুম, ব্যাটাকে ধ'রে ফেলেছি। সে দিন প্রায় একটা গোটা বাণ্ডিল চুল বাঁধবার ভাল ফিতে, আর এক দিন এক বাক্স সাবান, এ-ও ঠিক ওরি কাজ, শা—"

"বাস্—আর তোমায় বেশী বলতে হবে না" বলিয়া পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম। সে টাকা দুইটি হাতে করিয়া আমার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। সেই অবসরে দোকানের বাহিরে আসিয়া বিমুদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাসা কোথায়?" কি বিড় বিড় করিয়া বিমুদা বলিল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। চলিতে চলিতে কহিলাম,—"কোথায় তোমার বাসা—আমায় নিয়ে চল, আর তোমায় আমি ছাড়ছি না।" বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে বিমুদা চলিতে লাগিল। আমি তাহার হাত জোরে ধরিয়া রহিলাম।

অনেকগুলি অপ্রশস্ত গলি অতিক্রম করিয়া এক অত্যন্ত নোংরা পল্লীর মধ্যে ততোহধিক নোংরা একটা বাটীর সম্মুখে আসিয়া বিমুদা দরজায় ঘা দিতে দিতে জড়িতকণ্ঠে পদ্মার নাম করিয়া ডাকিল।

সেই অন্ধকারের মধ্যেই পদ্মা আমাকে চিনিতে পারিল। সামনে আসিয়া কহিল—"কাকু?" একবারে কোলের কাছে তাহাকে টানিয়া লইয়া কহিলাম—"হ্যা মা, কেমন আছিস্ বল্ ত রে?" পদ্মা আমার বুকে মাথা গুঁজিয়া দুই হাতে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়াই রহিল, আমার প্রশ্নের উত্তর সে দিতে পারিল না। বুঝিতে পারিলাম, সে কাঁদিয়া আমার বুকের জামা ভাসাইয়া দিতেছে।

ঘরের মধ্যে এক ধারে একটা কেরোসিনের ডিবা জলিতেছিল। তাহারই ক্ষীণালোকে দেখিলাম, মেজের এক ধারে একটি ছিন্ন মলিন শয্যা, অন্য দিকে দু'একখানা এনামেলের বাসন, একটা ছোট আম-কাঠের বাক্স, কতকগুলি খালি মদের বোতল, মাটীর গোটাদুই জলের কলসী, একজোড়া শত-তালিযুক্ত জীর্ণ জুতা, কয়েকটা ভাঙ্গা কলিকা, একটা হুঁকা, থান দু'চার ছেঁড়া কাপড়, একটা ভাঙ্গা আরসি,—ইহাই মাত্র ঘরের আসবাব! হায় বিমুদা!

পদ্মাকে কহিলাম—"সামনেই একটা খাবারের দোকান দেখলুম, কিছু খাবার তোদের জন্যে নিয়ে আসি আমি।"

পদ্মা মৃদুস্বরে কহিল,—"বাবার পকেট দেখি, বাবা হয় ত আমাদের রুটী এনেছেন।" এ কথার আর উত্তর না দিয়া

আমি সামনের দোকানখানি হইতে কিছু খাবার লইয়া আসিলাম ও পদ্মার হাতে দিয়া কহিলাম—"মা, তুই খা, তোর বাবাকে খাওয়া, আমাকেও কিছু দে। আর ঐ ছেঁড়া চট্ একখানা এক দিকে পেতে দে, আমি শোব। রাত হয়েছে, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড় আজ, তার পর যা করবার, সে আমি কাল করব।" কুলুঙ্গির মধ্যে একটি সাবানের বাক্সর উপর খাবারের চেঙ্গাটি রাখিয়া দিয়া পদ্মা পিতলের ঘটী লইয়া জল গড়াইতে লাগিল। আমি কহিলাম,—"কাগজের ঐ বাক্সটা থেকে চেংড়াটা নামিয়ে রাখ্ মা, খাবারের রস গড়িয়ে পড়বে। কি আছে ওতে রে?" বাক্সর উপর হইতে চেংড়াটি পার্শ্বে নামাইয়া রাখিতে রাখিতে পদ্মা কহিল,—"ওতে খান দুই চন্দন-সাবান আর এক বাণ্ডিল চুল বাঁধবার ফিতে আছে। বাবাকে রোজ রোজ ঐ ও ঘরের ওরা আমার জন্যে আনতে বলতো, তাই সে দিন বাবা কিনে এনে দিয়েছে।"

দুঃখে, কষ্টে, চিন্তায় সমস্ত রাত ধরিয়া চোখে আর ঘুম আসিল না। আশার মধ্যে এইটুকু যে, এত দিনের এত ব্যাপারের পর আজ বিনুদাকে ধরিতে পারিয়াছি। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া কেন যে বিনুদা এত কষ্ট সহ্য করিয়া আসিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। প্রথম দুই বৎসর বিনুদা না চাহিলেও, প্রতি মাসেই দেড় শ' দুই শ' করিয়া টাকা আমি তাহাকে দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তাহার পর এই তিন বৎসর ধরিয়া কেনই বা বিনুদা এই রকম পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতেছে, আর কেনই বা তাহার কালীঘাটের সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও, আমরা থাকা সত্ত্বেও, স্বেচ্ছায় এই দারিদ্র্য ভোগ করিতেছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কি যে তাহার দুঃখ, কোথায় যে তাহার অভিমান, সমস্ত রাত সেই সব কথাই ভাবিতে ভাবিতে শেষরাত্রিতে বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

খোলা দরজা দিয়া সকালের রৌদ্র মুখে আসিয়া পড়ায় যখন আমার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন অনেকটা বেলা হইয়া গিয়াছিল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়া দেখি, ঘরের মধ্যে কেহই নাই। 'পদ্মা' 'পদ্মা' বলিয়া বারকতক ডাকিলাম, কাহারও সাড়া পাইলাম না। তখন ঘরের মধ্যে চারিদিকে চাহিয়া দেখি, খালি বোতলগুলি, জলের কলসী ও আরও দু' একটা ঐরূপ জিনিষ ছাড়া ঘরে আর কিছুই নাই। বুঝিতে আর বাকী রহিল না যে, জ্ঞান ও শক্তি ফিরিয়া পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই পদ্মাকে লইয়া বিনুদা প্রত্যুষেই আবার পলাইয়াছে। এই বাটীর ওদিক্‌কার একখানি ঘরের এক জন স্ত্রীলোক ভাড়াটিয়া কহিল,—"খুব ভোরবেলায় একটা মুটের মাথায় জিনিষপত্র দিয়ে খুকীর বাবা চ'লে গিয়েছে, এ মাসের ঘর-ভাড়ার টাকা দেড়টা আমার কাছে রেখে গিয়েছে।"

জামা গায়ে দিতে গিয়া দেখিলাম যে, কোটের পকেটে যে দেড় শত টাকার নোট ছিল, তাহা নাই। বাহির হইতে কাহারও তাহা লইবার কোন সুযোগ ছিল না। ইহাতে তখনকার মত মনটা আমার একটু সুস্থ হইল, যে, এ অবস্থায় দিন কতকের জন্যও বিনুদা অর্থাভাবে হয় ত কষ্ট পাইবে না।

সেই দিনই সন্ধ্যাকে সমস্ত কথা জানাইয়া পত্র দিলাম। পত্রের শেষে লিখিলাম—"বিনুদাকে পাইবার আশা তুমি ছাড়িয়া দাও। এই লইয়া মন আমার এত খারাপ হইয়াছে যে, তাহা আর বলিবার নয়। শরীরও আমার খুব খারাপ। আমি এখন দিনকতক বাড়ী ফিরিব না। মন ও শরীরকে সুস্থ করবার জন্য আমি পশ্চিমের নানাস্থানে দিনকতক বেড়াইব। তবে কাশী হইতে যাইবার আগে আর একবার শেষবার আমি বিনুদার সন্ধান করিব। কাশীর প্রত্যেক রাস্তার, প্রত্যেক গলির প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়া বিনুদার খোঁজ করিব; প্রত্যেক ধর্ম্মশালা, প্রত্যেক সরাইখানা, প্রত্যেক ছত্র আর একবার তন্ন তন্ন করিয়া না খুঁজিয়া এখান থেকে আমি যাইব না।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রায় তিন মাসকাল পশ্চিমের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বাটী ফিরিবার পথে এক দিন মধ্যরাত্রিতে ভাগলপুর ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণ হইতে নামিলাম। আমার বহু দিনের এক বন্ধু সেই সময় ভাগলপুরে থাকিয়া ডাক্তারী করিত। রাজেনের সহিত অনেক দিন হইতে দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই বলিয়া একবার এখানে নামিলাম। কিন্তু চারি মাসেরও উপর বাটী হইতে বাহির হইয়াছি, বাড়ীর জন্য মনটা বড়ই টানিতেছে। সুতরাং পথে আর বেশী দেরী করিতেও ইচ্ছা হইল না।

দুই দিন ভাগলপুরে থাকিয়া তৃতীয় দিনে সকালে খুব খানিকটা বেড়াইয়া ফিরিয়া রাজেনের ডাক্তারখানায় আসিয়া বসিলাম এবং দৈনিক কাগজখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম। রাজেন জিজ্ঞাসা করিল—"আজই তুমি ঠিক যাবে না কি হে?" আমি বলিলাম—"হ্যাঁ ভাই, বাড়ীর জন্য মনটা বড়ই অস্থির হয়েছে।"

"দাদার তা হ'লে কোন সন্ধান-টন্ধান আর পেলে না?"

"না, বিনুদার আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি।"

"আচ্ছা, বিনু বাবু তোমার জ্যেঠতুতো ভাই, না?"

"হাঁ। তুমি কি বিনুদা'কে কখন দেখনি?"

"একবার বোধ হয় কোলকাতায় দেখেছিলুম, অনেক দিন আগে। কুস্তি-টুস্তি করতেন খুব, সেই ত?—কি হে, সাড়া দিচ্ছ না কেন, নিবিষ্ট-মনে কি পড়ছ বল দেখি?"

কাগজের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া কহিলাম,—"একটা খবর পড়ছি ভাই। লোকের দুঃখ-কষ্ট যে জগতে কত, তা আর বলবার নয়, আর কে-ই বা তার খোঁজ রাখে। রাজসাহীর এক ভদ্রলোক, ছেলে-মেয়ে পরিবারকে খেতে দিতে না পেরে আত্মহত্যা ক'রে মরেছেন,—তাই পড়ছি।"

"আরে ভাই, জগতে নিত্য কত কি দুঃখের ঘটনা ঘটছে, কে তার খবর রাখে বল। আজ যে এখানে এক জন লোক ঐ গাছতলাতে মরছে! মরবারও একটুখানি যায়গা হতভাগা পেলে না, তার কি বল দেখি?"

"কেন, তার কি বাড়ী-ঘর নেই?"

"আরে, বিদেশী লোক, এই দিন পনর হ'ল এখানে এসেছিল। একটা বেণিয়ার বাড়ীর একখানা খোলার ঘর ভাড়া ক'রে এই ক'দিন ছিল। বাড়ীওলাটা এক অদ্ভুত স্বভাবের লোক, সে তার ঘরের মধ্যে কিছুতেই তাকে মরতে দেবে না। শুনলুম, কাল রাত্রেই লোকটাকে ঘর থেকে বার ক'রে দিয়েছে।"

"বল কি! এমন পাষণ্ড লোকও আছে?"

"হাঁ। শুনলুম, এখনও না কি মরেনি, বেঁচে আছে। যাও না, একবার দেখে এস না; ঐ যে সামনে—ঐ 'তালাও'টার পাশে।"

এই সময় একটি বিশ বাইশ বছরের ছেলে দ্রুতপদে আসিয়া রাজেনকে কহিল—"আপনি কোন ওষুধ আর দেবেন কি?"

"এখনও মরেনি শুনলুম, না?"

"হ্যাঁ।"

"লোকটার দেখছি কইমাছের প্রাণ হে! কাল রাতে আমি গিয়ে যা দেখে এলুম, তা'তে তখনই ত হয়ে যাবার কথা।"

কাগজখানা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া রাজেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম——"লোকটা কোথাকার, এই দেশী?"

"না—না, বাঙ্গালী; তোমাদেরই ব্রাহ্মণ। হরিহর মুখুয্যে বুঝি ওর নাম, শান্তিপুরে বাড়ী।"

ছেলেটি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ওষুধ তা হ'লে কি কিছু দেবেন?"

"আরে, পাগল হয়েছ? এখন আর কি ওষুধ দোবো!"

ছেলেটি চলিয়া গেল।

রাজেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি অসুখ হয়েছিল?

রাজেন রাস্তার দিকে চাহিয়া কহিল,—"লোকটা খুব মাতাল ছিল, মাতালের যা' হয়।"

"তার সঙ্গে আর কে আছে?"

"কে থাকবে, কেউ এর আর নেই। কেউ থাকলে কি আর আজ এর এই দুর্দ্দশা! শুধু একটা মেয়ে—"

আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম,—"শুধু একটা মেয়ে? মেয়েটি কত বড়?"

"তা, চোদ্দ পনর বছরের হবে বোধ হয়। কি হে, ব্যাপার কি, তোমার কি জানা-চেনা কেউ হবে?"

রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলাম—"মেয়েটির নাম জান তুমি?"

"মেয়েটির নাম? হাঁ, জানি বৈ কি, মেয়েটির নাম হচ্চে প—ও কি, ছুটলে যে! হরিহর মুখুয্যেকে তুমি চেন না কি?—।" রাজেনের সব কথা আমার কাণে আসিয়া পৌঁছাইল না।। হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেই 'তালাও'য়ের ধারে গাছের তলায় ছুটিয়া গিয়া, ভীড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিলাম; সেই মুহূর্ত্তেই পদ্মা আমাকে দেখিয়া সেইখানে একেবারে লুটাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল— "কাকু! কাকু! বাবা, কাকু এসেছে! বাবা গো!"

সরকারী সড়কের পাশে একটা সুবৃহৎ বকুলগাছের তলায় ঘাসের উপর একখানি শতচ্ছিন্ন মলিন লেপ দো-পাল্টা করিয়া বিছাইয়া বিনুদা'র অন্তিম শয্যা পাতা হইয়াছিল।

সেই রবিকরোজ্জ্বল প্রভাতে চক্ষুর সামনে আমার যেন হঠাৎ সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। অভিভূতের মত সেই শয্যার এক প্রান্তে বসিয়া পড়িলাম। এই আত্মীয়-বান্ধবহীন বিদেশে, আজিকার এই দুর্দ্দিনে একটা 'আহা' বলিবার কেহ ত সেখানে ছিল না, তাই বুঝি এই হতভাগ্য মরণপথ-যাত্রীর অন্তিম শয়ন যাহার তলায় বিছান হইয়াছিল, সেই বকুলের পুষ্পগুলি সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বেদনাতে আশে-পাশে চতুর্দ্দিকে একটি একটি করিয়া সব ঝরিয়া পড়িয়াছিল।

বিনুদা চক্ষু বুজাইয়া ছিল। হঠাৎ পদ্মার চীৎকারে চোখ চাহিয়া ইঙ্গিতে আমায় আরও কাছে ডাকিল। তখন কথা কহিবার শক্তিও বোধ হয় আর ছিল না। তবুও একখানি হাত আমার কোলের উপর রাখিয়া, অতি কষ্টে, অতি ধীরে, অত্যন্ত অস্পষ্ট উচ্চারণে কহিল,—"এই জন্যেই বোধ হয় বেঁচেছিলুম, ভাই।" তার পর খানিকক্ষণ যেন ক্লান্তিতে চুপ করিয়া চক্ষু বুজাইয়া রহিল। মিনিট দুই তিন পরে আমার মুখের দিকে চাহিয়া সেই রকম স্বরে আরও জড়াইয়া জড়াইয়া কাহার যেন ছবি চাহিল, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। পদ্মাকে কহিলাম—"বৌদির কোন ছবি আছে কি, থাকে ত দে, বোধ হয়, তাই চাইছে।" মনে মনে কহিলাম,—"মরবার সময়ও বৌদি' বৌদি' ক'রে গেলে, বিনুদা'!"

অদূরে ঘাসের উপর রক্ষিত কাশীর সেই আমকাঠের বাক্সর মধ্য হইতে পদ্মা একটি ছোট পুঁটুলি বাহির করিয়া আনিল। তাহার মধ্যে সেই সাবানের বাক্স, সেই মাথা বাঁধিবার ফিতার বাণ্ডিলটি আর বৌদির একখানি ছোট্ট ফটোগ্রাফ ছিল। সেইখানি আনিয়া পদ্মা বিনুদার হাতে দিল। বিনুদা তাহা পার্শ্বে রাখিয়া দিয়া, মুখটা একটু বিকৃত করিয়া অত্যন্ত অস্পষ্ট জড়িত-কণ্ঠে, অত্যন্ত কষ্টের সহিত কহিল,—"ঠাকুরের—শ্রীকৃষ্ণের—"

সেই ছেলেটির দিকে চাহিয়া কহিলাম—"পার ভাই, কোথাও থেকে আনতে?" ছেলেটি ছুটিয়া গেল এবং মিনিট পাঁচ সাতের মধ্যেই ছোট্ট একখানি রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি আনিয়া আমার হাতে দিল। আমি বিনুদার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলাম—"বিনুদা!"

শুধু একটিবারের জন্য আর একবার চক্ষু মেলিয়া বিনুদা চাহিল এবং তাহার পর রাধাকৃষ্ণের সেই ছবিখানি দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বোধ হয় কিছু বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু শক্তিতে কুলাইল না, শুধু ঠোঁট দুইটি ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল, দুই কসের উপর কিছু ফেনা জমিয়া উঠিল আর মুদ্রিত নয়নদ্বয় হইতে ফোঁটা দুই চার জল গণ্ডের হাড় বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

তার পর?

তার পরের কথাটুকু বলিতে হইবে বৈ কি! এতটা যখন পারিলাম, সেটুকুও পারিতে হইবে। বুক ফাটিয়া গেলেও তাহা বলিতে হইবে। যদি আজ চীৎকার করিয়া বলি—ওগো, আর ইচ্ছা নাই—ইচ্ছা নাই—আর কিছু বলিতে আমার শক্তি নাই, সাধ্য নাই—সে কথা আমার কেহ কি আর শুনিবে? সুতরাং বুকের হাড় বুক হইতে খসিয়া আসিলেও একটুখানি তার পরের কথা আমাকে বলিতেই হইবে! এ আনন্দকাহিনীর কি শেষ রাখিতে আছে!

চৌদ্দ পনর বৎসরের বালিকার মস্তিষ্ক যে দুঃখে শোকে সাময়িক ভাবেও বিকৃত হইতে পারে, ইহা আমার জ্ঞান ছিল না। পদ্মার চোখের দিকে চাহিয়া আমার ভয় হইল। এক বিন্দু অশ্রু সে চোখে নাই। তাহার শুষ্ক পলকহীন চোখের উদাসদৃষ্টি শূন্যের পানে স্থির হইয়াছিল। সে দৃষ্টি দেখিলে মনে একটা আতঙ্কের ভাব আনিয়া দেয়। চোখের ন্যায় দেহেও তাহার যেন কোন সাড়া ছিল না। যেন কোন শোকের ছায়াপাত তাহার দেহে মনে পড়ে নাই। বুঝি তাহার আজ কিছুই ঘটে নাই। বুঝি অতি সাধারণ দিন তাহার যেমন, আজও ঠিক তাহার তেমনই দিন।

মুহূর্ত্ত পরেই হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পদ্মা নড়িয়া উঠিল। তার পর সম্মুখস্থ সেই খালি সাবানের বাক্সটি হইতে মাথায় বাঁধিবার ফিতার সেই তাড়াটি লইয়া খুলিতে লাগিল, আবার গুটাইতে লাগিল। সেই অপূর্ব্ব উদাসদৃষ্টি তাহার ভূমির দিকেই নিবদ্ধ। হঠাৎ ফিতাগুলি পাক দিয়া নিজের মাথায় জড়াইতে জড়াইতে সোজা উঠিয়া পদ্মা একবারে আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং সেই উন্মাদ-দৃষ্টি দিয়া একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া অদ্ভুত স্বরে বলিয়া উঠিল,—"তুমি কে বট হে,—ওগো, তুমি কে বট হে?"

আমি কিছু একটা বলিতে যাইতেছিলাম, বাধা দিয়া তেমনিভাবে পদ্মা বলিয়া উঠিল,—"ঘরে যাবো না? পান্তা ভাত খাবো না? ঠাউর দর্শন করবো না? বলি, অ পঞ্চু বাবু, তোম কেমসান আদমী হো? আরে উঠ উঠ—চল্ চল্! (সুরে) ... সব করে রব রাতি পোহাইল,কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল"

জোরে তাহার হাত ধরিয়া একটা ধমক দিয়া কাছে টানিয়া বসাইতেই পদ্মা একেবারে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বিনুদার মৃত্যুশয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল। এই সময় দর্শকদের ভিতর হইতে একটি বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ ... একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল,—"নারা... শ্রীরামচন্দর!"

আমিও আমার কলমের শেষ টানের সঙ্গে সঙ্গে ... কথারই প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলি,—নারায়ণ! নার...!

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়
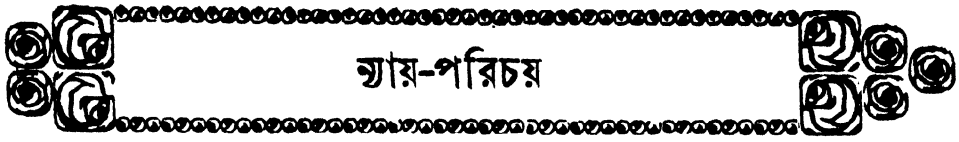
ন্যায়দর্শনে ঈশ্বর

শিষ্য। আপনি গোতমের মতের ব্যাখ্যা করিতেও পুনঃ পুনঃ জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের কথা বলিতেছেন এবং তাঁহার দর্শন ব্যতীত কাহারও মুক্তি হয় না, এই মহা সত্যও সবিশ্বাসে বলিতেছেন। কিন্তু গোতম নিজে উহা স্পষ্ট বলিয়াছেন কি না? তিনি ত ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রে তাঁহার কথিত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখই করেন নাই। আবার কেহ কেহ ইহাও বলেন যে, গোতম পরে "ঈশ্বরবাদ"কে পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রকাশ করিয়া উহার খণ্ডনই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমি ত উহা বুঝিতে পারি না। সুতরাং গোতমের সেই সমস্ত সূত্রের দ্বারা ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ সিদ্ধান্ত বুঝা যায় এবং বাৎস্যায়ন প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ সেখানে গোতমের কিরূপ সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, ইহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। অনেক পূর্ব্বেই আমার উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা জন্মিয়াছে। কিন্তু অন্য কথার মধ্যে প্রশ্ন করিতে পারি নাই।

গুরু। গোতম তাঁহার কথিত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন কি না, সে কথা পরে বলিব। কিন্তু তুমি "ঈশ্বরবাদ" বলিতে কি বুঝিয়াছ? মহর্ষি গোতম "ঈশ্বরবাদ"কে পূর্ব্বপক্ষরূপেই গ্রহণ করিয়া উহার খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা বুঝিলে সেই "ঈশ্বরবাদ" কিরূপ, ইহাও ত বুঝা আবশ্যক। ন্যায়দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে মহর্ষি গোতম ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত সমর্থনোদ্দেশ্যে যথাক্রমে যে তিনটি সূত্র বলিয়াছেন, আমি তাহার উল্লেখ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার ব্যাখ্যাই বলিতেছি। তাহা হইলে তুমি গোতমের সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারিবে।

গোতম প্রথম সূত্র বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষ-কর্ম্মাফল্য-দর্শনাৎ" ॥ ৪।১।১৯।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি প্রাচীনগণের ব্যাখ্যানুসারে গোতমের ঐ প্রথম সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষ-সূত্র। অর্থাৎ উক্ত সূত্রের দ্বারা গোতম প্রথমে কোন মত-বিশেষকে পূর্ব্বপক্ষরূপে সমর্থন করিয়া পরে অন্য সূত্রের দ্বারা উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে সেই মত-বিশেষ কি, ইহাই প্রথমে বুঝা আবশ্যক।

শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র তাহা বুঝাইতে "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকা" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, গোতম উক্ত সূত্রে "ঈশ্বরঃ কারণং"—এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বর জগতের উপাদান-কারণ, অর্থাৎ এই জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম অথবা ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, এই মতদ্বয়কেই পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রের বিবক্ষা এই যে, আরম্ভবাদী মহর্ষি গোতম নিজ মত সমর্থনের জন্য উক্ত স্থলে ব্রহ্মপরিণামবাদ এবং ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদ বা অদ্বৈতবাদেরও উল্লেখ পূর্ব্বক খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন।

সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র উক্ত স্থলে গোতমের সূত্রাবলম্বনে "ব্রহ্মপরিণামবাদ" ও "ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদ" অর্থাৎ অদ্বৈতবাদের খণ্ডন করিয়া গোতমের মত সমর্থন করিলেও আমরা কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারেও সরলভাবে গোতমের উক্ত সূত্রের দ্বারা তাঁহার অভিমত পূর্ব্বপক্ষ বুঝিতে পারি যে, "ঈশ্বরঃ কারণং"—অর্থাৎ জীবের কর্ম্মাদিকে অপেক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে ঈশ্বরই জগতের সৃষ্ট্যাদির কারণ। উক্ত পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিতে গোতম পরে হেতু বলিয়াছেন—"পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ।" অর্থাৎ পুরুষ বা জীব কর্ম্ম করিলেও যখন তাহার সেই কর্ম্মের বৈফল্যও দেখা যায়, তখন জীবের কর্ম্মকে তাহার সুখ-দুঃখাদি ফলের কারণ বলা যায় না। অতএব ঈশ্বরই সর্ব্ব-কারণ, তাঁহার স্বেচ্ছানুসারেই তিনিই জগতের সৃষ্ট্যাদি ও সর্ব্বজীবের সুখ-দুঃখাদি বিধান করিতেছেন। ন্যায়সূত্র-বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও পরে বাচস্পতি মিশ্রের পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যব্যাখ্যা গ্রহণ না করিয়া গোতমের উক্ত পূর্ব্বপক্ষ সূত্রের উক্তরূপ তাৎপর্য্যই প্রকৃত বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

বস্তুতঃ—জীবের কর্ম্মাদি-নিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের কারণ, ইহাও একটি সুপ্রাচীন মত। প্রাচীনকালে উহাই "ঈশ্বরবাদ" নামে কথিত হইত। "সুশ্রুত-সংহিতা"য় "স্বভাববাদ" "কালবাদ" "যদৃচ্ছাবাদ" "নিয়তিবাদ" প্রভৃতির সহিত উক্ত "ঈশ্বরবাদে"রও উল্লেখ হইয়াছে (১)। প্রাচীন পালি বৌদ্ধ গ্রন্থেও পূর্ব্বোক্ত "ঈশ্বরবাদে"রও উল্লেখ দেখা যায় (২)। "বুদ্ধ-চরিতে" অশ্বঘোষও মতান্তররূপে উক্ত

---

(১) স্বভাবমীশ্বরং কালং যদৃচ্ছাং নিয়তিং তথা।
পরিণামঞ্চ মন্যন্তে প্রকৃতিং পৃথুদর্শিনঃ।
সুশ্রুত। শারীরস্থান—১।১১।

(২) ইস্সরো সব্বলোকস্স সচে কপ্পেতি জীবিতং।
ইদ্ধিব্যসনভাবঞ্চ কম্মং কল্যাণপাপকং।
নিদ্দেসকারী পুরিসো ইস্সরো তেন লিপ্পতি।
মহাবোধিজাতক (জাতক পঞ্চম খণ্ড—২৩৮ পৃষ্ঠা)

"ঈশ্বরবাদে"রও উল্লেখ করিয়াছেন (১)। নকুলীশ-পাশুপত সম্প্রদায় উক্ত মতই সমর্থন পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"র প্রারম্ভে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যও মহাপাশুপত সম্প্রদায়ের মত বলিয়া উক্ত মতের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (২)। "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" মহামনীষী মাধবাচার্য্য নকুলীশ-পাশুপত সম্প্রদায়ের মতের ব্যাখ্যা করিতে তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বর স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাচারী, তিনি সৃষ্ট্যাদি কার্য্যেও জীবের কর্ম্ম বা আর কিছুই অপেক্ষা করেন না। তাঁহার যেমন ইচ্ছা, তিনি তদনুসারেই সমস্ত কার্য্য করিতেছেন—এইরূপ বলিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের উক্তরূপ মতবোধক বচনও (৩) উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ফল কথা, পূর্ব্বোক্ত "ঈশ্বরঃ কারণং" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা মহর্ষি গৌতম পূর্ব্বোক্ত সুপ্রাচীন "ঈশ্বরবাদ"কেই পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রকাশ করিয়া উক্ত মতেরই খণ্ডন করিতে দ্বিতীয় সূত্র বলিয়াছেন—

ন পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ ॥৪।১।২০।

অর্থাৎ জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ কেবল ঈশ্বরই জগতের কারণ নহেন। কারণ, জীব কর্ম্ম না করিলে তাহার কোন ফলনিষ্পত্তি হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মকারী জীবগণের অনেক কর্ম্ম নিষ্ফল হইলেও কর্ম্ম ব্যতীতও কাহারও কোন ফলোৎপত্তি হয় না, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, কর্ম্ম ব্যতীতও ফলোৎপত্তি হইলে সকল জীবেরই স্বর্গাদি সমস্ত ফললাভ হইতে পারে। যদি বল, ঈশ্বরের সেরূপ ইচ্ছা না থাকায় তাহা হয় না, তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ, তাঁহার ইচ্ছাও স্বতন্ত্র, নিত্য, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছায় কোনরূপ অনুযোগ করা যায় না; কিন্তু ইহা বলিলে তাঁহার এই জগতের বিষম সৃষ্টিও পরে সংহারপ্রযুক্ত তাঁহার পক্ষপাত ও নির্দ্দয়তাদোষ কেন হইবে না? ইহাও ত বক্তব্য। আর তিনি কি কেহ পুণ্যকর্ম্ম না করিলে তাহাকে সুখপ্রদানে অসমর্থ? এবং পাপকর্ম্ম না করিলে তাহাকে কি দুঃখপ্রদানে অসমর্থ? ইহাও ত বক্তব্য। সমর্থ হইলে কেন তিনি তাহা করেন না? এবং অসমর্থ হইলে তাঁহাকে কিরূপে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর বলা যায়?

বস্তুতঃ, পরমেশ্বর যদি জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা না করিয়াই স্বেচ্ছানুসারেই তাহার সুখ-দুঃখ বিধান করেন, তাহা হইলে কেহ কোন সুখজনক কর্ম্ম না করিলেও তাহাকেও তিনি কোন সময়ে সেই সুখ প্রদান করেন, ইহাও স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা হইলে মানবের সাধুকর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অসাধু কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে শাস্ত্রে বিধি ও নিষেধ ব্যর্থ হয়। শ্রুতিও স্পষ্ট বলিয়াছেন—"যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি, সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি, পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন" (বৃহদারণ্যক—৪।৪।৫) সুতরাং—পরমেশ্বর জীবের সাধু ও অসাধু কর্ম্মানুসারেই জগতের সৃষ্ট্যাদি করেন, ইহাই শাস্ত্রানুসারে স্বীকার্য্য হইলে তিনি যে জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ কর্ত্তা, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বেদান্তদর্শনে ভগবান্ বাদরায়ণও উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথা হি দর্শয়তি" (২।১।৩৪)। আচার্য্য শঙ্কর ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"সাপেক্ষো হীশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে, কিমপেক্ষত ইতি চেৎ? ধর্ম্মাধর্ম্মাবপেক্ষত ইতি বদামঃ"। *অর্থাৎ ঈশ্বর জগতের এই বিষম সৃষ্টিকার্য্যে জীবের ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে অপেক্ষা করায় অর্থাৎ জীবের বিচিত্র ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারেই বিচিত্র সৃষ্টি করায় তাঁহার বৈষম্য (পক্ষপাত) দোষ নাই, এবং তিনি জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারেই এক সময়ে জগতের সংহার করায় তাঁহার নৈর্ঘৃণ্য (নির্দ্দয়তা) দোষও নাই।* কিন্তু ঈশ্বর যদি জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল স্বেচ্ছানুসারেই জগতের বিষম সৃষ্টি ও সংহার করেন, তাহা হইলে তাঁহার বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা দোষের আপত্তি হয়।

কর্ম্মবাদী বলিয়াছেন যে, জীবের কর্ম্ম ব্যতীত তাহার কোন ফলই জন্মে না, ইহা স্বীকার্য্য হওয়ায় জীবের কর্ম্মই জগতের সৃষ্ট্যাদি ও জীবের সুখ-দুঃখাদি সমস্ত ফলের কারণ, ইহাই স্বীকার্য্য। জগৎকর্ত্তা ও জীবের কর্ম্ম ফলবিধাতা ঈশ্বরস্বীকার অনাবশ্যক। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, জীবের কর্ম্ম তাহার সমস্ত ফললাভের কারণ হইলে সর্ব্বত্রই ঐ কর্ম্ম সফল হয় না কেন? যাহা ফলের কারণ, তাহা ত সর্ব্বত্রই ফল জন্মাইবে। নচেৎ তাহাকে ত ফলের কারণই বলা যায় না। পরন্তু ঈশ্বর জীবের কর্ম্মকে সহকারী কারণরূপে অপেক্ষা করিলে সেই কর্ম্মে তাঁহার কোন কর্তৃত্ব বা ঈশ্বরত্ব নাই, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্বেশ্বর বলা যায় না। মহর্ষি গৌতম পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথার উত্তরে তৃতীয় সূত্র বলিয়াছেন—

তৎকারিতত্বাদহেতুঃ ॥৪।১।২১।

অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রে যে হেতু বলিয়াছি, তাহা জীবের কর্ম্ম জগতের কারণ, ঈশ্বর কারণ নহেন, এই মতের সাধক হেতু হয় না; এবং জীবের সমস্ত কর্ম্মই সর্ব্বত্র সফল [illegible]

(১) সর্গং বদন্তীশ্বরতস্তথাহন্যে, তত্র প্রযত্নে পুরুষস্য কোঽর্থঃ।
য এব হেতুর্জগতঃ প্রবৃত্তৌ, হেতুর্নিবৃত্তৌ জগতঃ স এব।
বুদ্ধচরিত ৯ম সর্গ ৫৩শ শ্লোক।

(২) লোকবেদবিরুদ্ধৈরপি নির্লেপঃ স্বতন্ত্রশ্চেতি মহাপাশুপতাঃ।
কুসুমাঞ্জলি।

(৩) কর্ম্মাদিনিরপেক্ষস্তু স্বেচ্ছাচারী যতো হ্যয়ং।
অতঃ কারণতঃ শাস্ত্রে সর্ব্বকারণ-কারণং।
"সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে" নকুলীশ-পাশুপতদর্শন দ্রষ্টব্য।

হইবে এবং জীবের কর্ম্মে ঈশ্বরের কোন কর্ত্তৃত্ব বা ঈশ্বরত্ব নাই, এ বিষয়েও হেতু হয় না। অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুর দ্বারা, পূর্ব্বোক্ত কোন সাধ্যই সিদ্ধ হয় না। কারণ, জীবের কর্ম্ম ও তাহার ফল "তৎকারিত"—অর্থাৎ ঈশ্বর-কারিত। ঈশ্বরই জীবকে সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইয়া তাহার ফল সম্পাদন করেন। তিনি জীবকে কর্ম্ম না করাইলে জীব কোন কর্ম্মই করিতে পারে না। সুতরাং জীবের কর্ম্মে ঈশ্বরই প্রযোজক কর্ত্তা, জীব তাহার প্রযোজ্য কর্ত্তা; এবং যে সময়ে ঈশ্বর জীবের কর্ম্মফল সম্পাদন করেন, তখনই জীবের সেই কর্ম্ম সফল হয়। নচেৎ উহা নিষ্ফল হয়। সুতরাং জীবের সমস্ত কর্ম্মই সর্ব্বদা সফল হইবে, ইহাও বলা যায় না এবং জীবের কর্ম্মই জগতের সৃষ্ট্যাদি ও জীবের সুখদুঃখাদি কর্ম্মফলের কারণ, ঈশ্বর তাহাতে কারণ নহেন, ইহাও বলা যায় না।

তাৎপর্য্য এই যে, জীবের সমস্ত কর্ম্ম ও তাহার সমস্ত ফল ঈশ্বরের অধীন। জীব সর্ব্বথা স্বাধীনভাবে কোন কর্ম্ম করিতে পারে না এবং তাহার ফললাভও করিতে পারে না। ঈশ্বরই জীবের প্রাক্তনকর্ম্মানুসারে জীবকে সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইয়া তাহাকে ঐ কর্ম্মফল প্রদান করেন। ইহাই শ্রুতিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। কারণ, শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন—

"এষ হ্যেবৈনং সাধুকর্ম্ম কারয়তি তং, য যেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত এষ উ এবৈনমসাধুকর্ম্ম কারয়তি তং, য মধো নিনীষতে" (কৌষীতকী উপ—৩।৮।)

এবং ঈশ্বরই জীবের কর্ম্মাধ্যক্ষ অর্থাৎ জীবের সেই সমস্ত কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা। তাই শ্রুতি তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করিতে বলিয়াছেন—"কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ" (শ্বেতাশ্বতর—৬।১১)

বস্তুতঃ জীবের সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টে সেই সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বরের অধিষ্ঠান ব্যতীত কোন অদৃষ্টই তাহার ফল জন্মাইতে পারে না। কারণ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট অচেতন পদার্থ। কোন চেতন পদার্থের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতন পদার্থ তাহার কার্য্য জন্মাইতে পারে না। সুতরাং যেমন কুঠার প্রভৃতি অচেতন পদার্থ কোন ছেদক পুরুষের অধিষ্ঠানপ্রযুক্ত ছেদন-ক্রিয়া জন্মায়, তদ্রূপ, জীবের সমস্ত অদৃষ্টও কোন চেতন পুরুষের অধিষ্ঠানপ্রযুক্তই তাহার কার্য্য জন্মায়, ইহা অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ হয়। কিন্তু অসর্ব্বজ্ঞ মূঢ় জীব তাহার অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না। সুতরাং যিনি অনাদিকাল হইতে অসংখ্য জীবের অসংখ্য প্রকার অসংখ্য অদৃষ্টের প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং কোন্ সময়ে কোন্ জীবের কোন্ স্থানে কোন্ অদৃষ্টের কিরূপ ফল হইবে, তাহাও সতত প্রত্যক্ষ করিতেছেন, এমন কোন সর্ব্বদর্শী পরমপুরুষ স্বীকার করিতেই হইবে। তিনিই জীবের সর্ব্বকর্ম্মের অধ্যক্ষ অর্থাৎ সমস্ত অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা।

গৌতম-মতের ব্যাখ্যাতা মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যও "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থের প্রথমস্তবকে উক্তরূপে ঈশ্বরের মনননের জন্য সমস্ত জীবের সমস্ত অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতৃত্বরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বসাধক অনুমান-প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তৎপূর্ব্বে বিশেষ বিচার দ্বারা নাস্তিকমত খণ্ডন পূর্ব্বক ঐ অদৃষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন। তিনি সেখানে শেষ শ্লোকে ইহাও বলিয়াছেন যে, জীবের কর্ম্মজন্য ঐ অদৃষ্টসমষ্টিই শাস্ত্রে অনেক স্থলে প্রকৃতি, মায়া ও অবিদ্যা নামে কথিত হইয়াছে। ঐ "প্রকৃতি" শব্দের অর্থ শক্তি বা কার্য্যের সহায়বিশেষ। জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর জীবের অদৃষ্টসমষ্টিকে সহকারী কারণরূপে অপেক্ষা করিয়া জগতের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করায় উহা তাহার সহকারি-শক্তি। সহকারি-কারণও শক্তি ও প্রকৃতি নামে কথিত হইয়া থাকে; এবং জীবের ঐ অদৃষ্টসমষ্টি অতি দুর্জ্ঞেয় বলিয়া উহা "মায়া" নামেও কথিত হইয়াছে এবং উহা তত্ত্বজ্ঞানরূপ বিদ্যানাশ্য, সুতরাং বিদ্যার সহিত উহার বিরোধ বশতঃ ঐ অর্থে উহা "অবিদ্যা" নামে কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বিষ্ণুপুরাণেও কথিত হইয়াছে—"অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে" (৬।৭।৬১) অর্থাৎ জীবের কর্ম্মনামক অবিদ্যা পরমেশ্বরের তৃতীয়া শক্তি।

অবশ্য শাস্ত্রে প্রকৃতি ও মায়া ত্রিগুণাত্মক, ইহাও কথিত হইয়াছে। কিন্তু উদয়নাচার্য্যের পূর্ব্বোক্ত কথার দ্বারা তাঁহার মত বুঝা যায় যে,—"সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ" এই নামত্রয়ে শাস্ত্রে যে গুণত্রয় কথিত হইয়াছে, তাহাও জীবের অদৃষ্ট ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং শাস্ত্রে অনেক স্থলে ঐ গুণজন্য কার্য্যেও ঐ সত্ত্বাদি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে এবং ঐ মায়ার কার্য্যকেও মায়া বলা হইয়াছে। জীবগত ঐ অদৃষ্টসমষ্টিরূপ মায়াই "গুণমায়া" বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু পরমেশ্বর ঐ মায়ার অধিষ্ঠাতা, ঐ মায়া তাঁহার সহকারিশক্তি এই অর্থেই তিনি মায়ী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তিনি ঐ মায়ায় অধিষ্ঠিত হইয়া উহার সাহায্যে সৃষ্ট্যাদি করেন। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন, "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ।" "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং" (শ্বেতাশ্বতর ৪।৯।১৯) কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তিরূপ যে মায়া, তাহা তাঁহার আত্মগত, উহা তাঁহাতেই নিত্যসিদ্ধ আছে,—এ জন্য শাস্ত্রে উহা "আত্মমায়া" নামে কথিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ শাস্ত্রে নানাস্থানে "মায়া" "প্রকৃতি" ও "অবিদ্যা" প্রভৃতি অনেক শব্দের অনেক অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে, এ জন্যও শাস্ত্রার্থব্যাখ্যায় অনেক মতভেদ হইয়াছে। উদয়নাচার্য্যের পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা অন্যান্য সম্প্রদায় গ্রহণ করেন নাই, ইহাও সত্য। গৌতমের মতে বেদোক্ত "মায়া" ও "প্রকৃতি" শব্দের অর্থ কি, তাহা তিনি নিজে কিছুই বলেন নাই। কিন্তু গৌতম পূর্ব্বোক্ত "তৎকারিতত্বাদহেতুঃ"—এই সূত্রের দ্বারা জীবের সমস্ত কর্ম্ম ও তাহার ফল ঈশ্বরকারিত বলিয়া উক্ত বিষয়ে শ্রৌত সিদ্ধান্তই যে সমর্থন করিয়াছেন, ইহা

অবশ্যই বুঝা যায়। ঈশ্বরই জীবের সর্ব্বকর্ম্মের কারয়িতা এবং সেই সমস্ত কর্ম্মের ফলদাতা, ইহা শ্রুতির সিদ্ধান্ত। শ্রুতি বলিয়াছেন—"স বা এষ মহানজ আত্মা বসুদানঃ"(বৃহদারণ্যক ৪।৪।২৪) সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরই জীবের "বসুদান" অর্থাৎ ধনদাতা,— এই কথার দ্বারা তিনি সর্ব্বজীবের সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা, ইহাই কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি অনুসারে বেদান্তদর্শনে (৩।২।৪১) বেদব্যাসও উক্ত সিদ্ধান্তই তাঁহার সম্মত, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। পরন্তু—ক্ষত্রিয় রাজা সুরথ ও সমাধি নামক বৈশ্যকে দেবী যে বরপ্রদান করিয়াছিলেন—ইহাও মার্কণ্ডেয়পুরাণের দেবী-মাহাত্ম্যে বেদব্যাসই বর্ণন করিয়াছেন। দেবী সকাম সুরথ রাজার প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে রাজ্য-বর প্রদান করিয়াছিলেন এবং সংসারবিরক্ত মুমুক্ষু বৈশ্য সমাধিকে তাঁহার প্রার্থনানুসারে আত্মজ্ঞান-বর প্রদান করিয়াছিলেন (১) সুতরাং মুমুক্ষুর মোক্ষসাধন সমস্ত কর্ম্মের ফলও ঈশ্বরের অধীন, ঈশ্বরদর্শন ব্যতীত মুক্তি হইতে পারে না, অর্থাৎ ঈশ্বরের দর্শন হইলেই ঈশ্বরই মুমুক্ষুকে আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া মুক্তিদান করেন—ইহাও গোতমের উক্ত সূত্রের দ্বারা তাঁহারও সম্মত বুঝা যায়। সুতরাং গোতমের মতে যে ঈশ্বরের সহিত মুক্তির কোন সম্বন্ধই নাই, ইহা কখনই বলা যায় না।

এখন মূল কথা স্মরণ কর যে, গোতমের প্রথমোক্ত "ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ" এই সূত্রকে পূর্ব্বপক্ষসূত্র বলিয়া গ্রহণ করিলে তিনি উক্ত স্থলে জীবের কর্ম্মাদিনিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের কারণ, এই "ঈশ্বরবাদ" খণ্ডন করিয়া জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের কারণ, এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন বুঝা যায়। বাচস্পতি মিশ্রও পরে ইহাও বলিয়াছেন।

কিন্তু মহর্ষি গোতমের প্রথমোক্ত "ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ" এই সূত্রটিকে তাঁহার সিদ্ধান্তসূত্ররূপেও গ্রহণ করা যায়। পরবর্ত্তিকালে কোন নৈয়ায়িক সম্প্রদায় যে গোতমের ঐ সূত্রকে সিদ্ধান্ত-সূত্র বলিয়াই গ্রহণ করিয়া উক্ত তিন সূত্রের দ্বারা জগৎকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সমর্থনই গোতমের অভিপ্রেত, ইহা বলিয়াছিলেন, ইহা বৃত্তিকার বিশ্বনাথও শেষে বলিয়া তাঁহাদিগের সেই ব্যাখ্যাও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের ব্যাখ্যা এই যে, "ঈশ্বরঃ কারণং" —অর্থাৎ জীবের কর্ম্মানুসারে ঈশ্বরই জগতের কর্ত্তা, জীবসমূহ জগতের কর্ত্তা নহে। জীবসমূহ কর্ত্তা নহে কেন? তাই বলিয়াছেন—"পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ"। অর্থাৎ যেহেতু জীবের কর্ম্মের বৈফল্য দেখা যায়, অতএব জীব জগতের কর্ত্তা নহে। কিন্তু জীব হইতে ভিন্ন সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই জগতের কর্ত্তা। তাৎপর্য্য এই যে, জীব যখন নিষ্ফল কর্ম্মেও প্রবৃত্ত হয়, তখন জীব তাহার অদৃষ্টাদি বিষয়ে অজ্ঞ ও ভ্রান্ত। সুতরাং জীবের পক্ষে জগৎকর্তৃত্ব কখনই সম্ভব নহে। পরন্তু সৃষ্টিকার্য্যে মূল উপাদান যে অতীন্দ্রিয় পরমাণুসমূহ, তাহার প্রত্যক্ষ ব্যতীত কাহারও সৃষ্টিকর্তৃত্ব সম্ভবই হইতে পারে না। কিন্তু অসর্ব্বজ্ঞ জীব অতীন্দ্রিয় পরমাণুদর্শী হইতে পারে না এবং জীবের শরীরাদি সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহার কোন জ্ঞানই জন্মিতে পারে না। অতএব জীব জগতের কর্ত্তা নহে, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই জগতের কর্ত্তা।

মহর্ষি গোতম উক্ত প্রথম সূত্রের দ্বারা উক্তরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া পরে পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিতে দ্বিতীয় সূত্র বলিয়াছেন—"ন পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ"। অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে জীবগণের শুভাশুভকর্ম্ম জন্য বিচিত্র ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টবশতঃই জগতের সৃষ্টি হইতেছে, জীবের অদৃষ্ট ব্যতীত তাহার পক্ষে কোন ফলেরই উৎপত্তি হয় না, ইহা স্বীকার্য্য। অতএব জীবগণই নিজ নিজ অদৃষ্ট দ্বারা জগৎসৃষ্টির কারণ হওয়ায় জগৎকর্ত্তা, ইহাই বলা যায়। জগতের কর্ত্তা বলিয়া ঈশ্বর-স্বীকার অনাবশ্যক। মহর্ষি গোতম উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে তৃতীয় সূত্র বলিয়াছেন—"তৎকারিতত্বাদহেতুঃ"। অর্থাৎ জীবের কর্ম্ম ব্যতীত সৃষ্টি হইতে পারে না, ইহা সত্য। কিন্তু ঐ হেতু জীবের জগৎ-কর্তৃত্বের সাধক হেতু হয় না,—উহা অহেতু। কারণ, জীবের সেই সমস্ত কর্ম্মও "তৎকারিত" অর্থাৎ ঈশ্বরকারিত। ঈশ্বরই অনাদিকাল হইতে সমস্ত জীবকে সেই সেই কর্ম্ম করাইতেছেন, সর্ব্বজ্ঞতা বশতঃ তিনিই জীবের সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষ অর্থাৎ সমস্ত অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা। অসর্ব্বজ্ঞ মূঢ় জীব তাহার অদৃষ্টদর্শী না হওয়ায় সেই সমস্ত অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা হইতেই পারে না। সুতরাং সেই সমস্ত অদৃষ্ট দ্বারাও জীবের জগৎ-কর্তৃত্ব সম্ভবই হয় না। এখন [illegible] দেখি, গোতমের প্রথমোক্ত "ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্য-দর্শনাৎ"—এই সূত্রটিকে তাঁহার সিদ্ধান্তসূত্র বলিয়াই গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত তিন সূত্রের উক্তরূপ ব্যাখ্যা [illegible] করা যায় না?

শিষ্য। আপনার কথিত গোতমের "ঈশ্বরঃ কারণং" — ইত্যাদি প্রথম সূত্রটিকে তাঁহার সিদ্ধান্তসূত্র বলিয়া [illegible] করিলে উহার দ্বারা জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরই [illegible] কারণ, ইহাও ত তাঁহার সিদ্ধান্ত বলিয়া ব্যাখ্যা [illegible] যাইতে পারে। তিনি পরে "তৎকারিতত্বাদহেতুঃ" এই তৃতীয় সূত্রের দ্বারা জীবের সুখ-দুঃখাদি ফল ঈশ্বরকারিত — অর্থাৎ ঈশ্বরই স্বেচ্ছানুসারে উহা উৎপন্ন করেন, [illegible] জীবের কর্ম্ম কারণ নহে,—জীবের কর্ম্ম ব্যতীতও ঈশ্বরের ইচ্ছায় জীবের অনেক ফল হইয়া থাকে, এই কথা [illegible]

---

(১) "সোঽপি বৈশ্যস্ততো জ্ঞানং বব্রে নির্ব্বিণ্ণমানসঃ।
মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতিকারকং।
বৈশ্যবর্য্য ত্বয়া যশ্চ বরোঽস্মত্তোঽভিযাচিতঃ।
তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি।"
মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৯০ অঃ (চণ্ডীর শেষ)

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, ইহাও ত বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইলে ত আপনার পূর্ব্বকথিত পাশুপত মতই গৌতমের মত বুঝা যায়। গৌতমের উক্ত তিন সূত্রের ঐ ভাবে কি ব্যাখ্যা করা যায় না?

গুরু। ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কিন্তু গৌতমের "তৎকারিতত্বাদহেতুঃ"—এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পাশুপতমতই তাঁহার সিদ্ধান্ত বলিয়া বুঝা যায় কি না, ইহা বুঝিয়া সেইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে এবং গৌতমের অন্যান্য সূত্র দ্বারাও তাঁহার সিদ্ধান্ত বুঝিয়া তদনুসারেই উক্তস্থলে তাঁহার সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিতে হইবে। গৌতম ন্যায়দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন—

পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ।৩।২।৬০। *

অর্থাৎ জীবগণের যে বিচিত্র শরীরসৃষ্টি, তাহা তাহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তক। মহর্ষি গৌতম উক্ত সূত্রের দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া পরে কতিপয় সূত্রের দ্বারা বিচার পূর্ব্বক উক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন, পূর্ব্বেও ইহা বলিয়াছি। সুতরাং গৌতমের মতে জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর যে জীবের প্রাক্তনকর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মসাপেক্ষ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব জীবের কর্ম্মাদিনিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তা ও জীবের সুখ-দুঃখবিধাতা, এই পাশুপত মতই গৌতমের মত বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। চতুর্ব্বিধ মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের অন্তর্গত পাশুপত সম্প্রদায় উক্তরূপ মত সমর্থন করিলেও শৈব সম্প্রদায় কিন্তু গৌতমের উক্ত মতই সমর্থন করিয়াছেন। "সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে" শৈবদর্শনের প্রারম্ভ দেখিলেও তুমি ইহা জানিতে পারিবে আর তুমি গৌতমের পূর্ব্বোক্ত তিন সূত্রের যে ভাবেই ব্যাখ্যা কর, জগৎকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর যে গৌতমের সম্মত, ইহা ত স্বীকার করিতেই হইবে। আর গৌতমের মতে যে সর্ব্বব্যাপী নিত্য সর্ব্বজ্ঞ, সেই এক মহেশ্বরই জগতের আদিকর্ত্তা, ইহা ত চিরপ্রসিদ্ধই আছে। এ বিষয়ে কোন মতভেদও নাই। জৈন পণ্ডিত হরিভদ্র সূরিও "ষড়্দর্শন-সমুচ্চয়" গ্রন্থে নৈয়ায়িক দর্শনের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন—

"আক্ষপাদমতে দেবঃ সৃষ্টিসংহারকৃচ্ছিবঃ।
বিভুর্নিত্যৈকসর্ব্বজ্ঞো নিত্যবুদ্ধিসমাশ্রয়ঃ॥"

অক্ষপাদ গৌতম মুনি যাহাদিগের আদিগুরু, এই অর্থে "আক্ষপাদ" শব্দের অর্থ নৈয়ায়িক সম্প্রদায়। কোন কোষকারও বলিয়াছেন—"নৈয়ায়িকশ্চাক্ষপাদঃ।" হরিভদ্র সূরি উক্ত শ্লোকের দ্বারা বলিয়াছেন যে, নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতে জগতের সৃষ্টি-সংহারকর্ত্তা শিব দেব, তিনি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, এবং নিত্য, এক, সর্ব্বজ্ঞ এবং তিনি নিত্যজ্ঞানের আশ্রয়। শিবই ন্যায়দর্শনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং তিনিই উক্ত মতে সৃষ্টি-সংহারকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বর,—ইহা প্রকাশ করিতেই হরিভদ্র সূরি উক্ত শ্লোকে বলিয়াছেন—"দেবঃ শিবঃ"। সর্ব্বজ্ঞ বলিলে যোগীর ন্যায় সর্ব্বজ্ঞও বুঝা যাইতে পারে, তাই শেষে আবার বলিয়াছেন—"নিত্যবুদ্ধিসমাশ্রয়ঃ"। অর্থাৎ সেই মহেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা বা সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান, যোগীর সর্ব্বজ্ঞতার ন্যায় যোগজনিত নহে, কিন্তু উহা নিত্য, উহার উৎপত্তি হয় নাই এবং কখনও উহার বিনাশও হয় না। তিনি সেই সর্ব্ববিষয়ক নিত্যজ্ঞানের আধার, তাই তাঁহাকে বলা হইয়াছে, নিত্য সর্ব্বজ্ঞ।

শিষ্য। ঈশ্বর নিত্যজ্ঞান ও নিত্য আনন্দস্বরূপ, তিনি সচ্চিদানন্দ, ইহাই ত বেদাদিশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার স্বরূপলক্ষণ বলিতে শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তিরীয় ২।১।১) "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃহদারণ্যক ৩।৯।২৮) এবং শ্রুতি বলিয়াছেন—"সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" (শ্বেতাশ্বতর ৬ ১১) সুতরাং সেই পরব্রহ্ম বস্তুতঃ নির্গুণ, ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত। তাহা হইলে ঈশ্বর যে নিত্যজ্ঞানস্বরূপ নহেন, কিন্তু তিনি নিত্যজ্ঞানের আধার অর্থাৎ নিত্যজ্ঞান তাঁহার গুণ বা ধর্ম্ম, ইহা কিরূপে বলা যায়? আর গৌতমের যে তাহাই মত, ইহাই বা কিরূপে বুঝিব? তিনি ত পূর্ব্বোক্ত স্থলে ঈশ্বরের স্বরূপলক্ষণ কিছুই বলেন নাই।

গুরু। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গৌতমের মতে জ্ঞান আত্মার গুণ। ঐ জ্ঞানের নামই চৈতন্য। সুতরাং যে পদার্থ ঐ জ্ঞানের আশ্রয়, তাহাই চেতন পদার্থ। চৈতন্যরূপ জ্ঞান

* কেহ কেহ বলেন যে, গৌতমের মতে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর জীবের অতীত শুভাশুভ কর্ম্মানুসারেই জগতের কর্ত্তা এবং জীবের সুখ-দুঃখবিধাতা; অর্থাৎ গৌতম জীবের শুভাশুভ কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামক আত্মগুণ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু উক্ত সূত্রে গৌতম "পূর্ব্বকৃত" শব্দের পরে "ফল" শব্দের প্রয়োগ করায় তিনি যে পূর্ব্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্মনামক ফলও স্বীকার করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও উক্ত সূত্রে "পূর্ব্বকৃত' শব্দ ও "ফল" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"পূর্ব্বশরীরে যা প্রবৃত্তির্ব্বাগ্-বুদ্ধি-শরীরারম্ভলক্ষণা, তৎপূর্ব্বকৃতং কর্ম্মোক্তং, তস্য ফলং তজ্জনিতৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ।" গৌতম ন্যায়দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেও "শরীরদাহে পাতকাভাবাৎ' (১।৪) এই সূত্রে "পাতক" শব্দের দ্বারা অধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন। পরে তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে ৪১শ সূত্রেও সংস্কারের উদ্বোধকসমূহের উল্লেখ করিতে সর্ব্বশেষে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মেরও উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং নৈয়ায়িক সম্প্রদায় গৌতমের সূত্রানুসারেই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে জীবাত্মার গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে মহর্ষি কণাদও ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ অদৃষ্টের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ প্রভৃতিও ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে জীবাত্মার গুণ বলিয়া গিয়াছেন।

কোন জড় পদার্থের ধর্ম্ম হইতে পারে না। গৌতম জ্ঞানকে কোন জড়ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন নাই; কিন্তু তিনি বিচারপূর্ব্বক জ্ঞানকে আত্মার গুণ বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে ঈশ্বরের যে নিত্যজ্ঞান, তাহাও ঈশ্বরেরই গুণ, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। কারণ, ঈশ্বরও আত্মা, তিনি পরমাত্মা। তাই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন শেষে গৌতমসম্মত ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—

"গুণবিশিষ্টমাত্মান্তরমীশ্বরঃ। তস্যাত্মকল্পাৎ কল্পান্তরানুপপত্তিঃ।"

অর্থাৎ গুণবিশিষ্ট যে আত্মান্তর, তিনি ঈশ্বর। আত্মার প্রকার হইতে তাঁহার অন্য প্রকারের উপপত্তি হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা দুই প্রকার;—জীবাত্মা ও পরমাত্মা, ঈশ্বরই পরমাত্মা, তিনি আত্মারই দ্বিতীয় প্রকার। অর্থাৎ একই আত্মত্ব জাতি জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দ্বিবিধ আত্মাতেই থাকায় পরমাত্মাও আত্মা, সুতরাং তিনিও গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ জ্ঞানাদিগুণের আশ্রয় কিন্তু তিনি জীবাত্মার সজাতীয় হইলেও জীবাত্মা হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন। বাৎস্যায়ন ঈশ্বরকে "আত্মান্তর" বলিয়া ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। বাৎস্যায়নের ঐ কথার দ্বারা তাঁহার মতেও গৌতম যে তাঁহার কথিত "প্রমেয়" পদার্থের মধ্যে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা পরমাত্মারও গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যায়।

ঈশ্বরের সগুণত্ব সমর্থন করিতে বাৎস্যায়ন পরে আবার বলিয়াছেন—"আগমাচ্চ দ্রষ্টা বোদ্ধা সর্ব্বজ্ঞাতা ঈশ্বর ইতি।" অর্থাৎ ঈশ্বর যে জ্ঞানবান্, জ্ঞান তাঁহার গুণ, ইহা শাস্ত্র দ্বারাও সিদ্ধ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন— "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" (মুণ্ডক ১।১।৯) যিনি সামান্যরূপে সর্ব্বজ্ঞ এবং বিশেষরূপেও সর্ব্বজ্ঞ, যাঁহার তপস্যা জ্ঞানস্বরূপ, ইহা বলিলে তিনি যে সর্ব্ববিষয়ক নিত্যজ্ঞানবান্, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। আর সেই মহেশ্বরের যে সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি ছয়টি অঙ্গ, অর্থাৎ উহা তাঁহাতে সতত বর্ত্তমান, ইহা পুরাণেও কথিত হইয়াছে। (১) নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের অনেক আচার্য্য মহেশ্বরের বায়ুপুরাণোক্ত সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি ষড়ঙ্গের ব্যাখ্যা করিয়া তদ্দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। গৌতমের মতে জ্ঞান যে মনের ধর্ম্ম নহে, কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্মারই ধর্ম্ম, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং তাঁহার মতে মহেশ্বরের চিত্তগত সর্ব্বজ্ঞতা গ্রহণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বজ্ঞ বলা যায় না। আর তিনি নিরাকার মহেশ্বরের চিত্ত বা মনও স্বীকার করেন নাই

বাৎস্যায়ন পরে ইহাও বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর নির্গুণ হইলে কোন প্রমাণের দ্বারাই কেহ তাঁহার উপপাদন করিতেই পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অসম্ভব; এবং তাঁহাতে জ্ঞান না থাকিলে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণও না থাকায় তাঁহার অনুমাপক কোন লিঙ্গও উপপাদন করিতে পারা যায় না—যদ্দ্বারা তাঁহার অনুমান করা যাইতে পারে। জ্ঞান প্রভৃতি গুণের দ্বারাই তাঁহার আশ্রয় আত্মার অনুমান হইয়া থাকে; এবং শব্দপ্রমাণের দ্বারাও ঈশ্বর জ্ঞানাদিগুণবিশিষ্ট, ইহাই বুঝা যায়। সুতরাং ঈশ্বরে যদি সেই জ্ঞানাদি গুণ না থাকে, যদি তিনি সেই সমস্ত গুণের দ্বারা উপাখ্যাত বা বিশেষিত না হন, তাহা হইলে ঐরূপ নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ঈশ্বর কোন প্রমাণেরই বিষয় না হওয়ায় প্রমাণাভাবে তাঁহার সিদ্ধিই হইতে পারে না।

শ্রীভাষ্যকার রামানুজও অন্যভাবে ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, প্রমাণমাত্রই সবিশেষ বস্তুবিষয়ক নির্ব্বিশেষ বস্তু কোন প্রমাণের বিষয়ই হইতে পারে না সুতরাং প্রমাণাভাবে ঐরূপ বস্তু সিদ্ধই হয় না অতএব বেদাদিশাস্ত্রে পরব্রহ্মের নির্গুণত্ববোধক যে সমস্ত বাক্য আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, পরব্রহ্ম সমস্ত প্রাকৃত হেয়গুণশূন্য, তিনি সর্ব্বপ্রকার সমস্তগুণশূন্য নহেন পরন্তু পরব্রহ্ম বাসুদেব যে অশেষ কল্যাণগুণের আকর, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ এবং তাঁহাতে যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণ নাই, ইহাও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে সুতরাং পরব্রহ্ম বাসুদেব অপ্রাকৃত অশেষ কল্যাণগুণযোগে সগুণ এবং তিনিই সমস্ত প্রাকৃত হেয়গুণশূন্য বলিয়া নির্গুণ, ইহাই শাস্ত্রার্থ। রামানুজের [illegible] গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণও "সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে [illegible] প্রাকৃতা গুণাঃ"—ইত্যাদি শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ শাস্ত্রার্থই সমর্থন করিয়াছেন। ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতেও পরমেশ্বরে সত্ত্বাদি গুণত্রয় নাই, এই তাৎপর্য্যে শাস্ত্রে অনেক স্থলে তিনি নির্গুণ বলিয়া কথিত হইয়াছেন তবে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে পরব্রহ্ম সগুণ হইলেও [illegible] নিত্যজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ।

কিন্তু কণাদ ও গৌতমের মতে জ্ঞান ও [illegible] গুণপদার্থ এবং গুণপদার্থে গুণ থাকে না। [illegible] গুণের আশ্রয়। তাই কণাদ দ্রব্যপদার্থের মধ্যেই [illegible] উল্লেখ করিয়াছেন। গৌতমেরও উহাই সিদ্ধান্ত [illegible] তাঁহাদিগের মতে আত্মা, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ [illegible]

---

(১) বায়ুপুরাণের দ্বাদশ অধ্যায়ে "বিদিত্বা সপ্তসূক্ষ্মাণি ষড়ঙ্গঞ্চ মহেশ্বরং"—এই শ্লোকের পরেই মহেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি ছয়টি অঙ্গ কথিত হইয়াছে। যথা—

"সর্ব্বজ্ঞতাতৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ।
অনন্তশক্তিশ্চ বিভোর্ব্বিধিজ্ঞাঃ ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য" ।১২।৩৩।

যোগভাষ্যের (১।২৫) টীকায় বাচস্পতিমিশ্রও বায়ুপুরাণের উক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া পরে মহেশ্বরের দশাব্যয়তা বিষয়েও প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

"জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং তপঃ সত্যং ক্ষমা ধৃতিঃ।
স্রষ্টৃত্বমাত্মসংবোধো হ্যধিষ্ঠাতৃত্বমেব চ।
অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠন্তি শঙ্করে।"

বলা যায় না। পরন্তু জ্ঞান ও আনন্দ, স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ। সুতরাং যাহা জ্ঞানস্বরূপ, তাহাই আনন্দস্বরূপ, ইহা সম্ভবই নহে। সাংখ্য-সম্প্রদায়ও আত্মাকে নির্গুণ চৈতন্যস্বরূপ স্বীকার করিয়াও পূর্ব্বোক্ত কারণে আত্মার আনন্দরূপতা স্বীকার করেন নাই সাংখ্য-সূত্রকারও বলিয়াছেন—"নৈকস্যানন্দচিদ্রূপত্বে দ্বয়োর্ভেদাৎ"। "দুঃখ-নিবৃত্তের্গৌণঃ" (৫।৬৬।৬৭) অর্থাৎ চৈতন্য ও আনন্দ যখন স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ, তখন একই পদার্থ চৈতন্যস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ, ইহা সম্ভবই হয় না সুতরাং "বিজ্ঞান-মানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "আনন্দ" শব্দের দুঃখা-ভাব অর্থে গৌণপ্রয়োগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু উক্তস্থলে অন্যান্য শাস্ত্রবাক্য দ্বারাও বিচার করিয়া উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। মীমাংসাচার্য্য পার্থসারথি মিশ্রও "শাস্ত্রদীপিকার" তর্কপাদে বিচার পূর্ব্বক আত্মার আনন্দস্বরূপত্বের খণ্ডন করিয়াছেন এবং আত্মার সগুণত্বই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি সেখানে ইহাও বলিয়াছেন যে, অনেক গুণবাচক শব্দেরও গুণবিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। "আনন্দং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্যে আনন্দবিশিষ্ট অর্থেই "আনন্দ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে এবং "রসো বৈ সঃ",—এই শ্রুতিবাক্যেও রসবিশিষ্ট অর্থেই "রস" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

"তত্ত্বচিন্তামণিকার" গঙ্গেশ উপাধ্যায় "ঈশ্বরানুমান-চিন্তামণি" গ্রন্থে উক্ত মতের সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, সুখবাচক "আনন্দ" শব্দ নিয়ত পুংলিঙ্গ। কিন্তু "আনন্দং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্যে "আনন্দং" এইরূপ ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগ হওয়ায় যাহাতে আনন্দ বিদ্যমান আছে, এই অর্থে "আনন্দ শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থ অচ্ প্রত্যয়নিষ্পন্ন ক্লীবলিঙ্গ ঐ "আনন্দ" শব্দের দ্বারা আনন্দবিশিষ্ট এইরূপ অর্থই বুঝা যায়। সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করিতে "আনন্দং" এই পদের দ্বারা ব্রহ্ম যে আনন্দস্বরূপ নহেন, কিন্তু আনন্দবিশিষ্ট, ইহাই কথিত হইয়াছে বুঝা যায়। নচেৎ উক্ত শ্রুতিবাক্যে "আনন্দং" এইরূপ ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগের উপপত্তি ও সার্থকতা হয় না। এইরূপ পূর্ব্বোক্তমতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতি-বাক্যে "জ্ঞান" শব্দের দ্বারাও জ্ঞানবিশিষ্ট অর্থই বুঝিতে হইবে। তাই "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্যে "বিজ্ঞান" শব্দের প্রয়োগের দ্বারা যাঁহাতে বিশিষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ নিত্যজ্ঞান আছে, তিনিই পরব্রহ্ম, ইহাই প্রকটিত হইয়াছে। ফল কথা, ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে পরব্রহ্ম নিত্যজ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ নহেন, কিন্তু নিত্যজ্ঞান ও আনন্দবিশিষ্ট। তাঁহাতে নিত্যজ্ঞান ও নিত্য আনন্দ আছে, এই অর্থেই তিনি শাস্ত্রে "সচ্চিদানন্দ" বলিয়া কথিত হইয়াছেন। অর্থাৎ ঐ "সচ্চিদানন্দ" শব্দে বহুব্রীহি সমাসই বুঝিতে হইবে।

কিন্তু পরব্রহ্মের যে আনন্দ বা সুখ নাই, ইহাও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। "নৃসিংহতাপনী" উপনিষদের উত্তরভাগে কথিত হইয়াছে, "অসুখদুঃখোঽদ্বয়ঃ পরমাত্মা" (১৫) মহাভারতের বনপর্ব্বেও (১৮০ অঃ) কথিত হইয়াছে— "পরং ব্রহ্ম নির্দুঃখমসুখঞ্চ তৎ"। অর্থাৎ পরব্রহ্মের সুখও নাই, দুঃখও নাই। তাই ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের অনেক আচার্য্যই ঈশ্বরের সুখ স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে পরব্রহ্মকে যে আনন্দবিশিষ্ট বলা হইয়াছে, উহা সুখরূপ আনন্দ নহে। কিন্তু তাঁহার নিত্যসিদ্ধ আত্যন্তিক দুঃখাভাবই ঐ "আনন্দ" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। দুঃখাভাব অর্থেও আনন্দ ও সুখ প্রভৃতি শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ হইয়া থাকে।

কিন্তু গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী "ন্যায়-মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্ট এবং পরবর্ত্তী রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি অনেক নব্য-নৈয়ায়িক "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "আনন্দ" ও "সুখ" শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়াই ঈশ্বরের নিত্য সুখও স্বীকার করিয়াছেন। পরমেশ্বরের অনিত্য সুখ না থাকিলেও তিনি নিত্যসুখের আশ্রয়। উদয়নাচার্য্যের "আত্মতত্ত্ব-বিবেকে"র টীকার শেষ ভাগে রঘুনাথ শিরোমণি উহা স্বীকার করিয়াছেন; এবং "তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি"র মঙ্গলাচরণে ঈশ্বরের নমস্কার করিতে তিনি বলিয়াছেন—"অখণ্ডানন্দবোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে"। রঘুনাথ শিরোমণির উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে যাহাতে অখণ্ড অর্থাৎ নিত্য আনন্দ ও নিত্য জ্ঞান আছে, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাস গ্রহণ করিয়াই তিনি "অখণ্ডানন্দ-বোধায়" এই বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন বুঝা যায়। টীকা-কার জগদীশ ও গদাধর প্রভৃতি উহার অন্যরূপ অর্থেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণির মতে পরমাত্মা যে নিত্যজ্ঞান ও নিত্য আনন্দস্বরূপ, এইরূপ ব্যাখ্যা তাঁহারা কেহই করেন নাই, কারণ, ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহারই উক্তরূপ মত নহে। কণাদ ও গৌতমের মতে আত্মা যে দ্রব্যপদার্থ ও সগুণ, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য এই মতের সমর্থনে "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে (৩।১৭) বলিয়াছেন যে, আত্মার নির্গুণত্ববোধক শাস্ত্র-বাক্য থাকিলেও তাহার তাৎপর্য্য এই যে, মুমুক্ষু কোন সময়ে আত্মাকে নির্গুণ বলিয়া ধ্যান করিবেন; কিন্তু আত্মা যে বস্তুতঃই নির্গুণ, ইহা ঐ সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য্য নহে।

বস্তুতঃ পরব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ অতি দুর্জ্ঞেয়। তাই শ্রুতিও তাঁহাকে বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া এবং তাঁহার নির্গুণ ভাব ও নানা বিরুদ্ধ ভাবের উপদেশ করিয়া তাঁহার সেই অতিদুর্জ্ঞেয়ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন এবং অধি-কারিভেদে তাঁহার নানারূপে উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। তাই মহর্ষিগণও সাধকের অধিকারানুসারে সেই পরমেশ্বরের উপাসনার জন্য নানা প্রকারে তাঁহার স্বরূপ

ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুচিরকাল হইতেই সাধকগণ নিজ নিজ আচার্য্যের উপদেশানুসারেই নানারূপে সেই পরমোপাস্য পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেছেন। তাই ঋষিও বলিয়াছেন—"বহ্বাচার্য্য-বিভেদেন ভগবন্তমুপাসতে"। অর্থাৎ সাধকগণ বিভিন্ন আচার্য্যগণের বিভিন্নরূপ উপদেশানুসারে ভগবান্‌কে বিভিন্নরূপে উপাসনা করেন। সমস্ত অধিকারীই প্রথমেই সেই পরমেশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ ধারণা করিতে পারেন না। তাই আচার্য্যগণ শিষ্যগণের অধিকার বুঝিয়া ক্রমশঃ তাঁহাদিগকে পরব্রহ্মের নানারূপে ধ্যানের উপদেশ করিয়াছেন। বরুণের উপদেশে ধ্যান করিয়া তাঁহার পুত্র ভৃগু যথাক্রমে অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"। "প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"। "মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"। "বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"। "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"। (তৈত্তিরীয় উপ ভৃগুবল্লী)

আর কত সাধক যে কত প্রকারে তাঁহার ধ্যানাদি করিয়া অবস্থাবিশেষে কত প্রকারে তাঁহার দর্শন করিয়াছেন এবং সেইরূপেই তাঁহার স্তুতি করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করা অসম্ভব। কত সাধক, আচার্য্যের উপদেশানুসারে তাঁহাকে অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই ধ্যানাদি করিয়া, সময়ে তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপই দর্শন করিয়া ঐরূপেই তাঁহার স্তুতি করিয়াছেন। বিষ্ণু-পুরাণে (১।৪) সনন্দনের সেইরূপ স্তুতি বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ নিজ আচার্য্যের উপদেশানুসারে কত সাধক সময়ে তাঁহাকে নিত্যজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়াও ধ্যানাদি করিয়াছেন সন্দেহ নাই। অদ্বৈতবাদী মাধবাচার্য্যও সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের' প্রারম্ভে সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার করিতে বলিয়াছেন—"নিত্যজ্ঞানাশ্রয়ং বন্দে নিঃশ্রেয়সনিধিং শিবং"।

ফল কথা, যে প্রকারেই হউক, সেই পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া, তাঁহাতে প্রপন্ন হইয়া, তাঁহাকে আত্মনিবেদন করিতে পারিলেই তখন তিনি সেই প্রপন্ন ভক্তকেই নিজের স্বরূপ দর্শন করান। তাঁহার চরম দর্শন হইলেই তখন তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ-দর্শন হয়। কিন্তু তাঁহার সেই স্বরূপদর্শনেরও অধিকারিভেদে নানাবিধ উপায় আছে। কেহ ধ্যানযোগের দ্বারা, কেহ সাংখ্যযোগের দ্বারা, কেহ কর্ম্মযোগের দ্বারা নিজের আত্মাতে অন্তর্যামী সেই পরমাত্মাকে দর্শন করেন। কিন্তু যে সমস্ত মন্দবুদ্ধি নিম্নাধিকারী, উক্তরূপ ধ্যানযোগাদি না জানিয়া অন্যান্য আচার্য্যের নিকটে যে কোনরূপে পরমেশ্বরের ধ্যানাদির উপদেশ শ্রবণ করিয়া সেইরূপেই তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহারাও সেই উপদেশে দৃঢ় শ্রদ্ধা ও পরমেশ্বরে পরা-ভক্তির প্রভাবে কালে তাঁহার দর্শন পাইয়া মুক্তিলাভ করেন। তাই তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

"ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে।
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥"

গীতা—১৩।২৫।২৬।

বস্তুতঃ, পরমেশ্বরের দর্শনের জন্য অধিকারিভেদে নানা শাস্ত্রে নানারূপে তাঁহার স্বরূপ ও উপাসনার উপদেশ তাঁহারই অভিপ্রেত, এবং তাঁহার পূর্ব্বোক্ত নিজবাক্যের দ্বারাও তাহা প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত মহর্ষি গৌতম প্রভৃতি যে কোন আচার্য্যের উপদিষ্ট মতানুসারে তাঁহার উপাসনা করিয়া তাঁহাতে প্রপন্ন হইলেই তিনি অবশ্যই কৃপা করেন। করুণাময় তিনি ত নিজেই বলিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" (গীতা ৪।১১) সুতরাং যে কোন প্রকারেই হউক, তাঁহাতে প্রপন্ন হইলে—তাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁহাকে আত্মনিবেদন করিলে তখন তিনি তাহাকে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করান। সাধক তখন তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হন। এক তিনিই ত নানামার্গাবলম্বী সকল সাধকেরই প্রাপ্য। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্যই ত সুচিরকাল হইতেই সমস্ত সাধক নানা পথে যাত্রা করিয়াছেন। সকল পথেই সকলের অধিকার ও রুচি কখনই সম্ভব হইতে পারে না। তাই মানবের বিচিত্র বিভিন্ন রুচি ও অধিকারানুসারে তাঁহার প্রাপ্তির জন্য তিনিই শাস্ত্রে অধিকারিভেদে নানামার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন বর্ষাকালে সরল ও বক্র নানা পথে সেই এক মহাসমুদ্রের অভিমুখে ধাবমান সমস্ত জল শেষে সেই সমুদ্রকেই প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সাধকগণ নিজ নিজ বিচিত্র রুচি অনুসারে বেদাদি নানা শাস্ত্রোক্ত সরল ও কুটিল ভিন্ন ভিন্ন মার্গ অবলম্বন করিলেও কালে সকলে সেই এক পরমেশ্বরকেই প্রাপ্ত হন। তাই তাঁহার পরম ভক্ত পুষ্পদন্ত তাঁহারই কৃপায় ঐ মহাসত্যের উপলব্ধি করিয়া মহিম্নঃ স্তোত্রে তাঁহাকে ঐ কথাই বলিয়াছেন—

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

[ক্রমশঃ।

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ (মহামহোপাধ্যায়)

নুলো রফিক

পরিচ্ছেদ—এক
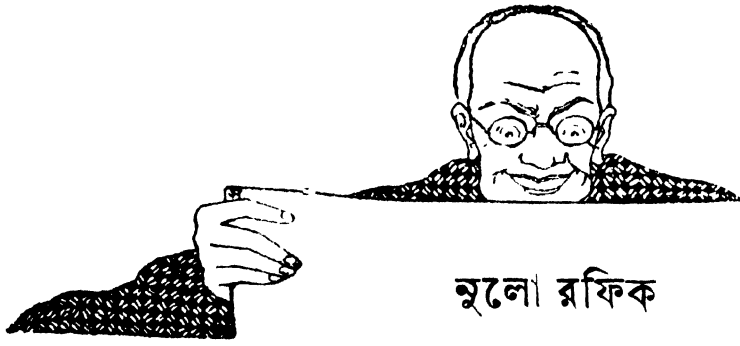
রাস্তার মোড়ে ব'সে, তার নুলো হাতটি বার ক'রে, পথিককে সেটি দেখিয়ে দেখিয়ে তীব্র তীক্ষ্ণকণ্ঠে রফিক্ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতো—"বাবারা সব, ঈশ্বর, আল্লা, খোদা—তোমাদের ভাল করবেন, এই নুলো রফিকের ওপর দয়া কর; কাল থেকে খেতে পাইনি—একটি পহা দিয়ে যাও—বাবারা সব—"

রফিক্ পয়সাকে পহা বলে; তাতে, যে প্রথম শোনে, তার হাসি পায়; কিন্তু ডান হাতটি দিয়ে যখন সে ঈশ্বর, আল্লা, খোদার দোহাই আকাশের দিকে দেখিয়ে দেখিয়ে সুরের লহরের সঙ্গে পাড়তে থাকে, তখন পথিকের পক্ষে তাকে অবহেলা ক'রে চ'লে যাওয়া শক্ত হয়। পয়সা বার করার জন্য সে যখন দাঁড়ায়, তখন রফিক্ বলে, "একের বদলে লাখ দেবে তোমায়, মা দুগ্‌গা; বেঁচে থাকো বাবা, একশো বছর।"

লোকটা কথার তুবড়ি! এতও জানে সে বলতে!

খ

সে দিন কিসের একটা যোগ ছিল। কাতারে কাতারে লোক চলেছে গঙ্গা-স্নানে। রফিকের পোয়া-বারো!

এমন দিন অনেক এলো,—গেল; এ-সব দিনে, পাঁচও হয়, দশও হয়; কালে-ভদ্রে কুড়ি টাকাও যে হয়নি, তা নয়!

রফিক্ জোর গলায় হাঁকে, "মা দুগ্‌গা—ওগো বাবা! ও মা! জোননী—"

এক জন অন্ধ, বুড়ো—চলেছে একটি ছোট ছেলের হাত ধ'রে; একটু থেমে বুড়ো বল্লে, "আর যা করিস্, করিস্ রফকে, তুই মোছলমান—অমন ক'রে মা দুর্গার নামটা আর এঁটো করিস্‌নে—"

রফিক্ হেসে জবাব দিলে, "ও নাম এঁটো হয় না, বাবা; ও যে মা'র নাম

বুড়ো দু-কাণে আঙ্গুল দিয়ে বল্লে, "থাম্, মেলেচ্ছো—কলি, এ ঘোর কলি কি না?" ব'লে বুড়ো মানুষটি আরও গঙ্গার দিকে এগিয়ে গেল।

গ

রফিক্ জানে, এ আপত্তির মূল কোথায়। সে মনে মনে হাসে; বুড়ো হলি, দু'চোখ গেল, তবুও হিংসে গেল না—মন থেকে!

সে দু'হাত যোড় করার চেষ্টা ক'রে পেয়গম্বরের কাছে বলে, "দোষ নিও না মালিক, গঙ্গাস্নানের রাস্তায়—দুর্গা নাম নিতেই হবে, হিঁদুর দেশ' নইলে, চলে কেমন ক'রে, আমার একটি হাত তো দিতেই ভুলেছ!" আবার মনের অতি গোপন অন্তরালে সে মা দুর্গাকে ডেকে বলে, "তুই যেন আবার তাই ব'লে রাগ করিস্ নি, মা!

"ভিখিরীর আবার ধম্মো! আগে পেট, না আগে ধম্মো? যার আছে সে দেয়; কারুর মন ভেজে আল্লা বল্লে, কারুর মন ভেজে কালী-দুগ্‌গাতে!

"রামও যা, রহিম ত তাই। নইলে আমাদের চলবে কি ক'রে?"

রফিক্ এমনি ক'রে কঠিনকে সহজ ক'রে নেয়।

পরিচ্ছেদ—দুই

ক

ঘরে পিসী ছাড়া রফিকের এক ভাই ছিল, ইছু। সে চা-বাগানে কায করতে গিয়ে সেখানেই সাদি করে, বাড়ীর কথা একদম যেন ভুলেই গেল।

পিসী বল্লে, "একবার কেন তুই যা না, রফিক্! ইদুর জন্যে যে আমার প্রাণে সুখ হয় না। সে কেমন আছে, তার ছেলে-ছাওয়াল হ'লো কি না? তুই বড় ভাই, একটা খোঁজ-খবর তোর নিতে হয় তো!"

রফিক্ বল্লে. "উপায় ছেড়ে, বেড়াতে গেলে চলবে কি ক'রে?"

পিসী বল্লে, "তোর ও উপায়ের ভাবনা কি? যেখেনে হাত পেতে বসবি—সেইখেনেই তোর আমদানী! দু'পয়সা পাবি।"

রফিক্ মুখে হাসল; কিন্তু ঐ কথাতে তার বুকের মধ্যে যেন কে একটা ধারাল ছুরি ঢুকিয়ে দিল!

পিসী রফিকের দুঃখ বোঝেও না; কেমন যেন সে ঐ নুলোটাকে দু'চোখে দেখতে পারে না! কিন্তু ইদু তার পেয়ারের ধন। সেই ইদুই কি না তাকে ছেড়ে গেল! হাতে ক'রে মানুষ করা!

পিসীর হাতে কিছু পয়সাও ছিল, সেটা ইদুকেই দেবার ইচ্ছা; তাও রফিক্ যে না জান্‌তো, তা নয়,—তাই সে কেবলই একটা-না-একটা ওজর করে; "বুঝেছ কি না পিসী, বড্ড শীত; মাঘী-পূর্ণিমার মেলার পর যাব একবার—নিশ্চয়—"

পিসী চাল ঝাড়তে ঝাড়তে বল্লে, "তার পর বল্‌বি, হোলি; তার পর আছে, চড়কের মেলা—বছর এমনি ক'রে কেটে যাবে রে—তা জানি আমি—"

রফিক্ কথার উত্তর দিল না।

৩

ইদুর সব চেয়ে বড় দোষ, সে রফিক্‌কে ভাই ব'লেই মান্‌তে চায় না; বড় ব'লে স্বীকার করা তো দূরের কথা!

ইদু বলে, "লোকের কাছে বলতেও যে লজ্জা করে, ভিক্ষে ক'রে দিন চলে! গলায় দড়ি জোটে না!"

কথার উত্তর রফিক্ দিতে পারতো না। তার সমস্ত বুকের মধ্যে ব্যথা ক'রে যেন চেপে আস্‌তো; চোখ জলে ভ'রে আস্‌তো—সে শুধু আল্লার কাছে মনে মনে বলতো—ও আমার ছোট ভাই—নইলে,—তুমি বিচার ক'র, সব ইন্‌সাফের মালিক তুমি, আল্লা! কিন্তু ওরে বাঁচিয়ে রেখো!

—কিন্তু এ কথার মধ্যেও রফিকের যেন স্বস্তি ছিল না। বিশ্বাস কি আল্লাকে?—সে নিজের নুলো হাতখানার দিকে চেয়ে বলে, এই তো—হুঁঃ! এ কি ইন্‌সাফ, কি দোষ ক'রে-ছিলুম?

মনের এক কোণে যেন একটা সাধ তার লুকিয়ে থাকে, আঃ, যদি থাক্‌তো দু'খানা হাত—দাঁতের উপর দাঁত দিয়ে রফিক্ বলে, চড়িয়ে লম্বা ক'রে দিতাম—ঠাস্! ঠাস্!

ইদুকে ঠিক শাস্তি সেই যেন কেবল দিতে পারে; এক তিল কম নয়, এক তিল বেশী নয়। ঠিক যেন সে নিক্তির ওজনে!—হ'লে হয় কি?—খোদার দোষ, তাঁর মাত্রা-বোধ নেই! হয় একদম রেহাই, নইলে জহন্নাম! একেবারে যমালয়!

৪

রফিকের রাগ আর বিরক্তির ঝাঁজের তলা দিয়ে ইদুর উপরে একটা ভালবাসার টান—যেন তারও অজ্ঞাতেই বইত। সে টানের হেঁচকা পড়লে ব্যথার মত তখনই মালুম হ'ত সেটাকে, নইলে সেটা তলিয়ে থাক্‌তো—মনের তলায়। আছে কি নেই, সে নিজেই জানে না।

হয় তো ইদু একলা থাক্‌লে, এত দিন সে ঘুরেই আসতো একবার। হাজার অশ্রদ্ধা করে সে, তবুও, এক মা'র পেটের ভাই তো বটে!

কিন্তু—এবার রফিক্ মাথা নেড়ে বল্লে; "কিন্তু, যদি সেই পরের ঘরের বিটি—যদি সে বলে আমাকে নুলো!"—রফিকের দুই চোখ লাল হয়ে উঠ্‌ল, রাগে; সর্ব্বাঙ্গ তার থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগ্‌ল—"এত বড় আস্‌পোদ্দা!"

মনে পড়ে বাছা বাছা সব গালাগাল; কিন্তু রাগের চোটে জিভটাও একেবারে যেন এড়িয়ে, নুলো হাতটার মত অবশ হয়ে যায়! আবার ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে যায় মন।

যেন কিসের প্রতীক্ষায় থাকে সে! যেন মনে হয়, এমন এক দিন আসবে, যে দিন তাকে নইলে চলবে না ইদুর। [illegible] ফতিমা বিবির সব ঠেকার মাথা হেঁট ক'রে তারই পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে।

কিন্তু রফিক্ মন ঝেড়ে খুসীও হ'তে পারে না; একেবারে এই কল্পনাতেও ভয় আছে, গা ছম্ ছম্ করে যেন; [illegible] সুখের মধ্যেও কোথায় একটা নিবিড় ব্যথার সঙ্গে [illegible] জড়িয়ে থাকে!

—

পরিচ্ছেদ—তিন

ক

মাঘী-পূর্ণিমার পর দোল, তার পর চড়ক-সংক্রান্তিও যায়; পিসীর তাগিদের অন্ত নেই, কিন্তু রফিক্ অচল, অটল! সে বলে, আর আট-দশ দিন সবুর কর, অক্ষয় তৃতীয়াটা সেরে নি।

পিসী রাগ ক'রে বল্লে, "তোকে চিনি রফিক্, তোর মনে কি মায়া-মমতা কিছু আছে? ছোট ভাইটা—না হয় একটা চিঠি দে,—যাবিনে, তা তো আগেই জানি রে—"

রফিক্ বল্লে, "রাগ ক'র না পিসী, বিদেশে যেতে হবে, এক মুঠো টাকাও তো চাই! কিছু না হয়, ফতিমার জন্যে এক জোড়া কাপড়ও তো নিয়ে যেতে হবে? নৈলে কি মনে করবে তারা!"

পিসী এবার সত্যি রাগ ক'রে ঝাঁজিয়ে উঠে বল্লে, "নে, নে, রাখ তোর বাজে কথা; বলেছি তোকে একশো দিন ধ'রে যে, কাপড় আমি কিনে রেখেছি—"

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রফিক্ বল্লে, "তা আমাকেও তো কিছু একটা দিতে হ'বে? বড় ভাই তো বটি!"

পিসী রাগ ক'রে সেখান থেকে চ'লে গেল।

খ

অবশেষে ইদুর চিঠি এলো; সে পিসীকে লিখেছে। জমাদারীর চাকরী তাকে ছাড়তে হয়েছে; ভারি অসুখ; এক এক দিন রক্তও উঠে; ঘুষ-ঘুষে জ্বর, আর কাসি লেগেই আছে।

চিঠিতে অনেক কথা আছে; কিন্তু রফিকের সম্বন্ধে একটা কথাও তা'তে নেই। সে যে একটা মানুষ, সে কথা যেন ইদুর মনেই নেই। শেষে ইদু জানিয়েছে—টাকার অভাবে ওষুধ খেতে পাচ্ছে না; টাকা পাঠাও।

চিঠিখানা পিসীরও যেন ভাল লাগেনি! রফিক্‌কে দু'চোখে না দেখতে পারলেও তার যে ন্যায্য অধিকার, সেটুকু থেকে বঞ্চিত করলেও কি ভাল লাগে? কত দিন পরে চিঠি দিলি? একটা কথা জিজ্ঞেস করলি না? কি দোষ রফিকের? ধুলো? ভিক্ষে ক'রে খায়? তা ছাড়া উপায় কি তার?

পিসীর মনের বিরক্তি এই ন্যায়ের সূত্র ধ'রে বাহ্যতঃ দেখা দিলে; কিন্তু গোপনে আর একটি কারণ লুকিয়ে ছিল। সেটা বোধ হয়, তেমন শোভন নয়, তাই গোপনেই থাকতে ভালবাসে!

গ

ইদুকে টাকা দেওয়ার জন্যেই তো পিসীর টাকা এত দিন প্রতীক্ষা করছিল; কিন্তু যেমনি সে টাকার একান্ত প্রয়োজন হয়ে উঠলো, অমনি পিসীর মনটিও বিমুখ হ'লো।

প্রয়োজন কাঙ্গাল ব'লে মানুষ তারে দেখতে পারে না। ভিখারীর টাকা নেই ব'লে মানুষ তাকে দূর, দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয়; কিন্তু রাজার কুটুম ব'লে চোরকেও মানুষ খাতির করে। প্রয়োজনের গর্ত্ত কেউ ভরাতে চায় না! কিন্তু তেলা-মাথায় তেল দেবার সরফরাজির একটুও অভাব হয় না, এই দীন-দরিদ্রের দুনিয়াতে!

পিসী দশটা টাকা রফিকের হাতে দিয়ে বল্লে, "যা, আর দেরী করিস্ নি, এ চিঠিটা নে, ওতেই ঠিকানা আছে, পাঠিয়ে দিগে যা ডাকঘরে গিয়ে! দশটাই দিস্, পাঠানর খরচটা তুই দিস্, পরে আমি দিয়ে দেব।"

ঘ

ভিখিরী রফিকের দশ টাকাটা হাতে খড়-কুটোর মত হাল্‌কা ঠেক্‌লো! ছিঃ, তার মনে হ'ল, এত দূর থেকে টাকা যাবে, মোটে দশ!

সে পা টিপে চোর-কুঠুরীর মধ্যে ঢুকে, তার নিজের জমান টাকা থেকে আরো দশটা মিলিয়ে দিয়ে যেন মনে মনে একটু স্বস্তি পেলে—হাঁপানির হাঁপের মত চাপটা যেন একটু নরম হ'ল বুকের মধ্যে।

ইদুর চিঠিখানা বুকের মধ্যে নিয়ে বাড়ী থেকে সে বেরিয়ে পড়লো।

বুকের মধ্যে চিঠিখানা সুস্‌সুড় ক'রে কেমন একটা আরামে রফিকের দেহ-মন ভ'রে দিতে লাগলো!

ডাকঘরে গিয়ে রফিক্ অনেক অনুনয়-বিনয় ক'রে বল্লে মণি-অর্ডার বাবুকে, "বড় অসুখ, আমার ছোট ভাই, চা-বাগানের বড় সায়েবের জমাদার—আমার মা'র পেটের ভাই, বাবু, আজই পাঠিয়ে দিও টাকাটা!"

বাবুটি চশমার উপর দিয়ে নিরীক্ষণ ক'রে বল্লে, "আ মর, এই বেটাই তো গঙ্গা নাইতে যাবার পথে ব'সে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে ভিক্ষে করে! আ রে! তুই আবার টাকাও জমাস্, আবার টাকাও পাঠাস্!"

রফিকের দু'কাণ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। সে বল্লে, "টাকা আমার নয় বাবু, আমার পিসীর—"

আর বলতে তার লজ্জা হ'ল! চোরের মত গুম্‌গুম্‌ ক'রে, বাড়ী ফিরে রফিক্ নিজের ঘরে গিয়ে প'ড়ে রইলো। পিসীকে বল্লে, "কি জানি, মন ভাল নেই; বোধ হয়, জ্বর হবে!"

রাতে মুখে কিছু রুচল না।

পরিচ্ছেদ—চার

ক

রফিকের রাতে ঘুম হ'ল না। কেবল মনে হয়, মুখ দিয়ে রক্ত উঠলে কি মানুষ বাঁচে? এত বড় অসুখ, কে-ই বা তার সেবা করছে? ফতিমা? সে হয় তো একটা কচি আধ-ফোটা মেয়ে! তার সাধ্যি! এই এত বড় রোগের সেবা করা?

রফিক্ বিছানার উপর উঠে বসলো। শুয়ে আর থাকা যেন যায় না; যার মা'র পেটের ভাইএর রক্ত উঠছে, সে কেমন ক'রে আরামে ঘুমোবে? রফিক্ ভাবে, এক হাতে কি সেবা হয় না? জানি, সে আমার হাতে খাবে না; কি করব? অন্ত হাতখানা যে নাড়তেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। তাই, এই হাতেই সব কায করতে হয়! একেই বলে কি না —খোদার মার!

কিন্তু, সে আবার মনে মনে বলে, কিন্তু, তেমন-তেমন হ'লে, ডাক্তারকে খবর দিয়ে ওবুধও নিয়ে আসতে পারি তো। —হয় তো এই রাতেই রক্ত উঠছে—কে ডাকবে ডাক্তার? ফতিমা? কচি, এতটুকু দুধের বাচ্চা সে! শুনেছি, চা-বাগানে বড় ভয়! সায়েবগুলো রাতে মদ খেয়ে—আর ইছু ভারি সৌখীন কি না! ফতিমা নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী—তা হ'লেই হয়েছে সর্ব্বনাশ! সে ভয় পেয়ে, একলাই ছুটেছে হয় তো ডাক্তারের বাড়ী—

দুশ্চিন্তায় রফিকের সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেল!

খ

প্রদীপ জেলে রফিক্ সেই চোর-কুঠুরীতে গেল; মর্চে-ধরা বাক্সটা খুলে গুণে দেখলো; সব শুদ্ধ আছে এই পঞ্চাশ টাকা, আর এই খুচরোও হবে টাকা পাঁচেক; এইটেই দিয়ে যাই পিসীর হাতে, তার খরচা,—যেতে আমার না হয় লাগবে টাকা দশেক, তা হ'লে থাকছে চল্লিশ, পাঁচ; রোজ যদি—ধর, দেড় টাকা খরচ দিতে পারি, তা হ'লেও—রফিক্ হিসেব করে।—কিন্তু অত বড় হিসেব সে জন্মে করে নি।—অনেক ভেবে বলে, বোধ হয়, এক মাসেই—তার পর?—ফিরবো কেমন ক'রে?—যদি ফতিমাকে আনতে হয়?—পরের বিটী হ'লে কি হয়?—ঘরের বৌ তো?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রফিক্ বেরিয়ে এল। বল্লে, সবই খোদার মর্জ্জি! ভেসে ত পড়ি!

গ

পিসী দু'চোখ কপালে তুলে ব'ল্লে, "পাগল হলি? এই রাতে যাবি কোথায়?"

রফিক্ বল্লে, "হেঁটে যেতে যেতে রাতটুকু পুইয়ে যাবে। গির্জ্জের ঘড়িতে তিনটে অনেকক্ষণ বেজে গেছে।"

"তা আগে বল্‌তে হয়, কাপড়গুলো ক্ষার-কাচা ক'রে দিতুম, নোংরা, ছেঁড়া; লোকে বলবে কি?"

"হোক্ গে পিসী, লোকেদের কাছে ত আর যাচ্ছিনে; ইছু আমায় জানে—"

"তা হ'লেও" পিসী বল্লে, "সে জমাদার ছিল, তাবই ভাই—ঐ জন্তেই তো সে তোর ওপর রাগ করে—"

রফিকের সমস্ত দেহমন যেন যাত্রার জন্ত আকুলি-বিকুলি ক'রে উঠল!—সে বল্লে, "মনটা বড় ব্যস্ত হয়ে গেছে, পিসী!"

পিসী একজোড়া ধোয়া কাপড় বার ক'রে বল্লে, "এরি একটা পর, আর এই ইজুরি জামা ছিল আমার কাছে; ও ছেঁড়াটা খুলে ফেল—"

রফিক্ হৃষ্ট হয়ে উঠল।

যাবার আগে পিসী বল্লে, "গিয়ে চিঠি দিস্—সঙ্গে টাকা-কড়ি আছে তো?"

রফিক্ মাথা নেড়ে সায় দিয়ে, পিসীর পায়ের কাছে একটা থলি রেখে বল্লে, "এতে তোমার খরচ আছে পিসী—"

তার পর, ত্রস্ত-পায়ে সে বাড়ীর বার হয়ে পথে হন্ হন্ ক'রে চল্‌তে লাগলো।

ঘ

ষ্টেশনে পৌছবার আগেই গাড়ী ছেড়ে গিয়েছিল। সে কথা শুনে রফিকের চোখ ফেটে জল এল; তবে কি ইছুকে আর দেখতে পাব না, মালিক?

বেলা ৫টার সময় আবার গাড়ী। চারটি মুড়ি খেয়ে সে ব'সে রইল।

রাস্তার কত লোক ব'সে ভিক্ষে করছে; কিন্তু রফিক্ সে দিকে ফিরেও চাইলে না; কি জানি, যদি ফের গাড়ী ছেড়ে যায়; আর তার ওপর ইত্বর জামা পরে ও কাযে নাম্‌তে তার সাহসে কুলোল না।

পরিচ্ছেদ-পাঁচ

ক

রফিকের কল্পনার ফতিমা বিবির সঙ্গে বাস্তবের ফতিমার এমনি তফাৎ হলো যে, তার মনটা যেন হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে প'ড়ে যায়।

কচিও নয়, আধ ফোটাও নয়। বয়সে ফতিমা রফিকের চেয়ে বড়ই হবে! রং ঘোর কাল। মুখে বসন্তের দাগ। মোটা যেন একটা হাতী। সেই পাকা মুখে আবার একটা রূপোর নোলোক ঝুলছে! মাথার সাম্‌নে টাক পড়তে আরম্ভ হয়েছে। সমস্ত দেহ জুড়ে যেন লালসার অপ-চারের ছবি!

রফিকের মনে হ'লো, ইত্ব মৃত্যুকে ঘরে ডেকে এনেছে। লজ্জায়, ঘৃণায় তার মনটা আকণ্ঠ তিক্ত হয়ে উঠলো।

অস্থি-চর্ম্মসার দেহখানি নিয়ে ইত্ব শুয়ে ছিল। রফিক্‌কে দেখে উত্তেজনায় সে উঠে ব'সে বল্লে, "কি করতে তুই এলি? তোর আসার যা খরচা হ'ল, সেটা পাঠিয়ে দিলে কাযে লাগতো এখেনে। কিছু টাকা এনেছিস্?"

আর ইত্ব কথা কইতে পাল্লে না, কাসির ঝোঁক যেন ঝড়ের মত এসে তাকে নাস্তা-নাবুদ ক'রে দিলে। কাসি থাম্‌তেই ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠল!

তার কষ্ট দেখে রফিকের দুই চোখ ফেটে যেন জল ধার হ'ল!

ইত্বর মাথাটা কোলের মধ্যে নিয়ে রফিক্ চুপি চুপি তার কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্লে, "টাকাও এনেছি ভাই, তোর ভয় নেই কিছু।"

একটু শান্ত হ'ল ইত্ব!

রফিক্ বল্লে, "পিসীও ডাকে টাকা পাঠিয়েছে—"

"ডাকে কেন?"

রফিক বল্লে, "আমার আসার তো কিছু ঠিক ছিল না!"

"তবে তুই এলি কেন, রফিক্?"

হায়! সে কথার কি উত্তর দেবে রফিক্?

মনের গোপনে ছোট ভায়ের জন্য একটি স্নেহের রক্ত করবী যে চিরকালই ফুটেছিল, তা' রফিক্ নিজেই যে জান্‌তো না!

সে রাতের পর থেকে ইত্বকে রফিক্ বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে শুতে লাগলো।

পাশের ঘরে, হাহা, হিহি, হুহু হাসির গর্‌রা চলেছে,—রফিক্ জিজ্ঞেস করে, "ও কি রে ইত্ব?"

"ওরা ফতিমার ভাই।" ব'লে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শোয়!

খ

টাকার মজা এই যে, সে যখন গরীবের হাতে আসে, তখন ফোঁটা ফোঁটা ক'রে; কিন্তু হাত থেকে বেরিয়ে যাবার সময় পালওয়ানের মত যায়—জোড়া লাফে!

ডাকে যে টাকা এলো, তা' পিসীর দেওয়া টাকা ব'লে একেবারে ফতিমার কবলে চ'লে গেল। সে টাকার যেন রফিক্ কেউ নয়! এ দিকে সমস্ত খরচ তারি হাতে; ক্রমেই তার মুখ শুকিয়ে আসে!

অনেক ইতস্ততঃ ক'রে রাতে সে ইত্বকে ব'ল্লে, "ভাই, টাকা যে সব ফুরিয়ে গেল!"

ইত্ব অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্লে, "তোর ফিরে যাবার টাকা সরিয়ে রাখিস্ নি?"

"না।"

"বোকা! দেখছিস্ নে? কত হাতে আছে?"

"পাঁচ টাকা মাত্তর।"

"ওই নিয়ে কাল তুই চ'লে যা, যা হবার, আমার হবে। বাকি পথ ভিক্ষে ক'রে চ'লে যাস্।"

আজ আর রফিকের মনে কোন ক্ষোভ, কোন অভিমান রইল না। ইত্বও বুঝেছে যে, ভিক্ষা নৈলে গতি নেই।

রফিক্ ভাবলে, যদি ভিক্ষে ক'রে যাই তো—আদ্ধেক পথ কেন? সারা পথটাই যাব। ফেরার তাড়া কি?

কিন্তু টাকার দুশ্চিন্তা তার মনটায় জড়িয়ে রইল।

গ

রফিক্ সকাল হ'লেই গিয়ে দুটো ডিম আর এক সের দুধ কিনে আন্তো। ইদুকে ডাক্তার খেতে ব'লেছিল। তার পর মুদীর দোকান থেকে চাল-ডাল কিনতে তাকেই যেতে হ'ত। রাতে একখানা রুটী। কম-জম ক'রে দিনে এক টাকা তো বটেই!

তাই সে ঘুমুবার আগে ভাবতে লাগলো—পাঁচ দিনের বেশী থাক্‌তেই পারা যায় না! পিসীকে লিখেছি; কিন্তু সে কি আর টাকা দেবে?

ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখলে? ফতিমার বাক্স থেকে সে এক মুটো টাকা চুরি করছে।

সে ধড়মড় ক'রে উঠে পড়তেই ইদু বল্লে, "ভয় পেয়েছিস্, রফিক্?"

"ভয় না, একটা বিশ্রী স্বপ্ন।"

সে আর শুলো না, বাইরে বেরিয়ে প'ড়ে বাকি রাতটা কাটিয়ে দিতে চায়।

দূরে সায়েবদের গো-শালা দেখা যাচ্ছে। গরুগুলো দাঁড়িয়ে উঠে খেতে আরম্ভ করেছে!

হঠাৎ রফিকের মনে এলো একটা অসাধ্য-সাধনের কথা।

একটা লোটা হাতে ক'রে সে ধীরে ধীরে গোশালার দিকে গেল!

এতক্ষণ তার মনে ছিল না যে, এক হাতে দুধ দোয়া শক্ত, বিশেষ চুরি ক'রে!

তবুও রফিক্ এগিয়ে গেল।

গয়লাটা ঘুর জ্বেলে মশা তাড়াচ্ছে, রফিক্‌কে দেখে বল্লে, "কি চাস্?"

"ভাই, একটু দুধ দিতে পার?"

"ইদুর জন্যে?"

"হুঁ, ভাই, খোদা তোমার ভাল করবেন।"

"আচ্ছা, দাঁড়া; দিচ্ছি।"

গয়লা এ-দিক ও-দিক দেখে এসে বল্লে, "এখেনে সেঁটে আমার আড়াল ক'রে ব'স্।"

রফিক্ তেমনি ক'রে ব'সে—অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগ্‌লো, এ কি দয়া খোদার!

গয়লা চুপি চুপি বল্লে, "খুব লুকিয়ে, ধরা পড়লে দু'জনেই মারা যাবো।"

রফিক্ গয়লার হাতে গোটাকতক পয়সা গুঁজে দিয়ে বল্লে, "ফের কাল—হবে ত?"

"আচ্ছা, রাত থাকতে!"

রফিকের জীবনে এই প্রথম চুরি। বাড়ী এসেও তার বুক-ধড়ফড়ানি কমে না!

ঘ

দুধের পরিমাণ কম দেখে ফতিমা তেলে-বেগুনে হয়ে এগিয়ে এসে দেখে, রফিকের মুখ-ময় তখনো কাল দাড়ির উপর দুধের ফোঁটা লেগে রয়েছে।

আর যাবে কোথা! সে রণচণ্ডীর মূর্ত্তি ধ'রে রফিক্‌কে যা' নয় তাই বল্লে; চোর ভিখিরী; নুলো—"

ইদু চুপটি ক'রে সব শুনতে লাগ্‌লো।

ফতিমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে, রফিক্ ইদুর দিকে চেয়ে কেঁদে ফেলে বল্লে, "ইদু!" তার দু'চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়ছিল!

"কিন্তু, রফিক্, তুই কি দুধ খেয়েছিস্, মুখে তোর দুধের ফোঁটা কেন?"

রফিক্ মুখ পুছে বল্লে, "ও দুধ দুইবার সময় ছিটে লেগেছে—ইদু, কিন্তু ইদু, আজ আমি চুরি সত্যিই করেছি" ব'লে রফিক হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগ্‌লো।

পরিচ্ছেদ—ছয়

ক

হাউ হাউ ক'রে কেঁদে নিয়ে রফিকের কিন্তু খুব উপকার হ'ল। বুকের ভিতরকার জমাট দুঃখের গ্লানিটা বেরিয়ে গিয়ে, বুকের সঙ্গে, মনটাও তার অনেকখানি হাল্কা হয়ে গেল।

ইদু তাকে বিকেলের দিকে বল্লে "দেখ রফিক্, তোর মনটা এখনও আমার চাইতে অনেক কাঁচা আছে—"

ইদু এত দিন পরে হাসলো দেখে, রফিক্ মনে মনে যেন আকাশের চাঁদ হাতের মধ্যে পেল।

"কেন রে ইদু?"—ইদুর মাথায়-মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে রফিক্ জিজ্ঞেস কল্লে।

"তুই এখনো কাঁদিস্?"

রফিক্ বল্লে, "দুঃখে—আমায় নুলো বল্লে ভারি রাগ হয়, মনে হয়, ধ'রে মারি; নুলো কি আমি নিজের দোষে?"

"কিন্তু রফিক্, আমি তো তোকে কত দিন মুলো বলেছি! —সে না বুঝে, না জেনে তোর মনে দুঃখ দিয়েছি; আজ থেকে আর কোন দিন, ভাই—" ইদুর স্বর গদ্‌গদ হয়ে আর সে বল্‌তে পাল্লে না।

এ দিকে রফিকের চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল পড়ল।

খ

দু'জনে শান্ত হ'লে ইদু জিজ্ঞেস করলে, "ফতিমা কি আজ হাট করতে গেল?—ক'টাকা দিলি?"

"সে দু'টাকা জোর ক'রে নিয়ে গেল।"

ইদু বল্লে, "একটি টাকা খরচ করবে আর এক টাকা জমাবে; অনেক টাকা ওর—"

"আর তোর এই কষ্ট?" রফিক্ আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

ইদু কপালে হাত ঠেকাল—"তুই এক দিন শুধু চুরি ক'রে কেঁদে মলি, আর জানিস? আমি যদি টাকা রাখতুম তো আমার হাজার টাকা জ'মে যেত—দু'হাতে চুরি করেছি—একটা সর্দ্দারের কি কম আয়!"

রফিক্ অবাক্ হয়ে বল্লে, "কিসে গেল সে টাকা?"

"মদে আর ফতিমার পেটে—ওর যে কত ভাই আছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই—" হঠাৎ ইদু উত্তেজিত হয়ে উঠল। "দেখছিস্ তো নিজের চোখে—শালী, হারাম্—"

রফিক্ দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, "চল ইদু, আমরা দুই ভায়ে মিলে পালিয়ে যাই, ওর হাতে তুই থাক্‌লে কিছুতেই বাঁচবি নে, তা আমি ব'লে দিচ্ছি।"

ইদু শান্ত হাসি হেসে বল্লে, "তা আমি জানি, রফিক্; কিন্তু কি ক'রে পালাই? হাতের টাকা যে সব ফুরিয়ে গেল!"

হঠাৎ ইদু ব'সে রফিকের মাথাটা মুখের কাছে টেনে নিয়ে বল্লে, "চুরি করতে পারবি, রফিক্?"

রফিকের রাতের স্বপ্ন মনে হয়ে গেল। সে একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্লে, "যদি ধরা প'ড়ে যাই?"

"দুৎত্তেরি, ভয়েই মলি!—ছেঃ! চাক্‌রী না করলে মানুষ চুরি করতে শেখে না—আর মাগীর পাল্লায় না পড়লে মানুষে শক্ত হ'তে জানে না—তুই রফিক্ একটা ভাল মানুষির প্যাটা!"

দুই ভায়ে চুপি চুপি অনেক পরামর্শ আঁটা চল্‌লো।

এ-দিকে ও-ঘরের স্ফূর্ত্তিটাও একটু বেশী জমে উঠলো। ফতিমা এক বোতল মদ পেট-কোঁচড়ে ক'রে নিয়ে এসেছিল।

গ

সকালে উঠে রফিক্ ডাক্তারের বাড়ী চ'লে গেল।

ইদু আস্তে আস্তে ঘর থেকে বার হয়ে বড় সায়েবের কুঠীর দিকে গেল। সায়েব গোলাপ-বাগানে ঘুরে ঘুরে ফুল দেখে বেড়াচ্ছিল।

ইদুকে দেখে সায়েব ভারি আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, "সর্দ্দার বহুত দুবলা হো গেয়া—"

"হুজুর!" ব'লে ইদু মাটী ছুঁয়ে সেলাম করলে।

"কেয়া মাংটা?"

"কল্‌কাতা জানে—"

"একেলা যায়ে গা?"

"ভাই আয়া লেনেকো—"

"তব?"

"খরচা ঘট্ গিয়া—"

"আচ্ছা"—ব'লে সাহেব একখানা দশ টাকার নোট ফেলে দিলে। ইদু চ'লে আস্‌ছিল। সায়েব আবার জিজ্ঞেস করলে, "হোগা? খুসী হ্যায়?"

ইদু কিছু না ব'লে বার বার সেলাম জানাল।

"আচ্ছা—মেম-সাহেব কা তরফসে আরো দশ দিয়া—কল্‌কাতাসে যা' কর ইলাজ করো।"

ইদু বাড়ী ফেরার পথে বাবুর্চ্চির কাছ থেকে সায়েবের চুরুটের ছাই খানিকটা চেয়ে নিয়ে এল।

ঘ

ইদু বাড়ী ফিরে দেখলে, রফিক্ ফিরেছে, দু'বোতল মদ সঙ্গে ক'রে।

ফতিমার দল তখনো নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে!

দুই ভায়ে খুব ভাল ক'রে সেই বোতলদুটোর মধ্যে চুরুটের ছাই মিশিয়ে দিলে।

ইদু বিছানায় শুয়ে বল্লে, "রফিক, খানিকটা মদ আমার সব গায়ে মালিশ ক'রে দে।"

রফিক্ ব'সে ব'সে ঐ কায করতে লাগলো।

ইদু জিজ্ঞেস করলে, "তোর কাছে কত আছে?"

"দুটো টাকা।"

"ভয় নেই, বড় সায়েব কুড়িটা দিয়েছে, রফিক্! আর ভয় নেই, বোধ হয় বাড়ী পৌছতে পারবো।—এই একটা রাখ, তুই বাজারে যা, সের দুই মাংস আনবি, আর মশলা—আর রোজ যা যা আনিস্, আনবি।"

রফিক্ ইদুর কথামত কায করতে গেল; সে আর একটুও ইদুকে অবিশ্বাস করে না। সে বুঝেছে যে, যে জালে ইদু জড়িয়েছে, তা' থেকে উদ্ধার সহজে নেই, আর পেলেও সে, সোজা পথে নয়।

পরিচ্ছেদ—সাত

ক

ফতিমা খুব বেলাতেই উঠলো।

ইদুর ঘরে মাংস, মশলা দেখে অবাক্ হয়ে গেল। তার উপর মদের গন্ধে ঘর ভুর্ ভুর্ করছে!

কিন্তু তার হঠাৎ কিছু জিজ্ঞেসা করতে সাহস হ'ল না।

ইদু কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে বল্লে, "রফিক ভাই কাল চ'লে যাবে, আজ তাই তোর জন্যে এই সব এনেছে; এক দিন ভাল ক'রে খাই। খুব ভাল ক'রে রাঁধ, বুঝেছিস্?"

ফতিমা বল্লে, "তুই কি মদ খেয়েছিস্?"

ইদু কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লে, "সে দিন কি হবে, ফতিমা! আবার তেমনি ক'রে—"

ফতিমা অনেক দিন পরে ইদুর কাছে এসে বসলো।

ইদু বল্লে, "ডাক্তার গায়ে মালিশ করতে বলেছে—তা রফিক্ একেবারে দু'বোতল কিনেছে!—তা তোরা আজ রাতে গোস্ত খাওয়ার পর একটু আধটু খাস্—"

ফতিমা গুম্ হয়ে শুনতে লাগলো।

ইদু বল্লে, "রফিক্ আবার ও-সব খায় না।—ফতিমা, উঃ, তুই যে বড় রোগা হয়ে গিয়েছিস্, আমার জন্যে ভেবে ভেবে?"

ফতিমা আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে লাগলো।

ফতিমা একলা নয়, এমন অনেকেই আছে, যারা মনে করলেই চোখের জল ফেলতে পারে, মনে করলেই চমৎকার কাঁদতে পারে!

খ

গভীর রাতে ইদু ফতিমার খুনসি থেকে চাবি চুরি ক'রে নিয়ে এলো।

গোটা চারেক লোক ঠিক মড়ার মত প'ড়ে পাশের ঘরে!

ফতিমার ছিল একটা শক্ত লোহার বাক্স; তার মধ্যে আর একটা হাতবাক্সে থাকত টাকা-কড়ি আর রূপোর গয়না-গুলো—সোনার নাক্‌ছাবি।

রফিক্ পাশে বাতি ধ'রে ব'সে; ইদু ধীরে ধীরে, একটার পর একটা ক'রে চাবি খুলে, হাতবাক্সটা খুলে ফেলে দেখে, পাঁচ তাড়া দশ টাকার নোট, আর পাশে যে পিসীর টাকা এসেছিল—সেই দুখানা রাখা রয়েছে।

ইদু বল্লে, "থাক এই দুখানা। বাকিগুলো সব আমারই চুরির টাকা!—এক গাল হেসে ইদু বল্লে, বুঝেছিস্ রফিক্—দু'দফা চুরি!—আর কিছু চাই নে; পাঁচশ টাকায় অনেক দিন চ'লে যাবে দুই ভায়ের—ব্যস্, চল্; চাবিটা যেখানকার, সেখেনে রেখে—ভোর না হ'তেই বেরিয়ে যাব;—কটায় গাড়ী বল্লি?"

রফিক্ ভাঙ্গা গলায় বল্লে—"পাঁচটা—"

ইদু তার মুখের দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে বল্লে, "ও কি! কাঁদিস্ যে?"

"ওকে আরো কিছু দে, ভাই!"

"তোবা! তোবা! তুই ওকে চিনিস্ না রফিক্; ওর টাকার ভাবনা?"

রফিক্ ইদুর শীর্ণ বিকট মুখের পানে যেন আর চাইতে পারছিল না।

শেষ রাতে দুই ভাই চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লো।

রফিক্ বল্লে, "পারবি ত ইদু, ইষ্টিশান পর্য্যন্ত হেঁটে যেতে?'

ইদু বল্লে, "তুই সঙ্গে থাকলে কি ভয় আমার?"

রফিক্ মনে মনে ভাবলে, "খোদা সঙ্গে আছে!"

গ

বাড়ী পৌছে ইদু বল্লে, "পিসী, রফিক্ না গেলে আমায় আর দেখতে পেতে না!"

রফিক্ হাসল। "ইদুটা পাগলা, যে দিকে ঝুঁকে সামলানো মুস্কিল। ওঃ, যা ক'রে এসেছে!"

পিসী বল্লে, "ফতিমাকে আনিস্‌নি কেন?"

"বাপ্, সে বনের বাঘ বনে শিকার ধ'রে খাবে; এখেনে এলে আগে তোমাকেই ধ'রে খেত!"

"সে কি রে! মানুষ আবার বাঘ হয় না কি?"—পিসীর মুখে বিস্ময়ের রেখা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

রফিক্ বল্লে, "বাবও ভাল পিসী, ফতিমা একটা রাক্ষস!"

"তোর যেমন কথা! চুপ কর।"—পিসী ধম্‌কাল।

পরিচ্ছেদ—আট

ক

সুধীন ডাক্তার বুক, পেট, পাঁজড়ায় চোঙা বসিয়ে দেখে বল্লে, "কে বলেছে থাইসিস্? জঙ্গলের জংলী ডাক্তার সে—"

ইদু বল্লে, "সে যে খাস গোরা, ডাক্তার বাবু—"

"শিকার খেলতে পারে তো?"

"খুব, খুব।"

ডাক্তার হেসে বল্লে, "ওরা লড়ুই করতে পারে; ওরা মার-ধোর করতে মজবুৎ—আরে, এ যে পরিষ্কার আসামের কালাজ্বর, কয়েকটা ইন্‌জেক্‌শন্ দিলেই সাফ! যা, যা, ভাবিস্ নে, রফিক্, তোর ভাইকে বাঁচিয়ে দেব—"

"এই পাঁচটা টাকা।"

সুধীন হেসে বল্লে, "আচ্ছা, এবার দিলি; আর দিতে হবে না; চিরকাল কালীঘাটের পথে ব'সে ভিক্ষে ক'রে মরলি—আর টাকা দিতে হবে না—"

"অষুদের দামটা দেবে আমার ভাই,—"

"আচ্ছা, দিস্ গে,—যা।"

বাড়ী ফিরতে ফিরতে রফিক্ বল্লে, "জানিস ইদু, বিনে পয়সার চিকিচ্ছেয় ফল হয় না; দেখবে কেন রুগীকে ভাল ক'রে?—পয়সা দিতেই হবে। ও ছোক্‌রা ভাল, মহেন্দর ডাক্তারের জামাই—মনে নেই তোর, মহেন্দর বাবুকে? রোজ সকালে প্রাতচ্ছান করবে, আর আমাকে একটি ক'রে পয়সা দেবে—ভারি পরিষ্কের লোক ছিল তিনি।"

খ

বাড়ী ফিরে গরম দুধ খেয়ে ইদু বল্লে, "বুঝেছিস্ রফিক্, আমি ঠিক সেরে উঠবো; এখুনি ভাল বোধ করছি,—এই তো সবে একটা ফুড়েছে—"

রফিক্ বল্লে, "আজ মঙ্গলবার, বলতে নেই ইদু—আঁ রাতে তোর জ্বর আস্‌বে, ব'লে দিয়েছে—"

"আসুক গে—আর আমি ভয় করি নে; পিসী আছে তুই আছিস্—কি আর কষ্ট হবে, একটু!—কিন্তু তোকে একটা কায করতে হবে রফিক্,—যা করেছিস্, তা করেছিস্ আর আজি গঙ্গার ধারে ব'সে ভিক্ষে মাংতে পাবি নে, ব'লে দিচ্ছি—"

রফিক্ অনেকক্ষণ ভেবে বল্লে, "কিন্তু আমার তো একটা কিছু করতে হবে? ব'সে খেলে মানুষ ক'দিন বাঁচে?"

ইদু হাস্‌লে, "রফিক্ ভাই, সে কথাও ভেবেছি; তোকে দুশো টাকা দিয়ে একটা দোকান ক'রে দেব; তুই ব'সে ব'সে বেচবি, পারবি নি?"

রফিক্ বল্লে, "তা খুব পারি, কিন্তু তোর টাকা যে ফুরিয়ে যাবে। তোর কি হবে?"

ইদু বল্লে, ঐ দোকানে আমিও খাটবো, মুরগীহাটা থেকে মাল এনে দেবো—তাতেই চ'লে যাবে, কি বলিস্?"

রফিক্ ছোট ছেলের মত হাস্‌তে লাগল।

গ

পিসী বল্লে, "ইদু, তোদের দোকান-তো চ'লে গেল। তোর ব্যামোও সেরেছে; এ দিকে সবিরণের বাপও ভারি ধ'রেছে, তোর নিজের একটা পয়সাও লাগবে না; আমি খরচ দেব!"

ইদু হাস্‌লে।

পিসী বল্লে, "নৈলে কোন্ দিন তুই আবার সেই চা-বাগিচের কাযে চ'লে যাবি—"

ইদু নাক-কাণ ম'লে বল্লে, "না পিসী, তা কিছুতেই যাব না —আমি বেঁচে থাক্‌তে রফিক্‌কে ছাড়বো না—ওর ওপর খোদার দোয়া আছে—"

পিসী বল্লে, "আহা, সুলো! বেঁচে থাক্!"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

তিব্বত

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)
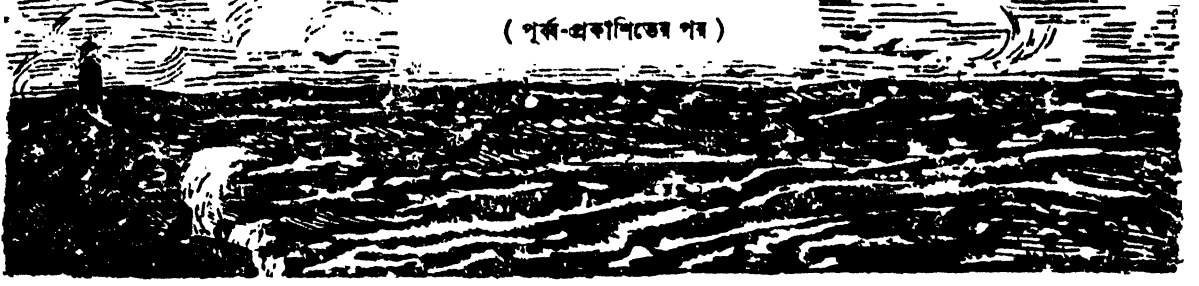
পথিমধ্যে এক জন মার্কিণ পরিব্রাজক এবং বাঙ্গালোরের এক জন ধর্ম্মপ্রচারকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা কুকুন বাংলোয় থাকিয়া ভোরে উঠিয়া জেলাপেলা দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে একটি ক্যামেরা ছিল। পাহাড়ের উপর যন্ত্রটি রাখিয়া তাঁহারা অশ্বতরবাহী এক দল তিব্বতবাসীর সহিত আলাপ করিয়া ফিরিবার সময় ক্যামেরাটি ভুলিয়া পাহাড়ের উপর ফেলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা আমাদিগকে খোঁজ করিতে অনুরোধ করায় আমরা অনুসন্ধান করিয়া পাইলাম না। যাহা হউক, আমরা ধীরে ধীরে উঠিতে উঠিতে জেলাপেলার উপরে পৌঁছিলাম।

জেলাপেলা ও দুই দিকের উচ্চ পাহাড় তখনও তুষারাবৃত। জেলাপেলার কোন কোন স্থানে তুষার গলিয়া গিয়াছে। সেই স্থানে সামান্য সামান্য ঘাস জন্মিয়াছে। কিন্তু তথায় কোন বৃক্ষ নাই। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া কুয়াসার জন্য কিছু দেখিতে পাইলাম না। কুজ্ঝটিকা অথবা মেঘবর্জ্জিত দিনের দৃশ্য অতি সুন্দর। আমরা তুষাররাশির উপর দিয়া নীচে নামিতেছি। কখনও কখনও পা পিছলাইতে লাগিল। যাহা হউক, লাঠির উপর ভর করিয়া অতিকষ্টে পর্ব্বতের পাদদেশে নামিলাম। তথায় একটি বড় চটান আছে। তাহাও তুষারাবৃত। কর্দ্দম ও তুষার-স্তূপের উপর দিয়া চলিতে চলিতে পুনরায় নিম্নাভিমুখে নামিতে শুরু করিলাম কিছু দূর নিম্নে নামিয়া আর তুষার পাইলাম না। কিন্তু রাস্তা অতি কদর্য্য—জল এবং কর্দ্দমপূর্ণ। বরফ ছাড়াইয়া প্রায় ৩ মাইল নীচে যাওয়ার পর বড় বড় বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। রাস্তায় এখন কর্দ্দম কি তুষার নাই, কিন্তু নিতান্ত অসমতল ও বন্ধুর। ছোট-বড় প্রস্তরস্তূপ অতিক্রম করিয়া নদীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিলাম। উপত্যকার মধ্য দিয়া নদী কলস্রোতে বহিতেছে। এইরূপে আমরা সোজা নীচে নামিতে লাগিলাম। প্রায় সমস্ত রাস্তাই হাঁটিতে হইল। আমার ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মাথা বেদনা করিতে লাগিল। নিরুপায় হইয়া তখনও হাঁটিতে হইল। কারণ, ডাণ্ডী কি ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়ার উপযোগী রাস্তা নাই। এইভাবে আরও ২ মাইল চলিয়া ডাণ্ডীতে চড়িলাম। সঙ্গিগণ ঘোড়ায় চলিল।

এই স্থানটি একটি উপত্যকার মত। চারিদিকে জঙ্গল, দক্ষিণদিকে চাহিলে তুষারাবৃত অভ্রভেদী হিমালয় যেন গগন স্পর্শ করিবার জন্য মস্তক উত্তোলন করিয়া হাত বাড়াইয়াছে। এ দিকে গগনও আপনাকে বাঁচাইবার জন্য যেন রাশি রাশি মেঘ দিয়া হিমালয়কে ঢাকিয়া রাখিতেছে। হিমালয় হইতে গলিত তুষারধারা নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইয়া পাহাড়ে-নদীতে পরিণত হইয়া তীব্রবেগে ছুটিয়াছে। নদীর পশ্চিমপারে রাস্তা এবং দুই দিকে জঙ্গল। পশু-পক্ষীর কোন চিহ্ন দেখিলাম না। কেবল নীরব নিস্তব্ধ নিবিড় জঙ্গল। উত্তরদিকে চাহিলে দেখা যাইবে, স্তরে স্তরে পাহাড় চলিয়া গিয়াছে। কবি গোল্ডস্মিথের প্রসিদ্ধ ছত্রটি মনে পড়িল—"Hills after hills with gay theatric pride." উত্তরদিকের পাহাড়ে এখন কোন তুষারচিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। তৎপরে জঙ্গলের মধ্য দিয়া ও নদীর ধার দিয়া আর ১ মাইল যাইয়া লংরাম বাজারে পৌঁছিলাম। জঙ্গলের মধ্যস্থানে পাহাড়ের গায় লংরাম বাজার। এই গ্রাম নদীর পশ্চিমপারে জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত। পশ্চিমদিকে অরণ্যাবৃত পাহাড়, পূর্ব্বদিকে পাহাড়গাত্রে স্তরে স্তরে বৃক্ষরাজি, নিম্নে পার্ব্বত্যনদী কলতানে ছুটিয়া চলিয়াছে। নদীর পূর্ব্বপারে আবার অরণ্য-সমাকীর্ণ উত্তুঙ্গ পাহাড়। দক্ষিণদিকে নেত্রপাত করিলে হিমগিরির তুষারাচ্ছন্ন শৃঙ্গের অপূর্ব্ব শোভা মনকে বিস্ময়াভিভূত করিয়া ফেলে।

লেংরাম বাজার

বেলাও তিন প্রহরের উপর হইয়াছে। কাজেই এই বাংলোয় অন্য রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করা হইল। অশ্বতরের পৃষ্ঠের মাল পূর্ব্বেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কেবল কুলী কয়েক জন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। অশ্বতরের সর্দ্দার আমাদের জন্য ৩টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া মালপত্র বাংলোর প্রাঙ্গণে নামাইয়াছে। আমরা বাংলোয় প্রবেশ করিয়া বড় ভাল বোধ করিতে লাগিলাম না। অপরিষ্কারের জন্য মনে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে লাগিলাম। কুলী ইত্যাদির দ্বারা বাংলোটি পরিষ্কার করাইলাম। বৃষ্টির সময় ইহার স্থানে স্থানে জল পড়ে। বাংলোয় তিনখানা তক্তপোষ আছে। যে যায়গায় বৃষ্টি পড়ার আশঙ্কা নাই, এমন স্থান দেখিয়া এক ঘরে আমার জন্য একখানা ও অপর ঘরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের জন্য একখানা তক্তপোষ পাতান গেল। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ঘরে রান্নার ব্যবস্থা করিয়া জিনিষপত্র এক ধারে গোছাইয়া রাখা হইল। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মাথাধরার দরুণ শুইয়া পড়িলেন। চাকর ও দ্বারবান্ রান্না চড়াইয়া দিল। আমিও সন্ধ্যার পর শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি ৮টার পর রান্না হইয়া গেল। তখন চাকর আমাকে ডাকিয়া কয়েকখানা রুটী ও তরকারী খাইতে দিল। আমি আহার করিয়া শুইয়া পড়িলাম। লেংরাম নেটিং হইতে ১১ মাইল দূরে, ইয়াটুং তথা হইতে আরও ১১ মাইল।

লেংরাম বাজারে খানকয়েক চা, রুটী ও মদের দোকান দেখিলাম। অশ্বতর রাখিবার ২।৩ খানা ঘরও আছে। ঘর সব কাঠের ছাউনী, চারিদিকে কাঠের বা পাথরের দেওয়াল এবং ভূমিতলে কাঠের পাটাতন। ঘরের ছাউনীর উপর লোহার পেরেক আছে বলিয়া দেখা যায় না। প্রবল বাতাসে কাঠের ছাউনী উড়াইয়া না ফেলে, তজ্জন্য কাঠের ছাউনীর উপর পাথর চাপা দিয়াছে।

এখানে কোন ডাকঘর নাই। কিন্তু ডাকের রাণার-(runner) দিগের জন্য একখানা ঘর আছে। তিব্বত হইতে যে ডাক আসে, তাহা এখানে বদলান হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে একটি টিনের বাংলো আছে। এই বাংলো তিব্বত অভিযানের সময় চীনের পক্ষ হইতে সৈনিকদের কোন ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর বাসের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ বাংলোয় এখন পথিকদিগকে থাকিতে দেওয়া হয়। বাংলোটি কিছু অপরিষ্কার। আমরাও বড় ক্লান্ত, এদিকে আবার শিরঃপীড়া, তদুপরি বৃষ্টি আসারও লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

১৯শে মে। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর অপরিষ্কার অসুবিধাজনক বাংলোটি ছাড়িয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। সুতরাং আহারাদি না করিয়া ৬টা সাড়ে ৬টার মধ্যে বাংলো হইতে বাহির হইয়া রওনা হইলাম। পথ পূর্ব্ববৎ অসমতল ও বন্ধুর। নদীর পশ্চিমপার ধরিয়া ৩ মাইল যাওয়ার পর আমরা একটি কাঠের সেতুর উপর দিয়া নদী পার হইলাম। আর ১ মাইল যাইয়া পুনরায় অন্য একটি সেতু পার হইয়া নদীর পশ্চিমপারে গেলাম। রাস্তায় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের তিব্বত অভিযানের সময় ইংরাজ বা তিব্বতীয়রা যে সকল স্থানে সৈন্যের বিশ্রামের জন্য অস্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও মধ্যে মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। নদীর পার দিয়া যাইতে যাইতে লেংরাম হইতে ৫ মাইল দূরে একটি অপরিষ্কার

তিব্বতদেশীয় গ্রামে পৌঁছিলাম। গ্রামটি পূর্ব্ব-পশ্চিমদিকে অবস্থিত। রাস্তার দুই পার্শ্বে কয়েকখানা ঘর। ঘরগুলি কাঠের বা পাথরের দেওয়াল, উপরে কাঠের ছাউনী, কাঠের ছাউনীর উপর পাথর চাপা দেওয়া, নীচে কাঠের পাটাতন, আবার কোন কোন ঘরে পাটাতন করাও নাই। গ্রামের মধ্যে এবং রাস্তায় অশ্বতরের মল ও অন্যান্য আবর্জ্জনার স্তূপ। গ্রামের মধ্যে কয়েকখানি চায়ের দোকান এবং অশ্বতর ও উহার রক্ষকদিগের থাকিবার স্থান আছে।

রহিয়াছে এবং স্থানে স্থানে একপ্রকার লতায় সাদা ফুল ফুটিয়া দৃশ্যটি মনোহর করিয়াছে।

আর কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, নদীর দুই পার দিয়া দুইটি রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। আমি বাম পারের পথ ধরিয়া পাহাড়ের উপর দিকে উঠিতে লাগিলাম। পাহাড়ের গা হইতে কিছু নিম্নে নদীর পারে আর একটি গ্রাম দেখা গেল, গ্রামটি দূর হইতে দেখিতে বড়ই সুন্দর। ১ মাইল অগ্রসর হইয়া গ্রামের মধ্যে পৌঁছিলাম। গ্রামের নাম রজিকাজ।

আমুচু নদীর উত্তর তীরস্থ বসতি

এখান হইতে রাস্তার অবস্থা কিছু ভাল দেখা গেল। রাস্তা পূর্ব্ব-উত্তরদিকে চলিয়াছে। আমরা এখন দুই পাহাড়ের মধ্যে সঙ্কীর্ণ উপত্যকা দিয়া চলিলাম। রাস্তার বামদিকে জঙ্গলাবৃত পাহাড় উপরদিকে উঠিয়াছে এবং দক্ষিণদিকে অবিরাম গতিতে দ্রুতবেগে একটি পার্ব্বত্য নদী ধাবিত হইতেছে। নদীর অপর পারে আবার জঙ্গল এবং জঙ্গলাবৃত পাহাড়। নদীর উত্তর পার্শ্বে একপ্রকার নীলবর্ণের কুসুম-জাতীয় ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। উপত্যকার এবং পাহাড়ের গায়ে সাদা ও লালবর্ণের চায়না গোলাপ প্রস্ফুটিত হইয়া

এতক্ষণ আমরা পূর্ব্বাভিমুখে চলিতেছিলাম। গ্রামে মধ্যে কিছু অগ্রসর হইলে আমরা ঘুরিয়া উত্তরদিকে চলিতে লাগিলাম। গ্রামে একতল এবং দ্বিতল বাড়ী। দেওয়াল হয় কাঠের, না হয় পাথরের এবং কাদার গাঁথনি, উপরে কাঠের ছাউনী। কাঠের ছাউনীর সম্মুখে কাঠের ঝালর, দ্বিতল বাড়ীতেই অধিক কারুকার্য্যসমন্বিত সুন্দর ঝালর দেখা যায়। ঝালর লাল, নীল, হরিদ্রা—নানা বর্ণের। দোতলা বাড়ীর সম্মুখে মধ্যস্থলে কাঠের দরজা। দরজা কপাট ও চৌকাঠের অঙ্গে কারুকার্য্য, বিচিত্র বর্ণে অনুরঞ্জিত। সম্মুখে

কেলিং গ্রামে গোম্ফা ও হোটেল

দরজার উপরে একটি খোলা বারান্দার মত আছে। উহার দারুনির্ম্মিত থামগুলি ক্ষোদিত এবং বর্ণানুরঞ্জিত। স্তম্ভগুলির উপরিভাগে কারুকার্য্যবিশিষ্ট কার্ণিশ ও ঝালর। চারিদিকে যে সকল জানালা আছে, তাহাও কারুকার্য্যবিশিষ্ট এবং বর্ণানুলিপ্ত। বাহির হইতে বাড়ীটি সুদৃশ্য হইলেও উহার অভ্যন্তরভাগ অপরিষ্কার। দোতলার মেঝে কাঠের পাটাতন-বিশিষ্ট, খাড়া কাঠের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়।

৩০।৩৫ হাত দীর্ঘ একটি কাষ্ঠদণ্ডের অগ্রভাগে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মন্ত্রলিখিত একটি বড় সাদা নিশান—বাড়ীর সম্মুখে প্রোথিত। উহার চারিপার্শ্বে ছোট ছোট অনেকগুলি নিশানও রহিয়াছে দেখিলাম। বাটীর পার্শ্বে ২০।২৫ হাত প্রশস্ত এবং ৫০।৬০ হাত দীর্ঘ ভূমিতে মূলা ও সরিষা শাক হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর পার্শ্বেই এইরূপ অথবা ইহা অপেক্ষা ছোট একটি ক্ষেত্রে মূলা ও সরিষা শাক লাগান হইয়া থাকে। গ্রামের মধ্যে একটি হোটেল আছে। হোটেলটি রাস্তার মধ্য-স্থানে অবস্থিত, উহাকে দক্ষিণভাগে রাখিয়া গমনাগমন করিতে হয়। গ্রামটি বেশ বড়। এখানে বহু বসতি আছে। গ্রাম্য রাস্তার দুই দিকে বাড়ী। আমুচু নদী গ্রামের পূর্ব্বদিক্ দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গ্রামটি বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত। জেলাপেলা প্রভৃতি তুষারাবৃত পাহাড় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া একটি ছোট নদী এই গ্রামের দক্ষিণ পাশ দিয়া আমুচু নদীতে পড়িয়াছে। গ্রামটি উচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে সমতল উপত্যকায় অবস্থিত। পূর্ব্বে উপত্যকা সকল অসমতল দেখা গিয়াছে; কিন্তু এখানে দেখিলাম, দেশের আকার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে পাহাড়ের পাদদেশের উপত্যকা সকল সমতল এবং প্রায় প্রত্যেক উপত্যকাভূমি প্লাবিত করিয়া একটি ছোট কি বড় নদী প্রবাহিত। উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদীর দুই পারেই চাষের ক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে গ্রাম। আমুচু নদীর অপর পারে অর্থাৎ পূর্ব্বপারেও বসতি আছে। উপরের পাহাড়ের ধার হইতে নদীটি বড়ই সুন্দর দেখায়। গ্রামের উত্তর এবং দক্ষিণদিকে শস্যশ্যামল ক্ষেত্র। ক্ষেত্রে গম চাষ হইতেছে। ক্ষেত্রের আইলের চারিদিকে পাথর সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। দূর হইতে দেখিলে মনে হইবে, যেন মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। সম্ভবতঃ এই কৌশলে পশুদিগকে বিতাড়িত করা হয়। আমরা যে নদীর পার দিয়া আসিতেছিলাম, তাহা ঐ রঙ্কিকাঙ্গ গ্রামের দক্ষিণদিকে আমুচু নদীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

জেলাপেলার গিরিসঙ্কটের উত্তরে টিনের ঘর বড় একটা দেখিতে পাইলাম না। উহার দুই দিকে জঙ্গলাবৃত গগনভেদী খাড়া পাহাড়। এই সব জঙ্গলের মধ্যে লতায় সুন্দর সাদা সাদা ফুল ফুটিয়াছে। চীনা গোলাপগাছে লাল ও সাদা গোলাপ ফুটিয়াছে। পাহাড়ের পাদদেশ হইতে উপত্যকায় নামিলেই শস্যশ্যামল যব ও গমের ক্ষেত্র সকল এবং মধ্যে মধ্যে পীচ ও আপেলের গাছ দৃষ্টিগোচর হইবে। পীচের গাছে ছোট ছোট ফল ধরিয়াছে। আপেল-গাছ লোহিতাভ সাদা ফুলে সুশোভিত। বিস্তৃত ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া কলনাদিনী আমুচু নদী অপ্রতিহত গতিতে তীব্রবেগে ছুটিয়াছে। নদীর স্রোতের বেগ দেখিলে মনে হয়, দুই পারই যেন ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। নদীর ভিতর স্থানে স্থানে পাথরগুলি মস্তক

উত্তোলন করিয়া যেন নদীর দৃশ্য দেখিতেছে। কোন কোন স্থানে ক্ষুদ্র জঙ্গলাবৃত চরাভূমির দুই পার্শ্ব দিয়া নদী প্রবাহিত হইতেছে। নদীর পারে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম। মনে হইল, আমরা যেন কোনও সুরচিত উদ্যানের মধ্য দিয়া চলিয়াছি।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আমুচু নদীর পারস্থিত কেলিং গ্রামে ছোট একটি গোম্ফা এবং ছোটেলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলাম। আরও ১ মাইল অগ্রসর হইবার পর আমরা একটি বড় গ্রামের পার্শ্বে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে পাহাড়ের উপর দিয়া চাম্পিটং বাংলো হইয়া নামুলা গিরিসঙ্কট পার হইয়া গণ্টকে যাইবার একটি রাস্তা আছে। এই গ্রামে এক জন জোঙ্গের আবাসস্থান। জোঙ্গ তিব্বত-রাজার স্থানীয় প্রধান কর্ম্মচারী। সে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীদিগের বিচার করিয়া থাকে। গ্রামটি বেশ বড়। এখানকার গৃহগুলিও বড় বড়। গ্রামের মধ্যে অশ্বতরের আড্ডা আছে। কিন্তু গ্রামটি অত্যন্ত অপরিষ্কার। ঘর-বাড়ীও তদনুরূপ। দূর হইতে দেখিলে ঘর-বাড়ী ও গ্রামখানি ছবির ন্যায় সুন্দর দেখায়। কিন্তু গ্রামে প্রবেশ করিয়া তাহার কদর্য্য অবস্থা দেখিলে মনে ঘৃণার উদয় হয়।

ইয়াটুং গ্রাম

আর কিছু দূর অগ্রসর হইয়া এক কাঠের পুলের উপর দিয়া আমুচু নদী পার হইয়া পূর্ব্বধারে গেলাম। অর্দ্ধ-মাইল যাইতে না যাইতে পুনরায় নদী পার হইয়া পশ্চিম পারে আসিলাম। এখানে নদীর জল নালা দিয়া আনিয়া, জলের শক্তি দ্বারা জাঁতা ঘুরাইয়া গম এবং যব পেষা হয়। পুনরায় অর্দ্ধ-মাইল অতিক্রম করিয়া ইয়াটুং নামক সুন্দর গ্রাম দূর হইতে দেখিতে পাইলাম। আর কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আমরা ইয়াটুঙ্গের বাংলোয় পৌঁছিলাম।

বাংলোটি আমুচু নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিত। ঘরগুলি টিনের, পাথরের দেওয়াল। বাংলোর পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে দুইটি বারান্দা। পূর্ব্বদিকের বারান্দার পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে কাচ দিয়া ঘেরা একটি ছোট ঘর। ইহা বসিবার ঘরস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ঘরে সতরঞ্চের উপরে মোটা মোটা সুন্দর কার্পেট পাতা। দরজায় উৎকৃষ্ট মোটা পর্দ্দা, এমন কি, শীত-নিবারণের জন্য পায়খানাতেও পশমের পর্দ্দা ঝুলিতেছে। বাংলোর দুই দিকে দুইটি শয়ন-ঘর, মধ্যে একটি ভোজনের ঘর। ঘরে কৌচ ও চেয়ার আছে। বাংলোর সংলগ্ন ভূমিতে বহু আপেল-গাছ আছে; তাহাতে অনেক ফুল ফুটিয়াছে। ইহা ছাড়া রান্না-ঘর, ঘোড়ার আস্তাবল, কুলী থাকিবার জন্য ঘর আছে। আমুচু নদীর পূর্ব্বপারে নদীর উপরে পোষ্ট অফিস, টেলিগ্রাফ অফিস ও হাসপাতাল আছে। তাহার দক্ষিণদিকে সিকিম এঞ্জিনিয়ারের বাংলো এবং বাজার ইত্যাদি অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বদিকে এক বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠে সৈনিকগণ খেলা ও কুচ-কাওয়াজ করে। এই মাঠের পূর্ব্বদিকে সৈনিকদিগের আবাসস্থান, রসদ বিভাগ ও ঘোড়ার আস্তাবল আছে। এই স্থানে ৫০ জন সৈনিক থাকে। পাহাড়ের উপর উঠিলে বৃটিশ ট্রেড-এজেন্টের বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার বাংলো হইতে কিছু নীচে নামিয়া অন্য একটি রাস্তা দিয়া পূর্ব্বদিকে উপরে উঠিলে এজেন্টের বড় বাবুর বাড়ী এবং তাহার উত্তর-পূর্ব্বে টেলিগ্রাফ এঞ্জিনীয়ারের বাস-ভবন।

আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পুলের উপর দিয়া আমুচু নদী পার হইয়া বাংলোয় ফিরিয়া আসিলাম। ইহার দক্ষিণে আমুচু ও মচু নদী একত্র মিলিত হইয়া আমুচু নদী নামে অভিহিত হয়। নদীর প্রবল স্রোত পুল হইতে দেখিলে মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। নদীস্রোতের ভীষণ শব্দে কাণে তালা লাগে। পাহাড় এই স্থানে জঙ্গলাবৃত ও খাড়া। উপত্যকাটি দেশে বাড়ী। ইনি লিভিং নামক স্থানের এক জন কাজী অর্থাৎ জমীদার। তাঁহাকে বাংলোর পাশের কথা বলাতে তিনি বলিলেন, "আগামী কল্য আপনাদের রওনা হইবার পূর্ব্বেই আপনার কেরাণীকে পাঠাইয়া দিবেন। তাহার হাতে আপনাদের পাশ ও Tour programme দিব।" বাংলোয় আসিয়া আহারাদির পর শয়ন করিলাম। স্থানটি প্রায় ১০ হাজার

মচু ও আমুচু নদীর সঙ্গমস্থল

সমতল, চাষের ক্ষেত্রে পূর্ণ। আমি পোষ্ট অফিস হইতে আমার পত্রাদি আনিয়া পড়িতে বসিলাম। বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য কলিকাতা হইতে এক টেলিগ্রাম আসিয়াছে, তাহাও পাইলাম।

বৃটিশ ট্রেড-এজেণ্ট এখন ইয়াটুংএ নাই। ডাকঘরে তাঁহার কেরাণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। লোকটি ভদ্র, সিকিম ফুট উচ্চ। নেটং এবং লেংরাম অপেক্ষা এখানে শীত কম। দিনের বেলা ৬০ ডিগ্রী উত্তাপ দেখিলাম। এখানে সকালে বাতাস থাকে না। বেলা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের বেগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। স্থানটি আর্দ্রতাশূন্য, শুষ্ক এবং অত্যন্ত মনোরম। সিকিমের মত এখানে অধিক বারিপাত হয় না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রিয়নাথ রায়।

প্যারীর মাসী

১

হঠাৎ আমার মন কি রকম খারাপ হয়ে গিয়ে আমি সংসারের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বিরক্তি কি বৈরাগ্য কি বিবেক, অত শত বিচার করা আমার হয়ে ওঠে নি। আমার চোখে ঠুলি দিয়ে ঘানিগাছে জুড়ে দেবার সব ঠিকঠাক হয়েচে, অর্থাৎ আমার বিয়ে দিয়ে আমার বুকে জগদ্দল পাথর চাপাবার আয়োজন হচ্চে, এমন সময় আমি দড়ী ছিঁড়ে, তিড়িং-মিড়িং ক'রে লাফিয়ে মাঠে ছুটে বেরিয়ে গেলাম। রাতারাতি উঠে কাউকে কিছু না ব'লে স'রে পড়লাম।

পেড়ে কাপড় ছেড়ে গেরুয়া ধারণ করলাম। সঙ্গে দু'চারখানা পুথি ছিল—গীতা, মোহমুদ্গর, খানকতক উপনিষদ, এই রকম। একখানা কম্বল আর একটা কমণ্ডলু সঞ্চয় করা গেল। তার পর অবারিত খোলা পথ, যে দিকে দু'চক্ষু যায়, সেই দিকে চললাম। কয়েক দিন বৈদ্যনাথে, তার পর গোটা কতক দিন গয়ায় আর বৌদ্ধ গয়ায় কেটে গেল। কোন ঝঞ্ঝাট, কোন বালাই নেই, যে দিন যেমন জোটে, সে দিন সেইরূপ যায়। সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ, তার মধ্যেও কখন সৎসঙ্গ, কখন অসৎসঙ্গ, কেউ পারমার্থিক কথা কয়, কেউ সাধু সেজেও ঘোর বিষয়ী। বেগতিক দেখলে আমি পাশ কাটিয়ে আর কোথাও চ'লে যেতাম।

কাশী যাব ব'লে এক দিন বক্সারে রেলগাড়ীতে উঠচি, দেখি, একখানা গাড়ীতে এক জন সাধু ব'সে রয়েচেন। দিব্য প্রকাণ্ড দেহ, উজ্জ্বল কান্তি, মাথায় বড় বড় চুল, জটা নয়, দাড়ী-গোঁফ প্রায় পাকা, বড় বড় চোখের কোণে লাল ছড়া, কপালে বিভূতি-তিলক, গলায় রুদ্রাক্ষমালা। আমি যুক্তহস্ত মাথায় ঠেকিয়ে বললাম, নমো নারায়ণ!

সন্ন্যাসী বললেন, এস, এস, এই গাড়ীতে এস। কোথায় যাবে?

আমি বললাম, কাশী যাব।

গাড়ীতে উঠে এক ধারে বসতে যাচ্ছি, এমন সময় তিনি নিজের পাশে যায়গা ক'রে দিয়ে বললেন, এইখানে ব'স।

আমি বসলে পর বললেন, তোমার বয়স ত বড় অল্প মনে হচ্ছে। এরি মধ্যে এ ভেক?

—গৃহস্থ আশ্রমে তৃপ্তি নেই।

—ভাল ভাল। সাধুকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে নেই। কাশী এর আগে দেখা হয়েচে?

—আজ্ঞে না, আমার কিছুই দেখা হয় নি, আমি কিছু জানি নে।

—তা হ'লে আমাদের সঙ্গে চল না? আমরাও কাশী যাচ্ছি।

—যদি আপনাদের কোন অসুবিধে না হয়—

—আরে, ও সব লোক-সমাজের কথা ভুলে যাও। আমাদের আবার সুবিধে অসুবিধে কি? সর্ব্বত্র সমান, আরাম কি কষ্ট, কোন জিনিষই নেই, সব স্থানে দরিদ্র নারায়ণ, সবই লীলাময়ের লীলা। কুণ্ঠা সঙ্কোচ লোকালয়ে, সে সব আমরা লোকালয়ে রেখে এসেছি।

—কেমন অভ্যাসের দোষ—

—আর বলতে হবে না, অমন সকলেরই নতুন নতুন হয়। তোমার হাতে পুথি দেখছি। কিছু পড়া-শোনা আছে?

—যৎসামান্য, বলতে গেলে কিছুই নয়। যদি কোন ভাল গুরুর আশ্রয় পাই, তা হ'লে কিছু পাঠাভ্যাস করি।

—নিষ্ঠা থাকলেই পাবে। পুথি-পাঁজি ত কত লোকে প'ড়ে, তাতে কি হয়? কেউ ঘোর দাম্ভিক, কেউ ঘোর নাস্তিক। সদ্গুরু কে? সদ্গুরু বত্তাওয়ে বাট, যে পথ দেখায়, সেই সদ্গুরু। যে পথ চায়, সে পথ পায়; যে সব ছাড়ে, সে সব পায়। সব ছোড়ো তো সব মিলেগা।

সন্ন্যাসীর কথার বেশ চটক। আর কিছু কথার পর বললেন, তোমাকে কি ব'লে ডাকব? বাপ-মায়ের রাখা নাম জিজ্ঞাসা করছিনে, এ আশ্রমে এসে একটা কিছু নাম হয়েছে ত? আমার নাম বালানন্দ।

—আমি সুনন্দ ব্রহ্মচারী।

—বেশ নাম। শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বচর। এই আমাদের যাত্রা ফুরাল।

মোগলসরাইতে গাড়ী বদলাতে হয় নি, বরাবর রাজঘাট কাশী ষ্টেশনে এসে গাড়ী থাম্‌ল। আমরা গাড়ী থেকে নামলাম।

মেয়েদের গাড়ী থেকে একটি স্ত্রীলোক নেমে বালানন্দ স্বামীর কাছে এল। কি আপদ! সন্ন্যাসীর সঙ্গে আবার মেয়েমানুষ কেন? আমার মনে কেমন খট্‌কা লাগল। কথা-বার্ত্তায় ত জ্ঞানীর মত, লোকটা বামমার্গী নয় ত? আমি কি করব ভাবছি, এমন সময় স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। দেখামাত্র মনের সংশয় ঘুচে গেল।

গেরুয়া পরা, শুভ্রকেশী, তেজস্বিনী রমণী। মুখে বার্দ্ধক্যের কোন চিহ্ন নেই। টানা টানা নাক-চোখ, রং ফর্‌সা, মুখ সুন্দর না হলেও তেজে ভরা, চোখের চাউনি তীক্ষ্ণ, তীব্র। বালানন্দ স্বামীর কাছে এসে বল্‌লে, বাবা-ঠাকুর, হেঁটে যাবে?

—কি দরকার? সারারাত্রি রেলে ভাল ঘুম হয়নি, তোমারও কষ্ট হয়ে থাকবে, চল, গাড়ী ক'রে যাই।

আমার দিকে ফিরে বালানন্দ স্বামী বললেন, ইনি আমার শিষ্যা, তীর্থ-পর্য্যটনে বেরিয়েচেন।

রমণীকে বললেন, উনি নতুন ব্রহ্মচারী হয়েছেন, কখন কোথাও যান নি। ওঁকে আমাদের বাসায় নিয়ে যাচ্চি।

—বেশ ত, চলুন না।

রমণীর স্বর মধুর, কিন্তু কথা স্পষ্ট, কোনরূপ সঙ্কোচ অথবা জড়তা কিছুমাত্র নেই।

একখানা ঠিকা-গাড়ীতে বালানন্দ স্বামী আর আমি এক দিকে বসলাম, রমণী অন্য দিকে বসল।

দশাশ্বমেধ থেকে একটু দূরে একটা গলিতে একখানি ছোট পরিষ্কার বাড়ীতে আমরা উঠলাম। বাড়ীতে লোক ছিল, তারা খুব সম্মান ক'রে আমাদের দোতলায় নিয়ে গেল। হাত-পা ধুয়ে বালানন্দ স্বামী বললেন, প্যারীর মাসী! আমরা গিয়ে এই দশাশ্বমেধ ঘাটে বসি। তোমার কিছু দরকার আছে?

—আমি যাব উজ্জুগ ক'রে নেব, তোমরা বেরিয়ে যাও না। বেলাও ত আর বড় নেই, আমিও কায সেরে যাচ্ছি। আরতি দর্শন করতে হবে ত?

—আরতি দেখতে আমরাও যাব। তুমিও কি আগে ঘাটে যাবে?

—তাই যাব।

আমরা বাড়ীর বাইরে এলাম।

২

প্যারীর মাসী! কোন দেশী নাম! যে সংসার থেকে বেরিয়েচে, তার আবার মাসী-পিসী সম্বন্ধ কি? আর যদি সন্ন্যাসিনী হয়েও নাম না বদলায়, তা হলেও নিজের ত একটা নাম আছে, সেই নামে ডাকে না কেন? অমুকের মা, অমুকের মাসী পাড়াগাঁয়ে ব'লে থাকে বটে, কিন্তু সন্ন্যাস আশ্রমেও কি সেই পরিচয় থাকবে?

আমি ভুরু কুঁচকে ভাবচি, বালানন্দ স্বামী আমার মুখ চেয়ে হাসলেন। বললেন, তোমার মন গোলোকধাঁধায় ঘুরচে! তুমি প্যারীর মাসীর কথা ভাবচ, না?

আমি চমকে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কেমন ক'রে জানলেন? সন্ন্যাসী হেসে কৌতুক ক'রে বললেন, মানুষের মনে ডুব দিয়ে যদি মনের কথা তুলতে না পারব, তা হ'লে আমার সাধুগিরি কিসের? আর এ ত সোজা কথা পড়ে রয়েচে। তোমার মনে হতেই পারে যে, সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে মেয়েমানুষ কেন? আমি বৈষ্ণব নই যে, বৈষ্ণবী সঙ্গে ক'রে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব; বামাচারী তান্ত্রিকও নই যে, আমার সঙ্গে অবিদ্যা থাকবে। কথাটা যখন তোমার মনে উঠেচে, তখন প্যারীর মাসীর বিষয়ে তোমার কিছু জেনে রাখা ভাল। ওর বিষয়ে সব কথা আমি নিজে জানিনে, যেটুকু জানি, বলতে আমার কোন আপত্তি নেই। প্যারীর মাসী ছাড়া ওর অন্য কোন নাম আমি কখন শুনিনি। প্যারী কে, তা কিছুই জানিনে, প্যারী বেঁচে আছে কি নেই, তাও বলতে পারিনে। প্যারীর মাসীকে জিজ্ঞাসা করলে সে কিছু বলে না, পূর্ব্বের কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করে। ও ডাকনামটা বোদলে আমি এ আশ্রমের একটা নাম

রাখতে চাইলাম, তাতে ও রাজি নয়। যখন সংসার ত্যাগ করিনি, আমাদের গ্রামের নিকটে আর একটা গ্রামে প্যারীর মাসী থাকত। একাই ছিল, আপনার লোক কেউ ছিল না। স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল, ওর নামে কেউ কখনো একটা কথাও বলতে পারে নি। শুনতাম—কেমন যেন ছেমো-ছেমো, সময় সময় এলোমেলো কথা কয়, কিন্তু পাগল কেউ বলত না। কয়েক বছর আগে কালীঘাটে একবার দেখা হয়, সেখানে আমার কাছে মন্ত্র নেয়। সেই পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে ঘোরে। সব কাযে তৎপর, বেশ পড়াশোনা আছে। তবে ঐ যা বললাম, ঠিক সহজ মানুষ নয়, পাগলও নয়। আমি ঠিক বুঝতে পারি নে, কিন্তু আমার মনে হয়, ওর কোন দৈবশক্তি আছে।

এ সব কথা আমি ত কিছুই বুঝতে পারলাম না। এর ভিতর একটা কিছু রহস্য আছে, কিন্তু সে ভাবনায় আমার কি কায? আজ এদের সঙ্গে রয়েচি, কাল কোথায় থাকব, তার ঠিক নেই। আমি আর কোন কথা কইলুম না।

আমি ত এর আগে বারাণসী কখন দেখি নি, তবু গঙ্গার ধারে দশাশ্বমেধ ঘাটে ব'সে আমার মনে হ'ল যে, এই তীর্থক্ষেত্র চিরকাল যেমন ছিল, ঠিক তেমনি রয়েচে। গঙ্গার একটানা স্রোতে সব ভেসে যায়, কেবল এই শিবপুরী অটলভাবে বিদ্যমান রয়েচে। পুরাকালে যেমন, এখনও সেইরূপ! কত রাজা, কত রাজ্য গেল, এই কাশীতেই কত অত্যাচার হয়েছিল, কিন্তু কার সাধ্য এই তীর্থের মাহাত্ম্য লোপ করে? ভাগীরথী-বিধৌত, অসিবরণাবেষ্টিত এই পুণ্যক্ষেত্র কালবিজয়ী। বারাণসী নামই বরণা ও অসি এই দুই নদী থেকে। তিন দিক থেকে এই ত্রিধারা কালের পথ আগলে রয়েচে।

সন্ধ্যা হয়েচে। আকাশের কোমল নীল ছায়া গঙ্গার ঢেউয়ে ভাঙচে, নৌকা ভেসে যাচ্চে কিংবা দাঁড় টেনে উজানে বাইচে। বড় বড় বাঁশের ছাতার তলায় ব'সে ভস্মদিগ্ধাঙ্গ সন্ন্যাসী, সামনে ধুনি জ্বলচে। ঘাটে স্ত্রীলোকরা কাপড় কাচচে, কাশীবাসীরা বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আমাদের পাশে আর দু'জন সাধু এসে বসল। হিন্দুস্থানী। এক জন বললে, বম মহাদেও!

সামনে একটা ছোঁড়া অমনি চেঁচিয়ে উঠল, টন্‌গণেশ! তার পর ধমক খেয়ে স'রে গেল।

সাধুর মধ্যে এক জন লম্বা সরু গাঁজার কল্কে বের করলে। তাতে ভিজে ন্যাকড়া গোঁজা ছিল, গাঁজার ধোঁয়ায় রং ঠিক তামার মত। গাঁজা বের ক'রে হাতের তেলোয় একটু জল দিয়ে বুড়ো আঙ্গুলের টিপ দিয়ে খুব খানিক ডলে কল্কেতে পূরে, এক জন সাধুর ধুনি থেকে একটু আগুন চেয়ে নিয়ে এল। গাঁজা সেজে কল্কে আর ন্যাকড়া বালানন্দ স্বামীর হাতে দিয়ে বললে, লেও মহারাজ!

বালানন্দ একটান টেনে আমার দিকে কল্কে আগিয়ে দিয়ে বললেন, এক টান হবে? ভোলানাথের প্রসাদ?

আমি বললাম, ওটা আমাকে মাপ করতে হবে। ও পথে আমি নেই।

—আমিও সচরাচর খাইনে, প্যারীর মাসী পসন্দ করে না। তবে এদের পাল্লায় পড়লে এক আধ টান টানতে হয়।

সন্ন্যাসী সাধুকে কল্কে ফিরিয়ে দিলেন। সে কল্কের নীচে ন্যাকড়া টিপে দু'চারবার টেনে লাগালে দম্। ছিলিমের মাথা দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠল, সাধু সঙ্গীর হাতে ছিলিম দিল, নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুতে লাগল। দুই চক্ষু টক্‌টকে লাল হয়ে উঠল, মুখ দিয়ে টপ-টপ ক'রে লাল পড়তে লাগল, বলতে লাগল, কাশী কৈলাসপতি! বম্ ভোলা! হর, হর, হর, মহাদেও!

গাঁজা টেনে সাধুরা উঠে গেল। আমরা ঘাটে ব'সে ঘাটের ও জলের সান্ধ্য দৃশ্য দেখতে লাগলাম। আমি ভাবছিলাম যে, কাশী মহাদেবের ত্রিশূলের উপর স্থির হয়ে আছে কেমন ক'রে? ত্রিশূল যাঁর হাতে থাকে, তিনি ত ভাঙ্গ-ধুতুরায় সব সময় চুর হয়ে থাকেন আর তাঁর নন্দীভৃঙ্গীর দল সব নেশাখোর, ত্রিশূল ধ'রে থাকে কে? বাসুকি যেন মাঝে মাঝে মাথা নাড়া দেয়, তাতে অপর যায়গায় ভূমিকম্প হয় কিন্তু কাশীতে ভূমিকম্প কৈ ত শুনতে পাওয়া যায় না! তা হ'লে কাশীর এত মাহাত্ম্য হবে না কেন?

ঘোর ঘোর হয়ে আসতে প্যারীর মাসী এসে উপস্থিত হ'ল। তার হাঁটবার ধরণেও যেন কেমন একটা তেজ আছে, দ্রুত লঘু পদক্ষেপে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল, বললে, বাবাঠাকুর, বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখবে চল।

বালানন্দ স্বামী বললেন, আমরা তোমার অপেক্ষায় ছিলাম।

আরতি দেখবার জন্য বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ভিড় হয়েছে। তার ভিতর দিয়ে গিয়ে প্যারীর মাসী দরজার এক পাশে দাঁড়াল, আমরা তার পিছনে দাঁড়ালাম।

তখন শিবলিঙ্গকে স্নান করান হচ্ছে। স্নানের পর মহাদেবের বিভূতি ক'রে আরতি আরম্ভ হ'ল। ধূনার ধূমে মন্দির সুবাসিত হয়েছে, পাঁচ জন পাণ্ডা পাঁচটি ঘণ্টা হাতে ক'রে উঠে দাঁড়াল। পাঁচটি পাঁচ রকম, ছোট বড়।

এর পূর্ব্বে কখন কাশী দেখি নি, বিশ্বেশ্বরের আরতিও দেখি নি। ঘণ্টার আওয়াজ বড় মধুর, ছোট বড় ঘণ্টার ধ্বনি মিশে একটা ঐক্যতান মাধুরীর আবেশ, ঘণ্টাশুদ্ধ হাত উঠছে নামছে। পরে পাণ্ডারা সাধা গলায় রুদ্রস্তোত্র আরম্ভ করলে। শম্ভু—শম্ভু—শম্ভু! শিব—শিব—শম্ভু! ছন্দিত, গম্ভীর, লয়শুদ্ধ কণ্ঠধ্বনি আর সেই সঙ্গে ঘণ্টার মিলিত নিক্কণ! আমার অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, হৃদয়ে স্তোত্রের বিচিত্র উদার শব্দাবলী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ'তে আরম্ভ হ'ল। স্তোত্রের প্রত্যেক শ্লোকের আবৃত্তি শেষে বার বার সেই ধীর গম্ভীর ধ্রুবক—শম্ভু, শম্ভু, শম্ভু, শিব, শিব, শম্ভু!

আরতি শেষ হ'লে আমরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। প্যারীর মাসীর চক্ষু ভাবে ঢল ঢল করছে, জলে ভ'রে এসেছে। আঁচল দিয়ে চক্ষুর জল মুছতে লাগল। মন্দিরের কোণে আর এক জন গালবাদ্য ক'রে, মাথা চালিয়ে কেবলি বলছিল, বম্ বম্ ভোলা! বব-বম্ বব-বম্ শিব শঙ্কর ভোলা!

৩

বাসায় ফিরে বালানন্দ জপে বসলেন, আমি হাত-মুখ ধুয়ে আচমন ক'রে সন্ধ্যা করতে গেলাম। ঘণ্টাখানেক পরে প্যারীর মাসী এসে বললে, প্রস্তুত। তোমরা এস।

পাশের ঘরে দুখানি কম্বলের আসন পাতা, দুখানি শালপাতে খাবার বাড়া। রুটী আর তরকারি। ব্যঞ্জনের রকম বেশী নয়, কিন্তু পরিপাটী রান্না। খেতে খেতে বালানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন খাচ্ছ? প্যারীর মাসীর রান্না কেমন?

—অমৃত। এমন সুন্দর রান্না কখন খাই নি।

প্যারীর মাসী সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, বললে, যেমন জানি সেই রকম রাঁধি। আর একটু ধোঁকা দেব?

—দাও।

তার পরদিন সকালবেলা আমরা গঙ্গাস্নান করতে গেলাম। স্নান ক'রে ফিরে এসে আমরা বসেছি, প্যারীর মাসী এসে বালানন্দ স্বামীকে দণ্ডবৎ ক'রে প্রণাম করলে। তার পর আমাকেও করতে আসে দেখে আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, ও কি কর? স্বামীজী তোমার গুরু আর আমি দুদিনের ব্রহ্মচারী, ওঁর শিষ্য হবারও যোগ্য নই। প্রণাম করতে হয়, আমি করব। তুমি আমার মাতৃতুল্য, আমি কি তোমার প্রণম্য?

প্যারীর মাসী বললে, সাধুমাত্রেই প্রণম্য, সন্ন্যাসী কি ব্রহ্মচারী, বয়স অল্প কি বেশী, সে খোঁজে আমার কি কায? আর তুমি ত ব্রাহ্মণ?

—আমার গলায় কি পৈতা আছে? আর এ আশ্রমে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের কোন ভেদ নাই।

বালানন্দ স্বামী বললেন, কথা ঠিক। জাতের ধার আমরা কি ধারি? ও ছেলেমানুষ, কুণ্ঠিত হচ্ছে, ওকে নমস্কার করলেই হবে।

আমিই আগে নমস্কার করলাম। প্যারীর মাসী আমাকে নমস্কার ক'রে নিজের কাযে গেল।

যে কয় দিন কাশীতে আমরা ছিলাম, আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। তীর্থস্থানে যথেচ্ছাচারের অভাব নেই, কাশীতেও অনেক দুর্বৃত্ত, দুশ্চরিত্র লোক আছে, কিন্তু বিশ্বাসের বলও অপরিসীম। ধর্ম্মে একাগ্রতা দেখে চমৎকৃত হ'তে হয়। যারা সে ভাবে তন্ময় হয়ে আছে, তাদের আর কোন দিকে দৃষ্টি নেই, মনের কোন রকম বিকার নেই। বিশ্বাসের মূল এমন দৃঢ়বদ্ধ হয়ে আছে যে, উৎপাটন করা ত দূরের কথা, শিথিল করবারও কারও শক্তি নেই। বিশ্বেশ্বরের প্রাচীন মন্দির ভেঙ্গে সেই স্থানে মসজিদ নির্ম্মিত হয়েছিল, ফলে কিছুই হ'ল না, যে কাশী সেই কাশীই রয়ে গেল। উচ্চ চূড়াসম্বলিত নূতন মসজিদ তৈয়ার হ'ল, কিছু দিন পরে সেই চূড়া বেণীমাধবের ধ্বজা হয়ে গেল। যত টানাটানি হয়, ততই শিকড় আরও নীচে নেমে যায়। বিশ্বাসের হিমাচলকে কে টলাবে?

মণিকর্ণিকার ঘাটে অনেক সময় ব'সে থাকতাম। শ্মশানের উদাস শূন্যতার কোন চিহ্নই নেই, আছে শুধু অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও নিশ্চিন্ততা। শববাহীরা বা আত্মীয়-স্বজনরা কোন প্রকার শোক প্রকাশ করে না, কাহারও মুখে বিষাদের লেশ নেই। প্রজ্বলিত চিতার পাশে ব'সে লোকে হাসিমুখে গল্প করচে। কাশীতে ত লোক মরবার জন্যই আসে, [illegible]

আবার মৃত্যুভয় কি? এ যে মৃত্যুঞ্জয়ের নগরী, মৃত্যু হার মেনে এখানে শান্ত বন্দীর মত হয়ে রয়েছে। হলাহল পানে যাঁর কণ্ঠ নীল হয়েছিল, আর কোনরূপ বিকার হয় নি, তাঁর নগরে মৃত্যুর বিভীষিকার কেমন ক'রে স্থান হবে? অমৃতের জয়, মৃত্যুর পরাজয়!

দিন কয়েক পরে আমার মনে হ'ল যে, কোন ধর্ম্মশালায় যাই, কিম্বা কাশী ছেড়ে আর কোথাও চ'লে যাই। বালানন্দ স্বামী কৃপা ক'রে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু এ রকম আশ্রিত হয়ে থাকলে ত এক রকম সংসারীই হয়ে পড়তে হয়। তিন চার দিন ইতস্ততঃ ক'রে এক দিন আমি কথাটা পাড়লাম। আর কোথাও চ'লে যেতে চাই শুনে বালানন্দ স্বামী বললেন, আবার কি হ'ল? আমাদের এখানে তোমার ভাল লাগছে না?

আজ্ঞে, তা কেন, বেশ আছি, কিন্তু—

আর আমার কথা এগলো না। স্বামীজী আমার কথায় বাধা দিয়ে বললেন, ঐ কিন্তুটাই যত নষ্টের গোড়া! তোমার আবার কিন্তু কিসের? কিন্তুর মুলুক ত ছেড়ে এসেছ, আবার ফিরে যাবে না কি? সংসারে ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে?

মহাভারত! ও জঞ্জালে আবার জড়াব!

তবে আবার কিন্তুর সঙ্গে কুটুম্বিতা কিসের? এখানে থাক ব'লে, এখানে খাও ব'লে? তাতে কি হয়েছে? তুমি নির্লিপ্ত বৈরাগী, ভোজনং যত্র তত্র আর শয়ন হট্টমন্দিরেই হোক আর গাছতলাতেই হোক, সর্ব্বত্র সমান। গৃহস্থ, সাধু-সন্ন্যাসী, পথিক যে শ্রদ্ধা ক'রে অন্ন দেবে, তারই অন্ন গ্রহণ করবে। এতে আবার দ্বিধা কি, কিন্তুই বা কিসের? আমাকে ভিক্ষা করতে হয় না, তার কারণ, কয়েকটি শিষ্য আমার অন্ন-সংস্থান ক'রে দেন, তাতে তুমি ছাড়া আরও অতিথির গুজরান হয়। প্যারীর মাসীকে এ কথা বলেচ?

কৈ, না, বলা কি দরকার?

তাকে না ব'লে কি কোন কায হয়? ও প্যারীর মাসী!

প্যারীর মাসী আটা মাখছিল, আটা-মাখা হাতে বেরিয়ে এল। জিজ্ঞাসা করলে, কি বলচ, বাবাঠাকুর?

ইনি আর আমাদের কাছে থাকবেন না বলচেন!

কেন, কি হ'ল?

প্যারীর মাসী আমার দিকে চেয়ে দেখলে। সে দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা, বিস্ময়, কৌতুক, সব জড়ানো। মুখ গম্ভীর ক'রে বললে, ও-বেলা কি তরকারি নুণে পুড়ে গিয়েছিল, না ডাল ধ'রে গিয়েছিল?

বালানন্দ হো হো ক'রে হেসে উঠলেন, বললেন, ঐ রকম একটা কিছু নিশ্চয় হয়ে থাকবে।

আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, রান্না ত চমৎকার খাচ্ছি, কিন্তু—

অমনি আমার মুখ চাপা পড়ল. বালানন্দ ব'লে উঠলেন, আবার ঐ! ওকে কিন্তু রোগে ধরেছে. বড় কঠিন ব্যারাম! প্যারীর মাসী, তুমি কিছু টোটকা-টুটকি জান?

প্যারীর মাসী ঘাড় নাড়লে, বললে, ও রোগ হ'লে এ আশ্রম ছাড়তে হয়। হাঁ বাছা, তোমার আবার কিন্তু কিসের? কিন্তু থাকলে বাবাঠাকুর আমাকে তাড়িয়ে দিতেন। পরশু আমরা বৃন্দাবন যাব, তুমি যাবে না? তবে একটা কথা বলি। যদি তোমার মনে আর এক ভাব হয়, যদি সব ছেড়ে-ছুড়ে নির্জ্জনে সাধনা করতে চাও, তা হ'লে কেউ তোমায় কোন বাধা দেবে না। গোবর্দ্ধন বেশ নিরিবিলি যায়গা, সেখানে গুহা আছে, তপস্যা করবার বেশ সুবিধা।

আমার আর কথা কইবার মুখ রইল না। সেখানেই আমার 'কিন্তুর' কাশীপ্রাপ্তি হ'ল।

৪

কৃষ্ণসলিলা কালিন্দীতটে সমৃদ্ধশালিনী মথুরা নগরী। চারিদিকে কোঠা বাড়ী, বিস্তর দোকান-পসার, শেঠেদের বড় অট্টালিকা। পথে লোকের ভিড়,—যাত্রী, ব্যবসায়ী সব চলেচে। আমরা একটা ধর্ম্মশালায় উঠলাম।

স্নানাহার ক'রে আমরা বৃন্দাবনে গেলাম। মথুরা-বৃন্দাবনে ধূলো বলতে নেই, সেখানে পবিত্র রজ, সকলে তুলে মাথায় দিচ্চে, কাপড়ে এক মুঠা ক'রে বেঁধে নিচ্চে। হরিদ্বারে হিন্দুস্থানী যাত্রীরা পানী বললে পাণ্ডারা তাদের বুঝিয়ে দেয়, জল বলতে হয়, পানী বললে দোষ হয়। বৃন্দাবনে পুলিন প্রকাণ্ড চড়া, যমুনা খানিক দূরে। কোথায় সে বংশীমুখরিত কুঞ্জ, কোথায় সে পুলকিত রোমাঞ্চিত পুষ্পশোভিত নীপরাজি! কদম্বমূলে ত্রিভঙ্গ মুরলীধারী কোথায়! কোথায় ভাই বলরাম, কোথায় শ্রীদাম সুদাম সুবল মিতা, স্থূলবুদ্ধি সর্ব্বভুক্ বটু মধুমঙ্গল! কোথায় বৃষভানু-নন্দিনী ব্রজেশ্বরী রাধা, সখী ললিতা বিশাখা চম্পকলতা চিত্রা'

চোখের দেখাই কি দেখা? স্মৃতিপটের চিত্র কে মুছে ফেলতে পারে? পথে ঘাটে যেখানে যার সঙ্গে দেখা হয়, সেই বলে রাধেশ্যাম! মুখে মুখে বিন্দরাবন, বিন্দরাবন! চারিদিকে ব্রজসঙ্গীত—

ব্রজমে ঐসী হোরী মুচাই!
শ্যামলিয়া কি লট্‌কী চাল জিয়া মে বস গই রে!

জুতা পায় দেওয়া নিষিদ্ধ, সকলে শুধু পায়ে রেণু উড়িয়ে চলেছে। সকলের মুখে আনন্দের চঞ্চলতা, সকলে ব্যস্ত-ভাবে আনাগোনা করছে। কেবল চোবেদের কোন তাড়া নেই। বিশালকায় দীর্ঘ মূর্ত্তি সব, হেলে দুলে পথের মাঝখান দিয়ে চলেছে। এদের দেখে চানূর-মুষ্টিককে মনে পড়ে। আবালবৃদ্ধ সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত ভাঙ্গ ঘুঁটছে আর ঘটী ঘটী ভাঙ্গ খাচ্চে। এক যায়গায় কোন ধনী যাত্রী চোবেদের খাওয়াচ্চে। অন্য সামগ্রীর সঙ্গে এক সের ওজনের এক একটা মিঠাই প্রত্যেকের পাতে পড়ছে, আর চোবেরা হাঁকছে, বাঃ মেরা লাল, লড্ডু লুড়কা দেও!

সন্ধ্যার সময় মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়ান গেল। প্যারীর মাসী নিবিষ্টচিত্ত, মুখে বড় কথা নেই, কেবল কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ! শ্রীমধুসূদন! মন্দিরে যেতে আসতে চোবেদের যুবতী কন্যাবধূ বেছে বেছে ধনী যাত্রীদের কাপড় ধরচে আর বলচে, লালজী, কিছু দিয়ে যাও। বালানন্দ দেখে আমার দিকে চেয়ে বললেন, এখানে এরা লজ্জা কাকে বলে, জানে না। না দিলে কেড়ে নেয়।

বৃন্দাবন থেকে গোবর্দ্ধন। পথে একটা খালি গরুর গাড়ী যাচ্ছিল, গাড়োয়ান আমাদের দেখে বালানন্দকে বললে, বাবা, গোবর্দ্ধন যাতে হো?

স্বামীজী বললেন, হাঁ।

গাড়োয়ান আমাদের গাড়ীতে উঠতে বললে, আমরা উঠে বসলাম। গাড়ী টিকিয়ে টিকিয়ে চলল।

গোবর্দ্ধন পৌছুতে রাত্রি হ'ল। গাড়ী একটা ধর্ম্মশালার সামনে দাঁড়াল। গাড়োয়ান বললে, মথুরার শেঠের নতুন ধর্ম্মশালা। এখানে সাধুদের থাকবার যায়গা আছে।

ধর্ম্মশালার একটা ঘরে আমরা রাত্রিবাস করলাম।

গোবর্দ্ধনে লোকসংখ্যা অল্প। কোথাও ভাঙ্গা বাড়ী, কোথাও প্রাচীন ভগ্ন মন্দির। গিরি গোবর্দ্ধন আঁকা-বাঁকা যৎসামান্য উঁচু পাহাড়। সাধুরা কেউ মাধুকরী ভিক্ষা করচে, কোথাও এক টুকরা রুটী, কোথাও অর্দ্ধমুষ্টি অন্ন। কেউ কেউ মৌনী, জীর্ণ ভাঙ্গা ঘরে ব'সে আছে। ভিক্ষা করতে যায় না, লোকেরা তাদের আহার দিয়ে যায়। তাদের দেখে বালানন্দ স্বামী মলুকা দাসের কবিৎ আবৃত্তি করলেন—

পঞ্ছী করে ন চাকরী অজগর করে ন কাম।
দাস মলুকা কহ গয়ে সবকা দাতা রাম॥

প্যারীর মাসী আমার দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে বললে, এ বেশ তপস্যার স্থান। এখানে মৌনী হয়ে বসতে তোমার মন নিচ্চে?

—কৈ, এখনো সে রকম কিছু বুঝতে পারিনে। এখনো চঞ্চলতাই বেশী, পরিব্রাজকতা এই সবে আরম্ভ হয়েছে। সেতুবন্ধ রামেশ্বর থেকে অমরনাথ পর্য্যন্ত ঘুরে দেখি, তার পর কি হয় দেখা যাবে।

—বৃন্দাবনেও সব বনের পরিক্রমা করতে হয়। তার পর যার ভাগ্যে থাকে, তার মন যুগল রূপের শ্রীপাদপদ্মে নিবিষ্ট হয়। ভোমরার আগে ভনভনানি, তার পর নীরবে মধুপান।

প্যারীর মাসীর এ রকম কথা শুনে বালানন্দ স্বামী কেন যে তাকে অনুগ্রহ করেন, তা বুঝতে পারলাম।

গোবর্দ্ধনের নির্জ্জন স্তব্ধতা মনে শান্তি ও বৈরাগ্য আনে। অনেক তীর্থস্থানেই যাত্রীর ভিড়; নিয়ত জনস্রোত, কেবল আসা-যাওয়া। সে কোলাহলের মধ্যে যারা চিত্তজয়ী, তারাই নিশ্চিন্তভাবে স্থির হয়ে থাকতে পারে, আর সকলে কেবল গোলে হরিবোল।

দিন পাঁচ ছয় আমরা গোবর্দ্ধনে কাটালাম। স্বামীজীর কাছে কখন কখন দু'এক জন সাধু আসত, তিনি তাদের সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করতেন, আমি ব'সে ব'সে শুনতাম। বালানন্দ স্বামীর অনেক পড়াশোনা, তার উপর চিন্তা সাধনাও অনেক, তাঁর কথায় অনেক শিক্ষালাভ করা যায়। বেদান্তবাদীর অটল বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে মধুর কোমলতা ছিল, প্যারীর মাসী আর আমি সর্ব্বদাই তা অনুভব করতাম।

একা থাকলে আমার মনে হ'ত, যে শান্তির জন্য সংসারের বন্ধন ছিঁড়ে এলাম, সে শান্তি কৈ? পিপাসিত ব্যক্তির যেমন মরীচিকায় জলভ্রম হয়, আমারও কি সেই অবস্থা? কোথাও ত স্থির হ'তে পারি নে, কে যেন কি যেন ভিতর থেকে তাড়া দিচ্চে আর বলচে চল্, চল্, চল্, কেবলি আগে চল্। শেষটা

কি শুধু ভবঘুরে হওয়াই সার হবে? বালানন্দ স্বামীকে এক দিন একান্তে পেয়ে মনের সংশয় তাঁকে জানালাম। তিনি একটু মুচকে হেসে বললেন, এই ত নিয়ম। সংসার-গারদ থেকে বেরুলে প্রথমে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে ইচ্ছে করে। বাঁধা গরু ছাড়া পেলে কি করে দেখেছ ত? সাধুদের সোজা কথায় কত জ্ঞান আছে, তুমি ত এই রকম ঘুরতে ঘুরতেই শিখবে। শোন সাধুর কথা—

চলতা সাধু অওর বহতা পানী।

সাধুরও চলা থামে না, জলেরও প্রবাহ বন্ধ হয় না। জলের কলনাদিনী অশ্রান্ত গতি বন্ধ হয় কখন্? না, যখন গিয়ে অনন্ত সাগরে মেশে, যখন নিস্তরঙ্গ মহাম্বুধিতে মিলিত হয়ে যায়। মহাসাগরের সঙ্গে একপ্রাণ হয়ে নিজেকে ভুলে যায়, সমুদ্রের শান্তিতে তার শান্তি, সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গে তার আনন্দ, সমুদ্রের দিগন্তব্যাপী—আকাশব্যাপী সাম-গানে তার কলকণ্ঠ মিশে যায়। সাধুরও পর্য্যটন শেষ হয়— যখন সে অনন্ত ব্রহ্মকে ধ্যানে ধারণা করে, অনন্তে লীন হয়; যখন চঞ্চলতার পরিবর্ত্তে স্থিরতা, অশান্তির পরিবর্ত্তে শান্তি আসে। চলতা সাধু তব ঠহর যাতা হয়।

গোবর্দ্ধন থেকে আমরা ভরতপুরের অভিমুখে যাত্রা করলাম। ভরতপুরের কাছাকাছি এক জন প্রসিদ্ধ পরমহংস থাকতেন, বালানন্দ স্বামীর ইচ্ছা, তাঁকে দর্শন করেন। সেখান থেকে কুরুক্ষেত্র হয়ে হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমনঝোলায় আমাদের যাবার কথা।

সারা দিন হেঁটে সন্ধ্যার সময় আমরা একটা মস্ত বাড়ী দেখতে পেলাম। নিকটে কোন গ্রাম কিম্বা লোকালয় নেই। পথের পরিশ্রমে আমরা শ্রান্ত হয়েছিলাম। স্বামীজী বললেন, এ বাড়ীতে লোকজনও দেখতে পাচ্ছি নে। চল, দেখা যাক, যদি পারি ত এখানেই রাত কাটানো যাবে।

বাড়ীর বাইরে কিছু দূরে একটি ছোট কুঁড়ে-ঘরে একটি বৃদ্ধ লোক আর তার বৃদ্ধা স্ত্রী বাস করে। আমরা তাদের কাছে গেলাম। বৃদ্ধ লোকটিকে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, এই বড় বাড়ীতে কেউ আছে?

বৃদ্ধ বললে, না, মহারাজ, বাড়ী প'ড়ে আছে, কেউ থাকে না।

—আমরা এখানে রাত্রিবাস করতে পারি?

—স্বচ্ছন্দে। বারণ করবার কেউ ত নেই।

বৃদ্ধা সেইখানে দাঁড়িয়ে ছিল। কি একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল। তার পর বললে, বাড়ীর ভিতর বড় অন্ধকার, তোমাদের একটা আলো দি।

কুটীরের ভিতর থেকে বুড়ী একটা কেরোসিন তেলের টিনের আলো নিয়ে এল, বললে, এতে আমি আজই তেল পূরে দিয়েছি, সমস্ত রাত জ্বলবে।

আলো আমি হাতে নিয়ে আগে চললাম। বৃদ্ধ কুটীর থেকে একগাদা খড় নিয়ে এল, বললে, তোমরা রাত্রে পেতে শোবে। আহারের জন্য কিছু আনব?

স্বামীজী বললেন, পথে আমরা আহার করেছি, এখন আর কিছু খাব না।

কয়েকটা সিঁড়ি উঠে বাড়ীর প্রকাণ্ড দরজা। দরজা চেপে ভেজান ছিল। বৃদ্ধ দরজার সামনে খড়ের গাদা নামিয়ে কিছু না ব'লে চ'লে গেল।

এক হাতে আমার আলো, এক হাত দিয়ে ঠেলে দরজা খুলতে পারলাম না। স্বামীজী বললেন, আমি খুলচি।

তিনি বলবান্, জোরে ঠেলে দরজা খুললেন। খুলতে পুরানো কলকব্জার শব্দ হ'ল, ভিতরে প্রতিধ্বনি হ'ল। দরজা খুলতেই কয়েকটা বাদুড় উড়ে বেরিয়ে গেল।

ভিতরে ঢুকে দেখি, মস্ত দরাজ ঘর, মাথার উপর ছাদ খুব উঁচু। একটু শব্দ হলেই চারিদিকে প্রতিধ্বনি হয়।

স্বামীজী দরজা ভেজিয়ে দিলেন। প্যারীর মাসী ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এ-দিক ও-দিক চেয়ে বললে, আমার কেমন গা ছম-ছম করচে!

স্বামীজী বললেন, ভয় করচে? তোমার ত কিছুতে ভয় করে না।

—ভয় আবার কিসের? সমস্ত রাত্রি শ্মশানে একা কাটিয়েচি, কোন ভয় হয় নি! এ বাড়ীতে যেন কেমন কেমন মনে হচ্চে।

—রাত্রিবেলা পুরানো পড়ো-বাড়ীতে ও-রকম হয়। এ ঘরটা বড্ড বড়, এস, আমরা আর একটা ঘর দেখি।

সেই ঘরের পাশে আর একটা মাঝারি রকমের ঘর ছিল, সেইখানে খড় পেতে আমরা শয়ন করলাম। স্বামীজী আর আমি পাশাপাশি, প্যারীর মাসী একটু দূরে। আলো প্যারীর মাসীর কাছে কোণে রাখা রইল।

কাজরী

বসুমতী-চিত্রবিভাগ]

[শিল্পী—শ্রীবীরেন্দ্রলাল ভৌমিক

৮
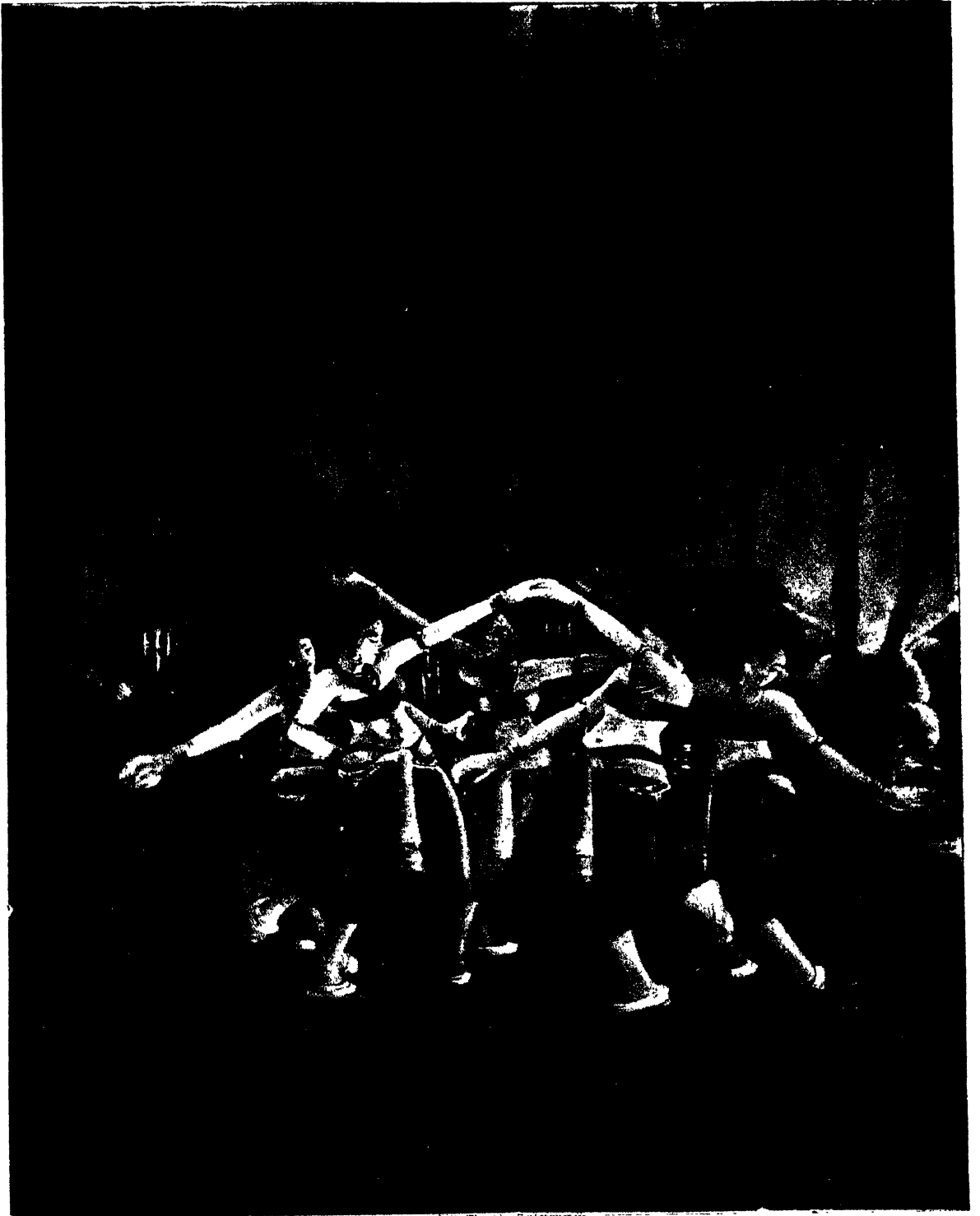
গভীর রাত্রে যেন কার গলার শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলে দেখি, প্যারীর মাসী আপনার মনে কি বলচে। পাশ ফিরে দেখি, বালানন্দ স্বামীও জেগে রয়েচেন, এক-দৃষ্টে প্যারীর মাসীর দিকে চেয়ে রয়েচেন। আমাকে দেখে ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে আমাকে চুপ ক'রে থাকতে ইঙ্গিত করলেন।

প্যারীর মাসী কি ঘুমের ঘোরে কথা কইচে? তার চোখ খোলা, কিন্তু আমাদের দিকে দৃষ্টি নেই, ঘরের ভেজানো দরজার দিকে চেয়ে কথা কইচে। কথায় কোন রকম জড়তা নেই, সব কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্চে, কিন্তু কথার ভাবে এক রকমের ব্যগ্রতা, কোন অভূতপূর্ব্ব ঘটনা দেখে কথায় যেমন বিস্ময়ের ভাব আসে—সেই রকম।

প্যারীর মাসী বলছিল, এই ত এত সব লোক গেল, এরা আবার কারা? কি রকম সব পোষাক পরেচে? এদের আগে আগে ও কে আস্‌চে? রাজপুত্তুর না কি? কার্ত্তিকের মত দেখতে, মাথার পাগড়ীতে হীরা জ্বলচে, গায়ের পোষাক ঝক্‌মক্ করচে! কোমরে বাঁধা তলোয়ার, তার মুঠোয় হাত দিয়ে মাথা উঁচু ক'রে আসচে, আর সকলে তাকে মাথা নীচু ক'রে দু'হাতে সেলাম করচে। কি একটা কথা বললে, আমি ওদের কথা বুঝতে পারি নে।—এ আবার কোথায় এল, এ ঘর ত কখনো দেখি নি। ঘরের মাঝখানে হাঁটু গেড়ে গালচের উপর ব'সে সেই লোকটা না? দুই পাশে দাঁড়িয়ে এরা সব কে?

এ আবার কাকে নিয়ে এল? দুই হাত বাঁধা, দুই দিকে দুটো যমদূতের মত মিন্‌ষে দাঁড়িয়ে! ও কি করেচে যে, ওকে চোরের মত বেঁধে এনেচে? তবু ভয় কিচ্ছু নেই, চোখ দুটো যেন জ্বলচে! যে ব'সে আছে, সে রেগে-মেগে কি বলচে? হাত বাঁধা থাকলে কি হয়, ও ভয় পাবার মানুষ নয়। বাঁধা হাত নেড়ে জোরে জোরে কেমন জবাব দিচ্চে! যে ব'সে রয়েচে, সে তলোয়ার কোমর থেকে টানচে—কেটে ফেলবে না কি? না, তলোয়ারের খাপ দিয়ে ধাঁ ক'রে ওর গালে মারলে। বাপ রে! কি তেজ! বাঁধা হাত দিয়েই খপ ক'রে খাপখানা কেড়ে নিলে—তুলে মারে আর কি, আর অমনি সেই দুটো যমদূতের মত লোক তার হাত ধ'রে মুচড়ে খাপ-খানা কেড়ে নিলে। যে বসেছিল, সে লাফিয়ে উঠে চীৎকার ক'রে কি বললে, হাত বাড়িয়ে কোথায় দেখিয়ে দিলে। ওকে ধ'রে কোথায় নিয়ে যাচ্চে? যাই, গিয়ে দেখি!

* * * *

প্যারীর মাসী ধড়মড় ক'রে উঠে বসল। ঘর থেকে কোথাও বেরিয়ে না যায় ভেবে আমি উঠতে গেলাম, বালানন্দ স্বামী আমার গায়ে হাত দিয়ে নিষেধ করলেন। আমরা দুই জনেই ত জেগে রয়েচি, আবশ্যক হয়, তখন প্যারীর মাসীকে আটকান যাবে। প্যারীর মাসী উঠে দাঁড়াল না। মুখ আমাদের দিকে, কিন্তু দৃষ্টি স্থির, যেন কোথায় কত দূরে কি দেখচে। জাগন্ত মানুষের এ রকম চাউনি কখন দেখা যায় না। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে আবার কথা আরম্ভ হ'ল।

—ভোর বেলা সব কোথায় চলেচে? সেই হাত-বাঁধা মানুষ, দশ বারো জন লোক তাকে ঘিরে নিয়ে যাচ্চে, আর তাদের পিছনে ঘোড়ায় চ'ড়ে তলোয়ার-বাঁধা জাঁকালো পাগড়ী-বাঁধা সেই লোক। চড়াইয়ের পথ, কেবল পাথর আর নুড়ি, আমার পায়ে লাগচে, উঠতে হাঁপ ধরচে!

আমরা অবাক্ হয়ে দেখলাম, পাহাড়ে উঠতে মানুষ যেমন হাঁপায়, প্যারীর মাসী সেই রকম হাঁপাচ্চে। একটু পরে সেটা বন্ধ হ'ল, আবার কথা কইতে লাগল।

—এখানটা বুঝি পাহাড়ের উপর? জমী সমান, আর চড়াই নেই। ঐ যে ও-ধারে সূয্যি উঠচে, কিসের উপর আলো চিকচিক করচে? ও মা! ঐ যে নদী, ঠিক পাহাড়ের নীচে দিয়ে গিয়েচে। এমন যায়গায় এরা কি করতে এসেচে? পাহাড়ের পাশ দিয়ে নেমে যাবার ত পথ নেই, তবে এখানে কেন?—সকলে দাঁড়িয়েচে, ঘোড়সোয়ার ঘোড়া থেকে নেমেচে। পাহাড়ের খানিকটা সরু হয়ে নদীর উপর ঝুঁকে আছে—কি সর্ব্বনাশ! ওর উপর সব যাচ্চে কেন?—না, সকলে ত নয়, যার হাত-বাঁধা আর সেই দুটো ষণ্ডা মিন্‌ষে আর তাদের পিছনে পাগধারী!

যার মাথায় পাগড়ী বাঁধা, সে কি বললে, আর অমনি সেই দুটো লোক হাত-বাঁধা লোকটার হাত খুলে দিলে। তার পর সেই পাগড়ী মাথায় লোকটা দুই হাত দিয়ে নীচে দেখিয়ে দিলে, কয়েদীকে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দিতে বললে। অমন যে সুন্দর মুখ—ঠিক পিশাচের মত দেখাচ্চে! যেই বলা আর যাকে ফেলে দেবে, সে হাত ছিনিয়ে নিয়ে এক লাফে পাগড়ী-বাঁধা লোকটাকে আঁকড়ে ধ'রে পাহাড়ের ধার থেকে নীচে

ঝাঁফিয়ে পড়ল। একটা বিকট চীৎকার আর সেই সঙ্গে একটা বিকট হাসি !—ঘুরতে—ঘুরতে—ঘুরতে—নীচে—নীচে—নীচে—

*   *   *   *

প্যারীর মাসী কয়েকবার শিউরে শিউরে উঠল, তার পর খানিকক্ষণ স্থির হয়ে রইল। আবার তার কথা বেরুল।

—এক ঘর মেয়েমানুষ! এরা কোন্ দেশের মেয়ে সব? সব ঘাগরা-পরা, গায়ে হীরা-মুক্তার গয়না। ঘরের চারি-পাশে ব'সে আছে, কেউ পান খাচ্চে, কেউ আলবোলায় তামাক টানচে। খোট্টা মেয়েদের মতন এরা তামাক খায়। ঘরের মাঝখানে চার পাঁচ জন আলাদা ব'সে আছে, এরা কারা? ওঃ, এরা বাঈজী, বাঈনাচ হবে। এক জন উঠে নাচচে আর দু'জন সারিঙ্গী বাজাচ্চে, আর এক জন বাঁয়া-তবলা বাজাচ্চে, বাঃ, বেশ নাচ, ঠমকে ঠমকে, ভুরু নাচিয়ে, পায়ের ঘুঙুরে তাল?

ঐ দরজার পাশে যে মেয়েটি ব'সে আছে, সে ত নাচ দেখচে না। এরা ত সব সুন্দরী, কিন্তু এর মতন সুন্দরী কেউ নেই। ওর মন যেন আর কোন দিকে রয়েচে। চোখের কি রকম চঞ্চল দৃষ্টি, কেমন যেন উসখুস করচে, কেউ না টের পায়, এই ভাবে দরজার দিকে একটু একটু ক'রে স'রে যাচ্চে।

নাচ বন্ধ ক'রে বাঈজীরা গান ধরেছে। গান যেই বেশ জমেচে, অমনি সে মেয়েটি কাউকে কিছু না ব'লে উঠে গেল। পায়ে নূপুর নেই, হাতের গয়না হাতে উপরে টেনে চাপা, কোন শব্দ নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে দেওয়ালের পাশ দিয়ে ছায়ার মত চলেচে, মাটীতে পা পড়ে কি পড়ে না। ছায়া—ছায়া—ছায়া—

একটা ছোট দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। দরজায় চাবি দেওয়া, মেয়েটির হাতে চাবি ছিল, দরজা খুলতেই আর একটি ছায়া ভিতরে এল, দুটি ছায়া মিশে গেল। দরজার কাছে একটা ধাপ ছিল, দুই জনে তার উপর বসল। দূর থেকে গানের সুর আসচে।

হঠাৎ দু'জনের গায়ে কোত্থেকে আলো পড়ল! দু'জনে ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল—দু'জনের মুখের উপর আলো—রতিকান্ত—

কালো জামা-আঁটা একটা হাত আলোতে এল, মানুষ অন্ধকারে। হাতের ছুরী হাতে চকমক ক'রে উঠল, মেয়েটির কাছে যে সুন্দর যুবা দাঁড়িয়ে ছিল, তার বুকে ব'সে গেল। একবার অল্প যন্ত্রণার শব্দ, তার পর সে প'ড়ে গেল। মেয়েটি আর্ত্তনাদ ক'রে তার বুকের উপর পড়ল।

ছুরী আবার উঠল, আবার পড়ল, এবার মেয়েটি একবার কাতরোক্তি ক'রে উঠল। আলো দু একবার তাদের দু'জনের সর্ব্বাঙ্গে পড়ল—সব স্থির—রক্ত মাটীতে ব'য়ে যাচ্চে—আলো নিভে গেল—আবার অন্য দুটো ছায়া অন্ধকারে মিলিয়ে গেল—

গানের আওয়াজ এখনো শোনা যাচ্চে, ঘরের ভিতর আলোয় আলো, চারিদিকে হাসি-তামাসা, আর এখানে—এই অন্ধকারে—

*   *   *   *   *

কথা বন্ধ হয়ে গেল। প্যারীর মাসী আস্তে আস্তে শুয়ে তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়ল। বালানন্দ স্বামী আমার কাণে কাণে অত্যন্ত লঘু স্বরে বললেন, তুমি যা শুনলে, প্যারীর মাসীকে কিছু বলো না।

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম।

৬

সকালে উঠে বাড়ীর পিছনে একটা পুষ্করিণী ছিল, তাতে আমরা স্নান করলাম। প্রাতঃকৃত্য সমাপন ক'রে স্বামীজী সেই বুড়ো মানুষটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কাছাকাছি কোন গ্রাম কি সহর আছে?

—আধ ক্রোশ দূরে একটা ছোট গ্রাম আছে। সহর অনেক দূর।

প্যারীর মাসী স্নান আহ্নিক ক'রে দাঁড়িয়েছিল। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, রাত্রে ঘুম হয়েছিল কেমন?

হেসে প্যারীর মাসী বললে, বেশ ঘুম হয়েছিল।

—আমরা কি এখনি বেরিয়ে পড়ব, না এখান থেকে খাওয়া-দাওয়া ক'রে যাব?

—বাবাঠাকুর, কাল রাত্রে তোমাদের খাওয়া হয় নি, এখান থেকে খেয়ে গেলে ভাল হয়। কিন্তু এখানে জিনিষ-পত্র ত কিছু নেই।

—কাছেই গ্রাম আছে, আমরা সব নিয়ে আসচি! তুমি ততক্ষণ এদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও।

—বেশ, তোমরা বাজার ক'রে এস।

পথে যেতে যেতে স্বামীজী বললেন, দেখলে, কাল রাত্রে প্যারীর মাসী যে সব কথা বলছিল, ওর কিছু মনে নেই। তুমি কিছু বুঝতে পারলে?

—না, মহারাজ, কিছুই বুঝতে পারিনি। কিন্তু আমার মনে হ'ল, ও সব ভয়ানক ঘটনা সত্য, অতীতের ছায়া ঘুমন্ত অবস্থায় প্যারীর মাসীর মনে পড়েছিল।

—সত্য কথা, আর এই বাড়ীর সঙ্গে ওই দুটা ভীষণ ঘটনার সম্বন্ধ আছে। প্যারীর মাসী একটু যেন কি রকম কি রকম, সে কথা তোমাকে বলেচি। এটা কিন্তু নতুন। ঘুমের ঘোরে ওকে কথনো কথনো কথা কইতে শুনেছি, কিন্তু এ রকম নয়। স্বপ্নের কিছু না কিছু মনে থাকে, প্যারীর মাসীর কিছুই মনে নেই। এ এক রকম আবেশ। ভূত-প্রেত নয়, ওর একটা কোন শক্তি আছে, যা ও জানে না, আমরাও বুঝতে পারিনে।

গ্রামে গিয়ে আমরা প্রথমে হাটে গেলাম না। এক জন আধা-বয়সী লোককে দেখে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, এ গ্রামে কোন অতি-বৃদ্ধ লোক আছে?

—হাঁ, বাবাজী! ঐ সামনের বাড়ীতে ত্রিলোচন দাস আছেন, লোকে বলে, তাঁর বয়স একশো বছর হয়েছে।

আমরা সেই বাড়ীতে গেলাম। ছোট পরিষ্কার খোলার ঘর, দাওয়ায় কম্বলের উপর ব'সে শীর্ণ-দেহ, স্থবির পুরুষ। চুল, ভুরু, গোঁফ-দাড়ী সব সাদা, কিন্তু চক্ষু নির্ম্মল। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আজ আমার কি সৌভাগ্য! প্রাতঃকালে সাধু-দর্শন!

স্বামীজী বললেন, আপনাকে আমরা কিছু জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

—সেও আমার সৌভাগ্য। বলুন।

আমরা ত্রিলোচন দাসের পাশে বসলাম। স্বামীজী বললেন, এখান থেকে পশ্চিমে কিছু দূরে একটা পুরাতন বড় বাড়ী আছে। সে বাড়ীর ইতিহাস আপনি জানেন?

—জানি।

প্যারীর মাসী স্বপ্নে কি আর কোন অবস্থায় যেমন দেখেছিল, স্বামীজী সংক্ষেপে সেই সকল কথা বললেন। তার পর জিজ্ঞাসা করলেন, এই সব ঘটনা কি সত্য? সেই বাড়ীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আছে?

—ঘটনা সত্য, আর ঐ বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধও আছে, কিন্তু আপনি জানলেন কেমন ক'রে? তবে আপনারা সর্ব্বদর্শী, আপনাদের কাছে ভূত ও বর্ত্তমান সমান।

—যদি পূর্ব্বের কথা আমাদের বলেন, তা হ'লে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত হয়।

বৃদ্ধ বললেন, মোগলের রাজ্যকালে ঐ বাড়ীতে কোন ধনী মোগল বাস করত। কয়েক পুরুষ কাটায়। সকলেই দেখতে সুপুরুষ, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত ও ঘোর অত্যাচারী। দুই ঘটনাই ঐ বাড়ী-সংক্রান্ত। কিছু দূরে একটা ছোট পাহাড় ও নদী আছে।

গ্রাম থেকে চাল, মুগের ডাল, ঘি, গোটাকতক আলু আর থানকতক কাঠ নিয়ে আসা গেল। সেই সঙ্গে একটা নতুন হাঁড়ি। দেখে প্যারীর মাসী বললে, ভাতে-ভাত হবে?

স্বামীজী বললেন, যাকে বলে ঘৃতপক্ক, তাকেই বলে ভাতে-ভাত।

ভরতপুরের কাছে এসে আমরা শুনলাম, পরমহংস কোথায় পরিব্রজ্যা করতে গিয়েছেন, মাসকতক ফিরবেন না। সেখান থেকে আমরা কুরুক্ষেত্রে গেলাম। কুরুক্ষেত্রে মেলায় বিস্তর লোকের সমাগম, আমরা একটা বাসা দেখে নিয়ে জনতার ভিতর ঘুরে বেড়ালাম। এক যায়গায় দেখি, একটা গাছতলায় তিন জন সাধু ব'সে মাথা হেঁট ক'রে কি করছে। তাদের মাথা-মুখ কামানো, কৌপীন-আঁটা, গায়ে এক একখানা কম্বল। দেখি, তারা কোমর থেকে গেঁজে খুলে হাতে টাকা-পয়সা ঢেলে গুণছে। বালানন্দ স্বামী একটু হেসে বললেন,—

শির মুণ্ডিদে তুণ্ড মুণ্ডিদে চিত্ত ন মুণ্ডিদে কীশ মুণ্ডিদে। *

কুরুক্ষেত্রে এক রাত্রি কাটিয়ে আমরা হিমাচলের অভিমুখে যাত্রা করলাম। পাহাড়ের পথে বেশী লোক চলে না, অনেক দূরে দূরে ছোট ছোট গ্রাম। বড় বড় দেবদারু-গাছ উদ্ধশির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের ফুলের রেণুতে পাহাড়ের সরু পথ ছেয়ে ফেলেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খড, নীচে চেয়ে দেখলে মাথা ঘুরে আসে। কোথাও বড় বড় ঝরণা, ঝর্ ঝর্ শব্দে

---

* মুণ্ডিত শির, মুণ্ডিত মুখ, চিত্ত মুণ্ডিত না হইলে কি মুণ্ডিত হইল?—মৃচ্ছকটিক।

খড বেয়ে নীচে চ'লে যাচ্ছে। চারিদিকে মৌন প্রকৃতি, বিশাল স্তব্ধতা সমস্ত আচ্ছন্ন ক'রে রয়েছে।

এক একবার আমি প্যারীর মাসীর দিকে চেয়ে দেখছিলাম। তার মুখে কোন কথা নেই, চক্ষুর উপর যেন একটা আবরণ নেমে তার বহির্দৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে অন্তর্দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়েছে। কখন কখন উপরের দিকে চেয়ে দেখে, আবার যেন তার চোখের উপর একটা পর্দ্দা পড়ে। পাহাড়ের গম্ভীর সৌন্দর্য্যে আমার চিত্ত অভিভূত হয়েছিল। পুরাকালে মুনি-ঋষি-তপস্বীরা এই সব স্থানে কি কারণে সাধনা করতে আসতেন, তা ত সহজেই বুঝতে পারা যায়। কোথায় প'ড়ে থাকে সংসারের কলকোলাহল, সহস্র রকমের ক্ষুদ্রতা! এখানে বিরাটের ব্যাপ্তি, নভঃস্পর্শী উন্নত মস্তক-বিশালতা, ধ্যান-মগ্নতার নিস্পন্দ স্থিরতা।

সন্ধ্যার সময় আমরা পথের পাশে একটি ভাঙ্গা কুড়ে-ঘর দেখতে পেলাম। হয় ত কোন সাধু কোন কালে সেখানে বাস করত।

গ্রাম কাছাকাছি কোথাও আছে কি না, আমরা জানি নে, এ-দিকে অন্ধকার হয়ে এল। স্বামীজী বললেন, রাত্রে এ পথে চলা যুক্তিযুক্ত নয়। পাহাড়ের পথ, পাশেই খড, দেখে শুনে চলা উচিত। অন্য আশঙ্কাও থাকতে পারে। আজ এইখানে রাত্রিবাস করা যাক।

পাহাড়ে শীত বেশী জেনে মেলা থেকে আমরা খানকতক কম্বল কিনে নিয়েছিলাম। প্যারীর মাসীর সেই রকম অবস্থা দেখে পর্য্যন্ত স্বামীজী আমাকে ব'লে দিয়েছিলেন, রাত্রে কখনো অন্ধকারে শোয়া হবে না, কি জানি, ও যদি কোথাও উঠে যায়। একটা টিনের আলোতে তেল পোরা আর দেশলাইয়ের বাক্স আমার কাছে থাকত।

কুটীরের ভিতর কাঁধের কম্বল নামান গেল। স্বামীজী বললেন, এইবার আগুন জালতে হবে, বেশী রাত্রে ভালুক আসতে পারে। আগুন জালা থাকলে কিছুই আসবে না।

আমি বললাম, এখানে কাঠ পাওয়া যাবে কোথায়?

প্যারীর মাসী বললে, বাঁশবনে ডোম-কাণা! চার ধারে গাছ, কাঠ নেই?

—ও যে কাঁচা কাঠ।

—তুমি বুঝি এই জান? দেবদারু-গাছের কাঁচা ডালে মশাল হয়, জান না? কতকগুলো ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এস।

আলো জালিয়ে রেখে আমি কাঠ আনতে গেলাম। সরু মাঝারি ডাল ভেঙ্গে এক পাঁজা এনে দেখি, স্বামীজী আর প্যারীর মাসী পাহাড়ের আর গাছের গা থেকে মখমলের মত নরম নরম পুরু পুরু এক রকম শেওলা তুলচেন। স্বামীজী বললেন, একে পাথর, তায় আবার কনকনে ঠাণ্ডা। আমাদের যে গদি হবে, তা রাজাদেরও জোটে না।

পুরু ক'রে শেওলার বিছানা পেতে ঘরের দোর-গোড়ায় আমরা আগুন জাললাম। দেবদারু-কাঠের নির্য্যাস ঘৃতের মত জ্বলে। আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠল। বাকি ডালপালা ভিতরে রইল।

সঙ্গে কিছু খাবার ছিল, খেয়ে ঝরণার জল পান করা গেল। দিব্য নরম শয্যা, পাহাড়ে সারাদিন হাঁটার শ্রান্তি, বেশ শীত, কম্বল মুড়ি দিয়ে আমাদের ঘুমিয়ে পড়তে বিলম্ব হ'ল না।

৭

আবার সেই রকম! প্যারীর মাসীর কথার সাড়ায় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে আপনার মনে কথা কইচে। বালানন্দ স্বামী ঘুমিয়েছিলেন, কিন্তু আমি যেই চোখ খুলেছি, অমনি তিনিও জেগে উঠলেন। আমরা হু'জনে চুপ ক'রে প্যারীর মাসীর কথা শুনতে লাগলাম।

সে বলছিল, ঐ দেখেছ গাছতলায় কে ব'সে রয়েছে! নড়ন-চড়ন নেই, একেবারে স্থির। মুনি-ঋষি কেউ হবে, ব'সে চোখ বুজে ধ্যান করছেন। গা থেকে তেজ ফুটে বেরুচ্চে। কোথাও কিছু শব্দ নেই, চারিদিক একেবারে স্তব্ধ। জন-মনুষ্য নেই, গাছে একটা পাখী পর্য্যন্ত নেই। কেবল বন—বন—বন—গাছের ছায়ায় যেন দিনের বেলাও অন্ধকার ক'রে রয়েচে—

বনের ভিতর দিয়ে ও দুটো কি আসচে? ভালুক না কি? আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে গুঁড়ি মেরে আসচে। জন্তু নয় ত মানুষ, এইবার উঠে দাঁড়িয়েচে, সাবধানে উঁকি মেরে এ-দিকে ও-দিকে দেখচে। দু'পা এগোয়, আবার দাঁড়ায়, আর চোখগুলো যেন ভাটার মতন ঘুরচে। ধীরে ধীরে, থেমে থেমে, একটুও শব্দ না ক'রে আসচে—আসচে—আসচে—

মুনিকে দেখে থমকে দাঁড়াল। একবার দু'জনে মুখ-চাওয়াচাওয়ি ক'রে, যিনি ধ্যানে ব'সে আছেন, তাঁর পাশ-কাটিয়ে

আর এক দিকে গেল। তিনি যেমন ব'সে ছিলেন, তেমনি বসে আছেন—চোখ বোজা, মাথা সোজা, অঙ্গের গৌরকান্তি থেকে জ্যোতি বেরুচ্চে—একেবারে স্থির, নিশ্বাস পড়চে কি না, বুঝতে পারা যায় না।

তিনি যেখানে ব'সে আছেন, তার পিছনে কিছু দূরে একটা গুহা। গুহার মুখের কাছে একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে এক একবার উঁকি মারচে—ও কে?

মেয়েমানুষ! পরমা সুন্দরী, বয়স অল্প। ওর এত ভয় কিসের? ভয়ে চোখ যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসচে, মুখ শুকিয়ে গিয়েচে, এক একবার হাঁপাচ্চে, গা ঠক-ঠক ক'রে কাঁপচে। গুহার ভিতর কোন জন্তু-জানোয়ার নেই ত? তা হ'লে ওখান থেকে পালিয়ে আসচে না কেন?

আর ঐ দু'জন লোক অমন ক'রে যাচ্চে কেন? ওরাও কি ভয় পেয়েচে? কৈ, ওদের মুখে ত ভয়ের কোন চিহ্ন নেই। কেবল সাবধান—সাবধান—সাবধান! ওদের পিছনে কি লোক লেগেচে? তা হ'লে এমন ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে কেন? ওরা যেন চোরের মতন উটকে পাটকে কি খুঁজচে—

ঐ গো! ওরা মেয়েটিকে দেখতে পেয়েচে, পেয়েই একেবারে সেই দিকে ছুটেচে!

তারা ছুটে আসচে দেখে মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল। শুদ্ধতার বুকে যেন ছুরী বিঁধে গেল। গুহার ভিতর পাহাড়ের গায় গায় চারিদিকে প্রতিধ্বনি হ'তে লাগল। সে শব্দে যোগীর ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল, তিনি চোখ মেলে উঠে দাঁড়ালেন। স্ত্রীলোকটি পাগলের মত ছুটে এসে যোগীর পা আঁকড়ে ধ'রে বলচে, রক্ষা করুন—রক্ষা করুন!

তিনি আস্তে আস্তে পা ছাড়িয়ে নিয়ে, যুবতীর মাথায় হাত দিয়ে তাকে অভয় দিলেন।

সে দু'জনও এসে উপস্থিত হ'ল। তারা একেবারে স্ত্রীলোকটিকে ধরতে যায়, যোগী হাত বাড়িয়ে তাদের নিষেধ করলেন। তারা রেগে মেগে তাঁকে ধাক্কা মেরে যেই ফেলে দিতে যাবে, আর অমনি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে তাদের আর পা এগোল না।

যোগী যেমন হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই রকম দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চক্ষু সেই দুই জন লোকের মুখের দিকে। তারা তাঁর চোখের দিকে চেয়ে রইল, আর চোখ ফিরাতে পারল না।

দেখ, দেখ, যোগীর চক্ষু দেখ! চোখ থেকে যেন আগুনের হল্‌কা ছুটচে। মহাদেবের ললাট-নেত্র না কি? এরা কি ভস্ম হয়ে যাবে? চোখের কি জ্যোতি! কি দহন-জ্বালা! স্ফুলিঙ্গের পর স্ফুলিঙ্গ, অনল-স্রোতের পর স্রোত—

সে দু'জন লোক ঠিক পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে, মুখে একটি কথা নেই, একটি পা চলবার শক্তি নেই—একেবারে আড়ষ্ট, নিস্পন্দ, চোখের পাতা পর্য্যন্ত পড়চে না।

যোগী একবার হাত তুলিয়ে আঙ্গুল দিয়ে নীচের দিকে দেখালেন। চক্ষুর দৃষ্টি সহজ হয়ে এল, বল্‌লেন, তোমরা চ'লে যাও, আর কখনো এখানে এস না।

তখন তাদের হাত-পায়ে সাড় হ'ল, শুকনো মুখে কাঁপতে কাঁপতে, কুকুরের মত ল্যাজ গুটিয়ে চ'লে গেল।

এতক্ষণ মেয়েটি চুপ ক'রে এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। যোগী তার দিকে কোমল দৃষ্টিতে চেয়ে কোমল স্বরে বল্‌লেন, মা, তুমি কোথায় যাবে?

যুবতী কেঁদে ফেল্‌লে, বল্‌লে, সংসারে আমি আর ফিরে যাব না। আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন, আপনি আমাকে আশ্রয় দিন।

যোগী বল্‌লেন, এখানে ত থাকবার স্থান নেই। গুহার মধ্যে তুমি কেমন ক'রে বাস করবে? আমি তপস্বী, তুমি যুবতী রমণী, তুমি এখানে থাকলে আমার সাধনার বিঘ্ন হ'তে পারে।

—তপোবনে কি ঋষিকন্যারা থাকতেন না? তাতে কি ঋষিদের তপস্যার কোন বিঘ্ন হ'ত? আমি সংসার থেকে এসেচি, আমার চিত্ত মলিন, কিন্তু আপনার কৃপা হ'লে আমারও চিত্তশুদ্ধি হ'তে পারে।

তপস্বী একটু চুপ ক'রে রইলেন, তার পর বল্‌লেন, আমার সাধনা এখনো পূর্ণ হয়নি। আর কাউকে শিক্ষা দেবার সময় এখনো হয়নি। এখান থেকে কিছু দূরে জনকতক তপস্বিনী থাকেন, তুমি তাঁদের কাছে থাকতে পার। এখন তাঁদের কাছে শিক্ষা কর, এর পর আবশ্যক হয়, আমার কাছেও শিখবে।

—আপনার যেমন আজ্ঞা।

* * * *

এই দু'জন তপস্বিনী আসছেন। গেরুয়া পরা শীর্ণ মূর্ত্তি, বেশ লম্বা, শান্ত স্থির চাউনি। এসে দুই জনে তপস্বীকে

প্রণাম করলেন। তিনি যুবতীকে দেখিয়ে বললেন, একে তোমরা নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রাখ।

তাঁরা যুবতীকে দেখে একটু আশ্চর্য্য হ'লেন, কিন্তু কোন কথা কইলেন না। এক জন এগিয়ে যুবতীর হাত ধরলেন, বললেন, চল, বোন্, অশান্তি থেকে শান্তিতে চল।

*   *   *   *

আর কোন কথা শোনা গেল না। প্যারীর মাসী পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘরের দোর-গোড়ায় আগুন প্রায় নিভে গিয়েছিল, ঘরের পিছন দিকে কিসের শব্দ? ঘরের পিছন দিকে কিসে যেন আঁচড়াচ্ছে। বালানন্দ স্বামী উঠে ব'সে চুপি চুপি বললেন, ভালুক। এই ব'লে তিনি তাড়াতাড়ি উঠে কতকগুলা কাঠ আগুনের উপর দিলেন। আমিও উঠে দরজা-গোড়ায় এসে দাঁড়ালাম। কাঠ হু হু ক'রে জ্ব'লে উঠল, চারিদিকে আলো হ'ল। সেই আলোয় আমরা দেখতে পেলাম, একটা ভালুক পালিয়ে গেল।

প্যারীর মাসীর ঘুম ভাঙ্গেনি।

সকালবেলা উঠে ঝরণার জলে মুখ-হাত ধুয়ে বালানন্দ স্বামী আর আমি একবার সামনের বনে গেলাম। প্যারীর মাসী নীচে ঝরণার কাছে নেমে গিয়েছিল। আমরা দেখলাম, পাহাড়ের গায়ে একটা বড় গুহা রয়েছে। বালানন্দ স্বামী আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ঐ দেখ। প্যারীর মাসী নিজে জানে না যে, সে জাতিস্মর। জাগ্রত অবস্থায় সে ভাব হয় না, কিন্তু ঘুমুলে পর অতীত তা'র কাছে বর্ত্তমানের মতন দেখায়। আবার দেখেছ স্থানের গুণ? সব যায়গায়, কি সব রাত্রে এ রকম তা'র হয় না।

প্যারীর মাসীর কোন কথাই মনে ছিল না, আমরাও কিছু উচ্চবাচ্য করলাম না।

৮

হরিদ্বারে, মনে হয় বটে যে, ব্রহ্মলোক থেকে অলকানন্দা মর্ত্ত্য-লোকে অবতীর্ণা হয়েছেন। দিবানিশি জলপ্রপাতের ন্যায় শব্দ ঘোর ঘর-ঘর রবে উপলখণ্ডে জলমগ্ন প্রস্তরে আহত-প্রতিহত হয়ে দেবী ভাগীরথী মুক্তবেণী হয়ে চঞ্চল গতিতে তরঙ্গলীলায় সাগর-সঙ্গমে চলেচেন। এ স্রোতের মুখে ঐরাবত ভেসে যাবে, তা'তে আর বিচিত্র কি! অবিরাম বেগ, অজস্র প্রবাহ, দূর-সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, দিক্-পরিপূরিত ধ্বনি! ছল ছল, ঝর ঝর, তর তর রবে গৌরী-পর্ব্বতের তলদেশ দিয়ে জহ্নু-কন্যা কোন দিকে দৃকপাত না ক'রে অনন্তের উদ্দেশে যাত্রা করেচেন।

ব্রহ্মকুণ্ডে পাণ্ডারা যাত্রীদের ছাঁকা-বাঁকা ক'রে ধরেচে, ঠিক যেন মিঠাইয়ের উপরে মাছি ঘিরেচে। আমাদের কে পুছে? গৈরিক বস্ত্র ধারণ করলেই মার্কামারা দেউলে, না তার চোর-ডাকাতের ভয়, না তার উপর পাণ্ডার পীড়ন। গয়ালী, প্রয়াগওয়ালা পাণ্ডা তার দিকে ফিরেই চায় না।

হরিদ্বারে কেউ বড় একটা ত্রিরাত্রি বাস করে না। আমরা দু'দিন থেকেই চ'লে গেলাম।

চলতা সাধুর চলা আর বন্ধ হয় না। হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ, সেখান থেকে লছমনঝোলা, গঙ্গোত্রী, গোমুখী। আরো আগে? আর আগে কি আছে? স্বামীজীর আর আগে যাবার ইচ্ছে নেই, প্যারীর মাসী চেপে ধরলে, আর খানিকটা যেতেই হবে।

আমরা দু'জনেই প্যারীর মাসীর একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছিলাম। তার কথাবার্ত্তা ক্রমে ক'মে আসছিল। সর্ব্বদা যেন অন্যমনস্ক, সময়ে সময়ে আমরা কেউ কথা কইলে চমকে উঠত। মাঝে মাঝে চোখে সেই রকম আবরণ, বাইরে কোন দিকে দৃষ্টি নেই। মনের ভাব টানা তারের মত, একবার আঙ্গুল ঠেকলেই ঝঙ্কার দিয়ে উঠে। আঙ্গুল যে কার, সেটা আমরা বুঝতে পারছিলাম না! একটা আকুলতা, অন্তরের ব্যগ্রতা তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছিল, কিন্তু কারণ আমাদের চোখে কিছু ঠেকছিল না। যে ভাব রাত্রে আমরা দু'বার দেখেছিলাম, দিনের বেলাও যেন সেই রকম আরম্ভ হ'ল। কিন্তু আপনার মনে প্যারীর মাসী বেশী কথা কইত না। বরং আমাদের মনে হ'ত, যেন অনেক সময় সে কাণ পেতে কা'র কথা শুনচে। এক একবার যেন ঘাড় নেড়ে কি কথায় সায় দিচ্ছে।

প্যারীর মাসীর অসাক্ষাতে স্বামীজীকে আমি বললাম, এ সব লক্ষণ কি আপনার ভাল মনে হচ্চে?

—না, ভাল আবার কোন্‌খানটা?

—যদি এমন স্থানে উন্মাদ হয়ে ওঠে কিংবা একটা কিছু কাণ্ড ক'রে বসে, তা হ'লে উপায়?

স্বামীজী মাথা নাড়লেন, বললেন, সে সব ভয় কিছু নেই,

কথনো কিছু উৎপাত করবে না। তবে হঠাৎ যদি কোথাও চ'লে যায়, সেই ভয়। হয় ত এই রকম কিছু দিন থেকে আপনি সেরে যাবে। হয় ত—

স্বামীজী কথাটা শেষ করলেন না, একদৃষ্টে আমার মুখ চাইলেন।

আমি বল্‌লাম,আপনি কি বলতে যাচ্ছিলেন, বললেন না?

স্বামীজী বল্‌লেন, যা মনে হবে, সব কথাই কি বলতে হবে? কথন একটা খেয়াল আসে, কথন কিছু কল্পনা।

—প্যারীর মাসীর এ রকম জেদ কত দিন থাকবে?

—এইবার যেখানে গিয়ে আড্ডা করা যাবে, সেইখান থেকে ফিরে আসব। আমার শরীর ভাল নেই বললে ও নিজেই ফিরে যেতে চাইবে।

পথে কিছু দূর গিয়ে আমরা দেখলাম, একটা সঙ্কীর্ণ পথ উত্তরদিকে চ'লে গিয়েচে। প্যারীর মাসী সেইখানে দাঁড়িয়ে বললে, এইবার এই পথ দিয়ে যেতে হবে।

স্বামীজী বললেন, এ পথ কোথায় গিয়েচে, আমরাও ত কিছু জানিনে।

—চল না, এই পথ দিয়ে গেলেই আমরা ঠিক যাব।

প্যারীর মাসী সেই পথে চলল। স্বামীজী আর কিছু না ব'লে তার পিছনে চললেন।

পথ সরু, পগদণ্ডী, দুর্গম। তার পাশেই অত্যন্ত গভীর, প্রশস্ত খদ, নীচে চেয়ে দেখতে গেলে ভয় করে। অন্য দিন হ'লে প্যারীর মাসী ভয়ে ভয়ে আমাদের পিছনে আসত, আজ সে দ্রুত অভ্রান্ত পদক্ষেপে আগে আগে চলল, যেন পাহাড়ে ওঠা তার চিরকালের অভ্যাস। আমরা কোনমতে যথাসাধ্য তার অনুবর্ত্তী হলাম। পাহাড়ের উচ্চতায় ও পথের কঠিনতায় হাঁপ লাগছিল।

হিমালয়ের হিমানীমণ্ডিত শৃঙ্গরাজি কিছু দূরে হ'লেও খুব নিকটে মনে হচ্ছিল। অতি প্রাচীন, শুভ্রশীর্ষ, বিরাটদেহ মৌনী ঋষির মত একের পর আর এক দাঁড়াইয়া আছে। কোনখানে উপত্যকার ন্যায়, সেখানে ঘনবিন্যস্ত ঘনশ্যাম বিশাল তরুরাজির সারি। চারিদিকে বিরাটের সমাবেশ, বিরাট গাম্ভীর্য্য, বিরাট স্তব্ধতা, বিরাট হিমগিরি। মধ্যাহ্নের পর আমরা দেখলাম, পথ পূর্ব্বমুখ হয়েছে। কিছু দূর গিয়ে দেখলাম, খডের ভিতর দিয়ে প্রবলবেগে স্রোতস্বতী প্রবাহিত হয়েচে, জল নির্ম্মল হ'লেও তা'তে গাঢ় শ্যাম আভা, পাহাড়ে ঠেকে শুভ্র ফেণা উঠছে। প্যারীর মাসী একবার দাঁড়িয়ে নীচের দিকে চেয়ে বললে, কৃষ্ণগঙ্গা।

স্বামীজী বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চাইলেন, আবার জলের দিকে চেয়ে বললেন, কৃষ্ণগঙ্গাই বটে।

যেমন অপরাহ্ণ হয়ে আসতে লাগল, সেই সঙ্গে খড দিয়ে মেঘ ঘনীভূত কুণ্ডলীকৃত হয়ে উপরে উঠতে লাগল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! ঘুরে ঘুরে, পাকিয়ে পাকিয়ে, জড়িয়ে জড়িয়ে, অলস মন্থর গতিতে চলেচে। যেন বৃহৎ অজগরের দল এঁকে-বেঁকে সংসর্পিত হয়ে পর্ব্বতারোহণ করছে। সারির পর সারি, স্তরের পর স্তর, মেঘের পর মেঘের দল, সব এক পথের যাত্রী। উপরে এসে গিরিশৃঙ্গের উপকণ্ঠে মালার মত জড়িয়ে যেতে আরম্ভ হ'ল। এ সব বিনা সূতায় গাঁথা হার, আপনা-আপনি পর্ব্বতরাজের গলায় উঠচে। অথবা এই সব মহাসর্প কৈলাসপতি মহাদেবের অঙ্গ বেষ্টন করচে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এল। আমরা কিছু চিন্তিত হলাম। যদি বৃষ্টি আসে, কোথায় দাঁড়াব? রাত্রিই বা কোথায় যাপন করব? বালানন্দ স্বামী বললেন, প্যারীর মাসী, আজ ত তুমি আমাদের পাণ্ডা। রাত্রের কি ব্যবস্থা করেছ? এ পথে তোমার ঘর-দোর কোথাও আছে?

প্যারীর মাসী মুখ ফিরিয়ে বললে, তোমরা ভাবচ কিসের জন্যে, বাবাঠাকুর? আমি কি আর না জেনে শুনে তোমাদের নিয়ে যাচ্চি। আর একটু এগিয়ে ঘর পাওয়া যাবে, তোমাদের রাতে কোন কষ্ট হবে না।

ঠিক সন্ধ্যার সময় আমরা দেখতে পেলাম, পথের কিছু উপরে একখানি পাথরের ঘর। তার সামনে একটু যায়গা পরিষ্কার ক'রে সমভূমি করা, ঘরের সামনে বারান্দা, তা'তে তিনটি পাথরের থাম, বেশ শক্ত কাঠের দরজা, বাইরে থেকে শিকল দেওয়া। প্যারীর মাসী তড়-তড় ক'রে উঠে গিয়ে দরজার শিকল খুলে ঘরে ঢুকল। বালানন্দ স্বামী আর আমি বিস্মিত হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে তার পশ্চাতে ঘরে প্রবেশ করলাম।

৯

ঘরের ভিতর গিয়ে দেখি, এক কোণে একরাশি কাটা কাঠ সাজানো রয়েছে, তার পাশে পাথরের উনান। একটা কুলুঙ্গিতে একটি পিতলের হাঁড়ি আর হাতা, তার পাশে কিছু চাল আর ডাল, একটা পাথরের বাটিতে খানিকটা ঘি, পাতার

উপর সব রকম গুঁড়া মসলা, নুণ, একটা ঝুড়িতে আধ ঝুড়ি আলু। আর এক পাশে কতকগুলো শালপাতা।

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, এ ঘরে নিশ্চয় কেউ থাকে।

কোথাও কিন্তু মানুষের কোন চিহ্ন নাই। বালানন্দ স্বামী বললেন, কেউ থাকত, তা ত স্পষ্ট দেখা যাচ্চে, কিন্তু এখন যে কেউ আছে, তা মনে হয় না।

ঘরের আর এক কোণে গাদা-করা খড় রাখা ছিল, প্যারীর মাসী দেখিয়ে দিয়ে বললে, এই শোবার বিছানা। এখানে যে থাকত, সে এই সব জিনিষ রেখে কোথাও চ'লে গিয়েচে, ভেবেছিল, আর কেউ এখানে এলে তাদের কাযে লাগবে।

স্বামীজী বললেন, আমারও তাই মনে নিচ্চে। এ রকম দুর্গম স্থানে কোথাও কোথাও এমন দেখতে পাওয়া যায়।

আমি বললাম, কে আমাদের এ রকম আতিথ্যের ব্যবস্থা ক'রে রেখেচেন, তা ত আমরা জানিনে, উদ্দেশ্যে আমরা তাঁর জয়-জয়কার করচি।

স্বামীজী হেসে বললেন, একশোবার। আর প্যারীর মাসীর পাণ্ডাগিরিরও জয়-জয়কার!

প্যারীর মাসী বললে, বাবাঠাকুর, এখন ত তামাসা করচ, আগে ভাবছিলে, কোথায় আমি তোমাদের নিয়ে যাচ্চি, রাত কাটাবার যায়গা পাওয়া যাবে না।

ঘরের পিছনেই একটি ছোট ঝরণা ছিল, খুব মিঠে জল। আমরা মুখ-হাত ধুয়ে খানিক এ-দিক ও-দিক ঘুরে দেখলাম। তখনও তেমন অন্ধকার হয় নি, কিন্তু চারিদিক মেঘ ঘিরে রয়েচে, অল্প বাতাস, পাহাড়ের চূড়ার উপর অন্ধকার ঘনিয়ে আসচে। আমরা সারা দিন চ'লে এসেছিলাম ব'লে তেমন শীত-বোধ হচ্চিল না। প্যারীর মাসী হাত-পা ধুয়ে এক মুঠা খড় দিয়ে ঘর পরিষ্কার করছিল।

ঘর থেকে খানিক দূরে একটা প্রকাণ্ড পাথরে ঠেসান দিয়ে স্বামীজী দাঁড়ালেন। বললেন, প্যারীর মাসীর ভাব-গতিক আজ তোমার কি রকম মনে হচ্চে?

আমি উত্তর করলাম, আমি ত কিছুই বুঝতে পারচিনে। এমন যায়গায় এ রকম ঘর থাকতে পারে, এ কথা সহজে বিশ্বাসই হয় না। প্যারীর মাসী কি রকম ক'রে জানলে যে, এখানে আশ্রয় আছে? আর আহারের সামগ্রী পাওয়া যাবে, তাই বা তার কেমন ক'রে মনে হ'ল?

—সে কথা যে তার মনে হয়েছিল, তা বোধ হয় না, তবে কিছু একটা প্রেরণায় যে সে এ পথে এসেচে, তার কোন সন্দেহ নাই। এ দিকে সচরাচর লোক চলে না, নিকটে যে কোথাও কোন তীর্থস্থান আছে, তাও শুনিনি! অথচ এই স্থানে এমন কিছু আছে, যার স্মৃতি প্যারীর মাসীকে অজ্ঞাতে এখানে আকর্ষণ ক'রে এনেচে। কি তা, আমরা জানিনে, জাগ্রত অবস্থায় প্যারীর মাসীও জানে না। কিন্তু আকর্ষণ যে বলবৎ, তা ত দেখতেই পাচ্চ। পথ চলতে চলতে প্যারীর মাসী আর এক পথে চলল। আমাদের এ-দিকে আসবার কোন কথা ছিল না, ইচ্ছেও ছিল না। কে তাকে এ পথে আসতে বললে, কিসের জন্য এখানে আসা?

—আমরা তা ত কিছুই জানি নে।

—প্যারীর মাসীও জানে না। নিদ্রাবস্থায় তার আর এক চৈতন্য জাগরিত হয়ে জানতে পারবে। এর আগে দু'বার যা দেখা গিয়েছিল, তা'তে ওর কোন হাত ছিল না। আমাদের পথে সে স্থান পড়ে, সে স্থানের পূর্ব্ব-ঘটনা নিদ্রিতাবস্থায় কোন অলৌকিক বলে ও প্রত্যক্ষ দেখতে পায়। ওর মধ্যে দুই সত্তা বিদ্যমান। যখন একটি জাগে, সে সময় অপরটি নিদ্রিত হয়। আজ যা দেখলে, সে ভাব নূতন। সহজ জাগ্রত অবস্থাতেই দ্বিতীয় চৈতন্যের প্রভাব। ওর নিদ্রিতাবস্থায় যে ক্ষমতার বিকাশ আমরা দেখেছি, সেই ক্ষমতাই আজ জাগ্রত অবস্থায় ওকে এখানে নিয়ে এসেছে।

—আপনার মনে কোন আশঙ্কা হচ্চে?

—চিন্তার কারণ বটে। আশঙ্কা আছে কি না, কেমন ক'রে জানব?

—ওকে নিয়ে ফিরে চলুন না কেন?

—কাল যাব। ত্বরা করতে হবে, আমার শরীর ভাল নেই।

ফিরে এসে আমরা দেখি, প্যারীর মাসী ঝরণা থেকে চাল-ডাল ধুয়ে এনেচে। আমি আলো জ্বাললাম, প্যারীর মাসী উনানে আগুন দিলে।

রাত্রিতে বেশ তৃপ্তি ক'রে আমরা খিচুড়ী খেলাম।

উনানের আগুন না নিভিয়ে আরও দু'চারখানা মোটা মোটা কাঠ দেওয়া গেল, দেওয়ালে ফুকর দিয়ে ধোঁয়া বেরুবার পথ ছিল। ঘর বেশ গরম রইল, রাত্রিতে আলো যেমন জ্বলে থাকে, সেই রকম রইল। দরজায় লোহার শিকল ছিল, শিকল দিয়ে খড়ের উপর আমরা শুয়ে পড়লাম।

আগেকার মত গভীর রাত্রে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। প্যারীর মাসী চোখ চেয়ে রয়েছে, কিন্তু ঘরের ভিতর কিছু দেখতে পাচ্চে না। দৃষ্টি স্থির, যেন দূরে কিছু দেখচে। কণ্ঠের স্বর আর এক রকম, যেন অনেক দূর থেকে কথা কইচে। বালানন্দ স্বামীও জেগেচেন। আমরা দু'জনে চুপ ক'রে প্যারীর মাসীর কথা শুনতে লাগলাম।

সে বলছিল, ছায়া! ছায়া! ছায়া! কেবলি ছায়া! কেবলি ছায়ার আনাগোনা। এ কি ছায়ালোক না কি? কোথাও কোন শব্দ নেই, নিঃশব্দে ছায়া সব ঘুরছে। সব যেন অস্পষ্ট, ছায়ার মত আলো। এত ছায়ার মধ্যে আমি কেন? আমিও কি ছায়া?—

সব যেন আবছায়া, আবছায়া! কারুর মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্চিনে। কারুর মুখে কথা নেই, কেউ কারুর সঙ্গে কোন কথা কইচে না! আমিও যেমন! ছায়াতে কি কথা কইতে পারে? এখানে কি মানুষ নেই, শুধু ছায়া?

ঐ অনেক দূর থেকে যেন একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে আলো আসচে। অল্প গোলাপী আলো, তেমন পরিষ্কার নয়, তার পর আলো বাড়চে—বাড়চে—বাড়চে—

কৈ, আলোয় ত ছায়া মিলিয়ে গেল না! ছায়ার চারিদিকে আলো খেলচে, আলোর মধ্যে ছায়ার মুখ! এমন সব মুখ ত কখন দেখিনি। পদ্ম-ফুলের মতন সব ফুটে রয়েচে। চোখের কি শান্ত, স্নিগ্ধ, কোমল দৃষ্টি!

ও কে ডাকচে? ও মা, আমার নাম ধ'রে ডাকচে! কমলা! আমার ও নাম ত কেউ জানে না, সবাই ভুলে গিয়েচে। এখানে আমাকে নাম ধ'রে কে ডাকে? কে গা, আমাকে ডাকচ? এই যে আমি এয়েচি। এ কে এল? জ্যোতির জ্যোতি! সত্য সুন্দর মঙ্গল মূর্ত্তি!—

* * * *

প্যারীর মাসী তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে গলবস্ত্র হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে। বালানন্দ স্বামী আমার মুখের দিকে চাইলেন। আমরা দু'জনেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলাম।

প্রণাম ক'রে প্যারীর মাসী বললে, ঠাকুর, আমাকে ডাকচ? এই যে আমি এসেছি। ঐ ডাক শোনবার জন্য আমি যে কত দিন ধ'রে কাণ পেতে আছি!

কোন্ দিকে যেতে হবে? ঐ যেখান দিয়ে আলো আসচে? এই সব জ্যোতির্ম্ময় ছায়ার ভিতর দিয়ে? ছায়ার সাথে মিশে আমিও ছায়া হয়ে যাব?

* * * *

প্যারীর মাসী আবার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। স্বামীজী আমার দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ কি ভাবতে লাগলেন, তার পর পাশ ফিরে নিদ্রিত হলেন। আমার চক্ষে অনেকক্ষণ ঘুম এল না। কত কি ভাবতে লাগলাম। শেষে ঘুমিয়ে পড়লাম।

শীতের জন্যই হোক, কিংবা রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে অনেকক্ষণ ঘুম হয়নি ব'লেই হোক, আমাদের ঘুম ভাঙ্গতে একটু দেরী হ'ল। তাড়াতাড়ি উঠে দেখি, ঘরের ফুটো দিয়ে প্রভাত-সূর্য্যের আভা আসচে।

বালানন্দ স্বামী উঠেই বললেন, প্যারীর মাসী কোথায় গেল?

প্যারীর মাসী ঘরে নেই দেখে আমি বললাম, হয় ত মুখ-হাত ধুতে গিয়েছে। আমাদের উঠতে দেরী হয়েচে।

—তাই হবে, ব'লে স্বামীজী ভেজান দরজা খুলে ঘরের বাইরে এলেন। আমি তাঁর পিছনে।

বারান্দার এক দিকে একটা থামে বাঁ হাত জড়িয়ে ব'সে প্যারীর মাসী। তাকে কিছু না ব'লে আমরা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে নিসর্গের অদৃষ্টপূর্ব্ব বিচিত্র শোভা দেখতে লাগলাম।

আকাশ নির্ম্মল, স্বচ্ছ, গভীর নীল। সূর্য্য সবেমাত্র উদয় হয়েচে, বৃহৎ লোহিত চক্র উপত্যকায় লগ্ন হয়ে রয়েচে। আকাশব্যাপী, শৃঙ্গকণ্ঠলম্বিত কৃষ্ণ অভ্ররাজি জ'মে শুভ্র তুষার হয়ে চারিদিক আচ্ছন্ন করেচে। গাছের মাথায়, পাহাড়ের গায়ে, পথে সর্ব্বত্র শ্বেত আবরণ। তুষার-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ ও তরুশীর্ষে সূর্য্য-কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্চে।

প্যারীর মাসী স্তব্ধ হয়ে ব'সে আছে দেখে স্বামীজী ডাকলেন, প্যারীর মাসী!

কোন সাড়া নেই।

শশব্যস্তে আমরা গিয়ে দেখলাম, প্যারীর মাসী পূর্ব্বমুখী হয়ে ব'সে আছে। দেহ নিস্পন্দ, স্থির, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মৃত্যু হয়েছে। মুখে অপূর্ব্ব আনন্দ-জ্যোতি!

বালানন্দ স্বামী ঊর্দ্ধমুখ, ঊর্দ্ধবাহু হ'য়ে গভীর স্বরে বৈদিক ছন্দে আবৃত্তি করলেন—

তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোমামৃতঙ্গময়!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

৬

অস্বাভাবে জুয়াচুরির প্রাদুর্ভাব

ফন্দীভূষণ বাবু এক ভদ্রবংশজাত বি-এ, ফেল কেরাণী। সরকারী অফিসে তিনি সদাই ফিট্‌ফাট সাজিয়া থাকেন। দেখিতে সুন্দর যুবাপুরুষ, রং চাঁপাফুলের ন্যায়, ভগবান্ তাঁহাকে সুন্দর করিয়া পাঠাইয়াছেন। দর্জ্জি ও ধোপাতে তাঁহাকে আরও সুন্দর করিয়াছে। এই তিনের দানে তাঁহার দেহমন্দিরটি বিশেষভাবে সুশোভিত। ইংরাজী বলেন মন্দ নহে, মুখ হইতে সর্ব্বদাই তুবড়ির ফোয়ারা বাহির হইতে থাকে। তাহার উপর ধর্ম্মের অভিনয়ও আছে। তিনি প্রায়ই তাঁহার জীবনের একটি আখ্যায়িকার পুনরাবৃত্তি করেন। আখ্যায়িকাটি এই :—

তিনি এক দিন গড়ের মাঠে প্রাতর্ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, এক জন ইংরাজ অশ্বারোহী যুবাপুরুষ খুব জোরে অশ্ব চালাইয়া আসিতেছেন। অশ্বটি এত দ্রুতবেগে আসিতেছিল যে, অশ্বারোহী তাহাকে আর বশে রাখিতে পারিতেছিলেন না। শেষে অশ্বটি অশ্বারোহীকে ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া দ্রুতবেগে পলাইয়া গেল। ফন্দীভূষণ তাঁহার কাছে যাইয়া দেখিলেন, অশ্বারোহী আহত। তাঁহার নাক ও মুখ দিয়া রক্তস্রাব হইতেছে। ফন্দীভূষণ সাধারণতঃ সাহসী হইলেও মনুষ্য-রক্ত দর্শনে কতকটা অধীর হইয়া পড়িলেন। তবে উপস্থিত-বুদ্ধির সাহায্যে তিনি তাঁহার রুমাল দিয়া আহত ইংরাজের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিলেন। একখানি রুমালে রক্তস্রাব বন্ধ হইল না দেখিয়া ঐ আহত ব্যক্তির পকেট হইতে তাঁহার রুমালখানি বাহির করিয়া সেখানাও ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া দিলেন। সেই সময়ে পকেট হইতে মাটীতে পতিত কার্ডকেশ হইতে কার্ড বাহির করিয়া দেখিলেন, কার্ডে লেখা ডাঃ থর্ণহিল—থিয়েটার রোড। একখানা প্রথম শ্রেণীর ফিটন তখন সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল, সেই গাড়ী থামাইয়া সহিসের সাহায্যে আহত ব্যক্তিকে গাড়ীতে চড়াইয়া ফন্দীভূষণ তাহার আবাসস্থানের দিকে লইয়া চলিলেন। এমন সময় আর একটি 'সাহেব' আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিলেন এবং তিনিও তাঁহার ঘোড়ায় চড়িয়া ঐ গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

গাড়ী সাহেবের বাটী আসিয়া পৌছিলে, আগন্তুক সাহেব, আহত সাহেবের বেহারা, ফন্দীভূষণ ও সহিস, এই চারি জনে তাঁহাকে গাড়ীর ভিতর হইতে ঘরে লইয়া গেল। আগন্তুক সাহেবটি নিজেই সাহেব ডাক্তার লইয়া আসিলেন। নবাগত ইংরাজটি ফন্দীভূষণের নাম-ধাম লিখিয়া লইলেন ও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় দিলেন। যখন তিনি চলিয়া আসিলেন, তখনও সাহেবটি সেইখানে আহত সাহেবের পরিচর্য্যায় নিয়োজিত রহিলেন। ফন্দীভূষণ প্রত্যহই আহত সাহেব কেমন আছেন, দেখিতে যান। চারি দিনের পর ডাঃ থর্ণহিল তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে প্রচুর ধন্যবাদ দিলেন। তিনি বলিলেন—"আমি তোমার নিকট বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ, তোমার ব্যবহারে আমি বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছি, এইরূপ ব্যবহারই চাই।"

সেই দিন হইতে তিনি প্রত্যহ ডাঃ থর্ণহিলকে দেখিতে যাইতেন, আর ডাঃ থর্ণহিলও তাঁহাকে দেখিলে বিশেষ খুসী হইতেন। ক্রমে ডাঃ থর্ণহিল নিরাময় হইলে এক দিন তিনি ফন্দীভূষণ বাবুকে তাঁহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন এবং বলিলেন, "আমার পুত্র, আমি তোমার কোন উপকার করিতে পারিলে বিশেষ সুখী হইব।" ফন্দীভূষণ বাবু পরে জানিতে পারিয়াছিলেন, অপর ইংরাজটি হাইকোর্টের জজ। তাঁহার নাম মিঃ জষ্টিস্ টিউনন্।"

সম্পূর্ণ আরোগ্যের পর ডাঃ থর্ণহিল একটি 'টি-পার্টি' দিলেন, তাহাতে উক্ত হাইকোর্টের জজ ও মিঃ জষ্টিস্ উড্রফ উপস্থিত ছিলেন। তিনিও ফন্দীভূষণ বাবুকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। সেই টি-পার্টিতে অনেক গণ্যমান্য

সম্ভ্রান্ত ইংরাজ উপস্থিত ছিলেন। দেশীয়দের মধ্যে ফন্দীভূষণ বাবু একা। গভর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ গুরলে, জজ টিউনন এবং আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। ডাঃ থর্ণহিল উৎসবক্ষেত্রে একটি ছোট বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতায় বিশেষভাবে ফন্দীভূষণ বাবুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে ফন্দীভূষণের সেবাপ্রবৃত্তি ও সৎসাহসের প্রশংসা করেন। এমন কি, মিঃ গুরলে পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন, "আমরা এইরূপ দেশীয় ভদ্রমহোদয়গণের আধিক্য প্রার্থনা করি।"

সেই দিন হইতে ফন্দীভূষণ ডাঃ থর্ণহিলকে পিতা বলেন এবং অবকাশ পাইলেই পরিচিত গণ্যমান্য ইংরাজদিগের বাটীতে গমন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সকলের সঙ্গেই তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ হইয়াছে। উক্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের কাছে তাঁহার এমন প্রতিপত্তি যে, তিনি ইচ্ছা করিলে অনেকের বড় বড় চাকুরী করিয়া দিতে পারেন।

ফন্দীভূষণের এই কাহিনী যত্র তত্র প্রচারিত হওয়ায় অনেক বেকার শিক্ষিত ভদ্রসন্তান তাঁহার দ্বারস্থ হইতে লাগিলেন। ফন্দীভূষণ কাহাকেও ফিরাইতেন না। তবে প্রত্যেকের কাছেই বলিতেন যে, এত লোক উমেদার! সকলের অভাব-পূরণের ইচ্ছা থাকিলেও সুবিধা হয় না। উপরওয়ালাদিগকে ভোজ দিবার জন্য টাকার প্রয়োজন। ভবিষ্যতের আশায় অনেক বেকার নবীন যুবক বিবাহের যৌতুকের দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিয়া ভোজের টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিত। ফন্দীভূষণ পরোপকারের জন্য সে টাকাগুলি গ্রহণ করিতেন। বাজারে এইভাবে ফন্দীভূষণ আত্ম-প্রচার করিয়াছিলেন।

মিঃ থর্ণহিল যখন কৌন্সলী হইয়া প্রথম মহম্মদ বিশী বনাম রায় বাহাদুর বিনোদবিহারী গুপ্তের মোকদ্দমায় পুলিস আদালতে পদার্পণ করেন, তখন তিনি আমারই প্রতিপক্ষের কৌন্সলীরূপে আসিয়াছিলেন। মহম্মদ বিশী বলিয়া এক জন দুর্দ্দান্ত লোক যোড়াসাঁকো থানার অধীনে বাস করিত। ইন্‌স্পেক্টর বিনোদ গুপ্ত যোড়াসাঁকো থানার চার্জ্জে ছিলেন। এই ইন্‌স্পেক্টর তাহাকে চালান দেন; বিশী সে মামলায় খালাস পায়; খালাস পাইয়া ইন্‌স্পেক্টরের নামে উল্টা মামলা লইয়া আসে। সেই মামলায় ডাঃ থর্ণহিল বিশীর পক্ষে আর আমি বিনোদ গুপ্ত মহাশয়ের পক্ষে। কিংসফোর্ডের বিচারালয়ে পাঁচ দিন বেলা ১২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত শুনানীর পর হাকিম ইন্‌স্পেক্টরকে বেকসুর খালাস দেন। সেই অবধি ডাঃ থর্ণহিল ও আমার মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় এবং যত দিন তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন, আমার সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল।

মামলার কিছু দিন পরে তিনি কলিকাতায় দ্বিতীয় ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে নিযুক্ত হন এবং অতি অল্পদিন পরে চীফ ম্যাজিষ্ট্রেটের আসন গ্রহণ করেন। পুলিস-আদালতে চীফ ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বিশেষ সুখ্যাতির সহিত কয়েক বৎসর কার্য্য করিবার পর তিনি কলিকাতা ছোট আদালতে চীফ জজরূপে নিযুক্ত হন। সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া ডাঃ থর্ণহিল অস্থায়িরূপে পাটনা হাইকোর্টের জজের পদে অধিষ্ঠিত হন। তাহার পর কলিকাতা হাইকোর্টের জজের পদে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া ভারত-বর্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে যাঁহারা অধিষ্ঠিত হন, তাঁহারা সকলেই শিক্ষিত ও ভদ্রবংশজাত, কিন্তু ডাঃ থর্ণহিলের ভদ্রতা অপরাপর উচ্চপদস্থ ব্যক্তির ভদ্রতাকে অতিক্রম করিয়াছিল। তিনি যাহাকে ভাল বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহার জন্য তাঁহার কিছুই অদেয় ছিল না। যখন তিনি চীফ ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কলিকাতার পুলিস-আদালতে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন আমার উপর এত বিশ্বাস ছিল যে, আমার অধিকাংশ দরখাস্ত মঞ্জুর করিতেন। আর আমিও সেই হেতু বিশেষ সাবধানে তাঁহার কাছে দরখাস্ত করিতাম। দরখাস্ত করিলেই মঞ্জুর, এই নিমিত্ত আমার অপরাপর উকীল বন্ধুরা প্রায় বলিতেন—তারক বাবু যদি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া তাঁহার কাছে পেশ করেন, তাহা হইলে থর্ণহিল সাহেব 'Is it in order'? বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া চক্ষু বুজিয়া সহি করিয়া দিবেন।

তিনি যখন চীফ ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সে সময়ে খ্যাতনামা কৌন্সলী মিঃ নর্টনের বাটীতেই থাকিতেন। মিঃ নর্টন দোতলায় থাকিতেন আর ডাঃ থর্ণহিল এক তলায় থাকিতেন। সেই সময় তিনি অসুস্থতা নিবন্ধন ছুটী লইয়া বিলাত গমন করেন। ৮ মাসের পর সুস্থ হইয়া যখন ফিরিয়া আসেন, তখন নর্টন সাহেবের বাড়ীতে আমি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। আমি দেখিলাম, তিনি বেশ সুস্থ হইয়া আসিয়াছেন এবং Doctor of Law উপাধি পাইয়াছেন। আমি সেই সময় বলি—"Dr. Thornhill, you went

out of India as a patient and you have come out as a Doctor." (তুমি রোগী হইয়া দেশে গিয়াছিলে, ডাক্তার হইয়া ফিরিয়া আসিলে) আমাদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে, তাহা আপনাতে মিলিয়াছে—'একবারকার রুগী, ফিরেবারকার রোজা।'—হাসির রোল পড়িয়া গেল। মিঃ নর্টন বলিলেন, 'Very neat' (সুন্দর)। আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "Mr. Sadhu, আপনার Reminiscence লেখেন না কেন? মনুষ্যের মনোবৃত্তির সুপ্রকাশ ও বিপর্য্যয়ভাব আপনার মত দেখিবার সুবিধা, এত কাহারও নাই।"

ডাঃ থর্ণহিলও বলিলেন—"তারকনাথ, তুমি যদি তোমার Reminiscence লেখ ত আমি বড় সুখী হইব।"

এই দুই বন্ধুর কথা শুনিয়া আমি আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করি।

কিছু দিন পরে এক দিন দেখি, তাঁহার বাটীর দরজায় Dr. Thornhill বলিয়া নামের প্লেট মারা হইয়াছে। আমি বলিলাম—"ডাক্তার, তুমি বুদ্ধিমানের মতন কার্য্য কর নাই, কোন্ দিন কলেরা-রোগীর জন্য তোমাকে ডাকিতে আসিবে, তখন তুমি কি বলিবে?" বস্তুতঃ তাহাই হইল। কয়েক দিন পরে থর্ণহিল আমাকে বলিলেন, "তারকনাথ, তোমার ভবিষ্যৎ-বাণী ফলিয়াছে। আজ প্রাতঃকালে এক মেমসাহেব আসিয়াছিলেন, তাঁহার কন্যার কলেরা হইয়াছে বলিয়া ডাক্তাররূপে আমাকে ডাকিতে আসেন। আমি বলিলাম—আমার দ্বারা আপনার কায হইবে না। তিনি বলিলেন, তাঁহার কার্য্য জরুরী, যাহা ফী চান, তাহা পাইবেন। এই কথা শুনিয়া তাঁহার আশু বিপদসত্ত্বেও আমি হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, আমি রোগের ডাক্তার নই, আমি আইনের ডাক্তার, আমার দ্বারা আইনসম্বন্ধে সাহায্য হইতে পারে। আমার দ্বারা রোগীর কোন সাহায্য হইতে পারে না। এই কথা শুনিয়া মেম সাহেব 'You are a fraud' বলিয়া চলিয়া গেলেন।"

আজকালকার দিনে "ডাক্তার" ও "প্রফেসার" এই দুইটি শব্দের অত্যন্ত ব্যবহারাধিক্য হইয়াছে। আমার বোধ হয়, সে দিকে সাধারণের একটু নজর রাখা উচিত। প্রথম ধরুন, "ডাক্তার"। প্রত্যেক বিষয়েই আজকাল লোক ডাক্তার উপাধি গ্রহণ করিতেছেন। নামের পূর্ব্বে ডাক্তার কথাটি বেশ শ্রুতিমধুর ও মুখরোচক। যাঁহারা চিরকাল সর্ব্ববিষয়ে রোগী ও মন্দবুদ্ধি, তাঁহারাও এখন সর্ব্ববিষয়ে ডাক্তার উপাধি গ্রহণ করিতেছেন। দুই ঘা তবলায় চাঁটি মারিতে পারিলেই এখন তিনি ডাক্তার, অন্ততঃ 'প্রফেসার অব তবলা'। পূর্ব্বে যাঁহারা তবলচি ছিলেন, আজকার দিনে তবলচির অপেক্ষা অনেক কম শিখিয়া তাঁহারা ডাক্তার না হয়, অন্ততঃ প্রফেসার। সে দিন কাগজে দেখিলাম, একটি অবস্থাপন্ন পরিবারের বালিকার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাহাকে ডাক্তার মিস্ অমুক বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। পরে জানিলাম, তিনি 'ডাক্তার অব মিউজিক।' আগে যাহারা জিমনাষ্টিক-মাষ্টার ছিলেন, এখন তাঁহারা 'প্রফেসার অব এথেলেটিকস্'। উপরন্তু 'প্রফেসার অব ডানসিং,' একটু ক্লারিওনেট বাজাইতে পারিলেই 'ডক্টর অব মিউজিক', 'প্রফেসার অব ওয়াকিং', পাড়ার বখাটে ছোঁড়া হইয়াছে 'ডক্টর অব জোকিং', মালি হইয়াছে 'ডকটর অব এগরিকালচার।' পাড়ার বখা হাড়ু-ডুডু খেলোয়াড়দের পদবী হইয়াছে 'ডক্টর অব হাড়ু-ডুডু।'

আমার বাটীতে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ অনাথনাথের বিলাতগমন উপলক্ষে একটি পার্টি হয়। তাহাতে একটি খ্যাতনামা এসোসিয়েসন হইতে একটি যুবাপুরুষ তাঁহার আর্টের দক্ষতা দেখাইবার জন্য আগমন করেন। তিনি তাঁহার দক্ষতা দেখাইলেন। কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে তাঁহাকে 'বখামির ডাক্তার' উপাধি দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহারই কার্য্যকলাপ দেখিয়া লোক ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। লোক তাঁহাকে একটি (Hero) মহাপুরুষ করিয়া তুলিলেন। গরীবের সন্তান পল্লীগ্রামে মেটেঘর ছাড়িয়া কলিকাতার রম্য মেসবাটীতে সময় কাটাইয়া সময়ে সময়ে সভ্য-সমাজে উপস্থিত হইয়া আর্টের নামে বেল্লিকতার ফোয়ারা ছিটাইয়া দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে নগদ বিদায়রূপে 'এনকোর, বহুত আচ্ছা, ফাষ্ট ক্লাশ, নিট' ইত্যাদি অর্থশূন্য বুকুনির পেলা পায়। সে অবস্থায় সেই গরীবের ছেলে আর কি তখন প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে? সে তখন স্বখাত-সলিলে ডুবিয়া মরে। তাহার পরবর্ত্তী জীবন একেবারে হাবুডুবু খেলিতে থাকে।

আজকালকার দিনে ডাক্তার বলিলে কি বুঝায়, তাহা বুঝা অতিশয় কষ্টসাধ্য। অনেকে ডাক্তার উপাধি ধারণ করেন, অথচ মেডিকেল কলেজের পাশ দিয়াও কখন যান নাই। অনেকেই সুদূর পল্লীগ্রামে কিছু দিন লোক মারিবার সুবিধা

পাইয়া পরে সহরে আসিয়া ডাক্তার উপাধিতে শোভিত হন। তিনিও ডাক্তার। ডাক্তার শব্দের ব্যবহারে স'র লিওনার্ড ও সার নীলরতন সরকার যেরূপ ভাবে অধিকারী, এই অশিক্ষিত, অর্দ্ধ-শিক্ষিত দূর পল্লীগ্রামের মহামারী হিরোও সেই-রূপ অধিকারী বিবেচনা করেন! তিনিও ডাক্তার উপাধির সমান অধিকারী!

ডাক্তার থর্ণহিল শুধু যে শিক্ষিত হৃদয়বান্ জজ ছিলেন, তাহা নহে। তিনি এক জন আমোদপ্রিয় পুরুষ ছিলেন এবং কথাবার্ত্তায় অতিশয় মার্জ্জিত-রুচি ছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ফন্দীভূষণকে লোক-ঠকানর অপরাধে কলিকাতার পুলিস চালান দেয়। ডাক্তার থর্ণহিল তখন পাটনা হাইকোর্টে অস্থায়িভাবে জজিয়তি করিতেছিলেন। তিনি সেই মামলায় সাক্ষিরূপে কলিকাতায় আসেন। প্রায় এক বৎসর পর আমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ। সেই সাক্ষাতে আমরা উভয়েই আনন্দিত। এইখানে বলিয়া রাখি যে, তিনি চির-কুমার ছিলেন। আমোদে-প্রমোদে খেলা-ধূলায় তাঁহার অবসর-সময় অতিবাহিত হইত। পরস্পরের সম্ভাষণের পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "পাটনা সহরটি কেমন লাগিতেছে?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন—"তারকনাথ, আমি ত সেখানে প্রায় ৬ মাস কাটাইলাম, তুমি হইলে সেখানে ৬ দিনও কাটাইতে পারিতে না। সেখানে মিশিবার লোক অতি অল্প। মিশুক লোকের পক্ষে সে স্থানটি শ্মশানভূমি বলিলেও চলে!"

আমি।—তবুও সেখানকার দু'চার কথা বলুন।

ডাঃ থর্ণহিল।—সে স্থান সম্বন্ধে আমার নিজের মত না বলিয়া আমার এক মহিলা-বন্ধুর ভাষায় বলিব। এক দিন আমি আমার ড্রেসসুট বাহির করিবার জন্য একটি আলমারী খুলিলাম। খুলিয়া দেখি, লাখে লাখে মশক ঐ আলমারী হইতে বাহির হইয়া আমাকে আক্রমণ করিল। আমার নাকে, মুখে, চোখে আক্রমণ করিয়া আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। আমি 'রাগ্‌বি-প্লেয়ার' হইলেও রণে ভঙ্গ দিলাম। সেই সময়ে আমার মহিলা-বন্ধুটি সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং রাগ্‌বিজয়ী বলিষ্ঠ যুবা-পুরুষের এই দুরবস্থা দেখিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলেন এবং বলেন, "সাবাস, সাবাস, রাগ্‌বি-রথীদের সহিত সমানভাবে যুদ্ধ করিয়াছ, তাহাদের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়াছ, কিন্তু মশক-আক্রমণে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলে, ইহা তোমার খুব বাহাদুরী!" সেই মহিলা-বন্ধুটি পাটনা সম্বন্ধে বলেন—এ স্থান পশুদের বাসের উপযুক্ত, এখানে কেবল জন্তু ও মশক বাস করিতে পারে।

যাহা হউক, ডাঃ থর্ণহিল্ ঘোড়া হইতে পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহাকে সাহায্য করিয়া তাঁহার এবং অপরাপর বড় সাহেবদের ভালবাসার পাত্র হওয়া, এই নিছক ভিত্তিহীন গল্প পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া অভাবগ্রস্ত নব্য সম্প্রদায়ের নিকট ফন্দীভূষণ বেশ আসর জমকাইয়া লইয়াছিলেন। অনেকগুলি মুরুব্বিহীন এম-এ, বি-এ, পাশকরা যুবকের নিকট হইতে ভাল চাকরী করিয়া দিবার প্ররোচনায় অনেকগুলি টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। Universityর ছাপ-মারা অনেকগুলি অকৃতবিদ্য যুবকের নিকট হইতে ২ শত হইতে ১ হাজার টাকা পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অনেকের নিকট হইতেই ডেপুটী না হয় সাবডেপুটী, অন্ততঃ একসাইজের সবইন্‌স্পেক্টর করিয়া দিবার অছিলায় অনেকগুলি টাকা ফন্দীভূষণের তহবিলজাত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কাহাকেও চাকরি করিয়া দেন নাই, সকলকেই আশা দিয়া আসিতেছিলেন। তাহার ফলেই বিশেষ নাম জাহির হইয়া পড়িল। দলে দলে ইউনিভারসিটীর পাশকরা চাকরী-বাকরি-বিহীন যুবাপুরুষ তাঁহার আশ্রয় লইয়াছিল। তিনিও জোর-গলায় তাঁহার মিথ্যা গল্পের পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তিনি এই গল্পটি এতবার পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন যে, তাঁহারই সময়ে সময়ে মনে হইতে লাগিল, পুনরাবৃত্তির দ্বারা তাঁহার মিথ্যা গল্পটি সত্যে পরিণত হইয়াছে। উমেদার ও স্তাবকদল এই গল্পটিকে ধ্রুব সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। পরীক্ষায় সাফল্যলাভের জন্য তাহারা অনেক টাকা নষ্ট করিয়াছিল। আর কিছু টাকা ফন্দীভূষণকে দিলে যদি একটা পাকা সরকারী চাকরী হয়, তবে সে চেষ্টা তাহারা করিবে না কেন?

ফন্দীভূষণের নিকট আবেদনকারীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু চিরকাল এক ফন্দী চলে না। ফন্দী-ভূষণের ফন্দীও ক্রমেই শেষ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিল। বাজারে যদিও তাঁহার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মেকার নাম খুব ছড়াইয়া পড়িল, তথাপি "Hope deferred maketh the heart sick," মাঝে মাঝে আবেদনকারীদিগের চিত্তে একটা উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের সঞ্চার হইতে লাগিল। সন্দেহের বশে কেহ কেহ

মন্তব্য প্রকাশ করিল, "ফন্দী বাবু যদি এতই ক্ষমতাবান্ লোক হইবেন, তবে নিজে ভাল চাকরী জোটাইয়া লন না কেন? তিনি ত সরকারী আফিসে সামান্য চাকরি করেন, তিনি আমাকে কি করিয়া ডেপুটী করিয়া দিবেন?" অপর পক্ষ মন্তব্য প্রকাশ করিল, "তা ভাই, তুমি জান না। বিলাতী সাহেবদের এখানে ত সামান্য চাকরী করিয়া দিবার মত আত্মীয়-স্বজন নাই। কাযেই যে কোন দেশীয় লোকের উপর সুনজর পড়ে, তাহাদেরই উপকার করেন। ডাঃ থর্ণহিল তাঁহাকে পুত্রের মত দেখেন। তিনি তাঁহাকে বাবা বলেন। জষ্টিস্ উডরফ, জষ্টিস্ টিউনন, মিঃ গুর্‌লে তাঁহাকে সন্তানের মত দেখেন এবং বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করেন। তিনি নিজের জন্য কিছু চাহিতে অনিচ্ছুক, আর তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তিও আছে। সেই কারণ নিজের জন্য তিনি কিছু চাহিতে প্রস্তুত নন, তবে মুরুব্বিহীন শিক্ষিত বেকার ভদ্র-সন্তানদের জন্য তিনি সব করিতে প্রস্তুত।"

এই প্রকার মন্তব্যও ক্রমশঃ বাজারে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

যাহা হউক, ফন্দীভূষণের 'রাহাজানি' আরও কিছু দিন এইরূপ ভাবে চলিল। কিন্তু খ্যাতনামা কার্য্যতৎপর বার্ড সাহেবের ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেণ্টের নজর তিনি এড়াইতে পারিলেন না। এক দিন বার্ড সাহেব খবর পাইয়া তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীকে ফন্দীভূষণের ফন্দীর তদন্ত করিতে বলিলেন। অল্প তদন্তের পরই তাহার আগাগোড়া মিথ্যাবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাহাকে জুয়াচুরির অজুহাতে গ্রেপ্তার করা হইল ও চালান দেওয়া হইল। অল্পদিনের মধ্যে ২০।২৫ জন প্রতারিত ব্যক্তি তাহার নামে থানায় এজাহার দিল। কিন্তু তখনও ফন্দীভূষণ খুব জোর-গলায় বলিতে লাগিল, "গ্রেপ্তার করুক, আমার বাবা থর্ণহিল কলিকাতায় আসিলেই আমি ত খালাস হইবই অপিচ পুলিস লাঞ্ছিত হইবে। যে যাহাই করুন, আমার কথার এক তিলও নড়চড় হইবে না। আমি যখন বলিয়াছি, চাকরী করিয়া দিব, তখন তাহাদের চাকরী করিয়া দিবই দিব, তা তাহারা আমার নামে নালিশ করুক আর অকৃতজ্ঞই হউক।" প্রথমতঃ এই মুখ-সাপটে অনেকে তখনও তাহার পক্ষসমর্থন করিতে লাগিল, বলিতে লাগিল—"পুলিস পারে না, এমন কায নাই। তাহারা এই নিরীহ পরোপকারী ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করিয়া নির্য্যাতন করিতেছে।"

রায় বাহাদুর কুমুদবন্ধু দাসগুপ্ত

আরও কিছু দিন তদারকের পর অনেকেই ফন্দীভূষণের দাগাবাজি বুঝিতে পারিল। সেই সময়ে রায় বাহাদুর কুমুদবন্ধু দাসগুপ্ত জোড়াবাগান পুলিস কোর্টের হাকিম। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ বিচারক খুবই কম দেখিতে পাওয়া যায়। আমার এই বহু-কালব্যাপী অভিজ্ঞতায় এরূপ হাকিম আর দেখি নাই। মোকদ্দমার ইতিহাস অল্প-পরিমাণ শুনিলে তিনি মোকদ্দমাটি বুঝিয়া লইতে পারিতেন। তাঁহার সূক্ষ্মবুদ্ধি অসাধারণ। তিনি যেরূপ ভাবে রায় লিখিতেন, এরূপ নিখুঁত রায় ফৌজদারী আদালতের কোন হাকিমকে লিখিতে দেখি নাই। এই মোকদ্দমার বিচারভার রায় বাহাদুর কুমুদবন্ধু দাসগুপ্তের হস্তে পড়িয়াছিল। ফন্দীভূষণের কাহিনী যে মিথ্যা, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আমাকে ডাঃ থর্ণহিল, জষ্টিস্ উডরফ, জষ্টিস্ টিউনন ও গভর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ গুর্‌লে সাহেবকে সাক্ষিরূপে ডাকিতে হইয়াছিল। প্রথমে অনেকগুলি যুবক যাহারা টাকা দিয়াছিল, তাহারা সাক্ষী দিতে অনিচ্ছুক হইল। প্রকাশ্য আদালতে তাহাদের নিজ নিজ নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতার পরিচয় দিতে তাহাদের সঙ্কোচবোধ হইল, কিন্তু শেষে

সকলেই আসিয়াছিল এবং তাহারা যে কি ভাবে ঠকিয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য দিয়াছিল। এই মোকদ্দমায় আসামীর পক্ষসমর্থনের জন্য আইনজ্ঞ উকীল ও কৌন্সলী নিয়োজিত হইয়াছিল। ডাঃ থর্ণহিল, মিঃ গুরলে, জষ্টিস্ টিউনন, জষ্টিস্ উডরফ সাক্ষ্য দিলেন যে, তাঁহারা জীবনে কখনও ফন্দীভূষণকে দেখেন নাই। ফন্দীভূষণ যে গল্প বলিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সরকারপক্ষে আমি উকীল ছিলাম। অপর-পক্ষে এক জন কৌন্সলী ও এক জন খ্যাতনামা উকীল ছিলেন। কয়েক দিন যাবৎ মামলা চলিয়াছিল। শেষে সাক্ষী-সাবুদ-প্রমাণ-প্রয়োগাদির দ্বারা মামলা প্রমাণ হইয়া গেলে হাকিম দাসগুপ্ত মহাশয় আসামীকে ২ বৎসর সশ্রম কারাবাসের হুকুম দিলেন, জরিমানা ১ হাজার টাকা করিলেন, না দিলে আরও ছয় মাস সশ্রম কারাবাস। বলা বাহুল্য, জরিমানার টাকা না দেওয়ায় পুরা আড়াই বৎসরই আসামীকে কারাবাস করিতে হইয়াছিল।

অধর্ম্মে যে অর্থ অর্জ্জন, তাহা কখনই স্থায়ী হয় না। শুনা গিয়াছিল, যদিও সে ৮।১০ হাজার টাকা ঠকাইয়াছিল; কিন্তু মামলা শেষ হইলে খরচপত্র বাদ তাহার হাতে আর কিছুই ছিল না। অধর্ম্মের উপার্জ্জন প্রায় অকার্য্যে কুকার্য্যে বিলীন হইয়া যায়। এই ঘটনাটি আজ কয়েক বৎসর হইয়া গিয়াছে, যদিও কমবেশী অনেকে এই জুয়াচুরি আখ্যায়িকা শুনিয়াছিলেন, তথাপি এখনও এইরূপ জুয়াচুরিতে অনেকেই প্রতারিত ও হৃত-অর্থ হইতেছেন। আশা-মরীচিকাই ইহার প্রধান কারণ।

১০ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ জুয়াচুরি বৎসরে একটা হইলে যথেষ্ট হইত। অধুনা বৎসরে ৩টি কি ৪টি করিয়া ঘটিতেছে। শিক্ষিত অভাবগ্রস্ত ভদ্রসন্তানদের ঠকাইবার জন্য কয়েক জন মিলিয়া যৌথ কারবারের নাম দিয়া লোক ঠকাইতেছে। এরূপ কেন হইতেছে? ইহার মূল কারণ, নিদারুণ অভাব ও বিনা প্রয়াসে প্রভূত ধনোপার্জ্জনের লিপ্সা ও ধর্ম্মহীন শিক্ষা। যুবকরা বিদ্যালয়ে ও কলেজে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা পাইতেছে, ধর্ম্মশিক্ষা একবারেই পায় না। ইউনিভারসিটীর শিক্ষা ও ছাপ পাইয়াও তাহারা নিজের ও পুত্রকন্যা-পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিতে পারে না, কাযেই যে কোন সময়ে যেরূপ অবস্থাতেই লোক তাহাদিগকে ডাকিয়া বলে যে, 'তোমরা আমার কাছে আইস, আমি তোমাদের চাকরী দিব', অমনই লোক দলে দলে তাহার দিকে ছুটিয়া যায়। অভাবগ্রস্তের সংখ্যা এত অধিক—চাকরীর জন্য এত লোক লালায়িত যে, কেহই ভাল করিয়া দেখিতে চাহেন না যে, ঐ লোকটির চাকরী দিবার ক্ষমতা আছে কি নাই। অধিক উপার্জ্জনের লিপ্সা অতিশয় বলবতী এবং নদীর স্রোতের ন্যায় বেগবিশিষ্ট। প্রত্যেকেরই চেষ্টা, কিসে তাহার কিঞ্চিৎ অর্থসমাগম হয়। অত্যধিক অভাব তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলে, ভালমন্দ-জ্ঞান তাহার থাকে না। সে যে প্রতারিত হইতে পারে, এ ভাবনা তাহার মনে একবারে জাগে না। সে অনন্যমন, হইয়া খালি চাকরীর স্বপ্ন দেখিতেছে। যখন খবরের কাগজে কিম্বা লোকের মুখে চাকরীর কথা শুনে, সে আলুথালু হইয়া চাকরীর জন্য শূন্যে ঝাঁপ দেয়—চাকরীর কথা শুনিলেই সে একবারে জ্ঞানহীন হইয়া পড়ে। যদি কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলে যে, যাহারা চাকরী দিব বলিতেছে, তাহারা জুয়াচোর, তোমার নিকট হইতে কিছু টাকা জুয়াচুরি করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে!—এ কথা শুনিলেও মনে করে, এ ভদ্রলোক আমার অভাব বোঝে না, আমার কষ্ট অনুভব করিতে পারে না, সেই জন্যই আমাকে এই চাকরী করিতে বারণ করিতেছে। আর জুয়াচোররাও জানে যে, মানুষের কি অভাব হইয়াছে, কতদূর অধঃপতন হইয়াছে। চাকরীর নাম শুনিলেই তাহারা উত্তর-পূর্ব্ব না ভাবিয়া—দিক্‌বিদিক না বুঝিয়া সবেগে জাহান্নমের দিকে ছুটিবে।

এক সময়ে আমার সহপাঠী ও আত্মীয় শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র শাহা অল্পদিন চাকরী করিয়া মেডিকেল সার্টিফিকেটের সাহায্যে পেন্সান লইবার পর তিনি বুঝিতে পারিলেন, কর্ম্ম হইতে অবসর লইলে বিশেষ আরাম পাওয়া যায় না। এই বুঝিয়া তিনি চাকরীর চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৫০ বৎসর। অনেক জুয়াচোর চাকরীর জন্য বিজ্ঞাপন দেয়। সেই জাতীয় বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া তিনি কাযের জন্য দরখাস্ত করিতে থাকেন। দরখাস্তের জবাব আসিলে আমার কাছে আসিতেন এবং জিজ্ঞাসা করিতেন, "এই লোক বা কোম্পানী চাকরী দিবার আগে ১ হাজার টাকা জমা চাহিতেছে, আমি এই টাকা দিয়া চাকরী করিব কি না।" প্রত্যেকবারেই খবর লইয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম যে, ঐ বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য চাকরী দেওয়া নহে, অর্থ পাওয়া। আর প্রত্যেকবারেই আমি তাঁহাকে বলিতাম, "নারাণ, তোমার এই চাকরীতে আমার একেবারেই মত নাই।"

এইরূপ পুনঃ পুনঃ বাধা পাইয়া তিনি ৮।১০ যায়গায় চাকরী করিতে যাইলেন না। শেষে বিখ্যাত বড় লোকের বাড়ীর ঠিকানা দিয়া এক জন বিজ্ঞাপন দিলেন—৫ শত টাকা জমা দিলে ৫০ টাকার চাকরী মিলিবে। নারায়ণ বাবু এবার আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলে তখনই আমি বলিয়া দিতাম, যদিও মিঃ ঘোষ কোন রাজ-বাড়ীর ঠিকানা দিয়াছেন, তথাপি তিনি এক জন পাকা জুয়া-চোর। কয়লার কাযে অনেকের সোনা গলাইয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, আমার বন্ধু ৫ শত টাকা জমা দিয়া চাকরী লইলেন। রোজ ১০টায় যান, ৫টায় আসেন। কায কিছুই করিতে হয় না, পাওনা যথেষ্ট! প্রথম লাভ—মাসকাবারি মাহিনার আশা; দ্বিতীয় লাভ—চাকরির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির আশা।

আমার বন্ধুটি ৬ মাস চাকরী করিলেন, একটি কপর্দ্দকও পাইলেন না। শেষে deposit-এর টাকা ফেরত চাহিলে অভদ্রোচিত ভাষায় পুরস্কৃত হইয়া তিনি বিতাড়িত হইলেন। তখন তিনি আসিয়া আমার আশ্রয় লইলেন, সব কথা আমায় খুলিয়া বলিলেন। আমি কীড ষ্ট্রীটে মিঃ কীজের (Mr. Keays) নিকট হইতে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া মিঃ ঘোষকে গ্রেপ্তার করাইলাম। মিঃ ঘোষ আমাকে বিশেষ রকম জানি-তেন। তখন কেবলমাত্র দুইটি কেস তাঁহার বিরুদ্ধে রুজু হইয়াছে;—আমার বন্ধুর ও অপর একটি লোকের। মিঃ ঘোষ যখন জানিতে পারিলেন, আমি এই মোকদ্দমায় বিশেষ interested, তখন এই রফা হইল যে, আমার বন্ধুর টাকা ফেরত দিবেন, কিন্তু আমি তাঁহার বিশেষ বিরুদ্ধাচরণ করিব না। এই স্থানে আমার বন্ধুটির ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কথা না বলিয়া আমি থাকিতে পারিলাম না। যখন মিঃ ঘোষের কাছ হইতে তাঁহার ৫ শত ডুবো টাকা আদায় করিয়া তাঁহার হস্তে দিলাম, তখন বন্ধুবর নারায়ণ বাবু বিশেষ খুসী হইয়া বলিলেন—"তা ভাই, আমার টাকাটি আদায় করিয়া দিলে, ইহা আমার প্রতি তোমার বিশেষ কৃপাদৃষ্টি, তবে ভাই, ৫০ টাকা হিসাবে ৬ মাসে আমার ৩ শত টাকা বাকি, তুমি সেই টাকাটি আদায় করিয়া দিলে আমি বিশেষ সুখী হইব।"

আমি। তুমি কি ৬ মাসে কিছু কায করিয়াছিলে?

নারায়ণ। তা ভাই, না করি, রোজ ত গিয়াছিলাম।

আমি। তুমি কথামালার বাঘ ও বকের কথা মনে কর। ৫ শত টাকা পাইয়াছ যথেষ্ট, আর মাহিনার টাকার নাম করিও না। মাহিনার বিষয়েও তুমি ও মিঃ ঘোষ দুজনেই Quits।

নারায়ণ। তা ভাই, তোমার ফীর টাকা আদায় হইয়াছে?

আমি। না।

নারায়ণ। কেন?

আমি। উপায় নাই। আমি ফী চাহিলে, তোমার টাকা আদায় হইত না।

নারায়ণ। তা ভাই, তোমার ফী যাবে না। তুমি খাটিয়াছ, রক্তওঠা কড়ি, সে টাকা কি কখন যায়? আজ হয়, কাল হয়, ঘোষকে এ ঋণ পরিশোধ করিতেই হইবে। এ জন্মে যদি না পারে, জন্মজন্মান্তরেও তাহাকে এই ঋণ শোধ করিতে হইবে।

আমি তাহার এই গভীর ধর্ম্ম-বিশ্বাস পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলাম—"তা নারাণ, তোমার এই ৫ শত টাকা হইতে আমাকে অন্ততঃ ১ শত টাকা ফী হিসাবে দাও, তাহার পর এ জন্মেই হউক, আর পরজন্মেই হউক, ঘোষ কিম্বা তাহার পরবর্ত্তী বংশধরগণের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইও।" কিন্তু নারায়ণ বাবু তাহাতে বড় রাজী হইলেন না।

যাহা হউক, এই ৫ শত টাকা ফেরত দিবার পর মিঃ ঘোষের নামে ৭।৮টি পুলিস-কেস রুজু হইল। প্রত্যেক মোকদ্দমাতেই প্রকাশ পাইল যে, ঘোষ তাঁহার কয়লার খনিতে চাকরী দিবার নামে আমানত টাকা জমা লইয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেককেই চাকরী দিয়াছেন, কেবল কার্য্যের বন্দোবস্ত করেন নাই ও মাহিনা দেন নাই।

যাহা হউক, এই রকম জুয়াচুরি করিয়া চাকরী দিবার ভাণ করিয়া অনেক জুয়াচোর অনেক যুবাপুরুষকে ঠকাইয়াছেন ও ঠকাইতেছেন। এই যুবাপুরুষরা পতঙ্গবিশেষ। বুঝিতেছেন, এই জলন্ত আগুনের মধ্যে পুড়িয়া মরিবেন, 'কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও সেই আগুনে ঝাঁপ দিতেছেন। মনের ভাব—জানি ত ইহা মিথ্যা; যদি সত্য হয়, তা হ'লে এ'যাত্রায় রক্ষা পাইব। চাকরী দিবার জন্য অনেকগুলি জুয়াচুরি ফারম হইয়াছে। সেই বিষয়ে পাঠক-পাঠিকাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তাঁহারা নিজে কিম্বা তাঁহাদের আত্মীয়রা এ সব কারবে টাকা জমা দিয়া যেন চাকরী না লন।

প্রথম;—এমন কোন কোন ব্যাঙ্ক খোলা হইয়াছে, যাহার

প্রায় বিজ্ঞাপন দিতেছে, ৭০।৮০।৯০ জন Bank Assistant চাই, মাহিনা গুণের তারতম্য অনুসারে। এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া অভাবগ্রস্ত বেকার যুবাপুরুষ দলে দলে দরখাস্ত লইয়া সেই ব্যাঙ্কের আফিসে যাইতেছে। Managing Director বা তাহার Personal Assistant সেই সব চাকরীর উমেদারদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন এবং সাক্ষাতের পর সর্ব্বপ্রথম বলিতেছেন, দেখুন, এই আফিসে চাকুরী পাইতে হইলে কোম্পানীর সেয়ার (Share) কিনিতে হইবে। প্রত্যেক সেয়ারে ১ টাকা অগ্রিম ও ১ টাকা Call money দিতে হইবে এবং সেয়ার কিনিতে যত টাকা দিবেন, তত টাকা মাহিনার চাকরী পাইবেন। এইরূপ প্রলোভন দেখাইয়া ভদ্রবংশীয় গরীব যুবাদিগকে ঠকাইয়া টাকা সংগ্রহ করিতেছে। কায কিছুই নাই, তথাপি দলে দলে লোক নিয়োজিত হইতেছে। দুই চার মাস পরেই সাবানের ফেনা ফাটিয়া যাইতেছে। প্রতারিত ব্যক্তিরা আদালতের আশ্রয় লইতেছে। পুলিস হাকিমের হুকুমমত তদারক করিয়া আসামী চালান দিতেছে, তখন আসামীরা উচ্চকণ্ঠে বলিতেছে—"দেশ অরাজকতায় পুরিয়া গিয়াছে। আমরা ব্যবসা করিব বলিয়া আফিস খুলিলাম, আর দেশে কি পুলিসের অত্যাচার, তাহারা আসিয়া আমাদের চলন্ত কারবারটি মাটী করিয়া দিল। দেশে আর ধর্ম্ম নাই। এই সব অত্যাচারের জন্য ইংরাজ রাজত্ব নিশ্চয়ই ধ্বংস হইয়া যাইবে"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ;—কোন কোন টি-কোম্পানী লিমিটেড।

এখানেও একই পদ্ধতি। ৭০।৮০ বা ৯০ জন কেরাণীর প্রয়োজন। এই প্রকার বিজ্ঞাপন অনেকগুলি কাগজে প্রকাশিত হইল। সেই বিজ্ঞাপন দেখিয়া অভাবগ্রস্ত বেকারদল ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিল। ম্যানেজার তখন তাহাদিগকে বলিলেন, এ কোম্পানীতে সেয়ার না কিনিলে চাকরী হইবে না। চাকরী পাইবার লালসায় তাহারা দলে দলে সেয়ার কিনিল। যত টাকার সেয়ার কিনিল, তত টাকার মাহিনার চাকরী। তার পর উপরি-উক্ত ব্যাঙ্ক কোম্পানীর যাহা হইয়াছে, তাহাই হইল। এইখানে বলিয়া রাখা উচিত, চাকরী দিবার বিজ্ঞাপনে টাকা গচ্ছিত রাখিবার কিম্বা সেয়ার কিনিবার কোন কথা নাই, যখন চাকরীর উমেদাররা ম্যানেজারের সহিত দেখা করিল, তখন সেই প্রস্তাব প্রথম করা হইল। আর সামান্য ১ শত টাকার সেয়ার কিনিলে ১ শত টাকার চাকরী হইবে শুনিলে লোক যেমন করিয়া হউক টাকা আনিয়া দেয়। এই সব প্রতারিত লোকের অবস্থা দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। কেহ বাড়ী বন্ধক দিয়া, কেহ স্ত্রী-কন্যা ও পুত্রবধূর গহনা বন্ধক দিয়া, কেহ ঘটি-বাটি বেচিয়া, কেহ বা পরনের কাপড়-জামা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া এই শ্রেণীর কোম্পানীতে সেয়ার কিনিয়াছে। ২।৩ মাস অফিসে হাঁটাহাঁটির পর যখন বুঝিতে পারিল যে, অফিসটি একটি জুয়াচুরির আড্ডা, তখন তাহারা একবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল, অনন্যমনে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিল। ধর্ম্মের রাজত্বে তাহাদের অবিশ্বাস জন্মিল। কত লোক দেশত্যাগী হইল। এই জুয়াচোররা অনেক সময়ে বিশেষ সুবিধা করিতে পারে না, তবে নিজেদের সুবিধা করিতে পারুক আর না পারুক, প্রবলবেগে অপরের সর্ব্বনাশ করিতেছে। পাঠকগণ বিশেষ সাবধান হউন।

শ্রীতারকনাথ সাধু (রায়বাহাদুর)।

মানসী

নন্দনচারিণী তুমি ষোড়শী তরুণী,
সৌন্দর্য্য-তরণী বাহি বঞ্জুল যৌবনে,
এলে এ পুষ্পিত কুঞ্জে কল্পনার রাণী,
মুগ্ধ ধরণী হেরি অপূর্ব্ব আননে।

চূর্ণ-কুন্তল উড়ে মলয়-হিল্লোলে,
অশোক-কিংশুক-রাগে রঞ্জিত চরণ,
জোছনা-জড়িত অঙ্গে লাবণ্য উছলে,
রূপ-রস-গন্ধস্পর্শে ধরা অচেতন!

কলকণ্ঠে মুগ্ধ পিক মানসী সুন্দরী—
বসন্তে বিভ্রম চিত্ত কার কর চুরী?

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়।

বিমানপোতে হরিণ-শিকার

আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলে বিমানপোতে চড়িয়া হরিণ শিকার করা হইয়া থাকে। ব্যোমপথে বিচরণকালে বহু উচ্চস্থান হইতে হরিণ দেখিতে পাইয়া পোতারোহী শিকারী ধীরে ধীরে

বিমানপোতে হরিণ-শিকার

নীচে নামিয়া আসে। তবে খুব নীচে বিমানপোতকে আনয়ন করা হয় না। কারণ, তাহা হইলে হরিণ পলাইয়া যাইতে পারে। দূরবর্ত্তী উচ্চ স্থান হইতে গুলী করিয়া হরিণ শিকার করা হয়। খুব বৃহদাকার না হইলে বিমানপোতের ডানার উপর নিহত হরিণগুলিকে তুলিয়া লওয়া হয়।

হংসাকৃতি নৌকা

বালক-বালিকাদিগের জন্য ইংলণ্ডে সংপ্রতি চিত্তাকর্ষক এক

হংসাকৃতি দাঁড়বিহীন নৌকা

শ্রেণীর নৌকা নির্ম্মিত হইতেছে। এই নৌকাগুলির আকার হংস প্রভৃতি জলচর পক্ষীর ন্যায়। নৌকাগুলির উপরিভাগে মোটরগাড়ীর ন্যায় চালন-চক্র বিদ্যমান। এই চালন-চক্রের সহিত নৌকার নিম্নভাগে জল কাটিবার পাদানি ও দাঁড়জাতীয় বস্তুর সংযোগ আছে। চক্রের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নৌকা চলিতে থাকে। এজন্য নৌকা-চালনের বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের প্রয়োজন হয় না। পূর্ণবয়স্কদের জন্যও এই শ্রেণীর বড় নৌকা নির্ম্মিত হইতেছে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে, এই শ্রেণীর নৌকা ঘণ্টায় ৩ হইতে ৪ মাইল পথ অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারে।

জার্ম্মাণীর চলমান ধর্ম্ম-মন্দির

বড় নৌকার উপর ধর্ম্ম-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া জার্ম্মাণীর সহরে সহরে নদীপথে ঐ ধর্ম্ম-মন্দির যাত্রা করিয়া থাকে। এই ধর্ম্ম-মন্দির

চলমান ধর্ম্ম-মন্দির

আকার ও প্রকারে স্থলের ধর্ম্ম-মন্দিরের অনুরূপ। যে সকল পল্লীতে ধর্ম্ম-মন্দির নাই, তত্রত্য অধিবাসীদিগের ঈশ্বরোপাসনার

সুবিধার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা। জার্ম্মাণীর জনসাধারণ এখনও ঈশ্বরকে ও ধর্ম্মকে বাতিল করে নাই।

মোটরে বিলাসিনীর ছত্র

মোটর গাড়ীতে চড়িয়া দোকানে, থিয়েটারে গেলেও বিলাসিনীর ভোগপুষ্ট দেহে রৌদ্রের তাপ বা বৃষ্টির জল লাগিবার সম্ভাবনা। সে অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য ছত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু মোটর গাড়ীর মধ্যে ছত্র রাখিবার সু-ব্যবস্থা না করিলে, সৌন্দর্য্যহানি হইয়া থাকে। এ জন্য ইংলণ্ডের কোনও মোটর গাড়ী-বিক্রেতা এক-প্রকার ছোট এবং সুদৃশ্য ছত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মোটরগাড়ীর দরজার গায় ছত্র রাখিবার একটি আধারও নির্ম্মিত হইয়াছে। এই আধারটি ধাতব দ্রব্যে নির্ম্মিত এবং উহার উপরিভাগ সুদৃশ্য চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত। আধারের নিম্নভাগে একটি ধাতব বাটি আছে। তন্মধ্যে পেঁজা স্পঞ্জ-রবার রক্ষিত। ছত্র ও আধারের স্বরূপ বর্ণিত চিত্রে হইতে উপলব্ধ হইবে।

মোটরগাড়ীতে বিলাসিনীর ছত্র

চরণসাহায্যে দাঁড় টানা

জলক্রীড়ার জন্য ডোঙ্গার আকারবিশিষ্ট ছোট ছোট তরী নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে সাধারণ দাঁড় বা হাল নাই। চরণ দ্বারা তাড়িত দাঁড়ের সাহায্যে নৌকা চলিতে থাকে। চিত্র দেখিলেই সমস্ত বুঝিতে পারা যাইবে। তরুণীরা এইরূপ এক একখানি নৌকা লইয়া জলক্রীড়া করিয়া থাকে।

চরণসাহায্যে দাঁড় টানা

তুষারাচ্ছন্ন বৈদ্যুতিক আলোক

আভিয়নডাকস্‌এর প্লাসিড হ্রদ শীতকালে তুষারে জমিয়া যায়। তখন তাহার উপর দিয়া স্কেট-ক্রীড়কগণ নৈশ ক্রীড়া করিতে পারেন। গত বৎসরে শীতকালে এই হ্রদের ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষ বৈদ্যুতিক আলোকোদ্ভাসিত কাচের আধারগুলি নানা ভাবে হ্রদের উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। তুষারপাত বশতঃ যখন হ্রদের জল জমিয়া গিয়াছিল, তখন বাল্‌বগুলি হইতে বৈদ্যুতিক আলোকদীপ্তি তুষাররাশি ভেদ করিয়া রাত্রিকালে সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইত। স্কেটবিহারীরা এই তুষারাবৃত আলোক সাহায্যে হ্রদের উপর ক্রীড়া করিতে পারিয়াছিলেন। চিত্র হইতে ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হইবে।

তুষারাচ্ছন্ন বৈদ্যুতিক আলোক

ইস্পাতের কেতাব

কালিফের ওক্‌ল্যাণ্ড নামক স্থানে রাজপথের আলোকস্তম্ভসমূহের গাত্রে ইস্পাতের কেতাব দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই কেতাবে পথ-ঘাটের নক্সা প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় সংবাদ পরিব্রাজকের সুবিধার জন্য লিপিবদ্ধ থাকে। ইস্পাতের কেতাবের পাতাগুলি ৬ ইঞ্চি প্রশস্ত এবং ১৬ ইঞ্চি দীর্ঘ।

ইস্পাতের কেতাব

অগ্নিনিবারক কম্বল

পশমনির্ম্মিত এক প্রকার কম্বল সম্প্রতি বাজারে বাহির হইয়াছে, উহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না; কীট-দষ্ট হইবার আশঙ্কাও নাই। এই কম্বল খুব ছোট নহে। এক জন লোক এই কম্বলে সমগ্র দেহ আবৃত করিয়া অগ্নির মধ্যে যাইতে পারে। এক খানি রোলারে কম্বলটি জড়ান থাকে। প্রয়োজনকালে স্বল্পায়াসে উহা গায় জড়াইয়া লওয়া চলে, এমনই ব্যবস্থা আছে। যখন প্রয়োজন থাকে না, তখন উহাকে খাড়া 'রোলারে' গুটাইয়া রাখা হয়।
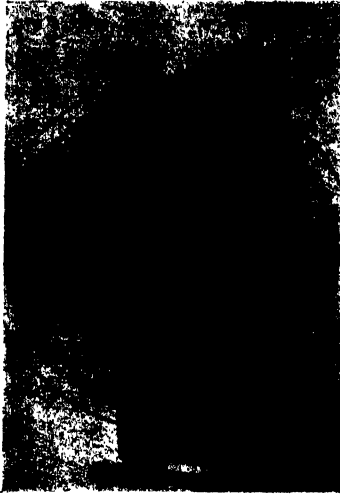
অগ্নিনিবারক কম্বল

এমন সময়ে যদি অকস্মাৎ মেঘ করিয়া বৃষ্টি হইতে থাকে, তখন ১৫ সেণ্ট ব্যয় করিলেই একটি ছত্র লাভ হইবে।

রবার-নির্ম্মিত বিচিত্র ডেস্কপ্যাড

আমেরিকার বাজারে সংপ্রতি মিশ্ররবার-নির্ম্মিত একপ্রকার ডেস্কপ্যাড নির্ম্মিত হইয়া বাহির হইয়াছে। এই ডেস্ক'প্যাড'এর উপর ধূলা, ময়লা সঞ্চিত হইতে পারে না। কালী পড়িলে তাহাতে দাগ হয় না। ব্লটিং কাগজের প্যাডে যেমন কালীর চিহ্ন থাকে, ইহাতে সে সকল কোন বালাই নাই। চুরুটিকা ধরাইয়া যদি রবার প্যাডের উপর রাখা যায়, তাহা হইলে কোনও দাগ পড়ে না। এই প্যাডের উপর কাগজ রাখিয়া লিখিবার সময় কাগজ সরিয়া যায় না, কাযেই এক হাতে লেখার কায বেশ চলে। এই রবার ডেস্কপ্যাড দীর্ঘস্থায়ী।
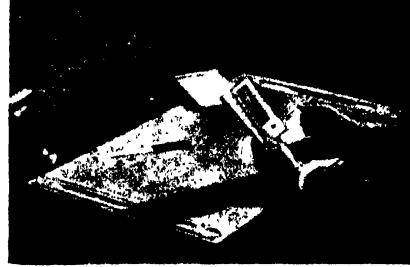
রবারের বিচিত্র ডেস্কপ্যাড

বিচিত্র উপায়ে ছত্রসরবরাহ

বার্লিনের রাজপথে ছত্রবিক্রয়ের জন্ত যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই যান্ত্রিক আধারের মধ্যে ছত্র সঞ্চিত থাকে। ১৫ সেণ্ট মূল্যের মুদ্রা যন্ত্রের গাত্র সংলগ্ন ছিদ্রপথে ফেলিয়া দিলেই একটা ছাতা বাহির হইয়া আসিবে। এই ছত্র অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী নহে। উহা পালিশ-করা কাগজে নির্ম্মিত। তবে বার্লিনের এক পশলা বৃষ্টি হইতে ইহার সাহায্যে আত্মরক্ষা করা চলে। পথিক পথ চলিতেছে, সহসা বৃষ্টির আশঙ্কা নাই,

ছত্রসরবরাহের বিচিত্র ব্যবস্থা

অগ্নিনিবারক তৃণনির্ম্মিত প্রাচীর

তৃণ বা খড় সহজেই অগ্নিসংযোগে জলিয়া উঠে। কিন্তু এই তৃণ বা খড়কে বৈজ্ঞানিক উপায়ে অদাহ্য বস্তুতে পরিণত করা যায়। বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভবপর হয়। সংপ্রতি বার্লিন সহরে এইরূপ অদাহ্য তৃণনির্ম্মিত প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়া প্রদর্শিত হইয়াছিল। যাঁহারা এইরূপ তৃণ-প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, ইহা দ্বারা যে কোনও অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলে, কখনই তাহা আগুনে

তৃণনির্ম্মিত অদাহ্য প্রাচীর

পুড়িবে না। শুধু তাহাই নহে, তৃণ-প্রাচীর সহজে ঋতুর প্রকোপে ধ্বংসপ্রাপ্তও হইবে না।

দুইটি শীর্ষবিশিষ্ট ডাব

প্রত্যেক ডাবের একটি করিয়া শীর্ষই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে প্রকৃতির খেয়ালে অনেক অস্বাভাবিক দৃশ্যও দেখা যায়। শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর শ্রীমানী মহাশয় প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহোদয়ের মারফৎ একটি

দুইটি শীর্ষবিশিষ্ট ডাব
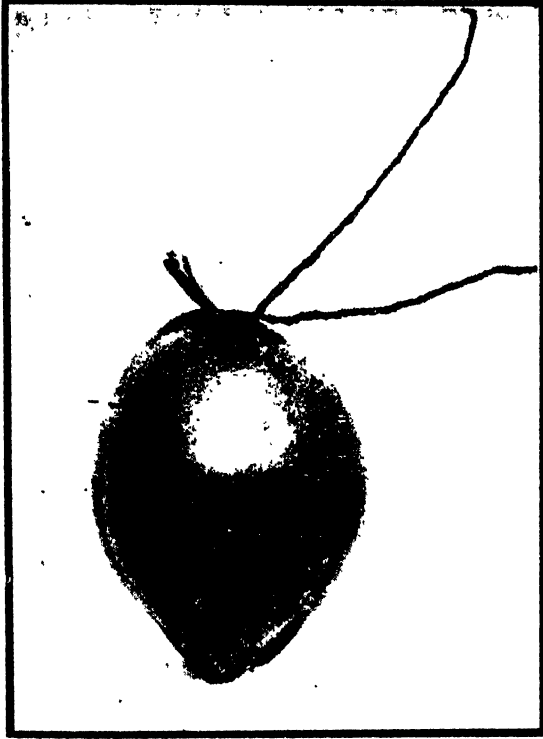
যুগল শীর্ষবিশিষ্ট নারিকেলের আলোকচিত্র পাঠাইয়াছেন। আমরা পাঠকবর্গকে চিত্রযোগে তাহা উপহার দিলাম।

বৈজ্ঞানিক কৌশল

আমেরিকায় কোনও কৃষক-ভবনে গরু, মহিষ প্রভৃতির জন্য জলের আধার জলপূর্ণ করিয়া রাখা হয়। আধারমধ্যে যখন জল কানায় কানায় পরিপূর্ণ থাকে, তখন কল হইতে জল পড়া আপন হইতেই বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু জল কমিয়া গেলেই আবার নল হইতে জল নিঃসৃত হইতে থাকে। স্প্রীংযুক্ত একটি পাটাতনের উপর টবটি বসান থাকে। নলের সহিত স্প্রীংয়ের উপরস্থিত টবটির এমন সংস্রব আছে যে, জল পূর্ণ হইলেই উহার চাপে স্প্রীং নামিয়া যায়, অমনই নল হইতে জল পড়া বন্ধ হয়। আবার জল কমিয়া গেলেই টব উপরে উঠে এবং আপনা হইতে জল বাহির হইতে থাকে। ছবি দেখিলেই ব্যাপারটি বুঝিতে পারা যাইবে।

বিজ্ঞানের কৌশল

প্রকৃতির খেয়াল

শ্রীযুক্ত শেঠ মহাশয় একটি পেঁপের চিত্র পাঠাইয়াছেন। উহার মধ্যে ফুলের কুঁড়ির মত একটি পদার্থ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

পেঁপের ভিতর ফুলের কুঁড়ি

প্রকৃতির খেয়ালেই ইহার উদ্ভব। এই পেঁপেটি শ্রীযুক্ত হরিহর বাবুর পরিচিত শ্রীযুক্ত ভজকৃষ্ণ পাল মহাশয় তাঁহার কাছে পাঠাইয়াছিলেন।

নূতন খাতা

১

বিঘা চল্লিশ পঞ্চাশ জমীর উপর খান পাঁচ সাত খোড়ো বাড়ী লইয়া গ্রামের বোষ্টম-পাড়াটি একবারেই রেল-ষ্টেশনের গায়ে ছিল। আম, জাম, শিরীষ, কদম, বকুল প্রভৃতি তরুচ্ছায়া-ঢাকা এই পাড়াটি যেন গ্রাম-ছাড়া একটি কুঞ্জবন। ইহারই উত্তর-পশ্চিমদিকে গাঁয়ের দক্ষিণ মাঠ, আর সেই ক্ষেত কয়খানি পার হইলেই গ্রাম।

দিবসের প্রথম সূর্য্যকিরণপাত এই পাড়ার গাছে গাছে, কুটীরে কুটীরে সর্ব্বাগ্রে আসিয়া পড়ে। বর্ষার প্রথম বাদল-ধারা যখন নামে, তখন হয় ত পূবে হাওয়ার ঝাপ্টাতে বোষ্টম-পাড়ার মাটীই সর্ব্বাগ্রে অমৃতধারায় সিক্ত করিয়া যায়। দক্ষিণে রেল-লাইন, তার পরই ধূ ধূ মাঠ। সেই মাঠ দিয়া বসন্তের প্রথম বাতাস এই পথ দিয়াই গ্রামে গিয়া ঢোকে। 'চোখ গেল,' 'বসন্ত বাউরী', 'কেষ্ট গোকুল', 'গৃহস্থের খোকা হোক' প্রভৃতি পাখীরা এই পাড়াটির গাছে গাছেই সর্ব্বপ্রথমে দেখা দিয়া কলরব সুরু করিয়া দেয়।

বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস বৈরাগী তাহার কুটীরের দাওয়ায় বসিয়া এই সব দেখে শুনে, উপভোগ করে। তাহার বৈরাগী জীবনের দীর্ঘ ৬৫ বৎসরকাল ইহারই মধ্যে এমনই করিয়াই কাটিয়া গিয়াছে।

সে শুধু নামেতেই বৈরাগী নহে, সত্যই সে বৈরাগী। তাহার কেহই ছিল না—কিছুই ছিল না। থাকিবার মধ্যে বাসের এই কুটীর আর গান গাহিবার একটি একতারা, ইহাই ছিল তাহার সম্পত্তি। আর ছিল তাহার সুদীর্ঘ বৎসরের জীর্ণ দেহখানি আর তাহারই মধ্যে পুরাতন দিনের স্মৃতি-বিজড়িত তাহার অন্তর, আর সেই অন্তরের মধ্যে, অতি যত্নে অতি গৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার অন্তরের অন্তর্য্যামী। কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণেরই দাস, রাধারাণীর চরণাশ্রিত পরম ভক্ত।

গান গাহিয়া, ভিক্ষা করিয়াই তাহার দিন চলে। আগে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিত, এখন আর ঘুরিতে পারে না, সামর্থ্যের অভাব বোধ করে। তাই এখন বৃদ্ধ অন্য পথ ধরিয়াছে। এখন রেল-কোম্পানীর মাস-টিকিট কিনিয়া, একতারাটি হাতে লইয়া গাড়ীতে গাড়ীতে গান গাহিয়া ফিরে। তাহাতেই যাহা কিছু পায়, তাই দিয়াই তাহার দিন চলে।

সে দিন নূতন বৎসরের প্রথম দিনে, শরীর তাহার একটু খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। গান করিতে বাহির হইবার সে দিন তাহার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু একটি টাকা, অন্ততঃ পক্ষে আট গণ্ডা পয়সা সে দিন তাহার চাই-ই, গ্রামে নূতন খাতার নিমন্ত্রণ হইয়াছে—দিতে হইবে।

গাঁয়ের কোন দোকানেই তাহার ঋণ থাকে না, ছিলও না। কিন্তু প্রতিবৎসরই নূতন খাতার উপলক্ষে গ্রামের দোকান কয়খানি হইতে তাহার নিমন্ত্রণ হয়। ভালবাসিয়া সকলে যখন তাহার মত ভিখারীকে নিমন্ত্রণ করে, তখন না গিয়া সে-ও পারে না। আর, নূতন খাতার নিমন্ত্রণ, যাইলেই কিছু দিয়া আসিতে হয়। চারিটি দোকান—চারি আনা করিয়া দিলেই ভাল হয়, অন্ততঃ পক্ষে দুই আনা। তাই, সকাল সকালই সে দিন কৃষ্ণদাস তাহার একতারাটি হাতে লইয়া কুটীর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

..

মগরা হইতে ব্যাণ্ডেল, এই পথটুকুই সে গাড়ীতে গাড়ীতে যাতায়াত করে।

সে দিন অসুস্থ শরীরে, ভাল করিয়া গানগুলি সে গাহিতে পারিতেছিল না। চেষ্টা করিয়াও সুরের মধ্যে কোন মাধুর্য্য যেন সে দিন সে আনিতে পারিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, কণ্ঠের সঙ্গে একতারাটিও যেন সে দিন একযোগ হইয়া ভাল করিয়া তেমন বাজিতেছে না। তাই অপরাহ্ণ-সময়ে ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে গাড়ীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া কৃষ্ণদাস ভাবিল, আর সে ক্ষেপ দিবে না, এই গাড়ীতেই বাড়ী ফিরিয়া যাইবে। ভিক্ষার পয়সাগুলি গণিয়া দেখিল, পুরা আট আনা তাহার হয় নাই, দুই পয়সা কম। ফিরিবার এই গাড়ীতে দুই চারি পয়সা অবশ্য তাহার উঠিয়া যাইবে।

৩

ঢং ঢং করিয়া গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল, গার্ডের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। কৃষ্ণদাস একখানি কামরায় উঠিয়া গান ধরিতে যাইতেছিল, কিন্তু বাধা আসিয়া পড়াতে সে গান ধরিতে পারিল না। ও দিকে জানালার ধারে একটি স্ত্রীলোককে লইয়া একটা গোলমাল তখন বাধিয়া উঠিয়াছিল।

স্ত্রীলোকটি আধা-বয়সী, থান পরা; কপাল পর্য্যন্ত তাহার মাথার কাপড় টানা ছিল। ভয়ব্যাকুল-নেত্রে সম্মুখে দণ্ডায়মান চেকার বাবুর (ক্রু) দিকে চাহিয়া সে বলিতে-ছিল—"দোহাই বাবা,—আমি মিথ্যে বলছি না। ছিরামপুর থেকে উঠিছি, মগরায় যাব. টিকিস্ দু'খানা আমার ভেয়ের কাছে আছে।"

চেকার তর্জ্জন করিয়া, গাড়ীর কাঠের মেজের উপর বুটের ঠোক্কর মারিয়া কহিল,—"আরে মাগী, কোথায় তোর ভাই, তাই দেখিয়ে দে না। উ-ই ওধারে পা ঝুলিয়ে ওপরে যে ব'সে রয়েছে—ওই ?"

স্ত্রীলোকটি একবার উদ্ধপানে সেই দিকে তাকাইয়া, এক-গাড়ী লোকের মধ্যে যেন থতমত খাইয়া কহিল,—"না বাবা—ও নয়। গাড়ীতে উঠে তাকে আর দেখতে পাইনি।"

"তা হ'লে পয়সা বা'র কর, ও সব কথা আমি শুনতে চাই না, শীগ্গীর পয়সা বার কর" বলিয়া চেকার বাবু হস্তস্থিত বাঁধান নোট-বইয়ের মলাটের উপর পেন্সিলটি ক্রমাগত ঠুকিতে লাগিল।

"পয়সা ত আমার কাছে নেই, বাবা। সবই যে তার কাছে। তুমি এতবার বলছ, থাকলে আর দিই না? ভাই আমার কোথায় গেল গো!" বলিয়া স্ত্রীলোকটি গাড়ীর চারিদিকে সেই অসংখ্য লোকের মধ্যে ভীতিবিহ্বল-নয়নে তাহার ভাইয়ের খোঁজ করিতে লাগিল।

কৃষ্ণদাস একটি ধারে দাঁড়াইয়াছিল, দাঁড়াইয়াই রহিল।

প্যাসেঞ্জারদের মধ্য হইতে এক জন কহিল,—"নষ্টামী—নষ্টামী, আজকাল মেয়ে-জোচ্চোরের সংখ্যাটা ক্রমে বেড়ে উঠছে।"

আর এক জন কহিল,—"সে দিন, মশাই, লিলুয়াতে এই রকম একটা মাগী—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া ওদিক হইতে, সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে একটি বাবু বলিয়া উঠিল,—"এরা সব পুরুষ-জোচ্চোরের ওপরে যায়! উঃ, কি মৎলবটা দেখুন একবার।"

আর একটি ভদ্রলোকের হাতে একখানি ইংরাজী সংবাদ-পত্র ছিল। তিনি চোখের চশমাখানি খুলিয়া কাপড়ে তাহার কাচ মুছিতে মুছিতে কহিলেন,—"দেশের কি দুর্দ্দশা, দেখুন সব একবার। এই দেশকে কি না গন্ধীজী—"

গাড়ী তখন পূর্ণবেগে ত্রিশবিঘা ষ্টেশনাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছিল।

স্ত্রীলোকটি চেকারের মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—"দোহাই বাবা, ওপরে ভগবান্ আছেন, জোচ্চোর নই, বাবা। আমায় না হয় এই তিরিশবিঘেতেই নামিয়ে দাও, বাকী পথ হেঁটেই যাবো, কিন্তু ভাই আমার—"

চেকার গর্জ্জাইয়া উঠিয়া কহিল,—"ভাড়া না দিলে, তোকে, মাগী, গাড়ী থেকে নামতেই দেবো না। আমার সঙ্গে সেই বৰ্দ্ধমান পর্য্যন্ত তোকে যেতে হবে। সেখানে তোকে পুলিসের হাতে দেবো। দেখি, কত বড় জোচ্চোর মেয়ে-মানুষ তুই।"

স্ত্রীলোকটি আর কোন কথা না বলিয়া, মুখ ঢাকিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। তখন প্যাসেঞ্জারদের ভিতরে তাহাকে লইয়া খুব একটা আন্দোলন—আলোচনা চলিতে লাগিল। কেহ বলিল—"পুলিসের হাতে দেওয়াই ঠিক," কেহ বলিল—"পুলিসকে ওরা থোড়াই কেয়ার করে", কেহ বলিল—"মাগী এই বয়সে হয় ত মগরার গঞ্জে অভিসারে বেরিয়েছে হে।"

ইতিমধ্যে গাড়ী ত্রিশবিঘা ষ্টেশনে আসিয়া, দুই মিনিট থামিয়া আবার মগরার দিকে ছুটিয়া চলিল।

৪

মগরায় আসিয়া গাড়ী থামিলে স্ত্রীলোকটি নামিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই চেকার তাহার হাত ধরিয়া জোরে বসাইয়া দিয়া কহিল,—"ভাড়া না দিয়ে যাস্ কোথা মাগী, বোস ঐখানে।" স্ত্রীলোকটি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।

কৃষ্ণদাস ধীরে ধীরে চেকার বাবুর সম্মুখে আসিয়া কহিল,—"কত ভাড়া ওর দিতে হবে, বাবু?"

সকলের দৃষ্টি তখন কৃষ্ণদাসের উপর পড়িল।

কে এক জন, অন্য এক জনকে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কহিল, —"ভাই, এইবার যে দেখা দিয়েছে হে।"

যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছিল, সে কহিল,— "নেড়া-নেড়ীর ব্যাপারই এই রকম। এতক্ষণ চেষ্টা ক'রে দেখছিলো, ভাড়াটা না দিয়ে চলে কি না। খুব কড়া চেকার, তাই সুবিধে কত্তে পারলে না, নইলে—"

কৃষ্ণদাস চেকারের দিকে চাহিয়া আবার কহিল,—"আমি অনেক দিন থেকে গাড়ীতে গান গেয়ে, ভিক্ষে ক'রে বেড়াই, —আপনাকে এর আগে দেখিনি, আপনি কি নতুন এসেছেন, বাবুমশাই ? তা হ'লে শ্রীরামপুর থেকে মগরা, মেয়ে লোকটির কত ভাড়া লাগবে ?"

চেকার কহিল,—"হাওড়া থেকে ভাড়া লাগবে,—আট-আনা দিতে হইবে।"

ঢং ঢং করিয়া গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কৃষ্ণ-দাস তাড়াতাড়ি হাতের পয়সাগুলি চেকার বাবুর হাতে দিয়া কহিল,—"সাড়ে সাত আনা আছে। দুটো পয়সা আমি এক দিন আপনার হাতেই দিয়ে দেবো, বাবু,—এস মা-লক্ষ্মি" বলিয়া কৃষ্ণদাস স্ত্রীলোকটির হাত ধরিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল।

সেই সময় পাশের গাড়ী হইতে একটি ২৪২৫ বৎসরের যুবক বিড়ি টানিতে টানিতে নামিয়াই, সম্মুখে যেখানে কৃষ্ণদাস ও স্ত্রীলোকটি দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানে আসিয়া কহিল,—"এই যে দিদি, তুমি নেমে পড়েছ। তোমায় ব'লে যেতে সময় পেলুম না। তোমায় তুলে দিয়ে বিড়ি কিন্‌তে গিয়ে দেখি, পাশের গাড়ীতে কুঞ্জলাল ব'সে রয়েছে। তাই তার গাড়ীতে উঠে তার সঙ্গে এতক্ষণ গল্প কচ্ছিলুম। এস।"

স্ত্রীলোকটি কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে কৃষ্ণদাসের দিকে একবার চাহিল। কৃষ্ণদাস কহিল—"এস মা-লক্ষ্মি।"

৫

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

দ্বাদশীর চাঁদ কৃষ্ণদাসের কুটীরের সম্মুখের কদম-গাছের মাথায় উঠিয়া, তাহার কুটীর-প্রাঙ্গণ, দাওয়ার সর্ব্বত্র স্নিগ্ধ-মধুর আলোকে ভাসাইয়া তুলিয়াছিল।

কৃষ্ণদাস দাওয়ার উপর একখানি তালপাতার চেটাই বিছাইয়া বসিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছিল :—

"কেলে সোনা কতই চতুর, (ও তোর) কতই চাতুরী
রাধারাণীর কাছে যে তোর ভাঙ্গলো জারিজুরি ॥"

তখন দক্ষিণের উন্মুক্ত প্রান্তর বহিয়া নূতন বৎসরের নূতন বাতাস ঝির-ঝির করিয়া বহিয়া আসিতেছিল।

বাহির হইতে পাড়ার কে এক জন হাঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"নতুন খাতায় যাবে না, দাদা ? আমরা যাচ্ছি সব।"

কৃষ্ণদাস ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল,—"নতুন খাতায় আজ বেলাবেলিই জমা দিয়ে এসেছি, ভাই। দুটো পয়সা খালি বাকী রয়ে গেল" বলিয়া কৃষ্ণদাস তাহার গানখানি গাহিতে লাগিল :—

"তোকে ধোরবো এবার, বাঁধবো এবার,
পায়ে দেবো বেড়ি।
সেই পায়েতে লুটিয়ে প'ড়ে—খাবো গড়াগড়ি
(অ মন) খাবো গড়াগড়ি ॥"

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

স্বরূপ

সত্য যেথায় গুপ্ত রহে
মিথ্যা আবরণে,
মর্ম্ম সেথায় গুমরে কাঁদে
মুক্তি-আবাহনে।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ রায়

রহস্যের খাসমহল
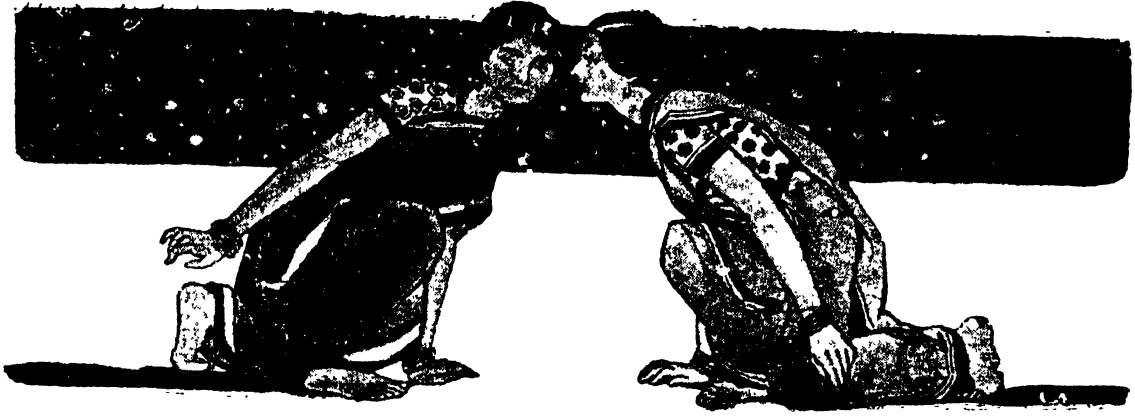
ষোড়শ প্রবাহ

যোয়ানের গুপ্ত-কথা

জিলরয় সেই কক্ষের দ্বার খুলিলে একটি বৃদ্ধা তাহার অন্য প্রান্ত হইতে আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্ত্রীলোকটি খর্ব্বাকৃতি; তাহার সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে আবৃত। বয়স প্রায় ৭০ বলিয়াই অনুমান হইল; কিন্তু তাহার চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল; পাকা-চুলে সীঁথির বাহার ছিল! নাক লম্বা এবং অস্থিসার মুখ অত্যন্ত কদাকার। লণ্ডনের বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে প্রহসনের অভিনয় উপলক্ষে যে সকল হাস্যোদ্দীপক চেহারার বৃদ্ধার সমাগম হইয়া থাকে, এই বৃদ্ধার আকার-প্রকার ঠিক সেই রকম। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার হাস্যসংবরণ করা কঠিন।—বেটী যেন যাত্রার দলের সং!

সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া, গলার ভিতর হইতে কাঁসরের মত আওয়াজ বাহির করিয়া বলিল, "ওগো ভদ্দর মশায়রা, আপনাদের কথাবার্ত্তাগুলা সবই আমি শুনেছি। না শুনে কি করি? কাণের মাথা ত খাইনি। আজ রাত্তিরে মিঃ জিলরয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসা আমার যে কত ভাগ্যির কথা, তা আপনারা কি ক'রে বুঝবেন? আমি এখানে এসেছিলাম ব'লেই ত—"

বৃদ্ধাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া জিলরয় বলিল, "এখানে আসিয়া খাসা কায করিয়াছ, এখন আর এক কায কর। তোমার সম্মুখে যে ভদ্রলোকটিকে দেখিতেছ, তাঁহাকে বুঝাইয়া দাও যে, তুমিই যোয়ানের অপরাধের একমাত্র সাক্ষী। মিসেস্ ম্যাক্সওয়েল, তোমার কাছেই আমি আসল গুপ্ত-কথাটি জানিতে পারিয়াছি। আমি উহা আর কাহারও কাছে জানিতে পারিতাম না।"

জিলরয়ের কথা শুনিয়া সেই কৃষ্ণবসনা, বিকটবদনা বিগলিতদশনা বৃদ্ধা সগর্ব্বে হাসিয়া মাথা নাড়িল, যেন সেইরূপ কঠিন কায সে ভিন্ন আর কেহই করিতে পারিত না!

জিলরয় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সেই রাত্রির দুর্ঘটনার কথা আমি এই ভদ্রলোকটিকে বলিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা যে সম্পূর্ণ সত্য, ইহা উনি হয় ত বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। যাহাতে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহাই তোমাকে করিতে হইবে। তুমি যাহা দেখিয়াছিলে, তাহা ঠিকভাবে বলিতে পারিলেই উনি বিশ্বাস করিবেন।"

আমি তাহাদের উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "যোয়ান কুপার নর-হত্যা করিয়াছে—এ কথা তোমরা আমাকে বিশ্বাস করাইতে পারিবে না। যাহা বিশ্বাসের অযোগ্য, তাহা আমি বিশ্বাস করিব না।"

জিলরয় ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "এই স্ত্রীলোকটির যাহা বলিবার আছে, তাহা শুনিতে বোধ হয় আপনার আপত্তি নাই? মিসেস্ ম্যাক্সওয়েল, তুমি যাহা জান, সমস্তই আমাদের কাছে বল।"

বৃদ্ধা বলিল, "এই ভদ্দোর লোক যদি শুন্‌তে চান, তা হ'লে সে সকল কথা বল্‌তে আর আমার আপত্তি কি? আমি যা জানি, তা ওঁকে বল্‌তে রাজী আছি। এক দিন হয় ত আমাকে আদালতে গিয়েই হাকিমের কাছেও ঐ সকল কথা বল্‌তে হবে। কি বলেন আপনি?"

আমি বলিলাম, "বেশ ত, আদালতে যদি তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হয়, তখন সেখানে গিয়া হলফ করিয়া সকল কথা বলিও। কথাগুলি আমাকে বলিবার জন্য তোমার আগ্রহ হই-য়াছে—তুমি তাহা বলিতে পার, আমি শুনিতে প্রস্তুত আছি।"

বৃদ্ধা জিলরয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তবে বলি সব কথা ?"

জিলরয় বলিল, "হাঁ, তুমি যাহা জান, সমস্তই মিঃ কোলফাক্সকে বল, তাহা শুনিলে উঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইতেও পারে।"

বৃদ্ধা উত্তেজিত স্বরে বলিল, "সত্য কথা বল্‌তে আর আমার ভয় কি ? সেই ছুঁড়ী কি রকম খুনে 'দস্যি', তা কি আমি জানি নে ? সে আমার নাতিকে খুন করেছে ; হাঁ, তাকে হত্যে করেছে।"

আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "হত্যা করিয়াছে ? এ কথা বলিবার তোমার অধিকার কি ? এই অভিযোগের কোন প্রমাণ আছে কি ?"

বৃদ্ধা বলিল, "অধিকার ! আমার নাতিকে খুন ক'রে পালিয়ে গেল, আর আমার সে কথা বল্‌বার অধিকার নেই ? আর যদি প্রমাণের কথা বলেন—তবে আমার এই চক্ষু দুইটি তার প্রমাণ, আমি নিজের চোখে যে তাকে খুন করতে দেখিছি, মশায় !"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "নিজের চোখে দেখিয়াছ বলিতেছ, তবে কি তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে ? তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ, বাছা ! তুমি সেখানে ছিলে না ; কেবল তুমি কেন, কেহই সেখানে ছিল না। কেবল তারাই দু'জনে সেই কুঠুরীতে ছিল ; তাহারা ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়াছিল। তুমি কি আমার এ কথা অস্বীকার করিতে পার ?"

বৃদ্ধা আমার কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য জিলরয়ের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হাঁ, তারা দু'জনে সেই কুঠুরীতে ছিল, দরজাও ভেতর থেকে বন্ধ ছিল—এ সব কথা কি আমি অস্বীকার করছি ? ও কথাও যেমন সত্যি, সেই কুঠুরীতে আমিও ছিলাম, এ কথাও তেমনই সত্যি।"

আমি বলিলাম, "তুমিও সেই কুঠুরীতে ছিলে ? সেখানে তুমি কি করিতেছিলে ?"

বৃদ্ধা বলিল, "সেখানে আমি আমার নাতির প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আমার নাতি এডউইন সেই নচ্ছার ইতর ছুঁড়ীর পীরিতে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল !"

আমি বলিলাম, "তুমি সেখানে ছিলে, তাহা কি যোয়ান জানিতে পারিয়াছিল ?"

বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, তা সে কি ক'রে জানবে ? আমি কি তাকে জানিয়ে সেই ঘরে ঢুকেছিলাম ? সেই রাত্তিরে ছুঁড়ী সেই বাড়ীতে একা ছিল ; আমি খিড়কী-দুয়োর খোলা পেয়ে সেই দুয়োর দিয়ে চুপে চুপে সেই কুঠুরীতে প্রবেশ করেছিলাম। আমি কাছেই একখান বাড়ীতে থাকি কি না। আমি জান্‌তাম, আমার নাতি সেই রাত্তিরে তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে ; কোন গুপ্তকথা শুন্‌বার জন্য তার আগ্রহ হয়েছিল। আমি হঠাৎ তাদের দু'জনের সাম্‌নে প'ড়ে তাদের অপদস্থ করব, এই রকম আমার মতলব ছিল।"

আমি বলিলাম, "সেই যুবকটি চাবি দিয়া দ্বার খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল ; সে কি সেই বাড়ীতে বাস করিত ?"

বৃদ্ধা বলিল, "না, সে আমার সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস করিত ; কিন্তু মিঃ কুপ এড্‌উইনকে খুব স্নেহ করতেন কি না, এই জন্য বাড়ীর দরজার একটা চাবি তাকে দিয়ে রেখেছিলেন, সেই চাবি দিয়ে দুয়োর খু'লে আমার নাতি সেই বাড়ীতে ইচ্ছামত যাতায়াত করত।"

আমি বলিলাম, "তোমার সেই নাতি কায কর্ম্ম কি করিত ?"

বৃদ্ধা।—সে পোটো ছিল, লিথোগ্রাফীর সাহায্যে পট আঁকতো। সে অনেক টাকা রোজগার করত। রাস্তার ধারে ঘরের দেওয়ালে ছবিওয়ালা বিজ্ঞাপন দেখেন নি ? বিজ্ঞাপনের ঐ রকম রং-বেরঙের বড় বড় ছবি এঁকে সে বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করত।

আমি।—তাহার নাম বার্লো ?

বৃদ্ধা।—হাঁ, এড্‌উইন বার্লো। ছবি আঁকতে আঁকতে হতভাগা ছোঁড়া বুড়ো কুপের মেয়েটার রূপ দেখে ম'জে গেল। শেষে তারই হাতে প্রাণ দিল।

আমি বৃদ্ধাকে আগ্রহভরে বলিলাম, "তাহা হইলে কুপকে তুমি চিনিতে ? তাহার সঙ্গে তোমার ভালরকমই জানাশুনা আছে ?"

বৃদ্ধা।—হাঁ, সংপ্রতি তাঁর সঙ্গে আমার দুই একবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল।

আমি।—সে কোথায় বাস করে ?

বৃদ্ধা।—লেক্সহাম গার্ডেন্‌সে।

আমি।—সে কি ! সে বেজওয়াটারে থাকে না ?

বৃদ্ধা।—সে খবর আমার জানা নেই।

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া আমার মনে হইল, সে সত্য কথাই বলিয়াছিল।

আমি বলিলাম, "তোমার কথা শেষ কর। দুর্ঘটনার সময় তুমি সেই বাড়ীর ভোজন-কক্ষে ছিলে—এই কথাই বলিয়াছ।"

বৃদ্ধা বলিল, "হাঁ, সত্য কথাই বলেছি। দরজার সাম্‌নে যে পর্দ্দা ঝুল্‌ছিল, আমি সেই পর্দ্দার আড়ালে ছিলাম। সেই ঘরের 'সুইচ'টা বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল—এ জন্যে আলো ছিল না, ঘর অন্ধকার। আমার নাতি এড্‌উইন সেই ছুঁড়ীকে খুব ধম্‌কাতে লাগ্‌লো, কারণ, সে সেই রাত্রিকালে এক জন অপরিচিত লোককে ঘরের ভিতর ডেকে এনেছিল। এতে আমার নাতির একটু হিংসা হওয়ারই কথা! তা সেই ছুঁড়ীও ত সহজ মেয়ে নয়! কাযেই দু'জনের ঝগড়া আরম্ভ হ'ল। আমি শুন্‌লাম—এড্‌উইন যোয়ানকে বললে—'আজ রাতে আমি তোমার বাপের গুপ্তরহস্য জান্‌তে পেরেছি। আমি তোমাকে বল্‌তে এসেছি, তুমি সময় থাক্‌তে পালিয়ে যাও। বিলম্ব করলে সুযোগটি হারাবে; কারণ, আমি এখনই থানায় গিয়ে পুলিসকে সকল জানাব।' আমার নাতি ছুঁড়ীকে ঠিক এই কথাগুলি বল্‌লে বটে, কিন্তু সে মিঃ কুপের কি গুপ্তরহস্য জানতে পেরেছিল, তা আমি শুনতে পাই নি; তা অনুমান করাও আমার অসাধ্য। আমার নাতির মুখের কথা শেষ হ'তেই আমি অন্ধকারে ধস্তাধস্তির শব্দ শুনতে পেলাম, মুহূর্ত্তের মধ্যে ছুঁড়া আমার নাতিকে ছোরা মারলে, প্রণয়িনীর ছোরায় খুন হয়ে এড্‌উইন ধপাস্‌ ক'রে কার্পেটের উপর আছড়িয়ে পড়ল।

"ছুঁড়ী এড্‌উইনকে ছোরা মেরেই বুঝতে পারলে, কি ভয়ানক কায সে ক'রে ফেলেছে! ভয়ে সে কেঁদে উঠল, তার পর মুহূর্ত্তমধ্যে জানালা খুলে বাগানের ভিতর লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সেই দিক দিয়ে সে চম্পট দিল। আমার ইচ্ছা হ'ল, আমি চীৎকার ক'রে লোক ডাকি। কিন্তু তখনই শুন্‌লাম—কে দরজা খুল্‌বার জন্যে ঠেলাঠেলি করছে! আমি ভয় পেয়ে আর কোন শব্দ করলাম না; আমার নাতির শরীরের পাশে রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রতিহিংসার আগুন আমার বুকের ভিতর জ্ব'লে উঠল। সত্য কথা সকলই ত আমি জান্‌তে পারলাম, কাযেই তাড়াতাড়ি করার দরকার হ'ল না। পাছে কেউ আমাকে সেখানে দেখতে পায়, এই ভয়ে আমি দরজার দিকে না গিয়ে, যোয়ান যে জানালা দিয়ে পালিয়েছিল, আমিও সেই পথে বাড়ী ফিরলাম। যোয়ান যেসিকে পূর্ব্বেই সেখানে পাঠিয়েছিল—যেসি তখনও আমার প্রতীক্ষা করছিল।"

আমি বলিলাম, "কুপ তখন কোথায় ছিল?"

বৃদ্ধা বলিল, "যোয়ান নিজের অপরাধ গোপন করার উদ্দেশ্যে সেই রাত্রেই ব্রাইটনে তার বাপের কাছে টেলিগ্রাম করায় কুপ প্রথম ট্রেণেই ফিরে এসেছিলেন। যোয়ান এ রকম চাতুরীর সঙ্গে সকল কায শেষ করেছিল যে, কি পুলিস, কি খবরের কাগজওয়ালারা কেউ এই রহস্য ভেদ করতে পারল না। সে সকলের চোখে ধূলো দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল। করোনারের আদালতের রায় প্রকাশ হওয়ার পরে আমি সেই আদালতের বারান্দায় যোয়ানকে দেখতে পেলাম। আমাকে দেখেই তার মূর্চ্ছা হ'ল।"

আমি বৃদ্ধাকে বলিলাম, "তুমি ত সকলই জান, যোয়ানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে না কেন?"

বৃদ্ধা বলিল, "দরকার কি—তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই ত তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া। আমি অন্য উপায়ে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলাম। হাঁ, এখন আমি সেই পথেই চল্‌ছি।"

আমি ক্ষুব্ধস্বরে বলিলাম, "হাঁ, তুমি যে পথে চলিয়াছ, সে অতি চমৎকার পথ। যোয়ান বেচারা আত্মহত্যা করে—তাহারই ব্যবস্থা করিতেছ।"

বুড়ী এবার বিদ্রূপভরে সাধু ভাষায় বলিল, "হাঁ, অত্যন্ত নিরীহ বেচারা! কচি খুকী, কাহাকেও উঁচু কথাটি বলিতে জানে না। ও দিকে আমার কি সর্ব্বনাশ করিল—কেহ কি ধারণা করিতে পারে? আমার নাতি এড্‌উইনকে ছোরা দিয়া খোঁচাইয়া মারিল!"—মুহূর্ত্তমধ্যে ক্রোধ বিদ্রূপের স্থান অধিকার করিল, সে আর আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "আত্মহত্যা ত সামান্য কথা, আমার ইচ্ছে হয়—তাকে খুঁটায় বেঁধে কুকুর দিয়ে খাওয়াই।"

আমি বলিলাম, "সেই ছোরাখানা সনাক্ত করা হইয়াছিল কি?—সেই ছোরার মালিক কে?"

বৃদ্ধা বলিল, "পুলিসে তা সনাক্ত হয়েছিল কি না, আমার জানা নাই।"

আমি বলিলাম, "উহা যে যোয়ানের ছোরা, ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই?"

বৃদ্ধা বলিল, "আমি সেই ছোরা ড্রয়িংরুমের টেবলের উপর কয়েক দিন প'ড়ে থাক্‌তে দেখেছিলাম। যোয়ান সেই ছোরা তুলে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল—তার পর তার মাথায় খুন চাপলে সেই ছোরা দিয়ে—খ্যাঁচ !"

জিলরয় বলিল, "কিন্তু যোয়ানই প্রথমে খানার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার প্রণয়ী তাহার অনুসরণ করিয়াছিল।"

আমি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বৃদ্ধাকে বলিলাম, "তোমার নাতি সেই রাত্রে কোন্ গুপ্তরহস্য আবিষ্কার করিয়াছিল ? সে এমন কি রহস্য যে, তাহা প্রকাশের ভয়ে যোয়ান তোমার নাতিকে হত্যা না করিয়া স্থির থাকিতে পারিল না ?"

বৃদ্ধা বলিল, "আমি কি তা জানি ? আমি কুপকে সব কথা বলেছি ; তা শুনে তিনি তাঁর মেয়ের অপরাধের গুরুত্ব বুঝে ভয়ে আঁতকে উঠলেন, কিন্তু আমার নাতি কি উদ্দেশ্যে ঐ কথা বলেছিল—তা জানেন না বল্‌লেন।"

আমি বলিলাম, "কুপের স্মরণশক্তি ঐ রকম ক্ষীণ বটে ; কিন্তু ভবিষ্যতে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে আমি তাহাকে এরূপ দুই একটি কথা বলিব, যাহা সে 'স্মরণ হয় না' বলিতে সাহস করিবে না।"

জিলরয় বলিল, "আপনার এ কথার মর্ম্ম কি ?"

আমি বলিলাম, "আমার কথার মর্ম্ম এই যে, বার্লো যে গুপ্তকথা প্রকাশের ভয় দেখাইয়া প্রাণ হারাইয়াছে, সেই গুপ্ত-রহস্য আমার সুবিদিত।"

জিলরয় সবিস্ময়ে বলিল, "সেই গুপ্ত-রহস্য আপনার সুবিদিত !—বুঝিয়াছি। যোয়ানের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। সে মিথ্যা কথা এমন চমৎকার 'লাগসই' করিয়া বলিতে পারে যে, তাহা অবিশ্বাস করা অসাধ্য হইয়া উঠে। আপনি তাহার নিকট সেইরূপ কোন মিথ্যা কথা শুনিয়াছেন !"

আমি বলিলাম, "আমি স্বয়ং তাহা আবিষ্কার করিয়াছি, সেই রহস্যের সহিত আমার সংস্রব আছে ; তাহার সহিত যোয়ানের কোন সম্বন্ধ নাই।"

জিলরয় একটু হাসিয়া বলিল, "হইতেও পারে।—আপনি তাহার বন্ধু অর্থাৎ এমন মধুর-হৃদয়া, কোমলপ্রাণা যুবতীর বন্ধু যে, তাহার পিতার কোন গুপ্তরহস্য প্রকাশের আশঙ্কায় তাহার প্রণয়ীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করিতে মুহূর্ত্তের জন্য কুণ্ঠিত হইল না, হাত একটুও কাঁপিল না ! এ রকম সদাশয়া বান্ধবীর দুর্নাম শুনিলে মন খারাপ হওয়াই স্বাভাবিক ; কিন্তু সেই গুপ্তরহস্যটি কি সত্যই আতঙ্কজনক ?"

আমি তাহার শ্লেষ গ্রাহ্য না করিয়া বলিলাম, "হাঁ, অপরাধীর সেই গুপ্তরহস্য প্রকাশ হওয়া তাহার পক্ষে কিরূপ আতঙ্কজনক, তাহা সে ভিন্ন অন্যে ধারণা করিতে পারিবে না। এ কথাও আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি—সেই গুপ্তরহস্য প্রচারিত হইলে পৃথিবীর সকল সভ্যদেশে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইবে। আমাদের রাজধানীর পক্ষেও তাহা লজ্জা ও বিড়ম্বনার বিষয় !"

বৃদ্ধা বলিল, "এই আন্দোলন আলোচনা বন্ধ রাখিবার জন্যই যোয়ান নরহত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।"

আমি কোন কথা বলিলাম না। বৃদ্ধার নিকট যে সকল কথা শুনিলাম, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়জনক ; আমি বিষম ধাঁধায় পড়িলাম। এক রহস্য হইতে অন্য রহস্যের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল।

অতঃপর আমি মিসেস্ ম্যাক্সওয়েলকে বিদায় দান করিয়া জিলরয়কে বলিলাম, "মিঃ জিলরয়, আমি সরলভাবেই আপনাকে বলিতেছি, কার্ল কুপ প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে গ্রেপ্তার হইতেছিল, কিন্তু অল্পের জন্য বাঁচিয়া গিয়াছে।"

আমার কথায় জিলরয় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "গ্রেপ্তার হইতেছিল ! কুপের গ্রেপ্তার হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল ? আশ্চর্য্য বটে ! কে তাহাকে গ্রেপ্তার করাইতেছিল ?"

আমি বলিলাম, "তাহার বিরুদ্ধে আমার যে অভিযোগ ছিল, সেই অভিযোগে তাহার গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা হইয়াছিল।"

জিলরয় উত্তেজিতভাবে বলিল, "তবে কি আপনি তাহার শত্রু ? তাঁহাকে শত্রু মনে না করিলে এ কায আপনি কেন করিবেন ? আপনার অভিযোগটা কি ?"

আমি বলিলাম, "তাহার গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে সে কথা প্রকাশ করা আমি সঙ্গত মনে করি না। আমার আশা আছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাহাকে পুলিসের হাতে ধরা পড়িতে হইবে। তাহার পর সেই বিস্ময়কর কাহিনী প্রকাশ করিতে বাকি থাকিবে না।"

জিলরয় ধীরে ধীরে উঠিয়া নীরস স্বরে বলিল, "আপনি তাহার সম্বন্ধে কি জানেন, তাহা শুনিতে চাই।"

আমি বলিলাম, "অনুসন্ধানে আমি অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি।"

জিলরয়।—কুপের বিরুদ্ধে?

আমি।—হাঁ, তাহার বিরুদ্ধে।

জিলরয়।—মিঃ কোলফাক্স, আপনি আমার কৌতূহল দূর করিবেন না?

আমি ঈষৎ বিরক্তিভরে বলিলাম, "তাহা কৌতূহলের বিষয় নহে; আজ রাত্রে আপনি আর সেই বুড়ীটা—দু'জনে মিলিয়া আমার প্রণয়িনী যোয়ান কুপারকে নরহন্ত্রী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার উপর নরহত্যার কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্যই এখন আমাকে চেষ্টা করিতে হইবে।"

জিলরয় বলিল, "সে আপনার প্রণয়িনী? তবে আপনি সত্যই তাহাকে ভালবাসেন! দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। বুঝিতে পারিলে ও সকল কথা আপনাকে বলিতাম না। আমার এই বিবেচনার ত্রুটি আপনি মার্জ্জনা করুন।"

আমি বলিলাম, "আপনার ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন নাই। আমার সহায়তায় যোয়ান আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। তাহার শত্রুরা প্রথমেই বিধ্বস্ত হইবে—আমার এ কথা আপনি বিশ্বাস করিতে পারেন। হাঁ, তাহার কোন গতি করিবার পূর্ব্বে তাহার শত্রুরা কঠোর শাস্তি পাইবে।"

জিলরয় আমার কথা শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। আমি কুপ-সম্বন্ধে কত দূর কি জানিতে পারিয়াছি, তাহাই বোধ হয় সে চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু কুপের গুপ্তরহস্য-ভেদে আমি কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা ধারণা করা তাহার অসাধ্য হইল; তবে কুপকে আমি সন্দেহ করিয়াছি, এটুকু সে আমার কথা শুনিয়া পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল।

জিলরয় সেই বৃদ্ধার সহিত যোগদান করিয়াছিল, সুতরাং সে যোয়ানের শত্রু, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইলাম। যে যোয়ানের শত্রু—সে আমারও শত্রু। জিলরয় ও সেই বৃদ্ধা যোয়ানের অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করিবে, হয় ত যোয়ানকে পুলিসের হস্তে অর্পণের জন্যও আগ্রহ প্রকাশ করিবে, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলাম, এবং এইটুকু অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট লাভজনক মনে করিয়া জিলরয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সপ্তদশ প্রবাহ

অপরাধ স্বীকার

পরদিন বেলা ১টার পর আমি আগ্রহভরে গ্রাহামের এঞ্জেলান এণ্ড ক্রাউন হোটেলে পুনঃপ্রবেশ করিলাম। সেই হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যোয়ান মিস্ হচিন্‌সন বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছিল, এ জন্য হোটেলের সর্দ্দার-খানসামাকে মিস্ হচিন্‌সনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম।

আমরা সেই হোটেলে আসিয়া যে কক্ষে প্রাভাতিক ভোজন করিয়াছিলাম—সেই কক্ষে যোয়ানকে দেখিতে পাইলাম না। সর্দ্দার-খানসামা আমার প্রশ্ন শুনিয়া বলিল, "আজ বেলা ১১টার সময় মিস্ হচিন্‌সন চলিয়া গিয়াছেন, মহাশয়! হাঁ, বেলা ১১টার সময় যে ট্রেণ দক্ষিণে যায়—তিনি সেই ট্রেণেই গিয়াছেন।"

খানসামার কথা শুনিয়া আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। যোয়ান আমার অজ্ঞাতসারে চলিয়া গিয়াছে! কিন্তু আমার নিকট সে অঙ্গীকার করিয়াছিল—হোটেলে আমার প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে সে কোথাও যাইবে না। তাহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবার কারণ কি?

আমি বলিলাম, "তিনি চলিয়া যাইবার সময় আমার জন্য কোন পত্র লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন কি?"

খানসামা বলিল, "আমি ত তাহা জানি না। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আফিসে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।"

খানসামা চলিয়া গেল; কয়েক মিনিট পরে সে একখানি চিঠি আনিয়া আমার হাতে দিল। লেফাপার উপর আমার নাম ছিল।

আমি ব্যাকুল-হৃদয়ে পত্রখানি খুলিলাম। যোয়ান তাড়াতাড়ি এই কথাগুলি লিখিয়াছিল,—

"সকল চেষ্টাই বিফল। সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। পুলিস আমাকে ধরিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; চারিদিকে আমার অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। পলায়ন করিয়া আমার পরিত্রাণ নাই। এখন মৃত্যু ভিন্ন আমার আর নিষ্কৃতি নাই। তুমি যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাও, আমাকে ভুলিয়া যাও। ইহাই এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয়। আর কোন দিন তুমি আমার সংস্রবে আসিও না বা আমার অনুসন্ধান করিও না; কারণ, তাহার ফল

কলঙ্কজনক হইবে। গভীর কলঙ্ক ভিন্ন অন্য কোন লাভ হইবে না। তুমি আমার জন্য যাহা করিয়াছ, সে জন্য আমি তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞ, তুমি আমার অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু সকলই বৃথা। আমাকে ভুলিয়া যাও; আমাকে আমার অপকর্ম্মের জন্য ফলভোগ করিতে হইবে; সে জন্য প্রস্তুত হইয়াই তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।"

আমি সেই পত্রখানির দিকে চাহিয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি!

সর্দ্দার-খানসামা অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। আমি মুখ তুলিয়া তাহাকে বলিলাম—"মিস্ হচিন্সন কখন্ চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন?"

খানসামা বলিল, "সকালে ৮টার সময় তিনি নীচে আসিয়া আহারে বসিয়াছেন, সেই সময় একটি যুবক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। যুবকটি তাঁহাকে চিনিত বলিয়াই মনে হইল।"

আমি বলিলাম, "তিনি কি সেই যুবকের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছেন?"

সর্দ্দার বলিল, "তাহা ঠিক বলিতে পারি না। শুনিলাম, সেই যুবকটির নাম জর্জ্জ।"

আমি।—সেই যুবক এখনও এখানে আছে কি?

সর্দ্দার।—না মহাশয়, সেই যুবক এই কামরায় বসিয়া প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া মিস্ হচিন্সনের সঙ্গে আলাপ করিয়াছিল। আমি এই কামরায় আসিয়া যুবকটিকে দেখিতে পাইলাম না। মিস্ হচিন্সন একাকী বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিলেন! কয়েক মিনিট পরে তিনি উঠিয়া দোতলায় গিয়া দাসীকে ডাকিলেন; তাহার পর হোটেলের গাড়ীতে ষ্টেশনে রওনা হইলেন।

আমি যুবকের চেহারা কিরূপ জিজ্ঞাসা করায় খানসামা যাহা বলিল, তাহা শুনিয়া আমার ধারণা হইল, সেই যুবক জর্জ্জ জিলরয় ভিন্ন অন্য কেহ নহে।

আমি খানসামাকে বলিলাম, "তাহার নাম কি জর্জ্জ জিলরয়?"

খানসামা বলিল, "হাঁ মহাশয়, উহাই তাহার নাম বটে; মিস্ হচিন্সন একবার তাহাকে মিঃ জিলরয় বলিয়া ডাকিয়াছিলেন।"

বুঝিলাম, জিলরয় কোন উপায়ে যোয়ানের সন্ধান জানিতে পারিয়া এখানে আসিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিল; সে বোধ হয় যোয়ানকে গ্রেপ্তারের ভয় দেখাইয়াছিল। যোয়ানের গুপ্তকথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে—এ কথাও তাহাকে জানাইয়াছিল। নতুবা যোয়ান আমাকে ঐরূপ পত্র লিখিত না। বুঝিলাম, প্রাণভয়েই সে পলায়ন করিয়াছে।

কিন্তু সে কোন্ দিকে গিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ষ্টেশনের বুকিং-ক্লার্ক তাহার সন্ধান বলিতে পারিবে, এই আশায় আমি ষ্টেশনে যাওয়াই সঙ্গত মনে করিলাম।

আমি হোটেলের আফিস-ঘরে প্রবেশ করিয়া চিঠির বাক্সে মিস্ হচিন্সনের নামে একখানি টেলিগ্রাম দেখিতে পাইলাম। যোয়ান হোটেল ত্যাগ করিবার পর টেলিগ্রামখানি আসিয়াছিল—তাহা বুঝিতে পারিলাম।

আমি টেলিগ্রামখানি খুলিয়া পাঠ করিলাম। তাহাতে লেখা ছিল,—"যেরূপে হউক, তোমাকে কোলফাক্সের সংস্রব ত্যাগ করিতে হইবে। সতর্ক থাকিবে। মঙ্গলবার রাত্রি ৮টার সময় বার্ণবি মুরের রেল-হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করিবে।—বাবা।"

টেলিগ্রামখানি টন্‌ব্রীজ ওয়েল্স্ হইতে প্রেরিত হইয়াছিল, সুতরাং বুঝিতে পারিলাম, কুপ আমার চোখে ধূলা দিয়া কেণ্টে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু এই টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া রহস্যের অন্ধকার গাঢ়তর বলিয়াই আমার মনে হইল। আমার ধারণা হইয়াছিল, কুপ তাহার কন্যাকে শত্রু মনে করে, তাহাকে কঠোর শাস্তি দেওয়াই কুপের আন্তরিক ইচ্ছা; কিন্তু এই টেলিগ্রাম পাঠে কন্যার প্রতি কুপের সহানুভূতিরই পরিচয় পাইলাম। জিলরয় তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল, কুপ তাহাকে পুলিসের কবলে পড়িতে না হয়, এজন্য তাহাকে সতর্ক করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

আমি সেই হোটেলের মহিলা কেরাণীটিকে বলিলাম, "মিস হচিন্সন হোটেল ত্যাগ করিবার কতক্ষণ পরে এই টেলিগ্রাম আসিয়াছিল?"

সে বলিল, "প্রায় আধঘণ্টা পরে।"

আমি।—আজ সকালে একটি ভদ্রলোক মিস্ হচিন্সনের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়াছিলে কি?

উত্তর পাইলাম—"হাঁ মহাশয়, সেই যুবক এখানে নামিয়া একখানি কুঠুরী ভাড়া করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি এক ঘণ্টা থাকিয়াই তাড়াতাড়ি ইয়র্কের ট্রেণে চলিয়া গিয়াছেন।"

আমি।—মিস্ হচিন্‌সন হোটেল ত্যাগ করিবার সময় কি খুব ব্যাকুল হইয়াছিলেন ?

মহিলা কেরাণী সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি এখানে আসিবার পূর্ব্বেই তিনি সরিয়া পড়িবার জন্য অস্থির হইয়াছিলেন—তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া এইরূপই আমার ধারণা হইয়াছিল। তিনি আমাকে বলিলেন—তাঁহাকে অবিলম্বে বোর্ণমাউথে যাইতে হইবে, তিনি কখন্ সে দিকের ট্রেণ পাইবেন ?"

আমি ব্যগ্রভাবে বলিলাম, "তিনি বোর্ণমাউথে গিয়াছেন ?"

মহিলা কেরাণী।—সেইরূপই আমার বিশ্বাস। তিনি আমাদের ছোকরা খানসামাকে দিয়া একখান টেলিগ্রাম পাঠাইয়া হোটেল ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই টেলিগ্রামের মর্ম্ম আমি জানিতে পারি নাই।

আমি বলিলাম, "খানসামাটা সেই টেলিগ্রাম পড়িয়া থাকিবে ; খানসামামাত্রেরই সে অভ্যাস আছে।"

কেরাণী বলিল, "বোধ হয় আছে। তাহাকে ডাকিতেছি।"—সে ঘণ্টাধ্বনি করিতেই একটি খর্ব্বাকৃতি বালক ভৃত্য তাহার সম্মুখে আসিল। কেরাণীর প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, "হাঁ মিস্, টেলিগ্রামখানা টেলিগ্রাফ আফিসে লইয়া যাইতে যাইতে তাহার উপর আমার নজর পড়িয়াছিল ; আমি হঠাৎ তাহা পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম।"

আমি।—তিনি কাহাকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন ? টেলিগ্রামে কি লেখা ছিল ?

বালক বলিল, "বোর্ণমাউথের গ্র্যাণ্ড হোটেলে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়াছিলেন, আজ রাত্রে তাঁহার জন্য একটি কামরা খালি রাখিতে হইবে।"

আমি তৎক্ষণাৎ বোর্ণমাউথে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। যোয়ান তাহাকে ভুলিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিল, তাহার অনুসরণ করিতে নিষেধ করিয়া পত্রে আমার নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সেই অনুরোধ রক্ষা করা আমার অসাধ্য। পুলিসের হাতে তাহার ধরা পড়িবার আশঙ্কা ছিল ; সে বিপন্না, আমি তাহাকে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

আমি তাড়াতাড়ি কিছু খাইয়া লইয়া হোটেলের গাড়ীতেই ষ্টেশনে আসিলাম। কিংসক্রস্‌গামী একস্‌প্রেস্ ট্রেণে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলাম। আমাকে হঠাৎ বাসায় ফিরিতে দেখিয়া আমার ভৃত্য ডেভিস্ অত্যন্ত বিস্মিত হইল। আমি তাহার নিকট কোন কথা প্রকাশ না করিয়া একটা 'সুটকেসে' আমার পরিচ্ছদাদি গুছাইয়া দিতে বলিলাম। তাহার পর একখানি ট্যাক্সি লইয়া বোর্ণমাউথে যাত্রা করিলাম। রাত্রি ৯টার সময় গ্র্যাণ্ড হোটেলের সম্মুখে ট্যাক্সি হইতে নামিলাম।

যোয়ান এই হোটেলে কি নামে আত্মপরিচয় দিয়াছিল—তাহা জানিতে না পারায় সে কোন্ কামরায় বাস করিতেছিল, তাহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। হোটেলের খাতায় নাম স্বাক্ষর করিবার সময় অন্যান্য ভাড়াটিয়াদের স্বাক্ষরগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলাম, কিন্তু যোয়ানের হস্তাক্ষরের মত অক্ষর দেখিতে পাইলাম না ; তখন আমার মনে হইল, আমি হয় ত তাহার আসিবার পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া যোয়ানের আগমন-প্রতীক্ষায় হোটেলের প্রবেশদ্বারের নিকট বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলাম। আমি মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত সেই স্থানে বসিয়া অনেকগুলি চুরুট ভস্মে পরিণত করিলাম ; অবশেষে বিরক্তিবোধ করিয়া হোটেলের আফিস-ঘরে প্রবেশ করিলাম, সেই হোটেলের মহিলা কেরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মিস্ হচিন্‌সন নাম্নী কোন মহিলা আজ হোটেলে আসিয়া কোন ঘর ভাড়া লইয়াছেন কি ?"

কেরাণী বলিল, "আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁহার এখানে আসিবার কথা ছিল বটে ; কিন্তু আজ রাত্রি ৯টার সময় তিনি টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়াছেন, তিনি কাল এক সময় আসিবেন, কোন কারণে আজ আসিতে পারিলেন না।"

পরদিন মধ্যাহ্নকালে যোয়ানকে দেখিবার আশায় ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ১২টা বাজিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে ট্রেণ প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইলে, যোয়ান একখানি কামরা হইতে নামিয়া আসিল। আমি টুপি তুলিয়া তাহার সম্মুখে হাত বাড়াইলাম। সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া চক্ষু অবনত করিল, তাহার মুখ হঠাৎ মলিন ও বিবর্ণ হইল। সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ, কোলফাক্স ? আমি তোমাকে আমার অনুসরণ করিতে নিষেধ করিয়াছি, তথাপি তুমি কেন আসিলে ?"

আমি ব্যাকুলভাবে তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "যোয়ান, তুমি বিপন্ন, এ সময় আমার সাহায্য ভিন্ন তোমার চলিবে না

বুঝিয়াই তোমাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছি। আমার সঙ্গে হোটেলে চল, সেখানে সকল কথা হইবে।"

যোয়ান অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত আমার সঙ্গে হোটেলে চলিল; আমি তাহার অনুরোধ রক্ষা না করায় সে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিল। কিন্তু আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া হোটেলে আমার কামরায় প্রবেশ করিলাম। সে বিশ্রাম করিতে বসিলে আমি তাহাকে বলিলাম—"জর্জ্জ জিলরয়ের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল।"

যোয়ান অস্ফুটস্বরে বলিল, "হাঁ, আমি তাহা জানি; সে তোমাকে সকল কথাই বলিয়াছে, তাহাও শুনিয়াছি। সে—"

আমি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম, "সে আমাকে তোমার সম্বন্ধে এক অদ্ভুত কাহিনী বলিয়াছে। তাহার কথাগুলি যেমন অদ্ভুত, সেইরূপ অবিশ্বাস্য। তাহার অভিজ্ঞতাও আমার অভিজ্ঞতার মত শোচনীয়। তাহাকেও বিপন্ন করিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া রাখা হইয়াছিল; সে 'ফাউন্টেন-পেনে'র বোমায় আহত হইলেও বাঁচিয়া গিয়াছে।"

যোয়ান কাতরভাবে বলিল, "ও সকল কথা আর আমাকে বলিও না, কোলফাক্স! ঐ সকল ভয়ঙ্কর কথা আর আমার শুনিবার ইচ্ছা নাই। আমাকে ভালবাসা জানাইবার পর সে আমার প্রতি বিমুখ হইবে, আমার কুৎসা রটনা করিবে—ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই!"

আমি বলিলাম, "মিসেস্ ম্যাক্সওয়েল তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে একটা অদ্ভুত কাহিনী শুনাইয়াছে। তাহার অভিযোগ বড়ই ভয়ানক!"

যোয়ান ঘৃণাভরে মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "কে? মিসেস ম্যাক্সওয়েল? সেই বুড়া ডাইনীটা অনেক দিন আগে আমাকে ভয় দেখাইয়া বলিয়াছিল—সে আমার সর্ব্বনাশ করিবে। এত দিন পরে তাহার কথা সত্য হইল। সে মুখে যাহা বলিয়াছিল, কাযেও তাহাই করিল!"

আমি ব্যাকুলস্বরে বলিলাম, "কিন্তু তুমি আমাকে বল, তাহার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বল, তুমি নিরপরাধ। আমি তোমারই কথা বিশ্বাস করিব।"

যোয়ান কোন কথা বলিল না, তাহার বিবর্ণ নতমুখে অপরাধীর সঙ্কোচ পরিস্ফুট দেখিলাম।

আমি পুনরায় আগ্রহভরে বলিলাম, "বল যোয়ান, সত্য কথা বল। তোমার কথা শুনিলেই বিশ্বাস করিব, নররক্তে তোমার শুভ্র হস্ত কলুষিত হয় নাই।"

তাহার ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল মাত্র, কিন্তু কোন কথা বাহির হইল না। আমি আবেগভরে বলিলাম, "সেই দুর্ঘটনার রাত্রির প্রকৃত ঘটনা আমি তোমার মুখে শুনিতে চাই। বেজওয়াটারের সেই বাড়ীর নম্বরটাও আমাকে বল, তাহা হইলে আমি তোমার শত্রু-দমনের ব্যবস্থা করিয়া তোমার সকল আশঙ্কা দূর করিব, তুমি নিরাপদ হইতে পারিবে।"

যোয়ান নীরবে মাথা নাড়িল। সে আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিল। আমার আগ্রহ, ব্যাকুলতা, মিনতি তাহার হৃদয় স্পর্শ করিল না!

অবশেষে আমি ক্ষুব্ধস্বরে বলিলাম, "তবে কি জিলরয়ের কথাই সত্য বলিয়া মানিয়া লইব? তাহার নিষ্ঠুর অভিযোগ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে?"

যোয়ান তথাপি নিরুত্তর, সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল।

আমি তাহাকে সান্ত্বনা-দানের চেষ্টা করিলাম। দীর্ঘকাল পরে সে অশ্রু মুছিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাও, তুমি এ ভাবে আমাকে বিরক্ত করিলে আমি ক্ষেপিয়া যাইব। কেন তুমি ঐ সকল কথার আলোচনা করিয়া আমার যন্ত্রণা বাড়াইতেছ? আমার মনের আগুন জ্বালিয়া দিতেছ? তুমি সেই ভীষণ সত্য কথা জানিতে পারিয়াছ, আর আমাকে জ্বালাতন করিও না; যাও, চলিয়া যাও। আমাকে শাস্তিদান করা তোমার অসাধ্য, সে চেষ্টা আমি অনাবশ্যক মনে করি। আমি দণ্ডগ্রহণের জন্য প্রস্তুত; তুমি চলিয়া যাও, আমাকে ভুলিয়া যাও, মিঃ কোলফাক্স!"

আমি বলিলাম, "তুমি বিনা দোষে শাস্তি গ্রহণ করিবে, যোয়ান! ইহা যে আমার অসহ্য।"

যোয়ান দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, অন্যায় শাস্তি নহে; সেই শাস্তি আমার প্রাপ্য। জিলরয় সকল কথা জানিতে পারিয়াছে, সে তোমার নিকট তাহা প্রকাশ করিয়াছে; তবে আর আমি কিরূপে সত্য কথা গোপন করিব? এখন আর তাহা আমার অসাধ্য।"

আমি বলিলাম, "জিলরয় তোমাকে শাস্তির ভয় দেখাইয়াছে, এ কথা কি সত্য নয়?"

যোয়ান কথা বলিল না, মাথা নাড়িয়া আমার উক্তি

সখী-সম্মিলনে

বসুমতী-চিত্রবিভাগ]

[শিল্পী—শ্রীঅখিল নিয়োগী ।

সমর্থন করিল। তাহার মুখ অশ্রুপ্লাবিত, চক্ষুতে আতঙ্ক পরিস্ফুট।

আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "যদি সে তোমার বিরুদ্ধে পুলিসের নিকট কোন কথা প্রকাশ করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে গলা টিপিয়া হত্যা করিব। যোয়ান, তুমি যদি ঘোর অন্যায় কাষও করিয়া থাক, তাহা হইলেও আমি তোমাকে বন্ধুভাবে সাহায্য করিব।"

যোয়ান অস্ফুটস্বরে বলিল, "কেন? আমাকে সাহায্য করিবার জন্য তোমার এরূপ আগ্রহের কারণ কি?"

আমি বলিলাম, "কারণ, আমি তোমাকে ভালবাসি। যাহাকে ভালবাসি, প্রাণ দিয়াও তাহার প্রাণরক্ষা করিব।"

যোয়ান কঠোরস্বরে বলিল, "ভালবাস? না, না, ও কথা তুমি আর আমাকে বলিও না। আমার মত তুচ্ছ, ঘৃণিতা নারী তোমার প্রেমের যোগ্য নহে। তুমি এই পাগলামী ত্যাগ কর, কোলফাক্স! তোমার প্রেম প্রত্যাহার কর। আমি তাহা চাহি না। শীঘ্রই, এমন কি, হয় ত আজই জানিতে পারিবে, আমার মৃত্যু হইয়াছে, না হয় নরঘাতিনী বলিয়া পুলিসের হাতে আমি ধরা পড়িয়াছি।"

আমি হতাশভাবে বলিলাম, "তবে সে কথা সত্য? গোল্ডার্শ গ্রীণে তোমার প্রণয়ীর হত্যাকাণ্ডের কথা তোমার পিতা প্রকাশ করিয়া দিবে, এই ভয়ে তুমি তোমার পিতার অপরাধ গোপন রাখিয়াছ?"

যোয়ান বিরক্তিভরে বলিল, "হাঁ, হত্যাকাণ্ডের কথা সত্য। তুমি সকল কথাই জানিতে পারিয়াছ, আর আমাকে বিরক্ত করিও না, আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাও; আমাকে ভুলিয়া যাও।"

আমি বলিলাম, "না, আমার তাহা অসাধ্য। আমি তোমার এ অনুরোধ রক্ষা করিব না।"

যোয়ান বলিল, "তুমি আমাকে ভালবাস বলিলে, তবে আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবে না কেন? কেন আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে না?"

আমি বলিলাম, "তুমি বিপন্ন, আমি তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি না, ইহা প্রেমের ধর্ম্ম নয়।"

যোয়ান হতাশভাবে বলিল, "কিন্তু তুমি আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। পুলিস আমার সন্ধানে ফিরিতেছে। আমি এখানে আসিয়াছি, তাহা তুমি যখন জানিতে পারিয়াছ, তখন পুলিস তাহা জানিতে পারে নাই, ইহা আমি বিশ্বাস করি না; তাহারা এখানে আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিবে।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সেই কক্ষের দ্বারে করাঘাত হইল। তাহা শুনিয়া যোয়ান আতঙ্কাভিভূত হইয়া বলিল, "ঐ শুন, পুলিস দ্বারে আসিয়া দরজায় ধাক্কা দিতেছে! সত্য কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, আর আমার পরিত্রাণ নাই; এখনই তাহারা আমাকে গ্রেপ্তার করিবে। না, আর কোন আশা নাই।"

পুনর্ব্বার দ্বারে করাঘাত হইল।—সত্যই কি পুলিস?

আমি যোয়ানকে রক্ষা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলাম। আমি উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলাম, দ্বার অর্গলরুদ্ধ ছিল না। আগন্তুক পুনর্ব্বার ধাক্কা দিতেই দ্বার খুলিয়া গেল; দেখিলাম—সে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান! আমি স্তব্ধভাবে আগন্তুকের দীর্ঘ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলাম; তাহাকে দেখিয়া আমার মুখে কথা ফুটিল না। আগন্তুকও আমার মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

চরমে

পাষাণ পরাণ করেছি এবার
বাহিরে সেজেছি কালো;
দুঃখের প্রলেপে শীতল হয়েছি
ভিতরে জ্বেলেছি আলো।

দুঃখের অনলে পুড়িয়া মরিতে
রাখি নাক' আর ভয়;
বেদনা সহিতে লভেছি জনম—
দেবতা সাজিতে নয়।

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
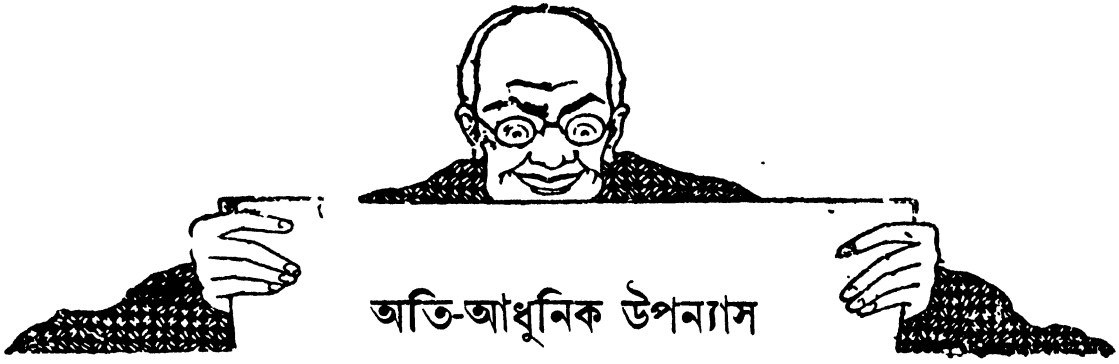
অতি-আধুনিক উপন্যাস

শ্রীযুক্ত বসুমতী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আপনার মাসিক পত্রখানি তো দেখি এক ঢাউস ব্যাপার। প্রত্নতত্ত্ব ছাপাইয়া পরিষদ-পত্রিকা না করুন, কিন্তু ছাপেন কি? কালের হাওয়ায় মাটী ফুঁড়িয়া এই যে এ দেশে প্রতিভার কত অঙ্কুর ব্যাঙের ছাতার মত দেখা দিয়াছে চারিধারে, যাঁদের লেখনী বাঙলা সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছে, বেচারা রবীন্দ্রনাথ যাঁদের কলমের গরম ঝাঁজ সহিতে না পারিয়া সাগর-পারে পাড়ি দিলেন, সেই সব ভুঁইফোড় প্রতিভাধরদের নামও আপনাদের ঐ ঢাউস কাগজের ক্ষুদ্র একটি কোণে দেখিতে পাই না। দাসী-বাঁদীর হৃদয়ের নিভৃত প্রেম লিখিতে গিয়া শক্তির অভাবে বঙ্কিমচন্দ্র কি কাপুরুষতারই না পরিচয় দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ সৌখীন সমাজ লইয়া মত্ত রহিলেন। বস্তীর পাঁকে তাঁদের বড় ঘৃণা! এ কি সাহিত্যিকের কাজ, না, কবির ধর্ম্ম? এ-কালের ভুঁইফোড় প্রতিভাধরদের লেখা পড়ুন তো…টাট্‌কা প্রাণের বার্-ফটকা আবেগে মন একেবারে চঞ্চল হইবে! আপনারা তাঁদের সেই আর্টমাজা তাজা লেখা ছাপেন না কেন? পেনাল কোডে ঐ যে একটা ধারা আছে ২৯২, তার ভয়ে? তার উপর দেখিতেছি, পাব্লিক প্রসিকিউটর মহাশয়ের রচনা প্রতি মাসে ছাপা হইতেছে, পাছে তাঁর চোখে পড়ে, এবং…? কাপুরুষতা আর কাহাকে বলে? আপনারা এ কথা জানেন তো…আর্ট ও ফ্লার্ট…অর্থাৎ, ঘৃণা-লজ্জা-ভয় এ তিন বস্তু বর্জ্জন করিতে না পারিলে আর্ট এবং ফ্লার্টের চর্চ্চা অসম্ভব!

আপনারা যখন মাসিকপত্র বাহির করেন, তখন এ তো সাহিত্যচর্চ্চা এবং সাহিত্যে যদি আর্ট না রহিল তো সে সাহিত্য নাই-বা করিলেন! আর্ট না মানিলে মাসে মাসে এ ঢাউস কাগজ ছাপানোর অর্থ প্রবঞ্চনা নয় কি? যেহেতু, আপনারা 'মাসিক-পত্র' নাম দিয়া যাহা বাহির করিতেছেন, তাহার সঙ্গে অপ্রত্যক্ষভাবে (implied) representation রহিয়াছে যে, মাসিকপত্রে সাহিত্যের বেসাতি করিতেছেন এবং মাসিক-পত্র নাম দেখিয়া পয়সা ফেলিয়া যে-কেহ ইহার গ্রাহক হইবেন, তিনিই এই বিশ্বাসে গাঁটের কড়ি বাহির করিতেছেন যে, উক্ত মাসিকপত্রে আর্ট থাকিবে। সুতরাং সে আর্ট না থাকিলে আপনারা representation-অনুরূপ দ্রব্য না দিয়া অপর দ্রব্য চালাইতেছেন। পেনাল কোডে ইহাকেই বলে, Cheating.

Cheatingএর বর্ণনা পেনাল কোডে আছে—

"Whoever, (বসুমতী-সম্পাদক) by deceiving any person (গ্রাহক) fraudulently or dishonestly (মাসিকপত্র নাম দিয়া) induces the person so deceived (বেচারা গ্রাহক) to deliver any property (বার্ষিক মূল্য) to any person (বসুমতী-সম্পাদককে) …to do etc. etc.…which act…causes…damage or harm to that person (গ্রাহক) in body, mind…is said to cheat."

সুতরাং বুঝিয়া দেখুন, মাসিকপত্র নাম দিয়া আপনি ঢাউস কাগজ বাহির করিলেন, গ্রাহক বুঝিল, যখন এ মাসিকপত্র তখন ইহাতে আর্ট থাকিবেই এবং সে বেচারা আর্টের লোভে পয়সা দিয়া গ্রাহক হইল; তার পর যখন দেখিল, আপনার কাগজে আর্টের নাম-গন্ধ নাই…এটা কি 'cheating' নয়?

যাক, এ সব আইনের কথা। আপনি বোধ হয় আইনের কেতাব পড়েন নাই। কাজেই ও-সব বুঝিবেন না! আপনার উকিল লেখকদের পরামর্শ লইবেন। আপনার উকিল আছে,—গত মাসে বেচারা হুজুগদাস হাজরাকে সেই উকিলের ভয়ও দেখাইয়াছেন! একবার এ সম্বন্ধে…

আপনাকে এ চিঠি লিখিবার কারণ আছে। আমি আবগারী বিভাগের দারোগা ছিলাম। চাকরি গিয়াছে—ভাবিতে…

গল্প-উপন্যাস লিখিয়া পয়সা রোজগার করিব। বহির দোকানে ঘুরিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, অতি-আধুনিক আর্টওয়ালা গল্প-উপন্যাস বিকায় বেশ। তা ছাড়া এঁদের দলে পরস্পরের প্রতি দরদ আছে, সহানুভূতি আছে—নীচ হিংসার লেশমাত্র নাই। এঁদের পরস্পরে পরস্পরকে ইবসেন, ব্যালজাক, বার্ণার্ডশ' গর্কি, ন্যুট হ্যামশেনের সমতুল্য বলিয়া মানেন। বহু বুড়াও শিঙ্ ভাঙ্গিয়া এঁদের দলে মিশিতেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের পাল্লায় কেমন জব্দ হইয়াছেন! এঁদের লেখার প্রতি বিদ্রূপ! অতএব লিখিতে যদি হয় তো এঁদের আদর্শেই লেখা উচিত। বঙ্কিম বাতিল, রবীন্দ্রনাথ রদি···আমি ইঁহাদের আদর্শে উপন্যাস ফাঁদিয়াছি। আপনার কাগজে ছাপাইতে চাই। প্লটের হদিশ আপনাকে পাঠাইতেছি···মূল্য পাঠাইলে গোটা উপন্যাসখানি পাঠাইব। আপনাকে ছাপিতেই হইবে। যদি না ছাপেন···থাক, সে যা করিবার, পরে দেখিবেন। পাব্লিক প্রসিকিউটর মহাশয়ও আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না! আমার উপন্যাসখানির নাম দিয়াছি "দু'জোড়া!"

শ্রীকলমবাজ কালিরত্ন।

নায়কের নাম পুষ্পরেণু। বালিগঞ্জে বাড়ী। মস্ত জমিদার। বিলাত ঘুরে এসেচেন। সাহেবী ষ্টাইলে বাস করেন! বাড়ীতে বন্ধু-বান্ধবের নিত্য আনাগোনা।

প্রথম পরিচ্ছেদে বই সুরুর মুখে নায়ক পুষ্পরেণু মস্ত একটা প্ল্যান দেখচেন, মুখে গোল্ডটিপ সিগারেট। তাঁর সামনে চেয়ারে ব'সে বন্ধু চম্পকনাথ। চম্পকনাথের চোখের দৃষ্টি পুষ্পরেণুর উপর নিবদ্ধ। নিস্তব্ধ ঘর। পাশের বাড়ীতে কে পিয়ানো বাজাচ্ছে, বায়ুতরঙ্গে তার সুর ভেসে আসচে। পুষ্পরেণুর পায়ের কাছে একটা বিলাতী হাউণ্ড ব'সে আছে নিঃসাড়ে—যেন ইটালিয়ান ভাস্করের হাতে গড়া পাথরের কুকুর!···

[সম্পাদক মহাশয়, এখানে একটা আশ্চর্য্য আর্ট দেখিয়েচি।. স্তব্ধ ঘরে পুষ্পরেণু প্ল্যান দেখচেন, আর ঘরের বাইরে আর এক ঘরে তরুণ-তরুণীরা মিলে আর্ট-সম্মত নব-সংস্করণ 'বিদ্যাসুন্দর' নাটিকার রিহার্শাল চালাচ্ছেন; এর বিশদ বিবৃতি উপন্যাসে পাবেন]

হঠাৎ পুষ্পরেণু একটা নিশ্বাস ফেলে প্ল্যানের কাগজখানা দূরে নিক্ষেপ করিলেন, চম্পকনাথ শিউরে পুষ্পরেণুর দিকে চেয়ে রইলো। পুষ্পরেণু বল্লেন,—মনকে শুধু ছলনা করা এই কাজের ভাণে, বন্ধু···মন আমার পঙ্গু···কিছু ভালো লাগে না—এই মোটর, ঐ পিয়ানোর সুর, বড় বাড়ী, ব্যাঙ্কের টাকা···কোনো আরাম দেয় না।

চম্পকনাথ গরীব গৃহস্থ। পুষ্পরেণুর কথায় তার বুক দুলে উঠলো। সে ভাবলে, তাই যদি তো আমায় ট্রাষ্টি করো···কিন্তু মুখে এ কথা ফুটলো না। যদি পুষ্পরেণু ভাবে, এ লোকটা অর্থের লোভে তার সাথী হয়েচে! [বাস্তব জীবনে এমন ঘটে] বন্ধুকে নির্ব্বাক্ দেখে পুষ্পরেণু তার দু'হাত চেপে ধ'রে ব'লে উঠলো—বন্ধুর কাজ করবে? আমায় এ পয়সার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেবে?

চম্পকনাথ অবাক্! পুষ্পরেণু বললে,—আমার টাকা-কড়ি সব নাও তুমি—নিয়ে আমায় নিছক প্রীতি এনে দাও বন্ধু!···

চম্পকনাথ বিহ্বল! হঠাৎ বেয়ারা এসে বল্লে,—বৌমা চিড়িয়াখানা দেখতে যাচ্ছেন—কোন্ গাড়ীতে যাবেন?···

ঘৃণায় মুখ সিঁট্‌কে পুষ্পরেণু বল্লে,—যেটায় তাঁর খুশী···

বেয়ারা চ'লে গেল। পুষ্পরেণু সজল চোখে বল্লে,—শুনলে? বসন্তের বাতাসে আমার প্রাণে এই আকুলতা—আর আমার স্ত্রী চললেন চিড়িয়াখানায় গণ্ডার দেখতে, ভাল্লুক দেখতে, বাঁদর দেখতে! তরুণ বয়সে এতখানি বেদনা কেউ কখনো পেয়েচে, বন্ধু···?

এইখানে প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ হয়েচে।

[সম্পাদক মশায়, আপনি হয় তো বলবেন, টাকা-কড়ির কথা যে উঠছিল, তার কি হলো? আমার জবাব···কিছু না! কারণ, টাকাকড়ি দিয়ে ফেলা প্রসঙ্গের ঐ অবতারণা? ও শুধু নায়কের প্রাণের সুগভীর বৈরাগ্যের ইঙ্গিত দেবার জন্ম। কিন্তু প্রথম পরিচ্ছেদেই পয়সা-কড়ি দিয়ে ফেল্লে কি পাথেয় নিয়ে তার জীবনে রোমান্স অগ্রসর হবে? অসঙ্গতি-দোষ ঘটে যদি?]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পুষ্পরেণু ডায়েরী লিখচেন। ডায়েরীটা এমনি,—

এর নাম জীবন? এ কি জীবন? এ শুধু বেঁচে থাকা··· শুধু নিশ্বাস-প্রশ্বাসের চমক লাগানো!···

এমন সময় পুষ্পরেণুর আর-এক বন্ধু এসে দেখা দিলেন;

এঁর নাম চিরঞ্জীব। ইনি পয়সা-কড়ি সম্বন্ধে ভারী হুঁশিয়ার—সারাদিন শেয়ার-মার্কেট, রেশ-কোর্শ, এটর্ণি-পাড়া, শ্মশান-ঘাট—এই সব জায়গায় ছুটোছুটি করচেন···কোথা থেকে দু'পয়সা আহরণের হদিশ মেলে! তিনি এসে বল্লেন,—তোমার লোহার শেয়ারগুলো আজই বেচে ফেলো হে। চরম দর উঠেচে। কাল থেকে আবার দর নামবে, দাঁও চাও তো এক মিনিট দেরী নয় ··

পুষ্পরেণু নিশ্বাস ফেলে বল্লে,—পয়সায় কি হবে?

চিরঞ্জীব বল্লে,—আরে man, পয়সায় কি না হয়? পয়সাই সব!···

পুষ্পরেণু টেবিলের ড্রয়ার খুলে এক তাড়া শেয়ারের কাগজ বার ক'রে ঘৃণা-ভরে চিরঞ্জীবের হাতে দিলে···চিরঞ্জীব ঝড়ের মত বেগে নিষ্ক্রান্ত হলো। এইখানে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শেষ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—চিরঞ্জীবের ঘর। চিরঞ্জীবের তরুণী পত্নী তড়াগিনী উদাস-মনে আকাশ-পানে চেয়ে ব'সে আছেন। পুষ্পরেণু এলেন, এসে প্রশ্ন করলেন,—চিরঞ্জীব আছে?···

শূন্য-নয়নে তার পানে চেয়ে তড়াগিনী বল্লেন—না···

পুষ্পরেণু গমনোদ্যত; তড়াগিনী আশ্রয়-কাঠি-ভাঙ্গা লতার মত ছিট্‌কে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন,—দাঁড়ান···

পুষ্পরেণু মন্ত্রচালিতের মত দাঁড়ালেন। তড়াগিনী বল্লেন,—কি নির্ম্মম তোমরা পুরুষ জাতটা! কাজ, কাজ, শুধু কাজই চিনেছো! আকাশের নীলিমা, ফুলের লালিমা, উতল হাওয়ার চালিমা—এ-সবের পানে তাকাতে জানো না। আর এই আমি এখানে শূন্য-মন নিয়ে ব'সে আছি··· হায়, দিতে চাই, নিতে নাই কেহ···তড়াগিনীর দুই চোখ ব'য়ে জলের ধারা ঝ'রে পড়লো!···

পুষ্পরেণু কেঁপে উঠলেন···বল্লেন,—আমি—আমি···

তড়াগিনী তাঁর হাত দুটো ধ'রে প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে বল্লেন,—অপদার্থ, অন্ধ···যাও চ'লে। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ধাক্কা···পুষ্পরেণু পড়তে পড়তে কোনোমতে টাল্ সামলে উঠে দাঁড়ালেন, তার পর চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।—আর তড়াগিনী? মেঝেয় লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কম্পিত কণ্ঠে স্খলিত সুরে গানের কলি ফুটলো,—

ও আমার মন, পোড়া মন···
কেউ নাই রে তোর আপন!

তার পর চতুর্থ পরিচ্ছেদ—পুষ্পরেণু উদ্‌ভ্রান্তের মত পথে পথে বেড়াতে লাগলেন—ঘূর্ণি-বাতাসে ধুলোর চর্কি যেন! তড়াগিনীর হাতের সেই তপ্ত স্পর্শে তাঁর মনে আগুন ধ'রে গেছে, প্রাণ সে তপ্ত স্পর্শে জেগে উঠেচে!··· ঘূর্ণিপাকে আবার সন্ধ্যার সময় পুষ্পরেণু চিরঞ্জীবের ঘরে এসে উপস্থিত। ঘর অন্ধকার—একটিও দীপ জ্বলেনি। পুষ্পরেণু এসে ডাকলেন,—চিরঞ্জীব···

ঘরের মধ্য হ'তে চাপা কান্নার অস্ফুট আভাস জাগলো··· (সম্পাদক মশায়, 'চাপা কান্নার আভাস' আপনারা বুঝবেন না। প্রাণের কারবার যে করেচে, সে জানে। ও বস্তুর সঙ্গে এ-কালের পাঠক-পাঠিকারও পরিচয় আছে।) পুষ্পরেণু স্তম্ভিত···কোনোমতে তিনি বল্লেন—আলো নেই কেন?

ফুঁপিয়ে কেঁদে তড়াগিনী বল্লেন,—ভিতর যার অন্ধকার—তার বাহিরের আলোয় দরকার?

এ কথায় পুষ্পরেণু শিউরে উঠলেন···সঙ্গে সঙ্গে তড়াগিনীও···

পুষ্পরেণু বল্লেন,—চিরঞ্জীব কোথায়?

তড়াগিনী বললেন,—শেয়ার মার্কেটে আপনি যে এ সন্ধ্যায় আপনার প্রিয়াকে ছেড়ে···?

পুষ্পরেণুর অন্তরে অশ্রুর বান ডেকে গেল। নিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন,—নিষ্ঠুর প্রিয়া···

তড়াগিনী বল্লেন,—কোথায় তিনি?

পুষ্পরেণু বল্লেন,—চিড়িয়াখানা থেকে এখনো ফেরেন নি। সঙ্গে সঙ্গে বুকভাঙ্গা আর্ত্তস্বর ফুটলো, ওঃ! ··

তড়াগিনীর কণ্ঠেও তেমনি রব—আঃ!···

এইখানে চতুর্থ পরিচ্ছেদ শেষ হয়েচে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে ঘরে আলো জ্বলচে। পুষ্পরেণু আর তড়াগিনী আলাপ-পরিচয় করচেন—আলাপ মানে, মনস্তত্ত্বের সুগভীর বিশ্লেষণ।

পুষ্পরেণু বললেন—চিরঞ্জীব মানুষ নয়···এই সন্ধ্যায় তরুণী প্রিয়ার পানে ফিরে চায় না—এমন প্রিয়া···প্রাণে যার প্রেমাবেগের সীমা নেই! রেশ-কোর্শে ঘোড়ার পা মেপে বেড়াচ্ছে দুটো পয়সার জন্য···! ছি!

তড়াগিনী বললেন—আর আপনার প্রিয়া···?

পুষ্পরেণু জবাব দিলেন—অট্টহাসি? (পুষ্পরেণুর পত্নীর নাম অট্টহাসি। নাম শুনে হাসবেন না মশায়। অতি-আধুনিক

প্রতিভাধরদের এই নামকরণই হলো এক মস্ত বৈশিষ্ট্য। আমি সেদিকে রীতিমত লক্ষ্য রেখে নায়ক-নায়িকার নামকরণ…তা ছাড়া এ নামের সার্থকতা কতখানি, উপসংহারে বুঝবেন)…

তড়াগিনী বললেন,—আপনার হতভাগিনী হৃদয়-ভাগিনীর নাম বুঝি ?

পুষ্পরেণু বললেন—হাঁ। তিনি চিড়িয়াখানা দেখতে যান, খিদিরপুরের ডক দেখতে যান, থিয়েটার বায়স্কোপ কার্ণিভ্যাল…এ-সব দেখা তো আছেই…

দু'জনের প্রাণ ছুঁয়ে বিদ্যুৎ-শিখা ব'য়ে গেল।…তড়াগিনী চুপ-চাপ রইলেন।

পুষ্পরেণু বললেন—চুপ ক'রে আছেন যে ?

তড়াগিনী। ভাবচি।

পুষ্পরেণু। কি ভাবচেন ?

তড়াগিনী। মনস্তত্ত্বের কথা !…উঃ, দু'জনের কি প্রাণ নেই ? মনও নেই ? বুকের নীচে মন… যে-মন দুরন্ত বাসনায় ফুঁশে ওঠে, দুর্মদ লোভে তপ্ত হয়…যে-মন ধরণীতে হাহাকার ক'রে মরে, আর স্বপ্নলোকে আরাম পায় ? প্রেম, প্রীতি, মিলন, বিরহ, হাসি-অশ্রুর চকিত দোলায় দোদুল সজীব থাকে ?… এদের এ জীবনে লাভ ? ঐ নুড়ি-পাথরগুলোর মত জীবন…শুধু একটু তফাৎ…

পুষ্পরেণু। ঠিক…এদের নাকে নিশ্বাস-প্রশ্বাস আছে—নুড়ি-পাথরের নাক নেই, কাজেই নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেই…এই তফাৎ !

তার পর আবার স্তব্ধতা…হঠাৎ দু'জনেই উঠে দাঁড়ালেন… পুষ্পরেণু সদ্য-প্রমোশন-পাওয়া হেড কনষ্টেবলের মত সদম্ভে পায়চারি…আর তড়াগিনী দুই চোখে আগুন জ্বালবার চেষ্টায় চঞ্চল সর্পের মত ফোঁশ ফোঁশ করতে লাগলেন…

[কি রকম বুঝচেন সম্পাদক মশায় ? এমন style আর physio-psychology আপনাদের বঙ্গ-সাহিত্যের শেষ-যুগ-প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত…(থাক্, পরের ঢাক আমি পিটবো না, পণ করেচি ; তাই নাম চেপে গেলুম) মশায়ও দেখাতে পেরেচেন ? বাঙলার কথা-সাহিত্যে গোটাকতক যুগান্তর ঘ'টে গেছে… পট্‌পট্ সমালোচকের দল জোর-গলায় বলতে সুরু করেচেন কি না…প্রথম, বঙ্কিমচন্দ্র ; দ্বিতীয়, রবীন্দ্রনাথ ; তৃতীয়…নাম করবো না। No advertisement. তবে এই যুগপ্রবর্ত্তনের ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই ঝঙ্কার-পরায়ণা হীরা দাসীর কাংস্য-ঝঙ্কার কোদণ্ড-টঙ্কারে শুদ্ধ হয়ে পিয়ানো-এস্রাজে বিলীন হয়েচে এবং মেশে ও কলকাতার গৃহিণীহীন বাসাগুলোয় হীরার দল জলচল হয়েছেন বিরাট convent on ভেঙ্গে…তার পর পথের পাণওয়ালী, হাড়িবৌ, বস্তীর আরো নানা মূর্ত্তি এই সব প্রতিভাধরদের ধ'রে তরুণ-চিত্তালয়ে অতি সহজে যাতায়াত সুরু করেচেন ! তার পরের যুগে সরেশ সাইকলোজি…যার দাপটে দত্তগিন্নী রায়গিন্নী থেকে মায় বুদ্ধদেবের পত্নী অবধি এসে সোনার গাছে হীরার ফুল হয়ে ফুটচেন। আমিও এঁদের মত যুগ-প্রবর্ত্তনের শক্তি রাখি]

হঠাৎ একটা চিন্তা তড়াগিনীর চিত্তপ্রান্তে চিকুরের মত চিক্‌চিক্ ক'রে উঠলো। পুষ্পরেণুর হাত ধ'রে তড়াগিনী হাঁকলেন—বন্ধু…

পুষ্পরেণু চমকে লাফিয়ে উঠলেন…

তড়াগিনী বললেন—কেঁপে উঠলে…?

স্খলিত কণ্ঠে পুষ্পরেণু বললেন—হ্যাঁ। কি বলচো ?

তড়াগিনী। বিষ…বিষ চাই… এতটুকু…কিন্তু খুব উগ্র…

পুষ্পরেণু। তুমি বিষ খাবে ! না, না…কি দুঃখে ?

তড়াগিনী হা-হা হেসে উঠলেন, বললেন—তুমি মূঢ়, বিমূঢ়…আমি কেন বিষ খাবো ? বিষ খাবে তারা, যারা জীবনের দাম জানে না…যারা ঐ নুড়ি-পাথরের সামিল…

রুদ্ধ নিশ্বাসে পুষ্পরেণু বললেন—বুঝতে পারচি না…বুঝিয়ে দাও…তবে কি আমি বিষ খাবো ?

—না। ব'লে তড়াগিনী পুষ্পরেণুকে ধাক্কা দিলেন, বেশ জোরে…পুষ্পরেণু দেওয়ালের কোণে গিয়ে পড়লো মাথা ঠুকে…

ফোঁশ ক'রে নিশ্বাস ফেলে তড়াগিনী বললেন—বিষ খাবে তোমার বন্ধু ঐ অর্থপিশাচ চিরঞ্জীব, আর তোমার হতভাগিনী হৃদয়ভাগিনী অট্টহাসি…বুঝচো না ? এ যদি না বোঝো, তা হ'লে আমি এই স্তব্ধ হলুম।

পা-চাটা কুকুরের মত পুষ্পরেণু তড়াগিনীর পানে চেয়ে রইলেন, তার পর মাথা নাড়তে লাগলেন, কথাগুলো মস্তিষ্কে চেলে ভালো রকম প্রণিধান করবার জন্য ! প্রণিধান হ'লে তিনি বললেন,—আঃ…আঃ…এই একটিমাত্র উপায় শুধু ওদের মুক্তির…

বিজয়-গর্ব্বে তড়াগিনী বললেন—সেই মুক্তিই আমি ওদের দিতে চাই।…

পুষ্পরেণু পরক্ষণে চিন্তিত হলেন, বললেন—কিন্তু কি ক'রে ? কথন্ ?·· পুলিশ যদি কোনো ফ্যাসাদ বাধায় ?

তড়াগিনী বললেন—না, না···এর মধ্যে পুলিশের স্থান নেই, বন্ধু, প্রিয় হে, সখা হে···

[এইখানে ইঙ্গিতে দু'জনের প্রতি দু'জনের প্রণয়-ভাব-জ্ঞাপন···এই ব্যাপার দুটি পরিচ্ছেদে বেশ ভালো রকম **develope** করেচি]

পুষ্পরেণু বললেন—তবে কি ক'রে বিষের ক্রিয়া···?

তড়াগিনী বললেন—শোনো···রাত্রে অট্টহাসি পাণ খান ?

—খান।

—বেশ, সেই পাণে এক পুরিয়া বিষ···তার অগোচরে··· ব্যস্ !

—কিন্তু পাণ যে ঝীয়ে সাজে···

—সেই ঝীয়ের হাতে দেবে···বলবে, ওষুধ···এ খেলে ক্ষিদে হয়···

—যদি ঝী ক্ষিদের লোভে নিজে সে বিষ খায় ?

—মরবে। ঝীয়ের প্রাণ···কোনো কোনো ঔপন্যাসিকের কাছে তার দাম থাকতে পারে। কিন্তু গৃহস্থের সংসারের যে-সব ঝী দেখা যায়, তাদের প্রাণের কোনো মূল্য নেই···

[সম্পাদক মহাশয়, local hitটা বুঝচেন]

পুষ্পরেণু। এ হলো অট্টহাসির ফাঁসির ব্যবস্থা। চির-জীবের সম্বন্ধে···

তড়াগিনী। সকালে চায়ের পেয়ালায় · বেয়ারা দিয়ে দেবে···

পুষ্পরেণু। আবার বেয়ারা ! ঐ তো বিপদের সূত্র রচনা করা·· সে যদি পুলিশে খবর দেয় ?

তড়াগিনী। তার আগে সেও ঐ পুরিয়া-মেশানো পেয়ালা মুখে দেবে, দিয়ে মরণ-পথের যাত্রী হবে ! তাদের জীবনের তো কোনো দাম নেই···এ কথা কত বার বলবো ? জানো না, প্রণয়-হীন, আবেগ-হীন জীবন জীবনই নয় ! ··

—তার পর ?

তড়াগিনী উচ্ছ্বসিত, আবেগে বললেন—তার পর এই অনন্ত অসীম ধরণীর নিভৃত প্রান্তরে আমরা প্রেমের কল-রাগিণী-ভরা এক নূতন স্বর্গ রচনা ক'রে বাস করবো·· বাতাস আমাদের ক্ষুধা-পিপাসা জোগাবে, অধর-সুধায় তার নিবৃত্তি হবে···নিভৃত নির্জ্জনে মৃদু মলয়-বীজনে প্রেম আর প্রীতি, প্রীতি আর প্রেম · পরকীয়-পরকীয়ায় হিয়ায়-হিয়ায়···

পুষ্পরেণু চক্ষু মুদলেন·· এ স্বর্গ প্রীতি-প্রেমে রচা, এ স্বপ্ন-স্বর্গ চাওয়া-চোখে দেখা যায় না ; তাই··

তড়াগিনী একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন—সে মধু মুহূর্ত্তের আর বিলম্ব কত, নাথ ? ··

তার পর বাড়ী ফিরে পুষ্পরেণু বিষ সংগ্রহ করলেন,··· বেয়ারাকে বললেন,—ইঁদুর মারবো !

তড়াগিনীর সঙ্গে সঘন পরামর্শ চললো···চম্পকনাথ (পুষ্পরেণুর সেই বন্ধু) পুষ্পরেণুর হৃদয়-ভার লঘু করার উদ্দেশে পাঁচ-সাতখানা হ্যাণ্ডনোট লিখে কিছু টাকা সংগ্রহ ক'রে নিল এই অবসরে···সে কবিতা লিখতে সুরু করেছিল, তার একটা কবিতা মাসিক কাগজে ছাপিয়েছিল···পুষ্পরেণুর সে-কবিতা ভারী পছন্দ হলো।

তড়াগিনীকে পুষ্পরেণু এ কবিতাটি উপহার দিতে ভুললেন না···

এইখানে উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় শেষ।

দ্বিতীয় অধ্যায়টা সংক্ষেপে বলি···

প্রথম পরিচ্ছেদ সুরু, পুষ্পরেণুর গৃহে। রাত্রি দশটায় পুষ্পরেণু গৃহে ফিরলেন। খাবার তৈরী। পত্নী অট্টহাসি বললেন, এত রাত হলো যে ?

পুষ্পরেণু বললেন,—হুঁ !

অট্টহাসির বেশভূষা অপরূপ ! পুষ্পরেণু তা লক্ষ্য করলেন।

অট্টহাসি বললেন,—কি দেখচো ?

পুষ্পরেণু বললেন,—সাজের ঘটা···

অট্টহাসি বললেন,—নেমন্তন্ন গেছলুম ও-বাড়ীতে—বৌভাত ছিল, মেয়ে-খাওয়ানো, তাই··

পুষ্পরেণু বললেন,—ওঃ !

পুষ্পরেণু খেতে বসলেন, অট্টহাসি চ'লে গেলেন বেশ পরিবর্ত্তন করতে। পুষ্পরেণুর মনে শয়তান জেগে উঠলো· প্রতিহিংসার আগুনে জল্-জলে মূর্ত্তিতে ! খেতে খেতে পুষ্পরেণু নিজের মনে ব'লে উঠলেন—মনের পানে তাকাতে জানে না,—তুমি নারী ? না, একটা মাংসপিণ্ড···আর একটা দি· তুমি সবুর করো···তার পর···? মনের মধ্যে বিদ্রূপের হা· হাজার বাতির ঝাড়ে জ্ব'লে উঠলো···চমৎকার !

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আবার চিরঞ্জীবের প্রবেশ। চিরঞ্জী·

বললে,—একখানা বাড়ী শস্তায় বিকিয়ে যাচ্ছে···তোমার স্ত্রীর নামে বেনামীতে কিনে রাখো···

পয়সার মায়া পুষ্পরেণুর ছিল না। পুষ্পরেণু বললেন, —বেশ। মন বললে, আর কতক্ষণ···হঠাৎ একটা চিন্তা মনে উদয় হলো—তিনি প্রশ্ন করলেন,—চা খাওনি ?

চিরঞ্জীব বললে,—না। ভোরেই চা না খেয়ে বেরিয়ে পড়েচি···তার পর চা পান করেচি বন্ধুর ওখানে···

দুর্দ্দৈব ! আরো এক দিন বিলম্ব হলো, কিন্তু উপায় কি ?

টাকা নিয়ে চিরঞ্জীব বেরিয়ে পড়লো। [এইখানে পুষ্পরেণুর মনের উল্লাসে আর দ্বিধায় দ্বন্দ্ব দেখিয়েচি পুরো পাঁচটি পৃষ্ঠা ব্যেপে]···

তৃতীয় পরিচ্ছেদে পুষ্পরেণু আর তড়াগিনী···দু'জনের দেখা লেকের ধারে। তড়াগিনী বললেন—সব আয়োজন তৈরী ?

পুষ্পরেণু বললেন,—তৈরী।···

তার পর দু'জনে ভবিষ্যতের আরাম-কুঞ্জ রচনার আলোচনা। তড়াগিনীর বুদ্ধিতে বিমুগ্ধ হয়ে পুষ্পরেণু বললেন, —একটি চুম্বন···

তড়াগিনী বাধা দিয়ে বললেন—এখনো সময় হয়নি··· কাল ওদের দু'জনকে মরণের পথে পাঠিয়ে যখন আমরা মিলন-পথে পাড়ি দেবো, তখন···

(সম্পাদক মহাশয়, এতক্ষণে দেখলেন, কি কৌশলে দুজনের মনের কথা প্রকাশ করলুম।)

তড়াগিনী বললেন,—কাল রাতে পাঞ্জাব মেলে রওনা হবো···হাওড়ায় দেখা হবে। প্রথমে যাবো বদরিকাশ্রম··· তীর্থ ঘুরে পাহাড়ের আড়ালে গুহার মুখে···আমাদের মিলনের মহাতীর্থ রচনা করবো !

পুষ্পরেণু চক্ষু মুদে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের পিছনে গুহার ছবি দেখতে লাগলেন। তার পর দু'তিনটে পরিচ্ছেদে অট্টহাসি আর চিরঞ্জীবের মনের গতি দেখানো হয়েচে অট্টহাসি তাস খেলচে সঙ্গিনীদের সঙ্গে; দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গেছে ; ছাদে ব'সে বড়ি দিচ্ছে···তরুণ স্বামীর তরুণ-মনের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে। আর চিরঞ্জীব ? রেস-কোর্শে ছুটোছুটি করচে, শ্মশান-ঘাট থেকে সদ্য-বাপ-মরা নাবালক ধনীকে সান্ত্বনায় স্নিগ্ধ ক'রে তার জন্য রেডিও-সেট্ কিনচে, মোটরের বায়না করচে এবং···ইত্যাদি।

পরের পরিচ্ছেদে পুষ্পরেণু আর তড়াগিনী···

তড়াগিনী ডাকলেন,—বন্ধু···

তড়াগিনীর হাত দুটি নিজের হাতে ধ'রে পুষ্পরেণু বললেন—বলো···

—বিষ দিয়েচো···?

—দিয়েচি। অট্টহাসি এতক্ষণে···

তড়াগিনী বললেন,—তোমার বিষয়ী বন্ধু চিরঞ্জীবও···

—তাকে বিষ দিয়েচো ?

—নিশ্চয়।

—আঃ !

—ওঃ !

তার পর আবার স্তব্ধতা। তড়াগিনী বললেন—নিজের মনের পানে কখনো তাকিয়েচো ? আমি তাকিয়েচি·· সে যেন আমি নই, আর এক জন কে সেখানে ব'সে আছে···

—কে সে ?

—জানি না। বুঝি জীবন-দেবতা !···তুমি কখনো তাকিয়েচো ?

—তাকিয়েচি।

—কি দেখেচো ?

—শূন্য···বিরাট শূন্য···

—ঠিক···ওই শূন্য পূর্ণ করো প্রাণের দাবী মিটিয়ে···

দু'জনে পরামর্শ হলো·· আজ রাত্রে হাবড়ায় দেখা হবে !···

সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে এলো—দু'জনে গৃহের পানে ফিরলেন··· পরের পরিচ্ছেদে দু'জনে দু'জনের ঘরে পৌঁচেছেন···দু'জনের বাড়ীতেই দারুণ বিশৃঙ্খলা···দু'জনেই কম্পিত-প্রাণে শঙ্কিত-মনে ঘরে ঢুকে পেলেন দু'খানি চিঠি।

পুষ্পরেণু পেলেন বিছানার উপর ছোট চিঠি···অট্টহাসির লেখা—

বিদায় ! ..

ঘরের জিনিষপত্র তচনচ···আলমারির ড্রয়ার খোলা··· গহনা নেই, দলিলপত্র, কোম্পানির কাগজগুলো অবধি সেই সঙ্গে অন্তর্হিত !

তড়াগিনী চিঠি পেলেন চিরঞ্জীবের লেখা। তাতে লেখা আছে,—

তড়াগ,—

অট্টহাসি আর আমি জীবনে আরাম রচে তোলবার

আয়োজনে চললুম। দূরে, বহু দূরে। সে বেচারী ভালোবাসা পায়নি তার ঐ মূঢ় স্বামীর কাছে···আর তুমি? স্বপ্নঘেরা কি ধোঁয়ার উপর বাস করো··তোমার নাগাল পেলুম না! অতএব··ভাবনার কারণ নাই··আমরা প্রচুর অর্থ নিয়ে যাচ্ছি! তুমি ব'সে কাব্য রচনা করো··আমি p actical মানুষ, কাব্য বুঝি না···

দুনিয়ার মাটী দুলে উঠলো। তড়াগিনী দুম্ ক'রে আছাড় খেয়ে পড়লো সেই মাটীর বুকে।···

আধ ঘণ্টা পরে পুষ্পরেণু এলেন উন্মত্তের মত···পুষ্পরেণু বললেন—আমায় পথে বসিয়ে গেছে···অট্টহাসি আমার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে চম্পট দেছে···এমন পয়সা নেই যে রেলের টিকিট কিনবো!

দু'চোখ জলে ভরা তড়াগিনী বললেন,—এই দ্যাখো তোমার বন্ধুর কীর্ত্তি···ব'লে স্বামীর বিদায়-লিপিখানি তড়াগিনী পুষ্পরেণুর হাতে তুলে দিলেন।

প'ড়ে পুষ্পরেণুর চক্ষুস্থির! তিনি ব'লে উঠলেন,—আমরা দু'জনে যখন নিভৃতে কাব্য-সুখে বিভোর···সেই অবসরে মনের চাষে নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার ওরা দু'জনে···ওঃ!

তড়াগিনী কাঁদতে কাঁদতে বললেন—দুনিয়ায় নর-নারীর মনের পানে তাকাতে জানে না···কাব্যের এমন অনাদর করে···আর ওরাই শেষে···আঃ!···

[সম্পাদক মহাশয়,

এর পর উপসংহার একটু লিখে দিতে বলেন যদি তো লিখে দিতে পারি। কিন্তু তাতে আর্টের sugg·stiveness মারা যায়। এর শেষটুকু পাঠক-পাঠিকা ভেবে নিতে পারে··· যে, পুলিশে ওরা গ্রেপ্তার হলো; কিম্বা···অর্থাৎ হাজার রকম ঘটনা ঘটতে পারে।

এখন আসল কথা, টাকা পাঠিয়ে দেবেন কি? না দেন তো মাসিক-পত্রের অভাব নেই বাংলা দেশে···সামনে বৈশাখ মাস—নববর্ষ···নূতন উপন্যাসের জন্য সমস্ত মাসিক-সম্পাদকই এখন রুখে আছেন···ইতি···]

শ্রীকলমবাজ কালিরত্ন।

গ্রন্থ-পরিচয়

সারি—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। নয়টি সমুজ্জ্বল ছোট গল্পে গ্রন্থখানি গ্রথিত। প্রথমে সন্নিবেশিত হইলেও 'সারি'ই এই সারিবাঁধা গল্পমাল্যের মধ্যমণি।

বাঙ্গালার গল্পসাহিত্যবাসরে যে দিন 'নীলাম্বরা'র অভ্যাগম হইয়াছিল, সেই সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া সে দিন বাঙ্গালার সাহিত্যরসিক সম্প্রদায় তাহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন এবং তাহার স্বত্বস্বামিত্বের যিনি অধিকারী, তাঁহাকে সৌভাগ্যবান্ কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন। সে অনেক দিনের কথা, তার পর সেই আসরেই যখন 'কাণের দুল' দেখা দিল, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'উজ্জ্বলে মধুরে' মিশিয়া যে অপরূপ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হইল, তাহাতে অনেকেই মুগ্ধনেত্রে 'বলিহারি' দিয়া উঠিয়াছিল। সে-ও অল্প দিনের কথা নয়। তার পর আরও দুইখানি গল্পগ্রন্থ—'মুদ্রাদোষ' ও 'বিবি বউ' লিখিয়া লেখক সাহিত্যে তাঁহার গল্পাঙ্কনী প্রতিভা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছেন। 'বাঁশীচোর' 'প্রেমে প্রতিদ্বন্দী' 'নন-কো-অপারেটার' প্রভৃতি এ কথার সাক্ষ্যদান করিবে।

মনে আছে, আমরা যে দিন 'মানসী'র সম্পাদকীয় বৈঠকে 'প্রেমে প্রতিদ্বন্দীর' প্রথম পাণ্ডুলিপি পাঠ করিলাম, সে যে কি আনন্দ, কি উৎসাহ—সে কথা বলিয়া বুঝাইবার নয়। বার বার পাঠ করিয়া ও বন্ধুবান্ধব যে কেহ আসে, সকলকে শুনাইয়া সাধ যেন কিছুতেই মিটিতে চাহে না। আলোচ্য গ্রন্থখানি লেখকের পরিণত লেখনীর পরিপক্ব ফল—ভাবে ও রসে ভরপুর সাহিত্য-রসজ্ঞের পরম উপভোগের সামগ্রী।

গল্পগুলি বিষয়-বৈচিত্র্যে যেমন উদার, রসবিন্যাসে ও কলাকুশলতায় তেমনই মধুর। বস্তুতঃ যে সকল গুণে কথাশিল্পীর গল্পকথা অনায়াসে চিত্তগ্রাহী হইয়া উঠে, প্রত্যেক গল্পটি সেই সকল গুণে সমলঙ্কৃত। সর্ব্বোপরি একটি অনাবিল রুচিসুন্দর সুরে রচনার তারগুলি যেন বাঁধা; পাঠকের মনকে একটি সহজ আনন্দরসে যেমন অভিষিক্ত করে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনই ভাবরসের উচ্চগ্রামে বহন করিয়া লইয়া যায়।

আজকালকার কালে 'আর্টের' পরিণতি দেখিবার কৌতূহলে আধুনিক তরুণ সম্প্রদায়ের আবর্জ্জনাবহুল গল্পরচনা পাঠ করিতে বসিয়া চিত্ত যখন সঙ্কুচিত ও ক্লিষ্ট হইয়া উঠে, এই সকল গল্প পাঠ করিয়া তখন মন যেন প্রসন্নতালাভ করিয়া পুনর্ব্বার হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। 'সারি' ও 'প্রেমের ঠাকুরে' যে উচ্চস্তরের রসমাধুর্য্য বৈষ্ণবোচিত ভাবতন্ময়তার পরিচয় পাই, বাঙ্গালার গল্পসাহিত্যে তাহা দুর্ল্লভ কেন, অলভ্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। লেখক যে ভগবৎলীলার নিগূঢ় রসতত্ত্বে ওতপ্রোত, কণ্ঠে যেমন তাহার পরিচয় মিলে, বক্ষ্যমাণ রচনাদ্বয়েও তাহা তেমনই জাজ্বল্যমান।

বাঙ্গালার সমাজে ও বাঙ্গালীর গৃহে সকলে সমান আগ্রহে ও অকুণ্ঠিতচিত্তে যে গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিতে পারিবেন, এ কথা অসংশয়েই বলিতে পারি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

অন্তরের কথা

বর্ত্তমানে ভারতের সমস্যাই বৃটেনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল সমস্যারূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এখন পার্লামেণ্ট এবং জনসাধারণের সভাসমিতিতে ভারতের সমস্যার কথা যতটা আলোচিত হইতেছে, ততটা অন্য বিষয়ে হইতেছে না। লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতার মন্তব্য গ্রহণ এবং ভারতবাসীর গোল-টেবল-বৈঠক-বর্জ্জনই যে ইহার মুখ্য কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এত দিন ভারতবাসী ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারই তাহার কাম্য বলিয়া মানিয়া লইয়া আসিতেছে। সাম্রাজ্যের ভিতর থাকিয়া অন্যান্য বৃটিশ-প্রজার ন্যায় সমান অংশীদাররূপে গণ্য হইতে পারিলে তাহারা সন্তুষ্ট হইত। বৃটিশ সরকারও এই ভাবের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন প্রকৃত কার্য্যের সময় আসিল এবং ভারতীয়রা এই সম্বন্ধে একটা পাকা কথা চাহিলেন, তখন ঐ লক্ষ্যসাধন করা বৃটিশ সরকারের মূল নীতি এই কথা বলা হইল বটে, কিন্তু কোন পাকা কথা দেওয়া হইল না। কাযেই এখন সমস্যা অতি গুরু আকারই ধারণ করিয়াছে।

মহাত্মা গন্ধীর নেতৃত্বে ভারতবাসী তাহার কর্ত্তব্যপন্থা ঠিক করিয়া লইয়াছে। অন্য পক্ষ হইতে ভয়, প্রলোভন, ক্রোধ, মিষ্টবচন, ভেদ—সকলপ্রকার কৌশলই অবলম্বন করা হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত মনের কথাটি পাইবার উপায় নাই। ভারতবাসীকে বৃটেনের শিক্ষা-দীক্ষায় অভ্যস্ত করিবার পর তাহারা সে বিদ্যায় অভ্যস্ত হইলে, উপযুক্ত হইলে, তাহাদের হস্তেই তাহাদের দেশের শাসনভার অর্পণ করাই বৃটেনের চরম উদ্দেশ্য, এ কথা বহু ইংরাজ রাজনীতিকের মুখেই শুনা গিয়াছে। কিন্তু কথাটা সত্য কি না, তাহার প্রমাণ আজিও পাওয়া গেল না। বরং ইহার বিপরীত কথা অনেক শুনা গিয়াছে ও যাইতেছে। অতীতে বোম্বাই হাইকোর্টের জজ বিম্যান (১১ বৎসর পূর্ব্বে) "Empire Review" পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

"আমি মনে করি, ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্য আমরা ভারত অধিকার করিয়াছি। যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, ইংলণ্ডের স্বার্থই ভারত-শাসনের স্বীকৃত নিয়ামক নীতি; উহাই ভারত-শাসনের নিয়ামক নীতি হওয়াই উচিত। প্রত্যেক শাসন-সংস্কার, প্রত্যেক বড় বড় অবলম্বিত কার্য্য, প্রত্যেক শাসন-সম্পর্কিত পরিবর্ত্তন,—এ সকলই একমাত্র মানদণ্ড দ্বারা পরিমিত করা উচিত। সে মানদণ্ড ইংলণ্ডের স্বার্থ।"

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্পষ্ট কথা। ইহাতে রাজনীতিকের কথার মারপ্যাঁচ নাই, এইটুকুই ইহার প্রশংসার কথা। চিনির মোড়কে নিমবড়ী খাওয়ান অপেক্ষা এমন সাদা বিষবড়ী খাওয়ান সহস্রাংশে শ্রেয়স্কর।

ঠিক এই ভাবের কথা আর এক স্পষ্টবক্তা ইংরাজের মুখেই শুনা গিয়াছিল। তাঁহার নাম সার উইলিয়াম জয়েনসন হিক্‌স্। তিনি মিঃ বলড্‌ইনের কনজারভেটিব মন্ত্রিত্বের আমলে ইংলণ্ডের স্বরাষ্ট্রসচিব ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন ;—

"আমরা ভারতবাসীর উপকার করিবার জন্য ভারত জয় করি নাই। আমরা ভারতে বৃটিশ মাল কাটাইবার জন্য ভারত জয় করিয়াছি, তরবারির দ্বারা ভারত জয় করিয়াছি, তরবারির জোরেই ইহা দখল করিয়া রাখিব। ভারতে বিলাতী পণ্য—বিশেষতঃ ল্যাঙ্কাশায়ারের কার্পাস-পণ্য বিকায় বলিয়াই আমরা ভারত দখল করিয়া রাখিব।"

(ইহাও চমৎকার স্পষ্ট কথা। এমন প্রাণখোলা কথায় বক্তাকে বেশ চিনিয়া লওয়া যায় এবং তদনুরূপ ব্যবস্থা করা যায়।)

ইহা ত গেল অতীতের কথা। বর্ত্তমানে 'টাইমস', 'ডেলিমেল', 'ডেলি-টেলিগ্রাফ,' 'মর্ণিং-পোষ্ট' প্রমুখ বিলাতের শক্তিশালী সংবাদপত্রসমূহ ভারতের শিরে বিষ উদ্গিরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবের স্পষ্ট কথারও আভাস দিতেছেন। এখন ইহা ভারতবাসীর গা-সহা হইয়া গিয়াছে। 'সাণ্ডে টাইমস' বলিয়াছেন :—

আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি যে, বৃটিশ জাতি তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ভারতে যায় নাই, পরন্তু ভারতে থাকিলে তাহাদের লাভ আছে বলিয়াই তাহারা ভারতে আছে। তাহারা ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার কল্পনাও করিতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে তাহাদের স্বার্থহানি হয়। তাহারা ভারত ছাড়িতে চাহে না, ছাড়িয়া যাইবেও না।"

এমন দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল কথা হইতে মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় না কি যে, ইংরাজ স্বার্থের জন্য ভারত অধিকার করিয়া রহিয়াছে? অবশ্য 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জেন', 'ডেলি হেরাল্ড' প্রমুখ দুই একখানা পত্র ইহার বিপরীত কথা বলিতেছেন, কিন্তু অধিকাংশের মত কি? মনোভিপ্রায় কি? 'গার্জেন' সম্প্রতি লিখিয়াছেন, The rule of one country by another is now—felt to be monstrous and indefensible, অর্থাৎ অধুনা এক দেশ অপর দেশের উপর কর্তৃত্ব করে,—ইহা অত্যন্ত অন্যায়, ইহার যুক্তি বিচারসহ নহে। কথাটা ঠিক। কিন্তু উহার অনুরূপ কার্য্যসূচনা ত দেখা যাইতেছে না। গেলে মহাত্মা গন্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন এত দিন বন্ধ হইয়া যাইত, ভারতে উভয়পক্ষে শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হইত।

ভারতীয় বিমানবিদ

গত মার্চ্চমাসে শ্রীযুক্ত চওলা ও এস্ পি এঞ্জিনিয়ার নামক দুই জন ভারতীয় তরুণ বিমানবিদ বিমানযোগে ১৭ দিনে করাচী হইতে বিলাতে পৌঁছিয়াছেন। এঞ্জিনিয়ার পার্শী বালক, তাঁহার বয়স সপ্তদশ বর্ষ মাত্র, তিনিই বিমানের মালিক। তাঁহার বিমানখানি 'মথ' এরোপ্লেন, সেখানি লঘু। চওলা চালক (pilot), তিনি কিছু দিন (১৯২৮ খৃঃ) বিলাতে বিমানবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

মিঃ চওলা

পাঠকের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে, মাননীয় আগা খাঁ ইতিপূর্ব্বে একটি পারিতোষিক দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। যে ভারতীয় বিমানবিদ একাকী বিলাত ও ভারত এই দুই দেশের মধ্যে বিমানযোগে যাত্রা করিয়া সফলকাম হইবেন, তাঁহাকে তিনি ৫ শত পাউণ্ড মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন। পঞ্জাবের মনোমোহন সিং এই পারিতোষিক লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। তিনি বিলাতে থাকিয়া বিমানবিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন। একাকী নিজের একখানি বিমান লইয়া তিনি তিনবার ভারতে আসিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনবারই অকৃতকার্য্য হইয়া বিলাতে ফিরিয়া যান। শেষবার তাঁহার বিমানখানির কল বিগড়াইয়া যাওয়ায় তিনি বিমান সমেত পড়িয়া যান, তিনি গুরু আঘাত প্রাপ্ত হইয়া হাঁসপাতালে চিকিৎসার্থ নীত হন, আর তাঁহার বিমান-যন্ত্রখানি ভাঙ্গিয়া যায়। তাঁহার পূর্ব্বে কাবালি নামক আর এক জন ভারতীয় বিমানযোগে বিলাত হইতে ভারতে আসিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও বিফল হইয়াছিলেন।

তাহার পর চওলা ও এঞ্জিনিয়ারের এই চেষ্টা। তাঁহারা আগা খাঁর পারিতোষিক লাভের উদ্দেশ্যে বিমানযোগে যাত্রা করেন নাই। তাহা হইলে দুই জনে একত্র যাত্রা করিতেন না। বার বার ভারতীয়রা ইহাতে অকৃতকার্য্য হইতেছে, ইহা দেখিয়া তাঁহাদের প্রাণে আঘাত লাগে। পাছে তাঁহারাও অকৃতকার্য্য হন, এই ভয়ে তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নে কোন কথা কাহাকেও ভাঙ্গেন নাই। তাঁহারা করাচীর উড়ো ক্লাবের অন্যতম সদস্য। এ জন্য মাঝে মাঝে করাচী হইতে দিল্লী, আগ্রা, লাহোর প্রভৃতি স্থানে বিমানযোগে বেড়াইতে যাইতেন। ঠিক যেন এই ভাবে ভারতের কোন স্থানে যাইতেছেন, এইরূপ আভাসে জানাইয়া তাঁহারা হঠাৎ বিলাত যাত্রা করেন। সে যাত্রা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। তাঁহাদের তথায় বিপুল অভ্যর্থনা হইয়াছে ও ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছে। তবে তাঁহাদের ইহারও অধিক অভ্যর্থনা হইতে পারিত। কিন্তু তাঁহারা যথাসময়ে ক্রয়ডনে পৌঁছিতে পারেন নাই বলিয়া এইরূপ হইয়াছে। তাঁহাদের ক্রয়ডনে নামিবার কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্য্য কারণে তাঁহারা ক্রয়ডন ছাড়াইয়া নরফোক সায়ারের থেটফোর্ড নামক বিমান আড্ডায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ দিকে তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য ক্রয়ডনে বিলাতের বহু গণ্য-মান্য পদস্থ ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আগা খাঁর পারিতোষিক পান নাই, কিন্তু বড়লাট লর্ড আরউইন ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত চওলাকে ৭ হাজার ৫ শত টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। আরও এক জন অজ্ঞাতনামা লোক তাঁহাকে ৫ শত পাউণ্ড মুদ্রা পারিতোষিক দিয়াছেন। বিলাতে ও ভারতে তাঁহাদের জয়গান হইতেছে। তাঁহাদের সদৃষ্টান্ত ভারতে অনুসৃত হউক, ইহাই কামনা। বাঙ্গালী এ বিষ

মিঃ এঞ্জিনিয়ার

পশ্চাৎপদ হইবে না, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, কারণ, বাঙ্গালী এ যাবৎ কোন বিষয়ে পশ্চাৎপদ হয় নাই। এবার ভারত ও ব্রহ্মের এয়ারো বোর্ড তাঁহাদের ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক রিপোর্ট বিমান-বিদ্যাশিক্ষায় বাঙ্গালাকে প্রথম স্থান দিয়াছেন।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য ও সেচের খাল

গত ফাল্গুন মাসের প্রথমে সেচ-বিশেষজ্ঞ সার উইলিয়াম উইলকক্স কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রীডার' হিসাবে 'বাঙ্গালার প্রাচীন সেচ-পদ্ধতি এবং বর্ত্তমান সমস্যার সমাধানকল্পে উহার বিনিয়োগ' বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছেন। প্রথম বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন,—

"প্রাচীন বাঙ্গালার শাসকগণ বর্ষাবারিপুষ্ট নদীর অতিরিক্ত জলধারা যে সেচের খাল দিয়া প্রবাহিত করিতেন, তাহাই বাঙ্গালায় এবং বাঙ্গালার সহিত সমান অবস্থাপন্ন দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল। ইহা গত ৭০ বৎসরের ঘটনাবলীর দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। প্রায় ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার নৃপতিগণ সেচের যে ব্যবস্থা করিতেন, তাহা কোন অংশে কোন সভ্যজাতির সেচের খালের ব্যবস্থা হইতে হীন নহে।"

সার উইলিয়ামের এই কথায় সরকারের অর্থে পুষ্ট এঞ্জিনীয়ার বিভাগের মধ্যে যেন এক বোমা ফাটিয়া পড়িয়াছে! কি সর্ব্বনাশ—সেকেলে রাজাদের আমলটাই হইল শ্রেষ্ঠ? কিন্তু সার উইলিয়াম যুক্তি না দিয়া কোন কথা বলেন নাই। এই প্রাচীন সেচের ব্যবস্থা বিপুলতায় অনন্যসাধারণ ছিল এবং এখনও ইহার চিহ্ন লুপ্ত হয় নাই। খালের দ্বারা এত অধিক বিস্তৃত স্থানের জল-নিকাশের এবং জলসেচের সুব্যবস্থা অন্য কোন দেশে হয় নাই। ইহার দ্বারা ৭০ লক্ষ একার (১ একার —৩ বিঘা) জমীতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অর্থাৎ এই সেচের খাল দ্বারা প্রায় ২ কোটি ১২ লক্ষ বিঘা জমীতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ভাবিয়া দেখুন, ব্যাপারটা কিরূপ বৃহৎ!

তাহার পর যেরূপ সরলভাবে এই সকল খালের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, তাহার মূল নিয়ম অতি সুন্দর। শত শত বৎসর এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে, অথচ ইহা একবারে নষ্ট হয় নাই। ইহাতেই বুঝা যায় যে, ইহার মূলনীতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সপ্তদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে দুই এক পুরুষের মধ্যে গৃহযুদ্ধ, অশান্তি ও অরাজকতার ফলে বাঙ্গালার নদ-নদীর শোচনীয় অবস্থা ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে। তদবধি বাঙ্গালার হাজা-মজা নদী বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালা স্বাস্থ্য-সম্পদের আকর বলিয়া পরিগণিত ছিল। সে সময়ে বাঙ্গালার শিল্পী জগতের সভ্য জাতিদিগকে শিল্পজ পণ্য সরবরাহ করিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এক লণ্ডন সহরেই প্রায় সওয়া তিন কোটি টাকার ভারতজাত বস্ত্র বিকাইয়াছিল বলিয়া বিদিত। ভারতজাত শর্করা তখন নানা দেশে রপ্তানী হইত। কিন্তু হাজা-মজা নদীর জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যশোহর জেলার মামুদপুরের নিকটে প্রথমে ম্যালেরিয়া দেখা দেয়, আর ঐ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে মধ্যবঙ্গ প্রায় ছারখার করিয়া দেয়। তৎপূর্ব্বে কলেরা আর এক মহামারী ছিল। ম্যালেরিয়ার পর কালাজ্বর ধ্বংসলীলায় যোগদান করিয়াছে। এই স্বাস্থ্যহীনতার মূল কারণ নদীর ও সেচের খালের সর্ব্বনাশ। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ তারিখে কলিকাতার বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান গৃহে মিশরের সেচ-বিভাগের বিশেষজ্ঞ এই সার উইলিয়াম উইলকক্সই বাঙ্গালার অতীত যুগের সেচের ব্যবস্থার সহিত তুলনা করিয়া বর্ত্তমান যুগের ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়াছিলেন। তখনও সরকার তাঁহার কথায় স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

সার উইলিয়াম আরও বলিয়াছেন,—

"সাধারণ সেচের খাল কেবলমাত্র বৃষ্টির জল বহন করিয়া থাকে। কিন্তু নদীর অতিরিক্ত জলবহনের জন্য যে বারিবহ খাল খনিত হয়, তাহা প্রধানতঃ প্রথমে নদীজল-বহনের জন্য পরিকল্পিত হইয়া থাকে। খালের প্রথম অংশ অতিরিক্ত নদীজল বহন করিয়া থাকে এবং শেষাংশ বর্ষার জলনিকাশের সহায়তা করে। এই খালগুলি যেরূপ অন্তর অন্তর কাটা হইয়াছে, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, যদি খালগুলি ঐভাবে কাটা না হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে ঐভাবে কাটিবার প্রয়োজন হইত। অর্থাৎ তখনকার কালের এঞ্জিনিয়ারদের অপেক্ষা বর্ত্তমানের এঞ্জিনিয়ারদের জ্ঞান অধিক অগ্রসর হয় নাই। যাহাতে খালগুলির দ্বারা কৃষির উন্নতি হয়, ভূমির উর্ব্বরা-শক্তি বৃদ্ধি হয়, সেইভাবে কাটা হইয়াছে।"

ইহাতে ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালী এঞ্জিনীয়ারদের কৃতিত্ব সার উইলিয়ামের মুখে স্বীকৃত হইয়াছে। এখন সেই প্রাচীন এঞ্জিনীয়ারদের অনুকরণ করিয়া যদি বাঙ্গালার হাজা-মজা নদীর সংস্কার সাধিত হয়, তবেই বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্ভবপর হইবে। ইহাই সার উইলিয়ামের অভিমত।

কয়েদীর প্রতি ব্যবহার

পার্লামেণ্টের প্রশ্নোত্তরে একটা আশ্চর্য্য কথা জানিতে পারা গিয়াছে। মিঃ উইলিয়াম ব্রাউন নামক সদস্য ভারত-সচিব মিঃ ওয়েজউড বেনকে জিজ্ঞাসা করেন,—

"বোম্বাই এর জি, আই, পি রেল ধর্ম্মঘটে ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের কার্য্যে কয়েদীদিগকে নিযুক্ত করিয়া কায আদায় করিয়া লওয়া হইতেছে কি না ?"

প্রশ্নটা কি ভীষণ ! কয়েদীরা যেন বে-ওয়ারিস মাল, তাহাদিগকে দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইয়া লওয়া যায় ! তাহার পর রেল-কর্ত্তৃপক্ষের সহিত হইতেছে বিবাদ রেল-শ্রমিকদের, সেই ব্যাপারে সরকারের মোড়লি করিতে যাওয়া কেন ? ইহাই কি নিরপেক্ষতার দৃষ্টান্ত ? কথাটা ভারত-সচিব অস্বীকারও করিতে পারেন নাই। প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন,—

"হাঁ, ১৪ জন কয়েদীকে রেলের স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগে এবং ১৪ জন কয়েদীকে রেলের মাল বোঝাই ও খালাস করিতে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

চমৎকার !

মিঃ ব্রাউন ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন,—

"অনিচ্ছাসত্ত্বে যে সকল কয়েদীকে এই সব কার্য্যে খাটাইয়া লওয়া হইতেছে, তাহাদিগকে যাহাতে এমন করিয়া নিযুক্ত না করা হয়, তাহার ব্যবস্থা তিনি করিবেন কি ?" মিঃ বেন তৎক্ষণাৎ বলেন, "নিশ্চয়ই। তবে ১৪টা ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল।"

মিঃ ব্রাউন ইহার উত্তরে বলিতে পারিতেন, স্বাস্থ্যরক্ষার যদি প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা হইলে রেল-কর্ত্তৃপক্ষরা একটু নরম হইয়া ধর্ম্মঘটীদের ডাকাইলে পারিতেন ত ! তাঁহাদের অন্যায় জিদ বজায় রাখিবার নিমিত্ত সরকার কয়েদীদের ধার দেন কোন্ হিসাবে ? তাহারা কি অস্থাবর সম্পত্তি যে, তাহাদের লইয়া লেন-দেন চলিবে ? যাহা হউক, মিঃ ব্রাউন সে কথা না বলিয়া কেবল বলেন যে,—

"অন্য ১৪টা ক্ষেত্রে কয়েদীদিগকে এমনভাবে রেলের কাযে খাটিতে দেওয়ার সরকারের কি অধিকার আছে ?"

মিঃ বেন অমনই আমতা আমতা করিয়া বলিলেন,—

"এ বিষয়ে আমি খবর লইতেছি।"

কিন্তু এ 'খবর লওয়ার' ফল যাহা হইবে, তাহা আমরা জানি। কয়েক দিন পরে এ প্রশ্নের কথা ধামা-চাপা পড়িবে, ব্যাপারেরও ঐখানে ইতি হইবে। কিন্তু ইহা হইতে দেওয়া উচিত নহে। এমন একটা প্রয়োজনীয় বিষয়ে দেশের লোকের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

বিচার-বৈচিত্র্য

এ দেশে কোন কোন মামলার সরাসরি বিচার (Summary trial) হইয়া থাকে। কোর্ট মার্শাল বা সামরিক বিচার কতকটা এই প্রকৃতির। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, কোর্ট মার্শাল বিচারে বিচারক দণ্ডাদেশের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া দীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন, তাঁহার বিচার চূড়ান্ত, তাহার কৈফিয়ৎ নাই। উহাকে বিচার না বলিলেও চলে।

সরাসরি বিচার বিচারই বটে। ইহাতে বিচার বিভাগের সকল নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে হয়। অর্থাৎ বিচারক তাঁহার রায়ের কৈফিয়ৎ দিতে আইনানুসারে বাধ্য।

সম্প্রতি লাহোর হাইকোর্টে একটা মামলার সম্পর্কে আবেদনের বিচারকালে সরাসরি বিচারের ক্ষমতার সীমা কতটুকু —ইহা লইয়া আলোচনা হইয়া গিয়াছে। মামলাটি এই :— আবেদনকারী রঘুনাথ সিং অন্য কয় জন লোকের সহিত গত ২৫শে নভেম্বর তারিখে লাহোর সেন্ট্রাল জেলের সম্মুখে হাঙ্গামা করিয়াছিল, এই অভিযোগে পুলিসের হস্তে ধৃত হয়। নিম্ন আদালতে সরাসরি বিচারের ফলে তাহারা পুলিস এ্যাক্টের ৩৪ ধারা অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মির্জা মেহেদি হোসেনের আদেশে ৫০ টাকা অর্থ-দণ্ডে দণ্ডিত হয় ; জরিমানা আদায় দিতে না পারিলে আসামীদিগকে এক সপ্তাহের জন্য বিনা শ্রমে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে, রায়ের এইরূপই আদেশ। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামী রঘুনাথ আবেদন করে এবং দায়রা জজ মিঃ ট্যাপ এই দণ্ডাদেশ রদ করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়া হাইকোর্টে আবেদন দাখিল করেন।

অতঃপর লাহোর হাইকোর্ট। হাইকোর্টের জজ মিঃ আগা হাইদার আবেদনের বিচার করেন। বিচারের পর তিনি রায় দিয়াছেন,—

"নিম্ন আদালতের বিচারকের এই দণ্ডাদেশ বহাল থাকিতে পারে না। ইহা সকলপ্রকার আইন-কানুন ও বিচারপদ্ধতির বিরুদ্ধে গিয়াছে। অবশ্য সরাসরি বিচারে ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় যে দীর্ঘ হইবে এবং উহাতে খুঁটিনাটি বিবরণ ও কৈফিয়ৎ থাকিবে, এমন কোন নিয়ম নাই। কিন্তু তথাপি সাক্ষ্যসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং দণ্ড হইলে দণ্ডের অনুকূলে যুক্তির কথা রায়ে

সন্নিবিষ্ট করা ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য। এই সর্ত্তগুলি পালিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। কেন না, যদি হাইকোর্টে উহার পুনর্ব্বিচার (Revision) করিতে হয়, তাহা হইলে হাইকোর্টের বিচারকের নথিপত্রের মালমশলা দেখিয়া বিচার করিতে হইবে, ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় ন্যায় কি অন্যায় হইয়াছে।"

জজ আগা হাইদার সাহেব এ সম্বন্ধে কয়টি নজীর উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সেই সকল মামলায় এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল। এই সকল নজীর হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সাক্ষ্যে এমন সমস্ত মালমশলা বিদ্যমান আছে, যাহা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অপরাধী সত্যই অপরাধ করিয়াছে। জজ বলিতেছেন, এ ক্ষেত্রে ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে অপরাধীর এমন কোন কার্য্যের কথা উল্লেখ করেন নাই, যাহাতে তাঁহার (হাইকোর্টের জজের) মতে পুলিস-এ্যাক্টের ৩৪ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত আসামীকে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করা যায়। বিচারপতি তাই নিম্ন আদালতকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিয়াছেন যে, যে সকল মামলার সরাসরি বিচারের নিয়ম আছে, সে সকল মামলায় ম্যাজিষ্ট্রেটের এই কথাগুলি মনে রাখিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য। নতুবা সরাসরি বিচারে আর কোর্ট মার্শালে কোন প্রভেদ থাকে না।

এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া বিচারপতি মাননীয় আগা হাইদার সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাদেশ রদ করিয়া দিয়াছেন এবং অপরাধী যদি জরিমানা দিয়া থাকে, তাহা হইলে জরিমানার টাকা তাহাকে ফিরাইয়া দিতে আদেশ করিয়াছেন। অন্যান্য অপরাধীর দণ্ড দেওয়াও রদ হইয়াছে এবং তাহাদেরও জরিমানার টাকা ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এ দেশে কোথাও কোথাও বিচারকের ক্ষমতার কিরূপ অপব্যবহার হয়, তাহার ইহা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ জন্য সরাসরি বিচারের ভার বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কাহারও হস্তে অর্পণ করা অনুচিত। নতুবা বিচার-বিভ্রাটের দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব হইবে না। উহা বিচার-পদ্ধতির সুনাম জ্ঞাপন করে না।

রাজদ্রোহে কলিকাতার মেয়র

ভারত-সচিব মিঃ ওয়েজউড বেন পার্লামেণ্টে বলিয়াছিলেন যে, মতামত প্রকাশ করার জন্য ভারতের লোককে রাজদ্রোহ অপরাধে অপরাধী বলিয়া গণ্য করা হইবে না। বড়লাট লর্ড আরউনও সার্ব্বজনীন আইন অমান্য আন্দোলন দমন করা সম্পর্কে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতেও এইরূপ অভিমতের আভাস দিয়াছিলেন। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, কলিকাতার মেয়র জনপ্রিয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে রেঙ্গুনে বক্তৃতা করার ফলে রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত ও দণ্ডিত করা হইয়াছিল।

সস্ত্রীক শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেন-গুপ্ত

তবে আশ্চর্য্য হইবার এ ভারতে কিছুই নাই। গুজরাটের রাসগ্রামে বক্তৃতা করার অভিযোগে সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল ধৃত ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। অথচ তাঁহারই কথায় প্রকাশ, তিনি মূলে বক্তৃতাই করেন নাই! সত্য বটে, সরকারী আদেশে ঐ গ্রামে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বক্তৃতা করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। সর্দ্দারজী যখন ঐ গ্রামে উপস্থিত হন, তখন তাঁহাকে নিষেধাজ্ঞার কথা জানান হইয়াছিল। তিনি সেই আদেশ মান্য করিতে সম্মত হন নাই। কিন্তু তিনি বক্তৃতা করেন নাই। তথাপি তাঁহাকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছিল। বিচারকালে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই, হাসিমুখে কারাবরণ করিয়াছেন। কিন্তু

বন্ধুবর্গ-বেষ্টিত যতীন্দ্রমোহন—রেঙ্গুন যাত্রার পূর্ব্বে

রেঙ্গুনগামী জাহাজে মাল্যভূষিত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন্‌-গুপ্ত

মাল্যভূষিত যতীন্দ্রমোহন জাহাজে আরোহণ করিতেছেন

করিয়াছিলেন। সর্দ্দারজীরই মত আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই। এমন কি, আত্মসম্মানের হানি হয় বিবেচনা করিয়া জামিনে মুক্তিলাভ করিতে সম্মত হন নাই। বিচারকালে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে তাঁহার নিজের দায়িত্বেও মুক্তি দিতে চাহিয়াছিলেন, যতীন্দ্রমোহন সেই জামিনেও মুক্তি গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও মহত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু আমলাতন্ত্র সরকারের পক্ষে কি কৈফিয়ৎ আছে?

পরাধীন দেশে যাঁহারা দেশনেতৃত্ব করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে কষ্ট-বিপদের অথচ বিজয়গর্ব্বের কণ্টক-মুকুট কখনও না কখনও পরিধান করিতে হইবেই। যতীন্দ্রমোহনও বাদ যান নাই। সুভাষচন্দ্র, বল্লভভাই, যতীন্দ্রমোহন—বেড়াজাল হইতে কেহই বাদ যাইবে না। আরও অনেকের মাথার উপর যে খাঁড়া ঝুলিতেছে, তাহাও সকলেই বুঝিতেছে।

এই গ্রামেই কিছু দিন পরে মহাত্মা গন্ধী সদলবলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, বক্তৃতাও করিয়াছিলেন, অথচ পুলিস তাঁহাকে স্পর্শও করে নাই। মিঃ মণ্টেগু বলিয়াছিলেন, এই ভারত সরকার too wooden, too iron, to inelastic, তাহাই বটে, এই প্রাণহীন আমলাতন্ত্র সরকারের তত্ত্ব নির্ণয় করা ভার!

বিচারকালে রেঙ্গুনের যে কয় জন গণ্যমান্য নাগরিককে সরকারপক্ষ সাক্ষিরূপে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, যতীন্দ্রমোহনের বক্তৃতায় কোন দোষ ছিল না। তথাপি বিচারক পুলিসের বিবরণ হইতে দোষের বীজ খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন!

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তও হাসিমুখে দণ্ড গ্রহণ

প্রাচ্যের লণ্ডন, সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগর মহানগরী কলিকাতার মত সহরের মেয়র সাধারণ দেশীয় লোকের মত ব্যবহার প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার মুখের কথা বড় হইল না, তাঁহার নিকট ১০ হাজার টাকার জামিন চাওয়া হইল! এই ত আমাদের মত সাম্রাজ্যের সমান অংশীদারের অবস্থা!

যে রাজদ্রোহ অপরাধে যতীন্দ্রমোহন মাত্র ১০ দিনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, সেই রাজদ্রোহের অপরাধে লোকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়, এ নজীরও আছে। এই নামমাত্র দণ্ডের জন্য সরকারকে কত টাকা খরচ করিতে হইয়াছে, ইহার জন্য দায়ীই বা কে? রাজদ্রোহ আইনের

ব্যাখ্যা কত রকমেই হইয়াছে! যাহা এক জন বিচারকের দৃষ্টিতে রাজদ্রোহ বলিয়া পরিগণিত নহে, তাহা অপরে রাজদ্রোহ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। সুতরাং কখন্ কাহার মস্তকে খড়্গ নিপতিত হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। হয় ত যতীন্দ্রমোহনের রেঙ্গুনের বক্তৃতা অপেক্ষা অন্যে অধিকতর উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন, কিন্তু সে ক্ষেত্রে আইনের ব্যবহার প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কুমিল্লার রাজদ্রোহের মামলার রায়ে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন,—বিদেশীর শাসনাধীন জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক, ইহাতে স্বদেশপ্রেমিকমাত্রেরই সহানুভূতি থাকা উচিত। আবার অন্য কোন ক্ষেত্রে এক বিচারক রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত আসামীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড দিয়াছেন।

সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল

সুতরাং আমলাতন্ত্র সরকারের সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া রাজদ্রোহের অভিযোগে দণ্ডবিধানের যখন ব্যবস্থা আছে, তখন যতীন্দ্রমোহনের কারাদণ্ডে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু ইহার ফল কি হইতে পারে, তাহা কি সরকার ভাবিয়া দেখিয়াছেন? কোন এক মডারেট পত্র লিখিয়াছেন—

"সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল এবং মেয়র যতীন্দ্রমোহনকে দণ্ডিত করিবার পর হইতে দেশের লোক অত্যধিক সংখ্যায় মহাত্মা গন্ধীর সত্যাগ্রহ সংগ্রামে যোগদান করিতেছে। চারিদিকে একটা উৎসাহ উদ্দীপনার সাড়া পাওয়া যাইতেছে। সরকার ইহাতে যে ভ্রম করিয়া বসিয়াছেন, তাহা এখনও সংশোধন করিয়া লইবার উপায় আছে। ধর্ষণনীতি আপোষের বা গোল টেবিল বৈঠকের অনুকূল নহে। সরকার সময় থাকিতে এ কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন কি?"

কিন্তু মডারেটরা যে আশাই করুন, সরকারের মূল-নীতি একই সুরে বাঁধা। যতক্ষণ সাধ্য, তাঁহারা প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি, ইজ্জৎ বা সাম্রাজ্যের স্বার্থ আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিবেনই। ইহার ফলে যে সাম্রাজ্যের ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্টের সমধিক সম্ভাবনা হয়, তাহা বুঝিবার সামর্থ্য আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী Little Englanderদের নাই। কিপলিং কবির ইংলণ্ড এক হাত দূরের ভবিষ্যৎ দেখিতে পান, বার্ক, সেরিডানের মত দূরদৃষ্টির ক্ষমতা এ যুগে অন্তর্হিত হইয়াছে।

যতীন্দ্রমোহন কারামুক্ত হইয়া ব্রহ্মবাসীদের দ্বারা যে দিন সম্বর্দ্ধিত হন, সে দিন তিনি বলিয়াছিলেন, রাজদ্রোহের আইন ভঙ্গ করা প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য, কেন না, এই আইন তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া গড়া হয় নাই, পরন্তু এই আইন বিদেশী শাসকদের সুবিধার জন্য করা হইয়াছে। বস্তুতঃ স্বাধীন দেশের সরকারে আর জনসাধারণে প্রভেদ নাই, উভয়ের স্বার্থ এক, কেন না, সরকার জনসাধারণেরই প্রতিনিধি। যে পার্লামেণ্টের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া মন্ত্রি-সভা গঠিত হয়, সেই পার্লামেণ্টই জনসাধারণের প্রতিনিধি সভা, সুতরাং সেখানে সরকারের বিপক্ষে যে কথা বলিলে রাজদ্রোহ হয় না, এখানে সে কথা বলিলে হয়। এখানে সরকার বিদেশী, সুতরাং তাহাদের স্বার্থের বিরুদ্ধ স্বার্থ দেশীয় লোক স্বভাবতঃই পোষণ করে। আর সেই হেতু স্বার্থ-সংঘর্ষ উপস্থিত হইলেই রাজদ্রোহ আইনের বিভীষিকা দেখা দেয়। যতীন্দ্রমোহন এই অবস্থার প্রতীকারের উদ্দেশ্যেই আইন ভঙ্গ

করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু সেই পন্থার একটি নৈতিক মূল্য থাকিলেও পরিণামে জয় অবশ্যম্ভাবী, এ কথা বলা যায় না। এই অবস্থার একমাত্র প্রতীকার স্বরাজলাভ। স্বরাজলাভ হইলে শাসক ও শাসিতে স্বার্থ-সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। স্বরাজলাভের পন্থা মহাত্মা গন্ধী দেশবাসীকে দেখাইয়া দিতেছেন।

স্বরাজের জন্য জয়-যাত্রা

মহাত্মা গন্ধী তাঁহার প্রতিশ্রুতিমত সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই সংগ্রাম শান্তির সংগ্রাম। ইহার মূলমন্ত্র—অহিংসা, সাজ-সরঞ্জাম—ধৈর্য্য, সংযম, কষ্টসহনক্ষমতা এবং সর্ব্বোপরি সত্য-সেবা। সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের স্বেচ্ছাসেবক সৈনিককে কায়মনে, কথায়, কাযে, সর্ব্বান্তঃকরণে অহিংস হইতে হইবে। মহাত্মা গন্ধী এই সংগ্রামের মন্ত্রগুরু। তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে, তিনি ইংরাজ সরকারের শত্রু, কিন্তু একটি ইংরাজেরও শত্রু নহেন, বরং তিনি প্রত্যেক ইংরাজকেই ভালবাসেন। পাপকে ঘৃণা কর, কিন্তু পাপীকে কোল দাও, ইহাই তাঁহার মূলমন্ত্র।

সংকল্পমত তিনি ১২ই মার্চ্চ তারিখের প্রত্যূষে তাঁহার সবরমতী আশ্রমের সংযম ও অহিংসায় অভ্যস্ত, সত্যে অবিচলিত কয়েক জন শিষ্য ও অনুচরকে সঙ্গে লইয়া লবণ-আইন ভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে গুজরাটের সমুদ্রতটে জালালপুর ও ডাণ্ডি নামক ক্ষেত্র-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই যাত্রাকে অনেকে অধর্ম্মের বিপক্ষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন হইতে জয়যাত্রার সহিত তুলনা করিতেছেন। কেহ বা ইহাকে শ্রীরামচন্দ্রের ভীষণ দণ্ডকারণ্যে যাত্রার সমতুল্য বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। এ সকল তুলনা কাহারও কাহারও মতে অতিরঞ্জিত হইলেও, যুগপ্রবর্ত্তক, সত্যসন্ধ গন্ধীর সত্যের ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই যাত্রা যে, জগতের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ জগতের অন্যান্য মুক্তিকামী জাতির জয়যাত্রার সহিত ইহার স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। এ জয়যাত্রায় অন্যান্য জয়যাত্রার মত অস্ত্র-ঝনঝনা নাই, ঘোর রোলে রণবাদ্যের ঝঙ্কার নাই, রক্তপাত নাই, এ যাত্রার বর্ম্ম-চর্ম্ম—সত্য, ন্যায় ও ধর্ম্ম! মহাত্মা গন্ধী তাই বলিয়াছেন,—

"যদি হিন্দু-মুসলমান আমায় এই জয়যাত্রায় শক্তিদান না করে, তাহা হইলেও আমি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিব, কেন না, ভগবান্ এ জয়যাত্রায় সহায় হইলে আর কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না।"

ভগবানে এই অগাধ বিশ্বাস লইয়া মহাত্মা গন্ধী এই অভূতপূর্ব্ব রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন, জগৎ বিস্মিত-নেত্রে স্তম্ভিত-হৃদয়ে তাঁহার জয়যাত্রা দর্শন করিতেছে এবং ইহার পরিণামের প্রতি উদ্বেগ-কম্পিত অন্তঃকরণে নিরীক্ষণ করিয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে। বস্তুতঃ ইহা যেন লোভ ও অনাচারের বিপক্ষে ধর্ম্মের যুদ্ধ, দৈহিক শক্তির বিপক্ষে আত্মিক শক্তির সংঘর্ষ বলিয়া অনেকে অনুমান করিতেছে। সুতরাং আধুনিক জগতে ইহার তুলনা নাই, ইহা অনন্যসাধারণ। তাই দূর-দূরান্তরের ফরাসী, জার্ম্মাণ, মার্কিণ প্রভৃতি জাতির বহু প্রতিনিধি মহাত্মা গন্ধীর শান্তিবাহিনীর সহিত সবরমতী আশ্রম হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্যস্থলাভিমুখে তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন।

লোকশিক্ষা

মহাত্মা গন্ধীর এই জয়যাত্রার প্রতি এক শ্রেণীর লোক বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের কটাক্ষপাত করিতেছিলেন। যদি এই কটাক্ষপাতের ফলে আধুনিক যুগে কাহারও ভস্মীভূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, এই জয়যাত্রা অর্দ্ধপথেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইত! কেবল 'ষ্টেটশম্যান' 'পাইওনিয়ার' প্রমুখ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র নহে, বলিতে লজ্জা হয়, আমাদের এ দেশের দেশীয়-পরিচালিত দুই একখানি সংবাদপত্রও এই 'সাধু' পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন। বোম্বাইএর এইরূপ এক পত্র লিখিয়াছেন,—

"গন্ধী লবণের পাত্রে মাথা ডুবাইতে ব্যস্ত, আর তাঁহার অনুচরদেরও উচিত—বরফের পাত্রের মধ্যে মাথা লুকাইয়া রাখিয়া মস্তিষ্ক শীতল করা। গন্ধীর এই আন্দোলন প্রহসনে পরিণত হইবেই।"

এ সকল নীচান্তঃকরণ লোকের কথায় উত্তর দেওয়াও ন্যক্কারজনক! দেশীয় পত্র যদি এইভাবে লিখিতে পারে, তবে 'পাইওনিয়ার' 'ষ্টেটশম্যান' কোম্পানীর অপরাধ কি? উহারা ক্রমাগত লিখিতেছে,—

"গন্ধীর আন্দোলন নিভিয়া যাইতেছে, দেশের অধিকাংশ লোক উহার সংশ্রব ত্যাগ করিতেছে।"

উহাদের এই মিথ্যা প্রচারের উদ্দেশ্য বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

লবণ-আইনভঙ্গে মহাত্মা গন্ধী

'ষ্টেটশম্যান' এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অগ্রণী। তিনি লিখিয়াছেন,—

"জগতের লোককে বার বার জানান হইতেছে যে, মহাত্মা গন্ধীর এই সমুদ্রতীরে গমন বিদেশীর প্রভুত্বের শৃঙ্খল হইতে ভারতবাসীর মুক্তির শেষ চেষ্টা। পণ্ডিত জহরলাল নেহরুও বহু জন মুসলমানকে গোপনে এই কথা জানাইয়াছেন। বেশ ভাল কথা, আমরা দেখিতে চাই, পণ্ডিত, মহাত্মা ও তাঁহাদের হইয়া যাঁহারা কথা বলেন, তাঁহারা যেন এই প্রতিশ্রুতি পালন করেন। এই যুদ্ধের পরিণাম যে বড় আশাপ্রদ নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি এই যুদ্ধে তাঁহাদের পরাজয় ঘটে, তখন তাঁহারা প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন ত? তাঁহারা সত্যবাদী ও সাধুপ্রকৃতি, সুতরাং আশা করা যায়, তাঁহারা আবার বুদ্ধিমান্ নাগরিকরূপে জীবন যাপন করিবেন।"

মহাত্মার লক্ষ্য

কিন্তু এ সকল তুচ্ছ চীৎকারের ফলে যে মহাত্মা গন্ধী অথবা তাঁহার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত দেশবাসী যে সংকল্প হইতে বিন্দুমাত্র চ্যুত হইবে না, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। মহাত্মার লক্ষ্য—আইন অমান্য করিয়া তৎপ্রতি শাসক জাতির ও তথা জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তিনি দরিদ্রের বন্ধু, তাই প্রথমেই যাহাতে দরিদ্রনারায়ণের উপকার হয়, এমন আইন ভঙ্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া গুজরাটের সমুদ্রোপকূলে জালালপুর ও ডাণ্ডিতে লবণ-আইনের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যাইতেছেন। যাত্রাপথে এক স্থানে তিনি গ্রামের লোককে

সমুদ্রোপকূল অভিমুখে মহাত্মাজীর সৈন্যদল

বুঝিয়া দেখুন, যাঁহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন-পণ করিয়া অহিংস-সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই নীচ রসিকতা করিতে সাহসী হয় কাহারা! যাহারা চিরদিন অপরাধ করিয়াও 'আদুরে গোপাল'-রূপে আইনের কবল হইতে মুক্তি পাইয়া আসিতেছে, তাহারাই দেশপূজ্য নেতার সম্বন্ধে এরূপ ইতর উক্তি করিতে সাহস পায়! এই পত্রই এক দিন লোকমান্য তিলকের স্মৃতির অসম্মান করিয়াছিল। অথচ এমনই এ দেশের দুর্ভাগ্য যে, এ দেশের লোকই এই কাগজকে ষোড়শোপচার দিয়া পূজা করিয়া থাকে!

তাঁহাদের বিপুল অভ্যর্থনা করিতে দেখিয়া এবং সত্যাগ্রহীদিগকে বিলাসলালসা সামান্য মাত্রায় চরিতার্থ করিতে দেখিয়া মহাত্মা ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। এ ভর্ৎসনা হইতে তিনি আপনাকেও বাদ দেন নাই। তিনি সেই সময়ে বলিয়াছিলেন,—

"দেশের অসংখ্য দরিদ্র অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে, আর সেই সময়ে এই আড়ম্বর ও অর্থব্যয়! ইহা কিছুতেই সমর্থিত হইতে পারে না।"

দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া মহাত্মা প্রথমে লবণ-কর সম্পর্ক আইন অমান্য করিয়াছেন।

লবণ-কর

লবণ-করের ইতিহাস জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন লবণের কারবার একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন। প্রথমে নীলামের দ্বারা তাঁহারা লবণ বিক্রয় করিতেন। এইরূপে লবণের কাটতি কমাইয়া লবণের উপর অত্যধিকরূপে কর বসাইলেন। ক্রমে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও অন্যান্য প্রদেশে লবণ প্রস্তুত করা আইন দ্বারা তাঁহারা নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিলেন। নানা স্থানে মৃত্তিকা হইতে এবং অন্যান্য স্থানে সমুদ্রের জল হইতে দরিদ্র জনসাধারণ যে লবণ প্রস্তুত করিত, তাহা ক্রমে নিষিদ্ধ হইল।

কস্তুরীবাই গন্ধী

কিন্তু বিলাত হইতে এ দেশে যে লবণ আমদানী হইত, তাহার সহিত দেশের সরকারী কারখানায় প্রস্তুত লবণ প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিল না। সরকারী কারখানা বন্ধ করিয়া দিতে হইল। ১৮৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় যত লবণ ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার শতকরা ৭৩ ভাগ ভারতে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং ২৭ ভাগ বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছিল; কিন্তু ১৮৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে শতকরা মাত্র ৫ ভাগ লবণ ভারতে প্রস্তুত হইয়াছিল, আর অবশিষ্ট ৯৫ ভাগ বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল!

কেহ কেহ বলেন, হিন্দু বা মুসলমান আমলেও লবণের উপর কর ধার্য্য হইত। কিন্তু তাঁহারা এমন কোন প্রমাণ দিতে পারেন না যে, লবণ প্রস্তুত করার উপর কর ধার্য্য হইত; তবে হয় ত লবণ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালান দিলে তাহার জন্য কিছু কর দিতে হইত।

প্রথমে লবণের উপর কর সর্ব্বত্র সমান ছিল না। ১৮৫৬ খৃঃ বাঙ্গালায় লবণের উপর মণ প্রতি ২ টাকা ৮ আনা, অথচ পঞ্জাবে মণ প্রতি কেবল ২ টাকা কর ধার্য্য ছিল। এ দিকে মাদ্রাজে মণ-প্রতি ১৪ আনা এবং বোম্বাইএ মণ-প্রতি ১২ আনা হিসাবে কর দিতে হইত। ১৮৭৮ খৃঃ ভারতের সর্ব্বত্রই লবণের উপর মণকরা ২ টাকা ৮ আনা হারে কর ধার্য্য হয়। পরলোকগত নেতা গোখলের চেষ্টায় লবণকর অনেক কমিয়া যায়। ১৯২৪ খৃঃ হইতে মণকরা ১ টাকা ৪ আনা হারে লবণকর দিয়া আসিতে হইতেছে।

লবণ প্রস্তুত করিতে যদি মণকরা ১ টাকা ৪ আনা খরচ হয় এবং উহার উপরে কর যদি ১ টাকা ৪ আনা হয়, তাহা হইলে দরিদ্র প্রজার উপরে কি চাপ পড়ে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই হেতু এই করের বিরুদ্ধে একাধিকবার তীব্র আন্দোলন উপস্থাপিত হইয়াছিল।

লবণ মনুষ্যের নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্য। যেমন জল ও বায়ু অথবা আলোক ব্যতীত মানুষ অধিক দিন বাঁচিতে পারে না, তেমনই লবণ না হইলেও মানুষের জীবন চলে না। কৃষিপ্রধান ভারতের অনেক লোক কেবল 'নুণ-ভাত' খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে। প্রকৃতিদত্ত লবণ যেখানে সহজ প্রাপ্য, ভারতবর্ষের দরিদ্র অধিবাসীদিগকে সেই লবণের জন্য কর দিতে হইতেছে, কাযেই মহাত্মা প্রথমেই ইহার বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গ করিয়াছেন।

সর্ব্বত্র সর্ব্ব শ্রেণীর প্রতি অনুমতি

মহাত্মা গন্ধী প্রথমে কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির অনুমতি গ্রহণ করিয়া, স্বয়ং কয় জন নির্ব্বাচিত আশ্রমবাসীর সহিত এই সত্যাগ্রহ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি দেশের অবস্থা বুঝিয়া প্রস্তুত থাকিলে সকলকেই এই আন্দোলনে যোগদান করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অনুমতি দেশবাসী সানন্দে শিরে ধারণ করিয়াছে।
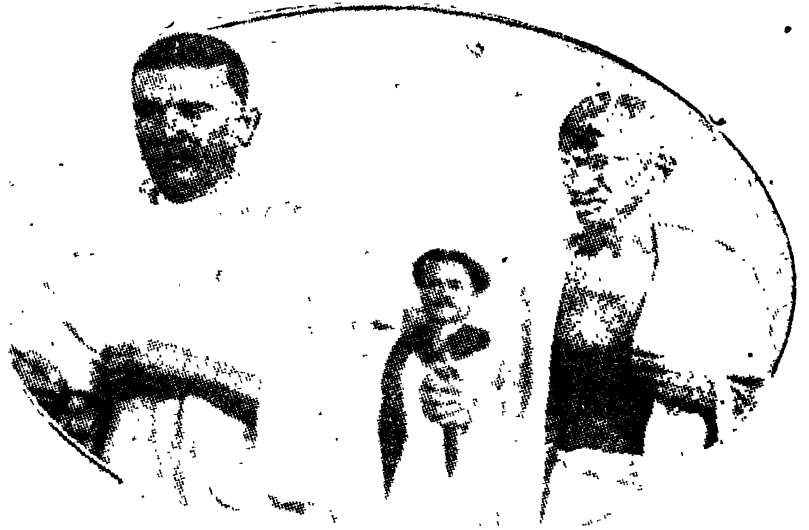
মহাত্মা গন্ধী ও মণিলাল কোঠারী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

প্রথমেই তিনি কিন্তু সত্যাগ্রহের কয়টি সর্ত্ত দিয়াছেন। (১) যে সকল আইন দোষাবহ ও পীড়া দান করে, তাহাই প্রথমে ভঙ্গ করিতে হইবে, অবশ্য বুঝিয়া দেখিতে হইবে, স্বরাজ সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই আইন অনুমোদন করিতেন কি না; এই হেতু তিনি চৌকীদারী কর বা বন-কর সম্পর্কিত আইন ভঙ্গ করিতে বলেন নাই, কারণ, স্বরাজ সরকারের আমলেও ঐ আইন বলবৎ থাকিবে, (২) যেখানে অবস্থা অনুকূল, সেখানে আবকারী আইন ভঙ্গ করা হইবে, (৩) বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিতে হইবে। এ সকল ব্যাপারে পরে হস্তক্ষেপ করা হইবে। আপাততঃ লবণ-কর অমান্য করাই প্রধান কর্ত্তব্য।

বাধা-বিঘ্ন

এ পথে বাধা-বিঘ্ন যথেষ্ট দেখা দিবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের আইন-পুস্তকে যত প্রকার অস্ত্র আছে, সমস্তই প্রযুক্ত হইবে। প্রবল শক্তিশালী বৃটিশ সরকারের কৌশল, শক্তি, ধনবল, লোকবল অফুরন্ত। সে সমস্তই এই ব্যাপারে ব্যবহৃত হইবে। প্রথমেই বোম্বাই সরকারের সহিত যোগাযোগে বোর্ড অফ

রেভেনিউ আদেশ দিয়াছেন যে, পুলিস-কনষ্টেবল অপেক্ষা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিমাত্রেই লবণ-সম্পর্কিত রেভেনিউ কর্ম্মচারীর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। তাহার পর বোম্বাইএর লবণ-করের কলেক্টার এক বিজ্ঞপ্তি দেন যে, জালালপুর বা ডাণ্ডি প্রভৃতি স্থানে যাহারা লবণ-আইন ভঙ্গ করিবে, তাহাদের ৫ শত টাকা জরিমানা অথবা ৬ মাস কারাদণ্ড অথবা উভয়রূপ দণ্ড হইবে। আইনভঙ্গে যাহারা সহায়তা করিবে, তাহাদেরও ঐ দণ্ড হইবে। মাদ্রাজের মছলিপত্তনেও সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ ঐ স্থানে যেখানে ভূমিতে লবণ আছে, তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিতে কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ দিয়াছেন। অন্যান্য স্থানেও লবণ রক্ষা করিবার রীতিমত চেষ্টা হইতেছে।

এ সকল অবশ্য সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। মহাত্মা গন্ধী এ সকল বাধা-বিঘ্নের—এমন কি, নির্য্যাতন-উৎপীড়নের সম্ভাবনার বিষয়ও সম্যক্ অবগত ছিলেন। এই হেতু তিনি পূর্ব্বেই আসলানি গ্রামে বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন ;—

"আমার পক্ষে দুইটি পন্থা উন্মুক্ত আছে। হয় আমাকে জেলে যাইতে হইবে অথবা মরিতে হইবে। আমি কিন্তু আর আশ্রমে ফিরিয়া আসিব না। আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্যপথ ঠিক করিয়া লইয়াছি, ফিরিবার আর উপায় নাই। আপনারা আমার পর এই কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু এই পথ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করিয়া করিবেন। কিন্তু একবার পথ গ্রহণ করিলে আর আপনারা ফিরিতে পারিবেন না। লবণ-কর রদ করা স্বরাজের প্রথম স্তর, এ কথা স্মরণ রাখিবেন।"

মহাত্মা গন্ধী এই আন্দোলনের প্রাণ। তিনি জানেন, তিনি ধরা পড়িলে বা দণ্ডিত হইলে নিশ্চিত অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। তিনি বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার সঙ্কল্প হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না। ইহাতে যদি শেষ পর্য্যন্ত এক জন দেশের লোকও তাঁহার অনুসরণ না করে, তাহা হইলে তিনি একাই লক্ষ্য পথ ধরিয়া চলিবেন। তবে যদি তিনি মধ্যপথেই ধরা পড়েন, তাহা হইলে জনসাধারণ কি করিবে, তাহাও তিনি বলিয়া দিয়াছেন। প্রথমেই তিনি তাহাদিগকে অহিংসায় অবিচলিত থাকিতে বলিয়াছেন। তাহার পর তিনি পর পর নেতৃবর্গকে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যখন এক জন নেতাও থাকিবেন না, সকলেরই জেল হইবে বা অন্য দণ্ড হইবে, তখন তিনি দেশের জনসাধারণকে স্বয়ং আন্দোলন চালাইতে উপদেশ দিয়াছেন। যতক্ষণ না স্বরাজলাভ হয়, ততক্ষণ যেন ভারতের শেষ প্রাণীটি পর্য্যন্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে ক্ষান্ত না হয়।

মহাত্মার আন্দোলনের মূলতত্ত্ব

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেবল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নহে, এ দেশবাসীদেরও মধ্যে কেহ কেহ মহাত্মা গন্ধীর এই আন্দোলনকে তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য অথবা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতেছেন! কেহ কেহ স্পষ্টই বলিতেছেন,—

"এই পাগলামিতে কি হইবে? নুণ তৈয়ার করিলেই স্বরাজ আসিবে, ইহা বাতুলের প্রলাপ ব্যতীত কি?" আমাদের বিশ্বাস, মহাত্মাজীর আন্দোলনটিকে ইহারা কখনই ভাল করিয়া তলাইয়া বুঝে নাই অথবা এ সম্বন্ধে মহাত্মার কথা ভাল করিয়া মনোযোগ দিয়া পাঠ করে নাই। মহাত্মা তাঁহার যাত্রাপথের এক স্থানের এক সভায় বলিয়াছিলেন, "কেবল লবণকর অমান্য করিলেই স্বরাজ আমাদের হস্তগত হইবে না, আমাদিগকে রক্তদান করিতে হইবে।"

ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কথাটা শুনিলে প্রথমে চমকিত হইতে হয়। অহিংসা-মন্ত্রের প্রধান পুরোহিতের মুখে এ কি হিংসার কথা? কিন্তু ইহার ভিতরের কথাটা তলাইয়া বুঝা বিশেষ প্রয়োজন। রক্তদান অর্থে কেবল যুদ্ধে অস্ত্রমুখে দেহ দান করাকে বুঝায় না

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

অর্থে সর্ব্বস্বদান অর্থাৎ স্বার্থত্যাগকে বুঝায়। অস্ত্র-মুখে রক্তদান অপেক্ষা পরার্থে আত্মদান বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। আবার জগতের অন্যায়, অধর্ম্ম ও অসত্যের বিপক্ষে একটা মল নীতি আঁকড়িয়া ধরিয়া স্বার্থ ও নিজস্ব সুখ-আরাম ত্যাগ করা তাহারও অপেক্ষা গরীয়ান্। দেশের জন্য সেইরূপ ত্যাগ কি আরও মহনীয় নহে? মহাত্মা গন্ধী দেশবাসীকে এই রক্ত দান করিতে বলিয়াছেন। যাত্রাপথে এক জন শ্রেষ্ঠীকে তিনি বলিয়াছেন—

"আমি আপনার অর্থ ভিক্ষা করি না। আপনারা দরিদ্র পল্লীর শোষণকার্য্য বন্ধ করিবার জন্য খদ্দর পরিধান করিতে আরম্ভ করিবেন; ইহাতেই রক্ত দান করা হইবে।"

দরিদ্র নর-নারায়ণের প্রতি মহাত্মার কি গভীর মমত্ববোধ, ইহা হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। দেশের কুটীরশিল্পের ধ্বংসসাধনের ফলে দেশের পল্লীবাসী আজ ধ্বংসোন্মুখ জাতিতে পরিণত। তাহাদের উদ্ধারের আশাতেই মহাত্মা গন্ধীর প্রাণের এই আকুলি-বিকুলি! তাঁহার এই সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে যাঁহারা প্রত্যক্ষে যোগদান করেন নাই, মহাত্মা তাঁহাদিগকে খদ্দর পরিধান করিতে ও খদ্দর প্রচার করিতে বলিয়াছেন। ইহার মূলেও দেশের দরিদ্রনারায়ণের সেবার আকুল আকাঙ্ক্ষা নিহিত আছে। পরন্তু ইহার মধ্যে দেশের অন্য দিকে মঙ্গলের চেষ্টাও আছে। এই আহ্বান দ্বারা জাতিকে স্বাবলম্বনে অভ্যস্ত হইতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। পরমুখাপেক্ষিতা, পরনির্ভরতা ও পরানুচিকীর্ষা যে আমাদিগকে দাস-মনোবৃত্তিতে অভ্যস্ত করিয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। এই জঘন্য আত্মঘাতী স্বভাব পরিহার করিবার নিমিত্ত মহাত্মা দেশবাসীকে এই উপদেশ দিতেছেন। যদি তাঁহার এই অনুরোধ বর্ণে বর্ণে পালিত হয়, তাহা হইলে স্বরাজ হস্তগত করিতে আমাদের অধিক বিলম্ব হইবে না। কেবল বসনে নহে,—শিক্ষায় দীক্ষায়, আচারে ব্যবহারে, ধর্ম্মে কর্ম্মে,—সকল বিষয়েই যদি আমরা স্বাবলম্বী হইতে পারি, তাহারই ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

মুক্তি-সংগ্রাম

৬ই এপ্রেল ডাণ্ডি শিবির হইতে সংবাদ আসিয়াছে, মহাত্মা গন্ধী তাঁহার সত্যাগ্রহী অনুচরগণ সমভিব্যাহারে ঐ দিন

প্রভাতে ৬টা ৩০ মিনিটের সময় একটি ক্ষুদ্র পল্বল হইতে এক মুষ্টি লবণ তুলিয়া লইয়া লবণ-আইন ভঙ্গ করিয়াছেন। এইরূপে ঐ দিন ভারতের নানা স্থানে আইন-ভঙ্গ হইয়াছে। ঐ দিন জালিয়ানওয়ালাবাগ জাতীয় সপ্তাহের প্রথম দিন। এই পুণ্যদিনে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম শুভক্ষণে আরম্ভ হইয়াছে। ফলাফল সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতার হস্তে!

বিলাতের 'টাইমস্' পত্র লিখিয়াছিলেন—

"সহসা মিঃ গন্ধীকে গ্রেপ্তার করা সমীচীন নহে। কেন না, তাহা হইলে তাঁহার অসংখ্য অনুচর আইন ভঙ্গ করিয়া জেলে লবণ নষ্ট করিয়া দিতেছে, লবণজল জ্বাল দিবার হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া দিতেছে। সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হইয়াছে।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রেল রবিবার ভারতের মুক্তির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় দিন। ঐ দিন প্রভাতে ৬টা ৩০ মিনিটের সময় মহাত্মা গন্ধী তাঁহার সত্যাগ্রহী শান্তিসেনাগণের সহিত ডাণ্ডি গ্রামে মুক্তি-সংগ্রাম আরম্ভ করেন। তিনি ঐ স্থানের একটি ক্ষুদ্র লবণ-পল্বল হইতে এক মুষ্টি লবণ তুলিয়া লইয়া লবণ-আইন ভঙ্গ করেন। এক মুষ্টি লবণ অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ, উহার কোন মূল্য নাই। কিন্তু উহার সংগ্রহ দ্বারা

বাঁকুড়া মহিলা সত্যাগ্রহী

যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইবে। তখন ম্যাজিষ্ট্রেটগণের অন্য কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, জেলেও তাহাদের জন্ম স্থান সঙ্কুলান হইবে না।"

বোধ হয়, এই নীতি অনুসরণ করিয়া সরকার প্রথম মুখে মহাত্মা গন্ধীকে ধৃত করেন নাই।

তবে তাঁহার পুত্র রামদাস ধৃত হইয়াছেন। তাঁহার শিষ্য শ্রীযুক্ত মণিলাল কোঠারী ধৃত হইয়া আমেদাবাদ জেলে অবরুদ্ধ হইয়াছেন। নানা স্থানে পুলিস ও লবণ-কর্ম্মচারীরা সরকারের আইন ভঙ্গ করাটাই অতি বড় বিরাট ব্যাপার। এই যে আইন-ভঙ্গের প্রবৃত্তির উন্মেষ, ইহাই মুক্তিসংগ্রামের প্রধান ভিত্তিশিলা। তাই যে মুহূর্ত্তে মহাত্মা গন্ধী লবণ সংগ্রহ করেন, সেই মুহূর্ত্তেই দেশনেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সানন্দে সাগ্রহে গন্ধীজীকে 'আইন ভঙ্গকারী' বলিয়া সম্বোধন করেন। যীশুখৃষ্টও এক দিন এমনই ভাবে আইন ভঙ্গ করিয়াছিলেন।

যে সময়ে ভারতের জাতীয় ইতিহাসের নব অধ্যায়ের এ

মহিষবাথানে সত্যাগ্রহীদিগের শিবির

পত্রাঙ্ক লিখিত হইতেছিল, সেই সময়ে শত শত দর্শক লোমাঞ্চিত-কলেবরে ভাবগদ্‌গদ অন্তরে এই অভিনব দৃশ্য অবলোকন করিতেছিল বটে, কিন্তু সরকারের শান্তিরক্ষক পুলিস বা আবকারী বিভাগের কর্ম্মচারীর মধ্যে কেহ তথায় উপস্থিত ছিল না। নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদে ভারতের প্রথম আইন-ভঙ্গের যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার রহিয়াছে। যে সময়ে মহাত্মা লবণ-আইন ভঙ্গ করেন, সেই সময়ের কয়েক ঘণ্টা ব্যবধানে ভাগীরথীগর্ভে বিলাত হইতে আগত একখানি লবণ-বোঝাই জাহাজের সলিলসমাধি হয়। অধুনা ভাগীরথীবক্ষে অসংখ্য জাহাজ যাতায়াত করে, সুদক্ষ অভিজ্ঞ পাইলটগণের কৃতিত্বে জাহাজডুবি হয় না। ভাগীরথীর মোহানার নিকটে বিস্তর চোরাবালি আছে বটে, কিন্তু সে সকল এড়াইয়া জাহাজ যাতায়াত করে, তবে এই লবণের জাহাজখানি ডুবিল কেন? এই জাহাজে ৮ হাজার
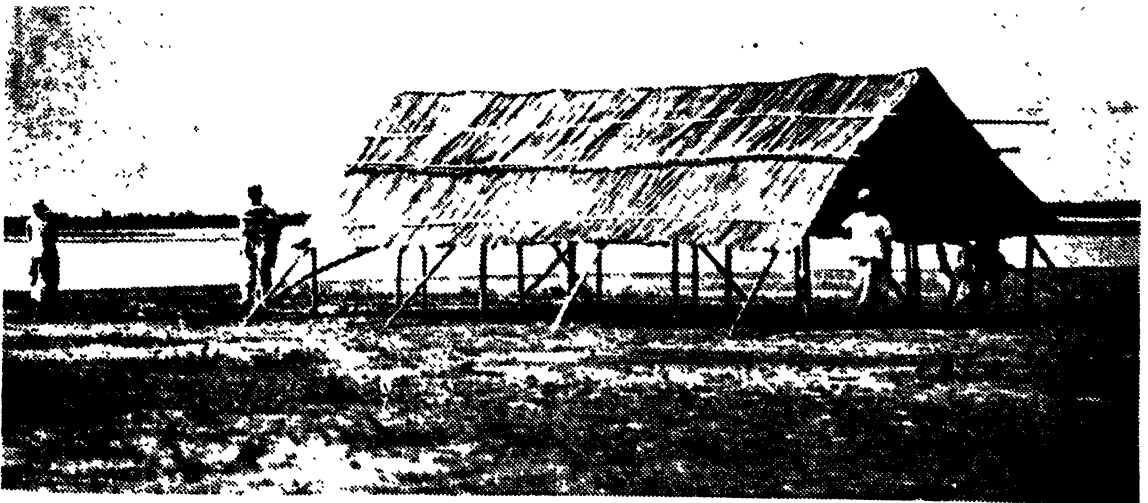
লবণ-হ্রদের তীরে আইন অমান্যের স্থান

৪ শত টন (এক টন সাড়ে ২৭ মণ) লবণ ছিল। মহাত্মার লবণ-আইন ভঙ্গের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী লবণের এই পরিণতি—ইহাতে কি বিধাতার মঙ্গল-হস্তস্পর্শ আছে? আরও আশ্চর্য্য এই যে, এই জাহাজডুবিতে একটিও প্রাণ নষ্ট হয় নাই। অহিংসার মন্ত্রগুরুর আন্দোলনের সহিত যুণাক্ষরেও যে ব্যাপারের সম্পর্ক আছে, তাহাতে কি প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকিতে পারে?

অভয় আশ্রমের ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়দিগের গঠিত শান্তিবাহিনী বাঁকুড়া হইতে কাঁথিতে গ্রামের পর গ্রামের মধ্য দিয়া জয়যাত্রা করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বত্র তাঁহারা দেশবাসী আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট অভ্যর্থিত ও সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন, তাহা এখন প্রাচীন কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর আইন অমান্য কাউন্সিলের উদ্যোগে খাদি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থত্যাগী

মহিষবাথানে বে-আইনী লবণ বিক্রয়

১৩ই এপ্রেল জালিয়ানওয়ালাবাগের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ সপ্তাহ দেশের জাতীয় সপ্তাহ বলিয়া নেতৃগণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত। এই সপ্তাহের প্রথম দিন ৬ই এপ্রেল লবণ-আইন ভঙ্গ করা হইয়াছে। ইহা শুভ লক্ষণ। কেন না, এই দিনেই জাতির মুক্তি-সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে।

গুজরাটে সংগ্রাম আরব্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে, বঙ্গে, বিহারে, বোম্বাইএ, যুক্তপ্রদেশে, পঞ্জাবে, মাদ্রাজে,—সর্ব্বত্রই দিকে দিকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে মুক্তিসংগ্রামের শান্তিবাহিনী উপযুক্ত নেতার অধীনে লবণ-আইন ভঙ্গ করিয়াছেন। বাঙ্গালায় অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের অধীনে যে শান্তিবাহিনী কলিকাতার পূর্ব্বে মাত্র ৭ মাইল দূরে মহিষ-বাথানের লবণহ্রদে যাত্রা করিয়া কিরূপে লবণ-আইন ভঙ্গ করিয়াছেন, তাহাও এখন সর্ব্বজনবিদিত। খুলনা জেলার রাড়ুলি কাঠপাড়া, ২৪ পরগণা ডায়মণ্ডহারবার, নোয়াখালী, কুমিল্লা প্রভৃতি নানা দিক্ হইতে শান্তিসেনারা লবণ-আইন ভঙ্গ করিবার স্থান ও কাল নির্ণয় করিয়া লইয়া উহাতে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের রায়বেরিলিতে, দিল্লীর নিকটে, মাদ্রাজের মছলিপটনে, বোম্বাই সহরে ও সহরতলীতে

—সর্ব্বত্রই এই রণসাজ ও রণহুঙ্কার! এ দৃশ্য ভারতে অভিনব। এ ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান, পার্শী-শিখ নাই। সত্য বটে, সকল স্থানে মুসলমানরা এ বিষয়ে উদ্যোগী হন নাই। কিন্তু মহাত্মা গন্ধীর দক্ষিণ হস্তই হইতেছেন আব্বাস তায়েবজী। তিনি পরিণতবয়স্ক মুসলমান, পূর্ব্বে বরোদা হাইকোর্টের জজ ছিলেন। মওলানা হসরৎ মোহানীর মত মুসলমানও এই আন্দোলনে যোগ দিবেন বলিয়াছেন। বোম্বাইয়ের কয় জন মুসলমান নেতা, পঞ্জাব অমৃতসহরের মুসলমান নেতা, এমন কত মুসলমান মহাত্মার ছত্রতলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। আমাদের বাঙ্গালার অধ্যাপক আবদুর রহিম সাহেব ৯ বৎসরের পুত্রকে লইয়া ইহাতে যোগ দিয়াছেন। ত্রিপুরায় গোপীনাথপুর গ্রামের নুরুল আমন আশ্রমের ৭০ হইতে ৮৩ বৎসর বয়স্ক তিন জন মুসলমান নেতা আইন ভঙ্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এক কুমিল্লা হইতে ১ হাজার মুসলমান এ বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিতেছেন।

হিন্দুদের মধ্যে ত কথাই নাই। স্বয়ং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী—যিনি এই পরিণত বয়স পর্য্যন্ত সরকারের সহিত সহযোগ করিয়া আসিতেছেন, তিনিও অসহযোগ গ্রহণ করিয়া বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন আন্দোলন করিতেছেন।

সরকারের মনোভাব

মহাত্মা গন্ধী যখন লবণ-আইন ভঙ্গ করেন, তখন সরকারী শান্তিরক্ষক তথায় উপস্থিত ছিল না। মহাত্মা যখন ডাণ্ডি-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখনও পুলিস বাধা দেয় নাই। তাহাতে কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, মহাত্মা গন্ধীকে ধরা হইবে না অথবা পুলিস আইন ভঙ্গে বাধা দিবে না। কিন্তু তাহার পরেই সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে। মহাত্মার পুত্র শ্রীযুক্ত রামদাস গন্ধী, মহাত্মার মন্ত্রশিষ্য শ্রীযুক্ত মণিলাল কোঠারী, মহিষবাথানের এক জমীদার, যমনালাল বাজাজ এবং অন্য কয় জন নেতা গ্রেপ্তার হইয়াছেন। এক জন নেতার দীর্ঘ কারাদণ্ড হইয়াছে। ইহা ছাড়া পুলিস লাঠি মারিয়া লবণ জ্বাল দিবার হাঁড়ী ফেলিয়া দিয়াছে, ভাঙ্গিয়া দিতেছে এবং কড়া ইত্যাদি কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। ফল কথা, সরকার নীরব থাকেন নাই।

মহিষবাথানে লবণ প্রস্তুত-কার্য্যে সত্যাগ্রহীদল

কর্ম্মীর মনোবল

কিন্তু যাহারা দেশের মুক্তির আকুল আকাঙ্ক্ষা প্রাণে লইয়া এই সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের দেহ দমন করা সম্ভব হইলেও সরকার তাঁহাদের মন লইয়া কি করিবেন? "নৈনং ছিন্দন্তি অস্ত্রাণি, নৈনং দহতি পাবকঃ,"—উহা অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন হইবার নহে, অগ্নিতেও দগ্ধ হইবার

নহে। যাহাদের নিকট Stone walls do not a prison make, পাষাণ-প্রাচীর ঘেরা কারাগৃহও কারা নহে, তাহাদিগকে দণ্ডিত করিয়া কি ফললাভ হইবে? যখন সত্যাগ্রহীরা মহাত্মার নিকট অভিযোগ করে যে, পুলিস লবণ কাড়িয়া লইতেছে, তখন তিনি লিখিয়া দেন (সে দিন মৌনব্রতের দিন),—

"লবণের উপর শুইয়া পড়িবে, মারিলেও উঠিবে না, প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে, তবু কোন বাধা না দিয়া কেবল লবণের উপর শুইয়া পড়িবে।"

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তকে যখন ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, 'মোগল আমল হইলে তোমাদের মাথা কাটা যাইত', নির্ভীক সতীশচন্দ্র তখনই জবাব দেন, 'আমি প্রস্তুত, আমার মাথা নিন।' আন্তরিকতা, নির্ভীকতা, একনিষ্ঠতা, সত্যবাদিতা এবং সহনক্ষমতা যাঁহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম, তাঁহাদের উপর ধর্ষণের ভয় কি ক্রিয়া করিতে পারে?

যিনি এই মুক্তি-সংগ্রামের সেনাপতি, তিনি দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—"যদি আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়, আমি তাহাতে বিস্মিত হইব না। যদি সরকার কেবল বাছিয়া বাছিয়া নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার করেন, তাহাতেও আমি ব্যথিত হইব না। সে অবস্থায় আপনাদিগকে অপ্রতিহত-গতিতে আপনাদের কায চালাইতে হইবে। আপনারা নেতৃবর্গকে ছাড়িয়া কি ভাবে কায চালাইতে হয়, তাহা ইতিমধ্যে শিখিয়া লইবেন। আপনাদিগকে আত্মপ্রত্যয়ী হইতে হইবে।"

কয়েক মাস পূর্ব্বে—এমন কি, লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনকালেও মহাত্মা গন্ধীর দেশের জনসাধারণের কার্য্যদক্ষতা, সংযম বা ত্যাগশক্তির উপরে বিশ্বাস ছিল না। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, জাতি প্রস্তুত হয় নাই। এখন মহাত্মাজীর মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তিনি জগদ্বিখ্যাত জয়যাত্রাকালে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহার প্রদর্শিত অহিংস সংগ্রামের পথে দেশবাসী অগ্রসর হইবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়াছে।

খুলনার মহিলা সত্যাগ্রহী

মহাত্মার সংগৃহীত লবণ দুই তোলা ৫ শত ২৫ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে, মহিষবাথানে প্রস্তুত মুষ্টিমেয় লবণ ১ শত টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। কি ভাবে অনুপ্রাণিত হইলে মানুষ এরূপ ত্যাগস্বীকার করে? ভাবপ্রবণতা জগতে অসাধ্যসাধন করিয়াছে। ভাবের বশে মানুষ এক দিনে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে পারে। লাভ-লোকসানের খতিয়ান করিয়া মানুষ কখনও স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই আজ ভারতবাসীর ভাবসমুদ্রে তুফান উঠিয়াছে, উহার গতি কিরূপে রুদ্ধ হইবে?

বস্ত্র শুল্ক বিল

এই বিলখানির সম্পর্কে ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট-বিতর্ককালে সরকারপক্ষের সহিত জাতীয় দলের নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের ও অন্যান্য সদস্যের ঘোর বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। পরিণামে যে ভাবে ইহাতে সরকারের জয় হইয়াছে এবং পণ্ডিত মদনমোহন ও অন্য ৬ জন জাতীয় দলের সদস্য পরিষদের সদস্যপদে ইস্তফা দিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বৃটিশ শাসনাধীনে অর্থনৈতিক অবস্থা বিশদরূপে বুঝিবার সুযোগ হইয়াছে। বৃটেন আমাদিগকে যে কেবল রাজনীতিক এবং শিক্ষা-দীক্ষার অধীনতাশৃঙ্খল পরাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা নহে, ঐ সঙ্গে আমাদের হস্তপদে যে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলও পড়িয়াছে, তাহাও জানিতে কাহারও বাকী ছিল না। তবে পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকারের অধীনতা যেরূপ নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, শেষোক্তটি সেরূপ হয় নাই। কিন্তু এইবার তাহার বিভীষিকাময় নগ্নমূর্ত্তি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।
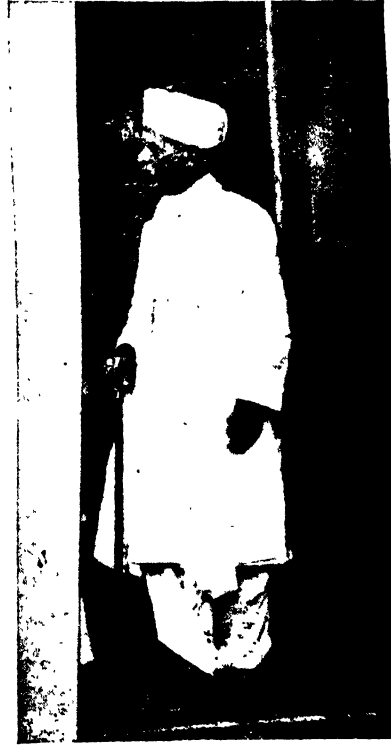
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

আমাদের আয়ব্যয়, আমাদের হিসাবনিকাশ, আমাদের তহবিল,—সমস্তই বৃটিশ শাসকের হস্তগত। কোন বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করিতে হইলে সরকার স্বয়ং সমস্ত করিয়া থাকেন। এ ব্যবস্থা 'কোম্পানীর আমল' হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। মণ্টেগু-সংস্কারের পর ব্যবস্থা পরিষদের 'অনুমতি' লইয়া ব্যবস্থা করার নিয়ম হইল। কিন্তু সেই অনুমতি কি ভাবে লইবার ব্যবস্থা আছে, তাহা দেখিলেই উহার মূল্য বুঝা যাইবে। ফল কথা, বড়লাটের অতিরিক্ত ক্ষমতারূপ ব্রহ্মাস্ত্র থাকিতে ভাবনার কারণ কি থাকিতে পারে? বৃটেন ভারতকে রাজনীতিক অধীনতায় আনিবার সঙ্গে সঙ্গে

আর্থিক অধীনতায় আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় ইংরাজ কুঠীয়ালদিগের সহিত নবাব মীরকাসিমের যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতেও বৃটিশ আর্থিক ও বাণিজ্যগত প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নিহিত ছিল। শুল্ক লইয়াই বৃটিশ শক্তির সহিত নবাব মীরকাসিমের শেষে যুদ্ধ হইয়াছিল, আর সেই যুদ্ধের ফলে বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাবের পতন হইয়াছিল। তদবধি বৃটিশ শাসকরা ভারতে শুল্কনীতি এবং

রাজ্যসম্পর্কিত অর্থনীতি স্বহস্তগত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কয়েক দিন পূর্ব্বে বর্ত্তমান শ্রমিক সরকারের ভারত-মন্ত্রী মিঃ ওয়েজউড বেন প্রকাশ্যে বলিয়াছেন—

"অর্থনীতি-সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে।"

কথাটা শুনিয়া ভারতবাসী হকচকাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সেই সুখস্বপ্ন অপ্রত্যাশিতভাবে অতি সত্বর ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। কেন, তাহা এই বাণিজ্য-শুল্ক বিলের সম্পর্কে পরিষদে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহার বিবরণ পাঠ করিলেই জানা যাইবে।

শ্রীযুক্ত বিরলা এই বিল-প্রণয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই সম্পর্কে বক্তৃতা বস্তুতঃ মনোরম হইয়াছিল। তাঁহার মূল কথা,—

"ভারতীয় প্রজার উপর কর বসাইয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের তন্তুবায়কুলকে সাহায্য দান করাই এই বিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য। যে কোন রক্ষণ-মূলক বাণিজ্যশুল্ক বসান হউক না, তাহার মূল লক্ষ্য হওয়া চাই যে, দেশের লোকের উপকার হয়, স্বদেশী বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। এ ক্ষেত্রে তাহা হইতেছে না। কারণ, সরকার বিলাতী পণ্য ব্যতীত অন্যান্য বিদেশের পণ্যের উপর এই শুল্কবৃদ্ধি চাপাইয়া এ দেশকে ভারতীয় পণ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী বিদেশী পণ্যের ৡ অংশকে ছাড়িয়া দিতেছেন। কেন না, এ দেশে যে সকল বিদেশী কার্পাস (বস্ত্র)

পণ্য আমদানী হয়, তাহার ২/৬ অংশ বিলাতের। সরকার ভয় দেখাইয়াছেন, যদি বিলাতকে এই বিশেষ অধিকার (preference) দেওয়া না হয়, তাহা হইলে মূলে-হাবাত হইবে—একেবারেই বিদেশী বস্ত্রের উপর শুল্কবৃদ্ধি করা হইবে না, বিলখানাই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু তাহাতে ভয় কি? আমরা পরিষদ ত্যাগ করিয়া যাইব, ইহার দায়িত্ব থাকিবে সরকারের। আমাদের স্বদেশী পণ্যের জন্য যে রক্ষণ-ব্যবস্থা করা হইতেছে, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। তবে আমরা কি হেতু এইটুকুর বিনিময়ে প্রতি বৎসর ল্যাঙ্কাশায়ারকে ২ কোটি করিয়া টাকা যোগাইব?"

রাজস্ব-সচিব এ সকল 'ছোট কথায়' কাণ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই। তাঁহার এক বুলি,—"রাজস্ব স্বাধীনতা পাইয়াছ; এই স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য যে বন্দোবস্ত (convention) হইয়াছে, তাহা তোমরা মানিয়া চল।" শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় এই রাজস্ব স্বাধীনতা বন্দোবস্তকে (Fiscal Autonomy Convention) অশ্বডিম্ব বলিয়া অভিহিত করেন। প্রেসিডেণ্ট পেটেল এমন একটি কথা বলেন, যাহাতে এই রাজস্ব স্বাধীনতার স্বরূপ আরও পরিষ্কাররূপে প্রকট হইয়া পড়ে। মিঃ জিন্নার প্রশ্নের উত্তরে যখন বাণিজ্য-সচিব সার জর্জ্জ রেণি বলেন, সরকার এই বিলের বড় রকমের পরিবর্ত্তন কিছুতেই সমর্থন করিবেন না। যদি সেরূপ কিছু পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে সরকার এই বিল একবারেই ত্যাগ করিবেন। তখন প্রেসিডেণ্ট পেটেল বলেন,—

"সরকার যদি এমন কায করেন, তাহা হইলে রাজস্ব-সচিবেরই কথার প্রতিবাদ করিবেন। কেন না, রাজস্ব-সচিবই বলিয়াছেন, ভারতের অর্থনীতিক স্বাধীনতা লাভের কথা এখন সত্য এবং এই সত্য এখন সংস্কার আইনের অঙ্গ হইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া স্বয়ং ভারত-সচিব কিছু দিন পূর্ব্বে পার্লামেণ্টে তর্ক-বিতর্ককালে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবাসী বৃটিশ জাতিরই মত টেরিফের সম্পর্কে স্বাধীনতা উপভোগ করে।"

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, রাজস্ব-সচিব বা ভারত-সচিবের কথারও কোন মূল্য নাই। ল্যাঙ্কাশায়ারের বৃটিশ তাঁতির স্বার্থহানির যেমনই আশঙ্কা হইয়াছে, অমনই তাঁহাদের কথা কর্ম্মনাশার জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। সার উইলিয়াম জয়েন্সন হিক্স (বর্ত্তমানে লর্ড ব্রেণ্টফোর্ড) এক সময়ে বলিয়াছিলেন,—

"আমরা বৃটেনের স্বার্থের জন্য ভারত অধিকার করিয়াছি এবং অধিকার করিয়া রাখিব। তরবারির দ্বারা ভারত অধিকার করিয়াছি, তরবারির দ্বারা ভারত অধিকার করিয়া রাখিব।"

ইহাও যেমন স্পষ্ট কথা, বাণিজ্য-সচিবের মুখে 'ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থ না রাখিলে বিলই ত্যাগ করিব', এই কথাও তেমনই স্পষ্ট কথা।

বাণিজ্য-সচিব বলিয়াছেন,—

"ভারত সরকার ও ব্যবস্থাপরিষদ যখন একমত হইবেন, তখনই এ সব বিষয়ে ভারত-সচিব হস্তক্ষেপ করিবেন না, কর্তৃত্ব বা তদারক করিবেন না।"

প্রেসিডেণ্ট পেটেলও উত্তর দেন,—

"যদি সরকার মন্ত্রীদিগের পদের সহিত আপনাদিগকে মিলাইয়া না দেন, অর্থাৎ মন্ত্রীরা স্বাধীনভাবে কায করিতে না পান, তত দিন অর্থনীতিক স্বাধীনতার কোনও অর্থই থাকে না।"

সার হরি সিং গৌর Joint Parliamentary Committeeর পরামর্শ হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও এই কথা প্রমাণিত হয়। যখন সংস্কার আইন সম্পর্কে পার্লামেণ্টে তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল, তখন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন বিলাতী মন্ত্রীরা স্বীকার করিয়াছিলেন যে, জয়েণ্ট কমিটীর পরামর্শও সংস্কার আইনের অঙ্গরূপে গণ্য করা হইবে। তবেই বুঝায় যে, এই জয়েণ্ট কমিটীর নির্দ্দেশের বিশেষ মূল্য আছে। ঐ নির্দ্দেশ হইতেই আমরা একাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

It follows as a matter of constitutional necessity that in the matter of fiscal autonomy, the procedure and practice of the Self-governing Dominions of the British Commonwealth must be followed.

যদি তাহাই হয়, যদি ভারতেও বৃটিশ উপনিবেশের মত আইনের ধারা ও কার্য্যপদ্ধতি প্রচলিত হইবে বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থাপরিষদ যখন ল্যাঙ্কাশায়ারকে সুবিধা করিয়া দিতে অনিচ্ছুক, তখন তাহার সেই ব্যবস্থা সরকারপক্ষকে অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে, অন্ততঃ ন্যায় ও ধর্ম্মের দিক্ হইতে দেখিলে এ কথা সরকারকে স্বীকার করিতেই হইবে।

ভোট গ্রহণের ব্যাপারেও যে কাণ্ড সরকারপক্ষ অনুষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহাদের স্বৈরাচারের পরিচয় পরিস্ফুট। সরকারী সদস্যদের এবং সরকারের মনোনীত সদস্যগণের ভোটও এই ব্যাপারে গ্রহণ করা হইয়াছিল, অথচ প্রেসিডেণ্ট পেটেলের মতে উহা আইন-বিগর্হিত! এ অবস্থায় জাতীয় দলের সদস্যরা পরিষদ ত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছেন। কেন না, যেখানে জনগণের প্রতিনিধি-সমূহের কথা অরণ্যে রোদনে পর্য্যবসিত হয়, সেখানে এই প্রতিনিধিদের থাকিয়া লাভ কি? তবে

দুঃখ এই, পণ্ডিত মদনমোহনের মত বিচক্ষণ রাজনীতিকের পক্ষে কথাটা বুঝিতে এত দিন লাগিল।

সংশোধিত ফৌজদারী আইন

বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় গভর্ণর সার ষ্ট্যানলি জ্যাকসন ফৌজদারী আইনের সংশোধন আইন সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে এমন কিছু একটা আশ্বাসের কথা পাওয়া যায় নাই, যাহার জন্য বাঙ্গালার জনসাধারণ বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার কীর্ত্তি-কথা শতমুখে বিঘোষিত করিতে পারে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের দিনে লাটের বক্তৃতা করার কথা ছিল; কিন্তু হঠাৎ প্রকাশ পাইল, তিনি একগোপনীয় বিষয়ে দিল্লীতে বড় লাটের সহিত পরামর্শ করিতে যাইতেছেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না। তাহার পর তাঁহাদের পরামর্শ হইল এবং তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বক্তৃতাও দিলেন। সমস্ত বাঙ্গালা সে জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। কিন্তু গভর্ণর যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হইতেছে, 'পর্ব্বত মূষিক প্রসব করিয়াছে'।

সার ষ্ট্যানলি জ্যাকসন্

মোটের উপর আইনটা কি? ফৌজদারী আইনের সংশোধন আইনখানি সম্পূর্ণ বে-আইনী আইন। বিনা বিচারে লোককে আটক করিয়া রাখা বা বিশেষ আদালতের সাহায্যে (জুরী বিনা) লোকের বিচার করা, বিদেশী সরকারের দৃষ্টিতে আইন বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু দেশের লোকের দৃষ্টিতে উহা স্বৈরাচার-সমর্থক আইন বলিয়াই গণ্য। এমন আইনের মেয়াদ বা আয়ুষ্কাল ফুরাইলে উহা উঠাইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। সরকার তাহা না করিয়া উহার একাংশ বর্জ্জন করিয়াও বলিলেন, প্রয়োজন হইলে ঐ আইনের অস্ত্র পুনরায় প্রযুক্ত হইবে, আর অপরাংশের আয়ুষ্কাল আরও ৫ বৎসর বাড়াইয়া দিলেন!

বিপ্লবমূলক রাজদ্রোহ মামলার আসামীদিগের দমনের উদ্দেশ্যে এই আইন ৫ বৎসর পূর্ব্বে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল। উহা কি ভাবে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহার ইতিহাসও কেহ বিস্মৃত হন নাই। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এই আইন যখন ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হয়, তখন দেশবন্ধু পরলোকগত চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বাধীনে বে-সরকারী সদস্যগণের মধ্যে অধিকাংশের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু লর্ড লিটন তখন তাঁহার অতিরিক্ত ক্ষমতার (Certification power) দ্বারা আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। যে আইনের পূর্ব্বেতিহাস এরূপ লজ্জারজনক, সেই আইন ত দেশবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এত দিন বলবৎ রাখা হইয়াছিল। সুতরাং উহার একাংশ বাদ দিয়া সার ষ্ট্যানলি যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন, তাহার ভিত্তি ত খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না।
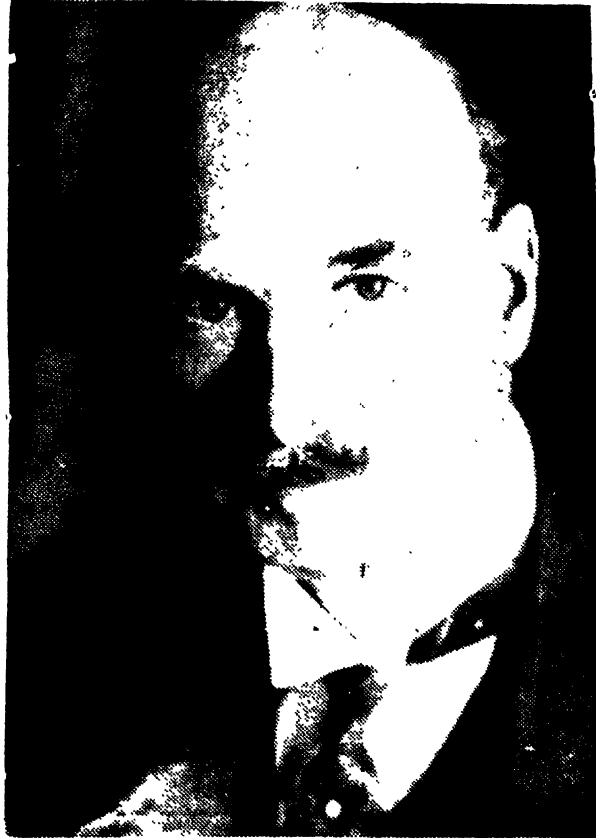
তিনি আইনের যে অংশটুকু সংহরণ করিবার আশ্বাস দিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জনের আশা করিয়াছেন, তাহাতে বিনা বিচারে যাহাকে সন্দেহ করা হইবে, তাহাকে আটক করা হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। এখন সে ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হইল বটে, কিন্তু বলিয়া দেওয়া হইল,

আবার যে মুহূর্তে আইন আবশ্যক বুঝা যাইবে, সেই মুহূর্তেই ঐ আইনের পুনঃ প্রবর্ত্তন করা হইবে। তবেই লোকের মাথার উপরে খাঁড়া ঝুলাইয়া রাখা হইল বুঝিতে হইবে। ইহাতে বদান্যতার পরিচয় ত কিছুই পাওয়া যায় না।

আইনের দ্বিতীয় অংশ বলবৎই রাখা হইল। অর্থাৎ Special Tribunal দ্বারা বিচারের ব্যবস্থা বলবৎই রহিল। ইহাতে সাধারণের যে জুরীর বিচারের অধিকার ছিল, তাহা অকারণে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল, এখনও সেই অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখা হইল। গভর্ণর ইহার কৈফিয়তে বলিয়াছেন,—

"যে সকল বিপ্লববাদী দলের উদ্দেশ্য হিংসা ও হত্যা, তাহাদের দমনের জন্য এই আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল। এই ভাবের আন্দোলন এবং তাহার দল এখনও বাঙ্গালাদেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে,—যদিও কিছু দিন হইতে কার্য্যক্ষেত্রে উহার দুষ্কৃতের পরিচয় বিশেষ পাওয়া যাইতেছে না বটে। গত ৩ বৎসর নূতন দমনমূলক ক্ষমতা হস্তগত না করিয়াও বিপ্লব দমনে রাখা গিয়াছিল।"

তাই সরকার দয়া করিয়া আইনের একাংশ মরজিমত বর্জ্জন করিয়াছেন। (অর্থাৎ ইচ্ছা করিলেই পুনঃ প্রবর্ত্তন করিবেন) এবং অপরাংশ বলবৎ রাখিবেন বলিয়াছেন।

কি চমৎকার ব্যবস্থা! ৫ বৎসর পূর্ব্বে এক বে-আইনী আইন রচা হইল ৫ বৎসরের জন্য। ঐ আইনের বলে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ দেশকর্ম্মীদিগকে বিনা বিচারে আটক করা হইল। অথচ তাঁহাদের বিপক্ষে কোন অপরাধের কথা প্রমাণিত হইল না। দেশের লোক জানিত, এই আইন বিধিবদ্ধ করার কোন প্রয়োজন ছিল না, যে আইন তখনই বর্ত্তমান ছিল, তাহাই যথেষ্ট, কেবল এই আইন করিয়া সরকার অকারণে লোকের স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করিলেন। গত ৩ বৎসরে এমন একটি মামলাও উঠে নাই—যাহাতে আইনের প্রথমাংশ ব্যবহৃত হইতে পারে। সরকার তথাপি নিজের ভ্রম স্বীকার করিলেন না। যেহেতু, বে-আইনী আইন প্রজার গা-সহা গিয়াছে, সেই হেতু ইহার একাংশ বলবৎ রাখিলে এবং অপরাংশের সম্বন্ধে ভয় দেখাইয়া রাখিলেও কোন ক্ষতি নাই, বোধ হয়, সরকার ইহাই ভাবিয়াছেন।

তবেই হইল, দমননীতিমূলক আইন দেশের বুকের উপর একবার চাপিয়া বসিলে তাহা রদ হওয়ার আর আশা থাকিবে না। সে আইনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না এবং প্রজা উহা চাহে কি না, তাহাও ভাবিবার প্রয়োজন নাই। যে ভাবে ভোট লওয়া হইয়াছে, তাহাতে বিল পাশ হওয়ায় আশ্চর্য্য নাই। সরকারের শাসন-পরিষদের সদস্যরা, মন্ত্রীরা, মনোনীত সরকারী ও বে-সরকারী সদস্যরা, সাধারণ ও বিশেষ য়ুরোপীয় নির্ব্বাচন কেন্দ্রের নির্ব্বাচিত য়ুরোপীয় সদস্যরা,—সকলেই ইহাতে সরকারের পক্ষে ভোট দিয়াছেন। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। ২৩ জন নির্ব্বাচিত দেশীয় সদস্য সরকারের পক্ষে ভোট দিয়াছেন, ইহাই লজ্জার কথা। ইঁহাদের মধ্যেও ১৬ জন মুসলমান। সুতরাং এই বে-আইনী আইন পাশের আগাগোড়া ইতিহাসই চমৎকার বলিতে হইবে।

পরলোকে হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী

কবি হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর নাম বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত। দেবী ইন্দিরার কৃপাভাজন হইয়াও তিনি দেবী ভারতীর পূজায় সর্ব্বদা অবহিত ছিলেন। বাগবাজারের এই জমীদার কবি অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বৃদ্ধ-বয়সেও তিনি বীণাপাণির আরাধনায় অমনোযোগী ছিলেন না। কিছু কাল হইতে তিনি জটিল রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। বিগত ৫ই এপ্রিল শনিবারে ৭৭ বৎসর বয়সে কবি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গ-সাহিত্যের এক জন একনিষ্ঠ সেবকের অভাব হইল। হরিশ্চন্দ্র সন্তান-সৌভাগ্যেও সুখী ছিলেন। প্রায় ৩৩ বৎসর ধরিয়া তিনি মাণিকতলা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনাররূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। শিয়ালদহ পুলিস-কোর্টে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটরূপেও তিনি ৩০ বৎসরকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। কবি হরিশ্চন্দ্র সাধক কবি ছিলেন। তাঁহার রচনা যেমন প্রাঞ্জল, তেমনই সুখপাঠ্য ছিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

জীবন-স্বপ্ন

নবম পরিচ্ছেদ

ঘেরে অন্ধকার

সকালে সংসার আবার তার শত দাবী লইয়া সামনে জাগিয়া দাঁড়াইল। সারা গৃহে কেমন ছন্নছাড়া ভাব। জীবন কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে, গৃহিণী যোগমায়া দেবী গুম্ হইয়া একধারে বসিয়া আছেন, যেন পাথরের মূর্ত্তি!

ভুবন আসিয়া কহিল—আজ কি তোমাদের রান্না-বান্না হবে না? আমাদের কলেজ এখনো বন্ধ হয়নি…যেতে হবে যে!

মা শূন্য দৃষ্টিতে ভুবনের পানে চাহিলেন, কোনো কথা বলিলেন না।

ভুবন কহিল—আর একটা বছর, তার পর কোনো স্কুলে মাষ্টারী করবো, তখন কারো তাঁবেদারী সইতে হবে না।

কমলী শুষ্ক ম্লান মূর্ত্তিতে দ্বারের কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; ভুবন কহিল—পারবে এক মুঠো ভাতের ব্যবস্থা করতে, না, হোটেলের আশ্রয় নেবো? দয়া ক'রে জবাবটা দিলে…

কমলার সহ্য হইল না। সে কহিল—তুমি কি দাদা… বাড়ীতে এই বিপদ…

ভুবন কহিল,—আগুনে হাত দেবে যে, তার হাত পুড়বেই, এ তো জানা কথা! তার জন্য ঘরে ব'সে কাঁদা…আমার ধাতে পোষায় না।…যেমন লক্ষীছাড়া বাড়ী, তেমনি লোকজন।

ভুবন চলিয়া গেল। সুবল পরক্ষণে আসিয়া উদয় হইল, কহিল,—বাড়ীতে বাস করা আর চললো না। পাড়ায় টী-টী কাণ্ড…মুখের পানে তাকায় সব। মান-ইজ্জৎ নিয়ে…

কথাগুলা মার বুকে জ্বলন্ত বহ্নি-মাখা তীর ফুটাইল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মা কহিলেন,—তোমাদের কাকেও এ-সব সইতে হবে না, বাবা। সে বিদায় হয়ে গেছে, আমিও যাবো…তোমরা দু'ভাইয়ে এখানে ব'সে রাম-রাজত্ব করো!…মানুষের চামড়াও গায়ে নেই! বলে কি না, মান-ইজ্জৎ! হোটেলে যেতে হবে না কাকেও—যতক্ষণ আছি, আর এ হাত দু'খানা বজায় আছে, তোমাদের কোথাও কোনো ত্রুটি ঘটতে দেবো না, বাছা…

মা উঠিলেন। কমলী ডাকিল,—মা…

মা কহিলেন,—তুই মা দুটো আলু-পটল কুটে দে—চালটা আমি ধুয়ে আনি…ওঁদের কলেজ আছে, সত্যিই তো, ওঁরা আমাদের মুখ চাইবেন কি-দুঃখে?

মার কথায় কমলী তরকারীর চুবড়ি লইয়া বঁটি পাতিয়া বসিল। মা গেলেন ভাঁড়ারে চাল বাহির করিতে।

রামু কোথা হইতে আসিয়া ডাকিল—পিসিমা…

যোগমায়া দেবী কহিলেন—কি বাবা?

রামু কহিল,—পিসেমশাই উকিলের বাড়ী গেলেন ভবানীপুরে—আমি সঙ্গে গেছলুম, আমায় পাঠিয়ে দিলেন দশটা টাকা নিয়ে যাবার জন্যে…

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—দি বাবা…

যোগমায়া দেবী কাজ রাখিয়া টাকা আনিতে গেলেন, টাকা আনিয়া রামুর হাতে দিয়া কহিলেন—তুই কলেজ যাবি না?

রামু কহিল,—না। পিসেমশায় একলা ঘুরবেন? তাই তাঁর সঙ্গে…

যোগমায়া দেবীর চিত্ত এ কথায় একেবারে উথলিয়া উঠিল। দুর্দ্দিনের মেঘ যখন চারিধার অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া তোলে, ভাগ্যে তখন বিদ্যুতের দু'চারিটা শিখা চমক দিয়া যায়…নহিলে ও-অন্ধকারে আশাহীন চিত্ত হাঁফাইয়া মরিত!…

টাকা লইয়া রামু চলিয়া গেল। যোগমায়া দেবী প্রাণের আকুল মিনতি জানাইলেন ঠাকুরের কাছে—হে ঠাকুর…

তাঁর দুই চোখে জল গড়াইয়া পড়িল। মানস-নয়নের সম্মুখে বলাইয়ের রাত্রিকার সেই পাগলের মত মূর্ত্তি করুণ শ্রীতে জাগিয়া উঠিল। সান্ত্বনার সে কি কথা তার মুখে!…

মানুষের জীবনে এমন শোচনীয় ব্যাপারও ঘটে! তাঁর মন হু-হু করিয়া উঠিল। রান্নার কথা মা ভুলিয়া গিয়াছিলেন; কমলীর ডাকে চেতনা হইল, কহিলেন,—যাই, মা…

উনান জলিতেছে। উনানে কমলী হাঁড়ি চাপাইয়া দিয়াছে ···মা কহিলেন—গোটা-চারেক আলু ছেড়ে দিস্ ভাতে···

—দেবো।···

পাড়ার দু' তিনটি রমণী দরদ দেখাইবার ছলে আসিয়া দাঁড়াইলেন···এ সকালে অন্য দিন তাঁদের কোনো দিকে চাহিবার অবসর থাকে না, কিন্তু আজ···এত বড় বিপদে না দাঁড়াইলে এর পর যে···তা ছাড়া ব্যাপারটা আগাগোড়া জানাও দরকার তো! মুখে-মুখে কাহিনীর যে আবছায়াটুকু জাগিয়া উঠিয়াছে, তাতে রস থাকিলেও সে কেমন অসম্পূর্ণ!

ক্ষমা ঠাকুরাণী কহিলেন,—তাই তো বৌমা,···কিছু বুঝতে পারচি না যে···দুধের ছেলে···কার পরামর্শে···তাই তো!

তাঁর কথা লুফিয়া লইয়া ঘোষাল-গৃহিণী কহিলেন,—দুরন্তপনার তো অন্ত ছিল না, বাপু। আমি তখনি জানি, না শুধরোতে পারলে ও ছেলের শেষ ··কাঁচা বাঁশেই ঘুণ ধরে, দিদি···

ক্ষমা ঠাকুরাণী কহিলেন,—সত্যি, এবার ফিরলে শাসন করিস্।

দয়ার পিশি কহিলেন,—এতখানি বুকের পাটা···অনেক দিন থেকেই গোল্লার দোরে গিয়েছে! শুনে আমার তো হাত-পা হিম হয়ে গেছলো! আজ আবার কালীঘাটে যাবো, ভেবেছিলুম, তা কখন্ যে কি করি···একবার না এসেও পারলুম না···

একে এই অপ্রত্যাশিত বিপদ···যার আঘাত মাটীতে মাথা একেবারে নোয়াইয়া দিয়াছে,—তার উপর এই দরদী প্রতিবেশিনীদের বিদ্রূপের দাহ! পাথরের বুকেও প্রাণ জাগিয়া ওঠে! যোগমায়া দেবী কথা না কহিলেও কমলীর মন ঝাঁজিয়া উঠিল। কমলী কহিল,—এমনিতে তো এ বাড়ীর মাটী মাড়াও না, আজ একেবারে দশভুজো হয়ে এসেচেন সব দশ হাতে দরদ বয়ে···আমরা তো পরামর্শ-উপদেশ চাইতে যাই নি কারো কাছে।

যোগমায়া দেবী করুণ দৃষ্টিতে কমলার পানে চাহিলেন, কহিলেন,—চুপ করো, মা···ছি—ও কথা বলো না!

দয়ার পিশি ফোঁশ্ করিয়া উঠিল,—থাম্ লো···যাদের হ'তে দেখলুম, তাদের মুখে অমন কথা···

কমলী কহিল,—আমি তোমার কথা শুনবো না মা···তুমি কথা কয়ো না। তুমি একেবারে কি হয়ে রয়েচো, ওঁরা এসেচেন চ্যাট্যাং-চ্যাটাং কথা শুনোতে!···আক্কেল নেই এতটুকু!··· চ'লে যাও, বলচি।

ঘোষাল-গৃহিণীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি একটু তীক্ষ্ণ···কমলীর রুদ্র ভাবে তিনি ঈষৎ বিচলিত হইলেন। তাঁর গুণধর পুত্রটি যে একদিন···

তাড়াতাড়ি তিনি কহিলেন,—চ' ভাই ক্ষমা ঠাকুরঝি··· সব কাজ-কর্ম্ম প'ড়ে রয়েচে।

ব্যাপার জমিল না দেখিয়া তিন জনেই ঈষৎ দুঃখিত চিত্তে প্রস্থান করিলেন।

সংসারের চাকা ঘুরিয়া চলিল,···যে দিক দিয়া বিপদের যে মেঘ ঘনাইয়া উঠুক, যে ঝড় বহিয়া যাক, তার ঘোরার বিরাম ঘটিবে না! বুকের আধখানা সে ঘূর্ণিচক্রে ছেঁচিয়া যদি চূর্ণ হইয়া যায়, তবুও···তার ছুটী নাই!

দুই ছেলে মুখে ভাত গুঁজিয়া গজ-গজ করিতে করিতে বিদ্যালাভ করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল। মা একবার শুধু বলিলেন—ওরে, ও-ধারে ছেলেটার কি যে হলো···

অর্দ্ধস্ফুট এইটুকু কথা, তাহাতেই দুই পুত্র একসঙ্গে ফোঁশ্ করিয়া উঠিল,—ঐ কর্ম্মই করি লেখাপড়া বিসর্জ্জন দিয়ে···

মা থামিয়া গেলেন,—দ্বিতীয় কথা তাঁর মুখে ফুটিল না।···

বেলা প্রায় একটা···রামু ফিরিল। তার শুষ্ক মুখ। যোগমায়া দেবী কাতর চোখে তার পানে চাহিলেন। রামুর মুখের ভাব ও তাকে একলা ফিরিতে দেখিয়া মার প্রাণ আকুল আর্ত্ত নাদ তুলিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া রামু কহিল,—হলো না কিছু পিশিমা···পুলিশ এখনো তদারক করচে। তদারক শেষ না হওয়া অবধি···

যোগমায়া দেবী রামুর পানে চাহিয়া রহিলেন,·· পলক-হীন দৃষ্টি।

রামু তাঁর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিল,—পিশে-মশায় খাবার কিনে তাকে খাইয়েচেন,—পুলিশ-সাহেবের কাছে আমাদের উকিল খাওয়ানোর কথা বলায় হুকুম পাওয়া গেছলো···

মার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। কাশিয়া গলাটা সাফ করিয়া যোগমায়া দেবী কহিলেন—কিছু বললে?···

প্রশ্নের সহিত অসহ বেদনা একেবারে উথলিয়া উঠিল… এতখানি বেলার মধ্যে তার স্বর কাণে বাজে নাই, তার দৌরাত্ম্যে এ-বাড়ীর প্রতি কোণ ও দিনের প্রতি নিমেষ কি ভাবেই না পরিপূর্ণ থাকিয়া গম্ গম্ করিত! দুধের বাছা…

মা নিশ্বাস ফেলিলেন। সে-নিশ্বাসে বেদনার কি জ্বালা!

রামু কহিল—কোনো কথা বল্‌লে না…কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো…

—কাঁদচে ?

—না। যেন পাথরের মূর্ত্তি!

যোগমায়া দেবী আবার নিশ্বাস ফেলিলেন। রামুকে কহিলেন—মাথায় জল দিয়ে খেয়ে নে বাবা…দেরী করিস্ নে আর। পিত্তি প'ড়ে অসুখ করবে না হ'লে…

রামু কহিল,—পিশেমশায় আসুন…

যোগমায়া দেবী কহিলেন—তিনি কোথায় রইলেন ?

রামু কহিল,—উকিলের কাছে। বললেন, সন্ধ্যার আগে ফিরতে পারবেন না…থানায় যাবেন ফের…

ছেলের উপর জীবনের এ স্নেহ…অন্ধকারে যেন আলোর উজ্জল রশ্মি! এত বেদনার মধ্যে মার মনে এই সান্ত্বনাটুকু বড় হইয়া জাগিল। কিন্তু কেন এ স্নেহ হঠাৎ ঐ নির্ব্বিকার লোকটির মনে উদয় হইল, ভাগ্যে যোগমায়া দেবী তা জানেন না। জানিলে…

দশম পরিচ্ছেদ

আঁধারে আলো

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। বলাইকে লইয়া বহু স্থান ঘুরিয়া পুলিশ অফিসার বিধু বাবু থানায় ফিরিলেন, ফিরিয়া কহিলেন,—জবর ছেলে মোদ্দা…একেবারে স্পীকৃটি নট্…আদায় করো তো দেখি একটি কথা—বুঝবো, বাহাদুর।

বড় ইনস্পেক্টর একখানা খাতা দেখিতেছিলেন। খাতাখানা ঠেলিয়া রাখিয়া তিনি বলাইয়ের পানে চাহিলেন, কহিলেন,—কি হে ছোকরা, কেন মিছে এত দুঃখ পাও? নাম-ধামগুলো ব'লে দাও…তুমিও খালাস পাবে, আমরাও বাঁচবো। তোমায় সাক্ষী ক'রে নেবো এ মকর্দ্দমায়…না হ'লে জেলে যেতে হবে সোজা…

রূপকথায় মহাপরাক্রান্ত সেই রাজার কথা লেখা আছে, —শত্রুর হাতে বন্দী হইয়া মরণ-ভয়েও যার বুক কাঁপে নাই, শত্রুর শত-সহস্র ভীতির বিরুদ্ধে দর্পস্ফীত দৃষ্টিতে চাহিয়া মরণের ভয় যে তুচ্ছ করিয়াছিল—বলাইয়ের মুখে-চোখে তেমনি তাচ্ছল্যের ভাব! জেলের ভয় তার প্রাণকে এতটুকু বিচলিত করিল না!

বড় ইনস্পেক্টর কহিলেন,—বলবে না?…আমরা জানতেই পারবো। তোমার চেয়ে কত বড়-বড় বিচ্ছু…বলে, হার মেনে গেল…আর তুমি তো একটা ক্ষুদ্র ফড়িং হে বাপু। ও বিধু বাবু, ওর বাপকে ডাকান্ না…ছেলেকে সৎপরামর্শ দিক…

বিধু বাবু জীবনকে ডাকাইলেন। থানার কম্পাউণ্ডের একধারে জীবন দীন মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া ছিল, যেন বেদনার এক রাশ স্তম্ভিত দীর্ঘ নিশ্বাস…বাক্যহারা, চিন্তাহারা জড় পদার্থের মত!

বিধু বাবুর কথায় জীবনের চেতনা ফিরিল। তার সারা মনে কে যেন বিছুটির জ্বালা ধরাইয়া দিল! তার অপরাধে ঐ একরত্তি ছেলেটা এত দুর্ভোগ সহে কি বলিয়া? একটা মুকুলিত জীবন…দুনিয়ার বুকে আজো যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার শক্তি পায় নাই…কিন্তু…ছেলেকে জীবন জানে— কি সর্ব্বনেশে তার জিদ, কি দুর্জ্জয় গোঁ—কারো কথায় কোনো দিন সে কোনো কাজে হটিতে জানে না!…তবু… হাজার হোক্ বাপের প্রাণ…

জীবন কহিল,—আমায় একটু আড়ালে যদি বোঝাতে দেন…দেখি চেষ্টা ক'রে।

বিধু বাবু কহিলেন,—দেখুন। ঐ পাশের কামরায় নিয়ে যান। ওহে ছোকরা, তোমার বাবা কি বলচেন, ঐ ঘরে গিয়ে শোনো…

বলাই বাপের পানে চাহিল। বাপের উপর ঘৃণার অন্ত ছিল না—কিন্তু বাপের পানে চাহিয়া তার মমতা হইল— বাপের কি শ্রী হইয়াছে! বেচারা! সারাদিন ধরিয়া আজ তার পিছনে কি আকুল বেদনার্ত্ত মনেই না বাবা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে…যাকে-তাকে ধরিতেছে এ বিপদে নিস্তার পাইবার আশায়!…বলাই কথা শুনিল, বাপের সঙ্গে পাশের কামরায় গিয়া দাঁড়াইল।

জীবন তার হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিল,—একটা প্রচণ্ড নিশ্বাস ঝড়ের বেগে বুক ভাঙ্গিয়া বাহির হইল।

জীবন ডাকিল—বাবা বলাই…

বলাই বেশ অবিচল দৃষ্টিতে বাপের পানে চাহিল।

জীবন কহিল—সত্য কথা বল্ বাবা···তোকে ছেড়ে দেবে···আর চেপে রাখিস্ নে···

বলাই সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল, কাছে কেহ নাই··· বলাই কহিল—তার পর ?

জীবন জানে, তার পর কি! তবু সে যে বাপ···জীবন কহিল,—আমায় ধরবে? ধরুক, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক···তা ব'লে তুই বিনাদোষে এত বড়···

জীবনের স্বর গাঢ় এবং দুই চোখ সজল হইয়া উঠিল।

বলাই ঘাড় নাড়িয়া কহিল,—না।···

জীবন মিনতি-ভরা স্বরে কহিল—লক্ষ্মী বাবা আমার, কথা শোনো···

বলাই চক্ষু মুদিল। এই বয়সেই অতীতের যতখানি মনে পড়ে, তার মধ্যে কৈ, বাপের এমন স্নেহ-ভরা স্বর কখনো শোনে নাই!

জীবন কহিল—তোকে এরা ছেড়ে দেবে, বাবা···তুই বাড়ী চ'লে যাবি। তার কথা ভাব্, তোর মা···মাটীতে মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে সেই কাল রাত থেকে, মুখে একটু জল অবধি দেয় নি···তার কথা ভাব্···

বলাইয়ের বুক অসহ্য বেদনায় যেন ফাটিয়া যাইবে·· মা, মা, স্নেহময়ী, দুঃখিনী মা···একবার ছুটিয়া গিয়া মার বুকে মুখ রাখিয়া মাকে যদি ডাকিতে পারিত···কিন্তু তা হয় না—হইবার নয়!

বলাই কহিল—তা হ'তে পারে না, বাবা। এই বয়সে তোমার সে লাঞ্ছনা—না, তা হ'তে পারে না।···যদি সাজা হয়, সারা জীবন সে-অপমান আমরা সকলে মাথায় বয়ে বেড়াবো? না, না···

সে চিন্তায় জীবন শিহরিয়া উঠিল। পরক্ষণে কহিল,—অপমান এতেও তো আছে, বাবা। লোকে জানবে, বলাই চোর—অথচ···

বলাই কহিল,—আমি চোর···এ অপবাদ আমি সইতে পারবো বাবা। কিন্তু মা-বাপের এ অপবাদ কোনো ছেলে সইতে পারে না···

জীবন কহিল—কিন্তু আমি কোন্ মুখে ফিরবো? আমার সারা মন যে জ'লে যাচ্ছে। আমিই যে তোকে বাঘের এ খাঁচায় পুরে দিছি বাবা···

বলাই কহিল,—চিরকাল তো জেলে আমায় আটকে রাখবে না। এক দিন বেরুবোই তো। তত দিন? ভেবো, যে, ছেলে বাড়ীতে ঝগড়া ক'রে কোথাও চ'লে গেছে। এক-বার তো সেই গিয়েও ছিলুম—সে দু'দিনের জন্য, এ নয় দু'মাস, তিন মাস, কি আরো বেশী।

জীবনের মনে পড়িল, জেদী ছেলের সে কীর্ত্তির কথা! বছরখানেক পূর্ব্বে ভাইয়েদের সঙ্গে বিষম ঝগড়া-মারামারি করিয়াছিল, বাপের কাছে কাণ-মলা খাইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। জীবন সেদিকে তখন ভ্রূক্ষেপও করে নাই···যোগমায়া দেবী এর-তার খোসামোদ করিয়া কত সন্ধানে ছেলেকে ফিরাইয়া আনেন্···

ছেলের হাত ধরিয়া জীবন বহু মিনতি করিল, এমন কথাও বলিল যে, বলাই না রাজী হইলেও জীবন সব কথা পুলিশের কাছে বলিয়া নিজেকে পুলিশের হাতে সঁপিয়া দিবে···

শুনিয়া বলাই কহিল—তাতে দু'জনেই যাবো···মা তাতে বাঁচবে?···

জীবন চুপ করিয়া রহিল। বলাই কহিল—এ বুদ্ধি না ক'রে বেশ তো উকিল দিয়েচো, দাও···মামলা জিততেও তো পারো···এমনও তো হয়!···দু'জনে জেলে ঢুকলে সংসারটার কি হবে, ভেবে দেখো··

সে কথা ঠিক!···যেমন করিয়া হউক, ঠাটটা বজায় রাখিয়া কোনো মতে সংসার চলিয়া যাইতেছে···ভুবন আর সুবল··· অমন ছেলে, অবাধ্য যত হউক, এদিকে মানুষ হইবার আশা তাদের বিলক্ষণ! দুঃখ তো এদের দ্বারা ঘুচিবে একদিন!

জীবন জেলে গেলে সমস্ত আশা-ভরসার সঙ্গে সংসারটাও একেবারে চূরমার হইয়া যাইবে!···বলাই? এর পর নয় বিদেশে কোথাও তাকে একটা কারবার করিয়া দিলে···

পুরুভুজের দীর্ঘ দেহের মত ভবিষ্যতের এক অপরূপ ছবির আভাস জীবনের মনে বিপুল বিস্তারে ফুটিয়া উঠিল।

বাহিরে আসিয়া জীবন কহিল—না, ফল হলো না!

বিধু বাবু কহিলেন,—ও ছেলে নয়, একটি রত্ন! যাক, আমরা সন্ধান পাবোই—পুলিশের কাজে চুল পাকালুম কি মিছিমিছি···

বিধু বাবুর দর্প সত্ত্বেও কিন্তু ব্যাপারটার বিশেষ কূল-কিনারা মিলিল না।

বলাইয়ের আশঙ্কা ছিল ঐ খোট্টা গাড়োয়ানটার জন্য—

সে যদি !···কিন্তু সে-ও তেমনি নির্ব্বাক্! বেচারা সাফ বলিয়া দিল, সে নগদা মুটের কাজ করে, গাড়োয়ানির লাইসেন্সও তার নাই। তাকে নগদ দশ টাকা দিয়া এক জন লোক ডাকিয়া আনিয়া বলে, মাল-সমেত ঐ গাড়ী চেতলায় পৌছাইয়া দিতে হইবে···

গাড়ীর সন্ধান করিয়া জানা গেল, গাড়ীতে যে নম্বর আছে, সেটা জাল। এই গাড়ী বাগবাজারের রজ্জব আলি আসিয়া সনাক্ত করিল, তার গাড়ী। সাত দিন পূর্ব্বে চুরি গিয়াছিল। পুলিশে সে ডায়েরি দিয়া রাখিয়াছিল, গাড়ীর সন্ধান পায় নাই!···

বিধু বাবু কহিলেন,—এ সব ষড়!

কিন্তু আইনের শৃঙ্খল দীর্ঘ ও সুদৃঢ় হইলেও তাহাদের বাঁধিবার পক্ষে প্রমাণের অভাব।···

অগত্যা খোট্টার সঙ্গে বলাইকে পুলিশ কাছারিতে চালান দিল বিচারের জন্য···

জামিন মিলিল না। হাকিম বড় কড়া···একফোঁটা ছেলের এতখানি শক্তি দেখিয়া তিনি বিষম তাতিয়া উঠিলেন। বাপকে দেখাইয়া উকিল কহিলেন,—এই বাপের জন্য··· হুজুর···

বাপের পানে চাহিয়া হাকিম কহিলেন—ছেলের মায়ায় অন্ধ হয়েচেন আপ···শায়েস্তার মধ্যে রাখতে পারেন নি! I have no sympathy with such fathers!

···ঘরে ঘরে সন্ধ্যার দীপ জ্বলিয়াছে অনেকক্ষণ! মাতালের মত টলিতে টলিতে জীবন আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

দালানে বসিয়া ভুবন খাতা পাড়িয়া অঙ্ক কষিতেছে—সুবল কি সব নোট লিখিতেছে। বাড়ীর এই বিপর্য্যস্ত ভাবের মধ্যে তারা দুটি ভালো ছেলে অচপল চিত্তে নিজেদের কাজে মত্ত!···

মা একখানা চিঠি পড়িতেছিলেন। চাঁপাতলার বাড়ীতে পৈতা উপলক্ষে ছাপানো নিমন্ত্রণের পোষ্টকার্ডে ছাপা-কথাগুলার ফাঁকে ফাঁকে লেখা চিঠি! বিন্দু লিখিয়াছে—

জ্যাঠাইমা, তোমাদের জন্য বড় মন কেমন করিতেছে। বলাই-দা কেমন আছে? তাকে বকিয়ো না। বলাই-দা ভালো ছেলে। এ বয়সে দৌরাত্ম্য সব ছেলেই করে। বলাই-দার জন্য কুঁড়ো রাখিয়া আসিয়াছি। বলাই-দা সে কুঁড়ো লইয়া মাছ ধরিতেছে খুব—না? আমরা কবে যাইব, জানি না। আমার প্রণাম লইও। বলাই-দার স্কুলের ছুটী হইবে কবে?

স্নেহের বিন্দু।

যোগমায়া দেবীর আঁধার-মনে জ্যোৎস্নার ধারা ফুটিল। পাকা গৃহিণীর মত মেয়েটা চিঠি লিখিয়াছে, ছাখো···ঠোঁটে মৃদু হাসিও ফুটিল।

এমন সময় জীবন আসিয়া রোয়াকে বসিয়া পড়িল।

যোগমায়া দেবী কহিলেন—কি খপর গা? তাঁর বুক কাঁপিয়া উঠিল এক অজানা ভয়ে···

আর্ত্ত ক্রন্দনে ফাটিয়া জীবন বলিল,—জামিন দিলে না হাকিম···

যোগমায়া দেবীর পায়ের তলায় সারা পৃথিবী দুলিয়া উঠিল। কোনো মতে দেওয়াল ধরিয়া তিনি সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। চোখের সামনে চাঁদের ক্ষীণ জ্যোৎস্নাটুকু দপ্ করিয়া নিভিয়া গেল। [ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

পরলোকে প্রমদাচরণ

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল বাঙ্গালী বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর নাম-গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, সার প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। গত ৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ্চ, শুক্রবার দিন তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সার প্রমদাচরণ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ১০ই এপ্রেল তারিখে বালি উত্তরপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে বিদ্যা-শিক্ষা সাঙ্গ করিয়া তিনি কিছু দিন এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতী করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি মুন্সেফের কার্য্যে নিযুক্ত হন। বিচার-বিভাগে কার্য্যকালে তাঁহার ব্যবহারশাস্ত্রে অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার কথা চারিদিকে ব্যক্ত হইয়া পড়ে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি আগ্রার ছোট আদালতে বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার পূর্ব্বে ঐ পদ সিবিলিয়ানদেরই একচেটিয়া ছিল। ইহার পর প্রায় ৩০ বৎসরকাল তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। জজিয়তি হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তিনি আর কোন বিশেষ সাধারণ কার্য্যে যোগদান করেন নাই। এ জন্য তাঁহার নাম এ যুগের বাঙ্গালীর নিকট বিশেষ পরিচিত নহে। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি যে অতীত যুগে বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, এ জন্য তাঁহার নাম এ যুগের বাঙ্গালীরও বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার পুত্র ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ। জজের পুত্র জজ এ দেশে বিরল।

নবদুর্গা

(উপন্যাস)

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রভার কীর্ত্তি

রামসিং দ্বারবান্, নবদুর্গার গ্লাসে যে পরিমাণ সিদ্ধি ঢালিয়াছিল এবং তাহাতে যে পরিমাণে ধুতুরার রস মিশাইয়াছিল, নবদুর্গা উহা পান করিলে বোধ হয় পরদিন দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইত না। কিন্তু প্রভাবতী একে কাশীর মেয়ে, তাহাতে, নবদুর্গার ভাষায়, একটু "অন্য রকম" মেয়ে, সিদ্ধিপানে বিলক্ষণ অভ্যস্তা—তাই, রাত্রি ২টা আন্দাজ সে সচেতন হইয়া উঠিল।

চক্ষুযুগল তখনও তাহার মুদ্রিত। চেতনালাভের সহিত তাহার প্রথম অনুভূতি—অসহ্য ক্ষুধা—যেন তাহার অভ্যন্তর-প্রদেশে একটা ব্যাঘ্র প্রবেশ করিয়াছে। তাহার দ্বিতীয় অনুভূতি—একটা বিশ্রী শব্দ, এবং তৃতীয় অনুভূতি—একটা দুর্গন্ধ। প্রভা ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিল।

চক্ষু খুলিয়া দেখিল, সে এক অপরিচিত কক্ষে অপরিচিত পালঙ্ক-শয্যায় একাকিনী শয়ন করিয়া আছে। কিয়দ্দূরে টেবিলের উপর একটা বড় ল্যাম্প দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। সেই টেবিলেই একটা চতুষ্কোণ ক্লক-ঘড়ি টিক্‌টিক্ করিতেছে। দেওয়ালগুলি পেণ্ট করা, আসবাবপত্রও ধনিজনোচিত।

প্রভা ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া দেখিল, মার্ব্বেল-টালি বিছানো মেঝের উপর, পালঙ্কের নিকটেই এক স্থূলকায় প্রৌঢ়-বয়স্ক পুরুষ পড়িয়া গভীর নাসিকাগর্জ্জনে নিদ্রা যাইতেছে। তাহার বেশবাস বিশৃঙ্খল, বমি করিয়াছে, সে পদার্থ তাহার নিজের পাঞ্জাবী বহিয়া মেঝের উপর পড়িয়া জমিয়া রহিয়াছে। মাতাল নামক জানোয়ার প্রভার নিতান্ত অপরিচিত ছিল না, ব্যাপারটা সে অনুমান করিতে পারিল

প্রভাবতীর নেশা তখনও বেশ রহিয়াছে। প্রথমটা এই সকল দেখিয়া সে কিছুই বুঝিতে পারিল না—বিস্ময়ের সহিত ভাবিতে লাগিল, এ কোথায় সে আসিয়াছে, কেমন করিয়াই বা আসিল, মেঝের উপর পড়িয়া ও মাতালটাই বা কে? হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল নিজ মণিবন্ধে নূতন উজ্জ্বল স্বর্ণবলয়-যুগলের উপর। তখন ধীরে ধীরে পূর্ব্বকথা সকল তাহার স্মরণ হইতে লাগিল। নবদুর্গার সহিত তাহার বস্ত্রালঙ্কার-বিনিময়, ছদ্মবেশিনী নবদুর্গার পলায়ন, অন্ধকার ঘরে হরিশের মার দেওয়া সিদ্ধিপান—সমস্তই মনে পড়িয়া গেল। তখন আর আসল ব্যাপারটা বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না। আপন মনে অস্ফুট স্বরে সে বলিতে লাগিল—'ওহ্, তুমিই বুঝি সেই মোহান্ত মুখপোড়া! আর এই বুঝি তোমার সিকরোলের বাসা! নবদুর্গা মনে ক'রে আমাকেই বেহুঁস ক'রে চুরি ক'রে এনেছ! আর মনের আনন্দে কোসে মদ গিলে, খাটে উঠতে গিয়ে বোধ হয় দুম্ ক'রে প'ড়ে জমি নিয়েছ! দাঁড়াও, তোমায় আমি মজা দেখাচ্চি— গেরস্তোর ঝি-বউয়ের উপর লোভ করার মজা তোমায় আমি ভাল ক'রে টের পাওয়াচ্চি। একখানা ধারালো ছুরি কিম্বা ক্ষুরটুর কি খুঁজে পাব না? একটি কাণ তোমার কুচ্ ক'রে কেটে নিয়ে এ বাড়ী থেকে যদি আমি না পালাই, তবে আমার নাম প্রভা বামনীই নয়।"

মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া প্রভা ক্রোধভরে খাট হইতে নামিয়া ছুরি অন্বেষণে কক্ষখানির চারিদিকে ঘুরিল, কিন্তু পাইল না। গোসলখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, সেখানেও কিছু মিলিল না। অর্গলবদ্ধ দ্বার খুলিয়া দেখিল, একটা বড় হল, দুই দিকের দেওয়ালে দুইটা দেওয়ালগিরি জ্বলিতেছে. মধ্যস্থলে চক্‌চকে শাদা কাপড়ে ঢাকা একটি টেবিল। নিকটস্থ হইয়া দেখিল, টেবিলের উপর কাঁটা চামচ রহিয়াছে. ঢাকা দেওয়া কয়েকটা ভোজনপাত্র, একটা ডিশে কয়েকটি

ল্যাংড়া আম, আর একটায় এক থোলে বড় বড় লাল লাল সুপক্ক লীচুও আছে।

"হাঁ—এই যে ছুরি, বেশ চক্‌চকও করছে!" বলিয়া প্রভা একটা তুলিয়া লইল। ছুরি রাখিয়া ঢাকাগুলা খুলিয়া দেখিল, পাত্রে পাত্রে নানাবিধ খাদ্য চপ, কাটলেট, কারি, পোলাও প্রভৃতি। খাদ্যগুলি দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল—"জয় মা অন্নপূর্ণা! কাণ পরে কাটবো, আগে খেয়ে প্রাণটা বাঁচাই ত!" —চেয়ারে বসিয়া প্রভা প্রথমটা চপ-কাটলেটগুলা গোগ্রাসে ভোজন করিতে লাগিল। ক্ষুধা কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে ধীরে সুস্থে খাইতে ও হাসিতে লাগিল এবং মনে মনে বলিল,—"এ সব নিশ্চয় ঐ মোহান্ত ড্যাকরার জন্যে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু বিধাতা না মাপালে কেউ কি খেতে পায়? যার কপালে থাকে, সে খায়।" জগে ভর্ত্তি জল ছিল, গ্লাসে ঢালিয়া তাহা পান করিল। এখনও বেশ ঠাণ্ডা রহিয়াছে, বোধ হয়, বরফ দেওয়া ছিল। দুইটা আম ও গোটা কতক লীচু খাইয়া প্রভা ভোজন শেষ করিল। কক্ষের এক প্রান্তে একটা বারান্দার মত দেখা যাইতেছিল। জলের জগটা হাতে করিয়া সেখানে গিয়া প্রভা আচমন করিয়া আসিল। তোয়ালে ছিল, মুখ-হাত মুছিয়া, টেবিলের উপরেই রূপার ডিবাভর্ত্তি পাণ ছিল, দুইটা মুখে দিয়া বলিল, "বাঃ, বেশ গোলাপ দেওয়া! নাঃ, লোকটা সৌখীন আছে বলতে হবে। হাজার হোক্, মস্ত বড়লোক ত!"

ছুরিগুলা একটার পর একটা তুলিয়া লইয়া অঙ্গুলি দ্বারা তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিতে করিতে বলিল, "এতে কি কাণ ভাল কাটবে? দেখতেই চক্‌চকে, ধার কৈ?"

চর্ব্ব্যচোষ্য ভোজনে প্রভার মনটা এখন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে—রাগ পড়িয়া গিয়াছে, নেশাও অনেকটা কাটিয়া আসিয়াছে। মনে মনে বলিল, "থাক্, কাণ কেটে কায নেই। এখন পালাবার চেষ্টা দেখি। নামবার সিঁড়ি কোথায়?"

হলের এ দিকে দুইটি, ও দিকে দুইটি ঘর,—এদিকের একটিতে মোহান্ত পড়িয়া আছে, অপর ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রভা দেখিল, মেঝের উপর বিছানা পাতিয়া, মাথার কাছে হরিকেন লণ্ঠন লইয়া ভৃত্যবেশী এক ব্যক্তি শুইয়া ঘুমাইতেছে। অপর দিকের দুইটি ঘরের একটি তালাবদ্ধ—অপরটি খোলা এবং তাহার মধ্যে কতকগুলা আজে-বাজে জিনিষ। অন্য একটি দ্বার খুলিয়া দেখিল, নামিবার সিঁড়ি রহিয়াছে বটে, কিন্তু অন্ধকার। প্রভা আস্তে আস্তে গিয়া ভৃত্যের ঘর হইতে লণ্ঠনটা লইয়া আসিল। পাণের ডিবা হইতে আর দুইটি পাণ লইয়া মুখে দিয়া ভাবিল, ডিবাশুদ্ধ বাকী পাণগুলা লইয়া গেলে হয়। তার পর ভাবিল—না, শেষে কি চুরির ফেঁসাদে পড়িব?—ডিবা খালি করিয়া পাণগুলা আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া, লণ্ঠন হাতে করিয়া সিঁড়ি নামিতে লাগিল। কিন্তু সিঁড়ির শেষে গিয়া দেখিল, দ্বার ভিতর হইতে তালাবদ্ধ। "তাই ত! মহামুস্কিলে পড়লাম যে!"—বলিয়া লণ্ঠন হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিল। আর কোনও পথ যদি থাকে, কিছুক্ষণ বৃথা অন্বেষণ করিয়া, অবশেষে শ্রান্ত হইয়া হলঘরের একটা সোফার উপর বসিয়া পড়িল।

বসিয়া বসিয়া তাহার ঘুম পাইতে লাগিল। "রাত আর কত আছে?"—বলিয়া প্রভা উঠিল। মোহান্তের শয়ন-কক্ষে ক্লক-ঘড়ি আছে লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু সে ত ঘড়ি দেখিতে জানে না। রাত্রিতে আকাশ দেখিয়া অনেকটা অনুমান করিতে পারে। পশ্চাতের বারান্দায় বাহির হইয়া আকাশ দেখিয়া সে অনুমান করিল, ভোর হইতে এখনও বিলম্ব আছে। "আমি ত বন্দিনী—কি করি এখন?"—ভাবিতে ভাবিতে সে আবার মোহান্তের শয়নকক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল। দেখিল, মোহান্ত যে কাতে ছিল, সে কাতে নাই—কখন্ পাশ ফিরিয়াছে। একদৃষ্টে মোহান্তের মুখপানে সে চাহিয়া রহিল। লোকটার দুরবস্থা দেখিয়া তাহার মনে কেমন মায়া হইল। পালঙ্ক হইতে একটা বালিস টানিয়া, উহা সাবধানে মোহান্তের মাথার নীচে দিল।

"কোথায় শুই বাকী রাতটুকু? এই ঘরেই শোব খাটের উপর? কিন্তু যে দুর্গন্ধ—রাম রাম!"—বলিতে বলিতে প্রভা স্নানকক্ষে প্রবেশ করিয়া, এসেন্সের একটা শিশি আনিয়া, খানিকটা শয্যায় ঢালিল, খানিকটা নিজ বস্ত্রাঞ্চলে ঢালিল। প্রাতে চাকরটা পাছে ঘরে ঢুকিয়া পড়ে, তাই দুয়ারে খিল বন্ধ করিয়া আসিয়া এসেন্স-মাখা আঁচলে মুখ গুঁজিয়া শয্যায় শয়ন করিল। মনে মনে বলিল—"বেলা চটা ৭টার আগে মাতালটা বোধ হয় জাগবে না— তার আগে চাকরটা উঠবে নিশ্চয়, সিঁড়ির দরজা খুলিবে, আর আমি উঠে চম্পট দেবো।"

ক্লকে টং টং করিয়া ৭টা বাজিবার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রভার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে চক্ষু খুলিয়া দেখিল, বেলা

হইয়াছে, বাহিরে বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। পালঙ্ক হইতে নামিয়া দেখিল, মাতাল সেই ভাবেই পড়িয়া ঘুমাইতেছে। প্রভা তাড়াতাড়ি গোসলখানায় গিয়া, চোখে মুখে জল দিল। তার পর দুয়ার খুলিয়া হলে বাহির হইয়া দেখিল, দেওয়াল-গিরিগুলা সেই ভাবেই জ্বলিতেছে। "চাকরটা তবে কি এখনও ওঠে নাই?"—বলিতে বলিতে দ্রুতপদে সিঁড়ি নামিয়া দেখিল, দ্বার সেই ভাবেই বন্ধ। তখন তাহার মাথায় একটা নূতন মৎলব আসিল।

পুনরায় গোসলখানায় প্রবেশ করিয়া মুখে হাতে বেশ করিয়া সাবান দিয়া, হেজলীন প্রভৃতি দ্রব্যের সাহায্যে নিজ প্রসাধনক্রিয়া সম্পন্ন করিল। চুল বেশ করিয়া আঁচড়াইয়া, শাড়ীখানা একটু লাট হইয়া গিয়াছিল, তাহা ভাল করিয়া গুছাইয়া পরিয়া দর্পণ-সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপন মনে বলিল, "নবদুর্গা নবদুর্গা ক'রে মিন্‌ষে অত হামলাচ্ছে কেন? তার রঙটাই না হয় খুব ফর্শা—আমিও ত সত্যি রক্ষে-কালীর বাচ্ছাটি নই। আমাকেও কত লোকে ত ফর্শাই বলে—তবে হ্যাঁ—তার মতন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ নই, এই যা। চোখ দুটি তার মতন বড় বড় টানাটানা না হলেও, মুখে আমার বেশ মানায়, এ কথা বলতেই হবে। থাক্, এখন পালাব না, মোহান্তের সঙ্গে একটু আলাপ করেই দেখা যাক না—যদি বা গাঁথতেই পারি। সত্যি ত বাঘও নয় ভালুকও নয় যে, আমায় খেয়ে ফেলবে। যতক্ষণ ওর ঘুম না ভাঙ্গে, যাই, হল-ঘরে গিয়ে ব'সে থাকি গে।"—বলিয়া প্রভা খিল খুলিয়া বাহির হইল।

দুয়ারের বাহির হইয়া দুই পা বাড়াইয়াই দেখিল, চাকরটা চোখ মুছিতে মুছিতে তাহার ঘর হইতে বাহির হইতেছে—প্রভাকে দেখিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইল। নবদুর্গাকে কেদারেশ্বরে সে দেখে নাই—সুতরাং ইহাকেই নবদুর্গা মনে করিয়া, খুব ঝুঁকিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

প্রভা কিছুমাত্র ভীত বা অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "তুমি বাবুর খানসামা বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি মহারাজের খাস খানসামা।"

"নাম কি তোমার?"

"শ্রীদীননাথ পরামাণিক।"—বলিয়া দীনু তাহার প্রভুর শয়নকক্ষের দিকে এক পা বাড়াইল।

প্রভা বলিল, "যাচ্চ কোথায়?"

"মহারাজ জেগেছেন কি না দেখ্‌তে।"

প্রভা বলিল, "না, এখন যেও না ও ঘরে। মহারাজ ঘুমুচ্ছেন।"

কথাগুলি প্রভা আদেশের স্বরেই বলিয়াছিল,—দীনু আরও থতমত খাইয়া গেল। মনে মনে বলিল, "ও বাবা, এক রাত্রের মধ্যেই ইনি যে আমার মনিবনী হয়ে উঠেছেন দেখছি! তবে যে শুনেছিলাম—

প্রভা তাহার চিন্তায় বাধা দিয়া বলিল, "চা দিতে পার এক পেয়ালা?"

দীনু বলিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

প্রভা ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ রাণীমা বলবে আমায়। যাও, ষ্টোভ জেলে শীগ্‌গির এক পেয়ালা চা ক'রে নিয়ে এস।" বলিতে বলিতে প্রভা গজেন্দ্রগমনে একটা সোফার দিকে অগ্রসর হইল।

তালাবন্ধ ঘরটি খুলিয়া ভিতরে গিয়া দীনু ষ্টোভ জ্বালিল। মিনিট কুড়ি পরে এক পেয়ালা ধূমায়িত সুগন্ধি চা আনিয়া, একটা ছোট টীপায়া টানিয়া প্রভার নিকট স্থাপন করিয়া বলিল, "বিস্কুট-টিস্কুট দেবো কি?"

প্রভা বলিল, "বিস্কুট! হিঁদুর মেয়ে বুঝি বিস্কুট খায়? সন্দেশ-টন্দেশ থাকে ত আনতে পার।"

দীনু মনে মনে বলিল, "মা ঠাকরুণের নিষ্ঠেটুকুও আছে দেখছি!" প্রকাশ্যে বলিল, "আজ্ঞে, চম্‌চম্ আছে, আর ভাল বর্ফি আছে।"

প্রভা গম্ভীরভাবে বলিল, "দু' রকমই নিয়ে এস।"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া দীনু আবার সেই ঘরে প্রবেশ করিল। আলমারী খুলিয়া একটা ছোট প্লেটে চম্‌চম্ ও বর্ফি সাজাইতে সাজাইতে আপন মনে বলিতে লাগিল, "অবাক্ করলে বাবা! অধর নায়েব ফাঁকি-ফুঁকি দিয়ে কালীঘাটে গিয়ে বিয়ে করলে,.একরাশ টাকা দিয়ে তাকে ভাগিয়ে দেওয়া হ'ল, সিদ্ধি খাইয়ে অজ্ঞান ক'রে ধ'রে আনা হ'ল—কি ক'রে পোষ মানাবে, রাজা ত ভেবেই অস্থির! এক রাতের মধ্যেই ভান্-মতীর খেল্—একবারে রাণীমা! ছিল চা'ল-কলা-খেকো পূজুরী বামুনের মেয়ে,—মহারাজের ঐশ্বয্যি দেখে লোভ সামলাতে পারলে না! ধুত্তোর মেয়ে জাতের মাথায় ঝাড়ু! ছি ছি! কি বেইমান—কি বেইমান!"

চা-পান ও মিষ্টান্ন-ভোজন শেষ করিয়া প্রভা বলিল,

"যাও, এবার তোমার মনিবকে ওঠাও গে। কি কাণ্ড করেছেন, দেখ গে—যাও, ভাল ক'রে স্নান-টান করিয়ে দাও গে।"

মোহান্তের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দীনু দেখিল, তিনি জাগিয়াছেন, কিন্তু এখনও উঠিয়া বসেন নাই। খানসামাকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন, এবং হাই তুলিয়া তিনটি তুড়ি দিয়া বলিলেন, "দীনে, কাল রাতে পাল্কী ক'রে এক জন মেয়েমানুষকে আনা হয়েছিল না?"

দীনু বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, তিনি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন, ধরাধরি ক'রে এনে ঐ খাটে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল।"

"কৈ, তাকে দেখতে পাচ্ছিনে। পালালো নাকি? কি ক'রে পালালো?"

"আজ্ঞে না হুজুর, তিনি পালাবেন কেন? ঐ যে হল-ঘরে ব'সে আছেন। চা চাইলেন, ষ্টোভ জেলে চা বানিয়ে দিলাম। মিষ্টি চাইলেন, চম্‌চম্‌ আর বর্ফি দিলাম, খেয়ে ব'সে আছেন।"

মোহান্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "বলিস্‌ কি রে? ত্যাখ ত্যাখ, ঐ ফন্দি ক'রে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়ে এতক্ষণ বোধ হয় পালিয়ে গেল।"

দীনু বলিল, "না হুজুর, সিঁড়ির দরজার চাবি এখনও আমি খুলিনি। তা ছাড়া, পালাবার কোনও লক্ষণই নেই, থাকবারই লক্ষণ।"

"কেন, কি লক্ষণ দেখলি?"

দীনু তখন কখন্‌ ও কি অবস্থায় স্ত্রীলোকটিকে এই কক্ষ হইতে বাহির হইতে দেখিয়াছে, কি কি আদেশ সে তাহাকে দিয়াছে, সমস্তই প্রভুর গোচর করিল। মোহান্ত হাসিয়া বলিলেন, "রাণীমা ব'লে ডাকতে বলেছে? না তুই এটুকু বানিয়ে বলছিস্‌!"

দীনু কহিল, "না হুজুর, আপনার পা ছুঁয়ে বলতে পারি, তিনি নিজমুখে আমায় হুকুম করেছেন। তাও, একটু রেগে! প্রথমে ত তাঁকে রাণীমা বলিনি আমি, এমনিই কথা কয়েছিলাম।"

মোহান্ত যেন নিজের কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিতে-ছিলেন না—অবাক্‌ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এতটা কি করিয়া সম্ভব হইল? তবে কি কেদারেশ্বরেই তাঁহাকে দেখিয়া ছুঁড়ী মজিয়াছিল? আশ্চর্য্য ত! কিন্তু এ প্রকার আচরণের ইহা ভিন্ন আর কি কৈফিয়ৎ হইতে পারে?

দীনু বলিল, "হুজুর উঠুন, চান করিয়ে দিই। এমন হ'ল কি ক'রে? কখন্‌ প'ড়ে গেলেন?"

মোহান্ত বলিলেন, "আমার কিচ্ছু মনে নেই।"

দীনু বলিল, "রাত তখন ১০টা। পাল্কী এল, ওঁকে ধরাধরি ক'রে এনে খাটে শুইয়ে দেওয়া হ'ল। হুজুর তখন সামনের বারান্দায় ব'সে পেগ খাচ্ছিলেন। একটু ইয়ে হয়ে পড়েছিলেন, আমাতে মাণিক বাবুতে দু'দিকে দু'জন ধ'রে আপনাকে ভিতরে আনলাম। বল্লাম, হুজুর, খেয়ে নিলে ভাল হ'ত। হুজুর বল্লেন, না, আমি এখন শোব, খাবার ঢাকা দিয়ে রাখ, পরে খাব। আমরা হুজুরকে খাটে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিতে চাইলাম। হুজুর আমাদের গাল দিয়ে বল্লেন, খবর্দ্দার, ঘরে কেউ ঢুকিস্‌নে। ব'লেই হুজুর ঘরে ঢুকে খিল বন্ধ করলেন।"

মোহান্ত বলিলেন, "এ সব আমার কিচ্ছু মনে নেই।"

"তার পর কখন উঠে হুজুর খেয়েছেন, আমি তা জান্‌তে পারি নি।"

"খেয়েছি না কি? তাও আমার মনে নেই।"

"হাঁ, টেবিলে ব'সে খেয়েছিলেন, সকালে উঠে দেখলাম। এখন উঠুন হুজুর, আগে চানটা করিয়ে দিই।"

"উঠছি। তুই আগে দেখে আয়, সে—তিনি কি করছেন। আর, সিগারেট দে।"

দীনু প্রভুকে সিগারেট দিয়া, বাহিরে গিয়া দেখিয়া আসিয়া বলিল, "আমাকে দেখেই প্রথমে, আপনি উঠেছেন কি না জিজ্ঞাসা করলেন। উঠেছেন শুনে বল্লেন, 'তুমি ওঁকে চান করাও গে, ষ্টোভ কোথা আছে, আমায় দেখিয়ে দাও, সারা রাত ওঁর খাওয়া হয় নি, আমি বরং ততক্ষণ চায়ের জল ফুটিয়ে রাখি।' আমি টেবিল দেখিয়ে বল্লাম, ঐ যে মহারাজ খেয়ে-ছেন রাত্রে। তিনি বল্লেন, 'মহারাজ বুঝি খেয়েছেন? ও-সব ত আমি খেয়েছি। আধেক রাতে ঘুম ভেঙ্গে যা ক্ষিদে পেয়েছিল আমার! মহারাজকে তোলবার জন্যে কত চেষ্টা করলাম, উনি কি উঠলেন!"

"কি করছেন এখন?"

"ষ্টোভ জ্বালছেন।"—বলিয়া, দীনু প্রভুকে তুলিবার চেষ্টা করিল।

মোহান্ত বলিলেন, "ওরে, আমি যে উঠতে পারছিনে। পাতলা ক'রে একটা পেগ আগে দে আমায়।"

দীনু আদেশ প্রতিপালন করিল।

স্নান করিতে করিতে মোহান্ত ভাবিতে লাগিলেন, "নবদুর্গা আর জন্মে নিশ্চয়ই আমার স্ত্রী ছিল—তাই এ কাণ্ড সম্ভব হয়েছে। স্নান ক'রে চা খেয়েই মাণিককে বাজারে পাঠাতে হবে—এক বস্ত্রে বেচারী এসেছে—এক যোট ভাল শাড়ী আর তার উপযুক্ত জামা-টামা শুদ্ধ কোনও বড় দোকানদারকে নিয়ে আসুক। আর, এক জন ভাল বাঙ্গালী সেকরাও দরকার। সে তখন ও-বেলা হবে।"

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন রাণী

স্নান ও বস্ত্রাদি পরিধান সমাপনান্তে মোহান্ত দীনুকে বলিলেন, "আমি এখন হলঘরে ব'সে চা-টা খাই গে, তুই নীচে গিয়ে মেথরকে ডেকে এ ঘরটা ধোয়া। তুইও বাথরুমের সিঁড়ি দিয়ে উঠবি। আর দ্যাখ, একতলার সিঁড়ির কাছে দারবান্ বসিয়ে রাখ্, বিনা এত্তেলায় কেউ উপরে না আসে, মাণিক ঘোষও না।"

দীনু বলিল, "হুজুরকে চা খাইয়ে, তার পর যাব ?"

"না, উনি রয়েছেন, তোকে দরকার হবে না।"

"তামাক ?"

"না, চা খেয়ে আমি চুরুট খাব এখন।"

দীনু বাহির হইয়া গেল। প্রভা যে ঘরে ষ্টোভ জ্বালিয়াছিল, সে ঘরের দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া বলিল, "রাণীমা, চা ভিজিয়ে দিন, মহারাজের চান হয়ে গেছে। ঐ আলমারীটায় মিষ্টি আছে, ফল-টলও আছে, মহারাজকে দেবেন। আমি এখন নীচে চল্লাম।"

মোহান্ত ভাবিতে লাগিলেন, প্রথম সম্ভাষণে প্রেয়সীকে কি উপহার দেওয়া যায় ? স্ত্রীলোকের উপযোগী কোনও অলঙ্কারই ত এখানে নাই। আংটীগুলা—তাও নবদুর্গার আঙ্গুলে বড় হয়—বর্দ্ধমানে ট্রেণেই তাহা দেখা গিয়াছে। তিনি তখন তাঁহার ক্যাশবাক্স খুলিয়া, একটা হীরার আংটীই বাছিয়া লইলেন। স্থির করিলেন, বলিবেন, এখন এটা রাখ, ও-বেলা সেকরা ডাকিয়ে তোমার আঙ্গুলের মাপে এটা ছোট করিয়ে দেবো।

আংটী হাতে লইয়া হাস্যমুখে মোহান্ত বাহির হইয়া দেখিলেন, তাঁহার নূতন রাণী পিছন ফিরিয়া টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া চা-দানী হইতে পেয়ালায় চা ঢালিতেছে। পাছে মেথর বা খানসামা কিছু দেখিতে পায়, এই জন্য শয়নকক্ষের দ্বারটি নিঃশব্দে বন্ধ করিয়া দিলেন। তার পর নিঃশব্দচরণে টেবিলের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "কি গো, চিনতে পার ?"

প্রভা চা-দানী টেবিলে নামাইয়া মোহান্তের দিকে ফিরিয়া করযুগলে ললাট স্পর্শ করিয়া মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "নমস্কার।—আপনাকে কি ভোলা যায় ?"

মোহান্তের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। তিনি অবাক্ হইয়া প্রভার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কে ? নবদুর্গা কোথায় ?"

প্রভা হাসিমুখে বলিল, "ছি ভাই, এই তোমার ভালবাসা ! দু' দিন অদর্শনেই আমায় একবারে ভুলে গেলে ?"

মোহান্ত বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন, "তোমায় আমি দেখেছি ? কোথায় দেখলাম তোমায় ? তোমার নাম কি ?"

প্রভা সপ্রতিভভাবে বলিল, "কেন, কেদারেশ্বরে, বাপ-মার সঙ্গে আমি যখন গিয়েছিলাম। তার পর, বর্দ্ধমানে, রেলগাড়ীতে, মুখ দেখে আমায় হীরের আংটী দিলে, এরই মধ্যে ভুলে গেছ ? সেই কেদারেশ্বরেই তোমায় দেখে আমি মজেছিলাম, সেই থেকেই মনে মনে তোমায় আমি মন-প্রাণ সমর্পণ করেছি—এখন দাসীকে পায়ে রাখবে না ?"

নবদুর্গার মুখ-চক্ষু মোহান্তের হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে। তিনি বেশ বুঝিলেন, এটা ভয়ানক জুয়াচুরি। ক্রোধের স্বরে বলিলেন, "তুমি বলতে চাও যে, তুমি নবদুর্গা ?"

প্রভা বলিল, "তা নয় ত আমি কে ?"

মোহান্ত দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন, "হারামজাদী ! তুই নবদুর্গা ?—সে একটা পরী—তুই ত একটা পেত্নী ! আমার চোখে ধুলো দিবি তুই ! তোর বাপের সাধ্যি !—নবদুর্গা টাকা খাইয়ে তোকে এখানে পাঠিয়েছে, নিজে পালিয়েছে, এ আমি বেশ বুঝতে পারছি। কে তুই, তাও আমি বুঝতে পেরেছি। তুই বাজারের একটা বেশ্যা।"

তাহাকে পেত্নী বলায় প্রভারও অত্যন্ত রাগ হইয়া পড়িল। ক্রোধে আত্মহারা হইয়া বলিল, "চোপরাও শুয়ার ! মুখ সাম্লে কথা কোস্। আমি পেত্নী ? আমি বাজারের বেশ্যা ? তোর মা-মাসী পেত্নী, তোর মা-মাসী বাজারের বেশ্যা।"

এরূপ সম্ভাষণ মোহান্তের জীবনে এই প্রথম। ইচ্ছা হইল, লাথির চোটে তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া, গলায় পা দিয়া সদ্য স্ত্রী-হত্যা করেন। কিন্তু ইহা কেদারেশ্বর নহে—কাশী, এই চিন্তায় নিরস্ত হইলেন। কম্পিত স্বরে বলিলেন, "হারামজাদী পাজী নচ্ছার বেটী! এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর? তুই জানিসনে যে, তুই কার পাল্লায় পড়েছিস? তোর কি শাস্তি করি আমি, একবার ছাখ। আমার সমস্ত চাকর দরোয়ানকে দিয়ে একে একে তোকে বেইজ্জৎ করিয়ে, তোর নাক-কাণ কেটে তোকে ছেড়ে দেবো—এ ব্যবসা ক'রে আর খেতে হবে না। এই— কোন্ হ্যায়!"

প্রভা দাঁত খিচাইয়া বলিল, "কোন্ হায়, তোর বাবা হায়। তুইও জানিসনে, কার পাল্লায় তুই পড়েছিস! পাজী ছুঁচো হনুমান! তোর কি শাস্তি করি, তাই আগে ছাখ।"— সঙ্গে সঙ্গে সেই গরম চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া মোহান্তের মস্তক লক্ষ্য করিয়া প্রভা ছুড়িয়া মারিল। ঠাঁই করিয়া উহা মোহান্তের মস্তকে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইল, তাঁহার কপাল কাটিয়া গেল এবং গরম চা আর সম্ভবতঃ পেয়ালা-চূর্ণ উভয় চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সাময়িক ভাবে অন্ধ করিয়া ফেলিল। দুই হাতে চক্ষু ঢাকিয়া "বাপ্" বলিয়া তিনি সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন।

পেয়ালা ছুড়িয়া প্রভা নক্ষত্রবেগে ষ্টোভের ঘরে প্রবেশ করিয়া ঝাঁটা আনিয়া, ভূপতিত মোহান্তের মাথায় বক্ষে ছপাছপ করিয়া মারিতে মারিতে বলিতে লাগিল—"হারামজাদা পাজী ছুঁচো রাস্কেল,—গেরস্ত-ঘরের ঝি-বউয়ের দিকে আর কখনও কুনজরে চাইবি? আর চাইবি? আর চাইবি?"— সঙ্গে সঙ্গে ছপাছপ্, ছপাছপ্।

চোখের যন্ত্রণায় মোহান্ত পড়িয়া গোঁ-গোঁ করিতে লাগিলেন। প্রভা ঝাঁটা ফেলিয়া ছুটিয়া সিঁড়ি দিয়া নিম্নে নামিল। নূতন রাণীর মূর্ত্তি দেখিয়া অনুচরেরা সকলে থতমত খাইয়া গেল। প্রভা বলিল, "জীগ্ গির তোমরা সব উপরে যাও, হলঘরে ফিট হয়ে মহারাজ প'ড়ে গেছেন—আমি চল্লাম ডাক্তার আনতে।" ভৃত্যগণ মহারাজের প্রতি নূতন রাণীর অসাধারণ আকর্ষণ ও প্রণয়ের কথা পূর্ব্বেই দীনু খানসামার মুখে অবগত হইয়াছিল; কেহ তাহাকে আটকাইবার চেষ্টা করিল না, সকলে ছুটিয়া উপরে গেল।

প্রভা ফটকের বাহিরে গিয়া একটা চলতি খালি টিকা গাড়ী দেখিতে পাইয়া তাহাতে আরোহণ করিল। নিজের বাড়ী গেল না—গণেশমহল্লায় তাহার এক "সাগর-মা" বাস করিত, তাহারই বাড়ী গিয়া সে এক সপ্তাহ লুকাইয়া রহিল। সপ্তাহ পরে লোক পাঠাইয়া খবর লইয়া জানিল, মোহান্তের সে বাড়ী খালি হইয়াছে, মালী বলিয়াছে, তিনি চক্ষু-চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। প্রভা তখন অজ্ঞাতবাস হইতে বাহির হইল।

ইহার দুই তিন দিন পরেই তাহার সাগর-মার নামে ডাকে এক পত্র আসিল। প্রভার মা লিখিয়াছে, তাহারা নৌকাযোগে কানপুরে পৌঁছিয়া তথায় কোতোয়ালী থানার অতি নিকটে একটি দ্বিতল বাড়ী ভাড়া লইয়া বাস করিতেছে, প্রভাকে যেন অবিলম্বে সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সাগর-মা'র এক আত্মীয়সহ প্রভা কানপুর যাত্রা করিল।

সেখানে পৌঁছিয়া মোহান্তভবনে তাহার কীর্ত্তির কথা প্রভা সমস্তই বর্ণনা করিল। শুনিয়া অধর ও নবদুর্গা হাসিয়া অস্থির হইল, এবং প্রভার খাতিরও তাহাদের নিকট অত্যন্ত বাড়িয়া গেল।

উপসংহার

কাশী হইতে মোহান্ত প্রস্থান করিয়াছে শুনিয়া, বামুন ঠাকরুণ কন্যাসহ ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু অধর বলিল, "মোহান্ত নিজেই কাশীতে নেই, কিন্তু তার লোকজন ত থাকতে পারে। সে যে রকম বজ্জাৎ লোক, সে তোমাদের সহজে ছাড়বে না, তোমাদের উপর ভাল রকম প্রতিশোধ নেওয়ারই চেষ্টা করবে। চাই কি, গুণ্ডা লাগিয়ে তোমাদের খুনও করাতে পারে। এখন তোমাদের কাশী ফিরে কায নেই, যেমন আছ, তেমনি থাক।" —তাহার উপর, অধর তাহাকে তীর্থ-ভ্রমণের লোভও দেখাইল; বলিল, "আমারও নিজের প্রাণের বিলক্ষণ ভয় আছে। বছরখানেক অন্ততঃ আমি দেশে যাব না,—নানা স্থানে ঘুরে বেড়াব। মথুরা, বৃন্দাবন, পুষ্কর, দ্বারকা, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার—এই সমস্ত যায়গায় দুই এক মাস ক'রে বাস করবো। আবার গ্রীষ্মকাল এলে কেদার-বদরী সেরে, মোহান্ত সম্বন্ধে ভাল ক'রে খোঁজখবর নিয়ে তার পর দেশে যাব স্থির করেছি।"—এক দিকে মোহান্ত হইতে বিপদের শঙ্কা, অন্য

দিকে বিনা খরচায় রাজার হালে তীর্থ-দর্শনের লোভে—বামুন ঠাকরুণ সহজেই অধরের প্রস্তাবে সম্মত হইল। নবদুর্গার সহিত প্রভারও বেশ ভাব হইয়া গিয়াছিল, প্রভাও আপত্তি করিল না।

অধর কালীঘাটে আত্মপরিচয় যাহা দিয়াছিল, তাহার আর সকল কথাই ছিল মিথ্যা, কেবল একটি কথা সত্য ছিল। দেশে সত্যই তাহার স্ত্রী ক্ষয়কাস-রোগে ভুগিতেছিল এবং তাহার বাঁচিবার আশাও বড় ছিল না। তীর্থভ্রমণ শেষ করিয়া বৎসরান্তে অধর খবরাখবর লইবার জন্য বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত করিয়া কেদারেশ্বরে এবং তাহার নিজ গ্রাম হালিসহরে পাঠাইল। লোক ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, মোহান্ত ছয়মাস কাল কলিকাতায় থাকিয়া চক্ষু-চিকিৎসা করাইয়াছিলেন, এখন আরোগ্য লাভ করিয়া কেদারেশ্বরে ফিরিয়াছেন বটে, কিন্তু একটি চক্ষু তিনি জন্মের মত হারাইয়াছেন। ইদানীং মোহান্তের চরিত্রের বিরুদ্ধে আর কিছু শুনা যায় নাই। মাণিক ঘোষের প্রতিপত্তি এখন আর পূর্ব্বের মত নাই। হরিশের মাকে তিনি চাল কাটিয়া কেদারেশ্বর হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন,—বাঙ্গারামেরও চাকুরী গিয়াছে, কেবল রামসিং নিজ পদে বাহাল আছে। হালিসহর সম্বন্ধে এই সংবাদ পাওয়া গেল যে, ছয় মাস পূর্ব্বে অধরের প্রথমা পত্নী নিজ পিত্রালয়ে পরলোক-গমন করিয়াছে, তাহার পুত্রটি মাতুলাশ্রমে প্রতিপালিত হইতেছে। মোহান্তের লোকজন হালিসহরে আসিয়া অধরের কোনও সন্ধান লইতে চেষ্টা করিয়াছিল, এরূপ সংবাদ নাই।

অধর এই সকল সংবাদ পাইয়া প্রথমে কাশী গেল। তথায় সপ্তাহখানেক থাকিয়া, উত্তমরূপে দেবদেবী সকল দর্শন করিয়া, বামুন ঠাকরুণ ও প্রভাবতীকে যথোচিত পুরস্কৃত করিয়া শ্বশুরালয় জুড়নপুরে গমন করিল। কানপুরে থাকা কালেই শ্বশুর মহাশয়কে পত্র লিখিয়া সে নিজেদের সংবাদ প্রদান করিয়াছিল, নানা তীর্থ হইতে মাঝে মাঝে পত্রাদি লিখিত। শ্বশুরালয়ে কয়েক দিন অবস্থান করিয়া, নবদুর্গাকে রাখিয়া একাকী হালিসহর যাত্রা করিল।

মোহান্তের নিকট হইতে সদুপায়ে (?) প্রাপ্ত তাহার সেই ১০ হাজার টাকা এবং নায়েবী কার্য্যকালীন অসদুপায়ে অর্জ্জিত টাকাগুলির মধ্যে এখনও ৭ হাজার টাকা অবশিষ্ট ছিল। নিজ বসতবাটী মেরামত করাইয়া, কৃষিকার্য্যের জন্য জমী, হাল, গরু প্রভৃতি কিনিয়া হাতে তাহার সাড়ে তিন হাজার টাকা অবশিষ্ট রহিল। ঐ টাকায় সে তেজারতি ব্যবসায় ফাঁদিল।

আশ্বিনমাসে নবদুর্গার একটি কন্যাসন্তান জন্মিল। শ্বশুর-শাশুড়ীর জন্য নানা উপহার-সহ জুড়নপুরে গিয়া, অধর কন্যার মুখ দেখিয়া আসিল।

অগ্রহায়ণের শেষ সপ্তাহে অধর গিয়া স্ত্রীকন্যাকে লইয়া আসিল, এবং পূর্ব্ব শ্বশুরালয় হইতে তাহার মাতৃহীন পুত্রটিকে আনিয়া, নবদুর্গার কোলে সমর্পণ করিল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সমাপ্ত